ষাণ্মাসিক সূচীপত্র মাসিক বসুমতী

৪২শ বর্ষ] ১৩৭০ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত [১ম খণ্ড

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(তৈলচিত্র)

আত্মহত্যা
—শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪২শ বর্ষ | ১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৭০ | ১ম সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

তোমাদের দেশের লোকগুলির রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটিতে পারিতেছে না—সর্বাঙ্গ paralysis (পক্ষাঘাত) হইয়া যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। আমি তাই ইহাদের ভিতর রজোগুণ বাড়াইয়া কর্মতৎপরতা দ্বারা এ দেশের লোকগুলিকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করিতে চাই। শরীরে বল নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই!—কি হইবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলি দ্বারা? আমি নাড়িয়া চাড়িয়া ইহাদের ভিতর সাড় আনিতে চাই—এইজন্য আমার প্রাণান্তপণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে ইহাদের জাগাইব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই অভয়বাণী শুনাইতেই আমার জন্ম।

এখন বীর্যবান হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ্—সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শনশাস্ত্র—আবার অবলম্বন কর, আর এই সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয়সমুদয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদরূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্যসকল অতি সহজবোধ্য। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহা তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য সকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর।

আমি তোমাদিগকে স্পষ্টভাষায় বলিতেছি, আমরা দুর্বল, অতি দুর্বল। প্রথমত, আমাদের শারীরিক দৌর্বল্য—এই শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের অন্তত একতৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা অলস, আমরা কার্য করিতে পারি না; আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না। ···আমরা ভাবি অনেক জিনিস, কিন্তু কার্যে পরিণত করি না। এইরূপে তোতাপাখীর মত চিন্তা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ? ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে উহা বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে।

আমরা চাই হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মিলন। আমার বলিবার ইহা তাৎপর্য নহে যে—খানিকটা হৃদয় ও খানিকটা মস্তিষ্ক লইয়া পরস্পর সামঞ্জস্য করি, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয় ও ভাব থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক।···জগতে অনন্ত পরিমাণ ভাব-বিকাশের এবং তাহাও সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ শিক্ষা ও বিচারের অবকাশ আছে। উহারা উভয়েই অনন্ত পরিমাণে আসুক—উহারা উভয়েই সমান্তরালরেখায় প্রবাহিত হইতে থাকুক।

জোর করিয়া সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তাহাতে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কাহাকে বলিও না—'তুমি মন্দ'। বরং তাহাকে বল—'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও।'···যদি তুমি কাহাকেও সিংহ হইতে না দাও, তাহা হইলে সে ধূর্ত শৃগাল হইয়া দাঁড়াইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

চিকাগো বক্তৃতা : স্বামী বিবেকানন্দ

[সভামঞ্চে যে সমুদয় বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন :—]

হে বৌদ্ধগণ! তোমাদের পরিত্যাগ করিয়া আমরা উন্নত হইতে পারি না এবং আমাদের ছাড়িয়া তোমরাও উন্নত হইতে পার না। অতএব নিশ্চয় জানিও, আমাদের পরস্পরের অসম্মিলন ইহাই স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, তোমরা ব্রাহ্মণগণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া দৃঢ়তা লাভ করিতে পার না এবং আমরাও তোমাদের ন্যায় উচ্চহৃদয় না পাইলে উন্নত হইতে পারি না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এই হেতুই আজ ভারতবর্ষ ত্রিংশৎকোটি ভিক্ষুকের আবাসভূমি হইয়াছে এবং সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজাতীয় নেতৃগণের দাসত্ব করিতেছে। অতএব আইস, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের উচ্চ হৃদয়, মহান্ আত্মা এবং অসাধারণ লোকহিতকারিতা শক্তির সম্মিলন করিয়া দিই।

বিদায়

[২৭শে সেপ্টেম্বর সপ্তদশ (শেষ) দিবসের অধিবেশন]

জগতে সর্বধর্মমহাসমিতির সম্ভবপরতা আজ সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল; এবং যাঁহারা এই মহাসভা গঠনের জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন ও তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমকে শুভময় ফল দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

যাঁহাদের প্রশস্ত হৃদয় এবং সত্যানুরাগ এই স্বপ্নের ন্যায় আশ্চর্য কাণ্ডকে প্রথমত কল্পনা করিয়া পরে তাহাকে কার্যে পরিণত করিয়াছে, আমি সেই মহানুভবগণকে ধন্যবাদ দিই। এই সভামঞ্চ যে সর্ববাদিসম্মত ভাবসমূহের বর্ষণ দ্বারা পরিপ্লুত হইয়াছে, আমি সেই সকল উদারভাবকে ধন্যবাদ দিই। এই জ্ঞানালোকসমুজ্জ্বল শ্রোতৃমণ্ডলী আমার প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন ও যে ভাবগুলি দ্বারা ধর্মসমূহের পরস্পর বিবাদ কমিয়া যায়, সেই সকল ভাব ধারণাও অনুমোদন করিয়াছেন—তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। এই সুমিলিত স্বরশ্রেণীর ন্যায় শৃঙ্খলার মধ্যে সময়ে সময়ে কিছু বিশৃঙ্খল সুর শুনা গিয়াছে। যাঁহারা সেইরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ দিই, কারণ তাঁহারা ক্ষণিক বিসঙ্গতা দ্বারা এখানকার স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলাকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্মসমন্বয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে যাইতেছি না। কিন্তু যদি এখানে কেহ এরূপ আশা করেন যে, উক্ত সমন্বয় এই সকল বিভিন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা সংসাধিত হইবে, তাঁহাকে আমি বলি, "ভ্রাতঃ, তোমার আশা ফলবতী হওয়া অসম্ভব।" আমি কি ইচ্ছা করি যে খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু হউন?—ঈশ্বর তাহা না করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হউন?—ঈশ্বর তাহা প্রতিষেধ করুন। বীজ ভূমিতে রোপিত হইল। মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে। সেই বীজটি কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া থাকে?—না। সেই বীজ হইতে ক্ষুদ্র বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে আপনার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং মৃত্তিকা, বায়ু ও জলকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই সকল উপাদান দ্বারা স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবর্দ্ধিত করিয়া বৃক্ষাকারে পরিণত হয়।

ধর্মসম্বন্ধেও ঐরূপ। খ্রীষ্টিয়ানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না, কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টিয়ান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মগুলির সারভাগগুলিকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্ব্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে।

যদি এই সর্বধর্মমহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে ত তাহা এই। সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয়, এবং প্রত্যেক ধর্মই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী প্রসব করিয়াছে।

এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এরূপ কল্পনা করেন যে, অন্যান্য ধর্মের বিনাশ হইয়া তাঁহার ধর্মই অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে,—তিনি বাস্তবিকই কৃপার পাত্র; তাঁহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত; তাঁহাকে আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাঁহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্মের পতাকার উপর ইহাই লেখা থাকিবে যে,—"বিবাদ করিও না, পরস্পর সহায়তা কর; পরস্পরকে বিনাশের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিয়া ধারণা কর; কলহ ছাড়িয়া মৈত্র ও শান্তি আশ্রয় কর।"

পরিশিষ্ট

১। কার্ডিন্যাল (পৃঃ ১, পং ১)—খৃষ্টধর্ম দুইভাগে বিভক্ত —রোমান্ ক্যাথলিক্ ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান গুরুর নাম পোপ। সমগ্র ক্যাথলিক ধর্মজগৎ ইঁহার উপদেশানুসারে কার্য করেন। এই পোপের অধীন ৭০ জন কর্মচারী আছেন ইঁহাদের প্রত্যেককেই কার্ডিন্যাল কহে।

২। আপ্তবাক্য (পৃঃ ৯, পং ১৫)—যাঁহারা রাগদ্বেষাদি দ্বারা অভিভূত নহেন, তাঁহাদের কথিত সত্যসমূহের নাম আপ্তবাক্য।

৩। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে (পৃঃ ১৪, পং ১০)—যোগ্য বস্তু যোগ্যের সহিতই যুক্ত হয়।

৪। এই নিয়মানুসারে তদুপযোগী দেহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন…(পৃঃ ১৪, পং ১১)—

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাচাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে।।
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৫ অঃ। ১১, ১২।

ভাবার্থ। ইচ্ছা হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাপারের উৎপত্তি ও তাহা হইতে দর্শন-শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপরে মোহ জন্মিয়া শুভাশুভ কর্মের অবতারণা করে। অন্নপানাদি দ্বারা দেহ যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহী সেই সেই কর্মানুযায়ী দেব, তির্যক্ বা মনুষ্য-যোনিতে স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবদেহ প্রাপ্ত হয়েন।

নিজ নিজ গুণানুসারে দেহী স্থূলসূক্ষ্মাদি নানা দেহ ধারণ করেন, পরে কর্ম ও গুণানুসারে তাঁহাদের অন্য দেহপ্রাপ্ত দেখা যায়।

৫। পূর্বজন্মের সমুদয় কথা মনে করিতে পারিবে ইত্যাদি··· (পৃঃ ১৫, পং ১৬)।

সংস্কারসাক্ষাৎ করণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।—পাতঞ্জল দর্শন।

অর্থ—চিত্তের সংস্কারগুলিকে সংযম অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

৬। সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না ইত্যাদি ···(পৃঃ ১৫, পং ১১)।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।—গীতা, ২।২৩।।

৭। হে অমৃতের পুত্রগণ ইত্যাদি (পৃঃ ১৮, পং ১৮)।—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।।

* * * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ২।৫ ও ৩।৮।

৮। হিন্দুগণ তোমাদের পাপী বলিতে অস্বীকার করেন··· (পৃঃ ১৯, পং ৬)।

অহং দেবো না চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।।
প্রাতঃস্মরণীয়শ্লোকমেকম্।

৯। যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ইত্যাদি····· (পৃঃ ২০, পং ১)।—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। কঠ, ২।৩।৩

১০। হে ভগবান, তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা কিছুই চাহি না·····(পৃঃ ২১, পং ৩)।—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবেদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

১১। আমি ধর্মবণিক নহি···(পৃঃ ২২, পং ৬)।—

নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত।।

* * *

ধর্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্।
—মহাভারত, বনপর্ব ৩১ ২।৫

১২। তখনই তাঁহার সমুদয় কুটিলতা নাশ পায় ইত্যাদি····· (পৃঃ ২২, পং ৮)।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।
মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮ এবং শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।২১।

১৩। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবেন···(পৃঃ ২৪, পং ৭)।—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
—মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯।

১৪। যখন এই নিখিল বিশ্বেই আমার আত্মবোধ হইবে ইত্যাদি·····(পৃঃ ২৫, পং ১)।—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।—ঈশোপনিষৎ, ৭।

১৫। বাহ্যপূজা মূর্তিপূজা প্রথমাবস্থার কার্য ইত্যাদি····· (পৃঃ ৩০, পং ৯)।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা।।
—মহানির্বাণ তন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস। ১২।

১৬। সূর্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না ইত্যাদি····· (পৃঃ ৩০, পং ১৬)।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।—কঠ, ২।২।১৫।

১৭। মণিগণ যেমন সূত্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে ইত্যাদি·····(পৃঃ ৩৪, পং ৬)।—

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।—গীতা, ৭।৭।

১৮। যাহা কিছু অতিশয় প্রভাবশালী ইত্যাদি·····(পৃঃ ৩৪, পং ৮)।—

যদ্ যদ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।—গীতা, ১০।৪১।

১৯। ভিন্নজাতীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই·····(পৃঃ ৩৪, পং ১৪)।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ।—বেদান্তসূত্র, ৩।৪।৩৬।

৫৮

কারাগারে সনাতনের কাছে রূপের চিঠি এসে পৌঁছুল।

প্রহরীকে বললে, 'তুমি জিন্দাপীর, সিদ্ধ মহাপুরুষ। কেতাবে-কোরানে তোমার অগাধ জ্ঞান। এত বড় ভাগ্যবান ক'জন আছে?'

রাজমন্ত্রী প্রশংসা করছে, প্রহরীর চিত্ত আলোড়িত হল।

'যদি কারাগার থেকে কাতর কোনো বন্দীকে মুক্ত করে দাও তবে ভগবানও তোমাকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবেন।' প্রার্থনাপূর্ণ চোখে তাকাল সনাতন: 'তুমি সাধনসিদ্ধ, এ কি আর তোমার অজানা?'

'কী করতে হবে বলুন।'

'মনে আছে আগে আগে তোমার অনেক উপকার করেছি, তুমি এবার তার কিঞ্চিৎ শোধ দাও। আমাকে ছেড়ে দাও, খালাস দিয়ে দাও।' সনাতন কাছে সরে এল, গলা নামিয়ে বললে, 'তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দেব। একসঙ্গে তোমার পুণ্য আর অর্থ দুইই লাভ হবে।'

'কিন্তু রাজাকে বড় ভয়।' প্রহরীও গলা নামাল।

'কিন্তু কে জানে, রাজা হয়তো যুদ্ধ থেকে ফিরেই আসবে না, মারা পড়বে।'

'যদি ফিরে আসে?'

'বলবে প্রাতঃকৃত্য করতে গঙ্গার পারে গেল আর অতর্কিতে ঝাঁপ দিল নদীতে। অনেক খুঁজলাম, সন্ধান পেলাম না। হাতে বেড়ি ছিল, সাঁতার দিতে পারে নি, জলের অতলেই ডুবে মরেছে। আমি মরে গেছি ভেবে রাজা আর তোমাকে শাস্তি দেবে না। শোনো, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি এদেশের ত্রিসীমানায়ও থাকব না, দরবেশ হয়ে মক্কায় চলে যাব।'

তাতেও প্রহরীর মন উঠল না।

'বেশ, সাত হাজার দিচ্ছি।' বললে সনাতন, 'বণিকের দোকানে গচ্ছিত আছে টাকা। তুমি আমাকে নিয়ে চলো তার কাছে। আগে টাকা গুনবে, পরে আমাকে ছাড়বে।'

প্রহরীর মন টলল। রাশীভূত মুদ্রা।

সনাতনকে ছেড়ে দিল। হাতের বেড়ি কেটে দিল। রাতারাতি গঙ্গা পার হয়ে গেল সনাতন।

নিরিবিলি পথ নিল। সঙ্গে চাকর ঈশান। পাতড়া পর্বতে এসে উঠল। সেখানকার ভুঁইয়াকে বললে, 'আমাদের পার করে দিন।'

গুনতে পারত ভুঁইয়া। গুনে দেখল এদের সঙ্গে আটটা মোহর আছে। খুশি মনে বললে, 'স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করো, রাত্রে লোক দিয়ে পার করে দেব।'

স্নানাহার সারল দুজনে। এত সম্মান সদ্ব্যবহার কেন, সন্দেহ হল সনাতনের। আমাকে তো ওর চেনবার কথা নয়, নিতান্ত দরিদ্রবেশ ধরে আছি, তবে কেন এত আপ্যায়ন? এ আবার কোনো বিপদের ছদ্মবেশ নয় তো?

ঈশানকে ডেকে জিগগেস করল, 'তোমার কাছে কি কোনো লোভনীয় জিনিস আছে? টাকা পয়সা?'

ঈশান বললে, 'সাতটা মোহর আছে।'

'এই কাল-যম সঙ্গে এনেছ কেন? দাও, আমাকে দাও।'

সনাতনের হাতে সাত-সাতটা মোহর দিয়ে দিল ঈশান।

সেই মোহর নিয়ে সনাতন ভুঁইয়ার কাছে গেল। বললে, 'এই সাতটা মোহর সঙ্গে ছিল, তাই আপনাকে সম্মানমূল্য দিচ্ছি। আমাদের পার করে দিন। আপনার পুণ্য হবে।'

'সাত নয়, আটটা মোহর আছে।'

'আটটা?'

'তা থাক গে।' ভুঁইয়া হাসল। 'আজ রাত্রে তোমাদের খুন করে মোহর সংগ্রহ করব—এই রকম সঙ্কল্প ছিল। তার দরকার হল না। তুমি নিজের থেকেই দান করতে এসেছ। বাঁচিয়ে দিয়েছ আমাকে নরহত্যার পাপ থেকে। শোনো, এই মোহর আমি নেব না, পাপের চেয়ে পুণ্যেই আমার এখন লোভ হচ্ছে। আমি লোক দিচ্ছি, তোমাকে পর্বত নির্বিঘ্নে পার করিয়ে দেবে।'

মোহর কিছুতেই ফিরিয়ে নেবে না সনাতন। বললে, 'এ শত্রু আমার সঙ্গে থাকলে দস্যুর হাতে আমি মারা যাব। এ মোহর আপনি গ্রহণ করে আমার প্রাণরক্ষা করুন।'

অগত্যা ভুঁইয়া নিল সেই সাত মোহর। সনাতনের জন্যে চারজন দেহরক্ষী নিযুক্ত করল। এরা বনপথে আপনার সঙ্গী হবে।

পর্বত পার হয়ে এসে সনাতন ঈশানকে জিগগেস করলে, 'তোমার কাছে আর কিছু আছে?'

ঈশান বললে, 'শেষ সম্বল আরেকটি মোহর আছে।'

'ওটি তুমি নাও। ওটি নিয়ে ফিরে যাও দেশে।'

ঈশান কাঁদতে লাগল।

সজলচোখে সনাতন বললে, 'আমি কাঙাল হয়ে একা-একা যাব। আমি নিঃসঙ্গ। আমি অকিঞ্চন।'

ঈশান ফিরে গেল।

দীনহীনের মত চলল সনাতন। 'তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিল একলা। হাতে করোয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা।'

নির্ভয়, যেহেতু কৃষ্ণেই আমার আত্মসমর্পণ, কৃষ্ণকেই আমি রক্ষাকর্তারূপে বরণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

শরণাগত আর অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। যাতে কৃষ্ণের প্রীতি সেই অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প, যা কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল তার বর্জন। কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস। রক্ষাকর্তারূপে একমাত্র কৃষ্ণকেই বরণ। আত্মনিক্ষেপ বা আত্মসমর্পণ। আমি আর্ত আতুর অভক্ত, হে কৃষ্ণ, তোমার কৃপা ছাড়া আমার গতি নেই এই দৈন্য বা কার্তর্য জানানো। এই ছয় লক্ষণেই শরণাগতি চিহ্নিত।

সনাতন শরণাগত। সনাতন অকিঞ্চন। সংসারে নিস্পৃহ, কৃষ্ণসেবার জন্যেই সংসারত্যাগী।

'আমার শরণাপন্ন হয়ে যে একবার মাত্র যাচঞা করে, হে ভগবান, আমি তোমার হলাম বলছেন ভগবান, 'আমি তাকে সর্বদা অভয় দিয়ে থাকি।'

'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান॥'

নিজের শক্তির জোরে সাধ্য কী অভিমান মায়া অতিক্রম করতে পারো। একমাত্র ভগবানে শরণাগত হলেই মায়ার প্রভাব থেকে মিলবে অব্যাহতি। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

হাজিপুরে এসে পৌঁছুল সনাতন। এক উদ্যানের পাশে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিল। আপন মনে করতে লাগল হরিনাম।

হাজিপুরেই থাকে শ্রীকান্ত, সনাতনের ভগ্নীপতি। বাদশা গৌড়েশ্বরের ঘোড়া জোগানের কাজ করে। কাছেই হরিহর ক্ষেত্রের মেলা বসে, সেখান থেকে ঘোড়া কিনে গৌড়ে চালান দেয়। তিন লাখ টাকা পুঁজি।

হরিনাম শুনে আকৃষ্ট হল শ্রীকান্ত। এ কী, সনাতন না? রাজৈশ্বর্যে পালিত দেহের এ অবস্থা? কী হয়েছে?

গোপনে শ্রীকান্তকে সমস্ত বললে সনাতন। প্রভুর জন্যে কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছি।

'কিন্তু এ তোমার কী পোশাক? চলো আমার ঘরে, ক'দিন বিশ্রাম কর। দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মুখখানি ভদ্র করো। ছাড়ো এই ধূলিসজ্জা।' শ্রীকান্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সনাতন হাসল, বললে, 'এখানে থাকব না, কাশী যাব। দয়া করে আমাকে গঙ্গা পার করে দাও।'

শ্রীকান্ত দেখল এ আরেক রকম সনাতন। বেশে-বাসে ভদ্রে-সভ্যে স্পৃহা নেই। ঈশ্বর-ভাবনাই তার একমাত্র আচ্ছাদন। ঈশ্বরচিন্তনই তার একমাত্র আহার। ঈশ্বরনির্ভরই তার একমাত্র আনন্দ।

শ্রীকান্ত সনাতনকে গঙ্গা পার করিয়ে দিল। শীতত্রাণ কম্বল দিল একখানা।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল কাশী। শুনল প্রভু এইখানেই আছেন। কোথায়, কার বাড়িতে? খুঁজে পেতে জানতে আর বাকি রইল না—চন্দ্রশেখরের বাড়িতে।

পথ চিনে চিনে চন্দ্রশেখরের বাড়ির দরজায় এসে বসল সনাতন। কে-না-কে এক ভিখিরি এসেছে ভিক্ষের জন্যে কেউ লক্ষ্যের মধ্যে আনল না।

বাড়ির ভেতর থেকে প্রভু বলে উঠলেন: 'দেখ তো এক বৈষ্ণব বুঝি দ্বারপ্রান্তে এসে বসেছে। তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

চন্দ্রশেখর বাইরে বেরুল। কই, কোনো বৈষ্ণব নেই তো।

'কাউকে দেখতে পেলে না?'

'একজন দরবেশ বসে আছে।'

ঐ দরবেশকেই নিয়ে এস।' প্রভু আগ্রহ দেখালেন।

চন্দ্রশেখর নিয়ে এল সনাতনকে। অঙ্গনে এসে দাঁড়াতেই প্রভু ছুটে এসে তাকে আলিঙ্গন করে ধরলেন।

'আমাকে ছুঁয়ো না। ছুঁয়ো না আমাকে।' কেঁদে উঠল সনাতন: 'আমি পতিত, আমি অধম, আমি তোমার স্পর্শের অযোগ্য।'

প্রভু তাকে তাঁর পাশে বসালেন, নিজ হাতে তার গা মুছে দিলেন, বললেন, 'নিজে পবিত্র হবার জন্যে তোমাকে স্পর্শ করছি। ভক্তিবলে তুমি সমস্ত বিশ্ব পবিত্র করতে পারো। যে কৃষ্ণচরণে মন-প্রাণ চেষ্টা বাক্য অর্থ অর্পণ করেছে, সে নীচজাতীয় হলেও ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, হোক না সে ব্রাহ্মণ গুণান্বিত বহুমান। ভক্তি যার নেই, সে পরকে দূরের কথা, নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। তাই তোমাকে দেখতে দাও, ছুঁতে দাও, গাইতে দাও তোমার গুণগান।'

ভক্তের দর্শনই চক্ষুর ফল: ভক্তগাত্রসঙ্গই দেহের ফল; ভক্তের গুণকীর্তনই জিহ্বার ফল। জগতে ভক্তই সুদুর্লভ। 'সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে।'

'কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করলেন।'

'আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি।' বললে সনাতন, 'তুমিই আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছ।'

প্রভু তপনকে আদেশ দিলেন ক্ষৌরকর্ম করিয়ে ভদ্র বানিয়ে দাও।

চন্দ্রশেখর নতুন বস্ত্র দিল। তা নিল না সনাতন। তপন নিয়ে এল তার বাড়ি, প্রভুর পাত্রশেষ নিবেদন করল সনাতনকে। এই মলিন বেশ ছেড়ে একখানা নতুন বস্ত্র পরুন, তপন অনুরোধ করল। সনাতন বলল, 'তোমার পরিহিত পুরোনো একখানা ধুতি দাও, নতুনে আমার রুচি নেই।' পুরোনো ধুতি দিলে তা ছিঁড়ে বহির্বাস ও ডোর কৌপীন করে পরল সনাতন।

বললে, 'আমি মাধুকরী করব, ব্রাহ্মণের ঘরে রোজ-রোজ ভিক্ষে নেব না। কেন ক্ষতিগ্রস্ত করব ব্রাহ্মণকে? কেন তার উদ্বেগের কারণ হব? আর আমার অভিমানের শেষ যদি এখনো কিছু থাকে তার অবসান হবে।'

কিন্তু বারে-বারে প্রভু তার কম্বলখানার দিকে তাকাচ্ছেন কেন? বোধহয় তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। যে মাধুকরী করে খাবে, তার গায়ে তিনটাকার কম্বল মানায় না। তার বৈরাগ্যধর্মের হানি হয়।

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে সনাতন, দেখল কে একজন কাঁথা ধুয়ে শুকোতে দিয়েছে। তাকে বললে, 'ভাই তুমি আমার কম্বলখানা নিয়ে তোমার ঐ ছেঁড়া কাঁথাখানা আমাকে দাও।'

কাঁথার বদলে কম্বল! লোকটা তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল।

কাঁথা গলায় দিয়ে সনাতন দাঁড়াল এসে প্রভুর কাছে। প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণ তোমার বিষয় ভোগ খণ্ডে দিয়েছেন; সদ্বৈদ্য রোগের অবশেষও রাখে না। 'রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ ভোগ।'

সনাতন বসল ঘনিষ্ঠ হয়ে শিক্ষার্থীর ভঙ্গিতে। এত দিন গ্রাম্য ব্যবহারে বিষয় ব্যাপারে দিন কাটালাম, আমাকে যদি উদ্ধার করলেন, এবার তবে আমার কর্তব্য কী বলে দিন। আমি কে, তাপত্রয় আমাকে কেন জীর্ণ করছে, কিসে আমার মঙ্গল?

'তুমি ঠিকই জানো, তোমাতে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা।' বললেন প্রভু, 'তবু তুমি যে জিজ্ঞাসা করছ এ শুধু তোমার জ্ঞানকে দৃঢ়তর করবার জন্যে। সাধুদের এই রীতি। জ্ঞানকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই তাদের জিজ্ঞাসা।'

ভাগবতধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানবার জন্যে যাদের

মতি নির্বন্ধিনী অর্থাৎ আগ্রহশালিনী, তাদের অভীপ্সিত সর্ববিষয়ই অবিলম্বে সিদ্ধ হয়।

সব তত্ত্ব তবে শোনো। ভক্তিধর্ম প্রবর্তন করতে তুমিই যোগ্য পাত্র।

জীবের স্বরূপ—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। সর্বব্যপক পরম ব্রহ্মেরই এক ক্ষুদ্র অংশ। ঈশ্বর যদি অগ্নিপিণ্ড, জীব তার স্ফুলিঙ্গ। ঈশ্বর বিভু-চিৎ জীব অণু-চিৎ। অগ্নির জ্যোৎস্না বিস্তারিণী, তেমনি ঈশ্বর-শক্তি অখিল জগৎ আচ্ছাদন করে রয়েছে। তুমি জীব, তুমি তারই এক কণিকামাত্র। 'ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥' আর জীব সব সময়ে আনন্দের দাস বলেই কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণই আনন্দঘন ভূমাপুরুষ।

কৃষ্ণকে ভুলে জীব যখন বহির্মুখ হয় তখনই তাকে ত্রিতাপজ্বালা দগ্ধ করে। তখনই সে মায়াগর্তে পড়ে হাবুডুবু খায়।

'কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥'

কৃষ্ণবহির্মুখ তাই সংসার দুঃখের হেতু। সেই মায়ায় থেকে বহির্মুখতা থেকে ত্রাণের উপায় কী? গুরুতে দেবতাবুদ্ধি প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন করে অবিচলা ভক্তিতে ভগবানকে ভজনা করাই উপায়।

মঙ্গল কিসে? সাধুর কৃপায়, শাস্ত্রের কৃপায়। যদি সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয় তা হলেই সে মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণভজনই সার কথা।

কে কৃষ্ণ? কৃষ্ণ আমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র ত্রাতা। একমাত্র প্রাপ্য। আর সেই প্রাপ্তির সাধনই ভক্তি। সুতরাং জীবের কর্তব্যই হচ্ছে ভক্তি। ভক্তির থেকে প্রেম। প্রেমই মহা প্রয়োজন। প্রেমই পুরুষার্থ শিরোমণি।

প্রেমেই কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন। প্রেমেই কৃষ্ণ-সেবা। কৃষ্ণরস সম্ভোগ।

দারিদ্র্য-পীড়িত এক গৃহস্থের বাড়িতে সর্বজ্ঞ এসেছে। বলছে, কেন তুমি দুঃখ পাচ্ছ? তোমার ঘরের মাটির নিচে পিতৃধন পোঁতা আছে। খনন করে উদ্ধার করো সেই ধন-ভাণ্ডার। কোন্ দিক থেকে খনন করব? জিগগেস করল গৃহস্থ। যদি দক্ষিণ দিকে খোঁড়ো বোলতা ও ভীমরুল বেরুবে, ধন মিলবে না। যদি পশ্চিমে খোঁড়ো এক যক্ষ এসে বাদ সাধবে, তোমাকে ভূতাবিষ্ট করে রাখবে, তুলতে দেবে না ধন। আর উত্তরে খুঁড়লে অজগরের দেখা মিলবে, অনায়াসে সে গ্রাস করবে তোমাকে। শুধু পুবেই রয়েছে তোমার ধনাগার। অল্প একটু খুঁড়লেই তোমার হাতে ঠেকবে।

তেমনি কর্মের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকে নয়, যোগের দিকে নয়, শুধু ভক্তির দিকে একটু খুঁড়লেই মিলে যাবে কৃষ্ণধন।

'ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥'

ধন পেলে কী হয়? সুখ হয়। আর সুখ এলেই দারিদ্র্য দুঃখ চলে যায়। ধন প্রাপ্তির মুখ্যফল তাই সুখ, দারিদ্র্যনাশ আনুষঙ্গিক ফল। তেমনি সাধনভক্তির ফলে যে প্রেম, সে প্রেম পেলে কী হয়? প্রেম পেলে কৃষ্ণ-আস্বাদনের সুখ হয়। আর সে সুখে ভবক্ষয় ঘটে। ভবক্ষয় আনুষঙ্গিক ফল। কৃষ্ণপ্রেমসুখই মুখ্য। সুতরাং প্রেমসুখভোগই মুখ্য প্রয়োজন।

এবার তবে কৃষ্ণতত্ত্ব শোনো।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই কৃষ্ণতত্ত্ব। জ্ঞান অর্থ হচ্ছে সৎ, চিৎ আর আনন্দ। সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। সুতরাং সচ্চিদানন্দই কৃষ্ণস্বরূপ।

'সবাদি সব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দদেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥'

কৃষ্ণের আরেক নাম গোবিন্দ। তাঁর নিত্যধাম গোলোক। তিনি স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।

'অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান সর্ব অবতংস॥'

কৃষ্ণের অনন্তস্বরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ। পরমাত্মা সাকার কিন্তু তাঁর পরিকর নেই। ভগবানের পরিকর আছে, লীলা-বিলাস আছে, তিনি সবিশেষ সাকার। জ্ঞানসাধকের কাছে ব্রহ্ম, যোগসাধকের কাছে পরমাত্মা আর ভক্তিসাধকের কাছে ভগবান প্রকাশিত।

'ভক্তে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্তস্বরূপ॥'

কৃষ্ণের লীলা তিন ধামে। গোকুলে, মথুরায় আর দ্বারকায়। মথুরাতে তিনি কেশব, নীলাচলে জগন্নাথ, প্রয়াগে মাধব, মন্দারে মধুসূদন, আনন্দারণ্যে বাসুদেব, বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু, হরিদ্বারে হরি। শুধু ভক্তজন হেতুই তাঁর বিচিত্র প্রকাশ।

'সর্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি ধর্মস্থাপিতে॥'

এক কৃষ্ণ থেকে অসংখ্য অবতারের উদ্ভব। গুণে শেষ করা যায় না। গাছের পল্লবিত শাখার মধ্যে দিয়ে দেখা টুকরো টুকরো চাঁদের মত।

'অনন্তাবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্রন্যায় করি দিগ দরশন॥'

সনাতন জিগগেস করল, 'প্রভু, এটা কলিযুগ। এই কলির অবতার কে? কী করে বুঝব?'

প্রভু বললেন, 'অন্য অবতার যেমন শাস্ত্র দিয়ে জানা যায়, কলিযুগের অবতারও তেমনি শাস্ত্র দিয়েই জানতে হবে। যিনি অবতার তিনি তো আর নিজের অবতারত্ব ঘোষণা করবেন না, লক্ষণ বিচার করেই আসতে হবে সিদ্ধান্তে।'

'যিনি স্বরূপে পীতবর্ণ আর প্রকটে কীর্তন-প্রবর্তক ও প্রেমদাতা তিনিই তো কলির অবতার।' সনাতন আকুল কণ্ঠে বললে, 'বলুন ঠিক কি না। নিশ্চয় করে বলুন। সমস্ত সন্দেহ দূর হোক।'

প্রভু বললেন, 'চাতুরালি ছাড়ো। কৃষ্ণের অন্য কথা শোনো।'

বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করে লীলা করছেন কৃষ্ণ। বালকৃষ্ণ ও পৌগণ্ডকৃষ্ণই কৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ।

কৃষ্ণের কৈশোরই সর্বভক্তির আশ্রয়। কৈশোরেই কৃষ্ণ নিত্যলীলা বিলাসবিশিষ্ট। সুতরাং কৈশোরেই কৃষ্ণের প্রশস্ত বয়স। কৈশোরেই কৃষ্ণের নিয়তস্থিতি। বাল্যলীলায় সখ্য নেই, মধুর নেই, পৌগণ্ডও মধুর-শূন্য। শুধু কৈশোরেই সর্বভাবের সমাহার। সৌন্দর্য মাধুর্য বৈদগ্ধ্য সমস্ত গুণের পরিপূর্ণ বিকাশই এই কৈশোর। 'কিশোরশেখর ধর্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।' সর্বগুণান্বিত জনই ধর্মী। তাই সর্বগুণাধার ভক্তিতেই কৈশোরের প্রশংসা। কৈশোরের পরে প্রৌঢ় বা বার্ধক্যলীলা নেই। কৃষ্ণ চিরকিশোর। 'রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি।'

পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম। কৃষ্ণের স্বরূপ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, পূর্ণতম ব্রজধামে। 'পরিকর পার্ষদদের মধ্যে কতটা প্রেমবিকাশ তারই নিরিখে এই পূর্ণতার বিচার। দ্বারকায় এই বিকাশ অল্প, মথুরায় কিছু বেশি, ব্রজে সবচেয়ে বেশি। 'এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান।'

কৃষ্ণগুণের ইয়ত্তা হয় না। কৃষ্ণ নিজেও অন্ত পায় না নিজগুণের। অনন্তদেব সহস্র বদনে অনাদি-কাল থেকে কৃষ্ণের গুণগান করছে, এখনও শেষ করতে পারেনি। তার বৈভবামৃতসিন্ধুর এক বিন্দুও মনো-বাক্যের গোচর নয়। কৃষ্ণের সমান কেউ নেই, উচ্চতরও কেউ নেই। যাকে বলা হয় অসমোর্ধ্ব, অসাম্যাতিশয়।

'কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অপার—অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারিল তার ছুঁইল একবিন্দু॥'

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা বলতে-বলতে প্রভুর কৃষ্ণ-স্ফূর্তি হল, মন মগ্ন হল মাধুর্যে। বলতে লাগলেন কৃষ্ণের মর্ত্যলীলার তাৎপর্য।

কৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্বোত্তম। এমন অঙ্গ ধরলেন যা ভূষণের ভূষণস্বরূপ। পরনে রাখাল বালকের পরিচ্ছদ। সঙ্গে গোচারণের সরঞ্জাম। হাতে বাঁশি। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, বুকে বনফুলের মালা, গালে কপালে অলকা-তিলকা। সনাতন, সে রূপের তুলনা হয় না। সর্বকাল সর্বপ্রাণীকে আকর্ষণ করছে।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কোণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥'

এই রূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ় ধন, মানসনেত্রে সতর্ক পাহারা দেয় সর্বক্ষণ। কী সুন্দর দাঁড়ায় ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে। ভ্রধনুর্নর্তন যদি দেখ! নিজের রূপ দেখে নিজেই কৃষ্ণ বিস্মিত। নিজেকে আস্বাদ করবার জন্যে নিজেই ইচ্ছুক-উৎসুক।

যারা পতিব্রতা-শিরোমণি বৈকুণ্ঠের সেই সব লক্ষ্মীরাও কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। আর কৃষ্ণ আকৃষ্ট গোপীদের কামগন্ধহীন নির্মল প্রেমে। সেই নির্মল প্রেমিকাদের সঙ্গেই কৃষ্ণের রাসক্রীড়া। সেই ক্রীড়ায় কন্দর্পের মনও মথিত। যে সকলের মোহ উৎপাদন করে সে এখন নিজেই মোহিত। তাই কৃষ্ণের এখানে মদনমোহন নাম। 'চড়ি গোপীমনোরথে, মন্মথের মন মথে, নাম ধরে মদনমোহন।'

নলকূপ সেচ-ব্যবস্থা

এ এক অভিনব মেঘ। জগৎ-শস্য জীবের উপর অমৃত বর্ষণ করে। এ কৃষ্ণ মেঘে শিখি পুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনু ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যায় না, স্থির বিদ্যুতের মত নিত্য জেগে থাকে।

আর মাধুর্যই ভগবত্তার শেষ কথা। সে কথাই প্রচারিত হয়েছে ভাগবতে। তাই ভাগবত শ্রবণই সর্বজীবের আশ্রয়। ভাগবতই জীবকে ভগবৎ-পরায়ণ হতে প্রবুদ্ধ করে।

কৃষ্ণমাধুর্যের কথা বলতে-বলতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে সনাতনের হাত ধরলেন। মথুরা নগরীর ভাষায় শোক করতে লাগলেন। গোপীরা কী তপস্যা করেছে যে নিরন্তর নেত্র দিয়ে কৃষ্ণের রূপমাধুরী পান করে তনু-মন শ্লাঘ্য করছে? গোপীভাব আর কৃষ্ণমাধুর্য কেউ কারু কাছে পরাজিত হচ্ছে না। গোপীভাব যত বাড়ে তত উজ্জ্বল হয় কৃষ্ণমাধুর্য। আবার কৃষ্ণমাধুর্য যত বাড়ে তত নির্মল হয় গোপীভাব। 'ক্ষণে ক্ষণে বাঁয়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি।'

কর্ম—জপাদিতে কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদ করা যায় না। কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদ শুধু রাগমার্গে। শুধু ভাবানুকূল সেবায়।

'কর্ম জপ যোগ জ্ঞান, বিধিভক্তি তপধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য সুলভ॥'

'সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য অমৃতের সমুদ্র।' বলছেন আবার প্রভু। 'আমার মন সান্নিপাতিক রোগীর মত দারুণ পিপাসা, ইচ্ছে করছে মাধুর্য সিন্ধুর সমস্তটাই পান করে ফেলি কিন্তু দুর্দৈব বৈদ্য দুর্ভাগ্য আমাকে এক বিন্দুও পান করতে দিচ্ছে না। আর তাঁর বাঁশি শুনেছ? এমন তার ধ্বনি যে যে শুনতে ইচ্ছুক নয় তারও কানে গিয়ে ঢোকে। সকলকেই মাতোয়ারা করে দেয়। জোর করে টেনে নিয়ে আসে। সে ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ব্রত ভঙ্গ করে, পতিকোল থেকে কৃষ্ণ কোলে টেনে নিয়ে আসে। আর, গোপীরা কী বলে শুনেছ? বলে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরাই বাঁশির আকর্ষণে নারায়ণের বক্ষ ত্যাগের জন্যে উন্মুখ হয়, আমরা তো সাধারণ গয়লার মেয়ে। সনাতন, তোমার প্রতি কৃষ্ণের অগাধ কৃপা। আমাকে যন্ত্র করে, আমার চিত্তভ্রম জন্মিয়ে, আমার মুখে তাঁর ঐশ্বর্য-মাধুরী তোমাকে শোনালেন। আমি তো পাগল, কী কথা বলতে কী কথা বলি তার ঠিক নেই। আমি তো বাতুল, শুধু কৃষ্ণমাধুরীর স্রোতে ভেসে যাওয়াই আমার কাজ।'

'আমি তো বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্যামৃত স্রোতে যাই বহি॥' [ক্রমশ।

নলকূপ সেচ-ব্যবস্থা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্যভাবে যে কয়টি জিনিস চাই, সেচ-ব্যবস্থা তার অন্যতম। দেশের এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে নদী-নালা নাই, পর্যাপ্ত জলের অভাবে কৃষিকার্য দারুণ ব্যাহত হয়। উন্নততর সেচ-ব্যবস্থার জন্যে জাতীয় সরকার সেজন্যে গোড়া থেকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। প্রতিটি পরিকল্পনায় এই খাতে অর্থ বরাদ্দও হয়েছে একই লক্ষ্য থেকে। প্রয়োজনের সময়ে জমিতে জল সরবরাহের জন্যে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। জলাধার সৃষ্টি করে স্লুইস গেট দিয়ে অনাবৃষ্টি প্রপীড়িত এলাকার সেই জল প্রবাহিত করে দেওয়ার পরীক্ষাটি এক্ষণে বহু স্থানে চলেছে। এমনি আর একটি পদ্ধতির পরীক্ষাও চলেছে, যাকে বলা যায় টিউবওয়েল বা নলকূপ সেচ-ব্যবস্থা। ভারতে নলকূপের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা খুব বেশি দিনের বলা চলে না। বিদেশী শাসন চলতে থাকাকালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই কতটুকু মাথা ঘামানো হয়েছে? এই ধরণের সেচ ব্যবস্থা বা অন্য কোন উন্নততর পদ্ধতি চালানো স্বতঃই তখন কঠিন জিনিস ছিল। অবশ্য ১৯৩০ সালে উত্তর প্রদেশেই সর্বপ্রথম টিউবওয়েল সেচ ব্যবস্থার পরীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষায় এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে লক্ষ্য করেই স্বাধীনোত্তর যুগে জাতীয় সরকার এই দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। এরই পরিণতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে উত্তর প্রদেশে ২,২২৬টি, পাঞ্জাবে ১,১৭৭টি, বিহারে ৩৯০টি, বোম্বাই-এ ৩৬৪টি এবং অপরাপর এলাকায় ৫০টির অধিক নলকূপ বসানো হয় এবং তা দ্বারা সেচের কাজ অগ্রসর হয়ে চলে। এদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে নলকূপ সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব আজ বিভিন্ন মহলে স্বীকৃত। এই ব্যাপারে এগিয়ে যেতে মার্কিণ সরকারও ভারতকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এসেছেন। সাধারণ কূপ থেকে জলসেচের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল থেকেই চালু থাকলেও টিউবওয়েল বা নলকূপ সেচ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি অগ্রগতি। হিসাব কষে দেখা গেছে সাধারণ কূপ থেকে জমিতে জল সেচ করতে নলকূপ সেচ ব্যবস্থার চেয়ে খরচ অনেক বেশি পড়ে। শুধু তাই কেন, অনাবৃষ্টি হলে সাধারণ কূপগুলো শুকিয়ে যায়, কিন্তু নলকূপের জল সরবরাহ অব্যাহত থাকে আর এই কারণে সেচ কার্যেরও অসুবিধা হয় না। নলকূপ সেচ ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এ-ও লক্ষ্য করবার।

বসুমতী ও বিবেকানন্দ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বসুমতী প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ

সহযোগী স্বামী বিবেকানন্দ

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুই শিষ্য—নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ছেলেবেলা থেকেই পরস্পরের পরিচিত তাঁরা। প্রথম যৌবনে দু'জনেই দীক্ষা নিয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে নরেন্দ্রনাথের অন্তরে জাগল মোক্ষলাভের জন্যে তীব্র ব্যাকুলতা—উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জ্বলন্ত আদর্শে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর পূর্বাশ্রমে আর ফিরলেন না, সন্ন্যাস-জীবনকেই বরণ করে ভবিষ্যতে বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হলেন উপেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ওদিকে বিয়ে করে সংসারজীবনে প্রবেশ করলেন উপেন্দ্রনাথ। তাঁর সহধর্মিণী 'বসুমতী' মা'র কথা লিখেছেন রাণী চন্দ 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের 'তীর্থবারি' অধ্যায়ে। হরিদ্বারে নীলসলিলা গঙ্গাতীরে ছোট্ট একটি তাঁবুতে এক দশকেরও অধিককাল আগে ভবতারিণী দেবীর (বসুমতীমার ঠাকুরের দেওয়া নাম) সঙ্গসুখ উপভোগের এবং তাঁর বচনামৃত পান করবার সৌভাগ্য হয়েছিল রাণী চন্দের। নিজের বিয়ের প্রসঙ্গে বসুমতী-মা তাঁকে বলেছিলেন—"আমাকে ঠাকুর বড়ো স্নেহ করতেন। বিয়ে ঠিক হল। কালো মেয়ে, শাশুড়ির মন ওঠে না। বলেন, আমার সুন্দর ছেলে, কালো বউ আনি কী করে? ঠাকুর বললেন, দেখো ঐ কালো মেয়েই আনো, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে তোমার।"

'বিয়ের পর সকলের মুখে 'কালো মেয়ে'—'কালো মেয়ে' শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে উঠল বালিকা-বধূর। নতুন বিয়ে হওয়া ছোট্ট মেয়েটি যখন শুনল যে, তার বাল্যসঙ্গী নরেনের মুখেও ঐ একই বুলি তখন অভিমানে সে বুঝি একেবারে ফেটে পড়তে চাইল। 'বসুমতী'-মার নিজের জবানিতেই শুনি:—"ছোটো হলে কী হবে, অভিমানী ছিনু বড়ো। বিবেকানন্দও বলেছিল, কালো মেয়ে বিয়ে করবে কী? তার পেটে যে বাগদীপাড়া জন্মাবে। কথাটা কানে এসেছিল আমার। বিয়ের পরে যখন আমায় বলেছে, নরেন এসেছে, সুপুরি কেটে দাও। বলেছিনু, আমি পারব না, ও আমায় 'কালো মেয়ে' বলেছে। ছোট্ট মেয়ে, দুষ্টু মন; ঐ 'কালো মেয়ে' বলেছে সে কথাটা ঠিক মনে ছিল। ছেলেবেলার সব সঙ্গী; আমার স্বামী আর আমি ছেলেবেলায় পূজোর ফুল কত তুলেছি। এক পাড়া থেকে ফুল তুলে আর এক পাড়ায় গেছি। বিবেকানন্দের বাড়িতে ছিল স্থলপদ্ম বড়ো বড়ো! ঘুম ভেঙে উঠে আসত ফুল পেড়ে দিতে, বিশাল নয়ন, সত্যি যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ি—কী সুন্দর। একসঙ্গে কত খুনসুটি করেছি। বিয়ের পরে নতুন বউ দেখতে এসে আমার ঘোমটা খুলে খোঁপা ধরে নাড়া দিয়ে বললে, আরে! তুই এলি শেষে অমুকের ঘর করতে।" (পূর্ণকুম্ভ রাণী চন্দ পৃ: ১৭৮)

বিয়ের আগে এই কালো মেয়েটিকে আশীর্বাদ করে তাঁর মাকে ঠাকুর বলেছিলেন: "মেয়ে তোমার রাজরাণী হবে।"

ব্যর্থ হতে পারে না ঠাকুরের আশীর্বাদ। রাজরাণীই হয়েছিলেন ভবতারিণী। সৎসাহিত্য প্রচারে ব্রতী হয়ে অমিত বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর স্বামী উপেন্দ্রনাথ। বসুমতীর মাধ্যমে ঠাকুর স্বামীজীর আদর্শ প্রচারকেও জীবনের অন্যতম ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি।

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ গৃহত্যাগী এবং অন্যান্য গৃহী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথও ছিলেন কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের অন্তিম রোগশয্যা-পার্শ্বে। ঠাকুরের শবদেহ কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলেন যাঁরা তাঁদেরও একজন ছিলেন তিনি। শ্মশানের পথে সাপে কামড়াল তাঁকে। তখন দৈববাণী শুনলেন: "সাপটাকে মারিস নে, আজ হতে তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন।"

স্বামীর সর্পদষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গে বসুমতী মা বলেছেন—"এদিকে বাড়িতে হুলুস্থুল। খবর এসেছে সর্পাঘাত হয়েছে। কান্নাকাটি পড়ে গেল। স্বামী ফিরে এলেন। সঙ্গের লোকেরা বলে গেল, ওকে খেতে দেবেন না, ঘুমোতে দেবেন না। স্বামী বললেন, খিদে পেয়েছে, আগে খেতে দাও। মা, মামী হা-হা করে ওঠেন। সেদিন সত্যনারায়ণের পূজো হয়েছিল, ঘরের কোণায় প্রসাদ ঢাকা। স্বামী নিজে গিয়ে ঢাকা

খুলে মালপোয়া, তাঁদের বড়া পেট ভরে খেয়ে দরজা এঁটে এক ঘুম দিলেন। কী হবে, কী হবে, আতঙ্কে সব অস্থির। লম্বা ঘুম দিয়ে স্বামী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন।" (—পূর্ণকুম্ভ, পৃঃ ১৮২)

উপেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এই দুই গুরুভ্রাতার জীবনচক্র আবর্তিত হয়েছিল বিপরীতমুখী দুটি বর্ত্ম অনুসরণ করে। একজন 'অখিলমিদং মায়াময়ং হিত্ব।' ব্রতী হয়েছিলেন ব্রহ্মলাভের সাধনায়, অপর জন ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। কিন্তু উভয়েরই জীবনের সাধনা সফল ও সার্থক হয়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত প্রযত্নে এবং ঠাকুরের কৃপায়। স্বামীজীর জীবদ্দশায় দেশবাসীর মধ্যে তাঁর আদর্শ প্রচারে অন্তরঙ্গ সুহৃদ এবং গুরুভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'বসুমতী' * কতটা সহায়ক হয়েছিল আজ তা বিশদভাবে জানা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। পশ্চিমে স্বামীজীর ধর্ম বিজয়ের সূচনা ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসভার অধিবেশনের সময়কাল থেকে। তার পরেই বিদেশের এবং স্বদেশের পত্রিকাগুলি মুখর হয়ে ওঠে বিবেকানন্দ প্রশস্তিতে এবং তাঁর কম্বুকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত নব বেদান্তবাদের বিশ্লেষণে। বসুমতীর কণ্ঠেও সেদিন যে বিবেকানন্দ-বন্দনা উচ্চারিত হয়েছিল উচ্চগ্রামে তাতে তিলমাত্রও সংশয় নেই। কিন্তু সত্তর বৎসর আগেকার বসুমতীর ফাইল খুঁজে পেতে তথ্য সমাহরণে কেউ উদ্যোগী হয়েছেন কি না তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। *

• তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩২২ সাল, শ্রীবিজয়নাথ মজুমদারের লেখা স্বামী বিবেকানন্দ সন্দর্শন ও কথোপকথন শীর্ষক প্রবন্ধে স্বামীজী ও বসুমতী সম্পর্কিত নিম্নোদ্ধৃত তথ্যটি পাওয়া যায়—

"১৩০৩ সালের···১০ই ফাল্গুন সকলের মুখে শুনিতে লাগিলাম স্বামী বিবেকানন্দ কল্য সকালে ৮ টার সময় কলিকাতায় আসিয়াছেন। রিপন কলেজে তাঁহার আহ্বান-সভা হইয়াছিল। হ্যারিসন রোডের উপর দুইটি বড় বড় তোরণদ্বার (Gate) করা হয়। একটির মাথায় "জয় রামকৃষ্ণ" ও অপরটির মাথায় "Welcome" লেখা আছে ইত্যাদি। অপরাহ্নে যাইয়া গেট দু'টি দেখিয়া আসিলাম। বিবিধ সংবাদপত্রে স্বামীজীর শুভাগমন সংবাদ পড়িতে লাগিলাম। বসুমতী পত্র তখন নূতন প্রবর্তিত। তাহাতে মঙ্গল-কলসীসহ স্বামীজীর প্রতিমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছিল।" (পৃ ৭৮) *

তবে স্বামীজীর দেহরক্ষার এগারো দিন পরে ১৩০৯ সালের ১লা শ্রাবণের বসুমতীতে তাঁর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে সেটির সন্ধান আমি পেয়েছি। উক্ত প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

'বাঙ্গালী তুমি না শক্তি-পূজক—শক্তি-সেবক? সেই অর্ধেন্দুকৃত-শেখরা, আকম্পিত লোলরসনা দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা না তোমার মা? তুমি না সেই পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তির সন্তান? ঐ খড়্গধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী, বরাভয়-প্রদায়িনী, পাপাসুর-নাশে উন্মাদিনী করালী কালী—ঐ না তোমার মাতৃ-প্রতিমা? তুমি না ঐ মহাশক্তির সন্তান বলিয়া সবত্র পরিচিত। কিন্তু কৈ, মাতৃপূজার আয়োজন কৈ—উপকরণ কৈ? মহাবীর্যশালিনী মহাশক্তির সন্তান হইয়া তুমি কি না পশু-শোণিতে পশুমাংসে মায়ের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে চাও? কেন তুমি কি সেই করালবদনার জন্য নিজের পাপলিপ্সা বলি দিতে পার না? —তুমি কি তোমার নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে মায়ের নিকট বলি দিতে পার না? তুমি কি বলিতে পার না, "মা, সর্বমঙ্গলে, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার জয় হউক! তুমি আমার পাপপ্রবৃত্তি দূর করিয়া দাও, আমার প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ কর। তোমার ঐ উদ্যত কৃপাণে আমার নীচতা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল।" সন্তান হইয়া যে মাতৃসেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে না পারিল—যে মায়ের পূজার জন্য ক্ষুদ্রত্ব, নীচাশয়ত্ব, দ্বেষ, মিত্রদ্রোহিতা বলি দিতে না পারিল, তাহার জন্ম বৃথা, কর্ম বৃথা।—সে মায়ের কুসন্তান। জননীর প্রিয় পুত্র বিবেকানন্দ তোমাকে এই মহামন্ত্র দীক্ষিত করিবার জন্য, এই মহাশক্তিকে উদ্বোধিত করিবার জন্য—এই মাতৃপূজা শিক্ষা দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমরা সে মন্ত্র গ্রহণ করিলে না—সে উদ্বোধনে যোগ দিলে না—সে পূজার আয়োজনে সহায়তা করিলে না।

বিদেশীর অর্থে বিবেকানন্দ বেলুড়ে যে মঠ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার আশা ছিল তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত পূজায় যোগ দিবেন—কিন্তু তাহা হইল না, সে ব্রত উদযাপিত হইল না, মহাপুরুষ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মহদনুষ্ঠান বর্তমান রহিয়াছে। তাঁহার সেই প্রদর্শিত বর্ত্মে যদি আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়ের কেহ বিচরণ করে তাহা হইলেও তাঁহার মহদনুষ্ঠান সফল হইবে। আমরা সাগ্রহে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।'

—বসুমতী ১লা শ্রাবণ, ১৩০৯ সাল।

স্বামী বিবেকানন্দ একদা বর্তমান ভারতবর্ষকে তার জাতীয় আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "হে ভারত, ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত;" এই মহাবাণীরই প্রতিধ্বনি কি শুনতে পাওয়া যায় না বসুমতীর উৎকলিত রচনাটিতে? বসুমতীর সঙ্গে বিবেকানন্দের যে সম্পর্ক, তা আত্মিক, তাই এই উদ্‌ধৃতিতেও অনুস্যূত রয়েছে তাঁর শাশ্বত বাণীর উদাত্ত অনুরণন। আজও পর্যন্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী এবং আদর্শ প্রচারে 'বসুমতী'র নিষ্ঠা এবং প্রচেষ্টার তুলনা নেই। মাসিক বসুমতীতে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে যত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা দেশের আর কোনো সাহিত্য-পত্রিকায় তা হয় নি। সেগুলিতে এমন সব অজ্ঞাত তথ্য ছড়ানো রয়েছে যা বিবেকানন্দের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জীবনী রচনার পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য হবার যোগ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে স্বরচিত গান গাইতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন—এই জ্ঞাতব্য তথ্যটিও বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ সালের ফাল্গুন মাসের মাসিক বসুমতীতে ডক্টর কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধে। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এই অমূল্য তথ্যটি সম্বন্ধে দেশবাসীর সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

* স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি কথায় (১৮৪ পৃ.) এই তথ্যটি পাওয়া যায় যে, 'বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় স্বামীজীর 'ঈশানুসরণ' (imitation of Christ-এর বঙ্গানুবাদ) প্রকাশিত হ'ত।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল। উনিশশো একুশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে এমন ভরসা দিয়েছিলেন গান্ধীজী। আমরা কিন্তু ভরসাকে প্রতিশ্রুতি বলেই জ্ঞান করেছিলাম। অতবড় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি কি ব্যর্থ হতে পারে! কেন যে কোন বুদ্ধি বলে আমরা ভেবে নিয়েছিলাম জানি না। স্বরাজ যেন তাঁর হাতের মোয়া, আমাদের সে বস্তু দেবার প্রতিশ্রুতি এবং তা রক্ষা করা যেন তাঁর ইচ্ছাধীন। ভরসার সঙ্গে যে কঠোর কর্মসূচী পালন ছিল প্রাক দাবী, সে দাবীর কথা আমরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মনে রাখি নি। আবেগে উদ্বেল হয়ে গান্ধীজী কি জয় ও বন্দেমাতরম বলেছি, একটি ফেষ্টুনের মাথায় আল্লাহো আকবর ও বন্দেমাতরম লিখে নিয়ে স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য অর্থসংগ্রহে বেরিয়েছি, আর মনে মনে স্থির বিশ্বাস করেছি একত্রিশ ডিসেম্বরের রাত পোহালেই দেখবো স্বরাজসূর্য ভাতিছে ভারত-গগনে।

পয়লা ডিসেম্বরের আকাশে কিন্তু ইংরেজের রাজ্যে ডুববার অধিকার-বর্জিত সেই পরাধীন সূর্যই উঠলো। ওদিকে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য যে কোমর বেঁধেছিল সবাই, মহাত্মা স্বয়ং বার্দোলিতে শুরু করলেই সারা ভারত জুড়ে চলবে তার অনুসরণ, তাও বাতিল হয়ে গেল চৌরিচৌরার দাঙ্গায় একুশজন পুলিশ নিহত হওয়ায়। গান্ধীজী বললেন, আঘাত পেয়ে যারা প্রতিঘাত দেবার প্রবৃত্তি দমন করতে পারে না, আইন অমান্য সত্যাগ্রহের যোগ্যতা অর্জনে তাদের অনেক দেরী।

তিনি যা বুঝলেন, তা করলেন। কিন্তু দেশের সাধারণ লোক, আমরা, ওরা ও আরো অনেকে, তারা পড়লো একেবারে মুষড়ে। যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে হাঁক ডাক করছে যারা তাদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বললে উদ্যম ভঙ্গ অনিবার্য; দৌড়ের ষ্টার্ট দেবার ইঙ্গিতের পরেই যদি নির্দেশ আসে বসে পড়ো, তবে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে হবে। সর্বত্র হতাশ্বাস ও হতাশা।

যে খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলেছিলাম, সেই আন্দোলনই গেল ভেসে। খলিফাকে তুর্কির সিংহাসনে আবার বসাবার শেষ আশাটুকু মিলিয়ে দিয়ে কামাল পাশা তুর্কিকে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করলেন। দৃঢ়ভিত্তিক ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন তিনি। ইংরেজের কাছে স্বরাজ চাওয়ার মানে হল, কারণ তা দেবার মালিক তারাই। কিন্তু খলিফাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবী ইংরেজের কাছে করাও যা, তুরস্কের কাছে ভারতের স্বাধীনতা চাওয়াও তাই।

অতএব মুসলমানদের ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ভেস্তে গেল। হোক তারা ভারতীয়, সে পরিচয় গৌণ; ভারতের স্বরাজলাভের ব্যাপারে তাই তাদের মাথা ব্যথা নেই। তাদের মুখ্য পরিচয়—তারা মুসলমান, ধর্মগুরু খলিফাকে রাষ্ট্রের মাথায় না বসালে থিওক্রাসি রইলো কোথায়। না যদি থাকেই, না থাকবে, তা বলে ভারতের স্বরাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবো না, হিন্দুদের ভারতে হিন্দুদের স্বরাজের জন্য হিন্দুরাই চেঁচিয়ে গলা আর পুলিসের লাঠিতে মাথা ফাটাক।

অনেক কষ্টে মহাত্মা গান্ধী আল্লাহো আকবর আর বন্দেমাতরম-এর জোরে যে ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন, সেই কাঁচা মাটির জোড় খুলে গেল। ইংরেজ মজা দেখলো, আর আমরা মুষড়ে পড়লাম।

এই অবস্থায় গান্ধীজীকে ইংরেজ কারাদণ্ড দিল। দেশবন্ধু বললেন, অসহযোগ করবো আমরা আইন সভায় ঢুকে, ইংরেজের শাসন সংস্থা অচল করে দেবো। নো-চেঞ্জারের দল বললে, খবরদার, গুরুর নির্দেশ অমান্য করে নিজের বুদ্ধি খাটানো চলবে না। দেশবন্ধু দাবী করলেন, গুরু যদি জেলে আটকা না থাকতেন, আমি নিশ্চয় তাঁর অনুমোদন আদায় করতাম, আইনসভা দখল করে বসে থাকার নয়। যুদ্ধকৌশল প্রসঙ্গে।

ওদিকে ইংরেজ সরকারের দমননীতি ছত্রভঙ্গ সমাজের উপর আরো কড়া আঘাত হেনে বীরত্ব প্রতিষ্ঠা করছে।

আশাভঙ্গ, বিভেদ, সংঘাত, আঘাত চারপাশের চারদেয়ালে অবরুদ্ধ হয়ে আমরা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সারা বাংলা হতবুদ্ধি।

দেশের এই জটিল পরিস্থিতিতে আমরা তখন পলাতকাবৃত্তি করে চলেছি। এখানে আড্ডা, ওখানে ক্লাব, সাহিত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা, যা নিয়ে আমাদের সময় কাটে, তার সঙ্গে তখন দেশের উদ্দাম হৃদস্পন্দনের কোন সম্পর্ক নেই।

থাকবেই বা কেমন করে! অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী ভাবপ্রবণ বাঙালী তরুণ মনে যুদ্ধের যুগে ভাঁটা পড়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রাবল্যে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা জেগেছিল তাতে। কিন্তু সে উদ্দীপনা মিলিয়ে যাওয়ার পরে মন একেবারে নিরালম্ব। বিদেশী শয়তানী শাসন থেকে দেশের মুক্তি সাধনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও আমরা অসহায়।

মনের এই দৈন্য বহন করে যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি, এমন সময় নজরুল ফিরে এল কলকাতায়। বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীট আবার সরগরম হয়ে উঠল। এবার আর নিছক কবিতা ও নিরর্থক প্রাণবত্তার উচ্ছ্বাস নয়, নজরুল প্রস্তাব করলে বাঙালীর বিপ্লবী চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য চাই অগ্নিক্ষরা রচনা। সে রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। অতএব বার কর নিজস্ব পত্রিকা। নবযুগের মত সংবাদপত্র নয়, প্রবন্ধ কবিতা ও সমালোচনার অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা।

সবার আগে সোৎসাহ সমর্থন জানালে নৃপেন। বললে, এই মরা জাতকে জাগাবার জন্য কশাঘাত যথেষ্ট নয়, তার মর্মে আঘাত করতে হবে এবং সে আঘাত করার শক্তি নজরুল ছাড়া আর কারুর নেই।

জাতি কতটা জাগবে বলতে পারি না, বললেন কাজী আবদুল ওদুদ। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার গ্লানিটা বড় বেশি চেপে বসেছে। তবে কাজী সাহেবের কলম থেকে যে বিপ্লবী-সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে বাংলা ভাষা তাতে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে।

সাপ্তাহিক বার করতে হলে 'এথি' লাগবে, সেটা আসবে কোত্থেকে, সেটা ভেবেছ কি কেউ? আমি সংশয় প্রকাশ করলাম।

চায়ের কাপটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে নজরুল বিরক্তিভরে চেঁচিয়ে উঠল, দে গরুর গা ধুইয়ে। টাকার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না। গৌরী সেন লোকটা আছে কি জন্যে?

গৌরী সেন আবার কাকে পাকড়ালি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কেন, মণি ঘোষ আছে। বললে নজরুল।

মণি ঘোষ কে, কত টাকা দেবেন, জিজ্ঞাসা করলেন ওদুদ সাহেব।

দুত্তোর! বিরক্ত হয় নজরুল। টাকা লাগবে কিসে? মেটকাফ প্রেসের মালিক মণি ঘোষ বাকিতে ছেপে দেবে। আর বইল তো এক রীম কাগজের দাম, সে তিন-চার টাকার জন্যে কারুর কাছেই হাত পাততে হবে না। আট পৃষ্ঠার কাগজ, দাম হবে এক আনা।

পত্রিকা প্রকাশ স্থির হয়ে গেল। ডিক্লারেশান চাইতেই পাওয়া গেল ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে। বিপ্লবী প্রেরণার মার্কামারা চারণ কাজী নজরুল ইসলামকেও পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দিতে সেদিনের সরকারী ব্যবস্থায় এতটুকু কালবিলম্ব হয় নি। স্বাধীন ভারতে অরাজনৈতিক নিরিমিষ্যি পত্রিকা প্রকাশেও যেভাবে দীর্ঘকাল দিল্লীর মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হয়, সেদিনের বিদেশী সরকারের লাল ফিতে তার তুলনায় যারপর নাই হ্রস্ব ছিল।

নামকরণ স্থির হল 'ধূমকেতু'। আমাদের সবারই ভাল লাগল। ধূমকেতুরই মত হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত নজরুল যার প্রতীক। কিন্তু ও নিজে বুলল, ধূমকেতু অকল্যাণ আনে, আমাদের নিশ্চিন্ত জীবনে বিপ্লবের ডাক সাময়িক ভাবে আলোড়নের অকল্যাণ আনুক, এই আমি চাই।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাণী চেয়ে পাঠানো হল এবং প্রথম পৃষ্ঠায় তা বহন করে দিন-দশেকের মধ্যেই প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। কবিগুরু লিখলেন:

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ, অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।

অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন।।

ধূমকেতু-রথের 'সারথি' কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন:

'...এদেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থিমজ্জায় যে পচন ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।... দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা-ভণ্ডামি-মেকি, তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী।'

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী বোধ হয় 'ধূমকেতু'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী একটি সংখ্যায় নজরুল লিখেছিলেন:

'অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, ধূমকেতুর পথ কি?... সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। ও-কথার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন।'

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'ধূমকেতু' প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করল। অন্য সব প্রচলিত সাপ্তাহিক চাপা পড়ে গেল, কাগজ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্ধচেতন জাতিকে সত্যি 'ধূমকেতু' এমন চমক দিলে যে সর্বত্র ধূমকেতুই হয়ে উঠল আলোচ্য বিষয়। দিনের পর দিন প্রবন্ধ ও কবিতায় আগুন ছড়াতে লাগলেন নজরুল ধূমকেতুর পৃষ্ঠায়।

একে নজরুল, তাতে সংযুক্ত হল ধূমকেতুর জনপ্রিয়তা। সব সময়েই ভিড়, কত লোকের আনাগোনা। বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে আর স্থান সংকুলান হয় না। আপিস উঠিয়ে আনা হল ৭নং প্রতাপ চ্যাটার্জি স্ট্রীট। জানা-অজানা কত লোকই আসে। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আসে কাজে সাহায্য করতে, অনেক অপরিচিতও আসে, কেউ ঔৎসুক্যে, কেউ উৎসাহে। পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ থেকে টিকটিকি আসে না এমন কথাও জোর করে বলা চলে না, তবে তা নিয়ে কারো গ্রাহ্য নেই, আমরা সবাই তখন বেপরোয়া।

কাজ যত হয়, আড্ডা চলে তার চেয়ে বেশি। পুলিশী চরের ক্রিয়াকলাপের আলোচনা ও পুলিশের বাপান্ত সবচেয়ে রসের যোগান

দেয়। মাটির ভাঁড়ে রাউণ্ডের পর রাউণ্ড চা আসে। পরিচিত অপরিচিত অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত কেউই বাদ পড়ে না। দু' আনার এক কেটলি চায়ে দশ-বারটি ভাঁড় ভর্তি করা যায়, কাজেই চা-সত্রের দ্বার অবারিত রাখতে কোন বাধা নেই। আর, তা ছাড়া, ধূমকেতুর বাজার গরম, ছাপা কাগজের খরচ পুষিয়ে যা থাকে তা ধূমকেতুর সুবাদেই খরচ করা হয়। আর্থিক প্রত্যাশায় কেউ সেখানে আসে না।

একটি তরুণ, বয়স, কুড়ির নিচে, শ্যামবর্ণ, নধর দেহ। এক কোণে এসে চুপচাপ বসে থাকে, তার পরিচয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পুলিশের টিকটিকি যদি হয়ই, হোক না। তাকেও নিয়মিত চা দাও, নিজেদের একজন বলে ব্যবহার কর। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আপনাদের দেখতে আসি। আপনাদের কাছে প্রেরণা নিতে আসি। কিসের প্রেরণা—এ প্রশ্ন যদি কেউ তোলে, 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে চায়ের শূন্য ভাঁড়টা উপরদিকে ছুঁড়ে দেয় নজরুল।

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাকিয়ে নিত্যবিষণ্ণ বদন তরুণটি প্রশ্ন করে, আপনারা এত আনন্দ পান কিসে?

কিসে? এ কথা তো কেউ ভেবে দেখিনি। দেশ পরাধীন, বন্ধন মোচনের আগ্রহে কত প্রাণ এগিয়ে আসছে হাসিমুখে আত্মবলিদান করতে, কত ঘর ভাঙছে, কত পরিবার অনাথ হচ্ছে, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পঙ্কে পড়ে থেকে লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোক জীবন্মৃত হয়ে পড়ে আছে, এর মধ্যে আনন্দের অবকাশ কোথায়।

" আছে—আছে, নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেও আছে সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশার প্রাবল্যে অন্ধকারের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। উপল প্রস্তরখণ্ডের বাধায় আহত হয়ে জলধারা আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। অজস্র শীকরে উৎফুল্ল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই প্রাণশক্তির প্রতীক নজরুল। দুঃখ আছে, বাধা আছে, সংগ্রাম আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আছে আশা আর আত্মবিশ্বাস। তাই তো এত আনন্দ, যখন তখন অট্টহাস্যে ও গানের কলিতে তা ফেটে পড়ে।

কিন্তু এত সব কথা কে কাকে বোঝাবে। কারুর দায় নেই, সময় নেই, উৎসাহ নেই। সংসর্গের ছোঁয়া লেগে বা রচনা থেকে প্রেরণা আহরণ করে যদি কেউ বুঝতে পার, বোঝ। মনে আনন্দ জাগিয়ে তুলতে পার, তোলো। অর্ধচেতন জাতকে চমক মেরে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যই ধূমকেতুর প্রকাশ এবং ধূমকেতু সারথির বৈঠকের দ্বার অবারিত।

এই বৈঠকে বসে থেকেও যে প্রশ্ন করতে পারে, আপনারা এত আনন্দ পান কোথায়, সে কেমন মানুষ!

মানুষ যে বড় বেয়াড়া, তা হাতে নাতে ধরা পড়ে যখন সে বলে, চা আমি খাই না।

আঁতকে ওঠে নজরুল। চা খাই না! তুমি তো মানুষ খুন করতে পার হে! আস্তে আস্তে উঠে যায় ছেলেটি, মুখে পরম বিমর্ষ ভাব বহন করে।

কে এল, কে না এল—তা নিয়ে মাথা ব্যথা করবার মত এতখানি অবকাশ কারুর ছিল না, নিত্য নতুন চমক, নিত্য নতুন আঘাত ও প্রতিঘাত, আর নজরুলের কলমের খোঁচায় ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত ফেটে পড়ে। কে ধার ধারে, কে এল, কে গেল, কে রইল—তা নিয়ে। এ শুধু সূর্যোদয়ের তোরণমুখে ছুটে চলা। যে যেতে পার—চলো, কেউ হাত ধরে কাউকে নিয়ে যাবে না। সেই তরুণটি যে তারপর আর আসে নি, কারুর নজরে পড়ে নি তা।

ইতিমধ্যে নতুন উত্তেজনা চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে— ডে সাহেব গুলির আঘাতে খুন হয়েছে, ধরা পড়েছে বাঙ্গালী তরুণ আততায়ী। মার্কেনটাইল ফার্মের একজন নিরপরাধ সাহেবকে খুন করেছে বলে সে দুঃখ প্রকাশ করেছে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এই বলে যে, তার আসল শিকার আপাতত বেঁচে গেল। সে শিকারটি হল পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্ট। আততায়ীর মতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের টেগার্ট এক মস্তবড় অন্তরায়। বাঙালী যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য তাঁর কলাকৌশলের অন্ত নেই। সেই দুশমনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজছিল ছেলেটি, চেহারার আদলে মিল থাকার ফলে টেগার্টের বদলে প্রাণ দিতে হল ডে'কে।

খবরের কাগজে আততায়ীর ছবি দেখে আমরা হতবাক। আরে, এ যে সেই ছোকরা! যে প্রশ্ন করেছিল, আপনারা এত আনন্দ পান কিসে? নজরুল বলে, কেমন বলেছিলাম না, ও মানুষ খুন করতে পারে? আজ কিন্তু নজরুলের মন্তব্যের সুরে সেদিনের লঘুচিত্ত বিদ্রূপ নেই। আমি মন্তব্য করলাম, ও কি টেগার্টকেই খুন করতে চেয়েছিল, না দেশের জন্য আত্মবলিদানই ছিল ওর মূল লক্ষ্য? টেগার্ট উপলক্ষ মাত্র।

তবুও সেইদিন থেকে সেই তরুণটিকে আমরা আমাদের নিজেদের একজন বলে ভাবতে শুরু করলাম। খবরের কাগজে বিচারের খবর আমরা সাগ্রহে অনুধাবন করি। তবে এও জানি, আইনের ফাঁক যদি থাকেও তাতে রেহাই নেই। সে ফাঁকি বরং বিরুদ্ধপক্ষই দিতে পারে।

গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেল। গলায় দড়ি পরবার সময়ও সে আপসোস প্রকাশ করেছিল একজন নিরপরাধকে মারবার জন্য, আর আসল শিকার পালিয়ে গেল বলে।

আমরাও আপসোস করেছিলাম তাকে ভালো করে জানতে পারি নি বলে। জানার চেষ্টাও করি নি। মনের যে অবস্থায় তাজা তরুণ প্রাণ দেশমাতৃকার বেদীতে বলি হবার জন্য গলা বাড়িয়ে দেয় সেই প্রাণের গভীরে তলিয়ে দেখতে পারলে আমরা তাদের সাহিত্যে রূপায়িত করতে পারতাম। সে প্রাণ লক্ষ লক্ষ তরুণের মনে সঞ্চারিত হত সাহিত্যের মাধ্যমে, হত চিরঞ্জীবী। যখন আজ ঢাক পিটিয়ে দেশপ্রেম জাহির করার নিচে আত্মসাধনের মূল লক্ষ্যই প্রকট হয়ে ওঠে। যে দেশপ্রেম আত্মবলিদানে উদ্বোধিত করে, তার অন্তর উদ্বেল করা আলোড়ন যদি ভাষায় উপস্থাপিত করা যেত তা হলে দেশপ্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারত স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণী সমাজ।

দু চার দিন আমাদের সকলেরই মন বিষণ্ণ হয়ে রইল, কিন্তু সময় যে নেই, আবার আর একদিকে নতুন ঘটনা প্রতিনিয়তই আমাদের

নতুন নতুন উত্তেজনা যোগায়, ধূমকেতুর পৃষ্ঠা আগুন ছড়ায়, মনের জ্বালাকে প্রখর করে তোলে।

এরই মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটল একদিন। আমরা মজা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু নজরুল রেগে আগুন, এমন ক্রুদ্ধ হতে তাকে কমই দেখেছি।

ধূমকেতুতে একটি প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল 'এই থেকেই মুসলমান সমাজে বেদনার সৃষ্টি হল।' ছাপাখানার প্রুফে দেখা গেল বেদনা'র একারটি বাদ পড়েছে। একাধিক বার সে ভুল সংশোধিত হল, বিশেষ করে মার্কা দিয়ে সেই ভুলের প্রতি ছাপাখানার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, তবু যখন মুদ্রিত পত্রিকা বেরুল, দেখা গেল তাতে রয়েছে—'এই থেকে মুসলমান সমাজে বদনার সৃষ্টি হল।

সকালের দিকে আপিসে জমায়েৎ হয়েছি। প্রেস থেকে নতুন সংখ্যা এসে পৌঁছবার অপেক্ষায় চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছি। কাগজ আসতেই যে যার একখানা করে সংখ্যা হাতে তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল। নজরুল তো রেগেই আগুন, বলে, হারামজাদা! বলে সেই অবস্থায়—পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, ছুটে বেরিয়ে পড়ে। কি ব্যাপার বলে আমরা থামাবার চেষ্টা করি। নজরুল ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে।

কি ব্যাপার? চললি কোথায়?

কোথায়? জাহান্নাম দখিণ দিয়ে আসছি হারামজাদাদের। বদনার বাড়ি মেরেই খুন কর [illegible]।

কলেজ ষ্ট্রীট ধরে সোজা [illegible] হনহুখো চলে নজরুল, পাগল শেষটায় সত্যি একটা খুন খারাপি ক[illegible] ব নাকি! ভয়ে ভয়ে আমরা ক'জনে সঙ্গ নিলাম। কিন্তু একটু পরেই পিছিয়ে পড়তে হল। ও যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট চলেছে।

বলরাম দে ষ্ট্রীট (বর্তমান ডবলিউ সি ব্যানার্জি ষ্ট্রীট) মেটকাফ প্রেসে এ.স যখন পৌঁছলাম, দেখি, প্রিণ্টার শশি দাসের জামার কলার ধরে তাঁক শাসাচ্ছে নজরুল: খুন করে ফেলবো। বার বার কারেক্ট করে দিলেও একটা বসানো যায় না, ইয়ারকির আর জায়গা পাওনি! মালিকের সম্বন্ধী ম্যানেজার রমেশ বসু পাশে দাঁড়িয়ে 'কাজী'দাকে শান্ত করবার বৃথা চেষ্টা করছেন।

অবস্থা দেখে অগত্যা নজরুলের হাত দুটো ধরে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করি। বলিষ্ঠ হাতের প্রতিরোধ, একটু পরেই শিথিল হয়ে যায়। ধরে এনে আমরা ওকে বসাই। রমেশ চায়ের হুকুম করেন। চা আসতে আসতেই দেখা গেল কাপের চা স্থির, সামান্য একটু ধোঁয়া উঠছে, একটু আগে যে প্রবল ঝড় উঠেছিল তার সামান্যতম কম্পনও অবশিষ্ট নেই চায়ের কাপে।

আমি বললাম, ছাপাখানার লোক মাঝে মাঝে আমাদেরও ভুল ধরে। বিবেক যার আছে, আছে নিজের বুদ্ধিতে বিশ্বাস, সে কি আর যদৃচ্ছ তল্লিখিতং করে ছেড়ে দিতে পারে?

পারে না, মানি, বলে নজরুল। তা বলে ও কি করে ধরে নিলো যে আমি বদনার উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করেছি।

আমি বললাম, ভাখ, ছাপাখানার অন্ধকার ঘরে টিমটিমে আলোর নিচে সীসের টাইপ সাজাতে সাজাতে যাদের জীবনপাত, তারা তোর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করবে কেমন করে! আসলে 'বেদনা' তো হৃদয়ের আবেগ, ওটা কবি-সাহিত্যিকদের কাছে যত সহজে ধরা পড়ে, দিনগত পাপক্ষয়ের জীবনে তার হদিশটুকুও মেলে না। ওরা অতিমাত্রায় রিয়েলিষ্ট, বদনা ওদের কাছে বাস্তব সত্য।

রমেশ বসু হেসে বললেন, যা সত্যি তা বদনা নয়, গাড়ু বা ঘটি। তবে প্রতিবেশীদের সুবাদে নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছে, হিন্দু-সমাজে যা গাড়ু ও ঘটি, মুসলমান সমাজে তাই বদনা।

অর্থাৎ—যা টিকি তাই দাড়ি, যা টুপি তাই পৈতে, বলেই হো হো করে হেসে উঠল নজরুল।

বৃদ্ধ শশীবাবু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার তাঁরও মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। নজরুল বলে, যাই হোক, আপনার লোকেদের বলে দেবেন নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি নিজেদের কাজের জন্যই যেন তুলে রাখেন, আমাদের উপর চাপাবার দরকার নেই।

ধর্মপদ

আলোক মুখোপাধ্যায়

পথে যেতে যদি কেউ—মেরে বসে গাঁট্টা,
ভেবোনা তা ঠাট্টা!
সামলিয়ে ফুসহাত সাটটা,
ভেঙো গাল পাট্টা।

আচমকা কভু যদি মারে কেউ লেংগি,
হোক না সে মাড়োয়ারী; হোক সে তেলেংগি,
একখানি ঘুষিতে;
দাঁতগুলি খুশীতে
খুলে ফেলো ইঁদুরের গর্তে।
খেতে দিও তাকে বিনা সর্তে।

মারে যদি কেউ কভু চাটি;
রদ্দা লাগাও তারে খাঁটি!
যখন দুচোখে তার,
জগৎ অন্ধকার;
সেই ফাঁকে দাও তাকে ধাক্কা।
তারপর কেটে পড় পাক্কা।

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্‌বেদ

১।৬২।১ এস মহাবল, দৃপ্ত প্রবল বিপক্ষদল হানি,—
করিমু গ্রহণ ভরি দেহমন তব জ্যোতির্ময়-বাণী।
নির্ভয়ে চলি মহাজনগত শ্রেষ্ঠ-পন্থা মানি।

১।৬২।২ পূজিল শক্রে অঙ্গিরাগণ সুমহান সাম-গানে,
নব চেতনায় সে মহামন্ত্র ধ্বনিল আমার প্রাণে।

১।৬২।৩ মাতা যদি হয় ধর্মনিরতা তবে সে পুত্র তার
লভে শিক্ষার উত্তম বীজ অন্তরে আপনার।
দেবগুরু তারে অঙ্কুরি' তোলে আলোকে, বাতাসে, জলে,
শাখা বিস্তারি সে তরু তখন বিকাশে পুষ্পে ফলে।

১।৬২।৪ গাহিছে তোমার বন্দনা-বাণী পুলকে সপ্তলোক,
বৈরী-নাশক, দূর কর যত গ্লানি, পরাজয়, শোক।
বিশ্বপূজ্য বরেণ্য যাঁরা জ্যোতিধাম অভিলাষী,
নব নব পথে যাত্রা তাঁদের নাশিতে বিঘ্নরাশি।
মোরা সেই পথে করিব গমন, শমনে না করি ভয়,
অজ্ঞানাশন মন্ত্রে লভিব মহাসংকটে জয়।

১।৬২।৫ হে জ্যোতি-দেবতা, পূজিল তোমারে ঋষি অঙ্গিরা যবে,
প্রকাশিল উষা রক্তিমভূষা আঁধার ভেদিয়া নভে।—
প্রাণ-উৎসব আছিল নীরব বসুমতী নিস্পন্দ,
রবিকর পাতে জাগিল ধরাতে শ্যামল শস্যে ছন্দ।—
উজ্জ্বল হ'ল গগনের হাসি চাহি ধরণীর পানে,
নিখিল-বিশ্ব ধ্বনিত হইল আলোক-মন্ত্র গানে।

১।৬২।৬ জটিল, কুটিল, নিষ্ঠুর অতি নির্দয় সংসার,
দম্ভ, শঠতা, লোভ, কপটতা সংকুল চারিধার!
ইহারি মাঝারে সাধিতে হইবে মঙ্গলময়কর্ম,
পালিতে হইবে নির্ভীক চিতে সরল সত্য-ধর্ম।

১।৬২।৭ নিত্য বিরাজ দ্যুলোকে, ভূলোকে—তোমারে প্রণাম করি,
হেরি নব নব বৈভব তব মহা অম্বর ভরি'।
ত্যাগে বর্জনে, কৃচ্ছ্রসাধনে তোমারে পূজিল যারা,
সমভাবে সবে লভিল তোমার আলোক করুণাধারা।

১।৬২।৮ তরুণী উষার লোহিত লাস্যে মোহিত বিশ্বলোক,—
নিশা-রাক্ষসী লেপি দেয় মসি আবরি সবার চোখ।
কভু অমরার অতুল পুলকে উল্লাসে মাতে হিয়া,
কভু বেদনার অতল সিন্ধু উথলে উছলিয়া:
কভু পরাজয়, দুঃসহ ব্যথা, কভু সে বিজয়ানন্দ,—
আলোকে আঁধারে নিখিল-বিশ্বে নিত্য চলেছে দ্বন্দ্ব।

১।৬২।৯ মিত্রশ্রেষ্ঠ, কল্যাণময়, শোভন বর্মবীর,
প্রসাদে তোমার পক্কতা লভে বস্তু সে ধরণীর!
শুভ্র দুগ্ধ গাভী করে দান হোক সে লোহিত, কালো,—
নানা রূপধারী মানবে প্রকাশে তোমারি চেতনা-আলো।

১।৬২।১০ পত্নী যেমন সঁপে তনুমন—পতিপ্রেম অনুগামী,
পালে সে সতত সুকঠিন ব্রত, লভিতে হৃদয়স্বামী।
সাধিলে কর্ম কল্যাণময় নিবারে সর্ব শোক,—
উদযাপি ব্রত উদবেগহীন, লভিতে অমৃতালোক।

১।৬২।১১ বন্দনা করি চিত্তহরণ,—নিত্য মন্ত্র গীতে,
উৎসুক মোরা দেহমনপ্রাণ তোমারে সমর্পিতে।
কামিনী যেমন কামবাসনায় যাচে সে আপন পতি,—
সুতীব্র কামী, মোরা যাচি তব পূর্ণ আলোক-জ্যোতি।

১।৬২।১২ মনোহর, তব সম্পদরাশি অক্ষয়, অফুরান,
হে দেব ইন্দ্র, ভাস্বর, তুমি, নিয়ত দীপ্যমান।
হে শতকর্মী, কর্মে মোদের যোগ্যতা কর দান,
সফল হউক প্রসাদে তোমার সকল অনুষ্ঠান।

১।৬২।১৩ হে আদি দেবতা, বিশাল নয়ন, তব বেগবান রথে,
আলোক-অশ্ব যোজিলে পলকে, ঝলকে আকাশ পথে।
রচিল মন্ত্র গোতম-তনয় নোধা সে নূতন করি;
প্রকাশিল উষা,—এস এস দেব মোদের যজ্ঞ'পরি।

১।৬৩।১ আতঙ্ক আজি মেলেছে আস্য সকল বিশ্ব জুড়ে,
স্থলেজলে ভয়, ভয় গৃহময়, আকাশেতে ভয় উড়ে!
কুহকমন্ত্রে দানব, অসুর মানবে করেছে বন্দী,
অট্টহাস্যে ঘোষিছে আঁধারে—"নাহি তার প্রতিদ্বন্দ্বী!"
শোষিত, দলিত, নিপীড়িত মোরা হে দেব বজ্রধর,
দাও, দাও তব ভীষণ অশনি! হানিব অসুর'পর।

১।৬৩।২ মহাভুজ, তব জ্যোতি-ময় রথে যুগ্মঅশ্বদ্বয়,—
বিদ্যুৎগামী ওই আসে নামি নাশিতে অসুর ভয়।
হানিলে অশনি, ভয়ভাণ্ডার নিমেষে করিলে ভগ্ন,
বিস্মরণের ধূলায় রহিল দানব-দম্ভ মগ্ন।

১।৬৩।৩ বৈরী প্রবল হয়ে যবে বল আসন্ন রণ মাঝে,
বজ্রী তোমার ভয়ভঞ্জন জয়-দুন্দুভি বাজে।
তরুণকান্তি, বৃত্রসূদন, ঋভুকুল অধিপতি,
দীর্ণ করিয়া ঘন তমরাশি বিকাশ সত্য-জ্যোতি।

১।৬৩।৪ জ্যোতি-বৈভব আবরিল তব বৃত্র, তমসাসুর,
হে বহুকর্মী, অশনি আঘাতে কর সে তামস দূর।
তুমি সে কঠোর, গগন-বিহারী—জলদমন্দ্র বাণী,
তুমি সে কোমল, সাজালে বসুধা শ্যাম অঞ্চল টানি।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

তিন

সেই রাববারের কথা দময়ন্তী ভোলে নি।

তার মা যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে বাগানের ফুল দেখছিল। এই কয়েক দিন বাগানের চেহারা একেবারে পালটে গেছে দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল। বড় মরসুমি ফুল শুকোতে শুরু করে পৌষ মাসে, মাঘ মাসে বিশেষ কিছু আর বাকি থাকে না। তবু এক আধটা ছোট ফুলের গোছে গাছ কেউ কেটে ফেলে না। পরের বছরের চারার জন্য নিয়মিত জল ঢালা হয় শুকনো গাছে। কাটিগুলোও এতদিন তোলা হয় নি। দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে দেখল যে এগুলো এখন পরিষ্কার। কাঠি তুলে গোড়া থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। নিচের ফোঁড়গুলি থেকে সজীব গাছ বেরিয়েছে। ডালিয়ার গাছে আর একটিও শুকনো ফুল নেই। ছোট ছোট ফুল আর কুঁড়ি ছাড়া আর সবই কেটে দেওয়া হয়েছে। আর যে সব মরসুমি ফুল এখনও শুকিয়েও শুকোয় নি, তাদেরও পরিচর্যা হয়েছে। শুকনো ডাল পালা ছেঁটে বীজের কালো কালো থোকা গুলো কেটে এখন একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। দময়ন্তী বুঝতে পারল যে ফুল যেমন সুন্দর, শুকনো ফুল তেমনই কুৎসিত। শুকনো ফুল গাছে না-থাকলে গাছটাকে কুৎসিত মনে হয় না। বুড়ো বয়সে সুন্দর মানুষকেও কি কুৎসিত মনে হয়।

পরমুহূর্তেই দময়ন্তীর মনে হল যে এ কথা সত্য নয়। কিছুদিন আগে একবার সে টপুর ঠাকুমাকে দেখেছিল। মাথার সাদা চুলের মতো তাঁর গায়ের রঙ, পাতলা ঠোঁট আলতার মতো টুকটুক করছে। ধবধবে সাদা ধুতি পরে যখন তিনি সামনে এসেছিলেন, দময়ন্তী চমকে উঠেছিল। বুড়োমানুষ এমন সুন্দর হয়!

কিন্তু ফুলের বেলায় কেন এমন হয় না! রূপের মতো ফুলের সৌরভও চিরদিন থাকে না। পচে দুর্গন্ধ হয় অন্য জিনিষের মতো। সুন্দরের বেলায় তার পরিণাম কি অন্য রকম হতে পারে না?

দময়ন্তী জেগে উঠেছিল মালীর প্রশ্ন শুনে: কী দেখছ দিদি?

দেখছি? দেখছি এই ফুলগুলো। কী নাম এর?

করিয়প্সিস।

বেশ ফুল তো, এখনও শুকিয়ে যায় নি।

এ তো সারাবছর ফোটে।

সারাবছর!

এ গাছ মরে যাবে, আবার নতুন চারা গজাবে আপনা থেকে।

সত্যি নাকি?

প্রায় সব ফুলই এই রকম। এ বছরের বীজ পরের বছর গজাবে। সময় মতো একটু জল পেলেই হল।

ভারি আশ্চর্য তো!

মালীও আশ্চর্য হয়। একটা অতি সাধারণ কথা শুনে এত বড় মেয়ে কী জন্যে আশ্চর্য হয় এই ভেবে তার বিস্ময় জাগে। আর কোন কথা না বলে নিজের কাজে সে মন দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু দময়ন্তীর নানা রকম কৌতূহল জেগেছে। প্রশ্ন করল: ও কী ছড়াচ্ছ?

জিনিয়ার বীজ।

জিনিয়ার চারা বুঝি আপনা-আপনি গজায় না ?

গজায়। বর্ষার জল পেলে গজাবে।

তবে এখন ছড়াচ্ছ কেন ?

এখনও জিনিয়া করি নি বলে মা কাল বকলেন।

ও।

বীজের জমিটা মালী ধুলোর মতো করেছিল। একেবারে মসৃণ। তার উপর আলতোভাবে বীজ ছড়িয়েছে। দময়ন্তী দেখল যে মালী একটা ঝুড়ি থেকে ধুলোর মতো পরিষ্কার মাটি মুঠো মুঠো ছড়িয়ে বীজগুলো ঢেকে দিচ্ছে। খানিকক্ষণ দেখবার পর দময়ন্তী বলল : জিনিয়া খুব ভাল ফুল।

কাজ করতে করতেই মালী বলল : বর্ষার ফুলের রাজা।

রাণী কোন্ ফুল ?

মালী এ-কথা ভেবে দেখে নি। তাই আমতা আমতা করে বলল : রাণী ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ তার মনে পড়ল : রাজা রাণী দুই-ই আছে জিনিয়ার মধ্যে। যেগুলো ডালিয়ার মতো সে রাজা, আর রাণী হল চন্দ্রমল্লিকার মতো।

দময়ন্তী ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর তার বিশ্বাস হল যে মালী ঠিক বলেছে। ফুলের ভিতর ডালিয়াই সবচেয়ে বড়, আর একটা রাজা-রাজা ভাব। তার পাশে চন্দ্রমল্লিকা বড় নরম, বড় কোমল, অথচ সুন্দর, কারও চেয়ে কম নয়। বাগানের রাণী হবার যোগ্য ফুল বটে। মালী ঠিকই বলেছে, জিনিয়া যদি দু'জাতের হয় তবে ডালিয়ার মতো ফুল রাজা আর রাণী চন্দ্রমল্লিকার মতো ফুল।

কিন্তু মা কেন মালীকে বকলেন ! মালী তো সারাদিন বাগানে কাজ করে, যত্ন করে সব রকম ফুলের। নিজে থেকেই সব ফুল লাগায়। ফুল ভাল না বাসলে কি সারাদিন এমন ফুলের পরিচর্যা করা যায় ! জিনিয়াকে তো মালী বর্ষার ফুল বলল। বর্ষা নামতে এখনও অনেক দেরি। তবে কেন মা তাকে বর্ষার ফুলের জন্য বকলেন।

মালী এক সময় উঠে গিয়ে জল এনেছিল। বীজের জায়গাটা জলে ভিজিয়ে দিতে দিতে বলল : এই সময়টাই বাগানের সবচেয়ে দুরবস্থা। শীতের ফুল সব শুকিয়ে যায়, অথচ বর্ষার ফুল একটাও ফোটানো যায় না গরমের জন্য।

গরমের কোন ফুল নেই।

সে আমাদের দিশী ফুল—বেল ফুল। যত গরম, তত সুগন্ধ।

দময়ন্তী বলল : বেল ফুল তো আমার খুব ভাল লাগে।

তারপরেই তার মনে হল, বেলফুলই সবচেয়ে ভাল ফুল। যখন কোন ফুল ফোটে না, তখন সে ফোটে। শুধু রূপ নয়, তার গুণও আছে। সৌরভে মনোহরণ করে।

মালী বলল : বেলফুল গরীবেরও ফুল। একবার লাগালে চিরকাল রইল। যত্ন কর আর নাই কর, অজস্র ফুল দেবে, আর গন্ধও কিছু কম দেবে না।

ঠিক তোমার বউ-এর মতো, তাই না ?

মালী এবারে মুখ তুলে হাসল, বলল : কি যে বল।

দময়ন্তী বলল : তুমি তো সারাদিন ফুলের যত্নই কর, বউ-এর যত্ন তো কর না। তবু তোমার সংসারটি কেমন সুন্দর।

মালী এ মন্তব্যের উত্তর দেবার সময় পেল না। বাড়ির বারান্দা থেকে দময়ন্তীর মায়ের গলা শোনা গেল : রোদে অমন দাঁড়িয়ে আছিস কেন, হাত মুখ যে পুড়ে গেল।

সত্যিই তো, দময়ন্তীর এতক্ষণ কোন খেয়াল ছিল না। নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখল, ফর্সা হাত দু'খানা যেন লাল হয়ে উঠেছে। মুখখানাও নিশ্চয়ই এমনি লাল হয়েছে। তাড়াতাড়ি উত্তর দিল : আসছি মা।

দময়ন্তী আর দেরি করল না, তৎপরভাবে বারান্দায় উঠে এল।

মা বললেন : ছি ছি, কী অসাবধানী মেয়ে ! এমন করলে ক'দিন আর রং থাকবে !

সত্যিই তো !

মা বললেন : বাথরুমে আমি গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি। মুখ হাত ধুয়ে একটু ক্রীম মেখে নে।

দময়ন্তী চলে যাচ্ছিল। মা ডেকে বললেন : শাড়িটাও বদলে নিস। অনেক ধুলো লেগেছে শাড়িতে।

নেব।

একবার নয়, দময়ন্তী অনেকবার শাড়ি বদলেছে সারাদিনে। ক্রীম তুলে পাউডার মেখেছে অনেকবার, গুনগুন করে গান গেয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু জগদীশ আসে নি। তার চিঠি এসেছিল বিকেল বেলায়। দময়ন্তীর মা মুসড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তার বাবা বিস্মিত হন নি। তিনি নাকি এইরকমই আশা করেছিলেন। কিন্তু আগে এ কথা বলেন নি। এ সব কথা তিনি আগে কখনও বলেন না, বলেন ঘটনা ঘটে যাবার পর।

দময়ন্তীর মা দুঃখ করছিলেন তাঁর সারাদিনের পরিশ্রমের জন্য। এত সাজসজ্জা, এত আয়োজনের কিছুই জগদীশ দেখল না।

নরোত্তমবাবু বললেন : যে দেখলে খুশী হবে না, সে ঠিকই দেখবে।

কে ?

আমাদের কাঠুরে চৌধুরী।

তাকে তুমি বারণ কর নি আসতে ?

রাতে আসতে বলেছি। তোমার জগদীশ তো সন্ধ্যার আগেই ফিরে যেত, কোন অসুবিধা হত না।

লীলাবতী কোন উত্তর দিলেন না দেখে নরোত্তমবাবু বললেন : তাকেই খাইয়ে দিও।

লীলাবতী এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না।

কাঠুরে চৌধুরী একখানা জীপে চেপে সন্ধ্যার পূর্বেই এসে উপস্থিত হল। মালী গেট খুলে দিয়েছিল। নরোত্তমবাবু নিজে এগিয়ে গেলেন তাকে অভ্যর্থনা করতে ; বাহিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দময়ন্তী দেখল যে কাঠুরে চৌধুরী একা এসেছে জীপ চালিয়ে। গাড়ি থেকে যখন নেমে দাঁড়াল, ভয়ে ও বিস্ময়ে দময়ন্তী অভিভূত হয়ে গেছেন। এ মানুষ, না দৈত্য ! লম্বা ও চওড়ায় এত বড় মানুষ সে আগে কখনও

দেখে নি। মুখ উঁচু করে তার বাবা তার সঙ্গে কথা কইলেন। বললেন : আসুন মিস্টার চৌধুরী, আমরা আপনারই অপেক্ষা করছি।

আমার অপেক্ষা!

নরোত্তমবাবু হেসে বললেন : না, আপনার অবশ্য দেরি হয় নি।

দময়ন্তী দেখল, কথায় কাঠুরে চৌধুরীর মন নেই, বারান্দার দিকেও সে এখনও তাকায় নি। তার দৃষ্টি বাড়ির গাছগুলোর দিকে। একটু এগিয়ে গিয়ে বলল : ওটা সিল্ভার ওক না?

নরোত্তমবাবু স্বীকার করলেন : জানিনে।

আর একটা গাছের দিকে চেয়ে কাঠুরে চৌধুরী বলল : দামী গাছ। মেহগনি। বিলিতি নয়, অ্যামেরিকান মনে হচ্ছে। ঐ তো বিলিতি মেহগনিও দেখছি একটা।

মাথা নেড়ে নরোত্তমবাবু বললেন : তা হবে।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : এসব সৌখীন গাছ এ অঞ্চলে দেখা যায় না। এ বাড়িটা কি কোন সাহেবের ছিল?

ঠিক ধরেছেন। রিচার্ডসন নামে একজন সাহেবের কাছ থেকে আমি এ বাড়ি কিনেছি।

খুব ভাল করেছেন। দিনে দিনে এ বাড়ির দাম বাড়ছে। ওদিকের দেবদারুগুলো তৈরি হয়ে এসেছে। মেহগনি তৈরি হতে আরও কিছু সময় লাগবে।

এসব গাছে বোধ হয় লাক্ষার কীট ধরে না?

সর্বনাশ! এমন সৌখীন গাছে আপনি লাক্ষার কীট ধরাবেন!

লজ্জিত ভাবে নরোত্তমবাবু বললেন : না—না। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম।

কাঠুরে চৌধুরী এবারে বাগানের ফুলের দিকে তাকাল। বলল : এখনও এত ফুল আছে?

নরোত্তমবাবু গর্বিত ভাবে বললেন : আমার স্ত্রী ফুল ভালবাসেন। তাঁরই জন্যে সারা বছর ফুল থাকে।

লীলাবতী তখন বেরিয়ে এসেছিলেন। নিঃশব্দে নমস্কার বিনিময় করে জিজ্ঞাসা করলেন : কেন, আপনার ফুল বুঝি শেষ হয়ে গেছে?

কবে?

তারপরেই বলল ; মরশুমি ফুলের বড়া ভারি সুস্বাদু হয়।

লীলাবতী বিস্মিত হয়েছিলেন, আর দময়ন্তী যে চমকে উঠেছিল, ও তার মনে আছে। কী নৃশংস মানুষ। এমন সুন্দর ফুল সে ভেজে খেয়ে ফেলেছে! দময়ন্তীর পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই তারা বারান্দায় উঠে পড়ল। দময়ন্তী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, নমস্কারের জন্য তার হাত দু'খানা কিছুতেই উপরে উঠল না।

নরোত্তমবাবু বললেন : আমার মেয়ে দময়ন্তী।

কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর পা থেকে মাথা অবধি দেখে বলল : বেশ মেয়ে।

লীলাবতী আবার আশ্চর্য হলেন এই লোকটির কথা শুনে। বয়সে যুবা পুরুষমানুষ যে এইরকম মন্তব্য করতে পারে, এ তিনি প্রথম দেখলেন। কিছু অমার্জিত মনে হল, কিছু রূঢ়। বনে বাস করে মানুষটা বুঝি বুনো হয়ে গেছে। জগদীশের কথা লীলাবতীর মনে পড়ল। জগদীশ হলে এ রকম কথা নিশ্চয়ই বলত না। তার ব্যবহারে নিশ্চয়ই অনেক সুরুচির পরিচয় পাওয়া যাবে।

দময়ন্তী লজ্জা পেয়েছিল। শাড়ির আঁচলটা পিছন থেকে সামনে টেনে নিয়ে সে পাশে সরে গিয়েছিল।

কাঠুরে চৌধুরী দাঁড়িয়ে থেকে আর কোন কথা বলে নি। সামনের ড্রয়িং রুমে আলো জ্বলছিল। সেই দিকেই সে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল।

দময়ন্তী তার মায়ের মুখের দিকে তাকাল। তাদেরও কি ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসতে হবে?

সায়াহ্নের ছায়া নেমেছে বাইরে। প্রসন্ন আবহাওয়া। মেয়েকে নিয়ে লীলাবতী বাইরেই থাকবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকবার আগে নরোত্তমবাবু তাদের ডাকলেন : এস!

লীলাবতী আর দ্বিধা করলেন না। মেয়েকে নিয়ে ঘরে গিয়ে বসলেন।

চার

তার বাবার সঙ্গে কাঠুরে চৌধুরীর যে গল্প হয়েছিল, দময়ন্তী তা শুনেছিল। তার বাবাই বেশি কথা বলছিলেন। নানা রকমের কথা। ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশের অবস্থার কথা, এমন কি রাজনীতি পর্যন্ত। কাঠুরে চৌধুরী স্বল্পভাষী, কিন্তু কথাগুলি চাঁচাছোলা স্পষ্ট, অনেক সময় রূঢ়। নরোত্তমবাবুর সঙ্গে তার প্রভেদটা বড় বিশ্রী মনে হচ্ছিল।

নরোত্তমবাবু বললেন : এমন করে আপনার সঙ্গে কোনদিন আলাপ হয় নি।

তিনি আশা করেছিলেন যে, কাঠুরে চৌধুরী কথাটা সমর্থন করবে। কিন্তু তার বদলে সে বলল : হঠাৎ কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তা এখন বলেন নি।

আরে ছি ছি, কি যে আপনি বলেন। এই একটু আলাপ করবার ছিল। আর একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া।

লীলাবতী বিস্মিতভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর কী প্রয়োজন ছিল। সে কথা তো বললেন না! না, পরে বলবেন! এও কি ব্যবসার কায়দা না কি! স্ত্রীর দিকে তাকিয়েই নরোত্তমবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বোধ হয় একটা কটাক্ষও করলেন।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : আমার কিন্তু বেশিক্ষণ থাকা চলবে না।

কেন?

একটা বাঘের খবর পেয়েছি। কাল রাতে একটা মোষের বাছুর টেনে নিয়ে গেছে।

আপনার?

পাগল হয়েছেন!

কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর দিকে চেয়ে দেখল যে সে ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

লীলাবতী দু'চোখ বিস্ফারিত করে প্রশ্ন করলেন : আপনি শিকার করেন?

করি।

কোনরকমে দময়ন্তী বলল : ভয় করে না ?

প্রশ্ন শুনে কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে হাসল। সেই হাসিতে দরজা জানালার শার্সিগুলো পর্যন্ত ঝনঝন করে কেঁপে উঠল।

দময়ন্তী লজ্জা পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল : গুলি করে মারতে আপনার মায়া হয় না।

এ প্রশ্নের উত্তরেও কাঠুরে চৌধুরী হাসল।

নরোত্তমবাবু বললেন : আপনার হাতী আছে ?

না।

তবে কি মাচার উপরে উঠবেন ?

না।

তাহলে কি পায়ে হেঁটে বাঘ মারবেন ভাবছেন ?

দরকার হলে গাছে উঠব। যাবেন আপনি ?

ভয়ে ভয়ে নরোত্তমবাবু বললেন : রক্ষা করুন।

আপনি ?

কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর দিকে তাকাল।

দময়ন্তীর তখন নিঃশ্বাস বইছে না। কাঠুরে চৌধুরী কি মানুষ, না সত্যিই একটা দৈত্য! তা না হলে এই অরণ্যের ভিতর অন্ধকারে বাঘের মুখে যেতে চাইছে অবলীলায়! দময়ন্তী কোন উত্তর দিতে পারল না।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঠুরে চৌধুরী আবার হেসে উঠল। সেই রকম উদ্দাম হাসি। মনে হয়, পৃথিবীতে আর কোন শব্দ নেই। শুধু সে আছে, আর তার হাসি আছে।

লীলাবতী জিজ্ঞাসা করলেন : শিকারে কি আপনি একা যান ?

হাতী থাকলে একা শিকার করা যায়, তা না হলে দু' একজন লোক থাকা ভাল।

কেন ?

বাঘের খোঁজের জন্যে।

ঠিক এই মুহূর্তে দময়ন্তীর মনে হয়েছিল যে কাঠুরে চৌধুরী নিজেই একটা বাঘ। তার হাসির সঙ্গে বাঘের হুঙ্কারের কোন তফাৎ নেই। যদিই বা থাকে তো সে ভাবের তফাৎ, স্বভাবের নয়। দময়ন্তী ভাল করে তার মুখখানা দেখেছিল। চৌকো ধরণের মস্ত মুখ, পুরু ভরাট, বড় বড় চোখ যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। রঙ ময়লা নয়, ফর্সাও নয়, নাকের নিচে কড়া করে ছাঁটা গোঁফ, আর মুখে চুরুট। সব মিলিয়ে এমন একটা রূপ যে মনের মিল হলে সুপুরুষ বলা চলে, না হলে বাঘ। দময়ন্তী ভেবেছিল, তাকে কাঠুরে চৌধুরী না বলে বাঘা চৌধুরীও বলা চলে।

লীলাবতী আর কথা বলেন নি, বলেছিলেন নরোত্তমবাবু : আপনার সাহস আছে। আপনার মতো চেহারা হলে আমরাও শিকারে যেতাম।

যেতেন না।

কেন ?

দেহের সঙ্গে সাহসের কোন সম্বন্ধ নেই।

নরোত্তমবাবুর ভাব দেখে মনে হয়, এ কথা তাঁর বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : কথাটা বিশ্বাস হল না বুঝি ?

বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে।

তবে একটা ছোট ঘটনা বলি। আমারই এক বন্ধু। রোগা পটকা, মাথায় আমার বুক পর্যন্ত, ওজন এক মণের সামান্য কিছু বেশি। তার সঙ্গে সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হতেই আমার বুকে এক ঘুষি মারল, আমার মুখে তার হাত পৌঁছল না। আমি দু'হাতে তাকে শূন্যে তুলে ধরলাম, সে কিন্তু ঘুষি চালাতেই লাগল।

আমি তাকে ছুঁড়ে ফেলতে পারতাম, আছড়ে মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু তার এতটুকু ভয় হল না। উলটে আমাকেই ভয় দেখাতে লাগল, তোকে আজ মেরেই ফেলব।

নরোত্তমবাবু হেসে উঠলেন, বললেন : তা যা বলেছেন। এ-রকম মানুষও পৃথিবীতে অনেক আছেন।

লীলাবতী বললেন : আমি কখনও দেখিনি।

নরোত্তমবাবু বললেন : দেখনি ! এই তোমাদের কথাই ধর না। মেয়েরা যখন পুরুষের উপর আস্ফালন করে, তখন কি হাসি পায় না ?

লীলাবতী লজ্জিত ভাবে বললেন : কি যে বল !

কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল হা-হা করে। দময়ন্তী চমকে উঠল। সেই রকমের বন্য অমানুষিক হাসি। এই লোকটার মধ্যে কোন কোমলতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই রকম মানুষকে তার বাবা বাড়িতে কেন নিমন্ত্রণ করে আনেন !

দময়ন্তীর মনে পড়ল, তার বাবা বলেছিলেন, নিজের প্রয়োজনে এই লোকটাকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন। নিজের মানে, তাঁর ব্যবসার প্রয়োজনে। কিন্তু বাড়িতে তো ব্যবসা করেন না, ব্যবসার জন্য তাঁর বাগান আছে, কারখানা আছে, বড় অফিস আছে যেখানে, আলাপ-আলোচনা তো সেখানেই করা চলে। তার জন্য বাড়িতে ডেকে এনে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে সপরিবারে এমন ঘনিষ্ঠ হবার কী প্রয়োজন! খাবার নিমন্ত্রণ! সে তো অফিসেও খাওয়ানো যায়। তার বাবা তো কতদিন বাড়ি ফিরতে পারেন না, রাতেও অফিসে থাকতে হয়। তখন তো তার মা অফিসে খাবার পাঠিয়ে দেন। সেখানে এই কাঠুরে চৌধুরীকে খাওয়ালে আজ তাদের এই বিশ্রী লোকটার মুখোমুখি বসতে হত না।

সহসা কাঠুরে চৌধুরী বলল : এইবারে আপনার কাজের কথাটা বলে দেখুন।

নরোত্তমবাবু বললেন : তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! কাজটা তো আমার, সময় মতো আমিই আপনাকে বলব।

উত্তরটা বোধ হয় কাঠুরে চৌধুরীর মনঃপূত হল না। কাজের জন্য ডেকে এনে কাজের কথা কেন বলছে না ? বাজে গল্প বলে শুধু সময় নষ্ট করছে !

নরোত্তমবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু সন্দেহ করলেন। বললেন : আজ পরিচয়টা আমাদের ভাল করে হোক। তারপর কাজের কথা হবে। আমি আপনার বাড়ি গিয়ে সে কথা বলব।

নরোত্তমবাবুর কথা শুনে লীলাবতীও আশ্চর্য হচ্ছিলেন। পরিচয় তো আছেই, আবার ভাল করে পরিচয় করার কী মানে।

আর কাজের কথাই বা এমন কী থাকতে পারে যে এত ভূমিকার দরকার। লীলাবতী নিজে কোন কথা কইলেন না।

দময়ন্তীর ভাল লাগছিল না। সে উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় নরোত্তমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার গান কেমন লাগে ?

গান ? বন্দুক !

না-না, আমি গান মানে সঙ্গীতের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

ও সঙ্গীত !

দময়ন্তীর মনে আছে যে তার বুক তখন টিপ টিপ করছিল। কাঠুরে চৌধুরী হয় তো এবারে গান শুনতে চাইবে, কিংবা তার বাবাই তাকে গান গাইতে বলবে। দময়ন্তীর গরম বোধ হতে লাগল।

লীলাবতী এই প্রসঙ্গের কোন প্রয়োজন বোধ করছিলেন না! কাঠুরে চৌধুরী তো জগদীশ মেহতা নয় যে মেয়ের গান শোনাবার দরকার আছে। শুধু শুধু তাকে কেন কষ্ট দেওয়া।

কিন্তু কাঠুরে চৌধুরীই সমস্যার সমাধান করে দিল, বলল : গান শুনলে আমার হাসি পায়।

নরোত্তমবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন : কেন ?

হাসি পাবারই কথা নয় কি! বড় বড় ছেলেমেয়ে কী করে ইনিয়ে বিনিয়ে চেঁচায় আমি ভেবে পাইনে।

লীলাবতীর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। গান সম্বন্ধে এ রকম মন্তব্য বুঝি তিনি জীবনে কখনও শোনেন নি।

দময়ন্তী যে খুশী হয়েছিল, তা তার মনে পড়ছে। এই একটি কারণে কাঠুরে চৌধুরীকে তার ভাল লেগেছিল। তাকে গান গাইতে হয় নি। ঐ বিশ্রী লোকটাকে কোনদিন গান শোনাতে হবে না। এ কম আশ্বাসের কথা নয়।

নরোত্তমবাবু বোধ হয় ভাবছিলেন। এবারে কী বলা যায়! কাঠের কথা শুরু করবেন, না লাক্ষার কথা। এ ছাড়া আর কোন কথা তাঁর মনে পড়ছিল না। আর একটু রাত না হলে খাবার কথাও বলা যায় না।

লীলাবতী উঠে বললেন : আমি আসছি।

দময়ন্তীও উঠে পড়ল।

নরোত্তমবাবুকে বড় অসহায় মনে হল। বললেন : খাবার হলেই আমাদের ডেকো।

খাবার টেবিলে দময়ন্তীর ভয় করছিল। কোন মানুষকে কাঠুরে চৌধুরীর মতো গোগ্রাসে সে খেতে দেখেনি। মানুষ যে এত খেতে পারে তাও তার জানা ছিল না। দময়ন্তী প্লেটের উপরেই হাত নাড়ছিল। সে হাত আর মুখে উঠল না।

অনেকক্ষণ পরে দময়ন্তীর দিকে কাঠুরে চৌধুরীর চোখ পড়েছিল। বলেছিল : আপনি শুধু আঙুল নাড়ছেন দেখছি, কিছুই খাচ্ছেন না।

খুশী হয়ে নরোত্তমবাবু বললেন : ও ঐ রকম।

লীলাবতী কিছু বলবার আগেই কাঠুরে চৌধুরী বলল : শরীরও সেইজন্যে কাহিল। এ মন্তব্যটা দময়ন্তীর কাছে খুব সভ্য বলে মনে হল না। মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে পুরুষদের কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। বিশেষত কাঠুরে চৌধুরীর মতো একজন অপরিচিত পুরুষের। অরণ্যে বাস করে এই লোকটা যে একটু বন্য হয়ে গেছে, তাতে আর দময়ন্তীর সন্দেহ নেই। চেহারাটা এমন দৈত্যের মতো না হলে সে বোধ হয় তাকে ক্ষমা করতে পারত। এখন ভয়ে সে ম্রিয়মাণ হয়ে আছে।

লীলাবতী বললেন : আমিও সেই কথা বলি।

তারপরেই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে গেলেন। দময়ন্তীর দৃষ্টিতে কোন ভর্ৎসনা ছিল না, নিতান্ত অসহায় ভাবে যেন অব্যাহতি চাইছিল। লীলাবতী জানেন যে মেয়ে এই আলোচনায় লজ্জা পায়।

কাঠুরে চৌধুরী চেয়ে দেখল, দময়ন্তী যেন একটু বেশি ফর্সা। রাতের আলোয় তাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। অনেকদিন রোগভোগের পর যেন নতুন উঠে বসেছে। পাতলা ঠোঁট, গোলাপী গাল, বড় বড় চোখের উপরে সরু ভ্রূ, সরু কপাল। প্লেটের উপরে তার লম্বা আঙুল থেমে গেছে, মাথাটা নুয়ে পড়েছে অনেকখানি। দময়ন্তী বোধ হয় এখন মুখ তুলবে না। কাঠুরে চৌধুরীর বোধ হয় মনে হল, দময়ন্তী সত্যিই সুন্দর মেয়ে। [ক্রমশ।

শঙ্খশিল্প

আশীষ বসু

সামুদ্রিক ঝিনুকের তৈরী
কাঁটা-চামচ

ছুরির হাতল মোষের শিংয়ের আর পাত
ঝিনুকের তৈরী

শাঁখ মোটামুটি দু'রকমের। যে শাঁখ বাজে আর যে শাঁখ বাজে না, তাও কাজে লাগে। আর তা কাজে লাগে নানাভাবে।
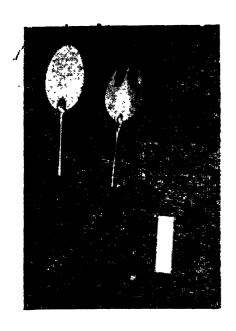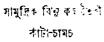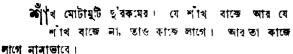
শাঁখ-জন্মায় সমুদ্রে। সমুদ্রের বুকেই তা বড়ো হয়। আর সেই সমুদ্রের গভীর থেকেই জীবন বিপন্ন করে ডুবুরী তা তুলে নিয়ে আসে।

ভারতবর্ষের সমুদ্রে শাঁখের দেখা পাওয়া যায় নানা জায়গায়। সিংহল থেকেও এক সময় শাঁখ আসতো প্রচুর।

শাঁখ বা শঙ্খ প্রধানত পাওয়া যায় দক্ষিণ ভারতের ওখা মণ্ডল, সৌরাষ্ট্রে, ত্রিবাঙ্কুরে, মাদ্রাজ উপকূলে, টিউটিকোরিনে, রামনাদে, করমণ্ডল উপকূলে আর তার আশে পাশে।
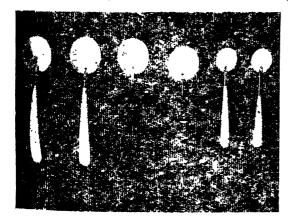
কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই যে, শাঁখের ব্যবহার হয় বাঙলায়, আসামে, বিহারে আর উড়িষ্যায়। শাঁখা তৈরী বাঙলার এক মস্ত বড় কুটির-শিল্প। যার মধ্যে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় প্রায় ১২,০০০ কারিগরের।

কথায় বলে, শাঁখের করাত যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। শাঁখা তৈরী করতে অস্ত্র লাগে খুব কম। শাঁখের ধারালো করাত, ফাইল এই সব। শাঁখার ওপরে সময় সময় গালা দিয়ে হয় নক্সার কাজ।

প্রায় ২২ লক্ষ শাঁখ ভারতবর্ষের সমুদ্র থেকে ওঠে, বছরে। তার মোটামুটি হিসাব এই রকম :—

টিউটিকোরিন	...	১০,০০,০০০
রামনাদ	...	৮,০০,০০০
উত্তর আরবসাগর অঞ্চল	...	২,০০,০০০
কেরালা	...	৭৫,০০০

সমুদ্রের ঝিনুকের চামচ নানা সাইজের

চিরবিখ্যাত সাবিত্রী শাঁখা

গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র	...	৫০,০০০
পণ্ডিচেরী	...	৫০,০০০
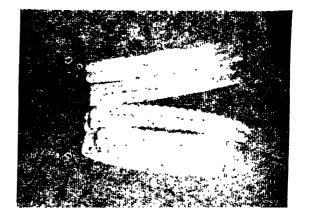
এর মধ্যে প্রায় ১৭,০০,০০০ লক্ষ শঙ্খ হয় নানা কাজের উপযুক্ত। বাকী পোকা ধরা, নয় তো কোনও রোগগ্রস্ত, যা দিয়ে কাজ চলে না বা অপ্রাপ্তবয়স্ক। আমাদের দেশে এই শঙ্খের রক্ষণাবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া না থাকায় বৎসরে বহু শঙ্খ নানা কারণে অকালে মারা যায়।

শাঁখের কাজ ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন শিল্প। ফ্রান্সের মিউজিয়ম 'লুভরে' রক্ষিত একটি শাঁখের কাপের বয়স পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে প্রায় আড়াই হাজার বছর। 'সুসা'র ধ্বংসাবশেষ থেকে এটি পাওয়া যায়, তবে অনেকে মনে করেন এটি তৈরী হয়েছিল প্রাচীন ভারতে।

বাঙলাদেশের শঙ্খ-শিল্পের ইতিহাসে একটি সুন্দর গল্প আছে। কথিত আছে, একবার দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্খকারের বেশ নিয়ে পার্বতীকে শাঁখা পরাতে আসেন। শাঁখা হাতে পরাতে গিয়ে বারবারই ভেঙ্গে যায়। দক্ষদুহিতা পার্বতী পরম পতিপরায়ণা। তাঁর হাতের শাঁখা ভেঙ্গে যায় এ অতি আশ্চর্য ব্যাপার। শঙ্খকার বেশী মহাদেব বললেন, তুমি যথেষ্ট পতিব্রতা নও তাই তোমার হাতে শাঁখার এই অবস্থা। দুর্গার ক্রোধের সীমা থাকে না। তিনি যদি পতিব্রতা না হন তো পতিব্রতা আর কে? ক্রোধে তিনি শাঁখারীকে (শঙ্খকারের অপভ্রংশ) শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন সহাস্য-বদনে মহাদেব নিজমূর্তি ধারণ করে বলেন যে, তিনি তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন মাত্র।

বিবাহিতা মেয়ে মাত্রেরই শাঁখা অতি অবশ্যধারণীয় ছিল একদা, আজকাল অবশ্য অনেকে তা পরা যথেষ্ট আধুনিক বলে মনে করেন না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করেই বাঙলার এই প্রাচীন শিল্পটি দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে আছে। বাঙলাদেশের বারো হাজার কারিগর এর উপর নির্ভরশীল। তাঁরা ছড়িয়ে আছেন নানা জায়গায়। মোটামুটি ভাবে তার একটা হিসাব দিই।

বাঁকুড়া	...	১,৫১১
মেদিনীপুর	...	৮৮০
মুর্শিদাবাদ	...	৫,০০০
হুগলী	...	৩২
হাওড়া	...	৪৩০
নদীয়া	...	১,০০০
কুচবিহার	...	৩৮
কলিকাতা	...	১,৫০০
চব্বিশ পরগনা	...	৭০০
অন্যান্য অঞ্চল	...	১,০০০

পশ্চিম বাঙলার মধ্যে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকাদহ, শাঁখারীপাড়া, কাদাশোল, টিকরগ্রাম, পাত্রসায়ের, সাহসপুর, রায়বাঘিনী, হাতগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে শাঁখা তৈরী হয়। মেদিনীপুরে শাঁখা তৈরী হয় কলমীজল, দুবরাজপুর, শ্রীবোরা, রাধাকান্তপুর, যোগীবার, পাঁচরোল, অমর্ষি প্রভৃতি স্থানে, হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া, শ্রীপুর, বদনগঞ্জ, রাজহাটি প্রভৃতিতে, মুর্শিদাবাদের জিতপুরে, হাওড়ার বাঁটুলে, নদীয়ার বেলডাঙ্গায়।

কলকাতার বাগবাজার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট প্রভৃতি জায়গায় একাধিক শাঁখার কারখানা রয়েছে বহুদিন ধরে।

অবিভক্ত বাংলায় বড় শাঁখার কারবার ছিল ঢাকায়। সেখান থেকে বহু শঙ্খকার চলে এসেছেন দেশ বিভাগের পর। এঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন হাওড়ায়, কলিকাতায়, বারাকপুরে, মুর্শিদাবাদের জিতপুরে, নদীয়ার বেলডাঙ্গায়।

সমুদ্র-শাঁখ অর্থাৎ যে শাঁখে শাঁখা হয়, তা ছাড়া আরও নানা রকমের শঙ্খ পাওয়া যায় ইংরাজীতে যাকে বলে 'সেল'। আন্দামানের কাছে সমুদ্রে পাওয়া যায় ট্রোকাস আর টার্বো সেল। তা দিয়ে আজকাল তৈরী হচ্ছে নানা সৌখীন জিনিষ। যেমন নকসী কানের গহনা, চুলবাঁধার ক্লিপ, গলার পেনডেন্ট, মুক্তোর মতো দেখতে হার আরও কত কি। তৈরী হচ্ছে চিরুণী, টেবিল ল্যাম্প, এমন কি ছুরির বাঁট, চামচে সব কিছু। বাজারে এগুলির চাহিদাও বাড়ছে ক্রমে ক্রমে।

যে শাঁখ বাজে না, তাও ফেলা যায় না। আসলে যে শাঁখ বাজে তা আকারে বড়ো এবং বেশী বয়সের। আর যে শাঁখে শাঁখা হয়, তা মাঝারী সাইজের। একটি প্রমাণ সাইজের শাঁখ থেকে তৈরী হবে চার থেকে পাঁচ জোড়া শাঁখা।

শাঁখ ছাড়াও সমুদ্র থেকে ওঠে নানা রকমের ঝিনুক, যা থেকে তৈরী হয় নানা জিনিষ। পুরী প্রভৃতি জায়গায় এমন কি কালীঘাটের বাজারেও সে নকসী কাজের দেখা মিলবে।

শিকার

বীরু চট্টোপাধ্যায়

পাশব প্রবৃত্তি জাগে; শান্তিপ্রিয়ে করে সর্বনাশ।
হিংসার উন্মত্ত ক্ষুধা, বর্বরের উদগ্র উল্লাস,
গুপ্ত ছিল এ তমিস্রা ঘ্যুতে আর সঘন গর্জনে।
মৈত্রী বুলি ছিন্ন করি, ভ্রাতৃভাব সমূল-বর্জনে,
শিয়রে চোরের ছায়া। আজিকার বিকৃত আঁধারে
কোথা গেল পঞ্চশীল? (কার কণ্ঠ কি সুরে বাঁধা রে!)।

কে ভেবেছে এতকাল অরণ্যের শ্বাপদ স্বপন,
সকল অন্তরে করে দধীচির বজ্রের বপন।
আপন অঙ্গের মাঝে রক্তে বুঝি ঢেউ জাগে তার—
সবল আক্রোশভরে অহর্নিশ উগারে ধিক্কার।
হায় আশা, মূঢ় আশা শান্তি চাহ আর—
বোঝোনিক তপোবনে একমাত্র তুমিই শিকার।

রানীবান্দে বাঘ শিকার

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(এক যাত্রায় তিনটি ব্যাঘ্র ও একটি ভল্লুক শিকারের কাহিনী)

শ্রীজয়কৃষ্ণ দাস

ওদিকে বাঘকে দেখিতে না পাইয়া শৃগালগুলি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আগ্রহের অসমাপ্ত-ভোজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। শৃগালেরপালকে তাহারই শিকারের গ্রাসকে এইরূপ নির্লজ্জভাবে উদরস্থ করিতে দেখিয়া বাঘের হয়ত ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল অথবা শৃগালেরদলটির উপস্থিতি বাঘের মনে হয়ত নিরাপত্তার ভাব সঞ্চার করিয়াছিল কি না জানি না. বাঘটা সহসা একটা মৃদু গর্জনসহ লাফ দিয়া তাহার গোপন স্থান হইতে ছুটিয়া বাহির হইল এবং নিহত গাভীটির উপরে দুইটি থাবা দিয়া চড়িয়া বসিয়া চতুর্দিকে তাহার ভাঁটার ন্যায় জলন্ত অক্ষিগোলকের অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, বাঘের আগমনে শৃগালেরপাল চক্ষুর পলকে উধাও হইয়া গেল। লক্ষ্যবস্তুর অল্পকালপ্রযুক্ত এবং বাঘের মস্তকে প্রথমেই ঠিকমত টর্চের আলো নিক্ষেপ করিতে না পারিলে বাঘের আমাদের দেখিয়া ফেলিবার ও লাফ দিয়া পলাইবার সম্ভাবনা থাকায় আমি তখনও পর্যন্ত নিশ্চল অবস্থায় বাঘের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

বাঘ আর সময়ক্ষেপ না করিয়া মৃত গাভীটির পশ্চাতের দিক যে অংশ ইতিপূর্বে খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল ঠিক সেই স্থানে মুখ ডুবাইয়া বড় বড় মাংসের খণ্ড তীক্ষ্ণদন্তে কাটিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া উবু উবু গোটা গোটা গিলিতে আরম্ভ করিল। বাঘকে ভোজনে নিবিষ্ট দেখিয়া আমি আমার সঙ্গীকে বাঘের বক্ষোদেশে টর্চ ফোকাস করিবার জন্য ইসারা করিয়া আমার বন্দুক তুলিলাম। টর্চ ফোকাস করা মাত্র আমি বাঘকে লক্ষ্য করিয়া উপর্যুপরি দুইটি গুলি নিক্ষেপ করিলাম। গুলি খাইয়া বাঘটা শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া আবার মাটিতে পড়িয়া গেল—এবং ঘন ঘন ক্রুদ্ধগর্জনে বনভূমি কম্পিত করিয়া তুলিল। মরণাহত ব্যাঘ্রের সেই সময়কার দন্তবিকৃতি, লোলজিহ্বা ও দাহকারী হিংস্র, ভয়াল কুটিল তীব্র দৃষ্টি ভুলিবার নয়। আহত ব্যাঘ্রের বিভীষিকাময় সেই মুখব্যাদনকারী হিংস্র করালদৃষ্টি অতি বড় সাহসীর মনেও ভয় ও হৃৎকম্পের সূচনা করে। আমার মাচার উভয় পার্শ্বের অনুচর দুইটি আহত ব্যাঘ্রের সেই রক্ত জলকরা মুহুর্মুহুঃ গর্জন ও আমাদের মাচার দিকে নিক্ষিপ্ত বিভীষণ দৃষ্টির আঘাতে থর থর করিয়া এত কাঁপিতেছিল যে, আমার ভয় হইল তাহারা আবার মাচা হইতে বাঘের সম্মুখে পড়িয়া না যায়। আমি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া শক্ত করিয়া মাচা ধরিয়া বসিয়া থাকিতে বলিলাম।

খানিক পরে বাঘের হুঙ্কার থামিয়া গিয়া গোঙানিতে পরিণত হইল। এই সময়ে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু একি হইল! হঠাৎ মুখ ফিরাইতেই দেখি যে, ইতিমধ্যে আহত ব্যাঘ্রটি ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই ভেল্কির খেলা কিরূপে সম্ভব হইল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বাঘটা যখন গুরুতর আহত অবস্থায় মরণযন্ত্রণায় গর্জন করিতে করিতে শায়িত অবস্থায় মাটী আঁচড়াইয়া ও নিকটস্থ গাছপালা কামড়াইয়া ও থাবা মারিয়া লণ্ডভণ্ড করিতেছিল তখন তাহাকে পুনরায় গুলি করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহাকে অন্তর্ধান করিতে দেখিয়া গভীর আপশোস অনুভব করিলাম। মনে পড়িল টর্চের আলোটি বাঘের বক্ষের সম্মুখ দিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক স্থানে ফেলিতে পারে নাই। হয়ত তাহার জন্যই আমার গুলি অল্পের জন্য বাঘের ফুসফুসকে ভেদ না করিয়া কিছুটা পাশ দিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু তথাপি বাঘটা যে গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছে এবং বেশী দূর পলায়ন করিবার তাহার যে ক্ষমতা নাই এবং শীঘ্র মধ্যেই যে তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয় ছিলাম।

যাহা হউক বন্দুকের শব্দে ও বাঘের গর্জন শুনিয়া গ্রামবাসিগণের তথায় আগমন না করা পর্যন্ত মাচাতেই অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতেই আশ্চর্য হইয়া দেখি যে, আমাদের মাচার নীচে কয়েকজন লোক বল্লম ও টাঙ্গি হস্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রাম হইতে এত শীঘ্র কাহারো আসা সম্ভব নহে ভাবিয়া তাহাদিগকে এত শীঘ্র উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, তাহারা গ্রামে ফিরিয়া না গিয়া কৌতূহলবশত বাঘ শিকার দেখিবার জন্য আমাদের মাচার কাছাকাছি কয়েকটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ডাল-পালার আবরণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি একই গাছে চড়িয়াছিল। বন্দুকের গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ঘন ঘন গর্জনের অল্প পরেই তাহারা দুইজন আহত বাঘটিকে হেঁচড়াইয়া একটি ঝোপের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া গাছ হইতে নিঃশব্দে নামিয়া সেই সংবাদ জানাইবার জন্য আমাদের মাচার নীচে আসিয়াছে এবং বাকী লোকগুলিকেও ডাকিয়া আনিয়াছে।

আহত ব্যাঘ্র যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় এবং লোকগুলির এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হঠকারিতা তাহাদিগকে যে কিরূপ মারাত্মক বিপদের সম্মুখে আনয়ন করিয়াছে তাহা তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া আমি তাহাদিগকে পুনরায় নিকটবর্তী বৃক্ষগুলিতে

তাড়াতাড়ি চড়িয়া বসিতে বলিলাম। প্রায় অর্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরে দূরে গ্রামবাসীদের আসিবার সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল। আমি আমার সঙ্গের লোকদিগকে বাঘ না মরিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে এবং মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে, এই কথা চীৎকার করিয়া গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া দিতে ও নিকটে আসিতে নিষেধ করিয়া দিতে বলিলাম। উপদেশমত সকলে উচ্চস্বরে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে ঐ সকল কথা জানাইয়া দিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষে চীৎকার করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে লাগিল ও অবশেষে গ্রামবাসিগণ প্রত্যুষেই আসিবে বলিয়া ফিরিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যে মাচায় কাটাইতে হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা না থাকায়, আমি মাচায় রাত্রিবাসের কোনরূপ উপযুক্ত আয়োজন করি নাই। এবরূপ উপবাসের মধ্য দিয়াই সেই কষ্টদায়ক মাচার উপর বসিয়া থাকিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। মাচায় উঠিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম যে চিতাবাঘ রাত্রি আটটা ন'টার মধ্যেই তাহার অর্ধভুক্ত শিকারের স্থলে ফিরিয়া আসিবে এবং আমরা রাত্রি দশটার মধ্যে অন্তত গ্রামে ফিরিয়া আহার ও নিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারিব। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে এক্ষণে ভোর হইবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু সকল প্রতীক্ষারই অবসান আছে। অবশেষে আমাদেরও দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। পূর্ব-দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উষার মৃদু আলোয় ক্রমে সেই বন-রাজ্যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করিয়া অল্প অল্প করিয়া সকল দৃশ্য দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করিতে লাগিল। আমরা মাচা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে দূরে গ্রামবাসীদের আগমনের সাড়া পাইলাম। তাহারা দূর হইতেই চীৎকার করিয়া আমাদের সংবাদ লইতেছে। তাহাদিগকে সাবধানে সেখানে আসিতে বলিয়া আমরা মাচা হইতে নামিয়া পড়িলাম। বৃক্ষারোহিগণও তর্‌তর্‌ করিয়া মাটিতে অবতরণ করিল। সারারাত্রি সেই স্বল্পপরিসর মাচায় সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া থাকিতে হওয়ায় সর্বাঙ্গে ব্যথা অনুভব করিলাম।

যাহা হউক সকলে সমবেত হইলে আমি আহত বাঘের সন্ধানে প্রথমে নিকটস্থ আশে-পাশের ঝোপগুলির মধ্যে তাহাদিগকে সতর্কতার সহিত দৃষ্টিপাত করিতে ও পাথর ছুঁড়িতে উপদেশ দিয়া প্রস্তুত হইয়া বন্দুক উঁচাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যে দুই ব্যক্তি রাত্রিকালে বৃক্ষারূঢ় অবস্থায় আহত বাঘটিকে একটা ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিতে দেখিয়াছিল বলিয়া জানাইয়াছিল, —তাহারা আরো কয়েকজনের সহিত সরাসরি সেই ঝোপটার দিকে আগাইয়া গেল। আমিও অল্পব্যবধানে তাহাদের পশ্চাতে অনুগমন করিলাম। উদ্দিষ্ট ঝোপটির নিকট যাইয়াই লোকগুলি উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। ঝোপটির অতি-নিকটে যাইয়া দেখিলাম যে, বাঘটি নিঃসন্দেহে মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল যে, গুলি খাইবার অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই বাঘটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল। মৃত বাঘটিকে ঝোপের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিলে পর অপর সকলে উহাকে বেষ্টন করিয়া সমস্বরে আনন্দ-কলরব করিতে ও প্রায় নাচিতে আরম্ভ করিল। যে ব্যক্তির গাভীটি বাঘের কবলে নিহত হইয়াছিল, সে আগাইয়া আসিয়া বাঘটি মরিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার উদ্দেশ্যে নানারূপ অভিশাপ ও গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির মাল ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া আমাকে গ্রামে ফিরিয়া আহার ও বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। আমার কথায় আর বিলম্ব না করিয়া বাঘটিকে একটা গাছের মোটা ডালে বাঁধিয়া লোকেরা কাঁধে ঝুলাইয়া লইলে আমরা সকলে মহা আনন্দে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলাম। গ্রামের মুখে দেখিলাম যে, উকিল-কমিশনারবাবু সহ গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আমাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। বাহকদের স্কন্ধে মৃত-বাঘকে দেখিয়া তাহারাও আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং পরস্পর মধ্যে ঠেলাঠেলি করিয়া বাঘটিকে দেখিতে লাগিল। কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার গুল শোভিত উজ্জ্বল ধূসরাভ হরিদ্রাবর্ণের গাত্রত্বক সম্পন্ন পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটি দেখিতে সত্যই অতিশয় মনোরম। এই হিংস্র শ্বাপদগুলির দেহ ও বর্ণসৌষ্ঠবের সৌন্দর্য প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়া নিরীক্ষণ করিবার মত।

উকিল-কমিশনারবাবু অগ্রসর হইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন ও আমার সাহস ও লক্ষ্যভেদ করিবার ক্ষমতা উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ প্রশংসা-বাণীর অত্যুক্তিতে নিজেকে সাতিশয় লজ্জিত অনুভব করিলাম। দেখিলাম যে গ্রামের সকলেও স-প্রশংসদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইয়া আছে। কমিশনারবাবু বলিলেন যে, আমি ব্যাঘ্র শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যাইলে পর তিনি সেই দিন আমার কথামত কমিশনের কার্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং অধিক রাত্রিতেও আমি ফিরিয়া না আসায় তিনি আমার বিপদাশঙ্কা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে রাত্রি-যাপন করিয়াছেন। তাঁহার এই স্নেহোক্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। গ্রামের বিদ্যালয়টিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমি চা ও কিছু জলযোগ করিয়া স্নান সারিয়া লইলাম ও অচিরকালমধ্যে গভীরভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। প্রায় একটানা তিন-ঘণ্টা নিদ্রাসুখ উপভোগ করিবার পর আমি গাত্রোত্থান করিলাম। তারপর সর্বাঙ্গে উত্তমরূপে সর্ষপতৈল মর্দন করিয়া স্নান-সমাপনান্তে গত রাত্রি জাগরণের ক্লেশ আমার শরীর হইতে সম্পূর্ণভাবে অপনোদিত হইয়াছে ইহা অনুভব করিলাম। দুপুরের আহার সারিয়া লইয়া খাটিয়ায় শুইয়া পড়িলাম। স্থির হইলে যে অপরাহ্ণ বেলায় পুনরায়—জরীপের কার্য আরম্ভ হইবে।

দুপুরে খাটিয়ায় শুইয়া বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময় কমিশনারবাবু আসিয়া বলিলেন যে, বাহিরে কাহারা আমায় ডাকাডাকি করিতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখি যে, 'সিন্দরীআম' গ্রামের ঠিক্ পশ্চিমের গ্রাম হইতে কয়েকজন সাঁওতাল আমার সাক্ষাতের আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহাদের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় তাহারা যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই যে, নিকটের পাহাড়ের নীচের জঙ্গলে গরু-ছাগল চরাইবার সময় সাঁওতাল বালকেরা একটি চিতা-বাঘিনীকে পাহাড়ের একটি গুহায় গতকল্য প্রবেশ করিতে দেখে। বাঘিনীটিকে দেখিয়া গুহামধ্যে তাহার বাচ্ছা আছে বলিয়া তাহাদের সন্দেহ হয়। তাহারা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দেওয়ায় গ্রামের সকলে তীর-ধনুক ও বল্লম ইত্যাদি লইয়া বাঘিনীর গুহার নিকট হানা দিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে বাঘিনী গুহা হইতে বাহির হইয়া বনে পলায়ন করে। বাঘিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহারা গুহামধ্যে ঢুকিয়া তথায় তাহার দুইটি বাচ্ছা

দেখিতে পাইয়া বাচ্চা দুইটিকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে। গতকল্য রাত্রিবেলায় সন্তান শোকাতুরা বাঘিনী তাহার শাবকদের তল্লাসে তাহাদের গ্রামে হানা দেয় ও গ্রামের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ডাকিতে থাকে। সাঁওতালেরা বাঘিনীকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার তীর ছুঁড়িয়াছিল কিন্তু অন্ধকারবশত লক্ষ্য ঠিক না হওয়ায় তাহা তাহার গায়ে লাগে নাই। সন্তানহারা ক্রুদ্ধা বাঘিনী অদ্য রাত্রেও তাহাদের গ্রামে নিশ্চয়ই পুনরায় হানা দিবে এবং মানুষ-জনকেও আক্রমণ করিতে পারে এই ভয়ে তাহারা এখানে আমার উপস্থিতি শুনিয়া সেইরাত্রে বাঘিনীকে মারিবার জন্য আমাকে তাহাদের গ্রামে যাইবার আমন্ত্রণ জানাইতে আসিয়াছে। তাহাদের নিকট এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমি তাহাদের গ্রামের অবস্থিতিস্থল ও বাঘের বাচ্চা দুইটিকে দেখিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে তাহাদের গ্রামে গমন করিলাম।

গ্রামটি তিরিশ চল্লিশটি সাঁওতাল পরিবার লইয়া গঠিত একটি ক্ষুদ্রগ্রাম বা সাঁওতাল পল্লীবিশেষ। গ্রামটির দুইটি মুখ। একটি মুখ আমরা যে বিদ্যালয়টিতে সাময়িকভাবে অবস্থান করিতেছিলাম তাহার দিকে প্রসারিত এবং অপর মুখটি পশ্চাতের জঙ্গলঘেরা পাহাড়ের দিকে অবস্থিত। দুইটি মুখের সামনেই খানিকটা করিয়া খোলা-মেলা স্থান আছে এবং তাহাতে কয়েকটা করিয়া বড় বড় আম, মোল, শাল ও কেন্দ বৃক্ষ আছে। আমি গ্রামটির পশ্চাতের মুখের সম্মুখস্থ খোলা স্থানটিকে আমার শিকারের উপযুক্ত স্থল বলিয়া বিবেচনা করিলাম। আমার নির্বাচিত স্থানটির নিকটেই অবস্থিত একটি গৃহের প্রাচীরের সংলগ্ন অল্প খানিকটা স্থান ঘিরিয়া জঙ্গলের লম্বা লম্বা মোটা সোটা শাল-রলা পরের পর, চারি অঙ্গুলি করিয়া ফাঁক রাখিয়া ঘন করিয়া গভীরভাবে মজবুত করিয়া পুঁতিবার জন্য আমি আমার সঙ্গের সাঁওতালদিগকে নির্দেশ দিলাম। আমার নির্দেশমত রলা পোঁতা হইলে সেগুলিকে সজোরে নাড়া দিয়া দেখিলাম যে রলাগুলি বেশ শক্তভাবেই প্রোথিত হইয়াছে। তথাপি সাবধানতার জন্য ঐ সকল রলাগুলির গাত্র বেষ্টন করিয়া নীচের দিক হইতে উপরের দিকে তিন সারি বাঁশের বাতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে বলিলাম। এইরূপে, হঠাৎ আক্রমণ হইলেও আমার বেষ্টনী যাহাতে অমিত বলশালী ব্যাঘ্ররাজেরও আক্রমণের আঘাত অন্তত সামান্যক্ষণের জন্যও সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে তাহার উপযুক্ত করিয়া লইলাম। বেড়া প্রস্তুত হইলে পর বেড়ার ভিতরের চারিদিকে প্রায় তিন হাত উঁচু করিয়া খড়ের তাড়ি স্থাপনা করিয়া খড়ের আবরণের দেওয়াল রচনা করিলাম এবং মাটিতে আরাম করিয়া হেলান দিয়া বসিবার উদ্দেশ্যে খড়ের তাড়ি পাশা-পাশি করিয়া স্থাপনা করাইলাম। বলা বাহুল্য যে, যে-গৃহটির দেওয়ালের সম্মুখে এই বেড়া প্রস্তুত হইয়াছিল এবং যাহার পশ্চাতের দেওয়াল এই ঘেরার এক দিকের দেওয়াল হইতেছে,—সেই দেওয়াল ঘেঁসিয়া একজন লোক কোনক্রমে প্রবেশ করিতে পারে সেইরূপ ফাঁক রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় আমি বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিলে পর সেই প্রবেশদ্বারটিও রলা দিয়া রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তখন হইতেই তাহার জন্য গর্ত খুঁড়িয়া রাখা হইল।

সমস্ত কায পরিসমাপ্ত হইলে আমি তাহাদের অনুরোধে তাহাদের গ্রামে কিছুক্ষণের জন্য গিয়া বসিলাম। তথায় সাঁওতাল মোড়লেরা আমায় কেন্দ, বঁইচি, কলসা প্রভৃতি ফল খাইতে দিয়া অতিথি সম্বর্ধনা করিল। একটি গৃহের বারান্দায় বাঘের বাচ্চা দুইটিকে বাঁশের সরু সরু ফালি দিয়া নির্মিত একটা মাছ ধরা পলুই ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে দেখিলাম। ধূসর-কালচে রঙের বিড়ালের আকার-সদৃশ দুইটি চিতা-বাঘের বাচ্চা। তাহাদের গাত্র-চর্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের অস্পষ্ট গুলের আভাষ পরিলক্ষিত হয়। শুনিলাম যে বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ গুল স্পষ্ট আকার প্রাপ্ত হইবে এবং গাত্রলোমও পরিবর্তিত হইয়া পাঁশুটে হরিদ্রাভ বর্ণ ধারণ করিবে। সাঁওতালেরা আমাকে একটি বাচ্চা উপহার দিতে চাহিল কিন্তু বাঘের বাচ্চা পোষ মানাইবার ঝক্কি ও বড় হইয়া উঠিলে তাহা হইতে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া ও ঐরূপ ব্যাঘ্র-শাবক পালন করার খেয়াল অতিশয় ধনী ব্যক্তিদের পক্ষেই শোভা পায় ভাবিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহস্থ মানুষ হিসাবে আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। অবশেষে সন্ধ্যার পূর্বেই আমাকে আনিতে যাইবার জন্য বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া কমিশনারবাবুসহ জরীপের কার্যে গমন করিলাম।

সেইদিনের অপরাহ্নের জরীপের কার্য অন্যদিন অপেক্ষা একটু শীঘ্রই ছেদ টানিয়া আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিলাম এবং তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া কিছু আহার করিয়া লইয়া সাঁওতালদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই কয়েকজন সাঁওতাল আমাকে লইতে আসিলে আমি টর্চ ও বন্দুক লইয়া তাহাদের সমভিব্যাহারে তাহাদের গ্রামে গিয়া পৌঁছাইলাম। অতঃপর আমার নির্দেশমত বাঘের বাচ্চা দুইটিকে সেই প্রস্তুতি বেড়া হইতে ১৫।২০ হাত দূরে বাঁশের পলুইটি চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইল এবং যাহাতে বাঘের থাবায় সহজেই উল্টাইয়া না যায় তজ্জন্য ঐ পলুই ঘিরিয়া তাহার চারিদিকে কয়েকটি গোঁজ পুঁতিয়া পলুইটিকে খোঁটার সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইল। আমি আর কালবিলম্ব করা সঙ্গত মনে না করিয়া সাঁওতালদের একজনকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রস্তুতি বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমরা প্রবেশ করিবার পর প্রবেশ দ্বারটিও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইলে আমি সকলকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সকলে প্রস্থান করিলে আমি সেই বেড়ার মধ্যে এমন সুবিধাজনকভাবে বসিয়া রহিলাম যেন মাথা একটু তুলিলেই সম্মুখস্থ বাঘের বাচ্চা ঢাকা বাঁশের পলুইটি লক্ষ্যগোচর হয়।

আমার সঙ্গের সাঁওতালটির মুখবিবর হইতে হাড়ি-মদের ও পেঁয়াজের উৎকট কড়া গন্ধ বাহির হইয়া আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে থাকায় আমি একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া তাহার হাতে টর্চ দিয়া বাঘিনী আসিলে আমার ইঙ্গিতমত তাহার বুকে টর্চের আলো ফেলিবার নির্দেশ দিয়া বন্দুক চালাইবার সুবিধার জন্য তাহাকে একটু সরিয়া বসিতে বলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, আমার সঙ্গী নিদ্রাক্রান্ত হইয়া বেশ ঢুলিতেছে। সাঁওতাল জাতি অতিশয় পরিশ্রমশীল, সরল প্রকৃতি ও বিশ্বস্ত। ইহারা উদয়াস্ত অশেষ কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে এবং নিত্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পাঁচুই অথবা তাড়ি সেবন করিয়া শরীরকে চাঙ্গা করিয়া লইতে অভ্যস্ত। অনেক সময় সন্ধ্যায় মাদল ও বাঁশী সহযোগে নাচ-গান করিয়া আনন্দ উপভোগ করিলেও ইহারা সচরাচর সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ভাত খাইয়া

গভীর ভাবে নিদ্রা যায়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সাঁওতালি নৃত্য ও গীতি-বাদ্য অতিশয় মনোরম ও সুখ্যাত।

যে কোন কারণেই হউক আমার সঙ্গের সাঁওতালটা ঘুমে ঢুলিতে লাগিল। অন্ধকারের মধ্যে আমি সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া নিকটবর্তী অদূরের পাহাড় শ্রেণী ও জঙ্গলের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলাম। এই রূপে কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল মনে নাই। ইতিমধ্যে নিজেরই অজ্ঞাতে হয়ত গত রাত্রির জাগরণজনিত ক্লান্তিবশত কোন সময়ে হয়ত তন্দ্রাতুর হইয়া বসিয়া বসিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দে চমকাইয়া ঝাঁকি মারিয়া জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, ব্যাঘ্রী-মাতা তাহার শাবক-ঢাকা বাঁশের পলুইটি শুঁকিয়া দেখিতেছে ও পলুইটির ভিতর হইতে শাবক দুইটি মাতার আগমন বুঝিতে পারিয়া চঞ্চল হইয়া নানারূপ শব্দ করিতেছে। আমার সচকিত হইয়া জাগিয়া নড়িয়া উঠিবার সময় হয়ত খড়ের মধ্যে একটা খস্ খস্ শব্দ বেশ একটু জোরেই হইয়া থাকিবে। বাঘিনী মুখ তুলিয়া সেই দিকে তাকাইয়াই আমি বন্দুক তুলিতে না তুলিতে চক্ষুর নিমিষে বিদ্যুদ্গতিতে দৌড়িয়া আসিয়াই সগর্জনে বেড়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিল ও তাহার অমিতশক্তিশালী থাবা সেই বলার বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র আঘাত হানিল। সেই আঘাতে অত শক্ত করিয়া প্রস্তুত বেড়াও মড়-মড় করিয়া উঠিল এবং সামনের দেওয়ালের আকারে সজ্জিত খড়ের আঁটি ছড়াইয়া পড়িল।

সৌভাগ্যবশত ঘেরার মধ্যে আমি যেখানটায় দাঁড়াইয়াছিলাম বাঘিনীর থাবার পাল্লা ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাইল না। নচেৎ সেই থাবার এক আঘাতেই আমার ব্যাঘ্র শিকার করা সেইদিনই ইতি হইত। বাঘিনী দ্বিতীয় আঘাত হানিবার পূর্বেই তাহার প্রথম আঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার বন্দুক বাঘিনীর একরূপ গাত্র স্পর্শ করিয়া ঘন ঘন দুইবার গর্জন করিয়া উঠিল। বাঘিনী একটা লম্ফ দিয়াই মাটিতে পড়িয়া গেল আর উঠিল না।

নখ-দন্ত বিস্তার করা বাঘিনীর সেই জ্বলন্ত ক্রুর, হিংস্র দৃষ্টি, লোলজিহ্বা ও ভয়াল মুখব্যাদনসহ এত নিকটে আসিয়া আক্রমণ, আমাকে যেন কতক্ষণ বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এই ঘটনার বহুদিন পর পর্যন্ত আমার মানসপটে অনেক সময় সেই ভয়াবহ দৃশ্য ভাসিয়া উঠিয়া আমায় বিচলিত করিয়া তুলিত। আমার সঙ্গের সাঁওতালটি বাঘের গর্জন ও আক্রমণে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সে টর্চ জ্বালিবার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ভয়ে সম্মোহিত অবস্থায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। গুলি খাইয়া বাঘিনী পড়িয়া যাইলে এবং তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া আমি সাঁওতালটিকে সজোরে নাড়িয়া দিয়া গ্রামের লোকদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে বলিলাম। বাঘিনীর গর্জনে ও বন্দুকের নির্ঘোষে ইতিপূর্বেই গ্রামের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রবেশপথটি পুনরায় খোলসা করিয়া আমাদিগকে বাহিরে আসিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। ঘেরার বাহিরে আসিয়া বাঘিনীটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। আর একটু অসাবধান থাকিলেই বাঘিনীর পরিবর্তে উহার থাবার প্রবল আঘাতে আমাকেই মৃত্যুবরণ করিতে হইত। সাঁওতালগণ বেড়ার উপর বাঘিনীর আক্রমণের তীব্রতা ও খড়ের আঁটিগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হওয়া লক্ষ্য করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল এবং আমরা দৈববলে কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছি দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করিল। মৃত বাঘিনীকে তাহাদের হেপাজতে রাখিতে দিয়া আমাকে বিদ্যালয়টিতে তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতে বলিলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ মহা-আনন্দে কলরব করিতে করিতে আমাকে তথায় পৌঁছাইয়া দিয়া নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া গেল।

বাঘিনীর নিজ শাবক দুইটিকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে টোপের মত ব্যবহার করিতে প্রথমে নিজের মনকে কিছুতেই সম্মত করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রতি বৎসর বাঘের অত্যাচারে এই সকল গরীব গ্রামবাসীদের বহুতর গরু, ছাগল ইত্যাদি নিহত হওয়ায় প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় এবং সন্তানহারা বাঘিনী হয়ত ইহার পর মানুষকেই আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে এবং বাঘিনীকে প্রলুব্ধ করিবার ইহা ছাড়া অপর কোন উপায় নাই ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া মনকে তখনকার মত ধামাচাপা দিয়াছিলাম। এক্ষণে কিন্তু বিদ্যালয়টিতে ফিরিয়া গভীর রাত্রিতে শায়িত অবস্থায় ঐরূপ নিষ্ঠুরতার কথা পুনরায় মনের মধ্যে উদিত হইয়া বিবেকের দংশন জ্বালা উপভোগ করিয়া অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলাম না। আবার বহুক্ষণ বা বাঘিনীর সেই করাল হিংস্র আক্রমণ ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিভীষিকা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। চিত্তের এইরূপ দোদুল্য অবস্থায় অবশেষে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

এই বাঘিনী শিকারের পর আরো কয়েকদিন আমাদিগকে ক্যাম্পের কার্য সমাপ্ত করিবার জন্য তথায় থাকিতে হইয়াছিল কিন্তু সেই যাত্রায় রাণীবান্দে আর অধিক শিকার করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। এই এক যাত্রায় কয়েকদিনের মধ্যেই তিনটি বাঘ ও একটি ভালুক শিকার আমার শিকারজীবনে এক বিশেষ অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইতিপূর্বে সময় ও সুযোগের অভাবে আমার কপালে বাঘ শিকার করা ঘটিয়া উঠে নাই। এই যাত্রাতেই আসিবার পথেই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে ও বিপর্যয়ের মুখে আমার প্রথম বাঘ শিকার করা ঘটিয়া উঠিয়াছিল। বাঘ শিকার করিতে না পারার জন্য ইতিপূর্বে মনের মধ্যে যে একটা ক্ষোভের সঞ্চার ছিল, সেই ক্ষোভ এই এক যাত্রাতেই দূরীভূত হইয়া তাহার স্থলে এক অনির্বচনীয় গর্ব ও আত্মতৃপ্তির ভাব আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

কিন্তু সকল সুখই অবিমিশ্র নহে। ইহার সহিতও একটা খেদ রহিয়া গেল। আমার এই শিকারের মধ্যে একটিকেও আমার অসমাপ্ত কমিশনের কার্য ফেলিয়া রাখিয়া বাঁকুড়া সহরে নিজগৃহে আনয়ন করার উপায় ছিল না। ইচ্ছা থাকিলেও সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে বনপথের মধ্য দিয়া গরুর গাড়ীতে করিয়া শিকার-করা বাঘ সহরে আনয়ন করা মোটেই সুবিধাজনক ও সম্ভবপর ছিল না। অধিকন্তু সঙ্গে কোন ফটো-ক্যামেরা না থাকায় শিকারের একটা ফটোও তুলিয়া আনিয়া প্রিয়জনদিগকে দেখান সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক আমার সে যাত্রায় শিকার-ভাগ্যের জন্য ও জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসার নিমিত্ত পরম করুণাময় ভগবানকে আমার অন্তরের অকুণ্ঠ ভক্তি পুনঃপুনঃ পরম শ্রদ্ধাভরে নিবেদন করিয়াছিলাম এবং আজিও করিতেছি।

(পাঠকদিগকে বারান্তরে অপর শিকার কাহিনী শুনাইবার ইচ্ছা রহিল)।

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

'সাধু-সন্দর্শনে পুণ্যলাভ,'—এই মহাজন বাক্য অনুসরণ করে একদিন যাই পাড়ার অতি প্রবীণ শ্রদ্ধেয় কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের নিকট। তিনি,—আজীবন কংগ্রেস কর্মী, মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বয়স তিরাশী বৎসর,—কিন্তু এতটা বয়স হওয়া সত্ত্বেও স্মৃতিশক্তি, লিখন-পঠন-ক্ষমতা, মননশীলতা অতি প্রখর,—চোখের দৃষ্টি অব্যাহত।

চিরকুমার, আজীবন ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, শ্বেত-শ্মশ্রু সমন্বিত, গৌর-কান্তি, সৌম্য-দর্শন এই সাধু মানুষটি লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের সাধন-ভজন, বিদ্যাচর্চা করে চলেছেন বহুকালাবধি নীরবে। তিনি নানা ধর্মসভায় বক্তৃতা ও ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নে জীবনের অনেক সময় ব্যয় করেছেন।

তার মধ্যে 'গিরিশচন্দ্র' ও 'গিরিশস্মৃতি' নামক পুস্তক দু'টি সুধীজনের নিকট সমধিক সমাদর লাভ করে। বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ বহু সাধু-সন্তের সান্নিধ্য লাভ করে, তাঁদের কথা লেখেন বহু প্রবন্ধে। তাঁর অগণিত লেখা ছড়িয়ে আছে, উজ্জীবন, প্রবুদ্ধ ভারত, উদ্বোধন প্রভৃতির পাতায়।

কুমুদবন্ধুবাবুর দীক্ষাগুরু মহাপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনী লেখা তাঁর আর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। শেষ জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের কথা অনেক লিখেছিলেন যা প্রকাশিত হয় নানা পত্রিকায়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র রাখাল-রাজ ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত,—শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্য,—স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ভগিনী নিবেদিতার সান্নিধ্য প্রাপ্ত এই জ্ঞানী, বহুদর্শী ভক্তটি শ্রীমাকে চাক্ষুষ দেখেছেন শুনে, তাঁরই কথা কিছু শুনতে চাই।

তিনি বলেন,—শ্রীমা ছিলেন অতি স্নেহশীলা সাধারণ মায়ের মত। অলৌকিক, অসাধারণ কিছু তাঁর ভিতরে দেখি নি। ধ্যান-জপ-সমাধি ছিল তাঁর প্রাণের সম্পদ,—বাহিরে ছিল না তার কোনো প্রকাশ। ধীর, স্থির, স্বল্প-বাক্ মার কথাবার্তায় করুণা যেন উপচে পড়ত; সেখানে আপন-পর, উচ্চ-নীচ, কোন ভেদাভেদ ছিল না।

ভক্ত কুমুদবন্ধুবাবু শৈশবে এগারো বৎসর বয়স থেকেই দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত আরম্ভ করেন। তারপর এখানে দীক্ষা নিয়ে দীর্ঘ ধর্মজীবন সাধনায় কাটিয়ে এখন বার্ধক্যে উপনীত। মায়ের স্নেহ পেয়েছেন অনেক, তাঁর অনেক কথাই বললেন।

১১।১২ বৎসর বয়স্ক কিশোর বালক কুমুদবাবু, দক্ষিণেশ্বরের রাখাল মহারাজের বড়ই প্রিয়। ছেলেটির সঙ্গে কুস্তি লড়া—তার কচি হাতের গা টিপে দেওয়া, গায়ের উপরে লাফাতে দেওয়ায় মহারাজের মহা আনন্দ! তাঁরই নির্দেশে প্রথম যেদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যান, মা বলেন,—'এটি কাদের ছেলে গা?'

বাল-সুলভ চাপল্যে কুমুদবাবু তৎক্ষণাৎ বলেন,—'তোমার ছেলে।'

মা থুতনীতে হাত দিয়ে চুম্বন জানিয়ে—মাথা ও বুকে স্পর্শ দিয়ে নীরব আশীর্বাদ করেন। পাশে ছিলেন ভক্তিমতী গোপালের মা, তিনি বলে উঠেন, দেখেছ বৌমা, আমার গোপাল কত চাঁদের মত ছেলে তোমাকে এনে দিচ্ছে!

তারপর মায়ের শ্রীহস্ত প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও অবাধে তাঁর নিকট যাতায়াত। বাৎসল্যময়ী জননীর স্নেহে শ্রীমা বলতেন, 'ছুটির দিনে এখানে এসো ও প্রসাদ নিয়ে রাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে যেও।' তিনিও তাই করতেন।

একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্য বাড়ীভাড়া করা হয় গঙ্গাতীরে; সেখানে যখন মা, ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ মহারাজ ঐ 'হলুদ-গুদামবাড়ী'তে অবস্থান করছিলেন,—কুমুদবাবুও সেখানে এসে কিছুদিন থেকে তাঁদের সঙ্গ-সুখে ধন্য হন। তখন তাঁর বয়স বেড়ে হয়েছে ১৫।১৬।

মহা আনন্দে দিন কাটে, প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান, প্রসাদ গ্রহণ, মা ও রাখাল মহারাজের স্নেহে মন অভিষিক্ত, এই সময়ে লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন গঙ্গা স্নানের পর মহাপুরুষ ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী অহেতুক কৃপায় দেন তাঁকে অযাচিত দীক্ষা ও শ্রীমায়ের নিকট পাঠান আশীর্বাদ ভিক্ষায়।

করুণাময়ী মা পরম স্নেহে আবার তাঁকে নিজ শক্তি ও মন্ত্রপূত মালা দিয়ে করেন প্রাণ-খোলা আশীর্বাদ। তাতেই তাঁর মানব জন্ম সার্থক হয়, মঙ্গলময়ের অপার করুণায় দিব্যদৃষ্টি পেয়ে খুঁজে পান জীবনের লক্ষ্যপথ এবং সমস্ত সুদীর্ঘ জীবন সেই পথেই এগিয়ে চলেছেন অনন্যমনা হয়ে মায়ের দয়ায়।

কুমুদবাবু বলেন,—একবার মার নিকট তিনি ভগবৎ লাভের সহজ উপায় কী, জানতে চাওয়ায়, মা ছোট্ট একটি কথায় এই কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিলেন,—'নির্বাসনা হওয়াই ভগবৎলাভের উপায়'

তারপর কুমুদবাবু বলেন,—'বেদ, উপনিষদ, গীতা—এই ছোট্ট কথাটিই অতি সহজ ভাষায় বলেছেন। কিন্তু ভাষ্যকারগণ এই সহজ কথাটি অতি জটিল করে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে আজও করছেন ভীতি-সঞ্চার।'

শ্রীমার কথা আরও বলেন,—'মা ছিলেন সেকালের পল্লীবালা। মেয়েদের তখন পুঁথিগত বিদ্যা মোটেই ছিল না; আচার-বিচার-শুচিবায়ু প্রভৃতির নিগড়ে ঘেরা পারিপার্শ্বিকে বেড়ে ওঠা মার মন ছিল নির্মল, সংস্কারমুক্ত।'

খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বিজাতীয়া ভগিনী নিবেদিতাকে মা অতি সহজে কন্যারূপে আন্তরিক স্নেহে গ্রহণ করেন। একদিন নিবেদিতা মার সঙ্গে দেখা করতে এসে বারান্দায় বসে অনেক কথাবার্তা বলেন। তিনি চলে যাবার পর মা'র পার্শ্বচারিণীদের মধ্যে একজন স্থানটি ধৌত করার মানসে জলের বালতি ও সম্মার্জনী নিয়ে এলো।

মা জিজ্ঞাসা করেন,—এ কি? অসময়ে এখানে জল ঢালা হচ্ছে কেন?

মহিলাটি বললেন,—বিধর্মী বসে গেল,—এখানে আপনি আবার জপে বসবেন, তাই জায়গাটা ধুয়ে রাখছি।

মা বলেন,—নিবেদিতাকে তুমি বিধর্মী বল? আর সে বসেছে বলে স্থানটি অপবিত্র হয়েছে মনে কর? এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল, —জান, নিবেদিতার স্পর্শে এ স্থান হয়েছে আরও পবিত্র।

একবার কুমুদবাবু রহস্যচ্ছলে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আচ্ছা মা,—পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ,—অসংখ্য তাদের ভাষা। ভগবানকে সকলেই মনের প্রার্থনা জানায় নিজ নিজ ভাষায়; ভগবানের ত' বড় মুস্কিল—এতগুলো ভাষা বোঝেন কী করে?

মা হেসে জবাব দেন,—মানুষের ভাষা? সে ত' পাখীর বুলি! পাখীরা যখন ডাকে, ময়না ময়নার ভাষায়,—কোকিল কোকিলের ভাষায়,—পাখীর ডাক যে শুনতে পায় সে তৎক্ষণাৎ বোঝে যে, এ পাখীর ডাক। আবার যে পাখী চেনে সে বুঝতে পারে কোন ডাক কোন পাখীর।

আমরা অধুনা শান্তিনিকেতনবাসী শুনে কুমুদবাবু বলেন,—আমি শান্তিনিকেতন যাই বহু পূর্বে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ওখানে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্কুলটি খোলার সময় এটি গড়ে তোলার ভার দেন, অভিজ্ঞ কর্মী ও পণ্ডিত ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উপর।

তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতা থাকায়, সে সময়ে তাঁর টানে শান্তিনিকেতন গিয়ে কিছুদিন থাকি। কবি রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য গুণীজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দিনগুলি খুব আনন্দে কেটে যেত। গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব-বিহীন, সাম্প্রতিক শান্তিনিকেতনে আবার আমার যাবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আগেকার সে আনন্দ কী আর আছে?

এই কথাবার্তার কিছুদিনের মধ্যেই শুনি তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছেন। তার কিছুদিন পরেই গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৬২) রোগজীর্ণ নশ্বরদেহ ত্যাগ করে গুরুর আশ্রয়ে, মায়ের কোলে স্থান পেয়েছেন।

স্যার গিলবার্ট ওয়াকার

জীবনের প্রথম ভাগে, সম্ভবত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সাক্ষাৎ পাই বিদেশী এক জ্ঞানযোগী তপস্বীর। তিনি বহুমুখী গুণ-সমন্বিত পৃথিবীখ্যাত গণিতবিদ আবহবিদ ও পদার্থবিদ, স্যার গিলবার্ট ওয়াকার। তিনি ছিলেন, তখন ভারতের আবহ-দপ্তরের কর্ণধার, অগাধ পাণ্ডিত্যমণ্ডিত, সেদিনের স্বল্প 'এফ, আর, এস'-এর একজন।

প্রথমবার সিমলা বাসকালে পাই তাঁর দর্শন। তিনি সপ্তাহে ছয়দিন আপিসের কাজে অত্যন্ত পরিশ্রম করে,—রবিবার নিতেন পূর্ণ বিশ্রাম। সেদিন যেদিকে চোখ যায়, বেরিয়ে পড়ে গাছতলায় বসে সুদূরপ্রসারী হিমালয়ের ছবি আঁকতেন, ক্ষুধার নিদ্রা ভুলে।

তখন তাঁর বৃদ্ধ বয়স,—ভারতের আবহাওয়ায় বেশ কাবু। টেবিলে থাকে এক গ্লাস দুধ—মাঝে মাঝে চুমুক দেন ও আলাপ করেন। না হলে মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়েন ও চেয়ারে বসেই নাক-ডাকা শুরু হয়ে যায়।

তাঁর স্ত্রী-পুত্র থাকতেন বিলেতে ও তিনি ভারত সরকারের অধীনে সমস্ত চাকুরী-জীবন কাটিয়েছেন ভারতে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বিলেতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতেন।

সিমলার বাড়ীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল শুধু রাত্রে ঘুমোবার সময়টুকু,—তা জেনেই একদিন দেখা করতে যাই তাঁর আপিস-কক্ষে। খুশী হয়ে আমাদের বসিয়ে কত গল্প বলেন, কত স্ব-অঙ্কিত ছবি দেখান।

এত বড় গণিতবিদ বৈজ্ঞানিক হিমালয়ের মনোরম দৃশ্যের কত যে 'স্কেচ' এঁকেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়।

অনেক দেশ ঘুরেছেন, সে সব দেশের অনেক অনেক গল্প বলে, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথাও বললেন। তিনি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাদের অনেক বুদ্ধি-চাতুর্যের পরিচয় পান। তারা পাতলা কাঠ দিয়ে এমন একটি অস্ত্র তৈরীর কৌশল জানে,—যা কায়দা করে ছুঁড়ে মারলে, আবার অনেক সময় ঘুরে নিক্ষেপকারীর দিকেই ফিরে আসে।

এই অস্ত্রটির নাম বুমারেং। বুমারেং যন্ত্র বক্রাকারে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে তৈরী। সুদক্ষ নিক্ষেপকারী উহার গতি এমন ভাবে নির্দিষ্ট করতে পারে যে, শত্রু যে দিকেই থাক না কেন,—ঐ যন্ত্র তাকে আঘাত করে ঘায়েল করতে পারে। এই যন্ত্রটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি হয়ত ছোড়া হল পূব দিক লক্ষ্য করে, কিন্তু ও গিয়ে আঘাত করবে পশ্চিম দিকে,—কাজেই এর ক্ষেপণ লক্ষ্য করে কেউ বুঝতে পারে না এটি যাবে কোন দিকে। শত্রু দমন করার জন্য মানুষ সেই আদিকাল থেকেই কত না ভেবেছে,—কত কি-ই না উদ্ভাবন করেছে।

স্যার গিলবার্ট এই আশ্চর্য যন্ত্রটি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অঙ্ক কষে বের করেছেন এর চাতুর্যের মূল-সূত্র।

সূর্যকরোজ্জ্বল পরিষ্কার দিনে সিমলা পাহাড়ের নীল আকাশে দেখা যায়,—ঝাঁকে ঝাঁকে চিল অনেক উঁচুতে উঠে ডানা মেলে চক্রাকারে মনের আনন্দে ভেসে বেড়ায় বায়ুস্তরে। স্যার গিলবার্ট লেগে গেলেন অঙ্ক কষতে। কী করে ঐ পাখীগুলো

একটুও ভাবা না নেড়ে খোলি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে ক্রমশ উপরে উঠে যায়? স্যার গিলবার্ট অঙ্ক কষে বলে দিলেন,—মানুষও কি করে এ ভাবে হাওয়ায় ভাসতে পারে। তারই পরিণতি আজকের গ্লাইডিং যন্ত্র—যা আধুনিক বিমান-চালনায় যুগে অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য।

তিনি কর্মকাল অন্তে স্বদেশে চলে যাওয়ার পূর্বে কোলাবা অবজারভেটরীতে আমাদের নিকট এসে কিছুদিন ছিলেন এবং যাবার আগে একটি 'বুমারেং' গৃহকর্তাকে উপহার দিয়ে তার চালন-কৌশল শিখিয়ে দিয়ে যান। সেই অদ্ভুত যন্ত্রটির আশ্চর্য ক্ষেপণ-কৌশল-পরিদর্শন আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

ঐ পণ্ডিত মানুষটি সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে এখানে কিছু বলা হল।

স্যার গিলবার্ট ওয়াকার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্র। তিনি গণিতে 'র‍্যাঙ্গলার' এবং অল্প বয়সেই পদার্থ বিদ্যায় উৎকৃষ্ট গবেষণার ফলে 'রয়েল-সোসাইটি'র 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁকে আহ্বান করেন, ভারতের আবহ দপ্তরের কর্ণধার (ডিরেক্টার-জেনারেল-অব অবজারভেটারিজ) রূপে। তাঁর কার্যকালে আবহ দপ্তরে আবহ-পর্যবেক্ষণ এবং আবহ-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। এখানে তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ,—ভারতের মনসুন—বৃষ্টিপাত ও শীত-বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্বাহ্নে নির্ণয় করা। (মনসুন ও উইণ্টার রেইন ফোরকাষ্ট)

এই কাজ তিনি করেছিলেন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মনসুন-পূর্ব ও শীত-পূর্ব আবহাওয়ার সঙ্গে ভারতের মনসুন-বৃষ্টি ও শীত-বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ পরিসংখ্যান-গণিতের সাহায্যে। এই বিরাট কাজটির জন্য তিনি একজন পৃথিবী-বিখ্যাত আবহবিদ বলে পরিগণিত হন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সরকারী কর্মকাল সমাপ্তির পর অক্লান্তকর্মী স্যার-গিলবার্ট আরও দশ বৎসর লণ্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজ অব সায়েন্সে আবহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে বিদ্যাদান ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন।

অশীতিপর এই সুদীর্ঘ জীবনের কঠোর জ্ঞান-যোগী-কর্মীর সকল সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটে অল্প কিছুদিন পূর্বে।

শ্রীমতী নরম্যাণ্ড

এক বিদেশিনী মহিলা শ্রীমতী নরম্যাণ্ড এঁর সঙ্গে মেলামেশা অনেক দিনের। প্রায় দশ বৎসর পুণা-প্রবাসে পাই এঁর সাহচর্য।

ভারতের আবহ দপ্তরের তদানীন্তন কর্ণধার স্যার চার্লস নরম্যাণ্ডের পত্নী তিনি। যদিও একই আপিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর স্ত্রী তিনি, তবুও স্বভাবে ছিল না বিন্দুমাত্র অহঙ্কার, প্রভুত্বের মর্যাদায় দূরে সরে থাকার মনোভাব—অন্যান্য ভারতীয় কর্মচারীর পত্নীদের সঙ্গে মিশতেন যেন ঘরের মানুষ।

জাতিতে স্কচ, অতি সুগৃহিণী, পুণার কোথায় কোন দোকানে কোন জিনিষটির দাম অপেক্ষাকৃত কম, তা যেন ছিল ওঁর নখ-দর্পণে! আমার মত নবাগতাদের তিনি অনেক তালিম দিতেন।

তখনকার দিনে মেমসাহেবরা—কৃষ্ণাঙ্গিনীরাও যদি 'অফিসার' গৃহিণী হতেন,—তবে রান্নাঘরের ধারেও যেতেন না। বাবুর্চি-খানসামার দয়ার উপর বাড়ীর লোকগুলির জীবন সমর্পণ করে, নিজেরা ক্লাব, তাস, টেনিস, ড্রাইভিং প্রভৃতিতে মত্ত হয়ে থাকতেন। রান্নাঘরে পা দিলেই তাঁদের মেমসাহেবি-আনা থেকে পদস্খলন ও সঙ্গে সঙ্গে 'প্রেষ্টিজ' লোপ ঘটত।

তেমন দিনে বড় মেমসাহেব মিসেস নরম্যাণ্ডকে দেখেছি, রান্নাঘরে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদারক করতে।

অনেক বয়সে পাওয়া দু'টি মাত্র পুত্রসন্তান ছিল তাঁদের। নয়ন-মণি ছেলে দু'টির আর আদরের সীমা-পরিসীমা ছিল না। এ হেন আদরের দুলাল দু'টি যেই সাত বৎসরের গণ্ডী পার হল, তাদের পাঠিয়ে দিলেন বিলাতের পাবলিক স্কুলের বোর্ডিং-এ।

ছোটর সাত ও বড়র দশ বৎসর বয়স, এমন দিনে 'তার' পেলেন, ছোটটির পড়ে গিয়ে মাথা ফেটেছে—শীঘ্র মা বাবার মধ্যে একজনের যাওয়া প্রয়োজন। স্বামী আপিসের কাজে ব্যস্ত, তাঁর যাওয়া অসম্ভব। তখনকার দিনের ষ্টিমারে তিন সপ্তাহে বিলাত যাওয়া, মিসেস নরম্যাণ্ড 'তার' পাওয়া মাত্র পি. এণ্ড. ও কোম্পানির জাহাজে চড়ে বসলেন।

ফিরে এলে, সুবিধামত একদিন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা অত ছোট ছেলে দু'টিকে বিলেতে রেখে কেন এই অশান্তি ভোগ করছ? এক সপ্তাহ চিঠি না এলে কত দুশ্চিন্তা। যদি এখানকার স্কুল তোমাদের ভাল না লাগে, তবে বাড়ীতে ইংরেজ গভর্ণেস রেখে ত' বাচ্চাদের অনায়াসেই মনের মত শিক্ষা দিতে পার।

তিনি বলেন,—তা হয় না। ভারতে মানুষ হলে ছোট থেকে ওদের একটা আত্মম্ভরিতা (সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স) জন্মে যাবে। মানুষকে—সে সাদাই হউক আর কালোই হউক, মানুষের মর্যাদা দিতে ভুলে যাবে। আরো কী হবে জানো? যখন জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখবে—বাড়ীতে এত দাস-দাসী, আয়া-'গভর্ণেস'—আরামের উপকরণ চতুর্দিকে ছড়ানো, ইচ্ছামাত্র সব পাওয়া যায়, তখন তারা হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম—পঙ্গু। আমরা চাই, শিশু থেকেই আমাদের ছেলেরা হয়ে উঠুক স্বাবলম্বী, সক্ষম, শক্ত মানুষ।

জান, ওখানে বোর্ডিং-এ ওদের সব নিজে কাজ করতে হয়। জামা-কাপড় ঠিক রাখা, জুতো পরিষ্কার করা, বিছানা পাতা—সব নিজেরা করে। এগুলো ছোট থেকে না শিখলে পরে আর পারে না, কিংবা ভাল লাগে না।

তাঁর কথা শুনে আমি অভিভূত! ক'জন মা সন্তানের ভবিষ্যৎ এভাবে চিন্তা করে? যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখনই তাঁকে মোজা বুনতে দেখেছি—হয় কালো, নয় ধূসর, নয় ত' ঐ জাতীয় কোন ম্লান রং-এর।

আমাদের তখন দারুণ বোনার ঝোঁক—নিত্য নূতন ডিজাইনের কার্ডিগান, পুলোভার, উজ্জ্বল রং-এর নানা সৌখীন বোনার দিকে। ভেবেই পেতাম না, সমস্তক্ষণ মিসেস নরম্যাণ্ড কী করে ঐ কুদর্শন মোজাই কেবল বোনেন।

পরে বেশী বয়সে বুঝেছি, বিলেতের দুর্জয় শীতে হাতে-বোনা

মোটা উলের মোজা ভিন্ন পা গরম রাখা কঠিন। সাগর পারের প্রিয়জনকে স্মরণ করে তিনি কেবল মোজাই বুনতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবার দেখি তাঁর অন্য রূপ! ক্যান্টিনের কাজ, যুদ্ধরত সৈনিকদের জন্য সরকার প্রদত্ত মোটা পশম দিয়ে অক্লান্ত ভাবে মাফলার, টুপি, মোজা, পট্টি, সোয়েটার প্রভৃতি নিজেও বুনে দিয়েছেন এবং আমাদের দিয়েও করিয়ে নিয়েছেন। এই শ্রদ্ধেয়া, সহৃদয়া সাগরপারের বিদেশিনী মহিলাটি আজ আর ইহজগতে নেই, কিন্তু মনে রেখে গেছেন একটি স্থায়ী ছাপ!

অধ্যাপক হারলো শ্যাপ্‌লি

জীবনের মধ্য ভাগে একবার দর্শন পাই, একটি অত্যন্ত পণ্ডিত, জ্ঞানী, আমেরিকান অধ্যাপকের। ইনিও জ্ঞানে বৃদ্ধ, কিন্তু চরিত্রে শিশু। নাম তাঁর অধ্যাপক হারলো শ্যাপলি, কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন,—করেন আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত।

প্রফেসার শ্যাপলি আমেরিকার হার্ভার্ড মানমন্দিরের ডিরেক্টার ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,—পৃথিবী-বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তিনি নক্ষত্র-পুঞ্জ, 'গ্যালাক্সি' ও তাদের বিকীর্ণ আলোকরশ্মির পরিমাণ নিয়ে বহু জ্ঞান-গর্ভ গবেষণা করেছেন।

আমাদের বাড়ীতে এসেই রাত্রে ওঠেন ছাদে; মুহূর্তে তাঁরা দেখে দিক্ নির্ণয় করে বলেন,—বাড়ীখানা এমন সোজা উত্তর-দক্ষিণে নির্মাণ কী করে করলে? আকাশের তারা দেখে?

এ রকম কথা ত' আমাদের কখনোই মনে আসে নি,—এটা একদম একটা আকস্মিক ঘটনা বলায়, খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন।

পরদিন,—আকাশের তারা, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গবেষণারত বৈজ্ঞানিকটিকে দু'টি ঘরোয়া কথা জিজ্ঞাসা করায় হয় প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি। খাবার টেবিলে তাঁর বাড়ীর খবর নিয়ে জিজ্ঞাসা করি,—ছেলেপুলে ক'টি?

বৈজ্ঞানিক মাথা চুলকে জবাব দেন,—তা ত' মনে নেই,—কিন্তু এটুকু ঠিকই বলতে পারি,—They all are problem children. (তারা সবাই একটি মুস্কিল-সন্তান)।

হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে মরি! এই সব বিদেশী বৈজ্ঞানিক যেন শিশুর মত সরল, নিরহঙ্কার, সাদাসিধা। তাঁদের জন্য দামী বিলাতী পানীয়, সিগারেট প্রভৃতি সংগৃহীত থাকলেও দু'একজন ভিন্ন বেশীর ভাগই এসব স্পর্শ করেন নি।

অধ্যাপক শ্যাপ্‌লির পকেট ভর্তি থাকত, নানা আকৃতির, নানা প্রকারের 'কেক'। তারই একটি খাবার বেলায় দিয়ে যান,—স্কুল-গামী ছোট ছেলেকে।

শুনি তাঁর অদ্ভুত পড়াশোনার কথা, গবেষণা-প্রীতির কথা,—যেন আশ্চর্য রূপকথার কাহিনী! তিনি এক সঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন কঠিন গবেষণার বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার উপযুক্ত পুস্তক-পত্রিকা, কাগজাবলি এক সঙ্গে তাল-গোল পাকিয়ে বৈজ্ঞানিককে করে বিভ্রান্ত! অনেক সময়েরও অপচয় হয় এতে, ভেবে-চিন্তে অধ্যাপক তৈরী করান এক অদ্ভুত ঘোরানো টেবিল।

প্রকাণ্ড গোলাকার টেবিলটিতে করালেন পঁচিশ-ত্রিশটি ভাগকরা খোপ। এক একটি খোপে এক একটি গবেষণার বই-কাগজ সযত্নে রাখা। অধ্যাপক তাঁর নিজের চেয়ারে বসেই টেবিলটি ঘুরিয়ে দিয়ে হাতের কাছে পান, যখন যেটি দরকার!

তিনি আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রদের, বিশেষত যাঁরা জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার জন্য যান, তাঁদের নানা প্রকারে সাহায্য করেছেন।

তিনি অনেকবার সমস্ত পৃথিবীর নানা স্থানে জ্যোতির্বিজ্ঞান-মন্দির (অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল অবজারভেটরী) দেখে বেড়িয়েছেন এবং উহাদের উন্নতি-কল্পে নানা সুপরামর্শ দিয়েছেন।

অধ্যাপক শ্যাপলি ভারতবর্ষের জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগার, কোডাই কেনেল মানমন্দির ও হায়দ্রাবাদের নিজামিয়া মানমন্দিরের কার্যকলাপ পরিদর্শন করে' অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন ও ঐ দুটি মানমন্দিরে নূতন যন্ত্রপাতি বসানো এবং নব-নব পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ দিয়েছেন।

তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে কোডাই কেনেল মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডঃ ডিউমু বাপ্পুর রাত্রির পর রাত্রি জেগে উল্কাপিণ্ডের তথ্য সম্বন্ধে যে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আমেরিকার একটি সুন্দর নিয়ম,—সে দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও, তাঁদের পূর্ব বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার অব্যাহত থাকে। তাঁদের বেতনের পরিমাণও কমানো হয় না। যিনি যতদিন সম্ভব হয়, অতি বার্ধক্য পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইচ্ছামত চালিয়ে যেতে পারেন।

অধ্যাপক শ্যাপ্‌লি কিছুদিন পূর্বে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলেও আজও নিজের টেবিলে বসে পূর্বের মতই গবেষণায় রত।

[ক্রমশঃ।

হায়, কী পরিহাস!

বুদ্ধদেব গুহ

তোমার দুয়ারে
আমি আর ফিরে যাবো না।
প্রত্যাশা চোখ মেলে আর তাকাবে না
সম্পর্কের এই শেষ নিঃশ্বাস।

আকাঙ্খার ক্লান্ত কবরে
আর কবিতার অশ্রুপাত নয়
এখন জীবনের মুখে সুচতুর মৃত্যু কথা কয়।
হায়, কী পরিহাস!

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী

(৪)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় ।

অভিন্নহৃদয়েষু— ১৮৯৪, গ্রীষ্মকাল।
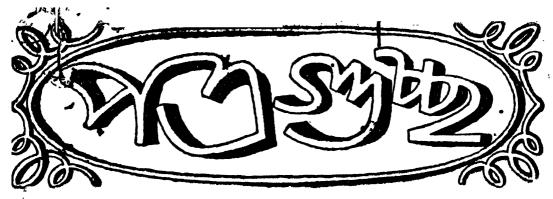
তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করতে পারিস, তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকত ক্যামেরা কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খোলে, তাই চেষ্টা কর। সন্ধ্যার পরে দিন-দুপুরে কত গরীব মূর্খ ওখানে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁতি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর—পার কি? না শুধু ঘণ্টা নাড়া?

—র কথা মান্দ্রাজ হইতে সকল পাইয়াছি। তারা তাঁর উপর বড়ই প্রীত।—তুমি যদি কিছুদিন মান্দ্রাজে গিয়ে থাক, তাহলে অনেক কাজ হয়। কিন্তু প্রথমে এই কাজটা সুরু করে যাও। মেয়ে ভক্তেরা কতকগুলি বিধবা মেয়ে চেলা বনাতে পারে নাকি? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে-সাদ্দি দিতে পার নাকি? তারপর তাদের ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পার নাকি?

উঠে-পড়ে লেগে যাও দেখি। গল্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু কার্য করিতে হইবেক। দেখি, বাঙ্গালীর ধর্ম কতদূর গড়ায় — গরম কাপড় চাই লিখেছে। এরা গরম কাপড় ইউরোপ আর ইণ্ডিয়া থেকে আনায়, যে দামে এখানে গরম কাপড় কিনব, তার সিকি দামে সেই কাপড় কলকাতায় মিলবে। কবে ইউরোপে যাব জানি না, আমার সকলই অনিশ্চিত—এদেশে এক রকম চলেছে, এই পর্যন্ত।

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকালবেলা আমাদের বৈশাখের গরম আর এখন এলাহাবাদের মাঘ মাসের শীত! চার ঘণ্টার ভেতর এত পরিবর্তন! এখানের হোটেলের কথা কি বলিব! নিউইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত রোজ ঘর ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইউরোপেও এমন নাই। এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ,—টাকা খোলা মত খরচ হয়ে যায়। আমি কদাচ হোটেলে থাকি। এখন মুলুকশুদ্ধ লোকে আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। হ— যার বাড়ীতে চিকাগোয় আমার centre (কেন্দ্র), তাঁর স্ত্রীকে আমি মা বলি, আর তাঁর মেয়েরা আমাকে দাদা বলে। এমন মহা পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি ত' আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা? কি দয়া এদের! যদি খবর পেলে যে, একজন গরীব ফলানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়ে-মদ্দ চলল। তাকে খাবার, কাপড় দিতে—কাজ জুটিয়ে দিতে! আর আমরা কি করি!

এরা গরমিকালে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোনও জায়গায়—এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল যেমন ইংরেজদের দেখেছ, তেমনি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগ্‌গি, সে দামে ৫ গুণো সেই জিনিস কলকাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আসতে দেবে না। মহা কর বসিয়ে দেয়—কাজেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা বড় একটা কাপড়-চোপড় বানায় না—এরা যন্ত্র আওজার আর গম, তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে—তা সস্তা বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিশ মাছ অপর্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, নেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল কালিফোর্ণিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, লিচু ইত্যাদি নাই।

একরকম শাক আছে spinach—যা রাঁধিলে ঠিক আমাদের নটেশাকের মত খেতে লাগে আর যেগুলোকে এরা asparagus বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে চচ্চড়ি নেই বাবা! কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাঁউরুটি আছেন, হর রঙ্গের নানা রকমের মাছ-মাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মত। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা—cream—সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখনও আছেন আর বরফজল,—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দি কি জ্বর এন্তের বরফজল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দিতে বরফজল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুল্পি এন্তের নানা আকারের। নায়াগারা falls (জলপ্রপাত) হরির ইচ্ছায়

৭।৮ বার ত' দেখলুম। খুব grand (মহান্ ও উচ্চভাবোদ্দীপক) বটে, তবে যত শুনেছ, তা নয়। একদিন শীতকালে aurora borealis(১) হয়েছিল।

—বোধ হয় এতদিনে বেশ সেরে গেছে।—র ঘুরঘুরে রোগ এখনও শান্তি হয় নাই। একটা power of organization (সঙ্ঘ-পরিচালনাশক্তি) চাই—বুঝেছ?—র originality (মৌলিকতা) ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering (ভাল কাজের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার, আর খুব executive (কাজের লোক)। কতকগুলো চেলা চাই—fiery youngmen (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝতে পারলে?—intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগরপারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে-মদ্দ both (দুই)। প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর। চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

Indian Mirror-কে পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বলতেন তেন বলতেন, কেন বলতে গেলে—আর আজগুবি-ফাজগুবি যত—পরমহংস মশায়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought reading আর nonsense (পরিচিত্তবিজ্ঞান আর বাজে) আজগুবি! * * *—কে আর—কে আমার বহুত বহুত দণ্ডবৎ লাটিবৎ ইষ্টিকবৎ ছতরীবৎ দিবে।—আনাগোনা করছে, বেশ বেশ। —কে তোমরা চিঠিপত্র লেখ—আমার ভালবাসা জানিও যত্ন করো। সব ঠিক আসবে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠি লিখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture লেকচার ত' কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। একবার ডিট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো তোর পেটে এতও ছিল' !! এরা সব বলে পুঁথি লেখ, একটা এইবার লিখতে-ফিকতে হবে দেখছি। ঐ ত' মুস্কিল, কাগজ-কলম নিয়ে কে হেঙ্গাম করে বাবা!

সমাজকে, জগতকে electrily (বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত) করিতে হইবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টানাড়া গৃহস্থের কর্ম, তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)।

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু' হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মদ্দ—বুঝলে? চেলা চাই at any risk (যে কোন রকমে হোক্)। তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো। গৃহস্থ চেলার কাম নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক একজনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men not fool (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থূল বাঁধাতে হবে, ছঁকো-ফুঁকো ফেলে কোমর . . খাড়া হয়ে যাও—মাদ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্কর দিকি বার কতক জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মেয়ে-মদ্দ যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে, তাঁর কৃপায়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (goal) নিবোধত।"

Life is in ever expanding, contraction is death (সদাই বিস্তার—জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ (প্রাণত্যাগ হইলেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তাঁরা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায় যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধ। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward, onward, (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)।। মেয়ে-মদ্দ আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। Onward, onward, নামের সময় নাই যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্ম অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখচ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চেঙ্গড়ামি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হরে হরে তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না—Onward এই কথা খালি বলছি, যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (ভাব) আসবে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে চিঠি বাজার করনা। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুরবো পাপী-তাপী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে তাদের ভিতর তিনি আসবেন। তাদের মুখে সরস্বতী বসবে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী নরাধম, বিলাসী তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক।

আমি আর লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুনগে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১) aurora borealis—পৃথিবীর উত্তর বিভাগে রাত্রিকালে (তথায় ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি) কখনও কখনও নভোমণ্ডলে এক প্রকার কম্পমান বৈদ্যুতিক আলোক দেখা দিয়া থাকে। উহা নানা আকারের এবং নানা বর্ণের হইয়া থাকে। ইহাকেই আরোরা বোরিয়ালিস কহে।

৮

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো,
C/o জর্জ ডবলিউ হেল। ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ম—লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিদ্যে করতে গেলে ঐ রকম হয়। আমার অপরাধ বড় নাই। সে দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল,—বড় খাতির ও সম্মান; এবার আমার পোহাবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া ম—র ছেলেমানুষি। যাক্‌, উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্‌। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্ধৃদয়রুধিরপোষিতাঃ? "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনম্‌" ইত্যাদীনি সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ।(২) প্রভুর ইচ্ছা—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রবোধিত হয়।—র কর্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form(৩)। হ—প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই—কোঽহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থয়িতুং বা কে বান্যে—দয়ঃ? তথাপি মম হৃদয়কৃতজ্ঞতা—প্রতি। "যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—নৈষঃ প্রাপ্তবান্‌ তৎপদবীমিতি মত্বা করুণাদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়মিতি।(৪) প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই। বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। * * * মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং(৫),—আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য। যে সহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়াছে—Cyclonic Hindu(৬)। তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও—I am a voice without a form.

ইংলণ্ডে যাব কি যমলাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব জোগাড় করে দেবেন। এদেশে একটা চুরুটের দাম এক টাকা। একবার ঠিকাগাড়ী চড়লে ৩৲ টাকা—একটা জামার দাম ১০০৲ টাকা। ৯৲ টাকা রোজ হোটেল—প্রভু সব যুগিয়ে দেন। * * জয় প্রভু, আমি কিছু জানি না।—'সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।'(৭) বিগতভীঃ হওয়া চাই। কাপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্থন করে। আমাদের মধ্যে কেহও যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মান্দ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই ও রাজপুতানারা Indian Mirror উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুখে দিয়ে। সব খবর পাচ্ছি। আর দাদা—এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—এ কথা সত্য বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে—যতটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথা মিথ্যে হয় না। দাদা কুকুর-বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে? তেমনিই সাধারণ মানুষের ঈর্ষা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোনও ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা আজ ছ' মাস থেকে বলছি যে, পর্দা হঠছে, সূর্যোদয় হচ্চে। পর্দা উঠছে—উঠছে ধীরে ধীরে, slow but sure. (ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত)—কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—"মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।" দাদা, এসব লিখিবার নহে। হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই—তবে পারে যাওয়া, আজ আর কাল—এইমাত্র। দাদা, Leader (নেতা) কি বনাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগান। Jealousy—selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে Leader. প্রথম by birth (জন্মের দ্বারা), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে Leader, সব ঠিক হচ্চে, সব ঠিক আসবে, তিনি জাল ফেলছেন, ঠিক জাল গুটাচ্চেন—বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ। প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌(৮) বুঝলে কি না? Love conquers in the long run(৯), দিক্‌ হলে চলবে না—wait wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর) সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে।

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চলছে চলতে দেও—তবে দেখো কোন form (বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি) যেন necessary (একান্ত আবশ্যক) না হয়—unity in variety (বহুত্বে একত্ব)—সার্বজনীন ভাবের যেন কোনমতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed if necessary for that one senti-

---

(২) তোমাদের ন্যায় মহাত্মাগণের তাহার কথা উপেক্ষা করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামান্য পোকার কামড়ে ভয় পাইব? "মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দেশ করিতে পারা যায় না, এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে।" (কুমারসম্ভব)—ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া এই মূর্খকে ক্ষমা করা উচিত।

(৩) আমি নিরাকার বাণী হইতে চাই।

(৪) তাঁহার প্রভাব বিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহায্য করিবার আমি কে?—প্রভৃতিই বা কে? তথাপি—র প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া লোকে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত না হয়" (গীতা)—এ ব্যক্তি এখনও সেই অবস্থা পায় নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয়ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

(৫) বোবাকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ও খোঁড়াকে পর্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে।

(৬) ঝড়ের মত সামনে যাহাকে পায়, নিজ শক্তিবলে তাহাকেই উলটিয়া-পালটিয়া দেয়, এরূপ শক্তিশালী হিন্দু।

(৭) সত্যের জয় হয়, মিথ্যা কখনও জিতিতে পারে না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয় (প্রশ্নোপনিষৎ) বেদান্তমতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্মধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণেরই এই গতি হয়।

(৮) আমরা কেবল তাঁহার পদানুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।

(৯) প্রেম আখেরে জয়ী হইয়া থাকে।

ment, univarsality (১০)। আমি মরি, আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখিবে যে, সার্বজনীনতা—Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform, take care how you trample on the least rights of others (১১)। ঐ দ'রে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটি দেখাতে হবে মনে রেখ। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চলবে। সকলের ইচ্ছা যে Leader (নেতা) হয়—কিন্তু সে যে জন্মায়—ঐটি বুঝতে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়।

আমরা সকলকে চাই—It is not at all necessary that all should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil.(১২) সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ কোন ভেদ থাকিবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। ৫।৭টা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কার্য আরম্ভ করলে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্ধমান) গতিতে বাড়িতে চলিল—এ হুজুক কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাদলি Jealousy (ঈর্ষা) পরিত্যাগ করে united action (সমবেত ভাবে কার্য) কর। Shameful (লজ্জার কথা)—আমরা Universal religion (সার্বজনীন ধর্ম) করছি দলাদলি করে।

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বললেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে ওঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তাহলে সকল ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়বার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠতে দেব না—বললে কি চলে? ঐ Jealousy (ঈর্ষা), ঐ absence of conjoined action (সম্মিলিত ভাবে কার্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব) কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত। ঐ terrible jealousy characteristic আমাদের (ঐ ভয়ানক ঈর্ষা আমাদের বিশেষ লক্ষণ), বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, We are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus (১৩)। পাঁচটা দেশ দেখলে ঐটি বেশ করে বুঝতে পারবে। আমাদের [illegible] এই [illegible] স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রীরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—white (শ্বেতাঙ্গ)-দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে।

আমরাও ঠিক ঐ রকম। কীটগুলো—এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—মাগের আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে। At any cost, any price, any sacrifice (কোন রকমে, ওর জন্য আমাদের যতই কষ্ট স্বীকার করতে হোক) ঐটি আমাদের ভিতর না ঢোকে—আমরা দশজন হই, দুজন হই do not care—(কুছ পরোয়া নেই) কিন্তু ঐ কয়টা perfect characters (সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ চরিত্র) হওয়া চাই। 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব রঘুবীর রাখে টেক্‌।' রঘুবীর টেক্‌ রাখবেন দাদা—সে বিষয় তোমরা নিশ্চিন্ত থেক। রাজপুতনা—পাঞ্জাব, N. W. P. (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ)—মান্দ্রাজ ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে—রাজপুতানায় যেখানে "রঘুকুলরীতি সদা চলি আ'ই। প্রাণ যা'ই বরু-বচন ন য'াই।" এখনও বাস করে।

পাখী উড়তে উড়তে এক জায়গায় পৌঁছায়—যেখান থেকে অত্যন্ত শান্তভাবে নীচের দিকে দেখে। সে জায়গায় পৌঁচেছ কি? যিনি সেখানে পৌঁছান নাই, তাঁর অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাও—ঠিক পৌঁছে যাবে।

ঠাণ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্ছেন—শীতকাল কাটিয়ে দেওয়া গেল। শীতকালে এদেশে সর্বাঙ্গে electricity (তড়িৎ) ভরে যায়। Shakehand (করমর্দন) করতে গেলে shock (ধাক্কা) লাগে আর আওয়াজ হয়—আঙ্গুল দিয়ে গ্যাস জ্বালান যায়। আর শীতের কথা ত লিখেছি। সারা দেশটা দাবড়ে বেড়াচ্চি—কিন্তু চিকাগো আমার 'মঠ'—ঘুরে-ফিরে আবার চিকাগোয় আসি। এখন পূর্বদিকে যাচ্চি—কোথায় যে বেড়া পায়ে লাগবে, তিনি জানেন।

—কেমন আছে?—র তোমাদের উপর সেই প্রীতি আছে কিনা? সে ঘন ঘন আসে কিনা?—কেমন আছে, কি করছে? তোমরা তার কাছে যাও কিনা—তোমরা তাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি কর কিনা? হাঁ হে বাপু, সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী মিছে কথা মূকং করোতি, ইত্যাদি। বাবা কার ভেতর কি আছে, বুঝা যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন—ও আমাদের পূজ্য। এত দেখে-শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, ধিক্‌ তোমাদের! সে তোমাদের ভালবাসে কিনা? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা দিও।—কে আমার ভালবাসা দিও—তিনি অতি উন্নতচিত্ত ব্যক্তি।—কেমন আছে? তার একটু বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে কিনা?—কে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ দিও।—ঘানিতে ঠিক ঘুরছে বোধ হয়—ধৈর্য ধরিতে কহিবে—ঘানি ঠিক যাবে। সকলকে আমার হৃদয়ের প্রীতি।

অনুরাগৈকহৃদয়ঃ
বিবেকানন্দঃ।

পুঃ—কে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্বাদে আমার সর্বতোমঙ্গল।

(১০) যদি প্রয়োজন হয়, তবে "সার্বজনীনতা"—এই ভাব রক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে হইবে।

(১১) আমরা শুধু "পরধর্মে বিদ্বেষ করিও না"—এই ভাব প্রচার করি না—আমরা সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি! আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্যেও পরিণত করিয়া থাকি। বিশেষ সাবধান থাকিও—যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিও না।

(১২) আমাদের ঠাকুরের উপর আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, সকলেরই সেইরূপ থাকিতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদয় অহিতকরী শক্তির বিরুদ্ধে কল্যাণকরী শক্তি সমবেত করিতে চাই।

(১৩) সমুদয় হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সর্বাপেক্ষা অধিক অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও কামুক।
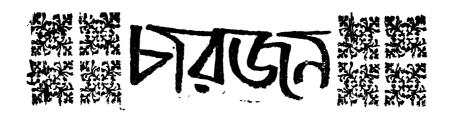
ডাঃ উমাপতি গঙ্গোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট শিল্পপতি, মৃৎশিল্প (Ceramics) বিশেষজ্ঞ ও সমাজসেবী]

শ্যামল প্রান্তরের ভিতর বাঙালী মধ্যবিত্তের কয়েকটি সুশ্রী পল্লী, কেন্দ্রস্থলে কয়েকটি কারখানার সমষ্টি, একপাশে শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথ, অন্যপাশে ঘোষপাড়া রোড—কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র ১৬ মাইল। এরই নাম এনামেলনগর—ডাক্তার উমাপতি গাঙ্গুলীর স্বপ্ন ও সাধনার ক্ষেত্র। এই মনোরম পরিবেশে বর্ধিত উপনগরীর প্রতিটি বাসিন্দার সব কিছু আশা-ভরসাই তাদের অতি আদরের 'ডাক্তার সাহেব'কে কেন্দ্র করে রয়েছে। তাদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে কারিগরী শিক্ষা এবং কর্ম-সংস্থানের ভারও তাঁরই উপর ন্যস্ত। অস্বাভাবিক বারিপাতের ফলে পল্লী বিপন্ন, ডাকো 'ডাক্তার সাহেব'কে, তিনি সকলের সঙ্গে একযোগে পরিশ্রম করে করবেন বন্যাত্রাণের ব্যবস্থা,—পল্লীর ছেলেমেয়েদের স্কুলের জন্য অর্থের প্রয়োজন, ডাক্তার সাহেবের ভাণ্ডার খোলা আছে। বেকার যুবকদের শ্রমবিমুখতা দূর করবার জন্য তিনিই স্থাপন করেছেন শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Technical School) তাদের কর্মসংস্থানের জন্য তিনিই গড়ে তুলেছেন বেঙ্গল এনামেল শিল্প-গোষ্ঠীকে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে। এনামেলনগরবাসী প্রত্যেকেই জেনে গর্ব অনুভব করে যে, বেঙ্গল এনামেলের দ্রব্যসম্ভারের উৎকর্ষ আজ ভারতের প্রতিটি ক্রেতার কাছে যেমন কদর পায়, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশের ক্রেতাদের কাছেও তা তেমনি প্রিয়। তারা জানে তাদের তৈয়ারী জলের বোতল ও মগই লক্ষ লক্ষ বীর জওয়ানের তৃষ্ণা নিবারণ করছে—তাদের শিল্প-কার্যের নিদর্শন দেশে-বিদেশে হাজার হাজার পেট্রোল ষ্টেশনে শোভা পাচ্ছে—এনামেল সাইনবোর্ড রূপে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ঘরে ঘরে ব্যবহার হচ্ছে তাদের তৈরী এনামেলের বাসন, শত সহস্র রোগীর পরিচর্যায় ব্যবহার হচ্ছে হাসপাতালের দ্রব্য-সামগ্রী। তাদের গৌরব এই যে, অন্যান্য শিল্পে বাঙালী পিছিয়ে থাকলেও এনামেল শিল্পে বাঙালী সারা ভারতে আজ অগ্রণী—তার মূল রয়েছে তাদের 'ডাক্তার সাহেবের' অক্লান্ত পরিশ্রম ও 'যন্ত্রের ডাক্তারী' করার ক্ষমতা।

কর্মজীবনের প্রাক্কালে কিন্তু মানুষের ডাক্তারই ছিলেন শ্রীউমাপতি গাঙ্গুলী এবং তাঁর পশারও ছিল প্রচুর। পিতা ক্যাপ্টেন প্রতুলপতি গাঙ্গুলী, আই, এম, এস, ছিলেন প্রথিতযশা চিকিৎসক ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে পুত্রও হৃদরোগের চিকিৎসায় প্রভূত পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর প্রবল এবং এরই ফলে শিল্প-সাধনার দিকে একদিন তাঁকে আকস্মিকভাবে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হল। যুদ্ধকালীন আমদানী বন্ধের হিড়িকে তাঁর পিতার মূল্যবান Electrocardiogram যন্ত্রটি বিকল হয়ে ছিল সূক্ষ্ম একটি বিদেশী অংশের অভাবে। ডাঃ উমাপতি সেটি নিজে প্রস্তুত করে শুধু যন্ত্রটিই চালু করলেন না, বাঙলার শিল্পগুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বজ্রমুষ্টিতে একটি স্বভাবসিদ্ধ কীল মেরে আচার্য বললেন, 'তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি শিল্প সংগঠন করো। বাংলা দেশে ডাক্তার উকীল তো হাজার হাজার আছে, শিল্পপতি ক'জন? তুমি বাংলার একটি শিল্পকে গড়ে তোলো।'

ডাঃ গাঙ্গুলী বলেন, 'সেই আচমকা আঘাতের ব্যথা তখনই মিলিয়ে গেলেও সেই চমকপ্রদ বাণী আজও হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। বাঙালীর শিল্প গড়ে তুলতে হবে—শিল্পের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার বাঙালীর অন্নসংস্থান করতে হবে—এ কথা কোনো সময়েই ভুলতে পারি না—এই প্রেরণাই আমাকে কাজের উন্মাদনায় পৃথিবীর সর্বত্র ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় বাঙালীর তৈরী মালের পসরা নিয়ে।' পুঁথিগত এঞ্জিনিয়ার না হলেও ভারতের প্রধান এনামেল বিশেষজ্ঞ হিসাবে দেশ-বিদেশের প্রচুর সম্মান অর্জন করেছেন ডাঃ গাঙ্গুলী। আমেরিকান সেরামিক সোসাইটির আমন্ত্রণে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি প্রতি বৎসরই তাঁদের বাৎসরিক সভায় যোগদান করছেন। আমেরিকার Boston Rotary Club তাঁকে বিশেষ সভ্য মনোনীত করেছেন। আন্তর্জাতিক এনামেল সঙ্ঘও তাঁকে সভ্য মনোনীত করেছেন। সর্বভারতীয় মৃৎ-শিল্প সঙ্ঘের (Indian Ceramic Society) সভ্যেরা তাঁকে একাদিক্রমে দুই বৎসর তাঁদের সভাপতি নির্বাচন করে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ডাঃ উমাপতি গঙ্গোপাধ্যায়

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বম্বেতে Indian Ceramic Society-র বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে যখন ডাঃ গাঙ্গুলী বললেন, 'আমি পেশাদার শিল্পপতিও নই, বৈজ্ঞানিকও নই, আমার পেশা ছিল ডাক্তারী,' তখন মহারাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রী মাননীয় ডব্লিউ, জি, বার্ভে বলেন, 'আপনি শিল্পের চিকিৎসক, মৃৎ-শিল্পকে আপনি পুনর্জীবন দান করুন।' আমরাও কামনা করি ডাঃ গাঙ্গুলী যেন মৃতপ্রায় বাঙালী শিল্প প্রয়াসকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন, এনামেল নগরকে এক বিরাট শিল্পকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার প্রয়াস যেন তাঁর সার্থক হয়।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র

[দি ন্যাশনাল সুগার মিলস লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও বাঙলার বিশিষ্ট শর্করাবিশেষজ্ঞ]

শর্করাশিল্পের প্রগতি ও সমৃদ্ধির ইতিহাসে যাঁদের অক্লান্ত উদ্যম ও অভাবনীয় দক্ষতার স্বাক্ষর অম্লান শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র সেই তালিকায় একটি বিশেষ নাম। এ দেশের শর্করাশিল্পের উন্নয়নে ও অনুশীলনে তাঁর অবদানের তুলনা মেলা ভার। শর্করাশিল্প সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও সৃজনধর্মী চিন্তাধারা তাঁকে উচ্চ শিল্পের একজন বিশেষজ্ঞের আসনে সমাসীন করেছে। সে আসনে তিনি সগৌরবে অধিষ্ঠিত। পঞ্চাশোত্তীর্ণ এই কৃতী বাঙালী শিল্পজগতের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে বাঙলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র ইং ১৯০৭ সালের ২১শে মে তারিখে অধুনা পূর্বপাকিস্তানস্থিত ঢাকা জেলার একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেবের নাম কালাচাঁদ মিত্র মহাশয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অনার্সের ছাত্র ছিলেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে ফলিত রসায়নে এম, এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় ডক্টর স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমিত্রের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

ছাত্র জীবনের অবসানে, ১৯৩২ সালে যখন চিনি শিল্প সংরক্ষণের জন্য তীব্র আন্দোলন আসন্নপ্রায়, সেই সময়ে শ্রীমিত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। চাকুরীর দ্বারা গতানুগতিক পথ অনুসরণ করতে দেওয়ার পরিবর্তে, আচার্য রায় শ্রীমিত্রকে পূর্ববঙ্গে চিনির কল প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য উৎসাহিত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীমিত্র বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলসমূহ যেখানে চিনিশিল্প কেন্দ্রীভূত—সেইসব স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ১৯৩৪ সালে পূর্ববঙ্গে প্রথম চিনির কল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকায় "দেশবন্ধু সুগার মিল" উদ্বোধন করেন। সেই সময়ে শ্রীমিত্রের বয়স মাত্র আটাশ বছর। সেই সময় থেকে ১৯৫০ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত শ্রীমিত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমগ্র পূর্ববঙ্গে সংঘটিত ভয়াবহ ও নৃশংস সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের পর শ্রীমিত্র চিরকালের জন্য পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই সময় থেকে ১৯৫৫ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল অঞ্চলে একটি বৃহৎ কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

১৯৫৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুগণের কর্মসংস্থানের জন্য, পশ্চিমবঙ্গে একটি মাঝারি ধরণের চিনির কল প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শ্রীমিত্রের উপর অর্পণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে যত্নবান মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীমিত্র ১৯৫৫ সালের ৩রা অগাষ্ট তারিখে "দি ন্যাশনাল সুগার মিলস্" নামে কোম্পানী রেজিষ্টারী করেন। চিনিশিল্পে দুই যুগব্যাপী কার্যকরী অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার আমেদপুরে একটি মাঝারি ধরণের চিনির কল প্রতিষ্ঠা করতে শ্রীমিত্রের খুব বেশী সময় লাগেনি। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মত যে কোম্পানীর ব্যাঙ্কে যখন নামমাত্র ৮।৶১ পাই জমা ছিল, সেই সময়ে শ্রীমিত্র ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনিকলের যন্ত্রপাতি সরবরাহের অর্ডার দেন। পরে তিনি কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত হন, উপরন্তু তিনি জনসাধারণের নিকট থেকে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা শেয়ার বিক্রয় বাবদ মূলধন সংগ্রহ করেন। বর্তমানে আমেদপুরে মিলের স্থাবর সম্পত্তির মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। নামমাত্র ৮।৶১ পাই মূলধন অবলম্বন করে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি সম্বলিত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্যে শ্রীমিত্রের অসাধারণ প্রতিভা ও কর্মশক্তির গভীরতা বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে।

আমেদপুরের চিনির কল অতি আধুনিক এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎচালিত মিল। এই মিলের প্রথম মরশুম শুরু হয় ১৯৬০ সালের ২৪-এ জানুয়ারী। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় এই মিলের উদ্বোধন করেন।

শিল্পপতি শ্রীমিত্রের লেখনীও সচল এবং যথেষ্ট শক্তির পরিচয়বাহী। ভারতবর্ষের ও বহির্ভারতীয় শর্করা শিল্পসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে, তিনি প্রায় বারোখানি পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম পুস্তক "Indian Sugar Industry—Problems Before It" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকাসহ ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

২৫ বৎসর সময়ের মধ্যে দুইটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য অল্পসংখ্যক শিল্পপতির ভাগ্যেই ঘটে থাকে। সেদিক দিয়ে শ্রীমিত্রের এই অভূতপূর্ব সাফল্যও বিশেষ উল্লেখের অধিকারী।

শ্রীমিত্র পশ্চিমবঙ্গের চা ও মৃৎশিল্পের সঙ্গেও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি ইণ্ডিয়া পটারিস লিমিটেড ও নিউ টি কোম্পানী লিমিটেডের পরিচালক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুগারকেন এ্যাডভাইসারি কমিটির তিনি সদস্য।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

[প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও সাংবাদিক]

সাংবাদিকতায় যে Thrill আছে—সেই বোধটাই নিয়মিত আয়ের সরকারী চাকুরী গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—আর নিয়ে আসে এক অজানা পথের অল্প আলোয়—যেখানে অর্থাভাব প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও প্রবল আবেগ সংবাদপত্রজগতে আজকের দিনের সুদক্ষ বার্তা-সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষকে পাদ-প্রদীপের আলোর সামনে উপস্থাপিত করেছে।

১৩২৭ সালের ভাদ্রমাসে ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ীতে সন্তোষকুমার জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব পরলোকগত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বদেশী আন্দোলনে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ায় কোন বাঁধাধরা আয় তাঁর ছিল না। ফলে, জীবনের প্রথমভাগ বেশ কিছুদিন অনিশ্চয়তার মধ্যেই কেটেছে। মাতা ৺সরযুবালা কয়েক বৎসর পূর্বে লোকান্তরিতা হন। তিনি রাজবাড়ী মিশনারী স্কুলে ভর্তি হন ও পরে স্থানীয় রাজা আর, এস, কে, ইনষ্টিটিউশান থেকে ১৩৩৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রহিসাবে তিনি গ্রাজুয়েট হয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে এম, এ, পড়বার সময় চরম আর্থিক দুরবস্থার জন্য পরীক্ষা দেন নি। সেই সময় কয়েক মাসের জন্য প্রাদেশিক সরকারের একটি অস্থায়ী চাকুরীতে যোগ দেন। পুনরায় আহ্বান এলে তিনি উহা গ্রহণ করেন নি।

শ্রীঘোষের পিতা 'কেশরী,' 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বাভাবিক কারণে সন্তোষকুমার সাংবাদিকতার প্রতি আগ্রহ দেখান এবং মনে মনে প্রবল আবেগ অনুভব করেন। আকস্মিকভাবে ১৩৪২ সালে 'প্রত্যহ' সংবাদপত্রে ৩৫৲ টাকা বেতনে তিনি যোগ দেন। কয়েক মাস পরে তিনি শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর সহায়তায় ও আনুকূল্যে 'যুগান্তর'-এ ৩০৲ টাকা বেতনে জুনিয়ার সহঃ সম্পাদক হিসাবে কাজ নেন। ইহার পর তিনি 'মর্নিং নিউজ'-এ চাকুরী গ্রহণ করে 'নবযুগ,' 'কৃষক,' 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' ও 'জয়হিন্দ' পত্রিকাগুলিতে আংশিক সময়ের জন্য যুক্ত হন। এইসময় শ্রীঘোষের পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট অর্থ-সংস্থান হয়—কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ব্যয় সঙ্কুলানে অসমর্থ হন। সেজন্যে অধিক মাহিনায় তিনি দেশবরেণ্য নেতা স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর 'নেশন' পত্রে প্রধান সাব এডিটর রূপে যোগ দেন। ১৩৪৯-৫১ সাল পর্যন্ত তিনি 'Statesman'-এ কাজ করার পর শ্রীকানাইলাল সরকার মহাশয়ের আগ্রহে দিল্লীর 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড'-এ প্রথমে চীফ সাব এডিটার ও পরে বার্তা-সম্পাদক হিসাবে কার্য করেন। ১৩৫৮ সালে তিনি কলিকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম বার্তা-সম্পাদক হন ও সম্পাদকীয় রচনার দায়িত্ব নেন। বর্তমানে তিনি উক্ত পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক হিসাবে রয়েছেন।

শ্রীঘোষ জানান যে, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকীর অন্যতম স্নেহভাজন হিসাবে তাঁর কাছে তিনি সম্পাদকীয় লেখার শিক্ষাগ্রহণ করেন। স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু তাঁকে বহু সভা ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিতেন।

সাংবাদিক হিসাবে শ্রীঘোষ ১৩৫৭ সালে প্রথম আলবানিয়া সহ ইউরোপ ও ব্রহ্মদেশ এবং পরে ১৩৬১ ও ১৩৬২ সালে (আন্তর্জাতিক প্রেস ইনঃ এ) কম্যুনিষ্ট দেশসহ ইউরোপ, শ্যামদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশ ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। ১৩৬২ সালে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানে যান। এক সময়ের নিজ মাতৃভূমির অংশ এবং পরবর্তীকালের 'বিদেশ' ভ্রমণে তাঁর মানসপটে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ দেখা দেয়। প্রথম জীবনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁহার রচনা শ্রীঘোষের মনকে উদ্বেলিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত লেখক ও কবির গ্রন্থগুলি তিনি খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। ১৩৩৮ সালে 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায়' তাঁহার লেখা দ্বিতীয় গল্প, ও প্রথমটি মাসিক ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। শ্রীজগৎ দাস ও শ্রীঘোষ স্ব-ব্যয়ে নিজেদের লেখা সাতটি গল্পের পুস্তক 'ভগ্নাংশ' প্রকাশ করেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কিনু গোয়ালিনীর গলি' মুদ্রিত হয়। ইহা ছাড়া, 'নানারঙের দিন,' 'মুখের রেখা,' 'রেণু তোমার মন,' 'সেই আমি' ইত্যাদি উপন্যাস ও 'পারাবত,' 'ছায়াহরিণ,' 'চিরন্ধপা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়। ছাত্রবয়সে তাঁর খেয়ালী মন কলিকাতার বিভিন্ন গলিঘুঁজি অনুসন্ধানের জন্য তাঁকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করত এবং তাহারই প্রতিফলন দেখা যায় শ্রীঘোষের বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে। শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক ইত্যাদি বন্ধুদের 'পীড়ন' তাঁহার অন্তরে লেখার আগ্রহ আনিয়া দেয়।

শ্রীমতী নীহারিকা ঘোষ তাঁর সহধর্মিণী।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

শ্রীঅসিত চৌধুরী

[চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম কর্ণধার]

জীবন অপেক্ষা জীবনের অবদান অনেক মূল্যবান বলিয়াই জীবন-চরিত প্রকাশের পূর্বে সেই অবদানের ভূমিকায় 'চারু পুরস্কার' সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় গৃহীত পরিকল্পনার উল্লেখ প্রসঙ্গত অমূলক নয়।

"A biennial cash prize called the Charu Chitra Award commencing on 1961 shall be awarded by the university for the best original contribution in the Bengali or the English Language on the artistic and technical Progress of Indian Motion Picture with special reference to Bengali Motion Picture art and industry." একদিকে স্বর্গতা স্নেহময়ী জননীর প্রতি আপন অন্তরের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া, অপর দিকে স্বীয় জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পকে প্রাপ্য পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। দুই মহান আদর্শের প্রথম পদক্ষেপ এই "চারু পুরস্কার"।

দেশের রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক জীবনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শিল্প যে অপরিহার্য এই বাস্তব সত্য প্রমাণ যজ্ঞে আজ যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন ছায়াবাণী পিক্‌চ র্স প্রাইভেট লিমিটেডের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীঅসিত চৌধুরী সেই যজ্ঞের প্রধান হোতা। সামাজিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শিল্পকে বৈপ্লবিক পথে চালিত করিতে আজ তিনি বদ্ধপরিকর।

ছাত্রাবস্থায় জ্ঞানবৃক্ষে আরোহণ করিয়া জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ঘুরিয়া বেড়াইবার কালে চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও যাহাতে কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীচৌধুরী কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চোদ্দ হাজার টাকা দান ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এক বিশেষ অবদান। স্বর্গত পিতা অশ্বিনীশঙ্কর চৌধুরীর পুত্র শ্রীঅসিত চৌধুরী ১৯১৮ সালে কুমিল্লা জেলার পত্তন গ্রামে জন্মগ্রহণ

শ্রীঅসিত চৌধুরী

করেন। শ্রীচৌধুরী আসামে বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৩৬ সালে শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীচৌধুরী কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে আসিয়া ডিগ্রী ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে উক্ত কলেজ হইতে ডিগ্রী লাভ করিবার পর শ্রীচৌধুরী চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বোম্বেতে যান এবং তথায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে যোগদান করেন। উক্ত কলেজ হইতে ১৯৪১ সালে সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা লাভ করেন। ১৯৪২ সালে আকস্মিকভাবে পিতৃবিয়োগ ঘটায় শ্রীচৌধুরী স্বগ্রাম পত্তনে ফিরিয়া যান। দেশ তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল। সেই উত্তাল তরঙ্গে শ্রীচৌধুরীও আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন এবং নিজ গ্রামেই বিবিধ রকম উন্নয়নমূলক কাজ আরম্ভ করেন। তিনি নিজ গ্রামে স্বর্গত পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই "অশ্বিনীশঙ্কর বিদ্যালয়"টি পাকিস্তানে আজও তাঁহার স্বর্গগত পিতার স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। অতঃপর ১৯৪৬ সালে শ্রীচৌধুরী কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং স্বীয় অর্জিত বিদ্যায় চলচ্চিত্রশিল্পে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তদানীন্তন চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট মহল হইতে বিশেষ কোন সহযোগিতার কোন আশা না পাইয়া ১৯৪৭ সালে "ছায়াবাণী" পিকচার্স প্রাঃ লিঃ নামে চলচ্চিত্র ডিষ্ট্রিবিউটার্স কোম্পানীর সৃষ্টি করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সহিত এই ব্যবসা পরিচালনা করিয়া ইহাকে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ডিষ্ট্রিবিউটার্স কোম্পানীতে পরিণত করেন। চলচ্চিত্র ব্যবসায় লিপ্ত থাকিয়া বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তিনি কোন দিন মনোবল হারান নাই। ১৯৫৩ সালে স্বর্গত মাতা চারুবালা দেবীর নামে "চারুচিত্র" কোম্পানীর মাধ্যমে "ছেলে কার" "পরেশ" এবং রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা" এই তিনখানি অপূর্ব চিত্রের সৃষ্টি করেন। উক্ত তিনখানা চিত্রই শুধু দেশে নয় বিদেশেও বাংলা চিত্রের মান অনেক উপরে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সব কয়েকটি চিত্রই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছে। এই বই কয়েকখানি লইয়া সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া বাংলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে জগতব্যাপী এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বর্তমানে শ্রী চৌধুরী উত্তমকুমার প্রডাক্সন্সের সহযোগিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "ভ্রান্তি-বিলাস" বইখানি নির্মাণে ব্যস্ত রহিয়াছেন। বাংলা ছবির দ্বারা পয়সা রোজগার অপেক্ষা বাংলা ছবির মান উন্নয়নের দিকেই শ্রী চৌধুরী বিশেষ অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে জনমন হইতে বিভ্রান্তিকর ধারণাকে তুলিয়া ফেলিতে তিনি বিশেষভাবে অগ্রণী হইয়াছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে চলচ্চিত্র বিষয়কে বিশেষ স্থান দেওয়ার জন্য অর্থ দান এবং বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা প্রভৃতি বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতি শ্রী চৌধুরীর গভীর ভালবাসারই সাক্ষ্য। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রী চৌধুরী অবিবাহিত। একমাত্র বিবাহিতা আপন বোন ব্যতীত এই সংসারে তিনি একক। স্বীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মচারীর নিজ ব্যয়ে বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা আদর্শ মালিক হিসাবেই নয় মানবিকতা বোধেরও পরিচয়।

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

কোণারকের মূর্তি

—চিত্ত নন্দী

সুপ্রভাত

—চিন্তা চক্রবর্তী

আঙুরফল কি টক?
—রামকিংকর সিংহ

ভোরের আলো

—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

হাড়তলী
, আর ঘোষ

হাজঘাট

মনে পড়ে

(শরৎচন্দ্রের কথা)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণামের পালা শেষ করে ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে তাঁকে। অবাক হয়ে দেখছে তাঁকে চেয়ে চেয়ে।
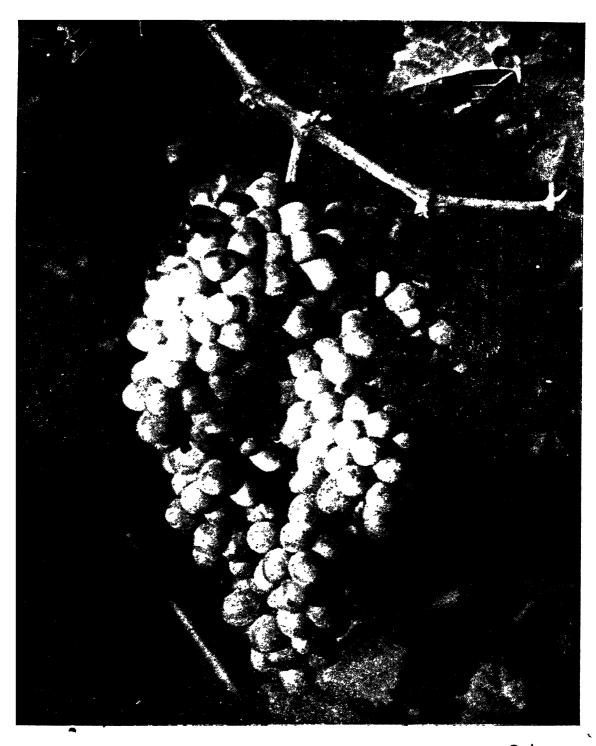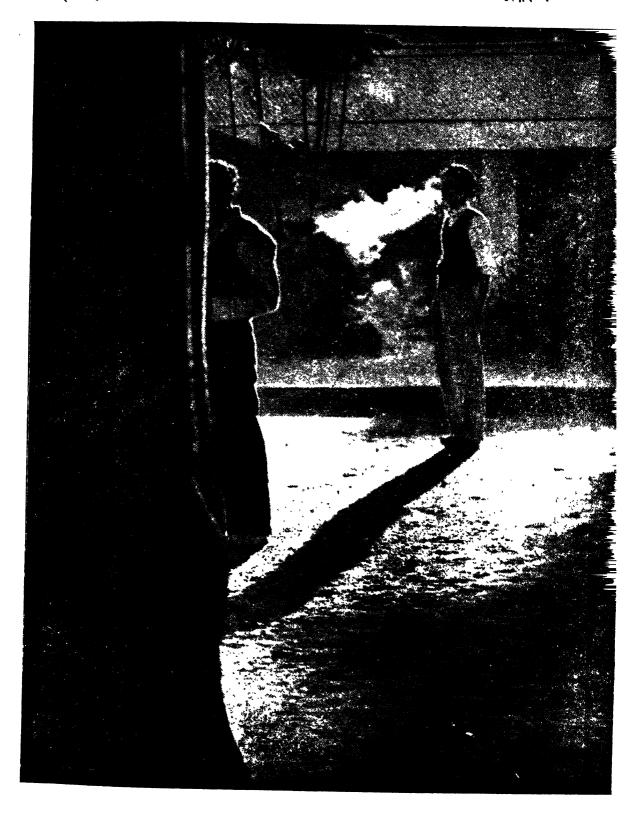
বড় বড় দু'টো চোখ, একটু একটু লাল; কারুর দিকেই বিশেষ করে চেয়ে নেই সেই চোখ দু'টি—অথচ কিছুই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না; সরু টিকলো নাক—নাকের ফুটো দু'টো বড় বড়; উস্কোখুস্কো এক মাথা পাৎলা চুল, চিবুকে আর দুই গালের এখানে ওখানে কিছু কিছু দাড়ি; রোগা লম্বা চেহারা, তামাটে রং আর সব সময়েই কেমন একটা ছটফটে অস্থির ভাব; কথা বলতে বলতে বা তামাক খেতে খেতে নাক দিয়ে কেবলই একটা খুঁক খুঁক শব্দ করছেন; সামান্য কোনো কারণেই চোখ দু'টো জলে ভরে যাচ্ছে—আর চোখের বাইরের দিকের কোণে সাদা মত কি জমে উঠছে।

ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখছে এই আশ্চর্য মানুষটিকে।

আশ্চর্য মানুষ বৈকি তিনি তাদের কাছে। তাঁর সব কিছুই সৃষ্টি ছাড়া, অসাধারণ। তাঁর ছেলেবেলার গল্প শুনেছে তারা বড়দের কাছে—সে সবও ভারি অদ্ভুত, ভারি মজার। এখন তাঁকে চোখের সামনে দেখছে তারা, দেখছে তাঁর ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-পরা; শুনছে তাঁর কথাবার্তা, হাসি-গল্প—কোথাও মিল নেই এ সবের আর সকলের সঙ্গে। একদিন তাদের এক পিসেমশাইকে একখানা বই পড়তে পড়তে কাঁদতে দেখেছে তারা—সেটি নাকি এঁরই লেখা—নাম 'চরিত্রহীন।' এমন বই লেখেন ইনি যে লোকে পড়ে কেঁদে ফেলে! মানুষটি আশ্চর্য বৈকি।

ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কোথা থেকে পপি এসে উপস্থিত।

পপি এ বাড়ীর কুকুর—নেহাৎই নেটিভ কুকুর। সে মুক্ত এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন। যতক্ষণ খুশী সে বাড়ীতে থাকে, যখন খুশী বেরিয়ে যায়, যখন খুশী ফিরে আসে। এ-বাড়ীর কঠিন শাসনের সে তোয়াক্কা করে না। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে না জানি কেমন করে সে শরৎচন্দ্রের আসার খবরটি ঠিক জানতে পেরেছে এবং কালবিলম্ব না করে তাঁর কাছে হাজিরা দিতে এসেছে।

শরৎচন্দ্র এলে পপির আদর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

সে এক দেখবার জিনিস।

—কি রে পপি, কেমন আছিস? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আয় আয়। রোগা হয়ে গেছিস দেখছি? এঃ, কি ধুলো রে তোর গায়ে! এখানে আবার কি হয়েছে? ঘা? কামড়া-কামড়ি করেছিস বুঝি? নাঃ,—কিচ্ছু দেখিস না তোরা। এত বড় একটা ঘা হয়েছে—কত কষ্ট হচ্ছে বল দেখি ওর? কুকুরটাকে একটুও যত্ন করিস না তোরা।

বড় বড় চোখ দু'টি জলে ভরে গেছে ততক্ষণে!

বাড়ীর বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ; সুন্দর চেহারা, চমৎকার গান গাইতে পারেন, থিয়েটার করেন খুব ভাল; কলেজে পড়েন, গৃহদেবতার পুজো করেন, জগদ্ধাত্রীপুজোয় বলির সময় হাড়িকাঠে পাঁঠার মুখ চেপে ধরেন, তাঁদের হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'মালতীর' সম্পাদক তিনি; ভাল কবিতা ও গল্প লিখতে পারেন—সুতরাং তিনি বকুনির ঊর্ধ্বে।

তারপরের দু'টি ভাই ইস্কুলে পড়ে—মণীন্দ্রনাথের মেজো ছেলে শম্ভু ও সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে রবি। দু'জনে প্রায় সমবয়সী। দুই মিতে বাড়ী জমিয়ে বেড়ায় দু'টিতে প্রায় কেদারনাথের আমলের মণি-শরতের মত! ছুটির দিন দুপুরে বোলতার চাক খুঁজে বার করে, খোঁচা দিয়ে বোলতা উড়িয়ে কঞ্চি হাতে ক্রোধান্ধ বোলতার ঝাঁকের সঙ্গে লড়াই করে তারা। গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সাঁতার কেটে এপার ওপার করে। শরৎচন্দ্র এলে তাঁর বর্মাচুরুট চুরি করে ছাদে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খায় দু'জনে। তিনি একটু চোখের আড়াল হলেই তাঁর গড়গড়ায় টান মারে তারা। কাজেই পপির অযত্নের জন্য বকুনি খাবার পালা এখন তাদেরই। মহা অপরাধীর মত কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনে মুখ বুজে শরৎচন্দ্রের বকুনি শুনছে।

—যা, গরম জল নিয়ে আয়; আর ওর চেনটা দে—বাঁধি ওকে।

কুকুরকে বাঁধতে শরৎচন্দ্রের বড় মায়া; কিন্তু উপায় নেই, সেবা-শুশ্রূষা করতে হবে পপির, কাজেই বাঁধতেই হবে তাকে।

তারপরে গরম জল এল, তোয়ালে এল, সাবান এল, গন্ধতেল এল, ওষুধ এল, তুলো-ব্যাণ্ডেজ এল এবং মহা আড়ম্বরে পপির পরিচর্যা সুরু হয়ে গেল।

তেল-সাবানের গন্ধে ভুরভুর, সদ্যঃস্নাত চেনে বাঁধা পপিকে বারান্দায় পরিষ্কার জায়গায় শুইয়ে তার ঘায়ে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন শরৎচন্দ্র।

—চুপ করে শুয়ে থাক পপি; ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলিস না যেন।

আদরে সোহাগে গদগদ হয়ে পপি রোদ্দুরে শুয়ে রইল।

রাস্তা দিয়ে মিষ্টিওয়ালা যাচ্ছিল হাঁকতে হাঁকতে—চাই গোপাল-ভোগ, মিহিদানা, গোকুলপিঠে, পান্তুয়া...

জানলা দিয়ে ডাকলেন তাকে শরৎচন্দ্র—ওহে শোনো, শোনো।

সে বাড়ীতে ঢুকলো—আজ্ঞে বাবু।

—কি আছে তোমার থালায় দেখি ?

সে তার খাবারের থালার ঢাকা খুলে দেখালো।

—ব্যস এই ? এতে কি হবে ? হতাশ হয়ে বললেন শরৎচন্দ্র।

একটু অবাক হয়ে মিষ্টিওয়ালা বললে—হবে না এতে ?

—না হে না, আরো চাই ; চট করে আনতে পার ?

—পারি বাবু।

—যাও নিয়ে এস ; দেরী করো না যেন।

—না বাবু, এক্ষুণি নিয়ে আসছি। হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ল মিষ্টিওয়ালা।

—অত মিষ্টি কি করবে শরৎ ?

—দরকার আছে সুরেন। ও ভোলা, ভোলা—

—আজ্ঞে, যাই বাবু!

—যাই বাবু! তামাক দে শীগগির।

কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে ভোলা ঘরে ঢুকতেই শরৎচন্দ্র বললেন—ভারি কুড়ে হয়ে গেছিস তুই! সকাল থেকে চা না খেয়ে গলা শুকিয়ে গেল। চা কই ?

—আজ্ঞে ভিজিয়েছি বাবু, এক্ষুণি আনছি।

—এতক্ষণ কি করছিলি ? যা, শীগগির নিয়ে আয়।

সকাল থেকে অন্তত বার তিনচার চা খাওয়া হয়ে গেছে তাঁর!

—কোথায় পেলে একে শরৎ ?

—কেন বল ত' ? ভারি প্রভুভক্ত চাকর।

—কেন ?

—প্রভুর মতই নেশায় পোক্ত।

ভোলা ছিল উড়ে ; দিনরাত পান আর গুণ্ডির সেবা চলত তার। সুরেন্দ্রনাথের কথা শুনে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল শরৎচন্দ্রের মুখে। নিজে ছিলেন তিনি নেশার রাজা। রাসবিহারী দাস একদিন এসে বড়াই করে বললেন—আমি তামাক ছেড়ে দিয়েছি শরৎদা।

শরৎচন্দ্র তখন একমনে তামাক খাচ্ছিলেন, বললেন—ছেড়ে দিয়েছ ? কেন ?

রাসবিহারী দাস বিজ্ঞের মত বললেন—একটা নেশা ত' ? তাছাড়া মিছিমিছি খরচ···

শান্তভাবে শরৎচন্দ্র বললেন—যখন ধরেছিলে তখন এ জ্ঞান হয় নি ? জানতে না যে খরচ হবে ?

রাসবিহারী দাস স্বীকার করলেন যে তিনি জানতেন!

দপ্ করে জ্বলে উঠলেন শরৎচন্দ্র।

—ভারি কাজ করেছ তামাক ছেড়ে! আবার বাহাদুরী করে শোনাতে এসেছ—তামাক ছেড়ে দিয়েছি শরৎদা! দু' চোখে দেখতে পারি না এই লোকগুলোকে! নেশা করে ছেড়ে দেয়! কাওয়ার্ডস্!

পালিয়ে বাঁচলেন সেখান থেকে রাসবিহারী দাস।

শরৎচন্দ্রের রাগ কিন্তু আর পড়ে না, তিনি পায়চারি করছেন আর বলছেন—তামাক ছেড়ে দিয়েছেন ত' ভারি কাজ করেছেন। আবার বলতে এসেছে সেই কথা আমার কাছে। বড় বাহাদুর।

শরৎচন্দ্র হঠাৎ একবার ভাগলপুরে এসে উপস্থিত।

অবাক হয়ে দেখলে সবাই—তাঁর গোঁফদাড়ি নেই।

—ও কি শরৎ, তোমার অমন ছাগনিন্দিত দাড়িটি কোথায় গেল ? চেনাই যায় না যে তোমাকে আর।—রহস্য করে বললেন সুরেন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র একটুও অপ্রতিভ হলেন না, বরং দুঃখ করে বললেন—আর বল কেন সুরেন। আমার অত সাধের দাড়ি—কতদিনের পুরোণো সাথী আমার—বিসর্জন দিতে হল তাকে।

—কেন ? কি অপরাধে ?

—কর্তাদের সুনজরে পড়েছি জান ত' ? ভাবলাম—আমাকে আর ক'জন চেনে ? চেনে সবাই আমার এই দাড়িটাকে। 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ'-এর ছবিই যত গণ্ডগোল বাধিয়েছে। তা—পুলিশ এলে বললেই হবে—আমি সে শরৎচন্দ্র নই—তার গোঁফদাড়ি ছিল, আমার নেই—এই দেখ···

খুব একচোট হাসির ধুম পড়ে গেল।

শরৎচন্দ্র বললেন—যাই বল সুরেন, জেলে যাওয়া পোষায় না। সেখানে না দেবে চা, না দেবে তামাক, না দেবে আফিঙ : বাঁচব কি করে ? আমি ত' আর দেশবন্ধু নই যে, কবে জেলে যেতে হবে ভেবে আগে থেকেই তামাক ছেড়ে দিয়ে বসে রইলেন। হ্যাঁ, নেশার জিনিস ঠিক ঠিক দাও—আমি এক্ষুণি জেলে যেতে রাজী আছি।

চা ও তামাক ছাড়াও ছিল তাঁর আফিঙের নেশা; তবে, চা ও তামাক চলত তাঁর মুহুর্মুহুঃ—আফিঙ খেতেন তিনি সকালে একবার ও সন্ধ্যায় একবার। ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে আফিঙের ডেলাটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পাকিয়ে পাকিয়ে সেটাকে একটা মার্বেলের মত গোলাকার করে ফেলতেন; হাতের তেলোয় তেলোয় ডেলাটাকে বার বার নিয়ে আন্দাজে তার পরিমাণ হিসেব করে নিতেন। হিসেব সূক্ষ্মভাবেই করতেন : বেশী মনে হলে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে কম করে নিতেন। ডানহাতের বুড়ো আঙুলে তিনি এই সময় এই উদ্দেশ্যেই বড় নখ রাখতেন। গুলির পরিমাণ ঠিক হয়ে গেলে টপ্ করে সেটা মুখে ফেলে দিয়ে জল খেয়ে নিতেন—বাঁ হাতে থাকত জলের গেলাস। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজটি তিনি এমন অভিনিবেশের সঙ্গে করতেন যে, চেয়ে চেয়ে দেখবার মতই ব্যাপার ছিল।

শেষ জীবনে শরৎচন্দ্রের রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে চিকিৎসকেরা যখন তাঁর প্রিয় নেশাগুলিকেই সব অনর্থের জন্যে দায়ী করলেন, শরৎচন্দ্রের মুখে তখন ফুটে উঠল ক্ষমার সুন্দর হাসি, ভাবখানা যেন—এরা বলছে বলুক—কিন্তু আমি ত' জানি তোমরা আমার কতখানি। আমার অস্থি, মজ্জা, রক্ত, আমার চিন্তা, আমার কাজ, আমার স্বপ্ন, আমার জাগরণ, আমার জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ সবের সঙ্গেই তোমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছ। তোমাদের বাদ দিলে আমার অস্তিত্বই থাকে না। এরা কি বুঝবে সে কথা।

পৌঁছে গেছে মিষ্টিওয়ালা তার মিষ্টি নিয়ে।

—এসে গেছ তুমি ? বাঃ!

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র—

—ওরে, আর তোরা সব, বসে যা এখানে, পাতা নিয়ে নে একটা করে। ঝিয়ের ছেলেটাকেও ডাক, বসে পড়ুক একপাশে। কই, দাও ত' হে ওদের সব রকম মিষ্টি একটা করে, তারপরে যে যা চাইবে তাকে তাই দেবে। যার যা ভাল লাগবে চেয়ে নিবি তোরা বুঝলি ?

পেট ভরে খাবি সব। কি নাম' তোর রে? মন্নুয়া? আয়, বোস এখানে। একেও দাও হে।

বালভোজন চলছে, শরৎচন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন তিনি—তাই ত'। তোর কথা যে ভুলেই গিয়েছিলাম রে। কই, একটা পাতায় সব রকম দাও দেখি পপিকে দি'! আহা, ও বেচারার নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

নিজের হাতে পপিকে খাওয়াতে বসলেন তিনি।

শরৎচন্দ্র এলে পপি আর বাড়ী ছেড়ে কোথাও যায় না—সুবোধ বালকটির মত সারাদিন উঠোনে চুপ করে শুয়ে থাকে। রোজ নিয়মিত সাবান মেখে স্নান চলে তার—দু'বেলা দুধভাত মেখে নিজের হাতে খাওয়ান তাকে শরৎচন্দ্র। পপি তখন আদরে ডগমগ।

তাঁর আদরের পপির জীবলীলা সাঙ্গ হল বন্দুকের গুলীতে।

শরৎচন্দ্র মজুমদার ছিলেন 'শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথে'র আর এক দাদা; পাড়া সুবাদে তিনি ছিলেন সকলেরই ছোড়দা। তাঁর বাড়ীর হাতা ছিল খুব বিস্তৃত। আরো কয়েকটি কুকুরের সঙ্গে পপিও একদিন তাঁর হাতায় ঢুকেছিল। শরৎচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠপুত্র পপির এই বেয়াদবির শাস্তি দিলেন তাকে গুলী করে মেরে।

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে এ খবর তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছয়।

এ ঘটনার পর যখন তিনি আবার ভাগলপুরে এলেন, তাঁর প্রথম কথা হল—পপিকে ওরা গুলী করে মারলে আর তোরা কিছু করতে পারলি নে?

—কি করব আমরা বলুন?

বিনুনি করা বেতের নল লাগানো একটি ছোট গড়গড়া হাতে নিয়ে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন আর প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। চোখ দু'টি লাল।

একটু চুপ করে থেকে শরৎচন্দ্র বললেন—আমি থাকলে আমার রিভলভার নিয়ে গিয়ে তাকেই গুলী করে মারতাম।

শরৎচন্দ্র মজুমদার বয়সে বড় হলেও শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ভাগলপুরে এলে শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং অনেক গল্প হত দু'জনে। কিন্তু পপির ব্যাপারে তিনি এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তার পরে আর ও দিকে যেতেন না।

শরৎচন্দ্র মজুমদারের ছিল ফুলের সখ। তাঁর ছোট্ট বাগানটিতে প্রতিদিন নানা রকমের ফুল ফুটে থাকত। কিন্তু ফুলে তিনি কাউকে হাত দিতে দিতেন না—বড় কড়া ছিলেন তিনি এ বিষয়ে।

জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন অতি প্রত্যূষে উঠে গাঙ্গুলিবাড়ীর ছেলেরা পুজোর ফুল তুলতে যেত এ কথা আগেই বলেছি। সব ফুলে পুজো হয় না। কোথায় কার বাড়ীর বাগানে পুজোর ফুল ফুটে আছে এ খবর তাদের জানা ছিল। শরৎচন্দ্র মজুমদারের বাগানে অন্য ফুলের সঙ্গে বড় বড় স্থলপদ্ম ফুটে থাকত। এ ফুলটির ওপর ছেলেদের লোভ ছিল অসীম—জগদ্ধাত্রী প্রতিমার হাতে, পায়ে, কোলে এ ফুলটি ভারি সুন্দর মানাতো। তাই, বিশেষ করে স্থলপদ্ম সংগ্রহের আশায় তারা সাজি হাতে মজুমদার মশায়ের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হত। এ বাড়ীর ছেলেদের শিক্ষা ছিল বাড়ীর কর্তার অনুমতি না নিয়ে ফুলে হাত দেবে না। মজুমদারমশাই খুব ভোরে উঠতেন এবং নিত্য প্রাতর্ভ্রমণে যেতেন। তিনি হয়ত বেড়াতে বেরুচ্ছেন এমন সময় ছেলেরা সাজি হাতে তাঁর সামনে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল, ফুল তোলবার অনুমতি চাই।

—কিরে, জগদ্ধাত্রী পুজোয় ফুল চাই? আচ্ছা আয়।

এই একটি দিন তিনি প্রসন্নমনে ফুল তোলবার অনুমতি দিতেন। তাঁর আর বেড়াতে যাওয়া হত না সেদিন—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে 'এটা তোল, ওটা তোল' করে বেছে বেছে ভাল ভাল ফুল পুজোর জন্যে তুলিয়ে দিতেন।

গল্পও করতেন সেই সঙ্গে।

—নেড়া এসেছে রে?

ছেলেরা হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকাতো।

নেড়া আবার কে?

—শরৎ রে শরৎ, তোদের শরৎদা; এসেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছেন।

—কবে?

—পরশু সকালে।

—পাঠিয়ে দিস, ত' একবার, বলিস, ছোড়দা ডেকেছে—বুঝলি?

—আচ্ছা।

—আমরা ওকে নেড়া বলে ডাকি। পৈতের সময় তারকেশ্বর থেকে মাথা মুড়িয়ে ফিরে এল, সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল নেড়া। জানতিস না বুঝি তোরা?

ছেলেরা সত্যিই জানত না যে তাদের শরৎদার নাম নেড়া।

বাড়ী ফিরে শরৎচন্দ্রকে তাঁর ছোড়দার কথা বলতে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—ছোড়দাকে বলিস এখানে আসতে; আমি তাঁর বাড়ী যাব না; তাঁর ছেলে পপিকে মেরেছে।

অগত্যা, তাঁর ছোড়দাকেই আসতে হল তাঁর কাছে।

বাড়ীর ছেলেরা উঠোনে মার্বেল খেলছে। 'ভিং-গুল্লি' নয়—সে হল বাজির খেলা অর্থাৎ জুয়া। তারা খেলছে খাটার খেলা। এ খেলায় যে হারবে তাকে খাটতে হবে। এই খেলায় বড়দের তত আপত্তি ছিল না, সুতরাং তাঁদের সামনেও খেলা চলত—অবশ্য পড়ার সময় বাদ দিয়ে।

খেলা খুব জমে উঠেছে। বড়রা বসে আছেন বারান্দায়—শরৎচন্দ্র গল্প করছেন তাঁদের সঙ্গে।

হঠাৎ তিনি উঠোনে নেমে এলেন!

—দে ত' রে আমায় দু'টো মার্বেল।

ছেলেরা অবাক!

—খেলবেন আপনি শরৎদা?

—কেন খেলব না?

—খেলতে পারেন আপনি? টিপ আছে আপনার?

মৃদু হাসি ফুটে উঠল শরৎচন্দ্রের মুখে।

—দ্যাখ-ই না পারি কি না! তোদের সকলকে হারিয়ে দাব।

একটা বেশ বড় আর একটা ছোট মার্বেল বেছে নিয়ে তিনি প্রচণ্ড উৎসাহে খেলায় লেগে গেলেন। কে বলবে যে তিনি ছেলেদের সমবয়সী নন! বড়রা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন আর হাসছেন। শরৎচন্দ্রের কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—একমনে খেলে চলেছেন তিনি ছেলেদের সঙ্গে। দূর থেকে ঠাই করে মেরে বললেন—দেখলি

খেলতে পারি কি না? ওরে, ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে মার্বেল খেলায় কেউ পারত না—জানিস? এত মার্বেল আমি জিতেছিলাম যে তাই দিয়ে ছোটখাটো একটা পাহাড় হয়ে যেত!

এ বাড়ীর ছেলেদের পাখী, খরগোশ, গিনিপিগ, বেজি, সাদা ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী পোষার সখ ছিল। পোষার আগে ও কিছুদিন পর পর্যন্ত তাদের আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত থাকত না, যত্ন ও আদরের ঠেলায় প্রাণীগুলির প্রাণ যাবার উপক্রম হত। তারপরেই কিন্তু তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ত এবং অনেক সময় এমনও হত যে পোষা জীবগুলিকে সময়ে খেতে দিতে পর্যন্ত তাদের ভুল হয়ে যেত—আদর যত্ন করা ত' দূরের কথা! মূক, অসহায় প্রাণীগুলি তখন মেয়েদের ভরসায় বেঁচে থাকত—মেয়েদের মায়া মমতা একটু বেশী।

বাইরের বাড়ীতে এক মস্ত বড় খাঁচায় একটি পোষা কোকিল ছিল এ বাড়ীতে। কোকিলটি অনেকদিনের—ছেলেরা জ্ঞান হয়ে অবধি তাকে দেখে আসছে। তার লেজ গিয়েছিল ক্ষয়ে, গলার স্বর গিয়েছিল ভেঙ্গে; খেতে দেবার সময় এত বড় হাঁ করে সে কামড়াতে আসত—তার লাল গলার ভেতরের অনেকখানি পর্যন্ত দেখা যেত। এমনিতে তার অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না—কেবল বসন্তের আগমনে সে কখনো কখনো ভাঙ্গা গলায় ডেকে উঠত। অনেক দিনের পুরোনো পাখী—কাজেই, শুধু খেতে দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোনো যত্ন কেউ তার করত না। ছেলেদের তাকে মনে পড়ত, যখন সামনের বাগানের তেলাকুচো লতার ঘন সবুজ পাতার আড়াল থেকে, পাকা, লাল টুকটুকে তেলাকুচো ফল উঁকি মারত। অন্য কোকিল এসে খেয়ে নেবার আগেই তারা বহু কষ্ট স্বীকার করে, কাঁটা ঝোপের ওপর লতিয়ে-ওঠা তেলাকুচো গাছ থেকে পাকা ফলটি পেড়ে এনে তাদের পোষা কোকিলটিকে উপহার দিত। কত আগ্রহের সঙ্গে সেই টাটকা, পাকা তেলাকুচো ফলটি তাদের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে সে খেতে সুরু করে দিত—ছেলেরা দাঁড়িয়ে তাই দেখত।

তাদের কোকিলের জন্যে মাঝে মাঝে তারা পাকা বকুলফল সংগ্রহ করে আনত। এ কাজটি একটু কঠিন ছিল এবং এই কাজের জন্যে অনেক সময় তাদের 'না-বলে নেওয়ার' অপরাধ করতে হত। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মশায়ের বাড়ীর পাঁচিল-ঘেরা হাতায় একটি বকুলগাছ ছিল। গাছটি ছিল প্রায় গেটের কাছাকাছি—বকুল পাকলে লাল ফলগুলি সামনের পথ দিয়ে যাবার আসবার সময় চোখে পড়ত। কিন্তু গেট দিয়ে ঢুকেই ছিল দরোয়ানের ঘর—কাজেই লোভনীয় লাল ফলগুলি চোখে পড়লেও সেগুলি নেওয়া নেহাৎ সহজসাধ্য কাজ ছিল না। এই দুঃসাধ্য কাজটিও ছেলেরা মাঝে মাঝে তাদের কোকিলের জন্যে করত। কিন্তু, কেবল খাওয়ানোই সব নয়, যত্নও নিতে হয়। অভাব ছিল সেইটিরই। শরৎচন্দ্র একবার এসে দেখলেন কোকিলের খাঁচার ভেতরে খুব নোংরা জমেছে। অমনি, যথারীতি বকুনি সুরু হয়ে গেল।

—কত নোংরা জমেছে খাঁচার ভেতর দেখ দেখি। একটু পরিষ্কার করে দিতে পারিস না? পাখীটা যে ঐ খাঁচায় থাকে এ কথা মনে হয় না তোদের? ঐ নোংরার ভেতর বাস করলে ও কদিন বাঁচবে বলত? যা, একটা শক্ত কাঠি আর একটুকরো কাপড় নিয়ে আয়, খাঁচাটা পরিষ্কার করি।

বিঘত দুই লম্বা একটা বেশ মজবুত কাঠি এল, ন্যাকড়াও এল খানিকটা।

—জল কই? জল নিয়ে আয় একটা বালতি করে।

জলও এল ছোট বালতিতে।

কোকিলের খাঁচা পরিষ্কার করতে বসে গেলেন তিনি।

খাঁচা বেশ বড়—দরজাও খুব প্রশস্ত—ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পরিষ্কার করার কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্তু গোল বাধালে খাঁচার অধিষ্ঠাতা পাখীটি। খাঁচার দরজা খুলে শরৎচন্দ্র তাঁর কাঠিশুদ্ধ হাত যেমন ভেতরে ঢোকালেন অমনি সে বিরাট হাঁ করে তেড়ে এল তাঁকে কামড়াতে। মানুষের হাতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বিঘত দুই লম্বা কাঠির সঙ্গে তার পরিচয় কোনোদিনই হয়নি—অন্তত তার পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনের মধ্যে। সেটিকে সে একটা মারাত্মক অস্ত্র মনে করে ভয়ে বার বার হাঁ করে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল। শরৎচন্দ্র তাকে সরিয়ে দেন, সে এক কোণে চলে যায়—আবার তেড়ে আসে।

হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে কি করে জানি না, শরৎচন্দ্রের হাতের কাঠি কোকিলের হাঁ এর ভেতর ঢুকে গেল—চলে গেল একেবারে তার গলার মধ্যে! পরক্ষণেই, মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত তুলে পাখীটা খাঁচার ভেতর গড়িয়ে পড়ল; তার পা দু'টো বারকয়েক থর থর করে কেঁপে উঠল, তারপরই সব স্থির হয়ে গেল। মরে গেল সে।

—যাঃ, মরে গেল পাখীটা। এ হে হে, শেষে আমার হাতেই মরল? অ্যাঁ? এ কি করলাম আমি! মেরে ফেললাম পাখীটাকে?

সযত্নে তাকে খাঁচা থেকে বার করে তার মুখে জল দিলেন তিনি, নেড়ে চেড়ে দেখলেন তাকে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় কি না, নাঃ, মরেই গেছে সে। বেঁচে থাকার কোনো লক্ষণই নেই! দেখতে দেখতে অশ্রুর বন্যা নামল তাঁর দুই চোখে। আর মুখে কেবল সেই এক কথা—আহা হা, পাখীটাকে মেরে ফেললাম আমি? গলা বুজে এসেছে কান্নায়, কথা বেরুচ্ছে না ভাল করে মুখ দিয়ে, কোনো রকমে তিনি বললেন,—দু'টি ফুল আনতে পারিস তোরা।

—পারি শরৎদা।

নিয়ে আয় ত' চট করে।

ছেলেরা ছুটে গিয়ে বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে এল। নিজের একটি ভাল রুমাল এনে তাতে ফুলগুলি বিছিয়ে তার ওপর সযত্নে পাখীটাকে শুইয়ে তিনি নিজে গিয়ে গঙ্গায় তাকে বিসর্জন দিয়ে এলেন।

কান্না আর থামে না তাঁর। ঘরে বসে তামাক খাচ্ছেন আর কেবলই চোখ মুছছেন। চোখ দু'টি জবাফুলের মত লাল।

সুরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসতেই ছেলেরা ছুটে গিয়ে তাঁকে খবরটা দিলে। অবাক হয়ে গেছে তারা শরৎচন্দ্রের কান্না দেখে।

—শরৎদা বড় ঘরে বসে কাঁদছেন।

—শরৎ কাঁদছে? কেন? কি হয়েছে? তিনিও কম আশ্চর্য হলেন না কথাটা শুনে।

কোকিলের খাঁচা পরিষ্কার করতে গিয়ে তাঁর কাঠির খোঁচা লেগে কোকিলটা মরে গেল; তাই তিনি কাঁদছেন। [ক্রমশঃ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

সুলেখা দাশগুপ্ত

কাচ্চি। এই কাচ্চি·····

মেমসাহেবের ডাক শুনে লম্বা বারান্দা দৌড়ে পার হয়ে এসে কাচ্চি শিবানীর সামনে দাঁড়ালো। একটু তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস টানতে টানতে বলল, কী মা ?

মা !

ভিজে মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছছিল শিবানী। মুখ থেকে তোয়ালে সরিয়ে অবাক চোখে তাকালো আয়ার দিকে। মেমসা'ব ডাকে অভ্যস্থ কানে আয়ার মা ডাকটা এতো আলগা ঠেকল যে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, হঠাৎ মা ডাকছিস যে তুই ?

ততোধিক বিস্ময়ে গালে হাত ঠেকালো আয়া—কাল আপনি নিজেই না বললে, এখন থেকে আমাকে মা বলে ডাকবি। ফের মেমসা'ব বলে ডাকলে মাথা গুঁড়িয়ে দেবো।

মনে পড়েছে। ঝরঝর শব্দে হেসে উঠল শিবানী। বলল, ও, তাই বলেছিলাম বুঝি !

বলেছিলে তো। সাহেবও ছিলেন ঘরে।

সাহেবও ছিলেন বুঝি ঘরে। হাসির তোড় আরো বেড়ে গেল শিবানীর। আয়া কি করে বুঝবে সাহেবও ছিলেন নয়, সাহেব ছিলেন বলেই ওর এই বলা। চোখের উপর ভেসে উঠল শিবানীর আয়ার প্রতি মা ডাকের আদেশ শুনে ইন্দ্রনাথের ক্রুদ্ধ মুখটা। ঐ জন্য—শুধু ঐ জন্যই। শুধুমাত্র ইন্দ্রনাথকে উত্যক্ত করবার জন্য এসব হলো ওর নিত্য নতুন আবিষ্কার।

হাসি থামিয়ে তোয়ালে চেপে চেপে ভিজে মুখ মুছতে লাগল শিবানী নয় তো যেন ইন্দ্রনাথের সেই ক্রুদ্ধ মুখের উপর নিজের মুখটা একবার এখানে, একবার ওখানে চেপে ধরতে লাগল। না—এ ইচ্ছেটা এখনও একেবারে মরে যায় নি শিবানীর। এক এক সময় ইচ্ছে করে, ভীষণভাবে ইচ্ছে করে ইন্দ্রনাথের মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্পিত ঠোঁটের ঝড় বইয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু পারে না। ভালোবাসতে দেয় না ইন্দ্রনাথ! ভালোবাসতে চাইলেই ভালোবাসা যায় না। এক একজন মানুষের স্বভাবের ভেতরই আশ্চর্য রকম বাধা থাকে তাকে ভালোবাসবার। দিতে গিয়েও হাত গুটিয়ে ফিরে আসতে হয় তাদের কাছ থেকে।

আপনার চা এখানে আনব ? মেমসাহেবের ডাকের কারণটা বুঝতে না পেরে জানতে চাইল আয়া।

আয়ার প্রশ্নে একটু চমকেই তোয়ালে থেকে মুখ তুললো শিবানী। ভাবালু হয়ে পড়েছিল সে ! আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল সে !

তোয়ালেটা কাচ্চির হাতে দিয়ে চিরুণী তুলে নিতে নিতে বলল, না। চা আমি ও-ঘরে গিয়েই খাবো। তোকে যেজন্য ডেকেছি তাই কর।

কি জন্য ডেকেছ তাই বল ? খোঁপা বেঁধে দেবো ? কাচ্চি এগিয়ে এলো শিবানীর কাছে।

মাথা সরিয়ে নিল শিবানী। যা, তোকে চুল বাঁধতে হবে না। তুই বাগানটা দেখ। দেখ কোন রং-এর ফুল আজ সব চাইতে বেশী চোখ টানছে। তারপর সেই রং-এর শাড়ি বের করে রাখ।

হ্যাঁ এই ভাবেই আজকাল শাড়ির রং নির্বাচন করে শিবানী। আগে তাকে শাড়ির রং নিয়ে বহু ভুগতে হয়েছে। একের পর এক শাড়ি ব্লাউজ খুলেছে, পরেছে আর ছেড়েছে। নাঃ, আজ মানাচ্ছে না এ রংটা। নাঃ মানাচ্ছে না এ রংটাও। তারপর স্তূপীকৃত ভাজা শাড়ি রেখে বেরিয়ে গেলে কাচ্চি গর্জাতো শাড়ি পাট করতে করতে। কিন্তু সে দুর্ভোগের দিন কাচ্চির আর আজকাল নেই। শিবানী তার দিনের রং বার করবার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে ফেলেছে। একদিন বহু শাড়ি খোলা আর ছাড়ার পর একটা ঘোর গোলাপ রং-এর শাড়ি পরে খুসী মনে বাগানের পথ দিয়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবানী। আজ বাগানের সমস্ত ফুলের ভেতর হলুদ রং-এর সিজিনফ্লাওয়ারের বেডটা যেন দশ দিকে বাসন্তী রং ছড়িয়ে দুলছে। গোলাপ আজ বাগানে নিষ্প্রভ। তক্ষুনি উঠে গেল শিবানী উপরে। আলমারী খুলে

বের করল বাসন্তী রং-এর কাশ্মীরী শাড়ি। কাঞ্চি মেমসাহেবকে ফের শাড়ি পালটাতে দেখে—রইল হাঁ করে তাকিয়ে। হেসে ফেলল শিবানী। বলল, ভগবানকে খুব বুঝি ডেকেছিস। তোর দুঃখ এতদিনে তিনি ঘোচালেন। এবার থেকে তোকে আর শাড়ির বোঝা পাট করতে বসতে হবে না। আমার শাড়ির রং বেছে দেবে আমার বাগানের ফুল। যেদিন যে ফুল সেদিনের আকাশ-মাটির সঙ্গে মিলে সব আগে চোখ টানবে, মন মাতাবে, সেই রং হবে আমার সেদিনের রং, বুঝলি? না বুঝে থাকিস তো যা। তুই এটুকু বুঝে রাখ, তোর শাড়ি পাট করার দুঃখ ঘুচেছে।

—কাঞ্চি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাগানটা দেখতে দেখতে বলল, ও: মেমসাব, আজ তোমার ডালিয়া ফুল বাগান আলো করে রয়েছে। অন্ত ফুল চোখেই লাগছে না।

ডালিয়া তো বুঝলাম। কী রং?

কী জানি, তোমরা পিঙ্ক বলো না মভ বল জানিনে।

উঠে এলো শিবানী। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, ঠিক বলেছিস। মভ রং-এর ডালিয়া আজ বাগান আলো করে রয়েছে। সূর্যমুখী পর্যন্ত চোখে লাগছে না। বের করে রাখ মভ রং-এর জরির বুটিদার চন্দেরী শাড়িটা।

শিবানী কিন্তু কোন বিয়ে বাড়ী যাচ্ছে না। কোন পার্টিতে যাচ্ছে না। কোন উৎসব বাড়ীতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে অফিসে। অফিস করাটা যেমন তার কিছু একটা করবার জন্যই করা, পোষাক করাটাও তাই। দু'টোই সে করার কিছু নেই বলেই করে। থাকলে হয় তো কোনটাই করত না।

আয়াকে পোশাক বের করে রাখবার আদেশ দিয়ে শিবানী চা খাবার জন্ত খাবার ঘরের দিকে চলল। ইন্দ্রনাথের ক্রুদ্ধ মুখটা এখন মিলিয়ে গেছে। ভরা বাগানের ফুলের রং তার দু' চোখে, গুনগুনিয়ে উঠল সে,—

'আকাশ বাতাস কেমন করে জানল
কাহার গলে দিলাম তুলে
আমার বরমাল্য—আকাশ'···

ফের কলিটা টানতে যেতেই বাধা পেয়ে থেমে গেল শিবানী।

আকাশ বাতাসেরও জানবার কথা নয় এমনি ভাবে কার গলায় মালা দিলে?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবানী স্বামীর জিজ্ঞাসায়।

ইন্দ্রনাথ বারন্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লাইটার জেলে পাইপ ধরাতে ধরাতে ফের জিজ্ঞাসা করল, কার গলায়?

প্রথমটায় বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না শিবানীর। অবাক দৃষ্টিতে তাকালো ইন্দ্রনাথের দিকে। তারপর হেসে উঠল ভীষণ ভাবে। সত্যি! এ ভাবে একজনের গলায় মালা পরিয়ে দিলে বেশ হয় তো! গভীর নি:সাড় রাতে, নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে চমকে উঠে এগিয়ে যাবো মালা হাতে! বুকের একান্ত কাছে গিয়ে কম্পিত হাতে পরিয়ে দেবো গলায় বেলফুলের মালা। মাথা কাৎ করল শিবানী, মালা এ ভাবেই পরানো উচিত; এক সভা লোক। এক মাথা আলো আর হৈ-হৈ রৈ-রৈ-এর ভেতর মালা পরানোর আসল সুরটাই যায় হারিয়ে আর তাই বোধ হয় সমস্ত জীবনেও আর সুর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কথা শেষে হাসল শিবানী।

পাইপ দাঁতে চেপে চোখ দু'টো ছোট করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী চোখ ফেরালো অন্ত দিকে।

ইন্দ্রনাথের পাইপ দাঁতে চাপা, চোখ ছোট করা বিশেষ ভঙ্গির এই তাকানোটা শিবানীর ভারি বিশ্রী লাগে। কেমন নাটুকে পনা নাটুকে পনা লাগে। শুধু এটাই নয় অরুচিকর ঠেকে শিবানীর কাছে ইন্দ্রনাথের অনেক কিছু। ইন্দ্রনাথের সাহেবীয়ানা অসহ্য ঠেকে তার।

সে নিজে বৃটিশ রাজত্বের পি, এম, জি অফিসারের মেয়ে। মেম গভর্নেস তাকে ইংরেজী পড়িয়েছে। নাচ শিখিয়েছে। পিয়ানো শিখিয়েছে। তবু সে যেমন বাঙ্গালী মেয়ে ছিল তেমনি আছে। ইন্দ্রনাথের নকল সাহেবীয়ানা লজ্জিত করে তাকে। পীড়া দেয় তাকে। পাঁচ বছর বিলেতে বাস করে ইন্দ্রনাথ কোন মতে কিছুকাল কাঁধ ঝাঁকিয়ে পাইপ দাঁতে চেপে চোখ মুখ কুঞ্চিত করে বাঙ্গালী বাপ মা ভাই বোনের সঙ্গে এক বাড়ীতে ছিল। তারপর জর্জকোর্ট রোডে এই বাড়ী করে ওকে নিয়ে চলে এসেছে। বাবা আপত্তি করেন নি। ইন্দ্রনাথের বুদ্ধিতেই তার ব্যবসার আয়ের অঙ্ক লক্ষ থেকে লক্ষ-লক্ষের পথে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইন্দ্রনাথ একবার দিল্লী ঘুরে আসে আর সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের আয়রন ফ্যাক্টরী আর মেটাল প্রেসি-এর বিরাট বিরাট অর্ডার। অন্ত ছেলেরা যত বাধ্য, বিনীত, ভালো হোক, বাপের কাছে সব চাইতে মূল্যবান ছেলে ইন্দ্রনাথ। সে মদই খাক আর মেম নিয়েই ঘুরুক বা পৈত্রিকবাড়ী ছেড়ে জর্জকোর্ট রোডে বাড়ী করুক, তাকে বাপ ঘাঁটান না।

কিন্তু শিবানী ঘাঁটায়। তার কারবার, কারবার নিয়ে নয়, মানুষটাকে নিয়ে। তার কারবার-ব্যবসা নিয়ে নয়, জীবন নিয়ে।

ইন্দ্রনাথের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে খাবার-ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল শিবানী। এখন বেলা আটটা। দশটায় ওর অফিস। পাকা দু' ঘণ্টা এখন ওকে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে কাটাতে হবে—না, ঠিক দু' ঘণ্টা নয়। এক ঘণ্টা। আর একটা ঘটাকে সে স্নান-খাওয়া পোষাকে টেনে নিয়ে যাবে।

সমস্ত দিনের ভেতর ওদের স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎকারটা আজ কেবল এ সময়টুকুর মধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর ইন্দ্রনাথ যাবে অফিসে। ফিরবে গভীর রাতে আর এমন অবস্থায় ফিরবে যে, শিবানীকে উঠে দু'জনার ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে। ধীরে ধীরে ব্যবধান বাড়তে বাড়তে আজ যে ওরা কতদূরে চলে গেছে তা বোধ হয় নিজেরাও জানে না। এক এক সময় স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখে শিবানী, কোনো বেদনাবোধ নেই ওর স্বামী সম্বন্ধে। কোনো প্রয়োজনবোধ নেই ওর স্বামী সম্বন্ধে। এক সময়ের মুহূর্ত গোণা স্ত্রী আজ হিসেবও করে না স্বামীর সঙ্গ-বঞ্চিত দিনটা সাত না সতেরো।

শুধু এই প্রাত:কালীন সময়টা নিয়ে ওর অবস্থা হয় যেন কতকটা ষ্টেজে নতুন অভিনয় করতে নামা অভিনেতার হাত দু'টো নিয়ে

অস্বস্তিতে পড়ার মতো। এ-ভাবে, ও-ভাবে কোন ভাবে রেখেই যেমন হাত দু'টোকে নিয়ে নতুন অভিনেতা স্বস্তি পায় না। শরীর থেকে আলগা ঠেকে তার হাত দু'টোকে, শিবানীরও ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অতিবাহিত করার এ সময়টা নিয়ে তেমনি অবস্থা দাঁড়ায়। এভাবে, ওভাবে যে ভাবে কাটাক শরীর-মন থেকে বিচ্ছিন্ন ঠেকে সময়টা।

চাকরীটা নিয়েছিল শিবানী নিতান্তই খেয়ালে। কিন্তু ভালো লাগছিল না তার কাজ! একেবারেই না। কিন্তু ছেড়ে দেবে ঠিক করেও আর ছেড়ে দেওয়া হলো না। ইন্দ্রনাথের জন্যই হলো না। প্রথম ক'দিন শিবানীর চাকরী নেওয়াটা ইন্দ্রনাথ বুঝে উঠতে পারে নি। ভেবেছে বেরুচ্ছে কোথাও। যাচ্ছে কোথাও। তারপর প্রতিদিন ঠিক দশটায় বেরুতে দেখে জিজ্ঞাসা করে যখন শুনল শিবানী চাকরী নিয়েছে, ক্ষেপে গেল প্রচণ্ড। ওর চাকরী নেওয়া যে ইন্দ্রনাথকে এমন ক্ষিপ্ত করবে, চঞ্চল করবে, শিবানী তা কল্পনাও করে নি। আর তাকে পায় কে। এতদিন ও কেবল একা যন্ত্রণা ভোগ করেছে। এবার এই অস্ত্রে কেটে চলবে ইন্দ্রনাথকে শিবানী। কাজ ছাড়া ওর হলো না। ইন্দ্রনাথের যন্ত্রণা ভোগটাই ওর কাজের আনন্দ। প্রতিদিন অফিসে যাবার প্রেরণা। ইন্দ্রনাথকে যন্ত্রণা দিতে পারলে ওর ভেতরটা ভারী খুসী হয়।

বাবুর্চি চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে গেল। ইন্দ্রনাথ এসে শিবানীর উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। চায়ের আয়োজন এখন নিতান্তই সামান্য। একটা প্লেটে কিছু বিস্কিট মাত্র। ইন্দ্রনাথ স্নান করে ভারী ব্রেকফাষ্ট খেয়ে তার ফ্যাক্টরীতে যাবে। লাঞ্চ খাবে সেখানে, নয় ত' কোন সাহেবী হোটেলে। শিবানী আর একটু বাদেই খাবে ভাত। আগে শিবানী একটা হাফ-বয়েল ডিম খেত। এখন তাও খায় না। চা ঢেলে ইন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে দিল শিবানী। ঠেলে দিল বিস্কিটের প্লেটটা। নিজে শুধু এক কাপ চা নিয়ে অল্প অল্প ঠোঁট ছোঁয়াতে লাগল। ইন্দ্রনাথ চোখের সামনে মেলে ধরল পত্রিকার পাতা। সে একটু নড়লে চড়লে শব্দ করলেই শিবানীর বুকটা ধক্ করে ওঠে, এ বুঝি সুরু হলো ওর চাকরী ছেড়ে দেওয়া নিয়ে ইন্দ্রনাথের রাগারাগি চেঁচামেচি। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে উঠে পড়ল শিবানী। হল ঘরে গিয়ে বসল পিয়ানোর ডালা খুলে। অলস হাতে আঙুল বুলিয়ে চলল পিয়ানোর উপর।

ভাবছিল শিবানী।

কিন্তু সত্যি কী কিছু ভাবছিল সে?

সুর কানে নিয়ে কী চিন্তা করা যায়?

বোধ হয় না।

না, তবে শিবানীও ভাবছিল না।

ভাবনা তার বহু ভাবা হয়ে গেছে। এখন আর সে ভাবে না। চলে, কেবল নিজের খুসী মতো চলে। মর্জি মতো চলে। থেমে সে কিছুতেই যাবে না। কিছুতেই না। জীবন তার যদি কোন আনন্দ, কোন সার্থকতা সঙ্গে নিয়ে আসতে না পেরে থাকে, তার চলার আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তার চলা যদি এমন চলা হয়, পথের শেষে দেখে, যেখান থেকে রওনা হয়েছিল সেখানেই আবার ঘুরে এসে পড়েছে: এক পাও এগুতে পারে নি, তবু সে চলবে। অসহ্য ওর কাছে জীবনের স্থবির অচলত্ব। পিয়ানোয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর তুলতে তুলতে সময় পার করতে লাগল শিবানী। আর কিছুটা সময় এমনি করে পার করতে পারলে—কিন্তু তা কী আর পারা যাবে।

গেলও না। ইন্দ্রনাথকে শিবানীর বাজনা উত্যক্ত করে তুলছিল। হাতের পত্রিকা ছুঁড়ে ফেলে এসে হলঘরে ঢুকল সে। ঠিক! যা ভেবেছে। শিবানীর কোলে সেই বেড়াল ছানাটা বসে রয়েছে গুটিশুটি। এই বেড়াল ছানাটা নিয়ে শিবানীর বাড়াবাড়িটা কিছুদিন ধরে অধৈর্য করে তুলছিল ইন্দ্রনাথকে। বেড়ালটাকে গল্প বলবে, তাকে থাবা টিপে টিপে পিয়ানো শেখাবে। দু'টো পা ধরে দাঁড় করিয়ে আর দু'টো পায়ে বল নাচ শেখাবে—রাগে শরীর রি রি করে ইন্দ্রনাথের।

শিবানীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, সেই থেকে বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে ঠুং ঠাং করে চলেছ! আশ্চর্য!

ঠুং ঠাং নয়, টুং টাং। কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাপে পিয়ানোয় সুরের ঝঙ্কার তুলে উঠে পড়লো শিবানী। কোলের বেড়াল ছানাটা ধুপ করে পড়ে গেল নীচে। তাড়াতাড়ি সেটাকে ফের কোলে তুলে নিয়ে গালে গাল লাগিয়ে বলে চলল শিবানী। তোকে এ বাড়ীর কেউ দেখতে পারে না! বাবুর্চি মাছ মাংসের বেমিল মেলায় তোর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে। কাচ্চি কাপড় ছিঁড়ে বলে, তুই নষ্টামী করে ছিঁড়েছিস। মালি তাড়া করে, তুই বাগান নোংরা করিস। আর বাড়ীর কর্তার তো কথাই নেই। তিনি ভাবেন দু' জনকেই আছড়ে মারা যায় কী ভাবে।

গাল থেকে বুকে নামিয়ে বেড়ালটার মাথায় হাত বুলোয় শিবানী। সে আরামে ঘর ঘর আওয়াজ তোলে গলায়। শিবানী বলে চলে, তা তেমন অবস্থায় তোর কী? দিবি তো দোতলা থেকে একতলায় পড়েই ম্যাও ম্যাও করে লম্বা দৌড়। আর আমি মরে থাকব হাড় গোড় ভেঙ্গে দলা পাকিয়ে। তা ফিরে এসে কিন্তু আমার জন্য কাঁদবি। বুঝলি? কেউ যেন বলতে না পারে শিবানীর শোকে একটা বেড়ালও কাঁদেনি। এই এমনি করে কাঁদবি—বেড়াল ছানাটাকে পিয়ানোর টুলটার উপর বসিয়ে তাকে শোক প্রকাশের ভঙ্গী শেখাতে গেল শিবানী, ইন্দ্রনাথ বেড়ালটার গলা দু' আঙুলে টিপে ধরে ঝুলোতে ঝুলোতে নিয়ে গিয়ে জানালা টপকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, আপাতত একজনকে আছড়ে ফেলে সাধ মেটানো গেল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমার কী তোমার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হবে?

নিশ্চয় হবে। গা ছেড়ে কোচে বসে পড়ল শিবানী। দু' আঙুলে দু' চোখ টিপে ধরল।

এটা তোমার কথা শোনার ভঙ্গী?

নয়? আচ্ছা! শরীর তুলল শিবানী।

এই? সোজা পিঠ টান করে বসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো ইন্দ্রনাথের দিকে।

একটু হাসল ইন্দ্রনাথ।

শুধু এইটুকু—শুধু মাত্র এইটুকুতেই শিবানীর বুকের উপর দিয়ে একটা রক্তের ঢেউ বয়ে গেল। দু' হাতের ভেতর টেনে আনা যায়

না ইন্দ্রনাথের মুখটা ? যায়। কিন্তু রাখা যাবে না। শরীরটা কোচে ঢেলে দিতে গিয়েও ফের সোজা করল শিবানী। বলল, বলো কী বলবে।

আমি কি বলব, তা তুমি জানো।

জানি ? কই না তো ?

তুমি জান না আমি কি বলব ? বেশ আমিই বলছি। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে কাজ ছেড়ে দেবে—দিয়েছিলে কি না ?

দিয়েছিলাম।

তবে ?

কি তবে ?

কাঁধ শরীর ঝাঁকা দিল ইন্দ্রনাথ।

শিবানী অন্যদিকে চোখ পাতল।

ইন্দ্রনাথ বলল, তবে ছাড়ছো না কেন ? অফিসে যাচ্ছ কেন ? রেজিগ্‌নেশন লেটার পাঠাচ্ছ না কেন ?

পাঠাব।

কবে ?

শিবানী যেন বর্তমান উপন্যাসের মত ভাঙা সংলাপে পাতা বাড়াচ্ছে—অর্থাৎ সময় পার করছে। বলল, দেখি।

এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, আদবেই তোমার চাকরী ছাড়ার ইচ্ছে আছে কি না সেটাই স্পষ্ট করে বল।

আছে।

তবে রেজিগ্‌নেশন লেটার লিখে দাও। আমি ম্যানেজারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আজ নয়। উঠে পড়ল শিবানী।

মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের। উঠে পড়ল সেও। কেন, আজ নয় কেন ?

অসহায় ভাবে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল শিবানী। তারপর বলল, যেদিন আমার সম্মান দেখব তোমার কাছে, সেদিন তোমার সম্মান দেখবে আমার কাছে।

তোমার চাকরী ছাড়ার জন্য দাসখৎ লিখে দিতে হবে নাকি আমাকে ?

শিবানী জানালা দিয়ে দূরের কৃষ্ণচূড়া ফুলে ঢাকা গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল।···ইন্দ্রনাথের মুখ দু' হাতে কাছে টেনে আনা যেত কিন্তু রাখা যেত না···

দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, কাজ ছাড়বে না এ জানি। অফিসের চাকরীতে অনেক রস—এ কী আর আমি জানিনে। ক'জন বন্ধু পেয়েছ শুনি ?

শিবানী পেছন ফিরে পা বাড়ালো।

ভালোবাসতে দেয় না এঁরা।

ইন্দ্রনাথ ঘুরে এসে দাঁড়ালো তার সামনে। মুখ চোখ দিয়ে যেন তার আগুন বেরুতে লাগল—তুমি আমাকে গ্রাহ্য করো না কেন আমি জানতে চাই ?

তুমি আমাকে গ্রাহ্য করো না কেন আমি জানতে চাই ? দু' পা ইন্দ্রনাথের প্রতি এগিয়ে এসে কথাগুলো ঘুরিয়ে বলল শিবানী।

হঠাৎ একটু হকচকিয়েই গেল ইন্দ্রনাথ শিবানীর কণ্ঠস্বরে আর ভঙ্গীতে। বলল, মানে, তোমাকে গ্রাহ্য করি না মানে ?

মানে, আমার অফিসের সময় হয়ে গেছে। ফের কাল আবার এ সময়ে। চলে গেল শিবানী। আশ্চর্য অস্বীকৃতি! নিরুপায় ক্রোধে পায়চারি করতে লাগল ইন্দ্রনাথ হলঘরের এ-মাথা ও-মাথায়। চুরুট ধরালো একটা। যে ভয় পায় না তাকে ভয় পাওয়ানো যায় কী করে ? তাকে সায়েস্তা করা যায় কী করে। সে চায় শিবানী তার মতে চলবে। শিবানীর চাওয়া তাকেও শিবানীর মতে চলতে হবে। শিবানীর পছন্দে চলতে হবে। হুঃ! করে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করলো ইন্দ্রনাথ।

অফিসে যাওয়ার মুখে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে শিবানী দেখে নিচ্ছিল ব্যাগ খুলে, রুমাল, কলম, টাকা পয়সা সব ঠিক মত নিয়েছে কি না. ইন্দ্রনাথ এসে দাঁড়াল সামনে।

এখানেই ইন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। সে চট করে নিজেকে শান্ত করে ফেলতে পারে। পারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই তার কথা চালিয়ে যেতে। সংকোচ বোধ করে না। অপমানও না। স্ত্রীর কাছে আবার মান অপমান, সম্মান অসম্মান কী। তাকে বাধ্য, আজ্ঞাবহ করাটাই হলো কথা। একমুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কখন ফিরবে জানতে পারি ?

পারো। একটু সময় ব্যাগের এটা ওটা নাড়াচাড়া করে, মুখ তুলে শিবানী বলল, তা তুমি কখন ফিরছ ?

আবার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল ইন্দ্রনাথের! আমি যদি রাত তিনটেয় ফিরি ? সকালে ফিরি ? চারদিন পরে ফিরি ?

আমিও রাত তিনটেয় ফিরতে পারি ; কাল ভোরে ফিরতে পারি। চারদিন নাও ফিরতে পারি। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে চলল শিবানী।

শিবানীর জুতোর শব্দ বারান্দা পার হয়ে ল'নে পড়ে। ইন্দ্রনাথের মনে হয় তার ব্রহ্মতালুর ওপর দিয়ে শিবানী জুতোর খট খট শব্দ তুলে হেঁটে চলেছে।

গাড়ীতে বসে এবার গাড়ীর গদিতে মাথা রাখল শিবানী। এতক্ষণে সে ক্লান্তবোধ করছে। ও জানে না শত শততম দিনের এক ঘেয়ে অভিনয়ে অভিনেতারা ক্লান্তিবোধ করে কি না। কিন্তু বাস্তব জীবন এক ঘেয়ে অভিনয়ে ক্লান্ত করে। মারাত্মক রকম ক্লান্ত করে। মরে যেতে ইচ্ছে করার মত ক্লান্ত করে।

[ক্রমশঃ।

উদ্ভিদ্‌-অভিধান

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কালবৃন্তিকা, কালবৃন্তী—পারুলগাছ।

কালশাক—[হি' নরচা শাক] ১ শাক বি', ২ তিক্ত পূতিকা, ৩ কুলত্থ শাক। পর্যায়—নাড়িক, শ্রাদ্ধ শাক, কালক।

কালশানি—ধান্যবি'

কালসিম, কালশিম—canavelia virosa.

কালসার—কালতুলসী।

কালস্কন্ধ—১ তমাল গাছ, ২ তিন্দুক গাছ, ৩ জীবক, জীওল গাছ, ৪ তুষখদির, ৫ যজ্ঞডুমুর।

কালহলদী—হরিদ্রা দ্র'।

কালহীন—লোধগাছ।

কালা—১ নীলগাছ, ২ কালজীরা, ৩ অশ্বগন্ধা ৪ পারুল গাছ, ৫ মঞ্জিষ্ঠা cardanthera triflora.

কালাঞ্জনী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি', কালিকর্ণসিকিনী। পর্যায়—অঞ্জনী, রেচনী, শিলাঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী, কৃষ্ণাঞ্জনী।

কালাদানা—[স' কালদানা, কৃষ্ণবীজ শ্যামবীজ, হি' গুজ' কালাদানা তাঁব জিবিকি বিবৈ, কড়িকক্কতন্ বিবৈ, তে' কোল্লিবিত্তুলু, ফা' তুঘম-ই-নীল, অ' হব্ব-নীল [কলমী আদি বর্গের বর্ষায়ু লতাবি', ipomoea hederacea. নীলকলমী শাক, ফুল নীলবর্ণ, শীতকালে রোপিত হয়, বীজের নাম কালাদানা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

কালাদেবধান—তৃণ ধান্যবি'।

কালানুসারক—তগর।

কালানুসার্য—শিংশপা বৃক্ষ।

কালাবড়ক—বৃক্ষবি', কালিয়াকড়া।

কালাস্থলী—পারুলগাছ।

কালিঙ্গ—১ তরমুজ, ২ ভূমি কর্কারু। পর্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ, ফলবর্তুল।

কালিঙ্গিকা—ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

কালিন্দ, কালিন্দক—কালিঙ্গ, তরমুজ।

কালিয়ক—দারুহরিদ্রা।

কালীকোড়া (দেশজ)—guarea paniculata.

কালীঝাঁপ (দেশজ)—ক্ষুদ্রলতাবি' pteris lumulata.

কালীয়াকড়া (দেশজ)—কেলেকোড়া।

কালীয়া জীরা (দেশজ)—কৃষ্ণজীরা।

কালেয়—কুঙ্কুম (?)।

কাল্ল, কাল্লক—হরিদ্রাবি', কাঁচা হলুদ। পর্যায়—কর্বুর, দ্রাবিড়ক, দ্রাবিড়ভূতিক।

কাল্যক—কাঁচা হলুদ।

কাবের—কুঙ্কুম।

কাবেরী—হরিদ্রা।

কাশ—[স' শারদ, সিতপুষ্পক] কেশো, খাগড়া, তৃণবি' saccharum spontaneum. ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু উন্নত ঘাসবি'। পাতা সরু চেপ্টা, ডাঁটা শ্বেত লোমশ। বিভিন্ন প্রকার—(১) খাগড় (কাশভেদ)—খাগড়া, কাশের চেয়ে মোটা। খাগড়া ভাল কলম হয়। পূর্বে লেখা হত, s. fuscum. (২) শরপত্র—উলুখড় s. cylindricum. গৃহাচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, কাণ্ড খুব সরু ও পত্রবহুল; (৩) হোগলা—দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আচ্ছাদন তৈরী হয়। নদী তীরে জলাজমিতে জন্মে। ইহার কাণ্ড নাই। লম্বা ৫।৬ হাত হয়। পর্যায়—ইক্ষুগন্ধা, পোটগল, কাস, কাশী, কাশা, বায়সেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমরপুষ্পক, কাসক, বনহাসক, ইক্ষ্বারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্পক, নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন, কাণ্ডকাণ্ডক, কচ্ছুলকারক।

কাশক—কাশ দ্র'।

কাশন্দ (দেশজ)—cassia esculenta.

কাশমর্দ—কাসুন্দে।

কাশমর্দন—কালকাসুন্দা।

কাশা—কাশতৃণ।

কাশাল্মলি—কূটশাল্মলি বৃক্ষ।

কাশিমূলা—[স' কূটশাল্মলি, কাশাল্মলি, ও' মই] জিওল, আম্রাদি বর্গের পত্রত্যাগী তরুবি', odina wodier. উচ্চতরু বিশেষ। বসন্তকালে সব পাতা ঝরিয়া যায়। কাঠ সাদা খুব হাল্কা। চৈত্র মাসে ফুল ফোটে। ফুল ছোট, হরিদ্রাবর্ণ। গাছে আঘাত করিলে বহুল পরিমাণে আঠা নির্গত হয়।

কাশুকার—সুপারি।

কাশ্মরী—গাম্ভারী বৃক্ষ, gmelina arborea. ফাল্গুন মাসে ফুল

হয়, কাঠ হাল্কা, রঙ ফিকা। পর্য্যায়—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মিরী, হীরা, কাশ্মর্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা, মহাকুসুমিকা।
কাশ্মিরী—গাম্ভারী।
কাশ্মীর্য—কুঙ্কুম।
কাশ্তা (দেশজ)—কাশতৃণ।
কাষ্ঠকদলী—কাষ্ঠবৎ কঠিনা কদলী। পর্য্যায়—সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা, অশ্মকদলী।
কাষ্ঠজম্বু—ভুঁইজাম বা কাঠজাম।
কাষ্ঠদ্রু—পলাশবৃক্ষ।
কাষ্ঠধাত্রী ফল—আমলকী ফল।
কাষ্ঠপাটলা—শ্বেত পারুল। পর্য্যায়—মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি।
কাষ্ঠ বল্লিকা—কটুকা (?)।
কাষ্ঠ শারিবা—অনন্তমূল।
কাষ্ঠা—দারুহরিদ্রা curcuma xanthorpiga.
কাষ্ঠালুক—আলুবিশেষ।
কাষ্ঠীল—রাজার্ক বৃক্ষ।
কাষ্ঠীলা—কলাগাছ।
কাষ্ঠেক্ষু—ইক্ষুবিশেষ।
কাষ্ঠোডুম্বরিকা—কাকডুমুর।
কাস্কি, কামনি (দেশজ)—লতাবিশেষ।
কাস—সজিনা গাছ।
কাসকন্দ—কামালুনামক কন্দবিং।
কাসঘ্নী—কণ্টকারী।
কাসজিং—ভার্গী, বামুনহাটি।
কাসনাশিনী—কাঁকড়াশৃঙ্গী।
কাসনি—সোমরাজিবর্গের শাক বিশেষ, cichorium endivia, c. intybus. পাঞ্জাবপ্রদেশে জন্মে।
কাসনী—কাসনি।
কাসন্দা—কালকাসন্দা।
কাসমর্দ, কাসমর্দক—বনফুল কাশন্দা, কালকাসুন্দা, cassia sophera, c. occidentalis, senna sophera, ফুল যেখানে সেখানে জন্মায়। ফুল ছোট, পীত।
কাসমর্দন—পটোল।
কাসারি—কালকাসন্দা।
কামালু—কোকন দেশজাত আলু। পর্য্যায়—কামকন্দ, কন্দালু, আলুক, বিশালপত্র, পত্রালু।
কাসুন্দা—কাসমর্দ।
কাহলাপুষ্প—ধুতুরা।
কাহান (দেশজ)—bridelia lanceœfolia.
কাহী—কুটজ গাছ।
কাহুয়া (দেশজ)—অর্জ্জুন গাছ।
কিংশুক—১ পলাশ বৃক্ষ। ২ নন্দী বৃক্ষ।
কিংশুলক—পলাশ বৃক্ষ।
কিকি—নারিকেল।
কিঙ্কিনি—১ অম্লরস যুক্ত বৃক্ষ, ২ জল জাম বৃক্ষবি, ৩ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচি গাছ।
কিঙ্কিরাত—১ অশোক গাছ, ২ রাঙা ঝাঁড়ি বৃক্ষ, ৩ পুষ্পবিশেষ গাছ। পর্য্যায়—হেমগৌর, পীতক, পীত অম্লক, পীতাম্লান ষটপদানন্দ।
কিঙ্কিরি—বঁইচি গাছ।
কিঞ্জ, কিঞ্জল, কিঞ্জল্ক—নাগকেশর পুষ্প, পদ্মফুলের কেশর।
কিনি—আপাঙ্ গাছ।
কিতব—ধুতুরা গাছ।
কিস্তন (দেশজ)—lauras obtresifolia.
কিরাত, কিরাতক, কিরাততিক্ত কিরাততিক্তক—চিরতা; পর্য্যায়—ভূনিম্ব, অনার্যতিক্ত, কিরাত, চিরতিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তাক, কটুতিক্ত, রামসেনক।
কিরিটি—হিন্তাল ফল।
কির্মি—পলাশ গাছ।
কির্মির—নাগরঙ্গ, নারঙ্গালেবুর গাছ।
কির্মিরত্বক—নারঙ্গাগাছ।
কিলাটী—বাঁশগাছ।
কিলাসঘ্ন—কাঁকরোল।
কিলিম—দেবদারু।
কিষ্ক পর্বা—১ ইক্ষু, ২ বাঁশ, ৩ নলখাগড়া।
কিসমিস—পাকা বীজশূন্য শুখান আঙুর। বড় বীজ হলে মনুক্কা বলে। ছোট বীজ কিসমিস।
কীটপাদিক—হংসপদী গাছ।
কীটভুক উদ্ভিদ—১ বিহারের মাঠে ও পাহাড়ের ঢালু জায়গায় হয়। পাতা ছোট গোল, লাল। পাতার চারিধারে কেশর-যুক্ত পত্রাণু আছে। এই পাতার অগ্রভাগে চিড়িতনের ন্যায় একটি গুটি দেওয়া মত আছে। মূল পত্র ঠোঙ্গার মত, তাহাতে তরল পদার্থ থাকে, আঠার মত চটচটে। পত্রাদি স্পর্শ মাত্র সঙ্কুচিত হয়, drosera burmanni. ২ বাংলা দেশে পুকুরে হয়। ঝাঁঝির পাতাগুলি সূক্ষ্ম নলাকার পত্রাণু মাত্র। পত্রাণুর মুখে একটি ঢাকনি থাকে। উহার ভিতরে আঠাবৎ রস থাকে। ৩ আমেরিকায় জন্মে, venus' fly trap, ৪ তামাক গাছের কচি পাতা ও ডাঁটা হইতে যে চটচটে রস বাহির হয় তাহাতে কীট পতঙ্গ আটকাইয়া যায়। কীট-ভুক নহে। ৫ লাল ভেরাণ্ডার গাত্রে কীটাদি বসিলেই গাত্রবর্ণ কাল হইয়া যায় ও কেশরবৎ পত্রাণুগুলি হইতে রসনির্গত হইয়া তাহাকে গলাইয়া ফেলে ও বৃক্ষ শরীর উহা শুষিয়া লয়। ৬ আর একপ্রকার বৃক্ষ আছে। তাহার পত্রের অগ্রভাগ হইতে একটি পেঁচাল শীষের ডগায় একটি ভাণ্ডাকার পত্র হয়। ঐ ভাণ্ডের মধ্যে রস থাকে ও তাহার মুখে ঢাকনি থাকে। কীটভাণ্ডে পড়িবামাত্র ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায়।

[ক্রমশঃ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অজিতকৃষ্ণ বসু

'আজই কি আপনার শেষ আগমন, না আরো দু'চারদিন পায়ের ধুলো দেবেন?' শুধালেন নিমাই মিত্তির।

'যদি আপনার অনুমতির সৌভাগ্য মেলে তা'হলে আরো অনেকবার আসতে পেলে ধন্য হবো।' বললাম আমি।

'তা বেশ, অনুমতি দিলাম। শুধু অনুমতি নয়। আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।'

সত্যিই ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তিরের কণ্ঠে আন্তরিক আমন্ত্রণের সুর।

'যে কোনো সন্ধ্যায় চলে আসবেন, ধনপতিবাবু।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'দ্বিধা করবেন না কোনো। আগে ফোনে এনগেজ করবারও কোনো দরকার নেই। সুলতান মিয়ার মুখে আপনার কথা শোনা অবধি আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অত্যন্ত বেশীরকম আগ্রহ হয়েছিল। পরিচিত হয়ে বড় খুশী হলাম। তাই ষ্ট্যাণ্ডিং ইনভিটেশন রইল' চিরস্থায়ী নিমন্ত্রণ। অনেক কিছু দেখাবো, অনেক কাহিনী শোনাবো। আরো অনেকবার আসবেন, অভয় দিলেন যখন, তখন আর তাড়াহুড়োর দরকার কি, একটু বিলম্বিত লয়েই শুরু করা যাক। আমাদের এই মিত্তির বংশের এ্যাটর্নীগিরি কয়েক পুরুষের পুরানো—কোম্পানির আমল থেকে চলে আসছে। সুতরাং এ্যাটর্নীগিরি মিশে আছে আমাদের রক্তের কণায় কণায়, অস্থিমজ্জায়।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'তা হলে ছেড়ে দিলেন যে?'

নিমাই মিত্তির বললেন 'ছেড়ে দিলাম কোথায়? আমার ছেলে কানাই করছে যে। এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তিরকে যেমন লোকে একডাকে চিনত, তেমনি আজকাল একডাকে চেনে এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরকে।'

অর্থাৎ পুত্রের এ্যাটর্নীগিরি করাতেই তাঁর এ্যাটর্নীগিরি করা হচ্ছে।

'এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির বেঁচে আছে এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের ভেতর।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'নিমাই মিত্তিরও একদিন চলে যাবে—যমের হাত থেকে দুনিয়ার কোনো ব্যাটার রেহাই নেই মশায়—নিমাই মিত্তির চলে গিয়েও বেঁচে থাকবে কানাই মিত্তিরের ভেতর; এই জন্যই লোকে পুত্র কামনা করে জানবেন, শুধু পুৎ নামক নরক থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে নয়।'

নীরবে মাথা নাড়লাম আমি।

'কিন্তু কানাই চলে গেলেও যার ভেতর বেঁচে থাকবে, সে আজও এসে পৌঁছল না, ধনপতিবাবু।' বললেন নিমাই মিত্তির। তামাকের ধোঁয়ায় দীর্ঘশ্বাস গোপন করবার চেষ্টা করলেন বলে আমার সন্দেহ হল। মনে হলো বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ মিত্তির বাড়ির এইটেই বোধ হয় এখন পারিবারিক ট্র্যাজেডি। মিত্তির বংশের এত পুরুষের এ্যাটর্নীগিরির ধারা কানাই মিত্তিরের পরে যে অক্ষুণ্ণ রাখবে, তাকে এসে পৌঁছতে দেখলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির, কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার সেই সৌভাগ্য তাঁর এখনো হয় নি। তাই উদ্বেগ, তাই দীর্ঘশ্বাস।

আমি বললাম, 'কেন?'

আমার এ প্রশ্ন বিশেষ কিছু ভেবে করি নি, করেছিলাম শুধু যাহোক একটা কিছু বলতে হবে বলে। কিন্তু প্রশ্নটা গুরুভাবেই নিয়ে নিমাই মিত্তির বললেন, 'কেন? এ প্রশ্নের কোনো একমাত্র নির্ভুল জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবু একটি জবাব বলি। কানাই অতি আধুনিক আণবিক যুগের মানুষ হলে হবে কি, সেকালের'

সুসন্তানের মতো পিতৃ-ভক্ত প্রাণ, যে কালের চালু বুলি ছিল; পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমং তপ।'

'কিন্তু তাতে কি হলো?' প্রশ্ন করলাম আমি।

নিমাই মিত্তির বললেন, 'একদিন কানাইকে আর বৌমাকে বলেছিলাম এ্যাটর্নীগিরি থেকে তো বানপ্রস্থ নিলাম, এবারে নাতির মুখ দেখলে নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে বিদায় নিতে পারি। জানিনে, হয় তো ওকথা বলেই সর্বনাশটি করে বসে আছি।'

'কি করে?'

'বলেছি না, কানাই পিতৃ-ভক্ত প্রাণ?'

'বলেছেন।'

'আমার কথা শুনে কানাই-এর মনে হয় তো এই বিশ্বাসটাই বাসা বেঁধেছে যে, নাতির মুখ দেখবার সাধটা মিটে গেলেই আমার আর ধরায় কোনো আকর্ষণ থাকবে না, আমি অবিলম্বে ওপারে রওনা হয়ে যাবো। সে ভাবছে যতদিন নাতি না আসবে, ততদিন নাতির আসার আশায় আশায় আমি যেমন করে হোক বেঁচে থাকব। কানাই চায় যেমন করে হোক তার বাপকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে।'

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। বাপকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্তেই বাপ হচ্ছেন না এ্যাটর্নী কানাই মিত্তির। কিন্তু সত্যি কি তাই? মনে প্রশ্ন জাগল, মুখে উচ্চারণ করলাম সেই প্রশ্ন।

হঠাৎ উচ্চারণ করে ফেললাম প্রশ্নটা; করে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। ভয় হল প্রশ্ন শুনে আমার মনের সন্দেহ টের পেয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন নিমাই মিত্তির।

কিন্তু না, মনঃক্ষুণ্ণ হলেন না তিনি। অক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'সত্যিই যে তাই, এ গ্যারান্টি তো দিতে পারব না ধনপতিবাবু। সে ইঙ্গিত তো আগেই দিয়েছি, আর সেই জন্তেই তো শুরু করেছি 'হয় তো' দিয়ে।' বলে কিছুক্ষণ উপভোগ করে নিলেন অম্বুরী ধোঁয়ার মাধুর্য। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি যে সম্ভাবনার কথা বললাম, তা ছাড়া আরেকটা সম্ভাবনাও আছে। হয় তো চেষ্টার ত্রুটি করছে না কানাই, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে বার বার। মানুষের সব চেষ্টা তো সফল হয় না ধনপতিবাবু, পূর্ণ হয় না সব কামনা।'

এতে যেন দুঃখ নেই নিমাই মিত্তিরের, তাই দীর্ঘশ্বাস বেরুলো না তাঁর বুকের ভেতর থেকে। যেন বিশ্ব-বিধানের এই অকরুণ সত্যটিকে তিনি মেনে নিয়েছেন দার্শনিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে।

কিন্তু এখানেই থেমে গেলেন না তিনি। বললেন, 'অথবা জানিনে এর পিছনে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ভূত কাজ করছে কি না। লোক-ভারাক্রান্ত পৃথিবী, তার ভার আর বেশী বাড়িও না; নতুন খাদক আর বেশী আমদানী কোরো না, বাড়িও না দেশের খাদ্যাভাব —এই ধুয়া উঠেছে আজকাল। আমাদের যখন যৌবন ছিল, তখন এসব হুজুগ শুনি নি ধনপতিবাবু। ম্যালথাসের তত্ত্বকথা তখন অর্থনীতির পুঁথিতে পড়েছি, আর পরীক্ষার খাতায় লিখেছি,—ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু আজকাল দেখছি, সরকারী-বেসরকারী নানা রকমের প্রোপাগাণ্ডা চলছে পরিবার পরিকল্পনার, জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের। কিন্তু এর ফল কি হচ্ছে ভেবে দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'কি হচ্ছে?'

'সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

'যারা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে দুনিয়ায় নতুন মানুষের আমদানী কমালে বা বন্ধ করে দিলে দুনিয়ার কল্যাণ হতো, তারা হিড় হিড় করে নতুন ভিড় বাড়াচ্ছে পঙ্গপালের মতো, আর যারা তাদের পরিবারে নতুন মানুষ আমদানী বাড়ালে দুনিয়ার সম্পদ বাড়ত, তারাই করছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং। ফলে দুনিয়ার লোক-সম্পদের অনুপাতে লোক-আপদ বেড়ে চলেছে হু-হু করে। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। তাই তো ভবিষ্যৎ নিয়ে এই বুড়ো বয়সে আর মাথা ঘামাই নে। দুনিয়া যদি হু-হু করে গড়িয়ে গড়িয়ে জাহান্নামের দিকে নেমে যায়, তাকে ঠেকাবার সাধ্য কোথায় আমার? অনর্থক ভেবে ভেবে মন খারাপ করে লাভ কি?'

কিন্তু মন যখন খারাপ হয় তখন লাভ-লোকসানের হিসেব করে না সে। মনে হলো এবার অন্তত মন একটু খারাপ হয়েছে নিমাই মিত্তিরের, আবার চেষ্টা করছেন অম্বুরী তামাকের ধোঁয়ায় মনটাকে চাঙ্গা করে তুলতে।

বৃদ্ধ হ'তে যার তখনো অনেক বছর বাকি, সেই আমার মন এই বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠল। জীবনের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এসে তিনি ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন তাঁদের বংশানুক্রমিক এ্যাটর্নীগিরির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না।

কিন্তু তাঁর পারিবারিক হাসি-কান্নার কাহিনী শুনতে আসিনি আমি, আমাকে তাঁর কাছে টেনে এনেছে ভূতপূর্ব বাতাসী-মঞ্জিলের স্বত্বাধিকারিণী বাতাসী বিবি সম্পর্কে কৌতূহল। তাই তাঁর অবান্তর ভাষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। এখন মনে হলো শুধু আমার খাতিরে নয়, বৃদ্ধের খাতিরেও আলোচনার মোড় ফেরানো দরকার। তাঁর গড়গড়ার গোড়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এতক্ষণ বলব বলব ভাবছিলাম, বলিনি। এবারে বলি, বাতাসী বিবি গড়গড়া টানতেন এ কথা ভাবতেও অদ্ভুত লাগে।'

'লাগা উচিত নয়।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'কেন, আপনি মেম-সায়েবদের সিগারেট টানতে দেখেন নি?'

'দেখেছি। কিন্তু স্ত্রীজাতির সঙ্গে ধূমপানের অন্তরঙ্গতায় অভ্যস্ত হতে পারিনি।'

'সে দোষ আপনার, ধনপতিবাবু। স্ত্রীজাতিরও নয়, ধূমপানেরও নয়'। বললেন নিমাই মিত্তির। 'আমাদের বা আমাদের কোনো আত্মীয় পরিবারের মেয়েমহলে ধূমপানের চল থাকা তো দূরের কথা, কল্পনাতেও উঁকি দেয় নি। কিন্তু তবু—আপনাকে তো আগেই বলেছি ধনপতিবাবু—বাবা বাতাসী বিবিকে গড়গড়ায় ধূমপান করতে দেখে ধাক্কা খান নি, মুগ্ধই হয়েছিলেন। সেই মুগ্ধতার স্মৃতি শেষ বয়সেও বাবার মন থেকে মুছে যেতে পারে নি। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও এইখানে বসে এই গড়গড়ায় অম্বুরী তামাকের ধূমপান করতে করতে স্বপ্নভরা চোখে গদগদ কণ্ঠে বলেছেন, বাতাসী বিবির আশ্চর্য অম্বুরী সৌখীনতার কথা। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেছে বাবার।'

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতি-পালিত বলেই এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই হাসি খুশী। কারণ অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক খাঁটি দুধ থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড় মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে।
মায়ের দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্য্যার সবরকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায় 'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭ কোলকাতা—১
OS. 9-X51-C. BG

একথা বলতে বলতে নিমাই মিত্তিরের চোখেও জল এসে গেল। কোঁচার ডগা দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললেন তিনি, পিতৃদেবের পুণ্য-স্মৃতি স্মরণ করে।

বললাম, 'বাতাসী বিবি সম্পর্কে আরো অনেক কথা, অনেক কাহিনীও নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনার বাবার মুখে?'

'অনেক নয়, কিছু কিছু।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'বাবা বেশী কথা কইতেন না, বোধ হয় কথার বাজে খরচ হবে বলে! গুরুগাম্ভীর্য বজায় রাখার দিকেও বাবার ঝোঁক ছিল বরাবর। লোকে বলত বাঘা এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির। শুধু যে অদ্বিতীয় আর স্বনামধন্য এ্যাটর্নীই ছিলেন তাই নয়, বাবা তখন শহরের একজন সেরা সৌখীন কুস্তিগীর—হপ্তায় তিন চারদিন ভোরে কুস্তি লড়তেন ছানুবাবুর কুস্তির আখড়ায়।'

'ছানুবাবু কে?'

'ছানুবাবু ছিলেন তখনকার সেরা তক্তার কারবারী, টিম্বার মার্চেণ্ট। আন্দামান থেকে, আরো অন্যান্য জায়গা থেকে টিম্বার আমদানী করতেন জাহাজ বোঝাই করে করে, আর টাকা কামাতেন প্রচুর। কুস্তির নেশা ছিল তাঁর পৈতৃক আমল থেকে। পয়সা খরচ করে বাড়ির মস্ত উঠোনে তৈরী করেছিলেন চমৎকার কুস্তির আখড়া, তাতে পেশাদার আর সৌখীন পালোয়ানরা আসতো কুস্তি লড়তে। ছানুবাবু নিজেও লড়তেন চমৎকার, শুনেছি বাবার মুখে। কুস্তিজগতে ছানুবাবুর ডাকনাম হয়েছিল কাঠ-পালোয়ান, আর বাবার ডাকনাম হয়েছিল পালোয়ান-এ্যাটর্নী। বাবা বোধ করি এ্যাটর্নী হয়েও তত খুশী হতে পারেননি, যত হয়েছিলেন 'পালোয়ান এ্যাটর্নী' হয়ে।'

'খুবই স্বাভাবিক।' বললাম আমি মাথা নেড়ে। 'আমি নিজে কখনো কুস্তি লড়িনি, কুস্তি লড়বার জন্তে যে দৈহিক এবং মানসিক মালমশলা দরকার, তা আমার নেই, কিন্তু কুস্তির এবং কুস্তিগীরদের ওপর আমার রোমাণ্টিক শ্রদ্ধা অসাধারণ। হয়তো এর মূল কারণ এই যে, আমার ভেতর যে শক্তির একান্ত অভাব, অন্তের ভেতর সেই শক্তির লীলা দেখতে পেলে কল্পনায় তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে আমি আনন্দ পাই। গোবর-গামা-ইমামবক্স প্রমুখ ভারতের সেরা মল্লবীরদের খাঁটি কুস্তি দেখবার সৌভাগ্য হয়নি; ভেজাল, মেকি কুস্তি দেখেছি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরের ময়দানে, আখড়ার কোপানো মাটির ওপর নয়, বক্সিং রিংএর মতো দড়ি দিয়ে ঘেরা মঞ্চের ওপর। ঐ মঞ্চের ওপর অনেক সন্ধ্যায় চারদিক থেকে একসঙ্গে নেমে আসা ফোকাস আলোর তলায় কুস্তি লড়তে দেখেছি দারা সিং, কিং কং, টাইগার যোগিন্দার, হরবনস সিং, জোরোপেংকো, আলি রিজা বে, লিলি সামারা, জিবিস্কো প্রমুখ দেশী বিদেশী নানা পেশাদার কুস্তিগীরকে, আন্তর্জাতিক 'ফ্রী ষ্টাইল' নীতিতে।

সেই কুস্তিমঞ্চের চারদিকে অগুণতি মানুষের মাথা—স্ত্রীলোক এবং ছোট ছেলেমেয়েরেও অভাব নেই। সিনেমা থিয়েটারের বন্ধ ঘরের দম আটকানো আবহাওয়ার চাইতে মুক্ত-অঙ্গনে মুক্ত বায়ু সেবন করতে করতে মুক্ত আকাশের তলায় বসে বাহুবলের লড়াই দেখার আমোদই এঁরা বেশী পছন্দ করেছেন। আড়াই ঘণ্টা সিনেমা বা থিয়েটারের বদলে আড়াই ঘণ্টা কুস্তি, জীবন্ত-মানুষ দৈত্যের লড়াই, শিহরণের পর শিহরণ। এ উত্তেজনার এক বিশেষ মজা আছে, যা মেলে না সিনেমা থিয়েটারে। মাঝে মাঝে উত্তেজনা চরমে উঠে যেতো, চোখ রগড়ে ভাবতে হতো চোখে যা দেখছি বলে মনে হচ্ছে তা সত্যিই দেখছি কিনা, কারণ ব্যাপারটা বিশ্বাস করা শক্ত। যেমন কিং কং-এর মতো বিরাটকায় পালোয়ানকে—যাকে 'মানুষ পাহাড়' বলেন অনেকে—দুহাতে কাঁধের ওপর তুলে চর্কির মতো ঘোরাচ্ছেন পালোয়ান দারা সিং, যিনি আকারে ঐ মানুষ-পাহাড়ের তুলনায় অনেকটা ছোট, ওজনেও অনেকটা কম।

আমার ভাবনার আওয়াজ যেন মনে মনে শুনতে পেলেন নিমাই মিত্তির? প্রশ্ন করলেন, 'কি ভাবছেন, ধনপতিবাবু?'

আচমকা প্রশ্নের চমক লেগে স্বপ্নভঙ্গ হলো। বললাম, 'ভাবছি ফোর্ট উইলিয়ামের মাঠে ফ্রী-ষ্টাইল কুস্তির কথা। দেখেছেন নাকি আপনি?'

নিমাই মিত্তির বললেন, 'দেখেছি বই কি। ছেলেভুলানো সস্তা চটকদার তামাসা মশায়। ওকে বলে মুরী কুস্তি, সব সাজানো, রিহার্শাল দেওয়া ব্যাপার, যাকে বলা যায় আপোসে লড়াই। ওতো আসল কুস্তি নয়। বোগাস।'

আমি বললাম, 'বলেন কি? বোগাস? কিন্তু মাঝে মাঝে যে রীতিমতো খুনোখুনী কাণ্ড হবার উপক্রম হতে দেখেছি, তাতে দু'চারজন পালোয়ান বেশ চোটও খেয়েছেন। সে লড়াই সাজানো বা মেকি বলে তো মনে হয়নি!'

আমার একথায় হেসে উঠলেন নিমাই মিত্তির। বললেন, 'ষ্টেজে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান দেখে শিউরে ওঠেন নি কখনো? মেকি বলে তখন মনে হয়েছে কি? থিয়েটারের ষ্টেজে সীতাহরণ দেখে বিদ্যেসাগর মশায় ষ্টেজের রাবণকে [illegible] ছুঁড়ে মেরেছিলেন, সে গল্প শোনেন নি? শিশির ভাদুড়ীর নাট্য মন্দিরে সীতা নাটক দেখে কেঁদে ভাসাননি? তখন কি মনে হয়েছে, যে রামকে দেখছেন তিনি আসলে মেক-আপ করা শিশির ভাদুড়ী। আর সীতাটিও খাঁটি জনকনন্দিনী নন, মুখে রং আর পাউডার মেখে এসেছেন শ্রীমতী প্রভা? ফোর্ট উইলিয়ামে বা ইডেন গার্ডেনের ষ্টেডিয়ামে যাদের কুস্তি দেখেছেন তারা শুধু কুস্তিই শেখেনি, অভিনয়ও শিখেছে। নাই বা শিখবে কেন? না শিখে করবেই বা কি? ঐ তো ওদের জীবিকা অর্জনের পন্থা। এ যুগে তো আর রাজা, মহারাজা, নবাব, জমীদার নেই যে পালোয়ানীর পৃষ্ঠপোষক হয়ে পালোয়ান পুষবে। এখন এদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে জনগণ, অর্থাৎ কিনা পাবলিক। এই পাবলিক দেবতাকে এরা খুশী করে মুরী কুস্তি দেখিয়ে। মনে আছে, টেনিসন বলেছিলেন 'ওল্ড অর্ডার চেঞ্জেথ, ঈলডিং প্লেস টু নিউ (**old order changeth, yielding place to new**)? যুগে যুগে হাওয়া বদলায়। পুরোনো হাওয়া বিদায় নিয়ে আসে নতুন হাওয়া। এখন খাঁটির দিন ফুরিয়ে গেছে, ধনপতিবাবু, বইছে মেকির হাওয়া। কি করবেন আপনি? কি করব আমি? এই হলো যুগধর্ম।'

বলে আবার গড়গড়ার নলে মুখ লাগালেন, নিমাই মিত্তির। মনে হলো পরিবর্তনের এই যে অমোঘ নিয়ম, এ সম্বন্ধে ইংরেজ কবি টেনিসন যাই বলে থাকুন না কেন, নিয়মটাকে খুশী মনে মেনে নিতে পারছেন না তিনি, তাঁর চিত্ত হাহাকার করছে সেই হারিয়ে যাওয়া বিগত যুগের জন্ত, যে কালে খাঁটির আদর ছিল, মর্যাদা ছিল, সাধনা ছিল।

'কুস্তিগীর দু'টোর নাম ভুলে গেছি, ধনপতিবাবু, বোধ করি ঝিমোশেংকো আর স্থামসন।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'ঐ ফোর্ট উইলিয়মেরই এক সন্ধ্যেবেলার কুস্তির কথা বলছি। দুই অসুর বসেছিল পাশাপাশি দুই চেয়ারে, কুস্তি মঞ্চের বাইরে। হঠাৎ কথায় কথায় তর্কাতর্কি হয়ে দু'জনের মেজাজ আগুন। ঝিমোশেংকো করলে কি, লিমনেডের বোতল একটা তুলে নিয়ে ধাঁ করে মেরে দিল স্থামসনের মাথায়—বোতল ভেঙে চুরমার। স্থামসন তখন একটা চেয়ার তুলে নিয়ে মারল ঝিমোশেংকোর পিঠে; চেয়ারের পায়া গেল ভেঙে। মারমুখো দুই ক্ষ্যাপা অসুরের সে যে কি ভীষণ রুদ্রমূর্তি, তা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। আপনি যদি না দেখে থাকেন—'

আমি বললাম, 'দেখেছিলাম।' সত্যিই দেখেছিলাম। কারণ—কি আশ্চর্য যোগাযোগ!—সে সন্ধ্যায় কুস্তি দেখতে আমিও গিয়েছিলাম ফোর্ট উইলিয়ামের অভ্যন্তরে। বিবদমান দুই কুস্তিগীরের নাম অবশ্য একটু গুলিয়ে ফেললেন নিমাই মিত্তির, কিন্তু নামেতে কি আসে যায়? ভেবে বৃদ্ধকে শোধরাবার চেষ্টা করলাম না।

বললাম, 'দেখেছিলাম। ওদের ভীষণ মারামারি দেখে সারা দর্শক মহলে আতঙ্ক জেগেছিল, সবাই আশংকা করেছিলাম যে সন্ধ্যায় একটা বীভৎস খুনোখুনী কাণ্ড হবে। শেষটায় মিলিটারী পুলিশ রাইফেল ছুটিয়ে এসে সেই দুই রাক্ষুসে পালোয়ানকে আলাদা করে। মিলিটারী না থাকলে সেদিন ভীষণ কাণ্ড হয়ে যেতো।'

আবার হাসলেন নিমাই মিত্তির। বললেন, 'আপনি বয়সে যেমন, বুদ্ধিতেও তেমনি ছেলেমানুষ আছেন দেখছি। মেকি কুস্তির মতো ঐ ভীষণ ঝগড়াও মেকি, সাজানো, রিহার্শাল দেওয়া।'

'আশ্চর্য! এত খবর রাখেন আপনি?'

'এ্যাটর্নীদের অনেক খবরই রাখতে হয়, ধনপতিবাবু।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'আপনার মতন সে রাত্তে আরো অনেকেই হাঁফ ছেড়ে ভেবেছিলেন ভাগ্যিস বন্দুকধারী মিলিটারি এসে ঐ দুই মহা অসুরের লড়াই থামিয়ে দিয়েছিল, নইলে উপায় হতো কি? মিলিটারী পাহারায় শুম্ভ নিশুম্ভকে আলাদা করে দুদিকে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর কুস্তিমঞ্চ থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হল আগামী মঙ্গলবার রাতে এই কুস্তিমঞ্চে কুস্তি প্রোগ্রামের সেরা আকর্ষণ হবে সে রাতের শেষ লড়াই: স্থামসন বনাম ঝিমোশেংকো। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা, আনন্দের প্রচণ্ড হাততালি। দু'টি অসুরে পরস্পরের প্রতি ভীষণ রকম ক্ষেপে আছে, সুতরাং দুইজনেই মরিয়া বেপরোয়া হয়ে লড়বে, লড়াই হবে দুর্দান্ত, চমৎকার উসুল হবে টিকেটের পয়সা। হুজুগ আর উত্তেজনা উঠল চরমে। কুস্তি-প্রদর্শনীর নূতনত্ব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে কুস্তি-দর্শকদের আগ্রহ আসছিল ঝিমিয়ে, তাই কমতে শুরু করেছিল টিকিট বিক্রি। কুস্তি প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ভাবছিলেন টিকিট বিক্রি বাড়াবার একটা মোক্ষম কায়দা অবলম্বন করা দরকার। তাই রাক্ষুসে ঝিমোশেংকো আর মহা দৈত্য স্থামসনের খুনোখুনী অভিনয়ের ব্যবস্থা। পরের মঙ্গলবারের টিকিট ঝপাঝপ আগাম বিক্রি হয়ে গেল, অনেক টিকেট চলে গেল কালোবাজারে। এ যুগটা যেমন মেকির যুগ, তেমনি হুজুগের যুগ ধনপতিবাবু।'

'আপনি কি সেই আগামী মঙ্গলবার গিয়েছিলেন ঝিমোশেংকো আর স্থামসনের সেই চ্যালেঞ্জ কুস্তি দেখতে?' শুধালাম আমি।

নিমাই মিত্তির বললেন, 'গিয়েছিলাম।'

'মেকি জেনেও?'

'হ্যাঁ, তামাসা দেখতে। অভিনয় দেখতে। থিয়েটার দেখতে যাওয়ার মতো।'

'কি রকম দেখলেন ঝিমোশেংকো আর স্থামসনের কুস্তি সেই মঙ্গলবারের রাতে?' জিজ্ঞাসা করলাম নিমাই মিত্তিরকে। সে রাতের সেই কুস্তি দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি আমার, খবরের কাগজে

ছোট্ট এক প্যারাগ্রাফ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র, তাই প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে জীবন্ত বিবরণ শুনবার অদম্য কৌতূহল জাগল মনে। বিশেষ করে প্রত্যক্ষদর্শী যখন ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির।

চমৎকার।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'অতি আশ্চর্য অভিনয় করলে সেই দুই বাঘা পালোয়ান—যেমন ঝিমোশেংকো, তেমনি স্যাম্‌সন। চমৎকার দু'টি শরীর, যেমন আকারে তেমনি প্রকারে। যেমন বিরাট, তেমনি সুঠাম, তেমনি আঁটসাঁট। রবারের তৈরি যেন, মঞ্চের মেঝের ওপর আছাড় খেতে না খেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে রবারের বলের মতো। অথচ হিংস্র আক্রোশে ফেটে পড়ছে, এই ভাব দু'জনের। যেন প্রাচীন রোমের অ্যাম্ফি থিয়েটারে দু'জন গ্ল্যাডিয়েটার, একজন আরেক জনকে সাবাড় না করা পর্যন্ত যেন থামবে না এ লড়াই। কীল, চড়, আছাড়, লাথি হানছে একে অন্যকে, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে রেফারীর জীবনও বিপন্ন। উত্তেজনার পর উত্তেজনা। দর্শকারণ্য মহা খুশী, উসুল হয়েছে টিকিটের পয়সা। লিমনেড, আইসক্রীম, চকোলেট, পোটাটো চিপস, ডালমুট, চা, কফি প্রচুর বিক্রি হয়েছিলো সে রাতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দু'জনকে ড্র করানো হলো; দু'জনেই মানী পালোয়ান, হারতে বা হারাতে রাজী হয় নি তাদের কেউ। যত রাত কুস্তি প্রদর্শনী হয়েছিল, প্রত্যেক রাতে গেছি। আর সেই নুরী কুস্তি দেখতে দেখতে ভেবেছি আসল, খাঁটি, নির্ভেজাল কুস্তির কথা, ভেবেছি বাবার কথা। আমি কেল্লায় কুস্তি প্রদর্শনী দেখতে যেতাম প্রধানত বাবার জন্য ধনপতিবাবু। কুস্তির সঙ্গে বাবার পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত।'

প্রশ্ন করলাম, 'আপনার বাবার মতো আপনিও কি···?'

'না ধনপতিবাবু, আমি বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কুস্তি শিখি নি। কুস্তি লড়ি নি, ও আমার ধাতে সয় নি বলেই আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি বাপকা বেটা হওয়া। বাবা মাটি ভালবাসতেন; ভালবাসতেন মাটির পরশ গায়ে নিতে, গায়ে মাখতে। তাই ভালবাসতেন আখড়ার মাটিতে কুস্তি লড়তে। কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকেই একটু সৌখীন, গায়ে মাটি মাখা আমার পছন্দ হয় নি। বাবাও জোর করেন নি। বাবা বাঘা এ্যাটর্নী ছিলেন বটে, তাতো আপনাকে বলেইছি, অন্যায় আর বেআক্কিলপনা সইতে পারতেন না, কিন্তু জুলুম করতেন না, জবরদস্তি করতেন না, ক্ষমতার সুযোগে জোর খাটাতেন না কারও ওপর। তিনি বললেন না, কুস্তি আমাকে করতেই হবে। শুধু বললেন—'

বলে আবার গড়গড়ার নলে মুখ লাগালেন মুখের কথাটা অসমাপ্ত রেখে। বুঝলাম এ তাঁর একটা চালাকি, আমার কৌতূহল বাড়াবার ফন্দি।

বললাম, 'কি বললেন আপনার বাবা?'

নিমাই মিত্তিরের বাবা এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির বললেন, 'কুস্তি পছন্দ নয়, কুস্তি না হয় নাই করলে নিমাই, কিন্তু শরীরটাকে তো মজবুত বানাতে হবে, বাড়াতে হবে গায়ের জোর, বুকের পাটা। মনের সাহস নইলে বাড়বে কি করে?'

নিমাই মিত্তিরের জন্যে এলো লোহার তৈরি বারবেল, এলো নানারকমের ওজন, এলো নানা শক্তির স্প্রিং ডাম্বেল। এলো নানা শক্তির টানবার স্প্রিং, শক্ত সিমেন্টের মেঝেওয়ালা ব্যায়াম-ঘর হলো, দেয়ালের গায়ে লাগানো হলো বড় আয়না। অর্থাৎ চমৎকার একটি জিমনাশিয়াম তৈরি হল, নিমাই মিত্তিরের জন্য নিযুক্ত হল একজন অভিজ্ঞ ব্যায়ামশিক্ষক। গায়ে মাটি না লাগিয়ে, পরিচ্ছন্নতা যথাসম্ভব বজায় রেখে চলতে লাগল বালক নিমাইয়ের শক্তি সাধনা।

আমাকে একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখে বৃদ্ধ নিমাই মিত্তির বললেন, 'আপনি হয় তো ভাবছেন বাতাসী বিবির কাহিনীতে এ সব কথা কেন? কিন্তু এ সব কথা অবান্তর নয়, ধনপতিবাবু। একটু ধৈর্য ধরে শুনে যান। আমি দেহের দিক দিয়ে একটু এঁচড়ে পেকে গিয়েছিলাম. খুব কম বয়সে খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিলাম লম্বায়-চওড়ায়, ওজনে, বাহুবলে। তাই বোধ হয় বাবা সেই বাচ্চা বয়সেই আমাকে নামাতে চেয়েছিলেন কুস্তির আখড়ার মাটিতে। বিনা ব্যায়ামেই আমি ছিলাম ভীষণ জোয়ান, গায়ের জোরে আমার সমান বয়সী তো দূরে থাক, আমার চাইতে বয়সে অনেক বড় ছেলেরাও আমার কাছে হার মেনে যেতো। কিন্তু বাবা খুশী নন যে, এই জন্মগত শক্তি নিয়েই আমি খুশী থাকব। বললেন, 'যা তুমি এমনিতেই পেয়েছ নিমাই, তাতে তো তোমার নিজের কোনো বাহাদুরি নেই। সাধনা করে তুমি যা অর্জন করবে, তাতেই শুধু তোমার বাহাদুরি।' সেই বাহাদুরি অর্জনের জন্যই শক্তি সাধনায় একাগ্র হলাম আমি। এ যেন বাবার স্নেহ মাখানো চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জ আমি মাথা পেতে নিলাম। কুস্তির মাটি গায়ে না মেখেও কত বিরাট বাহাদুর হতে পারি, সেইটে দেখিয়ে খুশী করব বাবাকে, এই হলো আমার ধ্যান, আমার সাধনা। বাবাকে আমি বড় ভালবাসতাম ধনপতিবাবু। বড় পিতৃভক্ত ছিলাম আমি, আমার পুত্র এ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের মতো। এই পিতৃভক্তি আমাদের এ্যাটর্নীগিরির মতোই বংশানুক্রমে চলে আসছে সেই কোম্পানীর আমল থেকে।'

বাতাসী বিবির উপহার দেওয়া পৈতৃক গড়গড়ার নল থেকে আরেক মুখ ধোঁয়া টেনে নিলেন নিমাই মিত্তির। সেই ধোঁয়া ধীরে, অতি ধীরে ছাড়তে লাগলেন মৃদু হাওয়ায়। সবটা ছাড়া হয়ে গেলে শুধালেন, 'এইবারে বাতাসী বিবির কথা বলব? সেই সঙ্গে কিছুটা বাবার কথা, তখনকার সেরা এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরের কথা?'

মনটা খুশিতে নেচে উঠল। বললাম, 'বলুন।'

'বাবার জীবনে বাতাসী বিবির, আর বাতাসী বিবির জীবনে বাবার আগমন কি করে হয়েছিল সেইটে বলি।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'বিধাতার মন আর পাখির খাঁচা নিয়ে কবিগুরুর কি একখানা কবিতা আছে বলুন তো ধনপতিবাবু'।

একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল। বললাম:

> "খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
> বনের পাখি ছিল বনে।
> একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
> কি ছিল বিধাতার মনে।"

খুশী হয়ে নিমাই মিত্তির বললেন, 'কি ছিল বিধাতার মনে! ঠিক

এই কবিতাটার কথাই ভাবছিলাম, কিছুতেই মনে পড়ছিল না। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে।' আশ্চর্য, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। বাতাসী বিবির এ্যাটর্নী হবার কথা ছিল হারান চাটুজ্যের— পাঁড় মাতাল হারান চাটুজ্যে। মাতালরা সাধারণত দিল খোলা দিল দরিয়া হয়ে থাকে, কিন্তু হারান চাটুজ্যে ভদ্রলোক তেমন ছিলেন না। এক নম্বর প্যাঁচালো, এক নম্বর ধড়িবাজ। বাতাসী বিবি তখন থাকে মেটিয়াবুরুজে। তখনো এ বাড়ি কেনবার কথা ওঠেনি—পরে এ বাড়ি বাবাই কিনিয়ে দিয়েছিলেন বাতাসী বিবিকে। যাক, সে হলো গিয়ে পরের কথা, পরেই হবে'খন। হারান চাটুজ্যে, এ্যাটর্নী, পাঁড় মাতাল ছিলেন বলেছি আপনাকে। আর স্বভাব চরিত্র? ও কথা না তোলাই ভালো। নিজের মুখে পরের নিন্দে করতে আমার ভালো লাগে না, ধনপতিবাবু। যোগাড়ে লোক ছিলেন হারান চাটুজ্যে, দুনিয়াদারিতে পাকা, খোঁজ-খবর রাখতেন খুব, বাতাসী বিবির চেলা চামুণ্ডাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে বাতাসী বিবির এ্যাটর্নী হবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে এনেছিলেন। এমন সময় এক কাণ্ড।'

'কি কাণ্ড?'

'ছামুবাবুর কুস্তির আখড়ার কথা বলেছি তো আপনাকে, যেখানে ভোরে কুস্তি লড়তে যেতেন বাবা, হপ্তায় তিন চার দিন!'

'বলেছেন।'

'সেখানে রবিবারে রবিবারে কুস্তি খুব বেশী রকম জমতো। যাকে বলে কুস্তির মহোৎসব। ঐ দিনটা এ্যাটর্নীগিরি সংক্রান্ত কোনো কাজই করতেন না বাবা। সারাটা দিন ভুলে থাকতেন তিনি এ্যাটর্নী—ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। ঘুমিয়ে পড়তেন তারপর। এক রবিবারের কথা বলি। কুস্তি লড়ছিলেন ছামুবাবু আর বাবা, কাঠ পালোয়ান আর পালোয়ান এ্যাটর্নী। ছামুবাবু কুস্তি শিখেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে, আর তাঁর বাবা ছিলেন সেকালের এক বড়ো কুস্তি-ওস্তাদের অন্যতম সেরা সাগরেদ। পৈতৃক তালিমের গুণে ছামুবাবুও কুস্তিবিদ্যায় রীতিমতো বড়ো বিদ্বান্ হয়ে উঠেছিলেন। কুস্তির নানা কায়দা, নানা প্যাঁচ বাবাকে সযত্নে শিখিয়েছিলেন এই ছামুবাবুই—দু'জনে ছিলেন প্রাণের বন্ধু, ছামুবাবু আর বাবা। ছামুবাবু অবশ্য ছিলেন বয়সে বাবার চাইতে কিছু বড়ো। কিন্তু সেজন্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে কোনো বাধা হয় নি। ছামুবাবু আর বাবা কুস্তি লড়ছেন আখড়ার মাটিতে, সেই আশ্চর্য কুস্তি দেখছে আখড়ার অন্যান্য কুস্তিগীরেরা। আর দেখছেন বাদশা পালোয়ান, মেটিয়াবুরুজের নামজাদা মল্লগুরু। মেটিয়াবুরুজে তাঁর বিখ্যাত কুস্তির আখড়া, সাগরেদরা দেবতার মতো ভক্তি করে তাঁকে।'

ছামুবাবু আর এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরের কুস্তি দেখে ভারি তারিফ করলেন বাদশা পালোয়ান। নটবর মিত্তিরের কুস্তি-চাতুর্য এবং অসামান্য শক্তির নমুনা দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি প্রথমে তাঁকে পেশাদার মল্ল বলে ভুল করেছিলেন। পরে যখন শুনলেন কুস্তি পেশা নয় নটবর মিত্তিরের, পেশা তাঁর এ্যাটর্নীগিরি, কুস্তি লড়েন নিতান্ত সখ করে এবং এ অঞ্চলের লোক তাঁকে পালোয়ান এ্যাটর্নী বলেই জানে, তখন পুলকিত বিস্ময়ের সীমা রইল না বাদশা পালোয়ানের।

তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সাবাস বাবুজি। পেশাদারি কুস্তির বাইরে এমন তাজ্জব আর কখনো দেখি নি।' তারপর ছামুবাবু আর নটবর মিত্তির, এই দুইজনকেই বললেন, 'এক রোজ মেহেরবানি করে আমার আখড়ায় পায়ের ধুলো দেবেন। আপনাদের কুস্তি দেখাতে চাই আমার আখড়ার সাগরেদদের। কি বলেন বাবুজি?'

কি বলবেন ভাবতে শুরু করলেন এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির। কিন্তু বেশী ভাবলেন না কুস্তি-পাগল ছামুবাবু। বললেন 'এ তো আমাদের সৌভাগ্যের কথা ওস্তাদ। আপনার আখড়ায় গিয়ে কুস্তি লড়ব বই কি। আপনার তারিফে ধন্য হল আমাদের কুস্তি শেখা।'

তারিখ ঠিক হল আগামী রবিবার। সেদিন ভোরবেলা রোদ উঠবার আগেই মেটিয়াবুরুজে বাদশা পালোয়ানের কুস্তির আখড়ায় চলে যাবেন ছামুবাবু আর এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির, এ আখড়ার আরো কয়েকজন বাছাই করা কুস্তিগীর নিয়ে। বাদশা পালোয়ানের সাগরেদদের সঙ্গে এ আখড়ার কুস্তিগীরদের হবে দোস্তির দঙ্গল, কুস্তিলড়ার প্রীতিসম্মেলন।

'এক জেনানাকে আপনার কুস্তি দেখাব সেদিন বাবুজি।' বাদশা পালোয়ান বললেন হাসিমুখে।

শুনেই বেঁকে দাঁড়ালেন পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির। বললেন, 'তাহলে আমায় মাফ করবেন। জেনানাকে দেখাবার জন্যে আমি কুস্তি শিখি নি।'

বাদশা পালোয়ান তখন অনুনয় শুরু করলেন। মানলেন না একগুঁয়ে নটবর মিত্তির। কুস্তি মর্দানা ব্যাপার, এ জগৎ পুরুষের জগৎ। এর ভেতর আবার মেয়ে মানুষ টেনে আনা কেন?

বাদশা পালোয়ান হার মেনে বললেন, 'আচ্ছা বাবুজি। আপনি যখন আপত্তি করছেন, তখন জেনানাকে আনব না কুস্তির সামনে।'

আশ্বস্ত হয়ে তখন রাজি হলেন নটবর মিত্তির। কথা পাকা হয়ে গেল। যাবার আগে ছামুবাবুকে বাদশা পালোয়ান চুপি চুপি জানিয়ে গেলেন 'জেনানাকে আপনাদের কুস্তি আমি দেখাব বাবুজি, কিন্তু সে দেখবে আড়াল থেকে, চুপি চুপি। আপনারা টেরও পাবেন না। সে জেনানা যেমন তেমন জেনানা নয় বাবুজি, তার জুড়ি মেলে না।'

'কে সেই জেনানা, ওস্তাদ?'

'পরে জানবেন বাবুজি।' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন প্রবীণ মল্লগুরু বাদশা পালোয়ান। [ক্রমশঃ।

একটি কলেজের চারটি মেয়ে

রাণু ভৌমিক (দাস)
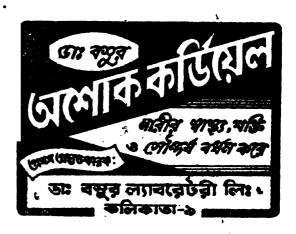
আজ আমি ওদের নিয়ে গল্প লিখতে বসেছি। পুতুল, পাপড়ি, প্রিয়া, প্রতিমা—এক কলেজের চারটি মেয়ে। ভাবতে নিজেরই অবাক লাগত কেন ওদের চারজনের কথা একসঙ্গে মনে হল! কিছুই তো মিল ছিল না ওদের মধ্যে। অপরূপ সুন্দরী প্রতিমা রায়চৌধুরী—ওর লালচে চুল আর বাদামী চোখ দেখে মনে হত—ও যেন এ যুগের নয় মধ্যযুগের—এ দেশের নয় ও দেশের। ঠিক ওর পাশাপাশি হাঁটত প্রিয়া চ্যাটার্জী, রোগা, লম্বা, কালো! শ্রীহীন দেহ—ততোধিক শ্রীহীন মুখ ওর পরুষ্পর ঘেঁষা বিরক্ত-বিরস চোখে অসীম বিরক্তি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সমস্ত বিদ্বেষ, বিরাগ যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ দু'টি চোখে। আর অকারণ হাসি, অকারণ উচ্ছ্বাসের সমুদ্রে যেন ভাসতে থাকত পাপড়ির চোখ দু'টি। আর ওরই পাশে সংযত পায়ে হাঁটত পুতুল বসু মাঝারী আকৃতির ছোট একটি মেয়ে—শুধু চকচকে উজ্জ্বল ওর চোখ।

ওদের কথা তো নয় ওদের চোখ। আমার সামনে ভাসছে চারজোড়া চোখ। সেই চোখেই যে আমি দেখেছিলাম ওদের আত্মা—শুদ্ধ আত্মা, বিকৃত আত্মা, শিশু আত্মা আর প্রবুদ্ধ আত্মা।

১

যদি কোন রকমে দেহ থেকে মনটা সরিয়ে নিতে পারতাম—হে বিধাতা, আমি সর্বস্ব দিতে রাজী—মনের এই যন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে রেহাই দাও—মনটাকে মেরে ফেল—শেষ করে দাও ওকে। ওকে আর আমি সইতে পারছি না। বাঁচতে দাও আমাকে—বাঁচাও—মুক্তি চাই ভগবান, মুক্তি চাই মনের নাগপাশ থেকে···

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে পুতুল। কালো আকাশ। সান্ত্বনা নেই—সৌন্দর্য নেই—পৃথিবী কালো—আকাশ কালো—মানুষ কালো। বিষে বিষে কালো হয়ে গেছে বাইশ বছরের মেয়ে পুতুল। শব্দহীন, অসহায় ক্রন্দনে ফুলে কেঁপে ওঠে পুতুলের দেহ। মাথা নীচু করে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

প্রতি মুহূর্তে কত যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণাময় কত লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী মুহূর্ত আমাকে বাঁচতে হবে বলতে পার? কি বলেছিল লোকটি। যৌবন দেখিয়ে চাকরি করতে এসেছিল যে মেয়েটি··আমাকে লক্ষ্য করে ও নোংরা কথা লিখল আর আমি-ই সেই নোংরা কথাগুলি সুন্দর দামী কাগজে চকচকে কালিতে ছবির মত করে লিখলাম—সযত্নে রেখেছিলাম আলমারীতে—যাতে অনেক, অনেকদিন পরেও লোকে পড়তে পাবে আমার অপমানের কাহিনী। 'ক্ষুধা নয় যৌবন জ্বালা—চাকুরী ছলনা'—ক্ষুধা—ক্ষুধার রূপ তুমি কি বুঝবে? নিজের ক্ষিদে সহ্য করা যায়—কিন্তু চারিদিকে কতগুলি অসহায় করুণ কটি মুখ—মন জাগেনি এমন কতগুলি দেহের কাতর কান্না—পৃথিবীর কোন কিছু জানে না তারা—জানতেও চায় না—তারা চায় শুধু এক মুঠো ভাত—খেতে না পেয়ে অসময় বুড়িয়ে যাওয়া নিরাভরণ একটি দেহ—ব্যগ্র উৎসুক দু'টি চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে কখন ফিরব আমি—আমার লাঞ্ছনার মূল্য হাতে তুলে দেব তাঁর—তারপরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে—হাতা বেড়ী ঠুং ঠাং থালার ওপর কতগুলি পদার্থ, কয়েকটি উৎসুক ব্যগ্র মুখের তৃপ্তি—এই তো জীবন। এভাবেই আমাকে কাটাতে হবে।

—কাটাতেই যখন হবে তখন হাসিমুখেই কাটাও না কেন, পুতুল?—চমকে ওঠে পুতুল! কে? কে বলল?

তাকিয়েই আবার চমকে যায়। এ কোন পথে সে এসেছে আজ। কতদিন আগের, হারিয়ে যাওয়া ভুলে যাওয়া অন্তরের কোণে দোলা দেওয়া এই পথ।

এই পথ।

প্রথম যৌবনের পথ।

কত বছর আগে আমি এই পথে চলেছিলাম? সে কি পূর্ব-জন্মে? এই পথেই চলতাম—এই পথেই ফিরতাম—এই গাছের নীচেই দাঁড়াতাম আমরা—

জীবনটা যখন কাটাতে হবে তখন হাসিমুখেই কাটিয়ে দাও পুতুল? সবুজ গাছের নীচে ছোট একখানি গোল মুখ। কোথাও নেই একটুকু ভাঁজ এতটুকু দাগ। একটি নিখুঁত চামড়া মুড়ে গেছে। সে মেয়ের চোখে হাসি, চুলে হাসি, ঠোঁটে হাসি, বুকে হাসি। সমস্ত শরীরটাই যেন একটা হাসির ঢেউ। হেসে যাচ্ছে তো হেসেই যাচ্ছে থামবার কোন লক্ষণ নেই।

আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে সেই হাসিতে। বিশ্বভুবন আলো

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
আঃ! কি তাজা, কি ঝরঝরে লাগছে।
লাইফবয় মেখে স্নান করায় কী আনন্দ!
তাছাড়া, লাইফবয়ে ধুলোময়লার রোগ-
বীজাণু পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে যায়।
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রতিদিন পরিবারের
সবাই লাইফবয় মেখে স্নান করুন।

করে পুতুলের সামনে দাঁড়ায় সেই হাসি···আমাকে তুমি ভুলে গেছ পুতুল ?

পাপড়ি ! নীরবে চেঁচিয়ে ওঠে পুতুল।

···আমাকে তুমি ভুলে গেছ পুতুল ? হাসির অক্ষরে, হাসির আনন্দে কথাগুলি ফুটে ওঠে।

ব্যথায় ভরে ওঠে পুতুলের দুই চোখ। ভুলে গেছি। হাঁ, ভেবেছিলাম ভুলে গেছি সব। ভুলে গেছি তোমাকে। ভুলে গেছি, এই পথ—এই আলো—এই রং। কিন্তু···

কিন্তু আজ দেখছি কিছুই ভুলিনি। আমার মনটা যে একটা অন্ধকার ঘরের মত—মনে হয়েছিল সেখানে বুঝি কিছু নেই—সব ফাঁকা—হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। দেখছি ঘরের মধ্যে সবই সাজান আছে—ঠিক আগে যেমনি ছিল তেমনি—পাপড়ি, প্রতিমা, প্রিয়া—এই আকাশ এই পথ···

প্রথম যৌবনের পথ।

প্রথম যৌবনের কথা।

তখন এই গাছটারও যৌবন ছিল—এমনি ভাবে বুড়ো হয়ে, শুকনো হয়ে যায়নি। সোনারংয়ের কচিপাতা নেড়ে সে হাসত আমাদের কথা শুনে।······

—তোদের সবারই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে—আমি-ই একদম সাধারণ—বলেছিল একটি কিশোর কচিমুখ যার রং ছিল উজ্জ্বল হলদে—আর চোখ দু'টি ছিল চকচকে কালো। তাকে আজ আমি চিনতে পারি না।

সেই মেয়েটির কথায় হেসে উঠেছিল পাপড়ি। ওর সেই অবাক-হওয়া অবাককরা অনুপম হাসি। প্রতিমা শাঁখের মত সাদা হাতে লালচে চুল সরিয়ে তাকিয়েছিল বাদামী চোখে—আর প্রিয়া চ্যাটার্জীর বিরক্ত-বিরস পরস্পরের কাছে ঘেঁষে থাকা চোখ দু'টি নিকটতর হয়ে উঠেছিল।

পরদিন সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়েই প্রিয়া উত্তর দিয়েছিল, পুতুল, বিশেষত্ব না থাকাটাই এক ধরণের বিশেষত্ব।

প্রিয়ার কথা শুনে হেসেছিল পুতুল। ও-কি রকম অদ্ভুত ভাবে হাসত। ঠোঁটটা একটু ফাঁক করে, সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলি একটু দেখিয়ে অল্প অল্প হাসত। ও হাসত শুধু ঠোঁটে নয়, মুখ নয়, সারা শরীরে।

—হেসেই উত্তর দিয়েছিল পুতুল, তুমি আমার সেই সামান্য কথাটা সমস্তদিন মনে রেখেছ প্রিয়া।

—হ্যাঁ, মনে রেখেছি। নীরস গম্ভীর উত্তর প্রিয়ার, সমস্তদিন কেন, হয়ত মনে রাখব সমস্ত জীবন। সত্যসত্যই, আমরা সকলেই একটু বিশেষ। অভিজাত দরিদ্রা অপরূপ রূপসী প্রতিমা রায়চৌধুরী, অকারণ হাসি উজ্জলতায় ভরা পাপড়ি সরকার আর···আর···

একটু থেমে যায় প্রিয়া। পরক্ষণেই বলে, আর কুশ্রীতার একক নিদর্শন প্রিয়া চ্যাটার্জী। কিন্তু তুমি! তোমার আপাত-সাধারণতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অসাধারণত্ব।

২

সত্যই, তোমার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। আকাশের ছোট তারাটার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে পুতুল। তোমাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ছোট্ট একটি মেয়ে, তোমার রং ছিল হলদে আর চোখদু'টি চকচকে কালো। আকাশের উজ্জ্বল তারাটার দিকে তাকিয়েছিলে তুমি। তখন সন্ধ্যে হয়েছে, কিন্তু অন্ধকার হয় নি। অনেকক্ষণ থেকে একা দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। কেউ তোমাকে সেদিন বিকেলে খেতে দেয় নি। মাকে তুমি তো সারাদিন-ই দেখতে পাও-নি। দিদি খানিকটা সময় তোমার সঙ্গে ছিল, তারপরে সে-ও কোথায় চলে গেল—

ক্ষিদে তোমার পায় নি, ভয়ও পাওনি তুমি, সন্ধ্যেবেলা ভয় কিসের—কিন্তু, তবু কি জানি কেন তোমার কান্না পাচ্ছিল। নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারছিলে না তুমি—ঠিক এমনি সময়ে তুমি তারাটা দেখলে।

আকাশের বুকে ছোট্ট একটুকরো হাসি। ভয়, কান্না সব মিলিয়ে যায়। মন ভরে ওঠে। ঐ একক একাকী তারাটার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক তুমি—হাতছানি দিয়ে কাছে ডাক। ও আসে না। কিন্তু কি সুন্দর হাসি হাসে তোমার দিকে চেয়ে।

ওর দেখার আলোতে অনেক কিছুই মনে পড়ে তোমার। অনেক সুখের কথা, গর্বের কথা। মনে পড়ে, কত রাতে মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শুয়েছিলে তুমি। মনে পড়ে, তোমার বাবা, দিদি তোমাকে কত ভালবাসে···আর···

আর, মনে পড়ে তোমার একটা ভাই হবে। ভাই হবার সংবাদ তুমি আগেই পেয়েছিলে···তোমার মা তোমাকে বলেছিলেন, পুতুল, তোমার একটি ভাই হবে। সে তোমাকে ডাকবে দিদি বলে। তোমার কথা শুনবে।

ছোট একটি শিশুর কর্তৃত্ব লাভের আশায় উৎসুক হয়ে উঠেছিলে তুমি। আনন্দে ও উৎসাহে বারবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলে অনাগত শিশুর আগমনবার্তা।

এখন ঐ তারার দিকে তাকিয়ে তোমার মনে এল সেই আনন্দ, সেই গর্ব। তুমি মুচকি হেসে বললে, জান, আমার একটি ভাই হবে। ছোট এতটুকু একটা ভাই—আমাকে ডাকবে দিদি।

আঁ···আঁ···আঁ—তিনটি তীক্ষ্ণ চীৎকার। ছোট হলেও তুমি এই চীৎকারের অর্থ বুঝতে পারলে—একটি নতুন প্রাণের আবির্ভাব হলো—তোমার একান্ত অনুগত একটি প্রাণ।

তুমি ছুটে সেই ছোট ঘরটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালে—যেখানে অনেকক্ষণ থেকেই তোমার মা আছেন। এতক্ষণ তোমাকে ওরা নিষেধ করেছিল তাই তুমি যাও নি—কিন্তু এখন তোমার ছোট ভাই হয়েছে—তুমি কি আর স্থির থাকতে পার! ছুটে গিয়ে ঘরটার পাশে দাঁড়ালে—দরজাটা ভেজান আছে—খোলামাত্রই গিয়ে ঘরে ঢুকবে।

—কি সুন্দর মেয়ে হয়েছে, দেখ। উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে কে যেন বলে।

বোধ হয় দাইমা।

—আবার মেয়ে···হা ভগবান···

মায়ের গলা। টেনে টেনে কান্নাকণ্ঠে তিনি বলেন, চারটি মাত্র শব্দ। কিন্তু এই চারটি শব্দেই তুমি শুনতে পেলে পৃথিবীর

পুঞ্জীভূত বিরাগ, বিদ্বেষ, হতাশা ও দুঃখ। এক তীব্র আর্তনাদে ঢেকে গেল সমস্ত আকাশ। কালো হয়ে গেল পৃথিবী। হারিয়ে গেল তারার হাসি।

তোমার মনে হল বহুদিন তুমি শুনেছ এই কথাগুলি। কাজের চাপে বিরক্ত হয়ে তোমার মা বারবার মেরেছেন তোমার ছোট বোনকে—তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বলেছেন, মর্, মর্, মরে শেষ হয়ে যা। শান্তি দে আমাকে।

কাছে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তুমি ভেবেছ, কেন মা এমন করেন ছোট বোনের প্রতি! অসহায় করুণায় তোমার চোখ জলে ভরে গেছে।

কখনও কখনও তোমার বাবা তোমাকে আদর করলে মা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছেন, মেয়ের ছাই, তার আবার এত আদর।

কি রকম যেন অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছেন তোমার বাবা। যেন সত্য সত্যই একটা অন্যায় কাজ করছিলেন।

তোমার প্রতি, তোমার দিদি ও ছোট দু'টি বোনের প্রতি বিদ্বেষের টুকরো টুকরো ছাপ তুমি অনেক দেখেছিলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও কিছু মনে কর নি।

এই মুহূর্তে তুমি সব বুঝতে পারলে।

বুঝতে পারলে তুমি মেয়ে। বুঝতে পারলে তুমি মায়ের অপ্রার্থিত। বুঝতে পারলে পৃথিবী কালো।

শৈশবের নন্দন-কানন, আনন্দময় স্থান পার হয়ে এলে তুমি। জেগে উঠল মন—চিন্তা করে বিচার করে যে মন।

সেই মনেরই খেলা। মনেরই যন্ত্রণা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তীব্র আর্তনাদে চেঁচিয়ে ওঠে পুতুল, হে বিধাতা, মনের এই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দাও আমাকে। মনহীন মানুষ—সেই তো প্রকৃত সুখী মানুষ। আমার মনটাকে মেরে ফেল—গলা টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে শেষ করে দাও একেবারে—আমাকে বাঁচতে দাও—আমাকে বাঁচতে দাও।

আকাশের দিকে তাকায় পুতুল। লাল হয়ে উঠেছে আকাশ—তারই মনের ছাপে।

৩

লাল হয়ে উঠেছে আকাশ। সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে বিমান। বলে, আকাশ, তুমি যতই হাস না কেন—সে হাসি তুমি হাসতে পারবে না। বৃথা চেষ্টা করছ।

রূপকথার রাজকুমারীর গল্প শুনেছ! যার হাসিতে মুক্তো ঝরত। ওর হাসিতেও আমি দেখেছি সেই মুক্তার দীপ্তি। টুকরো টুকরো হাসি—ছোট ছোট মুক্তাকণা—ঝিনুক ভেঙে বেরিয়ে আসছে।

সে তো হাসি নয়—আকাশের গান। সেদিকে তাকালে ছোট কথা, ছোট ছোট প্রার্থনা মনে জাগে না। নিজেকে হঠাৎ যেন খুব বড় মনে হয়। পায়ের নীচ থেকে নোংরা মাটী সরে যায়। মনে হয় ওপরে নীচে চারপাশে শুধু ফুল—ফুলের গন্ধ। সে ফুল—পারিজাত ফুল।

সে মেয়ের ছিল চোখে হাসি, চুলে হাসি, ঠোঁটে হাসি, বুকে

হাসি। হাতের আঙুলগুলি নতিয়ে উঠত হাসির ছন্দে, পায়ের পাতার শিরাগুলি উঠত কেঁপে। ওর চলার ছন্দে হাসি দুলে উঠত। ছোট একটি মুখ। একটি নিভাঁজ চামড়া ঘরে গেছে সমস্ত মুখময়। সমস্ত মুখে একটিও দাগ নেই। সেই চামড়ার ওপরে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে আলগাভাবে—ছোট একটি নাক, দু'টি কালো চোখ আর সাদা ঝকঝকে দাঁত, ফুলো ফুলো দু'টো ঠোঁট। মনে হত, একবার হাত বুলোলেই ওর চোখ, নাক, মুখ হাতের সঙ্গে উঠে আসবে—শুধু থাকবে ঐ নিখুঁত চামড়াটা—সেই চামড়াটাও বোধ হয় তখনও হাসবে।

প্রথম যেদিন আমি সেই হাসি দেখেছিলাম···মনে হয়েছিল নরকের আগুন চারিদিকে জ্বলছে—পচা মড়া পোড়ার বীভৎস গন্ধ—আর সেই মড়ারই গলা দুর্গন্ধ মাংস রক্ত মেখে বসে আছে একটি বীভৎস পশু—নরকের আগুনের ধোঁয়ায় তার রং ধোঁয়াটে কালো। অন্ধ সেই পশুটা হঠাৎ দেখতে পেল প্রথম উষার আলো। দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। আকুল আর্তনাদে বলে ওঠে, না, না, না, এ আমি দেখতে চাই না। এ আমি সইতে পারি না—আমি বেশ আছি—আনন্দে আছি। তোমাকে দেখে আমার সমস্ত দেহ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে—গনগনে আগুনের মত ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তুমি যাও, দূর হয়ে যাও, শেষ হয়ে যাও, আমার পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্ব নেই।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে সে সেই কৃমিভরা ক্লেদের মধ্যে ডুবে যায়। পরিচিত বন্ধুর মত সেই স্পর্শ তার গায়ে আনন্দ শিহরণ জাগায়। কিন্তু, তবুও একটু চিড়···

তবুও একটু চিড়। কখন যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে ছেলেবেলার কথা—ছেলেবেলারও আগের কথা—যখন হাল্কা ভেসে যাওয়া সাদা মেঘের মত ছিল তার মন—

সেই লোকটি চুপ করে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল, সামনেই ছিল ওর পানীয় গ্লাস কিন্তু ও চুমুক দেয়নি। আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সে।

এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে ছবির মত শহরটি। নিজের মনেই একটু হাসে বিমান। জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকায়—ঘটাং ঘটাং শব্দ দু'টো ট্রাম দু'দিক থেকে আসছে, তারই একপাশ দিয়ে খুব জোরে বেরিয়ে গেল একটা দোতলা বাস। ট্রামটার পাশাপাশি এসে একবার হেলে দাঁড়াল, ঠোকাঠুকি লাগল বলে—শিউরে ওঠে বিমান। এখনই কতকগুলি রক্তাক্ত দেহ আর তীব্র আর্তনাদ—কিন্তু না নিজেকে সামলে নিয়েছে বাস—জোর হর্ণ বাজিয়ে সোজা হয়ে চলে যায়। তারই পাশে একটা পুরান রিক্সা—রিক্সাওয়ালা বুড়ো। মনে হয়, এখনই ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে, ঠুং-ঠাং করে চলছে। ওকে উপহাস করেই যেন সবচেয়ে নতুন মডেলের একটা গাড়ী ভুস করে বেরিয়ে যায়—দু'পাশে অগণিত লোকের পায়ে চলার শব্দ, সব মিলে এক বিচিত্র ঐকতান···

এই হচ্ছে শহর। এর তুলনায় সে তো কিছুই নয়, সেখানে ট্রাম নেই, বাস নেই, এভাবে লোক চলাচল নেই।

দেখে মনে হত, যেন একটি গ্রাম্য মেয়েকে কেউ শহুরে সাজে সাজিয়েছে। গায়ের কুচকুচে কালো রংয়ে গোলাপী পাউডার, তার ওপরে রুজের লালচে ছাপ, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপষ্টিক, কিন্তু গোলাপী পাউডার কিংবা লাল রুজ তার মুখের কালো চামড়া ঢাকতে পারেনি—এখানে-ওখানে উঁকি দিচ্ছে গ্রাম্য মেয়ের কালো প্রাণবন্ত রং। পুরু, রসালো জীবনভরা ঠোঁট লিপষ্টিকের টানেও আধুনিক হয়নি। তার বেশ-বাসে, চলনে-বলনে, স্বাস্থ্য-প্রাচুর্যে সেই আদিম গ্রাম্য ছাপ।

মহকুমার অধিকাংশ শহরগুলিই এইরকম। তাই সকলে তাকে বলে জেলা-শহর। গ্রামের সঙ্গে খুবই কম তফাৎ। একটা কলেজ, দু'টো স্কুল আর একটি বিচারালয় থাকলেই তা শহর হল।

রামরাজপুরে আর একটি অতিরিক্ত জিনিস ছিল—জেলখানা। শহরের একটা দিক জুড়ে ছিল জেলখানা। প্রাচীর-ঘেরা প্রকাণ্ড জায়গা। তারি ভিতরে কয়েদী ও কয়েদীদের রক্ষক ও শাসকরা থাকতেন। তাদের থাকবার পৃথক পৃথক জায়গা, তা ছাড়া কাজ-করবার, বেড়াবার, খেলবার জায়গা ছিল। এ ছাড়াও আম, কাঁঠাল, সুপুরির প্রকাণ্ড বাগান। এ যেন একটা পৃথক রাজ্য।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও জেলার জেলখানার কাছাকাছি থাকতেন। অন্যান্য কর্মচারীরা একটু দূরে দূরে।

এই জেলেই জন্ম হয়েছিল তার। না, না, কয়েদখানায় নয়—অত্যাচারিত হলে হয়ত সে দেহে মনে পঙ্গু হতে পারত কিন্তু বিকৃতচিত্ত হত না।

অত্যাচারীর রক্তে জন্মগ্রহণ করেছিল আর চোখের সামনে নানা প্রতিবাদহীন অত্যাচার দেখেছিল বলেই তার মন বেঁকে, দুমড়ে, থেঁতলে একটা বিস্তৃত আকার ধরেছিল, অন্যায়ভাবে প্রশ্রয় পেয়ে সেই জীবটা ফুলে কেঁপে উঠেছিল।

আকাশ, তুমি তো তাকে চেন। যখন সে অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসবার জন্য ছটফট করছিল—যখন তার মায়ের চারিপাশে বসে আত্মীয় ও বন্ধুরা আদেশ উপদেশ দান ও নানা রকম অনুমান করছিলেন তখন তুমি মুখ টিপে হাসছিলে। তুমিই একমাত্র জানতে সে কে?

তারপরে সে হল। সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঘর ভরে তুলল। তখন তুমি চুপ করেছিলে—তুমি জানতে, আনন্দিত হবার মত কোন ব্যাপার হয়নি। এই ছেলে কোনদিনই কারো জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে না এমন কি নিজের জীবনেও নয়।

কিন্তু, সবাই তা মানবে কেন? কতদিন পরে ছেলে হল। কত ব্রত, নিয়ম, উপোষ, পুজো, মানত, মানসিক। কত ওষুধ, এ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী, টোটকা, কিছুই তো বাদ যায়নি। কত আশা, আশঙ্কা, চোখের জল। তারপরে, কি জানি কি ভাবে এই ছেলে হল। হয়ত সব কিছুরই সম্মিলিত ফল কিংবা কিছুরই নয়। তাই সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। সাধনার সিদ্ধি হয়েছে, পাওয়া গেছে তপস্যার ফল। শুধু তুমি মুখ টিপে হেসেছিলে। তুমি জানতে ভবিষ্যতের আমাকে। তুমি জানতে কয়েকদিন পরে এরাই আবার উল্টো কথা বলবে—তাই, তুমি মুখ

টিপে হেসেছিলে। চোখ খুলেই বেরিয়ে তোমার সেই হাসি দেখেছিলুম তাই মন আমার বিদ্রূপের জমাট বরফে পরিণত হয়েছিল।

৪

যখন আমার বয়স মাত্র তিন বছর তখন থেকেই সব কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী। আমি কোন কথা ভুলি না—ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারি না। স্মৃতিগুলি আমার মনে ছাপার অক্ষরে সাজান রয়েছে—জল-ন্যাকড়া দিয়ে বারবার মুছে দিলেও তা উঠবে না, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবারও জো নেই।

তিন বছর আগের কথাও আমার মনে পড়ে কিন্তু সে ছায়া ছায়া—স্পষ্ট কোন রূপ নেই।

এক রাতের কথা মনে পড়ছে—তখন আমি অনেক ছোট—তিন বছর বয়সের চেয়েও ছোট আর—

সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। এ রকম তো মাঝে মাঝেই ভাঙে—কিন্তু জেগে উঠেই পাশে হাত বাড়িয়ে পাই মাকে—সেদিন হাত বাড়িয়ে কাউকে পেলাম না—তাতেই বোধ হয় বেও চমকে উঠে কাঁদতে শুরু করলাম। আমি কেঁদে ওঠামাত্রই র হাত আমার গায়ে লাগল—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও বুঝতে পারলাম যে, প্রত্যেকদিনের মত নয় সে হাত—কেমন যেন রুক্ষ-কঠিন। তারপরে, মা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন—মায়ের কান্না দেখে আমিও কাঁদতে লাগলাম—

হয়ত এই অন্ধকার ঘর, মায়ের কঠিন হাত, এই কান্না কিছুই আমার মনে থাকত না কিন্তু আমার জ্ঞান হবার পরে (অর্থাৎ তিন বছর বয়সের পর) এই দৃশ্য অনেকবার দেখেছি তাই অবচেতন মনের এই ছায়া অস্পষ্ট রূপ নিয়ে মনে গেঁথে ছিল।

৫

প্রথম যেদিন থেকে আমি বুঝতে শিখলাম—ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ যেন জেগে উঠলাম—সেদিনের কথা আমার আজও মনে আছে। রামলাল আমাকে খুব ভালবাসত (পরে জেনেছিলাম সে ছিল একজন কয়েদী) রামলাল আমাকে খুব ভালবাসত আমিও ওকে খুব ভালবাসতাম। শুধু ভালবাসতাম না, ওকেই ভাবতাম পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বীরপুরুষ। রামলাল বলত, রাক্ষসকে আমি দু' হাতে টিপে মেরে ফেলতে পারি। ভূতকে উড়িয়ে দিতে পারি ফুঁ দিয়ে।

সেদিন আমি সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলুম—হাওয়ায় উড়ছিল চুল, রামলাল দাঁড়িয়েছিল মাটিতে, ওর মাথাটা আমার পায়ের কাছে দু'টো হাত উঁচু করে আমার পায়ের দু' পাশে রেখেছিল বোধ হয় ভেবেছিল, আমি যদি পড়ে যাই·····

মাটিতে দাঁড়িয়ে ও ওর সেই গল্প করছিল। কটা রাক্ষস মেরেছে,
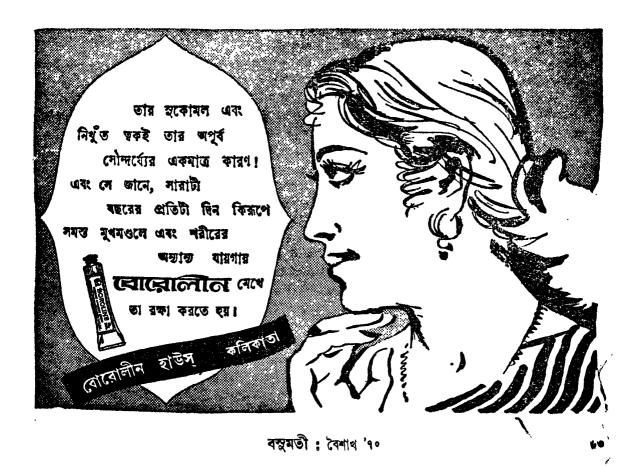
ভূতকে উড়িয়ে দিয়েছে ফুঁ দিয়ে—ঠিক এমনি সময়ে আর একটা লোক এসে দাঁড়াল—সে লোকটিকে আমি চিনি না।

একটিও কথা না বলে লোকটি রামলালকে মারতে শুরু করে—সে কি মার—কিল, চড়, লাথি, ঘুঁসি। আমি অবাক হয়ে দেখলাম মার খেতে খেতে রামলাল নীচে পড়ে গেল তবুও সে একটিও কথা বললে না—আমার স্বপ্নজগতের বীরনায়ক—যে ফুঁ দিয়ে ভূত উড়িয়ে দিতে পারে—রাক্ষসকে মারতে পারে গদা টিপে সে মাটিতে পড়ে অসহায়ভাবে কাঁদছে—বিস্ময়···বিস্ময়··· সেই বিস্ময়ের ধাক্কায় আমার প্রথম চেতনার অনুভূতি চোখ খুলল।

তিন বছর বয়সের শিশুকে কেউ সমীহ করে না—তাই আমার সামনেই অনেকে অনেক কিছু বলত—অনেক কিছু করত। বাইরের জগতের কাছে মানুষ মুখোস পরে থাকে—কিন্তু, সেই মুখোসের আড়ালে প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠে। যখনই সুযোগ পায় লোকে সেই মুখোস খুলে ফেলে—

এই রকম মুখোস খোলা মুখ আমি অনেক দেখেছি···তাই···

হ্যাঁ, তাই···মুচকি একটু হাসে বিমান। তাই, মুখোস পরে লোক যখন বড় বড় কথা বলে ধর্ম সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, সাহিত্যে, দর্শন, সৌন্দর্য···আমার হাসি পায়—মনে হয়, আস্তে আস্তে টেনে মুখোসটা খুলে দি···মুখোসটা···

ঐ যা বলছিলুম, তিন বছর বয়সে আমার চেতনার প্রথম উন্মেষ হ'ল, চোখ ফুটল। সে দেখতে শিখল—বুঝতে শিখল—আর দেখে শুনে তার মনে হল জগতটা একটা আজব চিড়িয়াখানা। একে তো লোকগুলি সব সময়ে মুখোস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর প্রত্যেকেই প্রত্যেককে উপদেশ দিচ্ছে—কিন্তু নিজেরা করছে না।

শিশুমনের সেই এক আশ্চর্য বিস্ময়—অপরকে যে যা করতে বলে নিজে তা করে না—

সেদিন রামলালকে ও ভাবে পড়ে যেতে দেখে আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলাম। আমার কান্না শুনে আমাদের রাঁধুনী বামনী ক্ষীরিদি ছুটে এল—ক্ষীরিদিকে দেখে লোকটা রামলালকে ছেড়ে দিল—রামলাল উঠে দাঁড়াল—ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে···

রক্ত দেখে আমি আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম—এত জোরে যে মা ছুটে এলেন···

মা এসে গম্ভীর ভাবে তাকালেন। দেখলেন, রামলালের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, সারা গায়ে ধুলো ও মারের চিহ্ন, দেখলেন পাশেই সেই লোকটি ছোট লাঠিটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও (পরে শুনেছিলাম ওর নাম 'বেটন')—যে লাঠিটা নিয়ে ও রামলালকে মেরেছে···সবই দেখলেন কিন্তু কিছুই দেখলেন না মা—

এখন বুঝতে পারি দেখলেন না নয় দেখতে দিলেন না—চোখকে সব সময়ে সব কিছু দেখতে দিলে চলে না—গম্ভীর ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকাকে কে কাঁদালে?

ক্ষীরিদি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, মুখপোড়াগুলো, তোদের যা মারবার আছে আড়ালে গিয়ে করতে পারিস না—খোকাবাবুর সামনে মারবার কি দরকার। মানুষ তো নয় জানোয়ার, কত আর বুদ্ধি হবে?

ওরা দু'জনেই জানোয়ারের মতই তাকিয়ে আছে। বিশেষত রামলাল। অসহায় ভয়ে ওর শরীরটা কুঁকড়ে গেছে। ও যে মার খেয়েছে, মাটিতে পড়ে গেছে, ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে, সে অপরাধ ওর, ওর প্রতি সহানুভূতিতে আমার চোখ দিয়ে জল পড়েছে তাও আর একটি প্রকাণ্ড অপরাধ—এই সব অপরাধের শাস্তি ওকে পেতে হবে—সে শাস্তি যে কি তা আমি জানি না—ও নিজেও হয় ত' জানে না কিন্তু তা যে ভীষণ একটা কিছু সে ধারণা ওর দিকে একবার তাকিয়েই হল আমার।

কাঁপছে। লোকটা কাঁপছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর শিরদাঁড়াটা বেঁকে গেল, হাত দু'টো নেই—চারটে পা দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে হাঁটতে থাকে ও।

ক্ষীরিদি আমাকে কোলে করে নিয়ে গেল। মা তাড়াতাড়ি একটা ডিসে সন্দেশ ও ফল নিয়ে আমাকে কোলে তুলে খাওয়াতে থাকেন—তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে পাউডার দিয়ে দেন—কিন্তু তবু আমি রামলালের কথা ভুলি না—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলি, ওকে কেন মারল?

মা একটা ছবির বই খুলে বলেন, ভাখ, কি সুন্দর ছবি!

—ওকে কেন মারল? ছবিটার দিকে এক নজর তাকিয়ে আবার বলি।

—এমনি এই, ও দুষ্ট কিনা তাই।

—না, রামলাল দুষ্ট নয় খুব ভাল। ওকে কেন মারল? প্রবল কান্না সুরু হয়ে যায় আমার।

কান্নার মধ্যে হেঁচকি তুলতে তুলতে সেই এক কথা—ওকে কেন মারল?

—বাপরে বাপ, মা শেষটা বিরক্ত হয়ে বলেন, ছেলেটা কি জেদী। কোন কথাতেই ওকে ভোলান যায় না।

কতকটা ঠিকই বলেছিলেন মা। আমি যাকে ভালবাসি, যা ভালবাসি তা সহজে ছাড়তে পারি না। কিন্তু, একবার ছাড়লে আর ফিরেও তাকাই না, বিন্দুমাত্র ভাবি না সে কথা।

পরদিন সকালে রামলাল এলো। জেলের কয়েকটি কয়েদী দল বেঁধে এসে আমাদের পায়খানা সাফ থেকে শুরু করে কাপড় কাচা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করে দিয়ে যেত—শুধু আমাদের নয়—ওখানে যাঁরা থাকতেন—অর্থাৎ ওদের শাসন করতেন তাঁদের সকলের বাড়ীতেই কাজ করত ওরা। নির্দিষ্ট সময়ে একটি দল প্রায় আট দশজন মিলে আসত—আর ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্ত একটি লোক থাকত—তাকে সবাই বলত 'মেট'। পরে শুনেছিলাম পুরানো পাপী কিংবা নৃশংস অপরাধী না হলে কেউ 'মেট' হতে পারে না।

গরুর রাখালের মত এই মেটের হাতেই দলের সব কিছু নির্ভর করত। সে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করত, পাহারা দিত—শাসন করত।

এই কথাটি পরে বলতাম সলিলকে, অপরাধ যদি কর তবে সামান্য করো না। যে যত বড় অপরাধী তার তত সুবিধে।

সত্যি, মেটরা যে কি সুবিধেতে থাকত। ওদের তো কোন কাজ করতেই হত না, কয়েদীরা উল্টে বরঞ্চ ওদের হাত পা টিপে দিত।

ওরা আসতেই আমি ছুটে গেলাম রামলালের কাছে। গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

রামলাল সেই লোকটির পিঠ চুলকে দিচ্ছে আর হাসছে। পিঠ চুলকাতে পেরে ও যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে এমনি একখানা মুখভাব ওর।

আমি এক মিনিট তাকিয়ে রইলাম, তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে চলে এলাম, যতদিন রামলাল ওখানে ছিল কোনদিন আর ওর সঙ্গে কথা বলি নি-ও ডাকলে সাড়া দিই নি।

তারপর থেকেই চোখ খোলা রেখে চলতে সুরু করি। দেখলুম, দুনিয়াটা একটা বিচিত্র জায়গা।

—'দুনিয়াটা' ঠিক এই পৃথিবীর মত। কলেজ জীবনে সলিলকে বলেছিলাম। সলিলের তাকাবার একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ছিল। ভ্রূ দু'টো এমনভাবে কোঁচকাত যে মাঝখানে একটা চৌকো ঘর তৈরী হয়ে যেত আর চোখ দু'টো হ'ত গোল গোল। মনে হ'ত সব সময়েই যেন চোখের তারা দু'টি বিদ্রূপভরে ঝিকঝিকিয়ে হাসছে। ওর সেই নিজস্ব ভঙ্গীতে তাকিয়ে সলিল বলে, 'দুনিয়া' আর পৃথিবীর মধ্যে তফাৎ কি?

—দুনিয়া হচ্ছে পৃথিবীর ওপরটুকু, নিতান্তই মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত সেখানে মানুষ নামে এক জাতীয় জীব থাকে আর মনের বিচিত্র রংয়ে রঙীন হয়ে এক একটি অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে···

—তাই বুঝি। সলিল হেসেছিল।

—হ্যাঁ। পৃথিবী শুধু মানুষ নয়—শুধু প্রাণ নয়। আকাশ, বাতাস, মাঠ, মাটি, মাটির নীচের সব কিছু নিয়ে এই পৃথিবী।

কিন্তু দুনিয়াটা এই পৃথিবীরই মত। ওপরটি খোলা, সেখানে কত রকম রঙীন মেঘ—ভেসে চলা সাদা মেঘের নীচে কালো পাখীর ঝাঁক। তারপরে শক্ত মাটি, মাটির নীচে অতল গহ্বর। মানুষের মুখেও কত হাসি খুসি কথা—কতগুলি রঙীন মেঘ যেন দেহের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর দেহের নীচেই সেই অতল গহ্বর মন যার আদি অন্ত কিছুই পাওয়া যায় না।

৬

অনেক রাতে কিসের গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের মধ্যে অনুভব করছিলাম যেন অনেক লোক চেঁচাচ্ছে—জেগে উঠে বুঝতে পারলাম অনেক নয় মাত্র দু'জন আমার বাবা, মা। ওঁরা চেঁচাচ্ছিলেন না—চাপা গলায় কথা বলছিলেন কিন্তু কি যেন একটা তীব্র আক্রোশ সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠছিল বন্ধ ঘরটার চারপাশে।

মা রেগে রেগে কি যেন বললেন—কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারি নি কিন্তু তা যে খুবই খারাপ কথা সেটুকু বুঝতে পারলাম।

উত্তরে বাবা হুঙ্কার দিয়ে কি একটা বলে মাকে দু'টো চড় মারলেন। মাও চুপ করে রইলেন না। বাঘিনীর মত উঠে গিয়ে বাবার ওপরে পড়লেন। আমি উঠে বসে অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করলাম—দু'জনেই দু'জনকে মারছে? না, শুধু একজন মার খেয়ে যাচ্ছে—কিন্তু না, দু'জনেই সমানে মেরে যাচ্ছে, রামলালের মত ব্যবহার নয় দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপরে, কতক্ষণ পরে জানি না আবার জেগে গেলাম। তখন

বোধ হয় প্রায় সকাল হয়ে এসেছিল—অন্ধকারটা একটু পাতলা মনে হল, দেখলাম আমি অনেকটা দূরে খাটের এক কোণে শুয়ে আছি—আমার পাশে একটা ভারী পাশ বালিশ. মা ও বাবা শুয়ে আছেন অত্যন্ত পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি—মনে হচ্ছিল যেন তখনও মারামারি করছিলেন—তবে খুব আস্তে আস্তে···আর মনে হচ্ছিল মারামারি করতে ওঁদের ভাল লাগছে···

ফিসফিস কথা—আর ফ্যাঁসফেঁসে একটা শব্দ—কাঁদছেন কি মা; আবার সেই শব্দ তবে কি হাসছেন···কি জানি কি···আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম—

এ রকম প্রায়ই হতো, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আমি বাবা মার সঙ্গে এক খাটেই শুতাম—ঐ রকম অনেক রাত্রেই জেগে যেতাম—চাপা গলায় চীৎকার, চেঁচামেচি—কখনও কান্না···

তারপরে একদিন বড় দারোগার স্ত্রী এসেছিলেন। বলতে গেলে, তিনি অনেকটা মা'র বন্ধু। কাঁদছিলেন বড় দারোগার স্ত্রী, তাঁদের স্বামী স্ত্রীতে কি ঝগড়া হয়েছে—দারোগাবাবু না খেয়েই বেরিয়ে গেছেন—কাজেই স্ত্রীও এই বেলা চারটে পর্যন্ত অভুক্ত বসে আছেন—

—আমাদের ভাই, মা বেশ বাহাদুরী করে বললেন, এ রকম কখনও হয় না। ঝগড়া ঝাটি, না খেয়ে থাকা এসব কি কাণ্ড!

আমি আর থাকতে পারলাম না বললাম, হাঁ, তুমি আর বাবা তো রোজ রাত্রে ঝগড়া কর। খেয়ে দেয়ে নিয়েই তারপরে ঝগড়া কর না খেয়ে কি করে থাকবে···

আমার কথা শুনে মা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। দারোগার স্ত্রীর চোখের জল শুকিয়ে গেল—তিনি হাঁ করে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে হল যেন ফিক করে একটু হাসলেন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মা হঠাৎ উঠে এসে আমাকে একটা চড় কসিয়ে দিলেন। মায়ের অত রাগ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি আর মার হাতে চড় খেলাম এই প্রথম।

বিনা দোষে মা আমাকে মারলেন? কেন? কি জন্য? অন্ধ রাগে ফুলতে ফুলতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম মায়ের ওপর। তাঁকে আঁচড়ে, খিমচে, চুল টেনে অস্থির করে তুললাম। কেন তুমি আমাকে মারলে? কেন? কেন?

মা চুলের মুঠি ধরে আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, মেরে শেষ করে ফেলব—হতভাগা ছেলে। বাড়ীতে কি কেউ নেই—এই ছেলেটাকে ধরে···সব কি মরেছে!

ক্ষীরিদি রান্না ফেলে ছুটে এল। টানতে টানতে নিয়ে গেল আমাকে। আক্রোশ খানিকটা ওর ওপরেই মেটালাম। কিন্তু, একটু পরেই নিজে থেকে থেমে গেলাম। ক্ষীরিদির শান্ত মুখটায় আমার নখের আঁচড়ে রক্ত ফুটে উঠেছে।

কালো মুখে লাল টকটকে রক্ত। শান্ত দুটি সজল চোখ। দেখেই আমার হাত থেমে গেল। ক্ষীরিদির গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, তোমার লেগেছে।

ক্ষীরিদি একটু হেসে বললেন, না। কিন্তু, তুমি বড় দুষ্টু হয়ে গেছ, সোনামণি। কেন মাকে অমন করে মারলে? মাকে কি মারতে আছে?

ক্ষীরিদির অন্যায় অভিযোগে আবার রেগে গেলাম। আমি মাকে মারলাম তা অন্যায় হল—আর মা যে আমাকে শুধু শুধু আগে মারল?

—মা আমাকে আগে মারল কেন? চেঁচিয়ে উঠলাম আমি পাঁচ বছরের গলায় যতটুকু চেঁচান সম্ভব।

—মা মারলেই বা। ক্ষীরিদি আস্তে আস্তে বলে, মা কত বড়। কত বোঝান···কত ভাল···

—কিছু ভাল না মা। মা মিথ্যে কথা বলে—

—না, না, ও রকম বলতে নেই।

আমি আবার সেই পুরাণো কথার খুঁয়া তুললাম, মা কেন আমাকে মারল?

—তুমি নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছিলে?

—না, না, না। মা বাবা রাত্রে ঝগড়া করে সে কথা বলেছিলুম। সে তো সত্যি কথা। মিথ্যে তো নয়।

ক্ষীরিদি একটুখানি চুপ করে থেকে বলে, কারো ঝগড়ার কথা বলতে নেই।

—কি? চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, ঝগড়ার কথা বলতে নেই। তবে, সেদিন কেন মা ডাক্তারবাবুদের বাড়ীর ঝগড়ার কথা বারবার জিজ্ঞেস করল? তুমিও তো সেখানে ছিলে?

হ্যাঁ, ক্ষীরিদিও সেখানে ছিল। ক্ষীরিদিও নানা কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—হাঃ হাঃ করে জোরে হেসেছিল বর্ণনা শুনে।

তার আগের দিন আমি ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঠিক বেড়াতে নয়—আমার সমবয়সী বন্ধু সমীরের সঙ্গে খেলা করতে করতে ঢুকে পড়েছিলাম ওদের বাড়ীতে···

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। ডাক্তারবাবুকে আমি অনেকবার দেখেছি। ছাই ছাই রংয়ের ময়লা একটা কোট, আর অদ্ভুত আকারের একটা প্যাণ্ট পরে খুব ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করতেন। ওঁকে দেখে আমার ভয় হত। ওঁকে কোনদিন হাসতে দেখিনি।

ওঁকে ভয় পাবার আরও অনেক কারণ ছিল। জ্বর হলে আমার সবচেয়ে বড় বিভীষিকা ছিল যে ডাক্তারবাবু আসবেন। তেতো ওষুধ খেতে কিংবা না খেয়ে শুয়ে থাকতে আমার কষ্ট হত না। কিন্তু, ঐ যে একটা রুক্ষ শুকনো মুখ দেখতে হবে তা ভাবতেই একটা বিরক্তি, শুধু ঠিক বিরক্তি নয়—ভয়, বিরক্তি, ঘৃণা সব মিলে সে একটা কি রকম মনোভাব।

ঐ রকম মনোভাব হয়েছিল আমার প্রথম বার গোসাপ দেখে। টিকটিকির মত দেখতে গোসাপ—কিন্তু টিকটিকির চেয়ে হাজার গুণ বড় সেই জীব। গায়ে কালো হলদে আর চকচকে রংয়ে ডোরাকাটা। চোখ দুটো যেন পাথরের মত ঝকঝক্ করছে। সেই জীবটাকে দেখে ভয় হত—সেই সঙ্গে সঙ্গে কি রকম একটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য মনে আসত।

ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকে কোন কথা বলতেন না। প্রথমেই হাতটা নিয়ে নাড়ী দেখতেন। গলায় ঝোলান রবারের নলটা জোরে জোরে চেপে ধরতেন বুকে, খটখটিয়ে পেটে টোকা মারতেন, পেট টিপতেন—তারপরে প্রথম কথা বলতেন, জিভ দেখি।

আমি চুপ করে থাকতাম। উনি অন্যদিকে তাকিয়ে ঠিক তেমনি কণ্ঠে বলতেন, জিভ দেখি।

মা আমাকে বলতেন, লক্ষ্মী সোনা, জিভ বার কর।

কিছুই না ব্যাপারটা, জিভ বার করতে কোন কষ্টও নেই কিন্তু তবু প্রথম থেকেই এত বিরক্ত বোধ হত যে ইচ্ছে করেই মুখ টিপে থাকতুম—কিছুতেই জিভ বার করতুম না।

ডাক্তারবাবু দু'বারের বেশী বলতেন না। নিজের পকেট থেকেই কাগজ নিয়ে খস্‌খসিয়ে লিখতেন। কাগজটা নেবার জন্য মায়ের বাড়ান হাতের দিকে লক্ষ্য না করেই টেবিলের ওপরে রেখে চলে যেতেন।

হয়ত ডাক্তারবাবুকে আমি ভয়ই করতুম কিন্তু, আমি জানতে পেরেছিলাম—বাবা মা'র কথা থেকেই যে ডাক্তারবাবু আমার বাবার অনেক নীচে কাজ করেন। আমার বাবাকে যমের মত ভয় করেন উনি। তাই, তাই একটি অদ্ভুত তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা ছিল মনে।

আমরা দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা মাত্রই একটা বালিস এসে আমাদের গায়ের কাছে পড়ল। আমি একটু সরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বললুম, কে ছুঁড়ে দিল রে বালিসটা।

—মা। সমীর সংক্ষেপে বলে।

—মা? আমি আরও অবাক হই। তিনি হঠাৎ আমি ঢুকতে না ঢুকতেই বালিস ছুঁড়ে মারলেন কেন? আমি তো এই প্রথম এলাম এখানে—এসেই কি অপরাধ করলাম—না, এখানে আসাটাই একটা অপরাধ।

—তোকে নয় বাবাকে। আবার অতি সংক্ষিপ্ত জবাব সমীরের।

—বাবাকে—এবারে আরও বিস্মিত হবার পালা আমার। সমীরের মা ওর বাবাকে বালিস ছুঁড়ে মারছেন আর সমীর এমনভাবে কথা বলছে যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

—তোর মা···তোর বাবাকে···কথা শেষ করতে পারি না আমি।

—রোজই মারে। আয়, ভেতরে আয়। বইটা শেলফে আছে।

বই নেবার উৎসাহ আর আমার ছিল না। কিন্তু, তবু আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকি।

বারান্দায় ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়েছেন। খোলা গা, রোগা শীর্ণ দেহের হাড়গুলি দেখা যাচ্ছে। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন তিনি আর তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সাত আটটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর একজন মোটা স্বাস্থ্যবতী মহিলা।

ভদ্রমহিলা হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছিলেন—আমাকে দেখে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। উদ্যত হাত নামিয়ে ও মুখ বন্ধ করে কি যেন বলতে গেলেন আমাকে। কিন্তু, তার আগেই সমীর আমার হাতধরে টেনে বলে, চলে আয় বিমান।

আমরা পাশের একটা ছোট ঘরে ঢুকে যাই। সমীর দরজা বন্ধ করে দেয়।

বন্ধ দরজার ভেতর থেকেও আমি শুনতে পাই ওঁর প্রবল চীৎকার, মুখপোড়া, ঘাটের মড়া, কোন লজ্জায় আমার বালিস মাথায় দিয়ে শুয়েছিল। লজ্জা করে না, পিশাচের লজ্জা করে না—নিজে তো সব সময়ে নরকের মধ্যে আছে আবার আমাকেও তারি মধ্যে রাখতে চাইছে। দূর হয়ে যাও বাড়ী থেকে—ঐ বালিস নিয়ে দূর হয়ে যাও।

—কি এমন হয়েছে যে, তুমি এরকম চেঁচাচ্ছ। ডাক্তারবাবু আস্তে আস্তে বলতে চান···

—আবার কথা। মুখের ওপর কথা বলছ। মুখ ভেঙ্গে দেব না—

আমি আর শুনতে পারছিলাম না। উঠে দাঁড়ালাম।—সমীর, আমি যাচ্ছি, ভাই।

—সে কিরে? যে ছবিটা দেখাতে আনলাম সেটা দেখ। দশলক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে এই রকম জীব ছিল।

তাকিয়ে দেখলাম, গোসাপের মতই দেখতে—কিন্তু অনেক অনেক বড়—বোধ হয় দশলক্ষ গুণ কি তার চেয়েও বেশী বড় সেই জীবটা···

—মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব না···বেরো···বেরো বলছি···

এক মুহূর্ত দেরী না করে সমীরের সঙ্গে একটি কথাও না বলে আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। ওরা কেউ বারান্দায় নেই পাশের ঘরে।

শুনতে পাই একটা ছোট ছেলের গলা—মা, বাবা কাঁদছে···

তারপরে ডাক্তারবাবুকে অনেকবার দেখেছি ময়লা কোট আর অদ্ভুত দেখতে প্যাণ্ট পরে ঘুরতে—ওঁর মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিইনি আমি। ওঁর দিকে তাকিয়েছি আগ্রহভরে, জানতে চেষ্টা করেছি ঐ মুখটা শুকনো ও রুক্ষ হয়ে যাবার কারণ।

ডাক্তারবাবু আমাকে দেখতে এলে মিষ্টি করে কথা বলেছি নিজে থেকে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, একবার বলামাত্র জিভ বের করে দেখিয়েছি, আর···

আর কোনদিন গোসাপকে ঘৃণা করিনি।

থাক, যা বলছিলাম, একটু চুপ করে থেকে ক্ষীরিদি বলল, কারো ঝগড়ার কথা কাউকে বলতে নেই। তুমি তাই বলেছিলে, তাই তো মা রাগ করলেন।

—বলতে নেই? আমি জ্বলে উঠি, সেদিনের ডাক্তারবাবুদের বাড়ীর ঝগড়ার কথা মা শুনতে চায়নি বার বার। আমাকে বকেনি সবটা শুনে আসিনি বলে।

একটু থেমে বলি, তুমি। তুমিও তো মুখে কাপড় দিয়ে হাসছিলে ওদের ঝগড়া শুনে···তবে?

ক্ষীরিদি চুপ করে থাকে। আমিও একটু চুপ করে থেকে ফের আবার ধুয়ো তুলি, তবে কেন মা আমাকে মারল? কেন মারল?

—মা দুষ্ট তাই। ক্ষীরিদি আমাকে কোলে তুলে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলে, মা দুষ্টু, মা পাপী···মাকে মেরে···

হঠাৎ পেছনে যেন বোমা ফাটল।

—তোর কত বড় আস্পর্ধা রে ক্ষীরি, তুই আমাকে দুষ্ট পাজী বলিস। দাঁড়া, আসুন আগে বাড়ীতে—তোর একদিন কি আমার একদিন।

ক্ষীরির কালো মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে ও। [ক্রমশঃ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

যখন আমার জীবনে এসেছিলো প্রবল বিতৃষ্ণা আর হতাশার অন্ধকার,—ঠিক সেই সময় স্বর্গের দেবীর মত তুমি এলে, এক হাতে অমৃতের পাত্র আর অপর হাতে এক উজ্জ্বল আশার বাতি নিয়ে—তোমার প্রেমের স্পর্শমণি ছুঁইয়ে আমাকে খাঁটি সোনা করে নিলে।

আমি মদ ছাড়লাম। সমস্ত কুপথ, কুসঙ্গ ত্যাগ করে, আবার মানুষ হওয়ার সাধনায় ব্রতী হলাম। আবার বাঁচবার জন্যে কি আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগলো আমার মনে—কিন্তু বড় দেরী হয়ে গিয়েছিলো। প্রচুর দেনা আমার চারিদিকে। সুন্দরম—পাবলিকেশন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে! এই সময় আমার লেখক বন্ধু শ্রীনিবাস আয়ার বললো যে,—সে নিজে আমার পার্টনার হতে রাজি আছে এবং আর একজন পার্টনারকেও পাওয়া যাবে,—এই দু'জনের টাকায় ব্যবসা আবার দাঁড়িয়ে যাবে। রাজি হলাম ওর কথায়।

একদিন সন্ধ্যায় আয়ার নিয়ে এলো অপর পার্টনারকে। তাকে দেখে আমি ঘৃণায় কণ্টকিত হলাম! সে হচ্ছে কমলেশ কাপুর। ওর এখন প্রচুর টাকা। হীরে মুক্তোর গহনা আর দামী শাড়ী পরে, ক্যাডিলাক্ গাড়ী চড়ে এসেছে সে!

মনটা আহত পশুর মত গর্জন করে বললো—ওকে খুন করো।—কিন্তু তখনই মনে পড়লো ধ্রুবতারার মত শান্ত উজ্জ্বল তোমার মুখখানা। সামলে নিলাম নিজেকে। গম্ভীর ভাবে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ করলাম। আইন সম্মত লেখা পড়াও হয়ে গেলো। মাস ছয়েক আগেকার ঘটনা এটা। কিছুদিন বাদেই আমার ভুল বুঝতে পেরে দারুণ অনুশোচনায় বুকটা জ্বলে উঠলো।

কমলেশ প্রায়ই আসে—আর অনুরোধ জানায়, তাকে গোপন সন্ধানের জন্য।

আমি বেশ ভদ্রভাবেই জানিয়ে দিলাম ওকে যে, এই ধরণের কুপ্রস্তাব সে যেন না করে। আর আমি পবিত্র ফুলের মত একটি মেয়েকে বিয়ে করছি, সে কথা বেশ গর্বের সঙ্গে ওকে জানিয়ে দিলাম।

এরপর বেশ ঘটা করে হলো সুন্দরম্-এর বাৎসরিক উৎসব। ওদের দারুণ উপরোধে সেদিন একটু মদ আমাকে খেতেই হলো।

তারপর অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে শপথ করেছি—এদেশে আর থাকবো না।

তোমাকে বিয়ে করার পরেই সব ছেড়ে চলে যাবো। কোনো দূর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধবো আমরা। আমি করবো প্রফেসরী, আর ছোট্ট ফুলে ভরা একখানি ছবির মত বাড়ীতে, তুমি করবে স্বর্গ রচনা। আমি একান্ত অনুগত ভাবে বাস করবো তোমার স্বর্গে।

সেখানে থাকবে না কোনো কমলেশ বা ঐ ভদ্রবেশধারী শয়তানের দল, যারা মানুষকে অন্ধ পাতালে নামাবার জন্য অভিজাত নামের মুখোস এঁটে বেড়ায়।

আমার শোচনীয় দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছে মারুতি।

ওদের পাল্লায় পড়ে আরো কয়েকবার মদ খেলাম আমি। তারপর অনুতাপের জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটে গেছি তোমার কাছে। তুমি তোমার অপরিসীম করুণা-অমৃত ঢেলে মুছে দিয়েছো আমার অন্তরের দাহ-জ্বালা। সেদিন তোমাদের বাড়ীতে ক্যাপ্টেন হালদারকে দেখে বড় ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি, কারণ উনি যে আমার পূর্ব ইতিহাস জানেন।

তবুও ভেবেছিলাম যে, এ যাত্রা হয় তো আমি রক্ষে পাবো। তোমার কাছে সব কিছু বলে ক্ষমা চাইলে, তুমি আমাকে কখনই ফেরাতে পারবে না, সে বিশ্বাস আমার মনে তখনও ছিলো মারুতি। তাই ক্রিসমাসের দিন ফিরে আসবো স্থির করে, তোমাকে একটু লিখে জানিয়ে চলে এলাম—মনে শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য। ক্রিসমাসের দিন মাদ্রাজের অফিসেও উৎসব হবে জানলাম।

আমি ওদের জানিয়ে দিলাম যে, আমি থাকতে পারবো না, কোচিন যাবো।

যথাসময়ে ট্রেনে উঠে দেখি, মিঃ আয়ার আর কমলেশও চলেছে ঐ কামরায় কোচিনে। ভারি অস্বস্তিবোধ করলাম ওদের দেখে। ওরা বললো, কোচিনে কয়েকজন বড় লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ওরা যাচ্ছে। ক্রিসমাসের দিন মালাবার হোটেলে তাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে ডিনারে।

DL. 96-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আমি কোথায় উঠবো, ওরা জিজ্ঞেস করাতে বললাম—এর্ণাকুলামে উডল্যাণ্ডস্-এ আমি যাবো।

ওরা ভীষণ ভাবে আমাকে ধরে বসলো যে, মালাবার হোটেলে ওদের সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে, অন্তত ব্যবসার খাতিরে। ডিনারের পর ওরা আমাকে উড্ল্যাণ্ডস্-এ পৌঁছে দেবে।

কি যে করি, ভেবে পেলাম না। মনটা তো ছুটে তোমার কাছেই চলে গেছে, শুধু দেহটাকে ওরা পাকড়াও করে নিয়ে গেলো মালাবার হোটেলে।

আমাদের কামরায় সেদিন মিঃ পিল্লাইও ছিলেন, যিনি তোমাদের টেবিলে সেদিন ডিনার খেয়েছিলেন। ডিনারের সময় যদি হলে যেতাম, তাহলে প্রথমেই দেখতে পেতাম তোমাকে—আর ছুটে চলেও যেতাম তোমার কাছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের জন্তই বোধ হয় সেটা হল না। আয়ারের একজন খৃষ্টান-বন্ধুর বাড়ীতে রাতে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিলো।

দুজন লেখকও এসেছিলেন সেখানেই। খাওয়ার পর মালাবার হোটেলে আসা হল, মদ্যপান আর স্ফূর্তির জন্য। লোকের ভিড় আর আবছা আলোর জন্যেই বোধ হয় প্রথমে আমি দেখতে পাইনি তোমাদের। আর সারা দিনের নেশার ঘোরও কিছুটা দায়ী।

আমি অবশ্য এট' কিছুতেই অনুমান করতে পারিনি যে—কমলেশ আয়ার, বা অন্য কারুকে বাদ দিয়ে আমারই হাত ধরে টানবে ওর নাচের জুড়ি হবার জন্য। তারপর—নাচতে নাচতে হঠাৎ নজর পড়লো তোমার দিকে।

প্রথমে মনে হলো নেশার চোখে ভুল দেখছি, আবার দেখলাম। না ভুল নয়, ঠিক্ দেখছি—দুটি করুণাকাতর চোখ, স্থির হয়ে আছে এই বিশ্বাসঘাতকের দিকে। তারপর কিছুক্ষণ আমার কোনো অনুভব শক্তি ছিলো না। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত শুধু ঘুরপাক্ খেয়েছি কমলেশের সঙ্গে! ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পর ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম সোফায়।

একটু সামলে নিয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি নেই।

আমার মনে প্রাণে সুরু হয়েছে তখন প্রবল ভূমিকম্প। আমি দেখছি ভেঙে যাচ্ছে আমার সুখস্বপ্ন—আমার আশা, আমার প্রেমের অমরাবতী, সব ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে,—আর আমি পাষাণের মত নিথর হয়ে বসে দেখছি সব।

ওদের স্ফূর্তির পর, ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো—ওদের সঙ্গে আমি যাবো কি না। অথবা এর্ণাকুলামে পৌঁছে দিতে হবে কি না।

আমি বললাম—কোনটারই দরকার হবে না। ওরা চলে গেলো, আর আমি এসে দাঁড়ালাম ব্যালকনির এক কোণের অন্ধকারে-চোরের মত মুখ লুকিয়ে। তোমাকে একবার শেষদেখা দেখে নেবার আশায়। দূর থেকে দেখলাম তোমার বিষাদ-করুণ নত মুখখানা।

মনটা আমার হাহাকার করে কেঁদে উঠলো, ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাই, কিন্তু পারলাম না। পারলাম না মারুতি। সেই পবিত্র অধিকারকে যে আমি দু' পায়ে দলে ছিন্ন ভিন্ন করেছি। হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

সারাটা রাত আইল্যাণ্ডের পথে পথে, উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়ে, ভোরের ট্রেনে মাদ্রাজে রওনা হলাম।

বিবেকের দংশন আর যে আমি সইতে পারছি না, মারুতি। সে যে রক্তচক্ষু মেলে আমাকে বলছে—কোন্ অধিকারে তুমি হাত বাড়িয়েছিলে নন্দনের পারিজাতের দিকে? ভদ্রতার ছদ্মবেশে নিজের স্বরূপক গোপন করে, কেন গিয়েছিলে সেই পবিত্র ফুলটিকে হরণ করবার জন্য?—

এবার করো তার প্রায়শ্চিত্ত!

হ্যাঁ আমি প্রায়শ্চিত্তই করবো মারুতি! সুন্দরম্ পাবলিকেশনের, —সকল স্বত্ব, আমি আইনসঙ্গত সই করে ত্যাগ করেছি।

বাড়ী ঘর রেখে গেলাম,—আমার বাবার আমলের বিশ্বস্ত কর্মচারীর হেফাজতে।

ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিলাম আমার শেষ সম্বল। আজ আমি রওনা হবো নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবো! সাধু সঙ্গে নিজের দেহ মনের মালিন্য ধুয়ে ফেলে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় আমি চললাম মারুতি।

সঙ্গে রইলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাথেয় তোমার অপার্থিব প্রেমের স্মৃতি, আর তোমার ফটোখানি।

দূর থেকে চাইছি তোমার করুণা, তোমার শুভেচ্ছা, হতভাগ্যকে এটুকু দিও মারুতি। যদিও আমি মহাপাপী, তোমার বিশ্বাসের উপযুক্ত নই, তবুও বলছি, আমার এই কথাটি তুমি বিশ্বাস কোরো।

—তোমাকে আমি সত্যই ভালোবেসেছিলাম মারুতি। সে ভালোবাসায় কোনো কপটতা ছিলো না।

যদি কোনো দিন দেহ মনের গ্লানি মুক্ত হয়ে সত্যি মানুষ হতে পারি, তবে সেদিন ফিরে যাবো তোমার কাছেই। তোমার প্রেমপ্রার্থী হয়ে নয়। তোমার হৃদয়ে সার্বজনীন যে অনন্ত করুণার ভাণ্ডার আছে—আমার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আমি দাঁড়াবো সেইখানে। তার থেকে আমি কিছুটা পাবোই এই আশাই আমার জীবনের একমাত্র ভরসা রইলো।

যদি পারো এ দুর্ভাগাকে ক্ষমা কোরো মারুতি।

তুমি সুখী হও—এই আমার শেষ কামনা। ইতি

চির হতভাগ্য—

শঙ্করম্ আয়েঙ্গার।

চিঠি শেষ করে, আমি বিহ্বল ভাবে চাইলাম মারুতির দিকে। মনে হলো ও যেন পাথর হয়ে গেছে।

আমি বেদনার্ত কণ্ঠে ডাক্লাম—মারুতি।

—আমার দিকে চোখ তুলে চাইলো ও। নড়ে উঠলো ওর রক্তহীন বিবর্ণ ঠোঁট দুটো।—ওর জীবনের সব দুর্ভোগ, সকল বিড়ম্বনা নিয়ে, ও কেন আমার কাছে ফিরে এল না বন্ধু। ও কি জানতো না যে আমি শুধু ওর সুখের ভাগই চাই নি, ওর সব দুঃখের ভাগী যে হতে চেয়েছিলাম ভাই। আমার জীবন দিয়ে যে ওর মনের সকল গ্লানি আমি মুছিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম, এই সত্যটুকু কেন ও জেনে গেল না।

মনটা আমার চমকে উঠলো,—আশ্চর্য মেয়েটার অসাধারণ কথাগুলো শুনে। অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত আমি চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

মনে হলো কোনো দুর্লভ রত্ন ঝকমক্ করে জ্বলে উঠছে আমার চোখের সামনে। আমি ওর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললাম,—সে আবার আসবে বন্ধু। তোমার কাছে ফিরে আসার জন্যই তো সে গেছে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে। যে অমৃতের স্বাদ সে পেয়েছে তোমার কাছে তাকে হারাতে চায় না বলেই তো সর্বস্ব ত্যাগ করে সে চলে গেছে ভাই। অনুতাপের আগুনে জীবনের সব খাদ পুড়িয়ে, খাঁটি সোনা হয়ে, সে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসবে বন্ধু।

অটুট ধৈর্যের পর্বত এতদিনে ভেঙে পড়লো আর সেই ভাঙা ফাটল দিয়ে ঝরে পড়তে লাগলো সহস্রধারা।

কাঁদুক। প্রাণভরে কাঁদুক ও।

ওর অন্তরবনে খাণ্ডব দাহন শেষ হয়েছে, এখন মনের আকাশে জমেছে রাশি রাশি মেঘের স্তূপ। সহস্র ধারায় ঝরে ঐ সজল মেঘ নিভিয়ে দিক ওর অন্তরের দাবানলকে।

দু'হাতে চোখের জল চাপতে চাপতে কান্না ভাঙা গলায় বললো মারুতি,—সেই আশা নিয়ে—আমি ওর জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করবো ভাই।

মারুতি মেননের আশ্চর্য দুর্বোধ্য স্বভাবকে উপলব্ধি করবার মত উপযুক্ত মস্তিষ্ক আমার নেই, সে কথা আমি অকপটেই স্বীকার করছি।

ওর মনোজগতে এমন সাংঘাতিক বিস্ফোরণ ঘটবার পরেও বহির্জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার ওপর তার বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ঘড়ির নির্ভুল কাঁটার মতোই ও নিজের দৈনন্দিন কর্তব্যের সঙ্গে পা ফেলে চললো দেখে আমি মনে মনে বার বার প্রণাম জানালাম মহীয়সী নারীর চরণে।

প্রতিদিনের মতো ওর বাবার কাজকর্ম করলো, দুপুরে আর রাতে খাবার টেবিলে পরিবেশন করলো, আমার কাছে গানও শিখলো। আবার পরদিন বাংলার ক্লাশে অধ্যাপনা করলো, ছাত্রীদের গানও শেখালো ধৈর্য আর নিষ্ঠার সঙ্গে। সমস্ত ক্ষণই আমি ছিলাম ওর পাশে। মানসিক বিপর্যয়ের এতটুকু রেখাও দেখলাম না ওর মুখে চোখে।

আমি কিন্তু সুস্থ ছিলাম না। সারাটা রাত ছট ফট করেছি এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণায়। কান্নার ঢেউ যেন বুকটাকে আমার ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে, তবুও চোখে নামলো না এক ফোঁটা জল। সকালে ঘুম থেকে ওঠবার পর নিজেকে বড় দুর্বল বলে মনে হলো। হাত পা যেন ভেঙে ভেঙে পড়ছে, মাথা ঘুরছে, বুকের ভেতর টিপ টিপ করছে। মনে হচ্ছে যেন কি এক সাংঘাতিক অপরাধ করে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কাল চলে যাবো তাই বাংলা ক্লাশের পর মারুতি

বললো—চলো ভাই পাড়াপড়শীর সঙ্গে দেখা শোনা বিদায় নেওয়ার পালাটা সেরে নাও এবেলা। ওবেলা হয় তো বাড়ীতে কেউ এসে পড়তে পারে, তখন আর বেরুনো যাবে না।

আমি অলসভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়েই জবাব দিলাম—পারছি না। আমি যে চলতে ফিরতে এখন পারছি না ভাই।

—কি হলো? আবার অসুখ বিসুখ বাধালে নাকি। দেখি দেখি। গায়ে হাত দিয়ে বললো মারুতি—গাটা যেন ভালো বোধ হচ্ছে না—তাহলে বেরিয়ে কাজ নেই এখন, বিশ্রাম করো।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। খাবার সময় আমাকে ডাক দিলো মারুতি। উঠে দেখি, আমার জিনিষপত্র সব ও গুছিয়ে ফেলেছে।

লজ্জিত হলাম নিজের দুর্বলতার জন্য। বললাম ওকে—সব তো রেডি করে রেখেছো দেখছি, আমাকে বিদেয় করবার জন্যে।

—হাঁ এবারে তোমাকে ভালোয় ভালোয় মাসীমার হাতে পৌঁছে দিতে পারলেই বাঁচি ভাই। তোমার সোনার অঙ্গ বন্ধুর দুঃখের তাপ লেগে গলতে সুরু করেছে যে। তোমাকে ধরে রাখার আর সাহস কোথায় পাই?—হাসতে হাসতে জবাব দিলো মারুতি।

—তুই অমন করে হাসিস না মারুতি। আমি যে তোর হাসি আর সইতে পারছি না।

বলতে বলতে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লাম ওর বুকের ওপর।

বিকেল হতেই পাড়াপড়সীরা সবাই একে একে আসতে সুরু করলেন আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য। সাবেষ্টিন আর কায়রণও এলো ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে।

মনে বুঝলাম—মারুতিই সকলকে খবর দিয়েছে। আমার শরীর মন দুই খারাপ, হয় তো বেরুতে পারবো না—সেই ভেবে মারুতি নিজেই সকলকে খবর দিয়ে দিয়েছে।

নতুন করে ওর প্রতি কি আর কৃতজ্ঞতা জানাবো? ওর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় আমার মনটা তো ভরপুর হয়ে আছে! ওর বন্ধুত্ব যে আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

মারুতি আমাকে বললো—তুমি তাহলে একটু গল্পগুজব করো, সকলকার সঙ্গে, আমি চট করে একবার ব্রডওয়ে থেকে ঘুরে আসছি! নানা ঝামেলায় ক'দিন তো বেরুতেই পারিনি। চলে গেলো মারুতি।

আমাকে উপহার দেবার জন্যই কিছু সওদা করতে গেলো মারুতি,—সেটুকু বুঝতে কষ্ট হল না।

একটি ভারি ওজনের ডবল ষ্ট্যাম্প মারা খাম বেয়ারা এনে দিলো আমাকে।

খামটি দেখলাম, আসছে কাবেরী কৃষ্ণমূর্তির কাছ থেকে।

এতদিনে তাহলে কাবেরীদি আমার চিঠির জবাব দিলেন?

• কি এত লিখেছেন তিনি?" খামটা এত ভারি কেন? ব্যাঙ্গালোর'র কি খবর আছে ওতে? পুলক বিষাদ মিলিত উত্তেজনায় বুকটা কেঁপে উঠলো, দেহ হলো রোমাঞ্চিত। চিঠিটা তখন পড়লাম না। সকলে চলে গেলে ধীরে সুস্থে পড়বো বলে রেখে দিলাম। সন্ধ্যার পরেই একে একে সকলে বিদায় জানিয়ে এবং আগামীর জন্যে সাদর অনুরোধ জানিয়ে চলে গেলো।

আমি ওপরে, নিজের ঘরে গিয়ে, কাবেরীদির চিঠিটা পড়তে সুরু করলাম। কাবেরীদি লিখেছেন।

—তোমার চিঠির জবাব দিতে দেরী হলো কারণ আমি একমাসের কিছু বেশী হল, মাদ্রাজে এসেছি আমার বাপের বাড়ীতে। তোমার চিঠি ব্যাঙ্গালোর ঘুরে তারপর এখানে এসেছে, তাই আমার চিঠি পেতে দেরী হয়েছিলো।

আমি জানি মারুতিকে তোমার ভালো লাগবে, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছিলাম। তুমি যে ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলে বা গানের আসরে গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছো, সে খবর আমি আগেই পেয়েছি যোগলেকারের কাছে। সে ও ঐ সময়ে মাইসোরে গিয়েছিল তার পিসিমার বাড়ীতে। ওর পিসতুতো বোন চন্দ্রমা দেশাইও গান গেয়েছিলো ঐ সঙ্গীত সম্মিলনীতে,—শুনেছো বোধ হয়। ব্যাঙ্গালোর খবর জানতে চেয়েছো তুমি, সে দুঃখের খবর জানাতে, বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমাদের আনন্দের হাট ভেঙে গেছে। শান্তাদি আর মিষ্টার চাটার্জি আমাদের সব আনন্দকে হরণ করে নিয়ে চলে গেছেন। আরেকটি দুঃসংবাদ,—ব্যাঙ্গালোর শ্রেষ্ঠ গোলাপ বাগিচা, যেটি ছিলো যোগলেকরের বাড়ীতে, তার আর কোনো চিহ্ন নেই এখন। সব গাছ শুকিয়ে মরে গেছে। আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গেছে বাগানটা। দেখলে তোমারও চোখে জল আসবে, কারণ আমি জানি তোমার বড্ড ভালো লাগতো ঐ গোলাপ বাগিচাটাকে।

—তোমার দিদির অধিকারে তোমাকে আরো কিছু আমি বলতে চাই রমলা। তোমার শান্তাদি বেঁচে থাকলে, হয় তো এ কাজের ভার তিনিই নিতেন—কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তিনি নেই, তাই এ কথাগুলো যদি আমি তোমাকে না জানাই, তবে হয় তো এ জীবনে তোমার আর জানা হবে না। আমি জানি পবিত্র হৃদয় নামে বস্তুটি তোমার ভেতর আছে। সেই হৃদয় দিয়ে আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে তুমি, এই ভরসায় এ সব কথা তোমাকে লিখতে পারছি।

তুমি হয় তো জানো, যোগলেকার আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে—ঠিক নিজের দিদির মত। আর আমিও তাকে স্নেহ করি নিজের ভাই-এর মত।

ব্যাঙ্গালোর'য় যখন তুমি ছিলে, তখন আমি তোমাদের অনুরাগের ব্যাপারটাও অনুমান করেছিলাম।

যাহোক এবারে আসল কথা বলি।

শান্তাদি আর মিষ্টার চাটার্জির মৃত্যুর ঠিক পরের দিন, ব্যাঙ্গালোরে ফিরে এলো যোগলেকার। আর এসেই এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

তারপর থেকেই ও যেন কেমন ধারা হয়ে গেলো। কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতো না, শুধু কাজ করতো আর একলা বাড়ীতে থাকতো। ধীরে ধীরে ওর অবহেলার জন্য ওর অত সাধের গোলাপ গাছগুলো শুকিয়ে মরে গেলো।

ওর এই উন্মনা ভাবটা আমাদের সকলকার কাছেই কেমন হেঁয়ালির মত মনে হলো। শাস্ত্রাদি আর মিষ্টার চাটার্জির জন্ম আমরা সকলেই মর্মাহত ছিলাম বটে, কিন্তু যোগলেকারের এমন ধারা পাথর হয়ে যাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকেছিলো আমাদের কাছে। আমার মনটা কাঁদতো ওর জন্তে। তাই মাঝে মাঝে কিছু খাবার তৈরী করে নিয়ে গেছি ওর জন্তে।

বাগানটা দেখে চোখে জল এসেছে। ওর স্বপ্নমহালে জমেছে, রাশি রাশি আবর্জনা আর শুকনো পাতার রাশ। মরা গোলাপলতা-গুলো এধারে ওধারে ঝুলছে। তার মাঝখানে বসে ও একলা,— আপন মনে ভায়োলিন বাজাচ্ছে দেখে, আমি অবাক হয়ে ভেবেছি যে ও কেন এমন ধারা হয়ে গেলো। নিশ্চই এর ভেতর গুরুতর কোন কারণ আছে।

ওর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের জন্ম বার বার এগিয়ে গিয়েও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি নি আমি।

বছর দু'য়েক কেটে যাবার পর একদিন শুনতে পেলাম যোগলেকারের খুব অসুখ। আমরা দেখতে গেলাম। দেখলাম ভীষণ জ্বরের ঘোরে ওর প্রায় অচেতন অবস্থা। সেবা করবার কেউ নেই। মিষ্টার কৃষ্ণমূর্তি আমাকে ওর সেবার ভার নিতে বললেন, কাজেই আমি থেকে গেলাম ওখানে।

বিকারের ঘোরে যোগলেকার বার বার ডেকেছে তোমার নাম ধরে।

প্রায় দিন পনেরো পরে ও সুস্থ হয়ে উঠলো। তার কয়েকদিন পরে আমি একদিন বললাম ওকে—জ্বরের ঘোরে বার বার যার নাম ধরে ডেকেছিলে, তার সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হলো কেন?

প্রথমে ও চম্‌কে উঠলো আমার কথা শুনে। বললো, জ্বরের ঘোরে কি বলেছি তাতো আজ মনে পড়ছে না।

আমি একটু হেসে বললাম— মনে ঠিকই আছে তবে আমাকে বিশ্বাস করে সে কথা বলা যায় কি না, সেটা ভাববার কথা বটে। আমার কথায় ছল ছল করে উঠলো ওর চোখ দুটো।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর বললো,—আপনার স্নেহের অমর্যাদা করবো না ভাবি! মা ছাড়া এত স্নেহ যে আমি আর কারুর কাছে পাই নি!

আজ আমার সব কথাই বলবো আপনাকে।

বল্লারশায় তোমাদের প্রথম অনুরাগের কথা, তারপর একোচিনের সব ব্যাপার, বিচ্ছেদের কথা সব কিছু আমাকে খুলে বললো যোগলেকার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কমলেশের সঙ্গে তুমি হঠাৎ অতটা মেলামেশাই বা করলে কেন?

ও জবাব দিলো—সমুদ্রের ধারে ঢেউ-এর টানে যখন কমলেশ নেমে যাচ্ছিলো, তখন ওকে রক্ষে করার স্বাভাবিক নিয়মেই আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি ধারণাও করতে পারি নি যে রমলাকে আঘাত করবার জন্তই কমলেশ ইচ্ছে করে বার বার ঢেউ-এ তলিয়ে যাবার অভিনয় করছে।

রমলার পছন্দকরা কৃষ্ণমূর্তিটাও ছিনিয়ে নিয়েছিলো আমার পকেট থেকেই টাকা নিয়ে। সে যে ঐ একই কারণে তখন বুঝতে পারি নি আমি!

বুঝতে পারি নি বলেই যখন রমলা সমুদ্রের ধারে প্রথম আমার ওপর রাগ করেছিলো, তখন আমি ভেবেছিলাম—এটা ওর মনের সঙ্কীর্ণতা।

তারপর যখন ও বোলগাডিন দ্বীপে গেলো না, আমার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে লাগলো, তখন আমি ভেবেছিলাম এটা ওর আভিজাত্যের অহঙ্কার। ও বড়লোকের মেয়ে তাই হয় তো চাইছে যে, আমি সর্বদা ওর মন জুগিয়ে চলি। বিশেষ করে ঐ জঘন্ত মেয়েটার প্রতি আমার দুর্বলতার ইঙ্গিতে আমার আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লাগলো। আমিও স্থির করলাম,—ওকে আমি এ আঘাত ফিরিয়ে দেব।

এইটুকু বলে চুপ করলো যোগলেকার! অন্তমনস্ক ভাবে চেয়ে রইলো ওর কাঁটাজঙ্গলে ভরা বাগানটার দিকে।

আমি বললাম—ভাবি ভুল তুমি করেছিলে ভাই। মেয়েদের মনের খবর যদি জানতে, তাহলে বুঝতে পারতে যে, ওরা অপরের প্রতি তার প্রিয়জনের সামান্ত মনোযোগই যে সইতে পারে না। এই ঈর্ষা প্রেমেরই রূপান্তর মাত্র।

ফিরে চাইলো আমার দিকে যোগলেকার। কি এক মর্মান্তিক বেদনায় কাতর ওর চোখ দু'টো। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললো ও,—হ্যাঁ ভাবি। কত বড় যে ভুল করেছিলাম সেটা বুঝতে পারলাম ওর সঙ্গে পেরেঙ্গেল কুঠি যাবার পথে। রমলার অসুস্থ শরীর দেখেও আমি চলে এলাম কমলেশের অনুরোধে। এটা যে আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয়েছিলো, তা আজও ভেবে পাই নি। যাহোক আমার এই হঠকারিতা দেখে কমলেশ বোধ হয় মনে করেছিলো যে আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। সেজন্ত গাড়ীতে সে আমার গায়ের ওপর এলিয়ে পড়তে চাইলো। হাত ধরে প্রেমের কথাও শুরু করলো।

তখনই আমি বুঝলাম যে, এই ইতর মেয়েটাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। আর রমলা যে এই কারণেই মনে ব্যথা পেয়ে অভিমান করে আমার কাছ থেকে সরে গেছে, সেটা সে ঠিকই করেছে। সত্যিই আমি বড় ভুল বুঝেছি তাকে। আমি রূঢ় ভাষায় বললাম কমলেশকে; যে ওর সঙ্গে প্রেম করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

চালাকুঠিতে পৌছবার আগেই গাড়ীটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলো। ড্রাইভার বললো,—এ গাড়ী আর চলবে না।

তখন কমলেশ বললো,—পথ তো আর বেশী নয়, ট্রেনে গিয়ে তারপর চালাকুঠি থেকে ট্যাক্সি নেওয়া যাবে।

আমি রাজি হলাম না। ঐ জঘন্ত মেয়েটাকে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মনটা ব্যাকুল হলো, রমলার কাছে ফিরে গিয়ে ক্ষমা চাইবার জন্ত। যে ট্রেন পরে পাওয়া গেল, সেই ট্রেনে আমি ফিরে এলাম কোচিনে। কমলেশও এলো, কারণ টাকা খরচের ভয়ে। পরের ঘাড় ভেঙেই চালানো ওর স্বভাব কিনা।

মালাবার হোটেলে ফিরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। মিঃ চ্যাটার্জীর অসুখ সংবাদ পেয়ে চলে গেছে রমলা আর শান্তাভাবি। বিবেকের দংশনে জলে-পুড়ে গেল মনটা। মিঃ চ্যাটার্জীর কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে? তিনি যে আমার ভরসায় ওদের পাঠিয়েছিলেন। আমি তো সে দায়িত্ব পালন করি নি। হায়, কোন্ শয়তান ভর করেছিলো আমার মাথায়। আমি কেন গিয়েছিলাম ওই পাপিষ্ঠার সঙ্গে? পাগলের মত আমি চলে গেলাম ষ্টেশনে। সেখানে সারা রাত কাটিয়ে ভোরের ট্রেনে রওনা হলাম।

বল্লারশায় ফিরে এসে আমি ওদের কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগটুকুও আর পেলাম না ভাবি। সকলেই চলে গেছে। শুধু অপরাধের বিরাট বোঝাটা মাথায় নিয়ে আর অনুতাপের দাহ-জ্বালা বুকে নিয়ে আমি রইলাম একা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তারপর তুমি নিজের ভুল স্বীকার করে রমলাকে চিঠি দিলে না কেন?

—সে অধিকার আর আমি কোথায় পাবো ভাবি? তাকে যে আমি আরব সাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। দু' হাতে মুখটা ঢেকে জবাব দিলো ও।

একটু পরে আবার বললো যোগলেকার—তার সঙ্গে এ জীবনে হয় তো আমার আর দেখা হবে না। তাই আপনাকে বলে যাই, যদি কখনও আপনি তার দেখা পান তো আমার এই কথাটা তাকে জানিয়ে দেবেন ভাবি যে,—আমার কাছে সূর্যের মত গৌরবোজ্জল আর সত্য তার আর আমার বল্লারশা'র দিনগুলো। মালাবার হোটেলের দিনগুলো ভুল আর মিথ্যে। সে দিনগুলো আমার জীবনের মস্ত অভিশাপ।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।

—মধুসূদন দত্ত

মঙ্গল গ্রহ

শ্রীপ্রণব রায়

[আকাশের লাল গ্রহের রহস্য ভেদ করার জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ বা Space Satellite-এর সাহায্যে এ গ্রহ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানতে পারব।]

মানুষ কেবল তার নিজের গ্রহ পৃথিবী নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, সে তার প্রতিবেশী সম্বন্ধে জানবার জন্য উৎসুক। এই কৌতূহলের জন্যই আজ বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কৌতূহল না থাকলে আজকের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হত না। বহু যুগ ধরে আকাশের এই লাল গ্রহ সাধারণ লোক ও জ্যোতির্বিদদের মনে কৌতূহল জাগিয়েছে। পৃথিবী ছাড়া আর অন্য কোন গ্রহে কি প্রাণের অস্তিত্ব আছে? মঙ্গল হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব এবং সেই কারণেই বিজ্ঞানীরা এই গ্রহ সম্বন্ধে জানতে এত আগ্রহান্বিত।

চাঁদের পরেই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল। রাতের আকাশে লাল রংয়ের উজ্জ্বল যে গ্রহ দেখা যায় সেটাই হচ্ছে মঙ্গল—একটি ক্ষুদ্র গ্রহ যার ব্যাস পৃথিবীর অর্ধেক (৪,২০০ মাইল) ও ওজন পৃথিবীর এক দশমাংশ। দিবারাত্র প্রায় পৃথিবীর মত এবং ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলের কক্ষ কেন্দ্রচ্যুত (eccentric orbit) এবং পনের বছরে একবার পৃথিবীর খুব নিকটবর্তী হয়। গত ১৯৫৬ সালে পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়েছিল এবং তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ছিল ৩৫০ লক্ষ মাইল অর্থাৎ চাঁদের থেকে ১৫০ গুণ দূরে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও একে ভাল করে দেখা সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা নিরস্ত হননি। কয়েকজন বিজ্ঞানীর অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং ধৈর্যের ফল আমরা আজ এ গ্রহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

পোলার ক্যাপ ঃ—এ গ্রহের উল্লেখযোগ্য যা তা' হচ্ছে মেরু প্রদেশে সাদা বলয় বা polar cap—এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। এটা শীতকালে বাড়তে থাকে ও বসন্ত ঋতুতে আকারে ধীরে ধীরে কমে যায়। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কিউপারের (Kuiper) মতে এটা কতকগুলো বরফখণ্ড এবং উনি তা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। স্পেক্ট্রোফটোমিটারের (spectrophotometer) সাহায্যে যে স্পেক্ট্রা (spectra) পেয়েছেন তা' হচ্ছে জমা জল এবং এ থেকে আরো জানা যায় যে এটা ঠিক বরফ নয়, খুব সম্ভবত পাতলা তুষারবৎ পদার্থের আবরণ। শীতকালে জল জমা হয়ে তুষারবৎ পদার্থে পরিণত হয় এবং বসন্তকালে সূর্যের তাপে তা' গলতে সুরু করে, যার ফলে এর আকৃতি হ্রাস পায়।

মরুভূমি ঃ—গ্রহের তিন-চতুর্থাংশ উজ্জ্বল লাল বা হলদে রং ঢাকা। এ অংশটুকু হচ্ছে বালির মরুভূমি। লোহার অক্সাইডের দরুণ এর রং লাল। এই রং সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানা মত পোষণ করেন, তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, গ্রহের এ অংশটুকু হচ্ছে বালির মরুভূমি।

বায়ুমণ্ডল ঃ—মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না তবে গ্রহের গঠনাকৃতি থেকে এটা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, এ গ্রহে হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম জাতীয় হাল্কা গ্যাসের অস্তিত্ব নেই এবং এ গ্রহে যে অক্সিজেন নেই সেটাও প্রমাণিত হয়ে গেছে। অক্সিজেন থাকলেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের এক হাজার এক ভাগের বেশী থাকা সম্ভব নয়। গ্রহের বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে নাইট্রোজেন, তাছাড়া রয়েছে কার্বনডাইঅক্সাইড ও নিষ্ক্রিয় আর্গন। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। উইলসন অবজারভেটোরীর বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গলগ্রহে জলীয় বাষ্প বর্তমান এবং তা' পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শতকরা এক ভাগেরও কম। জলীয় বাষ্পের অভাবের দরুণ গ্রহের অধিকাংশই শুষ্ক।

মেঘ ঃ—এই গ্রহে তিন প্রকারের মেঘ দেখা যায়। (১) নীল মেঘ, (২) হলদে মেঘ (৩) শুভ্র মেঘ।

নীল মেঘ কেবলমাত্র নীল ও হলদে আলোতে দেখা যায়। হলদে মেঘ কেবল হলদে ও লাল আলোতে দেখা যায় এবং সম্ভবত এগুলো মরুভূমির ঝড়ের বালি কণিকা। আর শুভ্র মেঘ বরফের ক্ষুদ্র কণিকা। কারণ, যখন গ্রহ সূর্য থেকে দূরে থাকে তখন এই মেঘ দেখা যায় না। গ্রহের মেঘের গতির থেকে বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বলে নির্ণয় করা হয়েছে।

আবহাওয়া ঃ—গ্রহের তাপমাত্রা শূন্যের নীচে, ৩০ থেকে ৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। দুপুরবেলা যখন মঙ্গল সূর্যের নিকটবর্তী হয় সে সময় এর বিষুব প্রদেশের শূন্য ফারেনহাইটের উপরে থাকে এবং উজ্জ্বল অংশের তাপমাত্রা ৭০° ফা: ও অন্ধকার অংশের তাপমাত্রা ৮০° ফা: পর্যন্ত পৌঁছায়।

মঙ্গলগ্রহের রাত খুব ঠাণ্ডা—তাপমাত্রা শূন্যের নীচে ৭০° ফা: পর্যন্ত নেমে যায়। গ্রহের বায়ুমণ্ডল হাল্কা ও শুষ্ক হওয়ার দরুণ তাপরক্ষণ ক্ষমতা খুব কম।

প্রাণের অস্তিত্ব ঃ—মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা খুব আশান্বিত নহেন কারণ প্রাণের জন্য যে অবস্থার দরকার এখানে তার অভাব রয়েছে। তবে গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে মনে হয়। গ্রহের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে অন্ধকার প্রদেশ। অনেকের মতে উদ্ভিদের ক্লোরোফিলের দরুণ গ্রহের এই অংশ অন্ধকার। কিউপার (Kuiper) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে বলেন যে, এই গ্রহে লাইকেন, মস্‌ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সকল নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ এখানকার শুষ্ক আবহাওয়া সহ্য করার পক্ষে খুবই উপযোগী।

১৯৫৬ ও ১৯৫৮ সালে উইলিয়াম সিনটন এই গ্রহে জৈব-রসায়ন অণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং তা সম্ভবত মিথেন জাতীয় (CH4) জৈব-রসায়ন। তাঁর মতে মঙ্গল গ্রহে cladophora নামক গুল্ম জন্মানোর খুবই সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটা কার্বহাইড্রেট অণু দ্বারা গঠিত।

খাল :—১৮৭৭ সালে সিয়াপারেলি (Schiaparelli) নামক বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহের উজ্জ্বল অংশে কতকগুলো সূক্ষ্ম সরল রেখা আবিষ্কার করেন, যাদের নামকরণ করা হয় বা canali বা শাখা খাল। এর পর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ছোট ছোট সরলরেখা অন্ধকার অংশে দেখতে পান এবং এদের মাঝে গোলাকার বিন্দুও দেখা যায় যাদের বলা হয় লেক বা মেরুস্থান। এই সকল খালের জ্যামিতিক আকৃতি, ঋতুর পরিবর্তনে এদের আকৃতির পরিবর্তন ইত্যাদি থেকে বহু বিজ্ঞানীর এটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এই সকল খাল কোন বুদ্ধিজীবী জীবের দ্বারা তৈরী এবং এগুলো শুষ্ক গ্রহের জল সিঞ্চনের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই খালের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।—দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। তা সত্ত্বেও কয়েকজন বিজ্ঞানী এমন দাবীও করেন যে, তাঁরা মঙ্গল গ্রহের খালের স্পষ্ট ছবি তুলেছেন। কেবলমাত্র বেলুন বা কৃত্রিম উপগ্রহ (space satellite) থেকে তোলা ছবি এর সঠিক মীমাংসা করতে পারবে।

মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আরো অনেক কিছু জানার জন্য গবেষণা করছেন, কারণ মঙ্গলগ্রহ হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। বেলুনের দ্বারা পরীক্ষার ফলে এই গ্রহে হাইড্রো কার্বনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে যদিও এটা নিশ্চয় করে প্রাণের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করে না. তবু এটা আশার আলো দেখায়। এইজন্য জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেছেন।

মঙ্গলগ্রহে যাবার সময় এই পৃথিবীর কোন জীবাণু যাতে না যেতে পারে বা গ্রহ থেকে পৃথিবীতে কোন জীবাণু না আসতে পারে তার জন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। আওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Space Summer School'-এ বিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করেছেন যে, মঙ্গল গ্রহকে পৃথক করে রাখতে হবে যাতে এটা পৃথিবীর কোনকিছু দ্বারা সংক্রামিত না হতে পারে এবং জীববিজ্ঞানীরা সেখানকার জীব সম্বন্ধে (যদি তার অস্তিত্ব থাকে) সুষ্ঠু ভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন।

দুটি গ্রন্থির কয়েকটি কথা

সুব্রত পাল

আজ যে দু'টি গ্রন্থির কথা বলবো তাদের ক্ষরিত হর্মোনগুলির ক্রিয়াকলাপে বৈচিত্র্য না থাকলেও শরীরের আভ্যন্তরীণ সুষমা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এদের অবদান অবিস্মরণীয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি সংখ্যায় একাধিক, সাধারণত চারটি। এগুলি থাইরয়েড গ্রন্থির পশ্চাদ্ভাগে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন থাকে। তবে অবস্থানের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হলেও থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্যারাথাইরয়েড-এর কাজের কোনই মিল নেই। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হর্মোনকে বলা হয় প্যারাথর্মোন। এই হর্মোন রক্তের ক্যালসিয়াম এবং অজৈব ফসফরাসের আনুপাতিক সমতা রক্ষা করে। এই গ্রন্থি জীবনের পক্ষে অপরিহার্য।

এই হর্মোনের আধিক্যের ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়, অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম দ্রুত বেরিয়ে আসতে থাকে। ফলে অস্থি নরম এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং নানা অস্থি বিকৃতির সূচনা হয়। পক্ষান্তরে, প্যারাথাইরয়েড হর্মোনের স্বল্পতা টিটানী নামক রোগের মূলীভূত কারণ। এই রোগে ক্যালসিয়াম অত্যন্ত কমে যায়। ফলে স্নায়ু এবং মাংসপেশীগুলি অত্যধিক উত্তেজনা প্রবণ হয়ে ওঠে। সমস্ত দেহে পেশীর অস্বাভাবিক খিঁচুনী শুরু হয়। হাত, পা, হাত ও পায়ের আঙুল প্রভৃতি বেঁকে যায়। স্বরযন্ত্রের পেশীর খিঁচুনীর ফলে স্বরবিকৃতি প্রকাশ পায়। হাত পায়ের সূক্ষ্ম কম্পনও এই রোগের অন্যতম মৌল লক্ষণ। রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাসই এই সব অনভিপ্রেত উপসর্গের মূল কারণ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, পিটুইটারী গ্রন্থির "প্যারাথাইরয়েড উদ্দীপক" হর্মোনটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির গঠনগত অখণ্ডতা এবং ক্ষরণ-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। আবার পিটুইটারীর প্যারাথাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোনের পরিমাণ নির্ভর করে রক্তের ক্যালসিয়ামের মাত্রার ওপর। এই পারস্পরিক সহ-অবস্থানকে বলা হয় "পিটুইটারী প্যারাথাইরয়েড চক্র।"

এবার বলবো অ্যাড্রিনাল মেডালার কথা। ইতিপূর্বে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স-এর কথা বলেছি। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে যেমন কর্টিকো-ষ্টেরয়েড হর্মোনগুলি ক্ষরিত হয় অ্যাড্রিনাল মেডালা থেকে ক্ষরিত হয় অ্যাড্রিনালিন।

এই হর্মোনটিকে শারীর তত্ত্ববিদগণ "আপৎকালীন প্রতিরক্ষক" বলে বর্ণনা করে থাকেন। কারণ শরীরের আকস্মিক আপৎকালে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সাংঘাতিক কোন বিপর্যয় বা বৈপ্লবিক দুর্ঘটনা ঘটলে অ্যাড্রিনালিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এর প্রভাবে ত্বক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং উদর-গহ্বরের মধ্যস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রের রক্ত প্রণালীগুলি সংকুচিত হয়। অন্যদিকে, মাংসপেশী, হৃৎপিণ্ড ফুসফুস এবং মস্তিষ্কে রক্ত নালীগুলি প্রসারিত হয়। ফলে, ত্বক প্রভৃতি অল্প প্রয়োজনীয় অংশ থেকে মাংসপেশী, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, এবং হৃৎপিণ্ডে অধিক পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করে। ফলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রগুলির কর্মশক্তিবৃদ্ধি পায়। এবং আমাদের শরীর অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে পারে। এই জন্যই এই হর্মোনকে আপৎকালীন প্রতিরক্ষক বলা হয়ে থাকে। অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণের ফলে আরও নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—যথা, রক্তের চাপবৃদ্ধি, করোনারী ধমনীতে অধিক রক্ত-সঞ্চালন, লিভার থেকে গ্লুকোজের অত্যধিক পরিমাণে রক্তে চলে আসা ইত্যাদি।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও অ্যাড্রিনালিনের ব্যাপক ব্যবহার আছে। আকস্মিক শক্, রক্তচাপ হ্রাস, অ্যালার্জিঘটিত ব্যাধি, অ্যাজমা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগে এর প্রয়োগ দ্রুত ফলপ্রসূ।

আগামী প্রবন্ধে পিটুইটারী এবং এণ্ডোক্রিন অর্কেস্ট্রা সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আলোচনা করে হর্মোন কাহিনীর ইতি করবো।

ইওরোপের সূর্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জার্মানীর সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি দিক থেকে মিল আছে। মিলটি হল এই উভয় দেশেই দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত নানা সমস্যা আছে তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হল উদ্বাস্তু।

অবশ্য ভারতে উদ্বাস্তরা যে অর্থে সমস্যা, জার্মানীতে সে অর্থে নয়। কারণ জার্মানী ফুল এমপ্লয়মেণ্টের দেশ। এখানে আর যাই হোক উদ্বাস্তদের আগমন আঘাত করেনি চেম্বার্স অব কমার্সকে।

কিন্তু অর্থনীতি বাদ দিয়েও সমাজ আরও নানা দিকের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ এবং সমাজে তাদের প্রভাবও নয় উপেক্ষণীয়।

অঞ্চল ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবেই গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা। একটি নির্দিষ্ট সমাজ জীবনের ছত্রছায়ায় মানুষের ব্যক্তি জীবন হয় বিকশিত। এই অঞ্চল এই সমাজ এই গৃহ যেখানে তার বাস পুরুষানুক্রমে, সেটাই তার জীবন রচনার মূল। এই মূলই রস গ্রহণ করে বাইরের পৃথিবী থেকে।

কিন্তু এই মূল যদি ছিন্ন হয়। হঠাৎ কোন দৈব-দুর্বিপাকে মানুষকে তার পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে বার হতে হয় নিরুদ্দেশ যাত্রায়, তাহলে তার মানসলোকে যে বিপর্যয় ঘটে, অর্থনৈতিক আঘাতের চেয়ে তার প্রতিক্রিয়া কম নয়।

নোয়াখালির অভ্যস্ত ও পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে হঠাৎ কোন মানুষকে উদ্বাস্তু হয়ে আসতে যদি হয় ধুবুলিয়ার শিবিরে—যেখানে ভিন্ন সাংস্কৃতিক চেতনার অসংখ্য মানুষের ভিড়, তাহলে নোয়াখালির সেই ব্যক্তি কখনও সুস্থ পরিবারের কর্তা হতে পারবেন না। এবং তার মূল্য দিতে হবে অন্তত এক জেনারেশনকে।

জার্মানীর উদ্বাস্তু পরিস্থিতি অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেনি বটে, কিন্তু তার ফলে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা চিন্তানায়কদের নিশ্চয়ই উদ্বেগের বস্তু।

১৯৪৫ সালের পর পূর্ব জার্মানী থেকে যত উদ্বাস্তু পশ্চিমে এসেছে তাদের সংখ্যা সাড়ে তেত্রিশ লক্ষের মত এবং এই উদ্বাস্তুরা অধিকাংশই এসেছে বার্লিন দিয়ে।

তার কারণ আর কিছুই নয়। পূর্ব জার্মানীর সীমান্তে কড়া প্রহরী। কাজেই তাদের আসতে হয়েছে পূর্ব বার্লিনে। বলতে হয়েছে আমরা রাজধানীতে বেড়াতে এসেছি।

পূর্ব বার্লিনে আসা মাত্রই ব্রান্দেনবুর্গ গেট অতিক্রম সহজতর। কারণ উভয় বার্লিনের মধ্যে অবাধ চলাচলের ওপর নাই বাধা নিষেধ।

তাই দলে দলে উদ্বাস্তু এসেছে ভ্রমণকারী সেজে। পশ্চিম বার্লিনে এসে তারা উপস্থিত হয়েছে রিফ্যুজি ক্যাম্পের রিশেপসন সেণ্টারে। তারা বলেছে: আমরা আর ফিরে যেতে চাইনা আপন ঘরে। ছেড়ে এসেছি আমার গ্রাম, আমার পিতৃপুরুষের ভিটে।
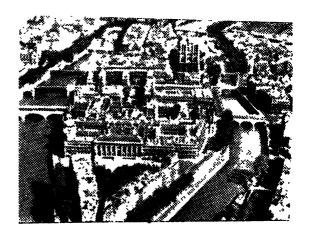
বৈমানিকের দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রান্স

তারা এসেছে একবস্ত্রে। একটি মাত্র স্যুটকেশ নিয়ে হাতে। কেউ বা রিক্ত। বার্লিনের প্রহরী যদি জানতে পারে। তাই এসেছে রিক্ত হাতে।

মেরিনফিল্ড রিশেপসন সেন্টার বার্লিনের উদ্বাস্তুদের একটি ট্র্যানজিট ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে গেলাম উদ্বাস্তুদের স্ক্রিনিং দেখার উদ্দেশে।

মিসেস হিলার বললেন: প্রতিদিন গড়ে পাঁচশত করে উদ্বাস্তুকে অভ্যর্থনা জানান হয় এই সেণ্টার থেকে।

একথা সত্য যে জার্মানীর উদ্বাস্তু শিবিরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরের তুলনা চলে না। কিন্তু দেখলাম উদ্বাস্তুদের অবয়বে তাদের পরিচয় সুস্পষ্ট। তারা যে গৃহহীন শরণার্থী তা এক নিমেষে বোঝা যায় মুখের দীনতায়, সসঙ্কোচ আচরণবাদে।

মিসেস হিলারকে প্রশ্ন করলাম: যে সব উদ্বাস্তু আসছেন তাঁদের অধিকাংশের পরিচয়—

মিসেস হিলার বললেন: শতকরা পঁচিশজন বুদ্ধিজীবী। শিক্ষক, ডাক্তার, অফিসের কেরানী। এখন আসছে অধিকাংশই কৃষিজীবী।

উদ্বাস্তুরা প্রথমে এসে উপস্থিত হয় স্ক্রিনিং কমিটির কাছে। আমরা এলাম স্ক্রিনিং কমিটির অধিবেশনে। সেই ঘরে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চতুর্দিকে তিন জন জার্মান বসেছিলেন। একজন বৃদ্ধ, দু'জন বৃদ্ধা। বৃদ্ধা দু'জনের পরণে স্কার্ট, চোখে চশমা।
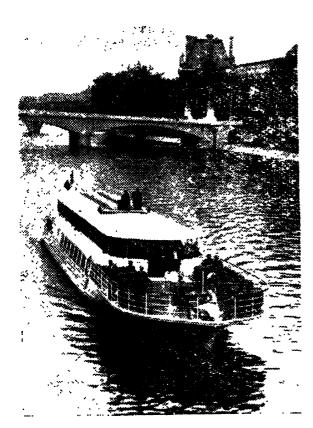
ঘরের দেওয়ালে ছিল পূর্বজার্মানীর একটি মানচিত্র। কমিটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এক প্রৌঢ়। গায়ে সস্তা জ্যাকেট, গলায় মাফলার, পায়ের জুতোটির জীর্ণ দশা।

মিসেস হিলার কানে কানে বললেন: লোকটি পেশায় কৃষক।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। জবাব দিচ্ছিল কৃষকটি।

মিসেস হিলার অনুবাদ করে দিলেন ইংরাজীতে।

কৃষকটি বলছিল:

ষাট একর জমি ছিল আমার আর কিছু ঘোড়া, লাঙল। আমাকে বলা হল যৌথখামারে আমার জমি দিয়ে দিতে হবে এর আগে আমার গরুর দুধ আমি পেতাম না। তা দিতে হত মিল্ক সেণ্টারে। সেখান থেকে আমাকে দুধ নিয়ে আসতে হত।

কিন্তু তা না হয় সহ্য করা যেত। বলা হল, আমার সব জমি দিতে হবে যৌথখামারে। আমি নিরুপায় হয়ে আর্জি জানাতে গেলাম মেয়রের কাছে। কিন্তু ফিরলাম বিতাড়িত হয়ে। পরের দিন উকিল এল কণ্ট্রাক্ট ফরম হাতে নিয়ে। আমি সই করতে অস্বীকার করলাম। কিন্তু পরদিন থেকে গরুর খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলল লোকটি। সমস্ত পরিবেশটি গম্ভীরতর হল কিছুক্ষণের জন্যে। লোকটি কোটের হাতা দিয়ে মুছল চোখের জল। তারপর কথা বলতে গিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল।

এবার আর অনুবাদ করতে হল না মিসেস হিলারকে। বুঝলাম তার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি থেকে যা উদ্গারিত হচ্ছে তা অভিশাপের লাভাস্রোত।

লং ফেলো বলেছেন গ্রাম হল গীতকাব্য: শহর হল নাটক। গীতিনাট্য রচিত হয় এই উভয়েরই মিলনে।

কিন্তু জার্মানীর শহর নাটক নয় তা সনেট। কাব্যেরই একটি শাখা। যদিও কঠিন বন্ধনে বাঁধা তবু তার দপ্তরে অনিন্দ্যসুন্দরের ব্যঞ্জনা।

জার্মানীতেও মানুষেরাই শহর তৈরি করেছে—ঈশ্বর নন। কিন্তু সে মানুষ বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক মানুষ—মধ্য যুগের সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীদের অনুগ্রহপুষ্ট স্থপতি নয়। আর এ যুগের বিজ্ঞান যেমন ধ্বংস করতে জানে, তেমনি জানে সৃষ্টি করতেও। সে জানে বাঁচবার আর্ট। সে সৌধ বানায় বটে ইঁটের পর ইঁট তুলে—কিন্তু মানুষ কীটদের জন্য নয় মানুষের জন্যই।

বার্লিন থেকে হামবুর্গে এসে এই কথাই মনে হল। হ্রদ আর নদী পরিবেষ্টিত এই সুন্দর শহরটি যেন জার্মানীর ভেনিস।

যখন এসে পৌঁছলাম হামবুর্গে তখন রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত। আলষ্টার হ্রদের ধারে হোটেল আটলাণ্টিকে হাজার বাতির দেওয়ালি।

পর্যটকের জীবনে সব চেয়ে যে বস্তুটি প্রয়োজন তা হল নিস্পৃহতা। তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে। আজ যে মানুষের সঙ্গে তার সান্ধ্যভোজ

একটি মনোরম ফরাসী জলযান

আগামীকাল সে হারিয়ে যাবে দূরের মিছিলে। আজ যে তার জীবনের পানপাত্র দিল পূর্ণ করে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত উৎসব শেষে পুরাতন পানপাত্রের মত তাকে দিতে হবে ফেলে। এজন্য পর্যটকের মনে থাকবে না বিন্দুমাত্র ক্ষোভ। চোখের কোণে আনন্দে চলবে না বিন্দুমাত্র অশ্রুধারা।

বার্লিন বিমান বন্দরে মিষ্টার ও মিসেস হিলার এসেছিলেন। তাঁদের বিদায় দিতে হল হাসিমুখে। যদিও মুখের হাসি অন্তরের বেদনাকে ঢাকা দেবারই ছিল ছদ্মবেশ।

মিসেস হিলার বললেন: চিঠি দেবেন দেশে গিয়ে আমার শুভেচ্ছা রইল আপনার মায়ের প্রতি। ঠিকানাটি হারিয়ে ফেলবেন না। আপনার ওভারকোটটা নিয়েছেন তো?

ফারুকিকে বললেন: আপনার স্ত্রীকে আমার ভালবাসা দেবেন।

কথায় আছে সাত পা এক সঙ্গে হাঁটলেই নাকি বন্ধুত্ব হবার পক্ষে যথেষ্ট। হামবুর্গে আমাদের সরকারী গাইড হানসের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে সাত পাও হাঁটতে হয়নি। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় হানস একে জার্মান তায় আমার সমবয়সী।

হানস বললে: যদি ক্লান্ত না হয়ে থাক তা হলে চল একটু বেড়িয়ে আসি। আগামী কাল আমরা যাব সীমান্ত পরিদর্শনে।

বললাম: তথাস্তু।

ফারুকি শুধু বলল: বিলকুল থাক গিয়া। এই বলে সে ডানলোপিলোর আশ্রয় নিতে চলে গেল।

জুঙ্গফেরনষ্টিগ-এর ওপর দিয়ে আমাদের মোটর চলল লেক আলষ্টারের দিকে। এই জুঙ্গফেরনষ্টিগের উদ্যানে বসে হেইনরিখ হাইন তাঁর সুবিখ্যাত লিডের কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন

হ্রদের ওপারে এক নৈশ রেস্তোঁরায় হানস আমাকে নিয়ে গেল। রেস্তোঁরাটি পুরাতন এবং অভিজাত। ইংলণ্ডে রেস্তোঁরা যত পুরাতন হবে তার আভিজাত্য হবে তার ততোধিক। সপ্তদশ শতাব্দীর বহু সরাইখানার আজও ইংলণ্ডে গৌরবের সঙ্গে অবস্থান এবং মাটির নিচে শতবর্ষের ধূলিলিপ্ত কার্পেটের ওপর পা দিয়ে দুই শত বর্ষের পুরাতন সোফায় বসে অর্ধশতাব্দীর পুরাতন শ্যাম্পেন পান করার সময় ইংলণ্ডের সকল ব্যক্তিই নিজেদের নাইট বলে অনুভব করেন। জার্মানীতেও পুরাতনের প্রতি মমত্ব আছে তবে এত আকর্ষণ নেই। আসলে জার্মানেরা ঐতিহ্যপরায়ণ জাতি ঐতিহ্যাশ্রয়ী নয়।

বাংলায় যাকে বলে পরিবেশ তা সৃষ্টি করাই নৈশ রেস্তোঁরাগুলির একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে সহায়তা করে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র। স্তিমিত প্রদীপের আলো ছায়া রচনা করে স্বপ্ন জগৎ। সে পরিবেশে মদিরাপাত্র হাতে জীবনকে খালি নিশার স্বপন বলেই মনে হয়।

বাজনার সুরের পরিবর্তন হল। দেখলাম সামনের কয়েকটি টেবিল থেকে কিছু নরনারী উঠে গিয়ে পরস্পরের কণ্ঠ লগ্ন হলেন। তারপর বাজনার তালে তালে ইতস্তত পদ সঞ্চালন করতে শুরু করলেন।

এই নৃত্যটির নামই যে বল তা বেশ কিছুদিন ইওরোপবাসের পর আমার অজানা ছিল না। কিন্তু ইওরোপীয় নৃত্যকলার এই শাখাটির প্রতি আমার কোনদিনই রুচি নেই, বন্ধুদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে একবার আমাকে এমন নাচে যোগ দিতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য অনভিজ্ঞতা ও অনীহার খেসারত দিতে হয়েছিল পুরোমাত্রায়। তার পর থেকে আমি এ ধরণের নৃত্যসভার শুধু দর্শক।

হানসকে বললাম: নৃত্য-গীতে আমার বিন্দুমাত্র পারদর্শিতা নেই। কাজেই 'ক্ষম হে ক্ষম।'

হানস বলল: তাহলে চল আমরা সরে পড়ি। কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধু শিল্পী। গল্প করা যাবে।

বললাম: এর মত সুপরামর্শ আর হয় না।

পথে যেতে যেতে হানসকে বললাম: বার্লিনে থাকতে এমন এক রেস্তোঁরায় এক মজার ঘটনা ঘটে।

হানস বলল: কী ব্যাপার?

আমাদের সঙ্গে ছিলেন মিসেস হিলার। ভদ্রমহিলা সুন্দরী। আমার পরণে ছিল প্রিন্স কোট, ফারুকির গায়ে শেরোয়ানি, মাথায় ফেজ টুপি। রেস্তোঁরায় ঢুকতেই দেখি সবাই আমাদের দিকে তাকাচ্ছে আর ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।

: ইন্টারেষ্টিং।

: হ্যাঁ সেই সঙ্গে এমব্যারাসিং ও। মিসেস হিলার অপ্রস্তুত হয়ে ওয়েটারকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ওয়েটার বলল: সারা রেস্তোঁরাময় রটে গেছে সুয়াইয়া ও তার বন্ধুরা এসেছে এই রেস্তোঁরায়।

নোতরে-দাঁর জগদ্বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল
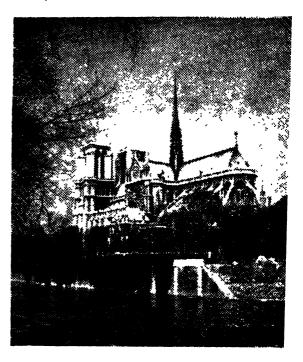
সুরাইয়া পারস্যের শাহ রেজা শাহ পহলবীর প্রথমা স্ত্রী। তিনি শাহকে সন্তান দিতে পারেন নি বলে বাস করেন বার্লিনে।

হানসের শিল্পী বন্ধুর নাম উইলহেম। বয়সে তরুণ।

উইলহেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইতিমধ্যে সে ঘুরে এসেছে লণ্ডন। দেখেছে টেট গ্যালারি, প্যারিসে ল্যুভর দেখেছে, আধুনিক ছবির ম্যুজিয়মও দেখেছে। এবারে ওর ইচ্ছা ফ্লোরেন্স গিয়ে উফিজিতে কিছু সময় কাটাবার।

উইলহেমকে বললাম: তাহলে যে একজন ফরাসী বলেছিলেন, হামবুর্গের লোকেরা সারা জীবন কাটায় অফিসে।

হানস বললে: কে বলেছে কথাটা?

বললাম: জ্যাকব গ্যালইস। হামবুর্গেরই এক স্কুল-মাষ্টার। লোকটা জাতে ফরাসী। তিনি আরও বলেছেন শুনুন: সমস্ত বিদ্যার মধ্যে হামবুর্গের লোকেরা কেবলমাত্র গণিতই জানে। আদাম রিয়েসে হল তাদের ভলতেয়ার। যদি কেউ তাদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে কথা বলে, তাহলে তারা সঙ্গে সঙ্গেই চিনি কিংবা কফির বাজার দরের প্রসঙ্গ পাড়ে।

উইলহেম আর হানস সশব্দে হেসে উঠল।

উইলহেম পরিচয় করিয়ে দিল তার মায়ের সঙ্গে।

মায়েরা পৃথিবীর সব দেশেই স্নেহময়ী। বিশেষ করে ছেলের বন্ধু বা সমবয়সীদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারে আছে আশ্চর্য রকমের সাযুজ্য বোধ। আমার মনে পড়ে গেল ইংলণ্ডে আমার বন্ধু জনের মায়ের কথা। বাড়িতে গেলে কোনদিনই কিছু না খাইয়ে ছাড়তেন না মিসেস টেলর। শুধু তাই নয় তাঁর সস্নেহ অনুরোধ যখন পরিণত

সেইন নদীর ধারে
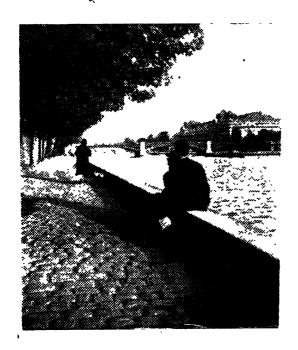
হত অনুনয়ে তখন সহস্র যোজন দূরে আমার পরিচিত মাতৃস্থানীয়াদের সঙ্গে তাঁকে কখনও মনে হত না পৃথক বলে।

উইলহেমের মা সস্নেহে কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর কোন প্রতিবাদ না শুনে কফি আর কেক নিয়ে এলেন।

ভদ্রমহিলার সাহিত্যপ্রীতি প্রশংসার যোগ্য। তিনি রাধাকৃষ্ণণের রচনা যেমন পড়েছেন তেমনি পড়েছেন গেটের ফাউস্ট। জন অসবর্ণের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের নাম তাঁর অজানা নয়—তেমনি তরুণ জার্মান সাহিত্যেও তাঁর সমান অধিকার। তিনি বেনের লিরিকগুলি যেমন পড়েছেন তেমনি পড়েছেন কাএকার উপন্যাস।

আবার আধুনিক তরুণ জার্মান লেখকদের মধ্যে এরিখ নোসাখ আর আর্ণেস্ট ক্রয়েডেও তাঁর প্রিয়।

জার্মানীতে এখন লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর আরাধনাও পুরোদমে চলছে। জার্মানীর ফ্যাক্টরীগুলি শুধু নয় ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এখন জমজমাট।

বলা বাহুল্য একমাত্র চাকুরি না পেলেই জার্মান ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যাডমিশন নেয় না। কন্যার পিতারা সৎপাত্র সংগ্রহে ব্যর্থকাম হয়েই তাঁদের মেয়েদের পৌঁছে দেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে। এমন কি উচ্চশিক্ষা বলতে সেদেশে বোঝায় না উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের শিক্ষা।

সারা জার্মানীতে ছড়িয়ে আছে সহস্রাধিক পিপলস ইউনিভার্সিটি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাধীন শিক্ষায় একদা যে দেশজোড়া পরীক্ষার জালের উদাহরণ দিয়েছিলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার সার্থক প্রয়োগ। বে-সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত প্রায় সমস্ত ছোট শহরের বিস্তৃত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আয়োজন করে সান্ধ্য ক্লাশের। সেখানে কলা ও বিজ্ঞানের নানা প্রশাখায় শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিব্যাপ্তি।

যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি এই আপ্তবাক্যটির সুপরিণত প্রয়োগ জার্মানেরা করেছে নিজের জীবনে।

পিপলস্‌ ইউনিভার্সিটিতে তাই ভিড় করে নানা বয়সের মানুষ। যুবক থেকে প্রৌঢ়, বৃদ্ধ!

উইলহেম বলল: তোমার একটা ছবি আঁকতে চাই। এই বলে অতি দ্রুত কাগজ পেন্সিল নিয়ে এল।

মনে মনে যে উল্লসিত হলাম একথা বলাই বাহুল্য। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে দেখেছি মানুষের দুর্বলতা অপরিসীম। মানুষ যতই কুৎসিত হক তবু সে নিজের আলেখ্য দর্শনে হয় পুলকিত। বহু নামী মানুষকে দেখেছি ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড়াবার দুর্বার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি কোনদিনও।

উইলহেমকে বললাম: ছবি আঁকছ ক্ষতি নেই কিন্তু ভাল হয় যেন।

ও বলল: ছবি ভাল না হলে সবাই দোষ দেয় শিল্পীকে।

বললাম: তার কারণ নিজের খারাপ চেহারা কোন মানুষই দেখতে চায় না ছবিতে। তাই ছবি যখন আঁকবে তখন সুন্দর করেই আঁকবে। ছবি যেন বিধাতাপুরুষের ওপর শিল্পীর ইমপ্রুভমেন্ট হয়।

সাদা-কাগজের বুকে কয়েকটা টান দিয়ে উইলহেম বলল:

কিনিশিং টাচ দেব সময়মত। তুমি তো আছ ক'দিন। আগামী পরশু সন্ধ্যায় সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। কারণ রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও তখন অতিক্রান্তপ্রায়।

শ্যাম-কুঞ্জে অভিসারিকা শ্রীরাধিকা 'কেন রজনী না যেতে জাগালে না' বলে আক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধিকা যদি কুঞ্জের বদলে আধুনিক কোন হোটেলে নিশা যাপন করতেন তাহলে কোন সমস্যারই উদ্ভব হত না।

কারণ আধুনিক সমস্ত হোটেলেই বোর্ডারদের পূর্ব নির্দেশমত যথা সময়ে ঘুম থেকে তুলে দেবার ব্যবস্থা আছে।

প্রাতরুত্থান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপাদেয় এই তথ্য আমি রচনা পরীক্ষার উত্তরপত্রে বহুবার উল্লেখ করেছি। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার বহুবিধ আইন যেমন সত্যাগ্রহীর মত অমান্য করি তেমনি এই কানুনটির প্রতিও কোনদিন বিন্দুমাত্র পক্ষপাত দেখাইনি।

সুতরাং সকাল ছ'টায় যখন টেলিফোন বেজে উঠল তখন অত্যন্ত দুর্বিনীত কণ্ঠস্বরে বললাম: হ্যালো,—

ওপাশ থেকে সুমিষ্ট নারীকণ্ঠে জবাব এল: সুপ্রভাত, আপনি সকাল ছ'টায় ডেকে দেবার জন্যে বলেছিলেন! সেই দুর্বিনীত-কণ্ঠে একটি 'থ্যাঙ্ক' বলে আমি মনে মনে উত্তপ্ত হতে লাগলাম। একথা সত্য গতকাল রাত্রে আমিই অফিসে এই অনুরোধটি পেশ করেছিলাম। কিন্তু অনুরোধ করেছিলাম বলেই যে তা রাখতে হবে তার কি মানে আছে।

কিন্তু লালাবাবুর মত আমারও উপলব্ধি হল সত্যিই বেলা যায়। আজ সকাল সাতটায় রওয়ানা হতে হবে লিউবেকে। হামবুর্গ থেকে কয়েক যোজন পথ। সেখানে আমাদের পূর্ব জার্মান সীমান্ত দেখার প্রোগ্রাম।

ঠিক সাতটার সময় হানস এসে হাজির। বলল: ব্রেকফাষ্ট হয়ে গেছে?

আমি বললাম: ব্রেকফাষ্ট? তোমরা কণ্টিনেণ্টের লোকেরা যাকে ব্রেকফাষ্ট বল তা খেয়ে আমাদের ফাষ্ট কখনও ব্রেক করে না। চা আর সেই সঙ্গে জেলি সহযোগে পোড়া রোল—এই তো ব্রেকফাষ্টের পুঁজি।

হানস বলল: না, আমরা ইংরাজদের মত কেউই গোচ্চার কর্ণফ্লেক ডিম আর টোষ্ট নিয়ে বসি না। তবু এই ব্রেকফাষ্ট খেয়েই আমরা পর পর দু'টো যুদ্ধ করেছি।

আমি হেসে বললাম: সেইজন্যেই তোমরা পর পর দু'টো যুদ্ধই হেরেছ।

হানস হেসে উঠে বলল: আবার এখনও হার মানছি। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে লিউবেক থেকে ওখানকার বিখ্যাত পিঠে কিনে খাওয়াব।

লিউবেকে এলে মনে হয় এলেম নূতন দেশে। সে দেশ বর্তমান দশকের জার্মানী নয়—ইংলণ্ডের কোন কাউণ্টি শহর।

আগাগোড়া গথিক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই শহরে পা দিলে মনে হয় কয়েক শতাব্দীর পূর্বেকার পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জার্মানীতে দাঁড়িয়ে আছি যেন।

ব্রুদেনব্রুক হাউস, হেইলগেন হসপিটাল, বাজার, পুরাতন চার্চ সমস্ত কিছু মিলিয়ে লিউবেকে এক বনেদী পুরাতন পরিবেশ।

আমাদের রথ-সারথির নাম এরিখ। পথে তাঁর পরিচয় জেনেছি তিনি সূতপুত্র নন ব্রাহ্মণ। হামবুর্গের একটি বিদ্যালয়ের তিনি শিক্ষক। অবসর সময়ে চক্ আর পেন্সিল ছেড়ে ষ্টিয়ারিং ধরেন। এতে তাঁর উপার্জনের অঙ্ক বৃদ্ধি পায় এবং বলা বাহুল্য তাঁর সম্মানের কণামাত্র এতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

আমাদের দেশের শিক্ষক কিংবা বুদ্ধিজীবীরা এ কথা শুনলে কানে আঙুল দেবেন নির্ঘাত। তাঁরা সিওর সাক্সেস ও ডাইজেষ্ট বটিকা বিতরণ করে অর্থ সঞ্চয় করবেন, কোচিং ক্লাশে সুকুমারমতি ছাত্রদের কর্ণে পরীক্ষা পাশের অমোঘ মন্ত্র দেবেন, কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের মেকানিক্সের শিক্ষক গ্রীষ্মের ছুটিতে কারখানায় কাজ করছেন এমন কল্পনাও কেউ করতে পারবেন না।

এরিখ বয়সে উত্তর-ত্রিশ। স্কুলে তার পাঠনের বিষয় ইতিহাস তবে সাহিত্যেও তার সম-অনুরাগ।

এরিখ বলল: চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই টমাসম্যানের গৃহে। যে ব্রুদেনব্রুক পরিবারকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, তা তো আপনাদের দেখিয়েছি।

টমাসম্যান যে গৃহে বাস করতেন, সেটি এখন একটি রেষ্টুরেণ্ট। তবে দ্বিতলের যে ঘরে ম্যান থাকতেন, সেটি এখনও সংরক্ষিত।

এরিখের কথাবার্তা শুনে মনে হল, সে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একজন সমর্থক।

জার্মানীতে এখন শাসনক্ষমতা খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হাতে। সংক্ষেপে যার নাম সি, ডি, ইউ। সি, ডি, ইউ'র পরেই শক্তিশালী দল হল এস, পি, ডি। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

এরিখকে জিজ্ঞাসা করলাম: আচ্ছা ডি-নাজিফিকেশন বলে একটি কথা শুনেছিলাম। যার অর্থ হিটলারের আমলের যে সব নাজি কর্তারা এখনও আছেন তাঁদের সংশোধন করার ব্যবস্থা আছে।

এরিখ বলল: অফিসিয়ালি আছে এবং তা হয়েছেও। কিন্তু মানুষের মনকে তুমি বাইরের আচার দিয়ে পালটাতে পার না। তোমাদের দেশেও তো ইংরেজ আমলের পুলিশ অফিসারেরা আছে। যারা একদিন দেশবাসীর ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম: হিটলার সম্বন্ধে অধিকাংশ জার্মানবাসীর কি ধারণা?

এরিখ বলল: সরকার থেকে দেশের যুবকদের মধ্যে হিটলারের ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনীগুলি তুলে ধরা হচ্ছে। অধিকাংশ লোকই তাকে মনে করে বদ্ধ উন্মাদ বলে। কিন্তু যুদ্ধে হিটলারের যদি জয় হত তাহলে তার সম্পর্কে জার্মানদের কি ধারণা হত তা বলা যায় না।

পূর্ব-জার্মান সীমান্তে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন অপরাহ্ণ। আরও কিছুদূরে বলটিক সমুদ্র সৈকত। আমরা সেদিকে না গিয়ে সীমান্তের পথ ধরলাম।

কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সীমান্ত। সেখানে দিবারাত্র অতন্দ্র প্রহরা।

হানস বলল: পূর্ব-জার্মান সীমান্তের নানা স্থানে মাইন পাতা আছে, আর আছে শিক্ষিত কুকুরের ঝাঁক। সুতরাং সীমান্ত পার হবার দুঃসাহসিক সাধ কারুরই জাগে না মনে।

পশ্চিম জার্মানীর সীমান্তে একটি তোরণ দেখলাম। ব্রুন্ডেনবুর্গ গেটের অনুকরণে তৈরী। তার ওপরে লেখা আছে macht das to rauf তার বাংলা অর্থ হল খুলে দাও দ্বার। বার্লিনে দেখেছিলাম প্রদীপের অনির্বাণ শিখা। মিসেস হিলার বলেছিলেন: উভয় জার্মানী যতদিন না এক হবে ততদিন এ শিখা জ্বলবে নিশিদিন।

জার্মানদের সঙ্গে আমাদের অনৈক্য হল যে পশ্চিম জার্মানের মানুষেরা বিশ্বাস করে উভয় জার্মানী আবার একদিন মিলিত হবে, কৃত্রিম দেশ-বিভাগের সীমারেখা হবে অপসারিত। সীমান্তের রুদ্ধ দ্বার যাবে খুলে।

কিন্তু আমরা মনের কোণে কখনও ঠাঁই দেই না যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কৃত্রিম সীমারেখার প্রাচীর একদিন যাবে ভেঙে। একদিন আমরা সকলে আবার মিলব মহামানবের সাগরতীরে।

কারণ জার্মানী বিভাগের জন্য দায়ী জার্মানীর অদৃষ্ট, আর ভারত বিভাগের জন্য আমাদের দেশের মানুষ, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদেরা।

জার্মানীর যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি বহু মানুষ বুকে ব্যাজ পরে বার হয়েছে পথে। তাতে ব্রুন্ডেনবুর্গ গেটের ছবি। এই গেট হল মিলিত জার্মানীর প্রতীক।

উভয় জার্মানীর যদি কোনদিন মিলন হয় তাহলে তা হবে জার্মানবাসীর এই ঐকান্তিকতায়, হবে এই আন্তরিকতার উচ্চ মূল্যে।

এরিথ বলল: আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না জার্মানী আবার এক হবে। যদিও মনে মনে আমি এই ঐক্য চাই।

বললাম: তোমার অবিশ্বাসের হেতু?

এরিথ বলল: কয়েক বছর আগে জার্মানীতে গণভোট নেওয়া হয়েছিল। কোন জিনিসটি জার্মানীর সবচেয়ে আগে দরকার এই প্রশ্নের ওপর। তাতে দেখা গিয়েছিল শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন বলেছে জাতীয় পুনর্গঠন, মাত্র শতকরা পনের জন বলেছে উভয় জার্মানীর মিলন।

: কিন্তু জার্মানীর পুনর্গঠনের কাজ তো আজ সমাপ্ত।

: তা ঠিক। কিন্তু জনসাধারণ চাইলেই তো হল না। বিনা যুদ্ধে রাশিয়া কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজি হবে না। আর যে কোন মূল্যেই হোক আমরা যুদ্ধ চাই না।

: তবু তো তোমরা নতুন করে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছ?

: মনে রেখ, আদেনুর সরকারের এই পলিসির সঙ্গে আমরা দেশবাসীরা কিন্তু একমত নই। তবে ন্যাটোর সঙ্গে না থেকে আমাদের উপায় নেই। আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় অনেক কম পড়ছে। আমরা বিনা উদ্বেগে দেশের শিল্পসমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে পাচ্ছি।

: আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে আসছে। আমি বললাম।

সীমান্ত দেখা শেষ করে আমরা ততক্ষণে অটোব্যানে এসে পড়েছি। এরিখের হাতে ষ্টিয়ারিং। স্পীডোমিটারের কাঁটা কাঁপছে থর থর করে। যাট—সত্তর।

ভুলে গিয়েছিলাম জার্মানী হল গতির দেশ। দুর্গতির অন্ধকূপ থেকে এরা এক নিমেষে গতির উচ্চশিখরে উঠেছে।

একটি বিপরীতগামী গাড়ি বিদ্যুদ্বেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আমি বললাম: জার্মানীর মিলন তোমাদের মিত্রপক্ষ বৃটেন ও ফ্রান্সই চাইবে না। মনে রেখ সাত কোটি জার্মানের মিলিত শক্তিকে সাড়ে পাঁচ কোটি বৃটিশ ও ফরাসী কথনই বরদাস্ত করতে পারবে না।

এরিখ পাকা কূটনীতিবিদের মত বলল: এগুলি রাজনীতির জটিল প্রশ্ন। সাংবাদিকদের কাছে এ সম্পর্কে মুখ না খোলাই ভাল।

[ক্রমশঃ।

অন্ধকারের অতলে

সমরেন্দ্র ঘোষাল

তোমাকে না স্পর্শ করলে আলো হয়ে উদ্ভাসিত হবে না তো তুমি
দুরারোগ্য আমার অন্ধকারে। যন্ত্রণার অসুস্থতায় জর্জরিত এই দেহে
এবং হৃদয় আর দেহ নিয়ে আমার যা কিছুতে বৃক্ষসম আমি একা।
একাকী মাঠের মত শূন্যতায় ভরা মোর পরম কামনা
আর পরম প্রার্থনা।

আমার নিঃশ্বাসে মেশা অন্ধকার বীজাণু হয়ে ভয়ংকর পীড়াদায়ক
এবং মৃত্যু ঘটানোকারীও। আমার অন্ধকার আমাকে নৃশংসভাবে
মৃত্যুর মুখোমুখী ঠেলে দিয়ে কত সুখ পায়। কত সুখ তার
আমার যৌবনকে বিষাদে ভরে, আমার ভালবাসাকে হতাশায় ছুঁয়ে।
অনুরোধ তোমাকে তাই হাসির আগুন আলো মুছে যাক পুড়ে যাক
আমার অন্ধকারের দেহ। তুমুল আলোর স্রোতে
আঁধারের মৃতদেহ সুদূরে হারাক।

প্রশান্ত চৌধুরী

২৮

সোহাগী তার তক্তাপোষের ওপর শুয়েছিল নির্জীবভাবে। পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে বিকেলের রোদের ফালি এসে পড়েছে তার দেহের ডান দিকটায়। কপালটায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে তার, ডান হাতের কাঁধের কাছটা রোদের তাতে চিন চিন করছে কেমন,—তবু পাশ ফিরে সরে শুচ্ছে না সোহাগী। কেমন একটা অসাড়ের মতন রোগশয্যায় পড়ে আছে সে।

চোখ দু'টো তার সামনের দিকের দেয়ালটার ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। মেলা থেকে কেনা মাটির যে-মাছটা দেয়ালে টাঙানো রয়েছে,—সেটার ওপর দিয়ে অন্ততপক্ষে একশোবার ঘুরে ঘুরে পড়েছে তার চোখ,—কিন্তু মাছটাকে কি সে সত্যিই দেখেছে একবারও? বোধ হয় না।

দেখলে তো ভাবত। একটুও ভাবত। অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও।—ঐ রকম দুটো মাছ ছিল, একটা চাঁপা ছোটবেলায় ভেঙেছে,—এত কথা মনে না পড়ুক, অন্তত ওটা যে শ্যামাপদর কিনে দেওয়া পুতুল সেটাও তো মনে পড়ত তার। আর, সেই সূত্রে এটাও তো মনে পড়ত যে, সেদিন থু-উ-ব জ্বরে চাঁপার গা এমন পুড়ে যাচ্ছিল যে, মাঝ রাত্তিরেও বরফ চাপাতে হয়েছিল তার মাথায়।

কি সেসব কিছু মনে পড়েনি সোহাগীর। আর, পড়েনি বলেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, চোখটা একশোবার মাছের ওপর দিয়ে ঘুরে এলেও মাছটাকে সে দেখতে পায়নি একবারও।

আসল কথা, অনেকক্ষণ ধরেই সে চেয়ে থেকেও কিছু দেখছে না; দেখতে পাচ্ছে না। ব্যাপারটা হয়েছে কি, কোনো কিছু দেখবার জন্যে শুধু সেই দিকে চোখ ফেরালেই তো হয় না, সেই সঙ্গে সেইদিকে মনটাকেও ফেরাতে হয়। সোহাগী সেই মনটাকেই ফেরাতে পারছে না কিছুতেই। তাই সে চোখ খুলে চেয়ে থেকেও দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

সোহাগীর মনটা তার দেহটার মতই এক ভাবে পড়ে আছে চুপচাপ। নড়ছে না, পাশ ফিরছে না।

ওর মনের মধ্যে সেই দুপুরবেলা থেকে চলছে শুধু খাঁদুর ভাবনা। খাঁদুর কথা নিয়েই ডুবে আছে ওর মন।

ঘণ্টা দুয়েক আগে ওরা কাঁধে তুলে নিয়ে গেছে খাঁদুকে।

সোহাগী দেখতে পায়নি অবিশ্যি। শুধু শুনেছে ওদের হরিধ্বনির শব্দ; আর বাদবাকি বিবরণ শুনেছে শ্যামাপদর মুখে।

ঐ কমবয়েসী রোগা মেয়েটার মাথা সিঁদুরে ভরিয়ে দিয়ে ওরা নিয়ে গেছে শ্মশানে। ওরা মানে, রাত-জাগা বস্তির মেয়েরা সব। নিজেরা কাঁধ দিয়েছে, নিজেরা গলা ফাটিয়ে হরিধ্বনি দিয়েছে, নিজেরা ফুল কিনে এনে সাজিয়েছে মেয়েটাকে।

তাই তো ওরা করে। সকলের বেলাতেই করে।

টগরবালা যেবার মরে যায়, সোহাগীও তো কাঁধ দিয়েছিল সবার সঙ্গে। চাঁপা তখন ছ-সাত মাসের মেয়ে।

টগরবালা ওদের বস্তির কেউ ছিল না। সে ছিল আর্টিষ্ট। ওদিকের পাড়ায় কোঠাবাড়ির তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। ফোনোগ্রাফের রেকর্ডে গান গেয়েছিল অনেক। থিয়েটারেও গান গেয়েছে কতবার। বেশ নাম ডাক ছিল তার। খবরের কাগজে ছবি উঠেছিল ছেপে।

ওদের বস্তির বাসিন্দে না হলেও একই জাতের মানুষ ছিল তো টগরবালা। কতকটা রাত-জাগা বস্তির মেয়েদের গর্বের জিনিস। তাই আশপাশের সবক'টা বস্তির মেয়েই জুটেছিল তাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যেতে।

মেয়েদের মধ্যে শতকরা আশীজনই মদ খেয়েছিল সেদিন। মদ খেয়ে গলা ছেড়ে হরিধ্বনির হল্লোড় তুলেছিল সারা রাস্তায়। সোহাগীর লজ্জা করেছিল খুব। মদ খায়নি বলেই হুঁশ ছিল তার।

আর, হুঁশ ছিল বলেই লজ্জা করেছিল। সমস্ত দৃশ্যটা কেমন নোঙরা, কেমন যেন বীভৎস লেগেছিল তার চোখে। তবু যেতে হয়েছিল ওকে।

আজ ঘণ্টা দুয়েক আগে খাঁদুকে নিয়ে গেল ওরা।

ওরা আজও কি মদ খেয়েছে?

নিশ্চয়ই খেয়েছে। তা' নাহলে অতটুকু মেয়েটাকে পোড়াতে নিয়ে যেতে যেতে অমন আকাশ ফাটানো চিৎকার করতে পারছিল ওরা কী করে? যদি একবারও ওদের হুঁশ হত যে, কতটুকু একটা মেয়েকে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছে; আর কী ভাবে মারা গেছে সে;—তাহলে কি 'বল হরি' বোলে অমন বিকট চিৎকার করতে পারত ওরা?

কতই বা বয়েস ছিল খাঁদুটার?

চাপারই বয়সী কিংবা দু' এক বছরের বেশি হবে। বাচ্চা একটা মেয়ে। পৃথিবীর অন্য কোনও কিছুর কথা বিন্দুমাত্র জানবার উপায় ছিল না তার। সব খবরের দরজা বন্ধ ছিল তার কাছে। খোলা ছিল শুধু একটিমাত্র দরজা;—যার ভেতর দিয়ে যাওয়া যায় সেইখানে,—যেখানে যা-কিছু কুৎসিত, যা কিছু বীভৎস, যা কিছু অশ্লীল, যা কিছু অবৈধ, সেইসব কিলবিল করছে! হামাগুড়ি দিতে শিখেই সব্বার আগে সেই দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়েছে খাঁদু!

যে-বয়েসে মিছরি-বাতাসা-লজেঞ্চুস খেয়ে খিলখিলিয়ে হাসবার কথা, সেই বয়েসে তার সামনে রাখা হয়েছে ঝাল-লঙ্কার বাটি। সেই লঙ্কা মুখে পুরে ককিয়ে কেঁদে উঠেছে মেয়েটা। তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে। এমন হয়েছে যে, লঙ্কা না হলে তার চলেই না।

খাঁদু খারাপ মেয়ে ছিল।

ছিলই তো; ছিলই তো। কিন্তু কেন ছিল, সে কথা শুধোয় না কেন কেউ? ছোটবেলায় খাঁদুদের সামনে থেকে ঝাল-লঙ্কার বাটি সরিয়ে দিয়ে মিছরি—বাতাসা—লজেঞ্চুস রাখে না কেন কেউ?

খাঁদু অসভ্য মেয়ে ছিল।

ছিলই তো; ছিলই তো। কিন্তু সভ্য-দরজার কপাট তার জন্যে খোলা রাখেনি কেউ?

খাঁদু ফিরিওলাদের ডালা থেকে খাবার চুরি করত।

করতই তো; করতই তো। কিন্তু ওকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে হাতে একটাও পয়সা দেয়নি কেন কেউ?

খাঁদু অল্প বয়েস থেকেই নোঙরামী শিখেছিল।

শিখেছিলই তো; ছিলই তো। কিন্তু ওকে শাসন করবার জন্যে, ওর ভালমন্দ দেখবার জন্যে, ওকে একটা চাপ দেয়নি কেন কেউ?

সেই খাঁদু মরে গেল। দু'ঘণ্টা আগে তাকে কাঁধে করে নিয়ে গেল সবাই। নিয়ে গেল রাত-জাগা বস্তীর মেয়েরা। ওদের মধ্যে আরেকজন মরবে যখন, বাকিরা নিয়ে যাবে তাকে।

এমনি করে কি কমে যাবে ওদের দল? হারাধনের দশটি ছেলের মতন, 'মনের দুঃখে 'বনে গেল, রইল না আর কেউ' হয়ে যাবে নাকি।

পাগল!

ততদিনে কত পাঁচির গর্ভে কত খাঁদুর জন্ম হবে যে গো!

তাদের কেউ লজেঞ্চুস দেবে না, দুধ দেবে না, বই দেবে না, বাপ দেবে না!—শুধু অপবাদ দেবে, গালাগাল দেবে, ঘেন্না করবে।

সেই ঘেন্না সর্বাঙ্গে মেখে মরে গেল খাঁদু।

বেশি টাকার লোভে খাঁদুর মা আর কুসুমবুড়ি দুজনে মিলে ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে মদ গিলিয়ে বেহুঁশ করে আধেক রাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল বসির মিঞার ওয়েলেসলির আড্ডায়।

বস্তিতে নিজেদের ডেরায় জানোয়ারের সঙ্গে লেনদেনের কারবার করেছে খাঁদু তার আগে কয়েকবার।

কিন্তু পরের আড্ডায় এগারোটা যমদূতের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন? সারারাত ধরে খাঁদুর রোগা দেহটাকে নিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে অট্টহাসি হেসেছে এগারোটা মাতাল।

পরের দিন তারা আরো কিছু উপরি টাকা দিয়ে বস্তিতে পৌঁছে দিয়ে গেছে খাঁদুর অচৈতন্য রক্তাক্ত দেহটা।

সেই বাড়তি টাকায় ডাক্তার-বদ্যিও এনেছিল খাঁদুর মা। তবু বাঁচাতে পারেনি। এমন কাণ্ড এর আগেও তিন-চার বার হয়ে গেছে এই বস্তিতে। তবু ওরা শিউরে ওঠেনি, চমকে ওঠেনি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়নি;—ঘাড় গুঁজে মুখ বুজে বেমালুম মেনে নিয়েছে সব।

পৃথিবী-জোড়া এই বিজ্ঞানের অকল্পনীয় উন্নতির যুগেও একদল মানুষের না খেতে পেয়ে মরে যাওয়াটাকে যেমন মানুষ সহজে মেনে নিয়ে দিব্যি দাঁত বের ক'রে কাজকর্ম করেছে, আপিস গেছে, সিনেমা দেখেছে,—ঠিক তেমনি।

এ-যেন অভাবনীয় কিছু নয়,—নিতান্তই আটপৌরে ব্যাপার।

খাঁদুর মরে যাওয়াটাও তাই। নিতান্তই আটপৌরে ঘটনা।
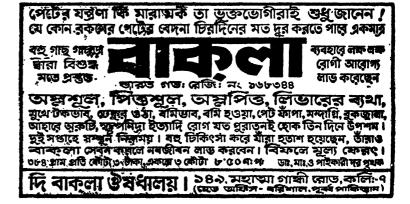
তাই আটপৌরে মৃত্যুর বেলাতেও যা, এ ব্যাপারেও তাই হয়েছে। মদ খেয়ে হল্লা করে সবাই কাঁধে তুলে নিয়েছে খাঁদুর মৃতদেহ।

আর, সেই হল্লা এসে বিঁধেছে শুধু সোহাগীর বুকে।

আহা, মেয়েটা বেঘোরে মরে গেল। চাঁপার বয়েসী একটা মেয়ে কী যন্ত্রণা পেয়েই না মরে গেল!

চাঁপাকে যদি না এমন করে আগলে রাখতে পারত সোহাগী, তাহলে চাঁপার কপালেও তো ঘটতে পারত এমনি দুর্ঘটনা।

কথাটা মনে হতেই আতংকে শিউরে উঠল সোহাগী। রোদ্দুরটা ততক্ষণে তার গা ছেড়ে দেওয়ালের ওপর উঠে গেছে;—তবু পিনপিন করে ঘামতে লাগল সোহাগী।

আজ এই মুহূর্ত অবধি চাঁপার ভাগ্যে ঘটেনি কোনো শোচনীয় দুর্ঘটনা। কিন্তু কোনোকালে ঘটবে না যে, কে বলতে পাবে সেকথা? সোহাগী যখন থাকবে না, তখন কে আগলাবে চাঁপাকে? কে আড়াল করে রাখবে তাকে কুসুমবুড়িদের কাছ থেকে?—শ্যামাঠাকুর? কতটুকু শক্তি তার?

খাঁদুর মৃতদেহ নিয়ে ওরা যাচ্ছিল যখন, তখন শ্যামাপদ ছিল ঘরে। সোহাগী শ্যামাপদর হাত দুটো ধরে বলেছিল,—আমি মরে গেলে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে তুমি অনেক দূরে কোথাও চলে যেয়ো ঠাকুর। এ-তল্লাটের ত্রিসীমানায় থেকো না। শ্যামাপদ বলেছিল,—'সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবছিস কেন তুই?'

তবু ভাবছে সোহাগী। তবু ভেবে চলেছে। চাঁপার ভাবনা থেকে রেহাই পাচ্ছে না সে কিছুতেই। কেবল ভাবছে,, শুধু এই পালিয়ে যাওয়াটাই চরম? তার বেশি আর কিছু নয়? শুধুমাত্র বাঘ-ভালুকের কবল থেকে দৌড়ে পালিয়ে বেড়ানো?—বন পেরিয়ে লোকালয়ে গিয়ে ঘর বাঁধা নয়?

কেন নয়? কেন নয়? কেন তা হয় না? কেন তা হবে না?

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে,—সোহাগী মরে যাবার পর চাঁপাকে নিয়ে শ্যামাঠাকুর চলে গেল অনেক দূরে। সেখানে সবাই জানল, মা-মরা গরীব ভটচাজ্যি বামুনের দুঃখিনী মেয়ে চাঁপা। সেই দুঃখিনী মেয়েকে দেখে দয়া হল এক গিন্নীর। তিনি নিজের হাতের সোনার বালা দিয়ে আশীর্বাদ করে চাঁপাকে ছেলের বৌ করে তুলে নিয়ে গেলেন ঘরে।

ভাবতে ভাবতে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল সোহাগীর ঠোঁটে।

দূর্! শেষ অবধি সেই চিরকালের অভ্যেস মতো রাণীমার গল্পই ভেবে চলেছে যে সে আবার! সেই নিরুপায় হয়ে শিশু-সন্তানকে গামলায় ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে নিঃসন্তানা এক দয়াময়ী রাণীর আশায় বসে থাকার চিরকেলে পুরোনো গল্প।

কিন্তু তাহলে? তাহলে কী আছে চাঁপার বরাতে? কী লেখা আছে তার কপালে?

২৯

সুধাদের বাড়ি থেকে টলতে-টলতে বেরিয়ে এসে একলা হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ কী মনে ক'রে চাঁপা থমকে দাঁড়াল সেই ভাঙা বাড়িটার সামনে, যেখানে প্রথম তার আলাপ হয়েছিল খাঁদুর সঙ্গে। যেখানে, মুগের নাড়ু আর এটা-ওটা মুখরোচক জিনিস খাইয়ে কুসুমবুড়ি তার কানে প্রথম শুনিয়েছিল এমন সব কথা, যা শুনলে কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। যা শুনলে নিজের ওপর ঘেন্না হয়, মায়ের ওপর ঘেন্না হয়, সমস্ত দুনিয়াটার ওপর ঘেন্না হয়।

চাঁপা থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল সেই ভাঙা বাড়িটার দিকে। দোতলার কার্নিসের দিকে তাকাতেই খাঁদুকে মনে পড়ে গেল। মনে হল, অনেকদিন আগেকার ছোট্ট একটা খাঁদু ঐ কার্নিসের ওপরে লম্বা লম্বা ঠ্যাং ঝুলিয়ে ব'সে বলছে,—আয় ভেতরে। তোর জন্যে সেই কখন থেকে বসে আছি এখানে। হাঁদার মতন দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো তবু! কী ছেনাল মেয়ে রে!

সেদিন রাত্রে সেই যে খাঁদুকে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে কারা নিয়ে গিয়েছিল কোথায়:—তারপর নাকি খুব অসুখ নিয়ে ফিরে এসেছে খাঁদু বস্তিতে।—কে জানে কেমন আছে সে আজ?

চাঁপা একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেবে নিল কি। তারপর ভাঙা পোড়ো বাড়ির কপাট-খোলা দরজাটা দিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

ভাঙা দরজার পরে সরু লম্বা একফালি দালান, সেই দালান পার হয়ে চাঁপা প্রকাণ্ড সেই উঠোনটায় গিয়ে পৌঁছল, অনেক বছর আগে যেখানে খাঁদুর সঙ্গে দেখা করতে এসে কুসুমবুড়ির সঙ্গে আচম্কা দেখা হয়ে গিয়েছিল তার।

এবারেও দেখতে পেল চাঁপা কুসুমবুড়িকে। সেবারের মতন এবারে কিন্তু ভাঙা বাড়ির ভাঙা দেয়াল থেকে ঘুঁটে ছাড়াচ্ছিল না সে।

চাঁপা দেখল, সেই প্রকাণ্ড নির্জন পোড়ো ভাঙা বাড়ির ভাঙা রোয়াকের ওপর গুটিয়ে-সুটিয়ে একলা শুয়ে ঘুমোচ্ছে কুসুমবুড়ি।

ভাঙা বাড়ির ভাঙা দেয়াল থেকে কিছু ঘুঁটে তোলা হয়েছে। যত তোলা হয়েছে, তার ডবল্ ঘুঁটে এখনও বাকি আছে তুলতে। সেসব না তুলেই ঘুমিয়ে পড়েছে কুসুমবুড়ি।

হয়তো ক্লান্ত হয়েছে কুসুমবুড়ি। রোগা জীর্ণ শরীরে রোদ লেগে চক্কর দিয়ে উঠেছে মাথার মধ্যে,—তাই শুয়ে পড়েছে। আর, শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে এই অবেলায়।

বুকের কাপড়টা খসে পড়েছে তার। রোগা জীর্ণ চোপসানো একটা বুক। কণ্ঠার হাড় দুটো উঁচু। গলার কাছটায় ধুকধুক করছে মোটা একটা শিরা। আজ সকালেও যাকে প্রকাণ্ড একটা রাক্ষুসী বলে মনে হয়েছিল চাঁপার, এখন যেন তাকে নিতান্ত অসহায় একটা ভিখিরি বুড়ি বলে মনে হল চাঁপার।

পরক্ষণেই নিজের মনটাকে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা সিধে শক্ত হয়ে দাঁড়াল চাঁপা।—না, না, কোনও মায়া নয়, কোনও দয়া নয়, কুসুমবুড়ির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে যাবে আজ চাঁপা।

চাঁপা উঠানের ঝুড়ি থেকে একটা শুকনো ঘুঁটে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ঘুমন্ত কুসুমবুড়ির গায়ের ওপর।

হ্যাঁ, হ্যাঁ,—চাঁপা আজ নিষ্ঠুর, চাঁপা আজ নির্মম। এ দুনিয়ার কারুর ওপর এতটুকু মায়া নেই তার। সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে যেমন তার বিরুদ্ধে, তেমনি সকলের ওপরেই প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে তবে সে।

ঘুঁটেটা লাগল না কুসুমের গায়ে। চাঁপা আরেকটা ঘুঁটে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল আবার।

এবারেরটা লাগল। লাগল কুসুমবুড়ির হাড়-জির জিরে পিঠের ডানার কাছে।

কুসুমবুড়ি চমকে উঠে ঘুম-জড়ানো চোখে চাঁপাকে দেখেই কী মনে করল কে জানে,—চিৎকার করে বলল,—আমি ভাবিনি তোকে। এমন করে মেরে ফেলবে খাঁদু। বিশ্বাস কর তুই।

চাঁপা কঠিন গলায় বলল,—আমি খাঁদু নই। চাঁপা।

—চাঁপা!

একটা স্বপ্নের ঘোর ভেঙে এতক্ষণে যেন ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল কুসুম। জেগে উঠে বোকার মতন চেয়ে রইল চাঁপার দিকে।

দাঁতে দাঁতে চেপে চাঁপা বলল,—খাঁদু কখন মরে গেছে?

—বেলা এগারোটায়।

চোখ বুজে কাঠের মতন দাঁড়াল চাঁপা সেই পোড়ো ভাঙা বাড়ির উঠানের মধ্যিখানে। তার মনে হল,—এক্ষুণি বুঝি ইজেরপরা রোগা ছোট একটা খাঁদু এসে তার হাত ধরে বলবে,—আমাদের কারুর বাবা নেই। আমার নেই, পটলির নেই, সতুর নেই, গেঁড়ির নেই। কারুর না।

চাঁপা চোখ খুলে চিৎকার করে বলল—তুই, তুই, তুই রাক্কুসী খেয়েছিস খাঁদুকে; তুই রাক্কুসী আমাকেও খেতে চাস। তোকে খুন করব, তোকে খুন করব আমি।

দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে চাঁপা এগিয়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি চড় আর কিল মারতে লাগল হতভম্ব কুসুমবুড়িকে। তারপর মার থামিয়ে হঠাৎ একসময় ছুটে বেরিয়ে গেল ভাঙা বাড়ি থেকে।

ভাঙা বাড়ি থেকে সোজা সটান্ একেবারে নিজেদের বাসার দোতলার ঘরের মধ্যে।

এর মধ্যে কী ভাবে কখন যে সে ট্রামরাস্তা পার হয়েছে, কখন যে সে ডালপটির মানুষগুলোর নষ্টামি-ফচ্‌কেমী এড়িয়ে এসেছে, কিছু মনে নেই চাঁপার।

অসহ্য একটা জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে সে যেন একটা হাউইয়ের মতো পোড়ো ভাঙা বাড়ির উঠোন থেকে উঠে সোজা ঢুকে পড়েছে সোহাগীর এই দোতলার ঘরটার মধ্যে।

—কে?

—আমি।

—চাঁপা?

—হ্যাঁ!

—বাব্‌বা! ভাবিয়ে তুলেছিলি; কী রকম থাওয়ালে রে!

—আমার বাবা কে?

চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে থেকেই কথাটা সজোরে ছুঁড়ে দিলে চাঁপা সোহাগীর দিকে। কিছুক্ষণ আগে যেমন করে ঘুঁটে ছুঁড়ে মেরেছিল কুসুমকে ঠিক তেমনি করেই যেন কথাটা ছুঁড়ে আঘাত করল সে সোহাগীকে, তার অসুস্থা মাকে।

প্রথম ঘুঁটেটা লাগেনি কুসুমের গায়ে। প্রথম কথাটাই কিন্তু বিষাক্ত তীরের মত গিয়ে বিঁধল সোহাগীর রোগজীর্ণ বুকের মধ্যে।

সোহাগী আর্তনাদ করে উঠল,—চাঁপা!

এবার তূণ থেকে দ্বিতীয় বাণ নিক্ষেপ করল চাঁপা।

—তোমার বাবা কে?

—চাঁপা, চাঁপা, থাঁদু মরে গেছে আজ।

—জানি। চাঁপাও মরবে।

—চাঁপা! অমন করে দগ্ধাসনি আমায়।

—আমাকে কেন দগ্ধালে তুমি? কেন জন্ম দিলে আমায়? দিলে যদি তো কেন গলা টিপে মেরে ফেললে না আমায় জন্মের পরেই।

—চাঁপা, চাঁপা, আমার নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

—কবে সহজ ক'রে নিশ্বাস নিতে পেরেছ?

—চাঁপা!

—কুসুমবুড়ির পেট থেকে জন্মাওনি তুমি?

—না, না, না।

—মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা নয়।

—তবে কে তোমার মা?

—কাঁটাপুকুরের ময়রাদের বাড়ির গিন্নি সে। ঐ কুসুম আমাকে হাসপাতাল থেকে চুরি করে এনেছিল। বিশ্বাস কর চাঁপা, বিশ্বাস কর। এর এক বিন্দু মিথ্যে নয়। সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি······

ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল সোহাগীর কণ্ঠস্বর। তার বুকটা কেমন ঘন ঘন ওঠা-নামা করতে লাগল। নাকের ধার দু'টো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। চোখ দু'টো কেমন স্থির হয়ে আসতে লাগল।

চাঁপা চৌকাঠ থেকে ছুটে গেল সোহাগীর বিছানার কাছে। বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সোহাগীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল,—আমি বিশ্বাস করেছি মাগো, সব বিশ্বাস করেছি,—সব, সব, সব, সব।

সোহাগী তার শীর্ণ হাতটা তুলে কাকে যেন খুঁজতে খুঁজতে বলল,—সে কোথায়? সে? সে?

—বাবাকে খুঁজছ মা? বাবাকে? এক্ষুনি আমি চেঁচিয়ে বলছি হাপোরকে। সে দু'-মিনিটে ডেকে আনবে বাবাকে। স্থির হও তুমি।

মাকে ছেড়ে দৌড়ে গেল চাঁপা নিজের সেই ছোট্ট খোপটুকুর মধ্যে। সেই খোপের ফোকরে মুখ রেখে ডাক দিল,—হা-পো-ও-ও-র।

সুবল কামারের দোকান থেকে সাড়া এল,—যাই দিদি-ই-ই-ই।

চাঁপা বলল,—শীতলা-মন্দিরে গিয়ে আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে এস এক্ষুনি-ই-ই। মা'র শরীর কেমন করছে।

এই প্রথম বাড়িতে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে শ্যামাপদকে বাবা বলল। বলেই ফিরে এল নিজের খোপ থেকে সোহাগীর ঘরের মধ্যে। আবার মায়ের বিছানার ওপর ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল,—এক্ষুনি এসে পড়বে মা বাবা।

সোহাগীর কাছ থেকে কিন্তু সাড়া এল না কোনও।

মাকে ছেড়ে চাঁপা তাড়াতাড়ি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে অঞ্জলি ছিটে দিল সোহাগীর চোখে-মুখে, হাতপাখা নিয়ে মাথায় বাতাস করতে লাগল ঘন ঘন।

দূর থেকে যেন কী একটা অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছে সোহাগীর কানে; আর সোহাগী সেই সুরের দিক আন্দাজ করবার জন্তে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে চলেছে তার চোখের তারা।

চাঁপা কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল,—কী খুঁজছ মা তুমি? কাকে খুঁজছ।

সোহাগী বলল,—সে কোথায় গেল?

—কে? কার কথা বলছ মা?

—সাগর।

—আমাকে সুধাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই তো সেই কখন চলে গেছেন তিনি।

—চলে গেছে? চলে গেছে?

সোহাগী বিড়বিড় করতে করতে অস্ফুট স্বরে বলল,—আর আসবে না সে? আসবে না আর?

চাঁপা বলল,—কেন আসবে না।

সোহাগী চোখ দু'টো বড় বড় করে বলল,—আসবে? আসবে? আবার আসবে?

—নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু তুমি আর এখন কথা বোল না মা।

সোহাগী তার শীর্ণ হাতে চাঁপার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল,—এবার এলে আর যেন তাকে ছাড়িস নি চাঁপা। কিছুতেই ছাড়িস নি।

চাঁপা কিছু ঠিক বুঝতে না পেরে বিহ্বলভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আরো জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল তাকে।

৩০

ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালী।
তেরা চুল্লি না যায় খালি॥

চিৎকার করে উঠল কালীকিঙ্কর পাগলা। খড়ি-ওঠা লিকৃপিকে দেহটা নিয়ে ঘুরছে সে শ্মশানের আনাচে-কানাচে। মড়ার খাটের ভাল মতো দু'টো ফুলের তোড়া পেলেই এখনই গিয়ে বসবে মালগাড়ির রেল-লাইনের ঠিক মাঝখানটিতে। রেল-লাইনের কাঠের স্লিপারের ওপর বসে দুলতে দুলতে চেঁচাবে,—'কই গো, কনে কই গো, আমার কনে কই?'

বিরুয়া ডোমের মুখটা অপ্রসন্ন। না এসেছে একটা পালিশ করা খাট, না এসেছে ভাল একটা তোষক-বালিশ। নাঃ, পয়সাওলা লোকগুলো আজকাল মরছেও কম।

বিরুয়ার ছেলে রঘুয়া চিতার জলন্ত একটা কাঠ তুলে নিয়ে তারই আগুনে মুখের বিড়িটা ধরিয়ে রাস্তার কুকুরটার সঙ্গে খুনসুটি করছে। —দিন পাঁচেক আগে চমৎকার একটা মাথার বালিশ জোগাড় করেছে রঘুয়া। বিরুয়া এসে পৌঁছবার আগেই মড়ার খাট থেকে চকচকে লাল সাটিনের নরম তুলতুলে মাথার বালিশটা সরিয়ে ফেলেছিল সে নিজের ঘরের দড়ির খাটিয়ার নিচে। রাত্তিরে সেই নরম তুলতুলে

বালিশে একসঙ্গে দু'জনে মাথা দিয়ে শুয়েছে ওরা;—রঘুয়া আর তার বৌ পদ্মা। রঘুয়া চায় না বিশেষ কিছু। শুধু তাড়ির ভাঁড়টা মজুৎ থাকুক হাতের কাছে, পদ্মাটা অমনি নরম থাকুক চিরকাল, আর রোজ অন্তত একটা কোরে পয়সাওলা মড়া আসুক বাবা শ্মশানে। ব্যস্. তাহলেই আর কুছ পরোয়া নেই কাউকে।

ক্যামেরাবাবু দুলাল সাহা তাঁর ক্যামেরার তিন-ঠেঙে স্ট্যাণ্ডটা আর মাথায় মুড়ি দেবার কালো কুচকুচে চাদরটা নিয়ে মাঝে মাঝেই ঘুরে যাচ্ছেন একবার করে শ্মশানের চত্বরটা। কালো কাপড় আর ক্যামেরার স্ট্যাণ্ডটা চোখের সামনে দেখতে পেলে কারুর যদি ফোটো তোলবার কথাটা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। বলা তো যায় না।

মড়িপোড়া বামুন তারাচরণ শর্মা দু'বার দু'টো মুখাগ্নির কাজ সেরে ফতুয়ার পকেটে পয়সা নিয়ে ঢুকেছে গিয়ে গুটাউলী বুড়ির দরমা-ঘেরা আস্তানায়। সেখানে মাটির একটি ছোট্ট তেল-চক্‌চকে কল্কেতে এক টুকরো দড়ি পরিপাটি করে গুটিয়ে রেখে তাতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে এখন।

শ্মশানেশ্বর ভূতনাথ শিবের মন্দিরের সামনে চুনীলালের ফুল আর এলাচদানার দোকানের কাটতি ভাল হয়েছে আজ। দু'-দুটো অবাঙালী মড়া এসেছে আজ শ্মশানে।

মন্দিরের জটাধর সাধু তার লম্বা জটার বাঁধন খুলে দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জটা দুলিয়ে দুলিয়ে ডিং মেরে মেরে ঘুরে এসেছে ক'বার শ্মশানের চত্বরটা। ক্যামেরাবাবুর মতোই একই উদ্দেশ্য তার। এখানে যে একটা উঁচুদরের সাধু আছে, সেটা দেখে রাখুক লোকে। শ্মশানের চুল্লির চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে চিতা থেকে কী যেন খপ করে তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে চিবোবার ভাণ করেছে সে যথারীতি। সবটাই ভাণ, সবটাই হাতের কারচুপি। লোকে ভাবুক,—সত্যিকারের সিদ্ধপুরুষ সাধুটা। তবে তো মড়া-টড়া পুড়িয়ে ফেরবার পথে যখন শ্মশানেশ্বর ভূতনাথ শিবের মন্দিরে নমস্কার ঠুকতে আসবে, তখন দিয়ে যাবে গো দু'-চারটে পয়সা জটাধর সাধুর ছেঁড়া কম্বলের ওপর।

আশু গণৎকার মেয়েদের চানের ঘাট থেকে উঠে এসেছে এখন শ্মশানের মধ্যে। শ্মশানের ঘাটে নেমে হাত-পা ধুয়ে ঘাটের সিঁড়িতে ব'সেই মুড়ি-মুড়কি খেতে বসেছে। চোখের সামনেই লাইন-বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে হাতে-হাতে মাটির কলসিতে জল তুলে নিয়ে যাচ্ছে একদল লোক চিতায় ঢালবার জন্যে। তাদের আসা-যাওয়া, ঘাটের কাদা, মড়া পোড়ার গন্ধ, চিতার ধোঁয়া,—কোনো কিছুই যেন স্পর্শ করছে না আশু গণৎকারকে। অম্লানবদনে ধীরে-সুস্থে মুড়ি মুড়কি খেয়ে চলেছে সে। যেন, চারপাশে কেউ নেই তার। যেন, নিজের ঘরের তক্তাপোষের ওপর ব'সে আরামসে জলযোগ সারছে মানুষটা। শুধু মাঝে মাঝে চলে যাওয়া নৌকো কিংবা ষ্টীমারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিজের ডান হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবছে,—কে জানে, আরো কতদিন বাঁচতে হবে তাকে।

শ্মশানের পাশের বসবার ঘরটা থেকে নারীকণ্ঠের একটা কান্নার সুর ছাপাখানার মেসিনের আওয়াজের মতন কেমন একটা ছন্দ বজায় রেখে একটানা বেজে চলেছে। স্ত্রীলোকটির আপনার জন মারা যায় নি কেউ। মারা গেছে যে, তার সঙ্গে তিনকুলের কোনো দিক থেকেই কোন সম্পর্ক নেই তার। তার মৃত্যুতে বুকের কোনোখানে এতটুকু বেদনাও অনুভব করে নি সে একবারও। তবু কান্নার একটা একঘেয়ে সুর গলায় ধরে রেখে কেবলই ভাবছে, কতক্ষণে বাড়ি ফিরবে। না কাঁদলে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, তাই কাঁদছে। হোক না পাশের ঘরের অনাত্মীয় ভাড়াটে, তবু একটা মানুষ মরে গিয়ে শ্মশানে পুড়ে ছাই হতে এল, অথচ তার জন্যে একটুও কোথাও কান্নার আওয়াজ উঠল না, এটা যেন মৃতের প্রতি কেবল একটা চরম নিষ্ঠুর উপেক্ষা বলে মনে হয়েছে ঐ স্ত্রীলোকটির। তাই কান্নার আওয়াজ এতটা ধরে রেখেছে সে আগাগোড়া।

ঐ ক্রন্দনরতা স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে অনেকটা তফাতে পাথর-বাঁধানো রোয়াকের ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এখানে-সেখানে চুপচাপ বসে রয়েছে ঠানদি, রাজীব, সুবল কামার, ছাঁট-কাগজের গুদোমের ননী, বাইধর শতপথি এবং আরো অনেকে। কথা নেই কারুর মুখে। সকলেই নীরবে কী ভেবে চলেছে আনমনে।

ঘরের বাইরে শ্মশানভূমির উত্তর দিকের শেষ চিতায় দাউ দাউ করে জ্বলছে একটি শব। শ্মশানের শক্ত কালো পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে চাঁপা। আগুনের আঁচে চোখের জল শুকিয়ে গেছে তার। আগুনের হলকায় ঝলসে গেছে তার কচি মুখখানা।

অনেকটা তফাতে উবু হয়ে বসে শ্যামাপদ অপলক চোখে দেখছে রক্ত-মাংসের একটি দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। সাগর কোমরে একটা গামছা বেঁধে দড়ির খাটিয়ার পাশের দিকে একটা বাঁশ খুলে নিয়ে সেই বাঁশটাকে লাঠির মতন ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে চিতার কাছাকাছি। মাঝে মাঝে ঐ লম্বা বাঁশ দিয়ে চিতার কাঠ ঠেকেটুকে ঠিকঠাক্ করে দিচ্ছে সাগর।

চিতার আগুন প্রচুর ধোঁয়া উড়িয়ে জ্বলছে দাউ দাউ করে।

চিতার দিকে তাকিয়ে এখন আর বোঝাও যাচ্ছে না, যে ছিল ঐ চিতায়, সে কে ছিল, কি ছিল। সে পুরুষ না নারী, বালক না বৃদ্ধ, কিছু বোঝবার উপায় নেই এখন দেখে। পোড়া-কাঠের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে দেহটা এখন।

ঘণ্টাখানেক আগেও কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল, কে ছিল সে, কী ছিল সে।

সে ছিল এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। ডালপটির দোকানের আঁকাবাঁকা কাদামাখা গলি পেরিয়ে, জগন্নাথের মন্দির সাবিত্রী-সত্যবানের মন্দির সব পেরিয়ে, শনিমহারাজের মন্দিরের কাছাকাছি জলের কলের ধারে টিনের যে দোতলা বাড়ি,—যার তলায় একটা মুড়ি-মুড়কির দোকান আর একটা ছাঁট-কাগজের গুদোম,—সেই বাড়ির দোতলার ঘরের বাসিন্দা ছিল সে।

সোহাগী ছিল তার নাম।

সোহাগী পুড়ছে, অথচ এই মুহূর্তেই কাঁটাপুকুরের ময়রাদের বাড়িতে গিন্নিদের মহলে বিন্তি খেলার আড্ডা চলছে হয় তো পুরোদমে। ওরা কেউ জানতেও পাচ্ছে না কিছু। কী মজা!

আচ্ছা, এই সময় যদি এমন হতো,—ঐ ময়রাদের বাড়িতে গিন্নিরা বিন্তি খেলছে, এমন সময় বাড়ির ছোট্ট কোনও একটা ছেলে

এসে খবর দিত,—'ঠাকুমা, বারান্দার খাঁচা থেকে টিয়াপাখিটা উড়ে গেছে।' তা হলে বেশ হতো। সোহাগীর সেই গর্ভধারিণী আসল মা সেই শুনে তাস ফেলে ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টিয়াপাখিটার জন্তে দুঃখে চোখের জল ফেলতেন খানিকটা। অথচ, জানতেও পারতেন না যে, তার চেয়ে কত বেশি চোখের জল ফেলবার একটা ঘটনা ঘটে চলেছে গঙ্গার ধারের শ্মশানে?

কিন্তু তাই কি হয় ছাই।

সোহাগীর দেহটা পুড়ছে।

তারপর?

শনিমন্দিরের পাড়ার দোতলার ঘরে একটা হতভাগিনী মায়ের বুক আর অস্থির হয়ে ছটফট করবে না চাপার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। চাপার স্কুলে যাওয়া আর ফিরে আসার মাঝখানের সমস্ত সময়টায় একটা সদাশঙ্কিত হৃদয় বার বার জানলা দিয়ে গলে গিয়ে চাপার স্কুলের দরজার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

আধেক রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে কেউ আর শ্যামাপদকে ডেকে শুধোবে না,—হ্যাঁ গো, আমার চাপার কি হবে?

দুপুরবেলা সুবল কামারকে ডেকে ব্যাকুল কণ্ঠে কেউ আর বলবে না,—সুবল সখা, চাপার গায়ে আমার মতন কাদা লাগবে না, কি বলো?

ঠানদিকে কাছে পেলেই কেউ আর তার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বলবে না—ঠানদি গো, তোমরা সবাই জোর ক'রে একটু বলো না যে, তোর চাপা ঘর পাবেই পাবে। তা হলেই তো আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।

সোহাগীর দেহটা ছোট্ট হয়ে ফুরিয়ে আসছে এবার।

দেহটা ছোট হয়ে আসছে যত,—তার বুকের ব্যাকুল প্রশ্নগুলো বড় হয়ে উঠছে ততই।

চিতার ধোঁয়ার সঙ্গে সেই প্রশ্ন যেন শূন্যে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। ধোঁয়ার মতই ম্লান করে দিচ্ছে সকলের মুখ, সকলের মন।

পিদিম জ্বালানো হয়েছে একটা।

তার পাশেই পেতলের ছোট ঘটিতে গঙ্গাজল রাখা হয়েছে। আর, কাঠ চেলা করবার লোহার কাটারিটা।

সোহাগীর ঘরে এসে উঠেছে সবাই। ঠানদি, শ্যামাপদ, রাজীব, সুবল কামার, সাগর এবং আরো অনেকে।

শুধু চাপা নেই।

সে কোনরকমে একটা পেন্নাম ঠুকেই পালিয়ে গেছে নিজের সেই ছোট্ট খোপের মধ্যে।

নিস্তব্ধ ঘরটা। প্রত্যেকেরই মনে হচ্ছে, কানে যেন তালা লেগেছে তার,—তাই কিছু শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ শোনা গেল,—

—চাপার কী হবে?

শুনে চমকে উঠল সবাই। চমকে উঠে তাকাল পিদিমটার দিকে।

কথাটা কে বলল?

ঠানদি কি?

শ্যামাপদ কি?

সুবল কামার কি?

যেই বলে থাকুক। সেও কিন্তু নিজেও চমকে চমকে উঠেছে কথাটা শুনে। নিজে বলেও তার মনে হয়েছে কথাটা অন্য কোথা থেকে ভেসে এল।

কী হবে চাপার? কোথায় যাবে সে? কে নেবে তার ভবিষ্যতের ভার?—এই চিন্তায় সমস্ত ঘরখানা যখন বোবা হয়ে গেল আবার ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠল সাগর,—আমি ব্যাটা জানোয়ার, না? তাই আমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করারও দরকার মনে করছ না কেউ। দিদিও আমাকে জানোয়ার ভেবেছিল, ঠানদিও জানোয়ার ভাবছে আমাকে। ঠিক আছে, আমি জানোয়ার। কিন্তু এই আমি বলে রাখছি সবাইকে; এই জানোয়ারের কাছেই থাকবে চাপা। চিরজন্মো থাকবে। কোনো মিঞাকে কেয়ার করি না আমি।

বলেই কারুর দিকে আর না তাকিয়ে দুমদুমিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল সাগর ঘরের মধ্যে একটা ঝড়ের হাওয়া তুলে।

আশ্চর্য! সেই ঝড়ে কিন্তু ঘরের মধ্যেকার মাটির পিদিমটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন!

৩১

চুমকি জরির কলকা চাই? গিলটির গয়না, বল-বেয়ারিং ডাইস, হিমালয়ের আসল শিলাজতু? রুপোর খাড়, পায়ের ঝাঁঝর, গলার হাঁসুলি?

জ্যামেকা সালসা চাই? বেবী সিনেমা, পকেট প্রেস, পিতলের পিকলু বাঁশী?

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ চাই? বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র, অদ্ভুত কোকশাস্ত্র, প্যাটেন্ট ঔষধশিক্ষা?

সাঁওতালী বশীকরণতন্ত্র খুঁজছেন? পবনবিজয় স্বরোদয়, হঠযোগ প্রণালী, জাতক-চন্দ্রিকা?

যাত্রার বই চাই? ভাড়া-করা সখীর ব্যাচ?

চলে আসুন, চলে আসুন বাবুরা এখানে।

গঙ্গার ধারের এলাকাটা চিৎকার করে হাঁক দিচ্ছে যথারীতি। খদ্দেরের আশায় ছটফট করছে সমগ্র অঞ্চলটা।

পানের দোকানগুলো পান সেজে চলেছে দ্রুত হাতে। খাবারের দোকানগুলো সিঙ্গাড়ার ঠোল পাকিয়ে পুর দিয়ে মুড়ে চলেছে চটপট। চায়ের দোকানগুলোর উনুনে গরম জল ফুটে চলেছে টগ্‌বগ্‌ করে।

অধীর ক্যামেরাবাবু দুলাল সাহা,—চঞ্চল মড়িপোড়া বামুন তারাচরণ শর্মা—অস্থির বিরুয়া ডোম।

খদ্দেরের অপেক্ষায় চন্‌মন্‌ করছে সবাই।

চন্‌মন্‌ করছে মোষের খাটালের পিছনের রাতজাগা বস্তিটা, চন্‌মন্‌ করছে মন্দিরের লোভার্ত পুরুৎগুলো, চন্‌মন্‌ করছে রাস্তার কুকুর ক'টা।

চারিদিকের এই ছটফটানির মধ্যে শুধু স্থির হয়ে আছে তিনটি প্রাণী।—ঠানদি, শ্যামাপদ আর সুবল কামার।

নিজের দোকান-ঘরটির ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে একটাও আলো না জেলে অন্ধকারে গুড়িসুড়ি হয়ে চুপটি করে ব'সে ঠানদি জেগে-জেগে সুন্দর স্বপ্ন দেখে চলেছে একটা।

সে-স্বপ্নে অনেক রঙ আছে, অনেক সুগন্ধ আছে, অনেক আলো আছে, অনেক সুর আছে। সে-স্বপ্নের ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্তুরের মুখটা ঠিক সাগরের মুখের মতন। আর, রাজকন্তেটা? সেটা ছ'বার যদি চাপা হয়ে যায়, চার বার মেনকা হতেও বাধে না তার একটুও।

মরণ আর কি বুড়ির!

সুবল কামারের কামারশালায় হাপোরটা হাপাচ্ছে না আজ। গরম লোহাকে পিটিয়ে নতুন চেহারা দেবার কাজ স্থগিত রয়েছে আজ। সাগর নামক জোওয়ান একটা ছেলে মরচে-পড়া ভোঁতা একটা ঘটনাকে যে শক্ত হাতে পিটিয়ে চক্ষের নিমেষে সোজা-সিধে ধারালো একটা খবরে দাঁড় করিয়ে দিল,—মনে মনে সেই মজবুত দৃঢ় হাতটাকে টিপে-টুপে দেখছিল সুবল কামার। আর বহুদিন আগেকার ফেলে-আসা একটা ঘটনার কথা মনে ক'রে ভাবছিল, সেদিন যদি তার নিজের হাতটাও সাগরের মতন অমনি শক্ত হতে পারত!

কিন্তু শ্যামাপদ কোথায়?

শীতলা মন্দির-চ্যুত শ্যামাপদকে কোথায় পাওয়া যাবে?

শ্যামাপদ একলা বসে আছে গোড়েন ঘাটের ধারে।

গঙ্গা বয়ে চলেছে। রোদের আলো চিক্‌চিক্ করছে জলে। মস্ত একটা পালতোলা নৌকা তার কালো বিশাল দেহটা নিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে গুটি গুটি। বড় নৌকাটার সঙ্গে একটা ছোট নৌকা বাঁধা। জলের ঢেউয়ে ছটফট্ করছে সেটা। বড় নৌকাটা যদি মা হয়—ছোট নৌকাটা তার দুরন্ত কচি মেয়ে।

যেন লক্ষীমণি চলেছে তার মেয়েটাকে কোমরের দড়ির সঙ্গে বেঁধে!

লক্ষীমণির বড় ভয় ছিল—পাছে মেয়েটা তাকে ফাঁকি দিয়ে যমের বাড়ি পালিয়ে যায়। তাই সব সময় তাকে নিজের কোমরের দড়ির সঙ্গে বেঁধে-বেঁধে পথ চলত।

সোহাগীও তো তাই করত।—সব মা-ই বুঝি মনে মনে লক্ষীমণি।

সোহাগী চোখে-দেখা দড়ি দিয়ে কোনোদিন বাঁধেনি চাঁপাকে। বেঁধে রেখেছিল অদৃশ্য এক দড়ি দিয়ে। লক্ষীমনির মতোই ওর বড় ভয় ছিল,—সোহাগী চোখ বুজলেই চাঁপা পাছে ধরা পড়ে যায় কুসুমবুড়িদের কবলে।

তারই জন্যে কী অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও যুঝেছে সে মৃত্যুর সঙ্গে এত কাল! লোকে প্রিয়জনের জন্যে প্রাণ দেয়; সেই তার চরম দান। সোহাগী চাঁপার জন্যেই শুধু প্রাণটা না দিয়ে টিকিয়ে রেখেছিল—সে কি কম দেওয়া!

কিন্তু কী আশ্চর্য! চাঁপাকে যে জায়গায় তুলে দেবার জন্যে প্রাণপণে এতকাল নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সোহাগী,—আজ চাঁপা যখন পৌঁছে গেল সেই জায়গাতে, তখন সোহাগীটাই রইল না বেঁচে।

কী অদ্ভুত! সোহাগীটাই নেই আজ।—যাঃ!

কত ছটফটানি, কত হাকুপাকু, কত রাত জেগে আবোল-তাবোল ভাবনা, কত রাগ, কত ঝগড়া, কত কান্না,—সব উড়ে গেল ফুস্‌মন্তরে।

এখন শ্যামাপদ কী করবে?

এই পুজুরি-বামুনের ছেলেটা কী করবে?

শ্যামাঠাকুর তাকাল দু'-দিকে। বাঁ-দিকে কাছের শ্মশান। ডান-দিকে দূরের শ্মশান। মাঝখানে একলা শ্যামাঠাকুর।

এখন শ্যামাপদ কী করবে?

সূর্যের আলো ম্লান হয়ে আসছে, সেই বড় নৌকাটা এগিয়ে গেছে খানিকটা, ওপারটা আবছা দেখাচ্ছে।

এখন শ্যামাপদ কী করবে?

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াতে এসে বাপের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে বাড়ির দিকে, পেন্সনরদের জমায়েৎ-টা ভাঙি-ভাঙি হচ্ছে, একটা ঠেলাগাড়ির গাড়োয়ান কাগজের ঠোঙার মধ্যে মোমবাতি জেলে সেটা গাড়িতে ঝুলিয়ে দেবার কসরৎ করছে।

এখন শ্যামাপদ কী করবে?

সারাদিনের কাড়াকাড়ি টানাটানির পর রেল-লাইনের খাঁজে-খাঁজে ভিখিরিদের উনুনে আগুন পড়ল ভূতনাথ-চিনিবাসেরা ভিক্ষের চাল ধুচ্ছে গঙ্গার জলে, একদল সিমেন্টের গুদোমের মজুর সারাদেহে সিমেন্টের গুঁড়ো মেখে নাইতে এসেছে গঙ্গায়।

এখন শ্যামাপদ কী করবে?

কী ভেবে উঠে পড়ল শ্যামাপদ গোড়েন ঘাট ছেড়ে। গুটি গুটি এগিয়ে গেল ঠানদির দোকানের দিকে।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ।

—ঠানদি গো।

ঝাঁপের কাঠের ফাঁকে মুখ রেখে আস্তে করে ডাকল শ্যামাপদ।

সাড়া এল না।

দোকানের পিছনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শ্যামাপদ।

দরজায় তালা ঝুলছে।

খুঁজে খুঁজে গঙ্গার ধারের বাজ-পড়া ন্যাড়া নিমগাছের তলায় দেখতে পেল ঠানদিকে।—অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়ে বসে আছে চুপচাপ নিমগাছের গোড়ায়।

শ্যামাপদ ধীরে ধীরে গিয়ে বসল পাশে।

—একলাটি এখানে বসে যে ঠানদি?

ঠানদি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল,—এই।

—দোকান খোলো নি?

—নাঃ।

—কেন গো? শরীর খারাপ?

—আর পারি না। একটু এবার জিরোতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে, একজন কেউ বসে-বসে দোকান চালাক আর আমি আঁচল পেতে শুয়ে-শুয়ে পান খেতে-খেতে দেখি।

কিছুক্ষণ চুপ করে গঙ্গার কালো জলের দিকে তাকিয়ে থেকে ঠানদি হঠাৎ যেন অন্ধকারে মাটি হাতড়ে কুড়িয়ে পেয়েছে কিছু, এমনি ভাবে বলে উঠল,—তুমিই আমার সেই সাধটা মেটাও না দাদা।

—আমি?

—হ্যাঁ গো। কোথায় সে কোন্ মেপাড়ায় চিনেমাটির পুতুলে

চোখ আঁকার চাকরি করতে যাবে দাদা। আমাদের ছেড়ে, এই গঙ্গার কাদা-মাখা পাড়া—পেত্তিবেশী ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি?

চুপ করে রইল শ্যামাপদ।

ঠানদি বলল,—আমি জানি তুমি পারবে না। তাই কি পারা যায় নাকি? এতদিনের মেলামেশা, এতদিনের জানাশোনা, এতদিনের একসঙ্গে ওঠা বসা কাঁদা-হাসা,—সব ঘুচিয়ে দিয়ে দূরে পালিয়ে যাওয়া যায় নাকি?

জড়াচ্ছে ঠানদি। জড়াচ্ছে শ্যামাপদকে। এক বাঁধন থেকে আরেক বাঁধনে জড়াচ্ছে।

বহুকাল বাদে হঠাৎ মাকে মনে পড়ে যায় শ্যামাপদর। মায়ের রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখটা পর্যন্ত। দশটি ছেলের মা হয়ে অভাবের সংসারে মুখ থুবড়ে প'ড়ে মরতে হয়েছে যে-মাকে, সেই মায়ের জন্যে হঠাৎ এতকাল বাদে মন-কেমন করে উঠল শ্যামাপদর। কান্না পেতে লাগল।

ঠানদি বলল,—কী হল? কাঁদছ না কি গো শ্যামাদাদা?

—নাঃ, কই না তো।

আকাশ থেকে অন্ধকারের গুঁড়ো ঝরে ঝরে পড়তে লাগল দু'জনের মাথার ওপর। সেই গুঁড়োয় একটু একটু করে ঢাকা পড়ে যেতে লাগল ওরা।

ঠানদি বলল,—অনেককাল আগে আদি-গঙ্গার ধারে এক কুমোরের মেয়ে ছিল, জানো শ্যামাদাদা। মেয়েটা ঘর চেয়েছিল, সংসার চেয়েছিল,—কেউ দেয়নি। সকলে শুধু তাকে আঁচড়েছে, কামড়েছে আর ছিঁড়েছে। তারপর যখন মেয়েটার চুল পাকল, দাঁত পড়ল, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হল—তখন জোয়ান একটা ছেলে বুক ফুলিয়ে এসে তাকে ঘর দিল, সংসার দিল। বলতে পারো, সেই ছেলেটার নাম কি?

শ্যামাপদ বলল,—সাগর।

—আর মেয়েটা?

—ঠানদি।

ঠানদি অন্ধকারে নিমগাছের গোড়ায় হাতড়াতে হাতড়াতে সেইখানে এসে থামালো তার কাঁপা হাতটাকে, যেখানে শশিকান্তর নামের পাশে ক্ষোদাই করা আছে সেই মেয়েটির পোষাকী নাম,—মেনকা।

সেই নামটির ওপর হাত বোলাতে-বোলাতে ঠানদি বলল,—এই কাদার রাজত্বি থেকে পা ধুয়ে উঠে চাঁপা আমার আলতা পরেছে পায়ে।—হ্যাঁ গো শ্যামাদাদা, বলতে পারো এ-সুখ আমি কোথায় থুয়ে সোয়াস্তি পাই?

শ্যামাপদ জবাব দিল না কোনও। ঠানদিবুড়িকে তার নবলব্ধ সুখের বিপুল ঐশ্বর্য গুছিয়ে তুলে রাখবার মতো উপযুক্ত স্থান বাছাই করবার অখণ্ড অবসর দিয়ে' মনে মনে ফিরে গেল ফেলে-আসা দিনের একটি রাত্রে।······

সেদিন সোহাগীকে ভরসা দেবার জন্যে শ্যামাপদ বলেছিল,—ছোটবেলায় গল্প শুনিসনি সোহাগী,—গরীব অসহায় মা-বাপ নিজেদের শিশুকে গামলায় শুইয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর স্রোতে। সেই গামলা ভাসতে-ভাসতে কোন্ ঘাটে এসে লেগেছে। সেখানে নাইতে এসেছেন সন্তানহীনা রাণীমা। তিনি বুকে তুলে নিয়েছেন সেই শিশুকে।—মনে কর, তুইও তেমনি ভাসিয়ে দিয়েছিস তোর চাঁপাকে। একদিন ঠিক ঘাটে গিয়ে লাগবে;—একদিন কেউ ওকে বুকে তুলে নেবে।

শুনে সোহাগী বলেছিল,—ভাসতে-ভাসতে চড়ায় এসে ঠেকবার আগে কত গামলাই যে ডুবে গেছে মাঝ-নদীতে, তার হিসেব কে রেখেছে?

চাঁপা ঘর পেয়েছে।

খাঁদুটা বেঘোরে মরল।

নদীর জলে গামলা ভাসিয়ে দিয়ে অসহায়ের মত আর কতকাল এমনি ঢেউ গুনবে মানুষ?

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে আরো। গঙ্গার জল কালো হয়ে উঠছে। শ্মশানের ঘাট থেকে চিতার পোড়া কাঠের জঞ্জাল কারা ভাসিয়ে দিলে গঙ্গার জলে।

নদীতে এখন ভাটির টান। জল নেমে যাচ্ছে। বেরিয়ে পড়ছে নদীর কাদামাটি।

সেই কাদা পায়ে পায়ে কতদূর ছড়িয়ে যাবে।

সমাপ্ত

কৃষ্ণপুরী দ্বারকা

মীরা রায়

মন্দিরময় ভারতের রূপৈশ্বর্য প্রত্যেক হিন্দুকে আকর্ষণ না করে পারে না। এর বাহ্যিক ঐশ্বর্য যেমন দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে, তেমনি এর আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ মানুষের মনোরাজ্যে এক প্রধান আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই-এরই আকর্ষণে ধর্মপিপাসু হিন্দুচিত্ত বরাবর ছুটে গিয়েছে নানা দুর্গম তীর্থের পথে। এই প্রলোভন আমায় একদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিল ভারতের এক প্রান্ত কলকাতা থেকে আর এক পশ্চিমতম প্রান্তে দ্বারকায়। সৌরাষ্ট্রের শেষ প্রান্তে আরব সাগরের নীলোচ্ছ্বাস জলরাশির মধ্য থেকে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের রাজত্বের লীলাভূমি, হিন্দুর পরম বরণীয় তীর্থ দ্বারকাধাম। এর একদিকে বিরাট নীলাম্বুধি অনুক্ষণ পাদবন্দনা করে চলেছে আর তিনদিকে ঘিরে রয়েছে শুষ্ক মরুপ্রায় সীমাহীন প্রান্তর। এরই মাঝে গড়ে উঠেছে ছোট দ্বারকা নগরী যেখানে নাকি এককালে শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করতেন তাই এখানকার কৃষ্ণের মূর্তি রাজবেশে মণ্ডিত রাজমূর্তি। এই বহু মূল্যবান ঐশ্বর্য-মণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তির এখানে একটি বিশেষ নাম আছে সে নামটি হল রণছোড়জী। সাধিকা মীরাবাঈ এই নামে এই মূর্তিকে আরাধনা করে গেছেন বলে এই নামেই তিনি দ্বারকার অধিবাসীদের মধ্যে অধিক সুপরিচিত। অবশ্য এই নামের পৌরাণিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পৌরাণিকরা বলেন, মহাভারতীয় যুগে জরাসন্ধ দিন দিন কৃষ্ণবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন এবং তিনি কৃষ্ণকে হীন প্রতিপন্ন করবার মানসে বার বার তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান জানান। শান্তিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় এসে রাজত্ব করতে থাকেন, যুদ্ধ পরিত্যাগ করে এসেছেন বলে তাঁর এখানকার মূর্তির নাম হল রণছোড়জী! যদিও শেষ পর্যন্ত দাম্ভিক জরাসন্ধকে দমন করবার জন্য তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এবং জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হন। ভক্তের কাছে ভক্তিপ্রিয় মাধব জীবন্ত হয়ে ওঠেন, তাই এই কৃষ্ণমূর্তি রণছোড়জী একদিন সাধিকা মীরাবাঈ-এর স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন। মীরাবাঈকে না জানলে দ্বারকাধীশকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মীরাবাঈ আর দ্বারকানাথ এক হয়ে জড়িয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায়, ভক্তের হৃদয়ে দ্বারকার মন্দিরে, দ্বারকার আকাশে বাতাসে অধিবাসীদের অন্তরে, তাদের পুরাণ গাথায়।

আবাল্য কৃষ্ণপ্রেমিকা মীরা তাঁর দয়িতের খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন বহু তীর্থে তীর্থে। অবশেষে এলেন দ্বারকায়। মেবারের রাণী মেবারের রাণা কর্তৃক বহু উৎপীড়িতা হয়ে ছুটে বেড়ালেন তাঁর ঈপ্সিতের খোঁজে, তাঁর অতৃপ্ত আত্মা শেষে খুঁজে পেল তাঁর প্রিয়তমকে এই রণছোড়জীর মাঝে, এইখানে তিনি পেলেন পরম শান্তি। তাঁর সাধনা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন তাঁকে। তিনি বিভোর হয়ে আরাধনা করতে লাগলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে। কিন্তু মেবারের বহু বিপর্যয় দেখা দিল, অমাত্যগণ স্থির করলেন তাঁদের রাণী মেবার ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাই মেবারে এত দুর্যোগ অতএব রাণীকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। রাণাও আদেশ দিলেন অনুচরবর্গকে মীরাবাঈকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। দ্বারকায় রাজ-অনুচরবর্গ এলেন রাণীকে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু মীরাবাঈ তাঁর রণছোড়জীর অনুমতি ভিন্ন যেতে পারেন না। এতদিন পরে তিনি মিলেছেন তাঁর প্রিয়তমের সাথে, তাঁকে ছেড়ে তিনি কিছুতেই যেতে পারেন না। তবুও অনুচরবর্গের পীড়াপীড়িতে রণছোড়জীর অনুমতি নিতে তিনি মন্দিরদ্বার বন্ধ করে গিয়ে পড়লেন তাঁর চরণে। বন্ধ দরজার এধারে অপেক্ষা করছেন মেবারের অনুচরবৃন্দ।

সময় চলে যায় বহুক্ষণ, বন্ধ-দরজা কেউ খোলে না। পুরোহিত অনুচরবৃন্দ সকলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে, শেষে অসহিষ্ণু জনতার অনুরোধে পুরোহিত বলপূর্বক দরজা খুললো। কিন্তু একি মীরার চিহ্ন মাত্রও নেই, মীরাবাঈ লীন হয়ে গেছেন রণছোড়জীর চরণতলে, সাধনা মিশে গিয়েছে সিদ্ধির মাঝে, প্রকৃতি লীন হয়েছেন মহাপুরুষের সাথে। মীরার জীবনস্বামী এতদিন পরে এসে মিলিত হলেন মীরার সাথে। দ্বারকার লোকজনের মুখে মুখে এ কাহিনী অমরত্ব লাভ করেছে, এবং দ্বারকানাথের মূর্তি যেন আজও সেই কাহিনীর জীবন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে বিরাজমানা।

ট্রেন থেকে নেমে প্রথমে চোখে পড়ে আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল জনবিরল প্রান্তর, যেন জলাভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে শুয়ে পড়ে ধুঁকছে। ষ্টেশনের ধারে একটি সুদৃশ্য রিটায়ারিং রুম নতুন তৈরী হয়েছে। তার পিছন দিয়ে চলে গেছে সহর ও মন্দিরমুখী একটিমাত্র পাকা রাস্তা। ষ্টেশন থেকেই রণছোড়জীর মন্দিরের সু-উচ্চ উড্ডীয়মান পতাকাসমেত প্যাগোডাকৃতি চূড়াটি দেখতে পাওয়া যায়। সহরে ঢুকতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে A. C. C. সিমেন্টের নতুন কারখানা। এই কারখানাকে ঘিরে স্থানীয় কর্মচারীদের একটি ছোট কলোনী গড়ে উঠেছে। এ-সব ছাড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে সহরের মধ্যে ঢুকলাম। এ-পাশে ওপাশে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে দু'টে-চারটে পুরাণো বাড়ী। সহরের প্রথমেই রয়েছে বাঙালীদের একমাত্র ধর্মশালা ভোলাগিরি মঠ। কলকাতার বাঙালীরা সাধারণত এইখানেই এসে উঠে থাকেন। এদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম বাজারের দিকে, ছোট ছোট দোকান-বাজারের

মেলা বসেছে, এদের মধ্যে দ্বারকানাথের ছবি ও মালার দোকানেরই সংখ্যা বেশী। এই বাজারের সামনে মন্দিরে ঢোকবার সহরমুখী বিরাট তোরণ। এরই ঠিক বিপরীত দিকে আছে মন্দিরের সমুদ্রাভিমুখী তোরণদ্বার। উঁচু উঁচু বহু সিঁড়ি পার হয়ে উঠে এলাম মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মন্দিরকে চারিদিকে বেষ্টন করে রয়েছে এই প্রাঙ্গণ। উঁচু চূড়াবিশিষ্ট রণছোড়জীর মন্দির সংলগ্ন রয়েছে নানাবিধ কারুকার্য সম্বলিত মোটা মোটা স্তম্ভে ঘেরা নাট-মন্দির। বেলে পাথরের তৈরী এই কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির প্রাচীন স্থাপত্যের এক অপরূপ নিদর্শন। সমগ্র মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭৮ ফুট এবং প্রস্থে ৬৬ ফুট লম্বা ও চওড়া। মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে দাঁড়ালাম, এই গর্ভগৃহে নারায়ণ বিরাজ করছেন রাজবেশে এতদূর থেকে বহু আশা নিয়ে গিয়েছি তাঁর সেই মূর্তি দর্শনের অভিলাষে, বহু শ্রমসাধ্যে আজ যে সৌভাগ্য অর্জন করতে চলেছি তারই আনন্দে ও উত্তেজনায় গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি মেলে দেবার আগের মুহূর্তটুকু পরম রমণীয়তার সঙ্গে উপভোগ করলাম, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রুদ্ধ হয়ে গেল, অন্তর্মুখী দৃষ্টি দিয়ে এবং সমস্ত চেতনা দিয়ে সমগ্র মনোজগৎ মন্থন করে আহৃত যে মাধুরী আমার হৃদয়পাত্রকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে তুলল, বহির্জগতের বিচারশক্তির কাছে তার কতটুকু মর্যাদা আছে জানি না, তবে আমার স্মৃতির মণিকোঠায় এটি একটি উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ হয়ে রইল, তার অমৃতময় স্বাদ আমার জীবনে অবিনশ্বর হয়ে রইল।

অন্তরের সব-কিছু উৎসর্গ করে দিয়ে দৃষ্টি মেলে ধরলাম যাঁর প্রতি, এ তাঁর কি মূর্তি দেখলাম! নানা ঐশ্বর্যমণ্ডিত সোনার সিংহাসনে বহুমূল্য রত্ন ও বস্ত্রালঙ্কারে ষড়ৈশ্বর্যমণ্ডিত চতুর্ভুজ নারায়ণ আপন রূপ ঔজ্জ্বল্যে জাজ্বল্যমান, তাঁর জগদ্ব্যাপী বিভূতি যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে এখানে তাঁর সর্ব অঙ্গে বিরাজ করছে। মন্দির অভ্যন্তরের উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলো তাঁর সর্বাঙ্গে আলোর প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। বাইরের চোখের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেল। চোখ বুজে মনে মনে খানিকক্ষণ ওঁর এই রূপসুধা পান করলাম। কি জীবন্ত মূর্তি কি অদ্ভুত চিত্তাকর্ষণকারী আবেদন নিয়ে ঐ রত্নকরোজ্জ্বল বদনে ভক্তের প্রাণে অপূর্ব সুধারস সৃজন করছেন। মাথায় রত্নশোভিত চূড়া, কানে হীরার কুণ্ডল, দুই গালে বড় বড় হীরার ফুলে চমক লাগান দ্যুতি, অঙ্গে ভেলভেট ও জরীর পোষাকের সঙ্গে নানাবিধ রত্নালঙ্কার এসব মিলিয়ে দ্বারকাধিপতিকে যথার্থই মহারাজা বলে মনে হল। ওঁর মুখে বিশেষ করে ওঁর দুই চোখে যে জীবন্ত আবেদন আমার মনে গভীরভাবে নাড়া দিল তার ঐহিক ব্যাখ্যা আমার কাছে অজ্ঞাত। আমিও কি সন্ধান পেলাম ওঁর মাঝে আমার আরাধ্য দেবতার? পূজা অর্ঘ্য যথারীতি প্রদান করে গর্ভগৃহ সংলগ্ন নাটমন্দিরে এসে দাঁড়ালাম। এই মণ্ডপটি চতুষ্কোণ পাঁচতলাবিশিষ্ট। প্রত্যেক তলা দাঁড়িয়ে আছে নানা কারুকার্যকরা স্তম্ভের ওপর। শেষ তলার ওপর আকাশমুখী একটি গম্বুজ এবং গর্ভগৃহের শীর্ষদেশ থেকে প্রশস্ত থেকে ক্রমবিলীয়মান প্যাগোডাকৃতি চূড়াটি সহরের সর্বত্র থেকে দৃষ্ট হয়। এই চূড়াটিতে ভারতীয় ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন খোদিত আছে। মন্দির গাত্রে বহু কারুকার্যের ওপর কালের নির্দয় ক্ষতচিহ্ন পড়েছে। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূড়া প্রধান চূড়াটিকে বেষ্টন করে নীচুতলা থেকে ক্রমে শিখরাভিমুখে উঠে গিয়েছে। সাতটি ক্রমিক সঙ্কীর্ণমান স্তরে এই প্রধান চূড়াটি গঠিত হয়েছে। নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণে এলাম—এই প্রাঙ্গণের চারিদিক ঘিরে রয়েছে অনেকগুলি ছোট মন্দির। এদের মধ্যে আছে বলরামজীর মন্দির, লক্ষ্মীদেবীর মন্দির ও কাশীবিশ্বনাথ জীউর মন্দির। রণছোড়জীর মন্দিরের সামনে রয়েছে ওনার ভোগ প্রস্তুতের জন্য রান্নামহল। সেখানে পুরোহিতের বাড়ীর মহিলারা স্বহস্তে রণছোড়জীর ভোগ প্রস্তুত করেন। ভোগের যে বিরাট প্রস্তুতি দেখলাম তা আমাদের যে কোন ধনীগৃহের উৎসবের আহারাদির ব্যবস্থাকে হার মানাবে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রণছোড়জীর বহুবার বহুবিধ পর্যায়ের ভোগ রান্না হয়।

প্রধান মন্দিরের ঠিক পশ্চাদ্দেশে রয়েছে শ্রীশঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত সারদা মঠ। এই মঠ সংলগ্ন একটি চত্বর রয়েছে এবং এর চারদিক ঘিরে ছোট ছোট ঘর আছে। প্রত্যেকটি ঘরের মধ্যে একটি করে বিগ্রহ রয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণ মহিষীগণ এবং অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ইত্যাদি কৃষ্ণ বংশধরগণের মূর্তি। মাতা দেবকীরও একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূজারীর নিকট শুনলাম শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এবং অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ ৫০০০ হাজার বছর আগে দ্বারকায় রণছোড়জীর এই মন্দির নির্মাণ করেন এবং শঙ্করাচার্য এই সারদামঠ ২০০০ হাজার বছর আগে এখানে স্থাপনা করেন। অবশ্য এর কোন ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় না। সমস্ত মন্দির পরিক্রমা করে মন্দিরের পশ্চিমে সমুদ্রাভিমুখী প্রবেশদ্বারে এলাম। তোরণমুখ থেকে প্রায় ৫০-৬০টি সিঁড়ি সোজা নেমে গিয়েছে নীচে গোমতী ঘাটে, সিঁড়ির দুধারে থরে থরে ঘরে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান বসেছে, তীর্থযাত্রীদের প্রলুব্ধ করবার প্রয়াসে। নীচে নেমে এলাম গোমতী ঘাটের বিস্তীর্ণ বালুর পাড় অতিক্রম করে ওর জল স্পর্শ করলাম। গোমতী নদী এইখানে সাগরে এসে মিশেছে, কিন্তু দেখে মনে হল দূরের সমুদ্র যেন তার এক অংশ প্রসারিত করে দিয়েছে দ্বারকানাথজীর মন্দিরের স্পর্শ করবার জন্য। তার স্বচ্ছ সলিলে খেলা করে বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য জীবজন্তু। এই গোমতী ঘাটে দাঁড়িয়ে এক নজরেই মন্দির সমেত সমস্ত দ্বারকানগরীকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে ধরে রাখা যায়।

বিকালে গেলাম দ্বারকার অন্যান্য মন্দিরগুলি পরিদর্শন করতে। সমুদ্রের ধার ঘেঁসে রয়েছে গাছপালায় ঘেরা একটি মনোরম আশ্রম এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি মন্দির। প্রথম মন্দিরটিতে আছেন সিদ্ধেশ্বর মহাদেব, পরেরগুলিতে যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, জানকী ও লক্ষ্মীনারায়ণজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সকলের পিছনে একটি কুণ্ড আছে এটির নাম সাবিত্রী কুণ্ড। এগুলি দেখে চলে এলাম সমুদ্রের ধারে লাইট হাউসের নীচে। বিশাল নীল আরব সাগর ছোট ছোট ঢেউ তুলে দ্বারকানাথের চরণ বন্দনা করতে এগিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে দ্বারকার সমুদ্র তটে। এক জায়গায় বেশ বড় বড় ঢেউ পাড়ে এসে ভেঙ্গে পড়ছে। এখানকার সমুদ্রতটের বিশেষত্ব হল বেশ খানিকটা জায়গা বিস্তীর্ণ বালুর তট। তারপর আরম্ভ হয়েছে শক্ত পাথরের এবড়ো খেবড়ো উপকূল। এ ভারতের এক দিকের উপকূল দেখে সূর্যোদয় আর এক দিকের উপকূলে সূর্যাস্ত। একদিন

খম্ভোপসাগরের কূলে যে সূর্যোদয় দেখলাম তার অস্তগামী রূপও দেখলাম আরব সাগরের কূলে। ইতিহাসের স্মরণাতীত যুগ থেকে এই উদয়াস্তের খেলা চলেছে ভারতের বুকে।

একদিন যে সভ্যতার উদয় আর একদিন তার অবসান, একদিন যে জাতির অভ্যুত্থান আর একদিন তার বিলুপ্তি। একদিন কাল যে ঐশ্বর্যের পসরা খুলে বসেছিল মহাকাল এসে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল তার সমারোহ। একদিন যে মহামানবের আবির্ভাব আর একদিন তার মহাপ্রয়াণ, এর কত সাক্ষী হয়ে রইল এ ভারত ভূমি—আরবের নীল জলে যখন বিয়োগ ব্যথায় রক্তিম হয়ে সূর্যদেব ঢলে পড়লেন তখন এই উদয়াস্তের লীলাখেলা দেখে ইতিহাসের খেলাগুলোও যেন জীবন্ত হয়ে আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যখন এ স্বপ্নের ঘোর কাটল তখন দৃষ্টি পড়ল সামনের সমুদ্র সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো হয়ে মিশে যাচ্ছে ভূলোক দ্যুলোক জোড়া আসন্ন রাত্রির বিরাট কালো অবগুণ্ঠনের তলায়। সমুদ্রতীর নির্জন, রূপসী রাত্রি ধীরে ধীরে উন্মোচন করছে তার রহস্যময়ী রূপ কিন্তু এ অন্তহীন একাকিত্বের মাঝে এ রূপ ভোগ করবার মত মনের সাহস আমার ছিল না কতকটা ভীতিগ্রস্ত হয়েই পিছনের ঐ সর্বগ্রাসী আঁধারময় জলজগৎকে ফেলে রেখে পালিয়ে এলাম শহরের আলোর মাঝে।

দ্বারকা শহরটি নিতান্তই ছোট, মন্দিরকে কেন্দ্র করে একদিন এই প্রাচীন শহরটি গড়ে উঠেছিল আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে সে টিকে রয়েছে, নবীনের খোলস কোথাও তার গায়ে নেই; অল্পসল্প দোকান বাজার, ধর্মশালা, ইস্কুল, পাঠাগার সবই এখানে আছে। স্থানীয় বসতি খুব কম, প্রায় দশ বার হাজার লোক নিয়মিত বসবাস করে। কলকাতা সময়ের একঘণ্টা পরে এখানে সন্ধ্যা নামে। রণছোড়জীর সন্ধ্যারতি দেখব বলে মন্দিরাভিমুখে রওনা হলাম। মন্দির প্রাঙ্গণে বেশ ভীড় হয়েছে, এরেই মধ্যে ঠেলাঠেলি করে জায়গা নিয়ে দাঁড়ালাম। কাঁসর ঘণ্টা সহকারে আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। সর্বশেষে প্রকাণ্ড ঝাড় প্রদীপ নিয়ে যখন পূজারী বিগ্রহের সামনে আরতি করতে লাগলেন তখন এতগুলি প্রদীপের আলোর ছটায় রণছোড়জী যেন আগুনের ফুলকি হয়ে জ্বলছেন মনে হল। সহস্র সূর্যের তেজ যেন ফুটে বেরোচ্ছে ওঁর সর্ব অঙ্গ দিয়ে, ওঁর ভাস্বর জ্যোতিতে সমস্ত মন্দিরাভ্যন্তর যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আরতি শেষ হলে ফেরবার পথে পা বাড়ালাম, পথে পড়ল সত্যনারায়ণের মন্দির, সংক্ষেপে এটি দর্শন করে আমাদের আস্তানায় ফিরে এলাম। নতুনত্বের উন্মাদনায় মন এতক্ষণ বেশ চাঙ্গা হয়ে দেহটাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল কিন্তু দেহের দাবী এবার তাকে মানতে হল, দু'চোখ ভরে ক্লান্তিতে যে ঘুম নেমে এল তার মনোরম স্পর্শে দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পরদিন ভোর চারটেয় উঠলাম, চারদিকে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার, এখানে সূর্যোদয় হয় সকাল ৭টার কিছু আগে। ৬টায় ওখা যাবার বাস ছাড়ে সেটা ধরতে হবে। ওখায় যাব ভেট দ্বারকা দর্শন করতে। দ্বারকা থেকে ওখা বন্দর আরও প্রায় ২১কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। দ্বারকা থেকে ওখা যাবার সুন্দর পাকা সড়ক রয়েছে, বাস যাতায়াত করে এই রাস্তায়। ট্রেনে গেলে একঘণ্টা সময় লাগে—বাসে গেলে সময় আর একটু বেশী লাগে। অন্ধকারেই বাস ধরলাম এবং ভোর হবার সাথে সাথে ওখায় পৌঁছে গেলাম। ওখা ভারতের পশ্চিমতম কোণে অবস্থিত একটি ছোটখাট বন্দর। মালবাহী জাহাজগুলো এখানে যাতায়াত করে। ভারত বিভাগের আগে করাচীর সহকারী বন্দর হিসাবে এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যিক ব্যাপারে এর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, কিন্তু করাচী পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। প্রধান বন্দর করাচীর সঙ্গে সংযোগ ছেদ ঘটায় এর একক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে। এর জেটী থেকে নৌকা ছাড়ল। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে হবে ভেট দ্বারকায়। অনেকের মতে এই ভেটে প্রকৃত দ্বারকাতীর্থ ছিল—এখন অধিকাংশ তার সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। যেটুকু স্থল ভাগ জেগে আছে সমুদ্রের মাঝে তার ওপর দ্বারকানাথের মন্দির আছে।

নৌকা করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসতে বেশ ভয় মিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করলাম, ভেটে এসে পৌঁছতে আমাদের ৪৩ মিনিট সময় লাগল। রণছোড়জীর মন্দিরের মত বিরাট মন্দির এখানে নেই। তবে ছোট ছোট অনেকগুলি ঘরে নানা দেবদেবীর বিগ্রহ আছেন ও প্রধান মন্দিরে রণছোড়জীর মূর্তির মত একই রকম সুসজ্জিত রত্নালঙ্কার বিভূষিত দ্বারকানাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে তাঁর যথারীতি নিত্য পূজারতি ভোগ ইত্যাদি হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজা হয়ে এলেন তখন এই ভেট দ্বারকায় তাঁর রাণীমহল ছিল, এইখানে তিনি মহিষীদের নিয়ে বিহার করতেন। এই সব প্রবাদ বাক্যের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে কাহিনীর রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাই পরীক্ষকের ভূমিকায় না থেকে শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করলে এসব কাহিনীর ভক্তিরস সৃষ্টি করবার যে অপূর্ব ক্ষমতা থাকে তা সহজেই প্রমাণিত হয়। পূজার্চনাদি সেরে অন্যান্য বিগ্রহাদি দর্শন করে আবার ফিরতি নাও ধরলাম। সমুদ্রের গতিবেগের সঙ্গে বেশ যুদ্ধ করে আবার ওখায় ফিরে আসতে আমাদের একঘণ্টা সময় লাগল। বেলা ১১টার মধ্যে আমরা বাসে করে দ্বারকায় ফিরলাম।

বিকালের দিকে গেলাম রুক্মিণী দেবীর মন্দির দর্শন করতে। উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে মনুষ্য বসবাসের অন্তরালে কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী দেবী এক অপূর্ব কারুকার্যকরা মন্দিরে অবস্থান করছেন। দয়িত মিলনের জন্য তাঁর এই নিভৃত সাধনার রূপ আমার কাছে অনন্যসাধারণ বলেই মনে হল। দেবীমূর্তির সামনে চারিদিকের দেওয়ালে কৃষ্ণ-রুক্মিণী ঘটিত পৌরাণিক কাহিনী চিত্র মাধ্যমে দেখান হয়েছে।

এ অঞ্চলে দারুণ জলাভাব হেতু জল বহু অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়। এজন্য তীর্থযাত্রীগণ দেবীর প্রণামীর সঙ্গে দেবী পূজার প্রয়োজনার্থে জলের দামও দিয়ে থাকেন। এই মন্দির থেকে প্রায় দুই মাইল শহরের দিকে গেলে পথে পড়ে মহামায়ার মন্দির। এটি দ্বারকার শক্তিপূজার অন্যতম মন্দির অতি প্রাচীন এবং বহুকাল সংস্কার বর্জিত, দ্বারকার অন্যান্য মন্দিরের মত এই মন্দিরেও গর্ভগৃহে দেবীর বিগ্রহ আছেন এবং তৎসংলগ্ন নাটমন্দির আছে। দেবীমূর্তিটি সর্বাঙ্গ মেটে সিঁদুরলিপ্ত শুধু কোটরগত দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

পূজারীকে প্রণামী দিয়ে এবার ষ্টেশনের পথ ধরলাম। ষ্টেশনের রিফ্রেসমেন্ট রুমে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম। এখানকার আহার দ্রব্যের অপ্রাচুর্যে ও একঘেয়েমিতে বাঙালীর আহারবিলাসী চিত্তে তীব্র অসন্তোষ জাগবে। দেবদর্শনের প্রশান্তিতে চিত্তের পূর্ণতা আসে কানায় কানায় কিন্তু দেহের দাবীর প্রতি মন দিলে এ জায়গার নাগরিক জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব দেহকে পীড়া দেবে নিঃসন্দেহে। ভোজ্য তালিকায় আমিষের ব্যবস্থা নেই বললেই হয় এবং নিরামিষ ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট দৈন্য আছে। বাজারের তরী তরকারী বেশীর ভাগই আমদানী করা হয়। কারণ স্থানীয় দ্রব্যের মধ্যে এক মাত্র জোয়ারের নামই অধিকভাবে উল্লেখযোগ্য। পদ্মফুলের বীচির তরকারী এদেশের একটি প্রিয় রান্না। অল্প স্বল্প যে খাবারের দোকানগুলি আছে সেগুলিতে মিষ্টি বলতে এক মাত্র লাড্ডু ও জিলিপী পাওয়া যায়। পকৌড়ী, চুরাভাজা ও বড়া এ দেশের লোকেদের প্রিয় খাদ্য, যেগুলি বঙ্গসন্তানের পাকস্থলীর পক্ষে একেবারে অচল। তবে রণছোড়জীর বহুবিধ ভোগদ্রব্য যা এক মাত্র ওনার রান্নামহলেই প্রস্তুত হয় যদি পাণ্ডাঠাকুরের অনুগ্রহে তার কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করতে পারা যায় তা হলে চিত্ত ও রসনা দুইই পরিতৃপ্ত হয়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দাবী মেটাতে এখানে আসিনি তাই এ সকল অসুবিধা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি, মন যে রূপতৃষ্ণায় অধীর হয়ে আমায় এতদূরে নিয়ে এসেছিল সে তৃষ্ণার শান্তি মিলে গেছে অরূপের এ রূপের খেলায় ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিতে—আমার অন্যদিকের রিক্ততায় মন ছিল না। দ্বারকাধীশের মধুর প্রভাব এখানে সর্বত্র বিরাজ করছে, ওঁকে দর্শন করে সারা জীবনের যে সঞ্চয় করে রাখলাম, তা হচ্ছে জীবনের পাত্র পূর্ণ করা এক প্রশান্তি এক অখণ্ড সন্তোষ। রিপুতাড়িত নরদেহের অভিযোগ আর্তনাদ জানাবার অবকাশ এখানে নেই, সকল অভাবের তুচ্ছতা আপনি লীন হয়ে যায় এ মহান প্রশান্তির মাঝে।

বিদায়ের আগের দিন নির্জন সমুদ্রতটে বসে মনকে একা পেয়ে এ সকল লাভ-ক্ষতির খতিয়ান হিসাব করে দেখছিলাম। লাভের ঘরে মোটা রকম সঞ্চয় নিয়ে ফিরে যাব, এ হাটের বিকিকিনির পাট সাঙ্গ হল, তাই আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে সামনের হাতছানি দিয়ে ডাকা সমুদ্রের পানে তাকিয়েছিলাম। কুলকুল শব্দে ঢেউগুলো এগিয়ে এসে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে উজাড় করে ফেলে দিচ্ছে রত্নাকরের সম্পদরাশি—আবার সেগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওর অতল গহ্বরে। ছোট ছোট মাথা তুলে ওরা এগিয়ে এসে আমার পায়ের নীচে পড়ে মিনতি জানাচ্ছে, 'যেও না যেও না ওগো যেও না।' বালির বেলাভূমির অনেক উর্ধ্বে জেগে রয়েছে দ্বারকানাথের মন্দির, সামনের আদিগন্ত বিস্তৃত বিরাট নীলিমায় নীলমণি হয়ে ওরই অধীশ্বর হয়ে এ সীমান্ত ভূমিতে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে যেন রক্ষা করে চলেছেন এর পবিত্রতা। কত শত শত যুগ ধরে কত অসংখ্য ভক্তের পূজা গ্রহণ করে বিরাজ করছেন তা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানবহির্ভূত ছিল, তবে এইটুকুই শেষবারের মত সেদিনের সন্ধ্যারতিতে দেখে বুঝে এলাম—

'জীবনে যে পেয়ে গেলাম তুলনা তার নাই
যাবার বেলায় শুধু এই কথা বলে যাই
তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপচিরন্তন
অন্তরে অলক্ষ্যালোকে, তোমার অন্তিম আগমন
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়াছ আপনি।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি তুমি দেখা দিলে দুঃখের আলোতে।'

এ বিচ্ছেদের বহ্নিশিখা অন্তরে নিয়ে ফিরে এলাম, দ্বারকা ভ্রমণের স্বল্প আয়ুর উজ্জ্বল স্মৃতি বিচ্ছেদবহ্নির ইন্ধন হয়ে জেগে রইল। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত জীবনে কতই এসেছে আরও আসবে, কিন্তু এই স্বল্প স্মৃতির কি অসামান্য অবদান রইল সারা জীবনে তা গভীরভাবে বুঝতে পারলাম—যখন ছুটন্ত ট্রেন থেকে ঝাপসা দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দূরে মন্দির শীর্ষের শেষ বিন্দুটিকে মিলিয়ে যেতে দেখলাম মহানীলের কোলে।

এসো

সুনন্দা দাস

এসো—
রিক্ত রবির ক্লান্ত রশ্মি শেষবার ভালবেসো
সমীরণ হয়ে ঝরা, শেফালীর ভীরু সৌরভ এনো
বিরহবিধুর অতীত বরষ স্মৃতি হয়ে আছে জেনো
ভবিষ্যতের সুপ্ত-স্বপ্নে ম্লান করে তুমি হেসো
এসো—
কালি-কলমের মৌন লেখায় কবির কাব্যে মেশো
কবে কোনদিন জ্যোৎস্না-নিশীথ বেদনোচ্ছল ছিল;
নিবিড় তিমিরে জীবন যজ্ঞ-অগ্নি কে জ্বেলে দিল?
নেইকো সে-সব শিথিল ভাবনা অপরিচয়ের লেশও
এসো—
শ্রান্ত এখন নির্ঝর নীর, সাগরের উচ্ছ্বাসও
কুলায় কাকলী হয়েছে নীরব ম্লান হল দিবাকর
আকাশে মাটিতে, তটে উর্মিতে ভাষাহীন মর্মর
বন্ধনহীন নাবিকের দল নীড়ছাড়া হয়ে ভেসো—
এসো—

ছড়া

শ্রীমতী চৌধুরাণী

(ভগবান)

তব কাছে এই অনুরোধ
ন্যায় অন্যায়ে থাকে যেন বোধ
পর উপকার যদি
নাহি করিতে পারি
কভু নাহি হই পর অপকারি
জানতে বড় ইচ্ছা করে
থাক তুমি কত দূরে ?
যে কথা কই মনে মনে
শুনতে তুমি পাও তা কানে
দুঃখ বিপদ যতক্ষণ আসে
থাক সদাই আমার পাশে।

দি নান স্টোরি !!!

[ক্যাথরিন হিউম্ রচিত মূল উপন্যাসখানির নাম **The Nun's Story.** ১৯৫৬ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক Fredrick Muller Ltd. যখন উপন্যাসখানি প্রকাশ করেন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সে বছর সর্বাধিক সংখ্যক বিক্রিত বইয়ের পর্যায়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল।

লেখিকার প্রথম বিখ্যাত উপন্যাস। ভদ্রমহিলার রচনাশৈলী অসাধারণত্বের দাবী রাখে। New York Herald Tribune পত্রিকা মন্তব্য করেছিল: "Remember the name Kathryn Hulme for it is likely to find a place in the history of letters."

উপন্যাসখানির অভিনবত্ব এর বিষয়বস্তু। নানা জীবনের নিভৃততম গোপনতম রূপটি কি গভীর, কি, আন্তরিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন লেখিকা—সত্যই বিস্ময়কর। কাহিনীর গতি অবাধে ছুটেছে···বেলজিয়াম থেকে কংগো পর্যন্ত · প্রশান্ত কনভেণ্ট চ্যাপেলের প্রার্থনা-সঙ্গীত থেকে নাৎসী বর্বরতায় অবধি। তারই মাঝে গড়ে উঠেছে একটি তরুণীর কাহিনী—একদিকে তার সন্ন্যাস-জীবন, অন্যদিকে শুশ্রূষাকারিণীর রূপ···একটার সঙ্গে অন্যটার সংঘাত বাধে বারে বারেই···এক অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষত না মিলাতে আর একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব এসে দেখা দেয়।

Birmingham Post লিখেছিল: "All will sympathize and all will find the Convent and hospital scenes engrossing." নান আর নার্স—এক নারীর এই দুই জীবনের ঘটনাবলী বিচিত্রতায়, আকস্মিকতায়, ভীষণতায়, কোমলতায় সহস্র বাহু বিস্তার করে ঘিরে ধরে, মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। Observer তাই বইটির কথা বলতে গিয়ে বলেছিল: "Most compellingly readable book..."

Warner Bros-প্রযোজিত চলচ্চিত্রটিও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন অড্রে হেপবার্ণ ও পিটার ফিঞ্চ।

এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশের বাঙলা অনুবাদের স্বত্ব খ্যাতিময়ী লেখিকা শ্রীমতী ক্যাথরিন হিউম্ এবং তাঁর বইয়ের প্রকাশক লণ্ডনস্থ হীথ, এণ্ড কোং দিয়েছেন মাসিক বসুমতীকে।—স]

এক

চাকচিক্যহীন ছোট কালো কেপটা, ঘাড়ের কাছে আটকে দিতে কনুই ছাড়িয়ে আরও একটু নীচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এটা পরতে পরতে লুড্স্ তীর্থের * কথা মনে পড়ে যায় যদি, সেটা বিসদৃশ। শেষ পর্যন্ত ধর্মজীবন বেছে নেওয়ার পিছনে নতুন সেই অভিজ্ঞতাটাই যেন কার্যকরী।

কনুই মুড়ে হাত দুটো কেপের মধ্যে একত্রিত করে এনেছে। এ পোশাকটা অবশ্য সাময়িক: ছ'মাস শিক্ষানবিশীর পর নানের রোব এর জায়গা নেবে। এই হাত দুটো যখন শুশ্রূষা বা প্রার্থনার প্রয়োজনে ছাড়া দৃষ্টির অন্তরালে স্থির হয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তারপর।

মঠের সাক্ষাৎকক্ষে গ্যাব্রিয়েল ভ্যান ডি' মালের সংগে আর চল্লিশটি তরুণী দাঁড়িয়ে। অধিকাংশ তার মত বেলজিয়ান, তাছাড়া ইংরেজ আর আইরিশ আছে ক'জন। আপাততঃ সবাই কেপ পরা তারই মত, আটকাতে ওদের কিন্তু বেশী সময় লাগছে আরও বিশেষতঃ ক'টি খামারের মেয়ে—লাল লাল গাঁটওয়ালা আঙুলগুলো কেপের ভাঁজে জামার আস্তিন খুঁজছে যেন। .

লুড্সের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বারে-বারেই! না, তা'বলে এ
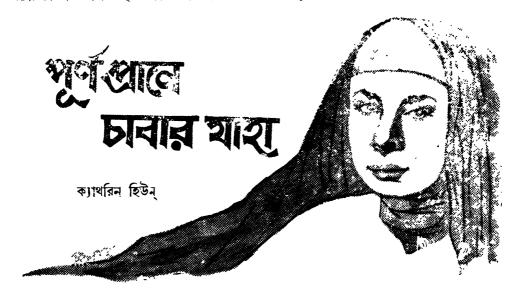
সহজে চাপ ওর মনে পড়ে না। তবু হঠাৎ মনে হ'ল বাৎসরিক তীর্থযাত্রার হসপিটাল-ট্রেনে আবার একবার চড়ে বসেছে। বেলজিয়াম থেকে শয্যাশায়ী রোগীদের নিয়ে যাবার পথে দেখাশোনায় সাহায্য করবার জন্য সিস্টার উইলিয়াম বেছে নিয়েছিলেন তাকে, ট্রেনিং স্কুল থেকে বাইরের ছাত্রী নার্সদের মধ্যে একমাত্র সে-ই ছিল। তীর্থযাত্রীদের স্থির বিশ্বাস যাবার পথে তারা নিশ্চয় বেঁচে থাকবে—শুধু তাই নয়, সেখান থেকে রোগমুক্ত হয়ে ফিরতে পারবে।...দেখতে দেখতে ভয় করছিল কেমন। নিজের নাড়ীজ্ঞান, রোগনির্ণায়ক চোখ, এমন কি নাকে এসে লাগা মৃত্যুর পরিচিত গন্ধ—সব-কিছু বলে দিচ্ছে কেউ কেউ সম্ভবত লুর্দসে পৌঁছনো অবধিও বাঁচবে না—এমনই মুমূর্ষু রোগী সব।

থাকতে না পেরে শেষে উত্তেজিত হয়ে সিস্টার উইলিয়ামের কাছে দৌড়ে গিয়েছিল।

চারদিকে তো দেখছি জ্বর...রক্ত পড়ছে...ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙ্গাচ্ছেন সব...তবু পাগলের মত শুধু আশার কথাই বলছে সবাই, আর কোন কথাই নেই কারো মুখে। আমার কামরাতেই জনা তিনেকের জন্যে এক্ষুণি শেষ ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা দরকার সিস্টার, না হ'লে—

আরও কিছু বলত হয়তো, কিন্তু সিস্টার উইলিয়ামের দৃষ্টিতে কি যে ছিল, থেমে যেতে হ'ল।

—পথে কেউ মারা যাবে না মাই চাইল্ড, কেউ তা যায় না। আমার কাছে যেটুকু শিখছ এতদিন তার বাইরেও আরও কিছু আছে—এখানে তেমন অনেক কিছুই দেখতে পাবে তুমি শীগগিরই, অলৌকিক অনেক কিছু। তোমার মন হয়তো প্রস্তুত নয় তার জন্যে, সে ক্রটি আমারই।...যা'হোক ধর্মবিশ্বাসকে পাগলের আশা বলছিলে—মনে মনে ভগবানের নাম নাও একবার। শান্ত মনে ডিউটিতে ফিরে যাও।

এক সপ্তাহ ছিল তারা লুর্দসে। মনের মধ্যে তার স্মৃতি একটা বহু উৎসবের ছবি হয়ে আছে...শুধু আলো আর আগুন, শুধু হাজার হাজার মোমবাতি আর ময়দানের ওপর ওঠা সূর্যের আলো! আর তারই সংগে অচ্ছেদ্যবন্ধনে জড়িয়ে আছে একটানা মর্মন্তুদ আর্তনাদ—এখনও কানে বাজে। মূল অনুষ্ঠানের দৃশ্য ভাসে চোখের সামনে—সারি সারি ষ্ট্রেচারগুলো সাজানো...এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি...মনস্ট্রেন্‌স্‌ হাতে ঘুরে ঘুরে আশীর্বাদ করবেন যাজক ঐ ষ্ট্রেচারে শায়িত মানুষগুলিকে...কখন তিনি আসেন, প্রতীক্ষা করে আছে সবাই!...মনস্ট্রেন্‌সের সোনার ওপর সূর্যের আলো পড়ে ঝলসে উঠছে...ষ্ট্রেচারগুলোর মাথার কাছে জ্বলছে, ক্রুশচিহ্ন যেন।...প্রত্যেকটি পৃথক স্বস্তিবচনের সংগে নতুন এক-একটা কর্কশ বিকারগ্রস্ত কণ্ঠ যোগ দিচ্ছে—কেউ আর্তরবে, অমুচ্চে কেউ বা...শব্দের ঝড় বইছে যেন!...ঐ ঝড়ের ঠেলাতেই বুঝি আলোকোজ্জ্বল মিছিলটা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে—সমুদ্রের ঢেউ যেমন করে এগিয়ে আসে বেলাভূমির দিকে, তটের বুকে আছড়ে পড়ে ভেঙে যায়। ঐ তরংগ কিন্তু সব শেষ মানুষটিকে অবধি আশীর্বাদ না করে ভেঙে পড়বে না কোনমতেই...

...হে যিশু, ডেভিডের পুত্র, আমায় রোগমুক্ত কর...

সেন্ট বার্ণাডেটের পুণ্যসলিলে স্নান করার আগে-পরে তোলা এক্স-রে প্লেটগুলোয় অনেক রোগমুক্তি নিজের চোখে দেখেছিল এও মিথ্যা নয়। দেহ-তন্তুর গঠনে পরিবর্তন, এমন কি মাঝে মাঝে হাড়ের গঠনেও। ছাপার অক্ষরের মত অনায়াসপাঠ্য।

যাদের সেবার দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিল ফেরার পথে, তাদেরই শুশ্রূষা করতে করতে বারবার কি অফুরন্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিল তাদের মুখের দিকে মনে পড়ে। এখনও রোগজীর্ণ, কাহিল মুখগুলো...তবুও কেমন করে যেন ষ্ট্রেচারগুলো পিরেনিজ পাহাড়ের পদতলে মা মেরীর আবির্ভাব-পূত মোমবাতি প্রজ্বলিত গুহার ভিতর নিয়ে গিয়ে রাখতে যে জ্যোতি ফুটে উঠেছিল, তারই আংশিক আভা বিধৃত হয়ে আছে সেখানে।

দেখে বিস্ময়ের শেষ ছিল না। সিস্টার উইলিয়াম রাউণ্ডে এলে বলেও ফেলেছিল।

—ওদের মনের আনন্দ দেখলে অবাক লাগে সিস্টার।

—তাই তো স্বাভাবিক মাই চাইল্ড, আসল রোগমুক্তি তো সেটাই। ডাক্তারদের সংগে মন দিয়ে এক্স-রে প্লেটগুলো দেখ তুমি।

দেখেছি—ওতে কিন্তু সংশয় থেকেই যায়। ফিল্মে যেটুকু ধরা পড়ে ডাক্তাররা তাই দেখেন কেবল। আসল হ'ল এই—নিস্তব্ধ স্লিপিং কামরাটার দিকে চেয়ে এমন শ্রদ্ধার সংগে মাথা নোয়ালেন যেন যিশুর নাম শুনেছেন, এই হল ভগবানের প্রকৃত করুণা—প্রত্যক্ষগোচর একেবারে, বিশ্বাসীমাত্রেই এ করুণার ভাগীদার।

তার জামার আস্তিন ধরে আস্তে একটু টেনেছিলেন সিস্টার উইলিয়াম। গ্যাব্রিয়েল নানদের কাছেই মানুষ হয়েছে, জানে নানরা কেউ কাউকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকেন না, প্রয়োজনে জামার আস্তিন ধরে একটু টানেন কেবল।

সিস্টার উইলিয়াম পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে ক'দিন আগে তাঁর বলা কথাটাই হঠাৎ শুনিয়েছিলেন তাকে, পাগলের আশা। কথাটায় ইংগিত ছিল একটা সেটা ভাল লাগেনি। কিন্তু জামার আস্তিনে টানটা আরও অস্বাভাবিক। নানদের মধ্যে প্রচলিত মনোযোগ আকর্ষণের ভাষা এটা, বাইরের সাধারণ মানুষের প্রতি প্রয়োগের রীতি নেই। গ্যাব্রিয়েলের বিস্ময় তাই, ও-ও যেন ওঁদেরই একজন!

আর এখন সত্যিই তাঁদেরই একজন সে। কিংবা হ'ল বলে।

সাক্ষাৎকক্ষে সংগিনী আর যারা রয়েছে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আত্মচিন্তার ছাপ তাদের মুখে...উত্তেজিত একটু ভয়ও পেয়েছে। আন্দাজ করা কঠিন নয়, ব্রাসেলসের এই কনভেণ্টটির বাইরের ঘরে এনে দাঁড় করাল যে ঘটনাপরম্পরা, মনের মধ্যে ওদের তারই পর্যায়গুলোর রোমন্থন চলছে।

গ্যাব্রিয়েলও নিজের ধাপগুলো ভাবছে পরপর। ছেলেবেলায় রাঁধুনি ফ্রান্সিসকে দেখত—বড় গোল পাঁউরুটিটার ওপর প্রথমে ছুরি ঠুকে ক্রুশচিহ্ন না করে নিয়ে সে কখনও রুটি কাটত না। শিশু গ্যাব্রিয়েল এই রুটি কাটার ধর্মানুষ্ঠান দেখত, তাঁর সংগে ম্যাসে যোগ দিত রোজ। অবশ্য মর্মার্থ উপলব্ধি করে নয়, অন্য কারণে। ঐ যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে মোমবাতির আলোয় গান গাওয়া ঐ যে বড়রা জিবে ওয়েফারটুকু না ঠেকিয়ে প্রাতরাশ খান না, তার শিশু-মন অনেকখানি বিস্ময়ের সন্ধান পেত তাতে অনেকখানি রহস্যেরও।

তাছাড়া বাবা তার ডাক্তার, তাঁর সংগে অনেক পুরাণো ...লের বাড়ীতে গেছে সে। সব বাড়ীতেই দেখত দেওয়ালে একটা ...টি পুরাণো ধাঁচের জপমালা ঝোলানো, আর তারই নীচের ...ক ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তি একটি। তাৎপর্য, হৃদয়ের মধ্যে যিশু ...াজিত সর্বদা। ঈশ্বরভক্তির এমন বাহ্যিক প্রকাশ এখন আর ...া যায় না।...রোগী দেখার কাজে ঘোরাঘুরি শেষ করে বাবা যে ... গাঁয়ের কাফেতে বসে সামান্য কিছু খেয়ে জিরিয়ে চাংগা হ'য়ে ...তেন সেখানে দস্তার পাতের ওপর একটা ত্রিকোণের মধ্যে বিশাল ...টা চোখ আঁকা থাকত। এখনকার দিনে সে রকমও আর দেখা ...য় না। মনে আছে, বাবা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঐ জবরদস্ত অদ্ভুত ...চটার অর্থ হল এ জায়গার ওপর ভগবানের দৃষ্টি রয়েছে সর্বদা, ...ব্যি টিব্যি দেওয়া এখানে চলবে না।

পুরোণো ধাঁচের ছেলেবেলা, ধর্মভিত্তিক। ঈশ্বর যেন তাদের ...রিবারের একজন ছিলেন...আমি যে এখানে এলাম তার প্রধান ...রণ সেটাই। খুব ছোট ছিলাম যখন, তখনই ঈশ্বরকে ভালবাসতে ...খেছি...জন কোথায় তখন, তার সংগে আলাপ হবারও আগে... ...নেক অনেক আগে...

দৃঢ়সংবদ্ধ হাত দুটো বুকের কাছে চেপে ধরে পসচুল্যান্টদের ...সিস্ট্রেসের কঠোর সুন্দর মুখের দিকে দেখছিল চেয়ে চেয়ে। লোকে ...ল, যদি কখনও ছাপা রেকর্ড থেকে অর্ডারের হোলিরুল নষ্ট হয়ে ...য় কি হারিয়ে যায়, এই সব নানদের বিশ্লেষণ করে তার ...মা-সেমিকোলনটি অবধি আবার উদ্ধার করতে পারা যাবে। ...রাই মূর্তিমতী নিয়ম।

সিস্টার মার্গারিটার মাড় দেওয়া করফটা শামুকের খোলার মত ...ঠিন, ফ্লেমিস মুখখানাকে যেন ডিম্বাকারে কেটে দিয়েছে সেটা। ...মুখে কালের ছাপ পড়ে না। মুখ ফিরিয়ে পরীক্ষা করে নিচ্ছেন ...র নতুন পসচুল্যান্টরা প্রত্যেকে চুলের ওপর ভেলটা পিন দিয়ে ...ক আটকেছে কিনা, কেপটা পরেছে কিনা ঠিক মত...মুখখানা প্রায় ...খাই যাচ্ছে না। কথা বলতে শুরু করলেন তারপর। পরিমিত ...ণ্ঠস্বর, ঠিক ঐ কেপে ঢাকা দলটার শেষ মেয়েটি অবধি শুনতে পাবে, ...কে ছাড়িয়ে আর কেউ নয়।

—এখন চ্যাপেলে যাব আমরা, ঈশ্বরের সংগে কথাবার্তা বলব একটু।—ঘুরে একটা ভারি ওক কাঠের দরজা খুললেন। এমন সাবলীল ভংগী যেন দরজাটা কাঠের নয়, তুলোর তৈরী, শব্দসাড়া হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। গ্যাব্রিয়েল দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা হাত তাঁর কেমন করে চামড়ার বেল্টে আটকানো চাবির গোছার ওপর এসে পড়ল, চলতে গিয়ে যাতে চাবিগুলো ঠোকাঠুকি হয়ে শব্দ না হয়।

—তোমরা জোড়ায় জোড়ায় আমার পেছনে এস। আমরা চোখ নীচু করে চলি, আমাদের হাত দেখা যায় না।

ব্র্যাকেটের মধ্যে মোমবাতিগুলো ধূম উদ্গীরণ করছে নিঃশব্দে, করিডর ধরে ধীর পদক্ষেপে সেই দিকেই এগোলেন।

যেতে যেতে দর্শনার্থীদের বসবার ঘরটার ছোট্ট দরজাটার দিকে গ্যাব্রিয়েল শেষবারের মত তাকাল। এইমাত্র সেখানে সবাই বাড়ীর লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছে। বাবা হয়তো এখনও দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শক্ত ভারি হাতে দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন ধীরে ধীরে। বেলজিয়ামের ডাকসাইটে চেস্ট সার্জেন ও হার্ট স্পেশালিস্ট চিনতে পেরে নমস্কার করছেন যাঁরা, প্রতিনমস্কার করছেন তাঁদের। ভাণ করছেন একমাত্র কন্যাকে ভগবানের চরণে অর্পণ করে তিনিও গর্বিত অন্যদের মত।

বিদায় দেবার সময় মোটা বুড়ো আঙুলটা দিয়ে ক্রুশচিহ্ন করে দিয়েছেন কপালে, স্পর্শটুকু এখনও অনুভব করা যায়। আগের দিন সন্ধ্যায় বড় হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলেন, বাইরের জগতে সেই শেষ খাওয়া। ডীল্যাণ্ডের চমৎকার মাংসল অয়েস্টার ছিল, বাবাই বিশেষ করে অর্ডার দিয়েছিলেন, স্বাদটা এখনও লেগে আছে মুখে। সফেন রুডেশাইমার মদ, কিনতে অন্ততপক্ষে পাঁচজন রোগীর ভিজিট লেগেছিল। তার প্রিয় আইসক্রীম ছিল, খুব বেশী করে বাদাম দেওয়া...চকচকে ভাঙা ভাঙা বাদামগুলো।...কনভেন্টে ঢোকায় বাবার অমত ছিল, অথচ বুঝিয়ে নিরস্ত করবার মত যুক্তি খুঁজে পাননি। যে কথা বলে বোঝাতে পারেন নি, জীবনের সব প্রলোভনের বস্তুগুলোকে জুটিয়ে এনেছিলেন সেই কথাই বলতে...বাবাকে শেষ বারের মত জামায় ন্যাপকিন গুঁজতে দেখেছে গ্যাব্রিয়েল সেদিন। দেখেছে মদের বোতলের ছিপি শুঁকে তবে ওয়েটারকে ঢালতে দিচ্ছেন, সারা মুখে ভোজন-রসিকের তৃপ্তি মাখা।...বাবা বোঝেননি প্রকৃত বেদনা তাকে এইগুলো দিয়েই দিচ্ছেন—তাঁর চিরপরিচিত হাবভাব, খুঁটিনাটি অভ্যাসগুলো চোখে পড়েছে যত বুকটা মুচড়ে উঠছে যন্ত্রণায়, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত পরীক্ষা করলে যন্ত্রণা হয় যেমন।...কফি খেতে খেতে বাবার ধূমপানের নলটা দেখছিল শেষবারের মত। সাবানের ফেনার মত সাদা হালকা ধরণের পাথরে তৈরী নলটা—অনেক দিনের হ'ল, ভালবাসেন বলে বাবা ব্যবহারও করেছেন বেশী...তামাটে হয়ে গেছে। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে বাবা তাকিয়ে আছেন তার দিকে, ডাক্তারি সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন, যেন তাঁর সহকর্মী সে।... ঐ নীল চোখ দুটিও এই শেষবারের মত দেখেছে গ্যাব্রিয়েল। একবারও কন্ভেন্টের নামোল্লেখ করেননি, তাকেও বলবার সুযোগ দেননি যে লুড্সের প্রভাব বা কোন নানের প্রতি স্কুলের মেয়ের মুগ্ধতা এখানে নিয়ে আসেনি তাকে।...জনের মা মারা গেছেন এক উন্মাদাশ্রমে, ডাক্তার হয়ে বাবা পাগলামি পুনরুৎপাদনের ঝুঁকি চাপাতে পারেননি তার ওপর...বিয়েতে মত দেননি। তাই যে ভগ্ন হৃদয়ে এ পথে এল তাও কিন্তু নয়। আসল কারণ এ সবগুলোর পুঞ্জীভূত ভার...

বন্ধ দরজাটা পেরিয়ে এল।

...কিংবা এও হতে পারে বাবামণি, যেভাবে গড়ে তুলেছ আমাদের তুমি, তারই জন্যে সৎকাজের ডাক শুনেছি...জুতো ছেড়ে এই প্রথম ও চামড়ার জুতো পরেছে। অজানা পাঁচমিশালি একদল মেয়েদের একজন, এখন থেকে ও কিন্তু তার সিস্টার। পাঁচমিশালি মেয়ের এই অজানা দলটাই এখন থেকে তার আত্মীয়স্বজন যা কিছু এদের ওপরই তার যেটুকু অধিকার ...বাবা তো ধার্মিক লোক, তবু যে কেন তার কন্ভেন্টে যোগ দেওয়ায় আপত্তি করছিলেন।

সামনের মেয়েরা চলতে শুরু করেছে। পিছন থেকে কার ধাক্কা খেয়ে যেন মোটা চামড়ার জুতোপরা পাগুলো এগোচ্ছে।‧ গ্যাব্রিয়েল অনুসরণ করল—ঋজু ভংগীতে, জোড় করপুটে হাত দুটো আবৃত,

নার্সিং ট্রেনিং-এ সার্জারি-রুমের কাজ শেখার সময় হাত ধুয়ে জীবাণুশূন্য করার পর যেমন করে হাঁটতে শিখেছিল, তেমন করে হাঁটছে। বাঁক ঘোরবার সময় একটি মাত্র অবাধ্য উর্ধ্ব দৃষ্টিপাতে দেখে নিল সমস্ত চ্যাপেল আর সিস্টারদের। এতদিনের পারিবারিক জীবন যে প্রাণময় স্নেহ ভালবাসায় পূর্ণ ছিল তার স্থান এবার ওঁরা নেবেন···একসার মূর্তি যেন!

লম্বা নেভে প্রায় শ'দু'য়েক সিস্টার সারি সারি নতজানু হয়ে বসেছেন ইতিমধ্যেই। দু'দিকের দেওয়ালের ধারের আসনে চিরব্রতা নানরা দু'সারিতে নতজানু হয়ে বসে, কালোভেল পরা। মাঝখান দিয়ে প্রধান আইল গিয়ে শেষ হয়েছে বেদীতে, সেখানে তেমনি করে তিনটি সোজা সারিতে বসেছেন সাদা ভেল ঢাকা নভিসরা। পসচুল্যান্টদের দর্শকদের গ্যালারিতে নিয়ে গেলেন সিস্টার মার্গারিটা। সেখান থেকে সমস্তটা একসংগে মিলিয়ে দেখাচ্ছে যেন একদল কচ্ছপ! মুখ দেখা যাচ্ছে না কারো···বস্ত্রাবৃত নিশ্চল মূর্তি···সারির পর সারি···একজনের সংগে অন্যজনের ব্যবধান সমান সর্বক্ষেত্রে। এত সমান যেন কোন সূক্ষ্মযন্ত্রে মেপে ঠিক করে দিয়েছে কেউ।

.... প্রার্থনা করবার চেষ্টা করতেই মনে হ'ল জন চুপি চুপি পাশে এসে হাজির হয়েছে, দক্ষিণের কেপ-ঢাকা মেয়েটির জায়গাটা দখল করেছে এসে। এই নতুন জীবনে পা বাড়াতে গিয়ে তাকে ছাড়াও আরও অনেক কিছু পিছনে ফেলে দিয়ে এল, সেগুলোই মনে করিয়ে দিচ্ছে বসে বসে। চাপা গলায় এখন আর তিক্ততার আভাস মাত্রও নেই।

চোখের ওপর দু'টো হাত গ্যাব্রিয়েল আরও জোরে চেপে ধরল।

···অনেক উজ্জ্বল দৃশ্য বাইরে টেনে আনছে জনের কথাগুলো, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাক তারা।···পাহাড়ে চড়ার পর আর্ডেনসে বিশ্রাম করত দু'জনে, খাড়া কিনারগুলো তার···বাতাস বইত হু হু করে···ফ্লানডার্সের মধ্যে দিয়ে সাইকেলের সমুদ্রমুখী পথগুলো···সৈকত শৈলের লুকোনো গর্তগুলো···দু'জনে রেষারেষি করে দৌড়ে হাঁফিয়ে যেত যখন, প্রায়ই পড়ে যেত কোনটার মধ্যে।

···যাক, অদৃশ্য হয়ে যাক সব।

কম্পিত কণ্ঠে চুপি চুপি বলল, প্রভু, তোমার বিশাল, বিস্তৃত জগৎকে হারাতে চলেছি—যে মানুষটা এ পথের পথিক করে দিল আমায় তার চেয়েও বেশী করেই হারাব বোধকরি।···এত ভাল তাকে আমি নিশ্চয়ই বাসিনি যে বাবার মতামত উপেক্ষা করতে পারি! বরং বাবাকেই বেশী ভালবাসতাম নিশ্চয়। নাকি বাবা-মার ইচ্ছের প্রতি সেকেলে আনুগত্যই কেবল পথ রোধ করে দাঁড়াল আমার? 'বাধ্যতা'—শব্দটা কনভেন্ট জীবনের চাবিকাঠির মত, ওঁরা বলেন তাই।···নিজের হৃদয়ের কথা শুনিনি, বাবা যা বলেছেন তাই মেনে নিয়েছি—তোমার পানে এগোবার দুর্গম পথে ছোট্ট একটি পদক্ষেপও কি পড়েছে তাতে? বাধ্যতা···'ওবে'···মূল ধাতুটা হ'ল 'অডায়ার'। 'অডায়ার' কথাটার বুৎপত্তিগত অর্থ শোনা, কথায় কান দেওয়া। ···কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত যখন নিতে পারিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমার চারপাশে। পৃথিবীটা যখন পুঞ্জীভূত বেদনা হয়েছিল, মনে হয় কিছুই যেন শুনিনি আমি প্রভু। জনের গলা শুনতাম কেবল···সে অভিযোগ করত—

এখনও সে তার অন্তঃস্বর ছাড়া আর কিছুই শুনছিল না। আর শুনছিল পার্শ্ববর্তিনীর দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। কেপ-ঢাকা মূর্তিটি, আঙুলগুলো একত্র সংবদ্ধ, তারই ফাঁক দিয়ে নীচে নানদের সারির দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রথম পাঁচ দিন আলাদা উইংয়ে রাখা হ'ল তাদের। ডরমিটরি, স্টাডি হল, খাবার ঘর সব সেখানকার নিজস্ব। ক'দিন সেখানে প্রস্তুতিপর্ব চলল। কথার বিকল্পে ব্যবহৃত আকার-ইংগিত-গুলো রপ্ত করল তারা, শিখল কেমন করে ছিটকিনি বা তালা-চাবির কোন কর্কশ শব্দ না করে দরজা খুলতে হয়, মাটির দিকে চেয়ে থাকতে অভ্যাস করল।—ঈশ্বরের সংগে বিরতিহীন কথোপকথন লক্ষ্য হওয়া চাই, মনকে সেই সর্বোচ্চ নিশানায় এগিয়ে দিতেও অভ্যস্ত হতে হবে। কমিউনিটির সংগে কোন যোগাযোগ নেই এখনও, তবু তার বিশালত্ব, তার সুশৃংখল উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

ওটা যেন নীরবতার দেশ। সীমানা পেরিয়ে ওদেশে ঢোকার আগে ওরা যেন নির্জনে রয়েছে এখন। থাকাটা বাধ্যতামূলক, অন্য দেশে ঢোকবার আগে অসুখের সংক্রামতা রোধ করতে যেমন থাকতে হয়, তেমনি যেন। সে জীবনের ভাব-ভংগী অভ্যাস করছে, নিয়ম-কানুন শিখছে প্রত্যহ হোলিরুলের থেকে পাঠ নিয়ে। হোলিরুল মঠ-জীবনের প্রাণ। এ জীবনের বন্ধুরতা আর যুদ্ধক্ষেত্র চিত্রায়িত সেখানে, দারিদ্র্যের, সর্বাংগীণ নির্মলতার, বাধ্যতার প্রশ্নগুলো পুংখানুপুংখ ভাবে আলোচিত। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সার্জের লম্বা স্কার্টটা যে পিছন থেকে তুলে ধরতে হয় একটু, ঘসা লেগে লেগে নষ্ট হয়ে না যায় যাতে—তাও জানা যাবে এখান থেকে।

সামনে যে নতুন সীমান্ত তার নাম মৌন। দৃষ্টির উর্ধ্বে, কল্পনার বাইরে এই নতুন সীমান্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই অন্তর-বাহিরের অনাবিষ্কৃত ভূমিতে। অন্তরের কেন্দ্রে অতীত দিনের বহু কণ্ঠের অব্যয় প্রতিধ্বনি···গ্যাব্রিয়েল অনুভব করতে পারে ঐ অনাবিষ্কৃত ভূমি চাপ দিচ্ছে ভিতর পানে···অন্তরের ঐ কেন্দ্রস্থলটাকে আপন সীমার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চায়।

—সন্ন্যাস জীবনের একটা মূল ভিত্তি হ'ল আভ্যন্তরীণ মৌন, ঐশ্বরীক শক্তি এটা—সিস্টার মার্গারিটা বলছিলেন। বিশিষ্ট কণ্ঠ, এত মৃদু যে গ্যাব্রিয়েলের মনে হল কথাগুলো যেন শুধু ঠোঁট নাড়া দেখেই বুঝে নিচ্ছে। ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করছে পিছনের সংগিনীরা শুনতে পেল কিনা। দেখল না অবশ্য, মনের জোরে দমন করল নিজেকে।

নিজের মনেই পুনরাবৃত্তি করছে কথাটা, আভ্যন্তরীণ মৌন। এই তার ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্র, এইখানেই হারতে হবে তাকে। একমাত্র মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করলে বোধহয় স্মৃতির ভীড় ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব, নইলে···

মনস্তত্ত্বের অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর এখনও কানে বাজে যেন, ক'বছর আগে শুনত যেমন।—কেউ না, এমন কি কোন সাধুসন্তও একেবারে সোজাসুজি খুব সাধারণ কি খুব ছোট্ট একটা মন্ত্রও উচ্চারণ করতে পারেন না। চারপাশের জড়িয়ে থাকা ভাবনাগুলোর কিছুটা অন্তত পড়বেই এসে—প্রচ্ছন্ন ভাবেও আসবে অন্তত, জানা কথা এটা।

সামনের টেবিলে মানব-মস্তিষ্কের মডেল থাকত, প্যারিস প্লাসটারের

তৈরী। ভিন্ন ভিন্ন ভাগগুলো খোলা যেত তার। প্যারাইটাল লোবটা খুলে নিয়ে সেটাশুদ্ধই হাতটা নাড়তে নাড়তে পুনরাবৃত্তি করতেন, একটা মন্ত্রও নয়···

···মাডেলটার গায়ে উজ্জ্বল লাল-নীল রঙে আঁকা শিরাধমনীগুলোর রেখা···হঠাৎ যেন সেইগুলোই গ্যাব্রিয়েল আঁকা দেখল সিস্টার মার্গারিটার স্ক্যাপুলারের ওপর···এক পলক মাত্র।

সিস্টারদের নিস্তব্ধ জগৎটার দিকে চেয়ে থাকলে আরও যেন ভয়-ভয় করে, ও সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা বরং সহজ। রোজ সকালে মাসের জন্য পসচুল্যান্টরা সারি বেঁধে চ্যাপেলে যায় যখন, নানরা তার আগেই এসে যান। মনে হবে যেন সেই প্রথম দিনের পর আর নড়েন নি কেউ।

গ্যাব্রিয়েল ভেবে পায় না এত স্থির হয়ে কি করে থাকেন তাঁরা। বিশেষ তো নভিসরা। প্রধান আইলে নতজানু হয়ে বসেন, ভর দেবার কোথাও কিছু থাকে না—এক অবশ্য বাতাস ছাড়া। কোন মেরুদণ্ড নমিত হয়ে যায় না তবু, একটা মাংসপেশীও নড়ে না যে পাথরের মত স্থির দেহের কোথাও এতটুকু কম্পন জাগবে। দলের মধ্যে বৃদ্ধা আছেন, অল্পবয়সী আছেন, সমস্ত নভিসরা পূর্ণ স্থৈর্য লাভের জন্য লড়াই করছেন অন্তরে-অন্তরে। বাত আছে অনেকের, ধর্মজীবনের সুবর্ণ-জয়ন্তী পালনের আর অল্পদিনই বাকি হয়তো তাঁদের। কনভেন্ট হাসপাতালের নার্সিং সিস্টাররা—সারারাত হয় তো জেগে বসেছিলেন কোন রোগীর কাছে। অনেক সময়ই এমন কয়েকজন থাকেন, প্রায়শ্চিত্ত বা প্রার্থনায় নতজানু হয়ে সারা রাত যাঁরা চ্যাপেলেই কাটিয়েছেন সম্ভবত। বার্ধক্যের, দৌর্বল্যের, শ্রান্তির কোন চিহ্নই কোথাও ধরা পড়ে না তবু।

পরে ওঁদেরই একজন হয়ে জেনেছিল নব গতা মেয়েরা উপস্থিত থাকলে বৃদ্ধা নানরা সব সময় প্রায় অতি-মানবীক সাহস ও ধৈর্যশক্তি প্রয়োগ করেন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য। লক্ষ্য সুদৃষ্টান্ত স্থাপন। তারপরও তবু প্রথম প্রভাবের সেই সশ্রদ্ধ বিস্ময় অটুট ছিল।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখছিল, মনে হ'ল ইতিমধ্যেই একটা বাঁধন লেগেছে তাকে ঐ মূর্তিসদৃশ দৃশ্যের সংগে। রেজেস্ট্রীর দিন যে নম্বরটা স্থির হয়েছে তার জন্য, সেই নম্বরটাই এই বাঁধন। ১০৭২, নম্বরটা একটি পরলোকগতা নানের। ঐ ১০৭২ নম্বরের সূত্রটা ছড়িয়ে আছে অনেক দূরে—ঐ নতজানু মূর্তিগুলি ছাড়িয়ে, মাদার হাউসের পবিত্রভূমি পেরিয়ে, বেলজিয়ামের সীমানার বাইরে, ইউরোপের তীরভূমি পরপারে। পৃথিবী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানে কল্পিত দ্রাঘিমা রেখার মত বৃত্তাংশ যেন একটা গিয়ে শেষ হয়েছে খড়ের ছাউনি দেওয়া একখানা কুঁড়ে ঘরে, বেলজিয়ান কংগোর কাতাংগা প্রদেশে। সেখানে এই বড়জোর মাস ছয়েক আগে একটি মিশনারী সিস্টার নিহত হয়েছেন। খুন করার জন্য ক্ষেপে উঠে একজন নিগ্রো ছুরি মেরেছে তাঁকে।

একদিন রিক্রিয়েশনে তার সংখ্যাটির পূর্বতন অধিকারিণীর কথা শুনেছে গ্যাব্রিয়েল। সেদিন তাদের দলটা বাগানে বেড়াচ্ছিল, সিস্টার মার্গারিটাও হাঁটছিলেন পাশে পাশে। এ সময় কথা বলার অনুমতি আছে, তবুও সবাই নীরব একেবারে। বাধানিষেধের আড়ষ্টতায় সহজ হয়ে কথা বলার সুরটাই হারিয়ে গেছে।

সিস্টার মার্গারিটাই একটু-আধটু কথা বলছিলেন তাই দু'একটা প্রশ্ন করছিলেন। কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের নম্বর কি।

গ্যাব্রিয়েলকে বললেন, সিস্টার মারিয়া-পলিকার্পের নম্বরটি পেয়েছ, তুমি ধন্য হয়ে গেছ সিস্টার।

তারপর কাহিনীটা বলেছিলেন একটুখানি গর্ব মিশিয়ে, যদিও সংযম ছিলই।

কি জীবন্ত এই নম্বরগুলো, আশ্চর্য! আঠারো-শো শতকের শেষদিকে এই অর্ডারের সৃষ্টি, সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোন সংখ্যাটা বাতিল করা হয়নি। এই মাদার হাউসে কত পসচুল্যান্ট এল গেল আন্দাজ করা যাবে না কোন মতেই। কেন না, কোন সংখ্যা কতবার নানের জীবনে যুক্ত হ'ল জানবার উপায় নেই। গ্যাব্রিয়েলের অনুমান, সুপিরিয়র জেনারেলের অফিসে কোন চামড়া-বাঁধানো খাতায় ধারাবাহিক রেকর্ড রাখা আছে। এ যেন পুরোনো একটা শক্ত সমর্থ আঙুরগাছের পাতা গোণা···নিজের মধ্যে থেকে সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে···অথচ যতক্ষণ নীচেকার প্রত্যেকটি ডালের আগা পর্যন্ত সজীব না হয়ে ওঠে, একটিও নবাংকুর উদ্গত হয় না।

সিস্টারদের দিকে তাকালেই নতুন কিছু, অপ্রত্যাশিত কিছু চোখে পড়বেই! বিশ্বাস হয় না যেন গোটা স্কুল বোর্ডিংয়ের জীবনটাই ওর নানদের সংগে কেটেছে। কৈশোরে সে সব কিছু লক্ষ্য করবার মত চোখই ছিল না···নিজে কত অন্যায় করেছে কতবার··· নার্সিং ট্রেনিং নেবার সময় বরং দেখেছে কিছু যখন বাঁকা পথ নেয়, উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে সবাই, সিস্টাররা স্থির থাকেন ঠিক। সার্জারি ঘরে তাঁদের সেই স্থৈর্য অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে।

নানদের জীবন একান্তভাবে তাঁদের নিজস্ব। তাঁদের কাছে বড় হয়ে উঠলেও সে প্রচ্ছন্ন জীবনের আভাস মাত্রও পাওয়া যাবে না। সিস্টার মার্গারিটা যখন দেখালেন ধর্ম-জীবনারম্ভের দিনটি থেকে কি ভাবে প্রত্যেক নান লিটল্ অফিস বইখানি পড়েন, গ্যাব্রিয়েল নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে তো এত ভালবাসে সবার হাতের দিকে চেয়ে থাকতে, কেন তবে লক্ষ্য করেনি এর আগে?

ডান হাতের চেটো অল্প একটু মুড়ে তার মধ্যে নিজের লিটল্ অফিসখানি খুলে ধরেছেন সিস্টার মার্গারিটা, কালো মলাটের চামড়ার কিনারটুকুকুতে শুধু অঙ্গুষ্ঠটি স্পর্শ করে আছে। পত্রচিহ্নটি দিয়ে সেদিনের পাঠ্য অফিসটি খুললেন, বাম অঙ্গুষ্ঠ রাখলেন বাঁদিকের পাতাগুলোর ওপর, সেগুলো মুড়ে না যায় যাতে। আঙুলের নীচে ছোট একটুকরো কাগজ।

—যে আঙুল দিয়ে পাতাগুলো ধরে রাখতে হচ্ছে বইটা খুলে রাখার জন্যে তার তলায় এই কাগজের টুকরোটা থাকলে পাতাগুলোয় দাগ লাগবে না। আমরা সবাই নিজের নিজের ছোট্ট থাম্-প্যাড তৈরী করে নিই। কাগজের চাকতিটা দেখালেন তুলে, আমারটা দেখ, পবিত্র একখানি ছবি আটকানো আছে। আঁকার হাত নেই বলে জল রং দিয়ে সুন্দর কোন ছবি এঁকে নিতে পারিনি আমি। অনেক সিস্টারই তাই করেন।

বুঝিয়ে দিলেন প্রত্যেক সিস্টার প্রতিদিন সাতবার নির্ধারিত সময়ে এই বইখানি পড়েন, তা সে তিনি যেখানেই থাকুন। তেমনি

করেই ধরে আছেন বইখানা, আর গ্যাব্রিয়েল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঐ হাতদুটির দিকে। আজ যা দেখল, আগে আর এমন কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না। আঙুলের নীচে এক টুকরো কাগজ, স্পর্শটুকু এতই হালকা, এতই সতর্ক, বহু ব্যবহারের পরও যে সময় মনে হবে যেন বইখানা এই প্রথম খোলা হ'ল।

—কাজের জন্যে সব সময় উপাসনায় যোগ দিতে চ্যাপেলে যেতে পারিনা আমরা। নির্ধারিত এই পাঠগুলো কখনও কখনও কাজের জায়গাতেই সেরে নিতে হয় আমাদের—রান্নাঘরে হাসপাতালে, স্কুলরুমে, লণ্ড্রীতে।

কিংবা হয় তো যাচ্ছি কোথাও, তাহলে ট্রেনে বা জাহাজেও। আমরা যেখানেই থাকি মাদার হাউসের সময়মত চলি। লিটল অফিসে যেন এতটুকুও ময়লা না লাগে, সব সময় সাবধান থাকতে হবে। এটা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই।

আঙুলটা তুলে নিতেই কাগজের টুকরোটা গড়িয়ে গিয়ে দু'পাতার ভাঁজের মধ্যে পড়ে গেল, বইটা অমনি বন্ধ হয়ে গেল হাতের ভাঁজে।

—সিস্টার মার্গারিটা সেদিকে তাকালেন এক পলক, প্রথম ব্রত নেবার সময় পেয়েছিলাম, আসছে বছর আমার রজত জয়ন্তীর সময় বদল হবে এটা।

যেন অতি সামান্য একটা কথা শোনালেন, তাতে না আছে কোন অধিকারবোধের ভাব, না আছে কোন গর্ব।

একেবারে সোজা উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে সমস্ত জোর পড়ল শুধু হাঁটু দুটোর ওপর। মেয়েরা এমন বসেছিল, কে যেন ওদের আটকে দিয়েছে, সচেতন হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবার। নড়াচড়া যেটুকু হল থিতিয়ে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, দুটি হাত স্ক্যাপুলারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

—এখন তোমরা চ্যাপেলে যাবে আমাদের এই পুণ্য কমিউনিটিতে প্রবেশের আগে শেষবারের মত প্রার্থনা করতে। কাল সেইদিন। যার যেমন সাহায্য দরকার তার জন্য প্রার্থনা কোর, যেমন ইচ্ছে কথা বোল ঈশ্বরের সংগে। শিশু ছিলে যখন তখন যেমন কাকুতি-মিনতি করে কোন জিনিষ চাইতে এখনও তেমনি করে পারমার্থিক বস্তু চাও তাঁর কাছে। মৌন থাকতে অভ্যস্ত হতে পার যাতে, নীরব প্রার্থনায় সেই শক্তি চাও। মনে রেখ হোলি রুল বলা হয়েছে আভ্যন্তরীণ নীরবতাই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার মজ্জা।

···এই আমার ওয়াটারলু!···কিন্তু যে কণ্ঠগুলো আমার অন্তরের শান্তি ভংগ করতে চায় তাদের প্রত্যেকটাকে গলা টিপে মারব আমি। কেমন করে তা জানি না, তবু এ কাজ করতেই হবে আমাকে। যিশুর নামেই সব···অল ফর জেসাস···

—অল ফর জেসাস—রবারের দস্তানাগুলো টেনে পরতে পরতে ওয়ার্ডে সিস্টার উইলিয়াম বলতেন।—প্রিয় ছাত্রীরা আমার, যখনই এমন কোন কাজের ভার এসে পড়বে বা অসম্ভব মনে হবে, তখনই এই কথাটি বোল। যে কোন কাজ শান্তভাবে করতে পারবে তাহলে। এমন অনেক নার্সিং ডিউটি আছে বিতৃষ্ণা এসে পড়েই তাতে, একমাত্র এই কথাটি সরিয়ে দিতে পারে সে বিতৃষ্ণা। বেড-প্যান নিয়ে যেতে, অজিতেন্দ্রিয় বুড়ো মানুষদের স্নান করাতে যক্ষ্মা পেসেন্টের স্প্যুটামকাপ নিয়ে যেতে বোল এটি।

—অল ফর জেসাস—পচা ঘায়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া একটা ড্রেসিং বদলে দেবার জন্য নিচু হতে হতে নিজেও বলে নিতেন, গ্যাব্রিয়েল, জেনি, শার্লোটি কাছে এসে দাঁড়াও—ভাল করে দেখ কি ভাবে করছি আমি। দেখছ তো কত সহজ! অল ফর জেসাস—ভাব রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা ভিখারির দেহ এ নয়···এ তো যিশুর দেহ···এই যে পেকে ওঠা ঘা এতো তাঁরই আঘাতগুলির একটি··

অল ফর জেসাস। হাসপাতাল করিডরে নিজেদের মধ্যে দেখা হত যখন বেড-প্যান বা কিডনি-বেসিন বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ওরাও এই কথাটি একবার ছুঁয়ে যেত। পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে হাতের নোংরা পাত্রগুলো একটু তুলে ধরে মৃদুকণ্ঠে বলত, অল ফর জেসাস।

তবু বলেছে অথচ বিশ্বাস করেনি এমনও ঘটেছে কখনও কখনও···কি একটা বিকারের রোগীর মত অনাস্থা আসত—যৌবনের ধর্ম! কিন্তু সেই মুখের কথাটুকুও কাজ করত, সিস্টার উইলিয়ামের সাহস আর শক্তির পিছনে কাজ করে যেমন তেমনই। যে মানুষটি ফ্রান্সের সম্ভ্রান্ত পিতৃবংশের পল্লীনিবাস থেকে কনভেন্ট হাসপাতালের কাঙালীওয়ার্ডে এসে না পড়া অবধি ইউরিন্যাল আর ফুলদানির পার্থক্য জানতেন না। নলাকার কাঁচের আধারে গোলাপফুল সাজিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, এ ফুলদানিটা একেবারে নতুন ধরণের দেখতে, তাই না? [ক্রমশ।

* লুড্‌স ফ্রান্সের এক পুণ্য স্থান। পিরেনিজ পাহাড় থেকে জলস্রোত প্রস্রবণের আকারে নেমে এসে একটি হ্রদের সৃষ্টি করেছে সেখানে। এই হ্রদের জল পবিত্র ও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। উত্তরকালে গির্জা নির্মিত হয়েছে এই হ্রদের তীরে। সেই সংগে প্রিস্ট ও নানদের পৃথক পৃথক মঠ।

এই হ্রদের জলে একনিষ্ঠ বিশ্বাসে ও প্রার্থনায় অবগাহন করলে যে কোন দুরারোগ্য রোগ সেরে যায় বলে প্রসিদ্ধি। দেশ-বিদেশের মানুষ এই উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাকে যখন এখানকার মঠ-পরিচালিত হাসপাতালে তাদের রাখা হয়, শুশ্রূষা করা হয়।

এই পুণ্য তীর্থের সংগে এক অলৌকিক কাহিনী জড়িত। কথিত আছে, বার্ণাডেট নামে একটি চাষী-মেয়ে প্রত্যহ এখানে বসে প্রার্থনা করতেন। ঠিক যেখানে এখন গির্জাটি দাঁড়িয়ে, সেখানে। প্রার্থনা কালে প্রতিদিন আকাশের গায়ে জ্যোতি দেখতে পেতেন তিনি আর সবিস্ময়ে তাকাতেন।

বলতেন, হে প্রভু, কি চাও তুমি আমার কাছে।

অবশেষে একদিন সেই জ্যোতি মাটিতে নেমে এল আর তার মধ্য হতে মা মেরী দেখা দিলেন।

বললেন, এই স্থানকে ঈশ্বরের আশীষধন্য বলে প্রচার কর তুমি। সেইক্ষণে পবিত্র হ্রদটির সৃষ্টি হ'ল।

মা-মেরী বললেন, এই পুণ্য হ্রদের তীরে গির্জা নির্মিত হোক, আর বিশ্বের লোক জানুক এই জল ঐশী আশীর্বাদপূত। এই জলের শক্তিতে মানুষ নিরাময় হবে।

এই হ্রদ সেন্ট বার্ণাডেটের নামে পরিচিত।

বর্তমান কালেও সব গির্জাতে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য লুড্‌স তীর্থের জল সযত্নে রাখা থাকে।

অনুবাদ : প্রণতি মুখোপাধ্যায়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

কিংশুকরাগিনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

॥ ৬ ॥

রাগিণী জরুরী পরামর্শের উদ্দেশ্যে তনুকার কাছে গেল। তনুকা বাড়ী ছিল না ছোটমাসীমার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল এল দিনকতক বাদে। রাগিণী বললে—কি রে খুব যে হাসিখুশী ভাব।

—ও গিনী! পরিতোষদার কথা যতই মনে পড়ছে ততই হাসি পাচ্ছে। কি ফাইন ছেলে! বিউটিফুল দেখতে!

—কে পরিতোষদা?

—ছোট মাসীমার বড় ননদের ছেলে, মেডিকেল কলেজে পড়ে। উঃ, এমন হাসাতে পারে যে কি বলবো। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। তেমনি ফাইন গায়। ওর মুখে না যেও না গো গানটা রেকর্ড-এর চেয়েও ভাল লাগে। তোর কথা বলেছি। শুনে বললে, কালই চলে যাচ্ছি নইলে তোমার সঙ্গে গিয়ে মিস্ রাগার সঙ্গে আলাপ করে আসতুম। আসবে ঠিক, দেখিস্ কি ফাইন ছেলে!

এত বড় একটা সংবাদেও যখন রাগিণী বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলে না তখন তনুকা বিস্মিত হল। এমনটি এর আগে হয়নি। বললে, —কি হয়েছে রাগিণী শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে যে। জ্বর হয়েছে নাকি।

—জ্বর হবে কেন, এমনিই, বলে একটু হেসে বললে—আমার তো আর পরিতোষদার সঙ্গে আলাপ হয়নি যে হাসিতে উপচে পড়বো। ভাল কথা—বীথি, কলকাতায় গেছলো কেন রে?

—কলকাতায় যাবে কেন?

—হ্যাঁ গিয়েছিল, আমি দেখলুম কাল ফিরে এল।

—কি করে বুঝলি কলকাতায় গিছলো!

—বাঃ ট্রেনের টাইমে মালপত্তর নিয়ে বাড়ী গেল।

এটা ঠিক কথা। বীথি কাল মালপত্তর নিয়ে গাড়ী করে গেছে। তনুকা বুঝতে পারলে না এত কথা থাকতে তিন সপ্তাহ আগে বীথির কলকাতায় যাবার কথাটা রাগিণী তুললে কেন। সে একটু ভেবে বললে—তা হবে, আহ্লাদী মেয়ে তো কলকাতা ঘুরে এলো।··· বুঝলি গিনী, পরিতোষদা আমায় বললে কি জানিস্, বললে···

বাধা দিয়ে রাগিণী বললে—শুকদেবদা বীথিকেই বিয়ে করবে।

তনুকা এ কথাটা আশাই করেনি, সে থতমত খেয়ে বললে—ধ্যেৎ।

—ধ্যেৎ নয়, সত্যিই!

—কে বললে?

—তুইই তো বলেছিলি।

তনুকা কি যেন বলতে গিয়েও বলল না।

—বলিস্ নি!

হাতের চুড়িগুলো নাড়তে নাড়তে তনুকা বললে,—না—মানে—ওরা বলছিল—সে তো বলতে গেলে—

—বানানো কথা, কেমন?

তনুকা মাথা নীচু করে রইল।

—কিন্তু আমি যা বলছি তা মোটেই বানানো নয়।

এবার তনুকার শুক্‌নো হবার পালা। বললে,—কার কাছ থেকে শুনলি?

—শুকদেবদা নিজে আমায় বলেছে।

—কি বলেছে?

রাগিণীর মুখে সেদিনকার সব ঘটনা শুনে তনুকা আঁতকে উঠে বললে—বলিস্ কি?

রাগিণী এ কথার জবাব না দিয়ে তনুকার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে—তুই শুকদেবদাকে ভালবাসিস্, কেমন? কিরে চুপ করে রইলি যে।

একটু চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে তনুকা বললে—না।

—আঙুর ফল টক হল নাকি?

—চোখে দেখিনি, চোখে দেখেছি খালি তাই বলতে পারবো না টক কি মিষ্টি। তুই তো মনে মনে অনবরত চাখছিস তুই-ই বল না কেমন, টক না মিষ্টি।

এমন চোখা জবাব রাগিণী আশা করেনি তাই ভেতরে ভেতরে রেগে গেল, বললে—তবে সব শুনে আঁতকে উঠলি যেন?

—চোখের সামনে কারুকে ডুবতে দেখলে সবাই আঁতকে ওঠে তা সে আঙুরই হোক কি টেপারিই হোক।

—তাহলে আর পাড়ে দাঁড়িয়ে কেন জলে ঝাঁপিয়ে আঙুর ফলকে উদ্ধার কর।

—তাই করবো। চোখের সামনে ওকে ডুবে যেতে দেখতে পারবো না। ওকে বাঁচাতেই হবে।

রাগিণী শ্লেষের সঙ্গে বললে—এদিকে বলছিস ভালবাসিস না কিন্তু পাবার আশা দেখছি ষোল আনা।

—উহুঁ ঠিক উল্টো। ভালো হয়ত' বাসি, যেমন তোকে ভালবাসি ঠিক সেই রকম, কিন্তু পাবার আশা একদম করি না।

—তবে বাঁচাবার জন্য অত মাথা ব্যথা কেন ?

তনুকার চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখা গেল। গোপন কথা বলবার মত করে ফিস ফিস করে বললে—টাইরোন পাওয়ার, নামটা ঠিক বলেছি তো, যখন ফিল্মে বাজে একটা মেয়েকে চুমু খায় তখন তোর রাগ হয় কেন ? ইচ্ছে করে কেন যে ছুটে গিয়ে টাইরোনকে সরিয়ে আনিস্। ফিরে, তাকে পাবার আশা করিস নাকি ?

রাগিণী অপ্রস্তুত হল, কথাটা সে একদিন তনুকাকে বলেছিল যে টাইরোন তার ভীষণ 'ফেবারিট' তাই যখন দেখে যে সে— —রাগিণীর অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে তনুকা হেসে বললে—ভয় নেই গিনী, ভালবাসা-বাসির মধ্যে আমি আর নেই। আমি কারুকেই ভালবাসি না।

—কারুকে না ? পরিতোষদা'কেও না ?

তনুকা জবাব দিলে না।

—পরিতোষদা'র কথাও বানানো নাকি ?

তনুকা হেসে বললে—না বানানো নয়। কিন্তু আমি তো বলিনি যে পরিতোষদাকে আমি ভালবাসি। বলেছি বিউটিফুল দেখতে, ফাইন ছেলে, হাসাতে পারে ভাল গান গাইতে পারে। ভালবাসতুম যদি না ওর বৌ থাকতো। —বলে হো-হো করে হেসে উঠে বললে—তনু আর সেই ন্যাকা মেয়ে নেই গিনী। নকলের ব্যাপারের পর থেকে সে বুঝে-সুঝে এগোয়।

তনুকার কথায় রাগিণী ভীষণ চটে গেল, বললে—তবে কেন অমন ভাবে বলেছিলি যে শুকদেবদা বীথিকে বিয়ে করবে, চিঠি লিখেছে, বীথি সে চিঠি দেখেছে।

তনুকার চোখে-মুখে কৌতুক উপচে পড়তে লাগল। এতকাল কি ছেলে কি মেয়ে সবাই ওকে নিয়ে রগড় দেখেছে, এই রাগিণীই কি কম জ্বালিয়েছে ! আজ ওর দিন এসেছে, আজ ও রগড় দেখবে। বললে, বলেছিলুম বলেই তুই রণচণ্ডী মূর্তি ধরবি ? বীথিকে বিয়ে করলেই বা তোর কি ?···ও: বুঝতে পেরেছি, সেই জন্যেই বুঝি মুষড়ে পড়েছিস।—বলে হঠাৎ রাগিণীকে জড়িয়ে ধরে হো হো করে হেসে উঠে বললে—দূর বোকা, সেদিন আমি বানিয়েই বলেছিলুম। তুই কি শুকদেবদাকে জানিস্ না।

—ছাড় ভাল লাগে না।

রাগিণীকে ছেড়ে দিয়ে তনুকা বললে, আমি জানি তুই শুকদেবদা'কে ভালবাসিস।

মাথা ঝাঁকিয়ে রাগিণী বললে—মোটেই না।

—তুমি না বললেই আমি শুনবো। আমিও একসময়ে ভালবাসতুম আর ভাবতুম ছেলেবেলাকার মত শুকদেবদাও আমাকে ভালবাসে, কিন্তু যখন জানলুম যে শুকদেবদা তোকে—থাকগে, তোর আর শুনে কাজ নেই শেষে বলে বসবি, এটাও তোর বানানো কথা।

পুরো কথাটা তনুকা বলল না বটে কিন্তু কথাটা যে কি ত

রাগিণীর বুঝতে কষ্ট হল না। তবু সে কেমন করে জানল; কার কাছ থেকে শুনল তা জানতে ইচ্ছে হলেও রাগিণী ও বিষয়ে কোনও কথাই বললে না, দেখি তমুকা নিজে থেকে কিছু বলে কি না।

তমুকা কিন্তু অন্ত প্রসঙ্গ নিয়ে এল।

—বীথির কথা কি বলছিলি যেন।

রাক্ষুসী! যাই বলি তাতে তোর কি। রাগিণী মনে মনে গর্জে উঠল: মুখপুড়ী আধখানা বলে থেমে গেল। ভারী একবার বানিয়ে বলার কথা বলেছি অমনি মেয়ের রাগ হয়েছে! বানিয়ে বানিয়ে বলিস্ না। তোর মত বানিয়ে বলতে আর কোন মেয়েটা পারে শুনি!

—বীথির কলকাতায় যাবার কথা কি বলছিলি?—সেই এক কথা! যে কথা শুনতে চাই হতচ্ছাড়ী সে কথার ধারে কাছে গেল না গা? অতএব, বাধ্য হয়ে রাগিণীকে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে কথাটা বলতে হল। কণ্ঠস্বরটা যতটা পারে গরম রেখে বললে—কি বলছিলি যে শুকদেবদা তোকে··শেষে বলে বসবি এটাও বানানো না কি—।

—বলছিলুম—ও:! হঁ্যা—। বলে একটু হেসে বললে—বাবারে বাবা, না শুনলে মেয়ের ঘুম হবে না। বলছিলুম যে শুকদেবদাও তোকে ভালবাসে। দুর্গা বলছিল, এটা কিন্তু আমার বানানো কথা নয়,—এই চোখ ছুঁয়ে দিব্যি গেলে বলছি দুর্গার মুখ থেকে শুনেছি। চাসতো দুর্গাকে ডেকে এনে ভজিয়ে দিতে পারি।

দুর্গা ভবতারণ ভটচাজের মেয়ে, তমুকার সঙ্গে পড়ে।

—কি বলছিল দুর্গা?—আগেকার মত গরম গলাতেই রাগিণী জিজ্ঞেস করলে।

—দুর্গা বললে, বাবা মা-কে বলছিল আমি ঘরের ভেতর থেকে নিজের কানে শুনেছি। তুই যেন তবু কাকেও বলিস্ না। তুই বীথির কথা—

—কি শুনেছে দুর্গা সেটা বলবি তো। এবার কণ্ঠস্বর গরমের বদলে নরম।

—শুকদেবদা নাকি তার বন্ধুদের কাছে বলেছে যে তোর ফিগারটা খুব সুন্দর। দুর্গা বললে, মা একথা শুনে বাবাকে বললে বেশ তো দাও না চারহাত এক করিয়ে। কথাটা তোল না দত্ত মশাই-এর কাছে। বাবা বললে, উহুঁ আমি তুলবো না যাদের হাত এক হবে তারা নিজেরা এসে হাত তুলুক।

শুনে ভাল লাগলেও রাগিণী বললে—বাজে কথা।

তমুকা চটে গেল।

—বাজে কথা! চোখ ছুঁয়ে দিব্যি করলুম তবু বিশ্বাস হল না। বেশ দুর্গাকে ডেকে আনছি।

—বস, ডাকতে হবে না।···কিন্তু ও কথা বললে কেন?

—ও তোকে জব্দ করার জন্যে বলেছে।

—কি করে বুঝলি?

—যা বলি শোন। তোর চেয়ে আমার এসব ব্যাপারে ঢের বেশী এক্সপিরিয়েন্স আছে। যদি সত্যিই রাগ করে থাকতো তাহলে তুই যখন কাছে গিয়েছিলি তখন সরে যেত না হয় তোকে ঠেলে সরিয়ে দিত। এ আর কিছু নয় তোর ওপর রাগ করে তোকে জব্দ করবার জন্যে বলেছে। চিঠির কথাটা ভুলে গেলি? পুরুষ মানুষ রাগ নেই শরীরে? যেই দেখলে তুই এখন বদলেছিস্, শোধ নিলে—তোর জন্যে ভেবে মরছে, বন্ধুদের কাছে তোর ফিগারের গুণ গাইছে, আর তুই বাড়ীতে বীথির কথা বলে এলি, এতেও কার না রাগ হয় রে। ও কিছু না। ভালবাসলে অমন হয়।

—তোর মাথা!

তমুকা এবার রাগিণীর মুখের কাছে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে—তুই কিছুই জানিস্ না। মিছিমিছি গুচ্ছের টাকা তোর জন্যে কুঞ্জ কাকার খরচ হচ্ছে, বিত্তে বুদ্ধি মোটেই হয়নি। সেইজন্যেই সুশান্ত, তরুণের দল তোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে! তবু মন্দের ভাল এখনও মুখে চুণ কালি পড়েনি। ক্লাস থ্রীর মেয়ের যে জ্ঞান গম্যি তোর তাও নেই। এই বেলা পালিয়ে আয়, কলকাতার নাম হাসাস্ নি।

কথার তোড়ে রাগিণী এবার ভেসে গেল। কোন রকমে হাবুডুবু খেতে খেতে [illegible]—কিন্তু বীথির কলকাতা যাবার কথাটা ঠিক ঠিক বললে কি করে? ও বাড়ী তো তোরা দু'একজন ছাড়া আর বড় কেউ একটা যায় না। ও নিশ্চয় অনেকদিন ধরে যাতায়াত করছে, তোরা কেউ জানতে পারিস্নি। আজ যখন দেখলে যে ধরা পড়ে গেছে তখন জাঁকিয়ে স্বীকার করে গেল।

কথাটা ভেবে দেখবার মত বটে! তমুকা বললে—সে তোকে ভাবতে হবে না আমি ঠিক বীথির কাছ থেকে ভেতরের খবর বার করে আনব'খন—বলে রাগিণীর কাঁধে একটা হাত রেখে বললে—তবে তুই একেবারে কেলেঙ্কারী করিস্নি, কিছুটা মান বাঁচিয়েছিস্। কাজলের সঙ্গে যা ফ্ল্যার্ট করেছিস্ বললি, ওটা গ্র্যাণ্ড হয়েছে। তোকে জব্দ করতে এসে শুকদেবদা' নিজেও কিছুটা জব্দ হয়ে গেছে।

—এদিকে আমি যে কাজলের জালায় জ্বলে মলুম। জোঁকের মত লেগে আছে।

তমুকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা থাকুক, হাতের কাছে কেউ না থাকলে আবার বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ওর জন্যে ভাবিস্নি বেশী বাড়াবাড়ি করে আমি টিট করে দেব'।

ছেলের রকম সকম দেখে শঙ্কিত হয়ে তরুবালা মামাকে গোপনে ডেকে পাঠিয়ে আনিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—বাবা, এসব কি শুনছি?

মামা নির্বিকার চিত্তে জিজ্ঞেস করলে—কি শুনছেন।

তরুবালা ইতস্তত করতে লাগলেন। বীথির কথা তিনি যা শুনেছেন তা যদি মামা না জেনে থাকে তবে তাকে জানান উচিত হবে

মামা তরুবালার মনের কথাটি বুঝতে পেরে বললে—বীথির কথা শুনেছেন তো।

এরাও জানে, তা হলে পাঁচকান হতে আর দেরী নেই, হয়ে গেছে কিনা তাই বা কে জানে। তবে ভরসার কথা এরা পুরুষ মানুষ কথা হজম করতে জানে? [illegible]দের কেচ্ছায় নিজেরা জড়িয়ে পড়লে যতটা আনন্দ পায় রটিয়ে ততটা পায় না।

মামা অভয় দিয়ে বললে—ও সবে কান দেবেন না। শুকদেব কি আপনার সেই ছেলে। বড়ঘরের ছেলেদের নামে অমন একটু আধটু রটেই থাকে। ভয় পাবেন না।

—দশটা নয় পাঁচটা নয় আমার ঐ একটিমাত্র ছেলে, তোমরা ওর ভাই-এর মত, দেখো বাবা ও যেন বিগড়ে না যায়।

—খুড়ীমা, আপনার যেমন একটি ছেলে আমাদেরও তেমনি একটি মাত্র বিং। তবে একটা কথা কি জানেন—বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা খাটো করে বললে—যদি তেমন কিছু কেউ এসে বলে কিংবা নিজের চোখেও যদি তেমন কিছু দেখেন তা হলেও বিশ্বাস করবেন না। ভেতরে একটু ইয়ে চলবে। ভয় পাবেন না, আমরা আছি।

দেখব 'শুনব' তাও আবার নিজে অথচ বিশ্বাস করব না, এক কথায় নিজেকে কানা ও কালা ভাবতে হবে। তরুবালা এ কথা শুনেই অবাক হলেন, বললেন,—দেখে শুনেও বিশ্বাস করব না তুমি কি বলছ বাবা? কি দেখব, শুনব বল দেখি, তোমার কথা শুনে যে ভয়ে বুক কাঁপছে।

—আহা, ঐ যে পিসী বলে না, কালে কালে কতই দেখব শুনব সেই সব দেখা শোনা আর কি। আপনি কিছু ভাববেন না।

মামা অভয় দিয়ে গেলেও তরুবালার ভয় দূর হল না। ঠিক করলেন ভেতরে ভেতরে তিনি নিজেই খোঁজ নেবেন, ব্যাপারটা কি। [illegible] পঙ্কজ-মাকে, দেখি ওকে দিয়ে বীথিদের বাড়ির কোনও খবর আনা যায় কি না।

অফিস থেকে বাড়ী আসবার পথে মামা দেখলেন তন্বুকা হন হন করে রাস্তা দিয়ে চলেছে। এমন ভাবে হাঁটছে দেখে মামার কৌতূহল হল কোথায় যাচ্ছে। মামাও পেছু নিলে এবং দেখলে তন্বুকা প্রফেসর মণ্ডলের বাড়ীতে গেল। বাড়ী ফেরবার পথে মামার মাথায় ঘুরতে লাগল, 'তন্বুকা অমনভাবে ও বাড়ীতে গেল কেন? যাওয়া দেখে মনে হল যেন এক জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে বাড়ীতে এসে দেখে কিংশুক বৈঠকখানায় বসে আছে। মাথায় প্ল্যান এসে গেল, এটাকে ও বাড়ীতে পাঠাতে হবে এখুনিই। বললে—কি রে?

—ভাল লাগলো না তাই চলে এলুম।

—সেদিনকার সেই জামাটা না?

—হ্যাঁ।

—সেদিন থেকে গায়ে চাপানো আছে?

—বাঃ? তুইই তো বললি জামা খুলিসনি, গায়ে দিয়েই ঘুমোস ভাল ঘুম হবে। খুললে তো আবার গাল মন্দ করতিস। তোর ওপরে যখন সব ছেড়ে দিয়েছি এখন জামা ত দূরের কথা যদি বলিস তাহলে এই গরমে কম্বল চাপিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।

—অঃ! তা কেমন ঘুম হল এ ক'দিন?

—ছাই।

—ঠিক আছে, এবারে ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। চলে যাও এখখুনি। কিংশুক বিস্মিত হয়ে বললে—কোথায় যাব?

—প্রফেসর মোড়লের বাড়ী।

—প্রফেসর মোড়ল মানে বীথিদের বাড়ী? কেন?

—যা বলছি শোন। কাল খুড়ীমা ডেকে পাঠিয়ে তোর কি ইচ্ছে

জানতে চেয়েছিলেন। বললুম ইচ্ছে আবার কি, খাবে দাবে হৈ হৈ করবে। বিয়ে থা করবে না, এই ইচ্ছে। খুড়ীমা বললেন—ওর যদি কারুকে পছন্দ হয়ে থাকে তা সে যে জাতের—আমি তো জাত শুনেই বুঝলুম কি ব্যাপার। তাড়াতাড়ি বললুম, আপনি ওসব ভাববেন না, ও বিয়েথাই করবে না তার জাত!—বলেই কেটে পড়লুম। তা হ্যাঁ রে মানে বলছিলুম যদি কোনও মেয়েকে মনে—।

—মেয়ে? মেয়ে আছে নাকি পৃথিবীতে! সব ভ্যাম্পায়ার মেয়ে নিয়ে মাতামাতি করবি তোরা। বিয়ে টিয়ে তোদের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। মেয়ে··ফুঃ?

—আমাদের জন্যে নয় মানে? আবার কে জুটলো তোর সঙ্গে?

—কেন মহাবীর। ও ঠিকই বলে, নাইনটি এইট পয়েণ্ট এইট পার্সেণ্ট ছেলেদের কোনও সেন্স নেই তাই মেয়ে দেখলেই হ'ল—।

—একেবারে ঝিঙে পোস্তো খাওয়ার দল বলছিস।

—ইয়েস।

—কিন্তু তোমার পরামর্শদাতা মহাবীরটি রোজ প্রফেসর মোড়লের বাড়ী যায় কেন বলতে পার চাঁদবদন। ঝিঙের খোসা চিবোতে?

—ও যায় বই পড়তে।

—বই নয় রে।

—মানে?

—মানে গেলেই জানতে পারবি। সিধে প্রফেসর মোড়লের বাড়ী চলে যাও···ধাঁ করে বইটি নে। তোকে কি ফাটকে যেতে বলেছি, তবে? একটা কথা জিজ্ঞেস করি পষ্টাপষ্টি বল বাপু। রাগিণী বাড়ী বয়ে অপমান করে গেছে, এখন তোর ইচ্ছেটা কি বল দেখি তাকে অমনি কিছু না বলে ছেড়ে দিতে চাস?

কিংশুক গর্জে উঠে বললে—ছাড়বো! দেখে নেব ও কত বড় মেয়ে। এই তোকে বলে দিচ্ছি এর পর যদি ও কেঁদে ভাসিয়ে দেয় তাতে তলিয়ে যাব সেই ভী আচ্ছা তবু ফিরে তাকাব না। তবে বিয়ে আমাদের জন্যে নয়।

—ইদিকে বলছিস বিয়ে আমাদের জন্যে নয়, আবার বলছিস দেখে নিবি। তা' অষ্টপ্রহর কাছাকাছি না থাকলে দেখবি কি করে, তলিয়েই বা যাবি কি করে?

—তাই থাকবো কাছাকাছিই থাকবো।

—ঐ লাও। পরের বাড়ীর সোমথ মেয়ে তোর সঙ্গে বিয়ে না হলে তার কাছাকাছি অষ্টপ্রহর থাকবি কি করে?

কথাটা ফেলবার নয়। কিংশুক বললে—না না ও বিয়ে টিয়ে নয়, তুই একটা রাস্তা বাৎলা।

মামার বাঁ হাতটা এগিয়ে এল এবং কিংশুকের আঙুলের খোঁচা খেয়ে আবার পেছিয়ে গেল। মামা বললে—সেইজন্যেই বলছি প্রফেসরের বাড়ী চলে যা, জানিয়ে দে যে তুই সত্যিই বীথিকে ইয়ে করিস—মানে—

—দূর! বীথিকে ইয়ে—

—আচ্ছা করিস রাগিণীকে তা জানি, তবে সেটা এখন চেপে যা। রাগিণীকে জব্দ করতে গেলে বীথির সঙ্গে মিশতে হবে। রাগিণী যেমন তোর সামনে কাজলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি—।

—না, ঠিক ফষ্টিনষ্টি নয়, মানে—।

—ফষ্টিনষ্টি আর কাকে বলে রে তাহলে? তুই আমায় ফষ্টিনষ্টি কাকে বলে শেখাবি? তোর সামনে আর কি করতে বলিস তাহলে। ···তবে? তোকেও বীথির সঙ্গে তাই করতে হবে। ওকে বুঝিয়ে দে যে বীথি তোমার চেয়েও সুন্দরী। যদিও বীথি রাগিণীর ধারে কাছে আসতে পারে না।

কিংশুক বাধা দিয়ে বললে—রাগিণী কি এমন সুন্দরী! মহাবীর ঠিকই বলে মেয়ে দেখলেই তোরা তাকে উর্বশী ভাবিস। গিনী সুন্দরী কোথায়? নাকটা একটু টিকোলো আর হ্যাঁ, আইল্যাশগুলো বেশ লম্বা লম্বা ফিলিম য়্যাকট্রেসদের মত। থুতনীটাও মন্দ নয়, তালশাঁসকে রিমাইণ্ড করিয়ে দেয়।

—ওরে বাব্বাঃ! কাছাকাছি না থেকেই থুতনী যখন তালশাঁস হয়েছে, কাছাকাছি থাকলে না জানি—

—না না, তুই বললি কিনা সুন্দরী তাই বললুম। আমি প্রফেসরের বাড়ী যাব। তোর ওপর যখন সব ভার ছেড়ে দিয়েছি তখন যা বলবি তাই শুনবো। তা তোর প্ল্যানটা কি—বীথির সঙ্গে মিশলে ও জব্দ হবে কেন?

—জব্দ হবে না আবার! জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে···ওর মেয়ের মত রাগিণীও চায় যে ছেলেরা ওকে তোষামোদ করুক ওর কাছে পিছে ঘুর ঘুর করুক। সব ছোঁড়ারাই তাই করে। কিন্তু তুই? তোষামোদ করা তো দূরের কথা একবার ফিরেও তাকালি না উপরন্তু মুখের ওপর বলে এলি বীথির কথা। এমন হেঁকে চোখের ওপর কোন মেয়ের না রাগ হয়। তা ছাড়া গেলে মহাবীরের ব্যাপারটাও একটু একটু করে জানতে পারবি, তুই তো ওকে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি ভাবিস কিন্তু ওটি মোটেই তা নয়। ওখানে যাতায়াত করতে থাকলে ওর হাজারো রকমের লীলা দেখতে পাবি।

—কিন্তু বাড়ীতে জানতে পারলে যে কেলেঙ্কারী হবে। মা, পিসীমা—।

—প্রফেসরের বাড়ী গেলে কেলেঙ্কারী হবে কেন শুনি? মাষ্টারের বাড়ী ছাত্র যাবে এতে দোষের কি আছে। এই যে মহাবীর রোজ যাচ্ছে কে তাতে দোষ ধরছে।

—কিন্তু পিসীমা জানতে পারলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবেন।

—পিসীমা কিসে না চেঁচান শুনি। তাছাড়া পিসীমা তো কামাখ্যা যাচ্ছেন তবে আর ভয়টা কি। নে ওঠ, আর দেরী করিস নি।

কিংশুক উঠতে উঠতে বললে, যেতে বলছিস যাচ্ছি। কিন্তু তুই যা ভাবছিস—যে গিনীকে আমি—মোটেই তা নয়।

—আমি কিছুই ভাবছি না। তুই এখন যা আর দেরী করিস না।

কিংশুক চলে গেলে মামা ভেতরে গিয়ে অনুপমাকে সব বললে। অনুপমা শুনে চোখ বড় বড় করে বললে—থুতনী তালশাঁস হয়েছে! বল কি?

—বোঝ তাহলে অবস্থাটা। থুতনী যদি তালশাঁস হয় তাহলে—।

বাধা দিয়ে কপট ক্রোধে অনুপমা বললে—আবার ঐসব···!

অম্বুকা চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বীথিকে জিজ্ঞেস করলে—কবে এলি রে?···উঃ! কি গরমটাই পড়েছে।

বীথি বললে—কাল।

রাগিণী ঠিকই বলেছে, এখন জানা দরকার কবে গিয়েছিল :

—এরই মধ্যে চলে এলি ?

—এরই মধ্যে কোথায় ? সেই বুধবারে গেছি এসেছি কাল।

তমুকার বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল, বুধবারে গেছে। তাহলে শুকদেবদা ঠিক কথাই বলেছে। তারপরে খেয়াল হল বীথি বুধবারের আগে একটা 'সেই' 'জুড়েছে।' 'সেই' মানেই দিন কতকের ধাক্কা।

—কি কি সিনেমা দেখলি ?—বলে বীথিকে জবাব দেবার সময় না দিয়ে নিজেই আবার বললে—সিনেমাই বা দেখবি কখন। বুধবারে গেছিস কাল গেছে শনিবার, মোটে তো মাঝে দু'টো দিন গেছে। দু'দিনে আর কি-ই বা দেখবি।

—দু'দিন থাকবো কেন, এক উইক্-এর ওপরে ছিলুম। গেছি আগের বুধবার দু'তারিখে, এসেছি কাল। ওখানে আবার সিনেমা দেখব কি !

কথাটায় কেমন খটকা লাগল। কলকাতায় সিনেমা দেখবে না ত' কোথায় সিনেমা দেখবে ? বলে কি ! বললে—তাহলে চার পাঁচটা বই তুই নিশ্চয়ই দেখেছিস। গিনী বলছিল, মেট্রোয় বইটা খুব ভাল হয়েছে, বীথি নিশ্চয়ই দেখে আসবে।

—গিনী কি করে জানল যে আমি কলকাতায় গেছি ? আমি তো কারুকে বলে যাই নি।

—শুনেছে।

—কার কাছে শুনলে ?

—তা কি করে জানবো। আমায় বললে তাই তোকে বললুম। আমার সেই বোকা মেয়ে পেয়েছ কিনা যে যার কাছ থেকে শুনেছি তার নাম বলি ?

বীথি একটু চুপ করে থেকে বললে—আমি দেখছি আজকাল কেমাস্ হয়ে পড়েছি। কি করি কোথায় যাই সে সব খোঁজ খবর তোদের লীডার গিনী অবধি রাখছে।

কথাটা শোনামাত্রই তমুকা জলে উঠল, কারুর গতিবিধির খোঁজ খবর রাখা মানেই তার চেয়ে খাটো হওয়া। আমরা তোর চেয়ে খাটো ? আমি ? গিনী ? বটে ? ভারী ত' চোখ দু'টো একটু ঢেলা ঢেলা তাই অত দেমাক। গিনীর দায় পড়েছে তোর খোঁজ খবর রাখতে। শুকদেবদা ওকে বলেছে, তাই শুনেছে।

বললে—গিনীর তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে কে কোথায় যাচ্ছে তার খোঁজ রাখবে। ওকে শুকদেবদা' বলেছে তাই জেনেছে।

বলেই তমুকা মনে মনে জিভ কামড়াল, এই যাঃ ! নামটা বলে ফেললুম ! আমতা আমতা করে বললে—বোধ হয় তোকে ষ্টেশনে শুকদেবদা' দেখেছে—।—বললে বটে কিন্তু বীথিকে দেখে মনে হল না যে সে কথা তার কানে গেছে।

এতক্ষণে সব পরিষ্কার হল বীথির কাছে। সকালে হঠাৎ পশুর মা এসে হাজির, বড় একটা আসে না। কেন এসেছে জিজ্ঞেস করাতে বললে—না, এমনিই এনু। এ'দিক দিয়ে যাচ্ছিনু অমনি হয়ে গেনু। কদ্দিন মোড়ল দিদিকে দেখেনি। আহা ! দিদি আমায় কি ভোগানই না ভুগছে গা !

মা-র জন্যে হঠাৎ পশুর-মার দরদ কেন উথলে উঠল' বীথি তখন বুঝতে পারেনি। এখন বুঝতে পারল যে কিছু একটা কাণ্ড কোথায়ও ঘটেছে যার জন্যে পশুর-মা সকালে এসেছিল, কিংশুক রাগিণীকে ওর যাবার কথা বলেছিল। ব্যাপারটা কি জানতে হবে। কিন্তু বেশ জানে যে তমুকাকে জিজ্ঞেস করলে সে কিছুই বলবে না। ঘুরিয়ে কথা বার করতে হবে। সোজা আঙুলে এক আঙুল ছাড়া ঘি বা বনস্পতি কিছুই ওঠে না, কাজেই আঙুল বেঁকাতে হবে। ঠোঁট ফুলিয়ে বীথি বললে—শুকদেবটা যে কি হচ্ছে দিন দিন ! বারণ করেছিলুম যে কারুকে বলো না অমনি গিনীকে বলে দিয়েছে ! তুই ঠিকই বলিস্ তমু, ছেলেদের বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়।

তমুকার চোখ দু'টো একটু বসা তাই রক্ষে নইলে একথা শোনবার পর চোখ কপালে দাঁড়িয়ে পড়ত ; আড় চোখে তমুকার অবস্থাটা দেখে নিয়ে বীথি বললে, আসুক না আজকে জন্মের মত আড়ি করে দেব। হাঁ রে, গিনীকে আর কি বলেছে রে শুকদেব ?

তমুকার চোখ কপালে না দাঁড়ালেও অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এসেছে। বললে,—যাবার আগে শুকদেবদা'কে বারণ করে গিয়েছিলি বুঝি ?

বীথি মুচকি হেসে বললে—বলব কেন ?

—কি-করে থেকে ভাব হল রে ?

—সে আমি কিচ্ছু বলবো না। আগে বল গিনীকে তারপর আর কি বলেছে তারপর সব তোকে বলব। উঃ ! এত কথা জমে আছে না যে না বলতে পেরে প্রাণ আইঢাই করছে।

তমুকা সঙ্কটে পড়ে গেল। পরের জমান কথা শুনতে গেলে নিজের ঘরের মাল ছাড়তে হবে। কিন্তু ছাড়বেই বা কি ? কোন মুখে বলবে যে কিংশুক বলেছে বীথিকেই সে বিয়ে করবে।

ও চুপ করে আছে দেখে বীথি বললে—তবে থাক তোর বলে কাজ নাই শুনেও কাজ নেই।

শুনে কাজ নেই ! এ জিনিষ শোনবার জন্যে প্রাণ দেওয়া যায়। এর চেয়ে কথামৃত আর কি আছে শুনি ? কিছু রেখে ঢেকেই ঘরের মাল ছাড়ি। বললে—না, এমন কিছু নয়। বলেছে, বীথি মন্দ মেয়ে নয় ; মেশা চলে। কলকাতায় যাবার আগে জিজ্ঞেস করলে—কি আনবো বল শুকদেবদা'—বলে শেষকালে একটু হুল ফোটালে। ম্যানারস্ জানে, তা জানবেই বা না কেন, খৃষ্টান তো ওদের ওসব জ্ঞান টন্‌টনে।

দেখা গেল হুল মোটেই বেঁধেনি। বীথির চোখ'দুটো খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ! বললে—তুই বানিয়ে বলছিস।··সত্যি বলছিস্ যে বলেছে যে আমি মন্দ মেয়ে নই ?

তমুকা চটে গেল, সবাই ওর কথায় অবিশ্বাস করে বলে, বানিয়ে বলছিস। চটে মটে বললে—চল না গিন্নীর কাছে খোঁজ নিচ্ছি।

তাহলে কিংশুকই সকালে পশুর-মাকে পাঠিয়েছিল। মা-কে দেখতে আসবার কথাটা পশুর-মা বানিয়ে বলেছে, কিংশুকই বোধহয়, বোধহয় কেন নিশ্চয়ই ঐ কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে। কিংশুক। এ নাম খালি স্বপ্নেই ভাবত বীথি। স্বপ্নও তাহলে সত্যি হয়! ও, পুওর ডার্লিং। না জানি কবে থেকে ভালবাসছে? বীথির এখন স্মরণে এল, তাই ইদানীং পথে ঘাটে অমন ভীরু চোখে চেয়ে থাকত (একদম বাজে কথা)। এখন মনে পড়ছে স্কুলের ছুটির পর রোজই রাস্তায় কেন দেখা হত (এটাও পুরোপুরি সত্যি নয়)।

বীথির ইচ্ছে হল নাচে। কিংশুক! কিং? এ যে কল্পনাতীত! শুকদেব। শুক! নেটিভদের একটা গান আছে শুক-সারী নিয়ে। শুক বলে আমার কৃষ্ণ। বীথি বলে আমার শুক। উঁহু ভাল লাগছে না। কেমন যেন নেটিভ গন্ধ। কিংশুকও নেটিভ। তা হোক, ও যখন আমার হয়েছে তখন আর নেটিভ নয় আমিও শু-ও তাই। কিংশুক! শুক! না, শুক নয় সুখ। সুখ, সুখ! নেটিভদের আর একটা গান মনে আসছে। জানি কতেক সুখ শুক মাঝে আছে গো···। ছ্যাটস বেটার স্থান শুক বলে আমার কৃষ্ণ।

বীথির হাবভাব দেখে তমুকা দমে গেল। এ যে একেবারে বিভোর হয়ে গেল। কথাই বলে না। ঘরের মাল হাতছাড়া হল অথচ পরের মাল হাতে এল না। একেই ছুঁচোভুবি বলে। মৃদুস্বরে তমুকা বললে—কবে থেকে শুকদেবদা'র সঙ্গে ভাব হল রে?

কিন্তু কে উত্তর দেবে? বীথি নির্বিকার। তমুকা এবার একটু জোরে বললে—কি নিয়ে এলি রে শুকদেবদা'র জন্যে!

এবার কথাটা বীথির কানে গেল, বললে—কি এনেছি?

চাকর ঘরে ঢুকল।

—কি?

—আজ্ঞে কিংশুকবাবু এসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন—

বীথি ও তমুকা দুজনেই একসঙ্গে দু' রকম স্বরে বলে উঠল—হ্যাঁ!

দিদিমণিদের কণ্ঠস্বরে চাকরটা ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বীথি বললে—কই?

তমুকা মনে মনে বললে—তাহলে কিছুই বানানো নয়।

চাকরটা বললে—বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, জিজ্ঞেস করলেন—।

—বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছো? ছিঃ ছিঃ! তোমাদের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে—বলতে বলতে বীথি ছুটে বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশ।

মিখাইল শোলোখভ

সুনীলকুমার নাগ

আজকের পৃথিবীতে রাশিয়া সব দিক দিয়েই প্রথম সারির দেশগুলির অন্যতম—যদিও মাত্র এক শ' বছর আগেও ইয়োরোপের পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই রাশিয়ার কথা বলতে হতো। কারণ সে সময়কার রাশিয়া আয়তনে যেমন বিশাল ছিল, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে অন্ধকারও ছিল তেমনি ঘনঘোর। আজকের রাশিয়া আয়তনে তেমনি বিরাটই আছে, বরং তা আরো বেড়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার সমস্ত দিকে উন্নতি যা হয়েছে তা এক কথায় বিস্ময়কর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিজস্ব সৃষ্টি বলতে গেলে রাশিয়ার কোনো কিছুই ছিল না। পিটার দি গ্রেটের সময় থেকে সেই যে ফ্রান্সের কাছ থেকে গ্রহণ করা শুরু হয়েছিল, বলতে গেলে এক শতাব্দী ধরে তাই চলতে লাগলো। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা কিছু ফরাসী তাই আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য হতে লাগলো। ফ্রান্সের গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের রুশ রাজদরবারে অতি মাত্রায় মর্যাদার সঙ্গে আসন দেওয়া হতে লাগলো। ইংরেজ কবি সাহিত্যিকদের কিছু কিছু রচনা যে রাশিয়ায় দেখা যেতো সে সময়ে তা-ও ফরাসীর মাধ্যমেই প্রচারিত হতো।

একদিক থেকে দেখতে গেলে সে সময়কার রাশিয়ার অবস্থা অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভারতবর্ষের মতো ছিল বলা চলে। আমাদের দেশে যেমন কে কতো শিক্ষিত তা বিচার হতো কে কী পরিমাণ ইংরেজী জানে তাই দিয়ে, রাশিয়ায় তেমনি লোকের শিক্ষা-দীক্ষার পরিমাপ হতো ব্যক্তিবিশেষের ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্যে দখল থেকে; যদিও, আমরা যেমন আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজের কাছে হারিয়েছিলাম, রাশিয়ানরা কখনোই সে-ভাবে ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয় নি। কাজেই আমরা ইংরেজী শিখেছিলাম বাধ্য হয়ে, কিন্তু রাশিয়ানরা শিখেছিল স্বেচ্ছায়।

যাই হোক, এইভাবে এক শ' বছর বা তারও বেশি সময় প্রধানত ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব আওতায় কাটাবার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রাশিয়ায় খাঁটি রুশ-সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিলো। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পুশকিনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো এবং পুশকিনকেই সাধারণত বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পাবার উপযুক্ত প্রথম রুশ প্রতিভা বলে গণ্য করা হয়। পুশকিনের পর গোগোল, তুর্গেনভ, দস্তয়েভস্কি এবং টলস্টয় পর্যন্ত এসে আমরা দেখতে পাই রুশ-সাহিত্য, বিশেষ করে রাশিয়ার উপন্যাস সমস্ত দিক দিয়েই পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। টলস্টয় তাঁর আনা কারেনিনার শেষ খণ্ড প্রকাশ করেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। পুশকিনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে এই আটান্ন বছরের মধ্যে একটা দেশের সাহিত্যের এই উন্নতি নিশ্চয়ই বিস্ময়ের ব্যাপার।

রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের ত্রিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে টলস্টয়ের উপন্যাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড বলেছিলেন যে,···'ফরাসী উপন্যাসের আর আগের মতো জনপ্রিয়তা নেই। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণ গত হয়েছেন, তাঁরা কেউই তাঁদের সমান শক্তির অধিকারী কোন উত্তর সাধক রেখে যান নি।···উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাই আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবাগত রাশিয়াকে পাচ্ছি। বর্তমানে রাশিয়ার উপন্যাসের যুগ চলছে এবং ন্যায্যতই চলছে।

ভবিষ্যতে যদি রুশ-সাহিত্যের মান আরো উন্নত হয় বা রাশিয়াতে উপন্যাসের বর্তমান মানও বজায় থাকে, তা হ'লে অবশ্যই আমাদের পুত্রদের রুশ ভাষা শিক্ষা করতে হবে।' টলষ্টয়ের পর থেকে বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত রুশ-সাহিত্যের মান আরও উন্নত না হ'ক অন্তত নেমে যে যায় নি গোর্কি, চেখভ, বুনিন ও আন্দ্রেয়েভ প্রভৃতির আবির্ভাব সে কথায় সাক্ষ্য দেয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে সংঘটিত রুশ বিপ্লব নিঃসন্দেহে মানুষের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। রাষ্ট্রবিপ্লব এর আগেও অনেক হয়েছে পৃথিবীতে, কিন্তু পূর্ববর্তী সমস্ত বিপ্লবের চাইতেই এই বিপ্লব ভিন্ন ধরণের, গুণগতভাবে ভিন্ন। এর পর থেকেই রুশ-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে-চুরে সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম হ'লো। টলষ্টয়ের পর যে চারজন লেখকের কথা আমরা একটু আগে বলেছি তার মধ্যে এক চেখভ ছাড়া আর তিনজনই অক্টোবর বিপ্লবের সময় জীবিত ছিলেন। তা' ছাড়াও আমরা পাই কবি হিসেবে ব্লক, মায়াকোভস্কি এবং পাস্তেরনাককে এবং উপন্যাসিক হিসেবে কুপরিন এবং আলেক্সি টলষ্টয়কে। বিপ্লবের সময় এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলা চলে।

বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ায় যে কবি-সাহিত্যিকগণ জীবিত ছিলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাঁদের তিনটি দলে বিভক্ত করে ফেললো। এক দলকে বিপ্লবের সমর্থকরূপে দেখা গেলো, আর একদল এই রাজনৈতিক গোলমাল এড়াবার জন্যে প্রথমটা দেশত্যাগী হলেন বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার স্বদেশে ফিরে এলেন, তবে রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর তৃতীয় দলটি বিপ্লব-জনিত পরিবর্তনকে কোনো মতেই মেনে নিতে পারলেন না, তাই স্থায়ীভাবে দেশত্যাগ করলেন। বিপ্লবের পরে অন্তত দশটা বছর এঁরাই রুশ-সাহিত্যে সৃজনধর্মী রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু তারপর ক্রমশ-সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্যের আসরে নতুন নতুন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটতে লাগলো। বিপ্লবের সময়ে যাঁরা বেশির ভাগই বালক বা কিশোর ছিলেন। কাজেই এঁরা সর্বতোভাবেই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার মানুষ বলা চলে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্ম হয়েছে জারের শাসনের শেষের দিকে অরাজক বা প্রায়-অরাজক রাশিয়ায়। পুরনো সমাজ-ব্যবস্থায় বলতে গেলে আকর্ষণের কিছুই এঁরা পান নি। সোভিয়েত রাশিয়ার এই শেষোক্ত নব্য সাহিত্য-স্রষ্টাগণের মধ্যমণি হলেন আমাদের বর্তমানের আলোচ্য শোলোখভ।

মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ শোলোখভ (জন্ম ১৯০৫) নিজে একজন খাঁটি কসাক। উনি সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিতও করেছেন প্রধানত কসাকদের জীবনের শব্দচিত্র এঁকে। ডন নদীর তীরে ভেসেনস্কায়া গ্রামে ওঁর জন্ম হয়েছিল; বাবার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছলই ছিল বলা চলে। উনি ব্যবসায়ী ছিলেন।

সাহিত্যিক হিসেবে শোলোখভের জীবনে একটা অত্যাশ্চর্য রূঢ় বাস্তবের প্রকাশ দেখা যায়। স্কুলের প্রাথমিক পড়াশুনোর পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন শোলোখভ। কিন্তু বেশিদিন চললো না পড়াশুনো। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সেনাবাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করে বসলো। রাশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত স্কুল কলেজ গেলো বন্ধ হয়ে। হাজার হাজার ছাত্রের সঙ্গে শোলোখভেরও পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেলো।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন সুরু হলো তখন থেকেই অর্থাৎ মাত্র নয় বছর বয়সের সময় থেকেই শোলোখভ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিপ্লবের সময় দেখা গেলো এগারো-বারো বছরের বালক শোলোখভ বলশেভিক নেতৃবৃন্দের নির্দেশে ছোটো-বড়ো নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মাত্র সতেরো বছর বয়সে শোলোখভকে দেখা যায় একটা জেলার পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

শুধুমাত্র রাজনীতি নিয়ে থাকলেও যে শোলোখভ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একজন হতে পারতেন এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। শোলোখভের মতো সৎ, বিশ্বাসী, নির্ভরযোগ্য এবং পরিশ্রমী কর্মী নিশ্চয়ই কোনো দেশের রাজনৈতিক দলেই কখনো বেশি দেখা যায় নি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে উনি ছিলেন একান্ত বিশ্বাসী। এবং বিপ্লবের পরে রাশিয়াতে রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোতে যে সমস্ত মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল সে সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে শোলোখভ নিজে সশরীরে কাজ করে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণেও সক্ষম হয়েছিলেন।

সমসাময়িক কালের দেশীয় সাহিত্য পড়ে হতাশ বোধ করতেন শোলোখভ, ওঁর মনে হতো বিভিন্ন লেখকেরা যা লিখছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে সম্পর্কে ওঁদের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। বিপ্লবের একজন সক্রিয় শরিক হিসেবে দেশের সাধারণ সম্পর্কে যে বাস্তব জ্ঞান হয়েছে শোলোখভের মনে হলো, তা' চেষ্টা করলে সাহিত্য হিসেবে রূপায়িত করা যেতে পারে। তাই দেখা যায় আঠার বছর বয়সের সময় কলম ধরলেন উনি। এই সময়ের লেখা কয়েকটি গল্প ওঁর বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হলো। পরে এগুলি একত্র করে একটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করা হ'লো—টেলস অব দি ডন। এই প্রথম বই প্রকাশের সময় শোলোখভের বয়স ঠিক কুড়ি বছর। এটা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময়েই শোলোখভ তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস রচনা সুরু করলেন এবং তিন বছরের পরিশ্রমের ফলে প্রকাশিত হ'লো "এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন"-এর প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো পরের বছর। এই সুবৃহৎ উপন্যাসের শেষ দুই খণ্ডের ইংরেজী নাম হলো—"দি ডন ফ্লোজ হোম টু দি সি" যথাক্রমে ১৯৩৩ এবং ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়—ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪১-এ—জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের কিছুদিন পূর্বে। এ ছাড়া শোলোখভের অন্যান্য প্রধান উপন্যাস হলো "ভার্জিন সয়েল আপটার্নড," "দে ফট ফর দেয়ার মাদারল্যাণ্ড" এবং "এ ম্যানস্ লট"। সংখ্যার দিক থেকে বেশি না হলেও এই ক'খানা উপন্যাস রচনা করেই শোলোখভ যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উনি বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরের সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তো বটেই, এ শতাব্দীতে গোটা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে একজন প্রথমশ্রেণীর স্রষ্টাও বটেন। কেন এবং কি বৈশিষ্ট্যের জন্যে শোলোখভ এই উচ্চ আসনের অধিকারী হলেন তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর

Maurice Hindus লিখেছিলেন : "আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে শোলোখভ প্রথম শ্রেণীর ইয়োরোপীয় সাহিত্যিকগণের পাশে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করার কাজটা যে কোনো সমালোচকের পক্ষেই একটা অত্যন্ত প্রীতিকর দায়িত্ব।"

কসাকদের নিয়ে রাশিয়ায় অনেকেই একাধিক কাহিনী রচনা করেছেন। মহান টলস্টয়ও ওদের নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে, শোলোখভ কসাকদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে যেমন অমরত্ব লাভ করেছেন, ঠিক অতোটা সাফল্যলাভ আর কেউই করেননি—এমন কি টলস্টয়ও নন।

এই কসাকরা কারা? কী তাদের বৈশিষ্ট্য? একাধিক কবি-সাহিত্যিকদের রচনা সাধারণ পাঠকের মনে কসাকদের সম্পর্কে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, কসাক বললেই মনে এমন একটা চিত্র ভেসে ওঠে যে এই বুঝি উন্মুক্ত তরোয়াল চালাতে চালাতে অশ্বারোহী দুর্দম সাহসী এবং কিছুটা নিষ্ঠুর পেশাদার যোদ্ধা আমাদের আশেপাশে উপস্থিত হলো। কসাকদের এই যে চিত্রটি এটা একেবারে মিথ্যে নয়, কিন্তু এইটেই সব কথা নয়

'কসাক' কথাটার অর্থ সম্পর্কে সকলে একমত নন। আমরা কথাটার সবচেয়ে বেশি স্বাভাবিক এবং সম্ভবপর অর্থ ধরে নেবো। অনেকের ধারণা যে কসাক কথাটা মূলত একটি তাতার শব্দ। এর অর্থ স্বাধীন। তাতারগণ মধ্য এবং উত্তর পূর্ব এশিয়া অঞ্চল থেকে এক সময়ে গোটা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। ওদের ছড়িয়ে পড়া মানে হলো বিশৃঙ্খলভাবে জয় করা। এটা অন্তত পাঁচশ বছর আগের ব্যাপার। এইভাবে ক্রমশ জয় করতে করতে ওরা ইয়োরোপীয় রাশিয়ার একটা বৃহৎ অংশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। একমাত্র ডন প্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও কেউ সাফল্যের সঙ্গে তাতারদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ এই ডন অঞ্চলবাসীরাই নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাই তাতাররা এদের বলতো স্বাধীন জনসমষ্টি—ওদের ভাষায় কসাকস। এই অঞ্চলবাসীরা একাধিক ঐতিহাসিক কারণে এমন কি আজ পর্যন্ত তাতারদের প্রতিরোধ করবার সময় যে সমস্ত গুণাবলীর সমন্বয় করতে পেরেছিল তাদের চরিত্রে—তার অনেকখানি বজায় রাখতে পেরেছে।

তাতার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বার সময় থেকেই দেখা গেছে রাশিয়ার শাসককুল কসাকদের এক একটি বৃহৎ গোষ্ঠীকে তাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। সে সময়কার রুশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে এদের বসবাস বলে সরকারের তরফ থেকেই কসাকরা বরাবর অস্ত্র রাখতে পারতো এবং বংশানুক্রমে এইভাবে চলবার ফলে ওরা ক্রমশ সুদক্ষও হয়ে উঠলো অস্ত্রের ব্যবহারে।

আর একটা ব্যাপারও হয়েছিল। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পলাতক দাস এবং আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তিদেরও ধরে এনে ডন অঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য করা হতো।

এইভাবে কয়েক পুরুষ কাটবার পরে ডন অঞ্চলে কসাক হ. , সারা দেশে প্রসিদ্ধিলাভ করলো তাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা, কষ্ট করবার শক্তি এবং সাহসিকতা শুধু রাশিয়া নয় গোটা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে রাশিয়ার পক্ষে সীমান্তের অনিশ্চয়তা'র ভাব অনেকটা কেটে গেছে। বহিঃশত্রুর চাইতে গৃহশত্রু এবং অবাধ্য জন-গোষ্ঠীই ক্রমে জার বংশের কাছে একটা স্থায়ী সমস্যারূপে দেখা দিলো। পৃথিবীর কোনো বড়ো দেশের শাসককুলই বোধ হয় কখনো জারদের মতো অযোগ্যতার পরিচয় দেয় নি রাজ্যশাসনের ব্যাপারে। ওদের কাছে শাসন করা উৎপীড়ন করারই নামান্তর হয়ে উঠেছিল স্বল্পকালের মধ্যে। জারগণ এবার কসাকদের অন্যভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। জারের সামরিক এবং অসামরিক পুলিশ বাহিনীতে হাজার হাজার কসাককে ভর্তি করা হতে লাগলো। বেছে বেছে নেতৃস্থানীয় এবং প্রভাবশালী কসাক পরিবারদের জমি-জায়গা দান করতে লাগলো জারগণ। রাষ্ট্রের কাছে থেকে আরো নানা রকম বিশেষ সুবিধা পেতে অল্পকালের মধ্যেই কসাকরা রাশিয়ার প্রায় অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের চক্ষুঃশূল হয়ে উঠতে লাগলো। এবং এই সমস্ত ব্যাপার চলবার সময়ে কসাকদের মধ্যে একটি মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেলো। কৃষিকার্য বলতে গেলে ওরা প্রায় ভুলেই গেলো। পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীতে যারা ঢুকে পড়তো তারা প্রায় বংশানুক্রমেই করতো ঐ কাজ—অনেকটা এক সময়ের ভারতবর্ষের শিখ, ডোগরা, পাঠান এবং গুর্খাদের মতো আর কি। এবং পুলিশ বা সামরিক বাহিনীতে যারা ঢুকতো না বা ঐ সমস্ত বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের পর শিকার এবং মাছ-ধরা ওদের পেশা হয়ে উঠলো। নৃ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কসাক বলতে আজ আমরা যাদের বুঝি গত কয়েক শ' বছরের মধ্যে তাদের জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তা সামাজিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা আশ্চর্য হয়ে যাবার মতো ব্যাপার।

যাই হ'ক, এই যে কসাক সম্প্রদায়, এদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, হিংসা, দ্বেষ ও ভয়ঙ্করতার শব্দরূপ দিয়েই শোলোখভ সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আগেই বলেছি কসাকদের কেন্দ্র করে রাশিয়ায় একাধিক প্রথম সারির লেখক কাহিনী রচনা করে গেছেন—শোলোখভের অনেক আগেই, যেমন গোগোল এবং টলস্টয়। গোগোলের 'টারাস বালবা' এবং টলস্টয়ের 'দি কসাকস' সুখপাঠ্য রচনা সন্দেহ নেই। যোগ্য সমালোচক মাত্রেই এ কথা স্বীকার করে গেছেন যে, বাস্তবনিষ্ঠ কসাক কাহিনী হিসেবে টলস্টয়ের চাইতে গোগোলের উপন্যাস শ্রেষ্ঠতর রচনা। কিন্তু শোলোখভের কসাক কাহিনী প্রকাশিত হবার পরে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, সমস্ত দিক থেকেই গোগোলকেও শোলোখভ ছাড়িয়ে গেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় টলস্টয় এবং গোগোল যেন নেহাৎ বাইরে থেকে একটি পরিবারের কথা লিখেছেন, আর শোলোখভ লিখেছেন ভেতর থেকে, সেই পরিবারের যাবতীয় সুখদুঃখের একজন শরিক হয়ে।

শোলোখভ তাঁর গদ্য মহাকাব্যের সূচনায় কসাকদের প্রিয় একটি কবিতার কয়েক লাইন তুলে দিয়েছেন। বাঙলায় তর্জমা করলে কবিতাটি অনেকটা এই রকম দাঁড়ায় :

লাঙল দিয়ে চাষ করি না আমরা মোদের ভূমি
ঘোড়ার খুরের দারুণ ঘায়ে তৈয়ারী হয় জমি
সেই জমিতে বীজ হলো লাখ কসাকের শির
দেখো, দেখো ডনের শোভা, কি বা শোভা বিধবা নারীর
সারা দেশের শোভা বাড়ায় অনাথ শিশুর দল
ডনের ঢেউয়ের তালে তালে ভাসে বাপ-মায়ের চোখের জল।

'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' শোলোখভ সুরু করেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব থেকে। পুরুষানুক্রমে কসাকরা কেমন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সমষ্টিগতভাবে সে সম্পর্কে এবং মানুষ হিসেবে তারা কে কেমন, প্রেম-ভালবাসা, আচার-অনুষ্ঠান ও নানা সংস্কার তাদের জীবনকে কতখানি জড়িয়ে ফেলেছিল তা' বুঝতে আমাদের বিশেষ সুবিধে হয় যুদ্ধ সুরু হবার পূর্ব থেকেই কাহিনী সুরু হয়েছে বলে। এক দিকে কসাক পুরুষরা যেমন মাছ ধরতে ওস্তাদ তেমনি পটু তারা বন্য হিংস্র পশু শিকারে। প্রেমে তারা দুর্দম এবং হয় তো বেশ কিছুটা নিষ্ঠুরও। নারীরা পুরুষদের এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গেই নিজেদের অভ্যস্ত করে নিয়েছে দেখা যায়; অবশ্য তারা নিজেরাও অনেক সময় নিষ্ঠুরতায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা আগেই দেখেছি দুষ্ট জারশাসকগণ সম্প্রদায় হিসেবে কসাকদের কী ভাবে নানা সুবিধে সুযোগ দিয়ে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু এর ফলে আর একটা ব্যাপারও হয়েছে। খাস কসাকদের মধ্যেও দু'টি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেছে। এক যারা সরকারের তরফ থেকে যথেষ্ট সুবিধে সুযোগ পায়, আর দ্বিতীয়ত যারা যথেষ্ট পায় না, বা হয় তো কিছুই পায় না। কাজেই যুদ্ধ (প্রথম মহাযুদ্ধ) যখন সুরু হলো আমরা দেখতে পাই সম্প্রদায় হিসেবে কসাকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতাপ্রিয়তা কসাকদের একটা সাধারণ গুণ। কাজেই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কসাকদের (অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে যারা যথেষ্ট সুবিধে সুযোগ ভোগ করে এসেছে) মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পেলো কেন্দ্রীয় সরকারের এই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন কসাক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু নিম্ন বা সাধারণ কসাকগণ (অর্থাৎ সরকারী সুযোগ সুবিধে যাদের ভাগ্যে যথেষ্ট জুটতো না) এতে রাজী হচ্ছে না দেখা গেলো। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের তিক্ত এবং কষ্টকর অভিজ্ঞতার ফলেই মনে মনে জানতো সমগ্র ভাবে দেশের মুক্তি ভিন্ন প্রকৃত মুক্তি আসবে না। তাই দেখা যায় একদিকে যুদ্ধের প্রচেষ্টা এবং অন্য দিকে দেশের অভ্যন্তরের কমিউনিষ্ট খণ্ড বিদ্রোহ বা ব্যাপক বিপ্লবের তোড়জোড়—এই দুই বিপরীতমুখী ঘটনা স্রোতের মুখে কসাক সম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে: এক শ্রেণী হয় জারের দাসত্ব কায়েম রাখতে বদ্ধপরিকর আর না হয় স্বাধীন কসাকরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টিত, আর এক শ্রেণী ক্রমাগত তাদের বিরোধিতা করছে; অর্থাৎ তারা জারকে যেমন চায় না, তেমনি চায় না স্বাধীন কসাকরাজ্য; তারা চায় বৃহৎ রাশিয়ার মধ্যে নিজেদের উপযুক্ত স্থান। এই শ্রেণীর কসাকরাই বরাবর বিপ্লবী সংগঠন অর্থাৎ বলশেভিক পার্টির সঙ্গে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা করে এসেছে।

কিন্তু এর ফলে ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে তা গৃহযুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। কসাকভূমিতে এই গৃহযুদ্ধের চিত্রই শোলোখভ এঁকেছেন তার উপন্যাসের দুটি খণ্ডে।

অক্টোবর বিপ্লবের মাস ছয়েক পরের কথা। দেশের অভ্যন্তরে বলতে গেলে অরাজকতা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে কসাকভূমি কার্যত উত্তর আর দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রে পরিবর্তন ঘটে গেছে বটে কিন্তু সরকারী ক্ষমতা যথেষ্ট সুসংহত নয় এবং দেশের সর্বত্রই ক্ষুদ্রবৃহৎ গোলমাল লেগেই রয়েছে। নায়ক গ্রেগর মেলেখভের অন্তরে দেখা দিয়েছে বিরাট দ্বন্দ্ব। বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যায় যে পরিবর্তনের সূচনায় (এমন কি ভালোর দিকে হলেও) মানুষের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবার প্রশ্নে গ্রেগরের মনে দেখা দেয় নানা প্রশ্ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও যোগ দিলো ওদের সঙ্গে। কিছুকালের মধ্যেই দেখা দিলো আর এক সমস্যা। বিপ্লবীরাও দু'দলে বিভক্ত—লাল এবং সাদা। পরিবর্তনশীল ঘটনা প্রবাহের প্রকৃতি বুঝে উঠতে না পারার জন্যেই আমরা দেখতে পাই গ্রেগর ভুল করে বসলো। লালদের ছেড়ে সাদাদের দলে ভিড়ে পড়লো। কিন্তু তারপর ও নিজেও বুঝতে পারলো নিজের ভুলটা। তাই দেখা গেলো সাদাদের দল থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ও এবং আত্মগোপন করে রইলো কিছুকাল। তারপর একসময় কিছুটা নিজের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই আবার আত্মসমর্পণ করলো লালদের কাছে।

ইতিমধ্যে জীবন সম্পর্কে বিচিত্র এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলেছে গ্রেগর। নারী-সংসর্গের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে একটি। কসাক নারীর সমস্ত দোষগুণের সমন্বয় ঘটেছে নায়িকা আকসিনিয়ার চরিত্রে! গ্রেগরের অনেক ভুলের মূল কারণ এই আকসিনিয়া তা ঠিক, কিন্তু তবু গ্রেগরের প্রতি ওর প্রেম যথার্থই মহৎ। গ্রেগরের চরিত্র যে বিশ্বের কথাসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এ বিষয়ে কোনো সমালোচককেই দ্বিমত হতে দেখা যায়নি। নানা বিপরীতমুখী ঘটনাস্রোতে ভেসে ভেসে গ্রেগর একসময় অনুভব করে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সাধারণ সত্য নেই সমস্ত মানুষ যার পক্ষপুটে নিরাপদ আশ্রয়লাভ করতে পারে। ব্যক্তি মাত্রেরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে আর তার সত্যও একান্তভাবে তার নিজস্ব। এই নিজস্ব সত্যোপলব্ধির তাড়নার ফলেই মানুষ সর্বদা কাজ করে চলেছে বলেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আদর্শের সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এক টুকরো রুটি, মাথা গুঁজবার মতো একটু জায়গা, নিজের বিশ্বাস মতো বাঁচবার অধিকার এর জন্যেই মানুষ চিরকাল সংগ্রাম করে এসেছে, এ সংগ্রামের কোনোদিনই বিরতি ঘটবে না যতদিন পর্যন্ত তার জীবন আছে।

সমাজচিত্র হিসেবে কসাক কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে শোলোখভ অধিকতর শিল্পনৈপুণ্য এবং মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিরাট চিত্র আঁকবার এই যে দক্ষতা, সমস্ত সামাজিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক মূল্য তার প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে সাহিত্যরস সৃষ্টির যে নিপুণতা দেখিয়েছেন শোলোখভ, বিশেষ করে সেই জন্যে স্বদেশে এবং বিদেশে শোলোখভকে অনেকেই এমন কি মহান টলষ্টয়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন।

'ভার্জিন সয়েল আপটারনড' উপন্যাসে শোলোখভ প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার সূত্র ধরে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের চিত্র এঁকেছেন। জার-শাসিত রাশিয়ার নিদারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। কুলাকদের কবলে দরিদ্র উৎপীড়িত চাষীদের সম্পর্কে ঠিক এ ভাবে আর কোনো রুশ লেখকই কখনো সাহিত্য রচনা করেন নি। যৌথ খামার প্রবর্তনের জন্যে বিপ্লবীদের যে কী মেহনৎ করতে হয়েছিল, তারও পরিচয় পাওয়া যায় এ রচনায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেলো শোলোখভ রণক্ষেত্রে। দেশরক্ষার সংগ্রামে রত থাকতে থাকতে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে রিপোর্ট শোলোখভ পাঠাতেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার ফলে সামরিক এবং অসামরিক উভয় শ্রেণীর মানুষের মনেই সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে নতুন মমতাবোধের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই শোলোখভ একদিন শুনলেন যে বাড়ীতে তাঁর মা জার্মানদের বোমাবর্ষণের ফলে প্রাণত্যাগ করেছেন।

এর পরে শোলোখভের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে দু'খানা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে, দে ফট ফর দেয়ার কাউন্ট্রি এবং এ ম্যানস লট।

অক্টোবর বিপ্লবের পর অনেকেরই লেখক জীবনের সুরু হয়েছে রাশিয়াতে কিন্তু তাঁদের মধ্যে কম সংখ্যকেই বিপ্লব বা তারপরের সংগঠনমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। অন্তত শোলোখভের মতো কথা ও কাজে পুরোপুরি সংগ্রামী নিশ্চয়ই আর কাউকেই দেখা যায় না। তাই আজকের সোভিয়েত রাশিয়াতে মিখাইল শোলোখভ সর্ববাদী সম্মতভাবেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

মস্কোর কোলাহলের চাইতে স্বগ্রাম ভেসেনস্কায়াতে থাকতেই শোলোখভ বেশি ভালোবাসেন। চারটি সন্তান, নিজে এবং স্ত্রী এই ছয়জনের ছোট্ট সংসার তাঁর। নিজের পরিকল্পনা মতো তৈরী ছোট্ট একটি বাড়িও আছে ওঁর। এ বাড়িতে দু'খানি ঘর আছে ওঁর লেখাপড়ার জন্যে। সাধারণত গভীর রাতেই লিখতে বসেন শোলোখভ! কোনো কোনোদিন রাত ভোর হয়ে যায় লিখতে লিখতে। লেখা সম্পর্কে শোলোখভ অত্যন্ত সতর্ক। যা তিনি জানেন না, তা কখনোই লেখবার চেষ্টা করেন না, আগে জেনে নিয়ে বার বার ভালো করে নানা ভাবে লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই তিনি লেখার কাজে হাত দেন। শোলোখভ বলেন: যে কোনো ত্রুটি, যে কোনো ফাঁকি পাঠকগণ ধরে ফেলেন, কাজেই পাঠক বুঝতে পারবেন না মনে করে তাঁকে যে ফাঁকি দেবার চেষ্টা তা নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর। এবং একবার যদি কোনো লেখকের ছোটো কোনো ব্যাপারে ফাঁকিও ধরা পড়ে যায় তা হলে পাঠক মনে মনে এই কথাই ভাবতে আরম্ভ করেন যে, নিশ্চয়ই বড়ো ব্যাপারেও এ লেখক ফাঁকি দেবেন।

কসাকদের জাতীয় চরিত্রের সমস্ত গুণের সমন্বয় শোলোখভের চরিত্রেও দেখা যায়। ওঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে খাঁটি কসাকের দুঃসাহসিকতার চরম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৩৩ সালে। বিপ্লবের ষোলো বছর পরের ঘটনা। ডন অঞ্চলের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার নামে যথেচ্ছাচার চলছিল সে সময়। কারোই মান মর্যাদা বা জীবনের কিছু মাত্র নিশ্চয়তা ছিল না। এ হেন পরিস্থিতিতে দেখা গেলো দুঃসাহসী শোলোখভ এগিয়ে এলেন। সোজা চিঠি পাঠালেন ষ্টালিনকে। উনি লিখলেন: শস্য সংগ্রহ এবং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার নামে এ অঞ্চলে জনসাধারণের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে, মান-মর্যাদা হানি থেকে আরম্ভ "হারিয়ে" যাওয়া পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলছে। এর প্রতিকার চাই। বলাই বাহুল্য ষ্টালিন প্রতিকার কিছুই করলেন না। তবে শোলোখভ যে "হারিয়ে" যাননি তা তো দেখাই যাচ্ছে। সোজা শোলোখভের জনপ্রিয়তার জন্যে ষ্টালিন তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে সাহসী হন নি।

সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতির চরম শিখরে উঠেও শোলোখভ তাঁর গ্রামের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আগের মতোই মেলামেশা করেন। দল বেঁধে সবার সঙ্গে মাছ ধরতে বেরোন বা শিকারে বেরিয়ে পড়েন, কখনো বা দেখা যায় আর পাঁচজনের সঙ্গে মহা উৎসাহের সঙ্গে শোলোখভ পায়রা ওড়াতে গলদঘর্ম হচ্ছেন।

জীবন-তৃষ্ণা

কান্তা দাশ

আকাশে আর স্মৃতির বন্দরে
স্তরে স্তরে জমা হয় অনেক অভাব, ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও প্রেম,
বেঁচে থাকি কোনমতে, জীবনের মুখে শুনে আশ্বাসের বাণী।

আজ
যুগ-যুগান্তের উষর চেতনার নক্ষত্র স্পন্দনে
মাঠের শেষে, নদীর অপর পারে
আদিম তিলোত্তমার স্মৃতি,
ফাগুনের রক্ত সন্ধ্যার স্বপ্নে সুর খোঁজে
অরণ্যে আদিম হোয়ে, নামনার স্বচ্ছ রূপালয়ে।

জীবনের সব তৃষ্ণারা
এই অনন্ত হিমনীল রাতে
স্বপ্ন সাধের বিরাট লালসায়
শোণিতের প্রতি ঢেউগুলোর সাথে যুঝে যুঝে
হোয়েছে, পাশবিক উল্লাসে প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয় পর্বত।

তাই
জীবনের সব অভাব, ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও প্রেম,
আজ জেগে থাকে
সূর্যের মুখ চেয়ে মনের সেই আদিম মুখোশে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চলন্ত ট্রেনের হাওয়া লেগে মাথাটা কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হবার পর মনে হল একটু বোধ হয় বাড়াবাড়ি করে ফেললাম। কিন্তু তীর বেগে গাড়ি ছুটেছে। সামনে বর্ধমান। ফিরে যাওয়াটা যেন নিজের-হাতে নিজেরই অপমান। অল্প বয়সে প্রচুর সম্পত্তি রেখে বাপ মারা গেছেন। মা এবং ঠাকুরমার অতিরিক্ত আদরে মানুষ। তাই রাগটাও একটু অতিরিক্ত।

এলাহাবাদে গিয়ে বুঝলাম, তখন ঝোঁকের মাথায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, আসলে তা মোটেই নয়। অত বড় সহরে একটা সামান্য বাংলা কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা খুঁজে বের করা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষেও রীতিমত কঠিন। কিন্তু এসে যখন পড়েছি কিছু একটা না করে ফিরি কোন মুখে? একদিন এপাড়া একদিন ওপাড়া ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। কাগজটার নামই কেউ জানে না। এমনি করে কেটে গেল ছ'-সাত দিন। এদিকে শরীরে আর কুলোয় না। পকেটও পাতলা হয়ে আসছে। ফিরে যাব মনে করে ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি একজন চশমাপরা খদ্দরধারী সাইকেলওয়ালা ছোকরা হকারের কাছ থেকে কোলকাতার কাগজগুলো বুঝে নিচ্ছে। চেপে ধরলাম তাকে—আপনিই কি অমুক কাগজের রিপোর্টার, I mean নিজস্ব সংবাদদাতা?

লোকটি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, কেন বলুন তো?

বুঝলাম, মেজাজ দেখালে হবে না, নরম পথ ধরতে হবে। একেবারে তার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বললাম, বিদেশী লোক। বড্ড বিপদে পড়েছি ভাই। আপনিই তাহলে—

—হ্যাঁ, আমিই এখানকার correspondent, বলুন কি করতে হবে।

—ওঃ, বাঁচালেন মশাই। এই খবরটা দেখুন। গোলক সান্যাল আমার বড় ভাই। উনি কি করে মারা গেলেন, মৃতদেহের কি ব্যবস্থা হল, কোনো হদিশই যোগাড় করতে পারছি না। এদিকে আমার বৌদিদি একেবারে অন্নজল ত্যাগ করে বসে আছেন।

—সব খবর তো আমি আপনাকে দিতে পারবো না। রেল পুলিশে খোঁজ করুন। ওরাই bodyর ভার নেয়। ময়না তদন্তও হয়েছিল জানি। নাম ধাম আমি ওদের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। শুধু কাগজ নয়, পুলিশও আছে এর মধ্যে। রিপোর্টার ছেড়ে এবার রেল পুলিশের আফিসে হানা দিলাম। আমার দিকে চেয়েই দারোগাবাবুর চোখ দু'টো কেন জানিনা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একটা গোটা সিগারেট শেষ করে বললেন, আপ্, কৌন্ হ্যায়?

বললাম, আজ্ঞে, সেটা তো আগেই বলেছি। আমি ওঁর ছোট ভাই।

—এক বাড়িতে থাকেন?

—হ্যাঁ; এক বাড়িতে বৈ কি? নিজের ভাই।

—তার পান নি?

—কিসের তার?

—ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সব খবর আমি জানিয়ে দিয়েছি।

—চমকে উঠলাম,—কোথায় জানিয়ে দিয়েছেন!

—কেন আপনাদের কোলকাতার ঠিকানায়।

স্থানকাল পাত্র ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, করেছেন কি?

—অন্যায় কি হল। এতো আমার ডিউটি।

জরাসন্ধ

—ভিউটি না ছাই। আপনি জানেন না সেখানে কী কাণ্ড হচ্ছে! যা এড়াতে চাইলাম—উঃ! এখন কী করি বলুন তো?

পুলিশী সন্দেহ গাঢ়তর হল। হবারই কথা। দারোগা আরো কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার নামটা জানতে পারি?

—কী হবে আপনার নাম জেনে?

—বলুন না, নতুন আলাপ হল।

—নাম শুনবেন! আমিই সেই গোলক সান্যাল, যাকে আপনারা মরা বানিয়ে ক্ষান্ত হননি, মরার খবরটা আবার ঘটা করে আমার বাড়িতে জানিয়ে বসে আছেন।

উঠে পড়েছিলাম। দারোগাবাবু হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান; এত কাণ্ডের পর কি আর আপনাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। উঁহুঃ, এটা তাহলে সাধারণ অ্যাকসিডেন্ট নয়। রীতিমত mysterious! এই, কৌন হ্যায়?

হাঁক শুনে একজন সিপাই ছুটে এল। দারোগাবাবু হুকুম দিলেন, ইসকো লক্ আপ মে লে যাও।

আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, কিছু মনে করবেন না। নমস্তে।

এ কী ফ্যাসাদে পড়লাম! সব রাগ গিয়ে পড়ল নিজের উপর। না হয় ছেপেছিল একটা মৃত্যু সংবাদ। সত্যি সত্যি তো আর মরি নি। শুধু কাগজে কলমে মরা। কী ক্ষতি ছিল তাতে? আর এবার যে সত্যিই মরতে বসেছি। দু'রাত ধরে মশা আর আরশোলার ভাগাভাগি করে যে রক্তটা নিয়েছে, এই হাজত ঘর থেকে জ্যান্ত ফিরে যাব সে ভরসা আর নেই। দু'টো দিন পেটেও কিছু পড়েনি। দারোগাবাবু খাবার পাঠাতে ত্রুটি করেন নি। তাঁর দোষ নেই, দোষ আমারই; সেটা মুখে তুলতে পারিনি। ছেঁড়া কম্বলের উপর অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। একটি পুলিশ এসে বলল, আমাকে এবার জেলে যেতে হবে। যেখানে হোক, যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। বললাম, বেশ, চল। জেলেই চল।

রাস্তা দিয়ে চলেছি। হাতে হাত কড়া, কোমরে মোটা দড়ি। তারই একটা দিক পুলিশের হাতে। মাথার উপর কড়া রোদ। দু'ধার দিয়ে যত লোক যাচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কেউ কেউ দাঁত বার করে হাসছে! কানে আসছে তাদের প্রকাশ্য মন্তব্য—"চোটা হ্যায়," "নেহি; পাক্কা পকেটমার।" "ডাকাতি কিয়া হোগা": "দেখোনা, বুড্ঢা হো গিয়া, তবভি কেৎনা বড়ি ছাতি।"

পাশ দিয়ে একখানা মোটরগাড়ি চলে যাচ্ছিল। পেছনের সীটে যে ভদ্রলোক বসে, মনে হল যেন চেনা মুখ। তিনিও ঝুঁকে পড়ে তাকালেন। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু তাঁর চোখ এড়ানো গেল না। চেনা গলা—"এই, রোখো, রোখো।"

গাড়ি থামিয়ে ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন—বেপার কি সানিয়েল বাবু!

আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু বংশীপ্রসাদ। ইষ্টার্ণ রেলের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি করেন। কথা বলবার মত অবস্থা আমার নয়। ছেলেমানুষের মত শুধু চোখ দু'টো জলে ভরে উঠল।

জেলে আর যেতে হল না। বংশীপ্রসাদের অনুরোধে পুলিশের সিপাই রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করতে লাগল। তিনি মোটর নিয়ে ছুটলেন থানায়, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দারোগাটিকে ধরে নিয়ে এলেন। তারপর সকলে মিলে থানায় ফিরে এলাম এবং একটু সামলে নিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা খুলে বললাম।

বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সিটা গলির মধ্যে মোড় নিতেই কীর্তনের সুর কানে এল। মনে হল যেন আমার বাড়ি থেকেই, মনটা বিষিয়ে উঠল। তারপর ভাবলাম, ভুল শুনেছি; অন্য কোনো বাড়ি হবে।

সে ভুল ভাঙল গেটের সামনে এসে। এ কি! এত লোকজন কিসের! দু'ধারে কলাগাছ; আগাগোড়া সমস্ত গেটটা সাদা ফুল আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো। ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম, একেবারে রাজসূয় কাণ্ড! সামনের মাঠটার প্রায় সবখানি জুড়ে চাঁদোয়া। তার তলায় কীর্তনের আসর। ওদিকে আর একটা শেডের নিচে মেহগিনির খাট, তার উপরে দামী বিছানা, পাশে একরাশ আসবাবপত্র, চৌকি, আসন, বাসনের স্তূপ, ছাতা, জুতো, কার্পেট আরো কত কি! হঠাৎ চোখে পড়ল তারই মধ্যে বসে আমার বড় শ্রীমান। মাথা কামানো, গলায় উত্তরীয়। পাশে আমাদের কুল-পুরোহিত বিধু ভটচাজ।

কীর্তন আগেই থেমে গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল যেন পাথর হয়ে গেছে। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ভটচাজ মশাই তার হাতে এক কুশী জল ধরিয়ে দিয়ে বলছেন, ভয় নেই; নিশ্চয়ই কোনখানে কোন গুরুতর ত্রুটি হয়েছে। তোমার স্বর্গত পিতার আত্মা কুপিত হয়েছেন। এই জল নাও, বল···

পুরোহিত কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। আমি সেই সুযোগে অন্দরে ঢুকলাম। সেখানকার অবস্থা আরো গুরুতর। ভাঁড়ারের মেঝের উপর গৃহিণী পড়ে আছেন। পুরোপুরি বিধবার বেশ পাড়ার কয়েকজন মেয়ে তাঁর মাথায় জল ঢালছে।

এমন সময় কে এসে খবর দিল পুলিশের কোন সাহেব এসেছেন দেখা করতে। বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।

—কি চাই বলুন?

—আপনিই মিষ্টার সান্যাল?

—তাই তো জানতাম। কিন্তু চারদিকে যা দেখছি—

—আপনার সম্বন্ধে যে ভুল খবর ছাপা হয়েছিল, তার জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কাগজে কাগজে Contradiction পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি।

—তা তো করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

পুলিশসাহেব একখানা নাম ছাপানো কার্ড বের করে বললেন, এটা আপনার কার্ড?

—হ্যাঁ। আপনারা ওটা কোথায় পেলেন?

—বাইশ তারিখে ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস থেকে একজন লোক এলাহাবাদে নামতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। তার মণিব্যাগে এই কার্ডখানা ছিল। আপনি কি কাউকে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ; আরও আপ্‌এ কোন্‌ একটা ষ্টেশনে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমার গাড়িতে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। ঠিকানা চাইতে আমি তাঁকে আমার একটা কার্ড দিয়েছিলাম, মনে পড়ছে। আহা! লোকটা মারা গেছে!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—তারপর কার্ড দেখেই বুঝি আপনারা আমার মরার খবরটা চারদিকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন?

পুলিশসাহেব মাথা নীচু করে রইলেন, জবাব দিলেন না। বললাম, ভুলটা ধরা পড়ল কি করে?

—ময়না তদন্তে। রিপোর্ট পড়ে মনে হল, চেহারার যে বর্ণনা রয়েছে, wheat-eating belt-এর বাইরে, মানে, মাপ করবেন, বিশেষ করে ভেতো বাঙালীর ওরকমটা অসম্ভব। Further enquiry চালাতে বললাম। তাতে আপনিই অনেকটা সাহায্য করেছেন। ঐ সময় G. R. P.-তে গিয়ে না পড়লে—

—এখনো পৈতৃক প্রাণটা ফিরে পেতাম কি না বলা যায় না। ত্রুটি আমারই। আর ক'টা দিন আগে যদি যেতাম, নিজের শ্রাদ্ধটা আর নিজের চোখে দেখতে হত না, অনেকগুলো টাকার শ্রাদ্ধও এড়ানো যেত।

॥ রাশিয়ার শিশু ॥

বিভিন্ন জাতের জীবজন্তু, নানা জাতের পশু-পক্ষী সেরিওজা জাজারভের বিশেষ প্রিয়। ছবিতে তাঁকে একটি খরগোস হাতে নিয়ে দেখা যাচ্ছে।

মুক্তাবতী সোনার মেয়ে

সুজিতকুমার নাগ

মুক্তাবতী সোনার মেয়ে
মেঘবরণ চুল,
দুই হাতে তার ফুলের মালা
খোঁপায় পরা ফুল।

পরীর দেশে ঘুমের বুড়ী
মুক্তাবতীর কাছে
নালিশ করে পরীরা সব
ঘুমিয়ে শুধু আছে।

ঘুম পরীদের ঘুম কি এতই বড়
তোমরা কি কেউ ঘুম ভাঙাতে পারো,
সবাই শুনে হেসেই হল খুন
ঘুম পরীদের নাইকো কোন গুণ।

অচিন গাঁয়ের রাখাল ছেলে
বাজায় শুধু বাঁশি
জানে না হায় কোন দেশেতে
শুধু ফুলের রাশি।

এই না, ভেবে রাখাল ছেলে
তীরের পানে এসে,
দেখতে পেল মেঘেরা সব
যাচ্ছে শুধু ভেসে।

অচিন গাঁয়ের রাখাল ছেলে
দূরের পথে দেখে
মল বাজিয়ে পা নাচিয়ে
কে চলেছে বেঁকে?

ঘুমের বুড়ীর সঙ্গে আছে
মুক্তাবতী আজ
যাচ্ছে তারা পরীর দেশে
তাই করেছে সাজ।

এমন সময় আকাশ ভরে
বৃষ্টি এলো মেলো,
রাখাল ছেলে তরী নিয়ে
অনেক দূরে গেলো।

বৃষ্টি পড়ে অঝোর ঝরে
মুক্তাবতী চলে,
ফুলের মালা ভাসিয়ে দিল
ঝরণা নদীর জলে।

পদ্ম-পাতায় ছিল যে এক
ঘুম পরীদের বালা,
মুক্তাবতী না জেনে তাই
ভাসিয়ে দিলে মালা।

শ্রীবীর হাম্বীর

শ্রীআর্য পালিত

তোমরা বীর হাম্বীরের নাম শুনিয়াছ ?

আকবর যখন ভারতের সম্রাট তখন মল্লভূমে এক স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহার নাম ছিল বীর হাম্বীর। সামন্তভূম, শিখরভূম, ধলভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি ভূমের রাজাগণ বীর হাম্বীরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আকবরের সেনাপতি মান সিংহ পাঠান বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাঁহার ছেলে জগৎ সিংহকে বাঙ্গলায় পাঠান। *শোনা যায় বিষ্ণুপুর হইতে গড় মান্দারণের পথে পাঠানেরা জগৎ সিংহকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। বীর হাম্বীর পাঠানদের হাত হইতে জগৎ সিংহকে রক্ষা করেন।*

মল্লভূমের আদি রাজার নাম ছিল আদিমল্ল (রঘুনাথ)। শত বৎসর পূর্বেও এই দেশে মল্লাব্দ ধরিয়া বৎসর গণনা হইত। এই অব্দ আদিমল্লের কাল হইতে আরম্ভ বলিয়া ইহার নাম মল্লাব্দ হইয়াছিল। মল্লাব্দ বঙ্গাব্দ হইতে ১০১ বৎসর কম। বীর হাম্বীরের সময় মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে ছিল। বীর হাম্বীর বাহুবলে মল্লভূমের সীমানা বাড়াইয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে মল্লভূম ধনে জনে পূর্ণ হইয়াছিল এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির এই ভূমে খুব উন্নতি হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীর কথা তোমরা শুনিয়াছ। বীর হাম্বীর এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। বীর হাম্বীরের মৃন্ময়ী প্রতিষ্ঠার অনেক গল্প আছে।

প্রবাদ বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরে মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মদনমোহনকে লইয়া মল্লভূমে কত না গল্পই রচিত হইয়াছিল। বীর হাম্বীর পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবন হইতে পুরুষোত্তম যাইতেছিলেন; সঙ্গে তাঁহার চারি ভার গ্রন্থ ছিল। এই সব গ্রন্থ রূপ, সনাতন, শ্রীবীর রঘুনাথ, কৃষ্ণ কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের রচিত। পথে ঐ সব গ্রন্থ চোরে চুরি করিয়া লয়। ঘটনাস্থল মল্লভূম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আচার্য ঠাকুর বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীরের সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সভায় তখন ভ্রমর গীতা পাঠ হইতেছিল। পাঠক এক স্থলের ভুল ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আচার্য ঠাকুর পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি ঐ ভুল ধরিয়া দিলে বীর হাম্বীর তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আচার্য ঠাকুরের গ্রন্থ সব উদ্ধার করিয়া দিলেন। তিনি অবশেষে আচার্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইলেন। বীর হাম্বীর আচার্য ঠাকুরের জন্য নাকি একটি বাড়ী নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বীর হাম্বীর পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে তিনি "মল্লাবনিপতি" "মল্লাবনিনাথ" ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হইয়াছেন। তিনি ব্রজবুলিতে বহু সুন্দর সুন্দর পদ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কবি বন্দনার পদ :

"শ্রীজয়দেব কবীকর রাজ।
বিদ্যাপতি তাহে মস্তকর শাজ।।
ছুটল গাঢ় তাহে শুর তরঙ্গ।
চণ্ডীদাস তাহে পদক পতঙ্গ।।
আর যত সব কবি তৃণ সমতুল।
কহে এ নবরর হাম উড়হি ধূল।।"

যাঁদের কাছে মানুষ ঋণী

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

অনেক দিন আগের কথা।

গান্ধীজী যাচ্ছিলেন উত্তর-প্রদেশের কোনও এক শহর দিয়ে। হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো পথের উপর শুয়ে আছে এক কুষ্ঠ রোগী! তার ক্ষতস্থানে মাছি উড়ে উড়ে বসছে! মাছিগুলোকে তাড়াবার মতো ক্ষমতা' ত' তার নেই। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে! *এ দৃশ্য গান্ধীজী সহ্য করতে পারলেন না!*

তিনি তখনই রোগীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন! তারপর নিজের পরণের কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিলেন রোগীর ক্ষতস্থানে।

তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক করুণ ছবি! তিনি ভাবলেন সারা ভারতে কতো লোকই না এই ব্যাধিতে ভুগছে! তিনি তাই এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করলেন,—নিজের হাতে কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করবেন। তাই তিনি সবরমতী আশ্রমে গড়ে তুললেন এক কুষ্ঠাশ্রম।

শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কুষ্ঠরোগী দেখতে পাওয়া যায়; প্রায় দু'হাজার বছর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক এই রোগে ভুগে আসছে।

যীশুখৃষ্টের জীবনীতে পাওয়া যায় যে, একবার তিনি এক কুষ্ঠ রোগীর পা নিজের হাতে ধুইয়ে দিয়েছিলেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, এ রোগ আজকের নয় প্রায় দু'হাজার বছরের পুরাণো।

কুষ্ঠরোগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেও এ রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে এ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু তেমন কোনও প্রতিষেধকের হদিস না পাওয়ায় রোগীরা প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যেতো। যারা মারা যেতো না তারা ঘৃণিত জীবনযাপন করতো।

প্রায় আশী বছর আগে নরওয়ের এক জীবাণু বিজ্ঞানী অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানালেন যে, কুষ্ঠরোগও ত' এক রকম জীবাণু থেকে হয়। আর এ জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি অন্যের দেহে ছড়িয়ে পড়ে এ ছাড়া তিনি আরো বললেন যে, এ রোগ ছোট ছেলে-মেয়েদের ভেতরেই তাড়াতাড়ি সংক্রামিত হয়। এ জন্য শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কুষ্ঠরোগীর কাছ থেকে দূরে রাখা উচিত।

জীবাণু বিজ্ঞানী হ্যানসেন এ রকম অনেক উপদেশ দিলেন কিন্তু কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবে আবিষ্কারের চেষ্টা চলতে লাগলো।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গেল যে 'হিডনোকারপাস' নামে একরকম গাছের তেল মাখলে কুষ্ঠরোগ সেরে যায়। বিজ্ঞানীরা ঐ গাছের ফল শুকিয়ে তা থেকে তেল বের করলেন। ঐ তেল মাখিয়ে কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা হলো। কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ালো আর এক বিপদ। দেখা গেল ঐ তেল মেখে রোগী সাময়িক সুস্থ হয় বটে, কিন্তু তার দেহের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপার দেখে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা দারুণ

বিবি-কা-মকবারা

—নারায়ণ সাহা

যাত্রারম্ভ

—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
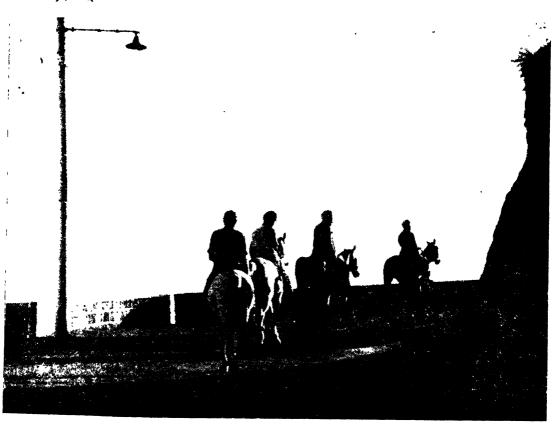
শিশু ভোলানাথ

—সুশীল নাথ

ভীষণ রোদ্দুর।

—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
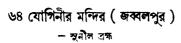
পুলিশ সার্জেন্ট

গণ্ডার
শুভাশীষ রায়

রম্ভা (খুলোমা)
—দিলীপ বসাক

৬৪ যোগিনীর মন্দির (জব্বলপুর)
— সুনীল ব্রহ্ম

দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা পরীক্ষা বন্ধ করলেন না। শেষে স্যার লিওনার্ড রোগার্সের চেষ্টায় ঐ তেল মাখিয়েই রোগীকে সুস্থ করা হলো। তিনি আরো কতকগুলো জিনিষ ঐ তেলের সংগে মিশিয়ে তাই মাখিয়ে রোগীকে সুস্থ ও সবল করে তুললেন। স্যার লিওনার্ড রোগার্স এভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর আনলেন। তাঁর নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।

আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কুষ্ঠরোগীর হাসপাতাল গড়ে উঠেছে ও উঠছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে চিউলোকারপাস গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা অনেক সহজ ও সরল হয়ে উঠেছে। এ রোগে আক্রান্ত হলে তাই আজ আর তত ভয়ের কারণ নেই।

সখের রাজা

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা অনেকেই ডাকটিকিট জমিয়ে থাক। ডাকটিকিটকে বলা হয় সখের রাজা এবং রাজার সখ। তোমাদের মতই বড় বড় রাজা-মহারাজারা ডাকটিকিট জমিয়ে থাকেন। এতে মূল্যবান ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে এঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতেন। আর মূল্যবান সংগ্রহগুলো লক্ষ লক্ষ টাকা দামে বিক্রী করা হত। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের ডাকটিকিট জমানোর সখ ছিল। পুরুষানুক্রমে সেটা ষষ্ঠ জর্জের কাছে আসে। এই সংগ্রহটি এখন বর্তমান ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছে আছে। তিনি সংগ্রহটিকে আরো বাড়িয়ে চলেছেন। এরকম বহু রাজা-রাজরা এবং ধনী ব্যক্তিরা ডাকটিকিট সংগ্রহ করতেন এবং এখনো করেন। তাই বোধ হয় ডাকটিকিট জমানোর সখকে 'রাজার সখ' বলা হয়।

এই টিকিট সংগ্রহ শুরু হল কবে থেকে আর প্রথম টিকিট সংগ্রহকারীই বা কে, তা তোমরা অনেকেই জানো না। সে এক ভারী মজার গল্প। গল্পটা শুনলেই তোমরা প্রশ্নটার উত্তর পেয়ে যাবে।

পৃথিবীর প্রথম ডাকটিকিট বের হয় ১৮৪০ সালে ৬ই মে ইংলণ্ড থেকে। এই টিকিট বের হবার পর ১৮৪১ সালের গোড়ার দিকে 'টাইমস' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এই বলে যে, এক ভদ্রমহিলা পুরনো ডাকটিকিট কিনতে চান এবং তাঁর কাছে পুরনো টিকিটের সংগ্রহ পাঠিয়ে দিলে তিনি যথাসম্ভব দাম দিতে রাজী আছেন।

বিলেতের একটা রেওয়াজ হল রঙীন কাগজ দিয়ে ঘরের দেওয়াল মোড়া। এই ভদ্রমহিলার সখ হল 'ওয়াল পেপার' না দিয়ে এক পেনী দামের কালো টিকিট—দেওয়াল জুড়ে লাগাবেন। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে থেকে টিকিট পেতে লাগলেন। বহু ডাকটিকিটের পার্শেলও তাঁর কাছে আসতে লাগল। একদিন তাঁর নামে পাঠান একটা পার্শেল পোষ্ট অফিসে কোনক্রমে ভেঙ্গে যায়, আর তার ভেতর থেকে হাজার হাজার ব্যবহৃত ডাকটিকিট বেরিয়ে পড়ে। ডাকঘরের লোকেরা তা দেখে থ বনে গেল। তারা ভাবলে, হয়ত এগুলো জাল করে আবার ব্যবহারের চেষ্টা করা হবে; ফলে সরকারের প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ডাকঘর থেকে পুলিশকে সমস্ত ব্যাপারটা জানান হল। পুলিশ এই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে ফেলেন আর কি! পুলিশ খোঁজখবর করে জানতে পারে যে, এই মহিলার এরকম কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। তারা তাঁকে এক নতুন ধরণের পাগল বলে সনাক্ত করল।

এই ভদ্রমহিলা ডাকটিকিট সংগ্রহের যে পাগলামীর সূচনা করলেন সেই পাগলামীই তোমরা অনেকে করে আসছ। তোমরা কি এই ডাকটিকিট জমানোকে পাগলামী বলবে?

॥ রাশিয়ার শিশু ॥

এই বালকটির নাম গেনকা কাজাখের ইসক্রাইট ফার্মেই এই বালকটি ভূমিষ্ঠ হয়।

রক্তের স্বাক্ষর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভক্তি দেবী

ভয়ও যে একটুও করছে না তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী হয়েছে ওর অন্তরের উত্তেজনা। বেশ কিছুক্ষণ পরে নীচের তলার কথাবার্তার আওয়াজও যখন সম্পূর্ণ থেমে গেল তখন নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো সীমা। টর্চ জেলে নিজের টেবিলের 'পরে রাখা ঘড়িটায় সময় দেখলো—রাত বারোটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকী। বুকের স্পন্দন

ক্রমস্তর হয়েছে। তবুও টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলমারিটার চারিপাশ লক্ষ্য করলো সীমা। না, আর ভুল নেই। ওটা নিঃসন্দেহে একটা দরজার কপাট। আস্তে আস্তে ওটা বাঁদিকে টানলো সীমা। স্লাইডিং-পাল্লার আলমারির মত সরে গেল আলমারিটা।

সামনেটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। টর্চের আলো আস্তে আস্তে ফেলে চারিপাশটা বোঝবার চেষ্টা করলো সীমা। ছোট খুপরী মত একটা ঘর। আর তার মধ্যে দিয়ে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। নীচে দিকে নেমে গেছে। শুধু নীচে দিকেই নয়—উপরের দিকেও উঠে গেছে। কিন্তু উপরে তো কোন ঘর নেই। এমন কী ছাদটাও সাধারণের যাবার মত নয়। টিনের বা খোলার ঘরের মত দো-চালার ছাদ। তাতে যাবার এমন গোপন সিঁড়ি কেন?

অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি ধরে পা বাড়ালো সীমা। প্রথমে নীচের দিকে। কিন্তু পা ঘসে ঘসে একতলায় পৌঁছে বাইরে যাবার ছোট একটা দরজা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সীমা। তাও দরজাটা এতই ছোট যে আউট-হাউসের লাগোয়া এই ছোট দরজাটা দেখলে যে কোন লোকই ভেবে নেবে যে, এ ঘরটা নিশ্চয় হাঁস মুরগী রাখবার জন্ত তৈরী হয়েছে। দরজাটা কিন্তু খুলতে পারলো না সীমা। ওটা বাইরে থেকে তালাচাবি দেওয়া রয়েছে বলে মনে হল।

এবার আস্তে আস্তে ওপরে উঠলো সীমা। লোহার সিঁড়িটা খুব ছোট হলেও কার্পেট দিয়ে মোড়া। বোধ করি চলাফেরায় যাতে কোন আওয়াজ না হয় সেইজন্ত। দোতলায় নিজের ঘর ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠলো সীমা। উপরে এসে বুঝলো তার ঘরে এবং ছাদের মাঝে ছোট একটা চোরা কামরা আছে এখানে। পুরা একটা ঘরও নয়—এটা একটা তাঁবুর মত খুপরী ঘর। এ ঘরে মাথা নীচু না করলে তো ঢোকা যায়ই না। এমন কী ঢুকেও সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই।

কিন্তু ঘরটার কাছাকাছি আসতেই কানে এলো কে যেন মর্মান্তিক কষ্টে অস্পষ্টভাবে আওয়াজ করছে।

টর্চের আলো পড়তেই সে লোকটা বললে—কে? কে তুমি? আমায় একটু জল দেবে?

সীমার পা' দু'টো এবার থরথর করে কেঁপে উঠলো। ঘরের ভিতর যে কোন লোক এভাবে এ সময় উপস্থিত আছে এ কথাটা তার মনে আসেনি।

লোকটা কিন্তু অসুস্থ। কে ও? এখানে এলো কী করে? ও কী বন্দী? নীচের দরজায় চাবি দিয়ে ওকে কেউ এখানে কী রেখে গেছে?

মানুষটা আবার বলে—আমাকে একটু জল দাও। ওঃ আমি আর পারছি না।

সীমা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে জল নিয়ে আসে। কিন্তু গ্লাস নিয়ে কাছে গিয়ে জল দিতে ওর ভয় করে। টর্চটা শক্ত করে ধরে একটু দূরে দাঁড়ায়, বলে—নিন, আমি জল এনেছি। মনে ভাবে লোকটা যদি উঠে পড়ে বা আক্রমণ করবার চেষ্টা করে তবে চট করে টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালাবে সে।

লোকটা কিন্তু এক ইঞ্চিও ওঠে না। ব্যগ্রস্বরে বলে—দাও দাও, জল দাও। আঃ—

মানুষটার ব্যাকুল তৃষ্ণা দেখে নিজের বিপদের আশঙ্কা ভুলে জল দেয় সীমা। আর এক মুহূর্ত পরেই টর্চের আলোয় চিনতে পারে ওই মানুষটাকে। ওর হাত কেঁপে অনেকখানি জল চলকে পড়ে। বোকার মত অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, আলিসাহেব আপনি!

মানুষটিও এবার সীমাকে চিনতে পারেন। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বলেন—ওঃ সীমা তুমি? শেষ পর্যন্ত তুমিই আমায় জল দিলে?

সীমা তাড়াতাড়ি বলে—কেন আমি কী কিছু অন্যায় করলাম আপনাকে জল দিয়ে?

জনাব হুসেন আলি বলেন—না। তা কেন? কিন্তু আমি যে তোমার পরম শত্রু সীমা। আমি যে তোমার শত্রুর চর।

সীমা অবাক হয়ে যায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে—এ আপনি কী বলছেন? আমার বোধ হয় আপনি অসুস্থ।

বেশ একটু সময় চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে থাকেন জনাব আলি।

তারপর বড় কষ্টে একটু পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করেন। সীমা তাঁকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু ভয়ে সংকোচে সে সহজ হতে পারে না। উল্টে বরং ভয়ে তার হাতে ধরা টর্চটা বারবার নিভে যায়। ও আবার সেটাকে জ্বালিয়ে রাখবার জন্ত চেষ্টা করে।

কিছুটা পাশফেরার মত শুয়ে আলি সাহেব বললেন—তুমি কী যেন বলছিলে? আমি অসুস্থ। তাই না? আমি অসুস্থ নয় আমি মুমূর্ষু। আমার প্রচণ্ড জ্বর এসে গেছে।—এটা সেপটিক ফিভার। আর বোধ হয় খুব বেশীক্ষণ সময় আমি বাঁচবো না। আর—আর অন্ধকার বলে বোধ হয় এখনও তুমি বুঝতে পারো নি আমার বাঁ-কাঁধের গুলীটা এখনও বের করা হয় নি।

সীমা চমকে ওঠে।

আলি সাহেব একটু হাসেন। বলেন—ভয় পেলে তো? পিনাকী যে কাল গুলী করেছিল।···উঃ যন্ত্রণায় আমি···উঃ

দারুণ উত্তেজনায় আর ভয়ে সীমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে বোকার মত বলে—কিন্তু আপনি—

আলি সাহেবও অনেকক্ষণ কথা বলেন না। তারপর বলেন—কিন্তু আমাকে পিনাকী খুন করেনি সীমা। আমাকে খুন করেছে মহেন্দ্র সিং।

—এ সব কী বলছেন আপনি? আপনার কথার সত্যি-মিথ্যে আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—হঃ·· হাঁ হাঁ বোঝা খুব শক্ত। হয়তো—হয়তো বিশ্বাস করাই প্রথমে কঠিন হবে—আমার কথাগুলো। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো—এ সময়ে এই মরণকালে আমি মিথ্যা বলছি না।··· আজ আমি যা বলবো তার সমস্ত কিছু বর্ণে বর্ণে সত্যি।—জীবনে আমি অনেক—অনেক অন্যায় করেছি। এখানেও এসেছিলাম তাই-ই করতে। পিনাকীর প্রাণের বদলে আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কড়ারে আমাকে এখানে এনেছিল ওই মহেন্দ্র সিং।

—এ সমস্ত কী বলছেন? আপনার কথা আমি—কিন্তু সে

যাই হোক, আমার উচিত এখনই একজন ভালো ডাক্তার আনা। আপনার চিকিৎসার—

—ডাক্তার? আর ডাক্তার কী করবে সীমা? ডাক্তার এনে কাজ হোত কাল রাত্রে। গুলিটা খেয়ে আমি যখন কাল এই ঘরে এসে আশ্রয় নিই—মহেন্দ্র সিং আমাকে বলে গিয়েছিল আধঘণ্টার মধ্যেই সে ডাক্তার আনবে।···

—ই এখন—এখন ক'টা রাত হবে? রাত দু'টো? চব্বিশ ঘণ্টারও অনেক বেশী সময় হয়ে গেছে সীমা। আর ডাক্তারের কিছু করবার নেই।—কিন্তু তুমি আমার কথা শোনো জীবনে আমি অনেক অন্যায় কাজ করেছি। আজ শেষ সময়ে একটা ভালো কাজ আমি করবো। উঃ! সীমা আমাকে আর একটু জল দাও। আঃ—বড় ভালো মেয়ে তুমি। মহেন্দ্র সিং বলেছিল প্রথমে—তোমার প্রাণের জন্ত আমায় পঁচিশ হাজার টাকা দেবে। কিন্তু এখন বলছে সে তোমাকে আর মারতে চায় না।

সীমার মনে হয়—আলি এবার বোধ হয় প্রলাপ বকছে। প্রচণ্ড জ্বরের তাড়নায় ওঁর মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে এবার।

আলি সাহেব কিন্তু ওর মনোভাব বোঝেন। বলেন—বিশ্বাস করছো না তো। ভাবছো, তোমায় মারবে কেন? সেই কথাটাই তো বলবো। বহুদিন হতে সন্ধান রাখতো ও তোমার। অনেক কারসাজি করে ও ফাঁদ পেতেছে তোমায় ধরবে বলে।

—অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব কথা। সীমা না বলে পারে না। এ আমি কি করে বিশ্বাস করবো।

—বিশ্বাস যে করতেই হবে সীমা। আমি সমস্ত প্রমাণ দেবো। কিন্তু আর বেশী সময় নেই। যাও, কমলাক্ষ আর পিনাকীকে ডেকে আনো। না, না, আমি এখনও একটুও ভুল বকিনি। একটুও বিভ্রান্ত হইনি। আমার কাছে তোমার সত্যকার পরিচয় পাবে। জানবে কত বড় বংশের রক্ত আছে তোমার শরীরে। জানতে পারবে আজও কত কিছু পেতে পারো—

—কিন্তু এত রাত্রে ও-বাড়ীতে গিয়ে ওঁদের আমি ডাকবো কি করে? সারা হোটেল জেগে উঠবে যে। তার চেয়ে বরং মিস্ ডরোথিকে বলি, মিঃ মহেন্দ্র সিংকে না হয়—

—সাবধান! আহত নেকড়েকে খুঁচিও না। আমি তোমাকে সব বলেছি জানতে পারলেই ও আগে তোমাকে খুন করবে।

—তবে? তবে আমি কি করবো?

—মিস্ ডরোথিকে পাঠাও। খুব সাবধানে কমলাক্ষ আর পিনাকীকে ডেকে আনুক। কিন্তু তুমি যেও না সীমা। তুমি চলে গেলে একা থাকতে থাকতে আমি যদি অজ্ঞান হয়ে যাই? কাল থেকে রক্ত পড়ে পড়ে শরীরটা বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে। আর যেন পারছি না। কিন্তু আমি বলবো, সব কিছু জানিয়ে দেবো তোমাদের কাছে।

সীমা তাড়াতাড়ি বলে—আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এখনই যাচ্ছি, মিস ডরোথিকে পাঠিয়ে আবার এখনই আসবো।

মিস ডরোথির ডাকে কমলাক্ষ আর পিনাকী যখন এসে পৌঁছলো ততক্ষণে আলি সাহেব বেশ খানিকটা কাহিল আর অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে। তবু পিনাকীর হাতে হাত রেখে ক্ষমা চাইলেন তিনি। বললেন—পিনাকীবাবু, আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন বিবাদ নেই। তবুও যে বারবার আমি পশুর মত আপনাকে আক্রমণ করেছি, সে জন্ম আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

মৃতপ্রায় লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে পিনাকীর দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো। সে বললে—এ কথা কেন বলছেন আপনি? সে যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? আপনি এ কাজ কেন করলেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলি সাহেব বললেন—মামুদপুরের জমিদারীটা মিথ্যা কথা। এই আমার কাজ—টাকা খেয়ে লোককে অন্যায় কাজে সাহায্য করাই আমার পেশা। মহেন্দ্র আমাকে এখানে এনেছে। পিনাকীবাবুর জীবনের বদলে সে আমায় টাকা দেবে।

—অসম্ভব। মহেন্দ্র সিংয়ের সাথে আমার কোন রকম ঝগড়া নেই।

—না না তুই উত্তেজিত হোস নি পিনাকী। আলি সাহেবকে একটু গুছিয়ে বলতে দে। কমলাক্ষ পিনাকীকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

আলি সাহেব বলেন—আমি জানি আমার কথা তোমাদের কাছে প্রথমে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। তবু শোনো, শুনে নাও পরে তদন্ত করো। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমার ঘরে, মানে নয় নম্বর কামরায় টেবিলের বাঁ দিকের দেরাজে মহেন্দ্র সিংয়ের চিঠি আছে। তাতে সমস্ত লেখা আছে। আমি প্রথমে রাজী হইনি পিনাকীর সঙ্গে শত্রুতা করতে। ও মস্ত বড় কাজ করে—আমার ভয় ছিল। কিন্তু শেষ অবধি টাকার লোভে—উঃ আমাকে একটু উঁচু করে বসিয়ে দাও। হাঁ—এই যে থাক থাক আর নয়। শোন এবার বলি—এই সিমলার রাজা সাহেব—রাজা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী তোমাদের, সীমার আর পিনাকীর ঠাকুর্দা। তিনি—

পিনাকী আবার চীৎকার করে ওঠে—কী বলছেন? সীমা আমার—

—হ্যাঁ। সীমা তোমার বোন। আপন বোন। তোমার বাবা কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ তাঁর বাবার একমাত্র মা-মরা সন্তান। বাপের অমতে একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে করে তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর মনান্তর হয়। রাজা সাহেব তাঁর পুত্রবধূকে ঘরে নিতে রাজী হন নি। কুমার তাই বাড়ী ছেড়ে চলে যান। নিজের রোজগারে সংসার পাতেন। কিন্তু···কিন্তু সীমার জন্মের অল্প কিছুদিন পরেই রাণীসাহেবা—মানে তোমাদের মায়ের শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত টাকার অভাবে যখন স্ত্রীর উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারছিলেন না তখন অভিমান ছেড়ে নিজের বাবার কাছে কুমার চিঠি লেখেন।

কিন্তু ঐ মহেন্দ্র সিং—তাঁর ষ্টেটের ম্যানেজার সে চিঠি চেপে রেখেছে—রাজা সাহেবের হাতে পৌঁছুতে দেয় নি।—

—হ্যাঁ ও আমায় নিজে বলেছে। দু'জনের বিবাদ মিটে যায় ও তা চাইতো না। ওঃ! সীমা তুমি আমাকে আর একটু জল দেবে?

—ও কী কমলাক্ষবাবু আপনি কোথা যাচ্ছেন? পিনাকী

আপনাকে ডাক্তার আনতে বলছে? না না আর ডাক্তার নয়, শুনুন বৌরাণী মারা যাবার পর খবর পেয়ে রাজা সাহেব বহু চেষ্টা করেছিলেন—তোমাদের কাছে পাবার। কুমারকে ফিরিয়ে আনবার। কিন্তু তিনি ততদিনে সম্পূর্ণ মহেন্দ্রের হাতের পুতুল। কিছুতেই কোন সঠিক খবর তাঁর কাছে পৌঁছে দেয় নি মহেন্দ্র সিং।

তারপর···তারপর হঠাৎ যখন পিনাকী একজন জমিদারের কাছে নিরাপদ এক আশ্রয় পেয়ে গেল আর সীমাও দৈবচক্রে মিশনারী বোর্ডিংয়ের মধ্যে ঢুকে গেল তখন অনেক মাথা খাটিয়ে এই হোটেল খুলেছে ও' যাতে একদিন তোমরা ওর ফাঁদে পা দাও।—

আলি সাহেবের মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়ে শেষের কথাগুলোও অস্পষ্ট শোনায়।

তবুও নিতান্ত হৃৎপিণ্ডহীনের মত ওঁর মুখের কাছে নীচু হয়ে পিনাকী জিজ্ঞাসা করে—রাজা সাহেব কোথায়? আর আমার বাবা? তিনিও কী নেই?

অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে মাথাটা একটু নাড়েন আলি সাহেব—বলেন—তিনি মারা গেছেন আত্মীয়। অনেকদিন আগে। নিজের স্ত্রীকে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে না পাবার মনঃকষ্টে দীন-দরিদ্র সন্ন্যাসীর মত পথে পথে ঘুরে ছিলেন শেষের ক'টা দিন। তবু বাপের কাছে ফেরেন নি আর।···রাজা সাহেব ছিলেন, এখন আর নেই। বছর দেড়েক আগে মারা গেছেন। কিন্তু সে-খবর কাউকে জানতে দেয়নি মহেন্দ্র সিং। নার্স, ডাক্তার, চাকর—টাকা দিয়েছে সবাইকে। রাজার উইল কিন্তু আছে রেজিষ্ট্রি অফিসে। মৃত্যু-সংবাদ ছড়ালেই নিশ্চয় ব্যবস্থা হোত। সমস্ত পিনাকী আর সীমার। আমার টেবিলের দেরাজের চিঠিগুলো—

অত্যধিক শ্বাসকষ্টে বক্তব্যটুকু আর শেষ করতে পারেন না আলি সাহেব!

এবার সীমা বলে ওঠে—তবে সেই ফটোটা সত্যিই কী ওঁর? আর সেই রক্ত? কী করে—

—আমার হাতে সেদিন পিনাকীর কুকুর কামড়েছিল। তাই খানিকটা রক্ত বার করে বেঁধে নিচ্ছিলাম এই ঘরে।···কাঠের ফাঁক দিয়ে নজর পড়লো পিনাকীর ছবিটা—তুমি একদৃষ্টে দেখছো। অসাবধানে হাতের রক্তটা নীচে পড়লো। আর ছবিটা মহেন্দ্র সরিয়েছে। কুমারের নিজে হাতে পাঠানো ছবি ওটা। রাজা সাহেবকে তাঁর নাতির ছবি পাঠিয়েছিলেন কুমার।···মহেন্দ্র দিয়েছিল আমায় পিনাকীকে চিনবার জন্যে। পিনাকীকে ও মারতে চায় তোমাকে আর মারবে না। তোমাকে···তোমাকে ও সাদী করবে। পিনাকী না থাকলে তোমার ছেলেপিলেরাই তো মালিক হবে কিনা। যদি কোনদিন সব কথা কেউ ফাঁসও করে তবে তাতে আর বিপদ হবে না ওর। কিন্তু উঃ, কিন্তু সাবধান—উঃ—

—ডাক্তার ডাক্তার···মিস ডরোথি যেখান থেকে হোক একজন ডাক্তার ডেকে আনো।—সীমা ভয়ে চীৎকার করে ওঠে।

—আমি ডাক্তার আনতেই গিয়েছিলাম মিস্ রায়। উনি এসেছেন।

কিন্তু আলি সাহেবের কথাই বর্ণে বর্ণে সত্যি। ডাক্তারের আর কিছুই করবার ছিল না।

কিছু সময়ের মধ্যে ভোরের দিকে আলি সাহেব মানুষের তদারকীর বাইরে চলে গেলেন। এই শত্রুরূপী মিত্রটির বিচ্ছেদে সকলেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলো।

ওখনকার মত ডাক্তার চলে গেলে কমলাক্ষ জিজ্ঞাসা করলো—মিস ডরোথি, আপনি যে এখান পর্যন্ত ডাক্তারকে নিয়ে এলেন হোটেলের অন্য সকলে জানতে পারবেন না? মহেন্দ্র সিং—

—তিনি কাল রাত থেকে হোটেলে নেই। হোটেলের অন্য সকলে এতক্ষণে খবর পেয়েছেন। আজকের বেড-টির সাথ এই মিষ্টি খবরটা আমিই সকলকে পরিবেশন করেছি।—মিস্ ডরোথির কণ্ঠে অকৃত্রিম খুশীর সুর।

মহেন্দ্র সিং গতকাল সন্ধ্যা থেকে তাঁর মনিবের কাছে নিত্যকার কাজের হিসাব দিতে গিয়েছেন অথবা আলি সাহেবকে তালা দিয়ে রেখে শান্তিপূর্ণভাবে মরবার সুযোগ করে দিয়ে তাঁর দেহটা পাচার করবার ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন।

তবে তিনি ফিরে এলে যাতে তাঁর সম্মান অভ্যর্থনার ত্রুটি না থাকে তার-ই ব্যবস্থা করতে পিনাকী কমলাক্ষকে পাঠিয়েছিল।

তা'ছাড়া আলি সাহেবের সংকারের আয়োজন এবং তার প্রয়োজনীয় সরকারী হুকুমনামার ব্যবস্থা তো আছেই।

যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে এসে কমলাক্ষ দেখলো সীমার ঘরটায় টেবিলের কাছে তার চা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা দু'জন—পিনাকী আর সীমা। হোটেলের অনেকেই শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

এঞ্জেলা তো খুশীতে উচ্ছ্বসিত। আর হেমপ্রভা দেবী? তিনিও খুব খুশী। সীমার হাতে তৈরী পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেয়ে প্রত্যেককে ডেকে বলছেন—আমি বরাবর বলছি পিনাকী আমার যে সে ঘরের ছেলে নয়। সম্রান্ত ঘরের ছেলে না হলে কারো এমন আচার ব্যবহার হয়?

কমলাক্ষ ফিরতেই তাকে বললেন—দেখলে বাবা কমলাক্ষ, এই বুড়োমানুষটার কথা শেষ অবধি ফললো কী না? ঐ যে মেয়েটা ওটা যে মিশনারীদের মেয়ে নয়—সে কথা আমি বলি নি তোমায়?

সকলে চলে গেলে কমলাক্ষ এলো ওদের কাছে। বললে—দু'টিতে পাশাপাশি বসেও কথা কইছো না যে নিজেদের মধ্যে? তোমাদের দু'জনকার নতুন পরিচয়ে আবার আলাপ করিয়ে দিতে হবে না কী নতুন করে?

ওরা শুধু হাসে। চকচক করে ওঠে চোখগুলো।*

---

* বিদেশী ছায়ায়।

সমাপ্ত

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন]

জার্মানীতে গীতার সমাদর

জনগণের কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে পৌরাণিক দেবতাদের প্রতি বিশ্বাস স্পষ্ট হইয়া যায়। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইতেছে "মহাভারত"—"ভারতবর্ষের অনুসরণকারীদের যুদ্ধের কাহিনী কবিতাকারে লিখিত"। এই পুস্তকে মোটামুটি দুই সহস্র পংক্তি আছে, এগুলি প্রাচীন ভারতের উপর আলোকসম্পাত করে। পৌরাণিক কবি বিশ্ব ইহার রচয়িতা। আধুনিক যুগেও সকলেই ধর্মগ্রন্থ হিসাবে শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করে।

এমন কি, জাগ্রত জার্মান অধিবাসীগণও 'মহাভারতের' রচয়িতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কয়েকজন বড় গুণী ব্যক্তি মহাভারতের অর্থানুবাদ করেন। তাহাদের মধ্যে বিখ্যাত মি: হারমেন ওলডেনবার্গের লিখিত "মহাভারত, তাহার উৎপত্তি, সারমর্ম ও রচনাপদ্ধতি" ১৯২২ সালে গোটিংগেন-এ প্রকাশিত হয়। ইহাতে সংক্ষিপ্তভাবে সকল জিনিসেরই উল্লেখ আছে। ইহার পূর্বে এই বিষয়ে মি: হারমেন জাকোভি মহাভারত, তাহার উদ্দেশ্য সাদৃশ্যভাবে অনুবাদ করিয়াছেন—যাহাতে প্রাচীন ভারতীয় জীবনের অনেক তথ্য জানা যায়।

জর্মান গুণীদের মধ্যে মহাভারতের অনুবাদকারীগণের মধ্যে বিশেষভাবে 'আডলফ হোলটস্‌মানের' উল্লেখ করা যায়। তাঁহার অনুবাদিত "ভারতীয় কথাবলী" পুস্তক সংকলিত হয় (কার্লসরুহে ১৮৪৫-৪৭)—যাহার মাধ্যমে সর্বপ্রথম জার্মান-সাহিত্যে দূরদেশের সম্বন্ধে, ভারতীয় চিন্তাধারার সম্বন্ধে ধারণা দেয়। এই পুস্তক অতি উচ্চাঙ্গের ছিল, যাহা আজও ১৯২০ সাল হইতে সংকলিত হয়। তাঁহার লেখনী হইতে ১৮২৩-২৪ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থাবলী যার নাম "মহাভারতের প্রয়োজনীয় বর্ণনাবলী।" এই ঘটনাবলী ভারতের বীরপুরুষদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ও ইহা ইউরোপীয় পাঠকদের উপর বেশি গভীর ও সুন্দর রেখাপাত করে। বিখ্যাত জার্মান গুণীদের মধ্যে একজন—পাউল ডয়সেন—যিনি কেবলমাত্র মহাভারত হইতে দুই নয়, এবং ভারতের দর্শন-শাস্ত্রের সারমর্মের উপর যথোচিত মতামত দেন। ইহা ১৯০৬ সালে লাইপজিগে প্রকাশিত—যার নাম "মহাভারতের দর্শনশাস্ত্রের চার অধ্যায়।"
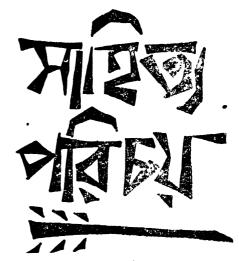
উৎকৃষ্ট ভাবে গীত—মহাভারতে গ্রথিত শ্লোকাবলী ভগবত গীতা ইহার মধ্যে অদ্বিতীয়। ইউরোপে পরিচিত ভারতীয় মেটাফিজিক দর্শন বা চিন্তাধারা যাহার সাহায্যে ভারতীয় ভাষায় অতি প্রকৃষ্ট ও সুন্দর ভাব প্রতিফলিত হয়। মহাভারতের এই অংশ মানুষের আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের, কালের গতিকে যাহা নিকৃষ্ট মনুষ্যত্বের গভীর পার্থক্যে, যাহা মানুষ সহস্র বৎসর পূর্বের লেখকগণের দ্বারা প্রকাশিত হইতে কখনই আশা করিতে পারিত না। বিখ্যাত জার্মান বিশ্ব অনুসন্ধানকারী "ভিলহেলম ফন হুমবোল্ড" মহাভারতের শ্লোকাবলীকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্ভবত বিশ্বসাহিত্যের উৎকৃষ্টতম দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র কবিতাবলী' বলিয়া অভিহিত করেন। অনূদিত গীতার সংখ্যাধিক্যও জার্মানীতে এত প্রচুর যে, জার্মানরা তাহাকে কেবলমাত্র ভারতীয় সাহিত্য বলিয়া গণ্য করে। ইহা একদিকে যেমন জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে, অন্যদিকে তেমনি অতি সাধারণ মুদ্রাকারেও প্রকাশিত হইতে
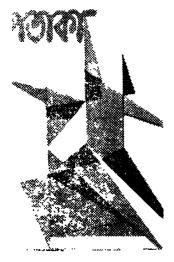
প্রখ্যাত কবি ও কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পতাকা যার দাও" গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। প্রকাশক এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স।

স্বনামধন্য কথাশিল্পী শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী "রাশিয়ার ডায়েরী" গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আলেখ্য। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।

দেখা যায়। ইহা ১৯০৫ সালে লাইপজিগে উ. আ. ফন রিচার্ড গর্বে, ১৯১১ সালে পলডয়সেন, ১৯১২ সালে রিওপোলড, ফন স্রয়ডার দ্বারা অনূদিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৫৫ সালে ডুসেলডর্ফে ৩০শ অধ্যায়টি শেষ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ সালে ষ্টুটগার্টে রুডলফ, ওটোর অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৫ সালে ষ্টুটগার্টে রবার্ট বক্সব্যারগার হেলমুট ফন গ্লাসেনহাফের কার্যাবলী লইয়া এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। শেষোক্ত পুস্তকটি ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ সালে রুডলফ, ওটো যাহা অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা ১৯৩৪ সালে টুইবিংশেনে "ভগবদ্ গীতার" আসল রূপ নামে প্রকাশিত হয় এবং তাহা জার্মান ধর্ম-জগতের গুণীদের নিকট হইতে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে।

প্রবীণ সাহিত্যসেবী রামপদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী "দেউল তীর্থ দ্রাবিড়" গ্রন্থটির প্রচ্ছদ-পট। প্রকাশক—তরঙ্গ প্রকাশন। শিল্পী—কমল চট্টোপাধ্যায়।

মহাভারতের অন্য একটি অংশ—যাহাতে নল এবং দময়ন্তীর ইতিহাস উল্লিখিত আছে। এই ইতিহাস এক রাজার সহধর্মিণী যাহাকে হোমারের পেনেলোপের মত কয়েক বৎসর তাঁহার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। মিঃ জে, সি, এস, কোসেগার্টেন এর প্রথম জার্মান অনুবাদ—যাহা ১৮২০ সালে জেনাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। কোসেগার্টেন জেনাগোথেতে বাস করিতেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, উভয়ে উভয়ের পরিচিত ছিলেন এবং গোথের লিখিত "পূর্ব পাশ্চাত্য দেওয়ানিদিগের সরলভাবে বুঝিবার জন্য সরল পুস্তক" হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় যে কোসেগার্টেন তাহার বন্ধু ছিলেন। ফ্রিডরিক রুফার্ট ফ্রাঙ্কফোর্ট আম মেন এ ১৮২৮ সালে প্রকাশিত পুস্তকে আর একবার ইহার পুনরাবৃত্তি করেন। ১৮৪৭ সালে ষ্টুটগার্টে Ernst Meier এক নূতন অনুবাদ করেন। ভারতীয় বিখ্যাত মহাকবি কালিদাস এই নলদময়ন্তী-কাহিনীর রচয়িতা—এই অধ্যায়ের নাম দেন "নল অধ্যায়," তাহার অর্থ নলরাজার তাবার প্রতিরূপে আবির্ভূতি," তাহার কাছে সকলেই এই বিষয় ঋণী।

জার্মান লেখক A. F. Von Schack যিনি প্রাচ্য দেশের সহিত ভালো ভাবে পরিচিত, তিনি ১৮৫৭ সালে বার্লিনে "গঙ্গার কলধ্বনি" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন, যাহাতে সাবিত্রী এক ভারতীয় সতী-স্ত্রীর কাহিনী উল্লিখিত—যিনি তাহার মৃত স্বামীকে যমরাজের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রথম জার্মান এবং বপ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৯৫ সালে লাইফজিগে H. E. Kellner-এর গদ্যাংশে ইহার প্রকাশ হয়। "ভারতীয় কথাবলী" পুস্তকে আডলফ হলসম্যানও এই ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন। শকুন্তলার ঘটনাবলী প্রথম কালিদাস মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করেন এবং নূতন নাট্যরূপ দেন—তাহা জার্মানীতে শকুন্তলার অপরূপ একনিষ্ঠতা হিসাবে পরিগণিত হয়, যখন জি ফরস্টার ১৭৯১ সালে ইহার অনুবাদ করেন। জার্মানীতে এই নাটকটি যাহা শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের একনিষ্ঠতার ঘটনাবলী বর্ণনা করে, যাহা ছন্দাকারে পুস্তকাবলীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।

প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীমনোজ বসুর "রাজকন্যার স্বয়ম্বর" গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ।

শুধু মহাভারতই নয়, রামায়ণও : বাল্মীকি দ্বারা রচিত রাবণরাজার বন্দিনী রামের স্ত্রী সীতার উদ্ধারের কাহিনী যাহা ৪৮ সহস্র পংক্তিতে লিখিত তাহাও ভারতের অন্যতম দান হিসাবে পরিগণিত হয়। রামায়ণও কেবলমাত্র একটি পরিগণিত গণ্ডিতেই সম্বন্ধ থাকে নাই বরং প্রচুর সংখ্যক সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। ১৮৪১ সালে জার্মান রচয়িতা আডলফ, হলফসম্যান দ্বারা কার্লসরুহে প্রকাশিত হয়। অদ্যাবধি ১৯০১ সাল হইতে রচিত ভারতীয় কথাবলীর সকল সঙ্কলনগুলিই সম্মিলিত আছে। ১৮৯৩ সালে বন-এ ভারত-তত্ত্বজ্ঞ হারম্যান জাকবই তাঁহার রচিত "রামায়ণ ঘটনাবলী ও সারমর্ম" পুস্তকে রামায়ণের একটি চিত্রাঙ্কন করেন। এক বৎসর পর আলেকজাণ্ডার গারটনার তাঁহার "রামায়ণ রাম সাহিত্য ও ভারতীয়" পুস্তক রচনা করেন (১৮৯৪ ফ্রাইবুর্গ)। উভয় রচনা দ্বারাই প্রমাণিত যে জার্মানীতে ভারতীয় সাহিত্যের এই দ্বিতীয় পৌরাণিক কাহিনীটি সাহিত্য-জগতের বাহিরেও পরিচিতি পায়। মিউনিকে ১৮৯৭ সালে জে, ম্যানরাড দ্বারা রামায়ণের সে অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা বিশেষ করিয়া কৈশোর কালের উপযোগী এবং অদ্যাবধি তাহা কিশোরদের নিকট খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জার্মান লেখক মেগেল লাটিন ভাষাতেও রামায়ণের ঘটনাবলী রচনা করেন ইহা ভারতের কেবল মাত্র মূল্যবান পৌরাণিক নথিপত্র হিসাবে

খ্যাতনামা সাহিত্যিক "স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প" গ্রন্থের প্রচ্ছদ আলেখ্য।

পরিগণিত নহে এবং ইতিহাস হিসাবেও পরিচিত। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় কেবল মাত্র প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের ভারত-তত্ত্বজ্ঞ বা দার্শনিকগণেরই নহে, ঐতিহাসিকগণের জন্য খণ্ডিত। দার্শনিকগণ, ধর্ম ঐতিহাসিক অধ্যাপকবৃন্দ ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে নিজদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে ভারতীয় সাহিত্য বহুমুখী ঐশ্বর্যশালী এবং ইহা হইতে বহু কিছু জ্ঞানার্জন করিতে পারা যায়।

The World Almanac and Book of Facts 1963

একটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত ও গুরুত্বপূর্ণ বর্ষপঞ্জী বলেই অভিহিত করা যায় আলোচ্য গ্রন্থটিকে। প্রয়োজনীয় সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও বিষয় সমূহের বিশদ পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে এই পুস্তকে, সেই সঙ্গে স্বনামধন্য ও বিখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের সম্পর্কেও যা কিছু জ্ঞাতব্য তা জানানো হয়েছে, যে কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি অমূল্য বলে পরিগণিত হবে। প্রকৃতপক্ষে বর্ষপঞ্জী না বলে আলোচ্য পুস্তকটিকে সংক্ষিপ্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলাই বোধ হয় অধিকতর সমুচিত। এরূপ মূল্যবান ও প্রামাণ্য বর্ষপঞ্জী প্রকাশের জন্য, প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই। **Published by the New York World Telegram and The Sun. Edited by Harry Hansen.**

আমাদের গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল যে মুষ্টিমেয় ক'জনের, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ তাঁদেরই অন্যতম; আলোচ্য গ্রন্থে তারই স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও জীবন-দর্শনের এক সংক্ষিপ্ত অথচ পরিচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বাঙ্ময় তাঁর রচনার প্রতিটি ছত্র। কয়েকটি বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-জীবন, তথা বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের জন্ম, তাঁর কাব্য ও কর্মজীবনের পটভূমিকা বিশদ ভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। গুরুদেবের অতলান্ত সাহিত্য-প্রতিভার পাশে পাশেই যে বয়ে গিয়েছে তাঁর বিভিন্ন কর্মধারা, সেকথা ভোলেন নি লেখক; বস্তুত সেটাকেই বিস্তৃততর পটভূমিকায় প্রদর্শন করেছেন। সমাজ-সেবক রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ও মানবপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের এক সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে এই রচনায়। লেখকের আন্তরিকতা ও সততায় রচনাটি সমৃদ্ধ ও তথ্যনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচিত প্রামাণ্য রচনাবলীর মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটির স্থান নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে। গ্রন্থকারের ভাষারীতি সরল ও ভাবব্যঞ্জক। কয়েকটি মূল্যবান চিত্র গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। আঙ্গিক সুচারু, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ, প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মিলারেপা তিব্বতের প্রাণপুরুষ

ভারতের যেমন গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ, ইউরোপের যেমন খৃষ্ট, ঠিক তেমনই স্থান অধিকার করে রয়েছেন মিলারেপা তিব্বতের গণমানসে; বস্তুত তিব্বতে তাঁকে ভগবান বুদ্ধের দ্বিতীয় অবতার বলেই পরিগণিত করা হয় তিব্বতের প্রাণসত্তাস্বরূপ এই মহাযোগীর জীবন কাহিনী, প্রতিবেশী ভারতের কাছে আজও সম্যক পরিচিত নয়, আলোচ্য গ্রন্থটি বিশেষ করে সেজন্যই মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। মিলারেপার অনৈসর্গিক জীবন কাহিনী বিবৃত করেছেন লেখক বর্তমান গ্রন্থে, যা যে কোনও রোমাঞ্চ কাহিনীর মতই আকর্ষণীয়। সেই সঙ্গে রয়েছে তিব্বতীয়গণের সমাজ ও ধর্মীয় রীতি-নীতির এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যার একটা আলাদা মূল্যও আছে। লেখক পায়ে হেঁটে নেপাল, তিব্বত-সিকিম প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন এবং মিলারেপার অসামান্য প্রতিষ্ঠার পরিচয়ে ধন্য হয়েছেন, যা তাঁর লেখনীকে আরও সত্যসন্ধানী করে তুলেছে। উপন্যাসের মতই মনোহর, রোমাঞ্চ রচনার মতই কৌতূহলোদ্দীপক এই জীবন কাহিনী, তথ্যসন্ধানী পাঠককে খুশী করে তুলবে বলেই আমরা আশা করি। লেখকের শৈলী বেগবান ও সহজ, রস গ্রহণে যা একান্ত সহায়ক। গ্রন্থটির আঙ্গিক

পণ্ডিতপ্রবর ভ৺মৃত্যুঞ্জয় চরণ বিদ্যাভূষণ রচিত প্রাচীন "ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য" গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট।

শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রী বিভূপদ কীর্তি প্রকাশনায়—শেফালিকা প্রকাশনী, ৬৪, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনচিত্ত জয় করেছিলেন একদা যে লেখক, তাঁর কাছে পাঠকের প্রত্যাশা অনেক; তাঁর সাম্প্রতিকতম এই রচনা সে প্রত্যাশাকে সার্থক করে তুলেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি স্মৃতিচারণমূলক, জীবনের পথে চলতে চলতে কত অজানাকে জেনেছেন লেখক, মুখোমুখি হয়েছেন কত বিস্ময়ের, জেনেছেন, উপলব্ধি করেছেন 'সবার উপর মানুষ সত্য', এই মহাবাক্যের তাৎপর্য কত গভীর আর সেই জানার আলো রাঙিয়ে দিয়েছে তাঁর [illegible]। জীবনদরদী এক গভীর মননের স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল [illegible] তাঁর রচনা, তাই উঠেছে সন্দেহাতীতরূপেই শিল্পোত্তীর্ণ। পড়তে পড়তে [illegible] যেতে হয় গভীর থেকে গভীরে; বুদ্ধির [illegible] পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চান না লেখক। [illegible] আবেদন [illegible] নয়, তাঁর আবেদন হৃদয়ে; ইণ্টেলেকচুয়ালিজম, [illegible], কমিউনিজম ইত্যাদি যাবৎ ইজম [illegible] করতে বসেন নি তিনি—শুধু দেখতে চেয়েছেন, [illegible] সেই মানুষকে যন্ত্রণা অপমানের পঙ্ককুণ্ড থেকে [illegible] না, হারিয়ে যেতে না যে অমৃতত্বের অধিকার। এক [illegible] জীবনবোধের উপস্থিতি অনুভূত হয় রচনাগুলির মাধ্যমে। বইয়ের পাতায় আঁকা চরিত্র যে কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দখল করে নিয়েছে পাঠকের হৃদয়-সিংহাসনটি, [illegible] অজ্ঞাত। শুধু পাঠ শেষে এক বিচিত্র অনুভূতিতে [illegible] মন, বিস্ময়চকিত ভাবে উপলব্ধি করেন—কখন [illegible] সজল হয়ে উঠেছে যুগল আঁখিপ্রান্ত, বেদনায় [illegible] কয়েকটি কাল্পনিক নরনারীর জন্য। পরিচ্ছন্ন [illegible] রসোপভোগে সহায়ক হয়ে উঠেছে। বইটির প্রচ্ছদ [illegible] ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শঙ্কর,

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের "ছেলেবেলার বিবেকানন্দ" গ্রন্থটির প্রচ্ছদ-পট। প্রকাশক শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ। শিল্পী প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

রাণা বসু রচিত "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আলেখ্য। প্রকাশক বাক্-সাহিত্য। শিল্পী কানাই পাল। মূল্য এক টাকা মাত্র।
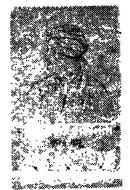
প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বন হরিণীর সংসার

সাংবাদিক সাহিত্যিকের এই নবতম অবদান, নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। একটি মনোরম কাহিনীর মাধ্যমে লেখক জীবনের এক মধুর সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। ঘর বাঁধা যে নারীহৃদয়ের চিরন্তন অভীপ্সা, তারই ছবি ফুটে উঠেছে অঞ্জনার মাধ্যমে। স্বামী শৈবাল ছোট শিখাকে নিয়ে যে সংসার অঞ্জনা গড়ে তুলেছে, তারই ভিত টলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আচার্য বিনায়ক, পূর্ব প্রেমের স্মৃতি জাগিয়ে টেনে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন অঞ্জনাকে তার কেন্দ্রচ্যুত [illegible] কল্যাণী নারীর শুভবুদ্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দিল সে প্রচেষ্টাকে, [illegible] আত্মবিস্মৃতিতে লজ্জায় শিহরিত হয়ে উঠল বিনায়কের শুভবুদ্ধি, [illegible] তাঁর বাজতে লাগল অঞ্জনার কাতর আবেদনটুকু [illegible] আজ পুরোপুরি আরেকজনের মাষ্টারমশাই। [illegible] সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় দিয়েছেন লেখক, কলকাতার এত কাছেই যে বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ প্রশস্ত [illegible] আজও প্রায় অবহেলিত [illegible] বৃহত্তর জনসমাজের [illegible], তার বিশদ পরিচয় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক বলেই পরিগণিত হবে। লেখকের শৈলী, সহজ ও সাবলীল, সুপাঠ্য এক রচনা হিসাবে বর্তমান উপন্যাসটি পাঠকের সমাদর লাভ করবে বলেই আমরা আশা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আনন্দ ভৈরবী

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য সংকলন, বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের স্বাদে কবিতাগুলি মনোরম। জীবন সচেতনতার আভাস এবং সমুজ্জ্বল; প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের যে [illegible] চিরন্তন সত্য কয়েকটি কবিতার মধ্যে তার ছবি ফুটে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ 'ল্যাণ্ডস্কেপ' কবিতাটির কয়েকটি চরণ উল্লেখ্য,—তাকে ছুঁয়ে হোক সন্ধ্যা আকাশ লাল, শিমুলে শিমুলে ছোঁয়া যাক [illegible] ডাল, পাখির মিথুন ফিরুক আপন নীড়ে, পাখায় জড়িয়ে পাখা এই দিনশেষে: ক্লান্ত মনের এইতো পান্থশাল,—হে জীবন! তুমি জুড়াও

এখানে এসে। অত্যন্ত সহজ এক সুষমাই এই কবিতাগুলির প্রাণসত্তা, অবোধ্য শব্দের ভিড়ে কোথাও তা খণ্ডিত হয় নি, হারিয়ে যায় নি অতি মননের তীক্ষ্ণ কুটিল আবর্ত। আপন বক্তব্যকে সহজেই পাঠক মননে পৌঁছে দিয়েছেন কবি, আর সেখানেই নিহিত তাঁর সার্থকতা। কাব্যগ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দুই টাকা।

সাহিত্য-সমীক্ষা

সাহিত্য বিষয়ক এই প্রবন্ধ পুস্তকটি নানা কারণেই বিশিষ্ট। লেখক খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও সমালোচক, সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, তাকেই রূপায়িত করেছেন তিনি আলোচ্য প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিভিন্ন সুর ধ্বনিত হলেও মূলত তারা এক ও অভিন্ন। লেখক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী এবং তাঁর সেই বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছে বর্তমান রচনাবলীতে, গদ্য-সাহিত্য ও কাব্য-সাহিত্য এতদুভয়েরই উপর আলোচনা করা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে। সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে আস্থাশীল লেখক যে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত করেছেন নিজের বক্তব্যের সপক্ষে, বিদগ্ধ ও চিন্তাশীল পাঠকের কাছে তা মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। সাহিত্যকে যে সর্বতোভাবেই সমাজ সচেতন হতে হবে এবং সেটাই যে তার মূল্যায়নের পক্ষে সর্বোত্তম নিরিখ এ কথা জোরের সঙ্গে বলেন লেখক। সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তাকে মেনে নিলেও তাঁর উপর সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব অস্বীকার করা সম্ভব নয় বলেই তিনি মত প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য-জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে এই সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী সমাদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—গোপাল ভৌমিক। প্রকাশক—জ্ঞানতীর্থ, ১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা।

দুই বাড়ী

আলোচ্য উপন্যাসের রচয়িতা, জনপ্রিয়তায় ধন্য, তাঁর বহুবিধ রচনা ছায়াচিত্র জগতে আদৃত হয়েছে, বর্তমান রচনাও তারই অন্যতম। এক পল্লীশহরে অবস্থিত পাশাপাশি দুই বাড়ী ও তার অধিবাসিবৃন্দই এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রী। এই দুই বাড়ীর গৃহকর্তাদের খামখেয়াল ও বালকোচিত কলহ বিবাদই রচনাটির মূল উপজীব্য, আগাগোড়া সিনেমার ছকে ফেলা কাহিনীটি বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই অগ্রসর হয়ে গিয়েছে ও পরিশেষে নায়ক-নায়িকার মধুর মিলনে ঘটেছে তার সমাপ্তি। সিনেমার গল্প পড়তে যাঁরা ভালবাসেন, আলোচ্য রচনা তাঁদের মনোহরণ করবে বলে আশা করা অন্যায় নয়। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে প্রধানত ছায়াছবির দাবী মেটাতে এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লেখক সার্থক হয়েছেন, কারণ হালকা রসের ছোঁয়ায় তাঁর রচনাটি আগাগোড়া সমুজ্জ্বল, আর সেটুকুই এর প্রধানতম সম্পদ। লেখকের শৈলী সাবলীল ও সরল, রচনার বিষয় বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিবিধায়ক। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শৈলেশ দে, প্রকাশক—শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২ দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এপার ওপার

আলোচ্য গ্রন্থটি এক সংক্ষিপ্ত উপন্যাস। দামোদরের তীরবর্তী একটি ছোট গ্রাম, তারই অধিবাসীদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। সরলা গ্রাম্যবধূর মনের ঘাত-প্রতিঘাতকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক সহজ কৌশলে। সমাজ সংসারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে চায় একটি হৃদয় প্রেমের আহ্বানে অথচ পারে না। সংসারের বাঁধনে যে তার হাত-পা বাঁধা, তাই তো দয়িতকে মিনতি করে বলতে হয়, ওগো, তুমি অমন করে বোলো না। তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে আমার আর ঘর-সংসারে মন বসে না। অভিসারিকা রাধাপ্রিয়ার চিরন্তন বেদনাই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে কামার বৌ-এর ঐ কথা ক'টির মাধ্যমে। সহজ সাবলীলতার সঙ্গে এক বেদনাবিধুর প্রেমের ছবি এঁকেছেন লেখক—আন্তরিকতায় যা হৃদ্য, সরলতায় যা মধুর। চরিত্রসৃষ্টিতেও পারঙ্গম লেখক, হরি বৈরাগী, কামার বৌ, রঘু কামার প্রভৃতি সব ক'টি চরিত্রই স্বাভাবিক ও জীবন্ত। লেখকের শৈলী এখনও কিয়দংশে অপরিণত, পরিশীলনসাপেক্ষ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—ইন্দ্রনীল। প্রকাশক—কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬৫, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আকাশ প্রদীপ

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে বর্তমান গ্রন্থের লেখক, জনপ্রিয় এই আখ্যায় চিহ্নিত হওয়ার অধিকারী। জন-মনোরঞ্জনী যে সব গ্রন্থ তিনি এ যাবৎ প্রণয়ন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসও তার ধারানুসারী। এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারীর জীবনায়ন করেছেন তিনি এখানে। গুণ্ডা হস্তে ধর্ষিতা শিবানীও একদিন স্বপ্ন দেখেছিল, নীড় বাঁধতে চেয়েছিল সে, ভাগ্যের বিচিত্র কৌতুকে বাঁধা ঘর টলে উঠল, সব পেয়েও আবার পথে নামতে হল তাকে, যে অপরাধ তার স্বেচ্ছাকৃত নয় তারই প্রায়শ্চিত্ত করে গেল সে জীবন দিয়ে। মূলত

ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পালের "উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। প্রকাশক লেখক স্বয়ং।
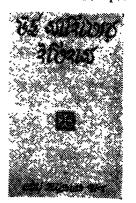
সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন লেখক এবং কাহিনীকে জোরালো করার উদ্দেশে নারীধর্ষণের একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা অপ্রয়োজনীয়, প্রকৃতপক্ষে নারীধর্ষণই যেন তাঁর একমাত্র উপাদান, ...ত্রা রমণীর করুণ চিত্র অঙ্কনই যেন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, এরই মাধ্যমে মানুষের সহজ হৃদয়াবেগকে তিনি ছুঁতে চেয়েছেন ও কিয়দংশে সফলও হয়েছেন। বিশেষ কোন সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ না হলেও একটা সহজ ও সরল মানবিকতা বোধ বিদ্যমান তাঁর রচনায়, সাধারণ পাঠককে যা আকৃষ্ট করবে। লেখকের আঙ্গিক সাধারণ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শৈলেশ দে, প্রকাশক—শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থা ভারতের এক বহু পুরাতন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। বেদে, পুরাণেও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়, বস্তুত প্রাচীন ভারতে এটাই ছিল একমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্র ও এর পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত! যুগে যুগে মনীষিগণ এই শাস্ত্রকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। নানা প্রামাণ্য গ্রন্থ এর উপর রচিত হয়েছে যার ভিতর চরক সংহিতা, বাগভট প্রভৃতি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ভাষায় এযাবৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার বিশেষ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমান গ্রন্থটির এক বিশেষ মূল্য আছে। সংক্ষিপ্তাকারে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক এই পুস্তকে। তথ্যনিষ্ঠ ও অনুসন্ধানী পরিশীলনে তাঁর রচনা সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। লেখকের ভাষারীতি সহজ সাবলীল। বইখানির আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা, বাঁধাইও তাই। লেখক—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম বি-বি-এস (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য বৈদ্য সার্বভৌম। প্রকাশনায়—সাধনা ঔষধালয়, সাধনানগর, কলিকাতা—৪৮, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অঙ্গজ

আলোচ্য উপন্যাসটির লেখক, সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও এক সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে তাঁর রচনা। এক সহজ সরল কাহিনী বয়নে তিনি নিপুণতা দেখিয়েছেন, বর্তমান রচনার মাধ্যমে। কাহিনীর নায়িকা অনীতা সুন্দরী, ধনীকন্যা, যৌবনের চাপল্য প্রসূত ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে কেমন করে আত্মবিসর্জন করল পরিণতিতে, তারই করুণ মধুর ছবি এঁকেছেন লেখক। অনীতা চরিত্রটি সত্যই লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি, যে সত্যপরায়ণতা ও মাধুর্য নারীহৃদয়ের শাশ্বত মহিমা ব্যক্ত করে অনীতা যেন তারই মূর্ত প্রতীক। উপন্যাসের শেষাংশে উদ্ধৃত সদ্য-মৃতা অনীতার পত্র, যাতে সে সব কিছু প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিল স্বামীর কাছে; সত্যই রোমান্টিসিজম্ ও সত্যনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। নায়ক চরিত্রে অমিতাভ—সহৃদয়তা ও মানবিক আবেদনে রীতিমত সমৃদ্ধ, তার অকপট আন্তরিক রূপটি সত্যই হৃদয়বেদ্য। সরল সাবলীল ঘটনা বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণের কৌশলে আলোচ্য গ্রন্থখানি সহজেই সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। বইটির আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

পরিচিতা

আলোচ্য রচনাটি উপন্যাস জাতীয়। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু সত্য ঘটনামূলক, সম্ভবত তাঁর ধারণা এতে রচনার মর্যাদা বৃদ্ধি হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান ক্ষেত্রে তা হয়নি, যে রচনা কৌশল আয়ত্তে থাকলে রচনা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, বর্তমান গ্রন্থলেখক তা হতে বঞ্চিত, আর সে জন্যই তাঁর রচনা অর্থহীন মামুলি প্রলাপে পর্যবসিত হয়েছে। এক গায়িকার বিড়ম্বিত জীবন-আখ্যান বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে, কাহিনী অত্যন্ত দুর্বল, পড়তে পড়তে পাঠক যা সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেন তা অপরিসীম ক্লান্তি, বাস্তবিক এ ধরণের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে বাধ্য হওয়াটা যে কোন সাহিত্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই অপ্রীতিকর বলে পরিগণিত হতে বাধ্য। লেখকের ভাষারীতি অত্যন্ত অপরিণত ও প্রচুর পরিশীলন সাপেক্ষ। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি। লেখক অজিত মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—এস, এন, মুখার্জী, ৫বি মুখার্জী পাড়া লেন, কলিকাতা—২৬, পরিবেশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা।

নতুন নগর

আলোচ্য উপন্যাসের লেখক পাঠকসমাজে অপরিচিত নন। নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে, যার মধ্য হতে দু'একটি ছায়াচিত্রায়িতও হতে পেরেছে। বর্তমান উপন্যাসের কাহিনী সাদাসিধে, এক আদর্শবাদী যুবক চিকিৎসকের আদর্শ ও জীবনের সংঘাতকে রূপ দিতে চেয়েছেন লেখক কিয়ৎপরিমাণে সফলও হয়েছেন। চরিত্রগুলি সহজ ও সুস্পষ্ট, নারী-চরিত্রের মধ্যে নায়িকা মালবিকা অপেক্ষা উপনায়িকা শীলার চরিত্রটি অনেক জীবন্ত অনেক মানবিক। লেখকের রচনার প্রধান প্রসাদ গুণ ও এই মানবিকতা বোধ, মানুষ দোষে গুণেই মানুষ এই সত্যই পরিস্ফুট হয়েছে বর্তমান রচনার ছত্রে ছত্রে, আর সেজন্যই তা পাঠকের মনে একটা সমবেদনা জাগিয়ে তোলে। লেখকের শৈলী এখনও পরিণতি সাপেক্ষ। গ্রন্থটির আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক বিশ্বনাথ রায়, প্রকাশক—শ্রীভারতী পাবলিশার্স। ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সুর ও বাণী (প্রথম খণ্ড)

আলোচ্য পুস্তকটি সঙ্গীত বিষয়ক। প্রধানত ভজন, শ্যামাসঙ্গীত ও রাগপ্রধান এই ত্রিবিধ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সঙ্গে স্বরলিপি সমেত গানগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও অনুরাগী এই উভয়বিধ পাঠকের কাছেই বর্তমান গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি, সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাদির ভাণ্ডারে আলোচ্য পুস্তকটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিমান পাল। প্রকাশক—শ্রীবিমল পাল ২৭।১। এ,বি জীবনকৃষ্ণ মিত্র রোড, কলিকাতা—৩৭, দাম—আড়াই টাকা।

॥ ১৩৬৯ সালের উল্লেখযোগ্য বই ॥

রবীন্দ্ররচনা ও চর্চা

গল্পগুচ্ছ (৪র্থ খণ্ড) ৫·০০ বিশ্বভারতী
ছন্দ ৮·০০ বিশ্বভারতী
দীপিকা শোভন ৮·৫০ সাধারণ ৭·৫০ বিশ্বভারতী
বীরপুরুষ ১·৩০ বিশ্বভারতী
সমুদ্রের পরীক্ষা ১·০০ বিশ্বভারতী
স্বদেশী সমাজ ৩·০০ বিশ্বভারতী
আমাদের গুরুদেব ৩·৫০ সুধীরঞ্জন দাশ বিশ্বভারতী
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২·০০ কাজী আব্দুল ওদুদ আই এ পি
কবি মানসী ১২·৫০ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ডি এম লাইব্রেরী
গুরুদেব ৫·০০ রানী চন্দ বিশ্বভারতী
পরিজন পরিবেশে বুলীন্দ্রনাথ ৩·০০ সুকুমার সেন কলি: বিশ্ব:
ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ ৮·০০ প্রবোধচন্দ্র সেন এ মুখার্জি
রবীন্দ্র অভিধান (২য়) ৬·০০ সোমেন্দ্রনাথ বসু বুকল্যাণ্ড
রবীন্দ্র কথা ২·০০ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আই এ পি
রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ ৬·০০ ডঃ সুধীর নন্দী শ্রীভূমি পাব্লিশার্স
রবীন্দ্রনাথ ৫·০০ অন্নদাশঙ্কর রায় ডি এম লাইব্রেরী
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) ১২·৫০ ডঃ মনোরঞ্জন জানা ভারতী বুক ষ্টল
রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ : কাব্য নাটক ৪·০০ ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাব্লিশার্স
রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা ১২·০০ ধীরানন্দ ঠাকুর বুকল্যাণ্ড
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য ১০·০০ ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত বুকল্যাণ্ড
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ ৫·৭৫ কেদারনাথ চট্টো: আই এ পি
রবীন্দ্র নির্দেশিকা ১০·০০ নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী ক্লারিয়ন পাবলিশার্স
রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ৪·০০ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র শিশুসাহিত্য পরিক্রমা ৫·০০ খগেন্দ্রনাথ মিত্র নবারুণ
রবীন্দ্র-সরণি ১০·০০ প্রমথনাথ বিশী মিত্র ও ঘোষ
রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে ১০·০০ বিশু মুখোপাধ্যায় এম সি সরকার
রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিধান (২য়) ৫·০০ হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল
সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ ৫·০০ বুদ্ধদেব বসু এম সি সরকার

কবিতা

অতি দূর আলোরেখা ২·০০ মণীন্দ্র রায় সুরভি প্রকাশনী
অন্ধকার উজানে যে নদী ২·০০ তরুণ সান্যাল কথা-শিল্প
অভিজ্ঞান শকুন্তল (অনুবাদ) ৫·৭৫ কালিপদ দাস আলফাবিটা পাব্লিকেশনস
আনন্দ ভৈরবী ২·০০ প্রমোদ মুখোপাধ্যায় এম সি সরকার
আরও সূর্যের কাছে ৩·০০ দক্ষিণারঞ্জন বসু এ মুখার্জী
ঋষভ-গান্ধার ২·৫০ সত্যব্রত বসু আলফাবিটা
এক সমুদ্র দুটি মন ২·৭৫ শান্তিভূষণ রায় আলফাবিটা
একা লব কবিতা (সংকলন) ৫·০০ বিষ্ণু দে সম্বোধি
কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা ২·০০ করুণাসিন্ধু দে গ্রন্থজগৎ
কবিতা ১৯৫৬—৬১ ৪·০০ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যো: কবিপত্র প্র: ভ:
কাছেই জানালা ৩·০০ অনিলেন্দু চক্রবর্তী নিউ বুক এম্পো:
চিত্ত যেথা ভয় শূন্য (সঙ্কলন) ২·০০ অমরেন্দ্র মুখো: সম্পা: এম সি সরকার
দিনযাপন ২·০০ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কবিতা পরিষদ
দীপশিখা দ্যুতিময় ৩·০০ বিনয় মিশ্র আলফাবিটা
নির্বাস ২·০০ পরিমল চক্রবর্তী ইণ্ডিয়ানা
নীল শহরের গল্প ১·৫০ জগদীশচন্দ্র দাস আলফাবিটা
প্রথম কবিতা ২·০০ পুরুষোত্তম আলফাবিটা
প্রথম ভালবাসা ২·০০ সবিৎশেখর মজুমদার গ্রন্থজগৎ
বাঁকা জল ২·০০ অনিল বিশ্বাস ইণ্ডিয়ানা
ভোরের নক্ষত্র (সংকলন) ৩·০০ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টা: সম্পা: কবিতা পরিষদ
মৃত্যুদিন জন্মদিন ১·০০ আশিস সান্যাল সম্প্রতি প্রকাশনী
যত দূরেই যাই ৩·০০ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ত্রিবেণী
যে কোন নিঃশ্বাসে ২·০০ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বসুচৌধুরী
বাগরূপ ৪·০০ সুনীল চট্টোপাধ্যায় বামা পুস্তকালয়
রোদ বৃষ্টি ভালবাসা ৬·০০ চিত্তরঞ্জন মাইতি এ মুখার্জী
শিউলি ঝরার শব্দে ২·০০ শান্তি লাহিড়ী সাহিত্য প্রকাশ
সন্ধ্যার জানালা ৩·২৫ মতি মুখোপাধ্যায় আলফাবিটা
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত (বিদেশী কবিতার অনুবাদ সঙ্কলন) ১২·০০ শঙ্খ ঘোষ ও আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত নতুন সা: ভবন
সাত রং সাত আকাশ (অনুবাদ) ৩·০০ শান্তিভূষণ রায় এশিয়া পাবলিশিং
সোনালি ডানার চিল ২·০০ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থজগৎ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

এই বিশ্বের কথাসাহিত্য ১৪·০০ অসিত গুপ্ত কথাকলি
ঘরে বাইরে সাহিত্য চিন্তা ৫·০০ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য জগৎ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০·০০ ডঃ সুশীল রায় জিজ্ঞাসা
প্রবন্ধ সংগ্রহ (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ৭·৫০ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য ২·০০ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভারতী লাই:

বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রাচীন পর্ব) ৮.০০ তারাপদ ভট্টাচার্য এস গুপ্ত ব্রাদার্স
বাংলা গদ্য-সা: ইতিহাস ১৫.০০ সজনীকান্ত দাস মিত্রালয়
বাংলা সাহিত্যে
ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮.০০ ড: বিজিতকুমার দত্ত মিত্র ও ঘোষ
বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প
ও গল্পকার ১৬.০০ ভূদেব চৌধুরী মডার্ন বুক এজেন্সি
ভারতীয় সা: ইতিহাস ১৫.০০ সুকুমার সেন গ্রন্থ প্রকাশ
ভাবাতত্ত্বের কথা ৬.০০ অতীন্দ্র মজুমদার নয়া প্রকাশ
মধুসূদনের কাব্যালঙ্কার ও
কবিমানস ৬.৫০ ড: সুবোধরঞ্জন রায় মডার্ন বুক এজে:
মোহিতলালের কাব্য
পরিক্রমা ৪.০০ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ মডার্ণ বুক এজে:
সাহিত্য সংস্কৃতির সময় ৪.০০ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বাক সাহিত্য
সাহিত্য ও সংস্কৃতির
তীর্থ সঙ্গম ১২.৫০ ড: শ্রীকুমার বন্দ্যো: মডার্ণ বুক এজে:

সংকলন

অনেক দিনের অনেক কথা ৪.০০ সাগরময় ঘোষ সম্পা: সুরভি প্রকা:
চিত্র বিচিত্র ৭.০০ প্রবোধকুমার সান্যাল কথাকলি
দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন ৮.০০ দিলীপকুমার রায় আই এ পি
মালঞ্চের রঙ ৬.৫০ বিরাম মুখো: সম্পা: সম্বোধি

জীবনী ও মনীষী প্রসঙ্গ

একটি পেরেকের কাহিনী ২.০০ সাগরময় ঘোষ এস গুপ্ত ব্রাদার্স
এলবার্ট আইনষ্টাইন ২.০০ রবীন বন্দ্যো: শ্রীভূমি পাব্লি:
গরীয়সী গৌরী ৪.৫০ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বাক সাহিত্য
নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ১২.০০ নরেন্দ্র চক্রবর্তী সুন্দর প্রকাশন
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ৬.৫০ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বুকল্যাণ্ড
মাইকেল জীবনীর আদিপর্ব ৫.০০ ধীরেন্দ্র ঘোষ মডার্ণ বুক এজে:
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৪.০০ তামসরঞ্জন রায় কলি: পুস্তকালয়
শ্রীনন্দলাল বসু ৬.৫০ কানাই সামন্ত কথাশিল্প প্রকাশ
সাহিত্য সাধক বিবেকানন্দ ৩.০০ ড: অধীর দে সৃষ্টি প্রকাশনী
স্বামী বিবেকানন্দ ৩.০০ ভূতনাথ ভৌমিক ভারতী বুক ষ্টল

রম্যরচনা

আমার ঘরের আশেপাশে ৫.০০ ডা: তারক দাস রূপা অ্যাণ্ড কো:
দশুক শবরী (১ম ও ২য় পর্ব) ৫.০০ বিকর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ
দিকবিদিক ৩.৫০ শিবতোষ মুখো: মিত্রালয়
নক্ষত্রের জাল ৫.০০ হরিনারায়ণ চট্টো: কথাকলি
বিচিত্র মানবী ৫.০০ শ্রীপান্থ গ্রন্থম
বিলিতি বিচিত্রা ৪.০০ হিমানীশ গোস্বামী বাক সাহিত্য
বিশ্বরূপ দর্শন ৪.০০ বিরূপাক্ষ কথাকলি
ভবঘুরে ও অন্যান্য ৬.৫০ সৈয়দ মুজতবা আলী বাক সাহিত্য
যা হলে হতে পারত ৩.৫০ প্রমথনাথ বিশী শ্রীগুরু লাইব্রেরী

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ৪.৫০ শঙ্কর বাক সাহিত্য
সম্পাদকের বৈঠকে ৫.৫০ সাগরময় ঘোষ ত্রিবেণী

বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য

গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও
তাঁহার যুগ ১৫.০০ বিমান মজুমদার কলি: বিশ্ববিদ্যা:
দাশরথি রায়ের পাঁচালী ১৫.০০ হরিপদ চক্র: সম্পাদিত „
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ৩.৫০ হরেকৃষ্ণ মুখো: ভারতী বুক ষ্ট
চৈতন্য পরিকর ১৬.০০ রবীন্দ্রনাথ মাইতি [illegible]
পদ্মপুরাণ (কবি বিজয়গুপ্ত) ১২.০০ জয়ন্ত দাশগুপ্ত সম্পা: কলি: বিশ্ব:
বিদ্যাপতি শিবগীত ৪.০০ সুধীর মজুমদার সম্পা: „
শাক্ত পদাবলী চয়ন ৩.০০ কমলকুমার গঙ্গো: এম এল দে
শ্রীধর্মমঙ্গল
(ঘনরাম চক্র: বিরচিত) ২০.০০ পিযূষ মহাপাত্র সম্পা: কলি: বিশ্ব:
শ্রীভক্তি সন্দর্ভ: ২০.০০ শ্রীরাধারমণ গোস্বামী ও
(শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত) শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পা: কলি: বিশ্ব:

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

অজন্তানগর দর্শন ৩.০০ অমিতাভ চৌধুরী গ্রন্থপ্রকাশ
এভারেষ্ট ডায়েরি ১.০০ ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাশ
আনন্দ পাব্লিশার্স প্রা: লি:
জাপানী জার্নাল ৩.৫০ বুদ্ধদেব বসু এম সি সরকার
জাহাজ ৫.০০ মধুসূদন চট্টো: বেঙ্গল পাব্লিশার্স
দেবভূমি দক্ষিণ ৬.৫০ অমলকান্তি ঘোষ এ মুখার্জি
নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ৫.০০ গৌরকিশোর ঘোষ আনন্দ
পাব্লিশার্স প্রা: লি:
রম্যাণি বীক্ষ (উৎকল পর্ব) ৭.৫০ সুবোধ চক্রবর্তী এ মুখার্জি
রাশিয়ার ডায়েরি ১ম ও ২য় ১৪.০০
১২.০০ প্রবোধকুমার সান্যাল বেঙ্গল পাব্লি:
রূপমতী নগরী ৪.৫০ অমিয় বন্দ্যো: আনন্দধারা প্রকা:
হিমাচলম ৩.৫০ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় আই এ পি

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

আকাশ ও পৃথিবী ১০.০০ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ আই এ পি
উড়িষ্যার দেবদেউল ৫.৫০ মনোমোহন গঙ্গো: কন্টেম্পোরারী
একদা যাহার বিজয়সেনানী ৩.০০ পার্থ চট্টো: এস গুপ্ত ব্রাদার্স
কবি কণ্ঠ ৫.০০ সন্তোষকুমার দে বিচিত্রা প্রকাশনী
ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স
অব এস্থেটিক ৬.৫০ ডা: সাধন ভট্টা: মিত্র ও ঘোষ
খেলাধূলায় বাঙলার মেয়ে ৫.০০ মুকুল আনন্দধারা প্রকাশনী
চীনের ড্রাগন ৩.৫০ ড: সত্যনারায়ণ সিংহ বাক সাহিত্য
ছন্দসূত্রে প্রবেশিকা ১.৫০ অম্বিকাচরণ দাস বরেন্দ্র লাইব্রেরী
নেফার মানুষ ৫.০০ নলিনীকুমার ভদ্র আর্ট এণ্ড লেটার্স
বাংলার সাধক বাউল ৪.০০ ইন্দিরা দেবী ভারতী বুক ষ্টল
বাঙালী ৬.০০ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ রূপা এণ্ড কো:

মুদ্রণ পরিচয় ৪.০০ দীপঙ্কর সেন ও সুপ্রিয়চন্দ্র দাস জেনারেল প্রিন্টার্স

যুগের অভিব্যক্তি ও শিক্ষা ৫.০০ ডাঃ হরিসাধন গোস্বামী ভারতী বুক ষ্টল

রাষ্ট্র সাহিত্যে জীবন যৌবন ৩.০০ বসুধা চক্রবর্তী জেনারেল প্রিন্টার্স

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ৫.০০ প্রভাতকুমার মুখো: বুকল্যাণ্ড

সঙ্গীত ও সাহিত্য ৭.০০ নীহারকণা মুখার্জি এম সি সরকার

ইতিহাস

প্রাচীন প্যালেষ্টাইন ৬.০০ শচীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি এম সি সরকার

বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর
স্বাধীন সুলতানদের আমল ১৩.৫০ সুখময় মুখো: ভারতী বুক ষ্টল

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক ২.৫০ সুপ্রকাশ রায় ঐ

গ্রন্থাবলী

কান্তকবি রচনাসম্ভার ১০.০০ প্রমথনাথ বিশী সম্পাঃ মিত্র ও ঘোষ

কান্তবাণী ১০.০০ ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠি ডি এম লাইঃ

মধুসূদন গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড কাব্য সংগ্রহ ৮.৫০ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাঃ কল্লোল প্রকাশন

ধর্মগ্রন্থ

জ্ঞানেশ্বরী ১২.০০ প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহেশ লাইব্রেরী

বেদ মীমাংসা ১০.০০ সংস্কৃত কলেজ

অনুবাদ সাহিত্য

অস্তগামী সূর্য (ওসামু দাজাই) ৪.৫০ কমল রায় রূপা অ্যাণ্ড কোং

আজকের চীন (ডাঃ এস চন্দ্রশেখর) ১.০০ নিরঞ্জন হালদার পরিচয় পাব্লিশার্স

কিন্নর দেশে (রাহুল সাংকৃত্যায়ণ) ৬.৫০ মিত্রালয়

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে (টমাস জেফারসন) ৩.০০ সুধীর দাশগুপ্ত পরিচয় পাবলিশার্স

গণতন্ত্রের ইস্তাহার (ফার্ডিনাণ্ড পেরুটকা) ১.০০ ভজন দাশগুপ্ত ঐ

গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি (জন এইচ হলওয়েল) .৭৫ অধীরকুমার রাহা ঐ

ছায়াময় অতীত (মহাদেবী বর্মা) ৪.০০ মলিনা দেবী রূপা অ্যাণ্ড কোং

জীবন জিজ্ঞাসা (আইনস্টাইন) ৮.০০ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ

তরাইয়ের তরুণী (সেলমা লাগরলফ) ২.০০ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বিচিত্রা

দি টাইম মেশিন (এইচ জি ওয়েলস) ২.০০ নির্মলচন্দ্র গঙ্গো: অভ্যুদয় প্রঃ মঃ

দ্বারকানাথ ঠাকুর (কিশোরীচাঁদ মিত্র) শোভন ১০.০০ সাধারণ ৮.৫০ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্বোধি

নবম তরঙ্গ (১ম) (ইলিয়া এরেনবুর্গ) ৭.৫০ সত্য গুপ্ত ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

নটা বাঘ আর একটা মত্ত হাতি (কেনেথ অ্যাণ্ডারসন) ৫.৫০ চিত্তরঞ্জন লাহিড়ী অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির

বাংলার লোককথা (লালবিহারী দে) ২.৫০ গোবিন্দ গুপ্ত চতুরঙ্গ পাব্লিশার্স

বিদ্রোহী তিব্বত (ফ্রাঙ্ক মোরেস) ১.২৫ জয়ন্ত রায় পরিচয় পাব্লিশার্স

রুদ্রপ্রয়াগের চিতা (জিম করবেট) ৪.৫০ জগন্নাথ বিশ্বাস অভ্যুদয় প্রঃ মন্দির

রুশ গল্প সঞ্চয়ন ৬.০০ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ন্যাশনাল বুঃ এঃ

শহরতলীর শয়তান (বারট্রাণ্ড রাসেল) ৪.৫০ অজিতকৃষ্ণ বসু রূপা অ্যাণ্ড কোং

সত্যই ভগবান (ম, ক, গান্ধী) ৩.৫০ বীরেন্দ্রনাথ গুহ গান্ধী স্মারকনিধি

স্মৃতিকথা ও আত্মচরিত

দ্বিতীয় স্মৃতি ৫.৫০ পরিমল গোস্বামী গ্রন্থ প্রকাশ

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০.০০ অহীন্দ্র চৌধুরী আই এ পি

স্মৃতিচারণ (২য়) ৬.৫০ দিলীপকুমার রায় আই এ পি

অভিধান

বিবিধার্থ অভিধান ৬.৫০ সুধীরচন্দ্র সরকার আই এ পি

সঙ্গীত

রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ (২য়) ৫.০০ প্রফুল্লকুমার দাস জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্র সঙ্গীতের নানাদিক ৪.০০ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্রালয়

নাটক

অধ্যাপকের স্ত্রী ২.০০ অশোক রুদ্র ন্যাশানাল পাব্লিশার্স

আগন্তুক ১.৭৫ নারায়ণ গঙ্গো: ডি এম লাইব্রেরী

আনন্দমঠ (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র) ২.৫০ নাট্যরূপ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্ট এণ্ড লেটার্স

উত্তরণ ২.০০ নিখিল মুখোপাধ্যায় জাতীয় সাঃ পঃ

এ কী অভিনয়? ২.৫০ জলধর চট্টোপাধ্যায় সিটি বুক এজেন্সি

খরনদী স্রোতে ২.৫০ সুনীল দত্ত জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

গুরুভার ১.৫০ বিধায়ক ভট্টাচার্য সিটি বুক এজেন্সি

চার প্রহর ২.৫০ বীরু মুখোপাধ্যায় আর্ট এণ্ড লেটার্স

ছায়াপথ ২.৫০ বিজন ভট্টঃ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

দশ ভাগ ও আরও কয়েকটি ৫.০০ বনফুল আই এ পি

দেশাত্মবোধক নাট্য সঙ্কলন (১ম ও ২য়) ২.০০ ২.০০ সূত্রধার সম্পাদিত জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

দ্বান্দ্বিক : জীবন যৌবন ১'৫০ অমর গঙ্গো: জাতীয় সাহিত্য পরি.
নাম নেই ২'০০ কিরণ মৈত্র সিটি বুক এজেন্সি
নীলকণ্ঠের বিষ ১'৫০ মনোজ মিত্র গন্ধর্ব প্রকাশনী
পতঙ্গ ১'০০ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মিত্রালয়
পরীর ডানা ২'০০ সুকোমল বসু শ্রীভূমি পাব্লিশার্স
পরোয়ানা ২'৫০ রমেন লাহিড়ী জাতীয় সা: পরিষদ
পাশাপাশি ২'০০ স্বপনবুড়ো ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং
বাঁধ ২'৫০ সুশীল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থপীঠ
বিবেকানন্দ ২'৫০ পরেশ ধর জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
মহাগুরু নিপাত ১'৫০ গঙ্গাপদ বসু সিটি বুক এজেন্সি
মহারাজ প্রতাপাদিত্য ১'৭৫ আনন্দময় বন্দ্যো: ডায়মণ্ড লাইব্রেরী
মানব থেকে দেবতা ১'৫০ শম্ভুনাথ ভদ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
মেঘে ঢাকা তারা ২'৫০ নাট্যরূপ শক্তিপদ রাজগুরু গ্রন্থপীঠ
লক্ষহীরা ২'৫০ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীগুরু
লোহার জাল ২'৭৫ ব্রজেন্দ্রকুমার দে নির্মল সা: মন্দির
সংঘাত ১'০০ তারাশঙ্কর বন্দ্যো: সাহিত্যায়ন
সাহেব বিবি গোলাম ৩'০০ নাট্যরূপ বৈদ্যনাথ ঘোষ
(বিমল মিত্র) বাক সাহিত্য
সৈনিক ১'৫০ ধনঞ্জয় বৈরাগী বাক সাহিত্য
স্বর্ণকীট ও জওয়ান ১'০০ মন্মথ রায় ডি এম লাইব্রেরী
স্বামী বিবেকানন্দ ১'৫০ অভিযাত্রী শ্রীগুরু

ছোট গল্প

অতলান্তিক ৫'০০ আশাপূর্ণা দেবী
এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্স
অর্কিড ১'৫০ সুবোধ ঘোষ আনন্দধারা
এংকোর ৩'০০ উৎপল দত্ত সাহিত্যায়ন
কেউ তত লাজুক নয় ৪'০০ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বর্তিকা
ক্বচিৎ কখনো ৩'৫০ প্রেমেন্দ্র মিত্র বাক সাহিত্য
গল্প পঞ্চাশৎ ১০'০০ মনোজ বসু মিত্র ও ঘোষ
চন্দ্রমল্লিকা ১'০০ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জ্ঞানতীর্থ
ছায়াকায়ার মায়াপুরে ১'০০ হেমেন্দ্রকুমার রায় লেখাপড়া
জননী ২'০০ বিমল কর বিশ্বাস পাব্লিশিং
জলভ্রমি ৩'০০ সতীনাথ ভাদুড়ী বাক সাহিত্য
জোনাকি মন ২'০০ পরিতোষ মজুমদার মণ্ডল বুক হাউস
দেহলি দিগন্ত ৪'০০ রমাপদ চৌধুরী গ্রন্থপ্রকাশ
পঞ্চ কন্যা ৪'০০ অমিয়ভূষণ মজুমদার নিউস্ক্রিপ্ট
পঞ্চদশী ৫'০০ শান্তাদেবী মিত্র ও ঘোষ
প্রতিহারিণী ৪'০০ আশুতোষ মুখো: মুকুন্দ পাব্লিশার্স
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি ১'৫০ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো: আনন্দধারা
বনফুলের গল্পসংগ্রহ
(প্রথমশতক) ৮'৫০ বনফুল আই এ পি
বরবর্ণিনী ৩'০০ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত রূপা এণ্ড কোং
মন দেউলে দীপালোক ৩'৫০ দক্ষিণারঞ্জন বসু কনটেমপোরারী পাব্লি
যখন পলাশ ফোটে ৩'৫০ সুমথনাথ ঘোষ মিত্র ও ঘোষ
রহস্যের অন্ধকারে ৪'০০ চিরঞ্জীব সেন মুকুন্দ পাব্লিশার্স
শঙ্খকঙ্কণ ২'৫০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
আনন্দ পাব্লিশার্স প্রা: লি:
শ্রেষ্ঠ গল্প ৬'০০ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই এ পি
সাতটি রাত্রি ২'৭৫ বাণী রায় ত্রিবেণী
সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩'৭৫ নরেন্দ্রনাথ মিত্র গুরুদাস চট্টো:
স্মরণীয় দিন ৬'৫০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র মিত্র ও ঘোষ
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২'৫০ শিবরাম চক্রবর্তী
আনন্দ পাব্লিশার্স প্রা: লি:

উপন্যাস

অচেনা আকাশ ৪'০০ নগেন দত্ত শিক্ষাভারতী
অনিলের পুতুল ৩'৫০ শ্যামল গঙ্গো: মানস প্রকাশনী
অনেক আলোর অন্ধকার ৪'৫০ পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্যজগত
অন্য নয়ন ৪'০০ সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থালয়
অন্তর্জলী যাত্রা ৫'৫০ কমলকুমার মজুমদার
[illegible]শিল্প প্রকাশ
অপাংক্তেয় ৪'০০ সুনীল চক্রবর্তী, ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ
অমিতাক্ষর ছন্দ ৩'০০ সৌবীন সেন সাহিত্যায়ন
অয়নান্ত ৬'৫০ সমরেশ বসু কথাকলি
অলখঝোরা ৫'০০ শান্তা দেবী বেঙ্গল পাবলিশার্স
অসমাপ্ত চটান্দ ৫'০০ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থপ্রকাশ
উর্বশীর তালভঙ্গ ৬'০০ প্রিয়দর্শিনী নাভানা
এক জীবন অনেক জন্ম ৬'৫০ সুধীরঞ্জন মুখো: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এপার ওপার ১'৫০ ইন্দুনীল কনটেম্পোরারী পাব্লিশার্স
এপিডেমিক ৩'৫০ সুশীলকুমার ঘোষ বসু চৌধুরী
কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য় খণ্ড) ১৪'০০ বিমল মিত্র মিত্র ও ঘোষ
কত রঙ ৪'০০ প্রভাত দেবসরকার গ্রন্থপীঠ
কঙ্কাস্থ ২'৫০ বনফুল আই এ পি
কর্ণাট রাগ ৪'০০ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থালয়
কাচ ৩'০০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য সংস্থাধি
কাল তুমি আলেয়া ১২'৫০ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মিত্র ও ঘোষ
কালো চোখের তারা ৩'৫০ কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীগুরু
চোখের বাহিরে ২'৫০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থশ্রী
চৌরঙ্গী ১০'০০ শংকর বাকসাহিত্য
ছন্দ যতি মিল ৬'৫০ ধনঞ্জয় বৈরাগী ত্রিবেণী
ঝড়ের সংকেত ৩'৫০ প্রবোধকুমার সান্যাল শ্রীভারতী
তুমি তৃষ্ণার জল ৩'০০ শৈলজানন্দ মুখো: বিশ্বনাথ পাব্লিশিং
দশটা পাঁচটার ড্যালহাউসি ৩'৭৫ তারকদাস চট্টোপাধ্যায় পুঁথিঘর
দিনান্তের রঙ ৬'৫০ আশাপূর্ণা দেবী এম সি সরকার
দুপুর গড়িয়ে বিকাল ৮'০০ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাসিক প্রেস
দেওয়াল (৩য় খণ্ড) ৮'০০ বিমল কর ডি এম লাই:
দেওয়ালের দাগ ৭'০০ ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য মুকুন্দ পাব্লি:
নীলকণ্ঠী ৭'৫০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র গ্রন্থ প্রকাশ
নীলরেখা ৩'৫০ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিহার সা: ভ:

নীল ঢেউ সাদা ফেনা	৪·০০	কুমারেশ ঘোষ	গ্রন্থগৃহ
পদ্মিনী	২·৫০	সুশীল রায়	আই এ পি
[illegible]	৪·৫০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	গ্রন্থপ্রকাশ
পরিশোধ	৬·০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	সা: জগৎ
পা বাড়ালেই রাস্তা	৫·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	মিত্র ও ঘোষ
পাহাড়ী সন্ধ্যা	২·৫০	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	রীডার্স কর্নার
প্রমত্ত প্রহর	৫·০০	বাণী রায়	অর্চনা পাব্লিশার্স
বনপলাশির পদাবলী	৮·৫০	রমাপদ চৌধুরী	আনন্দ পা: প্রা: লি:
বন্ধনহীন গ্রন্থি	১·০০	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	দেবী
বসন্ত তিলক	৫·০০	সুবোধ ঘোষ	আনন্দ পাব্লি: প্রা: লি:
বিলাতের পূর্বপাট	১·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	শরৎ সাহিত্য ভ:
মক্কেলের নাম বেন মোজেস	৪·০০	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	ন্যাশনাল পাব্লি:
মনচোরা	৩·০০	শরদিন্দু বন্দ্যো:	আনন্দধারা
মনমযূরী	৩·০০	শান্তিরঞ্জন চট্টো:	মানস প্রকাশনী
মনের বাঘ	৪·০০	গৌরকিশোর ঘোষ	ডি এম লাইব্রে:
মসিরেখা	১·০০	জরাসন্ধ	বাক্ সাহিত্য
ময়ূরের মন	১·৫০	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	তুলি কলম
মালদা থেকে মালাবার	৩·০০	দীপক চৌধুরী	এম সি সরকার
মিলন মধুর রাতি	৩·২৫	প্রাণতোষ ঘটক	গ্রন্থ প্রকাশ
মেঘ	২·৫০	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	বসু চৌধুরী
মেঘ ও মৃত্তিকা	৫·০০	হরিনারায়ণ চট্টো:	মিত্র ও ঘোষ
যন্ত্রণার অনুভব	৫·০০	জ্যোতির্ময় চট্টো:	ঋত্বিক প্রকাশন
রক্তবল্লরী	৪·৫০	শক্তিপদ রাজগুরু	গ্রন্থ প্রকাশ
রজনীগন্ধার আগুন	১·০০	বিজনকুমার ঘোষ	দেবী
রাঙা ভাঙা চাঁদ	৪·০০	প্রতিভা বসু	আনন্দ পাব্লি: প্রা: লি:
রাজচ্যুত ঈশ্বর	৫·০০	অচ্যুত গোস্বামী	মিত্রালয়
রোশনাই	৪·০০	সুমথনাথ ঘোষ	মিত্র ও ঘোষ
শ্রাবণী	৯·০০	গৌরীশংকর ভটাচার্য	মিত্রালয়
সঙ্ঘমিত্রা	২·৫০	সঙ্কর্ষণ রায়	গ্রন্থালয়
সন্ধ্যার কুয়াশা	৫·৫০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	মিত্র ও ঘোষ
সমুদ্র অনেক দূর	৩·০০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	ডি এম লাইব্রেরী
সূর্যশিখা	৩·৫০	মায়া বসু	গ্রন্থম
সে নহি সে নহি	১০·০০	চাণক্য সেন	ক্লাসিক
সোনারূপোর কাঠি	২·০০	কবিতা সিংহ	সুরভি প্রকাশনী
স্পর্শের প্রভাব	৪·০০	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	মিত্র ও ঘোষ
কবির গল্প শুনি	১·২৫	অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী	নয়া প্রকাশ
চলো যাই (ভ্রমণ কাহিনী)	১·৮০	ড: অমিয় চক্রবর্তী	শ্রীপ্রকাশ ভবন
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন	১·৮০	শিবরাম চক্রবর্তী	শ্রীপ্রকাশ ভবন
চাঁদে পাড়ি (উপন্যাস)	৩·০০	সুশীল ঘোষ	বঙ্গ সাহিত্য
ছেলেবেলার বিবেকানন্দ	২·০০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	সাহিত্য সংসদ
ছোটদের বৌদ্ধ গল্প	২·০০	সুলতা কর	সাহিত্য সংসদ
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যো:	শ্রীপ্রকাশ ভবন
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	আশাপূর্ণা দেবী	শ্রীপ্রকাশ ভবন
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	শৈলজানন্দ মুখো:	শ্রীপ্রকাশ ভবন
ঝিলমিল বাক্সার দেশে	১·৭৫	সরলা বসু	আনন্দধারা প্রকা:
টলি (উপন্যাস)	২·৭৫	লীলা মজুমদার	আই এ পি
টুইটুই	২·০০	শৈলেন ঘোষ	শি: সা: বিতান
ডেউ কথ কয়	২·০০	সুভাষ সমাজদার	ভারতী বুক ষ্টল
তাই নাকি	২·০০	ননীগোপাল মজুমদার	চিনকো
দণ্ডকারণ্যের বাঘ (উপন্যাস)	৩·০০	সাগরময় ঘোষ	বর্তিক
দুই পাহাড়ের মাঝের দেশ	২·০০	স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	সংযোগ
নীলকুঠির জঙ্গলায়	৩·০০	কানাই পাকড়াশী	মুকুন্দ পাব্লি:
নূতন পুরান	২·০০	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	অভ্যু: প্র: ম:
পিকনিক	২·০০	নমিতা বসু	বেঙ্গল পাব্লি:
পিকলুর সেই ছোটকা	২·৫০	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	মুকুন্দ পাব্লি:
প্রেত পাহাড়ের সরোবর	২·০০	রথীন্দ্র সরকার	আনন্দধারা প্রকা:
বায়ুমণ্ডল (অনুবাদ)	১·৭৫	বিনয় মজুমদার	ন্যাশ: বুক এ:
বিদেশী গল্পগুচ্ছ (অনুবাদ)	২·৭১	বিমল দত্ত	অশোক পুস্তকালয়
বিদেশী ছড়া	২·০০	সুখলতা রাও	এম সি সরকার
বিলিতি ছড়া (২য় খণ্ড)	১·২৫	সুকমল দাশগুপ্ত	ইউ: বুক প্রিণ্টার্স
ভোরের সূর্য (উপন্যাস)	২·০০	পবিত্রতোষ মুখো:	মুখার্জি বুক হাউস
রত্নগিরির রহস্য	২·৫০	সুনীলকুমার গুপ্ত	লেখাপড়া
রত্নদ্বীপ	২·৮০	ঋষি দাস	অশোক পুস্তকালয়
রূপকথার ঝুলি	৩·৫০	মৌমাছি	মিত্র ও ঘোষ
রোল নম্বর ২০৫	২·৫০	পবিমল গোস্বামী	গ্রন্থম
সাগর পারের দেশে	৪·০০	দক্ষিণারঞ্জন বসু	মুকুন্দ পাব্লি:
সিন্ধবাদ সওদাগরের কাহিনী	১·৫০	পূর্ণ চক্রবর্তী	কলিকাতা পুস্তকালয়
সোনালি ছড়া	১·২৫	শৈবাল চক্রবর্তী	অভ্যুদয় প্র: ম:

শিশুসাহিত্য

অচেনা প্রতিবেশী	১·০০	সতীকুমার নাগ	কলিকাতা পুস্তকালয়
অপরূপ রূপকথা	৩·০০	বুদ্ধদেব বসু	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
অশরীরী আত্মা	১·৫০	স্বপন বুড়ো	শরৎ সাহিত্য ভবন
অ্যাণ্ডারসেনের অমর গল্প	১·৫০	দেবদাস দাশগুপ্ত	বাক্ সাহিত্য
আবার ঘনাদা	২·৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	আই এ পি
একদা যাহার বিজয় সেনানী	২·০০	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	জেনারেল প্রিন্টার্স

শিশু-সাহিত্য

আলোর দেশে রাজকুমার	১·৫০	সুজিতকুমার নাগ	জ্ঞানতীর্থ
গল্পমেলা	১·০০	সুজিতকুমার নাগ	ন্যাশনাল পাব্লি:
বীরসাধক বিবেকানন্দ	২·০০	সুজিতকুমার নাগ	
রাত যখন নিঝুম	১·৫০	সুজিতকুমার নাগ	সাহিত্য ভবন
স্বামী বিবেকানন্দ	১·০০	রাণা বসু	বাক্ সাহিত্য
অ্যারাবিয়ান নাইটসের গল্প	১·২৫	অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শরৎসাহিত্য ভবন

রম্যরচনা

বার্ধক্যে বারাণসী (১ম পর্ব)	৫,	নীলকণ্ঠ	রাইটার্স সিণ্ডিকেট
এক ঝাঁক পায়রা	৩·০০	নীলকণ্ঠ	বিশ্ববাণী

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার কাছে একটি ছোট হোটেল, নাম সুজননিবাস। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আহারাদির ব্যবস্থাও ভাল। এ হোটেলের বাসিন্দারা প্রায় সকলেই দীর্ঘমেয়াদী। কাজেই সব কাজ কর্ম বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই চলে। ম্যানেজারবাবু লোক ভাল। বাসিন্দারা সবাই প্রায় চাকুরে, সময়মত হোটেলের পাওনা মিটিয়ে দেন, কাজেই ম্যানেজারবাবুরও মেজাজ বেশ খুসী। জল, আলো, বাতাস কিছুরই অভাব নেই। তাছাড়া ম্যানেজারবাবুর অফিস-ঘরে টেলিফোন আছে, একটি অল-ওয়েভ রেডিও-ও আছে।

দোতলায় দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে থাকে সুজিত। এক ঘরে একাই থাকে। একটা বড় অফিসে কাজ করে। মাইনে মোটামুটি মন্দ নয়। কিছুদিন হ'তে দেখা যাচ্ছে, তার ঘরে হোটেলের কয়েকটি সাধারণ আসবাব ছাড়াও কয়েকটি সুন্দর পালিশ করা চকচকে আসবাব এসে জুটেছে। সেইগুলি দিয়ে ঘরখানি বেশ সাজানো হয়েছে। পাশের ঘরের বিকাশ মাঝে মাঝে আসে সুজিতের ঘরে। সুজিতেরও ভাল লাগে বিকাশের সঙ্গে গল্প গুজব ক'রতে।

একদিন বিকাশ ব'লল, শ্বশুরবাড়ীর জিনিষ দিয়ে ত' ঘর ভর্তি করে ফেললে, আসল জিনিষটার খবর কি? শুধু মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণটা আসটা খেয়েই বা একটা শনিবারে দৈবাৎ শ্বশুরবাড়ী বাস করেই কি দিন কাটবে?

সুজিত বলে, কি আর করব বল? বিয়ে করার আমার ইচ্ছেই ছিল না।

তা কারোরই থাকে না। কিন্তু বিয়ে যখন হলই, তখন একটা বাসা টাসার চেষ্টা করলে হয় না?

কলকাতায় একটা বাসা জোগাড় করা কি সহজ কথা! তবে, খোঁজ কি আর একটু আধটু করছিনে। তোমার চেনাশোনা লোকদের একটু ব'লে রেখো না। যদি একটু ভাল পাড়ায়, ট্রাম-বাসের কাছে, বাজার পোষ্ট-অফিসের কাছে, একটা পার্ক-টার্কের কাছে যদি কম ভাড়ায় একটা নূতন গোছের বাসা পাওয়া যায়—একটু দেখো চেষ্টা করে।

বিকাশ ব'লল, তা দেখব।

এমনি করে দেখতে দেখতে কত মাস কেটে গেল। সুজিতের মা-বাবা থাকেন কলকাতার বাইরে। ছন্দা দিনকতক সেখানে ছিল। কিন্তু অত দূরে সুজিতের যখন তখন যাওয়া হত না। তাই সুজিত ও ছন্দা দু'জনে পরামর্শ করেই স্থির করেছে, নিজেদের বাসা না হওয়া পর্যন্ত ছন্দা তার মা-বাবার কাছে বেলিয়াঘাটার বাড়ীতেই থাকবে। সুজিতের মা-বাবা এতে আপত্তি করেন নাই। সুজিত কখনও অফিস-ফেরত, কখনও শনিবারের সন্ধ্যায়, কখনও রবিবারের বৈকালে বেলেঘাটায় যায়, যতক্ষণ ইচ্ছা সেখানে থাকে, কোন কোন দিন ছন্দাকে নিয়ে বেড়াতে যায়, বাজারে যায় বা সিনেমায় যায়।

ছন্দা বলে, বাসার কি হ'ল? খোঁজ টোজ করছ?

সুজিত বলে, সেটা কি তোমাকে বলে দিতে হবে ছন্দা? এই রকম মাঝে মাঝে আসা, মাঝে মাঝে দেখা, এতে কি প্রাণ ভরে?

আমি বুঝি কিছুই বুঝি নে!

একটু ধৈর্য ধরে থাক, হবেই একটা ব্যবস্থা।

আমার ধৈর্যের অভাব কোথায় দেখলে? এখানে মা বাবা ত' আমাকে কাছে পেয়ে ভারি খুসী। তুমি বাসা মোটে না করলেও এঁরা কিছু মনে করবেন না। ছট-ফট ত তুমিই করছ।

বেশ, তা হ'লে এখানেই থাক। কি দরকার বাসা ফাসা দিয়ে?

যাও! তাই বুঝি বলছি!

এমনি কথা হয় মাঝে মাঝে। খুবই স্বাভাবিক কথা!

সেদিন সুজন-নিবাসের নীচের তলায় রেস্তোরাঁয় বসে সুজিত

আর বিকাশ দু'জন দু'কাপ কফি আর গোটাকয়েক স্যাণ্ডউইচ সামনে রেখে গল্প করছে। সুজিত ব'লল, ভাই, বাসাটাসার কোন খোঁজ পেলে?

এখনো পাই নি। তবে দু'একটা খবর পেয়েছি? দেখা যাক।

সত্যি ভাই, তোমার কাছে কোন কথা আমি লুকাই না। একটা সার জন্ত সত্যি মনটা বড্ডই অস্থির হয়েছে।

ওদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, এমন সময় হোটেলের একটি চাকর এসে খবর দিল, সুজিতবাবুর কাছে টেলিফোন এসেছে।

সুজিত তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে গেল টেলিফোন ধরতে। বিকাশও তার ঘরের দিকে চলে গেল।

টেলিফোন ধরেই সুজিত বলল, ও, তুমি!

চারিদিকে একবার চেয়ে দেখে সুজিত ম্যানেজারবাবুর দিক একটু চাইল। ম্যানেজারবাবু ইঙ্গিত বুঝে একটু হেসে উঠে গেলেন।

সুজিত বলল, তারপর, কি খবর ছন্দা?

খবর আবার কি? খবর না থাকলে বুঝি টেলিফোন করতে নেই?

না, না, তা বলছি নে। তোমার টেলিফোন পেলে আমার কত ভাল লাগে, তা বুঝি জান না?

শোন, তবে একটা খবরই দিই!

কি খবর?

আমরা সবাই, মা, বাবা, দাদা, রণু—সবাই একমাসের জন্ত দেওঘর যাচ্ছি।

সুজিত গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, বেশ, যাও।

শোন, একটা কথা আছে।

কি?

তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে।

সে কেমন করে হয়?

কেন, বাধা কি?

অফিস থেকে ছুটি পাব কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া তোমাদের সঙ্গে—

কেন, দোষ কি?

না, দোষ কিছু না। তবে নূতন জামাইয়ের পক্ষে অফিস কামাই করে শ্বশুরবাড়ী পালালে দেখতে খারাপ হবে না? তোমার মা-বাবাই বা কি মনে করবেন? তাঁরা কি কিছু বলেছেন, না তুমি নিজেই এসব বলছ?

ম্যানেজারবাবু একবার উঁকি মেরে দেখে গেলেন, সুজিত তন্ময় হয়ে টেলিফোন করছে।

ফোনে ছন্দা ব'লল, বলেছেন গো বলেছেন। সেজন্ত তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যাবে কিনা তাই বল?

তোমরা কবে রওনা হচ্ছ, ঠিক করে আমাকে জানিও। আমি এদিকে দেখি, অফিসে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

আচ্ছা, তাহ'লে ঠিক রইল, দিন ঠিক হ'লেই তোমাকে জানাব। তুমিও ছুটির জন্ত চেষ্টা কর। কেমন?

হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন রাখি। আমাদের ম্যানেজারবাবু বারান্দায় পায়চারি করছেন। তাঁরই ঘরে টেলিফোন কিনা।

আচ্ছা। শনিবার বিকেলে আসছ ত? নিশ্চয়ই এসো। একবার মার্কেটে যাবার ইচ্ছে আছে।

আচ্ছা, যাব।

সুজিত বিকাশকে সব কথা ব'লল। বিকাশ লাফিয়ে উঠে ব'লল, এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়তে আছে। যেমন করে হ'ক অফিসের বস্-কে বুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করে ফেল। বুঝলে?

দেখি, ওদের যাবার তারিখটা ঠিক হোক।

তা হোক। এর মধ্যেই তোমার অফিসের যাকে যাকে বলা দরকার, আগে থেকে বলে ক'য়ে রেখো।

ছন্দাদের যাত্রার তারিখ কয়েকদিন পরেই জানা গেল এবং তদনুসারে সুজিত তার অফিসে ছুটির জন্য তদ্বির ক'রতে আরম্ভ ক'রল। পরের শনিবারে যখন সুজিতের সঙ্গে ছন্দার সাক্ষাৎ হ'ল, তখন ছন্দা জিজ্ঞাসা ক'রল, ছুটি মঞ্জুর হ'ল?

এখনো হয়নি তবে আশা আছে।
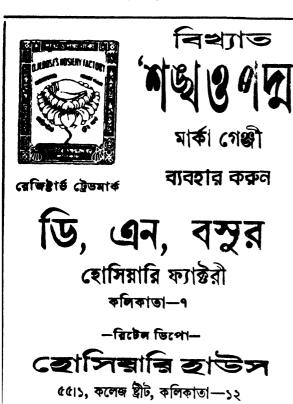
দেওঘরে গিয়ে কেমন একসঙ্গে থাকা যাবে, বেড়ানো যাবে, মনে করলে আমার এখন থেকেই আনন্দ হচ্ছে।

কিন্তু ছন্দা, নূতন জামাই এমন করে শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে কেমন বিশ্রী দেখাবে না?

কেন, তাতে হয়েছে কি? অত লজ্জা কিসের? ওসব কিছু ভেবো না।

ছন্দার মা ঘরে ঢুকে একখানি প্লেটে খাবার এনে সুজিতের সামনে একটি টিপয়ে রাখলেন এবং ছন্দাকে ব'ললেন, যা, চায়ের বাটিটা নিয়ে আয়। সুজিতকে ব'ললেন, হ্যাঁ বাবা, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে শুনে আমাদের খুব আহ্লাদ হয়েছে! অফিস থেকে ছুটি দেবে ত?

বোধ হয় দেবে। তবে এখনো পাকা কথা বলেনি।

হ্যাঁ, বাবা, দেখো যেন ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে যায়।

ছন্দা চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকল এবং ছন্দার মা ধীরে ধীরে ঘর হ'তে বার হ'য়ে গেলেন।

ছন্দা চায়ের কাপ রেখে ব'লল, একটু ব'স। আমার জন্যও এক কাপ চা নিয়ে আসি।

আর এক কাপ চা হাতে ক'রে ছন্দা এসে সুজিতের সামনেই ব'সল এবং দেওঘর গিয়ে কেমন আনন্দ ক'রবে, কেমন মজা হ'বে, তাই নিয়ে আলোচনা ক'রতে লাগল।

একটু পরে ছন্দা ব'লল, মা তোমাকে কি বললেন, আজ এখানে থাকতে বলেছেন? বোধ হয়, না।

কেন বল ত?

আমার এক পিসিমা একটু পরেই ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে আসছেন, দু' তিন দিনের জন্য। কাজেই—

সুজিত ব'লল, আচ্ছা, আজ উঠি তাহ'লে।

রাগ করলে?

না, না রাগ করবো কেন?

সুজিত উঠল।

ছন্দা ব'লল, অফিস থেকে ছুটি মঞ্জুর হলেই খবর দিও।

দেবো।

কয়েক দিন পরে সুজিত অফিস হ'তেই ফোন ক'রল, আমার ছুটি পাওয়া প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, ধরে নিতে পার ঠিকই হয়ে গেছে, তবে লিখিত অর্ডারটা এখনও বেরোয়নি।

ছন্দা ব'লল, বেশ হ'ল। আমি সেইভাবেই গোছগাছ করে নিচ্ছি। তোমাকে কিছু নিতে হবে না। শুধু খানকয়েক ধুতি, পাঞ্জাবী গেঞ্জি, হাফসার্ট, রুমাল, সেভিংসেট এই নিলেই হবে। একটা ছোট সুটকেশ হলেই হবে।

আচ্ছা সে সব ঠিক হবে। তোমাদের দিন ঠিক আছে ত?

হ্যাঁ, এই শুক্রবার সওয়া চারটের গাড়ী। আমরা তিনটে পনের মিনিটে রওনা হব। তুমি ঠিক হয়ে থেকো। তোমাকে তুলে নিয়েই সোজা ষ্টেশনে যাব। পার যদি এর মধ্যে একবার ঘুরে যেও না। ক'দিন ত এদিকে আসোনি।

আচ্ছা দেখি

বৃহস্পতিবার বৈকাল পর্যন্তও সুজিতের অর্ডার বার হ'ল না। সংশ্লিষ্ট কেরাণীরা ব'লল, কাল নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। কি আর করা যায়? সুজিত একটু উদ্বিগ্নমনেই বাসায় ফিরল।

শুক্রবার সকালে ছন্দা ফোনে জিজ্ঞাসা ক'রল, অর্ডার পেয়েছ?

সুজিত ব'লল, না। তবে আজ নিশ্চয়ই পাব।

ছন্দা ব'লল, আচ্ছা। তুমি তিনটে থেকে সওয়া তিনটের মধ্যে ফোন করে জানিয়ে দিও পাকা খবরটা।

তাই দেব। আমার কাছ থেকে শেষ খবর না পেলে আর কষ্ট করে বেলেঘাটা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত শুধু শুধু দৌড়বার কোন মানে হয় না। আমি তিনটে থেকে সওয়া তিনটায় অফিস থেকে জানাতে পারি।

আচ্ছা, তাই কথা রইল। বাপি?

হ্যাঁ।

সুজিত হোটেলের চাকরকে ডেকে ব'লল, এই পাঞ্জাবী দু'টো আর সার্ট তিনটে এই মোড়ের ধোপার দোকান থেকে একটু ভাল করে ইস্ত্রি করে নিয়ে আয় তো। দেখিস যেন পুড়িয়ে ফেলে না।
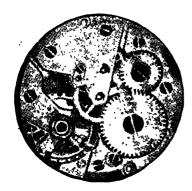
হোটেলের চাকর জানে যে কোন বাড়তি কাজ করলেই বখশিশ পাওয়া যায়। সে মহানন্দে ইস্ত্রি করাতে চলে গেল। অফিস হ'তে কখন অর্ডার নিয়ে ফিরতে পারবে ঠিক নাই। তাই সুজিত একেবারে প্রস্তুত হয়েই অফিসে যাচ্ছে। জুতাজোড়া নিজেই ভাল করে ব্রাস করে রাখল। ভাল করে দাড়ি কামাল। একটি সুটকেশের মধ্যে দরকারী জিনিষপত্র বেশ করে গুছাল। সময়মত স্নানাহার সেরে, যে বেশে ষ্টেশনে যাবে, সেই বেশেই অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। অফিসের কোন কাজের দিকে আর মন নাই। কোনমতে অর্ডারটা হাত করতে পারলেই হয়। বেশ একটু ফিটফাট হয়েই বাড়ীর বার হ'ল। বিকাশ দেখে ব'লল, এ যে দেখছি একেবারে বিয়ের বর!

সুজিত লজ্জিত হয়ে বলল, কাপড় চোপড় সবই বিয়ের সময়কার কিনা। আমার কোন দোষ নেই।

দোষ কিসের? বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে।

যাও!

সুজিত অফিসে গিয়ে কটিনমত কাজ কিছু করল বটে, কিন্তু তার একমাত্র চিন্তা, অর্ডারটা পেলে হয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় দুটোর সময়ে একটি বেয়ারা এসে হাসিমুখে অর্ডারটি তার হাতে দিয়ে যথাস্থানে তার সই নিয়ে চলে গেল। সুজিত তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের কাছে গেল ছন্দাকে ফোন করবে বলে। কিন্তু দু'বার চেষ্টা ক'রল, দু'বারই 'এনগেজড্' এর লম্বা টান শুনে ফোন রেখে দিয়ে তার উপরের অফিসারকে বলে হোটেলের দিকে যাত্রা করল।

পথে ভাবতে লাগল কত কথা। সুটকেশ হাতে করে শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে তার কেমন একটা লজ্জা করবে। হয়ত তারা দুজনকে পাশাপাশিই বসিয়ে দেবে। ট্রেনে উঠে সকলের সামনে ছন্দা কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে? কথা বললে লোকে আর সবাই কি মনে করবে? তার কপালটা যা ফাজিল। দেওঘরে গিয়ে তারা একলা একা বেড়াতে পারবে কি? সত্যি, সুজিতের মনে এই সকল কথা ভেসে উঠছে আর তার মনের মধ্যে একটা আনন্দ শিহরণের ঢেউ উঠছে।

সুজিত যখন সুজন-নিবাসে তার ঘরে পৌঁছল, তখন প্রায় তিনটে। সুজিতের জিনিষপত্র অর্থাৎ একটি সুটকেশ ও একটি ছাতা, গুছানই ছিল। পকেট হ'তে রুমাল বার করে মুখটা ও ঘাড়টা মুছে ফেলল। চট্ করে নীচে গিয়ে রেস্তোরাঁর একটি ছোকরাকে বলে এল, এখানে কোন গাড়ি এসে দাঁড়ালেই যেন তাকে খবর দেয়। ছোকরা সুজিতের কাছে অনেক দিন অনেক টিপস পেয়েছে। তাকে বেশি কিছু বলতে হ'ল না। সুজিত উপরে উঠেই অফিস ঘরে গিয়ে টেলিফোন ক'রল। তখন ঠিক তিনটা। ম্যানেজার মশাই নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছেন। চাকর বাকর কাজ শেষ ক'রে বিশ্রাম ক'রছে। হোটেলের বাসিন্দারা সবাই বাইরে। সুতরাং সুজিত নিরিবিলি ছন্দাকে শুভ সংবাদটা দেবে এবং দুই একটা মনের মত কথাও হয় তো ব'লে নেবে।

এদিকে ছন্দা অফিস হ'তে সুজিতের কাছ কোন খবর না পেয়ে দু'চার বার ফোন ক'রেছে অফিসের ঠিকানায়। দু'বারই 'এনগেজড্'। ছন্দা ভাবছে, যাকগে, তিনটের সময়ে নিশ্চয়ই

ফোন আসবে। রুণুকে ব'লে রেখেছে, ফোনটার দিকে একটু কান রাখিস। বেজে উঠলেই অমনি ধরবি।

সুজিত অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়ে ফোন ডায়াল ক'রল। ও হরি! আবার 'এনগেজড্'। এক মিনিট অপেক্ষা ক'রে আবার ডায়াল ক'রল। এবারও 'এনগেজড্'। তার এক মিনিট পরে আবার ডায়াল ক'রতেই তার কানে গেল, কেয়া বোলতা?

ফোনের মধ্যেই আর একজন ব'লল, দো লাখ।

ফোনের মধ্যেই কথা চ'লতে লাগল।

নেহি। আড়াই লাখ সে কম নেহি হোগা।

আমার কথাটা শুনুন না। বাজারের যা দর তাতে এর বেশি হয় না।

সে হামি জানি না। মগর আড়াই লাখসে কাম হোবে না।

আপ একটু ভাবকে দেখিয়ে।

হাঁ, হাঁ! হাম সক্ত সোচা হায়। আড়াই লাখসে এক হাজার কম হোবে না মশাই।

সুজিত অধৈর্য হ'য়ে ব'লল, ফোনটা একটু ছেড়ে দিজিয়ে, মেহেরবানি ক'রে।

ফোনের মধ্যে শব্দ হ'ল, নেঁহ।

সুজিত ব'লল, মানে, আমার একটু জরুরি কাজ আছে।

ফোনের মধ্যে শোনা গেল, নেহি নেহি, কভি নেহি ছোড়েগা।

শেঠজি, একটু ছেড়ে দেখুন। আমার বড় লোকসান হয়ে যায়।

সে হামি জানি না।

সুজিত অস্থির হ'য়ে ব'লে উঠল, আ ম'লো যা।

ফোনের মধ্যে শব্দ হ'ল, মুলুকে কোন ভাষা। হামি জানি না।

সুজিত অগত্যা ফোন ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি সহ্য হয় না। মিনিটটা পাঁচ মিনিট প্রায় হ'ল। তিনটে চার মিনিটের সময়ে সুজিত আবার ডায়াল করল। ফোনে শব্দ হ'ল, মেয়েলি গলায়, হ্যাঁ, আমি।

সুজিত প্রথম মনে ক'রল, ছন্দার গলা বুঝি। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভুল ভেঙ্গে গেল। ফোনের মধ্যেই শোনা গেল আর একটি মহিলার গলা। তিনি ব'লছেন, ও, আমি ত' তাই বলি। এমন সময়ে কে টেলিফোন করবে। তা, কি খবর? সব ভাল?

হ্যাঁ। খবর একরকম ভালই। তবে হাসিটার জরটা ছাড়ছে না।

ও যাবে। আজকাল দেখছ না, ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'লেই অমনি হয়। একটু একটু জ্বর লেগেই থাকে অনেক দিন।

খাই খাই করে বড় জ্বালাতন করছে।

খেতে চাইবে খেতে দেবে। কিছু খেতে মানা নেই।

হ্যাঁ, যা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম, রেবার মেয়ের বিয়েতে তুমি কি দেবে?

কি আর দেব? একখানা শাড়ীই দেব ভেবেছি।

আমিও তাই ভেবেছি। একটা কিছু গয়না দেব ভেবেছিলাম, তা আর হয়ে উঠবে না। আচ্ছা, তোমার নতুন ব্রেসলেটার প্যাটার্ণ আমাকে দেখাবে বলেছিলে, তা কই দেখালে না ত?

আর প্যাটার্ণ দেখে কি হবে, ক'দিন পরে একেবারে জিনিসটাই দেখো।

সুজিত ব'লল, দেখুন, ফোনটা একটু ছেড়ে দেবেন? আমার একটু দরকারী কথা ছিল।

ফোনের ভিতর হ'তে উত্তর এল, আপনার দরকারী কথা তাতে আমার কি? দেখ, কে যেন আবার ফোন ধরেছে। হ্যাঁ, তুমি না বলেছিলে, আসছে শনিবারে 'চিত্রায়' যাবে?

টিকিট পেলে নিশ্চয়ই যাব।

ছবিটা নাকি বিশ্রী হয়েছে।

যাই, দেখে আসি, কেমন বিশ্রী, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তুমিও চল না।

না, ভাই, এ শনিবারে আমার যাওয়া হবে না। আমার ননদ ছেলে মেয়ে নিয়ে সেদিন এখানে বেড়াতে আসবে।

তোমার ত কেবল ননদ আর ননদ।

আমার ননদরা খুব ভাল, জানো। তোমার মত নয়।

সত্যি, ভাই।

সুজিত অনুনয় করে বলল, দেখুন অনুগ্রহ করে একটু ফোনটা ছেড়ে দিন। আমার বড্ড দরকার।

ফোনে উত্তর এল, আমাদেরও বড্ড দরকার।

আপনারা ত নানা রকম গল্পসল্প করছেন। পরে করলেও চলতে পারে।

চলতে পারে কি না পারে তা আপনি বলবার কে? আপনি ভারি ইয়ে দেখছি।

মানে, আপনাদের সব কথাগুলো একবারেই বলে না ফেলে ক্রমে ক্রমে বলতে পারেন।

পাঁচটা কথা পাঁচবার বললে পাঁচটা কলের চার্জ হবে না?

তাই বুঝি এক বছরের কথা একবারেই সেরে নিচ্ছেন।

মশাই, আপনি এসব কথা বলবার কে? আমরা ফোন ছাড়ব না। পয়সা দিয়ে ফোন নেই নি?

সুজিতের মুখে উত্তর জোগায় না।

ফোনের মধ্যে শোনা যায়, আচ্ছা, দাও না ছেড়ে, ভদ্রলোক অত করে বলছেন।

কিছুতেই ছাড়বো না। হ্যাঁ, শুনেছ দত্তবাড়ীর খবর?

কি খবর? শুনিনি ত।

শাশুড়ী বউএ বেশ একপ্রস্থ হয়ে গেছে।

তাই নাকি?

তা হবে না। দু'জনের কেউই কম যায় না তো।

এদিকে ছন্দা উদ্বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখছে। তিনটে দশ হল

প্রায়। সুজিত কোন খবর দিল না। তাহ'লে কি ছুটি পায়নি। নইলে খবর না দেবার কোন কারণই নেই। কি হ'ল? হঠাৎ কিছু ঘটল নাকি? ব্যস্ত হয়ে চলতে ট্রাম-বাসে কিছু হ'ল না ত? যখনই ফোন করে, শোনে 'এনগেজড'। কারা বসে বসে ঠিক এ সময়ে সুজন-নিবাসে ফোন করছে! কি মুস্কিল!

একটু থামবার পর সুজিত আবার বলল, দয়া করে ফোনটা একটু ছাড়ুন না। বড্ড দরকার। আমার স্ত্রীকে একটা অত্যন্ত দরকারী কথা বলতে হবে।

ফোনে শব্দ হল স্ত্রীকে দরকারী কথা! সে আমার জানা আছে। অফিস থেকে ফোন করছেন, দু'খানা সিনেমার টিকিট করেছেন, পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরেই সিনেমায় যাবেন, তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন। এই ত? তা তাঁর প্রস্তুত থাকবার দরকার নেই। প্রস্তুত হ'তে তাঁর মোটেই দেরি হবে না। বরঞ্চ বিনা নোটিশে দু'খানা সিনেমার টিকিট তাঁর সামনে নিয়ে ধরলে, তিনি আহ্লাদে আটখানা হবেন। সুতরাং আপনার এখন ফোন করবার কোন দরকার দেখছি নে। ছিঃ ছিঃ, শুনলে ভদ্রলোকের দরকারী কথা? উনি স্ত্রীকে বলবেন, সিনেমায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে।

কই, সে কথা উনি বলেন নি।

তা, না বলুন, আমি ফোন ছাড়ছি নে। জানো ভাই, আমাদের সুরমা হাসপাতালে।

তাই নাকি? কি হ'ল, ছেলে না মেয়ে?

হয়েছে ছেলে। কিন্তু সুরমার জীবন সংশয়।

কেন? কেন?

সিজারিয়ান করতে হয়েছিল।

কেমন আছেন এখন?

বোঝা যাচ্ছে না।

ডাক্তারেরা কি বলেন?

তাঁরা বলছেন, জীবনের ভয় নেই। তবে সেরে উঠতে দেরি লাগবে।

তিনটে বেজে এগার মিনিট হয়েছে। সুজিত হাতঘড়ির দিকে চেয়ে শিউরে উঠল। আর মাত্র চার মিনিট! এদের কথা যে শেষ হবে, তা মনে হয় না। সুজিতের সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে। আদ্দির পাঞ্জাবীটা গলা ও বুকের সঙ্গে একবারে চপচপে হয়ে লেগে গেছে। কপালের ঘাম একটু মুছে সুজিত প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে ব'লল, দেখুন আপনার পায়ে পড়ি, একটু ছেড়ে দিন ফোনটা।

ফোনে শব্দ হ'ল, ছিঃ ছিঃ, কি ছেলেমানুষ আপনি! স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলবার জন্য এত? নূতন বিয়ে করেছেন বুঝি। আমাকে না দেখেই পায়ে পড়ছেন, দেখলে না জানি কি করতেন!—শুনলে ভদ্রলোকের কথা!

তুমিও ভাই বড় নাছোড়বান্দা।

তা, নূতন জামাইবাবুর সঙ্গে একটু—

কিন্তু সত্যিই যদি ওঁর কোন দরকারী কথা থাকে?

যত দরকারী কথাই থাক, দশ-বিশ মিনিটে কিছু আসবে যাবে না।

সুজিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'লে ফেলল, উঃ মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয়, তা জানতাম না।

কি করে জানবেন? সবে বিয়ে করেছেন। যাক দু'-চার বছর।

সুজিত ঘড়ি দেখল, তিনটা বারো মিনিট। আর তিন মিনিট পরই ছন্দা যাত্রা করবে। সে নিশ্চয়ই মনে করবে, আমার ছুটি মঞ্জুর হয় নি। শেষবারের মত চেষ্টা করবার জন্য সুজিত বলল, দেখুন, দয়া করে ফোনটা ছাড়ুন এবার। সত্যি, অত্যন্ত দরকারী কথা আছে।

ফোনে উত্তর এল, আমার কথা শেষ না হ'লে আমি ফোন ছাড়ব না।

সুজিত হতাশ হয়ে বিষণ্ণ মুখে বসেই রইল। তবু তিনটে পনেরো পর্যন্ত কানটা ফোনের সঙ্গে আটকিয়ে রইল। কোন লাভ হ'ল না। ফোনের মধ্যে কলকল শব্দে কথার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বিরামের কোন লক্ষণ নাই। তিনটে সতের মিনিটের সময় সুজিত ফোন ছেড়ে দিল।

নিজের ঘরে গিয়ে জামা, জুতো, হাতঘড়ি, সব খুলে ফেলে খাটের উপর শুয়ে রীতিমত ছটফট করতে লাগল। তিনটে কুড়ি মিনিটের সময় আবার অফিসঘরে গিয়ে ফোন ক'রল আর অন্য কারও কথা শোনা যাচ্ছে না। ফোন খানিকক্ষণ ধ'রে কররর—কররর—ক'রে চ'লল। ওদিক হ'তে কোন সাড়া নেই। বেশ খানিকক্ষণ পরে একটি গম্ভীর গলা ব'লল, হ্যালো?

সুজিত ব'লল, ছন্দা দিদিমণি হ্যায়?

নেহি। দিদিমণি, বাবু, মাইজি সব দেওঘর চলা গিয়া।

সুজিত ঠকাস ক'রে রিসিভার রেখে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ধপাস ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং ভাবতে লাগল, উঃ কি লজ্জা! হোটেলের লোকেরা কি মনে ক'রবে! বিকাশ কি মনে ক'রবে! ছিঃ ছিঃ, এ কি কাণ্ড! ওঁরা নিজেরা এসে গাড়ী করে নিয়ে যেতেন ত যাওয়া যেত। এখন গায়ে পড়ে হ্যাংলার মত কি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওঠা যায়? তাও আবার কলকাতার বাইরে। নাঃ, সে হয় না। কাল থেকে আবার অফিসেই বেরোনো যাক। ছিঃ, অফিসে গিয়ে কি বলব? আমাদের সেকশানের টাইপিস্ট মেয়েটা সব জানে, ভারী দুষ্টু মেয়েটা কি মনে ক'রবে যে? নিশ্চয়ই মুচকি মুচকি হাসবে। দিন কয়েক অফিস যাওয়া বন্ধ করলে কেমন হয়? লাভ কি অফিস কামাই করে হোটেলের ঘরে শুয়ে কড়িকাঠ গুণে?

বিকাশ দূর হ'তে সুজিতের ঘর খোলা দেখে ঘরের দরজায় এসে দেখে, সুজিত খাটে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ ক'রছে। বিকাশ খাটের পাশে একখানি চেয়ারে বসে উদ্বিগ্ন ভাবে ব'লল, কি, অসুখ-বিসুখ করল নাকি হঠাৎ। তুমি এখনো যে এখানে?

সুজিত প্রথমে কিছুই ব'লতে চায় না। পরে আস্তে আস্তে বিকাশের কাছে সব কথাই ব'লল। ফোনের মধ্যে অন্য মহিলাদের কথাবার্তাগুলি শুদ্ধ তাকে ব'লল। বিকাশকে সব কথা বলার ফলে ওর মনের ভার যেন একটু লঘু মনে হ'ল।

বৈকালে বিকাশ সুজিতের ঘরে এসে তার সঙ্গে চা খেতে খেতে ব'লল, একটা ভাল ছবি আছে। চল; দেখে আসি।

সুজিতের ইচ্ছা ছিল না আজ কোথাউ বার হয়। কিন্তু বিকাশের অনুরোধ এড়াতে পারল না। বিকাশ ব'লল, হোটেলের ঘরে ব'সে ব'সে বউয়ের ভাবনা না ভেবে, চল, ছবিটবি দেখলে অন্যমনস্ক হতে পারবে।

সুজিত আর আপত্তি ক'রল না। সন্ধ্যার সময়ে তারা শ্যামবাজারের কাছেই একটা সিনেমায় ঢুকে প'ড়ল।

ছবি দেখা শেষ হ'ল।

বাইরে এসে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক সিনেমা ঘর হ'তে বার হয়ে ওদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখেই বলে উঠলেন, ওই যে দু'টি ছেলে, ওর একটি আমাদের সুজিত না? ছন্দার সঙ্গে যার বিয়ে হ'ল?

হাঁ, তাই ত, ব'লে মহিলাটি একটু এগিয়ে গেলেন এবং ভদ্রলোকটিও তাঁর অনুসরণ ক'রলেন। মহিলাটিকে এখনও প্রায় তরুণীই বলা যায়, যদিও সুজিতের চেয়ে হয়তো বড়ই হ'বেন। একটি রূপসী যুবতী এগিয়ে আসছেন দেখে সুজিতের একটু কৌতূহল হ'ল, একটু বিব্রতও বোধ ক'রল। মহিলাটি তার কাছে এসে ব'ললেন, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তন্দ্রা, ছন্দার মাসতুত বোন।

সুজিতের মনের ভাব তখনও কাটে নাই। তবু ভদ্রতার খাতিরেই একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে ব'লল, হাঁ, এখন মনে পড়ছে। অনেকদিন দেখিনি কি না।

তবু ভাল যে চিনতে পেরেছ। তোমাদের খবর কি? সব ভাল আছ?

হাঁ, ভালই আছি।

বিকাশ সুজিতের পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। সুজিত তাকে দেখিয়ে ব'লল, ইনি আমার একজন বন্ধু বিকাশ।

তন্দ্রা ব'লল, বেশ, বেশ। ও হাঁ, আচ্ছা শুনেছিলাম না, ছন্দারা দেওঘর যাবে? কবে যাচ্ছে তারা? তোমারও ত যাবার কথা আছে ওদের সঙ্গে। তাই না। বেশ, যাও বেড়িয়ে এসো।

সুজিত ব'লল, ওরা চলে গেছেন।

চলে গেছেন? কবে?

আজ।

তুমি গেলে না যে?

সুজিত সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না, বিকাশ তা লক্ষ্য ক'রে সুজিতের হ'য়ে উত্তর দিল, একটা বিভ্রাট হয়ে গেছে।

তন্দ্রা উদ্বিগ্নস্বরে ব'ললেন, কি হ'ল আবার মান-অভিমানের পালা নাকি? না, একটু ঝগড়া-ঝাঁটি? তা বিয়ের পরে নতুন নতুন একটু আধটু অমন হয়ে থাকে।

বিকাশ ব'লল, না, না, সে সব কিছু নয়।

তবে?

সুজিতের ছুটি আজই মঞ্জুর হয়েছে। কথা ছিল, ছুটি মঞ্জুর হ'লে সুজিত টেলিফোন ক'রে ওর শ্বশুরবাড়ীতে খবর দেবে, ওঁরা হাওড়া যাবার পথে সুজিতকে তুলে নিয়ে যাবেন।

তার পর?

কিন্তু, ওঁদের যাত্রা করবার আগে টেলিফোন আর করা হল না।

কেন? কেন?

আফিস থেকে যে টেলিফোন ক'রেছিল, দু'তিন বার খালি এনগেজড্'-এর শব্দ। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এসে ওঁদের যাত্রার কিছু আগে যখন টেলিফোন ক'রতে গেল, ; সে এক মহা বিভ্রাট।

কি বিভ্রাট?

টেলিফোনের মধ্যে সুজিত শুনতে পেলে আর দু'টি মহিলা কথাবার্তা ব'লছেন।

তারপর?

তাঁদের কথা আর শেষ হয় না।

তন্দ্রা তাড়াতাড়ি ব'লল, ওই ত মেয়েদের দোষ, টেলিফোন হাতে পেলে আর ছাড়তে চায় না। তা, একটু ধ'রে থেকে, ওদের কথা শেষ হ'লে কথা ব'লতে পারতে?

কথা শেষ আর হ'ল না। ওঁর শ্বশুর বাড়ীর লোকরা নিশ্চয়ই ভাবলেন, সুজিত ছুটি পায় নি। এদিকে ফোন এনগেজড্ থাকায় তাঁরাও আর খবর নিতে পারেন নি। যে সময় দেওয়া ছিল হাওড়ায় গিয়ে গাড়ী ধরবার, সে সময় পর্যন্ত দেখে তাঁরা চ'লে গেছেন নিশ্চয়। সুজিত ক'বার অনুনয় বিনয় করে ফোনের মধ্যে ব'ললে, অনুগ্রহ ক'রে একটু ছেড়ে দিন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা আছে। তা গ্রাহ্যই করলেন না, তাঁরা কথা ব'লেই চললেন।

তন্দ্রা ব'লল, কি অন্যায় বলুন ত'। সে মহিলাটির কি একটু চক্ষুলজ্জা নেই, একটু ভদ্রতা নেই, একটু বিবেচনা নেই, ছি। এতক্ষণ ধ'রে কি কথা হ'চ্ছিল তাঁদের?

বিকাশ ব'লল, সে কত রকম কত কথা। ঘরকন্নার কোন কথাই বাদ ছিল না, বোধ হয়।

তন্দ্রা ব'লল, এই-সব অবিবেচক বাচাল মেয়েগুলোকে, আমার ইচ্ছে করে, খোপার বিনুনিটা ধ'রে বেশ ক'রে ক'ষে ঝাঁকুনি দিয়ে টাস ক'রে দু'গালে দু'টো চড় বসিয়ে দি। কি যে এত কথা বলবার থাকে টেলিফোনে, তা ব'লতে পারি নে।

বিকাশ ব'লল, সে কত রকম কথা। মেয়ে হাসির ইনফ্লুয়েঞ্জার খবর থেকে সুরু ক'রে কোন এক আত্মীয় স্বজনের সিজারিয়ান অপারেশনের খবর—

সহসা এক কাণ্ড ঘটে গেল। তন্দ্রাদেবীর মুখখানা যেন একেবারে সাদা হ'য়ে গেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে যেন মাটিতে প'ড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। তাড়াতাড়ি তাঁর স্বামী এবং বিকাশ দু' পাশ হ'তে দু'খানি বাহু ধ'রে ফেললেন।

বিকাশ ব'লল, এমন হ'ল কেন? ওঁর কি হিষ্টিরিয়া আছে?

তন্দ্রার স্বামী প্রকাশবাবু ব'ললেন, না, ওসব অসুখ ওঁর নেই। ওঁর কোন অসুখ বিসুখই নেই।

তন্দ্রা নিজেকে সামলে নিলেন। একবার ভাবলেন, টেলিফোনের ব্যাপারটা একেবারে চেপে যাবেন। কিন্তু সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে তা পারলেন না। সুজিতের কাছে গিয়ে ব'ললেন, ভাই সুজিত!

সুজিত নীরব।

তন্দ্রা ব'ললেন, আমারই জন্ত তোমার আজ দেওঘর যাওয়া হয় নি। আমাকে ক্ষমা কর ভাই। আমিই সেই টেলিফোনের ভিতরে যাঁরা কথা ব'লছিলেন, তাঁদের একজন।

বিকাশ সুজিতের কানে মুখ নিয়ে ব'লল, দাও না ওঁর খোঁপা ধ'রে গোটা কতক ঝাঁকানি—তখন ব'লেছিলে না—যদি একবার মহিলাটি'ক পেতাম—

সুজিত চাপা সুরে ব'লল, আহা, থামো না।

তন্দ্রা ব'ললেন, সত্যি ভাই সুজিত, আমার ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

সুজিত শ্যালিকা সন্দর্শন মনে মনে পুলকিত হয় তাঁকে সহজেই মনে মনে ক্ষমা ক'রে ফেলল। ব'লল, কেন আপনি অমন ক'রে বলছেন? আপনি ছন্দার চেয়ে কত বড়।

তন্দ্রা ব'ললেন, রাত হ'য়ে গেছে। চলুন আপনারা আমাদের গাড়ীতে। আপনাদের পৌঁছে দিয়ে যাই।

বিকাশ ব'লল, আমরা ত' উল্টো দিকে যাব। কেন আর কষ্ট ক'রবেন?

কষ্ট আবার কি? আসুন।

গাড়ীর কাছে গিয়ে সুজিত ড্রাইভারের সীটের পাশে ব'সতে যাচ্ছিল, কিন্তু তন্দ্রা তাকে টেনে নিয়ে পিছনের সীটে নিজের পাশে বসালেন। ওর কাঁধে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ললেন, কেমন ভাই, রাগ গেছে ত'? আমিও ভেবেছিলাম হাসিকে নিয়ে ছন্দাদের ওখানে দিন কতক ঘুরে আসব। হাসির শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না।

প্রকাশবাবু ড্রাইভিং সীট হ'তে ব'ললেন, বেশ, দিনকতক এস না ঘুরে। আমার এখন কলকাতা ছেড়ে এক পাও নড়বার জো নেই।

তন্দ্রা ব'ললেন, তোমার নড়বার দরকার নেই। আমি সুজিতকে নিয়ে দিনকতক ঘুরে আসি।

প্রকাশবাবু ব'ললেন, তাই যাও।

ঠিক ত'। তা হ'লে কালই আমি যাচ্ছি হাসিকে নিয়ে।

ভালই ত'।

তন্দ্রা সুজিতকে ব'ললেন, তা হ'লে এই কথা রইল, কাল তিনটের সময়ে তোমাকে তুলে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে যাব। আর কোন ফোন করবার দরকার নেই। প্রস্তুত হ'য়ে থেকো।

সুজিত এবার একটু হাসল। ব'লল, আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি।

গাড়ী সুজন-নিবাসের দরজায় দাঁড়াইতেই বিকাশ ও সুজিত নেমে প্রকাশ ও তন্দ্রাকে নমস্কার ক'রল। তন্দ্রা ও প্রকাশ প্রতিনমস্কার জানালেন।

তন্দ্রা ব'ললেন, কাল তিনটে।

সুজিত বিনীত সুরে ব'লল, হ্যাঁ।

সরোদ শিল্পী আলী আকবর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পান্নালাল দত্ত
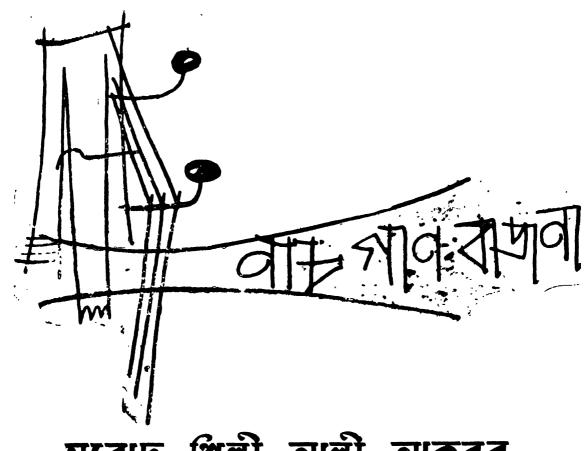
শিল্পী তাঁহার বিশ্বসঙ্গীত পরিক্রমার অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জ্ঞানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিদেশে প্রচারভিত্তির বৈতালিক দল গঠনে সমর্থ। ভারত সরকারের সহযোগিতায় প্রতি বছর নিয়মিত এইরূপ বৈতালিক দল বিদেশে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে তাঁহাদের নৈপুণ্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ব্যবসায়ভিত্তিক একটি লাভও হইতে পারে। ভারত সরকার এর দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পথটিও সুগম করিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত হালকা চালের পাশ্চাত্য সঙ্গীত 'রক-এন-রোল,' 'তাত্তা', টুইষ্ট'-এর দেশেও ঐতিহ্যবাহী আর একটি সুসমৃদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যমান। শেষোক্তটির সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাঁর সরোদবাদন সেই সব দেশের লোকের অভিনন্দন পাইয়াছে। অধুনা ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ললিত-কলার সর্বক্ষেত্রে একক নৈপুণ্যের প্রদর্শনকারী ও অধ্যবসায়ীর সংখ্যা কম হইলেও আলী আকবর খান স্বাভাবিক ভাবেই জনমানসে নিজের আসনটি বাছিয়া লইয়াছেন। সুরশিল্পী আলী আকবরের ভূমিকা মধ্যযুগের রাজপুত শৌর্যবীর্যের দিনে নৃপতিদের সঙ্গে ভট্টকবিগায়কদের ভূমিকার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসিবার মন্ত্রটি তিনি বাজাইয়া তোলেন তাঁর সরোদ যন্ত্রে।

শিল্পীর যথার্থ পরিচয় তাঁহার শিল্পকর্মের মধ্যেই আছে। সার্থক তাঁর দৌত্য, সার্থক তাঁর সৃজনী প্রতিভা। ঐশ্বর্যে ইনি শ্রেষ্ঠ, মাধুর্যে ইনি শ্রেষ্ঠ; তাঁহার শিল্পকর্মের ভাণ্ডার ফুরাইতে এখনও অনেক বাকী, আলী আকবর খানের বর্তমান বয়স একচল্লিশ। এরই মধ্যে তাঁর জীবনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া তিনি বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছেন। সংস্কৃতির-সমন্বয়ী সেতু আলী আকবর দেশে-বিদেশে ভারতের অধ্যাত্ম দর্শনের বাণীই বহন করিতেছেন।

বৃটিশ ভারতে রাজনৈতিক চেতনায় সমগ্র ভারতকে উদ্বোধিত করিয়াছিল বাঙলা দেশ। এখন আবার স্বাধীন ভারতে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষে অগ্রণী হইয়া সীমিত প্রাদেশিক স্বার্থ হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া ঐক্যবোধের সৃষ্টিতে বাঙলাই যে আগাইয়া আসিবে, এতে আশ্চর্য হইবার কী আছে। ভারতবোধের মহান্ প্রত্যয়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার মহান প্রয়াসে শিল্পীর রাগালাপের অবদান নিতান্ত কম নয়।

একদিনের একটি সাঙ্গেতিক ঘটনার উল্লেখ কতকটা অবান্তর হইলেও লিখিতেছি : ওস্তাদের বাড়ীতে ছাদে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে এবং তাহাতে অহোরাত্র গান বাজনা হইয়া থাকে। আমাকে তিনি আগের দিন গানবাজনা শুনতে আসিতে বলায় আমি আমন্ত্রণ রক্ষা করি। গত বছরের ঘটনা এইটি। সাহিত্যের জারকরসে রসাল করিবার শক্তি আমার নাই, নীরসপল্লী-টুকুই আমি দিতেছি। অনুষ্ঠানের সর্বশেষে শুরু হইল যন্ত্রসংগীতের বিশেষ অনুষ্ঠান—ওস্তাদ আলী আকবর খান (সরোদ)। তদীয় পুত্র আশিস খান (সরোদ), ছাত্র নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার) ও ছাত্রী শিশিরকণা ধর-চৌধুরী (বেহালা)। যুগপৎ এতগুলি যন্ত্রে এঁরা সুরের মন্দাকিনীধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন। সিন্ধুভৈরব রাগের বিলম্বিত লয়ে আলাপে মীড়ের অপূর্ব চমৎকারিত্বে এবং শেষে একই রাগের গৎতোড়া বাজাইয়া যখন বাজনা বন্ধ হইল তখন আমাদের মধ্যে অনেকেরই বাহ্যজ্ঞান প্রায় ছিল না। পরে এই দিনের বাজনা আমার কি রকম লাগিয়াছে তিনি জিজ্ঞাসা করার বিনা দ্বিধায় বলিয়াছিলাম—'আপনি যাদু জানেন।' পরে তিনি অবশ্য স্বীকার পাইলেন যে, এমন বাজনা তাঁর হাতে খুব কম দিনই বাহির হইয়া থাকে। বাস্তব ঘেঁষা শিল্পী বলিয়াই তাঁহার বাজনা মনে কঠিন অনুভূতি জাগায়, পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছিলেন, 'মানুষের মন চিরকালই শৈশবের সরলতায় ফিরিয়া যাইতে চায়।' তাঁহার সংস্পর্শে আসিলেও দেবশিশুর সরলতায় মনে আত্মিক অনুভূতি জাগে। আনন্দ স্মৃতি মনে লইয়া সেদিন ঘরে ফিরিবার সময় উপরোক্ত উক্তির যথার্থতা মনে পড়িয়া গেল। সংসংগীত পরাজয়ের গ্লানি, ব্যর্থতা, জীবনের দুঃখ-সন্তাপ, দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা ভুলাইয়া মানুষকে আলোর নিশানা দিক—সন্ধান দিক কাল হইতে কালান্তরে, দূর হইতে দূরান্তরে কোন অনির্বচনীয় লোকের—

'হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোথায় অন্য কোনখানে।'

শিল্পীর প্রতিভার উন্মেষ হইতে সুরু করিয়া পরিণতির সীমা পর্যন্ত তাঁহার ধ্যান তন্ময়তা মুক্তির আনন্দতীর্থে তাঁহাকে পৌঁছাইয়াছে; জন্মলগ্নের নবপ্রভাতেই তিনি বেলা শেষের আহ্বান-ধ্বনিও শুনিতে পান। এবং একথাও ঠিক যে, ভোরের ভৈরবীতেই তিনি 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের' করুণ সুরটি সাধিয়া লইয়াছেন। তিনি নিতান্তই যুবাবয়সের শিল্পী! অপরিণত বয়সেই তাঁর বাজনার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলা যায়।

নিজের স্বকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ হইতে না দিয়াও তিনি পূর্বসুরীদের অর্জিত জ্ঞান সম্ভার হইতে গ্রহণ করিবার ক্ষমতার পরিচয় দেখাইয়াছেন। প্রকৃত শক্তি তো এইখানে? যদিও তাঁহার প্রতিভা সর্বত্রগামিনী হইতে পারে নাই এবং তাহা হইতেও পারে না। একজন প্রাচীন ঋষির উক্তি, 'কোন পাখীই তার নিজের ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।' আলী আকবর খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি কোন কোন সময় নিজের সীমাকেও লঙ্ঘন করিতে পারিয়াছেন তাঁর অনুপম সুরে।

জীবিত থাকিয়া তিনি হাজার বার মরিতে ইচ্ছুকগণের দলে নাই। গতির শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, কেবলই টানাপোড়েনের মতুর আসা যাওয়া। তাঁহাকে দেখিয়াছি এইখানে সেইখানে ছুটাছুটি—ঘূরপাকে, তাঁহার বেদনাকরুণ দৃষ্টিভঙ্গী হইয়া শিক্ষার্থীদের ভুল শুধরাইতেও দেখিয়াছি। সরোদই তাঁহার সাধনা। খুব অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু ঘর-ঘরণী পুত্র-কন্যাকে ফেলিয়া রাখিয়াও স্রোতের তোড়ে কচুরীপানার ন্যায় তাঁহাকে ছুটিতে হয় দেশ-বিদেশ—এই গতিই তাঁর সাধনার আসল কথা। গতিই তাঁর জীবন।

সর্বশেষ হইলেও সর্বপ্রধান কথা,—আমাদের দেশে আজকাল এক প্রকার বর্ণসঙ্কর চটুল আধুনিক গানের বাড়াবাড়ি প্রকৃত সংগীত-পিপাসুদের কাছে কর্ণ পীড়াদায়ক এক উদ্ভট প্রহসন বলিয়াই ঠেকে। যার না আছে সুরের গভীরতা—না আছে বাণীর আবেদন! অথচ, কতকগুলি জনপ্রিয় মাধ্যমে যেমন গ্রামোফোন রেকর্ড, ছায়াছবি, পূজা প্যাণ্ডেল এমন কি বেতার মারফৎ এগুলি সহজেই অল্পবয়সের সুকুমারমতি বালকদের আকৃষ্ট করিয়া তোলে। অভিভাবকদের নিকট হইতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিলে জাতীয় চরিত্র গঠনের পরিপন্থী আধুনিক গান বাজনার বহুল প্রচারণা আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,—মার্কিন মুলুকে অতি সম্প্রতি চটুল রক-এন্‌-রোলের প্রচারণার সময় সংক্ষেপিত করিয়া দিয়াছেন সেখানকার বেতার কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকদের প্রতিবাদে সেখানে কাজ হইয়াছে।

একদা আধুনিক বাঙলা গানকে দেব সম্মান দিয়া দেশবাসী যে বড় ভুল করিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ঘটিবে শাস্ত্রীয় সংগীতের উপলব্ধির মধ্য দিয়া। ফল কথা, উচ্চাঙ্গসংগীতকে তাহার নিজের মূল্যে ভালবাসিতে না শিখিলেও অন্ধের হস্তী দর্শনের অবস্থা আমাদের আজও হয় নাই; অন্ধলোকগুলি কিন্তু মিথ্যাবাদী ছিল না।

সরোদ সাধক আলী আকবর খাঁ-র নাম আজ আর শুধু একটি নাম নয়—তার চেয়েও কিছু বেশী—একটি প্রতিষ্ঠান।*

কোলা ফোলা 'বেবীফেস্', মাথায় সুপরিসর টাক, গায়ে পাঞ্জাবী ও পায়জামা তাঁর ব্যক্তিত্বের অভিনব দিকটির ইঙ্গিত দেয় না,—কিন্তু এই সম্বল করিয়া আসরে সরোদ বাজাইতে বসিলে চিত্তের ঔদার্য ও নির্লিপ্তিতে এক দিব্য জীবনের পথপ্রদর্শনকারী যোগ-সাধক বলিয়াই মনে হয়। তাঁর বহিরঙ্গের কর্মচাঞ্চল্য তাঁর মনের প্রশান্তিকে ব্যাহত করে নাই। ধৈর্য, তিতিক্ষা, নিরলস কর্মসাধনা তাঁর নিষ্কাম সাধন জীবনে সফলতা ত্বরান্বিত করিয়াছে। তিনি আত্মাকে জানিতে চাহিয়াছেন—সত্যকে জানিতে চাহিয়াছেন। তাঁর জীবনের শতদলটি বিধাতার অকৃপণ ঐশ্বর্যের দানে ভরপুর—রূপে রসে ঝঙ্কারে সৌগন্ধে।

মার্গসংগীতের ধারকদের জীবনীর নানা দিক সম্বন্ধে বুঝিবার ও জানিবার চেষ্টা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই ভারতীয় সাধনার প্রতীক। ভারত চেতনার ব্রহ্মস্বরূপে ইঁহারা একই পথের যাত্রী। লয়, তান, গায়কী ভেদে উপরে উঠিবার প্রণালীর বিভিন্নতার জন্য শ্রোতার কাছে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার তারতম্য হইয়া থাকে।

কৃত্রিম কৌলীন্যের খাড়া প্রাচীর অনেক সময় উঁচুতলার

* এই নিবন্ধের সালতামামি কতকাংশে শিল্পীর Thumb-nail Biography হইতে লওয়া।

আর্টিষ্টদের সাধারণের কাছ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। ওস্তাদ আলী আকবর কিন্তু তার ব্যতিক্রম। হাস্য-পরিহাস মুখর আলী আকবর এক অভিনব ব্যক্তিত্বের অধিকারী; জন্মসূত্রে তিনি অবশ্য ভারতীয়, কিন্তু তাঁর সাংগীতিক জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য একসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে।

সংগীত তার নিজের গতিকে হারাইয়া সময়ের গতিকে দেখিতে পারে না এবং তা হইতে দিলেই তার মৃত্যু। শিল্পীর অবর্তমানে সংগীত সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখিতে তাই দরকার হয় অনুগামী শিষ্যের। সংগীতসিদ্ধ পুরুষ আলাউদ্দীন খান সাহেব জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় উপনীত হইয়া এখন বলেন,—'আমার যা কিছু দিবার সমস্তই দিয়াছি আলী আকবর আর রবোকে (রবিশঙ্কর)।' ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে শিল্পী পুরুষ আলাউদ্দীন এক ক্ষাণদীপ্ত সর্বগুন শ্রদ্ধেয় স্রষ্ট—সেনী ঘরোয়ানার ঐতিহ্যের ফল্গুধারা তাঁহার মধ্য দিয়া উৎসারিত। আত্মসাধনার কোন স্তরে উত্তীর্ণ হইলে উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া 'তৃপ্ত' থাকিতে পারেন। আলী আকবর ও রবিশঙ্কর সম্বন্ধে সুর সাধক আলাউদ্দীনের এই উপরোক্ত উক্তিটি নেহাতই প্রাকৃত উক্তি নয়। সংগীতের গতি অব্যাহত রাখিতে আলাউদ্দীনের অনাসক্ত সত্তা দেহে লুক্কায়িত থেকে গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

শোনা যায়, বৃন্দাবনে নিধুবন নামক স্থানে তানসেনের গুরু হরিদাসস্বামী নাকি সংগীতসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন; তাঁর কথায় রাগ-রাগিনীগুলো উঠিত বসিত। তানসেনও একবার আকবর বাদশাকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া হরিদাসস্বামীর অলৌকিক ক্রিয়া কর্মগুলো চাক্ষুষ দেখাইয়া আসিয়াছিলেন। অনুরূপ প্রতিভা আলী আকবরের নেই সত্য, কিন্তু তাঁর প্রতিভা সৃজন করিবার, গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার স্বর্ণচ্ছটায় আলোকিত। তাঁহার মধ্যে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই, আছে জীবনেরই ভূয়োদর্শন, দিব্যজ্ঞান।

অতি সম্প্রতি ইংলণ্ডে, পশ্চিম জার্মানীর ষ্টুটগার্ট নামক স্থানে ও লণ্ডনের 'পিপলস্' পত্রিকায় সধানকার টেলিভিসন রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে নিরন্ন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ভারতবাসীদিগকে তুলিয়া ধরিতেছে এই বলিয়া যে, অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ দেশ ভারত কৃপা চায়, অন্তত মানবতার দিক দিয়াও পশ্চিমী জনগণ ভারতবাসীকে সাহায্য করিবে। কিন্তু ইহা ভাবিতেও লজ্জা লাগে, কারণ ইহা তো আমাদের সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার চোখে জল তাই বসন্তকে 'বোদনভরা' দেখিতেছে। আমার মনেও ভয় হয় জলভরা চোখে আমরা শিল্পীদের সমাজে উচ্চাসন দিতে যাইয়া শিল্পীর মুখে নিজের চোখের জলের ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া না যাই।

সরোদ বাজনা তাঁর জীবিকার উপায় নয়, জীবনেরই অংগ। সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর তাঁর তীব্র এষণারই ফল। কাছের পৃথিবীটাকে সংস্কারের বেড়াজাল দিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া শতধাবিভক্ত করিতে চান না তিনি। জীবন পথিক আলী আকবরের প্রতিভাকে অনেকে বড় বড় পাহাড় পর্বতের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি বলি তাঁর সৃষ্ট কর্মের সঙ্গে সম্যক পরিচয় সাধনেই তাঁর মর্মকথা আমরা জানিতে পারিব। মানুষের অন্তরাত্মাকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসেন। এই সত্য উপলব্ধির মধ্যে ও ভগবানের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখেন না। মানবতাবোধই তাঁর কাছে 'ফকিরী'। তাঁর মানসিকতার সংগে আজ সকল বুদ্ধিজীবী মানুষেরই সমধর্মীতা দেখা যায়। শিবপুর নগণ্য পল্লীগ্রামের অতি সাধারণ ঘরের ছেলে আলী আকবর সংগীতের ক্ষেত্রে নিরলস সাধনার গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

আমার কথা (৯৮)

শ্রীমতী কৃষ্ণা হাজরা (সেন)

শিক্ষা ও সঙ্গীতের মধ্যে বর্ধিত শিশু যে কালক্রমে দুইটি বিষয়ে সমান পারঙ্গম হইতে পারে—তাহার নিদর্শন শ্রীমতী কৃষ্ণা হাজরার শিল্পী জীবনে মেলে। তাঁহার নিজের কথায় আসা যাক:

"১৯৩৫ সালের জুন মাসে আমি কলিকাতায় জন্মাই। পিতা পরলোকগত ডাক্তার অনিলকুমার সেন অধ্যক্ষ অমিয়কুমার ও অরুণকুমার সেনের অন্যতম ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীমতী ক্ষণিকা সেন ব্রহ্মসঙ্গীত ও ভাবসঙ্গীতবিশারদ ৺কালীনারায়ণ গুপ্তের পৌত্রী। আমি ভায়োসেশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ থেকে বি-এ এবং ১৯৫৭ সালে এম-এ পাশ করি। ১৯৫৮ সাল থেকে আমি সিটি কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছি। আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চা বরাবর আছে। তবে মায়ের কাছে আমার সঙ্গীতে প্রথম পাঠ গ্রহণ হয়। ছয় বৎসর বয়সে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের নিকট "গীতালী"তে নিয়মিত গান শিখতে থাকি। মধ্যে নিজেও বাড়ীতে চর্চা করতাম। তখন মায়ের প্রভাব আমার উপর খুব বেশী আসে—কারণ তিনিই ছিলেন সর্বসময়ের উৎসাহদাত্রী। ভালভাবে গান শেখবার জন্য আমি ১৯৫২ সালে "দক্ষিণী"তে ভর্তি হই এবং চার বৎসর শিক্ষার পর ১৯৫৫ সালে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। ১৯৫৪ সালে আমি কলিকাতার বেতারে প্রথম গান গাই। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে আমার রেকর্ড প্রকাশিত হয়—"আমারে ডাক দিল কে" ও "আমায় থাকতে দেনা আপন মনে"।

ক্যাপ্টেন বিজয়কুমার হাজরার সঙ্গে আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে আমি গান গাইতে ভালবাসি—তবে দক্ষিণীর বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতে আমি অন্যতমা শিল্পী হিসাবে থাকি।"

নীলকণ্ঠ

পঁয়ত্রিশ

কাশী কেবল ভারতের মর্মকেন্দ্র নয়। তার জীবন রণরঙ্গভূমি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রও এই কাশী। ১৯০৫—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল একটি সন। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে সেবার কাশীতে। সভাপতি—গোপালকৃষ্ণ গোখলে,—সেই শেষ মহৎপ্রাণ অবাঙালী যিনি বলতে পেরেছিলেন, 'বাংলা আজ যা ভাবতে পারে, সমগ্র ভারতের চিন্তাধারা আগামীকাল হয় তাই।' যে তরুণ যন্ত্রীদল সেদিন শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানের প্রতীক্ষা করছিলো তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভাগ করবার কার্জন প্রস্তাব, ১৯০৫ এর ২০শে জুলাই বিলেতের পার্লামেন্ট-এ পাস হয়ে গেলো। ৭ই আগষ্ট, টাউনহলে 'বিলাতি বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ' দিবস। সভাপতিত্ব করলেন মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। 'বয়কট'-এর জন্ম হলো ভারতের মাটিতে সেই প্রথম। জন্ম দিলেন শ্রীঅরবিন্দ। বরোদা থেকে বর্তমান পৃথিবীর শেষ অসাধারণ মানুষ, শ্রীঅরবিন্দই 'বয়কট' প্রস্তাব করেন। বাঙালী টাউন হলে শপথ নিলো: যদি বঙ্গভঙ্গ আইন হয়, তবে বাঙালী বিলিতি বস্ত্র ও পণ্য বর্জন করবে।

বিচ্ছেদ আসন্ন মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি বাংলার সব চেয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন মিলন-মন্ত্র:

"উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত হইতে চিত্তকে প্রসারিত কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণ ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও।"

১৬ই অক্টোবর বেরুলো রাখীবন্ধন যাত্রা রাজপথে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বাংলা দেশের উদ্বেল হৃদয় নিজেকে ধরা দিলো:

"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন—
এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

শ্রীঅরবিন্দের বয়কট প্রস্তাব বাঙলা দেশের যৌবনকে জাগিয়ে দিলে মুহূর্তে। জেগে উঠে সে শুনলো এক জ্যোতির্ময়ী বাণী:

'যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ইংরেজকে এই বঙ্গভঙ্গ আইন তুলে নিতে বাধ্য না করে, ততদিন আমরা সংগ্রাম করে যাব।'

এ বাণী বিবেকানন্দের অনির্বাণ অগ্নিশিখা,—নিবেদিতার কণ্ঠে উচ্চারিত হলো দার্জিলিং-এ। এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির পটভূমিকায় বারাণসীতে যবনিকা উত্তোলিত হলো কংগ্রেস-অধিবেশনের,—গোখলের সভাপতিত্বে। অধিবেশনের আগেই নিবেদিতা গেলেন কাশীতে। তিলেভাণ্ডেশ্বরের অন্ধকার শীর্ণকায়তম গলিতে এক বাড়িতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয়দের একজন,—বিবেকানন্দের বাণীর জীবন্ত মূর্তি,—নিবেদিতা গিয়ে উঠলেন। মিস মার্গারেট নোবল নিবেদিতার কোনও পরিচয় নয়। নোবল হচ্ছে,—নিবেদিতার ছদ্মনাম। মাইকেল যেমন,—মধুসূদনের। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিস্মরণীয় ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় নাম দু'টি—এক শ্রীঅরবিন্দ; দুই—নিবেদিতা। আর ভারতবর্ষের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা,—কাশীতে। ১৯০৫ ভারতের জাতীয় জীবনের অগ্নির অক্ষরে উজ্জ্বল। কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন-এ প্রথম বয়কট প্রস্তাব পেশ হয়। রচনা করেন,—বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ। গোখলে এবং শ্রীঅরবিন্দ,—রাজনৈতিক চেতনা ও সংকল্প, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। দু'জনকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একসঙ্গে চালনা করার কৃতিত্ব,—নিবেদিতার। নিবেদিতা-ছাড়া আর একজনও সেদিন কেউ ছিলেন না যিনি গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেস অধিবেশনে বাঙালীর বিলিতী দ্রব্য বয়কট প্রস্তাব পাস করাতে পারতেন। তার প্রমাণ:

'এই কাশী কংগ্রেসের সময় ভগিনী নিবেদিতা তিলেভাণ্ডেশ্বরের এক সঙ্কীর্ণ গলিতে এক অতি জীর্ণ পুরানো বাড়ী ভাড়া করিয়া মহাসমারোহে কংগ্রেস নেতাদের সহিত সলাপরামর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বরোদার মহারাজা, রমেশ দত্ত, গোখলে আসিতেন। নিবেদিতা, কংগ্রেস সভাপতি গোখলের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবার তিনি সন্ত্রাসবাদের কার্যে অরবিন্দের দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

এক হাতে গোখলে আর এক হাতে অরবিন্দকে তিনি পরিচালিত করিয়াছেন। ইহা সত্যই আশ্চর্য। [শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ]

কাশীর চেয়ে বড় আশ্চর্য ভারতবর্ষে আর কিছু আছে বলে আমি জানিনে। এই পৃথিবীতে নিবেদিতার মতো পরমাশ্চর্য আর কেউ আবির্ভূত হয়েছে কখনও কোথাও, এ কথা আমি মানিনে।

কংগ্রেস অধিবেশন বসবার আগে নিবেদিতা সভাপতি গোখলেকে বলেছিলেন, বয়কট সমর্থন করতে। গোখলের আপত্তি ছিলো। কারণ বয়কটের মধ্যে আছে বিদ্বেষের বিষ। নিবেদিতা বলেছিলেন, সেই বিষই ভারতে অমৃত। গোখলে আবার আপত্তি করেন। আবার নাকচ করেন নিবেদিতা এই বলে যে, কংগ্রেস না পারলেও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাঙালী এ বিস্ফোরণ নিশ্চয়ই ঘটাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বন্দেমাতরম গীত হবার সৌভাগ্য ধন্য বারাণসী-অধিবেশনে, বাঙালীর বিদেশী বয়কট ও স্বদেশী গ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদিত হলো। আমি মনে করি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম হয় সেই মুহূর্তে। তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্মস্থান, কাশী। তার পরিকল্পনা,—শ্রীঅরবিন্দের। এই সংগ্রামের উদ্দীপনা, নিবেদিতা।

এ কথা আমার একার নয়। অন্তত আরেকজনও বলেছেন:

কাশী কংগ্রেসেই ১৯০৫ এ যুগে সমস্ত ভারতবর্ষকে নূতন আলোক দেখাইয়াছে। সেদিন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বাংলার এই নূতন আলোক প্রসন্ন মনে ঠিক গ্রহণ করিতে পারে নাই।···সুরেন্দ্র ব্যানার্জী তাঁহার আত্মজীবনীতে কাশী কংগ্রেসের কথা কিছুই লেখেন নাই। কেন না, কাশী-কংগ্রেসে বাংলার স্বদেশী মণ্ডলী বিপিনচন্দ্র পালকেই সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত কার্য করিয়াছে, সুতরাং সে কথা তিনি লিখিতে ইচ্ছুক নহেন। তবে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ১৯০৮ খৃঃ মাদ্রাজ কংগ্রেসে এই কাশী-কংগ্রেসের গুরুত্বের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, কাশী-কংগ্রেসেই বাংলার চরমপন্থী আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ আর এই কংগ্রেসেই কিছু আপত্তি সত্ত্বেও বাংলার বয়কট বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ["The first ominous sign of a movement which has since unmasked itself appeared in the Benares Congress in December, 1905. It was at Benares that the boycott of English goods was declared to be legitimate...... with some opposition—etc"] [শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ : শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : পৃঃ ৪২৮ ৪২৯]।

সেদিন শ্রীঅরবিন্দের মনোভূমিতে যার জন্ম তার থেকেই বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সূচনা এবং ভারতে বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব-অস্ত অসম্ভবনার সাড়া। কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনেছে এ কথা যত দূর সত্য, তার চেয়ে অনেক বড় সত্য শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-উল্লাস-ক্ষুদিরাম-সত্যেন-কানাই-ভবভূষণ মিত্রের মতো রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে নির্গত তরুণ ঐ যাত্রীদলের প্রথম আঘাত না পড়লে, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হতো অসম্ভব। এবং শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্ব সত্ত্বেও তা সম্ভব হতো না যদি না সেদিন নিবেদিতা নিজের হাতে সেই আগুন ছড়াতেন। সেই আগুনের পরশমণি ছোঁয়াতে জেগে উঠেছে এই মরার দেশ প্রথম। এবং শেষ আঘাত যিনি হেনেছেন, যাঁর আঘাতে স্বাধীনতার বদ্ধদ্বার খুলে গেছে শেষ পর্যন্ত, তিনিই সুভাষচন্দ্র। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ ইতিহাসের স্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দ, এর ধাত্রী নিবেদিতা, এর পতাকা যাঁরা বহন করেছেন তাঁরা হলেন আলিপুরের বোমার মামলার আসামী, এই পতাকা শেষ পর্যন্ত যিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় নাম নেতাজী। কাশী এই ইতিহাসের কুরুক্ষেত্র। বয়কট আন্দোলন-এর জন্মভূমি। এসবেরই জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ,—কার্জনের কাছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ধুয়ো না তুললে বাঙালীর মরা গাঙে বান ডাকতো না সেদিন। এবং শুকনা গাঙে যৌবনের বন্যার উদ্দাম স্রোত না নামলে ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা থাকতো বিবর্ণ হয়ে আরও কতকাল কে জানে!

কাশীর কথা যেমন অশেষ, নিবেদিতার কথাও তেমনই বলে শেষ হবার নয় কোনও দিন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন লোকমাতা; আমি তাঁকে বলি আলোকমাতা। ভারতবর্ষের পরাধীনতার পঙ্কে একটি অরবিন্দ এবং একটি নিবেদিতা। এক শত দলে যা করতে পারতো না, এই এক, দু'টি শতদলে তা সম্ভব করেছে। উনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় বলে সবাই। আমি বলি,—পরাধীন ভারতে রক্তের অক্ষরে লেখা তারিখ,—১৯০৫। লোকে বলে, আমাদের ঋণ উনবিংশ শতাব্দীর কাছে। নবজাগরণের ঢেউ সেদিন যে ক'টি বাঙালীর চিত্ততট স্পর্শ করেছিলো, তাঁরাই সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, জীবনে এনেছিলেন বিপ্লব। আমি বলি, নবজাগরণ

ঘটেছে বাঙালীর ১৯০৫ এই প্রথম। পরাধীন জাতির ধর্ম, একমাত্র ধর্ম যদি হয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, তাহলে বলব, শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা বাঙালীকে, ভারতবর্ষকে সেই ধর্মে প্রথম দীক্ষিত করেছেন! রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, 'ধর্ম কি দেবে'—এর উত্তরে, 'দেবে দুঃখ নব নব'—তা সে নিছক কবিতা নয়, শ্রীঅরবিন্দ এবং নিবেদিতা তারই সবচেয়ে পুণ্য পবিত্র, পূর্ণ প্রদীপ্ত, পর্যাপ্ত, পরমাশ্চর্য প্রচণ্ড প্রকাশ।

এই পৃথিবীর কোনও প্রান্তে কোনও দিন, মানুষের ইতিহাসে নিবেদিতার মতো কোনও মানুষ যদি এসে থাকে আর কেউ তবে সেই এই এক মাটির ঢেলা, বসুন্ধরাকে করেছে বাসযোগ্য। কিন্তু আমি জানি। আমি জানি যে নিবেদিতার মতো কেউ আসেনি আর কোথাও। আর কখনও। মানুষের সেবায় এমন আত্মনিবেদিতার দ্বিতীয় উপস্থিতি, অদ্বিতীয় উপস্থিতি আবার ঘটবে কি না জানি না। শুধু জানি, তমো থেকে মহত্তমে মানুষকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজন যেমন বাণীর, তেমনই দরকার সেই বাণীকে জীবনের কাজে লাগাবার আগুন। নিবেদিতা সেই পাবকবাণীর প্রজ্বলন্ত প্রতিমূর্তি।

স্বামীজী বলেছেন, হঠাৎ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসা জীবনের দ্বিপ্রহরে, যে আগামী কয়েক শতাব্দী হোক দেশজননী একমাত্র আরাধ্যা

ভারতবাসীর। ইংরেজ না দূর করে দিলে, ভারতবাসীর দুঃখ দূর হবে না, এ কথা যিনি বুঝেছিলেন তিনি শ্রীঅরবিন্দ। সেই বোঝাকে যিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তিনি নিবেদিতা। শ্রীঅরবিন্দ বড় হয়েছেন যে-দেশে, নিবেদিতা সেই দেশেরই মেয়ে। একজন স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছেন জীবনের প্রভাত বেলাতেই; আরেক জন রক্তে তার বহন করে এনেছেন স্বাধীনতার বীজ। এঁরা দু'জনেই বুঝেছিলেন স্বাধীনতা ছাড়া বাঁচা অর্থহীন। নৈতিক উন্নতি অসম্ভব রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অসম্ভব নৈতিক বন্ধন ছাড়া। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আজ এসেছে। যে বস্তুটি ভারত এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তার নাম নৈতিক বন্ধন। রাজনৈতিক বন্ধন পৃথিবী এবং মানুষকে কখনও এক করতে পারবে না। মানুষকে শুধু পশু এবং জড় তৈরী করবে নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা। মানুষকে মুক্তি দেবে নৈতিক বন্ধন একদিন। এই কাশীতেই দেবে। এই বিশ্বাসেই আজ বেঁচে থাকা। না'হলে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। আমার বেঁচে থাকার অন্তত। আমার একার।

শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে বলেছেন, ডি, এইচ লরেন্সের ভারতবর্ষের মতো মিষ্টিক কোনও আবহাওয়ায় যোগীর জন্ম হওয়া উচিত। নিবেদিতার মৃত্যু হয়েছে ভারতের মাটিতে। নিবেদিতার কখনও মৃত্যু হয় না। নিবেদিতার পুনর্জন্ম হবে ভারতে। ভারত পুনর্জন্ম দেবে পৃথিবীকে। বলবে, আণবিক-উন্মাদদের মহত্তম মানবিক বাণীতে; মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। নিবেদিতা আবার না আসা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি কথা মাত্র। নিবেদিতার জীবনে সে বাণী সত্য হবে,—সে বাণী মানুষের বাঁচার একমাত্র ঔষধি।

নিবেদিতাকে রাজনীতির সংগে সংস্রব রাখার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাড়তে হয়েছিলো। কিন্তু তিনি বিবেকানন্দের জীবনে অসম্পূর্ণ মিশানকে ছাড়েন নি। সে মিশান,—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। স্পষ্ট করে বিবেকানন্দ কোথাও ইংরেজ তাড়াবার কথা বলেন নি। নিবেদিতা সেই অকথিত বাণী শুনতে পেয়েছিলেন। তাই সেদিন মিশনের কথায় তিনি ব্যথা পান নি। কারণ বিবেকানন্দের নিশান ছিলো তাঁর হাতে। যে নিশানা একবার হাতে পেলে, সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করার থাকে না কিছু। সেই আহ্বান,—যা কেবল বীরের প্রাণে বাজে। বীর কে? বীর সেই,—দুঃসাধ্য যার জীবন, কারণ, মহৎ জীবনে তার অধিকার।

নিবেদিতার চেয়ে বড় বীর আমার কল্পনার কোথাও নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের শেষ অংশের জীবনে নামরূপহীন ব্রহ্ম-সমাধির পরিবর্তে জননী জন্মভূমির মূর্তি উঠেছিলো উজ্জ্বল হয়ে। তিনি বলেছিলেন: 'জননি, আমি মুক্তি চাই না; তোমার সেবাই আমার জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট কর্ম।' [বিবেকানন্দ চরিত: সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার]। বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে আমি মনে করি,—সেই অবশিষ্ট কর্ম তিনি সম্পূর্ণ করে যেতেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সাধনায় তিনি হতেন প্রথম পবিত্র নাম। এ ধারণা যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ শ্রীঅরবিন্দ এবং সুভাষচন্দ্র দু'জনেই স্বামীজী অনুপ্রাণিত। স্বামীজীর এই অসম্পূর্ণ কাজ যিনি সম্পূর্ণ করার পথে পা বাড়িয়েছিলেন, নিবেদিতা সেই প্রলয়ের প্রদীপশিখা!

এই প্রদীপ প্রথম পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলে উঠেছিলো কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের অন্ধকার গলিতে। তিলভাণ্ডেশ্বর সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, পাথর একটা তিল তিল করে বাড়ছে এখানে। নিবেদিতার আদর্শও বাড়ছে তিল তিল করে এই পৃথিবীতে। সে আদর্শ,—মানুষের মহত্তম আদর্শ। অন্যের জন্যে নিজেকে নিবেদন করা। পৃথিবীতে কখনও এমন নিবেদন আর দেখা যায় নি।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম স্ফুলিঙ্গ কাশীতে জ্বলেছে। প্রথম পাবক শিখা নিবেদিতা। তার অগ্নিবাণী শ্রীঅরবিন্দের। ভারতবর্ষের নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। শ্রীঅরবিন্দের বাণীর মধ্যে তার আবার দিব্য, দৃঢ় হবার ইসারা লুকিয়ে আছে। তাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন আরেকজন নিবেদিতার। সে আসবে। এই কাশীতেই আসবে আবার। আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি। অপেক্ষা করব। [ক্রমশ।

নববর্ষ

বাসন্তী গোস্বামী

নবীন প্রাণের নববর্ষেরে স্বাগত জানাই
নবীন আশার নববর্ষে নব আনন্দ পাই,
এসেছে বর্ষ নূতন আশার মালাখানি গলে দিয়ে,
গত বছরের জীর্ণ, ক্লান্ত, হতাশা ঘুচায়ে দিয়ে,
পূর্ব গগনে নবারুণ সাথে, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে,
নূতন করিয়া গাহিব আমরা নূতন বাঁচার গান।
নবীন আশায়, নব আশ্বাসে জাগিবে মোদের প্রাণ,
ঘুচাব সকল বিবাদ ঈর্ষা, ঘুচাব সকল দ্বেষ,
এই অভয় মন্ত্রে, অমৃত মন্ত্রে বাঁচাব মোদের দেশ,
শক্ত সবল সাহসী হয়ে, ন্যায়নীতি মন্ত্র লয়ে,
রক্ষা করিব দেশকে আমার সকল দুঃখ সয়ে।
এই ত' মোদের কাজ,
নববর্ষের পুণ্য দিনে, এই শপথ নিলাম আজ।

প্রশ্ন

দীপ্তি দাশ

তমালের ডালে আজো
কৃষ্ণ নাম আঁকা,
শ্রীরাধার প্রেম আছে
হৃদয়েতে রাখা।
বৃন্দাবন আজো আছে,
যমুনাও বয়।
আমার উতল মনে
সে স্মৃতিও রয়।
তবু এ পরাণ কেন
আকুল, অধীর,
হৃদয়ে হৃদয় রেখে
অশান্ত, অস্থির?

তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নয়

॥ ক ॥

দিন ও রাত্রি।

রাত্রি আসে আবার প্রভাত হয়।

হরনাথ আর সুলোচনারও জীবনের সেই রাত্রি এক সময় প্রভাত হ'লো।

সে রাত্রের ক্ষীরোদাকে নিয়ে সেই কুৎসিত ব্যাপারের পর সুলোচনার ঐ ঘরের মধ্যে আবির্ভাবে সাধারণ যে পরিস্থিতিটা অতঃপর হরনাথ আশঙ্কা করে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তার কিছুই যখন ঘটলো না, বরং একান্ত শান্ত ও ধীরভাবে তাকে বাইরে গিয়ে হাতে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়বার জন্য বললে সুলোচনা, হরনাথ আর তার সামনে মুহূর্ত্তকালও দাঁড়াতে পারে নি।

নিঃশব্দে পালঙ্ক থেকে নেমে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

একটা দুর্নিবার লজ্জাও ছিঃ ছি যেন হরনাথকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়েছিল। তাকে যেন প্রতিমুহূর্ত্তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছিল।

তার জ্ঞান, শিক্ষা ও রুচির বাইরে অকস্মাৎ এ সে কি করে বসল।

তিন তিনবার জীবনে বিবাহ করতে যে লজ্জা ও গ্লানি কোন দিন তাকে—তার পৌরুষকে এমনভাবে ধিক্কার দেয় নি, আজ যেন সেই গ্লানিটা অপরিসীম হয়ে তাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল। অকস্মাৎ হরনাথের মনে হলো যেন ঐ মুহূর্ত্তে সুলোচনার চোখে সে অনেক অনেকখানি নীচে নেমে গিয়েছে।

আর বুঝি সে জীবনে সত্যি কোন দিনই সুলোচনার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

তার অবচেতন মনের যৌন লালসাদৃপ্ত পশুটা যেন অকস্মাৎ তার এক দুর্বল মুহূর্ত্তে সুলোচনার চোখের সামনে উৎকট উলঙ্গভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

বাড়ি থেকে বের হয়ে এঃক্ষণে যেন দৌড়তে শুরু করে হরনাথ রাতের নির্জন রাস্তা ধরে।

আর পিছনে পিছনে সুলোচনার নিঃশব্দ হাসির একটা ধিক্কার যেন তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলে।

ছিঃ ছিঃ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় এ সে কি করে বসল! এ সে কি করল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হরনাথ গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হলো। জোয়ারের স্ফীতি তখন গঙ্গাবক্ষে।

জোয়ারে কানায় কানায় পূর্ণ গঙ্গা কল কল ছল ছল শব্দে তীরের উপর এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

একেবারে জলের কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল হরনাথ।

অন্ধকার হলেও স্তিমিত তারার আলোয় গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় নানা ধরণের নৌকাগুলো আবছায় চোখে পড়ে।

জোয়ারের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দোলছে দুলছে অন্ধকারে নৌকাগুলো। তারই মধ্যে দু-একটায় আলোর আভাষ পাওয়া যায়।

অদূরে শ্মশানে একটা চিতা প্রায় বুঝি নিভে এলো। নিবন্ত চিতার বুক থেকে একটা আগুনের চাপা রক্তিম আভাস অন্ধকারে যেন একটা আলোর চক্র রচনা করেছে। মধ্যে মধ্যে সেই আলোর চক্র থেকে বাতাসে আগুনের ফুলকী অন্ধকারে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দু'টো মানুষ সেই নিবন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়।

ঐ ভাবে এই মুহূর্ত্তে যদি হরনাথ পুড়ে ছাই হয়ে যেত। অন্ধকারে নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে পারত। স্তব্ধ হয়ে হরনাথ দাঁড়িয়ে থাকে গঙ্গার কিনার ঘেঁষে আর মধ্যে মধ্যে এক একটা ঢেউ এসে ওর পায়ের উপর গোড়ালীর উপর আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে।

ঐ ভাবে গঙ্গার কিনার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে।

পূব আকাশে অত্যাসন্ন প্রত্যূষের চাপা আলোর একটা দ্যুতি একটু একটু করে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে।

এবং ক্রমে ক্রমে একজন দু'জন করে বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় স্নানার্থী নরনারী গঙ্গার জলে এসে অবগাহন শুরু করে।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে হরনাথ।

তন্দ্রাচ্ছন্ন সম্বিৎটা যেন অকস্মাৎ এক সময় আবার ফিরে আসে অম্বিকাচরণের কণ্ঠস্বরে, মিশ্র মশাই!

অম্বিকাচরণের ডাকে কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে হরনাথ তাকাল তার মুখের দিকে। আপনাকে ত কখনও এত সকালে গঙ্গাস্নান করতে আসতে দেখিনি?

অম্বিকাচরণ দত্তও একজন চালের আড়তদার এবং বেশ ফলাও চালের ব্যবসা। সেই সূত্রেই সুধামাধবের আড়তে হরনাথের সঙ্গে অম্বিকাচরণের আলাপ পরিচয় হয়।

হরনাথ অম্বিকাচরণের প্রশ্নে যেন লুপ্ত সম্বিৎ আবার ফিরে পায়। বলে, আজ একটু তাড়াতাড়িই এসেচি স্নান করতে দত্ত মশাই। কথাটা বলে আর দাঁড়াল না হরনাথ। সোজা গঙ্গার জলে নেমে যায়। গঙ্গার শীতল জলে পর পর কয়েকটা ডুব দেয়, এবং ডুব দিয়ে সোজা আবার তীরে উঠে হাঁটতে শুরু করে। পিছন ফিরে একটি বারও তাকায় না।

অম্বিকাচরণ দত্ত কেমন যেন একটু বিস্মিত হয়েই হরনাথের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেমন গম্ভীর চিন্তাযুক্ত মনে হলো হরনাথ মিশ্রকে। ভাল করে কথা পর্যন্ত বললে না। হরনাথ মিশ্রের প্রকৃতি ত তেমন নয়। তাছাড়া দুচোখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

গৃহের দরজার কাছে যখন এসে দাঁড়াল হরনাথ তখন চারিদিকে ভোরের আলো সবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গঙ্গার জলে ডুব দিয়েই সোজা চলে এসেছিল হরনাথ সিক্ত বস্ত্রে। শুধু যে পরিধেয় বস্ত্রই সিক্ত তাই নয়, সর্বাঙ্গ জলসিক্ত। মাথার চুল থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা চোখে মুখে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। সদর দরজা বরাবর এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হরনাথ।

সদর দরজাটা খোলা এবং খোলা দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে সুলোচনা। হরনাথ মুখ তুলে তাকাল এবং সুলোচনার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি আবার সে ভূমিতে নিবদ্ধ করে। মুহূর্তের জন্য দুজনেই নির্বাক হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। একজনের চোখের দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। অন্যের চোখের দৃষ্টি সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ।

সুলোচনাই একপাশে সরে দাঁড়াল একসময়। হরনাথ নিঃশব্দে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। হরনাথ সোজা নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

সুলোচনা এসে ঘরের সামনে বারান্দার 'পরে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। সারাটা রাত সুলোচনা ঘুমোয়নি। সুনয়না এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম আসেনি চোখে সুলোচনার। এবং সুনয়না ঘুমিয়ে পড়বার পর এক সময় নিঃশব্দে শয্যা থেকে উঠে বাইরে অন্ধকারে বারান্দায় এসে বসেছিল। আর বার বার একটা কথাই কেবল তার মনে হয়েছে কেন সে কলকাতায় এলো। কৃষ্ণনগরে দাদার ওখানে সে ত ভালই ছিল। মনের সুখ না থাকলেও সম্মান ছিল। এতবড় অসম্মানের মধ্যে কেন সে এসে স্বেচ্ছায় পা দিল।

স্বামী তার এখানে এসে আবার নয়নতারাকে বিবাহ করেছে সংবাদটা সুলোচনার অবিদিত ছিল না। লোক পরম্পরাতেই স্বামীর তৃতীয়বার বিবাহের সংবাদটা তার কানে গিয়ে একদিন পৌঁছেছিল। সংবাদটা শুনে সেদিন মনে দুঃখও পায়নি। অসম্মানও বোধ করেনি। কুলীন মেয়েদের ভাগ্যে ত অমন হামেশাই ঘটে থাকে। কুলীন পুরুষরা একাধিক বিবাহ করে। কুলীন মেয়েদের স্বামীর একাধিক দার পরিগ্রহণ তাই বুঝি তাদের মনে বিশেষ তেমন দাগ কাটত না কোনদিনই। তাছাড়া সুলোচনার স্বামী হরনাথের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। স্বামী ত তার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করতে চায়ই নি। সেই বরং কতকটা তাকে বাধ্য করেছিল। তাছাড়া স্ত্রী হয়েও স্ত্রীর সমস্ত সম্পর্কই একদিন যখন সে স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে মুছে দিয়েছিল নিজে থেকে তখন আর তার লজ্জা, অভিমানই বা কি—দুঃখই বা কি ?

আর তাইতেই বোধ করি দস্যু কর্তৃক মৃন্ময়ী একরাত্রে লুণ্ঠিতা হওয়ায় কৃষ্ণনগরের গৃহ তার কাছে শূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে যেখানে হোক চলে যাবার জন্য মনটা ছটফট করে উঠেছিল, তখন কলকাতায় স্বামীর গৃহে আসতে তার মনে কোন দ্বিধাই জাগে নি।

এক সময় ত সতীন কে নিয়ে সে ঘর করেছেই।

আজই বা তবে পারবে না কেন ?

তাছাড়া স্বামীর একটি সন্তান হয়েছে সুলোচনা শুনেছিল ! সেই সন্তানটিকে নিয়েও ত সে দিন কাটাতে পারে।

স্বামীর সংসারের সঙ্গে তাকে জড়াতেই হবে তারই বা কি মানে।

কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি সুলোচনা এমন কি স্বামীর ঘরে এক বছর পরে পা দেবার পূর্বমুহূর্তেও যে এখানে এতবড় অসম্মান ও লজ্জা থাকতে পারে।

ভাবতে পারে নি সুলোচনা যে স্বামীকে সে বরাবর দেবতাজ্ঞানে পূজা করে এসেছে সেই স্বামী তার কোন দিন এতখানি নীচে নেমে আসতে পারে।

গৃহে এক কিশোরী কন্যা থাকতেও এত বড় নির্লজ্জ হতে পারে কোন সন্তানের বাপ। হরনাথ শুধু তার চোখেই ছোট হয়নি বা নীচে নেমে আসেনি—তার সন্তানের চোখেও যে সে অনেকখানি নীচে নেমে এলো।

ছি: ছি: তার স্বামী এ কি করলো ? একটা ছোট জাতের বেশ্যাকে নিয়ে এ সে কি করলো। আত্মমর্যাদা, সাহস, সম্মানে এতটুকু তার লাগল না।

অতঃপর সুলোচনাই বা কি করবে: আবার সে ফিরে যাবে কৃষ্ণনগরে। কিন্তু সেখানে আবার ফিরে গেলেও কি স্বামীর এই কলঙ্ক-কথা আর চাপা থাকবে। সব কিছুই তারা জানতে পারবে। আর সে লজ্জাকে সে কেমন করে স্বীকার করে নেবে।

না, না—তার চাইতে এই ভালো।

স্বামীর লজ্জা নিয়ে সে স্বামীর ঘরের এই কোণেই পড়ে থাকুক—দশজনের সামনে গিয়ে সে আর দাঁড়াতে পারবে না।

তাছাড়া ঐ সুনয়না। মাতৃহারা অভাগী মেয়েটা। আজ ওর মুখের দিকে তাকাবারও ত কেউ নেই। ওকে এ দুঃখের মধ্যে ফেলে সেই বা কোন লজ্জায় যাবে। মায়ের মতই তো আজ হতভাগিনী মেয়েটা তাকে আজ দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে।

ওদিকে ক্রমশ রাত আরো গভীর হতে থাকে কিন্তু স্বামীর দেখা নেই।

দরজার দিকে কান পেতে বসে থাকে সুলোচনা।

ঐ বুঝি বন্ধ দরজায় করাঘাত পড়লো। ঐ বুঝি স্বামী ফিরে এলো। কিন্তু না—রাত শেষ হয়ে আসতে চললো তবু স্বামী ফিরে এলো না এবং এতক্ষণে একটা উদ্বেগে একটা অজানিত আশংকায় সুলোচনার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপতে শুরু করে।

কি হলো লোকটার।

দুঃখে লজ্জায় শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হলো না ত।

নিশ্চিন্ত হয়ে আর বসে থাকতে পারে না সুলোচনা। উঠে দাঁড়ায় এবং পায়ে পায়ে বন্ধ সদর দরজাটার দিকে এগিয়ে যায়।

দরজার আগলটা নামিয়ে দরজার গেট দু'টো খুলতেই সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ে সুলোচনার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সুলোচনা।

ভোরের আলো তখন চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এবং সেই আলোতেই নির্জন রাস্তায় চোখে পড়ে সুলোচনার, সর্বাঙ্গে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে—সিক্ত বসন—স্বামী তার এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকেই।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সুলোচনা স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সিক্ত বসন পরিত্যাগ করে হরনাথ তখন আহ্নিকে বসেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে নিঃশব্দে আবার একসময় ঘর থেকে বের হয়ে এলো সুলোচনা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সরকার মশাই এসে খোলা সদর দরজা দিয়ে আঙিনায় প্রবেশ করলেন। সুলোচনা এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

সুলোচনার কাছ বরাবর এসেই কিন্তু সরকার মশাই সুলোচনার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে যান। জাগরণক্লিষ্ট সুলোচনার বিষণ্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়েই সরকার মশাইয়ের মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে।

কি হয়েছে পিসিমা? সরকার মশাইয়ের প্রশ্নে ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল সুলোচনা নিঃশব্দে।

সরকার মশাই আবার প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে পিসিমা?

কিছু না—

কিন্তু আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে—

কিছু না সরকার মশাই। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি তাই হয়ত—

না পিসিমা, আপনি আমার কাছে লুকাবার চেষ্টা করছেন?

সুলোচনা সত্যিই এবার যেন কেমন নিজেকে বিব্রত বোধ করে। প্রৌঢ় সরকার মশাইয়ের চোখের দৃষ্টিকে যে সে ফাঁকি দিতে পারেনি বুঝতে পারে এবং কি জবাব দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

কিন্তু সুলোচনাকে বুঝি বাঁচিয়ে দেয় সুনয়না। ইতিমধ্যে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল এবং সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই সুলোচনা তাকে দেখিয়ে বলে, সরকার মশাই, আমার মেয়ে সুনয়না—সুনয়না—প্রণাম কর—

সুনয়না এগিয়ে গিয়ে সরকার মশাইকে প্রণাম করতেই তিনি সস্নেহে বললেন, থাক মা, থাক—বেঁচে থাক, দীর্ঘায়ু হও—নারায়ণের মত স্বামীলাভ কর—

আপনি কাল রাত্রে ফিরলেন না, অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। মৃদু কণ্ঠে সুলোচনা বলে।

হ্যাঁ, পিসিমা, ঘুরতে ঘুরতে অনেক রাত হয়ে গেল, তাই মন্দির চত্বরেই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

কোন খোঁজ করতে পারলেন?

পেরেছি, কিন্তু—

কি?

আমার মনে হয় আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয় পিসিমা। লোকটা পর্তুগীজই—আর লোকের মুখে এও শুনলাম, সাংঘাতিক চরিত্রের লোক।

কোথায় থাকে লোকটা কিছু সন্ধান করতে পারলেন?

এখানে কোন ঘর-বাড়ি নেই—দশ মাল্লাবাহী বিরাট একটা নৌকা আছে সেই নৌকাতেই থাকে।

নৌকাতে থাকে!

হ্যাঁ, কারো কাছে কোন সঠিক খবর কিছু পেলাম না বটে, তবে যতটুকু বুঝতে পেরেছি লোকটা সম্পর্কে—শুনি লুঠতরাজ করে বেড়ায়।

পর্তুগীজ দস্যু!

তাই ত মনে হলো!

নাম কি লোকটার?

সুন্দরম! সুন্দর সাহেব বললেই সকলে জানে। এখানকার অনেকেই সুন্দর সাহেবকে চেনে হয়ত মিশ্র মশাইও ওকে জানতে পারেন।

উভয়ের মধ্যে কথা হচ্ছে, ঐ সময় হরনাথ ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

হরনাথকে দেখে সরকার মশাই নত হয়ে প্রণাম জানান।

কেমন আছেন?

ভাল। আপনি? শুধায় হরনাথ।

ভাল। চলে যাচ্ছে একরকম। কাল ত কই আপনাকে দেখলাম না?

একটা কাজে বের হয়েছিলাম। ভাল কথা মিশ্র মশাই, আপনি হয়ত জানতে পারেন—

কি?

সুন্দরম সাহেবকে চেনেন?

কেন বলুন ত?

পিসিমা লোকটার খোঁজ নিতে বলেছিলেন আমাকে—

হরনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুলোচনার দিকে তাকায়, কি ব্যাপার সুলোচনা?

সুলোচনা ভাবছিল, কৃষ্ণনগরের ঘটনাটা স্বামীর কাছে প্রকাশ করবে কি করবে না এবং ইতস্তত করে হরনাথ তখন সরকার মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, কৃষ্ণনগরে রায়-বাড়িতে কিছুদিন পূর্বে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে—

দুর্ঘটনা!

হ্যাঁ—

কি হয়েচে?

সংক্ষেপে তখন সরকার মশাই মৃন্ময়ীর লুণ্ঠনের কথাটা প্রকাশ করেন।

সমস্ত শুনে হরনাথ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুধায়, কবে এ দুর্ঘটনা ঘটলো?

মাসখানেক আগে—

চোখের 'পরে যেন ভেসে ওঠে পর্তুগীজ সুন্দরমের বিরাট পেশীবহুল চেহারাটা। তার বিচিত্র পোষাক, বিচিত্র আচরণ।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা যেটা মনে পড়ে ঐ মুহূর্তে হরনাথের, ঐ লোকটার বিরাট অন্তঃকরণের কথা। নয়নতারার মৃত্যু সময়ে কাণা কবিরাজ ঐ লোকটার কথাতেই শেষ পর্যন্ত তার গৃহে নয়নতারাকে দেখতে এসেছিল, তাছাড়া—ঐ বিচিত্র মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন কেন যেন তার মনে হয়েছিল, মুখটা তার চেনা চেনা। কেন মনে হয়েছিল অমন অদ্ভুত কথাটা হরনাথের, আজো সে বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু মনে হয়েছিল তার কথাটা।

হরনাথ মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি লোকটাকে বিশেষ চিনি না—তবে সুধামাধবের আড়তে মধ্যে মধ্যে ওকে আসতে দেখেচি—সুধামাধব লোকটাকে চেনে—কিন্তু কথাটা বলে এবারে হরনাথ স্ত্রী সুলোচনার দিকে তাকাল, তোমার চিনতে ভুল হয়নি ত। সে রাত্রে যে মৃন্ময়ীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে সুন্দর সাহেবের চেহারার সত্যিই সাদৃশ্য আছে বলে তোমার ধারণা।

শান্ত মৃদু কণ্ঠে সুলোচনা জবাব দেয়, ঘরের প্রদীপের আলোয় সামান্যক্ষণের জন্য তাকে দেখলেও তার মুখ আমি ভুলিনি। গঙ্গার ঘাটে যাকে দেখেচি নৌকার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সে যে ঐ একই ব্যক্তি সে সম্পর্কেও আমি স্থির নিশ্চিত।

ক্ষণকাল অতঃপর হরনাথ চুপ করে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, অসম্ভব কিছু নয়! কারণ লোকটা সম্পর্কে আমিও ইতিপূর্বে অনেক কিছুই শুনেছি! যাই হোক আমি আজই লোকটা সম্পর্কে ভাল করে সন্ধান নেবো। এখানকার কোতয়ালীর দারোগা সাহেবও আমার পরিচিত বিশেষ বন্ধু লোক, প্রয়োজন হলে তার সাহায্যও আমি পাবো।

সরকারমশাই সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ফিরে গেলেন এবং রাত্রে গৃহে ফিরে হরনাথ সুলোচনাকে তার ঘরে ডেকে পাঠাল।

সুন্দর সাহেব সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিলাম—

দেখা হয়েচে লোকটার সঙ্গে? সুলোচনা শুধায়।

হরনাথ বলে, না। নৌকা নিয়ে কাল রাত্রেই সে যে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ কিছু বলতে পারল না। তবে মনে হলো তোমার সন্দেহ বোধ হয় মিথ্যা নয় সুলোচনা—

কিসে বুঝলে?

দ্বিপ্রহরের কথাটা উল্লেখ করে হরনাথ অবশেষে বলে, সন্ধ্যায় কাণা কবিরাজের ওখানে গিয়েছিলাম এবং তার মুখেই একটা কথা শুনলাম।

কি?

সে রাত্রে মানে নয়নতারাকে দেখবার জন্য যে রাত্রে কাণা কবিরাজকে আমি ডাকতে যাই, সেই রাত্রে সুন্দর সাহেবের স্ত্রীকে দেখতে কাণা কবিরাজ তার নৌকোয় গিয়েছিল এবং সেই মেয়েটিকে দেখেই কাণা কবিরাজের যেন কেমন সন্দেহ হয়, তাঁর ধারণা মেয়েটি তার স্ত্রী নয়—

কি রকম দেখতে মেয়েটি শুনলে কিছু?

হ্যাঁ—অপরূপ সুন্দরী নাকি।

আর কিছু শুনলে না?

হ্যাঁ এও শুনলাম মেয়েটি নাকি অত্যন্ত অসুস্থ এবং—

কি?

তার উত্থান শক্তি নেই নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে এবং বাক্‌শক্তিও রহিত। [ক্রমশঃ।

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLA
Glucose
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
CREAM
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০
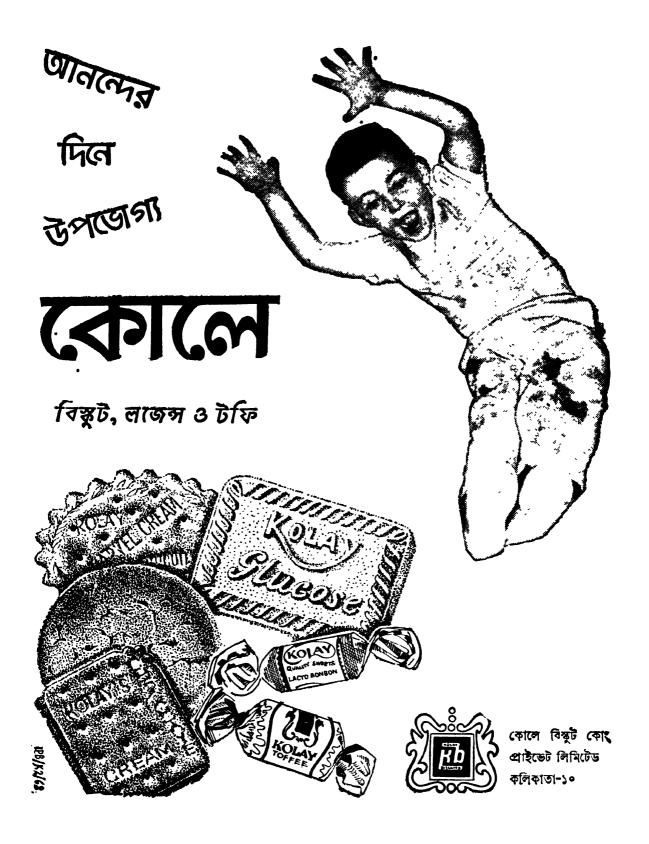
২১শে মার্চ রামোসের সঙ্গে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপের লড়াইয়ে ডেভী মুর মাথায় দারুণ আঘাত পান। হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার চারদিন পরে ডেভী মুর পরলোকগমন করেন। দশম রাউণ্ডের সময় রামোস্‌কে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এর দু'দিন পরে থাইল্যাণ্ডের মুষ্টিযোদ্ধা একাচিং গাংথং ব্যাঙ্ককে মুষ্টিযুদ্ধের পঞ্চম রাউণ্ডে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে মারা যান। এরপর আরও দুইজন মুষ্টিক আঘাত পাইয়া মারা যান। নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থার এ বিষয়ে মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: যে প্রতিযোগিতায় কায়িক ক্লেশ সহ্য করা, মারধোর ও খুনের ইন্ধন যোগায় সে অনুষ্ঠানকে প্রকৃত ক্রীড়ার মর্যাদা দেওয়া যায় না।

জাতীয় হকি

মাদ্রাজের "হিন্দু" দৈনিক পত্রিকা প্রদত্ত 'রঙ্গস্বামী' কাপ বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় রেল দল জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে সার্ভিসেস দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে। রেল দলের এইটি নিয়ে ষষ্ঠবার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ। এ বৎসর বাইশটি দল যোগ দেয়। তৃতীয় রাউণ্ডে তিনদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বাঙলা মাদ্রাজের নিকট পরাজিত হয়।

জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

এই বৎসর এলাহাবাদ আলফ্রেড পার্কের নবনির্মিত ষ্টেডিয়ামে চারদিনব্যাপী জাতীয় খেলাধূলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চৌদ্দটি রাজ্যের প্রায় পাঁচশত মহিলা ও পুরুষ উহাতে অংশ নেন। কয়েকটি নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হয়। বাংলার এস গাঙ্গুলী বর্শা নিক্ষেপে প্রথম, দু'হাজার মিটার ভ্রমণে বিবেকানন্দ সেন প্রথম, পোলভল্টে সুনীল ঘোষ ও এ. গাঙ্গুলী প্রথম ও দ্বিতীয় এবং বিশেষে বালিকা, মহিলা ও বালক বিভাগে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব, মহিলা ও বালিকা বিভাগে মহীশূর এবং বালক বিভাগে উত্তর প্রদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়।

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

উক্ত প্রতিযোগিতা কলিকাতা সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়: প্রখ্যাত বিদেশী খেলোয়াড়রা এবার অনুপস্থিত ছিলেন। উহার ডাবলস্ ফাইন্যালে কৃষ্ণাণ ও নরেশকুমার, জয়দীপ ও প্রেমজিতলালকে হারান আর কৃষ্ণাণ জয়দীপকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার বিজয়ী হন। কৃষ্ণাণ ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারী ম্যাকেকে হারিয়ে সর্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ন হন। এবারে কৃষ্ণাণের উক্ত প্রতিযোগিতায় দ্বিমুকুট লাভ হয়েছে।

শ্রীমতী ডেক্সটার

শ্রীমতী নাকি 'অপয়া'। তাই ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন টেড ডেক্সটারের ধারে-কাছে তাঁকে আসতে দিতে চান নি। কিন্তু শ্রীমতী কোন নিষেধাজ্ঞা না শুনে অষ্ট্রেলিয়ায় হাজির হন। খেলার ফলাফল হয়েছে—প্রথম টেষ্ট ড্র, দ্বিতীয়টিতে ইংলণ্ড ৭ উইকেটে জয়ী, তৃতীয়টিতে অষ্ট্রেলিয়া আট উইকেটে জয়ী, পরের দু'টি ড্র। কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' অষ্ট্রেলিয়ার হাতে রইল। শ্রীমতী ডেক্সটার হলেন কলিকাতায় সুপরিচিত বিশিষ্ট ক্রিকেটার এ. এল. হোসীর তনয়া।

ফুটবল

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে অফিস ও পাওয়ার লীগের খেলা সুরু হয়েছে। এ দু'টিতে তত উৎসাহ উদ্দীপনা জাগে না। তবে গত ১০ই মে থেকে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ আরম্ভ হয়েছে। আরও মাস দুয়েক চলবে 'সীজন'। হয়ত আশ্চর্য হবার মতন ফলাফল ঘটবে তার মধ্যে। লীগ খেলা সম্বন্ধে দু'টি প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে। একটি, প্রতি অর্ধে ২৫ মিনিটের পরিবর্তে ৩০ মিনিট খেলান আর অন্যটি হ'ল সপ্তাহে একদিন অফিস লীগের খেলার জন্য নির্দিষ্ট করা। দু'টি প্রস্তাব কার্যকরী হলে নানা দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

বেটন হকি কাপ

এবারে আটাশটি দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। নয়টি বহিরাগত দল ছিল। ছয়টি দলকে খেলার তালিকায় তৃতীয় রাউণ্ডে রাখা হয়। মোহনবাগান দল বাদ পড়ে। যাহা হউক, ফাইন্যালে সেন্ট্রাল রেলদল ১-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে।

কলিকাতা হকি লীগ

প্রথম ডিভিসন হকি লীগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগানকে ১—০ গোলে হারিয়ে এবারে 'অপরাজিত' চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে বিজয়ী দল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়।

দলীপ সিংজী ট্রফি

স্বগত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গত কে. এস. দলীপ সিংজীর নামে এক আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ১৯৬২ সাল থেকে আরম্ভ হয়। পশ্চিমাঞ্চল দল পরপর দু'বৎসর উহা দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

আগা খাঁ হকি কাপ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে (দিল্লী) নর্দান রেলওয়ে দল ২—০ গোলে গোল্ড-কাপ বিজয়ী পাঞ্জাব পুলিশ দলকে পরাজিত করেছে। রেল দল ১৯৫১ সালে এই কাপ প্রথমপায়। বিজিত দল ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালের বিজয়ী ছিল।

ফ্রেডি ট্রুম্যান

পূর্ব রেল এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন

পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম. এম. খাঁ কয়েকদিন আগে কলিকাতা ময়দানে উক্ত এসোসিয়েশনের নূতন তাঁবুর উদ্‌ঘাটন করেন।

মোহনবাগান ক্লাবের নূতন তাঁবু

পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গত ১৪ই মে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের নূতন অংশীদার মোহনবাগান ক্লাবের তাঁবুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

জাতীয় স্যুটিং প্রতিযোগিতা

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্যুটিং প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিরা সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শ্রীমতী শোভিতা চাটার্জি ও কণা বসু প্রোণ, নীলিং ও ষ্টাণ্ডিং—এই তিনটি বিষয়ে যথাক্রমে মহিলা চ্যাম্পিয়ন ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারিণী হয়েছেন। শ্রীহরিচরণ শা রাষ্ট্রপতির ট্রফি পেয়েছেন, জাতীয় প্রয়োজনে দলে দলে দেশের ছেলেমেয়েরা রাইফেল ক্লাবে যোগদান করুক এই আশা করব।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণে এসে উক্ত দল ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন ইয়র্কসায়ার দলের নিকট ১১১ রাণে পরাজিত হয়েছে। ফ্রেডি ট্রুম্যান ৮১ রাণে ১০টা উইকেট দখল করেছেন।

মোটর রেসিং

নিখিল ভারত ক্রীড়া-সংস্থার সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা উহার এক অধিবেশনে সম্প্রতি বলেছেন যে, মোটর রেসিংকে ভারতে অন্যতম স্পোর্টস হিসাবে পরিগণিত করা যেতে পারে।

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল

সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড বিভিন্ন খেলাধূলার বিভিন্ন বিভাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত দল গঠনের জন্য প্রস্তাব করেছেন।

ডেভিস কাপ

পূর্বাঞ্চল ডেভিস কাপের ফাইন্যালে ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে আমেরিকা ও য়ুরোপীয় অঞ্চলের বিজেতার সহিত খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

টুকরো খবর

মহারাষ্ট্রের ফারুক আলী এই বৎসর পঞ্চম জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

ইংল্যাণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ৬ই জুন ম্যাঞ্চেষ্টার ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে হইবে। টেড ডেক্সটার ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। বিশটি টেষ্টের অধিনায়ক হিসাবে তিনি আটটিতে জয়ী, তিনটিতে পরাজিত ও নয়টি অমীমাংসিত রেখেছেন। ফাষ্ট বোলার ট্রুম্যান নিজ দেশের পক্ষে আর খেলবেন না বলে জানিয়েছেন।

আগামী জানুয়ারী মাসে একটি শক্তিশালী এম. সি. সি. দলের ভারতে আসার কথা হয়েছে। ৪ দিনব্যাপী পাঁচটি টেষ্ট খেলার কথা শোনা যাচ্ছে।

দেরাদুনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের এক জরুরী সভায় স্থির হয়েছে যে, টোকিও গেমসের নির্বাচনী যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

একাদশ জাতীয় বাস্কেটবল খেলায় মহীশূর গত বৎসরের বিজয়ী পশ্চিমবঙ্গ দলকে ৪২—৩৬ পয়েন্টসে হারিয়ে এবার মহিলা চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছে।

মোহনবাগান ক্লাব সম্প্রতি দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়: তন্মধ্যে ৭টিতে জয়ী, তিনটিতে 'ড্র' ও একটিতে বিজিত হয়েছে। প্রত্যেক স্থানে দুর্ধর্ষ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রখ্যাত উইম্‌ব্লেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য কৃষ্ণাণ, জয়দীপ, প্রেমজিতলাল ও নরেশকুমার ভারতীয় দলের প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছেন।

জয়দীপ মুখার্জী

আরব ফেডারেশনের বিপদ ?—

গত এপ্রিল মাসে কায়রোয় আরব ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল। সিরিয়া ও ইরাকের বাথিষ্ট প্রতিনিধিরা তখন প্রেসিডেন্ট নাসেরের পুন: পুন: সতর্কবাণী সত্ত্বেও দ্রুত এই ফেডারেশন প্রতিষ্ঠায় জন্য জিদ করেন। কিন্তু কায়রো হইতে ফিরিয়াই তাঁহারা যেরূপ দলীয় সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে আরব ফেডারেশন গঠনের সম্ভাবনা হয়ত দূরবর্তী হইতেছে। সিরিয়ায় ও ইরাকে বাথ সোস্যালিষ্টরা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কৌশলে তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিয়াছেন। এই কলহে এবং রাজনৈতিক চালে প্রস্তাবিত আরব ফেডারেশনের প্রতি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সিরিয়ার সামরিক বিভাগে বাথ সোস্যালিষ্টদের প্রভাব থাকিলেও সেখানকার বেসামরিক অধিবাসীর প্রতি তাহাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ। এইজন্য কায়রোয় এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, বাথ পার্টি সিরিয়া, এবং ইরাকেও দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হইবে না—অন্যান্য দলের সহিত মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করিবে; মন্ত্রিমণ্ডলে এবং বিপ্লবী পরিষদে এই ফ্রণ্টের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। সিরিয়ায় বাথ পার্টি ব্যতীত আর তিনটি জাতীয়তাবাদী ফ্রণ্ট আছে—(১) আরব ইউনিটি ফ্রণ্ট, (২) সোস্যালিষ্ট ইউনিটি ফ্রণ্ট এবং (৩) হারাকাৎ আল্ কউমীন্ আল্ আরব। মন্ত্রিমণ্ডলে এবং বিপ্লবী পরিষদে ইহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বাথ নেতারা গত মাসে দামাস্কাসে ফেরেন। কিন্তু তাহার অল্পকাল পরেই অকস্মাৎ সাতচল্লিশ জন সামরিক কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হয়। তাহাদের মধ্যে অন্তত একজন বিপ্লবী পরিষদের সদস্য ছিলেন। পদচ্যুত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ এই যে, তাঁহারা বাথ

নাসের

পার্টির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন: কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত অপরাধ —তাঁহারা বাথ পার্টির সদস্য বা সমর্থক নহেন। এই পদচ্যুতি নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা যখন সফল হইল না, তখন আরব ইউনিটি ফ্রণ্ট, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি ফ্রণ্ট এবং হারাকাৎ আল্ কউমীনের পাঁচজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে দামাস্কাসে, এলোপ্পায় এবং সিরিয়ার অন্যান্য সহরে প্রবল গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। বাথ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত কঠোরভাবে এই বিক্ষোভ দমন করিতে সচেষ্ট হন এবং অন্য দিকে জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের প্রগতিশীলতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করেন; ৮ই মার্চের পূর্ববর্তী গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট কুদ্‌সি এবং মিশরের সহিত সংযুক্তি-বিরোধী আক্রাম হাকণির দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা হয়। ইহা ছাড়া, বাথ পার্টির পক্ষ হইতে একটি সস্তা কূটনৈতিক চাল দেওয়া হয়। বাথ নেতা মি: সালাহ বিতার হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিলেন। বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণা করিলেন যে, বিতারের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দলত্যাগী বাথ নেতা ডা: সামি এল জুন্দিকে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দুই দিন ধরিয়া জুন্দির সহিত আলোচনার একটা অভিনয় চলিল। তাহার পর সালাহ বিতার পুনরায় রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন এবং নূতন নির্ভেজাল বাথ মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইল। এই নূতন মন্ত্রিমণ্ডলের ছয়জন বাথ পার্টির সদস্য, সাতজন ঐ পার্টির সমর্থক এবং তিনজন সামরিক অফিসার। ইতিমধ্যে ইরাকেও প্রধানমন্ত্রী আহমেদ হাসান আল্ বকর পদত্যাগ করেন; প্রেসিডেণ্ট আরেক তাঁহার পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাঁহার উপরই নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ভার দেন। বকরের নূতন মন্ত্রিমণ্ডলে বাথ পার্টির পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইরাকের ইস্তিক লাল পার্টি নূতন মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান পায় নাই। বস্তুত, সিরিয়ায় এবং ইরাকে এখন বাথ পার্টির সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এই দুইটি দেশের কোনটিতেই জনসাধারণের প্রতি বাথ পার্টি প্রভাবশালী নহে, বাথ পার্টির প্রধান আশ্রয় রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী তরুণ সামরিক কর্মচারিবৃন্দ। সিরিয়া ও ইরাকের নাসেরপন্থী জাতীয়তাবাদীদিগকে অপসারণ করিয়া বাথ পার্টির সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি, তাহা এখন অনুমান করা দু:সাধ্য। উচ্চকণ্ঠে আরব ঐক্যের কথা জাহির করিয়া বাথ পার্টি জনসাধারণকে প্রভাবিত করিয়াছেন; গত এপ্রিল মাসে তাঁহারা অবিলম্বে আরব ফেডারেশন গঠনের জন্য অধৈর্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ, সমস্ত দল লইয়া মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য কায়রো বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তাঁহারা লঙ্ঘন করিলেন। ইহা আরব ফেডারেশনের মধ্যে বাথ পার্টির কর্তৃত্ব প্রসারের প্রস্তুতি হইতে পারে, মিশরের কর্তৃত্ব প্রতিরোধের জন্য আয়োজনও হইতে পারে; আর প্রেসিডেণ্ট নাসের যদি বাথ পার্টির এই একনায়কত্ব সমর্থন না করেন, তাহা হইলে তখন সিরিয়া ও ইরাককে লইয়া সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠনের জন্য ইহা প্রাথমিক আয়োজন হওয়াও সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকে মিশরের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা এবং সিরিয়া, ইরাক ও জর্ডানকে লইয়া ফেডারেশন গঠনে উৎসাহ দেওয়া বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নীতি; কারণ ইহাতে আরব ঐক্যের জন্য আগ্রহী প্রগতিশীল

আরবদের ধোঁকা দেওয়া সম্ভব এবং সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে আঘাত লাগিবার আশঙ্কাও ইহাতে কমিয়া যায়। সিরিয়া ও ইরাকের বাথ নেতারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে যাইতেছেন কি না, কে বলিবে ?

লাওসে অশান্তি কেন ?—

লাওসের পরিস্থিতি এখনও আশঙ্কাজনক হইয়া রহিয়াছে। জার সমতলভূমিতে দুইপক্ষের ছোট-খাটো সঙ্ঘর্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী সুভন্ন ফুমা ও পাথেট লাও নেতা সুফানো ভং-এর মধ্যে একটা মীমাংসার আলোচনা হইবার কথা আছে। এই আলোচনা সুফলপ্রসূ হয় কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

লাওসে এই বৎসর নূতন করিয়া অশান্তি আরম্ভ হইবার প্রকাশ্য কারণ দলগত কলহ। কিন্তু এই কলহ প্রকৃতপক্ষে লাওসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারমাত্র নহে—ইহার সহিত বাহিরের শক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। ১৯৬২ সালে জুলাই মাসে জেনেভায় লাওস সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়, তাহার সর্ত—এই রাজ্যটি শান্তি ও নিরপেক্ষতার পথে অগ্রসর হইবে, চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনও শক্তি উহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, উহার কোনও অঞ্চল তাহারা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না, রাজ্যের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার মত কোনও কাজ তাহারা করিবে না। চুক্তির সুস্পষ্ট নির্দেশ—তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য এবং সামরিক লোকজন অপসারিত হইবে ; আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-কমিশন এই সর্ত বাস্তবে পরিণত হওয়ার কাজ তদারক করিবেন। জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সময় লাওসে দেড় হাজার মার্কিন উপদেষ্টা ও সামরিক বিশেষজ্ঞ ছিল, সাড়ে তিন হাজার থাই সৈন্য, কিছু সংখ্যক দক্ষিণ ভিয়েৎনামী এবং ফিলিপিনো সৈন্য ও অফিসার ছিল এবং মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত কয়েক হাজার কুয়োমিণ্টাংমও সৈন্যও ছিল। জেনেভা চুক্তির পর মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞদিগকে বেসামরিক বিশেষজ্ঞরূপে লাওসে রাখিবার ব্যবস্থা হয়। পেণ্টাগন (মার্কিন সামরিক বিভাগ) এবং কেন্দ্রীয় মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সঙ্কেত অঞ্চলে দক্ষিণপন্থী-দিগকে সাহায্য করিতে থাকে ; লাওসের উপর দিয়া অবাধে মার্কিন বিমান ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৯৬২ সালে অক্টোবর মাসে, অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে লাওস হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য ও সামরিক লোকজন অপসারিত হইবার কথা, সেই সময় আন্তর্জাতিক কমিশন রিপোর্ট দেন যে, এই সম্পর্কিত সর্তটি ঠিকমত পালিত হয় নাই বলিয়া তাঁহারা সন্দেহ করেন। নিরপেক্ষতা-কামীরা পাথেট লাও ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবে—তাহাদিগকে সংঘর্ষ হইতে দূরে রাখিবে, এই ব্যবস্থার ভিত্তিতেই জেনেভা চুক্তিতে লাওসে শান্তি রক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল ! কিন্তু নিরপেক্ষতাকামী দলের সেনাপতি জেনারেল কংলী মার্কিন হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা

অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না, এই অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ শিবিরে অসন্তোষ দেখা দেয়। জার সমতলভূমিতে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্বে মার্কিন সামরিক লোক-জনের অপসারণের দাবীতে লাওসে বহু জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। জেনেভা সম্মেলনের অন্যতম সভাপতিরূপে সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এই আবেদন জানাইতে চাহে যে, লাওসের দক্ষিণপন্থীদিগকে মার্কিন সাহায্য প্রদান যেন বন্ধ করা হয়। কিন্তু বৃটেন (জেনেভা সম্মেলনের সভাপতি) উহাতে আপত্তি করায় শুধু লাওসের যুধ্যমান শক্তিগুলিকে নিবৃত্ত হইবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, জার সমতলভূমিতে পাথেট লাওর প্রধান কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রতিনিধিদিগকে স্থায়ীভাবে রাখার প্রস্তাব উঠিয়াছিল; কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের ঘাঁটি সভন্নক্ষেতে তাঁহাদিগকে রাখিবার কথা ওঠে নাই। পাথেট লাও নেতা প্রিন্স সুফানো ভং যে জার সমতলভূমিতে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রতিনিধিদের থাকিবার ব্যবস্থায় আপত্তি করেন, তাহার প্রকৃত কারণ ইহাই।

ইন্দোনেশিয়ায় চীনা-বিরোধী হাঙ্গামা—

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাভার বিভিন্ন সহরে প্রবল চীনা-বিরোধী হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। গত ১০ই মে বান্দুং-এ দশ হাজার ছাত্র বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চীনাদের দোকান, বাসগৃহে এবং মোটর গাড়ীকে আক্রমণ চালায়; আক্রান্ত হইয়াছিল ঐ সহরের সমস্ত চীনা দোকান। ইহার পর ঐ অঞ্চলের বোগোর এব অন্যান্য সহরেও হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়ে। কয়েকজন ইন্দোনেশীয় ছাত্রের সহিত চীনা ছাত্রদের বচসা নাকি হাঙ্গামার আশু কারণ। কিন্তু এই ব্যাপক ও তীব্র চীনা-বিরোধী অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ আরও গভীর। ইহা চীনাদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশীয়দের রুদ্ধ আক্রোশের অভিব্যক্তি। এত দিন সামরিক আইন জারি করিয়া কৃত্রিম শান্তি রক্ষা করা হইয়াছিল; ১লা মে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হইবার পর ইন্দোনেশীয় যুবকরা চীনাদের উপর মারমুখী হইয়া ওঠে। সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় এই যে চীনের প্রেসিডেণ্ট লিউ শাও-চি ইন্দোনেশিয়ার প্রতি প্রচুর শুভেচ্ছার বাণী বর্ষণ করিয়া যাওয়ার পরই এই অভ্যুত্থান। ইন্দোনেশিয়ার সমাজ-জীবনে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সাড়ে পঁচিশ লক্ষ চীনার ভূমিকা বিচিত্র। ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ে চীনাদের কর্তৃত্ব একচেটিয়া। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই সব চীনা চৈনিক নাগরিকত্ব পর্যন্ত বর্জন করে নাই। ঐ সময় ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট যখন পল্লী অঞ্চল হইতে চীনা ব্যবসায়ীদিগকে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করেন, তখন পিকিং-এর কর্তৃপক্ষ প্রবল প্রতিবাদ জানান এবং স্থানীয় চীনা দূতাবাস হইতে খুবই আপত্তিকর তৎপরতা চলিয়াছিল। বস্তুত জাভার দূতাবাস হইতে স্থানীয় চীনা ব্যবসায়ীদিগকে সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে, এই সর্তে মীমাংসা হইয়াছিল যে, প্রবাসী চীনারা ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকত্ব অর্জন করিবে। অর্থাৎ "ইন্দোনেশিয়ার ব্যবসায়ে ইন্দোনেশীয়"—এই নীতির সহিত আইনগত সম্মতি

রাখিয়া চীনারা ঐ দেশের ব্যবসাক্ষেত্রে পূর্বের মত জাঁকাইয়া বসিয়া থাকে। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার কম্যুনিষ্ট পার্টি হইল অ-কম্যুনিষ্ট দেশসমূহের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির মধ্যে বৃহত্তম পার্টি; এই পার্টির অধিকাংশ সদস্য চীনা। নীতির দিক হইতে ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি হইল চীনপন্থী এবং সুকর্ণ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম সমর্থক। সমাজ জীবনে ধনিক চীনা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে উগ্র চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট চীনাদের বিরুদ্ধে যে গণ-অসন্তোষ, তাহাই এই হাঙ্গামায় ব্যক্ত হইয়াছে। পিকিং কর্তৃপক্ষ এই দুই শ্রেণীর চীনাদের সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল; কম্যুনিষ্ট চীনারা তো তাঁহাদের প্রবাসী অনুচর বিশেষ, ইন্দোনেশিয়ার (তথা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেরও) ধনিক চীনাদিগকে কুয়োমিণ্টাং-এর প্রভাব হইতে তাঁহারা দূরে রাখিতে চাহেন এবং পিকিং-এর নীতির সমর্থনে ব্যবহার করিতে তাঁহারা আগ্রহী। ১৯৫৯ সালের অপ্রীতিকর ঘটনার পর হইতে ইন্দোনেশিয়ার সহিত হৃদ্যতা স্থাপনের জন্য পিকিং কর্তৃপক্ষের চেষ্টার অন্ত নাই। সম্প্রতি লিউ শাও-চি ও চেন-য়ির সফরের পূর্বে দুই দেশের মধ্যে নানা ধরণের প্রতিনিধিমণ্ডলের বহু আনা-গোনা হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যবদ্বীপের বর্তমান চীনা-বিরোধী হাঙ্গামা সম্পর্কে পিকিং কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিবাদ জানান নাই।

পাক-নেপাল সম্পর্ক—

শত্রুর শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে হইবে—এই আদিম নীতিবাক্য পাক নেতারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সব সময় নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই নীতিবাক্যের অনুসরণেই তাঁহারা এক সময় পর্তুগালের সহিত দহরম-মহরম আরম্ভ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহাদের নিকট ভারত পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু, সেই শত্রুর সহিত যখন পর্তুগালের শত্রুতা, তখন সে পাকিস্তানের স্বাভাবিক মিত্র। চীনের সহিত পাকিস্তানের মিত্রতা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাওয়ার মূলেও চীনের সহিত ভারতের শত্রুতা। নেপালের সহিত ভারতের শত্রুতা নাই; তবে, সাম্প্রতিক কালে দুই দেশের মধ্যে কিছু মন কষাকষি হইয়াছে। সুতরাং নেপালের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা পাক-নেতারা উপলব্ধি করিয়াছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ এবং পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জুলফিকার

জুলফিকার আলি ভুট্টো

আলি ভুট্টো নেপাল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। দুই বৎসর পূর্বে রাজা মহেন্দ্র পাকিস্তান পরিদর্শনের সময় পাক্ প্রেসিডেণ্টকে নেপাল পরিদর্শনে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, এতদিনে সে নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি হয়; কারণ এখন কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের সমর্থক চাই, এবং পাশ্চাত্য শক্তি ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করিলে পাকিস্তানের (এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের) বিপদ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া পাক্- নেতাদের যে শুধু চীৎকার, তাহার সমর্থনও আবশ্যক। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এবং মিঃ ভুট্টো নেপালের বন্ধু হিসাবে ভারতের 'আক্রমণকারী মনোভাবের' কথা এবং চীনের সহিত আচরণে তাহার 'অন্যায় ঔদ্ধত্যের' কথা শুনাইয়া আসিয়াছেন। নেপালের সহিত অতঃপর পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ঘনিষ্ঠ করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব কাঠমণ্ডুতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, শীঘ্রই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক মিশনের আদান-প্রদান হইবে। তিন বৎসর পূর্বে নেপালের সহিত পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলেও কূটনৈতিক দূতাবাস স্থাপনের কাজ এতদিন বাকী ছিল। এইবার এই অসমাপ্ত কাজ শেষ করা হইবে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব আরও বলেন যে, দুই দেশের সম্পর্ক কেবল কূটনৈতিক মিশনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিবে না—ইহা জনগণের পর্যায়েও প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনি দুই দেশের মধ্যে ছাত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রসারিত করিবার কথা বলেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরি পাকিস্তানের সহিত নেপালের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব নেপালে পৌঁছিয়াই এবং পরে জাতীয় পঞ্চায়েতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কতকটা আত্মশ্লাঘার সহিত নেপালের পঞ্চায়েৎ প্রথার প্রশংসা করেন। এই প্রথার মধ্যে তিনি পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিফলিত দেখিতে পান। পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র এবং নেপালের পঞ্চায়েৎ প্রথায় সত্যই যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। দুই দেশেই এই ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের উপর সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও কুপ্রথা চাপাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আমূল ভূমি-সংস্কার কোথাও হয় নাই।

প্রতিরক্ষা ও রাজনীতি—

মে মাসের প্রথম দিকে বিশিষ্ট পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনায়করা দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক, বৃটিশ উপনিবেশ সচিব ডানক্যান স্যাণ্ডস এবং তাঁহাদের সহযোগীরা ভারতে আসেন। চীনের আক্রমণাত্মক মনোভাবের দ্বারা ভারত কিভাবে এবং কতদূর বিপন্ন, প্রতিরক্ষার জন্য ভারতের প্রয়োজন কি ধরণের এবং সর্বোপরি এই সব প্রশ্নের সহিত কাশ্মীর সমস্যার সম্পর্ক আলোচনা করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। চীনের মনোভাব সম্বন্ধে বিশিষ্ট অতিথিরা ভারত সরকারের সহিত মোটামুটি এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, অনতিবিলম্বে চীনের পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিবার সম্ভাবনা কম; তবে এই সম্পর্কে কোনরূপ ঝুঁকি লওয়া উচিত নহে; আর চীনের দূরবর্তী লক্ষ্য হইল পৃথিবীর এই অংশে চীনের প্রভাব বিস্তৃতির পথে বিঘ্নস্বরূপ যে ভারত, তাহাকে অবনমিত করা এবং বশীভূত করা। ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য সঠিক সামরিক প্রয়োজন নির্ধারণ করাটা অবশ্য রাজনীতিকদের কাজ নহে; এই সম্পর্কে নীতি স্থির করাটাই

তাঁহাদের এক্তিয়ারভুক্ত। এই সূত্রেই কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মিঃ স্যাণ্ডস বলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসাটা ভারতকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার পূর্ব-সর্তরূপে উপস্থাপিত করা হয় নাই। তবে, এই সম্পর্কে পাকিস্তানের সহিত ভারতের মীমাংসা হইলে তাঁহাদের কাজটা সহজ হয়। বৃটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক উভয়েরই বক্তব্য চীনের জঙ্গী মনোভাব ভারতীয় উপমহাদেশ তথা সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বিপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মিটমাট হইয়া গেলে ভারতকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিবার প্রস্তাবটা মার্কিন কংগ্রেসে ও বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস করাইয়া লওয়া সহজ হইবে। ভারতের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্ররা কাশ্মীর সম্পর্কে তথা পাক-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহাদের মনের কথা এই প্রথম বলিলেন না। বস্তুত, কূটনৈতিক শালীনতা বজায় রাখিয়া বার বার এই কথা শোনানো হইতেছে যে ভারত যদি পাশ্চাত্য শিবির হইতে দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক সাহায্য চাহে, তাহা হইলে কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের সহিত তাহাকে মীমাংসা করিতে হইবে। পাকিস্তানের কর্তারাও সুযোগ বুঝিয়া দাবীর মাত্রা ক্রমেই চড়াইয়াছেন। যুদ্ধবিরতির রেখা ধরিয়া এবং প্রয়োজনমত কিছু অদল-বদল করিয়া কাশ্মীর বিভাগের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সহিত মীমাংসা করিতে ভারত প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের দাবী ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল, পাকিস্তানের কর্তারা শেষ পর্যন্ত বলিতে লাগিলেন—সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা তাহাদের চাই, কারণ ঐ অঞ্চল মুসলমানপ্রধান : জম্মুর অধিকাংশ তাঁহাদিগকে দিতে হইবে : কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নদীগুলির উৎস সেখানে ; লাদক্ পাকিস্তানকে না দিলে চলিবে না, কারণ ঐ সকল তাহার নিরপেক্ষতার জন্ত প্রয়োজন। স্বভাবত, রাস্ক-স্যাণ্ডসের ভারত পরিদর্শনের পরেও—কাশ্মীর সমস্যা মিটাইবার জন্ত তাহাদের মৃদু চাপ সত্বেও—ভুট্টো-শরণ সিং আলোচনা ষষ্ঠ পর্যায়ে আসিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভারতের আজ বৈদেশিক অস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে সত্য; কিন্তু এক আক্রমণকারীকে প্রতিরোধের প্রয়োজনে অন্ত একটি আক্রমণকারীর অন্যায়, অসঙ্গত ও উদ্ধত দাবীর নিকট সে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ পনর বৎসর পূর্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘে উত্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোনও মীমাংসা সম্ভব হয় নাই, কারণ পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামরিক স্বার্থের সহিত এই অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামরিক সহচর পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নালিশ জানাইয়া ভারত ন্যায় বিচার পায় নাই। আজ কাশ্মীর সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহকে এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করিতে হইবে। কাশ্মীর উপত্যকার প্রতি পাকিস্তানের দাবীর পিছনে পাশ্চাত্য শক্তির সমর্থন রহিয়াছে, কারণ সামরিক স্বার্থে উহা তাঁহাদের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতিরক্ষার জন্ত পাকিস্তানের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্ত পাশ্চাত্য শক্তির যে চাপ, তাহা কীলকের সূক্ষ্মাগ্র, ভারতকে পাশ্চাত্যের সামরিক জোটে ঢুকাইবার প্রাথমিক উদ্যোগ। গত শরৎকালে চীনের আক্রমণের সময় পাশ্চাত্য শক্তি ভারতে যখন অস্ত্রসাহায্য দেয়, তখন ভারতের নিরপেক্ষ নীতি পরিবর্তনের জন্ত চাপ দেওয়া হয় নাই দুইটি কারণে। প্রথমত, বিপদের সময় ভারতকে ঐ ধরণের চাপ দিলে ভারতবাসীর নিকট পাশ্চাত্য শক্তির মর্যাদা অবনত হইত। বস্তুত, তখন ভারতকে বিনা সর্তে সাহায্য দেওয়ায় পাশ্চাত্য শক্তি "বিপদের বন্ধু" বলিয়া অভিহিত হইতেছে : ভারতবাসীর নিকট তাহাদের মর্যাদা এখন খুবই উন্নত। পাশ্চাত্য শক্তির তৎকালীন উদারতার দ্বিতীয় কারণ—তখন ভারত যদি নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিতে সম্মত হইত, এবং সোভিয়েট রুশিয়া সহ সমগ্র কম্যুনিষ্ট শিবিরের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তির সহিত মিলিত হইবার জন্ত প্রস্তুতি জানাইত, তাহা হইলে চীন-ভারত বিরোধে রুশিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হইত না। কম্যুনিষ্ট শিবিরের বিরোধ মিটিতে সহায়তা করা কখনও পাশ্চাত্য শিবিরের নীতি হইতে পারে না। এই দ্বিবিধ কারণে গত শরৎকালে জরুরী অস্ত্র সরবরাহের সময় ভারতের নীতি সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তোলে নাই। কিন্তু এখন ভারতের নিরপেক্ষতা সমর্থন করিয়া অনাসক্তভাবে দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য তাহাকে দেওয়া যায় না—ইহা পাশ্চাত্য শক্তির নীতি-বিরুদ্ধ। বৃটেন ও আমেরিকার নিকট হইতে ভারত অস্ত্র সাহায্য লইবে, আর সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ঢলাঢলি করিবে—গাছের খাইবে তলারও কুড়াইবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। বস্তুত ভারতকে নিরপেক্ষ নীতি বর্জনে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত কৌশলে এবং ধীরে ধীরে চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে।

একটি চাঞ্চল্যকর গোয়েন্দা মামলা—

মে মাসে মস্কোয় একটি চাঞ্চল্যকর গোয়েন্দা মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। এই মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন রুশিয়ার প্রাক্তন সামরিক অফিসার এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত কার্যাবলীর সমন্বয় কমিটীর কর্মচারী ওলেগ পেন্‌কোভস্কি এবং বৃটিশ ব্যবসায়ী উইনী। দুই জনেরই বয়স চুয়াল্লিশ বৎসর। দুই জনই তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন। পেন্‌কোভস্কি ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দাদের সহিত মস্কোয় এবং সময় সময় ইউরোপের অন্যান্য রাজধানীতে সাক্ষাৎ করিয়া সরকারী গুপ্ত সংবাদ এবং বিশেষত সামরিক বিভাগের সংবাদ সরবরাহ করিতেন। উইনী ১৯৬০ সালে পেন্‌কোভস্কির সহিত পরিচিত হন এবং তিনি গুপ্ত সংবাদ বহন করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতেন। এই ব্যক্তিকে ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যাইতে হইত। পেন্‌কোভস্কিকে বৃটিশ বা মার্কিন সামরিক বিভাগে মাসিক দুই হাজার ডলার বেতনের চাকরি দিবার এবং গোয়েন্দাবৃত্তির পারিশ্রমিক হিসাবে প্রতি সপ্তাহে এক হাজার ডলার করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ পেন্‌কোভস্কির নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে গোপন সংবাদ পাওয়ার জন্ত আগ্রহী ছিলেন—জার্মানীর সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তুতি, পূর্ব-জার্মানীতে মোতায়েন সোভিয়েট সেনাবাহিনীর প্রকৃত সংখ্যা, চীন-সোভিয়েট সম্পর্ক প্রভৃতি। মার্কিন সামরিক বিভাগ সোভিয়েটের রকেট অস্ত্রের বিবরণ জানিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। মামলায় দুই জন আসামীই অপরাধী সাব্যস্ত হন। পেন্‌কোভস্কির প্রতি মৃত্যুদণ্ডের এবং উইনীর প্রতি আট বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়। —"মিহির"

আচার্য ভাবে ও ভেজাল ব্যবসায়ী সমাজ

'ডায়মণ্ড হারবারে ৪৪ জন ব্যবসায়ী আচার্য বিনোবা ভাবের সমক্ষে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁরা সুদ লইবেন না, ঔষধ ও খাদ্যে ভেজাস মিশাইবেন না এবং জ্ঞাতসারে ভেজাল জিনিষ কেনাবেচাও করিবেন না। চটুগঞ্জ নামক স্থানেও আরো ১৪ জন ব্যবসায়ী অনুরূপ শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য ভাবে যখন মুর্শিদাবাদ পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখনও কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ীর নাকি হৃদয় পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। আচার্য ভাবের অনুপ্রেরণার কল্যাণে সত্যই যদি ব্যবসায়ী সমাজের হৃদয়তন্ত্রীতে কোন সাড়া জাগে, তবে আনন্দের কথা। ভারতবর্ষ নাকি ধর্মের দেশ। এখানে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন; চণ্ডাশোক হইয়াছিলেন ধর্মাশোক। তবে অতীতে যাঁদের হৃদয়ের রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাঁদের কেহই বোধ হয় বণিক সমাজ হইতে আসেন নাই। ক্রিশ্চান জগতে সপ্তাহের ছয় দিনের অপকর্মের অপরাধ একদিন চার্চে গিয়া ক্ষালন করিয়া আসিবার যে রীতি আছে, এদেশে ব্যবসায়ী সমাজের একাংশের মধ্যে সেই রীতির প্রতি আসক্তিটাই যেন বেশী। ঘি-এ চর্বি মিশাইয়া যে পাপ হয় একটি মন্দির স্থাপন করিলে সে পাপ ধুইয়া মুছিয়া গিয়া পুণ্যের ঘরে কতটা জমা পড়ে—এই হিসাব খতাইয়া দেখিতেই তাঁরা বেশী অভ্যস্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে চণ্ডাশোকরা ধর্মাশোকে পরিণত হইবেন কিনা এবং হইলেই বা কয়জন হইবেন তাহাই দেখিবার বিষয়।'

—দৈনিক বসুমতী।

অকর্মণ্যতার পরিণাম

'কর্পোরেশনের কাজকর্ম কেন ঠিকমতন চলে না, এই প্রশ্ন তুলিয়া অনেক সময় উত্তর পাওয়া যায় যে, টাকার বড় অভাব। কিন্তু টাকার চাইতে উদ্যমের অভাব যে অনেক বেশী, সম্প্রতি তাহার আরও একটি প্রমাণ মিলিয়াছে। মহানগরীর আবর্জনা পুড়াইবার জন্য, আজ হইতে পঁচিশ বছর আগে, এই প্রতিষ্ঠান হইতে একটি যন্ত্র কেনা হইয়াছিল। দাম পড়িয়াছিল এগারো লক্ষ টাকা। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই যন্ত্রটিকে নাকি কাজে লাগানো হয় নাই। কেন লাগানো হয় নাই, করদাতা এই প্রশ্ন অবশ্যই তুলিতে পারেন। প্রশ্নটির জবাব হয়তো মিলিবে না; কিন্তু জবাব না মিলিলেও বুঝিতে পারা যায় আমাদের পৌর-প্রতিষ্ঠানটির মজ্জাগত অকর্মণ্যতাই যে, ইহার প্রধান কারণ। বস্তুত সেই অকর্মণ্যতার পরিণামেই এত মূল্যবান একটি যন্ত্র এতদিন ধরিয়া অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে এই যন্ত্রটির মূল্য হইবে চল্লিশ লক্ষ টাকা, এবং লাখ দুয়েক টাকা খরচ করিলেই নাকি এই যন্ত্রটিকে চালু করা যাইতে পারে। সে-কাজ অবশ্যই করা দরকার। কর্তৃপক্ষ নাকি তাহার জন্য উদ্যোগীও হইয়াছেন। ভাল কথা। তবু আশঙ্কা হইতেছে, কাজের চাইতে কোঁদলেই যাঁহারা বেশী পটু, এই জরুরী কাজেও তাঁহারা না আবার ঝঞ্ঝাট বাধাইয়া দেন।' —আনন্দবাজার পত্রিকা।
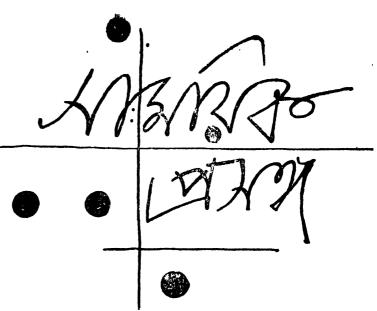
বিমান ভাড়া বৃদ্ধির অসুবিধা

'ভারতীয় বিমানপথে শতকরা দশ টাকা ভাড়া বাড়াইবার যুক্তি যত সঙ্গতই হউক, ইহার ফলে ত্রিপুরার জনসাধারণের যে বিশেষ অসুবিধা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা উদ্বেগ বোধ করিতেছি। আসাম, ত্রিপুরা বা ভারতের যে কোন স্থানের বিমান যাত্রীদেরই ইহাতে কিছু অসুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ত্রিপুরার কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন এই কারণে যে, ত্রিপুরা হইতে কলিকাতা বা অন্যত্র যাতায়াতের বিমানপথই একমাত্র এবং সর্বপ্রধান সম্বল। রেলপথ, ষ্টীমারপথ বা জলপথের সরাসরি সংযোগ না থাকার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের বিমানে ছাড়া ভারতের কোথাও যাতায়াতের সহজ পথ বা সুবিধা নাই। সুতরাং এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধিতে তাহাদেরই আঘাত করিবে সর্বাপেক্ষা বেশী। ত্রিপুরা রাজ্যের এই বিশেষ অসুবিধাজনক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ত্রিপুরার অধিবাসীদের জন্য বিশেষ কনসেসনের ব্যবস্থা দ্বারা পূর্বের বিমান ভাড়া বলবৎ রাখা সম্ভব কিনা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্তৃপক্ষ তথা ভারত সরকারকে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করি।'

—যুগান্তর।

একটি অদ্ভুত উক্তি

'পাকিস্তানী প্রতিনিধি ভুট্টো সাহেব এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে, পাক-ভারত বৈঠক ব্যর্থ হইলেও আমাদের যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। বৈঠকে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কাশ্মীর লইয়া একটা সত্যই বিরোধ আছে। অপূর্ব যুক্তি। এই যুক্তিতে যে কোন অপহরণকারী, আক্রমণকারী কোন বিচারে আসিতে পারিলেই বলিতে পারিবে—অপহরণকারী। সঙ্গে অপহৃতজনের আক্রমণকারীর সঙ্গে আক্রান্তের সত্যই একটা বিরোধ আছে। বিরোধের কারণ নাই, তথাপি বিরোধ বাধাইয়া স্বচ্ছন্দে বলা চলে বিষয়টা লইয়া একটা বিরোধ আছে। আমরা বহুবার এই কথাই বলিয়াছি; কাশ্মীর

সম্পর্কে কোন সমস্যা নাই; অন্তত: ভারতের দিক হইতে নাই। গায়ে-পড়া সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে পাকিস্তান, পাকিস্তান পররাজ্যের উপর লোলুপতা ত্যাগ করিতেছে না—ইহাই সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্যই ভারতকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।' —জনসেবক।

বিশেষজ্ঞের অভাব

'বসন্তের টিকা-প্রকল্পে কলিকাতা পুর-প্রতিষ্ঠান কোনও বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে পারে নাই। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সাধারণ এম-বি-বি-এস ডিগ্রীধারী। তিনি ডি-টি-এম বা ডি-পি-এইচ হইলেও কথা ছিল। ভেষজ সংক্রান্ত তদন্তে এই রহস্য ধরা পড়িয়াছে। রহস্যভেদে যে পরিস্থিতির ইতর-বিশেষ ঘটিবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।'

—লোকসেবক।

উপনির্বাচনের শিক্ষা

'মাটি ও মানুষ' নামে বারাসত হইতে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুপরিচিত কংগ্রেস কর্মীরা উহার পরিচালক। সম্পাদক সুব্রত বসু এবং প্রকাশক দুর্গাপদ ঘোষ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি যুক্তিবাদী শক্তি গড়িয়া উঠিতেছে আমাদের এই কথার প্রমাণ এই পত্রিকাটিতেও পাইতেছি। উপনির্বাচনের শিক্ষা সম্বন্ধে 'মাটি ও মানুষ' লিখিয়াছে: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পাঁচটি উপনির্বাচনেই কংগ্রেস প্রার্থীদের জয় হইয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই প্রকারের একদলীয় প্রাধান্য শুভ নয়। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলির ব্যর্থতাই এজন্য দায়ী। বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্ব ও সংগঠনে যে কতখানি ঘুণ ধরিয়াছে, উপনির্বাচন তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি তো বটেই, অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির উপরেও জনসাধারণের অধিকাংশ আর আস্থা রাখিতে পারিতেছে না। আদর্শের নামে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও দলবাজীর এই স্বাভাবিক পরিণতি। জনমতের রায় মানিয়া লইয়াও আমরা একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র আজ একদলীয় শক্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যতদিন না দেশে শক্তিশালী দেশপ্রেমিক বিরোধীদল গড়িয়া উঠিতেছে, ততদিন এ সমস্যার কোনই সমাধান নাই। কংগ্রেসের এই জয়লাভে একটি পুরাতন সত্য পুনরায় প্রমাণিত হইল যে, কংগ্রেসের নামে ল্যাম্প-পোষ্ট প্রার্থী হইলেও, কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস যদি কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির বংশগত সম্পত্তি না হইয়া সাধারণ নিষ্ঠাবান কর্মীর সংগঠন হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে, তবেই এই নিরঙ্কুশ জয়লাভ আশা ও আনন্দের হইবে। কিন্তু উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে, কর্মীকে অগ্রাধিকার না দিয়া, পাঁচটি আসনের মধ্যে তিনটি আসনেই পারিবারিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়ায়, কংগ্রেসে কংগ্রেসকর্মীর স্থান লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা কংগ্রেসকেই করিতে হইবে। নচেৎ গণতন্ত্র মার খাইতেছে, কংগ্রেসকেও মাশুল দিতে হইবে।'

—যুগবাণী (কলিকাতা।)

চিকিৎসালয়ে অব্যবস্থার ফলে

'হাসপাতাল কাহাদের জন্য? কিসের জন্য? ইহা কি কেবল ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি আখ্যাধারী এক শ্রেণীর স্বদেশীয়ের রুজী-রোজগারের ক্ষেত্র মাত্র? অথবা আর্তের আর্তি নিবারণের, ব্যাধিতের ব্যাধি উপশমের কেন্দ্র? রোগী যদি চিকিৎসকের দর্শন না পায়, না পাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে চিকিৎসকদের অনেক ঝামেলা মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রশ্ন থাকে—হাসপাতাল তবে কিসের জন্য? দীর্ঘদিন ধরিয়া এই হাসপাতালের বিভিন্ন অব্যবস্থার অভিযোগ শোনা যাইতেছে। যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে—তাঁহারাই বলিবেন সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে। চিকিৎসকদের ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অসুবিধাও আমরা বুঝি—যেরূপ রোগীর চাপ সেরূপ শয্যা নাই, যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ কর্মিসংখ্যা নাই, ইত্যাদি। কিন্তু সেই জন্যই যে চিকিৎসকগণ আগত রোগিগণের উপর হৃদয়হীন ঔদাসীন্য দেখাইয়া তাঁহাদের বিবিধ অসুবিধা ভোগের শোধ তুলিবেন—ইহা যুক্তিসিদ্ধও নহে, সহনীয়ও নহে। আমরা জেলাশাসক মহাশয়কে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে এই বিষয়টির তদন্তের জন্যে এবং অনুরূপ ঘটনার ভবিষ্যৎ পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।' —চুঁচুড়া বার্তাবহ (চুঁচুড়া)।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে গলদ

'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মধ্যে এক শ্রেণীর দালালের সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা অর্থ লইয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া দেয়। ইহাদের লোভ এবং দুর্নীতি এমন স্তরে উঠিয়াছে যে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিবার নামে মোটা টাকা লইয়া কিছুই করে না। যদি ঘুষদাতা খুব পেড়াপিড়ী করে তবে তাহার কার্ড নাকচ করিয়া (কোন কিছু কারণ দেখাইয়া) তাহার দাবী নস্যাৎ করিয়া দেয়। সর্বাপেক্ষা অসুবিধায় পড়ে দূরের পল্লীগ্রামের বেকার যুবকরা, তাহাদের ডাকা হয় অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তাহারা এমন দেরীতে চিঠি পায় যে তাহারা সময়ে আসিয়া পৌছিতে পারে না! যদি কোনরূপে আসিয়া পড়ে তবে তাহাদের এমন স্থানে পাঠান হয় যে সেখানে পৌছিবার সময় এবং অর্থ কোনটাই হতভাগ্য যুবকদের থাকে না। চাকুরী সংগ্রহের এই ধোঁকাদারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলে বাঙালী যুবকেরা অনাবশ্যক অর্থ ব্যয় এবং হয়রাণী হইতে বাঁচিয়া যায়। এই বাবদ বেকারদের যাতায়াত খরচ এবং বিদেশে আসিয়া ২।১ দিনের জন্য হইলেও থাকা খাওয়ার পশ্চাতে যে বিপুল অর্থ অপচয় হয় তাহার হিসাব নিকাশ করা দরকার। এই বিভাগ উঠাইয়া দিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। সরকারের অর্থ বাঁচিবে, জনসাধারণের অর্থ বাঁচিবে এবং হয়রাণী হইতে পরিত্রাণ পাইবে। চাকুরী সংগ্রহ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হওয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হাত পা বাঁধিয়া কর্ম সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিবার অধিকার সরকারের আছে কিনা ভাবিয়া দেখা উচিৎ।' জি, টি রোড (আসানসোল)

নির্ধারিত নিয়মে কৃষিকার্য

'সরকার একটি বিল আনয়নের কথা চিন্তা করিতেছেন। তাহাতে নাকি ঠিক হইয়াছে যে সরকারের নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী চাষ না করিলে এবং বাঁধিয়া দেওয়া ফসল উৎপাদন করিতে না পারিলে সরকার জোতদারের কাছ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবেন।

এমন কি জমি কাড়িয়া লইতে পর্যন্ত পারিবেন। সরকারের কৃষি বিভাগের কেরামতি আমরা জানি। আমরা জীপের ভেল্কী নিত্য দেখিতেছি। কিন্তু কথা হইতেছে ডি ভি সি যদি সময়ে জল সরবরাহ করিতে না পারে, আশ্বিন মাসে জল দিতে যদি বিলম্ব করে তাহা হইলে ফসল ঘাটতির ক্ষতিরপূরণ ডি ভি সি কর্মচারীদের মাহিনা হইতে কেন আদায় করা হইবে না? প্রস্তাবিত বিলে তাহারও উল্লেখ চাই। কৃষি বিভাগ যদি আষাঢ় মাসে পাটের বীজ, ভাদ্র মাসে ধানের বীজ সরবরাহ করে তাহা হইলে তাহাদের কাছ হইতেই বা ক্ষতিপূরণ কেন আদায় করা হইবে না। আমরা বলিব সরকার বিলটি চূড়ান্ত প্রণয়নকালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কেবল চাষীকে ধরিয়া টানাটানি করিলে চলিবে না। সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা বিলে করিতে হইবে।'

বর্ধমান বাণী (বর্ধমান)।

সীমান্তের সঙ্কট

'চীনা রণাঙ্গন (নেফা) আমাদের খুবই নিকটে। উত্তর সীমান্তে আছে তিব্বত, নেপাল, ভূটান ও সিকিম এবং পূর্ব সীমান্তে আছে পাকিস্তান। দুই সীমান্তই সন্নিকটবর্তী এবং বিপদগর্ভ তদুপরি গ্রামে গ্রামে আছে ঘরভেদী চীনাপ্রেমী 'বিভীষণ কমিউনিষ্ট। বিপদ ঘটলে নিছক সরকারী ব্যবস্থায় সে বিপদ ঠেকান যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন সচেতন জনসাধারণের আন্তরিক উদ্যোগ। জনসাধারণকে সেই আন্তরিক উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দাবীদার কংগ্রেসের। চীনা আক্রমণের পর দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং নূতন রূপে সৃষ্টি করেছে জাতির এক নূতন দায়িত্ব। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের এই সমস্যা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে মিলিত ভাবে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগও ঘটল এই প্রথম। এই সব কারণে পশ্চিমবাংলার বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় বৈশিষ্ট্য আছে।'

—যুগদীপ (বিষ্ণুপুর)।

বাঙ্গালী পল্টন প্রসঙ্গে

'বহুকাল যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে দূরে থাকায় যুদ্ধ নাম শুনিলেই হয় আতঙ্ক—ছেলে পল্টনে নাম লিখাইয়াছে শুনিলেই বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া যায়। কোন বিপদের সময়ে বাঙ্গালী মা, বোনদের রক্ষার জন্য পাঞ্জাবী বা জাঠ সৈন্য ডাকিতে হইলে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব রক্ষা হইবে না। বাংলাকে রক্ষা করিতে হইবে প্রধানত বাঙ্গালীকেই। বহুকাল ইংরেজের অধীনে চাকুরী করিয়া মনের প্রসারতা ও সাহস এতই কমিয়া গিয়াছে যে সৈন্যদলে প্রবেশ করিলে বেতন কিরূপ হইবে ইহাই আলোচনার প্রধান বিষয় হইয়াছে। এই মনোভাবের আজ কোন স্থান নাই। বিদেশী শত্রু একবার পশ্চিম বাংলার উপর দিয়া চলিবার সুযোগ পাইলে কোথায় থাকিবে অর্থ, কোথায় থাকিবে সম্পত্তি। বর্ণসঙ্করে দেশ আচ্ছন্ন হইবে। এদিকটাও চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে দেখা যাইবে এই ভেতো বাঙ্গালীর ছেলেরা পাঠান, মোগল, ইংরেজের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালীর শৌর্য ও বীর্য অন্তরায় হইয়াছিল ইংরেজের কাছে বাঙ্গালীকে সৈন্যদলে প্রবেশ অধিকার দিতে। বুদ্ধিমান বাঙ্গালীকে পল্টন দলে ভর্তি করায় বিপদ আছে ইংরেজ ইহা বুঝিয়াছিল। ভারতীয় সরকার নিশ্চয়ই ইংরেজী মনোভাব পোষণ করেন না। একটি মাত্র কথা এই সময়ে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—সৈন্যদলের কোন রাজনীতি নাই—তাহাদের একমাত্র কাজ অধিনায়কের নির্দেশ নির্বিচারে মান্য করা। সৈন্য দলে রাজনীতি বিভিন্ন রূপে প্রবেশ করিলে ফল হইবে অতি সাংঘাতিক। শত্রুদল সর্বদাই চেষ্টা করিবে যুদ্ধকালীন সৈন্য সংগ্রহের সময়ে স্বপক্ষের কিছু লোক সৈন্যদলে প্রবেশ করাইয়া দিতে। বাঙ্গালী পল্টন গঠনের সময়ে এই দিকে খুবই সাবধান হইতে হইবে। আশা করি সমগ্র ভারতবাসী বাঙ্গালী পল্টনদের সাদরে গ্রহণ করিবে ও বাঙ্গালী পল্টন সারা 'ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে তাহাদের কাযে ও ব্যবহারে।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)।

অবিস্মরণীয় সন-তারিখ

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর: সোভিয়েত দেশ পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করে। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল: য়ুরি গ্যাগারিনকে নিয়ে মহাকাশযান ভোস্তক মহাশূন্য পরিক্রমায় বার হয়। ১৯৬১ সালের ৬ই আগষ্ট: যেরমান তিতোভের পরিচালনায় ভোস্তক—২ পৃথিবীর চারদিকে ১৭ বার প্রদক্ষিণের অভিযান শুরু করে। ১৯৬২ সালের ১১ই আগষ্ট: আনদ্রিয়ান নিকোলায়েফকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে ভোস্তক—৩ প্রায় চারদিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ৬৪ বারেরও অধিক। ১৯৬২ সালের ১২ই আগষ্ট: পাভেল পোপোভিচের পরিচালনায় ভোস্তক—৪ পৃথিবীর চারদিকে প্রায় তিনদিনের ৪৮ বার প্রদক্ষিণের পরিক্রমায় বার হয়। সোভিয়েত মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে ছিলেন সর্বসাকুল্যে প্রায় ২০০ ঘণ্টা এবং পথ পরিক্রমণ করেছেন মোট ৫,৩৬৬,৭১৩ কিলোমিটার, অর্থাৎ সাত বার চাঁদে গিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসার দূরত্বের সমান।

একটি বিরোধের উত্তর

অমল মিত্র

কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের ইতিহাসে উনিশ শতকটিকে স্বর্ণযুগ বলা চলে। কত নাটক অভিনীত হ'ল, কত অভিনেতা এল-গেল, কত উর্বশীবিনিন্দিতা অভিনেত্রীর সার্থক অভিনয়সাফল্যে মুখরিত হ'ল সেদিনের আধা-শহর কলকাতা। নাট্য রসপিপাসু শহরের বুকের উপর তখন অভ্যুদয় ঘটেছে কত সুচারু রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠানের। বাষ্প-বুদবুদের মত তার কিছু মিলিয়ে গেছে অপরিচিতির গহ্বরে, কিছু বা নিশ্চিহ্ন হয়েছে নানা সংঘাত ও সমারোহের মধ্য দিয়ে।

১৮৩৯ সালের এক গভীর নিশুতি রাত্রে এমনি এক রঙ্গালয় চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একদিন সে ছিল বহুজনের আনন্দ-উৎস। রাতের পর রাত বহু সার্থক অভিনয় সেখানে হয়েছিল। অগ্নিবিধ্বস্ত রঙ্গালয়টি সম্বন্ধে তাই সেদিনের এক পত্রিকা ("ইংলিশম্যান", ৪ঠা জুন ১৮৩৯) লিখেছিল—

> "Besides, the theatre was, if nothing else, a monument of pleasant nights,—it was hallowed, we may say, by innumerable delicious souvenirs."

যাই হোক, সে অগ্নিদাহের অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় ইংরেজরা হতবাক। তাঁদের নতুন রঙ্গালয় গড়ার উৎসাহটুকুও নিবে গেল। অনেকেরই অনেক টাকা লোকসান গিয়েছে চৌরঙ্গী থিয়েটারে। তাই এই উদাসীনতা। এমন দিনে 'ইংলিশম্যান' প্রতিষ্ঠাতা নট ও নাট্যরসিক স্টোকলার এই দুরূহ কাজের ভার গ্রহণ করলেন। 'মেময়ার্স অফ এ জার্ণালিষ্ট'এ তিনি লিখেছেন—

> "No one seeming disposed to attempt the work of re-construction, it fell to me to endeavour to raise a subscription, and give the public a theatre in another part of the town."

স্টোকলার তাঁর এই মহৎ কাজে সঙ্গিনী পেলেন মিসেস লিচকে। হালফিল তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছেন। অভাবনীয় দুঃসংবাদে মর্মাহতা। অভিনেত্রী-জীবনের বেশীর ভাগই সংশ্লিষ্ট ছিলেন চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ের সঙ্গে এবং তাঁর যশের পথও সুবিস্তীর্ণ হয়েছিল সেখান থেকেই। এ ছাড়া সহকর্মিণী মিসেস ব্ল্যাক ও মিসেস ফ্রান্সিসকে দেখলেন সর্বহারা। তাঁর বিরাট শিল্পীমন চঞ্চল হয়ে উঠল রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে। চাঁদা সংগ্রহ শুরু হল। শহরের অপর এক অংশে জমির চেষ্টাও চলতে লাগল। ইতিমধ্যে ডালহৌসী অঞ্চলে সাময়িক এক রঙ্গমঞ্চ খাড়া করে কাজ চালু করে দেওয়া হল—ওয়াটার্লু ষ্ট্রীট ও গভর্ণমেণ্ট হাউস ইষ্টের কোণে আজ যেখানে দেখি এজরা ম্যানসন সেইখানে। উপরে থ্যাকার কোম্পানীর বই-এর দোকান। সুপরিসর একতলাটিতে নির্মিত হল রঙ্গালয়। নাম সাঁ সুসি থিয়েটার।

অল্পদিনেই নতুন রঙ্গালয় জমে উঠল। রাতের পর রাত অগণিত দর্শক সমাবেশ হত। হতাশ হয়ে ফিরেও যেতে হত অনেককে, প্রবেশপত্র যোগাড় করতে না পেরে ("We are informed that at least sixty persons were disappointed in their attempt to obtain tickets,'—"Englishman," 20th Sept. 1839.)। প্রশস্ততম এক প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হলেন মিসেস লিচ। ছোট মঞ্চে অভিনয় খোলেও না ভাল। তাই ১৮৪০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ই, ১৩ই এবং আরো অনেকগুলি তারিখে দেখি সংবাদপত্রে ("ইংলিশম্যান") বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন মিসেস লিচ। সুপরিসর প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করবেন। পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা খরচা। কলকাতাবাসীদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করলেন। কি ভাবে রঙ্গালয় পরিচালনা করা হবে সে সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপনে জানালেন।

আশ্চর্য, বিজ্ঞাপন পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড হাজার টাকা চাঁদা পাঠালেন। ১৫ই তারিখের 'ইংলিশম্যান' সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলে সেকথা। রামমোহনের পর যে বাঙালীর নাম সকলের মুখে মুখেই ফিরত সেদিন, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুরও দিলেন হাজার টাকা। চৌরঙ্গী থিয়েটারে বহু টাকা ডুবে গিয়েও তাঁকে দমাতে পারে নি। স্যার এডওয়ার্ড রায়াণ, মতিলাল শীল, স্যার জে, পি, গ্র্যাণ্ট, রমানাথ ঠাকুর, স্যার জাসপার নিকলস, অধ্যাপক গুডিভ, রসময় দত্ত, রুস্তমজী বয়াজী, মেজর এইচ, বি, হেণ্ডারসন, স্যার এইচ, সেটর্ণ, এইচ, এম, পার্কার, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাঁ সুসির শুভাকামী আরো অনেকে এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে।

বেশ ভালভাবেই চাঁদা সংগ্রহের কাজ শুরু হলেও অল্পদিনেই বোঝা গেল প্রয়োজনীয় টাকার সবটা উঠবে না। এদিকে অপরিসীম উৎসাহী মিসেস লিচ পার্ক স্ট্রীটের ওপর জমি নিয়ে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর শিল্পীমন বাস্তবজগতের কোন খবরই নেয় নি। তাই, অভাবনীয় এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন তিনি। এবং শেষ পর্যন্ত টাকার জন্যে নবনির্মিত রঙ্গালয়গৃহ, জমিজমা সব কিছুই বাঁধা দিতে বাধ্য হলেন। স্টোকলার সাধে বলেন নি, রঙ্গালয় এবং গির্জা নির্মাণে ঋণ যেন অবশ্যম্ভাবী। তবে তিনি এও বলেন যে, গির্জার ভাগ্যে ধর্মপ্রাণ কোন ধর্মযাজকের জনপ্রিয়তা ঋণ পরিশোধে সাহায্য করে। কিন্তু রঙ্গালয়ের সে সুযোগ কই? পবিত্রতার নামগন্ধ নেই তার আশপাশের কোথাও। দৈবাৎ কোন প্রতিভাবান শিল্পীর আবির্ভাব ঘটলে ঋণের বোঝা নামে। মালিকরাও কিছু পান। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই আগের অবস্থা আবার ফিরে আসে। স্টোকলারের অননুকরণীয় ভাষাটি উদ্বৃত করে দিই—.

> "Money had to be raised by the mortgage of the property, and all it was to contain, It seems to be the fate of theatres and churches to open under these disadvantages. Piety, and the popularity of some individual minister, will often contribute to relieve the church of its incumbrances; but theatres ares eldom so fortunate. There is no Odour of sanctity about them to hallow the voluntary contributions. It is only when some great genius appears—once in a century or so, that a flood of prosperity sets in, and gives the share-holders a divident. With his disappearance there comes an eble in the tide of affairs, and the difficulties are renewed".
>
> ('Memoirs of a Journalist")

দারুণ এই অর্থসঙ্কটের দিনে আবার আর এক সমস্যা দেখা দিল। সকল দেশেই সকল যুগেই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধতা করে থাকে একদল মানুষ। ইংরাজীতে তারা "Kill Joys"। ইতিহাস বলে বাংলা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাকালেও এমনি কিল জয়েসদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সাঁ সুসি প্রতিষ্ঠাকালেও তাদের আবির্ভাব ঘটল। "ক্যালকাটা কুরিয়ার" সংবাদপত্র তাদের দখলে। রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে তারা বেপরোয়া প্রতিকূল অভিযান শুরু করল। রঙ্গালয় তাদের মতে "profane and sinful amusement"। অতএব তা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আরো অনেক কথা বললে রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে।

অবশ্য তারা সুবিধে করে উঠতে পারে নি। রঙ্গালয়ের স্বপক্ষেও অনেকে তাঁদের মতামত জানালেন কাগজের মারফৎ। "ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট" (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৯) লিখলে, কখন সখন এক আধটা 'Burra khanna or Ball" নাচ উৎসব অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিলে বলা যায়, লণ্ডনের মতই কলকাতার জীবন নীরস বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে ("The place has become another London")। সাঁ সুসির প্রতিষ্ঠাতা তাই সকলকেই খুশী করবেন, স্বল্পব্যয়ে অনাবিল আনন্দ বিতরণের ব্যবস্থা করায় প্রতিষ্ঠাতাদের তারা অভিনন্দন জানাল।

'অ্যাটেনার' ছদ্মনামে একজন লিখলেন ('Englishman" 21st April, 1840) [illegible]

"নির্জন সৈকতে" ও "ছায়াসূর্য" প্রভৃতি চিত্রের নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর

আনন্দ দেয়। কর্মব্যস্ত পুরুষদের তবু দিন একরকম কেটে যায়। কিন্তু মহিলাদের অবস্থা সঙ্গীন। কিছুই করবার নেই। বিদ্রূপচ্ছলেই লিখলেন—

"As for the ladies, it is difficult to suggest the possibility of their doing anything at all, beyond going to sleep after breakfast and waking to tiffin, dozing till six, and driving till dinner".

রঙ্গালয় সম্বন্ধে 'কিল্ জয়েস'দের অন্যায় ও অশোভন মন্তব্যে স্টোকলারও ক্ষুব্ধ হন, বিরক্ত হন। তাই তাঁর হাত থেকেও তারা রেহাই পেল না। বেনামে ও সূক্ষ্ম চাতুর্যে তিনি রোষবর্ষণ করলেন। যেমন, নাট্যকার না হলে সেক্সপীয়ারের অমন দশা হয়? মাত্র আধ পেনির জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরতেন। তারপর বিয়োগান্ত নাটক রচয়িতা কর্ণেলী? সেই মর্মন্তুদ দারিদ্র্য। জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমন অবস্থা যে শেষ পর্যন্ত পেরেক বেঁধে পায়ে। সমসাময়িক একজন মন্তব্য করে গেছেন 'আয়রণ এন্টার্ড হিজ সোল্'। প্লটাস এবং সলোমন প্রহসন রচয়িতাদ্বয়ের অনুরূপ অবস্থা। বেঞ্জামিন জনসনের কথা যদি ধরি, তাঁরও দেখব রঙ্গালয়ের জন্যে নাটক লিখেই অমন দুরবস্থা। স্যাভেজের সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। রহস্যচ্ছলে সবশেষে—এদের সঙ্গে নিজেদেরও যুক্ত করে দিলেন তিনি। বললেন, সাঁ সুসির ক্যাপ্টেন ম্যাক্নটনের হয়ত ভারতের প্রধান সেনানায়কের কাজ জুটত। কিন্তু রঙ্গালয়ই তাঁর কাল হল। আর স্টোকলার? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছেন। সংবাদপত্রের

সুপ্রিয়া চৌধুরী ছায়াছবির বাইরে

ব্যবসা নিয়ে ছিলেন ভাল। হচ্ছিলও দু'পয়সা। কিন্তু রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এসে ঘটল সর্বনাশ। 'ইংলিশম্যান'-এর সব গ্রাহকই দেখি 'কুরিয়ার' পড়ছে আজ। স্টোকলারের অননুকরণীয় ভাষাটি তুলে দিই, পাঠকদের ভাল লাগবে বলে। তিনি লেখেন—

"William Shakepeare, an author who wrote some comedies as far back as the reign of Queen El'zabeth...is said to have been driven to steal deer for his subsistence, and was taken before a single magistrate for it. He afterwards earned half pence by holding people's horses when they dismounted so that, as the learned editor of the Eastern Star would say, the stealing of deer proved dear stealing to him...

"Corneille was so poor that he had to get his old shoes mended long after the period when respectability required that he should have had new ones. They became at last so thin in the under leather that a nail ran into his foot or, as a contemporary relates it, 'iron entered his sole', and surely Corneille wrote tragedies...

Plantus turned a mill and Ikey Solomon trod one, and the miller who lived by the river Dee doubtless wrote comedies......

Benjamin Jonson (not of our branch, we drive from Samuel) who scribbled for the stage was on that account reduced to carry the hod, and sometimes to use the trowell, when he wished to lay it on thick; and Savage lived without principle or interest, as a warning to people to mind how they write plays, or have anything even remotely to do with them......

One Captain Macnaughten, who might have been a Commander-in-Chief...took to writing opening addresses and farewell addresses for Mrs. Leach and criticisms of performances at the Sans Souci, and what is the result? He is now the incompetent writer of commercial articles to 'The Englishman'...

Mr. J. H. Stocqueler, having taken to the boards, finds the subscribers to his newspaper all flocking to the 'Courier', and yet he at one time had a respectable circulation."

উত্তরায়ণ

মিথ্যা সকল ক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য নয়। নিয়তির বিধান জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন মিথ্যাকে মেনে নেওয়া এক বৃহত্তর কল্যাণের বারতা বহন করে আনে। নায়ক প্রবীরের জীবনেতিহাসের মধ্যে এই বিরাট সত্যের জয়ধ্বনি করেছেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "উত্তরায়ণ" রচনাটির মাধ্যমে। তারাশঙ্করের রচনাবলীর মধ্যে উত্তরায়ণ এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, কারণ এই রচনায় জীবনের এক নিগূঢ় রহস্যের বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। এই বিশ্লেষণের ফলে জীবনের এক বৈচিত্র্যময় মূর্তি তাঁর সামনে উদঘাটিত হয়েছে।

প্রবীর উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার। রত্নেশ্বর সাধারণ মোটর চালক। উভয়ের আকৃতি হুবহু একরকম। কোথাও কোন প্রভেদ নেই। প্রথম পরিচয় রণক্ষেত্রে। আকৃতির সাদৃশ্যকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে ওঠে। দু'জনেরই পিছনে আছে এক ফেলে আসা ইতিহাস। প্রবীর রেখে এসেছে আরতিকে। রত্নেশ্বরের অন্ধ জননী এবং স্ত্রী সতী বর্তমান। রত্নেশ্বর প্রাণ হারায়। প্রবীর খবর দিতে আসে তার পরিবারবর্গকে। তারপর পরিস্থিতি এমন রূপ নিল যাতে প্রবীরকেই অনির্দিষ্টকালের জন্যে রতন হতে হয়। তারপর ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে কাহিনী এক নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

অগ্রদূত পরিচালিত উত্তরায়ণের চলচ্চিত্ররূপে পরিচালনগত কোন উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না বরং পরিচালনপদ্ধতি ছকে বাঁধা দোষে দুষ্ট। সেই গতানুগতিক গল্প বলার ধারা, মামুলী প্রেম নিবেদন, পিয়ানোর ধারে বসে গান গাওয়া যা আজকের দিনের দর্শকের মনে দাগ কাটার ক্ষমতা রাখে না। তবে কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ এই ত্রুটি বিচ্যুতি বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি। কাহিনীর সারবত্তা এবং আবেদন দর্শকের মন গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং দর্শকচিত্তে এক অপরূপ রসঘন অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই কাহিনীর মধ্যে যে উপাদান আছে তার যথাযথ পরিচর্যা ঘটলে এই ছবি রসোত্তীর্ণতার শেষ স্তরে অনায়াসে উপনীত হতে পারত এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

অভিনয়াংশে সবাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখনীয় এবং যাঁর অনবদ্য অভিনয় দর্শক সাধারণকে অভিভূত করে তোলে তিনি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। জীবনশিল্পী তারাশঙ্করের অপূর্বসৃজনীর এক অসামান্য নিদর্শন সতী চরিত্রটির মর্মবাণী তাঁর প্রাণঢালা অভিনয়ে উপলব্ধি করা যায়। প্রবীর ও রতনের যুগ্ম ভূমিকায় উত্তমকুমার অসাধারণ নৈপুণ্য ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সুপ্রিয়া চৌধুরীর আরতির ভূমিকায় অভিনয় দর্শকচিত্তে যথেষ্ট তৃপ্তি এনে দেয়। তাঁর অভিনয় যেমনই বলিষ্ঠ, তেমনই সংযত। অন্যান্য ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, গঙ্গাপদ বসু, ম্যালকম, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ধীরাজ দাস, সমরকুমার, গীতা দে, নিভাননী দেবী, আশা দেবী, রমা দেবী, কেতকী দত্ত প্রমুখ শিল্পীরা আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আলোকচিত্র ও আবহসঙ্গীতের কাজ প্রশংসা ও সাধুবাদের দাবী রাখে। ছবিটির প্রচারকার্য পরিচালনা করেছেন বাঙলার খ্যাতনামা প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্যাল।

রূপকার নিবেদিত ব্যাপিকাবিদায় ও চলচ্চিত্তচঞ্চরী

ব্যাপিকাবিদায় ও চলচ্চিত্তচঞ্চরী—এই নাটক দু'টি মঞ্চস্থ করে রূপকারগোষ্ঠী দর্শকসমাজের বিপুল প্রশংসায় বিভূষিত হয়েছেন। তাঁদের নিবেদন দর্শকমহলে পরম সমাদরে গৃহীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টা নাট্যামোদীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার লেকের নিকটবর্তী ত্যাগরাজা হলে এই নাটক দু'টির নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে। নাটক নির্বাচনের মধ্যেই রূপকারগোষ্ঠীর বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, সতেজ চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্যের গভীরতার পরিচয় মেলে। বিগত যুগের নাটক নতুন যুগের দর্শকদের সামনে তাদের সমান মর্যাদাসহকারে পরিপূর্ণ কৃতিত্বের সঙ্গেই যে পরিবেশন করা চলে রূপকারগোষ্ঠী এই সত্যই আবার নতুন করে প্রমাণ করলেন। নিজস্ব সনাতন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে উগ্র সাহেবিয়ানার অনুকরণ সমাজকে যে কতখানি সঙ্কটের সম্মুখীন করে তোলে তারই একটি নিখুঁত আলেখ্য অঙ্কন করেছেন রসরাজ অমৃতলাল তাঁর "ব্যাপিকাবিদায়" নাটকে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি যে কত দুর্বল, কত অসার, সেইদিকে স্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শিশুসাহিত্যরথী সুকুমার রায় তাঁর চলচ্চিত্তচঞ্চরী নাটকটির মাধ্যমে। এই বিশেষ জাতীয় বলিষ্ঠ

"ভ্রান্তিবিলাস"-এর দু'জন বিশিষ্ট শিল্পী উত্তমকুমার (প্রযোজক) ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তব্য সম্পন্ন নাটকের আবেদন ফুরিয়ে যায় না। বিশেষ করে আজকের দিনে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ধরণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক নাটক অর্থাৎ খাঁটি স্যাটায়ারের মাধ্যমে একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটন করে রচয়িতারা তাঁদের সমাজ কল্যাণকামী মনের পরিচয় দিয়ে গেছেন। অভিনয়ে, পরিচালনায়, প্রয়োগনৈপুণ্যে, টিমওয়ার্কে, রসসৃষ্টিতে সবিতাব্রত দত্তের নেতৃত্বে রূপকারগোষ্ঠী যে অসাধারণ কুশলতার ছাপ রেখে গেলেন তা তুলনাবিরল। তাঁদের নৈপুণ্যে নাটক দুটি সকলদিক দিয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এবং মনের গভীরে দাগ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে। নাটকে কোথাও ছন্দপাত নেই, কোথাও কোন কৃত্রিমতা নেই, কাথাও কোন প্রকার গতানুগতিকতা ও একঘেঁয়েমির সন্ধান মেলে না। উপযুক্ত পরিবেশ প্রসাদে নাট্যরস দানা বেঁধে উঠেছে। সবিতাব্রত দত্ত এবং অন্যান্য শিল্পীরা অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন এবং দর্শক সাধারণকে স্বতঃস্ফূর্ত নির্মল আনন্দরসে পরিপ্লাবিত করেছেন। শিল্পিবৃন্দের মধ্যে ভবরূপ ভট্টাচার্য, অমিত মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, প্রদ্যোত চট্টোপাধ্যায়, শক্তি দত্ত, সন্তোষ দত্ত, মানস ভট্টাচার্য, সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, তুলাঙ্গ ভট্টাচার্য, রেবা দেবী, স্মিতা সিংহ, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। দক্ষ নট বঙ্কিম ঘোষের রূপসৃষ্টি এক কথায় অতুলনীয়। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

একটি ন্যক্কারজনক উদ্যম

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না, নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী, গুড-আর্থের রচয়িত্রী প্রখ্যাতনাম্নী লেখিকা পার্ল বাকের ভারত আগমনের সংবাদ অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণের অশ্রুত নয়, তাঁর ভারত আগমনের উদ্দেশ্যও সর্বজনবিদিত।

"গাইড" ছবিটিকে কেন্দ্র করে তাঁর ভারতে আসা। ভারতের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নট দেব আনন্দ এবং পার্ল বাকের যুগ্মপ্রযোজনায় যৌথ ভারত মার্কিন প্রচেষ্টায় গাইড ছবিটি উভয় ভাষায় চিত্রায়িত হবে।

এ সংবাদ অন্যান্য বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার মত আমরাও যথা সময়ে আমাদের পাঠকদরবারে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

এই বহু আলোচিত বহুল প্রচারিত ছবিটির উপজীব্য গল্পাংশ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমরা এই সমগ্র প্রচেষ্টাটিকে ধিক্কার দিতে বাধ্য হচ্ছি, এই সমগ্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

পশ্চিমীরা আমাদের কি দিয়েছেন, তাদের দ্বারা কতখানি আলোকপ্রাপ্ত সভ্য মানুষ হয়েছি, তাঁরা আমাদের কত উন্নত করে তুলেছেন এবং আজও আমাদের সমাজে ও জীবনে কত শূন্যতা কত অন্ধকার কত গলদ তার ফিরিস্তি প্রণয়নে তাঁদের ক্লান্তি নেই। ভারতীয়দের ছিদ্র সন্ধানে তাঁদের উৎসাহ, উদ্যম উদ্দীপনা অতুলনীয়।

কিন্তু পূর্বগগন থেকে যুগ যুগ ধরে যে কত সূর্যের স্বর্ণাভ রশ্মি পশ্চিমের আকাশকে উদ্ভাসিত করেছে, তার অসংখ্য নরনারীকে রশ্মি দিয়েছে, তার সর্বাঙ্গকে অকৃপণ হাতে মুঠোমুঠো আলো ছড়িয়েছে ইতিহাস এবং বিধাতা তার সাক্ষী—তবে এ নিয়ে আমরা কখনও বড়াই করি না। তাই পশ্চিমের কাছে যে এ ব্যবহার আমরা পাব এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই—কারণ এটাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তবে যুগপৎ আশ্চর্য ও লজ্জা এইখানেই যেখানে দেখছি এর রচয়িতা একজন ভারতীয় এবং

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী প্রসূত "ভ্রান্তিবিলাস"
সহনায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়

এর ভারতীয় ভাষায় চিত্রায়ণে একজন ভারতসন্তান হস্ত প্রসারিত করেছেন।

এক ভারতীয় মন্দির প্রদর্শকের নিন্দনীয় জীবনের নানাদিক পরম আড়ম্বরে চিত্রিত করা হচ্ছে। এই ধর্মপথিকের কুৎসিত জীবনকে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শকদের দেখানো হবে যে ভারতীয়েরা কি এবং কোথায়?

কিন্তু ওঁরা কি নিজেদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখেন না? দেখলে দেখতে পেতেন ওঁদের সমাজও আবিলতা থেকে মুক্ত নয়! ওঁরা কি বলতে চান যে, ওঁরা সর্বতোভাবে পুতপবিত্র? নীল আকাশের নীচে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে পারেন ওঁরা বলতে যে ওঁদের দেশের ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন অনাচারের নিদর্শন মেলে না? অত্যাচারিত লাঞ্ছিত, শোষিত ভারতের এক প্রতিভা-মনীষা-মেধা-সংস্কৃতি-আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি, বেদ, উপনিষদ, গীতার জন্মভূমি মহান ভারতের সন্তান হিসাবে অমৃতের পুত্র হিসাবে বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, ব্রহ্মবান্ধব, চাণক্য, নাগার্জুন, কনিষ্ক, হর্ষ, প্রতাপ, শিবাজী, তিলক, সুভাষচন্দ্রের স্বজাতি হিসাবে আজকের পশ্চিমকে এ চ্যালেঞ্জ আমরা অনায়াসে করতে পারি এবং তা করলাম।

প্রমথ চৌধুরী আজ যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে আমাদের মনে হয় তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা "আমরা ও তোমরা"য় এই ঘটনা অবলম্বন করে আরও কয়েকটি পংক্তি যুক্ত হোত। ভারত-বিদ্বেষী রচনার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন মিস মেয়ো, মিস র‍্যাথবোন ইত্যাদি আরও কয়েকজন। আমরা লেখককে ঠিক এঁদের পর্যায়ে ফেলছি না। আরও হীন আসন তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট হোক। র‍্যাথবোন, মেয়ো— এঁরা বিদেশী কিন্তু ইনি যে দেশের কুৎসা প্রচারে পঞ্চমুখ তিনি সেই দেশেরই সন্তান। আপন মাতৃভূমিকে যারা বিদেশের কাছে এইভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে, জননীর সোনার অঙ্গে যারা কলঙ্কের কালি ছিটোতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে—সেই তথাকথিত লেখকের, সেই অর্থপ্রিয় চিত্রনাট্যের এবং এই ছবির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যোগ্য শাস্তি অবলম্বিত হোক—"মানুষ" নামের অধিকারী হিসাবে এই আমাদের একান্ত কামনা এবং এই ছবি প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য ও একমাত্র বক্তব্য।

সংবাদ বিচিত্রা

বাঙলা তথা ভারতের প্রখ্যাতনামা অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভারতের জনকল্যাণমূলক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সোসাইটি পরিচালিত হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুদের পরিচর্যার জন্য একটি নিউরো সার্জারি ব্লক নির্মাণের জন্য দুই লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং প্রথম কিস্তি হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছেন। প্রস্তাবিত ব্লকটি তাঁর স্বর্গগতা জননী স্মৃতিময়ী দেবীর নামানুসারে স্থাপিত হবে। মহানগরী কলকাতার ছয় মাইল উত্তরে বনহুগলীতে এই চিকিৎসালয়টি অবস্থিত। বিশ্বজিতের জনকল্যাণকল্পে এই মহৎ দান নিঃসন্দেহে সর্বসাধারণের অকুণ্ঠ সাধুবাদের দাবী রাখে। এই বিপুল দানের জন্যে আমরা এই জনকল্যাণকামী শিল্পীকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই পুণ্যদানকর্মের মাধ্যমে বিশ্বজিৎ প্রমাণ করলেন যে, এই ধরণের শিল্পীদের দ্বারা শুধু নাট্যজগতেরই নয়, সমাজেরও বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হয়।

* * *

বাঙলাদেশের চিত্রামোদীদের অন্তরে "চিত্রা" চিত্রগৃহটির একটি বিশেষ আবেদন আছে। আজ সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এই চিত্রগৃহ যে ভাবে দর্শক সাধারণকে আনন্দ জুগিয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। বাঙলাদেশের কত অবিস্মরণীয় চিত্র যে আমরা এই প্রেক্ষাগৃহে দেখেছি, কত ছবির মাধ্যমে কত গান শুনেছি, কত হাসি কান্নায় অজান্তেই নিজেরাও অংশ গ্রহণ করেছি তার হিসাব-নিকাশ করা আজ সাধ্যাতীত। বাঙলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসে "চিত্রা" প্রেক্ষাগৃহের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এর গৌরব যেমনই বিরাট, ঐতিহ্য তেমনই মহান। সেই প্রেক্ষাগৃহ আজও বর্তমান, দর্শকের সমাগম এখনও সেখানে নিত্য ঘটছে। রূপালী পর্দার ছবির প্রতিফলন বন্ধ হয়নি, তবে এই গৃহটির ইতিহাসের এবার মোড় ফিরল। নতুন পরিচালকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে তার নাম বদল হল। আজ তার নাম মিত্রা! তিরিশ বছরের গৌরবদীপ্ত অপ্রতিহত জয়যাত্রার স্মৃতি মানুষের মন থেকে মিলিয়ে যাওয়ার নয়। নতুন পরিচালকদের নেতৃত্বে মিত্রা প্রভূত সাফল্য অর্জন এবং নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হোক এই কামনা করি।

'মাসিক বসুমতীর' অনুরাগী পাঠক উৎপল দত্ত

বাঙলা দেশের অগণিত চিত্রামোদীর দল যে সংবাদে প্রভূত আনন্দ পাবেন সেটি হচ্ছে যে কলকাতার উপকণ্ঠে বজবজ রোডে নাগী অঞ্চলে সম্প্রতি মহাসমারোহে "ইন্দ্রধনু" নাম এক নতুন প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন সুসম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী কানন দেবী ও সম্মানিত অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীঅসিত চৌধুরী।

* * * *

অল্পকাল আগে লোকসভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী জানিয়েছেন যে, শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে অভিনয়ান্তে ১৮ সেকেণ্ড সময় নিয়ে সংক্ষিপ্ত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর সঙ্গীতের নির্বাচিত অংশটুকু অনুমোদন করেছেন। জনগণের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও জাতীয় মনোভাব উদ্দীপনের জন্যে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন।

* * * *

সম্প্রতি দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসবকে কেন্দ্র করে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে গেছে, সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ভবনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে চিত্রাভিনেত্রী মীনাকুমারীর সাক্ষাৎকার। পঁয়তাল্লিশ মিনিটব্যাপী এই সাক্ষাতে বিবিধ বিষয়ে উভয়ের আলাপ-আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হওয়ার পর এই এক বছরে চলচ্চিত্র-জগতের অন্য কোন ব্যক্তি বা মহিলার সঙ্গে তাঁর আলোচনা এত দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছে বলে মনে পড়ে না। দর্শক সাধারণ বোধ করি অনবগত নন যে, মুখ্যত অভিনেত্রী হিসেবেই মীনাকুমারী সুপ্রসিদ্ধা হলেও সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর বিপুল অধ্যয়ন তাঁকে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জনে সহায়তা করেছে। উর্দু ভাষায় তাঁর রচনাদি বহুল প্রশংসার দাবীদার। সাধারণভাবে তাঁর পাঠগ্রহণ বেশীদূর এগোয় নি তবে নিজের চেষ্টায় নানাবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে আপন জ্ঞানভাণ্ডার তিনি বহুলপরিমাণে ভরিয়ে তুলেছেন।

পদ্মা চক্রবর্তী "আয়নার" এর চিত্রগ্রহণের অবসরে

* * * *

বর্তমানকালের যে সকল ভারতীয় চিত্রতারকা আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধির অধিকারী রাজকাপুরের স্থান তাঁদের শীর্ষে। হিন্দী চিত্রজগৎ তাঁর দ্বারা যে বিপুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে, সে সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। বর্তমানে ইংরাজী ছবিতেও তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। হরিশ মেহরার গল্প অবলম্বনে রচিত ও আর, কে, নায়ার পরিচালিত "তিসরা কৌন" ছবিটি হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় গৃহীত হচ্ছে। দ্বি-ভাষী ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন রাজকাপুর, জয় মুখোপাধ্যায় ও সায়রাবানু।

* * * *

আগামী জুলাই মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর অন্যতম অংশ হিসাবে এক ভারতীয় চলচ্চিত্র সমারোহের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তর করেছেন। এই সমারোহে পাঁচটি ছবি প্রদর্শিত হবে। মন্ত্রিসভায় মতে রাশিয়ার দর্শকসমাজে নৃত্য-গীতবহুল এবং সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলি বিশেষ ভাবে সমাদৃত।

* * * *

বহুল প্রচারিত মুক্তি প্রতীক্ষিত "ক্লিওপেট্রা" ছবিটির শিল্পী-তালিকায় এলিজাবেথ টেলার ও রিচার্ড বার্টন ব্যতীত আর যে সব প্রসিদ্ধ নাম অন্তর্ভুক্ত খ্যাতনামা অভিনেতা রেক্স হ্যারিসন তাদের অন্যতম। ছবিটিতে জুলিয়াস সিজারের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটির তিনি রূপ দিচ্ছেন। বর্তমানে ছবিটির নির্মাতা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের বিরুদ্ধে তিনি মামলা দায়ের করেছেন। লিজ ও বার্টনের সঙ্গে সমান শিল্পীমর্যাদা তাঁর প্রাপ্য কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে তিনি তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। লিজ এবং বার্টন যে শিল্পীমর্যাদা পাচ্ছেন রেক্স তুলনামূলকভাবে তা পাচ্ছেন না। নির্মাতাদের বিরুদ্ধে তাঁর মামলা দায়েরের এই কারণ।

* * * *

বৃটিশ সাপ্তাহিক টাইম টাইডের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবীর মামলায় প্রখ্যাতনামা অভিনেতা স্যার লরেন্স অলিভিয়ার জয়লাভ করেছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, এই পত্রিকা ল্যারি অলিভিয়ারের সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, যা অশোভন, অবাস্তব এবং তাঁর বিবাহিত জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। জানা গেছে যে, পত্রিকাগোষ্ঠী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং আরও জানা গেছে যে, ঐ টাকা স্যার লরেন্স ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন না। ঐ টাকা তিনি দান করবেন। তাঁর নির্দেশমত উদ্দিষ্ট স্থানে ঐ টাকা পত্রিকাগোষ্ঠী পৌঁছে দেবেন।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

ভ্রান্তিবিলাস এবং উত্তর ফাল্গুনীর পর প্রযোজক হিসাবে উত্তমকুমারের আগামী অবদান জতুগৃহ। প্রখ্যাত কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচিত। ছবির পরিচালক তপন সিংহ এই চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বও পালন করেছেন। বিদগ্ধ সাহিত্যিকারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির রূপদানের ভার গ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বিনতা রায়, কাজল গুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীর দল। আশীষ খাঁ ছবিটিতে সুরের মায়াজাল বয়নের ভারপ্রাপ্ত।

* * * *

নবগঠিত "সন্ধানী" গোষ্ঠী তাঁদের চিত্রোপহার হিসাবে 'অয়নান্ত'কে নির্বাচিত করেছেন। আজকের যুগোপযোগী অভিনব, বলিষ্ঠ এবং বৈশিষ্ট্য ধর্মী এই কাহিনীর রচয়িতা যশস্বী সাহিত্যিক সমরেশ বসু। সমগ্র কাহিনীটিকে আলোক চিত্রায়িত ও সুরসমৃদ্ধ করার ভার নিয়েছেন দু'জন কৃতবিদ্য। প্রথম জন রামানন্দ সেনগুপ্ত, দ্বিতীয় জন সলিল চৌধুরী। লেখকের কল্পনার চরিত্রগুলিকে অভিনয়ে জীবন্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, এন বিশ্বনাথন, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অপর্ণা দেবী, শম্পা চক্রবর্তী প্রভৃতি কুশলী শিল্পিবৃন্দ।

* * * *

সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর "রৌদ্ররেখা" ছবিটির চলচ্চিত্ররূপ দিচ্ছেন রাজেন তরফদার। আলোকচিত্রায়ণের ভার নিয়েছেন অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, রেণুকা রায় ইত্যাদি।

* * * *

সাহিত্যসেবী ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে "বিনিময়" ছবিটি গড়ে উঠছে। প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব দিলীপ নাগ পালন করে চলেছেন। সুরযোজনা করছেন কালীপদ সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন অসিতবরণ, তরুণকুমার, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ভুবন চৌধুরী, রবি ঘোষ, গীতা দে, ভারতী দেবী, কাজল গুপ্ত, গীতালি রায় প্রভৃতি।

*

স্বনামধন্য পরিচালক সুশীল মজুমদার বর্তমানে "কালস্রোত" ছবিটি নিয়ে ব্যস্ত। বিনয় চট্টোপাধ্যায় এর কাহিনীকার। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী দেবী, ভারতী দেবী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, [illegible] ঘোষ প্রভৃতি।

প্রযোজক পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায়ের আগামী অবদান "মালাচন্দন" ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ বর্তমানে শুরু হয়েছে। অভিনয়ের জন্যে যে ক'জন শিল্পীর নাম ঘোষিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, সুখেন দাস, রেণুকা রায়, গীতা দে ও গীতালি রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

* * * *

পোদ্দার প্রোডাকসান্সের প্রথম নিবেদন "বিভ্রান্ত" ছবিটির নির্মাণ কার্য বর্তমানে আরম্ভ হয়েছে। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ছবিটির পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী। শিল্পী হিসাবে এই ছবির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের মধ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অনুপ দত্ত, কান্তি দত্ত, অনিল মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, এবং সুমিতা সান্যালের নাম উল্লেখনীয়। ছবিটির সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করে চলেছেন গোপেন মল্লিক।

"ক্যানক্যান" চিত্রের একটি দৃশ্যে লুই জর্ডান ও শার্লে ম্যাকলেন। ছবিটি টড-এ-ও পদ্ধতিতে ও ৭০ মিলিমিটারে গৃহীত।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত প্রথম, চতুর্থ ও অষ্টম সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সর্বশ্রী চিত্ত নন্দী, নৃপেন দত্ত ও স্বদেশ ঘোষ।
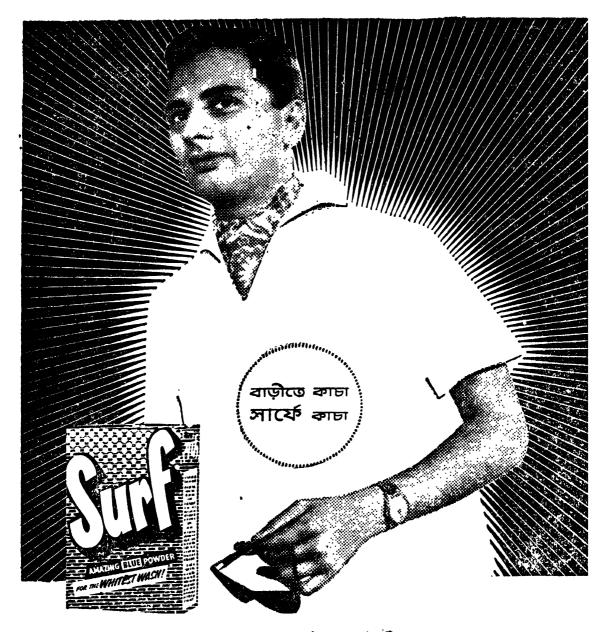
১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন—নানা সমস্যার দরুণ নববর্ষের আনন্দ বহুলাংশে ম্লান।

বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব কেন্দ্র কর্তৃক নাকচ।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): মহানগরীতে (কলিকাতা) কলেরাও (বসন্তের ন্যায়) মহামারী বলিয়া ঘোষিত।

চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকারের (পশ্চিমবঙ্গ) উদ্বেগ—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক জনসাধারণকে অধিক পরিমাণে গম খাইবার উপদেশ।

৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): ব্যাঙ্কশিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবীতে বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সভা ও শোভাযাত্রা।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল): 'জোর করিয়া হিন্দী চাপানো শুধু বিলের উদ্দেশ্য নয়'—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর অভিমত প্রকাশ।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের (৭৫) লোকান্তর।

৫ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল): পশ্চিমবঙ্গে চাউলের দর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি—শ্রীসেন (মুখ্যমন্ত্রী) কর্তৃক অবস্থাধীনে আলু খাইবার পরামর্শ।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এলাকায় ঘূর্ণিবাত্যায় ধ্বংসলীলা—বহু লোক হতাহত—হাজার হাজার নরনারী গৃহহারা—আসামের ধুবড়ি অঞ্চলেও প্রচণ্ড ঝড়ে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ও লোকজন হতাহত।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল): শিক্ষক সমাজ কর্তৃক 'শিক্ষা বাঁচাও' দিবস উদ্‌যাপন—শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাসের বিরোধিতা।

৭ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল): ১৯শে এপ্রিলের প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যায় কোচবিহারের ছয়টি গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত—ধুবড়ি এলাকাতেও ভয়াবহ পরিস্থিতি।

৮ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল): বারৌনির তৈল শোধনাগারের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠিচালনা।

আসামের প্রখ্যাত কবি শ্রীরত্নকান্ত বড়কাকতির (৭০) জীবনাবসান।

৯ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল): মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন কর্তৃক কোচবিহারের ঘূর্ণিবাত্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল সফর—ধ্বংসলীলা সন্দর্শনে গভীর মর্মবেদনা।

লোকসভায় সরকারী ভাষা বিলের উপর আলোচনা শুরু—সূচনাতেই তুমুল উত্তেজনা—বিল প্রত্যাহারের দাবীতে পার্লামেণ্ট ভবনের প্রাঙ্গণে স্বামী রামেশ্বরানন্দের (জনসঙ্ঘ এম-পি) ধর্ণা।

১০ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল): লোকসভায় ভাষা বিলের উপর বিতর্ককালে শ্রীনেহরুর ঘোষণা: অহিন্দীভাষীদের সম্মতি ছাড়া ইংরাজী ব্যবহারের পরিবর্তন সাধিত হইবে না।

ভারত প্রতিরক্ষা আইনে শ্রীস্নেহাংশু আচার্য গ্রেপ্তার।

১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল): 'পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চাউলের চাহিদা পূরণ করা হইবে'—লোকসভায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপাতিলের আশ্বাস।

১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল): শান্তিপূর্ণ উপায়ে চীন ভারত বিরোধ-মীমাংসায় মিঃ আলি সাবরির আস্থা—পিকিং হইতে দিল্লী ফিরিয়া সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র প্রধানমন্ত্রীর অভিমত প্রকাশ।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): প্রবল বিতর্ক ও বিতণ্ডার পর লোকসভায় সরকারী ভাষা বিল গৃহীত—১৯৬৫ সালের পরও অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইংরাজী বহাল রাখার ব্যবস্থা।

১৪ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল): শ্রীনেহরু কর্তৃক দীঘায় পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন—সম্মেলনের প্রধান অতিথি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল): 'বর্তমানে চাউলের রেশনিং কিংবা কন্ট্রোল প্রথা প্রবর্তন দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে'—দীঘা সম্মেলনে (রাজনৈতিক) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের ঘোষণা।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভারত আগমন।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): লোকসভায় মৌখিক ভোটে আবশ্যক সঞ্চয় বিল গৃহীত।

ত্রিপুরা সীমান্তে পাকিস্তানের সামরিক সমাবেশ—সীমান্ত বরাবর সড়ক ও শিবির নির্মাণের সংবাদ।

১৭ই বৈশাখ (১লা মে): কর্পোরেশনের (কলিকাতা) কাজকর্মে বাংলা ভাষা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবর্তন।

নয়াদিল্লীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সহিত মাউণ্টব্যাটেনের দীর্ঘ আলোচনা—বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব মিঃ ডানকান স্যাণ্ডসেরও দিল্লী উপস্থিতি।

১৮ই বৈশাখ (২রা মে): ভারত ভূমির অঙ্গচ্ছেদ রোধ করার ব্যবস্থা—লোকসভায় সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল গৃহীত।

দিল্লীতে মিঃ স্যাণ্ডস ও মাউণ্টব্যাটেনের সহিত শ্রীনেহরুর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডিন রাস্কের দিল্লী উপস্থিতি।

১৯শে বৈশাখ (৩রা মে): ভারতের প্রতিরক্ষা প্রশ্নে দিল্লীতে রাস্কের সহিত শ্রীনেহরুর নিবিড় আলোচনা।

২০শে বৈশাখ (৪ঠা মে): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা—লোকসভায় আবশ্যক বিল গৃহীত।

২১শে বৈশাখ (৫ই মে): 'ভারতকে অস্ত্র সাহায্য দান ও কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস' বলিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের আশ্বাস—শ্রীনেহরু কর্তৃক পশ্চিমী নায়কদের সহিত সাম্প্রতিক বৈঠকের (দিল্লী) মর্ম বিশ্লেষণ।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে): ভিভিয়ান বোস তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে লোকসভায় বিতর্ক—দফতরী-শাস্ত্রী কমিটির সুপারিশও (ডালমিয়া-জৈন সংস্থা সম্পর্কে) সভায় পেশ।

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সহকারী নেতার পদে শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রী এইচ সি দাসাপ্পা (মহীশূর) নির্বাচিত।

২১ দিন পর বারৌনি তৈল শোধনাগারে শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

২৩ বৈশাখ (৭ই মে): রাজ্যসভাতেও সরকারী ভাষা বিল ভোটাধিক্যে গৃহীত।

সিরাজুদ্দীন কোম্পানীর সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্যের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ—সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থা।

২৪শে বৈশাখ (৮ই মে): স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধির প্রতিবাদে কলিকাতায় পাঁচ শত বেকার স্বর্ণশিল্পীর অনশন।

কলিকাতার সভায় রেড ক্রশ সোসাইটির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে): বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১০২তম জন্মজয়ন্তী পালন। কবিগুরুর জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার চালু।

২৬শে বৈশাখ (১০ই মে): 'যুদ্ধ না চলিলেও চীনের আক্রমণ আশঙ্কা দূর হয় নাই'—আমেদাবাদের জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ম রাজ্যসভাতেও বিল গৃহীত।

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে): চুঁচুড়া বার লাইব্রেরী ভবনে আয়োজিত সভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের ভাষণ—গণতান্ত্রিক চেতনার উন্নয়নে দেশের আইনজীবীদের বিরাট ভূমিকার উল্লেখ।

পশ্চিমবঙ্গের স্বর্ণশিল্পীদের ৭২ ঘণ্টাব্যাপী অনশন ভঙ্গ।

২৮শে বৈশাখ (১২ই মে): কলিকাতায় আচার্য বিনোবা ভাবের বিপুল সম্বর্ধনা—ময়দানের জনসভায় ভাবেজীর ভাষণ: চীনের বিরুদ্ধে বৈরীভাববর্জিত ভারতের জয় অনিবার্য।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে): দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেনের (৬৫) লোকান্তর—স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনারের জীবনদীপ নির্বাণ।

৩০শে বৈশাখ (১৪ই মে): কানপুরের নিকট মোটর দুর্ঘটনায় নিখিল ভারত জনসঙ্ঘ সভাপতি ডাঃ রঘুবীরের (৬১) প্রাণহানি।

কলিকাতায় কলেরার আক্রমণ অব্যাহত—এক সপ্তাহে দুই শত ব্যক্তির মৃত্যু।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে): কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার দিল্লীতে ষষ্ঠ পর্যায়ের ভারত-পাকিস্তান বৈঠক—প্রথম দিনেই আলোচনায় অচলাবস্থা।

বহির্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): লণ্ডনে আণবিক অস্ত্র-বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল—পুলিশের সহিত বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ—কায়রো-এ তিনটি দেশের প্রধানদের দলিল স্বাক্ষর।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল): মিঃ গ্যালব্রেথের স্থলে মিঃ বোলজ ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নির্বাচিত।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল): বৈঠকান্তে জাকার্তা হইতে ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ ও চীনা প্রেসিডেন্ট লিউ শাও-চি'র যৌথ ইস্তাহার প্রচার—ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসায় আশা।

৭ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল) আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী আলি সাবরির পিকিং সফর—প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্ লাই'র সহিত বৈঠক।

নূতন আরব যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের জন্ম জর্ডনে ব্যাপক বিক্ষোভ—মন্ত্রিসভার পতন ও পার্লামেণ্ট বাতিল।

৮ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল): কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা কল্পে করাচীতে ভারত-পাক পঞ্চম পর্যায়ের বৈঠক।

১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল): করাচী বৈঠকেও কাশ্মীর সমস্যা অমীমাংসিত—১৫ই মে দিল্লীতে পুনরায় বৈঠকের ব্যবস্থা।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ কাস্ট্রোর সোভিয়েট ইউনিয়নে মৈত্রী সফর ও সম্বর্ধনা লাভ।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল): ডোমিনিয়ান প্রজাতন্ত্রের সহিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র হাইতির সম্পর্ক ছিন্ন।

মস্কোতে ক্রুশ্চেভ-কাস্ট্রো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): করাচীতে মধ্য চুক্তি সংস্থার ('সেণ্টো') বৈঠক সুরু।

১৭ই বৈশাখ (১লা মে): সিংহলে দুই বৎসর পূর্বেকার জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার।

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক পশ্চিম ইরিয়ানের কর্তৃত্ব গ্রহণ।

মার্কিন অভিযাত্রী দল কর্তৃক এভারেষ্ট বিজয়।

১৯শে বৈশাখ (৩রা মে): আমেরিকার আলাবামায় নিগ্রোদের ব্যাপক বিক্ষোভ—বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ—প্রায় ৮ শত নিগ্রো গ্রেপ্তার।

২১শে বৈশাখ (৫ই মে): বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটোর সহিত মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ রাস্কের বৈঠক।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে): কাশ্মীর প্রসঙ্গে করাচীতে পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর সহিত বৃটিশ সচিব মিঃ স্যাণ্ডসের আলোচনা।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে): নেপাল সফরে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের কাটমাণ্ডু উপস্থিতি—রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

২৬শে বৈশাখ (১০ই মে): ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ চীনাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ—চীনা দোকানপাট লুঠতরাজ।

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে): রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের (ভারত) আফগানিস্তান সফর সুরু—কাবুলে আফগান রাজা মহম্মদ জাহির কর্তৃক বিপুল সম্বর্ধনা।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে): বার্মিংহামে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের বিক্ষোভ দমনে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি কর্তৃক সৈন্য প্রেরণ।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে): মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপারের মহাশূন্য পথে পৃথিবী পরিক্রমা সুরু।
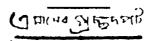
মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী শ্রীসুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

হে কংগ্রেস, সাবধান !

দেশের অবস্থা দিন-দিন বড়ই শোচনীয় রূপ ধরিতেছে। জাল ও ভেজালের পরিমাণ ক্রমে এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, আসল মানুষ ও বস্তুর অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। অনেক সন্ধান ও তল্লাসী চালাইয়াও প্রকৃত মানুষ ও নির্ভেজাল দ্রব্যের সন্ধান মিলিতেছে না। আমাদের বিকারগ্রস্ত দেশে সকল কিছুই যেন ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য ঊর্ধ্বগামী ও আকাশস্পর্শী হইলে কি হয়, বর্তমানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান নিম্নগামী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশবাসীর দৈনন্দিন অন্তহীন সমস্যার সংবাদ প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ অবস্থার ছায়াছবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হইতেছে। অন্নাভাবে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদও মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। ডাকাতি, লুণ্ঠতরাজ, খুনোখুনি ও রক্তারক্তির কাহিনীতে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসমূহ মুখরিত। কলিকাতার ন্যায় পৃথিবী বিখ্যাত একটি আন্তর্জাতিক সহরে কলেরা মহামারী ঘোষিত হইয়া শত-সহস্র মানুষের মরণের কারণ হইয়াছে। এই দুরবস্থার পরিবর্তন যে কিরূপে সম্ভব হইবে বা আপদের প্রতিকার কোন উপায়ে নির্ণয় হইবে বলা যাইতেছে না। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় পনেরো বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এখনও আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের চৈতন্যের উদয় হইল না। দেশের কয়েকটা বৃহৎ সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে দেশের এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইবে। জনগণের ভোটে শাসন-ক্ষমতা লাভের পূর্বে আমাদের গণনেতাদের মুখে কত আশা ও আশ্বাসের কথাই না শুনা যাইত। যদিও অদ্যাবধি দুর্নীতি পুরাপুরি বজায় রহিয়াছে। অসাধু ব্যক্তিদের যোগসাজসে পাপ-ব্যবসা প্রশ্রয় পাইতেছে।

চোরাকারবার ও ভেজাল দ্রব্যের বেসাতি অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। দেশের সামান্য মাত্র একটি দল ধনিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেও দেশের বাকী জনগণ নানাভাবে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইতেছে। ফলে কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসীর আস্থা থাকিতেছে না। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের ফলাফলই তাহার প্রমাণ। সেবার আদর্শ ও দেশের কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ ও দেশবাসীর যে কি লাভ হইয়াছে তাহা খতাইয়া দেখার দিন আসিয়াছে। দেশের সাধারণ মানুষকে বিচারবুদ্ধিহীন মনে করা সমীচীন নয়। দেশবাসী একবার জাগিয়া উঠিলে আর রক্ষা থাকিবে না। সুতরাং কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানটির আমূল সংস্কার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গলদ দূর করিতে হইলে কংগ্রেসভক্তদের আত্মশোধন করিতে হইবে। আমরা পুনরায় বলিতেছি, ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়া কিম্বা সাধারণের অর্থে শৈলাবাসে যাইয়া শুধু মাত্র বচনামৃত দান করিয়া দেশসেবা করা যায় না। দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে হইলে ও কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। এমন কথা কিছু কিছু কংগ্রেসীদের মুখেও আজকাল উচ্চারিত হইতেছে। ইহাতে প্রমাণিত হয়, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এখনও কেহ কেহ প্রকৃত দেশপ্রেমিক আছেন। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে তাঁহারা কংগ্রেসের সংস্কার চাহিতেছেন। আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন হইলেও হইতে পারে। অতএব, হে কংগ্রেস সাবধান ! মুষ্টিমেয় দুর্নীতিপরায়ণের জন্য সমগ্র দেশ ও জাতি দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা সঙ্কট কণ্টকে জর্জরিত হইতে পারে না। রাজনীতিতে স্বার্থান্ধদের কখনও স্থান হয় না। পরার্থে আত্মদান না করিয়া জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে যাওয়া মূর্খামি মাত্র। মুসোলিনীর পরিণাম বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

'পথে চলে যেতে যেতে—'

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে—"Always go by the highway and not by thc by-way." অর্থাৎ, 'সর্বদা বড় রাস্তা ধরিয়া পথ চলিবে, গলি বা ছোট রাস্তা এড়াইয়া যাইবে।' এই নির্দেশ পথ চলার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কেন না, বড় রাস্তা বা রাজপথে বিপদের ভয় কম থাকে। গলি প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ প্রায়ান্ধকার পথে ভূত-প্রেত, চোর-ডাকাত প্রভৃতি লুকাইয়া থাকে।
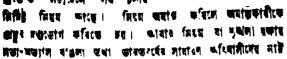
তাহারা পথিকের সংঘর্ষ অপহৃত্যের পরে নির্জন-পথে তাহাকে হত্যা পর্যন্ত করিয়া থাকে। পথিকারবাহনার নানারূপ অদ্ভুত সংবাদ প্রায়ই দেখা যায়। সম্প্রতি কলিকাতা শহরে পথিকজনকে পথ-চলার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন আমাদের কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীযুক্ত ঘোষ। তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন পুলিশ বাহিনী। শহর কলিকাতার ক্রিয়াশীল বিভিন্ন পথ-দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাহাতে রোধ করা যায়, তজ্জন্য এই প্রচেষ্টা। প্রত্যেক সভ্যদেশে পথ চলার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়ম অমান্য করিলে অমান্যকারীকে প্রচুর দণ্ডভোগ করিতে হয়। আবার নিয়ম বা শৃঙ্খলা রক্ষায় সভ্য-অভ্যাস বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসীদের নাই বলিলেই চলে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি পালন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে পথ-চলার আদর্শ হিসাবে 'আগে চলো' কথাটি প্রচলিত আছে। আগে চলিবার অদম্য বাসনায় অধীর হইয়া আমরা সকলেই যদি সর্বাগ্রে চলিবার জন্য উন্মুখ হই, তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। আমাদের দেশের মোটর গাড়ীর ড্রাইভারগণ পদে পদে Over-take-এর পক্ষপাতী বলিয়া আমরা যখন-তখন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই। এ স্থলে উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না, বিদেশে 'Go ahead' প্রথায় পথ চলার সভ্য রীতি বজায় আছে। অর্থাৎ 'তুমি আগে যাও।' ইহাতে পরস্পর সংঘাতের ভয় থাকে না। সহনশীলতায় পথের নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। অন্ধের মত চলিতে নাই।

কিন্তু আত্মভোলা পথিক বার বার পথ ভুল করে। কবির কল্পনায়, সাবধানী পথিকও নাকি ভুল পথে চলিয়া যায়। পৃথিবীর অন্যতম সভ্য ও সংস্কৃত দেশ আমেরিকার স্থান পথ-দুর্ঘটনার খতিয়ানে সর্ব-উচ্চে! তবুও মারের যেমন সাবধান নাই, তেমনি সাবধানেরও মার নাই। অর্থাৎ আত্ম-প্রকৃতিস্থ হইয়া পথ চলিলে পথের কাঁটা হইতে দূরে থাকা যায়। যদিও শুধু মাত্র পথিকদের সাবধান করিয়া সকল সময়ে শান্ত হয় না। কলিকাতার পথে পথে দিবা-রাত্রি ভারী ওজনের বাস এবং লরী তীব্রতম বেগে ছুটাছুটি করিতেছে। অধিকাংশ গাড়ীর ষ্টিয়ারিং, ব্রেক ইত্যাদির যান্ত্রিক গোলযোগের কোন শোধন বা মেরামতি হয় না। প্রতি মাইলের গতি কত হইবে—এই লিখিত সাবধানী বড় একটা কেহ মান্য করে না। বেশী ট্যাক্সি তো কত অসতর্ক মুহূর্তে পুলিশের ইশারাও মানিতে চায় না। লাল-হলুদ-সবুজ আলোর দিকনির্দেশের ক্রমপর্যায় অপেক্ষার ফুরসৎ মিলে না। গতানুগতিক পথে না চলার অভ্যাসও আমাদের মজ্জাগত। শাস্ত্রের আদেশ, মহাজন যে পথে চলেন সেই-ই পথ। মাভৈঃ পন্থা। কেই বা মানে।

জাতীয় শৃঙ্খলার অন্যতম প্রতীক, শৃঙ্খলাবদ্ধ পথিক। পথিকের গতির গজেন্দ্রগমন আর যাই থাক, মানবিকতার অভাব থাকিয়া যায়। কীট, পশু ও মানুষে তফাৎ অনেক—মানুষ আমরা যদি ভুলিয়া যাই, পথে পথে পদে পদে রক্তপাত, অঙ্গহানি, অপঘাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! পুলিশ কমিশনারের দৃষ্টি প্রসারিত হোক কলিকাতার বহিরাঞ্চলে। জি, টি এবং বি, টি রোড নামধারী করাল সাপের জঠরানলে কত শত নিরীহ পথচারী প্রত্যহ আত্মাহুতি দিতেছে! ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। পুলিশের সঙ্গে জনতার সংযোগ এক হইলে অসংখ্য মুহূর্তের অসাবধানতা হইতে অগণিত মূল্যবান জীবন রক্ষা করা যায়। চরৈবেতি বাণী আমাদের পালন করিতে হইবে। জীবন-যুদ্ধ চলন থামিতে পারে না। তাই আমাদের চালচলনে একটু সাবধান হইলেই চলিবে। পদক্ষেপের আগে দেখিয়া শুনিয়া পদার্পণের অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইবে। পথিকজনকে পথ-চলার জ্ঞান-দানের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ যানের চালকদেরও কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পথের নিয়ম এবং সঙ্কেত অমান্য করিয়া যাহারা চোখের সমুখে রাস্তায় গাড়ী চালাইতে অভ্যস্ত সেই সব প্রাইভেট এবং পাবলিক গাড়ীর চালকদের সহযোগিতা ভিন্ন দুর্ঘটনা নিবারণ অসম্ভব। পুলিশের চেষ্টা সফল হোক।

বাঙলা—সরকারী ভাষা

বৈশাখের ২৫ তারিখটি আবার এক মহৎ কারণে আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বর্তমান বৎসরের বৈশাখের ২৫ তারিখ হইতে আমাদের বহু তপস্যা ও সাধনার, গর্ব ও গৌরবের বাঙলা ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিল। তবু যা হোক, দেশবাসীর অনেক কালের একটি সুখ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। এখন হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নথিপত্রে এবং মন্তব্য ও নির্দেশে বাঙলা ভাষা ব্যবহৃত হইবে। পৃথিবীর বিখ্যাত ভাষাসমূহ কবি ও সাহিত্যিকদের সেবায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। বৈয়াকরণিক ভাষা সৃষ্টির নিয়ম-কানুন রচনা করিয়াই রেহাই পাইয়া থাকেন। ভাষাকে

সমৃদ্ধিশালী করিবার দায়িত্ব মসীজীবী লেখকদের। বাঙলা ভাষাও বহু দিকপাল কবি ও সাহিত্যিকদের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে আজ পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিতেছে। বাঙলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার আজ পৃথিবীব্যাপী। বিদেশে যে-ভাষা বহুকাল পূর্বে কদর ও সমাদর লাভ করিয়াছে সেই ভাষাকে যদি নিজের দেশের সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃতি না দেওয়া হয় তাহা অতীব দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক বিলম্বে হইলেও বাঙলা ভাষার যোগ্য সম্মান দান করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন। দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থেই সরকার বুঝায় না। 'সরকার' শব্দটি জনগণের নির্বাচিত লোকের বেলায় ই হিসাবে গণিত হইলেই গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিদেশী শাসন পদ্ধতিতে আমাদের সরকারী দপ্তরখানাগুলির আভ্যন্তরীণ কাঠামো ভিনদেশী আচার ও ব্যবহারে যেন বিদেশী বনিয়া গিয়াছিল। আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক ব্যবহারে এতদিনে হয়তো আমাদের দপ্তর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। বাঁধা ধরা নিয়ম ভঙ্গ করিলেই কিঞ্চিৎ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাঙলা ভাষা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যেমন যথাযোগ্য পরিভাষার অভাব। পরিভাষা কমিটি সরকারী নিয়োগের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। পরিভাষা যত সহজ হয় ততই সহজে ব্যবহার করা যায়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিভাষার মূল্য জনসাধারণ দিতে পারিবে না। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক শব্দ ব্যবহারের প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত বাঙলা ভাষার বহুল ও ব্যাপক ব্যবহারের জন্য আমরা আমাদের জনসাধারণকেও অবহিত হইতে অনুরোধ করি। বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে বাঙলা ভাষার যথার্থ সম্মান দান করে, তৎপ্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবলমাত্র সরকারী কাজেকর্মে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। আমাদের দৈনিক জীবনের প্রতিটি স্তরে বাঙলা ভাষার অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এখানে উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না, অবাঙালীদিগের মুখে ও কথায় বাঙলা ভাষার ব্যবহারও আমরা শুনিতে চাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে অবস্থিত আমাদের বাঙালী ভাইয়েরা নগণ কত কষ্ট স্বীকার করিয়া স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনে কথায় ও কাজে সেই ভাষা ব্যবহারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। অতএব হিন্দী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার প্রসারকল্পে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, যত অর্থব্যয় (বা অপব্যয়) করা হইতেছে আমাদেরও কর্তব্য এই সকল পদ্ধতি-প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া বাঙলা ভাষার প্রচারে সাহায্য করা। স্বাভাবিক গতি কার্যকরী না হইলে বাধ্যকরণ ভিন্ন অন্য গতি নাই।

৫৫৮৮ জন বাঙালী সৈনিক

চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ সরকার পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যখন তারস্বরে 'বাঙালী রেজিমেণ্ট চাই' দাবী জানাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি তখন অকস্মাৎ চমৎকার একটি সত্য তথ্য সাধারণের জ্ঞাতার্থে সগৌরবে ব্যক্ত হইল। সংবাদে প্রকাশ—গত ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচ মাসে ৫৫৮৮ জন বাঙালী যুবক সাধারণ সৈনিক হিসেবে ভারতীয় সেনা-বাহিনীতে যোগদান করিয়াছেন। গত ৪ঠা মে কর্তৃপক্ষের একজন এই তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন—বাঙালীর পক্ষে ইহা শুভ সংবাদ। কর্তৃপক্ষ আরও বলেন, বাঙালীও যে প্রয়োজন হইলে সকল দুঃখ বরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারে—ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। এই জন্য শীঘ্রই শুধু বাঙালী সৈনিক লইয়া একটি পৃথক সৈন্যদল গঠন করা হইবে। আমরা পূর্ববর্তী সংখ্যার পত্রিকায় বাঙালীর সমর নিপুণতা ও বাহুবলের পরিচয় উল্লেখ করিয়াছিলাম।

বুদ্ধিজীবী হিসাবে, ধীশক্তির ধারকরূপে উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী বাঙালী জাতির পরিচয় বহুকাল যাবৎ বহুজনবিদিত। বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে বাঙালীর যোদ্ধরূপ আরও অধিক স্পষ্ট ও স্বচ্ছ আকার ধারণ করিয়াছে। এই দুইটি যুদ্ধে কত যে বাঙালী সৈনিক আমাদের অজ্ঞাতে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ইহার হিসাব আত্মভোলা বাঙালী জাতি খাতায়-পত্রে হয়তো দেখাইতে পারিবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বহস্তে গঠিত সৈন্যবাহিনী ভারত সীমান্তে মণিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করে। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চক্রান্তে আমরা নেতাজীর আগমন সংবাদ যথাসময়ে পাই নাই। বর্তমান ভারতের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক

জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতের বাহিরে সোরিনা যুদ্ধের পরিচালনায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া বিশ্বসৈন্যমহলে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রকাশিত সংবাদটিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বাঙালী শ্রমবিমুখ সুখবিলাসী অলস জাতি নহে। প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বাঙালী যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষতার সহিত লড়াই চালাইবে, তাহা বার বার ঘোষণা করিবার আর কোন প্রয়োজন রহিল না। বাঙালী সৈনিক জিন্দাবাদ।

॥ শোক-সংবাদ ॥

হেমেন্দ্রকুমার রায়

শিশু সাহিত্যের অদ্বিতীয় যাদুকর। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ উপাসক, কিশোর সাহিত্যের নবযুগের স্মরণীয় স্রষ্টা হেমেন্দ্রকুমার রায় গত ৪ঠা বৈশাখ ৭৫ বছর বয়সে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। কৈশোরকালেই তিনি সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মৃত্যুকালেও তাঁর সাহিত্য সাধনায় যবনিকা পড়ে নি। আমাদের দেশে শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক আলোকোজ্জল নাম। শিশু মনের গঠনে ও বিকাশে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষেত্রেও তিনি অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত করেছেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, সাহিত্য ও নাট্য জগতের ইতিহাস শিল্প প্রমুখ নানাবিষয়ক প্রবন্ধাদি মিলিয়ে সাকুল্যে প্রায় দু'শো গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

সুকুমার সেন

বঙ্গজননীর মুখোজ্জলকারী সন্তান, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব, স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, দণ্ডকারণ্য সংস্থার চেয়ারম্যান সুকুমার সেন গত ২১শে বৈশাখ ৭৬ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ১১ই পৌষ ১৩০৪ (২রা জানুয়ারী ১৮৯৮) রবিবার তাঁর জন্ম। ১৯২১ সালে 'আই, সি, এস পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ থেকে ১৯৪৭ অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কাল পর্যন্ত শাসনবিভাগীয় নানা দায়িত্বশীল পদে তিনি সগৌরবে সমাসীন ছিলেন। ১৯৫৩ সালে সুদানে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনাকার্যে গঠিত আন্তর্জাতিক ইলেকশান কমিশনের সভাপতিরূপে তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ সুদানের একটি প্রধান রাজপথ তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে তাঁকে কেন্দ্র করে সারা ভারতকে সমগ্র সুদানের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। নির্বাচন পরিচালন সম্পর্কে তাঁর একটি গ্রন্থ তাঁর অনন্য প্রতিভার পরিচায়ক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত সরকার যখন রাষ্ট্রীয় উপাধি সমূহের প্রবর্তন করেন ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সুকুমার সেন তাঁর প্রথম প্রাপক (পদ্মবিভূষণ ১৯৫৪)। শাসনবিভাগীয় সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ললিতকলার সঙ্গে তাঁর যোগ কোনদিনই ক্ষুন্ন হয় নি। যন্ত্র ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে তিনি বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। সাহিত্যের ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। বৃটিশযুগে বিচারক হিসাবে তিনি যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়ে গেছেন তার তুলনা বিরল। ছিন্নমূল উদ্বাস্তদের কাছে তিনি ছিলেন নবজীবনের বার্তাবহ। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ হারাল একজন বিচক্ষণ ও যোগ্যতম প্রশাসককে, এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে ও এক দরদী সহানুভূতিশীল সমাজ হিতৈষীকে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুকুমার সেন

রবীন্দ্রকুমার সরকার

ভারতের বিজ্ঞাপন জগতের দিকপাল রবীন্দ্রকুমার সরকার গত বৈশাখ ৫৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিজ্ঞাপনশিল্প সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল যেমনই বিরাট, তেমনই গভীর। তিনি ১৯৬১ সালে ইণ্ডিয়ান এ্যাডভার্টাইজিং-এর সর্বোচ্চ সম্মান 'খাটাউ' স্বর্ণপদক লাভ করেন।

প্রিয়বালা গুপ্ত

সুপ্রবীণ ব্যারিষ্টার শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্তের সহধর্মিণী প্রিয়বালা গুপ্ত গত বৈশাখ ৮১ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। যৌবনে ইনি বিবিধ ক্রীড়াবিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন ও পরবর্তীকালে নানাবিধ সমাজ উন্নয়নমূলক ও লোককল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিগতযুগের মহিলা কবিকুলের নেত্রীস্বরূপা স্বর্গতা কামিনী রায়ের ইনি সপত্নীকন্যা ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যসচিব শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুষারকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

॥ পত্রিকা সমালোচনা ॥

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। মাসিক বসুমতীর একজন আগ্রহী পাঠিকা আমি। বসুমতীর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। যখন অক্ষর পরিচয় হয় নি, তখনও বসুমতী আমাদের বাড়িতে পৌঁছালে বড়দের সঙ্গে আমিও বইখানা আগে পাবার জন্য কাড়াকাড়ি করেছি। তখন রঙ্গিন ছবিরই ফাইল দেখতাম; খানতিনেক করে রঙ্গিন ছবি থাকতো বোধ হয় সে সময়। তখন আমার মা ছিলেন গ্রাহিকা, নতুন সংসারে এসে আমিও গ্রাহিকা হয়েছি। বর্তমানে বসুমতীর প্রতিটি বিভাগই সর্বাঙ্গসুন্দর। প্রাচীন রঙ্গালয় সম্বন্ধে যে তথ্য রচনাটি দিচ্ছেন, তা খুবই interesting. ভক্তি দেবীর "রক্তের স্বাক্ষর" উপন্যাসটি কি কোন ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ? উপন্যাসটি ভাল লাগছে। "চারজন" বিভাগে যে সংক্ষিপ্ত জীবনী আপনারা প্রকাশ করেন, সেগুলো আপনাদের নিজস্ব সংবাদদাতারাই সংগ্রহ করে আনেন বোধ হয়। আমি এমন একজন ভদ্রলোককে জানি, যাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এ বিভাগে প্রকাশযোগ্য। তাঁর নাম-ঠিকানা জানালাম। Capt. P. N. Mitra, M. B. D. T. M. A. M. S. 2D, Bowali Mandal Rd., Po. Kalighat, Calcutta-26. স্বকর্মক্ষেত্র চিকিৎসা-বিভাগ ছাড়াও অন্যান্য বিভাগেও এঁর প্রতিভা অনস্বীকার্য। চার পাঁচটি ভাষাতেও ইনি পণ্ডিত। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাবার একাধিক সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পিতৃদেবের অসম্মতির জন্য যেতে পারেন নি। ১৯৪১ সালে আসাম মেডিক্যাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। মাসিক বসুমতী সব দিক দিয়ে আরো উন্নতি করুক, এই কামনাই করি। নমস্কারান্তে—চিত্রলেখা কর, পোঃ রংজুলি, জেলা গোয়ালপাড়া, আসাম। [উত্তর—জীবনী সংগৃহীত হইবে।—স]

মহাশয়, বসুমতীতে প্রকাশিত বারি দেবীর "বাতিঘর" ও সুলেখা দাশগুপ্তার "বর্ণালী" নামক উপন্যাস দু'খানি কি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে? হয়ে থাকলে কোথায় পাওয়া যাবে দয়া করে জানাবেন,। মালবিকা সিংহ। [উত্তর—না হয় নাই।—স]

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—চৈত্র সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় 'নাচ গান বাজনা' বিভাগে সরোদ শিল্পী আলী আকবর শীর্ষক প্রবন্ধটির রচয়িতা শ্রীপান্নালাল দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি উক্তির বিরোধিতা করতে চাই। ১০৬৬ পৃষ্ঠার বিংশতিতম পংক্তিতে তিনি বলেছেন—যাঁহারা তাঁহার স্বরচিত রাগিণী লাজবন্তী, গৌরী মঞ্জুরী, চন্দ্রনন্দন ও মিশ্র শিবরঞ্জনি শুনিয়াছেন তাঁহারাই···। লেখক বোধ হয় জানেন না যে 'লাজবন্তী' রাগটি খান সাহেবের আদৌ আবিষ্কার নয়। এর প্রমাণ আমি দেখাতে পারি: গত ১৯৪১ সালে ৫ই মে তারিখে ভারতের অদ্বিতীয় বীণকার ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খান সাহেব আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে 'লাজবন্তী' রাগটি বাজিয়েছিলেন, রাগটি আমি লিপিবদ্ধ করি: আজও তা যত্নে আছে। এ ছাড়া তারও পূর্বে বাংলা দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধ্রুপদী স্বর্গত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্য ছিলাম আমি। তাঁর অসীম কৃপায় লাজবন্তী রাগের আলাপ ও গান লাভ করি। তবে? এ রাগ আলী আকবর খান সাহেব কর্তৃক পরিকল্পিত হয় কি করে? আরও বলবার আছে, লেখক জায়গায় জায়গায় ভয়ানক বিকৃত উচ্চারণ বা বানান করেছেন। যেমন—গৌরীমঞ্জুরী (আসল নাম গৌরীমঞ্জরী), মিশ্রমান্ত (আসল নাম মিশ্রমাণ্ড বা মিশ্র মাড়) যোগীয়া কানান্দা (আসল নাম যোগিয়া কালেংড়া) ইত্যাদি। অবশ্য এ যদি মুদ্রণ দোষ হয় তবে আমার বলবার কিছু নেই। আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার। নিবেদক—শ্রীঅমল সিংহ। নিউ আলিপুর।

মাননীয় মাসিক বসুমতীর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, সবিনয় নিবেদন, যদিও আমি আপনাদের মাসিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক নই তথাপি মধ্যে মধ্যে উহা পাঠ করিয়া থাকি। গত বৎসরের অর্থাৎ ১৩৬১ সালের চৈত্র সংখ্যায় "ক্ষণস্মৃতি" নামক বিভাগে শ্রীযুক্তা সংজ্ঞাদেবী সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া অমিয়া দেবীর লেখাটিতে অনেক ভুল সংবাদ লিখিত হওয়ায় প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি তিনি ইহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন! শ্রদ্ধেয়া সংজ্ঞাদেবী আমার পূজনীয়া দিদি এবং আমি পণ্ডিত ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র।

১। শ্রীযুক্তা সংজ্ঞাদেবীর, সন্ন্যাস আশ্রমের নাম লিখিয়াছেন শ্রীস্বরূপানন্দ পর্বত, উহা পর্বতের পরিবর্তে সরস্বতী হইবে।

২। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রিয়নাথ বাবুকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠি দিয়া ডাকিয়া পাঠান এবং নিজ আত্মীয়ার সহিত বিবাহ দিয়া জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী দেন। এই ঘটনা সম্পূর্ণ ভুল। সত্য ঘটনা এইরূপ:—আমাদের পূজনীয় পিতৃদেবকে সাহেবগঞ্জের "হরিসভায়" দেখিয়া মহর্ষি আকৃষ্ট হন এবং যখন পিতৃদেব মহর্ষিকে সভান্তে বজরায় পৌঁছাইতে যান, তখন মহর্ষি আমার পিতৃদেবকে পরের দিন সকালে একাকী আসিতে অনুরোধ করেন। পরদিন সকালে পিতৃদেব মহর্ষিকে দর্শন করিতে যাইলে, মহর্ষি তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, চাকরী ছাড়িয়া তাঁহার নিকট আসিতে এবং ধর্ম প্রচার করিতে। মহর্ষির এই অনুরোধ এবং ঈশ্বরের এই আদেশ মহর্ষির মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতৃদেব তাহাতে সম্মত হন এবং কিছুদিন পরে চাকরী ছাড়িয়া শান্তি-

নিকেতনে তাঁহার সহিত মিলিত হন। সেই সময় হইতে পিতৃদেব মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অনুগত শিষ্য ও পুত্রবৎ মহর্ষির নিকট থাকেন। তিনি মহর্ষির সহিত হিমালয় পর্বতে বহুদিন তপস্যাও করেন। পরে মহর্ষি পাহাড় হইতে নামিয়া কলিকাতায় বাস করেন। মহর্ষির তিরোধানের পর ঐ বন্ধন ছিন্ন হয়! জমিদারী সেরেস্তায় তিনি কখনও চাকরী করেন নাই। মহর্ষির আদেশেই একটু বেশী বয়সেই তিনি ৺শ্রীনাথ ঠাকুরের কন্যা পূজনীয়া ৺ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন। আমার পূজনীয় পিতৃদেব সেই সময়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং সমসাময়িক ব্যক্তি সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত. পূজনীয় পিতৃদেব সম্বন্ধে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী গ্রহণ করা লেখায় আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ। নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত—শ্রীমৌলীনাথ শাস্ত্রী।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীধর্মদাস গুহ, ১, জ্ঞানেন্দ্র এ্যাভিনিউ, উত্তরপাড়া, হুগলী * * * শ্রীনিশিকান্ত সিংহ, গ্রাম—কাচনা, ডাক—মাদারগাচি (পশ্চিম দিনাজপুর) * * * শ্রীমতী উমারাণী ভৌমিক, অবধায়ক—শ্রীফণিভূষণ ভৌমিক, করুণাটিং টি এষ্টেট, ডাক—বাদলীপার, শিবসাগর, আসাম * * * শ্রী ইউ, সি, দেবনাথ, মতিলাল নগর (হিল) ২১৩'২৩১১ মহাত্মা গান্ধী রোড, গোরেগাওন (পশ্চিম), বোম্বাই-৬২ * * * শ্রীমতী হেমরাণী দেবী, অবধায়ক—ডাঃ জে, চক্রবর্তী, লঙ্গাই রোড, করিমগঞ্জ, কাছাড় * * * শ্রীমুনীশ্বর বর্মণ, হিল মৌজাদার, গ্রাম—দলাইচেরা, ডাক—কনকপুর পূর্ব কাছাড়, আসাম * * * ডাঃ নিকুঞ্জবিহারী মণ্ডল, গ্রাম—উত্তর দুর্গাপুর, ডাক—ঐ (যুগকল্যাণ হয়ে), জেলা—হাওড়া * * * শ্রী জে, এন, চৌধুরী, ৪০-এ লেক টেম্পল রোড, কলকাতা—২৯ * * * শ্রীমতী লীলা মিত্র, অবধায়ক—শ্রী ভি, ভি, মিত্র, ২৫।১, এয়ার ইণ্ডিয়া কলোনী, স্যান্টা ক্রুজ, বোম্বাই * * * শ্রীসুবলকুমার কারফা, গ্রাম—ইন্দপুর, ডাক—সন্ধিপুর, জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রী কে, সি, দে, ঘুসুস কোলিয়ারী, ডাক—মাণিকপুর, জেলা—চাঁদা এম, এস,—(এম, এস) * * * শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র, কর্ণার হাউস, সাউজাউলি, শিমলা—৬ (পাঞ্জাব) * * * শ্রীমতী লতিকা গুহবিশ্বাস, অবধায়ক—থঙ্গিবা টি এষ্টেট, ডাক—রাজসাই, জেলা—শিবসাগর (আসাম) * * * সচিব প্ল্যাট ডিপো রিক্রিয়েশান ক্লাব, ডাক—মোগলসরাই, জেলা—বারাণসী * * * লেঃ, ডি, সি, সিংহ, (ভারতীয় নৌবাহিনী) সাউথওয়ার্ড কম,, নেভাল বেস, কোচিন—৪ * * * শ্রীমতী রেণুকা রায়, অবধায়ক—ডাঃ আর, এন, রায়, ইনচার্জ, লয়াবাদ হাসপাতাল, ডাক—বাঁশজোড়া, ধানবাদ * * * শ্রীমতী রেণুকা ভাদুড়ী, অবধায়ক—ডাঃ মাণিকলাল চক্রবর্তী, মেডিক্যাল অফিসার সোনাপুর টি এষ্টেট, ডাক—সোনাপুর, জেলা—কামরূপ (আসাম) * * * শ্রী বি, ভট্টাচার্য, ১৬ লি রো, কলকাতা-২০ * * * শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু, অফিস অফ দ্য সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ক্যানেল সার্কেল নং ২ (কোশী প্রোজেক্ট), ডাক—বীরপুর, জেলা—সহর্স।

Rupees fifteen is sent herewith on account of the renewal of my subscription for the year 1370 B S.—Carmichal Library, Varanashi U. P.

I am sending herewith Rs. 15/- as my annual subscription from Baisakh 1370 B. S. to Chaitra for monthly Basumati—Arati Dey, Cuttack, Orissa.

চলতি বৎসরের চাঁদা পাঠালাম—শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী, পুরুলিয়া।

আগামী বৎসরের মাসিক বসুমতীর গ্রাহক থাকবার জন্য ১৫৲ টাকা পাঠালাম। আমার প্রিয় বসুমতী দীর্ঘায়ু হোক প্রার্থনা করি। Sm. S. Ghose, Jabalpur (M. P.)

Annual subscription for 1370 B. S.—M s. Indira Das, Lucknow.

আমার ১৩৬৯-৭০ সালের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইতেছি—Miss. Mira Roy, Ranchi.

Annual subscription for one year (Masik Basumati)—Staff Club, Kanke, Ranchi.

I am sending herewith Rs. 15/- as one year's subscription for monthly Basumati—Sm. Promila Dutta, Calcutta-6.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের অগ্রিম গ্রাহিকা মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—Sm. S. Banerjee, Dhenkanal, Orissa.

Please renew my subscription for the current year,—Mrs. A. Chatterjee, Polytechnic, Sadar, Nagpur.

Remitting herewith my subscription of Monthly Basumati for the year 1370 B. S.—Sri Baidyanath Mookherjee. Katrasgarh, Dhanbad.

I am remitting Rs. 15/- for Monthly Magazine "Basumati" for the year 1963 64—Subhra Bose, Cuttack.

Renewal of one year's subscription to the Basumati for the year 1370 B. S.—Hooghly Women's College.

১৩৭০ বাংলা সনের জন্য বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম Mrs. Mamatarani Gabur, Jalpaiguri.

মনি অর্ডার যোগে বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম—Mrs. Lila Ghose. Calcutta-29.

Herewith Rs. 15/- on account of subscription for the Bengali year 1370—Susama Chakravarty. Dehradun.

১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। আশা করি আমাকে বৈশাখ ১৩৭০ সন হইতে বাৎসরিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিতে আর কোনো রূপ অসুবিধা হইবে না।—শ্রীমতী রেণুকা ভাদুড়ী, কামরূপ, আসাম।

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর ১৫৲ টাকা M. O. যোগে পাঠাইলাম—প্রতিমা রায়, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৩৭০ সালের মাসিক বসুমতীর জন্য বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—বিভা ভট্টাচার্য, নিউ দিল্লী।

(চলবে)

পূজারিণী

—শ্রীমতী গৌরী রায় অঙ্কিত।

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪২শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ — ২য় সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

আমাদের আবশ্যক শক্তি—শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদসমূহ শক্তির বৃহৎ আকর স্বরূপ। উপনিষদ যে শক্তি সঞ্চারে সমর্থ তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে।...... প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হও। দুর্বলতা হইতে মুক্ত হও।

পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য উঠবার আর বিলম্ব নেই! তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার সংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকেদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে বল্‌গে—'ভাই সব, ওঠ জাগ। কতদিন আর ঘুমুবে?' আর শাস্ত্রের মহান সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দেগে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিঁকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের ন্যায় তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি উপদেশ দেগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক্, আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক্।

আমি চাই A band of young Bengal (একদল জোয়ান বাঙ্গালীর ছেলে); এরাই দেশের আশা-ভরসাস্থল। চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আজ্ঞানুবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিষ্যৎ ভরসা—আমার idea (ভাব) সকল যারা work out (জীবনে পরিণত) করে আপনাদের ও দেশের কল্যাণ-সাধনে জীবনপাত করতে পারবে। নতুবা দলে দলে কত ছেলে আসছে ও আসবে। তাদের মুখের ভাব তমোপূর্ণ—হৃদয় উদ্যমশূন্য—শরীর অপটু—মন সাহসশূন্য। এদের দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নূতন পথে চালনা করে দিতে পারি।

হে ছাত্র ও যুবকবৃন্দ, তোমরা সহস্র সহস্র সমাজ গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মেলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার—এ সকলে কিছু ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের মধ্যে সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে, হৃদয় আসিতেছে যাহা সকলের জন্ম ভাবে।

Fame that last infirmity of noble mind (যশের আকাঙ্ক্ষাই উচ্চান্তঃকরণের শেষ দুর্বলতা)—পড়েছিস না? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে। ভালমন্দ—লোকে দুই তো বলবেই কিন্তু ideal (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে

আমাদের সিঙ্গির মতো কাজ করে যেত হবে; তাতে 'নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু' (পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিন্দা বা স্তুতি যাহাই করুক)।

যে সব music-এ (গীতবাদ্যে) মানুষের soft feeling (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে, কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল-টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow (আদর্শের অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।

দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজান, ঘণ্টা নাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে। যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর-মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে, হায়! তাদের সহানুভূতি করে তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নাই রে! এই দেখ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে; মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—"ছুঁস নে" "ছুঁস নে"। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে? বাপ! কেবল ছুৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা—মার লাথি! ইচ্ছা হয়—তোর ছুৎমার্গের গণ্ডি ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—কে কোথায় পতিত-কাঙ্গাল দীনদরিদ্র আছিস—বলে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হলো? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে, সকলে মিলে এদের চোখ খুলে—আমি দিব্য চোখে দেখছি এদের ও আমার ভিতর একই প্রভু একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোনও দেশ কোনও কালে কোথাও উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেল, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জানিবি।

চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ, ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।

সকলের দোষ সহ্য করিবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, এ কথা বিশেষরূপ বুঝিতে পারিলেই সকলে ঈর্ষা একেবারে ত্যাগ করিবে; দশজন মিলিয়া একটা কার্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই। এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন-চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষা মাত্র। সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যেদিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।

এই একটা ধারণা আমার হচ্ছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলোক দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য, এবং হায়? যুগ যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে। যাঁরা জগতে সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাঁহাদিগকে চিরদিন "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" আত্মবিসর্জন করতে হবে।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গ মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। জগতের যা এখন একান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত এবং যাঁরা স্বার্থহীন। সেই প্রেম প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের ন্যায় শক্তিশালী করে তুলবে।

সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময় বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।

মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটিরেই আমার জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই।

আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাস বড় বড় কার্যের জনক। এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্যন্ত গরীব পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

আমাদের দুই পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে। একদিকে কুসংস্কারপূর্ণ প্রাচীন সমাজ অপর দিকে জড়বাদ—ইউরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা, তথাকথিত সংস্কার, যাহা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তি পর্যন্ত প্রবিষ্ট। এই দুইটি হইতেই সাবধান হইতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা কখনও পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারিব না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর, তোমরা পাশ্চাত্য জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণে সমর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহূর্তে ইহাতে সমর্থ হইবে সেই মুহূর্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে—তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

(স্বামী বিবেকানন্দের Life and Mission হইতে)

স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের জন্যে আমার পরিকল্পনা—যা রচিত এবং কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তা এইরূপ,—আমি আপনাদের ভারতীয় সাধুসন্তদের কথা বলেছি, আমরা কিভাবে ঘরে ঘরে ধর্ম প্রচারের জন্য যাই, কোনরূপ অর্থের বিনিময়ে নয়, সম্ভবত সামান্য একটু রুটির জন্যে। তাই আপনারা দেখবেন, ভারতের 'সবার পিছে, সবার নীচে' যারা—তাদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে কি উন্নত ধারণা। ভারতীয়দের এই চমৎকার ধর্মীয় শিক্ষা এই সন্ন্যাসীদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত। পৃথিবীর ইতিহাসের খবর তারা রাখে না। সরকার কি? কে তাদের শাসন করে? এই সব আড়ম্বরের কিছু একনা জানে না। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের ভাল জ্ঞান রয়েছে। এই পৃথিবীতে তা'রা জীবন সম্বন্ধে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি ঘটিত বাস্তব জ্ঞানের অভাবে কষ্টভোগ করে। এত লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে জীবনের সত্যমর্ম নিতে প্রস্তুত, ইহাই কি মানুষের পক্ষে যথেষ্ট? আমি জোরের সঙ্গে বলবো—নিশ্চয় নহে: তাদের জন্য এর চেয়ে ভাল খাদ্যের প্রয়োজন আছে—আর তাদের দেহকে আচ্ছাদিত করবার উপযোগী ভাল বস্ত্রের অধিকার রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উচ্চ প্রশ্ন হ'চ্ছে, এই বঞ্চিত জাতিকে কি উপায়ে উন্নততর পরিধেয় আর উত্তম খাদ্য প্রদান করা যায়?

প্রথমতঃ আমি বলবো, তাদের মধ্যে বৃহত্তর সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। কারণ, আপনারা দেখেছেন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নিরীহতম মানুষ তারাই। তারা কি অত্যন্ত ভদ্র নয়? যখন তারা সংগ্রাম করতে চেয়েছে, তারা দানবের মতো লড়েছে। ভারতীয় চাষীদের মধ্য থেকেই ইংরাজদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নির্বাচিত (recruited) হয়েছে। মৃত্যু তাদের কাছে খেলার ক্রীড়নক। তাদের ধারণা, বহুবার আগেও আমরা মরেছি, এইবার মৃত্যুর পরেও আরো বহুবার জন্ম ও মৃত্যু আসবে। তাতে ভয়ের কি? "জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য—চিত্ত ভাবনাহীন" তাই তারা পশ্চাতে ফেরেনি। তাদের মধ্য থেকেই তৈরী হয়েছে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। চাষ-আবাদ করাই তাদের প্রধান কাষ। যদি আপনি তাদের চুরি করেন, হত্যা করেন, কর্কশভাবে নিপীড়িত করেন। তাদের যাই কিছু করো—তারা ততক্ষণ শান্ত ও নীরব থাকে, যতক্ষণ না তাদের ধর্মে আঘাত দেওয়া হয়। তারা অন্য ধর্মের সমালোচনা করে না। 'আমাদের ঈশ্বরের উপাসনা করবার স্বাধীনতা দেওয়া হোক, অন্য সব কিছুর বিনিময়েও' এই তাদের ধারণা। যখনই ইংরাজরা তাদের ধর্মে আঘাত করেছে—তখনই গণ্ডগোল সুরু হয়েছে: '৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইহাই আসল কারণ—ধর্মের অবমাননা সহ্য করতে তারা রাজী নয়।

বৃহৎ মুসলমান রাজত্ব উবে গেলো—ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দেওয়ার জন্যেই। অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত সর্বোপরি ভারতীয়দের মনে কোনরূপ হিংসা নেই। কোনো কড়া পানীয়ের ব্যবহার তা'দের মধ্যে নেই পৃথিবীর যে কোনো দেশের জনতার চেয়ে ইহা তা'দের শ্রেষ্ঠত্বের একটি—বড় প্রমাণ। ভারতের যে কোন দরিদ্রের জীবন যাত্রার সৌন্দর্য আছে। দারিদ্র্য বরণই পাপ নয়—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। অন্যান্য দেশে সুযোগ সুবিধের অভাব নেই। সেখানে অলস ও অজ্ঞরাই শুধু গাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদে চাকচিক্য এবং প্রসাধন বাহুল্যতা তাদের নিত্যসঙ্গী, সবপ্রকার জীবন ভোগ করার আনন্দে তারা মত্ত। কিন্তু ভারতের অন্যরূপ, এইখানে গরীবেরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করে। কিন্তু তাদের শ্রমে উৎপন্ন শস্য অন্যে কেড়ে নিয়ে যায়, তাদের সন্তানেরা মরে ক্ষুধায়। আপনাদের পোষা পাখীও যা না খায়—সেই ক্ষুদ তা'দের খাদ্য। এর কোন কারণ নেই—কেন তা'রা এত নির্যাতন ভোগ করবে? এই সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা? এদের কথা—এই অবহেলিত সহস্র সহস্র মানুষের কথা এবং অপমানিত ভারতীয় নারীর কথা, আমরা বহু শুনতে পাই, কিন্তু কেউ তা'দের সাহায্যের জন্য আগায় না। বিদেশীরা বলে, 'তোমাদের নিজস্ব সব ত্যাগ করো, তবেই তোমাদের সাহায্য করবো' মূর্খ এরা—জানে না জাতির ইতিহাস—ঐতিহ্য। ধর্ম এবং আশ্রম (institutions) ত্যাগ করলে—ভারত ভারতই থাকবে না। কারণ এই হচ্ছে আমাদের জাতীয় আদর্শ বা প্রাণশক্তি। আপন প্রাণশক্তিতেই ভারত বড়ো হ'বে।

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ঈশ্বর' আত্মারূপে বিরাজিত; তিনি সদাজাগ্রত, যেখানেই কোনরূপ সত্যিকারের দানব্রত অনুষ্ঠিত হয়—হাজার হাজার বৎসর পরেও তিনি তার সাক্ষীরূপে আবির্ভূত হন। প্রত্যেক প্রচেষ্টা যদি স্বার্থহীন, আত্মসন্ধানী না হয়, তবে শত প্রচারেও তা' ব্যর্থ হবেই। সম্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন ভাবে, নিষ্কাম কামনায়—আমার মন, শক্তি, সব যা' দেওয়ার আছে—সবই দেবো, শুধু দেওয়ার আনন্দে। আত্মত্যাগই ধর্ম। আমার পরিকল্পনা ছিল—এই সব ধারণাগুলি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। ধরুন গরীবের শিক্ষার জন্যে, ভারতের সর্বত্র আপনি বিদ্যালয় তৈরী করলেন, কিন্তু তবু তা'দের শিক্ষিত করতে পারবেন না। তবে কি ভাবে? ছোট ছোট গরীবের ছেলে আপনার বিদ্যালয়ে আসার চেষ্টা না করে নিজের চাষের কাজেই যাবে। আত্ম-অধ্যবসায়ই আপনার মূলমন্ত্র। তারা না আসলে, আপনাকে তাদের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে—যান ক্ষেতে খামারে। আমি বলি, শিক্ষা কেন ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে না? সে আসতে না পারে, ছায়ার মতো তার কাছে যাও। কারখানায়, খেলার মাঠে দেখা করো। যেমন ধর্মীয় গুরু আধ্যাত্মিকতা ছড়াচ্ছেন—এইভাবে তাদের দ্বারাও শিক্ষার প্রসার হ'তে পারে। তারা কেন একটু ঐতিহাসিক গল্প বা অন্য কোনো জ্ঞানের কথা বলবেন না—শুধু ধর্মের কথা ছাড়া। কানই হচ্ছে শিক্ষা লাভের প্রধান যন্ত্র। কানই বড়ো শিক্ষার বাহন। আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড়ো শিক্ষাই হ'চ্ছে তাই যা' আমরা মায়ের কাছ থেকে শুনি। বইতো অনেক পরের কথা। বই পড়ে শিক্ষা সামান্য মাত্র। গঠনমূলক সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা আমরা কানে শুনেই পাই। পরে ক্রমে ঔৎসুক্য বাড়লে নিজেই বহু কিছু জানবে, শিখবে, পড়বে। প্রথমে এই ভাবেই কানের কাছে বারে বারে বলো, আমার ধারণা এই ভাবেই জ্ঞান বিস্তার লাভ করবে।

অনুবাদক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে

হৃদয়, শুশ্রূষা

শুভাশীষ গোস্বামী

এখন চতুর্ধারে রক্তচাপবৃদ্ধি নিয়ে সব ঘোরে-ফেরে।
এ রকম ভ্রাম্যমাণ রক্তচাপ দেখিনি কখনও।
এ রকম ক্রমাগত ভয়াবহতায় ডুবে গিয়ে
বাঁচা দায়। নিরর্থক মুমূর্ষুর প্রাণ বহে যাওয়া।

মশাই, নেয়ারের খাট জীর্ণ, চেয়ারের হাতল ভেঙেছে,
অতঃপর জোরে হাততালি দিয়ে (যেন বা সুদক্ষ যাদুকর)
ভেল্‌কীবাজীর মতো টুক্ ক'রে শূন্যে ঝলুন।
নতুবা গন্তব্য সেই চিতাধূমে সমাকীর্ণ নষ্ট শ্মশান।

বিপন্নতা, বিপন্নতা, বিপন্নতা, ভয়াবহ সব,—
ল্যাবরেটরির মধ্যে সময়ের অস্ত্রোপচারে
অসফল এক্‌স্‌পেরিমেন্ট-এর ফলশ্রুতি যেন,
অবশেষে হাসপাতাল এক ভাগ স্কুলের মতন।

স্বপ্নের প্রতিমা দীর্ণ। শূন্য চালচিত্র হাতে নিয়ে
জ্যোৎস্নায় ইতি-আর শিউলিকে স্পর্শ করা কেন?
সন্তাপের দহনে, জিম্‌ন্যাস্টিকের কসরতে
অস্তিত্বের জোড়াতালি ক্লোজ-আপে কি ফল লভিছ!

হাসপাতাল, হাসপাতাল, হাসপাতাল, মুমূর্ষুর প্রাণ···
লাইজল···ফিনাইল···ক্লোরোফর্ম···মরফিয়া শুধু!
কত কত নম্বর বেডে সব কারা কারা যেন শুয়ে আছে!
এরা সব আমাদের ছিন্নভিন্ন হৃদয়েরা যেন।

হে হৃদয়, হে হৃদয়, রোদনের পরিসীমা আছে,
তোমার নিকটে আমি বিশল্যকরণী এনে দেব,
রক্তের উষ্ণস্রোত বহে যাবে উজ্জ্বল প্রদোষে,—
শুশ্রূষায় ভরে যাবে ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের দেহ।

তোমাকে বুকের রক্তে গোলাপের মতন ফোটাবো
অস্কার ওয়াইলডের সেই স্বার্থত্যাগী পাখিনীর মতো।

৫৯
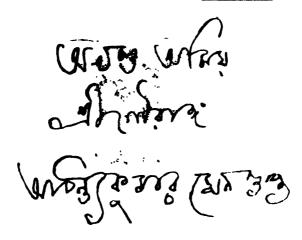
সনাতন, এবার তবে ভক্তিতত্ত্ব শোনো।

কী সে বস্তু যার থেকে কৃষ্ণ প্রেমধন পাওয়া যায়? যা দিয়ে জানা যায় কৃষ্ণকে? যা জানলে আর কিছু জানবার থাকে না।

শুধু কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। কৃষ্ণভক্তিই করণীয়। ভক্তি কী? ভক্তি সেবা। আর এ সেবা নিজের সুখের জন্যে নয়, কৃষ্ণের সুখের জন্যে। অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ো। ধরো সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন, যে অনুশীলনে শুধু কৃষ্ণের প্রীতিবিধান। আর, একমাত্র কৃষ্ণ প্রীত হলেই বিশ্ব প্রীত।

ভক্তি ছাড়া কর্ম, ভক্তি ছাড়া জ্ঞান, ভক্তি ছাড়া যোগ—সমস্ত নিষ্ফল। আর কর্মও নেই, জ্ঞানও নেই, যোগও নেই, অথচ ভক্তি আছে, তাতে কর্মযোগ জ্ঞানের ফলও আছে, মায়াবন্ধন মোচনও আছে।

যে জীব নিত্যমুক্ত, সে তো কৃষ্ণ পারিষদ। তার আর দুঃখ কী? সে তো কৃষ্ণচরণেই নিত্য-উন্মুখ, তার তো নিরন্তর সেবানন্দ।

কিন্তু যে নিত্যবদ্ধ?

তারই অশেষ দুর্গতি। সে যে নিত্য সংসারী। নিত্য কৃষ্ণ বহির্মুখ। তাই চিরকাল সে নরকদুঃখে জর্জর। সে কামক্রোধের দাস, ত্রিতাপদগ্ধ। মায়ার শাসনে সে নিত্যদণ্ডিত। নিত্যপীড়িত।

তবে তার উপায় কী?

উপায় সাধুবৈদ্য। যদি কোনো জন্মে ভাগ্যবলে সে সাধুসঙ্গ পায় আর সে সাধু যদি কৃপা করে তাকে কৃষ্ণভক্তির উপদেশ দেয় সেই কৃষ্ণভক্তিতেই মায়া পথ ছাড়ে। আর মায়া চলে গেলেই সংসার-আবেশ চলে যায়, কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করে সে চলে আসে কৃষ্ণের সামীপ্যে। 'কৃষ্ণভক্তি—জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

'কৃষ্ণ সূর্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥'

শুধু একবার বলো, কৃষ্ণ, আমি তোমার হলাম। আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত তোমার হল। আমি তোমাতেই প্রপন্ন, আমি একমাত্র তোমারই। তুমি ছাড়া আমি বলে কিছু নেই, তা হলেই মায়া পলাতকা। তা হলেই তুমি কৃষ্ণাচ্ছন্ন। যার মায়াতে অভিনিবেশ তারই ভয় আর যার ভয় তারই দুঃখ।

'কৃষ্ণ, তোমার হও যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥'

কৃষ্ণভক্তি করলেই সবকর্ম করা হয়। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তি ধর্মযাজনের অধিকারী, যার শ্রদ্ধা দৃঢ়, অন্যের যুক্তিতর্কে যা বিচলিত হয় না, যে শাস্ত্রে সুনিপুণ, সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ সেই অধিকারীদের মধ্যে উত্তম। যে শাস্ত্রদক্ষ নয় অথচ যে দৃঢ়নিশ্চয় সে মধ্যম অধিকারী। আর যার শাস্ত্রনৈপুণ্য দূরের কথা, যার শ্রদ্ধা কোমল, বিরুদ্ধ তর্কের কাছে বশীভূত সে কনিষ্ঠ অধিকারী।

যে সর্বভূতে ভগবানকে দেখে আর ভগবানে সর্বভূতকে দেখে সেই ভাগবতোত্তম। যে ভগবানে প্রেম, ভগবদ্‌ভক্তে মিত্রতা, অজ্ঞ জনে কৃপা ও ভগবদ্দ্বেষী জনে উপেক্ষা করে সে মধ্যম ভক্ত। আর, যে শ্রদ্ধায় শুধু বিগ্রহেই ভগবানকে পূজা করে, অন্য কাউকে করে না সে কনিষ্ঠ ভক্ত।

শোনো। কৃষ্ণের সমস্ত গুণ কৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয়। 'সর্বমহাগুণ গণ বৈষ্ণব শরীরে।' কী কী গুণ?'

দয়া, অদ্রোহ, সত্যবাক্য, সমদর্শিতা, দোষশূন্যতা, বদান্যতা, মৃদুতা, শৌচ, প্রশান্তি আর শরণাগতি। অধিকন্তু কৃষ্ণভক্ত হবে অকাম, অনীহ, স্থির, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী, মিতভুক, বিজিতষড়্গুণ ও সর্বোপকারক।

আর সদাচারই বিধি, অসদাচারই নিষেধ। মূল বিধি সতত কৃষ্ণস্মরণ। আর মূল নিষেধ অসৎসঙ্গ। স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ ও অভক্ত সঙ্গীর সঙ্গ দুইই ত্যাগ করবে। ভগবদভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য লোকদের দর্শনও করবে না। যে কৃষ্ণ সমর্থ কৃতজ্ঞ বদান্য ভক্তবৎসল তাকে ছেড়ে অন্যকে ভজন করবে এমন পণ্ডিত কে আছে? সর্বগুণনিধি কৃষ্ণ, সর্বসুহৃৎ কৃষ্ণ, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণকে ছাড়ে কে?

সাধনভক্তি দু' রকম। এক বৈধী, অন্য রাগানুগা। যার অনুরাগ নেই সে শাস্ত্রশাসনের ভয়ে কৃষ্ণ ভজনা করে, কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্যে নয়। আর যে অনুরাগে রঞ্জিত, সে বিধি-নিষেধের ধার ধারে না, সে প্রাণের থেকে ভজনা করে, তার প্রাণধন কৃষ্ণকে তৃপ্তি দিতে।

এবার সাধন-ভক্তির প্রধান অঙ্গগুলি বিবেচনা করো।

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা-গ্রহণ, গুরুসেবা। সদ্ধর্ম পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস, যাবৎ-নির্বাহ-প্রতিগ্রহ, অর্থাৎ যেটুকু নইলে কার্যনির্বাহ হয় না ঠিক সেইটুকু গ্রহণ। একাদশীতে উপবাস, আমলকী অশ্বত্থ গো-ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপূজন। সেবাপরাধ-নামাপরাধবর্জন। অবৈষ্ণবের সঙ্গ করবে না, অবৈষ্ণব সঙ্গে ভক্তি শুকিয়ে যায়। বহুশিষ্য করবে না, বহুগ্রন্থকলাভ্যাস বর্জন করবে। বিষ্ণুনিন্দা শুনবে না, বৈষ্ণবনিন্দা শুনবে না, শুনবে না গ্রাম্যবার্তা। মনে বাক্যে কোনো প্রাণীরই উদ্বেগ জন্মাবে না। নিজে কীর্তন করবে, অন্যে যখন কীর্তন করবে তখন শুনবে আর যখন কীর্তন নেই তখন মনে মনে স্মরণ করবে কৃষ্ণকে। পূজা করবে, বন্দন বা প্রণাম করবে আর পরিচর্যা করবে। আমি তাঁর আজ্ঞাবাহী দাস এই ভেবে তাঁর উপর সমস্ত কর্মার্পণ করবে, তিনি আমার বন্ধু এই ভেবে প্রাণের সমস্ত কথা খুলে বলবে তাঁকে। করবে আত্মনিবেদন।

চার বস্তুর সেবায় কৃষ্ণ আনন্দিত। তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা আর ভাগবত। যা-কিছু কাজ করবে সমস্তই কৃষ্ণের প্রীতির জন্যে। 'কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা।' প্রত্যেক ব্যাপারেই কৃষ্ণের কৃপা অনুভব করবে। হোক বিপদ, হোক দুঃখদুর্যোগ সমস্তই ভাববে ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা। সর্বথা শরণাপত্তিই পরম কৌশল।

যত সাধনবিধি বললাম, সংক্ষেপ করতে গেলে এই পাঁচ অঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস আর শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তিসেবা। এই পঞ্চের অল্প সঙ্গ করলেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়।

শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, পূজনে পৃথু, বন্দনে অক্রুর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন আর আত্মনিবেদনে বলি কৃষ্ণকে পেয়েছিল।

আর অম্বরীষ পেয়েছিল বহু-অঙ্গ সাধন করে। সে মন রেখেছে কৃষ্ণপদে, বাক্য রেখেছে কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে, হাত রেখেছে মন্দিরমার্জনায়, কান রেখেছে হরিকথা-শ্রবণে, চোখ রেখেছে বিগ্রহদর্শনে, অঙ্গ-সঙ্গ রেখেছে ভক্তগাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণ রেখেছে তুলসীগন্ধে, রসনা রেখেছে প্রসাদ স্বাদে, চরণ রেখেছে তীর্থভ্রমণে আর মাথা রেখেছে পদবন্দনায়। সমস্ত কামনাই নিয়োজিত করেছে ভগবৎদাস্যে।

যারা সুখবাসনা ত্যাগ করে শাস্ত্র-আজ্ঞা মেনে কৃষ্ণ ভজনা করে তাদের আর কিছু করণীয় থাকে না। এমন কি তার পাপাচারেও মন যায় না। যদি অজ্ঞানে বা অনিচ্ছায় পাপ এসেও পড়ে কৃষ্ণ তা শুদ্ধ করে দেন। ভক্তিতে জ্ঞানবৈরাগ্য বা ভোগত্যাগেরও প্রয়োজন নেই। ভক্তির প্রভাবেই যম-নিয়ম শৌচ-সন্তোষ এসে পড়ে।

যারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাদের অহিংসা জন্মাবে তাতে আর আশ্চর্য কী। যারা হরিভক্ত তারা পরপীড়ক বা পরতাপী হতে অনিচ্ছুক।

সনাতন, এবার রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শোনো।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণাই রাগ। ইষ্টে স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা, যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা তাই রাগ। আর রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। এ কোনো শাস্ত্র

ভক্তি মানে না শুধু ভাবমাধুর্যেই লোভান্বিত। বাইরে শ্রবণ-কীর্তন করে, অন্তরে স্মরণ-সেবন করে। যার যেমন ইচ্ছা কৃষ্ণকে সেই ভাবে প্রিয়তম ভেবে অন্তর্মনা হয়ে নিরন্তর সেবা করো। যার খুশি দাস হও, সখা হও, প্রিয়া হও। এতেই প্রীতির উদয় হবে। প্রীতির অঙ্কুর অবস্থার দুই নাম, রতি আর ভাব। আর এই রতি গাঢ় হলেই প্রেম নাম ধরে।

এবার প্রেমের লক্ষণ শোনো। প্রথমেই অনন্য-মমতা। কৃষ্ণ ছাড়া আমার বলতে আর কিছু নেই এই ভাব। পরে প্রেমসঙ্গতা। প্রেমরসে কৃষ্ণকে খুশি করার বাসনা। এই প্রেমরসব্যাপ্ত প্রগাঢ় মমতাই ভক্তি।

কোনো ভাগ্যে জীবের যদি শ্রদ্ধা জাগে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস জাগে, তবে সে কী করে? সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গে থেকে শ্রবণ-কীর্তন বা সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করে। এই সাধন-ভক্তিতেই সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা দূরে যায়। ভোগাভিনিবেশ থাকে না। অনর্থ-নিবৃত্তি থেকে নিষ্ঠা আসে। নিষ্ঠা রুচি আনে। রুচি থেকে জাগে আসক্তি। আসক্তি থেকে প্রীত্যঙ্কুর। আর আগেই বলেছি এই প্রীতি বা রতি ঘনীভূত হলেই প্রেম।

ভক্তের লক্ষণ কী?

ক্ষান্তি বা ক্ষোভশূন্যতা। অব্যর্থকালতা, এক মুহূর্তও বৃথা বা কৃষ্ণছাড়া না কাটানো। বিরক্তি বা বিরাগ। মানশূন্যতা। আশাবন্ধ। সমুৎকণ্ঠা। নামগানে সদা রুচি। কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি। তীর্থ-বাসে অনুরাগ। 'কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।' অহর্নিশ স্তব বা স্মরণ বা প্রণাম করেও তৃপ্ত হতে পারছে না ভক্ত। অবশেষে নয়নজলে সিক্ত করে সমস্ত পরমায়ুই কৃষ্ণসেবাই সমর্পণ করে দেয়। 'সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।' আর আশাবন্ধ মানে দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষ্ণ কৃপা করবেনই-করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে।' আর কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে লালসা। নামগুণকীর্তনে উজ্জ্বল বাসনা। আর কৃষ্ণলীলাস্থানে বসবাস। যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম জেগেছে তার কথা ও কাজের মর্ম বোঝা কঠিন। সে কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে কখনো গান করছে আনন্দে। তাকে বুঝি সবাই পাগল বলে ভাবে।

এবার তবে পঞ্চবিধ রস—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরের খবর নাও। মধুরই গাঢ়তম। স্বাদুতম। সকল রসের শিখামণি।

মধুরা রতি তিন রকম। সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণীতে স্বসুখবাসনা বর্তমান। তুমি সুখী হও তো হবে কিন্তু প্রথমেই আমার সুখ চাই। সমঞ্জসাতে তোমারও সুখ চাই, আমারও সুখ চাই। তোমাকে সুখী করতে আমরা পত্নী হতে চাই। আর এই পত্নীত্ব-অভিমান থেকেই আমার সম্ভোগেচ্ছা। আর সমর্থাতে শুধু তোমার সুখ হোক, আমাদের সুখ জলাঞ্জলি যাক। তোমার জন্যে আমরা লোকধর্ম বেদধর্ম নিধিধর্ম সব ছাড়তে পারি। সমর্থা রতিই গাঢ়তমা, মহাভাবের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত। কৃষ্ণসুখেচ্ছা ছাড়া আর কোনো বাসনাই বিদ্ধ করা দূরের কথা স্পর্শ করতে পারে না সে প্রেমকে। গোপীদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ তার কোটি গুণ আনন্দ গোপীর। কুলবতী হয়ে আর্য পথকে পর্যন্ত তুচ্ছ করেছি। 'রূঢ়-অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।' মধুরে অর্থাৎ সমর্থা রতিতে। সমর্থা রতি বা মহাভাবই বরামৃতস্বরূপশ্রী।

মহাভাবের দুই স্তর—রূঢ় আর অধিরূঢ়। রূঢ় ভাবের লক্ষণ শোনো। প্রথমেই নিমেষের অসহিষ্ণুতা। পলক ফেলতে গেলে দর্শনে যেটুকু ব্যাঘাত ঘটে তাও যেন অসহ্য। তারপরে কল্পক্ষণত্ব। মিলনে একই তন্ময় যে কল্পকালকেও ক্ষণখণ্ড বলে মনে হয়। আবার ক্ষণকল্পতা। কৃষ্ণবিরহে অল্পক্ষণকেও মনে হয় কল্পকাল বলে। তারপরে, কৃষ্ণ সুখে থাকলেও মনে হয় কত না জানি তার কষ্ট হচ্ছে। আনন্দের মধ্যেও বিষাদ লেগে আছে ছায়ার মত। এ আমার, ও তার—এই স্মৃতি লুপ্ত হয়ে যায়, সমস্তই কৃষ্ণের শুধু এই ভাবই খেলা করে। আর কী? কৃষ্ণ দূরে থাকলেও বিরহিণীর প্রেমের শক্তিতে অকস্মাৎ তার সামনে এসে আবির্ভূত হয়।

আর, মিলনের সমস্ত সুখ ও বিরহের সমস্ত দুঃখ যদি একত্র স্তূপীকৃত করা যায় তাই অধিরূঢ়।

'ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ—নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা ঠাকুরাণী॥'

কৃষ্ণের অনন্তগুণ। কৃষ্ণ সুরম্যাঙ্গ, সর্বসৎলক্ষণ-সংযুক্ত। রুচির, অর্থাৎ আনন্দ-জনক, বলশালী, তেজোময় বা তেজসান্বিত নব কিশোর। সুপণ্ডিত

ভাষাবিৎ সত্যবাদী, প্রিয়ংবদ, শ্রুতিপ্রিয়। বুদ্ধিমান প্রতিভাবান, বিদগ্ধ ও চতুর। দক্ষ কৃতজ্ঞ দৃঢ়ব্রত। শুচি বশী দান্ত স্থির গম্ভীর ক্ষমাশীল। শাস্ত্রচক্ষু, দেশকালসুপাত্রজ্ঞ। বদান্য রাগদ্বেষশূন্য ধার্মিক ও ধৃতিমান। করুণ দক্ষিণ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ। শূর বা যুদ্ধনিপুণ শরণাগত পালক, হ্রীমান। সর্বসুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রতাপী, প্রেমবশ্য। কীর্তিমান অনুরাগ ভজন, শুভঙ্কর। সাধুসমাশ্রয়, নারীগণমনোহারী। সর্বারাধ্য বরীয়ান সমৃদ্ধিমান ঈশ্বর।

আর রাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা। কৃষ্ণপ্রেয়সীদের সর্বপ্রধানা। তার গুণের অন্ত নেই অবধি নেই।

আর এদের অবলম্বন করে যে মধুর রসের উদ্ভব তাই ভক্তি, তাই প্রৌঢ়ানন্দ চমৎকারকাষ্ঠা। এই আনন্দ শুধু তাদেরই প্রাপ্য যাদের কৃষ্ণপাদাম্বুজই একমাত্র সম্পদ, সর্বস্ব জীবনীভূত। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থই কৃষ্ণপ্রেমধন।

সনাতন, যাও, মথুরার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো, বৃন্দাবনে প্রচার করো কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব আচার আর ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র। শুষ্কবৈরাগ্য ছেড়ে ধরতে বলবে যুক্তবৈরাগ্য। যারা নিরাসক্ত হয়ে বিষয় উপভোগ করে তারাই কৃষ্ণাগ্রহী, তাদের বৈরাগ্যই যুক্তবৈরাগ্য। তাদের ভগবানই পালন রক্ষণ করেন। ধনদুর্মদ অন্ধ অভক্তকে তাদের সেবা করবার দরকার হয় না।

শাস্ত্রসম্মত সমস্ত মীমাংসা জেনে নিল সনাতন।

'প্রভু, যে সকল সিদ্ধান্ত তুমি আমাকে শেখালে তা ব্রহ্মারও অগোচর।' বললে সনাতন, তা স্বাদে অমৃত, পরিমাণে অম্বুনিধি। এই অমৃতসমুদ্রের এক বিন্দুও ধারণ করার আমার সাধ্য নেই। তবে তুমি যদি পঙ্গুকে নাচাতে চাও, আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।'

'তোমাকে যা শেখালাম,' প্রভু বললেন, 'তোমাতে তা স্ফুরিত হোক।' প্রভু তার মাথায় হাত রাখলেন।

যাঁরা আত্মারাম, যাঁরা মায়ামুক্ত, তাঁরাও ঈশ্বর ভজন করেন—এমনি ঈশ্বরের আকর্ষণ। সংসার-মুক্তদের ঈশ্বর-ভজনের দরকার কী? কিন্তু এমনি ঈশ্বরের চিত্তাকর্ষক গুণ যে নির্গ্রন্থ বা অবিদ্যাগ্রন্থিহীন হয়েও মুনিরা ঈশ্বরে অহেতুকী ভক্তি করে বসে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকী ভক্তি মিথম্ভূতগুণো হরিঃ॥

'প্রভু শুনেছি তুমি এই আত্মারাম শ্লোকের আঠারো রকম ব্যাখ্যা করেছ সার্বভৌমের কাছে,' সনাতন বললে, 'আমাকে কিছু শোনাও।'

প্রভু একষট্টি রকম অর্থ করলেন।

আত্মা অর্থ— ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ইতি, বুদ্ধি আর স্বভাব। এই সাতে যে রমে বা আনন্দ করে সেই আত্মারাম। মুনি অর্থ মৌনী, মননশীল, তপস্বী, যতি, ব্রতী আর ঋষি। নির্গ্রন্থ অর্থ গ্রন্থিশূন্য, অবিদ্যাশূন্য অর্থাৎ মায়াবন্ধনশূন্য, যারা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মানে না। আরো অর্থ শাস্ত্ররিক্ত, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, ধনসঞ্চয়ী, এমন কি নির্ধন। আর, উরুক্রম অর্থ বৃহৎ যার পদবিক্ষেপ। যে চরণ চালনে ত্রিভুবন কাঁপিয়েছিল সেই বিষ্ণু। অহৈতুকী অর্থ যেখানে কৃষ্ণসেবা ছাড়া বাসনান্তর নেই। যে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি চায় না অথচ কৃষ্ণের সেবা করে তার ভক্তিই অহৈতুকী। আর তা থেকেই কৌতুকী কৃষ্ণ বশংবদ। কৌতুকী ছাড়া কী! সর্বশক্তিমান হয়ে নইলে কি ভক্তের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে?

আর কৃষ্ণগুণের কথা কী বলব? 'যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয়।' সে সর্বাকর্ষক সর্বাহ্লাদক মহারসায়ন। নিজেকে ছাড়া সমস্ত কিছুকে জগৎ সংসারকে ভুলিয়ে দেয়। কৃষ্ণের কী গুণ? সচ্চিদানন্দময়তা। ঐশ্বর্য মাধুর্য করুণা ভক্তবাৎসল্য—আত্মপর্যন্ত বদান্যতা। নিজেকে পর্যন্ত দান করে ফেলতে কুণ্ঠা নেই। কৃষ্ণের সৌরভে সনক-সনাতনরা আকৃষ্ট, লীলাশ্রবণে আকৃষ্ট শুকদেব। নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হয়েও ভাগবত অধ্যয়ন করছে। ভাগবত কৃষ্ণকথার তত্ত্বদীপ। ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হয়েও স্বসুখ নিভৃতচেতা হয়েও কৃষ্ণকথাকেই বেশি আনন্দ-কর মনে হল। আর গোপীরা আকৃষ্ট হল অঙ্গরূপে। সহাস্যকটাক্ষ দেখেই তারা দাসী হয়ে গেল। রূপ গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হল রুক্মিণী। আর বংশীগীতে লক্ষ্মী। পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন—সমস্ত।

'হরি' শব্দের বহু অর্থ, মুখ্যতম দু'টি। সমস্ত অমঙ্গল হরণ করে, আবার প্রেম দিয়ে হরণ করে। 'যৈতে তৈছে যোই কোই'—স্মরণ করলেই হল। যে কোনো ভাবে যে কেউ যেখানে-সেখানে। স্মরণ করলেই পাপ চলে যায়, প্রেম জাগে। প্রেমের জাগরণ মুখ্য ফল পাপ-পলায়ন গৌণ। সমৃদ্ধ আগুন যেমন কাঠ

ভস্মীভূত করে তেমনি হরিভক্তি বিনিঃশেষে দগ্ধ করে সর্বপাপ। 'ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥'

যে বিপন্ন, আর্ত, রোগাদিতে অভিভূত, যে অর্থার্থী, বিষয়কামী, যে জ্ঞানী বা আত্মবিৎ আর যে জিজ্ঞাসু, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু—এই চার রকম লোকই ঈশ্বরকে ভজনা করে। আর্ত আর অর্থার্থী দুইই সকাম, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী মোক্ষকাম। কিন্তু এদের যখন মহৎ ভাগ্যের উদয় হয় তখন তারা কাম্যবস্তুর জন্যে প্রার্থনা না করে শুদ্ধা ভক্তি চেয়ে বসে। আর শুদ্ধা ভক্তি আসে কোত্থেকে? সাধুসঙ্গ কৃপায়। বা কৃষ্ণ কৃপায়। সেই মহৎ কৃপায় কামত্যসঙ্গ চলে যায় আর শুদ্ধা ভক্তি জেগে ওঠে। সাধুকণ্ঠে কৃষ্ণকথা একবার শুনলে কে পারবে সেই সাধুসঙ্গ ত্যাগ করতে? ভগবৎ কথা শ্রবণের লালসাই তো ভক্তি। সাধুসঙ্গেই সেই লালসার সমৃদ্ধি।

যা কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক তাই কৈতব, তাই আত্মবঞ্চনা। আর তাই দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ। যাতে কৈতব নেই তাই ধর্ম। সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা আর ভক্তি এদের স্বভাবই হচ্ছে কৃষ্ণে অনুরাগ জন্মায়। কৃষ্ণভাব বা ভক্তি-উন্মেষের অন্য কোনো পথ নেই। যে পর্যন্ত ভুক্তি-মুক্তির ইচ্ছা সে পর্যন্ত প্রেম নেই, কৃষ্ণভাব নেই।

'বহুজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।'

ভগবৎকৃপায় বা সাধুকৃপায় যখন মন থেকে অন্যবাসনা দূরে যাবে তখনই ভক্তি হৃদয়ে আসন পাতবে।

'কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥'

একে একে সেই শ্লোকের একষট্টি রকম অর্থ করলেন প্রভু। কিন্তু সব অর্থেরই শেষকথা ভক্তিই সারবস্তু। আর জন্মজন্মান্তরে কোনো সৌভাগ্যে কোনো সময়ে যদি কেউ সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা লাভ করে তবে আর সমস্ত ছেড়ে সে অহৈতুকী ভক্তিতেই একমাত্র কৃষ্ণকে ভজন করে।

ভক্তির কৃপাতেই ভাগবতের অর্থবিকাশ। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।' ভাগবতের অর্থ বুদ্ধি বা ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিপন্ন নয় একমাত্র ভক্তিতেই বোধগম্য।

প্রভুর চরণ ধরে সনাতন স্তুতি করতে লাগল। 'তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন, তোমার নিশ্বাস থেকেই সমস্ত বেদের উৎপত্তি। তুমিই শ্রেষ্ঠ বক্তা, তুমিই ঠিকঠিক অর্থ জানো ভাগবতের—'তোমা বিনু অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ।'

'আমার স্তব না করে ভাগবতের স্বরূপ বিচার করো।' বললেন প্রভু, 'ভাগবত কৃষ্ণতুল্য—সর্বাশ্রয় ও সর্বব্যাপক। তার প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে বিচিত্র অর্থ। কলিকালে অজ্ঞানান্ধ জীবের ভাগবতই 'পুরাণার্ক অধুনোদিত'—সেই পুরোনো সূর্য নতুন করে উদিত হয়েছে। ভাগবতই কৃষ্ণের প্রতিনিধি। কিন্তু আমার কথা কে নেবে? লোকে হয় তো বলবে ও বাতুলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। হ্যাঁ, আমি বাতুল, হাসলেন প্রভু; 'কৃষ্ণপ্রেমে বাতুল।'

'কিন্তু আমাকে যে আপনি বৈষ্ণবস্মৃতি প্রচার করতে বললেন, আমি যে নীচ আমি যে অনাচারী-অনধিকারী, আমার দ্বারা কী হবে?' সনাতন দৈন্যে নম্র হল: 'তবু যদি কিছু সূত্র বলে দেন চেষ্টা করতে পারি।'

তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। যা তুমি চাইবে তাই কৃষ্ণ তোমাকে জুগিয়ে যাবেন—জ্ঞান বুদ্ধি ভাব সূত্র—সমস্ত।

'যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই-সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥'

তবু দিগদর্শন সূত্র তোমায় কিছু বলছি, শুনে রাখ।'

প্রথমেই গুরু। গুরু-আশ্রয়নই ভজনের মূল। গুরুলক্ষণ কী, অর্থাৎ কে দীক্ষাগুরু হবার উপযুক্ত? যে শাস্ত্রবিৎ, কৃষ্ণনিষ্ঠ, আচারবান, অমলচরিত্র, নির্লোভ নির্লিপ্ত কৃষ্ণানুভাবী, স্নেহশীল। আর, শিষ্যলক্ষণ কী? শাস্ত্রে ও গুরুতে যে শ্রদ্ধাবান, যে বিনীত, শুভচরিত্র, সত্যবাদী। একে-অন্যকে পরীক্ষা করে নেবে। কোন মন্ত্রের কী মাহাত্ম্য তাও বিচার করে নেবে। কোন মন্ত্র গ্রহণযোগ্য তাও। আর কৃষ্ণ যে একমাত্র সেব্য একমাত্র ভজনীয় সে সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হবে। তারপরে জানবে সমস্ত যাবতীয় করণীয়। আচমন থেকে তিলক-ধারণ থেকে জপস্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন ভাগবত শ্রবণ পর্যন্ত। সর্বত্র পুরাণ বচন থেকে প্রমাণ দেবে। তোমার সিদ্ধান্তের অনুকূলে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করবে।

বৈষ্ণব আচার তো পালন করবেই, সাধারণ যে সদাচার তাও লঙ্ঘন করবে না। তোমাকে সব সূত্রে সংক্ষেপে বললাম, লিখতে আরম্ভ করলেই, দেখবে কৃষ্ণ তোমার চিত্তে সমস্ত উজ্জ্বল করে তুলবেন। 'যবে তুমি লিন কৃষ্ণ করাবেন স্ফুরণ।"

কাকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু? যে গৌড়েশ্বরের সভাবিভূষণ। যে ঋদ্ধাশ্রীকে বর্জন করে তরুণী বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে বরণ করেছে। যার বাইরে অবধূতের বেশ অথচ হৃদয় অন্তর্ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। যেন শৈবালাচ্ছন্ন নির্মলজলের সরোবর।

আর কে আলিঙ্গন করলেন?

যিনি অতিমাত্রদয়ার্দ্র সেই চম্পকগৌর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। নেত্রপথে প্রথম উপাগত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সুদীর্ঘ বাহুযুগলে আলিঙ্গন করে ধরলেন। [ক্রমশঃ।

হরিদ্বার

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

ভুলতে তোমায় পারি না যে
চির নূতন হরিদ্বার
তোমায় ছেড়ে এসেও তো' তাই
তোমায় জানাই নমস্কার।
তোমার স্নিগ্ধ পুণ্য পরশ
তোমার দিব্য গঙ্গাধারায়
ইন্দ্রজালের মোহন মায়ায়
ক্লান্ত মনের শ্রান্তি জুড়ায়।
তোমার মাটির স্পর্শ লাভেই
চিত্তে জাগে শিহরণ,
কোন সাধনার গুপ্তধনে
কর এমন আকর্ষণ?
হরিদ্বারে নেমেই দেখি
মূর্তি শিবের মনোহর,
আপন হাতে গঙ্গাজলে
স্নান করেন ঐ মহেশ্বর।
হিমালয়ের শীতল পরশ
বহন ক'রে সমীরণ,
হরিদ্বারের পথে পথে
ঘুরে বেড়ায় অনুক্ষণ।
"মনসা পাহাড়" সদাই তোমায়
আড়াল করে সযতনে
তুমি যেন জগৎ ছাড়া
বুঝি প্রথম পদার্পণে।
গঙ্গা প্রথম নামেন হেথায়
হরির দুয়ার সত্যি তুমি,
পথে চলার আগেই দেবী
চলেন তোমার চরণ চুমি
কী যে মধুর শান্তিময়ী
হরিদ্বারের গঙ্গামাতা,
নীরবে দাও পরাণ ভ'রে
তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।

ভোলাগিরির ঘাটের পাশে
যখন দাঁড়ায় আগন্তুক,
অজানা এক আনন্দে তার
ভরে ওঠে সকল বুক।
ব্রহ্মকুণ্ডে চলি যখন
কর্ম মুখর পথটি দিয়ে
সহ যাত্রী কতই দেখি
যাচ্ছে ফুলের অর্ঘ্য নিয়ে।
ব্রহ্মা যেথায় ধন্য হলেন
সে পুণ্য স্রোত আজও সেথায়,
স্নেহের পরশ দিয়ে কত
তপ্ত প্রাণের ক্লান্তি ঘুচায়।
গঙ্গাদেবীর আরতি হয়
বিচিত্র তার অনুষ্ঠান,
দেবী যেন মূর্ত হ'য়ে
করেন তথায় অধিষ্ঠান।
ওপারের ঐ নীল ধারাতে
ভাগ্যক্রমে যে জন যায়,
"চক্রধারী" পাথর কতই
নীল জলে সে কুড়িয়ে পায়।
চণ্ডী পাহাড় কী রূপ তাহার।
আমলকী বন পথে তার,
শীর্ষে দেখি মূর্তি দেবীর
দৃশ্য অতি চমৎকার।
তুষার শুভ্র শৃঙ্গ দেখি
দাঁড়িয়ে মনসা পাহাড় চূড়ায়,
হিমালয় ঐ ডাকছে যেন
সুদূর থেকে—"আয় রে, আয়।"
প্রণাম জানাই তোমায় সদাই
হরিদ্বার, হরিদ্বার,
মাঝে মাঝে কাছে ডেকে
নিও আমার নমস্কার।।

বাদ-প্রতিবাদ

[মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ব্যায়ামবিদ্যা ও মল্লবীরগণের সম্বন্ধে অগণিত রচনা প্রকাশিত হয়ে বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশবিদেশের মল্লবিদ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। সম্প্রতি ঐ জাতীয় কোন রচনার কিছু তথ্যগত ও ইতিহাসগত ভুল-ভ্রান্তিকে কেন্দ্র করে ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট আলোড়ন ঘটেছে। এই সম্বন্ধীয় দুটি পত্র আমরা প্রকাশ করলাম। বিখ্যাত মল্লবীর শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবর গুহ) ও শ্রীঅজয় বসু পত্র দু'টির রচয়িতা। বাদ-প্রতিবাদমূলক এই পত্র দুটির মধ্যেও যথেষ্ট গুরুত্ব নিহিত আছে এবং এই পত্র দু'টির মাধ্যমে বহু তথ্যের উদ্ঘাটন ঘটেছে, যা পাঠকপাঠিকাকে বহুল পরিমাণে আনন্দ দান করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। সেই কারণে পাঠকপাঠিকার চিঠি বিভাগে পত্র দুটি মুদ্রিত না করে বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পাঠকপাঠিকার অবগতির জন্য মাসিক বসুমতীর স্বতন্ত্র ও বিশেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হল।—স]

সুধীবর সম্পাদক মহাশয়,

মাসিক বসুমতীর বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৯) শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিশ্বজয়ী মল্ল গামা' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার কয়েকটি বক্তব্য আপনার পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় স্থান দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে পরস্পর-বিরোধী কয়েকটি উক্তি এবং কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর মন্তব্য থাকায় আমি ওই পত্র লিখেছিলাম। আমার পত্রোত্তরে শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য মাসিক বসুমতীর দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের বক্তব্যের উত্তরে আমি এই পত্রটি পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমার পত্রটি প্রকাশের ব্যবস্থা করলে বাধিত হবো। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এই সঙ্গেই মল্লগুরু শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবরবাবু) লিখিত একখানি চিঠিও আপনার কাছে পাঠালাম। গোবরবাবুর চিঠি আমার বক্তব্যেরই পরিপূরক। সুতরাং আমার পত্রের সঙ্গে তাঁর পত্রটি প্রকাশিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া গোবরবাবুর চিঠিটি একটি প্রামাণিক দলিল বিশেষ। একাল ও উত্তরকালের কাছে সেকালের বিশ্ববিশ্রুত মল্লবীর গোবরবাবুর অভিমতের যেমন সবিশেষ মূল্য আছে, তেমনি তাঁর পত্রটি অনেক অজানা তথ্যের জানান দিয়ে ভুল বোঝার অবসান ঘটাতে পারবে। এই কারণে তাঁর পত্রটি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজনীয়ও বটে।

মাসিক বসুমতীর দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রোত্তরে আমার বক্তব্য :—

'বিশ্বজয়ী মল্ল গামা' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার পূর্বপত্রে মূলত: তিনটি বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়েছিল। প্রথম প্রতিবাদ ছিল 'এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারত পর পর তিনবার বিশ্ববিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল' লেখকের এই মন্তব্য সম্পর্কে। প্রবন্ধকার শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পত্রে আমার বক্তব্য মেনে নিয়ে জানিয়েছেন যে আমি যা বলতে চেয়েছি তা তাঁর মূল প্রবন্ধে ইতস্তত ছড়ানো ছিল। ছিল, আমিও তা স্বীকার করি। তবে ছড়ানো মন্তব্যগুলি যদি পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে তাহলে কি পাঠকদের ধাঁধায় পড়ার আশঙ্কা থাকে না? তাছাড়া বিশ্ববিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছিল আপাতদৃষ্টিতে এই বাক্যের অর্থ কি আনুষ্ঠানিক গৌরব অর্জন বোঝায় না?

আমার দ্বিতীয় প্রতিবাদ প্রবন্ধকারের 'গোবরবাবু কিন্তু গামাকে সমীহ করেই চলতেন। তিনি নাতি-গুরু ওজনের জগজ্জয়ী মল্ল হয়েও কোনোদিন বড় গামাকে তাঁর আহ্বান জানান নি' এই মন্তব্য সম্পর্কে। কারণ, আমার বিচারে, এই কথায় শুধু ইতিহাসকেই বিকৃত করা হয়নি, সেই সঙ্গে বড় গামা পালোয়ানকে বড় করতে গিয়ে গোবরবাবুর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পত্রে বোঝাতে চেয়েছেন যে সমীহ শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন 'সম্মান' অর্থে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে 'সমীহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে ভয় মিশ্রিত মনোভাবের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়েছে কিনা সেকথা আমি পাঠকবর্গকেই বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই।

এ সম্পর্কে লেখকের প্রতি আমার কোনো অনুরোধ নেই। কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলী নস্যাৎ করায় তিনি যে উগ্রতা দেখিয়েছেন তাঁর পত্রে তারপর এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা নিরর্থক। তিনি তাঁর পত্রে বেশ জোরের সঙ্গেই আমার প্রতিবাদটিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় বলেছেন যে, গোবরবাবু বড় গামাকে কোনোদিন আহ্বান জানাননি এবং প্রকারান্তরে বোঝাতে চেয়েছেন যে, বড় গামা বনাম-গোবর পালোয়ানের প্রস্তাবিত কুস্তি প্রসঙ্গে আমি যে তথ্য পরিবেশন করেছি তা নাকি ভুয়া। কিন্তু বাস্তবে ভুয়ো কি এবং সঠিকই বা কি, গোবরবাবুর পত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। পাঠকদের অবগতির জন্যে সেই প্রামাণিক পত্রখানিও আমি এই সঙ্গে পেশ করলাম।

শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে শ্রীখেলোয়াড় রচিত দু'খানি পুস্তক এবং শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী রচিত প্রবন্ধ 'মল্লজগতে ভারতের স্থান' পড়তে অনুরোধ জানিয়েছেন। অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না কারণ পুস্তক দুখানি এবং ১৩৩৬ সনের ফাল্গুন ও ১৩৩৭ সনে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীর প্রবন্ধাবলী আমার আগেই পড়া ছিল। কিন্তু ওই পুস্তক ও প্রবন্ধাবলীতে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ঠিক কোন কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছেন তা জানাতে চাননি বলেই এ সম্বন্ধে আমি বিশদ আলোচনা করতে পারলাম না। এবার তাঁর অনুরোধের উত্তরে আমার এই নিবেদন যে, শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ৺শচীন্দ্রনাথ

মজুমদারের 'বলীদের গল্প' শীর্ষক পুস্তক এবং 'ভারতীয় মল্লরাজ কাহিনী' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী এবং শ্রীসমর বসু রচিত পুস্তক, 'মল্লজগতে ভারতের স্থান' ও সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত 'কুস্তি জগতে বিস্ময়' শীর্ষক বিবিধ প্রবন্ধ পড়ে থাকতেন তা হলে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হোতো। আমার ধারণা, শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীখেলোয়াড় এবং শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামীর রচনা যতোটা মূল্যবান বলে বিবেচনা করেন ততোটা মূল্য তিনি ৺শচীন্দ্রনাথ মজুমদার বা শ্রীসমর বসুর রচনার ওপর দেন না বলেই তাঁর মূল প্রবন্ধ 'বিশ্বজয়ী মল্ল গামা'তে একাধিক ভ্রমাত্মক তথ্য যথা বড় গামা পালোয়ান রহিম পালোয়ানকে এলাহাবাদের দঙ্গলে পরাজিত করেছিলেন ১৯১১ সালে; গামা জিবিস্কোকে হারিয়ে ইউরোপীয় মল্লসমিতি কর্তৃক 'বিশ্বজয়ী মল্ল' বলে স্বীকৃত হলেন; গামাই প্রথম ভারতীয় মল্ল যিনি ইউরোপীয় মল্ল সমিতি কর্তৃক সরকারী ভাবে 'বিশ্বজয়ী' আখ্যা লাভ করেন, গোংগাই ছিলেন গামার একমাত্র ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী; বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'জন বুল বেল্ট', প্রসিদ্ধ হিন্দু মল্ল মাধব সিংয়ের কাছেও নাকি কিছুদিন গামা কুস্তি শিক্ষা করেছিলেন! ইত্যাদি ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তবে শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসমর বসুর 'মল্লজগতে ভারতের স্থান' শীর্ষক পুস্তক পড়ুন বা না পড়ুন দু'জনের রচনায় কিন্তু আশ্চর্য মিল আছে। পাতিয়ালায় গামা—যিস্কোর লড়াইয়ের বর্ণনায় শ্রীসমর বসু ও শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, দুজনেই হুবহু এক। বাক্যে বাক্যে, শব্দে শব্দে এমন সাদৃশ্য যে 'মল্লজগতে ভারতের স্থান' ও 'বিশ্বজয়ী মল্ল গামা'র রচনাকাল জানা না থাকলে কোনটি যে মৌলিক রচনা তা বুঝতে আমাদের গোলক ধাঁধাঁয় পড়তে হোতো!

আমার জানা নেই যে বসুমতীর প্রবন্ধকার এবং ১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের দেশে প্রকাশিত 'মল্ল যুদ্ধে অপরাজিত আখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিন্ন ব্যক্তি কিনা। তবে এইটুকু জেনে শঙ্কিত হয়েছি যে, দুজনের হাতে পড়েই আজ ইতিহাস বিপন্ন বোধ করছে। 'দেশ'-এতে শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় গোবরকে একেবারে বড় গামার সাকরেদ বানিয়ে ফেলেছেন 'ইমাম বক্স, ছোট গামা, হামিদ ও বাংলার গোবর পালোয়ান, এঁরা প্রায় বড় গামার হাতে তৈরী এক একটি রত্ন' এই সব কথা বলে এবং বসুমতীর লেখক নিজের কল্পিত উক্তি 'বড় গামার সাথে কারুর তুলনাই চলে না' গোবরবাবুর মুখে জুড়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অথচ গোবরবাবুর পত্র ভিন্ন মতের সাক্ষ্য বহন করছে। এইসব দৃষ্টান্ত থেকেই পাঠকবর্গ উপলব্ধি করতে পারেন যে, কেমন ওয়াকেবহাল ও নিষ্ঠাবান লেখকের হাতে আমাদের দেশের খেলাধূলার ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের ভার পড়েছে। এই ইতিহাসের ভবিষ্যত যে কি তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

ইতি—
ভবদীয়
অজয় বসু

প্রীতিভাজনেষু,

অজয়বাবু সম্প্রতি কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত কুস্তি সম্পর্কে কোন কোন প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকারের অভিমত সম্বন্ধে আপনার মনে প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় আপনি আমাকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি।

আপনি জানিতে চাহিয়াছেন যে ১৯২০ সালে বড় গামা পালোয়ান ভারতীয় মল্লদের উদ্দেশ্যে এক মুক্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন কিনা এবং সেই আহ্বানে আমি সাড়া দিয়াছিলাম কিনা? এবং বড় গামা পালোয়ানের সহিত আমার প্রস্তাবিত কুস্তির প্রকৃত ইতিহাস কি?

ইহার উত্তর: ১৯২০ সালে বড় গামা পালোয়ান ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে কোন মুক্ত আহ্বান জানান নাই, সুতরাং আমার পক্ষে সাড়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁহার পক্ষে সেই সময় ভারতীয় মল্লদের উদ্দেশ্যে কোন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা শোভন ও ভারতীয় মল্লদের সনাতন প্রথাসম্মত হইত না। কারণ ইহার প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এলাহাবাদ দঙ্গলে রহিম পালোয়ানকে 'টেকনিক্যাল' পরাজিত করিয়া বড় গামা পালোয়ান প্রচলিত মতে 'ভারতশ্রেষ্ঠ' স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। যিনি স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ তাঁহার পক্ষে অন্যদের চ্যালেঞ্জ জানানোর রীতি কোনদিনই আমাদের দেশে অনুসৃত হইত না। অন্য দেশেও সচরাচর এইরূপ ঘটে নাই। কারণ এই রীতি শ্রেষ্ঠের সুনামের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ১৯২০ সালের সমকালবর্তী সময়ে উঠ্‌তি ও নামী ভারতীয় জোয়ানদের মধ্যে কেহ কেহ বড় গামা পালোয়ানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া প্রকাশ্যে অথবা তাঁহার নিকট লিখিত পত্রে বড় গামা পালোয়ানকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন। যাহারা এই ভাবে বড় গামা পালোয়ানের নিকট চ্যালেঞ্জ পাঠাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। প্রখ্যাত মাজি পালোয়ানের মাধ্যমে ১৯১৮ সাল হইতেই আমার পক্ষ হইতে এইভাবে বড় গামা পালোয়ানের সহিত মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইতেছিল। বৎসরাধিক কালের চেষ্টার পর বড় গামা পালোয়াম কলিকাতায় আমার সহিত দ্বন্দ্বে রাজী হইলে স্বর্গত পিতৃদেব রামচরণ গুহ মাজি পালোয়ান সমভিব্যাহারে পাতিয়ালায় গিয়া চুক্তিপত্রে বড় গামা পালোয়ানের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। চুক্তি অনুসারে ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় দঙ্গলে বড় গামা পালোয়ানের সহিত আমার কুস্তি হইবার কথা ছিল। এই দঙ্গলের সংগঠক ছিলেন আমার পিতৃদেব ও তাঁহার সহযোগীরা। একালের ইসলামিয়া বা মৌলানা কলেজ স্কোয়ারে দঙ্গলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং দঙ্গলে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বড়গামা পালোয়ান দলবলসহ মার্চ মাসের সুরুতেই কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দঙ্গলের কিঞ্চিদধিক এক সপ্তাহ পূর্বে আমি সাংঘাতিকভাবে ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ায় প্রস্তাবিত দঙ্গল পরিত্যক্ত হইয়া যায়। বড় গামা পালোয়ানের সহিত আমার প্রস্তাবিত কুস্তির কথা বয়স্ক ক্রীড়ামোদীদের জানা আছে এবং ইহার সংবাদ কলিকাতার তৎকালীন পত্রিকাগুলিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয় যে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পুরানো অমৃতবাজার পত্রিকার ফাইল ঘাঁটিলে আপনিও এ বিষয়ে কিছু কিছু খবর লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

আপনার আর একটি প্রশ্ন বড় গামার সাথে কারুর তুলনা চলে চলে না—এরূপ মন্তব্য আমি করিয়াছি কি না?

যতদূর স্মরণ আছে, এরূপ মন্তব্য করি নাই এবং করিতেও চাহি না।

তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বড় গামা পালোয়ানের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল (তাঁহার রক্ষ-মূলক মল্লনীতি পায়তারা ইত্যাদি) যাহা অন্য পালোয়ানদের ছিল না। তেমনি অন্য কোন কোন পালোয়ানের বৈশিষ্ট্য (রহিম, রহমানি, আলাবক্সের দু'দিকের প্যাঁচ কষার সমান দক্ষতা এবং চাক, বাহালি, চাক বাহাস্তি ও কালাজাং প্রয়োগে তাঁহাদের সিদ্ধহস্ততা) বড় গামার মধ্যেও তেমন দেখা যায় নাই। বড় গামা দিক্‌পাল মল্লবীর। ইতিহাসে—তাঁহার যথার্থ ভূমিকা স্বীকৃত হইয়া আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সহিত সমপর্যায়ের অন্য পালোয়ানদের তুলনা করায় আপত্তি ওঠার কারণ নাই। এবং কুস্তি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে বড় ও নামী কুস্তিগীরদের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়া চিরদিনই আনন্দ পাইয়াছি এবং অভিজ্ঞ মহলের সহিত প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নিজেও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছি।

বড় গামা আমাকে তৈয়ারী করিয়াছেন কি না? আপনার এই প্রশ্ন আমাকে অবাক করিয়াছে!

কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিতেছি না। আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, বড় গামা যে আমাকে তৈয়ারী করেন নাই—ইহা শুধু আপনিই নহেন ভারতীয় কুস্তি সম্পর্কে যাঁহারা সামান্য খবরও রাখেন তাঁহারা সকলেই জানেন। কারণ সঙ্গীতের মত ভারতীয় মল্লজগতেও ঘরোয়ানার-ও এক বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে। ঘরোয়ানার পরিচয় না জানিয়া কোন ভারতীয় কুস্তিগীরের আসল পরিচয়ও জানা যায় না। ঘরোয়ানা সম্পর্কে আমাদের দেশের সুর-শিল্পীদের মতো কুস্তিগীরেরাও রীতিমতো স্পর্শকাতর। মল্লক্রীড়ায় আমাদের নিজস্ব ঘরোয়ানা আছে। ৺কালীচরণ চোবের শিষ্য আমার পিতামহ ৺অম্বু গুহ সেই ঘরোয়ানার স্রষ্টা। কুস্তিতে আমার শিক্ষাগুরু খুল্লতাত ৺ক্ষেত্রচরণ, পিতৃদেব রামচরণ, খুল্লতাত শিষ্য নেত্যলাল রায় ও ৺জগদীশচন্দ্র সিংহ রায়। অনেক ভারত বিখ্যাত পালোয়ান আমার সহিত জোর করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আমাকে তৈয়ারী করিয়াছেন বলিলে ভুল বলা হইবে। কারণ জোর প্রক্রিয়াটি আপেক্ষিক। জোর-এর অর্থ অভ্যাসসঙ্গীকে তৈয়ারী হইতে যেমন সহায়তা করা তেমনই নিজেকেও গড়িয়া তোলার প্রস্তুতি। এক কথায় 'জোর'-এর অর্থ পারস্পরিক অনুশীলন। কোন অভ্যাস-সঙ্গীর প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ না করিয়াও আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি যে, আমার যৌবনের অসংখ্য অভ্যাস-সঙ্গীদের (তন্মধ্যে অধিকাংশই সেকালের ভারতের শীর্ষস্থানীয় মল্ল ছিলেন) মধ্যে একমাত্র খোসলা চোবে ছাড়া আর কেহই কোন নূতন প্যাঁচ বা চলতি প্যাঁচের নূতন দিকের সন্ধান আমাকে কখনো জানাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। এ ক্ষেত্রেও অধিকাংশই ছিলেন যেন নিজস্ব ঘরোয়ানা সচেতন। প্রয়োজন বোধে আপনি আমার এই পত্র প্রকাশও করিতে পারেন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ (গোবর)

ব্যর্থতার আবেদন

স্বপনকুমার দত্ত

নিদগ্ধ অশ্রু এ নিয়ত নিষ্ফল আর্তনাদে
বিধাতা তোমায় কয়টি প্রশ্ন করি,
যে সৃষ্টিতে হাহাকার যুগ যুগ ধরি
করিছে মানব বক্ষে অমোঘ শর-বৃষ্টি
কি প্রয়োজন ছিল তোমার সে সৃষ্টির?

তোমার বিধান মানিল যাহারা
দিবারাতি কেন নিত্য দিশাহারা
লভিতে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন
কেন মানুষ নিত্য লভিছে যাতন?
অসহায়তা কি মোদের স্বকৃত অপরাধ।

নিয়তি তুমি চির মুক্ত, অবাধ
শুধু বলো অসহায়ের দল সজল চক্ষে
কেন নিয়ত অশ্রুতে ভাসিয়া বক্ষে
মূকের মতন প্রসারিত হস্তে ভিক্ষা মাগে,
বাঞ্ছিত জীবনে অবাঞ্ছিত মৃত্যু আগে
নাশে কি নিষ্ঠুর প্রয়োজনে? তাহাদের
ঊর্ধ্বপানে চাহি অসহায় অভিশাপ
বিধাতা, আঁখিতে লাগে না কি তাপ
স্থিতিরে করে না কি দুর্বিষহ? তোমার
অসহায়েরে লয়ে উপহাস করার

অনাদি, অনন্ত, অসহনীয় পাপে
জ্বলিবে কোন জ্বালায়, কোন নিষ্ঠুর শাপে
অনন্ত কাল ধরি।

তুমি বিধাতার পরে থাকে যদি কোন বিধাতা
তাহার পায়েই এ নালিশ তুলিয়া ধরি।
হে ত্রাণকর্তা, রক্ষাকর্তা মোদের
বিধাতারে শাসন করো যে প্রবিধাতা,
এ নিত্য, বীভৎস, রুধির স্রোত হতে
চিরতরে বাঁচাও এ পঙ্গু অসহায়ে
বিষম কারায় রুদ্ধ মানব সম্প্রদায়ে।

কলঙ্কমণ্ডিত সভ্যতায় প্রয়োজন নাই
শুধু ত্রাণকর্তা, শুধু চাই
যে বিষাইল এ ধরণীর বায়ু
ফুরাইল সৃষ্টির অসমাপ্ত আয়ু
আপন খেয়াল খুশীতে;
প্রভু মোর, হবো না'ক মায়াময়
যত দীনতারে করো করো জয়
পাপীরে লুপ্ত করে, হত্যা কর
শাস্তি দাও
বলাও তাহারে কাঁসিতে।

জ্ঞানান্বেষক

কলকাতায় পথচলা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ট্রাম-বাস-লরী-মোটর হরেকরকম যানবাহন চারিদিকেই ছুটে চলেছে। এর মাঝে পথচলা এবং গন্তব্যস্থলে যাতায়াতের জন্য গাড়ীতে ওঠা-নামা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাণটি হাতে করে যেন চলাফেরা করতে হয়। মোটর দুর্ঘটনায় প্রতি বছর কত লোক যে মারা যায় তার সংখ্যা নেই। এর জন্য পথচারীদের যেমন সতর্ক হওয়া দরকার তেমনি ড্রাইভারদেরও সতর্ক হওয়া দরকার কম নয়।

ড্রাইভার যতই সতর্ক হোক না কেন তাকে অনেক সময়ই এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছতে হয় যে তার মুহূর্তের সিদ্ধান্তের ওপর মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করে। নীচে ড্রাইভারদের পক্ষে কতকগুলো অত্যন্ত সাধারণ বিপদ এবং কি করে সে বিপদ অতিক্রম করতে হয় সে সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যতম বিশেষজ্ঞ হেণ্ডনের—মেট্রপলিটান পুলিশ ড্রাইভিং স্কুলের কর্তা চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিডনী ফারমানের অভিমত দেওয়া হল।

চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফারমান বলেন, ড্রাইভারদের যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের নিরাপদে এগিয়ে যেতে হবে।

হেণ্ডনে ড্রাইভারদের আত্মরক্ষামূলক গাড়ী চালানো পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমেই তাদের এই মূলনীতিতে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সে ছাড়া রাজপথের অন্য সব ড্রাইভারই হয় নির্বোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীন অথবা মাতাল। কিম্বা সবার মধ্যে তিনটি দোষই আছে।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে হেণ্ডন বিদ্যালয় এ ব্যাপারে সত্যি সত্যি সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৩৫ সালে যখন এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন লণ্ডন পুলিশ-ড্রাইভাররা গড়ে হাজার মাইল গাড়ী চালিয়ে একটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হত। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার মাইলে একটি।

জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের কি করতে হবে? গাড়ীর হুইল হাতে নিয়ে বসুন, অবস্থাটা ভাল করে বিচার করুন এবং দেখুন চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফারমান কি বলেন।

ধরুন, আপনি একটি জনবহুল রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার দু'পাশেই গাড়ী দাঁড় করানো আছে, কাজেই আপনার সামনে রয়েছে ছোটো মাত্র গলি। অন্য লেন থেকে আপনার দিকে এগিয়ে আসছে "ক" নম্বরের মোটর গাড়ী। পেছন থেকে "খ" নম্বরের গাড়ীটি এই গাড়ীটিকে পিছনে ফেলবার চেষ্টায় আপনার সম্মলাইনে এসে পড়েছে। আপনি আটকা পড়ে গেছেন।

তাড়াতাড়ি হর্ণ বাজান এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার গাড়ীটিকে একেবারে থামিয়ে ফেলুন। যদি সময় থাকে আপনার ইগনিসনকে "অফ" করুন এবং আপনি যখন থেমে পড়েছেন তখন আপনি যদি সমান রাস্তায় থাকেন, আপনার ব্রেকটাকে ছেড়ে দিন। আপনার গাড়ীর গতি কমিয়ে ফেলে আপনি অন্য ড্রাইভারকে গাড়ী থামাবার বা গতি থামাবার সময় দেবেন এবং ব্রেক অফ করে আপনি গাড়ীর ধাক্কার বেগও কমিয়ে ফেলেছেন। আপনার ইগনিসন বন্ধ করে দিয়ে আপনি আগুন লাগার আশঙ্কাকে কমিয়ে ফেলেছেন।

গাড়ীবহুল রাস্তায় আপনার গাড়ীর পিছনে অনেকগুলো গাড়ী। আপনার এ্যাক্সিলারেটার আটকে পড়েছে এবং আপনার গাড়ী সামনের দিকে এগুচ্ছে। এই জরুরী অবস্থায় আপনি কি করবেন?

প্রথমে দেখুন—আপনাকে জানতে হবে কি আপনাকে করতে হবে না। ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলে আপনি আপনার ব্রেক চাপ করে দেখবেন না। ইগনিসনের সুইচ অফ করে ধীরে ধীরে গাড়ীর গতি কমিয়ে ফেলুন।

ধীরে ধীরে ব্রেক কষতে থাকুন। খুব আকস্মিক ভাবে গাড়ীর গতি কমাবেন না। গাড়ীর গতি কমে গেলে আবার ক্লাচটিকে মাঝামাঝি জায়গায় আনুন।

তখন গাড়ী আপনা থেকে নিজের গতিতে এগুতে থাকবে—এই সময় আপনাকে নিরাপদ জায়গা খুঁজতে হবে।

আপনি যদি খুব দ্রুত ব্রেক কষেন, তাহলে গাড়ী তার নিজস্ব গতিবেগ হারিয়ে ফেলবে এবং আপনার পিছনের গাড়ীগুলো সব লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

আপনি রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছেন, এমন সময় আপনি দেখতে পেলেন আপনার সম্মুখের গাড়ীর চালক মাতালের মত গাড়ীটিকে একবার এদিক একবার ওদিক করে চালিয়ে নিচ্ছে। মাতালের মত কেন বোধহয় চালক মাতাল হয়েছে। আপনি কি তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন?

যদি সে বেশ জোরে গাড়ী চালাতে থাকে তাহ'লে তার পিছনে থেকে তাকে এগিয়ে যেতে দেওয়াই ভালো। কিন্তু যদি সে ধীরে ধীরে গাড়ী চালাতে থাকে তাহলে কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ্য

করুন এবং সে কোন রাস্তা ধরে যায় সেটাও দেখতে থাকুন। যতক্ষণ না পর্যন্ত সে রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে যাচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করে সুযোগ পাওয়া মাত্র তাকে যত দ্রুত পারেন পিছনে ফেলে এগিয়ে যান।

আপনার নিকটবর্তী টেলিফোন কেন্দ্র হ'তে পুলিশকে সংবাদটি জানিয়ে আপনি গাড়ীর ড্রাইভার এবং অন্যান্য পথযাত্রীদের সাহায্য করতে পারেন।

* * * *

একটি জনবহুল রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাবার সময় আপনার সামনের দিকের টায়ার থেকে বাতাস বেরিয়ে যেতে থাকলে আপনি কি করবেন ?

সর্বপ্রথম ব্রেক কষে গতিবেগ কমাতে চেষ্টা করুন। ষ্টীয়ারিং হুইল দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে গাড়ীকে সোজা রাখার চেষ্টা করুন।

চাকা ঘুরাবেন না গাড়ী উল্টে যেতে পারে। বাঁ দিকে গাড়ী চলার জন্য ঝুঁকবে। গাড়ীকে নিজের আয়ত্তে আনার পর গাড়ীর গতি আরও কমিয়ে ফেলবার জন্য হ্যাণ্ড ব্রেকের সাহায্য গ্রহণ করুন।

(এই ধরণের বিপদ এড়াবার জন্য যাত্রা শুরু করার আগে গাড়ীর টায়ার ভাল করে দেখে নিন! আর তা' ছাড়া টায়ার কোম্পানী যত মাইল বেগে যাওয়ার জন্য লিখে দিয়েছে তা' থেকে বেশী বেগে গাড়ী চালাবেন না।)

* * * *

একটি খাড়া পাহাড়ের ঢালুতে নামছেন—আপনার পিছনে আছে আরো অনেকগুলি গাড়ী। হঠাৎ আপনার ব্রেকের পেডাল অচল হয়ে পড়লো। কি করে আপনার গাড়ীকে থামাবেন ?

প্রথমে আপনি যত জোরে পারেন আপনার হ্যাণ্ড-ব্রেক চেপে ধরুন, এ্যাক্সিলারেটর থেকে পা তুলে নিন। ফুট-ব্রেক দিয়ে পরপর কয়েকবার বেশ দ্রুত চাপ দিতে থাকুন। তারপর গীয়ার বদলে গতিবেগ কমাতে চেষ্টা করুন। তারপর আপনার ইগনিসন 'অফ' করুন, রাস্তার ধারে গাড়ী আনুন এবং পিছনের গাড়ীগুলিকে পথ ছেড়ে দিয়ে কি ভাবে এগিয়ে যেতে পারেন সেই পথ ধরে এগিয়ে চলুন।

*

প্রত্যেক ড্রাইভারকেই সময় সময় এমন অবস্থায় পড়তে হয় যাতে তার গাড়ী পথ থেকে পিছলে সরে যায় বা লাফিয়ে উঠে। এই অবস্থা থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পেতে হবে ?

বার বার করে আপনার টায়ার এবং টায়ারে বায়ুর চাপ পরীক্ষা করে নিন। এগুলো উপেক্ষা করলেই আপনার বিপদের সম্ভাবনা থাকবে।

পথ ভিজে কিনা ভাল করে লক্ষ্য রাখবেন। এরূপ ক্ষেত্রে গাড়ীর গতি নিশ্চয়ই বন্ধ করবেন এবং আপনার গাড়ীকে কঠোর ভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন। গাড়ী লাফিয়ে চলা বা পিছলে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে তীব্রবেগে গাড়ী চালানো কিংবা খুব জোরে ব্রেক কষা বা এ্যাকসিলারেটরকে চেপে ধরা। এর যে কোন একটা কারণে বা একাধিক কারণ একসঙ্গে মিলিয়েই এই সব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

গাড়ী চালাতে গিয়ে যখনই কোন গোলমাল বোধ করছেন তখনই গাড়ীকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকে নজর দিন। কারণ খুঁজে বের করে ত্রুটি দূর করুন, এ্যাক্সিলারেটর ঠিক করুন, স্টিড ঘোরান গাড়ীকে ঠিক পথে আনুন, তারপর আপনার গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে যান।

যদি জোর ব্রেক কষার জন্যেই গোলমাল বোধ করে থাকেন তাহলে আপনার ব্রেকের উপর চাপ কমিয়ে ফেলুন, চাকাগুলিকে ঘুরতে দিন তারপর আস্তে ব্রেক কষুন, পরে প্রয়োজন হলে ক্রমে ক্রমে ব্রেক কষার বেগ বাড়িয়ে দিন।

* * * *

গভীর অন্ধকারের মধ্যে গাড়ী চালাচ্ছেন এবং আপনার হেডলাইট খারাপ হয়ে গিয়েছে, তখন কি করবেন ?

ভয় পাবেন না। আপনি আপনার পথ ধরে চলতে থাকুন, সুযোগ মত ব্রেক চেপে ধরবেন এবং গাড়ীটিকে ঠায় দাঁড় করিয়ে দিন, প্রথমে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখবেন আপনার পিছনে কি আছে।

এই সব-ই খুব সতর্ক ড্রাইভারকেও দ্বিধায় ফেলতে পারে। যদি অতিরিক্ত যত্ন না নেওয়া হয় তাহলে আরও অনেক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

কলিকাতার রাজপথে সঙ্ঘটিত একটি সাম্প্রতিক মোটর দুর্ঘটনার দৃশ্য।

দুই লেন-বিশিষ্ট রাস্তার বাঁক ঘুরতে যাচ্ছেন এবং হঠাৎ দেখলেন একটা বড় লরী দুটি লেনকে আড়াআড়ি অতিক্রম করতে গিয়ে আপনার পথ রুদ্ধ করতে যাচ্ছে। সময় মত বেরিয়ে যেতে হচ্ছে আপনি কি করবেন ?

আপনাকে বিশেষ কোন সমস্যায় পড়তে হবে না যদি আপনি রাস্তার একটা পাশ ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং এমন গতিতে গাড়ি চালান যাতে আপনি পথরুদ্ধ হওয়ার আগেই আপনার দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে পারেন। তা ছাড়া সব সময় নজর রাখবেন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোন পথ আপনি পাচ্ছেন কি না, আর তা ছাড়া সম্ভাব্য বাধা বা অসুবিধার দিকেও নজর রাখবেন।

* * * *

আপনি রাত্রে বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ ঘন কুয়াসা এসে রাস্তা ঢেকে ফেললো। আপনি সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কি করবেন ?

এটাও সতর্ক ও সাবধানী ড্রাইভারের কাছে কোন সমস্যাই নয়। আপনি নিশ্চয়ই এমন বেগে গাড়ী চালাচ্ছেন যে আপনার হেডলাইটের আলোতে যতটা দেখা যায় তার মধ্যেই আপনার গাড়ী আপনার আয়ত্তে থাকবে। দিনের বেলায়ও তো আপনার দৃষ্টি যতদূরে যায় তার মধ্যেই আপনার গাড়ী থামিয়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। রাত্রে আপনি এক অজানা রাস্তা দিয়ে চলছেন, সামনের দিক থেকে একখানা গাড়ী আসছে। তার হেডলাইটের আলো আপনার চোখ ধাঁধিয়ে ফেললো, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কি করবেন ?

গাড়ীর বেগ কমিয়ে ফেলুন, সম্ভব হলে গাড়ী থামিয়ে দিন। প্রতিশোধ নেবার কথা ভাববেন না। সব সময়েই গাড়ীর হেডলাইট জ্বালিয়ে চলবেন, অবশ্য যে সব রাস্তা বেশ আলোকিত আছে সেখানে আপনার সাইডলাইটের ওপরই নির্ভর করা ভালো।

সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা গাড়ীর হেডলাইটের আলো আপনার মনে যেন কোন বিভ্রম সৃষ্টি না করে। আপনার সাইডলাইটের আলোর সাহায্য রাস্তার পাশের দিকে দৃষ্টি রাখুন।

* * * *

আপনার পিছন থেকে একখানা গাড়ী এসে দ্রুত বেগে আপনাকে পিছনে ফেলার জন্য আপনার গাড়ীর গা ঘেঁষে এমন ভাবে যাচ্ছে যে, আপনার সামনের দিকের পাশের চাকা রাস্তা থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হলো—কি করবেন ? এরকম অবস্থায় আপনি কখনই পড়বেন না। সব সময় আয়নার দিকে দৃষ্টি রেখে পিছনে কি হচ্ছে দেখতে চেষ্টা করবেন। এরকম ক্ষেত্রে আপনার পিছন থেকে যে গাড়ীখানা বেগে এগিয়ে আসছে আয়নায় তা' দেখে আপনার আগে থাকতেই কি করা উচিত তা' ঠিক করে রাখা প্রয়োজন।

এ ছাড়া আরও অনেক সূক্ষ্ম কৌশলের কথাও চালকের জানা দরকার হতে পারে। কিন্তু ভাল চালক হতে হলে মূল কি কি বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন। অথবা হেণ্ডন বিদ্যালয়ে মূল কি কি বিষয় শেখান হয় ?

হেণ্ডনের শিক্ষক ছাত্রদের দশটি মূল নীতি শিখিয়ে দেন। ঐ দশটি নীতি মেনে চললে আপনার বিপদের বা ঝুঁকির সম্ভাবনা খুব কমই থাকবে। প্রত্যেক চালকেরই এই নীতিগুলো ভাল করে জেনে রাখা উচিত।

১। রাজপথে চলার নিয়ম-কানুন মুখস্থ করে ফেলুন এবং সব সময়েই ঐ নিয়ম মেনে চলবেন।

২। সর্বদা একাগ্রমনে গাড়ী চালাবেন।

৩। কাজ করার আগে ভেবে নিন কি করতে হবে।

৪। সংযত হয়ে গাড়ী চালান—প্রয়োজন হলে গাড়ীর গতি কমিয়ে ফেলবেন।

৫। গাড়ী চালানোর সময় কোন দ্বিধা রাখবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য গাড়ীকে পিছিয়ে ফেলার কাজটা সেরে ফেলুন।

৬। গাড়ীর গতিবেগ বাড়াতে হলে বেশ বিবেচনা করে তারপর বাড়াবেন। শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া দ্রুতবেগে গাড়ী চালাবেন না।

৭। গাড়ী সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান বাড়াতে হবে—সব সময় চেষ্টা করবেন যাতে আপনার গাড়ীর ব্যবহারজনিত ক্ষয়ের পরিমাণ খুব কমে যায় এবং বেশী বিপদের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সামান্য ত্রুটি দেখলেই মেরামত করে ফেলুন।

৮। বিবেচনা করে হর্ণ বাজাবেন। উপযুক্ত সঙ্কেত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আপনার দিকে এগিয়ে-আসা গাড়ীর চোখ-ধাঁধানো আলো এড়াবার জন্য আপনার হেডলাইট কখনোই একেবারে নিভিয়ে ফেলবেন না। গভীর অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হওয়ার আগেই গাড়ী চালাতে চেষ্টা করলে আপনার চোখ আরো বেশী ধাঁধিয়ে যাবে।

৯। গাড়ী রাস্তায় বের করার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন—আপনার গাড়ী পথে চলার উপযুক্ত কিনা।

১০। আপনার রাস্তায় চলার দক্ষতা বৃদ্ধি করুন। রাস্তায় অন্য যারা চলছে তাঁরা পথ-চলার নীতি মেনে নিয়ে আপনাকে যে সৌজন্য দেখাচ্ছেন তাদের প্রতি সেই সৌজন্য আপনাকে অবশ্যই দেখাতে হবে। নিরাপদে পথ চলার জন্য সৌজন্য ও বিনয় প্রদর্শন একেবারে অপরিহার্য।

কোন দেশে ?

কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয়রে দূর্বা কোমল ?

কোথায় ফলে সোনার ফসল
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ধূমকেতু জনসমাজে জাগিয়েছিল আলোড়ন, কিন্তু সরকারী মহলে জাগাল বিভীষিকা। প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের ছোট্ট ঘরটিতে সব সময়ই লোকের ভিড়। তার মধ্যে আত্মগোপনকারী পুলিশ টিকটিকির উপস্থিতি আমরা ঘ্রাণে বুঝতে পারি। তারা কখনো চুপ করে বসে থাকে—যেন আমাদের কথাবার্তা খোশ-গল্পে নীরবে যোগদান করছে। নীরবতা কখনো বা সরব হয়ে ওঠে, এটা ওটা প্রশ্ন করে মন্তব্যও করে। ভাঁড়ে ভাঁড়ে যখন চা বিতরিত হয়, নির্বিকার হাত পেতে নেয়—যেন আমাদেরই একজন। গোপীনাথকে আমরা টিকটিকি বলে ভুল করিনি। সত্যি টিকটিকি যারা আসে তাদের সম্পর্কেও আমাদের ভুল হয় না। কেউ যদি বা ইঙ্গিতে বা ঘৃণাক্ষরে ওদের উপস্থিতি প্রসঙ্গে সচেতনতা প্রকাশ করে ফেলে, নজরুল 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে সে প্রসঙ্গ নস্যাৎ করে দেয়।

কিন্তু আগেই বলেছি, আমরা বেপরোয়া গলাবাজি করে রাজদ্রোহ করছি, কাগজে ছেপে তা ছড়িয়ে ও চারিয়ে দিচ্ছি, এর মধ্যে ভয় আবার কাকে ?

ধূমকেতুর উত্তাপ দিনে দিনে বাড়তে থাকে, পুচ্ছের সম্মার্জনীরূপ দিনে দিনে বেশী প্রকট হতে থাকে। বিদ্রোহী কবির অগ্নিঝরা কলমের মাথায় ফুলকিগুলি ক্রমেই তীব্রতর হয়ে ওঠে।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ধূমকেতুর বিশেষ সংখ্যা বের হল। বইয়ের আকারে দৈনিক বা সাপ্তাহিকের পূজা সংখ্যার রেওয়াজ তখনো হয়নি। ধূমকেতুর আকৃতি বদল না হলেও তার পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু বেশী হল এবং শারদীয়া উপলক্ষে এ ধরণের প্রকাশ সে যুগেও দুর্লভ ছিল। সম্পাদকীয় হিসাবে বেরুল নজরুলের কবিতা :

> আর কত কাল থাকবি বেটী
> মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
> স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
> অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

পুরো কবিতাটি হারিয়ে গেছে, সে সংখ্যা ধূমকেতু এক কপিও পাওয়া যায়নি বলে কবিতাটির পূর্ণাঙ্গরূপ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যিনি যতটুকু পেয়েছেন নজরুল সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে ও রচনায় সেই অংশটুকুই মুদ্রিত হয়েছে।

মুদ্রণ-সংখ্যা অনেক বাড়ানো সত্বেও ধূমকেতুর শারদীয়া সংখ্যা ধোঁয়ার মত উড়ে গেল। দ্বিতীয় দিনেই নিঃশেষ, হকারদের তরফ থেকে জোরদার দাবী আসতে লাগল, আরো কাগজ চাই। ব্যক্তিগত ভাবে বহু ক্রেতা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

আমরা কেউ কেউ বললাম, পুনর্মুদ্রণ কর।

নজরুল বললে, দুত্তোর, একি বইয়ের কারবার পেয়েছিস যে দ্বিতীয় সংস্করণ হবে! এ সাময়িকপত্র, নদীর ঢেউয়ের মত সময় যায় তাহারি প্রায়, সাময়িকপত্র পিছন ফিরে তাকাতে পারে না। ধূমকেতুরও গতি সব সময়েই শুধু সামনে, আর সামনে।

ধূমকেতু পিছন ফিরে না তাকালেও পুলিশের একদিন ধূমকেতুরই মত উদয় হল কার্যালয়ে। তারা চাইল পিছনের কৈফিয়ৎ : অমুক সংখ্যা ধূমকেতুতে রাজদ্রোহ প্রচার করা হয়েছে। সেই সংখ্যা সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে, আর সম্পাদকের বিরুদ্ধে আছে গ্রেফতারি পরোয়ানা।

রাস্তার ধার থেকে একজন ওড়িয়া পানওয়ালাকে ধরে নিয়ে এসেছেন পুলিশ অফিসার, সঙ্গে চারজন জাঁদরেল কনেস্টবল, কি জানি, কথায় যে রকম রক্ত ঝরানোর শপথ থাকে ধূমকেতুর লেখায়, সেই রক্ত ঝরানোওয়ালাদের গুহায় এসে হানা দিতে হলে তৈরি হয়ে আসাই সমীচীন।

সকালবেলা, শান্তি সবে এসে দরজা খুলে রাতের অগোছালো কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে রাখছে। সে সব দায়িত্ব তারই, কারণ পদ-মর্যাদা তার অনেক। তার ডেজিগ্‌নেশান শান্তিপদ সিংহ, ম্যানেজার,

ধূমকেতু। নজরুল অবশ্য ঠাট্টা করে বলত, গিন্নি। তবে সে সম্বোধনে সিংহ কখনো রাগ করেনি, অপমানও বোধ করেনি।

ঘরের ভিতর সাত-সকালে পুলিশের এই হঠাৎ অভিযানে সিংহ কিছুটা হকচকিয়ে গেল। অবশ্য ধূমকেতুর উপর যে পুলিশের নেকনজর আছে, তা আমাদের সবারই জানা ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের অভ্যর্থনার জন্য তৈরী ছিল না কেউ। শান্তি কাগজ গুছিয়ে রাখছিল, প্রথমেই তার হাত থেকে সেগুলি টেনে নিল এক সিপাই। জলদগম্ভীর কণ্ঠে তাকে হুকুম দিল, ঠিকসে ঠারা রহিয়ে।

সিপাইয়ের হাত থেকে কাগজপত্রগুলো নিলেন দারোগাবাবু, তারপর ঘরের চারদিকে চেয়ে একটু যেন নিরাশই হয়ে গেলেন। একটা আলমারি নেই, র‍্যাক নেই, টেবিল নেই, দেরাজ নেই, খানা তল্লাসীটা করবেন কোথায়। এক কোণে একটা বাক্স ছিল, সেটা খুলে একটা বাণ্ডিল বার করলেন, কিন্তু বিল, রসিদ আর একটা সিগারেটের টিনে কিছু টাকা পয়সা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। রাজদ্রোহমূলক কাজের নথি হিসেবে কিনা জানি না, একখানা বিল ও একখানা রসিদ বই তিনি সংগ্রহ করলেন। বিপ্লবকার্যে ব্যবহারের জন্য রাজদ্রোহমূলক রচনা বিক্রি করে সংগৃহীত যে অর্থ বাক্সে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন দারোগাবাবু সেই অর্থ কিন্তু তিনি বাজেয়াপ্ত করলেন না। বোধ হয় তার নগণ্যতা বিষয়ে ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করার ইচ্ছা হয়নি তাঁর।

ঘরের মধ্যে মাদুর বিছানো, সেগুলি সব উল্টিয়ে দেখলেন, তলায় কিছু বিপ্লব লুকোনো আছে কি না। একটা মাটির কলসী ছিল জল খাওয়ার জন্য, সিপাহীকে বললেন সেটার ভিতর সন্ধান করে দেখতে। ভয়ে ভয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলো সিপাই, কি জানি, ভিতরে যদি বোমা থাকে! হঠাৎ ফেটে গেলেই তো চিত্তির।

নানা জায়গায় কাগজপত্র, ধূমকেতুর দু'-চারখানা করে পুরোনো সংখ্যা—যা পড়েছিল দারোগার হুকুমে পুলিশ সবই বাণ্ডিল বেঁধে নিয়ে নিল। কি জানি, কোনখানে, দু'লাইনের ফাঁকে অদৃশ্য কালিতে যদি রাজদ্রোহ লেখা থাকে। তাতো আর ওখানে বসে আবিষ্কার করা চলে না। আপিসে নিয়ে গিয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তা সন্ধান করতে হবে।

যে ওড়িয়া পানওয়ালাটিকে ডেকে এনেছিল, সে সারাক্ষণ ভয়ে জবু থবু হয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের এক কোণে, যেন তাকে গ্রেফতার করে বেঁধে আনা হয়েছে। তল্লাসীর শেষে একখানি কাগজে সাক্ষী হিসেবে তার সই নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল তাকে। কিন্তু চলে যাবে তার সাহস কি! সে একবার আমতা আমতা করে যাবার অনুমতি চাইলো বটে, তবে দারোগাবাবুর কানে তা পৌঁছলো না। তাঁর তখন আরো কঠিনতর কর্তব্য। সম্পাদককে গ্রেফতার করতে হবে। সে, কোথায় সে?

শান্তিকে সম্পাদক বলে ভুল করবার কোন কারণ ছিল না। গোঁফের রেখা জাগা একটা হ্যাংলা ছেলে, বয়স যার কুড়িও হয়নি, সে-ই হবে লড়াই ফেরত হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম? বৃটিশ-রাজের নির্দেশে চন্দ্রসূর্য যে দুনিয়াময় আলোক বর্ষণ করে চলেছে, সেই দুনিয়াটাই উল্টে দেবে বলে যে অহরহ হুঙ্কার ছাড়ে? না না, এ হতেই পারে না সম্পাদক।

সম্পাদক কোথায়, হুমকি দিয়ে ওঠেন দারোগাবাবু।

আসে নি ত' এখনো, শান্তি জবাব করে।

কখন আসবে?

বেলা দশটাও হতে পারে, আবার দু'টোও হতে পারে।

দশটাও হতে পারে, দু'টোও হতে পারে? ব্লাফ দেবার আর জায়গা পাওনি? থাকে কোথায়?

আমি ধূমকেতুর কাজ করি, সম্পাদকের বাড়ীর খবর জানবো কি করে বলুন?

নিশ্চয়ই জান।

হ্যাঁ, এইটুকু জানি যে, কাছাকাছি কোথাও থাকেন, নইলে ফুট করে যখন তখন আসা আর চলে যাওয়া সম্ভব হত না।

আমি বলছি, তুমি জান।

আমি বলছি, আমি জানি না।

যাতে জান সে ব্যবস্থা করছি। তেওয়ারি, হাতকড়া লাগাও, হুকুম করেন দারোগাবাবু।

তেওয়ারি এগিয়ে আসতে শান্তি বলে, হাতকড়া লাগালেই কি জেনে যাব?

হাতকড়া দিয়ে লালবাজারে নিয়ে যাই তোমাকে, সেখানে বোঝা যাবে তুমি জান কি না।

লালবাজারে নিয়ে যাবার জন্য হাতকড়ার দরকার হবে না, বলে শান্তি।

এত যে কাণ্ড ঘটে গেল, অসময় বলে আমরা কেউই উপস্থিত ছিলাম না। কিছু কিছু সংশয় আমাদের মধ্যে আগেই জেগেছিল, কিন্তু তাই নিয়ে ভেবে মরা ডোন্ট-কেয়ার নজরুলের মনঃপূত ছিল না। সেদিনকার ঘটনার বিবরণ সবই আমি পরে জেনেছিলাম শান্তির কাছে।

অনেক দিন পরে গড়ের মাঠে বসে ভাঁড়ে করে ঘড়ার চায়ে চুমুক দিতে দিতে ও চিনে বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে শান্তি সব কাহিনী বলেছিল আমাকে। লালবাজারে তাকে নিয়ে একাধিক অফিসার মিলে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিল। ধমক আর হুঙ্কারের হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে কম ঘায়েল করা হয়নি তাকে। কিন্তু শান্তির কাছ থেকে একটি কথাও তারা বার করতে পারেনি।

তবু যেভাবে হোক নজরুলের ডেরার ঠিকানা তারা পেয়েছিল। সেখানে হানা দেওয়ায় পুলিশ শুনল, নজরুল কোনদিনই সেখানকার বাসিন্দা নয়। মোসলেম-ভারত পত্রিকার লেখক হিসেবে সেখানে কখনো-সখনো যাওয়া-আসা করে। সেটা ব্যাচেলার্স ডেন বলে সময়-অসময় রাত কাটাতে চাইলে চেনাশুনো যে কেউ কাটাতে পারে। এবং নজরুলও সেই রকমই রাত কাটিয়েছে কখনো-সখনো।

খবর পেয়ে নজরুল ফেরার। পুলিশ তার সন্ধানে সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। সওগাত, বিজলী, এমন কি ফজলুল হকের বাড়ী একবারের জায়গায় দশবার খোঁজ করেছে।

নজরুল চলে গেছে সোজা কুমিল্লা, বিরজাসুন্দরী দেবীর আশ্রয়ে। পুলিশকে এড়িয়ে কলকাতা ছেড়ে গিয়ে থাকলেও আত্মগোপন করে থাকেনি নজরুল। সাময়িক অসুবিধার জন্য আপাতত কর্মক্ষেত্র

সরানো হয়েছে কলকাতা থেকে কুমিল্লায়। কুমিল্লায় এসেও সভা জমাচ্ছে নিত্য নানা জায়গায়, গান বাঁধছে, গান গাইছে, বাড়ীতে, জনসমাবেশে ও পথের মিছিলে।

কাজেই তাকে খুঁজে পেতে পুলিশের অসুবিধা হ'ল না। আমাদের পুলিশ, কি বৃটিশ ভারতে, কি স্বাধীন ভারতে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সন্ধানলাভে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে তার শতকরা পাঁচ ভাগ অরাজনৈতিক অপরাধ নিবারণে প্রযুক্ত হলে দেশ থেকে চুরি-ডাকাতি, খুন-রাহাজানি কবে লোপ পেয়ে যেতো। সারা দেশ-জোড়া টিকটিকির জাল পাতা, এত সূক্ষ্ম যে দেখা যায় না। কিন্তু এত শক্ত যে যত বড় ও যত ভারীই হোক না সে আসামী, তাকে ঠিক টেনে তুলবেই। সে পুলিশের হাতে নজরুল ধরা পড়বে না তো কি!

কুমিল্লা থেকে গ্রেফ্‌তার করে পুলিশ নজরুলকে কলকাতায় নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী জেল-হাজতে রাখল। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর এজলাসে তার বিচার। রাজনীতিক ও সাহিত্যিক মহলে তুমুল উত্তেজনা। তরুণ উকিল মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল—কে নজরুলের পক্ষ সমর্থন করবে। নজরুল নিজে তো হাজতে, তার কোন পরোয়াই নেই। নজরুলের বন্ধু ও ভক্ত যাঁরা, নজরুলের জেল হওয়া চান না, তাঁদের মধ্যে কোন সুপরিকল্পিত ডিফেন্স প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। মামলার তারিখ পড়লে সবাই হৈ হৈ করে আদালতে যায়। শৃঙ্খলাভাঙা নজরুলের বিশৃঙ্খল বেপরোয়া চরিত্রের প্রতিফলন প্রকাশ করে। যতদূর মনে পড়ে ভূপতিদা'ই (ভূপতি মজুমদার) যা মাথা ঠাণ্ডা করে মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সযত্ন প্রয়াস করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নজরুলের পক্ষ সমর্থনে উকিল হিসাবে ছিল তরুণ উকিল মলিনকুমার মুখোপাধ্যায়।

বিচার সংক্ষেপ। নজরুল অপরাধ অস্বীকার করেনি, আবার স্বীকারও করেনি। পত্রিকায় যা লেখা আছে, তার পূর্ণ দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছে এবং তা যদি রাজদ্রোহ হয় তাতেও তার অস্বীকৃতি নেই। একটা মহাজাতিকে অধীন করে তার উপর রাজত্ব চালায় যে বিদেশী রাজা, সেই রাজার বিরুদ্ধে জাতির স্বাধীনতা প্রয়াস রাজার বিচারে অপরাধ হলেও ন্যায়ের বিচারে তা কোন অপরাধই নয়। এই কৈফিয়ৎ বিষের বাঁশীর সুরে বিস্তৃত বিবৃতির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছিল নজরুল, যতদূর মনে আছে, সেটা আদালত কক্ষে সে পাঠ করেনি, তার জবানবন্দী হিসেবে বোধ হয় তা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে দাখিল করেছিল। নোট পড়ে বা নজরুলের মুখে তা শুনে বিচারক তাকে মুক্তি দেবেন, এমন উদ্দেশ্য নিয়ে তা রচিত হয়নি। রচনার উদ্দেশ্য ছিল, নজরুলের সেদিনের মনোভাব দেশের জনগণে সঞ্চারিত করা, দেশবাসীকে স্বাধীনতা-ব্রতে উদ্‌বুদ্ধ করা। সেই উদ্দেশ্যে পুস্তিকাকারে রাজবন্দীর জবানবন্দী ছাপা হয়েছিল, এক আনা মূল্যের পুস্তিকা হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। লোকের হাতে হাতে, পকেটে পকেটে ঘুরেছে, সর্বত্র আলোচিতও হয়েছে। প্রভূত আবেগ সৃষ্ট হয়েছে তা নিয়ে। জবানবন্দীর সমাপ্তিতে নজরুল বলেছিলেন:

"সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং ভগবান। অতএব মাভৈঃ! ভয় নাই!"

"কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কি না জানি না, যদি হয়, বিচারককে অশ্রুসিক্ত ধন্যবাদ জানাব।"

ধন্যবাদ জানাতে অসুবিধা হয়নি, কারণ কবির অনুরোধ রেখেছিলেন সুইনহোর সাহেব। তাকে কারাদণ্ডই দিয়েছিলেন—এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

আদালত থেকে জেলের গাড়ীতে ওঠবার সময় আমাকে বলেছিল, জেলে বসে লেখা বন্ধ করব না রে, তবে দেখিস, আমি যেন বাইরের খবরাখবরগুলি পাই।

নজরুল নেই। সব আড্ডাই জলো হয়ে গেছে। শান্তি আর বীরেন সেনগুপ্ত ধূমকেতুর শ্মশান আগলে বসে আছে। আর আমি নজরুলী নেশার আমেজ কাটাবার প্রয়াসে নানান জায়গায় ঠোকর মেরে বেড়াচ্ছি।

গৌরবাবুর চায়ের দোকানে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল হরিপ্রসাদ, রবি, অনিলের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের ক্লাব কতদূর?

আমরা তো অনেকদূর এগিয়েছি, জবাব করলে রবি, আপনারই পাত্তা পাওয়া যায় না।

এবার পাবে। হঠাৎ বেকার হয়ে পড়েছি। জান তো নজরুল জেলে চলে গেল।

একটু গম্ভীর হয়ে পড়ল তিন জনেই। রবি বললে, আমরা যাতে আপনাকে পেতে পারি তার জন্য নজরুল জেলে যাক—এ আমরা চাই নি।

যেন তোমার চাওয়া না-চাওয়ার কোন দাম আছে, মন্তব্য করে হরিপ্রসাদ। তবে আমি তার জন্য ব্যথা পাইনি। আমাদের জীবনে এরও প্রয়োজন ছিল।

আমি বললাম, আপাতত কিছুটা নিজের মধ্যে ডুবে থাকতে চাইছি, বাইরের জগৎ তো অন্ধকার। সেখানে যদি আলো মেলে। তোমাদের বৈঠক বসবার বাধা কি আছে?

বারবেলা বৈঠকের উদ্বোধনী অধিবেশন বসল মদন মিত্র লেনে হরিপ্রসাদের বাসার বৈঠকখানায়। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত তাঁদের মধ্যে ছিলেন: অনিল বসু, পরিমল ঘোষ, শৈলেশনাথ বিশী, বীরেন মিত্র, বলাই মিত্র, জনাই মিত্র, বুড়ো মিত্র। আরো অনেকে। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে নজরুল আমাকে একটি কবিতা পাঠিয়েছিল, সেটি পাঠ করে বৈঠকের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। পরে কবিতাটি মণিদা'কে দিয়েছিলাম এবং ভারতীতে তা ছাপা হয়েছিল—সৃষ্টিসুখের উল্লাসে।

ধূমকেতুর পৃষ্ঠায় যে অবিরত ভাঙার তূর্যনিনাদ ধ্বনিত করেছে, জেলের প্রাচীরের আড়ালে বসে সে হয়ে উঠেছে সৃষ্টিসুখে উল্লসিত, মন্তব্য করলে হরিপ্রসাদ।

এটা নজরুলের কোন নতুন রূপ নয়, আমি বললাম। ভাঙা ও গড়া দুয়েতেই ওর সমান উল্লাস। বিষমের সমাবেশেই নজরুল।

গল্প, কবিতা পাঠ ও কয়েকখানি গানে বৈঠকের অধিবেশন সমাপ্ত, তারপরে চা এবং গুলতানিতে কেটে গেল অনেক সময়।

বাইরে থেকে নিজেকে টেনে নিতে চেয়েছিলাম। ফল ফললো উলটো। নজরুলকে ঘিরে যে ভাবে দিন কাটছিল, আজ এতদিন পরে আবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছি। অনেকদিন পরে ভারতীর আড্ডায় নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলাম, গজেনদা'র বাড়ীতে সকালে বিকেলে জমায়েত হতে লাগলাম। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের জীবনকালী রায়ের কবিরাজখানায় মোহিতলাল ও করুণাদা'র কবিতার আকর্ষণেও মাঝে মাঝে ছুটে যাই। [ক্রমশ।

স্বপ্ন সমুদ্র

[বরিস সাট্স্কি'র একটি কবিতা অনুসরণে]

কোন এক বিক্ষত শাখার বুকে বাঁধা
জিপ্‌সী মেয়ের কালো ওড়না যেমন—
অথবা মুকুল কোন, কিছু কচি পাতা আর
ফুলের মতন,
চিন্তার পৃথিবীকে সাজিয়ে রেখেছি শুধু
মনের দেওয়ালে।
যেন রোদ মুছে দেয় মলিনতাটুকু,
যেন বৃষ্টি ধুয়ে দেয় তার সব গ্লানি।

মনচিত্রে কেঁপে ওঠে মানচিত্র আজও
যদিও দিয়েছি মেলে সেই—
কবে কোন বিগত অতীতে।
তারপর ধীরে ধীরে তার রঙে লেগেছে আঁচড়,
বিক্ষত বেদনাগুলি ফেলে গেছে বুকে
কলংকের রেশ।

তাই আর ভাবিনেকো ;
ভাবিনা যুদ্ধের ক্ষত, রক্তের ইশারা,
ভাবিনা নাজীর সেই গূঢ় নির্যাতন,
ওরা সব লুপ্ত হয়ে গেছে—
মানচিত্র জেগে আছে আজ।

অন্বেষণ বৃথা।
কোন এক হাত আছে (অচঞ্চল প্রাণ)—
সেই সংকেতে নাচে পৃথিবীর দেহ,
অন্য সব মিছে।
তাই শুধু খুঁজে মরি—মনের দেওয়ালে—
অন্য কোন—অন্য কোন দেশ।

মনে আছে, কলম্বাস খুঁজে পেয়েছিল
অনেক বেদনা নিয়ে, অনেক আর্তি নিয়ে—
অচেনা সাগর আর অচেনা নগর।
সেই আশা আছে।
মনের কোথাও বুঝি বেঁচে আছে উজ্জ্বল স্থান—
তাই মন মেলে দিয়ে
মানচিত্র খুঁজি।
মনের সাগর পারে হয়ত বা পেয়ে যাবো
স্বপ্নের সাগর !

অনুবাদক—হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তারপর

(Thomas Hardy-র 'Afterward's-এর অনুবাদ)

বলবে কি আর তখন কি কেউ আমার কথা আপন করে,
যখন আমি রইব না আর বিদায় নেব চিরতরে।
"বাসত ভালো," বলবে লোকে ?
"এই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ?
নিদাঘ কোমল তার সে রূপে প্রাণ ঢেলেছে আকুল করে ?"

বলবে জানি আমার কথা নানা ভাবে আপন করে,
যখন আমি রইব না আর বিদায় নেব চিরতরে।
"যেথায় দূরে আকাশ গায়ে,
সন্ধ্যা নামে ওড়না-ছায়ে,
দেখত চেয়ে পাখীর পাখা নিঃসীম সেই শূন্য 'পরে।"

যদি আমি যাই গো চলে জোনাক-জ্বলা অন্ধকারে,
সজারুরা যখন চলে নির্জন এই মাঠের ধারে।
দেখে সবার পড়বে মনে
আমার কথা ক্ষণে ক্ষণে।
বলবে তখন, "বাসত ভালো এই প্রাণীদের প্রাণটি ভরে।"

বিদায় নেব যখন আমি, আসবে লোকে দলে দলে,
আমার কথার প্রতিধ্বনি হ'বে তখন কোলাহলে।
তখন কি আর বলবে তারা,
"দূর আকাশের ঐ যে তারা,
মোদের কবির যত কিছু ভালোবাসা ওদের তরে ?"

বিদায়সূচক ঘণ্টা যখন বাজবে আমি চলে গেলে,
কইবে কথা করুণ সে সুর সবা'র কানে আমায় ফেলে
তখনও কি বলবে না কেউ,
"এই যে সূক্ষ্ম ধ্বনির ঐ ঢেউ,
শুনত কবি উপভোগও করত যে তা'র মাধুর্যেরে ?"

অনুবাদক—দেবেশ রায়

অধ্যাপক স্যার সিডনি চ্যাপম্যান

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে অতিথি-রূপে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল দিল্লী বাসকালে। তার মধ্যে বিশিষ্ট একজন মাননীয় অতিথি ডঃ চ্যাপম্যান।

তিনি তখন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের নামকরা অধ্যাপক,—পৃথিবীখ্যাত গণিতবিদ। 'টেরেস্ট্রিয়ল ম্যাগনেটিজম,' বায়ুস্তরে 'ওজোন' এবং 'কসমিক-রে' ইত্যাদি বিষয়ে গণিতের প্রয়োগে নব নব আবিষ্কারে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছেন।

বয়সে প্রবীণ কিন্তু উৎসাহে নবীন বৈজ্ঞানিকটির দৈনন্দিন ঘরোয়া ব্যবহার ছিল অতি সুন্দর। তাঁর অমায়িক শিশুসুলভ মধুর চরিত্রে আজও মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছেন।

আমাদের সঙ্গে মিশে গেলেন যেন বাড়ীর মানুষ; আমাদের দেশের রান্না ও খাবার খেয়ে কী খুশী। নিরামিষ চপ, ক্ষীরের মালপোয়ার আস্বাদনে খুশীতে উচ্ছল।

সারাদিন বক্তৃতা, পরিদর্শন প্রভৃতিতে কাটে,—সন্ধ্যায় যান কেনা-কাটায়। রাত্রে একরাশ কাপড়-চোপড় এনে গৃহকর্ত্রীকে না দেখালে মন ভরে না। 'কাশ্মীর এম্পোরিয়াম' উজাড় করে নিয়ে আসেন,—হাতের কাজকরা বেড-কভার, টি-ক্লথ, পিলো-কেস। শিশুর মত খুসীতে উচ্ছল হয়ে বলেন,—কী সুন্দর,—আর কী সস্তা! আমাদের দেশে আমরা কল্পনাই করতে পারি না, এত কম দামে এত সুন্দর জিনিষ পাওয়া যেতে পারে।

একদিন প্রায় একশো টাকা দাম দিয়ে নিয়ে আসেন গজ-খানেক কাশ্মীরী মহার্ঘ 'পশমিনা,'—নরম যেন মাখন।

কী হবে অতটুকু কাপড়ে? বলেন,—গলায় বাঁধবো। আর একদিন অতি দামী এক টুকরো বেনারসী ব্রোকেড এনে খুশীতে ফেটে পড়েন। তাকে নানা ভাবে দেখেন আর দেখান।

অবাক হয়ে বলি,—এত দামে ঐটুকুন কাপড় কিনলেন,—কী হবে ওতে? আপনার স্ত্রীর একটা ব্লাউস কি মেয়ের একজোড়া জুতো,—কিছুই ত' ঐটুকুন কাপড়ে হবে না,—এ নিছক বাজে খরচ!

পাঁচ বছরের শিশুর মত খুসীতে গদগদ হয়ে বলেন,—এর সৌন্দর্যে এমন আকৃষ্ট হলাম যে, ফেলে আসতে মন চাইলো না। এই টুকরোটি আমি আমার শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব।

একদিন দেখি খুব হাল্কা রঙের পাঁচ-ছয় খানা জালের মত বোনা তাঁতের শাড়ি এনে হাজির করেন।

অবাক হয়ে বলি,—এ আবার আপনার কোন কাজে লাগবে? রোজই আপনি কতকগুলি বাজে খরচ করেন।

মিষ্টি হেসে প্রতিবাদের সুরে বলেন, মোটেই বাজে খরচ নয়। এ দিয়ে যা সুন্দর পর্দা হবে, ভাবতেও আমার আনন্দ হচ্ছে!

ভারত ভাগাভাগির পর নবোদগত পাকিস্তানের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মাত্র একদিনের জন্য। তাদের জানিয়ে দেন সকালের প্লেনে যাবেন ও সব দেখে শুনে বিকেলে দিল্লী ফিরে আসবেন। সেই অনুসারে একদিন খুব ভোরে উঠে বলেন, লাহোর যাচ্ছি,—বিকেলে চায়ের আগে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে চা খাবো।

ঋণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

বসে আছি চায়ের আসর সাজিয়ে, তাঁর দেখা নাই। বিকেল গেল, সন্ধ্যা গেল, নৈশ-ভোজের সময়ও উত্তীর্ণ,—কিন্তু কৈ—তিনি ত' এলেন না। তাঁর জন্য রাঁধা তাঁর প্রিয় জিনিষগুলো তুলে রেখে, নিজেরা খেয়ে চিন্তিত মনে বসে থাকি। প্লেনের রাস্তা, না জানি কী অঘটন ঘটেছে,—কিছুতেই আমরা শুতে যেতে পারি না।

রাত্রি দশটার পর ষাট বৎসরের বৃদ্ধ ডঃ চ্যাপম্যান আলুথালু বেশে শুকমুখে এসে উপস্থিত,—শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে বসি নিকটে,—শুনি তাঁর সমস্ত দিনের দুর্গতির কাহিনী।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ আর শেষ হয় না,—তিনি যত বলেন,—দু'টোর প্লেনে দিল্লী ফিরে যাব,—কর্তৃপক্ষ ততই আশ্বাস দেন, আর একটু থাকুন, আমরা ফোন করে দেব আপনাকে না নিয়ে প্লেন যাবে না। এ ভাবে দ্বিপ্রহর গত হওয়ার পর জানা গেল, যাত্রীবাহী প্লেন ঠিক সময়েই দুপুর দু'টোয় লাহোর ছেড়ে গেছে—কালকের আগে আর কোনো প্লেন দিল্লী যাবে না।

কর্তৃপক্ষ মুসলমান ভদ্রলোক হাসিমুখে বলেন,—তাতে হয়েছে কী? আমরা যদি আপনাকে না ছাড়ি? এসেছেন নিজের ইচ্ছায়—যাবেন আমাদের ইচ্ছায়। থাকুন এখানে কিছুকাল, আমরা আপনাকে পরম সমাদরে রাখব।

শুনে অস্নাত অভুক্ত বৈজ্ঞানিকের পিত্ত জ্বলে গেল,—রক্ত মাথায় চড়ল। অতি প্রত্যূষের সেই সামান্য চায়ের পর পেটে পড়ে নি কিছু—

তার উপরে পাকিস্তানের এই অসহ্য প্রস্তাব! এই দারুণ অভদ্রতা!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন তদানীন্তন ইংরেজ গভর্ণরের বাড়ী। তাঁকে সকল কথা বলায় ও এখানে তিনি এক রাত্রিও বাস অথবা জলগ্রহণ করবেন না বলায়, অনেক কষ্টে গভর্ণরের চেষ্টায় চার্টার্ড প্লেন জোগাড় হ'ল রাত আটটায়।

বৃদ্ধ বয়সে বেড়াতে গিয়ে বেচারীর দুর্গতি ও হয়রানির কথা শুনে সহানুভূতিতে মন ভরে গেল।

বর্তমানে তিনি 'আলাস্কা' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-তত্ত্ব এবং মহাব্যোম নিক্ষিপ্ত 'স্যাটেলাইট' থেকে প্রাপ্ত নানা নূতন তথ্য নিয়ে গভীর গবেষণায় নিযুক্ত। জাতিতে ইংরেজ, চেহারায় সুপুরুষ, ব্যবহারে ভদ্র, জ্ঞানে জলধি, স্যার সিডনি চ্যাপম্যান ৬৫ বৎসর পর্যন্ত নিজের দেশে অতি যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনা ও গবেষণায় কাটিয়ে রিটায়ারের পর আমেরিকার সাদর আমন্ত্রণে সেখানে যান।

মেরুপ্রদেশের মেরু-জ্যোতি ও সেখানকার বায়ুস্তরের নানা বৈদ্যুতিক তথ্য নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি শেষ বয়সে বেছে নেন উত্তরমেরু সান্নিহিত আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়। আজও সেখানে তিনি অক্লান্তভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত ও নিত্য নূতন আবিষ্কারে সফলকাম। এই সেদিন আমেরিকার ভূ-তত্ত্ববিদ সংহতি তাঁকে দিলেন দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার—বাওই মেডেল। (Bowie medal)

বয়স বোধ হয় বর্তমানে সত্তরের ঊর্ধ্বে, কিন্তু কর্মক্ষমতা এখনও পূর্বের মতই অব্যাহত।

ডঃ চার্চ

আর একজন অশীতিপর বৃদ্ধ জ্ঞানোন্মাদ বৈজ্ঞানিকের দর্শন পাই কলকাতা-বাসকালে! তিনি আমেরিকার নেভাডার বরফ-সংক্রান্ত গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডঃ চার্চ।

নেভাডার বরফ-ঢাকা অবজারভেটরীর ডিরেক্টর ডঃ চার্চ সমস্ত জীবনই করে এসেছেন বরফ-মাপার কাজ; কোন পাহাড়ে কত বরফ, —সেই বরফ গলে কত জল হবে,—তার নির্ভুল নিশানা দেওয়াই হ'ল তাঁর কাজ।

বরফ-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি নানাবিধ অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাদের নামও দিয়েছেন চমৎকার। কোনটির নাম 'স্নো-স্যাম্পলার,' কোনটির নাম 'স্নো-ক্যাট' ইত্যাদি।

ডঃ চার্চ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যখন আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ,—কিন্তু কর্ম-ক্ষমতায়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় যুবককেও হার মানান। মাথার চুল ধবধবে সাদা হলেও, শরীর শক্ত-সবল, পাকা বংশদণ্ডের ন্যায়। বরফ মাপা কাজে জীবন কাটিয়ে, চুল পাকিয়ে,—বৃদ্ধত্বে এসে হয়েছেন তিনি একাজে পৃথিবী জয়ী 'এক্সপার্ট'।

তাঁকে আনা হয় আমাদের হিমালয়ে কত বরফ আছে, স্থানে স্থানে তা মেপে বের করতে। বয়স আশীর ঊর্ধ্বে হলেও, উৎসাহে জলন্ত নবীন বৈজ্ঞানিকটি 'ভারতীয় আবহ-দপ্তর' ও 'জল-বিদ্যুৎ-কমিশনে'র কয়েকজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং বরফ মাপা যন্ত্রপাতি নিয়ে যান হিমালয়ে অতি দুর্গম বরফ-ঢাকা প্রদেশে বরফ মাপতে।

বৃদ্ধের হিমালয় যাত্রার বিপুল বিধি-ব্যবস্থা করতে, তাঁরই কল্যাণে হয় জীবনের প্রথম দার্জিলিং দর্শন! সেও মনে কম উজ্জ্বল নয়! কাঠ-খোট্টা শিমলা-শৈলে অনেক দিন কাটিয়ে হয়েছিলাম শৈলাবাসের প্রতি বিরক্ত,—কাজেই বাংলার দার্জিলিং দেখার সুযোগ ও ইচ্ছার অভাবে বহুদিন এখানে যাবার কথা মনেই আসে নি।

কলকাতার মে মাসের গরম ছেড়ে দার্জিলিং এসে যেন দেহের সঙ্গে হৃদয় মনও জুড়িয়ে গেল। ফুলে ফুলময় দার্জিলিঙের তখন কী শোভা! মাঝে মাঝে বরফ-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা যখন মেঘের আড়াল থেকে মুখ খোলে,—অপূর্ব দ্যুতিতে চোখ ঝলসে দেয়!

কে বলেছিল,—কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় শ্রেণী যেন ধ্যান-মগ্ন শিব! তখন বিশ্বাস করিনি, কিন্তু যখন চাক্ষুষ দেখি—সত্যই দেখতে পাই এক বিরাট দেহ,—সুতীক্ষ্ণ নাসিকা,—পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল-মণ্ডিত পুরুষ যেন আকাশপানে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে অনন্তশয্যায় শয়ান! সেই ধ্যানমগ্ন বিরাট বপুখানি দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই! তাঁর রূপের উজ্জ্বলতায় বেশীক্ষণ চোখ খুলে রাখা যায় না,—আশ মিটিয়ে দেখার উপায় নেই,—পার্থিব চক্ষুতে এই স্বর্গীয় মহান দৃশ্য এক পলকের বেশী দেখা সম্ভব নয়,—চোখ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনিই বন্ধ হয়ে যায়!

দার্জিলিং-এর রাস্তায় যেখানে-সেখানে দেখা হয় ডঃ চার্চের সঙ্গে। দার্জিলিং থেকেই এক রাশ পাহাড়ী কুলী-মজুর, বাহক শেরপা,—তাঁর দুর্গম পথের সঙ্গীদের নিয়ে পথ চলেন। পকেটে থাকে প্রচুর লজেন্স, টফি,—থেকে থেকে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দেন তাদের মধ্যে।

তিনি নেপাল-হিমালয়, সিকিম-হিমালয় ও ভুটান-হিমালয়ের বরফ-ঢাকা স্থানে স্থানে প্রায় দু'বৎসর ধরে বরফ-মাপা কাজ চালান। সঙ্গে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও বাহক প্রভৃতি নিয়েছিলেন ত্রিশ চল্লিশ জন।

ডঃ চার্চের মন হিমালয়ের সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও আকর্ষণে এতই বিমুগ্ধ হয় যে,—নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার পর যখন নিজের দেশে ফিরে যাবার সময় এলো,—তখন তাঁর মন কিছুতেই এতে সাড়া দিতে চায় না! বিমুখ মন নিয়েই তিনি করেন এ দেশ ত্যাগ!

এই দেহ ও জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বীকে কলকাতার বাড়ীতে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—তাঁর বাড়ীর খবর। সন্তানাদি ক'টি জিজ্ঞাসা করায় খানিক ভেবে গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন,—তা হবে প্রায় ত্রিশ চল্লিশটি!

অবাক কাণ্ড! প্রশ্ন করে লজ্জিত হই নিজেই। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মুখে এ কী কথা? এ কী মহাভারতের যুগ যে একজনের শত পুত্র জন্মাবে?

পরে ধীরে ধীরে জানতে পারি, বৃদ্ধ অকৃতদার। সমস্ত পৃথিবীময় পাহাড়ের মাথায় মাথায় বরফ মেপে বেড়াবার মধ্যে সময় কোথায় বিয়ে করে সংসার পাতবার? তখন জীবন-সায়াহ্নে ত্রিশ চল্লিশটি ছাত্র-ছাত্রী তাঁর নিকটে থেকে তাঁর নিকট বিশেষ বিষয়ে পাঠ নেয় ও তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করে, তাদেরই তিনি নাম দিয়েছেন,—চার্চ-বয়,—এদেরই বলেন নিজের পুত্র-কন্যা।

পেটারসন-দম্পতি

কলকাতার বাড়ীতে একবার এসেছিলেন, নরওয়ের আবহবিদ, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ পেটারসন ও তাঁর সহধর্মিণী।

সেবার ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস হবে পাটনায়; পেটারসন-দম্পতি নরওয়ে থেকে প্লেনে কলকাতায় এসে তাঁরা যাবেন পাটনায়। অতদূরের রাস্তা পার হয়ে, কলকাতায় এসে দু'দিন বিশ্রাম করবেন আমাদের আস্তানায়।

ব্যবস্থা সব ঠিক, কিন্তু ওঁরা আর আসেন না! সময় পার হয়ে গেল, দমদম বিমান ঘাঁটিতে ঘন-ঘন ফোন সংযোগে জানা যায়,—তাঁদের প্লেনের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

সাত-সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আসা,—কী জানি কোথায় কী হল! এদিকে পাটনায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির জরুরী অধিবেশন—সক্রিয় সদস্যরূপে যেতেই হবে গৃহকর্তাকে।

নরওয়ে বাসকালে এই দম্পতির সঙ্গে ওঁর হয় ঘনিষ্ঠ পরিচয়। উনি তাঁদের বাড়ীতে পরম সমাদরে কিছুদিন কাটান। আর অপেক্ষা করতে না পেরে উনি বলেন,—তাঁরা দুটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অতি ভালোমানুষ। এলে তুমিই খাইয়ে-দাইয়ে আদর যত্ন কোরো। আমি জানি, ওঁদের প্রয়োজন অতি সামান্য, যা করবে, যা খেতে দেবে, তাতেই হবেন পরিতুষ্ট, কাজেই তোমার ভাবনার কোনো কারণ নেই।

আলিপুর হাওয়া-দপ্তরে ভার দিয়ে যাচ্ছি, তারাই সব সময়ে খোঁজ নিয়ে বিমান ঘাঁটি থেকে ওঁদের নিয়ে আসবে বাড়ীতে,—তারপর যে কয়দিন বাড়ীতে বিশ্রাম করতে চান, করার পর, ওরাই তুলে দেবে পাটনার গাড়ীতে।

সব বিধি-ব্যবস্থা করে উনি চলে যান পাটনায়। দিন দুই পরে এলেন পেটারসন-দম্পতি। তাঁদের চেহারা দেখে ত' আমি অবাক। কোথায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা? ডঃ পেটারসনের প্রবীণ বয়স হলেও, তা বোঝা যায় না,—অতি সুপুরুষ, মাথায় এক মাথা ঘন পাটকিলে রং-এর চুল, আর তাঁর স্ত্রী ত' একেবারে নবীন যুবতী। সুবেশী, সুকেশী, সুদর্শনা আধুনিকা মহিলাকে দেখি আর ভাবি,—এই কী স্বামী বর্ণিত বৃদ্ধা? তাঁর কী চব্বিশ ঘণ্টা কাজ কাজ করে চোখের দৃষ্টিটাও নষ্ট হয়ে গেছে? বৃদ্ধা ও যুবতীর পার্থক্য বোঝার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছেন?

যাক, মনে যাই হউক, মুখে তাঁদের আদর আপ্যায়নের কোন অভাব ঘটে না। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতির কারণ জানাই।

শুনি,—তাঁরা ঝড়ে কোথায় দু'দিন আটকা পড়েছিলেন। সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার ওলট-পালটের কারণ সম্পূর্ণ তাঁদের অনিচ্ছাকৃত। খাবার সময় মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে নানা আলাপ-আলোচনা চালাই। তাঁদের দেশ, নরওয়ের মানুষ, মেয়েদের পোষাক, আবহাওয়া প্রভৃতি জানতে চেয়ে শ্রীমতীকে প্রশ্ন করলে,—সুসজ্জিতা মহিলাটি রঙ্গীন ওষ্ঠাধরে হাসি এনে তাকান তাঁর স্বামীর দিকে। বৈজ্ঞানিক স্বামীটি তখন ভাঙ্গা ইংরেজীতে সব বুঝিয়ে দেন। ভদ্রলোক ট বর্গ উচ্চারণে অক্ষম,—কাজেই ইংরেজী কথা অস্পষ্ট।

কারণ অবোধ্য,—ইয়োরোপীয়ান ভদ্রমহিলা কথা বলেন না কেন? তাঁদের দেশ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কেবলি তাঁর স্বামীর দিকে তাকান আর হাসেন।

পরদিন প্রাতঃকালে হয় এর মর্মোদ্ধার। মিসেস্ পেটারসন আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে অনুসন্ধিৎসু,—ঘরে পিয়ানো দেখে কে বাজায় জিজ্ঞাসা করেন! অনুরুদ্ধ হয়ে পিয়ানোর সঙ্গে দু'খানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে অন্তরঙ্গ হই। সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করি, তোমার ইংরেজী উচ্চারণ চমৎকার, বুঝতে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু তোমার স্বামীর উচ্চারণ ত' এ রকম নয়।

হো-হো করে হেসে মহিলা জানান,—আমি যে ইংরেজ,—মাতৃভাষায় কথা বলতে পারবো না? ওঁর দেশ নরওয়ে, কিন্তু আমার দেশ ইংল্যাণ্ড, সম্প্রতি আমাদের লণ্ডনে বিয়ে হয়েছে। আমি আজ পর্যন্ত নরওয়ে দেখি নি।

হরি, হরি! এতক্ষণে সব জলের মত পরিষ্কার হ'ল। আমার স্বামী কয়েক বৎসর পূর্বে নরওয়েতে ডঃ পেটারসনের যে স্ত্রীটিকে দেখেছিলেন,—তিনি সত্যই বৃদ্ধা। তাঁর মৃত্যুর পর বৈজ্ঞানিক কিছুকাল বাস করেন লণ্ডনে,—এবং কাজকর্মের সুবিধার জন্য রাখেন সুন্দরী, তরুণী, লেডি টাইপিষ্ট। তারপর অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,—সম্প্রতি সেই টাইপিষ্টের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ।

হাস্যমুখী সুন্দরী ইংরেজ তরুণীটির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। দু'দিন তাঁদের সঙ্গে খুব আনন্দে কাটার পর, যাবার সময় আমি তাঁকে উপহার দিলাম—একটি রূপার ব্রোচ ও কয়েকখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড। তিনি আমায় দিলেন,—নরওয়ের জাতীয় পোষাক পরা একটি নিখুঁত ডল-পুতুল, আজও সযত্নে ঘরে রক্ষিত ও তাঁদের কথা মনে করায়।

ডঃ পেটারসন একজন পৃথিবী-বিখ্যাত আবহবিদ। তাঁর লিখিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত আবহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক, সমস্ত পৃথিবীর আবহবিদগণের অতি আদরের বস্তু। তিনি ভারতবর্ষে প্রায় তিন মাস থাকেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পাটনা অধিবেশনে ও ভারতের নানা স্থানে আবহকর্মীদের অনেক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

তিনি বর্তমানে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজে ও গবেষণায় নিযুক্ত।

ডঃ পেটারসন অত বড় পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলেও ছিলেন বড় অমায়িক ও মিশুক প্রকৃতির। তাঁদের দেশ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ দেখে খুসী হয়ে আমাকে সে দেশের কত গল্প শোনান। দেশে ফিরে গিয়ে অতি সুন্দর নরওয়ের ছবি-সম্বলিত একখানা বই পাঠিয়ে দেন। আজও মনে পড়ে তাঁর বর্ণিত দু'একটি কাহিনী।

তিনি বলেন,—তাঁদের দেশের দুর্দান্ত শীতেও মাঝে মাঝে বনে জঙ্গলে দু'একটি ভারতীয় সন্ন্যাসীকে দেখা যায় তপস্যা-রত। উত্তরে মেরুপ্রদেশে 'নিশীথ-রাতের সূর্যে'র এলাকায়ও মাঝে-মাঝে তাঁদের দর্শন পাওয়া যায়। ভারতবাসীর প্রতি তাঁদের দেশবাসীর শ্রদ্ধা অপরিমেয়! [ক্রমশ।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

পাঁচ

এই দিনটির কথা কাঠুরে চৌধুরীর স্পষ্ট মনে আছে। এই ঘটনা মনে পড়লে তার সমস্ত হিসাব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। মূর্খ মনে হয় নিজেকে। মূর্খই তো। তা না হলে মিথ্যাকে সত্য ভেবে সে অমন বোকার মতো কাজ করে। এই আটত্রিশ বছরের জীবনে মন্দ কাজ সে অনেক করেছে কিন্তু সেজন্য কোন অনুশোচনা তার নেই। শুধু এই একটি হঠকারিতার জন্য তার অনুশোচনার শেষ নেই। জীবনের একটি ছোট অধ্যায় কি কোন রকমে মুছে ফেলা যায় না।

কাঠুরে চৌধুরী বারান্দার অপর প্রান্তে দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে দেখল। চোখের উপর একটা হাত রেখে সে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিংবা ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আছে। ক্লান্ত হবারই কথা। পরিশ্রমে নয়, উদ্বেগ ও উত্তেজনায়। চোখ বন্ধ করলেই সে বোধ হয় সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে, কাঠুরে চৌধুরী তার জীপ চালিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। সংকীর্ণ পথ, পাশাপাশি দু'খানা গাড়ি কোনমতেই চলতে পারে না। পাশ কাটিয়ে দাঁড়াবার মতোও জায়গা নেই। বাম হাতে গভীর খাদ নেই, আছে চাষীদের ক্ষেত, রাস্তা থেকে একটুখানি নিচে। দময়ন্তীরা গাড়ি থামিয়ে হর্ণ দিতে পারত। কিন্তু জীপখানা বেপরোয়াভাবে আসছিল। হর্ণ শুনেও হয়তো থামত না। ধাক্কা দিত তাদের ঝকঝকে নূতন গাড়িতে। দময়ন্তীর স্বামী তাই বাম হাতে পাশ কাটাতে চেয়েছিল। একটু হিসেবের ভুল। গাড়িখানা রাস্তা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ল। যদি কাৎ হয়ে পড়ত, তাহলে দময়ন্তীই বেশি আঘাত পেত। কিন্তু এমন অদ্ভুতভাবে ঝুলে রইল যে দময়ন্তীরই আঘাত লাগল কম। কাচ ভেঙে ক্ষত বিক্ষত হল দেহের কয়েক জায়গা, কিন্তু গুরুতর আঘাত কোন লাগল না। আর তার স্বামী—

দময়ন্তীর মাথা ঝিমঝিম করে উঠছে। নিশ্চয়ই নিজের জন্য নয়, তার স্বামী এখনও অজ্ঞান। ডাক্তার আশা দিয়েছেন বটে, কিন্তু দময়ন্তী কি খুব ভরসা পাচ্ছে! দেহের কোথায় কোথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে তা জানা যাচ্ছে না। কোন হাড় ভেঙেছে কিনা তাও বোঝবার উপায় নেই। এ সব পরীক্ষার প্রশ্ন উঠবে তার স্বামীর জ্ঞান হবার পরে। যদি আর জ্ঞান ফিরে না আসে, তাহলে কী হবে। দময়ন্তীর মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। পায়ের তলায় মাটি মনে হয় সরে যাচ্ছে।

সত্যিই তার পায়ের নিচে এখন আর শক্ত মাটি নেই। তার বিবাহের সময়েই মাটি আলগা হয়ে গেছে। দময়ন্তী সেদিন ভয় পায়নি। তার স্বামীর সাহসে সাহস ছিল তার। কিন্তু আজ? আজ তাকে কে সাহস দেবে? এই কাঠুরে চৌধুরী।

ছি ছি, কী বন্য জঘন্য এই লোকটা। তার মা তাকে ঠিকই বলেছিলেন, ও মানুষ নয়, মানুষের মুখ নিয়ে একটা দৈত্য জন্মেছে। আকৃতি প্রকৃতিতেও একটা দৈত্যের মতো।

দময়ন্তীর মনে পড়ছে, তার মা তার বাবার সামনেই এই কথা বলেছিলেন। খেয়ে দেয়ে কাঠুরে চৌধুরী চলে যাবার পরেই বলেছিলেন: এ সব লোককে বাড়িতে কেন নিমন্ত্রণ কর?

নরোত্তমবাবু রুক্ষস্বরে বললেন: লোকটার কী দোষ দেখলে?

দোষ? ওর শরীরে গুণ কোথায়!

গুণের পরিচয় তোমরা পাওনি, কিন্তু আমি ওর দোষের কথা জানতে চাইছি।

লীলাবতী অত্যন্ত তিক্তভাবে বললেন : একটা বনমানুষ।

নরোত্তমবাবু মুখভঙ্গী করে বললেন : মেয়েদের সুরে সুর না মেলালে মানুষকেই বনমানুষ মনে হয়। ও-একটা পুরুষ মানুষ, ওকে সকলের শ্রদ্ধা করা উচিত।

দময়ন্তীর বড় কষ্ট হচ্ছিল। তার বাবার চেয়ে তার মায়ের কথাই ঠিক মনে হচ্ছিল। কেমন একটা বন্য ভাব, বন্য স্বভাব, বন্য কথাবার্তা। কাঠুরে চৌধুরী যতক্ষণ বাড়িতে ছিল, ততক্ষণ তার ভয় ভয় করছিল। একটা হাত দিয়ে গলা টিপে ধরলে দময়ন্তী মরে যেত। যেমন ডেসডিমোনা মরেছিল ওথেলোর হাতের মুঠোয়। কী বীভৎস! দময়ন্তীর দেহ উঠেছিল থর থর করে কেঁপে।

লীলাবতী তাঁর স্বামীর কথা মেনে নেন নি। বলেছিলেন : ভদ্রলোকের সমাজে যে মিশতে জানে না, সে হল শ্রদ্ধার পাত্র!

লীলাবতীর সুরে কিছু ঘৃণা ছিল, নরোত্তমবাবু আহত হলেন, বললেন : ভদ্রলোকের আবার সমাজ! চোর স্বার্থপর পরশ্রীকাতর। ভদ্রলোক সাজলেই মানুষ ভদ্রলোক হয় না।

এ একেবারে স্বতন্ত্র অনুযোগ। বর্তমানের শিক্ষিত সমাজকে নরোত্তমবাবু আক্রমণ করেছেন। যে মানুষ নিজেও এ-সব দোষযুক্ত নন, তিনিও অনুযোগ করেন। জগতের সমস্ত শিক্ষিত মানুষ আজ এ-কথা জেনেও কোন প্রতিকারের চিন্তা করছেন না, করবেন না। পুরাকালের মুনি ঋষি যা কল্পনা করে লিখে গেছেন, তা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। কলিযুগের এই ধর্ম। লীলাবতী এ নিয়ে আলোচনা করতে চান না। বললেন : শাস্ত্রের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি তোমার কাঠুরে চৌধুরীর কথা। মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতে সে জানে না।

কোন গর্হিত কথা সে বলেছে?

বলে নি?

নরোত্তমবাবু তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

লীলাবতী বললেন : বয়সে সে কি তোমার মেয়ের দাদামশাই যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ মেয়ে!

সত্যি কথাই বলেছে।

এ-রকম সত্যি কথা কি তার মুখে শোভা পায়?

কেন পাবে না? সে তো জগদীশ নয় যে তোমার মেয়ে দেখতে এসেছে! সে এসেছে আমার নিমন্ত্রণে। বন্ধুর মেয়েকে সে যদি 'বেশ মেয়ে' বলে, আমি তার নিন্দা করি না।

সহসা লীলাবতী এ-কথার উত্তর খুঁজে পেলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : বেশ বলেছ! এই রকম বুদ্ধি না হলে আর ব্যবসাদার!

দময়ন্তীর মনে আছে যে কাঠুরে চৌধুরীকে নিয়ে তার বাবা-মার মধ্যে অনেক অপ্রিয় কথা হয়েছিল। কাঠুরে চৌধুরীর চরিত্র যে নিতান্ত নিষ্ঠুর তার প্রমাণ লীলাবতী পেয়েছিলেন। তর্কে তিনি সেই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আর নরোত্তমবাবু চেয়েছিলেন তাকে একজন বীর পুরুষ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে। যে লোক ফুল দেখলে বড়ার কথা ভাবে আর গানকে বলে কান্না, তাকে নিষ্ঠুর বলতেই হবে।

নরোত্তমবাবু বললেন, মিথ্যা বলে মেয়েদের মন ভোলাবার প্রয়োজন সে মানে না। এ তার নিষ্ঠুরতা নয়। এ তার সত্যভাষণ।

স্বামী-স্ত্রীর কলহ বোধ হয় এইখানেই মিটে যেত। কিন্তু তা মিটল না। লীলাবতী একটা কঠিন কথা বলে ফেললেন: তাকে বাড়িতে ডেকে আনার পিছনে তোমার কী মতলব ছিল বল।

মতলব?

হ্যাঁ মতলব। বিনা মতলবে তুমি কি কোন কাজ কখনও কর।

তুমিই বা কোন কাজটা বিনা মতলবে কর।

দময়ন্তী ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই রকম করে তার বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া বাধে। দুজনেই দুজনকে সমান ভাবে আক্রমণ করেন। অনেক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অনেক তীক্ষ্ণ কটু কথা, অনেক অকথ্য কথা।

লীলাবতী বললেন : আমার মতলব তোমার মতো ঘৃণ্য নয়। তোমার মতো কদর্য—

দাঁতে দাঁত চেপে নরোত্তমবাবু বললেন : থামলে কেন?

কিন্তু লীলাবতী আর বেশি কিছু বলতে পারলেন না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নরোত্তমবাবু বললেন : কোথাকার এক উঁছা ছেলে জগদীশকে বাড়ি ঢোকালে দোষ নেই, দোষ হল আমার এক বন্ধুকে আনার জন্যে।

লীলাবতী ফোঁস করে উঠলেন : জগদীশের সঙ্গে কাঠুরে চৌধুরীর তুলনা ক'রো না। জগদীশকে কেন আসতে লিখেছি, তা তোমার জানা আছে।

জানা আছে বলেই তো বলছি। ফাঁদ পেতে ছেলে ধরার মতলবটা তোমার সভ্য নয়।

লীলাবতী চেঁচিয়ে উঠলেন : তোমার মতলবও আমি বুঝতে পেরেছি। ঐ কাঠুরে চৌধুরীকে যদি ফের বাড়িতে ডেকেছ তো আমি তোমাকে দেখে নেব।

কী করবে শুনি?

আর কিছু না পারি তো বিষ খেয়ে মরব।

দময়ন্তী চেঁচিয়ে উঠেছিল : ছি ছি, কী বলছ মা।

লীলাবতী উঠে দাঁড়িয়ে মেয়ের দিকে হাত বাড়ালেন : চলে আয় দময়ন্তী, এই রাক্ষসের সংসারে আর থাকব না।

বলে মা মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন।

নরোত্তমবাবু গুম হয়ে বসে রইলেন একাকী। এরপর কী কর' উচিত তা কিছুতেই ভেবে পেলেন না।

রাত বাড়তে লাগল।

ছয়

দময়ন্তী বিশ্বাস করে যে সেদিন জগদীশ মেহতা এলে তার পিতা মাতার মধ্যে সেই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত না। জগদীশ আসবে বলে তার মা সারাদিন পরিশ্রম করেছিলেন। বিকাল বেলায় যখন খবর এল যে, সে আসতে পারবে না, তখনই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়েছিল। কিন্তু কাউকে কোন কথা বলতে পারেন নি। কাউকে বলতে পারলেও মন খানিকটা হাল্কা হত। সেই সুযোগ পাবার আগেই এল কাঠুরে চৌধুরী। সে বাইরের

লোক, তার উপর রাগ দেখানো চলে না। কাজেই ঝগড়া হল স্বামীর সঙ্গে।

অন্য কোন দিন কাঠুরে চৌধুরী এলে তাকে হয়তো অত খারাপ লাগত না। দীর্ঘ দেহ তো আভিজাত্যের লক্ষণ। ফুল দিয়ে বড়া ভাজার কথাও বেশ উপভোগ করা যায়। আর শিকারের গল্প শুনতে তাঁর ভালই লাগে। সেবারে জুনাগড়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে শিকারের অনেক গল্প মন দিয়ে শুনেছেন। গীর ফরেষ্টে সিংহ এখনও ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু শিকারের আর অনুমতি নেই। ভারতবর্ষ থেকে সিংহের বংশ শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে সরকার আর অনুমতি দেন না।

দময়ন্তীর মামার কথা তাঁর মনে পড়ল। দু'তিন বছর আগে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার প্রয়োজনে এসেছিলেন দিল্লী, দিল্লী থেকে কলকাতা। দেশে ফেরার আগে পালামৌ জেলার এই অরণ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে ভাগ্নীকেও এনেছিলেন সঙ্গে করে।

দময়ন্তী তার মামাকে এই প্রথম দেখল। মামীকে দেখেনি, দেখেনি মামাতো কোন ভাইবোনকে। মামার ব্যবসা তাঁর নিজের দেশেই। দেশ ছেড়ে বেরুতেন না। বেরুলে ব্যবসার ক্ষতি হত। এতদিন পরে বড় ছেলে গদিতে বসছে। তারই উপর ভার দিয়ে মামা দেশের বাইরে বেরিয়েছিলেন।

এই অরণ্যের ভিতর তাদের বাড়ি দেখে মামা আশ্চর্য হয়েছিলেন। বোনকে বলেছিলেন : এই জঙ্গলে থাকিস কী করে?

লীলাবতী হেসে বলেছিলেন : জংলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ, এখন আর আপশোষ করে লাভ কি!

মামা বললেন : তোরা দেখছি শাস্ত্রবাক্য উল্টে দিলি।

কী রকম?

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবার বিধান, তোরা সেই বয়সে শহরে যাবি। বলে হাসতে লাগলেন।

হাসলেন নরোত্তমবাবুও।

কিন্তু লীলাবতী হাসলেন না। তাঁর মনে কোন ক্ষোভ হয়তো প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই ক্ষোভ ভিতর থেকে খোঁচা দিল। এই বনের ভিতর বেশিদিন থাকতে হলে দময়ন্তীও হাঁপিয়ে ওঠে? তার ভয় করে। অন্ধকার যত বাড়ে, ভয় তত গভীর হয়। কিন্তু এ কথা কাউকে বলা যায় না, বলতে সাহস হয় না। দময়ন্তীর মনে হয়, তার মারও ভয় করে। তিনিও এ কথা কাউকে বলতে পারেন না।

মামা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে একেবারে অজ্ঞাতসারে ভগিনীর কোন দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছেন। তাই তৎপর ভাবে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন। দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করলেন তার লেখাপড়ার কথা, পড়াশুনো কেমন লাগে?

সসঙ্কোচে দময়ন্তী বলল : ভাল।

ভাল মানে বোঝা কঠিন। ওটা উত্তর না দেবার ফন্দি।

তবে কী বলব?

বল, একেবারেই ভাল লাগে না, কিংবা খুব ভাল লাগে। তাতে মনের কথা খানিকটা বোঝা যাবে।

দময়ন্তী হেসে বলল: খুব ভাল লাগে।

মামা বললেন: ও-কথায় বাবা-মা খুশী হতে পারেন, কিন্তু আমি হব না।

কেন?

লেখাপড়া ভাল না লাগলে আমাদের লাভ।

দময়ন্তী এ-কথার মানে বুঝল না। তাই মামা বললেন: বুঝলে না তো! লেখাপড়া ছেড়ে দিলেই মা বলবেন, মেয়ের এবারে বিয়ে দেব। বিয়ে মানেই তো নেমন্তন্ন।

দময়ন্তী লজ্জায় মাথা নত করল।

লীলাবতী বললেন: সত্যিই দাদা, ভাল পাত্রের সন্ধান পেলেই দিও।

হাসতে হাসতে মামা বললেন: সন্ধান আছে বলেই তো বলছি।

আছে! লীলাবতী উৎসুক হলেন।

মামা এবারে লীলাবতীর দিকে মুখ ফেরালেন, বললেন: আমাদের পাড়ার মেহতাদের মনে আছে?

লীলাবতী অনেকক্ষণ ধরে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন: না।

মামা মেনে নিলেন, বললেন: অনেক দিন হল দেশ ছেড়েছিস, মনে থাকবার কথা নয়। মেহতারা বড়লোক। তাদের একটি ছেলে সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে সরকারী চাকরি পেয়েছে। সুন্দর ছেলে, ভাল ছেলে। আমাদের দময়ন্তীর সঙ্গে চমৎকার মানাবে।

লীলাবতী যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন: সত্যি বলছ?

শোন কথা, আমি তোমার বউকে মিথ্যা কথা কেন বলব? বলে মামা নরোত্তমবাবুর দিকে তাকালেন।

তারপর প্রস্তাব করলেন দেশে যাবার। বললেন: অনেকদিন তোমরা দেশে যাও না, চল না একবার।

লীলাবতী স্বামীর দিকে তাকালেন।

নরোত্তমবাবু সংক্ষেপে বললেন: যাব।

যাব নয়, আমার সঙ্গেই চল।

এ প্রস্তাব দময়ন্তীর ভাল লেগেছিল, বলল: চল না বাবা।

মামা হেসে বললেন: জগদীশ কিন্তু দেশে নেই।

লীলাবতী বললেন: জগদীশ কে?

মেহতাদের সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলে।

দময়ন্তী লজ্জা পেল, বলল: আমি বুঝি সেই জন্যে যেতে চাইছি!

আমরা তো তাই ভাবছি।

ভাবলেই হল।

বলে পালিয়ে গেল। দময়ন্তী তখন আরও ছোট ছিল, আরও ছেলেমানুষ, আরও লাজুক। দীর্ঘদিন হস্টেলে থেকেও সে সপ্রতিভ হতে পারেনি। তার বন্ধুরা অনেক-কিছু বলতে পারে, যা ভাবতেও তার লজ্জা হয়। এই লজ্জার জন্য দময়ন্তীর আরও লজ্জা করে।

মামা হাসলেন। তারপর বললেন: আমি ঠাট্টা করছি না লীলা, অনেকদিন তো দেশে যাসনি, চল এইবারে ঘুরে আসি। তোর মামী খুবই খুশী হবেন।

লীলাবতী তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন।

কিন্তু নরোত্তমবাবু কোন উত্তর দিলেন না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে লীলাবতী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন: দাদা কী বলছেন শুনেছ?

শুনেছি।

একটা উত্তর দাও।

আমি কী বলব!

যাবে, কি যাবে না, তা-তো বলবে।

আমার যাওয়া এখন অসম্ভব। তোমরা যেতে পার।

ভারি মুস্কিলের কথা তো। তোমাকে একা রেখে আমি যাই কী করে!

মামা হেসে বললেন: এ বয়সে ওকে আর ভয় নেই। তোদের যাওয়ায় মত যখন দিয়েছে তখন বাক্স-বিছানা বেঁধে ফেল।

লীলাবতী তবু একবার জিজ্ঞাসা করলেন: ভাল মনেই যেতে বলছ তো?

উত্তরটা মামা দিলেন; হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল মনেই বলেছে।

পরদিনই বাক্স-বিছানা বাঁধা-ছাঁদা হল। দময়ন্তীর আনন্দ আর ধরে না। সে কোনদিন মামাবাড়ি দেখেনি। তা'ছাড়া বেড়াবারও একটা আনন্দ আছে। কলকাতা আর এই বনজঙ্গল দুই-ই তার কাছে তিক্ত লাগে।

এক সময় নরোত্তমবাবু তাঁর সহধর্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা প্লেনে যাবে তো?

প্লেনে! এখানে প্লেন কোথায়।

এখান থেকে নয়, আমি কলকাতা থেকে বলছি।

বল কি নরোত্তম, আমরা আবার কলকাতায় যাব প্লেন ধরতে!

তবে কি দিল্লী থেকে প্লেনে উঠবে?

মামা অনেকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন: তোমরা বদলে গেছ।

কেন?

সামান্য আরামের জন্য তোমরা পয়সার অপব্যয় করতে শিখেছ।

নরোত্তমবাবু প্রতিবাদ করলেন: পয়সার অপব্যয় ব'লো না। সময়ের অপব্যয় বাঁচাতে অর্থব্যয়ের কথা বলছি।

মজুরের কাছেই সময় সোনা বলে জানি, আমাদের কাছে নয়।

আমরা কি মজুর নই?

না।

কেন?

আমাদের পরিশ্রমের মূল্য সময়ের মাপকাঠিতে নয়, আমরা সৌভাগ্য বেচে খাই। অন্যের পরিশ্রমের সোনা আমরা বুদ্ধি দিয়ে আত্মসাৎ করি। সুবিধার জন্যই আমরা মজুর সাজি, সৌখীন মজুর।

নরোত্তমবাবু বেশ আশ্চর্য হলেন, বললেন: আজকাল দেখছি নতুন ধরণের কথা বলছ।

হ্যাঁ, আমার ব্যবসা এখন বড় ছেলে দেখছে। আমি স্বাধীনভাবে ভাববার চেষ্টা করছি।

খুবই ভাল কথা। বুড়ো বয়সে পা যাতে না ফস্কায় সেদিকে দৃষ্টি রেখ।

শেষ পর্যন্ত দময়ন্তীদের যাওয়া স্থির হল। মামার সঙ্গে তারা জুনাগড়ে যাবে। নরোত্তমবাবু গিয়ে তাদের নিয়ে আসবেন। তিনি প্লেনে যাবেন, আসবেনও প্লেনে। তাঁর সময়ের দাম আছে। সময় তাঁকে পয়সা দেয়।

দময়ন্তীরা ডেহরি অন শোণ থেকে দিল্লীর ট্রেন ধরল। দিল্লী থেকে আমেদাবাদ মেল। মেহসানায় গাড়ি বদল করে কীর্তি এক্সপ্রেস। কীর্তি এক্সপ্রেস রাজকোট জেতলসর হয়ে পোরবন্দর যায়। দু'-একখানা গাড়ি সোমনাথ মেলে জুড়ে দেওয়া হয় জেতলসরে। সেই গাড়িতে চড়ে দময়ন্তীরা জুনাগড়ে নামল।

দময়ন্তীদের দেখে মামীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছেন। বুকে জড়িয়ে কেঁদে একেবারে অস্থির।

দু' চোখ বিস্ফারিত করে দময়ন্তী চেয়ে রইল। মামীর মুখে প্রথম শুনল যে, সে জুনাগড়ে ঐ বাড়ীতেই জন্মেছে। আরও অনেক কথা শুনল। এখানে না এলে সে সব কথা বোধ হয় কোনদিন জানতে পেত না।

ছোট ছোট ভাই-বোনেরা দময়ন্তীকে জড়িয়ে আনন্দে লাফাচ্ছে। যেন তাদের কত আপনজন এসেছে। দময়ন্তীর জন্যই যেন এরা এতকাল অপেক্ষা করে আছে।

জুনাগড়ে এসে দময়ন্তী জানল যে, এই পৃথিবীতে সে একা নয়। তার বাবা-মা ছাড়াও আরও অনেক আত্মীয় আছে। তাদের কথা সে জানত না, কিন্তু তার কথা তারা জানত। ভালবাসত তাকে, একান্ত আপন ভাবত। যারা তাকে কোনদিন দেখেনি, তারাও তার নাম শুনেছে, ভেবেছে তার কথা আর ভালবেসেছে। অথচ দময়ন্তী এ সব জানত না। কেউ তাকে জানায়নি, আপনার জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে মানুষ হয়েছে। এ যুগের সভ্যতা কি আপনকে পর করছে।

সাত

মামীর মুখে দময়ন্তী অনেক পুরনো কথা শুনল।

তার দাদামশায় জুনাগড়ে ব্যবসা করতেন না। তিনি ব্যবসা করতেন করাচীতে। কাপড়ের ব্যবসা। তার বাবা সমুদ্রতীরের করাচী বন্দরে ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন। সে যুগে রেল সর্বত্র ছিল না, যাতায়াতের ব্যবস্থাও আজকের মতো সহজ ছিল না। তিনি কী ভাবে করাচীতে গিয়ে প্রথম উপস্থিত হয়েছিলেন, তা জানা নেই। জুনাগড়ের কাছে ভেরুবাক বন্দর, সেখান থেকে করাচীতে হয় তো জাহাজে যাওয়া চলত, কিংবা বড় নৌকায়। আরব সাগর বঙ্গোপসাগরের মতো ভয়ঙ্কর নয়। দময়ন্তী ওখান থেকে ভেট দ্বারকায় যায়নি, গেলে দেখতে পেত যে ছোট ছোট নৌকোয় কেমন করে যাত্রীরা পারাপার করে। অনেকে মনে করেন যে, সেকালে সকলে স্থলপথে যাতায়াত করতেন। হয় কচ্ছের উপর দিয়ে কিংবা ঘুরে। আর কাপড়ের ব্যবসা যখন করতেন, তখন আমেদাবাদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ছিল না।

এ সবই অনুমানের কথা। কিন্তু দময়ন্তীর মামী তাঁর শাশুড়ির কাছে জাহাজের গল্প শুনেছেন, শুনেছেন রেলের গল্পও। দুই-ই তাঁরা দেখে গেছেন। আর দেখেছেন তার মায়ের কাণ্ড।

মামী রাঁধতে রাঁধতে এই গল্প বলছিলেন দময়ন্তীকে। একটা ছোট টুলের উপর বসে দময়ন্তী শুনছিল। কী একটা কাজে তার মা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন। পিছনে ছায়া দেখতে পেয়ে মামী বললেন: ঠাকুরঝি নাকি?

হ্যাঁ।

বলব নাকি সেই সব কথা?

কোন্ কথা?

কেন, তোমার সেই কাণ্ড-কারখানা।

আমি আবার কি করলাম?

কী করনি!

দময়ন্তীর লজ্জা করতে লাগল। মামী এখনও সেকেলে আছেন, রেখে-ঢেকে কথা বলার প্রয়োজন বোধ নেই। হয় তো এমন কোন কথা বলতে চাইছেন যে মা লজ্জা পাবেন। কী দরকার তাতে। তাই সেই বলল: থাক সে কথা।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে কিরে, মায়ের কীর্তির কথা শুনবি না?

মা বললেন: আমার কথা আবার কেন উঠল?

করাচীর কথায় তোমার কথা। গুজরাটে এত ভাল ভাল ছেলে থাকতে একটা সিন্ধির সঙ্গে কেন বিয়ে হল—

মেয়ের সামনে ও সব কথা কেন?

হাসতে হাসতে মামী বললেন: শুনছিস তো!

দময়ন্তী অনুরোধ করল: ও-কথা থাক মামীমা, তুমি অন্য গল্প বল।

মামী বললেন: মেয়ে তো বেশ গড়েছিস লীলা, এ যুগের মেয়েই মনে হচ্ছে না!

মা বললেন: তোমার যুগের মনে হচ্ছে না বল। এ যুগের মেয়ের ওসবে কৌতূহল কম।

মামী বললেন: তাই কি! আমার মেয়েরা তো দেখি এসব গল্প তেঁতুলের আচারের মতো ভালবাসে।

লীলাবতীর হয়তো মনে হয়েছিল যে শিক্ষার প্রসারে এইরকম কৌতূহল কমে যাচ্ছে। এ যুগের মেয়েরা এসব চর্চায় খানিকটা গ্রাম্যতা আছে বলে তা সযত্নে বর্জনের চেষ্টা করে। কিংবা এই ব্যাপারটা এখন এতই সাধারণ হয়ে গেছে যে, আর কারও মুখরোচক বলে মনে হয় না। লীলাবতী সহাস্যে বললেন: তোমার কাছে মানুষ হয়ে মেয়েরা তোমার মতোই কৌতূহলী হচ্ছে।

ও, তাহলে দোষটা আমার বল। তোমরা যে ঢলাঢলি করলে তাতে কিছু হল না।

লীলাবতী তাঁর বৌদির মুখ জানেন। একবার খুলে গেলে আর কোন আগল থাকে না। ভাবলেন, এ স্থান পরিত্যাগ করাই বুদ্ধির কাজ। বললেন: তোমার সঙ্গে পাগলে প্রলাপ বকে! চলে আয় দময়ন্তী। বলে তিনি সরে গেলেন।

দময়ন্তী উঠে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মামী বললেন: কোথায় যাচ্ছিস?

মা যে ডেকে গেলেন।

ভারি বাধ্য মেয়ে যে দেখছি! মা তোর ডেকে গেল। না পালিয়ে বাঁচল।

দময়ন্তী উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভাবছিল কী করবে। মামী বলে উঠলেন: বসে পড় শীগগির।

দময়ন্তী বসে পড়ল।

মামী বললেন: কী করেছিল বলি তোকে।

না না, মার কথা থাক, মা লজ্জা পাবে।

মা লজ্জা পাবে, না তোরই লজ্জা হচ্ছে। ঐ মায়ের কী রকম মেয়ে হয়েছিস রে তুই!

দময়ন্তী চুপ করে রইল।

মামী বললেন: কলকাতার মেয়েরা শুনেছি বুট পরে সাহেবদের সঙ্গে গটগটিয়ে চলে। সেই কলকাতায় পড়ে তুই এমন পল্লবিনী লতেব হয়েছিস!

দময়ন্তী লজ্জা পেল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

মামী হঠাৎ তরকারীটা নামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সাঁড়াশি দিয়ে ধরে কড়াইটা একটা বাসনের উপর কাৎ করলেন। খুন্তি দিয়ে চেঁচে কড়াইটা পরিষ্কার করে সেটা মাটিতে রাখলেন। তারপর জলে ধুয়ে আবার উনুনে চড়ালেন। আবার কিছু রান্না হবে। ব্যবস্থাটা গুছিয়ে নিয়ে বললেন: থাক সে কথা। তোর যখন শুনবার ইচ্ছা নেই, তখন আমি কেন গায়ে পড়ে বলি।

দময়ন্তীর মনে হল, সে একটা মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে। কী বলবে ভেবে পেল না।

মামী জিজ্ঞাসা করলেন: আমার কালো মেয়েটা কী করছে।

কালো মেয়ে।

ললিতা গো ললিতা।

ললিতাকে তুমি কালো মেয়ে কেন বল? সে তো কালো নয়।

তোরই মতো রঙ। কী বলিস?

ললিতা মামীর বড় মেয়ে। বড় ছেলেটির পর এই মেয়ে। দময়ন্তীরই সমবয়সী। গায়ের রঙ শ্যামল বলে মামী কালো মেয়ে বললেন। হয়তো স্নেহেরই ডাক, কিন্তু দময়ন্তীর আপত্তি আছে। সেই আপত্তি জানাতে গিয়েই সে এই লজ্জা পেল। মুখে আর কথা জোগাল না।

মামী নিরস্ত হলেন না, বললেন: কিরে, উত্তর দিচ্ছিস না যে?

উত্তর নেই।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন: তোর মতো চেহারা হলে আমার কোন ভাবনা ছিল না।

দময়ন্তী বুঝতে পারল যে এ তাঁর ক্ষোভের কথা, বেদনার কথা। দময়ন্তীর রূপের জন্য তাঁর ক্ষোভ নয়, তাঁর বেদনা নিজের কন্যার রূপের অভাবের জন্য। অভাব ঠিক নয়। যে রূপ পুরুষকে প্রলুব্ধ করে, ললিতার সে রূপ নেই। তার রূপে আগুনের বদলে আছে

স্নিগ্ধতা। তার দিকে তাকিয়ে চোখে ধাঁধা লাগে না আরাম হয়। বিয়ের বাজারে এই শান্ত রূপের দাম নেই, পয়সার লোভ দেখিয়ে মেয়ে পার করতে হয়। সংসারে সুখের জন্য সে দামিনীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কল্যাণীর, সে কথা সব পুরুষ জানে, কিন্তু সময় মতো ভুলে যায়। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় যখন সে জ্ঞানে বিশ্বাস জন্মে, তখন অনুতাপ করে আর ফল হয় না, সংশোধনের সময় গেছে অতীত হয়ে।

দময়ন্তী তখন জানত না যে ললিতার সঙ্গে জগদীশ মেহতার পরিচয় একদা নিবিড় হয়েছিল। পাশাপাশি বাড়ি না হলেও তাদের একই পাড়ায় বাস। এত নিকটে যে প্রতিবেশী বললে অনুচিত হবে না। এদেশের আবহাওয়ায় যতটা মেলামেশা সম্ভব, তার চেয়ে বেশি হয়েছিল। মন দেওয়া নেওয়া হয়েছিল কিনা সে কথা ললিতা জানে, কিন্তু কাউকে বলেনি। মায়ের মনে সন্দেহ হয়েছে কিন্তু বাবা কিছু বোঝেন নি। তাই বোনের কাছে সহজ ভাবেই জগদীশের প্রশংসা করেছেন, বলেছেন দময়ন্তীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা।

কিন্তু মামী এ কথা বলতে পারেন নি। তাঁর মনে অন্য আশা ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, জগদীশ তাঁর মেয়ের সঙ্গে শুধু খেলাই খেলেনি, তার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। সে কথা প্রকাশ করবার সময় এলে নিশ্চয়ই করবে। মেয়ের রূপের কথা তাঁর মনে হয়েছে। মেয়ে অমন নিষ্প্রভ না হলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

দময়ন্তী ভাবছিল, মামীকে এখন অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ তার মা আবার মুখ বাড়ালেন, বললেন: কি গো বউ, তোমার রান্না কি আজ শেষ হবে না?

তোমার অত তাড়া কেন?

তাড়া কি আমার জন্যে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন: ছি ছি, কী হয়েছে মুখখানা, পুড়ে যে লাল হয়ে গেল। ওঠ ওঠ, আমি বসি তোর টুলটায়।

দময়ন্তীকে উঠিয়ে দিয়ে লীলাবতী বসলেন।

পিছন ফিরে মামী বললেন: ওমা সত্যিই তো, মেয়ের রঙ যে পুড়ে গেল। যা যা, পালা এখান থেকে।

দময়ন্তী যেন পালিয়ে বাঁচল। [ক্রমশ।

চুম্বন যেখানে অপরাধ

সপ্তাহখানেকের মধ্যে যদি কাজের খাতিরে ছ'সাতটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতে হয় তাহলে চাই রীতিমত হজমশক্তি আর রকমারি আবহাওয়া সহ্য করবার মত স্বাস্থ্য। আর একটি ব্যাপারের জন্যেও তৈরী থাকতে হয়—সেটি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ও অদ্ভুত ধরণের আইনকানুন। যেমন একজন অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী—যাঁর লাইসেন্স নেই—তিনি লিসবনে সকলের সামনে বা কোনো পুলিশ-ম্যানের সামনে তাঁর সিগারেট লাইটারটি ব্যবহার করা সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন। ওখানকার আইন অনুসারে সিগারেট লাইটারের জন্যে লাইসেন্স রাখা দরকার। রোমে ট্রাফিক লাইট অগ্রাহ্য করে যদি রাস্তা পার হওয়া যায় অমনি খুব জোরে হুইশল বেজে উঠবে এবং পথিককে সেইখানেই জরিমানা দিতে হবে। ইটালী দেশের কর্তৃপক্ষ হয়ত মনে করেন যে মোটরিস্টদের মত পথিকদেরও পথচলার নিয়ম-কানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে—তাই বোধ হয় এই নিয়ম। কোপেনহাগেন শহরে ঠাণ্ডা যেমন, জলঝড়ও তেমনি। সেখানে তাই হোটেলের ঘরগুলি গরম করে রাখার ব্যবস্থা আছে। যদি কোনো নতুন লোক সেখানে গিয়ে নিজের ঘরটি বড় বেশী গরম মনে করে একটি জানলা খুলে দেন—তাহলেই গোলমাল। ঘর গরম রাখার ব্যবস্থাটি এমন যে এই একটি জানালা খোলার দরুণ সে ঘরের তাপমাত্রা যেই কম হয়ে যাবে অমনি অন্য ঘরগুলির তাপমাত্রা এত বেড়ে যাবে যে সেসব ঘরের বাসিন্দারা গরমে প্রায় সেদ্ধ হতে থাকবেন। নীতির কথা ভেবেও আবার কয়েকটি অদ্ভুত অদ্ভুত আইন তৈরী হয়েছে। ইস্তানবুল শহরে কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভার যদি তার গাড়ীর ভেতরের আলো না জ্বেলে একজনের বেশী আরোহী নিয়ে চলে তাহলে তাকে সোজা বিচারালয়ে যেতে হয়। রোম শহরে কোনো সরকারী কর্মচারী যদি কোনো প্রেমিক যুগলকে চুম্বনরত অবস্থায় দেখতে পায়—তাহলে আর কথা নেই, সেইখানেই তাদের জরিমানা করা হয়। যদি বলা যায় যে মেয়েটির ত আপত্তি ছিল না, বরং সে সাড়াই দিয়েছিল এ কাজে—তাহলে জরিমানা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ইটালীর পুলিশ জরিমানার ওপর কমিশন পায়—কাজেই চুম্বনরত প্রণয়ীযুগল খুঁজে বেড়ানোর কাজে তাদের উৎসাহ যে একটু বেশীই হবে তাতে আর সন্দেহ কি? স্পেন ও পর্তুগালের নৈতিক আইন খুবই কঠোর। সেখানে স্নান করার সময় পুরুষদের বুক খোলার নিয়ম নেই। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে সেখানকার পুলিশ স্নানরত লোকটিকে সেই অবস্থাতেই জল থেকে টেনে তুলে খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সোজা থানায় হাজির করে। ফ্রান্সে পথ চলার নিয়মকানুন মানুষকে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে। ডান দিক দিয়ে গাড়ী চালানোর যে বিচিত্র নিয়মটি সেখানে আছে সেটি অসাবধান পথিকের পক্ষে মারাত্মক। ইংলণ্ডে একটি নিয়ম আছে—বাড়ির জনসাধারণের যাওয়া আসার পথের ধারে পাপোশ বা ঐ রকম কিছু ঝাড়া নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে একজন ইতালিয়ানের মন্তব্য বেশ মজার।—হাঁ, নিয়মটি অদ্ভুত, কিন্তু এ কাজ কেবল একজন ইংরেজের পক্ষে করাই সম্ভব।

SAVINGS

মেরি আনতয়নের পত্রাবলী

মেরি আনতয়নের পত্র

২০শে জুলাই ১৭৯১

গত সপ্তাহের স্মরণীয় ঘটনাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করেছিলাম। যাদের উদ্দেশে বলছি বিপুল শক্তি ও প্রচুর সাহসের সঙ্গে তাদের রাজতন্ত্রকে পূর্ণ সমর্থন আমি পরম আনন্দে লক্ষ্য করেছি। তাদের মনোভাব ও কার্যধারা অন্যান্য বিষয়েও আমার মধ্যে তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা এনে দিয়েছে। কিন্তু, আমার সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রেখে গেলে তাদের কাজের ব্যাপারে অনেক সুবিধা হবে অন্তত তাদের পরিকল্পনা সমূহও আমাকে বিশদভাবে জানাক। যদিও কারোর সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই, কারোকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানানোর স্বাধীনতাও আমার হস্তচ্যুত, কচ্চিৎ কখনো কিছু লেখার অনুমতি ভাগ্যে জোটে। তৎসত্বেও এই অসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় একঘেয়ে দিনযাপন করেও বার্তাবহ পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সকল সংবাদই আমার কাছে ভেসে আসে। কিছুই আমার অগোচর থাকে না। এত অপ্রচুর উপায়কে ভিত্তি করে কোন মন্তব্য গঠন করা আমার পক্ষে অসম্ভব—তবে পারি যে রাজার ভ্রাতৃবৃন্দের কাছে যে প্রতিনিধিদল পাঠাবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে একমাত্র সেই বিষয়টিকেই কেন্দ্র করে আমি কিছু বলতে পারি। আমার মতে, এ ব্যাপারে যদি কাউকে পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীতই হয় তা হলে যাঁকেই পাঠানো হোক—পাঠানোটি যেন অবিলম্বে হয়। তার উপর এই পরিকল্পনাটি ইতিমধ্যে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে, অতএব জনগণও এ বিষয়ে অনবহিত নয়। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপকারীরা নিজেদের স্বার্থের অনুকূল কার্য সর্বদাই করে চলে। আপন স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায় তাদের নেই। তারা আপন প্রভাব বিস্তার করে আমাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ আমাদের নামে যে কথাবার্তা চলছে তা কার্যকরী হতে দেবে না—এইভাবে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে তারা যত্নবান হবে। ঠিক এই কারণেই মঃ মুগের রিপোর্ট আমাকে অত্যন্ত দুঃখিত করে তুলেছে। তাঁর রিপোর্টে আমি দেখলাম যে তার মধ্যে কুমারদের ও অন্যান্য দেশ-ত্যাগীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ এই ইচ্ছা এ-রকম ব্যাপকভাবে প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। এর ফলে হল কি আমাদের প্রতিনিধিরা যখন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবেন তখন তাঁরা আরও অদমনীয় ও অবাধ্য হয়ে উঠবেন। এই রিপোর্টটিই তাঁদের অধিক অবাধ্য হতে উদ্দীপিত করল। এটা যে সম্মিলিত কমিটারই ইচ্ছা এটা তারা পক্ককাল পূর্বেই জেনে নেবে। অথচ, লক্ষ্য করবার মত ব্যাপার এই যে, এই একই ইচ্ছা মঃ বার্নেভও প্রকাশ করেছেন অথচ তা কত সূক্ষ্ম ও বুদ্ধিমত্ত'সহ এমন নিপুণভাবে কুশলতার সঙ্গে তিনি ইচ্ছাটি প্রকাশ করেছেন যাতে আমাদের চিন্তার কোন কারণই থাকছে না। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাদৃপ্ত বক্তৃতায় এমনভাবে বাসনাটি প্রকাশিত হয়েছে যাতে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় অথচ শংকার কোন কারণ রইলো না।

এঁদের সঙ্গে কিছু চুক্তিতে আমাদের আসতেই হবে। চুক্তির সর্তাবলীগুলি তাঁদের দেওয়া হোক—অবশ্যই যে চুক্তিই তাঁদের সঙ্গে করা হোক সেটা যেন তাঁদের পক্ষে গ্রহণীয়ও হয়। আমি আর বিশদ বিবরণের মধ্যে যাচ্ছি না কারণ সঠিক ভাবে সর্তগুলি আমার জানা নেই তবে কথাবার্তা যদি চালাতেই হয় তবে সর্তগুলি শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়—যেন সর্বতোভাবে সম্মানজনকও হয়।

চিঠি শেষ করার আগে একটি কথা বিশেষভাবে বলে রাখি যে, কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সংবাদ কর্ণগোচর হয়—আমি নিজে যে সব কার্যাবলীর মধ্যে জড়িত তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমার পূর্ণ সচেতন থাকা দরকার। বিশেষ করে যে ঘটনাগুলি ভবিষ্যতে ঘটবে—সেই অনাগত ঘটনাগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করব, খুঁটিনাটি ঘটনাসমূহকেও সমান প্রাধান্য দেব এবং ঘটনাগুলির কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে যাব এবং তার যে জবাব আমি দেব তার সৃষ্টি শুধু সাধারণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থেকেই নয় তার উদ্ভব সাধারণের কল্যাণ প্রয়াসী একটি মন থেকে। সর্বসাধারণের উন্নয়ন ও কল্যাণের আমি নিয়ত কামনা করি এবং তারই মধ্যে আমাদের নিজেদেরও সর্বৈব কল্যাণ ও শ্রী নিহিত।

পত্রের উত্তর

২১শে জুলাই, ১৭৯১

রাজতন্ত্র যখন রীতিমত নিরাপদ হয়ে উঠবে সেইসঙ্গে শান্তি, নিয়মানুবর্তিতা এবং আইনের প্রতি বশ্যতাও দেখা দেবে। বিপ্লবও শেষ হয়ে যাবে। সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা গোলযোগই পুরোপুরিভাবে দমিত হবে। সরকার পুনরায় তাঁর কাজ শুরু করবেন এবং রীতিমত গুরুত্বের ও নিয়মের মধ্যে আইন প্রয়োগ করা হবে। এইসবই তাঁর কর্তব্য এবং ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

রাজার রাজকীয়তা এবং ক্ষমতা আবার তাঁর হস্তগত হবে। সংবিধানের যে সব সুযোগসুবিধা তাঁর অনুকূলে উদ্ভূত হবে সেগুলি যখন কার্যকর হবে তখন দেখা যাবে যে তার ব্যাপকতা ও পরিমাণ তাঁর বর্তমান আশার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এমন জিনিষও

আছে যা আইন কখনও দিতে পারে না—তা অর্জন করতে হয়, যথা—সহানুভূতি ও বিশ্বাস। এগুলি ঠিক নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হলে অর্জিত হয়। দেশত্যাগীদের সংবিধানের নির্দেশগুলির স্বীকৃতির পূর্বে—তাদের সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ঔচিত্যের প্রচুর পরিচায়ক বলে মনে হয় না। যদি তাদের দিয়ে সংবিধানের বশ্যতা স্বীকার করানো যায় তাহলে রাজা শুধু জাতীয় বিশ্বাসেরই অধিকারী হবেন না—এক বিরাট দেশীয় কল্যাণকর কাজের জন্য দায়ী হয়ে থাকবেন এবং এর ফলেই তিনি এই দেশত্যাগীদের সঠিক পথে আনতে সফলকাম হবেন। তারা যদি অসহায় হয়ে পড়ে কোন দিক দিয়ে কোন শক্তির সক্রিয় সাহায্য না পায় এবং অসহায় অবস্থায় রাজ-ছত্রছায়ে পুনর্বার মিলিত হতে পারে তা হলে রাজার নাকি মর্যাদা পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে তাই এর ফল সর্বতোভাবে ভাল বলেই গণ্য করা যেতে পারে।

রাণীর পক্ষে সম্রাটের সঙ্গে মধ্যস্থতার প্রয়োজন। এই মধ্যস্থতার ব্যাপারে রাণী যদি সফলকাম হন তা হলে সেই সফলতা তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলেই গণ্য হবে। এবং এ কাজে বিলম্ব করা তাঁর পক্ষে আর মোটেই কোন প্রকারে সমীচীন নয়। দেশবাসীর নিকট রাণীর যা প্রাপ্য তা তাঁর পাওয়া নিশ্চয়ই উচিৎ। নেপোলিটান সভায় কিছু করা যায় কি না সে বিষয়ে রাণীর ভেবে দেখা সর্বাগ্রে উচিৎ। মনে হয় তাঁর ভগ্নীর প্রতি প্রভাব এখানে সর্ব প্রকারে লাভবান হবে।

এ সব বিষয় আগেও আলোচিত হয়েছে। একবার নয় বহুবার। বিষয়গুলি যেমনই জরুরী তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে তাঁদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তারপর যেমন যেমন সময় আসবে সেই অনুযায়ী পন্থাও ঠিক করা যাবে। সেই সব পন্থা সাফল্যের সম্মুখীন হলে যা ভুল করা হয়েছে সেগুলিরও যথাযথ সংশোধন হয়ে যাবে। যদিও ঘটনার প্রবাহ ও সঠিক অবস্থা এখনও সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত নয় তবু সচিববৃন্দ সকলে যদি সর্বপ্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কারগুলি বর্জন করে চলেন তাহলে নিশ্চিত রূপে বলা যায় যে, ভবিষ্যত যথেষ্ট আলোকিত এবং আশাপ্রদ। সেদিক দিয়ে সে সম্বন্ধে চিন্তার কিছু নেই।

দ্বিতীয় লিওপোল্ডকে লেখা মেরি আনতয়নের পত্র

আমার আদরের ভাই,

তোমাকে এই চিঠি আমি লিখি, আমার প্রতি এই ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে সেকথাও আমাকে জানানো হয়েছে। আমার দিক থেকে যোগাযোগ করার সব রাস্তাই বন্ধ। অন্যান্য বিষয়ে তো দূরের কথা, শুধু স্বাস্থ্য-সমাচার বিনিময়ের পথও যে আমার রুদ্ধ। আমাদের যাত্রার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আমি বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি না।

আমাদের প্যারিস প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী ঘটনাগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজার স্বার্থের অনুকূলে আমার পক্ষে কি কি পন্থা গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে আমার ভাবা শুরু হল। এ সম্বন্ধে নানা প্রভাবের সমবায়ে একটি সিদ্ধান্ত আমার মনে জন্ম নিয়েছে।

আমার অবস্থা যাই দাঁড়াক না কেন, ভাগ্যচক্র আমাকে যেদিকেই টেনে নিয়ে যাক, নিয়তির বিধানে আমার জীবনের গতিপথ যে দিকেই নিয়ন্ত্রিত হোক তোমার উপর নির্ভরতা থেকে দুর্যোগের শতসহস্র করাল ভ্রূকুটি আমাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। তা ছাড়া আমার কাছে রাজার ও তোমার স্বার্থ তো পৃথক নয়, তোমাদের দু'জনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আমার কাছে যে সমমূল্যের—যখন এই কথা নিয়ে নিজের মনে চিন্তা করি তখন অন্তরে সে যে কি আনন্দের সংমিশ্রিত অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা ভাষায় প্রকাশ করব কেমন করে?

আমাদের যাত্রার ফলে অব্যবহিত পরেই ঘটনাবলী নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। সেই কারণেই পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। জাতীয় সভা অনেকগুলি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। নতুন কোন আদেশ তো দূরের কথা বহাল আইনগুলিই ক্রমশ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। দেশের আইন বিপন্ন, আজ ঘোর বিপন্ন। ক্রমশই আইন ব্যর্থ হতে চলেছে। সংবিধান গঠনের সময়ে তাই জাতীয় সভার প্রভাবে আজকের ক্ষমতাচ্যুত রাজার পুনরায় সকল ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তা ছাড়া তাঁর নিজের ধারণাও তাই ছিল। কারণ জাতীয় সভা নিজেই আজ বিপন্ন। জনসাধারণের সর্বপ্রকার আস্থা সে আজ হারিয়েছে। এই বিশৃঙ্খলার কোন সমাধান তখন আমরা দেখতে পাই নি।

তবে বর্তমানে পরিস্থিতি যে ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার ফল আমাদের কাছে আশাপ্রদ বলেই প্রতিভাত হচ্ছে। অধিকাংশ প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে প্রকাশ্যে রাজতন্ত্র বহাল রাখা এবং রাজার পুনরায় পূর্ব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলাভের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের পুনর্মিলনের পরই দেশে রাজদ্রোহ ও অনিষ্টকর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিপুলভাবে দমিত হয়েছে। সারা দেশে জাতীয় সভা আজ অভূতপূর্ব সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে এবং দেশে আবার লুপ্ত শান্তি এবং আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট পরিমাণে যত্ন নিচ্ছে। সংক্ষেপে প্রকাশ করতে গেলে গত দু'বছর ধরে সারা ফ্রান্সকে যে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও আভ্যন্তরীণ দুর্বিষহ অশান্তি দুর্যোগ ক্ষতবিক্ষত করে তুলছিল আজ তার কবল থেকে ফ্রান্স মুক্তিলাভ করেছে। মুক্তির পবিত্র স্নানে ফ্রান্স যেন নবজীবন লাভ করল।

এই পরিণতি আনন্দজনক হলেও ক্ষমতার পুন: প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ শক্তির দরকার (আমার মতে যেটা বিশেষ প্রয়োজনীয়) রাজতন্ত্রকে সেই শক্তি দান করতে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ। এ কথা অবশ্যই উল্লিখিতব্য যে, এই পরিণতি এক সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর ফলে অনেক স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ হবে এ বিশ্বাসও আমি রাখি।

সকল বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখে আমি বলছি যে, আবার যদি দুঃসময় ঘনিয়ে আসে তখন তার চেহারা হবে আরও ভয়ঙ্কর। এক অপ্রতিরোধ্য মূর্তি নিয়ে সে দেখা দেবে। তখন তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এক বৃহত্তর শক্তির প্রয়োগ ছাড়া

চোখের সামনে অন্য পথ থাকবে না। আর পরোক্ষভাবে তার ফলও শুভপ্রদ নয়।

আত্মরক্ষায় এখানকার প্রত্যেকেই বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কৃতসঙ্কল্প। সৈন্যসমূহ নেতাহীন অথচ এ দেশে সৈন্যসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছু কম নয়। সমগ্র রাজ্য অস্ত্রধারী মানুষে পরিপূর্ণ কিন্তু তাদের পরিচালনা করায়—তাদের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর লোকের অভাব।

এ ক্ষেত্রে বিপ্লবের অবসানে রাজাকে সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি সর্বসাধারণের মনে এক অটল আস্থার জন্ম দিতে হবে এবং আপন কর্মের মধ্যেই তাঁকে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করতে পারে না। তবে আমার মনে হয় তাঁর কার্যাদিতে সহযোগীর অভাব এখন ঘটবে না। যে সব নেতারা পরে রাজাকে সমর্থন জানিয়েছেন এ ক্ষেত্রে তাঁদের সহযোগিতাও তিনি পেতে পারেন সে সম্ভাবনা অবিদ্যমান নয়। এমন কি তাঁর পূর্বমর্যাদা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এদের অবদানের মূল্য কম নয়। এর ফলে এক শক্তিমান ও দৃঢ় শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবে বলে আশা করা যায়।

এই সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও অবস্থার প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ করে আমি এই মর্মে উপনীত হচ্ছি যে, আমাদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা শুধু আমাদেরই নয়, তোমারও এবং শুধু তুমি কেন সারা ইয়োরোপেরই। তাই বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে যত দ্রুত সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায় সে চেষ্টা আমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিৎ। এখানে আমাদের সকলেরই সমান ভূমিকা এবং এখন এই আমাদের এক পবিত্র কর্তব্য। তাই আজ রাজা যে কাজ করতে চলেছেন তাতে তোমার সহানুভূতিদান এবং সাহায্য আমি বিশেষভাবে আশা করি এবং এর ফলে আমাদের সকলেরই জীবন এক পরম কল্যাণের পবিত্র স্পর্শে ভরে উঠবে।

আমার অন্তরের সর্বাঙ্গীণ প্রীতি ও শুভকামনা গ্রহণ কর।

মেরি আনতয়নকে লেখা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের চিঠি

আমার আদরের বোন,　　　　　ভিয়েনা, ১১শে অগাষ্ট, ১৭৯১

আমাকে লেখা তোমার চিঠিখানি নির্বিঘ্নে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।

তোমার এবং রাজার বর্তমান অনিশ্চয় অবস্থার ভয়াবহরূপ আমাকে যে কি যৎপরোনাস্তি বেদনাহত করেছে তা আমি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে অক্ষম জানবে। তোমাদের এই দুঃসময়ে এই বিপদ-সঙ্কুল মুহূর্তে, এই নিদারুণ দিনগুলিতে আমার যথোচিত সাহায্য দান করতে আমি উৎসুক এবং এ আমার অন্তরের ইচ্ছা। তোমার চিঠি পড়ে আমি কিন্তু কিছু আনন্দও পেয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতির যে আলেখ্য তুমি সুনিপুণ হাতে এঁকেছ তার কোন কোন অংশ তো নিশ্চয় উজ্জ্বল। ঘটনার স্রোত কোন কোন ক্ষেত্রে তো ভালর দিকেই মোড় ফিরছে বলে মনে হয় এর ফলও আমার মনে হয় কল্যাণজনক। অতীত ও বর্তমানের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি আশার আলোই দেখতে পাচ্ছি।

তুমি যে তথ্যটি জানিয়েছ অর্থাৎ রাজার অধিকার ও শক্তি যাতে পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তাঁর স্বার্থ যাতে পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে সেদিকে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি একত্র হয়ে যত্নবান হয়েছেন। আমাকেও সেই মর্মে এক পত্রে জানান হয়েছে—তাতে বলা হচ্ছে যে, জাতীয় সভার সদস্যগণ রাজতন্ত্র বহাল রাখার জন্য যত্নবান—রাজার স্বার্থ ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকুক এই তাঁদের কামনা এবং রাজা যাতে পুনরায় তাঁর পূর্ব ক্ষমতা লাভ করে রাজ্যশাসনে সক্ষম হন সে বিষয়ে তাঁর সর্বতোভাবে সহায়তা করতে উন্মুখ।

রাজার এবং সমগ্র ফরাসীজাতির প্রকৃত হিতকামী বান্ধবদের শুভ উদ্দেশ্য সাধনে আমার'ও সাহস, আন্তরিকতা ও শুভকামনার সঙ্গে আমাদের সমর্থন প্রসারিত করতে পরাঙ্মুখ নই।

যে সব আশ্বাসবাণীগুলি পত্রে উচ্চারিত হয়েছে সেগুলি কার্যে পরিণত হ'লে আনন্দের সীমা থাকবে না এবং আমার অন্তরের আশা পূর্ণ হবে।

আমার আদরের বোন, আমার অন্তরের প্রীতি ও শুভকামনা তোমার উদ্দেশে পাঠাই।

মেরি আনতয়নের পত্র

২৫শে অগাষ্ট

আপনাদের চিঠি লিখতে যদি বিলম্ব হয়ে থাকে তবে তার কারণ আমি প্রতিদিন প্রতিশ্রুত দলিলটির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম জানবেন। এই দলিলটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমাকে অনেকদিন আগে দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস যে আলোচনা যতক্ষণ চালু থাকবে—যতক্ষণ তার সমাপ্তি না ঘটছে ততক্ষণ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব কি? আমি একটি বিষয় স্বীকার করি এবং খোলাখুলি ভাবেই বলে রাখি যে, আমি সহজ সরল এবং সোজা কথার পক্ষপাতী। এই ভদ্রমহোদয়েরা বলছেন যে, সংবিধানটি অত্যন্ত রাজতন্ত্র ঘেঁষা হয়ে গেছে এবং কেবল রাজতন্ত্র ও শুধু রাজার স্বার্থ দেখেই রচিত হয়েছে। এ অভিমত না হয় আমি মেনেই নিলাম কিন্তু আমার বক্তব্য যে তাঁরা কোন্ জায়গাটিতে—তাঁরা রাজতন্ত্রের ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা ও রাজার দিকে দৃষ্টি রেখে রচনা—দেখতে পেলেন সেই অংশটি একটু আমায় পরিষ্কার করে দেখাবেন কি? সেটি যদি তাঁরা পারেন, তাহ'লে আমি কথা দিচ্ছি আমি নতমস্তকে তাঁদের অভিমত স্বীকার করে নেব।

'ব্যক্তিস্বার্থ পরে বিবেচিত হবে' এবং 'সব কাজ আইনসঙ্গত ভাবে করতে হবে' এসব প্রস্তাবে তো আমার কোনই অমত নেই উপরন্তু আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে ধরুন, যারা রাজার সেবায় জীবন কাটাল, যাদের নিঃস্বার্থ সেবা রাজা সুদীর্ঘকাল ভোগ করলেন এখন তাদের যদি বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমার দিক থেকে সায়-পাওয়া যাবে না জানবেন। এই ভদ্রমহোদয়দের এই বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। মঃ বার্নেভকে আমি যা বলেছি, সেই বক্তব্যটি এঁদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিই এবং এক্ষেত্রেও সেই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করি। জনকল্যাণকর কার্যে আমার হস্ত আমি কখনোই সঙ্কুচিত করব না। এ অভিমত আমার একার নয়, আমাদের উভয়েরই জানবেন এবং এ অভিমত পরিবর্তন হওয়ার নয় সে বিষয়েও স্পষ্টভাবে আলোকিত করে রাখলাম।

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী
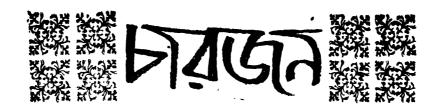
(নিরলস জ্ঞান-সাধক ও বিশিষ্ট আইনজীবী)

বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানের সাধনায় যাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা যাঁদের অমায়িকতা ও ঔদার্যকে বিন্দুমাত্র খর্ব করতে পারে নি, যাঁদের বয়সের মাপকাঠি তাঁদের কর্মপ্রেরণাকে শিথিল করতে পারে নি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত বাঙলাদেশের অন্যতম সাহিত্যসেবী ও মেদিনীপুর জেলার গৌরব শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুর জেলায় পিংলা গ্রামের বসু পরিবার এক সম্ভ্রান্ত নামী বংশ। এই বংশে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের কর্মকুশলতায় যশ ও প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই বংশে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু তৎকালে কালেক্টর ছিলেন। তাঁর সাত পুত্র সকলেই কৃতী। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র হেমাঙ্গচন্দ্র প্রথমে মুন্সেফ ও পরে সাবজজ হন। তদানীন্তন কালে লর্ড ডাবলিন যখন কলকাতায় আসেন—তখন তিনি এদেশের বিচার পদ্ধতি দেখবার জন্য কলকাতা হাইকোর্ট ও পরে মফস্বল কোর্ট দেখতে যান। তখন হেমাঙ্গবাবু হুগলীর সাবজজ। তাঁরই এজলাসে আসেন, তাঁর কর্মকুশলতা দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাঁরই পুত্র মনীষিনাথ। তিনি যখন বাকুড়ায় সাবজজ ছিলেন তখন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ খাতড়াগ্রামে মনীষিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মনীষিনাথ বাল্যাবস্থা থেকেই মেধাবী। ১৯০০ সালে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০১ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম-এ পাশ করেন ও রৌপ্যপদক লাভ করেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুনজরে পড়েন। সংস্কৃত ও বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অদ্ভুত মননশীলতার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশেষ সম্মানজনক "সরস্বতী" উপাধিতে বিভূষিত করেন। এরপর তিনি ১৯০৫ সালে বি-এল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এবার কর্মজীবনের সূত্রপাত—১৯০৬ সালে ওকালতী আরম্ভ। আইন ব্যবসায়ের উন্নতির সোপানে উঠে মেদিনীপুরের আদালতে লিডিং অফ দি বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। দীর্ঘকাল বিচক্ষণতার সঙ্গে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে ১৯৫১ সালে অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে ১৯২৪ সালে কো-অপারেটিভ আন্দোলনে যোগদান করেন ও মেদিনীপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর অগ্রজ মন্মথবাবু ছিলেন সম্পাদক। মন্মথবাবু সভাপতি হলে তিনি সম্পাদক হন। ১৯৩৭ সালে তিনি সারা বাঙলা কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন হতে 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' লাভ করেন ও উক্ত সময়ে ভাইস-চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪২ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত চেয়ারম্যানরূপে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে অধিষ্ঠিত আছেন। এই ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্করূপে পরিগণিত। তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কেরও কিছুকাল ডিরেক্টার ছিলেন। মেদিনীপুর ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৫১) থেকে আজ পর্যন্ত চেয়ারম্যান আছেন। কো-অপারেটিভ ল' বোর্ডেরও তিনি একজন সভ্য ছিলেন। এছাড়া আইনজীবী হিসেবে তিনি ১৯৩২ সাল থেকে মেদিনীপুর জমিদারী কোং নাড়াজোল রাজ, মহিষাদল রাজ, ঝাড়গ্রাম রাজ এষ্টেটের রিটেনার প্লিডার হিসেবে ছিলেন।

কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান অনুশীলনও তাঁর বাদ পড়েনি। সাহিত্যকীর্তিও তাঁর কম নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখারূপে মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে। প্রথম বছর হতে তিনি এই পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তৎপরে সহ-সভাপতি এবং ১৯৪৭ হতে সভাপতির পদে আসীন আছেন। 'মেদিনীপুর সাহিত্য সমাজ' ১৯১২ সালে গঠিত হয় তার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৩ সাল হতে মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী

'মাধবী' (মাসিক) প্রকাশ হতে থাকে—প্রথম হতেই তিনি তার সম্পাদক। বহু বিদ্বান্ ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রবন্ধ সম্ভারে পত্রিকাখানি সুশোভিত। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' বাংলা ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়া যখন প্রকাশ হতে আরম্ভ হয় তখন হতেই তাঁর বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তিনি 'বঙ্গীয় মহাকোষের' সহযোগী সম্পাদকও ছিলেন।

বহু সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন (মেদিনীপুর) তিনি একবার দর্শন শাখার সভাপতি হয়েছিলেন এবং একাধিকবার উক্ত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। মেদিনীপুরের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র'ও (চতুষ্পাঠি) তিনি সভাপতি। তাঁর রচিত গ্রন্থ "ভাগবততত্ত্ব জিজ্ঞাসা" তাঁর শাস্ত্রসাধনা ও মননশীলতার স্বাক্ষর। এই ৮২ বছর বয়সেও এখন তাঁর জ্ঞান-অনুশীলনে শৈথিল্য দেখা যায় নি।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে

(কেন্দ্রীয় সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মন্ত্রী)

লোভনীয় উচ্চপদ ও তদুপযুক্ত উচ্চ বেতনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যিনি ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে পারেন—প্রচার বিমুখ হইলেও স্বাভাবিকরূপে তিনি জননেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ও জনগণের মানসপটে একটি স্থায়ী আসন রাখিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমষ্টি-উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে মহাশয় ইহার অন্যতম উদাহরণ।

শ্রীদে ১৯০৬ সালে শ্রীহট্ট জেলার (পূর্বপাকিস্তান) মেদিনীমহাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে

হয়। পরে তিনি কলিকাতা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পড়াশুনা করেন। উহা সমাপ্ত করিয়া তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারীং-এ মাইনর ডিগ্রী লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীতে (জি, ই, সি) নিযুক্ত হন। নিজ কর্মদক্ষতায় তিনি উক্ত কোম্পানীর (ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহল শাখার) জেনারেল ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৪৭ সালে তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ভারত-বিভাগজনিত উদ্ভূত সমস্যার দরুণ দলে দলে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সুষ্ঠুভাবে বাস্তুহারাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি কয়েকরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং উহার ফলস্বরূপ নীলোখেরী (Nilokheri) উপনগরীর পত্তন হয়। ইহাই ভারতে একত্রীভূত কৃষি ও শিল্প রূপায়ণের প্রথম দিগদর্শক রূপে প্রতিভাত হয়। সৎ ও মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা যে যথাযথভাবে পুরস্কৃত হইয়া থাকে—বোধ হয় ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীদে-কে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৫৫ সালে 'পদ্মভূষণ' খেতাব লাভ করেন।

১৯৫৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রকুমার নবগঠিত সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে সমবায় বিভাগেরও দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৫৭ সালে শ্রীদে রাজ্যসভার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি রাজস্থানের নাগৌর (Nagaur) কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য হন।

তাঁহার লেখা অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে Questand, A Movement is born, Panchayati Raj, A Synthesis, Random thoughts (তিন খণ্ড), Fragments Across, Missing Link and Planning for Life বহুজন সমাদৃত গ্রন্থসমূহ।

ডঃ শ্রীধরনাথ মুখোপাধ্যায়

(সর্বভারতীয় শিক্ষাব্রতী)

প্রতিভাধর বাঙ্গালীর অভাব নেই, বিশেষ করে বাংলা দেশের বাইরে যেখানেই একজন বাংলার সন্তান নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তিনি কালক্রমে নিজেকে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। দিকে দিকে তাই বাঙ্গালীর জয়যাত্রা আজও অব্যাহত; বুদ্ধি, জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব আজ ইতিহাস রচনা করেছে।

ডঃ শ্রীধরনাথ মুখোপাধ্যায় তেমনি একজন প্রবাসী বাঙ্গালী। শিক্ষাজগতে যাঁর খ্যাতি পশ্চিম-ভারত ছাড়িয়ে আজ উত্তর-ভারতে, রাজধানীতেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক-শিক্ষিকার মহল নেই যেখানে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, আদর্শ শিক্ষকের খ্যাতি পৌঁছয় নি।

১৯০১ সালের ২১শে আগষ্ট বর্ধমান জেলার গলসী গ্রামে মাতুলালয়ে ডঃ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহ ছিলেন

বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গত বলরাম গঙ্গোপাধ্যায়; পিতা জব্বলপুর গভর্ণমেণ্ট এইচ-ই স্কুলের অধ্যক্ষ, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। আদি-বাড়ি বাঁকুড়ার পলাশডাঙ্গা।

শ্রীধরবাবুর তিন পুরুষ বসবাস হ'ল জব্বলপুরের রাইট টাউন; পিতামহ এসেছিলেন এখানে রেলের চাকরি নিয়ে,—সেই থেকেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। পিতা রায়বাহাদুর অমৃতলাল

ড: শ্রীধরনাথ মুখোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায়ই এখানকার শিক্ষাজগতে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন এবং শিক্ষাজগতে তাঁর খ্যাতি অচিরে সুবিদিত হয়ে পড়ে। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান ড: শ্রীধরনাথ।

জব্বলপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জব্বলপুরের রবার্টসন্ স্কুলে বি-এ অধ্যয়ন করেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তারপর স্পেনস্-ট্রেনিং কলেজ থেকে বি-টি, নাগপুরের মরিস কলেজ থেকে এম-এ, ইংলণ্ডের লণ্ডন ইনসটিটিউট অফ এডুকেশন থেকে টি-ডি, ইংলণ্ডে ডাবলিন ট্রিনিটি কলেজ থেকে এইচ ডেপ (শিক্ষা), যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনির্ভাসিটি টিচার্স কলেজ থেকে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করলেন। তারপর ভারতে ফিরে এসে শিক্ষাজগতে নিজের আসন অধিকার করলেন।

১৯৪০ সালের ১৯ মে শ্রীধরবাবু শ্রীমতী রেণুকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামীর ন্যায় শ্রীমতী রেণুকা দেবীও শিক্ষাজগতে সুপরিচিতা মহিলা। বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সহিত তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে ইনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ হোম সায়েন্স বিভাগের রীডার।

আগেই বলেছি শ্রীধরবাবুর কর্মক্ষেত্র এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারতেই প্রসারিত। নিখিল ভারত ট্রেনিং কলেজ সমিতির তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। বর্তমানে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের তিনি সদস্য; গুজরাট ও কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচিং বোর্ডের সদস্য, গুজরাট রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরও তিনি সদস্য। ১৯৬১ সালে ত্রিবান্দ্রমে যে সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে টিচার্স ট্রেনিং শাখার তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রেও পশ্চিম-ভারতে শ্রীধরবাবুর নাম সুবিদিত। তিনি বরোদার রামকৃষ্ণ কেন্দ্রের সম্পাদক; বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসবের তিনি আহ্বায়ক। আজীবন শিক্ষাব্রতী এই প্রবাসী বাঙ্গালী নিজেকে শিক্ষাজগতে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন। জব্বলপুরের বাংলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর ১৫ হাজার টাকা দান, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ হাজার টাকা দান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত।

ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় লিখিত তাঁহার বহু গ্রন্থ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি এডুকেশন এ্যাণ্ড সায়কোলজি রিভিউ-এর সম্পাদক। তাঁর রচিত এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া ও সেকেণ্ডারী স্কুল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সর্বত্র সমাদৃত।

গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রদেশ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা মহলে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ না কেউ শিক্ষাদান বা অধ্যাপনাব্রতে ব্রতী নন।

শ্রী বি কে রায়

[জেনারেল ম্যানেজার গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা]

১৯০৫ সালের ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় ভারত সরকারের জেনারেল ম্যানেজার (প্রেস) শ্রী বি কে রায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার হিন্দু স্কুলে এবং পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন শেষ করে শ্রীরায় সুদূর লণ্ডনে "লণ্ডন স্কুল অফ প্রিণ্টিং"-এ শিক্ষাগ্রহণ করেন। লণ্ডনে তিন বৎসর অতিবাহিত করে প্রিণ্টিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে শ্রীরায় হাতে কলমে শিক্ষার জন্য লাইনো টাইপ মেসিনারী কোম্পানী লিমিটেডে, অলিভ্রিনগাস, টিমসন বুলক এবং বারবার লিমিটেড ও কেটরিঙ ইত্যাদি কোম্পানীতে ভর্তি হন। ওখান থেকে প্যারিস,

শ্রী বি কে রায়

বার্লিন, হিডিলবার্গ, অস্বুসবার্গ ও লিপজিগ ইত্যাদি শহরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্ত ভ্রমণ করেন।

১৯৩০ সালেই ভারত সরকারের বিভাগীয় প্রেসের ওভারসিয়ার পদে যোগদানের জন্ত কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীরায় খুব অল্প বয়স থেকেই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সকল কাজে আত্মনিয়োগই ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। কাজেই কোনদিন তিনি তাঁর কর্তব্যকে অবহেলা করতেন না। কোন কাজকেই তিনি ছোট বলে মনে করতেন না। কাজেই সেই মনের একাগ্রতাই তাঁর উত্তরোত্তর জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই বিভাগীয় পদে উন্নতি করতে থাকেন। সামান্ত ওভারসিয়ার পদ হতে সহকারী ম্যানেজার এবং পরে ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় শ্রীরায় সিমলাতেও চাকুরী করেন ১৯৩৪ সাল হতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। এরপর অর্থাৎ ১৯৪২ সালে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং ফর্মস প্রেসের ম্যানেজারের পদে যোগদান করেন। পুনরায় শ্রীরায় দিল্লী প্রেসের ম্যানেজারের পদে যোগদান করেন এবং দিল্লীতে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঐ পদেই ছিলেন। এরপর থেকেই কলকাতায় কর্মজীবন শুরু হয়।

শ্রীরায় ছাত্রাবস্থায় খেলাধূলায় বিশেষ করে হকি ও ফুটবলে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল শ্রীরায় চিরদিনই হাসিখুশী প্রকৃতির। অল্প বয়সেই একজন বন্ধুকে নিয়ে শ্রীরায় সাইকেলে কলিকাতা হ'তে পুরী ভ্রমণ করেন এবং পরে কলিকাতা হ'তে কাশী পর্যন্ত সাইকেলে যাত্রা করে আসেন। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ সরকার শ্রীরায়কে অসাধারণ কর্মনৈপুণ্যতার জন্ত "রায়-সাহেব" খেতাবে ভূষিত করেন।

আর একটি বিষয়ে শ্রীরায় ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী—কাজের মধ্যে ডুবে গেলে তিনি সব কিছুই প্রায় বিস্মৃত হতেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের মধ্যে মাত্র তিন মাস ছুটি তিনি উপভোগ করেছেন। এমনিভাবেই শ্রীরায় বর্তমানে কাজ করে চলেছেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বর্তমানে বিশেষ করে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর, উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় ব্যানার্জী, দুর্গাপুরের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীপ্রভাত নিয়োগী এবং কালেক্টর অফ কলিকাতা করপোরেশন শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন, এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে শ্রীরায়-এর একটি পুত্র, একটি কন্তা এবং স্ত্রী এই নিয়েই তাঁর ছোট সংসার সুন্দর ভাবেই এগিয়ে চলেছে। আমরা শ্রীরায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

জেগে থেকো

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

এখনো ফেরেনি ওরা : তবু জেগে থেকো।
জেগে থেকো সারারাত এক আকাশ তারা
যেমন তাকিয়ে থাকে প্রতীক্ষা বিছিয়ে ছায়াপথে।

উথাল-পাথাল ঢেউ, দুরন্ত সময়,
থমথমে অন্ধকারে কে জানে, কী হয়?
কী হয়! কী হয়!—এই ভয় থরো থরো বুকে,
চতুর্দিক করে শুধু ফিস্‌ফাস্, অমঙ্গল স্বর
শুনোনা! রয়েছে জেগে শুকতারা, চতুর্থ প্রহর।

এখনো অনেক বাকি; তবুও এখনি মনে হয়
সকলেই ঘরে ফিরবে। ঘরছাড়া, যত গৃহহারা
সকলেই ফিরে আসবে আপন অঙ্গনে, পরিচিত
পরিজন পরিবৃত অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিবেশে
ভোরের নরম আলো মুখে মেখে; শিশির-কোমল
হাওয়ায় হাওয়ায় শোনো কেমন ফেরার সুর বাজে!

সকলেই ফিরে আসে। গোধূলির বিদায়ী আলোক
সকালে ঝিল্‌কিয়ে ওঠে রোদ্দুরের সুবর্ণ-রেখায়;
রাতে ঝরে-যাওয়া কুঁড়ি, পুনর্বা ফুলের প্রতিমা—
হেসে ওঠে আরেক সকালে।

যেমন রাত্রির পারে জেগে থাকে উষার রক্তিমা—
তুমি জেগে থেকো।

যন্ত্র-সঙ্গীত

—প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

উস্তাদজী

বিস্ময় —শফিউল হাসান

ওরা কাজ করে

রামকিঙ্কর সিংহ

জলে ফেলে জাল —মানা চৌধুরী

—রামবিক

মনে পড়ে

(শরৎচন্দ্রের কথা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘরে ঢুকে সুরেন্দ্রনাথ দেখলেন, শরৎচন্দ্রের চোখ দিয়ে তখনও অনর্গল জল গড়াচ্ছে।
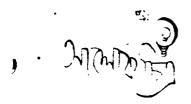
—কি হয়েছে শরৎ? কাঁদছ কেন?

পাখীটা আমার হাতে মরে গেল সুরেন। খাঁচাটা নোংরা হয়েছিল—পরিষ্কার করতে গেলাম কি করে যে কাঠিটা তার গলার ভেতরে ঢুকে গেল—মরে গেল পাখীটা!

আবার তাঁর গলা বুজে এল।

[illegible] সুরেন্দ্রনাথ বললেন—তোমার আর দোষ কি শরৎ—[illegible] করে ত' তুমি মারনি তাকে?

শরৎচন্দ্র কিন্তু বিশেষ সান্ত্বনা পেলেন না তাঁর কথায়; অবরুদ্ধ স্বরে বললেন তিনি—না, ইচ্ছে করে মারিনি তাকে ঠিক, কিন্তু মরল ত' সে আমারই হাতে! এ দুঃখ যে আমার কিছুতেই যাবে না সুরেন।

বাস্তবিক, কোকিলের খালি খাঁচার দিকে চোখ পড়ে আর জলে ভরে ওঠে তাঁর চোখ দু'টি। শেষ কালে, তিনি দেখতে না পান এমন জায়গায় খাঁচাটা সরিয়ে ফেলা হ'ল।

বাড়ীতে শান্ত ছেলেটির মত কলের জলের নীচে মাথা পেতে দিয়ে স্নান করা এ বাড়ীর ছেলেদের ধাতে পোষাত না! গঙ্গার পাড়ের ডাঙ্গা নীলকুঠির উঁচু চত্বর থেকে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটোপাটি করে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার না কাটলে তাদের স্নান করার আনন্দই হ'ত না। কি বর্ষা, কি শীত প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করা চাই-ই চাই। গরমকালের ত' কথাই নেই; ঘণ্টা দুই জলে না পড়ে থাকলে আশ মিটত না তাদের। জল থেকে যখন উঠে আসত তারা, হাত পায়ের আঙুল চুপসে যেত, চোখ দু'টো হয়ে যেত লাল। বর্ষায় যখন দুই তীর ছাপিয়ে গঙ্গার মাটি গোলা ঘোলা জল জায়গায় জায়গায় ঘূর্ণির সৃষ্টি করে গর্জন করতে করতে প্রচণ্ড বেগে পশ্চিম থেকে পুবে ছুটে চলত; বড় বড় গাছ, গরু বাছুর, খড়ো ঘরের চাল, তার ওপরে মানুষ নিরুপায় অসহায় অবস্থায় সেই ভীষণ স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে যেত, বৃষ্টির জলে অসম্ভব পেছল ঘাটে পা রাখা যেত না, তখনো কিন্তু এ বাড়ীর ছেলেদের গঙ্গাস্নান বন্ধ হত না। বড়দের কঠিন নিষেধ নিঃশব্দে অমান্য করে, তাঁদের চোখ এড়িয়ে, চুপি চুপি বেরিয়ে যেত তারা খিড়কির দরজা দিয়ে।

বাঙ্গালীটোলা থেকে হাঁটা পথে মাইলখানেক পশ্চিমে গঙ্গার ধারে বুড়োনাথ শিবের মন্দির। এই মন্দিরের দোতলার রেলিং ঘেরা বারান্দার ঠিক নীচে দিয়েই তখন গঙ্গার গেরুয়া জলের স্রোত পুব দিকে ছুটে চলত। এত প্রখর এই স্রোত যে, দোতলার এই বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে গঙ্গায় পড়ে সেই স্রোত ধরে মিনিট কয়েক ভাসলেই বাঙ্গালীটোলার ঘাটে এসে পৌঁছে যাওয়া যেত। অনেক সময় আবার সেই প্রচণ্ড স্রোত কাটিয়ে বাঙ্গালীটোলার ঘাটে ওঠা সম্ভব হ'ত না—ভেসে যেতে হ'ত আরো আগে। একটু এগোলেই পাওয়া যেত এক আকণ্ঠ জলমগ্ন বিরাট বটগাছ। তারই ঝুরি বা ডাল ধরে ডাঙ্গায় ওঠা সহজ হ'ত। বর্ষার সময় এ বাড়ীর এবং এ পাড়ার ছেলেদের এটি ছিল একটি বিশেষ প্রিয় খেলা।

ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই এ বাড়ীর ছেলেদের সাঁতার শেখা হয়ে যেত। বড়দের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে নিজের মনে জলে দাপাদাপি করতে করতে ক্রমশ তারা সাঁতার শিখে ফেলত। তারপর একটু একটু করে সাহস বাড়তে বাড়তে দশ বারো বছর বয়স হ'তে তারা সাঁতার কেটে গঙ্গার এপার ওপার করতে সুরু করে দিত।

তাদের এই সাহসে বাধা পড়ত তখন যখন সাঁতার কাটতে গিয়ে তাদের পাড়ার বা অন্য পাড়ার কেউ গঙ্গায় ডুবে যেত। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

একদিনের এমনি একটি করুণ ঘটনার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে!

ছেলেটি এসেছিল পাটনা থেকে, তার মার সঙ্গে ভাগলপুরে তার মামার বাড়ীতে। এসেছিল দু' চার দিনের জন্যে। চমৎকার চেহারার স্বাস্থ্যবান ছেলে—বয়স ষোল সতের বছর। ঘটনার দিন সকালে উঠে তার মা গেছেন বুড়োনাথ শিবের মন্দিরে পুজো দিতে—বোধ হয় ছেলের মঙ্গলকামনায়—আর ছেলে এসেছে তার মামাতো ভাই-এর সঙ্গে বাঙ্গালীটোলা'র ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে। দু'জনেই প্রায় সমবয়সী—আর দু'জনের কেউই ভাল সাঁতার জানত না। ঘাট তখন জনমানবহীন, ভোরের স্নানার্থীরা স্নান করে চলে গেছে—কেবল একজন বৃদ্ধ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে নাম জপ করছিল।

এরা দু'জনে জলে নেমে স্নান করছে আর একটু একটু সাঁতার কাটছে। বেশী দূরে যাচ্ছে না কেউই, দু'জনেরই মনে ভয় আছে।

সেই ছেলেটি একবার গলা-জল থেকে হাত পাঁচ-ছয় দূরে সাঁতার কেটে গিয়ে ফিরে আসবার সময় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আমি আর যেতে পারছি না—ডুবে যাচ্ছি—বাঁচা আমাকে!

তার মামাতো ভাই মনে করল সে হয়ত তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে—এটুকু আর সে আসতে পারছে না!

২১—৬

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে চেঁচিয়ে উঠল—বাঁচা ভাই আমাকে—ডুবে গেলাম আমি! এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হাঁকপাঁক করতে করতে সে জলের নীচে তলিয়ে গেল!

তাকে ডুবে যেতে দেখে তার মামাতো ভাই আর সেই বৃদ্ধ চীৎকার করে উঠলেন—লোক ডুবে গেল—লোক ডুবে গেল—কে কোথায় আছ শীগগির এস—লোক ডুবে গেল গঙ্গায়!

ঘাটের ওপরেই ঘোষেদের বাড়ী—অনেক লোকজন সে বাড়ীতে। চীৎকার শুনে সে বাড়ী থেকে যে ক'জন পারলে তখুনি ছুটে গিয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ে খুঁজতে লাগল ছেলেটিকে। মুহূর্তের ভেতর এই দারুণ দুঃসংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে গঙ্গার ঘাট লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেল। অনেকেই জলে নেমে ডুব দিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে খুঁজতে লাগল—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তন্ন তন্ন করে খোঁজা সত্বেও তার কোন হদিস পাওয়া গেল না।

শেষকালে, প্রায় আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর এক ভদ্রলোক ছেলেটির সন্ধান পেলেন এবং ডুব দিয়ে তুলে আনলেন তাকে জলের ভেতর থেকে। তখন সে আর বেঁচে নেই!

ঘাটের ওপর শুইয়ে ছেলেটির ওপর জলে ডোবার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হচ্ছে—এমন সময় ঝড়ের মত ছুটতে ছুটতে তার মা এসে ছেলের বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন!

উঃ, কি মর্মভেদী তাঁর কান্না!

এ রকম ঘটনা যখন ঘটত তখন এ-বাড়ীর ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করত—আর গঙ্গাস্নান করব না। পরের দিন স্নানের সময় হলে প্রতিজ্ঞার সুর একটু নরম হয়ে যেত—কেবল ডুব দিয়ে উঠে আসব—সাঁতার কাটব না। জলে নেমে ডুব দিতে গিয়ে তাদের হাত-পা কি রকম উসখুস করত—একটু সাঁতার কাটলে কি হবে—বেশী দূর ত' আর যাব না!

একটুখানি গিয়ে মনে হ'ত—আর একটু যাই—তারপরে আর একটু—তারপরে আর একটু। এমনি করতে করতে, দিন তিন-চার যেতে না যেতেই আবার এপার-ওপার করা সুরু হয়ে যেত।

রবিবার; ইস্কুলের তাড়া নেই; গঙ্গায় স্নান করতে গেছে দুই ভাই শম্ভু আর রবি।

স্নান করতে করতে হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল দু'জনের—চল, ওপার যাই।

অমনি সাঁতার কাটতে কাটতে চলল দুই ভাই ওপারের দিকে।

ঘাটে বসে আহ্নিক করছিলেন কালা ভটচাযি্য মশাই। কানে কম শোনেন তিনি, তাই নাম তাঁর কালা ভটচাযি্য।

এদের দু'জনকে ওপারের দিকে যেতে দেখে তিনি চেঁচিয়ে জিগগ্যেস করলেন—কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

এরা একবার পেছন ফিরে তাঁর দিকে চেয়ে ওপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার এগিয়ে চলল।

শঙ্কিত হয়ে কালা ভটচাযি্য মশাই চীৎকার করে বললেন—ফিরে আয় বলছি, নইলে বাড়ীতে বলে দোব!

এরা শুনতেই পেলে না তাঁর কথা, সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গেল ওপারে।

সাঁতার কেটে আবার যখন এপারে ফিরে এল তারা, শম্ভুর তখন প্রচণ্ড জ্বর, চোখ দু'টো টকটকে লাল।

চুপি চুপি বাড়ী ঢুকে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। রবি গিয়ে ভাল ছেলেটির মত ভাত খেতে বসল।

কিন্তু এত জ্বর ত' আর মার কাছে লুকোন যায় না; তিনি ব্যস্ত হয়ে সুরেন্দ্রনাথের কাছে গেলেন ওষুধ চাইতে। সুরেন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথী করেন।

—মেজঠাকুরপো, শম্ভুর বড় জ্বর হয়েছে, একটু ওষুধ দাও।

সুরেন্দ্রনাথ শম্ভুকে দেখতে এলেন। বাড়ীর সকলে তাঁকে ভীষণ ভয় করত। শম্ভু ত' ভয়ে কাঠ; এইবার বুঝি বকুনির তোড় ছোটে!

সুরেন্দ্রনাথ তার জ্বর দেখলেন, ওষুধ দিলেন তাকে, তারপরে বললেন—অতক্ষণ জলে থাকলে তার শাস্তি ভোগ করতে হয়; আর কখনো ও কাজ করবে না!

বলে দিয়েছে কালা ভটচায তাহলে!

যাক, অল্পে রক্ষে পাওয়া গেল!

রবি তখন আনাচে-কানাচে!

কেদারনাথের আমলের ডানপিটে ছেলে দু'টি কিন্তু অত সহজে নিষ্কৃতি পায়নি অঘোরনাথের হাত থেকে!

'যমুনীয়া' অর্থাৎ ছোটগঙ্গার লাল জলে সাঁতার কেটে এসেই মামা-ভাগ্নে পড়ে গেলেন একেবারে বাঘের মুখে!

অঘোরনাথ ফিরে এসেছেন সফর থেকে—নিতান্ত অসময়েই! এসেই খোঁজ নিয়েছেন তিনি—মণি-শরৎ কোথায়?

ভয়ে সকলে চুপ—সত্যি কথা বললে ত' আর রক্ষে নেই।

কিন্তু 'কালা ভটচায' ছিল বোধ হয় তখনো—কাজেই আসল কথা জানতে দেরী হ'ল না অঘোরনাথের। তিনি রুদ্ধরোষে ফুলতে লাগলেন; বাড়ীর লোকে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

এই অত্যন্ত অশুভ মুহূর্তে রক্তবর্ণ চোখ, জলে ভেজা মূর্তি নিয়ে মামা-ভাগ্নে এসে উপস্থিত।

অঘোরনাথের খড়মের নির্মম আঘাতে মণিমামা হলেন ক্ষতবিক্ষত।

আর 'ভাগ্নে শরৎচন্দ্র? ব্যাপারের গুরুত্ব আঁচ করে তিনি চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

দু'দিন পরে, অঘোরনাথ আবার সফরে বেরিয়ে যাবার পর সুস্থ শরীরে, পরম নিশ্চিন্তচিত্তে তিনি আবির্ভূত হলেন।

তাঁর মণিমামা তখনো গায়ের ব্যথায় শয্যাশায়ী।

জানা গেল, শরৎচন্দ্রের এই দু'দিনের অজ্ঞাতবাসে সহায় হয়েছিলেন তাঁর ছোড়দি, অঘোরনাথের সহধর্মিণী কুসুমকামিনী দেবী।

ভাগলপুরের গঙ্গার প্রতি এই দুর্নিবার টান শরৎচন্দ্রের জীবনে বরাবরই ছিল। সেই ভাঙ্গা নীলকুঠির চত্বর থেকে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে স্নান করার ছিল তাঁর ছেলেবেলার মতই উৎসাহ ও আনন্দ। তাই, তিনি ভাগলপুরে এলে তাঁকে তাদের গঙ্গাস্নানের সঙ্গী হিসেবে পাবার লোভে এ বাড়ীর ছেলেরা কোমরে গামছা বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর জন্যে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করত।

বাইরের ঘরে চলেছে ঘন ঘন চা-তামাকের সঙ্গে জোর গল্প আর হাসি; ঘড়িতে বেজে চলেছে এগারোটা, বারোটা, একটা। বাড়ীর ভেতরের ও ক্ষিদের তাগিদ অগ্রাহ্য করে ছেলেরা ঘুর ঘুর করছে সামনের বারান্দায়—কোমরে গামছা-বাঁধা—উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তিনি তাকাচ্ছেন মাঝে মাঝে তাদের দিকে—উঠছে তাদের বুক—এইবার বোধ হয় যাবেন ন্যাড়াদা! কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝছে তারা—এ তাঁর সেই দৃষ্টি যা দেখেও দেখে না, আবার না দেখেও সবই দেখে! হতাশ হয়ে পড়ছে তখন তারা!

মনে ভয় আছে তাদের, বড়রা যদি হঠাৎ বলে বসেন—তোরা এখনো ঘুর ঘুর করছিস কেন? অনেক বেলা হয়ে গেছে নেয়ে-খেয়ে নিগে যা!—তাহলেই সব মাটি!

কখনো হয়ত শরৎচন্দ্র ছেলেদের দিকে চেয়ে যেন একটু অপ্রতিভ হয়েই বলছেন—তোরা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি? আচ্ছা, চল, এবার যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের সাড়া পড়ে যাচ্ছে ছেলেদের মধ্যে। যারা একটু ঝিমিয়ে পড়েছে, হয়ত বা বসেই পড়েছে হতাশ হয়ে—তারা অমনি লাফিয়ে উঠে গামছাটা কোমরে ভাল করে বাঁধতে সুরু করে দিয়েছে—এইবার তাহলে যাওয়া হবে গঙ্গাস্নানে।

কিন্তু হায়! কোথায় গঙ্গাস্নান আর কোথায় কি! আবার মেতে উঠেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে।

এমনি করে গড়িয়ে কোনোদিন বাজত বেলা দু'টো, কোনোদিন বা ঘড়ির কাঁটা গিয়ে পৌঁছত তিনটের ঘরে! অতিশয় লজ্জিত শরৎচন্দ্র তখন গামছা কাঁধে ফেলে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন—বড্ড বেলা হয়ে গেল রে! গোটাকয়েক ডুব দিয়ে উঠে আসি চল, সাঁতার কাটা আজ আর হবে না!

—এত বেলায় আজ আর গঙ্গায় না-ই বা গেলে শরৎ—আজকের মত বাড়ীতেই নেয়ে নাও না—বললেন হয়ত সুরেন্দ্রনাথ।

—না না সুরেন, এরা আমার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে; চল রে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আসি আমরা!

ছেলেদের সব উৎসাহ ততক্ষণে প্রায় নিবে গেছে; একরকম মনমরা-ই হয়ে পড়েছে তারা! শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার ঝোঁক তাদের অত্যন্ত বেশী তাই তারা রণে ভঙ্গ দেয় নি—ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে!

তাঁর সঙ্গে গঙ্গায় গিয়ে গোটাকয়েক ডুব দিয়ে তারা সেদিনকার মত স্নান পর্ব শেষ করলে। সাঁতার কাটা আর হল না!

কোনো কোনোদিন আবার ছেলেদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ত—বাইরের ঘরের গল্প একটু সকাল সকাল শেষ হ'ত। সেদিনের উৎসাহ আর আনন্দ দেখে কে! শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়ে সেদিন তাদের দাপাদাপি মাতামাতির অন্ত থাকত না।

এককালে শরৎচন্দ্রের শিকারের খুব সখ ছিল; তাঁর হাতের লক্ষ্যও ছিল অব্যর্থ। এক অতি করুণ ঘটনায় চিরদিনের মত তাঁর এই সখের পরিসমাপ্তি ঘটে!

বন্ধুদের সঙ্গে শিকারের অন্বেষণে চলেছেন শরৎচন্দ্র, হাতে বন্দুক। মাথার ওপর দিয়ে এক জোড়া চকা-চকী উড়ে যাচ্ছিল। বন্ধুদের মধ্যে একজন বললেন—মারো ত' দেখি শরৎ, কি রকম টিপ তোমার!

বন্দুক তুলে ছুঁড়লেন শরৎচন্দ্র। তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্যে নিমেষের মধ্যে একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। অন্যটি কিন্তু পালিয়ে গেল না, নীচে নেমে এসে তার আহত সঙ্গীটিকে ঘিরে ঘিরে উড়তে লাগল ও কাতরভাবে ডাকতে লাগল।

এই মর্মস্পর্শী দৃশ্যে শরৎচন্দ্রের বড় বড় চোখ দু'টি জলে ভরে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—জীবনে আর কখনো শিকার করবেন না।

তাঁর শিকারের সখের সেইদিনই শেষ হল বটে কিন্তু বন্দুকের সখ গেল না। ভাগলপুরে তিনি যখন আসতেন তখন তাঁর সঙ্গে আসত একটি ছোটখাটো অস্ত্রাগার—রাইফেল্স, রিভলভার, পাখীমারা বন্দুক, বিচিত্র আকারের ছোরাছুরি ইত্যাদি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর প্রায়ই তিনি সেগুলি নিয়ে পরিষ্কার করতে বসতেন। তাদের ব্যবহার আর ছিল না কিন্তু তাদের প্রতি তাঁর মমতা আর যত্নের অন্ত ছিল না। পরে, বিপ্লবীদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা সন্দেহে ইংরেজ সরকার তাঁর সেই মূল্যবান ও সখের অস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করেন।

জিনিসপত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র ছিলেন ভারি সৌখীন। কোনো খেলো জিনিস কখনো তিনি ব্যবহার করতেন না। তাঁর ব্যবহারের প্রতিটি জিনিস—জামা, কাপড়, জুতো, চশমা, ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন, লেখার কাগজ, মণিব্যাগ, পাইপ, গড়গড়া, গড়গড়ার নল, ঘরের নানারকম আসবাব—তাঁর সৌখীনতা ও শিল্পীমনের পরিচয় দিত। তাঁর আগ্নেয়াস্ত্রগুলিও ছিল উৎকৃষ্ট। সেগুলি ঐ ভাবে খোয়া যাওয়ায় তিনি রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

অবশ্য ইংরেজ সরকারের সন্দেহ যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিল তা নয়। বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল—এবং তাদের তিনি নানাভাবে সাহায্যও করতেন।

বিপ্লবী বীর বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি বয়সে ছোট হলেও সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মামা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

একদিন গভীর রাত্তিরে বিপিনবিহারী শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত!

জেগেই ছিলেন শরৎচন্দ্র, বললেন—এত রাত্তিরে যে বিপিন? ব্যাপার কি?

মৃদু হেসে বিপিনবিহারী বললেন—দিনের বেলা কি পথে বেরুবার জো আছে শরৎ, যে আসব?

—তাই নাকি?

—আর বল কেন, ক'দিন নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

—বল কি? বস, বস—ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শরৎচন্দ্র—তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করি দাঁড়াও।

—থাক গে শরৎ, এত রাত্তিরে আর মেয়েদের বিব্রত করে কাজ নেই।

—তা হোক, কিছু খেতে হবে ত'?

—তা ছাড়া, বেশীক্ষণ বসা নিরাপদ নয়, পেছু নিয়েছে বোধ হয়।

—আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি, একটু বস।

বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন শরৎচন্দ্র।

খানিকপরে, খাওয়া সেরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন বিপিনবিহারী।

—চলি শরৎ।

—সঙ্গে কিছু আছে?

—আছে।

—আরো কিছু নিয়ে যাও।

মুহূর্তপরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বিপিনবিহারী।

কিছুক্ষণ পরেই গোয়েন্দা পুলিশের আবির্ভাব হল শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে।

—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি এখানে এসেছেন নাকি?

—এসে থাকলে আছেন নিশ্চয়ই, খুঁজে দেখতে পারেন—নির্লিপ্ত উত্তর শরৎচন্দ্রের।

বিফলমনোরথ গোয়েন্দা পুলিশ ফিরে গেল। পাখী উড়ে গেছে!

শরৎচন্দ্রের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিরাগের অন্যতম বড় কারণ তাঁর 'পথের দাবী'।

বইটি যখন 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল, শরৎচন্দ্র সে সময় একবার তাঁর ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে ভাগলপুরে আসেন। প্রকাশচন্দ্রের বিয়ের ঘটকালি করেন মণীন্দ্রনাথের তৃতীয় জামাতা প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়। বিয়ে হয় মুঙ্গেরে, বরানুগমন হয় ভাগলপুরের গাঙ্গুলিদের বাড়ী থেকে। কথা ছিল, শরৎচন্দ্র বিয়ের দিন আসবেন, তার আগের সব ব্যবস্থা সুরেন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লকুমার করবেন। এদিকে, বিয়ের ক'দিন আগেই সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এক 'তার' করে বসলেন—চলে এস।

'তার' পেয়ে শরৎচন্দ্র চলে এলেন বটে, কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়েই তাঁর রাগ—আমাকে এত আগে কেন আনলে সুরেন? বিয়ের ত' এখনো ক'দিন দেরী আছে?

সুরেন্দ্রনাথ হেসে বললেন—আমাদের সঙ্গে খাটবে না একটু?

—এ মাসের লেখা এখনো দেওয়া হয় নি জানো?

—ও আর নতুন কি! সম্পাদক এসে তোমার বাড়ীতে বসে ধর্ণা না দিলে ত' তুমি লেখা দাও না!

—না না, কি রকম অপদস্থ হতে হবে আমাকে জানো না!

—অপদস্থ হতে হবে কেন? তুমি এখানে লেখ না, আমি তোমার লেখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

শরৎচন্দ্র এ কথায় বিশেষ শান্ত হলেন না; তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন—ভারি ক্ষতি হয়ে গেল আমার, তোমরা বুঝছ না সে কথা! কেন তোমরা এত আগে আসবার জন্যে 'তার' করলে আমাকে? আমি সব কাজ সেরে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হতাম!

পরের দিন সকালে তিনি লিখতে বসলেন, বাঁ হাতে গড়গড়ার নল, ডান হাতে ফাউন্টেন পেন, চোখে চশমা, সামনে টেবিলের ওপর লেখার প্যাড।

সুরেন্দ্রনাথ ছেলেদের বলে দিয়েছেন—শরৎ লিখছে, গোলমাল করবে না বা ওদিকে যাবে না।

কৌতূহলী ছেলের দল আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে শরৎচন্দ্রের লেখা দেখছে।

শরৎচন্দ্র দু' চার লাইন লিখছেন, লেখা বোধ হয় মনের মত হচ্ছে না—অমনি পাতাটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। এমনিভাবে, কয়েক লাইন করে লেখা খান পাঁচ ছয় পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

—কি শরৎ, লিখলে না? জিগগেস করলেন সুরেন্দ্রনাথ।

—নাঃ, লেখা আসছে না।

—তোমারও এরকম হয় নাকি?

—খুব হয়! কখনো কখনো ত' এমন হয় যে দিনের পর দিন কলম ছুঁতেই পারি না।

ক্রমে 'পথের দাবীর' প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

শরৎচন্দ্র বললেন—'পথের দাবীর' যে শেষ পর্যন্ত কি দশা হবে জানি না।

—কেন?

—প্রতি মাসের লেখা সরকারের অবগতির জন্যে ইংরিজীতে অনুবাদ করা হয়। অনুবাদক ত' এরই মধ্যে চেঁচামেচি সুরু করে দিয়েছেন—দাদা, একটু সামলে লিখুন, বড্ড কড়া হয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা আরো গড়িয়েছে। সেদিন প্রেণ্টিস আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল; খাতির করে বসিয়ে বললে—মিষ্টার চ্যাটার্জি, বাংলাদেশের আপনি একজন নামকরা লেখক; সরকার আপনার ওপর অনেক আশা রাখেন।

আমি জিগগেস করলাম—কি রকম আশা?

সে বললে—সরকার আশা করেন, আপনার লেখার ভেতর দিয়ে লোকের মনে সরকারের প্রতি আস্থা হবে। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যে সত্যিই এ দেশের মঙ্গল কামনা করেন এবং এ দেশের ভাল করার জন্যে যে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন—এ বিশ্বাস লোকের মনে যাতে দৃঢ় হয়, আপনার লেখার ভেতর দিয়ে আপনি সরকারকে সে বিষয়ে সাহায্য করবেন। আপনার এ কাজ যে অপুরস্কৃত থাকবে না সরকারের তরফ থেকে এ আশ্বাস আমি আপনাকে দিচ্ছি।

—তুমি কি উত্তর দিলে? জিগগেস করলেন সুরেন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্রের মুখে মৃদু হাসি, বললেন—কি আর উত্তর দোব? বললাম—আমার সম্বন্ধে সরকারের দেখছি একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে।

প্রেণ্টিস বললে—ভুল ধারণা? কি রকম?

আমি বললাম—লেখাই আমার পেশা বটে, কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বানিয়ে লিখি না, যা সত্য বলে জানি তাই লিখে থাকি; আমার তরফ থেকে এই কথাটা আপনি দয়া করে সরকারকে জানিয়ে দেবেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

কপোত-দূত

বেঞ্জামিন ডিসরেলী

['The Carrier Pigeon' নামক গল্পের অনুসরণে লিখিত]

যদিও উপত্যকার উদার বুকে ঘনিয়ে এসেছিলো গোধূলির কালোছায়া, নদীর অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল শুধুমাত্র একটা তরঙ্গায়িত ধ্বনির মাধ্যমে। সুউচ্চ স্থানে অবস্থিত শার্লয় প্রাসাদের প্রাকার ও তৎসংলগ্ন ভূমি কিন্তু তখনও অস্তগামী সূর্যের রক্তিম বর্ণাভা গায়ে মেখে নিয়ে ঝলমল করছিল। মনে হচ্ছিল, যেন বিপরীত পার্শ্বের ব্রাঁসিমন্ট প্রাসাদের দিকে চেয়ে চেয়ে ওটা বিজয়ীর হাসি হাসছে। শেষোক্ত প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল উপত্যকার পশ্চিম অংশে, উঁচু উঁচু মিনার ও বুরুজ সমন্বিত একটা সুবৃহৎ কাল পাথরের স্তূপ যেন আকাশের পটভূমিতে সুতীক্ষ্ণ স্পষ্টতায় প্রতিফলিত।

এই দু'টি প্রখ্যাত প্রাসাদের শক্তিমান ভূস্বামিগণের ভিতর বংশ-পরম্পরাক্রমে বর্তমান ছিল তীব্র শত্রুতার সম্বন্ধ; কিন্তু সম্প্রতি এই দীর্ঘপালিত বৈরিতাও যেন তার চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল, কারণ, মাত্র কিছুদিন পূর্বে শার্লয় প্রাসাদের একমাত্র পুত্র ব্রাঁসিমন্টের ভূতপূর্ব ব্যারনের হাতে মৃত্যুবরণ করে এক ক্রীড়াযুদ্ধে ও শোকসন্তপ্ত পিতা শার্লয়ের বর্তমান ভূস্বামী প্রতিহিংসা সাধনার্থে অনিচ্ছুক হত্যাকারীকেও সঙ্গে সঙ্গে বধ করেন।

তথাপি যদি কোনও পথিক এইদিন সন্ধিক্ষণে ক্ষণেক বিশ্রাম তরে এই জায়গায় কিছুক্ষণের জন্যও থামেন। চতুর্দিকের অপূর্ব পারিপার্শ্বিকে চোখ ফেরান, তাহলে তাঁর পক্ষে উপলব্ধি করাও কঠিন যে, মানব-হৃদয়ের তীব্রতম জুগুপ্সা নিজের লীলাক্ষেত্র হিসাবে এই মনোরম শান্ত পরিবেশটিকে বেছে নিয়েছে।

সূর্যাস্ত হয়েছে, কম্পিত ও উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা ব্রাঁসিমন্টের আঁধার চূড়াগুলির উপর ভেসে উঠেছে। নদীর অপর কূল হতে ভেসে আসছে শার্লয়ের গির্জার মধুর ঘণ্টাধ্বনি। সেখানকার সদ্যমৃত তরুণ উত্তরাধিকারীর মরদেহ যে সুন্দর সমাধি স্থানে চিরবিশ্রামে শায়িত তারই উদ্দেশে নিবেদিত ঐ ধর্মসংগীতধ্বনি।

নিহত পুত্রের জন্য প্রাসাদের মাইলখানেক দূরে নির্মাণ করিয়েছেন ভগ্নহৃদয় পিতা এক মনোরম কাষ্ঠাচ্ছাদিত সমাধি মন্দির।

এই মধুমুহূর্তে, মধুরতর আকৃতির এক কুমারী নির্গত হলেন শার্লয়ের প্রাসাদসীমার অন্দর থেকে; 'লেডি ইমোজেন,' দুঃখসন্তপ্ত শার্লয় স্বামীর একমাত্র কন্যা ও একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান।

কুমারীর সঙ্গে একটিমাত্র পরিচারক যে বহন করে এনেছে তাঁর প্রার্থনা পুস্তকখানি।

সমাধিস্থানে না পৌঁছান অবধি চড়াই ভেঙ্গে ভেঙ্গে অগ্রসর হলেন কুমারী।

সমাধি বেদীটি আলোক পরিপূর্ণ, তার চারপাশে কিছু কিছু লোক নতজানু অবস্থায় রয়েছেন, বিশ্বস্ত সেই সব মুখ তাদের শ্রদ্ধেয়া মহিলাটির পূর্বপরিচিত।

কুমারীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একজন ধর্মযাজক যাঁর মস্তকাবরণটি মুখের উপর নামানো ও দেহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত অঙ্গাবরণে, কুমারীর হাতটি ধারণ করলেন ও সমাধি সম্মুখে রক্ষিত পবিত্র বারিতে তাঁর অঙ্গুলিগুলি সিক্ত করে নিলেন।

সে সময় করধৃত অঙ্গুলির উপর একটা মৃদু চাপও অনুভূত হ'ল।

সমবেত অপরাপর ব্যক্তিবর্গের অলক্ষ্যে, এক রক্তিম আভা জেগে উঠল লেডী ইমোজেনের কপোলে, কিন্তু আত্মসংবরণে অভ্যস্তা হওয়ার জন্য বা পবিত্র সমাধির উপর গভীর শ্রদ্ধাবশত আর ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশ পেল না, উন্নত বেদীমূলে উপনীতা হয়ে প্রার্থনায় যোগদান করলেন তিনি।

শোকানুষ্ঠান সমাপ্তিতে সমবেত সকলেই গাত্রোত্থান করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে লেডী ইমোজেন রয়ে গেলেন তখনও এবং ভ্রাতার সমাধির পাশে নতজানু হলেন।

এক ক্ষীণ গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে, যাতে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তাঁর পাশেই আরও একজন উপস্থিত রয়েছে।

শীঘ্রই পূর্বোক্ত ধর্মযাজককে দেখা গেল কুমারীর পাশেই নতজানু অবস্থায়।

'লোথেয়ার', ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন, কুমারী ঠিক যেন প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করছেন এমন ভঙ্গীতে, লোথেয়ার—প্রিয়তম তুমি বড়ই দুঃসাহসী।

ইমোজেন—তোমার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি, রুদ্ধকণ্ঠের উত্তর এল।—আমাদের আশা পূরণের জন্য যদিও তা দুরাশা মাত্র, আমি সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতিনী।

ভয় পেয়ো না, আমার প্রার্থনা রীতি দেখে পুরোহিত কিছু ধরতে পারেন নি; এই সুবর্ণ মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে অনুমতি দাও, আমি আগে যা অনুরোধ করেছি তারই পুনরাবৃত্তি-করছি আবার। ইমোজেন তোমার পিতা কখনই সম্মতি দেবেন না, কাজেই পালানো ছাড়া কোন উপায় নেই প্রিয়তমে, এসো আমরা পালাই।

ওঃ—লোথেয়ার তা কি করে সম্ভব? কোথায় পালাব আমরা? প্রাণ—আমার, মিনতি করি শোন—চল ইটালীতে যাই। আমার জ্ঞাতিভ্রাতা মিলানের ডিউকের এলাকায় আমরা

সুখে শান্তিতে বাস করতে পাবব। আমি কি তোয়াক্কা করি ব্রাঁসিমন্ট প্রাসাদ ও তার ঐশ্বর্যের? আর আমার প্রজারাও বিশ্বস্ত, যদি কখনও উপযুক্ত সময় আসে তখন আমরা সানন্দে ফিরে আসতে পারি, তাহলে প্রিয়তমে—বিশ্বাস কর আমার পূর্বপুরুষের ভূমিতে আমারই নিশান উড়বে।

লেডী ইমোজেন উঠে দাঁড়িয়ে সমাধিবেদীকে অভিবাদন জানালেন।

'কাল—ঠিক এই সময়' ফিস্ ফিস্ করে বলল লোথেয়ার। সম্মতিসূচক শিরোনমন করলেন লেডী ইমোজেন, তারপর পরিচারকের সঙ্গে সমাধিস্থান ত্যাগ করে গেলেন।

ওঃ, লোথেয়ার কেন আমাদের দেখা হয়েছিল? কেনই বা সাক্ষাৎ-এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরস্পরের কুলগত বিদ্বেষে অনুপ্রাণিত হইনি? আমার হৃদয় বিভ্রান্ত, এই অপরিসীম যাতনাই কি প্রেম? তবু আমি তোমায় ছাড়তে পারি না'।

লেডী পরিচারক এগিয়ে এল, পুরোহিত মহাশয় আসছেন।

'মাননীয়া কুমারী' তরুণ ভৃত্যটি নিবেদন করল, প্রাসাদে ফিরে আমার মনে অশুভ শঙ্কা জাগছে, সমাধিভূমি ত্যাগ করার সময় শিকারী রাফাসকে যেন দেখতে পেলাম বনে লুকিয়ে পড়তে।

হায়—সে তো আমার পিতার অতি বিশ্বস্ত অনুচর, তাঁর

আদেশে সে সব কিছুই করতে পারে অকুণ্ঠ চিত্তে। একটা দুঃসাহসী শয়তান।

অন্ধকারে লোকটা আবার মার্জারের মতই দেখতে পায়। তরুণ থিয়োডোর মন্তব্য করল।

আমার অতি শৈশবেও আমি কোনদিন ওকে পছন্দ করতে পারি নি, লেডী ইমোজেন বলে উঠলেন। ঠিক দেখেছ তো—যে [illegible] লুকিয়ে পড়ল ?

তাই তো মনে হল মহাশয়া।

ওঃ থিয়োডোর, তুমি ছাড়া আমাদের আর কোন বন্ধু নেই, আর তুমি তো একটি কিশোর ভৃত্য মাত্র।

আমার আপশোস হয় আমি কেন একজন বীর যোদ্ধা হলাম না, কুমারী, তাহলে তো আপনার জন্য লড়তে পারতাম।

আমি তোমায় নিশ্চয় করে বলছি, বললেন লেডী ইমোজেন, ছোট্ট থিয়োডোর তোমার হৃদয় সাহসিকতায় পূর্ণ। হে মা মেরী, আমি তোমার শরণ নিলাম, দেখো যেন সব বিপদ আপদে আমার উজ্জ্বল নয়ন লোথেয়ার রক্ষা পায়।

লর্ড ব্রাঁসিমণ্টের মতন উন্নত বীরপুরুষ আর কখনও দেখি নি আমি, থিয়োডোর বলে ওঠে, আমি যদি তাঁর পার্শ্বচর হতে পারতেম।

সব যদি মঙ্গল মত চলে—তবে আমার ছোট থিয়োডোর একদিন তার মনোরথ পূরণ করতে পারবে।

ওঃ—কি আনন্দেরই না দিন হবে সেদিন, যেদিন আমি চাদরের বদলে তরবারি বহন করতে সক্ষম হব। মাননীয় কুমারী, সত্যই কি তবে আমি একদিন তাঁর পার্শ্বচর হ'ব ?

নিশ্চয়—আমার তো মনে হয় সে কর্তব্যের দায়িত্ব তুমি খুব সুচারুরূপেই পালনে সমর্থ হবে।

আমি যদি প্রভু ব্রাঁসিমণ্টের মতন বীর যোদ্ধা হতুম, কি দীর্ঘ তাঁর আকৃতি যেন বর্শার ফলা, সিংহের মতই সাহসী তিনি ; আর, আর কি সুন্দর দাড়ি।

সত্যই সুন্দর দাড়ি—থিয়োডোর, বললেন কুমারী ইমোজেন, তোমার কতদিনে দাড়ি গজাবে ?

সম্ভবত আর এক বছরের মধ্যেই, থিয়োডোর বলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের নির্লোম মুখমণ্ডলে হাত বোলাল সে।

আর একবছরে ? সহাস্যে উত্তর করেন লেডী ইমোজেন, আরে আমি ও তো ততদিনে একটা দাড়ি গজিয়ে ফেলতে পারি।

আপনি তো প্রভু ব্রাঁসিমণ্টের টাই পেতে পারেন, কিশোর ভৃত্য উত্তর করল।

আমেন, সায় দিলেন কুমারী।

কিশোর থিয়োডোরের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল। শার্লয় সমাধিস্থলে ব্রাঁসিমণ্টের সঙ্গে লেডী ইমোজেনের সাক্ষাৎ-এর পরবর্তী প্রভাতে কুমারীর তলব এল পিতার কাছ থেকে। বংশগত মহাশত্রুর সঙ্গে গোপন মিলনের জন্য তিক্ততম তিরস্কারের বন্যা বয়ে গেল তাঁর উপর দিয়ে, তারপর প্রাসাদ চূড়ার এক কক্ষে আবদ্ধ রাখা হ'ল তাঁকে, যেখানে থেকে প্রহরিণী ব্যতীত এক পা বেরুবার স্বাধীনতা রইল না তাঁর। ওই কর্তব্যপরায়ণা ভীষণা বৃদ্ধা পরিচারিকার সঙ্গে দীর্ঘ প্রশস্ত অলিন্দে পাদচারণার অনুমতি রইল শুধু। তাঁর কিশোর পরিচারক তিরস্কৃত হওয়ার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল আগেই, আর কুমারীর চিত্তবিনোদনের জন্য অবশিষ্ট রইল তাঁর ম্যাণ্ডোলিনটি মাত্র। প্রাসাদশীর্ষে যে বুরুজটির উপরিস্থ কক্ষে বন্দিনী ছিলেন ইমোজেন তা এতই দুরারোহ যে, সেখানে পৌঁছনো দুরধিগম্য বলেই বিবেচিত হ'ত।

সেজন্যই কক্ষ পার্শ্বস্থ অলিন্দটি ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া হয় নি তাঁকে ; অলিন্দটি উন্মুক্ত ছিল।

সেখান থেকে শার্লয়ের সীমার অন্তর্গত সুন্দর বনভূমিই কেবল তাঁর দৃষ্টিগোচর হ'ত। ব্রাঁসিমণ্ট প্রাসাদ যাতে তাঁর চোখে না পড়ে সেরূপ সতর্কতার সঙ্গেই কারাকক্ষটি নির্বাচন করেছিলেন তাঁর অভিভাবক। উপত্যকার সচল জীবনযাত্রা দেখবার উপায় ছিল না তাঁর। প্রায়ই একটি মানুষও চোখে পড়ত না দিবাবসানে।

নিস্তব্ধ বনানীর দিকে চেয়ে থাকতেন অসুখী কুমারী আর বীণার তারে ঝঙ্কার তুলতেন হৃদয়াবেগকে প্রকাশার্থে। একটি অশান্তিময় সপ্তাহ প্রায় কেটে গেল এইভাবে। একদিন মধ্যাহ্নে নিজকক্ষে বসেছিলেন লেডী ইমোজেন, করলগ্ন কপোলে চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিলেন ; স্বপ্ন দেখছিলেন অন্তরতম লোথেয়ারের, হঠাৎ একটা ঝটপট আওয়াজে সচকিতা হয়ে উঠলেন, সাশ্চর্যে চেয়ে দেখলেন ঘরের মধ্যের উঁচু চেয়ারটার মাথায় বসে আছে একটি সুন্দর পাখী ; তুষারের চেয়েও সাদা রং-এর একটি কপোত, তার চক্ষু সুদৃঢ়, চোখের মণি দু'টি জ্বলছে নানা রং-এর দ্যুতি বিকীর্ণ করে।

লেডী ইমোজেনকে এগিয়ে আসতে দেখেও ভয় পেল না সুন্দর পাখীটি, বরং সন্ধানী কোমল চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে পাখা ঝাড়া দিল।

লেডী ইমোজেন বন্দী জীবনে এই প্রথম সানন্দ বিস্ময়ের হাসি হাসতেন, আর ওই তুষার-শুভ্র পাখীর পাখার চেয়েও শুভ্র হাতটি বাড়িয়ে প্রফুল্ল আগন্তুকের উজ্জ্বল গ্রীবায় রাখলেন ও ধীরে ধীরে ওর পাখায় করাঘাত করলেন।

ঈশ্বর—আমাকে একটি বন্ধু পাঠিয়েছেন, বলে উঠলেন মনোরমা ইমোজেন। এ কি! এটা আবার কি?

আপনি কি ডাকছিলেন, মাননীয়া কুমারী? মার্থার শীতল কণ্ঠ শোনা গেল, কুমারীর গলার আওয়াজে যে দ্বারপ্রান্তে উপনীতা হয়েছিল।

না-না-কিছু নয়, আমি কিছু চাই না, ত্বরিতে উত্তর করলেন ইমোজেন, পাখীটিকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মার্থার প্রশ্নের জবাব দিলেন। ও কি তোকে দেখতে পেয়েছে, মাণিক আমার? সুরু করলেন বিচলিতা তরুণী। দেখতে পেয়েছে কি আমার ছোট্ট সোনাটাকে?

আমার তো মনে হয় পায় ন, বলতে বলতে মৃদুতম পদসঞ্চারে এগিয়ে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন বন্দিনী।

তারপর পাখীটিকে তার মধুর আশ্রয় থেকে বাইরে এনে, একটা চিঠি খুলে নিলেন সেটার বাঁদিকের পাখার তলা থেকে, এক লহমা চেয়েই বুঝতে পারলেন পত্রলেখক তাঁরই প্রিয়তম লর্ড ব্রাঁসিমণ্ট ব্যতীত কেউ নয়।

কুমারীর চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কপোলযুগল থেকে রক্ত অন্তর্হিত হল, মনে হল শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। উপরে অসীম উন্মুক্ত নীল আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল হস্তগত পত্রটির উপর, শত শত চুম্বনে অভিনন্দিত করলেন চিঠিটিকে—তারপর প্রাণপণ প্রয়াসে স্থৈর্য অবলম্বন করে সেটির বিচিত্র ও মধুর বিষয়বস্তুতে মনোনিবেশ করলেন:—

ইমোজেনের উদ্দেশে লোথেয়ার:—

"আমার জীবনাধিক—'মিগনন' যার প্রতি তুমি অবিচল আস্থা স্থাপন করতে পার, আমার প্রেমের এই স্বাক্ষরটুকু বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ইমোজেন আমি তোমাকে ভালবাসি, এই পাখীটার কাছে মুক্ত নভতল যত না প্রিয়, তারচেয়েও তুমি প্রিয়তর আমার কাছে। পাখীটিকে সহস্র চুম্বন দিও, যাতে ফিরে ওকে চুম্বন করে দূর থেকেও আমি তোমার দেহের সুরভিত ঘ্রাণ পেতে পারি।

প্রিয়তমে—তোমার মুক্তি ও আমাদের সম্মিলিত সুখের জন্য উপায় নির্ধারণ করছি আমি। প্রত্যহ 'মিগনন' তোমার কাছে যাবে সেই সম্বন্ধীয় খবরাখবর বহন করে, আর প্রতিদিনই ফেরার সময় নিয়ে আসবে তোমার কাছ থেকে কিছু না কিছু স্মারকচিহ্ন আমাদের বিশ্বস্ত প্রেমের স্বাক্ষরে যা সমুজ্জ্বল।"

—লোথেয়ার

পত্রটি পঠিত হ'ল, বারবার পঠিত হ'ল উদগ্র আনন্দের উচ্ছ্বসিত অশ্রু নিষিক্ত হয়ে। হাজার বার আলিঙ্গন করলেন ইমোজেন, বিশ্বস্ত 'মিগনন'কে।

পাখীটিকে কাছছাড়া হতে দিতে সক্ষম হতেন না তিনি, যদি না জানতেন যে সমস্তক্ষণ তাঁর লোথেয়ার উৎকণ্ঠ হৃদয়ে ওটার প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে আছে।

খাতা থেকে একটি পাতা খসিয়ে নিয়ে, নিজের ব্যাকুলতাকে ভাষা দিলেন কটি কথার মাধ্যমে, তারপর কপোতটির পাখায় সযত্নে লিপিটুকু বেঁধে দিয়ে, বহন করে নিয়ে গেলেন তাকে বাতায়ন সান্নিধ্যে, শেষবারের মত 'মিগনন'কে একবার আলিঙ্গন করলেন, তারপর ছেড়ে দিলেন তাকে আকাশের বুকে মনোরম পাখাদু'টি আবার সঞ্চালন করতে।

উজ্জ্বল সূর্যালোকের দিকে চেয়ে দেখল একবার ঐ শ্বেত-পা... তারপর ভেসে গেল নীল আকাশের মাঝে। যতক্ষণ পর্যন্ত উজ্জ্বল আকারটিকে দেখা গেল, চেয়ে রইলেন ইমোজেন অপলক ... ; ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে হতে দূর আকাশের বুকে এক সময় মিলিয়ে গেল 'মিগনন'। শার্লয়ের সুন্দরী বন্দিনীটির একমাত্র কাজ হ'ল এখন তাঁর প্রহরিণীকে যথাসম্ভব কম নিজের ঘরে ঢুকতে দেওয়া; আর শুধু সেই সময়টুকুতে দেওয়া যখন 'মিগননে'র আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনা মাত্র নেই। এই সুন্দর পাখীটি তার প্রাত্যহিক যাওয়া আসার কাজটুকু বিশ্বস্ত ভাবেই করে যাচ্ছিল, আর তার সাহায্যে নিজের মুক্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় খবরাখবর লোথেয়ারের সঙ্গে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে অবগত হচ্ছিলেন লেডী ইমোজেন।

প্রেমাসক্ত তরুণ-তরুণী হাজার রকম উপায় উদ্ভাবন করছিলেন আবার অসম্ভব বোধে সেগুলো পরিত্যক্তও হচ্ছিল। একবার প্রহরিণী মার্থাকে উৎকোচদানে বশীভূতা করার পরিকল্পনা করা হ'ল, আবার ঠিক হ'ল যে, বালক ভৃত্য থিয়োডোরকে বালিকা সাজিয়ে কোন রকমে কুমারীর পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত করা হবে; কিন্তু সম্যক চিন্তার পর অবাস্তব বোধে কোনটাই কার্যে পরিণত করাটা সম্ভব হ'ল না, এই ভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যেই কেটে গেল আর এক সপ্তাহ।

দ্বিতীয় সপ্তাহটি কিন্তু প্রথমটির মত নৈরাশ্য জাগালো না, বরং তীব্র আশা সঞ্চার করলো প্রণয়ীযুগলের হৃদয়ে প্রতিদিন লোথেয়ারের প্রেরিত প্রণয়বাণী শুনতে পেয়ে ও উত্তরে নিজের বিশ্বস্ত হৃদয়ের বার্তা তাকে জানাতে পেরে কুমারীর বন্দী জীবনের মুহূর্তগুলি মধুময় হয়ে উঠলো।

কিন্তু নিয়তি যা প্রায়শ সত্যকার প্রেমের প্রতি অনুকূল হয় না, তারই নির্দেশে নিরূপিত হল যে ওদের সান্ত্বনা লাভের মধুর মাধ্যমটিও আর নীলাকাশে পক্ষ বিস্তার করতে সমর্থ হবে না।

শিকারী রাফাসের শ্যেনচক্ষু একদিন আবিষ্কার করল পারাবত-দূতটিকে প্রাসাদশীর্ষস্থ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময়। তার অভিজ্ঞ মনে ধরা পড়ল যে কপোতটি বার্তাবাহী, সাধারণ নয়, সে ওটার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'ল।

হাঃ হাঃ, ব্রাঁসিমণ্টই কি তোমার গন্তব্যস্থল? ছোট্ট পাখীটি আমার, মনে হচ্ছে তোমার বাহিত বার্তাটি দেখতে পাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

পর পর দু'দিন কেটে গেল, আর দু'দিনই 'মিগননে'র আসা যাওয়া চোখে পড়ল রাফাসের এবং তারপর একদিন শিশিরসিক্ত প্রত্যূষে, নিজের তীর ধনুটি গুছিয়ে নিয়ে ব্রাঁসিমণ্ট প্রাসাদের দিকে যাত্রা করল সে।

ওর অনুমানকে সত্য প্রতিপন্ন করে শীঘ্রই 'মিগনন' দেখা দিল নীল আকাশের বুকে। সুন্দর অতি সুন্দর পাখী বিশ্বস্ত অনুরাগী

প্রেমের দূতকে সন্দেহমাত্র করতে পারে যে নিজের সান্ত্বনাদায়ক দৌত্যের মর্ম তোমার অপরিজ্ঞাত? অসুখী হৃদয়ে তুমি আনন্দের বার্তা পৌঁছে দাও, হতাশ মনে আশা সঞ্চারিত কর।

কুমারী তোমাকে চুম্বন প্রদান করবেন দীপ্তকায় 'মিগনন,' তাঁর একটি অধরের আলিঙ্গন লাভ করবে তুমি, যে অধর স্বর্গলোকে প্রথম শিহরের চেয়েও মধুরতর, আর তাই হবে তোমার যোগ্য পারিশ্রমিক।

আর প্রকৃতপক্ষে তখনই লেডী ইমোজেন অভ্যস্ত স্থানটিতে দাঁড়িয়ে চেয়েছিলেন মেঘমুক্ত আকাশের দিক, প্রত্যাশাপূর্ণ নেত্রে অপেক্ষা করছিলেন পরিচিত ক্ষুদ্র আকারটির আবির্ভাবের, যার ইঙ্গিত-মাত্রই তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠত এক অভূতপূর্ব আলোড়ন।

হায়—বাতাসের মধ্য দিয়ে ছুটে গেল এক জ্যামুক্ত তীর, এমন সন্ধানীশর যা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, 'মিগনন' যা তোমার দ্রুততম গতিকেও পরাস্ত করতে সক্ষম।

সর্পের আকস্মিক দংশনের চেয়েও যা ভয়াবহ তাই স্পর্শ করল তোমাকে, বিদ্ধ করল তোমার অপরূপ বক্ষ।

হে—আলাউদ্দিনের আশা, কোন মহৎ প্রাণ কি ছিল না তখন তোমাকে রক্ষা করার জন্য? হায়—ঈশ্বর তোমার বক্ষ ভেদ করে রক্তধারা বেরিয়ে এল, তোমার সুন্দর চঞ্চুর পাশ দিয়েও গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা রক্ত, তোমার উজ্জ্বল স্বচ্ছ চোখ দু'টির দৃষ্টি হয়ে গেল স্তিমিত, সব শেষ; কপোত-দূত লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে।

দিনের মধ্যে একবার অন্তত লোথেয়ারের সংবাদ না পাওয়াটা ছিল মৃত্যুতুল্য, অথচ যখন প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও দেখা দিল না 'মিগনন'; ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যাকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অবসন্ন হয়ে এল চক্ষু, আতঙ্ক ও হতাশায় উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠলেন লেডী ইমোজেন।

দিবালোকের আভাটুকু বর্তমান থাকা পর্যন্ত একটা ক্ষীণ আশায় স্পন্দিত হচ্ছিল কুমারীর হৃদয়, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যখন উন্নত পর্বতমালার অস্পষ্ট রেখা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র রইল না, নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। নিজের কক্ষতলে আছড়ে পড়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন।

সব কি প্রকাশ পেয়েছে? লোথেয়ার কি বিস্মৃত হয়েছেন? নিষ্ফল প্রচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাঁর প্রেমিক কি তাঁকে ভাগ্যের হাতে ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন?

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল, যেন একটা কিছু পড়ল কক্ষ মধ্যে। চেয়ে দেখলেন কুমারী। পাশেই পড়ে রয়েছে পাথরের টুকরোয়-বাঁধা একটি লিপি। ঘরের মধ্যে যেটি ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষণপূর্বে।

আনন্দে চমকে উঠলেন তরুণী। নিজেকে অভিশাপ দিলেন মুহূর্তের জন্য ও প্রেমিকের বিশ্বস্ততায় সন্দেহারোপ করেছেন বলে।

চিঠিটি ব্যগ্রহাতে খুলে ফেললেন, কিন্তু এত বেশী উত্তেজিতা হয়ে পড়েছিলেন যে, পত্রের মর্মোদ্ধার করতে কিছু সময় লাগল।

অবশেষে বুঝতে পারলেন যে, পরদিন লোথেয়ার ও বালক থিয়োডোর শার্লেয়ের শিকারীর ছদ্মবেশে যে কোন উপায়ে উপনীত হবে তাঁর কক্ষ-বাতায়ন সমীপে, তাঁকে সাহস অবলম্বন করে অবতরণ করতে হবে সেখানে।

মতলবটা অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক। মরিয়া না হলে এ ধরণের কাজ করে না কেউ, কিন্তু জীবনে এমন ক্ষণ আসে যখন সফল হতে গেলে মরিয়া হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

লেডী ইমোজেন দুর্বল স্বভাবা নারী ছিলেন না। তাঁর হৃদয় ছিল খাঁটি রমণী-হৃদয়, প্রেমের জন্য সব-কিছুই করতে সক্ষমা ছিলেন তিনি।

মাটি থেকে নিজের কক্ষের উচ্চতা কত পরীক্ষা করে দেখলেন কুমারী, চতুর্দিকে অবলোকন করলেন, অবতরণের উপায় অন্বেষণে, গাত্রাবরণী, পোষাকসমূহ, শয্যাস্তরণ প্রভৃতির দিকে চোখ পড়ল, এই তো প্রয়োজনীয় উপকরণ, এতেই তো নিহিত মুক্তির আশা।

এই সব চিন্তায় বিভোর হয়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত সংবাদপ্রেরণের পরিবর্তিত রীতি সম্বন্ধে অবহিতি হল না, কিন্তু হঠাৎ সচেতন হলেন সে সম্বন্ধে। 'মিগনন' কোথায় গেল? কিন্তু চিঠির লেখা তো লোথেয়ারেরই। সে তো তাঁর ভুল হবার নয়। হয়ত সে ভাবে দেখলে তিনি দেখতে পেতেন যে, অক্ষরগুলি অস্পষ্ট দেখাচ্ছে, কাগজটাও মলিন কিন্তু এ-সব কিছুই চোখে পড়ল না ওঁর। লোথেয়ারের বুদ্ধির উপর অবিচলিত আস্থা ছিল তাঁর, তিনি নিঃসংশয় ছিলেন।

পবিত্র কুমারীর মূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় সফলপ্রযত্ন হওয়ার জন্য আকুল প্রার্থনা জানালেন তরুণী। তারপর সারাদিনব্যাপী উত্তেজনায় ক্লান্ত দেহ লেডী ইমোজেন ঢলে পড়লেন গভীর নিদ্রার কোলে।

প্রভাত হল একসময়ে কিন্তু 'মিগননের' দেখা নেই। নিশ্চয় কিছু কারণ আছে, ভাবলেন কুমারী, লোথেয়ারের কোন ভুল হতেই পারে না, আর আশা করি শীঘ্রই দূতের প্রয়োজন হবে না আমাদের।

আঃ—ওঁর বন্দিজীবনের শেষ দিনটি কি বিরক্তিকর রূপেই না দীর্ঘ।

রাত্রি কি আসবে না কিছুতেই—যে রাত্রিকে এতাবৎ তিনি ভীতির চোখে দেখেছেন? হায় দিবাকর, তুমি কি আজ অস্তমিত হবে না? সূর্যালোক তো আর আনন্দ সঞ্চার করছে না।

যদিও ছায়াপাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে, তবুও তোমার সুগোল আকার আকাশের বুকে মধ্যাহ্নের মতই অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান।

পাখীদের অবিরাম কাকলি যা সব সময়েই সান্ত্বনাদায়ক মনে হত, এখন তাঁকে অধিকতর অধীরা করে তুলছে।

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন চঞ্চল হৃদয়ে, যে পর্যন্ত না রক্তাভ নভতলে সাড়া জাগলো দিবাবসানের, আর সন্ধ্যাতারা দর্শন দিল অভ্যস্ত স্থানটিতে।

গোধূলি ঘনিয়ে এল, কক্ষতলে পদচারণা করতে করতে ও প্রার্থনা-বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অবশেষে বিলীন হয়ে গেল ক্লান্তিকর প্রহরগুলি।

প্রার্থনাগারের ঘণ্টাধ্বনিতে রাত্রির পদক্ষেপ ধ্বনিত হল।

ইতিমধ্যেই বস্ত্রখণ্ডগুলি জোড়া দিয়ে একটি রজ্জু প্রস্তুত করেছিলেন কুমারী, এবার সেটি সেই বাতায়নে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করে ঝুলিয়ে দিলেন নীচে;

৩০—৭

ঘণ্টাধ্বনিতে প্রহর ঘোষিত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে লেডী ইমোজেন নিজেকে সমর্পণ করলেন ভাগ্যের হাতে।

শঙ্কিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করতে শুরু করলেন উনি; বহুক্ষণ শূন্যে থাকার পর এক খণ্ড প্রস্তরে ঠেকলো ওঁর পদদ্বয়।

সাবধানে দাঁড়াবার স্থানটি অনুভব করে, এতক্ষণে একটু বিশ্রাম নিলেন ও চারদিকে চেয়ে দেখলেন। প্রায় কুড়ি ফুট মত নেবে এসেছেন উনি।

অবতরণের শেষাংশের উপর পড়েছিল দীপ্ত চন্দ্রালোক, মনে হ'ল সেটা অপেক্ষাকৃত কম দুরূহ, কুমারী ভূমিতে অবতীর্ণা হলেন।

সাবধানে মাননীয়া লেডী, পরিচিত কণ্ঠে ধ্বনিত হল, সব ঠিক আছে, কিন্তু আপনি আমাদের কোন জবাব পাঠালেন না কেন?

থিয়োডোর, আমার লোথেয়ার কোথায়?

ঐখানে গাছতলার অন্ধকারে আছেন প্রভু ব্রাঁসিমণ্ট,—আপনার হাতটি ধরতে অনুমতি দিন কুমারী; সাহস অবলম্বন করুন, সব ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের চিঠির একটা উত্তর দেওয়া উচিৎ ছিল আপনার।

শার্লয়ের ইমোজেন মিশে গেছেন ততক্ষণে ব্রাঁসিমণ্টের লোথেয়ারের বক্ষে।

আলিঙ্গনের সময় নেই এখন, বলে উঠলো থিয়োডোর, অশ্ব প্রস্তুত আছে। মা মেরীর কৃপায় কোন গোলযোগ হয় নি। সদ্য সদ্য নাইটহুড পাবার লোভেও আমি আর কোন দিন বিগত আটচল্লিশ ঘণ্টার অভিজ্ঞতা আস্বাদ করতে চাই না। 'মিগনন' কি আপনার কাছে আছে?

'মিগনন'—না তো, আজ দু'দিনের মধ্যে তার কোন চিহ্ন দেখি নি আমি। কিন্তু আমার চিঠি লোথেয়ার বলে উঠল, তুমি পাওনি সেটা?

সেটা তো আমার জানালার মধ্য দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, উত্তর করলেন লেডী ইমোজেন।

আমার যেন ভাল ঠেকছে না প্রভু—ছোট থিয়োডোর বলে উঠল।

পালান—পালান—আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবেন না। ঐ শুনুন পদশব্দ। এই পথে আসুন। আবার চীৎকার—পালান—পালান, প্রভু ব্রাঁসিমণ্ট আমরা ধরা পড়ে গেছি।

সত্যই চারিদিক থেকেই বিভিন্ন আওয়াজ জেগে উঠল এই সময়, প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমগ্র পরিবেশ।

লোথেয়ারের কণ্ঠলগ্না হলেন ইমোজেন। আমরা একসঙ্গে মরব, চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে মুখ লুকোলেন প্রিয়তমের বক্ষে।

একটা গাছের অঙ্গে ভর দিয়ে নিজের শক্তিশালী অসি কোষমুক্ত করলেন লোথেয়ার।

ওকে বন্দী কর—একটা কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, লেডী ইমোজেনের পরিচিত।

দস্যুটাকে বন্দী কর, সজোরে বলে উঠলেন ওর পিতা।

তোমরা নিপাত-যাও, চারধারের আততায়ীদের উদ্দেশে বললেন লোথেয়ার!

সেই ভয়ঙ্কর দলটি জোট বেঁধে উপস্থিত ছিল, পিতা ও তাঁর রক্তপিপাসু অনুচরবর্গ—যারা ব্রাঁসিমণ্টের সম্মুখস্থ হতে ও তাদের প্রভুকন্যার দেহে অস্ত্রাঘাত করতে সমভাবেই অনিচ্ছুক ছিল। মশালের রক্তবর্ণ ছটা ও রুপোলী চন্দ্রালোক সরাসরি পড়ল বন্দী ও তার বক্ষলগ্না প্রণয়িনীর পাণ্ডুর মুখচ্ছবির উপর। একটা মৃত্যু তুহিন স্তব্ধতা নেমে এল স্থানটিতে, ক্রোধান্ধ পিতার কণ্ঠ বেজে উঠল তার মাঝে, কাপুরুষের দল—একটি মাত্র বাহুকে এত ভয়? হত্যা কর ওকে, বিশ্বাসঘাতিনীকেও সেই সঙ্গে!

তথাপি অনুচরবৃন্দ স্থির হয়ে রইল, লেডী ইমোজেনকে তারা ভালবাসত আর সেজন্যই প্রভুভক্ত হওয়া সত্বেও আদেশ পালনে বিরত থাকতে সাহসী হ'ল।

তাহলে আমাকেই তোমাদের কর্তব্য শিক্ষার ভার নিতে হল, বিক্ষুব্ধ পিতা সোচ্চার হলেন।

অগ্রসর হলেন তিনি, কিন্তু একটা উদ্দাম আর্তনাদে সঙ্কুচিত হয়ে গেল তাঁর প্রসারিত তরবারি।

যুদ্ধোদ্যত অথচ নিষ্কম্প সেই ব্যক্তিবৃন্দের চোখের সামনে ছুটে এল একটি তীর, বিদ্ধ করল ব্রাঁসিমণ্টের বীর হৃদয়। করধৃত অসি খসে পড়ল তাঁর, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি।

হ্যাঁ—এ সেই তীর যা একদিন শেষ করে দিয়েছিল নভচারী মিগননের পক্ষ সঞ্চালন, আজ ঠিক সেইরকম অকস্মাৎই শেষ করে দিল তার প্রভু ব্রাঁসিমণ্টের জীবনপ্রবাহকেও।

ঘৃণ্য শিকারী রাফাস—এ তীর তোমারই।

শার্লয়ের প্রার্থনা ঘণ্টা আবার বেজে উঠেছে, কিন্তু তার যে মধুর ও উৎসাহপ্রদায়ক ধ্বনি শার্লয়বাসীদের সমবেত করে দিনান্তের প্রার্থনা সভায়, তার সঙ্গে আজকের এই ঘণ্টাধ্বনির কত প্রভেদ। হ্যাঁ শার্লয়ের ধর্মমন্দিরে আজ আবার বেজে উঠেছে ঘণ্টা—মৃত্যুর স্পর্শে অনুরণিত হয়ে।

হায়—সুন্দরী উপত্যকা তোমার আকাশ তোমার বাতাস এখনও ঠিক সেইরকমই নির্মল, ঠিক যেমনটি ছিল প্রণয়বিহ্বলা কুমারীর বিচরণের ক্ষণে; এখনও তোমার বুকে ঠিক সেইভাবেই প্রদীপ্ত ভাস্কর অস্তমিত হয় বীর যোদ্ধার সুদৃঢ় অবতরণের ভঙ্গিমায়, কিন্তু সেই কুমারী যে ছিল সকল সৌন্দর্যের রাণী আর কোন দিন লঘু পদক্ষেপে ধন্য করে তুলবে না তোমার কুসুমিত বনভূমিকে, আর কখনও তার সুধাস্রাবী কণ্ঠ ঝঙ্কার তুলবে না তোমার পাখীদের মধুর কূজনের সঙ্গে সঙ্গে, কারণ সে আজ মৃত; হ্যাঁ সুরূপা ইমোজেন আর নেই, তিনদিনব্যাপী দুঃখভোগের পর দেহত্যাগ করেছেন তিনি। কিন্তু দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ যে পুরোহিত আকৈশোর প্রভুকন্যার ধর্মাচরণের সাথী ছিলেন, তিনিই উপস্থিত ছিলেন কুমারীর মৃত্যুশয্যার পাশে আর তিনিই শুনিয়েছেন শোকাহত শার্লয়বাসীদের এক মধুর ও করুণ সান্ত্বনাবাণী।

কুমারীর মৃত্যুকালে কয়েকটি চিহ্ন দ্বারা তিনি নাকি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্বেত এক কপোতের বেশে ঈশ্বরের অপার করুণা নেমে এসেছিল শার্লয়ের ইমোজেনের শেষ যাত্রা সুগম করে তুলতে, টেনে নিতে ভাগ্যহতা কুমারীকে চির-শান্তির কোমল ক্রোড়ে।

অনুবাদিকা—রেবা দেবী।

মায়ের মমতা ও
অষ্টারমিল্কে
প্রতিপালিত
আপনার শিশু অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত বলেই এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, সদাই হাসি খুশী। কারণ অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতন। অষ্টারমিল্ক খাঁটি দুধ থেকে শিশুদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। সেজন্য সহজেই হজম হয়। শিশুদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড় মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে।
OSTERMILK
..মায়ের দুধেরই মতন
বিনামূল্যে অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্য্যার সবরকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায় 'অষ্টারমিল্ক' পোঃ বক্স নং ২২৫৭ কোলকাতা—১
OS. 9-X51-C. BG

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

মালাবার হোটেলের দিনগুলো ভুল আর মিথ্যে।

সে দিনগুলো আমার জীবনের মহা-অভিশাপ। আমার শেষ কথা এবার বলছি!

জানি না তুমি আজও যোগলেকারকে মনে রেখেছো কি না, বা তার জন্ম অপেক্ষা করছো কি না। তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে,—ভালোবাসার ভিত যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে হাজার ভুলের ঢেউও তাকে ভাঙতে পারে না।

অনেক দিন দেখিনি তোমায়। দেখতে বড় ইচ্ছে করে। আমি কন্যাকুমারী আর ত্রিবেন্দ্রম হয়ে আট দশদিনের ভেতরই এর্ণাকুলামে গিয়ে পৌঁছোবো। যদি সম্ভব হয়, আমার জন্যে কিছুদিন অপেক্ষা কোরো।

পুলক-বিষাদ মিলিত এক কুয়াসার ধূম্রজাল ধীরে ধীরে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে,আমার দেহ-মনকে। একবার, দু'বার,—বার বার পড়লাম কাবেরীদি'র চিঠিখানা। বুকের ভেতর আছাড়ি-পিছাড়ি করছে কান্না-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা।

যোগলেকারের সেই গোলাপ বাগিচা শুকিয়ে গেছে!

হায়! কেন এমন হলো? এর জন্যে দায়ী কে।

আমি এখন কি করবো? কি কর্তব্য আমার? অথৈ অন্ধকার সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিক যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না তার নির্ভুল পথের দিশা।

চিঠিখানা মাথার বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়লাম।

নিদারুণ চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত দেহ-মন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল ছিল না।

বল্লারশা'র সেই পাকদণ্ডি চড়াই পথে ছুটে চলেছি আমি।

উঠে এলাম উঁচু পথটায়। হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসছে সেই গোলাপের অপূর্ব সুরভি। আঃ!—বুক ভরে নিলাম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই মনমাতানো গোলাপ নির্যাসকে।

সামনে গেটের গায়ে সূর্যাস্তের রঙিন আলোয় জ্বলে উঠছে সেই পেতলের নেম-প্লেটটি,—যার ওপরে খোদাই করা "যোগরাজ যোগলেকার"।

গেট খুলে ব্যাকুল চিত্তে ছুটে চললাম ভেতরে।

—কিন্তু কোথায় সে গোলাপ বাগিচা? চারিদিকে জমেছে শুকনো পাতার রাশ। মাঝে মাঝে গোলাপ গাছগুলো শুকিয়ে মরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বড় বড় পাথরের স্তূপগুলো ঢাকা পড়ছে কাঁটা গাছ আর বুনো লতার তলায়।

উঃ! কি মর্মান্তিক দৃশ্য!

দু'হাতে চোখ ঢাকলাম আমি! কানে ভেসে এলো ভায়োলিনের করুণ কান্নার সুর। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চললাম সেই সুর মহালের দিকে।

হায়! এখানেও যে সেই মর্মঘাতী দৃশ্য। শুকনো মরা গোলাপ লতাগুলো তারের জালি থেকে নেমে—সাপের মত এঁকে বেঁকে, এদিক ওদিকে দোল খাচ্ছে।

একরাশ শুকনো পাতা আর আবর্জনার মাঝে দাঁড়িয়ে,—চোখ বুজে আপন মনে ভায়োলিন বাজাচ্ছে যোগরাজ যোগলেকার।

আমি আকুল স্বরে ডাকলাম—রাজা! যোগলেকার।

কোনো সাড়া এলো না।

আত্মমগ্ন হয়ে বাজিয়ে চলেছে ও।

কি করুণ মর্মভেদী সুর ঝরে পড়ছে ভায়োলিনের অন্তর ভেদ করে। মনে হচ্ছে ও সুর যেন ভায়োলিনের নয়। কোন বেদনার্ত হৃদয়ের আকুলকান্না ভেঙে পড়ছে ঐ সুর-মূর্চ্ছনার মাঝে।

আমি বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলাম ঐ বিষাদ সমাহিত মূর্তিটার দিকে।

কি চেহারা হয়ে গেছে ওর?

চোখের কোলে জমেছে মনস্তাপের কালিমা। রগের দু'পাশের চুলে সাদা ছোপের ছোঁয়া লেগেছে। দেহ হয়েছে শীর্ণ।

মনে হলো ওর যেন আরো দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

উঃ। মাগো।

এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন প্রাণটা আমার আর্তনাদ করে উঠলো।

ঘুমটাও পালালো চোখ ছেড়ে।

জানুয়ারীর হিম ঠাণ্ডাতেও প্রচুর ঘামে কপাল আর ঘাড়টা ভিজে গেছে অনুভব করলাম।

ঘরে জ্বলছে নীলাভ আলো। পাশের টেবিলে আমার রাতের খাবার, জল ঢাকা দেওয়া রয়েছে দেখলাম।

মারুতি হয় তো ডেকেছিলো আমায়, কিন্তু আমার সাড়া না পেয়ে শরীর খারাপ মনে করে আর ডাকে নি। খাবার রেখে, ছোট আলোটা জ্বেলে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে চলে গেছে।

চারিদিক নিশুতি। কত রাত হয়েছে বুঝতে পারলাম না।

কিছু খেতে ইচ্ছে নেই—খালি ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিলো। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা টেনে নিয়ে জল খেলাম। ঘাড়ে মাথায় জলের ছিটে দিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করলাম পাখাটা খুলে দেবার জন্য। উঠতে পারলাম না।

মাথাটা ভীষণ ভারি লাগলো, আর মনে হলো ভারি লোহার শেকল দিয়ে যেন পা দু'টো আমার কে বেঁধে রেখেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে ফুল পয়েন্টে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বিছানায় ফিরে এলাম।

দু'চোখে আবার এলো ঘুমের অতল অন্ধকার।

দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেলো,—কিন্তু উঠতে পারছি না যে।

বড় কষ্টে উঠে গিয়ে দরজার খিলটা খুলে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে আমি হাঁফাতে লাগলাম।

মারুতি ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে চমকে উঠলো। ব্যাকুলভাবে বললো—কি হয়েছে ভাই? শরীর কি বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে? দেখি দেখি। আমার গায়ে হাত দিয়ে আর্তকণ্ঠে বললো ও —ইস্ গা যে পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে!—কি সর্বনাশ! চলো চলো শোবে চলো। আমি এখুনি ডাক্তারবাবুকে আনতে বলছি।

আমাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে—বিছানায় শুইয়ে দিলো মারুতি। তারপর চাদর দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে বললো—আজ তো তোমার যাওয়া হতে পারে না রমলা। জ্বরটা কখন এলো? আমাকে ডাকোনি কেন ভাই? কাল সন্ধ্যেয় অমন অসময়ে তোমাকে ঘুমোতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিলো আমার, যে তোমার শরীর নিশ্চয়ই খুব অসুস্থ হয়েছে,—তাই তোমাকে না ডেকে খাবারটা ঘরেই রেখে গিয়েছিলাম, খাবার তো দেখছি ছোঁওনি। এখন নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কি আনবো বলো?

আমি ওর কোনো কথারই জবাব দিতে পারলাম না, ইসারায় বললাম,—একটু জল!

কাঁচের গ্লাশে করে জল এনে,—আমার মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিলো মারুতি। তারপর ব্যস্তভাবে চলে গেলো ডাক্তারকে কল্ দেবার জন্য। আমি বোধ হয় আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। কতদিন যে কেটে গেলো তাও জানি না! শুধু ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মতো মাঝে মাঝে দেখেছি মাকে। মা আমার মাথার শিয়রে বসে যেন কাঁদছেন! কখনও বা মা'র ঠাণ্ডা নরম হাতের স্পর্শ অনুভব করেছি কপালে। আর তখুনি মনে হয়েছে যেন আমার সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

দু'চোখ বিস্ফারিত করে খুঁজেছি মাকে। কিন্তু দেখতে পাইনি কিছু। চোখের সামনে শুধু থৈ থৈ অন্ধকার!

আবার স্বপ্ন। যোগলেকার যেন আমার পাশে বসে আছে। ওর মুখখানা বড় বিমর্ষ।

প্রথম যেদিন সেই স্বপ্নের ঘোরটা আমার চোখ থেকে মুছে গেলো, মনে হলো যেন আমি অনেকক্ষণ ঘুমের পর জেগে উঠলাম।

কারণ এখন মাকে আর স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে না, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা বসে আছেন আমার পাশে। আমি ক্ষীণস্বরে ডাকলাম—মা!

আমার ডাক শুনে মা ঝুঁকে পড়লেন আমার মুখের কাছে। তারপর দু'হাতে আমার গালদুটো ধরে বললেন,—এই যে! এই যে আমি! আমার সোনা, চেয়ে দেখো তো মা।

ডাক্তার বসেছিলেন একটু দূরে। তিনি ছুটে এসে আমাকে পরীক্ষা করে ইংরিজিতে বললেন—বিপদ কেটে গেছে। আর ভয় নেই, জ্ঞান ফিরেছে।

এ পাশে চোখ ফেরালাম। সেখানে বসেছিলেন একজন মহিলা! তিনি একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন—দেখো তো। আমায় চিনতে পারো কি—না।

একটু চেয়ে রইলাম তার দিকে। হ্যাঁ চিনি বৈ কি। অস্ফুট স্বরে আমি বললাম—কাবেরীদি'!

—এই তো। সব মনে আছে দেখছি। আচ্ছা আর কথা নয়। লক্ষ্মী মেয়ে, লেবুর রসটা খেয়ে ফেলো দেখি।

কাবেরীদি' চামচ করে সন্তর্পণে লেবুর রসটা আমাকে খাইয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে,—কাপটা নিয়ে উঠে গেলেন।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম—আমি কোথায় মা?

—তুমি যে কোচিনে মারুতিদের বাড়ীতেই আছ মা। তোমার বড্ড জ্বর হয়েছিলো কিনা। মারুতির টেলিগ্রাম পেয়ে আমি প্লেনে চলে এসেছি।

আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দিলেন মা।

—আমি বললাম—কৈ আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি মা!

—কেমন করে বুঝবে মা গো! তোমার কি জ্ঞান ছিলো? ঠাকুরের কৃপায় আজ কুড়ি দিন পরে তো কথা বললে।

বলতে বলতে মা কেঁদে ফেললেন।

চোখ মুছে আবার বললেন,—তোকে যে ফিরে পাবো সে আশা আর ছিলো না খুকি।

এই সময় মারুতি এসে মায়ের হাতে কিছু ফুল দিয়ে বললো—মহাদেবের নির্মাল্য এনেছি মাসীমা, ওর মাথায় ছুঁইয়ে দিন। তারপর আমার দিকে চেয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো—মাসীমা, মাসীমা! মনে হচ্ছে রমলার জ্ঞান ফিরেছে।

—হ্যাঁ মা! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। আমার মাথায় ফুল ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন মা মহাদেবের উদ্দেশে।

আমি ক্ষীণস্বরে ডাকলাম—মারুতি।

—রমলা, বন্ধু! বলতে বলতে,—মারুতি এসে বসলো আমার পাশে।

ঝর ঝর করে ওর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো।

আরো ক'দিন কেটে গেছে। আমি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছি।

মারুতিদের পাড়াপড়শীরা আর বন্ধু-বান্ধবী সকলেই আসছেন আমাকে দেখবার জন্ম, আর মায়ের সঙ্গে আলাপ করবার জন্ম।

সাবেষ্টিন আর কায়রণ রোজ আসেন একগোছা ফুল হাতে নিয়ে। পাশের বাড়ীর গিন্নি তাঙ্গম, শিক্ষয়িত্রী আনামা আসেন ঘরে তৈরী নারকোলের বরফি আর গাছের কাজু-বাদাম নিয়ে। গাছের কলা, বিস্কুট, টফিও দিয়েছেন অনেকে। সিষ্টার ষ্টেলা আর ডাক্তার মেরী অ্যাণ্টনি আমার পাশে বসে প্রার্থনা করে, ওঁদের বুকে ঝোলানো ক্রশটি আমার মাথায় ছুঁইয়ে দেন প্রতিদিনই।

মারুতির ছাত্রীরা সজল চোখে প্রতিদিন দূর থেকে আমাকে দেখে গেছে আর আমার আরোগ্য কামনা করেছে,—এসব কথা শুনে ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসায় মনটা আমার সিক্ত হয়ে উঠলো।

মা বলেন—যেমন সুন্দর এ দেশটা, তেমনি ভালো এ দেশের মানুষ জন।

ক্যাপ্টেন মামাও আমার অসুখের খবর পেয়ে প্রতিদিন এসেছেন।

কাল তিনি মাকে বলছিলেন,—জানিস লিলি, সেই ভগবান নামে ভদ্রলোকটি, চিরটা কালই শত্রুতা করে এসেছেন আমার সঙ্গে। আর আমিও ওকে গালাগাল না দিয়ে জল খাইনি কোন দিন। তারপর হঠাৎ যে কি একটা ঘটে গেলো, মানে ঐ লোকটাকে আমি একটা নমস্কার করে ফেলেছি।

হা, হা, হা, হা করে দরাজ-গলার হাসি ছড়িয়ে, আবার বললেন তিনি,—তারপর পরে বুঝলাম যে, রমলা মাকে কেড়ে নেবার উদ্দেশ্য নিয়ে সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে একেবারে রণং দেহি করে দাঁড়ালেন ভদ্রলোকটি। পরে আবার করুণা করে ছেড়ে দিয়েও গেলেন আর তার ওপর কিছু উপরি পাওনাও দিয়ে গেলেন আমাকে, এই তোকে এনে দিয়ে।

নাঃ! যতটা খারাপ ভেবেছিলাম তাকে, এখন দেখছি ঠিক ততটা নয়। মাঝে-সাজে দয়া-দাক্ষিণ্যও করে ফেলেন ভদ্রলোকটি।

মায়ের সঙ্গে এমনিধারা সরস আলাপ আর মামারবাড়ীর গল্প,—ওঁদের ছোট বেলাকার টুকরো টুকরো ঘটনার গল্প নিয়ে মেতে ওঠেন ক্যাপ্টেন মামা। সে-সব কথায় কখনও ওঁরা উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন, কখনও বা চোখের জল মোছেন।

আমি, মারুতি আর কাবেরীদি', আমরাও যোগ দিই ওঁদের গল্পে। মিষ্টার মেননও এসে বসেন মাঝে মাঝে। সকলকার মনের গুমোট ভাবটা সরস হাসি গল্পে হাল্কা হয়ে আসে।

বিপদ যে কখনও কখনও সম্পদও বহন করে আনে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম আমার নিজের অসুখে।

ঐ অসুখটাই তো ক্যাপ্টেন মামার সঙ্গে আমার মায়ের সুদীর্ঘকাল পরে আবার অভাবনীয় ভাবে যোগাযোগ ঘটিয়েছে। বাবার মৃত্যু আর আমার জীবনের ব্যর্থতা আমার মায়ের মুখের হাসিটুকু যে একেবারে কেড়ে নিয়েছিলো। এখন মা আবার প্রাণ খুলে হাসছেন দেখে মনটা আমার গভীর আনন্দে টলমল করে উঠছে।

যে ভীষণ ব্যাধিটি আমাকে মৃত্যুর দরজায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, আমি যেন আজ তার ভয়াল রূপের অন্তরালে একটি শাশ্বত শুভ মঙ্গলময় রূপ দর্শন করলাম। তাই মনে মনে অজস্র প্রণাম জানালাম তাঁর উদ্দেশ্যে, যাঁর বিশ্বরূপের ভেতর ব্যাধিও একটি রূপ।

সেদিন বিকেলে—কাবেরীদি' আমার রুক্ষ চুলের রাশ নিয়ে বসেছেন জোট ছাড়াবার জন্ম।

মা বসেছিলেন পাশে,—আর মারুতি ঘরের এটা-ওটা গুছিয়ে সাজিয়ে রাখছিলো।

মিষ্টার মেনন বাড়ী ফিরেই প্রথমে আসেন এই ঘরে আমাকে দেখবার জন্ম।

আজও এসেছিলেন। কিছুক্ষণ বসে,—আমার শরীর কেমন আছে, একটু বল পাচ্ছি কিনা, আজ কি কি পথ্য দেওয়া হয়েছে আমাকে বা খেতে কোনটা ভালো লেগেছে—সব-কিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

মা বললেন—মিষ্টার মেননের মত এমন সৎ লোক আমি জীবনে আর দেখিনি! আহা যেমন বাপ, মেয়েটিও তেমনি তার উপযুক্ত। রমলার চিঠিতে ওর কথা পড়ে, ওকে দেখবার বড্ড ইচ্ছা হয়েছিলো আমার,—তা ভগবান যে এমন করে সে ইচ্ছা পূরণ করবেন তা তো জানতাম না। আমার মারুতি মা, কাবেরী মা,—দুটি বোন ওরা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতী! ওদের সেবা-যত্নেই তো এ-যাত্রা তোকে ফিরে পেলাম খুকি।

কাবেরীদি' আমার চুলগুলো বেণী করতে করতে একটু হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন—সেবা কি শুধু আমরাই করেছি মাসীমা? সব চেয়ে বেশী যে করেছে—তার নাম তো করলেন না?

একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন মা। কোনো জবাব দিলেন না।

কাবেরীদি', মায়ের মুখের পানে চেয়ে তাঁর চোখের সঙ্গে নিজের চোখ মিলিয়ে, যেন কিছু মনের ভাব বিনিময় করে হাসিমুখে আমাকে বললেন—যেমন তোকে দেখার সাধ করেছিলাম, তেমনি দেখা দেখিয়েছিস ভাই। কন্যাকুমারী ঘরে, এখানে এসে,—তোকে দেখে তো একেবারে ভয়ে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম আর কি। জানলাম, পাঁচ ছ' দিন ধরে তুই এমনি বেহুঁস হয়ে আছিস। মাসীমা এসেছেন কলকাতা থেকে। তোর এমন অসুখ দেখে আমিই বা চলে যাই কি করে? তাই তোর ভগ্নীপতি চলে গেলেন আর আমি জমে যাওয়া হাত-পাগুলোকে কোনোরকমে চালিয়ে নিয়ে, লেগে গেলাম তোর রোগের সঙ্গে লড়াই করতে।

যাক্ শেষপর্যন্ত লড়াই-এ জিত হয়েছে, এবারে আমাকে ছুটি দে ভাই!

—কি কথা গোপন করলেন মা আমার কাছে? কাবেরীদি' যে বললেন,—'সবচেয়ে বেশী সেবা যে করলো,—তার নাম তো করলেন না মাসীমা?'

—কে—সে ?

আমি কাবেরীদি'র একখানা হাত চেপে ধরে বললাম—আমি তো প্রায় সুস্থ হয়েই উঠেছি কাবেরীদি'! একসঙ্গে সকলেই রওনা দেব, কিন্তু আমার কাছে আপনারা কি যেন ব্যাপার গোপন করছেন? বলুন না কাবেরীদি'! আমার সবচেয়ে বেশী সেবা যে করেছিলো—কে—সে ?

কাবেরীদি' একটু হেসে চাইলেন মার দিকে।

মা আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন—তার নাম যোগরাজ যোগলেকার!

—যোগলেকার? অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে উঠলাম আমি। পুলক বেদনার কয়েকটা ঢেউ এসে যেন বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটাকে নিয়ে লোফালুফি সুরু করেছে।

কাবেরীদি' আমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে বললেন—অত উতলা হলে তো চলবে না ভাই—খুব শান্ত মন দিয়ে শোনো, বলছি সব কথা। বাঙ্গালোরের জলসার পর বল্লারশায় ফেরার পথে যোগলেকার মাদ্রাজে নেমে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, সে কথা তোমাকে বোধ হয় চিঠিতে লিখেছিলাম। তখন ওকে আমি আর যেতে দিইনি,—ওকে বলেছিলাম যে—তোমার তো এখন ছুটি আছে, আমাদের সঙ্গে চলো। কন্যাকুমারী দেখে সকলে একসঙ্গেই—বল্লারশায় রওনা দেবো। ওকে অবশ্য বলিনি যে কোচিনে তুমি আছ। ভেবেছিলাম ওকে এখানে এনে, একেবারে অবাক করে দেব। তা ওকে অবাক করতে এনে, প্রথমে নিজেই তো "থ" বনে গেলাম। তারপর সেবার বহর দেখিয়ে ও'ই আমাদের অবাক্ করে দিয়েছে।—কি বলুন মাসীমা ঠিক কথা বলছি না ?

—তা আর বলতে? আহা বাছা আমার সারাটা রাত জেগে কি সেবাটাই না করলো তোর খুকি। পুরুষমানুষ যে এমন সেবা করতে জানে, তা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। তারপর তোর জ্ঞান হবার পর থেকে ও' আর তোর সামনে আসেনি, পাছে মনের ওপর হঠাৎ চাপ পড়ে।

আমার দু'চোখে নেমে এলো অনর্গল ধারা। মাকে জড়িয়ে ধরে, আকুল স্বরে বললাম,—তাকে একবার ডাকো মা। আমার যে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে ওকে।

মারও দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিলো, তিনি আমার চোখ-মুখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বললেন—এই যে, এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি। তবে মনটাকে শান্ত রাখো মা,—তা না হলে আবার হয় তো শরীর খারাপ হবে।

কাবেরীদি'কে বললেন তিনি—চলো মা কাবেরী শঙ্করনাথের মন্দিরে আমরা পুজো দিয়ে আসি।—আর মা মারুতি তুমি যোগলেকারকে ডেকে নিয়ে এস।

মা কাবেরীদি'কে নিয়ে চলে গেলেন।

মারুতি এসে আমায় চুপি চুপি বলে গেলো—যোগলেকারের বাগানে আবার ফুল ফুটবে।

আমি হাসলাম ওর দিকে চেয়ে। বললাম—সব ফুল ফুটবে সেই দিনই, যে দিন,—আয়েঙ্গার ফিরে আসবে তোমার কাছে বন্ধু।

আমি আবেগে দুরু দুরু বক্ষে চেয়ে আছি দরজার দিকে।

প্রতীক্ষা।

প্রতীক্ষার অসহ্য উৎকণ্ঠা বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পিটছে।

পল, সেকেণ্ড, মিনিটগুলো মার্চ করে চলে যাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে।

উন্মুক্ত কপাটের পরেই প্রশস্ত বারান্দা! তারপরেই অবারিত অকূল আকাশ নীলে, সোনায়, ফাগে মাখামাখি। দিনান্তে কর্মক্লান্ত তপনদেব ফিরে চলেছেন নিজ ঘরে। তাঁর প্রিয়তমা সহস্র দীপমালায় গৃহ আলোকিত করে বুঝি এমনি অসহ্য প্রতীক্ষায় সময়ের পদধ্বনি শুনছেন। সেই সহস্র রত্নদীপের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে পুব-দিগন্ত।

কৈ সে তো এখনও এলো না। তবে কি সে আসবে না ?

—না! না! সে আসছে, ঐ যে শুনতে পাচ্ছি আমার চির পরিচিত পদধ্বনি। উন্মুক্ত দরজার ভেতর দিয়ে টেরচাভাবে দীর্ঘ ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ঘরের দুধ-সাদা মার্বেলের মেঝের ওপর। তারপরেই সোনা, নীলা, চুনি, পলা রং দেওয়ালীর উজ্জ্বল পটভূমিকায় ভেসে উঠলো একখানি রঙিন ছবির মতো যোগরাজ যোগলেকার।

ও আমার খাটের কাছে এগিয়ে এলো না। বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে রইলো একটু দূরে,—ওর সমুদ্রের মত গভীর দুটি চোখের দৃষ্টি স্থির হলো আমার মুখের ওপর।

আর আমি? আমার অপলক দৃষ্টিও আটকে গেছে ওর মুখের ওপর। কান্নার সপ্তসিন্ধু যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে বুকের ভেতর। হায়! মাত্র তিন বছরে একি পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর চেহারার? গভীর মনস্তাপের কালি জমেছে ওর চোখের কোলে। দেহটা শুকিয়ে যেন আধখানা হয়ে গেছে, রগের দু'পাশের চুলে লেগেছে ফিকে সাদার ছোপ। অন্তর্বিপ্লবের নিষ্ঠুর হাত যেন ওর সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে।

মনটা আমার হাহাকার করে উঠলো। কান্নার ঢেউ সকল বাধার বাঁধ ভেঙে চোখের দুকূল ভাসিয়ে, অঝোর ধারায় ঝরতে লাগলো। আমি অধীর আবেগে দু'টি হাত বাড়িয়ে কান্নাভাঙা গলায় ডাকলাম—রাজ।

—রমি! রমি!—বলতে বলতে ছুটে এসে আমার শীর্ণ হাতখানি নিজের দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, বিছানায় আমার পাশে বসে পড়লো যোগলেকার। তারপর গভীর মমতায় আমার হাতখানা চেপে রাখলো ওর গালের ওপর।

আমার শীর্ণ হাতখানি বেয়ে দর দর করে ঝরে পড়তে লাগলো ওর চোখের জলের উষ্ণধারা!

শেষ

স্টুওয়ার্ট আবেলের নেতৃত্বে ল্যাটভিয়ার কৃষি-সংস্থার কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে এমন কতকগুলো বড়ি আর গুঁড়ো মিকশ্চার তৈরী করেছেন যার সাহায্যে বিনা মাটিতেই ফুল, তরিতরকারী ও অন্যান্য গাছপালা বাড়তে পারে। এই বড়ি আর মিকশ্চারে আছে এগারটি রাসায়নিক ছোট ছোট পদার্থ যা গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফল ধারণের জন্যে প্রয়োজন হয়।

বিনা মাটিতে গ্রীণ হাউসের মধ্যেকার পরিবেশে তরিতরকারী ফলাবার জন্যে সোভিয়েত ল্যাটভিয়ার যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে ব্যাপকভাবে এই মিকশ্চারগুলি ব্যবহার করা হয়। রিগা জেলায় "মারুপে" খামারে মিকশ্চারের গুঁড়োর সাহায্যে আবর্জনার পাত্রে তাঁরা তরিতরকারী ফলাচ্ছেন। নিয়ন্ত্রিত তাপ ঘরে সারা বছরই শশা, টোমাটো, লেটুস ও পেঁয়াজ ফলানো হয়। সাধারণ মাটিতে প্রতি বর্গমিটারে যেখানে ১০ কিলোগ্রাম আলু তোলা হয়, সেখানে আবর্জনার পাত্রে মিকশ্চারের সাহায্যে দেড়গুণ বেশী ফসল পাওয়া যায়। শশা, কাঁচা মটর ও মূলো ফসলও খুব ভাল হয়।

এই বড়ির চাহিদা ক্রমাগতই বাড়ছে। বড়ি আর মিকশ্চার তৈরীর জন্য সিগুলদা শহরের স্থানীয় শিল্প কারখানায় একটি বিশেষ বিভাগ গড়ে তোলা হয়েছে। গত বছর এই বিভাগে প্রায় আশী টন মিকশ্চার তৈরী হয়েছে এবং এ বছর একশো টনেরও বেশী মাল তৈরী হবে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা আলুর পরীক্ষা

আলুর ফসল তোলার যন্ত্র এখন ক্ষেতে নেমেছে। কৃষির যন্ত্রীকরণ ও বৈদ্যুতিকরণ বিষয়ে সারা ইউনিয়নে সংস্থার কমিশন লক্ষ্য করেছেন যে, মূল আলু ও মাটির ঢেলা ও পাথরের মধ্যে দিয়ে গামা রশ্মির প্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অতিক্রম করে। এই থেকে তাঁরা ঠিক করেছেন আলু থেকে বাইরের মাটি, পাথরের টুকরো প্রভৃতি আপনা থেকেই আলাদা করে ফেলার জন্যে এই রশ্মি ব্যবহার করা যেতে পারে। যখনই গামারশ্মির একটি রেখার মধ্যে বাইরের জিনিষগুলো এসে পড়ে তখনই একটি নির্দিষ্ট সঙ্কেত সৃষ্টি করে। রেডিও মেট্রিক যন্ত্র থেকে দ্রুত কার্যকরী ইলেক্‌ট্রনিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং তার থেকেই যন্ত্রের কাজ চলে। পরবর্তী যন্ত্রের কাজ হলো আলু ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জিনিষকে একটি জায়গায় ফেলা, তাহলে বাকী আলুগুলো আর একটি জায়গায় আলাদা হয়ে গিয়ে পড়ে। কন্‌ট্রোল এলাকার মধ্য দিয়ে গেলেও আলুর ওপর তেজস্ক্রিয় প্রভাব যদি পড়েও তা খুবই কম এবং গামারশ্মিকে ক্ষেপণ করা হয় না।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই নূতন যন্ত্রটি শুধু আলুর ফসলের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য যন্ত্রে, যেমন বলা যায় বীট ফসল তোলার যন্ত্রেও সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

খাঁটি দুধের মতো দুধ তৈরীর যন্ত্র

আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান মাখন তোলা দুধের সঙ্গে মাখন মিশিয়ে সহজে ও অল্প খরচায় স্বাদের ও গুণের দিক থেকে খাঁটি দুধের মতো দুধ তৈরী করার একটি অভিনব যন্ত্র বার করেছেন। প্রতি গ্লাসের মূল্য পড়বে এক সেন্ট বা পাঁচ নয়া পয়সা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা জানিয়েছেন যে, শান্তির স্বার্থে খাদ্য পরিকল্পনা অনুসারে

বিজ্ঞান বার্তা

প্রস্তাবিত এই যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী দুধ উত্তর-পূর্ব ব্রেজিলের কোটি লেক্সাবের শিশুদের সরবরাহ করা হবে।

এই নতুন যন্ত্রটিতে আছে একটি অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন মোটর। এই মোটরের সাহায্যে গুঁড়া দুধের সঙ্গে মাখন ও জল খুব ভালভাবে মেশানো হয়। নিউইয়র্কের সিফোর্ড উড কোম্পানী এই যন্ত্রটি তৈরী করেছেন। পাঁচ গ্যালন পর্যন্ত দুধ এই যন্ত্র একেবারে তৈরী হবে।

অভিনব সব আলো

আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় তিনশো কোটি বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব তৈরী হয়ে থাকে। এ ছাড়াও নানা ধরণের কয়েক লক্ষ আলোর বাল্ব তৈরী হয়, যাদের আলো আদৌ চোখে দেখা যায় না। আর দেখা গেলেও সেই সব বাল্বের দ্বারা প্রধানত অন্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে।

আর এক ধরণের বাল্ব আছে, তারা দুর্গন্ধ দূরীকরণ, ব্লিচিং বা ধবধবে সাদা করা, উদ্ভিদের বৃদ্ধিসাধন, সার উৎপাদন, রিকেট রোগাক্রান্ত ক্ষীণ দুর্বল শিশুদের সবল করা—এক কথায় মানুষের জীবন রক্ষায় নানাক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। এর মধ্যে এক ধরণের বাল্ব আছে, যাদের ব্যবহারক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারলাভ করছে! এদের বলা হয় 'আলট্রাভায়লেট রেডিয়েটর'। এই অতি-বেগুণী আলো বা আলট্রাভায়লেট কিরণ বিকিরণকারী বাল্ব থেকে যে অতিক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গ নির্গত হয়, তা মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। 'ব্ল্যাকলাইট ল্যাম্প' এই ধরণেরই একটি বাল্ব। বিশেষ ধরণের কাচের সাহায্যে নির্মিত এই সব বাল্ব বা টিউবে পারদবাষ্প ও আর্গন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কোন বস্তু থেকে সূর্যরশ্মির সবগুলি রং শুষে নেবার পরেও যে সব রং বাকী থাকে, তার অন্যতম হলো এই অতি-বেগুণী বা আলট্রাভায়লেট রশ্মি। সেই রশ্মির সাহায্যে এমন সব রং তৈরী করা যায়; যা অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে। এই সব রঙের তৈরী পোষাক থিয়েটারে ব্যবহৃত হয় এবং এই রং বিজ্ঞাপনে ও অন্যান্য নানা কাজেও লাগানো হয়।

এই অদৃশ্য আলো বা ব্ল্যাকলাইট ধাতব বস্তুর, কাপড়-জামার,

প্লাষ্টিক নির্মিত দ্রব্যাদির এবং কাঁচের তৈরী আসবাবপত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরই সাহায্যে কোন ধাতুতে কোন গলদ বা ফাটল থাকলে তার সন্ধান পাওয়া যায়। হাতের ছাপ, কোন দাগ বা অদৃশ্য কোন চিহ্নের সাহায্যে জাল-জুয়াচুরি ও রাহাজানি সম্পর্ক অপরাধীর সনাক্তকরণের ও তার সন্ধানলাভেও এই অদৃশ্য রশ্মি বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

এ ছাড়া জনহীন প্রান্তরে, অরণ্যে, পর্বতে দস্তা ও অন্যান্য ধাতুর অস্তিত্বও খুঁজে বার করা যায় এই অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে। এরই সাহায্যে অতি উজ্জ্বল রংও তৈরী করা যায়। মাটির তলায় জলের সন্ধান দেয় এই অদৃশ্য আলো, কোন চিত্রশিল্প বা পেন্টিং এর বয়স কত, অর্থাৎ কবে ছবিটি আঁকা হয়েছিল মূল অথবা প্রতিলিপি এবং কোন কাঠের আসবাবপত্র বা সূচিকার্যের নিদর্শন কত প্রাচীন তারও সন্ধান এই অদৃশ্য আলোর সাহায্যে পাওয়া যায়: ঠিক যেন গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভের কাজ করে এই আলো।

এ ছাড়া এই অদৃশ্য আলো মানুষকে বহু রোগের হাত থেকেও রক্ষা করে থাকে। এই আলো প্রয়োগে বহু রোগের জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রতি নূতন ধরণের একটি আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্প বা অতিবেগুনী রশ্মির প্রদীপ উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রদীপ নানা ধরণের ব্যাকটেরিয়া বা রোগজীবাণু ভাইরাসের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোন বাড়ীতে যে নলের সাহায্যে বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয় সেই নলেতে এই অদৃশ্য আলোর প্রদীপটি রেখে দিলে ঐ বাড়ীর প্রায় সকলেই রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে। বায়ু প্রবাহিত প্রায় সকল ভাইরাস ও রোগবীজাণুর শতকরা ৮০ ভাগই এর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। এই প্রদীপ নির্মাতাদের অভিমত যে, একটি নূতন প্রদীপ যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে থাকে তার রোগবীজাণু ধ্বংস করার ব্যাপারে সমপরিমাণ সূর্য থেকে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয়ার তুলনায় একশো থেকে হাজার গুণ বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে।

আমেরিকার উত্তর ক্যারোলাইনার ডারহামস্থিত ডিউক ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে যে দশটি শল্য চিকিৎসা গৃহ রয়েছে তাদের সব কিছুই এই অতিবেগুনী আলোর তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে বীজাণু-মুক্ত করা হয়ে থাকে। সাধারণ অস্ত্রোপচারের পর কোন কোন সময় রোগীর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, রোগী অন্য রোগের দ্বারা সংক্রামিত হয়ে থাকে। কিন্তু এইভাবে অপারেশন করার ফলে ঐ সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, রোগী অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিরাময় হয়ে থাকে।

পোলিও বা শিশু পক্ষাঘাত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের টিকা যাঁরা তৈরী করেন তাঁরাও এই টিকা তৈরীতে ঐ অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে থাকেন। জীবন্ত ভাইরাসকে অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে মেরে ফেলা হয়। ঐ মৃত ভাইরাস রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু ঐ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মাতে পারে।

সূর্যরশ্মির বর্ণালীর আর একটি অংশ হলো ইনফ্রারেড রে'এর আলোর তরঙ্গ অতি দীর্ঘ। কোন কিছু গরম করা, সেঁকা বা শুকোনোর কাজে এই আলো ব্যবহৃত হয়। অবলোহিত রশ্মিদের অদৃশ্য আলো মানুষের শরীরে অন্তর গভীরে প্রবেশ করে এবং শারীরিক বেদনা প্রশমনে, রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে থাকে। হাঁস মুরগীর ডিম ফোটানোর ব্যাপারে অথবা আলোকচিত্র গ্রহণে এই আলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

আর এক ধরণের ল্যাম্প আছে যা রেফ্রিজারেটারে ব্যবহৃত হয়। এই সব বাল্বের রং নীলাভ। এরা সৃষ্টি করে ওজোন গ্যাস এবং দুর্গন্ধ নাশ করে; ওজোন ও অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগ ছত্রাক জন্মাতে পারে না, খাদ্য শুধু নষ্ট হয় না।

আর এক ধরণের অভিনব বাল্ব আছে যা সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের সাহায্যে সঙ্কেত দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সঙ্কেত দৃশ্য নয়। বিশেষ ধরণের ফটো সেলের সাহায্যে এই বাল্ব নির্গত আলো দেখা যেতে পারে, এদের বলা হয় ক্যালসিয়াম ভেপার ল্যাম্প।

উদ্ভিদ সাধারণ সূর্যালোকেই জন্মায়। নিউজার্সির রাটজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, বহু গাছপালা সূর্যালোক ছাড়াও নানা রঙের ল্যাম্পের আলোয় জন্মাতে পারে এবং বাড়তে পারে। তাপমাত্রা, আলোক ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যতে মাটির নিচেও গাছপালা জন্মাবার সম্ভাবনা আছে বলে তাঁরা আভাস দিয়েছেন।

মানুষের দেহে তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া

প্রকৃতিতেই যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে মানুষ দীর্ঘকাল তার সংস্পর্শে থাকলে তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা নির্ধারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গবেষণা শুরু করেছে। গবেষণা পাঁচ বছর চলবে।•

এই ধরণের গবেষণা এর আগে হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের ৪টি অঙ্গরাষ্ট্রের ৫০ হাজার অধিবাসীকে নিয়ে এই গবেষণার কাজ চলবে। এঁরা যে জল পান করে তাতে স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ রেডিয়াম আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল ডাঃ লুথার এল টেরী সম্প্রতি এই গবেষণার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগ যুক্তভাবে এই গবেষণা করবেন।

এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের দেহে এই তেজস্ক্রিয়তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে কি প্রতিক্রিয়া আনতে পারে তা প্রায় এখনও অজানা রয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সারাজীবন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে থাকার ফলে ক্যান্সার হতে পারে কি না, এই গবেষণার ফলে তা নির্ধারিত হতে পারে।

ইলিনয়, আইওয়া, মিনেসোটা ও উইসকনসিনের কয়েকটি রাষ্ট্র বেছে নেওয়া হয়েছে এই গবেষণার জন্য। কারণ ইতিপূর্বে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের এক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই অঞ্চলে গভীর কূপের জলে স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশি রেডিয়াম আছে।

এই রেডিয়াম স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে এ পারমাণবিক ভস্মের ফল নয়!

পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে হিলিয়াম গ্যাসের সন্ধান

নবতম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১৭ প্রমাণ করেছে পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আবহ মণ্ডলে নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম গ্যাসের একটি স্তর আছে।

হিলিয়াম হাল্কা ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুমণ্ডল ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত বেলুনকে স্ফীত করার জন্য এই গ্যাস ব্যবহার

করা হয়। এ ছাড়া অন্ত আরও নানা কাজে এর প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর মাটির অনেক নীচে এই গ্যাস পাওয়া যায়। এখান থেকে এই গ্যাস নিষ্ক্রিয় রূপে অবিরাম আবহমণ্ডলে উত্থিত হচ্ছে।

কক্ষ পরিক্রমারত এক্সপ্লোরার-১৭ বেতারযোগে যে সব তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে আগে যতখানি মনে করা হত তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ হিলিয়াম উর্ধ্ব আবহমণ্ডলে জমা রয়েছে।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থায় বিজ্ঞানীরা ওয়াশিংটনে মার্কিন ভূপদার্থবিজ্ঞান ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে এক্সপ্লোরারের এই নূতন আবিষ্কারের বিবরণ দেওয়া হয়।

আবহমণ্ডলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উপাদান পর্যালোচনার জন্য গত ২রা এপ্রিল কেপ কেনাভেরাল থেকে এক্সপ্লোরার-১৭ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

মোনাজাইট সম্পর্কে গবেষণার জন্য কেরল বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ৩০ হাজার ডলার বৃত্তিদান

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ত্রিবেন্দ্রম শহরের নিকটবর্তী সমুদ্রতটস্থ বালুকায় যে পরিমাণ মোনাজাইট রয়েছে এই পরিমাণ মোনাজাইট পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। মোনাজাইটের মধ্যে আছে থোরিয়াম নামে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই সকল বালুকণার স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে দেখবেন। কণাগতি নিরূপক পদার্থ সমূহ উদ্ভিদের প্রজনন ও ভৌত অবস্থা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে। বালুকণায় ঐ স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা ঐ সকল পদার্থকে কি ভাবে ও কি পরিমাণে পরিবর্তিত করে থাকে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পর্যালোচনা করে দেখবেন।

এজন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ত্রিবেন্দ্রমস্থিত কেরল বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ বৎসরের জন্য ৩০ হাজার ৭ শত ৬৪ ডলারের সমমূল্যের ভারতীয় মুদ্রা বৃত্তি দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮০নং সরকারী আইন অনুসারে বিদেশে কৃষিপণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকেই এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদের উপর ঐ সকল বালুকণার তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হবে—মার্কিন কৃষি-দপ্তর সম্প্রতি একটি ঘোষণায় এই বৃত্তিদানের কথা জানিয়েছেন।

চাঁদে ভ্রমণের সমস্যা

গ্রহান্তরে ভ্রমণ যখন বাস্তবে পরিণত হবে এবং মানুষ যখন চন্দ্র অবতরণ করবে তখন সেই চন্দ্রগ্রহযাত্রীর সেখানে সফর করা সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। কারণ কম্পাস বা দিক নির্ণয় যন্ত্র চুম্বকক্ষেত্রের অভাবে কার্যকরী হবে না এবং সূর্যের সাহায্যে দিক নির্ণয় করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং অভিযাত্রীদের প্রতিপদে বেতার সংকেতের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

কলোরাডোর বোল্ডারস্থিত ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডের বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই এ সকল সমস্যা দেখা দিবে বলে অনুমান করেছিলেন। চাঁদের উপরিভাগ ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁরা বলেছেন যে, চাঁদের উপরিভাগে দশ ওয়াটের একটি অ্যানটেনা স্থাপন করলে ঐ স্থান থেকে আট মাইলের মধ্যে বেতারে বার্তার আদান প্রদান করা যাবে।

চন্দ্রের উপরিভাগের মত পরিবেশে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখছেন।

আগামী দশ বছরের মধ্যে পরমাণুশক্তি চালিত যানে মহাকাশ যাত্রা সম্ভব হবে

আমেরিকার ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান জি এ প্রাইস সম্প্রতি বলেছেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যেই পরমাণুশক্তি চালিত যানে মহাকাশ যাত্রা সম্ভব হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ঐ সময়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী কারখানা সমূহের মধ্যে শতকরা পঁচিশটিতেই পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে এবং ঐ বিদ্যুৎশক্তি সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করা সম্ভব হবে।

গত শীতকালে ৪৫ দিনের মধ্যে আমেরিকার চারটি প্রতিষ্ঠান পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের চারটি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন—এর মধ্যে ২টি ক্যালিফোর্নিয়ায়, একটি কানেটিকাটে এবং আর একটি নিউইয়র্কে স্থাপন করা হবে। এই তিনটিতে মোট ২৩৭৫০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে এবং এই সকল কারখানা নির্মাণে খরচ পড়বে ৪০ কোটি ডলারেরও বেশী। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কারখানায় উৎপন্ন মোট বিদ্যুৎশক্তির তুলনায় তিনগুণ অধিক শক্তি ঐ সকল কারখানায় উৎপন্ন হবে।

মিঃ প্রাইসের ধারণা বিগত ৭৫ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যে সকল কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং তাতে মামুলী ইন্ধনের সাহায্যে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে, ঠিক সমপরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা আগামী দশ বছরের মধ্যে করতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে হবে। তারপর মামুলী ইন্ধন থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খরচ এবং পারমাণবিক ইন্ধন থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খরচের মধ্যে ব্যবধান বর্তমানে খুব বেশী নয়। সুতরাং কি প্রকার ইন্ধন যে ব্যবহার করা হবে নূতন কারখানা স্থাপনকারীদের সে সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে।

তোমাকে

মায়া দত্ত (দেবী)

তোমার চোখের দু'ফোঁটা জলে,
অবুঝ তোমার প্রাণে,
সবুজ করে তোলে যদি
আবার নতুন গানে।

একটি গানের সেই লহরী
তোমায় দিয়ে গেলে,
বুকের বোঝা নামিয়ে যাব
কৃতজ্ঞতায় ছলে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

চিরদিন আমি এই দেখেছি লোক সুবিধে পেলেই অপরের ওপরে অত্যাচার করে আর চিরদিনই আমার আত্মা সেজন্য অস্থির হয়েছে, কেঁদেছে, মাথা কুটেছে। মানুষ মানুষকে কেন অপমান করে? মানুষ মানুষকে কেন কষ্ট দেয়? আর মানুষ কেন এক একটি মুখোস পরে থাকে?

মুখোস? হ্যাঁ, তখন থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম মানুষ মুখোস পরে থাকে। এক একজনের মুখোসের এক এক রকম রং—এক এক রকম চেহারা।

আমার মা দেখাতে চাইতেন যেন তিনি খুব সুখী এবং আদরিণী। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। আমার দাদু বেশ বড়লোক ছিলেন এবং প্রথম সন্তান ও একমাত্র মেয়ে বলে ওখানে মায়ের আদর সত্যই খুব বেশী ছিল এবং শ্বশুরবাড়ীতেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি।

যতটা সুখী নন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখাতে চাইতেন। মুখে সব সময় ঐ ভাবটা ফুটিয়ে রাখতে চাইতেন—আমি বড়লোকের মেয়ে এবং একমাত্র মেয়ে। আমার স্বামী একজন বড় অফিসার।

বাবার মুখোসের রং চিনতে পেরেছিলাম অনেকদিন পরে—আর সেদিন থেকেই আমার সমস্ত পৃথিবী একদম বদলে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই একটু একটু করে যে পরিবর্তন হচ্ছিল, সেদিনের সেই 'আবিষ্কার' এক মুহূর্তে তা পূর্ণ করে দিল।

আমার বাবা খুব সুপুরুষ ছিলেন। গল্প শুনেছি ওঁর চেহারার জন্যই এখানে অর্থাৎ জেল ডিপার্টমেণ্টে ওঁর চাকরি হয়। পৈত্রিক অবস্থা ভাল ছিল না এবং পড়াশুনোয়ও তিনি ভাল ছিলেন না। তিনবার চেষ্টা করে আই-এ পাশ না করতে পেরে তিনি পড়াশুনো ছেড়ে দেন এবং চাকরির চেষ্টা করেন। কি একটা খেয়ালে বোধ হয় কোন বন্ধুর মারফৎ খবর পেয়ে তিনি এখানে আসেন।

জেলের এ-দরজায় না এলে ও-দরজায় যেতে হত, বাবা হেসে হেসে বলতেন, আমার তখন যা অবস্থা—টাকা আমার চাই-ই। চাকরি অথবা চুরি যাই করি না কেন!

যা হোক, বাবার সুন্দর চেহারা জেলের বড়কর্তার খুবই পছন্দ হয়ে গেল। তখন চাকরির বাজারে এত কড়াকড়ি ছিল না। অফিসাররাই হর্তাকর্তা বিধাতা।

তাঁর ইচ্ছানুসারেই বাবার চাকরি হল। খুবই ছোট পদ। তারপর সেখান থেকে এই জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট—এ এক বিচিত্র ইতিহাস।

পঁচিশ বছর—মাত্র পঁচিশ বছরে এমনি উন্নতি। বাবা হেসে হেসে গর্বভরে বলতেন, বলতে গেলে 'মিরাকেল'—অসাধ্য-সাধন। আর, সেই অসাধ্য সাধন করেছে আমার এই চেহারা—গর্বভরে বলতেন বাবা।

চাকরির উন্নতির পেছনে বাবার চেহারা কতটা কাজ করেছিল জানি না, কিন্তু এটা ঠিক যে মাকে বিয়ে করেছিলেন বাবা শুধু চেহারার জোরে।

আমার মায়ের রূপ ছিল না কিন্তু মায়ের বাবার প্রচুর রূপো ছিল। দাদু নাকি বলতেন, সোনা-রূপোয় মেয়েকে মুড়ে দেব—কেউ রং দেখতে পাবে না।

সাত ভাইয়ের এক বোন। দিদিমার ইচ্ছে ছিল, ঘরজামাই রাখবেন। কিন্তু দাদু আপত্তি করলেন।

—ঘরজামাইকে কেউ কখনও শ্রদ্ধা করতে পারে না—আমি পারব না, আমার মেয়েও পারবে না। আর এইটুকু স্থির জেনো, শ্রদ্ধা ছাড়া কখনও ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না—তা ছাড়া, আজ আমরা বেঁচে আছি। ওকে আদর করে রাখব কিন্তু পরে ভাইয়েরা বোনের স্বামীকে কি সেই সম্মান দিতে পারবে—ভাইরা যদিও পারে ভাইয়ের ছেলেরা।

—কিন্তু, মেয়েটা চোখের সামনে থাকত··

—চোখের সামনে থাকলেও সুখে থাকত না, ওর দুঃখে বিরক্তিতে তুমি প্রথমে দুঃখী হতে, পরে অবসাদ ও বিরক্তিতে মন ভরে যেত—তোমার মনে অশান্তি হত—সেই অশান্তির কালো ছায়া পড়ত চার পাশে।

—তার চেয়ে এই ভাল, দাদু একটু থেমে আবার বলতেন, ভাল একটি ছেলে দেখে বিয়ে দেব। জামাইয়ের উন্নতির জন্য যতটা চেষ্টা করা দরকার করব। তুমি মেয়েকে কাছে এনে রাখবে, তার কাছে গিয়ে থাকবে। তা হলে সব দিক দিয়েই ভাল হবে। একটা কথা মনে রেখ—লোকাচারের বিরুদ্ধে গেলে সুখী হওয়া যায় না।

এই কথাটা চিরদিন মনে রেখেছিলেন আমার দাদামশাই, লোকাচারের বিরুদ্ধে যাবেন না বলেই প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও বাড়ীতে দালান করেন নি।

খাড়াপল্লীতে বাড়ী ছিল ওঁর। চারদিকে খড়ো চাল মাটির দেয়াল আশে পাশে পঁচিশটা গ্রামের মধ্যে দালান নেই। দালান আছে অনেক দূরে জমিদার বাড়ীতে।

এখানে দালান করা মানেই লক্ষগুণ সম্মান বেড়ে যাওয়া। তাই আমার বড়মামা, মেজমামা, দিদিমা এবং হিতৈষী আত্মীয়স্বজন খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন দালান তোলবার জন্যে। কিন্তু দাদামশাই কিছুতেই রাজী হন নি। বলেছিলেন, না, আমাদের বংশে কেউ দালান করেনি আমিও করব না?

বড়মামার খুব ইচ্ছে ছিল দালান হোক। তাই একটু তর্ক করেছিলেন তিনি—বংশে কারো করবার ক্ষমতা ছিল না, তাই হয় নি। আর একথা তো ঠিক যে কেউ না কেউ প্রথম করবে।

দাদামশাই মাথা নেড়েছিলেন, আমি সেই 'প্রথম' হতে চাই না যে কোন কিছুতে 'প্রথম' হতে যায় তার মাথায় পড়ে যত ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা। যেমনি চলছে ঠিক তেমনি ভাবে চলতে চাই আমি, ঝাঁকের কই হয়ে ঝাঁকে মিশে যেতে চাই।

দালান তো নয়-ই টিনের ঘরগুলির ভিটে পোস্তা বাঁধাবার প্রস্তাবেও মাথা নাড়লেন তিনি।

—না, না, ওসব করে দরকার নেই, আমি করতে পারবও না। মাটি আমার সোনা আমার লক্ষ্মী, মাটির দৌলতে-ই আমার এত কারবার। সেই মাটি পোড়াতে পারব না আমি।

অনেক জমি ছিল দাদামশাইয়ের। ধান পাট, কলাই বিক্রী করে প্রচুর টাকা থাকত হাতে। জমে জমে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বেশ মোটা অঙ্কেরই হয়েছিল।

মামারা কিন্তু লেখাপড়া শেখেননি। অবশ্য দাদামশাই চেষ্টার কমতি করেননি। কিন্তু মামারা বাড়ীতে নিষ্কর্মা হয়ে আরামে থাকতে থাকতে কোন কাজই করতে পারতেন না। সুগন্ধি সরু চালের ভাত, পুকুরের টাটকা মাছের মুড়ো, ক্ষীরের ঘন দুধ—এই সব খেতে খেতে এবং হজম করতেই সমস্তদিন চলে যেত তাঁদের।

দাদামশায় মারা যাবার পরে মামারা দালান তুলেছিলেন। কিন্তু, সে দালান শেষ করতে পারেন নি। উপর্যুপরি কতগুলি বিপদ। ব্যাঙ্ক থেকে খরচের জন্য টাকা তুলে রেখেছিলেন—চোর এসে সব নিয়ে গেল। একটা জমি নিয়ে এমন গোলমাল বাঁধলো যে 'কোর্ট-কাচারী' করতে করতে টাকা আর সময় দুই-ই শেষ হয়ে গেল।

তারপরে ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হওয়া—ঝগড়া-ঝাটি, গোলমাল। দালান আর কোনদিন শেষ হয় নি। এমন কি দালানের কাছাকাছিও থাকে নি কেউ।

আমি একবার মাত্র ওঁদের ওখানে গিয়েছিলাম। দাদামশায়ের বিরাট জায়গা সাতভাগে ভাগ হয়ে নিতান্তই ছোট ছোট অংশে পরিণত হয়েছে। ছোট ছোট ঘর। নোংরা, অপরিষ্কার। ঘরের চাল ফুটো।

মামীমাদের গায়ে গয়না তো নেই-ই একটা ব্লাউজও নেই। ছেঁড়া ময়লা শাড়ী পরে মূর্তিমতী অলক্ষ্মীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সব কটি মামীমারই একই অবস্থা। তবু ওরি মধ্যে দু'একজনের স্বাস্থ্য একটু ভাল আছে। ছেলেমেয়েগুলি ভালভাবে খেতে পায় না—ল্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

—বাবা বারণ করেছিলেন, বড়মামা বলেন,—দালান করতে। বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে দালান সয় না। সত্যিই দালান আমাদের সর্বনাশ করে দিল। এখন তো আমরা ভিখারী হয়ে গেছি।

দালানটাও দেখলাম। অর্ধসমাপ্তভাবে এককোণে পড়ে আছে। মামারা ওকে অভিশপ্ত মনে করেন। কেউ হাঁটেন না ওর পাশ দিয়ে—ওরি মধ্যে দেয়ালের ফোকরে ফোকরে বড় বড় গাছ হয়েছে। চারিপাশে আগাছার জঙ্গল।

অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে নয়, তাকে ব্যঙ্গ করে যেন দাঁড়িয়ে আছে অসমাপ্ত বাড়ীটা। সেজমামা যখন পূর্বের ঐশ্বর্য ও জমজমাট সংসারের বর্ণনা দিচ্ছিলেন আমার স্পষ্ট মনে হ'ল—বাড়ীটা যেন মুচকি হাসল!

একমাত্র মায়ের কাছ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় দাদামশায়ের অতীতের সম্পদের ইতিহাস। মা'র বাক্সভরা গয়না—রূপো, সোনা, হীরে, মুক্তো।

কি নেই সেই বাক্সে। মাথার সোনার মুকুট—পঁয়ত্রিশ ভরি। কোমরে চন্দ্রহার—চল্লিশ ভরি। মা যদি সবগুলি গয়না পরতেন—তবে হাতের আঙ্গুল থেকে উপরের হাত পর্যন্ত একটু চামড়াও দেখা যেত না। আর তা সত্ত্বেও অনেকগুলি চুড়ি, রুলী, তাবিজ, বাজু অবশিষ্ট থাকত।

আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় আমি খুব আশ্চর্য হতাম, মা গয়নার বাক্স খুললেই আমি হাঁটু গেড়ে ওঁর পাশে বসতাম—এটা কে দিয়েছে, মা।

—তোমার দাদামশাই, মা উত্তর দিতেন।

—এটা কে দিয়েছে মা।

—তোমার দাদামশাই।

—সবই দাদামশাই দিয়েছে! হঠাৎ যেন খেপে যেতাম আমি।

—হ্যাঁ, সবই। আরও শুধু কি গয়না—খাট, পালঙ্ক, আলমারী, দেরাজ সবই দিয়েছেন—বাবা। আমাকে দিয়েই উজাড় হয়ে গেলেন উনি।

যাক, যা বলছিলাম। শুধুমাত্র দাদামশায়ের সম্পদের স্মৃতি নয়, তাঁর মতবাদও মা রেখেছিলেন। লোকাচার অত্যন্ত বেশীরকম ভাবে মেনে চলতেন উনি।

কেউ বেড়াতে এলে মা তাঁর সামনে বসে এমন হাসি-খুশী গল্প, এমন বিনয় বিগলিত ভাব দেখাতেন যে, মনে হত অতিথি ভদ্রমহিলাকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র আরম্ভ হ'ত তার সম্বন্ধে সমালোচনা।

ভদ্রমহিলার সবই খারাপ। তার স্বভাব খারাপ, চেহারা খারাপ, হাসি খারাপ, কথা খারাপ, আমার আরও খারাপ লাগত, যে জিনিষগুলি উনি ওঁর সামনে ভাল বলছেন—সেগুলিই আড়ালে খারাপ বলতেন।

আমি একদিন বলেছিলাম, আচ্ছা মা, উনি যদি গেটের সামনে থেকে ফিরে আসেন···

মা চম্‌কে উঠেছিলেন। পাংশুমুখ করে অপরাধীর মত বলেছিলেন, কি? ফিরে এসেছেন নাকি?

তখন আমি বেশ বড় হয়েছি। কথার কায়দা শিখেছি। হেসে বললাম, কেন? তুমি চমকে উঠছ কেন? ভালই তো হবে—আয়নায় নিজের ঠিক চেহারাটা দেখে যাবেন। বলেই, একটু হেসে বললাম, আর সেই সঙ্গে তোমারও।

মা তাড়াতাড়ি উঠে দরজার সামনে থেকে ঘুরে এলেন। তারপর থেকে মা কখনও অভ্যাগত চলে যাওয়ামাত্র তাঁর সমালোচনা শুরু করতেন না।

সেদিন ক্ষীরিদি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ত মাকে দুষ্টু পাজী বলেছিল—মা আড়াল থেকে সে কথা শুনে এগিয়ে এসে ক্ষীরিকে খুব বকলেন। ক্ষীরিও মুখে মুখে উত্তর দিল। দু'জনে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল।

ক্ষীরির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল—তা দেখে আমার এত কষ্ট হ'ল যে, আমি ছুটে গিয়ে মাকে মারতে শুরু করলাম।

মার রাগের যেটুকু বাকী ছিল তা সম্পূর্ণ হ'ল।

—কি? আমার ছেলেকে আমারই বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছিস—তোর এত বড় সাহস। যা, তুই এখনই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা—

ক্ষীরিও রাগের মাথায় দুম দুম করে পা ফেলে নিজের জিনিষপত্র গুছালো—না খেয়েই চলে গেল বাড়ী থেকে।

ক্ষীরি চলে যাওয়ার পরে আমাদের সংসার প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। মা কোন কাজই করতে পারতেন না। কয়েদীরা বাসন মেজে, বাটনা বেটে, কুটনো-কুটে দিয়ে যেত—কিন্তু তারা রান্না করত না। ওদের হাতে রান্না অবশ্য কেউ খাবেও না।

দু'দিনে মা অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন ক্ষীরি ফিরে এলে হাতে স্বর্গ পেতেন। কিন্তু ক্ষীরি ফিরে এল না। এমন কি ওর বাকী মাইনে নিতেও আসে নি।

পরিচিত সবাইকে এক কথা বলেন মা, আমাকে একটা ঝি খুঁজে দাও—মরে গেলাম যে···

তারপরে একদিন সকালে বাবা বেরিয়ে যাবার পরে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। বয়স বেশী নয়। আমার তো ওকে দেখেই খুব ভাল লাগল। বেশ ফর্সা রং—চোখ দু'টি বড় বড়—পরণে একটা সাদা শাড়ী আর ব্লাউজ। খালি গা।

পরে মা বলছিলেন, ঐ খালি গা দেখেই যা বুঝতে পারলাম নইলে তো 'আপনি আজ্ঞে' করে কথা বলেছিলাম আর কি?

—কি চাই? মা জিজ্ঞেস করলেন।

—আপনি একটা ঝি'র কথা বলেছিলেন—তাই এসেছি। কথাও বলে খুব আস্তে আস্তে।

ক্ষীরির ঠিক উল্টো। ক্ষীরি ছিল কালো, মোটা। কথা বলত তা যেন বাড়ী কাঁপত।

—ঝি? তুমি কাজ করবে? মা যেন খুব অবাক হয়েই বলেন।

—হ্যাঁ মা।

—কি নাম তোমার?

—মালতী।

—রান্না করতে জান?

—হ্যাঁ।

—আগে কোথায় কাজ করতে।

কোথাও কাজ করতুম না, মা। ভাইদের সংসারে ছিলাম। মালতী আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তা, এখন সেখানে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—তাই···।

—এখানকার খবর কে দিল?

আমার মনে হ'ল মেয়েটির মুখের ওপরে যেন একটা ছায়া ভেসে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ও উত্তর দিল তখনই, ঐ যে আপনাদের কি বলে তাই···জেল।

—ডেপুটি জেলার। মা বলেন।

—হ্যাঁ। উনিদের বাড়ীর ঝি আমাকে বলেছিল।

ওকে দেখেই মাকে কি রকম অপ্রসন্ন মনে হচ্ছিল। অনিচ্ছুক, অপ্রসন্ন ও বিরক্ত। যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

ডেপুটি জেলারের বাড়ীর ঝি'র মারফৎ এসেছে শুনে আরও বিরক্ত হলেন মা। ওদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মা কথা বলেন না।

মালতী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাও চুপ করে আছেন। ভ্রূ-দু'টো কোঁচকান। কি যেন ভাবছেন। এক কথায় বিদায় করে দেওয়া যায় ওকে। কিন্তু···

রান্নাঘরে উনুন জ্বলছে, কুটনোগুলো পড়ে আছে—রান্না করা, সব গুছিয়ে তোলা, খেতে দেওয়া—চারটে বাজতে না বাজতে উঠে চা, খাবার করতে হবে—আবার রাত্রের রান্না—কিন্তু একবার হ্যাঁ বলে দিলেই পরম নিশ্চিন্ততা যেভাবেই হোক ও করবে—সারাদিন অখণ্ড অবসর শুধু দু' একটা আদেশ, উপদেশ ও সমালোচনা।

এখন যেভাবে মায়ের মনের কথাগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন কি আর তাই হয়েছিল। আমি দেখলাম—মা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন—আর ট্যাংরা মাছ ভাজতে গিয়ে হাতে যে বড় ফোসকাটা হয়েছিল তাতে হাত বোলাচ্ছেন।

একটু পরে বললেন, আচ্ছা থাক। কত মাইনে নেবে?

তারপরে ওকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে বসলেন।

একটু পরে বড় দারোগার স্ত্রী এলেন। পাশাপাশি থাকতেন। উনি দিনে দু'বার তিনবার আসতেন এ বাড়ীতে।

—কি ব্যাপার, দিদি রাজরাণীর মত বসে যে···রান্না নেই?

—ঝি পেয়েছি, ভাই।

—ও:। তাহলে তো বেঁচে গেছেন।

—হুঁ। দায়ে পড়ে রাখলাম, একদম কাঁচা বয়স।

—তাই নাকি? যাই একবার দেখে আসি।

চটপট উঠে তিনি রান্নাঘরের দিকে গেলেন। ফিরে এলেন একটু পরেই—রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর—পনের-কুড়ি হাত পথ তা এলেন যেন হাঁপাতে হাঁপাতে—

—এ্যা: দিদি, এ যে একদম আগুন···

—কি করি বল।

—এক আগুন থেকে আর এক আগুনে মা পড়ে যান।

কাঁদি ?

—মানে বলছিলাম যে, আগুনের তাঁতে যেতে পারেন না বলে কি বাধা, দেখবেন আবার আগুনের মধ্যেই বাস না করতে হয়—

মাকে চুপ করে থাকতে দেখে বড় বড় চোখ দু'টি আবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, কথায় বলে ফুলকো আগুন আর ঘি একজায়গায় রাখলেই সর্বনাশ।

মা হঠাৎ জোরে হেসে ওঠেন। বলেন, কি যে বল ভাই, সে ভয় আমার নেই। উনি একেবারে গঙ্গাজল। কোনদিকে ফিরেও তাকান না।

দারোগা-কাকীমার মুখটা খুব অপ্রতিভ দেখায়। একটু ফিকে হাসি হেসে বলেন, সে তো ঠিক-ই। আপনার কর্তার মত কে? উনি তো শিবের মতই আপনভোলা।

এখন বুঝতে পারি বাড়ী যাবার পথে উনি খুব হেসেছিলেন। কারণ···

মার মধ্যে কিন্তু আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলাম সাংসারিক ব্যবস্থার মধ্যেও। আগে আমরা বারাণ্ডার টেবিলটায় খেতাম—এখন মা ব্যবস্থা করলেন যে বাবা ঘরে খাবেন। মালতী খাবারদাবার সব এনে বাইরের টেবিলে সাজিয়ে দিল, মা সেগুলি ধরে ধরে ঘরে বাবার সামনে একটা ছোট্ট টেবিল পেতে তাতে দিলেন।

বাবা বললেন, এ কি? ঘরে কেন?

—হ্যাঁ, ঘরেই খাও, তাতেই সুবিধে।

বাবা আর কিছু বললেন না। তখন কি জানি যে, বাবা একটা মুখোস পরে আছেন এবং পাছে কেউ মুখোস খুলে মুখ দেখে নেয় সেই ভয়ে তিনি সর্বদা সশঙ্ক।

ক্ষীরিদি চারটে বাজলেই চা তৈরী করে বাবাকে দিত। মা সে সময়ে বিছানা ছেড়ে উঠতেনই না। প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত তাঁর দিবানিদ্রা চলত। তারপরে উঠে মুখ ধুয়ে, জামা কাপড় ছেড়ে বাইরের ঘরে বসে চা খেতেন। প্রায়ই সে সময়ে বড় দারোগাবাবুর স্ত্রী আসতেন। দু'জনে এক সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে চা খেতেন।

আজ দেখলাম চারটে বাজতে না বাজতেই মা উঠে পড়লেন। মালতী চা, খাবার করেছিল। মা বাবার সামনে নিয়ে ধরে দিলেন।

দু'দিনের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম যে, মা চান না মালতী—ওকে আমি মালতীমাসী বলতাম—বাবার সামনে আসুক। আর তখনই আমার মনে পড়ল—মা আর দারোগা-কাকীমার কথাগুলি।

মায়ের ব্যবহারের আরও অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ত। মা নিজে খুব সাজতে ভালবাসতেন—সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে নিয়েই কি কতগুলি কাঁচা হলুদ, ডালবাটা নিয়ে বসতেন—পুরো একঘণ্টা। চুলও বাঁধতেন অনেকক্ষণ ধরে—দামী দামী জামাকাপড় পরতেন—মুখে কি সব মাখতেন।

কিন্তু মালতীমাসী একদিন মুখে একটু স্নো মাখছিল বলে কি বকুনিটাই না দিলেন ওকে।

সেদিন বাবা বাড়ী ছিলেন না। বাইরে কোথায় গিয়েছিলেন। মালতীমাসীর বিকেলটা ছুটি—চারটের সময় উঠে চা, খাবার করবার তাড়া নেই—তাই বোধ হয় মালতীমাসী সখ করে সাজতে বসেছিল।

আমি বাইরের ঘরে বসে একা একা খেলা করছিলাম—বড় সোফাটা আমার নৌকো—সেই নৌকো নিয়ে অন্ধকার বনের মধ্যে একা যাচ্ছিলাম আমি—চারিদিকে ভীষণ জঙ্গল আর রাক্ষস-খোক্কস—এক হাতে আমার হাল—আর এক হাতে বন্দুক—এমনি সময়ে চেঁচামেচি শুনে ছুটে বাইরে এলাম।

মালতীমাসী কাঁদছে—আর মা তার সামনে কোমরে হাত দিয়ে রেগে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে একটা স্নো'র শিশি খোলা—

আমি ভাবলাম, মালতীমাসী বোধ হয় মা'র স্নো নিয়ে এসেছে তাই মা ওকে বকছেন। তা এত বকবার কি আছে। মার তো অনেক স্নো-পাউডার। একটি নিলে কি ক্ষতি।

—কোন্ লজ্জায় তুই সাজতে বসেছিস? বেহায়া! বিধবা হয়ে পরের বাড়ীতে এসেছে ঝি-গিরি করতে—তার আবার সাজগোজ। এই রকম চরিত্র দেখেই বোধ হয় ভাইরা লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে···

আমি অবাক হয়ে মায়ের কথাগুলি শুনছিলাম—কিন্তু শেষের কথাটা মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল—লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে মালতীমাসীকে—কেন? মালতীমাসী—একটু স্নো মাখলে তাকে তার দাদারা লাথি মেরে দূর করে দেবে—মা তাকে অমন ভাবে গালাগালি করবেন—হাত থেকে কেড়ে নেবেন স্নো'র কৌটো—মালতীমাসীর চোখ দিয়ে অমন ভাবে জল পড়বে—

—কেন তুমি মালতীমাসীকে স্নো মাখবার জন্য বকছ, পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠি আমি, তুমি তো কত কিছু মাখ···

আমার কথা শেষ হবার আগেই মা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলাম, মার মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

—তুমি কেন এ-ঘরে এসেছ? চেঁচিয়ে উঠলেন মা। এত জোরে চেঁচালেন যে, আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

মার ও-রকম চেহারা আমি জীবনে দেখি নি। আমি চমকে চুপ করে দাঁড়াতেই মা আমাকে হিড় হিড় করে টেনে এনে বাইরের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন।

—এখানে চুপ করে খেলা কর—বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। একবারও দরজা ধাক্কালাম না—একটুও কাঁদলাম না।

রামলাল মাটিতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে—ক্ষীরিদি করুণমুখে ওর জিনিষপত্র দু'হাতে জড়িয়ে চলে যাচ্ছে—মালতী মেঝেতে বসে আছে—ওর দু'চোখে জলের ধারা—সামনে একটা খোলা স্নো'র কৌটো—আর···

আর আমি দাঁড়িয়ে আছি বন্ধ দরজার এপাশে। আমরা সব-ই একজাত। অসহায়।

অসহায়কে কেউ দয়া করে না।

সেই কথাই একদিন বলেছিলাম এক অন্ধ ভিখারীকে—বেশ একটু খেয়ে ফিরছিলাম—মনটা দরাজ ছিল—ও হাত পাতল—অন্যমনস্কভাবে হাতে যা উঠল—তাই দিতে গেলাম—হঠাৎ ও বলল, অসহায় অন্ধকে দয়া করুন বাবা—আপনার মঙ্গল হবে।

সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা টেনে নিলাম বললাম—অসহায়কে কেউ দয়া

করে না। আমি এইমাত্র একটা দোকানে পঞ্চাশ টাকা খরচ করেছি কিন্তু তোমাকে আমি এক পয়সাও দেব না।

ঐটুকু বয়সে এরকম উপলব্ধি মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়, আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে বিমান। আকাশে ভোরবেলা তোমার গায়ে দেখি অরুণ রঙ। তেমনি অরুণ রাঙা মন নিয়েই তো আমরাও পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করি।

কিন্তু আমার জীবন শুরু হল অসুস্থ মন নিয়ে। কিছুই না জানা, কিছুই না বোঝা লালচে একটি মনে কতগুলি কালো কালো দাগ। জানলাম, পৃথিবীতে সবাই অত্যাচারী, সবাই অত্যাচারিত। জানলাম, বড়রা অর্থাৎ মানুষ এক একটি বিচিত্র জীব। সে নিজের ছেলেকে ভালবাসছে কিন্তু অন্যের জন্যে একটু দরদ অনুভব করছে না—নিজে যা করছে, অপরে সে কাজ করলে বিরক্ত হচ্ছে—সব সময়ে সে একটা মুখোস পরে আছে।

মায়ের মুখোসটার রং চিনতে পারা খুবই সহজ ছিল। উনি সর্বদা দেখাতে চাইতেন যেন কত সুখী—মনে যাই থাক না কেন, লোকের সামনে একটা খুশীর মুখোস পরে থাকতেন।

১০

বাবার মুখোস আমি চিনতে পেরেছিলাম কয়েক দিন পরেই আর তখনই জানতে পেরেছিলাম—বোকা বোকা মুখ আর ড্যাবডেবে বড় বড় চোখ মালতীমাসীও একটা মুখোস পরে আছে। অবাক লেগেছিল, যে মেয়ে মার একটা কঠিন কথা শুনলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, একটা সামান্য কাজ করতে যে তিনবার ভুল করে তারও মুখে মুখোস।

মালতীমাসীকে দেখাত যেন একটা হাবা গোবা মেয়ে—পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছে। নির্বোধ এবং নিরীহ, সেও যা দেখায় তা নয়—

কিংবা হয়ত তাই। হয়ত আসলে মানুষের নিজের কোন রং নেই। জলের মত ভিন্ন পাত্রে রেখে ভিন্ন রং হয়।

আমি···হ্যাঁ, আমি চিরদিন মুখোস ঘৃণা করেছি কিন্তু তবু বাইরের লোক আমার মুখে মুখোসই দেখবে। কেউ বলবে আগেকারটা ছিল মুখোস, কেউ বা ভাববে এখনকারটা।

আমার বাবা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। আমি ওঁদের যৌবন-শেষের সন্তান। যখন আমি বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি, তখন বাবার বেশ বয়স হয়েছে। কিন্তু তখনও ওঁর চেহারা নয়নমুগ্ধকর।

ধবধবে সাদা রং, দুধের মত সাদা, নিবিড় কালো চোখ, একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বাবাকে দেখাত ঠিক কুড়ি বছরের মত।

মা অত যত্ন করতেন চেহারার—অত সাজসজ্জা করতেন—কিন্তু তবুও বাবার পাশে মাকে মানাত না অনেক বুড়ো দেখাত। মা তা বুঝতেন, সে জন্যই উনি সব সময়ে চেষ্টা করতেন বয়স কমাবার, আর বাবার সামনে হাসিখুসী ভাব বজায় রাখলেও বাবা বেরিয়ে গেলেই ওঁকে অত অসুখী দেখাত।

মার সঙ্গে বাবার ব্যবহার ছিল খুব সংক্ষিপ্ত ও ভদ্র। দরকারী কথাগুলি বলতেন, হাসতেনও পরিমিত আর বাইরের কেউ এলে জোরে জোরে চেঁচিয়ে মায়ের নাম ধরে ডাকতেন। আমার মায়ের নাম ছিল স্বর্ণা।

কিন্তু আমি জানতাম ওঁদের রাত্রির ইতিহাস, অবশ্য এখন আর আমি মা বাবার সঙ্গে শুতাম না আলাদা ঘরে একটা ছোট খাটে একা থাকতাম—মালতীমাসী মেজেতে শুত কিন্তু ছেলেবেলার সেই অভিজ্ঞতা আমি ভুলিনি।

তাই আমি অবাক হয়ে ভাবতাম রাত্রে যারা এ রকম ব্যবহার করে দিনের বেলা তাদের ভাব এত ভদ্র হয় কি করে।

বাবা তো শুধু দিনে-রাত্রে বদলাতেন না।

বাবার ব্যবহার বদলাত লোকে লোকে সময়ে সময়ে। জানতে পারলাম, শুধু চোখে যা দেখি বাবা তা নন।

বাবা চরিত্রহীন। বাবা মাতাল। বাবা ভণ্ড। বাবা চোর। বাবা অত্যাচারী, বাবা নীতিজ্ঞানহীন, বাইরের পৃথিবী বাবার সম্বন্ধে জানতে পারলে এতগুলি বিশেষণই বলবে বটে কিন্তু, আমি শুধু এক কথা বলব বাবা ভণ্ড।

জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত একমাত্র যাঁকে ভালবেসেছি তাঁর সম্বন্ধে এই কথা জানা যে কি জানা—কি যন্ত্রণা তা যে না জেনেছে সে বুঝবে না। তাই পনের বছর বয়সেই আমার পৃথিবী বদলে গেল। অরুণ-রাঙা কাগজে দু' একটি কালো দাগ পড়ছিল—সেদিন সমস্ত পাতাটাই নিকষ কালো হয়ে গেল।

আগেই বলেছি, আমার ঘরে মালতীমাসী শুত। এক রাত্রে জানি না তখন কত রাত জেগে গেলাম—জেগেই মনে হল ঠিক যে রকম থাকা উচিত তেমনি নেই—কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে ঘরের মধ্যে। ঘুম ভরা চোখে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হল কে যেন এসেছিল—দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে নয় মালতীমাসীর পাশে—একটা দীর্ঘ ছায়া রাতের তৃষ্ণার্ত আত্মার মত—তারপরে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম আর কিছুই মনে নেই।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে। আকাশ, তখন থেকেই তো তুমি আমার একান্ত আপনার। তাকিয়ে থাকতাম তোমার বুকে ভেসে থাকা সেই জল জলে তারাটার দিকে যার নাম দিয়েছিলাম বন্ধু। বন্ধুকে বলতাম দিনের অভিজ্ঞতার কথা। তারপরে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়তাম। জাগতাম একদম সকালে যখন মালতীমাসী আমাকে ডেকে তুলত।

১১

বিকেলের দিকে বাবা বেরিয়ে গেলে মা প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যেতাম। না যেতে চাইলে মা বকতেন। কি জানি কেন, উনি আমাকে মালতীমাসীর সঙ্গে একা বাড়ীতে রেখে যেতে চাইতেন না।

সেদিনও আমরা একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় গিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। মা একটা বিশ্রী উগ্র রংয়ের শাড়ী পরেছিলেন।

—তুমি এই শাড়ীটা কেন পরেছ, আমি বললাম, রাস্তার লোকরা সব হাঁ করে তাকিয়ে আছে···

মা একটু হাসলেন। বেশ তৃপ্তির হাসি।

—এ শাড়ীটা তোমাকে একটুও মানাচ্ছে না। তাই রাস্তার লোকরা তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে—

—দেব একটা চড় কষিয়ে, মা হঠাৎ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, সব সময়ে পাকা পাকা কথা। ছোট মুখে বড় কথা।

সত্যি কথা বলায় মার এই অকারণ রাগ ও অপমানজনক উক্তি শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল।—যাও, তোমার সঙ্গে যাব না—বলেই ছুটে চলে গেলাম।

মা কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু তখন আমি বাড়ীর পথ ধরেছি। কোন উত্তর দিলাম না—ফিরেও তাকালাম না।

গেটের কাছে এসে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, মা আমার দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখে উনি নিজের পথে চলে গেলেন।

দরজা খোলা ছিল। আমি ভেতরে ঢুকে গিয়ে খেলা ঘরে খেলতে বসে গেলাম। বারান্দায় বড় একটা আলমারী—একটা সোফার আড়ালে চৌকোমত একটা জায়গা ছিল। সেটাই ছিল আমার খেলাঘর।

বাড়ীতে ঢুকে মালতীমাসীকে আমি দেখতে পাইনি—তার কথা আমার মনেও হয় নি।

একটু পরেই জুতোর পরিচিত শব্দ। সোফার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম বাবা বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বোধ হয়, কোন দরকারী কাগজপত্র ফেলে গেছেন তাই নিতে এসেছেন। কিন্তু, কই বেরুচ্ছেন না তো।

নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে আবার উঁকি দিলাম, প্রচ্ছন্ন রাখবার কারণ ছিল। বাবার সামনে সহজে পড়তে চাইতাম না। বাবাকে খুবই ভালবাসতাম কিন্তু সে ভালবাসা—এখন বুঝতে পারি ছিল এ্যাডমিরেশান এবং অ (awe)—বিস্মিত বিমুগ্ধ সৌন্দর্যপ্রীতি। বাবাকে দূর থেকেই ভালবাসতাম—আড়াল থেকে দেখতেও ভাল লাগত—কিন্তু বিশেষ কাছে ঘেঁষতাম না। তার আর একটা কারণ এই যে, বাবা ছিলেন খুবই স্বল্পভাষী।

উঁকি দিয়ে দেখলাম বাবা শোবার ঘরে খাটের ওপরে বসে আছেন। মনে হচ্ছে যেন কারো প্রতীক্ষা করছেন। তবে কি বাবা জানেন না যে, মা বেড়াতে গেছেন। বেরিয়ে গিয়ে খবরটা বলব কিনা ভাবছি এমনি সময়ে বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

মালতীমাসী বারান্দা পার হয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। মালতীমাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম—ধবধবে সাদা মুখটা, কি যেন মেখেছে মালতীমাসী—নিশ্চয়ই কিছু—যা মাখলে মায়ের কালো মুখটাও সাদা দেখায়—কপালে কাঁচপোকার টিপ—পরনের শাড়ীটা সাদাই তবে খুব পরিষ্কার—এত ফর্সা কাপড় পরতে মালতীমাসীকে আমি কখনই দেখি নি—

মালতীমাসী বারান্দা পার হয়ে যেতেই একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম—মা যে সেণ্টটা বাইরে বেরুবার সময়ে মাখেন। তবে কি মা যা বলেন তা সত্যি, মালতীমাসী লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের প্রসাধনের জিনিস মাখে—কিন্তু—

কিন্তু কেন সাজে মালতীমাসী!

মালতীমাসী এ ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি এগিয়ে গিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়ালাম। কৌতূহলে ভেঙ্গে পড়ছি। কি করবে—ওরা কি করবে।

আর ঘরের দিকে তাকাতেই আরও অবাক হয়ে গেলাম। অবাক কথাটা যেন খুবই সাধারণ—এত বিস্ময়ও আমার ভাগ্যে জমা ছিল। মালতীমাসী ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবা উঠে ওকে দু'হাতে টেনে কাছে নেন···

—এত দেরী করলে কেন?

—কি করব? ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে মালতীমাসী। ওর গলা শুনে আরও অবাক হয়ে গেলাম। এই প্রথম এভাবে কথা বলল মালতীমাসী। সাধারণত এত আস্তে কথা বলে যে, গলাই বোঝা যায় না।

মা অনেকদিন বকতেন—তুমি কি পেটের মধ্যে অর্ধেক কথা রেখে কথা বল। কথা বোঝা যায় না কেন?

এখন মালতীমাসীর গলা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ঝনঝনিয়ে বাসনের মত শব্দ হচ্ছে। চোখ দু'টোও অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওর।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস। বাবা বললেন।

অ্যাঁ! জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম। মায়ের বিছানায় বসবে মালতীমাসী।

ওরা দু'জনে চমকে তাকাল। মুখটা সাদা হয়ে গেছে। তুমি এখানে কি করছ? বাবা জিজ্ঞেস করলেন। গলাটাও অন্যরকম শোনাচ্ছে আজ।

—খেলা করছি। বাবা, তুমি মালতীমাসীকে মায়ের বিছানায় বসতে বললে কেন?

—অ্যাঁ···না, না তো আমি বলিনি তো···

—হ্যাঁ তুমি বলেছ। জোর দিয়ে বলি, আবার মিছে কথা বলছ।

মালতীমাসী ঘরের কোণে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলি, আর, মাসীই বা এত সেজেছে কেন? কেউ কোন উত্তর দেয় না।

—কেন তুমি সেজেছ? আমি আবার প্রশ্ন করি। এবারে সোজা মালতীমাসীকেই বলি—বল, কেন তুমি সেজেছ?

এবারে ও আমার দিকে ফিরে তাকায় চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে। বলে, আমার কি কখনও সাজতে ইচ্ছে হয় না? তোমার মা কত সাজেন। আমি তোমার মায়ের চেয়ে দেখতে খারাপ।

মালতীমাসী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঠিকই বলেছে ও। চুপ করে ভাবি।

শোন, তুমি এসব কথা মাকে বলো না—

বাবার হঠাৎ বলা কথায় চমকে তাকাই। আমি হয়ত মাকে কিছুই বলতাম না। কিন্তু, বাবা নিষেধ করবার জন্যই বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করি, কেন?

বাবা সে কথার উত্তর না দিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট আমার হাতে দেন। বলেন, তোমার ইচ্ছে মত খেলনা কিনো।

পাঁচ টাকা দূরে থাক আজ পর্যন্ত কখনও পাঁচটি পয়সা নিজের হাতে পাইনি। বাবা এ বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন তিনি বলতেন ছেলেদের হাতে পয়সা দিলে ওরা খারাপ হয়ে যায়, মায়েরও তাতে পূর্ণ

সম্মতি ছিল। বাবা বলতেন, তোমার যা দরকার আমাকে বলবে—কিনে দেব।

কিন্তু, আমাদের একান্ত দরকারী জিনিষগুলি অধিকাংশ সময় বড়দের দরকারের পর্যায়ে পড়ে না। তাছাড়া আমার একটা স্বভাব আমি একটা কথা দু'বার বলতে পারি না। তাই আমার সমবয়সী ছেলেরা যখন পরমানন্দে পকেট থেকে ঝনঝনিয়ে পয়সা বার করে দোকানে গিয়ে জিনিষপত্র কিনত, আইসক্রীম কিনে খেত, চিনেবাদাম কিনে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলোত তখন আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতুম—মনটা কি রকম শুকনো হয়ে যেত, ভাবতাম কবে বড় হব—নিজের জিনিষ নিজে কিনতে পারব।

এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে হাতে তুলে নিলাম আর সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম—বাবা যা বলবেন তাই আমাকে শুনতে হবে—এই সব কথা ইচ্ছে হলেও কাউকে বলতে পারব না।

অতল গহ্বরে নামবার পথে সেই আমার প্রথম ধাপ। সেদিন টাকাটা নিতে গিয়ে কিন্তু থমকে দাঁড়াই নি। হাত বাড়িয়ে নিয়েছি হাসিমুখে খরচ করেছি। বাবার কাছেই আমার হাতেখড়ি হল।

কয়েদীরা যারা কাজ করতে আসত তাদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসতাম। গল্প মানে ওদের পূর্বজীবনের ইতিহাস শোনা। জেলে আসবার আগে কে কি করত—কেন জেল হল।

ধরম নামে একটা কয়েদী ছিল সে বলত, কে কি করতাম ছোটবাবু, এমনি দুনিয়ায় হাজারটা মানুষ যা করে আমরাও তাই করতাম। পেটের চিন্তা—সংসারের চিন্তা—এইসব। ওরই মধ্যে মাথাটা ঠিক থাকতে থাকতে হঠাৎ বেঠিক হয়ে যায়, বাবু। তেমনি একদিন বেঠিক মাথায় একটা লোককে খুন করে বসলাম।

—খুন। অবাক হয়ে বলি, তার মানে তুমি লোকটাকে মেরে ফেললে।

—হ্যাঁ। হা-হা করে হেসে ওঠে ধরম, খুন মানে মেরে ফেলা। শেষ করে দিলাম ওকে। ও ব্যাটা ছিল এক নম্বরের হারামী। আমি না খতম করলে আর কেউ-না-কেউ করত। জজসাহেব তা বুঝলেন তাই তো ফাঁসী হল না।

ধরমের কাছেই আমি আর সব কয়েদীদের গল্প শুনতাম। সে ছিল ওদের 'মেট', কয়েদীদের মধ্যে খুনীর সম্মান খুব বেশী।

ধরম বলত, ওগুলি তো সব 'সস্তা কলজের' আদমী। কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ রাহাজানি করেছে, কেউ বা করেছে পরের বউয়ের সঙ্গে পীরিতি।

—পীরিতি কি?

আবার জোরে হেসে উঠত ধরম। বলত, ছোটবাবু, তুমি এখনও কচি ছেলে। তুমি কি আর ওসব কথা বুঝতে পার?

—হ্যাঁ, বুঝতে পারব। তুমি বুঝিয়ে বল না, জেদ ধরতাম।

—ঐ আর কি? হাসি-তামাসা করা, হাত ধরে টানা···

একটা সাদৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মালতীমাসী দাঁড়িয়ে আছে—বাবা হাসতে হাসতে উঠে ওর হাত ধরে বসতে বলছেন।

—আর সেই মেয়েটার যদি স্বামী না থাকে···

—তাহলে তো আরও খারাপ। চট করে যেন আগুনের মত জ্বলে ওঠে ধরম, 'অবলা' মেয়েকে পেয়ে যে খারাপ করে, সে তো মানুষ নয়, কুত্তার বাচ্চা···কুত্তা···কুত্তা···

—তাই তো, খেপে গিয়েছিলাম সেদিন, নিজের মনেই বলে ধরম, 'কুত্তাকে' শেষ করে দিয়েছিলাম। দেখবার কেউ নেই সেই গরীব মেয়েটার সর্বনাশ করেও যখন লোকটা বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকল—একটুও লজ্জা পেল না। মেয়েটা পচে-গলে মরল, কেউ তার মুখে এক ফোঁটা জল দিতে এগিয়ে এল না।

তার পরদিনও দেখলাম লোকটা সেজেগুজে 'খুসবু' মেখে একটা মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। আর সহ্য হল না—সেখানে ঐ সব লোকের সামনেই মাথায় 'দা' মারলাম···

আমি তখন যে ওর সব কথা বুঝতে পেরেছিলাম তা নয়, কিন্তু শুনতে ভাল লাগছিল। রূপকথার গল্পের মত। রাজা, রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়া আর বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি—বুঝতে পারতুম না—তবুও কতো ভাল লাগত।

—সর্বনাশ কি? এতক্ষণে প্রশ্ন করলাম।

—বাবুজী, ধরম হাসত, বাবুজী, তুমি এখনও ছোট—মেয়েদের সর্বনাশ কি তা বললেও বুঝবে না—শুধু এইটুকু জেনে রেখো, পুরুষ পাশে দাঁড়ালে যা মেয়েদের গৌরব—পুরুষ সরে দাঁড়ালে তাই চরম বিপদ। যখন দেখবে একটা মেয়ে জোরে কাঁদতে পারছে না, গুমরে গুমরে কাঁদছে, যখন দেখবে বিনা দোষে তাকে লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে, তাকে সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে তখন বুঝতে পারবে মেয়েদের সর্বনাশ কি। [ক্রমশ।

LUX

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

হামবুর্গের লর্ড মেয়রের কথাটি মনে নাড়া দিয়েছিল। মেয়র আমাকে বলেছিলেন: জানেন, আমরা তাকিয়ে আছি নতুন জেনারেশনের দিকে। কেবলমাত্র যান্ত্রিক ও কারিগরি উন্নতির সাফল্যের ওপর জার্মানী বেঁচে থাকতে পারে না। সে বেঁচে থাকবে তার নতুন মানুষের মধ্যে।

এই নতুন মানুষের সামনে কোন্ আদর্শ আপনারা তুলে ধরবেন? আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

আধ্যাত্মিকতার আদর্শ। প্রগতি কখনও একমুখো হতে পারে না। রাস্তা-ঘাট কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রসার চাই। আর মনের প্রসার হতে পারে অধ্যাত্মবাদের ধারণা মনে বদ্ধমূল হলেই। আমরা মানবতাবাদী রাষ্ট্র তৈরি করতে চাই।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল। লণ্ডন থেকে আসবার সময় হেরোডোটাস যে প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছিল মনে।

ভার্সাইলের একটি আলোকিত অট্টালিকা
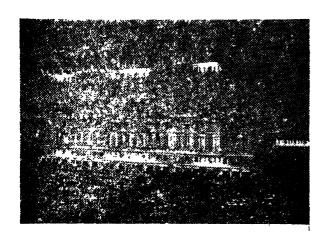
জড়বাদীরা বলবেন: দু'হাজার বছর ধরে ইওরোপ ধর্মের আফিম খেয়ে এসেছে। তাতে মানব জীবনের সমস্যাগুলির কি বিন্দুমাত্র হয়েছে সমাধান? ইওরোপ যে নাস্তিক একথা তার অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভারতীয় নৃপতিরা সমবেত হয়েছিলেন স্বল্পকালের জন্য মাত্র একবার—কিন্তু ইওরোপের মানুষ ক্রুশেড লড়েছে শুধু একবার নয় বহুবার। কিন্তু তাতে কি ধর্মদ স্থাপন হয়েছে?

কেউ বলবেন: না হয়নি। তার কারণ ইওরোপে খৃস্টানিটির নামে যা চলে এসেছে তা সেণ্ট অগাষ্টাইনের প্রচলিত ধর্মমত নয়। আধ্যাত্মিকতা তো নয়ই।

প্রশ্ন উঠবে: কিন্তু রিফর্মেশনের পর? কনষ্ট্যান্সের সভায় হাস-এর আত্মদানের পর? ম্যাকসনির রাজগৃহে বসে মার্টিন লুথার তো বাইবেলের জার্মান অনুবাদ করে জার্মানবাসীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, সেণ্টপিটারো থেকে পোপ যা বলছেন তা বাইবেলের কথা নয়।

১৫১৭ সালের কথা বাদ দিলাম। তারও পরে চলে আসি ১৮৫১ সালে। ম্যাক্সমুলার প্রাচ্যদর্শনের খনি উদঘাটিত করেছেন পশ্চিমের কাছে। তাঁর **Sacred Books at the East** উনপঞ্চাশ খণ্ডে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শতক থেকে কুড়ি শতক জার্মানী তথা ইওরোপের স্বর্ণযুগ। গ্রোগল, হার্ডার, গ্যেটে, নোভালিস, ফিক্টে, শেলিং, হেগেল, শোপেন-হাওয়ার, ভাগনার, নীটশে। জার্মানীতে যেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে কোন নাটকের সম্মিলিত অভিনয়।

কিন্তু কি হল? অ্যারিস্টটলের শিক্ষা কি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট?

আসলে মনে হয় ইওরোপ স্পিরিচুয়ালিজম্ বলতে একমাত্র রিলিজিয়নকেই বুঝেছে। আর রিলিজিয়ন হল ইওরোপে রাজধর্ম। তা রাজনীতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এখনও জার্মানীর ক্যাথলিকেরা

চিন্তা করে উভয় জার্মানী মিলিত হলে প্রটেষ্ট্যান্ট প্রধান পূর্বজার্মানীর দ্বারা কোন সমস্যার উদ্ভব হবে কি না।

আর চার্চকে তারা গ্রহণ করেছে, অবলম্বন করতে পারেনি। ড্যানিয়েল ডিফো তাঁর এক কবিতায় এই অবস্থাকেই সম্ভবত ব্যঙ্গ করে বলেছেন,

Whereever God erects a house of prayer.
The devil always builds a chapel there.

তারা সারা সপ্তাহ পাপ করেছে রবিবারে এসে প্রার্থনায় যোগ দিয়েছে। এ প্রার্থনা আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে নৈমিত্তিক বাধ্যতামূলক জাতীয় সংগীত গাওয়ার মত।

আর মামুদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন। কিন্তু তিনি মসজিদ লুণ্ঠন করেন নি। অথচ গত দু' দুটো যুদ্ধে ইওরোপে যারা বোমা ফেলে চার্চ ধ্বংস করেছে, তারা সকলেই খৃষ্টান।

সুতরাং জার্মানীর নতুন দিনের মানুষদের সম্মুখে যে আধ্যাত্মিকতার আদর্শ রাখা হবে, তার স্বরূপ কি? দশটা স্কুল, পাঁচটা হাসপাতাল আর সেই সঙ্গে দুটো চার্চ করে দিলেই কি জড়বাদের ভূত ঘাড় থেকে নামানো যাবে? ইংলণ্ডে দেখেছি, বড় বড় কারখানায় মাঝে মাঝে লাঞ্চের সময় চার্চের লোক এসে বক্তৃতা দেন। বিষয় ধর্ম—স্কুলে ধর্মচর্চা বাধ্যতামূলক, শুক্রবার রাতে শুঁড়িখানায় যেমন ভিড়, রবিবার সকালে চার্চে দেখেছি ভিড়ের সংখ্যা সমধিক। তাহলে কি বুঝব অধ্যাত্মবাদের শিক্ষা ইওরোপের সম্পূর্ণ হয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব পাইনি।

হামবুর্গের দুটি রূপ আছে—একটি তার ছায়াঘন রূপ, যেখানে তার শ্যামকুঞ্জছায়া শুধু অবসর দিয়ে ঘেরা। যেখানে নাইটিংগেল পাখিরা গান গায়, আলষ্টার লেকের মরালেরা সাঁতার কাটে রাত্রি-দিন। যেখানে সান্ধ্যভ্রমণে আসে তরুণ-তরুণীরা।

আর একটি দিক—সেখানে শুধু ফার্ণেসে আগুন জ্বলে, ক্রেনের ঘর্ঘর শব্দ ওঠে, জাহাজ থেকে মাল খালাস হয়। পণ্য ওঠে। হামবুর্গের একদিকে আছে জাহাজ তৈরির কারখানা, একদিকে আছে বন্দর।

কিন্তু বন্দরের সীমা শেষ হলেই পাওয়া যাবে সুন্দরী হামবুর্গকে। এস আলষ্টার পার্কে, এস স্টুলবার্গে, এস জুয়োলজিক্যাল গার্ডেনে, অ্যালটেস ল্যাণ্ডে। এমন কি এসে দাঁড়াও সিটি হলের সামনে।

চারিদিকে শুধু ইমারত। যেন বিরাট বিরাট ম্যাচ বাক্সকে সাজিয়ে রেখেছে। আর প্রতিটি ইমারতের সামনেই একটু করে তৃণাচ্ছাদিত লন। বিরাট বিরাট ফুটপাথ— তার মাঝে মাঝে একটু করে তৃণশষ্য।

ইওরোপের আধুনিক শহরগুলির স্থাপত্য রীতির পরিকল্পনাই হল এই। শহরের উষরতার মাঝে সবুজের ছন্দ জাগানো। মেশিন-গানের সম্মুখে গাওয়া জুঁইফুলের গান।

ইওরোপ বাঁচবার আর্ট জানে। সে বলে না বস্তু হতে সেই তো মায়া সত্যতর। বস্তুকেই সে ঘিরে রাখে মায়া দিয়ে।

জীবন-চর্যা বলে একটি শব্দ ছিল আমাদের দেশেরও অভিধানে। যা ছিল কালিদাসের কাব্যে, যার বর্ণনা ছিল বাৎস্যায়নের কামসূত্রে। কিন্তু আজ আমাদের দেশে তা শুধু ইতিহাস—স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের গবেষণার বস্তু।

দীর্ঘ দু'শতাব্দী ধরে চেষ্টা করে আমরা পুরোপুরি ইওরোপীয়ও হতে পারলাম না—খাঁটি ভারতীয় বলে নিজেদের পরিচয় দেবার গৌরবও হল অন্তর্হিত।

আর এখন আমাদের জীবন দারিদ্র্যের পঙ্কিল স্রোতে অবরুদ্ধ। জীবনই নেই তার জীবন-চর্যা?

কিন্তু মানুষের সৌন্দর্যবোধ? তার রূপ চেতনা? ইংরাজীতে যাকে বলে অ্যাসথেটিক সেন্স? যা আছে ইতর প্রাণীর মধ্যেও। বাবুই যখন বাসা বাঁধে তখন সে নিপুণ শিল্পীর মত আপন বাসগৃহকে করে সুসজ্জিত। কেউ বলবে না সেখানে ধনের বিজ্ঞাপন আছে, বলবে অর্থের দৈন্য থাকলেও মনের দীনতা নেই।

কোন কেরাণীর পক্ষে তার সরকারী ফ্ল্যাটের প্রকোষ্ঠগুলিকে ডানলোপিলো দিয়ে মণ্ডিত করা অসম্ভব মানি, এ-ও জানি সেখানে কাশ্মীরী কার্পেট সাধ্যাতীত নয় অসম্ভবও। কিন্তু তাই বলে মানতে পারি না পরিমিত সামর্থ্যের মধ্যেও রুচির পরিচয় দেওয়া যায় না।

আমি আশা করি না কলকাতার হ্যারিসন রোড রাতারাতি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু বিশ্বাস করি হ্যারিসন রোডকে আমরা আরও সুন্দর করতে পারি। আমাদের কর্পোরেশন পথের ওপর থেকে ডাষ্টবিন অপসারণ করতে পারে, পথের দু'ধারে বৃক্ষরোপণ করতে পারে; এবং আমরাও সাধারণ
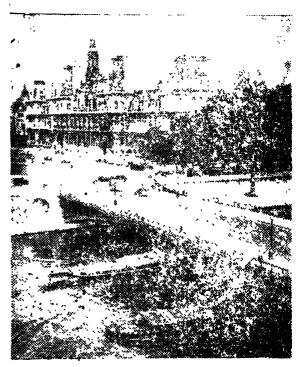
প্যারিসের একটি বিখ্যাত হোটেল

নাগরিকতা বোধ ও স্বাস্থ্য-রক্ষা বিধি সম্পর্কে যেটুকু পাঠ স্কুলে গ্রহণ করেছি তার প্রয়োগ করতে পারি।

এর জন্যে ধনী হবার প্রয়োজন হয় না শুধু রুচিবান হবার প্রয়োজন হয়, এর জন্য নগদ অর্থের ব্যয় নেই ; প্রয়োজন শুধু সৌন্দর্য সম্পর্কে মৌলিক চেতনার।

ব্যক্তিগতভাবে সে চেতনার অধিকারী কেউ কেউ থাকতে পারেন, কিন্তু জাতিগতভাবে সে চেতনা আমাদের একান্ত ভাবেই অনুপস্থিত।

হামবুর্গ বিমান বন্দরে আবার হানসকে বিদায় দিতে হল। এবার আমাদের যাত্রা বনে'র পথে।

বিমান ছাড়ার দেরী আছে। হানস এয়ার পোর্টের একটি হোস্টেসের সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল হানস : কাল তোমাকে মেরির কথা বলেছিলাম। যার সঙ্গে কথা বলছিলাম এই হল মেরি।

মনে পড়ল গতকাল সন্ধ্যায় আলস্টার পার্কে বসে হানস আমাকে এই মেয়েটির কথা বলেছিল।

মেরি তখন চাকরি করত ট্রাভেল এজেন্সীতে ; ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল হানসের সঙ্গে। একবার ছুটিতে একসঙ্গে গিয়েছিল 'কিয়েল'এ। বলটিক সমুদ্রের তীরে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দুজনের দুজনকে ভাল লাগেনি। হানসকে চিঠি লিখেছিল মেরি : ভেবে দেখলাম আমাদের বিয়ে সম্ভব নয়। আমরা বন্ধুই থাকতে চাই।

হানস চিঠি পড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল : ঠিক এই কথাটাই সে নিদারুণ সঙ্কোচে মেরিকে জানাতে পারছিল না। সে যদি আঘাত পায় ? সে যদি দুঃখ পায় ?

কিন্তু কেন এ অতৃপ্তি ? আজ যাকে ভাল লাগে কাল তাকে কেন দূরে ঠেলে দেয় মানুষ ? আজ যাকে প্রেয় বলে মনে হয় আগামী কাল তাকে কেন মনে হয় না শ্রেয় বলে। তাহলে ফাঁক কোথায় ? নিজের মনে ? না যাকে চাই তার মাঝে ?

হানস বলেছিল : দুটোই সত্যি। জীবনের সমস্ত ভুল করে চাওয়াগুলি যখন শেষ হয়ে যাবে তখনই হয়ত পাব সত্যিকারের মনের মানুষ।

নাও হতে পারে। হয় ত দেখা যাবে পাওয়ার সংখ্যা যত বেড়ে চলেছে চাওয়ারও তত পরিতৃপ্তি হচ্ছে না। আর মানুষ তো গিনিপিগ নয়।

কিন্তু এভাবে নেতি নেতি করে এগুনো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। নারী দেহ একদিন আমাদের দেশেও রহস্য ছিল। একমাত্র বিবাহের সার্টিফিকেট ছিল সে রহস্য উন্মোচনের একমাত্র ছাড়পত্র। কাজেই যে নারীই জীবনে এসেছে আমরা প্রকৃতির প্রয়োজনে একদিন তাকে বরণ করে নিয়েছি। সারা জীবন তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি। কারণ সেদিন নারীকে আমরা একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি।

কিন্তু আজ ? আজ নারী দেহ আমার কাছে রহস্য নয়। সতীত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা পালটে গেছে। আজ অবিবাহিত নর-নারীর মধ্যে অবাধ যৌন-সংসর্গ খুব অসাধারণ কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় নয়। যৌন ক্ষুধাটাকে আমরা জীবনের আর পাঁচটা ক্ষুধার মত সহজ করে নিয়েছি।

কাজেই বিবাহ একমাত্র নারীদেহের রহস্য অবগুণ্ঠন উন্মোচনের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। সেজন্য জীবনসঙ্গিনীর কাছ থেকে আমরা আশা করি উভয়ের মানসিকতার সাযুজ্য, রুচির সমতা। এখন আমার স্ত্রীকে আমি সে দৃষ্টিতে দেখি না যে দৃষ্টিতে আমার পূর্বপুরুষেরা দেখেছে।

অবাধ যৌন-জীবনের যে স্বচ্ছন্দ গতিবিধি দেখছি ইওরোপে তা কি নৈতিক অসাড়তা নয় ?

এবার হান্স হেসে বলেছিল : মর‍্যালিটি বলতে যারা সেকসুয়াল মর‍্যালিটিকে বোঝেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমার কাছে মর‍্যালিটির অর্থ ব্যাপক। আমরা যদি হিপোক্র্যাট না হই, আমরা যদি খাবারে আর ওষুধে ভেজাল না মেশাই, আমরা যদি জাতি-গঠনের কাজে ফাঁকি না দিই, কঠোর পরিশ্রম করি, সত্যি কথা বলি, চুরি না করি—এবং তারপর তোমাদের ভাষায় ইম-মর‍্যাল জীবন যাপন করি তাহলে আমি তাকে দুর্নীতি-পরায়ণতা বলতে পারলাম না।

হয়ত তাই। হান্সের কথাই সত্য। মর‍্যালিটির সংজ্ঞা নিয়ে আমরা বড় বেশী হৈ-চৈ করি। যার পিছনে আত্মশোধনের চেষ্টার চেয়ে আমাদের অবদমিত কামনা থেকে উৎসারিত ঈর্ষাটাই অনেক সময়ে প্রবল।

পেনাল কোড কোনদিন কোন দেশের জাতিগঠন করে নি। শহরের আর্চবিশপ আর পুলিশ কমিশনার কোনদিন কোন জাতির জীবনে রেনেশাঁ আনেন নি। দেশ আর জাতি বড় হয়েছে পুঞ্জিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগে। আপন সঞ্চিত শক্তির প্রাবল্যে—বাইরের ঠেলায় নয়।

ফ্রান্সের কথাই বলি, ভোগের প্রাবল্যের মাঝেও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কলায় উড়েছে বিজয়কেতন। সক্রেটিশ, প্লেতো, আরিস্ততলের গ্রীসে তথাকথিত মর‍্যালিটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। অতদূর যেতে হবে কেন—মহাভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও পূর্ণতা যুগে যৌনজীবনকে মানুষ ভাবেনি সমস্যা বলে।

হান্স বলেছিল : মেরির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে মাস কয়েক। এখন পেয়েছি নতুন বন্ধু। কিয়েলের সেই হোটেলটির রিসেপসনিস্ট। আবার গিয়েছিলাম কিয়েলে। মেয়েটিই চিনতে পারল। জিজ্ঞাসা করল : এবার একলা ? বলেছিলাম : সে আর আসবে না।

আবার মাইক্রোফোনে ঘোষিত হল বিমানে আরোহণের নির্দেশ। হান্সকে বিদায় দিলাম। পিছন ফিরে তাকালাম। মেরি মাথা নিচু করে খস খস করে কি লিখে যাচ্ছে কাগজের ওপর।

চিতোর যতদিন উদ্ধার না হয় ততদিন রাণা উদয়সিংহ মেবারের অস্থায়ী রাজধানী করেছিলেন উদয়পুরে।

জার্মানী যতদিন না এক হয় ততদিন পশ্চিম জার্মানীর সরকার অস্থায়ী রাজধানী করেছেন 'বনে,' বার্লিনই হল জার্মানীর ডিজুরো রাজধানী।

জার্মানেরা বনকে বলে গ্রাম। এই গ্রামের একদিক দিয়ে প্রবহমান বিখ্যাত রাইন। বনের আশে পাশে ছোট ছোট জনপদ ভেনাসবার্গ, পিটাসবার্গ, গডসবার্গ।

ক্ষুদ্র হলেও বনের ঐতিহ্য তুচ্ছ নয়। বেটোচেলের জন্মভূমি বন। বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে নীটশে এবং বুকহাউট-এর মত ছাত্র। এই বনের তৃণশয্যায় চিরজীবনের মত চক্ষু মুদেছেন স্থু-ম্যান আর শ্লেগেল। বনের জনসংখ্যা মাত্র এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার। পশ্চিমবঙ্গের অনেক মিউনিসিপ্যাল শহরের জনসংখ্যার সমান।

বনের চেয়ে কোলনের জনসংখ্যা অধিক। সাড়ে সাত লক্ষেরও বেশী। বন পুরোপুরি অফিসিয়াল শহর কিন্তু নাগরিকজীবন দেখতে গেলে আসতে হবে কোলনে। বনে এ সম্বন্ধে একটি কৌতুক প্রচলিত আছে। বনের 'নাইট লাইফ' আছে কি না এ সম্পর্কে এক ট্যুরিষ্ট প্রশ্ন করেছিল।

উত্তর পেয়েছিল: আছে, তবে উইক এণ্ডে সে বেড়াতে গেছে কোলনে।

বৃটেন ভারত ইত্যাদি রাষ্ট্রের মত ফেডারেল জার্মান রিপাবলিকের আইনসভাতেও দু'টি কক্ষ। বুন্দেসরাত আর বুন্দেসতাগ।

তার মধ্যে বুন্দেসতাগই হ'ল নিম্ন পরিষদ। যার সদস্যরা নির্বাচিত করে চ্যান্সেলারকে। আর জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের চ্যান্সেলারই হলেন সে দেশের প্রধান মন্ত্রী। বলা বাহুল্য জার্মানীর বর্তমান চ্যান্সেলার আডেনুয়েরের নাম আজ সকলের কাছেই পরিচিত।

কথিত আছে স্যার উইনস্টন চার্চিলের জন্মদিনে এক তরুণ প্রেস-ফটোগ্রাফার তাঁকে বলেছিল: আশা করি আপনার শততম জন্মদিনের ফটোও আমি নিতে পারব।

উত্তরে চার্চিল তাকে বলেছিলেন: নিশ্চয়ই পারবে। যদি তুমি তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নাও।

এ কথাটি জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের অশীতিপর চ্যান্সেলার ডঃ কোনারড আডেনুয়েরে-এর সম্পর্কক্ষেত্রে খাটতে পারত। ছিয়াশী বছর বয়সের আডেনুয়েরের এখন এ যে কোন তরুণের প্রতি চ্যালেঞ্জ।

১৮৭৬ সালে আডেনুয়েরের যখন জন্ম তখন রাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন ইউলিসিস এস, গ্র্যান্ট, রবীন্দ্রনাথ তখন ষোল বছরের বালক এবং সোভিয়েত রাশিয়াতে তখন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। তবু আডেনুয়েরকে এখনও সব সময় চশমা পরতে হয়নি, হিয়ারিং এইড ছাড়াই তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় যথেষ্ট শক্তিশালী এবং এখনও তিনি সময় পেলে বাউলস খেলেন।

একজন সাংবাদিক লিখেছেন: আডেনুয়েরকে প্রতিষ্ঠা পেতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে তিনটি বস্তু। শ্রেণী, ধর্ম আর ভূগোল।

মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। ধর্মে তিনি ক্যাথলিক (লোকে বলে তিনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর ও ক্যাথলিক এবং কনজারভেটিভ) সব শেষে আডেনুয়েরে রাইন উপত্যকার মানুষ। এদিক থেকে তিনি ইওরোপীয় ও টিউটোনিক উভয় ঐতিহ্যেই সমভাবে লালিত।

আডেনুয়েরের জীবনে সাফল্য এসেছে অনেক বিলম্বে। একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি লর্ড মেয়র হন কোলন শহরের। এই পদে তিনি ছিলেন এক যুগেরও বেশী—দীর্ঘ ষোল বৎসর। নাজি অধিকৃত জার্মানীতে তাঁর ভাগ্যে নিগ্রহ জোটে। তিনি দু'বার গ্রেপ্তার হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কোলনের পতন হ'ল আমেরিকান সৈন্যদলের কাছে। আডেনুয়েরকে আবার ডেকে আনা হল যবনিকার অন্তরাল থেকে

১৯৪৫ সালে আবার তিনি মেয়র হলেন। ১৯৪৭ সালের পর তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন সেণ্ট্রাল ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের এবং ১৯৪৯ সালে তিনি জার্মানীর চ্যান্সেলর হ'লেন। সেই থেকে তিনি আজও চ্যান্সেলর।

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানও যা—কোন বিদেশীকে জার্মানীর বাজার দেখানও তাই।

কাজেই মনে আমাদের গাইড মিসেস হেরম্যানকে যখন বললাম: 'টিঠ্ ক্ষণকাল' তখন মিসেস হেরম্যান বললেন: কি কি কিনবেন?

বললাম: আমার কাছে অর্ডার আছে দু'টা ট্রানজিষ্টর রেডিও, তিনটে টেপ রেকর্ডার, এক ডজন ফাউণ্টেন পেন। আর ফারুক সাহেব নিশ্চয়ই—

ফারুকি বলল: আমার একটা কমে হ'লেই চলবে।

মিসেস হেরম্যান সকৌতুকে বললেন: আপনার খুব অ্যামবিশাস মার্কেটিং প্রোগ্রাম বলে মনে হচ্ছে।

বললাম: কি করব বলুন। জার্মানীতে যাচ্ছি শুনেই বন্ধুরা ফরমাস করেছে। আমি আবার খুব বন্ধু-বৎসল।

মিসেস হেরম্যান বললেন, আর ঘড়ি কেনার কিছু প্রোগ্রাম নেই?

বললাম: আছে। কিন্তু তা সুইজারল্যাণ্ড থেকে।

মিসেস হেরম্যান বললেন: জানেন তো, জার্মানীর ঘড়ি এখন জনপ্রিয়তায় সুইজারল্যাণ্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। আর তা দামেও সস্তা।

আপনি কি তাদের পাবলিসিটি ম্যানেজার? তা তো বলবেই। ভাল পরামর্শ দিতে গেলাম কি-না। শোন পশ্চিম জার্মানীর ঘড়ি কি রকম ঠিক সময় দেয় সে সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে।

কি রকম?

পূর্ব জার্মানীর এক জেলে তিনজন কয়েদীর দেখা হয়েছে। প্রথম জন বলছে: ভাই আমি লেট করে অফিসে আসতুম তাই জেল হয়েছে। দ্বিতীয় জন বলছে: আমি অফিস টাইমের আগে অফিসে আসতাম সেই অপরাধে জেল খেটে মরছি।

কেন? কেন? জিজ্ঞাসা করল দু'জনে।

ওরা ভেবেছিল, আমি নিশ্চয়ই পশ্চিম জার্মানীর গুপ্তচর—নয় ত' এত তাড়াতাড়ি অফিসে আসব কেন। এবার জিজ্ঞাসা করা হ'ল—তৃতীয় ব্যক্তিকে।

সে বললে: আর বোল না ভাই। আমি ঠিক সময় অফিসে আসতুম, তাই আমার জেল হয়েছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। কেন? কেন?

ওরা ভেবেছিল আমার কাছে বুঝি পশ্চিম জার্মানীর ঘড়ি আছে।

মিসেস হেরম্যান দীর্ঘদিন ছিলেন দিল্লীতে। তাঁর স্বামী মিঃ হেরম্যান আজও দিল্লী প্রবাসী। কোন একটি জার্মান সংবাদপত্রের তিনি ছিলেন দিল্লী-প্রতিনিধি। কিন্তু প্রবাসী হেরম্যান এখন অসুস্থ। তাই এই প্রৌঢ়বয়সেই মিসেস হেরম্যানকে বার হতে হয়েছে জীবিকার সন্ধানে।

মিসেস হেরম্যানের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল সন্ধ্যাবেলায়। উদ্দেশ্য জার্মানদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ।

[ক্রমশ।

সুলেখা দাশগুপ্ত

পরের দিন সকালবেলা চোখ মেলেই সর্বপ্রথম যে কথাটা মনে পড়ল শিবানীর তা হলো আজ ওর জন্মদিন। কিন্তু কাল এ কথা তার মনে ছিল না, মনে নিয়ে ঘুমায়ও নি। জন্মদিনের তারিখটা ভুলেই থাকত সে যদি না মার উপহারের পার্শেলটা কাল সন্ধ্যায় এসে কথাটা স্মরণ করিয়ে না দিত। সাতাশ বছর পূর্ণ হলো ওর। পার হয়ে গেল কতগুলো দিন। একটা বিগত দিনকে যেখানে ফিরিয়ে আনা যায় না, সেখানে ব্যর্থ—একবারে ব্যর্থ অপচয়ে খসে পড়ছে জীবন থেকে একটি একটি করে কত অসংখ্য দিন। ব্যয় না করলে কিছুই ফুরায় না—তবে কেন দিন ফুরোবে। তবে কেন ও ফুরোবে। দিনের আরম্ভকে দু'হাতে ঠেলে ফিরিয়ে দিতে চায় শিবানী—এসো না, আজ এসো না। কোন প্রয়োজন নেই আজ তোমাকে আমার। কী করব তোমাকে নিয়ে আমি। কিন্তু তবু দিন আসে। জীবনের গোলাপগুলি নবীন পাতাগুলো হতে একটি একটি করে পাতা খসিয়ে নিয়ে যায়—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায় শিবানীর।

ব্রতকথায় গল্প শুনেছে, রাজকন্যা রাজমহিষীরা অবাঞ্ছিত লোকের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ব্যাকুল আহ্বানে ঈশ্বর স্মরণ করে নদীতে ডুব দিয়ে প্রার্থনা করতেন, ফিরিয়ে নেও, ফিরিয়ে নেও ঠাকুর আমার যৌবন, আমার রূপ। ভগবান তাদের আকুল ডাকে সাড়া দিতেন। ডুব দিয়ে উঠেই তারা দেখত তাদের রাজকন্যা, রাজমহিষী রূপ নেই, যৌবন নেই। তারা কুরূপ কুৎসিত। তারপর যেদিন জীবনের মহাক্ষণ দেখা দিত, আসত জীবনে বাঞ্ছিত সম্মিলনের সময়, অঞ্জলিবদ্ধ হাতে গিয়ে ভগবান স্মরণ করে আবার নদীতে ডুব দিতেন তারা। বলতেন, আমার রূপ যৌবন ফিরিয়ে দেও ঠাকুর। নইলে আমার সুখ নেই।

অবগাহন শেষে গচ্ছিত যৌবন নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন তারা।

হায়! শিবানী যদি তার রূপ যৌবন আজ এমনি ভাবে ঈশ্বরের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারত আর পূর্ণ প্রাণে চাওয়ার দিনে ঈশ্বরের কাছে হাত পাতলেই পেত!·····কেন, কেন, কেন—কেন খরচ না করলে অর্থ ফুরোয় না, বিষয় ফুরোয় না, সম্পত্তি ফুরোয় না তবে দিন ফুরোবে ও ফুরোবে। কেন, কেন, কেন। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে আসে শিবানীর—এ কী নির্মম ফুরোনো।

পাশের ঘরে ইন্দ্রনাথের ওঠবার সাড়া পেয়ে—বালিশে মুখ চাপল শিবানী।

২

শিবানী যখন এ উপন্যাসের নায়িকা তখন তার রূপ বর্ণনাটা বোধ হয় একটু দিয়ে নেওয়া দরকার। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে তার রূপ বর্ণনায় পাঠক সাধারণকে আমি সুখী করতে পারব না।

কৈশোরে, যৌবনে—কার্যে, বিশ্রামে, জাগরণে, নিদ্রায় যে মনোমোহিনী নারীমূর্তি আপনাদের স্মরণ পথে যাতায়াত করে তেমন বঙ্কিম-বর্ণিত নায়িকারূপ তার নয়। যারা রূপের পূজারী, এখানেই বই বন্ধ করতে পারেন। আর যারা তা নন, তাদের শুধু এ কথাটাই বলতে পারি—তারা ঠকবেন না। রূপ যেখানে থামে শিবানীর রূপ সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে। শিবানীর মা তার অন্য দু'মেয়ের উজ্জ্বল বর্ণের দিকে তাকিয়ে যখন শিবানীর কালো রং-এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতেন তখন বাবা পরেশনাথ বলতেন, কালো নয় ও আলো। তোমার অন্য দু' মেয়ের ভেতর এমন আলো আছে কারু? আমার শিবানীর রূপ দেখতে হলে তৃতীয় নয়ন চাই। শিব যে রূপের তলায় বুক পেতে দিয়েছেন।

পরেশনাথের পোষ্ট অফিসের বদলির চাকরী। কিছুটা সে জন্যও বটে, কিছুটা স্কুলে দেওয়াটা তার মনঃপূত নয় বলেও বটে, তিন মেয়েকেই তিনি বাড়ীতে পড়িয়েছেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর ভর্তি করেছেন কলেজে। শিবানীর যখন কলেজে ভর্তি হবার সময় এলো আর পরেশনাথ নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে

তাকে ভর্তি করে ঐ নামই রেখে এলেন। তখন সবাই ভাবল বড় দু' মেয়ে কল্যাণী-ইন্দ্রাণীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছোট কন্যার জন্য পরেশনাথের এই নাম নির্বাচন। কিন্তু পরেশনাথ সগর্জনে প্রতিবাদ করে বললেন, শিবানী নাম রাখলাম আমি ওর চেহারার মহিমার জন্য। এ নাম ছাড়া এত বিদ্যুৎ ধরবে কে।

মোটকথা শিবানী মিত্র রূপসী নয়। বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাশকরা মেয়ে বাঁশরী সরকারের মত তারও রূপসী না হলে চলে। শ্রীমতী বাঁশরী সরকারের মত প্রকৃতিটা তারও বিদ্যুৎশক্তিতে সমুজ্জ্বল, আর আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য।

যখন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শিবানীর পরিচয় হয় তখন পরেশনাথ মারা গেছেন। বড় দু' মেয়ের বিয়ে তিনিই দিয়ে গেছেন। শিবানীর বিয়ে আর দিয়ে যেতে পারলেন না। সে জন্য কোন দুশ্চিন্তা নিয়েও তিনি চোখ বোজেন নি। কিন্তু বড় রকমের না হলেও একটা উদ্বেগ ছিল শিবানীর মার। তাঁর ক্ষোভের সঙ্গে কেবল মনে হতো, রূপসী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেলেন পরেশনাথ, আর—কালো মেয়েটি রইল তাঁর জন্য। শিবানী বড় আর দু' মেয়ে কেন ছোট হলো না। তৃতীয় নয়ন কার থাকবে, কে তার মেয়ের কালো রূপ শিবের চোখ নিয়ে দেখবে। ইন্দ্রনাথ যখন তার শিবের মতো রং আর ঐ নাম নিয়ে এসে শিবানীকে প্রার্থনা করল, শিবানীর মার মনে হলো ইন্দ্রনাথই স্বয়ং শিব। নইলে অমন ঘোর সাহেব কালোর আলো দেখল কী করে। তৃতীয় নয়নের অন্বেষণে ইন্দ্রনাথের কপালের দিকেও হয়ত একবার তাকিয়েছিলেন তিনি। ভিখারী হয়ে নয় রাজৈশ্বর্য সঙ্গে নিয়ে এসে শিব তাঁর কন্যা প্রার্থনা করছে—মনে মনে স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। দ্বিধা করার প্রশ্ন আসে না। দ্বিধা করলেনও না মত দিতে।

কিন্তু দ্বিধা করেছিল শিবানী নিজেই। একটু নয় অনেকটা—অনেকটা সংশয়িত দ্বিধায় থেমে ছিল সে।

কিন্তু কেন ?

তার কী ভালো লাগত না ইন্দ্রনাথকে ?

লাগত। তখন ইন্দ্রনাথের এতোগুলো মন্দ দিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। ভালো লাগত শিবানীর ইন্দ্রনাথকে।

তবু দ্বিধা করছিল ?

করছিল। মন্দ দিকগুলোর সঙ্গে পরিচয় না ঘটলেও স্বভাব মাঝে মাঝে মানুষের প্রকাশ হয়ে পড়েই। ইন্দ্রনাথের ভেতরের স্বভাবটাও মাঝে-মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ত আর থমকাতো শিবানী। এই থমকানোই হয়ত একদিন একেবারে নেমে পড়ায় চলে যেত, কিন্তু ইন্দ্রনাথের স্বভাবে আর কিছু থাক আর নাই থাক আছে লেগে থাকবার ক্ষমতা। এ ক্ষমতাটা না থাকলে হয়ত শিবানীকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

তবে কী শিবানী কেবল ইন্দ্রনাথের লেগে থাকার জন্য তাকে বিয়ে করছে ?

তা কী হয় ? তা কী কেউ করে ?

অ.শুই 'ভালো-লাগা' ছিল শিবানীর ইন্দ্রনাথের প্রতি।

অবশ্যই 'ভালোবাসা' ছিল শিবানীর ইন্দ্রনাথের প্রতি।

যখন আকাশে কালো মেঘ করে আসত, বাতাস ঝড়ের শব্দ উঠত, শিবানী চঞ্চল হয়ে উঠত বেরিয়ে পড়বার জন্য, আর তক্ষুণি গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হয়ে চমকে দিত ইন্দ্রনাথ ওকে। তখন ভীষণ ভালো লাগত ইন্দ্রনাথকে ওর। দু'হাত তুলে আনন্দে বলে উঠত, কী মজা! গাড়ী এনেছেন তো?

নিশ্চয়।

বেরুবেন? ঝড়ের ভেতর বেরুতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। মা গাড়ীটা বেচে দিয়ে এমন বিপদে ফেলেছেন।

নিশ্চয় বেরুব। সে জন্যই তো এলাম।

এটা বাজে কথা। আপনার সঙ্গে তো এই সবে পরিচয়। আপনি জানলেন কী করে ঝড়ের ভেতর বেরুতে আমি ভালোবাসি?

যদি বাসেন—

ও—হেসে উঠল শিবানী। তৈরী হয়ে এসে বলল, যত দূর খুশী যাব্বো?

যত দূর খুশী।

তাড়া লাগাবেন না ফেরবার জন্য?

একটু সময় চুপ করে থাকত ইন্দ্রনাথ। সন্ধ্যার কিছুটা অবশ্যই শিবানীকে দেওয়া যায়। দিতে এসেছেও সে। কিন্তু পুরোটা···

ঐ তো ভাবনায় পড়ে গেলেন তো খুব? ভেবেছিলেন গাড়ী দেখে নেচে উঠেছে, বাচ্চাদের মতো একটু গাড়ীতে তুলে এনে ছেড়ে দেব।

হেসে ফেলেছিল ইন্দ্রনাথ। বলেছিল, চলুন তো দেখা যাক কে আগে ফেরার কথা বলে। আপনার মার কাছে জবাব দেবেন আপনি।

অবশ্যই সে দায়িত্ব আমার।

লম্বা ড্রাইভ দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ডায়মণ্ড হারবারের কূল পর্যন্ত। জলে বৃষ্টিতে ভিজেছিল ওর সঙ্গে সমান তালে। ভালো লেগেছিল শিবানীর।

কিছু খাবেন কোথাও নেমে?

খাবো·····আচ্ছা।

গাড়ী থেমেছিল একটা রাস্তায়। হঠাৎ বিনীত কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল ইন্দ্রনাথ—আমি একটু ড্রিঙ্ক নিতে পারি?

ড্রিঙ্ক!

থাবড়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ শিবানীর বিস্ময়ে। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, না না। থাক।

ভদ্রলোক ওর জন্য অনেক কষ্ট করেছেন আজ। ওকে খুসী করায় জন্য জলে-বৃষ্টিতে কাদায় দামী স্যুট, দামী জুতো নষ্ট করেছেন। ওর জন্য না হলে ইন্দ্রনাথ কখনই ভেজবার জন্য আর ঝড় দেখবার জন্য ডায়মণ্ড হারবারের দিকে ছুটতেন না—

শিবানী না হয় একটু ছাড়ল তার দিক ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে। কি হবে ওর কাছে বসে একদিন ড্রিঙ্ক করলে। ভাবল অনুমতি দেয়। কিন্তু দিল না। কিছু হবে বলে নয়। কিছু হবে না জেনেও। প্রথমত এ ছাড়াটুকুই হবে অনেকখানি ছাড়া—অনেক খানি ঢিলে দেওয়া। দ্বিতীয়ত অনেক চলা আছে যে চলা বলে।

একটি ছেলে যদি একটি মেয়ের কোমরে হাত জড়িয়ে সন্ধ্যায় গঙ্গার পারে হাওয়া খায়—তবে সে চলা বলে। যদি প্রতিদিন একটি ছেলে-মেয়েকে একসঙ্গে রেস্তোরায় খেতে গল্প করতে দেখা যায়, তবে সে চলা কিছু বলে। যদি কোন মেয়েকে নিয়ে কাউকে ড্রিঙ্ক করতে দেখা যায় তবে সে চলাও কিছু বলে। এই চলাটা যতক্ষণ সত্য নয়, ততক্ষণ কী করে সে ইন্দ্রনাথকে তার সামনে গ্লাস হাতে নিতে দিতে পারে? সেদিন ওর সঙ্গে বসে ঠাণ্ডা ক্রিম কফি খেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। তখন বোঝে নি আজ বোঝে শিবানী কতটা কষ্ট সেদিন ইন্দ্রনাথ তার জন্য করেছিল। প্রায় প্রতি টেবিলে সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গিনীর হাতে সাদা, সোনালী, লাল, নীল বর্ণের রকমারী পানীয়ের গ্লাস। ওয়েটার আসছে যাচ্ছে ট্রে-র উপর নানা চেহারার, নানা লেবেল আঁটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে—সেখানে বসে ইন্দ্রনাথকে কিনা অল্প অল্প ঠোঁট ডোবাতে হয়েছিল সেদিন কফির কাপে নিরীহ বালকের মতো!

তবে কী শিবানী জানত না ইন্দ্রনাথের মদ খাওয়ার অভ্যাসের কথা?

জানত।

কিন্তু ও নিয়ে সে ভাবিত হয়নি। বাবাকে সে ড্রিঙ্ক করতে দেখেছে। ডিনার টেবিলে পরেশনাথ স্ত্রী-মেয়েদের সঙ্গে বসেই ড্রিঙ্ক করতেন। অফিস থেকে ফিরে একটা দীর্ঘ সময় নেওয়া স্নান সারতেন। তারপর সিল্কের বর্মি লুঙ্গীর উপর আদ্দির পাঞ্জাবী চাপিয়ে এসে বসতেন বারান্দায়। হাতে থাকত হুইস্কির গ্লাস। ওদের নিয়ে বসতেন আসর জাঁকিয়ে। একদিকে সিগারেটের পর সিগারেট ধরাতেন আর একদিকে আস্তে আস্তে চুমুক দিতেন গ্লাসে। শিবানী দেখত, সারাদিনের সাদা বাস্তব মানুষটা ধীরে ধীরে কেমন রঙ্গিন হয়ে উঠছে। চোখে ঘোর আসছে। কণ্ঠে আবেগ। কথায় দরদ। অন্তর মেলে ধরছেন ওদের কাছে। দিনের পরেশনাথের চাইতে রাতের পরেশনাথের ভেতর অনেক বেশী উত্তাপ দেখতে পেতো শিবানী। রোমাঞ্চ জাগাত রাতের পরেশনাথ তার মনে। সুন্দর লাগত। ভালো লাগত। আবেশময় লাগত তখন বাবাকে ওর।

ইন্দ্রনাথ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। একদিনের বেড়ানো ওদের প্রতিদিনে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে ইন্দ্রনাথ এক-আধটুকু যে ড্রিঙ্ক করেও আসছে, তা শিবানী বুঝতে পারল। সে ড্রিঙ্ক করা খারাপ লাগা তো দূরের কথা, আরো রোমাঞ্চ জাগাত শিবানীর দেহ-মনে। যেমন রোমাঞ্চ জাগাত রাতের পরেশনাথ তেমনি রোমাঞ্চ জাগাত ইন্দ্রনাথ। অনেক বেশী রোমান্টিক লাগত—লাগত অনেক বেশী সুন্দর।

ড্রিঙ্কের কুৎসিত দিকটার সঙ্গে তার তখন ঘরোয়া পরিচয় ছিল না। জানা ছিল না এ বস্তু মানুষকে কোথায় তলিয়ে নিয়ে যায়। জানা ছিল না কত ক্লেদ এ বস্তু টেনে আনে জীবনে। আজ শিবানী বোঝে সমাজ যে বস্তুকে ঘৃণা করার রায় দেয়, তা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার পরই দেয়। আজ শিবানী ড্রিঙ্ক করাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে শুভরাত্রির দিন থেকে।

ইন্দ্রনাথ অনেক—অনেকগুলো দিন শিবানীকে দিয়েছিল, বিয়ের পর আর পারল না। পারায় দরকারটাই বা কী। বিয়ে তো হয়ে

গেছে। এখন আর ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে নেওয়ার জন্য শিবানীর অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। গ্লাসের পর গ্লাস, পেগের পর পেগ সে খেয়ে যেতে পারে তার ইচ্ছেমত। অবশ্য প্রথম যখন ইন্দ্রনাথ বিয়ে-বাড়ীর নেমন্তন্নের পাট মিটলে, অতিথি-অভ্যাগতের দল চলে গেলে গাড়ীটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছিল চৌরঙ্গীর দিকে। তখনও তার মনে মহৎ বাসনা ছিল দু-তিন পেগের বেশী আজ সে খাবে না। কিন্তু দুইয়ের পর তিন পেগ যখন হয়ে গেল, তখন ইন্দ্রনাথকে ইন্দ্রনাথ নয়—চালনা শুরু করে দিল পেগের গ্লাস। যখন টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, তখন বারবার বলতে লাগল, ঠিক হলো না···এটা ঠিক হলো না। ফুলশয্যার ফুলের বিছানায় উপর উপুড় হয়ে পড়ে শিবানীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল, আজকের দিনটা ক্ষমা করো শিবানী। আর কখনও হবে না···কখনও না।

সেদিন ক্ষমা করেছিল শিবানী।

তারপরও অনেকবার ক্ষমা করেছে সে। অনেকদিন ক্ষমা করেছে। কিন্তু এখন আর করে না। বিশেষ করে একটা রাতের পর থেকে আর করে না।

তখনও ওরা ওদের এই জর্জকোর্ট রোডের বাড়ীতে আসেনি। ইন্দ্রনাথদের বাড়ীতে দু' দুটো বিয়ে হয়ে গেছে ক'দিন আগে। বাঙালী বাড়ীর বিয়ের হৈ হট্টগোল এমনই নিদারুণ ব্যাপার যে, বিয়ে মিটে গেলে বাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থাটাকেই কেমন যেন হঠাৎ নীরব নিঃসহায় ঠেকে। যদিও রাত খুব বেশী হয়নি তবু এরই ভেতর খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে নিয়ে যে যার ঘরে গিয়ে এ ক'দিনের অনিদ্রা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য শুয়ে পড়েছিল। বেশীর ভাগ ঘরের আলোই ছিল নেভানো। বাড়ীটাকে অসহায় ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। বাতাস যেন কিছু নেই, 'কেউ নেই' সুরের দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু বাড়ী থেকে একটি লোকও কমেনি। মেয়েকে যেমন পরের ঘরে দিয়ে আসতে হয়েছে তেমনি পরের মেয়েকে ঘরেও আনা হয়েছে। তবে?

গাড়ী বারান্দার ছাদে বসে নববিবাহিত দেবর কালীনাথ আর নববধূ ললিতার সঙ্গে গল্প করতে করতে এ কথাটাই ভাবছিল শিবানী। কেন এই আকাশে বাতাসে কিছু নেই, 'কেউ নেই'-এর সুর? এ কী কেবল ওর মনের সুর, না সবার মনেই এই সুর বাজছে? বাড়ীর মেয়ে চলে গেছে—বাড়ীর বাতাসে নেই নেই সুর কিছু দিন থাকবেই। কিন্তু ওর মনে কেন এ সুর কাঁদবে? ওর তো মেয়ে চলে যায়নি। এই তো ইন্দ্রনাথের দেওয়া মুক্তোর মালাটা ওর গলায় শুভ্র হাতের মতো ভালোবাসায় জড়িয়ে আছে। ইন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণছে সে। ইন্দ্রনাথ এলেই আর ও একা নয়—তবে···তবে কথায় ফাঁকে আকাশের দিকে চোখ পড়লেই কেউ নেই, কিছু নেই-এর কান্না ওর গলা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে কেন?

অনেকক্ষণ ধরেই ভেতরে ভেতরে উসখুস করছিল কালীনাথ। নতুন বৌ নিয়ে রাতেরবেলা বৌদির কাছে বসে থেকে আনন্দ পাবার কথাও নয়। মস্ত মস্ত দুই হাই তুলে কালীনাথ বলল, ঘুম পেয়েছে। তুমি ঘরে যাবে না বৌদি?

ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়েছিল শিবানী। সে সামনে বসে থাকা কালীনাথ আর নববধূ ললিতার কাছ থেকে মনের দিক থেকে এত দূরে ছিল যে, তার খেয়ালই হয়নি, ওরা দুজন ওর জন্যই বসে রয়েছে। ও না ওঠা পর্যন্ত ওরা উঠে যেতে পারছে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। কী কাণ্ড দেখ তো? তোমরা আমার জন্য বসে রয়েছো—

ললিতা আপত্তি জানাল, বাঃ তা কেন হবে। আমরা তো গল্প করছিলাম।

কাল আবার গল্প হবে। ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবানী। তোমরা ঘরে যাও।

কালীনাথ চলে গেল।

শিবানী তাড়া দিল ললিতাকে, তুমি যাও ললিতা।

ললিতা উঠে পড়ে বলল, আপনি যাবেন না?

শিবানী কী করে বলবে, সে ইন্দ্রনাথের অপেক্ষায় বসে আছে। বলল, যাবো একটু বাদে। হাওয়াটা ভারী ভালো লাগছে। একটু বসব আরো।

ললিতা ক' পা গিয়েছে এমনি সময় গাড়ী থামবার শব্দ হলো। ললিতা থেমে পড়ে বলল, কে যেন এলেন।

ললিতা নবাগতা। সপ্তাহও হয়নি সে এসেছে। সে জানে না ইন্দ্রনাথ বাইরে ছিল। বলল, এত রাতে কে এলেন?

শিবানী হেসে বলল, বাইরের কেউ নয়। এ বাড়ীরই ছেলে।

এবার একটু দুষ্টু হাসি দেখা গেল ললিতার ঠোঁটে। যেন সে বলতে চাইল, বলছিলেন হাওয়াটা ভালো লাগছে কিন্তু আমি বুঝে ফেলেছি কেন বসেছিলেন।

ইন্দ্রনাথ উঠে এলো ওপরে। কিন্তু তখন তার কোথায় কী বা কে কিছুই দেখবার মতো অবস্থা ছিল না। ডাইনে বাঁয়ে টাল খেতে খেতে ঘরের দিকে গেল।

উঠে দাঁড়াল শিবানী।

ইন্দ্রনাথ শরীরটাকে দরজার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালে।

আঁতকে উঠে ললিতা তাকাল শিবানীর দিকে।

শিবানী স্তব্ধ।

দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় শরীরটাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে ফেলল বটে ইন্দ্রনাথ কিন্তু ধাক্কাটা সামলাতে পারল না। মেঝের উপর পড়ে যাচ্ছিল, অস্ফুট কণ্ঠে শব্দ করে ছুটে গেল ললিতা। ইন্দ্রনাথের পড়ন্ত শরীরটা দু' হাতে ধরে ফেলল।

ললিতার দু' কাঁধ ধরে নিজেকে সামলালো ইন্দ্রনাথ। সে ভেবেছিল শিবানী। কিন্তু ললিতাকে দেখে চিনতে না পেরে বিস্ময়ে বলে উঠল, তুমি কে? তোমাকে তো চিনতে পারছিনে!

ললিতা ইন্দ্রনাথকে কোচের দিকে নিয়ে যেতে যেতে ছোট করে বলল, আমি নতুন এসেছি।

কবে এসেছ? এ্যাঁ কবে? যেন গভীর ঘুমের জগৎ থেকে কথা বলছে ইন্দ্রনাথ।

দিন ক'য়। ইন্দ্রনাথকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে পেছন ফিরতে যাচ্ছিল ললিতা, ইন্দ্রনাথ হাত চেপে ধরল তার। এমনিতেই ভয় ভয় করছিল ললিতার, এবার আতঙ্কে কেঁপে উঠল সে।

কেঁপে উঠল ছাদের উপর শিবানী। ছুটে এসে ঘরে ঢুকল সে। কিন্তু না নিজের, না ললিতার, না ইন্দ্রনাথের কারু সম্মান রক্ষা করতে পারল না সে। ততক্ষণে ইন্দ্রনাথের জড়িত জিহ্বা বলে ফেলেছে, নতুন মেয়ে, একটা চুমু খেয়ে যাও না। [ক্রমশ।

স্মৃতির রাগ

দিলদার

স্বপ্নময় একটি গ্রামের ছবি আমার মনকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই শাল-তমালের শান্ত পরিবেশে মনে হয় একবার ঘুরে আসি। কিন্তু যাওয়ার এখন অনেক বাধা। শাণিত তির্যক ফলার মত তারা দাঁড়িয়ে আছে অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে। একটা অস্পষ্ট অবচেতনার অবরুদ্ধ অতীতের কোন গোপন স্বপ্নিকণা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে তাই বা কে জানে? গ্রাম-সহর। সন্ধ্যা হতেই আমার সব ভীরু মনের লজ্জাকে দূর করে দিয়ে চলে আসতাম মাধবীদি'র কাছে। মাধবীদি' ছিলেন আমাদের বাড়ীর পাশের মেয়ে। চমৎকার হাসি-খুসী মন। তাঁর সেই উচ্ছল, উজ্জ্বল প্রাণময়ের প্রদীপ্ত শিখা প্রতিটি গানের তরঙ্গের ঢেউ আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর ঠিক তেমনি পাশাপাশি বেঁচে রয়েছে সেই গ্রামের প্রতিটি রাস্তা। কতদিনের সেই হারানো দুর্লভ দিন?

কে জানতো সেই স্মৃতিই আবার জাগিয়ে তুলবে আমাকে। হাত বাড়াতে গিয়েই পেতাম নানা রকমের ফুল। মালি থাকত না বাগানে। কিন্তু মালিক থাকতেন দাঁড়িয়ে। সহাস্যে তাঁর প্রশান্ত মুখশ্রী দেখে সে ফুল যেন আরও সুন্দর হয়ে ঘিরে উঠত আমার মনে। দু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিতাম ফুল। হাসতেন মাধবীদি'। এই ফুলের মধ্যে কি সুবাস ছিল জানি না। পথে তার সৌরভ থাকত, আসত ছুটে আমার মত অনেক চঞ্চলের দল। এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া—ও-পাড়া মিলিয়ে অনেক রকমের হালকা মেঘের প্রজাপতির চঞ্চলতা! সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় তার দ্বার খোলা। বাগান যেন মাঠ। আমরা তার খেলার সাথী। মনে মনে এক একদিন কল্পনায় কবি হয়ে উঠতাম আমি। কোন এক অচিন রাজকন্যার স্বপ্নময় ছবি দেখে, মনে হত আমার হাতের যত ফুল আছে তার সঙ্গে যদি আরও কিছু বেশী করে মালা গাঁথা যায় তা হলে কি রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গবে না?

কিন্তু সেই মনটা?

মেঠো পার হতে পারলেই সহরের রাস্তা পাওয়া যায়, আর একটু এগোলেই ট্রেনের লাইন। দু'ধারে লাইনগুলো যেন ঘুমিয়ে আছে। খুব ভোরবেলাকার কথার মালা নিয়ে যখন আমরা লাইনের সাথে মিতালী পাতাতাম। দূরের নিশানা আসত একটা সবুজ পতাকা। গাড়ী আসবে, তোমরা দূরে যাও। সবুজ পতাকা যেন সজীব হয়ে উঠত! আমরাও ভয়ে ভয়ে চলে আসতাম। গাড়ী যেন ছুটে যেত। কোথায়? হঠাৎ ইচ্ছে হত বড় হয়ে যাই, লম্বা পাঁচটার মতন। ফিরে আসতে আসতে আবার ভাবনা।

কে যেন আজও অপেক্ষা করছে? কে? কে আবার? মাধবীদি'। ছুটতে ছুটতে বাগানের মধ্যে গিয়ে অজস্র ফুলের মধ্যে কাড়াকাড়ি। আর তার মালিক যেন উজাড় করে দিতে চাইছে সব।

এখন বুঝি, সব দেওয়ার পেছনে কি মানুষের কোন মানে থাকে?

সকাল গড়িয়ে দুপুর আসত। অসহ্য! অসত্য। চৈত্রের ডুবন্ত দুপুরে মনটা যেন উদাস করত। মনে হত পালিয়ে যাই এই বন্দীঘর থেকে। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে উঁকি মারলে দেখতে পেতাম এই নির্জন দুপুরও যেন মুখর হয়ে উঠেছে। ঐ নদীটার পাশটা ঘিরে হাসি।—হাসি।—কান্না নয় শুধু হাসা। আকাশের প্রশান্ত আশীর্বাদ বর্ষণে শান্ত নদী অশান্ত হয়ে উঠেছে। এসেছে মায়ের দলেরা। মনে হচ্ছে ঐ নদীটার চার পাশে একবার ঘুরে এলে কেমন হয়। কেমন হত জানি না, কিন্তু কেমন হয় এই ভাবনায় আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত। যদি যেতে পারতাম.—যদি যেতে পারতাম ঐ অশান্ত নদীর মাঝে। কিন্তু মনের ভাবনা যখন আকাশের দিকে মুখ ফেরালো, বর্ষণ থেমে গেছে। এক টুকরো কালো মেঘ যেন একটু আগে খেলা করছিল আমার মনের মধ্যে। এখন নীলাকাশের হালকা মেঘমালায়, বৃক্ষচূড়ায় পাখীদের স্বপ্নাচরণ, অশান্ত মেঘে ওদের অবাধ গতি।

নিশানা পেলাম বিকেল হয়েছে। বন্দী-ঘর থেকে বাইরে। কিন্তু বাইরে শব্দ জানা ছিল, ঠিক চেনা ছিল না। কেমন করে বাইরে যেতে হয়?

ঘর থেকে বাইরে গেলেই বাগান-বাড়ীটাই ছিল আমার কাছে সব চেয়ে বেশী দুর্লভ রহস্য। মনে হত যেন একটিমাত্র জায়গায় আমার অবাধ গতি। কোন শাসন নেই, বিচার নেই। আমি এখানকার সম্রাট। ফুলের দেশের রাজা হবার সৌভাগ্যে আমার মনটাও যে মাঝে-মাঝে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত ঠিক তা নয় ভাবটা, ভাবনাটা সব মিলিয়ে মোটামুটি আমি স্থির লক্ষ্যে আসতাম বলে মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম। মাঝে-মাঝে এমন একটা দুর্ভাবনায় মনটাকে যখনই ভরে দিতাম, দেখতাম পথের মাঝে ছড়ানো ফুল, পথের দু'ধারে ফুল, এ-বাড়ী ও-বাড়ী সব বাড়ীতেই ফুল।

তা'হলে?

সব ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে যেতাম বাগানে, দেখতাম মাধবীদি' দাঁড়িয়ে আছেন কার জন্য যেন? আমাকে, আমাদের

'মাধবীদি, কথা বলো'

দেখেই বললেন, নিয়ে যা যত পারিস ফুল, যত ইচ্ছে তোদের, যা দরকার। আমাদের সেই ছেলেমানুষের মন দিয়ে ততটা ভাল মন্দ বিচার করতাম না, শুধু পাওয়ার নেশাটাই ছিল দুরন্ত। দু'হাতে চার বার করে ফুল নিয়ে দৌড়ে আসতে গিয়ে যেন একটা হাসির কল্লোল এলো। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলাম মাধবীদি'র সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন সহাস্যে। কে এই সুচারুকুন্তল দর্শনীয় যুবক ? কে ? দেখেছি। পথে যেতে যেতে। রায় বাড়ীর বড়সাহেব। গায়ে যার হাওয়াই সার্ট, পরণে যার বিলেতী দামী স্যুট, মুখে যার সবসময়ই সিগার তিনিই হচ্ছেন রজতকান্তি রায়। থাকেন সহরে। কিন্তু এখানে কেন ? তবে কি ওঁর ফুল দরকার ? আর উনি নেবেন বলেই কি আজ মাধবীদি' আমাদের ফুল নিতে বললেন বেশী করে। যাতে রজতকান্তি না পান। হয়ত বা তাই হবে।

কে জানে ?

এমনি করে দিন বদলের পালা শেষ হয় আর বদলায়।

আমার এই ছোট সংসারী মনে একটা ফরমুলা এসে ধাক্কা দিলো। যখন এখানে আমরা থাকব না তখন কি করে এ ফুলের দেশের রাণীকে দেখতে পাব আমি ? আমি কোন দূর-দিগন্তের দেশে পাড়ি দেব ? কোন নাবিক রাজপুত্রের মতন সপ্তনদী পার হয়ে আসব ফুল পরীদের জলসায় ? সত্যি এমনও তো হতে পারে আমিও তো একদিন রজতদা'র মত বড় হতে পারি, তখনও কি মাধবীদি' ফুল দেবেন ? আমি কী বোকা। নিজেই যেন মস্ত একটা আবিষ্কার করলাম, মাধবীদি' তো আরও আরও অনেক বড় হয়ে যাবেন, তা হলে আমার চেয়েও বড়।

ফরমুলার আর একটা দিকেও একটা ছোট্ট সংশয় এসে গেল, সত্যি যদি না পাই ফুল। যদি, যদি আর বাগানে না থাকে ফুল, সব নিয়ে যাবে কলকাতার বাবু রজতকান্তি।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেলাম বাগানে। কিন্তু আজ বাগানটা যেন কী রকম লাগছে। ফুলের সৌরভ যেন ম্লান-মৃত বিষণ্ণ। কেন ? কেনর উত্তর আর পেলাম না। চুপি চুপি বাগানের মধ্যে গিয়ে দেখলাম ফুলের দেশের রাণী মাধবীদি'র সঙ্গে কথা বলছেন রজতকান্তি রায়। হাসি। আর হাসি। ইচ্ছে হচ্ছে, বাগানের সমস্ত ফুলগুলিকে নষ্ট করে দি'। ইচ্ছে হচ্ছে বলি, 'এসেছি'।

কিন্তু কে কার কথা শোনে ?

এমনি করে দিন মিছিলের পালা শেষ। মনের পোষাকী বাহার বুঝি লুকানো থাকে। তারা সব কথা বলে মনে খাঁচায়। মাঝে মাঝে কোন এক গানের কলির মত আসতে চাইত। তখন হৃদয়ের আবরণের ছদ্মবেশটা মুছে দিত সহজ ভাবে। তবুও না ভেবে উপায় নেই, দিন কেন কর্মমুখর ? রাত কেন অতন্দ্র, নিষ্ঠুর। এই দিনরাত্রির ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে কত কি ঘটে তাই বা কে জানে। যে দিকে তাকাই সবই সুন্দর, আকাশ, পাখী, ফুল-তারা চাঁদ কিম্বা ভাগীরথীর সেই কলধ্বনি ? মাঝে মাঝে মনে হত কি হবে এই সব ভাবনায়। ইচ্ছে করলে তো ছুটে যেতে পারি ঐ জন-অরণ্যে, মিছিলে মিছিলে আরও আরও অগ্রসর হলে সকালে সন্ধ্যায় আলোক-মালায় ঝিলমিল করা কোন জলসায় ? অথবা এও তো পারি এখনই এই হৃদয়ের সমস্ত কান্নার অবরুদ্ধ দেওয়ালগুলিকে সমাধি দিতে পারি। না ভেবেই, তবুও না ভাবনারও কি কারণ আছে ? কে দেখেছিল কবে বৃষ্টির দিনে এক নির্জন পথে একখানা হাত ? কার হাত ?

সাক্ষী দিয়েছিল দু'গাছা কাঁচের চুড়ি, অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ এসেছিল মনে। আজ যার হাত দেখি, কাল যদি দেখি তার মুখ, 'তারে আমি কভু চিনিব না'।

এমনি কত লিরিক, এমনি কত টুকরো কঠিন গল্প, এমনি কত ছন্দহীন কাব্য, এমনি কত হঠাৎ চকিতে চাওয়া, কবে কখন কি খেয়ালে কার নাম লিখে রেখেছিলাম পুরাণো কাগজে, তারা জমতে জমতে যখন খরচের খাতায় এলো হিসাব-নিকাশের সময় সেই নামই মনে হল, কিন্তু মুখ নয়। এই নামহীন সেই মুখশ্রীকে কল্পনা করতে করতে নিয়ত সংগ্রামের একটা নিষ্ঠুর চেতনা যখন মনের অন্তরালে এসে আঘাত দেয়, তখন স্মৃতিগুলি বাধা দেয় বলে খবরদার এগিও না। তবুও 'ভালোবাসায়', 'ভালোলাগায়' কেন সুজাতার কাছে ঘুরে ফিরে চাওয়া? (কেনই বা সুজাতার মনের মণিকোঠায় স্বর্গ-লোকের চাবি চুরি করতে গিয়ে নিজেকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া? এই মনোভিসারের বেদনায় সমুদ্র তীরে যখন দাঁড়াই তখন দেখতে পাই কেন যে এই স্থিরতার মতন সুজাতার কথা ভাবা?) কেন ভুল—বার বার ফুল হয়ে ফুটে ওঠে? কতদিনের সেই স্বপ্নলোক থেকে ঘুমিয়ে পড়া এক ভাবুক রাজপুত্র আজ ভাবসাগরে ডুব দিত। সে জানত এই সাগরে অমৃত নেই আছে বিষ। সে বিষকে ভালোবেসেছিল কেন তা সে নিজেই জানে না?

হায় এই না জানার জন্যেই হয়ত সে পেয়েছে একটা প্রশ্ন, সেই নীল নিথর আকাশের এক কোণে ঝড় বয়ে গেছে বারে বারে মুর্শিদাবাদ থেকে ব্রহ্মপুত্র আর সেখান থেকে কখনও কখনও ঘুরে ফিরে সহর কলকাতায়—তাকে কেন্দ্র করে জন-অরণ্যে কত চক্রান্ত। এই যাযাবর মন কি জানত না, এই চলাহীন পথেরও একদিন শেষ হবে? শেষ হবে তার জীবনের গতি? মৃত্যুকে মুখোমুখী দেখেছি আমি অনেকবার। নিষ্ঠুর কিম্বা নিয়তি তা জানি না। 'চোখের জলে কেন তারে বিদায় দিলাম না' এ কথা আমি বলতে পারিনি, লিখতে চেয়েছিলাম 'চোখের জলে বিদায় আমি মানব না।' কিন্তু তার মূল সূত্রটা কি কেউ তা জানে না, জানে না, এ জীবন কত ছোট, এ জীবন কত অসহায়, এ জীবন কত নিষ্ঠুর। হৃদয়, বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্তি কমছে না বাড়ছে তা জানি না। তবে দেখেছি বেদনাহত আশাহত নিপীড়িত মনোমিছিলে আমার দাম আছে। তাই বার বার এই কথাই বলব জীবনে যারা দুঃখ পেলে না, হারিয়ে যারা ফিরে চাইল না, দুঃখকে যারা হাসিমুখে মেনে নিতে পারল না, তারা কি পেয়েছে জীবন? জীবন মানে কি ঘর? ঘর মানে কি সংসার? আর সেই সংসারের মিছিলে দেখেছি মায়ের কান্না, প্রিয়ার দুঃখ আর আত্মীয়-স্বজনের অজস্র অভিশাপ, আর নিজের প্রতি একটা অবিচার?

ঘর চেয়েছিলাম। পাইনি। বাইরে এসে ঘর করতে গিয়ে বাধা পেয়েছি। ফিরিনি। শুধু বাইরের অন্ধকারটাই হাত বাড়াতে গিয়ে একটা অশান্ত প্রদীপ আমার সামনে এসে ধরা দিল, সে প্রদীপের শিখার মতই জ্বলে নাম তার জানি না। তাকে দেখতে পেলাম। ভাগীরথী নদীর তীরে একমনে দাঁড়িয়ে নৌকার উপরে উঠে আছে যাত্রীর অপেক্ষায়।

সাড়া পেয়েই উঠলাম এক অজানা নিরুদ্দেশে।

এ কিসের সংকেত?

ভাগীরথী নদীর তীরে এসে কার সংকেত? কোন অজানা দেশে?

পেছনের দিকে আর তাকালাম না। যাত্রীরা চলেছে? আমার মনের অতলান্তে একবারও কি মনে জাগছে না মায়ের সেই পবিত্র মুখ? এই জলতরঙ্গে কি ছায়া পড়ছে মা মাধবীদি'র? (এই আলোয় আকাশে কি তারা হয়ে ফুটে উঠেছে সুজাতার গানের সুর?) জানি না, জানি না।

এ কি আকুলতা? না ভেবেই উঠলাম নৌকায়। চলেছে তরী তার দেশে? শুধু জল আর জল। কোন উদাসী মাঝি আজ চলেছে তার পথে? চেয়ে চেয়ে সব দেখলাম। চিনি না, জানি না এরা কারা? আর আমিই বা কে? কেনই বা চলেছি, দিকছাড়া পালছাড়া এক সব-হারানোর প্রতিনিধি হয়ে কোথায় যাব? সন্ধ্যাকালে স্তিমিত সূর্যের রশ্মি জলে ছড়িয়ে পড়েছে, দিগন্তাকাশে মেঘের অবিশ্রান্ত ঘূর্ণীর ফোয়ারা। শুধু জলরাশি আর তার কোলাহল? দেখতে দেখতে, আমি আমার পরিচিত পথ হারিয়ে ফেলে এদের সাথে চলেছি। একটু পরেই রাত হবে? যাত্রীরা যে যার ঘরে ফিরে যাবে? কিন্তু আমি ওপারে গিয়ে কার ঘরে নেব আশ্রয়? কোন ফুলের দেশে?

নদীর তীরে কিসের কোলাহল?

অজানিত অজস্র লোকের হাসিকান্নার বিশ্রাম যেন। তীরে প্রায় তরী এসে গেছে। মাঝি যে যার লোকের কাছ থেকে তার প্রাপ্য চেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আমি কি দেব?

একটু পরেও তো আমায় নেমে যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাব?

এই নদী তীরে বসে কার জন্য করব অপেক্ষা? কেই বা আমায় নিয়ে যাবে? সংশয়, সন্দেহ, কল্পনা, ভাবনা ভয় রহস্য সব এক সঙ্গে আমার মনের মধ্যে ফিরে এলো। না, আর যদি কোনদিন আমি ফিরে না যাই আমার লোকালয়ে? কে ভাববে আমার জন্য? মায়ের কি অশ্রুধারা এই নদী তীরে এসে জমা হবে? কল্পনা করতে করতে আমি এক দর্শন জগতে চলে গেলাম যেন। এই যে

জীবন, এই যে পৃথিবী, এই যে রাত, এই যে মন, এরাই বা কেন মনের মধ্যে দোলা দিয়ে যায়? কিন্তু সত্যি সত্যি এই পৃথিবীর বুক থেকে আমি হারিয়ে যাই, মিলিয়ে যাই তাহলেও কি আমার জন্য কেউ কোনদিন ভাববে? জ্ঞানে-অজ্ঞানে দেখেছি আমি, আমার প্রতি লোকের মোহ আছে, কিন্তু মায়া নেই। বিশ্বাস আছে ভালবাসা নেই। এই অনাদি কালের স্রোতে, এই গহন তিমির অন্ধকারে এই নির্জন নিরালা নদীতীরে এসে মনের মধ্যে কেন জাগছে একটা বিরাট বিপ্লব। বিস্ময়তার কি নিদারুণ যন্ত্রণা। ধ্যানমগ্ন এই নদী তীরে, ঐ দূরে, ঐ একটা জীর্ণকুটিরে কিসের আলো? তবে কি এখানেও তীর আছে? আছে আশ্রয়? আছে আশা?

তবে কি পরম সত্যকে চিনে নিয়েছি আমি? কোন মুসাফিরের উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি? মাঝি কি চলে গেছে? না। ধীরে ধীরে এগোলাম মায়াহীন, বন্ধনহীন হয়ে। পেছনে পড়ে রইল জল আর জল—আর দূরে বহুদূরে এক ঘননিবিড় শিবির, যেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে ক'টা লোক? তাদের বিনিদ্র রাত কাটবে আমারই ভাবনায়? ভাবুক, এই ভাবনার কূল থেকে আমি যখন দূরে এসেছি, তখন কি হবে ফিরে?

এমনি করে তো কত লোকই ফেরে না ঘরে? কত বিনিদ্র রাত কাটে, প্রহর গোণে? মধ্যরাতের নির্মম যন্ত্রণায় কত দিন তো আমার চোখের নিদ্রা গেছে টুটে, স্বপনে—জাগরণে, ভয়ে ভাবনায় আমিও কতদিন ভেবেছি জীবনের পরম সত্য কি তাকে জানবার জন্যে?

আজ যদি তার তীরে আবার ফিরে যাই ঘন অন্ধকারে, সেই জটিলতম জীবনের সিংহদ্বারে সেই কান্না আর হাসির মাঝখানে, যেখানে মধুলোভী কোন এক বিষাক্ত ভ্রমর এখনও আছে ফুলের সৌরভে?

আস্তে আস্তে এগোলাম সেই জীর্ণ কুটীরে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে জ্বলছে দীপ-শিখা! আর সেই শিখার আলোয় দেখতে পেলাম ফকিরকে।

ফকির সাহেব কি যেন পড়ছিলেন। আমার পায়ের শব্দে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গলো।

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: কে? কি চাই? এখানে কেন?

হাসলাম। তাঁর প্রশ্ন শুনে। কি চাই তা কি আমি নিজেই জানি, না কেন এসেছি তা কি করে বলব? শুধু একটা রাতের মত আশ্রয়। ভোর হলেই চলে যাব। আমার পরিচয় পেয়ে ফকির সাহেব হেসে উঠলেন।

তারপর মৃদু হেসে বললেন: এখানে থাকতে চাও? সাহস তো কম নয়? দূরে যাও—এগোলেই পাবে শ্মশান। অনেক লোক। ওখানে গিয়ে চেয়ে নাও আশ্রয়।

হাসলাম।

আমার হাসি শুনে ফকির সাহেব বললেন: আমি মুসাফির, এখানে তোমার কষ্ট হবে ভাই। খাদ্য নেই, শোবার যায়গা নেই। কেন এসেছ মিছি মিছি এই রাতে? চলে যাও?

বললাম আমি: না, তা হয় না ফকির। আমি যে পালিয়ে এসেছি। আজ রাতটা থাকতে চাই। কাল ভোর হলে চলে যাব।

ফকির সাহেব চুপ করলেন। তারপর কি মনে করে বললেন, আচ্ছা তাই হবে। তার আগে বলতে বলতে একটা টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও আগে ঐ ঘাটে, ওখানকার কোন দোকানে খেয়ে এসো।

বাইরে চলে এলাম।

অন্ধকার এই তীরে, দূরে দূরে কয়েকটা দোকান, আরও খানিক দূরে যেন দেখতে পেলাম অনেক মিলিত লোকের চিৎকার, হরি-ধ্বনি!

বল হরি—হরিবোল।

এইবার ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে এলো, অথচ নির্মম চিরন্তনী যে সত্য, যে ধ্বনি তাতে কেন ভয় জাগে? এই পথে তো সকলকেই যেতে হবে। আবার ধ্বনি! কে গেল চলে? ফকির সাহেবকে ধন্যবাদ তিনি আমায় তাঁর ঘরে আশ্রয় দেবেন। আমি এগোতে লাগলাম, এগোতে এগোতে অনেক লোক, অনেক কোলাহল, অনেক কান্না, অনেক যাত্রী, অনেক আশা, অনেক দুঃখের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। মহাশ্মশানের তীরে দাঁড়িয়ে আমি যেন আজ এক হয়ে গেলাম। কে চলে যাচ্ছে এই পৃথিবী থেকে? ঐ তো দূরে আসছে তার

প্রিয়জন? কে গেল? কারও চোখের জল সে বাধা মানল না। অগ্নিসাক্ষী রেখে কে মুখে দিয়েছে হোমাগ্নি? কে তাঁর উপবীতকে সাক্ষী রেখে করছে মন্ত্রোচ্চারণ? কিন্তু কেন? কেনই বা? ঐ তো এইমাত্র নিভে গেল একটা শিখা? কিন্তু কে সে? নারী না পুরুষ? কী সব ভাবছি আমি? ফকির সাহেব কি আমার জন্য জেগে আছেন? মা কি ভাবছেন? পরিচিতরা কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

চমকে উঠলাম আমি!

এ কে? এই যে এইমাত্র যাকে নিয়ে এলো, কোন এক কিশোরী, না তরুণী, না বধূ, না মা, না প্রিয়া—এ কে? ঐ তো তার করুণ আঁখি, কে? কি নাম? পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাচ্ছে? কাদের কান্না?

এগোলাম। স্পষ্ট করে তাকিয়ে আছেন মেয়েটি, যেন সদ্য ঘুমে তার চোখ মেলা। দুধের মতন তার পায়ের রং, তাতে আলতা। মাথার দু'পাশে অজস্র ফুল। ফুল আর ফুল। জীবনে ও মরণে! কিন্তু কারা যেন বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন? এখনই কি আসবে ঝড়? হবে বৃষ্টি? জন্ম নেবে কি কোন নতুন পৃথিবী? আগুন জ্বলছে ধু-ধু করে। মেয়েটির মুখে কে দিলে তুলে? তাঁর চোখে জল? তিনি কি ভাই? পিতা? স্বামী? বন্ধু? কে কার? দুদিনের এই সংসার?

আমি ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। না ফিরে যাই? ফকির সাহেব ভাবছেন বোধ হয়, ভাবুক। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম, পরিচয়ের ছল করে প্রশ্ন করলাম, কি হয়েছিল? কে যেন জবাব দিল—না, রাণীর তো কিছু হয়নি। কারা যেন বলছিলেন, কি সুন্দর এমনি ভাবে চলে গেল।

কে যেন কেঁদে কেঁদে বলছেন, কে দেখবে এবার ওঁর সখের-ফুলের বাগান? আর ক'মাস পরেই তো বিয়ে হত? কে যেন এগিয়ে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন, সবই তো আমার অদৃষ্ট।

ঝড় উঠেছে না কি? তা হলে? না আর এখানে নয়। আগুন জ্বলছে। লেলিহান শিখার মত অগ্নিদেবতা তাঁর মেয়েকে বরণ করে নিচ্ছেন স্নেহভরে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলাম। মনে হল সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ আকাশের তারা এরা কারা? ঐ মেঘে কার আশ্বাস। তা হলে কি আর ঝড় হবে না? ভালো, ভালো! দোকানে গিয়ে আর কি লাভ। ঘড়ির শব্দ রাত দু'টো। অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন সব নিথর, নীরব। ফকির সাহেবের ঘরে কি এখনও দীপ-শিখা জ্বলছে? এখনও কি কোরান পড়ছেন তিনি। আমার জন্য এখনও জেগে?

আমার চোখে যেন আগুন জ্বলছে। কার চোখ দু'টি এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি। কি যেন নাম মেয়েটির? রাণী! আহা! কি সুন্দর দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কখন যে ফকির সাহেবের ঘরের কাছে এসেছি তা খেয়াল ছিল না আমার। কিন্তু ঘরের আলো কই? অন্ধকার কেন? তবে কি নিদ্রায় অভিভূত ফকির সাহেব? অন্ধকারে কি আমি ঠিক যেতে পারব? ডাকব কি?

ফকির সাহেব! সাড়া এলো না!

আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পেলাম।

উত্তর এলো, আজ আর দেখা হবে না। ফকির সাহেব এখন ধ্যানস্থ।

কণ্ঠস্বরটা অপরিচিত কোন এক রমণীর।

আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি কি করব ভেবে সারা হলাম। মনে হল, এই বুঝি আমার সত্যিকারের পরীক্ষা! ফকির সাহেব কি ভুলে গেলেন আমায়। চারিদিকে তাকালাম।

ভাগীরথী নদী বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে! আকাশের গায়ে নক্ষত্র জ্বলছে আর নিভছে। শুকতারার মত ধ্রুবতারাটি আকাশের গায়ে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে আজ। এমন কেন হল?

চেয়েছিলাম জীবনটাকে শান্তির মত খানিক ভরিয়ে দেওয়া। তবু আজ বিনিদ্র রাতের সমস্ত চিন্তা এসে আমার মনের সংসারে ভিড় করছে কেন? সুদূর প্রসারিত ঐ নীলাকাশ, অবারিত উদ্দাম জলস্রোত, নীল নির্জন নিথর এ পরিত্যক্ততার, এখানেও কি ভয় আছে? এখানেও কি প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর ইশারা? এখানেও কি সংশয় সন্দেহ। না, মানে হল দিকচক্রবালে কুহেলি বিছান এই ঘনায়মান অন্ধকারে জীবনের যে প্রশ্ন আমার জেগে উঠেছে তার পরম সত্য পেয়েছি আমি। শুধু জীবনকে চিনে যাওয়া, শুধু মানুষকে দেখে যাওয়া, শুধু মনকে বাচাই করা।

সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা পেলাম মনে আমি এখনও আত্মবিস্মৃতির কবলে যাইনি। মনের মধ্যে যায়নি এখন কোন সূত্র।

ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম তা আমার মনে নেই। কখন যে এক অদেখা অজানা রহস্যের দেশে চলে গিয়েছিলাম তা আমার মনে নেই। আমি যেন সে রাত্রে দেখতে পেয়েছিলাম রাণীর মৃত্যুকে, নিবিড় মধ্যরাত্রে রাণীর সেই সহাস্য মুখশ্রী আমার নয়নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বারবার, তার জন্য পরমদেবতার কাছে অপার শান্তির প্রার্থনা চেয়ে নিলাম যেন।

আর কি দেখলাম ?

দেখলাম যে আমি আমার আত্মার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি আজ, এই জন্মে আর এক নবজন্ম, দেখলাম কুয়াশায় ঘেরা ফকির সাহেবের জীর্ণ কুটিরে আত্মমগ্না কোন নারীর আকুল মিনতি। সেই নারী যে তার সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে ফকিরের পদপ্রান্তে মিনতি জানাচ্ছে, এ বেশ তোমার নয় ফকির, ঘরে চলো, ফিরে চলো তোমার সংসারে।

যেন স্পষ্ট দেখলাম ফকির সাহেব তাঁর আয়তঘন নিবিড় কালো চোখ দিয়ে হাসির তরঙ্গ তুলে দিয়ে এক প্রতিধ্বনি করে বললেন, দুর্বলা রমণী ফিরে যাও ঘরে, আমার ঘর নেই আমি যাযাবর। শুনতে পাচ্ছ না হাজার হাজার মানুষের কান্না, দেখতে পাচ্ছ না রোগগ্রস্ত, শোকার্ত নরনারীর সেবাই একমাত্র সত্য, আমার তা কাম্য। আমার জীবনে প্রেম নেই কি হবে মিথ্যার পেছনে ছুটে ?

তড়িদ্বেগে আমার নিদ্রা গেল ছুটে। রাতের সমস্ত কালিমা কেটে আসছে, আসন্ন প্রভাত। ঘাটে লেগেছে আবার তরী। তীরে ফিরে যেতে হবে নাকি আবার ? যাবার আগে একবার কি দেখা করে যাব ফকির সাহেবের সঙ্গে ? তাঁর সহাস্য প্রদীপ্ত প্রশান্ত মুখখানা দেখলেও মনে হয় যে নতুন জীবনের আলোর স্পর্শ।

কি করব ?

ধীরে ধীরে ঘরে এলাম। জীর্ণ কুটীর। প্রদীপের শেষ শিখা নিভে গেছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন ফকির সাহেব, এসো এসো, তোমার কাল ফিরতে দেরী হয়েছিল বুঝি ?

বললাম, হাঁ কাল দুই প্রহরে দেখেছি নতুন পৃথিবীর নবজন্ম। দেখেছি মৃত্যুকে, চিনেছি সত্যকে।

বললেন, বেশ বেশ, এখন ফিরে যাও ঘরে, এখনও তোমার সময় হয়নি, কেন এসেছো এই দুর্বোধ্য জগতে ? এই রহস্যময় জগতে পাবে না বিশ্বাস।

নিঃশব্দে চলে এলাম ওখান থেকে।

ফিরে এলাম তীরে।

আবার সেই পরিচিত লোক, আবার সেই তরী। সেই উদাসী মাঝি। পেছনের দিকে তাকালাম, পড়ে রইল ফকির সাহেবের জীর্ণ কুটীর। আকাশের দিকে তাকালাম, মনে হল নতুন প্রভাতের নবজন্ম। সারাটা মনে কিসের একটা শূন্যতা অনুভব করলাম।
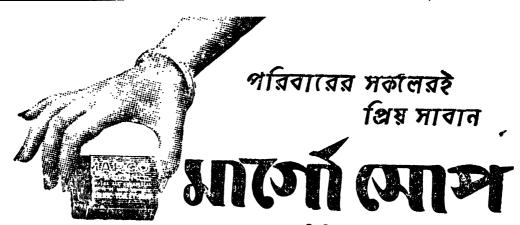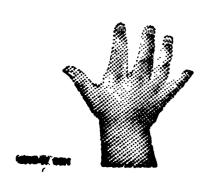
কার চোখ দু'টি এখনও ভাসছে আমার চোখে। রাণীর সেই সোনার দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে আর কূল পেলাম না। চারিদিকে শুধু দেখতে পেলাম জল আর জল।

বাইরের দিকে মন ছুটে গেলেও, মনটা কেন জানি না ঘরের দিকেই টানত।

কারণ কি ছিল ?

মনের আয়নায় যখন তাকে বিচার করতাম, দেখতে পেতাম একটা সহজ সুর, সহজ গতি। মনে হত ঘরের এই টেবিলটা হয়ত আমার জীবনের চরম শান্তির নিশানা।

টেবিলের পর বসে বসে কত সময় কত হিজিবিজি লিখেছি, কত কি যে ভাবনা এসে মনের মধ্যে সংঘাত দিয়েছে তার শেষ ছিল না। শুরুও ছিল না হয়ত। একবার যদি ছবি আঁকা হয়ে যায় আর তাকে মুছে কি লাভ ? দুরন্ত কালের গতিতে সে ছবি যাবে হারিয়ে, তার রেশ যাবে মুছে। কিন্তু মনের ভাবনার ছবিটা কি মিলিয়ে যাবে ? না। হয়ত যাবে না।

সেই রকম মন নিয়ে কোনদিন মাধবীদি'র কথা ভেবেছি। ভাবনার কূল পাইনি। কিন্তু শুরু দেখেছি, দেখেছি অজান্তেই মাধবীদি'কে কত ভালবাসতাম, কত শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর সেই ভালবাসার বিশ্বাসকে কোনদিনই আমি অমর্যাদা করিনি। আমার মনের সমস্ত কামনা বাসনা উজাড় করে দিয়েছিলাম দয়াহীন দেবতার চরণে। এক একদিন প্রার্থনা করতাম আহা মাধবীদি' কত ভাল মেয়ে, তাঁকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখো ঈশ্বর। এক-এক দিন মনে হ'ত, সেই উদাস করা দুপুরে মাধবীদি' এত ম্রিয়মাণ কেন ? এই মনের আকাশে যতবারই মিল চেয়েছি, সংঘাত এসেছে বার বার।

আজ মনে পড়ছে মাধবীদি'কে ভুল বুঝেছি আমি, হয়ত বা মনের ভুল, হয়ত বা বয়সের প্রতি বিচার করে তাঁর প্রতি অন্যায় করেছি। আজ যখন এই দ্বিধাযুক্ত মন নিয়ে তাঁকে বিচার করেছি তখন মনে হয় হায় কোথায় গেল সেই স্বপ্নময় দিন ? সেই ফুলের বাগান ? সেই উতল করা কোন বিকেল ? সকালে-সন্ধ্যায় বাগানের ফুলের রং বদলায়, মন বদলায়, কিন্তু বিশ্বাস বদলায় না। (আমি যাকে বিশ্বাস করি তাকে কোনদিনই সন্দেহ করি না, ভালবাসার গভীরতায় ঠিক তেমনি সুন্দ্রতা আমার কাছে পবিত্র ও সুন্দর)

দেওয়ালের আনাচে-কানাচে যখন নিজেরেই ছায়া দেখি তখন চমকে উঠি আমি। ভাবি এ ছায়া কার ? সময়ের ? মনের ? ঠিক তেমনি মাঝে মাঝে মাধবীদি'কে দেখতাম, আর ভাবতাম যদি একবার তাঁর মনের মাধুরীকে চিনতাম, যদি তাঁর গানের কলিতে সুর ফেলতাম গানে গানে।

বলতে লজ্জা নেই মাধবীদি'কে দেখলেই মনে হত, ঝরা বকুলের কান্না। মনে হত কোন ধূসর দিগন্তের কোল থেকে তাঁর আগমন ? এক একদিন আমার অবিশ্বাসী মন নিয়ে বলতাম, সত্যি সত্যি যেদিন তুমি থাকবে না, তুমি চলে যাবে কোন এক সানাইয়ের সুরে। সেদিনও কি মনে রাখবে আমায় ?

হাসতেন মাধবীদি'। বলতেন, পাগল ছেলে, আমি কোথায় যাব এই গাম ছেড়ে ? আর···

জানতাম বাকীটুকু তিনি বলবেন না, অথচ আশ্চর্য, মাধবীদি'র সব বয়সের মেয়েরাই বিয়ে করে ঘর করছে। অথচ মাধবীদি' ?

এই সব ভাবনা আমার টেবিলে বসে দিনের পর দিন সাদা কাগজে অনেক হিজিবিজি লিখেছি। তখন আমার মনের আকাশে ছিল বসন্ত, গানে ছিল সুর, আর মনে মনে ছিল রামধনু রং করা কোন বসন্তের দিনলিপি জানার, দেখার, চেনার আকুলতা।

জানি না কোন এক দুর্বার আকর্ষণে আমায় টেনে নিয়ে যেতো, বলতাম, তুমি কি ভাবো আমার কথা ? তুমি কি চেনো আমার মনকে ?

হাসতেন, বলতেন মাধবীদি': চিনি, চিনি। সব পুরুষকেই আমার চেনা আছে, সব এক চেনা মুখ।

কি বলতে গিয়ে কি বললাম, কি শুনতে গিয়ে কি শুনলাম। আজও সেই অতীতের অবরুদ্ধ দরজা দিয়ে ছুটে গেলে মনের মধ্যে যে সংঘাত আসত, ভাবি আমার বিশ্বাস, আমার শ্রদ্ধা, আমার ভালবাসা কী করে হারিয়ে গেল তাঁর প্রতি ?

জানি না আজ যদি সেই অতীতের ঘটনার মুখোমুখি আমরা হতাম, হয়ত তাঁর চেহারাটা যেত পালটে। কিন্তু সেদিন ?

সেদিনের সেই দুরন্ত দুপুরে, সেই ফুলের বাগানে, সেই চঞ্চল করা মনের আয়নায়, সেই এক কালান্তর ঘটে গেলো। য' আমি জানতে পারি নি তাঁর কথাকে।

আজ দিগন্তের ছায়ার মিছিলে সেই হৃদয়-সমুদ্রের ঝড় এখনও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মনে হয় এই নির্মম পৃথিবীতে কি সবই সম্ভব ?

উদাস করা দুপুরে মনটা যখন বিষণ্ণ, ছুটে গেলাম মাধবীদি'র কাছে। ফুলের বাগানে রক্ত গোলাপ, তার পাশে রয়েছে একরাশ জবাফুল। কেন জানি না গোলাপ দেখলেও আমার মন রাঙিয়ে ওঠে লোভ হয় তুলি আরও তুলি। দু'হাত ভরে নিয়ে, কি খেলার ছলে মাধবীদি'কে ডাকতে গেলাম। সাড়া নেই। উদাস চঞ্চল দুপুরে নিদ্রামগ্ন এই নির্জন বাড়ীতে আরও স্পষ্ট করে ছায়া মেলেছে পাখীরা। তারা ডাকছে। তাদের কিচির-মিচির শব্দে জেগে উঠেছে দাঁড়ের ময়না পাখী। পাখী। ফুল। আমি। আমরা তিন জনেই মুখর হয়ে উঠেছি আজ।

কিন্তু কোথায় মাধবীদি ?

তবে কি বাড়ী নেই ?

তবে কি বাইরে ?

তা হলে কি আজ আমার ডাকে সাড়া দেবে না।

ঠিক এমনি করেই তো কত দুপুরে পালিয়ে এসেছি আমি। আমাকে দেখে পাশে বসিয়েছেন সস্নেহে। কত গল্প করেছি আমি। কত হাসি, কত গান। কিন্তু আজ ?

কেন এই নীরবতা ? ঘরে গেলাম। নিদ্রামগ্না মাধবীদি'। আবার ডাকলাম, সাড়া নেই। আবার, বার-বার। চিৎকার করে উঠলাম, ভয় পেলাম। বাইরে কি কেউ আছে ? পাখীদের সাড়া নেই। ময়না পাখীটা কী খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে ? রক্ত গোলাপ কী এখনও বাগানে ? জবা কি আছে তার পাশে ?

আমি কী ভাবছি ?

মাধবীদি'র কি তবে জ্বর হয়েছে ? কোন অসুখ ? হার ভাবনায়

আমি বিভোর। হঠাৎই তাঁর গায়ে ধাক্কা দিলাম। কী শীতল! কী ঠাণ্ডা! চোখের দিকে তাকালাম। কী বিষণ্ণ! কী নীল!

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

ভয়ে-ভাবনায় মাধবীদি'কে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলাম, কথা বলো, সাড়া দাও।

আশ্চর্য, কোন শব্দ নেই। প্রতিধ্বনিও নেই। হঠাৎ ঘরটা আমার চোখের সামনে দুলতে লাগলো, ঘরটা আমার দিকে চেয়ে আছে যেন।

বাগানটা কতদূর? পা টলছে কেন? একি টেবিলের পর কী একটা সাদা কাগজ। তুলে নিলাম, লেখা আছে তাতে। মাধবীদি'র নিজের হাতে লেখা। লিখেছেন, সমাজ মানি না, ধর্ম মানি না, আজীবন বৈধব্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই, তাই স্বেচ্ছায় এ আমার মৃত্যু। কারও প্রতি ক্ষোভ নেই, নেই মান-অভিমান অভিযোগ!

মৃত্যু! হাসি পেলো। যে মৃত্যুকে দেখেছিলাম বৈরাগীর বেশ ধরে। ক'দিন আগেও ভাগীরথীর ঐ ওপারে, দেখেছিলাম একটি সোনার প্রতিমা বাণী ছাই হয়ে গেল। তার বুকভরা ভালবাসা, তার মনের সমস্ত সঞ্চিত বাসনা-কামনা মিলিয়ে গেল। সে-মৃত্যুকে ভুলিনি।

আজ আবার নতুন করে এক মৃত্যুকে দেখলাম, ভৈরবীর বেশ ধরে, যে সমাজের কাছে ছিল নিষ্ঠাবান হিন্দু বিধবা। সে তার যৌবন-যন্ত্রণার প্রয়োজনের জন্য মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলে। আমার চোখের সামনে যেন বাগানের হাজার হাজার ফুল এসে আমাকে বিদ্রূপ করছে।

মনে হচ্ছে একি অভিনয়!

দেবতার মন্দিরে দেবদাসীর কী অপমৃত্যু! এর জন্য দায়ী কে? সমাজের কোন বিধি আইন, না সমাজের নকল মোহ জয় না করার জন্যে শাস্তি।

তবে কি?

আমার সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, এই কি তার রূপ? কি মর্মান্তিক, কি হৃদয়-বিদারক!

মাধবীদি' নেই, তবু কি তাঁর স্মৃতি চিরদিনই বিরাজ করবে আমার মনোমন্দিরে। না, আমি ভুলে যাব? আমার অশান্ত মনে কোন সান্ত্বনা এল না। চিঠিটা বার বার পড়লাম। হিজিবিজি দেওয়ালে কার ছায়া? বৈতরণী কতদূর? এই সোনার দেহ কি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আগুন জ্বলছে মনে, দেহে এনে দেবে শান্তি। ফকির সাহেব কি বলেছিলেন আমায় মনে হচ্ছে, কেন এসেছ দুর্বোধ্য এক জগৎকে চিনতে, ফিরে যাও।

ফিরে আসার এই কি রূপ?

মাধবীদি' নেই। কিন্তু দেহটাপড়ে আছে আর আমি আছি তার সামনে। মাধবীদি' কি দেখতে পাচ্ছেন আমায়? আমি কি দেখছি আমাকে? জ্বলে জ্বালায় যন্ত্রণায় কেন ঘর থেকে বাইরে যেতে পারছি না? কেন ভয় লাগছে না আমার? কেন এই দুরন্ত দুপুরে আসছে না ঝড়?

আয়নায় কার ছায়া? ঘরেতে কার দেহ? এইখানে কে বসে? একটা সমুদ্র নাকি? ভাবতে ভাবতে আমার চোখে কেন আসছে না অশ্রু? অথচ সেই দিনের সেই মায়া ঘেরা দুপুরে মাধবীদি'কে কি বলেছিলাম আমি, তুমি যখন থাকবে না আমি কেঁদে ফেলব। হাসি পেল, হাসির তরঙ্গে সর্বাঙ্গে বইছে ঝড়। না, একটা কিছু করতে হবে। থাক পড়ে মাধবীদি'। আমি পালাই।

ভীরু পাখীর মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাগানে কি ফুল ফুটেছে? পাখীরা কি ডাকছে? ময়না পাখীটা কি নেই।

সব ফাঁকা।

অসীম অনাদি আকাশের দিকে তাকালাম। জানি না সে আকাশে কি লেখা ছিল?

দেখলাম কালো আকাশে ঝড়, মেঘে তার বর্ষণ। আর আমি না বলা বেদনার বাণী নিয়ে দৌড়ে গেলাম বাইরে। বাইরে থেকে বাইরে।

যেতে যেতে, পথে পথে আমার মনে হল, দেহটা কি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, না পুড়ে খাক হয়ে যাবে মন। মন—না দেহ? এই পবিত্র দেহে কি পুষ্পের বীজ ছড়ানো থাকে?

জানি না, জানি না হঠাৎ কি ভেবে আবার ফিরে এলাম বাগানে, বাগান থেকে তুলে নিলাম জবাফুল, গোলাপ কটিগুলি ঝরে গেছে মাটিতে।

পাখীরা কি ফিরে গেছে আকাশে?

ময়না পাখীটাও নেই।

আমি একা, চুপি চুপি পা টিপে টিপে চোরের মত আবার এলাম ঘরে। নিথর, নীরব, নিষ্প্রাণ, বিষণ্ণ, ম্লান, মৃত মাধবীদি'র কাছে, পায়ে দিলাম ফুল। মনে মনে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললাম, মাধবীদি' তোমাকে ভুলব না।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, অনেক দেখা অদেখা রহস্যের তীরে এসেও ভুলতে পারিনি আমার সেই হারানো দিনের ফেলে আসা মাধবীদি'র কথা;

মনে পড়ছে ......

এই সুদূর প্রসারিত নীলাকাশে মাঝরাতে আমার বাতায়নের কাছ দিয়ে যে ফুলের সৌরভ এখনও আসে, তখন মনে পড়ে সেই এক উদাস করা গ্রামের কোন এক শান্তময়ী কল্যাণময়ী মাধবীদি'কে। মনে হচ্ছে দূর দিগন্তের ছায়ার মিছিলে হয়ত তাঁর কথা ভুলে গেছে সবাই। কিন্তু আমি ভুলিনি। ভুলব না। ভুলতে পারব না কোন দিনই। কেন যে পিছু ডাকে তা কেউ জানে না।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ।
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সখিনা বিবি

শিবানী ঘোষ

আপন পালঙ্কে অর্ধশায়িতা অবস্থায় গবাক্ষপথে চেয়ে রয়েছেন রাজমাতা ফিরোজা বেগম। দূরে সুবিস্তৃত প্রান্তর। তারই ছায়াশীতল আম্রকুঞ্জের তলে দেখা যাচ্ছে জন কয়েক যুবক। বলিষ্ঠ তাদের চেহারা, মুখে চোখে দীপ্তির আভা। ঐ দলের দলপতি হচ্ছে ফিরোজ খাঁ। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান হবার পর থেকে সে গড়ে তুলেছে ঐ দলটি।

তাদের পানে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফিরোজা বেগম। ওদের মধ্যে কিসের যে জল্পনা-কল্পনা চলেছে তা তিনি বুঝতে পারেন এখান থেকেই। বাংলার বিদ্রোহী ঈশা খাঁর রক্ত রয়েছে তাঁর পুত্রের ধমনীতে। সেই রক্তে সে আগুন জ্বালতে চাইছে মোগলের বিরুদ্ধে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভঙ্গ হয়ে গেল দলটি। যে যার চলে গেল আপন আপন আস্তানায়। ফিরোজ খাঁও ফিরে আসেন রাজবাড়ীতে। রাজমাতা সেই শূন্য প্রান্তরের পানে চেয়ে রইলেন আরও কিছুক্ষণ। তারপর ডাক দিলেন—দরিয়া।

—বেগমসাহেবা? ছুটে আসে বাঁদী।

—হ্যাঁ রে ও বাড়ী ফিরেছে?

—হ্যাঁ এইমাত্র এলেন।

—একবার ওকে ডেকে দে তো আমার কাছে।

—দিই বেগমসাহেবা। চলে গেল দরিয়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন ফিরোজ খাঁ। এসেই তিনি বললেন—মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ। বসো একটা কথা আছে।

একটু ব্যস্ততার সঙ্গে ফিরোজ খাঁ বলেন—এখন তো বসবার বিশেষ সময় নেই।

—তা হোক, তবু বসো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মায়ের কাছটিতে বসে পড়েন দেওয়ান। পা দুটো অল্প একটু গুটিয়ে নিয়ে বেগমসাহেবা বলেন—এখন কি আবার কোথাও বেরোবে?

—হ্যাঁ মা। এখুনি আমাকে তাজপুরে গিয়ে দেখা করতে হবে দেওয়ান ওমর খাঁর সংগে।

—খুব জরুরী কাজ আছে বুঝি?

—হ্যাঁ মা।

কি জরুরী কাজ তার, জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না বেগমসাহেবার। ও নিশ্চয়ই যাচ্ছে মোগল বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার কোন মতলব স্থির করতে। যা ভাবতেও কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গে! সামান্য জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান হয়ে বিরাট মোগল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা তো জেনে শুনে সাপের গর্তে হাত ঢোকানো। তিনি বললেন—আমি বলছিলাম কি আমার বয়স তো হল। আর ক'দিনই বা বাঁচবো। এবার তুমি একটু সংসারী হও। একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করে—

মায়ের কথার মাঝখানেই ফিরোজ খাঁ বলে উঠলেন—এখন আমি উঠি মা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজমাতা। ছেলেকে বিয়ের কথা বললেই সে এড়িয়ে যায় সেটাকে। হায় যিনি তাকে এমন রূপবান এমন গুণবান করে এই জগতে পাঠিয়েছেন তিনি তার অন্তরে এতটুকু সংসারী হবার বাসনা কেন রাখলেন না! কেন তিনি বিদ্রোহের আগুন ঠেসে দিলেন এই সুকুমার দেহের অন্তরে!

ফিরোজ খাঁ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—এখন তবে আমি যেতে পারি?

—এসো। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে দিয়ে কথাটা বেরিয়ে আসে বেগমসাহেবার মুখ থেকে।

মায়ের কথা শুনে তখুনি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন ফিরোজ খাঁ। ফিরোজা বেগমের চোখ দুটি তখন অকারণে হয়ে ওঠে বাষ্পাচ্ছন্ন।

ঘোড়া নিয়ে সবেগে জঙ্গলবাড়ী থেকে তাজপুরের দিকে ছুটিয়ে দিলেন ফিরোজ খাঁ। খুরে খুরে উড়তে থাকে ধুলো। ক্রমশ নেমে আসে সন্ধ্যে। রাত্তিরের আঁধার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলে মেদিনী।

সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে ভোরবেলায় তাজপুর কেল্লায় পৌঁছলেন ফিরোজ খাঁ। সেখানকার দেওয়ান ওমর খাঁ সাদরে আহ্বান জানালেন জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানকে। তিনি তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন আপন কক্ষে।

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর ফিরোজ খাঁ জানালেন তাঁর আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চান মোগলের বিরুদ্ধে। কারণ মোটা মূলধনের রাজস্ব দিয়ে দিল্লীশ্বরের ক্রীড়নক হয়ে থাকাটা হীনতার পরিচায়ক। তা এতে তাজপুরাধিপতির সমর্থন আছে কি? আর তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে কি না?

বিরাট মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাটা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখলেন না ওমর খাঁ। তবে ফিরোজ খাঁকে অসন্তুষ্ট না করে তিনি বলেন—দেখুন এতে সমর্থন আমার আছে তবে সাহায্য করা যাবে কিনা তার সঠিক সংবাদ আমি দিন দুয়েকের মধ্যেই আপনাকে জানাবো।

—বেশ। এখন তবে আমি উঠি —বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন ফিরোজ খাঁ। হঠাৎ তাঁর মনে হল অন্তঃপুরের দিকে পর্দার অন্তরালে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গোলাপের মত আরক্ত কোমলাঙ্গী একটি তন্বী। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরই পানে। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই তখুনি তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন পর্দার অন্তরালে। ফিরোজ খাঁ তাড়াতাড়ি নেমে এলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতে যাবেন জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান, এমন সময় পেছন দিক থেকে কে একজন বলে উঠলো—আপমার একটা চিঠি।

ফিরোজ খাঁ তাকিয়ে দেখেন তাজপুর দেওয়ান-বাড়ীর এক দাসী। সে এগিয়ে এসে চিঠিটা দিল তাঁর হাতে।

ফিরোজ খাঁ জিজ্ঞেস করেন—এ চিঠি কে দিয়েছেন।

দাসীটি বললে—দেওয়ান ওমর খাঁর কন্যা শাহজাদী সখিনা।

ফিরোজ খাঁর চোখের সামনে তখুনি ভেসে ওঠে পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সেই তন্বীটি। তিনি তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে লাগলেন চিঠিটা,—হে বীরশ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত অযাচিত ভাবে আপনাকে পত্র দিয়ে বিরক্ত করছি। আশা করি অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনি বাস্তবিকই স্বাধীন-চিত্ত পুরুষ। কিন্তু আমার পিতা আপনাকে সাহায্য করবেন কিনা সন্দেহ। অপরাধ নেবেন না আমি অন্তরাল হতে আপনার এবং পিতার সব কথাই শুনেছি। তবে এটুকু জানবেন মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সৎসাহস তাঁর নেই। আর হে পুরুষোত্তম, আপনার বীরত্ব কাহিনী আমি ইতিপূর্বেই শুনেছি, কিন্তু আজ আপনার তেজোদ্দীপ্ত কান্তি আমাকে এত বিমুগ্ধ করেছে যে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। তা এই দাসী কি আপনার পদসেবা করবার মত সৌভাগ্যবতী হতে পারে না? উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।—ইতি আপনার রূপমুগ্ধা সখিনা।

চিঠিটা পড়ে খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েন ফিরোজ খাঁ। তিনি পত্রবাহিকাকে বলেন—আমি তাজপুরে গিয়ে এর জবাব পাঠিয়ে দেবো।

সখিনা বিবির কথাই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত। দিন দুয়েক পরেই ওমর খাঁ দূত মারফৎ একটা পত্র পাঠিয়ে দিলেন জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানকে। যাতে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তিনি উপস্থিত রাজী নন। কাজেই কোন প্রকার সাহায্য পাঠানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

এর জন্তে বিশেষ দুঃখিত হলেন না ফিরোজ খাঁ। কিন্তু শাহজাদী সখিনার কি করা যায়! তিনি সেই দূত মারফৎই একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন ওমর খাঁকে। যাতে জানালেন তিনি পাণিগ্রহণ করতে চান তাঁর কন্যার।

এর উত্তরে ওমর খাঁ জানালেন ফিরোজ খাঁর পূর্বপুরুষ ঈশা খাঁ ছিলেন হিন্দুর সন্তান। কাজেই তাঁর দেহে নেই খাঁটী মুসলমানের রক্ত। এ অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে আপন কন্যার বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক।

এই পত্র পড়ে আগুন জ্বলে ওঠে ফিরোজ খাঁর শরীরে। তিনি স্থির করলেন যেমন করেই হোক তিনি সখিনাকে ছিনিয়ে আনবেন ওমর খাঁর কাছ থেকে

সেদিন রাত্রে আপন কক্ষে একাকিনী বসে রয়েছেন সখিনা। ফিরোজ খাঁর কথাই তাঁর মনে পড়ছে বার বার। পিতা তাঁকে যে অপমানসূচক পত্র দিয়েছেন তা ভেবে মরমে মরে যান শাহজাদী। তাঁর ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে তিনি তাজপুরের প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যান জঙ্গলবাড়ীর দিকে।

হঠাৎ এক সময় সখিনা বিবির মনে হল প্রাসাদের চতুর্দিকে কারা যেন চীৎকার করে উঠলো। ছুটোছুটি পড়ে গেল প্রহরীদের। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সশস্ত্র সেনারা। চমকে ওঠেন শাহজাদী। হঠাৎ এ কি হল! তিনি এগিয়ে গেলেন অলিন্দের কাছে। হঠাৎ কে একজন ছুটে এসে চেপে ধরে তাঁর হাতটা।

ভয়ে চীৎকার করতে যাচ্ছিলেন সখিনা। কিন্তু তখুনি আগন্তুকের মুখের পানে তাকিয়ে তাঁর মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে—এ কি আপনি!

আগন্তুক ফিরোজ খাঁ বললেন—হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্তেই আমি এই তাজপুরের কেল্লা আক্রমণ করেছি। এখন বলো শাহজাদী তুমি আমার সাথে যেতে প্রস্তুত আছো তো?

ফিরোজ খাঁর মুখের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সখিনা বিবি। কিছুক্ষণের জন্য তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না।

খাঁ সাহেব বলেন—তাড়াতাড়ি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও কুমারী। কারণ এভাবে এখানে বেশীক্ষণ থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সখিনা বিবি বলেন—আমি অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছি প্রিয়তম। তুমি এখান থেকে আমাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলো।

—বেশ, তবে এসো আমার সাথে।—বলে ফিরোজ খাঁ সখিনা বিবির হাত ধরে বেরিয়ে আসেন দুর্গ থেকে। তারপর প্রিয়তমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে তিনি তীব্রবেগে তা ছুটিয়ে দিলেন জঙ্গলবাড়ীর দিকে।

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। ফিরোজা বেগম বিছানায় অর্ধশায়িতা অবস্থায় চেয়ে রয়েছেন গবাক্ষপথে। এমন সময় সখিনাকে নিয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন ফিরোজ খাঁ। বেগমসাহেবা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকেন পুত্রের মুখের পানে।

ফিরোজ খাঁ বললেন—মা, আপনি আমাকে বিয়ে করবার কথা বলেছিলেন না, তাই নিয়ে এলাম আপনার গৃহবধূকে।

শয্যা ছেড়ে বেগমসাহেবা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন সখিনার কাছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—এমন সুন্দরী মেয়ে কোথায় পেলি বাবা?

ফিরোজ খাঁ বলেন—ইনি তাজপুরের দুর্গাধিপতি ওমর খাঁর কন্যা।

—ওমা, তাই নাকি! ওরে ও দরিয়া।

তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় বাঁদী। বেগমসাহেবা বলেন—ওরে দরিয়া, বিয়ের সব আয়োজন কর্ রে। আজ যে আমি আনন্দে আর দাঁড়াতে পারছি না।

কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করায় ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন ওমর খাঁ। তিনি দিন কয়েকের মধ্যেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করলেন জঙ্গলবাড়ী। তখন যুদ্ধ করবার মত মনের

অবস্থা ছিল না ফিরোজ খাঁর। তা ছাড়া ঐ অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মত প্রস্তুতিও তেমন কিছু ছিল না। তবু যুদ্ধে গেলেন ফিরোজ খাঁ। তিন দিন ধরে যুদ্ধ চলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে নিতে হল জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানকে। ওমর খাঁ তাঁকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিলেন তাজপুরে।

এই সংবাদ শীঘ্রই গিয়ে পৌঁছল জঙ্গলবাড়ীতে। শোকে মুহ্যমান হয়ে দরিয়া এই খবরটি দিতে গেল সখিনা বিবিকে। কিন্তু স্বামীর বিজয়-সংবাদ শোনবার জন্যে তিনি এতই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে সে যাবামাত্রই বলে উঠলেন—ওরে দরিয়া, আজ আমার মনে হচ্ছে এখুনি উনি বিজয়ী হয়ে ফিরবেন। তা তুই ফুলের মালা ঠিক করে রাখ, উনি এলেই আমি ওঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দোবো। আর উনি রণক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরবেন, ওঁর জন্যে সুগন্ধি জল, আভের পাখা সব ঠিক করে রাখিস। আর দরিয়া, পাঁচ-পীরের দরগা থেকে যে মাটি আনা হয়েছে সেটা এনে ঐ দরজার কাছে রাখ—উনি ঐ মাটি ছুঁয়ে এই ঘরে প্রবেশ করবেন।

সখিনা বিবির এই সব কথা শুনে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে দরিয়ার চোখ। কোন কথাই সে বলতে পারে না। তাকে নীরবে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সখিনা বল্লেন—একি দরিয়া, তুই অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? একি, তুই কাঁদছিস? কেন রে, কি হয়েছে?

এইবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠে দরিয়া বলে—শাহজাদী আমাদের এবার সুখের দিন ফুরিয়েছে। তোমার স্বামী তোমার পিতার নিকট পরাজিত হয়ে বন্দী হয়েছেন। এখন আমাদের রক্ষা করবার আর কেউ নেই।

কথাটা শুনে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন সখিনা। তারপর ডাক দিলেন—দরিয়া।

—শাহজাদী?

—এখান থেকে ঐ যুদ্ধের পোষাকগুলো নিয়ে আয় তো।

বিস্মিতা হয়ে দরিয়া বলে—এগুলো কি হবে শাহজাদী?

সখিনা বিবি বল্লেন—আগে তুই নিয়ে আয় তারপর সবই দেখতে পাবি।

দরিয়া এনে দিল যুদ্ধের পোষাক। সখিনা পরে নিলেন সবগুলি। মাথায় চুলটা জড়িয়ে নিয়ে বেঁধে নিলেন উষ্ণীষ। দরিয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর পানে। সখিনা তাঁর সাজ পোষাক সমাপ্ত করে বল্লেন—দরিয়া, এখন কি আর আমাকে নারী বলে মনে হয়?

দরিয়া বলে—না শাহজাদী, এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ষোড়শবর্ষীয় এক যুবকের মত।

—আচ্ছা এইবার একটা ভাল ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রাখ।

দরিয়া বিস্মিতা হয়ে বলে—ঘোড়া কি হবে শাহজাদী?

সখিনা বিরক্ত হয়ে বল্লেন—আঃ দরিয়া এখন তর্ক করবার সময় নেই। তোকে যা বললাম শীগগির কর।

চলে গেল দরিয়া। সখিনাও তার সাজপোষাক সমাপ্ত করে গেলেন ফিরোজা বেগমের ঘরে। পুত্রের শোকে তখন মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন বেগমসাহেবা। হঠাৎ এক নবীন যুবককে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি বল্লেন—একি তুমি কে!

সখিনা বিবি বল্লেন—মা, আমি আপনার বৌমা, আমি চললাম যুদ্ধে। হয় আপনার পুত্রকে উদ্ধার করে আনবো, নয় যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেবো।

ফিরোজা বেগম বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির মুখের পানে। কোন কথাই তিনি বলতে পারেন না। সখিনা বিবি তখন নতজানু হয়ে বেগম সাহেবাকে আদাব জানিয়ে চলে আসেন বাইরে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সবেগে ছুটে যান তাজপুরের দিকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরোজ খাঁ ধৃত হওয়ায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তাঁর সেনাদল। তখুনি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন সখিনা বিবি এবং অপূর্ব দক্ষতার সাথে তিনি সংহত করে নিলেন তাঁর সেনাদল। তারপর চালাতে লাগলেন যুদ্ধ।

তক্ষুনি ঘুরে গেল যুদ্ধের পরিস্থিতি। তাজপুরের সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগল জঙ্গলবাড়ীর সেনাদের নিকট। এই খবর শুনে হতবাক হয়ে গেলেন ওমর খাঁ। কে ঐ নবীন যুবক! যাঁর রণকৌশলে পরাজিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর সেনারা; তিনি তখুনি ডেকে পাঠালেন তাঁর সেনাপতি আমীর খাঁকে। সেনাপতি এসে জানালেন এরকম অদ্ভুত বীরত্ব তিনি ইতিপূর্বে আর দেখেন নি। যা হোক তিনি পুনরায় চললেন কোন কৌশল অবলম্বন করে তাঁকে পরাজিত করতে। অন্যথায় তাঁদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

আমীর খাঁ আবার গিয়ে দাঁড়ালেন তাজপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে। এবার তিনি ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলেন নবীন যোদ্ধার দেহাবয়ব। সন্দেহ জাগল তাঁর মনে। তিনি তখুনি নিভৃতে চলে এসে ফিরোজ খাঁর হস্তাক্ষর অনুকরণ করে তাঁর জবানী দিয়ে এই মর্মে একটি পত্র লিখলেন—

হে নবীন যোদ্ধা, জঙ্গলবাড়ীর নেতৃত্ব নিয়ে কে তুমি যুদ্ধ করছো জানি না। যা হোক তুমি এ যুদ্ধ থেকে এখুনি নিরস্ত হও কারণ আমি ওমর খাঁর সাথে সন্ধি করেছি। আর তাঁর কন্যা সখিনাকে আমি তালাক দিলাম, কারণ সে-ই এই অশান্তির মূল।

—ইতি, জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ।

আমীর খাঁ পত্রটি ভাঁজ করে দূতের হাত দিয়ে তখুনি সেটি পাঠিয়ে দিলেন সেই নবীন যোদ্ধার নিকট। ফিরোজ খাঁ পত্র দিয়েছেন জেনে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে সেটি চোখের সামনে মেলে ধরলেন সখিনা বিবি।

হঠাৎ চিঠিটা পড়েই তাঁর কাছে মনে হল যেন দুলে উঠল সমগ্র পৃথিবী। যার জন্যে আজ তিনি জীবনপণ করে যুদ্ধে নেমেছেন সেই স্বামী শেষকালে দিলেন কিনা এই পত্র! তালাক দিয়েছেন উঃ! এর চেয়ে একটা তীর এসে বিদ্ধ হল না কেন তাঁর বক্ষে!

সংগে সংগে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন সখিনা বিবি। পতনের ফলে তাঁর ঘুচে গেল পুরুষের ছদ্মবেশ। মাথার উষ্ণীষ খুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো দীর্ঘ কেশদাম। দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে। জঙ্গলবাড়ী ও তাজপুরের সেনারা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। এতক্ষণ তবে যিনি যুদ্ধ করছিলেন তিনি নারী! এবং সেই নারী যে ওমর খাঁর কন্যা তা চিনতেও কষ্ট হল না কারও।

তখুনি এ খবর চলে গেল তাজপুরের সৈন্যদের কাছে। ওমর খাঁ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ছুটে এলেন মেয়ের কাছে? সখিনার দেহ তখন ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সে করুণ নেত্রে একবার চাইল পিতার মুখের পানে। তারপর অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করেন—তিনি কোথায়?

কন্যার শোচনীয় অবস্থা দেখে ওমর খাঁ তখুনি হুকুম করলেন ফিরোজ খাঁকে ঐ স্থানে আনাবার জন্য। ফিরোজ খাঁ সেখানে আসতে সখিনা সজল চোখে একবার চেয়ে দেখলেন স্বামীর মুখের পানে। তারপর করুণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—আমি কি দোষ করেছি যে তুমি আমাকে তালাক দিলে?

ফিরোজ খাঁ বিস্মিত হয়ে বলেন—কে বলেছে আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি!

সখিনা তখন কম্পিত হস্তে তাঁর সামনে এগিয়ে ধরেন সুত্র পত্রটি।

ফিরোজ খাঁ চিঠিটা পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে বলেন—এ জাল চিঠি! কে দিয়েছে তোমাকে?

তখন সেনাপতি আমীর খাঁ বলেন—অপরাধ নেবেন না প্রভু! ওঁর কাছে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করবার জন্যেই আমি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তবে এর পরিণতি যে এই দাঁড়াবে তা আমি ভাবতে পারি নি।

ফিরোজ খাঁ তখন সখিনার মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে বলেন—আঃ আমীর খাঁ, আজ একি তুমি করলে!

সখিনা বিবি তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ফিরোজ খাঁর মুখের পানে। স্বামীকে এমন ভাবে তিনি আর কখনও পান নি কিন্তু এ দেখবার সৌভাগ্য তাঁর আর বেশীক্ষণ রইলো না। ধীরে ধীরে বুজে এল তাঁর চোখ দুটি। তাই দেখে ওমর খাঁ ফিরোজ খাঁ এবং অন্যান্য সকলের চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

কেমন করে

অনীতা মিত্র

ফোটা ফুলের মেলায়
ফুল হ'য়ে ফুটে উঠতে চেয়েছিল
কিন্তু
পারলো না,
পারলো না অতীতের রেখাকে টেনে
ভবিষ্যতের বেদীমূলে
প্রতিষ্ঠা করতে।
কেন?
কে দেবে উত্তর?
পেল না একটু আলো,
একটু বাতাস, এককোঁটা জল,
পেল না
শীতের শিশিরবিন্দুটুকুও;
তবে কেমন ক'রে সে ফোটে বলো?

কুরুক্ষেত্রের কথা

শ্রীসাধনা কর

ধনে সেরা, মানে সেরা, প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে নাম করা কুরু-রাজা। যত খ্যাতি, তত সমৃদ্ধি। অশান্তি নেই, অসদ্ভাব নেই, নির্বিঘ্নে সব চলছে—একদিন দেখা দিল সমস্যা।

বংশের জ্যেষ্ঠ ভীষ্ম—রূপে শ্রেষ্ঠ, গুণে গরিষ্ঠ, স্বাস্থ্যে-স্বভাবে অতুলনীয়। স্বর্গের দেবতা, অভিশাপে এসেছেন পৃথিবীতে। কিন্তু পণ করে বসেছেন—বিয়ে করবেন না, রাজ্যভারও নেবেন না।

বৈমাত্রেয় দুই ভাই—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। অল্পবয়সে দু'জনেই গেলেন মারা। রইলেন কেবল বিচিত্রবীর্যের তিন ছেলে—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, পাণ্ডু শাপগ্রস্ত, বিদুর দাসী পুত্র—তিন জনেই অযোগ্য।

—হবে? রাজা হবে কে? কেমন করেই বা চলবে এত বড়ো রাজত্ব!

ধৃতরাষ্ট্রের আশা—তাঁরই আগে ছেলে হবে, রাজত্ব পাবে, অন্ধের মনের ক্ষোভ মিটবে। একটি নয়, দু'টি নয়, ছেলে হল একশটি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস—আগে জন্মালেন যুধিষ্ঠির, সে হল পাণ্ডুর ছেলে। সবার বড়ো, সুতরাং সেই হবে রাজা। ধৃতরাষ্ট্রের আশা হল নির্মূল।

নিয়তির খেলা—গন্ধর্বের অভিশাপে অকালে স্বর্গে গেলেন পাণ্ডু। পাঁচ ছেলে তাঁর তখনো শিশু। কে তাদের মানুষ করে, কে বা নেয় রাজ্যভার। সব ভারই নিতে হল ধৃতরাষ্ট্রকে। যুধিষ্ঠির সাবালক না হওয়া অবধি তিনিই থাকবেন রাজা।

ভাগ্যের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব পৌরুষ-গর্বে। বল যার রাজ্য তার। পিতা রাজা, পুত্রগণ হবেন বঞ্চিত? ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন—তাঁর চেষ্টা হল পাণ্ডবদের ধ্বংস করা। যত হয় ব্যর্থ, তত বাড়ে বিদ্বেষ, জেদ হয়ে ওঠে প্রবল। এক সঙ্গে কৌরব পাণ্ডবদের থাকা-খাওয়া, খেলা-ধূলা, অস্ত্র শেখা চলে, ভিতরে ভিতরে জমে পর্বত প্রমাণ দ্বেষ। একের আচরণ অন্যকে তুলল বিষিয়ে। অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের পরিণামে রণ, সে মহারণে আহুতি পড়ল কুরুবংশ, এক যুদ্ধেই বীরশূন্য হয়ে গেল ভারতবর্ষ। রাজার সমস্যা গেল মিটে।

কোথায় সে হস্তিনাপুর; কোথায় বা কুরুক্ষেত্র, কবে জলে উঠেছিল বিদ্বেষানল, কবে সে হল শেষ—সঠিক কে বলবে!

আরও কত যুগ পরে সে কাহিনী নিয়ে ব্যাসদেব লিখলেন মহাকাব্য। তারও সন-তারিখ প্রমাণ হল না। পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাধে তর্ক, মতে মতে হয় ধুন্ধুমার। অজানা যা অজানাই থেকে যায়। দেশে-দেশে ঘরে-ঘরে যুগ-যুগান্ত মানুষ প'ড়ে চলে—এক অন্ধ পিতার একশ' পুত্রের নিধন-কথা, এক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত শত ইতিহাস; এক কাহিনীর পাকে বাঁধা হাজার কাহিনী।—নর-নারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতনের বিচিত্র আখ্যান,—মহাভারত।

গল্প আছে রচনায় বসে ব্যাস ভাবছেন—কেমন করে লিখে উঠবেন এমন বিরাট কাব্য। ব্রহ্মা এসে বললেন—গণেশকে স্মরণ করো, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

সকল কাজে সিদ্ধিদাতা গণেশ—নমো গণেশায় বাঞ্ছদেবায় নমঃ। নমো গণেশায় সর্বসিদ্ধায় নমঃ। মহানন্দে ধ্যানে বসলেন মহামুনি ব্যাস। ভক্তের আহ্বানে ভগবান হাজির। বললেন—লিখে দিতে পারি, একটি সর্ত্তে—শুরু করে শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামব না, মুহূর্ত মাত্র নয়।

—তথাস্তু। তবে আমারও এক সর্ত—যা বলে যাব, না বুঝে তার লেখা চলবে না এক বর্ণও।

যিনি সকল জ্ঞানের আধার, তিনি হারবেন মানুষের কাছে? গণেশ লেখনী ধারণ করলেন, ব্যাসদেব বলে চললেন। শ্লোকের পর শ্লোক, তারপর শ্লোক, শ্লোক-নির্ঝর বয়ে চলল। লক্ষ, দু'লক্ষ, পাঁচ লক্ষ, সাত লক্ষ—শ্লোকের আর অন্ত নেই। দুর্বোধ্য তার অর্থ। সে শ্লোকের মধ্যে আবার আট হাজার শ্লোকের অর্থ বোঝেন একমাত্র ব্যাসদেব আর তাঁরই পুত্র বুধশ্রেষ্ঠ শুকদেব। ব্যাসদেবের বর পেয়ে যিনি সব জ্ঞান লাভ করেছেন সেই সঞ্জয়ও সব শ্লোকের অর্থ সম্যক বুঝতে পারেন কি না সন্দেহ। লিখতে লিখতে গণেশ হিমসিম খেয়ে গেলেন। বুঝতে গিয়ে ভাবতে হয়, ভাবতে গিয়ে থামতে হয়, এরই মধ্যে ব্যাস বহু শ্লোক রচনা করে ফেলেন। এমনি ভাবে দেবতা আর মানবে মিলে পালা দিয়ে রচিত হল ষাট লক্ষ শ্লোক।

কোথায় গেল সে ষাট লক্ষ? ছড়িয়ে গেল লোকে-লোকে। ত্রিশ লক্ষ গেল দেবলোকে, পনেরো লক্ষ পিতৃলোকে, চোদ্দ লক্ষ যক্ষ-লোকে, মাত্র এক লক্ষ রইল নরলোকে। সেই এক লক্ষেই হল মহাভারত।

ব্যাসের রচিত সে কাহিনী দেবগণকে প্রথম শোনালেন দেবর্ষি নারদ, পিতৃগণকে শোনালেন অসিত-দেবল; রাক্ষস ও যক্ষগণকে শোনালেন শুকদেব। আর নরলোকে প্রথম গাইলেন বৈশম্পায়ন। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সে গান প্রথম হল গীত।

পুরাণ-কথক সৌতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে কাহিনী শুনলেন। তারপর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এসে পৌঁছলেন সমন্ত-পঞ্চক দেশে। সেখানেই কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর। সে ধর্মক্ষেত্র তিনি দেখলেন। কুলপতি মহর্ষি শৌনক বারো বছর ধরে যজ্ঞ করছিলেন নৈমিষারণ্যে। সেখানে গিয়ে সৌতি গাইলেন বৈশম্পায়নের বলা কাহিনী। দিকে-দিকে ঘরে-ঘরে প্রচার হয়ে গেল সে কাব্য—রচিত হল আরো কত কলা, নৃত্য-গীত, শিল্পসম্ভার। গড়ে উঠল মহাভারতীয় সভ্যতা।

মহাভারত মর্ত্যের কল্পতরু—সে কাব্য পাঠ ক'রে সকল কামনার হয় তৃপ্তি, সকল বাসনার হয় ক্ষয়, সফল হয় সকল সাধনা।

আঠারো পর্ব মহাভারত—দশটি পর্বের ঘটনাস্থল কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর; প্রধান ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধের প্রধান নিয়ন্তা পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ। রণ বিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োগ করাই তাঁর মানব-অবতারের অন্যতম কাজ। সে নিয়োগকাহিনীর অংশটি হল 'গীতা'। মহাযুদ্ধের সূচনা মুহূর্তে উদ্বেল রণোন্মাদনাকে শান্ত রেখে, স্তব্ধ রেখে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে উদ্‌গীত হয়ে উঠল—গীতার মহাবাণী—কুরুক্ষেত্রের কথা।

অন্য কোথা নয়

তরুলতা ঘোষ

কোথা যাস দূরে অকারণে উড়ে
কোন সে দেশের শেষে,
ওখানে কেবল সোনালী স্বপ্নে
আকাশ মাটিতে মেশে।
ওখানে স্বর্ণ-শিখর চূড়ায়
রামধনু-রং ওড়না উড়ায়
অস্তরাগের লালিমা-লালিম
কিন্নরী দিগ্বধূ—
ভবিষ্যতের বুকে সঞ্চিত
অতীত দিনের মধু।

স্বপ্ন-মদির বিলোল নয়নে,
নীল অঞ্জন মাখা;
তৃপ্তি বিহীন তৃষ্ণার জ্বালা—
তাই মেলে পাখা।
তাই মনে হয় আছে আরও দূরে
বেদনা-বিধুর বেহাগের সুরে
তাই মনে হয় পক্ষ ঝাপটে
কালের বক্ষ চিরে
চোখের পলকে পৌঁছাব গিয়ে
লক্ষ যুগের তীরে।

প্রলয় পয়োধি শীকর-সিক্ত
অট্ট অট্ট হাসি
যুগান্তরের পরপার থেকে
কোন সে সর্বনাশী
কুহকী মায়ায় বিলোল নয়নে
ইসারায় ডাকে বাসর শয়নে;
বহু মৃত্যুর পারে মনে হয়
কালের প্রান্তে তবে
নব জনমের কোন প্রত্যুষে
বাসর মিলন হবে।

রুদ্ধ দুয়ার ভেঙ্গে কিরে তবে
শৃংখল ছিঁড়ে যাবি?
মৃত্যু-সাগর মন্থন করা
অমৃত সেথায় পাবি?
শ্মশান বহ্নি লেহি লেহি ওঠে
আকাশেরে চুমি ভূমি পরে লোটে
ব্যর্থ আশার বিফল বাসর
চিতার অনলে জ্বলে,
আকাশ কখনো মাটিতে মেশে না,
মেশে না সাগরজলে।

তার চেয়ে ভাল এখানে শ্যামল
শাল-পিয়ালের বনে
বন-মর্মরে গান গেয়ে যাওয়া
অজানা অন্বেষণে।
দুঃখ সুখের দোদুল দোলায়
আগামী দিনের ভাবনা ভোলায়,
প্রতি নিমেষের অতীতের বুকে
চরণ-চিহ্ন আঁকা
কত না মরণ বিস্মরণের
কুহেলিকা জালে ঢাকা।

ঋতুরঙ্গের লীলাসঙ্গিনী
কত মরসুমী ফুল
ক্ষণ জীবনের রূপের বিভায়
স্মরণেতে সমাকুল।
কত ছোট ছোট বন্ধন-জাল
বন্দী করেছে মুক্তি মাতাল
অসীম গগন স্বপ্ন পিয়াসী
পলাতক বলাকারে;
শিশিরবিন্দু সূর্যেরে বাঁধে
বক্ষের কারাগারে।

উদয়াচলের প্রসাদ ভিখারী
শর্বরী ধ্যান-মগ্ন,
ওই দেখা যায় অরুণ আভায়
তিমির হরণ লগ্ন।
দেবতা দাঁড়ায় দুয়ারের পাশে
অঞ্জলি ভরা ভিক্ষার আশে,
বিরহ-ব্যথার সুধার পরশে
জীবন-দেবতা তৃপ্ত।
দুখের দহনে অমরাবতীর
উজ্জ্বল দীপ দীপ্ত।

উড়াবে প্রাণের উন্মাদনায়
দিশা হারানোর ক্লান্তি,
রাজপথে এসে ঘুচে যাবে শেষে
পথহারা উদ্‌ভ্রান্তি।
ভাণ্ডার ভরা রত্ন-মণিকা—
যদি পাই তার একটি কণিকা
জীবনের ঋণ হবে পরিশোধ—
কিছু তো রবে না বাকী,
জীর্ণ কুটিরে মহাসম্পদ
কোথায় লুকিয়ে রাখি!

কথাটা মনে পড়ে গিয়ে গ্যাব্রিয়েল আপন মনেই হাসল একটু মিছিলের সংগে এগোতে এগোতে···আত্মভোলা মৌন যে ভাঙছে সে খেয়াল নেই।···সিস্টার উইলিয়াম···দৃঢ়ব্রত', ক্ষীণতনু। ম্লান-জীবনের নির্দেশতন্ত্র···অপরিচিত কনভেন্ট জীবনের একটিমাত্র অতি-পরিচিত রাস্তা। অনেকখানি সান্ত্বনা আছে এতে, অনেকখানি তৃপ্তি।···এ যেন ব্যক্তিগত অতীতের সারবস্তু কিছু অপেক্ষা করে আছে কনভেন্টে তার জন্য। সিস্টার উইলিয়ামের কাছে এ হাত দু'টো যে শিক্ষা পেয়েছে ফেলে দিতে বলবে না যেমন কেউ, এটাও তেমনি। স্মৃতি থেকে উপড়ে ফেলতে হবে না, নির্বাসন দেবার দরকার নেই।

···ভাবানুষংগ সিস্টার, ভাবানুষংগ—ঐ যে ভাবনাগুলো জড়িয়ে থাকে চারপাশে—আচ্ছা ওগুলোকে দমন করার জন্যে কি করেন আপনি ?···

তখনও জানে না তিন বছরের আগে একমাত্র ডিউটির কথাবার্তা ছাড়া আর কোন কথা বলতে পারবে না সিস্টার উইলিয়ামের সংগে। ঐ পরিচিত চেহারা তৃষিত চোখে পড়বে প্রায়ই, তবু চিরব্রতাদের সংগে পসচুল্যান্ট আর নভিশদের চিরন্তন ব্যবধান স্বচ্ছ বরফের প্রাচীরের মত এসে দাঁড়াবে উভয়ের মাঝে। সে প্রাচীর ভেদ করে সিস্টার উইলিয়ামের কাছ থেকে কিছুই পৌঁছোবে না এসে—এক তাঁর আবছা মূর্তিটি চোখে পড়বে আর হাসপাতালের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে যা তাকাবেন তার দিকে।

অথচ, আজ শুধু মনে হচ্ছে কাল তাকে কমিউনিটিতে স্বাগত জানাতে ঈশ্বর ছাড়া আরও একজন উপস্থিত থাকবেন—অতি-পরিচিত একজন।···চিন্তাটা সুখপ্রদ। ব্যক্তিগত সুখের এ ভাবনা আসা উচিত হয়নি মনে—চ্যাপেলে গ্যাব্রিয়েল তাই ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

দুই

কমিউনিটিতে যোগ দেওয়ার মুহূর্তে অতীতের সংগে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল অংগব্যবচ্ছেদের মত। পরবর্তীকালে প্রথম দিনটিই কেবল সামগ্রিক রূপে স্মরণে আসত। চৈতিল্যকোণে দেখা দূরের মত আর সব দিনগুলো মিলিয়ে ছ'মাস লম্বা যুদ্ধ একটা—সূর্যোদয় থেকে রাত্রি পর্যন্ত কনভেন্ট ভাবধারার সূক্ষ্ম মৌলিকতাগুলোকে নিজের মনের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যুদ্ধ আর দেহটাকেও তার সংগে মিলিয়ে আচার-আচরণ শেখানো।

এমন এক শব্দ দিয়ে দিনের সূচনা, এই নির্জন পরিবেশে যা কখনো কোনদিন ভাবেনি। ইলেকট্রিক এ্যালার্ম একটা—বিশাল, বিশাল ডরমিটরির আধা-পার্টিশন করা কুঠুরিগুলোয় দু'শো নান ঘুমোন—সেখানকার প্রত্যেকটি করিডরে তীক্ষ্ণরবে বেজে ওঠে এক সংগে। মুহূর্তে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় যেন ঘুম থেকে তুলে দেয়। খড়-ভরা থলির মত বিছানাটা থেকে এমন করে লাফিয়ে উঠতে হয় যেন ঐ বিছানাটার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেছে, তাতেই যেন তড়িৎস্পৃষ্ট বস্তুর মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই রাত সাড়ে চারটের সময়, তড়িৎকম্পন শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই পড়ে যাবে।

পর মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল মৌচাকের মত কুঠুরিগুলোর মাথায় মাথায়। পর্দার ফাঁক দিয়ে পাশের কুঠুরির ছাই-রঙা পর্দার ওপর নাইট গাউন পরা একটি নানের ছায়া মূর্ত নজরে পড়ছে, তারই মত ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠে বসেছে সোজা হয়ে।

খানিকটা দূর থেকে সিনিয়র নানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যীশু খৃষ্টের জয় হোক !

এ্যালার্ম বাজা আর আলো জ্বলে ওঠবার এমনই অব্যবহিত পরে শোনা যায় বচনটি, মনে হবে তিনটি যেন একই সুইচে সংযুক্ত।

দু'শো দেহের নতজানু হয়ে বসে পড়ার শব্দ—পরবর্তী কর্মসূচীর এটাই সূত্র। এর পর ওক কাঠের মেঝেয় ঐ দেহগুলি প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়ার সময় কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস শোনা যাবে।

অপর একটি কণ্ঠে শুরু হয়েছে 'প্রণাম মারিয়া' প্রার্থনাটি।

গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না কোন মতেই, গ্যাব্রিয়েল তৎক্ষণে চেষ্টা করল প্রার্থনাগুলো মনে করতে। কিন্তু কেবল মনে পড়ছে বাকি জীবনটা কি ভাবে ঘুম ভাঙবে তার। আগামী বহু বছরের ব

অন্ধ মাবাজুর উপর দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে মনে জানত এই ইলেকট্রিক ঘটার শাসনে সহজ ভাবে অভ্যস্ত হতে সে কোনদিনও পারবে না, ঐ বিদীর্ণকারী শব্দে সমস্ত স্নায়ু তার উঠবেই কেঁপে।

এখানে আসার আগেও কঠোর সংযমের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে, কিন্তু এ ধরণের সংযমের কঠোরতা যে থাকতে পারে কোথাও, তার অনুভবও অগোচর ছিল। খড়ের খদির নীচে কাঠের তক্তাখানা তাকাবার হাড়গুলোকে শাসনে রেখেছিল। বালির বিছানার বড়টা ফুটি খাওয়া সত্ত্বে, ঠাসা করে ঘুমোনো, মস্ত, গুঁজোনো খড়-জড়া ছিদ্রিটা বার বেরে বেশী দৃষ্টি দেয়নি। মোটা চাদর, বালিশের কোর শুইয়ে পোঁছো হয়নি। তাতেই সেটা অর্ধনতার ছটে সংগ্রাম। তার নীরব ধীর স্বাভাবিক ভাবে বেজে ওঠার বিশ্রামটুকু কেড়ে নিয়েছে ঐ প্রভাতী ঘণ্টা।

সব কুঠুরি থেকে প্রার্থনার শব্দ শোনা যাচ্ছে, ব্যক্তিরূপ কেবল তার কুঠুরি······চারিদিকে প্রণাম ও আবার সময় সামঞ্জস্য তাবটুকু অপ্রকাশ নয়। নানরা গাইছেন যখন···'মহিমাময়ী'···কি একটা অস্থিরতা প্রকাশিত হল, যেন ঐ দুঃখে জনের সবাই আজই প্রভাতে প্রথম আবিষ্কার করেছেন ও মহিমা।

···ঘুম থেকে অমন ধাক্কা খেয়ে উঠেই কেমন করে এত নিখুঁত প্রার্থনা করেন ওঁরা।···ঐ খড়ের বিছানার রাত কাটিয়ে কেমন করে কণ্ঠে ওঁদের আনন্দের সুর বাজে এমন।

আবার চারপাশের শব্দগুলো খেয়াল করে শুনে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও চাকাগুলো ঠিক সমান সমান তিনটি ভাঁজ দিয়ে পাট করল, সিস্টার মার্গারিটা ঠিক যেমন দেখিয়ে দিয়েছেন তেমন করে। বোর্ডের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখল তারপর সাবধানে—কোনটার কোন ধার যেন মেঝের ঠেকে না থাকে, ত্রুটি হবে তা হলে। হাতে করবার কাজ পেয়ে মনটা শান্ত হয়েছে।

সিস্টাররা পোশাক পরে তৈরী হচ্ছেন, শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মাড় দেওয়া শক্ত সাদা ওইম্পগুলো পরতে গিয়ে থমথম শব্দ হচ্ছে, চামড়ার বেল্টটা আটকাবার সময় চাবিগুলো বাজছে ঠুং ঠাং করে, টেবিলের ওপর থেকে জপমালা তুলে নিয়ে বেল্টে ঝুলিয়ে দিতে গিয়ে কাঠের কর্কগুলো ঠোকাঠুকির শব্দ হচ্ছে। গ্যাব্রিয়েল চেষ্টা করছে এই অনিচ্ছাকৃত ব্যক্তিগত শব্দগুলো উপেক্ষা করতে, রাত্রে যেমন নাক ডাকার শব্দ, ভয়ের স্বপ্ন দেখে চাপা চীৎকার করে ওঠার শব্দ উপেক্ষা করতে চেষ্টা করে। পোশাক-পরা হয়ে গেলেই সিস্টাররা ধীর পদক্ষেপে চলে যাচ্ছেন তার ছাই-রঙা পর্দার সামনে দিয়ে। দেখে মনে পড়ছে চ্যাপেলে যেতে দেরী করে ফেললে শাস্তি পেতে হবে—মাদার জেনারেলের প্রার্থনা ডেস্কের পিছনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে মেঝের, সেটা ভীতিপ্রদ।

মেডিটেশান, প্রাইম, টিরস্—মাস পূর্ব নিয়মিত প্রার্থনাগুলো, তারপর আজকের প্রবেশানুমতি অনুষ্ঠান। তারপর মাস। এ কনভেন্টে এই প্রথম প্রবেশ, গ্যাব্রিয়েল মহড়া দিয়ে নিচ্ছে মনে মনে। প্রার্থনাদির পর বিশাল খাবার ঘরে প্রাতঃরাশ। সেখানকার সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকার-ইঙ্গিতগুলো মনে রাখতেই হবে। সিস্টার মার্গারিটা দেখিয়ে দিয়েছেন একবার—জল চাইতে হলে হাত তুলে তর্জনীটি বাড়াতে হবে, এক করতলের ওপর অন্যটির পাশ দিয়ে কাটবার ভঙ্গী করে পরিবেশনকারিণীকে বোঝাতে হবে রুটি চাই, মধ্যমা ও তর্জনী নীচের দিকে আঁকশির মত বেঁকিয়ে ধরার অর্থ একটা কাঁটা দাও না দয়া করে, বুকের ওপর দু'টি মৃদু আঘাত তার অর্থ—ক্ষমা করবেন। এমন বিস্তর জিনিষ মনে রাখা দরকার। ভাবছে, যতক্ষণ না পুনরাবৃত্তির ফলে এই মূক অভিনয় একেবারে নিখুঁত হয়ে ওঠে, প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তের সমবেত শক্তি প্রয়োগে সজাগ হয়ে থাকতে হবে।

চুলের ওপর ভেলটা পিন দিয়ে আটকালো, কিনারাগুলো স্পর্শ করে দেখে নিল সোজা হয়েছে কি না। আশ্চর্য লাগে এমন আয়নাহীন জগতে বাস করছে। আরও আশ্চর্য, চারপাশে বহু নারী রয়েছেন যাঁরা বহু বছর দেখেন নি নিজেদের—কেবল সন্ন্যাসিনীর পোশাক গ্রহণের সময়, ব্রত নেবার সময় আর জপের জানলার সময় যখন বাড়ীর জন্য দুটি জোগাড় রীতি আছে, সেই ছবিতে ছাড়া।

কুঠুরির পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল। এ উইংয়ের অধিকাংশ সিস্টার চলে গেছেন ইতিমধ্যে। ঐ পর্দার আচ্ছাদনটুকু যেটুকু অন্তরাল সৃষ্টি করে। তাও পুরো নয়, অর্ধেক। শুধু দৃষ্টির অন্তরাল, শ্রবণের নয়। পর্দাগুলো পিছনে সরানো এখন। ওগুলোর পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে চোখ নীচু করে থাকা শক্ত। আর চোখ তুলে তাকিয়ে ফেললে উপলব্ধি করা অসম্ভব কি করে এত বিভিন্ন রুচির, এত বিভিন্ন বংশ ও পরিবেশের নারী বাস করে এই অনুরূপ কুঠুরিগুলোয়, অথচ কেউ কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নমুনা রেখে যায় না।

কমিউনিটির সব সভ্যাই এখানে বাস করেন, সুপিরিয়র জেনারেল অবধি। বয়স, পদমর্যাদা বা কাজ—কোনটাই গ্রাহ্য হয় না। কয়ার নানরা, শিল্পীরা, ভেষজ বা প্রাচীন সাহিত্যে ডক্টর নানরা, রান্নাঘরে, লণ্ড্রীতে, ক্ষেত-খামারে, তরি-তরকারীর বাগানে যে নানরা কাজ করেন তাঁরা, আর জুতো তৈরী করেন যে সিস্টাররা তাঁরাও—সবাই এই বাক্সের মত কুঠুরিগুলোয় বাস করেন। এক আকারের কুঠুরি, জিনিষপত্রও একই। বিছানা, টেবিল, চেয়ার, প্রতি চেয়ারের ওপর তিন ভাঁজ রাখা বিছানার ঢাকা—এক বন্দোবস্ত সর্বত্র। অত্যাশ্চর্য কথা, তা সত্ত্বেও প্রতি বছর প্রত্যেক নানকে কুঠুরি বদল করতে হয়, নির্দিষ্ট কুঠুরির বিশেষ স্থানটির ওপর মায়া পড়ে যায় যদি, তাই।

চ্যাপেলে যাবার প্রধান করিডরের দেওয়ালের ধার ঘেঁষে লম্বা সারি বেঁধে নান আর নভিসরা চলেছেন, গ্যাব্রিয়েল দ্রুতপায়ে এসে তার মধ্যে ঢুকল। হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে গেল যেন নিমেষের জন্য··· সিস্টার মার্গারিটার মুখে যে নম্রতার অভ্যাসের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। না হলে এমন চঞ্চল পায়ে ছুটে আসার কথা নয়।···আসা-যাওয়ার যে কোন প্রশস্ত পথে নানরা যে নম্রভাবে একধার দিয়ে চলেন, প্রার্থনা পুস্তকের পাতায় রক্ষক আঙুলটির মত এটাও এর আগে কোনদিন চোখে পড়েনি তার। কনভেন্ট হাসপাতালে ট্রেনিং নেবার সময় এরই মধ্যে বাস করেছে, তবুও না। এখন বুঝছে নানদের এই অভ্যাসটির জন্যই কনভেন্ট হাসপাতালের সুবিশাল সাদা দেওয়ালগুলোয় অবধি তাঁদের সমাহিত দৃষ্টির আভাস ফুটত, এখানে এই মাদার হাউসেও এইজন্য মুষ্টিমেয় জনাকয়েকের মাত্র অবস্থিতি অনুভব করা যায়।

বিপরীত দিকের দেওয়ালের ধার দিয়ে ছায়ার মত একজন সিস্টার চলেছেন সোজা রেখার মত, কোথাও বেঁকেন নি। তারই মত ছোট ছোট আর কেপ-পরা একটি ক্লান্ত পসচুলান্ট চলেছে দু'জন প্রানের মধ্যে। সুন্দর দু'টি অভিজাত মূর্তির মধ্যে পড়ে কেমন ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে তাকে। হেঁটেই চলেছে কেবল, মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। দেখে গ্যাব্রিয়েল ভাবছে, আমাকেও তাহলে ঐ রকম দেখাচ্ছে…তবে নিজের ওপর কেমন অনুকম্পা হল গ্যাপেলে ঢুকতে ঢুকতে।

বেদীর সামনে জানু পেতে প্রণাম করল, অর্ধেকটা দু'র অপিরিয়র জেনারেলকে শ্রদ্ধা জানাল আবার। নিজের কুঠুরির অন্ধকারে প্রণাম করেছিল যখন, একা একা সহজ মনে চলেছিল। কিন্তু এখন; অথচ এই আমমীরা প্রাণপরিহিতা প্রতিকৃতির সামনে নিজেকে কুণ্ঠাকুল ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে এখন। চাপার মেঘ যেন প্রণাম জানাচ্ছে বাণীকে। নীচু হয়ে বাও করতে গিয়ে সেটা যেন কাঠির মত কোমরের কাছে ভেঙে শক্ত হয়ে রইল। খুলে পড়া দু'টি হাতের করতলে কম্পমান হাঁটু দু'টি ঢাকা পাচ্ছে।…নিজের অপ্রতিভ অবস্থাটা অনুভব করে এক ঝলক রক্ত ছুটে এল মুখে, পিছু হটে সরে এল।

নানরা নতজানু হয়ে বসে আছেন সারি সারি, মধ্যে গলিপথের মত ব্যবধান। অতিথিদের গ্যালারি থেকে প্রথম দেখেছিল যখন, তখন তবু সারিগুলোর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টির আওতায় ছিল, এখন সব সারিগুলো মিলিয়ে একটা সীমাহীন গোলকধাঁধার মত লাগছে। স্কার্টগুলো গোল হয়ে মেঝের অনেকখানি ঢেকে ছড়িয়ে আছে—দেরী করে আসে যারা তাদের হেঁটে যাবার রাস্তা বড় থাকে না। মাঝখান দিয়ে চলে যেতে কেমন ভয় ভয়ও করে।…একেবারে অনেকটা সামনে নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটায় পৌঁছে গ্যাব্রিয়েল হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল শরীরের সব ভারটা ছেড়ে দিয়ে। সারা অংগে দিয়ে একটা আকস্মিক ক্লান্তি, বহুকালের পরিশ্রমে যেন পেরিয়ে এসেছে পথটুকু।

প্রভাতী-প্রার্থনা ছয় পনেরো মিনিট ধরে। দু'শো গলার স্বর এই প্রার্থনার জন্য নীচু সুরে বাঁধা। বহির্বিশ্ব সুষুপ্ত এখনও, সেখান থেকে গথিক আকারের জানলা ভেদ করে যে ধূসর রঙের আলো আসে, ঐ নিম্নগ্রামে বাঁধা সুর যেন তারই সগোত্রীয়।

পসচুল্যান্টদের পৃথক করে স্টাডিহলে আনা হল তারপর ধ্যান করতে। অপাংগে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখছে তারা। গ্যাব্রিয়েলের নজরে পড়ল একটি আইরিশ মেয়ে জুতোর ফিতে বাঁধছে, আর একজন এত নীচু করে ভেলটা আটকেছে যে ভ্রূ পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে!

সিস্টার মার্গারিটা বললেন, শোন সিস্টাররা, আজকের ইপিসল্ থেকে একটি লাইন, এখন পড়ব আমি, তাই নিয়ে ধ্যান করব সবাই। আধঘণ্টা সময় আছে হাতে, তার মধ্যে এই দৈবানুপ্রাণিত কথাগুলো অন্তরে গ্রহণ করব, গভীরভাবে ভাবব তাদের প্রকৃত অর্থ কি।

নিজের ইপিসলটি খুলে পড়তে শুরু করলেন, 'মনুষ্য অথবা দেবদূত আমার জিহ্বা দিয়া আমি যাহারই ভাব প্রকাশ করি, এবং পরচিটি ভরণ যদি আমার না থাকে, পিত্তলের আওয়াজ বা করতালির শব্দের মতন আমার যে কণ্ঠস্বরের কোন পার্থক্য নাই। তাহা এমনই নির্জীব পদার্থ।'

…খড়ের থলির বিছানা…পোশাক পরল, তা একটা আয়নাও ছিল না…স্যুপিরিয়র জেনারেলকে প্রণাম—এতগুলো যে পিছনে ফেলে এসেছে চটেমধ্যেই। সামনে আরও অসংখ্য বিপত্তি অপেক্ষা করে আছে—প্রবেশানুমতি অনুষ্ঠান…খাবার ঘর আর তার চাকের টিসাবার ভার। দিনের একটা ঘণ্টাও বোধ হয় কাটেনি এখনও কিন্তু এই প্রথম দিনেই কতদিন আরও কত শত অপরিচিত কাজ রয়েছে…মনটাকে ক্রোমন্তই প্রসারিত করতে পারছে না গ্যাব্রিয়েল অন্যান্য বিষয়ে ভাবছে এ সব ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করতে পারছে কি না একজনও।

'…এবং…পরচিটি ভরণ…না…থাকে…' ওদের বিচ্ছিন্ন টুকরো-গুলোকে একত্রিত করে এনে পথ দেখাচ্ছেন সিস্টার মার্গারিটা ঐ দুরূহ বিবৃতির অন্তরালে। ইপিসলটি গ্যাব্রিয়েল জানে। ক্রমেই বিপদ হয়েছে আরও। নির্দিষ্ট ভাবটি নিয়ে ধ্যান করার বদলে ইপিসলটি সম্পূর্ণ মনে পড়ে যাচ্ছে তার, বলছেও মনে মনে।…বড় হয়ে অবধি এর ভাবটা বিষণ্ণ করে তুলত তাকে।

'…আমি যখন শিশু ছিলাম, শিশুর ন্যায় কথা বলিতাম, শিশু বুদ্ধিতে বুঝিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম…'

শিশু সে কোনদিনও ছিল না। শিশু ছিল তার তিনটি ভাই। মা মারা গেছেন অনেক দিন, একমাত্র তারই তাঁকে মনে আছে স্পষ্ট। কাজেই মায়ের শূন্য স্থানটিতে ভাইদের কাছে সে-ই ছিল।…আর বাবার মনে মায়ের স্মৃতি এমনই জাগরূক, এমনই প্রাণবন্ত, তাঁর স্থানে আর কাউকে এনে বসাতে পারেন নি কোনদিন। না হ'লে কাকারা, পিসীমারা রাজী করাবার চেষ্টা করেছিলেন অনেক।

'…কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানব হইয়া উঠিলাম যখন, শিশুসুলভ যা কিছু ছিল আমার মধ্যে সকলই সরাইয়া দিলাম…'

যা কোনদিনও তার ছিল না তাই সরিয়ে দিল গ্যাব্রিয়েল, ঔদার্যের কথা ভাবতে চেষ্টা করল।

সিস্টার মার্গারিটার ছোট্ট ঘণ্টায় টিং করে একটা শব্দ হতেই উঠে পড়ল সবাই, দুটো শব্দ হতে সারির নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। গ্যাব্রিয়েল তার আগামী চিরদিনের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সরে এল, চল্লিশটি পসচুল্যানটের মধ্যে তৃতীয় স্থানটি। এই মাত্র ক'দিন আগে, এক সপ্তাহও হয়নি এখনও—নবাগতারা অর্ডারে এল যেদিন, তালিকায় তিন নম্বর নাম ছিল তার। সেই মুহূর্তেই জন্ম তারিখ হিসেবের বয়সটা মরেছে…ধর্মজীবনের বয়স শুরু হ'ল, এখন থেকে কেবল এটাই গণ্য হবে।

সামনের মেয়ে দু'টি ক'মিনিটের কেবল বড় তার চেয়ে, পিছনের আর সাঁইত্রিশ জনই ছোট। অথচ দু'তিনটি অভিজাত মুখ চোখে পড়েছে, তারা তার চেয়ে অন্তত বছর দশেক আগে জন্মেছে তো নিশ্চয়ই? হঠাৎ মনে হ'ল যেমন করে ধর্মজীবন থেকে বয়সকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল তার মধ্যে বেশ একটা দৃঢ়তার ভাব আছে,

একটা উপন্যাও। মানবিক সময় অর্থহীন এখানে ধর্তব্য কেবলমাত্র ঈশ্বরে অর্পিত সময়—কনভেন্ট সময়ের প্রতিটি মুহূর্তই তাই। এত বড় কমিউনিটির মধ্যে সমবয়সী কাউকে পাওয়া যাবে না, বিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীতে প্রত্যেকে একা দাঁড়িয়ে। ঘড়ির কাঁটাটিও এ পৃথিবীর নিজস্ব···অভিজাত রাজকীয় অনুশাসন—জ্যেষ্ঠদের সুযোগ-সুবিধা আছে বটে, সমসাময়িক কেউ নেই, একজনও না।

—এখন চ্যাপেলে নিজেদের জায়গা জান তোমরা, আমি অন্য পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব না। ডিনারের পর কিন্তু অপেক্ষা কোর, প্রবেশানুমতি অনুষ্ঠানের জন্যে চ্যাপেল হলে নিয়ে যাব আমি তোমাদের।

সারির প্রথম মেয়েটির দিকে চেয়ে মাথাটা একটু নাড়লেন সিস্টার মার্গারিটা। এ অনুষ্ঠানের জন্য মহড়া দিয়েছে তারা, কি কি করতে হবে সব জানে। এই প্রথম সমগ্র কমিউনিটির সংগে তাদের সামনাসামনি সাক্ষাৎ হবে।

—শেষবার মনে করিয়ে দিই, চ্যাপেলে মংগলসংগীতে তোমরা যোগ দেবে না। তোমরা শুধু দৃষ্টি দিয়ে অক্ষিস অনুসরণ করবে, চোখ তুলেও তাকাবে না। প্রথম তিন সপ্তাহ শুধু শুনবে মন দিয়ে। তারপর বিভিন্ন আওয়াজের সুরগুলো তোমাদের কানে ধরতে পারবে যখন তখন গাইবে সিস্টারদের সংগে।

মাথা নেড়ে ইংগিত করতেই দলটা চলতে শুরু করল।

ছশো জন সিস্টার এখনও তেমনি ভাবে বসে আধঘণ্টা আগেও দেখে গেছে যেমন নতজানু, নিশ্চল, অলটারের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। এমন নম্রভাবে যে বসে থাকতে পারে মানুষ, দেখেও উপলব্ধি করা যায় না যেন। কি এই শক্তির উৎস? জগতে কোথায় তুলনা মিলবে এর? ওঁদের মধ্যে থাকতে থাকতে জন্মান্তর করে, পাহাড়ে হারিয়ে গেলে ভয় করবে যেমন, তেমন ভয়।

অপিরিয়র তাঁর হাতুড়িটি দু'বার ঠুকলেন।

'হে ঈশ্বর, স্বেচ্ছায় সাহায্য কর আমাকে'—প্রার্থনাটি আরম্ভ করার ইংগিত।

প্রার্থনা-নেত্রীর সুস্পষ্ট কণ্ঠে গ্যাব্রিয়েল যেন নিজেরই হৃদয়ের ক্রন্দন শুনছে, হে ঈশ্বর, স্বেচ্ছায় সাহায্য কর আমাকে।

চ্যাপেলের অন্ত প্রান্তের সাড়ায় তার প্রত্যুত্তর···ও কান্না ফলবতীও হয় ঐ সাড়াতেই, হে প্রভু ত্বরায় আসিয়া আমায় সাহায্য কর। [ক্রমশ।

অনুবাদ—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

॥ বসুমতীর বিভিন্ন সংস্করণের মূল্য ॥

নয়া পয়সা অনুযায়ী বসুমতীর বিভিন্ন সংস্করণের মূল্য ও চাঁদার হার নিম্নলিখিতরূপ—

॥ দৈনিক বসুমতী ॥

ভারতের জন্য

বার্ষিক (সডাক)	···	৪২৲
ষাণ্মাসিক "	···	২১৲
ত্রৈমাসিক "	···	১১৲

॥ সাপ্তাহিক বসুমতী ॥

বার্ষিক (সডাক)	···	১৬৲
ষাণ্মাসিক "	···	৮·৫০
ত্রৈমাসিক "	···	৪·৫০

প্রতি সংখ্যা ২৫ নয়া পয়সা

● ● মাসিক বসুমতী ● ●

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে	···	২৫৲
ষাণ্মাসিক রেজিঃ ডাকে	···	১২·৫০

ভারতের বাহিরে প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়)	···	২·২৫
ভারতে (ভারতীয় মুদ্রায়, বার্ষিক সডাক		১৫৲
ষাণ্মাসিক	···	৭·৫০

প্রতি সংখ্যা (ভারতীয় মুদ্রায়) ···

রেজিঃ ডাকে	···	২৲

পাকিস্তানে (ভারতীয় মুদ্রায়) ···

বার্ষিক সডাক রেজিঃ ডাকে	···	২১·৭৫
ষাণ্মাসিক " "	···	১০·৮৫
প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে (ভারতীয় মুদ্রায়)		২৲

দ্রষ্টব্য : চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে-কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

কর্মাধ্যক্ষ—বসুমতী ●

তাসের গল্প

জুলফিক্কার
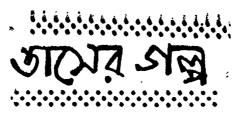
গত চৈত্র মাসের মাসিক বসুমতীতে তাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রচলিত কাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এবারে আমরা আরও কয়েকখানা তাসের কথা বলব।

এখনকার খেলার সবচেয়ে সেরা তাস হচ্ছে ইস্কাবনের টেক্কা,—যাকে বলে 'হেড অব দি প্যাক'। প্রথম যখন ইংল্যাণ্ডে তাস খেলার প্রবর্তন হল, তখন তাসের উপর দুর্দান্ত ট্যাক্স বসান হয়েছিল। তাস প্রস্তুতকারক প্রত্যেক ফার্মকে এক কুড়ি ইস্কাবনের টেক্কার তাস একসাথে ছাপা হয়, এমন একখানা প্লেট তৈরী করে গভর্ণমেণ্টকে দিতে হত। এই প্লেটের সাহায্যে ইস্কাবনের টেক্কার সব তাসই, সরকারী ছাপাখানা,—সমারসেট হাউসে ছাপা হত। কোম্পানীর নাম ও নিজস্ব মার্কা এই তাসের উপর লেখা থাকত। প্রত্যেক বিশখানা টেক্কার সিটের জন্ত তাস ব্যবসায়ীকে দিতে হত এক পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রতি একশো' জোড়া তাসের জন্ত ট্যাক্স লাগত পাঁচ পাউণ্ড। সে যুগে এক প্যাক তাসের দাম ছিল কমসে কম এক গিনি। তখনকার দিনে আমীর-ওমরা গোছের লোক ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে তাসখেলাটা একরকম সাধ্যাতীত ছিল। ট্যাক্স অবশ্য তারপর কমতে কমতে মাত্র তিন পেন্সে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে ব্রিটেনে তাসের উপর কোন শুল্ক আছে কি না এবং থাকলেও তার হার কি, লেখকের জানা নেই। পাঠক-পাঠিকাদের কারো এ বিষয়ে জানা থাকলে অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

ওম্বার ও কোয়াড্রিল খেলায় ইস্কাবনের টেক্কাকে বলা হত'স্প্যাডিল (Spadille) আলেকজাণ্ডার ডুমা (Dumas) বলেছেন যে, শিশু নেপোলিয়ানের ভাগ্য গণনার ব্যাপারে কর্সিকার ডাইনী বুড়ি কড়াইয়ে যে ঐন্দ্রজালিক পাঁচন জাল দিয়েছিল, তার অন্ততম উপাদান ছিল স্প্যাডিল; অন্যান্য উপাদানগুলো হচ্ছে—

ছ'টো বিষাক্ত ক্ষুদে সাপ (adder),
চব্বিশটা মাকড়সা,
সাত সাতটা কোলা ব্যাঙ,
আর মাদি বাচ্ছা ভেড়ার হৃৎপিণ্ড।

ইস্কাবনের চৌকাকে বলা হয় 'ক্রফোর্ডের শেষ'তাস'। ডেভনশায়ারের ক্লাবে ছোট একটা কাঁচের কেসে একখানা ইস্কাবনের চৌকো আজও রক্ষিত আছে—এর গায়ে লেখা, 'Crawfords last card'। ক্রফোর্ড নামে এই ক্লাবের একজন পরিচালক ছিল। নিজে কোনদিন সে তাস খেলত না, অন্তত সেই আড্ডায় যারা খেলতে আসত, তাদের কেউ কখনও ক্রফোর্ডকে খেলতে দেখেনি। তা'বলে মাঝে মাঝে হোটেলের সেফ (Chef) বা হেড ওয়েটারের সাথে আধ পেনী বাজীতে যে দু'চার হাত ন্যাপ (Nap) খেলেনি এমন নয়। জীবনে এই ক্লাব থেকে বহু টাকা উপার্জন করেছিল ক্রফোর্ড। বুড়ো বয়সে যেদিন সে কাজ থেকে অবসর নিল, সেদিন পকেট থেকে হঠাৎ এক প্যাক তাস বার করে, ক্লাবের ভদ্রলোকদের সম্বোধন করে বলল—

'After today I have done with these for ever. Would you oblige me gentlemen, by sitting down with me at a rubber?'

ক্রফোর্ডের অনুরোধে কয়েকজন তাঁর সাথে খেলতে বসলেন—প্রতি পয়েণ্টে এক শিলিং বাজী। মাত্র পঞ্চাশ মিনিট খেলায় ক্রফোর্ড ও তাঁর খেঁড়ু চৌদ্দ পাউণ্ড জিতে নিল। খেলা শেষ হলে ক্রফোর্ড তাঁর হাতের শেষ তাসখানা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলেন। তাসটা ছিল ইস্কাবনের চৌক্কি।

তুরুপের তাস হিসাবে ইস্কাবনের ছুরি উঠলে সে যুগের প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী খেলোয়াড়েরা তার উপর টোকা মারতেন। খুব পয়মন্ত তাস, কিন্তু সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হত যেন ভুল করে হাতের কনুইটা তাসটায় না লাগে। কনুই দিয়ে ছুঁলেই নাকি তাসটার সব গুণ নষ্ট হয়ে যেত।

চিঁড়ের বিবির চলতি নাম ছিল 'ব্ল্যাক বেস।' শ্রপশায়ারের দিকে বলত 'কুইন বেস'। 'বেস' কথাটা এলিজাবেথের অপভ্রংশ। কেউ কেউ বলেন রাণী এলিজাবেথের রঙটা ছিল একটু ময়লা। ইংরাজীতে যাকে বলে সোয়ার্দি (Swarthy) তাই তাসটার নাম হয়েছিল ব্ল্যাক বেস। ঐতিহাসিকেরা কেউ কিন্তু কোথাও বলেননি যে এলিজাবেথ শামলা ছিলেন। মতান্তরে বলা হয়েছে যে, এই তাসটা এলিজাবেথের খুব প্রিয় ছিল বলেই তাঁর নামের সঙ্গে এর নামের যোগ হয়েছে।

বিখ্যাত ফরাসী নৃপতি চতুর্দশ লুই (Le Grand Monarque LousXIV) তাঁর জীবনে প্রথম যে তাসের প্যাক নিয়ে খেলেছিলেন, তার চিঁড়িতনের দশখানা প্যারির মুজিয়ামে আজও রয়েছে। ১৬৪৭

মূর্তিকে তারই রঙে বিশেষভাবে এই তাস ছাপা হয়েছিল।—রাজার বয়স তখন মাত্র ন'বছর। খেলতে বসে লুই তাসের প্যাকেটটা কাটতেই উঠল চিঁড়ের দশ। এই তাসটার চলতি নাম ছিল, 'কিং পেপিন'। কার্ডিনাল মাজারাঁ (Mazarin) এটাকে একটা শুভ সূচনা মনে করেছিলেন। খেলা হয়ে যাবার পর, তিনি প্যাকেট থেকে এই তাসখানা আলাদা করে রেখে দেন নিজের কাছে। মৃত্যুকালে তিনি তাসখানা রাজাকে দিয়ে যান। রাজার কাছে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে (Royal memento) যে সব জিনিষ ছিল, তার মধ্যে এ তাসখানাও স্থান পেয়েছিল। সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে, ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত এটা রাজপ্রাসাদেই ছিল। পরে এটা Comtesse d' Eu-র হাতে আসে। এই তাসখানায় একজন অশ্বারোহী ক্যাভালিয়ারের মূর্তি আঁকা। মূর্তিটা একটা পাদপীঠের উপর স্থাপিত, তার গায়ে ফলকে লেখা :

PEPIN LE BREF
Chof de la Seconde race

Sage, actif vaillant aymant ses Suiets jl vainquit les Saxons & Les Lombards donna aux Papes beaucoup de terres en Italic & dompta Gayfre Duc de Guyenne

স্প্যানীশ আমার্ডা ধ্বংসের তিনশো বছর পর সমুদ্র থেকে যে সব জিনিষ উদ্ধার করা হয়েছিল, তার মধ্যে একখানা তাস (চিঁড়ের আট) ছিল। জলের নীচে এতদিন থেকেও তাসটা নষ্ট হয়ে যায় নি। অবিকৃত না হবার কারণও ছিল। তাসটাকে পাওয়া যায় টোবেমোরি উপসাগরের উপকূলের নিকট বালুতে প্রোথিত একটা কাস্কেটের মধ্যে। এতে ছিল কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা, এক ছড়া স্ফটিকের মালা (বোধ হয় ক্যাথলিকদের জপমালা) এবং গোটাকত পিতলের বোতাম। বোতামগুলো দেখে অনুমান হয় যে, এই পেটিকার অধিকারী জাহাজের উপর জুয়া খেলছিলেন এবং প্রতিপক্ষের নিকট থেকে যে টাকা জিতেছিলেন, তার নিদর্শন হিসাবে বোতামগুলোকে রেখেছিলেন নিজের কাছে, হাণ্ডনোটের মত (I. O. U)।

নুরেমবার্গে একজন জার্মান একবার ঘোষণা করল যে, সে এমন কায়দায় তাস তুলতে পারে, যাতে তাসগুলো পরপর একটা নির্দিষ্টক্রমে সাজানো হবে,—সবার আগে থাকবে চিঁড়ের সাত। লোকটা দিনের পর দিন তাস নিয়ে মেতে রইল, শেষটায় তার মতিচ্ছন্ন হল। পাগলা গারদে যাবার সময়ও কিন্তু সে তাসের প্যাকেটটি সঙ্গে নিতে ভোলে নি। বিশ বছর এক নাগাড়ে দশঘণ্টা ধরে তাস নিয়ে পরীক্ষা চালালো। পাগল হয়েও লোকটা ধৈর্য হারায় নি। সপ্তম বৎসরে সে প্রায় সফল হয়েছিল আর কি। অবশেষে ৪২,৪৬,০২৫ বার তাস টানার পর বেচারা সিদ্ধকাম হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্যার জেমস্ জীনসের বিখ্যাত উপমার কথা মনে পড়ে। এলোমেলো চাবি টিপে একটা বানরও কয়েক কোটি বছর পর টাইপ রাইটারে সেক্সপীয়রের একটা সনেট ছেপে ফেলতে পারে।

নু্য ইয়র্কের একজন তাস সংগ্রহীতার কাছে একখানা চিঁড়িতনের ছয় আছে। এই তাসখানা সিভিল ওয়ার বিদ্রোহীদের মধ্যে ফেডারেল দলের কামান থেকে ছোড়া হয়েছিল। তার দিয়ে ভাল করে বেঁধে ন্যাকড়া ও তুলো জড়িয়ে তাসের প্যাকেটটা গুলির মত ছুঁড়ে দেওয়া হয়। একটা পাথরে লেগে প্যাকেটটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একখানা তাস শুধু চিৎ হয়ে আলাদা হয়ে পড়ল—সেটা হচ্ছে চিঁড়ের ছক্কা। সবাই চীৎকার করে ওঠে 'Clubs are trumps!' তারপর সেই তাস কুড়িয়ে ঝ্যুকার (Euchre) খেলা চললো।

জনি রেব (Reb) বলে একজন লোক এমন দারুণ খেলা খেলল যে, "one of the most extraordinary and unexpected games of euchre ever played by soldiers civilians."

প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে একখানা চিঁড়ের পাঁচের উপর বাজী ধরে ওয়াটসন নামক এক ব্যক্তি ফ্যারো (Faro) খেলায় দশ হাজার পাউণ্ড জেতেন। সেই অবধি চিঁড়ের পাঞ্জার নাম হয়েছে Watson's Card.

জেমস প্যেনের (Payn) নামের সঙ্গে চিঁড়িতনের তিরির স্মৃতি বিজড়িত। প্যেনের খুব পয়মন্ত তাস ছিল এই তিরি। এই তাসখানা হাতে পেয়ে খেলায় সে অনেকবার মোটা টাকা জিতেছিল। বিলাতে একখানা প্রাচীন চিঁড়ের তিরি সংরক্ষিত আছে, যার পিছন দিকে Prince of Orange এর স্বাক্ষর রয়েছে। যে প্যাকেট থেকে তাসটা নেওয়া হয়েছিল, সেটা লর্ড ডানব্লন প্রিন্সকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স যখন সাগর পার হয়ে ইংলণ্ডে চলে যান, তার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে এই তাস জোড়া নিয়ে খেলেছিলেন। খেলা শেষ হলে, তিনি প্যাকেটটা ডানব্লনকে ফেরৎ দেন, চিঁড়ের তিরির উপর দস্তখত করে—স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে। টম হুড, এই তাসখানার ঠাট্টা নাম দিয়েছিলেন Old Dog Tray.

চিঁড়ের ছুরির কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু 'it is always considered a sign of five trumps in the dealer's hand'—বহুদিন ধরে এই ধারণাটা তাস খেলোয়াড়দের মধ্যে চলে আসচে। রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের একবার এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে প্রায় সকলেই এই মতের সমর্থন করেন।

হরতনের আটার নাম প্যারানথিসিস্। দেড়শো বছর আগে এডিনবরায় (Edinburg) এক হুইষ্ট খেলার বৈঠকে আসন্ন-প্রসবা জনৈকা তরুণী ভদ্রমহিলা খেলছিলেন। জোর খেলা জমে উঠেছে, হঠাৎ দেখা গেল misdeal হয়েছে। ভদ্রমহিলার হাতে মাত্র বারখানা তাস, ফের বাঁটা হল তাস। এবার খেলতে খেলতে হরতনের আটার যখন খোঁজ পড়ল দেখা গেল কারো হাতেই ওটা নেই। আশ্চর্য, সেবারেও মেয়েটার হাতে একখানা তাস কম। হরতনের আটার যখন খোঁজ চলছে তখন মেয়েটি হঠাৎ প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে উঠলেন। ওদের একজন ছুটলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এসে পৌঁছনোর আগেই ভদ্রমহিলার এক কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠা হল। সেদিনের আসরে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেভিড হিউমও উপস্থিত ছিলেন। ঠাট্টা করে নবাগতার নাম রাখলেন তিনি,—'Parenthesis'। স্যর ওয়াল্টার স্কট বলেছেন, উত্তরকালে যখন মেয়েটি বয়ঃপ্রাপ্তা হল এবং সমাজে যখন তার রীতিমত প্রতিপত্তি, তখনও এই নামেই সবাই তাকে ডাকত। …সেই হরতনের আটাখানার খোঁজ আর পাওয়া যায় নি। রূপকথার আমল হলে সবাই ভাবত, কে জানে হয়ত বা সেই তাসটাই কোন পরীর দয়ায় রূপসী কন্যায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

হরতনের ছক্কার এক নাম Graces Card ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে কোটস টাউনের ব্যারণ জন গ্রেস নিজ ব্যয়ে রাজা জেমসের সাহায্যার্থে একদল পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাবাহিনী গঠন করেন। কিলকেনী (Kilkenny) কাউণ্টীর মাতব্বর ব্যক্তিদের মধ্যে গ্রেসই ছিলেন সর্বপ্রধান। ডিউক অব স্কোমবার্গের (Schomberg) জনৈক অনুচর এসে, তাঁকে জোরদখলকারী ডাচ সর্দারের পক্ষাবলম্বনের জন্য বহু প্রকারে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাহসী জ্যাকোবাইট লর্ড গ্রেস, টেবিলের উপর থেকে একখানা তাস তুলে নিয়ে তারই উপর তার দৃপ্ত অস্বীকৃতি জানিয়ে সেই তাসের লেখাখানা ডিউকের দূতের হাতে তুলে দিলেন। যে তাসখানার উপর গ্রেস ডিউকের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে লিখে জানিয়েছিলেন, সেটা একখানা হরতনের ছক্কা। সেই অবধি হরতনের ছয়ের 'গ্রেসেস কার্ড' নামটি চালু হয়ে আসছে।

রেভারেণ্ড জন টেলর একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, কবি হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল, একবার তাস খেলতে বসে, হাতে হরতনের একখানা পাঞ্জা থাকা সত্বেও, টেলর হরতনের পিঠে তুরুপ লাগালেন। ফলে বিপক্ষদল তুমুল সোরগোল সুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত রেভারেণ্ড জনও ক্রোধে আত্মহারা হয়ে হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে অপর পক্ষের খেলোয়াড় দুজনাকে যথেচ্ছ কটূক্তি করলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত ও মর্মাহত হলেন। এইরূপ অশোভন ও হীন আচরণের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য তাস খেলা চিরদিনের জন্য বর্জন করলেন। জীবনে আর কোনদিন তিনি তাস স্পর্শ করেন নি। হরতনের পাঞ্জাখানাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে বসার ঘরে টাঙিয়ে রাখলেন, নীচে লিখে দিলেন—

A Perpetual Reminder
against the sin of losing ones self control.

…ফ্রান্সে মিসিসিপি বাবল্ (Mississipi Bubble) ও ইংল্যাণ্ডে সাউথ সী বাবল্ (South Sea Bubble) নামক দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রায় একসঙ্গেই লাল বাতি জ্বাললো। সে যুগে ইউরোপের ইতিহাসে এইরূপ অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় সত্যই বিরল। এই কারবার দুটো বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, বহু লোককে আর্থিক সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই ঘটনার দু'এক বছর পর ইংল্যাণ্ডের হৃতমান চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার Aislabie ভেনিসে এলেন। তিনি জানতেন না যে মিসিসিপি বাবলের কর্মকর্তা ল (Law) ও সেখানে এসে জুটেছেন। ওয়ারটন নামে এক ভদ্রলোক ('সাউথ সী'তে যাঁর বহু টাকা গচ্চা যায়) তাঁর বাড়ীতে Aislabie ও Law দুজনাকেই নেমন্তন্ন করে আনলেন। ডিনারের পর বাড়ীর কর্ত্রী তাঁদের এনে বসালেন তাসের টেবিলে। দুইজন কুখ্যাত financier খেলতে বসলেন। Aislabie প্রথমে তাসের প্যাকেট কাটলেন, উঠল হরতনের তিরি। অদ্ভুত প্যাটার্ণের তাস, তাসখানাকে ভাল করে দেখবার জন্য সেটা হাতে তুলে নিলেন কৌতূহলী Aislabie। পরক্ষণেই তাসটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে থমথমে মুখে উঠে দাঁড়ালেন। ঘাড় নীচু করে দায়সারা গোছ নমস্কার জানিয়ে (bowing stiffly) ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

Law সেই তাসখানাকে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতেই Aislabieর কক্ষত্যাগের কারণটা বুঝতে পারলেন। তাঁকেও খুব কুপিত ও অপমানিত মনে হল। রাগে তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে।… তাসের গায়ে তাঁদের পরিকল্পনা দুটিকে (financial scheme) তীক্ষ্ণ শ্লেষ করে কয়েক ছত্র ডাচ কবিতা ছাপা ছিল।

এই তাসের প্যাকেটটা মিসেস ওয়ারটন বহুদিন সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। পরে জনৈক তাস সংগ্রাহক সেটা তাঁর ভাণ্ডারভুক্ত করে নেন।

১৭২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সৌখীন ও অভিজাত মহলে যেসব খেলার প্রচলন ছিল, সেগুলো হচ্ছে—

ক্রিম্প এ্যাণ্ড হ্যাজার্ড
কমার্স
কোয়াড্রিল, কমেট প্রভৃতি।

এসব খেলাগুলোয় দুরি বাদ দিয়েই হত। দুরি হাতে নিয়ে খেলাটা ছিল হীনরুচির পরিচায়ক। **It was considered vulgar to play with deuces, because an element of chance popular in the kitchen attached to them as**

'swabbers' or 'swipers' in the game of 'whisk and swabbers'. The players who held a deuce were entitled to take up a share of the stake independent of the general event of the game in other words, the deuces swept the board as seamen 'swabs' the decks. দুরি হাতে পেয়ে এইভাবে টেবিল কুড়িয়ে টাকা নেওয়াটা অনেকের কাছেই অসম্মানজনক মনে হত।

অবিশ্যি তাসের প্যাকেটে চারখানা দুরি সমেত, মোট বাহান্নখানা তাসই থাকত। খেলবার সময় আটচল্লিশখানা তাসে খেলা হত। বেডফোর্ড রো-এ ক্রাউন কফি হাউসে একজন একবার হুইষ্ট খেলার প্রস্তাব করলেন কোয়াড্রিলের পরিবর্তে। তাস বাঁটার পর দেখা গেল হরতনের দুরিখানা প্যাকের খাপের মধ্যে থেকে গেছে। একজন মন্তব্য করলেন, "The deuce take it." (deuce শব্দের অর্থ দুরি, অন্য অর্থে শয়তান) Sir Jacob de Bouverie বললেন, 'Nay let the deuce remain ; I move that all the deuces be brought back.'। সেই থেকে দুরি বাদে whist খেলা বন্ধ হয়ে গেল। এই চারটে তাসের জন্য পিঠের সংখ্যাও যেমন বাড়ল, পয়েন্টও কিছু বাড়ল এবং খেলাটাও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াল। কালে কালে হুইষ্ট খেলাটা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং অন্য সব খেলার কদর আর থাকে না। হুইষ্ট হচ্ছে ব্রীজ খেলারই আদিম রূপ। যদি দুশো বছর আগে হরতনের দুরিটা প্যাকের মধ্যে ভুলক্রমে থেকে না যেত, তবে হয়ত ব্রীজ খেলাটা আজও লোকের কাছে অজানা থেকে যেত।

Ace হচ্ছে টেক্কা, এই 'এস' শব্দটি ল্যাটিন 'as' কথা থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে unit বা একক। বিশপ ল্যাটিমার একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি গীর্জার বেদিতে (পুলপিটে) তাসের প্যাক নিয়ে ধর্ম বিষয়ক উপদেশ বা sermon প্রচার করতেন (এদেশে কোর্ট কাছারীর প্রাঙ্গণে যেমন ওষুধ বিক্রেতারা এখনও তাসের খেলা বা ভেল্কী দেখানোর ছলে লোক জড়ো করে থাকে।)

ল্যাটিমারের এই উপদেশকে বলা হত, Salvation by Christ's cards'। ল্যাটিমার বলতেন, "Let us play at triumph (এই triumph শব্দ থেকেই trump কথাটার উৎপত্তি) Here is your heart, turn up your trump and cast your all on this card !"

এই হরতনের টেক্কা হচ্ছে ঐশ্বরিক এককত্বের (Divine unity) প্রতীক। বিশপের বক্তৃতার মর্মার্থ হচ্ছে যে, ঈশ্বরে সর্বার্থ সমর্পণ করতে পারলে, মানুষ তার আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।...বিশপ ল্যাটিমারের নাম অনুসারে হরতনের টেক্কার নাম হল Latimar's Card. তাসের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক নাবিকের তা[illegible] খেলার অসম্ভব নেশা ছিল। জুয়া খেলাটা খৃষ্টীয় ধর্ম বিরুদ্ধ, কাজেই [illegible]নেক গোঁড়া খৃষ্টান লোকটাকে ভাল চোখে দেখত না। নাবিকটা কি[illegible] তার নিন্দুকদের সবাইকে চুপ করিয়ে দিল এক অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে। সে তাদের বুঝিয়ে দিল,—তাস খেলাটা অধর্মের কাজ নয়, বরঞ্চ এটা ধর্মচিন্তার সহায়ক। Each card in its turn reminds him of the cardinal truth and persons of his religon, adding to ten Apostles one of the kings as Peter and knave Judas.

মাদামোয়াজেল ও মানতাঁত (Maintenton) তাঁর রোজনামচায় সঙ্গে একখানা রুহিতনের সাহেব ও একখানা রুইতনের বিবি সযত্নে রেখে দেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁর ডাইরীখানা নষ্ট হয়ে গেলেও, তাস দুখানা পাওয়া যায়। এই তাস দুটো যে প্যাকের, সেই তাসের প্যাকেট নিয়ে রাজা চতুর্দশ লুই ও বিধবা মিসেস স্ক্যার (Scarron) দুজনে মিলে পিকে (Piquet) খেলেছিলেন। খেলার ফাঁকে উক্ত মহিলাকে লুই গোপনে বিবাহের প্রস্তাব জানান।

সে যুগে রাশিয়ার রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গের (বর্তমান লেনিনগ্রাড) হার্মিটেজে দু'খানা তাস রাখা ছিল,—রুহিতনের আট আর গোলাম। সম্রাট ফ্রেডরিক দি গ্রেট তাঁর ঐতিহাসিক সমর অভিযানের প্রাক্কালে কাউন্ট জেসীর সঙ্গে যে তাস দিয়ে খেলেছিলেন, এ তাস দুটা সেই প্যাকেট থেকে সংগৃহীত।

রুহিতনের দশের নাম 'Picks বা Pyx'। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেডমেনহাম এ্যাবির কুখ্যাত মঠবাসী সাধুদের (মধ্যযুগে খৃষ্টীয় মঠের মঙ্করা অনেক কুকার্য ও ব্যভিচার ক্রিয়ায় আসক্ত ছিলেন) নৈশ আড্ডায় (nocturnal orgies) প্রবেশের সাংকেতিক শব্দ (watch word) হিসাবে এই শব্দটির (Pyx) ব্যবহার হত। এই কথাটা উচ্চারণ করে দ্বার-রক্ষককে একখানা রুহিতনের দশ দেখাতে হত, তবেই ভিতরে প্রবেশের অনুমতি মিলত। এই তাসটার অপর একটা নাম হচ্ছে ট্যাফি (Taffy)।

রুহিতনের নওলার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত। একে বলা হয় The curse of Scotland. ক্যালোডেনের যুদ্ধের পর, ডিউক অব কাম্বারল্যাণ্ড ধৃত বিদ্রোহীদের ব্যাপক হত্যার হুকুম দেন। একখানা রুহিতনের নয়ের পিঠে তাঁর এই আদেশ লেখা ছিল।...মতান্তরে বলা হয়েছে ষ্টুয়ার্টদের সমর্থক স্যার জেমস ড্যালরিম্পলের (Dalrymple), (যিনি পরে Earl of Stair হয়েছিলেন এবং গ্লেঙ্কোর কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যাঁর ঘৃণ্য স্মৃতি জড়িত) ঢালের উপর সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজের ক্রুশের চারধারে নয়টি রুহিতনের কৌটার মত চৌকা বরফির আকৃতি চিহ্ন আঁকা ছিল। সম্ভবত এই থেকে রুহিতনের 'স্কটল্যাণ্ডের অভিশাপ' এই নাম হয়েছে। অন্য একজন বলেছেন নটা রুহিতনের কৌটা সাজিয়ে যে ক্রুশ চিহ্ন তৈরী হয় সেটা হচ্ছে St. Andrews Cross—স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় ক্রুশের প্রতীক। এই cross of Scotland এর অপভ্রংশ হচ্ছে curse of Scotland.

হাইল্যাণ্ডের উত্তরাংশে জর্জ ক্যাম্বেল বলে একজন দুর্ধর্ষ দস্যু ছিল।

সে এডিনবরা ক্যাসেল থেকে স্কটল্যাণ্ডের রাজমুকুটের নয়খানা মূল্যবান হীরা চুরি করে নেয়। এই অপহৃত হীরকগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য রাজা আশেপাশের সবার উপর পাইকারী হারে ট্যাক্স ধার্য করলেন। নয়টি ডায়মণ্ডের জন্য লোকদের এই হয়রানি বোধহয় রুহিতনের নওলার এই অপযশসূচক নামটি অর্জনে সহায়তা করেছে।

আগেই বলা হয়েছে সেণ্টপিটার্সবার্গে সম্রাট ফ্রেডরিক দি গ্রেটের খেলার যে দু'খানা তাস রক্ষিত ছিল, তার মধ্যে একখানা ছিল রুহিতনের আটা। গ্লেন্স্ ক্যাসলেও একখানা রুহিতনের আটা সংরক্ষিত আছে। রাজা দ্বিতীয় জর্জের উপপত্নী কাউণ্টেস অব ইয়ারমাউথ প্রবল পরাক্রান্তা ছিলেন। ব্রিটেনের রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। একবার হ্যামিলটনের ডিউক কাউণ্টেসের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছিলেন। খেলা ছেড়ে যখন উঠলেন, ডিউকের তখন অনেক টাকা জিত হয়েছে। টাকা পাবার আশু কোন সম্ভাবনা নেই দেখে, ডিউক ভাবলেন এই সুযোগে তাঁর কোন আশ্রিত ব্যক্তির চাকরীর একটা সুবিধা করে নেওয়া যেতে পারে। কাউণ্টেস ডিউকের অনুরোধ রক্ষা করেন নি, কারণ চাকরীটা শেষ পর্যন্ত অন্য লোকের ভাগ্যে জুটলো। এরপর ডিউক একখানা রুহিতনের আটার গায়ে দু ছত্র লিখে, লেডী ইয়ারমাউথকে পাঠালেন,—তাঁর পূর্ব প্রার্থনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তাসটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ডিউকের কাছেই ফিরে এল। এই তাসখানা পরবর্তী ডিউক পত্নী এবার্ডিনশায়ারের লর্ড এরোলকে (Erroll) উপহার দেন। ডিউক অব হ্যামিলটন তাঁর বিজিত অর্থ কাউণ্টেসের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছিলেন কিনা কিম্বা তাঁর অনুগ্রহভাজন ব্যক্তির ভাগ্যে কোন সরকারী পদ মিলেছিল কিনা শেষ পর্যন্ত তা জানা যায়নি।

মৃত্যুশয্যায় শুয়েও অনেকে তাস খেলেছেন। এ সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। সবচেয়ে কৌতুকজনক গল্প হচ্ছে লীডস সহরের মিসেস হচকিসের (Hotchkiss)। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মত তিনিও ছিলেন 'an unconscoinable time a-dying'. এগারো বছর ধরে আজ মরেন কি কাল মরেন, এইভাবে চললেন। শেষটায় পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। অঙ্গ সঞ্চালন করতে বা কথাবার্তা বলতে না পারলেও, জ্ঞান ছিল টনটনে। এগারটি বছর বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিবি হচকিস একার্তে (écurté) খেলতেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ একদিন তাঁর মৃত্যু হল। মরবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি রুহিতনের সাত খেলবার জন্য তাস তুলে নিয়েছেন, ঠিক এমনি সময়ে তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাঁর অনুচরেরা কিছুতেই তাঁর হাত থেকে তাসখানা খুলে নিতে পারল না। একজন বললেন হাতখানা কেটে তাসটাকে বার করা হোক। শেষে তাঁর ছেলেই আপত্তি জানালেন। 'কাজ কি আছে হাঙ্গামে, থাক না ওটা হাতে ধরা!—ঐ ভাবেই ওঁকে গোর দেওয়া হোক। ওঁর জীবনের সবচেয়ে বড় নেশা, তাস খেলার স্মারক হিসাবে এই তাসখানাও ওঁর সাথে সমাধিস্থ হোক!' জর্জ সেলুইন গল্পটা শুনে বেশ একটা সরস মন্তব্য করেছিলেন:

'Ah then when the last trumph sounds,
Mrs. Hotchkiss will hold it.'

বিখ্যাত সুরকার Toplady ছিলেন হুইষ্ট খেলার বিশেষ অনুরাগী। তাঁর দু'-একটা ধর্মসংগীত তাসের গায়ে লেখা হয়েছিল। এই রকম একটা hymn লেখা রুহিতনের ছক্কা বহুদিন তাঁর পরিবারে রক্ষিত ছিল পরে ওটা অ্যামেরিকায় চলে যায়। সম্ভবত ১২ই মার্চ তারিখে এই গীতটি রচিত হয়েছিল:

Rock of ages cleft for me
Let me hide myself in thee!
(Mar 12)

বিখ্যাত চার্লস জেমস্ ফক্স ব্রুকস্ ক্লাবে এক রাত্তিরে ক্যারো খেলায় রুহিতনের পাঞ্জার উপর দশ হাজার পাউণ্ড বাজী রেখেছিলেন। খেলায় অবিশ্যি ফক্স সাহেবের হার হয়েছিল। কম টাকা নয়, প্রায় দেড় লাখ টাকার ধাক্কা। সে যুগে লণ্ডনে তিনটে বিখ্যাত তাস খেলার আড্ডা ছিল।

ব্রুকস্ ক্লাব,
হোয়াইটস্ ক্লাব,
ও
ক্রকফোর্ডস্ ক্লাব

এই ক্লাবগুলোতে খুব উঁচু ষ্টেকে খেলা হত। খেলোয়াড়দের সবাই খুব ধনী ও বেহিসাবী ছিলেন। কাপ্তানীতে বিলেতী যুবকেরাও কম যেতেন না সেগুলি যদিও অবিশ্যি বারবনিতার বিড়াল বা বানরের বিয়েতে এ দেশের কাপ্তানদের মত কেউ লাখ, দু' লাখ টাকা খরচ করেন নি। একবার ফক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী খেলায় জিতে বলেছিলেন,

"I have just won a thousand guineas from Charles; but as the baliffis are after him. I have compounded for a supper at the Club."

হাজার গিনির বদলে এক পেট ডাক রোষ্ট, ভীল কাটলেট, অয়েষ্টার, এ্যাসপ্যারাগাস র‍্যাপসবেরী ও ক্রীম আর বোতল কয়েক বার্গাণ্ডি—যার দাম বড় জোর পাঁচ গিনি।

একদিন সান্ধ্য তাসের বৈঠক বসেছে সাহিত্যিক চার্লস ল্যাম্বের বাড়ীতে। জোর হুইষ্ট খেলা চলছে। রাত দুটো,—ছয় ছয়টা রাবার হয়েছে। আশ্চর্য, প্রত্যেক বার রাবার হবার আগে হরতনের চৌকোই উঠছে তুরুপের তাস হিসাবে। আরও মজা হচ্ছে অন্যান্য বার খেলায় এই তাসখানা হয় ল্যাম্ব কিম্বা তাঁর জুটী বার্ণের (Burney) হাতে এসে জুটছে।

এই ব্যাপারে খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ একটু কৌতুকমিশ্রিত উত্তেজনার সঞ্চার হল। রবিনসন নামে এক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে বলে উঠলেন, "The card has been magnetised by Lamb. ল্যাম্ব কিন্তু ওঁর মন্তব্যটা ঠিক লঘুভাবে নিতে পারলেন না। প্রত্যুত্তরে বললেন, "Every one knows that diamonds are attractive. But why the four?"

আগেই বলা হয়েছে একবার রাজা যেমন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন ও রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট খ্যাতনামা জ্যোতির্বেত্তা হ্যালিকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাওয়ার পর তাঁদের সাথে কমেটও খেলেছিলেন। তাস জোড়া ছিল যাকে বলা হত এ্যাষ্ট্রনমিক্যাল কার্ড অর্থাৎ প্রত্যেকখানা তাসের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন তারকাপুঞ্জের ছবি আঁকা ছিল। এই খেলার স্মৃতি হিসাবে একখানা রুহিতনের তিরি প্রাসাদে রাখা ছিল। এই তাসখানা পরে রয়েল এ্যাষ্ট্রনমার হার্শেলকে দেখানো হয়। হার্শেল তাস খেলার কিছুই জানতেন না। ছবিতে আঁকা তারাগুলো তাঁর মনঃপূত হল না। তাই বললেন "Why didn't the artist make five points to the stars? There is no use upsetting the convention."

তাস খেলার নেশা সে যুগে অল্পবিস্তর অনেকেরই ছিল—ধর্মযাজকেরা বাদ যেতেন না! আর্কবিশপ কর্ণওয়ালিশের সাংঘাতিক নেশা ছিল হুইষ্ট খেলার। রাজা তৃতীয় জর্জ কিন্তু তাস খেলাটা আদপেই পছন্দ করতেন না। রাজ্যের প্রধান যাজকের এবম্বিধ তাস ক্রীড়ার আসক্তি তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। তাস খেলার জন্য রাজা তাঁকে অনেকবার ভর্ৎসনা করেছিলেন। কর্ণওয়ালিশের খেলার নেশা এতই প্রবল ছিল যে, রাজার তিরস্কারে তিনি কর্ণপাত করেননি। একবার খেলতে বসে রুহিতনের দুরি তুলতেই তাঁর ডান হাতখানা অসাড় হয়ে পড়ল, হঠাৎ পক্ষাঘাতের আক্রমণে। হাতের তাসখানা খসে মেঝেয় পড়ে গেল। এই ব্যাপারে মেথডিষ্টিক্যাল সমাজে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। সবাই বলল, 'এটা ভগবানের সাজা, পাপের ফল ভুগতেই হবে।' এই নিয়ে একটা ব্যঙ্গচিত্র ও ছড়া ছেপেও প্রচারিত হলো। প্রচারলিপির শিরোনামা দেওয়া হল—"The Deuce has got the Prelute." (Deuce অর্থ দুরি, বিকল্পার্থে শয়তান)। কর্ণওয়ালিশ কিন্তু এসব ঠাট্টা তামাসা গায়েই মাখলেন না। ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায়ও খেলা ছাড়েননি। এরপরও বহুদিন ধরে খেলার আনন্দ উপভোগ করেছেন পাদরী সাহেব। একবার একজন তরুণী খেলার আসরে (কর্ণওয়ালিশও ছিলেন সেখানে) হঠাৎ বেফাঁস একটা কথা বলে ফেলায়, কর্ণওয়ালিশকে বেশ একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে হয়েছিল। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন তাঁদের অঞ্চলে (লিঙ্কনসায়ার) রুহিতনের দুরিকে সবাই কর্ণওয়ালিশের অভিশাপ বলে থাকে।

তাসের সম্বন্ধে কারো যদি আর কোন ঐতিহাসিক বা সামাজিক ঘটনার কথা জানা থাকে (তা এদেশেরই হোক বা বিদেশেরই হোক) অনুগ্রহ করে বসুমতী মারফত জানালে বাধিত হব।

বাঁধন

শ্রীমতী বসু

দু-চোখ মেলিয়া
আমাকে দেখতে দাও।
মর জগতের সকল চেতন ভুলি,
ঐ তারা ভরা রাতে,
জোছনার সাথে,
চাঁদিনীর কোলাকুলি।

দখিনা বাতাসে
কি এক আবেশে
অনাদিকালের গান ভেসে আসে
সুরের পাখনা তুলি,
তারই তালে তালে প্রতি সন্ধ্যায়
নীড়ে ফেরা পাখি কণ্ঠ মেলায়,
দু-কান ভরিয়া
আমাকে শুনতে দাও,
তাদের সে কলকাকলি।

ঐ ফুলে ফুলে ছাওয়া
ফুল প্রাঙ্গণ—
চঞ্চল করে দিল মোর মন,
মৃদুলের সাথে
মৃদু মৃদু তালে
দোলে যে কুসুম কলি।

ঐ গুন গুন গানে
কি মধুর তানে
লোটে যে মধু অলি।
এই সুন্দর সব কিছু ফেলে
কেমনে যাব গো চলি।

হ্যালডোর ল্যাকস্‌নেস

সুনীলকুমার নাগ

বর্তমান শতাব্দীর সুরুতেই দেখা গিয়েছিল ইয়োরোপীয় সাহিত্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির লেখকগণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। এ শুধু স্টাইল বা বাচনভঙ্গী প্রভাবিত করা নয়—এ প্রভাব অনেক গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছিলো।
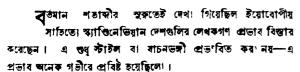
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বলতে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং ইসল্যাণ্ডকে বোঝায়। আমাদের বর্তমানে আলোচ্য ল্যাক্‌স্‌নেস ইসল্যাণ্ডের অধিবাসী। শিল্প-সাহিত্যের সমস্ত দিকেই ইসল্যাণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্য তিনটি দেশের চাইতে অনেক অনগ্রসর তো বটেই, ঐ দেশগুলির অনুগামীও বটে; কাজেই ঐ দেশগুলি সম্বন্ধে প্রথমে কিছু আলোচনা করা দরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুটি দশকে নরওয়ের হেনরিক ইবসেন যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন তার ফলে বিংশ শতাব্দীর সুরুতেই সাহিত্যপাঠকগণের সামনে একটা নতুন জগতের কপাট খুলে গিয়েছিলো। মরমিয়াধর্মী, ঐতিহাসিক, প্রণয়ধর্মী, তথা পুরোপুরি সামাজিক সমস্যামূলক—সমস্ত রকম নাটকই রচনা করেছিলেন ইবসেন। একদিকে বক্তব্যের নতুনত্ব আর একদিকে রচনাশৈলীর অভিনবত্ব—এ দুয়ের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিলো ইবসেনের রচনায় এবং বলতে গেলে তিনি একাই সাহিত্যের ইতিহাসে একটা যুগ বিশেষ। ইবসেনের পীয়র গিণ্ট, কাটালিনা, রসমারসহলম্‌, এ ডল্‌স হাউস, ঘোস্টস, মাস্টার বিল্ডার, এ্যান এনিমি অব দি পিপল, দি পিলারস অব সোসাইটি প্রভৃতি নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকে দেখা গেছে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে—শুধু ইয়োরোপ কেন পৃথিবীর সকল দেশেই তরুণ লেখকগণের মধ্যে ইবসেন-পন্থীরাই সংখ্যায় বেশি। শ্রেণীদ্বন্দ্বই যে সমাজের একমাত্র সমস্যা নয় সে কথা ইবসেনই সর্বপ্রথম, তাঁর বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করলেন। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যে কোনো রকম ধাঁচেরই হোক না কেন মানুষে মানুষে চিন্তা, বিশ্বাস এবং কর্মের বিভিন্নতা পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ কালজয়ী বলা চলে! আর এ জিনিষগুলি যুগে যুগে ব্যক্তিজীবনের মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে এসে থাকে। কাজেই ইবসেনের নাটকগুলি এক কথায় বলতে গেলে সর্বকালের সমস্যা নিয়ে যে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করলো সাহিত্যজগতে তার প্রভাব বা প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনেও কিছু কমেনি।

নাট্যকার হিসেবে ইবসেনের পরেই বলতে হয় সুইডেনের অগাষ্ট ষ্ট্রীণ্ডবার্গের কথা। ষ্ট্রীণ্ডবার্গের রচনায় সামাজিক সমস্যার চাইতে ব্যক্তিমানসের বিশ্লেষণের প্রতি অধিকতর প্রবণতা দেখা গেলো। নাটকের পক্ষে এ একটা নতুন জিনিষ। কনফেশনস অব এ ফুল এবং মিস জুলিয়া ষ্ট্রীণ্ডবার্গের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা। ইবসেনের মতো ষ্ট্রীণ্ডবার্গও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লেখক ছিলেন তবে ওঁর প্রভাব ইবসেনের মতো ব্যাপক নয়।

নরওয়ের ঔপন্যাসিক এবং কবি বিয়র্ণষ্টার্ণ বিয়র্ণসন ইবসেনের সমসাময়িক ছিলেন। স্বদেশে গদ্য এবং পদ্য দু'রকম রচনাতেই ওঁর সমান খ্যাতি ছিলো যদিও, কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বাইরে ঔপন্যাসিক হিসেবেই ওঁর অধিকতর খ্যাতি। আর্ণী, ইন গডস ওয়ে এবং ফিশার মেডেন—এই তিনখানা হলো ওঁর সব চাইতে সার্থক রচনা।

ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ এবং বিয়র্ণসন—এই তিনজনের সাহিত্য একত্রযোগে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বিশ্বসাহিত্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার জন্যে একটা বিশিষ্ট স্থান আপন মহিমায় অধিকার করে নিয়েছিলো

এবং এর পর থেকে দেখা গেলো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বিভিন্ন দেশে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের আবির্ভাব ঘটতে লাগলো। তার মধ্যে কয়েকজন হলেন নরওয়ের ন্যুট হামসুন, জোহান বয়ার এবং ট্রিগবি গুলব্রানসেন; সুইডেনের উইলিয়ম মলবার্গ, সেলমা ল্যাগারলফ, গুস্তাভ হেলস্ট্রাম, ভার্নার ভন হাইডেনষ্ট্রাম এবং সিগ্রিড উনসেট; ডেনমার্কের মার্টিন এণ্ডারসন নেকসো, জোহানেস জেনসেন এবং এ্যাক্সারলারসেন। লেখক হিসেবে এঁদের সকলের খ্যাতি সমান নয় তা ঠিক কিন্তু এঁদের প্রতিভার বিরাটত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। এঁদের মধ্যে চারজন—হামসুন, লেগারলফ, উনসেট এবং জেনসেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন। একটা নোবেল পুরস্কার পেয়ে থাকুন আর নাই পেয়ে থাকুন একটা বিষয় এঁরা সকলেই সমান বলা চলে। সে হলো সাহিত্যে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই যে চাষী মজুর নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর সমস্যাবহুল জীবন সারা পৃথিবীর সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করেছে তার মূলে এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির লেখকগণের রচনা উত্তরসূরীগণের মধ্যে প্রেরণা জুগিয়েছে।

অন্যতম স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশ ইসল্যাণ্ড যে অন্য তিনটি দেশের অনুগামী শিল্পসাহিত্যের ব্যাপারে সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এবং কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্তও ইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের একটি উপনিবেশ বলে গণ্য হতো। কিন্তু আজকের ইসল্যাণ্ড স্বাধীন। ইসল্যাণ্ডের সাহিত্য অন্যান্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে রাষ্ট্রগত স্বাতন্ত্র্য সত্তেও ইসল্যাণ্ডের সাহিত্যসেবীদের মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের পূর্বসূরিগণের অনুসরণ প্রচেষ্টা যে কোনো মনোযোগী পাঠকেরই কৌতূহল উদ্রেক করে। বর্তমানের ইসল্যাণ্ডের সাহিত্যে তিনজন প্রথম শ্রেণীর লেখক রয়েছেন—গুনার গুনারসন এবং হালডোর ল্যাকস্‌নেস। ল্যাকস্‌নেস নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

হালডোর কিলিয়ান ল্যাকস্‌নেস (জন্ম ২৩শে এপ্রিল, ১৯০২) জন্মগ্রহণ করেন ইসল্যাণ্ডের রাজধানী রেকিয়াভিকে। ওঁর বাবা ছিলেন একজন অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী। ওঁর আসল নাম হালডোর গুডজনসন। সাহিত্যসেবা আরম্ভ করবার পর উনি নিজের পদবী লিখতে লাগলেন "ল্যাকস্‌নেস" বলে। এর একটু ইতিহাস আছে। ল্যাকস্‌নেসের বাবার বিরাট একটি খামার ছিলো রাজধানী থেকে উত্তরে গ্রামাঞ্চলে। প্রথম জীবনের দশটা বছর এই খামারেই কেটেছে ওঁর। খামারটির নাম ছিল ল্যাকস্‌নেস। তরুণ বয়সে নিজেকে এমন গভীরভাবে উনি এই খামারের সঙ্গে জড়িত করে ফেলেছিলেন যে নিজের নামের সঙ্গেই যুক্ত করে দিলেন খামারের নামটা পদবী হিসেবে।

ইস্কুলের পড়াশুনো শেষ করবার পরে বছরখানেক কলেজেও পড়েছিলেন ল্যাকস্‌নেস। এবং এই কলেজে পড়াশুনোর সময়তেই অনেক উদীয়মান লেখকের সঙ্গে পরিচয় হলো ল্যাকস্‌নেসের। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেখা যায় ষোলো বছর বয়স থেকেই ল্যাকস্‌নেস একটু একটু লেখার চর্চা করছেন। এবং সতেরো বছর বয়সে একটি ছোটো উপন্যাসও রচনা করে ফেললেন উনি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই ছোট বইখানির নাম চাইল্ড অব নেচার। এ বইখানা সাহিত্য হিসেবে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এর পরে দেখা যায় ল্যাকস্‌নেস কাজ হিসেবে সাহিত্যসেবাই স্থির করলেন নিজের জন্যে।

নিতান্ত হাল্কা মনোভাবসম্পন্ন যাঁরা তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা একটু সিরিয়াস মনোভাবের মানুষ তাঁদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যৌবনে পা দিয়েই কিম্বা তার কিছু পূর্ব থেকেই ভেতরে ভেতরে একটা তাড়না অনুভব করতে আরম্ভ করেন। কারো বেলায় দেখা যায় এর প্রভাবেই সে ব্যক্তি হয় তো নেহাৎ আকস্মিকভাবে রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, কেউ বা হঠাৎ অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন; কারো বা নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে, কেউ বা ভাবুক হয়ে পড়েন। বাস্তবিক পক্ষে যে শক্তি মানুষের ভেতরে এই অস্থিরতার সৃষ্টি করে তাকে ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করতে পারলে হয় তো অনেক সাধারণ মানুষই তার কর্মজীবনে অসাধারণত্ব অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ জিনিষটি কদাচিৎ ঘটতে দেখা যায়। ল্যাকস্‌নেসের জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের অনেক কিছুই দেখেছেন এবং শিখেছেন ল্যাকস্‌নেস।

কুড়ি-একুশ বছর বয়সে দেখা গেলো ভেতরের তাগিদে ল্যাকস্‌নেস বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। দেশভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসলো ওঁকে। ইসল্যাণ্ডের ছোটো-বড়ো নানা শহর এবং গ্রামে গ্রামে কিছুদিন ঘুরে বেড়াবার পর একদিন হঠাৎ নরওয়েগামী এক জাহাজে চেপে উঠে বসলেন। একে একে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স এর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন ল্যাকস্‌নেস। বলা বাহুল্য সাহিত্যচর্চার কাজ এ সময়ও পুরোদমেই চলছিল। এই সময় কোপেনহেগেনের একটি পত্রিকায় নিয়মিত গল্প লেখার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন ল্যাকস্‌নেস।

ফ্রান্সে থাকতেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ল্যাকস্‌নেসের। উনি ছিলেন কিছুটা ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের ধার্মিক প্রকৃতি এবং দৃঢ়বিশ্বাসের দ্বারা জীবনে অনভিজ্ঞ এবং ভাবুক প্রকৃতির ল্যাকস্‌নেস অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রীতিমত প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং মনস্থ করলেন যে খৃষ্টধর্মের মূলে প্রবেশ করতে হবে। বলাই বাহুল্য খৃষ্টধর্মই যে সকল ধর্মের সার এবং বিশ্বচরাচরের সমস্ত চূড়ান্ত সত্যের সন্ধানও যে এই ধর্মানুশীলনের মধ্যেই লাভ করা যাবে অন্তত এই সময়ে কিছুকালের জন্যে ল্যাকস্‌নেসের সে সম্পর্কে স্থির বিশ্বাস হয়েছিল। ঐ ভদ্রলোকের সুপারিশ নিয়েই তরুণ ল্যাকস্‌নেস চলে এলেন লুক্সমবুর্গ-এ। এখানে একটা মঠে কয়েকজন গৃহত্যাগী সাধক এবং পেশাদার পাদ্রীর সঙ্গে প্রায় একটা বছর কাটালেন ল্যাকস্‌নেস। এ সময়কার চব্বিশ ঘণ্টার প্রত্যেকটি মিনিট ওঁর কাটতো ধর্মচর্চায়। কখনো একা পড়াশুনোয় মগ্ন থাকতেন, কখনো বা আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে যীশুখৃষ্টের জীবন এবং তাঁর শিক্ষার কোন না কোন দিক সম্বন্ধে জোর আলোচনায় মত্ত হতেন।

এই মঠে প্রবেশের কিছু পূর্ব থেকেই ল্যাকস্‌নেসের অন্তরে সাহিত্যপ্রীতি সুদৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিয়েছিলো। কাজেই ধর্মচর্চার ফাঁকে ফাঁকে এক একদিন কিছু লিখবার জন্যেও ভেতর থেকে একটা তাগিদ অনুভব করতেন। এ সময়ে ওঁর বয়স ছিল

একুশ-বাইশ বছর। এক বছর এই মঠে কাটাবার পরে ল্যাক্‌স্‌নেস শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন সংসার ত্যাগ করবেন না। বরং আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই প্রাত্যহিক সমাজ জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করে চলবেন এবং তারই মধ্যে এমনভাবে ধর্মানুশীলনে নিযুক্ত রাখবেন নিজেকে যে তা' দেখে আর সবাই আদর্শজীবন যাপন সম্পর্কে একটা চাক্ষুষ নজির পেতে পারে। নিজে ক্যাথলিক হিসেবে দীক্ষিত হলেন ল্যাক্‌স্‌নেস এবং সারা জীবন খৃষ্টের বাণী প্রচারের প্রতিজ্ঞা নিয়ে মঠ ত্যাগ করলেন।

কিন্তু বৈচিত্র্য-প্রিয় ল্যাক্‌স্‌নেস এক জায়গায় থাকতে পারতেন না বেশিদিন। তাই দেখা গেলো এর পর লণ্ডন চলে এসেছেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জবাসীদের যোগাযোগ স্মরণাতীত কাল থেকে। বলতে গেলে ইংরেজরা আধা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। বিভিন্ন আর্ট গ্যালারী এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ মিউজিয়মে এসে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সঙ্গে বৃটেনের যোগাযোগ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক শিক্ষালাভ করাই ছিল ল্যাক্‌স্‌নেসের লণ্ডনে আসার প্রধান আকর্ষণ। এ কাজ তো করতে লাগলেনই কিন্তু তার চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে উনি লণ্ডনের নেতৃস্থানীয় ক্যাথলিক পাদ্রী এবং শিক্ষাগুরুদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করলেন। যুবক ল্যাক্‌স্‌নেসের খৃষ্টধর্মের প্রতি উৎসর্গিত মানসিক অবস্থা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যেতেন। এ যুবক যে কালে কালে যন্ত্রদানব পরিচালিত পৃথিবীতে নতুন করে আর একবার খৃষ্টের মহিমা প্রচার করে জীবনসংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত পাপী-তাপীদের একটা মুক্তির পথ করে দেবেন এ যুগের এ রকম আশাও পোষণ করতেন অনেকে এবং সে কথা প্রকাশ্যেও বলতেন অনেকে। যা সাধারণত হয়ে থাকে; এই ধরণের কথাবার্তা যখন ল্যাক্‌স্‌নেস নিজের কানে শুনতেন তখন প্রকৃতই তাঁর মনে হতো বুঝি বা সত্যি, তাঁর জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্যই খৃষ্টধর্ম প্রচার করা।

এ ভাবটা অবশ্য ল্যাক্‌স্‌নেসের খুব বেশিদিন ছিল না—কম-বেশি তিন বছরের মতো। তবে যতদিন ওঁর কেটেছে এ ভাবে তার মধ্যে কোনো ফাঁকিও দেখা যায়নি। তার প্রমাণ হলো এ সময়কার লেখা। এই তিন বছরে ছোটো ছোটো খানকয়েক বই লেখেন ল্যাক্‌স্‌নেস, যার মধ্যে সবচাইতে নামকরা হলো "এ্যাট দি হলি মাউন্টেন।" সকলেই এ বিষয়ে একমত যে এই রচনাগুলির সাহিত্যমূল্য কিছুই নয়—কারণ ধর্ম ওঁকে এতটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে এ বইগুলি সাহিত্য না হয়ে ধর্মপ্রচারমূলক পুস্তিকা হয়ে দাঁড়ালো। শোনা যায় অনেক ক্যাথলিক পাদ্রী মহলে ধর্মান্তর-করণের সহায়ক হিসাবে এখনো ল্যাক্‌স্‌নেসের রচনাগুলি ব্যবহার করে থাকেন।

মাস কয়েক লণ্ডনে কাটাবার পর ল্যাক্‌স্‌নেস চলে এলেন রোমে। এটা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকের কথা। সুকুমার-শিল্পের প্রতি ধীরে ধীরে ওঁর মনে যে প্রীতি জন্মেছিল রোমে আসবার পর ল্যাক্‌স্‌নেস নিজেই অনুভব করতে লাগলেন তা যেন এবার ওঁকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেললো। নিজের ভেতর বোধ করতে লাগলেন একটা বিরাট সংঘাত। একদিকে ধর্ম আর একদিকে সাহিত্য। কোন্‌টা করবেন? কোন্ কাজে জীবনটা ব্যয় করা অধিকতর সমীচীন হবে? কার দাবী অধিক গ্রাহ্য। মঠ ত্যাগ করবার সময় নিজে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ল্যাক্‌স্‌নেস তা মনে হতে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়তেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ঠিক পরক্ষণেই রোমের দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো। দেখতে পেতেন উঠতি ফ্যাসিস্ত গুণ্ডাদের যথেচ্ছ ব্যবহার। এ সবই হচ্ছে রোমে—হ্যাঁ রোমে। রোম—যার আদেশে একদা খৃষ্টের প্রাণনাশ করা হয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে যার আগ্রহে এবং শ্রমে সারা বিশ্বে খৃষ্টের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। স্বর্গ এবং নরক—দু'টো জিনিবেরই কিছুটা যেন পরশ পেলেন ল্যাক্‌স্‌নেস রোমে বসে। কয়েকটা সপ্তাহ অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করলেন ল্যাক্‌স্‌নেস নিজের সঙ্গে, তারপর ঠিক করলেন ঈশ্বরের যে সামান্যটুকু নিজের ভেতরে অনুক্ষণ অনুভব করা যায় তারই নির্দেশ মেনে চলবেন—নিজের বিবেককে মেনে চলবেন—সাহিত্য-চর্চাই করবেন, ধর্মপ্রচার নয়।

এটা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথা। দু'মাসের চেষ্টায় একখানা ছোটো কাহিনী রচনা করলেন ল্যাক্‌স্‌নেস 'দি উইভার অব কাশ্মীর।' এ বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাক্‌স্‌নেস সাহিত্যরসিক তথা ধর্মে আগ্রহশীল সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কারণ এ বইয়েতে তরুণ ল্যাক্‌স্‌নেস তাঁর স্বভাবসুলভ জোরালো প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে বলে ফেললেন যে, খৃষ্টধর্মের কিছু উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সুদূর অতীত কোনো কালে হয় তো কিছু ছিল কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব জীবনযাত্রার পক্ষে খৃষ্টের বাণী কোনোই কাজে লাগতে পারে না, কাজে লাগানো যেতে পারে না। বর্তমানের পৃথিবীর জটিল সমাজ-জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধান না করে খৃষ্টের কথা বা খৃষ্টধর্মের কথা বলা অবাস্তব তো বটেই কিছুটা ভণ্ডামীও বটে। ব্যস্! একথা আর কারো বুঝতে বাকী রইলো না যে, ল্যাক্‌স্‌নেসের চিন্তাধারায় একটা মৌল পরিবর্তন ঘটে গেছে। খৃষ্টধর্ম প্রচার বাস্তবের সংস্পর্শে এসে রীতিমতো খৃষ্ট-বিরোধী হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা সত্যি তাই হয়েছিল। এর থেকে একটা জিনিষ খুবই পরিষ্কার হয়ে যায়। সে হলো এই যে, ল্যাক্‌স্‌নেস কখনো ভাবের ঘরে চুরি ঘটাবার চেষ্টা করেননি। যখন খৃষ্টধর্মকে তাঁর সব কিছু সম্পর্কে চরম কথা বলে মনে হতো, সে-কথাও জোর গলায় বলে বেড়াতেন; আবার যখন তার উল্টোটা মনে হতে লাগলো, সে কথাটাও সমান উৎসাহ, আগ্রহ এবং জোরের সঙ্গে বলতে লাগলেন। ল্যাক্‌স্‌নেস মনে করেন জীবনে যত বেশি জিনিষ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় ততোই লাভ। তাই খৃষ্টধর্মের জন্যে উনি যে তিনটে বছর ব্যয় করেছেন সে সম্পর্কে কোনো অনুশোচনা নেই, জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্ট গলায় বলে থাকেন: সত্যি যে খৃষ্টধর্মের মধ্যে কিছু নেই তা নিজে ঐভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বলেই তো জোর গলায় বলতে পারছি তা না হলে হয় তো সারা জীবন একটা "কিন্তু, কিন্তু" ভাব দেখা দিতো মনে। সব সময়েই মনে হতো বুঝি ঐদিকে গেলেই মানুষের মুক্তিলাভ ঘটতো। আজ বুঝতে পারছি ওসব কতো মিথ্যে।

রোম থেকে স্বদেশে ফিরে এলেন ল্যাক্‌স্‌নেস। বিরাট একখানা উপন্যাস রচনায় হাত দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন উনি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কিছুটা আকস্মিকভাবেই চলে এলেন আমেরিকায়। ছোটো-বড়ো নানা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকাদির

অফিস দেখে বেড়াতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে অনেক খ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে পরিচিত হলেন ল্যাক্‌সনেস—তার মধ্যে আপটন সিনক্লেয়ার এবং আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে প্রধান। হেমিংওয়ের 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' পরে এক সময় অনুবাদও করেছিলেন ল্যাক্‌সনেস।

রোমে এসে বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ল্যাক্‌সনেসের মন সজাগ হয়ে উঠেছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরে দেখা গেলো সেই বাস্তববোধ ওঁকে প্রায় বিদ্রোহী করে তুললো। আমেরিকার সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করে স্বদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচুর লেখা পাঠাতে লাগলেন ল্যাক্‌সনেস। কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ল্যাক্‌সনেসের রচনা এবং খাস মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সংবাদপত্র তথা প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারকে সুপারিশ করলেন আর দেরি না করে ল্যাক্‌সনেসকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্যে। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না! সত্য কথা শুনতে বিমুখ তখনকার আমেরিকার সংবাদপত্র জগতের ওপর রীতিমতো বিরক্ত হয়ে ল্যাক্‌সনেস নিজেই আমেরিকা ত্যাগ করে আবার স্বদেশে ফিরে এলেন। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে রূপ ল্যাক্‌সনেস আমেরিকায় দেখলেন প্রধানত তার ফলেই ওঁর চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের প্রতি একটা প্রবণতা খুব ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে দানা বেঁধে উঠতে লাগলো। ল্যাক্‌সনেস বুঝতে পারলেন বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ যন্ত্রের দাস মাত্র এবং এই যন্ত্রের দাসত্বের ফলে তার মস্তিষ্কের সৃজনধর্মিতা ক্রমশ কমে আসছে, অনুভূতি ক্রমশ তার শক্তি হারাচ্ছে, মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে, সত্য ভূ-লুণ্ঠিত হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনধারণের পক্ষে আরামদায়ক অনেক কিছুই সে পাচ্ছে যার প্রচুর আর্থিক দিক দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা আছে; কিন্তু এই ক্রয়ক্ষমতা যার নেই মানসিক শান্তি তার চাইতে বেশি পাচ্ছে না। তা'হলে সে পেলো কি? কেবল ছুটোছুটিই সার, অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাড়াহুড়ো। ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে ল্যাক্‌সনেস খাপ খাওয়াতে পারলেন না নিজেকে।

অনেক দেশের অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর ল্যাক্‌সনেস এবার মনস্থ করলেন স্বদেশেই স্থায়ী আস্তানা পাতা দরকার। তাই রেকিয়াভিকের একটি পল্লীতে ছোটো একটি বাড়ী নিলেন এবং বিয়ে করলেন। এ সময়ে ওঁর বয়স আটাশ।

দু' বছর পরে কয়েক বছরের পরিশ্রমে লেখা ল্যাক্‌সনেসের সুবৃহৎ উপন্যাস দু'খণ্ডে প্রকাশিত হলো—'ও পিয়োর ভাইন', 'বার্ড অব দি শোর'। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 'সালকা ভলকা' নাম নিয়ে এ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হলো। সালকা ভলকা প্রকাশিত হবার পর থেকে স্বদেশে যেমন সাহিত্যসেবী হিসেবে ল্যাক্‌সনেস নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন, দেশের বাইরে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান এবং রুশ ভাষাভাষী অঞ্চলেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কারণ এ চারটি ভাষাতেই প্রায় একই সময়ে সালকা ভলকা ছাড়াও ওঁর আরো দু' একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। স্বদেশের সরকার ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে সারাজীবন সাহিত্যসাধনার পথ সুগম করবার জন্যে ল্যাক্‌সনেসকে একটা বাৎসরিক ভাতা দেওয়া হবে। কিশোর বয়স থেকে এক এক সময় নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে কাটাবার পর এতদিনে ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন ল্যাক্‌সনেস।

ইসল্যাণ্ডের উত্তরে একটি বন্দর আছে, তার নাম ওসেরি। শিগুরলিনা আর তার মেয়ে সালকা মূল এই দু'টি নিঃসহায় প্রাণী মা ও মেয়ের জীবনকে কেন্দ্র করে ল্যাক্‌সনেস স্বদেশের একটি সহরের নিম্নবিত্তদের কাহিনী পরিবেশন করলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যিকদের কৃষকজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্যরচনার যে প্রবণতার কথা আমরা আলোচনার গোড়াতেই বলেছি সালকা ভলকাতে ঠিক তা নেই কিন্তু হামসুনের বাস্তববোধ এবং বয়ারের মুক্তিকামী মানবাত্মার ক্রন্দন শোনা যায়—একটু পরিচ্ছন্ন জীবন, সকলের সামনে অকপটে মুখ তুলে দাঁড়ানো যায় এরকম একটু সরলতার পরশ এটুকুও কি মানবজীবনে আশা করা যেতে পারে না? শিগুরলিনা আর সালকা চোখের ওপর দেখতে পায় চতুর্দিকে চোর, বদমায়েস, ফাঁকিবাজ মানুষের ভীড়; কেউ লালসা-সর্বস্ব, কেউ বা সম্পদ-সর্বস্ব, কেউ প্রকাশ্যে নিষ্ঠুর, কেউ কপট, ধূর্ত। কিশোরী সালকার চোখে একদিন তার মা-ও ধরা পড়া গেলো। মা-ও আদর্শ মানুষ নয়। সালকা ভলকা উপন্যাস ট্র্যাজিকধর্মী। তরুণী সালকা ঘটনার আবর্তে এক সময়ে নাবিকদের একটি সরাইখানার সঙ্গে যুক্ত হলো। ওর পূর্ব পরিচিত একটি যুবক আর্ণালদুর একজন নাবিক। এবার নতুন করে আবার ঘনিষ্ঠতা হলো আর্ণালদুরের সঙ্গে। কিন্তু এর পরিণতি মধুর হলো না। একদিন আর্ণালদুর তার জাহাজে রওনা হলো দক্ষিণে আর ফিরলো না। সালকার জীবন হয়ে উঠলো সম্পূর্ণ রিক্ত—আধুনিক পৃথিবীর বাস্তব রূপ।

সালকা ভলকা প্রকাশের পর কয়েক মাসের জন্যে ল্যাক্‌সনেস আর একবার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এবার দেখলেন রাশিয়া, জার্মানী আর স্পেন।

স্বদেশে ফিরে এসে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করলেন 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল।' এ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হলো ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে। এবং তারপর থেকে দেশ-বিদেশের সাহিত্য সমালোচক মহল এক বাক্যে এ কথা স্বীকার করে আসছেন যে, ল্যাক্‌সনেস বর্তমান শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা। এ উপন্যাস ল্যাক্‌সনেসের নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি তো বটেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ধারার সার্থক এবং উন্নততর সাক্ষ্যও বটে। কৃষকজীবনকে কেন্দ্র করে সেলমা লেগারলফ, সিগ্রিড উনসেট, মুট হামসুন, জোহান বয়ার বা এণ্ডারসন নেকসো যে বিশেষ ধরণের সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে খ্যাতি অর্জন করে গেছেন 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল' রচনা করবার পরে এ কথা বলা চলে যে, ল্যাক্‌সনেস তাঁর পূর্বসূরিগণের পাশে নিজের যোগ্যস্থান করে নিলেন।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল-এ ল্যাক্‌সনেস স্বদেশের কৃষক সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। এ বই এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তো বটেই একটা দেশের কৃষক সমাজের বাস্তব অবস্থার নিখুঁত চিত্রও বটে! 'দি গ্রেট হাঙ্গার'-এর নায়কের মতো এ উপন্যাসের নায়ক বিয়ার্তুরও বলতে গেলে একা অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে চলেছে নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে কখনো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। পার্বাকের ওলানের মতো নিঃস্ব

নিঃসঙ্গ কৃষক বিয়ার্তু্‌র নিজের শ্রমশক্তির ওপর ভরসা রেখে একসময় জীবন শুরু করলো। ক্রমে প্রতিষ্ঠা এলো ওর জীবনে। বিয়ে করলো। ছেলেমেয়ে হলো, স্ত্রী চলে গেলো। মেয়ে এবং ছেলে দু'টি প্রকৃতির দান স্বাধীনতার স্পৃহায় বাপের অবাধ্য হলো। যে বিত্তের অধিকারী হয়েছিলো বিয়ার্তু্‌র তা'ও শেষ পর্যন্ত আবার ঋণের দায়ে হাতছাড়া হয়ে গেলো—যে কাহিনীর শুরুতে একা বিয়ার্তু্‌র সমাপ্তিতেও সে একা। এই রকমই ঘটে থাকে জীবনে।

'লাইফ অব দি ওয়ার্ল্ড', 'দি বেল অব আইল্যাণ্ড', 'ব্রেকুকোট-সানাল' এবং 'দি হ্যাপি ওয়ারিয়রস' ল্যাক্স্‌নেসের অন্যান্য উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে ল্যাক্স্‌নেস স্তালিন পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৭ সালে লাভ করেন নোবেল পুরস্কার।

১৯৬১ সালে কয়েকজন দেশী-বিদেশী ল্যাক্স্‌নেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন একদিন এবং সেই সময়ই এ কথা প্রকাশ হয় যে নতুন আর একখানা উপন্যাস উনি লিখছেন।

অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন—মিঃ ল্যাক্স্‌নেস, আপনি কি কম্যুনিষ্ট?

এর উত্তরে উনি স্পষ্টই বলে থাকেন—না, আমি কম্যুনিষ্ট নই, আমি একজন বামপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী!

এ দেশে তিসি উৎপাদন

ভারত তিসি শস্য উৎপাদনের একটি বড় কেন্দ্র—এদেশের বহু স্থলে তিসির চাষ হয়ে থাকে। পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গেরও স্থানে স্থানে তিসি উৎপাদিত হয়। এর চাহিদা যত বাড়ছে, উৎপাদনও বাড়াবার চেষ্টা চলেছে সেই হারে। তিসির তেলের কয়েকটি বিশেষ গুণ লক্ষ্য করা যায়। রঙে ও বার্নিশের কাজে এইটি ব্যবহার করা হয়। ঐ তেল মিশ্রিত থাকলে রঙটা যথাসত্বর শুকিয়ে যায়, এটা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত। এই গুণটি থাকার জন্যে তিসির অর্থনৈতিক মূল্য ও ব্যবহারিক সমাদর নষ্ট হতে পারছে না। অন্যান্য শস্য উৎপাদনের বেলায় যেমন বীজ, সার, বপনপদ্ধতি এ সকলের দিকে নজর রাখতে হয়, তিসি চাষের ক্ষেত্রে সেই সকল চাই। চাষের উপযোগী জমি বা মাটি হলেই শুধু চলবে না, সেই জমিতে উত্তম সার দিতে হবে। বীজও বেশ উন্নত মানের সংগ্রহ করা আবশ্যক। মোটের ওপর, একর পিছু ফলন বর্ধিত করার লক্ষ্যটি সর্বোপরি থাকা চাই, ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যও যা একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় সরকার তিসি চাষের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন। ভালো বীজ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার, এগুলোর প্রয়োজনানুরূপ সরবরাহ যদি ঠিক থাকে, তা হলে তিসি উৎপাদন পূর্বের চেয়ে বেশি হওয়া কঠিন নয়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রঙ ও বার্নিশের কাজ বাড়ছে বই কমছে না। তিসির ব্যবহারও ক্রমে ব্যাপকতর হয়ে চলেছে। ফলন বৃদ্ধির দাবী পূরণের জন্যে উৎপাদন পদ্ধতির যেখানে যেরূপ রদবদলের প্রয়োজন হবে, তা না করলেও চলবে না। ভারতে জাত তিসি নতুন কি কাজে লাগানো যেতে পারে সেজন্যে গবেষণা-আলোচনা শেষ হয়ে যায় নি। তিসির তেল একটি সম্পদ—এই থেকে শিল্পে ব্যবহার্য উপকরণ উৎপাদনের ব্যবস্থা যত ভাবে হতে পারবে, ততই এর মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এর ভেতর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অবশ্য গবেষণা চালিয়ে কিছুটা সফলতা লাভ করেছেন। এই গবেষণা চালানো হয় হায়দ্রাবাদ জাতীয় গবেষণা ভবনে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদল সবজী তেল থেকে কতকগুলো উপকরণ তৈরীর অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন—যা বাইরেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কতক বছর আগে মার্কিন কৃষি-মন্ত্রণালয়ের দুইজন বিজ্ঞানী ভারত সফরে এসেছিলেন। তাঁরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়াদি দেখে-শুনে প্রশংসা না করে পারেন নি। তিসির তেল দিয়ে বার্নিশ, রঙ প্রভৃতি তৈরী হয়ে চলেছে দীর্ঘকাল থেকে। আরো অন্য ভাবে এর ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা চালনার জন্যে ভারতের জাতীয় গবেষণাগারের (হায়দ্রাবাদ) সঙ্গে মার্কিন কৃষি দপ্তরের একটি চুক্তি হয়। চুক্তির সর্তাবলীতে ঐ গবেষণালয়কে পাঁচ বছরের জন্যে আমেরিকার ১,১৪,১৪০৲ টাকা দেওয়ার কথা থাকে। মার্কিন বিজ্ঞানীদের অভিমত—ভারতীয় প্রক্রিয়ায় সবজী তেল যে-ক্ষেত্রে শক্ত বস্তুতে পরিণত হয়, সেই স্থলে একটি উপাদান (হাইড্রোক্সিল গ্রুপের) কম পরিমাণে প্রয়োগ করলে ঐ তেল কঠিন হয়ে পড়বে না, পরন্তু ক্যাষ্টর অয়েলের মত তা ঘন বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন ব্যাপারে এর ব্যবহার সম্ভবপর হবে। হায়দ্রাবাদের জাতীয় গবেষণা ভবনে তিসি তেল নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, জানা গেছে, এতে একটি একটি করে সফলতা জুটছেই। এই গবেষণা ব্যাপারে নেতৃত্ব করছেন ডাঃ কে, টি, আচারয়া। গবেষণায় দেখা গেছে—অপর একটি কৃষিজাত দ্রব্যের (লোধ্র তেল) সঙ্গে তিসি তেল যদি নিয়মানুযায়ী সংমিশ্রিত করা যায়, তা হলে নানা কৃত্রিম বস্তু উৎপাদন করা চলতে পারে। তিসির রকমারী ব্যবহার সম্ভবপর হলে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বাইরেও এর সমাদর বাড়বে, এ বলার অপেক্ষা রাখে না।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

ঘর ঢুকে তনুকাকে দেখে কিংশুক থমকে দাঁড়াল।

বীথি বললে—দাঁড়ালে কেন? ও আমাদের তনু, অচেনা ঠেকছে নাকি?

আমতা আমতা করে কিংশুক বললে—না অচেনা নয়, রোদ্দুর থেকে এলুম কি না তাই ঠিক—।

তনুকা—(মনে মনে) রোদ্দুর না ঘোড়ার ডিম! বীথির বেলায় রোদ্দুর নেই বুঝি।

—তারপর তনুকা কেমন আছ? মাসীমা ভাল আছেন,··· মেসোমশাই···

তনুকা গম্ভীরভাবে বললে—চিঠি লেখ তাহলেই সব জানতে পারবে।

বীথি হেসে বললে—তনু আজকাল বেশ কথা বলতে শিখছে।

দেঁতো-হাসি হেসে কিংশুক বললে—হেঁ-হেঁ···আচ্ছা আমি চলি। মহাবীরকে দরকার ছিল। তাও যখন নেই তখন···।

বীথি মনে মনে উৎফুল্ল হল, তনুকাকে দেখেই মহাবীরের কথাটা বলেছে। কি চালাক!

তনুকাও মনে মনে দাঁত কড়মড় করে বললে—কি বজ্জাত! আমাকে দেখেই মহাবীরের কথাটা বলছে। এ নিশ্চয় ও-মুখপুড়ীর শেখানো।

—আচ্ছা চলি···য়্যা। আর একদিন আসব'খন।···মহাবীরটা—বলে কিংশুক যাবার জন্যে পা বাড়াল।

এবার তনুকা ও বীথি একই সঙ্গে বললে—যাবে কেন?

বীথি বললে—ব'সো, মহাবীরবাবু এলেন বলে।

তনুকা বললে—আমি যাচ্ছি। ব'সো শুকদেবদা', বীথি তোমার জন্যে কলকাতা থেকে কত কি এনেছে দেখো। চলি···। বলে উঠে দাঁড়াল।

কিংশুক তাড়াতাড়ি বললে—না-না যেও না, ব'সো। বীথি বুঝি কলকাতায় গেছলে। আচ্ছা—বলে একরকম দৌড়েই বেরিয়ে গেল।

কিংশুক যাবার পর তনুকাও উঠে দাঁড়াল।

—চলি বীথি। যা জিনিস এনেছিস সেগুলো নিয়ে না হয় শুকদেবদা'র বাড়ীতেই যা।

তনুকা চলে যাবার পরও বীথি গোঁজ হয়ে বসে রইল। মনে মনে বললে—মুখপুড়ী মরতে আর দিন পেলে না, ঠিক আজকেই এলো।

একটু পরেই মহাবীর এল। মহাবীর একটু তফাতে বসে কিছুক্ষণ ভাল করে বীথিকে দেখে নিয়ে তারপর মোলায়েম স্বরে বললে—বসে আছ বুঝি?

ওর কথা শুনে বীথির হাসি পেল। সং? তারপর বললে, মহাবীরবাবু, আমায় একটা কাজ করে দেবেন?

কাজ করে দেব? একি কথা শুনি আজি বীথিরাণীর মুখে! মহাবীর প্রথমটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি। বীথির দিদিদের বিয়ে হয়ে যাবার পর এ-বাড়ীর কোনও তরুণী এ কথা মহাবীরকে জিজ্ঞেস করেনি। অথচ মহাবীর হাজরা কোনও কাজ করতে না পেরে ছটফট করে মরছে। আরাম যে সত্যিই হারাম হায়, তা নেতাদের বলবার অনেক আগেই ও জানতে পেরেছে।

বীথি আবার বললে—আপনাকে করতেই হবে, প্লীজ, করবেন বলুন।

প্লীজ! বীথি প্লীজ বললে! একসঙ্গে ডজন দুই কোকিল ডেকে উঠল, ঘরে দিনের বেলাতেই চাঁদের জ্যোৎস্না এসে আছড়ে পড়ল, হৃৎপিণ্ডটা ছোট ছেলের মত লাফালাফি সুরু করে দিলে। ফলে তোড়ে পাইপ দিয়ে জল নামলে যেমন আওয়াজ হয় বীথির কথার জবাব দিতে গিয়ে মহাবীরের গলা দিয়ে কেবলমাত্র সেই রকম আওয়াজ বের হল।

বীথি বুঝলে, কাজ হবে। বললে,—শুকদেবদা'কে কাল ধরে আনতে হবে।

—শুকদেবদা'!

—হ্যাঁ, আপনাদের কিংশুক।

কিংশুক! কোকিলের বদলে শত শত দাঁড়কাক ডেকে উঠল, এই কাজ! খিদের ঠেলায় যে সপ্ত-সমুদ্র পেটে পুরে হিমালয় পর্বতটিকে মুখশুদ্ধি হিসেবে গালে ফেলতে পারে তার সামনে কিনা এক গ্লাস ত্রিফলার জল এগিয়ে দেওয়া হল। শুকদেবদা'কে ধরে আনতে হবে। শেষকালে কিংশুক বৈরী হল। ওঃ! ভগবান!··· না, ভগবান নয়, ভগবান নেই। শুধু ওঃ! ও! ও হো-হো!!

রাগিণী প্রসাধনে ব্যস্ত, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তনুকা এল।

—গিনী, সর্বনাশ হয়েছে।

—কি সর্বনাশ হল? কেউ মারা গেছে?

—প্রায় সেই রকম।

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
Glucose
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
Kb
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০

—কে প্রায় মারা গেল ?
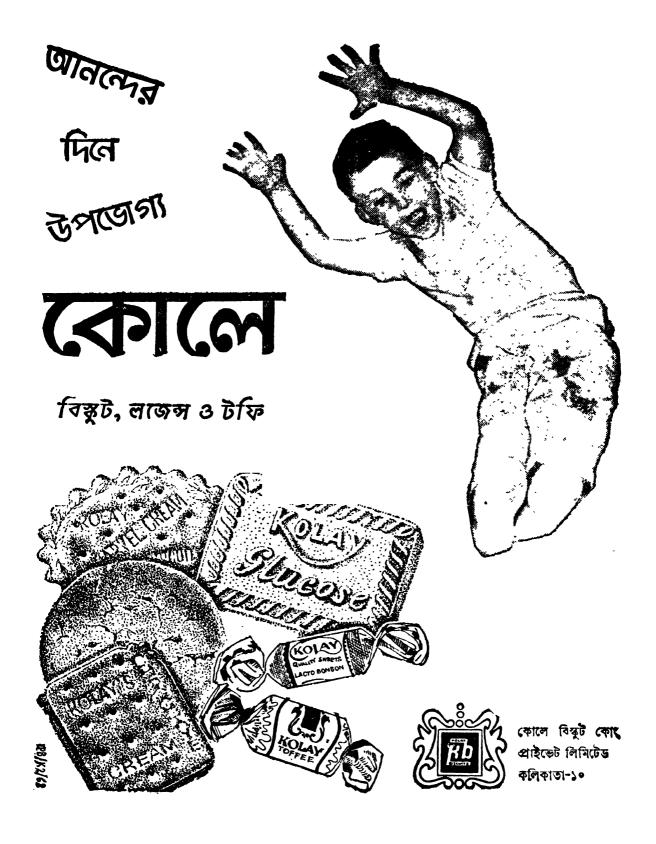
—ঠাট্টা নয়। তুই।

—আমি !—প্রসাধন অসমাপ্ত রেখে রাগিণী ঘুরে বসে বললে—কখন গেলুম ?

—ঠাট্টা নয়, সব শুনলে পর বুঝতে পারবি কখন গেছিস, কবে গেছিস।

—বল, তাহলে নিজের মৃত্যু-সংবাদটাই আগে শুনি তারপরে অন্য কাজ।

—বীথি সত্যিই কলকাতায় গিয়েছিল। আর শুকদেবদা'—।

—উহুঁ বীথি কলকাতায় যায় নি।

—তুই বললেই হবে ?

—হুঁ তাই হবে। তবে শোন, বীথি গিয়েছিল সুলতানপুরে ওর ছোড়দি'র কাছে, কলকাতায় নয়। শুকদেবদা' যা বলেছে তা বানানো কথা, আমাকে চটিয়ে দেবার জন্যে। তুই ঠিকই বলেছিলি।

—তবে যে বীথি আমায় বললে।

—কী বললে, কলকাতায় গেছে বলেছে কি ?

—না, তা বলেনি। তবে বললে যে, শুকদেবকে বারণ করলুম তবু সবাইকে বলে দিলে।

—মিথ্যে কথা বলেছে।

—মিথ্যে কথা বলেছে ? তুই কি করে জানলি ?

—যে করেই হোক জেনেছি। তুই ভাবিস্ না।

বীথি যে কলকাতায় যায় নি তা জেনেছে খেপীর কাছ থেকে। খেপী এসে বললে—খেংরা মারি অমন লেখাপড়ার মুখে। মা-মাগী বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে আর মেয়ে গেলেন সুলতানপুরে দিদির কাছে হাওয়া খেতে।

শৈলজা বললেন—কার কথা বলছিস্ ?

—বলছি ঐ খেষ্টান মোড়লের মেয়ের কথা। পশুর-মা মোড়ল গিন্নীকে দেখতে গেছল, এসে বললে।

কথাটা ওপর থেকে রাগিণীও শুনেছিল। পশুর-মা আর খেপীর খবর একেবারে হাঁড়ির খবর।

তমুকা গম্ভীর ভাবে বললে—কিন্তু শুকদেবদা' যে ও বাড়ীতে নিত্য যায় তা কি জানিস্ ?

—যাক্‌গে। ডুবুক।

—ডুবুক ! তুই লাইটলি কথাটা বলতে পারলি।

—হুঁ পারলুম। বেশ তো তুই না হয় সিরিয়াসলি জলে ঝাঁপিয়ে পড়, ওকে টেনে তোল।

কথাটা রাগিণী বললে বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভাবনা হল। ও বাড়ীতে যাতায়াত আছে একথাটা ত' মামী-বৌদি বললে না। হয়ত কোনও কাজে গেছে। বীথির বাবা ত' ওদের প্রফেসর। কিংবা ওর বন্ধু মহাবীর সে ত' শুনেছি দু'বেলা ও বাড়ীতে যাতায়াত করে তার সঙ্গেও যেতে পারে। রাগিণী আবার তমুকাকে বললে—কিছু ভাবিস না তমু, ও জব্দ করবার জন্যে অমন করছে। আর সত্যি যদি তয় তাহলে ওকে ছেড়ে দেব ভাবছিস, এমন জব্দ করব যে মজা টের পাবে। নে আর ভাবতে হবে না তোকে। তেঁতুলের আচার খাবি।

নীচে থেকে কাজলের গলা শোনা গেল—মামীমা, মামীমা গো।

তমুকা উঠে পড়ে বললে—ঐ তোমার জব্দ এসেছে। তোমারে জ্বালাবে যে নীচেতে এসেছে সে।

আমি পালাই তেঁতুলের আচার আর এক সময় এসে খাবো'খন।

—যাসনি ভাই তমু, আচ্ছা মনে থাকে যেন।

তমুকা চলে গেল। কি ভাবে কাজলকে ভাগাবে তাই রাগিণী ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ অনুপমা এল। রাগিণী বেঁচে গেল। কাজলও এল এবং এসে অনুপমাকে দেখে সুবিধে হবে না বুঝে চলে গেল।

কাজল চলে গেলে অনুপমা রাগিণীর চিবুক ধরে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল'। রাগিণী লজ্জা পেয়ে বললে—কি দেখছ ?

—না, শুকদেব ঠাকুরপোর নজর আছে। সত্যিই তালশাঁসের মত।

রাগিণী বিস্মিত হয়ে বললে—তালশাঁস।

অনুপমা রাগিণীর চিবুক নেড়ে বললে—হ্যাঁ-গো তালশাঁস। শুকদেব ঠাকুরপো তার বন্ধুদের কাছে বলেছে রাগিণীর থুতনীটা তালশাঁসের মত। তাই তো ভাবছি থুতনী যদি তালশাঁস হয়—বলে রাগিণীর কানে কানে কি যেন ফিসফিস করে বললে।

রাগিণী অনুপমার হাতে চিমটি কেটে বললে—মামী-বৌদি, ভাল হবে না বলছি।

তা আমায় চিমটি কাটলে কি হবে। বলে রাগিণীর গাল টিপে দিয়ে বললে—এ জিনিষ কেউ ভাল না বেসে পারে। আমি মেয়ে-মানুষ আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে, তা শুকদেব ঠাকুরপো যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি···অবশ্য শুধু শুকদেব ঠাকুরপোই পাগল হয়নি আরও একজন তার জন্যে পাগল হয়েছে।

—একজনের দায় পড়েছে কারুর জন্যে পাগল হতে।—বলে রাগিণী মুখ ফেরালে।

—বটে ! দোষ নাকি বীথিকে লেলিয়ে।

—দিতে হবে না। তোমার শুকদেব ঠাকুরপোর সে বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত আছে।

—সেইজন্যেই বুঝি অভিমান হয়েছে।···কি শ্রীমতীর মুখে যে আর কথা নেই। বোকা কোথাকার। বুঝতে পারছিস না কেন যায়। ওটা তোর ওপর রাগ করে, তোকে ডোণ্টকেয়ার করার জন্যে যায়। একবার ডেকে দেখ, ছুটে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু খবরদার ডাকতে পারবি না। দিনকতক নাকের জলে চোখের জলে হোক। তোর দাম নেই। সেদিন তো নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলি, ঋষ্যশৃঙ্গমুনি হয়ে মুখ ফিরিয়ে ছিল কেন ? নিজের পাওনা বুঝে নিলেই পারতো। খবরদার গিনী রাশ আলগা দিবিনি।—বলে আরও কিছুক্ষণ বক্ বক্ করে অনুপমা চলে গেল।

রাতে খেতে খেতে রাগিণী মাকে বললে—পাশ করলে আমি আর কলকাতায় যাব না, এখানকার কলেজে পড়ব।

—ও-মা সে কি কথা ! এখানের আবার কলেজ তার আবার পড়া।

—কেন সেণ্টপিটার'স কলেজ, কলকাতার কলেজেরই ব্রাঞ্চ ওটা, কত ভাল কলেজ।

—যা ইচ্ছে তাই কর। সুসাইটিতে তোমার জন্তে আর মুখ দেখানো যাবে না দেখছি।

ঠোঁট ফুলিয়ে রাগিণী বললে—সবাই এখানে থাকবে আর আমার বুঝি সেখানে একলা থাকতে ভাল লাগে।

শৈলজার খটকা লাগল—সবাই এখানে। একথাটা আগে মেয়ের মুখে শোনা যায়নি। একটু ভাবতেই সবাইর অর্থ শৈলজার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শৈলজা খুশী হলেন, কাজলকে তাহলে মেয়ের মনে ধরেছে। তাই মেয়েকে আজকাল ঢের বেশী হাসিখুশী দেখায়। আহা, তা দেখাবে না, যে বয়সের যা।

৭

পড়ার ঘরে কিংশুক একলা আছে দেখে মহাবীর আশ্বস্ত হল। বাঁচা গেল নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে। বললে—বিয়ে দেবার কত্তেগুলো আসেনি দেখছি। ভাল কথা তুই প্রফেসার মণ্ডলের বাড়ী গিছলি?

—হ্যাঁ মামা বললে—।

—মামাই তোকে পাবে।

—তোকে খুঁজতে গিয়েছিলুম।

—আমায় খুঁজতে ওখানে কেন? ভূ-ভারতে আর জায়গা ছিল না?

—মামার দরকার। বললে ওখানে একবার ঢুঁ মেরে আয়, পাবি।

—মামার লেজকাটা তাই চাইছে সবারই লেজ কাটুক। মাসকেলটাকে ঝুলিয়েছে আমাকে পারবে না, তাই তোর ওপর যাকে বলে 'বম্বার্ডমেণ্ট অব ভাচু´ন' তাই হচ্ছে। আমি আর কত আগলাবো? কচি খোকাটি তো আর নস যে সবসময় ট্যাঁকে করে রাখবো। যা ইচ্ছে তাই কর। হ্যাঁ, কাল একবার ও বাড়ীতে যেও।

—কেন?

—চা খেতে। মিস মণ্ডল মানে বীথি বলেছে। নিজেই আসতো, একবার ভাবলুম আসুক তুই ডুববি বলে পাঁচজনের কথায় ডিটারমিণ্ড আমি কেন বাধা দিই। পারলুম না। তোকে ত জানি ভালমানুষ যেমন নাচিয়েছে তেমনি নেচেছিস। তাই ভাবলুম দেখি একটা লাষ্ট য়্যাটেম্পট নিয়ে। বীথিকে ঠেকিয়ে এলুম।

—গেলুম তোকে ডাকতে অমনি চা খাবার নেমন্তন্ন।

মহাবীর হেসে বললে—তাহলেই বোঝ মহাবীর হাজরা যা বলে তা সত্যি কিনা। ম্যানইটারস অব কুমায়ুনের হাত থেকে বাঁচা যায় কিন্তু ম্যান-কিলার তা সে যেখানকারই হোক—ধরলে আর রক্ষে নেই, নেভার। এরপর কি হবে তা আগে থেকে বলে দিতে পারি।

—কি হবে?

—কর্ণেল বি ঘোষ রেজিমেণ্টে যাকে আড়ালে সবাই বলত বুনো ঘোষ তার ছেলে পানতুয়া বাপের বেটা কি চেহারা, তার কি হাল হয়েছে!
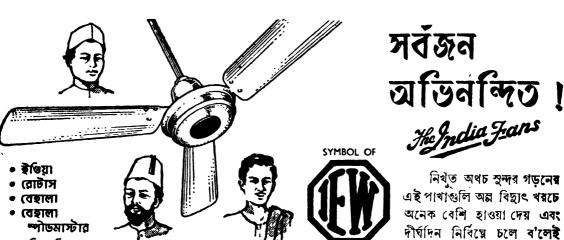
—জানিনা ত'। রোগা হয়ে গেছে বুঝি?

—রোগা হবে কেন। বীথির ছোড়দি নীতকে বিয়ে করেনি?

—ওঃ, এই কথা, হ্যাঁ সে ত' জানি।

—কয়ত না। হি ওয়াজ ফোর্স'ড টু ম্যারি। চা খাবার পর থেকে সুরু। আলাপ জমে উঠল। নীতি রাশ আলগা দিলে পানতুয়া লিবার্টি নিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল লাঞ্চ, ডিনার, সাপার তারপরেই সাফারিং। তদ্দিনে নীতি সিঙ্গল লাইফ থেকে ডবল লাইফ হয়েছে, কোর্ট অবধি ধাওয়া হয় আর কি, চেপে যা নেত্য চেপে যা। আর চেপে যা। বাধ্য হল বিয়ে করতে। একেবারে প্রি-প্ল্যানড্। কই ব্রাদার আমায় তো নেমন্তন্ন করে না। বলতে গেলে প্রায়ই যন্ড, নো নট। প্রায়ই ভারটুয়ালি ডেলি যাই, জানে এ ভেরী হার্ড নাট। দুদিন কাছে পিঠে ঘুর ঘুর করেছিল। স্ট্রেট বললুম লুক হিয়ার, আই য়্যাম নট ইনটারেস্টেড ইন ইওর ফিজিক্যাল জাগলারি। ইয়েস ইন সো মেনি ওয়ার্ডস বললুম। জাগলারি কথাটার মানে জানে না য়্যা য়্যা করতে লাগলো। তারপরের দিন থেকে টিট। কিন্তু তোকে, ডোণ্ট মাইণ্ড এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ইনভাইট করেছে।

কিংশুক চটে গেল, বললে—তুই-ই জার্ম কেরিয়ার, ইনভিটেশান বয়ে নিয়ে এলি।

—যাও ঠেলা যত দোষ নন্দ ঘোষ। বীথি মণ্ডল তোর বাড়ী এসে নেমন্তন্ন করলে বুঝি খুব ভালো হত? যাই পিসীকে খবরটা দিয়ে বীথিকে বলে আসি তুমি বাপু নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসো। আমার কম্মো নয়।

কিংশুক আমতা আমতা করে বললে—সব জেনে শুনে কাটাতে পারলি না, তুইই যদি না পারিস তাহলে আর—।

—তাহলেই বুঝছো কে জার্ম-কেরিয়ার? ঐ মামা। যা হোক কাল একবার গিয়ে বুড়ী ছুঁয়ে এসো, আবার যদি আসতে বলে স্ট্রেট না বলবে, এ বিগ ফুল মাউথ নো—ও।

—তুই থাকবি তো।

—ক্ষেপেছিস, বলছিল স্ট্রেট বললুম মাপ করবেন আমার সময় নেই, আপনাদের এখানে আসি স্রেফ প্রফেসার মণ্ডলের জন্তে, নষ্ট করবার মত সময় আমার ডিসপোসালে নেই। বলতে চেয়েছিলুম মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে নষ্ট করাব মত সময় আমার নেই, বললুম না চেপে গেলুম।

—আমি যাব না।
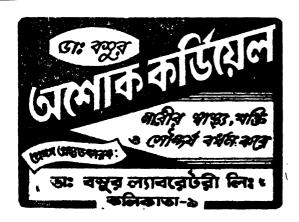
মহাবীর শঙ্কিত হল। বীথি স্পষ্টই বলেছে, শুকদেবদাকে যদি না ধরে আনতে পারেন তাহলে আপনার সঙ্গে এ জন্মে কথা বলব না। শুধু তাই নয় ভাল কেকও এনে দিতে হবে।

—না না যাবি না কেন? না যাওয়াটা মোটেই ম্যানলি হবে না, ওকি, ছিঃ। তুই পুরুষ মানুষ না। সেকেণ্ড টাইম বললে নো-ও। এবারটা যাস্। বেশী কথাবার্তা কইবি নে, কে জানে কোন কথায় কি কথা আসে। মামাটামাকে বলে কাজ নেই, এমনিতেই কি হয় বলা যায় না, ঢাকে কাটি দিয়ে দরকার কি। আর দেখ তোর সঙ্গে ডিসকাশন করলুম এসব আর কারুকে বলিসনি। সব ভ্যাম্প, ব্লাড সাকার, চলি।

—বস না, সবাই এলো বলে।

—না না গণির দোকানে যেতে হবে, এরপর খোলা পাব না। চেয়েছিল রামঠাকুরের রুটি দিয়ে কাজ সারতে: আমি বললুম তা হবে না, গণির কেক চাই, কোঁকটে বিস্কুট খাইয়ে পার্টি দিলুম বলে নাম কিনবে তা হবে না। মালকড়ি খসাতে হ'বে। কিছু খসুক, তোমার লোক না থাকে আমি যাব। কেঁচোর টোপ দিয়ে পাকা রুই গাঁথতে চাও? মাইরি আর কি, তুই যেন আবার গণির কেক দেখে গপাৎ করে টোপ গিলে ফেলিসনি, যাস্, সাড়ে পাঁচটা ছটা নাগাদ, পনের মিনিটের ব্যাপার, যদি ম্যানেজ করতে পারি যাব'খন।

মহাবীর চলে যাবার পর মামা এল।

—কোথায় ছিলি? বাড়ীতে পেলুম না।

—ঠাকুরখুড়োর বাড়ী গিছলুম। তারপর ওদিককার খবর কি?

সব খবর, বলবার পর কিংশুক বললে—কি গেরোয় ফেললি বল দেখি।

—তা বৃহৎ ব্যাপারে অমন একটু আধটু গেরোয় পড়তে হয়। নিজের নাক না কাটলে পরের যাত্রাভঙ্গ করা যায় না।

—বীথিকে টিট করতে গিয়ে নিজে টিট হচ্ছি। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় কে জানে।

—টিট কোথায়! দিব্যি চা-কেক ওড়াবে তারপর স্রেফ মাটিয়ে যাবে ও মুখো হবে না, রাস্তার জল ঠিক নর্দমায় পড়বে। আর যদি দেখিস বড্ড এলোমেলো বলছে তুইও ক্যাবলা সেজে আল্টু বাল্টু যা প্রাণে চায় বলবি। মোদ্দা কথা হচ্ছে ওকে বেশী ট্যাঁ ফুঁ করতে দিবিনি। আর হ্যাঁ শশী কবরেজের মেয়ে ছিল বললি ত'।

—হ্যাঁ।

—তবে আর দেখতে হবে না, এতক্ষণে রাগিণীর কানে খবর পৌঁছে গেছে। ওর এখন সেই যে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর হাল বলে না সেই অবস্থা।

—ছি, ছি, রাগিণী কি ভাবছে।

—রাগিণী?

—মানে রাগিণীরা তার মা, অমুকা কি খুড়ীমাকে না বলে ছেড়েছে। রাগিণী কি ভাবছে কে জানে।

মামা বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে—ঘণ্টা ভাবছে, তোর সামনে যে কাজল ছোঁড়ার সঙ্গে অত ফষ্টিনষ্টি করলে তা তুই কিছু ভাবছিস

—না, মানে আমার এমন রাগ হচ্ছিল, আমার সামনে—।

—কেন? তোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি না করে কাজলের সঙ্গে করছিল বলে।

—তোদের খালি ঐ একব'গা চিন্তা।

—চিন্তার আর দোষ কি বল, কে কোথায় কি করলে আর তুই রেগে উঠলি, তাতেই মনে হয় যে—থাকগে তুই আবার চটে যাচ্ছিস। থাকগে দুর্গা দুর্গা বলে প্রফেসারের বাড়ী ঘুরে এসো দেখি।

সাড়ে পাঁচটার কিছু আগেই কিংশুক বীথিদের বাড়ী হাজির হ'ল। মনের ভাবটা চা পানের পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে আলোয় আলোয় ফিরে যাবে। বীথি বোধ হয় আগে থেকেই ওকে আসতে দেখেছিল, দরজায় পা দিতে না দিতেই পাকড়াও করে ড্রইংরুমে নিয়ে কৌচ বসিয়ে পাশে বসে বললে—ওঃ! কখন থেকে ঘর বার করছি। চারটে বেজে গেল অথচ এলে না দেখে ভাবলুম নিশ্চয় আসবে না, মহাবীরের ওপর এমন রাগ হচ্ছিল।

—কেন?

—হবে না? ঐ ত' আমায় যেতে দিলে না। বললে কিংশুকেরা ভারী কনসারভেটিভ আগের চাইতে আরও গোঁড়া হয়েছে, ওর মা দীক্ষা নিয়েছে কি না। তার ওপর ওর পিসীমা অনবরত ধোয়া-মোছা করে করে জাত চক্কুকে রাখছে। লোকটা ফাজি তাই না। এমন সব কথা বলে। আরও বললে—তুমি গেলে কিছুতেই আসবে না। আমি চুপি চুপি বলে আসবখন। ভাবলুম হবেও বা নেটিভরা ভীষণ গোঁড়া হয়ে থাকে। তোমরা নাকি চা অবধি খাওনা আজকাল। কি খাও তুলসীপাতা সেদ্ধ?

—কে বললে চা খাই না? মহাবীর?

—হ্যাঁ, ঐ তো বললে চা খাওয়া তো দূরের কথা এখানকার কিছু ছুঁলেও নাকি তোমাকে বাড়ী গিয়ে চান করতে হবে আরও কি কি সব বিচ্ছিরি জিনিষ খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সত্যি?

—ধ্যেৎ বাজে কথা।

—ছুঁলে জাত যাবে না।

—জাত যাবে কেন?

—আমাকে ছুঁলেও না।

—বাঃ।

বাঁ হাতটা সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কিছুটা এগিয়ে দিয়ে বীথি বললে—ছোঁও দেখি।

কিংশুক মনে মনে বললে—এটা প্ল্যানড না প্রি-প্ল্যানড? উঁহু মনে হচ্ছে য়্যাক্সিডেণ্টাল কথার পৃষ্ঠে এসেছে। যেমন নেতারা জুতোর দোকান খুলতে গিয়ে শিশু মড়কের কথা বলে।

—কই ছোঁও। নাঃ মহাবীরবাবু ঠিকই বলছে।

—এই তো একটু আগে হাত ধরে নিয়ে এলে।

—ওতো আমি ধরে এনেছি, তুমি তো ধর নি, তুমি জান অন্যে ধরলে জাত যায় না।

কিংশুক হেসে যেন বল সঞ্চয় করে নিয়ে বললে—না, তা হবে কেন। বাঃ···তাই কখন···এই···এই তো ছুঁয়েছি।

হাত তো নয় যেন এ-সি কারেন্ট টেনে নিলে। ভেতরে ভেতরে ঘামলেও মুখের হাসিটি অব্যাহত রেখে কিংশুক বললে—কই জাত তো গেল না, হাতটা এবারে···

চাকরটাকে আসতে দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট অফ হওয়াতে কিংশুক নিষ্কৃতি পেয়ে হাত টেনে নিলে। মনে মনে বললে—এটা কি র‍্যাক···।

সঙ্গে সঙ্গে মহাবীরের মুখটা মানসপটে ভেসে উঠে বললে—নো, এ বিগ ফুল মাউথ নো-ও।

চাকর খাবার সাজিয়ে চলে গেল।

—কিছু ফেলে রাখতে পারবে না, কেক, চপ, সব খেতে হবে। এই চপটা খেয়ে দেখ তোমাদের পবিত্র পাঞ্জাবী হোটেলের চপ-এর চেয়ে খারাপ নয়। আমি নিজে বানিয়েছি।

চপ, ও কেক দুই-ই কেনা। মহাবীর এনে দিয়েছে। দাম অবশ্য এখনও পায় নি।

বীথি বললে—কাল যেই বাবা শুনলেন তুমি চা অবধি খাওনি, আমায় কি বকুনিটাই না দিলেন। শেষে যখন বললুম তাড়াতাড়ি ছিল বলে তুমি চলে গেছ আজ আসবে, তখন চুপ করলেন। জান তো উনি ষ্টুডেণ্টদের কি রকম ভালবাসেন, নাও খাও।

—স্যার কোথায়? খেতে খেতে কিংশুক বললে।

—চার্চের রিলিফ কমিটির মিটিং-এ গেছেন। এলেন বলে। মা ওপরে শুয়ে আছেন। জান নীচে এখন আর কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি।

চপ খেতে খেতে কিংশুক বললে—আর ঐ চাকরটা, কি নাম যেন, আচ্ছা ও কি কষাইগু-হ্যাণ্ড রান্নাও করে।

—আঃ, ও তো বাইরের লোক।

—ওঃ, রাত্তিরে এখানে থাকে না বুঝি।

কিংশুক দেখলে হাতের গোড়ায় একটা কথা বলার মত জিনিষ পাওয়া গেছে ঐ চাকরের কথা বলে সময় কাটিয়ে কোনরকমে চা গিলে পালাতে হবে। মহাবীর ঠিকই বলেছে সব প্রি-প্ল্যানড।

—ওর কথা ছেড়ে দাও না।

—বাঃ চাকরের কথা ছেড়ে দেওয়া যায়, ওরা না থাকলে কে চা করে দেবে।

—কেন আমি দেব।

—তুমি?

—হ্যাঁ তোমার আমি।

কিংশুকের টনক নড়ে উঠলো। এই দেখ কি কথার পিঠে কি কথা এলো। আবার মহাবীরের কথা মনে পড়লো "বেশী কথা কইবি নি, কি কথার পিঠে কি কথা আসে কে বলতে পারে।" কিন্তু বললুম চাকরের কথা, গিয়ে দাঁড়াল আমিতে! এ যে ভারী বিপদ হল। কথা বললেও আমি না বললেও আমি। মহাবীর ঠিকই বলেছিল।

[ক্রমশ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকৃষ্ণ বসু

পরের রবিবারে যখন দু'টি গাড়িতে পাঁচজন কুস্তিগীর রওনা হলেন মেটিয়াবুরুজে বাদশা পালোয়ানের বিখ্যাত কুস্তির আখড়া অভিমুখে, তখনো আকাশে ভোরের আলো দেখা দিতে শুরু করেনি বটে, কিন্তু শুরু করতে আর খুব বেশী দেরি করবে না বলে আভাসে ইঙ্গিতে জানানী দিয়েছে।

এই কুস্তিগীর দলের অধিনায়ক 'কাঠ-পালোয়ান' চানুবাবু, অর্থাৎ টিম্বার-মার্চেন্ট চাঁদমোহন দাস এবং সহ অধিনায়ক 'পালোয়ান এ্যাটর্নী' নটবর মিত্তির। কুস্তিগীর-বাহী গাড়ি দু'খানার মালিক এঁরা দু'জন। এঁরা দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে চলেছিলেন এক গাড়িতে; বাকি তিনজন কুস্তিগীর চলেছিল বাকি গাড়িটিতে—তারা উঠতি জোয়ান, তাদের দেহে আর মনে যৌবনের জোয়ার।

অন্ধকার থাকতেই রওনা হবার উদ্দেশ্য বাদশা পালোয়ানের আখড়ায় গিয়ে একটু আগেই পৌঁছনো, যেন কুস্তির লড়াই শুরু হবার আগে ওখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের একটু অভ্যস্ত করে নেবার সময় পাওয়া যায়। হলোই বা মিতালির দঙ্গল, আপোষের লড়াই; পেশাদারী বা প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা কিছু নয়, তবু প্রতিযোগিতা তো বটে। বাদশা পালোয়ানের কুস্তির আখড়ায় সেই আখড়ারই কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়বে চানুবাবুর আখড়ার কুস্তিগীরেরা, দোস্তির দঙ্গল হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইজ্জতের প্রশ্ন। তাই ভাবনা একটু রয়েছে চানুবাবুর মনে: পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরের মনেও কিছুটা।

দ্রুতগতিতে চলছিল না গাড়ি, চলছিল সহজ মাঝারি গতিতেই; এই গতিই যথেষ্ট হবে যথাকালে মেটিয়াবুরুজের আখড়ায় পৌঁছবার পক্ষে, সে কথা জানতেন চানুবাবু। বাদশা পালোয়ানের আখড়ায় যাওয়া এই তাঁর প্রথম নয়।

"বাদশা পালোয়ানের এই হঠাৎ খেয়ালের মানেটা কি, চানুদা?" প্রশ্ন করলেন এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির।

"এটা পালোয়ানের ঠিক হঠাৎ খেয়াল নয়, মিত্তির।" বললেন চানুবাবু। "কিছুদিন ধরেই পালোয়ান আমায় বলছিলেন আমার আখড়ায় যারা লড়তে আসে, তাদের মাঝে মাঝে ওঁর আখড়ায় নিয়ে গিয়ে কুস্তি লড়াতে। কারণ শুধু নিজেদের আখড়ায় কুস্তি লড়লে সাহস বাড়ে না, অভিজ্ঞতা বাড়ে না। দক্ষতাও কম বাড়ে।"

বিস্মিত হয়ে নটবর মিত্তির বললেন, "ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, খাপছাড়া ঠেকছে না চানুদা? আমাদের আখড়ার কুস্তিগীরদের সাহস, অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা বাড়াবার জন্য মেটিয়াবুরুজের বাদশা পালোয়ানের মাথাব্যথা হতে যাবে কেন? এত বেশী উদারতাকে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ বলে সন্দেহ হয় নাকি?"

চানুবাবু হেসে বললেন, "তোমার পক্ষে অমন সন্দেহ

হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় মিত্তির, কারণ বাদশা পালোয়ানকে তুমি চেনো না, জানো না তাঁর চরিত্র, জানো না তাঁর জীবনের বিচিত্র কাহিনী।"

সত্যিই জানতেন না নটবর মিত্তির। কুস্তি জগতের কথায় বা কাহিনীতে উৎসাহ ছিল না তার। উৎসাহ ছিল শুধু কুস্তি লড়তে।

"বাদশা পালোয়ানের বিচিত্র কাহিনী তুমি জানো না মিত্তির।" বললেন ছানুবাবু। "সেই গোপন কাহিনী বাদশা পালোয়ানের সেরা সাগরেদরাও জানে না, আমি জানি।"

"কি করে?"

"পালোয়ানই আমাকে শুনিয়েছেন নিজের মুখে।" বললেন ছানুবাবু। "তাঁর জীবনের এক গভীর কলঙ্কের কাহিনী। খানিকটা—হ্যাঁ, বেশ খানিকটা নোংরামি আছে কাহিনীতে, ছেলে-ছোকরার সামনে বলার মতো নয়। ছোকরা নওজোয়ানরা পিছনের গাড়িতে রয়েছে, সুতরাং এ গাড়ীতে তোমাকে শোনাতে কোনো বাধা নেই। শুনতে চাও তো সংক্ষেপে শোনাতে পারি, মিত্তির।"

"থাক ছানুদা। নোংরা কলঙ্কের কাহিনী যখন, নাই বা শুনলাম।" বললেন নটবর মিত্তির। "এ্যাটর্নীগিরির জগতে অনেক কেচ্ছা শুনতে হয়, তার বাইরে আরো শুনে দরকার নেই।"

কিন্তু দেখা গেল বাদশা পালোয়ানের নোংরা কলঙ্কের কাহিনী শুনতে নটবর মিত্তির অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ছানুবাবু, ভাবটা যেন মিত্তির এ্যাটর্নী পরম তাচ্ছিল্যে অপমান করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় কুস্তি ওস্তাদ বাদশা পালোয়ানকে, তাঁর কলঙ্ক কাহিনী শুনতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

"কিন্তু ঐ নোংরা কলঙ্কের কাহিনী যদি তোমায় না শোনাই, মিত্তির, তা হলে পালোয়ানের উদার চরিত্রের রহস্যটুকু যে তোমায় কিছুতেই বোঝাতে পারব না।" বললেন ছানুবাবু। "জীবনে ঐ নোংরা অধ্যায়টুকু না ঘটলে বাদশা পালোয়ানের চরিত্র এমন মহৎ আর উদার হত না। হতে পারত না।"

"হেঁয়ালি মনে হচ্ছে, ছানুদা।"

"কাহিনীটা শুনলে আর তা মনে হবে না মিত্তির।"

অগত্যা, যেন বাধ্য হয়েই নটবর মিত্তির নিজেকে ছানুবাবুর কৃপার ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "বলুন তাহলে। বাদশা পালোয়ানের রাজ্যেই যাচ্ছি যখন, তখন বাদশা-চরিত একটু জেনেই যাই।"

তখন খুশী হয়ে ছানুবাবু বলতে শুরু করলেন বাদশা পালোয়ানের অতীত জীবনের নোংরা কলঙ্কের কাহিনী।

"আজ ষাট বছর বয়সেও যে শরীর আর শক্তি বজায় রেখেছেন পালোয়ান, তা থেকে খানিকটা আন্দাজ করা যায় যৌবন কালে তিনি কি ছিলেন।" বলতে লাগলেন কাঠ-পালোয়ান ছানুবাবু। "তখনো তাঁর নামের সঙ্গে পালোয়ান যুক্ত হয় নি, তখন তিনি শুধু বাদশা, তখনকার নামী মল্লগুরু বসির পালোয়ানের পেয়ারের সাগরেদ। বসির পালোয়ানের তখন বয়স হয়েছে, মল্ল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু তার আগে ছিল তাঁর দুরন্ত দাপট, কোন দঙ্গলে পাঁচ মিনিটের বেশী তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি বাংলার কোনো পালোয়ান, ওরি ভেতরে হার না মেনে উপায় থাকেনি বসির পালোয়ানের কাছে। দঙ্গলের পর দঙ্গল জিতে জিতে শেষ পর্যন্ত বসির পালোয়ান হয়েছিলেন রুস্তম-এ-বঙ্গাল, সারা বাংলার কুস্তি চ্যাম্পিয়ন। আর তখনকার বাংলা মানে এখনকার ছোট্ট বাংলা দেশ নয়। ভারতের অনেকখানি এলাকা জুড়ে বিরাট বাংলা। এই রুস্তম-এ-বঙ্গাল বসির পালোয়ানের সেরা সাগরেদ বাদশা নামে এক তরুণ, তার সারা দেহে মনে যৌবন-জলতরঙ্গ।"

কাঠের ব্যবসাদার কাঠ-পালোয়ান হলে হবে কি, কাঠের মতো শুক্‌নো ছিলেন না ছানুবাবু, রস প্রচুর ছিল তার ভেতরে, বাইরে থেকে যা সব সময়ে বা সহজে টের পাওয়া যেত না।

"বলা বাহুল্য, সেদিনের সেই যুবক বাদশাই আজকের মল্লগুরু বাদশা পালোয়ান।" বললেন ছানুবাবু। "কুস্তি জগতে খ্যাতি রটল বসির পালোয়ানের নাম রাখবে তাঁর সাচ্চা সাগরেদ বাদশা, ভবিষ্যতে রুস্তম-এ-বঙ্গাল হয়ে। যেমন মজবুত জোয়ান, তেমনি সুন্দর সুপুরুষ, লম্বা চওড়া গৌরবরণ বাদশা সাগরেদকে ভীষণ রকম ভালোবাসতেন রুস্তম-এ-বঙ্গাল বসির পালোয়ান। কারণ তিনিও আশা করতেন তাঁর এই অসাধারণ সাগরেদই হবে তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।"

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

"তাই তো হয়েছেনও বোধ হয়।" বললেন নটবর মিত্তির, এ্যাটর্নী।

"হয়েছেন। কিন্তু তারি সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক, যার দাগ আজো মন থেকে মোছেনি বাদ্‌শা পালোয়ানের।" বললেন কাঠ-পালোয়ান ছানুবাবু।

এইবারে সত্যি সত্যি উদগ্র হয়ে উঠল পালোয়ান এ্যাটর্নী নটবর মিত্তিরের কৌতূহল। তিনি সাগ্রহে বললেন, "বলুন সেই কাহিনী, ছানুদা।"

ছানুবাবু তখন শোনাতে শুরু করলেন বাদ্‌শা পালোয়ানের জীবনের সেই গভীরতম কলঙ্কের কাহিনী। বললেন "এই কলঙ্ক-কাহিনীর নায়িকা ছিল আশ্চর্য রূপসী তহমিনা, যার দেহে ছিল ভারতীয় আর অভারতীয় রক্তের মিশ্রণ।"

কাহিনী এই পর্যন্ত শুনিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে লাগলেন ৺নটবর মিত্তিরের বৃদ্ধ বংশধর ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির। অম্বুরী তামাকের অমৃতময় ধোঁয়া গাল ভরে উপভোগ করলেন কিছুক্ষণ নীরবে।

আমিও নীরব রইলাম কিছুক্ষণ। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলেছেন বৃদ্ধ, তাঁকে একটু বিশ্রাম দেওয়া অত্যাবশ্যক, এইটে অনুভব করলাম মনে মনে। তারপর যখন মনে হ'ল তাঁর বিশ্রাম যথেষ্ট হয়ে গেছে, এখন কৌতূহল দেখানো যেতে পারে এবং তা না দেখালেই হয় তো তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন, তখন বেশ আগ্রহের সুরেই প্রশ্ন করলাম "তারপর আপনার বাবাকে ছানুবাবু কি কাহিনী শোনালেন?"

নিমাই মিত্তির বললেন, "সেই শেষ রাতে অথবা প্রথম প্রত্যূষে বাদ্‌শা পালোয়ানের কুস্তির আখড়ায় যেতে যেতে গাড়িতে বসে বাবাকে ছানুবাবু যা শুনিয়েছিলেন তা তো ঠিক কাহিনী নয়, কাহিনীর ইঙ্গিত বা চুম্বক মাত্র। কারণ সেদিন কাহিনী শোনাবার মতো যথেষ্ট সময়ও হাতে ছিল না ছানু বাবুর; তাছাড়া—বুঝতেই পারছেন—কাহিনীটাও ঠিক কুস্তি লড়তে যাবার আগে রসিয়ে রসিয়ে সবিস্তারে বলার বা শোনার মতো কাহিনী নয়। এ কাহিনী ছানুবাবু পরে পুরোপুরি শুনিয়েছিলেন বাবাকে।"

"আর আপনি শুনেছিলেন আপনার বাবার মুখে?" শুধালাম আমি।

নিমাই মিত্তির বললেন, "খেপেছেন? বাঘা এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির বেশী কথা কইতেন না, গুরুগাম্ভীর্য বজায় রাখবার দিকে তাঁর বরাবর ঝোঁক ছিল, বলেছি না আপনাকে?"

"বলেছেন।"

"সেই পুরো কাহিনী বাবা আমাকে বলেন নি, কাউকেই বলেন নি, লিখে রেখেছিলেন তাঁর ডায়েরি খাতায়।"

"তাঁর বুঝি ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল?"

"নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন বাবা। গোপনে।" বললেন নিমাই মিত্তির। "অবশ্য রোজ নয়; লেখার মতো কিছু থাকলে তবেই লিখতেন, নচেৎ নয়। মাও জানতেন না এই ডায়েরির কথা। না জেনেই তিনি স্বর্গে চলে গিয়েছিলেন। আর আমি জেনেছিলাম বাবার মৃত্যুদিনে, বাবারই মুখে শুনে।"

"তারপর?"

"তারপর অনেক বছর ধরে বাবার লেখা সেই সব ডায়েরি ঘুমিয়ে রইল বাবার আলমারির তালাবন্ধ দেরাজে। বাবার মৃত্যুকালে আমি যৌবনের শেষ প্রান্তে পা দেওয়া এ্যাটর্নী। বাবার সেই ডায়েরি আমি পড়লাম আমার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে, এ্যাটর্নীগিরি থেকে অবসর নিয়ে।"

আমি বললাম, "কি আশ্চর্য! এত বছরের ভেতর আপনার কোনো কৌতূহলই হয়নি সেই ডায়েরি পড়বার? অন্তত একবার পাতা উল্‌টে দেখবার?"

"কৌতূহল ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু বাবার অনুমতি ছিল না।" বললেন নিমাই মিত্তির। "মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বাবা আমাকে একটি অনুরোধ করে গিয়েছিলেন। সেই অনুরোধ আমার কাছে আদেশের চেয়ে বড়ো।"

মৃত্যুর কিছু আগে নটবর মিত্তির পুত্রকে বলেছিলেন, "নিমাই, আমার জীবনের অনেক কথা, অনেক কাহিনী, অনেক অভিজ্ঞতা লিখে রেখে গেছি অনেক ডায়েরি খাতায়। সেগুলো রইল আমার ঐ আলমারির দেরাজের ভেতর। খাতাগুলোকে এখন বিরক্ত কোরো না, ওরা যেমন আছে, যেখানে আছে তেমনি বিশ্রাম করুক। ঐ দেরাজের তালা যেমন বন্ধ আছে তেমনি বন্ধ থাক—শুধু দরকার হলে মাঝে মাঝে চাবি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে একটু তেল দেবার ব্যবস্থা করতে পারো, যেন মরচে ধরে না যায়। চলে যাচ্ছে

নটবর এ্যাটর্নী, এবার তার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখ তুমি, এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির, চুটিয়ে এ্যাটর্নীগিরি করে যাও বছরের পর বছর। তারপর যখন তোমার বংশধরকে পাকা এ্যাটর্নী বানিয়ে রেখে তুমি বানপ্রস্থ নেবে এ্যাটর্নীগিরি থেকে, সেই অবসর জীবন শুরু হলে তুমি আমার রেখে যাওয়া ডায়েরি-গুলো পড়া শুরু কোরো।"

"কিন্তু, বাবা—" বলেছিলেন নিমাই মিত্তির।

"কিন্তু নয়, নিমাই। এ আমার কিন্তু-হীন শেষ কথা। আমি বাঁচার মতো বেঁচেছি এ্যাদ্দিন, এখন তোমার মা-র কাছে চললাম।" বলে ওপারে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন সেকালের সেরা এ্যাটর্নী নটবর মিত্তির।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম।" বললেন নিমাই মিত্তির। "বাবার আলমারির সেই দেরাজ আমি প্রথম খুললাম এ্যাটর্নীগিরি থেকে অবসর নিয়ে। খুলে দেখলাম অনেকগুলো ডায়েরি খাতা, তাদের পাতায় পাতায় বাবার হাতের লেখা মুক্তোর অক্ষর। চোখ জুড়িয়ে গেল সেই লেখা দেখে। শুরু করলাম সময়ানুক্রমে পর পর ডায়েরিগুলো পড়তে। সাতদিন একরকম নাওয়া-খাওয়া ভুলেই গোগ্রাসে গিললাম বাবার সেই আশ্চর্য ডায়েরিগুলো। বিশ্ব সাহিত্যের অনেক সেরা সেরা ডায়েরি আমি পড়েছি, ধনপতিবাবু, কিন্তু বাবার লেখা এই ডায়েরিগুলোর মতো এমন আশ্চর্য ডায়েরি আমার জীবনে কখনো চোখে পড়েনি। ভাববেন না আমার বাবার লেখা বলেই এ আমার বিশেষ পক্ষপাত। একেবারেই যে তা নয়, এরা যে সত্যিই অতুল্য, অনন্যসাধারণ, বাবার ডায়েরিগুলোর ওপর একবার ভালো করে চোখ বুলোলেই সে বিষয়ে আপনার কোনোই সন্দেহ থাকবে না।"

হয়তো কিছু অতিরঞ্জন ছিল নিমাই মিত্তিরের কথায়, কিন্তু তাঁর কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। কৌতূহলের প্রচণ্ডতাও বেড়ে গেল। বেড়ে এত বেশী হল যে নিতান্ত বে-আক্কেল বে-হিসেবীর মতো বলে ফেললাম, "ডায়েরিগুলো আমাকে একবার পড়তে দেবেন ?"

গড়গড়ার নল থেকে এক চুমুক অম্বুরী ধোঁয়া টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়, স্থির, অবিচলিত, নিরাবেগ কণ্ঠে নিমাই মিত্তির বললেন :

"না।"

এই অতি ছোট্ট জবাবটুকু শুনেই প্রথমে মনে হল যেন বিনা হুঁশিয়ারিতে একটি প্রচণ্ড চড় খেলাম। সলজ্জ আফ-সোসে ভাবলাম চড়টি খাবার জন্য আমি নিজেই গাল বাড়িয়ে দিয়েছি, যেচে গাল না বাড়ালে এ চড়টি গালে পড়ত না।

কিন্তু নিমাই মিত্তিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন থেকে মুছে গেল লজ্জা আর অনুশোচনা। পরম স্নিগ্ধ প্রশান্তি আঁকা ঐ মুখে। আমার প্রশ্নে তিনি বিরক্ত বোধ করেন নি, বে-আক্কেল নির্লজ্জ বলেও ভাবেন নি আমাকে।

"আপনাকে পড়তে দেবো না দুটি কারণে।" বললেন নিমাই মিত্তির। "প্রথমত এ জিনিষ বাবার একান্ত গোপনীয়, আমার চোখ ছাড়া অন্য কোনো চোখকে এ জিনিষ দেখাবার অধিকার বাবা আমাকে দিয়ে যান নি। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যে কারণে বাবা আমাকে শেষ বয়সের আগে এ ডায়েরি দেখতে মানা করে গিয়েছিলেন, সেই কারণ। এ ডায়েরি তো আর অন্যের পড়বার জন্যে নয়, ডায়েরি লেখা মানে নিজের কথা নিজেকেই বলা। অনেক পাতায় তাই খোলাখুলি এমন অনেক কিছু লিখে গেছেন তিনি—মনের কথা, দেহের কথা, নিজের কথা, পরের কথা—যা আপনার কাঁচা মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে, আপনি ভুল বুঝতে পারেন বাবাকে, আর আরো অনেককে।"

কৌতূহল তৃপ্ত হবে না জেনে একটু আশাভঙ্গ ঘটল আমার। আমার মুখ দেখে মনের ভাব বুঝে নিয়ে নিমাই মিত্তির বললেন, "কিন্তু আপনি হতাশ হবেন না ধনপতিবাবু। বাবার ডায়েরি পড়ে যা যা জেনেছি তা থেকে বেছে বেছে শোনাবার মতো অনেক কিছুই শোনাবো আপনাকে—শুধু অত্যন্ত ব্যক্তিগত অংশগুলো বাদ দিয়ে। হয়তো বাবার ডায়েরির অনেক অংশ হুবহু পড়েও শোনাবো আপনাকে। সুলতান মিয়া আপনার সম্বন্ধে মৌখিক যে সার্টিফিকেট দিয়েছে আমাকে, তাতে আপনি আমার অনেকখানি আস্থা-ভাজন হয়ে গেছেন ; সুলতান মিয়ার কথার দাম আমার কাছে খুব বেশী। তারপর ক্রমেই যখন আপনার সঙ্গে আরো বেশী ঘনিষ্ঠতা হবে, তখন হয়তো—দেখা যাক।"

আমি সবিনয়ে বললাম, "কিন্তু বাদশা পালোয়ানের জীবনের গভীর কলঙ্কের কাহিনী শোনাবেন বলেছিলেন, সেইটে শোনান, যেমন জেনেছিলেন আপনার বাবার ডায়েরি খাতা থেকে।"

[ক্রমশঃ।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪৪। এই ভাবে চলতে লাগল কৃষ্ণ-তাদাত্ম্যের লীলানুকরণ।

একটি সুন্দরী…হঠাৎ তাঁর জ্ঞান হ'ল,—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কৃষ্ণের মত আমিও ঘুরবো, বনে বনে বেড়িয়ে বেড়াব; আমার সঙ্গে থাকবে বাছুরের দল, রাখালের দল আর থাকবেন বলভদ্র।"

এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিকন্তু স্থির হয়ে গেল তাঁর আরো একটি সিদ্ধান্ত,—

'হত্যা করব বৎসকাসুরকে।'

আহ্লাদে আটখানা হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ অভিনয় করে বসলেন বৎসকাসুর-বধের পালা। রাখাল, বাছুর এবং বলভদ্রকে নিয়ে সত্যিই যেন তিনি অসুরটাকে ফেঁড়ে ফেললেন …বাছুরের মত! কী চমৎকার অনুকরণ! এই প্রত্যয়ের মূলেও কিন্তু বিরাজ করছিলেন ভগবতী যোগমায়া।

একটি সুন্দরী নিজের করকিশলয়ে…যেন একখানি বাঁশরী পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখে, রাঙা রাঙা আঙুল খেলিয়ে, বাজাতে লাগলেন মন্দ মন্দ; এবং তার স্নিগ্ধ ধ্বনি ছেড়ে ডাকতে লাগলেন নৈচিকী গাভীদের,—

'হিঃ হিঃ, আয় রে আয়, কালী, নীলী, শবলী, ধবলী, ধূমলী, আয় রে তোরা আয়।'

আর একটির রকম দেখো। তিনি লীলাভরে অন্য একটি সুন্দরীর কাঁধের উপর নিজের মৃণাল-বাহুখানিকে ফণার মত গোল করে রেখে, অন্যান্য সুন্দরীদের ডাক দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন,—

'ওরে তোরা দেখ্, আমি কৃষ্ণ। আমার এই ধীর্ ধীর্ থির্ থির্ নধর-নধর কুঞ্জবিহার চলনটি একবার তোরা দেখ্…।'

বলতে বলতে তিনি চলতে লাগলেন, যেমন আনন্দের উল্লাসে হেঁটে বেড়ায় লালিত্য-লোল একখণ্ড প্রৌঢ় দাম্ভিকতা।

আমার মনে হয়, রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান স্বয়ং অনুকরণ করছিলেন তাঁর এই প্রসিদ্ধ লীলাগুলি; এবং তাই বোধহয় তিনিও সন্নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন গোপসুন্দরীদের হৃদয়-কুহরে। তাই যদি না হবে তাহলে,…চৈতন্য যেখানে নিরুদ্ধ, ব্যাপাররহিত যেখানে অন্তঃকরণ,· সেখানে, কিসের জন্যে, কেমন করেই বা হয় সুন্দরীদের এই বাক্যলালিত্যের স্ফূর্তি?

৪৫। আর একটি সুন্দরী…তাঁর ভাবের মন্দিরে তখন কেবল একলা বিরাজ করছেন কৃষ্ণ, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তাঁর আত্মার সহজ অবস্থা,…যমুনার তটপ্রান্তে বসে হঠাৎ তাঁর জ্ঞান হল, তিনি কৃষ্ণ হয়ে গেছেন। আর যায় কোথায়। হৃদয় সুড় সুড় করে উঠল। কালীয়কে তো তাহলে মারতেই হয়! ঐ অকল্যাণ কালসাপটাই তো যমুনাকে বিষিয়েছে।… মুহূর্তে দূর হয়ে গেল তাঁর কল্যাণভাব হৃদয়ের। তিনি তখন আরম্ভ করে দিলেন কালীয়মর্দন লীলা; বলে উঠলেন,—

'যমুনার জলে আমি খেলা করি, আর তুই কিনা ভুজঙ্গাধম, দূষিত করছিস সেই জল? দূর হ এখান থেকে।'

কী রোষ, কী পরুষ ভাষা সুন্দরীর! তাঁর সমস্ত শরীর যেন জানান দিয়ে বলছে,—

'আমি কৃষ্ণ, ফণী-মণির মণ্ডলে আমি নাচছি।' কী নাচ তখন সুন্দরীর, কী তর্জন!

৪৬। অপরা একটি উন্মাদিনী আত্ম-নাথের সঙ্গে পরমা একাত্মতা লাভ করে 'কৃষ্ণোঽহম্' ভাবের অসীমতার মধ্যে যখন ডুবে রয়েছেন, এবং সেই অবস্থাতেই যখন বিনাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন নিজ স্বভাবের, তখন হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন, যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন…দাব—কৃষ্ণবর্ত্ম (দাবানল)। অকালে কোথা হতে এল এই কৃষ্ণবর্ত্ম? শব্দটি মনে পড়তেই, অবাক কাণ্ড, তিনি যেন দেখতে পেলেন কৃষ্ণের পথ। নেচে উঠলেন আনন্দে। দাবানল নেভাবার উদ্দেশ্যে হাত-পা নেড়ে প্রকাশ করতে লাগলেন মায়াবল এবং বান্ধবদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—

"ভয় পাবেন না ভয় পাবেন না, এই লেলিহান দাবাগ্নি দেখে ভয় পাবেন না। আমি ত্রাতা সর্ব বিপদের। নিঃশঙ্ক হোন্। এই দেখুন এখনি আমি পান করে ফেলছি দাবানল।

যদি ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে আচ্ছন্ন করুন দু'নয়ন।"

৪৭। এই রকম করে ভাবের পর ভাব, পুলকের পর পুলক লাগতে লাগল গোপীদের। একটি গোপী কৃষ্ণোন্মুখ হয়ে এতক্ষণ বসে ছিলেন···হঠাৎ তিনি হাসতে লেগে গেলেন। সে এক অতিরহস্যের হাস্যমানতা। এ হাসির রহস্য যাঁরা ধরতে পারলেন না, তাঁদের সামনে তিনি এবার লীলানুকরণ করতে লাগলেন বস্ত্রহরণের,···যেন গোপীদের বসনগুলি নিয়ে তিনি তড়তড় করে শাখার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন কদম্ব বৃক্ষে। চড়তে চড়তে সে কি আহ্লাদ, মুক্তোর মত দন্ত বিস্তার করে সে কি হাস্য-ভাষণ!—

"এক এক করে এসে যে যার বসন নিয়ে যান। একসঙ্গে আসবার কোনো প্রয়োজন নেই। নৈলে দেবো না, নৈলে পাবেন না। রাজা আবার রেগে উঠে কি করবেন আমার শুনি?"

৪৮। কৃষ্ণকৈবল্যের প্রাবল্যে ততক্ষণে বিধুর হয়ে উঠেছে আর একটি গোপীর প্রকৃতি। তিনি প্রকট করতে লেগে গেলেন ব্রাহ্মণ বধূদের নিতান্ত সৌভাগ্যপ্রদা লীলা। তাঁর বাক্যবিলাসে ধারাবর্ষণ হতে লাগল আনন্দের। যাঁরাই উপস্থিত হন, তাঁদেরি তিনি ঠাউরে নেন ব্রাহ্মণবধূ বলে; আর মিষ্টি মিষ্টি হাসি বিলিয়ে বলেন,—

"কল্যাণীদের স্বাগত জানাই। নির্মল গার্হস্থ্যধর্মে যদিও আপনারা ব্রতিনী, তথাপি আমার উপর আপনাদের সভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সুবিদিত। আমাকে তো আপনারা দেখেই নিলেন। এরপর স্বামীসোহাগিনীদের আর থাকাটি উচিত নয় এখানে। শ্রবণ ও চিন্তনের মধ্য দিয়েই আমার সু-ভাব আস্বাদনীয়, অঙ্গসঙ্গের মাধ্যমে নয়।"

এইভাবে বলতে বলতে চলতে লাগল তাঁর হাসি।

৪৯। আর একটি সুন্দরী ততক্ষণে প্রিয়ের সঙ্গে অভিন্নাত্মা হয়ে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন হৃদয়খানি, এবং নিজেকেই কল্পনা করেছিলেন আধাররূপে প্রিয়তার। অকস্মাৎ তিনি আরম্ভ করে দিলেন গোবর্ধনধারণ-লীলার অনুকরণ। যেন তিনি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন··· মেঘ-মূর্ধণ্য-ধন্য গোবর্ধন পর্বতের বিরাট কলসের মত মুখ; আর সে মুখ বেয়ে বিপুল ধারায় ঝরে পড়ছে বর্ষণজল, ভেসে যাচ্ছে অবনীতল; উঃ, আর কি কষ্ট! নিতান্ত কাতর-বদনে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে গো গোপ ও গোপীদের আতঙ্কিত সাম্রাজ্য! আশ্বাস দিয়ে তিনি বক্তৃতে লাগলেন,—

"ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না, এই প্রচণ্ড ঝড় এই ভয়ঙ্কর বর্ষণ থেকে মাভৈঃ। ধৈর্য ধরুন আর্যগণ। এই দেখুন অঙ্গুলির শিখরে আমি তুলে ধরেছি গোবর্ধনকে, পৃথিবীর মাথায় যেন একটি ছাতা। সন্দেহ করবেন না এতটুকুও যে, আমার এই ছোট্ট হাত থেকে খসে পড়ে যেতে পারেন গিরীন্দ্র। অবিশ্বাস করবেন না আমার কথায়। সমুদ্র-দ্বীপও পর্বত-সঙ্কুল এই ভূতলটিকে ধরে রয়েছেন অনন্তনাগ বাসুকি, আর আমি একজন মহাবিনোদী নাগর-রাজ, আমি কি না উৎক্ষিপ্ত করতে পারব না একটি পাহাড়কে?"

ভাষণ দিতে দিতে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। দাঁড়িয়ে উঠলেন তীক্ষ্ণবেগে, ছুটে এলেন;···উশীরের গন্ধকে পরাস্ত করে যেমন ছুটে আসে মৃণাললতার পরিমল। মনোহরণ বাম বাহুখানি তুলে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। অভয়-কেতনের মত সেই হাতে উড়তে লাগল তাঁর শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয়। দক্ষিণ নিতম্ব দেশে দক্ষিণ করতলখানি চেপে ধরে তিনি পুনর্বার বলে উঠলেন,—

"আপনারা প্রবেশ করুন, আমার এই শত গব্যূতি-বিস্তার শতপত্র-ছত্রের অধোদেশে আপনারা প্রবেশ করুন।"

আর একটি উন্মাদিনী, হঠাৎ তিনি তুলে নিলেন নিজের বাঁশীখানি। তিনিই তো কৃষ্ণ!···তিনিই তো বাজান বাঁশরী! অতএব গোপী আপন মনে বাজাতে লাগলেন বাঁশরী। বাঁশরীর ধ্বনি টেনে নিয়ে এল কুলধর্মত্যাগিনী গোকুল-রমণী-মণিদের। তারা এলেন। তাঁদের সর্বাঙ্গে শৃঙ্গারের বিশৃঙ্খলা। তাঁরা এলেন। তাঁদের অখিল প্রেমে অঙ্গসঙ্গের অনিভৃত আবেদন। তাঁরা এলেন। প্রণয়ের, নীতির ও স্পৃহার পর্যবসান তাঁদের নয়নে। সে কি কেবল চলে আশা! ধেয়ে এল যেন চাঁদের হাট···রাহুর কবল থেকে মুক্ত···রাস-রসের সরসতায় শ্রীকৃষ্ণে বিলীন। হাস্য-পরিহাসের অতিচাতুর্য ছড়িয়ে উন্মাদিনী এবার কৃষ্ণের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন,—

"হে সাধ্বীগণ; আসুন আপনারা আসুন, আদেশ করুন কোন্ শুভকর্ম কোন্ অতিপ্রিয় কর্মের সমাধান করতে হবে

আমাকে? আশ্চর্য হতে হচ্ছে যুগপৎ আপনাদের শুভাগমন দেখে। কিন্তু আপনাদের বেশ-বাস অলঙ্কার সমস্তই কেমন যেন আলুথালু, বিপর্যস্ত। অনুমান করছি নির্ঘাত সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। তা না হলে এত ত্বরাই বা কেন আপনাদের? ঘোর রজনী, অতি ঘোর,—

এই বনস্থল, কম ভয়ঙ্কর নয় এই বনের জন্তুরা। আপনাদের মত ললনাদের এখানে কেমন করে থাকা সম্ভব? অতএব অনুরোধ করছি, লতামন্দিরে ফিরে যান। আহা এই কানন ভূমি, কত না ফুল ফুটে রয়েছে এর কাননে কাননে, কত না জ্যোৎস্না ধুয়েছে এর কাননতল, কত না গন্ধ ভাসছে শীতল সমীরে,…এর সবি তো দেখা হয়ে গেল আপনাদের।

অতএব, আমার মত একজন পরম ধর্মবিদের সঙ্গে ঐ পঙ্কজপত্রের মত নেত্র নিয়ে আপনাদের নিশিপালন করাটি যুক্তিসঙ্গত হবে না। ধ্যান, গুণ-শ্রবণ বা গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে আমাকে পাওয়া যতটা রমণীয়, হে সাধ্বীগণ, অঙ্গসঙ্গের মাধ্যমে, হায়, ততটা নয়।"

৫২। কৃষ্ণের ভাষায়, কৃষ্ণের ভাবভঙ্গিতে কৃষ্ণের এই সকল অনুকরণ,…এক কীর্তি বটে গোপীটির। মধুরস্নিগ্ধ কণ্ঠে কী অপূর্ব কী অস্ফুট-মধুর তাঁর সেই নিবেদন! ভাষণ শেষ হতেই গোপীটির মনে জাগল, 'আমি কৃষ্ণ, এবার অন্তর্ধান হব।' এই মানস-প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে যেই তিনি আরম্ভ করে দিলেন অন্তর্ধান-লীলা, অমনি সদ্য-সদ্যই তাঁর এবং নিখিল গোপীদের নয়নে ঘটে গেল তাদাত্ম্য-নিদ্রাভঙ্গ।

৫৩। জাগ্রৎ অবস্থায় আবার ফিরে এল কৃষ্ণোন্মত্ততার মধ্যম অবস্থা।

পুষ্পের মত বিকশিত হয়ে উঠলেন ব্রজগোপীরা… মন-ইত্যাদির জাগরণে;

জীবিত হয়ে উঠলেন তাঁরা…নেত্রাদির প্রস্ফারণে, সমুত্থিত হয়ে উঠলেন…সন্তাপের শাসনে;

চমকিত হয়ে উঠলেন…জ্ঞানের ও চিন্তার সম্প্রসারণে।

হরিণের মত চোখ বড় বড় করে আগের মতই তাঁরা কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন। দিকে দিকে ছুটে চলল তাঁদের কাঙাল নয়নের কাতরতা। [ক্রমশঃ।

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পিছনে নাম, ঠিকানা ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

উড়িষ্যার মন্দির ... চিন্ময় দাস

খোকাবাবু —চিত্ত নন্দী

কেবল খেলা —ঝুণু দাশগুপ্ত
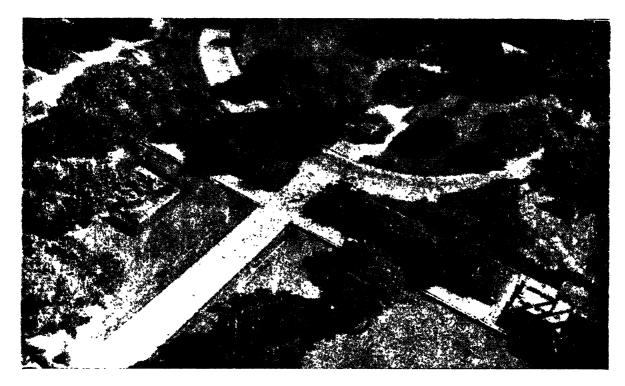
কুতুব থেকে

—শুভ্রাংশুরঞ্জন মজুমদার

মেঘের পর মেঘ

—প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
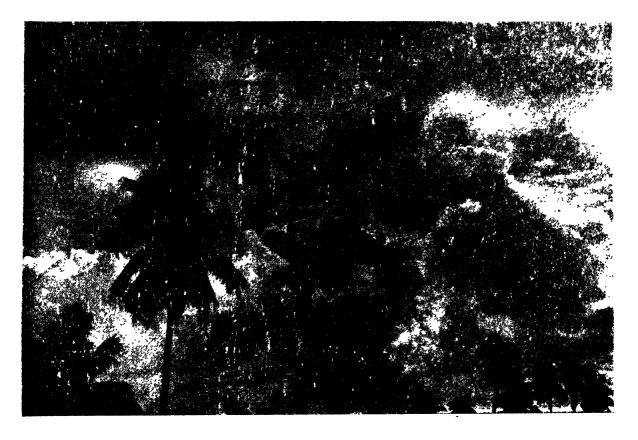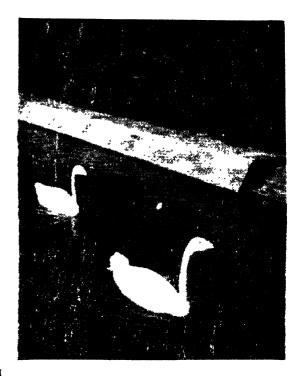
প্রতিবিম্ব —ননীগোপাল সাহা

জলচর

—পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলের মানুষ —বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

কর্ম

—.মেন বাগচী

ক্লান্তি

—এস, ধর

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য
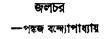
অভিনয় আমার ভালোই লাগে। তবে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের আমি চট্ করে বিশ্বাস করতে পারি না। সেটা হয়তো আমারই ত্রুটী, আমারই দুর্বলতা। আমার মনে হয় তাঁদের কথায় বার্তায়, চালে চলনে যেন অভিনয়ের একটা ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

এতদিন যাঁর সাথে সেক্রেটারীর চাকরী করে এলাম তাঁর নাম বললে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত পৃথিবীর চিত্র-প্রেমী এক কথায় তাঁকে চিনতে পারবেন। চিত্রজগতে তিনি কোনোকালে সম্রাজ্ঞী ছিলেন। অপরূপ রূপ। দেখতে এখনও ষোড়শী। যোগ অভ্যাস করলে নাকি মানুষ যৌবন হারায় না। বইতে পড়েছিলুম। এতদিনে তার প্রমাণ পেলুম। সত্যিকারের নামটা জিজ্ঞাসা করবেন না। ধরুন তার নাম দেবী।

চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিলে কি হবে, চিত্রজগৎ এখনও তাঁকে ছাড়ে নি। প্রতিদিন বহু দেশ-বিদেশ থেকে চিঠিপত্র আসছে। আধুনিক তারকার দল আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি লিখছে। নতুন অভিনয়ের উদ্বোধন করতে যেতে হচ্ছে। কাজের অন্ত নেই। একটা জিনিস দেখে অবাক হলাম কাজে তাঁর কখনও ক্লান্তি নেই। দিন নেই, রাত নেই, কাজ লেগেই রয়েছে। সে কাজ না করলেও হয়তো পৃথিবীর কোনো লোকসান হবে না। তবু তাকে সে কাজ করতেই হবে। সে কাজে তাঁর ব্যস্ততায় আমি মাঝে মাঝে নিজে হিমসিম খেয়ে গেছি। দিন শেষে শ্রান্ত-শুষ্ক মুখে খুশী মনে তাঁকে প্রাণ খুলে গল্প করতে দেখেছি। তাঁর সব কাহিনী শুনে গেছি। কোনোটাতেই সায় দিই নি। হ্যাঁও করি নি। না-ও করি নি। করার প্রয়োজন বোধ করি নি। কেননা তাঁর একটা কথাও বিশ্বাস করি নি। মুহূর্তের জন্যও আমি ভুলতে পারি নি যে আমার কর্ত্রী একজন অভিনেত্রী।

তাই হেসে তিনি যখন একটা লেখার প্রশংসা করেছেন, তখন আনন্দে আত্মহারা হই নি। একটা ভালো লেখাকে যখন তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তখনও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ি নি। সর্বদাই, কেন জানি না, আমার মনে হয়েছে এটাও তাঁর একটা অভিনয়।

চলায়, হাঁটায়, কথা বলায় তাঁর নিশ্চয়ই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি সাধারণ নারীর মতই চলেন না। কথা বলার ধরণ সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমাদের কথা বলার ধরণ সাধারণ—কারুর কণ্ঠস্বর মিষ্টি, কারুর কর্কশ। কারুর পুরুষোচিত, কারুর বীণা বিনিন্দিত। কারুর কণ্ঠস্বর জয়ঢাকের মতন। তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও এক সুরে বাঁধা ছিল না। কখনও মধুর কোমল করুণ, কখনও ধ্যানগম্ভীর, কখনও রুদ্র কঠোর। আমার মনে হত আমি যেন সর্বদা অভিনয় দেখছি।

একদিন একটা নতুন শহরে গিয়েছি। নিমন্ত্রণেই। খরবটা সবাই জানতে পেরেছিল। বহু লোক সমাগম। কেউ গাড়ীর মাথায়, কেউ গাছের ডালে বৃক্ষ চূড়ায়, কেউ ছাদের কোণায় দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁরা সব অভিনেত্রীর দর্শন-অভিলাষী।

আমি তাঁর ভাষণের পাণ্ডুলিপি তৈরি করছিলাম।

হঠাৎ দেবী আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'তোমাকে কি বলেছিলাম?'

আমি বললাম, 'পুলিশ ডাকতে।'

'ডেকেছো?'

বললাম, 'না'।

'কেন ডাকো নি?'

বল্লাম, 'ডাকার প্রয়োজন বোধ করি নি। এখন বাইরে লোক দাঁড়িয়েছে এক হাজার। একশো পুলিশ ডাকলে লোক সংখ্যা বেড়েই যাবে। কমবে না। তা ছাড়া সত্যি বলুন তো ওরা দেখতে এসেছে বলে মনে মনে আপনার একটা আনন্দ হয় নি কি?'

'ঐ তো তোমার দোষ। একবারে যা বলব সব সময়ে

তার উল্টোটি করবে। যা ভালো বোঝ করো। তোমাকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলুম না যে ভীড় আমার ভালো লাগে না। ভীড়ে আমার শরীর কাঁপে। ভীড়ে আমার এ্যালার্জি!'

মনে মনে বললুম, 'সে কি কথা? অভিনেত্রীর ভীড় ভালো লাগে না এ কথা কে বিশ্বাস করবে?' ভাবলাম এটাও নিশ্চয়ই অভিনয়!

মাঝে মাঝে লোক এসে খবর দিত তোমাকে দেবীজি ডেকেছেন।

মৃদু হেসে বলতেন, 'অত কি কাজ? বসো না একটু। মন খুলে কথা বলার একটা লোক পাই না। যারা আসে সবাই একটা না একটা সমস্যা নিয়ে আসে। তাদেরই বা দোষ কি? স্বার্থ নিয়েই মানুষ। স্বার্থটুকু ছাড়তে পারলেই সে পরম মানুষ। কি বল?'

আমি কি বলব? মনে মনে বললাম, 'আবার অভিনয়!'

কিন্তু আপনি এত রাতে? শরীর ভাল আছে?

দেবী নিজের থেকেই বলতে সুরু করলেন, 'জানো মণি, বেশী অভিনয় করলে মানুষ মেশিনের মতন হয়ে যায়। মনে হয় যেন সব সময়েই সে অভিনয় করছে। প্রায়ই আমার স্বামীকে আমি যেন দেখতে পাই। মনে হয় যেন কত বড় ছলনাটাই না করেছি তাঁর সাথে। তুমি বিশ্বাস করো, তাঁকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি। অভিনয় বন্ধ করে সাধারণের মতন সংসার চালাতে চেয়েছি। তিনি ছিলেন সুন্দরের সাধক। তিনি বলতেন, 'সে কি কথা? কত সহস্র লোক তোমার অভিনয়ে আনন্দ পাবে। কোন্ অধিকারে তুমি তাদের তা থেকে বঞ্চিত করবে বলো।'

তখন আমার অভিনয়ে মন বসত না। মনে হত যেন সব ছলনা। সব ফাঁকি। সব সময়ে কেন যেন আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত। মুক্ত বাতায়নেও স্বস্তি পেতাম না।

তিনি ছিলেন কবি। কবিতা লিখতেন। বলতেন, 'দেবী, আমি দেব শব্দ, তুমি দেবে সুর। আমি দেব ছন্দ, তুমি দেবে ঝঙ্কার। মানুষকে আনন্দ দিয়ে যাও। হাসি অশ্রুর দু'দিনের ছোট্ট জীবন। বিরহ-মিলনের গান নিয়েই জীবন। তোমার অভিনয়ে, আমার সঙ্গীতে মানুষ পাক পরম আনন্দ। পরম শান্তি।'

মনে মনে বললাম, 'আবার অভিনয়।' "অভিনয় করতে করতে কবে থেকে আমার চিন্তাশক্তি যন্ত্রচালিতের মতন হয়ে গেছে খেয়াল করি নি। আপন প্রাঙ্গণ কবে থেকে পর্দার অঙ্গন হয়ে গেল জানতে পারি নি। বছরের পর বছর সফলতার সাথে অভিনয় করেছি। বহু জয়মাল্য পেয়েছি। অর্থ, নাম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোনোদিন কোনোটার অভাব হয় নি। দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে নিমন্ত্রণ। তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছি। ছুটে গেছি দেশে দেশান্তে।

খ্যাতির নেশায় খেয়াল করি নি যে মহান্ বিশ্ব এত যত্ন করে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে সেখানে আমার ছোট্ট নীড়টুকুও তৈরি হয় নি। এ যেন বিয়ের বাসরের সাজানো গেট। শাখাগুলো সবৃন্ত করবী অতসী দিয়ে সাজানো। তার কোনোটারই মূল নেই! জীবনের প্রকৃত আনন্দকেও চিনতে পারি নি। অভিনয়ের মতনই তাকেও সত্যের ছায়া বলেই গ্রহণ করেছি। সত্যকে গ্রহন করতে পারি নি।

এ সব কথা তোমার কাছে হেঁয়ালি মনে হতে পারে কিন্তু জানবে এগুলো সম্পূর্ণ সত্য। জগৎকে আনন্দ দেবার আগে নিজে আনন্দ ভোগ করবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন করার আগে নিজের ছোট্ট ঘরটুকু মধুময় করবে।

এমন সময়ে আরদালী এসে খবর দিল একজন ওস্তা

দেবীজির সাথে দেখা করতে চান। বহুদূর থেকে আসছেন।

দেবী ভয়ে যেন আঁতকে উঠলেন। 'আবার গায়ক, ওস্তাদ! কেন বাবা আমি তো সব ছেড়ে দিয়েছি।' আমাকে বললেন, 'মণি, তুমি গিয়ে দেখো লোকটা কি চায়?'

গিয়ে দেখলাম লোকটা মুক্ত পাগল না হলেও তার বেশী দূর নেই। আমাকে দেখেই সে সন্ধ্যার সময়ে ভৈরবীতে খেয়াল ধরে বসলো। আমি বললাম, "গান ছেড়ে আসল কথায় এসো। কি চাই? সে কিছুতেই গান থামাবে না। অতি কষ্টে মহাসাধ্যসাধনার পর দয়া করে যখন গান থামালো, তখন আব্দার ধরলো সে দেবীজির সাথে দেখা করবে।

আমি বললাম, 'আমায় জানাও। আমার পূর্ণ অধিকার আছে। বল কি করতে হবে।

শুনে আকাশ থেকে পড়লাম না। এ রকম লোক প্রায় রোজই দু-একজন করে আসে। লোকটি অভিনয় করতে চায়!

দেবীকে গিয়ে বললাম। তিনি মুঠো ভর্তি টাকা দিয়ে বললেন, 'লোকটা মন্দ গায় না। ওর গান আমি দূর থেকে শুনেছি। 'ওকে গিয়ে বল গানের স্কুল খুলতে। তাতে মনে শান্তি পাবে। অভিনয় ওর লাইন নয়।'

এ রকম ঘটনা প্রায় রোজই ঘটেছে। ধীরে ধীরে লেখাপড়ার চেয়ে এই শ্রেণীর লোক নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করাই যেন আমার নিত্য কাজে দাঁড়িয়ে গেল। লেখাপড়ার কাজও কমে আসছিল। এ সব লোক নিয়েও আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। ঠিক করছিলাম একদিন এবার দেবীকে গিয়ে বলি, 'আমাকে এবার ছুটি দাও। আর তো বেশী কাজ নেই।'

মনে একটু বাধলো। শুধু ভাবলাম কে ওর কাছে বসে দুটো কথা শুনবে। সেই বিদেশী গল্পটা মনে পড়লো। একটা গাড়ির সহিস তার যুবক ছেলেকে হারিয়ে সারাটি দিন সমস্ত যাত্রীকে নিজের দুঃখের কথা বলছিল। কিন্তু কেউ তার কথায় কর্ণপাত করে নি। কারই বা এত সময় আছে? দিন শেষে বেচারা ঘোড়াটাকে মালিশ করতে করতে তার কাছে নিজের প্রাণের কথা বলে হাল্কা মনে গিয়ে বিশ্রাম নিত। আমি চলে গেলে এই অভিনেত্রীর মনের

কথা শুনবে কে? তা ছাড়া সত্যি কথা আমিই বা যাব কোথায়?

এই সব নানা চিন্তায় মনটা একদিন যখন ছিল মগ্ন, অর্ধ-শায়িত অবস্থায় আমি চলে গেছি এক অজানা জগতে। হঠাৎ আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন দেবী।

'ঘুমিয়েছো?'

বললাম, 'না? কিন্তু আপনি এত রাতে? শরীর ভালো আছে? লেখায় কোনো ভুল বেরোয় নি?'

'থামো থামো। অতোগুলো প্রশ্নের জবাব আমার জীবনে কখনও এক সাথে দিই নি। তোমার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হবে না তো আমি এখানে একটু বসলে?'

আমি বললাম, 'তা কেন হবে? তবে বলছিলাম এত রাতে আপনার বিশ্রাম নেওয়া উচিত নয় কি?'

তিনি বললেন, 'তুমি বোধ হয় জানো না মণি, রাত জাগার আমার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া আজকাল কেন জানি না আমার চোখে বিন্দুমাত্র ঘুম নেই।'

নাইট বাল্বটা নিবিয়ে বড় বাতিটা জ্বাললাম। দেবীর ওপর চোখ পড়তেই নজরে পড়ল তাঁর সযুঁথিকাস্তবক আলুলায়িত অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম। সজ্জায় কোন কৃত্রিমতা নেই। তাই বোধ হয় তাঁকে আরও ভালো লাগছিল।

দেবী বললেন, 'আবার ঐ বাতিটা জ্বালালে কেন? বেশ তো ছিল। সবুজের একটা স্নিগ্ধভাব আছে। আমার এটা খুব ভাল লাগে। রাত প্রায় বারোটা। আমি মহা সমস্যায় পড়লাম। যাদের তখন কাছে 'রজনী এখনও বালিকা' আমি তাদের দলে পড়ি না। ছাত্র অবস্থায় দু'-পাঁচদিন রাত জাগা অন্য কথা। তা ছাড়া আমার আসল ভয় হ'ল সুন্দরীকে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। তিনিই আমার কর্ত্রী। আমার সমস্ত সময়টা তাঁর কাছে টাকা-আনা-পাই-এর বিনিময়ে বিক্রিত।

'জানো মণি, 'মহামিলন' বইটার যখন শুটিং হয়, তখন আমার মন ভয়ানক খারাপ। পর পর দু'-তিনজন বন্ধু আমাকে প্রতারণা করে। তখনও আমার বিয়ে হয় নি। মনে জ্বলছিল বেদনার বহ্নিশিখা। মনে হচ্ছিল বন্ধুত্ব, সমবেদনা, প্রেম, ভালবাসা সব কিছু মিথ্যা, সব কিছু ছলনা। কিন্তু কি করব ষ্টুডিওতে সেদিনই আবার আমার দিন পড়েছে। 'মহামিলন' একটা রোমান্টিক বই। তার হিরোইন। বুঝতেই পারছো সমস্ত দিনটা আমার কি রকম কাটলো।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বইটা দেখে তো তা মনে হয় না। হাল্কা হাসির লহরীতে ভরা। তাই না?'

দেবী বললেন, 'সেই তো অভিনয়। ছলনা। প্রতারণা।'

আমি বললাম, 'ছলনা কেন হবে? কত লোক কত আনন্দ পেয়েছে। কত লোক দুঃখ ভুলে হাসির ফোয়ারায় ডুবে গেছে। কত লোক! আপনি ওটাকে প্রতারণা বলতে পারেন কি?'

'প্রতারণা নয়তো কি? নিজের ভারাক্রান্ত মনকে সেদিন বিশ্রাম দিতে পারি নি। শুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে চোখের জল মুছে এসেছি। ষ্টুডিওর একটি লোকও টের পায় নি।'

আমি বললাম, 'ষ্টুডিওর কেন লক্ষ লক্ষ দর্শকের ভিতরও কেউ টের পায় নি।'

'তারপর আমার দেখা হ'ল কবির সাথে। দেখলাম, সে আমার অভিনয়ের উপাসক। আমার অভিনয়টাকেই সে ভালবাসে। আমাকে নয়।'

আমি বললাম, 'তার মানেই আপনাকে।'

দেবী বললেন, 'ঐ তো ভুল করছো মণি, অভিনয়ের আমি ছাড়াও আমার একটা আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে তো। যেখানে শুধু আছি আমি। মুক্ত আমি। অভিনেত্রী আমি তো শুধু তার একটা ছায়া মাত্র। তিনি ছিলেন কবি। কল্পনা রাজ্যেই থাকতেন। তাঁর প্রথম প্রণয়ী ছিল কবিতা। দ্বিতীয় আর্ট। তারপরে সৌন্দর্য। সেখানে আমি নিজেকে যেন কোনো দিনই প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি।'

আমার বলার কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছিলুম না। দেবীর কল্পনা শক্তি ছিল প্রবল। তাঁর ভাষায় জোর ছিল প্রবলতর।

'জীবনে প্রকৃত ভালবাসা পাই নি। ভালবাসার ছায়াকে নিয়েই ভুলে থাকতে হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখ হ'ল সেটা কেউ জানতেও পারল না। তোমরা সবাই জানো আমি কত সুখী। কিন্তু সত্যি বলছি মণি, তুমি শুধু জানলে

আজ ; আমার চেয়ে অসুখী বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ নেই।'

বেদনাতে কষ্ট পাই না, ভয় পাই না, কষ্ট পাই মানুষের অবহেলাকে। মানুষ বাইরের গ্ল্যামারে ভিতরের আসল মানুষটাকে জানতে পারে না। জানতে চায় না। অভিনয় ছাড়াও কি আমার একটা জীবন সত্তা নেই বলতে চাও ?'

'জীবন-তৃষ্ণা' বইটা দেখেছো তো ? একদিন জীবন-তৃষ্ণার হিরো প্রদীপের ওপর আমার সত্যি বিতৃষ্ণা এসেছিল। তখনও শুটিং শেষ হয় নি। আমার যেন মনে হ'ল ভাবে, ভঙ্গীতে, আচারে, ব্যবহারে, প্রদীপ খুবই নীচু স্তরের লোক। ঘৃণায় মন ভরে গেল। জিজ্ঞাসা করবে কেন হঠাৎ এ ধারণা হ'ল আমার ? জিজ্ঞাসা করো না। এর জবাব আমি দেব না। ঘটনাটা এতই ভালগার যে আমি সেটা মুখে আনতেও ঘৃণা বোধ করি। জানবে, অভিনয় জগতে নামলেই যাকে তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায়, এ ধারণা যাদের আছে তারা ভ্রান্ত। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রদীপের সাথে সেদিন আমাকে সমস্ত দিন অভিনয় করতে হয়েছে। অভিনয়ই বটে। সেদিনের অভিনয়ে নিজের সত্বাটুকুও আমাকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল।'

রাত গভীর থেকে গভীরতর হ'ল। তারপর ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল আকাশের শুকতারা। প্রভাতসূর্য শীঘ্রই উঠবে। পাখীর কল-কাকলিতে বৃক্ষশাখা মুখরিত। দেবীর সান্নিধ্যে চোখের তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল। তাঁর ব্যস্ত জীবনের একটা অজ্ঞাত অধ্যায় জানলাম। নিকট থেকে দূরের মানুষকে দেখলাম, দেবীর মুখের দিকে তাকালাম। মনে হ'ল ভুবন বিখ্যাত অপরূপ রূপসী, যাঁর যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, বিত্ত-বৈভব কিছুরই অভাব নেই, অভিনয় জগতে আজও যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজত্ব চালাতে পারেন, দর্শনাভিলাষী শত সহস্র নরনারী যাঁর সামনে দাঁড়ালে নিজেদের ধন্য মনে করে, তাঁর বাস্তব জীবনটা কতই না ফাঁকা !

গোলাপটা যতক্ষণ অনাঘ্রাত থাকে ততক্ষণই পবিত্র। জীবনটা হবে অনাঘ্রাত গোলাপের মতন। কথাটা যিনি বলেছিলেন তাঁর সৌম্যমূর্তি আজও আমার চোখের সামনে

ভাসছে। অভিনেত্রীর মায়া কাটাতেই হ'ল। চাকরী ছেড়ে চলে গেলাম অন্য শহরে।

তাঁর চাকরী ছেড়েছি, তাঁর চিন্তা ছাড়তে পারি নি। শুনেছিলাম তিনি মায়াবিনী। মায়া জানেন। কথাটা কতখানি সত্য জানি না, তবে তিনি মানুষের চিন্তা পড়তে পারেন। তিনি থট রিডিং জানেন। আমি তার বহু প্রমাণ পেয়েছি। চাকরী ছাড়লেই চাকরী পাওয়া যায় না। তা ছাড়া দেবীকে আমি কিছু জানিয়ে আসি নি। তাঁকে জানালে তিনি কখনই আমাকে আসতে দিতেন না। আমি জানি। তবে কোথায় যাই? অনেক চিন্তা করে হরিদ্বারে যাওয়াই স্থির করলাম। পৃথিবীতে এত শান্তিপূর্ণ জায়গা আছে কিনা জানি না। ভারতবর্ষে খুব কমই আছে।

হিমালয়ের পদপ্রান্তে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে পূর্ণ যৌবনা গঙ্গা কল কল খল খল রবে ছুটে চলেছে অজানার ডাকে। ধ্যানগম্ভীর পর্বত শৃঙ্গ যুগ যুগ ধরে পরম সত্যের সন্ধানী সাধকদের শেষ আশ্রয়স্থল। পুণ্য করা উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য মনের শান্তি, তার জন্য হরিদ্বারই প্রশস্ত জায়গা।

কনখল সেখান থেকে দূরে নয়। সন্ন্যাসী বন্ধুদের একটা আস্তানা আছে সেখানে। সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারি। তারা নিশ্চয়ই হঠাৎ আমাকে দেখে অবাক হবেন। এ রকম অসময়ে কোনো খবর না দিয়ে পূর্বে কখনও আসি নি। আমার মুখ চোখ দেখেই তারা হয়তো ধরে ফেলবেন আমি গম্ভীরভাবে চিন্তাক্রান্ত। তাছাড়া সত্যি কথা বলছি দেবীর জন্যও মনটা বেশ খারাপ ছিল। ও রকম অসহায় অবস্থায় তাঁকে না ফেলে এলেও হত। আবার আমার ফিরে যাবার পথও ওদিকে রুদ্ধ।

ওপারে দূরে নীল পর্বতে অসংখ্য লাল পতাকা হাওয়ায় উড়ছিল। লাল পতাকা যাত্রীরাই বেঁধে রেখে গিয়েছে। দক্ষঘাটে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছিল। খরস্রোতা গঙ্গা প্রবাহের সাথে অভিনেত্রীর জীবনপ্রবাহের যেন একটা মিল দেখলাম। পিছনের দিকে এরা কেউই তাকিয়ে দেখে না। সর্বদা সামনেই ছুটে চলেছে। উভয়ই চঞ্চল। উভয়ই উদ্দাম। উভয়ই ঘর ছাড়া। উভয়ের জীবনই উদ্দেশ্যবিহীন বাঁধন ছাড়া। উভয়ই প্রগলভ।

ক'দিন থেকেই মনটা খারাপ ছিল। খারাপ ছিল দেবীর জন্য কি? খারাপ ছিল নিজের ছন্নছাড়া জীবনের জন্য? জানি না। পান্থনিবাসের কামরাটিতে তালা বন্ধ করে হৃষীকেশের দিকে চলে গেলাম। কাছেই। হরিদ্বার মুখরা। হৃষীকেশ শান্ত সমাহিত। যাত্রীর কোনো ভীড় ছিল না। ব্রীজের ওপর দিয়ে ওপারে গেলেই পাইন, ফার্ণ, সবুজে ঢাকা হিমালয়ের বুকে স্বর্গদ্বারের পথ। কত সহস্র যাত্রীর পদধূলিপূত স্থান। ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম। ত্রিবেণীতে স্নান করলাম। স্নিগ্ধ শীতল জলধারার স্পর্শে একটা নতুন জীবন যেন ফিরে পেলাম। এবার শহরে ফিরে যেতে হবে।

শহরে এসে দেখলাম অনেকগুলো চিঠি এসে জমে রয়েছে। এক এক করে খুললাম। প্রথমখানাতে জানলাম আমার একটা নতুন চাকরী হয়েছে। অনেক ভেবেও মনে করতে পারলাম না কে আমার জন্য এ কাজের চেষ্টা করতে পারে? দ্বিতীয়খানা এসেছে বাড়ী থেকে। আমার নীড় বাঁধার খবর। তৃতীয়খানা নাতিদীর্ঘ, লিখেছেন দেবী। চিঠিখানা পড়লাম এক নিঃশ্বাসে।

'মণি, তোমার না বলে অমনভাবে চলে যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তোমার ভয় ভুল। তোমার সাথে আমি অভিনয়ই করেছি। তুমি ভুল বুঝেছো। শহরে তুমি নেই। কোথায় আছো জানি না। শহরের ঠিকানাতেই এ চিঠি পাবে।

ছন্নছাড়া জীবন ছাড়ো। ওতে শান্তি নেই।

আমাকে খোঁজার চেষ্টা করো না। আমি এখন বহু দূরের যাত্রী। সে পথের পাথেয় সঞ্চয় করতে মানুষের জীবন কেটে যায়। স্বর্গদ্বারের গল্প একদিন তোমারই মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। হিমালয়ের কোলে পরম শান্তি চির বিরাজমান, তুমিই একদিন বলেছিলে। তোমার সেই বর্ণনা এখনও আমার কানে বাজছে। হিমালয়ে বহুবার গেছি। কিন্তু তার এই শান্ত সমাহিত ধ্যানগম্ভীর মূর্তি কখনও দেখিনি! মনটা তখন ছিল অন্য রকম।

আবার বলছি আমাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা করো না।

যা পিছনে ফেলে এলাম মানুষের কল্যাণে কাজে লাগিও। তাদের দিও শান্তি। তোমার জন্য রইলো অফুরন্ত প্রাণভরা ভালবাসা।'

উদ্ভিদ্-অভিধান

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কীটমাতা—হংসপদী গাছ।

কীটমারী—ছোট অরণ্য শাক বি° drosera burmanni, বর্ষাকালে জন্মায়। পাতা ছোট, পাতার লোমের মাথায় আঠা থাকে, কোন কীট পাতায় বসিলে সঙ্কুচিত হয়ে তাহাকে বধ করে। বাঁকুড়ায় ইহাকে 'ভুঁইচাঁপা' বলে।

কীটশত্রু, কীটারি—বৃক্ষবি°।

কীড়ের—নটেশাক।

কীরক—বৃক্ষবি°।

কীরমালা—বৃক্ষবি°, artemesia maritima, পশ্চিম হিমালয়ে জন্মে। ইহার বীজ হইতে কৃমিঘ্ন ঔষধ হয়।

কীরেষ্ট—১ আমগাছ, ২ আখরোট গাছ, ৩ জলযষ্টিমধু গাছ।

কীলসংস্বর্ণ—গাব গাছ।

কীশপর্ণ, কীশপর্ণী—আপাং গাছ।

কুঁচ—[স° গুঞ্জা, গুঞ্জ, হি° ঘুঁঘচি, চিরমিটি; ম° গুঞ্জা, তে° গুলুবিদে, তা° কুরিন, ও° রুঞ্জ, ফা° চশমেখ্রুশ্] শিম্বাদি বর্গের রোহিণী লতা বি°, abrus precatorius, ভাদ্র আশ্বিনে ফুল হয়। তেঁতুল পাতার মত পাতা, শিম ফুলের মত ফুল, তবে কিছু বড় ও গোলাপী রংয়ের। শিম্বি ছোট, ভিতরে ২-৬টি কুঁচ থাকে। প্রকার ভেদ—(১) রক্তকুঁচ—সমস্ত গা রক্তবর্ণ, মুখের কাছে কাল। (২) শ্বেতকুঁচ—সমস্ত গা শাদা। মুখের কাছে কাল।

কুঁচিলা—[স° রিষ্টমুষ্টি] strychnos nux vomica।

কুঁদ—[স° কুন্দ] মল্লিকাদিবর্গের পুষ্প ক্ষুপ বি° jasminum pubescens, j° pirsatum. শীতকালে অসংখ্য ফুল হয়, ফুল শাদা, নির্গন্ধ। বড় কুন্দ—j° arborescens।

কুঁদরি—কুষ্মাণ্ডাদিবর্গের বন্য এতানী বি°, trichosanthes cucumerina পটোলের মত গাছ। ফুল ছোট, ফল অণ্ডাকার, পাকলে লাল হয়।

কুঁদরুকী (দেশজ)—লতা বি°, boswellia then...

কুকশিমা—[স° কুকুরদ্রু, ও° পোক শোঙ্গা] সোমরাজ্যাদি-বর্গের বর্ষায় লোমশ শাক বি°, blumca lacera। পাতায় গন্ধ, ফুল পীতবর্ণ, শীতকালে জন্মে। ছোট কুকশিমা—ফুল ঘোর রক্তবর্ণ vernonia cinerera।

কুকশিমে—[স° কুলাহল, কুকুন্দর] একপ্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত গাছ, celsia coromandeliana. শীতকালে যেখানে সেখানে প্রচুর জন্মায়। ডাঁটায় ও পাতায় রোঁয়া আছে। ফুল হলুদবর্ণ, ঈষৎ তিক্ত।

কুকুর—গ্রন্থিপর্ণী নামক বৃক্ষ বি°।

কুকুর-আলু—আরণ্য আলু লতা বি°। diascoria anguina, পাতা অল্প লোমশ। উত্তর বঙ্গে ও দক্ষিণ বঙ্গে জন্মে।

কুকুর-চিতা—চিরশ্যামল বন্য তরু বি°, tetranthera apetala, litsaea pebefera, ফুল ছোট গ্রীষ্মকালে ফোটে, স্ত্রী ও পুং পুষ্প পৃথক গাছে হয়। বড় কুকুর-চিতা—t° monopetala।

কুকুর-চূড়া—[স° পপ্পান, ও° কুকুর ঢেনিয়া] আচ্ছুকাদিবর্গের ছোট অরণ্য তরু বি°, pavetta indica। ফুল শাদা, অল্প গন্ধযুক্ত ও চতুর্দল, গুচ্ছাকারে হয়।

কুকুর-ছিট-কী—ছোট ক্ষুপ বি°, leca staptylea. ঢোল-সমুদ্র গাছের মত। ফুল ছোট, বর্ষাকালে হয়।

কুকুরজিহ্বা—ক্ষুদ্র বৃক্ষ বি°, ixora undulata।

কুকুরলেজ (দেশজ)—উলটচণ্ডাল।

কুকুরশুঙ্গা, কুকুর শোঁকা—কুকুন্দর গাছ।

কুকুর সুন্দা—কুকুরশিমে দ্র°।

কুকুরিয়া বঙ্গল (দেশজ)—একজাতীয় শিম গাছ, dolicos. lignosus.

কুকুটী—শিমুল গাছ।

কুক্কুট শিখ—কুসুম ফুলের গাছ।

কুক্কুরদ্রু—কুকুর শোঁকা গাছ।

কুগ্রম (দেশজ)—dalbergia rimosa।

কুঙ্কুম—[সং কুঙ্কুম, হিং কেসর] কন্দ শাক বিং, crocus sativus। ইহার ফুলের কেসরকে কুম্‌কুম বলে। আজকাল ভারতে কেবল কাশ্মীরে ইহার চাষ হয়। উত্তম কুম্‌কুম গাঢ় লেবু রঙের, অধম কুম্‌কুম পীত বা কাল। প্রকার ভেদ—অরণ্য কুঙ্কুম, আবাদী কুঙ্কুম। কাশ্মীরজাত উত্তম, বাহ্লীকজাত মধ্যম, ঈষৎ শাদা, পারস্যজাত অধম। পর্যায়—কাশ্মীরজ, অগ্নিশিখ, বর, বাহ্লীক, পীতন, রক্ত, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, লোহিত চন্দন, চারু, বরবাহ্লীক, রক্ত চন্দন, অগ্নিশেখর, অসৃক, পীতক, রুচির শঠ, শোণিত, ঘুসৃণ, বরেণ্য, অরুণ-কালেয়ক, জাগুড়, কাণ্ড, বহ্নিশিখ, কেশর-বর, গৌর, হরিচন্দন, খল, দীপক, সৌরভ, চন্দন।

কুঙ্কুমী, কুঙ্গনী—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কুচই কাটা (দেশজ) --mimosa octandra.

কুচড়ি—exacum tetagonum.

কুচণ্ডিকা, কুচণ্ডী—মূর্বালতা।

কুচন্দন—১ কুঙ্কুম, ২ বৃক্ষ বিং।

কুচফল—দাড়িমগাছ।

কুচাদেরী—চুকাপালং শাক।

কুচি কাঁটা—mimosa rubicaulis.

কুচিলা—বন্য ছোট তরু বিং, strychnos nux vomica. দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যায় প্রচুর জন্মে। বসন্তকালে ফুল হয়। ফল লালবর্ণ, ফলের শাঁস বাঁদরে খায়, কিন্তু বীজে ভয়ানক বিষ আছে।

কুচিলা-লতা—slrychnos colubrina.

কুচেলা—আকনাদি।

কুচ্ছ—কুমুদ ফুল, হেলা ফুল।

কুঞ্চফলা—কুমড়া।

কুঞ্চি—১ কুঁচ, ২ কঞ্চি, ৩ কৃষ্ণজীরা, ৪ মেথী।

কুঞ্চিত—তগর ফুল।

কুঞ্জরকণা—গজপিপ্পলী।

কুঞ্জরা—১ ধাতকী, ধাঁইফুল, ২ পারুলগাছ। পর্যায়—ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা।

কুঞ্জরালুক—হস্ত্যালু নামক আলু বিং।

কুঞ্জরাসন—অশ্বত্থগাছ।

কুঞ্জলতা—কলম্ব্যাদিবর্গের বর্ষায়ু রোহিণী, quamoclit pinnata. ফুল সরু লাল, পাতা পক্ষছিন্ন, বীজ চারিটি। বড় কুঞ্জলতা—Q. phoenicia. পাতা পানের মত। বীজ লোমশ।

কুঞ্জবল্লরী—নিকুঞ্জি কাম্না গাছ।

কুঞ্জিকা—১ কৃষ্ণজীরা, ২ নিকুঞ্জি কাম্না গাছ।

কুটচ—কুটজ দ্রং।

কুটজ—[সং পাণ্ডুর দ্রুম] কুড়চিগাছ, কুড়চি, holarrhena antidysenterica. বৃক্ষ মধ্যমাকৃতি, বাঙলার সব জায়গায় জন্মায়। ফুল শাদা, তগরাদিবর্গের আরণ্য ক্ষুপ বিং। পার্বত্য প্রদেশে বহু পরিমাণ জন্মে। বৎসরে একবার করে পাতা ঝরে। ফল বা বীজের নাম—ইন্দ্রযব [হিং ইন্দ্র যৌ]। প্রকার ভেদ—১ সিতকুটজ—পূতিকুটজ, ২ অসিতকুটজ [সং কৃষ্ণ তণ্ডুলা, হিং মিঠা ইন্দ্র যৌ] wrightia tinctoria. পর্যায়—শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কৌটজ, বৃক্ষক, কাহী, কালিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ, বরতিক্ত, যবফল, সংগ্রাহী, মাহাগন্ধ, পাণ্ডর, কৌচ, শক্রশালী।

কুটজ বীজ—ইন্দ্র যব।

কুটন্নট—১ শোনাগাছ, ২ কেশুর।

কুটরুণা—তেউড়ী লতা।

কুটিল—তগরপাদিকা ফুল। পর্যায়—কালানুশারিকা, বক্র, তগর, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীন, তগরপাদিক।

কুট্টেম—দাড়িমগাছ।

কুঠের—১ তুলসী, ২ বাবুই তুলসী।

কুঠেরক—১ তুলসী, ২ শ্বেত তুলসী। পর্যায়—অর্জক, শ্বেতপর্ণাস, গন্ধপত্র, ৩ বাবুই তুলসী। পর্যায়—বর্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা পর্ণাশ।

কুঠেরজ—শ্বেত তুলসী।

কুড়—কুষ্ঠ দ্রং।

কুড়কবালী (দেশজ)—ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিং, hedysarum bupheuri foluim.

কুড়চি—কুটজ দ্রং।
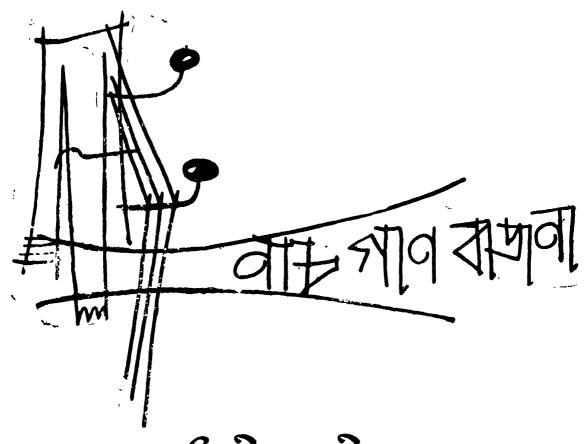
কুড়পুঙ্খি—উচ্ছে। [ক্রমশঃ।

সরোদ শিল্পী আলী আকবর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পান্নালাল দত্ত

নদীমাতৃক দেশ পূর্ববঙ্গ। সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ছিল অঙ্গাঙ্গি। ভাটির টানে নৌকা চলে আর চলে মাঝি-মাল্লাদের ভাটিয়ালি সুরে গান। হাসি কান্না, আনন্দ বিরহ অশান্ত মনের কথা গ্রাম্য ভাষায় স্ফুরিত এই গানে। রাগ-রাগিণীর বাঁধুনী এতে নেই—আছে মনের আবেগ সুরায়ত্ত হইবার প্রাণোচ্ছলতা। গ্রাম বাংলার লোকগীতি ও অধ্যাত্মবাদের গানে পূর্ববঙ্গের সংগীত রচয়িতা ও সাধক সমাজে বংশীবাদক ফকির আপ্তাবুদ্দীন তাঁর অনবদ্য প্রাণমাতানো সুরের ও মাধুর্য তৎকালীন সমাজকে বিমোহিত করেন। আর এই জন্যই দুঃখ ও দুশ্চর তপস্যাকে তিনি বরণ করিয়া লন। সংগীতে তিনি যা কিছু অবদান রাখিয়া গিয়াছেন তার দ্বারাই যুগ যুগ ধরিয়া সংগীত প্রেমিকদের মনোমন্দিরে তাঁহার পূজা হইবে। ত্রিপুরা জেলার সাতমোড়া গ্রাম আমার স্বগ্রাম। আমার জ্যেষ্ঠতাত সাধক কবি ৺মনোমোহন দত্ত'র প্রধান শিষ্যরূপে আপ্তাবুদ্দীনের আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা। শোনা যায় 'বাবা' সংবোধনে পঁচিশ মাইল দূরত্বের ব্যবধানকে কয়েক মিনিটে অতিক্রম করিয়া শিষ্য গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়িতেন। মনোমোহন দত্ত আদর করিয়া 'বাবা' নামে ডাকিতেন আপ্তাবুদ্দীনকে। বলেজো গানে বাজনায় আমাদের বাড়ী সরগরম থাকিত। সকলে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষেরা আপ্তাবুদ্দীনের গুণ মুগ্ধ হইয়া ধন্য ধন্য করিত। শিক্ষিত লোকেরা বলিত 'Good soul' আর সকলে 'পুণ্যাত্মা' বলিত। যে শোনে সেই বলে এমন বাঁশী, সানাই, বেহালা, হারমোনিয়াম, দোতারা বাজনা আর হয় না।

এই ছিল সাধকযন্ত্রী আপ্তাবুদ্দীন। তাঁকেই আমরা বিস্মৃতিকা শয়নে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্রের দেবসভায় আসর মাৎ করিতে রম্ভা আছে, ঘৃতাচী আছে, মেনকা ও অন্যান্য অপ্সরীরা আছে কিন্তু যাঁর বিহনে আজও সেই অপূর্ণ স্থান পূরণ হইল না সেই মনীষীর কথা আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। ইচ্ছা করিলে ইনি দেশ-কালের সীমা অতি সহজে অতিক্রম করিতে পারিতেন—কিন্তু বাহবা পাওয়ার লোভ ছিল না। তিনি একান্তই পল্লীগ্রামের মন ও জলহাওয়ার মানুষ ছিলেন। অশান্ত-জীবনে শুধু ভগবানের কৃপা-লাভই ছিল তাঁর সাধনার প্রাণসত্তা। চোখে-মুখে ছিল বাউলের নির্লিপ্তির ছাপ।

তাঁর কথা শুধু তুলিতে পারেন নাই সহোদর ভাই আলাউদ্দীন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগীতাচার্য আলাউদ্দীন ভাই সাহেবের স্মৃতিতর্পণ করিয়া চলেন সংগীতের আরাধনায়।

কথায় আছে—'বাড়ীর গরু ঘাটার ঘাস খায় না।' আলাউদ্দীন তখন পর্যায়ক্রমে বরিশাল, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে গানবাজনা শিক্ষা করিতেছিলেন। হাজারী ওস্তাদ, লবো সাহেব, হাবু দত্ত'র নিকট তালিম নিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছিলেন। একদিনের একটি ঘটনার জন্ত আলাউদ্দীন উন্মুখ ছিলেন না।

হঠাৎ ভাইসাহেব বলিলেন—ঘর ছাইড়া গিয়া, বাইরে গিয়া কী শিখলি বাজা একবার আমার সামনে।

আলাউদ্দীন গৎ বাজাইল।

—এ আমার ঘর দোতারাডা, আপ্তাবুদ্দীন বলিলেন।

অবিকল সেই গৎ বাজাইয়া আলাউদ্দীনকে বলিলেন শান্ত মৃদুস্বরে—এর জন্ত তুই দেশে দেশে ঘুরবি, খোদার কসম ভগবানের দিব্য আমি তুরে সব শিখামো ঘরে বইসা।

আলাউদ্দীন সেদিন অপ্রতিভের ন্যায় তমসার আড়ালে জ্যোতির্ময়কে দেখিলেন। দোতারার ঝঙ্কারের ও তরফের তার থাকেনা।

বস্তুত আপ্তাবুদ্দীনকে বুঝিতে হইলে যে ধরণের মানসিক প্রস্তুতি দরকার তাহা আমাদের মধ্যে এখনও হয় নাই। জাগতিক নিয়মের প্রাকৃত জড়বস্তুর পারে আর এক জগৎ তাঁর কাছে ধরা দিত।

'তিন পুরুষে'র বংশ পরম্পরাগত সংগীত সাধনার উৎসমূলে ভাইসাহেবের পুণ্যফল কাজ করিয়া চলিয়াছে। আপ্তাবুদ্দীনের সুর প্রাণ থেকে প্রাণে মন থেকে মনে উৎসারিত হউক আবার। মীর্জা গালিবের বিখ্যাত সেই উক্তি দিয়ে তাঁর বন্দনা শেষ করিতেছি:

'তুম সালামত রহো হাজার বরস—
হর বরসকে হো দিন পঞ্চাশ হাজার।'

* * * *

প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলাম,—পরিচয়ও নূতন নয়। আলাউদ্দীন খান এন্টালীতে দক্ষিণারঞ্জন রায়চৌধুরীর বাড়ীতে উঠিয়াছেন। এইখানেই দুই-এক মাস থাকিয়া শীতকালীন অধিবেশনগুলিতে যোগদান করিবেন। ১৯৫১ সালের ঘটনা! এত বড় সংগীতবিদের সঙ্গে আমি কী লইয়া আলাপ করিতে পারি? কাঠের লম্বা সিঁড় বাহিয়া উঠিতে উঠিতে এসবই চিন্তা করিতেছিলাম। তাঁহার রাতুল চরণে প্রণাম করিয়া জীবন ধন্ত করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি অপ্রতিভের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—'তোমরা গুরুর জাত, পা ছুঁইয়া প্রণাম করিও না।' আমাদের সংসারের নানা খোঁজখবর এমন কি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়িতেছিল তার বি, এস, সি পরীক্ষার ফাইনাল কবে ইত্যাদি। জ্যেষ্ঠা ভগিনী মায়া দত্ত তখন তৃতীয় বার্ষিকীর ছাত্রী। চুরুট হাতে ছিল। কখন যে তাহা নিভিয়া গিয়াছে তাঁহার খেয়াল নেই। প্রসঙ্গ পাল্টাইলেন। 'আচ্ছা, এমন বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিতে পার যাহাতে আঙুল দিয়ে যা মনে করিব তাই বাজিবে'—এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেলেন আমাকে। তারপর কি ভাবিয়া আত্ম সমাহিত হইয়া নিজেই হাসিতে লাগিলেন।

—রবো (রবিশঙ্কর) পাঁচ মিনিটে যন্ত্র টিউন করিতে পারে জান। ১৯৩৫ সালে উদয়শঙ্কর আমাকে বিলেত লইয়া যায়। ফরমায়েসের পর ফরমায়েস আসিতে লাগিল সেখানকার লোকের কাছ হইতে। সকালে বলিত ভারতীয় রাগ-রাগিণী বাজাইয়া রাত্রির আবহাওয়া সৃষ্টি কর, আবার রাত্রে বলিত প্রভাত কালের। আমাদের দেশে শ্রোতারা আসরে বসিয়ে থক্ থক্ করিয়া কাশে বিলেতে এমনটি হয় না। সাগরের ঢেউ-এর মতো মাথা দোলান ছাড়া একটি টুঁ শব্দও করে না। একটি আসরে কুড়ি মিনিট টাইম ছিল সরোদ বাজনার। আমি বাজাইয়া যাইতেছি, কুড়ি মিনিটের জায়গায় এক ঘণ্টা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রবো আমাকে কাছে গিয়া বলিল, 'বাবা সময় হয়ে গেছে।' আমারও সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল—বাজনা থামাইলাম। শ্রোতারাও সময়ের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়া আমার বাজনা শুনিয়াছে। পশ্চিমদেশের মতো আমাদের দেশের শ্রোতারা নিজেদের প্রস্তুত করে নাই।

বিদগ্ধ শ্রোতা-সাধারণ হয়তো জানেন আসরে তার ছিঁড়িয়া গেলে খাঁ সাহেব তার বাঁধিতে ভাইসাহেবের গুরু মনোমোহন দত্তের গান ধরেন। তিনি গান ধরিলেন—

'ফকিরী কি গাছের গোটা···।
শিখিয়ে দে তুই আমারে কেমন ক'রে তোরে ডাকি,
এক ডাকেতে ফুরিয়ে দে তুই জন্মভরার ডাকাডাকি।'···

আবেগ-মথিত কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধ ওস্তাদের দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। এ দৃশ্য দেখার জন্ত সত্যিই উন্মুখ ছিলাম না।

শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থকারত্ব লইয়া বিরোধী মন্তব্যে পাঁচ হাজার বই আছে। কেহ কেহ এখন বলেন 'গ্লোব থিয়েটারে'তে ছিল শেক্সপীয়রের প্রবল বিশ্বাস অর্থাৎ কিনা নাটকের কমিটিতে ক্রিস্টোফার মার্লো, র‍্যালে প্রভৃতি সুনামধন্য সাহিত্যিক ছিল বলিয়াই শেক্সপীয়রের লেখা নাটক পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লণ্ডনে এই লইয়া তর্কাতর্কি খবর খোঁড়াখুঁড়ি এ সবের কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু আলাউদ্দীন খাঁর অবর্তমানে তাঁর সঙ্গীতের গতি ব্যাহত হইবে না—তর্কাতর্কিও হইবে না এমন কিছু। অগণতি গুণমুগ্ধ শিষ্য এবং তার সঙ্গে পুত্র আলী আকবরকে রাখিয়া যাইবেন গুরুদায়িত্ব পালনে। সর্বোপরি তাঁহার সঙ্গীত যুগ যুগ ধরিয়া আনন্দ দিবে আর যাহা রহিল তাহা হইল তর্কাতর্কি। ইহাও আমরা উপভোগ করিব।

সমাপ্ত

সাম্প্রতিক রেকর্ড

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কয়েকখানি নূতন রেকর্ড "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" এবং "কলম্বিয়া"-তে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম:—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 83009—সুচিত্রা মিত্র: কাঞ্চনের পূর্ণিমা; দেখা না দেখায় মেশা।

N 83010—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়: তোমারই তরে মা; আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

N 83011—শ্রীলা সেন: পরবাসী চলে এসো ঘরে; মম চিত্তে জিতি নৃত্যে।

N 83012—আলপনা রায়: পুষ্পবনে পুষ্প নাহি; দু'জনে দেখা হল।

N 83013—চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়: ধরা দিয়েছি গো; কেটেছে একেলা বিরহের বেলা।

কলম্বিয়া

GE 25134—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়: হায় গো ব্যথায় কথা; অনেক কথা যাও যে বলে।

GE 25135—পূরবী মুখোপাধ্যায়: কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন; দিয়ে গেনু বসন্তের এই।

GE 25136—মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা: তুমি হঠাৎ হাওয়ায়; আহা তোমার সঙ্গে।

GE 25137—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়: ঘরেতে ভ্রমর এলো; আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা।

GE 25138—বাণী ঠাকুর: দীপ নিভে গেছে মম; হে মাধবী দ্বিধা কেন।

GE 25139—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়: সে আসে ধীরে; আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল।

এ ব্যতীত পাঁচখানি এক্সটেণ্ডেড প্লে রেকর্ডে এবং একখানি লং প্লেইং রেকর্ডেও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রকাশিত হয়েছে।

আমার কথা (৯৯)

শ্রীপরিতোষ শীল

অশেষ চেষ্টা ও প্রভূত অধ্যবসায়ের গুণে এক সময়ের বিদ্যালয়ত্যাগী ছাত্রটি আজ Menuhin of Bengal নামে পরিচিত শ্রীপরিতোষ শীল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি জানান:—

"৺তুলসীচরণ ও ৺সিদ্ধেশ্বরী শীলের পুত্র আমি ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জন্মাই। নয় বছর বয়সে স্কুল ছাড়ার জন্য খুব বকুনী খাই—তবুও সখের যাত্রাপার্টির ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকি। একদিন হারমোনিয়ম-বাদক অনুপস্থিত—পার্টির যন্ত্রী শ্রীলক্ষ্মণ বসাক ও শ্রীঅক্রূর দাস আমাকে সাহায্য করলেন সঙ্গীতরাজ্যে প্রবেশের। কাকা শিল্পী শ্রীসুরেশ শীল গান-বাজনায় বিশেষ করে বেহালায় আমার শিক্ষার পথ সুগম করে দিলেন।

বিদেশী সঙ্গীত শেখার জন্য কলিকাতা স্কুল অফ মিউজিকে বারো বৎসর যুক্ত থাকি—শিক্ষক Sandri সাহেব খুব স্নেহ করতেন। যদিও অত্যন্ত পয়সার টানাটানি সে সময় ছিল, তবুও বেহালা বাজান একদিনও বন্ধ রাখি নি। এই সময় টিটাগড় পেপার মিলের এক গানের আসরে বেহালা বাজানোর জন্য প্রচুর সমাদর লাভ করি।

তখন নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। শ্রদ্ধেয় অনাদি বসুর (অরোরা ফিল্মস্) পরামর্শে ও সাহায্যে কলিকাতার বাইরে কতকগুলি চিত্রগৃহে ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজানোর জন্য আমাকে যেতে হয়। কয়েক বছর বাদে এই কাজের জন্য কলিকাতার টকী শো হাউসে যোগদান করি—তখন হঠাৎ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সহিত পরিচয় হয়। মিনার্ভা থিয়েটারে বাজনা শুনে মুগ্ধ হন কবি। আমার পরবর্তী জীবনে তাঁহার নিকট প্রচুর সাহায্য লাভ করি। তাঁহার পরামর্শে আমি ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখিতে থাকি। প্রত্যহ ১৬ হ'তে ১৮ ঘণ্টা রেওয়াজ করার জন্য প্রতিবেশীরা পুলিশের শরণ নেন—কিন্তু আমি নিবৃত্ত হই নাই।

আমি প্রথমে টুইন রেকর্ড কোম্পানী ও পরে এইচ-এম-ভি-তে চাকুরী লইয়া সঙ্গীত পরিচালনা করি। ১৯৩১ সালে টুইন রেকর্ডে আমার সোহনী ও ভীমপলশ্রী রাগ দুইটি প্রথম রেকর্ডিং করা হয়—পরে বহু বাজনা বিভিন্ন রেকর্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দেশের বহু স্থানে আমি বাজিয়েছি।

১৯২৭ সালে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে আসি এবং এখনও উহার সহিত যুক্ত রয়েছি। একক ও সমবেত ভাবে উহার বহু

শ্রীপরিতোষ শীল

অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছি। ১৯৫৩ সালে উহার Light Music Unit এর সহিত সংশ্লিষ্ট হই।

আমি বহু সবাক চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালকরূপে যুক্ত ছিলাম। "বন্ধুর পথ" ও "পরশমণি" কথাচিত্র দুইটির গানগুলি শ্রোতারা বেশ ভালভাবে গ্রহণ করেন।

আমার শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে প্রো: বিমল গুপ্ত ও শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

আমি বহু সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম বা আছি। 'সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা' তন্মধ্যে অন্যতম। আমার এক প্রিয় ছাত্র রতনলাল দাঁ অল্প বয়সে মারা যায়। তাহার মৃত্যুতে আমি খুবই অভিভূত হয়ে পড়ি।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) আমাকে নিজের ছেলের মতন স্নেহ করতেন। পৃথিবীখ্যাত বেহালাবাদক ইটালীয়ন Mario de Georgio এদেশে এসে আমার বাজনা শুনে খুশী হয়েছিলেন।

শ্রীশীল উচ্চশ্রেণীর গীটার বাজিয়ে থাকেন এবং উহার মাধ্যমে যখন তিনি ভারতীয় রাগ-রাগিণীর রূপ ফোটান, তখন এক অভূতপূর্ব শিহরণ মনের মধ্যে দোলা জাগায়।

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

ছত্রিশ

এরই মধ্যে বারাণসী দৌড়েছিলাম একবার। বিশ্বনাথ-দর্শনে নয়, গোপীনাথ-দর্শনে। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজকে প্রশ্ন করেছিলাম, মহাত্মা জ্যোতিজী যদি সূক্ষ্মদেহে মহাপুরুষ-কৃপায় লোক-লোকান্তর ঘুরে আসতে পারেন তো বন্ধুকে খুঁজতে গিয়ে তারকেশ্বরে এবং ত্রিবেণীতে এত কষ্ট করার দরকার কি ছিলো? পথের কষ্ট, থাকার কষ্ট, খাবার কষ্টর মধ্যে না গিয়ে সূক্ষ্মদেহেই তো পৌঁছতে পারতেন তারকেশ্বরে ত্রিবেণীতে। গোপীনাথ বললেন: না। পারলেও তাঁরা তা করেন না। এমন কি অনেক সময় সূক্ষ্মদেহেরও প্রয়োজন হয় না। স্থূল দেহে কোথাও না গিয়েও লোক-লোকান্তরের রহস্যকে আহ্বান মাত্র পারেন আহ্বান করতে। আবরণ পারেন উন্মোচন করতে মুহূর্তে। তবুও তাঁরা অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজন ছাড়া এবং প্রায়ই গুরুনির্দেশ ছাড়া এই শক্তিকে কাজে লাগান না। সামান্যের জন্যে অসামান্যের অপব্যবহার করেন না।

কথা বলতে চোখ বুজে ফেলেন গোপীনাথ। তখন মনে হয় জ্যোতির্দীপ্ত এই একটি লোক, চিরন্তন ভারতের শেষ অশেষ আলোক বিশ্বনাথ সন্নিকট গোপীনাথ নিজের সংগে নিজেই কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যা, গোপীনাথের ক্ষেত্রেও তাই। নিজের সংগে ছাড়া আর কার সংগে কথা হবে এঁদের। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সংগ করবেন কার। পথে যেতে দেখা হবে অনেকের সংগে। পথ যেখানে শেষ হবে সেখানে জীবনদেব ও রবীন্দ্রনাথ একা। পথে চলতে কথা বলতে হবে বৈ কি গোপীনাথের অনেকের সংগে। দর্শন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তর্ক, বিতর্ক, বিচার, কথার পরে কথার মালা গাঁথা। তারপর: তারপর চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রার্থনা; এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে, পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা।

রবীন্দ্রনাথই বলো, গোপীনাথই বলো, জীবনদেবতাই বলো, কিংবা বলো বিশ্বনাথ;—সমস্ত সন্ধ্যা সমস্ত প্রভাত দিয়ে যেতে হবে তাঁকে যাঁর কাছে থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন বাঁশি, গোপীনাথ পেয়েছেন মেধা। এজন্ম অথবা পরজন্ম, কোটিজন্ম পরে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি 'সে'-ই। কেউ এসেই বোঝে সেকথা, কেউ বোঝে না অনেক কেঁদে হেসেও। কেউ ভালোবেসেই পেয়ে যায় তাঁকে।

গোপীনাথ বলছেন আমি শুনছি। মর্ত্যলোকের মৃৎপাত্রে উচ্ছলিত অমৃত দান করছেন অযোগ্যকে। মধু ক্ষরিত হচ্ছে বিষাক্ত বায়ুতে, শিখা নিবে আসা বাতিতে জ্বলছে মৃত্যুহীন দীপ্তি। বুদ্ধদেবের কথা বলছেন গোপীনাথ। লৌকিক সাধনার শেষে লোকোত্তর জ্ঞানের আসন পেতেছেন পথের ধারে গাছের ছায়ায় বুদ্ধদেব। এ জ্ঞান নিজেকে পেতে হয়। এ কেউ কাউকে দিতে পারে না। চরমের পরম নির্দেশধন্য বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করছেন আনন্দ: তিনি কি আছেন? বুদ্ধদেব উত্তর দিচ্ছেন: তাতো বলিনি। আবার আনন্দজনক প্রশ্ন: তিনি কি নেই? আবার প্রবুদ্ধ উত্তর: তাতো বলিনি। আনন্দ তখন চেপে ধরেছেন বুদ্ধকে: তিনি কি আছেন এবং নেই এক সংগে? মুহূর্তে প্রশ্নচ্যুত করেছেন আনন্দময় গুরু: তাও তো বলিনি। তবে? আনন্দাসনের দিকে তাকিয়ে আনন্দাতীত অবস্থা আদেশ করেছে: তবে তুমি নিজে ডুব দাও। উত্তর পাবে তোমার প্রশ্নের। তোমার চরম প্রশ্নের পরম উত্তর।

এই একই কথা কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়? রূপনারায়ণের তীরে জীবনের প্রথম সূর্যে সে প্রশ্ন উদিত তুমি কে? জীবনের শেষ সূর্যে তার উত্তর কি মুদিত নয়। কেন উত্তর পাননি কবি? পাননি কারণ সমুদ্রের ও প্রশ্ন উত্তরেই হিমালয় চিরনিরুত্তরের প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলংগকে ঐ প্রশ্নই অন্যভাবে করেছিলেন। ত্রৈলংগ নিরুত্তর থেকে উত্তর দিয়েছিলেন তার। শিষ্যরা বলেছিলো ত্রৈলংগকে দেখিয়ে: উনি আজ কিছুকাল হলো কথা বলেন না। অবাক শ্রীরামকৃষ্ণ সংগে সংগে বলেছেন: কথা বলেন তো!

কথা বলেন তিনি ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি কে' এর উত্তর পাইনি আমি। যাকে জানা মানেই আমাকে জানা। আমাকে জানা মানেই যাকে জানা। তারপর আবার কথা কেন? তারপর আবার কার কথা? পথ যতক্ষণ চলেছে ততক্ষণই পায়ের শব্দ; পথ যেখানে শেষ সেখানে আকাশ নিস্তব্ধ; সেখানে পথিক নিঃশব্দ।

গোপীনাথের কণ্ঠে সেদিন বিশ্বনাথের কৃপা বুঝি ভর করেছে আমারই ওপর অহৈতুকী কৃপায়। ফোর্থ ডাইমেনশান পর্যন্ত ভাবতেই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দম বন্ধ হয়ে আসছে, গোপীনাথ বলছেন দশ ডাইমেনশানের কথা। গতকাল, আজ এবং আগামীকাল বলে কিছু নেই। ইটার্ণাল প্রেসেন্ট পড়ে আছে অখণ্ড জ্যোতিসমুদ্রের মতো। আমরা তাকে ভাগ করেছি, অতীত, বর্তমান ভবিষ্যতের ফিতেয়। হিমালয়কে যেমন বলেছি, উনত্রিশ হাজার ছ' ফিট। শ্রীচৈতন্যকে বলেছি অমুক সময়ের লোক। খণ্ডদৃষ্টিতে অখণ্ডের বিচার। হিমালয়ের কোনও মাপ নেই; যেমন বয়স বলে কিছু নেই শ্রীচৈতন্যের। হিমালয়ের চর্মচক্ষে যেটুকু দেখা যায় সেটুকুর সীমাহীন ঊর্ধ্বে আছেন হিমালয় দাঁড়িয়ে। শ্রীচৈতন্য কোনও বিশেষ সময়ের

লোক নয় ? তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, কেবল তিনিই থাকবেন।' ও ইটার্ণাল প্রেসেন্ট।

জন্ম-মৃত্যু, কর্ম-অকর্ম, পাপ-পুণ্য আছে : আবার নেইও। কি রকম ? গোপীনাথের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আবার কথা বলতে বলতে। আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে খুলে যাচ্ছে আমার চোখ।

অনেক অনেক যুগের ওপার থেকে, বহুবিস্মৃত সেই কণ্ঠস্বর, যা কখনও মরে না কারণ তা সত্য, শতশতাব্দীর বিস্মৃতির অতলে যা হারায় না কখনও, অপমানে যা টলে না, অধৈর্য হয় না যে, আঘাতে হয় না অস্থির, সেই অমৃতবাণী উচ্চারিত হচ্ছে বিশ্বনাথের কাশীতে গোপীনাথের কণ্ঠে। আমার মনে হচ্ছে, পূর্ব দিগন্তে ভোর হচ্ছে আবার, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ, মাংসগন্ধে মুগ্ধ ক্ষমতা-বিভোর মানব অসভ্যতার হচ্ছে লয়। জেগে উঠছে অপরাজিত মনুষ্যত্বের মুখে সেই সত্য, সেই শাশ্বত,—আরেকবার হাওয়া বন্ধ বন্ধঘর, বহু ব্যবহারে জীর্ণ জরাগ্রস্ত চৌকি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু মূল্যবান চিঠি, বই, পাণ্ডুলিপি, পার্স এবং কি নয়। মেঝের ম'তুর পাতা। তার ওপর কাঠের চেয়ার একখানা। তবু মনে হচ্ছে অলকাপুরী। মনে হচ্ছে, সেই চির নূতন যুগের সকালে সেই চিরকালের ফুল ফুটছে। তার গন্ধে মধুলোভী মন ভুলেছে তার পরিবেশ। ফ্যানের হাওয়া নয় ; সুবাতাস বইছে মন্দ মন্দ। সেই বাতাসে, অন্ন-বিভার তাদের ঘর জেগে পড়ে নিজের অবিভার ভারে। আর লোকোত্তর বিভার গর্ভ থেকে প্রসূত হয় বেদনার পুষ্প। যে বেদনা স্রষ্টার একার। যে বেদনায় বিদীর্ণ হবেন বলে তিনি বহু হয়েছেন। যে বেদনার সংগে শুধু অভিন্নহৃদয় যে, তার নাম আনন্দ।

গোপীনাথ ব্যাখ্যা করছেন জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্যের রহস্য। যতক্ষণ ভুলে থাকা যে আমিই 'সে'-ই ততক্ষণ কর্ম-অকর্ম পাপ-পুণ্য, ততক্ষণ জন্ম-জন্মান্তর। এ পর্যন্ত অন্যমুখেও শুনেছি, পড়েছিও অনেক বইতে। গোপীনাথের অনন্যমুখে একথা শুনতে আসিনি। তবুও বাধা দিলাম। কথার ঝরণা বেদনার পাথর ঠেলে নামছে। তাকে নামতে দাও। সূর্যের আলোয় ঝরণার জলে রং-বেরংয়ের খেলা দাও দেখতে। তারপর সেই স্রোত হবে স্রোতস্বতী। নদী বেরুবে সিন্ধুর উদ্দেশে। তারপর প্রবেশ করবে সিন্ধুর গভীরে। উচ্ছ্বাসহীন এবং গতিহীন সমুদ্রের গভীরে মুখর কবিকে হতে হবে নীরব। এই বাহ্য। তারও পরে কথা আছে। ঐ মহাসমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসবে কি সংগীত,—কান পেতে রইলাম তারই জন্যে। বুঝবার জন্যে নয়। বাজবার জন্যে। ইন্দ্রিয়কে তৈরী কর ইন্দ্রিয়াতীতের হাতে বাজবার জন্যে। শূন্যে ভরা থাক মা রে বাঁশি, বলেছেন কবি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।

একটু পরেই খুলে গেল অমরলোকের দ্বার। মহাসূর্যের আলো এসে পৌঁছলো মর্ত্যলোকে। গোপীনাথের কণ্ঠে আবির্ভূত হলো বিশ্বনাথের সৃষ্টি সৃজনরহস্যের, বিশ্ববিহীন বিজনবাসর কান্না। এই গোপীনাথের মধ্যে যে নিত্য সত্য শাশ্বত গোপীনাথের বাস তিনি বললেন : কর্ম আমরা পথ চলতে কুড়িয়ে পেয়েছি। আরম্ভে কর্ম

ছিলো না। মনে করুন, গোপীনাথ চোখ বুজিয়ে ফেলেছেন, মনে করুন, রাজার ছেলে নেমেছে ভিখিরির ছেলের ভূমিকায়। নিজেকে রাজার ছেলে মনে রাখলে অভিনয় জমে না। তাই ভোলা, তাই নিজেকে ভুলে থাকা। বার বার নানা ভূমিকায় নানান সংস্কারের বেশ নিয়ে বাঁশি বাজানো। যে মুহূর্তে মনে পড়ে, আমি সেই রাজার ছেলে সে মুহূর্তেই ছুটি। অথবা তার ওপরে, 'আবার যদি ইচ্ছে কর আবার আসি ফিরে'। ইচ্ছে কর নয়, ওটা হবে 'আবার যদি ইচ্ছে করি'। সত্যিই, সকলি তোমার ইচ্ছা নয়, সকলি আমারই ইচ্ছা। কারণ আমিই সেই ইচ্ছাময়ী তারা। এ আমি সে আমি নয় যে আমি চাকরি করি, প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকায় বাড়ি করি, মেয়ের জন্য সৎ পাত্র খুঁজি, ছেলের জন্যে ভালো চাকরি। যে আমি সন্তান মৃত্যুতে কাঁদি, নিজের নাম কাগজে ছাপা হলে খুসি হই। ডক্টরেট পেলে ভাবি আমি পণ্ডিত, না পেলে গাল পাড়ি আমার প্রতি অবিচার হয়েছে বলে,—এ-আমি সে-আমি নয়। এ আমি, সেই আমি যার মনে পড়ছে সে রাজার ছেলে, ইচ্ছে করেই নেমেছে ভিখিরির ছেলের ভূমিকায়। তাই ইচ্ছে করেই ভুলে আছে নিজেকে। কারণ মনে পড়লেই একথা যে, 'সে রাজার ছেলে'। তখন আর ভিখিরির ছেলের ভূমিকায় কি বলতে হবে তা মনে পড়লো কি করে। এই ভোলা, এই জট পাকানো, আবার তা খোলা, আবার মনে করা, আবার ইচ্ছে করা। এরই মধ্যে জন্ম-মৃত্যু পাপ পুণ্য, স্বর্গ-মর্ত্যের সমস্ত রহস্যই আছে, 'আবার কোনও রহস্যই নেই।

স্বামীজী যে বলেছিলেন অথবা স্বামীজীকে যে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যে স্বামীজীর যে মুহূর্তেই মনে পড়বে তিনি কে, সে মুহূর্তেই তাঁর মর্ত্যলীলার সংবরণ, একথা সত্য। কেবল স্বামীজীর ক্ষেত্রে সত্য যে তা নয়। তোমার আমার সকলেরই বেলায়ই তা সত্য। সত্য এবং শাশ্বত। আমাদেরও যেদিন মনে পড়বে আমরা কে, সেদিন আমাদেরও ছুটি। যতক্ষণ মনে পড়ছে না, ততক্ষণই ছুটোছুটি।

তবে যিনি জেনেছেন তিনি কি করে কখনও কখনও আবার আসেন খেলা করতে? সে ঐ, আবার যদি ইচ্ছে কর আবার আসি ফিরে। ইচ্ছে কর নয়। আবার বলি : যদি ইচ্ছে করি!

চার্বাকের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম ডক্টর গোপীনাথকে। বলেছিলাম, চার্বাক তো বলেছেন, খাও, দাও, ফুর্তি করো। ইট, ড্রিংক এণ্ড বি মেরি। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ। সেই একদিন উত্তেজিত হতে দেখেছিলাম, সমুদ্রের গভীরে দেখেছিলাম তরংগের ফণা তুলতে, যিনি শান্ত তাঁকে দেখেছিলাম হাত দিয়ে হাতের ওপর আঘাত করে বোঝাতে যে চার্বাককে যারা বিশুদ্ধ সেন্টেয়ালিজম্-এর প্রবক্তা মনে করে। তারা অনবিজ্ঞ ভয়ংকরী ওয়েষ্টার্ন বক্তা মাত্র। চার্বাকের দর্শন বৃহস্পতির দর্শন। সে দর্শনে ধরা পড়েছে এই দেহের মধ্যেই তাঁর বাস যিনি সন্দেহের অতীত। দেহকে জানলেই সকল সন্দেহ গেলো। জানা গেলো অজানাকে। আমাকে বললেন : ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের দিকে বার করে আছে লালায়িত মুখ। সেগুলোকে অন্তর অভিমুখী করুন কিছুক্ষণের জন্যে; দেখবেন যা ঐ দেহে নেই তা নেই কোথাও। দেহতত্ত্বের গান, সহজিয়া সাধনা ওরই ক্রুড ফর্ম।

এই দেহকে ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো। বাইরের হু'টো চোখের কালোয় দেখছ তাই ঐ দেহ পঞ্চভূত। প্রদীপের সেই আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখো যে আলো সাধকের, প্রেমিকের, পাগলের; দেখবে,—তোমার ও দেহ ভূত নয়। ওতেই আবির্ভূত আছেন তিনি, যিনি ভস্মীভূত হন না কখনও। আগুন যাঁকে দগ্ধ করতে পারে না! পবন স্পর্শ করতে পারে না যাঁকে, সিন্ধুর সমস্ত জল ভাসাতে পারে না যাঁর চরণতল, মানবদেহই তাঁর মহত্তম বিশ্ব—যাঁর নাম। এখানেই বাস করেন বিশ্বনাথ।

কাশী ভারতবর্ষের সেই দেহ যা চিরকাল ধরে রাখবে তাঁকে যিনি নিঃসন্দেহ। এই জন্তেই আমরা যাকে চর্মচক্ষে বিশ্ব বলি, আসল বারাণসীর অবস্থান তার বাইরে। মর্মচক্ষে এই কাশী হচ্ছে সেই জায়গা। সেখানে আত্মার সংগে আমার আত্মীয়তা হবে একদিন। এই বাস্তু। ধর্মচক্ষেই কেবল বারাণসীর অন্তরাত্মার উদ্ঘাটন।

চর্মচক্ষে কাশীর গলিতে সাধু, সিঁড়ি আর বিধবার সংগে সাক্ষাৎ। মর্মচক্ষে কাশী হচ্ছে তীর্থ, বহু মন্দির, ঘাট, রামায়ণ-মহাভারত কথকথার ক্ষেত্র—স্মরণাতীতকালের স্মৃতি। ধর্মচক্ষে কাশী ভারতবর্ষের আত্মার আলো, বহু মানুষের ধ্যান দিয়ে গড়া। এহ বাহ্য। এরও পরে আরেক চক্ষু আছে সে-দৃষ্টিতে কাশী আর অন্য কোনও স্থানে কোনও তফাৎ নেই। সে-দৃষ্টিতে ত্রৈলংগ এবং শুধুই উলংগে নেই

কোনও পার্থক্য। যে ইচ্ছের মহোত্তমের দিকে যাত্রা তমের সেই একই ইচ্ছে সৃষ্টি হয়ে চলেছে গাছের পাতা। সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছের খুলে গেছে যার লোকোত্তর চোখ সে আর কথা বলে না। শুধু দেখে। দেখে,—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।' এই ছলনা যে অনায়াসে সইতে পেরেছে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার। বিদ্যায় নয়, বুদ্ধিতে নয়, বোধিতেও নয়—ছলনাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় শুধু ভালোবাসায়। বিশ্বনাথের সবচেয়ে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।

বুঝেছি কি বুঝি নি এ তর্ক যার, তার ট্রাজিডির শেষ নেই। ভালো লেগেছিলো,—মাত্র এইটুকু যার মনে রইলো,—তার হাতেই শেষ পর্যন্ত রইলো শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এবারের গোপীনাথ-প্রসংগের আরম্ভেই বলেছি যে, গোপীনাথ আমাকে বলেছেন, শক্তিমান পুরুষেরা সামান্যের জন্যে অসামান্যের শরণ নেন না। সেকথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ তো গোপীনাথ নিজেই। তাঁর ছেলে মারা গেছে। মারা যাবার আগে তিনি জানতেন, মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার প্রার্থনাও জানতেন তিনি। তবুও সন্তান মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেন নি গোপীনাথ। এ জন্যে নয় যে, তাঁর মতো পণ্ডিতের চোখে জল দেখা দেবার নয়। এই জন্যেই শুধু যে, তাঁর মতো প্রেমিক জানেন 'মৃত্যু'র চেয়ে 'মিথ্যা' আর কিছু নেই। জীবনে যে চোখের সামনে থাকে মৃত্যুতে সে চোখের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তখন যেদিকে তাকাও সেদিকেই দেখতে পাও তাকে। অরণ্যের সবুজে, আকাশের নীলে, সমস্ত অনিমেষে তার আশ্চর্য ইশারা। মুদিত আলোর কমল-কলিকা নবপ্রভাতের তীরে তরুণ কমল হয়ে ফুটে উঠবে বলেই সন্ধ্যা তাকে গোপন রেখেছে আঁধার পর্ণপুটে,—এই ইশারাই তো তারার আলোয় অনাদিকাল ধরে কাঁপছে। এই ইশারাই সকালের প্রথম আলোয়, সন্ধ্যাকাশের গলানো সোনায়, নিশীথ রাতের বাদল অন্ধকারে দুঃখ দিনের দুঃখ না পেলে জীবনের দরজায় বন্ধুর রথ এসে কেন থামবে। ঝড়ের রাত না হলে পরাণসখা বন্ধুর অভিসার ব্যর্থ হবে যে!

ডক্টর গোপীনাথ নিজেও নিদারুণ দেহ-দুঃখ পেয়েছেন এবং তাকেও বলেছেন ভাগবতী করুণা: 'আমি বলছি জোর গলায়ই যে, দুঃখ বেদনাকে ঠিক মত গ্রহণ করতে শিখলে সাধন পথে সত্যিই এমন উপলব্ধি হয় যে, বেদনাকে মনে হয় ভগবানের দান…। [স্মৃতিচারণ: দ্বিতীয় খণ্ড: দিলীপকুমার রায়]

জীবনে যে দুঃখ পায়নি সে 'শব' পেয়েছে এবং শব ছাড়া আর সব পাওয়াই বাকী আছে তার।

গোপীনাথ কবিরাজের বয়স যখন এখনকার চেয়ে অনেক কম তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বলেন এক শক্তিধর পুরুষের কথা। সেই শক্তিমানের বৈশিষ্ট্য কি জানতে চান কবিরাজ। উত্তর হয়: তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পারেন বিন্দুবিসর্গ কারুর না জেনেই। গোপীনাথ বলেন অলৌকিক বিদ্যার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ তখন গভীর ছিলো না। তবু তিনি বললেন যে, সেই শক্তিবিশিষ্ট লোকটি কাশীতে এলে তাঁকে যেন খবর দেন তাঁর বন্ধু; তিনি দেখা করতে যাবেন। তারপর যথাসময়ে খবর এলো, তিনি এসেছেন। সমিত্র গোপীনাথ চললেন শক্তি-দর্শনে।

সেখানে ভদ্রলোকের সংগে দেখাশোনা আলাপ-পরিচয়ের পর গোপীনাথ বললেন: আলাপ হলো। এবারে চলি। বিস্মিত শক্তিধর পুরুষ বলেন: সে কি! আমার কাছে আপনি কিছু দেখবেন না। অব্যাহতবাক কবিরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন এই বলে যে, আমি কিছু দেখবার আগ্রহী নই। তবে আপনি কিছু দেখাতে চাইলে নিশ্চয়ই দেখব।

ভদ্রলোক তখন কতগুলো কাগজ কেটে তাতে কি-সব লিখে চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন গোপীনাথকে: আপনি তো ম্যাট্রিক পাস করেছেন অনেকদিন?

আমার সময় এন্ট্রান্স ছিলো—

পাঠ্য-পুস্তকের কোনও বাংলা পদ্য মনে আছে?

আছে।

বলুন তো—

গোপীনাথ একটা লাইন আবৃত্তি করলেন। ভদ্রলোক প্রথম কাগজটি খুলে দেখালেন, গোপীনাথ-আবৃত্ত লাইনটি হুবহু সেখানে লেখা হয়ে আছে আগেই।
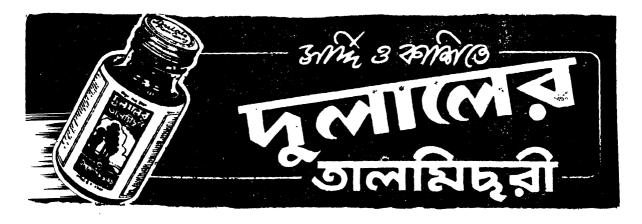
আবার প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক : কলেজে গিয়ে সেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে হয়েছে তো ?

গোপীনাথ তার উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

: বেশ, সেক্সপীয়ারের একটা লাইন বলুন তো ? গোপীনাথ সেক্সপীয়ারের একটা লাইন বলতে দেখা গেলো, দ্বিতীয় কাগজটিতে সেই লাইনটি আগেই লেখা হয়ে গেছে।

গোপীনাথের সংগে যে বন্ধু পরিচয় করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এবার বলেন, 'আমার একটা—,' পুরো কথা বলতে না দিয়েই শক্তিসম্পন্ন সেই ব্যক্তি বলেন, এই দেখুন আপনি কি প্রশ্ন করবেন, আমি তা এই তৃতীয় কাগজটিতে লিখে রেখেছি। প্রশ্নটি ছিলো কাশীর একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু-রহস্য সংক্রান্ত। বাড়ির ওপর থেকে পড়ে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে কাশীতে তখনও দারুণ চাঞ্চল্য অব্যাহত। পুলিশ তদন্ত চলছে।

গোপীনাথের বন্ধু আবার প্রশ্ন করেন : আপনি বলতে পারেন এ মৃত্যু দুর্ঘটনা না হত্যাজনিত ?

অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখাতে ব্যস্ত ভদ্রলোকটি গোপীনাথের বন্ধুকে বললেন : আপনার এ প্রশ্নের উত্তরও আমি জানি ; কিন্তু আমি তা এখনই এখানে আপনাকে বলব না। বলব না কারণ, এই মৃত্যু নিয়ে থানা-পুলিশ চলছে। আমি যে শক্তির সাহায্যে এর নির্ভুল উত্তর দিতে পারব, সে শক্তিতে পুলিশের বিশ্বাস নেই। কাজেই সে আমাকে এই ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িয়ে দেবে। তার মধ্যে আমি পা দেব না। তবে কখনও যদি একা আসেন আপনি আমার কাছে, আর আমার যদি মন হয় তাহলে বলে দেব এ মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা।

এই ভদ্রলোকই আরেকদিন ডক্টর গোপীনাথকে তাজ্জব করে দেন সেই বয়সে, অংকের উত্তর আগে থেকে কষে রেখে। গোপীনাথ আমাকে বলেছেন যে, ব্যাপারটা খুব বিজি নয়। নয়, তার কারণ গোপীনাথ সে সময় এনট্রান্স পাঠ্যের কোনও চিন্তাই করছিলেন না। তাছাড়া তিনি কি লাইন বলবেন সেটা জেনে রেখে, আগে থেকে তার উত্তর লিখে রাখা খুব বিজি-এর কর্ম নয়। এই বিদ্যায় কখনও ভুল হয় কি না সে প্রশ্ন ঐ শক্তিমান লোকটিকে করেছিলেন গোপীনাথ। তিনি বলেছিলেন হয়। ইকোয়েশান করে অংকের উত্তর যখন করেন তখন কোটিকে গোটিক ভুল হয় ত' হয়। হয় ত' কেন,—হয়। তবে ভিসন্ থেকে যখন বলি তখন আর ভুলের কোনও সম্ভাবনা নেই। কোটিতে একবার না।

হ্যাঁ। ভুল হয়। গোপীনাথকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম : আপনি যাদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করেন, তাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল প্রমাণ হয় না কখনও ? এ প্রশ্ন আমি একটি বিশেষ লোকের কথা মনে রেখে করেছিলাম। ডক্টর গোপীনাথ তাকে নিজের বাড়ীতে এনে রাখেন। সেখানেই একদিন ধরা পড়ে যায় তার চালাকি। তারপরেও গোপীনাথ তার কোনও অসম্মান করেন নি। কাউকে বলেন নি এ কথা। আমাকেও কিছুই বললেন না ; শুধু এইটুকু বললেন যে, হ্যাঁ, আমি তাকে যা ভেবেছিলাম সেটা ঠিক তা . পর শুধু বললেন : এ ভুলেরও দরকার ছিলো।

যে কোনও লোক । ... কুৎসিত কদর্য হতে পারত বিশ্বস্ত কেউ বিশ্বাস নষ্ট করলে। ... থ পণ্ডিত হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও ব্যতিক্রম। নিন্দার্হ ব ... র দোষ নিজের ঘাড়ে নিলেন। বললেন ; ভুল করেছি। এ ভুলে ... রকার ছিলো।

এই গোপীনাথকে ... ম ভালোবাসি ! এই গোপীনাথকে না দেখলে আমার বিশ্বনাথ দর্শন অসমাপ্ত থাকতো।

কাশীতে এখন একজন আছেন যাঁর নাম লালবাবা। উলংগ। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কিছুদূরে তাঁর বাস। এঁর কাছে গেলে ইনি মারতে আসেন, ভাগিয়ে দেন। আবার কারুর জন্যে নিজে থেকেই বাড়িয়ে বসে আছেন বিপুল ঐশ্বর্যের হাত। দিলীপকুমার রায় তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এঁর কথা লিখেছেন। লালগোলার হেডমাষ্টার বিখ্যাত বরদাবাবুই দিলীপকুমারকে লালবাবার কথা বলেন। চির উলংগ, তিব্বতে যোগসিদ্ধ লালবাবা দূর থেকেই অনেক সময়ে বহু যোগীকে সাহায্য করেন। বরদাবাবুকেও করেছিলেন চাক্ষুষ দর্শন ছাড়াই।

দিলীপকুমার কাশীতে লালবাবার সন্ধানে গিয়ে দেখেন, লালবাবা দোতলায় উলংগ হয়ে খাটে বসে আছেন। তিনি দিলীপকুমারকে দেখা করতে দেবেন না। লালবাবাকেও ছাড়বেন না দিলীপকুমার। লালবাবাকে দিলীপকুমার বললেন : কেন ভাণ করছেন ? জানেন তো আমি ঐহিক কামনা নিয়ে আসি নি। পরের দিন সাক্ষাতের অনুমতি মিললো। পরের দিন দিলীপকুমারকে একটি উল্লেখযোগ্য কথা বললেন : 'আমার সাহায্য পেতে হলে আমার দেখা পাবার দরকার নেই—বরদাবাবু যে আমার সাহায্য পেয়েছিলেন সে কি আমার দেখা পেয়ে ? তোমাকে যখন তিনি আমার কাছে এসে ধর্ণা দিতে বলেন, তখন কি বলেন নি তোমাকে যে আমি বহু দূর থেকেই তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।'

বরদাবাবু সে কথাই বলেছিলেন দিলীপকুমারকে, সে কথা লালবাবার জানবার কথা নয়। [স্মৃতিচারণ : দ্বিতীয় খণ্ড : পৃঃ ১৯৯-২০০]

কাশীতে বার্ধক্যে বারাণসীর কোনও পাঠক-পাঠিকা গেলে, সব কিছু দেখবার পর লালবাবাকে একবার দেখে আসবেন। গণেশ তাঁর মা-কে প্রদক্ষিণ করেই হারিয়ে দিয়েছিলো কার্তিককে জগৎ প্রদক্ষিণ করতে পারে কে আগে সেই খেলায়। কাশীতে গিয়ে লালবাবাকে দেখলে কাশী দেখা সম্পূর্ণ হয়।

চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। মর্মচক্ষে কাশী এবং লালবাবাকে কলকাতায় বসেই দেখা যায়। কেবল লালবাবাই যে দূর থেকে সাহায্য করেন তা নয়। যার তৃতীয় চক্ষু খুলে গেছে সে-ও শুধু লালবাবাকে নয়, বাবা বিশ্বনাথকেও টেনে আনতে পারে নিজের কাছে।

এ কথায় বিশ্বাস করা টেলিভিসনের পরেও শক্ত, জানি। সেই সংগে এও জানি, টেলিভিসনের যুগ শেষ হয়ে ভিসানের যুগান্তর ঘটতে যাচ্ছে। মানের দুর্দিন শেষ হয়ে সুপারম্যানের দিন। [ক্রমশঃ।

কবিকণ্ঠ

'কবিকণ্ঠ' গ্রন্থখানির মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠের সকল রেকর্ডের পরিচয় তো আছেই, আরও আছে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সকল রেকর্ডের পরিচয় শিল্পী তালিকা, রেকর্ডে কবিকণ্ঠ, নানা-ভাষায় রূপান্তরিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড ও রবীন্দ্রসঙ্গীত-সম্বন্ধ চলচ্চিত্রের তালিকা, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে উৎসর্গিত গানের রেকর্ড তালিকা আর কবির নিজকণ্ঠ রেকর্ড ধরবার ইতিহাস। গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন যে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাতে গ্রন্থখানির মূল্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সন্তোষকুমার দে দীর্ঘকাল গ্রামোফোন শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। [illegible] রেকর্ড আবিষ্কারের পরেও যে কবির কণ্ঠ রেকর্ড করা হয়েছিল এ বিষয়ে তিনি [illegible] পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত সন্তোষ কুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের "কবিকণ্ঠ" গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

করেন। তিনি তদবধি বিভিন্ন পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধে নূতন নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন। এতদিনে সব একত্রে গ্রন্থীভুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের নিজকণ্ঠের রেকর্ড বিষয়ক ইতিহাস সত্যই অতি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। সত্যের খানি তথ্যাদির সাহায্যে গ্রন্থখানির আরও মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। গ্রন্থের বিপুল রেকর্ড তালিকা সংকলনে সহায়তা করে কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যও প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রানুরাগী, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধনা ও চর্চায় যারা উৎসাহী তাদের সকলের পক্ষেই 'কবিকণ্ঠ' একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ হয়েছে। সংকলক—সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য। পরিবেশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে এক অবিস্মরণীয় নাম, তাঁর সাম্প্রতিকতম এই কবিতাগ্রন্থ বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে যে মৌলিকতার সঙ্গে পাঠক সমাজকে পরিচিত করে দিয়েছিলেন তিনি একদিন, তার স্বাক্ষর আলোচ্য গ্রন্থেও বর্তমান। মোট ১৫২টি কবিতা আছে বর্তমান গ্রন্থে, তার মধ্যে কয়েকটি নিঃসন্দেহে সনেটধর্মী, 'সূর্যাস্ত বেলায়,' 'আদিম অন্তিম', 'এ মৃত্যুসংবাদে,' শীর্ষক কবিতাগুলির নাম উল্লেখ্য এই প্রসঙ্গে। যে বলিষ্ঠতা কবির স্বভাবসিদ্ধ তারই পরিচয়ে বাঙ্ময় তাঁর রচনা, প্রকৃতপক্ষে আবেগ অপেক্ষা ঋজু মননশীলতারই সন্ধান পাওয়া যায় কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে, আর সেটাই তাদের প্রাণসত্তা। কবির জীবনসন্ধানী বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, যথাযথভাবেই রূপায়িত হয়েছে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে, এক আশ্চর্য প্রাণোচ্ছলতায় সিক্ত কবিতাগুলি; জীবনের প্রান্ত কোণে সন্ধানী আলোকরশ্মি ফেলে যেন অন্বেষণে মগ্ন কবি। পাঠকমনেও সঞ্চারিত হয়ে যায় যেন সে অন্বেষণ অভীপ্সা। এই একাত্মতাতেই কবিতাগুলি সার্থক ও সফল। কাব্যগ্রন্থটির প্রচ্ছদ শিল্পোত্তীর্ণ, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—বিষ্ণু দে। প্রকাশক—সম্বোধি পাবলিকেশানস্ প্রাঃ লিঃ, ২২ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। দাম—পাঁচ টাকা।

রূপমতী

রূপমতী ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, মালবের সুলতান বাজবাহাদুর ও তাঁর রাণী রূপমতীর কাহিনী ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত কিংবদন্তী; এই অমর প্রেমকথাই রূপায়িত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক কুশল কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন অতীতের এই রূপকথারই মত অপরূপ কাহিনীকে, জাতিধর্মের অনুশাসন যে চিরদিনই প্রকৃত প্রণয়ের সামনে অর্থহীন 'রূপমতী' তারই প্রামাণ্য দলিল। সঙ্গীত-প্রেমিক মুসলমান সুলতান বাজবাহাদুরকে হৃদয় দিয়েছিলেন একদা সঙ্গীত-সাধিকা হিন্দু রাজকন্যা রূপমতী। সে প্রেম সার্থক হয়েছিল পরিণয়ে; কিন্তু শেষরক্ষা হল না কালবৈশাখীর কালো ঝড়ের মতই মোগল সম্রাট আকবর শাহের সৈন্যবাহিনী নেমে এল, সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংস করতে, পরাজিত সুলতান পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন, আর রূপমতী হারিয়ে গেলেন মৃত্যুর অন্ধকারে; স্ত্রী-ধর্ম বজায় রাখতে তীব্র হলাহল পানে আত্মবিসর্জন করলেন নির্দ্বিধায়; এই সকরুণ মধুর প্রেম-আলেখ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের আন্তরিকতায়. ইতিহাসকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে যথাযথ-ভাবেই কাহিনী বয়ন করেছেন তিনি, আর তাতেই তার রচনা সার্থক পরিণতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। লেখকের ভাষারীতি স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর, আঙ্গিক পারিপাট্য সম্বন্ধেও তিনি সচেতন, আমরা বইটি পড়ে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি।

মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত বসুমতী প্রাইভেট লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি অমূল্য সম্পদ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ "কৃত্তিবাসী রামায়ণের" প্রচ্ছদচিত্র। মূল্য—আট টাকা মাত্র।

গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীমন্ত সওদাগর, প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম দুই টাকা।

কাঁচের আয়না

সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, অনেক নতুন নতুন নাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যাঁদের মধ্যে অনেকেরই ভবিষ্যৎ

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত পরমপবিত্র ধর্মগ্রন্থ "মহাভারত"-এর প্রচ্ছদচিত্র।

প্রতিশ্রুতিময়, আলোচ্য উপন্যাসের লেখক তাদেরই অন্যতম। এক বয়স্থা কুমারীর শুষ্ক বঞ্চিত জীবন রূপায়িত হয়েছে এই গ্রন্থে। নায়িকা স্বাতী বাংলা দেশের সেই সব অসংখ্য মেয়েদেরই একজন, বয়স হয়ে গেলেও যাদের বিয়ে হয় না, হৃদয়ের সব চাওয়া-পাওয়াকে কঠিন হাতে দমিয়ে রেখে যাদের পথ চলতে হয় একা একা। সমাজ সচেতন লেখকের কলমের টানে টানে, আজকের সমাজের এক অতি বাস্তব সমস্যা নিখুঁতভাবেই রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ঘাত প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বে দোলা এক কুমারী হৃদয়ের ব্যথা বিধুর ছবি যা দিয়ে যায় পাঠক মননে। উপন্যাসের পরিণতি অবশ্য সম্ভাবনাময়, স্বাতী ও পার্থের মিলন, জীবনের চিরন্তন সত্যেরই জয় ঘোষণা করে। লেখকের ভাষারীতি সমৃদ্ধ, সহজ পারঙ্গমতার সঙ্গে যা কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—পরিতোষ মজুমদার। প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম—দু'টাকা।

Whither Bound Are we ?

আলোচ্য পুস্তকটি এক বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ, লেখক মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সমাজনীতি, রাজনীতি এ সবই পর্যালোচিত হয়েছে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে, বস্তুতঃ অধ্যাত্মবাদই যে মানব জীবনের

শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি, সেটা দেখানোই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ভগবৎ প্রেমই যে জীবনের মূল সূত্র, মানুষের বিভিন্ন কর্মধারার যে সেটাই প্রাণসত্তা, এ সম্বন্ধে অবহিত লেখক। তাঁর মতে যা কিছুই আমরা করিনা কেন ভগবৎ প্রেমেই নিহিত আছে তার সার্থক পরিণতি। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নেই, এমন জনেরও জন্য নির্দেশ করেছেন তিনি সেই প্রেমেরই পথ, তাঁর মতে সর্ববিধ প্রেমেরই পেছনে রয়েছে একই মহতী প্রেরণা. ভালবাসতে শেখাটাই যে মানুষের জীবনের সর্বোত্তম সফলতার স্বাক্ষরবাহী, সংক্ষেপে এটাই লেখকের মূল বক্তব্য। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল, মূল গ্রন্থের ভাবধারা অবিকল বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন অনুবাদকদ্বয়। আমরা এই অনুবাদ গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক - যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এম. এ, প্রকাশক--সাধনা ঔষধালয় লিমিটেড, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্থান। অনুবাদকদ্বয়— শ্রী ই, জে স্পেনসার, এম. এ ও শ্রীপরেশচন্দ্র ভোরা। মূল্য— আট টাকা।

শিল্পীর আত্মকথা

আলোচ্য গ্রন্থের প্রকাশক বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মকথা বা অটোবায়োগ্রাফী জাতীয় রচনা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন, বর্তমান গ্রন্থটি সেই পর্যায়ের প্রথম ফসল। মূল আত্মকথা ইংরেজী ভাষায় লিখিত, বাংলায় অনুলিখিত হয়েছে। অনুলেখক যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই মূল বিষয়বস্তুটিকে রূপান্তরিত করেছেন, কাহিনীর মেজাজ সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে, তার ভাষারীতিও মনোরম। মূল লেখিকা সুবিখ্যাতা নৃত্যশিল্পী ছিলেন, পাদপ্রদীপের আলোয় আজ তাকে দেখা না গেলেও একদিন সমগ্র বাংলা তথা ভারত তার নামে সচকিত হয়ে উঠত, স্বভাবতঃই নৃত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই তার সম্বন্ধে আজও কিছু কৌতূহল পোষণ করেন, আলোচ্য রচনায় সে কৌতূহল কতকাংশে তৃপ্ত হবে বলে আশা করা অসঙ্গত নয়। সবাংশে না বলে কতকাংশে বলার অর্থ যে এই আত্মকথা পূর্ণাঙ্গ নয়, শিল্পীর শিল্প জীবনের রূপটুকুই এতে ধরা দিয়েছে মাত্র, তার ব্যক্তি জীবন রয়ে গেছে অন্তরালেই, অথচ যে কোন মানুষকে সম্যক্‌ভাবে চিনতে হলে, জানতে হলে, সামগ্রিক রূপায়ণ অবশ্য প্রয়োজনীয় ; কিন্তু এই ক্ষেত্রেই লেখিকা দ্বিধাগ্রস্তা, নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে সঙ্কুচিতা হয়েছেন তিনি। হয়ত বা এ সঙ্কোচ স্বাভাবিকই, কিন্তু তার ফলেই শুধু শিল্পী সাধনা বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়েই নিরস্ত হতে হয় পাঠককে। এই নতুন

মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত কালপুরুষ রচিত "নিষিদ্ধ এলাকা" গ্রন্থটির প্রচ্ছদচিত্র। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ। শিল্পী—সুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

ধরণের উদ্যমের জন্য, বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশক নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা—সাধনা বসু অনুলেখক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৯। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অপাংক্তেয়

এক ভবঘুরে অপাংক্তেয়ের জীবনায়ন করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। কাহিনীর নায়ক মদন, সমাজে যাদের অপাঙ্ক্তেয় বলা হয় তাদেরই অন্যতম। সে লেখাপড়া শেখেনি, গোঁয়ার-গোবিন্দ গুণ্ডা বলেই তার নামডাক চারিদিকে, কিন্তু পাঁকের মধ্যে দলমেলা পদ্মের মতই অপূর্ব মহিমা তার অন্তরের। বহিরঙ্গে হীন, অন্তরঙ্গে সমৃদ্ধ এই অদ্ভুত মানুষটির জীবনের ইতিকথা, আন্তরিকতার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। পড়তে পড়তে নিজের অজ্ঞাতেই পাঠক সমবেদনা অনুভব করেন এই অপাংক্তেয় মানুষটির জন্য, আর সেটাই এই কাহিনীর পক্ষে সবচেয়ে বড় বলার কথা। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, সহানুভূতিশীল মন ও প্রকাশভঙ্গী প্রশংসার্হ। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুনীল চক্রবর্তী। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

পরলোকে বিজ্ঞ কোচ রহিম

ভারতীয় ফুটবলের অভিজ্ঞ কোচ সৈয়দ আবদুল রহিম ক্যান্সার রোগে চার মাস ভোগার পর গত ১১ই জুন সোমবার হায়দরাবাদে পরলোকগমন করেছেন। গত জাকার্তা গেম্‌সে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোচ রহিমের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, পরামর্শ, উদ্যম এবং অধ্যবসায় ভারতীয় দলকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। মেলবোর্ণ অলিম্পিকে তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পৃথিবীখ্যাত ফুটবল সমালোচক ডঃ উইলি মিজন অলিম্পিক গেম্‌সের অফিসিয়াল রিপোর্টে রহিম সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। রহিমের লোকান্তর ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

কোলকাতার ফুটবল

কোলকাতার ফুটবল লীগ প্রথমার্ধের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। এবারে লীগে অপরাজিত কেউ নেই। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, বি-এন-আর এবং ইষ্টার্ণ রেল ছাড়াও এরিয়ান ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলও এ-বছর দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অনেকেই আশা করেছিলেন, এ-বছরে উন্নত ধরণের খেলা দেখতে পাবেন। আগামী বছরে টোকিও অলিম্পিকের পূর্ববর্তী বছর হিসেবে ১৯৬৩ কে অলিম্পিক-প্রস্তুতি বছর বলা যেতে পারে। সেদিক থেকে ফুটবলের উন্নততর উৎকর্ষই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, খেলার মান যেন ক্রমশই নিম্নগামী। এখনো পর্যন্ত কোন দলই পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে খেলতে পারছেন না। কোলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে উৎসাহ উত্তেজনা, হর্ষ-বিষাদ, পুলক-বিস্ময় সবই আছে; নেই শুধু ভালো খেলার পরিচয়।

বম্বের ফুটবল

বম্বের হারউড লীগ ফুটবল সুরু হয়ে গেছে। লীগের আগে নাদকার্ণী কাপের (নক আউট) খেলায় বম্বের প্রথম ডিভিশন লীগের সবগুলো দলই যোগ দিয়েছিলো। গত বছরের বিজয়ী মফতলাল গ্রুপ্‌স্‌ ফাইনালে ফোনেক্স মিলনকে এক গোলে হারিয়ে উপর্যুপরি দু'বার নাদকার্ণী কাপ বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে। নাদকার্ণী কাপে এবারে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম মফতলাল দলের ষ্টপার এবং মহারাষ্ট্র রাজ্য দলের লেফ্‌ট্‌ ব্যাক (এবং একমাত্র বাঙ্গালী খেলোয়াড়) কল্যাণ মিত্র।

রেফারী প্রতুল চক্রবর্তীর সম্মান

রেফারী প্রতুল চক্রবর্তী ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশনের (FIFA) ব্যাজ লাভ করেছেন।
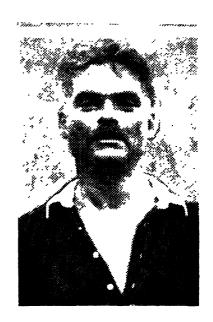
প্রতুল চক্রবর্তী

তাঁর আগে একমাত্র মালয়ের রেফারী কোএ টিক এই ব্যাজ লাভ করেছিলেন।

জাতীয় ফুটবল

এবারের সন্তোষ স্মৃতি বা জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হবে। মাদ্রাজই একমাত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠান,

যাঁরা এই প্রতিযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে উত্তর প্রদেশে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ইংল্যাণ্ড

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেষ্ট ম্যাচের আগে পর্যন্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলা দেখে অনেকেই তাদের সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু টেষ্ট ম্যাচের ব্যাট বলের (এবং বুদ্ধির) লড়াইতে তাদের অনায়াস শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত দিক থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচ দিনের টেষ্ট খেলার যবনিকা পড়েছে চতুর্থ দিনে এবং নিতান্ত ভাগ্যের জোরেই ইনিংসের পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেলেও ইংল্যাণ্ড ১০উইকেটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। প্রথম টেষ্টের দুই প্রধান নায়ক হলেন ব্যাটিং-এ হান্ট এবং বোলিং-এ ল্যান্স গিব্‌স্‌, যিনি এ-খেলায় একাই এগারোটি উইকেট দখল করেছেন। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে অধিনায়ক ডেক্সটারের ৭৩ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নবাগত ষ্টুয়াটের ৮৭-ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাণ। পক্ষান্তরে কনরাড হান্টের ১৮২ রাণ (ইংল্যাণ্ডের মাটিতে টেষ্ট খেলায়, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রাণের সবচেয়ে বেশী রাণ), কানহাই-এর ৯০, অধিনায়ক ওরেলের নট আউট ৭৪ এবং সোবার্সের ৬৭ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ইনিংসের সুদৃঢ় ভিত রচনা করতে সহায়তা করেছিলো।

লর্ডসে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের প্রথিতযশা বোলার ব্রায়ান ষ্ট্যাথাম, উইকেট রক্ষক এণ্ড্‌ এবং কার্টরাইট বাদ পড়েছেন। তাদের পরিবর্তে এসেছেন লারটার, জিম পার্কস এবং স্যাকল্টন। ইংল্যাণ্ড দল দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শীতের সফর

শেষ পর্যন্ত আগামী শীতে এম সি সি দল ভারতে পাঁচ দিন ব্যাপী টেষ্ট খেলতে স্বীকৃত হয়েছেন। ক্রীড়ামোদীদের কাছে আরও একটি সুসংবাদ এই যে, বিগত ভারত সফরের নৈরাশ্যময় ফলাফলের কথা স্মরণ রেখে এম সি সি কর্তৃপক্ষ দলটি বিশেষ শক্তিশালী করে পাঠানোর বিষয় চিন্তা করেছেন।

এ, মৌলিক

আগামী শীতে ব্রিটেন হকি দলও ভারত ভ্রমণ করবেন। এঁরা ভারতে পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ এবং কয়েকটি সাধারণ ম্যাচ খেলবেন। টেষ্ট ম্যাচ হবে লক্ষ্মৌ, দিল্লী, মাদ্রাজ, কোলকাতা ও বোম্বাই শহরে।

ভারতীয় হকি সম্পর্কে বাবুর মন্তব্য

ভারতীয় হকির প্রাক্তন অধিনায়ক বাবু কিছুদিন আগে বলেছেন,—"ভারতীয় হকির মানদণ্ড পাকিস্থানের চেয়ে কম নয়। কিন্তু যদি দশ বার ভারত বনাম পাকিস্থান হকি খেলা হয়, পাকিস্থান সাত বার ভারতকে পরাজিত করবে। এমন হওয়ার কারণ পাকিস্থান খেলার সময় কখনও জাতীয় সম্মানের কথা ভোলেন না, ভারত এ-কথা ভুলে যায়। যদি জাতীয় সম্মান এবং দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত সামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করে, তাহ'লে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব ভারত ফিরে পাবে। তিনি আরও বলেন, যতদিন পর্যন্ত না স্কুলে স্কুলে শিক্ষা-দপ্তর হকি খেলা বাধ্যতামূলক করছেন, ততদিন হকি খেলার মান উন্নত হবে না।"

উইমব্লডন

উইমব্লডন টেনিসে বাছাই তালিকায় পুরুষ বিভাগে

অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমারসন এবং মহিলা বিভাগে মার্গারেট স্মিথ শীর্ষস্থানে রয়েছেন। তবে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি এখানে এক বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে সেটি হচ্ছে যে ভারতের রমানাথ কৃষ্ণানকে এবারে বাছাই খেলোয়াড়দের তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

টমাস কাপ

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে টমাস কাপের ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা নিউজীল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত হবে।

ভলিবল

ভারতীয় ভলিবল দলের পনেরো জন সদস্য খেলায় যোগদান করতে এবং খেলার আইনকানুন ভালো করে শিখবার জন্য মস্কো যাত্রা করছেন।

মুষ্টিযুদ্ধ

মুষ্টিযুদ্ধে আরও একটি বলি হলেন যুগোশ্লাভিয়ার জোসিপ।

টেব্‌ল টেনিস

ভারতের নামকরা খেলোয়াড়রা যোগ দেওয়ায় ওয়াই-এম-সি-এ চৌরঙ্গী হলে মেট্রোপলিটান টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিলো। কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রচেষ্টায় বিশ্ব টেব্‌ল টেনিসে ভারতের প্রতিনিধি পাপু হাণ্ডালকর ও আর চাচাদকে এ-বছর সবপ্রথম কোলকাতায় দেখা গেলো।

নামকরা খেলোয়াড় থাকার জন্য প্রতিযোগিতার আকর্ষণ ছিলো, কিছু ভালো খেলা দেখবার আশা নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তারা একান্ত নিরাশ হয়েই ফিরেছেন।

টুক্‌রো-কথা

সহোদর ফুটবল খেলে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আছে। কিন্তু পাঁচ ভাই ফুটবল খেলে এবং রীতিমত উচুঁদরের খেলোয়াড় এমন নজীর এর আগে পাইনি। অজিত নন্দী (ইষ্ট বেঙ্গলের প্রাক্তন লেফ্‌ট হাফ এবং ১৯৩৮-এর অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের সদস্য), অনিল নন্দী (ইষ্টার্ণ রেলের লেফট হাফ, ১৯৪৮-এ লণ্ডন অলিম্পিক দলের খেলোয়াড়,) নিখিল নন্দী (ইষ্টাণ রেলের লেফট হাফ ; ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়, ১৯৫৮-এ এশিয়ান গেম্‌সে ভারতীয় ফুটবল দলের সহ-অধিনায়ক), সুনীল নন্দী (মোহনবাগানের এবং গত বছরের জাতীয় ফুটবলে পশ্চিম বাংলার খেলোয়াড়) এবং এস নন্দী (এরিয়ান)—এই পাঁচ ভাই-এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথম তিনজনেই লেফট্‌ হাফে খেলেছেন।

কোলকাতার ফুটবলে এখন পর্যন্ত যাঁদের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ, তাঁরা—

গোল—সনৎ শেঠ, পি বর্মণ, থঙ্গরাজ, কে সরকার ও বি-রাও।

ব্যাক—এস, সিংহ, রহমান, বি. রায়চৌধুরী, বি, ঘোষ ও সি, চন্দ।

ষ্টপার—অরুণ ঘোষ, অমিয় ব্যানার্জী. এস রায় ও এম ঘোষদস্তিদার

হাফ—বিদ্যুৎ মজুমদার, রাম বাহাদুর, পি, সরকার ও এ, ঘোষ।

ফরোয়াড—(রাইট আউট) পি. কে, ব্যানার্জী, সমাজপতি। (রাইট ইন) পি, সিংহ, এস নন্দী। (সেণ্টার ফরোয়াড) এ, মৌলিক, মঙ্গল পুরকায়স্থ, আপ্পালারাজু। (লেফট ইন) বলরাম, চুনী গোস্বামী। (লেফট আউট) অরুময়নিয়াগম, এস, দাশচৌধুরী।

এ বছরের লীগে সর্বোচ্চ গোলদাতার প্রতিযোগিতা কেন্দ্রীভূত থাকবে।

মৌলিক, পুরকায়স্থ, বলরাম ও আপ্পালারাজুর মধ্যে।

সি-এ-বি স্কুল ক্রিকেট লীগ প্রবর্তন করে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে সমস্ত তরুণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে, উপযুক্ত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং সুযোগ তাদেরও সেই সঙ্গে পশ্চিম বাঙ্গলার ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলবে বলেই অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

সাধক কবি রামপ্রসাদ

শ্রীনিরঞ্জন সেন

সাধক অথচ কবি—এমন একজনের কথা তোমাদের বলছি। তার নাম তোমরা সবাই জান নিশ্চয়-ই। তবু আমি বলছি তাঁর নাম,—রামপ্রসাদ সেন। সাধক অথচ কবি! শক্তির পূজারী—অথচ মহত্বের বেদীমূলে তাঁর আত্মনিবেদন! মরমী কবিও! নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে "কবিরঞ্জন" উপাধিদান করেন বিশেষ সম্মানের দ্বারা।

তিনি (রামপ্রসাদ) পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরী করেন—তার উপরে বসে তান্ত্রিক সাধনায় পূর্ণতা আনেন। পূর্ণতার স্বাক্ষর তাঁর সাধক জীবন। পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবেশন কালে তিনি মাতৃরূপ দর্শন করেন।

ভক্তি ভারাক্রান্ত তার গান—ভক্তির ভাব—উচ্ছ্বাস প্রতি গানের ছত্রে ছত্রে। "রামপ্রসাদী সঙ্গীত" তোমরা শুনেছ। সাধক কবির নামানুসারে তার গানেরও নামকরণ। তিনি নিজেই সুর সংযোজক -তাই সুরেরও নামকরণ-- "রামপ্রসাদী সুর"।

—শ্যামা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক তার নিজের মায়ের মত! তাই সাধক মনের বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন গানের মধ্যে।

আগমনী গান তোমরা শুনেছ। দেবী দুর্গার শুভাগমনের বার্তা প্রচার করা হয় আগমনী গানের মাধ্যমে। সাধক কবি রামপ্রসাদই আগমনী গানের আদি রচয়িতা।

তোমরা জান তবুও বলছি,—

তিনি একদিন গান গাইতে গাইতে বেড়া বাঁধছিলেন—একাকীত্ব দড়ি ফিরাতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই দড়ি ফিরিয়ে দেবার জন্য তাঁর নিজের মেয়ে পরমেশ্বরীকে ডাক দিলেন কিন্তু পরমেশ্বরী ঘরে না থাকায়—পরমেশ্বরীরূপে শ্যামা-মা এসে দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

—সাধক কবি মায়ের স্নেহের ছায়ায় বসে দুরূহ কর্মে নিজেকে চালিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। অসীম ধৈর্য তার সাধনার প্রতি সোপানে!

একটা ঘটনা বলি শোন,—ঘটনার মাধ্যমে ইচ্ছা পূরণে সহায়তা। সদিচ্ছা পূরণ হয়-ই তার ফলে সাধনার পথ সত্য সুন্দর হয়ে ওঠে।

যখন সাধক কবির বাবা মারা গেলেন তখন অভাবের স্রোতে ভাসতে লাগল সংসার। যাতে সংসার একেবারে অভাবের স্রোতে হারিয়ে না যায় তাই সাধক কবি এলেন কলকাতায় চাকরীর জন্য।

দুর্গাচরণ মিত্র তাকে মুহুরীর চাকরী দিলেন। দুর্গাচরণ মিত্র সং জমিদার ছিলেন।

—চাকরী তো হলো বুঝলে—তার পরের ঘটনা শোন। সাধক কবি হিসাবের খাতার পাতায় হিসাবের পরিবর্তে "শ্যামা-সঙ্গীত" লিখে ভরিয়ে দিতে লাগলেন। শেষে তিনি ধরা পড়ে গেলেন তার উধ্বর্তন কর্মচারীর হাতে—অভিযোগ চলে গেল জমিদার দুর্গাচরণের কাছে তাড়াতাড়ি।

ভয়ে বুক কেঁপে গেল সাধক কবির—চাকরী তো যাবে-ই তাছাড়া আরও কত কি হতে পারে। অভাবের স্রোতে সংসার ভেসেই যাবে—। সাত-পাঁচ ভাবছেন আর কি। এমন সময়ে দুর্গাচরণ তাকে খাতা নিয়ে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু গিয়ে তিনি পেলেন আশাতীত। জমিদার দুর্গাচরণ তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন। আরও বললেন—যেন তিনি শ্যামা-সঙ্গীত রচনাই করেন আর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা পাকা করে দিলেন।

বুঝতে পারছ,—মা নিজে যাঁর সহায় তাঁর আর ভাবনা কিসের। সাধক কবি ফিরে এলেন কুমারহট্টে। বর্তমান হালিসহর। আনুমানিক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে কুমারহট্টে তিনি

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম রামরাম সেন। অবস্থা রামরাম সেনের একেবারে ভাল ছিল না। তিনি (রামপ্রসাদ) দীক্ষা নিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের কাছে। অনেকে বলেন, তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন মাধবাচার্যের কাছে। অবশ্য মতভেদ আছে ঐ সম্বন্ধে।

এখানে আমি প্রমাণ সহ ঐ সম্বন্ধে কোনটি ঠিক তা আর প্রমাণ করছি না বুঝলে? তোমরা বড় হয়ে জেনে নেবে---এখন অজানা থাক কেননা অজানাকে জানবার জন্য যে তৃষ্ণা---ওই তোমাদের মনকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে জানবার সাহায্য করবেই।

কাজেই অজানাকে জানবার তৃষ্ণা ভালই।

বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ও পারসী---এই চার রকমের ভাষা জানতেন সাধক কবি।

আনুমানিক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সাধক কবি রামপ্রসাদ চিরদিনের মত ছেড়ে গেছেন---কিন্তু ছেড়ে গেলেও তিনি থেকে গেছেন—আর থাকবেনও। মহা সাধকের মৃত্যু যে নেই। তাঁর সাধনার পথ, তাঁর কর্ম, রামপ্রসাদী সঙ্গীত তাঁর স্বীকৃতির দাবী রেখে যাবেই যুগ যুগ ধরে।

তোমাদের মানসে সাধক কবি রামপ্রসাদের স্থান চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকুক—এই আমারও কাম্য।......

রাজা সীতারাম

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অনুমান, সেন রাজাদের সময়ে গৌড়ের দক্ষিণে যে সকল দ্বীপের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে সর্বোত্তরে যে দ্বীপটির উদ্ভব হয়, তাহার নাম রাখা হয় মৌরসুধাবাদ। মৌর শব্দের অ বেষ্টিত আর সুধা অর্থে এ স্থানে জল, অর্থাৎ চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ভূভাগই মৌরসুধাবাদ নামে খ্যাত। তৎপরে উহার চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদ্রশাখা লুপ্ত হইয়া দ্বিতীয় ভাগীরথী, পদ্মা ও কালান্তর বিলের সৃষ্টি হয়।

গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ মুখসুদন দাস নামক জনৈক নানকপন্থী সাধুকে ঐ ভূখণ্ডটি দান করিলে উহার নাম হয় মুখসুদাবাদ। তাহার পরে দিল্লীশ্বর আকবরের সময়ে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা সায়েদ খাঁর ভ্রাতা মুকসুস্ খাঁ ঐ অঞ্চলে আসিয়া রাজকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে উহার নাম হয় মুকসুসাবাদ। সর্বশেষে মুর্শিদকুলী খাঁর নামানুসারে উহার নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে বেশির ভাগই হিন্দু কর্মচারী ছিলেন এবং সে সময় বাঙ্গালা দেশে বেশীর ভাগই হিন্দু জমিদার ছিলেন, শুধু তাহাই নহে, মুর্শিদাবাদে হিন্দু প্রজার সংখ্যাই অধিক ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। অথচ মুর্শিদকুলী খাঁ কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। ঐ প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ বলেন,—"মুসলমান ধর্মের গোঁড়ামী তাঁহার ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে মুসলমান হইলে সে টুকু ঘটিয়া থাকে।" (বিশ্বকোষ, মুর্শিদকুলী খাঁ শব্দ)।

মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন দাক্ষিণাত্য প্রদেশবাসী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। তাঁহার মাতাপিতা জঠরজ্বালা নিবারণার্থ তাঁহাকে পারস্য দেশীয় বণিক হাজি সুফিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। হাজি সুফিয়া তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া গিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার নাম রাখেন মহম্মদ হাদি। হাজি তাঁহাকে ক্রীতদাসের কাযে ব্রতী না করিয়া নিজ সন্তানদের সহিত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কাজেই তিনি ভালরূপ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। হাজি সুফিয়ার পরলোকগমনের পর, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দেন। সেই উপদেশক্রমে তিনি নিজ দেশে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে আশ্রয় না দেওয়ায়, তিনি ভবঘুরের মত বেড়াইতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা আবদুল্লার সুনজরে পড়িয়া তাঁহার অধীনে সামান্য চাকুরী লাভ করেন। কালক্রমে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সুদৃষ্টিমূলে মুর্শিদাবাদের নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি বিচক্ষণ ও সুশাসক নবাব ছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদ নগরবাসী হিন্দুগণের প্রতি যে, অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন রহিয়াছে বর্তমান কাটরার মসজিদ। ঐ মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে বিশ্বকোষ বলেন,—"নবাব নিজের শেষাবস্থা বুঝিতে পারিয়া সমাধি নির্মাণের আদেশ দেন। মোরাদ ফরাস নামক এক ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হয়। মোরাদ চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থানের হিন্দু মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া সেই সমস্ত উপাদানে

৬ মাসের মধ্যে মস্‌জিদ ও সমাধি মন্দির নির্মাণ করেন। হিন্দুগণ মন্দিরের পরিবর্তে অট্টালিকার নূতন উপাদান দিলেও মোরাদ তাহা গ্রহণ করেন নাই। এইরূপে মুর্শিদকুলী হিন্দু-দিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছিলেন।" (বিশ্বকোষ, মুর্শিদকুলী খাঁ)

হিন্দু জমিদারগণের প্রতি তিনি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্যদান করে ভূষণার জমিদার রাজা সীতারামের জীবন কাহিনী।

সীতারামের প্রপিতামহের নাম ছিল রামরাম দাস। তিনি ঢাকার নবাবের নিকট হইতে বিশ্বাস খাস উপাধি লাভ করেন। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্দ্র কর্মদক্ষতা গুণে নবাবের নিকটে "রায় রায়ান" উপাধি লাভ করেন। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণও ঐ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ প্রথমে রাজমহলে কার্য করিতেন, তৎপরে তিনি ঢাকায় গমন করেন। পরে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে কার্য গ্রহণ করিয়া প্রথমে গোপালপুরে (রাজসাহী জেলায়), তৎপরে সূর্যকুণ্ড নামক স্থানে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন ক্রমে তিনি একটি তালুক ও বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্যামনগরের (রাজসাহী জেলায়) জোতস্বত্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন।

সীতারামের মাতামহের বাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্যামনগরে। তিনি বাল্যকালে তথায় থাকিয়া মহম্মদ আলি নামক জনৈক মৌলবীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। উত্তরকালে ঐ মৌলবী সাহেবই তাহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে মহম্মদপুর নগরের নাম রাখা হইয়াছিল।

সীতারাম যখন যুবক মাত্র, সেই সময় শায়েস্তা খাঁ ছিলেন ঢাকার নবাব। ঐ সময়ে করিম খাঁ নামক জনৈক পাঠান নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। সীতারাম ঐ বিদ্রোহীকে দমন করার জন্য নবাবের নিকটে সৈন্যবল ও অস্ত্রশস্ত্র প্রার্থনা করেন। নবাবের সাহায্য লইয়া তিনি ঐ বিদ্রোহীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাহার দুর্গ ও ধনাগার লুণ্ঠন করেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চাকলা ভূষণার অন্তর্গত নলদী পরগণা জায়গীর স্বরূপ দান করেন। এবং তাঁহাকে "রায় রায়ান" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময় দেশে অত্যন্ত দস্যুভয় দেখা দিয়াছিল। তিনি তাহার সহকর্মিগণের সাহায্যে ঐ দস্যুভয় দূরীকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য শায়েস্তা খাঁ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও ফৌজদার তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া তীর্থ ভ্রমণের ছলে দিল্লী যাইয়া বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহ শায়েস্তা খাঁর পত্রাদিতে পূর্ব হইতেই তাঁহার গুণাবলীর পরিচয় অবগত ছিলেন। এ সময় মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে রাজা উপাধির পাঞ্জাসহ ফরমান দান করেন এবং সেই সঙ্গে নিম্ন বঙ্গের সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলা ও প্রজাপালনের ক্ষমতা অর্পণ করেন।

বাদশাহ কর্তৃক ঐরূপ সম্মান লাভ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনিও তাঁহাকে তাঁহার জমিদারীর দশ বৎসরের নিষ্কর আবাদী সনন্দ দান করেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর গত হইতে না হইতেই নবাব তাঁহাকে রাজস্বের জন্য তাগিদের পর তাগিদ দিতে আরম্ভ করেন। নবাব তাঁহার কৈফিয়তের কোন বিবেচনা না করিয়া ফৌজদার আবুতোরাপের উপর রাজস্ব আদায়ের জোর হুকুম দেন, বলা বাহুল্য ফৌজদার এবং পার্শ্ববর্তী জমিদারগণ পূর্ব হইতেই সীতারামের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সীতারাম নিরুপায় হইয়া মুনিরাম নামক জনৈক মোক্তারের দ্বারা নবাবকে জানাইতে চেষ্টা করেন যে, তার নিষ্কর ভোগের তখনও ছয় বৎসর বাকী। কিন্তু মুনিরামই ভিতরে ভিতরে নবাবকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। শেষে বহু কাণ্ডকারখানার পর সীতারামের হুকুমমত তাঁহার অনুগত সৈন্যদলের সহিত ফৌজদারের যুদ্ধ হয়। ফৌজদার পরাস্ত ও নিহত হইলে, তাঁহার ছিন্নমুণ্ড সীতারামকে উপহার দেওয়া হয়।

উক্ত সংবাদ মুর্শিদাবাদে ও ঢাকায় পৌঁছাইলে উভয় নগরের সৈন্যগণ পার্শ্ববর্তী জমিদারগণের পাইক-ফৌজ প্রভৃতির সহায়তায় বহুকষ্টে বীর সীতারামকে পরাজিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। ঐ প্রসঙ্গে

বিশ্বকোষ বলেন,—"ভূষণার জমিদার সীতারাম রায় তত্রস্থ মুসলমান ফৌজদার আবুতোরাপকে নিহত করায় নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বক্‌স আলি খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ পূর্বক সীতারামের জমিদারী লুণ্ঠন করিতে এবং তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, "সীতারাম ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত ও শূলে আরোপিত হন, এবং তাহার স্ত্রী-পুত্র দাসরূপে বিক্রীত হয়।" (বিশ্বকোষ, মুর্শিদকুলী খাঁ)। সীতারামের জীবনকাহিনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, সে যুগে তাহার ন্যায় জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাহিতৈষিণী, দানশীল, গুণগ্রাহী ও চরিত্রবান জমিদার আর কেহ ছিলেন কি না, তাহা বলা বড়ই কঠিন।

বিচিত্র জীব ডায়েটম

মিহিরকুমার ভট্টাচার্য

তোমরা বোধ হয় সবাই জান—এক ফোঁটা জল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যাবে—তার মধ্যে নানারকমের অদ্ভুত জীব রয়েছে। এদের চাল-চলন, দেহাকৃতি খুবই বিচিত্র। খালি চোখে কিন্তু এদের মোটেই দেখা যায় না। আর এজন্যে এদেরকে বলা হয়—আণুবীক্ষণিক জীব। জলে বসবাসকারী এরকম আণুবীক্ষণিক জীবের সংখ্যা বড় কম নয়। এদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য কাজ। ডায়েটমও এরকম একটি বিচিত্র আণুবীক্ষণিক জীব। এরা বাস করে নালা, ডোবা, পুকুর, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয়ে। এখন ডায়েটমের বিচিত্র জীবনকাহিনী মোটামুটি-ভাবে তোমাদের কিছু বলছি।

নানা জাতের রকমারি ডায়েটমের খোঁজ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। এরা থাকে জলের তলায়। অধিকাংশ ডায়েটম খুব শান্তশিষ্ট—এক জায়গায় স্থিরভাবে থাকে—মোটেই নড়াচড়া করে না। আবার কোন কোন জাতের ডায়েটম খুব আস্তে আস্তে নড়াচড়া করে থাকে। আগেই তোমাদের বলেছি—এদের দেহাকৃতি এত ছোট যে—খালি চোখে এদের দেখা যায় না। ডায়েটমের দেহাকৃতিও বিচিত্র—গোল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সূচ, মাকু, নল, তারা, গোল কৌটা প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট ডায়েটম দেখা যায়।

জলে দ্রবীভূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বালুকণার সাহায্যে ডায়েটম তার দেহের চারদিকে একটা শক্ত আবরণী বা ঢাক্‌নি তৈরী করে। আবরণীর উপরের দিকে ঠিক বাক্সের ডালার মত কারুকার্যকরা একটা ডালা সংযুক্ত থাকে। এই কারুকার্য দেখতেও খুব সুন্দর। ডালাটার চারদিকে একটা ফিতার মতো পদা জড়ানো থাকে। আবরণীটি বরাবর এক রকমই থাকে—এর কোন পরিবর্তন হয় না। এরকম শক্ত এবং অপরিবর্তনীয় দৈহিক ঢাকনি আর কোন জীবদেহে নাকি দেখা যায় না।

ডায়েটম প্রাণী, না উদ্ভিদ্—এ নিয়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। কেউ কেউ বলেন,—ডায়েটম প্রাণী, আবার কারো কারো মতে—এরা উদ্ভিদ্। এর কারণ হচ্ছে—উদ্ভিদ্ ও প্রাণী—উভয়ের লক্ষণই ডায়েটমের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

ডায়েটমের বংশবৃদ্ধির কৌশলও বেশ মজার। সাধারণতঃ এদের দেহের বহিরাবরণটি (ঢাক্‌নি) দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটো ডায়েটমের জন্ম হয়। আবার সেই দুটো ডায়েটম থেকে হয় চারটে ডায়েটমের উৎপত্তি। ডায়েটমের দেহের প্রোটোপ্লাজম বাড়লে—সে আবরণীটাকে ধাক্কা মেরে বাইরে বেরোতে সুরু করে এবং বাড়তে বাড়তে প্রোটোপ্লাজম এমন অবস্থায় আসে যখন তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দুই ভাগের মাঝখানে পরস্পর সংলগ্ন দুটো আবরণীর সৃষ্টি হয়। তারপর পুরনো আবরণীর অর্ধেক এবং নূতন আবরণীর অর্ধেক নিয়ে দু'টো আলাদা ডায়েটমের উৎপত্তি হয়। আবার কোন কোন ডায়েটম তার শরীরের প্রোটো-প্লাজম বৃদ্ধি পেলে—পুরনো আবরণী ত্যাগ করে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং নতুন আবরণী তৈরী করে নেয়। কখনও কখনও দেখা যায়—কোন কোন ডায়েটম পরস্পর মিলিত হয় এবং তাদের মিলিত প্রোটোপ্লাজম বাড়তে বাড়তে পুরনো আবরণী ত্যাগ করে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'টো নতুন ডায়েটমের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ডায়েটমের জোড়া মুখ দুটি করাতের দাঁতের মত পর্যায়ক্রমে উঁচু-নীচু থাকায় খুব শক্তভাবে আটকে থাকে।

ডায়েটমের শরীরের বহিরাবরণীতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রচুর ছিদ্র থাকে এবং ছিদ্রগুলি নক্সাকারে সাজানো। জলে

দ্রবীভূত খাদ্যাদি এরা এই ছিদ্রের সাহায্যে দেহসাৎ করে দেহের পুষ্টি নির্বাহ করে। আর শ্বাস-ক্রিয়াও ডায়েটম এই ছিদ্রের সাহায্যেই চালিয়ে থাকে। প্রবালকীটের মতই ডায়েটমের সঞ্চিত দেহাবশেষ বা কঙ্কাল দিয়ে বড় বড় পাহাড়, মাটি প্রভৃতি তৈরী হয়। ডায়েটম ঘটিত মাটি বা ডায়েটোমাইট খুব মিহি, হাল্কা আর বরফের মত সাদা। রোদে এই মাটির দিকে তাকানো যায় না—চোখ ঝলসে যায়, ডায়েটোমাইট নিয়ে কাজ করবার সময় রঙীন চশমা পরতে হয়। ডায়েটোমাইট আমাদের নানা কাজে লাগে।

বিভিন্ন রকমের কতকগুলি ডায়েটমের নমুনা, এগুলিকে প্রায় ৬০গুণ বর্ধিতাকারে দেখানো হয়েছে।
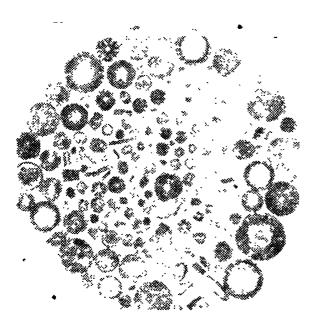
ডায়েটোমাইটের উত্তাপ আর জলীয় বাষ্প শোষণের ক্ষমতা প্রচুর। আর এই কারণেই ডায়েটোমাইট আমাদের নানা কাজে প্রয়োজন হয়। বাসনপত্র তৈরীতে, মূল্যবান ধাতব পদার্থ পরিষ্কারে ডায়েটোমাইট ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিড বা ঐ জাতীয় কোন ক্ষয়কারক পদার্থ স্থানান্তরিত করবার সময়—পাত্রের চারদিকে ডায়েটোমাইট ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অ্যাসিড বা অন্য কোন পদার্থ চুঁইয়ে বা উপচে পাত্রে পড়লে—ডায়েটোমাইট তৎক্ষণাৎ তা একেবারে শুষে নেয়। তরল গ্যাসোলিন জ্বালাতে গিয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে ডায়েটোমাইট ব্যবহৃত হচ্ছে। চিনি পরিষ্কারের কাজেও ডায়েটোমাইটের প্রয়োজন হয়। যে সব খনি ও কারখানায় আগুন লাগবার সম্ভাবনা খুব বেশী—সেখানকার দেয়ালে ডায়েটোমাইট ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সহজ দাহ্য পদার্থের সূক্ষ্ম কণায় কোন স্থান ভর্তি হলেই সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবার সম্ভাবনা। ডায়েটোমাইট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণার সঙ্গে মিশে থাকে এবং কোন স্থানের উত্তাপ বাড়লেই তা শোষণ করে নেয়। ফলে উত্তাপ আর অন্য জায়গায় ছড়িয়ে বিপদ ঘটাতে পারে না। এসব ছাড়াও আরও অনেক কাজে ডায়েটোমাইট ব্যবহৃত হয়।

বাংলার বিবেক

কার্তিক ঘোষ

—ও বিলে…বিলে—

ঘরের দরজা ধাক্কা দিতে দিতে মা ডাকছেন তাঁর দুষ্টু ছেলেকে।

—বিলে, কি করছিস্ ঘরে? ঘর খোল—

এবারেও কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। তাই মা কি যেন একটা অমঙ্গল চিন্তায় পড়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ফেললেন।

—ছেলের কি রকম গো! মা কাঁদছেন আর বলছেন, বিলে ও বিলে ঘর খোল।

কড়্ কড়্ কড়াৎ—কড় কড় কড়াৎ—

বার বার দরজার কড়া নাড়ছেন মা। ছেলের কিন্তু সাড়া নেই।

ব্যাপার দেখে বাড়ীর লোক এসে জড় হ'য়েছেন। বাড়ীর মেয়ে-ছেলে, ঝি-চাকর সবাই বলে,—এ্যাঁ! কি হ'লো গো…

বাড়ীতে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেল। বিলের হ'লো কি! ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়েছে…কিন্তু এতো ডাকাডাকিতেও খিল খুলছে না! ব্যাপার কি!

বিলের কাণ্ডকারখানা দেখে বাড়ীর লোকেরা তখন দরজা খুলে ফেলেছে বাইরে থেকেই। দরজা তো প্রায় ভেঙে ফেলবার জোগাড় হ'য়ে গিয়েছিল। ঘরতো খোলা

হ'লো। কিন্তু···যার জন্যে খোলা হ'লো সে কই? সবাই উঁকি মারলো এদিক-ওদিক।

—একি!

সবাই অবাক। বিস্ময়ে কারো কারো চোখে মুগ্ধ হাসি উপচে পড়ছে। মা ভুবনেশ্বরী তো তখন হেসেই অস্থির। একি কাণ্ড ছেলের! বিলে যে ধ্যান ক'রছে একমনে। এতো হৈ হুল্লোড়েও ছেলের সাড়াশব্দ নেই! এইটুকু ছেলে একমনে ধ্যান করছে!

ওর বাবা কিন্তু আশ্চয হ'য়ে যাননি। কারণ বিলেকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন ওর বাবা। উনি জানেন, বিলের ছেলেখেলা কিন্তু একেবারে ছেলেখেলা নয়। সত্যের আলো অনেকবার ওর চোখেমুখে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠতে দেখেছেন! অনেক বার দেখেছেন, বিলে খেলার ছলে ধ্যান করতে করতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আত্মভোলার মতো ঠাকুরের চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে গেছে।

মা কিন্তু অতোশত বুঝতে পারেননি। তাই তিনি হাসলেন বিলের কাণ্ড দেখে। ধ্যান যখন ভাঙলো, বিলে তখন যেন অন্য এক রাজ্য থেকে ফিরে এলো। তার চোখেমুখে এক উজ্জ্বল জ্যোতি বিরাজ করছে। আর সকলের দিকে তাকিয়ে বিলে তখন হাসছে আপন মনে।

তোমরা হয়তো ভাবছো ছেলেটা খুবই ভালো! খুবই শান্ত আর সুন্দর স্বভাবের। বিলে কিন্তু ছোটবেলায় মোটেই শান্তপ্রকৃতির ছিল না।

—উ! মা···মাগো—

—বল্—বল্ আর আমাকে দুষ্ট ছেলে বলবি? বিলে ওর ছোট ভাইটিকে খুব কষে মার দিচ্ছে তখন। গায়ে যেমন জোর···তেমনি একগুঁয়ে। সব সময় দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় ঘুরছে ওর। কা'কে কেমন ক'রে মারবে—জব্দ করবে! বিলের এই মারপিট দেখে বাড়ীর বড়রা ছুটে গেলেন বিলেকে শাসন কর'বে বলে। কিন্তু···বিলেকে ধরবে কে?

ছুট দিল বিলে। ওর পিছনে পিছনে সবাই তখন ছুটছেন। তবুও সবাই হার মানলেন বিলের কাছে। বিলে নর্দমায় নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। ধরতে গেলেই নর্দমার নোংরা কাদা ছুঁড়বে গায়ে। তাই বিলের কাছে পরাজিত হ'য়ে ফিরে গেলেন সকলেই। তবে বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি ছিল অসীম। তার প্রমাণও আছে অনেক। আছে অনেক—অনেক সত্যি কাহিনী।

সেদিন পড়ার ক্লাসে মাষ্টারমশাই কি যেন বোঝাতে চাইছেন ছাত্রদের। আর সেই সময়েই বিলে গল্প জুড়ে দিয়েছে আশেপাশের ছেলেদের সংগে। অনেকক্ষণধরে লক্ষ্য করলেন মাষ্টারমশাই। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'বলোতো, আমি কি বলছিলাম?'

বিলে কিন্তু ভয় পেল না। হুবহু বলে গেল মাষ্টারমশাই যা বলছিলেন। বিলের সঠিক জবাব শুনে সবাই অবাক! তা' হ'লেই বুঝতে পারছো—বিলের একটা মস্তবড় শক্তি ছিল···একটা মনকে দু'ভাগ করে দু'দিকে ছড়িয়ে দেবার।

তোমরা হয়তো ভাবছো এই বিলে কে? এই বিলে কে জানো? সিমলা বাড়ীর বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছোটবেলায় ওর নাম ছিল বিলে। হয়তো জানো, পরবর্তীকালে এই বিলেই হ'য়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বাংলার বিবেক!

জগতের মানুষকে এই বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন ধর্মের পথ, সত্যের পথ, ত্যাগের পথ। অন্ধকার মুছে দিয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন আলো আর আলো। যে আলোতে বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি মানুষ প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। ফিরে পেয়েছিল তার পথ।

গল্প হলেও মিথ্যে নয়

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

বইখানা প্রকাশ হওয়া মাত্র অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায় বইখানার অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। বললেন, এমন বই সত্যিই খুব কম লেখা হয়েছে।

যাঁরা বইখানাকে প্রকাশ করতে গররাজী হয়েছিলেন তাঁদের আফশোষের সীমা রইলো না। ভাবলেন, হায়রে! কতো টাকাই না রোজগার করা যেতো!

বইখানার নাম—প্রিন্সিপিয়া।

নিউটনের প্রিন্সিপিয়া সত্যি সত্যিই সে যুগে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো। মহাবিজ্ঞানী নিউটন তাঁর বিখ্যাত

আবিষ্কারের কাহিনীগুলো প্রিন্সিপিয়ার ভেতরে লিখে রেখে-ছিলেন। অথচ বইখানা ছাপানোর জন্য তিনি কোনই আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এমনকি রয়েল সোসাইটির সদস্য হয়েও তিনি তাঁর প্রিন্সিপিয়া সম্বন্ধে কোনও কথা কাউকেই জানান নি। তিনি বইখানা লিখে বাক্সবন্দী করে রেখে দিয়েছিলেন।

তবে বইখানা শেষ পর্যন্ত কিভাবে প্রকাশিত হলো?

তাই বলছি শোন।

নিউটনের এক বন্ধু—হ্যালি একদিন আবিষ্কার করলেন যে, নিউটন প্রিন্সিপিয়া লিখে বাক্সবন্দী করে রেখে দিয়েছেন।

হ্যালি হলেন সে যুগের একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক।

তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করতেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজ করতে করতে এক জায়গায় এসে তিনি ভীষণভাবে আটকে গেলেন। সে সময় ইংল্যাণ্ডে নিউটন ছাড়া আর কেউ ছিলেন না যিনি হ্যালিকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন।

হ্যালি তাই একদিন বন্ধু নিউটনকে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

শুনে নিউটন খুশী হয়ে বললেন, হ্যালি, তুমি যা ভেবেছো ঠিক। তাই তোমার গণনা নির্ভুল।

হ্যালি গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

নিউটন বললেন, বেশ, আমি এখুনি অংক কষে দেখিয়ে দিচ্ছি যে তোমার গণনা নির্ভুল।

তারপরে তিনি অংক কষে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বাক্স খুলে বের করলেন প্রিন্সিপিয়া বইয়ের পাণ্ডুলিপি।

পাণ্ডুলিপি খুলে তিনি হ্যালির সমস্যা সমাধান করে দিলেন।

হ্যালি বিস্মিত হলেন! বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, এমন একখানা বই নিউটন না ছাপিয়ে বাক্সবন্দী করে রেখে দিয়েছেন কেন!

এ রকম বই কি কেউ লিখতে পারে?

প্রিন্সিপিয়ার পাণ্ডুলিপি দেখে হ্যালি আর স্থির থাকতে পারলেন না। পাণ্ডুলিপিখানা হাতে নিয়ে বললেন, বন্ধু, আমি তোমার প্রিন্সিপিয়া নিয়ে চললুম। তোমার এ বই ছেপে বের না করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না।

নিউটন বাধা দিলেন। বললেন, কেন মিছিমিছি এটা নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছো? হ্যালি কোনও কথা শুনলেন না। পাণ্ডুলিপিখানা নিয়ে সোজা রওনা হলেন রয়েল সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে।

তিনি তাঁদের বইটা ছাপার জন্যে অনুরোধ করলেন।

তাঁরা প্রথমে ছাপতে রাজী হয়েও পিছিয়ে গেলেন।

হ্যালি তখন কি আর করেন। শেষে তিনি নিজের টাকায় প্রিন্সিপিয়া ছাপালেন। ছাপার আগে অনেকেই তাঁকে এ কাজে নামতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, হ্যালি, এতো টাকার ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না—এ বই কাটতি হবে না।

হ্যালি তাঁদের কথায় কান না দিয়ে বই ছাপলেন!

বই ছেপে বের হ'বার সংগে সংগে হু হু করে বিক্রী হতে লাগলো!

নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ইংল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিকমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো!

নিউটনের নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো!

সত্যি সত্যিই নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার মতো জ্ঞানের বই এ পর্যন্ত আর কেউ লিখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

কথা কও

শান্তিময় ঘোষাল

হাবুর আনন্দ আর ধরে না, নতুন মা আসবে ঘরে; হাবুকে আদর করবে, কাছে বসে খাওয়াবে। নতুন জামা পরিয়ে দেবে। কত কি!

হাবুর মা মারা গেছেন অনেকদিন। হাবুর বেশ মনে পড়ে সেদিন জোৎস্না রাত। পাড়ার লোকেরা তার মাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে গেল। সেদিনটা ভুলতে পারেনি হাবু।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তারপর থেকে হাবুকে কেউ আর আদর করে না। কাছে টানে না। পিসি একটুও দেখতে পারে না। গাদাগাদা এঁঠো বাসনগুলোকে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘাটে নিয়ে গিয়ে মাজতে হয়। তবে দুটো ভাত পায় সে। বাবা তো বাড়ী থাকেন না, রোজই সকালে চলে যান। কলকাতায় অফিস। ট্রেন ফেল হবে যে। শুধু রবিবার হাবু বাবার পাতের কাছে বসে দুটো ভালমন্দ খাবার পায়।

পিসি কত মারে, এক এক দিন সারাদিন কিছুই খেতে পায় না সে ; জীবনকাকার কামারশালে গিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদে ; জীবনকাকা মুড়ি আর নারকেল দেয়, তাতেই পেট ভরে হাবুর। জীবনকাকা বড় ভাল। হাবুর কেউ নেই, আছে একজন—এই জীবনকাকা।

সারা দিন খেতে না পেলেও কিছুই বলতে পারে না হাবু। হাবু কথা বলতে পারে না। মা তাই আদর করে নাম রেখেছিলেন হাবু! আর লোকে তাই ঘৃণা করে। স্কুলে নেয় না। কিছুই শুনতে পায় না সে।

পিসিমা আজ নতুন লালপেড়ে ধুতি পরিয়ে দিয়েছে। কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, হাবুকে! হাবুর মা আসবে। পিসিমা বলেছে,—"আ মর, পোড়ার মুখোর আনন্দ আর ধরে না।" হাবু ভাবলো মা আসছে তাই পিসিমা আদর করে কথা কইলো।

শাঁখ বেজে উঠলো, উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো হাবুদের ছোট অঙ্গনখানা। পালকি এসে দাঁড়াল দোর গোড়ায়। হাবু ছুটে এলো, সবাই ভীড় করে দাঁড়িয়েছে সেখানে, হাবু ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না, তার নতুন মাকে।

নতুন বেনারসী শাড়ী পরা কি সুন্দর তার নতুন মা। কই হাবুকে তো কাছে টেনে নিলো না? আদর করে তো গালে চুমু খেলো না? সকলেই নতুন মাকে নিয়ে আনন্দে মশগুল। ঘরে গেল সকলে, হাবু আড়াল থেকে দেখলো নতুন মাকে। চোখ বাধা মানে না। জলে ভর্তি হয়ে আসে। তারপর কত লোক এলো। আনন্দ, হাসি, সবাই খেতে বসলো। জীবনকাকাকে আসতে বলেনি কেউ, সে আসেনি। কেন আসবে, গাঁয়ের এক কোণে পড়ে থাকে সে, হাবুর মত সেও সকলেরই ঘৃণার পাত্র।

বেশ রাত হয়ে এলো, ধীরে ধীরে সকলে যে যার বাড়ী চলে গেল। দ্বিপ্রহরের শেয়ালগুলো ডেকে উঠলো বাড়ীর আনাচে-কানাচে।

সারা বাড়ী তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। অতিথিরা বাড়ী ফিরে গেছে। বাড়ীর সবাই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। হাবুর খাওয়া হয়নি। নতুন মাতো খেতে বললে না। অন্য দিন হাবু বাবার কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবাও আজ হাবুকে ডাকলেন না। দাওয়ায় বসে বসে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করলো সে, যদি বাবা ডাকেন, নতুন মা তো চেনে না তাকে।

নিঝুম রাত্রি! দরজাটার ধার এখনও বসে আছে হাবু। পেটের ভেতরটায় কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ ফেটে জল ঝরছে কখন থেকে। হাবুর কেউ নেই। কেউ তাকে আপন করে নিলো না। কত আশা নতুন মা আসবে। সেও তো আপন করে নিলো না হাবুকে।

বাইরের দরজাটা খাঁ খাঁ করছে। সারা রাত্রি হয়তো খোলাই পড়ে থাকবে, হাবু আস্তে আস্তে একবার জানলা দিয়ে দেখলো তার নতুন মা কি করছে। হাবু দেখে... খাটটাকে ফুল দিয়ে কি সুন্দর করে সাজিয়েছে পিসিমা। ফুলের গন্ধ আসছে জানালা দিয়ে। নতুন মা আর বাবা শুয়ে ঘুমচ্ছে সেই খাটটায়, যে খাটে মা তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শুয়ে থাকতো। পিঠে হাত বুলিয়ে দিত। হাবু মার কোলটিতে কেমন ঘুমিয়ে পড়তেন পরম নিশ্চিন্তে। নতুন মা শুয়ে আছে। সিঁথির সিন্দুরটা কেমন টকটকে লাল, ঠিক তার মায়ের মত।

দাওয়ায় একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো; হাবুর চমক ভেঙ্গে গেল। আবার পেটের যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে।

হাবু ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে এলো। এত রাত্রে সে কখনও রাস্তায় বের হয়নি। ভূতের ভয়ে সারা গা ছম্ ছম্ করছে। দূরে জীবনকাকার কামারশালটা দেখা যাচ্ছে। একটা কেরোসিন তেলের ডিবে জ্বলছে। হাতুড়ি আর হাপরের আওয়াজ হচ্ছে এখনও।

হাবু কামারশালের কাছে এসে থমকে দাড়ালো। জীবনকাকার মুখটা লাল আগুনের আভায় কেমন বীভৎস দেখাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম কপালের চারদিকে ছড়ান।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো হাবু। জীবনকাকার হাপর টানা আর থামে না। জীবনকাকাও কি পর করে দিল তাকে! হাবু হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো।

হাপরের শব্দ গেল থেমে। জীবন চমকে উঠলো। ফিরে দেখে হাবু সেই সকালে পরা লাল পেড়ে ধুতিটা পরে তার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

জীবন ভাবে, হয়তো তাড়িয়ে দিয়েছে! নতুন বৌ আসার পর একটা দিনও কী সময় হল না এই হাবা-বোবা

ছেলেটাকে ঘরে রাখার! হায় ভগবান! হয়তো সারাদিনই এর খাওয়া হয়নি। "আয় বাবা আয়।" জীবন হাবুকে বুকে টেনে নিলো। হাবু আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো।

একটু পরেই হাবুকে বসিয়ে রেখে জীবন ঘরে ঢুকে হাঁড়ি থেকে চারটি মুড়ি আর একটা নারকেল নাড়ু এনে হাবুকে খেতে দিল। হাবু গো-গ্রাসে খেতে শুরু করে দিল, জীবন কাকার স্নেহের সে দান।

হাপর বন্ধ করে জামা কাপড় গুছিয়ে ফেলেছে জীবন। হাবু অবাক হয়ে দেখে।

জীবন বলে,—"আর নয়, চল আজই তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব। হাতটা যতদিন আছে হাতুড়ি ঠিকই চলবে। কলকাতায় শুনেছি হাবা-বোবাদের স্কুল আছে। সেখানে তোকে ভর্তি করিয়ে দেবো। আমার ছেলে নেই হাবু। তুই আমার ছেলেরই মত। আর সইতে পারি না তোর এ কষ্ট।" জীবন হাবুর হাত ধরে চলতে শুরু করলো।

তখন ভোর হয়ে এসেছে।

জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে গেল কলকাতার ফুট পাথের ধারে ছোট্ট কামারশালে। হাবুর জীবনে পূর্ণতার আলো প্রায় ছোঁয়া দিয়ে গেছে। হাবুর বিয়ে দিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে সে! কিন্তু বার্ধক্যের শিথিলতা ঘিরে ধরেছে জীবনকে। রাত্রির অন্ধকারে হাপরের একটু করে আগুন, তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে গ্রাস করলো জীবনকে। হাবুর চলার উদ্যম গেল ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে। জীবনের গতি ভিন্ন পথে মোড় ঘুরলো, সহযাত্রী মলির প্রেরণায় ফুট-পাথের সেই ধারটায় গড়ে উঠলো 'নব-জীবন শিল্প মন্দির।'

জীবন কামারের ছোট্ট মূর্তিটার সামনে এসে রোজ ওরা প্রণাম করে যায়।

বিরহী যক্ষ

শান্তশীল দাশ

বিরহী যক্ষের ব্যথা আজো তো কমেনি—
কমেনি, বেড়েই চলে ; বাড়বে তবুও :
কোনদিন যক্ষপ্রিয়া আসবে না কাছে—
ব্যবধান দিনে দিনে বেড়ে যাবে শুধু।

ব্যবধান বেড়ে যাবে, আর সাথে সাথে
অজস্র চোখের জল ঝরবে। বেদনা-
মথিত হৃদয় হতে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
উঠবে, মিলিয়ে যাবে শূন্যে নীলাকাশে।

যক্ষের দয়িতা কাঁদে : আকাশ বাতাস
অলকার কান্না-ভরা—দিন গোণা সার।
অভিশাপ শেষ হবে কোনদিন সে কি ?
এ কান্নার শেষ নেই—এ বুঝি নিয়তি।

ঘুচবে না কোনদিন এই ব্যবধান;
সারাটি জগৎ জুড়ে বেদনার গান।

মনে পড়ে

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

মনে পড়ে কবে একদিন
এ-হৃদয় ছিল যেন সাজানো বাগান ;
চারিদিকে ফুলের রঙীন
সমারোহ, পাখিদের গান !

মনে পড়ে কবে একদিন
হৃদয়-মালঞ্চে কেউ টকটকে লাল
একটি গোলাপ হ'য়ে ফুটেছিল—
ক'রেছিল আমাকে মাতাল !

আজ সেই সাজানো বাগান
মরুভূমি। নেই সেথা ফুলের রঙীন
সমারোহ, পাখিদের গান !

আর সে গোলাপ, তাকে হিংস্র নখরে
সময় নিয়েছে ছিঁড়ে মালঞ্চের বুক শূন্য ক'রে॥

কর্ম

কুশোবন্ত সিং

প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আর একবার নিজেকে ভাল করে নিরীক্ষণ ক'রলেন স্যার মোহনলাল। আয়নাটাকে আপাতদৃষ্টিতে ভারতে তৈরী বলেই মনে হয়। স্থানে স্থানে পিছনের পারদ উঠে গিয়েছে। স্থানে স্থানে অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে আয়নাটা। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে একটা ম্লান হাসি হাস্‌লেন স্যার মোহনলাল।

"এই দেশের সব কিছুর মতোই তোমারও সেই দুর্দশা—নির্লিপ্ত, অপর্যাপ্ত, নোংরা," আপন মনে বিড়্‌ বিড়্‌ করতে থাকেন স্যারমোহন। আয়নার প্রতিবিম্বও যোগ দিল সেই হাসিতে। "তবু একটু যেন পরিবর্তন," কথার সূত্র ধরিয়ে দিল প্রতিবিম্ব, সুদক্ষ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ—এমন কি সুদর্শনও। সেই সুন্দর গোঁফ, সেই ঝক্‌ঝকে স্যুট, ওডিকলমের নির্যাস্‌ এবং মুখে পাউডারের প্রলেপ! সবই আছে। কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটু পরিবর্তন। হ্যাঁ বৃদ্ধ, একটু পরিবর্তন।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেন স্যার মোহনলাল। চাপানো কোট্‌টা ঝট্‌ করে খুলে ফেললেন। আস্তে আস্তে সরে এলেন আয়নার সামনে থেকে।

ঘড়ির দিকে পলকের জন্য তাকালেন। এখনও তা'হলে সময় আছে।

"কৈ হ্যায়?"

সামনের জাল দেওয়া দরজা ঠেলে সাদা উর্দিপরা চাপরাশী এসে হাজির হ'লো।

চাপরাশীকে ছোট্ট এক পেগ স্কচের হুকুম দিয়ে সামনের আরাম কেদারায় নিজেকে এলিয়ে দিলেন স্যার মোহন। চোখ দুটো আস্তে আস্তে বুজে আসে তাঁর। স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে পিছনে ফেলে আসা কয়েকটা রঙীন বছর।

বিশ্রামাগারের এক কোণে দেওয়ালের ধারে জড়ো হ'য়ে আছে স্যার মোহনের জিনিষপত্রগুলো। ধূসর রঙের স্টীলের ট্রাঙ্কটার ওপর বসে স্যার মোহনের স্ত্রী শ্রীমতী লচ্‌মী আপন মনে একটা খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছেন। গালভর্তি তার পান। বেঁটে, মোটা শ্রীমতী লাল চল্লিশের ঘর পেরিয়ে এসেছেন। তাঁর পরনে একটা লাল পাড় সাদা শাড়ী। পথের ধূলোয় শাড়ীটা বেশ ময়লাই হয়েছে। কিন্তু তার নাকের হীরের লাল নাকচাবিটা বেশ চক্‌চকই ক'রছে। দু'হাতের সোনার চুড়িগুলোর টুঙ্‌টুঙ্‌ আওয়াজ হচ্ছিল মাঝে মাঝে। চাপরাশীর সঙ্গে কথা ব'লছিলেন তিনি। হঠাৎ স্যার মোহন কি জন্য যেন চাপরাশীকে ডাকলেন। চাপরাশী চলে যাওয়া মাত্র শ্রীমতী লাল এক রেলওয়ে কুলীকে সেই পথে যেতে দেখে ডাকলেন।

"মহিলাদের বসবার ঘরটা কোনদিকে?" কুলীকে প্রশ্ন ক'রলেন শ্রীমতী লাল।

"প্ল্যাটফর্মের একদম্‌ শেষে—ওই ডানদিকে।" দেখিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল কুলীটা।

কুলীটাকে ইসারায় দাঁড়াতে বলে তাকে বাক্স-প্যাটরা তুলবার নির্দেশ দিলেন শ্রীমতী লাল। নিজে খাবারের কৌটাটা হাতে নিয়ে কুলীটাকে অনুসরণ ক'রলেন তিনি। যেতে যেতে মাত্র একবারের জন্য সামনের ষ্টলটার কাছে দাঁড়ালেন। পানের কৌটাটা ভর্তি করে নিলেন। একেবারে মহিলাদের বিশ্রামাগারের সামনে গিয়ে কুলী বাক্স-প্যাটরা নামালো। স্টীলের ট্রাঙ্কটার উপর এবার ধীরে সুস্থে ব'সলেন শ্রীমতী লাল। কুলীটাকে প্রশ্ন করলেন—

"এই পথের ট্রেনগুলোয় কি খুব ভীড় হয়?"

"ইদানীং সব ট্রেনেই ভীড় হ'চ্ছে মা, তবে আপনি মহিলাদের কামরায় জায়গা পেয়ে যাবেন।"

"তা' হলে আমার খাওয়া-দাওয়াটাতো এখনই সেরে নেওয়া উচিত।" শ্রীমতী লাল তাঁর খাবারের কৌটো খুলে একগোছা চাপাটি আর খানিকটা আমের আচার বের

করলেন। আর তিনি যখন খেতে আরম্ভ ক'রলেন, কুলীটা সামনে বসে বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের উপর আঙ্গুল দিয়ে দাগ কাটতে লাগলো।

"বহিন্, আপনি কি একাই যাচ্ছেন?" হঠাৎ প্রশ্ন করলো সে। "না ভাই, আমার স্বামী রয়েছেন আমার সাথে। ওখানে যিনি বসে আছেন উনিই আমার স্বামী। উনি নামকরা ব্যারিষ্টার। তাই প্রথম শ্রেণীতেই যাতায়াত করেন উনি। ট্রেনে বহু পদস্থ কর্মচারী বা বিলেতী সাহেব থাকে ওঁর সঙ্গে—আর আমি তো একজন সাধারণ মেয়ে। আমি ইংরাজী বলতে পারি না, ওঁদের বিষয় কিছু বুঝিও না, তাইতো আমি ওই মহিলা কামরাতেই---" কুলীটার সাথে কথা বলতে থাকেন শ্রীমতী লাল। কারো সাথে কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বাড়ীতে একা একা কাটাতে হয় তাঁকে। কথা বলার দ্বিতীয় লোক নেই। তাঁর স্বামীর তো তাঁর সাথে কথা বলার অবসরই হয় না। তিনি থাকেন দোতালায়, আর স্যার মোহন থাকেন এক তলার ঘরে। অশিক্ষিত গরীব আত্মীয়দের তাঁর বাংলোয় আসা পছন্দ ক'রতেন না শ্রীলাল। তাঁরাও আসতেন না। রাত্রে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য তিনি শ্রীমতীর ঘরে আসেন। সাহেবী কায়দায় আদেশ করেন। নির্বিবাদে তাই পালন করেন শ্রীমতী লাল। কোন সন্তানসন্ততিও হয়নি তাঁদের।

সিগ্‌ন্যাল ডাউন করা হ'লো। মাইকে ঘোষণা করা হ'লো ট্রেনের আগমন বার্তা। শ্রীমতী লাল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন। সাদা হয়ে যাওয়া আমের আঁটিটা শেষবারের মতো আস্বাদন ক'রতে থাকেন। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কলে হাত ধুতে যেতে গিয়ে একটা লম্বা ঢেকুর তুললেন। মুখ-হাত ধুয়ে শাড়ীর আঁচলে মুখটা মুছে আবার তাঁর জায়গায় ফিরে এলেন। আর একটা লম্বা ঢেকুর তুললেন শ্রীমতী লাল। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন নির্বিঘ্নে ভোজন সমাধা হওয়ার জন্য।

একটা বিরাট দৈত্যের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে ট্রেনটা এসে ষ্টেশনে দাঁড়লো। শ্রীমতী লাল দেখলেন পিছনের একটা মহিলা কামরা বেশ খালিই রয়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। মোটা শরীরটা দরজার ফাঁকে গলিয়ে ঢুকে পড়লেন কামরার মধ্যে। জানালার ধারে একটা সীট্ দেখে বসে পড়লেন। আঁচলের খুঁট্ থেকে একটা দু'আনি বার করে দিয়ে দিলেন কুলীটাকে। কৌটো থেকে পান বার করে এবার মুখে পুরলেন তিনি। একটু চুন আর খানিকটা গুণ্ডিও মুখে পুরে দিলেন। গাল ভর্তি পান নিয়ে দু'হাতের ওপর চিবুকটা রেখে বাইরের জনতার দিকে উদাস নেত্রে তাকিয়ে রইলেন।

এত গোলমালের মধ্যেও স্যার মোহনের স্বপ্নজাল ছিন্ন হয় নি। তখনও তিনি স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে যাচ্ছেন আর চাপরাশীকে শুধোচ্ছেন যে কি করে সে তাঁর বাক্স-প্যাট্‌রাগুলো এখানে নিয়ে এলো।

উত্তেজনা, গোলমাল, অস্থিরতা—এ সব অসভ্যতারই নামান্তর। স্যার মোহন এদিক থেকে যথেষ্ট সভ্য। তিনি সব কিছুর মধ্যেই একটা সংযমের বাঁধন খুঁজতে চান। পাঁচ বছর বিদেশে থেকে সভ্য সমাজের আচারনীতির অনেক কিছুই আয়ত্ত করে এসেছেন তিনি। খুব কম সময়েই তিনি মাতৃভাষায় কথা বলেন। যদিও বা কখনও বলেন তো ঠিক বিলিতী সাহেবের মতোই—শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শব্দগুলো, তাও বিলিতী কায়দায়। কিন্তু খাস্ অক্সফোর্ড থেকে ইংরাজী ভাষা রপ্ত ক'রেছেন। আলাপ করতে তিনিও ভালবাসেন এবং একবারে ইংরেজদের মতো, যে কোন বিষয়েই কথা ব'লতে পারেন তিনি—রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ পর্যন্ত। কতোবারই তো তিনি ইংরেজ সাহেবদের ব'লতে শুনেছেন যে, তাঁর ইংরাজী বলার ধরণ নাকি একেবারে সাহেবদের মতো!

আজ যদি স্যার মোহন একলা থাকতেন! কি করতেন

তিনি? এটাতো একটা সেনানিবাস এবং ট্রেনে দু'একজন বৃটিশ সামরিক অফিসারও থাকা সম্ভব। মনের মতো আলাপের সম্ভাবনায় পুলকিত হয়ে ওঠেন তিনি। অন্যান্য ভারতীয়দের মতো সাহেবদের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ কখনও প্রকাশ করেননি তিনি। তাদের মতো গায়েপড়া ভাবও তাঁর কখনও ছিল না। চরম নীরবতার মাধ্যমেই শুধুমাত্র আদব-কায়দা দিয়েই চিরকাল তাঁর কাজ সেরেছেন তিনি। এবারেও তাই করতেন!

ভাবতে থাকেন স্যার মোহন। কল্পনায় ভেসে ওঠে ইংরাজ সহযাত্রীর সাহচর্য। তিনি জানালার ধারে চুপ করে বসবেন। তারপর 'টাইম' ম্যাগাজিনটা বার করে এক মনে পাতা ওল্টাতে থাকবেন। অবশ্য ম্যাগাজিনটা এমনভাবে মুড়ে ধরবেন, যেন দূর থেকেই নামটা অন্ততঃ পড়া যায়। 'টাইম' ম্যাগাজিন নিশ্চয়ই সব সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কেউ হয়তো নিশ্চয় ওটা পড়তে চাইবে। আর, তিনিও অমনি ওটা বাড়িয়ে দিয়ে এমন ভাব দেখাবেন যেন ওটা তিনি পড়েই ফেলেছেন। হয়তো কেউ তাঁর 'টাইটা'র প্রশংসা

করবে। সেই শুনে তিনি এমন একটা গল্প ব'লবেন যা অক্সফোর্ডের স্বপ্নালু দিনগুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে। আর যদি 'টাইম' বা 'টাই' কোনটাই পরের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তবে স্যার মোহন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গলায় হাঁক পাড়বেন, 'কৈ হ্যায়।' অন্ততঃ তাই শুনে চাপরাশী আর এক বোতল স্কচ্ এনে হাজির করবে। আর হুইস্কি দেখে কোন ইংরেজ তনয়ই নিশ্চয় মুখ গোমড়া করে থাকতে পারবে না। তারপর স্যার মোহন তাঁর সোনার সিগারেট কেস খুলে একটা বিলিতী সিগারেট ধরাবেন। ভারতে বিলিতী সিগারেট? আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে আসবে ইংরেজ তনয়! হয়তো ব'লবে, 'ডোণ্ট মাইণ্ড।' মাইণ্ড অবশ্যই তিনি করবেন না।

সেই পাঁচ বছর। জীবনের সেই রঙীন পাঁচ বছর! নাচ, গাওয়া আর খাওয়া-দাওয়া। এইতো জীবন। আর এখানে? বাকী পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এখানে শুধু হাহাকারই শুনে গেলেন তিনি। নির্লজ্জ মানুষগুলো যেন দুর্ভিক্ষেরই প্রতিমূর্তি। জঘন্য, দুর্বিষহ এ জীবন! আরও দুর্বিসহ লালপাড় শাড়ী পরনে একমুখ পান ভর্তি ঐ লছ্মীর সান্নিধ্য! চাপরাশী এসে জানালো যে স্যার মোহনের জিনিষপত্র পিছনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় তোলা হয়েছে। চাপরাশীর কথায় বাস্তব জগতে ফিরে এলেন স্যার মোহন। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন। কামরাটা খালিই ছিল। উঠে গিয়ে জানালার ধারে একটা সীটে বসলেন। বহুবার পড়া 'টাইমে'র পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন স্যার মোহন। দু'জন বৃটিশ সামরিক কর্মচারী কামরায় কামরায় উঁকি মারছে। কিন্তু, সব কামরাই ভর্তি। ইংরেজ তনয় দেখে স্যার মোহনের চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। তাদের আহ্বান জানাতে যাচ্ছিলেন আর কি! কিন্তু ওরাতো প্রথম শ্রেণীর যাত্রী নয়। তিনি গার্ডকে বলাই মনস্থ করলে৷

ঘুরতে ঘুরতে ওদের একজন স্যার মোহনের কামরার সামনে হাজির হোলো। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিলো। কামরাটা খালি দেখে চীৎকার করে উঠলো—

"হিয়ার, বিল্ হিয়ার।'

মুহূর্ত মধ্যে বিল এসে হাজির হলো। ভেতরে তাকিয়ে স্যার মোহনকে একবার দেখে নিলো।

"গেট্ দি নিগার আউট", সঙ্গীকে পন্থা বাত্‌লে দিলো সে।

দু'জনে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ঈষৎ হাসি-খুশী স্যার মোহনের দিকে তাকালো আর একবার।

নিজের খাঁকী পোষাক দেখিয়ে জিম্ ব'ললো 'জানতা, রিজার্ভড্ আর্মি—ফৌজ"।

"একদম যাও—গেট্ আউট!" বিল্ এগিয়ে এলো।

শেষবারের মতো স্যার মোহন আর একবার অক্সফোর্ডের কায়দায় প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু—

বিল্ আর জিম্ ঘুরে দাঁড়ালো। গাড়ী ছাড়ার বাঁশীও বেজে উঠলো। গার্ড তাঁর সবুজ পতাকা নির্দেশ ক'রলেন।

তারা স্যার মোহনের স্যুট্‌কেশ তুলে বাইরে ছুঁড়ে দিলে। এক এক করে ফ্লাস্ক্, বিছানা এবং 'টাইমও'।

রাগে ফুলতে ফুলতে স্যার মোহন চীৎকার করে উঠলেন, "জঘন্য, অসহ্য। তোমাদের গ্রেপ্তার করাবো। গার্ড, গার্ড!" বিল্ আর জিম্ এবার ঘুরে দাঁড়ালো। "কিপ্ ইয়োর রাডি মাউথ সাট্।" দু'টো ঘুষি এসে পড়লো স্যার মোহনের চোয়ালের ওপর। ধরাশায়ী হোলেন স্যার মোহন। ছোট্ট একটা বাঁশী দিয়ে ইঞ্জিন ছাড়লো। গাড়ীও চলতে আরম্ভ করেছে। বিল্ আর জিম্ স্যার মোহনকে তুলে ধরে জানালা দিয়ে গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলো। খানিক গড়িয়ে, বিছানায় ধাক্কা খেয়ে স্যুটকেশের গায়ে গিয়ে ঠেক্‌লেন তিনি

ঘটনার আকস্মিকতায় স্যার মোহন বিমূঢ়। কামরার আলোগুলো এক এক করে তাঁর চোখের ওপর দিয়ে চলে যেতে লাগলো। লাল বাতি হাতে গার্ড তাঁর কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। সেটাও আস্তে আস্তে প্লাটফর্ম ছেড়ে সরে যাচ্ছে।

তখনও হাতের উপর চিবুক রেখে বসেছিলেন শ্রীমতী লাল। তাঁর নাকের হীরেটা ঠিক্‌রে আসা স্টেশনের স্বল্প আলোয় চক্‌চক্ ক'রছে তখনও। গালভর্তি তখনও তাঁর পান। ঠোঁট দু'টোও বেশ রাঙা হয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একগাল লাল থুথু ফেললেন শ্রীমতী লাল। ট্রেনটা তখন আস্তে আস্তে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অনুবাদ : **বীরেন ঘোষ**

বিচার

(Laurence Hopeএর 'Men should be Judged' কবিতা অবলম্বনে)

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মানুষ কি করে আর কি সে খায়,
রঙ তার কালো নাকি সুন্দর,
এ নিয়ে বিচার নাকি করা যায়—
দেখে তার গতি দ্রুত-মন্থর ?

মানুষ কি নাচ নাচে, কি সে খায়,
কি গৃহেতে পেল তার শিক্ষা—
এ নিয়ে বিচার নাকি করা যায় :
কতদূর দিল সে পরীক্ষা ?

বিচার তারেই দেখে করা যায়
মৌলিক কত কে সে চিন্তায় !

পঞ্চম দার্শনিকের গান

আলডুস হাক্সলি

অর্বুদে-অর্বুদে এলো শুক্রাণুর ঢেউ
একটি জীবাণু ছাড়া বাঁচিবে না কেউ।
জীবন তরীতে এক নোয়া পাবে শুধু ঠাঁই
নতুবা এ মহাবিপর্যয়ে ত্রাণ আর কারো নাই।

একটি কণিকা ছাড়া, সেই-প্রাণ অগণন
হয়তো হতো কোন নব সেক্সপীয়ার কিংবা নিউটন।
কিন্তু সেই এক অণু
দিল মোরে এই তনু।
শ্রেষ্ঠেরে হটায়ে দিলি ধিক তোরে ওরে !
তরীতে উঠিলি তুই, তারা র'লো পড়ে।
তার চেয়ে হে মানবক ! হতে যদি নীরবেতে অস্ত
আমাদের হতো ভালো, পৃথিবীটা আরেকটু শান্ত।

অনুবাদক—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিচয় গুপ্ত

এই গ্রামেরই শেষ প্রান্তে রেলওয়ে ষ্টেশনটি অবস্থিত। ষ্টেশনের পরিপূর্ণ মর্যাদা না পেলেও ইদানীং প্রায় সব লোকাল ট্রেনই এই ষ্টেশনে দাঁড়ায়।

ষ্টেশনমাষ্টার নতুন। অল্প বয়েস। নাম অবনীশ চট্টোপাধ্যায়।

নতুন হ'লেও অবনীশ গ্রামের লোকদের মোটামুটি চিনে ফেলেছে। প্রতিদিন সকালে ডেলিপ্যাসেঞ্জারের দল যখন ঠাট্টা তামাসা এবং বচসায় প্ল্যাটফর্মটি মুখরিত ক'রে রাখে, অবনীশ ভাঙ্গা শার্সির মধ্য দিয়ে দেখে। মনে মনে হাসে আর আগের ষ্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়েছে কিনা সেই খবরের জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে। ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে দূত আসে। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়ায়, অবনীশ ইশারায় বলে আস্‌ছে কিংবা দেরী আছে।

কলের পুতুলের মত এদের জীবন। হৈ হৈ ক'রে সকালের ট্রেন চড়ে কর্মস্থলে ছুটে যায়, রাত্রিতে ধীর ক্লান্ত পদক্ষেপে চুপি চুপি বাড়ী ফেরে। কোনওরকম বৈচিত্র্য নেই বললেই হয়। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কেউ কেউ এদেশ সেদেশ যায় বটে, কিন্তু সেও কালে-ভদ্রে। শখ ক'রে কেউ যায় ব'লে মনে হয় না। কর্তব্যের টানেই মাঝে মাঝে মানুষের এই ছকে ফেলা জীবন-প্রবাহে ব্যতিক্রম ঘটে।

গ্রাম্য জীবন-স্রোত যখন বোবা হ'য়ে তার সুনির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হ'চ্ছিল, ঠিক সেই সময় একদিন ভোর রাতে গর্জনবিলাসী বোম্বে মেল, কোনও এক তরুণীর জীবন যৌবন পদদলিত ক'রে ফণাধারী ক্রুদ্ধ সাপের মত দাঁড়িয়ে গজ্‌রাতে লাগল।

পাখীর ডাকের আগেই মানুষের গলা পৌঁছল ঘরে ঘরে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুট্‌ল ষ্টেশনের দিকে।

অবনীশ ঘুমোচ্ছিল কোয়ার্টারে। প্রচণ্ড গণ্ডগোলে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই মনে হ'ল কোথায়ও যেন একটা অঘটন ঘটেছে। অবশ্য তৎক্ষণে রেলওয়ে কুলীরাও এসে হাজির।

অবনীশ ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

: চাপা পড়েছে বাবু—

: চাপা! কে চাপা পড়েছে—, চিনিস নাকি?

: না, জেনানা বাবু।

জেনানা—, পাজামার ওপর কোটটা চাপিয়ে, টর্চ নিয়ে ছুটে এসেছে অবনীশ। অবনীশ পৌঁছতেই কুলীরা কৌতূহলী গ্রামবাসীদের সরিয়ে পথ ক'রে দেয়। অবনীশ লাইনের ধারে নেবে টর্চ জ্বালে।

ভরা যৌবনা—সিঁথিতে সিঁন্দুর ঠোঁটের কোণে এক ফালি হাসি। ইঞ্জিনের চাকাটা বোধহয় পেটের ওপর দিয়েই চলে গেছে, কারণ রক্তে পেটের ওপরের আবরণটা লাল হ'য়ে উঠেছে।

পরিচয় তখনও জানা যায়নি। অর্থাৎ ষ্টেশনের ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিশ্চয়ই থাকে না তবে কেউ কেউ বলতে লাগল, চেনা চেনা ঠেকছে যেন এই গ্রামেই কোথায় না কোথায়ও তাকে দেখেছে।

ট্রেন থেমে ছিল। অবনীশ লাশ সরিয়ে নেবার যথারীতি বন্দোবস্ত ক'রে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী ক'রতে লাগল।

যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেবে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে আত্মহত্যারই মুখরোচক গল্প নিয়ে জটলা করছে।

ট্রেনের সংলগ্ন ফার্ষ্ট ক্লাসের দরজায় একজন কোট-প্যান্ট পরিহিত যুবক অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সিগারেটের টিন, মুখে জলন্ত সিগারেট।

অবনীশকে পায়চারী ক'রতে দেখে ছেলেটি প্ল্যাটফর্মে নাবল। অবনীশের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ব'ললে, কি ব্যাপার স্যার, সুইসাইড কেস্‌ নাকি?

অবনীশ অন্যমনস্ক ছিল। আগন্তুকের এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সচকিত হ'য়ে ব'ললে, সেই রকমইতো মনে হ'চ্ছে। কারণ এত ভোরে সুইসাইড করা ছাড়া আর কোন্‌ উদ্দেশ্যে এখানে আসবে বলুন!

পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ছেলেটি আবার একটি সিগারেট ধরাল। অবনীশের প্রতি সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললে, যদি আপত্তি না থাকে—

অবনীশের কোনকালেই এই বস্তুটির প্রতি অনাসক্তি

ছিল না। এখনও নেই। সিগারেটটা যথারীতি ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

ছেলেটি আবার নিজে থেকেই আরম্ভ করল, বিলেতে বসে ইদানীং আমাদের দেশে আত্মহত্যার খবর প্রায়ই পত্রিকায় পড়তুম। হঠাৎ এত আত্মহত্যার হিড়িক কেন পড়েছে বল'তে পারেন ? ওসব দেশের মানুষ কিন্তু এমন অসহায়ভাবে নিজেকে হত্যা করে না। ওদের জীবনে একটা অদ্ভুত থ্রিল আছে। ওরা যখন মরে মরার মতন মরে। ইদানীং আমাদের দেশের লোকেরা বড্ড সেন্টিমেণ্টাল হ'য়ে পড়েছে।

অবনীশ নীরবেই ধূমপান ক'রছিল। কেবল বিলেত যাওয়ার ইঙ্গিতে একবার আগন্তুকের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলে।

হঠাৎ অবনীশের উদ্দেশে ব'ললে, মেয়েটিকে দেখেছেন নাকি ?

ঃ হ্যাঁ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে দেখেছি।

ঃ আমিও আপনার মত। এসব দৃশ্য একেবারেই সহ্য করতে পারি না। তবু এটা কেমন দেখতে ইচ্ছে ক'রছে— একবার দেখেই আসি কি ব'লুন।

অবনীশ উত্তর দিল না। কেবল একটু হাসল।

ছেলেটি এগিয়ে যায়। চলন-বলনে পুরোপুরি বিলিতিয়ানার ছাপ। তাছাড়া চেহারা দেখে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ব'লেই মনে হয়।

ভোরের স্পষ্ট আলোয় ছেলেটি ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ কেমন গম্ভীর হ'য়ে হন্‌হন্ ক'রে অবনীশের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে নিজের কামরায় উঠল।

অবনীশ হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল, কি মশাই ভয় পেলেন নাকি ?

ঃ ভয়—ভয় পাবার ছেলে আমি নই। তবে দুঃখ হ'ল, যতই হোক বাঙ্গালী তো। দীর্ঘদিন বিলেতে থাকার ফলেই বোধ হয় স্বজাতি-প্রেমটা একটু বেড়ে গেছে।

হাসপাতালের গাড়ী দেখে অবনীশ এগিয়ে এল। পোষ্টমর্টম করবার জন্য লাশ নিয়ে যাবে।

লাশ সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনটা গর্জন করে ওঠে। গাড়ীতে ওঠবার জন্য যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ট্রেন আস্তে আস্তে চলতে শুরু ক'রেছে। যে স্থানে আত্মহত্যা ঘ'টেছিল, সেই স্থানে ফার্স্ট ক্লাস কামরাটি পৌঁছনোর সঙ্গেই সঙ্গে সেই ছেলেটি জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে। টুকরো পাথরগুলোর গায় তখন তাজা রক্ত লেগে আছে।

ট্রেনটি চলে গেলেও, লাইন দু'টি কাঁপছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অবনীশ সবে চেয়ারে বসেছে। এমন সময় যে বিভ্রান্ত যুবকটি ঘরে ঢুকেই তাকে মাষ্টারমশাই ব'লে সম্বোধন ক'রল, সে আর কেউ নয় নিরঞ্জন অর্থাৎ সতীর্থ নিরঞ্জন চৌধুরী।

আই, এসসি পর্যন্ত তারা দু'জনেই এক কলেজে পড়েছে। তারপরই ছাড়াছাড়ি—আজ প্রথম দেখা হ'ল।

'মাষ্টারমশাই' সম্বোধন ক'রেই নিরঞ্জন অবাক হ'য়ে ব'ললে, তুই অবনীশ না—

ঃ হ্যাঁ, এমন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কোত্থেকে আস্‌ছিস ? অবনীশ চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসে।

ঃ তুই ষ্টেশনমাষ্টার !

ঃ হ্যাঁরে, এইতো মাস তিনেক জয়েন করেছি।

ঃ কিন্তু তুই—

ঃ আমি আমি—ব'লব পরে, আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দে। এখানে কাউকে আত্মহত্যা করতে দেখেছিস ?

ঃ আত্মহত্যা ! হ্যাঁ, ওইত ওখানে। কিন্তু ডেডবডিতো নিয়ে গেছে।

: নিয়ে গেছে ? বেঁচে আছে না—

: অবনীশ একটু করুণ হাসি হেসে ব'ললে, ডেড বডি ব'ললুম যে।

: হ্যাঁ, তাইতো, কিন্তু কোথায় গেলে তাকে দেখতে পাব ব'লতে পারিস ?

অবনীশ ব'ললে, তুই সোজা ফাঁড়িতে চলে যা ; কারণ সবকিছু এখন ওদের হাতে। ওরাই তোকে ব'লে দেবে কোথায় গেলে লাশ দেখতে পাবি।

নিরঞ্জন আচ্ছা ব'লে হন্ হন্ ক'রে অপেক্ষারত সাইকেল-রিক্সাটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল কিন্তু অবনীশ ওর হাত টেনে ধরল। তোর কেউ হয় নাকি ?

: হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। সব কথা তোকে বলব কিন্তু আজ নয়। আর একদিন।

সমস্ত দিনটাই বিশ্রীভাবে কাটল অবনীশের। বিশেষ ক'রে নিরঞ্জনের পরিচয় পাওয়ার পর থেকেই মনটা হঠাৎ

কেমন খারাপ হ'য়ে গেল। নিরঞ্জনের স্বভাবচরিত্র সে ভাল ক'রেই জানে। নিরঞ্জনের ব্যবহারে কোন মেয়ে আত্মহত্যা করবে, একথা অবনীশ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

অবনীশের কৌতূহলদীপ্ত মন প্রতিদিন সকাল বিকেল এবং সন্ধ্যা বেলায় নিরঞ্জনের জন্য পথ চেয়ে থাকে। নিরঞ্জনের মুখ থেকে সব কথা না শোনা পর্যন্ত অবনীশ কেমন যেন শান্তি পাচ্ছে না।

সাতটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। নিরঞ্জনের কোনও সাড়াশব্দ নেই।

সেদিন সকাল বেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অবনীশ খাটের ওপর বসে কাগজ পড়ছিল, হঠাৎ বাইরে গলার শব্দ পেয়ে অবনীশ জানালার দিকে মুখ ফেরাতেই চম্‌কে ওঠে—নিরঞ্জন নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

: নি-র-ঞ্জ-ন, আয়। ডাকিসনি কেন—

: ডেকেছিলুম, শুনতে পাস্‌নি। নিরঞ্জনের গলাটা অস্বাভাবিক রকম ভেঙ্গে গেছে।

অবনীশের খাটের ওপরেই নিরঞ্জন বসল। অবনীশ চাকরটাকে আরও এককাপ চায়ের ফরমাস ক'রে বললে, ব্যাপারটা কি খুলে ব'লত এবার।

: ব্যাপার ! নিরঞ্জন অবনীশের মুখের দিকে তাকাল। ব্যাপার আমিও তোর মত জানতুম না। কাল বালিশের তলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একখানা চিঠি থেকে সব জেনেছি।

: কি জেনেছিস্—কোনও রকম মনোমালিন্য……

: নাঃ, মনোমালিন্য হয়নি। বিয়েতো করেছি গত বছর। তবে বিয়ের পর মাঝে মাঝে আমি ওকে কাঁদতে দেখেছি। যার জন্য আমি বার বার ওকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি ?

ঘাড় নেড়েছিল। তখন আমি বলেছিলুম তবে কাঁদছ কেন ?

: বলল, মনটা যে আমার হাতের বাইরে। তাই যুক্তি দিয়ে তাকে আমার আয়ত্তে আনতে পারি না।

তারপর যেদিন আত্মহত্যা করল, এই চিঠিখানা লিখে বালিশের তলায় রেখে গেছিল। কাল বালিশটা তুলতেই পেলুম। চিঠিতে যা লিখে গেছে, পড়লেই তুই সব কথা জানতে পারবি। আমার মুখ থেকে কিছু শোনবার দরকার হবে না।

নীল রাইটিং প্যাডে গোটা গোটা লেখা পুরো তিনপাতা চিঠি। শেষের দিকটায় লেখাগুলো ট্যারা-বেঁকা, বোধ হয় হাত কাঁপছিল। এক যায়গায় লেখাটা অস্পষ্ট, বোধহয় তার ওপর কোনও কিছু পড়েছিল।

চিঠির সূচনাটা অতি সাধারণ। কোনও অন্যায় কাজ ক'রে ফেলে কোন নারী কোন পুরুষের কাছে সেটা ব্যক্ত করবার পূর্বে যেটুকু গৌরচন্দ্রিকা ক'রে এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

যেমন "শুনেছি তুমি খুব ক্ষমাশীল, আচ্ছা আমি যদি কোন অন্যায় কাজ ক'রে ফেলি, তোমার কাছে ক্ষমা চাই, তুমি ক্ষমা ক'রবে ? নিশ্চয়ই ক'রবে এখানেইতো তোমার পৌরুষ আবার মহত্বও।"

তারপর "আচ্ছা আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, তুমি তোমার জিনিষগুলো কেমন ক'রে পাবে—খুব কষ্ট হবেতো। এই কারণেই বলি, কোনও পুরুষের স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। অথচ তুমি এই ক'মাসেই যেরকম নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছ, তাতে আমি মোটেই শান্তি পাচ্ছি না। গয়নাগুলো কোথায় আছে জানো? আয়রণ চেষ্টের বাঁদিকের ড্রয়ারে কাশ্মীরী কাঠের বাক্সটার মধ্যে। যে টাকা তুমি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে, তা থেকে দু'টাকা খরচ ক'রে সিনেমা দেখেছি। বাকী টাকা ট্রাঙ্কের মধ্যে খামে ভরা আছে। আয়রণ চেষ্ট এবং ট্রাঙ্কের চাবী কুলুঙ্গিতে যে সেলাইয়ের বাক্স আছে তার মধ্যে আছে।" ইত্যাদি।

সব শেষে, 'কেন আমি আত্মহত্যা করছি সেই কথাই তোমাকে বলি। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের প্রতিবেশী মৃণাল চ্যাটার্জী অর্থাৎ মৃণাল কাকার একমাত্র ছেলে সৌমিত্রকে আমার ভাল লাগতো। তার হাবভাব চালচলন বুদ্ধিবৃত্তি সর্বোপরি বড় হবার যে ভাবনা, সে ভাবনা আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়ে আমরা আমাদের মনের কথা পরস্পরকে বলেছিলুম। সৌমিত্র বলেছিল, বেশ আমরা দু'জন দু'জনকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করি এস কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না। ওর কথামত সেদিন প্রতিজ্ঞাও ক'রেছিলুম।

ক্রমশঃ বাড়ীতে সে কথা জানাজানি হ'ল। আশ্চর্য হ'লুম শুনে আমার বাবা নাকি ইতিমধ্যেই মৃণালকাকার কাছে সে প্রস্তাব ক'রে ব'সে আছেন।

মৃণালকাকারও আপত্তি ছিল না। কারণ মৃণালকাকার ছেলেবেলা থেকেই আমার ওপর টান ছিল। কাজেই ভবিষ্যতে পুত্রবধূরূপে আমাকে গ্রহণ করার পক্ষে এতটুকু অসম্মতি প্রকাশ পায়নি।

তবে সৌমিত্রকে বিলেত পাঠানোর ইচ্ছে ছিল মৃণাল কাকার। বাবাকে ব'লেছিলেন বিয়ের সময় হ'লেই এই শুভকার্য সমাধা করা যাবে।

কিন্তু আশ্চর্য! দু'জনেই কৈশোর ছাড়িয়ে তারুণ্যে পা দিলুম। সৌমিত্র এম, এস, সি-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেল।

মৃণালকাকা সৌমিত্রর বিলেত যাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রতে লাগলেন।

সৌমিত্র বিলেত গেল।

সৌমিত্রর বিলেত যাওয়ার কয়েকদিন পরেই মৃণালকাকা বাবাকে চিঠি মারফৎ জানালেন, আমার সঙ্গে সৌমিত্রর বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার জন্য বাবা যেন অন্যত্র চেষ্টা করেন।

বাবা সৌমিত্রকে চিঠি লিখলেন। সৌমিত্রও উত্তর দিল না।

বাবার অভিমান হ'ল। মৃণালকাকাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ ক'রলেন না। আমার জন্য ছেলে দেখতে লাগলেন।

বাবা ঘটনাটিকে তুচ্ছজ্ঞান করলেও আমি পারিনি। তোমার সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক বিয়ে হ'লেও মনের বিয়ে হ'ল না। বিয়ের আগে ও পরে কেবল এই কথাই ভেবেছি, সত্যকে মানুষ স্থূল স্বার্থের লোভে ছোট ক'রবে কেন?

সৌমিত্র বড় হ'য়েছে ব'লে তার মনে অহঙ্কার হ'তে পারে, মুখনিঃসৃত নিগূঢ় সত্যকে অস্বীকার ক'রতে পারে, কিন্তু আমিও যদি আমার অন্তরের মূল সত্যবস্তুটিকে এত সহজেই মিথ্যে ব'লে মেনে নিতে পারি, তাহ'লে আমারই বা মনুষ্যত্ব কোথায়?

সৌমিত্রর বিলেত থেকে ফেরবার দিন খবরের কাগজ মারফৎ বিজ্ঞাপিত হ'য়েছিল। ও বোম্বে মেলে ফিরছে—খবর সংগ্রহ ক'রলুম ঠিক ক'টায় বোম্বে মেল বিজয় পতাকা সহ এই ষ্টেশন অতিক্রম ক'রবে।

শুনলুম, ভোর সাড়ে চারটে। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে চাঁদনি রাতে পথে নাবলুম।

আমি আজ ওই ট্রেনের তলায় পড়ব। একান্ত কঠিন এই সত্যকে যদি মারতে চায় ও নিজে হাতে মারুক। মানুষ জানবে পুঁথিগত বিদ্যেতে সৌমিত্র সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু মানবিকতায় একটি অতি সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের চেয়ে অনেক ছোট।

তুমি আমার প্রণাম ও ভালবাসা নিও।
তোমার "অনু"।

চিঠিটা শেষ ক'রে অবনীশ নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকাল। ওর চকচকে চোখের তারার ওপর বোম্বে মেলের প্রতিচ্ছায়া—ভদ্রবেশী যুবকটি ঝুঁকে প'ড়ে দুর্ঘটনাস্থলটি দেখছে।
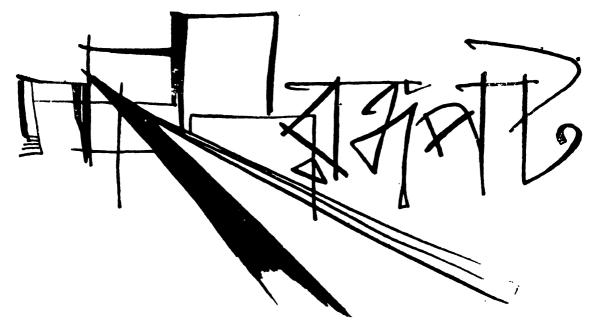
হোয়েলার প্লেস থিয়েটার

অমল মিত্র

নতুন এক রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন কাগজে ("ক্যালকাটা গেজেট", ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৭) বেরুল। রঙ্গালয়ের নাম হোয়েলার প্লেস থিয়েটার। বিজ্ঞাপনদাতা রঙ্গালয়ের ম্যানেজার নিজে। ওই মাসের মধ্যেই দ্বারোদ্ঘটন হবে জানালেন। আর দু-একটা খবরও বিজ্ঞাপনে জানান হয়েছিল। উদ্বোধন রজনীতে একখানি প্রহসন, 'দি ড্রামাটিষ্ট' অভিনীত হবে। প্রবেশপত্রের দাম এক সোনার মোহর। প্রবেশপত্র বিক্রী শুরু হয়েছে। যাঁরা আগে থাকতে আসন সংগ্রহ করতে চান ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ করার নির্দেশ। এও জানান হল যে, সব আসন আগেই ভর্তি হয়ে গেলে অভিনয়-সন্ধ্যায় টিকিট বিক্রী করা হবে না। হেস্টিংসের কাউন্সিলের নামজাদা এক সদস্য এডওয়ার্ড হোয়েলারের নামে হোয়েলার প্লেস রাস্তায় এই রঙ্গালয়। তাই রঙ্গালয়ের নামও হোয়েলার প্লেস থিয়েটার। রঙ্গালয়টির মত সে রাস্তাও আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাজভবনের পথের ধূলায় সেই স্মৃতি এমনই মুছে গেছে যে, বহু গবেষণায়ও রঙ্গালয়ের সঠিক স্থান নির্দেশ আজ আর সম্ভব নয়।

দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠাতারা রঙ্গালয় খুলে। বিশ বছরের পুরনো ক্যালকাটা থিয়েটারেরই তখন টলমলে অবস্থা। নতুন এক রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন কল্পনাও করতে পারেন না কেউ। সব থেকে বিস্মিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই ক্যালকাটা থিয়েটারের মালকরা। চিন্তিতও হয়েছিলেন। দারুণ এক দুর্দিনে আবার প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা। বেশ কিছুদিন চললও প্রতিযোগিতা হোয়েলার প্লেস থিয়েটার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

২১শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার নতুন রঙ্গালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল 'দি ড্রামাটিষ্ট' প্রহসন দিয়ে। তারপর স্বল্পকালস্থায়ী এ রঙ্গালয়ে 'সেন্ট প্যাট্রিকস্ ডে', 'থ্রী উইক্স আফটার ম্যারেজ,' 'ক্যাথেরিন অ্যাণ্ড পেট্রুসিও', 'দি মোগল টেল', 'দি মাইনর', 'আইরিশম্যান ইন্ লণ্ডন', 'দি ডেফ্ লাভার', 'দি লায়ার' 'দি ক্রিটিক' প্রভৃতি নানা নাটক ও প্রহসন অভিনীত হয়েছিল।

প্রবেশপত্রের দাম দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য রঙ্গালয়টি নির্মিত হয়েছিল। সাধারণ দর্শকদের সেখানে প্রবেশের রাস্তা খুব সুগম ছিল না। রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষেরাও সেই আভিজাত্যের ধারা অনুযায়ী

প্রেক্ষাগৃহে ভাল পরিবেশ ও মার্জিতনীতি রক্ষার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু, প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম রাত্রেই এক মহিলা দর্শক এই নীতির বাইরে পা দিলেন। কী আচরণ করেছিলেন তা কাগজে নেই। তবে সুবাঞ্ছিত আচরণ যে করেননি তা কর্তৃপক্ষদের দেওয়া কাগজের এক নোটিশ দেখে বোঝা যায়। ভবিষ্যতে সেই মহিলা দর্শকটিকে রঙ্গালয়গৃহে প্রবেশ করতে তাঁরা নিষেধ করলেন। এও জানালেন যে, নির্দেশ অমান্য করে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাঁকে বার করে দিতে তাঁরা বাধ্য হবেন ("ক্যালকাটা গেজেট", ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৭)।

ক্যালকাটা থিয়েটারের দেখাদেখি এঁরাও সিজ্‌ন টিকিটের প্রবর্তন করেন। কোন নাটকের পুনরাভিনয় হবে না এক সিজ্‌ন-এ তাও ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় নেমে গোড়া থেকেই দর্শকআকর্ষণের জন্যে যা করবার সব রকমই করেছিলেন নতুন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা। ১৭৯৮ সালে সিজ্‌ন টিকিট ব্যবস্থায় কিছু অদলবদল হয়েছিল ("ক্যালকাটা গেজেট," ১৫ই মার্চ, ১৭৯৮)। নতুন নিয়মে ছটির পরিবর্তে তিনটি অভিনয়ের জন্যে সিজ্‌ন টিকিট চালুর ব্যবস্থা। প্রবেশপত্রের দামও কমান হল। একশ কুড়ি সিক্কা টাকার জায়গায় পঞ্চাশ সিক্কা টাকা এবং চৌষট্টি সিক্কা টাকার জায়গায় বত্রিশ সিক্কা টাকা প্রবেশপত্রের দাম ধার্য হল।

মাঝে মাঝে বেনিফিট নাইটের ব্যবস্থা করতেন এঁরাও। ১৭৯৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মিসেস মিড্‌লটনের জন্যে এমনি এক বেনিফিট নাইট দেওয়ার খবরকাগজে ("ক্যালকাটা গেজেট, ১০ই আগষ্ট, ১৭৯৭) পাই। 'দি মিড্‌নাইট আওয়ার' এবং 'আইরিশম্যান ইন্ লণ্ডন' অভিনীত হয়েছিল সে রাত্রে। আর এক রাত্রে (১লা জুন, ১৭৯৮) ডাচ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে অ্যাড্‌মিরাল লর্ড ডানকানের অধীনে যুদ্ধারত নিহত সৈনিকদের অনাথ শিশুসন্তান ও বিধবাদের জন্যে বেনিফিট নাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সে রাত্রের খরচ-খরচা বাদ দিয়ে সমস্ত টাকাটাই সেই উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছিল।

সময় সময় বিজ্ঞাপন দিয়েও কী অদ্ভুত কারণে শেষ মুহূর্তে অভিনয়ের তারিখ বদল করতে হত, তারও খবর মেলে সেদিনের পত্রিকার পাতা ওল্টালে। একদিনের "ক্যালকাটা গেজেট"-এর (৩০শে মার্চ, ১৭৯৭) সম্পাদকীয় স্তম্ভে এমনি একটা নিদর্শন ছিল। পরবর্তী মঙ্গলবারের জন্য নির্দিষ্ট অভিনয় বুধবারে হবে। কারণ বাজনদাররা মঙ্গলবার অন্যত্র বাজাবার বায়না নিয়ে বসে আছে। গেজেট লেখে—

"The performance at the theatre in Wheler Place advertised for representation on Tuesday next, is postponed to Wednesday, on accouut of the Band having been previously engaged."

এমনি অদ্ভুত ও অভাবনীয় কারণে সেদিন অভিনয়ের তারিখ বদল হওয়ার আরো অনেক খবর প্রাচীন সংবাদপত্রের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। যেমন, ১৮২৪ সালে বিখ্যাত চৌরঙ্গী থিয়েটার বিজ্ঞাপন দিয়েও একবার 'কোরিওলেনাস' এর মত নাটকের অভিনয়ের তারিখ একদিন পিছিয়ে দিতে হয়। কারণ ওই একই দিনে ব্যারাকপুরের মাঠে ঘোড়দৌড় ছিল। ("জন বুল" ১০ই জানুয়ারী, ১৮২৪) সেদিনের ইংরেজদের কাছে তার আকর্ষণও কম ছিল না।

চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন, হপ্তায় হপ্তায় নতুন পালাবদল, বেনিফিট নাইটের ব্যবস্থা, দর্শকদের সুযোগ সুবিধে দান এই সব কিছুই কিন্তু ব্যর্থ হল। কারণ সেদিন দু'টি রঙ্গালয় চলা

"অয়নান্ত"-এর নায়িকার রূপসজ্জায় সুপ্রিয়া চৌধুরী

সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে অত বেশী দামের টিকিট করে। প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ক্যালকাটা থিয়েটারের পরিচালকরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। অভিনয় ইত্যাদি সকল দিকে নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তাঁরা, উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেছিলেন। দীর্ঘদিন বহুজনের আনন্দ-উৎস লায়েন্সরেঞ্জের এই রঙ্গালয়ের প্রতি কলকাতাবাসীদের একটু বিশেষ দরদও ছিল মনে হয়। তখন ভাগ্যবিড়ম্বিত হলেও, দর্শকদের সহানুভূতি খুবই স্বাভাবিক। একদা বহু জমজমে অভিনয় সেখানে দেখার সৌভগ্য দর্শকদের হয়েছিল। সুপরিসর প্রেক্ষাগৃহে কমদামী টিকিটের ব্যবস্থা থাকায়ও কম সুবিধে হয়নি ক্যালকাটা থিয়েটারের মালিকদের। এমনি নানা কারণে এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেশি দিন টিকে থাকা হোয়েলার প্লেস থিয়েটারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরিসীম আশা ও উৎসাহ নিয়ে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেও, লোকসানের তাড়া খেয়ে প্রতিষ্ঠাতারা দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্যালকাটা থিয়েটারের মালিকরাও হয়ত হাঁপ ছেড়ে বেঁচে ছিলেন সেদিন।

"প্রেয়সী"র সহ-নায়িকা সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই)

চলচ্চিত্র সম্পর্কে

শক্তিমান্ অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

What is art ? এই প্রশ্নের উত্তরে টলষ্টয় বলেছিলেন, —To evoke in oneself a feeling one has experienced and having evoked it in oneself then by means of movement, colours, sounds or forms expressed in words so to transmit that feeling that others experience the same feeling—this is the activity of art. রবীন্দ্রনাথ যাকে বলে গেছেন,—নিজস্ব সত্তাকে ভুলে গিয়ে অভিনীত চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে যিনি তা ফুটিয়ে তোলেন তাই-ই জীবন্ত চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়, আর্ট যিনি অঙ্কিত করেন তিনি পরিচিত হন জাতশিল্পী হিসাবে। অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সেই জাতেরই শিল্পী তাই তাঁর প্রতিটি অভিনীত চরিত্রের মধ্যে পাই একটি জীবন্তভাবের প্রকাশ সেই কারণেই একদিন গেলাম তাঁর কাছে। প্রথমেই তাঁর কাছে যে প্রশ্নের অবতারণা করলাম এবং যে উত্তর তিনি দিলেন, আজ তা লেখার কোন প্রয়োজন দেখি না ; কারণ যে বিষয়বস্তুর উপর আমাদের আলোচনা সেদিন হয়েছিল ; আজ তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে গেছে। তবে জানিয়ে রাখি শিল্প ও শিল্পী যেমন এক একের পূরক তেমনি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শিল্পী ও চলচ্চিত্রে নিয়োজিত কর্মীরাও তাই। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দরদ ও সহানুভূতি ছাড়া কোন চিত্র সম্পূর্ণ হয় না বা সুন্দর হতে পারে না। না হলে ক্ষতির সম্ভাবনা উভয় দিকেই। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আজকাল একশ্রেণীর অভিনেতাদের অভিনয়ের মধ্যে পাশ্চাত্যের ছাপ এসে পড়েছে এটা কি ঠিক? এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

দেখ ভাই—অনুকরণ, করা ভাল, তবে সেটা যদি যথার্থ হয়। ধর জন গিলবার্ট ক্লার্ক গেবল, গ্যারি কুপার এঁরা সবাই Academy honour winner এখন এঁদের অভিনয়ে ভাল যেটুকু অর্থাৎ এক একটা চরিত্র অভিনয় করতে গিয়ে এঁরা কতটা সংযম তাতে প্রয়োগ করেন, চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কতটা মুখের অথবা মনের

অভিব্যক্তি তাঁরা প্রকাশ করেন সেইসব যদি কেউ গ্রহণ করেন, তবে সেটা খারাপ কিছু দেখি না। তা না করে রোনাল্ড কোলম্যান কি ভাবে সিগারেট ধরান আর গ্রেগরি পেক এর হাঁটার ভাব যদি কেউ নকল করেন তবে সেটা নিশ্চয়ই সার্থক হবে না। কাঠের পুতুলের ভিতর দিয়ে কতকগুলো তার থাকে। আর নিচে মানুষ সেগুলোকে ধরে প্রয়োজনানুসারে কখনও ডাইনে বামে টানাটানি করে। তা না করে রাগ প্রকাশের সময় হাতের তার না টেনে যদি মাথার তার টেনে মাথাটা নিচু করে দেয় তা হলে যেমন যথার্থ হয় না হাস্যাস্পদর কারণই শুধু হয় তেমনি। অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের মধ্যে সেই String থাকে। চরিত্রানুযায়ী সেই String গুলোকে মস্তিষ্ক দিকে চালনা করতে হয় তবেই তা যথার্থ হবে। সেখানে অনুকরণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। আমি নিজের কথাই বলি, লৌহকপাট চিত্রে ফকিরের ভূমিকায় যথাযথ রূপ দিতে গিয়ে আমাকে অতিরিক্ত পরিমাণে পরিশ্রম করতে হয়েছে। বাড়ীতে রাতের বেলায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত। বিছানা থেকে উঠে পড়ে আয়নার সামনে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে। চিত্রটি আত্মপ্রকাশের পর শুনলাম আমার অভিনয় নাকি দর্শকদের অভূতপূর্ব আনন্দ দিয়েছে। তাই বলছি এই যে আনন্দ এ অনুকরণ করে দেওয়া যায় না।

আপনি আপনার অভিনীত কোন বই দেখেন নাকি? দেখলে কতগুলি? এবং দেখার সময় আপনার মনের উপর তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কি?

নিশ্চয়ই দেখি? শুধু তাই নয়, অভিনেতা যদি তাঁর অভিনীত কোন বই না দেখেন, তবে আমার মনে হয় সেই অভিনেতা কোনদিন সার্থক অভিনেতা হতে পারেন না।

চলচিত্রে, মঞ্চে এবং বেতারের মধ্যে কোন্‌টার মাধ্যমে অভিনয় করে আপনি বেশী তৃপ্তিলাভ করেন?

গোড়ায় বলেছি আবার বলছি, অভিনয়টাকে অভিনয় হিসেবে না নিয়ে যদি তাকে একটা সত্যকার চরিত্র হিসেবে ভাবা যায় তাহলে সবকিছুর মধ্যে তৃপ্তি পাওয়া যায়।

আমার পরের প্রশ্ন, চলচ্চিত্রে যোগদান করলে অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা অসামাজিক হয়ে পড়েন বলে শোনা যায়, সেটা কি ঠিক?

ঠিক কি করে বলি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আমি নিজেকে কোনদিন অসামাজিক বলে মনে করতে পারি না তখন অপরকে কি করে তা ভাবি।

বাংলা চলচ্চিত্র কি আগের চেয়ে অনেক উন্নত বলে মনে করেন?

নিশ্চয়ই। এক সত্যজিত রায়ই বাংলা চলচিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বের দরবারে বাংলা চলচ্চিত্রের যে আসন তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন তা বহুকাল অক্ষয় অম্লান হয়ে থাকবে। এই আমার সবশেষ প্রশ্ন এ ছাড়া শিল্পীর ব্যক্তিগত কাহিনী সম্পর্কে আমি যা জেনেছি আপনাদের কাছে এবার তাই জানাব।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চ থেকেই তাঁর অভিনয় জীবন সুরু করেন। ১৯৪৫ সালে ষ্টার থিয়েটারে তিনি যোগদান করেন। ষ্টারে তখন শতবর্ষ আগে চলছে। থিয়েটারের মাধ্যমে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তাঁর মন কিন্তু তখন অন্যদিকে ছুটে চলেছে।

বিরাট মিছিল করে ছাত্রের দল এগিয়ে চলেছে বুক চিতিয়ে। চোখে তাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বার হচ্ছে। মাঝে মাঝে বজ্রমুষ্টিবাহু শূন্যে আন্দোলিত করে চীৎকার করে উঠছে অস্ত্রধারী ইংরাজ পুলিশের মুখোমুখি হয়ে। ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কারের ভাব জনতার মুখে মুখে। হঠাৎ পুলিশের রাইফেল গর্জে উঠল। আর যুবক ছাত্র সয়েদ আলির রক্তে পিচঢালা কালো পথ রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠল। কালীবাবু তখন যুবক। থমকে দাঁড়ালেন পথ চলতে গিয়ে। তাঁরও বুকের ভিতরটা গর্জে উঠল। থিয়েটারে যাওয়া আর সেদিন হল না। জীবনের মোড় তাঁর ঘুরে গেল। এরপর আবার হিন্দু-মুসলমান সংগ্রাম। কিন্তু কেন? শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে প্রশ্ন জাগল। কাদের জন্য এই সংগ্রাম? এতদিন তো তারা উভয়ে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। কোনদিন তো এ পাশবিকপ্রবৃত্তি তাদের মধ্যে জাগেনি। এই এই সময় তিনি I.P.T.A তে যোগদান করলেন। সলিল চৌধুরী, সজল রায়চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে South Squard গঠন করলেন। তারপর তিনি মিশে গেলেন "যেথায় মাটি করছে চাষা চাষ"।

তাদের জানার জন্যে, চেনার জন্যে যাদের নিয়ে নাকি

রচনা হয় উপন্যাস তাদের আসল পরিচয় না জানলে তাদের ভাষা, আচারব্যবহার না শিখলে অভিনয়টা অভিনয়ই হয়ে থাকবে। প্রাণবন্ত তা কোনদিন হতে পারে না। তাই দিন-মাস-বছর তিনি গ্রামের মধ্যে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে লাগলেন। বহু প্রতিষ্ঠান, মজদুর, সমিতি গঠন করলেন। তারপর এক বুক-ভরা আনন্দ নিয়ে ফিরে এলেন শহরে।

এই ঘোরাঘুরির ফলে তিনি অসুখে আক্রান্ত হন। সুস্থ হয়ে উঠে তিনি চলচ্চিত্রে যোগদান করেন। 'বরযাত্রী' চিত্রে প্রথম সুরু থেকে আজও পর্যন্ত দুর্বারগতিতে তিনি এগিয়ে চলেছেন বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে তিনি অভিনয় কারছেন এবং সাফল্য লাভও করেছেন বহু ক্ষেত্রেই। পেশাদর রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁর মাঝে মাঝে ডাক আসে বটে; কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রতি তাঁর এখন আকর্ষণ কম থাকায় তিনি সে ডাকে সাড়া দিতে পারেন না। অমায়িক

সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার—ছায়াছবির বাইরে

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও একমাত্র কন্যা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রী শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে এক সুস্থ ও সুন্দর সংসার গড়ে তুলেছেন। —জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রান্তিবিলাস

জাতীয় জীবনের নবজাগরণের ইতিহাসে যাঁদের অকৃপণ দানের তুলনা মেলে না পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই তালিকায় এক চিরোজ্জ্বল নাম। মহাকবি সেক্সপীয়ারের কমেডি অফ এরার্সের পটভূমি অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর মহাশয় রচনা করেছিলেন ভ্রান্তিবিলাস নাটক। এই অফুরন্ত ও নির্মল হাস্যরসসমৃদ্ধ রচনাটিকে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করে দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন উত্তমকুমার।

এক কাষ্ঠব্যবসায়ী ও তাঁর অনুগত ভৃত্য কাযব্যপদেশে এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল, যেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাঁর ভৃত্যের সঙ্গে এই দু'জনের আকৃতিগত পুরো মিল বিদ্যমান। ফলে ভুলের শুরু—যে ভুল দর্শকসমাজে জুগিয়ে চলে অবিরাম আনন্দ। তাদের ভরিয়ে রাখে পরিপূর্ণ হাস্যরসে। এই অস্বাভাবিক মিল কেমন করে সম্ভবপর হল সবশেষে সেই রহস্যের সমাধান ঘটেছে ও পরম পরিতৃপ্ত-চিত্তে দর্শকবৃন্দ নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে।

প্রায় শতবর্ষপূর্বের এই রচনাটিকে এমন অভূতপূর্ব কুশলতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সাধারণের সামনে তুলে ধরার গৌরব অবশ্যই উত্তমকুমারের প্রাপ্য। এ ছবির কাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য অফুরন্ত আনন্দের স্রোতোমুখ খুলে দেওয়া বলা বাহুল্য সেদিক দিয়ে ছবিটি সার্থকতাই বরণ করেছে। কৃত্রিমতা ও নোংরামির আশ্রয় না নিয়েও যে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করা যায়, এই জাতীয় ছবির দ্বারা সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সমগ্র ছবিটির মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই, কষ্টকল্পনা নেই, কৃত্রিমতা নেই। আঙ্গিকে, বিন্যাসে, গঠনকৌশলে ছবিটি সব দিক দিয়ে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা ও আধুনীকিকরণ করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য ও ছবিটি পরিচালনা করেছেন মানু সেন। দ্বৈতভূমিকায় উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিনয় এক কথায় অনবদ্য। ক্ষুদ্র ভূমিকায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের অভিনয় দর্শকচিত্ত স্পর্শ করে। এঁরা ব্যতীত সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী, লীলাবতী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ধীরাজ দাস, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতির অভিনয়ও প্রশংসনীয়। বাংলার দর্শকসমাজকে একখানি পরম উপভোগ্য ও পরিচ্ছন্ন ছায়াছবি উপহার দেওয়ার জন্য উত্তমকুমারকে আমরা অভিনন্দিত করি।

নির্জন সৈকতে

বলিষ্ঠ আবেদন, সুক্ষ্ম রসসৃষ্টি ও অপূর্ব প্রকাশভঙ্গীর জন্যে যে জাতীয় ছবিগুলি দর্শকচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হয় "নির্জন সৈকতে"র নাম সেই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য। এর নায়ক সাহিত্যপথযাত্রী—এই জীবনপিপাসু যুবক বৈচিত্র্যসন্ধানী। বৈচিত্র্যের আকর্ষণ তাকে দিক থেকে দিগন্তরে টেনে নিয়ে বেড়ায় আর নায়িকা —জীবনের বোধনলগ্নে ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষতা, এক পরম মুহূর্তের চরম আঘাতের যন্ত্রণা তার প্রাণসম্পদ কেড়ে নিয়েছে তার ফলে পৃথিবী আজ তার কাছে কুৎসিত, জীবন অর্থশূন্য। পুরীগামী ট্রেণে নায়কের সঙ্গে নায়িকার সাক্ষাত, উভয়েরই গন্তব্য পুরী। নায়িকার সঙ্গে চারটি বিধবা মহিলার সঙ্গেও নায়কের পরিচয় হয়। পুরীতে দুটি ভিন্ন রেখা একটি বিন্দুতে মিলল। নায়ক তার কাছে সন্ধান দিল অমৃতময় জগতের আনন্দঘন মহাজীবনের। তাকে জানাল নীরই শেষ নয়—তারপর ক্ষীরও আছে। ক্ষুধাকে অতিক্রম করার মত সুধারও অভাব নেই। দুঃখ, বেদনা, গ্লানির মধ্যে জীবনের মানে সীমাবদ্ধ নয়। সে তার দৃষ্টির সামনে খুলে দিল সার্থক জীবনের অমৃতদুয়ার।

চরিত্রগুলি এই কাহিনীর এক একটি সম্পদ। প্রতিটি চরিত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে। এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে কাহিনীকার বাংলার শক্তিমান কথা-শিল্পী কালকূট জীবনের এক পরম ও শাশ্বত সত্যের উদঘাটন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছবিটিতে কোথাও একঘেয়েমি নেই নয়, কৌতূহল আছে গতানুগতিকতার ছাপ অনুপস্থিত অপূর্ব শিল্পরুচির স্বাক্ষর আছে। কাহিনীগ্রন্থনে ও উপস্থাপনে দৌর্বল্য ও দৈন্যের ছাপ মেলে না, অফুরন্ত আনন্দ বিতরণের প্রতিশ্রুতি আছে। কাহিনীবিন্যাসে, আঙ্গিকে, গঠনকৌশলে সকলদিক দিয়েই পরিচালক তপন সিংহ সমগ্র ছবিটিকে পরম উপভোগ্য করে তুলে যথেষ্ট কৃতিত্ব ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তবে, সমুদ্রস্নানের দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হতো, এবং সেজদির শ্বশুরবাড়ী ত্যাগের কারণ বর্ণনার প্রসঙ্গে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই বর্জিত হওয়া উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের দুখানি গানের অন্ত-র্ভূক্তি সাধুবাদের দাবী রাখে।

অনিল চট্টোপাধ্যায় নায়কের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন। নায়িকারূপে শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয়ও বিশেষ প্রশংসার অধিকারী। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, রবি ঘোষ, অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, রুমা দেবী, রেণুকা রায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দের অভিনয় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষরবাহী। এঁদের সম্মিলিত অভিনয়দক্ষতা ছবিটির সাফল্যে বহুলাংশে সহায়তা করেছে।

সুদর্শন চিত্রনায়ক বসন্ত চৌধুরী

সংবাদ-বিচিত্রা

বিশ্ববুধমণ্ডলের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভারতের শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মহোদয়ের সম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পরিক্রমা নিঃসন্দেহে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত। এই বিদেশভ্রমণে তিনি সর্বত্র যে স্বতঃস্ফূর্ত সমাদর ও সশ্রদ্ধ আবাহনলাভ করেছেন তা তাঁকে কেন্দ্র করে ভারতকেই সম্মানিত করা হয়েছে এবং এই সম্মান সারা ভারতের। বিদেশবাসীর সামনে ভারতের অশেষ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে তাদের মনে ভারত সম্বন্ধে এক শ্রদ্ধাপূর্ণ চেতনার সৃষ্টিতে তাঁর গৌরব অবিসম্বাদিত। তাঁর এই আপাতশেষ ভ্রমণেও এই মহান কর্মে ছেদ পড়ে নি। হলিউডের চিত্ররাজ্যে তিনি পদার্পণ করে আমাদের দেশের শিল্পী ও কুশলীদের সম্বন্ধে যে সুন্দর ধারণা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার জন্যে এ দেশের চিত্রজগত তাঁর কাছে বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ। এ্যামেরিকার মোশান পিকচার্স এ্যাসো-সিয়েশান কর্তৃক আয়োজিত এক সম্বর্ধনাসভায় তিনি বলেন যে, ভারতের শিল্পীদের কাজ শুধু প্রাদপ্রদীপের সামনে ও ষ্টুডিওর ফ্লোরেই সীমাবদ্ধ নয়। তার বাইরেও জনজীবনের নানা দিকে তাঁদের স্পর্শ বিদ্যমান। লোকসভার সদস্যপদও তাঁদের দ্বারা অলঙ্কৃত (পৃথ্বীরাজ কাপুর ও রুক্মিণী দেবী) দেশের সঙ্কটজনক মুহূর্তে আমাদের শিল্পীসমাজ যেভাবে এগিয়ে আসেন তারও তুলনা বিরল।—এই সফরে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বিভিন্ন ষ্টুডিও পরিদর্শন করেন এবং কুশলী ও চিত্র তারকাদের সঙ্গে মিলিত হন।

চাঁদ ওসমানী (বোম্বাই)—ছায়াছবির বাইরে

*　　*　　*

যাঁদের অতুলনীয় দেশপ্রেম অগণিত নরনারীকে দেশ-বন্দনার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে, আজকের স্বাধীনতার আশীষধন্য প্রতিটি ভারতীয়ের সশ্রদ্ধ নমস্কার নিত্য যাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হচ্ছে দেশপ্রেমিক ভগৎ সিং-এর নাম তাঁদেরই তালিকায় উল্লেখনীয়। প্রযোজক কেবল কাশ্যপ এই লোকান্তরিত দেশপ্রেমিকের উৎসর্গিত জীবনকাহিনীটি ছায়া-চিত্রে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাম পরিভ্রমণ করে ভগৎ সিং-এর জননী, সহোদরা ও অনুজের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তাঁরা ভগৎ সিং সম্পর্কিত বহু তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং কাশ্যপকে তাঁর এই অভিনন্দনীয় কার্যে সবপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

*　　*　　*

সুপ্রসিদ্ধা চিত্রতারকা মীনাকুমারীর বাসভবনে সম্প্রতি এক ভয়াবহ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাঁর গৃহ থেকে নগদ তিরানব্বুই হাজার টাকা চুরি গেছে। মীনাকুমারী ও তাঁর স্বামী কমল আমরোহীর অনুপস্থিতিতে আলমারী থেকে ঐ টাকা নিয়ে পলায়নরত অবস্থায় গৃহভৃত্য রমেশকে দেখা যায়। রমেশকে বলা বাহুল্য—পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়।

*　　*　　*

বর্তমানকালে যে সকল গ্রন্থ নিয়ে এক বিশ্বব্যাপী আলোচনার ঝড় উঠেছে বোরিস পাস্তারনাকের "ডক্টর জিভাগো" গ্রন্থটি তাদের অন্যতম। এই বহু আলোচিত গ্রন্থটির রচয়িতা হিসাবে রুশ লেখক পাস্তারনাক ১৯৫৮ সালে নোবেলপুরস্কার লাভ করেন। এই গ্রন্থে কম্যুনিজমের আসল রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্যে নিজের দেশে এই দক্ষ সাহিত্যিককে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। ইতালির বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক কার্লো পন্টি এই বহুআলোচিত গ্রন্থটির চিত্ররূপ দেবেন বলে জানা গেল। বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার নামভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে ঘোষিত হয়েছে।

বিশ্ববিখ্যাত ওয়াল্ট ডিসনি প্রোডাকসান্স এ্যামেরিকার মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন বলে নিউইয়র্ক থেকে এক সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। পূর্বোক্ত এ্যাসোসিয়েশানের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশানের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে বলে আশা করা যায়।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

স্বর্গ হতে বিদায়

আজ থেকে সতেরো বছর আগে বাংলার নারী-সমাজ থেকে একজন এগিয়ে এসেছিলেন চিত্র পরিচালনার কাজে। তাঁর নাম প্রতিভা শাসমল। নিবেদিতা ছবিখানি তিনি উপহার দিয়েছিলেন বাঙ্গলা ছবির দর্শক সমাজকে। দীর্ঘকাল পরে চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমানে আর একজন মহিলা এগিয়ে এসেছেন। তিনি বিদুষী ও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মঞ্জু দে। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে "স্বর্গ হতে বিদায়" ছবিটির মাধ্যমে শ্রীমতী দের পরিচালিকারূপে প্রথম আবির্ভাব ঘটবে। ছবিটিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুভা গুপ্ত, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

প্রতিনিধি

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে মৃণাল সেনের পরিচালনায় "প্রতিনিধি" ছবিটির কাজ সমাপ্তপ্রায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যো-

"বিদ্যারত্ন" ছবিটির চিত্রগ্রহণের অবসরে পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সংগে আলোচনারত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিতা সান্যাল

পাধ্যায়, জহর রায়, শ্রীমান প্রসেনজিত ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আলো কেন আলেয়া

তরুণ পরিচালক শরণ দে অমল দত্তের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে 'আলো কেন আলেয়া'' র কাজ শুরু করেছেন। কাহিনীর বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দেবোত্তম চক্রবর্তী, মনি শ্রীমানী এবং গীতা দে প্রভৃতি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সম্পা চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দসহ "অয়নান্ত"-এর কুশলীবৃন্দ।

শৌখীন সমাচার

পাহাড়া ফুল

শৈলেশ গুহনিয়োগীর "পাহাড়ী ফুল" নাটকটি অভিনয় করলেন ক্যালকাটা মেরি মেকার্স ক্লাব। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করেন তুষার রায়, শিবকুমার শর্মা, বিশ্বনাথ দাস, ভিক্টর সিং, বিমান বিশ্বাস, রঞ্জন রায়, রামেশ্বর রায়, বেলা রায়, তপতী মণ্ডল ইত্যাদি।

মেঘে ঢাকা তারা

পি এ্যাণ্ড টি রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যরা নিবেদন করলেন শক্তিপদ রাজগুরু "মেঘে ঢাকা তারা"। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শক্তি মুখোপাধ্যায়, উমাশঙ্কর বসু, মৃণাল সেনগুপ্ত, গীতা দে, সবিতা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। নাটকটি পরিচালনা করেন মমতাজ আহমেদ।

"ন্যায়দণ্ড" ছবিটির নায়ক আশীষকুমার ও নায়িকা তন্দ্রা বর্মণসহ পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী

ভবিষ্যত ভারত

শঙ্করদাস বাগচী রচিত 'ভবিষ্যৎ ভারত' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন জাগৃহি নাট্যগোষ্ঠী। অভিনয়াংশে ছিলেন মৃণাল নন্দী, সুখময় বরাট কানু নন্দী, সৌমেন ধর, ললিতা পাণ্ডে, স্মৃতি মণ্ডল, অপরাজিতা চৌধুরী ইত্যাদি।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যায় রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী ও নৃপেন দত্ত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

পরীক্ষা বন্ধের প্রশ্ন—

জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে অচল অবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশ্বের জনমতকে শুধু সান্ত্বনা দিবার জন্য এই সম্মেলন অভিনয় মাত্র বলিয়া মনে হইতেছিল। এই সময়ে—গত ১০ই জুন কতকটা আকস্মিকভাবেই নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় আন্তরিকতা সঞ্চারের জন্য নূতন উদ্যমের কথা ঘোষিত হইয়াছে। এই দিন ওয়াশিংটন, মস্কো ও লণ্ডন হইতে এক সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের ব্যাপারে ঐক্যমত সৃষ্টির জন্য জুলাই মাসের মাঝামাঝি মস্কোর একক পর্যায়ে আলোচনা আরম্ভ হইবে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি, মিঃ ম্যাক্‌মিলান্‌ ও মঃ ক্রুশ্চেভের মধ্যে ব্যক্তিগত পত্র বিনিময়ের দ্বারা এই ব্যবস্থা হইয়াছে; এই তিন রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিশেষ প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় যোগ দিবেন। বৃটেনের পক্ষ হইতে ভাইকাউন্ট হ্যালিশ্যাম এবং আমেরিকার পক্ষ হইতে মিঃ এভোরেল হ্যারিম্যান মস্কো-বৈঠকে যোগ দিবেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ আশা করা হইতেছে যে, মস্কো-বৈঠকের আলোচনা সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইলে শীর্ষ সম্মেলন সম্ভব হইবে। এই শুভ-সংবাদ যেদিন প্রচারিত হয়, সেই দিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমেরিকাবাসীকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ঠাণ্ডা-যুদ্ধ সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তন করিতে অনুরোধ জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'Among the many traits the peoples of our two countries have in common, none is stronger than our mutual abhorrence of war'. অর্থাৎ, আমাদের দুই দেশের অধিবাসীর মধ্যে বহু বিষয়ে মিল আছে; তাহার মধ্যে যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেন যে, ১৯২০ সাল হইতে নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, বর্তমানে ইহার সম্ভাবনা যতই স্তিমিত হউক না কেন, আমরা এই সম্পর্কে চেষ্টা চালাইয়া যাইব—এই আলোচনার বৃহত্তম ক্ষেত্রে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হইলেও এই সম্পর্কে নূতন উদ্যম বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন। তিনি ঘোষণা করেন যে, অন্য কোনও শক্তি যদি বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা আরম্ভ না করে, তাহা হইলে আমেরিকা আর এই পরীক্ষা চালাইবে না। বিশ্বশান্তি সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদীদের লক্ষ্য করিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "Our problems are man-made—therefore, they can be solved by man." অর্থাৎ, আমাদের সমস্যাগুলি মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষের দ্বারা ইহার সমাধান হইতে পারে।

রাজনৈতিক প্রচারগন্ধবর্জিত এইরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তৃতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক দিন শোনা যায় নাই। রুশিয়া ও আমেরিকার অধিবাসীর মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে এবং উভয়ে সমানভাবে যুদ্ধকে ঘৃণা করে—মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানের মুখে এই উক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পরিবর্তন সূচিত হইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই উক্তি করিবার সময় রুশ জনসাধারণের শান্তির আগ্রহের সহিত সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের মনোভাবের পার্থক্য করেন নাই; জনসাধারণের প্রতি দরদ দেখাইয়া গভর্ণমেন্টের নিন্দা করিবার অভ্যস্ত প্রচার কৌশল এই ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় নাই। এই

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত অক্টোবর মাসে কিউবার ঘটনার পর হইতে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সহিত মঃ ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগতভাবে পত্র-বিনিময় চলিতেছিল। ইহার ফলে দুই পক্ষে বহু ভুল বোঝাবুঝির অবসান হইয়া থাকিবে। ওয়াশিংটনের সহিত মস্কোর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্যও চেষ্টা চলিতেছে; 'হট্ লাইন্' নামে পরিচিত এই ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে সরাসরি সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হইবে, যাহার ফলে কোনও আকস্মিক কারণে যুদ্ধের আশঙ্কা আর থাকিবে না। জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ চার্লস্ ষ্টেল্ গত ১২ই জুন বলিয়াছেন যে, 'হট্ লাইন' সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যমত স্থাপিত হইতে আর বিলম্ব নাই। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ গত ১৫ই জুন 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়ার' সম্পাদকের সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডির আপোষকামী মনোভাবের প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই মনোভাব বাস্তবে প্রতিফলিত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জার্মান সমস্যার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক ঘাঁটির এবং কিউবার প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রনায়কদের হুমকীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এইগুলি আপোষকামী মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্যকর নহে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি

পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তির দাবীতে ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতিতে বিশেষ পার্থক্য আর নাই। এই সম্পর্কে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের দাবী

—পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি লঙ্ঘিত না হওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্ত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক সরেজমিনে তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রথম দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের এতে আপত্তি ছিল না: কিন্তু ১৯৬০ সালে আমেরিকার ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান সোভিয়েট ইউনিয়নে ধরা পড়ার পর হইতে সে বাঁকিয়া বসে এবং বলিতে আরম্ভ করে যে, আন্তর্জাতিক কমিশনে তদন্তের ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া গুপ্তচরবৃত্তিতে সে প্রশ্রয় দিবে না। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে কোথাও পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিলে তাহা জানিবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর অভিমত উল্লেখ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন বলিতে আরম্ভ করে যে, আন্তর্জাতিক তদন্তের কোনই প্রয়োজন নাই—নিজ নিজ দেশ হইতেই এই তদন্ত চলিতে পারে। ক্রুশ্চেভের উক্তি—"National facilities of detection combined with automatic seismic stations, are dependable guarantee to ascertain any possible attempts to violate a test ban agreement." শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের ব্যাপারে যাহাতে একটা আপোষ সম্ভব হয়, তদুদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন মূলনীতি হিসাবে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী মানিয়া লয়। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তি—বছরে তিন বারের বেশী আন্তর্জাতিক তদন্তের প্রয়োজন নাই; বিজ্ঞানীদের অভিমতের দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়ন তাহার এই যুক্তি সমর্থন করিতেছে। পক্ষান্তরে, আমেরিকার অভিমত—প্রতি বৎসর অন্তত সাত বার তদন্ত আবশ্যক। বস্তুত, মতবিরোধের ক্ষেত্র এখন খুবই সঙ্কুচিত হইয়াছে; তবে, ক্ষেত্রটুকুই বহুদিন দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া রহিয়াছে। মস্কো আলোচনায় যদি এই সামান্য মত-পার্থক্য দূর হয় তাহা হইলে উহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে। প্রথমত, পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের অর্থই হইল—পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতার অবসান। পরীক্ষা বন্ধ হইলে প্রকৃতপক্ষে পারমাণবিক অস্ত্রের নির্মাণ বন্ধ হইবে; পরবর্তী পর্যায়ে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করিবার প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি সম্পাদিত হইলে সমগ্র নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার শুভ

ম্যাকমিলান

মঃ ক্রুশ্চেভ

প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইবে। ইংরাজীতে যাহাকে 'বরফ ভাঙ্গা' বলে, পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি হইলে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার সেই বরফ ভাঙ্গিবে এবং তাহার পর এই আলোচনার গতি স্বচ্ছন্দ হইতে পারিবে! তৃতীয়ত, এই বিষয়ে মীমাংসা হইলে কম্যুনিষ্ট শিবিরে চৈনিক উগ্রতার নৈতিক পরাজয় ঘটিবে। চৈনিক নেতৃবৃন্দের বড় যুক্তি এই যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত কম্যুনিষ্ট শিবিরের কোনও ব্যাপারে প্রকৃত মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়—এই সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের চেষ্টা শুধু পণ্ডশ্রম। বস্তুত, আজ পর্যন্ত কোনও ব্যাপারে ক্রুশ্চেভ পাশ্চাত্য শিবিরের সহিত প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারেন নাই: লাওস সম্পর্কে গত বৎসর যে মীমাংসা হইয়াছিল, উহা এখন ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম, কিউবার স্থায়ী নিরাপত্তা ক্রুশ্চেভ জানিতে পারেন নাই। পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি যদি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে ক্রুশ্চেভের শান্তিকামী নীতির একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটিবে এবং কম্যুনিষ্ট শিবিরে তাঁহার অনুসৃত নীতি অধিকতর শক্তিশালী হইবে। জগতের কল্যাণের জন্য—বিশ্বশান্তির নিশ্চয়তার জন্য এই নীতির শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত আবশ্যক; প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যে আপোষকামী মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যদি তাহা বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি জয়যুক্ত করিতে তাঁহারা সহায়তা করিবেন। এই সহ-অবস্থানের নীতির মধ্যেই বর্তমান সঙ্কট হইতে বিশ্ব-মানবের প্রকৃত মুক্তির পথ রহিয়াছে।

কাস্ত্রোর মস্কো সফর—

কিউবা বিপ্লবের জনক এবং বর্তমানে কিউবার প্রধান মন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো দীর্ঘ চল্লিশ দিন সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন করিয়া জুন মাসের প্রথমে দেশে ফিরিয়াছেন। গত বৎসর অক্টোবর মাসে কিউবাকে কেন্দ্র করিয়া যখন তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন ক্রুশ্চেভের আচরণ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানারূপ আলোচনা হইয়াছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ মাত্রই ক্রুশ্চেভের সংযম ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছিল। কিন্তু চৈনিক নেতৃবৃন্দ তাঁহার তীব্র বিরূপ সমালোচনা করেন; তাঁহাদের অভিযোগ—ক্রুশ্চেভ তখন দুই ভাবে কিউবার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, প্রথমত তিনি কিউবায় মিসাইল্ স্থাপন করিয়া এই রাজ্যকে বিপন্ন করেন এবং পরে আমেরিকার চাপে মিসাইল্ সরাইয়া তাহাকে অরক্ষিত রাখেন।

তখন এইরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ রটিয়াছিল যে, কিউবার সহিত পরামর্শ না করিয়া কিউবা সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ আমেরিকার সহিত

নূতন ব্যবস্থায় সমত হওয়ায় ফিদেল কাস্ত্রো অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন; সোভিয়েট-কিউবা সম্পর্ক খুবই অবনত হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনে যাইয়া কাস্ত্রো যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত গুণাবলীর যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে এইসব রটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদিন আমেরিকার পক্ষ হইতে নানাভাবে এই আভাস দেওয়া হয় যে, কিউবা যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক বর্জন করে, তাহা হইলে সোস্যালিষ্ট কিউবার সহিত সহ-অবস্থানে তাহার কোনও আপত্তি থাকিবে না। কাস্ত্রোর সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরে এবং তাঁহার বিভিন্ন উক্তিতে ইহা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সোভিয়েট কিউবা সম্পর্কে অত্যন্ত দৃঢ়; ইহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া দূরে থাকুক—ইহাদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিড় খাইবার সুদূরবর্তী সম্ভাবনাও নাই।

মস্কোর ঐতিহাসিক রেড স্কোয়ারে ফিদেল কাস্ত্রোকে অভ্যর্থনা জানাইবার সময় মঃ ক্রুশ্চেভ কিউবার প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে 'আমেরিকান মহাদেশের প্রথম সোস্যালিষ্ট বিপ্লবের প্রতিনিধিবৃন্দ' বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন—কিউবার বিপ্লব প্রকৃত গণ-বিপ্লব, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিউবার মেহনতী মানুষ দেশের সমস্ত সম্পদের মালিক হইয়াছে এবং লাতিন আমেরিকার কিউবাই একমাত্র দেশ, যেখানে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। ক্রুশ্চেভ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন—বীর কিউবা তাহার সংগ্রামে নিঃসঙ্গ নহে—সোভিয়েট ইউনিয়নের পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগ তাহার প্রতি রহিয়াছে।

ফিদেল কাস্ত্রো তাঁহার উত্তরে বলেন—১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের জন্যই কিউবার বিপ্লব সম্ভব হইয়াছে। এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবায় বিপ্লব ঘটাইয়াছে—ইহার অর্থ হইল, সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল বলিয়াই সাম্রাজ্যবাদীরা কিউবা বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদীরা কিউবার চিনি ক্রয় বন্ধ করিয়া এবং কিউবাকে তৈল সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিয়া বিপ্লব ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার ফলে বিপ্লব সত্যই ব্যর্থ হইত; কিন্তু হয় নাই সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য। সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবার চিনি ক্রয় করিয়া এবং কিউবাকে তৈল সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের নিশ্চিত দুর্গতি নিবারণ করিয়াছে এবং কিউবার অর্থনীতিকে রক্ষা করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক চাল ব্যর্থ হইবার পর কিউবায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা হইল। কোনও পুঁজিপতি দেশ তখন কিউবাকে অস্ত্র বিক্রয় করিতে চাহে নাই—প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যোগাইল সোভিয়েট ইউনিয়ন, যাহার জন্য কিউবার পক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ব্যর্থ করা সম্ভব হয়। সর্বোপরি, Were it not for the Soviet-Union, the imperialists would not hesitate to lanch a

direct military attack on our country. অর্থাৎ, সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সামরিক আক্রমণ চালাইতে ইতস্তত করিয়াছে। দেশে ফিরিয়া কাস্ত্রো গত ৪ঠা জুন এক দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার চল্লিশ দিন ব্যাপী সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। এই বক্তৃতার এক বড় অংশে তিনি ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রীর যে গুণটি তাঁহার মনে সবচেয়ে বেশী রেখাপাত করিয়াছে, উহা তাঁহার অসাধারণ সহৃদয়তা এবং সারল্য। ইহা ছাড়া, ক্রুশ্চেভ অত্যন্ত বুদ্ধিমান বিপ্লবী নেতা ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি খুবই অভিজ্ঞ, কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং তিনি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির লোক। ক্রুশ্চেভের শান্তির আগ্রহ এবং তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব কাস্ত্রো বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। ফিদেল কাস্ত্রো বলেন—স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি এই উক্তি করিতেছেন না, ইহা তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। কাস্ত্রোর এইসব উক্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে তাঁহার যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে কিউবা-সোভিয়েট বিরোধ সংক্রান্ত অমূলক প্রচারের অবসান হওয়া উচিত।

কিউবান বিপ্লবের মার্ক্সীয় রূপান্তর এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কিউবার হৃদ্যতা সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথমত, মার্কিন রাষ্ট্রনায়করা যখন পৃথিবীর সর্বত্র কম্যুনিজমের অনুপ্রবেশ ঠেকাইবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাদেরই ভ্রান্ত নীতির ফলে তাঁহাদের গৃহদ্বারে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সঙ্ঘটিত, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ধীরে ধীরে মার্ক্সীয় বিপ্লবে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিউবার বিপ্লবীরা কাস্ত্রোর একনায়কত্বের অবসান ঘটাইয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চাপে কিউবার বিপ্লব প্রকৃত মার্ক্সীয় বিপ্লবের রূপ লইয়াছে। কাস্ত্রোর বিশিষ্ট গুয়েভারার ভাষায়, Cuban revolution "discovered Marxism"—কিউবার বিপ্লব মার্ক্সবাদকে আবিষ্কার করিয়াছে। একজন বিশিষ্ট বৃটিশ সাংবাদিক লিখিয়াছেন,...He (Castro) was an idealist who hoped to carry through a fundamental socialist revolution without destroying democratic liberties. He relied on enthusiasm. অর্থাৎ, কাস্ত্রো আদর্শবাদী, তিনি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমূল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন—তিনি জনগণের উৎসাহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই কাস্ত্রো এখন পরিপূর্ণভাবে মার্ক্সবাদে দীক্ষা লইয়াছেন এবং বলিতেছেন—The future of mankind is the future of Socialism and Communism অর্থাৎ সোস্তালিজম্ ও কম্যুনিজমের ভবিষ্যতই সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ? পৃথিবীর প্রধান সোস্তালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরাই আজ কাস্ত্রোর সর্বপ্রধান মিত্র। অদৃষ্টের পরিহাস—কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে যাঁহাদের পৃথিবীব্যাপী জেহাদ, তাঁহারাই এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। দ্বিতীয়ত, কিউবার বিপ্লবের গতি ও প্রকৃতি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, সমগ্র মহাদেশের যুবশক্তি উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এই আলোড়ন ও উৎসাহ কম্যুনিজমমুখী না হইলেও ইহা সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ নিশ্চিত ও নিকটবর্তী করিতেছে।

কীলার-প্রফুমো-আইভানভ—

Killer নহে, Keeler—হত্যাকারী নহে, কীলার নাম্নী এক সুন্দরী বারবনিতা। কীলার কাহাকেও হত্যা করে নাই; বরং তাহার পূর্ববর্তী প্রেমিক পশ্চিম ভারতের গায়ক আলোয়সিয়াস গর্ডন ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে হত্যার চেষ্টায় তিন বৎসরের জন্য কারাগারে গিয়াছে। কীলার কাহাকেও হত্যার চেষ্টা না করিলেও তাহার রূপের ও ছলাকলার সঙ্ঘাতে বৃটেনের রক্ষণশীল মন্ত্রিমণ্ডল মুমূর্ষু হইয়াছে। আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত যদি এই মন্ত্রিমণ্ডল টেকেও, টিকিবেন না বোধ হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান।

বারবনিতার রূপ, ব্যভিচার, রাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাহিনীটি এইরূপ। ডাঃ ওয়ার্ড নামক এক ডাক্তার-চিত্রকরের আড্ডায় বৃটেনের সমর সচিব জন প্রফুমো এবং রুশ কূটনীতিক ইউগেন্ আইভানভ রূপসী ক্রিষ্টিন কীলারের সহিত মিলিত হইতেন। ওয়ার্ড এই তরুণীকে উপরতলার নানা মহলে লইয়া যাইত এবং মক্কেল জুটাইয়া দিত। এক সময়ে সে তাহাকে "টাইমস" পত্রিকার মালিক লর্ড য়্যাষ্টরের বাগানবাড়ির পার্টিতে লইয়া যায়; সেখানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁও তাহার ফটো তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক, কীলারের পূর্ববর্তী প্রেমিক গর্ডন, উপেক্ষিত হইয়াই হউক, অথবা তাহার প্রেমিকার উঁচুমহলে প্রমোশনে ঈর্ষান্বিত হইয়াই হউক, তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়া ধরা পড়ে। এই সময় বৈদেশিক সংবাদপত্রে কীলারের সহিত প্রফুমোর সংসর্গের কথা প্রকাশিত হয়। প্রফুমো তখন কমন্সসভায় হম্বী-তম্বী করিয়া বলেন—এই সব কথা একেবারে মিথ্যা, কীলারের সহিত তাঁহার অবৈধ সংসর্গ নাই, এই মিথ্যা নিন্দা যদি আর প্রচারিত হয়, তাহা হইলে তিনি মানহানির মামলা আনিবেন। বস্তুত, একখানি ইতালীয় সংবাদপত্রের বৃটিশ এজেন্টকে তিনি উকিলের চিঠি পাঠান এবং এজেন্ট কোম্পানীটি ক্ষমা চাহিয়া রক্তচক্ষু সমর সচিবকে শান্ত করে। ঘটনা
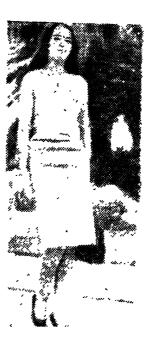
ক্রিষ্টিন কীলার

স্রোতের এত দূর পরিণতি দেখিয়া ওয়ার্ড ভয় পাইয়া যায় এবং পার্লামেন্টের কয়েক জন শ্রমিক সদস্যকে ও প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে জানায় যে, প্রফুমো সত্য কথা বলেন নাই। ইতিমধ্যে ইহাও প্রকাশ পায় যে, ওয়ার্ডের আড্ডায় কীলারের নিকট প্রফুমোর ও আইভানভের গতায়াতের সংবাদ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের (গুপ্তচর বিভাগের) অজানা ছিল না। তখন প্রফুমো বেগতিক দেখিয়া পদত্যাগপত্র পাঠান এবং বলেন যে, কমন্সসভায় তাঁহার উক্তি সত্য নহে—কীলারের সহিত তাঁহার অবৈধ সংসর্গ ছিল। এইরূপ সন্দেহ তখন প্রবল হইয়া ওঠে যে, কীলারের মারফৎ আইভানভ হয়ত প্রফুমোর নিকট হইতে বৃটিশ সমর বিভাগের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সন্দেহ ঘনীভূত হয় কীলারের এই উক্তিতে যে, আইভানভ এক সময় পশ্চিম জার্মানীকে পারমাণবিক অস্ত্র প্রদান সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রফুমোর নিকট হইতে জানিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌মিলানের বিরুদ্ধে এইরূপ সমালোচনা আরম্ভ হয় যে, গুপ্তচর বিভাগ নিশ্চয়ই ওয়ার্ডের আড্ডার ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাকে অবগত রাখিয়াছিল; তিনি জানিয়া শুনিয়া প্রফুমোর মিথ্যা ভাষণ হজম করিয়াছেন। ম্যাক্‌মিলান প্রথমে সলিসিটার জেনারেলের দ্বারা তদন্ত করাইয়া এই সম্পর্কে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেন যে, সমর বিভাগের কোনও গোপন সংবাদ রুশ কূটনীতিক জানিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে ডাঃ ওয়ার্ড পতিতার উপার্জিত অর্থে জীবিকা আহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। তাহার পর গত ১৭ই জুন মিঃ ম্যাক্‌মিলান ক্রুদ্ধ কমন্সসভার সম্মুখীন হন। বিরোধী দলের আনীত মুলতুবী প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিতর্ক আরম্ভ হয়। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত ৩২১-২৫২ ভোটে অগ্রাহ্য হইলেও এই বিতর্কে ম্যাক্‌মিলান-মন্ত্রিমণ্ডলের ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে। জন ত্রিশ রক্ষণশীল সদস্যই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট দেন নাই। ম্যাক্‌মিলান আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন যে, তিনি প্রফুমোর ব্যাপারে বরাবর সম্মানজনক আচরণ করিয়াছেন; গুপ্তচর বিভাগ প্রথম হইতে সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে জানান নাই—সুতরাং তিনি জ্ঞাতসারে কোনও অসম্মানজনক কাজ করেন নাই। তাঁহার এই উক্তিকে কেহ অসত্য বলে নাই—তিনি নির্দোষ বটেন; তবে শাসনকার্যে তাঁহার শিথিলতা সমালোচকরা আবিষ্কার করিয়াছেন। রক্ষণশীল দলের মধ্যেও বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে; যাহার ফলে দলের নেতৃপদে পরিবর্তন সাধনের কথা উঠিয়াছে। অতঃপর কে মিঃ ম্যাক্‌মিলানের স্থলাভিষিক্ত হইবেন, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে; এই সম্পর্কে উপ-প্রধান মন্ত্রী মিঃ বাটলার, অর্থসচিব মিঃ মড্‌লিং, লর্ড হেইলশ্যাম ও মিঃ সেলউইন্ লয়েডের নাম আলোচিত হইতেছে।

প্রফুমো

মালয়েশিয়া প্রসঙ্গ—

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশের প্রাক্তন উপনিবেশ সিঙ্গাপুর, মালয়, সারোয়াক্, ব্রুণি ও উত্তর বোর্ণিওকে লইয়া মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠনের সকল আয়োজন শেষ হইয়াছে, আগামী ৩১শে আগষ্ট এই ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ফেডারেশন সম্পর্কে ফিলিপাইনস্ ও ইন্দোনেশিয়ার—প্রধানত ইন্দোনেশিয়ার বিরোধিতায় যে অশান্তি সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তাহা একান্ত আকস্মিকভাবেই দূরীভূত হইয়াছে। গত মে মাসে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ টোকিওয় যাইবার পথে ম্যানিলায় ফিলিপিনো প্রেসিডেণ্ট মাকাপাগালের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার পর টোকিওয় যাইয়াই মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টেঙ্কু আব্দুল রহমানকে টোকিওয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমন্ত্রণ জানান। টেঙ্কু টোকিওয় গেলে দীর্ঘ ছয় বৎসরের পরে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই আলোচনার ফলে ফিলিপাইন্স, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ের পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের কাজ সহজ হইয়াছে এবং এই সম্মেলনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সম্মেলনের শেষে গত ১১ই জুন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট তিনটি রাষ্ট্র মূলনীতি হিসাবে বৃহত্তর মালয়েশিয়ান কন্‌ফেডারেশন মানিয়া লইয়াছে; জুলাই মাসের শেষে তিন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ম্যানিলায় এক সম্মেলনে মিলিত হইবেন। পররাষ্ট্র সচিবগণ তাঁহাদের রাষ্ট্রনায়কদিগকে তিনটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে তিন পক্ষের মধ্যে সর্বস্তরে আলোচনার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ইহার পর টেঙ্কু আব্দুল রহমান গত ১৪ই জুন শুক্রবারে কুয়ালালামপুরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোর্ণিওর তিনটি রাজ্যে—সারোয়াক, ব্রুণি ও উত্তর বোর্ণিওতে মালয়েশিয়া সম্পর্কে জনমত জানিবার ব্যবস্থা হইতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ-থাণ্টের সহকারী মিঃ নরসিংহনকে এই কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে।

সুকর্ণ

টেঙ্কু-সুকর্ণ আলোচনা এবং পরে পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচনার ফলে মালয়েশিয়া ফেডারেশন সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ার আপত্তি প্রত্যাহৃত হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বৃহত্তর মালয়েশিয়ান্ কন্‌ফেডারেশনের সাহায্যে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনকে এই নূতন ফেডারেশনের সহিত যুক্ত করা হইবে। সর্বোপরি, উত্তর বোর্ণিওর তিনটি রাষ্ট্রে মালয়েশিয়া সম্পর্কে বিক্ষোভ আছে। ঐ রাষ্ট্র তিনটিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধির মারফৎ জনমত গ্রহণের ব্যবস্থা প্রশংসনীয় উত্তম। —"মিহির"।

দীপালী চৌধুরী

কলেজ স্ট্রীট গেছি, হ্যাঁ মধ্যবিত্তদের যেথায় স্থান, বড় দোকানে যাওয়ার সাহস নেই। তাই ছোট দোকানের ভীড়ে মিশে গেলাম।

সাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করার মত ব্লাউজের অভাব, সুতরাং ব্লাউজের বর্ণ নির্ধারণে ব্যস্ত এই সময় ভেসে এল একটি জোরাল কণ্ঠের উচ্চধ্বনি: হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিই তো সঙ্গে ছিলেন, আপনি দেখেননি? না? আপনাকে এসেই তো বাচ্চা ছেলেটা দেখাল, আপনাকে দিদি বলে ডাকল, আপনি জানেন না?·····

এর পরে নারীকণ্ঠের প্রতিবাদ, মোটেই না···আপনি ভুল বলছেন। আমি দেখিনি যে ও আপনার দোকান থেকে জামা তুলে এনেছে।

চম্‌কে পিছু ফিরে চেয়ে দেখি কিছু দূরে এই বাদ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, বুঝলাম নারীঘটিত ব্যাপার। সুতরাং যা স্বাভাবিক তাই হ'ল, আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'লাম।

একটি শ্যামবর্ণা, জীর্ণা প্রায়, বিংশবর্ষীয়া তরুণীর পরণে জীর্ণপ্রায় বস্ত্র। দু'চোখে ক্লান্তির ছাপ। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন এসে জমায়েৎ হ'ল।

মহানগরীতে তো আর লোকসংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সেই তরুণীর অবিশ্রান্ত প্রতিবাদের মাঝে দেখলাম আর একজন বিবাহিতা প্রৌঢ়া মহিলা উদীয়মান হয়েছেন: খবরদার· বললেন তিনি, চোখলাল করে কথা বলবে না। এখানে ইয়ার্কি পেয়েছ না? চোর অপবাদ দেওয়া? দোকান উঠিয়ে দেব, ইত্যাদি।

দোকানদার বেচারা আর রাগ সামলাতে পারল না একে ত পূজার সময় তার আবার "বৌনির" সময়। সবে দোকান খুলেছে, খদ্দের ফিরে যাচ্ছে, ফলে বাচ্চা ছেলেটিকে ধরে দিলেন 'এক চড়' ব্যস, তারস্বরে চিৎকার তৎসঙ্গে বাচ্চাটির কণ্ঠ, কেন? কেন, আপনি আমায় মারলেন? আমি নিইনি, জানি না বলছি না?

সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থিত কোন রক্ থেকে নেমে এলো জনৈক সমাজসেবী। মাথায় চুলের ছোটখাট এভারেষ্ট। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। নাইলনের সার্ট পরিহিত, এসে বললে, এই শালা! মা বোনের ইজ্জৎ কি করে রক্ষা করতে হয় জান না? · মা-বোনকে অপমান? শালা, মেয়েছেলের নামে চুরির অপবাদ? দাঁত ঝেড়ে দেব শালা তোমার—বলে সাঁ করে এক চড়। পেয়েছ কি? এখানে নবাবী করে দোকান করার সাধ ঘুচিয়ে দেব, মনে রেখ।

বুঝলাম মা-বোনের প্রতি দরদটা একটু বেশী। যাক, দোকানদার তো আশীছক্কার চড় খেয়ে খানিকটা হাঁ করে ভাবতে লাগল কি রে বাবা, অপরাধ কে করল, আমি? কিন্তু কিছু বলাও যায় না, বিশেষত পাড়ার উদীয়মান সমাজসেবীদের নেতা বিশেষ। রকের·উপর বিদ্যমান এই সমাজসেবীদের জন্য তাহলে আর দোকান সত্যি করতে হবে না।

যা হোক ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল সেই তারস্বরে চীৎকাররতা মহিলাদ্বয় তাদের এই বাচ্চা ভাই দুটিকে ত্যাগ করে উধাও। ·ভাইটির হাত তখনও দোকানদারের হাতের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাপারটা বুঝতে আর কারো সময় লাগল না। একদল বললেন, পুলিশে দিয়ে দিন না মশাই, ঝামেলা মিটে যাবে।

: কিন্তু বাচ্চা ছেলে যে, আসল চোর তো উধাও, তার উপর মেয়েছেলে, কি করি বলুন? দোকানদারের আর্তস্বর ভেসে এল।

হয়ত ঘৃণা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ব্লাউজটা নিয়ে ফেরার পরে সারা রাস্তা মনে হল, পদাতকাদের দেহ কলঙ্ক যেন চাবুক মারল। ভাবছি, হয়ত বা দরিদ্র অসমর্থ পিতা সন্তানদের নতুন পোষাকে সজ্জিত করতে অক্ষম, হয়ত বা পেটের তাড়না, নয়তো শারদীয়ার আমন্ত্রণে সাড়া দেবার ব্যর্থ প্রয়াস। এইজন্যই বোধ হয় এ পথ বেছে নিতে হয়েছে।

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল, ভেসে উঠল বাচ্চা দুটোর করুণ মুখ। ছিনিয়ে-নেওয়া সার্ট-প্যান্টের প্রতি তৃষিত নয়নের করুণ দৃষ্টি। বাড়ীতে ভাইদের জন্য জামা-কাপড় এসেছে, ভেসে উঠল তাদের উজ্জ্বল হাসিতে ভরা মুখ, না আর ভাবতে পারছি না। গতানুগতিক ভাবেই বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। মনে হচ্ছিল যেন ব্লাউজটা অভিশপ্ত, ফিরিয়ে দিই। কিন্তু লোভী মন ছাড়তে চাইল না।

বাড়ীতে এসে ফলাও করে কাহিনীটি বিবৃত করলাম। সবাই এক এক রকম মন্তব্য করল।

আমি কিছু বলতাম কিন্তু সাহস হ'ল না, তাদের মন্তব্যের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে সেই কথাগুলি যা কিছুক্ষণ আগে ফিরে আসার সময় মনে আলোড়ন তুলেছিল। আমি ভীরু লোভী তাই পারিনি। হয়তো কোনদিনই পারব না।
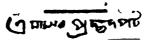
মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী—শ্রীসূর্য রায়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ (মে-জুন '৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): দিল্লীতে কাশ্মীর সম্পর্কে মন্ত্রিপর্যায়ে ভারত-পাকিস্তান আলোচনা ব্যর্থ—বৈঠকান্তে উভয় রাষ্ট্রের যুক্ত ইস্তাহার প্রচার।

স্বর্ণ আইনের প্রতিবাদ স্বরূপ বোম্বাই-এ কর্মহীন ২৪০ জন স্বর্ণশিল্পীর অনশন।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): সমগ্র উত্তর সীমান্ত বরাবর পুনরায় চীনাসৈন্য সমাবেশ—চীনা বিমান কর্তৃক ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন—পররাষ্ট্র দপ্তরের (দিল্লী) বিবৃতিতে তথ্য প্রকাশ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে): বোম্বাই-এ আরও এক শত স্বর্ণশিল্পীর অনশনে যোগদান।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): বোম্বাইস্থ বিক্ষুব্ধ স্বর্ণশিল্পীদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে ভারত-ডেনমার্ক চুক্তিপত্র বিনিময়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে): মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলির সিদ্ধান্ত—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট স্মারকলিপি পেশ।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে): আমরোহা (উত্তর প্রদেশ) লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আচার্য কৃপালনীর (নির্দলীয়) জয়লাভ—কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎসচিব মি: হাফিজ মহম্মদের (কংগ্রেস প্রার্থী) পরাজয়—ফরাক্কাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সোস্যালিষ্ট নেতা ডা: রামমনোহর লোহিয়া নির্বাচিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী ডা: বি ভি কেশকারের পরাজয়বরণ।

বর্ধমান অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা—বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।

নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) বাসভবনের সম্মুখে বেকার স্বর্ণশিল্পীদের বিক্ষোভ।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): পর্তুগীজ কবলমুক্ত গোয়ায় শ্রীনেহরুর সফর-সুরু—সর্বত্র যথাযোগ্য সম্বর্ধনা।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে): প্রবীণ শল্য চিকিৎসক ডা: পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের (৭১) লোকান্তর।

ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে জাপানের ৭.১৪ কোটি টাকা ঋণদানের চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে): দার্জিলিং-এ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): কলিকাতার খোলা বাজার হইতে চিনি উধাও—চিনির বিক্রয় দর বাঁধিয়া দেওয়ার জের।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে): কলিকাতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ৬৫তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত।

দিল্লী হইতে সরকারী ঘোষণা: ১লা জুলাই (১৯৬৩) হইতে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা চালু।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): কলিকাতা অঞ্চলে বিভিন্ন দোকান মারফত সরকার নির্দিষ্ট দরে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

রাজকোট লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র দলের সম্পাদক শ্রীমাসানীর জয়লাভ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় ত্রিপুরার প্রায় দশ সহস্র নরনারী গৃহহারা—সর্বত্র ব্যাপক ধ্বংসলীলা।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): সিকিম সীমান্তে বিপুল চীনাসৈন্য সমাবেশ—পুনরায় আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতির সংবাদ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে): দিল্লীতে কৃপালনী-লোহিয়া (নব নির্বাচিত লোকসভা সদস্যদ্বয়) বৈঠক—বিরোধী ঐক্য ফ্রন্ট গড়িয়া তোলার চেষ্টা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীবায়া কর্তৃক বিহারে এড হক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী গঠন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাত্রা।

'দৈনিক বসুমতী'র প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদকপদ একত্রিত—সম্পাদকরূপে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনার সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবন কর্তৃক সিকিমের অগ্রবর্তী ঘাঁটিসমূহ পরিদর্শন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): পাঠানকোটের নিকট আই-এ-সি'র ডাকোটা বিমান বিধ্বস্ত—ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ২১ জন আরোহীই নিহত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): বঙ্গাইগাঁও-এ (আসাম) নিখিল আসাম-বঙ্গ বঙ্গভাষাভাষী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন—সভাপতি: শ্রীরমণীকান্ত বসু।

বিহার কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড দলের মধ্যে সংযুক্তির প্রশ্নে বোঝাপড়া।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যানগত তথ্য: ভারতে বেকারের সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বেকারের সংখ্যা সর্বাধিক।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): সাম্প্রতিক কয়েকটি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন): শ্রীনেহরু কর্তৃক নবনির্মিত ব্রহ্মপুত্র সেতুর (গৌহাটির নিকট) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, আই-এস-সি পরীক্ষার (সর্বশেষ) ফলাফল প্রকাশ—আই-এ: শতকরা ৫৮ জন ও আই-এস-সি: শতকরা ৫৮.৮ জন উত্তীর্ণ।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৮ই জুন): কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুব্রাহ্মণ্যম কর্তৃক দুর্গাপুরে ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত দ্রবণ কারখানার উদ্বোধন।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও সস্তাদরে খাদ্যের দাবীতে কলিকাতায় বামপন্থীদের উদ্যোগে বিরাট মিছিল।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন): 'যে কোন মূল্যে সীমান্ত প্রতিরক্ষা করিতে হইবে'—ডিব্রুগড়ের (আসাম) জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): প্রধানমন্ত্রী (শ্রীনেহরু) কর্তৃক পৃথক পার্বত্য রাজ্য গঠনের দাবী পুনরায় নাকচ।

সীমান্ত বরাবর চীনের ২৬টি অসামরিক চৌকি স্থাপনের সংবাদ।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১১ই জুন): সুন্দরবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত সুন্দরবন প্রতিনিধিদলের আলোচনা—দলীয় নেতা: শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন): পুরুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব ও হাহাকার—বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সফর অভিজ্ঞতা।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন): সর্বোদয় নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের কলিকাতা মহানগরীতে দ্বিতীয় পর্যায়ে পদযাত্রা সুরু।

ভারতীয় জনসঙ্ঘের অস্থায়ী সভাপতি পদে আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ নির্বাচিত।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন): আসামের বহু অঞ্চলে প্রচণ্ড প্লাবন—ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতে বন্যার জের।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে. ডি মালব্য ও মিঃ হাফিজ মহম্মদের শেষ অবধি পদত্যাগ।

বহির্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): ইন্দোনেশিয়ায় আবার চীন বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামার সংবাদ।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ (ভারত) তেহরাণে ইরাণের শাহ কর্তৃক সম্বর্ধিত।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): ২২ বার পৃথিবী পরিক্রমার পর মার্কিন মহাকাশচারী কুপারের নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ।

ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ রাস্কের সহিত ভারতের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বৈঠক।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে): 'চীনারা শুধু যুদ্ধ চায়—তারা বিশ্বের প্রগতির প্রতিবন্ধক'—যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট টিটোর মন্তব্য।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): ডাঃ সোয়েকার্ণো ইন্দোনেশিয়ার আজীবন প্রেসিডেণ্ট মনোনীত।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে): ওয়াশিংটনে মার্কিন-প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত শ্রীকৃষ্ণমাচারীর (ভারতীয় মন্ত্রী) বৈঠক—আলোচ্য বিষয়: ভারতের প্রতিরক্ষা প্রশ্ন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): আদ্দিস আবাবায় প্রতীক্ষিত আফ্রিকান শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ—উদ্বোধক: ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি। একই দিনে দুই পথে দুইটি মার্কিন পর্বতারোহী দলের এভারেষ্ট বিজয়।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে) তুরস্কের তিনটি সহরে জরুরী ঘোষণা—সামরিক অফিসারদের অভ্যুত্থানের চেষ্টার জের।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): আফ্রিকান শীর্ষ-সম্মেলনে (আদ্দিস আবাবা) স্বাধীন আফ্রিকার ঐক্যবিধায়ক সনদ অনুমোদিত।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যায় চট্টগ্রাম ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে (পূর্ব পাকিস্তান) প্রায় দশ হাজার নরনারীর প্রাণহানি—লক্ষ লক্ষ অধিবাসী গৃহহারা।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): ভারতের প্রতিরক্ষা প্রশ্নে লণ্ডনে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত ভারতীয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বৈঠক।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে): ধর্মীয় সাম্যের দাবীতে সায়গনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিক্ষোভ মিছিল।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): গণতান্ত্রিক কেনিয়ার প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মিঃ কেনিয়াট্টার শপথ গ্রহণ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ (ভারত) নিউইয়র্ক উপস্থিতি ও সম্বর্ধনালাভ। পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চল সফরে পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ কেনেডি কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ সম্বর্ধিত।

ভ্যাটিকান সিটিতে ত্রয়োবিংশ পোপের (পোপ জন—বয়স ৮১) জীবনাবসান।

সিন্ধুর খয়েরপুরের (পশ্চিম পাকিস্তান) মহরম উপলক্ষে প্রচণ্ড শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ—বহু লোক হতাহত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেঃ চৌধুরীর নেপাল সফর।

ওয়াশিংটন হইতে কেনেডি-রাধাকৃষ্ণ যুক্ত ইস্তাহার প্রচার: আমেরিকা কর্তৃক ভারতের উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষায় সক্রিয় সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): তেহরাণে সামরিক আইন জারী—সংস্কার বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামার জের।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): ভারত সাহায্য সংস্থা কর্তৃক তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে ১১.৫ কোটি ডলার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি। (প্যারিসের সংবাদ)

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৮ই জুন): তেহরাণের নানা স্থানে পুনরায় বিক্ষোভ ও হাঙ্গামা—সর্বত্র সেনাবাহিনী মোতায়েন।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণের (ভারত) রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভাষণ দান। রুশ-ভারত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ব্যবস্থা—মস্কো-এ উভয় রাষ্ট্রের চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১১ই জুন): নিগ্রো ছাত্রের ভর্তিতে (আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধা না দেওয়ার জন্য আলাবামা গভর্ণরের প্রতি মার্কিন প্রেসিডেণ্টের (কেনেডি) নির্দেশ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন): রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণের (ভারত) লণ্ডন উপস্থিতি—রাজদম্পতি কর্তৃক অভ্যর্থনা।

আলাবামার গভর্ণর ওয়ালেসের দর্পচূর্ণ—আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বাধায় নিগ্রো ছাত্রের ভর্তি ব্যবস্থা।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন): রাশিয়ার পঞ্চম মহাকাশচারী কর্ণেল বিকোভস্কির মহাকাশ পরিক্রমা আরম্ভ—প্রতি ৮৮ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): সোভিয়েট মহাকাশচারী বিকোভস্কির অব্যাহত পৃথিবী পরিক্রমা।

রাষ্ট্রপতির বিদেশ সফর

জগতের সুধীসমাজের অন্যতম অত্যুজ্জ্বল রত্ন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্রপতি আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিলেন। নানা কারণে তাঁহার এই ভ্রমণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও গুরুত্বসমন্বিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই ভ্রমণকে কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যবেক্ষণ করা বিধেয় নয়। এই ভ্রমণের মধ্যে সারস্বত ভাবধারার আদান প্রদানের স্পষ্ট স্বাক্ষরও বিদ্যমান। সংস্কৃতির এক তীর্থ হইতে আর এক তীর্থে এ যেন এক মহান্ তীর্থঙ্করের পরিক্রমা। যাঁহাদের রচনায়, পাণ্ডিত্যে, ভাষণে বিদেশের নিকট স্বদেশের মহিমা প্রচারিত হইয়াছে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের আসন তাঁহাদেরই মধ্যে। আজীবন শিক্ষাব্রতী, সারস্বতীর উ সঙ্গীত উপাসক, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের ন্যায় মনীষীর এই জাতীয় বিদেশযাত্রা বিদেশবাসীর মনে ভারতচেতনার আর একটি দুয়ার অর্গলমুক্ত করারই অর্থান্তরমাত্র।

এই সাম্প্রতিক পরিক্রমায় রাজার প্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্যন্ত তিনি বিপুল সম্মান ও স্বতঃস্ফূর্ত সমাদরে বিভূষিত হইয়েন। প্রশস্ত প্রশস্ত রাজপথসমূহে অগণিত জনতা তাঁহাকে জয়োল্লাস দ্বারা স্বাগত জানাইয়াছে। প্রতিটি অলিন্দ তাঁহার দর্শনার্থীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। সাধারণ জনতা হইতে পূজ্য মনীষীর দল, একজন নাগরিক হইতে এক বৃহৎ রাষ্ট্রের রাণী তাঁহার প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। সারা পশ্চিম তাঁহার স্তুতিতে মুখরিত।

এই যে সম্মানের ঘনঘটা, শ্রদ্ধার সমারোহ, সাধুবাদের প্রাচুর্য ইহা ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে উপলক্ষ করিয়া ভারতকেই অর্পিত হইয়াছে। এ সম্মান শুধু তাঁহারই নয়, এ সম্মান সেই দেশের—যে দেশের সন্তান হিসাবে, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে, যে দেশের অন্যতম মনীষী হিসাবে তিনি পশ্চিমের দরজায় পদার্পণ করিয়াছেন। তাই এই সম্মানে সারা ভারতবাসীর অংশ। তাঁহার সম্মানে আমরা সম্মানিত, তাঁহার গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত, তাঁহার গর্বে আমরা গর্বিত।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

ভারত সর্বপ্রকার সমস্যামুক্ত দেশ নয় (পৃথিবীর কোন দেশ এইরূপ আছে কিনা আমাদের জানা নাই)। অর্থের অভাব, অন্নের অভাব আমাদের বস্তুব জীবনের এক নিদারুণ সত্য। এক বাস্তব সত্য। এক জীবন্ত সত্য। কিন্তু আমাদের এই দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের অভাব, অভিযোগ, অনটন, বেদনা, দুঃখ, আমাদের প্রতিভা, মনীষা, মেধা, সৃষ্টি—অবদানের জগতকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে নাই। সৃষ্টির অফুরন্ত আলোর সম্মুখ হতাশার এক মুঠো অন্ধকার সহস্র চেষ্টাতেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা সকল দুয়ার খুলিয়া দিয়াছি। ক্ষেত্র প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়াছি, পূবের আলো পশ্চিমে ছড়াইয়া দিয়াছি, পশ্চিমের কিরণে আবার নিজেদেরও উদ্ভাসিত করিয়াছি। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমরা জগতের চিত্ত জয় করিয়াছি, আমরা অন্যকে নিঃস্ব করিয়া জয় করি নাই, অন্যকে পূর্ণ করিয়া জয় করিয়াছি, আমরা অস্ত্র দ্বারা জগজ্জয় করি নাই, করিয়াছি প্রতিভা, মনীষা, মেধায়। ইহা ঘটনা নহে, ইহা ইতিহাস।

আমাদের সাধনার ধন কেবল আমরা একলাই ভোগ করি নাই, জগতকে তাহার ভাগ দিয়াছি, যুগে যুগে এ দেশের সন্তানগণ ভারতের পূতপবিত্র মৃত্তিকার স্পর্শ লইয়া এ দেশের মহিমা, ভাবধারা, শাশ্বত আত্মার বাণী পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কালে কালে তাঁহারা ভারতের বাণী বহন করিয়াছেন দিক হইতে দিগন্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে। এই বার্তাবহদের মধ্যে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এক উল্লেখযোগ্য অত্যুজ্জ্বল নাম।

আজ আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন, এক বিশেষ সময় বিন্দুর উপর আমরা দণ্ডায়মান, একটি যুগের পট পরিবর্তনে আমরা যুগপৎ সাক্ষী ও কারণ! সেই পরিপ্রেক্ষিতে, জগৎসভায় ভারতের প্রাণের বাণী বহন করার প্রয়োজন আবার নূতন করিয়া দেখা দিয়েছে, ভারতবর্ষের আজিকার চিন্তা, কল্পনা, ধ্যান-ধারণার ভাবধারার সহিত বিশ্ববাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটানোর বিশেষ প্রয়োজন এবং এই বিরাট প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা রাধাকৃষ্ণণের ন্যায় মনীষীদেরই আছে। তাই সেই কারণে এই ভ্রমণ যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বৈশিষ্ট্যবান।

নানা অঙ্গে—নানা বেশে

সাম্প্রতিক চীনা-আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের অনিষ্টকারী বহুজনকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারত সরকার বলা বাহুল্য যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রভৃত বুদ্ধিমত্তার সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। যাহাদের চক্রান্ত দেশের শান্তিপূর্ণ সুস্থ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে এবং সারা দেশে এক ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব ঘটায় তাহাদের কঠোর হস্তে দমন ও উপযুক্ত শাস্তিবিধান সেই সকল কুৎসিত চক্রান্তের সমুচিত উত্তর। বিদেশী শত্রুদের তুলনায় ইহারা আরও মারাত্মক। কারণ, আমার মাতৃভূমি বিদেশীর কাছে পররাজ্য কিন্তু সেই অন্যায় পররাজ্যলিপ্সায় যাহারা ইন্ধন জোগায় তাহারা যে এই দেশেরই সন্তান। এই দেশ তাহাদের অন্ন দিয়াছে, পুষ্টি দিয়াছে, ভাষা দিয়াছে, ঝড়-বন্যায়, বর্ষা শীতে, বসন্তে ধীরে ধীরে তিলে তিলে বিবর্ধিত করিয়া তুলিয়াছে সেই মাতৃভূমিকে বিক্রয় করার স্বপ্নে ইহারা সমাচ্ছন্ন। যে দেশ সহস্র সহস্র আত্মদানে, শত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অজস্র নির্যাতনে জর্জরিত হইয়া সুদীর্ঘ সাধনায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে সেই পবিত্র স্বাধীনতার তাহারা মূলোচ্ছেদে যত্নবান। অতএব, ইহাদের দমনের জন্য সরকার সারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু শয়তান কেবল এক মূর্তিতেই বিরাজিত নয়। নানা মূর্তিতে, নানা অঙ্গে, নানা ভাবে, নানা বেশে, নানা বর্ণে সমাজের সর্বস্তরে সে বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে এবং আপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া চলিতেছে।

খাদ্যে ভেজাল, ঔষধে বিষ, চায়ের মধ্যে কাঠগুঁড়া ইত্যাদি হইতে শুরু করিয়া তাহার ছলাকলা যে কত বিচিত্র, কত ব্যাপক, কত অসংখ্য তাহার তুলনা মেলা ভার।

ইহারা সমাজের পবিত্র আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। ঘরে ঘরে ইহারা হাহাকার আনিতেছে, সুন্দর জীবনে ইহারা কদর্যতার প্রলেপ দিতেছে। মানবসমাজের ইহারা মূর্তিমন্ত অভিশাপ, ইহারা ধ্বংসের দূত, কুৎসিত লোভ, স্বার্থসাধনের মূর্তিমান প্রতীক।

অবশ্য ইহাদের দমনেও ভারত সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেদিক দিয়াও তাঁহাদের চেষ্টার অবধি নাই এবং সকলেই অবগত আছেন একাধিক দুষ্কৃতকারী শাস্তি পাইয়াছে, তথাপি ইহাদের দমনে আরও অধিকতর শক্তিপ্রয়োগ ও দৃষ্টিদান বাঞ্ছনীয়, ইহাদের সমূলে বিনষ্টির প্রয়োজন এবং তাহা মর্মে মর্মে অনুভূত হইতেছে কারণ আজিকার সমাজে যত কিছু দৈন্য, দুঃখ-দুর্দশার ইহারাই একমাত্র কারণ।

দল বড় নয়—দেশ বড়

জীবনের দিক্ নির্ণয়ে ইতিহাসের পাঠ যেভাবে আমাদের সহায়তা করিয়া থাকে সেদিক দিয়া তাহার তুলনা মেলা ভার। ইতিহাস নানাভাবে বারবার যে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে তাহা—দল বড় নয়, দেশ বড়। তুচ্ছ দলাদলি কত সমৃদ্ধিশালী দেশের ধ্বংসের কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইতিহাসে তাহার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সকল কালের ইতিহাসে অনুরূপ প্রমাণ ভূরি ভূরি মিলিবে। ইতিহাস আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া আসিতেছে যে, কত সম্ভাবনা, কত প্রতিশ্রুতি, কত প্রাচুর্যের বেদনাদায়ক অবসানের কারণ দলাদলি।

সুদীর্ঘ সাধনায়, বহু আত্মোৎসর্গে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাও অখণ্ড ভারতকে আমরা স্বাধীনরূপে দেখিতে পাইলাম না। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা পাইল। ইংরেজ ভারত ত্যাগের পূর্বে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া গেল। দুই শত বৎসরের জটিলতা এক দিনে গ্রন্থিমুক্ত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয় এবং নূতন সরকারকে এই সকল সমস্যা, অভিযোগ প্রভৃতির দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে এবং ইহার দূরীকরণে প্রভূত শ্রম স্বীকার ও কর্মোদ্যমের পরিচয় দিতে হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ সমস্যার সঙ্গেই বাহিরের সমস্যা দেখা দিতে থাকে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষেত্রে অসহযোগিতার মধ্যে কার্য পরিচালনা করিতে হয়। তদুপরি চীনের অন্যায় আক্রমণ শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীকে এবং ভারতসরকারকে যে কি পরিমাণে বিব্রত করিয়া তোলে সে সম্বন্ধে বিশদ লেখা বাহুল্য মাত্র। চীনের দুরভিসন্ধিপূর্ণ অন্যায় আক্রমণের কবল হইতে সারা দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও সর্বোপরি স্বাধীনতা রক্ষার যে বিরাট দায়িত্ব আজ সরকারের হস্তে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধির বস্তু।

এই ভিতরের সহস্র সমস্যা এবং বাহিরের নিদারুণ সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত সরকারের সহিত দেশবাসীর সকল বিষয়ে সহযোগিতা করা উচিত। কারণ শান্তি নিরাপত্তা সরকারের একার নয় তাঁহাদেরও। সুদীর্ঘকাল পরে আজ ভারত স্বাধীন দেশের মর্যাদা পাইয়া রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জগৎসভার এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছে। সেই আসনের মর্যাদা পুরোপুরি যাহাতে বজায় থাকে তাহার ভার সকলেরই। এই সময় দলাদলির দ্বারা সরকারকে বিব্রত করা কোনক্রমেই দেশপ্রেমিকের কার্য নয়।

সমস্যা-সমাধানে সহযোগিতা না করিয়া উপরন্তু সমাধানব্রতী সরকারকে পদে পদে বাধা দিলে দেশের অগ্রগতি কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে বুঝিয়া ওঠা ভার।

এ-ক্ষেত্রে সমস্যা আরও গভীর, আরও ব্যাপক এবং আরও ভয়াবহ। সারা দেশের শান্তি আজ বিঘ্নিত, স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও বিপর্যস্ত। ইংল্যাণ্ড প্রমুখ অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশ যখন বিপর্যস্ত তখন দেশের সন্তান—এই এক পরিচয়ে সকলে সম্মিলিতভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে। জয়-পরাজয় ভাগ্যের কথা। তবে এই মনোভাব নিঃসন্দেহে অনুকরণযোগ্য।

ভারতের এই জাতীয় দুর্দিনে সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের রাহুর কবল হইতে তাহাকে সর্বতোভাবে মুক্ত করাই এখন ভারতবাসী মাত্রেরই 'একমাত্র পবিত্র কর্তব্য। নানা মতের ও আদর্শের দ্বারা বিভক্ত একাধিক খণ্ডিত শক্তি রাষ্ট্রের অখণ্ড ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং বহিঃশত্রুর উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়া থাকে।

সমাধানের পথ

'কয়েকদিন আগে আমরা প্লাবিত কলিকাতার শোচনীয় সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে বৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক; না হওয়াই ক্ষতিকর এবং অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বৃষ্টি হইলেই যদি কলিকাতা সহরের জীবনযাত্রা অচল হইয়া যায়, রাস্তা-ঘাটে নদীর মত ঢেউ খেলিতে থাকে এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, তবে তার চেয়ে অস্বাভাবিক ঘটনা আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরিয়া এই অস্বাভাবিক ঘটনাটাই বর্ষার সময় কলিকাতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থার কারণ কি? সুদূরপ্রসারী কারণ ছাড়াও কতকগুলি আশু কারণের কথা কর্পোরেশনের স্পেশ্যাল ডেপুটী কমিশনার সম্প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন। গত কয়েকদিন কলিকাতায় প্লাবনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য গত বৃহস্পতিবার স্পেশ্যাল ডেপুটী কমিশনার শ্রীকুট্টি বাগপাড়া ও বাগজোলা পাম্পিং ষ্টেশন এলাকায় সরজমিনে তদন্তে গিয়াছিলেন। তাঁহার পর্যালোচনা হইতে একথাই মনে হয় যে, ইচ্ছা থাকিলে বর্ষার প্লাবনের হাত হইতে কলিকাতাকে মুক্ত করা অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব নয়। অন্তত প্লাবনের প্রকোপ কমানো সম্ভব। কারণ তিনি যে সব পথে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন তার কোনটাই বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয়, কিংবা অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নামে ফেলিয়া রাখিবার মত ব্যাপারও নয়। কিন্তু শ্রীকুট্টির বক্তব্য হইতে এ-প্রশ্নও মনে জাগে, এই সামান্য ছোটখাট কাজগুলি তবে এতদিন করা হয় নাই কেন? কেন তবে কলিকাতাবাসীকে অনর্থক দুর্ভোগের মধ্যে রাখা হইয়াছে? এ কি অজ্ঞতা, না গাফিলতি, না অবহেলা? না, ইহার পিছনে আরো বড় কোন রহস্য আছে? এবং ঠিক এই কারণেই আর একটি প্রশ্নও ওঠে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? শ্রীকুট্টি তো পথ দেখাইলেন—কিন্তু এতদিন যে কারণে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা হয় নাই, এখনও সেই কারণটা বড় হইয়া উঠিবে না তো? যদি না হয়, যদি জনসাধারণের আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়, যদি গভর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতা কর্পোরেশন অনতিবিলম্বে এখনও এই সমস্যার সুরাহা করার জন্য একযোগে কাজে নামেন, তবে আমরাই সবচেয়ে সুখী হইব।'

—দৈনিক বসুমতী

শস্যোৎপাদনে বাধা

'অবৈজ্ঞানিক, অনুন্নত ও সেকেলে কৃষিপদ্ধতিই যে ভারতে শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান বাধা, সে কথা সর্বজনস্বীকৃত। কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিয়া বর্তমান কালোপযোগী করিতে হইলে এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃষির এই গবেষণার দিকটাই অত্যন্ত অবহেলিত হইতেছে। কোন কৃষিবিশেষজ্ঞের মতে গবেষণা সম্পর্কে এই অবহেলা ইতি মধ্যেই ভারতীয় কৃষির প্রচুর ক্ষতি করিয়াছে আর অবহেলা যে করা হইতেছে পরিসংখ্যানগুলির উপর চোখ বুলাইলেই তাহা মোটামুটি বুঝা যাইবে। ১৯৬২ সনে কৃষি-গবেষণার জন্য ছয় কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা খরচের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। এই বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের এই অঙ্ক যে নিতান্তই অপ্রচুর তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অপ্রচুর বরাদ্দেরও সব অর্থ গবেষণায় ব্যয়িত হইতে পারে নাই। প্রায় দুই কোটি টাকা অব্যয়িত রহিয়া গিয়াছে! সবগুলির উল্লেখ না করিয়া দুইটি মাত্র ক্ষেত্রে অব্যয়ের পরিমাণের উল্লেখ করিতেছি। অবহেলা যে কিরূপ হইতেছে, উহা হইতেই তাহা স্পষ্ট হইবে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের জন্য বরাদ্দ করা ছিল এক কোটি তিন লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে প্রায় চৌষট্টি লক্ষ টাকা ব্যয় না হওয়াতে ফেরৎ গিয়েছে। ধানচাষ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য যে সোয়া এগার লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, তাহারও প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হয় নাই। অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় ভারতে উৎপাদনের হার নিতান্তই কম, আর তাহার অন্যতম প্রধান কারণ কৃষি সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণার ও কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগের অভাব। সরকারের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে যদি সফল করিয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে গবেষণাব্যবস্থাকে উন্নততর করিতে হইবে। আমরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—উভয় সরকারেরই দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

নীতিহীন চীনা জবরদস্তি

'মাত্র কয়েক দিন আগেই সম্পাদকীয় রচনায় আমরা লদাক এলাকায় সশস্ত্র চীনা বাহিনীর খোঁচাখুঁচির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, তাহারা আবার নূতন করিয়া বিবাদ পাকানোর ফিকির খুঁজিতেছে। দেখা যাইতেছে, জিনিসটা আর অনুমানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নাই। হাতে হাতে প্রমাণ মিলিয়াছে। সত্য সত্যই তাহারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ভারতীয় এলাকা বলিয়া বিবেচিত এলাকার

উপর গায়ের জোরে সাময়িক চৌকি স্থাপন করিয়াছে। কারাকোরাম গিরিবর্ত্মে আনাগোনার জন্য ব্যবহৃত পথের উপর অবস্থিত দেপশাংলার প্রায় বারো শত গজ দূরে স্থাপিত এই চৌকির জন্য চীনারা নিজেরাও ইতিপূর্বে দাবী করে নাই। তাহাদের মানচিত্রেও ইহা ভারতীয় এলাকা হিসাবেই চিহ্নিত হইয়াছে। সহসা ইহার উপর জবর দখল একথাই প্রমাণ করে যে, এই এলাকাটিকে সৈন্যবিমুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণার দ্বারা চীনারা ভারতবর্ষকে ধোঁকা দিয়াছিল এবং তাহাদের অসতর্কতার সুযোগেই আজ ইহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। সাপের অহিংসায় বিশ্বাস যেমন বিপজ্জনক, চীনাদের অস্ত্রবিরতি ও ভালোমানুষীতে প্রত্যয় তেমনি ক্ষতিকর। ভারতবর্ষ অবশ্যই এই শ্রেণীর বেয়াদপি বেশী দিন বরদাস্ত করিবে না।'

—যুগান্তর।

বিমানবাহিনী সতর্ক হোন

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনের শ্রীনগরগামী বিমান ধ্বংস হওয়ার ফলে যাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছেন, পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলাফলে তাঁহাদের শোকার্ত পরিজনবর্গ সান্ত্বনা পাইবেন না। এই জাতীয় দুর্ঘটনার পর কখনও কখনও যান্ত্রিক বিচ্যুতির কথা শুনা যায়। দৈববাদীরা সব কিছুর মধ্যে যথারীতি নিয়তির খেলাও প্রত্যক্ষ করেন কিন্তু শ্রীনগরের পথে যেসব যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই বিদেশী। উহার ফলে বহির্বিশ্বে ভারতীয় বিমান পরিবহনের বদনাম রটিতে পারে।' —লোকসেবক।

পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতন

'সরকারী সূত্রে প্রকাশ গত দুই মাসের মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত হাজার হিন্দু বাস্তুত্যাগ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা পৈতৃক বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের পক্ষে ইহা অবশ্য নূতন কোন ঘটনা নয়। ভারত বিভাগের দিন হইতে এই নিষ্কাশনের পালা সেই যে শুরু হইয়াছে আজও তাহার বিরাম নাই এবং যতদিন একজন হিন্দুও মোল্লা শাসিত মুস্লিম রাষ্ট্রে অবস্থান করিবে ততদিন এই বিতাড়নপর্ব বিরতি মানিবে না। অথচ বেআইনীভাবে আসামে অনুপ্রবিষ্ট পাকিস্তানী মুসলমানদিগকে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত পাঠাইয়া দিলে এই পাকিস্তান সরকারেরই গোঁসার অন্ত থাকে না। তাঁহারা যে কেবলমাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন তাহা নয় এমন কি সেই নালিশ বহিয়া লইয়া গিয়া রাষ্ট্রসংঘের দরবারে দায়ের করিতে উদ্যত হন। পাকিস্তান ব্যতীত এমন বিচিত্র ব্যাপার বিশ্বের অন্য কোন রাষ্ট্রে ঘটে বলিয়া আমাদের জানা নাই এবং আমরা ভাগ্যবান যে এমন একটি রাষ্ট্রক নিকটতম প্রতিবেশীরূপে আমরা পাইয়াছি।' —জনসেবক

পরীক্ষাকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার কারণ

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং-এর পরীক্ষাকেন্দ্রে আবার সেদিন হাঙ্গামা হইয়াছে। সমস্ত হলটি লণ্ডভণ্ড হইয়াছে। সিণ্ডিকেটের জরুরী সভা আহূত হইয়াছে এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েনের প্রস্তাব হইয়াছে। সেদিন একটি সরকারী কলেজে পরীক্ষার সময় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করিতে দেখিয়াছি। ইহা সমস্যার সমাধান নহে। অধ্যাপনা, পরীক্ষার প্রশ্ন রচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রসমাজের যে অসন্তোষ প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া চলিয়াছে তাহা একদিন বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে বাধ্য। তাহাই ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার কঠোরতা নহে, সহৃদয়তা। শিক্ষা সংহার স্কীমে ছাত্রসমাজের যে পরম অনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছে তাহার প্রতিকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা অগ্রসর হইলে ভাল করিবেন। এই অসহ্য অবস্থা আর বেশীদিন চলিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই রবীন্দ্রনাথের কথা—শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।' —যুগবাণী

চীনের চাতুরি

'চীন ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভারতের উপর আর একবার কূটনৈতিক টেক্কা দেবার চেষ্টা করেছে। ভারত সীমান্তে যে সময় চীন পুনরাক্রমণের জন্য উদ্যোগী হয়েছে, ঠিক সে সময়ে চীনের এই ঘোষণা স্বভাবতই দেশের ও বিদেশের জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। কারণ চীন এই সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে যে, ভারতের বিরুদ্ধে কোন অসদুদ্দেশ্য চীনের নেই। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেবার মধ্যে কোন দেশের মহানুভবতা নেই; মুক্তি দেওয়াই নিয়ম। সুতরাং চীন সেই নিয়ম পালন করছে মাত্র। একসময় পৃথিবীতে ছিল যখন যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা হতো। কিন্তু কালক্রমে এই নিয়মের অবসান হয়েছে। এখন যুদ্ধবন্দীরা রুগ্ন ও পীড়িত সৈনিকদের মতোই ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করে। কোন কোন দেশ ভাল ব্যবহার করে এবং কোন কোন দেশ করে না, কিন্তু আজ আর প্রাণে মারার নিয়ম নেই। সুতরাং যাদের দিয়ে শত্রুপক্ষের আপাতদৃষ্টিতে কোন স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই, তাদের আটক রেখে ব্যয় বাড়িয়ে কি লাভ?—জনমত।'

বিমান ভাড়া বৃদ্ধি

'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স কর্পোরেশন কলিকাতা-আগরতলা শিলচর-ইম্ফল লাইনে বিমান ভাড়া পুনরায় বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে বিমান ভ্রমণ মধ্যবিত্ত সমাজের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; গরীব জনসাধারণের তো প্রশ্নই উঠে না। ভারতের অবহেলিত এই পূর্বাঞ্চল এমনিভাবেই নানাবিধ দুর্বিপাকে বিপর্যস্ত: ঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তদুপরি যোগাযোগ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সর্বসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কাছাড় হইতে কলিকাতা ট্রেনে যাইতে তিন হইতে চারি দিন সময় লাগে। ত্রিপুরা হইতে যাওয়ার কোন সুলভ ব্যবস্থা তো নাই-ই। কলিকাতার সহিত কেবলমাত্র বিমানের মাধ্যমেই ত্রিপুরার যোগসূত্র রক্ষিত হয়। মণিপুরের ক্ষেত্রে তো শোচনীয়তর অবস্থা। এই সব কারণে বিমানের ভাড়া কমাইবার জন্য এতদিন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহ হইতে ন্যায়সঙ্গত দাবী জানান হইতেছিল। কিন্তু ভাড়া হ্রাস করার পরিবর্তে অকস্মাৎ এই ভাড়া বৃদ্ধির ফলে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা যে কতখানি বিব্রত বোধ করিতেছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।' —যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

প্রয়োজনীয় রোডব্রীজ

'সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এই সহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তিস্তার উপর প্রস্তাবিত রেল-কাম রোডব্রীজ কারিগরী অসুবিধার জন্য বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কেবল রেলব্রীজ নির্মাণ করিবেন। অবশ্য শ্রীদাশগুপ্ত উক্ত সম্মেলনেই রোডব্রীজের জরুরী প্রয়োজনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই জন্য প্রায় ১ কোটী টাকা দরকার হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই অর্থ চাওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে রোডব্রীজ নির্মাণের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টাও তিনি আশ্বাস দিয়াছেন রোডব্রীজ নির্মাণ যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তিস্তার পারাপার সম্পর্কে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন কত সময় এই পারাপারে নষ্ট হয় এবং কত কষ্টসাধ্য সেই প্রয়াস। কিন্তু কেবল পারাপার বা যোগাযোগই নয়। অন্য প্রয়োজনও রহিয়াছে। প্রথমতঃ আসাম, ডুয়ার্স, কোচবিহারের যোগাযোগ যেমন এই ব্রীজ নির্মাণ হইলে সহজ হইবে তেমনই দেশের অন্য অংশের সহিত দ্রুত যোগাযোগ করা যাইবে। ফলে এই উত্তরাঞ্চলের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কিছুৎ পরিমাণে কমিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। দ্বিতীয়তঃ তিস্তা পার সহজ হইলে ডুয়ার্সের অন্য দিকে ভূটান-আসামের সীমান্তে প্রতিরক্ষার কাজ সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। উপরন্তু সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য সহজভাবে সৈন্য চলাচল ও রসদ সরবরাহের দরকার। এই ব্রীজ অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজন সাধন করিতে পারিবে। সুতরাং জরুরী অবস্থা হিসাবে এই ব্রীজ নির্মাণ কার্যকে গ্রহণ করিতে হইবে।' —জনমত (জলপাইগুড়ী)।

প্রকৃতির রুদ্ররোষ

'সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রান্তে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত করেছে। আনুমানিক হিসাবে জানা যায় যে, অন্তত পনেরো হাজার অসহায় মানুষের মৃত্যু হয়েছে। লক্ষাধিক লোক এবং অপরিমেয় পরিমাণ সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ দেশ বিভাগ সত্ত্বেও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে আত্মীয় জ্ঞান করেছে এবং এখনও করে থাকে। তাই পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের দুর্বিপাকে আমাদের অন্তর ব্যথিত হয়। আমরা উদ্বেগ অনুভব করি। কিন্তু পাক সরকারের একদেশদর্শী সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন শাসকদের মতিগতি, ভারতবিদ্বেষ এবং অপপ্রচার ক্রমশই আত্মীয়তার বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এসব সত্ত্বেও আমরা দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং আত্মীয়বিয়োগে কাতর অধিবাসীদের সান্ত্বনা জানাই। বিজ্ঞানীরা আণবিক অস্ত্র নির্মাণ করেছেন। রাষ্ট্রনেতাগণ তা প্রয়োগ করে পৃথিবী ধ্বংস করতে পারেন। মহাকাশ বিজয়ের জন্যও বিজ্ঞানীরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতির রোষ প্রতিহত করার শক্তি কি মানুষ অর্জন করতে পেরেছে? সর্বশক্তিমানকে অতিক্রম করার যে দুর্বার আগ্রহ আজ আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে তার শতাংশও কি আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তায় ব্যয় করি? সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কাজেই বিশ্বের এক প্রান্তে যখন মানুষ বিপর্যস্ত হয়, তখন অন্য প্রান্তে তার দোলা লাগে।' —বিচার (হাওড়া)।

পাকিস্তানের অভিসন্ধি

'মূলত পাকিস্তানের লক্ষ্য হইল যেন তেন প্রকারেণ কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করা। বলের প্রয়োগ সে সুরুতেই করিতে গিয়াছিল। ভারতীয় জওয়ানদের মারের দাপট চোখে সর্ষেফুল দেখিয়া এখন ছলের এবং কৌশলের আশ্রয় লইয়াছে। গণভোটের দাবীও আসলে ছল। যদি কেহ বলে গোটা কাশ্মীর তোমার হাতে তুলিয়া দিতেছি—গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া সে তাহা হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না। মধ্যস্থতায় গররাজি ও মধ্যস্থতা মানিবারই একটা ছল। আসলে ভারতকে ছলে কৌশলে প্রতারিত করিয়া মধ্যস্থতার একবার প্রস্তাবের ফাঁদে আটকাইয়া দেওয়া। নেফা ও লাদাকে ভারতের সাময়িক বিপর্যয়ে পাকিস্তানের বলপ্রয়োগের আর একবার সুপ্ত ইচ্ছা জাগিয়াছিল। তাই পশ্চিমী গোষ্ঠির সাহায্যে তাহার এত গোসা। যেমন তেমন করিয়া পশ্চিমী সাহায্য যদি বন্ধ করা যায়—তাহারই জন্য পাকিস্তানের তোড়জোড়ের অন্ত নাই। ইচ্ছা আর একবার কাশ্মীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া। পাকিস্তানের গগনচুম্বী আশা দেখিয়া তাজ্জব বনিতে হইতেছে। পাকিস্তানের জানা উচিত বিশ্বাসঘাতক চীনের অতর্কিত আক্রমণে ভারত বিড়ম্বিত হইলেও বিপর্যস্ত হয় নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গের আনুকূল্যে পাকিস্তান এমন দুর্বার হয় নাই যে, সে ভারতের আর এক ইঞ্চিও অঙ্গ অধিকার করিতে পারে। কিন্তু আশা বড় ছলনাময়ী। তাহার দুষ্কর্মের নূতন দোসর জুটিয়াছে কম্যুনিষ্ট চীন। ভারতের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধিতে তাই আমুবশাহী পাকিস্তান আর মাওশাহী কম্যুনিষ্ট চীন অনাগত প্রমাদ গণিতেছে।'—বীরভূমের ডাক (বীরভূম)

শোচনীয় পরাজয়

'জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর সহিত প্রজা-সোস্যালিষ্ট প্রার্থীর সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই নির্বাচনী দ্বন্দ্বে দলীয় প্রতীকবিহীন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া জেলায় একটি আসন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। জনমত প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির অনুকূলে আনিবার জন্য সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু আমরা জানিতাম জামালপুরের অধিবাসীরা পি-এস-পি'র ভ্রান্ত অপপ্রচারে কোনোদিনই বিভ্রান্ত হইবেন না। জানিতাম বলিয়াই আমরা বলিয়াছিলাম কংগ্রেস দখলীকৃত আসন পুনরায় কংগ্রেসই পাইবে। জামালপুর থানার জনমনের খবর রাখিতাম বলিয়াই দ্বিধাহীন চিত্তে এই কথাই বলিয়াছিলাম। তবে পি-এস-পি যে ইহা অবগত ছিলেন না তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন 'প্রেষ্টিজ' বলিয়া একটা জিনিষ নাকি তাঁহাদের আছে। এবং সেটা নাকি জামালপুর থানায় সর্বাধিক। তাই জেলা পি-এস পি সভাপতি জেলার একটিমাত্র উপনির্বাচনে প্রেষ্টিজের মূল্য যাচাই করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জামালপুর থানার অধিবাসিগণ এই উপনির্বাচনে তাহার সমুচিত জবাব দিয়াছেন। কেবল জবাব নহে নির্বাচনের দিন যুবকবৃন্দ স্বতঃ-

প্রবৃত্ত হইয়া নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত ভোট গ্রহণ কার্য সমাধা করেন। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে জামালপুর থানার জনসাধারণের মনে কংগ্রেস কোথায় প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই সঙ্গে পি-এস-পি'র স্থান কোথায় তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। এই উপনির্বাচনের প্রাক্কালে পি-এস-পি যে ভাবে প্রচার চালাইয়াছিলেন তাহাতে মনে হইয়াছিলো ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অধিকৃত আসনটি বুঝি এবার হাতছাড়া হইয়া যায়। বিভ্রান্তিকর ধুয়া তুলিয়া, কংগ্রেস শাসনের ভয়াবহতা পত্রিকা মারফত প্রচার করিয়া এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস হইয়াছিলো যে, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস বোধহয় জয়ী হইবে না। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি এই অঞ্চল পরিভ্রমণ অন্তে যে বিবরণ দেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, শত অপপ্রচার সত্ত্বেও কংগ্রেসী প্রার্থী বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিবে। আর ভোট গণনার ফলাফল তাহারই সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।'

বর্ধমান বাণী (বর্ধমান).

পীচের পথ—মাটির প্রলেপ

'প্রগতিশীল পরিকল্পনার যুগে পীচ রাস্তা যে মাটির প্রলেপ দিয়া সংরক্ষণ করা হয় তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যাইত না। আমরা ঘাটাল-পাঁশকুড়া পীচ রাস্তার কথা বলিতেছি। বহু সাধ্য সাধনার পর যদিও রাস্তাটি হইয়াছে কিন্তু কর্মকর্তাগণের কর্মচাতুর্যের ফলে তাহা কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে পীচ ও খোয়া মধ্যে মধ্যে উঠিয়া গিয়া বিরাট বিরাট গর্ত সৃষ্টি করিয়া পথচারীদের উপহাস করিতেছে। রুট-বাস গুলিতে চড়িয়া ঐ পথে যাইতে যাইতে মনে হয় এক এক সময় পৈতৃক প্রাণ বা এইখানেই রাখিয়া যাইতে হয়। রোগী কিংবা শিশুদের লইয়া যে কোনও যানে এই পথে চলা যে কিরূপ বিপজ্জনক ও আশংকামূলক তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অনুধাবন করিতে পারিবেন। এহেন পথটিতে বর্তমানে মাটির প্রলেপ দিয়া মাঝে মাঝে মেরামত করা হইতেছে। খুকুড়দহ হইতে পাঁশকুড়া পর্যন্ত এই পথটির অবস্থা ততটা আশংকাজনক না হইলেও খুকুড়দহ হইতে ঘাটাল পর্যন্ত এই পথটির অবস্থা সত্যই কদর্য ও পীচ রাস্তা নামের অনুপযোগী—এত অল্প সময়ের মধ্যে পীচ রাস্তার পীচ ও খোয়া উঠিয়া যাওয়া সত্যই পরম বিস্ময়কর ও সেই সংগে সন্দেহজনক। সতর্ক দৃষ্টি দিয়া যদি এই পথের পীচ ও খোয়া ঢালাই কার্য তদারক করা হইত তবে এত শীঘ্র নিশ্চয়ই এই পথের এই অবস্থা হইত না ইহা অনেকের ধারণা, সে যাই হোক এখন এই পথের কদর্যতা ও ভয়াবহতা দূরীকরণে সরকারী ঠিকাদার মাটির প্রলেপ দিতেছেন। ইহা খুবই আপত্তিজনক। মাটির প্রলেপ দিয়া কখনই পীচ রাস্তা সংরক্ষণ করা যায় না। বিশেষ করিয়া ঘাটাল পাঁশকুড়া পথটি বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। ঘাটাল মহকুমার জনসাধারণের বাইরের সংগে যোগাযোগের সমস্ত পথগুলির মধ্যে—এই পথটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। সরকারের পরিকল্পনায় বিশেষ করিয়া চীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্য নূতন করিয়া সংযোগ রক্ষার পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথের সংস্কার করা হইতেছে। এখন পর্যন্ত সরকারী অর্থের এত অনটন ঘটে নাই যাহার জন্য এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ পথের সংস্কারকার্যে পীচ ও খোয়ার পরিবর্তে মাটি ব্যবহার করিতে হইবে। মাটির পথকে যেখানে পাকা করা হইতেছে সেখানে পাকা পথের সংস্কারে মাটি ব্যবহার করার কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। ক'দিন বাদে এই সমস্ত মাটি বর্ষার জলে ধুইয়া গিয়া পুনরায় পূর্বের ন্যায় গর্ত বাহির হইবে ও পথচারীদের অসুবিধা সৃষ্টি করিবে। এই অস্থায়ী সংস্কারের জন্য যে ব্যয় তাহা অপচয় বলিয়াই আমাদের ধারণা।'

—জনমত (ঘাটাল)।

শোক-সংবাদ

ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

'ভারতবিখ্যাত শল্যবিদ্যাবিশারদ ডাঃ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ ৭১ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯২০ সালে ইনি কারমাইকেল (বর্তমান আর, জি, কর) মেডিক্যাল কলেজ তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যোগ দেন। সেই বছরই তিনি বিদেশযাত্রা করেন ও এডিনবরার রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন্সের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। ১৯২৮ সালে ইনি মেডিকাল কলেজের অনারারী সার্জন নিযুক্ত হন ও সার্জারীর অধ্যাপক হিসাবে ১৯৫২ সালে অবসরগ্রহণ করেন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ইনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল মেডিক্যাল কনফারেন্স ও এ্যাসোসিয়েশান অফ সার্জেন্স অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতির আসনও অলংকৃত করেছিলেন। কীর্তনের প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগের কথাও বহুজনের বিদিত। তাঁর প্রয়াণে শল্যশাস্ত্রবিদ সমাজ থেকে একটি বিরাট আসন শূন্য হ'ল।'

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতী, রাজনীতিজ্ঞ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে ইনি সসম্মানে প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যানথ্রোপলজি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। দেশবন্ধুর আহ্বানে ইনি পৌরসভার প্রথম শিক্ষাসচিবের কর্মভার গ্রহণ করেন, পরে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ও বিভাগীয় প্রধানের আসন অলংকৃত করেন। ১৯৬০ সালে ইনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে ইনি নদীয় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ থেকে ৬০ পর্যন্ত ইনি বিধান পরিষদের সদস্য আসনে সমাসীন ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ইনি কয়েকবার কারাবরণ করেন। তাঁর প্রপিতামহী, জননী ও সহধর্মিণী যথাক্রমে রাজর্ষি রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী।'

সম্পাদক—**শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক**

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পত্রিকা-সমালোচনা

গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'প্রাচীন ভারতে লেখার উপাদান' সম্পর্কে গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠিটির জন্যে লেখককে ধন্যবাদ, কারণ ১৯৩৪ সালের Journal of the Andhra Historical Research Society-র প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত রামা রাও-র Libraries in Ancient Mediaeval India শীর্ষক প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে আমার পড়া ছিল না। পত্র লেখকের কাছে যখন জানলাম, রামা রাও-র প্রবন্ধটি নাকি আমার প্রবন্ধের উৎস, তখন কৌতূহলী বাধ্যতায় ওটি পড়লাম এবং পড়ে দেখলাম, জর্জ বুহ্লার নামে জনৈক জার্মান ভদ্রলোক, আমাদের চোখে যিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিতনামা ভারততত্ত্ববিৎ, ১৮৯৬ সালে Indische Palaeographie বলে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং যার ইংরেজি অনুবাদ ১৯০৪ সালে Indian Antiquary পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, রামা রাও-র প্রবন্ধটি তারই অংশবিশেষের সংক্ষিপ্তসার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুহ্লারের সেই মহামূল্য রচনাটি সম্প্রতি গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের লিপিশাস্ত্র, এমন কি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানেরও অধিকারী মাত্রেই ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে বুহ্লারের অসামান্য কর্মকৃতির, বিশেষত Indian Palaeography-র কথা জানেন। বুহ্লারের প্রবন্ধের বক্ষ্যমাণ অংশ Writing Materials, Libraries and Writers (Sec VIII, pp 112-118—পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের পত্র সংখ্যা) এবং রামা রাও-র প্রবন্ধের Writing Materials সংক্রান্ত অংশটি পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লেই আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, Indian Palaeography পণ্ডিতমহল এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেন এবং প্রয়োজনমতো তা থেকে প্রেরণা ও সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। এবং বলা বাহুল্য, অন্যান্য অনেকের মতো আমিও বুহ্লারের রচনা থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি, আমার প্রবন্ধে তার প্রমাণও আছে। দ্বিতীয়ত, আমার প্রবন্ধে এমন কিছু কিছু তথ্য আছে, যেমন প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত কালি সংক্রান্ত, যা রামা রাও-র প্রবন্ধে নেই। পত্র লেখকের সন্ধিৎসু দৃষ্টি সেগুলি পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, এটা নেহাতই আমার দুর্ভাগ্য! তৃতীয়ত, এ কথা বিশদ করে বলার প্রয়োজন নেই আশা করি যে, প্রবন্ধকারের বিশেষত ঐতিহাসিক নিবন্ধরচয়িতাদের একটি প্রাথমিক কর্তব্য 'ফ্যাক্ট' বা তথ্য সংগ্রহ। '১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল' '১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন' এগুলি হল 'ফ্যাক্ট' এবং এ 'ফ্যাক্ট' গুলির উপর সকলেরই সমান অধিকার। আমার প্রবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন, আমার প্রবন্ধটি যাকে বলে 'ফ্যাকচুয়াল' রচনা এবং ওটি গবেষণামূলক নিবন্ধও নয় (তা হলে ইংরেজিতেই লিখতাম) ওটি বিভিন্ন সুপরিজ্ঞাত ও অল্পজ্ঞাত তথ্যের সমাহারমূলক সাধারণ পাঠকদের জন্যই রচিত। ঐ সব তথ্যের অধিকাংশই ইতিপূর্বে বহু লেখক, যেমন পত্রলেখকের রামা রাও নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং ঋণ স্বীকারের প্রশ্নই যদি ওঠে, তাহলে রামা রাও এবং অন্য সকলে যাঁর কাছে ঋণী, সেই মনীষীপ্রবর বুহ্লারের কাছেই ঋণ স্বীকার করব এবং আমি তা ইতিপূর্বেই করেছি। পরিশেষে, আমার বিনীত জিজ্ঞাস্য: আমি যদি কোনদিন আমার কোন প্রবন্ধে 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে' এই তথ্যের উল্লেখ করি, তা হলে কি আমাকে স্কুলপাঠ্য 'প্রকৃতি পরিচয়' 'সহজ বিজ্ঞান' জাতীয় বইয়ের কাছে ঋণস্বীকার করতে হবে? বিষয়বিশেষে অধিকারীরা কি বলেন?—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা—১২

সবিনয় নিবেদন আমি আপনার 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহক না হলেও একজন সাধারণ পাঠক। মাসিক বসুমতী আমার পড়তে খুব ভাল লাগে তার কারণ ছেলে বুড়ো সবারই উপযুক্ত খোরাক এতে আছে এবং সব কিছুরই আলোচনা এতে আছে। আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে—'কথামৃত'। কারণ কত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় লেখা অথচ প্রত্যেকটি কথা কত গুরুত্বপূর্ণ ও দামী। 'কথামৃত' ও 'তালপাতার পুঁথি' পড়বার জন্য প্রতিমাসেই মাসিক বসুমতীর জন্য অতীব আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি এবং মাসিক বসুমতী পেলেই প্রথমে 'কথামৃত' ও 'তালপাতার পুঁথি' পড়ে নিই। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' আমার ভাল লেগেছে এবং এর জন্য লেখককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। বিজ্ঞান বিভাগে আধুনিক নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভাল হয়। 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' ও 'দেশে বিদেশে' পড়তে আমার ভাল লাগে। কারণ প্রথমটিতে সমগ্র বিশ্বের বর্তমান অবস্থা কেমন তা জানা যায় এবং দ্বিতীয়টিতে দেশ বিদেশের খবর সহজেই জানা যায়। তাছাড়া দ্বিতীয়টি সাধারণ জ্ঞানেরও কাজ করে। বাজারে অনেকগুলি মাসিক পত্রিকা বের হয়েছে; কিন্তু সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে 'মাসিক বসুমতী' তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ মাসিক পত্রিকা। শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে আপনার পত্রিকায় আলোচনা করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ, উচ্চশিক্ষারত ছাত্রছাত্রীদের এতে অনেক উপকার হবে। অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব,

ভারতীয় দর্শন; পাঠক পাঠিকাদের প্রশ্নের উত্তর—এই সমস্ত বিভাগগুলির প্রতিষ্ঠা করলে আমার মতে আপনার পত্রিকাখানি পাঠক-পাঠিকাদের মনে নূতন আশা, আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে এবং তাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মফঃস্বলের সব জায়গায় যাতে 'মাসিক বসুমতী' পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবার জন্ত আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশেষে ভগবানের কাছে 'মাসিক বসুমতী'র বহুলপ্রচার প্রার্থনা করি; সেই সঙ্গে আরও একটি প্রার্থনা জানাই যে 'মাসিক বসুমতী'র চলার পথ শুভ হোক। নমস্কারান্তে—বিনীত, শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার, ওয়েষ্ট জামুড়িয়া কোলিয়ারী, পোঃ—জামুড়িয়া, বর্ধমান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীজ্ঞানমোহন সরকার, গ্রাম—বরহুবা, ডাক—ভুরাগাওন নওগাঁ, আসাম * * * শ্রীমতী মাধুরী সেন, ৪৪এফ কালীঘাট রোড, কলকাতা-১১ * * * শ্রী এইচ, পি, রায়, বি-১-৫৮৩ গানফ উণ্ডি, হায়দরাবাদ, এ, পি * * * তত্ত্বাবধায়ক, এন্টালি হিন্দু বালিকা বিদ্যামন্দির, ৮ মিডল রোড, কলকাতা-১৪ * * * শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার, গ্রাম ও ডাক—শঙ্করী, জেলা—বর্ধমান * * * রাঙ্গা পুস্তকালয়, ডাক—মাশালিয়া, জেলা সাঁওতাল পরগণা * * * শ্রীমতী মাধবী বটব্যাল, ১১২ এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ-২ * * * শ্রীসোমনাথ ভাদুড়ী, ৮৩-বি বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬ * * * শ্রীমতী ছায়ারাণী নাহা, অবধায়ক—শ্রী জে, বি, নাহা, কায়ার ব্রিগড হেড কোয়ার্টার্স, কোয়ার্টার নং ১২, ১৩-ডি ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৬ * * * শ্রীনির্মলকুমার ভট্ট, অবধায়ক—মেসার্স ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড পণ্ডিয়া, ভাণ্ডারা, মহারাষ্ট্র * * * ডক্টর পি চৌধুরী, খৃষ্টীয় সেবা নিকেতন, ডাক—সারেংগা, বাঁকুড়া। * * * শ্রীদেবব্রত আইচ ভৌমিক, অবধায়ক, লাইফ ইন্‌সঃ করপোঃ, অব ইণ্ডিয়া, ইউনিট হিন্দুস্থান, আসানসোল * * * শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহীতোষ বিশ্বাস ষ্ট্রীট, ডাক—কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া * * * সচিব, কাশীপুর বান্ধব সমিতি পাঠাগার, ডাক—মাহেশগঞ্জ, জেলা—বর্ধমান (পঃ বঙ্গ) * * * শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বসু, গ্রাম—সেবাদাই, ডাক—দত্তপুকুর, জেলা—২৪ পরগণা * * * শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার, ১।সি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২ * * * শ্রীসতীশচন্দ্র গিরি, সচিব, ঠাকুর নগর শ্রীগৌরাঙ্গ পাঠ সংসদ, ডাক—ঠাকুর নগর (হেঁড়িয়া হয়ে) জেলা—মেদিনীপুর * * * গ্রন্থাগারিক, ইণ্ডিয়ান অফিস, লাইব্রেরী কমনওয়েলথ রিলেশন্‌ অফিস, কিং চার্লস ষ্ট্রীট, লণ্ডন, এস ডব্লিউ—১ * * * শ্রীক, এন চৌধুরী, এ, ডি, জি (ও, পি) পি এ্যাণ্ড টি ডাইরেক্টরেট, নতুন দিল্লী—১ * * * মসাম্মত নাসিরা বেগম, অবধায়ক—মহঃ সোলেমন সেখ, গ্রাম—মুরাগাছা, ডাক—মাহেরজপুর (কালনা হয়ে) জেলা—বর্ধমান * * * সচিব, নস্করপুর বীণাপাণি পাঠাগার, গ্রাম ও ডাক—নস্করপুর, জেলা—হাওড়া * * * শ্রীমতী এইচ, এম, মুর্মু হেডমিসট্রেস অবধায়ক—ডি, নাথ টুডু (সচিব) ১৩৬৬, রাঙাপাড়া এল পি স্কুল, ডাক—হারাপুতা, জেলা—গোয়ালপাড়া, আসাম।

Sending herewith Rs. 15·00 as my subscription for the year 1370 B. S. Please send my copies regularly as usual. Mrs. Biva Mookherjee, Delhi.

আগামী বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মৈত্রেয়ী সিংহ, বিহার।

Herewith Rs. 7·50 for renewal subscription of Monthly Basumati for 6 months from Baisakh to Aswin, 1370 B. S. Mrs. Bela Sengupta, Jalpaiguri.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম মাসিক বসুমতীর সভ্যা করিয়া লইবেন সুজাতা মুখার্জী, পাতাশিয়া (মঃ প্রদেশ)।

I am herewith remitting Rs. 15·00 as yearly subscription of Monthly Basumati. Sova Dutta. Dhanbad.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। নিরুপমা ত্রিপাঠী, উড়িষ্যা।

বৈশাখ মাস হইতে বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। গ্রাহিকা করিয়া বাধিত করিবেন। মীনাক্ষী মুখার্জী, ভূপাল।

I am sending herewith Rs. 15·00 being my subscription for the year 1370 B. S. Rekha Banerji, Calcutta—20.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। প্রতিমা দেবী, কলিকাতা—১১।

Herewith sending Rs. 15·00 as subscription of Monthly Basumati from Baisakh to Chaitra, 1370 B. S. Ramkrishna Mission Library, Murshidabad.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ৭·৫০ টাকা পাঠাইলাম। জ্যোৎস্না গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর।

I am sending herewith Rs. 7·50 being subscription for Masik Basumati from Baisakh to Aswin 1370 B. S. Krishna Choudhuri, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর ১৩৭০ সালের জন্ত এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। সুষমা চৌধুরী, তেজপুর।

Sending herewith Rs. 15·00 as subscription for one year of Masik Basumati. Mrs. Dipa Maitra, Patna.

I am remitting herewith Rs. 15·00 as subscription for the continuance of my membership for Monthly Basumati. Himani Banerji. Jhansi.

Please accept my annual subscription Rs. 15·00 for the year 1370 B. S. of Monthly Basumati. Secretary, Milani Samity, Jalpaiguri.

(অপ্রকাশিত, জলরং)

প্যারীর রাস্তায়

—স্বর্গত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত

৪২শ বর্ষ ১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৭০ ৩য় সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত প্রায় বোধ হইতেছে, মহাদুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত সব যেন জাগ্রত হইতেছে। ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, কিংবদন্তী পর্যন্ত যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকার ভেদে অসমর্থ, তথা হইতে এক অপূর্ব বাণী যেন শ্রুতিগোচর হইতেছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অনন্ত হিমালয়-স্বরূপ আমাদের মাতৃভূমি ভারতের প্রতি শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন ঐ বাণী মৃদু অথচ দৃঢ় অভ্রান্ত ভাষায় কোন অপূর্ব রাজ্যের সংবাদ বহন করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই যেন উহা স্পষ্টতর, ততই যেন উহা গভীরতর হইতেছে। যেন হিমালয়ের প্রাণপ্রদ বায়ুস্পর্শে মৃতদেহের শিথিলপ্রায় অস্থিমাংসে প্রাণ সঞ্চার করিতেছে—নিদ্রিত সব জাগ্রত হইতেছে। তাহার জড়তা ক্রমশ দূর হইতেছে।

অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত মস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, কোনো বহিঃস্থশক্তিই এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।

কতকগুলি নির্দিষ্ট ভাবের স্নায়বিক অনুষঙ্গই শিক্ষা। অর্থাৎ, যখন কতকগুলি ভাব বা চিন্তা আমাদের স্নায়ুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একেবারে রক্তধারার সঙ্গে মিশিয়া যায়, একেবারে প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকেই 'শিক্ষা' শব্দে অভিহিত করা যাইতে পারে।

মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত করিয়া তোলাই শিক্ষা। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতায় বিকাশ হয়, সর্বাঙ্গীণ শক্তি -প্রকাশে সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে তাহার দেহ মন ও বুদ্ধি, তাহাকেই বলিশিক্ষা।

নানা বিচ্ছিন্ন বিষয়ের কতকগুলি তথ্য অপরিপক্ক ও অজীর্ণ অবস্থায় চিরজীবনের মত মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়ার নাম শিক্ষা নয়। পরন্তু, কেউ যদি পাঁচটি মাত্র ভাব ঠিক ঠিক উপলব্ধি করে এবং নিজের জীবনে সেগুলিকে রূপায়িত করিতে পারে তবে সে-ই যথার্থ শিক্ষা লাভ করিয়াছে। শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা বলে।

মানুষ-প্রস্তুতকরণে সক্ষম, জীবনীশক্তি প্রদানে সক্ষম এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা আনয়নে পটু যে-শিক্ষা, সেইটিই প্রকৃত শিক্ষা।

এমন শিক্ষাই এখন আমাদের প্রয়োজন।

আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবক-যুবতীর আবির্ভাবে যাহাতে দেশ যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে—আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সেটিই হইবে লক্ষ্য।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তার প্রায় সবটাই দোষযুক্ত, কেবল চূড়ান্ত কেরাণী-গড়া কল ভিন্ন উহা আর কিছুই নহে। শুধু সেটুকু হইলেও রক্ষা ছিল। কিন্তু তাহা হয় না। মানুষগুলি একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বর্জিত হইয়া

যায়। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলে, বেদকে বলে চাষার গান। ভারতের বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জানা আছে, কিন্তু নিজের, সাতপুরুষ দূরে, তিন পুরুষের নামও জানে না।

আমরা কেবল দুর্বলতাই আয়ত্ত করিয়াছি।···তোমাদের শ্রদ্ধা নাই, আত্মপ্রত্যয়ও নাই। কি হইবে তোমাদের? না হইবে সংসার, না হইবে ধর্ম।

একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকার!

তোমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে অভাব কি পূর্ণ হইবে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে—মাটি খুঁড়িয়া অন্নের সংস্থান কর চাকুরি বা গোলামি করিয়া নহে—নিজ চেষ্টায় নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া।

স্বাধীনতাই শিক্ষার প্রধান সোপান। অনাবশ্যক হস্তক্ষেপে সেই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিও না। নিজেকে সবজান্তা বলিয়া ভাবিও না। মনে রাখিও সেবাতেই তোমার অধিকার, অন্য কিছুতে নহে।

মানুষের নিভৃত মনকুটিরে যে অখণ্ড শক্তি নিহিত—সে নিজ স্বভাবধর্মেই পূর্ণ বিকাশের পথ খুঁজিতেছে। সেই প্রয়াসে সহায়তা করিবার দুর্লভ সুযোগ সকলের ভাগ্যে আসে না। যদি তোমার ভাগ্যে তাহা আসিয়া থাকে তবে তুমি ধন্য। উপাসনার ভাবে, পূজার ভাবে সে মহৎ কর্তব্য পালন কর।

মনে রাখিও, ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া আসে। তাহাকে আমন্ত্রণলিপি পাঠাইতে হয় না। অতএব, যখন তোমার হৃৎপদ্মটি বিকশিত হইবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিবে। সর্ববিধ শিক্ষারই মূল কথা—আদান-প্রদান; লেনা-দেনা। আচার্য দান করিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। সুতরাং আচার্যেরও দিবার মত সঞ্চয় থাকা চাই, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি চাই।

যিনি মুহূর্তে শিষ্যের সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতে পারেন, যিনি নিজের আত্মাকে শিষ্যের আত্মার সহিত একীভূত করিয়া, তাহারই মন দিয়া, তাহারই চিন্তাসূত্র অনুসরণ করিয়া সব কিছু দেখিতে ও বুঝিতে পারেন—তিনিই যথার্থ শিক্ষক।

প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব আবার আমাদের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আত্মবিশ্বাস পূর্ণভাবে জাগ্রত করিতে হইবে। তবেই দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বস্তুত, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাসের বাণী প্রচার করাই আমার জীবনব্রত।

জানিও, অসীম জীবন-সমুদ্র, শক্তি-সমুদ্র, ধর্ম-সমুদ্র আমারও যেমন তোমারও তেমন।

অতএব, তোমাদের সন্তানসন্ততিদিগকে জন্ম হইতেই এই জীবন-প্রদ ও মহান তত্ত্ব শিক্ষা দাও।

আহার, পোশাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হইয়া যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখিতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যায় জাতীয়ত্ব লোপ হয়, তাহাতে উন্নতি হয় না, অধঃপাতেরই সূচনা হয়। ব্যস্ত হইও না। অপর কাহাকেও অনুসরণ করিতে যাইও না। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হয় না।

শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধ।

পাশ্চাত্যের বহু স্থান পরিভ্রমণকালে সেই সব দেশের দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া নিজ দেশের দরিদ্রদের কথা আমার মনে পড়িত। আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতাম না।

চিন্তা করিতাম—কিসে এই পার্থক্য হইল?

উত্তর পাইলাম—শিক্ষাই ঐ পার্থক্যের মূলে।

প্রকৃত শিক্ষা এবং আত্মবিশ্বাসের ফলেই তাহাদের হৃদয়ে ব্রহ্মভাব জাগ্রত হইয়াছে।

জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, যে-সকল ব্যক্তি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে—তাহারাই প্রবল ও বীর্যবান হইয়াছে। অতএব দৃঢ়চিত্ত হও। বিশ্বাস কর তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়।

জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যুগে যুগ যত ঐশ্বর্য সঞ্চিত হইয়াছে, যত সম্পদ সংগৃহীত হইয়াছে, সবই মনোজগৎ হইতে আসিয়াছে। মহাবিশ্বের অন্তহীন গ্রন্থমালা মানব-মনের মণিকোঠায়ই সজ্জিত থাকে।

যুগে যুগে মানুষ এক জীবন হইতে জীবনান্তরের নিঃসীম পথে এই আত্মোপলব্ধির অব্যাহত তপস্যাই করিয়া চলিয়াছে।

আমার নিজের শিক্ষাব্যবস্থা যদি নূতনভাবে শুরু করিতে পারিতাম তবে কোনো সংবাদ বা তথ্য আহরণে আমি অগ্রসর হইতাম না। পরন্তু একাগ্রতা ও অনাসক্তির যুগপৎ উৎকর্ষে আমার মন-রূপ যন্ত্রটিকে প্রথমে নিখুঁত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতাম—তারপর সেই যন্ত্রটিকে দিয়া ইচ্ছামত জ্ঞানাহরণ করিতাম।

শিশু নিজেই নিজেকে শিক্ষা দিয়া থাকে।

অতএব ইতিবাচক শিক্ষাদান করিতে হইবে। যে শিক্ষা নেতিবাচক অথবা নেতিবাচক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা মৃত্যুর মতই ভয়াবহ অথবা তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

নিউইয়র্কে দেখিতাম—আইরিশ ঔপনিবেশিক দুর্ভাগ্য, সর্বহারা মানুষগুলি কত ভীত ত্রস্তভাবে সামান্য একটি পুঁটুলি কাঁধে লইয়া আমেরিকার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করে। প্রতি পদক্ষেপে তখন তাদের কত শঙ্কা, কত ভয়। চাহনিতে ভীতিবিহ্বল কত কুণ্ঠা, দুর্বহ জীবনভারে কত অবনমিত ক্ষীণ দেহগুলি···তারপর! তারপর খুব দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত না। পাঁচ-ছয় মাস মাত্র সময় মধ্যে আর একটি দৃশ্য নয়নগোচর হইত। যে আইরিশ সব দেশের মাটিতে কেবলি শুনিয়াছিল সে কিছুই নয়, সে অকর্মণ্য, সে অপদার্থ—আজ স্বাধীন আমেরিকার মুক্ত বায়ুতে পা দিয়াই চারিদিকে শুধু এই সঞ্জীবনী মন্ত্রই সে শুনিতে লাগিল—জগতের সকল অসম্ভবকেই মানুষ সম্ভব করিতে পারে। প্যাট, তুমিও মানুষ, তোমার অসাধ্যও কিছু নাই। অতএব তৎপর হও। সাহস অবলম্বন কর।

ভারতের পতিত, দরিদ্র শত কোটি নরনারীর অবিমিশ্র দুঃখ দুর্দশার কথা চিন্তা করিলে চিত্ত আমার অবশ হইয়া আসে। বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ—গভীর হইতে গভীরতর পঙ্কে ইহারা ডুবিতেছে। নির্মম নিষ্ঠুর সমাজ অবিরত ইহাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে আর হতভাগ্য মূক এই জীবগুলি সেই আঘাতের কঠিন বেদনা সহ্য করিতেছে—আঘাতকারীকে চিনিতে পর্যন্ত পারিতেছে না। —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

৬০
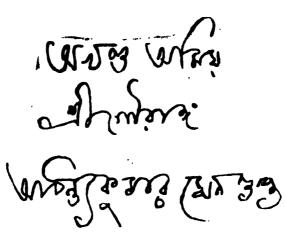
সন্ন্যাসীর স্থান কাশী আর কাশীর প্রধানতম সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ। প্রভুর নিন্দায় শতমুখ। বলে, 'নিজে সন্ন্যেসী হয়ে কি না লোকটা নৃত্য-গীতে মত্ত হয়েছে। বেদান্ত পড়ে না; ভাবের বন্যায় ভাসে। এমন অদ্ভুত মূর্খ তো কোথাও দেখি নি।'

'সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ—করে সংকীর্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে।
ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥'

'প্রভু, তোমার নিন্দা আর শুনতে পারি নে।' বললে চন্দ্রশেখর। বললে তপন মিশ্র। 'এর একটা কিছু বিহিত করো।'

প্রভু হাসলেন। নিন্দা—অপবাদ গ্রাহ্যই করলেন না। প্রতিবাদও নেই মনঃক্ষোভও নেই। উদাসীন হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু ভক্ত দুঃখের খণ্ডন করবে তো? তোমার নিন্দা শুনে ভক্তদের যে দুঃখ হচ্ছে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কোথায়? ভক্ত দুঃখ দেখে তোমার করুণচিত্ত বিগলিত হবে না?

মহারাষ্ট্রী বিপ্র শুধু ভাবছে কোনো উপায়ে যদি প্রভুকে একবার সন্ন্যাসীদের সামনে নিয়ে যেতে পারি! যদি ওরা কোনো সুযোগে প্রভুকে একবার দেখত চোখ খুলে! যদি ওদের প্রভু সাক্ষাৎ না হয় তো চিরদিনই ওরা প্রভুর নিন্দে করে বেড়াবে। তা হলে এ কাশীবাস তো আমার কাছে অন্তহীন যন্ত্রণা!

প্রভুর চরণে নিবেদন করল বিপ্র: 'প্রভু, আপনার কাছ থেকে এক বস্তু ভিক্ষে করতে এসেছি।'

'কি?'

'আমি জানি আপনি সন্ন্যাসীসঙ্গ করেন না, তবু আমি প্রার্থনা করছি, আমার বাড়িতে একবার চলুন।'

'তোমার বাড়িতে কী?'

'নিমন্ত্রণ। আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

'সেখানে মায়াবাদীরাও আসবে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাদের নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি একবার চলো। কৃপা করে আমার নিমন্ত্রণ রাখো।' বিপ্র মিনতিতে নুয়ে পড়ল: 'একবার তোমাকে ওরা দেখুক। আমাদের, ভক্তদের কৃপা করো, এরাও তোমার করুণার ভাগী হোক।'

'প্রভু বললেন, 'চলো।'

সন্দেহ কী, 'সন্ন্যাসীর কৃপা—লাগি এ ভঙ্গি তাঁহার।'

নির্ধারিত দিনে প্রভু গেলেন ব্রাহ্মণের ঘরে, নিমন্ত্রণ রাখতে। দেখলেন গর্বের পর্বত হয়ে বসে আছে সন্ন্যাসীরা, মধ্যস্থলে প্রকাশানন্দ সরস্বতী। দেখেও দেখল না। এই বুঝি সেই ভাবুক জাদুকর। সাবভৌমকে যে পথে বসিয়েছে। সন্ন্যাসীরা নড়ে-চড়ে উঠল। কিন্তু এই কাশীতে তার ভাবকালি বিকোবে না।'

না বিকোক, প্রভু দূর থেকে সন্ন্যাসীদের নমস্কার করে, পা ধুয়ে পা ধোবার জায়গাতেই বসে পড়লেন, যদি গাহেক না পাই, ফিরে যাব। কিন্তু এত ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে যাব কা করে? তাই ঠিক করেছি অল্প-স্বল্প দাম মেলে এখানেই বেচে দেব।

প্রভু ভাবলেন, আর দৈন্য-বিনয় নয়, একটু ঐশ্বর্য প্রকাশ করি। নইলে ওদের গর্ব খর্ব হবার নয়।

প্রভুর অঙ্গ তেজোময় হয়ে উঠল। আলো হয়ে গেল চারদিকে। এ কে? সন্ন্যাসীরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু—কোটি সূর্যাভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসীগণ ছাড়িয়া আসন॥'

প্রকাশানন্দই এগিয়ে গেল। জিগগ্যেস করল, 'শ্রীপাদ, আপনি ঐ অপবিত্র স্থানে, ঐ পা ধোবার জায়গায় বসে আছেন কেন? আপনার অন্তরে কিসের দুঃখ?'

প্রভু বললেন, 'আমি হীন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস নিয়েছি। আপনাদের সঙ্গে সভায় বসবার আমার যোগ্যতা নেই।'

প্রকাশানন্দ প্রভুর হাত ধরে সসম্মানে সভায় এনে বসাল। জিগগ্যেস করলে, 'আপনিই কি কেশবভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই।'

'শত হলেও তুমি তো সন্ন্যাসাই, আছও এই কাশীতে, তবে আমাদের সঙ্গ কর না কেন?' বললে প্রকাশানন্দ, 'আর সন্ন্যাসী হয়ে নাচ-গান করছ কী! সন্ন্যাসীর ধর্ম হচ্ছে বেদান্ত পাঠ, তা না করে ভাবুকের কর্ম কর কেন? তোমার প্রভাব দেখে মনে হয় তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তবে এই হীনাচার কিসের জন্যে?'

প্রভু নম্রমুখে বললে, 'আমি মূর্খ, তাই আমার গুরুদেব আমাকে শাসন করলেন, বললেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নেই, তুমি কৃষ্ণমন্ত্র জপ করো। এই কৃষ্ণমন্ত্রই সমস্ত বেদান্তের সার।'

'কৃষ্ণমন্ত্র?'

'হ্যাঁ, কৃষ্ণমন্ত্রেই সংসারমোচন, কৃষ্ণমন্ত্রেই কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি।' বললেন প্রভু, 'কলিকালে এই কৃষ্ণনাম ছাড়া আর ধর্ম নেই বলে গুরু আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছেন—সেই শ্লোকটি শুনবে?'

'কী শ্লোক?'

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

কলিকালে অন্য গতি নেই, হরিনামই একমাত্র সাধন। প্রভু বললেন গাঢ়স্বরে, 'গুরুর আদেশে তাই নিরন্তর নাম নিচ্ছি, নাম নিতে নিতে অন্য বিষয়ে আমার ভ্রান্তি জন্মেছে। পাগলের মত হয়ে গিয়েছি। শুধু হাসি কাঁদি নাচি গাই, আমার সমস্ত জ্ঞান কৃষ্ণনামে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। গুরুদেবকে অবস্থার কথা বললে তিনি বললেন, না, তুমি পাগল হওনি, তুমি কৃষ্ণনামের ফল যে প্রেম সেই প্রেম লাভ করেছ, আর এই প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। আমার উপদেশ সফল হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি। তুমি অমনি নাচো গাও, ভক্তসঙ্গে কীর্তন করো, উদ্ধার করো সকলকে। গুরুবাক্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাই আমি অহর্নিশ কীর্তন করে বেড়াই।'

প্রভুর মধুর কথায় সন্ন্যাসীদের মন প্রসন্ন হল। কিন্তু প্রকাশানন্দ টলল না। বললে, 'কৃষ্ণভক্তি করো তো করো, কিন্তু বেদান্তকে বাদ দাও কেন? নিজে না বোঝো তো আমাদের কাছে এসেও শুনতে পারো। বেদান্ত শুনতে কী দোষ!'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'যদি দুঃখ না নাও, তবে কিছু বলি সবিনয়ে।'

'বলো।' সন্ন্যাসীরা আকুল হয়ে উঠল। 'তোমার কথা শুনে মন-প্রাণ জুড়োয়, তোমার মাধুরীতে নয়ন সন্তোষ মানে। তোমার কথা অসঙ্গত হবে না।'

প্রভু বললেন, 'বেদান্তসূত্র তো ঈশ্বরেরই বাক্য। নারায়ণই তো বেদব্যাসরূপে এ ব্যক্ত করেছেন। তাই এর পঠনে-শ্রবণে দোষ নেই। আর ঈশ্বরের বাক্যে কোনো ভ্রম-প্রমাদ নেই, নেই বিপ্রলিপ্সা বা বঞ্চনা করবার ইচ্ছে। না বা করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা। সাদাকে হলদে দেখবার দোষদৃষ্টি। মুখ্য অর্থ করুন, বেদান্ত ঠিক আছে, কিন্তু গৌণার্থেই যত অসঙ্গতি।'

'কেন, ব্যাখ্যা করুন।'

'সেব্য-সেবকের ভাবই ভক্তিমার্গের মূল। জীব আর ব্রহ্ম যদি অভেদ হয় তবে কে সেবক কে বা সেব্য। ভক্তি আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। শঙ্করাচার্য তো জীব আর ব্রহ্মের অভেদত্বই প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা'হলে ভক্তি আর রইল কোথায়? তবে শঙ্করের দোষ নেই, তিনি ঈশ্বরের আদেশেই মুখ্য অর্থকে গৌণার্থ দিয়ে আচ্ছন্ন করেছেন।'

'ঈশ্বরের আদেশে?'

'ভগবান মহাদেবকে আদেশ করলেন, স্বকল্পিত আগমশাস্ত্র দিয়ে মানুষকে তুমি আমার থেকে বিমুখ

করো। আমাকে গোপন করো। সবাই যদি ভগবৎ-উন্মুখ হয় সৃষ্টি লোপ পাবে। শঙ্কর নিজেই তো মহাদেব। মহাদেব তাই মায়াবাদ রচনা করে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব গোপন করলেন। নইলে, ধরুন, ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ কী!'

'আপনিই বলুন।'

'ব্রহ্ম অর্থ, যিনি নিজে বড় হন ও যিনি অন্যকেও বড় করেন।' বললেন প্রভু, 'তাই তিনি সর্বশক্তিমান। শক্তি না থাকলে অন্যকে বড় করবেন কী করে? সর্ববৃহত্তম যে তত্ত্ব তাই ব্রহ্ম। তাঁর অসীমত্ব সব দিকে, স্বরূপে, শক্তিতে, প্রকাশবৈচিত্র্যে। আর বৃহত্তমতাকে কী বলবেন? নিশ্চয়ই এটা গুণ। তা'হলে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। সচ্চিদানন্দময়। এ হেন ব্রহ্মকে শঙ্কর শুধুই নিরাকার বলেন কী করে? ভগবান অর্থই বিগ্রহময় বস্তু। শুধু উপাসনার সুবিধের জন্যেই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয় নি, ব্রহ্মই নিত্যরূপ সত্যরূপ আনন্দরূপ।'

'কিন্তু শ্রুতি তো নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছে, তা কি মিথ্যে?' তাকিকরা প্রশ্ন করল।

'না, সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য। শক্তির অল্পতম বিকাশেই সাকার, ন্যূনতম বিকাশে নিরাকার।'

'তা'হলে দাঁড়াল কী?'

'দাঁড়াল শঙ্করের গৌণার্থে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, শক্তিশূন্য। তাঁর ধাম নেই লীলা নেই, পরিকর নেই, ঐশ্বর্য নেই এক রতি—'

'আর আপনার মতে?'

'আমার মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সাকার, সবিশেষ, স্বশক্তিমান। তাঁর ধাম আছে, লীলা আছে, পরিকর আছে, ঐশ্বর্যের আনন্ত্য আছে।

'আর?'

'আর শঙ্কর বলছেন সাকার ভগবান প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার। তাঁর মতে ভগবান মায়িক উপাধিবিশিষ্ট। যিনি নিজে মায়াময় তিনি অন্যকে কি করে মায়ামুক্ত করবেন? নিজে শৃঙ্খলিত হয়ে কি অন্যকে শৃঙ্খল মুক্ত করা যায়? যে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার সে তো সৃষ্ট বস্তু আর সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তা হলে ঈশ্বরও অনিত্য হয়ে দাঁড়ান। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিরোধী। কেন না শ্রুতি বলছে ঈশ্বর নিত্য, অনিত্যের মধ্যে নিত্য, নিত্যোনিত্যানাম্। ভগবানের দেহকে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলে মানা চরমতম বিষ্ণু নিন্দা।'

'বিষ্ণু নিন্দা আর নাই ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর॥'

'কিন্তু জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কী বলবেন?'

'ঈশ্বর যদি প্রজ্বলিত অগ্নি, জীব তার স্ফুলিঙ্গের কণা।' বললেন প্রভু, 'চৈতন্যে বা স্বরূপে দুই অভেদ, কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন, ঈশ্বর বিভু-বস্তু জীব অণু-বস্তু। বিভু অণু হতে পারে কিন্তু অণু কখনো বিভু হতে পারে না। দুইই চিদ্বস্তু বলে এরা আবার বিভুত্বে-অণুত্বে ভিন্ন। ভেদ আর অভেদ একসঙ্গে। আরো আছে—'

'বলুন শুনি।'

'ঈশ্বর শক্তিমান জীবশক্তি। এখানেও সেই ভেদাভেদ। শক্তিমানের অনুভব ছাড়াও কখনো কখনো শক্তির অনুভব হয়, কস্তুরিকে অনুভব না করেও তার গন্ধকে অনুভব করা সম্ভব। তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক শক্তিমানে আর শক্তিতে বুঝি ভেদ আছে, ভেদ আছে মৃগমদ আর তার গন্ধে। কিন্তু কস্তুরি বা মৃগমদ ছাড়া গন্ধের অস্তিত্ব নেই, তেমনি শক্তিমান ছাড়া কোথায় শক্তির অস্তিত্ব। এখানে দুই আবার অভিন্ন।'

'মৃগমদ তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥'

তাই দেখতে পাচ্ছি জীবে ব্রহ্মে অভেদ থেকেও ভেদ আছে! যদি ভেদের কথা ভুলে যাই, তা হলে জীবের মনে হবে শক্তি-সামর্থ্যে আমি ঈশ্বরেরই সমতুল। ঈশ্বর যা করতে পারেন আমিও তাই করতে পারি। এই ভাব ঈশ্বরমহত্ত্বকে খর্ব করে। সিন্ধু কি বিন্দুরূপে পরিচিত হবার যোগ্য? সে পরিচয়ে সিন্ধুর গৌরবের হানি হয়। তাই জীব ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম হতে পারে না।'

'আর জগৎ?' তাকিকেরা প্রশ্ন করল।

'শঙ্কর বলছেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয়, জগৎ ব্রহ্মে ভ্রমমাত্র যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এটা গৌণার্থ। কিন্তু মুখ্যার্থে, যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ঘট যেমন মৃত্তিকার তেমনি জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি।'

'পরিণামবাদ যদি স্বীকার করেন তাহলে ব্রহ্মকে বিকার্য বা বিকারশীল বলে মানতে হয়। কিন্তু আসলে

ব্রহ্ম অবিকৃত। সুতরাং এ জগৎ বললে তার্কিকেরা, 'ব্রহ্মে ভ্রম মাত্র। যেমন শুক্তিতে রৌপ্যভ্রম, মরুভূমিতে সূর্যকিরণে মরীচিকাভ্রম। তার মানে ব্রহ্মকেই আমরা জগৎ বলে ভ্রম করছি আর এই ভ্রমবাদই আমাদের বিবর্তবাদ।'

'তার অর্থ, বিবর্তবাদে এ জগৎ মিথ্যা, বাস্তব-সত্তাহীন। কিন্তু, ভেবে দেখুন, দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যেই এই বিবর্ত। অনাত্মদেহে আত্মভ্রমই বিবর্ত। আসলে ভগবান স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হয়েও আবার অবিকারী। কারু আদেশে-অনুরোধে বা কোনো কর্মবশে ঈশ্বরের কার্য নয়, তাঁর ইচ্ছাই জগৎরূপে পরিস্ফূর্ত এবং জগৎ হয়েও তিনি যে তিনি সেই তিনিই থেকে যাচ্ছেন। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আর একমাত্র মহাবাক্য হচ্ছে প্রণব।'

'প্রণব?'

'হ্যাঁ, প্রণবই ওঙ্কার, ওঙ্কারই ব্রহ্ম।' বললেন প্রভু, 'দৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার অদৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কার। জগৎস্থিত জগদতীত—সমস্ত। ওঙ্কারই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপক। বেদেরও উৎপত্তি এই প্রণব থেকে। সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য আর সমস্ত সাধনের লক্ষ্যও এই প্রণব।'

'আর তত্ত্বমসি?'

'শঙ্করের মতে তত্ত্বমসিই মহাবাক্য। তত্ত্বমসি তো বেদের এক পরিচ্ছেদে একটি বাক্য মাত্র, তা প্রণবের মত সর্ববিশ্বব্যাপী নয়। আর, তত্ত্বমসির অর্থ তো তুমি ব্রহ্ম নও, তুমি ব্রহ্মের। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে আর উপাসনা করতে চায় না, কিন্তু তুমি যদি ব্রহ্মের হও তবে উপাসনা তোমার অবশ্য কর্তব্য। সহজ অর্থ ছেড়ে গৌণার্থ ব্যাখা করেই যত অনর্থের সূত্রপাত।'

সন্ন্যাসীরা বিস্ময় মানল। বললে, 'তুমি যে গৌণার্থ খণ্ডন করলে তাতে প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। শুধু সাম্প্রদায়িকতার খাতিরেই শঙ্করের ব্যাখ্যাকে মর্যাদা দিই।'

কিন্তু প্রকাশানন্দ সহজে হটবার পাত্র নয়। তার মতে একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসম্মত। তার উপলব্ধির জন্যে একমাত্র জ্ঞানযোগই প্রশস্ত। প্রভু দেখালেন সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও ভগবানের উপাসনাও শ্রুতি স্মৃতিসম্মত। আর কলিকালে সংসারজয় সন্ন্যাসে নয় একমাত্র হরিনামে, ভক্তিতে। 'কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি।'

'ভক্তি বিনা মুক্তি নহে'—ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥'

কী বলে এই 'বাঙালি ভাবক সন্ন্যাসী?'

শুধু বলে না, বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিয়ে বলে। তাই সাধ্য নেই কেউ অতিক্রম করে। ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু সন্দেহ নেই, আর এই ব্রহ্মই ভগবান। বহুবিধ ঐশ্বর্যপূর্ণ। সেই ঈশ্বরকেই বন্দনা করি যিনি কমলনয়ন, মেঘশ্যামল, বৈদ্যুতাম্বর, মৌলিমালাঢ্য বনমালী। আর ভক্তিই সেই ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়। সর্ববেদের অভিধেয়। আর ভক্তি থেকে প্রেম, প্রেম থেকেই সেবাবাসনা। আর উপাসনা ছাড়া সেবা হয় কী করে? উপাসনার মন্ত্র কী? হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। দৃঢ়তার জন্যে তিনবার হরের্নাম বলা, আবার 'এব' দিয়ে আরো নিশ্চয়াত্মক করা হয়েছে। হ্যাঁ, হরিনামই একমাত্র গতি। আবার 'কেবল' দিয়ে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। যে এর অন্যথা মানে তার নিস্তার নেই। নেই, নেই, কিছুতেই নেই। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' তাই কলিকালে নামই একমাত্র সাধন।

কী ভাবে নাম করবে? তৃণ হতে নীচ হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান কামনা না করে অন্য সকলকে সম্মান দেখিয়ে।

আর বুঝি ঠেকানো গেল না বক্তাকে। বিগলিত হল প্রকাশানন্দ। বিনয় করে বললে, 'তুমি বেদময় মূর্তি, সাক্ষাৎ নারায়ণ। আগে যে নিন্দা করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাই।'

'তা'হলে এবার কৃষ্ণধ্বনি তোলো।'

প্রচণ্ড ভিড় জমে গেল। সুরু হল কৃষ্ণকীর্তন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সকলে হাসতে-কাঁদতে নাচতে-গাইতে লাগল।

মহারাষ্ট্রী বিপ্রের ঘরে সন্ন্যাসীদের মধ্যে বসিয়ে প্রভুকে ভিক্ষা করালেন প্রকাশানন্দ।

সমস্ত কাশী প্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। যেখানে যান সেখানেই দারুণ জনতা। যেখানেই যান, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেই হোক বা গঙ্গায়ই হোক, হরিধ্বনি করেন প্রভু আর জনতা প্রতিধ্বনি তোলে।

'বাহু তুলি বোলে প্রভু—বোল হরি-হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্য ভরি॥'

একদিন পঞ্চ-গঙ্গাতে স্নান করে প্রভু বিন্দুমাধব দর্শনে গেলেন। মাধবের সৌন্দর্য দেখে ব্রজভাবে আবিষ্ট হয়ে অঙ্গনে নাচতে লাগলেন প্রভু। চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপন আর সনাতনও কীর্তনে যোগ দিল। এদিক-ওদিক হতে কত যে লোক ছুটে এল তার লেখাজোখা নেই।

প্রেমোন্মত্ত হয়ে প্রভু গান ধরলেন: 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'

হরি-হরি। স্বর্গ-মর্ত্য ভরে ধ্বনি উঠল। প্রতিধ্বনি হল হাজার লোকের কণ্ঠে।

প্রকাশানন্দের আশ্রম মন্দির থেকে বেশি দূরে নয়। সে নামধ্বনি শুনে প্রকাশানন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। শিষ্য-দের বললে, চলো দেখে আসি।

আর বুঝি এ 'ভাবকের ভাবকালি' নয়, এ একেবারে 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ। এ যে প্রাণ ধরে টান মারা। 'চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়।'

কিন্তু এ-কী দেখছে! প্রভু নৃত্য করছেন। শুধু কীর্তন নয়, নর্তন। অনন্ত সৌন্দর্যের নিকেতন দেহ ভঙ্গিতে এ কী অসমোর্ধ্ব মাধুরী!

আত্মহারার মত প্রকাশানন্দ বলে উঠল: হরি-হরি! তার শিষ্যদলও উন্মথিত সমুদ্রের মত গর্জন করে উঠল: 'হরি-হরি।'

প্রকাশানন্দ শুধু ধ্বনিত হল না, সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিক ভাব, পুলককদম্ব ধারণ করল। শুধু তাই নয় কাঁদতে লাগল দীনহীনের মত।

কাশীবাসীদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যে-সমস্ত ব্যবহারকে চিরকাল সে বিদ্রূপ করেছে, শুধু নয়, ধিক্কার দিয়ে বেড়িয়েছে, সে নিজেই কি না তা প্রত্যক্ষ প্রকাশ করছে। এত বড় পণ্ডিত, গর্বে যে পর্বতায়মান, তার এ কী দৈন্যচাপল্য! কোথায় তার গাম্ভীর্য, কোথায় তার বিরক্তি! অলক্ষিতে সে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

সত্যিই বুঝি সে আজ প্রকাশানন্দ। শুষ্ক জ্ঞানের কঠিন আবরণ উন্মোচন করে সে আজ ভক্তিতে প্রকাশিত, আনন্দে উচ্চারিত। সে আজ সার্থকনামা প্রকাশানন্দ।

লোক-সংঘট্ট দেখে প্রভুর বাহ্যস্মৃতি ফিরে এল। সন্ন্যাসীদের দেখে ভাব সংবরণ করলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ রাধাভাব, তাঁর হৃদয়ের গোপন নিধি—এ সকলের সামনে অনাবৃত করার নয়।

প্রকাশানন্দকে প্রভু প্রণাম করলেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর চরণযুগল ধারণ করল।

প্রভু বললেন, 'আপনি জগদগুরু, পূজ্যশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মসম, মায়াতীত। আর আমি অজ্ঞ, হীন মায়াবদ্ধ। আপনার শিষ্যের শিষ্য। আমি আপনার প্রণামের যোগ্য নই। আপনি শ্রেষ্ঠ হয়ে আমার মত হীন জনকে যদি প্রণাম করেন, তা'হলে আমার সর্বনাশ হবে।' আপনি ব্রহ্মতুল্য বলে সমস্ত কিছু ব্রহ্মময় দেখছেন, তাই বলে লোকশিক্ষার ছলেও সকলকে বন্দনা করা বিধেয় নয়।

'তোমাকে আমি আগে অনেক অযথা নিন্দা করেছি,' বললে প্রকাশানন্দ, 'তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যেই আমি তোমার চরণ স্পর্শ করলাম। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। আর ভগবৎ-চরণস্পর্শেই সমস্ত অপরাধের অবসান।'

যারা জীবন্মুক্ত, তারাও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানের কাছে অপরাধী হয়, পুনরায় সংসারবাস বাসনায় পুড়ে মরে।

কিন্তু ভগবানের পাদস্পর্শে যে সমস্ত অমঙ্গল ক্ষয় হয় তার প্রমাণ সর্পের বিদ্যাধরদেহ ধারণ।

দেবযাত্রা উপস্থিত হলে নন্দ-সুনন্দ প্রভৃতি গোপেরা সরস্বতীতে স্নান করতে গেল। স্নানান্তে পশুপতি ও অম্বিকার পূজা করল। নদীতীরে রাত্রে শুয়ে আছে, এক ক্ষুধিত মহাসর্প নন্দকে গ্রাস করল। 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাসর্প আমাকে গ্রাস করছে। আমার জীবন বিপন্ন। বৎস, আমাকে উদ্ধার করো।' নন্দ আর্তনাদ করে উঠল। অন্যান্য গোপ-গোপাল বিশ্রাম ছেড়ে উঠে এল, বিভ্রান্ত হয়ে এক মশাল জ্বালাল, আর জ্বলন্ত মশাল দিয়ে দগ্ধ করতে লাগল সর্পকে। প্রজ্বলিত অঙ্গারে দহ্যমান হয়েও ভুজঙ্গম নন্দকে ত্যাগ করল না। অনন্তর ভক্তপতি ভগবান এসে সর্পকে পদাঘাত করলেন। নন্দ বিপন্মুক্ত হল, আর ভগবানের চরণস্পর্শে অশুভ দূরীভূত হওয়াতে সর্প সদেহ পরিত্যাগ করে বিদ্যাধরবন্দিত পরমরমণীয় দীপ্ত দেহ ধারণ করল। কৃষ্ণের পদতলে লুণ্ঠিত হতে লাগল।

হৃষীকেশ জিগগেস করলেন, 'দীপ্ততেজ পুরুষ, তুমি

কে ? কী জন্যে অবশ হয়ে এমন নিন্দিত গতি প্রাপ্ত হয়েছিলে ?'

সর্প বললে, 'আমি এক গন্ধর্ব। কমলার কৃপা আর আমার রূপ এই দুই বৈভবের জন্যে আমার নাম ছিল সুদর্শন। একদিন বিমানে চড়ে দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করতে-করতে অঙ্গিরাবংশসম্ভূত বিরূপ মুনিদের উপহাস করেছিলাম। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অভিশাপ দিল। আমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হলাম। এখন দেখছি তাদের সেই শাপ শাপ নয়, কৃপা। দয়ালু মুনিরা কৃপা করেছিল বলেই আজ আমি আপনার ত্রিলোকবন্দিত চরণ স্পর্শ করতে পারলাম। আপনার চরণস্পৃষ্ট হয়ে আমার সকল অশুভ দূর হল। হে দুঃখনাশন! ভববন্ধভঞ্জন! আমি প্রপন্ন। আপনাকে দেখামাত্র আমি জন্মদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করলাম। যার নাম কীর্তন করে মানুষ শ্রোতাকে ও নিজেকে পবিত্র করে তার পাদস্পর্শে যে সে পবিত্র হবে তাতে আর বৈচিত্র্য কী!'

প্রভু বললেন, 'আমি ক্ষুদ্র জীব। জীবকে বিষ্ণু মনে করলে অপরাধ হয়। ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্তা আর রুদ্র যে সংহারকর্তা তাদেরকেই নারায়ণের সমান মনে করলে অপরাধ হয় আর জীব তো সামান্য কথা।'

'তুমি যে সাক্ষাৎ ভগবান তাতে সন্দেহ নেই' বললে প্রকাশানন্দ, 'তবু যদি জীবশিক্ষার জন্যে তুমি নিজেকে কৃষ্ণদাস বা ভগবানের ভক্ত বলে মনে করো তা হলেও তুমি আমার চেয়ে বড়, আমার পূজনীয়। তোমাকে নিন্দা করেছি, ভক্তনিন্দাতেও জীবের সর্বনাশ ঘটে। সুতরাং সে অপরাধ সে সর্বনাশ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যেও আপনার চরণস্পর্শের প্রয়োজন।'

কী বলছে ভাগবত ?

বলছে, কোটি কর্মনিষ্ঠের মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে হয় তো একজন জীবন্মুক্ত হয়। আবার কোটি জীবন্মুক্তের মধ্যে এক কৃষ্ণভক্তই দুর্লভ। অর্থাৎ সিদ্ধ-মুক্ত সকলের চেয়ে ভক্তই শ্রেষ্ঠ।

আর যারা মহৎ তাদের অবমাননায় মানুষের আয়ু নষ্ট, শ্রী যশ ধর্ম স্বর্গ এমন কি নিজের বাঞ্ছিত বিষয় ও সর্ববিধ কল্যাণ নষ্ট।

'এখন তোমার চরণস্পর্শে আমার নিন্দাপরাধ খণ্ডন হয়েছে বলে চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হবে।' বললে প্রকাশানন্দ, 'তাই তো তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছি।'

'এবে তোমার পদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তার নিমিত্তে করি তোমার চরণে প্রণতি॥'

মহৎ কৃপা ছাড়া জীবের সংসারনিবৃত্তি নেই। সজ্জনসঙ্গতিই ভবার্ণবতরণের তরণী। [ক্রমশ।

'বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই আমি আত্মহারা হয়ে যাই। খুব কম লোকের পক্ষে, এমন কি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সুগভীর, জটিল ও ঋদ্ধিসমন্বিত ব্যক্তিত্ব—তাঁর বক্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অথচ তাঁর এই বক্তৃতা ও লেখার দ্বারাই তিনি তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর, বিশেষত বাঙ্গালীর উপর বিস্তার করেছিলেন। এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে, এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামীজী মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন, অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মত। আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর The Master as I saw him পুস্তকে বলেছেন, The queen of his adoration was his Motherland—অর্থাৎ তাঁর আরাধনার দেবতা ছিল তাঁর মাতৃভূমি। পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন আপনারা তা পড়েছেন। সে সব কথা বলা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষেও বিশেষ প্রশংসার বিষয়। আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভণ্ডামী বলতে পারেন স্বামীজীর মধ্যে তার বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না। তাঁর চোখে এ সব অসহ্য বোধ হোত। বকধার্মিকদের উদ্দেশ করে তিনি বলতেন Salvation will come through football and not through Gita.'

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

আঁদ্রে কার্পেলে হগ্‌ম্যান

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

"বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা।"

—জন্মদিনে

বিদেশী-লোক সমাজেও কবির এরূপ আত্মীয়তার অভাব ছিল না, ঘরে ঘরে সেই পরমাত্মীয় মণ্ডলীতে ছিলেন মহিলারাও। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা বিশেষভাবেই উল্লিখিত হয়েছে।

এই একান্ত অনুগতা কতিপয় বিদেশিনী নারীর মধ্যে আছেন কবি-আখ্যাত 'বিজয়া' নাম্নী দক্ষিণ আমেরিকার লেখিকা সিনোরা ভিক্টোরিয়া ডি এস্ট্রাডা ও' কাম্পো, 'পূরবী' কাব্য ওঁকেই উৎসর্গীত হয়েছে;—'তিনি যখন নতজানু হয়ে বাবামশায়ের পায়ের কাছে বসতেন মনে হোত ক্রাইষ্টের পুরানো কোনো ছবির পদতলে তাঁর ভিক্ত তরুণমহিলার নিবেদন মূর্তি।'—শ্রীপ্রতিমা দেবী, নির্বাণ, পৃঃ ৩৪।

আরো আছেন ফ্রান্সের প্রভাবশালিনী অভিজাতমহিলা কৃতবিদ্যা কবি কঁটেস দ নোয়াই, এঁর নামটিও রবীন্দ্রানুরাগীদের অপরিচিত নয়। 'আর একদিন কাহনের নিমন্ত্রণে আসিলেন ফ্রান্সের বিদুষী মহিলা-কবি Comtesse de Noailles। বিদুষীর কথাবার্তা মনস্বী কবিকে খুবই মুগ্ধ করিল। "...১৯৩১ সালে ফ্রান্সে কবির যে চিত্র প্রদর্শনী হয় তাহাতে [ইনি] বিশেষ সহায়তা করেন, চিত্রসূচীর বিস্তৃত ভূমিকা লেখেন। ১৯৪৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।"—রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩।

মিসেস এলমহার্ষ্ট, মিসেস ডন মুডি, ডাঃ সেলিগ প্রভৃতি আরো কয়েকটি নামও এ-প্রসঙ্গে এসে পড়ে। মিসেস ডরোথি এলমহার্ষ্টের শ্রীনিকেতন-সম্পর্কে বদান্যতা সুবিদিত; মিসেস মুডির আতিথ্যসংকার কবির আমেরিকা-ভ্রমণকে করেছে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, ডাঃ সেলিগ শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন থেকেও গিয়াছিলেন। 'Dr. Selig খুব ভালো লোক, প্রাণপণে যত্ন করছেন।'

...জার্মনীতে এবার Dr. Selig-এর দ্বারা অনেক উপকার পাব। দেখেছি এসব জায়গায় মেয়ে-বন্ধু পেলেই সবচেয়ে কাজে লাগে। প্যারিসে ভিক্টোরিয়া যে রকম ছিল Dr. Selig সেই রকম, এমন কি তার চেয়ে বেশি। ওঁর আনুকূল্যে আমেরিকাতেও অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।...১৫ জুলাই ১৯৩০।'

—চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২—১৩।

এঁরা যে কেবল গুণমুগ্ধ ছিলেন, তা নয়, কবিকে নানা সময়ে এঁরা নানা কাজে সেবা ও সাহায্য দান করেছেন; বিদ্যাবুদ্ধির দীপ্তি, স্বভাবের কমনীয়তা ও সে সঙ্গে চিত্তের প্রসারেও এঁরা ছিলেন ঐশ্বর্যশালিনী। এই পর্যায়েরই অন্যতমা ছিলেন প্যারিসের অধিবাসিনী চিত্রশিল্পী ও সমালোচক মাদাম আঁদ্রে কার্পেলে হগ্‌ম্যান। কিছুকাল আগে ফ্রান্সে শিল্পসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধিকা এই গুণবতী মহিলার পরলোকগমন ঘটেছে (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬)।

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েরই তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বিয়োগে (১৯৫২ সনে) তিনি লিখেছিলেন, আমার গুরুকে আমি হারালাম।...চল্লিশ বৎসরের উপর আমাদের মধ্যে অটুট সম্বন্ধ ছিল। (১) বালিকাবস্থায় তিনি অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'মেঘদূত' ছবিখানির একটি প্রতিলিপি (Print) দেখতে পান বিলাতের 'ইষ্টুডিয়ো' পত্রিকায়। সেই থেকে শিল্পীকে সাক্ষাৎ দেখবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মে। ঘটনাক্রমে তিনি যখন এর পরে ভারতবর্ষে আসেন তখন কলকাতায় এসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শিল্পগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বহুদিন ধরে আলাপ-আলোচনাক্রমে ভারতীয় শিল্পের মর্মোপলব্ধি করেন। তিনি স্বকীয় ধারাতেই শিল্পচর্চা করে গেছেন; সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্পধারার প্রতিও তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ১৩২৯ সালের 'প্রবাসী'র বৈশাখ-সংখ্যাতে আঁদ্রের আঁকা অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি মুদ্রিত দেখতে পাওয়া যাবে। পুরোনো দিনগুলির মধুর স্মৃতি উল্লেখ করে অবনীন্দ্রনাথদের তিন ভ্রাতার নিবিড় ঘরোয়া পরিবেশটিকে তিনি অতি মনোজ্ঞভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অবনীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত একখানি পত্রে:

"I can see as freshly as if it were only yesterday the three brothers; Gaganendra so vivid, Samarendra dreaming with his hookah, and your father dipping his fine Japanese brush in a big silver bowl where a pink lotus floated. And the noise of children's voices from below came upto that verandah where the three brothers, rare specimens of what is best in India, were talking about art and literature far away from India's parties..."

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি ছবি আঁদ্রে তাঁদের বিবাহের সময় জোড়াসাঁকো থেকে উপহার পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দূরপ্রবাসী আত্মীয়ের অন্তরঙ্গতামাখা আলাপেই তাঁর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছে বরাবর। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর মুখেও নানাপ্রসঙ্গে প্রীতির সুরে বহুদিন শোনা গেছে আঁদ্রের নাম। শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ও আঁদ্রেকে বিশেষ ভাবে জানতেন; তপনমোহন-কৃত ইংরেজি অনুবাদ ও আলোচনার সাহায্যে বাংলার লোককাহিনী ও রাজস্থানের গল্প ফরাসীতে অনুবাদ করে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এ দেশের প্রাচীন শিল্প-

---

১ দ্রঃ—বিশ্বভারতী নিউজ ১৯৫২ ফেব্রুয়ারি পৃঃ ৮৬

সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থই তিনি তাঁর জাতীয় ভাষায় রচনা করে গেছেন। তাঁর সেই সচিত্র সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত গ্রন্থাবলী তিনি রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও 'বৌমা' প্রতিমা দেবীকে স্বাক্ষর ক'রে উপহারও পাঠিয়েছিলেন। এ সব রবীন্দ্রসদনে সমাদরে সুরক্ষিত আছে। "Feuilles de L' Inde" সিরিজের প্রথম সংকলনগ্রন্থ "L' Inde et son Ame"—এর উপহারের পাতাটিতে এই কথা ক'টি আঁদ্রের হাতে পেনসিলে লেখা রয়েছে :

Chitra 1928.

To our beloved Gurudeva with the deepest gratitude and veneration from the editor and engraver his devoted chelas who wish L' Inde et son Ame to be a small stone added to the big monument built by universal admiration.

Dal and Andrée.

বোমা রোঁলাদের সঙ্গেও আঁদ্রেদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কিত উক্ত সিরিজটি সম্পাদনায় রোঁলা ও মেদেলিন রোঁলা উভয়েই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপর রোঁলার একটি প্রবন্ধও এই সিরিজের একটি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং মেদেলিন রোঁলা কৃত গান্ধীজী, আনন্দকুমার স্বামী, ডাঃ দীনেশ সেন, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, শান্তা দেবী ও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নানা রচনার অনুবাদ গ্রন্থ আঁদ্রেদের 'চিত্রা' পাবলিশিং থেকেই প্রকাশিত হয়েছে।

গোড়ার কথাটুকু এই : আঁদ্রের পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী, জাতিতে ইহুদী ফরাসী ; দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে কফির ব্যবসায় সূত্রে তাঁর যোগ ছিল। আঁদ্রের দু'বোন ছোটবেলাতেও একবার ভারতবর্ষ বেড়াতে এসেছিলেন। ছোটো বোন সুজান (Suzanni) প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌, ঐতিহাসিক প্রাণী-বিশেষজ্ঞ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভাষাবিদ। বহুকাল তিনি ইন্দোচীনে ছিলেন। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থেকেও তিনি কিছুকাল কাটান ; সম্প্রতি আছেন পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে।

নোবেল প্রাইজ পাবার পর ১৯২০ সনেই প্যারিসে আঁদ্রেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। তখন কবি প্যারিসের প্রসিদ্ধ ধনী ও সংস্কৃতি-পূজারী কাহ্‌নের (Mr Kahn) অতিথি হয়ে বাস করেছিলেন তাঁর শহরতলীর সুরম্য বাগান-বাড়ীতে (Autour du monde)। সেখানে প্রতিবেশী ছিলেন আঁদ্রেরা। তখন দুই পরিবারে খুব মেলামেশা চলে। তারপরে বিশ্বভারতী স্থাপিত হলে, ১৯২৩ সনে 'শিল্পসদন'-এর ভিত্তি গড়েছিলেন এই মহিলাশিল্পী, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে মিলে। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন, (১৯২৩) "মাদাম কার্পেলিস আসিলেন কলাভবনে। তিনি কলা ও শিল্পকে সমন্বিত করিবার পরিকল্পনা জোগাইতেছেন।" (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃ: ১১৭)।

কার্পেলেসের সহিত ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বহুকালের। কলাভবনের সহিত তিনি কিছুকাল যুক্ত ছিলেন ; উহার অন্তর্গত 'বিচিত্রা' নামে কারু-সংঘ তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়।" (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১)।

১৩২১ সাল। "বিদ্যালয় এখন নানা কাজকর্মে মুখর।·· বিশ্বভারতীর কর্মস্রোত নূতন নূতন ধারায় ধাবিত হইতেছে।··" শান্তিনিকেতনে তখন মনস্বিতার বিচিত্র রূপ।"—সত্যই উদ্দীপকর বিনটারনিজ, বেনোয়া, লেসনি, বগদানফ, ক্রামরিশ, ফ্রমিউম ইত্যাদি বহু গুণী জ্ঞানীর আগমনে আশ্রমে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-কাল জেগে উঠেছে। কলাভবনেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেখানে মুখ্যত ভারতীয় শিল্পের চর্চার আয়োজন ক্রমপরিণতি লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ এসব দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষয় তখন থেকেই (৭-১২-১৯৫৬) দূরদৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল—সে হচ্ছে শিল্পের ব্যবহারিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা। তিনি বলেছিলেন, শোভন সূক্ষ্ম চারুশিল্পের অনুশীলন চাই ; কিন্তু সাধারণ লোকের নিত্য ব্যবহারের জিনিসেও শিল্পের যোজনা করতে হবে ; এজন্য বিশ্বভারতীতে কারুশিল্পেরও আয়োজন থাকা দরকার। সে-সব শিল্পসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রীর ব্যবস্থা এবং তার থেকে শিল্পীদের উপার্জনের পথ কিছু না করে দিলে চলবে না। কারণ জীবিকার জোগান না পেলে গ্রামের শিল্প ও শিল্পীদের টিকে থাকা শক্ত হবে। গ্রামাঞ্চলের প্রাচীন শিল্পের মধ্যে যে মহৎ ব্যঞ্জনা বর্তমান, তার মর্যাদা-প্রসারের দিকেও কবির আগ্রহ ছিল পূর্বাপরই। এইদিকে তাঁর প্রবণতা বহুকালের। বিশেষ ক'রে 'মেয়েলি শিল্প' ও 'গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্যে'র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ অন্বেষণে তিনি যে নানাসময়েই ব্যাপৃত ছিলেন, নিম্নের পত্রখানিতে তা স্পষ্টই বোঝা যায় :

"চাটগাঁ অঞ্চলে 'মেয়েলি শিল্প' যা কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন ? ওরা লক্ষ্মী পূজা, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন ? খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালীর শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই—চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়ে ঘর আছে, তার ফোটো বা অন্য কোনো রকমের প্রতিকৃতি। আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবে না। ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কি রকম চলিত আছে, ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন। আপনার স্ত্রীকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন—তিনি এই সংগ্রহকার্যে যেন আমার আনুকূল্য করেন।—ইতি, ১লা পৌষ, ১৩২২।" (২)

যা হোক, এই নবপর্বে বিশ্বভারতীতে বিশ্বের বিবিধ সংস্কৃতিচর্চার মহার্ঘ সমাবেশের পাশে কারুশিল্পেরও প্রবর্তন বিষয়ে কবির চিন্তাধারা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে কার্যারম্ভেরও সুযোগ উপস্থিত হল এই মাদাম কার্পেলেসের আগমনে। কার্পেলেস চিত্রে একজন সুদক্ষ শিল্পী, লাক্ষাশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠখোদাই, বই বাঁধাই, খেলনা তৈরী প্রভৃতি বহু কাজেই তাঁর কৃতিত্ব ছিল। আর একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন কবিপুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী। দু'জনে মিলে তাঁদের

২ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩ কার্তিক-পৌষ, পৃঃ ১৪।

নবোদ্‌ঘাটিত কর্মবিভাগটির জন্য অবনীন্দ্রনাথের নিকট একটি নাম প্রার্থনা করেন। অবনীন্দ্রনাথই নাম দেন "বিচিত্রা"। এখন যেখানে বিশ্বভারতীর আ'লো ও জল সরবরাহের অফিস রয়েছে, তারই সংলগ্ন ঘরগুলিতে এই বিভাগের কাজ সুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণে ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসম্মত আধুনিক রুচিকর কারুশিল্পের উন্নতি ও প্রসার এবং শিল্প ও শিল্পীদলকে ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে সংগঠিত ক'রে প্রত্যেকের জীবিকারও কিছু সংস্থান করে দেওয়া ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। সেবার পৌষমেলাতেও এ বিভাগ থেকে হাতের কাজের বিচিত্র শিল্প-নিদর্শনগুলি প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়েছিল। অনেক অধ্যাপক এ বিভাগে বই বাঁধতে গিয়েছিলেন; অতিথিশালাতে এঁদের প্রদর্শনী বসেছিল। শিল্পী ও গ্রামীণ কারিগরদের মধ্যে যোগস্থাপন করে পরস্পরের পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা। বিনিময়ের ব্যবস্থা ক'রে দুয়েরই শিল্পবোধ ও শিল্পরচনাকে এঁরা সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নানা ধরণের খেলনা, ব্যাগ, কাঁথা, কুশন, বইয়ের মলাট, জামা কাপড়, আসবাব পত্র, ঘরের দেয়াল—সব কিছু জিনিস অলংকরণের দ্বারা সুদৃশ্য করে তোলা এবং সহজে ব্যবহারোপযোগী ও মজবুত ক'রে তৈরি করা।—এজন্য কামার, কুমোর, ছুতোর ও তাঁতিদের সহযোগিতায় বেত, চামড়া, কাঠ, সুতা ও পশমের কাজ, লাক্ষার কাজ, সজে সেলাই ও আলপনা প্রভৃতি নানাবিধ কুটিরশিল্প চর্চার আয়োজন হয়, ইলামবাজার থেকে আসেন লাক্ষার কাজের কারিগর; তাঁর কাছে শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—এঁরা দুজনে তখন কিছুদিন লাক্ষাশিল্পও চর্চা করেছেন। সপ্তাহে মঙ্গলবার বিকালে এ বিভাগের কর্মী ও শিল্পীদের একটি নিয়মিত চা-পান সভার বৈঠক হত—এ সবই তৎকালীন শিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণের নিকটে শোনা।

কেবল শহরের রুচি ও বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়,—গ্রামের লোকের মধ্যেও যাতে এ নিয়ে সাড়া জাগে, তাদের জীবনযাত্রাও যাতে শিল্পের সৌকুমার্যে সুন্দর হয়ে ওঠে, কবির এই অনুপ্রেরণাটি সর্বদাই এর পিছনে কাজ করেছে; তাঁর গণসংযোগের প্রবণতাযুক্ত ইচ্ছাটিকে কার্যকরী করে তুলতে "বিচিত্রা"র বিচিত্র আয়োজন করেছিলেন তার প্রতিষ্ঠাত্রীদ্বয়। কলাভবনের মূলে যেমন আচার্য নন্দলালের, তেমনি শিল্পসদনের মূলে এঁদের দান স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র রচনাকাব্যের এক একটি অধ্যায় এই রকমই এক একটি জীবনের পাতায় আরো কত স্থলে কত লেখা রয়েছে।

১৩২১ সনের 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় মাদাম কার্পেলেসের ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'Vichitra' নামক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তাতে 'বিচিত্রা'-বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি সুন্দর ক'রে ব্যক্ত করেছেন। এদেশে সুচারু কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রবর্তনায় ও কারুশিল্পীদের সংগঠনের কাজে বিশ্বভারতীর একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। এর মূলে আছে প্রত্যক্ষভাবে এখন শ্রীনিকেতনের 'শিল্পসদন'। কিন্তু সেদিনের 'বিচিত্রা'-ই যে স্থানান্তরিত ও নামান্তরিত হয়ে 'শিল্পসদনে'র মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে এ-কথা বোধ হয় অল্পলোকেই জানেন।

সুচনা ক্ষুদ্র ছিল বলেই তাকে উপেক্ষা করা চলে না। বরং এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই একজন বিদেশিনী মহিলার মহতী উদ্ভাবনা ও সুদূর উদ্যোগের কাছে দেশবাসীর কৃতজ্ঞ বোধ করবার কারণ ঘটবে। আরো বিস্ময় জাগবে, যখন দেখা যাবে, সেদিনের আঁদ্রে-লিখিত 'Vichitra' প্রবন্ধটির মধ্যে যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা দেওয়া রয়েছে, 'শিল্পসদনে'র পরবর্তী উদ্যোগগুলিও তারই প্রসারণ মাত্র, তাকে ছাড়িয়ে আজো অভিনব একটা কোনো নূতন পথে বেশি কিছু অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। এজন্য আঁদ্রের সে লেখাটির সঙ্গে শিল্পকর্মীদের বিশেষ করেই আরো পরিচিত থাকার আবশ্যকতা আছে। সেটি পড়লে ধারণা পরিস্ফুট হবে, সেই সঙ্গে আর একটি বিষয় দেখে আমাদের আনন্দও হবে। আঁদ্রের মতো একজন বিদুষী শিল্পবিশেষজ্ঞা তাতে লিখছেন:

"No country in the world has had such a rich past in the field of popular art as India, and she must not be deprived of one of her most precious treasures. In no other country have the simplest people understood so clearly that "a thing of beauty is a joy for ever."

ভারতবর্ষকে কত ভিতরের থেকে তিনি জেনেছিলেন এবং কী শ্রদ্ধা করতেন, এই ক'টি পংক্তিতে তাঁর সে গভীর উপলব্ধি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যশিল্পপদ্ধতি সম্বন্ধেও সেখানে আলোচনা করতেন। বিশেষ ক'রে অয়েল ও ওয়াটার কালারের কাজ তিনি দু'একজনকে শিখিয়েও ছিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে ফেরবার পথে ডাল হগম্যান নামে জনৈক সুইডিস ব্যবসায়ীর সহিত আঁদ্রের পরিচয় হয়। দেশে ফিরে তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। পরে দু'জনে মিলে ফ্রান্সেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানে নিজেদের আবাসে তাঁরা একটি প্রকাশনা-বিভাগ স্থাপন করে বাকি জীবন শিল্প-আলোচনা, নানা অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ, চিত্রাঙ্কন, বইয়ের মলাট অলংকরণ ও কাঠ খোদাই প্রভৃতি বিচিত্র কাজে নিরত থাকেন।

শান্তিনিকেতনের কারুশিল্পবিভাগের পূর্বতন 'বিচিত্রা' নামটি তাঁদের এতই পছন্দ হয়েছিল যে, স্বগৃহে স্থাপিত পাবলিশিং বিভাগের নামকরণ করেছিলেন তাঁরা—'চিত্রা'। কবির সঙ্গ লাভ ও সেবার সুযোগ গ্রহণে এর পরেও আঁদ্রে তৎপর ছিলেন। ৩০শে মে (১৯২৬) কবি যখন ইতালি ভ্রমণে যান সে সময় তাঁর জাহাজ নেপলসে পৌঁছলে মিঃ এলমহার্স্টের সঙ্গে আঁদ্রেও এসে কবির সঙ্গে মিলিত হন। সেই দিনই স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের রোমে নিয়ে যাওয়া হয়। (দ্রঃ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৮৭)।

কবিও তাঁর পরিবারের লোকজনদের বিদেশ ভ্রমণকালে কিংবা ফ্রান্সে কবির নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সম্পর্কে, এই স্নেহাস্পদা মহিলা ও তাঁর স্বামীর সাহায্য ও পরামর্শের উপর নির্ভর করেছেন। প্রতিমা দেবীকে তিনি লিখছেন,—"তুমি যে একদা বলেছিলে আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার প্রমাণ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে—ভারি আশ্চর্য ঠেকচে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া [ভিক্টোরিয়া ও'কাম্পো] যদি

না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক মন্দই হোক কারো চোখে পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল যা ভালোই ছবির প্রদর্শনী আপনিই ঘটে—অত্যন্ত ভুল। এর এত ভ্রাট গত আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য—আঁদ্রের পক্ষেও। প্রচুর কষ্ট স্বীকৃতি—চিন্তার খোঁচা পাইতে হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ঢালছেন। এখানকার মস্ত বড়ো বড়ো গুণী-জ্ঞানীদের ও ধনী লোকদের ভিড় জমিয়েই তারা আছে। Comtesse de Noailles উৎসাহের সঙ্গে লেগেছেন—এমনি করে দেখতে দেখতে চারদিক সরগরম করে তুলেছে। আজ বিকেলে প্রথমে হাবোল্লাটির হবে—তারপরে কি হয় সেইটেই দ্রষ্টব্য। যাই হোক এখানকার পালা সাঙ্গ হলে ছবিগুলি যাতে করে কী করতে হবে ভেবে পাই নে। আজ [আঁদ্রের স্বামী জাল হগ্‌ম্যান] বলছে সুবে জাহাজে একবার তাড়াই করা যাবে, সেখানেও একটা গোলমাল হতে পারে।" (চিঠিপত্র, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৫-১৬)

একবার (১৯৫৫) প্যারিসে আঁদ্রেদের গৃহে কবির পুত্র এবং পুত্রবধূ ক'দিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কবির চিঠিপত্র গ্রন্থের ২য় (পৃঃ ১০০), ৩য় (পৃঃ ৭১, ৯৫, ১১১) ও ৪র্থ (পৃঃ ১২৩, ১১৬, ২১৪) খণ্ডের চিঠিগুলি এসব সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। তার একখানিতে কন্যা মীরা দেবীকে কবি লিখছেন,—"পুপেকে (৩) নিয়ে বৌমা প্যারিসে আঁদ্রেদের বাড়িতে আছেন।" (চিঠিপত্র, ৪র্থ পৃঃ ১২৩) আরেকখানিতে কবি তাঁর বিদেশভ্রমণরতা পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখছেন,—"আঁদ্রেকে বোলো, কল্পনা করছি তোমরা তার ভালোবাসা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করছ— দূর থেকে আমি কেবল ঈর্ষা করে মরছি। কোনোদিন আমার অদৃষ্টে যে এই সৌভাগ্য ঘটবে, সে আশা করিনে—সময় পেরিয়ে গেছে।···আঁদ্রে-দম্পতিকে আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানাবে।···৮।৩।৩৫"—চিঠিপত্র ৩য় পৃঃ ১১১।

আঁদ্রেকে শিল্পীরূপেই লোকে জানে, কিন্তু ফরাসী সাহিত্যেও তিনি একজন সুলেখিকা ছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সে-সাহিত্য তিনি যে কেবল পড়েছিলেন তাই নয়, কবির একাধিক গ্রন্থ তিনি অনুবাদও করে গেছেন। আঁদ্রে কৃত রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলী অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির ফরাসী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য :—

রবীন্দ্র-সাহিত্য : ফায়ার ফ্লাইজ (১৯৩৫, যুক্ত গ্রন্থকর্ত্রীদ্বে)
চিত্রা (১৯৪৫, 'অমৃতা' ছদ্মনামে)
লিপিকা (১৯৪৬)
বিদায় অভিশাপ
চিত্রাঙ্গদা
ছেলেবেলা (১৯৫০, শেষ অনুবাদগ্রন্থ)

অবনীন্দ্র-সাহিত্য : ভারতশিল্পে মূর্তি (১৯২১)
ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ (১৯২২)
শকুন্তলা (১৯৩৭)

শ্রীরের পুতুল (১৯৫০)
বাংলার আলপনা ও অলংকরণ রীতি সম্বন্ধে নানা রচনার সংগ্রহ (কমলমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে)

এ ছাড়াও 'Feuilles de L' Inde' সিরিজের প্রথম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আচার্য জগদীশ বসু ও শ্রীঅরবিন্দ রচিত প্রবন্ধাবলীর অনুবাদ প্রকাশ প্রায় কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগের ধারা বোধহয় বহুমাত্র ছিল। শান্তিনিকেতনের স্কুলবিভাগ 'পাঠভবনে'র ছাত্র-ছাত্রীদের রচনা সংকলনে ও তাদেরই আঁকা চিত্রে পরিভূষিত হয়ে 'আমাদের লেখা' নামক একখানি বার্ষিকী প্রতিবছর নববর্ষের দিনে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার একটি সংখ্যা মাদাম আঁদ্রেকে প্রীতি উপহারস্বরূপ একবার পাঠানো হয়েছিল। তিনি এই অনুরাগের নিদর্শন পেয়ে শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ অনুভব ক'রে একখানি সুদীর্ঘ পত্র দেখেন। তাঁর গভীর আনন্দের আন্তরিক স্পর্শটি পত্রের প্রতি ছত্রে মাখা না আছে। তাতে একস্থলে তিনি লিখছেন,—I think India, and specially Bengal, is still civilized enough not to crush the divine childish impulses, or on all accounts your Santiniketan is the really suitable garden in which those fragrant flowers, those slender grasses, can grow and prosper and go on progressing and growing yet preserving all the freshness and eternal promise of the buds just as it did, and is to be seen in Abandada's works, writings and paintings, in Rathindranath's art and crafts." (৪) শান্তিনিকেতনের সহজাত শিল্পবোধ ও রেখাবিন্যাসাদির স্বচ্ছন্দ পদ্ধতি আঁদ্রের খুবই ভালো লেগেছিল, তা উদ্ধৃত মন্তব্যেই বোঝা যায়। এত করে বলার একটি কারণও তখন ঘটেছিল। বার্ষিকীটির কপিখানি তাঁর হাতে গিয়ে যখন পড়ে, ঠিক তখনি তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর এক তরুণী ছাত্রীকে নিয়ে। ছাত্রীটি ছবি এঁকে এনেছিলেন, তিনি তা দেখে দিচ্ছিলেন। ছাত্রীটি খুব খেটে যা করবার সবই করেছিলেন, বাকি ছিল একটি জিনিস—ছবিতে প্রাণ আনতে পারছিলেন না। একটা আড়ষ্টতার ছাপ লেগে রয়েছিল সবখানেই। মুশকিল হচ্ছিল,—জিনিসটা তাঁকে বোঝানো যাচ্ছিল না কিছুতেই। এমন সময় হাতের কাছের 'আমাদের লেখা' আঁদ্রেকে কলকাঠির কাজ করে দিল। তিনি সেখানি খুলে ভিতরকার ছবিগুলি একে একে ছাত্রীটিকে দেখাতে বললেন। দেখতে দেখতে মেয়েটি এবার হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে বলে উঠল, বুঝেছি, আর অসুবিধে হবে না। সিসেমের দোর খুলে গেল। আঁদ্রে লিখেছেন, সেদিন আঁকার রহস্য ধরিয়ে দিতে আর বেগ পেতে হল না, সহজেই সব চুকল। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন আঁদ্রের কাছ থেকে আঁদ্রেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দশখানি পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হয়েছেন। কবির একখানি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন এই মহিলাশিল্পী;

৩ কবি-পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনী দেবী। 'পুপে' নামটি আঁদ্রের দেওয়া। ফরাসীতে পুপে মানে খুকু।

৪ দ্রঃ বিশ্বভারতী নিউজ ১৯৫২ নভেম্বর পৃঃ ৪২।

শান্তিনিকেতনের পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতালকক্ষে সেখানি অদ্যাবধি টাঙানো আছে।

কবি-কৃতির নিদর্শনও আছে আঁদ্রের বহু রচনায়। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীত একটি স্বরচিত কবিতা মূল ফরাসী থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে সুসজ্জিত একটি পটে লিখে তিনি পাঠিয়েছিলেন, রবীন্দ্রসদন থেকে সংগ্রহ করে তারই একটি অনুচ্ছেদ নিম্নে সংকলিত হয়ে দেওয়া গেল:

"In the mould of his limitless genius all different
arts become one,
he paints with words and plays with colour,
he draws with rhythm and dances with thoughts,
he builds with dreams and teaches with silence;
his lines are philosophy, his ideas sculpture,
Unveiled by Him, Death's mysterious image
reveals her misunderstood beauty.

Gurudeva; interpretor of Love's mystery and of nature's secret." (৫)

সন্দেহ নেই, আঁদ্রের বিয়োগে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া একজনকে হারানোর ব্যথাই অনুভব করেছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, তপনমোহন প্রভৃতি তাঁর এদেশের বন্ধুগণ, কিন্তু সে সঙ্গে ভারতবর্ষ তার আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যবৃদ্ধির পথে একান্ত সহায়ক একটি সুন্দর সুকোমল সূত্রের সংযোগ বঞ্চিত হয়েছে একথাও ভুলবার নয়। শুধু রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথই নয়, সে সঙ্গে ভারতের আরো এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরাগ ছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণে শোকাতুরা আঁদ্রে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন:

"You must all be upset about it—and we want you to know that every wave that upset your Indian ocean comes and beats upon the shore of our mediterranean and that the echo of these waves is repeated in our hearts. His influence and the one of Gurudeva will increase as centuries pass by, just like the influence of christ and other prophets (৬) রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এই দুই জনকে আঁদ্রে জগতের ধর্মগুরুর আসনে বসিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি এতই মহৎ জানতেন।

ভারতের কবি, শিল্পী ও কর্মীর প্রাণ আঁদ্রের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ভারত ও ভূমধ্যসাগরের ব্যবধান ভুলিয়েছিল। আঁদ্রের কথাগুলি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের আরেকদিনের কথা; "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল-বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক্। সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক, সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্ত একটি মাত্র দেশ আছে সে বসুন্ধরা, একটি মাত্র দেশ আছে সে হচ্ছে মানুষ।" (৭) এই মানুষের মেলামেশার কাজই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। বলেছিলেন ঐ পত্রেই, "আমাদের শান্তিনিকেতন পৃথিবীর উদয়গিরির কাছে, সেখানে আমি অস্তগিরির লোকদের নিমন্ত্রণ করেছি। তারা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। তাদের বরণ করে নেবার জন্তে তোমরা তোদের প্রশস্ত কর—হৃদয়কে উন্মুক্ত কর...। ১১ই ডিসেম্বর ১৯২০।"

কবির আটাশ বছর আগেকার এই কথার পরে আঁদ্রের কথাগুলি যথাযোগ্য সাড়ার মতোই ধ্বনিত হচ্ছে না কি? শান্তিনিকেতনে তিনি এসেছিলেন; বিদেশস্থ কবির মানুষ তিনি মনের মতো সাধনার বিষয়ের সন্ধান পেয়ে তাঁর চৈতন্যকে ও সৃজনশীল ভাবে ও কর্মে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন। ঘরে ঘরে আছে যে পরমাত্মীয়, দেশকালের ব্যবধানকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, দেখা দিয়েছিল সেই সত্য এঁদের পরস্পরের মধ্যে, আঁদ্রের জীবনধারায় মানুষে মানুষে অন্তর্নিহিত এই একটি শাশ্বত সম্বন্ধের সহজ বিকাশের সাক্ষ্য নিহিত আছে—সে সাক্ষ্যকে রবীন্দ্রনাথের 'মানব সত্যে'র সাক্ষ্য-পর্যায়ে ফেলা চলে বললে অত্যুক্তি হবে না। ফরাসী ভাষায় অনুবাদের সাহায্যে ফরাসী দেশের ও সমগ্র পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পসংস্কৃতির যোগ-সাধনের সূত্রপাত করে তিনি যে মহৎ কাজ করে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম।

আঁদ্রের শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার দিনে তাঁর উদ্দেশে কবি একটি গান লিখেছিলেন। তিনি তখন কোনার্ক-বাসী। পাশের অধুনালুপ্ত খড়ের (চাতাল মাত্র অবশিষ্ট) 'মৃন্ময়ী' গৃহে থাকতেন প্রতিমা দেবীরা। আঁদ্রের বিদায় উপলক্ষে বিকালে টি-পার্টি হয় তারই পিছনদিকের প্রাঙ্গণটিতে। সকালে গানটি তৈরি হয়েছিল। বিকেলে টি-পার্টির পরে আঁদ্রের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর অটোগ্রাফ খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে লিখে দিলেন কবি স্বকৃত ইংরাজি অনুবাদ সহ নিম্নোদ্ধৃত এই পংক্তি ক'টি,—(৮) প্রবাসীতে ১৩৩০ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ: ২০২) এই ভাবে তা মুদ্রিত হয়েছে 'বিদায়' শিরোনামে:

বিদায়
(গান)

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি ।।
বিষাদের অশ্রুজলে নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে হৃদয়ের নূতন বাণী ।
যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা
নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোক রেখা।
সারাদিন সংগোপনে সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি ।।

---

৫ রবীন্দ্র সদনের সংগ্রহ।

৬ বিশ্বভারতী নিউজ ১৯৪৮ মার্চ পৃ: ১০৬।

৭ শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা পৃ: ২৮৩।

৮ শান্তিনিকেতনে আঁদ্রে বেশিদিন ছিলেন না—বছর খানেক। গানটি রচিত হয় ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩০। দ্র: শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত রবীন্দ্ররচনা সূচীর খসড়া পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রসদন। ঘটনাটি শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী কর্তৃক কথিত।

শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শ্রীঅরবিন্দ
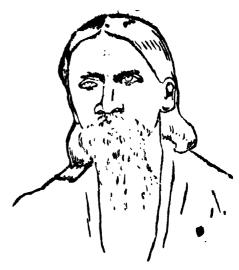
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের আলোচনা একসঙ্গে করার বিশেষ সার্থকতা আছে। এঁদের পরস্পরের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল, শুধু তাই নয়, নানা বিষয় এঁদের মত ও বিচারের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। যদিও কয়েকটি মৌলিক ব্যাপারে, যেমন অধ্যাত্ম-মূল্যবোধ, দিব্যমানবতা বাদ (divine humanism) প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা, গণতন্ত্র বিশ্বাস ইত্যাদিতে ভারতের সমস্ত আদর্শবাদী মহামনীষীর মধ্যেই মূলগত ঐক্য দেখা যায় তবু রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে মিল অতি নিবিড় এবং খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই তা প্রকট। এঁরা দুজনেই প্রাচীন ভারতের শুধু অধ্যাত্ম-সমাজের দিকটাতেই দৃষ্টি দেন নি, তার শিল্প-সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সুসমৃদ্ধ ঐহিক জীবন এগুলোও সমানভাবে তাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। সন্ন্যাসকে তাঁরা দুজনেই নিন্দা করেছেন, সংসারকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ হিসাবে জেনে ব্রহ্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়ে সমৃদ্ধ ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন রচনার প্রেরণা তাঁদের। গভীর স্বদেশানুরাগ সত্ত্বেও বিজাতি-বিদ্বেষ এঁদেরকে আদৌ স্পর্শ করেনি। বিদেশী দ্রব্য পুড়িয়ে নষ্ট করা রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি; শুধু জাতীয় স্বার্থে বিদেশীকে হঠাবার চেষ্টাকে শ্রীঅরবিন্দ collective egoism বলে গণ্য করেছেন; প্রতিটি জাতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের মধ্যে দিয়ে নিজের সম্ভাবনাকে বিকশিত করবে এবং এভাবে সমগ্র বিশ্বজীবন ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠবে এটাই ভগবদ-বিধান —এই প্রতীতিতেই শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষণের জন্যে বাইরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে যে জাতির আত্মপ্রস্তুতি দরকার—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় দরকার সেকথা উভয়েই জোরের সঙ্গে বলেছেন ('বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এত বড় অহিত আর কিছু নেই'—রবীন্দ্রনাথ) সাহায্যদান বাইরে থেকে গিয়ে উপকার করা দুজনেরই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বহির্ভূত, মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে, ভিতরের শক্তিকে মুক্ত করতে প্রেরণা দিতে হবে এই মাত্র। শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ দুজনেই সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনধর্মিতার দিকে জোর দিয়েছেন, অবশ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য ও নীতির সামঞ্জস্যও তাঁরা চেয়েছেন। পশ্চিমের জীবনবাদে দু'জনেই মুগ্ধ, বিজ্ঞানের দানকে সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক হিসাবে তাঁরা দেখেছেন, বিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক যান্ত্রিকতা, প্রাণহীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে অসচেতন না থেকেও তাঁরা বিজ্ঞানকে অধ্যাত্ম-মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গত করে নেওয়া যায় বলে মেনেছেন, দীন গ্রামীণ জীবনের পরিকল্পনা তাঁদের নয় যদিও গ্রামোন্নয়নের গুরুত্ব তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছেন।

উভয়ের মধ্যে এত মিল অথচ একথা বলার উপায় নেই যে কেউ কাউকে প্রভাবিত করেছেন। দু'জনের জীবন বিকাশের ধারা স্বতন্ত্র, ফলে এঁরা কাছে এলেও পরস্পরকে প্রভাবিত করেন নি। শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, "Tagore has been a wayfarer towards the same goal as ours in his own way—that is the main thing, the exact stage of advance and putting of the steps are minor matters." উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ, আমাদের বুদ্ধির অতীত কিছুর ইঙ্গিত এর মধ্যে থাকতে পারে। তবে সহজদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে মিলের মূল নিদান দেখতে পাই তাঁদের কবিত্বে। রবীন্দ্রনাথ ত' বলেইছেন কবিত্বই তাঁর একমাত্র পরিচয়—"My religion is essentially a poet's religion." শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"I am a poet first, everything else afterwards." দু'জনের কবিধর্ম ও কাব্য সম্পর্কে তাঁদের ধ্যানধারণার খোঁজ কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে নিতে হয়। তার আগে অন্য একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বলে নিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের এগার বছর পরে ১৮৭২ সালে (১৫ই আগষ্ট) শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয় কলকাতায়? শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু মহর্ষির বন্ধু ছিলেন, এই বৃদ্ধবালকের সাহচর্য রবীন্দ্রনাথও পেয়েছেন ছেলেবেলায়। স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই পুরোভাগে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণমাতানো গানে ও ভাষণে এবং শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিময়ী বাণীতে দেশে অদ্ভুতপূর্ব

সাড়া জেগেছিল। শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রীতি, ত্যাগ, ধৃতি ও মনীষায় মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে (১৯০৭ সাল) বিখ্যাত নমস্কার কবিতাটি লেখেন :—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।"

···কবি স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শুনিয়েছিলেন অন্তরের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি। আবার অনেক দিন পরে, ১৯২৮ সাল, রবীন্দ্রনাথ গেলেন দক্ষিণ ভারত পর্যটনে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে তিনি একখানি পত্র পাঠালেন, সানন্দে শ্রীঅরবিন্দ সম্মতি জানালেন। একখানি ষ্টীমারে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরী এসে পৌছলেন। আশ্রমের সেক্রেটারী ষ্টীমারে গিয়ে কবিকে স্বাগত জানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন আশ্রমে। দু' বছর আগে থেকে শ্রীঅরবিন্দ একান্তবাস নিয়েছিলেন, বছরে শুধু তিনবার তিনি বের হতেন ভক্ত ও অনুরাগীদের দর্শন দেবার জন্যে। শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দরজায় আশ্রমের কর্ত্রী শ্রীমা কবিকে অভ্যর্থনা করলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের কাছে নিয়ে গেলেন। এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে কথাবার্তা কি হয়েছিল জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ জাহাজে ফিরে এসে বাকী দিনটা অত্যন্ত গম্ভীর ও স্তব্ধ ভাবে কাটালেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা একটি দীর্ঘ রচনায় প্রকাশ করলেন। ওটি Modern Review-তে জুলাই মাসে ছাপা হয়েছিল। খানিকটা খানিকটা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ থেকে উদ্ধার করা যাচ্ছে—বন্ধনীর মধ্যে মূলের অংশবিশেষও দেওয়া গেল :

"অনেকদিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখব। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল ···প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েওছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে : ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন।···মনে হল তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত, তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা।···আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন : যুক্তাত্মান: সর্বমেবাবিশন্তি :···আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে : শৃণ্বন্তু বিশ্বে—I said to him "you have the word and we are waiting to accept it from you. India will speak through your voice to the world, 'Hearken to me'."

"অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায় আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

'To-day I saw him in a deeper atmosphere of a reticent richness of wisdom and again sang to him in silence, 'Aurobindo, accept the salutation from Rabindranath'.

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন, সর্বত্রই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর The Renaissance In India বইয়ে বাংলার নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথের উচ্চস্থান ও গুরুত্বপূর্ণ দানের কথা বলেছেন,—একটি বাক্য : (রবীন্দ্রনাথ) "released the real soul of Bengal into expression." Karmayogin পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখাভিসার' কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধির অনধিগম্য দৈবী প্রেরণার কথা বলেই বলছেন, "And of this unattainable force the best lyrics of Rabindranath are full to overflowing." চিঠিপত্রে অনেক জায়গায়ই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে তিনি যুক্তি দিচ্ছেন ও তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাধুর্য তুলে ধরছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Future Poetry গ্রন্থে জগতের কাব্যরাশির আলোচনা করে তুলে ধরেছেন 'তার ক্রমস্ফূর্ত ক্রমস্ফুট ছবি, কোন পরিবর্তন ও পরিক্রমার পথে সে চলেছে, তারপরে উত্তীর্ণ হবে নবযুগের কোন প্রভাতী মন্ত্রে, কোন অধ্যাত্মচেতনার অনাস্বাদিত অপরূপ স্বপ্নে।' তাঁর বিচারে ভবিষ্যতের কাব্য হল মন্ত্র, যাতে গভীরতম অধ্যাত্মদৃষ্টি ও সার্থকতম প্রকাশের সমন্বয় ঘটবে। (প্রাচীন ভারতে কবি ও ঋষি একার্থবাচক ছিল, অপৌরুষেয় প্রেরণালব্ধ কবিতাখণ্ডগুলিই মন্ত্র নামে চলে এসেছে।) ঐ মন্ত্র রচনার দিকেই কাব্যের গতি। আধুনিক কবিদের মধ্যে Whitman, Yeats, A. E. Meredith, Carpenter ও আরও অনেকের মধ্যে এই প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র আকস্মিক অসাধারণ খ্যাতির মূলেও রয়েছে এই সত্য যে, যে জিনিসের জন্তে যুগ-চেতনায় আকুতি জেগেছিল, যাকে অন্যান্য শিল্পীরা ধরতে বা প্রকাশ করতে পারছিলেন না তার অতি স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটল রবীন্দ্রনাথের কবিতায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যতের কাব্যের প্রথম নিশ্চিত আগমনী শুনলেন।

"The poetry of Whitman and his successors has been that of life, but of life broadened, raised and illumined by a strong intellectual intuition of the self of man and the large soul of humanity. And at the subtlest elevation of all that has yet been reached stands or rather wings and floats in a high intermediate region the poetry of Tagore not in the complete spiritual light, but amid an air shot with its seekings and glimpses, a sight and cadence found in a psycho-spiritual heaven of subtle and delicate soul experience transmuting the earth tones by the touch of its radiance. The wide success and appeal of his poetry is indeed one of the most significant signs of the tendency of the mind of the age".

রবীন্দ্রনাথের শুধু কবিতা নয় জীবনেরও মর্ম উদ্‌ঘাটন করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও যোগের মূল কথা হল মানুষেই অভিব্যক্তির শেষ নয়, মনের থেকে ঊর্ধ্বতর একটি চেতনার dynamism নিয়ে অতিমানবের বিকাশ ঘটবে এই পৃথিবীতে; অতিমানবত্বার দিকে অগ্রসর হওয়ার অন্যতম পন্থা হল ঊর্ধ্বের

আলোর সন্ধান ও তাকে নামিয়ে নিয়ে এসে নীচেকার বৃত্তিগুলির রূপান্তর সাধন—জীবনে উচ্চতর ছন্দ আনয়ন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের মূল কথা হল সৌন্দর্য; প্রেমের দৃষ্টিতে সংসারকে দেখে তিনি তার মধ্যে সুন্দরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এই সুন্দরকে তিনি সত্য বলে, আনন্দের উৎস বলে এবং কল্যাণেরও নিদান বলে জেনেছেন। তারই অজস্র প্রকাশ তিনি দিয়েছেন সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, অভিনয়ে, নৃত্যে, সাহিত্যের নানা শাখায়। কিন্তু একে তিনি কাব্যশিল্পেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। দুল প্রাত্যহিক কর্মেও রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। বাঙালীর আদব-কায়দায়, পোষাকে-আশাকে, গৃহসজ্জায় যে বিশিষ্ট সুরুচি প্রকাশ পায় তার পশ্চাতে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথেরই পরোক্ষ প্রভাব। এই ভাবে উর্ধ্বচেতনার আলোকে জীবনের আনাচ-কানাচকেও আলোকিত করে তোলা—এটাই হল পূর্ণযোগের সাধনা—মর্ত্যে অতিমানুষের আবির্ভাবের পথ-রচনা। তাই শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন নবচেতনায় অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে, তাঁর মধ্যে তিনি পেয়েছেন নূতনের প্রথম আভাস, "A glint of the greater era of man's living, something that seems to be in promise." এইজন্যেই বোধ হয় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "Tagore has been a wayfarer towords the same goal as ours in his own way."

কাব্যশিল্প ও কবিত্বের বিশ্লেষণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে বিরোধ নাই কিন্তু পার্থক্য আছে। উভয়ের তত্ত্বদৃষ্টির তারতম্যই বোধ হয় এই পার্থক্যের কারণ; বোধির আলোকে রবীন্দ্রমানস ভাস্বর ছিল, সেই আলো সবসময় সমান উজ্জ্বল না থাকলেও একদম নিভে কখনও যায়নি। গদ্যে বুদ্ধিবিচারের মধ্যেও তিনি নিয়ে এসেছেন বুদ্ধির অতীত কিছু, মনে হয় তাঁর লজিক যেন বুদ্ধির নয় অনুভবের। এই বোধির আলোকেই কবি সুন্দরকে আবিষ্কার করেছেন, সীমার মধ্যে অসীমের স্পর্শ পেয়েছেন। কিন্তু এর চেয়ে উচ্চ উচ্চ স্তরের অধ্যাত্ম অনুভূতি কবির অধিকারে আসেনি বলেই আমাদের ধারণা। কবির নিজের জবানি এই: "I have already confessed that my religion is a poet's religion, all that I feel about it, is from vision and not from knowledge. I frankly say that I can not satisfactorily answer questions about the problem of evil, or about what happens after death. And yet I am sure that there have come moments when my soul has touched the infinite and has become intensely conscious of it through the illumination of joy". (The Religion of An Artist প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ সাল মুইর হেড লাইব্রেরীর Contemporary Indian Philosophy গ্রন্থে।) এই উক্তির মধ্যেই কবির অধ্যাত্ম অনুভূতি স্তরের পরিচয় ও দর্শনের মূলসূত্রটি রয়েছে। অপরপক্ষে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপরিসীম অধ্যাত্ম প্রজ্ঞায় বৌদ্ধ ও হিন্দু উপলব্ধিগুলোর সমন্বয় করেছেন এবং দর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ system দিয়েছেন যাতে ভারতীয় দর্শনের একপেশে অতীন্দ্রিয়-অনুভূতি-নির্ভরতা নেই, অপরদিকে সেই পাশ্চাত্যদর্শনের অতিমাত্রায় প্রাকৃত বিজ্ঞান-নির্ভরতা। ইয়েলফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Frederic Spiegelberg তাই বলছেন, "I shall not restrict Sri Aurobindo's greatness to this age only we have Plato, Spinoza, Kunt and Hegel—but they do not have the same all embracing metaphysical structure, they do not have the same vision."

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সুন্দরই সত্য, বস্তুর সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেলে তার অন্তর্নিহিত সত্যেরও পরিচয় পাওয়া হয়। কাজেই তাঁর মতে খাঁটি সাহিত্যে আমরা শুধু সুন্দর নয় সত্যকেও পাই। শ্রীঅরবিন্দ শুধু উচ্চ অধ্যাত্মভূমিতেই সত্য ও সুন্দরের এই ঐক্য স্বীকার করবেন, নিম্নতর স্তরে প্রাপ্ত সকল পরিচই আপেক্ষিক, ঐ ঐ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণে তা সত্য। তাঁর মতে ব্যক্তি ও বিশ্বসত্তার বহুবিচিত্র স্তর রয়েছে, কবির প্রেরণা নিম্ন ও উচ্চ প্রাণ, মানস, অধিমন, উর্ধ্বমন প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর থেকে আসতে পারে, কাজেই কোন স্তর থেকে পাওয়া পরিচয় যেমন মিথ্যা নয় আবার কোনটাই বস্তুর চরম পরিচয়ও নয়। সৌন্দর্য সম্বন্ধেও একই কথা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমার কাজ আত্মীয়তা কর—ইহা হইতেই সৌন্দর্যসৃষ্টি হইল।" অর্থাৎ শিল্পীর সঙ্গে মনুষ্য বা প্রকৃতির আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই সামগ্র সৌন্দর্যানুভূতি ঘটে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলবেন মানবেতর জীব বা অপরিণত মানুষের মধ্যেও একরকম সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যপ্রীতি দেখা যায়, সেটাই বিদগ্ধ মানুষে এসে পরিমার্জিত লাভ করে, আর তার পূর্ণতর পরিণতি ঘটে চেতনার উচ্চতর স্তরে। কাজেই আত্মিক সম্পর্ক যদিও সৌন্দর্যের মূল তত্ত্ব অনুভব ও প্রকাশ সব স্তরে সমান নয়। প্রেম, মঙ্গল ইত্যাদি সম্পর্কেও শ্রীঅরবিন্দ এজাতীয় ক্রমাভিব্যক্তি ও আপেক্ষিকতার কথা বলেন। এভাবে শিক্ষা সমাজ রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের অনুভূতিতে যা বলে গেছেন তা একটা পূর্ণাবয়ব system-এ স্থান পেয়েছে শ্রীঅরবিন্দের হাতে।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ দু'জনেই কবি, তাঁদের কাব্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। কবি হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ প্রায় অপরিচিত, অপরপক্ষ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, সাহিত্যের সকল শাখায়ই তাঁর হাত সমানভাবে চলেছে, তাছাড়া আছে সঙ্গীত, চিত্র, অভিনয় ইত্যাদি। তাঁরই কল্যাণে বলতে গেল একটি প্রাদেশিক ভাষায় বিশ্বস্তর বেজে উঠেছে। তাঁর সঙ্গে কবি শ্রীঅরবিন্দের তুলনা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বিসদৃশ, কিন্তু সত্যিই তা নয়। প্রায় সকলেই স্বীকার করেন রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি যতখানি উচ্চতা ততখানি নয় এবং শিল্পকর্মে—technique, finish ইত্যাদিতে তিনি নিরঙ্কুশ নন। শেলীর পাঁচটি শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি শ্রেষ্ঠর তুলনায় বরমাল্য শেলীর কণ্ঠেই দুলবে, অথচ সব দিক মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ কত বড়। রবীন্দ্র কাব্যপুরীতে আর একটি বড় অভাব, তাতে মহাকাব্যের ইমারত নেই। এটি মহাকাব্যের যুগ নয় বলে একটা কথা চলিত

আছে কিন্তু সে রামায়ণ মহাভারত ইলিয়ড অডিসি জাতীয় মহাকাব্য যাদের বলা হয় Original Epic. Literary Epic রচিত না হওয়ার কোন কারণ নেই। মধুসূদন খুব পুরনো লোক নন, গোটের ফাউষ্ট ও টমাস হার্ডির Dynasts নাটকাকারে রচিত হলেও মহাকাব্য। একথা মানতেই হবে মহাকাব্য রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মূলত গীতিকবি, তাঁর প্রেরণা lyric. মহাকাব্যের দার্ঢ্য, বিরাটত্ব, সমুচ্চতা, দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ড প্রেরণা কবির অধিগম্য ছিল না, একথা তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি রেখেও আমি বলতে বাধ্য।

শ্রীঅরবিন্দ কিশোর বয়স থেকেই কবিতা লিখছেন এবং তাঁর রচনার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। গীতিকাব্য, কাহিনীকাব্য, নাটক, মহাকাব্য অবিরল ভাবে তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে; অনুবাদক হিসাবেও তাঁর কীর্তি অসাধারণ। কিন্তু তাঁর কাব্যের ব্যাপক প্রচারের বাধা অনেক, অধিকাংশ রচনাই সময়মত প্রকাশিত হয়নি, দ্বিতীয়ত স্থূলভাবে বলতে গেলে ভাষা বিদেশী ভাবচিন্তা ভারতীয়—ইংলণ্ড, ভারত দু'খানেই প্রচারলাভের অসুবিধা। যাহোক আমি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা অতুলনীয় মহাকাব্য Savitri-র কথাই শুধু বলতে চাই। প্রাচীন সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে এ'টি লেখা। কবির প্রেরণা অতীন্দ্রিয় কিন্তু বর্ণিত বিষয় কেবল অতীন্দ্রিয় লোক থেকে আসেনি। বলতে গেলে সমস্ত বিশ্ব-সংসার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ কাব্যের

...vision and revelation of the actual inner structure of the cosmos and of the pilgrim of life within its sphere—Bhu, Bhuvar, Swar; the stairway of the worlds reveals itself to our gaze—worlds of light above, worlds of darkness beneath—and we see also ever-circling life...ascending and descending that stair under the calm unwinking gaze of the Cosmic Gods who shine forth now as of old —শ্রীকৃষ্ণ প্রেম

আদৌ না পড়ে কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি ও কাব্যে দর্শন আছে, অধ্যাত্ম অনুভূতি আছে কিন্তু কবিতা হিসাবে তা কি তেমন হয়েছে?

তাঁদের আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই প্রকাশের উপরেই যে মুখ্যত কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে সেকথা শ্রীঅরবিন্দ ঘুণাক্ষরে ভোলেন নি। সারাজীবন তিনি ছন্দ ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং শিষ্যদের নিকট লেখা অজস্র চিঠিতে প্রকাশের গুরুত্ব ও সমস্যা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। সাবিত্রীকে প্রেরণায় ও প্রকাশে একটা মানের নীচে নামাতে চান নি, তাই বহু বছরের পরিশ্রমে অনেক অনেক পরিবর্তন পরিবর্জনের মধ্যে দিয়ে তাকে বর্তমান আকার দিয়েছেন। কবিতা হিসাবেই এটি অনবদ্য, এযুগে তার তুলনা বিরল; রোমান্টিক কাব্যের অনুষঙ্গ (associations) বর্জন করে তার এ কাব্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে হবে একথা খুবই সত্যি উচ্চতর অনুভূতি থাকলেই কাব্য কিছু উঁচু হয়ে যায় না। ভাবতত্ত্ব ও চিন্তার ঐশ্বর্যে গোটে অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কিছুতেই গোটেকে শেকস্‌পীয়রের সমশ্রেণীর কবি বলে স্বীকার করেন নি। শুধু প্রকাশের দিকটা বিবেচনা করে ও ব্যাপারে শেকস্‌পীয়রের তুলনা না কি একমাত্র হোমর ও বাল্মীকি। তবে একথাও সত্য thought content বা ভাব-চিন্তা-অনুভূতির মাহাত্ম্যও কাব্যকে গৌরবান্বিত করে, সে হিসাবেও 'সাবিত্রী' তুলনারহিত।

সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতাকে সুনজরে না দেখার একটা প্রবণতা আজ কাল দেখা যায়। সে প্রবণতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে না গিয়ে শুধু একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, অধ্যাত্ম সম্পদ ব্যতিরেকে কোন ক্ষেত্রেই মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়—অধ্যাত্ম কথাটি অবশ্য এখানে অনেকখানি ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা হল। চিত্রশিল্পী ও কলারসিক E. B. Havell, যিনি ইবলতে গেলে ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যকে rehabilitate করেছেন, কি বলছেন শুনুন তাঁর 'An open letter to Educated Indians' নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে:

"I have said that is the greatest period of every country's art the spiritual element is always in the ascendant. Art in such periods is speaking with a living voice of the hopes and fears, the joys and sufferings of body and spirit, the strivings and yearnings of humanity. It has its lessons for each and all of us."

হাভেল সাহেব তাঁর 'Indian sculpture and painting' গ্রন্থে আবার লিখেছেন, "The contrast of the profound culture of the ancient Indian Universities with this superficiality and Philistine dogmatism (আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলির) sufficiently explains the altered condition of art in India." Art-এর জায়গায় literature কথাটি স্বচ্ছন্দে বসিয়ে নেওয়া যায় এবং তাতেই ভারতের সাম্প্রতিক সাহিত্যের অবস্থা ও শ্রীঅরবিন্দের কাব্য, সমাজদর্শন, বেদভাষ্য ইত্যাদির সঙ্গে স্বল্পপরিচিতির কারণ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দুই যুগন্ধর পুরুষের তুলনায় আলোচনা আরও অনেক দূর টেনে নেওয়া যায়। আপাতত শ্রীঅরবিন্দের মিশন ও কবির ধ্যানের কথা বলেই শেষ করা যাক্। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা হল দিব্যজীবন রচনা, পৃথিবীতে দিব্যমানব সমাজ বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করা, যে সমাজে অজ্ঞানতা থাকবে না, থাকবে না সেই সঙ্গে তার অনুষঙ্গ সব দুঃখ-বেদনা, হিংসা-দ্বেষ, জরা ব্যাধি—

Beauty shall walk celestial on the earth;
Nature shall overleap her mortal step. —*Savitri.*

এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথেরও ধ্যানে ধরা দিয়েছিল, তাকে সামনে রেখেই তিনি জীবনরচনা করেছেন, প্রেমের সাহায্যে মৈত্রী ও বিশ্বাসবলেই এই ধ্যানের স্বর্গকে ক্রমে বাস্তবে নামিয়ে আনা যায়। পূর্ণতার দিকে সমাজের ক্রমিক অভিব্যক্তিতে বিশ্বাসী কবি তাই সহশিল্পীদের উদ্দেশ করে বলছেন,—

"It is for the artist to proclaim his faith in the everlasting YES—to say: 'I believe that there is an ideal hovering over and permeating the earth, an ideal of the paradise which is not the mere outcome of fancy, but the ultimate reality in which all things dwell and move."—The Religion of An Artist.

ভারতে নারী

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬১ সনের জনগণনায় মোট ২১ কোটি ২১ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৬২ জন নারী গোণা হয়েছিল। এ সংখ্যা পুরুষের মোট সংখ্যা থেকে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫২ হাজার ১৫৮ জন কম। কথাটা অঙ্ক ভাবে প্রকাশ করলে ধারণা করা সহজ হয়। ভারতে গড়ে প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৯৪১ জন। পুরুষের হাজারে নারী ৫৯ জন কম। পুরুষের হাজার প্রতি নারীর যে সংখ্যা তা স্ত্রী-পুরুষের হার বা অনুপাত। অঞ্চল ভেদে এ হারের হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। রাজ্য ছেড়ে জেলার হিসাবে নেমে এলে বৈচিত্র্য আরো বাড়ে।

যে যে অঞ্চলে নারী বেশি

পর্তুগীজদের কবল থেকে মুক্ত গোয়া, দমন ও দিউর লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ২৭ হাজার; এর মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারী ২১ হাজার ৭২ জন বেশি। প্রতি হাজার পুরুষে নারী ১,০৭০। ভারতে এটাই নারীর সর্বোচ্চ হার। ক্ষুদ্রতম রাজ্য কেরলে পুরুষের চেয়ে নারী ১ লক্ষ ৮০ হাজার বেশি। পুরুষের হাজারে নারী ১,০২২। আরব সাগরে ভারতীয় দ্বীপ লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনা-দিভির মোট জনসংখ্যা মাত্র ২৪ হাজার। এদের প্রতি হাজার পুরুষে নারী ১,০২০। ভারতের পূর্ব সীমান্তে মণিপুরে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার লোকের বাস। সেখানে নারীর হার ১,০১৫। পণ্ডিচেরীর ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার লোকের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে নারী ১,০১৩ জন। আসামের মিজো পাহাড় অঞ্চলে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার লোকের বাস। এদের পুরুষের হাজারে নারী ১,০০৯। আয়তনে উড়িষ্যা কেরলের চারগুণেরও বেশি। লোক কেরলে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ, উড়িষ্যায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ; নারীর হার যথাক্রমে ১,০২২ ও ১,০০১।

নারী-প্রধান জেলা

ভারতে জেলার সংখ্যা ৩২১। এদের ৪৭টিতে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। দক্ষিণ ভারতের উপকূল বেষ্টন করে মালার মত ২৪টি নারী-প্রধান জেলার অবস্থান। পশ্চিম উপকূলে গুজরাটের কচ্ছ থেকে আরম্ভ করে মহারাষ্ট্রের কোলাবা, সাতারা, রত্নগিরি, মহীশূরের দক্ষিণ কানারা, কেরলের কানানোর, কোঝিকোডে, পালঘাট, ত্রিচুর, এলেপ্পি ও ত্রিবান্দ্রমের পর কন্যাকুমারিকা প্রদক্ষিণ করে মাদ্রাজের তিরুনেলভেলি রামনাথপুরম, থানজাভুর ও তিরুচিরপল্লী ছেড়ে পণ্ডিচেরী; তারপর অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তম, শ্রীকাকুলম, মাহবুবনগর ও নিজামাবাদ। উপকূলের সব শেষে উড়িষ্যার গঞ্জাম, কালাহাণ্ডি, বৌধ-খণ্ডমলস ও পুরী। বাকি ২২টি নারী-প্রধান জেলা মধ্যপ্রদেশ থেকে উত্তরপ্রদেশ হয়ে বিহার অবধি একটি পাটির মতো বিস্তৃত। মধ্যপ্রদেশের সিওনি, মান্দলা, বালাঘাট, বিলাসপুর, রায়গড়, রায়পুর ও বস্তার উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর, প্রতাপগড়, আজমগড়, জৌনপুর, বালিয়া ও গাজিপুর। উত্তর-বিহারের সারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও গয়া; এ-ছাড়া উত্তর-প্রদেশের উত্তর ভাগে রয়েছে চামলি, পিথোরগড়, তেহ্‌রিগড় গড়, গাড়োয়াল ও আলমোড়া নারী-প্রধান।

আসামের মিজো পাহাড় একটি বিচ্ছিন্ন নারী-প্রধান জেলা। কেরলে জেলা মাত্র নয়টি; তার ছয়টিতে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। সমস্ত দেশের মধ্যে এ রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ স্থানে নারী কেন বেশি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আবশ্যকীয় তথ্যাদি হাতের কাছে নেই। সাধারণভাবে বলা যায় যেখানে নারীর জন্ম বেশি, মৃত্যু কম, সে অঞ্চলে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। কিন্তু কোন্ অনুকূল অবস্থার জন্য কেরলে বেশি নারীর জন্ম ও কম নারীর মৃত্যু ঘটে, তার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের বাড়িতে রেখে কর্মক্ষম পুরুষদের অর্থোপার্জনের জন্য স্থানান্তরে বাস কোনো কোনো অঞ্চলে নারীর সংখ্যা বেশি হবার অন্যতম কারণ। উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো স্থানে এ জন্য নারী বেশি দেখা যায়। পুরীতে পুণ্যার্থী যাত্রী ও বাসিন্দাদের বড়ো অংশই নারী। এ জন্য সেখানে নারীর হার বেশি।

১৯০১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সাত বার জনগণনায় প্রতি দশকে কেরলে পুরুষের চেয়ে বেশি নারীর হিসাব পাওয়া গেছে।

মাদ্রাজে ১৯০১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত নারী ছিল বেশি। ১৯৬১ সনে পুরুষের প্রতি হাজারে নারী মাত্র ৮ জন কম। অন্ধ্রপ্রদেশে নারীর হার ৯৮০ থেকে '৯৯৩-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। মহীশূরে সে হার ছিল ৯৫৯ ও ৯৮৩-এর মধ্যে। মহারাষ্ট্রে ১৯০১ সনের ৯৭৮, ১৯৬১ সনে নেমে এসেছে ৯৩৬-এ।

উত্তর-ভারতে বিহার ও উড়িষ্যায় নারী বেশী থাকার কারণ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। বাইরের পুরুষ ধরে হিসেব করলে নারী বেশি দেখাবে না। উত্তর-প্রদেশের হার ৯০৪ ও ৯৩৭-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গত চার দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে নারীর হার ৯০০-র নিচে পড়ে আছে। পাঞ্জাবে নারীর হার কোনো দশকেই ৯০০ পর্যন্ত ওঠেনি। সাত-দশকে রাজস্থানের সর্বোচ্চ হার দেখা গেছে ৯২১। ১৯০১ সনের ৯৯০ থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে মধ্যপ্রদেশের হার ১৯৬১ সনে দাঁড়িয়েছে ৯৫৩।

উপরের সংখ্যা থেকে প্রমাণিত হয় যে দক্ষিণ ভারতে নারীর হার বেশি।

দক্ষিণ ভারতে নারীর হার বেশি কেন?

উপরে দেখা গেছে দক্ষিণ ভারতে নারীর হার ৯৩৬-এর নিচে কোথাও নামেনি। উত্তর ভারতে পাঞ্জাব, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর

এবং পশ্চিমবঙ্গে ঐ হার ১০০০-র অনেক নিচে পড়ে আছে। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে নারীর হার ১০০০ ছাড়িয়ে বেশি এগোতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের ছোঁয়াচ লেগেছে তার পাশের মধ্যপ্রদেশে। সেখানে উপজাতির সংখ্যাও বেশি। বিহার ও উড়িষ্যায় বৃদ্ধির কৃত্রিমতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'রাজ্যে উপজাতিও আছে। গুজরাটের সাদৃশ্য রাজস্থানের সঙ্গে নয়, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে, যার সঙ্গে এ রাজ্য দীর্ঘকাল যুক্ত ছিল।

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে নারীর হারের বৈষম্যের মূলে রয়েছে নারীর প্রতি ব্যবহারের বৈষম্য। মধ্যযুগে উত্তর ভারতে নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা কিরূপ কঠিন কাজ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ময়মনসিংহ গীতিকায়। কন্যা, বিশেষত সুন্দরী কন্যা জন্মালে পিতামাতার হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হত। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কথায় আছে 'অতি আহ্লাদের তুলা ঝি, তুরুকে নিলে করবি কী।' তুরুকের দৃষ্টি এড়াবার জন্য উল্কি পরা মুখ ঢাকা ঘরের কোণে লুকিয়ে থাক প্রভৃতি দুর্বলের আত্মরক্ষার প্রথা সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে চলে আসা এ সব প্রথা উত্তর ভারতের নারীদের নানা দিক দিয়ে পঙ্গু করে ফেলেছে। তাদের মনে 'সদা ভয় সদা লাজ'। পশুশালার জীবজন্তুদের মতো পর্দার আড়ালে আবদ্ধ নারীদের রোগ ও মৃত্যু বেশি হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কন্যা পিতামাতার দায়! তাই আহারে, পোষাকে, শিক্ষায়, রোগের চিকিৎসায় অগ্রাধিকার লাভ করে ছেলে, মেয়ে নয়। এক মহিলা কবি মেয়ের প্রতি অবহেলার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'দাদা খায় দুধ সর, আমি খাই চাঁচি'। এই ভয় ও অবহেলার পরিবেশে সুস্থ সবল নারী গড়ে উঠতে পারে না।

পরিবারে ও সমাজে উত্তর-ভারতের নারী যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কালের দিক থেকে মধ্যযুগের অবসান ঘটেছে অনেক আগে। কিন্তু উত্তর-ভারতে, বিশেষত বাংলা দেশে নারী-নিগ্রহের বর্বরতা এখনো থামেনি। ১৯৫১ সনের জনগণনায় দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে নারীর বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছিল। উত্তর-ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও হয়তো তা সত্য।

দক্ষিণ-ভারতে নারীর চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুনীতিবাবুর কথায় তা প্রকাশ করা যাক। 'তেলেগু, কানাড়ী, তামিল, মালয়ালীদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নেই। দক্ষিণ-ভারতে এটা সবচেয়ে বেশি করে আমাদের চোখে লাগে—মেয়েরা উন্নত মস্তকে দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। তাদের দেখে মনে হয় যে, তারা জানে যে তাদের উপযুক্ত সম্মান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় পুরুষদের কাছ থেকে তারা পাবেই। এটা দেখে মনে বিশেষ বিস্ময়পুলকের সঞ্চার হয়।' শুধু দ্রাবিড়ই নয়, মারাঠী রমণীদের মধ্যেও অবাধ স্বাধীনতা প্রচলিত। এটাই দক্ষিণ-ভারতে নারীর হার বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

নারীর হারে পরিবর্তন

পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর এবং বিহার ছাড়া আর সব রাজ্যে ১৯৬১ সনে নারীর হার হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব দশক অপেক্ষা হাজারে ১৩ জন বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে, ৮ জন পাঞ্জাবে, ৫ জন জম্মু ও কাশ্মীরে, আর বিহারে বেড়েছে ৪ জন। ১৯৪৬ সনে নোয়াখালির উদ্বাস্তু আসা শুরু হয়। তার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টিতে একটা অনিশ্চয়তার ভাব চলে আসছে। এ রাজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলে না। বহু হিন্দু পাকিস্থানে সম্পত্তি রক্ষা করে, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য নারীদের রাখা হয়েছে এখানে। আসাম প্রবাসীরাও অনেকে নারী ও শিশুদের রাখে পশ্চিমবঙ্গে। বৃদ্ধা ও নিরাশ্রয়া উদ্বাস্তু নারীগণ আন্দামান বা দণ্ডকারণ্যে না গিয়ে এখানেই রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে নারীর হার বৃদ্ধির এ সবই হয় তো কারণ। সেনা বিভাগের আহ্বানে পাঞ্জাবের পুরুষ আর শিবিরের অনুগামী বিহারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই এ দু'রাজ্যে নারীর হার বেড়ে যায়। জম্মু ও কাশ্মীরে নারীর হার বরাদ্দ করে ধরা হয়েছে, তাতে ভুল থাকা অসম্ভব নয়।

এ চার রাজ্য ছাড়া বাকি এগারো রাজ্যে নারীর হার হ্রাস পেয়েছে। এমন কি ক্রমবর্ধমান কেরলে পর্যন্ত ১৯৫১ সনের ১,০২৮, ১৯৬১ সনে ১,০২২-এ নেমে এসেছে। নারীর হারের এই ক্রমাবনতির কারণ সম্বন্ধে জনগণনার প্রকাশিত গ্রন্থে কোনো সিদ্ধান্ত করা হয়নি।

শহরে ও নগরে নারী

শিল্পপ্রধান বড়ো শহর ও নগরে নারী সাধারণত কম থাকে। আবাসিক শহরে নারী পুরুষের চেয়ে অল্প কম বা বেশি। বড়ো শহর ও নগর প্রধানত পুরুষের কর্মক্ষেত্র। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প নারীর কর্মগণ্ডীর বাইরে। বড়ো শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় বেশি, বাসা দুষ্প্রাপ্য। তাই গ্রামের বাড়িতে পরিবার রেখে কর্মক্ষম পুরুষরা চলে আসে শহরে বা নগরে। পাড়াগেঁয়ে রমণী বড়ো শহরের পরিবেশে পুরুষ-কর্মীর সাহায্যের চেয়ে ভার বৃদ্ধি করে বেশি। এসব কারণে শহর যত বড়ো নারী তত কম। দক্ষিণ ভারতে অবরোধ-প্রথা নেই বলে সেখানকার নারীদের চলাফেরায় কোনো অসুবিধা নেই। উত্তর-ভারতের নারীরা তাদের জড়সড় ভাব সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাই তারা শহর এড়িয়ে গ্রামে বাস করতে ভালবাসে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শহরের নারীদের হারে। শহরে নারীর হারেও কেরলের স্থান প্রথম। রাজ্যের গড় হার ৯৯৯। মোট ৭৯টি নগর ও শহরের মধ্যে ৫৪টিতে প্রতি হাজার পুরুষে নারী এক হাজারের বেশি। মাদ্রাজ শহরে নারীর গড় হার ৯৬৩। ২৮৭টি নগর ও শহরের অর্ধেকের বেশিতে নারীর হার হাজারের উপর। অন্ধ্রপ্রদেশে নারীর গড় হার ৯৫১, শহর ও নগর ২১২, হাজারের বেশি নারীর হার এমন শহর ৫৩। মহীশূরের শহরে নারীর গড় হার ৯১৩, নগর ও শহর ২১৪, নারীর হার হাজারের বেশি ২৫টি শহরে। মালয়ালী, তামিল, তেলেগু ও কানাড়ীদের কথা বলা হল। এদের স্বাধীনতা বেশি, শহরের পরিবেশে চলাফেরায় দ্বিধা-সংকোচ নেই, তাই এ চার রাজ্যের পৌরাঞ্চলে নারীর হার বেশি। মহারাষ্ট্রের পৌরাঞ্চলে নারীর গড় হার নেমে এসেছে ৮০১-এ। ২৪১টি শহরের মাত্র ২৩টিতে নারীর হার হাজারের বেশি। বড়ো বড়ো শিল্প শহর এ রাজ্যে নারীর হার হ্রাসের কারণ। গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার শহরে নারীর গড় হার ৮০০ ও ৯০০-র মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গে ৭০১, আসামে ৬৭৭। নারীর হার কলকাতায় ৬১২, বৃহত্তর বম্বেতে ৬৬৩, নয়াদিল্লীতে ৭২৭ এবং মাদ্রাজে ৯০১।

নারীর শিক্ষা

শিক্ষা জাতির অগ্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ। সেকাল ও একাল শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মাধ্যমের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মনীতি ও চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষিত করে তোলার জন্ম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মৌখিক উপদেশ, যাত্রা কথকতা এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিতর্ক সভাই যথেষ্ট ছিল। এখন বিজ্ঞানের জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয়, একক চিত্তবিনোদনের উপায় সাহিত্য, জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্ম চাই দর্শন। রেডিও, সিনেমা, বক্তৃতা প্রচার করে খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, এদের মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব। নিজের প্রয়োজনের সময় এ-সব মাধ্যমের সাহায্য পাওয়া যায় না। লেখাপড়া জানা লোক জ্ঞানলাভে স্বাবলম্বী। আকবর ও শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু সেকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের সাহায্যের জন্ম সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। এজন্ম নিরক্ষরতা তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। একালের বিশ্ববিদ্যা সঞ্চিত আছে মুদ্রিত পুস্তকে। সাক্ষরতা এই বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি। এতে ব্যক্তি ও জাতির শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা বিদ্যমান। নারীর সাক্ষরতা তাকে সংস্কারমুক্ত করে যোগ্য নাগরিক হতে সাহায্য করতে পারে। নারীর বন্ধনমুক্তির জন্ম আধুনিক জ্ঞান অপরিহার্য। জনগণের জননী নারী। জনসমস্যা সমাধান ও সন্তানের প্রথম শিক্ষার জন্ম নারীর সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অজ্ঞ নিরক্ষরা নারী জাতির শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে থাকে।

নারীর শিক্ষার বর্তমান অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে জনগণনার পরিসংখ্যান থেকে। এখানে বলে রাখা ভাল শিক্ষা ও সাক্ষরতা এক নয়। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে সহজ চিঠিপত্র লিখতে এবং তাদের কাছ থেকে আসা চিঠি যে পড়তে পারে তাকেই বলা হয় সাক্ষর। সাক্ষরতা শিক্ষার প্রথম সোপান মাত্র। সব শিক্ষিত লোকই সাক্ষর কিন্তু বেশির ভাগ সাক্ষর ব্যক্তির কোনো শিক্ষা নেই বলা যেতে পারে। চাবি হাতে থাকলেই দুয়ার খোলা হয় না। এখানে যে সংখ্যা দেওয়া হবে তাতে সাক্ষর ও শিক্ষিত পৃথক করা হয় নি। শিক্ষার মানের বিভাগ এখনো অপ্রকাশিত।

যেমন নারীর হারে তেমনি নারীর সাক্ষরতায় রাজ্যসমূহের মধ্যে কেরল অগ্রণী। সেখানে শতকরা ৩৮·৯ জন নারী সাক্ষর। নারী শিক্ষায় গুজরাটের স্থান দ্বিতীয়, কিন্তু শতকরা হার কেরলের অর্ধেকেরও কম—১৯·১। মাদ্রাজে নারীদের শতকরা ১৮·২ জন লেখাপড়া জানে। তার পরের স্থান পশ্চিমবঙ্গের। কলকাতার স্কুল কলেজে মেয়ের ভিড় দেখে স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতির জন্ম আমরা গর্ব অনুভব না করি এমন নয়। কিন্তু জনগণনার সংখ্যায় সে ভুল ভেঙে দেয়। একশ জন নারীর মাত্র ১৭ জন চিঠিপত্র লিখতে ও পড়তে সক্ষম এ রাজ্যে। মহারাষ্ট্রে সাক্ষর নারীর শতকরা হার ১৬·৮। আসামে এ হার ১৬। মহীশূরে উহা ১৪·২। তার পরই পাঞ্জাবে ১৪·১। অন্ধ্রপ্রদেশে সাক্ষর নারী প্রতি একশ জনে ১২ জন। উড়িষ্যায় ৮·৬ শতাংশ নারী লেখাপড়া জানে। উত্তর প্রদেশের হার মাত্র ৭। বিহারে লেখাপড়া জানা নারীর হার ৬·৯ আর মধ্যপ্রদেশে ৬·৩। রাজস্থানে নারীদের ৫·৮ শতাংশ সাক্ষর। জম্মু ও কাশ্মীরের ৪·৩ শতাংশই সর্বনিম্ন হার।

অন্ম অঞ্চলসমূহের মধ্যে দিল্লীর ৪২·৫, পণ্ডিচেরীর ২৪·৬, আন্দামানের ১১·৪, মণিপুরের ১৫·১ এবং নাগাভূমির ১১·৩ উল্লেখযোগ্য।

গোয়া, দমন ও দিউ না ধরে সাক্ষর নারীর সর্বভারতীয় গড় দাঁড়িয়েছে ১২·৯ শতাংশ। স্বাধীনতা অর্জনের সাড়ে চৌদ্দ বৎসর পরে স্ত্রী-শিক্ষার এই শোচনীয় তথ্য মনকে পীড়া দেয়? দশ বৎসরে নারী-সাক্ষরের হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। শিক্ষা যদি এমনি শামুকের গতিতে চলতে থাকে ত'হলে সাক্ষরতায় এদেশের নারীদের পাশ্চাত্য নারীদের সমকক্ষ হতে দেড়'শ বছর কেটে যাবে।

মহামতি গোখেল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯১১ সনে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় এক বিল উত্থাপন করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সমগ্র দেশ বিলটি সমর্থন করে। সরকারের বিরোধিতায় বিল আইনে পরিণত হতে পারে নি। তারপর অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে। রাজ্যে রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছে। দেশ শাসনের দায়িত্ব দেশের লোকের হাতে এসেছে পনেরো বছর আগে। কিন্তু শিক্ষা এখনো ইচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়। তাই নারীদের সাক্ষরতা এখনো শতকরা তেরোর নিচে। শিক্ষার ভার শিক্ষাবিদের উপর না দিয়ে রাজনীতিক ও দলীয় লোকের হাতে ন্যস্ত করলে এর চেয়ে ভাল ফল আশা করা যায় না। দেশের বিশাল নিরক্ষরতার মূলে রয়েছে আন্তরিকতা ও কর্মদক্ষতার অভাব—অর্থাভাব এর কারণ নয়। বিপ্লবের পর রুশ দেশ দারুণ অর্থসংকটের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে দু'তিন বৎসরের মধ্যে দেশে সাক্ষরতার হার প্রায় নব্বই শতাংশ তুলেছিল। তারা এ কাজের জন্ম নিযুক্ত করেছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এদেশে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে অনতিক্রমণীয় কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না।

পরনির্ভরতা

ভারতীয় নারী সংখ্যায় ২১ কোটি ২৯ লক্ষ ৪১ হাজার। এদের ৫ কোটি ১৪ লক্ষ স্বাবলম্বী, অবশিষ্ট ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৪ হাজার পরান্নভোজী। নারীদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি পরনির্ভর। এই পরনির্ভরতাই তাদের বহু দুঃখ, ক্লেশ ও গ্লানির কারণ। একমাত্র ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার দ্বারা এ অবস্থার প্রতীকার সম্ভব।

আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি।—শরৎচন্দ্র

মিহিরকুমার ভট্টাচার্য

এমন বাড়ী খুব কমই আছে—যেখানে আরশোলার উপদ্রব নেই, আর এদের অত্যাচার আমাদের অনেকটা গা-সহা হয়ে গেছে—সহ্য না করেই বা উপায় কি! এদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কঠিন। এদের অত্যাচারের নমুনা যাঁরা টের পেয়েছেন তাঁদের কাছে এসব কথা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত বলে মনে হবে না। আলো নেভালেই এদের কর্মতৎপরতা সুরু হয়। আবার আলো জ্বাললে যে যার জায়গায় প্রাণপণে ছুটে পালায়। দু'একটা পালাতে না পেরে বেকুবের মত ধরা পড়ে যায়। তখন তাদের অবস্থা এবং আমাদের করণীয় কাজ কি—সেটা না বললেও বোধ হয় বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না। এরা আমাদের ভীষণ শত্রু। সুতরাং শত্রুর শেষ রাখতে নেই। কিন্তু কাজটা বড় সোজা নয়।

আরশোলা এক জাতের পতঙ্গ। এরা কিন্তু একটা বিষয়ে পাখনাওলা পতঙ্গদের টেক্কা দিয়েছে। প্রাচীনত্বের দিক থেকে পাখনাওলা পতঙ্গদের মধ্যে এরা হচ্ছে সম্রাট; অর্থাৎ সকলের আগে এরা ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছে। দু'এক লাখ বা দু'এক কোটি বছর তো এদের কাছে কিছুই নয়! কেন না এরা কুড়ি কোটি বছর আগে প্রথম পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত এরা বহাল তবিয়তে পৃথিবীতে বিরাজ করছে। এরা যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়—তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় কার্বনিফেরাস যুগ। প্রায় ৫০০ বিভিন্ন জাতের সে যুগের আরশোলার জীবাশ্ম পণ্ডিতেরা খুঁজে পেয়েছেন। আর তখন তাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, পুরাজীবতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর সেই স্যাঁৎসেঁতে যুগটাকে বলেছেন, 'আরশোলার রাজত্বের যুগ।' নিশ্চয়ই এই উপাধি আরশোলাদের বিরাট গর্বের বিষয় ছিল। এখন কিন্তু তাদের সেই দেমাক ভেঙ্গে গেছে। তবুও 'মরা হাতী লাখ টাকা।' কারণ, পৃথিবীতে এখনও সব জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মিলিয়ে এরা সংখ্যায় যা—তাও বড় কম নয়।

পৃথিবীতে আড়াই হাজার বিভিন্ন জাতের আরশোলা আছে। আর এদের আকৃতি-প্রকৃতিও নানা রকম, এদের গায়ের রঙ বিচিত্র। কারোর গায়ের রঙ সবুজ, কারোর বা কমলা বা হলদে। আবার অনেকের গায়ে লাল দাগ বা ডোরা থাকে। তবে বেশীর ভাগ আরশোলার গায়ের রঙ ধূসর বা বাদামী। এসব বিচিত্র বর্ণের আরশোলারা যে আমাদের অতি পরিচিত ধূসর বা বাদামী রঙের আরশোলাদের নিকটাত্মীয় তা বোঝা খুব কঠিন। মনে হবে এরা একেবারে ভিন্ন জাতের পতঙ্গ। এরা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্র। এদের মধ্যে কেউ কেউ জাহাজে চড়ে মেরুদেশও ঘুরে এসেছে। না বললেও বুঝতে পারছেন—এরা জাহাজের আরোহী কেমন করে হয়—মালপত্রের সঙ্গে গোপনে এরা জাহাজে চড়ে বসে। কেউ এদের আদর করে নিয়ে যায় না।

কোন কোন দেশে কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে আরশোলা সম্বন্ধে বেশ মজার ধারণা চালু আছে। আমাদের দেশে এদের সম্বন্ধে কোন অদ্ভুত ধারণা চালু আছে বলে শোনা যায় না। ফ্রান্স ও রাশিয়ার কারো কারো বিশ্বাস—বাড়ী যদি আরশোলা শূন্য হয় তা হলে বিপদ হবে। সে জন্যে বাড়ীতে আরশোলার বাস মঙ্গলজনক বলে গণ্য হয়। জার্মানীতে এদের নাম দেওয়া হয়েছে—'রান্না ঘরের উকুন।' ফ্লোরিডায় এদেরকে বলা হয়—এক জাতের ছারপোকা (palmetts bug) সেখানকার কোন কোন লোকের বিশ্বাস, যদি বলা হয় অমুক বাড়ী আরশোলায় ভর্তি তাহলে সে বাড়ীর সব বিপদ নাকি দূর হয়ে যায়। এই সব ধারণা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, এর মূলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

আরশোলার একটা মানানসই নাম দেওয়া যায়—'রান্নাঘরের ছিঁচকে চোর।' এদের উৎপাত সব চেয়ে বেশী হয় রান্নাঘরে। আবার এরা তেলাপোকা নামেও পরিচিত। খাবারের খোঁজে এরা সাধারণত রাত্রিতে রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। চোরের মত ভঙ্গীতে এদের মাথা নীচু করে পা টিপে এগুবার দৃশ্য বোধ হয় কারুরই নজর এড়ায়নি। হাঁটবার ভঙ্গীটা দেখলেই মনে হবে ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। তাড়া খেলেই প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে পালায়, একবার চিৎ হয়ে পড়লে

এরা বড় বেকায়দায় পড়ে যায়। আরশোলা উড়ে এসে আমাদের শরীরে বসলে ভীষণ অস্বস্তি লাগে। পরিষ্কার জায়গায় এরা কখনও থাকবে না। কোন কিছুর আড়ালে, নোংরা আবর্জনা, দরজা জানালার ফাটল বা গর্তেই এরা বাস করে যাতে সহজে শত্রুর নজরে না পড়ে। দিনের বেলায় এদের খুব কম দেখা যায়। কোন কোন জাতের আরশোলা ভীমরুলের বাসার নীচে সঞ্চিত আবর্জনা স্তূপের মধ্যে বাস করে। আবার কেউ কেউ সৈনিক পিঁপড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায় আর তাদের দেহ-নিঃসৃত এক রকম রস মহানন্দে চেটে খায়। পিঠে চড়ে বেড়াবার সময় এদের মধ্যে কোন ভয়ের চিহ্ন দেখা যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের একজাতের আরশোলা ছোট নদী বা পুকুরের পাড়ে বাস করে এবং কোন কারণে ভয় পেলে লাফিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

ভয় পেয়ে আরশোলা যখন পালায় তখন এমন একটা ভঙ্গী করে যেন তেড়ে শত্রুকে আক্রমণ করতে আসছে। শরীরের প্রান্তভাগটা কুঁচকে কিছুটা উঁচু করে রেখে যেন হুল ফোটাতে আসছে। আসলে কিন্তু ওটা শত্রুকে ভয় দেখাবার একটা কৌশল। শত্রুও তখন কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মানে মানে সরে পড়ে। আরশোলার দেহের বাইরে একটা চক্‌চকে, মসৃণ ও নমনীয় প্লাষ্টিকের মত একটা আবরণী থাকে। কারো কারো দেহে ঘন লোমের মত ছোট চুলওলা আচ্ছাদন দেখা যায়।

আরশোলা যে সব জায়গায় আস্তানা গাড়ে—সেখানে তাদের সংখ্যা নির্ণয় এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অসংখ্য আরশোলা এক স্থানে ঘাঁটি গাড়ে। যদি কোন ঘাঁটিতে এদের খাদ্যাভাব ও স্থানাভাব ঘটে—তখন এরা দলবদ্ধভাবে নতুন ঘাঁটি স্থাপনের জন্যে অভিযান চালায়। একটা আস্তানায় এদের সংখ্যা মোটামুটি কত—সে বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরীক্ষা করা হয়েছিল। টেক্সাসের একটা বাড়ীতে এই অনুসন্ধান পরিচালিত হয়। বাড়ীটায় ছিল চারটে কামরা প্রতি কামরায় ছিল অসংখ্য আরশোলা। সব কটা কামরা ধোঁয়া দিয়ে একেবারে ভর্তি করা হয়। এর ফলে গুপ্ত স্থান থেকে অসংখ্য আরশোলা ছটফট করতে করতে বেরিয়ে আসে। পরে গুণে দেখা গেল আরশোলার সংখ্যা মোটামুটি ১২৫,০০০। আমাদের দেশেও এক একটা ঘাঁটিতে এদের সংখ্যা আমেরিকার চেয়ে বোধ হয় কম হবে না। একই ঘাঁটির বিভিন্ন অংশে এরা দলবদ্ধভাবে কখনও বা এককভাবে বাস করে।

আরশোলার প্রধান খাদ্য হলো উদ্ভিজ্জ ও জৈব পদার্থ। তবে এর মধ্যে একটু বাছ-বিচার এরা করে। রান্নাকরা খাবার, বিশেষত মিষ্টি খাবারের প্রতিই এদের লোভ খুব বেশী। কয়েক জাতের আরশোলা বই, চামড়া, কাপড়, কাঠ, শিরিষ প্রভৃতিও খায়। কোন কোন আরশোলা আবার মানুষের হাত-পায়ের নখ খুঁটে খায়। এরা মানুষের সাংঘাতিক ক্ষতি করে।

আরশোলাও আবার মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, পৃথিবীর কোন কোন দেশের অধিবাসীরা এদের খেতে খুব পছন্দ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের বাসিন্দারা আরশোলার ভাজা বা ঝোল খেতে খুব ভালবাসে। আরশোলার শরীর থেকে বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ বেরোয়। এই দুর্গন্ধই আরশোলার আত্মরক্ষার বড় সহায়। আক্রান্ত হলে এরা দুর্গন্ধ নির্গত করে শত্রুকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে। দুর্গন্ধের চোটে শত্রু কখনও সরে যায়, কখনও বা এই দুর্গন্ধকে গ্রাহ্য না করে আরশোলাকে আক্রমণ করে।

এক জাতের বোলতা আরশোলার মারাত্মক শত্রু। এরা আরশোলার ডিমের খোলে ডিম পেড়ে রাখে। সুরিনাম ব্যাঙের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে আরশোলা। আরশোলার সন্ধান পেলে এরা সহজে সে স্থান ত্যাগ করতে চায় না। কেন্নো, বিছা প্রভৃতি প্রাণীরা আরশোলার ডিম বাগে পেলে খেয়ে ফেলে। আরশোলাও প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না। বাগে পেলে এরাও কেন্নো, বিছা প্রভৃতি প্রাণীকে উদরসাৎ করে ফেলে। আরশোলা ছারপোকার প্রধান শত্রু।

শীতকালে আরশোলা একটা লম্বা ঘুম দেয়। এদের এই ঘুম 'শীত-ঘুম' নামে পরিচিত। তখন এদের দেখা কদাচিৎ পাওয়া যায়। যে যার গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে। তখন এদের ভোজনের প্রয়োজন হয় না। শরীরের সঞ্চিত চর্বিজাতীয় পদার্থের সাহায্যে দৈহিক পুষ্টি সাধিত হয়। যত দাপট এদের গ্রীষ্মকালে।

আমাদের পরিচিত অধিকাংশ আরশোলাই গ্রীষ্মকালে ডিম পাড়ে এবং খাদ্যের সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠে। রাত্রিতেই এদের বেশী দেখা যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় এদের গোষ্ঠীগত নাম হচ্ছে—Blattidal অর্থাৎ যে পতঙ্গ আলো এড়িয়ে চলে। আলোতে এদের কোমল দেহের আর্দ্রতা খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। সেজন্যেই এরা সাধারণত দিনের বেলায় আত্মপ্রকাশ করে না। এরা দ্রুতগতিতে হাঁটে, সেজন্যে এদের ধরাও খুব শক্ত।

যৌন-মিলনের পূর্বে স্ত্রী-আরশোলাকে খুশী করবার জন্যে পুরুষ আরশোলা—তার সামনে গর্বোন্নত ভঙ্গীতে চলাফেরা করতে থাকে। এই সময়ে পুরুষ আরশোলা তার ডানা উঁচু করে পেটকে ফুলিয়ে রাখে, প্রথম প্রথম স্ত্রী-আরশোলা একটা উদাসীন ভাব দেখায়, যেন সে পুরুষটাকে গ্রাহ্যই করছে না, অনেক সময় তাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। পরে তার এই উদাসীন ভাব কেটে যায় এবং সে আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে। এর পর তাদের যৌন-মিলন হয়।

ডিম পাড়বার সময়ে—স্ত্রী-আরশোলা ডিমের থলিটাকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে। থলিটা শরীরের প্রান্তদেশে অর্ধনির্গত অবস্থায় সংযুক্ত থাকে—তার মধ্যে থাকে ডিম। এদের বংশবৃদ্ধির হার খুব ব্যাপক। কোন কোন স্ত্রী-আরশোলা এক বছরে প্রায় ৪০০,০০০ বংশধর উৎপাদন করতে পারে। আরশোলার ডিমের খোলার উপর এক রকম আঠালো পদার্থ থাকে। এর সাহায্যে ডিমগুলি না ফোটা পর্যন্ত কোন কিছুর সঙ্গে আটকে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর তারা আহারের সন্ধানে এদিক-সেদিক যায়।
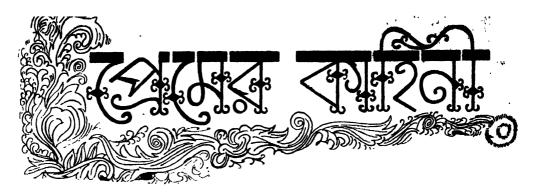
(মহারাণীর প্রেম)

জয়শ্রী বসু

চতুর্থ উইলিয়ম যখন মারা গেলেন, তখন গ্রেট-বৃটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হলেন তাঁর ভাইঝি ভিক্টোরিয়া। তখন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ, ভিক্টোরিয়ার বয়স আঠারো।

দু'বছর সিংহাসনে বসে, এত ক্ষমতা আর এত সম্মানের স্বাদ পেয়ে ভিক্টোরিয়ার মনের অনেক পরিবর্তন হ'ল, বিশেষ ক'রে বিবাহ সম্বন্ধে। এতদিন ধরে কিন্তু তিনি ভেবে এসেছিলেন জার্মানীর স্যাক্স্-কোবার্গ গথা-রাজ্যের যুবরাজ অ্যালবার্টই হবেন তাঁর স্বামী। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডও খুবই ইচ্ছা করতেন যে তাঁর ভাগ্নী ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্টের কণ্ঠেই বরমাল্য দেবে। কিন্তু একচ্ছত্র মহারাণী হবার স্বাদ পেয়ে ভিক্টোরিয়ার মনে হলো এর পর বিয়ে করে পতিদেবতার বশ্যতা স্বীকার করে থাকা তাঁর কিছুতেই সইবে না। প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণকে মহারাণী পরিষ্কার বলে দিলেন, "অ্যালবার্টকে আমি বিয়ে করব না। আপনারা মিছিমিছি আমাকে অনুরোধ করবেন না।"

খুব অল্পবয়সে একবার কোবার্গে গিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া; তখন ভালোও লেগেছিল অ্যালবার্টকে। কিন্তু সে তো অনেক আগেকার কথা। তা'ছাড়া তখন তো আর সিংহাসনে বসেন নি!

কুড়ি বছর বয়স যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেই সময় ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া সন্দর্শনে প্রথম রওনা হলেন অ্যালবার্ট—স্যাক্স্—কোবার্গ গথার যুবরাজ ফ্রান্সিস চার্লস্ অগাষ্টাস অ্যালবার্ট ইমানুয়েল। তিনি আসছেন জেনে খুব খুশী হলেন না ভিক্টোরিয়া। ডায়েরিতে লিখে রাখলেন, "ঠিক জানি এসেই সে পুরুষালী কর্তৃত্ব জাহির করবার চেষ্টা করবে।" ভদ্রতার খাতিরে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন "অ্যালবার্ট না এলেই ভালো হত।"

কিন্তু এই বিরূপ ভাব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যেইমাত্র অ্যালবার্টকে প্রথম দেখলেন। এমন সুন্দর সুপুরুষ তিনি জীবনে আর কখনো দেখেন নি। ফলে মত বদলে গেল! মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণকে জানিয়ে দিলেন অ্যালবার্টকে বিয়ে করতে তিনি রাজী আছেন। পরে একদিন অ্যালবার্ট এলেন ভিক্টোরিয়ার কাছে আমন্ত্রণ পেয়ে। নিভৃতে সাক্ষাৎ হ'লো দু'জনের, ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্টকে জানিয়ে দিলেন, অ্যালবার্ট তাঁকে বিয়ে করলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। দু'জনে দু'জনের বাহু বন্ধনে ধরা দিলেন। দু'জনের প্রেমে দু'জনের হৃদয় ভরা।

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু নির্ধারিত তারিখ যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই যেন দু'জনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ভিক্টোরিয়ার মনে এই ভয় যে নিজের রাজ্যে স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করা আর বোধ হয় চলবে না, আর ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর ওপর স্বামীত্বের দাবীতে নানাভাবে কর্তৃত্ব করবেন অ্যালবার্ট। আর যুবরাজ অ্যালবার্ট? নিজের প্রিয়ভূমি কোবার্গ ছেড়ে এখানে এই অনভ্যস্ত, অপ্রিয় আবহাওয়ায় তাঁকে থাকতে হবে, যেখানকার মানুষের হাব-ভাব চাল-চলন তাঁর ভাল লাগে না, একথা ভেবেই তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। বিবাহের আসরে অ্যালবার্টের সুন্দর চেহারা দেখে ভিক্টোরিয়ার সব অশান্তি আর উদ্বেগ চলে গেল। বিবাহ হ'ল ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী, খুব ধুমধামের সঙ্গে।

বিয়ের পর অ্যালবার্ট দেখলেন তাঁর পরিচয় কেবল ভিক্টোরিয়ার স্বামীরূপে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন লর্ড মেলবোর্ণ। অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির রাজ্যশাসন কার্যে নাক গলানো এঁদের দু'জনেরই অপছন্দ ছিল। রাজনীতিতে অ্যালবার্টের থাকা ভিক্টোরিয়ারও পছন্দ ছিল না। আবার সাংসারিক ব্যাপারেও ভিক্টোরিয়া অন্য কারও পরামর্শ চাইতেন না ধাত্রী ব্যারণেস লেহজেন ছাড়া, যিনি ছোটবেলা থেকে ভিক্টোরিয়াকে মানুষ করেছিলেন এবং সেজন্য ভিক্টোরিয়ার ওপর যাঁর প্রবল প্রতাপ ছিল।

ভিক্টোরিয়া আর অ্যালবার্টের পছন্দ অপছন্দও ছিল বিপরীত। লণ্ডনবাসীদের মত ভিক্টোরিয়া সমস্ত রাত নাচের আসরে আনন্দ করতে পেলে আর কিছু চাইতেন না কিন্তু শহরের হৈ-চৈ অ্যালবার্টের একটুও ভালো লাগত না। সন্ধ্যায় তিনি জ্ঞানী, বিজ্ঞানীদের নিয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল বেশী রাত না জাগা এবং খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা। দু'জনের রুচিতে ও পছন্দ-অপছন্দে

একেবারে মিল ছিল না বলেই তাঁরা যে যাঁর নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা করতেন।

অ্যালবার্ট খুব হাসিখুশী লোক না হলেও সত্যিকারের রসিক ছিলেন; চমৎকার নকল করতে, অভিনয় করতে এবং তলোয়ার খেলতে পারতেন। গান ও খেলাধুলা তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

অ্যালবার্ট মানসিক অশান্তি দূর করবার জন্য তাঁর পুরাতন বন্ধু ও শিক্ষকের সাহায্য চাইলেন। শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ইংরাজী রাজনীতি শিখতে লাগলেন ও মনে প্রাণে ইংরেজ হবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ইংলণ্ডের রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম সুযোগ অ্যালবার্ট পেলেন যখন টোরীদের হাতে ক্ষমতা এল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে হুইগ মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করলেন, লর্ড মেলবোর্ণের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হ'লেন স্যার রবার্ট পীল। কিন্তু ভিক্টোরিয়া তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে অস্বীকার করলেন। এবার ভিক্টোরিয়া স্বামী অ্যালবার্টের সাহায্য চাইলেন। অ্যালবার্ট এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন—সুযোগ পাওয়ামাত্র তিনি মহারাণীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে গেলেন মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

সাংসারিক জীবনে ব্যারণেস লেহজেনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আরও একবছর লাগল। তাঁদের প্রথম সন্তান রাজকুমারীর পরে প্রিন্স অব ওয়েলসের অর্থাৎ যুবরাজের (ভবিষ্যতে সপ্তম এডোয়ার্ড) জন্মের যখন কিছুদিন বাকি, সে সময় ব্যারণেস লেহজেনকে একরকম জোর করেই তাঁর দেশ হ্যানোভারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এরপর ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্টের জীবন বেশ সুখের হ'ল।

স্ত্রীকে আরও কাছে পেয়ে অ্যালবার্ট তাঁদের সংসারে শৃঙ্খলা আনতে সুরু করলেন। এতদিন প্রত্যেকটি জিনিষেরই অপব্যয় আর অপচয় হত। অনেক চাকর-বাকর থাকা সত্ত্বেও বাড়ীতে কোনও কাজই সুন্দর ভাবে হত না। অ্যালবার্ট কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত কাজ শৃঙ্খলার মধ্যে এনে ফেললেন। অ্যালবার্টের কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে ভিক্টোরিয়া তাঁকে আগের চেয়েও বেশী ভালবাসতে লাগলেন।

এরপর সাম্রাজ্য-শাসনের ব্যাপারেও অ্যালবার্ট কিছু কিছু পরামর্শ দিতে লাগলেন। ভিক্টোরিয়াও বিনা দ্বিধায় সে সব পরামর্শ শুনতে লাগলেন। ক্রমে এমন হলো যে অ্যালবার্টের পরামর্শ ছাড়া মহারাণী কোনও কাজই করতেন না।

অ্যালবার্টের অতুলনীয় জ্ঞান ও গুণের জন্য তাঁর প্রতি ভিক্টোরিয়ার শ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ভিক্টোরিয়াও এখন থেকে স্বামীর ইচ্ছামত সন্ধ্যায় বাড়ীতে থেকে জ্ঞানী-গুণী লোকদের আলোচনা করে রাত্রিতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তেন আর খুব ভোরে দু'জনে বেড়াতে যেতেন। এ সময় নানা পাখী আর নানা গাছের নাম মহারাণী স্বামীর কাছ থেকে শিখে নিতেন। তাঁরা দু'জনেই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে থাকতে ভালবাসতেন।

লণ্ডনে নিরিবিলিতে থাকা সম্ভব নয় বলে, তাঁরা নিরিবিলিতে থাকবার জন্যে আইল অব ওয়াইটের অসবর্ণ নামক জায়গায় একটি সুন্দর বাগানযুক্ত বাসভবন কিনলেন। এখানেই তাঁরা যতদিন পারতেন থাকতেন।

স্কটল্যাণ্ডের প্রতি তাঁদের খুব আকর্ষণ থাকায় তাঁরা সেখানকার বিখ্যাত বালমোরাল প্রাসাদটি কিনে নিলেন। পরে পুরানো প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলে অ্যালবার্টের নির্দেশমতো বিরাট নতুন প্রাসাদ তৈরী হলো।

ক্রমে তাঁদের নয়টি সন্তান হলো—পাঁচ মেয়ে আর চার ছেলে।

স্বামী, সন্তান ও রাজত্ব নিয়ে ভিক্টোরিয়া খুবই সুখে ও আনন্দে থাকতেন। আদর্শ জায়া, জননী ও রাণী ছিলেন তিনি। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল অ্যালবার্টের মত স্বামী থাকায়।

অ্যালবার্টের নানা গুণের অন্যতম গুণ ছিল—তিনি খুব ভাল সংগঠনকারী ছিলেন। পাহাড়প্রমাণ বাধা থাকা সত্ত্বেও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অ্যালবার্টের উদ্যোগে ও ইচ্ছায় একটি বিরাট প্রদর্শনী হয়। অ্যালবার্টের সংগঠনে ও পরিচালনায় প্রদর্শনীটি অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ঐশ্বর্য, সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রদর্শনই যে কেবল ছিল তা নয়, অ্যালবার্টের অসাধারণ কৃতিত্বও প্রদর্শনীর সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভিক্টোরিয়াও চাইতেন যেন তাঁর প্রিয়তম স্বামীর দক্ষতার প্রশংসা সবাই করে।

এত আনন্দ, সম্মান, শ্রদ্ধা পাওয়া সত্ত্বেও অ্যালবার্টের মনে শান্তি ছিল না। হয়ত তাঁর মনে হ'ত কেউ তাঁকে ভালবাসে না। যদিও ইংলণ্ডের প্রত্যেক জ্ঞানী লোকই অ্যালবার্টের কর্মক্ষমতা ও উদ্যমের প্রশংসা করতেন তবুও ইংলণ্ডকে তিনি নিজের স্বদেশ ব'লে কিছুতেই ভাবতে পারতেন না! তাঁর মনে হত তিনি যেন স্বদেশ থেকে নির্বাসিত।

তাঁর এ মানসিক অশান্তি দূর করার জন্য ভিক্টোরিয়া তাঁকে উচ্চতম সম্মানের উপাধিতে ভূষিত করলেন। অ্যালবার্ট উপাধি গ্রহণ করলেন কিন্তু তাঁর অশান্তি গেল না—নিজেকে তিনি ইংরেজ মনে করতে পারলেন না। সব সময়েই তাঁর মনে হত তিনি কোবার্গের লোক, ইংলণ্ড তাঁর প্রবাস মাত্র।

এই ভাবনা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্তব্যে কোনও অবহেলা করেন নি। সাম্রাজ্য শাসন ও বৈদেশিক রাজনীতির ব্যাপারে সব সময়েই তিনি পরিশ্রম করতেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অ্যালবার্টের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। রাত্রিতে একেবারেই ঘুম হ'ত না। এই অবস্থায় একদিন খুব শীত ও বৃষ্টির মধ্যে স্যাণ্ডহার্স্ট (Sandhurst) মিলিটারী অ্যাকাডেমীর নূতন বাড়ীটি দেখে এসেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন! অসুস্থ শরীরেই আবার কেমব্রিজে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পরে তাঁকে জোর করে বিছানায় শোয়ান হ'ল বিশ্রামের জন্য।

অ্যালবার্টের স্বাস্থ্য বরাবরই খুব ভালো ছিল। এজন্য ভিক্টোরিয়া ভেবেছিলেন দু' দিনেই অ্যালবার্ট সুস্থ হ'য়ে উঠবেন। কিন্তু অ্যালবার্টের বেঁচে থাকবার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। এজন্য ভাল হবার তাঁর কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। কয়েকদিনের মধ্যেই অ্যালবার্ট পরলোক যাত্রা করলেন।

ভিক্টোরিয়া শোকে দুঃখে এত মুষড়ে পড়েছিলেন যে কেউ তাঁকে শোকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন না। দিনের পর দিন কারো সঙ্গে কোনও কথা বলতেন না, কেবল কাঁদতেন। অ্যালবার্টের ঘরে

কোনও লোককে তিনি ঢুকতে দিতেন না। (শোনা যায় তারপর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে প্রতি সন্ধ্যায় অ্যালবার্টের শূন্য বিছানায় নতুন চাদর পাতা হ'ত আর বেসিনে নতুন করে জল রাখা হত।)

স্বামীর মৃত্যুতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শোক এত তীব্র হয়েছিল যে, বহুদিন তিনি কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি। প্রাসাদের সমস্ত জায়গায়, তিনি অ্যালবার্টের ছবি বা মূর্তি সাজিয়ে রাখালেন, আর স্কটল্যাণ্ডে এবং ইংলণ্ডে অ্যালবার্টের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করালেন—অ্যালবার্টের স্মৃতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

এরপর তিনি ঠিক করলেন স্বামী যে সব কাজ করবেন ভেবেছিলেন, যে সব কাজ দু'জনে মিলে করতে পারতেন, সে সব কাজ তিনি একাই করবেন।

ভিক্টোরিয়ার আত্মবিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, সাম্রাজ্যের হিতের জন্য তিনি যা ভাল মনে করতেন তাই করবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতেন। মন্ত্রীরাও তাঁর পথ থেকে তাঁকে টলাতে পারতেন না।

এ সময় ভিক্টোরিয়ার কাছে জন ব্রাউন নামে স্কটল্যাণ্ডের একটি লোক এল। বালমোরাল প্রাসাদে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্টের থাকা কালীন জন ব্রাউন ছিল তাঁদের প্রিয় ভৃত্য। জন ব্রাউনকে পেয়ে ভিক্টোরিয়া খুশী হ'লেন

কাঠখোট্টা গোছের মানুষ জন ব্রাউন বেশ বুদ্ধিমান ছিল: কিছুদিনের মধ্যেই সে ভিক্টোরিয়ার খাসভৃত্য হ'য়ে পড়ল। জন তাঁকে পরামর্শ দিত এমন কি কেউ কখনও যা করেনি, ভিক্টোরিয়াকে তিরস্কারও করত। মৃত্যু পর্যন্ত জন ভিক্টোরিয়ার কাছে ছিল।

স্বামী অ্যালবার্টের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে ভিক্টোরিয়া আবার সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে স্বর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল।

স্বামীর সঙ্গে তিনি মৃত্যু কামনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী স্বামীর মৃত্যুর দীর্ঘ ৪১ বছর পরে।

সন্ধ্যার ধোঁয়াশায়

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আরেকটি দিনের শেষে ধোঁয়াশা সন্ধ্যা নামে।
আর আমার উর্দ্ধে-ডাইনে-বামে
রক্তলিপ্সু মশারা দেয় হানা
মত্ত উল্লাসে বাজায় অগণ্য ডানা।

দূরে, ময়দানে উচ্চভাষযন্ত্রে শুনি হু-হু রব।
কোন সে বক্তা ?—জানি না তো নাম তার !
তার বাক্যের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস
উদ্দেশ্যের দেয় কি আভাস ?
যদি বা বুঝিতাম কি সে বলে,
বুঝিতাম না মাতব্বর কোন সে দলে।
যদি জানিতাম দল, অবোধ্য হতো নীতি ;
নীতি বোধ্য হলে, শঙ্কা জাগাতো পরিণতি !

ক্রমে শ্রান্ত হয়ে যায় ভাষযন্ত্রের দম্ভনাদ
স্ফীতোদর মশাদের মিটে আসে রক্তের আস্বাদ !
মুহূর্তের মৃতস্তূপে প্রহর গড়ায়, রাত্রি বাড়ে ;
নিস্পৃহ চাঁদ পৃথিবী ঘোরার দায় সারে।

হঠাৎ চকিতে দেখি গাছেতে জাগিছে কোটাল
অস্তাজ ফুলের গন্ধে বাতাস স্খলিত মাতাল।
প্রান্তর স্পন্দিত করে জোনাকী ও শিশিরের আলো
সহসা ক্ষণিক যেন জীবনেরে লেগে যায় ভালো।

স্বামী বিবেকানন্দ

নিতাইচন্দ্র চক্রবর্তী

জাগ জাগ সনাতনী গাও বার বার
বিবেকানন্দের নাম মাতায়ে ওঁকার
সপ্তর্ষি-মণ্ডল হয় যাঁহার আধার
হেন নরগুরু পদে কর নমস্কার।

শিবশক্তি পরিবেশে জনম যাঁহার
নিজের মুক্তি নহে সাধনা অপার
শিবজ্ঞানে জীবপ্রেমে যাঁহার বিচার
হেন নরগুরু পদে কর নমস্কার।

রামকৃষ্ণ মহামন্ত্র করি সারাৎসার
সর্বধর্ম সমন্বয় করেন প্রচার—
বিশ্বপ্রেম আবাহনে বাঁধিল আগার
হেন নরগুরু পদে কর নমস্কার।

বিবেক বৈরাগ্য সনে ত্যাগের সম্ভার
অষ্টাদশ তেজঃপুঞ্জে জ্ঞান বিভাকর
জল, আকাশ যাঁর করিছে বিচার
হেন নরগুরু পদে কর নমস্কার।

নমঃ নমঃ সবে মিলি নমঃ অনিবার
জীবের কল্যাণ তরে যিনি প্রেমাধার
বিবেক আনন্দদানে ঘুচা'ন আঁধার
হেন নরগুরু পদে শত নমস্কার।।

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

দে-বাবা

হিন্দুতীর্থ বারাণসী কাশীধাম অনাদি কাল থেকে সমগ্র [illegible] শ্রেষ্ঠ তীর্থ শিক্ষার পীঠস্থান। এই পৌরাণিক ধর্ম ও বিদ্যার সংস্কৃতিকেন্দ্রে অবস্থিত বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের অমর কীর্তি।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একবার কিছুদিনের জন্য থাকার সৌভাগ্যলাভ করি। কথায় বলে,—'কাশীবাস স্বর্গবাস'। শেষ জীবনে এখানে বসবাস, দেবদেবী দর্শন, ধর্মালোচনা, শ্রবণ-মনন, গঙ্গাস্নান সাধুসঙ্গ প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম-বিশ্বাসী হিন্দুর একান্ত কাম্য।

কাশীতে অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর বাস। আধুনিক মেকীর যুগে মনে একটি আকাঙ্ক্ষা জাগে,—কাশীতে যেন সত্যকার একটি সাধুর দর্শন পাই।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাসাধিকাল থাকার জন্য একটি সুন্দর বিতল বাড়ী দিলেন। একদিন প্রত্যূষে উঠে ফটকের নিকট থেকে চতুর্দিকের মনোমোহন শান্ত ছবি দেখছি, এমন সময়ে একটি শ্বেত-শ্মশ্রু শোভিত কৃশাঙ্গ বৃদ্ধ নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করেন,—আপনারা কি নূতন এ বাড়ীতে এসেছেন?

সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করে বলি,—আপনি কোথায় থাকেন?

মিষ্টি হেসে জবাব দেন,—এই ত' কাছেই!

অল্পায় কথাবার্তায় ও আকৃতি-প্রকৃতিতে মানুষটিকে খুব ভালো মনে হল। অনুসন্ধানে শুনি তাঁর নাম শ্যামাচরণ দে। বয়স ৮৫ বৎসর, অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির মানুষ,—আজীবন জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চায় রত, অকৃতদার, দানবীর, প্রকৃত সাধু। বেরিলী কলেজের অঙ্কের অধ্যাপকরূপে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে, অতি সাধারণ ভাবে নিজের আহার-বিহার চালিয়ে যা সঞ্চয় করেছিলেন,—শেষ জীবনে সর্বস্ব দান করেছেন কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিশাল 'শ্যামাচরণ দে হোষ্টেল' নির্মাণকল্পে।

বর্তমানে তাঁর কর্মজীবনের অবসরপ্রাপ্ত বার্ধক্যে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাসের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ী দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে। সেখানেই তিনি এখন অতি সরল, অনাড়ম্বর, ধর্ম-জীবন যাপন করছেন। এখানকার ছোট-বড় শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই অগাধ শ্রদ্ধার পাত্র, আবার সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবেও নমস্য তিনি—দে-বাবা নামে খ্যাত।

নয়টি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নাম 'নাগোয়া'। অনেকের নিকট আবার দে-বাবার নাম শোনা গেল 'নাগোয়ার সাধু'।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চেহারার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল, আবার আকৃতির মত প্রকৃতিগত মিলও বিস্ময়জনক। মাসখানেক তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগে দেখি, তিনি যেন কাশী-ক্ষেত্রে পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের আধুনিক সংস্করণ। সর্বস্ব হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে বৃদ্ধ বয়সে কী দীন, সরল একক জীবন যাত্রা!

শ্যামাচরণ দে বেরিলী কলেজে অধ্যাপকের কাজ করার পর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেক দিন অঙ্কের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দেশের লোককে বিদ্যাদান, শ্রমদান, অর্থদান, প্রীতিদানের জন্যই বোধ হয় তাঁর জন্ম হয়েছিল। এই সরল, নিরহঙ্কার, বিদ্বান, দানবীর, দেহের দিকে ছোটখাটো, কিন্তু মনের দিকে অত্যন্ত বড় মানুষটিকে দেখে সাধু-দর্শনের পুণ্যে মন ভরে যায়।

কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, তিনি সংসারের লীলা সংবরণ করে চলে গেলেন সাধনোচিত-ধামে। বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী মণিহারের একটি উজ্জ্বল রত্ন খসে পড়ল চিরদিনের জন্য।

ডঃ ভগবান দাস

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কয়েকটি দিনের জন্য স্থান পেয়ে আনন্দিত হই। এসেই শুনি অল্পদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত এই বিশাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ৫২ সালের ৩৩তম সমাবর্তন উৎসবের কথা, অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলীর মুখে। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডঃ ভগবান দাস ছিলেন এ যজ্ঞের হোতা; তাঁর জ্ঞান-গর্ভ সুললিত ভাষণ শুনে সকলে মুগ্ধ,—শুনেই প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগে একবার চাক্ষুষ তাঁকে দর্শন করে ধন্য হবার।

বিদ্যা-কলা-কৃষ্টি-ধর্মের পীঠস্থান কাশীতে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত হাজার ছাত্রের উচ্চশিক্ষা এবং আহার ও বাসস্থানের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের অবিস্মরণীয় কীর্তি হলেও এর সঙ্গে জড়িত, মূলে ছিলেন এক সাগর পারের বিদেশিনী মনস্বিনী মহিলা ও ডঃ ভগবান দাস।

আজকের এই বিশাল বিদ্যায়তনের বীজ বপন করেন বহু পূর্বে শ্বেতাঙ্গিনী ডঃ অ্যানি বেশান্ট, ইংরেজ সূর্য তখন মধ্য গগনে। ভারতবাসী তখন নিজের কৃষ্টি ভুলে, ইংরেজী শিক্ষার

বন্যায় ডুবে বিদেশী বিধর্মীর চোখ দিয়ে নিজেদের দেখছে। বিদেশিনী অ্যানি বেশান্টের প্রাণে তা করে দারুণ আঘাত। তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় এই আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে আবার স্বধর্মে, স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। এক দলত্যাগী ভারতীয় কর্মী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ডঃ ভগবান দাসকে পুরোধায় রেখে, তাঁকে সাহায্য করতে।

সেই উদ্দেশ্যে প্রাচীন হিন্দুধর্মের আবেষ্টনীতে জনগণকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে কাশীতে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ নামে একটি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন মনস্বিনী অ্যানি বেশান্ট ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। ডঃ ভগবান দাস তখন সুশিক্ষিত নবীন যুবক, হাত মেলান এসে ডঃ বেশান্টের সঙ্গে, তাঁর সর্বকর্মে সহকারী হিসাবে।

একদিন পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করে, সন্ধ্যায় যাই তাঁর আবাসে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে সহরের ভিতরে উচ্চ প্রাচীর ঘেরা প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে ছোট বড় কয়েকটি পাকা বাড়ী; তারই একটি ছোট একতলা বাড়ীতে থাকেন ডঃ ভগবান দাস ও তাঁর পত্নী।

বন্ধ দরজায় বার বার আঘাত করায় বৃদ্ধ ভগবান দাস নিজেই এসে দরজা খুলে দিলেন, স্মিত-হাস্যে স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়ে। মনে হয়, পড়াশোনায় এমন মগ্ন হয়ে ছিলেন যে, সহজে ডাক শুনতে পান নি। বয়স প্রায় নব্বই হলেও, সরল দীর্ঘ দেহ, কাঞ্চন বর্ণ, প্রতিভা-দীপ্ত চক্ষু, শুভ্র কেশ ও শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত বদন-মণ্ডল, দীর্ঘ আলখাল্লা পরিহিত আকৃতি, বার বার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

ঐ বয়সেও ডঃ ভগবান দাস ছিলেন জরার আক্রমণ বর্জিত। স্মৃতিশক্তি তখনও অতি প্রখর; উপনিষদের অনেক শ্লোক সুললিত কণ্ঠে মন থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন। তিনি থিয়জফি ও ফিলজফিতে কত যে বই লিখেছেন সমস্ত জীবন,—তার সংখ্যা করা যায় না। এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও পড়াশোনায় ক্ষান্ত হন নি।

কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করি,—এই ভর-সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসে পড়ছেন কেন? বাইরে বেড়াতে যান না?

সহাস্যে জবাব দেন,—সমস্ত জীবন লেখাপড়া ভিন্ন আর কিছুই তো অভ্যাস করি নি,—কাজেই আজ এই বয়সে যা জানি, তা ছাড়া আর কী করব?

চারিদিকের পুস্তকের পাহাড়ের আড়ালে ধ্যান-মগ্ন প্রাচীন ঋষিটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। ক্ষণ পরে তাঁর অশীতিপরা, লোলচর্মা বৃদ্ধা স্ত্রী, মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা (বোধ হয় উত্তর-ভারতীয় শালীনতার প্রভাব) টেনে, কী এক সাংসারিক প্রয়োজনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেদিন সন্ধ্যায় এই দু'জনকে পাশাপাশি দেখে মনে হয়, আমাদের কাশী আসা সার্থক! জীবন্ত হর-গৌরীর দর্শনে জীবন হল ধন্য! এঁদেরই সুযোগ্য পুত্র রাজনৈতিক শীর্ষস্থানে অবস্থিত ভূতপূর্ব রাজ্যপাল—শ্রীপ্রকাশ।

কর্ণেল গোল্ড ও তাঁর কন্যা

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুণা-প্রবাস। তার মধ্যে একবার দেখি এক বিদ্বান পিতা ও তাঁর বিদুষী কন্যাকে।

লণ্ডন মেটিওরলজিকেল অফিসের 'ডেপুটি ডিরেক্টার' এলেন পুণায় তাঁর স্ত্রী-কন্যা সহ। পিতা যেমন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক,—কন্যাও তাই! কে কাকে ছাড়িয়ে যায়—তার ঠিক নেই। নাম তাঁদের,—কর্ণেল, মিসেস্ ও মিস্ গোল্ড। তাঁরা আসার পূর্বেই পুণার 'হাওয়া-দপ্তরে' তাঁদের আগমন সংবাদ ও তাঁদের সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। সাগরপার থেকে এত বড় বিদুষী ও মহিলা-বৈজ্ঞানিক ভারতে বোধ হয় কমই এসেছেন।

তাঁরা এসে পড়লেন। মিসেস ও মিস্ গোল্ডের এই প্রথম ভারত আগমন। তাঁরা ভারতীয় মহিলা সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলান্বিতা। এসেই বললেন,—আমরা একদিন ভারতীয়াদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চাই।

সেই অনুসারে হয় অফিসের টেনিস-ক্লাবে এক চা-সম্মেলনের আয়োজন ও এই দপ্তরের সমস্ত ভারতীয় কর্মচারী ও তাঁদের গৃহিণীদের নিমন্ত্রণ।

নির্দিষ্ট দিনে সকালে খবর পাই,—অফিস-কোয়ার্টার-নিবাসিনীরা একজনও সে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না।

আশ্চর্য ব্যাপার! কারণ? কারণ অজ্ঞাত। পরিচালকের মুখ-নিঃসৃত খবর শুনে অবাক হয়ে, মনে মনে কারণ অনুসন্ধান করি। মনে হয়,—অফিসার-গৃহিণী মারাঠী, গুজরাটী, মাদ্রাজী মহিলাদের সেকালের রীতিতে ইংরাজীতে অনভ্যাস, হয়ত এর কারণ হতে পারে,—কিন্তু বাঙ্গালী? তাঁদের মধ্যে তো আই, এ—বি, এ—ডিগ্রীধারিণীরাও আছেন,—তবে তাঁরা যাবেন না কেন?

এখানে মনে হয় একটি কথা, সেদিনে দেখেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী মহিলারা বিদেশে গিয়ে পড়েন কি বিষম বিপাকে! এক বাক্য ইংরেজী বলা হয়ত দিয়ে পাকে সহজ, অথচ বাঙ্গলার বাহিরে সে সব দিনে ভাল ইংরেজী কথোপকথনের অভ্যাস না থাকলে যে কী অসুবিধায় পড়তে হত, তা ভুক্তভোগীরা ভালোই জানেন!

যাহোক,—দুপুরে খাবার সময়, সমস্ত ঠিক পরিচালক এসে বললেন,—বিকেল চারটেয় চায়ের নিমন্ত্রণ আমি ঠিক দশ মিনিট আগে এসে নিয়ে যাবো, তৈরী থেকো।

তাড়াতাড়ি জানাই, অফিস-কোয়ার্টারের কিছু লোক, শুনলেন এর মুখে শোনা সঠিক তাজা সংবাদ। আমরা ছিলাম তখন অফিস-সব এলাকার বাইরে, কিন্তু বেশী দূরে নয় বলেই, অফিস প্রাঙ্গণের খবরাখবর পেতে দেরি হত না। খবরটা দিয়েই বলে,—একটিও ভারতীয় মহিলা যদি না যান, তবে আমিই বা যাবো কেন? আমি কী সেখানে 'হংস মধ্যে বকো যথা' হয়ে বসে থাকব? যাবো না আমিও!

কর্তা বললেন,—কে যায়,—কে না যায়, তোমার তা দেখার দরকার কী? কেউ যদি নাও যান, তবুও তোমাকে যেতেই হবে। বিদেশিনীরা বিশেষ করে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছেন,—না যাওয়া হবে চরম অভদ্রতা।

যথা সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে যাই সেখানে। গিয়ে দেখি,—যা শুনেছি তাই সত্য। একটিও ভারতীয় অফিসার-গৃহিণীর দেখা নেই, ভারতীয়াদের মধ্যে একা আমি, অন্য দু'জন বিদেশিনী অফিসার-গৃহিণী ছিলেন। নিজেকে যেন বেশ অসহায় মনে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

নজরুল জেলে চলে যাওয়ার ফলে আমাদের জীবন কিছুদিনের মত মরা কোটাল চললেও নজরুলের প্রাণপ্রবাহে জোয়ার অক্ষুণ্ণই রইল। জেল থেকে যে চিঠি লেখে তাতে প্রাণের উৎসাহ কল কল করে ছুটছে। চার পাশে তার যতই ইটের দেয়াল থাক, মন তার অবাধে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। প্রতি বুধবার প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছি আমরা, মোটা জালের বেড়ার ওপাশে থেকেও সে হাসি গানে উচ্ছল করে তোলে পরিবেশ। পাহারাদাররা প্রমাদ গণে, কিন্তু আপত্তি করার মত তেমন কিছু পায় না। রাজনীতি বাদ দিয়ে বাইরের খবরাখবর আদান-প্রদানে কোন বাধা নিষেধ নেই, কিন্তু নজরুলের পক্ষে উত্তেজিত হওয়ার মত কারণ দুর্লভ নয়। তবে উত্তেজনা যেনা হয়ে ফেটে পড়ে, বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। কয়েদীর পক্ষে আর কি করা সম্ভব। যেহেতু কি নজরুল, কি আমরা, কেউ কর্মবিপ্লবী নই। আমাদের বিপ্লব ভাবের রাজ্যে, তার প্রকাশ আবেগে ও বাক্যে।

তবু প্রথম দিনে জেলে ভিজিটার হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, সরকারী সাক্ষী রেখে কথাবার্তা কওয়া আর কাটা জালের ফোকর দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করায় কারুরই মন ভরবে না। তাই জেলের ওয়ার্ডার দরোয়ানদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ব্যবস্থা করতে হল যাতে চিঠির আদান-প্রদান অব্যাহত হতে পারে। বে-সরকারী আদান-প্রদানের ফলে প্রেরকের কাছ থেকে প্রাপকের হাত পর্যন্ত চলাচলিতে চিঠিখানি অক্ষতই থেকে যাবে। কিন্তু তাদের প্রচুর তোয়াজ করতে হয়েছে। তার ফলে আমাদের অর্থব্যয়ও কম হয়নি। তবে তাদের দিক থেকে সহযোগিতার প্রয়াস ছিল যথেষ্ট। আলিপুর থেকে মধুরায় লেনের মেসে রোদ্দুর ভেঙে এসে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার উপযুক্ত দক্ষিণা আমরা কোনদিনই দিতে পারি নি।

কিন্তু কতখানি খবরাখবর বে-সরকারী খাতে আদান-প্রদান করতে হবে সে সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবহিত ছিলাম। তাই ওয়ার্ডার বাহিত ডাকে যখন নজরুল কবিতা পাঠালে, সরাসরি আমরা তা ফিরিয়ে দিলাম। তাকে জানালাম, কবিতা সরকারী ডাকে আসা চাই। নইলে প্রকাশের পরেই প্রশ্ন উঠবে জেলে লেখা কবিতা বাইরে এল কি করে? লক্ষ্মী ছেলের মত কবিতাটি ডাকেই পাঠিয়ে দিল নজরুল।

• * * •

একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে মার্কেটে গোকুলের ফুলের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। যেন আমাকেই প্রত্যাশা করছিল, এমন ভাবে সে আমাকে অভ্যর্থনা করলে। বললে, খবর দিতে পারি নি বটে, কিন্তু পত্রিকা বেরোনোর সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। আপনার সহযোগিতার উপর অনেকখানি নির্ভর করছি। ডি, আর, আর আমি কল্লোল পত্রিকা হয় তো প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু তাতে নবযৌবন জলতরঙ্গের কল্লোল ধ্বনি জাগাতে হলে আরো অনেককে দরকার হবে। সেই অনেকের মধ্যে পয়লা নম্বর আপনি।

আমি তো চাই-ই আপনাদের সঙ্গে থেকে কল্লোলের জল ঘোলা করব, আমি বললাম। তবে কাজের কাজ কতটুকু করতে পারব, তাই ভাবছি। জানেন তো, আমার কলমের ডগা সব সময়ই শুকনো। যাই হোক, ডি, আর-এর সংগে বসে পরামর্শ করা যাবে।

ডি, আর-এর বাড়ীতেই তো আমাদের আপিস। আপনার পক্ষে আন্ধেক রাস্তা এলেই চলবে। সিমলা থেকে পটুয়াটোলা, এমন কি দূর।

দূরের কথা বলছি না, কাজের কথা ভাবছি। ভাবছি নজরুলের একটা কবিতা আছে আমার কাছে জেল থেকে পাঠানো। সেটা কল্লোল-এর প্রথম সংখ্যায় ছাপলে কেমন হয়?

নজরুলের কবিতা? বলেন কি! গোকুলের চোখ-মুখ উৎসাহে দীপ্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন সন্ধ্যায় নজরুলের কবিতাটি পকেটে নিয়ে ১০।২ পটুয়াটোলা লেন কল্লোল কার্যালয়ে আমার প্রথম প্রবেশ।

ছোট্ট একখানি সেক্রেটেরিয়েট টেবিলে এক জোড়া সম্পাদক আসীন। সিনিয়ার সম্পাদক দীনেশরঞ্জনই প্রধান আসনে উপবিষ্ট। গোকুল বসেছে তারই উল্টোদিকে একখানি লোহার চেয়ারে। টেবিলের উপর সামান্য কাগজপত্র—কিছু লেখা, কিছু প্রুফ, ঝকঝকে দোয়াতদানিতে সৌখিন হ্যাণ্ডেলওয়ালা কলম। দীনেশরঞ্জনের চেয়ারের ডান পাশে ছোট্ট একটি হোয়াটনট, দিশি-বিলাতী শিল্প ও সাহিত্যের বই তাতে সাজানো। ছোট্ট ঘরের দেয়ালগুলি ম্লান, যে কোন সময় বালির চাপড়া খসে পড়তে পারে। ঘরের একপাশে শতরঞ্চি বিছানো তক্তপোশে বসে পড়লাম। পকেট থেকে নজরুলের কবিতার পাণ্ডুলিপিটি বার করে এগিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গোকুল সেটি তুলে নিল এবং তখনই তা পড়তে সুরু করে দিল। ডি, আর-এরও প্রায় কেড়ে নেওয়ার অবস্থা। প্রথম অংশটুকু দেখে ডি, আর বলে উঠলেন, নজরুলের উল্লাসে আমরা সৃষ্টিসুখ উপভোগ করব। গোকুল সঙ্গে সঙ্গে সুর করে পড়তে সুরু করে দিল:

আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে—
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার জোয়ার-ভাঙা কল্লোলে!

আজ।
জাগ্‌ল সাগর, হাসল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়-মরা বাম পাশে! * * *

পড়া শেষ করে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে গোকুল। তারপর বলে, কবিতাটা কি কল্লোল-এর প্রথম সংখ্যার জন্যই বিশেষভাবে রচিত, নইলে এমন করে কল্লোল-এর মর্মবাণী তার মধ্যে প্রকাশ পেল কি করে?

পায় হে, পায়, বললেন ডি, আর। এটা যে এ যুগের যৌবনের মর্মবাণী। অনেকেরই মনের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরছে প্রকাশের আকুলতায়।

আমি বললাম, কল্লোল যদি বাঁধ ভেঙে দিতে পারে, তাহলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে নতুন যুগের আবেগের প্লাবন। অনেকেই আসবে, কল-কাল্লোলে ভরে যাবে এ ঘর, বান ডাকবে কল্লোল-এর পাতায়। সদ্যোজাত শিশু জরায় মরাদের ভাসিয়ে দেবে।

গোকুল বললে, আপনার উপর কিন্তু অনেকখানি নির্ভর করছি।

লোক ডেকে এনে জড়ো করতে আমার অসুবিধা হবে না, আমি বললাম। তারপর কে থাকবে, কে যাবে, কাকে দিয়ে কাজ হবে, আর কাকে দিয়ে কাজ হবে না, তা রইলো ভবিতব্যের হাতে।

বিকেল তখন প্রায় চারটে। চৈত্র মাসের রোদ, গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছে, হাওয়ায় আগুনের হল্কা, তারই মধ্যে বাদুড়বাগানে শৈলজার ঘরের জানলায় এসে টোকা মারলাম, নইলে এই ভরদুপুরে এসে গোলমাল করলে ওর বৃদ্ধ মাতামহ আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে নেবেন না।

শৈলজা তৈরীই ছিল, টুক্ করে বেরিয়ে এল। প্রবাসী আপিসে যাব, একটা নতুন গল্প লিখেছে, সেটা চারুবাবুকে দেখাবার জন্য আমাদের এই যাত্রা।

'প্রবাসী' আপিস তখন ব্রাহ্মসমাজের পাশের গলিতে। কাজেই বাদুড়বাগান রো (বর্তমান রামানন্দ চ্যাটার্জি স্ট্রীট) থেকে পশ্চিমমুখো এসে আমরা আমহার্স্ট স্ট্রীট পড়লাম, সেখান থেকে বাঁয়ে ঘুরে দু' পা যেতেই দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে গোকুল। কাছে আসতেই জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার, এই রোদে কোথায়?

ছাপাখানায় যেতে হচ্ছে ভাই। এই তো একটু আগেই, মাণিকতলা স্ট্রীট (বর্তমানে মাণিকতলা স্ট্রীটের সেই অংশ বিবেকানন্দ রোড আত্মসাৎ করে নিয়েছে)।

আমি শৈলজার সঙ্গে গোকুলের পরিচয় করিয়ে দিলাম। জানালাম, ও নজরুলের কৈশোরের বন্ধু এবং ওর পকেটে একটি সদ্য লেখা গল্প।

তা আপনি যেসব লেখক ধরে এনে দেবেন বলেছিলেন, ইনি কি তাদের একজন?

বলতে পারলাম না যে লেখা নিয়ে 'প্রবাসী'তে ছাপাতে দেওয়ার চেষ্টায় চলেছি। শৈলজার পায়ে একটু মাড়িয়ে দিয়ে ইঙ্গিত জানালাম, তারপর বললাম, যাবার তো কথা ছিল, তা আপনি প্রেস থেকে ঘুরে আসুন। আমরাও অন্য একটু কাজ সেরে পটুয়াটোলায় গিয়ে হাজির হচ্ছি।

প্রেসে এখন না গেলেও চলবে, কি ভেবে বললে গোকুল। ওঁর পকেটের গল্প ইতিমধ্যে পকেটমার হয়েও যেতে পারে। দরকার কি, চলুন তিনজনে মিলেই পটুয়াটোলা যাই।

শৈলজা আমার দিকে তাকায়। আমি কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলি, চল না, ভাবনার কি আছে। গোকুল নাগ মাসিক কল্লোল বার করছে। সেখানে গিয়ে জুটলে আখেরে সবারই ভালো হবে। তোকে তো বলেছি গোকুল নাগের কথা? চল।

তিনজনে সেই রোদে আবার আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে চললাম দক্ষিণে? পটুয়াটোলার ঘরে এসে যখন পৌঁছলাম, দীনেশরঞ্জন টেবিলে বসে ছবি আঁকছিলেন। গোকুল বললে, দেখো ডি, আর, পবিত্রবাবু লেখাসুদ্ধ লেখক ধরে এনেছেন।

তক্তপোশের উপর জাঁকিয়ে বসে অগত্যা লেখাটি বার করে পড়তে শুরু করল শৈলজা; কয়লাকুঠির ময়লা লোকগুলোর কালো জীবন নিয়ে শৈলজার নতুন পরীক্ষা। গল্পটির নাম 'মা।' দীনেশরঞ্জন হাতের কলম হাতে ধরেই একাগ্র মনে শুনলেন।

পড়া শেষ হতে গোকুল হাত বাড়িয়ে দিল, অতি সহজেই শৈলজা গল্পটি তুলে দিল তার হাতে। গোকুল বলল, এই সব কথা বলবার জন্যই কল্লোল-এর জন্ম। এ গল্প কল্লোল-এর, সহজাত অধিকারের বলে।

প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের রচনাবাহী 'প্রবাসী'তে গল্প প্রকাশের আশা পোষণ করেছিল শৈলজা, কিন্তু গোকুল যেভাবে

সোচ্ছাস আগ্রহে গল্পটিকে গ্রহণ করল, শৈলজাকে বলল, আপনি তো কল্লোল-এর, আপনার সুর কল্লোল-এর সুরে বাঁধা—শৈলজা তাতে অভিভূত হয়ে পড়ল। আমার আরকাঠি-বৃত্তির প্রথম পর্বের সার্থকতা উদযাপনের জন্য চায়ের প্রস্তাব করলেন দীনেশরঞ্জন।

* * * *

কি জানি কেন জ্বর এসে গেল। জ্বর তেড়ে উঠলে শুয়ে শুয়ে কবিতার ডিলেরিয়াম বকি। আশু ঘোষ বলে: সাহিত্য কল্পের ঠেলা সামলাও এখন।

আবার যখন জ্বর কম বসে বসে চা খাই, আশু ঘোষ খগেনকে ডেকে বলে, ভগা, আদার কুচি আইনা দিতে পার না?

খগেন অবশ্য পারে। জ্বরো মুখে বেশ লাগে। ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ। আর কিছু না হোক, অন্তত মোড়ে গৌরের চায়ের দোকান পর্যন্ত যেতে পারলে অনেক ভালো লাগতো।

এইভাবে তিন-চারদিন পড়ে আছি। সন্ধ্যার সময় সদলবলে হরিপ্রসাদ এসে হাজির। দলে আছে অনিল বসু, বীরেন মিত্র ও আরো দু'একজন।

এ কি কাণ্ড করেছেন? বলে হরিপ্রসাদ, এত জ্বর নিয়ে পড়ে আছেন!

কয়েন তো কনে কো, বলে আশু ঘোষ, বোন কথা শোনবো না, খালি বদ্‌'বে বদ্‌'বে গুইরা বেরাইবো। জ্বর আইবো না তো কি!

কিন্তু ডাক্তারপত্র তো কিছু দেখাতে হয়, বলে অনিল।

বেকার মেসবাসীদের অসুখ করলে ডাক্তার লাগে না, আমি বললাম। দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকলে আপনি সেরে যায়।

মেস-বাসীদের অসুখে ডাক্তার হয় তো লাগে না, বললে বীরেন, সেই জন্যই আপনাকে এখনই মেস থেকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। নাড়ীটা কি বলুন তো, গায়ের জ্বর আপনার কম্সে কম একশো তিন ডিগ্রী হবে। আর বলছেন, এখন একটু কম আছে। একটা থার্মোমিটার পর্যন্ত নেই।

থার্মোটার আইনা জ্বর হয় তো জ্ঞাপন যাইতো, কিন্তু তার পর? বেশী জ্বর দেইখ্যা কপাল থাবড়ান ছাড়া আর কি করতাম?

কিছু করা হয় তো আপনার পক্ষে সত্যি সম্ভব নয়, বলে বীরেন, কিন্তু আমি ডাক্তার। আমার পক্ষে যখন কিছু করা সম্ভব—

তবে নিশ্চয়ই করবেন, আশু ঘোষ যেন হালে পানি পেল। খগেনরে একখান রিক্স ডাকতে কই।

* * * *

রিক্সা করে এসে বীরেনের বাড়ী হাজির হলাম।

বীরেনের বাড়ীতে তারুণ্যের সংসার। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ তার বয়স সেই বাড়ীর কর্তা তার অনুজা বাড়ীর গৃহিণী। ভাইবোনে মিলে বাপ-মা মরা ছোট ভাই-বোন ক'টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। সরকারী চাকুরে বাবার সামান্য সঞ্চয়ের উপর বীরেনের সংসার। হোমিওপ্যাথী সে পাশ করেছে, কিন্তু ডাক্তারী বৃত্তি করার তার সময় কোথায়। তখন দেশ জুড়ে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, চরকা-খদ্দর এই সব নিয়ে মেতে থাকতেই তার সময় ও শক্তি ব্যয় হয়। খদ্দর ফেরি করা, লোককে খদ্দর ব্যবহারে প্রণোদিত করা—এই বাতিকেই সে মেতে আছে। তবে ডাক্তারী সে করে, যেমন আমার ক্ষেত্রে করছে, বৃত্তি হিসেবে নয়, পাত্র বুঝে ব্রত হিসেবে।

বীরেনের চিকিৎসায় ও তার ভাই বোনদের শুশ্রূষায় ক'দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। এরই মধ্যে একদিন গোকুল এসে হাজির। মেসে গিয়ে সে শুনেছে, অসুস্থ অবস্থায় আমাকে চিকিৎসার জন্য মদন মিত্র লেনে স্বগৃহে নিয়ে গিয়েছেন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বীরেন মিত্র। ঐ সূত্র ধরেই খুঁজে খুঁজে এসেছে গোকুল।

কল্লোল প্রকাশ আসন্ন, আর আপনি কি না আরাম করে নার্সিংহোমে শুয়ে আছেন, বললে গোকুল।

নার্সিংহোম কি না জানি না, আমি বললাম, তবে যে পরিমাণ নার্সিং হচ্ছে ও আয়েস করছি, আমার জীবনে তা দুর্লভ। সেরে তো উঠেছি, কল্লোল বেরোবার আগেই চাঙা হয়ে উঠবো।

বেরুবার আর বাকী কি, বললে গোকুল। হ্যাণ্ডবিল বিলি হয়ে গেছে। বৈশাখেই পত্রিকা প্রকাশিত হবে। লেখা সংগ্রহের দিকে আপনি যা সহায্য করেছেন, তাতে প্রথম থেকেই কল্লোল-এ আপনি এক প্রধান খুঁটি হয়ে বসে গেছেন।

লেখা সংগ্রহই সব নয়, আমি বললাম, আর দু'টি লেখা নিয়ে কোন পত্রিকা চলে না।

ছাপাখানার কাজ আপাতত আমিই চালিয়ে নিচ্ছি, বললে গোকুল। আপনার উপর যে দায়িত্ব বর্তেছে তাহল কল্লোল-এর ডাক বহুর মধ্যে চারিয়ে দেওয়া। আপনার সম্পূর্ণ শক্তি কল্লোল-এ প্রয়োগ করুন, এমন দাবি এই মুহূর্তে করতে পারব না। কিন্তু সেই মুহূর্তটিকে এগিয়ে নিয়ে আসার পথও আপনাকেই করে দিতে হবে।

বাড়ীর সামনের ঘরেই আমি ছিলাম। কাজেই গোকুলকে বাড়ী খুঁজতে যেটুকু বেগ পেতে হয়েছিল, আমাকে খুঁজতে কোনই কষ্ট পেতে হয় নি, কারো সাহায্যেরও দরকার হয় নি। রাস্তার ডাণ্ডগুলি খেলছিল যে সব পাড়ার ছেলে তাদেরই মধ্যে একজন গোকুলকে পৌঁছে দিয়েছিল আমার কাছে। ছেলেটি বীরেনের বাড়ীওয়ালা ডাঃ প্রেমতোষ বসুরই ছোট ভাই, নাম আশাতোষ বসু।

একটু পরেই বীরেন এসে ঘরে ঢুকলো। ভাবখানা যেন কে আবার এল রোগীকে বিরক্ত করতে। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম, জানালাম কল্লোল বার হচ্ছে। বারবেলা বৈঠকের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস জানালে বীরেন।

গোকুল বললে, ঐ জন্যই তো পবিত্রবাবুকে টোপ ফেলেছি। ওর চার দিকে জাল ছড়ানো। সেই জাল টেনে তুললে অনেকে আসবে কল্লোল-এর ঘরের মানুষ হয়ে। আপাতত যা দরকার তা ওঁর সেরে ওঠা।

না, ওঁর এমন কোন অসুখ করেনি যার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে, বললে বীরেন, তবে বিশ্রাম নেওয়া একান্ত দরকার।

বেশ তো। ঘোরাঘুরি এখন না-ই বা করলেন, বলল গোকুল। আসর জাঁকিয়ে এসে বসুন না। তারপর যে-যাকে পারে চায়ে এনে হাজির করলে টেনে তোলবার ভারটুকু থাকবে ওঁর ওপরে।

গোকুলকে কথা দিলাম, সেরে উঠেই পটুয়াটোলায় গিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসব। আমি কাউকে টেনে তুলতে পারব কি না জানি না, আমারই যে টান পড়েছে। অনিবার্য ভাবে টানছে, গোকুল দীনেশ কল্লোল-এর চার। সে আকর্ষণ নিবারণের কোন আগ্রহ আমার নেই, বরং ধরা দেবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। [ক্রমশ।

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্‌বেদ

১।৬৩।৫ আপন কর্মে বিশ্বাসী যেবা দেবতা সহায় তার,
বিঘ্ন বিপদ দুখ-সংকট সহজে সে হয় পার।
আসে যদি তারে নাশিতে বৈরী আঁধারেতে চুপ চুপে,
হান তারে তব কিরণ-ভল্ল প্রভাত সূর্য রূপে।
যদি কেহ আসে ঊর্ধ্ব-আকাশে আতঙ্ক সঞ্চারি,
বিদারে বজ্রী দম্ভোলিঘাতে সবল দস্যু তারি।

১।৬৩।৬ গ্রাসিল বৃষ্টি, নাশিল ভুবন দারুণ বৃত্রাসুর,
রুক্ষ বাতাসে মরীচিকা ভাসে, বিশ্ব বেদনাতুর।
শস্যশূন্য নিঃস্ব বসুধা, ত্রস্ত অসুর ত্রাসে,
নৃত্য করিছে দৃপ্ত দানব, মত্ত অট্টহাসে!
সহসা দ্যুলোকে দামিনী দমকে ঝলকে বহ্নিশূল,—
উথলে গগনে অনল-সিন্ধু,—কাঁপে দানবকুল।
বাজে গুরু গুরু প্রলয় ডমরু কহিলা পুরন্দর,—
অমোঘ অশনি—ঋষিবঙ্কাল হানিল অসুর 'পর।

১।৬৩।৭ পুরুকুৎসরে দারুণ সমরে রক্ষিলে বার বার,
ভেদিয়া সপ্ত সুদৃঢ় দুর্গ নাশিলে শত্রু তার।
সুদাস রাজনে সমরাঙ্গনে করিতে শঙ্কা দূর,
কাটিলে নিমেষে কুশতৃণ সম কুৎসী অংহাসুর।

১।৬৩।৮ হে মেঘবাহন, প্রসাদে তোমার মোরা তনু-প্রাণ ধরি,
মিলন ঘটালে আকাশে ভূতলে বারি বর্ষণ করি।
সে মহামিলনে শ্যামল শস্যে অবনী উঠিল ভরি।
হে দাতা মহান, জগৎ-যজ্ঞে তোমারে নিত্য স্মরি।

১।৬৩।৯ হে মরুৎ, তব হেরি নব নব উষার আবির্ভাব,
সাধি প্রাণপণে দুঃসহ ব্রত সম্পদ করি লাভ।
লভিনু তোমার প্রসাদ-বিভূতি—প্রতুল অন্নদান।
গোতম পুত্র রচিল মন্ত্রে তব বন্দনা গান—
'যোজিত তোমার দ্যুতিমান রথে তুরঙ্গ বেগবান।'

১।৬৪।১ শ্যামশোভাদাতা, মরুদ্দেবতা বারি বর্ষণকারী,
শস্যে পুষ্পে সাজালে বসুধা, মুক্ত গগনচারী।
নোধা বিরচিত বন্দনা গানে রচিনু অর্ঘ্য তারি॥
এস সে মন্ত্রে সকল দেবতা ধরাতলে সঞ্চারি।

১।৬৪।২ মঙ্গলদূত, হে দেব মরুৎ অতুল বীর্যবান্‌,
ভয়-নিরসন, বৈরী-নাশন সংকটে কর ত্রাণ।
বিপুলা এ ধরা সদা উর্বরা লভি তব বারিদান।

১।৬৪।৩ হে চিরনবীন, জরাব্যাধিহীন রুদ্রপুত্র সবে—
প্রচণ্ডগতি করাল মূরতি অরাতি বিনাশ হবে।—
ফুৎকারে উড় শৈল-ভূধর ধাবিত মেঘের সাথে,
সপ্তসিন্ধু নাচে দুর্দাম প্রলয় ঝঞ্ঝাঘাতে।
বেগবান্ তুমি হে দেব মরুৎ দুঃসহ তব জ্যোতি,
অনলে অনিলে ভূমে রসাতলে বন্ধনহীন গতি।

১।৬৪।৪ হে দেব মরুৎ খর বিদ্যুৎ নয়নে তোমার ঝলে,
চন্দ্র শোভিছে বক্ষমাঝে বেষ্টিয়ে তারকা জ্বলে।
সূর্য-কিরীটি প্রখর কিরণ ভাতিছে গগন ভালে,
তূর্য তোমার মেঘডম্বর বেজে ওঠে তালে তালে।
বসনে তোমার বাসব-ধনুর সপ্ত বরণ লীলা,
অশনে হে দেব হুতাশন সম আপনারে প্রকাশিলা।
স্কন্ধে তোমার আয়ুধ ভীষণ, বিশ্ব শাসন তরে,
শক্তিদাতা মর্ত-জনের হান মস্তক 'পরে।

১।৬৪।৫ হে মরুৎ, তুমি সম্পদদূত, বৈরী বিনাশকারী,
তুমিই সৃজিলে ঝঞ্ঝাবাত্যা মহাবেগ সঞ্চারি।
আবরিলে নভ নীরদপুঞ্জে, মন্থর গতি তার,
শাসিলে সে মেঘে বিদ্যুৎ-কশা হানিয়া বার'বার!
ঝটিকা তাড়নে গগনে গগনে উন্মাদ সম ছোটে,
কশা প্রহারে ঝরঝর ধারে ধারার বক্ষ লোটে।
পুলকে শিহরে বিশ্ব-নিখিল লভি বরুণার দান,
শ্যামল শোভায় গাহিল বসুধা তব বন্দনা গান।

১।৬৪।৬ ধূমিত অঙ্গ মেঘতুরঙ্গ দুর্বার গতি তার,
তড়িৎ-কশার চকিত আঘাতে গুমরে বার'বার।
ধ্বংস বাজী ঘন মেঘরাজি সংহত করি বলে,
কল্যাণকারী, সিঞ্চিলে বারি ভূলোকে, ধরণীতলে।
তৃষিত, তাপিত, তরুলতাহীন মরুময় পৃথিবীর
জুড়ালে বক্ষ,—হে শোভনদাতা বরষি অমৃত নীর!

১।৬৪।৭ এস ঝঞ্ঝার ঝটিকা উড়ায়ে হে দেব মরুত্বান,
অরুণ বরণী তব অশ্বিনী বেগভরে ধাবমান—
পশি অরণ্য নিমেষ মধ্যে অস্থির ক্ষুরাঘাতে,
নাশি তরুগণ ধ্বংসি কানন প্রলয় নৃত্যে মাতে।
ঘেরি বনতল রুষে দাবানল মেলিয়া লক্ষ শিখা
অসীম কালের অম্বরে আঁকে দীপ্ত দহন-টিকা।

১।৬৪।৮ তুমি সে ভীষণ, শুনি গরজন ত্রিভুবন থর থর,
তুমি সে কোমল, বিহার কাননে মৃগশিশু সুন্দর।
দোসর তোমার জলদ-ঝটিকা, তড়িৎ-ত্রিশূল করে,
ঝলকি গগন কর আগমন বৈরী দমন তরে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

আট

দময়ন্তীর দাদামশায় করাচীর ব্যবসা গুটিয়ে জুনাগড়ে কেন ফিরে এসেছিলেন, সে কথাও সে মামীর মুখে শুনল। তিনি ভাবতেন, সিন্ধীরা তাঁদের ভাল চোখে দেখে না। ভাবে যে গুজরাতীরা এসে তাদের দেশটা নষ্ট করছে। বুড়ো কেন এমন কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন তা কারও কাছে বলেননি। শুধু বলতেন যে, এ মনোবৃত্তি দিনে দিনে বাড়বে এবং একদিন কদর্য আকার ধারণ করবে।

জগতের এই নিয়ম। কোন দেশ পিছিয়ে আছে শুনলেই নানা দেশের লোক এসে সে দেশে ভিড় করে। নানা কাজের জন্য। কেউ মজুর খাটতে আসে, কেউ ব্যবসা করতে আসে, কেউ আসে শিক্ষা সংস্কৃতির ভার নিয়ে। ধর্মপ্রচার করতেও কেউ আসে। তারপর কায়েমি ব্যবস্থার জন্য লাঠালাঠি। যারা জেতে, তারাই কর্তা হয়ে বসে। তারপর সে দেশের লোক যখন শিখে পড়ে মানুষ হয়ে ওঠে, তখন শুরু হয় আসল গোলমাল, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। এখানে রাজনৈতিক গণ্ডগোল নয়। এখানে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা। গুজরাতীরা ব্যবসা করতে নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য প্রদেশের লোকেরাও শিখে উঠছে। তখন তারা চুপ করে কেন থাকবে? গলা ধাক্কা খাবার আগেই নিজের দেশে ফিরে যাওয়া ভাল।

মামীর ধারণা যে তখন দেশে ফিরে না এলে সংসারে লক্ষ্মী বাঁধা পড়ত। জাপানীরা যখন ভারতের পূর্বপ্রান্তে হানা দিয়েছিল, তখনই তো সকলের কপাল ফিরেছে। কিন্তু তার আগেই সবাই এসে জুনাগড়ে বসেছেন।

মামা বলেন, এ ভালই হয়েছিল। সে সময় চলে না এলে কয়েক বছর পরে আসতেই হত। তখন মার খেয়ে আসতে হত নিঃসম্বল অবস্থায়। সময় থাকতে চলে এসে বুড়ো ভালই করেছিলেন।

দময়ন্তীর দাদামশায় জামাইকেও আনবার চেষ্টা করেছিলেন। নরোত্তম খেমলানি তখন যুবক, জুনাগড় তার ভাল লাগল না। শুনেছিল, কলকাতা খুব ভাল জায়গা। গুজরাতীদের মতো সিন্ধীরাও বেশ ব্যবসা ফেঁদেছে। বন্ধুরাও সেখান থেকে ডাকছে। ব্যবস্থা একটা হবেই। কাজেই শ্বশুরের বন্ধন কাটিয়ে জামাই একদিন সরে পড়লেন। দময়ন্তীর জন্ম তখনও হয়নি। যুদ্ধের পরে সে জন্মেছে। মামার বাড়িতেই জন্মেছে। তারপরে এই আবার দেশে এল।

মামী জিজ্ঞাসা করছিলেন: এ দেশের কথা কিছু মনে আছে?

বা রে! কী করে মনে থাকবে!

তাই তো, তোর তখন কয়েক মাস বয়েস। একেবারে ফুলের মতো দেখতে। আমি সবাইকে বলতাম, ও যার ঘরে যাবে—

লজ্জায় দময়ন্তী রাঙা হয়ে ওঠে।

মামী বলেন: ওমা, অত লজ্জা কিসের গো। সারা জন্ম তো পরের ঘরই করতে হবে। পরের ঘর করবার জন্যেই তো জন্মেছিল।

না, না—

না না কিরে বিয়ে করবি না নাকি? লেখাপড়া করে কি কলকাতার মেয়েদের মতো মাষ্টারনী হবি?

দময়ন্তী এ সব কিছুই বলেনি, শুধু এই প্রসঙ্গ বন্ধ করবার জন্য আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু মামী থামলেন না, বললেন: লীলা কোথায় গেলি, তোর মেয়ের কথা শোন একবার।

লীলাবতী কাছেই কোথাও ছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন: কী বলছ?

বলছি তোমার মেয়ের কথা।

দময়ন্তী পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। মামী ডেকে বললেন: পালাচ্ছিস কেন! কী বলেছিস, তোর মাকে একবার শুনিয়ে যা।

দময়ন্তী দাঁড়িয়ে বলল: আমি তো কিছুই বলিনি।

বলিসনি মানে!

লীলাবতী বোধহয় ভেবেছিলেন যে দময়ন্তী কোন অন্যায় কথা বলেছে। তাই বললেন: তুমিও যেমন, তাই ছেলেমানুষের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ!

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন: যেমন মেয়ে তার তেমন মা।

আমি আবার কী করলাম?

তোমার মেয়েই বা কী করেছে!

তারপরে নিজেই বললেন: বলেছে যে তোমার আমার মতো সংসার সে করবে না।

দময়ন্তী আপত্তি জানাল, বলল: আমি তাই বলেছি বুঝি?

মামী বললেন: তবে রাজার ঘর করব বলেছিস?

তাও বলিনি।

তবে কী বলেছিস বল।

অপরাধীর মতো দময়ন্তী বলল: এসব কথা বলতে বারণ করেছি।

লীলাবতী হাসতে হাসতে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু দময়ন্তী সরে যায়নি। মামীর কাছে পুরনো দিনের গল্প শুনতে বসেছিল।

ভিতরের বারান্দায় একফালি রোদ পড়েছিল। সেই রোদে পা ছড়িয়ে বসে মামী সোয়েটার বুনছিলেন। এক কাঁটা সোজা ও এক কাঁটা উল্টো করে একেবারে সাধারণ একটা সোয়েটার। কোন নক্সা তুলতে তাঁর কষ্ট হয়, হিসেব থাকে না। অথচ ছেলেদের দরকার। বাজারে নাকি ভয়ানক দাম, তাই না বুনে উপায় নেই। সময়ও কাটে। দময়ন্তী আবার পাশে এসে বসেছিল।

মামী বললেন: তোকে কী বলছিলাম?

তোমাদের পুরনো গল্প।

মনে পড়েছে। তোর বাবার ব্যবহারে তোর দাদামশায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

কেন?

তার বয়স তখন অল্প। রাতারাতি বড়লোক হতে চেয়েছিল। বললে, জুনাগড়ে ব্যবসা করব না, করাচী আমেদাবাদ বোম্বাই-এও নয়। সে কলকাতায় যাবে।—যাবে যাও, কিন্তু ব্যবসাটা পৈত্রিক কর। তাও না। সে বললে, কাপড়ের ব্যবসায় কি পয়সা আছে!

তবে কিসের ব্যবসা করবেন?

শুনেছিলাম, সে এক নতুন জিনিব। রূপোর মতো চক চক করে, কিন্তু রূপো নয়। কী একটা নাম।

মাইকা?

কী জানি বাবা।

বোধ হয় অভ্র।

ঠিক বলেছিস। ঐ রকমই একটা নাম শুনেছিলাম। তাতে নাকি লাখ লাখ টাকা। মাটি খুঁড়ে নিচে নামতে হয়, আর কপালে থাকলে কোটি। কিন্তু তোর দাদামশায় কি বললেন জানিস?

না।

বললেন, কাপড়ের ব্যবসা করলে মূলধন আমি দেব। ফাট্‌কা খেললে এক কড়িও না। কাজেই তোর মাকে ফেলে তোর বাবা পালিয়ে গেল।

দময়ন্তী চমকে উঠেছিল—পালিয়ে গেল!

হ্যাঁ রে হ্যাঁ। পালিয়ে যাবে না তো কি শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকবে!

নিজের বাড়ি?

নিজের বাড়ি আবার কোথায়? গুজরাতী মেয়ে বিয়ে করেছিল, বলে তার বাবা তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

একটু থেমে বললেন: তোর দাদামশায়ও তোর মাকে হয়তো তাড়িয়ে দিতেন।

কেন?

গুজরাতে কি ছেলে ছিল না যে একটা সিদ্ধি ছেলের গলায় মালা দিতে হবে!

দময়ন্তীর ভারি আশ্চর্য বোধ হল, তার বাবা ও মায়ের মধ্যে তো সে কোন ব্যবধান দেখতে পায় না। তবে কেন তাদের বিয়ের জন্যে এত বিপত্তি! সেও তো অনেক বাঙালী ছেলেকে চেনে, বাঙলায় কথা বলতে পারে তাদের সঙ্গে। তারও যদি এমনি কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়, তবে কি তার বাবা-মা তাকে তাড়িয়ে দেবেন! পরক্ষণেই তার মায়ের আদেশ তার মনে পড়ল। তিনি তাকে প্রায়ই বলেন, ফস্ করে কাউকে বিয়ে করে ফেলিসনে, তাতে অনেক দুঃখ পাবি। বলেন, এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব যে রাজরাণীর মতো সুখে থাকবি।

দময়ন্তী ভাবল, তার মা'ও তো রাজরাণীর মতো সুখে আছে। কিন্তু মামী বলছেন যে তিনি নিজের পছন্দমতো বিয়ে করেছেন। তিনি কি তাঁর মায়ের কথা শোনেননি।

বিয়ে সম্বন্ধে তার হোস্টেলের মেয়েদের অন্য মত। তারা বলে, সংসার যখন নিজে করব, তখন বিয়ে কেন অন্যের পছন্দে হবে। দুর্গা বলে পথে বেরিয়ে পড়া যায়। কেন না পথে নেমেও পরীক্ষা চলে। বিয়ে তো দু'বার করা উচিত নয়, কাজেই দেখে শুনে বাজিয়ে নিয়ে করা উচিত। অনেক সময় দময়ন্তীর মনে হয়েছে যে মেয়েদের কথাই ঠিক। কিন্তু মায়ের কথাটাও তুচ্ছ মনে হয়নি। মা বলেন, অত কম বয়সে ছেলে-মেয়ের বিচারবুদ্ধি পাকে না। প্রায়ই ভুল করে বসে। আর ভুল হলে শোধরাবার পথ নেই। তাইতেই বলে যে বিয়েটা বাপ-মায়ের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। যাঁরা অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, তাঁরা কখনো ভুল করবেন না।

দময়ন্তী লক্ষ্য করেনি যে তার মামী তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল: কী ভাবছিস বল তো?

আমি ?

আমি কি তবে দেওয়ালকে জিজ্ঞাসা করছি।

লজ্জিত ভাবে দময়ন্তী বলল : কিছু ভাবছি না তো।

মিথ্যে কথা। তোকে আমি অন্যমনস্ক দেখছি যে।

মাথা ঝাঁকিয়ে দময়ন্তী বলল : এই তো, আমি একটুও অন্যমনস্ক নই।

মামী তাঁর দু'হাতের কাঁটা এক হাতে নিয়েছিলেন, আর এক হাতে দময়ন্তীকে কাছে আকর্ষণ করলেন। দময়ন্তী মামীর আরও কাছে সরে এল।

চুপি চুপি মামী বললেন : একটা সত্যি কথা বলবি ? আমি কাউকে বলব না।

মামীর কাণ্ড দেখে দময়ন্তীর বিস্ময় আর ধরে না।

মামী বললেন : কোন বাঙালী ছেলেকে ভালবেসেছিস বুঝি ?

দূর !

লজ্জা কি, বল না। দরকার হলে আমি তোকে সাহায্য করব।

দময়ন্তী বুঝতে পারল না, কেমন করে তার মুখ দিয়ে বেরুল : মাকে তো তোমরা বের করে দিতে চেয়েছিলে।

মামী সহাস্যে তার গাল দুটো টিপে দিয়ে বললেন : তোর সে ভয় নেই রে পাগলি, দিন কাল পালটে গেছে।

সত্যিই দিন কাল পালটে গেছে। এখানকার মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ কিছুই মানে না। মানে শুধু হৃদয়ের ধর্ম। দুটো হৃদয় যখন মিলে যায়, তখন বিবাহে আর কোন বাধা নেই। এ যুগের প্রেমিক মনুকে অস্বীকার করেছে, প্রয়োজন হলে অগ্রাহ্য করে অভিভাবকের মত। প্রেমে হয় বিবাহ, লালসায় ব্যভিচার।

তারপর মামী সেই বাঙালী যুবকের কথা জানতে চেয়েছিলেন দময়ন্তীর কাছে। আর দময়ন্তী পালিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিল।

নয়

সকৌতুকে ললিতা জিজ্ঞাসা করেছিল দময়ন্তীকে : সত্যি না কি রে ?

কী সত্যি ?

মা যা বলছে ?

মামীমা কিছু বলেছেন বুঝি ?

ললিতা অঙ্গভঙ্গি করে বলল : আহা হা, কিছুই জানে না যেন।

দময়ন্তী যেন বুঝেও বুঝতে পারছে না, বলল : কী জানতে চাইছিস খুলেই বল না।

জানতে চাইছি তোমার সেই বাঙালী নাগরের কথা।

লজ্জায় দময়ন্তীর মুখ রাঙা হল। তাই লক্ষ্য করে ললিতা গাইল :

> অগ্নি বিচ র.ম নিত রঙ্গে প্রাণ পতঙ্গা মরদানী
>
> সাজন সঙ্গ মিলন মানিলে প্রীত পুরানী পহচানী।

মায়ের কাছে দময়ন্তী গুজরাতী শিখছে। বুঝতে পারল যে ললিতা তার সঙ্গে কৌতুক করছে। বলছে, যে প্রিয়ের সঙ্গে তোমার পুরনো প্রেম, তার সঙ্গে মিলনের আনন্দ উপভোগ করবে, পুরুষ পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ দেবার মতো।

দময়ন্তী বাধা দিয়ে বলল : কী যা তা বলছিস !

কিন্তু ললিতা থামল না, গাইল :

> চল প্রীত নগরিয়াঁ মনমানী
>
> গরথে বাঁধ নকাই গঠরিয়াঁ ব্যরথ নদো নে লুঘানী।

তোমার মনের মতো প্রীতি নগরে চল। সঙ্গে কিছু নিও না, লাভ লোকসানের কথাও ভেবো না মনে।

দময়ন্তী ললিতার মুখ চেপে ধরল, বলল : দোহাই তোর ললিতা, এবারে থাম।

কেন, আমার গলা কি নিতান্ত মন্দ ?

গলা নয়, মুখ।

কী, আমি কুচ্ছিৎ ? এত অহংকার তোর ?

ছি ছি, আমি কি তোর রূপের কথা বলছি !

দময়ন্তীর যেন লজ্জার শেষ নেই। তার লজ্জা দেখে ললিতা হেসে উঠল।

তারপর দুই বোনে বেড়াতে বেরিয়েছিল। দময়ন্তী কথা বলেনি, বলেছিল ললিতা। অনর্গল কথা বলেছিল। জগদীশ মেহতাদের বাড়ি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই বাড়িটা কাদের জানিস ?

জানিনে।

ললিতার ঠোঁটে দময়ন্তী কৌতুকের হাসি দেখল। কিন্তু আর কোন কথা শুনল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দময়ন্তী বলল : কাদের বাড়ি ?

একজনের।

তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কার ?

তা দিয়ে তোর কী দরকার ?

দময়ন্তী গম্ভীর ভাবে বলল : বুঝেছি।

কী বুঝেছিস ?

তা বলব কেন ?

ছাই বুঝেছিস তাহলে।

তবে তাই বুঝেছি।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ললিতা বলল : কী বুঝেছিস বলনা ?

দময়ন্তী এবারে হেসে বলল : তুই নিজেই বল।

এসব কথা বলবার জন্যেই ললিতা আজ দময়ন্তীকে টেনে বার করেছে। বলল : আজ কাল আর আমার কোন খোঁজ নেয় না।

আগে বুঝি রোজ নিত ?

রোজ মানে ! সারাক্ষণ নিত। সকালে সন্ধ্যায় —

তবে এখন কেন নেয় না ?

এখন নাকি লায়েক হয়েছে।

ললিতার সঙ্গে দময়ন্তী হাঁটছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?

উপরকোটের দিকে।

সে আবার কোন্ জায়গা ?

দেখিস নি বুঝি ?

না।

ললিতা বলল : সত্যি তো। এসে অবধি তো তুই মার কাছেই বসে আছিস। বাবা এলে তোকে নিয়ে বেড়াবার কথা বলব। দেখবার জায়গা জুনাগড়ে অনেক আছে।

জুনাগড় দেখবার আগ্রহ দময়ন্তীর হল না। বলল: উপরকোট কত দূর?

এই রাস্তার শেষে।

চোখের সামনে রাস্তার শেষ দেখা যাচ্ছিল না। দময়ন্তী তাই আশ্চর্য হল। হয় তো ভয়ও পেল। বলল: এতটা হাঁটতে হবে!

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

তার যে হাঁটার অভ্যাস নেই, দময়ন্তী সে কথা বলল না। বলল: কষ্ট নয়, আমি সময়ের কথা বলছি।

সময়! সময় কাটাতেই তো বেরিয়েছি।

দময়ন্তীর মুখ লাল হয়েছিল। ঘামও হচ্ছিল অল্প অল্প। বলল: এখানকার রাস্তাগুলো খুব লম্বা।

ললিতা বলল: গির্ণারের রাস্তা আরও লম্বা। সোজা গিয়ে পাহাড়ের নিচে পৌঁচেছে।

এও তো আমরা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি।

ললিতা হেসে বলল: তোকে গির্ণারেও নিয়ে যাব। মন্দির দেখবি? বেশি না মাত্র দশ হাজার সিঁড়ি ভাঙতে হবে।

দশ হাজার!

দময়ন্তী যেন আকাশ থেকে পড়ল।

ললিতা হেসে বলল: বললাম না, মাত্র দশ হাজার। প্রতিদিন কত হাজার যাত্রী উঠছে আর নামছে।

ভয়ে ভয়ে দময়ন্তী বলল: আমি পারব না।

কেন?

সিঁড়ি ভাঙার অভ্যাস আমাদের নেই। একশোটা সিঁড়ি আমরা হেঁটে উঠি না?

তবে?

লিফটে উঠি।

লিফট্ কী?

দময়ন্তী একবার ললিতার মুখের দিকে তাকাল। এমন একটা সাধারণ জিনিস ললিতা জানে না, এ কথা ভাবতে পারছিল না। কিন্তু তার মুখ দেখে আর সন্দেহ রইল না। বলল: লোহার খাঁচা, বিদ্যুতে উপর-নিচ করে।

ললিতা বুঝতে পারছিল না বলে দময়ন্তী অনেক যত্নে তাকে বোঝাল। সব শুনে ললিতা বলল: এমন জিনিষ তাহলে গির্ণার পাহাড়ে কেন নেই?

পাহাড়ে তো লিফট হয় না, পাহাড়ের জন্য রোপ ওয়ে।

রোপ ওয়ে আবার কী?

দময়ন্তী রোপ ওয়ের কথাও ললিতাকে বোঝাল। তারপরে বলল: রোপ ওয়ে কিন্তু মানুষের জন্যে নয়। এদেশে ওতে মালপত্র আনা-নেওয়া হয়।

ললিতা অনেকটা পথ চলল কথা না বলে। তারপরে বলল: আমার কী মনে হয় জানিস?

না।

আমার মনে হয়, কষ্ট না করে কেষ্ট পেলে তার মাহাত্ম্য থাকবে না। এত কষ্ট করে আমরা তীর্থ করি বলেই তা এত ভাল লাগে।

দময়ন্তী বলল: সেইজন্তেই আমাদের তীর্থ হয় না। হঠাৎ একটু জোরে তার নিঃশ্বাস পড়ল। এ কি তার দীর্ঘশ্বাস!

দশ

কথায় কথায় তারা উপরকোটের দরজায় পৌঁছে গেল। সামনের বড় রাস্তাটা এখানে এসেই শেষ হয়েছে। রাস্তার ধারে দু'-তিনখানা অদ্ভুত ধরণের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ি: কিন্তু এ রকম গাড়ি দময়ন্তী আগে কখনও দেখেনি। একা টাঙ্গার মতো খোলা নয়, আবার ছ্যাকরা গাড়ির মতো বন্ধ নয়। এ যেন সার্কাসের সিংহের খাঁচা। লোহার গরাদের বদলে রঙিন কাঠের বাক্স। ভিতরে গদির আসন। এ-গাড়িতে চড়ে দময়ন্তীরা ষ্টেশন থেকে বাড়ি এসেছিল। উঠতে নামতে তার রীতিমত ভয় করেছিল।

দুর্গের বিরাট দরজা দিয়ে ঢুকবার সময় দময়ন্তী থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ললিতা বলল: থামলি কেন?

কেউ-কিছু বলবে না তো!

তুই পাগল হয়েছিস!

বলে ললিতা তার হাত ধরে টানল।

দরজার পাশে দময়ন্তী একজন প্রহরীকে দেখতে পেল। তার হাতে একটা ক্যামেরা। ললিতা বলল: ওকে দেখে ভয় পাচ্ছিস! ওর ঐ কাজ। কারও হাতে ক্যামেরা থাকলে সেটা কেড়ে রেখে দেয়। ভিতরের ছবি তোলার অনুমতি নেই।

দুর্গের ভিতরে সৈন্য নেই?

ললিতা মুস্কিলে পড়ল। এ-কথা জানবার চেষ্টা সে কোনদিন করে নি। জগদীশ মেহতার সঙ্গে সে এখানে অনেক বার এসেছে। এই ধাপ দিয়ে উপরে উঠে গেছে। সরোবরের ধারে ছায়ায় বসে অনেক গল্প করেছে তার সঙ্গে। কিন্তু এই দুর্গের ভিতরে আর কী আছে, সে-কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করে নি। বলল: তা-তো জানি নে ভাই।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল: এ দুর্গ কত দিনের পুরনো?

ললিতা তাও জানে না। বলল: জানি নে।

কোন হিন্দু রাজার তৈরি, না—

কী বিপদ! তুই কি ইতিহাসের পরীক্ষা দিচ্ছিস নাকি!

না না পরীক্ষা কেন, এমনিই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আশ্চর্য!

কেন?

এ-সব জানতেও কারও ইচ্ছে করে! আমার তো লেখা পড়াই হল না এই জন্যে। কিছুই আমার জানতে ইচ্ছে হত না।

দময়ন্তী এবারে বলতে পারত, আশ্চর্য! কিন্তু তা বলল না। বলল: আমারও এই জন্যে লেখা পড়া হয় না। এত জিনিষ জানতে ইচ্ছে করে যে কিছুই মনে রাখতে পারি নে।

ললিতা দময়ন্তীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর বলল: আর কত পড়বি?

এখনও ডিগ্রি নিতে পারি নি, তারপরে এম-এ পড়া।

তারপরে কী করবি?

দময়ন্তী বলল: ভেবে দেখি নি।

চাকরি-বাকরি তো করবি না, করবি সেই হাঁড়ি ঠেলার কাজ, আর—

আর কী?

মার মতো ছেলে মানুষ।

লজ্জায় দময়ন্তীর দু'কান রাঙা হল। কোন উত্তর দিতে পারল না। ললিতার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে হাসছে, উপভোগ করছে তার লজ্জাটুকু। ললিতা তার সমবয়সী হয়েও যে কথা বলতে পারল, দময়ন্তীর কানে তা বড় অশোভন শোনাল। ললিতা বলল: এই লজ্জা কতদিন থাকে তাই দেখব।

নিজের পায়ের দিকে চোখ রেখে দময়ন্তী উপরে উঠছিল। ছাদে পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে গেল। একটি বিরাট জলাশয় চারিদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বাঁধানো পথ আছে সব দিকে আর কিছু ফুল আছে। দময়ন্তী মুগ্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

ললিতা বলল: কেমন লাগছে?

ভাল।

ললিতা কটাক্ষ করে বলল: সঙ্গে সে থাকলে আরও ভাল লাগত।

সে কে?

এঃ, কলকাতার নিন্দে করলি!

কেন?

কলকাতার মেয়ে যে এত বোকা হয় আমার জানা ছিল না।

কলকাতার মেয়েরাও আমাকে বোকা বলে।

তাই বুঝি!

দময়ন্তী উত্তর দিল না।

ললিতা বলল: তবু ভাল যে কলকাতার মেয়ে তোর মতো বোকা নয়।

চলতে চলতে তারা একটি ছায়ায় এসে বসল। তারপর তার হৃদয়ের দুয়ার খুলল অল্প অল্প করে। এইখানে এমনি করে তারা এসে বসত। ললিতা আর সে।

সে কে?

কৌতুকে ললিতার চোখ নেচে উঠল। বলল: সময় হলেই বুঝতে পারবি।

সময় আবার কবে হবে?

আমিও তো তাই ভাবি।

ললিতা একটি পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিল। তারপর ছুঁড়ে ফেলল সরোবরের জলে। বলল: সে কী বলে জানিস?

কী?

ঐ জল যদি হয় মানুষের মন, তো ঐ নুড়ি হল প্রেম। ঐ নুড়ির ছোঁয়ায় জল কেমন আকুলি-বিকুলি করে উঠল।

তারপর তো আবার স্থির হয়ে গেল।

একেবারে স্থির হয় না। সারাক্ষণ কাঁপতেই থাকে।

দময়ন্তী দেখতে পাচ্ছিল যে জল স্থির হয়ে গেছে, তবু বলল: তা হবে।

ললিতা জগদীশ মেহতার নাম একবারও করল না। কিন্তু তার অনেক গল্প শোনাল। অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা। কোনদিন এইখানে এসে তারা সারা দুপুর কাটিয়েছে, কোনদিন দামোদর কুণ্ডের ধারে কাটিয়েছে সারা বিকেল, সন্ধ্যেবেলায় সিনেমাতেও গেছে কতদিন; সে যখন জুনাগড়ে আসে, ললিতাকে তখন বাড়িতে পাওয়া যায় না।

মামা কিছু বলেন না?

বাবা! বাবা এ সব জানবে কী করে! তিনি তো সারাদিন তাঁর ব্যবসা নিয়েই আছেন।

মামীমা?

মা!

ললিতা হাসল? কিন্তু দময়ন্তী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল: মা আবার কী বলবে!

বলবেন না কিছু।

ললিতা দময়ন্তীর কাঁধে একটা ঠেলা দিল। বলল: তুই ভারি বোকা আছিস।

দময়ন্তী তার বোকামির কারণ কিছু বুঝল না। তাই নীরব চেয়ে রইল ললিতার মুখের দিকে।

ললিতা হেসে বলল: মা তো উদ্ধার হয়ে যায়।

উত্তর শুনে দময়ন্তী বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

ললিতা নিজেই বলল: ও যখন বিয়ের কথা বলবে—

দময়ন্তী এতক্ষণে বুঝেছে। তার মাও তো মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন। সে অবশ্য অন্য কারণে। বিদেশে তাদের সমাজের ছেলে নেই। নিজেদের দেশে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর এত ভাবনা হত না।

ললিতা তার নিজের কথা শেষ করে নি। শুধু দময়ন্তীকে আর একটা ঠেলা দিয়ে বলল: বুঝছিস এবারে?

বুঝেছি।

ললিতা হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। বলল: এইবারে মেয়ের বুদ্ধি খুলেছে।

দময়ন্তীর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই! এ কথায় হাসবার কী আছে! কিন্তু ললিতা তবু অনেকক্ষণ ধরে হাসল।

এগারো

দময়ন্তী কোনদিন সন্দেহ করে নি যে, ললিতা জগদীশ মেহতাকেই ভালবেসেছিল। ললিতার কাছে নানা গল্প শুনে সে বুঝেছিল যে, তাদের বিবাহ একেবারে আসন্ন হয়েছে। কিন্তু পাত্র জগদীশ নয়, পাত্র তাদের প্রতিবেশী আর কোন যুবক। ললিতা কোনদিন তার নাম বলে নি, শুধু লজ্জা বা সংকোচে নয়, বোধ হয় সংস্কারের বাধা ছিল।

দময়ন্তী ললিতার কাছেই শুনেছিল যে তার মামা তাদের

সম্বন্ধের কথা জানতেন না। জানলে তিনি নিশ্চয়ই তার মাকে নিজে থেকে জগদীশের খবর দিতেন না। শুধু খবর দেওয়া নয়, তার মাকে নাকি সাহায্যও করেছিলেন। তার মার কাছে শুনেছে যে মেহতাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিয়েছিলেন। তারপর জগদীশ যখন চাকরি পেয়ে রাঁচীতে আসে তখন তার ঠিকানাও পাঠিয়েছিলেন।

দময়ন্তী অনেক পরে বুঝেছে যে তার মামী একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেছিলেন। সেইজন্যেই তার মায়ের সঙ্গে বিরোধ না হলেও ঘনিষ্ঠতা হয় নি। দু'জনেই দু'জনকে যেন এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। সে কি জগদীশের জন্য!

তার মামার মনের কথা মা একদিন তার বাবাকে বলছিলেন। জগদীশের রূপ-গুণের কথা শুনে শুনে তার বাবা বোধ হয় ক্লান্ত বোধ করছিলেন। বলেছিলেন: ছেলে যদি এমনই লোভনীয়, তবে তোমার দাদা কেন নিজের মেয়ের জন্যে চেষ্টা করছে না?

উত্তর দিয়েছিলেন: নিজের মেয়ে যে কালো। ও ছেলের সঙ্গে যে মানাবে না, দাদা তা ঠিকই বোঝেন।

ও।

বলে নরোত্তমবাবু তাঁর মুখখানা বিকৃত করেছিলেন। জগদীশ মেহতাকে কেন তিনি পছন্দ করতে পারেন নি, তা গোড়াতেই জানিয়েছিলেন। গুজরাতের ছেলে বুদ্ধিমান হলে বাণিজ্য করবে, গোলামি করবে না। লীলাবতী এ কথা মানতে রাজী হননি। বাণিজ্যের হাল তাঁর জানা আছে। শুধু অশান্তি, আর হায় হায়।

নরোত্তমবাবু বলেন: সে কি বাণিজ্যের দোষ!

তবে দোষ কিসের?

দোষ আমার কপালের আর—

আর?

আর বিজ্ঞানের।

বিজ্ঞান আবার কী করল?

কী করল না তাই বল। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যেই তো লাক্ষার দর কমল। সিনথেটিক ল্যাকে এখন বাজার ছেয়ে গেছে। তা না-হলে আমার লক্ষ্মী—

বাধা দিয়ে লীলাবতী বলেন: তোমার লক্ষ্মীর কথা আমার কাছে বলো না।

নরোত্তমবাবু এ কথার উত্তর দেন না। জানেন যে, উত্তর দিলেই বিপদ। কলহে তাঁর পরাজয় হবেই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতে হবে: কোন স্ত্রী নিজের স্বামীকে অপদার্থ ভাবে না, সেইটুকু জানতেই শুধু বাকি আছে।

জুনাগড় থেকে দময়ন্তীরা একা একা ফেরেনি। নরোত্তমবাবু নিজে তাঁদের আনতে গিয়েছিলেন। সৌরাষ্ট্রের রাজধানী রাজকোট পর্যন্ত প্লেনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে জুনাগড় ঘণ্টা পাঁচেকের পথ। মিটার গেজ ট্রেন রাজকোট থেকে ভেরাবল যায়। ভেরাবলেই প্রভাস পত্তন, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সোমনাথ। মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরের পৌরাণিক নাম সুদামাপুর। জেতলসর জংশন থেকে যেতে হয়। কলকাতা থেকে জুনাগড়ে আসবার সময় মামা এইসব গল্প দময়ন্তীকে বলেছিলেন। মেসাল জংসনে গাড়ি বদল করে বলেছিলেন: এইবারে আমরা কীর্তি এক্সপ্রেসে চাপলাম। এই গাড়িটার এক এক অংশ এক এক জায়গায় যাবে। রাতে ঘুমিয়ে নে, সকালবেলায় সব বুঝিয়ে দেব।

ভোরবেলায় তারা রাজকোটে পৌঁছেছিল। দেখল, ট্রেনের একটা অংশ দ্বারকার দিকে যাচ্ছে। জামনগরের উপর দিয়ে দ্বারকা হয়ে ওখা বন্দরে যাবে। সেটাও তীর্থস্থান। সমুদ্রের ভিতর মাইল তিনেক নৌকোয় গিয়ে বেট দ্বারকা।

জেতলসর জংসনে মামা বলেছিলেন: কীর্তি এক্সপ্রেস এখান থেকে পোরবন্দর যাবে।

আমরাও?

দময়ন্তীর প্রশ্নের উত্তরে মামা হেসে বলেছিলেন: আমাদের অংশটা এখানে কেটে রাখছে। আমেদাবাদ থেকে সোমনাথ মেল আসছে, সেই ট্রেনে লাগাবে।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল: কীর্তি এক্সপ্রেসের তাহলে তিনটে অংশ?

মামা তখনই স্বীকার করলেন: ভুল হয়েছে। আর একটা অংশ ছিল ভাবনগরের জন্যে। মাঝ রাতে সুরেন্দ্রনগরে তা কেটে গেছে।

দময়ন্তী বলেছিল: এরকম অদ্ভুত গাড়ির কথা আমি কোনদিন শুনিনি।

মামা উপভোগ করে বললেন: শুনেছি, দক্ষিণ ভারতেও এইরকম গাড়ি আছে। মাদ্রাজ আর কোচিন থেকে ছাড়ে। ব্যাঙ্গালোর, নীলগিরি পাহাড়, আরও সব কোথায় কোথায় যায়।

আশ্চর্য!

এ আর আশ্চর্য কী! দুনিয়ায় আশ্চর্য জিনিষ অনেক আছে।

দময়ন্তীরা এই পথেই জুনাগড় থেকে ফিরেছিল। জুনাগড় থেকে রাজকোট, সেখান থেকে প্লেনে দিল্লী। দিল্লী থেকে ডেহরি অন সোন এল ট্রেনে, গাড়ি বদল করে এই বন জঙ্গলের দেশে।

এই ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। দময়ন্তী পড়াশুনো করেছে, আর লীলাবতী খবর রেখেছেন জগদীশ মেহতার। কলেজের ছুটিতে যখনই সে বাড়ি এসেছে মায়ের কাছে শুনেছে জগদীশের কথা। অনেকদিন ধরে অনেক কথা শুনে তার মনে হয়েছে যে পৃথিবীতে এই একটিমাত্র পুরুষ আছে। যার জন্যে তার জীবন আছে উন্মুখ হয়ে। সে মহাভারতের দময়ন্তী, আর নল হল জগদীশ মেহতা। সেই জগদীশ সেদিন তার মায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল না। তার বদলে কাঠুরে চৌধুরী। কী বিশ্রী লোকটা, কী জঘন্য রঙ্গ! কাঠুরে চৌধুরীর কথা ভাবলে ঘৃণায় তার দেহ শিউরে ওঠে।

[ক্রমশ।

মেরি আনতয়নে ও তৎসম্বন্ধীয় পত্রাবলী

[অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকটি ফ্রান্সের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কাল। এই সময়টি ফরাসী বিপ্লবের যুগ। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব শুধু ফ্রান্সেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, ফ্রান্সের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের সর্বৈব জীবনে এক অভিনব পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই নতুন ফ্রান্স জন্ম নিল। নবজীবনের নবমন্ত্রোদ্গাতাদের, নতুন জীবন সংহিতার নতুন ভাষ্যকারদের নিত্য নব অবদান এই বিপ্লবকে পুষ্ট করল, রূপ দিল, গতি দিল। এই বিপ্লবের বহ্নিশিখায় যত কিছু গ্লানি, ক্লেদ, অসুন্দর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে পশ্চিমের দিকদিগন্তে নতুন ফ্রান্সের বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রাজতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের এই ইতিহাসবিখ্যাত সজ্ঘর্ষে ফার্সেন, বার্ণেভ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ রাজতন্ত্রের প্রধান সমর্থক এবং শ্রেষ্ঠ উপাসকরূপে জনজীবনে দেখা দিয়েছিলেন। রাণী মেরি আনতয়নের পক্ষ সমর্থনে এঁরা সর্বতোভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। এই সংক্রান্ত কয়েকখানি ঐতিহাসিক পত্র মাসিক বসুমতীর বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমান সংখ্যায়ও কয়েকখানি পত্র প্রকাশ করা হল। পত্রগুলির মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের গতি-প্রকৃতির এক স্পষ্ট আলেখ্য ফুটে উঠেছে। বহু আকর্ষণীয় তথ্য ও চিত্তাকর্ষক সংবাদের আকর এই পত্রগুলি। পাঠক সাধারণ, আমরা আশা করি, পত্রগুলির মধ্যে প্রায় পৌনে দু'শো বছর পূর্বের ফ্রান্সের এক অবিস্মরণীয় যুগের এক উজ্জ্বল ছবি দেখতে পাবেন। পত্রগুলি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।—স।]

ব্যারন টবকে লেখা ফার্সেনের পত্র

রাজা, রাণী এবং মাদাম এলিজাবেথ মধ্যরাত্রে পরম নির্বিঘ্নে এবং নিরুপদ্রবে প্যারিস ত্যাগ করেছেন। বঁদি পর্যন্ত আমিও তাঁদের যাত্রাপথের সহচর ছিলাম। আমি অবশ্য ভবিষ্যতে, বলা বাহুল্য, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এব যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা তো করবই।

ব্যারন টব এই সময়ে আ-লা-চ্যাপেলে সুইডেনের রাজার সঙ্গে ছিলেন ও তাঁর সেক্রেটারী অফ ষ্টেট পদে সমাসীন ছিলেন।

সুইডেনের রাজা তৃতীয় গুস্তাভকে লেখা ফার্সেনের পত্র

২৩এ জুন, ১৭৯১

সব ব্যর্থ হয়ে গেল। সীমান্ত থেকে মাত্র ষোল লীগ দূরে রাজা গ্রেপ্তার হলেন। দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলব এত পরিকল্পনা, এত সতর্কতা, গোপনীয়তা, সর্বোপরি এত আন্তরিকতা সকল কিছুই ব্যর্থতার রূপ নিয়ে শেষ অবধি প্রতিভাত হল। রাজাকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে আবার প্যারিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। আমি একবার মঃ অ মার্সির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ব্রাসেলস যাওয়া স্থির করেছি। রাজার একখানি পত্রের বাহক হিসেবে আমার এই যাত্রা জানবেন। রাজার পক্ষে যাতে সম্রাট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন সেই বাসনাই ভাষার মাধ্যমে এই আলোচ্যপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রাসেলসে কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমি আ-লা-চ্যাপেলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এবং এই সাক্ষাতে সকল বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত ও বিস্তৃত আলোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে এ সকল বিষয়ে আপনার সহযোগিতা ও উপদেশ আমাদের কাছে যেমনই মূল্যবান তেমনই অপরিহার্য।

ভগ্নীকে লেখা ফার্সেনের পত্র

৫ই জুলাই, ১৭৯১,

আমি স্থির করেছি যতক্ষণ শেষ আশার আলোটুকু বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ তাঁদের (রাজপরিবার) সঙ্গেই আমি যুক্ত থাকব এবং

মেরি আনতয়নে

তাঁদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গিত করব। তাঁদের সেবা ছাড়া অন্য কোন স্বপ্ন, চিন্তা, বাসনা আজ আমার নেই। সর্বতোভাবে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকাই আমার একমাত্র সঙ্কল্প জেন। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব কেউ জোর করে কোন দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চড়িয়ে দেয় নি। কেউ আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে বাধ্য করে নি, কেউ আমার আদর্শে সংঘাত ঘটে এমন কোন কাজ আমাকে দিয়ে করাতে পারে নি। অনেক চিন্তা করে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে অনেক বিবেচনার পর আমি এই সঙ্কল্পগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছি—তাই এ সম্বন্ধে আর কারো কিছু বলার থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। এই সিদ্ধান্তই আমাকে আমার সকল দুঃখ, জ্বালা, ব্যথা সহ্য করবার শক্তি ও সাহস জুগিয়ে যাবে, এ বিশ্বাসও আমার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

এখানে হয় তো আমি আর হপ্তাখানেক আছি, যদি একান্ত প্রয়োজন হয় কিম্বা কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা হ'লে হয় তো বড় জোর আরও ক'টা দিন অতিবাহিত করে যেতে পারি। এখান থেকে আমি যাচ্ছি আ-লা-চ্যাপেলে সেখানকার কাজ শেষ করেই সেখান থেকে রওনা হব ভিয়েনার উদ্দেশে, কিন্তু খুব সাবধান, এ কথা যেন ব্যক্ত না হয় কারণ আমার গতিবিধি আমি বাবাকে পর্যন্ত জানাই নি। শুধু তোমাকে জানালাম—আর দৃঢ় বিশ্বাস যে কথা প্রকাশিত হবে না। ভগ্নী, বিদায়।

মেরি আনতয়নকে লেখা ফার্সেনের পত্র

৩০এ জুন, ১৭৯১

সুইডেনের রাজা দেখলাম আপনার একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং আপনার যথার্থ মঙ্গলাভিলাষী। আপনার বিপন্মুক্তি ঘটুক সদাসর্বদাই এই কামনা তিনি করে থাকেন। তাঁর একটি 'নোট' এই পত্রের সঙ্গে পাঠাচ্ছি, মনোযোগসহকারে পড়ে দেখবেন এবং করণীয় সম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

আমি কালই রওনা হয়ে যাচ্ছি। শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ওঁদের সঙ্গে এক সংযোগ সম্মিলন যাতে ঘটানো যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করাই এই যাত্রার উদ্দেশ্য জানবেন।

ফার্সেনকে লেখা মেরি আনতয়নের পত্র

আমাদের জন্যে কোন চিন্তা কোর না। আমরা বেঁচেই আছি। মৃত্যুর স্পর্শ এখনো দূরে। পৃথিবীর আলো বাতাস এখনো আমাদের ত্যাগ করে নি। পরিষদ সদস্যরা খুব একটা নিষ্করুণ ব্যবহার এখনো তো করছেন না এবং সে রকম একটা ভয়ঙ্কর কিছু ব্যবস্থা যে অবলম্বন করবেন তাঁদের আচরণে তাও তো মনে হয় না।

তবুও এ অবস্থা তো অভিপ্রেত নয়, সময়টি তো দুঃসময় ছাড়া কিছুই নয়। বন্দীদশা কোনসময়েই প্রীতিপ্রদ হতে পারে না। তাই এরা যে আচরণই করুক তুমি আমার আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ কোর এবং আমাদের অবস্থা বিশদভাবে তাঁদের বুঝিয়ে বোল। বিদেশ থেকে সাহায্য করে যাতে আমাদের উদ্ধার করা যায় সে বিষয়টি একটু গভীরভাবে চিন্তা কোর। তাঁদের সঙ্গে তোমার আলোচনা যদি ব্যর্থ হয় অর্থাৎ এই আলোচনার শত সহস্র সুবিস্তৃত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সত্ত্বেও যদি তাঁরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে থাকেন তাহলে আবার তাঁদের নতুন করে বোঝাতে আরম্ভ কোর, যাতে তাঁরা সমগ্র পরিস্থিতি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারেন।

ফার্সেনকে লেখা মেরি আনতয়নের পত্র

প্যারিস, ২১এ জুন

আমি বর্তমান। এখনও অতীতে পরিণত হই নি। তোমার সম্বন্ধে যে কতখানি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। আবার আমার খবর না পেয়েও তুমিও যে কতখানি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছ তাও আমি সর্বতোভাবে উপলব্ধি করছি, আমি জানি, বারেকের তরে আমার সংবাদ না পেলে তুমি ভগ্নোত্তম হয়ে পড়বে ভেঙ্গে পড়বে, দিশাহারা হয়ে পড়বে। তা কি আমি জানি না? আর তা জানি বলেই সেই কারণেও আমি গভীর দুঃখবোধ করছি জানবে।

কাউন্ট এক্সেল ফার্সেন

একটা কথা তোমায় বলি। অবস্থার গতি দেখেই বলছি, যে ভাবে অবস্থার মোড় ফিরছে সে ক্ষেত্রে এ কথা না বলে আজ উপায় নেই। বলতে নিদারুণ ব্যথা পাচ্ছি, অন্তরে গভীর দুঃখ জাগছে, কলম সরে না তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমাকে তুমি এখন আর চিঠি লিখ না। কারণ তা হলে এই অপরিমাপ্য বিপদ কম তো দূরের কথা, আমি স্পষ্ট অনুভব করছি বেড়েই যাবে। আর শুধু তাই নয় কোনও কারণে এখানকার ত্রিসীমানা মাড়িও না, এখানকার এলাকা থেকে শত হস্ত তফাতে থেক।

এখানে সবাই জানে তুমি আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এদের কাছে জলের মত পরিষ্কার। আমাদের মুক্তির জন্যে তুমি যে বদ্ধপরিকর সে খবরও এরা পুরোপুরি রাখে। অতএব, তোমাকে যদি এরা একবার আমার কাছে দেখতে পায় তা'হলে বুঝতেই পারছ সব নিষ্ফল হয়ে যাবে, এত প্রচেষ্টা শেষ অবধি আর ফলবতী হবে না। তা ছাড়া দিবারাত্র আমাদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করা হয়, এক প্রখর দৃষ্টির মধ্যে আমরা বাস করছি। এই সতর্কতায় মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই।

তবে, এ জন্যে উতলা হয়ো না। চিন্তার কোন কারণ নেই, কোন গভীর ক্ষতি আমাদের এখন হবার আশঙ্কা নেই, বিধানসভা

আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ অনুকূল ব্যবহার করার জন্যে প্রস্তুত আছেন।

আজ এখানেই শেষ করছি। বিদায়। বিদায়, আর আমি লিখতে পারছি না। বিদায়।

ফার্সেনকে লেখা মেরি আনতয়নের পত্র

জুলাই, ১৭৯১

আমার প্রতি তোমার প্রীতি ও আমার মঙ্গলের কর্মে তোমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ আমি বিশেষ ভাবেই মূল্য দিয়ে থাকি। সেই জন্যেই তোমাকে অনুরোধ করছি একবার আমার পক্ষ থেকে বার্ণেভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে যে, এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে আমার কি করা উচিত সে বিষয়ে আমি তাঁর মূল্যবান উপদেশ চাই। তুমি তাঁকে সকল বিষয়ে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে বোল যে, কি গুরুতর পরিবেশের মধ্যে আমি দিন কাটাচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে এখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা তো অসম্ভব ব্যাপার, কারোর সঙ্গেই আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। সে চিন্তার স্থান আজ স্বপ্নেও নেই এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে তুমিও যে কত বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছ বিশেষ করে যেখানে প্রতি পদে বিপদের সম্ভাবনা, এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যে কত সতর্কতার মধ্যে তোমাকে কাজ করতে হচ্ছে, সে বিষয়েও তাঁকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বোল।

কখন যে কি হয় কিছুই বলা যায় না। ভবিষ্যতের প্রতিকৃতি চিরদিনই অজানা। সে আনন্দের স্বাক্ষর নিয়ে আসবে, কি দুঃখের বোঝা বহন করে আনবে, তা কোনক্রমেই কোন বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে, পাণ্ডিত্য দিয়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় না। একটা অনুমান করে নেওয়া যায় মাত্র। তাও সে অনুমানও যে সফল হবে সে বিষয়েও নিশ্চিত থাকা চলে না।

তবে কিছু তো একটা করতেই হবে। এইভাবে চুপচাপ অলস হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকাও চলে না তা ছাড়া সময়ের দাম অনেক বেশী। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। কিন্তু বলতে পার আমি কি করতে পারি। কি যে করি কিছুই ভেবে পারছি না। চিন্তার অথৈ সমুদ্রে আমি ভেসে বেড়াচ্ছি, চারদিকে শুধু জল আর তরঙ্গ, কূলকিনারা নেই। মনের এমন উদ্বেগজনক অবস্থা যে কর্মপন্থা কিছুই স্থির করা সম্ভব হচ্ছে না, মন অত্যন্ত চঞ্চল সেইজন্যে গভীরভাবে কিছু যে ভেবে যাব তারও উপায় নেই। এইসব কারণেই আমি তাঁর উপদেশ ও সাহায্য চাইছি। আশা করি আমাদের আলোচনার এটুকু অন্তত উনি বুঝেছেন যে, আমার মধ্যে আন্তরিকতা নামক বস্তুটির কোন অভাব নেই। সে বস্তুটি আমার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আর তা ছাড়া ঐ একটি জিনিষই আমায় এখনো অবধি ত্যাগ করেনি। সব কিছুই গেছে কিন্তু ঐ বস্তুটি তিলমাত্র শূন্য হয় নি, আর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে যে এ জিনিস আমি কোনদিনই হারাব না জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বস্তুটি আমার মধ্যে আজকের মতই পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকবে। এখন তিনি যা উপদেশ বা বুদ্ধি দেবেন তা আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলব। আমার প্রতিটি 'পদক্ষেপ তাঁর পরামর্শ অনুসারে চলবে জেন। এখন, এই দূরত্বের প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানে তাঁর বাণী আমার কানে এবং আমার বক্তব্য তাঁর দরবারে কিভাবে পৌঁছোবে সে চিন্তার প্রয়োজন সর্বাগ্রে, সে বিষয়টি সম্বন্ধে খুব ভেবে-চিন্তে একটি উপায় উদ্ভাবন করতে হবে কারণ এ ক্ষেত্রে এইটেই প্রধান বিবেচ্য। সাধারণ মঙ্গলের জন্যে আমার দিক থেকে যা করার প্রয়োজন হয় আমি করব, সে দিক দিয়ে আমি পিছপাও নই, এর জন্য যে কোন দুঃখ কষ্ট বরণ করতে আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছি। নিজের মনকে আমি সেই ভাবেই তৈরী করে নিয়েছি।

আজকে আমার এ হেন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর সহায়তাই আমার সবিশেষ কাম্য এবং একান্ত নির্ভর। রাজার ও রাজপুত্রের মঙ্গল-কামনায় তাঁর চিন্তা সদাসর্বদা আচ্ছন্ন, তাঁদের হিতার্থে এঁর প্রচেষ্টা তা ছাড়া তাঁর দক্ষতা, কর্মশক্তি এবং অক্লান্ত উদ্যম তো বিশেষভাবেই জানা। তাই এই মুহূর্তে তাঁর উপদেশ আমাকে লাভবানই করবে তাই তাঁর প্রতি আমি এতখানি নির্ভর করে আছি।

ভগ্নী সোফিকে লেখা ফার্সেনের পত্র

(মেরি আনতয়নের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে)

আমার পরম স্নেহের সোফি,

আজ আমার যা মনের অবস্থা তাতে তুমিই আমার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল, সারা জগতের মধ্যে একমাত্র তোমার স্নেহচ্ছায়াই আজ আমার আশ্রয়। তুমি ছাড়া আজ আর আমার জীবনে কোন শান্তি নেই, কোন আনন্দ নেই, কোন ভরসা নেই। আজ তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সব কিছু থেকে আজ আমি বঞ্চিত।

সে-ই আমার জীবনের মূর্তিময়ী আনন্দ ছিল। আমার কল্পলোকের সে ছিল অধীশ্বরী যার জন্যে আমার বেঁচে থাকা সে-ই চলে গেল, সে চলে গেল আমাকে সকল দিক দিয়ে শূন্য করে আমার সকল আনন্দ আজ নিঃশেষিত। আমার সব হাসি আজ মিলিয়ে গেছে, জীবনের চলার পথে এ আমার নিদারুণ ছন্দপতন। আজ পৃথিবী আমার

এ, পি, জে, এম বার্ণেভ

কাছে ধূসর, নিষ্প্রাণ, অর্থহীন। সোফি, এমন একটা মুহূর্ত ছিল না যে সময়ে তার প্রতি আমার ভালবাসার প্রবাহ শুষ্ক ছিল, তাকে ভালবাসায় মুহূর্তের জন্যেও আমার দিক থেকে ছেদের কল্পনা আমি কল্পনাতেও আনতে পারি নি। যার জন্যে আমার জীবনধারণ, যে আমার জীবনের সর্বস্ব সেই আজ নেই, সে আজ অনন্ত পথযাত্রিণী, আজ সে আমাদের মধ্যে নেই, তার হাসি, তার কথা, তার মাধুর্য, তার ভালবাসা আজ শুধু স্মৃতি। হে ঈশ্বর। ওগো সর্বশক্তিমান। কি অপরাধে তুমি আমার জীবন এই ভাবে শূন্য করে দিলে। যতদিন আমাকে এখন এই দুর্বহ জীবনের বোঝা বইতে হবে তার মধুর স্মৃতি তার সুন্দর স্মৃতি তার উজ্জ্বল স্মৃতির কাছ থেকেই এই বোঝা বহনের শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। আজ সর্বহারা আমার তাই একমাত্র সম্বল।

কেন আমিও তার পাশে থেকেই মৃত্যুবরণ করলাম না? জীবন সঙ্গী থেকে মরণ সঙ্গীই বা হলাম না কেন? তার রক্তের জন্যে যাদের তৃষ্ণা দুর্বার আমার রক্ত দিয়ে সেই পিপাসা মেটালাম না কেন? সে-ছাড়া জীবন আমার পক্ষে অসহ্য। আমার সকল কল্পনার সীমার বাইরে।

আজ আমার এই রিক্ত অবস্থা এ পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই অনুভব করতে পারবে। আমার মনের বেদনা তুমি ছাড়া অন্য কারো মনে এতটুকু রেখাপাত করতে পারবে না। আমার কান্নার মানে তুমি ছাড়া বোঝবার আর কেউ রইল না। তোমাকে যেন ঈশ্বর আমার পাশ থেকে আর সরিয়ে না নেন। আমার সকাতর অনুরোধ, তুমি আমাকে কোন মতে ত্যাগ কোর না।

সোফি! একটু কাঁদ, তুমি একলা নয় তোমার চোখের জলে আমার অশ্রুও মিশিয়ে দিই। এস, দু'জনে সজল চোখে তাকে স্মরণ করি। প্রাণভরে এক মনে শুধু তার কথাই ভাবি।

আর একটি লাইনও লিখতে পারছি না।

ঈশ্বর। আমাকে দয়া কর।

রূপবান কন্যা

জসীম উদ্‌দীন

কুঁচের বরণ কন্যা যাহার মেঘের বরণ কেশ,
দুধে আলতায় হাসিখান যার ছড়ায় সকল দেশ,
শাড়ীতে যাহার নক্সা হইতে ফেরে ময়ূরের দল,
গলায় যাহার গজমতিহারে তারাগুলি ঝলমল,
কথাটি যাহার 'ছড়ায়' ধরিতে কবিরা নানান দেশে,
কথা খুঁজে খুঁজে কথার সরিৎ-সাগরে বেড়ায় ভেসে;
শিল্পীরা যারে রেখায় ধরিতে রামধনু লয়ে টানে,
সুরকার যারে সুরের সূতায় বুনাইছে গানে গানে;
রূপকথার সে রূপবান কন্যা কাল যাবে দূর গাঁয়,
পথ হবে রাঙা-মাটি লুটি' তার মেহেদি-ছোপান পায়।

চলিতে চলিতে খোঁপা হতে তার ঝরিবে কদম ফুল
মেঘ-ডম্বুর শাড়ীতে তাহার বাতাস খেলিবে ভুল।
সামনে দীঘিতে রক্ত সাপলা হাসিয়া হাসিয়া চাবে,
সোনালী লতিকা হেলিবে দুলিবে তাহার তনুর ভাবে।
আঁকা বাঁকা পথে চলিতে চলিয়া পড়িবে সে অকারণে,
দু' ধারের লতা শিহরি উঠিবে অঙ্গের পরশনে।
ধানের পাতার সবুজে কালোতে মাখামাখি গেঁয়ো মাঠ,
মাঝে মাঝে তার কলমীলতার ফুল-আখরের পাঠ;
সেইখান দিয়ে চলিতে তাহার আওলাবে শাড়ীখান
বকেরা ডানায় ছায়া মেলি তারে শুনাবে মাঠের গান।
পাটের বনের ঘন-কালো-ছায়ে ডাকিবে কোড়া ও কুড়ী
সোল-পোনা জলে আলপনা রেখা আঁকিবে যে ঘুরি ঘুরি।

জাঙলা-জড়ান সীমলতা-আঁকা দূরে কৃষাণের ঘর,
কলার পাতায়-খণ্ড-বাতাসে ছায়া ঘোরে তারপর।
সেখানে কৃষাণী মেঝেয় মেলিয়া রঙিন নক্সী কাঁথা,
সরু সে সূতায় ফুলেল আখর বুনাইছে নুয়ে মাথা।
লাল নোটে-রাঙা ঠোঁট হতে গান ঝরিছে মিহিন-সুরি,
আরও সে মিহিন ছবি হাসে ভরি কাঁথার ইন্দ্রপুরী।
সেইখানে এসে রূপবান কন্যা দাঁড়াবে ক্ষণেক তরে
যদি বা কৃষাণী সরু সূতা-জালে কিছু তার রাখে ধরে।

তারপর সে যে কলার ভেলায় ভাসি বরষার জলে
যাবে আর গাঁয় সাপলা কুসুম কুড়াইয়া কুতূহলে।
ঝাউ ঝাড়ে তার রঙিম ঠোঁটের মাখিবে কিটু হাসি
একটু মাখিবে যেখানে ছুটিয়া ভিজলের ফুলরাশি।
তাহারি সামনে ডোবার পানিতে চাষারা ছাড়ায় পাট,
আর গান গায় 'জিলুয়' বাতাসে মুখরি গাঁয়ের বাট।
সে সুরের জালে জড়ায়ে পড়িয়া বন্দী রূপবান বনে,
আর ফিরিবে না মাটির ধরায় রূপ ধরি কোন ক্ষণে।

শুধু মাঝে মাঝে গাজীর গানের মেঠেলী মধুর সুরে,
হেরিবে চাষীরা রূপবান কন্যা ফিরিবে মনের পুরে।
মাঠের ফসল কাটিতে কাটিতে সেই সুর অনুকরি
চাহিবে তাহারা মনের গহীনে হেরিতে সে রূপ-পরী।

শ্রীসুনীলবরণ রায়

(কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার)

কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা ও অধ্যবসায় গুণে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী সুনাম অর্জন করেছেন কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান কমিশনার শ্রীসুনীলবরণ রায় তাঁদের অন্যতম। এস বি রায় নামেই তিনি সাধারণের কাছে পরিচিত।

শ্রীরায় ১৯১৬ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রকুমার রায়। মাতা শ্রীমতী প্রিয়বালা রায় এখনও জীবিতা। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩২ সালে প্রবেশিকা ও ১৯৩৭ সালে বি. এস. সি. পাশ করেন। ঐ বছরই বিলাত রওনা হন ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও ১৯৩৯ সালে এ্যাকচুয়ারিয়াল ম্যাথমেটিকসে ডিপ্লোমা পান। ১৯৪০ সালে তিনি ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার রূপে বৃটিশসৈন্য বাহিনীতে এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট সেকসনের ওয়ার্কসপে যোগ দেন ও ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।

১৯৪৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন। কলকাতায় তিন মাস যাপন করে আর্মিতে যোগ দেন ও আসামে বহাল হন। ১৯৪৫ সালে তিনি ব্রহ্মদেশে আর্মিতে গেলেন। ব্রহ্মদেশে এক বছর কাজ করার পর ১৯৪৬ সালে আর্মি থেকে খালাস পেলেন। কলকাতায় ফিরে এসে একটি প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজারের চাকুরী গ্রহণ করেন। ঐ বছরই তিনি দেবাদুনে যুদ্ধ ফেরৎ লোকদের জন্য বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এক বিশেষ পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসে যোগদান করেন। এ সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন স্থানে নানা পদে কাজ করেন, যথা, মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস-ডি-ও। বক্সা বন্দীশিবিরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, জলপাইগুড়িতে ডেপুটি কমিশনার, চন্দননগরে এডমিনিষ্ট্রেটর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের জয়েণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার, এডিসনাল ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার, ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার। এরই মাঝে তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইউরোপের ৮টি দেশ ও আমেরিকায় ৬ মাস সফর করেন। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার নিযুক্ত হন ও আজও সেই পদে বহাল আছেন।

এস, বি, রায়

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

[একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক ও সাহিত্যসেবী]

বিজ্ঞানের জটিল ও দুরূহ তত্ত্বগুলি সাহিত্যের মাধ্যমে যারা প্রাঞ্জল ও বোধগম্য করে তুললেন অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় বিজ্ঞানের জনক আচার্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রমুখ সেই পথিকৃৎগণের নাম বাঙালী পাঠক-পাঠিকার স্মৃতির আলোয় চির উজ্জ্বল। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে এই প্রাতঃস্মরণীয় মনীবিবৃন্দ যে ধারার সৃষ্টি করলেন সেই ধারা অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চলতে দেখেছি অনেক কৃতবিদ্যকে। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এই সার্থক উত্তরসূরীদের অন্যতম। সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞানচেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যেরও অবদান অনুল্লেখ্য নয়। অহংকার এই মানুষটিকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি, আত্মম্ভরিতা এঁর কাছ থেকে শত হস্ত দূরে, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের মনোরম পরিবেশে অবস্থিত একটি কক্ষে এই কর্মসাধক বিজ্ঞান গবেষণায় ও সাহিত্যসাধনায় আত্মমগ্ন।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত লোনসেন গ্রাম নিবাসী স্বর্গত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্যের পুত্র গোপালচন্দ্র ১৮৯৮ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাস শুরু। লোনসেন হাই স্কুল থেকে ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র তালিকায় আপন নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন গোপালচন্দ্র।

স্কুলজীবনে একটি ঘড়িকে কেন্দ্র করে পদার্থবিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। কলেজ জীবনে এ্যামোনিয়া গ্যাসের একটি গবেষণা তাঁর মনে রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহের জন্ম দেয়।

স্বগ্রাম থেকে চার পাঁচ মাইল দূরবর্তী পণ্ডিতগার হাই স্কুলে শিক্ষকতার কর্ম গ্রহণ করলেন গোপালচন্দ্র। শিক্ষকতার সময়েই আলোকবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর মনে জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। ঘটনাচক্রে এই সময় কলকাতায় আসতে হয়। এই সময়ে ডঃ ফিপসনের 'লিটল বুক অন ফসোফোরেসেন্স' বইটি চোখে পড়ে। এই গ্রন্থে জীবজন্তুর এবং মাংসাদির মধ্যে বহু আলোচনা তরুণ গোপালচন্দ্রের চোখে পড়ে। কলকাতায় আসার পর কাশীপুর মিল অঞ্চলে টেলিফোন অপারেটারের কার্যভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। কাজের ফাঁকে এখানে অবসর প্রচুর। পড়াশুনার অফুরন্ত অবকাশ, কবিতা লিখে সময় কাটে। কিন্তু মন ভরে না, মন ভাবে—হায় রে, একবার যদি কোনক্রমে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে পৌঁছতে পারতেম। একদিন সেই সুযোগ এল। এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, হঠাৎ। জীবনের মোড় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আকস্মিকতার মধ্যে পরিবর্তিত হয়। স্বদেশী যুগের অন্যতম নায়ক বিখ্যাত লাঠিয়াল স্বর্গত পুলিনবিহারী দাসের মধ্যস্থতায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করলেন গোপালচন্দ্র। শুধু সান্নিধ্যই নয়। জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে এল সস্নেহ ও সাদর আহ্বান। জগদীশচন্দ্র তাঁকে টেনে নিলেন বিশ্ববিখ্যাত বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। এ হচ্ছে ১৯২১ সালের কথা।

কলেজের ছাত্রজীবনে অধ্যাপক তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকজীবনে প্রধানশিক্ষক নিবারণচন্দ্র সেনের সক্রিয় উৎসাহ তাঁকে নানা ভাবে ভরিয়ে তুলেছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গোপালচন্দ্রের সমগ্র জীবন বৈচিত্র্যের এক বৈশিষ্ট্য। এক অপূর্ব সমন্বয়। সরকারী আর্ট কলেজে কিছুকাল চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিখেছেন। জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থে চিত্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ করেছেন। ব্লক নির্মাণ বিদ্যাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধেও পাঠ নিয়েছেন।

পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে এঁর কাছে কত যে জ্ঞাতব্য আছে তার তুলনা নেই। কীটপতঙ্গ জগতের হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ, ঘাত, প্রতিঘাতের আশ্চর্য বিবরণগুলি শুনলে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়তে হয় সে যে কি অনবদ্য। আশ্চর্যজনক, অভাবনীয় বিবরণ তা যে মনের মধ্যে কি পরিমাণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তার তুলনা হয় না। অবশ্য এর জন্যে গোপালচন্দ্রকে যে কত লাঞ্ছনা এমন কি দৈহিক প্রহার পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে তারও এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। গোপালচন্দ্র যে সময় কোন মাকড়সা লালপিঁপড়ে বা অন্য কোন প্রাণীর কোন বিশেষ গতিবিধি লক্ষ্য করছেন—ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিংবা কোন স্থানের ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে কিংবা কোন বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে, স্থানীয় বাসিন্দারা ভেবে নেন যে, কোন দুরভিসন্ধি আছে। বাস, তারপর আর দেখতে হয় না। খানিকক্ষণ পর বুঝিয়ে বললে কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। সাধারণ অজ্ঞ মানুষের হাতে বিজ্ঞান-সাধকের এই নির্যাতন আজকের এই ব্যাপক অগ্রগতির দিনে মনের মধ্যে আর এক বিস্ময়ের জন্ম দেয়।

হিতবাদীতে প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় গোপালচন্দ্রের। প্রবাসীতে লেখা বেরোয় আনুমানিক ১৩১৬-১৭ সালে। আজ পর্যন্ত দেশের ও বিদেশের অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় প্রচুরসংখ্যক জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধাদি রচনা করে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের বহু জিজ্ঞাসা অকৃপণ হাতে মিটিয়ে চলেছেন। ১৩৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম রূপকার তিনি। এই পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞানবিজ্ঞান' পত্রিকার তিনি সম্পাদক। 'ভারতকোষ'এর সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি অন্যতম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির তিনি একজন সদস্য। 'করে দেখ' প্রমুখ অনবদ্য গ্রন্থগুলির তিনি সার্থক রচয়িতা।

শ্রীমন্মথ রায়

(সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার)

নাটক লিখে আধুনিক কালে যাঁরা সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমন্মথ রায় অন্যতম। গত ৪০ বছর ধরে তিনি নাট্যরচনা করে আসছেন ও আজও তাঁর লেখনীর বিরাম নেই। তিনি আধুনিক বাংলা একাঙ্ক নাটকের জন্মদাতা। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচনা করে তিনি একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন।

আধুনিক বাংলা একাঙ্ক নাটকের জন্মদাতা বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ১৮৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার গালা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গত দেবেন্দ্রগতি রায়। মাতা শ্রীযুক্তা সরোজিনী রায় জীবিতা আছেন। তাঁর যখন সাত বছর বয়স, তখন তাঁর পরিবার উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে বিদ্যালয়ে

পাঠকালে তিনি ডাকঘরের অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯২১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দেবার সময় অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও ঐ বছর গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন থেকে উপাধি পরীক্ষা পাশ করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ও বি-এল পাশ করেন। একমাত্র পাঠকালে তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' ষ্টার থিয়েটার কর্তৃক ১৯২৩ সালে অভিনীত হয়। তিনি ১৯২৬-৩৮ সাল পর্যন্ত বালুরঘাটে ওকালতি করেন: এ সময় বালুরঘাট লোকাল-বোর্ড, বালুরঘাট ইউনিয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। তিনি এ পর্যন্ত ৩৫খানির অধিক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দেশপ্রেমমূলক নাটক লিখেছেন ও এই ৬৪ বছর বয়সেও তাঁর লেখনীর বিরাম নেই। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া, মীরকাশিম, বিদ্যুৎপর্ণা, রাজনটী, মহাভারতী, সাবিত্রী, অশোক, চাঁদসদাগর, খনা, ধর্মঘট, আজব দেশ, অমৃত অতীত, একাঙ্কিকা, মহাপ্রেম, স্বর্ণকীট ও জওয়ান, বন্যা প্রভৃতি। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি নাট্য সাধনা করে আসছেন। তাঁর কারাগার নাটকে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে তৎকালীন বৃটিশ সরকার সেটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৯৩৮ সালে তিনি কলিকাতায় বসবাসের জন্য আসেন ও ভাণ্ডার বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জর্ণাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত বসুন্ধরা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বালুরঘাটে থাকাকালে তিনি এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ফ্রি প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেন। তাঁর বহু রেকর্ড-নাট্য জনপ্রিয় হয়েছে ও বহু নাটক সিনেমায় রূপায়িত হয়েছে। তাঁর লেখা কোর্ট ডান্সার ভারতে নির্মিত প্রথম সবাক ইংরাজী ছবি। ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ ফিল্মের নাট্যরূপ দেন তিনি, ও এজন্য সেরা নাট্যরূপ হিসেবে উল্টোরথ পুরস্কার পান। রেডিওতেও তাঁর বহু নাটক অভিনীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী নিয়ে একটি ডকুমেন্টারী ছবি শীঘ্রই রিলিজ করবেন, এর চিত্রনাট্য তিনি রচনা করেছেন।

শ্রীমন্মথ রায়

১৯৪৭-৫৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-প্রযোজক পদে অধিষ্ঠিত থেকে বহু ডকুমেন্টারী তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন। ১৯৫৮-৬১ পর্যন্ত আকাশবাণীর প্রযোজকপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ৺রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে যে পরিভাষা সংসদ গঠিত হয়, তিনি তার যুগ্ম-সম্পাদক হন ও আজও তার সদস্য আছেন। ১৯৬১ সালে তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নেন ও ঐ বছর নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে ও বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত নাট্যশাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেটে পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল প্রকাশিত হয়। বিলটি গৃহীত হলে বাংলার নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কার্যধারা রুদ্ধ হবে বিবেচনা করেই নাট্যজগতে বিরাট আন্দোলন হয় ও তাঁরই সভাপতিত্বে সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলনে বিলের প্রতিবাদ করা হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার বিলটি প্রত্যাহার করায় তাঁর আনন্দ ও গর্বের সীমা নেই। ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীরায় নিরহঙ্কার, সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র নান

(বাঙলার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রসেবী)

চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে তার মাধ্যমে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যুগপৎ সমৃদ্ধি সাধনে যাঁরা যথেষ্ট দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র নানের স্থান তাঁদেরই দলে।

আজকের চলচ্চিত্রমহলে প্রকাশচন্দ্র নান একটি বিখ্যাত ও সুপরিচিত নাম। যণী নান নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ নান পরিবারের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। শুধু কর্মদক্ষতায়ই নয়, হৃদয়বত্তায়, বিনয়গুণে, সহানুভূতিশীল মনোভাবে সকল দিক দিয়েই তিনি বংশের মর্যাদা নানাভাবে বর্ধিত করেছেন।

১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় জন্ম। পিতৃদেব স্বর্গীয় পান্নালাল নান ছিলেন প্রসিদ্ধ এ্যাটর্নী। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯২৬ সালে। তারপর আক্রমণ করল দারুণ ব্যাধি। রোগের ভয়াল আক্রমণ জর্জরিত করে তুলল আঠারো বছরের সম্ভাবনার আলোয় প্রদীপ্ত তরুণকে। তাঁর জীবনমরণ যেন সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়াল। কিন্তু মরণ পারল না জয় করতে জীবনকে। অফুরন্ত প্রাণশক্তি পরাভূত করল মরণকে। ব্যর্থকাম হয়েই অবনত মস্তকে ফিরে যেতে হ'ল মরণকে।

অসুস্থতা থেকে মুক্তির পর সাধারণ অধ্যয়নে ছেদ পড়ল। কিন্তু দিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কাটে না। পিতৃদেবের এ্যাটর্নীর অফিসে যোগ দিলেন প্রকাশচন্দ্র, সেখানে দৈনন্দিন কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন।

দাদা সুধীরচন্দ্র নান চিত্রজগতে যুক্ত হলেন। প্রযোজনা করলেন একটি ছবি। ছবিটির নাম 'চুপ'। পরিচালনা করেছিলেন হীরেন বসু। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল চিত্রায়। এই চুপ ছবিটিই এঁদের মধ্যে এনে দেয় একটি নিজস্ব চিত্রগৃহ সৃষ্টির দুর্বার বাসনা। আর সেই বাসনারই ফলে কলকাতাবাসী আজ পেয়েছেন রূপবাণী,

অরুণা, ভারতী। বাঙলা দেশ পেয়েছে এক সার্থক ও স্বনামধন্য চিত্রসেবী। যাঁর কল্যাণে বাঙলা দেশের চিত্রজগত নানাভাবে উন্নত হয়ে চলেছে!

'রূপবাণী'র প্রথম দ্বারোদ্মোচন হল ১৯৩২ সালে। তার দুয়ার প্রথম উন্মুক্ত করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রূপবাণীর নামকরণও তিনিই করেছিলেন। সারা বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের এ-এক সুদুর্লভ সৌভাগ্য। রূপবাণীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রকাশচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার পদে সগৌরবে সমাসীন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আরও যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এ প্রসঙ্গে তাঁদের নামও বিশেষভাবে উল্লিখিতব্য। তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত ও সুধীরচন্দ্র নান। রূপবাণীতে সেদিন মুক্তি পেল

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র নান
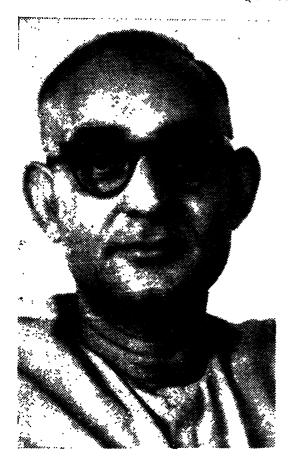
"বাঙলা ১৯৮৩" যার পরিচালক ছিলেন বাঙলা তথা ভারতের ছায়াচিত্র জগতের গৌরব স্বর্গত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া।

এঁদের চিত্রগৃহগুলির একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করার মত। হিন্দী ছবি যে এখানকার রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত হয় নি তা নয় তবে যতদূর সম্ভব এঁরা বাঙলা ছবিই দেখিয়েছেন এবং শুধু বাঙলা ছবি বললেই সব বলা হয় না—বাঙালীর তোলা বাঙলা ছবি। চিত্রসেবার মধ্যে যে গভীর দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় এঁরা দিয়ে চলেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

১৯৩৫ সালে এঁদের নিজস্ব পরিবেশক প্রতিষ্ঠান প্রাইমা ফিল্মসের প্রতিষ্ঠা হল। অরুণা ও ভারতীর দ্বারোদ্‌ঘাটন হল যথাক্রমে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ও ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল মিতালি ফিল্মস। এর কর্মাধ্যক্ষ হলেন পুত্র অমর নান।

প্রদর্শক, পরিবেশক হিসাবে প্রকাশচন্দ্র নান প্রযোজনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে রইলেন না। প্রযোজক হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটল ১৯৬১ সালে। 'চিত্রযুগ' সৃষ্ট হল। দর্শক-সমাজে চিত্রযুগের অসামান্য উপহার কাচের স্বর্গ, দীপের নাম টিয়া রং ইত্যাদি।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর স্টুডিওটি ক্রয় করে সেখানে গঠন করলেন ইণ্ডিয়া ফিল্মস ল্যাবরেটারি। এই প্রচেষ্টায় প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিলেন অসিত চৌধুরী, কানন দেবী, সুবোধ মিত্র ইত্যাদি। বাঙলা দেশের চিত্রজগতের একটি বিরাট অভাব ছিল, এ দেশে স্কোরিং পদ্ধতির প্রচলন ছিল না, এখানে সেই অভাবের অবসান ঘটল। এই প্রতিষ্ঠানটিরও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলেন প্রকাশচন্দ্র। এখানে ল্যাবরেটারি ছাড়া স্টুডিওর কাজও যথারীতি চলছে।

চিত্রজগতের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যাবৎ সংযুক্ত প্রকাশচন্দ্রকে রূপালী পর্দার বুকেও জনসাধারণ একবার দেখতে পেয়েছেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের জীবনীচিত্রে প্রকাশচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথের ভূমিকায়।

বিখ্যাত বেতার প্রতিষ্ঠান নান এ্যাণ্ড কোম্পানীর তিনি পরিচালক। দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশানের তিনি সহকারী সভাপতি।

চিত্রজগতে বিপুল প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার অধিকারী পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক শ্রীনান তাঁর চিত্রজগতের বন্ধুমহলে একজনের উপকার গভীর ভাবে স্মরণ করেন। বাঙলার চিত্রজগতের তিনি নবযুগ প্রবর্তক, চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যস্রষ্টা, বাঙলার চিত্রজগতের তিনি গর্ব ও গৌরব। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার।

"স্কুল ছাড়বার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার মধ্যে ধর্মভাবও ততই তীব্রতর হয়ে উঠল। লেখাপড়ায় মন রইল না। আমাদের একমাত্র কাজ হল তখন দল বেঁধে বাইরে গিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা। শিক্ষকদের মধ্যে দু' একজন বাদে কাউকেই আমাদের ভাল লাগত না। যে দু' একজনকে ভাল লাগত, তাঁরা ছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভক্ত।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

পর্বতকন্যা

— মোনা চৌধুরী

—সমরেশ চৌধুরী

—সত্য চট্টোপাধ্যায়

—বিনীত রায়

শিশু-জগৎ

ধীবর

—সাগর রক্ষিত

মন্দির (তাঞ্জোর)

—এন. রামকৃষ্ণ

মনে রাখবেন যে, ছবি গ্লসি কাগজে ছাপা (print) হলে ছাপার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধে হয়।]
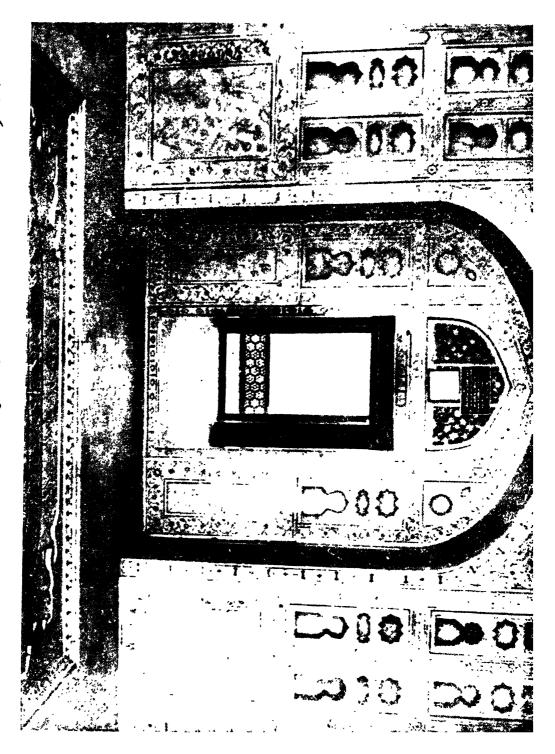
বেলুড়মঠ

—বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আগ্রা দুর্গ

—মোনা চৌধুরী

'পথের দাবী' বই হয়ে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। সেদিন কি করে ইংরেজ-গভর্ণমেণ্ট যে শুধু এটুকু করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন এ কথা ভেবে আজ বিস্মিত হতে হয়।

শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রথম শিকারের কাহিনীটি ভারি মজার।

বালক শরৎচন্দ্র এসেছেন মামার বাড়ীতে লেখাপড়া করতে। এসেই কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই ডানপিটে ছেলেটি এখানকার সমবয়সী ছেলেদের দলপতি হয়ে দাঁড়িয়েছেন! দলপতি হয়ে দলের ওপর নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে হলে নিত্য নতুন চমক লাগানো উদ্ভাবনে দলটিকে মাতিয়ে রাখা দরকার। এ বিষয়ে আমাদের এই দলপতিটি বিলক্ষণ পটু ছিলেন।

একদিন তিনি ঘোষণা করলেন—আর ভাবনা নেই, এবার তিনি বন্দুক তৈরী করবেন। শুনে চমকে যাবার মত কথা!

—বন্দুক? বন্দুক তৈরী করবে তুমি?

—হ্যাঁ, বাঁশের বন্দুক—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন দলপতি।

বাঁশের বন্দুক শুনে মন কেমন যেন একটু মুষড়ে যায়।

—বাঁশের বন্দুক? কাক মারবে বুঝি?

এ কথায় দলপতির আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগা অস্বাভাবিক নয়; তিনি বললেন—তোর কিছু জ্ঞান নেই।

—তবে? বাঘ?—ছেলেটি সামলে নিয়ে বলল।

খুশী হলেন দলপতি, বললেন—বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, গণ্ডার, বুনো শুয়োর··সব···

শুনে ছেলেদের নীচের ঠোঁট লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ল।

—কিন্তু বাঁশ চাই, ভাল পাকা বাঁশ—বললেন দলপতি।

অতএব, মহা উৎসাহে বাঁশের সন্ধানে ছুটোছুটি সুরু হয়ে গেল—এবং অবিলম্বে তা যোগাড়ও হয়ে গেল।

তারপর, অসীম ধৈর্য, চেষ্টা ও পরিশ্রমে বন্দুক তৈরী হল।

কিন্তু বন্দুক তৈরী করলেই ত' হল না, কেমন হল সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার! তার জন্যে চাই শিকার!

মুশকিল এই যে বাঘ, ভাল্লুক, হাতী, গণ্ডার যখন-তখন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না—মাথা খুঁড়ে মরলেও না! বুনো-শুয়োর মাঝে-মাঝে এ শহরে এসে উৎপাত করে বটে, কিন্তু সে-ও আবার বর্ষাকালে! গঙ্গার জল বেড়ে ওপারের ক্ষেত সব ডুবিয়ে দেয়—সেই সময়ে আশ্রয়হীন বুনো শুয়োর সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে অনেক সময়ে এপারে এসে ওঠে ও সামনে যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে। বুনো-শুয়োর পেতে হলে তাহলে সেইদিনের জন্যে বসে থাকতে হয়!

—চিন্তায় পড়ে গেল সকলে শিকার পাওয়া যাচ্ছে না, বন্দুকের পরীক্ষা হয় কি করে?

একজন হঠাৎ বললে—কুকুর মারলে হয় না? ঐ যে ওখানে একটা শুয়ে রয়েছে! ঐ কুকুরটাই সেদিন আমাকে কামড়াতে এসেছিল!

সকলে অমনি বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ কুকুরই মারা হোক।

দলপতি কিন্তু এ কথায় সায় দিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—না, কুকুর মারা হবে না, তোকে কামড়ালেও বলি, তবও না!

মনে পড়ে

(শরৎচন্দ্রের কথা)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

—তবে বেড়াল মারা হোক—বললে একজন।

এটি দলপতির মনের মত কথা! তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন—ঠিক বলেছিস, বেড়ালই মারব! ধরে আন একটা বেড়াল!

তাঁর একটি পোষা শালিক ছিল। আদর করে তার পায়ে তিনি ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছিলেন। সে উঠোনে নেচে নেচে বেড়াত—আর তার পায়ের ঘুঙুর বাজত ঝুন ঝুন করে। একদিন এক হুলো বেড়াল তাকে ধরে খেয়ে ফেলে—সেই থেকে সমস্ত বেড়াল-জাতটার ওপরেই তাঁর আক্রোশ! অতএব বেড়াল মারতে তাঁর আপত্তি নেই!

অনতিবিলম্বে এক বেড়াল বন্দী হয়ে তাঁর সামনে নীত হল।

দলপতি বললেন—ঠিক, একেই মারব। দেবিন, তুই ওর গলায় দড়ি বেঁধে ওকে ঝুলিয়ে নিয়ে দাঁড়,—আমি গুলি করি!

দেবিন ইতস্তত করে বললে—গুলি যদি আমার লাগে?

তাকে অভয় দিয়ে দলপতি বললেন—না, তোর লাগবে না—

—আমার 'এম্' অত খারাপ নয়—দাঁড়া।

দেবিনের ভয় তবু গেল না; কিন্তু কি আর করে বেচারী—দলপতির হুকুম না শুনলেও বিপদ! অতএব, বেড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে সে কাঠ হয়ে দাঁড়াল—আর ঝুলন্ত বেড়াল ছাড়া পাবার জন্যে শূন্যে পা ছুঁড়তে লাগল।

আর সকলে বাঁশের বন্দুকের কেরামতি দেখবার জন্যে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

দলপতি লক্ষ্য স্থির করে বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন।

ভীষণ জোরে একটা আওয়াজ হল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বারুদের গন্ধে আর ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে গেল।

ধোঁয়ার ভেতর অস্পষ্ট দেখা গেল—এদিকে দলপতি আর ওদিকে দেখিন চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন—আর বেড়াল উধাও হয়ে গেছে!

ভোরে শয্যা ত্যাগ করার অভ্যাস শরৎচন্দ্রের ছিল না। ঘুম ভেঙ্গে গেলেও তিনি বেলা পর্যন্ত বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকতেন; চাকর তামাক সেজে এনে মশারির ভেতর তাঁর হাতে গড়গড়ার নল ধরিয়ে দিত—তিনি শুয়ে শুয়ে পরম আরামে তামাক টানতেন। রাত্রিরে শুতেন তিনি অনেক দেরী করে—পড়তে পড়তে বা লিখতে লিখতে রাত দেড়টা-দুটো বেজে যেত। দুপুরে তিনি কোনোদিন ঘুমোতেন না।

ভাগলপুরে এসে, শরৎচন্দ্র সকাল বেলায় ছোট ঘরটিতে তাঁর অভ্যাসমত চোখ বুজে বিছানায় পড়ে আছেন—তামাক টানছেন শুয়ে শুয়ে; পাশের বড় ঘরে তখন কীর্তনের আসর বসেছে—গাঙ্গুলি পরিবারের নিত্য সকালের কীর্তন। এটির প্রবর্তন করেন সুরেন্দ্রনাথ—তাঁর অগ্রজ মণীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর—তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে। এই আসরে মূলগায়েন হতেন রাসবিহারী দাস, সুরেন্দ্রনাথ বেহালা ও শচীন্দ্রনাথ হারমোনিয়ম বাজাতেন, বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েরা কেউ খোল, কেউ করতাল বাজাত—ও সকলে মিলে মূলগায়েনের দোহারকি করত।

রাসবিহারী দাস গাইছেন :—

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে
ছিল প্রাণ তাই দেখা হল
নইলে দেখা হত না
* * *
অধিক উল্লাসে কহে চণ্ডীদাসে
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে।

এ-ঘর ও-ঘরের মাঝের দরজা খোলাই আছে—শরৎচন্দ্র বিছানায় শুয়ে শুয়ে কীর্তন শুনছেন। গানটি শেষ হতে তিনি ও-ঘর থেকে বললেন—রাসবেহারী, 'ও কুব্জার বন্ধু'টি গাও।

গানটি শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু এ গান তিনি শেষ পর্যন্ত শুনতে পারতেন না—তার আগেই কেঁদে ভাসাতেন, আর সেখান থেকে উঠে পালিয়ে যেতেন; অথচ শোনাও চাই তাঁর গানটি।

রাসবিহারী জানতেন যে, শরৎচন্দ্র গানটি শুনতে ভালবাসেন; অতএব, ও-ঘর থেকে ফরমাশ আসতেই তিনি মাধুর্যরসে গলা ভিজিয়ে গাইতে শুরু করলেন :—

বলি, ও কুব্জার বন্ধু
তোমায় রাধানাথ আর বলব না হে
ও কুব্জার বন্ধু
বলি, কেমন করে
পাসরিলে রাই মুখ ইন্দু
অমন সোনার মুখ কি মনে পড়ে না
কেমন করে
* * *
বলি, দেখাও মোতির মালা
ওগো দুদিনের রাজা
দেখাও মোতির মালা
অমন মোতির মালা
ব্রজে কত পড়ে আছে ধূলায়।

গানটি কিছুক্ষণ গাওয়ার পর খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল—মশারির ভেতর শরৎচন্দ্র ছটফট করছেন। একটু পরেই তিনি উঠে পড়লেন এবং এ-ঘরে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। ছেলেরা দেখছে—মাঝে মাঝে তিনি চট্ করে হাত দিয়ে চোখ মুছে ফেলছেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ-ঘরে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না—চলে গেলেন তিনি বারান্দায়। অবশেষে, গান যখন শেষ করলেন রাসবিহারী—শরৎচন্দ্র তখন সরে এলেন। ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে এসেছেন তিনি জল দিয়ে—তবু তাঁর চোখ দু'টি তখনও লাল হয়ে আছে।

—গানটি রাসবেহারী গায় ভাল—না? বললেন তিনি সরে এসে।

—তুমি আর শুনলে কৈ—পালিয়ে পালিয়েই ত বেড়ালে—বললেন সুরেন্দ্রনাথ।

—না, না, শুনেছি বৈকি! বেশ লাগল। আচ্ছা রাসবেহারী, তোমার গলার ঐ তুলসীর মালা পেলে কোথায় বল ত?

—তৈরী করেছি শরৎদা—বললেন রাসবিহারী।

—নিজে করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিজেই করেছি।

—বাঃ বেশ হয়েছে ত। তুমি ত দেখছি একজন ওস্তাদ কারিগর!

পাশের বাড়ীর অনাদিনাথ ঘোষ বসেছিলেন, তিনি রহস্য করে বললেন—রাসবেহারী 'বলতে নেই' থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারে।

হাসতে হাসতে শরৎচন্দ্র বললেন—আমায় একটা মালা তৈরী করে দিতে পার রাসবেহারী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি বৈকি! আপনি পরবেন?

—হ্যাঁ। দিও তো করে।

এবার কণ্ঠিধারণ করবে নাকি তুমি!—হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলেন সুরেন্দ্রনাথ।

মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—সত্যি, ভারি ইচ্ছে হয় গলায় তুলসীর মালা পরি। কবে করে দেবে রাসবেহারী?

রাসবিহারী বললেন—তাঁর আর তর সইছে না। আজই তৈরী করব।

সেদিন সারাদিন পরিশ্রম করে রাসবিহারী তুলসীর মালা তৈরী করলেন এবং পরদিন সকালে সেটি এনে শরৎচন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিলেন।

ভারি খুশী হলেন শরৎচন্দ্র কণ্ঠিধারণ করে।

সুরেন্দ্রনাথ বললেন—বাঃ, বেশ মানিয়েছে তোমায় শরৎ। ফোঁটাতেলক আর বাকী থাকে কেন—ওটাও কেটে দাও না রাসবেহারী শরতের কপালে।

শরৎচন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললেন—না না, সুরেন, ওটা থাক।

জগদ্ধাত্রী পুজোর পরের দিন সকাল থেকে বাইরের বাড়ীর উঠোনে ষ্টেজ বাঁধার ধুম পড়ে যেত। সেদিন সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জনের পর রাত্তিরে ঐ ষ্টেজে থিয়েটার হত, অভিনয় করত বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেরা। রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব, ডাকঘর, বিসর্জন, রাজা, রাজা ও রাণী কয়েকবারই অভিনয় করেছে এই ছেলেরা। অভিনয় দেখতে এত লোকের সমাগম হত যে, উঠোনে জায়গা হত না, অনেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা (অভিনয়) ও গান শুনতেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ একবার ভাগলপুরে এসে এই ছেলেদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকটি দেখেন। অভিনয় তাঁর এতই ভাল লেগেছিল যে, তিনি বলেছিলেন শান্তিনিকেতনের বাইরে গুরুদেবের নাটকের যে এত ভাল অভিনয় হতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। ফিরে গিয়ে গুরুদেবকে এ খবরটি দিতে হবে।

অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করার ভার পড়ত শচীন্দ্রনাথের ওপর। নিজে তিনি ভাল অভিনয় করতেন এবং গানও গাইতেন চমৎকার—এ কথা আগে বলা হয়েছে। ছেলেদের অভিনয় শিক্ষা দেওয়া, গান শেখানো ইত্যাদি সব কিছু তিনি একাই করতেন এবং করতেনও যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে। অভিনয়ে এতটা সাফল্য যে তাঁর শিক্ষার গুণেই সম্ভব হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্র একবার জগদ্ধাত্রী পুজোর তিন চার দিন আগে ভাগলপুরে এসে পৌঁছালেন।

শচীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত তাঁদের হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা 'মালতী' এবং তাঁদের দেখা-দেখি তাঁদের ছোটদের হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা 'মালা' তখন নিয়মিত প্রকাশিত হত। 'মালতী' ও 'মালা'র সম্পাদকদ্বয় শরৎচন্দ্রকে তাঁদের পত্রিকা দেখতে দিয়ে তাঁর মন্তব্য শোনবার জন্তে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র পত্রিকাগুলি উল্টেপাল্টে দেখলেন, তারপর তাঁদের নিজেদের ছোটবেলার হাতে-লেখা পত্রিকা 'ছায়া'র কথা তুললেন। 'ছায়া'র কয়েকসংখ্যা তখনও এ বাড়ীতে ছিল; সেগুলি এনে তাঁর হাতে দেওয়া হল। 'ছায়া'য় থাকত গিরীন্দ্রনাথের হাতের লেখা। শরৎচন্দ্র একসংখ্যা 'ছায়া'র পাতা খুলে বললেন—'কি সুন্দর লেখা দেখেছিস গিরীনের? ছায়ার গল্প, কবিতা—প্রবন্ধও নেহাৎ মন্দ হত না। তোরাও চেষ্টা করে যা—ভাল লিখতে শিখবি। খাটতে হয়, না খাটলে কিছু হয় না।'

কথায় কথায় থিয়েটারের প্রসঙ্গ এল; শরৎচন্দ্র জিগ্যেস করলেন—এবার তোরা কি প্লে করছিস রে?

—শারদোৎসব—বললেন শচীন্দ্রনাথ।

—ও ত' ছোটরা করবে; তোরা বড়রা একটা কিছু কর না।

—কি করব, বলুন?

—ডি, এল, রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে একটা সিন কর্। ও গিরীন, গিরীন—

—কি বলছ শরৎ?—গিরীন্দ্রনাথ এলেন সেখানে।

—'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে একটা সিন্ কর না তোমরা; তুমি আছ প্রফুল্ল রয়েছে, শচী আছে—সেই ভিক্ষুকের সিনটা কর—তিনজনে হয়ে যাবে।

—সময় কোথায় শরৎ?

—অনেক সময় আছে। আজই রিহার্শাল সুরু করে দাও। তুমি চাণক্য, প্রফুল্ল কাত্যায়ন, আর শচী ভিক্ষুক,—ও গান গাইবে। দেখিন কোথায়? দেখিন প্রম্টার হবে।

মহা উৎসাহে সেইদিনই রিহার্শাল সুরু হয়ে গেল।

অভিনয়ের রাত্তিরে উঠোনে আর লোক ধরে না—এত ভিড়। শরৎচন্দ্র বসেছেন বারান্দার ওপর—ষ্টেজের সামনাসামনি, তাঁর চারিপাশে বাড়ীর ও পাড়ার বড়রা বসেছেন।

প্রথমে সুরু হল শারদোৎসব, ভালই অভিনয় করলে ছেলেরা—দর্শকদের কাছে বাহবা-ও পেলে যথেষ্ট।

তারপরে সুরু হল বড়দের অভিনয়—'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে চাণক্য, কাত্যায়ন ও অন্ধ-ভিক্ষুকের দৃশ্য। অন্ধ-ভিক্ষুকের ভূমিকায় শচীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে ও গান শুনে শরৎচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না: অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ধরা-গলায় কয়েকবার 'আহা' 'আহা' বলে তিনি উঠে নিজের ঘরে পালিয়ে গেলেন—বারান্দায় বসে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না! খানিক পরে, চোখমুখ ভাল করে মুছে তিনি ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলেন—কিন্তু আর আলোয় বসলেন না—অন্ধকারে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে লাগলেন।

অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর তিনি শচীন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন—'তুই এত ভাল অভিনয় করিস্ শচী? চল্ তুই আমার সঙ্গে কলকাতায়—আমি তোকে শিশিরের (শিশিরকুমার ভাদুড়ী) দলে ঢুকিয়ে দোব। শিশির আমাকে প্রায়ই বলে—দাদা, ভাল গান গায় আবার ভাল অভিনয় করে—এমন লোক আমি পাই না। তোর চেহারা ভাল, অভিনয় ভাল করিস্ গানও চমৎকার গাইতে পারিস্—শিশির তোকে লুফে নেবে।'

কিন্তু নানা কারণে সেদিন শচীন্দ্রনাথের পক্ষে শরৎচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

ভাগলপুরে গাঙ্গুলিদের সেই বাড়ী আজো আছে, বৎসরান্তে জগদ্ধাত্রী পুজো আজো সেই ঘরটিতেই অনুষ্ঠিত হয়—কিন্তু মণীন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্র পাঠে সে ঘর আর ধ্বনিত হয়ে ওঠে না, শরৎচন্দ্রের উচ্ছল হাসিতে সে ঘর আর মুখরিত হয় না।

মূক বাড়ীটি সেই সব দিনের পুঞ্জীভূত স্মৃতি বহন করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সমা

কৃষ্ণা বসেছিল ঘরের এক কোণে সন্ধ্যার আধো-আলো আধো-ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে—হাতে তার বুনবার সরঞ্জাম। কৃষ্ণা ও রমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পুলকের সঙ্গে গল্প করছে। ওদের মুখের ওপর পড়ন্ত রোদ এসে পড়ছে জানালা দিয়ে। পুলক ভাবছিল, ওদের দু'বোনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর—কৃষ্ণা না রমা!

খানিক বাদে মিহির ও রমেন এসে উপস্থিত হ'ল। মিহির ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, প্রকাশ কই?

রমা বললে, দাদা তো বাড়িতে নেই। একটু বাদেই আসবে।

মিহির বা আর কেউ তা'তে বিশেষ হতাশ হ'ল ব'লে মনে হ'ল না। কৃষ্ণা ও রমার সঙ্গে তাদের গল্প জমে উঠতে বিশেষ সময় লাগে না।

তাদের গল্প-গুজবে কৃষ্ণা অবশ্য অংশ নেয় না।

তার দিকে নজরও পড়ে না কারুর। ঔদাসীন্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা দিয়ে সে নিজেকে তার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস নেই তার। কারুর সম্বন্ধে কোন কৌতূহলও নেই তার মনে। রমেন, মিহির বা পুলক কারুর দিকেই বোধ হয় সে চোখ তুলে তাকায়নি।

প্রকাশ হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে বললে, কৃষ্ণা, চট্ করে চা করে দে—ভীষণ চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমিই করে দিচ্ছি। তুই বোস কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বললে, কৃষ্ণা যে ঘরে ছিল তা তো দেখিনি।

কৃষ্ণা বললে, দিদিকে কেইবা দেখতে পায়!

প্রকাশ তার বন্ধুদের প্রত্যেকের দিকে একবার ক'রে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, কতক্ষণ এসেছিস তোরা?

পুলক বললে, অনেকক্ষণ। তোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে বুড়ো হ'য়ে গেলাম।

প্রকাশের মুখে-চোখে চাপা হাসি ফুটে ওঠে। গলার স্বর নামিয়ে সে বললে, সে' রকম তো মনে হচ্ছে না। ও' ছাড়া আমার জন্য অপেক্ষা করবিই বা কেন? হ্যা-রেরমা কৃষ্ণা, তোরা কী ওদের বসিয়ে রেখেছিলি?

চোখে কপালে তুলে রমা বললে, ও-মা, বসিয়ে রাখলাম কখন! এতক্ষণ ধ'রে যে ওঁদের সঙ্গে গল্পটল্প করলাম—হ্যাঁ পুলকদা', এই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প ক'রে যাচ্ছি, তা' বুঝি কিছুই নয়!

বুঝি-বা অভিমানে ঈষৎ ভারি হ'য়ে আসে রমার গলার স্বর।

প্রকাশ তখন ভাবছিল রমার পাশে পুলককে কেমন মানায়। মিহির বোধ হয় কৃষ্ণাকে ভালবাসে। সেদিন তার কথাবার্তায় তার আভাস পেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার কৃষ্ণার কথা মনে হ'ল। কৃষ্ণার কথা ভাবতেই দুর্ভাবনা এসে জোটে। ও কী নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবে না! জীবনটা কী তার নিজেকে কেন্দ্র ক'রেই কেটে যাবে? তার এক-এক সময় ইচ্ছে হয় ওর আত্মসর্বস্ব সত্তাকে ধ'রে দুর্দম নাড়া দিয়ে ওর চার পাশের জগৎটা সম্পর্কে ওকে সচেতন ক'রে তুলতে। রমেনের মত এমন একটা ভাল ছেলের দিকে বোধ হয় সে চোখ তুলেও তাকায় নি।

রমেনের মত এমন অনুগত বন্ধু আর প্রকাশের নেই। সে আদেশ করলে এই মুহূর্তে সে কৃষ্ণাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণা যে কোন্ জগতে বিচরণ করছে তার নাগাল সে পায় না। রমেন রোজই আসে। কিন্তু কৃষ্ণা হয়তো তাকে চেনেই না। নিজেকে ছাড়া কাকেই বা সে চেনে!

চাকর চা নিয়ে এল। কৃষ্ণা পাঠিয়ে দিয়েছে—নিজে আর আসে নি।

কৃষ্ণা তখন তার নিজের ঘরে ব'সে সোয়েটার বুনতে শুরু করেছে। প্রকাশের জন্য বুনছে। প্রকাশ বলছিল, প্রত্যেক বছরই তো আমার জন্য বুনিস—এবারে না হয় রমেনকে একটা বুনে দে।

কৃষ্ণার ভারি রাগ হ'য়েছিল। কোথাকার কে রমেন—তার জন্য সে সোয়েটার বুনতে যাবে কেন?

রমেন সম্পর্কে দাদার অত দুর্বলতা কেন সে ভেবে পায় না। দাদার বন্ধুদের মধ্যে কারুর সম্বন্ধেই তার উৎসাহ নেই—আর সব বন্ধুদের থেকে তফাৎ ক'রে রমেনকে সে কখনো দেখে নি। রমেনকে তার সামনে এনে দাঁড় করালে সে হয়তো চিনতেই পারবে না।

কৃষ্ণা বেশ টের পায় যে সে ক্রমশ নিজেকে তার চারপাশ থেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে সে যেন তার পারিপার্শ্বিক জগৎটা থেকে নিজের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। সে যেন তার পূর্বতন সহজ জীবনটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। জীবন-মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছে। তার সামাজিক সত্তা সঙ্কুচিত।

আর সবাই কী ক'রে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সামাজিক অস্তিত্ববোধকে ফিরে পেল সে ভেবে পায় না। এক বছরও তো হয় নি। অতি প্রাণবন্ত একটা অস্তিত্বের আকস্মিক হৃদরোগে পরিসমাপ্তি শুধু নয়—তাঁকে কেন্দ্র ক'রে লতিয়ে ওঠা অনেকগুলো জীবনের বিপর্যয়ও বটে। আর সবাই কী ক'রে ভুলল? সে তো পারছে না।

অতল নিঃসঙ্গ বোধের ভার তাকে একা বহন করতে হচ্ছে। মাকে হারিয়েছে ছেলেবেলায়—আবছা আবছা মনে পড়ে তাঁর মুখ। তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টির স্পর্শ সে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে প্রতি মুহূর্তে। একমাত্র তিনিই হয়তো তার এই নিরালম্ব শূন্যতাবোধের অংশ নিতে পারতেন।

রোজপরার কাপড়

সানলাইটে কেচে

কত ফরসা, ঝলমলে !
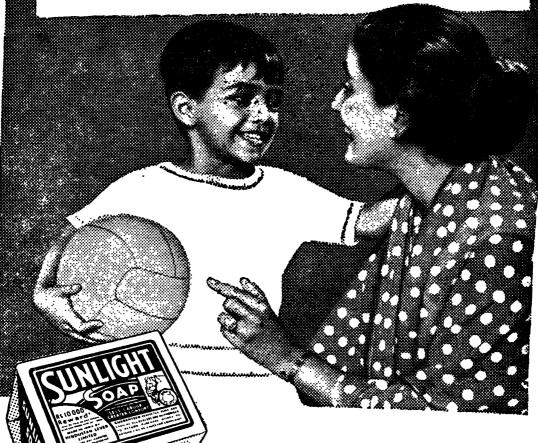
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড় !
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন...

সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান

S. 32A-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বুনতে বুনতে কৃষ্ণা তার মনের ভাবনাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। বাইরের ঘরে রুমা অথবা রমা হঠাৎ খুব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠল। কে যেন গলার স্বর খুব চড়িয়ে কথা বলছে—বোধ হয় পুলক। ওদের হাসিখুশি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না সে। এক এক সময় অসহ্য লাগে তার। কী ক'রে হাসে ওরা? কান্নার সমুদ্রের উপর হাসির হাল্কা ফানুস কী ক'রে ওড়ায়?

প্রকাশ ঘরে ঢুকে বললে, একা একা ঘরে ব'সে কী করছিস্ বল্ তো? সবাই বাইরে ব'সে হাসিগল্প করছে—আর তুই—ওরা কী যে ভাবছে—

কৃষ্ণা বিরক্তমুখে বললে, যা খুশি ভাবুক গে ওরা—আমার ভাল লাগে না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বললে, কী তোর ভাল লাগে বল তো।

কৃষ্ণা বুনতে বুনতে মুখ না তুলে বললে, একা থাকতে—শুধু একা থাকতে। দোহাই দাদা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

প্রকাশ বললে, সারাজীবন কী একাই থাকতে চাস্?

গলার স্বর নামিয়ে কৃষ্ণা বললে, হ্যাঁ দাদা।

প্রকাশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আমি তো তা' হ'তে দিতে পারি নে। তোর ভবিষ্যৎ তো আমাকে দেখতে হ'বে।

কৃষ্ণা চুপ ক'রে থাকে।

খানিক বাদে প্রকাশ বললে, রমেন যে তোর জন্যই রোজ এ বাড়িতে আসে তা' জানিস?

কৃষ্ণা অবাক হ'য়ে মুখ তুলে বলে, আমার জন্য! সে কী দাদা!

মুখচোরা ছেলে—মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। তুই তো ওর সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপও করিস নি।

গম্ভীর মুখে কৃষ্ণা বললে, আমি যে তেমন আলাপী নই তা তো জানই দাদা। রমেন কেন, কারুর সঙ্গেই ভাল ক'রে আলাপ করি নি। ও আমি পারি নে।

প্রকাশ ঢোঁক গিলে একটু ইতস্তত করে বললে, কিন্তু রমেন যে তোকে ভালবাসে।

কৃষ্ণা চমকে উঠল। আরক্ত মুখে কঠিন স্বরে সে বললে, রমেনকে ব'লে দিও দাদা সে যেন আর এ বাড়িতে না আসে।

বিস্ফারিত চোখে প্রকাশ বললে, ও কী বলছিস তুই!

ঠিকই বলছি। অনর্থক ও কষ্ট পাবে এ তো আমি চাই নে। এ বাড়িতে না আসাই ভাল ওর পক্ষে।

কী যে বলিস তুই! খামোকা ওকে হঠাৎ কী ক'রে বলি বলতো এ কথা!

খামোকা ওকে যাতে কষ্ট পেতে না হয় তার জন্য বলবে। আমার সম্বন্ধে কোনও রকম দুরাশা পোষণ করবে এ আমার সইবে না।

প্রকাশ আর কিছু বলতে পারল না।

আর বাইরের ঘরে গিয়ে বসে না কৃষ্ণা। নিজের ঘরটির মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে ফেলে সে।

প্রকাশের জন্য সোয়েটার বোনা শেষ হয়। তারপর সে শোপেনহায়ারের দর্শন নিয়ে বসে।

ঘরের মধ্যে বদ্ধ বাতাস ভারি হয়ে ওঠে—এক এক সময় যেন তার দম আটকে আসতে চায়। তখন দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে রাস্তার জনস্রোত। এক এক সময় তার মনটা তৃষিত হয়ে ওঠে ঐ জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু কে তাকে তার মধ্য থেকে টেনে আর সকলের মাঝখানে এনে দাঁড় করাবে?

নীচের ড্রইংরুম থেকে রুমা ও রমার তরলিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। ওদের প্রাণপ্রাচুর্য তার নিষ্প্রাণ সত্তাকে এক এক সময় স্পর্শ করে। ইচ্ছে হয় ড্রইংরুমে ওদের মাঝখানে গিয়ে বসতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলে নেয়—মনে পড়ে যায় যে, রমেন আছে সেখানে।

রমা এসে সেদিন বললে, জানিস দিদিভাই, রমেনদা' ছোড়দিকে বিয়ে করতে চায়।

প্রকাশ বলেছিল যে কৃষ্ণাকেই ভালবাসে রমেন। কৃষ্ণার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। রমাকে সে বললে, দাদা জানে তো?

রমা বললে, জানে বৈ কি। রমেনদা তো দাদাকেই বলেছে—ছোড়দিকে বলেনি।

সে কী রে! রুমার মত আছে তো?

আছে বৈকি। বলে রমা মুখ টিপে হাসল।

খুশির খবর। কিন্তু কৃষ্ণা খুশি হতে পারছে না কেন? খুশি হবার ক্ষমতাটুকুও সে কী হারিয়ে ফেলেছে? মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোও কী নিষ্ক্রিয়?

ঘরের ছেলের মত এ বাড়িতে অবাধ হয়ে ওঠে রমেনের আনাগোনা। তার সঙ্গে এক আধবার আলাপও হয়েছে কৃষ্ণার। এড়াতে পারে নি।

রমা কৃষ্ণাকে বললে, জানিস দিদিভাই, মিহিরদা' আর আসে না।

মিহিরকে চেনে না কৃষ্ণা—তবু জিজ্ঞাসা করে, আসে না কেন?

মুচকি হেসে রমা বললে, আমি তো তা' জানি নে—ছোড়দি' হয়তো জানে।

কৃষ্ণা চুপ করে থাকে। মিহিরের আসা বা না-আসায় তার কিছু এসে যায় না। হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার খেলায় কে হারল কে

উজ্জল সে খবর নিতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই তার। হৃদয়ের বৃত্তিগুলি বুঝি তার সব শুকিয়ে গেছে।

মিহির আসে না আর। রমেন ও পুলক আসে। আসে আরও অনেকে—প্রকাশের নতুন নতুন সব বন্ধু-বান্ধব। ওরা সবাই মিলে গ'ড়ে তোলে 'খেয়ালী সংঘ'। পুলক সংঘের মধ্যমণি। অনেকেই সভ্য হ'য়েছে।

রমা ও ক্ষমা কৃষ্ণার কাছে এসে বললে, দিদি, তুই সভ্য হবি নে ?

কৃষ্ণা একটু হেসে বললে, জানিস নে বুঝি আমি সভ্যতার বাইরে চলে গেছি ? সভ্য হওয়া কি আমার পোষায় ?

বাইরের ঘরে সন্ধ্যার পরই বসে 'খেয়ালী সংঘের' অধিবেশন। হৈ হল্লা ও গান-বাজনা। কান ঝালাপালা হ'য়ে যাওয়ার জোগাড় হয় কৃষ্ণার। নিজের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে সে বসে থাকে।

প্রকাশ এসে দরজায় ধাক্কা দেয়—বলে, কৃষ্ণা আয় না আজ বাইরের ঘরে। গান-বাজনা হ'বে।

কৃষ্ণা ভেতর থেকে জবাব দেয়, হোক গে। গোলমাল সইতে পারিনে।

গান-বাজনাও তোর কাছে গোলমাল! দিন দিন তোর যে কী হচ্ছে ভেবে পাইনে।

ঝাঁঝাল স্বরে কৃষ্ণা বলে, কাজ নেই ভেবে। যাও না দাদা—অনর্থক কেন সময় নষ্ট করছ ?

প্রকাশ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

কৃষ্ণা ভাবে, এমনি সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে আর কতকাল সে চলবে! তার সামাজিক সত্তা যে ক্রমশ বিলুপ্ত হ'তে চলল।

বাইরের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশাতেই শুধু নয়—ভাইবোনদের সাহচর্যেও যেন তার মনে বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।

খাবার টেবিলে সেদিন রাত্রে ক্ষমা বললে, কী চমৎকার সেতার বাজালেন পুলকদা—তুই তো শুনলিনে দিদি।

কৃষ্ণা বললে, তার জন্য এতটুকু দুঃখ নেই আমার।

রমা বললে, তুই তো জানিসনে দিদি কত কী miss করেছিস তুই।

প্রকাশ কৃষ্ণার দিকে বক্র কটাক্ষ হেনে বললে, নিজেকে তো আর miss করেনি—তা' হ'লেই হ'ল।

রমা বললে, দিদির চেহারা দিন দিন কী রকম খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখেছিস ছোড়দি ?

ক্ষমা বললে, সত্যি—নিজের দিকে এতটুকু নজর দেবে না। সাজগোজের তো ধারই ধারে না।

রমা বললে, দিদিভাই, চুল বাঁধাও তো ছেড়ে দিয়েছিস!

প্রকাশ বললে, আর ক'দিন বাদে তোদের দিদিভাই বোধ হয় সন্ন্যাসই নিয়ে বসবে।

রমা চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বললে, ইস্ তাই বৈ কি! দিদি-ভাইয়ের বিয়ে হ'বে না!

কৃষ্ণা রমার দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, তোদের বিয়ে হ'লেই তোদের দিদিভাই খুশি হয়।

সেদিন গভীর রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণা তার ঘরের ড্রেসিং-টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেক দিন বাদে নিজেকে

ভাল ক'রে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—দেখল নিজের প্রতিটি অবয়ব। এ যেন আর সে' কৃষ্ণা নয়। কোথায় সেই পুষ্পিত যৌবনলাবণ্য। এ শুধু শুকনো ফুলের রাশ। তার অজ্ঞাতে তার বুক চিরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

একদিন বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর পিঠে নিয়ে নীচেরতলার বারান্দার ব'সে হেগেলের ডায়েলেকটিক্স পড়ছিল কৃষ্ণা। সেদিন খেয়ালী সংঘের অধিবেশন বসবে না। সভ্য-সভ্যারা সবাই বোটানিক্সে গেছে পিকনিক করতে। খালি বাড়ি। তাকে বিরক্ত করতে কেউ আসবে না। নিশ্চিন্ত মনে তাই সে বাইরের বারান্দায় এসে বসেছে।

এক মনে সে প'ড়ে যাচ্ছে—কোন দিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে সে চমকে চোখ তুলে তাকাল।

দেখল একটি অপরিচিত যুবক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্কোচ-ত্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। আশ্চর্য সুন্দর তার চোখ দু'টি। সুদূর আকাশের নীলিমার গভীরতা আছে তাতে। চেয়ে আছে কেন অমন করে? কিছু বলবে তো বলুক।

যুবকটির চোখের চাওয়ায় বোধ হচ্ছিল যেন সদ্যোদ্‌ঘাটিত এক পরম বিস্ময়ের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কৃষ্ণার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। তার আঁধার-ঘেরা সত্তায় প্রথম আলোর পদক্ষেপ। কৃষ্ণা চোখের পাতা তুলে বার বার তাকায়।

যুবকটি অবশেষে বলে, প্রকাশ আছে?

যুবকটির কণ্ঠস্বরে যেন মধুরতম সুরের উন্মেষ হ'ল। অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরে যায় কৃষ্ণার মন। প্রথমে সে জবাব দিতে পারে না। তারপর আস্তে আস্তে বলে, নেই—সবাই মিলে বোটানিক্সে গেছে পিক্‌নিক্ করতে।

যুবকটি বলে, ও।

হেগেলের বইখানা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে কৃষ্ণা মুখ নীচু করে বসে থাকে। চোখ তুলে আর পারে না তাকাতে। তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। অনমুভূত লজ্জার শিহরণ তার সর্বাঙ্গে।

যুবকটি একটু ইতস্তত করে বললে, আমি তা' হলে চলি।

কৃষ্ণা কিছু বলতে পারল না। উৎসুক দৃষ্টিতে সে শুধু যুবকটির গমনপথের দিকে চেয়ে রইল।

জানা হল না যুবকটি কে। নামটিও তো জেনে নিতে পারল না সে। প্রকাশের সঙ্গে কী তার দরকার তা-ও তো জিজ্ঞাসা করতে পারে নি।

হয় তো সে খেয়ালী সংঘেরই সভ্য—রোজই হয় তো আসে এ বাড়িতে। ইচ্ছে করলে আবার হয় তো সে তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু অব্যক্ত বেদনায় তার বুকের ভেতরটা টন্ টন্ করে ওঠে কেন? ঐ যে সে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে—যেন তার জীবন অবগাহন করা প্রথম আলোর মত তাকে শুধু কয়েক নিমেষের জন্য স্পর্শ ক'রে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে—যেন ওকে আর ধরা যাবে না।

সন্ধ্যার পর বোটানিক্স থেকে ফিরে এল প্রকাশ, রুমা ও রমা। বারান্দার অন্ধকারে বসে থাকা কৃষ্ণাকে দেখে প্রকাশ বললে, অন্ধকারে ব'সে আছিস যে? আলোটা জেলে নিতে পারিস নে? না, আজকাল তোর আলো সহ্য হচ্ছে না।

কথাটা কৃষ্ণার বুকে গিয়ে বেঁধে। আর্ত চোখে তাকায় সে প্রকাশের মুখের পানে।

রমা সোচ্ছ্বাসে বললে, বোটানিক্সে কী যে মজা করলাম আমরা—জানিস দিদিভাই?

প্রকাশ হেসে বললে, তোর দিদিভাই কোনরকম মজা করা বরদাস্ত করতে পারে না। ও-কথা মুখেও আনিসনি ওর কাছে।

কৃষ্ণা বললে, তোমার এক বন্ধু এসেছিলেন দাদা।

প্রকাশ সাগ্রহে প্রশ্ন করলে, কে? কী নাম?

তা' তো জানি নে।

জেনে নিতে পারলি নে? কী রকম দেখতে বলতো?

কৃষ্ণা আরক্তমুখে বললে, তা তো দেখিনি।

প্রকাশ মুখ টিপে হেসে বলে, তোকে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে আমার। কারুর দিকে চোখ তুলে তাকাবি তুই, এ কি কখনো হয়!

কৃষ্ণা কিছু বলে না। একটা তরঙ্গোচ্ছ্বাস তার বুকের ভেতর উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে।

রুমা বললে, সমীরবাবু এসেছিলেন বোধ হয়।

প্রকাশ বললে, সমীর তো হুগলী গেছে। সে কি ক'রে আসবে! কে যে এসেছিল—নামটাও যদি জেনে রাখতিস!

প্রকাশ ভুরু কুঁচকে ভাবতে থাকে।

পরদিন বিকেলে আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বসে কৃষ্ণা। বহুদিনের না বাঁধা রুক্ষ চুলের ভার যেন চিরুণীর শাসন মানতে চায় না। চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে কৃষ্ণা আয়নায় ফুটে ওঠা তার মুখের দিকে ভাল করে তাকায়। নিজের দৃষ্টিতে নয়—আর কারুর চোখের আলোয়। কী দেখেছিল সে অমন করে? রুক্ষ চুলে ঘেরা তার শুকনো মুখে কী আবিষ্কার করেছিল? জানতে কী পারবে সে কখনো!

চুল বেঁধে হালকা নীল রঙের একটি শাড়ি পরল কৃষ্ণা। মৃদু প্রসাধনের প্রলেপ বোলাল মুখে। কাজল আঁকল চোখে। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

রুমা ও রমা তখন তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। কৃষ্ণাকে দেখে তারা অবাক। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে রমা বললে, ওমা, দিদিভাইকে কী মিষ্টি দেখাচ্ছে! এমনি রোজ সাজলে তো পারিস দিদিভাই।

প্রকাশ এসে ঠাট্টা করে বললে, কী রে কৃষ্ণা—তোর কৃষ্ণপক্ষ শেষ হল নাকি! ব্যাপার কী বলতো? নাম লেখাবি আজ আমাদের খেয়ালী সংঘে?

রুমা সোৎসুককণ্ঠে বললে, তাই না কি রে দিদি!

রমা হাততালি দিয়ে বললে, ভারি মজা হবে—তা হলে।

কৃষ্ণা বললে, না রে না—ও সব সভা-টভ্য হওয়া আমার পোষাবে না।

রমা হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করে বললে, তবে'

কৃষ্ণা হেসে বললে, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'লাম ব'লে যে তোদের সংঘের সভ্য হ'তে হ'বে তার কী কথা আছে!

ব'লে সে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল খেয়ালী সংঘের সভ্যদের চা-জলখাবারের তদারক করতে।

রান্নাঘরে তাকে দেখে ঠাকুর-চাকর সবাই অবাক। রামশরণ অনেকদিনের পুরোনো চাকর—সে বললে, বড়দিদিমণি, তুমি এখানে কেন? বাইরের ঘরে গিয়ে বোস।

কৃষ্ণা বললে, কেন আমার কী এখানে আসতে নেই? বাইরের ঘরেই বা গিয়ে বসব কেন?

রামশরণ বললে, ওখানে দাদাবাবু-দিদিমণিরা নেকচার দিচ্ছেন।

কৃষ্ণা হেসে বললে, নেকচারে কাজ নেই আমার।

খেয়ালী সংঘের সভ্যদের জন্য চা-জলখাবার চ'লে যায়। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে কৃষ্ণা। ভাবে নিজের ঘরে চ'লে যাবে কি না।

বাইরের ঘরে সোরগোল চলেছে। অনেকে মিলে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে। কৃষ্ণা বাইরের ঘর ও খাবারঘরের মাঝখান প্যাসেজে এসে দাঁড়ায়।

উৎকর্ণ হয়ে শোনে কৃষ্ণা। কী নিয়ে আলোচনা চলছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য নেই তার। সকলের সম্মিলিত গলার স্বরের মধ্যে সেই কণ্ঠস্বরটিকে খোঁজে সে।

খুঁজে পায় না। অনেকের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে। উদ্ধার করতে পারবে না তাকে?

পারে না। দিনের পর দিন শুধু বাইরের ঘরের দরজার সামনে উৎসুক কান পেতে থাকে—তার উৎকর্ণ শ্রবণ বৃথাই প্রতীক্ষা করে সেই মধুরতম সুরের উন্মেষের। হয় তো ভিড়ের মধ্যে চাপা প'ড়ে গেছে—আর সকলের মুখরতায় স্বর মেলাতে পারছে না।

রমা একদিন তাকে আবিষ্কার করল বাইরের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। সে অবাক হ'য়ে বললে, এ কি দিদিভাই—তুই এখানে দাঁড়িয়ে যে!

ঈষৎ অপ্রস্তুত হাসি হেসে কৃষ্ণা বললে, তোদের গান শুনছিলাম।

ভেতরে গিয়ে শুনলেই তো পারিস।

কৃষ্ণা শিউরে উঠে বললে, না ভাই, ভেতরে আমি যাব না।

রমা একরকম জোর করে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

তার মনের সঙ্কোচের বাধা ডিঙোতে পারেনি এতদিন—কাজেই রমার প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞতাই বোধ করল।

খেয়ালী সংঘের জমাট আসরে হঠাৎ যেন চিড় ধরল কৃষ্ণা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই। সংঘের সভ্য-সভ্যাদের সকলের দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়ে। কৃষ্ণা সঙ্কুচিত বোধ করে রীতিমত। কোন মতে একটি চেয়ারে ব'সে পড়ে সে।

যারা কৃষ্ণাকে চিনত না তাদের চেয়েও উৎসুকভাবে তার দিকে তাকায় পুলক। কৃষ্ণাকে সে যেন চিনতে পারছে না। এ কী আশ্চর্য রূপান্তর!

সে খাতা খুলে বললে, এখন থেকে তা' হ'লে আপনাকে আমাদের একজন হিসেবে ধরে নিতে পারি?

কৃষ্ণা একটু হাসল—কিছু বলল না।

প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে কৃষ্ণা একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকাল। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না;

আসেনি সে। অন্তরালে যার সান্নিধ্য সে প্রাণ-মন দিয়ে অনুভব করেছে তার অনুপস্থিতিতে মনে মনে আচমকা একটা ধাক্কা খেল। হয় তো সে এ সংঘের আসরে আদৌ আসে না।

কিন্তু এ-ও তো হ'তে পারে যে, সে আজ অনুপস্থিত। কৃষ্ণার মনে এক ঝলক আলোর মত এই সম্ভাবনাটির উদয় হয়।

সভার শেষে পুলক বললে, আজ তিনজন অনুপস্থিত। এঁরা অনেক দিন ধ'রেই আসছেন না।

কৃষ্ণার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অনুপস্থিতদের মধ্যে সে-ও হয় তো আছে। আজ আসে নি—কাল নিশ্চয়ই আসবে।

অনুপস্থিত তিন জনের নাম জেনে নিতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণার। রমা বা রুমাকে জিজ্ঞেস করবে কী? থাকগে। কিছু হয় তো ভেবে বসবে ওরা।

পরদিন আরও যত্ন ক'রে সাজ করে কৃষ্ণা। ফিকে নীল সিল্কের শাড়ি পরে—কপালে আঁকে কুমকুম টিপ—খোঁপায় জড়ায় বেলফুলের মালা। কিন্তু সে এল না।

সে কী আসবে না! কৃষ্ণার চোখের কাজল জলে ধুয়ে যায়।

পুলক একদিন বললে, একজনের নাম কাটা গেল আজ।

কার! কৃষ্ণা উৎসুক দৃষ্টিতে পুলকের মুখের পানে তাকায়। যার নাম কাটা গেল তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না কেউ। কী তার নাম জানতে পারল না কৃষ্ণা।

নতুন ক'রে কৃষ্ণাকে দেখছে পুলক—বার বার দেখেও তার আশ মেটে না।

এতদিন ধরে দেখে এসেছে কিন্তু কুহেলিকা উদঘাটন করা সূর্যের মত তার এই আত্মপ্রকাশ তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অতি সাধারণ সেই মেয়েটি কোন্ সুদূর শুভ্র স্বর্গের আলোয় অবগাহন করছে! কোন আলোয় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে তার মুখখানা! পরম একটা বিস্ময়ের মত পুলকের সমস্ত মন জুড়ে থাকে সে।

কৃষ্ণার মাথার বালিশ ভিজে যায় তার চোখের জলে। তার জীবন-যৌবন মন্থন করা অমৃতভাণ্ড নিয়ে আর কতকাল প্রতীক্ষা করবে সে!

সেদিনও হতাশ-মনে সে তার ঘরে এসেছে। মনের উদ্গত কান্নাটাকে চেপে সে শুয়ে পড়েছে তার বিছানায়—এমন সময় চাকর তার হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়ে গেল। বললে, পুলকবাবু দিয়েছেন।

কৃষ্ণা অবাক হ'ল। পুলক তাকে চিঠি লিখেছে কেন?

চিঠিটা খুলে পড়ল সে। পড়তে পড়তে পাথরের মত কঠিন হ'য়ে ওঠে তার কমনীয় মুখখানা। অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন চিঠিটার পংক্তিতে-পংক্তিতে। এ কী দুঃসাহস পুলকের!

দুঃসহ জ্বালায় ঝলসে ওঠে কৃষ্ণার চোখ দু'টো। পরক্ষণে অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হ'য়ে আসে তার দৃষ্টি। তার ওপর অভিমানে মনটা ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। সে তো এল না—তবু তাকে টেনে আনল বাইরে দুঃসহ অপমানের মাঝখানে!

চিঠিটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে কৃষ্ণা। খেয়ালী সংঘের আসরে আর কখনো তাকে দেখা যায় নি।

দুটি কবিতা

রবার্ট ফ্রষ্ট

(রাত্রির পরিচিতি)

আজ এই রাতকে আমার চেনা হল
বর্ষায় হেঁটেছি এই রাতে—ফিরেছি বাদলে
আলোতে কত যে পথে পথে ঘুরেছি—এই শহরে

বিষণ্ণ গলির আঁধারে কত যে হ'ল চলা
নিঃশব্দে প্রহরীকে পাশে রেখে গোপনে
চলে এসেছি সে ব্যথা যায় না বলা।

পথে থেমে গেছি—স্তব্ধ রেখেছি পদশব্দ
কখনো কোথাও ভেসেছে শিশুর ব্যাহত কান্না
পথের প্রান্ত থেকে প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায়

কিন্তু কেউ ফিরে যেতে নয়—বিদায় জানাতে
আসেনি—সেই সব আলো—অপার্থিব
উচ্চতা থেকে, আকাশের বুকে অনন্ত আলোতে

ঘড়ি: ঘোষণা করেছে সময়—কেউ জানে না
কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়—তবু এ রাত্রের
সাথে আজ হয়েছে পরিচয়।

(আগুন ও তুষার)

কেউ বলে এ পৃথিবী শেষ হবে একদিন
—বহ্নিজ্বালায়
কেউ বলে—তুহিনে শীতলে
সে যাই হোক, আমি আকাঙ্ক্ষার স্বাদ নিয়েছি
যে অগ্নিহোত্রীর স্পর্শ পেয়েছি
কিন্তু যদি দুইই শেষ হয়।

আমি—ঘৃণার অনেক গভীরে
তুষারকে গলতে দেখেছি,
সেও অনেক যন্ত্রণা
তবু এ পৃথিবী শেষ হবে
(তবে তাই হোক)

অনুবাদক: দেবী ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

১২

প্রায় একবছর পরে মালতীমাসীকে আমি সেই অবস্থায় দেখেছিলাম। আমারই চোখে প্রথম পড়েছিল। রান্না করছে মালতীমাসী—চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

—ওকি তুমি মাসী, কাঁদছ? জিজ্ঞেস করতাম।

—কই না তো। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলত মালতীমাসী।

তারপরে একদিন সেই দারোগা-কাকীমা এলেন বেড়াতে! আমি সামনেই বসেছিলাম। মা সব সময়ে আমাকে সামনে বসিয়ে রাখতে ভালবাসতেন।

ওরা কি কথা বলছিলেন প্রথম দিকে অতটা খেয়াল করি নি। হঠাৎ কানে এল দারোগা-কাকীমা বলছেন, একটা কথা বলব দিদি, কিছু মনে করবেন না তো।

এতক্ষণের এত কথায় মা কিছু মনে করেন নি, হঠাৎ একটা কথায় কি মনে করবেন···আর গলাটাও যেন অন্যরকম লাগল।

—কি? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—না, যদি রাগ না করেন তো বলি···আমি তো সব সময়ই ভয়ে ভয়ে কথা বলি···কিন্তু কি জানেন দিদি, আপনাকে ভালবাসি··· তাই আপনি কোন বিপদে পড়বেন—একথা ভাবলেও চুপ করে থাকতে পারি না—

—কি কথা যে এত ভূমিকা করছ? বিরক্তিতে মা'র ভ্রূ একটু কুঁচকে ওঠে।

—আপনার ঐ যে রাঁধুনী···মালতী নাকি নাম—

—হাঁ, মালতী। তা ওর কি হয়েছে?

—আপনি ওর দিকে লক্ষ্য করেছেন—নীচুকণ্ঠে প্রায় ফিসফিস করে বললেন দারোগা-কাকীমা।

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকেই তাকিয়ে থাকেন মা। তারপরে আবার বলেন, কেন? কি হয়েছে ওর?

—আমার কি রকম সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা, ও খাবার পরে বমি টমি করে।

—তুমি পাগল হয়েছ। হেসে ওঠেন মা, ও ওষুধণের···

মা'র কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠি, হ্যাঁ মালতীমাসী খাওয়ার পরে বমি করে। আমি অনেকদিন দেখেছি।

ওঁরা দুজনেই ভীষণ চমকে ওঠেন। প্রথমটায় মা যেন ভ্রূ কুঁচকে আমাকে ধমকাতে যান—কিন্তু সামলে নিয়ে ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করেন। কি দেখেছিস তুই?

—মালতীমাসী রোজ বমি করে। আমি বললাম, মাসী-তুমি ওষুধ খাও। তোমার অসুখ করছে—আমি মাকে বলব তাতে···

—তাতে কি? ওঁরা একসঙ্গে বলে ওঠেন।

—মালতীমাসী বলল, ওষুধে আমার এ অসুখ ভাল হবে না।

—তুই আমাকে আগে বলিস নি কেন? আমার ওপরে ঝাঁজিয়ে ওঠেন মা।

—আহা, ছেলেমানুষ, ওকি আর অতশত বুঝেছে? দারোগা-কাকীমা—মাকে বোঝান। এখন ঐ মিটমিটে শয়তানকে ডেকে এনে সোজা জিজ্ঞাসা করুন। তারপরে, পাপ বিদায় করুন।

—বমি করলেই কি কেউ পাপী হয় নাকি? প্রশ্ন করি আমি।

—তুমি ওসব কথা বুঝবে না, বাবা। আস্তে আস্তেই বলেন দারোগা-কাকীমা তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মা হঠাৎ আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন।

এত অবাক হয়ে যাই যে, প্রতিবাদও করতে পারি না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হয় যেন, মা খুব চেঁচাচ্ছেন—দু'একটা কথা কানে আসে—পোড়ারমুখী, কালামুখী···বেরিয়ে যাও··· এই সব কাণ্ড···

দারোগা-কাকীমার ভিজে ভিজে মসৃণ গলা···দেখে মনে হয় ভোজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না···পেটে পেটে এত···

একটুক্ষণ পরে সব চুপচাপ। মা দরজা খুলে আমাকে স্নান করতে বলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম, রাগ করে থাকব—কিন্তু মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে স্নান করতে চলে যাই। তখনই চোখে পড়ে মালতীমাসী নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

—আজ মা নিজে ভাত বেড়ে দেন।

—মালতীমাসী শুয়ে আছে কেন? প্রশ্ন করি।

—শুয়ে আছে! চমকে ওঠেন মা, কেন? ও চলে যায় নি। বলেই মা প্রায় ছুটে মালতীমাসীর ঘরের সামনে এসে বলেন, মালতী···

কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

—তুমি এখনই এই মুহূর্তে চলে যাবে···, স্থির কণ্ঠে মা বলেন।

—না, আমি যাব না। ততোধিক স্থির কণ্ঠে জবাব আসে।

—কি সাহস। অন্যায় করে আবার মুখ নাড়া হচ্ছে। যে তোর এই দশা করেছে তার কাছে যা···

—তার কাছেই তো আছি···

পলকের মধ্যে মা যেন কুঁকড়ে গেলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে গর্জন করে ওঠেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বেরিয়ে যা···বেরিয়ে যা···

মালতী এসে সামনে দাঁড়ায়। ওর ঐ রকম মুখখানি আমি আর কখনও দেখি নি। চোখ দু'টোতে আগুন জ্বলছে। মাটিতে অসহায় ভাবে কিলবিল করে যে কেঁচো সে হঠাৎ সাপের মত ফণা ধরল।

—আপনার কথায় আমি বেরিয়ে যাব না। যে আমার এরকম দশা করেছে সে আসুক—সে এলে তাকে জিজ্ঞেস করে তবে যাব···

মা এক মিনিট চুপ করে রইলেন। হতভম্ব হারিয়ে যাওয়া ভাব—

কিছুক্ষণ ঐ রকম পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে দাঁড়ান অবস্থাতেই মাটিতে পড়ে গেলেন মা। আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—মা মরে গেল···আর ঠিক সেই সময়েই জুতো মসমসিয়ে খাকী হাফ প্যান্ট ও হাফ সার্ট পরে বাবা ঘরে এসে ঢুকলেন—

—কি? কি··, মালতীমাসীর দিকে তাকিয়ে বাবা আর কথাটা শেষ করলেন না।

বাবার গলা শোনামাত্র মা তীরের মত উঠে দাঁড়ালেন। বিশৃঙ্খল চেহারা মা'র। চুলগুলি খুলে এসে সামনে পড়েছে—জলে কাদায় সামনের কাপড়টা ভিজে গেছে—পাগলের মত চেঁচিয়ে বললেন, ওকে এখনই বিদেয় কর। ওকে এখনই বিদেয় কর।

বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—ওকে এখনই বিদেয় কর···ওকে এখনই বিদেয় কর···

ছবির মত দাঁড়িয়ে আছি আমরা সবাই। মা হঠাৎ সোজা শক্ত শরীরটা নিয়ে দেওয়ালে গিয়ে দুম দুম করে মাথা ঠুকতে থাকেন—ওকে বিদেয় কর · ওকে বিদেয় কর···

বাবা এগিয়ে এসে মা'র পিঠে একটা হাত দিয়ে বলেন, বেশ তো, ও চলে যাবে এ কি একটা কথা। খুবই সহজ—বিদেয় করলেই হল—তুমি নিজেই তো পার—তা নিয়ে এত উতলা হচ্ছ কেন?

আর আশ্চর্য, এক মিনিটেই মা শান্ত হয়ে গেলেন।

সেদিন মা'র হঠাৎ শান্তভাব দেখে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কি করে এত তাড়াতাড়ি চুপ করে গেলেন মা। ঠিক যেন কলের পুতুল। কল খোলা ছিল তো হাতমুখ দাঁত খিঁচুনী—কল বন্ধ হয়ে গেল তো সব চুপ।

এখন বুঝতে পারি মা'র সেদিনের মনোভাব। বুঝতে পারি, বাবার ওপরে মা'র বিশ্বাস ছিল না। মালতীমাসীর কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন মা। তাই পাগলের মত নিজের অধিকার খাটাবার প্রাণপণ চেষ্টা—'তুমি তো নিজেই ওকে তাড়াতে পার—এত উতলা হচ্ছ কেন'—বাবার ঐ একটি কথাতেই ভারসাম্য ফিরে এল মনের।

যেন কিছুই ঘটেনি এমনি ভাবে মা ঘরে ঢুকে গেলেন। বাবাও নিজের চোখ একাগ্রভাবে মা'র দিকে স্থির রেখে মা'র সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—কিছু ভাবছিলাম না—আমার সেদিনের সেই ঐটুকু মন থমকে গিয়েছিল—মনে হয়েছিল, ঠিক যা ঘটা উচিত তা ঘটল না—মনের সেই শূন্যতা নিয়েই আমি অন্যমনস্কভাবে ওপরের দিকে তাকালাম—চমকে উঠলাম।

'যখন দেখবে একটা মেয়ে জোরে কাঁদতে পারছে না, গুমরে গুমরে কাঁদছে···

গুমরে গুমরে কান্না সেই প্রথম দেখলাম। মালতীমাসীর সমস্ত শরীর মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত কান্নার আবেগে কাঁপছে—দু'চোখ দিয়ে মোটা জলের ধারা গড়াচ্ছে—কিন্তু মুখে একটুও শব্দ নেই।

এর পরেও আমি নির্যাতিত নারীর বহু ছবি দেখেছি, মেয়েদের চোখের জলে ভেসে যেতে দেখেছি, বুক চাপড়ে কাঁদতে দেখেছি, মাথা কুটে রক্ত বার করতে দেখেছি—কিন্তু সেদিন সেই শিশুবয়সে মালতীমাসীর কান্না দেখে যে কষ্ট পেয়েছিলাম—জীবনে সে-রকম কষ্ট আর কখনও পাই নি।

ধরম বলেছিল, অবলা নারীর যে সর্বনাশ করে সে তো মানুষ নয়—'কুত্তা' কুত্তার বাচ্ছা···

ধরম আরও বলেছিল, বাবুজী, পুরুষ পাশে দাঁড়ালে যা মেয়েদের গৌরব—পুরুষ সরে দাঁড়ালে তাই চরম বিপদ··সর্বনাশ···

আজ একটি মেয়ের সর্বনাশের রূপ আমি দেখলাম—দেখলাম সেই সর্বনাশকারীকে—হাসতে হাসতে যার হাত ধরেছিল আজ সেই মেয়ে যখন কাঁদছে···আমি ছুটে গিয়ে শোবার ঘরের সামনে দাঁড়ালাম—দেখতে হবে এখন সেই লোকটি কি করছে—

খাটের ওপরে বসে আছেন বাবা—সামনে মা দাঁড়িয়ে—মুখে মৃদু মিষ্ট হাসি—এরই মধ্যে মা'র চুল, চেহারা বদলে গেছে। মাঝখানের এই ব্যাপারটা—মায়ের সেই আলুথালু চুলে চীৎকার—যেন কিছুই না—একটা স্বপ্নমাত্র।

আমি হঠাৎ দেখলাম—মা নয় ওখানে মালতীমাসী দাঁড়িয়ে আছে—পরক্ষণেই দেখলাম—মা। মা'র একটা হাত বাবার হাতে—দু'জনেই হেসে হেসে কথা বলছেন—

তারপরে মা আর একবারও চেঁচান নি এমন কি জোরেও কথা বলেন নি—বাবা খেয়ে বেরিয়ে গেলে খুব ধীরে শান্তকণ্ঠে মালতীমাসীকে খেয়ে নিয়ে বিকেলে চলে যেতে বললেন। মালতীমাসী কোন উত্তর দেয়নি এবং পরে জানতে পেরেছিলাম সেদিন সে খায়ওনি কিন্তু বিকেল হবার আগেই চলে গিয়েছিল। মা ওর বাকী মাইনে হিসেব করে রান্নাঘরের বারান্দায় রেখে দিয়েছিলেন—ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তা তেমনিই আছে—এমন কি ওর নতুন এক জোড়া কাপড়

—যা মাত্র কয়েকদিন আগে ওকে মা কিনে দিয়েছিলেন তাও পড়ে আছে।

ঘুম থেকে উঠে খুব অবাক হয়ে গেলেন মা—রেগেও গেলেন—মুখ কালো ক'রে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ—বারান্দা থেকে টাকা পয়সাগুলি তুলে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—কাপড় দু'টোও ফেলতে যাচ্ছিলেন আবার কি ভেবে এনে রেখে দিলেন ঘরে—

বাবাকে মা এ সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। এমনিতে খুব সাধারণ কোন ঘটনা ঘটলেও মা সালঙ্কারে বর্ণনা করেন। রোজই খেতে বসে বাবা হেসে হেসে বলেন, আজকের কি রিপোর্ট ?

সেদিন কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল—যার কিছুটা অংশ বাবা জেনে গেলেন—তারপরে আরও ঘটল মাংতীমাসী না খেয়ে দেয়ে, মাইনে না নিয়ে এমন কি নিজের কাপড় দুটোও রেখে চলে গেল—কিন্তু সে সম্বন্ধে বাবা একটি কথাও জিজ্ঞেস করলেন না।

মারও আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। এর আগে মাংতীমাসী'র আসবার আগেও অনেকদিন আমাদের রাঁধুনী ছিল না। তখন মা কি রাগারাগিটাই না করতেন। ঘুম থেকে উঠেই বিরক্ত—যে যা কথা বলছে তাতেই রেগে যাচ্ছেন—এমন কি আমার কথাও সহ্য করতে পারতেন না—সকালের চা-খাবার, দুপুরের রান্না কিছুই ঠিক সময়ে হত না—আর মা'র মুখে অনবরত সেই এক কথা—আমি কি পারি এসব। কোনদিন অভ্যাস নেই—আমার শরীর ভাল নয়। এবারেই আমি মরব।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাজারবার সেই একই কথা। খেতে বসে মা ভালভাবে খেতেন না। অর্ধেক খেয়ে উঠে যেতেন। বাবা অনুযোগ করলে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠতেন, এত গাধার খাটুনী খেটে কি আর খাওয়া যায় ? যা সুখে রেখেছ।

মোট কথা, যতক্ষণ জেগে থাকতাম, এক মিনিটও ভুলতে পারতাম না (মা ভুলতে দিতেন না) যে আমাদের রাঁধবার লোক নেই—মা'র খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি, বাবা দু'জনেই অপরাধীর মত মুখ করে থাকতাম; সশঙ্কভাবে চলাফেরা করতাম—খেতে বসে ভাত গলায় আটকে গেলেও জল চাইতাম না। একদিন এমন হল, জল-তেষ্টায় থাকতে না পেরে উঠে এঁটো হাতেই এক গ্লাস জল ভরে নিলাম। মা তাতে আরও চটে গেলেন।

বাবা বললেন, তুমি রাগ করছ কেন ? তোমার হাতজোড়া তাই ও নিজে নিয়েছে—কি দোষ হয়েছে তাতে ?

দোষের কথা মা কিছুই বললেন না—রাগ করতে থাকেন। ঠিক রাগ নয়, এ রাগের কোন ভাষা নেই। শুধু দুমদাম করে থালা-বাটি আছড়ে ফেলা আর মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী—জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা—সব মিলিয়ে যেন নির্বাক একটা ঝড়।

—অত মেজাজ খারাপ করছ কেন, বাবা এবারে বিরক্ত হয়ে বললেন।

আর তখনই আমি বুঝতে পারলাম এরই নাম মেজাজ।

এবারে কিন্তু রাঁধুনীর অনুপস্থিতিতে একবারও 'মেজাজ' করলেন না মা। সংসারে এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই, সমস্ত কিছু গোছানো, পরিষ্কার, তকতকে, ঝকঝকে—মা'র মুখখানি হাসি-হাসি।

সে ক'দিন রান্নাটাও অদ্ভুত ভাল হত। কি করে যে মা অত ভাল রাঁধতেন, জানি না। বাবা রোজই খেতে বসে বলতেন, আজ খুব ভাল খেলাম।

আমিও মনে মনে সেই কথাই বলতাম আর প্রার্থনা করতাম, কোনদিনই যেন রাঁধুনী না পাওয়া যায়। রাঁধুনী পেলেই তো মা

আবার গিয়ে খাটের ওপরে বসবেন—সেইভাবে সারাদিন কেটে যাবে চুল বাঁধায় আর মুখে সাবান দেওয়া আর গল্পের বইয়েতে। দারোগা-কাকীমা আসবেন, নাক টেনে টেনে রাজ্যের লোকের আলোচনা।

তার চেয়ে এই আলুথালু চুল, আধময়লা শাড়ী-পরা হাস্যমুখী মা অনেক ভাল।

কিন্তু আমার ভাল লাগাতেই তো পৃথিবী চলবে না। কয়েকদিন পরেই রাঁধবার লোক এল। এবারে মেয়ে নয়, পুরুষ। বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, হাসিমুখে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কি কি কাজ করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন—মালতীমাসীর ছায়া কোথাও পড়ল না।

শুধু আজ নয় মালতীমাসী চলে যাবার পর থেকেই ওকে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। মা এমন ভাবে আমাদের চারদিক থেকে বেড়ে ধরেছিলেন যে কোথাও একটু ফাঁক ছিল না।

আজ বুঝতে পারি, বাবার জীবন থেকে মালতীমাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যই মার অত আয়োজন ছিল। কিন্তু, মালতীমাসী ছাড়াও আর যেসব ছায়া···

হ্যাঁ আরও অনেক ছায়ার ছাপ ছিল বাবার জীবনে। আর একটু বড় হয়েই তা আমি আবিষ্কার করেছিলাম। কিন্তু সেসব ছায়া···ছায়াই, তাই বাবার মনে কোন দাগ কাটেনি কিংবা হয় তো বাবার মনটাই ছিল নিরেট—কোন কিছুর দাগই সেখানে পড়ত না।

যেদিন বাবার চরিত্রের এই দিকটা আমার সম্পূর্ণভাবে জানা হয়ে গিয়েছিল সেদিনই মনে মনে বলেছিলাম, ধরম, মেয়েদের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য কটা লোককে তুমি শেষ করবে। পৃথিবীতে আজ লক্ষ লক্ষ 'ধরমে'র প্রয়োজন।

আজ আমি সহজ সরল ছোট একটি কথায় বলতে পারি—বাবা 'চরিত্রহীন' ছিলেন। কিন্তু সেদিনের আমার শিশুমনের কাছে এ যে কত বড় জানা ছিল তা বুঝিয়ে বলতে পারি না—

শেফালিদি'র ঘটনা শুনেই আমার অনেকদিন পরে মালতীমাসীর কথা মনে পড়েছিল। তারপরে বিন্দুপিসী, হেডমাষ্টার মহাশয়ের ঝি মোক্ষদা···একটির পরে একটি শেষে আর কিছুই ভাবতাম না—মনটা বোধ হয় অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

আমার মা কিন্তু সব ঘটনাই জানতেন এবং সমস্ত কিছুই ক্ষমা করতেন।

১৩

আজ এতদিন পরে মনে হয় তিনি শুধু ক্ষমা করতেন না বাবার এই সব অভিযানে খুশীই হতেন। ভেবে ভেবে এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের একটা ব্যাখ্যাও আমার মনে হয়েছে।

মা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং সেইজন্যই নিজের সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি জানতেন কোনদিক দিয়েই তিনি বাবার সমকক্ষ নন। রূপে, বিদ্যায় লোকের সঙ্গে মেশবার ক্ষমতায় সবদিক দিয়েই বাবা মার থেকে অনেক ওপরে।

বাবাকে তিনি নিজের অধিকারে একটা দুর্লভ প্রাপ্তি বলেই মনে করতেন এবং সেজন্যই লোককে দেখিয়ে লোকের ঈর্ষা আকর্ষণ করে গৌরব বোধ করতেন।

তারপরে জানতে পারলাম বাবা শুধু চরিত্রহীন নন—বাবা···হ্যাঁ খুব সহজে বলতে গেলে 'চোর'ও ছিলেন। সঙ্কোচহীন এ সেই চুরি যা সহজে ধরা পড়ে না, যা প্রত্যক্ষভাবে অপরের ক্ষতি করে না—

এ হচ্ছে বিদ্যার সেরা বিদ্যা মহাবিদ্যা।

একদিন বাবা খুব ব্যস্ত ও বিমর্ষমুখে বাড়ীতে এলেন। কোন কথাই বলছিলেন না—মা অনেকবার প্রশ্ন করায় শেষে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে সংক্ষেপে বললেন, অফিসের একাউণ্ট চেক করতে স্পেশ্যাল কমিশন আসছে।

মার মুখটাও সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে গেল।

আমি তখন বেশী বড় হই নি কিন্তু শুনে শুনে কথাবার্তায় যে সব ইংরেজী ব্যবহার হয় তার অর্থ বুঝতে পারি, কিন্তু এদের মুখভাব দেখে মনে হল আমি বোধ হয় ভুল বুঝেছি—নইলে অফিসের হিসেব দেখতে গভর্ণমেণ্ট লোক পাঠাবে তাতে বাবা মা উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?

—কি হয়েছে মা। কে আসবে? প্রশ্ন করলাম।

—তোমার সব কথাতে নাক গলাবার কি দরকার? মা হঠাৎ ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

আমি অবাক হলাম, অপমানিত হলাম এবং অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। যে কথা খুব সহজেই ভুলে যেতাম—মার এই রকম উগ্র উত্তরে তা জানবার ইচ্ছা মনে গেঁথে গেল।

খাওয়ার পরে বাবা মা ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি এমন জায়গায় গিয়ে খেলতে বসলাম যেখান থেকে তাঁদের দেখতে পাই, তাঁদের কথা শুনতে পাই।

—কি করে কি হল? মা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—যত সব 'ব্যাটা বদমাইস', বাবা রেগে ওঠেন, আমার ভাল ওদের সহ্য হচ্ছে না। চোখ টাটাচ্ছে—

—হিংসুকের শাস্তি ভগবান দেবেন, মা রায় দেবার ভঙ্গীতে বলে ওঠেন।

—সে তো যখন হবে তখন হবে, তোমার ভগবান বড় ধীরে ধীরে কাজ করেন—এখন আমি কি করি বল তো।

মা বিপন্নমুখে ভাবতে থাকেন। বাবাও চুপ।

—কত টাকা খাবে, কে জানে? একটু পরে নিজের মনেই বাবা বলেন।

—কারা!

—যারা আসবে···

—যারা ঘুষ ধরতে আসবে তারাই ঘুষ খাবে, মা খুব অবাক হয়ে বলেন।

—কে ঘুষ খায় না বলতে পার? চেঁচিয়ে ওঠেন বাবা, দুনিয়ার সবাই ঘুষ খায়। কেউ দু'টাকা, কেউ দু'শো, কেউ দু'হাজার, কেউ দু'লাখ।

ঘুষ তো খাবেই। জরুর খাবে। একটু পরে বাবা আবার বলেন, কিন্তু কথা হচ্ছে ঘুষটা কি করে দেব! কাকে দিয়ে—কি ভাবে।

সেদিন এ পর্যন্তই শুনেছিলাম এবং এই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল—পরে জানতে না পারলেও বুঝতে পেরেছিলাম বাবা নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করেছেন—নইলে চাকরি থাকত না—

সেদিন যা জেনেছিলাম তাই যথেষ্ট সারাজীবনে আর কিছু

জানবার প্রয়োজন হয় নি—তাই একদিন হেসে উঠেছিলাম বাবার মুখের ওপরে—

একটু বেশীমাত্রায় খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। টলতে টলতে এসেছিলাম। বাবা তখন কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। রোজ দু'বেলা গীতাপাঠ করেন। সন্ধ্যাহ্নিক না করে জল খান না।

চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিলাম—জানলা দিয়ে দেখতে পেয়ে বাবা বেরিয়ে এসে বলেন, তোর লজ্জা করে না আমার ছেলে হয়ে···।

—তোমার ছেলে বলেই তো। আমি হো হো করে হেসে উঠেছিলাম।

বোধ হয় মাথাটা খুব ঠিক ছিল না বলেই অমন করে হাসতে পেরেছিলাম।

অন্য সময় হলে বাবা হয়ত চুপ কোরে যেতেন—কিন্তু সেদিন সকালেই গুরুদেব আমাদের বাড়ী থেকে চলে গেছেন—যাবার সময়ে একশো টাকার প্রণামী নোটটা পকেটে ফেলে বাবাকে বলেছেন, তোমার মত ধর্মজ্ঞ শিষ্য বিরল।

সেই ধর্মতেজেই বাবা বোধ হয় উদ্দীপ্ত ছিলেন। আগুনের মত জ্বলে উঠে বলেন, তোর সাহস, স্পর্ধা কম নয়। তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস। আমার ছেলে বলে তুই মাতাল হস। লজ্জা করে না তোর!

—মদ খেলে লোক দু' এক সময়ে মাতাল হবেই। যারা বলে মদ খাই অথচ কখনও মাতাল হই না তারা হয় মিছে কথা বলে নইলে মদের বদলে জল খায়—কোথায় যেন পড়েছিলুম কথাটা মনে পড়ল বলে দিলাম।

—আমাকে তুই কোনদিন মদ খেতে দেখেছিস? ভ্রূ দু'টো ভীষণভাবে কুঁচকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বাবা। কোনদিন কারো কাছে শুনেছিস যে আমি মদ খাই।

—না। শুনলেও বিশ্বাস করতাম না।

—বিশ্বাস···করতিস···না···স্খলিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বাবা বলেন, কিন্তু কেন?

আমার তখন মাথা ঠিক হয়ে গেছে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছিল। খুব ভাল লাগছিল কথা বলতে। মনে হচ্ছিল শরীরে কোন ভার নেই আর মনটাও বেরিয়ে এসেছে খাঁচা থেকে।

—বিশ্বাস করতাম না, কারণ তুমি সমস্ত জীবনভোর যা করেছ মদ খেলে তা করতে পারতে না।

বাবা অবাক হয়ে তাকান বুঝতে পারেন না আমি ঠিক কি বলতে চাইছি।

—তুমি যদি মদ খেতে তাহলে অনেকদিন আগেই নিজে গিয়ে আদালতে বলতে, আমি চোর—চরিত্রহীন—আমাকে শাস্তি দিন। আমাকে জেলে পুরে দিন—জেলের রক্ষক হবার যোগ্যতা আমার নেই।

—কি? কি বললি?

হিংস্র পশুর মত আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান বাবা। মালতীমাসীকে দেখতে পেলাম—ভিক্ষে করছিল।

এক মুহূর্তে পাথর হয়ে যান বাবা। আমি মুখে এক টুকরো হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরে পাথরের মূর্তি নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়।

মিথ্যে কথা বলেছিলাম আমি সেদিন। হঠাৎ মুখে এল তাই বললাম—মালতীমাসীকে দেখেছি ভিক্ষে করছিল। হয় তো আমার কল্পনায় ছিল মালতীমাসীর পরিণামের ঐ রূপ।

আর বাবার মুখ দেখে বুঝতে পারলাম তিনিও জানেন মালতীমাসীর ঐরকম পরিণতি হতে পারে। জেনে, বুঝে, নিজের একটু সুখের জন্য একটি মেয়েকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছেন।

তারপর থেকে বাবা আর কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলেন নি এবং···

এবং আমিও সেজন্য এতটুকু দুঃখিত হইনি।

•

খেতে বসলে মা একদিন বললেন, তুই আমাদের একমাত্র সন্তান, তোর ওপরে কত আশা করেছিলাম—তুই লেখাপড়া শিখবি।

—লেখাপড়া কি শিখিনি, মাকে বাধা দিয়ে বলি এবং সেকথা সত্য, স্কুলে-কলেজে ভাল ফল না করি—পাশ করে গেছি ঠিকই আর শিক্ষিতদের যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ ডিগ্রীধারী হওয়া তাও হয়েছি।

—মানুষ হবি···

—মানুষ! আমি জোরে হেসে উঠি। মানুষ বলতে তোমরা

কি বোঝ! আমি বড় হয়েছি, বাবা যে ব্যবসা পত্তন করে গিয়েছেন।

—লোকে তোর নামে নানা কথা বলে···

—বলুক। বলুক। সে তো আমার সৌভাগ্য—যে যত বলবে তত তুমি আমাকে ভালবাসবে। বাবার সময়েও তো তাই দেখেছি···

মা হঠাৎ রেগে গেলেন। প্রাণপণে চেঁচিয়ে বললেন, তুই কি? তুই কি একটা মানুষ। তুই তো একটা কুলাঙ্গার।

—কি হল কি? শান্তকণ্ঠেই জবাব দিই, থেমে গেলে কেন? মাথা ঠিক করে বল কি বলতে চাও।

—তুই সেদিন তোর বাবার সঙ্গে ও-রকম ভাবে কথা বলেছিস কেন?

—অন্যায় কিছুই বলি নি, বলেছি আমি তোমারই ছেলে—

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপরে ধীরে ধীরে বললেন, এই সব বাড়ী, ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সবই তোমার বাবা একা একজীবনে করেছেন—তোমার দাদুর কিছুই ছিল না—এত গরীব ছিলেন তিনি যে, তোমার বাবা-কাকাদের ভাল করে খেতে দিতে পারতেন না—

—সেই কথাই তো বলেছি। আমি বাবার উপযুক্ত পুত্র। তিনি সঞ্চয় করেছেন—আমি ভোগ করছি—আমি তো বাবার উপার্জিত অর্থ ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দিই নি। আমি জানি এই হাজার হাজার টাকায় হাজার হাজার পাপ লুকিয়ে আছে। সেই পাপ নিয়েই আমি পাপের মসৃণ পথে গড়গড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।

এর পরে আর কখনও মা আমাকে কিছু বলেন নি।

১৫

দু'টি লোক এসেছিল আমার শৈশব জীবনের পথে। দু'জনের প্রতি আমার একই ধরণের মনোভাব ছিল—ঘৃণা—খাঁটি নির্জলা ঘৃণা।

কিন্তু সেই দুই ব্যক্তি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। একজন আমার বাবা অপর সরোজ রায়।

সরোজের সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম পরিচয় হয় সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। স্কুলে আমরা এক সঙ্গে অনেক ছেলে ভর্তি হয়েছিলাম—অনেকের মধ্যে সরোজও ছিল—মুখটা দেখেছিলাম আবছা আবছা ছবির বইয়েতে ছবি দেখার মত—কিন্তু সে তো পরিচয় নয়।

পরিচয় হল কয়েকদিন পরে—আর পরিচয় হবার দিন থেকেই তাকে গভীরভাবে ভালবাসলাম—গভীরভাবে ঘৃণা করলাম—ঠিক যেমনি করেছিলাম আমার বাবাকে—মালতীমাসীর কান্না দেখবার পর থেকে।

এরা কিন্তু চেহারায় চরিত্রে একদম আলাদা। সরোজ আমারই সমবয়সী—ময়লা রংয়ের রোগা ছেলে—যে পঞ্চাশ কেন পাঁচ জন ছেলের মধ্যে থাকলেও চোখে পড়বে না—

চরিত্রের দিক দিয়েও বাবার ঠিক উলটো—অসম্ভব 'ময়ালিষ্ট'। তখন ঐ ঐটুকু বয়সে তার চরিত্র গঠিত হয়ে গিয়েছিল—সে শুধু নিজে নীতিবাদী ছিল না—অপরকে উপদেশও দিত।

ঐটুকু ছেলে। প্রথম দিন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আকারে প্রকারে ঐটুকু একটা ছেলে। যাকে কি না দু'আঙুলে টিপে মেরে ফেলতে পারি।

কিছুই না কিন্তু ব্যাপারটা। আজ মনে পড়লে হাসি পায়। পড়াশুনোর চেয়ে খেলাটাই অনেক ভাল লাগত আমার। সারা বছর ঐ রকম নিয়ম করে পড়া পোষায় না। পরীক্ষার ক'দিন আগে পড়বে—ব্যস; হয়ে গেল। কিন্তু, মাষ্টারমশাইরা তো তা বোঝেন না। রোজই গাদা গাদা হোমটাস্ক। তাই ক্লাশের একটা ছেলের সঙ্গে ঠিক করেছিলাম ও অঙ্ক করে নিয়ে আসবে একদিন আমি স্কুলে এসে টুকে নেব।

বেশ চলছিল কয়েক দিন। সেদিন, ছেলেটির করে আনবার পালা। করেও এনেছে। আমি নিশ্চিন্ত। টিফিনের সময়ে টুকে নিলেই হবে। টিফিনের ঘণ্টা পড়বার অল্প বাকী—যখন টুকতে গেছি—ছেলেটি দেবে না।

মার্বেল খেলায় সবগুলি গুলি হারিয়ে খুব রেগে গেছে ও। তুমি খেলতে পার না তাকি আমার দোষ। তাই বলে চুক্তিভঙ্গ করে আমাকে বিপদে ফেলবে। ছিনিয়ে নিয়েছি খাতাটা। ছিঁড়ে ফেলব এটা।

—দাও, দাও আমার খাতা দাও, প্যান-প্যান করতে থাকে ছেলেটা।

ওর প্যান-প্যানানি শুনে আরও খারাপ লাগে—ঘেন্না ধরে যায়। রেগে গিয়ে খাতাটা ফেরত দিতে যাচ্ছি এমনি সময়ে কে যেন বলে, ওর খাতাটা ওকে দিয়ে দাও।

চমকে তাকিয়েই কিন্তু হেসে ফেলি। গলাটা তো মোটা—অঙ্কের মাষ্টারের মত মানুষটাতো এইটুকু। একদম শেষের বেঞ্চে বসে আছে—কি যেন একটা বই পড়ছে। তখনই চকিতে মনে পড়ে, এই ছেলেটাকে অনেকদিন যেন দেখেছি এমনিভাবে বই পড়তে—

—আমি সব কথা পেছনে বসে শুনেছি, ছেলেটি গম্ভীরকণ্ঠে বলে।

—শুনেছ তো কি হয়েছে—ফিকফিকিয়ে হেসে উঠেছিল।

—তুমি ওর খাতা ওকে দিয়ে দাও—যেন আমার কথা শুনতে পায়নি, দেখতে পায়নি আমার বিদ্রূপের হাসি—এমনিভাবে অটল গাম্ভীর্যে কথা শেষ করে ছেলেটি।

আজ স্বীকার করতে বাধা নেই সেদিনের সেই বিমানের ভাল লেগেছিল ছেলেটিকে। পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য করবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা—যা [illegible]র নিজের একটুও নেই—দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে।

—কি রকম লাটসাহেবের মত কথা বলছ? তুমি কথা বলবার কে? রুখে উঠেছিলাম।

—ওর খাতা ওকে দিয়ে দাও, গম্ভীরকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করেছিল ছেলেটি।

—তোমাকে কথা বলতে কেউ ডাকেনি—

—ডাকবার দরকার নেই—অন্যায় দেখলে আমি বলবই।

—নিজের চরকায় তেল দাও—ওর ওপরে দুঃসহ রাগেই খাতাটা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

তারপর ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। বলেছিলাম যে, খাতাটা ছিঁড়ে ফেললাম—এস বাধা দাও।

একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলুন

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খোলা খুবই সহজ। মাত্র ৫৲ টাকা দিয়ে অ্যাকাউণ্ট খুলতে পারেন এবং আপনার জমা টাকার ওপর প্রতি বছর ৩% হিসেবে সুদ পাবেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আজই আপনার কাছাকাছি স্থানীয় শাখায় দেখা করুন। ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে আপনার যেকোন সমস্যার সমাধানে সুনিপুণ ও সৌজন্যপূর্ণ সেবার জন্য আমরা সবদাই প্রস্তুত।

১৮৬৩ ১৯৬৩

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ১০০ বছর

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

যুক্তরাজ্যে সংমিতিবদ্ধ • সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ NGB/59 B BEN

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ: ১৯, নেতাজী সুভাষ রোড, ২৯, নেতাজী সুভাষ রোড, (লয়েড্স ব্রাঞ্চ), ৩১, চৌরঙ্গী রোড; ৬১, চৌরঙ্গী রোড, (লয়েড্স ব্রাঞ্চ); ৬, চার্চ লেন; ১৭, ব্রাবোর্ন রোড; ১বি কনভেণ্ট রোড, ইণ্টালী, ১৭ এসডি, ব্লক এ, নলিনী রঞ্জন এভিনিউ, নিউ আলিপুর; ১৬৩, রাসবিহারী এভিনিউ।

ছেলেটি কিছু বলেনি—রাগে ওর মুখটা থমথমে হয়ে গিয়েছিল—আর যার খাতা সে কাঁদতে শুরু করেছিল।

সমস্ত মিলে ব্যাপারটা বিশ্রী—খুবই বিশ্রী লাগে—বিশেষত ছেলেটার কান্না দেখে চোখে জল এসে যায়—সেইজন্যই বোধ হয় আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠি, তুমি বাধা দিতে এলে তোমাকেও এমনিভাবে ছিঁড়ে ফেলব।

সে কথাটা বিমান বলতে পারত বটে, সে ক্ষমতা সে রাখত। সেই দশ বছর বয়সেই তাকে দেখাত পনের বছরের ছেলের মত—জেলখানার অপর্যাপ্ত খাঁটি দুধ, ঘি, মাখনের দান ছড়ানো সর্ব শরীরে।

যার খাতা সে ভয়ে একটি কথাও না বলে জানালার পাশে বসে চোখের জল ফেলতে থাকে—দু' একটা কথা শুধু ওর বোঝা যায়—খাতা···আমার খাতা···

ওর কান্না দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায়—ইচ্ছে হয় দেয়ালে নিজের মাথা ঠুকে দিতে। জানি তো এই ছেলেটা কত গরীব—একটা ভাল খাতা কিনতে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয় ওর মা বাবার—মনে মনে ভাবি, দারোয়ানের কাছ থেকে একটা খাতা কিনে ওর বইপত্রের মধ্যে রেখে দেব—

মোটা খাতাটা কিনেও এনেছিলাম, কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। টিফিনের পরেই অঙ্কের ক্লাশ। সবচেয়ে রাগী মাষ্টারমশাই। অঙ্ক করে না আনবার জন্য কি কৈফিয়ৎ দেব তাই মনে মনে ভাবছিলাম হঠাৎ চমকে ওঠি।

সেই কালো রোগা ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে।

—স্যর, একটা কথা বলব?

—বল।

—বিমান ভূতনাথের অঙ্কের খাতা ছিঁড়ে দিয়েছে—

—হোয়াট. চেঁচিয়ে উঠলেন মাষ্টারমশাই।

—ভূতনাথ, তোমার খাতা দাও।

ভূতনাথ উঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ; মাষ্টারমশাইয়ের সামনে ভাল মন্দ কোন কথা বলবার সাহসই ওর নেই।

—কি হয়েছে তোমার খাতা? গম্ভীর কাটাকাটা কথা মাষ্টারমশাইয়ের।

তবুও ভূতনাথ কোন কথা বললে না।

—বিমান।

আমি উঠে দাঁড়াই।

—তুমি ওর খাতা ছিঁড়ে দিয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর।

—কেন?

—এমনিই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল।

—ঝগড়া হয়েছে বলে তুমি খাতা ছিঁড়ে দেবে। কি নিয়ে ঝগড়া।

একথা শুনে ভূতনাথ চকিত ভয়ে আমার দিকে তাকায়। সেদিকে একবার তাকিয়ে শান্তকণ্ঠেই উত্তর দিয়েছিলাম, আজ্ঞে, গুলিখেলা নিয়ে।

মাষ্টারমশাই অত্যধিক রাগে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু ওঁর চোখ দুটি ধকধকিয়ে জ্বলতে থাকে।

—তুমি যাও ঐ কোণে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাক—এখন থেকে ছুটি হওয়া পর্যন্ত তুমি এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে—

তাই ছিলাম। দুটো থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত একইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। অঙ্কের মাষ্টারমশাই এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার। তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের বলে দিয়েছিলেন—কেউ ওকে একবারও ডাকেন নি।

বিমানের শাস্তির ব্যবস্থা করে ভূতনাথের দিকে তাকিয়েছিলেন মাষ্টারমশাই। বলির পাঁঠার মত কাঁপছে বেচারী। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেও তা অনুভব করতে পারছিল বিমান আর মনে মনে ভাবছিল, আহা, ওকে যেন মাষ্টারমশাই কিছু না বলেন।

সত্য সত্যই মাষ্টারমশাই ওকে কিছু বলেন নি। শুধু বললেন, আর কখনও গুলি খেলবে না। ও এক ধরণের জুয়োখেলা। আর কোনদিন শুনতে পেলে শাস্তি দেব।

ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে লম্বা ঘাড় নেড়েছিল। না, সে জীবনে কখনও খেলবে না। যদিও বিমান জানত পরদিনই খেলতে যাবে ও। ওর প্রতিশ্রুতির মেয়াদ নিতান্তই কয়েকঘণ্টা।

মাষ্টারমশাই এবারে বলেছিলেন, সরোজ—

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার মাথা একবারে ঘুরে যায়। তাহলে এর নাম সরোজ। আমি তো এর নামই জানতাম না—ও কিন্তু সবই জানে।—সরোজ, তুমি আমাকে কথাটা বলে 'মনিটারে'র উপযুক্ত কাজই করেছ—

মনিটার? সেই পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটানা মনিটার ছিল সরোজ। প্রায় সব স্কুলেই মাসে মাসে মনিটার বদলায়।—এভাবে ক্লাশের সব ছেলেকেই এই 'ডিউটি' করতে হয়। খুব প্রীতিকর কাজ অবশ্য নয়। অন্তত আমার তো তা মনে হয় নি। তবে সরোজের নিশ্চয়ই ভাল লাগত। ও তো ঐ ধরণের কাজই ভালবাসত।

'তার পরে যা বলছিলুম, আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে বিমান, আকাশ তোমাকে আজ বলছি, সরোজ মনিটার ছিল বলেই বিমান স্কুলে অত দুষ্টু ছিল। জেদ স্রেফ জেদ।'

কি না করেছে স্কুলে। বোর্ডে আজে বাজে কথা লিখেছে। প্রথম দিন লিখেছিল নিতান্তই খেয়ালবশে—একটি বন্ধুর প্ররোচনায়।

সেই ছেলেটির নাম ছিল পঞ্চানন। ছেলেরা বলত পঞ্চমুখ—কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

সত্যি সত্যিই, ঐটুকু ছেলে কিন্তু কত রকম খারাপ কথা যে জানত তার ইয়ত্তা নেই। আর শুধু লোকের সম্বন্ধে খারাপ কথা, মাষ্টারদের সম্বন্ধে, ছেলেদের সম্বন্ধে, দারোয়ানের সম্বন্ধে কত যে নোংরা কথা বলত তার ঠিক ঠিকানা নেই। ও কি করে সব খবর জোগাড় করত তা ওই জানে।

'আকাশ পরে পঞ্চাননের মত অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার—যারা জলের ওপরের স্বচ্ছতা দেখতে পায় না দেখতে পায় না ঢেউ খেলান সৌন্দর্য—দেখতে ভালও বাসে না—তারা ভালবাসে জলের নীচের কাদামাটি পচা পাঁক ঘাঁটতে।' [ক্রমশঃ।

বিজ্ঞান বার্তা

শক্তির উৎস সূর্য

অসীমকুমার বসু

সূর্য কেবলমাত্র এই পৃথিবীর জন্মই দেয় নি, তাকে নিজের অফুরন্ত শক্তির প্রভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই সৌরশক্তির প্রভাবেই পৃথিবী আজও উষ্ণ, আলোকিত। প্রাচীনকাল থেকে এইজন্যই এক উজ্জ্বল পৌরুষময় দেবতা হিসাবে সূর্যকে পৃথিবীর মানুষ বন্দনা করেছে। আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বিস্তৃত বিস্ময়কর উন্নতির ফলে সেই সৌরশক্তিকে মানুষ তার বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছে। এই প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে সৌরশক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

শুনলে বিস্মিত হবেন সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ করছে, তা ৫৫০ কোটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণজাত শক্তির সমান। প্রতি সেকেণ্ডে এই বিপুল পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ করলেও সূর্যের তেজ এখনও প্রচণ্ড, সূর্য এখনও প্রখর ও উজ্জ্বল। সূর্যের এই অফুরন্ত শক্তির উৎস সম্বন্ধে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। সৌরশক্তির এই উৎস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সে মতবাদ অপ্রচলিত হয়ে নতুন নতুন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

গবেষণার প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল সূর্যের আয়তনের সঙ্কোচনের ফলেই এই শক্তি (energy) বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Radio-active elements) আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা হ'ল, এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির স্বয়ংক্রিয় বিশ্লিষ্টতার জন্যই এই বিপুল পরিমাণ শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই ধারণা বৈজ্ঞানিকদের পাল্টাতে হ'ল, কারণ বিশেষ পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'ল যে সূর্যের এই বিচ্ছুরিত শক্তি সূর্যের অভ্যন্তরস্থ বিপুল উত্তাপের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিশ্লিষ্টতা এই বিপুল বিচ্ছুরিত শক্তির উৎস হ'লে উত্তাপের তারতম্যের উপর ঐ বিচ্ছুরিত শক্তির পরিমাণ নির্ভর করত না।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মহলে এরপর আরও অনেক মতবাদ প্রচার লাভ করলেও কোনটাই বিশেষ যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচিত হয় নি। এরপর ১৯৩০ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার এডিংটন তাঁর গবেষণায় সৌরশক্তির উৎস সম্বন্ধে সর্বাধুনিক মতামতটি প্রকাশ করলেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর এই মতামত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ'ল। তিনি বললেন, সূর্যের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত। এই বিপুল উত্তাপে বিভিন্ন পদার্থ যে কেবল তাদের আণবিক অবস্থাতে (Atomic Stage) বিশ্লিষ্ট হয় তাই নয়, প্রত্যেক অণু (Atom) ইলেকট্রনে বিশ্লিষ্ট হয় এবং বিভিন্ন পদার্থের অণুকেন্দ্র নিউক্লিয়াসগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটায়। এই আণবিক সংঘর্ষই তাঁর মতে ঐ বিপুল পরিমাণ শক্তির মূল উৎস।

সৌরশক্তিকে আজ বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছেন এবং সৌরশক্তির এই ব্যবহার আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতিতে যদিও এই শতাব্দীতেই বিস্তৃতভাবে করা হচ্ছে এর প্রথম ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল বহু বছর আগে, এমন কি ২১৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও যে এই সৌর-শক্তিকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস শত্রুপক্ষের জাহাজে আগুন ধরাতে ব্যবহার করেছিলেন, গ্রীক ইতিহাসে তার নজীর আছে। রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আর্কিমিডিস নাকি সমুদ্রতীর বরাবর বিরাট বিরাট মসৃণ পেতলের ধাতবপাত এমন ভাবে স্থাপিত করেছিলেন যাতে সূর্যরশ্মি ঐ ধাতবপাতে প্রতিফলিত হয়ে জাহাজের কাষ্ঠগাত্রে একত্রিত হয়। কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মির প্রচণ্ড উত্তাপে রোমানদের সেই সমস্ত রণতরীতে আগুন ধরে গিয়েছিল। আর্কিমিডিস এইভাবেই নাকি সেদিন গ্রীক নগরী সায়রাকাসকে রক্ষা করেছিলেন।
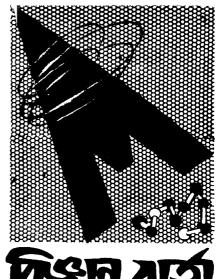
সূর্যরশ্মির নির্বীজন ক্ষমতা ছাড়াও তার উত্তাপের দিকটাই বিশেষ ভাবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যরশ্মির সাথে যে প্রচুর উত্তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁচচ্ছে, বিশেষ ধরণের লেন্সের সাহায্যে সেই উত্তাপ কেন্দ্রীভূত করে জল ফোটানো হচ্ছে, রান্না করা হচ্ছে।

সৌরশক্তির আর এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যবহার-এর সাহায্যে ছোট ছোট সিলিকন ব্যাটারীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করব। এই ব্যাটারীতে ট্রানজিষ্টার রেডিও চালানো হচ্ছে। কাছাকাছি জায়গার মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও এই ব্যাটারী ব্যবহার করা হচ্ছে। বিরাট আয়তনের সিলিকন ব্যাটারীগুলিতে সৌরশক্তির সাহায্যে প্রতি ১ বর্গগজে ৫০ ওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। ব্যাটারীগুলিকে ১ঘণ্টা রৌদ্রে রেখে দিলে সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে পরের পঞ্চাশ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ চালানো যাবে।

আধুনিক কৃত্রিম উপগ্রহগুলি, যেগুলি পৃথিবীর চারিদিকে কক্ষপথে স্থাপন করা হচ্ছে তাতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিগুলি চালিত করার জন্য এ ধরণের সৌরশক্তিচালিত ব্যাটারী স্থাপন করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস এবং এ্যারিজোনার এ্যাপলাইড সোলার এনার্জির পরীক্ষাগারে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে ৬৩০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পরিমাণ উত্তাপ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রচণ্ড উত্তাপে যে কোন মিশ্রিতধাতুকে গলিত করে বিশুদ্ধ উপাদানগুলি পৃথক করা সম্ভব। বস্তুতপক্ষে বিশুদ্ধ ধাতুর গবেষণায় কোন কোন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকগণ আজ এই সৌরশক্তিকে ব্যবহার করছেন।

নিউ মেক্সিকোর কয়েক জায়গায় বাড়ী গরম রাখবার জন্ত সৌরশক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত সূর্যরশ্মির উত্তাপের সাহায্যে জল গরম করে তা ঘরের দেওয়াল ইত্যাদির সংলগ্ন বিভিন্ন পাইপের ভিতর দিয়ে চালিত করে ঘর গরম করা হচ্ছে। টোকিওতে কোন কোন শিল্পকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় গরম জল ও উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে এই সৌরশক্তির সাহায্যে।

কিন্তু আকাশে সূর্য না থাকলে—রাত্রে অথবা মেঘলা দিনে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে বৈজ্ঞানিকরা সেকথাও ভেবে দেখেছেন। তাঁরা স্থির করেছেন যে, সৌরশক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তা ব্যাটারীতে সঞ্চিত করে রাখলে পরে দরকার মত ব্যবহার করা চলবে।

মেরুপ্রদেশের তুষারাবৃত ঠাণ্ডা অঞ্চলে যে কয়মাস সূর্য থাকবে তখন সূর্যরশ্মির সাহায্যে উত্তাপ সঞ্চয় করে তা ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় কি না সে সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ আর এইচ গার্ডেন্স গবেষণা চালাচ্ছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে সৌরশক্তির সঠিক ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ, সুন্দর ও আরামদায়ক করে তুলবে। আমাদের দেশেও সৌরশক্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হচ্ছে।

মানুষের বশে আকাশের মেঘ

এম. ফেল্ড্

আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। আকাশে মেঘের ভার এখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। আলমা-আতা বিমান বন্দর থেকে আমাদের এল-আই-১ বিমানখানা যাত্রা করল দক্ষিণের দিকে। ইসিক-কুল হ্রদের কাছাকাছি এসে দেখি বিশাল পার্বত্য উপত্যকার উপর কুয়াশার কুণ্ডলী।

বিমানে যাত্রীদের কামরায় মাত্র ছটো সীট। প্রত্যেকটি সীটের সামনে টেবিলের উপর যন্ত্রপাতি—আবহ চাপ ও আর্দ্রতা রেকর্ড করার যন্ত্র, স্পেশাল থার্মোমিটার, অণুবীক্ষণযন্ত্র, মেঘের নমুনা সংগ্রহের যান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। সাড়ে পাঁচ হাজার মিটার ঊর্ধ্বে উড়ন্ত ল্যাবরেটরিটি এবার ঘন মেঘের স্তরে প্রবেশ করল। উপরে জলীয় পদার্থের এমন অকৃপণ আশীর্বাদ, অথচ নিচে আমাদের ক্ষেতখামারে প্রায়শ দেখা যায় ঘাটতির বঞ্চনা।

কাজাক হাইড্রো-মেটেওরোলজিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিট্যুটের আবহ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের কর্ণধার নিকোলাই ফেদোরোভিচ গেল্মগোলংজ বললেন, "অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ মেঘের উপর তার সক্রিয় প্রভাব খাটাবে, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারবে।"

কাজাক প্রজাতন্ত্রের উত্তরে ও অনুর্বরভূমি অঞ্চলে শস্যক্ষেত্র তৃষ্ণার কষ্ট পায়, বিশেষ করে জুন মাসে বৃষ্টি না হলে। দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের দ্বারা পাহাড়ে নদ-নদীগুলিকে ভরিয়ে দিতে পারলে আবাদী জমি উপকৃত হতে পারে অপরিসীম।

স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করার কোনো উপায় আছে কি: —হ্যাঁ, আছে। বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা "চার্জ করা" স্পেশাল ইউনিটের সাহায্যে মাথার উপর থেকে মেঘলা ভাব ও কুয়াশা অপসারিত করা যায়। স্পেশাল রকেট দিয়ে মেঘদের "গুলীবিদ্ধ" করা যায়। এই রকেট ফেটে পড়ে অনেক উঁচুতে। অবশেষে একখানা বিমান থেকে শুকনো বরফের সঙ্গে মেঘকে বীজ বোনার মতো করে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

গত শীত ঋতুতে আলমা-আতা ও তার আশপাশ থেকে সমস্ত কুয়াশা একেবারে অপসারিত করা হয়েছিল নিয়মিত বিমান-চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্তে।

নিকোলাই ফেদোরোভিচ পরিহাস করে বললেন, "আমাদের আকাশ-অর্থনীতির হিসাব-নিকাশ নিতে আমরা শুরু করেছি আমাদের ইন্সটিট্যুট এখন কাজাকস্তানের মেঘ-সম্পদের পরিমাপ ও পর্যালোচনার কাজে ব্যাপৃত। মেঘ সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার আছে—মেঘের সংখ্যা, মেঘের আকৃতি-প্রকৃতি, মেঘের উচ্চতা, ঘনত্ব, উত্তাপ, জল-ভার। মেঘের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাঠামোর অনুশীলনও কম গুরুত্বের বিষয় নয়। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের কাছে উড়ন্ত ল্যাবরেটরির প্রয়োজন পড়ে। আবহাওয়ার বাঁধাধরা পর্যালোচনার পরিবর্তে উড়ন্ত ল্যাবরেটরিগুলি মেঘের "পিছু ধাওয়া" করে নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নেয়। আবহবৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত এই সব বিমান এক নতুন ধরণের গবেষণার ভার নিয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের অনুর্বরভূমিতেও এরূপ মেঘের গবেষণা চালানো হচ্ছে

ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক সম্পদ বহুবিধ ও বহুবিচিত্র। মানুষ তার নিজের কল্যাণের জন্যে এই বিপুল সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে পারে ভূগর্ভের কয়লা, তেল, ধাতু আকরিক, বন-বনানীর সবুজ স্বর্ণ, খরস্রোতা নদ-নদীর শক্তি-প্রবাহ প্রভৃতি সম্পদের সঙ্গে এবার যোগ দিতে চলেছে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সম্পদ—মেঘ-সম্পদ।

আবহবিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে, "প্রতি ঘন কিলোমিটার পরিমাণ মেঘে জলের পরিমাণ এক হাজার টন।" এই তথ্য আর নিছক তথ্য হয়েই থাকছে না এবারের গ্রীষ্মকালে ইতিমধ্যেই কাজাকস্তানের অনুর্বরভূমি অঞ্চলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছে প্রকৃতির "সংশোধনের" এ এক প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

বিজ্ঞানীরা এখন কৃত্রিম বারিপাত সৃষ্টির নানাবিধ পদ্ধতির অর্থনৈতিক দিক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তাঁদের অভিমতে, অনুর্বরভূমিতে কৃত্রিম তুষারপাত অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের চেয়ে অধিক লাভজনক। এই পদ্ধতিতে খরচও কম।

আকাশের মেঘ মানুষের বশে এসে যাচ্ছে। মেঘ ক্রমশ নতি স্বীকার করছে মানুষের ইচ্ছার কাছে। গত বছর গ্রীষ্মকালে আলাজান উপত্যকাকে (ট্রান্সককেসাসে) শিলাবর্ষণের উৎপাত সহ্য করতে হয়নি: আবহবিজ্ঞানীদের রকেট 'কামান' শিলাবর্ষণকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে

এই ধরণের ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অবশ্য তাই বলে এই কথা মনে করবার কারণ নেই যে, কৃত্রিম বারিপাত বা বারিপাত বন্ধের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। বরং বিস্তর সমস্যার সমাধান এখনো বাকি আছে।

এক-পা দু'-পা করে মানুষ অতীব অবাধ্য প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে বশে আনছে। মানুষের প্রয়োজন মাফিক বৃষ্টিপাত! মানুষের মর্জি মাফিক তুষারপাত! মানুষের আদেশে শিলাবর্ষণের পশ্চাদপসরণ! কিছুকাল আগেও এসব রূপকথার কাহিনী বলে মনে হত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বনে এসে একাধিক প্রেস কনফারেন্সে আর সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ইণ্টারভ্যুয়ে জেনেছি জাতির অর্থনীতি, রাজনৈতিক অবস্থা। পরিদর্শন করেছি ক্রুপ ইস্পাত কারখানা, রাতে উপস্থিত থেকেছি অপেরায়—কিন্তু জার্মান জাতির ব্যক্তিগত জীবনচর্যা সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে আসতে হবে তাদের গৃহকোণে।

ইওরোপের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ—ইওরোপ প্রাচ্য থেকে কিছু গ্রহণ করেনি। দীর্ঘ দু'শ বছর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে ইংরাজেরা যখন ফিরে গেছে সাগর পারে তখন সঙ্গে নিয়ে যায়নি মহামানবের সাগর তীর থেকে সামান্য বারিবিন্দুও।

ইংরাজেরা ভারতে এসে রচনা করেছে আপন জন নিয়ে আপনার সমাজ।

যে কৌলীন্য প্রথার তারা নিন্দা করেছে, আপনাকে ঘিরেছে সেই কৌলীন্য প্রথারই বৃত্তে। তার নিজের চার্চ, নিজের ক্লাব, নিজের পাড়া—তার বাইরে যে দেশ সেটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে জিয়োগ্রাফিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মানচিত্রের মাধ্যমে।

কিন্তু মিসেস হেলম্যানের পরিবারে তার দেখলাম ব্যতিক্রম। হেলম্যানের তিনটি সন্তানের জন্ম ভারতবর্ষে। তার মধ্যে দু'জনের শৈশব কেটেছে দিল্লীর উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ হেলম্যান পরিবারের ওপর পড়েছে লক্ষণীয় ভাবে। মিসেস হেলম্যান মেয়ের নাম রেখেছেন ইন্দিরা।

হিন্দিতে অভ্যর্থনা শুনে বিস্মিত হলাম। সেই সঙ্গে আনন্দিতও। মিসেস হেলম্যানের দুই ছেলেরই আছে হিন্দি-ভাষণে পটুত্ব।

বড় ছেলের নাম মাইকেল। উত্তীর্ণ কৈশোর থেকে অনাগত যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে তার অবস্থান। পরের ভাই ফ্রেডারিক এক বছরের ছোট। ইন্দিরার সঙ্গে ওদের বয়সের ব্যবধান প্রায় বছর দশেকের। ইন্দিরা হেলম্যান দম্পতির বেশী বয়সের সন্তান।

মিসেস হেলম্যান তাঁর ব্যাগ খুললেন। ছেলেমেয়েরা চারপাশে ঘিরে ধরল তাঁকে।

একটি চকোলেটের বাক্স মেয়ের দিকে পরম স্নেহে এগিয়ে দিলেন মিসেস হেলম্যান। ছেলেদের বললেন, তোমাদের জন্যে এই এনেছি একটি করে. বলে তাদের দুজনের দিকে এগিয়ে দিলেন দুটি সিগারেট প্যাকেট।

ওরা খুশী হল।

মাইকেল আর ফ্রেডারিকের মধ্যে মানসিকতার দিক থেকে বিরাট পার্থক্য—সেই সঙ্গে চেহারার দিক থেকেও।

মাইকেল মননধর্মে একটু সিরিয়াস। তার চিন্তা, সাহিত্য, দর্শন ও সমাজনীতির নানা শাখায় প্রধাবিত। উপরন্তু মাইকেল আকৃতিতে একটু কৃশ।

মাইকেল বলছিল: দিল্লী থেকে চলে এসেছি মাত্র দু' বছর। অথচ চোখের সামনে ভাসছে শৈশব-স্মৃতি। আচ্ছা, আগ্রায় দয়ালবাগের সেই মন্দিরটি কি শেষ হয়েছে? দিল্লীর আসফ আলি রোডে তখনও কনস্ট্রাকশন চলছিল এখনও শেষ হল কি-না কে জানে?

ফারুকি বলল: দেশ বিভাগের আগে আমার বাড়ি ছিল দিল্লীতে দরিয়াগঞ্জে।

মাইকেল শুনে উল্লসিত হল।

আমরা থাকতাম আসফ আলি রোডে।

আচ্ছা, শুনেছি ড্যাডি চিঠি লিখেছে যমুনা নাকি সরে গেছে অনেকখানি।

ভারতবর্ষ কেমন লেগেছে তোমার?

অত্যন্ত সুন্দর লেগেছে। আমার তো খুব ইচ্ছা আবার ফিরে যাই। আমরা দু' ভাই হরিদ্বারে গিয়ে একমাস ছিলাম; স্বামী—এর আশ্রমে। ড্যাডির খেয়াল হল আমাদের ইয়োগা শিখতে পাঠাবেন। আমরা গিয়েছিলাম।

মাইকেল এখনও ছাত্র, তার শেলফে অরবিন্দের গীতা, নেহরুর আত্মচরিত।

ফ্রেডারিক সম্পর্কে মিসেস হেলম্যান খুব গর্বিত। ফ্রেডারিক একটি কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস। সে উপার্জনক্ষম। মিসেস হেলম্যান হয়ত মনে করেন সে শুধু কথাও জোটায় না অন্নও জোটায়।

ফ্রেডারিক বলল: তোমাকে আমার তোলা ছবি দেখাই।

কয়েকটি অ্যালবাম বার করল ফ্রেডারিক। ভারতে তোলা অনেক ছবি—জার্মানীতে তোলা সাম্প্রতিক কালের কিছু।

অসংখ্য তরুণীর ছবি বার করল ফ্রেডারিক। বিভিন্ন ভঙ্গীতে; একাকিনী, দ্বৈত অথবা গ্রুপে। কেউ নৃত্যের বিশেষ ভঙ্গিমায় ফ্রেডারিকের কণ্ঠলগ্না, কেউ বা চুম্বনরতা, কেউ বাহুলগ্না। বহু ছবি পিকনিক কিংবা কোন সমবেত পার্টির। মিসেস হেলম্যান আড়চোখে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন: ফ্রেডরিকের আবার ইয়ং লেডিদের ওপর বিশেষ অনুরাগ। পুত্রকে জনান্তিকে বললেন: তোর গার্লের ছবিটা ওঁদের দেখিয়েছিস?

ফ্রেডারিক একটু সলজ্জ মুখ করে একটি বিশেষ খাম বার করল। তাতে আরও অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে একটি তরুণীর কিছু ছবি।

ফারুকি বলল: কোন ইণ্ডিয়ান গার্লের ছবি নেই?

মাইকেল বলল: তাও আছে। ফ্রেডারিক শীলার ছবিটা দেখা।

ফ্রেডারিক ভারতীয় নারী বলে যার ছবি দেখাল তার পরনে স্কার্ট, মাথায় ববড্ চুল, ভ্রু-যুগলে সুনিপুণ পেন্সিলের টান।

শুনলাম এঁর নামই শীলা নাইডু। এঁর পিতা ভারত সরকারের একজন দু'হাজারী মনসবদার।

ফারুকি জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা, ফ্রেডারিক কোন ইণ্ডিয়ান গার্লকে বিয়ে করে নিয়ে এলে না কেন?

ফ্রেডারিক জবাব দিল: কেন, জার্মানীতে কি মেয়ের অভাব?

প্রাচীন ভারতে গৃহসজ্জার আবশ্যকীয় উপকরণ ছিল বীণা। আধুনিক ইওরোপে সে উপকরণ হল টেলিভিশন। গৃহিণী ছাড়াও গৃহ হয় কিন্তু টেলিভিশন ছাড়া গৃহ?

বৃটিশদের অত্যধিক টেলিভিশন প্রীতি সম্পর্কে ঠাট্টা করে কে একজন বলেছেন, সারা পৃথিবী বৃটিশদের দেখছে, কিন্তু বৃটিশরা দেখছে খালি টেলিভিশন।

জার্মানী সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। কিন্তু মিসেস হেলম্যান বললেন: তাদের টেলিভিশন নেই। তার কারণ তাঁরা পছন্দ করেন না। তবে তাঁদের বড় রেডিওগ্রাম আর টেপ রেকর্ডার আছে। আছে রেফ্রিজেটর। আর এই বাড়িটি যদিও তাঁদের নিজের নয় তবু সুদৃশ্য কার্পেট, সোফা ও মনোরম ওয়াল পেপারে তা মুদ্রিত।

আমাদের নৈশ আড্ডা চলেছিল রজনীর মধ্যযাম পর্যন্ত। আগামীকাল বন থেকে চলে যাব ফ্রাঙ্কফুর্ট। সেখান থেকে বিকেলে প্লেন ধরব জুরিখের। ফ্রাঙ্কফুর্টে শুধু একবার যাব গ্যেটের জন্মস্থান দর্শনে। তারপরে বিদায় জার্মানী। ভিটাজেন।

অনেক রাত্রিতে রাইন পার হলাম খেয়ায়। দূরে উজ্জ্বল কয়েক ঝাঁক জোনাকির মত বন শহরের আলোগুলি জ্বলছে।

মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ। আজ রাস পূর্ণিমা। তার প্রতিবিম্ব রাইনের কাকচক্ষু জলে। মনে পড়ে গেল হাজার হাজার মাইল দূরে আমার গ্রামেও এমন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তার প্রতিবিম্ব শীর্ণতোয়া গ্রাম্যনদীর বুকে।

মনে পড়ে গেল দীর্ঘদিন আমি দেশ ছেড়েছি।

মহাজ্ঞানী সক্রেতিশ বলেছেন: একটি পর্বত, একটি সমুদ্র ও একটিমাত্র নদী দেখলেই না কি সব কিছু দেখা হয়ে যায়।

সক্রেতিশের এই বক্তব্য একদিক থেকে অভ্রান্ত। প্রকৃতির যেটি ভৌগোলিক রূপ সেটি আপাতদৃষ্টিতে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্। হিমালয়ের সঙ্গে আল্পসের যা পার্থক্য তা শুধু দৈর্ঘ্যের। গঙ্গার সঙ্গে ভলগার, কিংবা টেমসের সঙ্গে যমুনার যে তফাৎ সেটিও শুধু গভীরতার।

কিন্তু বাহির হতে অমন করে দেখলে কোন বস্তুর পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার অন্তর স্বরূপকে জানা যায় না। সেখানে প্রতিটি একই বস্তু বটে, কিন্তু সব বস্তুর যোগফল এক নয়। গঙ্গা আর ভলগা, ভৈরব আর মিসিসিপিতে হয়ত একই জোয়ার-ভাঁটার নিত্য খেলা, কিন্তু গঙ্গার জলকল্লোলে যে সংগীত আর ভলগার প্রবাহে যে কলতান কান পাতলে শোনা যাবে তা ভিন্ন।

সুইজারল্যাণ্ডকে তাই আমার নতুন লাগল। নস্ত লাভার্নের এই হ্রদের পাশে বরফের মুকুটপরা পর্বতমালাকে আমি তো আগেই দেখেছি। দেখেছি স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডে—স্কগল উপত্যকায়, ইংলণ্ডের লেক ডিষ্ট্রীক্টে, ভারতবর্ষের কাশ্মীরে। কিন্তু কাশ্মীর দেখে সুইজারল্যাণ্ড দেখার তৃপ্তি অনুভব করবে শুধু মূর্খ, স্কটিশ হাইল্যাণ্ড দেখে সুইজারল্যাণ্ডের গ্রিণ্ডেলওয়াল্ড দর্শনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করবে শুধু কৃপণ ও দরিদ্ররা।

জুরিখে পৌঁছে আর যাই হোক হোটেলের জন্য বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় না। কলকাতার প্রতিটি রাস্তায় যেমন আছে একটি করে কোচিং ক্লাশ, প্যারিসের প্রতি পাড়ায় যেমন একটি করে কাফে, সুইজারল্যাণ্ডের প্রতি পাড়ায় তেমনি একটি করে হোটেল।

শিবময় কাশীর মত হোটেলময় জুরিখ। শোনা যায় ষাট লক্ষ মানুষের দেশ সুইজারল্যাণ্ডে হোটেলের সংখ্যা প্রায় আট হাজার। প্রায় দু' লক্ষ অতিথির জন্যে সেখানে ঢালাও ব্যবস্থা।

অতএব জুরিখ সিটি টার্মিনালে আসতেই হোটেলের সন্ধান পাওয়া গেল। কাউণ্টারে বড় বড় করে লেখা: হোটেল অ্যাকমোডেশন। হোটেল চাই জানাতেই কাউণ্টারে বসা সুইস তরুণী শুধোলেন: ও এই কথা। তা কি ধরণের হোটেল চান বলুন। দৈনিক দশ ফ্রাঁ থেকে ষাট ফ্রাঁ পর্যন্ত নানা ধরণের হোটেলের ঠিকানা আছে আমার কাছে।

দৈনিক পনের ফ্রাঁর যে হোটেলটিতে আশ্রয় নিলাম, তার কৌলীন্য না থাক স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি নেই। বেসিনে গরম জলের ট্যাপ আছে, নিচের অফিসে ইংরাজী জানা কর্মচারী আছে, একজন ট্যুরিস্টের পক্ষে এর চেয়ে আর কি দরকার?

ইওরোপে এসে দেখেছি এদেশের মেয়েরা হাসতে জানে। বিশেষ করে বয়সে যারা তরুণী তাদের কাজল মাখা মোহিনীদৃষ্টির সঙ্গে আর যে বস্তুটি জড়িয়ে থাকে সেটি হল মিষ্টি হাসি। দোকানে

যে মেয়েটি আপনার হাতে জিনিসের প্যাকেট তুলে দেবে, সে সেই সঙ্গে আরও কিছু দেবে—দেবে মিষ্টি হাসি। কাউন্টিং মেশিনের সামনে যে মেয়েটি দাম নিয়ে বলবে থ্যাঙ্ক, সেও একটু হাসবে। রেষ্টুরেন্টে আপনার টেবিলে কফির ট্রেটি নামিয়ে রেখে পরিচারিকা মেয়েটি একটু হেসে বলবে : আপনাকে আর কিছু দেব মঁশিয়ে?

তাই আমার হোটেলের মেয়েটিকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম : টোবলার ষ্ট্রাশেটা কোন দিকে? তখন সে একটু হেসে জুরিখ শহরের একটি ম্যাপ বার করল। তারপর পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে দেখিয়ে দিল।

দু' চারটি কথায় প্রাথমিক পরিচয় পর্ব যখন সমাধা হল, তখন সে বলল: টোবলার ষ্ট্রাশের নিশানা নিয়ে কি করবে? জু-গার্ডেনে যেতে চাও তো?

বললাম : মাদামওয়াজেল, ওখানে যে একটা জু-গার্ডেন আছে তা এই প্রথম তোমার মুখে শুনছি; আমি ওখানে যেতে চাই এক দেশোয়ালী ভাইয়ের খোঁজে।

হোটেল বালিকা আবার ম্যাকলিনসের বিজ্ঞাপনের মত একটু হাসল এবং ভ্রূধনু ভঙ্গ করে বলল : ইন্টারেষ্টিং। তা তাঁদের কি করা হয়?

: মিষ্টার আর মিসেস নন্দী। মিষ্টার নন্দী ইঞ্জিনীয়র। ইংলণ্ডে আলাপ। বাড়ি ফেরার পথে মাসখানেক ধরে ওরা জুরিখে আছেন।

হোটেল বালিকা বলল : আমাদের এই জুরিখ শহরটি এত ছোট যে, ঘণ্টাখানেক ঘুরলেই সব দেখা হয়ে যায়। এই জন্যে তো আমাদের লোকসান। শহর জুরিখে কোন ট্যুরিস্ট তিনদিনের বেশী থাকতে চায় না। লণ্ডন দেখতে গেলে পুরো তিন মাস লাগবে, প্যারি দেখতে ছ'মাস, রোম দেখতে হলে বছরখানেক তো লাগবেই। কিন্তু আমাদের এই জুরিখ। ওদিকে জুরিখবার্গ এদিকে বার্নবাসেল, শহরের ল্যাজা থেকে মুড়ো একঘণ্টার মধ্যে হেঁটে ফিরে আসতে পারি।

আমি পরম দার্শনিকের মত জবাব দিলাম : মাদাম যে শুধু জুরিখকে জানে সে জুরিখের কতটা জানল?

অনেক সময় আমাদের সচেতন মনের অগোচরে অবচেতন মন কথা বলে ওঠে। নাটকে তার নামই বোধ হয় ড্রামাটিক আয়রণি। মূর্খ হঠাৎ বিজ্ঞের মত কথা বলে, পাপীর মুখে হঠাৎ ধর্মের কথা শোনা যায়। আপাতদৃষ্টিতে তাকে পরিহাস বলে মনে হলেও, বিশ্লেষণে ধরা পড়ে তত্ত্বকথা হলেও সে সত্য।

সোনেনবার্গ পাহাড়ের চূড়ায় বসে জুরিখ শহরের দিকে তাকিয়ে সকালের কথাই ভাবছিলাম। যে সুইজারল্যাণ্ডকে দেখল, জুরিখকেই শুধ দেখল সে জুরিখের কতটুকু দেখল।

আমিও তো আজ জুরিখের পথে পথে সারাদিন ছিলাম পদাতিক।

আমি তো দেখেছি ভানফষ্ট্রাসের সুসজ্জিত বিপণিগুলি, দেখেছি কংগ্রেস হল আলপেনকোয়াই, দেখেছি বেলভ্যুর আর্ট গ্যালারি, রেমিষ্ট্রাসের বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। জুরিখ হ্রদের জলে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ দেখেছি নয়ন ভরে।

কিন্তু তবু জুরিখকে যে দেখল সে জুরিখের কতটুকু দেখল?

সুইজারল্যাণ্ড যুগে যুগে পৃথিবীর প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে তার যৌবনকুঞ্জে। তারা তার যৌবনের সমুদ্রে ঢেউ খেয়েছে, ঘট ভরেছে, সব শেষে নিয়েছে বিদায়।

কিন্তু পেয়েছে কি তার অন্তরের পরিচয়?

সাতশ' বছর ধরে যে-দেশে গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পৃথিবীর সামনে অমলিন সংবিধানের আদর্শ উপস্থাপিত করেছে সেই দেশের অন্তরের সন্ধান নিতে আসে ক'জন? কে খোঁজ রাখে এই ভুবনমোহিনী দেশের মানুষের প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রামের কি মহান উত্তরাধিকার রেখে গেছে পরবর্তী মানুষদের জন্যে?

ট্যুরিস্টেরা জানে কোথায় তুষারকিরীটা আল্পসের ওপরে মনোরম সানাটশবান. কোথায় গ্রিণ্ডেল ওয়াল্ড যেখানে বরফে-ঢাকা পাহাড়ের রঙের সঙ্গে গা মেলান চমরি গাইয়েরা চরে বেড়ায়। কোথায় পিলাটুসবাহন যেখানে পাইন গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ইলেক্ট্রিক ট্রেন চলে গেছে রূপকথার দেশে।

কিন্তু কেউ জানে না সুইস লেখক জেরামিয়াস গোটেলফকে, জানে না গোটফ্রিড কেলার বা কার্ল স্পিটেলারকে। আলেকজাণ্ডার ভিলেটের নামও সকলের অজানা, অথচ রুশোর পর অত বড় চিন্তানায়ক আর মধ্য-ইউরোপে জন্মগ্রহণ করেন নি। শিল্পী আন্তোনিও ডোকাপোবটা ও ফ্রান্সেস্কো বোরোমিনির নাম শুনে অনেকে বলবেন : নাম দু'টো শুনেছি শুনেছি বোধ হচ্ছে। ইতালিয়ান শিল্পী। কিন্তু না—স্যর লয়েড জর্জ যেমন ইংরাজ নন, হাক্সলে যেমন আমেরিকান নন, ওঁরাও তেমনি ইতালিয়ান নন—সুইস।

অনেক সময় আমার মনে হয়েছে ভাষাগত সমতার জন্যে তিনটি শক্তিশালী দেশ সুইজারল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। এই দেশ তিনটি হল : জার্মান, ফ্রান্স আর ইতালি।

সুইজারল্যাণ্ডের ভাষা হল সংখ্যায় চার। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান আর রোমান।

তার মধ্যে সংখ্যাধিক্য জার্মানের। প্রতি হাজারে সাতশ' একুশ জন বলে জার্মান; দু'শ তিন জনের মুখে শোনা যায়

জার্মানীতে বসন্ত

ফরাসী ভাষা। ইতালিয়ানভাষীর সংখ্যা খুব কম, সংখ্যায় মাত্র হাজার করা উনষাট। আর কুড়িয়ে বাড়িয়ে দশ জন রোমান।

বরিশালের বাংলার সঙ্গে মেদিনীপুরের বাংলার যেমন উচ্চারণের তফাৎ তেমনি বনের জার্মানের সঙ্গে বার্ণ-এর জার্মানের উচ্চারণে প্রভূত ফারাক তেমনি প্যারিসের লোককে বেগ পেতে হবে জেনেভার লোকের কথা বুঝতে। যদিও ভাষাটা ফরাসী।

কিন্তু যখন লেখা হয় তখন সব একাকার করে। বন থেকে ভিয়েনা সব একই ষ্টাইল, একই লিপি। ফ্রাঙ্কফুর্ট ছাপা বই জুরিখের লোকে পড়ে। জুরিখের লোকের লেখা বই হামবুর্গে বিক্রি হয়।

কিন্তু সবই এসে জমা হয় জার্মান সাহিত্যের ক্রেডিটে। আর বিদেশে জার্মান, ফ্রান্স আর ইতালিয়ান ভাষার অর্থই হল, জার্মানী, ফ্রান্স আর ইতালি।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিমিদের বড় শত্রু তিমিঙ্গিল।

পূর্ব পাকিস্তানে মাঝে মাঝে যে গেল গেল রব ওঠে, আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতি ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে। সুইজারল্যাণ্ডের অবস্থা দেখে মনে হয় আশঙ্কাটা অমূলক নয়।

টোবলার ষ্ট্রাসের সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন জনপথ কলকাতায় আমার চোখে পড়েনি। যাঁরা সিমলায় গেছেন, ছোট সিমলার স্নিগ্ধ রাজপথটি তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সেই রাজপথ যদি সমতল হত, তাহলে তাকে স্বচ্ছন্দে এই পথটির সঙ্গে তুলনা করতে পারতাম

আগে থেকেই ফোন করা ছিল। বেল টিপতেই যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনি মিসেস নন্দী।

নারীদেহ বর্ণনায় কালিদাস কিংবা জয়দেব কেন আধুনিক বাঙালী লেখকদের মতও আমার শক্তি নেই। বিশেষ করে পরস্ত্রীর রূপ বর্ণনা যে দেশে শাস্ত্রমতে গুণাহ।

তবু বলব, মিসেস নন্দী পরদার হলেও তাঁকে মাতৃবৎ ভাবার আগে যে কোন যুবক কিছুক্ষণ বিব্রত বোধ করবেন। কারণ সংসারের রঙ্গমঞ্চে এই বাঙালী মহিলাকে মায়ের পাঠ কোনদিনই মানায় না।

এই বিশ্ব মিউজিয়মের শিল্পী ভাল করেই জানেন: ম্যাডোনা আর মনালিসাকে কখনই এক এক করে ভাবা যায় না।

মিসেস নন্দী কার্টসি শিখেছেন কলকাতার ডায়াসিসনে। আমাকে দেখে তিনি অকৃপণ ভাবে হাসলেন। তাঁর ফর্সা গালে মুক্তার বিন্দুর মত টোল পড়ল। বললেন: তাহলে শেষ পর্যন্ত এলেন?

বললাম: পুরুষদের সব কিছুতেই সন্দেহ করা মেয়েদের ধর্ম। এমন কি আমার সশরীর উপস্থিতিটা পর্যন্ত আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মিসেস নন্দী একটু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন: বানিয়ে বানিয়ে এত কথা বলতে পারেন!

মিসেস নন্দী তারপর বললেন: আমি রান্না চড়িয়ে দিয়ে আসছি। আপনি একটু বসুন। আপনি কিন্তু খেয়ে যাবেন এখান থেকে। তারপর অনেক গল্প করা যাবে।

বললাম: মিষ্টার নন্দী কোথায়?

: একটু মার্কেটিং-এ গেছে। আপনি আসছেন ও জানে। এসে পড়ল বলে।

বললাম: পাঞ্চালীই তাহলে এখন দ্রৌপদী হয়েছেন। রান্নার লোক এখানেও পেলেন না বুঝি।

কথাটার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম খোঁচা ছিল। লণ্ডনে আমার যেদিন নন্দী-দম্পতির সঙ্গে আলাপ হয় সেদিন ওঁদের প্রবাসে তৃতীয় দিন। কলম্বো প্ল্যানে তিন মাসের জন্য এসেছেন। ওঁদের ইচ্ছা হোটেলে না থেকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকবেন।

কিন্তু নন্দী-দম্পতি মুশকিলে পড়েছিলেন রান্নার কথা চিন্তা করে। নন্দী-দম্পতি কলকাতার যে পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁরা ডিভিশন অব লেবরে গভীরভাবে বিশ্বাসী। যাঁরা কেশ চর্চা করবেন, মহিলা সমিতি করবেন ও সর্বোপরি সংস্কৃতির চর্চা করবেন নিয়মিত রন্ধনের মণিহার আর যাই হোক তাঁদের সাজে না। আর যেখানে তিরিশটা টাকা ফেললেই একটি পাচক কিনতে পাওয়া যায় সেখানে বধূর পাকশালায় প্রবেশ ঘটে নিতান্তই দুর্বিপাকে পড়ে। কিন্তু মুশকিল হল লণ্ডনে এসে। এখানে মনুষ্যত্বের যেমন দাম মানুষেরও তেমন দাম। নন্দী-দম্পতি শুনে অবাক হলেন, রুজ লিপষ্টিক মেখে সন্ধ্যাবেলা স্বামীকে বগলদাবা করে যে মহিলারা সান্ধ্যভ্রমণে বার হন, তাঁরাও সাত পাকে বাঁধা পড়ার আগে পাকপ্রণালীটা রপ্ত করে নেন। মিসেস নন্দী সভয়ে দেখলেন: একজন মেড রাখতে গেলে তাঁর স্বামীর স্কলারশীপের অর্ধেক টাকাই যাবে চলে।

দু'একজন কৌতূহলী হয়ে মি: নন্দীকে বলেছিলেন: মেড খুঁজছেন? মিসেস অসুস্থ বুঝি?

প্রশ্নটি বলাবাহুল্য মি: নন্দীকে লজ্জা দিয়েছিল।

মিসেস নন্দী বললেন: আমি খুব ভাল রাঁধতে শিখেছি জানেন। এখন তো রেগুলারই রাঁধি।

বললাম: হিজ হাইনেস আগা খাঁ একবার কি বলেছিলেন জানেন? রূপের ছটায় ও কথার ঘটায় মুগ্ধ হয়ে কোন তরুণীকে বিবাহ করা উচিত নয়। দেখতে হবে তাঁর মধ্যে রন্ধন-কলায় পটুত্ব আছে কি-না।

মিসেস নন্দী হেসে বললেন: হিজ হাইনেস ঠিক কথাই বলেছেন।

মিষ্টার নন্দী এলে আমরা তিনজন এক টেবিলে আহারে বসলাম। মিসেস নন্দী আয়োজন নেহাৎ কম করেন নি।

খাওয়া শেষ হতে মিষ্টার নন্দী একখানা বই দিলেন এগিয়ে। বললেন: বইটা পড়েছেন?

সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সম্বলিত একখানা বই। Collective Security in Swiss Experience। লেখকের নামটা পরিচিত। উইলিয়াম ই র‍্যাপাড। ভদ্রলোক এই শতকের গোড়ার দিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ছিলেন। পরে হয়েছিলেন জেনেভার ইনষ্টিট্যুট অব ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজের ডাইরেক্টর।

মিষ্টার নন্দী বললেন: বইটিতে সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক

ইতিহাসটি সুন্দরভাবে লেখা আছে। বইটি পড়তে পড়তে ভাবছিলাম মাত্র বাট লক্ষ লোকের এই ছোট দেশ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে।

বললাম: কি আশ্চর্য মিঃ নন্দী। গতকাল আমি এই কথাই বসে বসে ভাবছিলাম।

মিসেস নন্দী ও ঘর থেকে এসে স্বামীকে ধমক দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে এতদিন পরে দেখা হল। অন্য গল্পটল্প কর না। ইতিহাসের কচকচি। সেই যে গান আছে না—চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পীরিতি ফাঁদ।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম: না, না, আমার ভাল লাগছে আলোচনা। আপনি বলুন মিষ্টার নন্দী।

আধুনিক যুগে সিদ্ধান্ত করতে গেলে ভাবনা শুধু একমুখী রাখলেই চলে না। স্পেশালাইজেশনের কুফল হল মনীষার মেকানাইজেশন। তাই সত্যিকারের মনীষীরা বড় দাঁতের ডাক্তার হয়েও সফল কৃষিমন্ত্রী হন; নামকরা কেমিষ্ট হয়েও তার চেয়েও নামকরা সাহিত্যিক হন। বিখ্যাত বেহালাবাদক ক্রিজ ক্রাইসলার তাই শব্দতত্ত্ব নিয়ে অবসর সময় মাথা ঘামান; আণব-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের সাংখ্যদর্শনেও নাকি গভীর অনুরাগ। শোয়াইৎসার শুধু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ডক্টর নন, দর্শন ও মিউজিকেরও তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভে ধন্য।

মিঃ নন্দী রুড়কীর সেরা ছাত্র হয়ে অবসর সময় সাহিত্য পাঠ করেন। তাঁর গীটার বাজনা আমি শুনেছি। আকাশবাণীর অনেক শিল্পীর চেয়ে অনেক ভাল হাত তাঁর।

মিঃ নন্দী বললেন: ভারতের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক গঠনের অনেকখানি মিল আছে। এখানে একদিন ছিল ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান।

: কি ভাবে এক হল সে রাষ্ট্রগুলি?

মিঃ নন্দী বললেন: সে কথাই বলছি। সে অনেক আগের কথা। ত্রয়োদশ শতক। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যে তখন ভরা জোয়ার। সেই সময় হাউস অব হাপসবুর্গের সাম্রাজ্য-লিপ্সার হাত থেকে বাঁচার জন্য আলপাইন উপত্যকার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ না হয়ে পারল না। ১২৯১ সালের আগষ্ট মাসে লেক লার্জার্ণের ধারে প্রথম তিনটি রাষ্ট্র এগিয়ে এল। ইউরি, সুইজ আর আণ্টারওয়াল্ডেন। তিন রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা বললেন: আমাদের কোন রাষ্ট্রের কোন অংশের গায়ে যদি আঁচড় লাগে, তাহলে আমরা সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

যৌথ নিরাপত্তার যে কথা আমরা প্রায়ই শুনি এ যুগে, ভাবলে অবাক হতে হয় তার জন্ম এই সুইজারল্যাণ্ডে এবং এ ভাবেই।

একে একে আরও রাষ্ট্র এগিয়ে এল। গঠিত হল শক্তিশালী কনফেডারেশন। কিন্তু নেপোলিয়ন এসে একদিন সব চুরমার করে দিলেন। কনফেডারেশনকে ভেঙে তিনি করলেন হেলভেটিক রিপাবলিক। কিছু অংশ জুড়ে নিলেন ফ্রান্সের সঙ্গে। নেপোলিয়নের পতনের পর কিন্তু মুমূর্ষু রিপাবলিককে আর বাঁচান গেল না। কনফেডারেশন স্বাধীন হল।

নতুন সুইজারল্যাণ্ডের গোড়াপত্তন কিন্তু আরও পরে ১৮৪৮ সালে। এই বছরই হল সুইজারল্যাণ্ড সত্যিকারের একক রাষ্ট্র। তারও প্রায় একশ বছর পরে ১৯৪৩ সালের ২৭শে মার্চ পাশ হয়েছিল কমিয়্যুন বিল, গণতন্ত্রের পথে প্রধান পদক্ষেপ।

বললাম: তারপরের ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কিছুটা জানা আছে। এই কমিয়্যুনই হল আমাদের দেশের পঞ্চায়েতের মত। বিশ বছর বয়স হয়েছে এমন প্রতিটি নাগরিকই তার সভ্য।

মিঃ নন্দী বললেন: কমিয়্যুনগুলো মিলেই ক্যাণ্টন। মোট উনিশটি বড় আর ছ'টি ছোট ক্যাণ্টন আছে সুইজারল্যাণ্ডে। জানেন কি কয়েকটা এমন ক্যাণ্টনও আছে যেখানে কোন আইন পাশ করাতে গেলে তা ক্যাণ্টনের সমস্ত নাগরিকের সম্মিলিত সভায় উপস্থিত করতে হবে। অন্য ক্যাণ্টনগুলোতে অবশ্য তা নয়—সেখানে বলবৎ আছে রেফারেণ্ডাম। আইনসভা যদি জনস্বার্থ বিরোধী আইন পাশ করে তাহলে জনসাধারণ দাবি করতে পারে সে সম্পর্কে গণভোটের।

আমাদের কথোপকথন সুরু হতেই মিসেস নন্দী ঈষৎ কুপিত হয়ে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। এবার চায়ের ট্রে হাতে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটল। মিসেস নন্দী টিপয়ের ওপর ট্রে-টা নামাতে নামাতে একটু কটাক্ষ হেনে প্রশ্ন করলেন: কি আলোচনাটা থামল কেন?

মিঃ নন্দী এবার বললেন: এবার আলোচনার প্রসঙ্গটা পাল্টাব ভাবছি। শ্রেফ উলের প্যাটার্ণ, বাজার দর আর সিনেমার চিত্র-তারকাদের নতুন খবর হবে আমাদের আলোচনার বিষয়।

মিসেস নন্দী কথা বললেন না। তাঁর রোষারক্তিম নেত্রে যে মৌন অভিযোগ ফুটে উঠল, তার অর্থ করলে এই দাঁড়ায়:

'এতেক সহিল অবলা বলে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।'

মিসেস নন্দী বললেন: ক'দিন আছেন জুরিখে?

বললাম: আর মাত্র একদিন। পরশুদিন আমি সিট রিজার্ভ করেছি। গন্তব্যস্থল জেনেভা।

মিসেস নন্দী বললেন: আমরা আরও কিছুদিন আছি।

ওর কি কাজ আছে। আর মাসখানেক থাকলে বড় ভাল হত। বরফ পড়ত। সুইজারল্যাণ্ডে বরফ এক রমণীয় দৃশ্য।
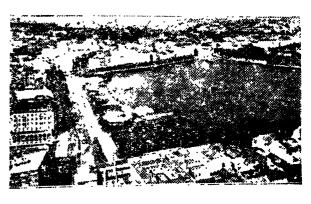
মিঃ নন্দী বললেন: কিন্তু সরকার যে, আমাকে ছেড়ে

হামবুর্গ। আকাশ থেকে

তৌলিগেপনের টিম ম্যানেজার করে পাঠায় নি এটা তোমাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না।

মিসেস নন্দী সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন : মিঃ চ্যাটার্জী আপনি লাজার্ণে গেছেন ?

বললাম : না। আগামী কাল যাবার ইচ্ছা আছে।

উনি বললেন : তাহলে ভালই হবে। কাল রবিবার। আমরাও যাব লাজার্ণ। চলুন এক সাথে যাওয়া যাবে।

বেলভ্যুর অপেরা হাউসের সামনে থেকে কোচ-ট্যুর ছাড়ে। মিষ্টার আর মিসেস নন্দী সময় দিয়েছিলেন ত্বপুর ছ'টো।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম বারোটা নাগাদ। হোটেল-বালিকা তেমনই মধুর হেসে বলল : লাজার্ণে চলেছ বুঝি। উইশ ইয়ু ! গুড লাক।

বাহনহোফ ষ্ট্রাসে ধরে এগিয়ে চললাম ব্যুকলি প্লাৎসের দিকে। প্লাৎসের সামনে ত্রিভুজের মত লেক জুরিখ, ট্যুরিস্টের দল বুকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে ম্যাপ, বুকে ঝোলান ক্যামেরা, চোখে গগলস, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ, আইনজীবী, চিকিৎসক ও শিক্ষকদের মতন ট্যুরিস্টদেরও পোষাক নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সময় খটকা লাগে। এই লোকটাকেই না দেখেছি ল্যুভরের চত্বরে, ট্রাফালগার স্কোয়ারের সামনে ? পর মুহূর্তে ভুল ভাঙে। না একই লোক নয়। একই পোশাক পরা বটে, একই লোক নয়।

ভ্রমণবিলাসীদের কাছে সুইজারল্যাণ্ড হল মক্কা। প্রতি বছর ইওরোপ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝেঁটিয়ে আসে সুইজারল্যাণ্ডে। সিজনের তিনমাস ইংলণ্ড থেকে প্রতিদিন ট্যুরিস্ট বাস ছাড়ে। গন্তব্যস্থল সুইজারল্যাণ্ড। বিবাহের আগে প্রিয়াকে নিয়ে ছুটি কাটাতে যাবেন, আসুন সুইজারল্যাণ্ড। বিবাহের পর মধুযামিনী যাপনের স্থান খুঁজছেন, আসুন সুইজারল্যাণ্ডে। বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য কোন নিরালা জায়গায় ঘর বাঁধতে চান, এদিক থেকে সুইজারল্যাণ্ডই সারা ইওরোপের যোগ্য স্থান।

লাঞ্চের জন্য ঢুকলাম রেষ্টরেন্টে।

টেবিলের ওপাশে বসে এক যুবক। যুবকটি যে ইংরাজ নয় তার প্রমাণ পেতে দেরী হল না তার আলাপচারিতার ধরণ দেখে।

: স্পাখেন জি ডইচ ?

উত্তরে ঘাড় নাড়লাম।

: পার্ল্যেবু ফ্রাঁসে ?

: এবারেও সেই একই নেতিবাচক উত্তর।

এবার যুবকটি এমন ভাব প্রকাশ করল : যার অর্থ জার্মান বা ফ্রেঞ্চ জান না তাতে কি আছে। এতে এই ছুই ভাষা বা পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না।

একটি চুরুট বার করে আমার দিকে ধরল যুবকটি।

: বিদেশী মানুষ, নতুন আলাপ হল। চুরুটটা খাও।

আমি ব্রাহ্মণ হলেও যে প্রতিগ্রহ করি না, তা ঠিক নয়। বরং বিনামূল্যে বিষ পেলেও তা পান করতে পারি কিন্তু এই বিদেশে অপরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে চুরুট গ্রহণ করাটায় সন্দেহ-ভাজন মনটা আপত্তি জানিয়ে উঠল।

দেশলাই জেলে নিজের চুরুটটি ধরাল যুবকটি। পরে জলন্ত কাঠিটা এদিকে এগিয়ে দিতেই তা গ্রহণ না করে উপায় রইল না।

না কিছুই হল না। ছদ্মবেশী তুর্বৃত্তেরা নিরীহ পথিকদের এভাবে সংজ্ঞাহীন করার যে রোমহর্ষক বিবরণ বইতে পড়েছিলুম, তেমন কিছুই হল না। শুধু অনভ্যাসের জন্য মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করতে লাগল।

অজ্ঞান হলাম না দেখে আমার সাহস বেড়ে গেল, ম্যাপটা বার করে ওকে ইংগিতে বোঝালাম আমাকে অপেরা হাউসের পথটি দেখিয়ে দেবে ?

সেই অপরিচিত যুবকটি সেদিন আমাকে থিয়েটার ষ্ট্রাসে পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর একদিনের ঘটনার কথা মনে আছে। যুগোস্লাভিয়ায় এক ভদ্রলোককে সহযাত্রী পেয়েছিলাম দীর্ঘ ট্রেন পথের। আমরা কেউ কারুর ভাষা জানতাম না। অথচ আমাদের মাঝে সখ্যতা হতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি।

কেন জানি না সেদিন এই কথাই মনে হয়েছিল বার বার : ভাষা যদি না আবিষ্কৃত হত, সমস্ত মানুষ যদি মূকই থেকে যেত আমাদের পূর্বপুরুষের মত, তাহলেও মানব সভ্যতার ইতিহাস এমন কোন বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত না।

পরণে কালো রঙের স্ল্যাকস, গায়ে ফুলহাতা উলের জ্যাকেট আর চোখে প্রমাণ সাইজের কালো গগলস পরা মিসেস নন্দীকে আমি দূর থেকে চিনতে পারি নি। চিনলাম মিষ্টার নন্দীকে দেখে। ভদ্রলোক দূর থেকে আমাকে দেখেই সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন।

মিসেস নন্দী বললেন : আর একটু হলেই বাস ফেল করতেন। তাহলে কিন্তু বেশ হত।

আমি বললাম : আমি তো আপনাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভাগ্যিস মিষ্টার নন্দী দেখতে পেলেন। আপনি যদি কালকে বলতেন আজ আপনার রূপসজ্জায় এমন বিবর্তন ঘটবে, তাহলে হয়ত সহজেই চিনে নিতে পারতাম।

মিসেস নন্দী প্রশ্ন করলেন : কেন খুব খারাপ দেখাচ্ছে কি ?

আমি বললাম : মিসেস নন্দী, বল্কল পরিহিতা শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্ত কি মন্তব্য করেছিলেন জানেন তো ? 'ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।' এই তন্বী বল্কলে আরও মনোরম। গড়ন যার সুন্দর তার কি-না আভরণ ? ·

মিঃ নন্দী কাছেই ছিলেন। বললেন : আগেরটুকু কি সৌজন্যের খাতিরে বাদ দিয়ে গেলেন ? সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং, মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।

পিছনে শেওলা লেপা থাকলে পদ্মও সুন্দর, চাঁদের কলঙ্ক ময়লা হলেও তা তার রূপ বাড়িয়ে দেয়।

মিসেস নন্দী স্বামীকে বললেন : জানি, আমাকে তুমি পুরোপুরি কিছুতেই ভাল বলতে চাও না।

মিঃ নন্দী জবাবে বললেন : একমাত্র অঙ্ক ছাড়া আর কোন সাবজেক্টেই ফুল মার্ক পাওয়া যায় না।

আমাদের বাস ছাড়ল এবার। গাইড মহিলা মাইক্রোফোনটি মুখে দিয়ে পর পর চারটি ভাষায় বক্তৃতার তুবড়ি ছোটালেন। ভদ্রমহোদয়গণ। আমাদের ড্রাইভার মধ্য ইওরোপের সেরা ড্রাইভার আর আমি বলায় গিয়ে তামাম ইওরোপের সেরা গাইড। আমরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই লাজার্নে পৌঁছে যাব।

জুরিখ থেকে লাজার্নের এই পথটি বড় মনোরম। শেলী থাকলে নিশ্চয়ই আর একখণ্ড ওয়েস্টেল লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ এই পথে এলে আমরা আর একখণ্ড ছিন্নপত্রের রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতাম না।

মিসেস নন্দী বললেন: এই পথে এই একমাসে আমরা আরও বার কয়েক এসেছি। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে পথ। পাশ দিয়ে রেল লাইন। দূরে সব পাহাড়ের চূড়োগুলো বরফে ঢাকা। এই দেখুন ওই ফার্গাছটার ওপরে দু'টো পাখি বসে আছে। ওটা কি পাখি বলুন তো—রোবিন না ম্যাগপাই?

মাঝে সুইস ফার্ম চোখে পড়ে। ভিক্টোরিয়া মিউজিয়মের কনেষ্টবলের সেই ল্যাণ্ডস্কেপটির মত—কটেজ ইন এ কর্ণফিল্ড।

দু'পাশে অর্চার্ড। তার মাঝে কাঠের বেড়ার দরজা। খামারের মাঝে একটা—ইংরাজী ক্যাপিটাল 'এ' অক্ষরের মত ফার্ম হাউস। তার সামনে লোমশ মেরিনো মেষের পাল চরছে উপত্যকায়। ড্রিল আর রোলার হাতে করে ক্ষেত থেকে ফিরছে কেউ কেউ।

মি: নন্দী বললেন: কি দেখছেন?

বললাম: মনে হচ্ছে আমার সামনের প্রকৃতিটা কনেষ্টবলের আঁকা কতগুলি ল্যাণ্ডস্কেপ।

মি: নন্দী বললেন: অথচ শুনলে আশ্চর্য হবেন এই প্রকৃতি বাইরের রূপে এত মনোহর বলেই বোধ হয় অন্তর সম্পদে নিঃস্ব। পনের হাজার বর্গমাইলের মধ্যে তিন হাজার মাইল জমিতেই চাষ হয় না। এই দেখছেন মনোমোহিনীরূপ, মাইলের পর মাইল খুঁড়েন সামান্য একটু কয়লাও পাবেন না—অন্য দামী জিনিসের কথা বাদই দিলাম। তবে সামান্য একটু লোহার খনি আছে আর কিছু লবণের খনি। কিন্তু একটা জাতির অর্থনীতির কাছে তা কতটুকু?

বললাম: তবু সুইজারল্যাণ্ডের তো রূপ আছে। সে বন্ধ্যা হতে পারে কিন্তু দরিদ্র নয়।

মি: নন্দী বললেন: সে-কথা ঠিক। ঐ রূপ দেখিয়েই দেশের যা কিছু আয়। আর ছোটখাট ব্যবসা থেকে। সুইজারল্যাণ্ডের ট্যুরিস্ট ব্যবসায়ে যে আয় তা তার ঘড়ির ব্যবসার আয়ের কাছাকাছি। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলি মিষ্টার চ্যাটার্জী। পয়সা এদের হাতে আসে সহজে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জনের কথা এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু কোনদিন যদি ট্যুরিস্টেরা আসা বন্ধ করে দেয় সেদিন কিন্তু গোটা জাতি সর্বনাশের মুখে পড়বে।

বললাম: নিশ্চয়ই সেদিন বিলম্বিত।

বাস যখন এসে থামল লাজার্নে তখন সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পড়েছে সামনের তুষারধবল পর্বত চূড়ায়। হ্রদের জলে তার প্রতিবিম্ব।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার মত বিরতি। যাত্রীরা নেমে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারের ভেতর দিয়ে জোড়া জোড়া দৃষ্টি এখন হ্রদের দিকে।

মি: নন্দী বললেন: আপনি ওকে নিয়ে ঘুরে আসুন। ছোট্ট শহর লাজার্ন। হেলভেটোরিয়াম আছে একটু দূরে। বিরাট পাহাড়ের বুকে প্রস্তরীভূত আহত সিংহ। আপনারা দেখে আসুন। আমি ততক্ষণ এই বেঞ্চে বসে একটু ধূমপান করে নিই।

মিসেস নন্দী আমার গাইড এবং গার্জিয়ান হলেন। বললেন: সময় বেশী হাতে নেই। নয়ত আপনাকে দেখিয়ে আনতাম লাজার্নের বিখ্যাত ক্যাটারিং কলেজ। দেশ-বিদেশ থেকে এখানে ছাত্ররা পাক-প্রণালী আর হোটেল পরিচালনা শিখতে আসে।

বললাম: তাহলে তো আপনার আগে গিয়ে এই কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত।

কথাটার মধ্যে গতকালের আলোচনার জের ছিল।

মিসেস নন্দী বললেন: আপনার বয়স তো অনেক কম, এত চোখা চোখা কথা শিখলেন কোথা থেকে?

বললাম: মিসেস নন্দী, জ্ঞান-বৃদ্ধদের বাইরে থেকে বালখিল্য বলেই মনে হয়।

লেকের ধার ঘেঁসে কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসেছি অপর প্রান্তে। এ দিকটা নির্জন। শুধু হ্রদের জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যায়। একটি বড় পাথরের ওপর আমরা বসলাম।

মিসেস নন্দী বললেন: একটা কথার জবাব দিতে পারেন? ভাল লাগার কি রঙ বদলায়?

নির্জন প্রকৃতির বিশালতার মাঝে দাঁড়িয়ে অনেকের নাকি জন্মান্তর সৌহৃদ্যের কথা মনে পড়ে। কোন মুখর কবি বান নীরব হয়ে, কারুর বা মূক মন মুখর হয়ে শত ধারায় ঝরে পড়ে। মনের সঙ্গে কথা বলেন কেউ, তাঁদের অস্বাভাবিক আচরণের অনেক নীরব সাক্ষী আমাকে হতে হয়েছে। শুনেছি দার্শনিক স্পিনোজা নির্জন প্রকৃতির মাঝে একটি অরেঞ্জ গাছের পাতা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠে একবার নাকি বলেছিলেন: বল, কি বলতে চাও ডিয়ার?

মিসেস নন্দীর কথা শুনে তাই আশ্চর্য হলাম না। এই মুহূর্তে এই রূপবতী যুবতীর কোন অস্বাভাবিক আচরণেই আমার আশ্চর্য হওয়া সাজে না।

বললাম: এ কথা কেন বলছেন?

মিসেস নন্দী জলের দিকে তাকিয়ে বললেন: কথাটা প্রায়ই আমার মনে হয়। আমার আজকের ভাল লাগা যদি দেখি কয়েক বছর পরেও সমান রয়েছে, তাহলে কি বুঝব না আমার মনের গতি একই জায়গায় থেমে গেছে। আমার মন একটা জড় পদার্থ।

বললাম: কিন্তু শাশ্বত ভাল লাগা বলেও তো একটা জিনিস আছে। কবিরা যার নাম দিয়েছেন প্রেম।

মিসেস নন্দী বললেন: আসলে বোধ হয় আমরা কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসি নিজেকে। নিজের সৃষ্টিকে। গ্রীক পুরাণের পিগম্যালিয়ন আর গালাশিয়ার গল্প জানেন তো? শিল্পী পিগম্যালিয়ন নিজের রচিত নারীমূর্তি গালাশিয়ার প্রেমে পড়েছিল। দেবী আফ্রিদিতির বরে পিগম্যালিয়নের আকুল আহ্বান সার্থক হয়েছিল। গালাশিয়া প্রাণ পেয়েছিল। পিগম্যালিয়নের এই

ভালবাসায় সবাই কি প্লাতোনিয়ার ওপর চলতে চান ? এ ভালবাসা তার নিজের স্ত্রীর ওপর, এক কথায় নিজের ওপর ?

বললাম : মিসেস নন্দী আপনারা কি ভালবেসে বিয়ে করেছেন ?

বেশ বুঝলাম উনি অপ্রস্তুত হলেন। এভাবে সরাসরি আলোচনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তবু কথা যখন উঠলই ; সুন্দর মিসেস নন্দী নিজেকে সামলিয়ে নিলেন।

বললেন : হ্যাঁ ! আমাদের আলাপ অনেক দিনের। নন্দীর মা আমার বাবার বাল্যবন্ধু। আমাদের মেলামেশা ছোটবেলা থেকেই। নন্দী আমাকে ওর নিজের মত করে তৈরি করেছে। আমি যেন সেই গ্যালাটিয়া ও সেই শিল্পী পিগম্যালিয়ন।

মিসেস নন্দী আর একটি কথাও বললেন না। বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা যখন অসহনীয় হয়ে উঠল তখন ওঁকে বললাম ; চলুন আমাদের ফেরা যাক।

দেখলাম নীরবে মিসেস নন্দী উঠলেন। এগিয়ে চললেম ধীরে ধীরে।

লেক লাকার্ণের দিকে তাকিয়ে তখনও একমনে বসেছিলেন মিঃ নন্দী। আকাশে চাঁদ উঠেছে। আলো-আঁধারে আলো-অন্ধকারে পিছন থেকে মিঃ নন্দীকে একজন বৃদ্ধের মত দেখাচ্ছে। আমরা যে পিছনে দাঁড়িয়েছি তা তিনি খেয়ালই করেন নি। শুনলাম তিনি গুন্ গুন্ করে গান ধরেছেন :

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে।
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে।

সারা পথ মিসেস নন্দী আর কথা বললেন না। বুঝলাম লজ্জিত হয়েছেন। অতর্কিত মুহূর্তে অর্ধ পরিচিত এক পুরুষকে যে কথা বলেছেন, তার জন্য এখন তাঁর অনুশোচনার অন্ত নেই।

কিন্তু ভালবাসায় যদি ফাঁকি থাকে তাহলে সে কার ভালবাসায় ? মিঃ নন্দীর না মিসেস নন্দীর নিজের ? বিবাহের তিন বছর পরে মিসেস নন্দী কি নতুন করে আত্মানুসন্ধান করছেন ? মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। একজন মহিলার দুর্বলতার খবরে আমার প্রথম থেকেই কৌতূহলী না হওয়া উচিত ছিল।

[আগামীবারে সমাপ্য।

বিরহিণী

শ্রীমতী যূথিকা ঘোষ

বেদনার ফুলদলে গাঁথি এ মণিহার,
তোমারে হারায়ে, প্রিয়, খুঁজি বারবার।
আমার ভুবনে তোমার মঞ্জুল অভিসার,
সে কী মিছে স্বপ্ন, শুধু কী স্মৃতিভার ?
অশ্রু সায়রে ভেসে যাই,
কোথা যাই ? ঠাঁই নাই।
নয়নের আলো মোর নিভে এল
আমার নিখিল নিকষ ঘন কালো।
আমার ব্যথার পরশ লেগেছে গোলাপে,
সন্ধ্যার আকাশে আর বাতাসের বিলাপে।
চলেই যদি যাবে চল-চঞ্চল চরণে
এত মায়া কেন তুমি ছড়ালে অকারণে ?
হে রাজেশ,
তোমার আসনখানি পাতা আছে
প্রিয় পরিজনের মরমের মাঝে ?
তোমার পূজা লাগি অর্ঘ্যডালি সাজাই,
মম মন্দিরে এস ফিরে, বাজিছে সানাই।
আমার গানের সুর ভেসে চলুক বিশ্বজগময়
তোমার বিদেহী আত্মা যেথা নিত্য আনন্দময়।
স্বর্গের সুধারসে পূর্ণ ক্ষণিকের এ লীলাভিনয়
নিমেষে ফুরালো কখন নানাবর্ণ গন্ধময়।

সার্থকতা

রমেন চৌধুরী

মনে করো
এই ফাল্গুনী জ্যোছনায়
এই যে আমরা দু'জনায়
নিরজনে রচিনু বাসর,
হৃদয়ের কাছাকাছি
তুমি আছো আমি আছি
ঢেউ হয়ে আসে প্রেম
বালু-বেলা 'পর !
মধু বাতাসে মনের কথা জড়ানো
গানে গানে চারিদিক ভরানো
স্বপনের মধুময় ছবিটি
জাগরণে হোলো যে অমর।

সব সঁপিবার রাত্রি আজি গো
এরে ভুলো না,
বাহুর মালায় নিই বাঁধি গো—
এরে খুলো না।
বিফল না হবে এই লগ্ন
দোঁহে অনাবিল সুখ-মগ্ন,
কামনার চঞ্চল পাখিটি
এতোদিনে পেল তার ঘর॥
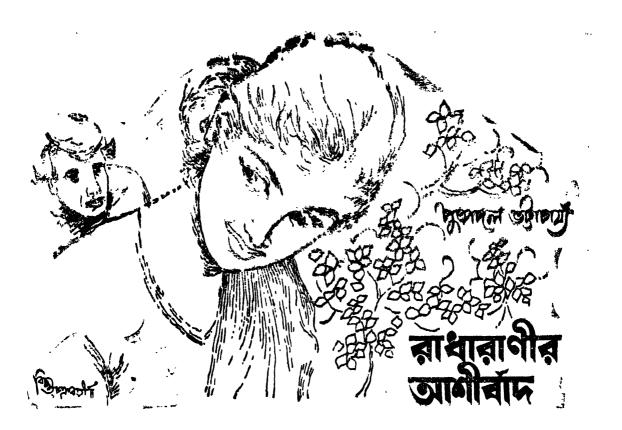
যতটা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়ে বেশী সুন্দরী হয়েছে সমীরের বউ। সে কথা বলে তাকে অভিনন্দন জানাতেই অনিল বলল—'একেই বলে পাতা চাপা কপাল। এক ঢিলেই রূপসী রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব।'

অনিলকে সমর্থন করলাম, 'সত্যিই সমীর, রূপে গুণে লক্ষ্মী লাভই হয়েছে তোর।'

সমীর হেসে বলল, 'শুনেছি সেকালে দেবতারা সাগর-মন্থন করে লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন। আমাকেও লক্ষ্মী লাভ করতে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। কিংবা বলতে পারি সেকালের রাজাদের মতন যুদ্ধ করে রমণীরত্ন লাভ করেছি।'

'যুদ্ধ? তার মানে এ বিয়েতে তোর মা, বাবার মত ছিল না বুঝি?'—অনিল জানতে চাইল।

'ঠিক তার উলটো। মা তো প্রথম দর্শনেই উমার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বাবাও তাঁর উমামাকে পুত্রবধূ রূপে ঘরে আনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন।'

'তোর শ্বশুর বাড়ির আপত্তি?'

'না রে তাও না। আমার শালক প্রবর জয়ন্তের সাহায্য না পেলে তো এ যুদ্ধে আমার পরাজয় অনিবার্যই ছিল। আমি তো সব দেখে শুনে উমাকে বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

'তবে কার সঙ্গে যুদ্ধ করলি খুলে বল না? প্রতিপক্ষের সঙ্গে ডুয়েল?'

'ডুয়েল কিংবা কোন রকম অস্ত্র যুদ্ধ নয় হে। আমাদের ছিল বুদ্ধির লড়াই। তাও দুই জাঁহাবাজ ছদ্মবেশী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর বিরুদ্ধে।'

এই সময়ে জয়ন্ত ঘরে আসতেই সমীর তাকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে আমার মন্ত্রীবর এসেছেন। সমস্ত কাহিনী আমার চেয়ে ইনিই তোমাদের ভালো করে শোনাতে পারবেন। জানই তো জয়ন্ত একজন উদীয়মান সাহিত্যিক।'

জয়ন্ত হেসে বলল, 'আর তুমি ততক্ষণ কি করবে হে?'

'সুধা পান।' বলে চোখটিপে হেসে সমীর সরে পড়ল।

'বিয়ে হতে না হতেই ছোকরা দারুণ বেহায়া হয়ে পড়েছে।' হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে জয়ন্ত বলল।

আমরা ততক্ষণে তাকে ঘিরে ধরেছি, 'কি ব্যাপার জয়ন্ত? কাদের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই করলি তোরা? কি হয়েছিল?' আমরা আট দশটি বন্ধু সমস্বরে জানতে চাইলাম।

'তোদের খাওয়া হয়েছে?' জয়ন্ত ফরাসের উপর গা এলিয়ে শুয়ে জানতে চাইল। 'না হয়ে থাকে তো খেয়ে আয়। কারণ সমীরের বিয়ের গল্প শুনতে গেলে আজ আর বাড়ি ফিরতে পারবি না কেউ। এখুনি দশটা বাজে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এদিকের শেষ বাসটাও চলে যাবে।'

জয়ন্তর দেখাদেখি আমরাও ফরাসে গা ঢেলে দিয়ে জানালাম খাওয়া আমাদের হয়েছে এবং বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্ন এসে একরাত্রি বাড়ি না ফিরলে বাড়ির লোকেরা কেউই কিছু ভাববে না। যদি দরকার হয় তো না হয় পদব্রজেই বাড়ি ফেরা যাবে।

মনে মনে ঘটনাক্রম গুছিয়ে নিয়ে জয়ন্ত গল্প আরম্ভ করল:

'জান বোধ হয়, উমা আমারই মামাতো বোন। মামার একমাত্র সন্তান উমা। তাই তাকে ছেলের মতই উচ্চশিক্ষা দেবার ইচ্ছা ছিল মামার। কিন্তু উমা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল যে বছর,

একটা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সেই বছরই বাবা স্বর্গে গেলেন। মামীমা দিল্লীর বাস তুলে দিয়ে একটা ছোট তীর্থস্থানে বাস করতে লাগলেন। ঐ শহরে মেয়েদের তো নয়ই, ছেলেদেরও কলেজ ছিল না। কাজেই উমার কলেজে পড়ার ইচ্ছা পূর্ণ হোল না।

উমা কিন্তু দমল না। আমার সাহায্যে আই-এর সব বই আর নোটস্ সংগ্রহ করে প্রাইভেটে আই-এ পড়তে আরম্ভ করল। আমি ছুটি পেলেই উমাদের কাছে ছুটে যেতাম উমার পড়ায় সাহায্য করতে। মামীমা মেয়েদের বেশী লেখাপড়া পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমার উপর তাঁর জোর খাটত না। তাই উমার লেখাপড়া বন্ধ হল না।

উমা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। আই-এতে সে অঙ্ক নিয়েছিল। আর সব বিষয়ে পারলেও অঙ্কে আমি উমাকে সাহায্য করতে পারলাম না। তাই এক ছুটিতে উমাদের বাড়ি যাবার সময়ে সমীরকে সঙ্গে নিলাম। সপ্তাহ খানেকের ছুটিতে সমীর উমাকে অঙ্কে অনেকখানি এগিয়ে দিল। কথা রইল পরের ছুটিতে আমি যখন আসব তখন সমীর আবার আমার সঙ্গে এসে উমাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু এরপ-রই খবর পেলাম মামীমা তাঁর বসতবাটি ভাড়া দিয়ে সকন্যা কোন এক বৈষ্ণবী-মায়ের আখড়া বা আশ্রমে গিয়ে বাস

করছেন। উমার চিঠিতে জানলাম আমাদের হাত থেকে উমাকে রক্ষা করবার জন্যই তাঁর দীক্ষাদাত্রী বৈষ্ণবী-মায়ের পরামর্শে মামীমা এ কাজ করেছেন।

উমা লিখেছিল—'ছোটবেলায় বাবার কাছে স্বামীজী ও সিষ্টার নিবেদিতার গল্প শুনে ইচ্ছা করত আমিও ঐ রকম আশ্রমবাসী হয়ে দেশসেবা করব। তাই মা যখন এখানে এসে বাস করতে চাইলেন তখন আমি আপত্তি করি নি। কিন্তু জয়ন্তদা' এখানে এসে আমার আদর্শে একটা প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। এই কি আশ্রম জীবন? সারাদিন কেবল খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা আর বৈষ্ণবী-মায়ের সেবা করা? বৈষ্ণবী-মা ছাড়া কোন ঠাকুর দেবতাই আশ্রমে পূজা পান না। কারণ বৈষ্ণবী-মা নাকি স্বয়ং রাধারাণী। কাজেই তাঁর পূজাতেই রাধাকৃষ্ণের পূজা হয়।

এখানের আরো এমন সব কাণ্ডকারখানা আছে যা দেখলে রীতিমত ভয় করে। কিন্তু আমার মা সে সব দেখেও দেখেন না। আমার মনে হয় বৈষ্ণবী-মা 'হিপনোটাইজ' করতে পারেন। তাই ওঁর চোখের দিকে কিছুক্ষণ চাইলেই মনের ভেতর কেমন যেন অবশ হয়ে আসতে থাকে। উনি নিশ্চয় মাকে 'হিপনোটাইজ' করেছেন। দোহাই জয়ন্তদা', তুমি আমাকে এই আশ্রম থেকে উদ্ধার কর।'

উমার চিঠি মাকে দেখাতে মা বললেন, 'ভাবনার কথা হল যে। বৌদিকে তো জানি, দারুণ একগুঁয়ে স্বভাব। তেমনি ওর ধর্মের গোঁড়ামি। দাদা বেঁচে থাকতেই গুরুদীক্ষা নেবার জন্য পাগল হয়েছিল। কিন্তু দাদা দীক্ষা নিতে রাজী হন নি। বলতেন: এমনিতেই তোমার গোঁড়ামি আর শুচিবাইয়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। এর উপর গুরুমন্ত্র নিলে সারা বাড়ী গোবর গোলায় ডুবিয়ে রাখবে।—বৌদি ধর্মের কাছে স্বামী ছেলেমেয়ের সুখদুঃখও তুচ্ছ মনে করে। মেয়েটার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে যে জয়ন্ত।'

বললাম, 'উমাকে আশ্রম থেকে উদ্ধারের একটা উপায় করতেই হবে।'

মা বললেন, 'সামনের মাসে যদি তোর বিয়েটা ঠিক হয়ে যায় তাহলে বৌদিকে আমাদের বাড়ি আসবার জন্য জোর করতে পারব।'

মা আমার বিয়ের খবর দিয়ে মামীমাকে যে চিঠি দিলেন তার উত্তরে মামীমা যা লিখলেন তাতে বুঝলাম বিয়ে, পৈতা ইত্যাদি উপলক্ষে তিনি আশ্রম ছেড়ে নড়তে রাজী নন। তাই সমীরের পরামর্শ মতন আমাদের উকীল রমেশবাবুকে ধরলাম। তিনি আমার সম্পত্তিরও দেখাশোনা করতেন। মামাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল কলকাতার কাছেই একটা গ্রামে। কিছুদিন থেকে মামীমা ঐ বাড়িটা বিক্রীর চেষ্টা করছিলেন। তাই রমেশবাবু আমাদের পরামর্শ মতন মামীমাকে লিখলেন যে, কলিকাতায় তাঁর আর উমার উপস্থিতি ভিন্ন ঐ বাড়ি বিক্রী করা সম্ভব নয়।

যতই ধার্মিক হোন মামীমা কিংবা তাঁর বৈষ্ণবী-মা, কেউই অর্থসম্বন্ধে নিস্পৃহ ছিলেন না। কাজেই আমার বিবাহের ছাপা নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে মামীমা উমাসহ কলকাতায় এলেন।

আমার বিবাহ উপলক্ষে সমীর আর তার বাবা মাও ঐ সময়ে আমাদের বাড়িতে ক'দিন বাস করছিলেন। অঙ্কের ফরমূলা শেখাতে গিয়ে কখন যে সমীর উমার কাছ থেকে প্রেমের ফরমূলা শিখে বসেছিল তা জানতাম না। এবার আত্মীয় কুটুম্বের ভিড়ের মধ্যেও ওদের ফরমূলার আদান-প্রদান আরো ভালোভাবেই চলতে লাগল।

ছেলের মনোভাব বুঝে একদিন সমীরের মা মামীমার কাছে উমাকে পুত্রবধূরূপে পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সমীরের বাবাও স্ত্রীর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। আমরা ভেবেছিলাম বিনা পণে এমন ঘরে-বরে মেয়ের বিয়ে দিতে পেরে মামীমা খুশী হবেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন শুনলাম মামীমা নিস্পৃহ সুরে বললেন, 'বৈষ্ণবী-মায়ের ইচ্ছা নয় যে উমার বিয়ে হয়। তিনি উমাকে নিজের কুমারী সহচরী হিসাবে গ্রহণ করেছেন।' মামীমার মতে বিয়ে করার চেয়ে বৈষ্ণবী-মায়ের কুমারী সখী হয়ে থাকলে উমার জীবন ধন্য হবে। আর সেই সঙ্গে মামীমার মাতৃকুল আর শ্বশুরকুলও স্বর্গলাভ করবে।

কোনো মা যে তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এরকম ব্যবস্থা করতে পারেন তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার মা বললেন, 'মেয়ে তোমার একার নয় যে তার জীবন নিয়ে তুমি যা খুশী তাই করবে। আমিও মেয়ের পিসী। আমিই লিখব তোমার

বৈষ্ণবীমাকে উমার বিয়ের কথা। অমন ঘর-বরের কথা শুনলে তিনি কখনই এ বিয়েতে অমত করবেন না।'

'বেশ, তাই দেখ।' বলে মামীমা রাগ করেই ঘর থেকে চলে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে উমা বলল—'পিসীমার চিঠির যা উত্তর আসবে, তা আমি জানি। বৃথা চেষ্টা তোমাদের।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর কি মনে হয় বৈষ্ণবী-মা তোর বিয়েতে মত দেবেন না?'

'না। কারণ তাহলে বাবার সম্পত্তি আশ্রমের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তা ছাড়া সুশ্রী অল্পবয়সী তরুণীদের বৈষ্ণবী-মা সহজে আশ্রমের বাইরে যেতে দেন না। তারা 'মাকে' ঘিরে থাকে বলেই অনেক ধনী পুরুষ সর্বদা তাঁকে দর্শন করতে আসে আর প্রচুর দর্শনী দিয়ে যায়।'

আমার স্ত্রী বললেন, 'বল কি ঠাকুরঝি, এ যে রীতিমত ব্যবসা।'

উমা তখন নীরব হয়েই রইল। কিন্তু পরে নির্জনে আমার স্ত্রীকে বলেছিল, 'শুধু রূপ দেখিয়েই ক্ষান্ত হলে তো অনেক ভালো ছিল বৌদি। কিন্তু বৈষ্ণবী-মায়ের ব্যবসায় বুদ্ধির অন্ত নেই। যে সব মেয়েদের মা-বাপ কিংবা আত্মীয়-স্বজন নেই, তাদের আবার রাত্রে আশ্রমের বনে লীলাভিসারে যোগ দিতে পাঠান।'

'মেয়েরা যায় কেন?'

'না গেলে যে অত্যাচারের শেষ থাকে না। প্রথম প্রথম অনাহার, তারপর আশ্রম থেকে বহিষ্কারের ভয় দেখান, এরপরেও যদি মেয়েটি অভিসারে যেতে আপত্তি করে, তাহলে আছে বৈষ্ণবীমায়ের সর্বনেশে আদর।'

'আদর?' আমার স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

'হাঁ, বৌদি, বড় সর্বনেশে আদর। কুসুম নামে একটি পরমা-সুন্দরী বালবিধবা তার শ্বশুরবাড়ির সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আশ্রমে এসে বৈষ্ণবী-মায়ের মন্ত্রশিষ্যা হয়। সে আসবার পরেই এক কোটিপতি মারোয়াড়ী বৈষ্ণবী-মায়ের দর্শনে এসে তাঁর অনুগত ভক্ত হয়ে পড়ল। কিছুদিন পরে শুনলাম, সে কুসুমকে বিধবা-বিয়ে করতে চায়। বৈষ্ণবী-মা কুসুমকে সে প্রস্তাব জানাতে সে দারুণ ঘৃণার সঙ্গে ঐ বিবাহে অসম্মতি জানাল আর সেই সঙ্গে এও বলল ঐ বিষয়ে তাকে আর কিছু বললে সে নিজের শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে।

কুসুমকে হাতছাড়া করলে যে কেবল তার সম্পত্তি আশ্রমের বাইরে চলে যাবে তাই নয়, হয় তো কুসুমের রূপমুগ্ধ ভক্তরাও আশ্রমে সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে। এই সব ভেবে বৈষ্ণবী-মা কুসুমকে বললেন—'তোমার কথা শুনে বড় সুখী হলাম। এই তো সতীলক্ষ্মীর মত কথা। আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম। তোমার কৃষ্ণে মতি দেখে খুশী হয়েছি কুসুম। আজ রাত্রে তুমি আমার

নিজে পুজার ঘরে একলা থেকো। আমি তোমাকে তোমার ইষ্টদর্শন করিয়ে দেব।

তখনও আমি আসল ব্যাপার জানতাম না। দেখলাম বৈষ্ণবী-মায়ের কথা শুনে কয়েকটি ভক্ত-মেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এই মেয়ে ক'টির স্বভাব-চরিত্র আমার কখনই ভালো লাগত না। তাই তাদের হাসি দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। কুসুমকে এক সুযোগে ঐ সন্দেহের কথা বললাম আমি।

সে বলল—'দেখি না, কি হয়। যদি অন্যায় কিছু করতে বাধ্য করেন, তাহলে চেঁচিয়ে আশ্রমসুদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে তুলব।'

পরদিন অনেক বেলায় কুসুম যখন পুজার ঘর থেকে বেরুল তখন তার চোখ-মুখ বসে গেছে। কেমন যেন সর্বস্বান্তের মতন সে নিজের ঘরে চলে গেল। বৈষ্ণবী-মায়ের সঙ্গিনীরা বললেন, ইষ্ট দর্শনের ঘোর লেগেছে কুসুমের তাই ওকে অমন দেখাচ্ছ।

আমার কিন্তু তাদের কথা বিশ্বাস হল না। তাই দুপুরে যখন সবাই বিশ্রাম করছিল তখন চুপিচুপি কুসুমের ঘরে গেলাম। কুসুম সেই সবহারানো-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল তারপর আমার কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার কাছে শুনলাম কাল রাত্রে আশ্রমের বাগানে বৈষ্ণবী-মা নিজে কুসুমকে সেই মারোয়াড়ীর কাছে দিয়ে এসেছিলেন আর আজ খুব ভোরে তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন।

বললাম, 'তুমি গেলে কেন কুসুম?'

কুসুম বলল, 'আমি কি নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিলাম? রাত্রে আমি পুজার ঘরে যেতে বৈষ্ণবী-মা প্রথমে আমাকে নিজের হাতে সাজালেন। তারপর সামনে বসিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কি যেন মন্ত্র পড়লেন। আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে কেমন যেন ঘুম পেতে লাগল। তখন বৈষ্ণবী-মা আমাকে এক গেলাস প্রসাদী সরবত পান করতে দিয়ে বললেন: এটা খেয়ে আমার সঙ্গে লীলাকুঞ্জে চল; সেখানেই মদনমোহন দর্শন দেবেন তোমাকে—সরবত খাবার পর আমার আর কোন কথা বলবার কিংবা কাজ করবার ক্ষমতা রইল না। বৈষ্ণবী-মায়ের হাত ধরে তিনি যেখানে নিয়ে গেলেন সেখানেই গেলাম। তিনি বাগানের একটা অন্ধকার ঘরে কার পাশে বসিয়ে এলেন, সেখায় অন্ধকারে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। বিছানায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম। ভোরে ঘুম ভেঙে সেই মারোয়াড়ীটাকে দেখে সব বুঝলাম।'
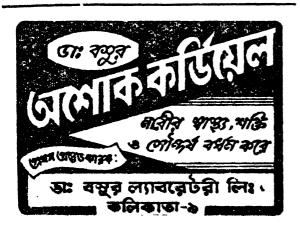
কুসুমের কাছেই শুনেছিলাম ঐ কুঞ্জে প্রতিরাত্রে বৈষ্ণবী-মায়ের কৃষ্ণও আসেন তাঁর রাধারাণীর সঙ্গে লীলা করতে। কুসুম বলল, 'উমা, তোর তো পালাবার পথ আছে। তুই পালা এই বেলা। নইলে কবে বৈষ্ণবী-মায়ের সাংঘাতিক আদরের পাল্লায় পড়ে আমার মতই মরবি।'

কুসুমের কথায় ভয় পেয়েই আমি জয়ন্তদাকে লিখেছিলাম আমাকে আশ্রম থেকে উদ্ধার করে আনতে।

জয়ন্ত বলল, রাত্রে আমার বউয়ের কাছে সব বিবরণ শুনে চিন্তিত হলাম। ভাবলাম দেখি বৈষ্ণবী-মা যদি উমার বিয়েতে মত না দেন তো তাঁর আশ্রমের এ সব কীর্তির কথা পুলিসে জানাব। যা করেই হোক উমাকে ঐ কপটাচারী বৈষ্ণবীর পাল্লা থেকে রক্ষা করব।

দিন কয়েক বাদে বৈষ্ণবী-মায়ের চিঠি এল। উমার কথাই ঠিক, তিনি উমার বিয়েতে মত দেননি। উপরন্তু তিনি যে চাল চাললেন তাতে সমীরের বাবা-মা-ও ভয় পেয়ে গেলেন। বৈষ্ণবী-মা জানিয়েছিলেন: উমার যে বিবাহ সম্বন্ধের কথা তাঁর পিসী লিখেছেন সেই সম্বন্ধ সব দিক থেকেই ভালো। কিন্তু রাধারাণীর ইচ্ছা অন্য রকম। উমার ভাগ্য গণনা করে দেখেছি সে বিবাহের রাত্রেই বিধবা হবে। তাই রাধারাণী উমাকে চিরকুমারী রাখতে চান।

উমার বৈধব্যযোগের সংবাদে সমীরের মা-বাবা ভয় পেলেন কিন্তু সমীর ঐ সংবাদে একটুও দমল না। বৈষ্ণবীমায়ের নামে একটা অনুচ্চার্য বিশেষণ প্রয়োগ করে সে বলল—'ওর ভণ্ডামী আমি ভাঙব তবে আমার নাম সমীর।'

উমা নিজেও বৈষ্ণবী-মায়ের চিঠি পড়ে ভয় পেয়েছিল—'যাই কর তোমরা, আমি আর বিয়ে করব না। কি দরকার অমন সর্বনাশ ডেকে আনবার।'

উমার ভয় ভাঙবার জন্য আমি মামীমার কাছ থেকে উমার কুষ্ঠী চাইলাম। কোন বড় জ্যোতিষীকে দেখিয়ে মেয়েদের মনের কুসংস্কার দূর করতে হবে। কুষ্ঠী পেলাম না। শুনলাম সেটিও বৈষ্ণবী-মায়ের কাছে আছে। অগত্যা উমার জন্ম-সময়ের সাহায্যে নতুন কুষ্ঠী করাব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু তার আগেই মামীমা উমাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন।

যাবার আগে আমি উমাকে একান্তে ডেকে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে দিলাম। তাকে আশ্বাস দিলাম আশ্রম থেকে মুক্ত করে এনেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও বিয়ে দেব না। সে যাতে লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হয় তারই ব্যবস্থা করব।

উমারা চলে যাবার কয়েক দিন পরে আমি আর সমীর বৈষ্ণবী-মায়ের জন্মস্থান—গ্রামে গেলাম। সেখানে সকলকে জানালাম আমরা মায়ের ভক্ত। তাঁর বাল্য লীলার কথা লিখব বলে সেই বিষয়ের নানা তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি।

গ্রামের লোকেরা কেউই কিছু বলতে চায় না। তাদের হাবভাবে মনে হল বৈষ্ণবী মায়ের প্রতি ভক্তির লেশমাত্রও নেই ওদের। কিন্তু তাঁর ভক্তদের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয়ে সবাই তাঁর

বিষয়ে কোনো আলোচনা করতে অসম্মত। নিরুপায় হয়ে ষ্টেশনে ফির'ছি, পথে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। আলাপ করে মনে হল তিনি বেশ স্পষ্টবাদী মানুষ। বৈষ্ণবী-মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন—'সেই বদ স্ত্রীলোকটির নাম কোর না আমার সামনে। বৈষ্ণবী-মা? মা হয়েছেন তিনি? এদিকে নিজের কোলের দুগ্ধপোষ্য দু'টো শিশুকে ফেলে রেখে নিজের মনের মানুষের সঙ্গে উধাও হল।

'বেচারা মাধব স্ত্রী পালানোর পর সমাজে মাথা তুলতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে ম'ল। মাধবের বোন এসে শিশু দু'টির ভার না নিলে সে দুটোও মরত।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'যে লোকটির সঙ্গে পালিয়েছিলেন তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি?'

'যাবে না কেন? বৈষ্ণবীর আশ্রমের পাশেই যে বৈষ্ণব-গুরুর আখড়া রয়েছে তার মোহান্তই হল সেই শয়তানটা। এখান থেকে যাবার পর দিন কয়েক খুব অনটনে পড়েছিল। পথে কলেরা হয়ে সঙ্গী পুরুষটা মর মর হয়ে পড়ে। তখন আখড়ার মোহান্ত ছিলেন বনমালী বাবাজী।' বক্তা করজোড়ে মাথায় হাত ঠেকিয়ে ভক্তি ভরে বললেন, 'বনমালী বাবাজী সত্যিকার সাধক ছিলেন। এদের মতন কপটাচারী নয়। তাঁর শিষ্যরাও ছিল যোগ্য ভক্ত। তা বনমালী বাবাজী দয়া করে এই দু'টো শয়তান-শয়তানীকে নিজের আখড়ায় থাকতে দিলেন। শিষ্যরা সেবা করে শয়তানটাকে কলেরা থেকে বাঁচিয়ে তুলল।

'সুস্থ হয়ে শয়তান নিজের মূর্তি ধরল! বনমালী বাবাজীর খাবারের সঙ্গে কি যেন বিষ মিশিয়ে তাঁকে স্বর্গে পাঠাল। তারপর কতকগুলো যোগ্য চেলা জুটিয়ে তাদের সাহায্যে ভয় দেখিয়ে বনমালী বাবাজীর শিষ্যদের তাড়াল। কিন্তু ঐ সং শিষ্যরা চলে যেতেই আখড়ার আয়ও কমে গেল। তখন ঐ শয়তানী তার রূপের জাল পাতল। চারদিকে রটিয়ে দিল ওর শরীরে রাধারাণীর আবির্ভাব হয়েছে। তারপর'—ভদ্রলোক আর কিছু না বলে হাতের হুঁকায় কয়েকটা টান দিলেন।

সমীর বলল, 'তারপর যে কি সেটা আমরাও আন্দাজ করতে পারি। যতদিন আমাদের দেশে অন্ধবিশ্বাসী মেয়ে-পুরুষ আছে ততদিন এ ধরণের অবতারদের পোয়া বারো।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ঠিক বলেছ বাবা। শুনেছি আজ ওদের টাকা পয়সার অভাব নেই। এদিকে দেখ ওর ছেলেমেয়ে দু'টোর কি হাল। টাকার অভাবে মেয়েটার বুড়ো বরে বিয়ে হল। ছেলেটার লেখা পড়া হল না। চটকলে কুলীগিরি করছে সে।'

ভদ্রলোক দুঃখ করে আরো অনেক কিছুই বললেন। কিন্তু আমাদের কাজ হয়ে গিয়েছিল তাই তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে এলাম। আসবার সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম বৈষ্ণবীর বিষয়ে কোন খবর যে আমরা তাঁর কাছে জেনেছি তা কারো কাছে বলব না। কারণ বৈষ্ণবীর ভক্তেরা জানলে মাথায় লাঠি মেরে সংবাদদাতাকে ভবপারে পাঠিয়ে দেবে।

হেসে বললেন—'মরবার বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু অপঘাতে মরে ঐ ভূত-প্রেতদের দল ভারি করতে পারব না বাবা!'

ট্রেনে উঠে সমীরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার কি করবি?'

'উমাদের আশ্রমে গিয়ে বৈষ্ণবীকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করব। হয় সে উমার বিয়েতে মত দিক, আর না হয় ওর সব ভণ্ডামী ভেঙ্গে দেব।'

'ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। শুনলে তো গ্রামের লোকের' বৈষ্ণবীর ভক্তদের কি রকম ভয় পায়। তা ছাড়া তোর ছুটিও তো ফুরিয়ে এল।'

'আবার ছুটি নেব। যদি না পাই তো চাকরি ছেড়ে দেব। কিন্তু যা করেই হোক উমাকে ঐ দুর্বৃত্ত দলের হাত থেকে উদ্ধার করবই।'

'কিন্তু এত কাণ্ড করে উমাকে উদ্ধার করার পর যদি তোর বাবা মা বিয়েতে মত না দেন? উমার বৈধব্যযোগের কথা শুনে ওঁরা কি রকম ভয় পেয়েছেন দেখলি তো?'

'এ বিয়েতে মত ওঁদের দিতেই হবে! কেবল আমার বাবা মা কেন, উমাকে আর উমার মাকেও বিয়েতে মত দিতে হবে।' সমীর জেদী গলায় বলল। 'কিন্তু সব কিছুর আগে সেই ভণ্ড মেয়েমানুষটিকে দিয়েই বলাতে হবে যে উমার বৈধব্য যোগটোগ ওসব মিথ্যে।'

সমীরের জেদ দেখে আনন্দ হল কিন্তু তাকে একলা বৈষ্ণবীর আশ্রমে যেতে দিতে সাহস পেলাম না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিন কয়েকের জন্য শান্ত করে রাখলাম।

উমাদের শহরে গিয়ে একটা ধর্মশালায় উঠে আমরা বৈষ্ণবীর আর তার আশ্রমের সম্বন্ধে নানারকম খোঁজ খবর নিতে লাগলাম। এই শহরে একজন পুলিস অফিসার আমার কাকার সহপাঠী বলে শুনেছিলাম। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বৈষ্ণবী-মায়ের কথা তুলতে তিনি বললেন—'পুলিসের গোপন সংবাদে জানা গেছে আশ্রমটা মেয়ে-বিক্রীর একটা আড্ডা বিশেষ। কিন্তু কোন রকমেই এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যাতে ওদের হাতে-নাতে ধরা যায়।'
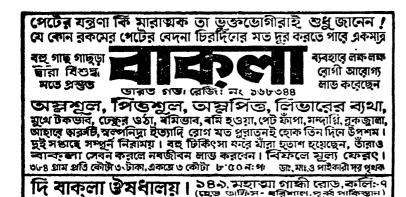
আমাদের কাছে লীলাকুঞ্জের কথা শুনে বললেন, 'আমাদেরও ঐ ধরণের সন্দেহ হয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, এ শহরের অনেক লোকের মনে একটা অন্ধবিশ্বাস আছে যে, রাত্রে ঐ কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের লীলা হয়। যদি কেউ লুকিয়ে সেই লীলা দেখতে যায় তো সে অন্ধ হয়ে যায়।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি আবার বললেন,—'ওদের কুসংস্কারের মধ্যে কিছু পরিমাণে সত্যও আছে। এখানে আসবার পথে একজন অন্ধ ভিখারীকে দেখেছ বোধ হয়। লোকটা মস্ত ভক্ত। ওর সাধ ছিল যা করেই হোক একবার রাধাকৃষ্ণকে দর্শন করব। তারপর চোখ যদি যায়ই তো না হয় যাবে। তাই অন্ধ হবার আগে, এক রাত্রে চুপিচুপি কুঞ্জের দেওয়াল টপকে ভেতরে যায়। পর মুহূর্তেই চোখ গেল, চোখ গেল বলে চিৎকার করতে করতে কুঞ্জের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে রাস্তায় চলে আসে। সেই রাত থেকেই লোকটা অন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'লোকটা সেখানে কি দেখেছে তা কিছু বলে নি কাউকে?' কৌতূহলী হয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

'না।' পুলিস অফিসার হেসে বললেন, 'বেচারার রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখা আর হয় নি।' আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলল, 'দেওয়াল টপকে ভেতরে নামতেই হঠাৎ কেমন একটা আলো এসে আমার মুখে পড়ল তারপরেই চোখে মুখে এক ধরণের জ্বালায় ছটফটিয়ে উঠলাম। আলো তখনি নিভে গেল। কিন্তু আমার চোখের জ্বালা আরো বেড়ে গেল।'

'একটু পরেই একজন এসে আমার হাত ধরে একটা দরজা খুলে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে চলে গেল। কত জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কে, তা সে একটুও সাড়া দিল না।

সমীর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা ঐ অন্ধ লোকটিকে ডাক্তার দেখান নি? আমার মনে হয়—'

সমীরকে বাধা দিয়ে পুলিস অফিসার বললেন,—'আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। ডাক্তারী রিপোর্টেও সেই সন্দেহের কথাই আছে।'

সমীর বলল, 'আমরা দু'জন আজ রাত্রে লীলাকুঞ্জে যাব ঠিক করেছি।'

আমাদের প্ল্যানের কথা শুনে পুলিস অফিসার একটু চিন্তিত হলেন। তিনি আমাদের দু'জনকে তাঁর গোপনকক্ষে নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েকটি উপদেশ দিয়ে সাবধান করে দিলেন।

গল্প থামিয়ে জয়ন্ত হঠাৎ বলল, তোদের কারো কাছে একটা সিগারেট থাকে তো দে। বকবক করে মুখ ব্যথা হয়ে গেল।

শ্রোতারা চেঁচিয়ে উঠল,—'না, না। সিগারেট পরে হবে। আগে তোমাদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী শেষ কর।'

অনিল তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট জয়ন্তর মুখে গুঁজে দিয়ে বলল—'নে, এটা শেষ করেই আবার আরম্ভ কর গল্পটা।'

বেশ আরামে কয়েকটা সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জয়ন্ত আবার আরম্ভ করল—'সেদিন গভীর রাত্রে কুঞ্জের দেওয়াল টপকে আমি আর সমীর ভেতরে নামলাম। যেমন ভেবেছিলাম, আমরা ভেতরে নামতেই একটা আলো দপ করে জ্বলে উঠে সমীরের মুখে পড়ল আর সেই সঙ্গে একটা তীব্র এসিডের স্প্রে এসে পড়ল তার মুখে। পরক্ষণেই আলোটা নিবে গেল। আমি সমীরের একটু পেছনে ছিলাম বলে ব্যাপারটা সবই স্পষ্ট দেখতে পেলাম।'

শ্রোতারা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল—'তারপর? তুমি বুঝি তখনি সমীরকে নিয়ে ডাক্তারখানায় ছুটলে?'

'না।' জয়ন্ত হাসল, 'এসিডে সমীরের কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ পুলিস অফিসারের পরামর্শে আমরা তাঁরই দেওয়া দুটো এসিড-প্রুফ মুখোস আর দস্তানা পরে গিয়েছিলাম।'

'তাই বল।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বন্ধুরা আবার আরাম করে শুয়ে পড়ল।

জয়ন্ত বলে চলল—'যেদিক থেকে আলো এসেছিল আমরা দু'জনে সেইদিকেই অগ্রসর হলাম। উমার কাছ থেকে আগেই কুঞ্জের অবস্থান ভালো করে জেনে নিয়েছিলাম। পুলিস অফিসার বলে দিয়েছিলেন আমরা যেন বিশ্রাম কুঠিগুলো এড়িয়ে চলি। যে সব বৃদ্ধভক্তেরা সেখানে রাত্রে অভিসারে যান তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ ও দারোয়ানেরা সেই ভবনটি আগলে থাকে।

আমরা চাইছিলাম কুঞ্জ থেকে আশ্রমের যে প্রবেশদ্বার আছে তা
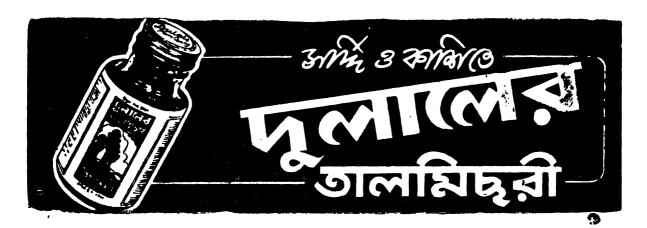
আটকাতে। এই দুয়ার দিয়েই বিপদে পড়লে বৈষ্ণবী ও তার সঙ্গিনীরা আশ্রমের ভেতর সরে পড়ে।

আগের দিন আমি উমার সঙ্গে দেখা করে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলেছিলাম, বৈষ্ণবী আর তার সখীরা রাত্রে লীলাভিসারে যাবার পর তুই ঐ সংযোগ দুয়ারগুলি বন্ধ করে দিস। আমরা যতক্ষণ না ডাকব ততক্ষণ খুলিস না। উমার কাছ থেকে ঐ সব দরজার সঠিক অবস্থানও জেনে নিয়েছিলাম। এখন সেই দরজা আগলে দাঁড়িয়ে একটা সঙ্কেত করতেই কুঞ্জের বাইরে অপেক্ষারত পুলিস দলসহ পুলিস অফিসার অনেকগুলি জোরালো টর্চ হাতে বাগানের ভেতর ঢুকে বিশ্রাম ভবন ঘিরে ফেলল।

একটু আগে আমাদের দু'জনের ব্যবহারে কুঞ্জবাসীরা সাবধান হয়েছিল! অনেকেই পালাবার চেষ্টা করছিল। অন্যরা আসছিল আমাদের ঠেঙ্গিয়ে শেষ করতে! কিন্তু আমাদের কাছে আসবার আগেই পুলিসের আক্রমণে ওরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

এই সময়ে একদল মেয়েমানুষ ছুটতে ছুটতে কুঞ্জ থেকে আশ্রমের প্রবেশ দরজার কাছে এসে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। এ ভাবে ধরা পড়েও বৈষ্ণবীর সে কি তেজ। আমাদের ধমকে বললেন—'কে তোমরা? শীগগির চলে যাও এখান থেকে। জান না এটা মেয়েদের আশ্রম। এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।'

সমীর বিদ্রূপ করল,'কেবল লীলাকুঞ্জেই বুঝি পুরুষের প্রবেশাধিকার আছে? তা আমরাও তো আশ্রমের ভিতরে যাইনি। কুঞ্জ দুয়ারে দাঁড়িয়ে রাধারাণীর লীলাভিসারই দেখছিলাম।'

বৈষ্ণবী রাগে তর্জন করে উঠলেন, 'বেয়াদব, তোমরা যাবে না পুলিস ডাকব?'

'আহা, আপনি আর কষ্ট করবেন কেন? বলেন তো আমিই তাদের বাঁশী বাজিয়ে ডাকছি এখানে।' অদম্য সমীর পুলিস 'হুইসল' বার করে দেখাল।

তার বিদ্রূপ শুনে বৈষ্ণবী থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তোমরা। পুলিসের লোক?'

'আজ্ঞে, পুলিসের সঙ্গে সামান্য আলাপ পরিচয় থাকলেও আমরা তাঁদের দলের লোক নই। আমরা আপনার বিনীত ভক্ত মাত্র। আমি সমীর, শ্রীমতি উমার পাণিপ্রার্থী। আর ইনি তাঁর দাদা জয়ন্ত।'

আশ্বস্ত হয়ে বৈষ্ণবী আমাদের এড়িয়ে আশ্রমে প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু ঠেলা দিয়ে যখন দেখলেন দুয়ার আশ্রমের ভিতর দিক থেকে বন্ধ তখন ঘুরে দাঁড়ালেন। হয়তো অন্য কোন দুয়ারে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সমীর বাধা দিয়ে বলল, 'ওদিকে গেলে বিপদে পড়বেন। সমস্ত বাগান পুলিসে ঘিরে ফেলেছে। আমরা পুলিসের লোক না হলেও, পুলিসও যে এসেছে তা আপনি ভালো করেই জানেন।'

বৈষ্ণবী ব্যস্তভাবে সামনের রুদ্ধ দুয়ারে ঠেলা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এসেছ তোমরা? আমার কাছে কি দরকার তোমাদের?'

'এসেছি শ্রীমতী উমার সঙ্গে আমার বিবাহে আপনার অনুমতি নিতে। ঐ অনুমতি যদি না দেন তো আশ্রমের দুয়ারও খুলবে না। উমাকে বলে রেখেছি আমরা আদেশ দিলে তবে দুয়ার খুলবে, নইলে নয়।'

রোষ-বিকৃত চোখে সমীরের দিকে চেয়ে বৈষ্ণবী বললেন, 'তার মানে উমাও তোমাদের সঙ্গে ষড় করেছে? আচ্ছা, একবার আশ্রমে যাই তারপর দেখব।'

সমীর অতি শান্ত সুরে বলল, 'প্রথমত আমাকে আর উমাকে বিবাহে অনুমতি দিয়ে আশীর্বাদ না করলে আপনার আশ্রমে প্রবেশের কোন সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত আশ্রমে প্রবেশের পর আপনি যদি উমার উপর কোন রকম অত্যাচার করেন কিংবা আপনার কথা না রেখে আমাদের বিবাহে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করেন তাহলে এই ফটো সমেত সব কথাই পুলিসকে জানাব। আপনাদের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ তারা সহজে সংগ্রহ করতে পারবে না সেই প্রমাণই পাবে তারা এই ফটোতে। সেই সঙ্গে আপনি কি ভাবে কুসুমকে ছলনা করে মারোয়াড়ী ভক্তের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেকথাও জানাব পুলিসকে।'

'কই, কি ফটো? দেখি।' বলে বৈষ্ণবী আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই আমার দামী ক্যামেরার ফ্লাস বাল্ব জ্বলে উঠে বৈষ্ণবীর একটি বেশ পরিষ্কার ছবি তুলে নিল।

জয়ন্ত এবার বালিস ছেড়ে উঠে বলল, 'তোরা এবার ঘুমো। আমি ও ঘরে যাই, নইলে আমার গিন্নী চটবে।'

বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল, 'না, না? তা হবে না। গল্পটার শেষটা বলে যা।' তারা জোর করে জয়ন্তকে টেনে বসাল।

'আরে কি বোকা তোরা?' জয়ন্ত অনুপায়ের ভঙ্গীতে বলল—'তারপর যে কি হল তা তো আজকের নেমন্তন্ন খেয়েই বুঝতে পারছিস।'

'তা পারছি, কিন্তু তুই গল্পের শেষটুকু না বলল ছাড়া পাবি না।'

জয়ন্ত বলল, শেষটুকু এই—দিন কয়েক পরে আমার মায়ের কাছে বৈষ্ণবীর একটা চিঠি এল। তার সঙ্গে ছিল উমার কুষ্ঠী। বৈষ্ণবী লিখেছেন প্রথমবার তিনি উমার কুষ্ঠী বিচার করতে ভুল করেছিলেন। কিন্তু তারপরেই রাধারাণী পরপর কয়েকদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানিয়েছেন যে, সমীর আর উমার মিলন তাঁর অভিপ্রেত। এ বিবাহে বাধা দেওয়া অন্যায়। ঐ স্বপ্ন দেখার পর তিনি তাঁর গুরুদেবকে দিয়ে উমার কুষ্ঠী বিচার করান। গুরুদেব বলেছেন উমার বৈধব্যযোগ নেই।

বুঝতেই পারছিস সমীরের মা বাবাও ভালো জ্যোতিষী দিয়ে বর-কনের কুষ্ঠী বিচার করিয়ে আজকের এই—মধুরেণ সমাপয়েতের আয়োজন করেছেন।

'বৈষ্ণবীকে ছেড়ে দিয়ে তোরা কিন্তু অন্যায় করেছিস।' অনিল বলল।

আমরা ছেড়ে দিলেও ধর্ম কাউকেই ছেড়ে কথা কয় না। লীলা-কুঞ্জে যে সব ধনী ভক্তরা পড়েছিলেন আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তাঁরাই বৈষ্ণবীকে ধরিয়ে দিয়েছেন। পুলিসের কাছে আশ্বাস পেয়ে আশ্রমের অনেক মেয়েও বৈষ্ণবীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে। এদিক সুযোগ বুঝে বৈষ্ণবীর কৃষ্ণ, সেই আখড়ার মোহান্তটির একান্ত বিশ্বাসী এক চেলা বনমালী বাবাজীর হস্তারক বলে মোহান্তকে ধরিয়ে দিয়েছে। আখড়ার চেলারাও বৈষ্ণবীর বিপক্ষে অনেক সাক্ষ্য দিয়েছে।

কিন্তু আর না, এবার আমি চললাম। জয়ন্ত একলাফে দরজা পার হয়ে অন্তঃপুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
Glucose
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০

কাশ্মীরে কি দেখলাম ?

শিপ্রা দত্ত
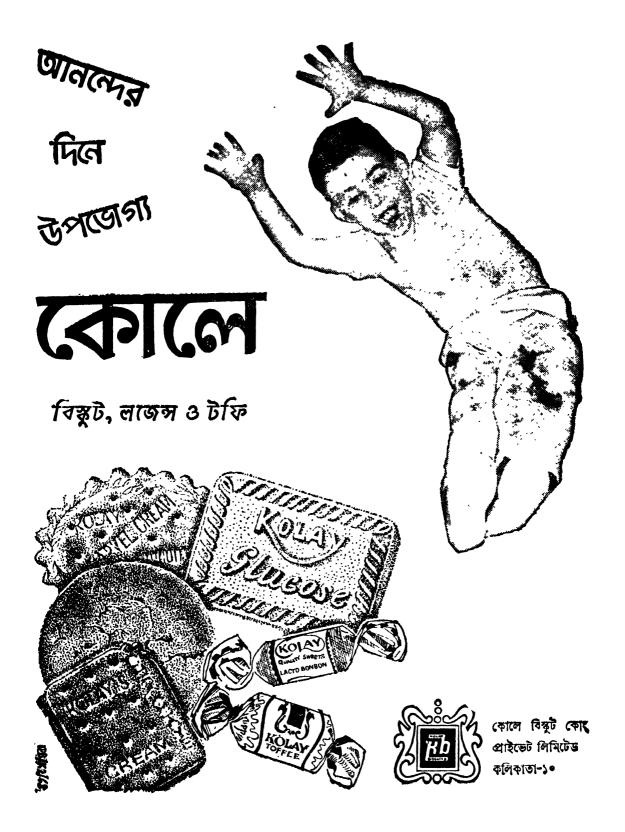
ভূস্বর্গ কাশ্মীর। বর্তমান বিশ্বের বিতর্কের বিষয়বস্তু কাশ্মীর। প্রকৃত স্বর্গ মানুষের অজ্ঞাত। কিন্তু কল্পনায় স্বর্গের যে আলেখ্য আমরা পাই—তারই প্রতিচ্ছবিরূপে দেখি কাশ্মীর। যার চারিদিকে কি এক অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি—যা সবার চোখে কি এক মোহাঞ্জন এঁকে দেয়। চুম্বকের মত সবাইকে আকর্ষণ করে। এক কথায় কাশ্মীরের রূপ-মাধুরী মদিরার নেশার মত।

আবাল্যের বাসনা প্রকৃতির লীলাভূমি ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শন। তাই অজানার উজানে ভূস্বর্গের নেশায় পাড়ি দিলাম। দিল্লী-দিল্লী বহু দেশ পর্যটন করে পাঠানকোটে এসে ট্রেণ থামলো। পাঞ্জাবের সীমান্তে এসে পা দিলাম। চারিদিকে শুধু দেখলাম মিলিটারী পিপীলিকার মত চলে বেড়াচ্ছে। মিলিটারী 'কনভয়'গুলি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে বেপরোয়া ভাবে। স্পেশাল ট্রেণে করে আসছে মিলিটারী রসদ, ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতি।

আমাদের বাস ছুটে চলেছে কাশ্মীরের প্রবেশ দ্বার জম্মুর উদ্দেশ্যে। মাইলের পর মাইল বাস ছুটেছে, মাঝে মাঝে 'পুলিশ চেক্'-এর জন্য বাস থেমে যাচ্ছে। আবার ছুটেছে নূতন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে। পাকিস্তান হ'তে কাশ্মীরের প্রবেশ পথ ঢুকবার দূরত্ব দেখলাম একস্থলে মাত্র ৪ মাইল। ফোর্টের মত দৃঢ়মুষ্টে সেই দ্বার রক্ষা করছে ভারত সেনাবাহিনী। প্রাকৃতিক দৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে দেখছি, ভারত সেনাবাহিনীর তৎপরতা—যা হয়ত আপনাদের অনেকেরই কাশ্মীর ভ্রমণকালে দর্শন ঘটেনি। যতই জম্মুর নিকটবর্তী হচ্ছি ততই বরফাচ্ছন্ন শ্বেত পর্বতমালার বিস্ময় আমাদের সব যাত্রীকেই অভিভূত করেছিল। কোথাও বা গিরিগাত্রবাহী জলপ্রপাতের ধারা, কোথাও বা ঝর্ণার ঝিরঝিরে স্রোত বয়ে চলেছে পাহাড়ের গা দিয়ে প্রস্তরখণ্ডের উপর। প্রায় দীর্ঘ সোয়া এক মাইলব্যাপী সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়ে ধীর মন্থরগতিতে বাসটা জম্মুর দিকে এগিয়ে গেল। স্থানে স্থানে এই সুড়ঙ্গর ওপর দিয়ে ঝর্ণার জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। বেলা আড়াইটার সময় পাঠানকোট হ'তে বাস যাত্রা করেছিল। রাত প্রায় সাড়ে নয়টার সময় 'বাস' জম্মুর ট্যুরিষ্টদের জন্য নির্দিষ্ট আলয়ে যেয়ে উঠল। অবশ্য এই দীর্ঘ সময় লাগবার কথা নয়। কোথাও বা 'বাস'টি বিকল হয়ে পঙ্গু হয়ে প'ড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। কোথাও বা মিলিটারী 'কনভয়'দের এগিয়ে যাবার পথ করে দিতে হচ্ছিল। কোথাও বা যাত্রীদের বৈকালিক চা-পানের জন্য থামতে হয়েছিল। এমনি নানা টুকিটাকি কারণে দীর্ঘ সময় নিয়েছে জম্মু পৌঁছাতে। বহুদূর হ'তে জম্মু নগরীর আলোকমালা দীপান্বিতা রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। আঁধারের কোলে সারি সারি আলোর মালা সত্যি দূর হ'তে অপরূপ লাগছিল।

যদিও শুনলাম পূর্বে পাঠানকোট হতে শ্রীনগরে একদিনেই যাওয়া যেতো। কিন্তু অধুনা সেনাবাহিনীর নির্দেশে রাত্রে কোন 'বাস' বা 'কার' জম্মু নগর হ'তে শ্রীনগর অভিমুখে যেতে পারবে না, একমাত্র মিলিটারী কনভয় ও ট্রাকই যেতে পারবে।

যেখানে এসে জম্মু'তে আমাদের রথ থেমেছিল সেই ট্যুরিষ্ট সেণ্টার হ'তে শুনতে হোল—

'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই। ছোটো সে তরী'

তাই আবার যাত্রা হলো শুরু। আরেকটা ট্যুরিষ্ট সেণ্টারে যাওয়া হ'ল। মুসাফিরখানার বিরাট বড় একটা হল খুলে দেওয়া হল মুসাফিরদের জন্য। দ্বিতলের বড় বড় মুক্ত বাতায়ন পথে আসছিল স্নিগ্ধ শীতল বাতাস। সারাদিনের দীর্ঘ পথ শ্রমের ক্লান্তিতে যাত্রীরা সকলেই ঢলে প'ড়েছিল নিদ্রাদেবীর কোলে ?

প্রত্যূষে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন ট্যুরিষ্ট সেণ্টারের দ্বিতলের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় প্রাণ মন দোলা দিয়ে গেল। ভোরের আধো-আলো আধো-আঁধারের মধ্যে অদূরের মন্দিরের যে চূড়াগুলি চিক্ চিক্ করছিল—সেগুলিই আমাকে আকর্ষণ করল। সেই মন্দিরাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করলাম, মন্দিরের চূড়াই দেখছি। কিন্তু জানি না তার অবস্থান। বিদেশী পথিককে পথের নিশানা দিয়ে চলেছে সরল জম্মুবাসী। হাঁটার যেন শেষ নেই। তবু মন্দির দর্শন না করে ফিরবো না—এই প্রতিজ্ঞাই যেন মনে গেঁথে গেল। অবশেষে রঘুনাথ মন্দিরদ্বারে এসে পৌঁছলাম। মুখ্যত যদিও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের জন্যই এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—কিন্তু এখানেও রয়েছে শিবলিঙ্গ। ছোটখাট বেশ কয়েকটা মন্দির, নাটমন্দির—মন্দিরগাত্র রামায়ণ কাহিনীর ভাস্কর্য সুন্দর। কিন্তু সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল স্ফটিকের শিবলিঙ্গ। বছরে দুইবার এই মন্দিরে মেলা বসে। রামনবমী ও দুর্গা অষ্টমীর সময়। প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত এই মন্দিরে পূজা অর্ঘ্য দিতে আসে। উষাকালে যখন মন্দির দর্শনে গিয়েছি—তখন দেখেছি বহু ভক্ত নাটমন্দিরে বসে রামায়ণের বিশ্লেষণ শুনছে ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে। ফিরবার পথে দেখলাম আরও একটা মন্দির। মন্দির দর্শন করে যখন মুসাফিরখানায় ফিরলাম—তখন 'বাসে' মাল তোলা হচ্ছে। চা পান সমাপ্ত করে আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু।

পাহাড়ী সর্পিল বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রীবাহী বাস ছুটে চলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে করতে আমরাও শ্রীনগরের পথে চলছি। পাহাড়ী ঝর্ণা ধারায় প্রবাহিত নদী কুলকুল্ রবে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের বুকে পাথরের নুড়ির সর্পিল পথ দেখা যায়। কিছুকাল আগেও এই পথে পাগ্‌লা ঝর্ণা ছুটে ছিল—তারই সাক্ষ্য বুকে বহন করে চলেছে—শ্যামল পাহাড়ের বুকে এই শ্বেত নুড়ির পথ, ধবল পর্বতমালা যাত্রীদের সবার মনেই বিস্ময় জাগিয়েছে।

গোধূলির আবির ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিমাকাশে। রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখন (আমাদের দেশের রাত) ৮টা। কাশ্মীরের সন্ধ্যা—আমাদের রাত সাড়ে দশটার সময় শ্রীনগরের ঝিলাম নদীর বোটে যেয়ে উঠলাম।

কাশ্মীর সমুদ্রতট হতে ৫২০০ ফিট উঁচুতে। এই কাশ্মীরনগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্বিতীয় প্রভারসেনা এবং তিনি কাশ্মীর শাসন করেছিলেন ৭২ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঝিলাম নদীর তটে এই নগরী অবস্থিত। এই নদীবক্ষে ৯টা সেতুর দ্বারা শ্রীনগর এপার হতে ওপারে যোগসূত্র রেখেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিরাট ব্যবসা কেন্দ্র এই সহর। পৃথিবীর মধ্যে কাশ্মীর রেশম ও পশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। তাছাড়া কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ দুর্লভ কার্পেট পৃথিবীর দূরপ্রান্তে প্রতিদিন রপ্তানী হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত নিপুণ কাগজের কাজ, কাঠের কাজ, সূচীশিল্প, পশম ও রৌপ্য শিল্পের জন্য কাশ্মীর প্রসিদ্ধ। বিশ্ব শিল্পীর তুলির সূক্ষ্ম টানে যেমন কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্রিত হয়েছে, তেমনি প্রতিটি কাশ্মীরীর মনও শিল্পীর মন রূপে গড়ে উঠেছে। তাই প্রতিটি কাশ্মীরী শিল্পী। তাদের হাতের সূক্ষ্ম কাজের জন্য তারা জগতখ্যাত। উপরোক্ত দুটাই কাশ্মীরের একমাত্র ব্যবসা এবং এই ব্যবসা চালু থাকে বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫ মাস (মে হতে অক্টোবর)। যখন ট্যুরিষ্ট সম্প্রদায় কাশ্মীরের রূপ নিরীক্ষণ করতে যায়। এই ৫ মাসের আয়েই দরিদ্র কাশ্মীরবাসীকে বাকী ৭ মাস কাটাতে হয়। তাই অধীর প্রতীক্ষায় কাশ্মীরীরা থাকে কখন বরফ পড়া বন্ধ হবে—কখন মুসাফিররা আসবে এবং তাদের ব্যবসা চালু হবে। প্রকৃতপক্ষে ট্যুরিষ্টদের আনাগোনাতেই এ দেশবাসী বেঁচে আছে। প্রতি বছর হাজার হাজার পরিব্রাজক যায় এই দেশ পর্যটন করতে। এ বছরও দৈনিক ৮০০ ট্যুরিষ্ট কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। এই বছরই সর্বাধিক ট্যুরিষ্টের ভিড় হয়েছে কাশ্মীরে। এক লক্ষের উপর ট্যুরিষ্ট গত মে মাস হতে কাশ্মীরে এ যাবৎ গেছে। হয়ত তৃতীয় পক্ষের শ্যেনদৃষ্টির ভয়ে—ভূস্বর্গ হারানোর সম্ভাবনায় সবাই কাশ্মীরে এসে ভিড় করেছে। বম্বের ফিল্ম কোম্পানী-গুলি সবই এসে ভিড় করেছিল "ডাল লেকে" বোটগুলিতে। এরা অনেকেই এসেছে কাশ্মীরের শোভা নিরীক্ষণ করতে। কেউ কেউ বা জীবিকার্জনের পথের সন্ধান পেয়েছে এই ভূস্বর্গে। তাই কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় চিত্র তারকাদের স্যুটিং চলেছে। সহরের তুলনায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রীনগর, পহেলগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে কোন হোটেল বা কোন বোটেই স্থান ছিল না। স্থানাভাবে পহেলগাঁতে নদীতটে তাঁবু খাটিয়ে অনেক ট্যুরিষ্টদের বসবাস করতে দেখেছি।

এখানকার হাউস বোটগুলি ভারী সুন্দর। এদের দৈনিক ভাড়া ২০৲। ২৫৲ হ'তে ২০০৲ পর্যন্ত। পাশ্চাত্য কায়দায় কাশ্মীরীদের শিল্পে সাজানো প্রতিটি নৌকার কক্ষ। ফুল ও ফুলের টব দিয়ে সাজানো হাউস বোটগুলি। এই হাউস বোট হ'তে তীরে আসতে হলে শিকারায় চড়ে আসতে হয়। এই শিকারাগুলিও আমাদের দেশের সাধারণ ডেঙী নৌকার মত নয়। স্প্রিং-এর 'সিটে'-কাশ্মীরী কাজ করা। কুশানের ওপরেও কাশ্মীরী কাজ করা। চাঁদোয়াতেও কাশ্মীরী শিল্প। এসব শিকারাগুলি দেখতে যেমন সুন্দর—বসতেও তেমনি আরামদায়ক। এই শিকারায় করে ফুল হতে আরম্ভ করে শাল, শাড়ী, পশমদ্রব্য, খাদ্যদ্রব্য সবই ফেরিওয়ালারা বোটে বিক্রি করতে আসে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বাস করেও—কাশ্মীরীরা অতি নোংরা। সহরের কয়েকটি প্রধান রাজপথ ব্যতীত শহরের প্রায় সমস্ত রাস্তাই অপরিচ্ছন্ন। কাশ্মীরীরা দরিদ্র। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাশ্মীরদের সৃষ্টি করেছেন। তাই এদের অনুপম সৌন্দর্যও অতুলনীয়। কাশ্মীরের আবালবৃদ্ধ-বনিতা যে সৌন্দর্যের অধিকারী—পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলের অধিবাসী তা দাবী করতে পারে না। কেবল গোলাপের মত রং নয়। নিখুঁত এদের নাক, চোখ, ভ্রূ, ঠোঁট। কাশ্মীরী মেয়েদের দেখে মনে পড়ে যায়—

> "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
> কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
> স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী
> হে ভুবনমোহিনী উর্বশী!"

শ্রীনগরে ঢুকতেই প্রথমেই শঙ্করাচার্যের মন্দির সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীনগর হতে ১০০০ ফিট উঁচু খাড়া এই পর্বত। কথিত আছে ঝিলাম নদী হতে শঙ্করাচার্য পর্বত পর্যন্ত পাথরের সিঁড়ি ছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান শাসকেরা এই পাথর উঠিয়ে সেই পাথর দিয়ে মসজিদ তৈরী করেছে। এই পর্বতে একটি শিবের মন্দির আছে। শঙ্করাচার্যের মন্দিরও একটি আছে। এই পর্বত হতে সমস্ত শ্রীনগর ও তার শহরতলীর অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করা যায়. বৌদ্ধরাও এই মন্দিরকে পবিত্র পীঠস্থান রূপে গণ্য করত এবং পাশ-পাহাড় বলতো। রাজা গোপাদিত্য এই মন্দির পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীনগরের উত্তরদিকে ছোট একটা পর্বতের উপর অবস্থিত হরিপর্বত-ফোর্ট। ৩ মাইল লম্বা ও ২৮ ফিট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই পর্বত। এই প্রাচীরের গায়ে বড় কারুকার্যখচিত গেট আছে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর এই ফোর্ট প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীনগর হ'তে ৪০০ ফিট উঁচুতে এই ফোর্ট। ট্যুরিষ্ট অফিস হ'তে পাশ নিয়ে এই ফোর্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়।

ঝিলাম নদীর তটে বিখ্যাত রঘুনাথ-মন্দির আছে, প্রায় একশত বছর পূর্বে ডোগরা শাসকদের দ্বারা এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাশ্মীরের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মসজিদ জুম্মা মসজিদ। ১৩৮৮-খৃষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনবার এই মসজিদ ধ্বংস করা হয়। সর্বশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেব এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান কাশ্মীরের পাথর মসজিদ তৈরী করেছিলেন। সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায় উপাসনা মন্দির রূপে এই মসজিদ ত্যাগ করেছিলেন, যেহেতু শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এক নারীর দ্বারা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। এই মসজিদ ঝিলাম নদীর বাঁ দিকে। বর্তমানে এই মসজিদের নাম "শাহী-মসজিদ"।

ঝিলাম নদীর ডান দিকে বাদশাহ মন্দির অবস্থিত। রাজা দ্বিতীয় প্রভারসেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক কিংবদন্তী আছে এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে।

শাহ-হামদান মসজিদটি সূক্ষ্ম কাঠের কারুকার্যখচিত। ঝিলাম নদীর ডান দিকে ইহা অবস্থিত। সুলতান কুতুবুদ্দীনের সময়ে পারস্যের এক ঋষি শাহ-হামদান কাশ্মীরে এসেছিলেন তাঁরই অমর স্মৃতিস্তম্ভ রূপে তৈরী হয়েছে এই মসজিদ।

শ্রীনগরের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পাণ্ডেথান মন্দির ১১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা পার্থের প্রধানমন্ত্রী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্রীনগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ "ডাল লেক": এই হ্রদটি ৫ মাইল লম্বা ও ২ মাইল প্রশস্ত। তিনদিকে জল—অন্যদিক ৮০০০ ফিট উঁচু পর্বতমালায় আবৃত ছবির মত সুন্দর এই হ্রদ! 'ডাল লেক' ভাসমান বাগিচা, পদ্মবন ইত্যাদি জন্য প্রসিদ্ধ।

'নাগিন' ডাল লেকের পশ্চিমে অবস্থিত ছোট্ট স্বচ্ছ হ্রদ। এই হ্রদ আগাছা হতে মুক্ত। উপরোক্ত হ্রদ দুইটিতে নৌকা বিহার, সাঁতার ইত্যাদি হয়ে থাকে।

পরী মহল প্রথমত বৌদ্ধদের মন্দির ছিল। পরে সাজাহানের পুত্র দারা এইখানে তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার স্থান নির্ণয় করেছিলেন।

মোগল সম্রাটের বিলাসের নিদর্শন বাগিচাগুলি। কাশ্মীর আজও মোগল শাসকের সেই স্বাক্ষর বহন করে আছে, কত দরিদ্র প্রজা-পীড়নের অর্থে তৈরী হয়েছিল এই বাগিচাগুলি। চশমা শাহী, নিষাদ-বাগ, শালিমার বাগ, নাসিম বাগ, চিনার বাগ প্রভৃতি প্রতিটি উদ্যান আমাদের কল্পনায় নন্দনকাননের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্ন সম্রাট বিভিন্ন উদ্যান তৈরী করেছিলেন। নানা বর্ণ গন্ধের ফুলের সমন্বয় ঘটেছে এসব বাগিচায়। ছোট ছোট পাহাড়ের ধাপে ধাপে অপূর্বভাবে শিল্পী যেন এই রম্য উদ্যানগুলি রচনা করেছেন। ফোয়ারা ও ছোট ছোট ঝর্ণা বা জলপ্রপাতে বেষ্টিত এইসব উদ্যান মুসাফিরদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এইসব পুষ্পোদ্যানের মনোরম শোভা ও স্নিগ্ধ শীতল বাতাস টুরিষ্টদের মনেও আনন্দের ফোয়ারা তোলে।

হারওয়ান শ্রীনগর হতে ১১ মাইল দূরে একটি ছোট হ্রদ। এই হ্রদের জল সহরের সর্বত্র পানীয় জলরূপে সরকার কর্তৃক বিতরণ করা হয়। এটাকে মহাদেব পর্বতের শৈল প্রান্ত বলা যেতে পারে।

হজরৎবল ডাল লেকের পশ্চিমকূলে মুসলিমদের প্রসিদ্ধ একটি মসজিদ। কথিত আছে কোন মুসলিম পয়গম্বরের পবিত্র চুল এইখানে রক্ষিত আছে।

রাজা অবন্তী বর্মনের রাজধানী অবন্তীপুর। মহাদেবের দু'টো মন্দির ছিল অবন্তীপুরে। সেই যুগের সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে এই মন্দিরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষের ভাস্কর্য।

মার্তণ্ড মন্দির রাজা রামদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মার্তণ্ডের নামে খ্যাত ছিল। যদিও মন্দিরের ছাদ প্রায় ধ্বংসোন্মুখ—তবু এর দৈর্ঘ্য যে ৭৫ ফিট ছিল আজও তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন স্থাপত্যের অনিন্দনীয় প্রতিমূর্তি এই মন্দির। এই মন্দির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশেরই প্রশংসাভাজন।

১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ভেরীনাগ উদ্যানটি রচনা করেন। বানিহাল রাস্তার অনতিদূরে এই জায়গাটি অবস্থিত; ভেরীনাগের পাথরের জলাশয়, ঝর্ণা ও বাগানের শোভা সত্যই মনোরম। ভেরীনাগ ঝিলাম নদী হতেই প্রবাহিত।

কোকরনাগ শ্রীনগর হতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। বহু ঝর্ণা এই বাগিচায় আছে, বহু ট্রাউট মাছ এখানে রক্ষিত হয়েছে।

অচ্ছাবল শ্রীনগর হতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানটি ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের জন্য খ্যাত। সাজাহানের কন্যা জাহানারা এখানে একটি বাগান তৈরী করেছিলেন। এখানেও সরকারী ট্রাউট মাছের চাষ হয়। এই ঝর্ণার জল পেটের জন্য, কিডনির ও নানা ব্যাধির জন্য উপকারী।

পহেলগাঁ। শ্রীনগর হতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পর্বতটি হ্রদ, পর্বত, জলাশয়, ঝর্ণা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত। মুসাফিররা নানারকম আমোদ-প্রমোদ করতে পারে—এইখানে অশ্বারোহণে, পদব্রজে, পর্বতারোহণে, মৎস্য শিকারে। এখান হতে যাত্রীরা শেষনাগ, শেষ নাগ, তারসার, অমরনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে যায়। পহেলগাঁতে বহু ভাল হোটেল ও একটি ক্লাব আছে, শ্রীনগর হতে ২০০০ ফিট উঁচুতে এই পর্বত।

শ্রীনগর হতে ২৮ মাইল দূরে ও শ্রীনগর হতে ৩৩০০ ফিট উঁচুতে গুলমার্গ পর্বত। গুলমার্গ পর্বতের দীর্ঘ ৪ মাইল পথ হয় পনীতে অথবা পদব্রজে যেতে হয়। গুলমার্গ পর্বতের গাত্রবাহী ২ মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া একটি নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে। ফার্ণ ও পাইন বৃক্ষের সারি উঠেছে গুলমার্গের সর্পিল পথ বেয়ে। এখানে বহু হোটেল আছে। গুলমার্গ হতে হিমালয় পর্বতের বহু শৃঙ্গ দেখা যায়।

খিলানমার্গ পর্বত সমুদ্রতট হতে ১০,০০০ ফিট উঁচুতে এবং গুলমার্গ হতে ৪ মাইল উঁচে। এই পর্বত হতে কাশ্মীরের বিভিন্ন হ্রদ ও পর্বতমালার অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করা যায় এবং এখানে বরফের উপর মুসাফিররা স্লেজ গাড়ীতে চড়ে বেড়ায়।

উল্লিখিত স্থান ব্যতীত দেখবেন আরও কত ছোট খাট হ্রদ, পর্বত, পুষ্পবনে আচ্ছাদিত জলাশয়। ডাল লেকের নেহরু পার্কটিও দর্শনীয়। বরফ; ফুল, ঝর্ণার লীলা কেন্দ্র কাশ্মীর। কোন কোন কাশ্মীরবাসীর ঢালু টিনের ছাদে দেখেছি কিসের চাষ। শুনলাম বাড়ীর ছাদে তারা জাফরাণের চাষ করে।

যে কাশ্মীরের শোভা নিরীক্ষণ করতে পূর্ব পশ্চিম দুই প্রান্ত হতে বছরে লাখে লাখে লোকের সমাগম হয়—সেই কাশ্মীরের শ্রী আজ যেন অনেকটা ম্লান। পথঘাটে কেবল মিলিটারী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে ডিনামাইট ফিট করিয়ে—পাহাড় ধ্বংস করে পাশাপাশি দু'টি 'কনভয়' যাবার প্রশস্ত পথ করা হচ্ছে। যাত্রীবাহী বাসগুলিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে—'কনভয়'গুলি দুর্জয় বেগে ছুটে চলেছে। পথে ঘাটে পর্বতগাত্রে যত্র তত্র মিলিটারী তাঁবু

খাটানো হয়েছে। একাগ্র মনে সেনাবাহিনী দেশরক্ষার কাজ করে চলেছে। সমস্ত কাশ্মীরে যেন মিলিটারীরই রাজত্ব চলেছে। শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে তারা যেন শত্রুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় রয়েছে। আমাদের নওজোয়ানরা জীবন পণ করেই যেন কাশ্মীর রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে।

বাটিকের কাজ

মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাটিকের কাজকে বলা হয় প্রতিরোধক রঞ্জন পদ্ধতির কাজ। কারণ এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতিরোধকদ্রব্য দ্বারা প্রয়োজনীয় অংশ ঢেকে বস্ত্রে রং-এর সাহায্যে নক্সা আঁকা হয়। প্রাচীনকালে জাভায় এই শিল্প সর্ব প্রথম কুটীরশিল্প হিসাবে সমাদর লাভ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে সৌখীন সমাজে এর বিশেষ আদর দেখা যায়। কাজটি অতি সূক্ষ্ম, ব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। তাই আপাতদৃষ্টিতে একে একটু গোলমেলে বলে মনে হলেও সাহস করে আরম্ভ করলে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। যথাযথ ভাবে করতে পারলে অবশেষে কাজটি দেখে মনে হবে সমস্ত শ্রম সার্থক হয়ে উঠেছে। এই শিল্পের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ এর ডিজাইনের মৌলিকত্ব ও অননুকরণীয়তা। কোন ডিজাইনের হুবহু নকল করা সম্ভব হয় না। বাটিকের কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য "ক্র্যাক" (crack) তা প্রত্যেকের তুলিতে পৃথক ভাবে ধরা দিতে বাধ্য। এই রঞ্জন পদ্ধতি দ্বারা পর্দা, কুশন, ব্লাউজপিস, টেবিলক্লথ, শাড়ী ইত্যাদি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা যায়। বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয় এই সমস্ত জিনিষ। মেয়েদের শিল্পকলার মাধ্যমে ঘরে বসে অর্থোপার্জনের ইহা একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

সাধারণত সুতি ও রেশম বস্ত্রেই এই কাজ করা হয়। সুতি বস্ত্রের মধ্যে ঠাসবুনন, আদ্দি ও কেম্বি ক ইত্যাদিই ভাল হয়। এই রঞ্জন পদ্ধতিতে ক্রমশ হাল্কা থেকে গাঢ় রং-এ বস্ত্রটিকে রঞ্জিত করা হয়ে থাকে। এক কিংবা একাধিক রং-এ নক্সা প্রস্তুত করা যায়। এখানে তিন রং-এ একটি নক্সা প্রস্তুতের পদ্ধতি বর্ণনা করছি। উপকরণগুলির মাপ বোঝাব সুবিধার জন্য এক গজ কাপড় রং করতে কি কি মাপ লাগে বলা হল। প্রয়োজন মত একে কম বেশী করে নিতে হবে।

এই কাজের জন্য প্রয়োজন :—

মৌচাকের মোম————তিন ভাগ } রেজিটিং
রজন——————এক ভাগ }

প্যাডিংবাথ :—ব্রেনথল বা ন্যাপথল———এক ভাগ
কষ্টিক সোডা————এক ভাগ
মনোপল সোপ বা টার্কিরেড অয়েল———পরিমাণ মত।
ফুটন্ত জল———সামান্য।

ডেভলাপিংবাথ :—কালার সল্ট———দুই ভাগ।
সাধারণ লবণ———৫।০০ ভাগ।
ঠাণ্ডা জল———কাপড়ের ২০ গুণ।

পদ্ধতি :—এক গজ সাদা ঠাসবুনন মিহি আদ্দি সাবান জলে কেচে মাড়শূন্য করে নিন। শুকিয়ে গেলে ইস্ত্রি করে পছন্দ মত নক্সা আঁকুন।

একটি এ্যালুমিনিয়মের পাত্রে মোম ও রজন একত্রে উনুনে বসান। গলে গিয়ে যখন বাদামী ধোঁয়া উঠতে থাকবে তখন নামিয়ে গরম অবস্থায় তুলি দ্বারা নক্সার যে যে অংশ সাদা রাখতে চান, তার দু' পিঠ ঐ মোম রজনের দ্রবণ দিয়ে ঢেকে দিন। এখন প্রথমে হলুদ রং করা হবে। কাপড়টি সাবধানে ঠাণ্ডা জলে একঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন।

প্যাডিং বাথ—একটি পাত্রে সামান্য ফুটন্ত জলে আগে দুই চা-চামচ মনোপল সোপ গুলে নিয়ে তাতে ব্রেনথল আধ তোলা (হলুদের ব্রেনথল A. T.) এবং কষ্টিক সোডা দুই চা-চামচ গুলে পেষ্ট মত তৈরী হলে তাতে কাপড়টি ডোবার মত ঠাণ্ডা জল দিন। এবার মোম-লাগানো ঠাণ্ডা জলে ভেজানো কাপড়টি এই জলে দশ-পনেরো মিনিট ডুবিয়ে রেখে না ধুয়ে সাবধানে মেলে দিন। আধ শুকনো হলে নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত কালারসল্ট, সলিউশনে ডুবাবেন।

ডেভোলাপিং বাথ—অল্প ঠাণ্ডা জলে প্রথমে এক তোলা কালারসল্ট (হলুদের কালারসল্ট জি, পি) গুলে তাতে আন্দাজমত সাধারণ লবণ ও প্রচুর ঠাণ্ডা জল দিন, যাতে জলভারে কাপড়টা ডোবে। এবার আধ শুকনো ঐ কাপড়টি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ জলে পনেরো-কুড়ি মিনিট রেখে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। এতক্ষণে হলুদ রং করা শেষ হ'ল।

এবার নক্সার যে যে অংশ হলুদ রাখতে চান, তার দু'পিঠ গরম মোম রজনের দ্রবণে ঢেকে লাল রং করতে হবে। একই পদ্ধতিতে ডেভোলাপিং বাথ ও প্যাডিং বাথ দ্বারা রং করা হবে। উপকরণের পরিমাণ সমান থাকবে। কেবল লালের ব্রেনথল হবে এম, এন এবং কালারসল্ট হবে রেডসল্ট বি।

লাল রং সমাপ্ত হলে পর নক্সার যে অংশ লাল রাখতে চান, তা মোমে ঢেকে শেষে কালো রং করুন। কালোর ব্রেনথল এম, এন ও কালারসল্ট ব্লু সল্ট বি। রং করার কাজ সমাপ্ত হলে মোম রজন কাপড় থেকে তুলে ফেলতে হবে। গরম ফুটন্ত সাবানজলে ঐ রং করা কাপড়টি ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করলে মোম আপনা হতে গলে উঠে যাবে। রেশম বস্ত্র এভাবে না ফুটিয়ে নক্সার উপর ও নীচে দুটি ব্লটিং বা ফিল্টার পেপার দিয়ে গরম ইস্ত্রি চালালে মোম আপনা হতে কাগজে শুষে নেবে। কয়েকটি সাধারণ রং-এ কি কি ব্রেনথল ও কালারসল্ট লাগবে, নীচে তার তালিকা দেওয়া হ'ল।

মেরুন :—
প্যাডিং বাথ—ব্রেনথল এ, এস, বি, এস, অথবা এম, এন
ডেভোলাপিং বাথ—ডেভোলাপিং সল্ট বোরাক্স জি, পি

ব্রাউন :—
প্যাডিং বাথ—ব্রেনথল এ, এ, জি অথবা ন্যাপথল এ, টি,
ডেভোলাপিং বাথ—ডেভোলাপিং সল্ট ব্লু সল্ট বি।

অরেঞ্জ :—
প্যাডিং বাথ—ব্রেনথল এ, এস
ডেভোলাপিং বাথ—অরেঞ্জ সল্ট জি, আর।

হলুদ :—
প্যাডিং বাথ—ব্রেনথল এ, এস, জি বা ন্যাপথল এ, টি
ডেভোলাপিং বাথ—ডেভোলাপিং সল্ট বোরাক্স জি, পি।

দুই

সিস্টাররা প্রথম আওয়ার গাইছেন! চোখ দু'টি লিটল্ অফিসের পাতায় নিবদ্ধ, ল্যাটিন ধর্মসংগীত ও স্তবগুলি সহজেই অনুসরণ করতে পারছে গ্যাব্রিয়েল। দিনের প্রথম আলো চ্যাপেলের জানলাগুলো দিয়ে বাঁকা হয়ে এসে পড়েছে···তারই মধ্যে উচ্চ সপ্তকে দু'টি কয়ার গান···বিশুদ্ধ গ্রেগোরিয় সুর···মধুরতর আর কিছু শোনেনি কোনদিন। অভিভূত হয়ে পড়েছে, পাতা ওলটাতে গিয়ে আঙুলগুলো কাঁপছিল। বারবার চোখ দু'টো গিয়ে পড়ছে সুন্দর ঐ পংক্তিগুলির ওপর।

দু'টি বিপরীত কয়ারের প্রত্যেকটিতে শ'খানেক কণ্ঠস্বর যোগ দিয়েছে, তবু মনে হয় যেন শুধু একটি গলায় গান হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এদিক থেকে ওদিকে আসা-যাওয়া করছে সুর, তাল কাটে না তবু। উচ্চ গ্রামের দু'টি মাত্র সুরে সমস্ত গানটা বাঁধা, তীক্ষ্ণ, সুমিষ্ট। এমন সাদাসিধে গান গ্যাব্রিয়েলের ভারি ভাল লাগে। চিরকাল ভাবত কোনদিন না কোনদিন সলোমন-এ গিয়ে বেনেডিক্টাইন সন্ন্যাসীদের সুললিত কণ্ঠে গীর্জার এই সর্বপ্রাচীন সংগীত শুনবে। আর এখন? যেন নিজের বাড়ীতে বসে শুনছে—এমনি অনুভূতি। এর সুরটা আরও কিছুটা চড়া হয় তো, তবু এখানেও সেই একই রকম স্বরসংগতি আর বিরতি!

এদিকের কয়াররা গাইছে। সংগে সংগে সুর ধরে নিচ্ছে অন্য প্রান্তের দল। যেন উত্তর প্রত্যুত্তর চলছে পর্যায়ক্রমে।

সংগীত-প্রধানা কয়ার নানদের আইলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি পদচারণা করছেন আভাস পেয়ে ও অপাংগে দেখছেন চেয়ে চেয়ে। বিদুষী মহিলা, গ্রেগোরিয় সংগীতে বিশেষজ্ঞা। একটি শিক্ষানবীশের কাছে থেমে তার শ্বাসসংযম শুনছেন অথবা অনবধানতায় তরুণ-কণ্ঠে কোন নিষিদ্ধ অতি অনুভূতি প্রকাশ পেল কি শুনছেন তাই। তাকান নি কিন্তু, মাথাটা শুধু একটু ঘুরিয়ে রেখেছেন তার দিকে, শামুক যেমন করে শব্দ আহরণ করে তাঁর কর্ণদ্বয়ও তেমনি করে বন্দী করছে শব্দগুলো।

উপাসনাদি শেষ হ'ল। এখন সবাই চ্যাপেল হলে সমবেত না হওয়া অবধি মঠের বাগানে অপেক্ষা করবে তারা। আঙুরলতায় ঢাকা দেওয়ালের ওধারে পথ···কান পেতে বহির্জীবনের শব্দ শোনবার চেষ্টা করল গ্যাব্রিয়েল, কিন্তু বৃথাই। পৃথিবীর আর কেউ জেগে ওঠার আগেই কত কাজ যে নানদের করতে হয়, অবাক লাগে ভাবতে। ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল তাঁরা এখন ওদের স্বাগত জানাবার জন্য অতিরিক্ত ধর্মানুষ্ঠানের জন্য সমবেত হচ্ছেন। সুপিরিয়র জেনারেলের কথাও মনে পড়ল—এ হাউস তাঁর বলে অভিহিত, তাঁর তুচ্ছ কথাটিও আইন এখানকার। এমন কি কোন না-বলা ইচ্ছাও কোন সিস্টার অনুমান করতে পারতেন যদি, সেটাও আইন হ'ত। কনভেন্টে যোগ দেবার বাসনা কেন হ'ল খুলে বলার জন্য রেভারেন্ড মাদার ইমানুয়েলের সংগে নিয়মমত দেখা করেছিল, কিন্তু তখনও জানত না তার আর ঐ সমুন্নতা মহিলাটির মাঝে কি পার্বত্য আড়াল দাঁড়িয়ে! অথচ মানুষটি বসেছিলেন বড় জোর এক হাত ব্যবধানে, একটা ডেক্সের ওধারে। লক্ষ্য করে দেখছিলেন তার হাত নাড়া, মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো। কয়েকটা প্রশ্নও করছিলেন, কণ্ঠস্বরটা কিন্তু মনে পড়ে না এখন। স্মিতহাসিও দেখেছিল, মুখখানা কিন্তু স্মরণে আসছে না!

দু'জন শিক্ষানবীশ চ্যাপটার হলের দরজাগুলো খুলে দিয়েছে। হলের সর্বশেষ প্রান্তে একটি সিংহাসন-প্রতিম চেয়ারে রেভারেন্ড মাদার বসে, মাথার কাছে বিরাটকায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি। পস্চুল্যান্টরা প্রথমে হাত জোড়াজোড়ি করে নতমস্তকে বাও করল কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে হাতের পাতায় মুখ ঢেকে মেঝের ওপর সাষ্টাংগে প্রণাম করল তারপর। সুপিরিয়র জেনারেলের গথিকাকৃতির কৃশ মুখখানির যে আভাসটুকু পেল, তাতে যেন আর একবার নতুন করে তাঁকে দেখল। সিস্টার মার্গারিটার কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে।
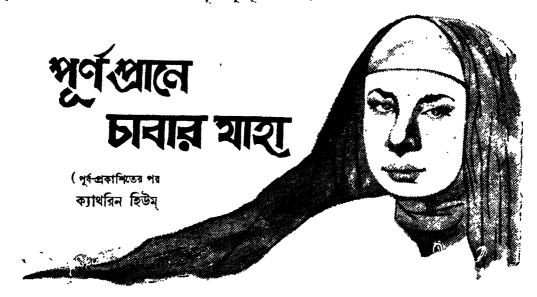
—রেভারেন্ড্ মাদার ইমামুয়েল পুরুষও নন, নারীও নন। আমাদের মধ্যে তিনিই যীশুর প্রতিভূ, আমরা তাঁকে সেই ভাবেই ভালবাসি।

গ্যাব্রিয়েল অপেক্ষা করে আছে তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য।

—মেয়েরা আমার, কি তোমাদের প্রার্থনা!

যে কণ্ঠ ডেক্সের ওধার থেকে কথা বলেছিল সেদিন, এ কণ্ঠ সে নয়। এ কণ্ঠ কেমন বিবিক্তি যেন, যেন বহু দূরাগত।

তেমনি ভাবেই করতলে মুখ ঢেকে ওরা উত্তর দিল, এই সম্প্রদায়ে স্বীকৃতি পেতে চাই আমরা।

—ঈশ্বরের নামে গাত্রোত্থান কর।

ওরা উঠে বসল নতজানু হয়ে।

সুপিরিয়র জেনারেল দাঁড়িয়ে উঠেছেন। দীর্ঘাঙ্গী, অতিরিক্ত কৃশ! সাদাসিধে মুখে সরলতা মাখানো, মৃদু হাসলেই কিন্তু সুন্দর দেখায় মুখখানি, দেখে থমকে যেতে হয়।

—আমরা প্রত্যেকে প্রার্থনা করেছি তোমাদের জন্য, যাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার শক্তি পাও তোমরা অন্তরে।—একবার দক্ষিণে, একবার বামে ফিরে মাথাটা নাড়লেন একটু সমবেত নানদের দিকে চেয়ে, তাঁরাও তখন এক সঙ্গে ওদের দিকে চেয়ে সমর্থনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।—এখন থেকে তোমরা এই পুণ্য মঠের অঙ্গ। ঈশ্বরের করুণা যা আসবে তোমাদের কাছে কখনও উপেক্ষা কোর না! কাজের মধ্যে তাকে মিলিয়ে নাও। ঈশ্বরানুগ্রহ যে শক্তি যোগাবে তার সবটুকু অতি প্রয়োজনীয়।

কল্যাণময়ী মূর্তিটি, মুখের মধ্যে কালো চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করছে। গ্যাব্রিয়েল অবাক হয়ে ভাবছে প্রথম দিনকার ঐ পবিত্রভাব কি করে চোখ এড়িয়ে গেল তার।

সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকগুলো সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছেন ধীরস্বরে, নান হওয়া সহজ নয়। নানের জীবন ত্যাগের জীবন, আত্মবিলুপ্তির জীবন। এ জীবন প্রকৃতি-বিমুখ।

এ জীবন প্রকৃতি-বিমুখ···গ্যাব্রিয়েল চমকে উঠল। বাবা ঠিক এই একই কথা বলেছিলেন।

সুপিরিয়র জেনারেল উচ্ছাসহীন অবিকৃত কণ্ঠে তারই পুনাবাবৃত্তি, এ জীবন প্রকৃতি-বিমুখ। দারিদ্র্যে, সর্বাঙ্গীণ নির্মলতায়, বাধ্যতায় অভ্যস্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।—এ জীবনে অভ্যস্ত হতে কারো কারো অন্যদের চেয়ে বেশী কষ্ট হবে, আবার কোন দু'জনের ক্ষেত্রেও হয় তো এর প্রতিক্রিয়া এক রকম হবে না। যীশুর শিষ্যদের বিষয়টি উল্লেখ করলেন সুপিরিয়র জেনারেল, তিনি গুণে দেখেছিলেন এর চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র তাঁর সেই শিষ্যগোষ্ঠীতে একজন দ্বিধান্বিত আছে, তিনবার অস্বীকার করেছে একজন, আর একজন আছে বিশ্বাসঘাতক। মন্তব্য করলেন, সম্ভবত ঈশ্বর নিজের শিষ্যদের মধ্যে এইসব গলদ আসতে দিয়েছিলেন তাঁর কাছে যাবার পথ যে কত দুর্গম তা দেখাতে।

—অথচ তাঁর করুণা চাও যদি তো সর্বদাই পাবে। প্রার্থনা কর তোমরা সবাই যেন সেন্ট জন হতে পার, যেমনই অনুরক্তা হতে পার যীশুর প্রতি।

একটুক্ষণ থামলেন সুপিরিয়র জেনারেল, তারপর ফ্লেমিস ভাষায় বলতে শুরু করলেন আবার।

এটা খামারের মেয়েদের জন্য। রেভারেন্ড মাদারের কণ্ঠে জোরালো উচ্চারণে নিজেদের মাতৃভাষা শুনলেই তাঁকে ভালবেসে ফেলবে তারা, গ্যাব্রিয়েল জানে। ভাষণটি দ্বিতীয়বার শুনতে শুনতে মানুষটিকে বিশ্লেষণ করে দেখছে। নানজীবনে তিনি ভারতে মিশনারী হিসেবে কাজ করেছেন, পোল্যাণ্ডে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে, সংঘের মনোরোগ চিকিৎসা-সংস্থাগুলোর পরিদর্শিকা হিসেবেও—তার মধ্যে জড়বুদ্ধি শিশুদের হোমও পড়ে। শিক্ষা অচল সেখানে, হৃদয়বিদারক দৃশ্য। তাই দেখা যায় সেখানকার ডিউটির পালা শেষ হবার পর অধিকাংশ নানই ভেঙে পড়েন। সুপিরিয়র জেনারেল সেক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। দর্শনে ও প্রাচীন সাহিত্যে ডিগ্রী আছে, তা ছাড়াও তিনি একজন পাস করা নার্স। আর সবাই বলে তাঁর স্মৃতিশক্তি নাকি অদ্ভুত। প্রতি ছ'বছর অন্তর চীনের মহাপ্রাচীর থেকে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটায় ঘোরেন যখন অর্ডারের মিশনগুলো পরিদর্শন করে, প্রত্যেক নানকে তার নাম ধরে ডাকতে পারেন, স্থানীয় সুপিরিয়রদের মনে করিয়ে দিতে হয় না।

গ্যাব্রিয়েল ভাবছে উনি নারী নন, নারীসমষ্টি।

এরপর সুপিরিয়র জেনারেল ইংরিজীতে দিলেন বক্তৃতাটি, দিয়ে শেষ করলেন। ডান হাতখানি বেরিয়ে এল স্ক্যাপুলারের মধ্য থেকে—লম্বা, ছুরির মত পাতলা হাতখানা। ক্রুশ চিহ্ন করলেন ওদের সামনে—সুসংবদ্ধ ভংগী, কোথাও এতটুকু অনাবশ্যকতা নেই যে শক্তির অপচয় হবে।

ল্যাটিনে আশীর্বাণী দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

সিস্টার মার্গারিটার ইংগিতে পসচুল্যান্টরা উঠে দাঁড়িয়ে 'এস সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মা' প্রার্থনাটি আবৃত্তি করল তাঁর সামনে। তারপর অভিবাদন করে হল ছেড়ে চ্যাপেলে ফিরে গেল ম্যাসে যোগ দিতে। চ্যাপেলে প্রায় ঢুকতে যাবে তখন প্রথম খেয়াল হ'ল গ্যাব্রিয়েলের চ্যাপটার হলে সিস্টার উইলিয়াম উপস্থিত ছিলেন কি না তাও লক্ষ্য করা হয়নি। রেভারেন্ড মাদারের ঐ গথিক শিল্পছাঁদে গড় রমণীমূর্তিটিতে এমনই মগ্ন হয়েছিল।

এখন থেকে তিনি তার চিরদিনের শাসনকর্ত্রী।

তিন

ছ'মাস প্রায় শেষ হয়ে এল। একদিন সতীর্থদের গুণতে গিয়ে আবিষ্কার করল গ্যাব্রিয়েল, তিনজন কম। ওদের সময়ের প্রতি মুহূর্তটি এমনই নজরবন্দী যে পরস্পরের সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি এই ছ'মাসেও। একটুও বুঝতে পারছে না দলের কোন তিনজন ছেড়ে দিল, ফিরে গেল বহির্জগতে।

কনভেন্ট সময়ের মালিক চ্যাপেলের ব্রোঞ্জের ঘণ্টাটা ছকে-বাঁধা একটানা কাজের নির্দেশ দিয়ে চলে। সিস্টার মার্গারিটা ব্যাখ্যা করছিলেন এই ঘণ্টাধ্বনি ডিউটি বা উপাসনায় যোগদানের আহ্বানের চেয়েও বেশী কিছু। এ স্বয়ং খৃষ্টের কণ্ঠস্বর, তাঁর প্রয়োজনে ডাকছেন তাদের। এই ঘণ্টাধ্বনির কাছে বশ্যতা স্বীকার তাই বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পড়ে। হোলি রুল বলছে, ঘণ্টা বাজার সংগে সংগে আধা বলা কথা, আধা করা কাজ বন্ধ করতে হবে—না হলেই অপরাধ করলে তুমি, বাধ্যতার নিয়ম ভাঙলে।

এটাই কি ঐ মেয়ে তিনটির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল? গ্যাব্রিয়েল নিজে যে ব্যর্থ হচ্ছে অনবরত, তার কারণ ঘণ্টাধ্বনি মাত্রই অর্ধসমাপ্ত কথার মধ্যে থামতে পারে না সে, অনুচ্চারিত শব্দটা গিলে ফেলতে পারে না। অসমাপ্ত অক্ষরটা অসমাপ্ত অবস্থাতেই রেখে হাতের পেন্সিল বা খড়িটা রেখে দিতে অভ্যস্ত করতে পারছে না আঙুলগুলোকে। ওয়াইয়ের ল্যাজের টানটা না দিয়ে পারে না সে, টি'য়ের মাথাটা কেটে বসে।

মূক-বধিরদের যে স্কুলটিতে তার কাজ নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানে দেখে নানরা আর তাঁদের কাছে কাজ করেন যে সব শিক্ষানবীশরা তাঁরা নির্বিবাদে ঘণ্টাধ্বনির হুকুম মেনে চলেন, অসমাপ্ত কাজটা শেষ করবার কোন ইচ্ছাও দেখা যায় না। ওদের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য লড়াই করে গ্যাব্রিয়েল, তাই জানে ঘণ্টার ঐ অবশকারী ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে আন্তরিক শক্তির আয়োজন। অথচ বাধ্যতার এই সহজতম রূপটিতেও অভ্যস্ত হতে না পারলে ঈশ্বরের পাদমূলে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেবে কি করে? সেই চরম লক্ষ্যের প্রস্তুতিতে এসব খেয়ালী আচারগুলো তো বলতে গেলে ব্যায়াম শিক্ষার মত।

গীর্জার এই ঘণ্টার শব্দটা বেশ মৃদুই বলা চলে, সুরেলাও। তবু মাদার হাউসের সংগে জড়িত যে কোন জায়গার সুদূর কোণটিতেও শব্দ পৌঁছায় তার—হাসপাতাল ওয়ার্ডে, স্কুলঘরে, রান্নাঘরে। আর কুড়োনো শিশুদের নার্সারির মত ভীষণ হৈ-হট্টোগোলের জায়গা আর যদি থাকে গোটাকতক যেখানে ঘণ্টার প্রথম আওয়াজটা অন্তত সহজেই কান এড়িয়ে যেতে পারে, কাজেই নিষ্পাপ মনে হাতের কাজটা শেষ করে ফেলা চলে, সেখানেও সর্বদাই বর্ষীয়সী নান একজন থাকবেন কাছাকাছি—ঘণ্টাধ্বনি তাঁর রক্তে মিশে আছে। হাতের বদ্ধমুষ্টি তুলে শূন্যে দু'বার নাড়বেন তিনি, মূক অভিনয়ে জানিয়ে দেবেন যীশু-ডাকছেন। এমন নীরব ইংগিত রোগীরা অবধি করে অনেক সময়। গ্যাব্রিয়েলের পক্ষে ভারি লজ্জাকর আর বিস্ময়কর একটা ঘটনা ঘটেছিল একবার। একটি মূক-বধির শিশুর মুখে দুধের গেলাস ধরেছিল, ঘণ্টা বাজতেই গেলাসশুদ্ধ হাতটা সে ঠেলে সরিয়ে দিল, অথচ ঘণ্টার শব্দ সে শুনতেও পায়নি।

তার অভিজ্ঞতায় এই একঘেয়ে রুটিনটার মত কষ্টদায়ক কিছু আসেনি কোনদিন। রুটিনটা পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন চায়, কোথাও কোন ফাঁক না থাকে। অবশ্য বিনিময়ে পুরস্কার পাওয়া যায় প্রায়ই, অন্তত নিজেকে কোন রকমে টেনে-হিঁচড়ে ঐ পথে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্টই। প্রাত্যহিক ম্যাসের শক্তি নতুন করে সতেজ করে তোলে, রহস্যময় সৌন্দর্য তার ম্লান হয় না কখনও, ধ্বংস তো হয়ই না। সারাদিনে নির্ধারিত সময়ে সেভেন আওয়ার্সের সংগীত হয়। প্রতি রাত্রে সব সিস্টাররা চ্যাপেলে মিলিত হন, দিন সমাপ্ত হয় সমবেত কণ্ঠে সালভে রেজিনা সংগীত দিয়ে। তারপরই গ্র্যানড সাইলেন্‌স্ শুরু। তার ঠিক আগেই ঐ ভার্জিনের উদ্দেশ্যে গীতে স্তোত্রগান সবচেয়ে বেশী মায়াজাল বিস্তার করে।

দিনের শেষ উপাসনা লড্‌স্, সাত মিনিট বিবেক-পরীক্ষা তারপর। এ দু'টোই হয়ে গেলে সালভে রেজিনা শুরু হয়। কমিউনিটি যখন তার দু'শো নানের বিবেক-পরীক্ষা করে, সেই স্বল্পস্থায়ী নীরবতায় আত্মবিচার-নিমগ্ন নতজানু মূর্তিগুলির দৈহিক অভিব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের প্রকাশ অনুভব করা যায়।···নোটখাতার পাতায় পেন্সিলের খস্‌খস্ আওয়াজ···ফিস্‌ফিস্ করে বলছে···আমার অপরাধ···আমার অন্যায় ···নিজেকে অভিযুক্ত করছি আমি।···চারপাশ ঘিরে তখন ছাঁচে-ঢালা কমিউনিটির অস্তিত্বের অনুভূতি থাকে না। ক্ষণকালের জন্য প্রত্যেক নান ঐ ছাঁচের মধ্যে থেকে পালিয়ে আসেন, সিস্টারদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মচিন্তায় ডুব দেন।···সাত মিনিট সময়টা এমন বেশি নয়, তারপরই আবার ঘণ্টার পাঁচটি শব্দ একত্রিত করে আনে তাঁদের। সালভে রেজিনায় যোগ দেন সবাই একসংগে সাগ্রহে। দিনের কাজ সমাধা হয়।

চ্যাপেলের আলোগুলো নিবে যায় একে একে। বেদীর আলোটা জ্বলে কেবল, ওটা সারারাত জ্বলবে। আর ভার্জিন মেরির মূর্তির কাছে শেড-ঢাকা আলোটাও, মূর্তিটি আলোকিত থাকে যাতে। আর সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, নানরা গাইতে শুরু করবেন।

এই যে মুহূর্তটি—এই মুহূর্তটিই প্রত্যহ গ্যাব্রিয়েলের পরের দিনটাকে সম্ভব করে তোলে। ইতোমধ্যে ওরা সিস্টারদের সংগে গাইবার অনুমতি পেয়েছে, তবুও নিজের গলার ওপর ওর ভরসা হয় না। প্রায়ান্ধকার ঘরে ঐ গম্ভীর স্বর ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারকে যেন বিস্তৃততর করে তোলে—তখন এমনই একটা অনুভূতি আসে মনে যেন সব কনভেন্ট, সব মঠ, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের সব মিশন অবধি কেমন করে তার নিজের চ্যাপেলে জড়ো হয়েছে এসে। এই বিশেষ মুহূর্তটিকে যে কোন কনভেন্টের প্রাচীরান্তরাল থেকে এমনই ক্রন্দনসিক্ত প্রার্থনা উত্থিত হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী সেই সমবেত সংগীতের মধ্যে তার চারপাশে যে সিস্টাররা পবিত্রকণ্ঠে গাইছেন তাঁদের কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে জোরালো, একইমাত্র। অন্ধকার পরিবেশ শিশুসুলভ আনুগত্য সবার চোখে, কেমন মনে হয় যেন ঐ হাজার হাজার চোখ তারই দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঐ মূর্তিটির দিকে।

···একটিমাত্র আলো তাঁর সামনে···তাঁরই উদ্দেশ্যে সমবেত কণ্ঠে স্তবগান উঠছে।

···সিস্টাররা শেষ পংক্তিটি গাইছেন, হে মধুরা, কুমারী মেরি।

অন্ধকারেই সিস্টাররা চ্যাপেল থেকে সার বেঁধে বেরিয়ে আসেন পর-পর। প্রথম থাকে পসচুল্যান্টরা, তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠজন সব চেয়ে সামনে। তারপর শিক্ষানবীশরা। সবশেষে চিরব্রতা নানরা, এ জীবনের হিসেবে সবচেয়ে বয়স্কা যিনি, তিনি সর্বপশ্চাতে—যেন পুরো কমিউনিটিটাই ক্রমানুগ মিছিল করে এগিয়ে আসছে। সেই সনাতন মিছিল গ্যাব্রিয়েল ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে, দেখছে বিরাট এক পরিবারের রেখাচিত্র। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ মেয়েটি বয়োজ্যেষ্ঠা সিস্টারের দৃষ্টির সামনে সব আগে দাঁড়িয়ে। আর হাউসের স্থানীয় মাদার সুপিরিয়র—অথবা রেভারেন্ড মাদার ইমানুয়েল যদি তাঁর বহু কাজের মধ্যে থেকে মাথা তোলার অবকাশ পান তো তিনি নিজে—দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন, আশীর্বাদ জানাবেন। সবচেয়ে ছোট শিক্ষানবীশ মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে থাকে পবিত্র জলের পাত্রটি নিয়ে,

সেই জল ছিটিয়ে দেবেন তাদের। আবছা-আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় না। তাঁর হাতের কুশের গোছাটি সমতালে উঠছে নামছে আর সেই মেয়েটির হাতের পাত্রে নিমজ্জিত হচ্ছে মাঝে-মাঝে, কিন্তু মুখের ওপর কখনও কখনও ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা কয়েকটা এসে পড়ে। সেই সংগে ল্যাটিনে আশীর্বাণী···বিছানায় যাবার আগে এই পাথেয়।

পরীক্ষাধীন মাসগুলোয় গ্যাব্রিয়েলের মনে হ'ত দোষ-ত্রুটিগুলো যেন তার আপ্রাণ চেষ্টার সংগে রেষারেষি শুরু করেছে। যতই চেষ্টা করছে নির্দোষ হতে, ত্রুটিহীন হতে, দোষ-ত্রুটি যেন ততই ঘটছে পদে-পদে। সকালে দশ মিনিট সময় ধার্য করা আছে, ঘণ্টা বাজে তার আগে-পরে। সিস্টাররা সবাই সে সময় বিবেক-পরীক্ষার ফলাফল নোটখাতায় লেখেন। নিজের নোটখাতাখানা দেখে গ্যাব্রিয়েলের মনে হয় ওটা যেন স্নেলিঙ্কলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিবরণী।···ছুটে ওপরে গিয়েছি···দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করেছি··· আজও খাবার ঘরে বাহুল্যহীনতার বোধ ছিল না··খাবার সময় কাঠের টুকরোর বদলে প্লেটের জন্য এখনও বাসনা হয়···

সপ্তাহে একবার ষ্টাডি হলে সিস্টার মার্গারিটার কাছে নিজেদের দোষ-ত্রুটির তালিকা চেঁচিয়ে পড়ে ওরা। গলা ভেঙে যায়, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোটে। নিজের পালা না আসা পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করে গ্যাব্রিয়েল। আর নিজের বেলা প্রায়ই মনে হয় ভুল সপ্তাহেরটা পড়ছে বুঝি! সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ত্রুটিগুলো পুনরাবর্তিত হয়, একই সংখ্যায়, একই রূপে।

ওর ধারণা, নিজের নোটখাতাখানার সংগে সংগিনীদের নোটখাতা-গুলো মিলিয়ে দেখতে পেত যদি হয় তো সাহায্য হত—তারাও তো অমনি প্রাণপণ চেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু এ জীবনে সে রকম কোন সুযোগ নেই। প্রথম দিন থেকেই তারা বিচ্ছিন্ন, যে দিকে যার যোগ্যতা আছে সে সেই বিভাগে কাজ করতে গেছে। আর প্রতিদিন রিক্রিয়েশানে সমস্ত দলটা একত্রিত হয়ও যখন, আলোচনার বিষয়বস্তু সবার ভাল লাগার মত হয় যেন খেয়াল রাখতে হয় কড়া নিয়ম আছে, অতীতের উল্লেখ নিষিদ্ধ। কাজেই, এই প্রায় অপরিচিতা মেয়েদের সংগে কথা বলার কিছুই আর থাকে না বলতে গেলে। এক অবশ্য সামনের দৃশ্যের কথা বলা চলে, তা সে-ও তো সব সময় একই! সিস্টার মার্গারিটার তাগিদে পপলার গাছের তলা দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়ায় ওরা, গভীরভাবে নিঃশ্বাস নেয়। পরস্পরের মধ্যে অমিশুক ছাড়া-ছাড়া ভাব, ঐ পপলার গাছে ঝুলে থাকা গুটিপোকাগুলোর মত।

যাই হোক, একটা-দু'টো করে কনভেন্ট জীবনের গোপন দিক চোখে পড়ছে, কখন যে সঠিক সেগুলো চেনা হয়ে গেল গ্যাব্রিয়েল মনে করতে পারে না। প্রায় অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ গড়ে উঠছে, অন্তর জুড়ে তারই চেতনা। এই ছ'মাসের মধ্যে একদল শিক্ষানবীশ প্রথম ব্রত গ্রহণ করে দীক্ষিতাদের ছাবিটি নিলেন। তখন একবারও তার মনে হয় নি কালো পোশাকে কেমন দেখাচ্ছে দেখবার জন্য অত্যুগ্র বাসনা হতে পারে তাঁদের। একদিন সকালে ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটি প্রাক্তন শিক্ষানবীশকে আগে যেতে দেবার জন্য থামল, থেমে তাকিয়ে দেখল নতুন নামটি ব্যস্ত পায়ে যে কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এলেন সেই দিকে। আধ-খোলা সার্শির একদিকে কালো একটা এ্যাপ্রোণ ঝুলছে! তখনও কিন্তু কিছুই বোঝেনি কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে সিস্টার মার্গারিটা অহংকারের প্রলোভনের কথা বলছিলেন, বোঝাচ্ছিলেন কেন নানদের সপ্তাহে একবার মাত্র জুতো পালিশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রোজ নয়, যদিও কারো কারো মনে ইচ্ছা হতে পারে তাই। চকিতে সেদিন সেই মুহূর্তে গ্যাব্রিয়েল বুঝল সিস্টারের এই দর্পণহীন জগতে চুরি করে নিজেদের চেহারা দেখতে চেষ্টা করেন নিশ্চয়। অথচ অন্তরের সেই রহস্যময় নিশ্চয়তার সংগে সেদিন সকালের সেই স্মৃতির কোন যোগ ছিল না—সেই যে একদিকের সার্শির পিছনে কালো এ্যাপ্রোণ ঝুলছিল একটা··সার্শির ওপর কালো প্রতিবিম্ব পড়ে তাতে!

শিক্ষানবিশী নেবার প্রস্তুতিপর্বে প্রতিটি ধাপ পার হচ্ছে যেন তারই ভিতর দিয়ে। পুরোবর্তী দলের শিক্ষানবীশরা তো সর্বদাই রয়েছে চোখের সামনে, গোপনে তাদের সব সময়েই সমনোযোগে লক্ষ্য করা চলে, আর তাদের ওপরও আবার দীক্ষিতা নানরা রয়েছেন। এ যেন পূর্বাহ্নেই ভবিষ্যতের জীবনে বাস করছ তুমি! যতক্ষণ খুসী তাকিয়ে থাকতে পারা যায় ঐ জীবনের দিকে, ঐ জীবন নিয়ে চিন্তা করতেও পারা যায় সব সময়, যাবে না শুধু কথা বলা।

তবুও কেমন করে যেন বাতাসে-বাতাসে মনোভাবের আদান-প্রদান চলে।···

করিডরে সিস্টার উইলিয়াম যখন চলে যান পাশ দিয়ে, কত কিছু যে বলা হয়ে যায় আশ্চর্য! হয় তো তাকানও না তার দিকে, তবু তীক্ষ্ণ চোখ দু'টি কথা বলে তাঁর হয়ে···এমন একা একা সংগ্রাম কোর না সিস্টার, ঈশ্বরের করুণা আসবার পথ রাখ। সেন্ট কদাচিৎ কেউ হন, তাও কখনও একদিনে নয়।···একটি ত্রুটি সংশোধন করে নিতে নিতে অন্য আর দশটা মাথা তোলে, ড্রাগনের দাঁতের মত।···ভাল নান হবার প্রচেষ্টার সমাপ্তি নেই কোথাও, এ প্রচেষ্টা অসীম, অনন্ত কিন্তু আমাদের বানটি ভুলো না কখনও—ঈশ্বর যখন আদেশ করেন তিনিই দেন।···

তিনি চলে যাবার পরও নিস্তব্ধ প্যাসেজে সার্জের স্কার্টের মৃদু খমখম্ শব্দ সেই কথাই বলে চলে।

প্রতিদিন সকালে সব কিছু নবোদ্যমে শুরু করবার প্রেরণা নিয়ে ঘুম ভাঙে, ঈশ্বর সে শক্তি যোগান। যে চেতনার উৎপত্তি রহস্যাবরণে ঢাকা, বিস্তৃত হয়ে হয়ে নানদের অন্তর্জীবনকে সে চিনিয়ে দিচ্ছে যতই, একটা কথা বুঝতে পারছে গ্যাব্রিয়েল, তাদের প্রত্যেককেই বোধ হয় প্রতিদিনটি এমন করে শুরু করতে হয় যেন এটিই প্রথম দিন, তা সে তিনি ধর্মজীবনে যত পুরাতন হোন।

আর যতই প্রায়শ্চিত্ত করছে, বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে যে প্রকৃতি-সংগ্রামী এই জীবনে কখনও অভ্যস্ত হওয়া যায় না। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের জীবন এ, প্রত্যাবর্তিত পথে কাজ চলবে না কোনদিনও। চ্যাপেলে পৌঁছোতে দেরী হয়ে গেলে নেভের মাঝখানে সাষ্টাংগে প্রণতা হতে হয়, সুপিরিয়রের ইংগিত পেলে তাঁর সহকারিণী জামার আস্তিন ধরে টানেন একটু, নির্দিষ্ট জায়গায় পাঠিয়ে দেন। তার

আগে পর্যন্ত অমনি শুয়ে থাকাই নিয়ম। চিরব্রতা নানরাও অনেক সময় থাকেন এ দলে! তাঁদের দায়িত্বাধীন চাবির সংখ্যাই তাঁদের গুরুত্ব-নির্দেশক।

বহু জানলা দিয়ে তির্যক আলোক এসে পড়ে খাবার ঘরে, সেই উজ্জ্বলালোকে সেখানকার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ইউ আকারের টেবিলগুলোর মাথার দিকে সুপিরিয়রদের চেয়ার, আসতে দেরী হয়ে গেলে সেই চেয়ারগুলোর পাশে নতজানু হতে হয়—সবাই দেখতে পায়। তারওপর বসবার অনুমতি পাওয়া যখন, বেঞ্চের অন্যান্য সিস্টারদের ব্যতিব্যস্ত করতে হয়, ভারি খারাপ লাগে—এটা উপরি পাওনা।

চিত্রবৎ নিশ্চল, নিশ্চুপ বিশাল একদল মানবী—গঠনে, তাৎপর্যে প্রাচীন—বাধ্য হয়ে যেন ছিন্ন করতে হচ্ছে তাঁদের। যখনই এমন ঘটে, শিউরে ওঠে গ্যাব্রিয়েল। ইতোমধ্যেই নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার বিরুদ্ধে নান-সুলভ ভীতিটা অন্তরে দানা বেঁধেছে যেন। দেরী করে এল যে তার জায়গা যদি বেঞ্চের মাঝখানে হয় তো জনা দশেককে উঠতে হবে, সারবন্দী হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে যাতে সে তার নিজের জায়গায় যেতে পারে।

খাবার টেবিলের দিকে আড়চোখে একবার তাকালেই বোঝা যাবে, সেখানকার যত কিছু সাজ-সরঞ্জাম, সব উদ্দেশ্যে ও আকৃতিতে দারিদ্র্য-সাধনার উপযোগী। বড় বড় ন্যাপকিনগুলো একযোগে খাবার টেবিলের ন্যাপকিন আর যার যার টেবিল-ঢাকার কাজ করে। চটের মত মোটা অশুভ্র টুকরোগুলো—তার একটা দিক মাড় দেওয়া বিবের মধ্যে আটকানো হয়, আর একটা দিক টেবিলের ওপর বিছিয়ে কাঠের তক্তার প্লেটটা দিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকে। কাজেই উঠতে গেলে সেগুলো তো খুলে ফেলতে হবে প্রথমেই। যেতে যেতে বাধা পান যাঁরা, সামনের টেবিলে ন্যাপকিনগুলো রেখে দিয়ে তবে উঠতে পারেন। উঠে সুপিরিয়রকে বাও করে সারবন্দী বেরিয়ে আসেন। পশ্চাদ্গতা তাঁদের সামনে দিয়ে চলে আসার সময় প্রত্যেকের কাছে নিজের বুকে মৃদু আঘাত করে দু'বার—ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আমায়—বেঞ্চ আর টেবিলের মধ্যে দিয়ে নত হয়ে ঢোকে তারপর। সে কতটা লম্বা, অল্পবয়সী কি না, অনুক্রমের দিক দিয়ে কতটা প্রাচীন —কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সব সময়ই মনে হয় শুধু সে যেন চুপি চুপি আনত হয়ে ঢুকছে।

গ্যাব্রিয়েল তাই প্রার্থনা করত যাবার সময় যেন কোনদিন দেরী না হয় তার। পুরো এক সার সিস্টারকে বিশৃংখল করে দেওয়া, ভাবতেও খারাপ লাগে! চ্যাপেলে সাষ্টাংগে প্রণিপাত হওয়া এর অর্ধেকও ভয়াবহ নয়। মুখে হয় তো আধ-চিবোনো খাবার—এমনি সময় পরীক্ষায় ফেলতে হয় তাঁদের। হোলি রুল বলে: সিস্টারদের মুখভাব শান্ত হবে সর্বদা, ভাব-ভংগী হবে করুণার্দ্র—তারই পরীক্ষা।

ব্রত নেবার পথের প্রতিটি ধাপে পা দেবার আগে সেটি ব্যাখ্যা করা তো হয়ই, চারপাশে তাদের নীরব অভ্যাসও চোখে পড়ে অহরহ —বিস্ময়ের ঘোর তবুও কাটে না। ব্রত গ্রহণের দিন যত এগিয়ে আসছে, ত্যাগের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে তত বেশী। এ যেন একটা অত্যুচ্চ পর্বতশিখর—সিস্টার মার্গারিটা কিন্তু এমন ধীরে ধীরে চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার ওপর যে গ্যাব্রিয়েলের মনে হয় সে ইতোমধ্যেই পেরিয়ে এসেছে ঐ অত্যুংগ পর্বতশৃংগ! আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে, বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে আসতে যে হবে, এ জানা কথা, এসেছেও। প্রথম দিন থেকে চেষ্টা চলেছে তারই, সুগভীর নিষ্ঠায়।··· বাড়ীতে চিঠি লিখেছে মাত্র একখানা। তার চিন্তাধারা বা অনুভূতির কণামাত্রও প্রকাশের চেষ্টা নিরর্থক। কাজেই সে চিঠিও সংক্ষিপ্ত, গতানুগতিক—সব কিছু ভালই চলছে!···গ্রামের মেলায় পাগড়ীধারী ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাদের কাছ থেকে ভাইরা তার যেমন সব অতিপ্রাকৃত বচন কিনে আনত, তেমনি আর কি!·· সব ভাল যাচ্ছে!

মনে হয়েছিল জিনিষপত্রের প্রতি আসক্তি কাটিয়ে ওঠা স্বজনদের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে ওঠার চেয়ে কঠিন হবে না। সিস্টার মার্গারিটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যা কিছু তাদের কাছে রাখা আছে সযত্নে, ব্রত গ্রহণের আগের দিন রাত্রে সে-সব কিছুই তারা সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে বলে আশা করা হয়। সব চিঠি, সব ফটোগ্রাফ নষ্ট করে ফেলবে, এমন কোন জিনিষ যদি থাকে কাছে যা কোন বিশেষ স্মৃতির দিকে টানবে মনটাকে, তাহলে গরীবদের জন্য নির্দিষ্ট ঝুড়িটার কাছ দিয়ে ঘুরে যাবার সময় ফেলে দেবে সেখানে, এও প্রত্যাশা। জনের দেওয়া সোনার সৌখীন পেন্সিলটা একবার স্পর্শ করে দেখল, স্কার্টের পকেটে রাখে সেটা। গরীবদের ঝুড়িতে এটা ফেলে দেবার সময় এলে বলবে, অল ফর জিসাস্, তাহলে আর তেমন কষ্ট হবে না।

চুল কেটে ফেলার কথায় এলেন যখন কোমলকণ্ঠে কথা বলছিলেন সিস্টার মার্গারিটা। বাহ্য আকৃতির আকর্ষণ জয় করতে হবে, চুল নারীর প্রধান ভূষণ।

মাথার চুলগুলো ছেঁটে ফেলাই ভবিতব্য, গ্যাব্রিয়েলের মনে সেজন্য কোন চঞ্চলতা নেই। যদিও একথাও ভাল করেই জানে, নানদের ব্যাণ্ড আর বনেটের নীচে কেশহীন মাথাটা সাংসারিক জগতের কল্পনাকে সবচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ করে, বলতে গেল মঠবাসিনীদের জীবনের আর সব দিকের চেয়েই। তার মতে কিন্তু ত্যাগের দিক দিয়ে চুল কেটে দেওয়া সবচেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত। শুধু তাই নয়, এখন থেকে যাদের স্কাল-ক্যাপ পরতে হবে, কয়ফের ভার তার ওপর, মাড় দেওয়া ঠেকনোগুলো এবং সব শেষে লম্বা ভেল—তাদের পক্ষে এ পদ্ধতি স্বাস্থ্যকরও বটে। আসল ঘটনাটি সম্বন্ধে সে কৌতূহলীও নয়, কেন না ইতোমধ্যেই একদিন ব্যাপারটা সে প্রত্যক্ষ করেছিল— লণ্ড্রীতে তাকে একদিন পাঠানো হয়েছিল তখন।

পূর্ববর্তী একটি দলের মেয়েরা কাঠের বেঞ্চে বসেছিল, ক্লিপার আর বড় কাঁচি নিয়ে তিনজন নান তাদের কর্তৃত্বে ছিলেন। চুল কাটার পর্ব সমাপ্ত তখন, ধান কেটে নেবার পর ধানের ক্ষেত যেমন দেখতে লাগে কেশহীন মাথাগুলো তেমনই দেখাচ্ছিল। পাথরের মেঝেয় চুলের ছড়াছড়ি···গুচ্ছ গুচ্ছ বাদামী আর ফিকে সোনালী রংয়ের চুল··চুল কাটছেন যে নানরা, আসা-যাওয়া করতে তাঁদের জুতোয় জড়িয়ে গেছে কিছু। মেয়েগুলির সংগে কথা বলছেন নানরা, দৃশ্যটা চুল কাটার চেয়েও বেশী চমকপ্রদ। আন্দাজ করা যায়, এটা একটা বিশেষ অনুমতি। যাদের চুল কাটা হ'ল, ভয়টা কাটিয়ে উঠে তারা সহজ হতে পারে যাতে তাই এই ব্যবস্থা। আবার অন্যদের চুল ছাঁটার পর কেমন দেখাচ্ছে দেখতে দেখতে হেসে ফেলার সম্ভাবনাও থেকে যায় তো!

এক পলকে দেখা ভবিষ্যতের এই আভাসটুকুর জন্য ত্যাগের শেষ অধ্যায়টা যে অন্যদের তুলনায় বেশী ভয়ংকর হয়ে উঠল তা নয়। তোমার বাবা আর ভাইদের ছবি, তোমার সোনার পেন্সিলটা, পাঁচটা ঘরোয়া গল্পে ভরা পিসিমার চিঠিখানি, তোমার চুল···ভাবছে যখন উপলব্ধি করেনি স্থান পাত্রের সংগে জড়িত অনুভূতির এলাকা ছাড়িয়ে সহজাত মানব-প্রকৃতির গভীরে ত্যাগের অনেক উপাদান ডালপালা ছড়িয়ে আছে। তোমার জন্মের দিন থেকে তোমারই অংশ হয়ে আছে।

চ্যাপেলে একটি শিক্ষানবীশ মেয়েকে প্রথম অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে সব নিয়ম ভেঙে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল।

নতজানু হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ নান আর শিক্ষানবীশদের মাঝেই লুটিয়ে পড়েছে মেয়েটি, লিট্‌ল অফিসখানা ছিটকে পড়েছে হাত থেকে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে যেন। তবু তারা কেউ চোখ তুলেও একবার তাকায় নি কয়েকটি মুহূর্ত। উপাসনা চলছে। আবপাশে সিস্টারদের মুখে দানবীয় নিস্পৃহতা, জ্ঞানশূন্য মেয়েটি সম্বন্ধে সবাই সম্পূর্ণ উদাসীন···সামনেই কার্পেটের ওপর সংকুচিত দেহে কেউ এলিয়ে পড়ে নেই যেন। তারপর গ্যাব্রিয়েল দেখল কমিউনিটির স্বাস্থ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নানটি নেমে এলেন আইলে, নিকটতমা সিস্টারটির জামার আস্তিন ধরে আকর্ষণ করতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন তখনই। অচেতন দেহটাকে আইল দিয়ে বয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। একশো জনের পাশ দিয়ে চলে গেলেন, মাথা ঘুরিয়ে চাইল না কেউ, দু'শো চোখের একাগ্র দৃষ্টি অলটারের দিকে স্থির হয়ে রইল।

আর সে যে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সেটা হৃদয়হীনতার দিকে নয়, নির্লিপ্ততার রূপায়ণের দিকে। এতদিন যে নিয়ম-শৃংখলা আয়ত্ত করতে তৎপর ছিল, এ নির্লিপ্ততা তার ঊর্ধ্বে···কেঁপে উঠেছিল অনুভব করে। ত্যাগের অভ্যাস এমনই সুদূরপ্রসারী হবে যে, সহজাত মানবধর্মের ডাকও আর পৌঁছোবে না কানে। নিরাশ হয়ে ভেবেছিল সেইক্ষণেই, কেমন করে পারবে! ভেবেছিল এ লক্ষ্যে পৌঁছোবে না সে কোনদিন। খেয়াল ছিল না, সে যে তার নার্সসুলভ প্রবৃত্তি দমন করেছে, সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি ছুটে, এতে করেই ঐ অত্যুংগ পর্বতারোহণের প্রথম চড়াইটা পেরিয়েই এসেছে।

উত্তরকালে নিখুঁত সদয়তা আয়ত্তে এল যখন, কোন সিস্টার যন্ত্রণাভোগ করছেন, চ্যাপেলে নতজানু হয়ে আছেন একাকী, নিঃশব্দে কাঁদছেন দু'টি হাতের পাতায় মুখ ঢেকে, কোন ঔদ্ধত্যকে বাধ্যতার বশে আনতে গোপনে উপবাস করছেন—তখন আর দেখেও দেখত না। তবুও জেনেছিল পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততার তুষারচূড়ায় তাদের মধ্যে খুব কম জনই পৌঁছোবে কোনদিন, আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় পৌঁছোতে তারা পেরেছে বুঝি। আর আসল কথা হল পৌঁছোতে পারলেও সেটা বজায় রাখা আরও অনেক বেশী দুরূহ। কখন যে কান দুর্বল মুহূর্তে ব্যর্থতা আসবে পতন ঘটবে কোন অবস্থাতেই কেউ তা অনুমান করতে পারে না।

ব্রত গ্রহণের পুরোবর্তী এক সপ্তাহ নির্জনে ধর্ম চিন্তায় কাটাল তারা। শেষদিন সন্ধ্যায় নানদের অন্তর্বাস দেওয়া হল তাদের। প্রত্যেকটির সংগে তার নির্দিষ্ট নম্বরটি সেলাই করা। হাতে বোনা কালো মোজা আর তার ওপরের বন্ধনী লম্বা হাতা সেমিজ—ঝুলে হাঁটু পর্যন্ত গ্যাব্রিয়েল পরে দেখছিল নিজে!

···মনে বিচিত্র অনুভূতি···সিস্টার মারিয়া পলিকার্পে চেয়ে চেয়ে দেখছেন যেন···দেখছেন ১০৭২ নম্বরের পোশাকগুলো নবজীবনে পূর্ণ হয়ে উঠছে।

··শতাব্দ মিশনারী সিস্টারটির মুখখানি কনভেন্ট ম্যাগাজিনের ছবিতে দেখে দেখে চেনা হয়ে গেছে···সেই মুখখানি যেন তারই দিকে ঝুঁকে আছে। ফ্যাকাসে ডিম্বাকৃতি মুখ একখানি···একটুকরো নিষ্প্রভ হাসি।

কল্পনার ছবিটা নিজের ঘরে একটা আয়না থাকার মত কাজ করছে।

কালো সার্জের স্কার্টটা কাঁধের ওপর দিয়ে গলিয়ে দিল। কোমরের কাছে আটকে দিতে ঝুলটা ছড়িয়ে পড়ল মাটি অবধি। সুন্দর পোশাকটি; এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত পায়চারি করে এল বার কয়েক···ভারি করে মোড়া প্রান্তভাগ চলার সংগে সংগে দুলছে এদিক-ওদিক, দেখল তাই চেয়ে চেয়ে। পকেট খুঁজে পেয়ে তার মধ্যে হাত দু'টো ঢুকিয়ে দিয়েছে আস্তে আস্তে। জিনিস লুকিয়ে রাখার চমৎকার জায়গা হত এই পকেটগুলো, অনুমতি থাকত যদি! পকেটগুলো এত বড় আর এমন বুদ্ধি করে ভাঁজগুলোর মধ্যে লুকোনো যে তাতে নিজস্ব যা কিছু জিনিসপত্র সব লুকিয়ে রেখেও জায়গা থাকবে আরও, তাদের এতটুকু অস্তিত্বও টের পাওয়া যাবে না আদপে।

কল্পনায় দেখছে সিস্টার মারিয়া পলিকার্পে সখেদে মাথা নাড়ছেন···এমন চিন্তা মনে আসবে কেন!

শিক্ষানবীশদের শিক্ষয়িত্রীও সিস্টার মার্গারিটার মতই কঠোর, অমনই সুন্দর। ঐ পকেটগুলোয় কি কি জিনিষ রাখতে পারেন নানরা তার তালিকা করে দিয়েছেন। অন্য কিছু রাখলে শেষ পর্যন্ত বিবেক বাধ্য করবে নিজের অবাধ্যতার কথা জানাতে। অনুমোদিত জিনিষ দু'টো রাখা রয়েছে ড্রসিং ষ্ট্যান্ডে, গ্যাব্রিয়েল তাকাল সেগুলোর দিকে। কালো শক্ত চামড়ার থলি একটা তার মধ্যে ভারতীয় কাগজে ছাপা লিট্‌ল অফিসের একটি সংস্করণ বিবেক-পরীক্ষার নোটখাতাখানা আর খানকয়েক পুস্তিকা রাখতে পারা যাবে। কব্জা দিয়ে আটকানো ঢাকনা দেওয়া ছোট গোল একটা বাক্স, তার মধ্যে পিনকুশন আছে, সাদা-মাথা পিন কতকগুলো আটকানোই আছে তাতে—ভেল আটকাতে লাগবে। চামড়ার ছোট থলিতে ছোট একটি জপমালা। কলমকাটা ছুরী একটা। একটা খিম্বল, সেলাই করার সময় আঙুলে টুপির মত পরে সেটা। নীলেতে সাদাতে বড় সূতির রুমাল একখানা—নানের কাছে এই একটিমাত্রই রঙীন জিনিস থাকতে পায়।

ব্রত নেবার পর কিন্তু জিনিষপত্র রাখার আরও একটা জায়গা বাড়বে। স্ক্যাপুলারের নীচে, ঐ বহির্বাসটায়। ওটা একটা পশমের হাতকাটা রোব—ঝুলে কাঁধ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত, সামনে-পিছনে দু'দিকেই। সিসট্রেস বলছিলেন, ওটা যীশুর যোয়ালের প্রতীক। এর ওপর বকলস দিয়ে চামড়ার বেল্টটা আটকে দিলে হাতের কাছে আর একটা ছোট থলি তৈরী হয়ে যায়। কোন আত্মীয়ের

মৃত্যু-সংবাদের কালো বর্ডার দেওয়া চিঠি রাখা চলে তাতে। অথবা কোন প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া ছাপানো প্রার্থনা কার্ড। তা বলে স্ক্যাপুলারের নীচে কিছু আছে বলে ধরা না যায় যেন। কাজেই এমন কিছু রাখা চলবে না যাতে উঁচু হয়ে থাকবে, বোঝা যাবে বাইরে থেকে।

পকেট থেকে হাত দু'খানা বার করে এনেছে। মুহূর্তখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিচিত পোশাকগুলোর ওপর মনে মনে যোগ করল সাদা গাউনটা, স্ক্যাপুলার, ভেল আর কেপটা।

মনের চোখ দিয়ে নিজের চেহারাটা দেখছে, কাল সকালে বাড়ীর লোকেরা তাকে দেখবে যেমন।

তবু রক্ষা, সন্ন্যাসিনীর পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় মঠ সত্যাই পসচুল্যান্টদের কনের সাজে পাঠায় না। ভাইদের ওপর তার প্রতিক্রিয়াটা কেমন হ'ত কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে।

ডিউটির পোশাক বদলাতে বদলাতে তাদের হাসিমাখা মুখগুলো ভাসছে চোখের সামনে। হাতটা মাথার টুপিটায় ঠেকে গেল··· চুলগুলো ছাঁটা—কল্পনা বাধা পেয়ে মাঝপথেই থামল।

সচেতন হয়ে মনে মনে ভাবল এই মনে করিয়ে দেবার জন্যই এর দরকার।

তুতির সাদা ক্যাপটা মাথার ওপর আঁট হয়ে বসে। আরও আঁট করার জন্য ফিতে আছে: এ টুপির বিশেষত্ব সেটাই।

সিসটেস বলেছেন, যত আঁট করে বাঁধবে ফিতেগুলো, কল্পনা তত সংযত থাকবে। ভাল করে বেঁধো তোমরা এগুলো। আকাশ-কুসুম কল্পনায় ঈশ্বরের সময় নষ্ট করি না আমরা···

···আগ্রহাতিশয্যে অতিরিক্ত আঁট করে ফেলেছে ফিতেগুলো, এবার সেগুলো ঢিলে করে দিল গ্যাব্রিয়েল। বিছানার পাশে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে বসল তারপর, পসচুল্যান্ট হিসেবে এই তার শেষ প্রার্থনা।

কোন ভোরে দিন শুরু হয়, ঘুম আসতে তাই সময় লাগে না মোটেই। সে রাতে কিন্তু প্রতি ঘণ্টায় শহরের ক্যাথিড্রালের ঘণ্টাধ্বনি কানে এল তার। চারপাশে গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ, খড়ের থলির খস্‌খস্ আওয়াজ···ডরমিটরির জানলা দিয়ে ভেসে-আসা ঘণ্টার ঐ সুরেলা ধ্বনি মিলছে তার সংগে। সেদিন বিকেলে সুপিরিয়র জেনারেলের সংগে কথাবার্তাগুলো মনে পড়ছে, একদিন কংগোতে মিশনারী সিস্টার হয়ে যাবার গোপন বাসনাটুকু লুকোনো ছিল মনে। রেভারেন্ড মাদার ইমাম্যুয়েলের উজ্জ্বল কালো চোখ দু'টো যেন বাইরে টেনে নিয়ে এল কথাটা। অথচ সে গোপন বাসনার আভাস মাত্র দিতে চায়নি সে। বলতে চেয়েছিল সে আশা করে ভাল নার্স হবে, ভাল নান হবে, যেখানে পাঠানো হবে তাকে বিনা দ্বিধায় যাবে। ঈশ্বরের কত শত কাজ আছে, তার জন্য যে জায়গাই নির্দিষ্ট হোক সত্যাই কিছু আসে-যায় না···ঘণ্টাধ্বনি মধ্যরাত্রি ঘোষণা করছে।

রেভারেন্ড মাদার হেসেছিলেন, অতি ব্যস্ততায় কেউ চাঁদের দিকে হাত বাড়ালে যেমন করে হাসে মানুষ।

—আমরা দেখব মাই চাইল্ড্। সব-চেয়ে যারা দৃঢ় চিত্ত, মিশনের জন্যে কেবল সেই সব সিস্টারদেরই বেছে নিই আমরা। নার্সিং কোয়ালিফিকেশন যা আছে তোমার, তাতে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবারই সম্ভাবনা, কিন্তু এখানকার আদর্শে গড়ে উঠতে তো তোমার এখনও অনেক দেরী। এই আদর্শই আমাদের মিশনারীদের বর্ম, এ তো একদিনে আয়ত্তে আসবে না। ধৈর্য চাই, চিরন্তন প্রার্থনায় করুণা ভিক্ষা চাই।

আমরা দেখব···আমরা দেখব···তিনটি ঘণ্টা এক তালে বাজছে প্রতিধ্বনির মত। দু'ঘণ্টাও সময় নেই আর, গ্যাব্রিয়েল ভাবছে। প্রত্যাশা দিয়ে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার আচমকা ধাক্কাটা জয় করতে শিখেছে, এখন তারই প্রতীক্ষায় শুয়ে সে।

ম্যাস অবধি প্রভাতের নিয়মিত প্রার্থনাগুলো সারা হ'ল একে-একে। সাতটা বাজল যখন, সন্ন্যাসিনীর পোশাক গ্রহণানুষ্ঠানের জন্য তৈরী তারা। অতিথিদের দিকে ওদের নিকটাত্মীয়রা বসে আছেন সব। ম্যাজিনসের মনসিগনর নানদের আর সমবেত আত্মীয়দের একটি সারমনের পাঠ দিতে শুরু করলেন। ওরা ততক্ষণে পোশাকের ঘরে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেখানে দুটি টেবিলে ভাবি নানদের পরিধেয় বাকি সমস্ত পোশাকগুলো রাখা—চামড়ার বেল্ট, মাড় দেওয়া গুইম্প, ভেল আর স্ক্যাপুলার। আলাদা আলাদা সাঁইত্রিশটি পরিচ্ছন্ন থাকে সাজানো।

গ্যাব্রিয়েল সব কিছুই দেখছে। সহস্রাক্ষী যেন, একসংগে সব দিকেই তাকাতে পারে।

কমিউনিটির প্রধান চারজন—সুপিরিয়র জেনারেল, মাদার সুপিরিয়র, শিক্ষানবীশদের সিসটেস আর পসচুল্যান্টদের সিসটেস—তাদের পোশাক পরাবেন বলে অপেক্ষা করে আছেন পরিচারিকার মত। ওঁরা কালো স্কার্টের ওপর সাদা গাউন পরিয়ে দিচ্ছেন যখন, চিবুকের নীচে চওড়া শক্ত গুইম্পগুলো ঠিক মত আটকে দিচ্ছেন, খামারের মেয়েগুলো আরক্তিম হয়ে উঠছে। ভেল আর স্ক্যাপুলারটি আশীর্বাদ করে দেওয়া, পরবার আগে ওরা চুম্বন করবে সেগুলি। আজ বলে নয়, এখন থেকে এ জীবনের প্রত্যহ প্রভাতে পোশাকের মধ্যে এইগুলি এমনি চুম্বন করতে হবে। নিজের পালার প্রতীক্ষা করতে করতে পোশাক পরা যাদের হয়ে গেছে তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল গ্যাব্রিয়েল। কয়েকটা সামনে মুখের চারদিকে টেনে দেওয়ামাত্র কি একটা পরিবর্তন আসছে, তাকে ব্যাখ্যা করা চলে না ঠিক। ফ্লেমিস-ইংরেজ-আইরিশের ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে, একই রকম দেখাচ্ছে এবার সবাইকে।

গ্যাব্রিয়েলের মনে হচ্ছে ওরা দেবদূত যেন, হালকা বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

সিসটেস দেখিয়ে দিলেন গুইম্পটা কি ভাবে পিছন থেকে ওপরে আর সামনের দিকে টেনে নিতে হয়, যাতে মুখের চারদিক ঘিরে ওটা ফ্রেমের মত বসে। এবার গ্যাব্রিয়েল বুঝতে পারছে কেন ওদের বিস্মিত মনে হচ্ছিল। দু'পাশের যা কিছু সব মুছে গেছে একেবারে চোখে যেন ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে কে! মনে পড়ে গেছে, গুইম্পের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যও এই। যে দিকে চেয়ে থাকার কথা তোমার সেই দিকেই চাওয়াবে তোমাকে···সোজা ঈশ্বরের দিকে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সব সময় কি হয় তাই?

মিছিলের সংগে আইল দিয়ে যাচ্ছে যখন অলটার আর প্রতিনিধি-যাজকের দিকে চেয়ে, মনে মনে বুঝতে পারছে জন বসে আছে অতিথিদের মধ্যে। এমনই স্থির-নিশ্চয় যেন মাদার পিছন দিক দিয়ে দেখছে।

নিশ্চয়তাটা নিমেষের জন্য ধাক্কা দিল অন্তরে।

আর কিছুর জন্য নয়. জন কথা দিয়েছিল কখনও তাকে দেখবার চেষ্টা করবে না কোনদিন, ওর কথার নড়চড় হয় না।···মনের চোখে দেখছে শেষ সারির মধ্যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে, ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে চলমানা শ্বেতমূর্ত্তিগুলোর দিকে, তবু ধরতে পারছে না তাদের মধ্যে কোন জন সে। পারছে না তার কারণ আগেকার সেই স্বচ্ছন্দ বলিষ্ঠ গমনভংগীর মাঝে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না আর। এই পরিবর্তনটাই বেশী ঢেকে রেখেছে তাকে জনের চোখ থেকে, পরিহিত পোশাকগুলোর চেয়েও বেশী।

মনসিগনর সুর করে আবৃত্তি করছেন, এস প্রভু যীশুর সেবিকা—ওরা একে একে এসে দাঁড়াচ্ছে অলটারের সামনে···ভেলের ওপর দিয়ে মাথায় তাদের লালচে ফুলের কুঁড়ির রিম পরিয়ে দেওয়া হ'ল।

সমাহিত পদক্ষেপে চলছে, এখনও এ ভংগী বজায় রাখতে সদা সচেতন হয়ে থাকতে হয়।

দু' সারিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়ার দল পরম প্রভুর নামগান করছেন আনন্দস্বরে। চলার পথের দু'ধারে ওঁরা দাঁড়িয়ে আছেন যেন রক্ষাপ্রাচীরের মত, সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। অলটারের কার্পেট মোড়া সিঁড়ি ক'টি সামনে খোলা কেবল··· যে পথ তার রাজাধিরাজের পদপ্রান্তে নিয়ে যাবে তাকে আর তাকে তার নতুন নামের যোগ্য করে তুলবে।

যে নামে এখন থেকে পরিচিত হবে সে—সিস্টার লুক।

পরে মঠের সব সিস্টারকে আলিংগন করতে অনেকটা সময় গেল।

হাল্কা আলিংগন, দৈহিক স্পর্শটুকু বিহ্বল করে তোলে তবু। চোখে জল এসেছে দেখতে পেলে মাঝে মাঝে তার হাতের ওপর তাঁদের হাতের চাপ এসে পড়ছে। ওর ইচ্ছা হ'ল বলতে, আর ক'জন নতুন মেয়ের মত ভয় পেয়ে চোখে জল আসেনি তার, আত্ম-করুণাতেও না। অন্যদের মত স্বর্গীয় আনন্দেও নয়। এ কেবল তার স্বস্তির অশ্রুজল!

মন বলতে চাইছে, দু' পথের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, পেরিয়ে আসতে পেরে এবার হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি!

ঘুরে ঘুরে সব নানকে 'শান্তি চুম্বন' দিয়ে আলিঙ্গন করতে করতে হামেশাই এক একখানি সমাহিত মুখ চোখে পড়ছে। বয়স্কের মধ্যে মুখখানা দেখাচ্ছে যেন খোলায় লুকোনো কাছিমের মুখের মত ··· অনেক বছর পরে একদিন সেও এমনি নতুন মেয়েদের কাছ থেকে 'শান্তি চুম্বন' গ্রহণ করবে। তার কপোলের নাগাল পেতেও তার

ঘাড় দেওয়া গুইম্পের ওপর এমনি চাপ দেবে তারা। আর সে প্রাণপণে সংযত রাখতে চেষ্টা করবে নিজেকে—লালচে কুঁড়ির রিমে ঘেরা তরুণ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আলিংগনের প্রত্যুত্তরটা আবেগময় হয়ে না যায়!

মঠে পা দেওয়াব থেকে এই সিস্টাররাই তার আত্মীয়-স্বজন যা কিছু, আর এতদিন যাঁরা আপনার জন ছিলেন তাঁরা এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মীয়।

সেই দ্বিতীয় আত্মীয়-পরিবারকে সম্ভাষণ জানাতে বসবার ঘরে গেল যখন, কাঁপছিল।

বাবা খব সপ্রতিভ ভাবে বীরোচিত ভংগীতে এগিয়ে এসে হাত দু'টো তাঁর নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। পিছনে ট্যান্ট্ কলেট দাঁড়িয়ে সবচেয়ে ছোট ভাইটির হাত ধরে। বিয়ে-থা করেননি ভদ্রমহিলা, সম্পর্কে ওর পিসি হন।

সস্নেহে বাবাকে বলল, চিকিৎসক পরিবার!—ঠাটাটা বাবার প্রিয়, গর্বেরও।

—আর তুমি! চিকিৎসক-সুলভ বিশ্লেষণী দৃষ্টির অন্তরালে মনের আবেগ লুকিয়ে ফেলেছেন বাবা, রোগা হয়ে গেছেন! অনুষ্ঠানে তোমায় দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভয় পেয়েছ!

—তুমিও ভয় পেতে দাদা, ভগবানের কাছে যেতে যখন—অবশ্য কোনদিনও যেতে যদি সত্যি!—ট্যান্ট্ কলেটের মন্তব্য।

সোৎসাহে চুমু খেলেন গ্যাব্রিয়েলকে। কানে কানে বললেন, বেচারা জন! কতবার যে ঢুকল আর বেরুল! অবশ্য তোমাকে আর বলছি কি, তুমি তো টের পেয়েছই।

ভাইরা গম্ভীর মুখে করমর্দন করল, বলবার মত কিছু খুঁজেই পেল না।

সব ছোট ভাইটি কেবল জিজ্ঞাসা করল মাথার ঐ লালচে ফুলগুলো আসল কি না।

ট্যান্ট্ কলেট বললেন, ওরা খুব বাধ্য ছেলে। যা তোরা আজকের উৎসবে সিস্টাররা কত কেক তৈরী করেছেন কত যত্ন করে, চেখে আয়।

বাবা বললেন, ও এরই মধ্যে বশ করে ফেলেছে ওদের।

—তোমাকেও তো বুড়ো ছেলে।—পিসি সপ্রতিভ ভাবে মাথা নাড়লেন ভাইয়ের দিকে চেয়ে, ভাই তাঁর পরম শ্রদ্ধার। গ্যাবি, মাফলারটা গলায় জড়িয়েছে, লক্ষ্য করিস কিন্তু।

মনে হচ্ছিল বাবার পক্ষে কথাবার্তা চালানো দুষ্কর হয়ে উঠছে। কথা অল্পই বলছেন, বারবার তাকাচ্ছেন নিজের ঘড়ির দিকে। পিসি না থাকলে এই দেখাটা অসহনীয় রকম আড়ষ্ট হয়ে উঠত। তিনি বরং অনেক আবোল-তাবোল গল্পে নীরব মুহূর্তগুলো ভরে দিলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে যথেষ্ট খেতে দিচ্ছে কি না। বাবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি কোথাও কিছু হচ্ছে না জানালেন—শুক্রবার ঠিক সওয়া একটায় অর্ধেক খোলায় সাজানো জীল্যাণ্ডের অয়েসটার পর্যন্ত ডজনখানেক পাচ্ছেন তিনি নিয়মিত।

দেখা সাক্ষাতের সময়টা পার হয়ে যেতে সেও যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বাবার সহজ হবার প্রয়াস বেদনা দিয়েছে তাকে, বিহ্বল করেছে। সতীর্থদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতাও একই ধরণের। বেদনাহত মুখে ফিরে এল তারা বসবার ঘর থেকে, মাথার লালচে ফুলের রিমগুলো খুলে ফেলল··গীর্জার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তখনও ঝুড়ি নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ান নি সেগুলো জড়ো করে তুলে নিয়ে যেতে।

···আচ্ছা এই রিমটাই কি?

সাংসারিক জগৎ থেকে বার করে আনা এই প্রতীক চিহ্নটাই কি মূক করে রাখল ওদের আত্মীয়দের, কথা বলতে দিল না?

সেইদিনই রাত্রে হস্‌পিটাল ওয়ার্ডে তার ডিউটি পড়তে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। নিদ্রাতুর বৃদ্ধা নানটির কাছ থেকে সেই সবেমাত্র কাজের ভার বুঝে নিয়েছে, সব ক'টা কলিংবেল এক সংগে বাজতে লাগল। তখনও জানে না মাদার হাউসের সব হাসপাতাল, সব দাতব্যালয় জুড়ে এই একই ব্যাপার ঘটছে এখন। এমন অনেক বৃদ্ধ রোগী আছেন বছরের পর বছর যাঁরা হাসপাতালেরই তত্ত্বাবধানে রয়েছেন—কনভেন্টের জীবন এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে তাঁদের যেন এই কমিউনিটির লোক তাঁরা। সর্বত্রই তাঁরা অপেক্ষা করে আছেন নতুন নানদের দেখবেন বলে।

··লাল আলোগুলো দপদপ করে জ্বলছে—উৎকণ্ঠিত পায়ে নিজের ওয়ার্ডে এল তাড়াতাড়ি।

যে দরজা দিয়ে সে ঢুকবে সবাই জানে সেই দিকে চেয়ে রোগীরা সব উঠে বসে আছে! বিছানার সারির প্রথম থেকে কাজ শুরু করল সে—বালিশ ঠিক করে দিল, কাউকে এক ঢোক জল খাওয়ালো বা ব্যাণ্ডেজটা একটু ঠিক-ঠাক করে দিল কারো, যাতে একটু স্বস্তি পায়। তারই মধ্যে শুনছে চারপাশে অবাধ্য গুঞ্জন···গ্র্যানড্ সাইলেন্স'ভাঙছে, সিস্টার তুমি কি সুন্দর।

ও তবুও শুনেও না শোনার ভাণ করছে।

কিন্তু দেখতে পাচ্ছে বার্ধক্যের নিষ্প্রভ চোখে পুঞ্জীভূত বিস্ময়··· এর আগে অবধি পসচুল্যানটের ছোট কালো পোশাকে দেখেছে সবাই।

দেখে বক্ষস্পন্দন দ্রুত হল।

মনে মনে ভাবছে বাবাও যেমন শেষ দেখেছিলেন আমায়। খুব বেশী হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন বলে যে কথা তিনি বলতে পারেন নি, এরা তা বলে দিল। এদের বলায় কৃতজ্ঞতার ভাবাবেগ মেশানো ছিল, এই যা। বাবার ব্যবহারে বিহ্বল করেছিল, এখন এদের মুখে নিজের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে মনে মনে শুভেচ্ছা জানাল তাদের।

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলছে তারা, আহা সিস্টার, নান হয়ে ভারি চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে! [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

অজিতকৃষ্ণ বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাসরী মঞ্জিল

'হ্যাঁ, তাই শোনাচ্ছি। কোন পর্যন্ত বলেছিলাম যেন?' প্রশ্ন করলেন নিমাই মিত্তির।

বললাম, 'বলেছিলেন এই কলঙ্ককাহিনীর নায়িকা ছিল রূপসী তহমিনা, যার দেহে ছিল ভারতীয় আর অভারতীয় রক্তের মিশ্রণ।'

'হ্যাঁ নীলনদের দেশের রক্তও ছিল তহমিনার দেহে। আর বয়স ছিল উনিশ।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'আশ্চর্য সুন্দর, আয়ত দু'টি চোখে স্বপ্নের আবেশ মাখানো আবেশ জাগানো দু'টি নীল তারা। অমন আশ্চর্য রূপ, অমন নিখুঁত, নিটোল, অপরূপ দেহের গড়ন নাকি আর দেখা যায় না। নারীরূপ বর্ণনায় আমি কালিদাস নই; সে বয়সও আর নেই মশায়। উনিশ বসন্তের অনন্যা রূপসী তহমিনার রূপ আপনি বরং কল্পনাই করে নিন। নানা কায়দায় ঐ রূপ দেখিয়ে শাঁসালো পুরুষদের মাথা ঘুরিয়ে-দেওয়াই ছিল ওর মাতৃকব্যবসা। মানে ওর মায়ের মতো ওরও ঐ রূপই ছিল মূলধন। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করাবার সময় মেনকাকে পাওয়া না গেলে তহমিনাকে পাঠিয়েও অনায়াসে কর্ম ফতে করা যেতো। বুঝলেন না ব্যাপারটা?'

'বুঝলাম।'

বুঝলাম মেনকার বদলে তহমিনাও শকুন্তলা-জননী হতে পারতো। এই কথাই বোঝাতে চাইছেন ভূতপূর্ব এ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির এবং এটা আমি না বুঝলে ওঁর চটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

'তহমিনার মা ছিল উঁচু মহলে জনপ্রিয়া, হট, ফেভরিট, রূপসী নর্তকী, মর্জিনা বাঈজী।' বললেন নিমাই মিত্তির। এককালে মর্জিনারও রূপযৌবনের তুলনা ছিল না বটে, কিন্তু তহমিনার মতো নয়। মর্জিনার ছিল শুধু এদেশী রূপ, আর তহমিনার ছিল রূপ সঙ্কর, ভারতীয় রূপের সঙ্গে মিশরী রূপের জোড়, বলেছি তো আপনাকে। মর্জিনা বাঈজীর গলায় গান খেলতো বটে, কিন্তু তার মুজরো ছিল যে সব সাহেব-সুবো, কাপ্তান আর হোমরা-চোমরাদের ক্লাবে, বৈঠকে, আসরে, আড্ডায়, মাইফেলে, তাদের কাছে আসল আকর্ষণ ছিল মর্জিনা বাঈজীর হাস্যমুখ আর লাস্যনৃত্য; গানের ফাউটা হলেও চলতো, না হলেও আপত্তি হতো না। মর্জিনা বাঈজী পয়সা লুটতো তার কাপ্তান খদ্দেরদের চোখের খোরাক জুগিয়ে, কান খুশী করে নয়। একবার মিশর থেকে এসেছিলেন এক মস্ত ব্যবসাদার, ব্যবসাসংক্রান্ত কি একটা কাজে। যেমন পয়সাওয়ালা, তেমনি সুপুরুষ, তেমনি নারী-রূপ সৌখীন। তৌফিক বে তাঁর নাম। দেশে তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছিল কি না জানিনে, জেনে দরকারও নেই; শুধু জানি বিদেশে এসেছেন বলেই নারীসঙ্গ বর্জিত হয়ে নিশিযাপন করতে হবে, এমন কিছু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন নি তৌফিক বে? এক নাচের আসরে মর্জিনা বাঈজীর নাচ দেখে তাঁর চোখ নেচে উঠল আর মন নেচে উঠল। তারপর দেশে ফেরৎ রওনা হবার আগে একমাস ধনী মিশরী সওদাগর তৌফিক বে হলেন রূপসী নর্তকী মর্জিনা বাঈজীর কুটিরে পেয়িং গেষ্ট, পয়সা দেনেওয়ালা অতিথি।'

'তারপর?'

'অনেক সোনা, অনেক টাকা পরমানন্দে জায়গা বদলালো তৌফিক বে'র ভাণ্ডার থেকে মর্জিনা বাঈজীর ভাণ্ডারে। মর্জিনাকে

আরো অন্তরঙ্গ দান অকৃপণভাবে দিয়ে গেলেন তৌফিক যে, তারই স্মরণচিহ্ন সুন্দরী তহমিনা, বাদশা পালোয়ানের জীবনের কলঙ্ক কাহিনীর নায়িকা।'

কাহিনীর ভূমিকাতেই এতটা সময় গেল। আমি আসল কাহিনীটি শুনবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে বললাম, 'এবার যদি কাহিনীটা না বলেন তাহলে কি করে বুঝব কি হিসেবে তহমিনা এ কাহিনীর নায়িকা?'

নিমাই মিত্তির একমুখ অম্বুরী ধোঁয়া হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'প্রথমেই ব্রহ্মচর্য পালনের আবশ্যকতার কথাটা ভালো করে বলে নেওয়া দরকার। মল্লবীরদের জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন শুধু আবশ্যক নয়, আবশ্যিক। মল্লজগতে সাধারণ স্তরে উঠেই যাদের মন সন্তুষ্ট, তাদের জন্যে এত কড়াকড়ির প্রয়োজন নেই, দাম্পত্য-জীবনযাপন করেও কুস্তিগীর হওয়া যায়। কিন্তু যারা অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে দিগ্বিজয়ী হবার সাধনা করে, তাদের ওপর ওস্তাদের নির্দেশ থাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে একাগ্র সাধনায় কয়েক বছর, এ সময়ে দূরে থাকতে হবে নারীসঙ্গ বা নারীর আকর্ষণ থেকে। বিন্দুপাতে সিন্ধুপ্রমাণ শক্তি ক্ষয় হবে, এই ধারণা মনে রেখে। এমনিধারা কঠোর সাধনার মধ্য দিয়েই অসাধারণ কুস্তিবীর হতে পেরেছিলেন বসির পালোয়ান। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য অটুট রেখে শক্তি সঞ্চয় করে তারপর শুরু করেছিলেন দাম্পত্যজীবন।'

'কুস্তিগীরদের জীবনের এদিকটার কথা আমার জানা ছিল না। আমার বরং ধারণা ছিল ওরা অসামান্ত শক্তিমান বলেই ওদের জৈব কামনাও তেমনি জোরালো।' বললাম আমি।

নিমাই মিত্তির হেসে বললেন, 'ঠিক তা নয়, ধনপতিবাবু। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, আর বাছা বাছা কুস্তিগীরেরা সবাই শুকদেব গোস্বামী বা ভীষ্মদেবের অবতার তাও বলি নে, কিন্তু সংযম-সাধনার মূল্য সত্যিকারের শক্তিসাধকেরা সহজে ভোলেন না। এক কথায় বলি একাগ্র কুস্তি সাধনার প্রথম পর্যায়ে পাশাপাশি চলে কঠোর ব্রহ্মচর্য আর আরো নানারকম সংযমের সাধনা। ভূমিকা এই থাক। এবার কাহিনী শুরু করি।'

বলে কাহিনী শুরু করলেন নিমাই মিত্তির। বাদশা পালোয়ানের জীবনের সবচেয়ে লজ্জাজনক কলঙ্ককাহিনী, যে কলঙ্কের বেদনা বাকি জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি বাদশা পালোয়ান।...

'বাদশা, বেটা, চলো আমার বাড়িতে। কথা আছে তোমার সঙ্গে।' বললেন বসির পালোয়ান। (কাহিনী এইভাবে গুছিয়ে বলতে শুরু করলেন নিমাই মিত্তির।)

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল যুবক কুস্তিগীর বাদশা, স্বনামধন্য রুস্তম-এ বঙ্গাল বসির পালোয়ানের প্রিয়তম সাগরেদ। প্রত্যেক শিষ্যকে পুত্রের মতো স্নেহ করেন বসির পালোয়ান, কিন্তু বাড়িতে কখনো ডাকেন না কাউকে, তাঁর বাড়ির অন্দরের খবরাখবর অন্দর ছেড়ে কদাচিৎ বাইরে বেরোয়। বাদশা শুধু এইটুকু জানে যে বসির পালোয়ানের একটি মাত্র সন্তান আছে, কন্যা নাসিম। নাসিম কিশোরী, এইটুকু জানে সুন্দরী কি না তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি কখনো।

তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন স্বয়ং বসির পালোয়ান, এ তার স্বপ্নের অতীত বিস্ময়। এ এক অতুলনীয় সম্মান তার জীবনে।

'চলুন ওস্তাদ।' বলে বসির পালোয়ানের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌছল বাদশা। ওস্তাদের সঙ্গে গিয়ে যে ঘরে বসল, তার অদূরেই উঠোন। উঠোনের মাঝখানে পড়ে আছে বেশ বড় প্রায় গোলাকার একখণ্ড পাথর।

'ঐ পাথরটা ওখানে কি জন্যে, ওস্তাদ?' শুধাল কৌতূহলী বাদশা।

'ঐটে মাথার ওপর তুলে দূরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কসরত করে আমার মেয়ে নাসিম।' বললেন বসির পালোয়ান। 'বেটি বিষম চটে আছে আমার ওপর।'

'কেন, ওস্তাদ?'

'অনেকদিন ধরে এটাকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এটা নাসিমের কাছে হাল্কা হয়ে গেছে। তাই সে এর চাইতে বেশী ওজনের পাথর চায়। সে আমি এখন কোথা থেকে যোগাড় করি বলো তো?'

বাদশা বিস্মিত। এই বড় পাথর খণ্ডের ওজন তো কম নয়; এও নাসিমের কাছে হাল্কা? এত শক্তি ওস্তাদের কন্যার বাহুতে?

'নাসিম, এক পেয়ালি সরবত আর এক থালি নাশ্‌তা নিয়ে আয় তো মা।' বলে অন্দর লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়লেন বসির পালোয়ান।

'যাই, আব্বাজান।' অন্দর থেকে জবাব দিল নাসিম। কণ্ঠস্বরে মেয়েলি লালিত্যের সঙ্গে পুরুষালী বলিষ্ঠতা মেশানো।

কিছুক্ষণ পরে সরবত আর নাশ্‌তা নিয়ে ঘরে ঢুকেই হঠাৎ হকচকিয়ে গেল নাসিম। সে ভেবেছিল সরবত আর নাশ্‌তা তার আব্বাজানের জন্য, আব্বাজান যে সঙ্গে অতিথি নিয়ে এসেছেন তা সে জানত না। বাদশার এই আগমন তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

বাদশার জীবনে নাসিমের এই প্রথম আবির্ভাব এক মুহূর্তে রাঙিয়ে দিল বাদশার সারা হৃদয়। এত দিন একাগ্র সাধনায় শুধু কুস্তিই আয়ত্ত করেছে, কুস্তিই ছিল তার ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন। সেরা কুস্তিগীর হয়ে দিগ্বিজয় করতে হবে, এই ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। নারী জাতি সম্পর্কায় চিন্তাকে মনে ঠাঁই দেয়নি কখনো। কোনো মেয়ের সান্নিধ্যেও কখনো আসবার সুযোগ বা দুর্যোগ তার ঘটেনি এর আগে। অদ্ভুত, অবর্ণনীয় পরিস্থিতি অনুভব করতে লাগল বাদশা। এ পরিস্থিতির উপযুক্ত আদব কায়দা তার জানা নেই, ঠিক করে উঠতে পারল না কি বলা আর কি করা উচিত এ অবস্থায়।

বসির পালোয়ানের সস্মিত ইসারায় সরবত আর নাশতা— বাদশার সামনে রেখে সোজা দাঁড়িয়ে রইল নাসিম। ঈষৎ সংকুচিত ভাব। এই ভাবটিই বড় মিঠে লাগল বাদশার, সুধায় ভরে দিল তার চিত্ত।

'বাদশাকে সঙ্গে করে আজ নিয়েই এলাম রে নাসিম।' বললেন বসির পালোয়ান। 'তোর কসরতের এই পাথরখানা দেখাব বলে। কি তাজ্জব, আমি দেখাবার আগেই দেখে ফেলেছে বাদশা, ওর পাকা চোখ এড়াতে পারেনি ঐ পাথর।'

হরলিক্স-এর একটি বিশিষ্ট নজির :

"ছেলের বাড়ি বেড়াতে এসে এখন কিনা দুবেলাই রান্নাঘরে কাটিছে!"

ছ বছর পর ছেলে আর বউকে দেখব ব'লে আমার কত আশা! কিন্তু ছেলের বাড়ীতে পা দিয়েই তো আমার চক্ষুস্থির! সারা বাড়ি অগোছাল, ছেলেমেয়েদের দিকে কারো নজর নেই···ফলে, সব কাজের ঝক্কি আমার উপর পড়ল! কথাটা সীতাই নিজে মুখ ফুটে বলল। বলল, "মা, কী করি আমায় বলুন। কিছুদিন থেকে সব সময়েই বড় ক্লান্ত মনে হয়—সংসারের কাজ আর ক'রে উঠতে পারি না।"

আমি বললাম, "চল ত বৌমা, তোমায় একবার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাই।" ডাক্তারবাবু একথা-সেকথা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার পর বললেন, "ভাববেন না, আপনার বৌমার গুরুতর কিছু হয়নি। আসলে, যতখানি পুষ্টির দরকার তা পাচ্ছে না বলেই শরীর দুর্বল লাগে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রোজ হরলিক্স খেতে দিন, দেখবেন শীগ্‌গিরই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হলও তাই! হরলিক্স হচ্ছে উৎকৃষ্ট খাঁটি দুধ আর তার সঙ্গে পেষাই করা গম ও মল্টেড বার্লির অতিরিক্ত পুষ্টি। ক' সপ্তাহের মধ্যেই দেখি বৌমা আবার সেই আগের মানুষ! আগেকার মতই চটপটে হয়ে উঠেছে। হরলিক্স-এর তুলনা হয় না!

হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

HORLICKS

'কি দেখবার আছে ঐ পাথরে, আব্বাজান ?' শুধাল নাসিম।

'ঐ পাথরে নয় মা, দেখবার আছে ঐ পাথর নিয়ে তুই কি কসরত রোজ করিস, তাইতে।' বললেন বসির পালোয়ান। 'সেইটে একটু বাদশাকে দেখিয়ে দেতো' মা।'

কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল নাসিম। তারপর স্নিগ্ধ-হাসিতে মুখ ভরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'তুমি বড্ড ছেলেমানুষ, আব্বাজান।'

'ছেলেমানুষ বলেই তো তোকে মা বলে ডাকি, নাসিম।' হেসে বললেন বসির পালোয়ান। 'যা মা, একবার দেখিয়ে দে বাদশাকে।'

বাপের অনুরোধ রাখতে নাসিম উঠোনে নেমে গিয়ে দু'হাতে সেই ভীষণ ভারি পাথরের খণ্ডটাকে অবলীলাক্রমে মাথার ওপরে তুলে ফেলল, তারপর তেমনি অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দিল বেশ খানিকটা দূরে, উঠানের একেবারে ওধারে। তারপর অনায়াস পদক্ষেপে ফিরে এসে দাঁড়াল নাসিম ; তাকে দেখে মনে হয় না কিছুমাত্র পরিশ্রম তার হয়েছে।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল বাদশা। তারপর তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে শুধু একটি শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো : 'সাবাস।'

'বহুৎ আচ্ছা। এবারে তুই অন্দরে যেতে পারিস, নাসিম।' বললেন বসির পালোয়ান। পালোয়ান-দুহিতা চলে গেল অন্দরে।

এইবার মল্লগুরু বসির পালোয়ান তাকালেন সোজাসুজি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বাদশার দু'টি চোখের দিকে। এমন একান্ত, একাগ্র স্নেহকরুণ, আবেদন-ভরা দৃষ্টি ওস্তাদের চোখে আর কখনো দেখেনি বাদশা। ওস্তাদ আজ একটা বিশেষ কথা বলবার জন্যই তাকে ডেকে এনেছেন, এ-কথা বুঝতে বাকি রইল না বাদশার। কথাটা যে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ এইটে আরো ভালো করে বোঝা গেল যখন ওস্তাদ তাকে বললেন, সরবতটা পান করে আর নাশতাটা খেয়ে নিতে।

বাদশা সবিনয়ে বলল, 'এ-সবের কি দরকার ছিল, ওস্তাদ ?'

বসির পালোয়ান সস্নেহ হাসি হেসে বললেন, 'বেটা, আমার গরীবখানায় এই তোমার পয়লা বার আসা। সরবত-নাশতা না হলে কি চলে ?'

সুতরাং সরবত আর নাশতা পর্ব শেষ করে নিল বাদশা, একটা অতি মধুর সন্দেহ মনে পোষণ করতে করতে। পর্ব সমাপ্ত হলে বসির পালোয়ান বললেন, 'বেটা বাদশা, তোমার সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। তাই তোমাকে ডেকে এনেছি।'

'বলুন, কি আপনার হুকুম, ওস্তাদ। জান দিয়েও তামিল করব।' ওস্তাদের পা ছুঁয়ে বলল বাদশা।

প্রসন্নমুখে বসির পালোয়ান বললেন, 'আমার হুকুম তামিল করবার জন্যে তুমি জান দিতে পারো তা আমি জানি, বেটা বাদশা। কিন্তু আমি তোমার জান তো চাইনে, চাই তোমাকে। আর হুকুমও আমি করব না, করব অনুরোধ।'

'আপনার অনুরোধ আমার কাছে হুকুমের চেয়েও বড়ো, ওস্তাদ।'

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে তারপর বসির পালোয়ান বললেন, 'শোনো বাদশা, আমার একমাত্র সন্তান বেটী নাসিম। খোদা আমার এক বেটাকেও বাঁচিয়ে রাখেননি, সেজন্যে নালিশ জানাইনে, খোদা আমায় তোমার মতো হীরের টুকরো সাগরেদ দিয়েছেন। আমার জীবনে যে ইচ্ছা মেটেনি, তা আমি তোমাকে দিয়ে মেটাতে চাই। জানি তুমি আমার সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। সেদিন আমি যদি বেঁচে নাও থাকি তো বেহেস্ত থেকে দেখব।'

'কি আপনার সেই ইচ্ছা ওস্তাদ ?' শুধাল বাদশা।

'রুস্তম-এ-হিন্দ, তারপর রুস্তম-এ-দুনিয়া হবার।' বললেন বসির পালোয়ান। 'আগে তামাম হিন্দুস্থানের, তারপর তামাম দুনিয়ার। কিন্তু খোদার তা ইচ্ছে নয়। রুস্তম-এ-বঙ্গাল হয়েই আমায় খুশী থাকতে হলো। অনেক হিম্মৎওয়ালা পালোয়ান যাকে বাঘের মতো ভয় করত, এক দঙ্গলে তাকে নাস্তানাবুদ করে হারিয়ে দিলাম। ক্ষেপে গিয়ে তারপর সে পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে একটা বিশ্রী পাঁচ মেরে আমার বাঁ হাতটা ভয়ানক জখম করে দিল। ভাঙা হাত অনেকদিন পর জোড়া লেগে মোটামুটি কাজের লায়েক হল বটে, কিন্তু ও হাতের বেশীর ভাগ জোর চিরদিনের জন্য চলে গেল। সবাই ছি ছি করলে সেই পালোয়ানকে, কিন্তু তাতে আমার তো কোনো ফায়দা হলো না, বাদশা। রুস্তম-এ-হিন্দ হবার আশা আমার এ জিন্দগীর মতো খতম হয়ে গেল। পুরো ডান হাত আর সিকি বাঁ হাত নিয়ে লড়ে তবু রুস্তম-এ-বঙ্গালগিরি বজায় রাখতে পেরেছি, খোদার এ মস্ত মেহেরবাণী। তোমাকে আমার তালিম উজাড় করে দিয়েছি বেটা বাদশা। বদনসিবে আমি যা পারলাম না, তা তুমি পারবে। তুমি হবে রুস্তম-এ-বঙ্গাল, রুস্তম-এ-হিন্দ, রুস্তম-এ-দুনিয়া।'

'আপনার দোয়া থাকলে জরুর হবো, ওস্তাদ।' বলল গুরুভক্ত বাদশা।

'আমার দোয়া নয়, বাদশা। বলো খোদার দোয়া। খোদার দোয়া আছে তোমার ওপর।' বললেন বসির পালোয়ান।

'তোমার বয়স এখন বিশ বছর হয়েছে, পঁচিশ বছর বয়সের ভেতর তোমাকে আমি রুস্তম-এ-হিন্দ বানাব। আমি জানি তুমি পারবে। বলো পারবে।'

এ যেন ওস্তাদের ব্যাকুল প্রার্থনা প্রিয়তম সাগরেদের কাছে। বাদশা বলল, 'পারব, ওস্তাদ। আলবত পারব।'

বসির পালোয়ান বললেন, 'এবার আসল যে কারণে ডেকেছি তোমাকে। আমার বেটী নাসিমকে তো দেখলে ?'

'দেখলাম ওস্তাদ।'

'বেটী আমার বেহেস্তের হুরী হয় তো নয়, কিন্তু খোদা ওকে রূপের অভাব দেননি।' বললেন বসির পালোয়ান।

'আর ওর এই পনের বছর বয়সেই তা কতের নমুনা তো চোখের সামনেই দেখলে।'

'দেখলাম, ওস্তাদ। কিন্তু তাজ্জবের বাত কিছু নয়। বাপকী বেটী।'

'তোমার কুস্তিও দেখেছে বেটী নাসিম।' বললেন বসির পালোয়ান। 'আড়াল থেকে দেখেছে—তুমি ওকে দেখতে পাওনি। তোমার কুস্তি দেখে বেটী নাসিম বলেছিল, আব্বাজান, তোমার এই বাদশা সাগরেদকে তুমি রুস্তম-এ-দুনিয়া বানাতে পারো।—আমি বললাম হাঁ বেটি, জরুর পারব। কিন্তু থাক সে কথা। এখন বলো, আমার বেটী নাসিম যদি এই বাদশার বেগম হয় তা হলে কেমন হয়?'

'ওস্তাদ, এ যদি আপনার তামাসা না হয়, তা হলে এর চাইতে খুশ বরাত আমার আর হতে পারে না। কিন্তু ওস্তাদ—'

'হ্যাঁ, তুমি 'কিন্তু' বলবে তা জানতাম। তোমার তালিম এখনো পুরো হয়নি। আরো পাঁচ বছর তোমাকে আওরৎ থেকে দূরে থাকতে হবে।' বললেন বসির পালোয়ান। 'কিন্তু বাদশা, আমার বুড়ি আম্মাজানের জিন্দগী ফুরিয়ে এসেছে, হেকিম সাহেব বলেছেন যে, কোনো দিন হঠাৎ আম্মা বেহেস্তে চলে যেতে পারেন। তার আগে—'

বসির পালোয়ানের বৃদ্ধা জননী শেষ শয্যার পাশে গিয়ে ওস্তাদের সঙ্গে দাঁড়াল বাদশা। বাদশার জবান পেলেন বুড়ি। নাতনীর ভাবী স্বামীর বলিষ্ঠ দেহ আর পুরুষোচিত সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে ওপারের যাত্রিণী স্নেহ-সজল চোখে বললেন 'জিতা রহো বেটা।'

সাগরেদ এবং ভাবী জামাতা বাদশাকে নিয়ে বাইরের ঘরে ফিরে এলেন কুস্তিগীর বাদশার ওস্তাদ এবং ভাবী শ্বশুর বসির পালোয়ান।

'আজকের এই ব্যাপারটা শুধু আমার আম্মাজানের শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ করবার জন্যেই করলাম, বাদশা।' বললেন বসির পালোয়ান। 'নইলে আরো অনেক পরে করতাম। এখন শুধু কথা হয়ে রইল। আর পাঁচ বছর পরে তোমাদের শাদী হবে। এই পাঁচ বছর তোমরা দু'জনে দু'জনের জন্য তৈরি হবে।'

এই পর্যন্ত কাহিনী বলে নিমাই মিস্তির বললেন, 'আপনি হয়তো প্রশ্ন করতে চাইছেন উদ্ভিন্ন যৌবনা নাসিমকে অমন করে চোখের সামনে ধরে নওজোয়ান বাদশাকে পাঁচ বছরের জন্যে ঝুলিয়ে রেখে বসির পালোয়ান ঠিক বুদ্ধির কাজ করলে কি না।'

বললাম, 'এ প্রশ্ন মনে যে একেবারে জাগে নি, তা বলতে পারব না।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নিমাই মিস্তির বললেন, 'দেখুন ধনপতিবাবু, দুনিয়ায় সবাই যদি সব সময় ঠিক বুদ্ধির কাজ করত তাহলে দুনিয়ার অনেক ট্রাজেডিই ঘটত না, অনেক কমেডিও নয়। কোনো নবযুবতীর রূপ মনে গেঁথে যাওয়া কোনো নওজোয়ানের ব্রহ্মচর্য ব্রত

পালনের পক্ষে খুব সহায়ক নয়, বলতে পারেন বই কি। যাক গে, তারপর শুনুন। ঐ ঘটনার, মানে বাদশা আর নাসিমের চার চোখের মিলনের মাস চারেক বাদের কথা। নন্দনপুরের চৌধুরীরা অনেক পুরুষের বড়লোক। আগামী নববর্ষের মেলা উপলক্ষে তাঁদের মস্ত মাঠে বিরাট কুস্তি প্রতিযোগিতা হবে, আগাম ঘোষণা হয়ে গেল দিগ্বিদিকে, নববর্ষের মাস দেড়েক আগেই। আড়াই মণ পর্যন্ত ওজনের যে কোনো কুস্তিগীর এ প্রতিযোগিতায় লড়তে পারবে। সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লকে দেওয়া হবে বিরাট সম্বর্ধনা, আর নগদ এক হাজার টাকার একটি তোড়া। বিজয়ীকে কি রকম রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হবে, তার লোভনীয় বর্ণনা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। দিলদরিয়া দরাজহস্ত বলে ধনকুবের চৌধুরীদের খ্যাতি ছিল বহু বিস্তৃত। নেচে উঠল বসির পালোয়ানের মন—তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই বিজয়ীর বরমাল্য দুলবেই তাঁর প্রিয় শিষ্য বাদশার গলায়, ভাবী স্বামীর বিজয়গর্বে আনন্দে ভরে উঠবে তাঁর কন্যা নাসিমের হৃদয়। তেমনি নেচে উঠল বাদশার মন। বিজয়ীর বরমামাল্য সে পাবেই, কোনো সন্দেহ ছিল না তার মনে। প্রিয়তমা নাসিম নিজের চোখে দেখবে তার ভাবী স্বামীর শক্তির লীলা, গর্বে ফুলে উঠবে তার কিশোরী বুক, এই কল্পনাতে মহা আনন্দের আকাশে উড়তে লাগল বাদশা। প্রবল উৎসাহে তৈরি হতে লাগল প্রতিযোগিতার জন্য। জয়ী সে হবেই সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত, নিশ্চিত—প্রস্তুতি শুধু কত অনায়াসে, কত অবলীলাক্রমে বিজয়ী হওয়া যায়। তারি একটা অভূতপূর্ব রেকর্ড বা নজির সৃষ্টি করার জন্যে। কিন্তু বাদশার এই নিশ্চিত বিশ্বাস টলে উঠল একটা আশ্চর্য, অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে। আর সেই ভূমিকম্পই হল বাদশা পালোয়ানের জীবনের মহা কলঙ্কের সূত্রপাত।'

'কি সেই ভূমিকম্প?'

'কি নয়, কে বলুন।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'বাদশারই বয়সী এক অতি রহস্যময় ছোকরা, তার নাম মোহন। অন্তত ঐ নামেই সে নিজের পরিচয় দিলে চৌধুরীদের কাছে। এসে বললে, আশ্রয় চাই, কুস্তি প্রতিযোগিতায় সে লড়বে, এক হাজার টাকা তার চাইই, আর সেই প্রকাশ্য সম্বর্ধনা, যার কথা বিশেষ ভাবে ঘোষিত হয়েছে। বললে না, কোথা থেকে এসেছে, দিলে না নাম ছাড়া নিজের আর কোনো পরিচয়, শুধু বললে কুস্তি শিখেছে এক ওস্তাদের আখড়ায় কুস্তি দেখে দেখে, তালিম পেয়ে নয়, আর শক্তি অর্জন করেছে নিজের সাধনায়। তার নগ্ন দেহ দেখে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন বড় চৌধুরী মশাই। এমন আশ্চর্য সুগঠিত, মজবুত দেহ তিনি আর কখনো দেখেননি, মনে হলো অসামান্য শক্তির বিদ্যুৎ সুপ্ত রয়েছে ঐ দেহের পেশীতে পেশীতে। চৌধুরীদের ছিল এক ঝাঁক ভোজপুরী, দারোয়ানই বলুন আর পালোয়ানই বলুন। চেহারায় আর গায়ের জোরে তারা সবাই এক একটি অসুর। জমিদারদের লেঠেল পোষার মতো এদের শখ করে পুষতেন চৌধুরীরা। এদের থাকবার জন্যে ছিল আলাদা ব্যারাক, কুস্তি লড়বার জন্যে চমৎকার নরম মাটিওয়ালা আখড়া। এরা হলো সব অভিজাত অসুর, প্রতিযোগিতায় যে এরা লড়বে না তা শুধু ওজনে আড়াই মণের বেশী বলেই নয়। মনিবের আদেশে মোহনের সঙ্গে প্রাণপণে লড়েও পর পর এরা এত সহজে এত ক্রুত হেরে গেল যে, মোহনের দাবী সম্বন্ধে কারও মনে কোনো সংশয় রইল না। সমাদরে চৌধুরীদের আশ্রয় পেলো মোহন। পরাজিত পালোয়ানদের কাছাকাছি নয়, তাদের থেকে দূরে। খবর রটে গেল এসেছে এক রহস্যময়, আশ্চর্য শক্তিমান তরুণ মল্ল, আগামী প্রতিযোগিতায় নিশ্চিত বিজয়ী হবে বলে যে বিনা দ্বিধায় দাবী করে, এবং চৌধুরীদেরও বিশ্বাস বিজয়মাল্য লাভ করা তার পক্ষে হয় তো অসম্ভব হবে না।—কিন্তু এবার একটু সংক্ষেপে বলি, কি বলেন? নইলে কাহিনীর বেগ বাড়বে না।'

'বলুন।'

'অনেক ধাপ বাদ দিয়ে বলি, বাদশা নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে বুঝল মোহন এই প্রতিযোগিতায় লড়লে বাদশার কোনো আশা নেই বিজয়মাল্য গলায় পরবার। কুস্তি-কৌশলে বাদশা বিশ, মোহন উনিশ, কিন্তু নিছক গায়ের জোর মোহনের এত অবিশ্বাস্য রকম বেশী যে, বাদশাকে পরাজিত করতে তার বেশী সময় দরকার হবে না; সমস্ত আলো যেন মুছে গেল বাদশার ভবিষ্যৎ থেকে। আগামী দঙ্গলে যোগ না দেওয়া মানেই পরাজয় মেনে নেওয়া। যোগ দেওয়া মানেই কুস্তি-জগতে অজ্ঞাত-কুলশীল মোহনের কাছে নিশ্চিত পরাজয়—যার ফলে মাথা হেঁট হবে ওস্তাদ বসির পালোয়ানের, লজ্জায় আর ব্যথায় ভেঙে যাবে নাসিমের মন, ধূলায় লুটিয়ে পড়বে বাদশার গর্ব। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। বাদশার দোস্ত ছিল সিরাজ। অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারের ছেলে, বাপের সঙ্গে ব্যবসা করে। কুস্তি লড়ার শক্তি নেই, সাহস নেই, শখও তার নেই, কিন্তু কুস্তি দেখতে ভালোবাসে, আর তার চাইতে বেশী ভালোবাসে বাদশাকে। বাদশা তার দোস্ত, এই তার জীবনের সেরা গর্ব। বাদশার গর্ব ধূলায় লুটোবে, এ কল্পনাও অসহ্য মনে হল সিরাজের।'

সিরাজ বলল, 'তুমি বিচ্ছু ভেবো না দোস্ত। শুধু নাসিমের কথাটা ভাবো, তোমার জন্যে মাথা যেন তার হেঁট না হয়। আর তাকৎ বাড়াও, আরো তালিম নাও ওস্তাদের কাছে। এখনো তৈরী হবার অনেক সময় আছে। দঙ্গলে তোমার কাছে মোহন হারবেই। সে ভরসা আমি তোমাকে দিলাম, দোস্ত। তুমি একেবারে বিনা ভাবনায় তৈরি হতে থাকো।'

সিরাজের কথায় ভরসা পেল বাদশা। বাজে কথা কখনো বলে না সিরাজ। কিন্তু এত বড় ভরসা সে দিল কিসের ভরসায়? ভেবে পেল না বাদশা।

বাদশা ভেবেই পেল না সিরাজ তাকে এত বড় ভরসা দিল কি করে। বললেন নিমাই মিত্তির।

আমি একটু অধৈর্য হয়েই বললাম, 'কিন্তু কোথায় আপনার, মানে বাদশা পালোয়ানের কলঙ্ককাহিনী, আর কোথায় তার নায়িকা রূপসী তরুণীরা?'

নিমাই মিত্তির বললেন, 'এইবারে আসছে সেই কাহিনী। আমি নিঃসংকোচে বলি, আপনি অসংকোচে শুনে যান।'

অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া আরো কয়েক টান উপভোগ করে নিমাই মিত্তির বললেন, 'সিরাজের ছিল বেশ লম্বায় চওড়ায় অনেকখানি জায়গা নিয়ে যেমন বড় তেমনি চমৎকার বাগিচা আর

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
কি তাজা, ঝরঝরে লাগছে !
লাইফবয় মেখে স্নানে সত্যিকারের স্নানের
আনন্দ। তাছাড়া, লাইফবয়ে ধুলোময়লার
রোগবীজানু পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে যায়।
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রতিদিন পরিবারের
সবাই লাইফবয় মেখে স্নান করুন।
L. 39-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বাগানবাড়ি। একদিকে বিরাট বাগিচা, অন্যদিকে বাগানবাড়ি, আর এই দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় অতি চমৎকার একখানা পুকুর। এ সবই দেখে এসেছি আমি, কিন্তু আমি যখন দেখেছি তখন আর সেই আগের মতো অবস্থা নেই, যা আছে তাকে বলা যায় দুরবস্থা। দৈর্ঘ্যে চওড়ায় সেই পুকুরটা বাতাসী মঞ্জিলের এই পুকুরেরই মতো; হয় তো সামান্য একটু বড়, কিম্বা সামান্য একটু ছোটও হতে পারে। কিন্তু তার নাম ছিল দীঘি—নীলনয়নীর দীঘি। ঐ দীঘির জলে নিরালা নিঝুম বিকেলে একা সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরেছিল একটি নীলনয়না সুন্দরী মেয়ে, এই ছিল কিংবদন্তী। তাই থেকে ঐ পুকুরের নাম নীলনয়নীর দীঘি। মেয়েটির আসল নাম কি ছিল জানিনে, কিংবদন্তীতে নীলনয়নী নামটাই আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। বেশ ভালোই নাকি সাঁতার জানত মেয়েটি, তাই ওর ডুবে মরাটা একটু রহস্যময়, একটু সন্দেহজনকও বটে। দুর্ঘটনা যখন ঘটবার তখন ঘটেই, কেউ তা রোধ করতে পারে না, তাই কথায় বলে অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। সুতরাং সাঁতারু মেয়ের ঐভাবে জলে ডুবে মরাটা সত্যি সত্যি দুর্ঘটনা হতে পারে, কিছু অসম্ভব নয়। মনে করুন সাঁতরাতে সাঁতরাতে পুকুরের, অর্থাৎ ঐ দীঘির মাঝখানে হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ল, অথবা কোথাও মাংসপেশীর সংকোচন ঘটল, অথবা—মানে নানা রকম কারণ তো ঘটতে পারে? কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন দুর্ঘটনায় মরে নি নীলনয়নী, ও ছিল তার আত্মহত্যা। মনের ভেতর কোনো গভীর দুঃখ ছিল, সেই কারণে আত্মহত্যা। আবার কেউ কেউ সন্দেহ করেন হত্যা করা হয়েছিল মেয়েটাকে ঐ দীঘির জলে ডুবিয়ে, অথবা হত্যা করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল দীঘির জলে।'

আশ্চর্য গল্প বলার ভঙ্গি নিমাই মিত্তিরের। তাড়া নেই হুড়ো নেই, আস্তে আস্তে রসিয়ে রসিয়ে সুদূর অতীতের কথা এমনভাবে বলেন, যেন কালকের কথা বলছেন আর যা বলছেন তা যেন মনে মনে বানিয়ে বলছেন, তাই হুবহু বর্ণনা করে যাচ্ছেন। নীলনয়নীর শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী শুনে ব্যথিত কৌতূহল জাগল মনে। ভাবলাম একটু বরং অপেক্ষা করে থাকুক সিরাজ, বাদশা, তহমিনা আর মোহনের কাহিনী, তার আগে শুনে নেওয়া যাক নীলনয়নী কন্যার করুণ কাহিনী। তাই প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু কি দুঃখে অমন করে আত্মহত্যা করতে যাবে মেয়েটি। অথবা কি কারণে তাকে হত্যা করবে কেউ?'

নিমাই মিত্তির বললেন, 'দুটি প্রশ্নই এমন, যার সঠিক জবাব নিঃসংশয়ে দিতে পারব না আমি। তবে নীলনয়নীর কাহিনী যেটুকু জেনেছি, তাই খুব সংক্ষেপে বলি শুনুন। ঐ যে দীঘিওয়ালা বাগিচা আর বাগান বাড়ির কথা বললাম, যার মালিক সিরাজ, ঐ সম্পত্তিটার আগেকার মালিক ছিল বনেদী বড়লোক এক রায় পরিবার। রায় বাড়ির চার ছেলের চার বৌ। চার বৌ'র সন্তানদের ভেতরে সব চেয়ে বেশী রূপ নিয়ে জন্মাল ছোট বৌ'র এই মেয়ে, নীলনয়নী নাম যার আজও ঐ দীঘির সঙ্গে জড়ানো। রায় বাড়ির অন্য বৌরা, মানে বড়, মেজ আর সেজো বৌ ছিলেন সেকালের সাবেকপন্থী পরিবারের মেয়ে, তাঁদের লেখাপড়া ছিল পাঠশালা পর্যন্ত। ছোট বৌকে রায় বাড়ির বড় কর্তা নিজে পছন্দ করে এনেছিলেন। দত্ত পরিবারের মেয়ে, যাকে তখনকার যুগের তুলনায় বলা যায় উচ্চশিক্ষিতা। আর রূপ লাবণ্যেও বাকি তিন বৌ তার কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে না, লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে তার প্রতি অঙ্গ থেকে। রায় বাড়িতে সুখের সংসার, কিন্তু মনের তলায় বড় তিন বৌ বুঝি বা একটু হিংসের ভাবই পুষতে লাগলেন শ্বশুরের সবচেয়ে বেশি আদরের ছোট বৌ'র ওপর। সে ভাবটা আরেকটু ঘন হল ছোট বৌ'র ঐ মেয়ের জন্মের পর। ঐ মেয়ে মানে নীলনয়না।

এ কাহিনী তাড়াতাড়ি সারতে হবে, তাই নীলনয়নীর বিয়ের বয়স, মানে ষোড়শী অবস্থা, এনে ফেলছি। নীলনয়নীকে দেখতে এলেন এক খুব ভালো পাত্রের বাবা। কনে পছন্দ হল, আশীর্বাদ পর্বটাও হবার উপক্রম, এমন সময় পাত্রের মামা একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন পাত্রের বাবাকে, মৃদু স্বরে আলোচনা করলেন কি একটা বিষয়ে যেন। তারপর পাত্রের বাবা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাকালেন পাত্রীর বাবার চোখের দিকে, পাত্রীর মা'র চোখের দিকে, পাত্রীর চোখের দিকে। দেখেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন। যাবার আগে আশীর্বাদটা সেরেই যাবেন এরকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সে ইঙ্গিত বাতিল হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে গিয়ে বিবেচনা করে মতামত জানাবেন, এই বলে গেলেন বিদায় নেবার আগে। তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে চিঠিতে জানালেন কোনো বিশেষ কারণে এই সম্বন্ধের ব্যাপারে তিনি আর অগ্রসর হতে ইচ্ছুক নন, রায়মশাই যেন নিজগুণে তাঁকে ক্ষমা করেন।

রায়মশাই পরে জানতে পারলেন রায়বাড়ির ছোট বৌ'র এবং ছোট ছেলের চোখের তারা কালো, কিন্তু মেয়ের চোখের তারা নীল কেন, এই ভেবে খটকা লেগেছিল পাত্রের মামার মনে, আর তাঁর কথা শুনে পাত্রের বাবার মনে। সেই থেকে রায় বাড়িতে শুরু হল লজ্জা, দুঃখ, অশান্তি এবং এই জাতীয় আরো অনেক কিছু। তারই আঁচ এসে লাগল আর লাগতে লাগল নীলনয়নীর গায়ে। ক্রমে তার সন্দেহ হতে লাগল এ পরিবারে যেন সে একটু অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে। ভালো লাগতো না বাড়িতে, তাই যখন তখন একাই এসে পড়ত বাগান বাড়িতে ঐ দীঘির ধারে। সাঁতার কাটতো একা এসে দীঘির জলে। তারপর একদিন বিকেলে ঘটল ঐ ট্রাজেডি, যার রহস্যের সমাধান আজও হয় নি। সংক্ষেপে এই হল নীলনয়নীর কাহিনী।'

'তারপর?'

'মানে, নীলনয়নীর মৃত্যুর পর? নাতনী ছিল রায় বাড়ির বড় কর্তার বড় আদরের। শোকে দুঃখে অধীর হয়ে পড়লেন তিনি। বেচে ফেললেন ঐ অপয়া সম্পত্তি, যা তাঁর নাতনীর মৃত্যুর কারণ

হয়েছে। ও ভাবে নীলনয়নীর অপঘাত মৃত্যু না ঘটলে সিরাজ হত না ঐ বাগান-বাড়ির মালিক, আর যে কাহিনী আপনাকে বলতে যাচ্ছি, সে কাহিনীও ঘটত না। কিন্তু সে কাহিনী বলবার আগে ঐ দীঘি, বাগিচা, বাগান, আর বাড়িটার খানিকটা বর্ণনা দরকার, নইলে কাহিনীটা আপনি ঠিক মতো বুঝবেন না ধনপতিবাবু।'

'বর্ণনা করুন।' বললাম আমি।

'বাগিচা তো নয় যেন বিরাট রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন।' বললেন নিমাই মিত্তির। 'রায়েরা ছিলেন যেমন ধনী, তেমনি সৌখীন আর দরাজ হাত দু' হাতে খরচা করতে পারলে যেন আর কিছু চান না। দেশে বিদেশে যত রকমের ফল আছে, প্রায় সব রকম ফলের গাছে ভর্তি বাগিচা। তাতে অজস্র ফল ফলন্ত—আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আতা, পেঁপে, পেয়ারা থেকে শুরু করে আপেল, নাশপাতি, ডালিম, বেদানা, আঙুর, বাদাম পর্যন্ত। আর ওদিকে ফুল বাগানে দেশী বিদেশী, সুগন্ধ নির্গন্ধ হাজারো রকমের ফুল আর পাতাবাহার। আর পুকুরটা অদ্ভুত পরিষ্কার, তাতে টলমল করছে স্বচ্ছ জল, তার মধ্য দিয়ে পুকুরের তলা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। পুকুরপাড় বাগিচার গাছগুলো বেশ ঘন সন্নিবিষ্ট, কোনো কোনো জায়গায় এত ঘন যে বিকেলের আলোয় পুকুরের অর্থাৎ ঐ দীঘির পারে দাঁড়িয়ে ও বাগিচার ভেতরে অনেক সময় দৃষ্টি বেশী দূর এগোয় না।'

বলে আবার খানিকটা ধূমপান করে নিমাই মিত্তির বললেন, 'রায়েদের কাছ থেকে যখন সিরাজের হাতে চলে এলো ঐ বিরাট বাগিচা, দীঘি আর ঐ বাগানবাড়ি, তখন মালিদের আর ভৃত্যদের মনে ভয় হল এইবার তাদের চাকরি যাবে, তাদের তাড়িয়ে সধর্মীদের এনে এখানকার চাকরিতে বহাল করবে নতুন মালিক সিরাজ। কিন্তু না, তা করলে না সে; যে যেমন ছিল সে তেমনই বহাল রইল, মালী আর ভৃত্যরা সবাই।

সিরাজদের ঘরে লক্ষ্মী ঠাকরুণ অচলা, তাছাড়া বাগিচা থেকে যে আয় হতো তাতে বাগিচার সব মালী আর অন্যান্য কর্মীদের মাইনে পুষিয়েও অনেক থাকত; আমি মশাই এ্যাটর্নী মানুষ, হলেমই বা রিটায়ার্ড, কবিত্ব যতই করি না কেন, টাকার হিসেবটা মাথায় এসেই পড়ে। ওটা ভুলতে পারি না কিন্তু এসব হল ভূমিকা মাত্র। এইবার কাহিনীটা শুরু করি।'

'করুন।'

'কিন্তু তার আগে যে আরেকটা কথা বলে নেওয়া দরকার, ধনপতিবাবু।'

'বলুন।'

'নীলনয়নীর দীঘি সমেত রায়েদের ঐ যে পরম লোভনীয় সম্পত্তি, ওটি যে দরে বিক্রি করেছিলেন রায় মশাই—কতকটা বিতৃষ্ণ হয়ে, কতকটা বাধ্য হয়ে—তাকে একরকম জলের দামই বলা যায়। দাম যা নিলেন, বা পেলেন ও একটা মামলা হয়েছে। কমিশ ছেড়ে কাটিয়ে উঠা এ্যাটর্নীর ভাষায় বলি, ঐ অপয়া সম্পত্তির আর খদ্দের পেলেন না রায়মশাই। পেলেন না, তার কারণ খদ্দের যাঁরা হতে পারতেন, অর্থাৎ ন্যায্য দাম দিয়ে ঐ সম্পত্তি কেনবার মত যাঁদের ক্ষমতা ছিল, তাঁদের লোকজন সংস্কারগ্রস্ত মন ভাবতো ঐ সম্পত্তির ওপর অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপেই ঘটেছে বাড়ির অমন অতুলনীয় মেয়েটা অপঘাতে মারা পড়ল। তা ছাড়া আরেকটা গুজব ছড়াল—কি করে ছড়াল তা জানিনে মশাই—যে দীঘির জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে সেই দীঘির মায়া কাটাতে পারে নি নীলনয়নী, ঐ দীঘির জলে এখনো সে রোজ একা একা সাঁতার কাটে, সাঁতার কেটে সিক্ত দেহে উঠে ডাঙার দীঘির পাড়ে, অনেকে তাই দেখে নাকি ভয়ও পেয়েছে। ঐ গুজবটা মালী আর ভৃত্যদের মনেও কিছুটা সংক্রামিত হয়েছিল। ওরাও সন্ধ্যায় আর রাতে তো বটেই, নিরালা দুপুর বা বিকালেও ঐ দীঘির ধারে একা আসতে ভয় পেতো। এই ভুতুড়ে সম্পত্তি সম্বন্ধে খদ্দেরদের মনে একটু ভয়, অন্তত একটু বিরূপ ভাব থাকাটা স্বাভাবিক।'

'এমনি গুজব ছড়ানো ছিল যখন তখন সিরাজের কানেও তো সেটা না পৌঁছবার কথা নয়। অন্য খদ্দেররা যদি ঐ ভুতুড়ে গুজব শুনে ভয় পেল তো সিরাজই বা পেলে না কেন?'

'ভয় তো সিরাজের অমন ভয় বা কুসংস্কার কিছু ছিল না। সব মানুষই তো আর এক চরিত্রের হয় না মশায়। তাছাড়া এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে ঐ সম্পত্তির দাম কমিয়ে দিয়ে সস্তায় কিনে নেবার জন্যে কিছু মগজ, কিছু মেহনত আর কিছু পয়সা খরচ করে ঐ গুজব সিরাজই রটিয়েছিল। যাক গে, এসব হচ্ছে আগেকার ঘটনা; এইবার পরের কাহিনী বলি শুনুন।'

বলে সিরাজ তহমিনা-বাদশা মোহনের কাহিনী শুরু করলেন নিমাই মিত্তির:

'নন্দনপুরের চৌধুরীবাড়িতে চলে গেল সিরাজ, ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনো একটা কাজের অছিলায়। সিরাজের পৈতৃক কারবারের সঙ্গে চৌধুরীদের কারবারী লেন-দেন ছিল, আর সম্পর্কও ছিল পরম প্রীতির। সিরাজ রীতিমতো সুপুরুষ না হলেও ওকে দেখলে মন খুশী হতো; বেশ হাসিখুশি ছোকরা, যাকে আপনারা আজকাল 'মাই ডিয়ার' গোছের মানুষ বলেন, তেমনি। কথা কইতে পারত ভারি মিঠে করে। তাছাড়া অভিজাত বনেদী খানদানী বংশের ছেলে, আদব-কায়দায় আশ্চর্য রকম দুরস্ত। আর সিরাজের বাবা নাসির আমেদ সাহেবের সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির বড়কর্তা নন্দন চৌধুরীর সম্পর্কটা কারবারী লেন-দেনের সম্পর্ক ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছিল আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্কে—সে সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা মেশানো। নন্দনপুরে নন্দন চৌধুরীর কাছে গিয়ে হাজির হল সিরাজ। ভারি খুশী হলেন নন্দন চৌধুরী, সিরাজকে তিনি স্নেহ করতেন পুত্রবৎরূপে।' [ক্রমশ]

আলবেয়ার কামু

সুনীলকুমার নাগ

রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন সব দেশের বাস্তব সামাজিক জীবনযাত্রায় যেমন মোড় ঘোরায়, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। মানুষমাত্রেই কমবেশি স্পর্শকাতর, আর যাঁরা সুকুমার শিল্পের চর্চা করেন তাঁরা তাঁদের বর্ধধারার বিশেষ প্রকৃতির জন্যেই ক্রমশ অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে উঠতে থাকেন। তাই দেখা যায়, বড়ো রকমের একটা রাজনৈতিক বিপর্যয় এক-একটা গোটা দেশের সাহিত্যচিন্তাতেও আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর কাছে ফ্রান্সের পরাজয় নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা। ফ্রান্স শুধু জার্মানীর কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয় নি, গোটা ফ্রান্স জার্মানী কর্তৃক অধিকৃতও হয়েছিল এবং চার বছরের ওপর ফরাসী জনগণকে কার্যত বন্দীদশাতেও কাটাতে হয়েছিল। স্বাধীনতা হারানোর মানে যে কি তা আমরা সকলে হয় তো ঠিক সমানভাবে এবং সহজে বুঝে উঠতে পারবো না; কারণ আমরা ও জিনিস হারিয়েছিলাম কয়েক পুরুষ আগে এবং তারপর পুরুষানুক্রমে পরাধীন জীবনযাপন করবার ফলে ও জিনিসটির আসল মূল্য আমাদের অনেকের কাছেই বোধ হয় খুব স্পষ্ট নয়—এমন কি নতুন করে এ যুগে স্বাধীনতা অর্জনের ষোলো বছর পরেও। তাই স্বাধীনতা হারাবার পরে সোয়া চার কোটি ফরাসী নরনারীর বাস্তব সামাজিক জীবনের কথা বাদ দিয়ে তাদের মানসিক যে যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছিল, সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে তা মৃত্যুরও অধিক।

সমস্ত রকমের বিচিত্র এবং বিপরীতধর্মী চিন্তার সৃজন করা, তাকে লালন করা এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করা যে ফরাসী দেশের শিক্ষিত সমাজের একটি প্রধান নেশা বলে আমরা গত শতাধিক বছর ধরে জেনে এসেছি, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে দেখা গেলো শ্রেণী নির্বিশেষে তাঁদের বেশির ভাগই এক উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন—সে হলো স্বাধীনতা পুনরর্জন করা। স্বাধীনতা পুনরর্জনের এই সংগ্রামে সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য একজন হলেন আজকের ফ্রান্স তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ এবং নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক জাঁ-পল সার্ত্র। সার্ত্র সম্বন্ধে মাসিক বসুমতীর বিগত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি। বর্তমানে আলোচ্য আলবেয়ার কামু স্বাধীনতা পুনরর্জনের সংগ্রামে যেমন এক সময় সার্ত্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, তেমনি চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য কামুকে দেখা যায় চিন্তার ক্ষেত্রে কামু তাঁর নিজস্ব মত গড়ে তুলবার জন্যে প্রয়াসী হয়েছেন—আমরা যথাস্থানে সে প্রসঙ্গ আলোচনা করবো।

আলবেয়ার কামু বয়সে সার্ত্রের চাইতে আট বছরের ছোট। সার্ত্রের জন্ম ১৯০৫ সালে আর কামুর ১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর। সার্ত্র একেবারে বাল্যবয়স থেকেই খাস ফ্রান্সের আবহাওয়াতে পরিবর্ধিত হয়েছিলেন: কিন্তু কামুর প্রথম জীবন কিছুটা ভিন্ন রকমের ছিল। জন্মসূত্র থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়েই সার্ত্র যেমন পুরোদস্তুর ফরাসী, কামু ঠিক সে সুযোগ লাভ করেন নি; খাঁটি ফরাসী হয়ে উঠবার জন্য তাঁকে গোটা কৈশোর এবং যৌবন রীতিমতো চেষ্টা করতে হয়েছিলো। তার একটি কারণ কামুর মা ছিলেন স্পেন দেশের মেয়ে, আর দ্বিতীয় কারণ কামু জন্মগ্রহণ করেছিলেন খাস ফ্রান্স থেকে অনেক দূরে—ভূমধ্যসাগরের অপর পারে, আলজিরিয়াতে। আলজিরিয়া ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিলো বটে, কিন্তু নানা কারণবশত খাস ফ্রান্সের সঙ্গে আলজিরিয়ার ফরাসী অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণার যোগাযোগ ছিলো খুবই ঘনিষ্ঠ এবং লক্ষ লক্ষ ফরাসী নরনারী স্থায়ীভাবে আলজিরিয়াতে বসবাস করতেন এমন কি, আজো করছেন। কামুর বাবা জাতিতে ফরাসী

ছিলেন কিন্তু ফ্রান্সের যে অঞ্চলে তাঁর জন্মস্থান ছিলো, অর্থাৎ আলজেরিয়া, দীর্ঘকাল তা ছিলো জার্মান সাম্রাজ্যের অঙ্গ। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হবার ফলে রাইন নদীর পশ্চিমের এই আলজেরিয়া প্রদেশ আবার ফ্রান্সের অঙ্গ হয়ে ওঠে। যাই হোক, কামুর বাবা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীদের একজন সৈনিক হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত অবস্থাতেই প্রাণ দিয়েছিলেন—সে সময়ে কামুর বয়স মাত্র এক বছর ছিলো। কামুর জীবনে দুঃখ-দৈন্যও এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে কামুর ছাত্রজীবন কেটেছিলো। সরকারী এবং বে-সরকারী নানা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়েছে কামুকে এই সময়। ক্লাসেই ছাত্রদিগের মাস্টার-মশায়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন উনি। আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কামু পাশ করেছিলেন ১৯৩৬ সালে তেইশ বছর বয়সে। উনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র। প্লোটিনাস এবং সন্ত অগস্টাইনের ভাবধারা সম্পর্কে কামুর নিজস্ব মতামত আলজিরিয়ার ফরাসী চিন্তাবিদ মহলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং দু'বছরের মধ্যেই দেখা গেলো রাজধানী অর্থাৎ আলজিয়ার্সের চিন্তাবিদ এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মহলে যুবক কামু একজন বিশিষ্ট সক্রিয় ব্যক্তি। এ সময়ে কামুর বয়স পঁচিশের বেশি নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার পরেই কামুকে দেখা গেলো আলজিয়ার্সে নবনাট্য আন্দোলনের একজন নায়করূপে। উনি নিজে একটি ছোটো কিন্তু শিক্ষিত এবং সুসংবদ্ধ নাট্য সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। কামু নিজে শুধু পরিচালনাই করতেন না তাঁর নাট্য সম্প্রদায়কে, একাধিক নাটকের অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করতেন। দেশ-বিদেশের প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারদের নাটকের যেমন মঞ্চরূপ দিতেন কামু তাঁর সম্প্রদায়ের সহযোগিতায়; তেমনি অনেক বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ করেও তা মঞ্চস্থ করতেন। এই সময়ে দেখা যায় জিদে, সিঞ্জ, বেন জনসন এবং ডষ্টয়েভস্কি কামুর সবচাইতে প্রিয় লেখক ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের স্বনামধন্য নাট্যকার ইসকাইলাসের অমর নাটক 'প্রমিথেউস বাউণ্ড' এর অনুবাদ করে কামু আলজিয়ার্সের শিক্ষিত সমাজের একজন আলোচনার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এর মঞ্চরূপটিও সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলো।

সাহিত্যক্ষেত্রে কামুর আবির্ভাব ঘটলো ১৯৩৭ সালে একখানা ছোট প্রবন্ধের বইয়ের রচয়িতা হিসাবে; পরের বছরই প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় প্রবন্ধের বই। এ দু'খানা বইই আলজিয়ার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো।

১৯৩৮ সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার কিছুদিন পূর্বে কামুকে প্রথম দেখা গেলো আলজিরিয়ার বাইরে বেরুবার সুযোগ পেয়েছেন। জার্মানী, মধ্য ইয়োরোপের অন্য কয়েকটি দেশ, ইতালী এবং খাস ফ্রান্স ঘুরে কয়েক মাসের মধ্যেই কামু আবার আলজিরিয়াতে ফিরে এলেন।

আলজিয়ার্সে ফিরে কামু এবার সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসেবে বেছে নিলেন এবং 'আলজার রিপাবলিকান' নামে জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্রের একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে চাকুরী নিলেন উনি। এর অল্প কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো। সাংবাদিক হিসেবে কামুর যোগ্যতার কথা অল্পদিনের মধ্যেই এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে ১৯৪০-এর প্রথম দিকেই প্যারিসের একটি সংবাদপত্রের মালিকের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলেন তাঁর কাগজের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে। কামু চলে এলেন প্যারিসে। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের বেশি ওঁর পক্ষে প্যারিসে থাকা সম্ভব হয়ে উঠলো না। ১৯৪০-এর জুনে খাস ফ্রান্স পদানত হলো জার্মানীর কাছে। প্যারিস অধিকৃত হবার কিছু পূর্বেই কামু আবার আলজিরিয়া ফিরে এলেন।

এবার আর আলজিয়ার্সে এলেন না কামু। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-জীবনের শুরু থেকেই দেশ-বিদেশের সাহিত্য এবং দার্শনিক রচনাদি পাঠ এবং নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সব কিছুর সমন্বয়ে যুবক কামুর ভেতরে ভেতরে শুরু হয়ে গিয়েছিলো একটা প্রবল আলোড়ন। এ আলোড়ন হয় তো প্রায় সব দেশের সব তরুণ মনেই দেখা দেয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা দেয় মানুষ তার ভেতরের স্ফূর্তিমান স্ফুলিঙ্গগুলিকে টুঁটি টিপে মারছে কখনো সুযোগের অভাব বলে, কখনো সংসারের চাপের দোহাই দিয়ে, কখনো বা নিজের ভেতরের শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখতে পারে না বলে। কাজ যে করবে না, তার অজুহাতের অভাব হয় না। আর কাজ যে করবে, কোনো অসুবিধেই তাকে বেশিদিন পঙ্গু করে রাখতে পারে না। আমরা আগেই দেখেছি কামু নেহাৎ গরীব ঘরের ছেলে। নিজের যোগ্যতার গুণেই যদিও প্যারিসের মোটা মাইনের একটা সাংবাদিকের চাকুরী জোগাড় হয়েছিল এবং আর্থিক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য এবং দর্শনচর্চা আরম্ভ করবেন মনস্থ করেছেন ঠিক এমনি সময় নাৎসী বর্বরেরা বাধ সাধলো। প্রথমটা কামু একটু হতাশ হয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু সে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। কিন্তু তারপরেই বুঝলেন যে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং' বজায় রাখার চাইতে ভেতরের স্ফুলিঙ্গগুলিকে প্রকাশের একটা বন্দোবস্ত করা অধিকতর জরুরী কাজ। তাই দেখা গেলো আলজার রিপাবলিকানের আগের চাকুরীতে ডাক পড়া সত্ত্বেও কামু সেখানে গেলেন না। পড়াশুনা, চিন্তা-ভাবনা এবং লেখার জন্যে যেমন প্রয়োজন কিছু সময়ের, তেমনি প্রয়োজন উত্তেজনা থেকে দূরে থাকবার। কামু তাই আলজার রিপাবলিকা নয় বেশি মাইনের চাকুরীতে না গিয়ে আলজিয়ার্সের দূরে একটি ছোট সহর ওরান-এ চলে এলেন। ওরানে এসে একটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন কামু। ইতিমধ্যে বিবাহিত হয়েছিলেন উনি। স্কুলমাষ্টারের স্বল্প উপার্জনের মধ্যেই সংসারযাত্রা নির্বাহের বন্দোবস্ত করে কামু এবার তাঁর সাধনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। এসময়ে ওঁর বয়স সাতাশ বছর।

প্যারিসের পতনের পূর্বেই সার্ত্রের প্রথম উপন্যাস 'নসিয়া' এবং গল্পসংগ্রহ 'দি ওয়াল' প্রকাশিত হয়েছিল, এ দুখানি বই এবং প্রথমশ্রেণীর সাময়িক পত্রপত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি প্রকাশের ফলে ফ্রান্সের তরুণ চিন্তাবিদগণের মধ্যে সার্ত্র নিজের বিশিষ্ট আসন করে নিয়েছিলেন। প্যারিসের পতনের সময় সার্ত্র এবং কামুর কার কতটা প্রতিষ্ঠা সে সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এ সময়ে কামু দু'খানা বইয়ের লেখক এবং ফ্রান্সের অন্যতম

উপন্যাসের আলজিরিয়াতে একজন প্রথম শ্রেণীর এবং উদীয়মান চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃত আর সার্ত্রেরও বইয়ের সংখ্যা যদিও দু'খানা কিন্তু তাঁর স্বীকৃতি তখনই বদলে গেলে শুধু খাস ফ্রান্সেই নয়, ফরাসী ভাষাভাষী পৃথিবীর সর্বত্রই একজন তরুণ চিন্তানায়ক এবং অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যাতা হিসেবে শিক্ষিত সমাজের আলোচনার পাত্র। ওরানে এসে কামু যখন একাগ্রচিত্তে সাহিত্যসাধনা শুরু করলেন সে সময়ে উনি নীতিগতভাবে সার্ত্রের একজন অনুগামী এবং ভক্ত। প্যারিসের সংবাদপত্রে চাকুরী নেবার কিছুদিন পরেই ইন্টেলেকচুয়ালদের সার্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কামু। কামু অবশ্য সৈন্যদলে যোগদান করেন নি। কিন্তু সার্ত্র ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন একজন যোদ্ধা হিসেবে। প্যারিসের পতনের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই সার্ত্রের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর কামু ওরানে এসে শিক্ষকতা শুরু করবার কিছুদিন পরে জানতে পারলেন যে সার্ত্র জার্মানদের বন্দীশিবিরে রয়েছেন।

ওরানে এসে দু'বছরের চেষ্টায় কামু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি স্ট্রেঞ্জার' এবং কাহিনীভিত্তিক একখানি দর্শনের বই 'দি মিথ অব সিসিফাস।'

প্রায় নয় মাস জার্মানদের যুদ্ধবন্দী শিবিরে কাটাবার পরে মুক্তি পেয়ে সার্ত্র প্যারিসে ফিরে এলেন এবং ফিরে এসেই নাৎসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হলেন। একদিকে যেমন গুপ্ত বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সার্ত্র অন্যদিকে তেমনি গুপ্ত সংবাদ সরবরাহের কাজ তথা গুপ্তভাবে কাগজ প্রচারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন সার্ত্র। যুক্ত ছিলেন অর্থাৎ রীতিমতো নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সব ছাড়াও সার্ত্রের একান্ত নিজস্ব সংগ্রামী সাহিত্যসৃষ্টির কাজ তো চলছিলই।

জার্মানদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সার্ত্র প্যারিসে আসবার পরেই চেষ্টা করেন কামুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের। একজন প্রতিশ্রুতিবান তরুণ চিন্তাবিদ হিসেবে কামু সার্ত্রের আস্থাভাজন ছিলেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় কামুর সঙ্গে সার্ত্রের যোগাযোগ স্থাপিত হলো। সার্ত্রের অনুপ্রেরণায় কামুও বুঝতে পারলেন যে দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেকেরই সক্রিয়ভাবে কিছু-না-কিছু করা দরকার, এ শুধু সাহিত্য বা দর্শনের চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, ব্যাপকতরভাবে সক্রিয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই সার্ত্রের আহ্বানে সাড়া দিলেন কামু।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি জার্মান অধিকৃত প্যারিসে চলে এলেন কামু। সে সময়ে ওঁর দু'পকেটে দু'টি পাণ্ডুলিপি 'দি স্ট্রেঞ্জার' এবং 'দি মিথ অব সিসিফাস'। দু'খানা বইই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ফ্রান্স জার্মান কবলমুক্ত হবার পরে। প্যারিসে এসেই সার্ত্রের নির্দেশে কামু গুপ্ত সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হলেন—অন্তত চারখানি গুপ্ত সংবাদপত্রে নিয়মিত লিখতেন কামু। তার মধ্যে একখানা The Combat ফ্রান্স জার্মান কবলমুক্ত হবার পরে যখন নতুনভাবে প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে আরম্ভ করলো তখন কামুই এ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গুপ্ত সংবাদপত্রগুলিতে কামুর রচনাবলী স্বাধীনতাযোদ্ধাদের এতই প্রেরণা জোগাতো যে, বাস্তবিক পক্ষে সে সময় বেশ কিছুদিনের জন্য কামুকে ফরাসী তরুণ সমাজের বিবেক-নিয়ামক বলা হতো। ফ্রান্সের স্বাধীনতা পুনরর্জনের কিছুদিন পরেই অবশ্য কামু The Combat-এর সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন পুরোপুরিভাবে এবং সমস্ত সময়ের জন্য সাহিত্যচর্চার জন্য নিজেকে নিযুক্ত রাখবার জন্যে। এ সময় পর্যন্ত কামু প্রায় সর্বতোভাবেই সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের অনুগামী ছিলেন বলা চলে। সার্ত্র ঘোষণা করেছিলেন যে, ভগবান নেই এবং ভগবান নেই বলেই মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এ স্বাধীনতা তার পক্ষে একটা শাস্তি বিশেষ (Man is condemned to be free)—মানুষের জীবন নানাবিধ যন্ত্রণা (Anguish), অসহায়তা (forlornness) এবং নিরাশায় (despair) এ পরিপূর্ণ। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত কামু তাঁর তৃতীয় এবং চতুর্থ বইয়েও ('দি স্ট্রেঞ্জার এবং দি মিথ অব সিসিফাস) প্রকারান্তরে সেই কথাই বলেছেন—মানুষের জীবন অতি অসহায়, অর্থহীন, একটা পণ্ডশ্রম করে বেড়ানো।

কিন্তু এর পর থেকেই কামুর চিন্তাধারায় স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করলো। যে কামু অস্তিত্ববাদকে মানুষের দর্শনচিন্তার শেষ কথা মনে করতেন—সার্ত্রের 'পর্সন্যা' যার বাইবেল স্বরূপ হয়ে উঠেছিল, প্রাচীন গ্রীসের ওরেস্টেস উপাখ্যান অবলম্বনে সার্ত্র রচিত নাটক "দি ফ্লাইজ" মঞ্চস্থ করবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়ে কয়েক সপ্তাহ আহার নিদ্রা ভুলে গিয়েছিলেন, তিনিই এবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে রচিত প্রবন্ধাদিতে অস্তিত্ববাদের বিরোধিতা শুরু করলেন। কামু তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতবাদের নাম দিলেন 'সেকিউলার হিউম্যানইজম' কিন্তু সমালোচকগণ বললেন যে কামু একটা নতুন আবিষ্কার করলেন মাত্র, সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের আওতা কাটিয়ে খুব বেশি দূর এগুতে পারেন নি কামু। তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতায় নতুন যা বললেন আসলে তা' অস্তিত্ববাদেরই একটা বিকৃতরূপ। সব কিছুতেই অবিশ্বাস (Nihilism) হয়ে উঠলো এই সময়ে কামুর প্রধান বক্তব্য। প্রবন্ধের বই 'দি রেবেল' এ কথার সাক্ষ্য দেবে। পশ্চিমী দুনিয়ার একাধিক রাজনৈতিক বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পরে কামু এই বলে উপসংহার টানছেন যে, বর্তমান সময় মানুষের জীবন একটা নিদারুণ হতাশা তথা অবিশ্বাসের স্রোতের মধ্যে উজান ভেঙে চলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না এবং এটা পারবার নয়, এবং এই যে অর্থহীন অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা এবং যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হচ্ছে খুন-জখম-নরহত্যা এবং তার ব্যাপকতর রূপ যুদ্ধ বা মহাযুদ্ধের জন্ম এবং তার সমর্থনে মতবাদ গড়ে তোলা। কামু আরো বললেন যে, বিদ্রোহ বা বিপ্লব যখন চরমরূপ নেয় তখন কার্যত সেই স্বাধীনতাকেই সে খর্ব করে ফেলে বা এমন কি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেও ফেলে যা অর্জন করা শুরুতে এর লক্ষ্য ছিলো বা থাকে। 'দি রেবেল' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে এবং এ বই প্রকাশের পরেই ঘোরতরভাবে মার্কসবাদ এবং স্ট্যালিনবাদ বিরোধী বলে একদিকে এবং এক মহলে কামুর খ্যাতি খুব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে আর একদিকে ঠিক ঐ কারণের জন্যেই কামুর জনপ্রিয়তা কমে আসতে থাকে।

'দি রেবেল'-এর পূর্বে প্রকাশিত 'দি প্লেগ' উপন্যাস কামুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলেই বেশির ভাগ সমালোচকের বিশ্বাস। আমরা

সবার শেষে এ বই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কামুর আর একখানি জনপ্রিয় উপন্যাস হলো 'দি ফল।'

প্রবন্ধ এবং উপন্যাস ছাড়া কামু তিনখানা নাটকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি কখনোই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি।

১৯৪৬ সালে কামু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং তখনই 'দি ষ্ট্রেঞ্জার' প্রকাশিত হবার পরে আমেরিকার সাহিত্য-রসিকমহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

কামু আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একটি বিশ্ব-সরকার (World Government) প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে মানব জাতির কোনই ভবিষ্যৎ নেই, তাই ১৯৪৭ সাল থেকেই বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে উনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া কামু একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম হলো 'কমিটী টু এড দি ভিক্‌টিমস্ অব টোটালিটারিয়ান ষ্টেট।' নামের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই কমিটীর মধ্য দিয়ে হিটলারের জার্মানী, ষ্ট্যালিনের রাশিয়া, সালাজারের পর্তুগাল এবং ফ্রাঙ্কোর স্পেন থেকে বিতাড়িত অন্তত কয়েক শ' নরনারীকে কামু প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কামু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৫৭ সালে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এবং এর তিন বছর পরে ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে প্যারিসে একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। কামুর স্ত্রী এবং একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বর্তমানে স্থায়ীভাবে প্যারিসেই বসবাস করছেন।

মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কামুর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা মোট বারো এবং বয়স ছেচল্লিশ বছর কয়েক মাস। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই কামু সাহিত্য জগতে যে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তা এ শতাব্দীতে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এটা সম্ভব হলো কি ভাবে, কিসের জন্যে, কি এমন গুণ তাঁর সৃষ্টির? আমরা আগেই বলেছি 'দি প্লেগ' উপন্যাসই কামুর শ্রেষ্ঠকীর্তি বলে সমালোচকগণ মনে করে থাকেন; আমরা তাই 'দি প্লেগের' মধ্যেই কামুর বিশিষ্টতা খুঁজবার চেষ্টা করবো।

আড়াই শ' পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদিও কামু ওরান সহরে একদা মহামারীরূপে ঘোষিত প্লেগ রোগ এবং তার আক্রমণের ফলে দু'লক্ষ লোকের একটা গোটা সহরের অবস্থা চিত্রিত করেছেন, কিন্তু আসলে প্লেগ রোগটা একটা প্রতীক। এ উপন্যাসে যেখানে প্লেগ শব্দটি আছে সেখানে যদি নাৎসী বা আক্রমণকারী বা শত্রু বা অত্যাচারী পড়া যায় এবং যেখানে ওরান শব্দটি আছে সেখানে যদি ফ্রান্স বা পিতৃভূমি পড়া যায় এবং ওরানের অধিবাসীদের জায়গায় যদি ফরাসী জনগণকে ধরে নেওয়া যায় তা' হলেই প্রকৃত চিত্রটি পাওয়া যাবে। প্লেগটা একটা প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন বলেই কামু তাঁর উপন্যাসের টাইটেল-পৃষ্ঠায় 'রবিনশন ক্রুশো'র ভূমিকায় ড্যানিয়েল ডিফোর কয়েকটি কথা তুলে দিয়েছেন: এক ধরণের বন্দীদশার কথা দিয়ে আর ধরণের বন্দীদশা দেখানো খুবই ন্যায়সঙ্গত, ঠিক যেমন যার বাস্তব অস্তিত্ব আছে এ রকম জিনিষের সাহায্যে যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই এরকম জিনিষ আমরা গড়বার চেষ্টা করি।

আলজিরিয়া উপনিবেশের একটি সহর ওরান। দু'লক্ষ লোকের বাস এ সহরে। এ সহরের সব মানুষই পৃথিবীর অন্য যে কোনো সহরের মতোই—যে যার কাজ নিয়ে আছে। কাজ মানে অর্থোপার্জনের জন্যে সদা ব্যস্ততা। ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত চলে এই কাজ—তারপর এক সময় 'সবুজের চিহ্নহীন, চাকচিক্যহীন, হৃদয়হীন, নিষ্প্রাণ সহর ইট আর পাথরের গাঁথুনির মধ্যে মুখ লুকিয়ে চোখ বোজে।' কয়েক ঘন্টার জন্যে মাত্র, তারপর আবার কাজ।

ওরান সহরে গরম প্রচণ্ড, প্রায় সারা বছরই কম-বেশি গরম চলে, বর্ষার সময় কয়েকটা দিন কিছু কিছু বৃষ্টি হয়, এখানে শীত ঋতুর আগমন বোঝা যায় যখন গরম খানিকটা কমে আসে—অর্থাৎ খুবই কম ঠাণ্ডা পড়ে। বসন্তকালের খবর প্রাকৃতিক কোনো পরিবর্তনে বোঝা যায় না। কিন্তু তবু বসন্ত যে এলো তা সবাই বুঝতে পারে সহরের বাজারের ফুলওয়ালাদের হাঁকডাক বেড়ে যায় (it's a spring cried in the market-places)।

এই ওরান সহরে একদিন দেখা গেলো ইঁদুর মরতে আরম্ভ করেছে। প্রথমে একটি দু'টি পথে ঘাটে এখানে সেখানে, তারপর ডজনে ডজনে, শতে শতে, হাজারে হাজারে—তাই কি রোজ মরা ইঁদুর ফেলবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আলাদা বন্দোবস্ত আরম্ভ করতে হলো, ট্রাকের বন্দোবস্ত করতে হলো। ব্যাপারটা সকলেরই নজরে পড়লো—কেউ অবাক হয়ে গেলো, কেউ দুঃখ বোধ করতে লাগলো অসহায় জীবগুলির জন্যে, কেউ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো কারণ কোন বইতে নাকি লেখা আছে ইঁদুর মারা যাওয়া একটা মারাত্মক অশুভ ইঙ্গিত। কেউ বললো ভূমিকম্পের আগে ইঁদুর মরতে আরম্ভ করে—ইত্যাদি।

সহরের একজন তরুণ ডাক্তার, নাম তার বার্ণার্ড রিয়ো প্রথম থেকেই ইঁদুর মারা যাবার এই ব্যাপারটাকে মোটেই ভালো মনে করছিল না। ডাঃ রিয়ো যেমন কোনো কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়, তেমনি আসল ব্যাপারটা যা হতে পারে তাও অন্যকে বলতে কিছুটা দ্বিধাবোধ করছে। কারণ আসল ব্যাপার যা হতে পারে—অর্থাৎ 'প্লেগ' কথাটা মনে হতেও গা শিউরে ওঠে ডাঃ রিয়োর।

হঠাৎ ইঁদুর মরা বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর একদিন ডাঃ রিয়োর ডাক পড়লো একটি রোগী দেখবার জন্য। রোগীর প্রচণ্ড জ্বর, গা হাত পায়ে এবং গলায় প্রচণ্ড ব্যথা। ডাঃ রিয়ো পরামর্শ দিলো রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে। এ্যাম্বুলেন্স এলো। ডাঃ রিয়ো রোগীকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো। সঙ্গে রোগীর স্ত্রী। রোগীটি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অকস্মাৎ একেবারেই চুপ হয়ে গেলো। রোগীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো—'কি বুঝছেন ডাক্তারবাবু, কোনো আশাই কি নেই?'

—'ও মারা গেলো।' ডাক্তার রিয়ো সংক্ষেপে জানালো।

এই যে সুরু হলো কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেলো সহরের অন্যান্য অঞ্চলেও মানুষ মরতে সুরু করেছে। ডাঃ রিয়ো তার কয়েক ডাক্তারবন্ধুর সঙ্গে মিলে সহরের পৌরসভাকে চাপ দিতে আরম্ভ করলো সহরে প্লেগ সুরু হয়েছে বলে ঘোষণা করতে। পৌরসভা গায়ে কানে তুললো না ডাক্তারদের কথা। প্রত্যহ দশ-বিশ জন মানুষ মরতে সুরু করলো। কিন্তু যে খবরের কাগজ ইঁদুর মরার সময়ে বড়ো বড়ো হেড লাইনে খবর ছাপাতো এবার তারা নীরব। কারণ,

কামু বলছেন : 'ইঁদুর মরে রাস্তায় আর মানুষ মরে ঘরের ভেতরে, খবরের কাগজের কারবার রাস্তা নিয়ে।'

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সহরে দৈনিক প্লেগের শিকার সংখ্যা যখন তিরিশ-চল্লিশে পৌঁছলো তখন পৌরসভার টনক নড়লো। প্লেগ মহামারী হিসেবে ঘোষিত হলো। শুধু তাই নয়, সরকার ওরান সহরকে আইন জারী করে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন বাইরের জগৎ থেকে। সহরে লোক যেতে পারবে, কিন্তু বেরুতে পারবে না। বাইরে চিঠিও পাঠানো চলবে না, চালু রইলো শুধু টেলিগ্রাম।

হাজার হাজার মানুষের জীবনে অকস্মাৎ দেখা দিলো এক নতুন সমস্যা। কেউ হয় তো কাজকর্মের প্রয়োজনে সহরে এসে পড়েছিল, তাদের কারোই বাইরে যাবার উপায় রইলো না। কোনোভাবেই না সমস্ত রকম বিশেষ অনুমতি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। পালিয়ে যাবারও কোনো উপায় রইলো না। কারণ সহরের বাইরে যাবার সমস্ত পথে কড়া পাহারা, আমরা আগেই জেনেছি বাইরে থেকে সহরের ভেতরে মানুষের আসতে বাধা নেই। কিন্তু কামু সুতীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে বলছেন যে, স্বামী বা স্ত্রী দু'জনে দুই জগতে থেকে বিরহে অশ্রুপাত করছে বটে কিন্তু বাইরে যিনি আছেন তাঁকে সহরে আসতে খুব ইচ্ছুক মনে হলো না—অর্থাৎ কিনা প্রেমের আকর্ষণের চাইতে প্লেগের ভয় অনেক বেশি। শুধু একটিমাত্র নারী সহরে এলো তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সেও নেহাৎ বুড়ী।

এইভাবেই কাটতে লাগলো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দৈনিক মৃত্যুসংখ্যা এখন দেড়শতে পৌঁছে গেছে। প্রতিটি নাগরিকের মুখ-চোখ সর্বক্ষণ থমথমে। হাসতে মানুষ ভুলে গেছে। তবে হ্যাঁ, হাসে, এখনো অনেকেই হাসে, প্রচুর হাসে—এক হাসে যারা মাতাল হয়ে ওঠে আর হাসে যারা পাগল হয়ে গেছে। পাগলের সংখ্যা সহরে প্রতিদিনই বাড়তে লাগলো।

প্লেগকে প্রতিরোধের জন্যে যারা দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে আসছিল প্রথম থেকে—একে একে তারা অনেকেই প্লেগের শিকার হয়ে পড়তে লাগলো। ডাঃ রিয়ো প্রথম থেকেই নিরলসভাবে খেটে চলেছে, কিন্তু এবার সেও অবসন্ন বোধ করতে লাগলো। সহরের পাদ্রী এই সুযোগে প্লেগের ভয় দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে ভক্তি আদায় করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু খুব সুবিধে হয়ে উঠলো না। মানুষের মনে আজ আর শুধু ভয় নয় নিদারুণ অবিশ্বাসও দেখা দিয়েছে। গোটা পৃথিবী পড়ে থাকতে এই সহরটাই শুধু প্লেগের কবলে পড়লো কেন? কেন, কেন, কেন? সবারই এক প্রশ্ন।

কামুর রচনাশৈলীর এক আশ্চর্য গুণ বাক্‌সংযম। এতো অল্প বলে বেশি বোঝাতে পারার দক্ষতা কদাচিৎ দেখা যায় এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অড়াই শ' পাতার এক বই আমাদের দেশেরই হ'ক বা ইয়োরোপেরই হ'ক অন্য কেউ লিখতে গেলে পাঁচ শ' পাতায়ও বলে উঠতে পারতেন না। যেমন ডাঃ রিয়োর স্ত্রীর খবরটা প্লেগ এখন আর সহরে মহামারী আকারে নেই। ডাঃ রিয়োর স্ত্রী প্লেগ সুরু হবার পূর্ব থেকে অসুস্থ অবস্থায় বাইরের এক স্যানাটোরিয়ামে ছিল। যোগাযোগের ব্যবস্থা টেলিগ্রাম। সেখান থেকে টেলিগ্রাম এলেই বৃদ্ধা শাশুড়ী, অর্থাৎ ডাঃ রিয়োর মা উৎসুকভাবে ছেলের মুখের দিকে তাকান। এবারের টেলিগ্রাম আসার পরও তেমনি হলো। ডাঃ রিয়ো সংক্ষেপে জানালো···হ্যাঁ, এক সপ্তাহ আগে।

বাক্‌সংযমের সঙ্গে ক্ষুরধার বিদ্রূপ মিশে 'দি প্লেগ' একখানি অনবদ্য সৃষ্টি হয়েছে। বিপন্ন মানুষকে বুঝবার এই যে গভীর দৃষ্টির পরিচয় কামু তাঁর রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন তাও নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ সাহিত্যকর্ম।

উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই, প্লেগমুক্ত ওরানের সাধারণ মানুষের আনন্দ, উল্লাস আর কোলাহল। কিন্তু এসবের মধ্যেও ডাঃ রিয়ো ভাবছে: এসব বোধ হয় ঠিক নয়, এ আনন্দ বেশি স্থায়ী হবার নয়; কারণ প্লেগের বীজাণু কখনোই একেবারে মরে যায় না, লুকিয়ে থাকে; তারপর একসময় আবার ইঁদুরগুলিকে চাঙ্গা করে তোলে···আবার সুরু হয়ে যায়···

প্রার্থনা

শ্রীবীণা কুণ্ডু

প্রভু, নিজের বোঝা নিজের করে
বইব না আর বইব না
আপন ঘরে কাঙ্গাল হয়ে
রইব না আর রইব না।

ভিক্ষাঝুলি পরের দানে
ভরতে যে মন নাহি মানে,
রইব চেয়ে তোমার পানে
আর কারো দান সইব না॥

নিঠুর, তোমার আঘাত সব মানি,
সে যে আগুন হয়ে সব কামনার
আঁধার নিবে টানি
তাই আঘাত সব মানি।

দুঃখ সুখের বিচার করে
ক্ষতিই শুধু আছে ভরে,
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নিয়ে
আর ত' কথা কইব না।
আপন ঘরে কাঙাল হয়ে
রইব না আর রইব না।

নৌকাযাত্রা

—পি, বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক বসুমতী
আষাঢ় / ১০

প্রতিবিম্বিত

রতন বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন ফসল

—নীরদ ভট্টাচার্য

মাসিক বসুমতী
আষাঢ় / ৭০

একটি জাহাজ

—চিত্ত নন্দী

ডানপিটে

—শক্তিপদ রায়

পাহারা

—তরুণকুমার মিত্র

মাসিক বসুমতী
আষাঢ় / ৭০

মৎস্য শিকার

—শান্তিময় সান্যাল

বাতায়ন (সেকেন্দ্রা) —তরুণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)
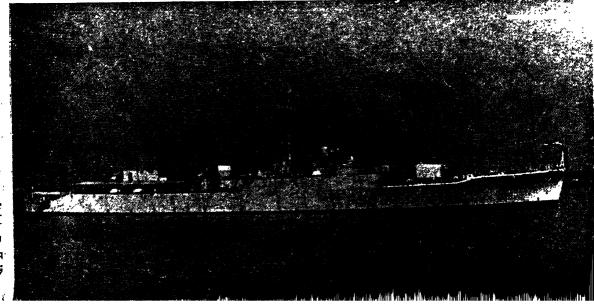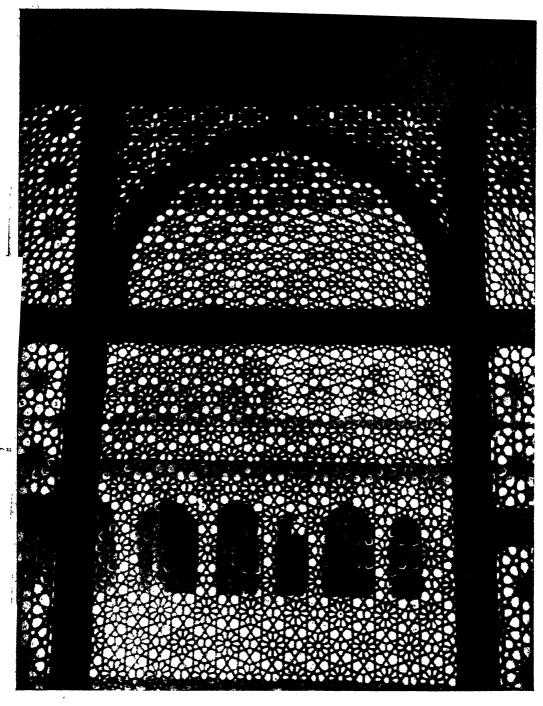
সুলেখা দাশগুপ্ত

সেদিন অসহ্য অপমানে মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছিল শিবানীর। প্রথম মুহূর্তে মনে হয়েছিল ইন্দ্রনাথের গালে চড় কষিয়ে দেয়, ঠিক যেভাবে রাস্তার লোক হলে এখন চড় কষত। ইচ্ছাটাকে সে দিন সামলাতে হয়েছিল শিবানীর। তবু দু' পা সে এগিয়েছিল কেন সে বলতে পারে না—কি করত তাও সে জানে না—কিন্তু ততক্ষণে নববধূ ললিতা আশ্চর্য রকম উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলেছে—সত্যি আশ্চর্য রকম।

শিবানী ভেবেছিল ললিতা ইন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাবে। এ অবস্থায় তার পক্ষে আর কিছুই করার থাকতে পারে না। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে দেখল, ললিতার ভীত দৃষ্টি মুহূর্তে দীপ্ত হয়ে উঠল। ইন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা তো সে করলই না বরং আরো দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালো। ইন্দ্রনাথের মাতাল হাতের মুঠোয় যেমন জোর ছিল না তেমনি জোর ছিল না তার হাতের আকর্ষণের ভেতর। তাই ইন্দ্রনাথের টানের ঝোঁক সামলাতে শরীরটাকে ঐটুকু শক্ত করার বেশী কিছু করতে হলো না ললিতাকে। টাল সামলেই ইন্দ্রনাথের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল সে! তারপর বসে পড়ল ঝপ করে ইন্দ্রনাথের পায়ের কাছে। ইন্দ্রনাথের পা টেনে নিতে নিতে শিবানীকে সম্বোধন করে বলল, শিবানীদি আপনি দাদার গলার টাই আর কোট খুলে নিন আমি জুতো মোজা খুলে নিচ্ছি। ভীষণ ঘামছেন। বোধ হয় অসুস্থ বোধ করছেন।

যেন ইন্দ্রনাথ ওকে চুমু খেতে বলার কথা ও শুনতে পায় নি। বা এমন কথা ইন্দ্রনাথ উচ্চারণ করে নি। যেন ইন্দ্রনাথ মাতাল নয়—অসুস্থ। ও অসুস্থ হয়ে ফেরা ভাসুরের পায়ের তলায় বসল সেবা করবার জন্য।

ততক্ষণে শিবানীর দিকে ইন্দ্রনাথের চোখ পড়েছে। পা টেনে নিয়ে দু' চোখ বুজে লম্বা কৌচের উপর টান হয়ে শুয়ে পড়েছে ইন্দ্রনাথ! নতুন দেখা ভ্রাতৃবধূর মুখ যেমন সে ঘোর চোখে চিনতে পারে নি—অপরিচিত মুখের সঙ্গে নিজের শোবার ঘরটাকেও তেমনি ইন্দ্রনাথের ঠেকেছে অপরিচিত। এখন বুঝতে পেরে—কিংবা হয়ত কিছু বুঝতে না পেরেও কেবল শিবানীকে দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে। মাতাল যেমন নিজেকে ছেড়ে দেয় তেমনি সামলায়ও। চোখ বোজা আর ঘুমের ভেতর বড় ফাঁক থাকে না মাতাল মানুষের। মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথ।

বাইরের বারান্দা দিয়ে একটা চটির শব্দ প্রায় দরজা পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেল। প্রতীক্ষারত কালীনাথ বধূর খোঁজে এসে বড় দাদা-বৌদির ঘরে বুঝতে পেরে ফিরে গেল। শিবানী দেখল, ইন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়েছে—কালীনাথ ললিতাকে ডাকছে—তবু ললিতা গেল না।

কেন?

সে আরো, আরো সহজ স্বাভাবিক করে আবহাওয়া করে দিয়ে তবে যেতে চায়।

কাল যেন ওরা দু'জন (ইন্দ্রনাথের কথা ললিতা একেবারেই ভাবছে না। সে জানে কাল এসব কোন কথাই তাঁর মনে থাকবে না।) ললিতা ভাবছে ওর আর শিবানীর কথা। ওরা যেন কাল পরস্পরের সম্মুখীন হতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ না করে। কালকের সকালের আলোয় যেন ওরা দু'জন লজ্জায় পরস্পরের কাছে মুখ লুকোতে চায়।

ললিতা ইন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের জুতো মোজা খুলতে খুলতে বলল, এ ভাবে জুতোটুতো শুদ্ধ ঘুমোতে বড্ড কষ্ট হবে। আমি খুলে দিচ্ছি।

ললিতা ইন্দ্রনাথের পায়ের জুতো মোজা খুলল। তারপর পায়ের কাছ থেকে ঘুরে মাথার কাছে এসে গলার টাই-এর ফাঁসটা দিল

টিপে করে। মাথার তলায় ঢুকিয়ে দিল একটা বালিশ খাট থেকে তুলে এনে।

ও কী ভীষণ ঘামছেন। সব ভিজে গেছে! আঁচল দিয়ে ইন্দ্রনাথের কপালের ঘাম মুছে দিতে লাগল ললিতা।…না, ললিতা শোনে নি ইন্দ্রনাথ কী বলেছেন।

কিংবা সে জোর করে বলতে পারে, ইন্দ্রনাথ কিছু বলেন নি।

যদি বলতেন তিনি আর ললিতা শুনত তবে কী সম্ভব ছিল ললিতার পক্ষে ইন্দ্রনাথের কপালের ঘাম আঁচল দিয়ে মোছা?

ললিতা কী নির্লজ্জ?

কিছু ঘটে নি।

ইন্দ্রনাথের কপালের ঘাম মুছে উপরের দিকে তাকাল ললিতা—কী কাণ্ড! পাখা খোলা নেই! ঘামবে না তো কী!

তরতর করে ঘরের কোণে গিয়ে রেগুলেটারটা 'অনে' ঘুরিয়ে দিল সে। তারপর শিবানীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, শিবানীদি—আপনার গায়ে সন্ধ্যেবেলা ভীষণ মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধ পাচ্ছিলাম—সে সেন্টটার নাম কি?

শিবানী এবার একটু হাসল।

কিন্তু তাও দেখল না ললিতা। আবার বলল, সেন্টটা কী?

শিবানীকে জবাব দিতে হল। বলল, স্যানেল।

স্যানেল! কই এ নামের সেন্ট তো দেখি নি। কোথায় পাওয়া যাবে? মার্কেটে?

না। এখানে কোথাও পাবে কি না আমি জানি নে। আমাকে একজন প্যারিস থেকে এনে দিয়েছেন।

ও, তাই বলুন। একটু শিবানীর দিকে এগিয়ে গিয়ে গভীর নিঃশ্বাস টেনে বলল ললিতা—ইস্, গন্ধটা এখনও তেমনি তাজা রয়েছে। যেন এই মাত্র দিয়ে এলেন। কী মিষ্টি আর নরম গন্ধটা; আঃ! বিলিতি না হলে এমন গন্ধ হয়।

তুমি নেবে একটা শিশি?

একটা শিশি নেবো? অনেকগুলো আছে নাকি?

এক একটা বাক্সে দু' রকম গন্ধের দু'টো করে শিশি আছে। সত্যি যদি তোমার ভালো লেগে থাকে, তোমার পছন্দমত গন্ধ নিতে পারো।

কই দেখি?

শিবানী ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও গেল। ড্রয়ার থেকে সেন্টের বাক্সটা বের করে ললিতার কাছে মেলে ধরল শিবানী। ললিতা সবগুলো শিশির উপর চোখ বুলিয়ে গন্ধের নামগুলো পড়ে গেল একবার—তারপর একটা শিশি তুলে নিয়ে গেল, ললিতা চলে গেলে মনে মনে মেয়েটিকে সাধুবাদ দিয়েছিল শিবানী।

তারপর সারা রাত নির্ঘুম চোখে বসে বসে কেবল ভেবেছিল।

আগে সে ভাবত।

এখন আর ভাবে না।

আগে সে ইন্দ্রনাথকে ক্ষমা করত।

এখন আর ক্ষমা করে না।

এখন সে কেবল নিজের খুশী মতো চলে। মর্জি মতো চলে। থেমে সে কিছুতেই যাবে না—কিছুতেই নয়। জীবন যদি তার কোন আনন্দ, কোন সার্থকতা সঙ্গে নিয়ে না এসে থাকে, ওর চলার আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ওর চলা যদি এমন চলা হয় যে, পথের শেষে দেখে যেখান থেকে ও যাত্রা শুরু করেছিল—ঘুরে এসে আবার সেখানে পড়েছে—এক পা—এক পা'ও এগুতে পারে নি, তবু সে চলবে। অসহ্য ওর কাছে জীবনের স্থবিরত্ব। ওর এই দুরন্ত চলা—ইন্দ্রনাথের বেহালায় পৈতৃক-বাড়ীতে থাকলে সম্ভব হতো না। যত খাতির আর সমীহই ইন্দ্রনাথকে তার পরিবার করুক, শিবানীকে পরিবারের ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে কিছুটা মেনে চলতেই হতো। পুরোনো পরিবারের পারিবারিক কানুনকে কিছুটা সম্মান দেখাতেই হতো। আর ওর সংগ্রাম ইন্দ্রনাথের সঙ্গে, তার পরিবারের সঙ্গে নয়। ওদের পারিবারিক মর্যাদার ধারণা আর সংস্কারকে অযথা আহত করে চলতে পারত না শিবানী। জজ কোর্ট রোডের বাড়ীতে সে স্বাধীন।

জজ কোর্ট রোডের বাড়ীতে সে স্বাধীন?

কী করে?

তার স্বামী?

স্বামী?

যতদিন স্বামী ওকে না মানছে আর মান্য করছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মান্য মান্য—সম্মান।

হ্যাঁ সম্মান করার কথাই বলছে শিবানী।

বলছে, স্বামী যতক্ষণ না স্ত্রীকে সম্মান করছে—ততক্ষণ স্ত্রীরও স্বামীকে সম্মান করার প্রশ্ন আসছে না।

যেদিন ইন্দ্রনাথ এসে বলবে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—সেদিন শিবানীও বলবে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—প্রেম-সঙ্গীতের এটাই আসল সুর।

নারী পুরুষের জীবন-সঙ্গীতেরও তাই এ তানই আসল তান। এ ঐকতান যেখানে ধ্বনিত হয় না সেখানে মিলিত জীবন ব্যর্থ।

শিবানীর বিশ্বাস এ ঐকতান ওঠে না বলেই সর্বত্র আজ কেবল ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠছে আর পড়ছে। একটু যার শোনবার কান আছে সেই শুনতে পায় সে সব দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। একটু যার দেখবার চোখ আছে সেই দেখতে পায় এ সব মুখের সুখ মুখাবরণ মাত্র।

হিন্দুকোড বিলের এক মস্ত সমর্থক ছিল শিবানী। বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল সমর্থন করে পত্রিকায় ওজস্বী ভাষায় প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে। আচার্য কৃপালনীর 'ম্যারেজ ল রিফর্ম ইন্ ইণ্ডিয়া' পড়ে রাগে ক্ষেপে উঠেছে। শ্রীকৃপালনী বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলের সমর্থক ছিলেন না। পরিষদে বিরুদ্ধতা করেছেন। প্রবন্ধটিতে নিজ মত যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তক্ষুণি কলম নিয়ে বসেছিল শিবানী উত্তর লিখতে:

কৃপালনীজীর মতে নিতান্ত অসময়ে এ বিল পাশ হয়ে মেয়েদের জীবনে দুঃখ-দুর্ভোগ নাকি বাড়িয়ে চলবে বই কমাবে না। কারণ, আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও অর্থনৈতিক উপযুক্ততায় পৌছোয় নি।

এই উপযুক্ত না হয়ে ওঠার মন্তব্য আমরা দেশ স্বাধীনতার ব্যাপারেও বহু জনের মুখে শুনেছি। তাঁদের মতে আমাদের আজকের সব দুঃখের মূল—অনুপযুক্ত দেশের হাতে স্বাধীনতা অর্পণ। আরো

কিছুকাল ইংরেজ অধিষ্ঠানই নাকি ছিল মঙ্গলের। শ্রীকৃপালনীজী নিশ্চয়ই এই মতাবলম্বীদের সঙ্গে একমত হবেন না। তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, মনুষ্যত্বের অপমান আর লাঞ্ছনা ভোগার চাইতে দুঃখ-দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে চলতে চলতেই আমার দেশ উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

আমরা মেয়েরাও তাকে সে কথাই বলব। আরো বলব—বিশ্বের বেশীর ভাগ কাজই এগুতে এগুতে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়। উপযুক্ত হয়ে এগুবার অপেক্ষায় বসে থাকলে সমস্ত জীবনেও উপযুক্ত হওয়া হয়ে উঠে না। আর দুঃখের ভয়? দূরের ভয় কিছু শেখায় না। কেবল ভয় বাড়ায়, কেবল আতঙ্কিত করে। কাছে গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরলে তবেই ভয়, ভয় পায়!

কৃপালনীজী জিজ্ঞাসা করছেন, বিচ্ছেদ ঘটে গেলে এ সব মেয়েদের অবস্থাটা কী হবে? তাদের বিয়ে করবে কে? সন্তান সমস্যাটা তো দুরন্তই আর সন্তান না থাকলেও বিয়ে করবার বেলা কুমারী কন্যায় পুরুষের বিশেষ পছন্দ।

হায় ঈশ্বর! কুমার কী মেয়েরাই কম পছন্দ করে? দোজবরে একাধিক সন্তানের পিতাকে বিয়ে করতে নারীমনই কী আনন্দে পাখা মেলে দেয়? পুরুষের কাছে আপন সম্ভোগের মূল্য এতো বেশী যে, তারা চিরকাল নারীমন দাবিয়ে রেখে, এমনি সব অপূর্ব এক তরফা যুক্তি দিয়ে তরুণী আর কুমারী লোভ করে আসছে—ভোগ করে আসছে।

নারী নাকি বুড়ো হয় পুরুষের চাইতে অনেক আগে। সব পুরুষের তাই মত—কৃপালনীজীরও তিনি বলছেন, মেয়েরা বুড়ো হয় পুরুষের চাইতে অনেক আগে। তখন তারা আশ্রয় পাবে কোথায়?

তা যায়। দেখা গেছে, যে দেশ যত অসভ্য আর বর্বর সে দেশের নারীর যৌবনকাল তত অল্প। এমন সব দেশও নাকি আফ্রিকায় আছে, যেখানে কুড়ি বছর বয়স পার হলে নারীকে মেরে ফেলা হয়। আমাদের দেশ সে অবস্থা থেকে কতদূর এগিয়েছে জানি নে,—আদবে এগিয়েছে কি না তাও বলতে পারি নে। কতগুলো কথা আছে শুনলে যেন কেমন গাটা ঘৃণায় কুঁকড়ে ওঠে। পুরুষের কুমারী পছন্দ করা, নারীর আগে বুড়িয়ে যাওরা—সে জাতীয় কথা। নারীর মর্যাদা তো দূরের কথা! পুরুষের মর্যাদারই কী কিছু অবশিষ্ট থাকে?

নারীর থাকার চিন্তা? পূর্বকালে কুলীন কন্যারা কী যৌবনে কী বার্ধক্যে থাকত কোথায়? বর্তমানে বিধবা নারী থাকে কোথায়? স্বামী-ঘরচ্যুত নারীর সংখ্যা এখনও কম নয়, তারা আছে কোথায়? সুখের আশায় ঘর বেঁধে দেন যারা—সে ঘর দুঃখের হয়ে উঠলে ফের বুকে ফিরিয়ে আনেন তাঁরাই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রয়োজনে যা চলছিল, তাই চলবে।

যদি এ বিল পাশ করতে হয় তবে কেবল নারীর জন্য পাশ করবার পরামর্শ দিয়েছেন শ্রীকৃপালনী। নারী পারবে প্রয়োজনে বিচ্ছেদ চাইতে—পুরুষ নয়। পুরুষের হাতে এ আইনের অপব্যবহার হবার সম্ভবনা বেশী।

শিবানীর কলম ঝড়ের বেগে ছুটে চলল: আমরা বলি, তাও ভালো—তাও ভালো। যা করবার ছেড়ে দিয়ে করতে হবে, বেঁধে রেখে পারবে না—সেই মস্ত মুক্তি, মস্ত মুক্তি।

প্রায় গোটা পৃথিবী যে আইন মেনে নিয়েছে আমরা মুখ ফিরিয়ে থাকব সেখানে কিসের গর্বে? পুরোনো ঐতিহ্য? সমাজের কাছে তার বর্তমানটাই বড় কথা।

তাই যুগে যুগে তার রূপ বদলায়। আগে টাকা ছিল, এখন না থাকলেও চলবে। অনেক খেয়েছি আগে, আর না খেলেও চলবে—এ যেমন হয় না, তেমনি পুরোনো দিনের দিকে তাকিয়ে বর্তমান পার করা যায় না। আর পুরোনো ঐতিহ্য? তাই বা কী? কত মর্মন্তুদ ঘটনা যে মেয়েদের জীবনে ঘটেছে ইতিহাসের পাতা ওল্টালে তা দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু লাভ কী! অতীত—অতীত। সে পাঁক ঘেটে ঘটনা টেনে বার করবার উৎসাহ নেই—বাড়িয়ে তুলে ঐতিহ্য বলে গৌরব করতেও নারাজ। শুধু বর্তমান গড়ে উঠুক দশটা সভ্য জাতির মতো এই আমরা চাই।

লেখা একেবারে কাগজের অফিসে পাঠিয়ে তার পর ঠাণ্ডা হয়েছিল শিবানী তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হলে দিদিকে লিখেছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হয়ে আমাদের মেয়েদের জীবনে যে কী উপায়হীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে দিল—কী নিঃসীম অন্ধকারে দিল আলো জ্বালিয়ে তা বুঝতে আমাদের আরো কিছু সময় লাগবে। বহুক্ষণ অন্ধকারে কাটালে অতর্কিত আলো চোখ সহ্য করতে পারে না—চোখ নিজে বুজে থেকে অন্ধকার খোঁজে, জানি আমাদের আরো কিছু সময় তেমনি যাবে—তবু আলো-আলোই রে দিদি।

শিবানীর কী তবে এখন নিজের চোখ বন্ধ রেখে অন্ধকার খোঁজার সময় চলছে?

না আজ তার এ পথটাকেই অন্ধকার ঠেকছে।

৩

মা!

কাচ্চি এসে শিয়রে দাঁড়ালো শিবানীর। আস্তে আস্তে আবার ডাকল, মা উঠবে না?

কাচ্চির মা ডাকটা ভালো লাগে।

শিবানীর প্রশ্রয় পেয়ে ইন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সে তাই ম-ই ডাকে তাকে। ইন্দ্রনাথের সামনে মা ডাকার সাহস তার হয় না। তখন সে ডাকে মেমসা'বই।

শিবানী যে জেগেছে, দু'বার এপাশ-ওপাশ করে কাচ্চিকে তা বুঝিয়ে দিল, কিন্তু সাড়া দিল না।

শিবানী জেগেছে দেখে জানালাগুলো খুলে দিল কাচ্চি। রোদ এসে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল।

পুবের রোদটা যেন হঠাৎ উষ্ণ হাতে গলা জড়িয়ে ধরল শিবানীর। আলোর তীব্রতায় চোখ মুখ কুঁচকে বিছানার উপর উঠে বসল সে। ধমক দিল কাচ্চিকে, বুদ্ধু একটা তুই। ঘুমন্ত মানুষের মাথার উপরের জানালা এ ভাবে দুম্ করে খুলে দিতে হয়।

ঘুমিয়ে কোথায় তুমি মা। তুমি তো জেগেই ছিলে, জানালা খুলে না দিলে কী তুমি উঠতে।

সত্যি—শিবানী জেগেছে তো অনেকক্ষণ। জন্মদিনের সকালটায় চোখ মেলতে ইচ্ছে করছিল না তার। দিনটাকে সে ফেরৎ পাঠাতে চাচ্ছিল—শুধু জন্মদিনের দিনকে নয়, প্রতিটি দিনকে সে দু' হাতে ঠেলে ফেরৎ পাঠাত চায়।

দিন কী করেৎ যায়!

যায় না যে সে কথা শিবানী মানে।

তবে?

মানুষের যত মাথা খোঁড়া তো অসম্ভবের পায়।

একে অসম্ভব—অসম্ভব। তাতে তার চোখ নেই। কান নেই। দেখতেও পায় না। শুনতেও পায় না যে।

জানালা দিয়ে দিগন্তের ঘন নীল আকাশের দিকে চোখ পাতল শিবানী: অসম্ভব নয় দেখতেও না পেল, শুনতেও না পেল কিন্তু যিনি দেখতে পান, শুনতে পান—এমন কেউ কী নেই·····

নাও এসো চুল খুলে দি—শিবানীর মাথা টেনে নিয়ে বিনুনী খুলতে বসল কাচ্চি। যে দিন উঠতে দেরী করে ফেলে বিছানার উপর বসেই শিবানীর চুল খুলে দেয় কাচ্চি। শিবানী একেবারে স্নান করে চায়ের টেবিলে যায়। বেণী খুলতে খুলতে কাচ্চি বকবক করে চলল, আজ তোমার জন্মদিন, কোথায় সকাল করে উঠে স্নানটান করে, ঠাকুর প্রণাম করবে—

আমার জন্মদিন লোকে এ খবর দিল কে?

বলবে আবার কে। আমি বুঝি জানি নে শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে তোমার জন্মদিন আর বৈশাখের মাঝামাঝি বিয়ের দিন। তোমার মার কাছ থেকে দু'বারই উপহারের শাড়ি-কাপড়-জামা আসে। ঐ তো কাল সন্ধ্যায় এসে রয়েছে, এখন পর্যন্ত দেখেও নি মা কী পাঠিয়েছে। স্নান করে মা'র পাঠানো শাড়ী পরো—বুঝলে মা।

ইন্দ্রনাথের কাছে কাচ্চি ঝি বা আয়া। কাচ্চি নামটাও ইন্দ্রনাথেরই দেওয়া। নইলে তার নাম কচি। ইন্দ্রনাথ এমন বাঙ্গালী 'কচি' নাম নরম গলায় ডাকতে পছন্দ করল না। সে বাঙ্গালী ঝি রাখতেই রাজী ছিল না। শিবানীর জন্য রাখতে হয়েছে। শিবানী বলে, হিন্দুস্থানী আয়া রাখব! ঘরে বসে দিন-রাত হিন্দী বলিয়ে নেবে জোর করে—বোকা আর কাকে বলে। এক গুচ্ছের মাদ্রাজী হিন্দুস্থানী আয়ার ভেতর মনোনীত করল শিবানী কচিকে। ইন্দ্রনাথ কচি নামাকে করে নিল কাচ্চি। কাচ্চি জানে সাহেবের ওকে একটুও পছন্দ ছিল না। ইন্দ্রনাথের কাছে তাই সে খুব সতর্ক হয়ে চলে। কিন্তু শিবানীর সঙ্গে চলনটা তার কিছুটা সখীর কাছ ঘেঁষা। সম্মান করা আছে, সমীহ করা আছে। ভালো-মন্দ বলা আছে, আব্দার-অভিমান করা আছে। শিবানীর মা'র উপহারের প্যাকেটটা তার হাতে এনে ধরে দিয়ে বলল, নাও খোল। আমি দেখছি, তোমার মুখ ধোবার জল জুড়িয়ে গেছে কি না।

শিবানী রাতে শোবার আগে আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঈষদুষ্ণ জলে মুখ ধোয়। জল একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখে কাচ্চি বাটি হাতে ছুটল গরম জল আনতে।

সত্যি মা'র উপহার পড়ে রয়েছে টেবিলের উপর বিকেল থেকে। এখন পর্যন্ত ও খুলেও দেখে নি। কালকে বাড়ী ফিরেছিল অনেক রাতে। সেই সকাল ন'টায় বেরিয়ে ফিরেছিল বারোটার পর নাইট শো'তে ছবি দেখে। বড্ড ক্লান্ত লাগছিল। প্যাকেটটা আর খোলা হয় নি। অনিচ্ছার কাজ আর অনিচ্ছার সঙ্গ মানুষকে এতো ক্লান্তও করে! তবু অমল ওর বন্ধ। সে যখন এসে, কখনো বেড়াতে যাবার, কখনো ছবি দেখতে যাবার, কখনো বা কোথায় গিয়ে বসে খাবার আমন্ত্রণ জানায় তখন আপত্তি করে না সে। না তেঁতো, না মিষ্টি, একটা স্বাদহীন সময় কাটিয়ে বাড়ী ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কাল তাই পড়েছিল। কালকে ও বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথকে দেখে। বারোটা শিবানীর পক্ষে রাত হলেও ইন্দ্রনাথের কাছে নয়। সে এমন সময় বাড়ী ফেরে না কখনও। কিন্তু কাল উপরে এসে দেখল বারান্দায় সবগুলো বাতি জ্বলছে। ইন্দ্রনাথ সেই আলোকিত বারান্দায় পাইপ হাতে ধীর পায়ে পায়চারী করছে। শিবানীর বারান্দা অতিক্রম করে ঘরে যাওয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ইন্দ্রনাথ পাইপ দাঁতে চেপে।

এটা কি ইন্দ্রনাথের শিবানীর জন্য প্রতীক্ষা করা ছিল?

না। শিবানী জানে, ওকে ইন্দ্রনাথ দেখছে এ কথাটাই শিবানীকে বোঝাচ্ছে ইন্দ্রনাথ।

শিবানী জানে, ইন্দ্রনাথের দাঁতে চাপা পাইপের গায়ে দাঁতের দাগ বসে গেছে।

এক্ষুণি সে ঘরে গিয়ে তার খাস-বেয়ারাকে ডাক দেবে, আব্দল···

[ক্রমশ।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৫৪। তাঁরা বিস্মৃত হয়ে গেলেন তন্ময়ীভাব। সেই অবস্থায় তাঁদের ভিতর থেকে ফুটে বেরিয়ে এসেছিল যে বিশিষ্ট উজ্জ্বলতা, কোথায় যেন মিলিয়ে গেল তা। লতায় যেন শুকিয়ে গেল রস। ধৈর্যের কৃত্রিমতা ফুটে উঠল শশব্যস্ত নয়নে। তারপরেই···অবাক্ কাণ্ড,···চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তাঁরা দেখতে পেলেন শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন। ঝড়ের বাতাসে পৃথিবীর বুকে আঁচল উধাও হয়ে গেলে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় পত্রাঙ্কুর, এ চিহ্নগুলিও যেন ঠিক সেই রকমের দেখতে।

গোপীদের বিস্ময় তখন মূর্ত হয়ে মর্মধ্বনি করে উঠল 'না না, আমাদের হৃদয় বেদীতে তাঁর পায়ের যে ছাপগুলি রয়েছে, সেগুলো কি তাহলে আমাদের চোখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল ধরণীতে? সত্যিই পদচিহ্নগুলি কি নিখুঁত! বিপিনলক্ষ্মী যেন নিজের হাতে লিখে রেখেছেন। কী মহিমা! উপাসনা করবার উদ্দেশ্যে বোধ হয় ঐ চিহ্নগুলিকেই সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছিলেন কমলা প্রভৃতি দেবীরা, হঠাৎ খসে পড়ে গেছে দ্যুলোক থেকে···ভূলোকে। কিম্বা, ঐ যে লতার মত লতিয়ে চলে গেছে পথখানি ওরা কি তার দু'ধারের নবীন পত্রদল? বিচিত্র।'

৫৫। চিহ্ন দর্শনমাত্রই গোপীদের গায়ের চামড়ার উপরকার লোমগুলি প্রগল্ভ হয়ে উঠল হর্ষে। বিস্মিত হয়ে গেল যেন আনন্দও। এ যে সৌভাগ্যের মহোদয়! গোপীদের খই ফুটতে লাগল মুখে।

একদল বললেন,—'ওরে দেখ দেখ, জ্যোৎস্না পড়ে চরণচিহ্নগুলি কেমন পিদ্দিমের মত জ্বলছে দেখ।

হতেই হবে শ্রীহরির চরণচিহ্ন। প্রত্যেকটি রেখা··ধ্বজ-কমল বজ্র-অঙ্কুশ···স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। কী চোখ-জুড়োনো শোভা!

আর ঐ শোভার কথা বলিস নে সই। ও শোভাও যে পুরুষরতনের প্রণয়িনী।'

আর একদল বললেন,—'নরম নরম বালির উপর ছাপ পড়েছে পায়ের। গোড়ালির দিকটা একটু নীচু। আঙুলের ডগাগুলোর দিকটাও কিছু নীচু। মাঝখানটি আবার চিতোনো। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের রেখায় রেখায় কেমন যেন ছবি-ছবি দেখাচ্ছে পদাঙ্ক।···

কী যে বকিস্। ওটি কি শ্রীহরির পদাঙ্ক, না ধরণীদেবীর মাথার সিঁথির ঝাপটা?'

এবার অন্য একদল বললেন,—'যা বলিস্ তা বলিস্, ধ্বজটি যেন ফেটে পড়ছে মহাগর্বে; কমলটি যেন কতই কৃপালু, শীতল করে দিচ্ছে অবনী; বজ্রটি যেন বাড়াবাড়ি রকমের নির্দয়; আর অঙ্কুশটির কথা সই বলিস্ নে, ওটি অতি ক্রুর, হৃদয়—খননের আচাযি্য।

প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা গুণ, তবু সহস্থিতি ওদের এমন সুন্দর করে তুলেছে, যে নয়নধারীদের হতেই হবে মন চুরি।'

বাম-প্রখরাদের উক্তি শেষ হতেই দক্ষিণ প্রখরারা বলে উঠলেন,—'আ মরি মরি কি মাধুর্য গো কি মহিমা···রাতুল দু'টি চরণের। কেবলমাত্তর চিহ্ন পড়ে আছে মাটিতে, তাতেও উপুড় হয়ে বসে রয়েছে মুগ্ধ মধুকর। তুই তো ফুলের ধুলো ভালবাসিস, এ দশা হল কেন তোর? ধন্য মধুকর, জয় হোক তোমার। পরম ভাগবতের মত তুমি মহাভাগ্যশালী। আহা এ ধূলিও ধন্য। নড়িয়ে দেয় ধরণীর দুঃখ, খণ্ডিয়ে দেয় ধীরদের দুঃখভার, ধ্বংস করে ধৈর্য-বজ্জ ধৃতিমানদের। শ্রীগোবিন্দের যুগল চরণের এই পদ্মধলি,···এঁকে বন্দনা করেন ইন্দিরাসুন্দরী, বন্দনা করেন নন্দীশ, বন্দনা করেন ব্রহ্মা।'

৫৬। ধূলি-বন্দনা শুনেই ক্ষেপে উঠলেন আর একটি গোপী। বললেন,—'তাহলে এস, আমরাও আঁজলাভরে তুলে নি···রসিক-শেখরের এই অতি রমণীয় চরণধূলি। এস, মুঠো মুঠো করে তুলে নি, বুকে মাখি, জুড়োই আমাদের দুরন্ত সন্তাপের দুর্দান্ত জ্বালা।'

৫৭। জনৈকা পরামর্শদাত্রী পাশেই ছিলেন; তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন,—'আহা কর কি কর কি সই, ও ধূলি নিও না, অমন খেলা খেলতে নেই। এক এক করে তুলে নিলে লোপ পেয়ে যাবে যে পদচিহ্ন আঁকা অমন রমণীয় পথ। চোখ ভরে সবাই দেখে নাও ওগুলোর পরিষ্কার রেখা। হাতের ঘষড়ানি লাগিয়ে মিলিয়ে দিও না যেন।'

বলতে বলতে, আর দেখতে দেখতে, তিনি হঠাৎ নতুন কিছু যেন আবিষ্কার করে বসলেন। একি?···আর একজোড়া পায়ের ছাপ। তবে নিশ্চয়ই তিনি আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন এই পথ ধরে।···সোহাগিনী কোনো রসবতীর চরণচিহ্নের শ্রেণীই তো বটে! এতো যে সে পদচিহ্ন নয়। এঁ্যা···রাধার চরণচিহ্ন!···তাই হবে। বিশেষ সৌভাগ্যের চিহ্নদল। তবে কি তিনিই পেলেন? সুলভ হল বল্লভের প্রণয়? সার্থক হল মান? রাধিকাই পেলেন···সহজ প্রণয়-সুখের আরাধনা?

৫৮-৫৯। ভাল করে চরণচিহ্নগুলিকে পরীক্ষা করলেন গোপী। দেখে, সকলকে ডেকে বললেন,—'আশ্চর্য, ব্যাপারখানা কী। একটিই যেন প্রশস্ত লতা, আর তাতে ধরেছে বিজাতীয় পল্লব? প্রিয় পদচিহ্নের প্রণয়ে বাঁধা পড়ে পাশাপাশি চলে গেছে আর একদল প্রিয় পদচিহ্ন··কোনো ভাবময়ীর। তাই কি দেখছি না পোড়া চোখে? কৃষ্ণচরণের সঙ্গে সঙ্গে এঁরও পদ্মপায়ের ছাপগুলি সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে বিলাসভরে। মনে হচ্ছে, ভারি মিষ্টি একখানি কাঁধের উপর ডান হাতখানি রেখে, এঁকে ভর করে চলে গেছেন কৃষ্ণ। মদগজ আর তার উন্মদা প্রেয়সী।

হায় রে, আমাদের সব যত্ন বিফলে গেল। নিষ্ঠুর তিনি। অনাদরের আবর্জনায় আমাদের ফেলে দিয়ে, যাঁর আনুগত্য তিনি নিয়েছেন, বলিহারি যাই তাঁর কপাল। একলা তাঁকেই তিনি ভালবেসেছেন, লুকিয়ে তাঁকেই করেছেন চুরি।'

৬০। হঠাৎ থেমে ক্ষণকাল কী যেন চিন্তা করলেন গোপী, তারপরেই বললেন—'ধন্যা আমাদের রাধারাণী, ধন্যা। জগতের মাঝে যত উন্নতা বধূ রয়েছেন, তাঁদের তিনি মুকুটমণি। পুণ্যের খনি হলেই তো তাঁকে বেছে নিয়েছেন তিনি। চাঁদ ছাড়া কি জ্যোৎস্না হয়? বসন্ত ছাড়া কি কুহু হয়? মেঘ ছাড়া কি বিদ্যুৎ হয়? এমন সম্ভাবনাও যে অসম্ভব।'

৬১। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা···পদ্মজয়ী মুখ নিয়ে এতক্ষণ বাক্যহারা হয়ে বসেছিলেন। সুহৃৎ পক্ষের ভাষণ শুনে গুণশ্যামা শ্যামাকে এবার বললেন,—'ওলো শ্যামা, রাধা এবার তোমাদের পক্ষপাতিত্বকে পথে বসিয়েছেন। তুমি তো তাঁর এক মাত্র প্রাণের বন্ধু। বনান্তরে তোমায় নির্মাল্যের মত ফেলে দিয়ে, হায় রে, তিনি চলে গেলেন; যিনি সকলের···তাঁকে একলার করে নিয়ে, চুরি করে, নিজেই লীলা খেলতে চলে গেলেন। তোমাদের বন্ধুত্ব দেখছি ভাসা ভাসা, অন্তরের নয়।'

৬২-৬৪। শ্যামা বললেন,—'বড্ড স্বার্থপর, হিংসুটে স্বভাব তোমার পদ্মা। দুষ্টবুদ্ধির একটি খনি। সরে পড় আমার সামনে থেকে।

শোনো বলি,—রাধার কাছে কৃষ্ণ প্রণয়···একটি উৎসব···উৎসবের অমৃত···অমৃতের রসস্রোত। রসস্রোতের সেই স্রোতস্বতীতে শিশুকাল থেকে ডুব দিয়েছেন রাধা। তাঁর নিজের বশে নেই নিজের দেহ। গভীর আবেগে সেই মহাস্রোত না জানি কোথায় তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে। নিজেকে সামলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। শৈবালের মত ভেসে চলেছেন রাধা। ক্ষোভ না করে তোমাদের বরং পূজা করা উচিত তাঁকে।

একই লাবণ্যময় রূপের ভিতর জন্ম, এক সঙ্গেই বাড়ে, কোনো ভিন্নতা নেই ঐক্যে···তবু সময় হলেই উপকোষটি ত্যাগ করে চম্পক। তার জন্যে কি অপরাধী করা চলে চাঁপাকে?

তাই সময় হলে প্রাণের তুল্য সখীও ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু রসিকার বন্ধুত্ব কমে না কিছুতেই।'

৬৫। অন্যেরা বলে উঠলেন,—'শ্যামা, নিজের পক্ষের লোক কখনও নিজের পক্ষের অমঙ্গল দেখতে পায় না। এখনও তুমি হজম করতে পার নি ভালবাসার গুরুভোজন, তাই অমন যুক্তির উক্তি আওড়াতে পারলে।

সত্যি কথা বলতে কি ভাই, রাধা আমাদের মনে হয় এমন কাজটি করেন নি। তিনি যে প্রধানা। এ কাজ যিনি করেছেন তিনি একেবারে নির্ঘাৎ দয়া-মায়ার লেশ-শূন্যা। নিষ্কৃপা! তা না হলে নিখিল গোপ-রমণী-মণিদের কামনার ধন যে বৃক্ষাধর, তাকে কি না তিনি নিজেই পান করছেন··একলা। চকোরীকেও পথে বসিয়েছে।···

এই যে চিহ্নগুলি, যা দেখে আমরা নাচছি, এ হতেই পারে না

রাধার পায়ের!' এই বলে সেই নয়ন ভুলানো চরণচিহ্নগুলিকে মনোযোগ-সহকারে দেখতে দেখতে, হেলতে দুলতে এগিয়ে চললেন শ্যামার বিপক্ষীয়েরা। কখনো হর্ষ, কখনো গর্ব, কখনো প্রণয়, কখনো কোপ, কখনো দীনতা···ফুটতে লাগল তাঁদের চলায় বলায় চাহনিতে। কেমন যেন একটা আবিলির ভাব। তারপরেই আর একটু এগোতেই···ধুলোর দিকে চাইতেই···তাঁরা অবাক্।

৬৮-৬৯। ধুলো আছে, বধূ-পদের চিহ্ন নেই।

খণ্ডিয়ে গেল সমস্ত সন্তাপ। ঝড় উঠল তর্কের।

···'আশ্চর্য, এ কেমন করে হল? রমণীর পা, পায়ের ছাপ, ছাপের অমন বাহার, আশ্চর্য, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অথচ ওদিকে সুন্দর ফুটে রয়েছে শ্রীহরির পদাঙ্ক? এ কেমন করে হয়?

···ও: বুঝেছি, খরখরে তৃণাঙ্কুর লেগে পায়ের তলা পাছে ছিঁড়ে যায়···তাই বোধ হয় বধূটিকে বুকে তুলে এই পথে চলে গেছেন তিনি বোধ হয় নয়, নিশ্চয়!

···রমণীটির কৃপায় রসিয়ে উঠছে ঈশ্বরের বুক, বইতে বইতে ভারে ঐ দেখো, নরম নরম বালিতে নীচু হয়ে বসে গেছে তাঁর কমল-চিহ্ন চরণের···আহা তাই বলো। তাহলে এখন ওলো কৃষ্ণপ্রিয়া, দয়া করে আপনি অনুভব করুন,···করুন···করতে থাকুন···জন্মজন্মার্জিত পুণ্যের, সৌভাগ্যের, গরিমার মধুরিমা—মত্ত-করীর মাথায় চড়ে যেটি অনুভব করে থাকে মধুকরী। এত চড়ে গেছে আপনার অনুরাগ, যে মনে করছেন, এই উৎসব বুঝি এখনও ফুরোয় নি। কি কপাল নিয়েই না এসেছিলেন! যিনি প্রেম বিলোন তাঁকেই কি না ভাসালেন প্রেমে?

···একসঙ্গে আমরা এলেম। দর্শন পেলেম তাঁর। তাঁর আলাপ শুনলেম। রুক্ষ আলাপ। তারপর একসঙ্গে আস্বাদ করলেম রতিরস। আর এখন···আপনাকে বুকে নিয়েছেন তিনি, তৃণের মত ত্যাগ করেছেন আমাদের। ফলেই প্রকাশ পায় পুণ্য,—পাপও। কী আশ্চর্য, পায়ের ছাপ দেখতে দেখতে, দেখাটাই হয়ে উঠল আমাদের এত বড় দুঃখের খনি?'

৭০। আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে, বিস্ময়-দীর্ণ হয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন, বলে উঠলেন,—

'···দেখেছেন, কাণ্ডখানা একবার দেখেছেন? যেন কত না পরিশ্রম হয়েছে, যেন ভার বইতে আর পারছেন না, তাই বুক থেকে এইখানে তিনি নামিয়ে দিয়েছেন ভাবময়ীকে। বুকের লক্ষ্মীঠাকুরুণকেও হার মানিয়েছেন দেখছি এই বিনোদিনী। নামিয়েও ক্ষান্তি নেই। আবার তাঁকে মুখোমুখী করে দাঁড় করানো হয়েছে। যেন কতই না তিনি শ্রান্ত।

···ওলো সই দেখ দেখ, জোড়া জোড়া পায়ের ছাপ মুখোমুখী কেমন দাঁড়িয়েছে। রহস্যালাপ যে চলছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার চেষ্টা। বেশ বোঝা যাচ্ছে, শ্রান্তি আর লীলার অলসতায় এঁর কাঁধ হেলে পড়েছিল ওঁর কাঁধে: উঁ ও তাই। বয়স্ত-ভাবের সূচনা করে বাহুগুলিও বোধ হয় সমাপ্ত করেছিল আলিঙ্গন।'

৭১। কথার পিঠে কথা পড়তে পারে বটে, কিন্তু এই হেন কথা থেকেই সৃষ্টি হয় অসূয়ার। চন্দ্রাবলী-পক্ষীয়াদেরও হল তাই। অকারণে কঠোর হয়ে গেল তাঁদের মন, কোথায় যেন বেশ কিছু অভাব ঘটে গেল রসের।

৭২। শ্যামা-পক্ষীয়াদের কিন্তু মনের অবস্থাটি হল অন্য রকমের। একেই তাঁদের হৃদয় সখীপ্রেমে ভরা, তার উপর যখন তাঁরা বুঝলেন··· ভালবাসার পাল্টা সম্মান পেয়ে গেছেন তাঁদের রাধা, তখন এত খুসী হয়ে উঠলেন তাঁরা যে, নিমেষে নিভে গেল তাঁদের বিরহানল, নিমেষে ভুলে গেলেন তাচ্ছিল্যের রূঢ়তা, বরং অনুভব করতে লাগলেন নিবিড় আনন্দের মসৃণ কোমলতা।

৭৩। পদাঙ্ক লক্ষ্য করে তাঁরা চলতে লাগলেন। দূরে দেখা যাচ্ছিল···যমুনার পুলিন। ঝকঝক করছে যেন পৃথিবীর বুক। চারদিকে রূপোর পাতের মত জল। চন্দ্রালোকে নিতান্ত পুলকিত। আশা মেটে না চোখের। কিন্তু রসিকশেখর কি অতটা দূরে চলে গেছেন? না, হতেই পারে না। দ্রুত চলার লক্ষণ নেই তো এখানকার এই পদচিহ্নে একজন বলে উঠলেন,—

'এই পদাঙ্কগুলিতে তো কই, একেবারেই দেখা যাচ্ছে না ধ্বজবজ্রাঙ্কুশকমলের রেখা? কেবল ব্যক্ত দেখছি পায়ের আঙুলের ডগাগুলোর ছাপ। নিশ্চয় তিনি গোড়ালি উঁচিয়ে, মাটিতে পায়ের আঙুল ডুবিয়ে, মাথার উপর হাত উঠিয়ে, নুইয়ে ছিলেন শাখা।' আর একজন বললেন,—

'আহা, তাই বলো···। প্রিয়তমাটি ফুল তুলেছিলেন প্রিয়তমাটির জন্যে।'

৭৪। এগোতে এগোতে আরো কতকগুলি পদচিহ্ন চোখে পড়ে গেল তাঁদের। বিঘ্নহীন কোনো আশ্রয়কে অবলম্বন করে যেন পরিষ্কার ফুটে রয়েছে চিহ্নদল। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন,—

৭৫। কর্পূরের মত ধবধবে বালির পথ। তার উপরে মরি মরি, কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের পাতার দু'পাশের দাগ! দু'পায়েরি···দেখেছিস্? মিহি কাপড়েরও একটা দাগ রয়েছে! না?

···কিন্তু প্রেয়সীটির তো কোনো চিহ্নই নেই।

···বুঝলি না কি হয়েছে?

···কি আবার হবে?

···নিভৃত জায়গা, আতঙ্ক নেই এতটুকুও, অঙ্ক থেকে নামিয়ে, ঐ মিহি বসনখানির উপর বসিয়েছিলেন।

···আর ফুল দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁর কবরী!'

৭৬-৭৭। এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে আর এক গোপী বলে উঠলেন,—'আরো আশ্চর্যের এক ব্যাপার দেখবি আয়। ঐ দেখ্। অকাল হলে হবে কি, রসের খেলার জোর-জারির বহরটা একবার দেখ্। শুনেছেন,···অশোক গাছে ফুল ফোটে প্রিয়ার পদাঘাতে। বকুল হয় ফুল্ল-মুকুল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে। সামনেই অশোক, বকুল, অমনি কৃষ্ণের অভিলাষ হয়েছে, প্রয়োগ দেখবেন। অনুনয় বিনয়। প্রয়োগ করিয়ে ছেড়েছেন প্রেয়সীকে। সত্ত সত্ত ফুল ফুটে উঠেছে অশোকে, বকুলে। ফুল তুলতে ঐ দেখ্ তিনি চড়েও ছিলেন গাছ দু'টোতে। অশোক-তরুর মূলে নতুন পাতার মত ঐ দেখ তাঁর পায়ের আলতার রাঙা রাঙা চিহ্ন। আর ঐ দেখ বকুলের মূলে, ফুল ছেড়ে গোল বেঁধেছেন ভ্রমরেরা। ঐখানে পড়েছিল কি না মুখমদের গণ্ডূষ। এইখানেই কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয় রয়েছেন তাঁরা।' অতএব সেইখানেই সে দুটিকে তঁতিপাতি করে করে খুঁজতে লেগে গেলেন শ্যামাপক্ষীরা গোপীরা।

৭৮। এদিকে, দায়লব্ধ ধনের মত যাঁকে আদায় করে তিরোহিত হয়েছিলেন রসিকশেখর, তাঁর সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল তাঁর অখণ্ড প্রণয়-লীলা। যেমন উৎকর্ষ লাভ করল অতি নিবিড় রতিরাগ, তেমনি আবার অপর একটি রতিভাগ লাভ করবার জন্যেও উতলা হয়ে উঠল তাঁর হৃদয়। তিনি বিচার করলেন,—'কামী···দীন হয়।

স্ত্রীলোক···দুরাত্মা হয়।

কিন্তু আমার মধ্যে রয়েছে লীলা-কামিত্ব। অতএব কামিত্ব থাকলেও আমি দীন নই। এঁরাও সামান্য স্ত্রীলোকের মত নন; কারণ এঁরা আমার অঙ্গসঙ্গ-মঙ্গলের অধিকারিণী। মদ্ব্যতিরিক্ত কামীই দীন; এতদ্ব্যতিরিক্ত স্ত্রীলোকেরাই দুরাত্মা। অতএব, যাঁরা আত্মতুল্যা তাঁদের আধারেই লীলা প্রশস্ত।'

এই বিচার করে, আত্মারাম অবস্থায় তিনি লীলাবিহার প্রকট করলেন তাঁর সঙ্গে।

৭৯। কিন্তু রাধা···হৃদয়ে যাঁর অনন্ত কোমলতা, অগ্রণী যিনি শ্রেষ্ঠা হৃদয়বতীদের, সৌভাগ্যবতীদের এবং মঙ্গলময়ীদের, বৈজয়ন্তীর মত যিনি সুচির-সুদুর্লভা, তাঁর মন কিন্তু মুদিত হয়ে উঠল না কেবলমাত্র এই আত্মনিষ্ঠ সুরতনিষ্ঠায়। তিনি ভাবতে লাগলেন,—

'একলা আমাতেই বন্যা নামল প্রবল ভালবাসার···পরাণপ্রভুর। আমার সখীরা কেউ দেখতে পেল না···এ সৌভাগ্য। মরি মরি, এ বিচ্ছেদ তারা সইছে কেমন করে? হায় রে, তারা কি আর বেঁচে আছে? তা···এখন আমায় এমন একটা সুন্দর দুষ্টুমি করে ফেলতে হয়, যাতে করে এখান থেকে ইনিও বেশী দূরে যেতে পারবেন না, আর সখীরাও সকলে মিলে ক্রমে ক্রমে এখানে এসে জুটবে।'

৮০। আর্যমন এই হেন বিচারই করে থাকে। অতএব রাধা ধীরে ধীরে, যিনি নিরুপম প্রণয়রসের সমুদ্র তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন,—

'আর আমি এতটুকুও নিজে চলতে পারছি না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নিয়ে যাবার মত রথও কোথাও দেখছি না। কেমন করে যাই? রাতও বাড়ছে। হে রসিক, এই সিকতায় এস ক্ষণকাল বসি।'

৮১। রাধিকার কথায় চমকে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। কথা তো নয় যেন বাণ। কৃষ্ণের মনে হল, কথাগুলি সহজ ও গর্বহীন সত্য তবুও কথার বাইরেটা কেমন যেন গর্বিত ও ধারালো। বিচারের কৃত্রিমতা তিনি বুঝতে পারলেন, কিন্তু কেমন যেন ঐ বাইরে বাইরে। শেষে স্থির করলেন,—

'স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকাদের পক্ষে গরবিনী হওয়াটা এমন-কিছু অস্বাভাবিক নয়; আর আমার মত ধীরললিত নায়কের হৃদয়টিকেও যে এই গর্ব সুখময় করে তোলেনি তা-ও নয়। তাহলেও এঁর ভিতরকার ঐ গর্বটিকেই আমায় তীর্থ করতে হবে তিরোধানের।'

এই সিদ্ধান্তের পর শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করলেন সকৃত্রিম একটি দারুণ

ভাব। রাই-গরবিনীর গরব ভাঙা···হাঁ, খেলার মত একটা খেলা বটে। তাই তিনি পদ্মচোখে ফুটিয়ে তুললেন অরুণকান্তি এবং নীতিবিরুদ্ধ ভাষায় বললেন,—

৮২। 'রথ-টথের দর্শন যদি না পান তাতে হয়েছে কি? এই তো আমার স্কন্ধ রয়েছে···বিপুল লাবণ্যে ঢলঢল। আরোহণ করে কৃতার্থ করুন স্কন্ধ।' বলতে বলতে···দৃশ্যমান তিনি··· সেইখানেই বিদ্যমান তিনি···অন্তর্ধান হয়ে গেলেন রাধার দু'নয়ন থেকে।

৮৩-৮৪। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল, আকাশে হারিয়ে গেল রাধার বচন পাণ্ডিত্য। যে বাণীর রসমাধুরী সুধার তরঙ্গিণী বহাত বসুধায়, যাতে অবগাহন করে সুখী হত ব্রজধাম, সে মাধুরী মুহূর্ত্তে হয়ে উঠল বিষ-তরঙ্গিণী, বক্ষে অনুলেপনের জন্তে সঙ্গে এনেছিলেন যে চন্দনপঙ্ক, জলন্ত আঙ্‌রা হয়ে উঠল তা। নয়নমণ্ডলের জন্তে নিয়ে এসেছিলেন যে সিদ্ধকজ্জল সেটিকে মনে হল বিষমাখা ময়লা জল। কণ্ঠাভরণ ঐ মুক্তাহার···ও যেন লকলকে গোখরো! সাপের ফণা···ঐ তাম্বুলের পাতাগুলো! গয়নার থামিগুলো খিলগুলো,···সব যেন বিষে ভরা! বুক ভেসে যেতে লাগল কাজল-ধোয়া নয়নজলে। বুক চিরে গুমরে গুমরে বেরিয়ে আসতে লাগল কান্না। নিদারুণ উদ্বেগ যেন একজন সূত্রধরের চেহারা ধরে, রাধিকার বুকের উপর টানতে বসে গেল কালো ডোরার দাগ আর তারপরে সেই দাগে দাগে চিরতে লাগল বুক··· সন্তাপের খরখরে করাত চালিয়ে।

৮৫। মুক্তকণ্ঠে উঠল রাধার বিলাপ—'কোথায় তুমি, কোথায় তুমি? হা নাথ, হা রমণ, একমাত্র সিন্ধু প্রণয়ের···কোথায় তুমি? প্রকাশ হও। নয়ন সমুখে দেখা দাও। জানি,···আমি জানি তুমি এইখানেই আছ। তবে কেন আমার এই দু'চোখের বাইরে তোমার থাকা? কী যন্ত্রণাই না দিচ্ছে পোড়া প্রাণ! যতক্ষণ বেঁচে আছি, জীবন বড় লোল···অন্তত ততক্ষণ তুমি রাগ করে থেকো না; পথিক হও নয়ন-পথের। তা না হ'ল, নিষ্প্রাণ এই দেহখানি সত্যিই তোমায় বইতে হবে···ঐ তোমার ঐ স্কন্ধে···সত্যিই। আমার কী এমন গর্ব দেখলে, কী এমন বলেছি, কী এমন অপরাধ করেছি··· যাতে রাগ হয়েছে তোমার এত? ওরা আসবে, একটু দেরী করবো, তাই তো' আমি বলেছিলুম,···চলতে পারছি না। এ তো গর্ব করে বলি নি। তাই কর প্রভু তাই কর···যাতে করে তারা এসে এই দুর্দশা না দেখতে পায়; যাতে করে হে ভাগ্যবান, তোমার চাঁদের মত মুখ তারা নয়নভরে ভাখে; যাতে করে তোমার ভালবাসার তারা নিন্দে না করে। তাই কর প্রিয়, তাই কর। একাকিনী··· এই বনে···আমাকেই তুমি ত্যাগ করে চলে গেছ! এ বড় সাহসের কাজ হয়ে গেছে তোমার। ওরা তবু পরস্পরের সঙ্গ সুখ পায়। এত যাতনা পায় না আমার মত। এখন চোখের জলে সান্ত্বনার পথও আমার রইল না। ধিক্ যামিনীকে···যদি তাকে ভালই না বাসেন চাঁদ: ধিক্ পদ্মিনীকে···যদি তার মুখই না দেখেন সূর্য; কি ছার সে জীবনে···যদি তাকে পায়েই ঠেলেন প্রিয়তম। সোহাগের ভোগ হলে তবেই না গুণ···গুণ হয়।'

৮৬। রাধার সমস্ত অন্তরের মসৃণতায়, সমস্ত অন্তরের অনাবিল সরসতায়, ভুজঙ্গের মত প্রবেশ করল, বৈশাখের সূর্যের মত জলতে লাগল,···প্রিয়তমকে হারানোর অনির্বচনীয় খেদ। কিন্তু সে-দংশন সে উত্তাপ সহ্য করা কি এতই সহজ? জ্ঞানের অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আক্রমণ করল দশমী দশা। ম্লান হয়ে এল চেতনা। সর্বাঙ্গ ঘিরে সুবিপুল যন্ত্রণার হল আবির্ভাব। নিমেষের মধ্যেই অসময়ের বন্ধুর মত সেখানে ছুটে এলেন মূর্ছাদেবী; কল্যাণহস্তে মুছিয়ে দিলেন সব যাতনা।

যমুনার বালুবেলায় ঢলে পড়ে গেল শ্রীরাধার তনুখানি, ম্লানা··· মৃণাল-লতিকার মত। অন্তরের শ্বাস অন্তরেই রইল, এক ফোঁটাও বেরিয়ে এল না দেহের বাইরে। বাধা হল জনলজ্জা, বাধা হল প্রেমের প্রসিদ্ধি।

রাধার তনুখানিকে চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল সারঙ্গেরা। তাদের চোখে ভয়, গাল বেয়ে টস্‌টস করে ঝরে পড়ছে অশ্রু। পুষ্পরসের উপচার দিয়ে রাধার তনুখানিকে সিক্ত করল বল্লীদল। ছুটে এল স্তব্ধ-গুঞ্জন ভ্রমরেরা, ডানা কাঁপিয়ে বাতাস করতে লাগল জোরে জোরে। হা হা করে ডাক দিয়ে উঠল বিপিন-বিহঙ্গেরা আর বন্ধু-পরিজন। সময়োচিত প্রাথমিক সেবা নিয়ে এল তারা।

যেন আর শ্রীরাধার তনুখানির শয্যা হয়ে রইল···পদ্মপাপড়ির মত তাঁর নিজেরি ছায়াখানি। তাঁর শরীরের উপর আকাশের জ্যোৎস্নাই ঝরাতে লাগল চন্দনের ধারাজল; শীতল মৃণাল-বল্লীর রূপ গ্রহণ করল তাঁর দু'খানি বাহু। বিয়োগ জ্বরে উত্তমা প্রিয়-সখীর মত মূর্ছাদেবীই ছিন্ন করে ছিলেন তাঁর দুঃখের অনুভূতি।

আর আহা, সেই কানন-কুঞ্জের লতাগুলি। তাদের পাতা কাঁপে, আর মনে হয়, হাত দিয়ে যেন বুক চাপড়াচ্ছে। তাদের শাখায় বসে পাখীরা ডাকে, আর মনে হয়, আর্তরোল তুলছে বুঝি তারা। ফুল থেকে মধু ঝরে, আর মনে হয় তারা কাঁদছে। এরাই এখন যেন রাধার প্রিয় পরিজন। [ক্রমশ।

প্রেম

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

দৃশ্যের গভীরে কোন মায়া আছে,
আশ্চর্য আকাশ কাঁপে তার অন্তরালে।

আমরা ঘুমিয়ে আছি,
ঘুমিয়ে আছি নিকান্ত আনন্দে।
নক্ষত্রেরা আলো দিচ্ছে ঝিম্‌'কর অন্তর-গহনে।

আমিও আমার যত দুরন্ত ইচ্ছাকে
নদীর শরীরে আজ অক্লেশে ভাসাবো।
সেইখা'ন যা'বো।
ওপারে অচেনা দেশ, অচেনা, অচেনা,·····

দৃশ্যের গভীরে কোন মায়া আছে, মায়া·····

সত্য পালন

সাবিত্রী সেনগুপ্তা

কঙ্কন প্রদেশ। দুপুর রাত্রি। মহারাজ শিবাজী নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। এমন সময় ঘরে ঢুকল এক বালক। খুব আস্তে-আস্তে সে ঢুকল। হাতে তার তলোয়ার, বিছানার পাশে গিয়ে একদৃষ্টিতে শিবাজীকে দেখতে লাগল। শিবাজী তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, বালক ভাবলো—দিই চালিয়ে হাতের তলোয়ার শিবাজীর বুকে। শিবাজীকে হত্যা করলে অনেক পুরস্কার মিলবে। আমার অভাব দূর হবে।

বালক যেই হাত তুললো, অমনি পেছন থেকে কে একজন সেই হাতখানা ধরে ফেললো? বালক চমকে উঠলো। লোকটি চেঁচিয়ে উঠল—হত্যাকারী! হত্যাকারী!

মহারাজ শিবাজীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে অবাক হয়ে উঠে বসলেন। দেখলেন সেনাপতি তানাজী একটি বালকের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তানাজী শিবাজীর একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। পরে সিংহগড় দুর্গ দখল করে সেইখানেই প্রাণ দেন।

শিবাজী দেখলেন বালকটির হাতে খোলা তলোয়ার মুখে তার একটুও ভয়ের আভাস নেই। দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন মনে মনে আর কিছু মতলব আঁটছে! শিবাজী বালকের দিকে তাকিয়ে শুধালেন, কে তুমি?

বালক উত্তর দিল মহারাজ, আমার নাম মালোজী।

শিবাজী আবার শুধালেন—এখানে কেন এসেছো তুমি?

আপনাকে হত্যা করতে!

শিবাজী অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে দেখতে দেখতে বললেন—জানো, এর শেষ পরিণাম কী?

বালক উত্তর দিল, জানি মহারাজ। মৃত্যুদণ্ড?

শিবাজী বললেন—আমায় হত্যা করতে এসেছো কেন? তোমার জীবনের উপর মায়া নেই?

না মহারাজ, বালক উত্তর দিল। আমার মা আজ তিন দিন রোগে ও ক্ষুধায় কাতর। পিতৃহীন হয়ে, একমাত্র মা ছিলেন সম্বল। এখন সেই মাকেও হারাতে বসেছি। বলুন রাজা নিজের প্রাণের মায়া করে কি হবে?

শিবাজী আশ্চর্য হয়ে শুধালেন—তোমার মার সঙ্গে আমার হত্যার কি সম্পর্ক?

সম্পর্ক আছে মহারাজ, বালক নির্ভয়ে বললো, আপনিই এর মূল। আমার পিতা আপনার সেনাদলে কাজ করতেন। আপনারই সেবা করতে করতে যুদ্ধে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। আজ আমার আর আমার মায়ের এই দুরবস্থার জন্য আপনি দায়ী, আমাদের এই দুর্দিনে সাহায্য করবার কেউ নেই। ক'দিন থেকে মা রোগে কাতর হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। আজ তিন দিন থেকে মাকে এক ফোঁটা ওষুধ ও পথ্য দিতে পারিনি! বলতে বলতে বালকটির চোখ ছল ছল করে উঠলো।

শিবাজী নিবিষ্টমনে বালকের কথা শুনছিলেন, এবার তিনি বললেন—আমায় হত্যা করে কি ভাবে তোমার মায়ের আহার পথ্য জোগাড় করবে মালো?

মালো উত্তর দিল—আপনার শত্রু শোভন রায় আপনাকে হত্যা করবার জন্য আমায় নিযুক্ত করেছেন। যদি আপনাকে হত্যা করতে পারি তাহলে তিনি আমায় প্রচুর অর্থ দেবেন। সেই অর্থ দিয়ে রুগ্না মায়ের ওষুধ নেবো, পথ্য নেবো।

শিবাজী আরও অবাক হয়ে বালকের কথা শুনছিলেন। সেনাপতি তানাজী এবার বালককে বললেন—মালো, মৃত্যুর জন্য তৈরী হও।

মালো উত্তর দিল—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না সেনাপতি, বীরের মত মরাই ক্ষত্রিয়ের কাম্য কিন্তু···

কিন্তু কি? শিবাজী শুধালেন—

আমি আমার মৃত্যুশয্যায়কাতর মাকে একবার দেখতে চাই। আমি সকাল হবার আগেই ফিরে আসব আপনার কাছে মহারাজ।

শিবাজী বললেন—তুমি পালিয়ে যাবে না তার প্রমাণ কি?

ক্ষত্রিয় কখনও মিথ্যে কথা বলে না। সে যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা সে পালন করে।

শিবাজী বালককে যাবার অনুমতি দিলেন।

পরদিন দরবারে বসে আছেন শিবাজী। দ্বারী এসে খবর দিল একটি বালক মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

শিবাজী বালককে রাজসভায় নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

রাজসভায় বালককে নিয়ে আসা হল। শিবাজী দেখে চিনলেন গতরাত্রের সেই বালক ফিরে এসেছে। মালো শিবাজীকে প্রণাম করে বললো—মহারাজ আমি প্রস্তুত।

মহারাজ এবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন—হ্যাঁ তোমাকে শাস্তি দেবই। তারপর সিংহাসন থেকে নেমে মালোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—মালো তোমার মত সাহসী বীরের যোগ্য স্থান আমার বুকে, শূলে নয়।

মালোকে উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হল, তার মাতার চিকিৎসার জন্য। এবং সেই দিন থেকে শিবাজীর বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে স্থান পেলো মালোজী।

তুতুল ঃ তার কাঠঠোকরা

কার্তিক ঘোষ

—তুতুল—ও তুতুল ··

রান্না ঘর থেকে তুতুলের মা ডাকে তুতুলকে।

—আয় মা আয়, বেলা হ'য়েছে, দু'টো খেয়ে নিবি আয়।

তুতুলের তবুও কোনো সাড়া নেই। মা'য়ের কথা যেন তার কানেই যাচ্ছে না। শান্ত, স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। ঝাঁক ঝাঁক বুনো টিয়ার দল উড়ে যাচ্ছে। ওদের পিছনে পিছনে ছুটে যাচ্ছে আরো এক ঝাঁক গাঙ শালিক উঃ ··কতো দূরেই না ওরা চলে গেলো! কোথায়··কোন্ দেশ পার হ'য়ে ওরা চলে যাচ্ছে কে জানে! আপন মনে ভাবছিল তুতুল। পিছন থেকে মা এসে চোখ টিপে ধরলো তুতুলের।

এবার আর জমে থাকা অভিমান চাপা দিয়ে রাখতে পারলো না তুতুল। বলে উঠলো—না, না, আমি ভাত খাবো না যাও।

চোখের থেকে হাত নামিয়ে অভিমানী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা বললো, কি হ'য়েছে শুনি···এতো রাগ কিসের!

—যাও, আমি জানি না। মা'য়ের বাহু বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার বৃথা চেষ্টা ক'রে তুতুল কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, কিছুতেই আমি ভাত খাবো না।

—কি হ'য়েছে বল্ না তুতুল। কাঁদছিস্ কেনো মা!

সত্যি সত্যিই চোখে জল এসে ছিল তুতুলের। কিন্তু, এবার সে মা'য়ের বুকে মুখ রেখে কচি ছেলের মতো কেঁদে উঠলো।

মেয়ের কান্না দেখে মা'তো অবাক!

—কি হ'লো বল্ না···! কাঁদলে আমি কি ক'রে তোর মনের কথা বুঝবো বল তো?

—আমাকে একটা কাঠঠোকরা পাখী কিনে দিতে হবে। কান্না ভাঙ্গা গলায় তুতুল বললো, আগে বলো কিনে দেবে?

—কাঠঠোকরা পাখী! মা'তো হেসেই খুন। মেয়ের মান ভাঙ্গানোর জন্তে তবুও বললো, আচ্ছা, কিনে দেব, এখন খেয়ে নিবি চল।

এবার হাসি ফুটলো তুতুলের মুখে। খুশীর আলোতে ঝলমল ক'রে উঠলো তুতুলের দু'টো চোখ।

ভাত খেয়ে দেয়ে সারাদিন টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ালো আমবাগান আর জামবাগানের আশে পাশে। কিন্তু আজ একটাও কাঠঠোকরা পাখীকে দেখলো না কাঠ কাটতে। আশ্চর্য হয়ে অনেকক্ষণ ভাবলো তুতুল। তবে কি কাঠঠোকরাগুলো এই বাগানে আর কাঠ কাটতে আসবে না কোনো দিন! ওরা কি তবে চলে গেছে এ দেশ ছেড়ে।

বড্ড মন খারাপ হ'য়ে গেল তুতুলের। কি করবে ভেবে পেলো না। আবার ছুটে এলো মায়ের কাছে।

—বলো না মা, কবে কিনে দেবে কাঠঠোকরা পাখী!

—কালকেই কিনে দেবো ফিঙিওয়ালার কাছ থেকে!

ঠোঁটের কোলে হাসি লুকিয়ে মা বলে, এতো তাড়াতাড়ির কি আছে বল্ তো? বলেছি তো কিনে দেবো।

—কিন্তু—তুতুল মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে বলে, সে কাঠঠোকরা কাঠ কাটবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ কাটবে। মা বলে, কিন্তু, কি হবে শুনি কাঠঠোকরার কাঠ নিয়ে?

—বাঃ! তাই বুঝি জানো না?

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এক মাথা রেশমী চুল দুলিয়ে তুতুল বলে, পরশু দিন আমার পুতুলের বিয়ে। কতো কাঠ চাই জানো?

—তা—এক ঝোড়া তো বটেই। তারপর—··

বোকামেয়ের কথাগুলো শুনতে মায়েরও খুব ইচ্ছে হয়। তাই বলে,—তারপর কি?

—তারপর···ধরো, বিয়ে বাড়ীর যেমন সমস্ত কাঠ এনে দেবে কাঠঠোকরা, তেমন সারা রাতদিন কি সুন্দর গান গাইবে···মুখে মুখে বাজনা বাজাবে। কেমন সুন্দর নাচ দেখাবে।

—ওমা, তাই না কি! মা হাসতে হাসতে বলে, তা' কে জানে বল।

—তুমি বুঝি জানো না? এবার তুতুল নিজের মুখেই কাঠঠোকরার মতো শব্দ করে··টক টক টকর টকর টকর··

হাসতে হাসতে মা এবার বিছানাতে লুটিয়ে পড়ে। তারপর কিছুক্ষণ বাদে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা—ঠিক কিনে দেবো তোকে! এখন খেলগে যা। কেমন!

আনন্দে নাচতে নাচতে তুতুল বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। বিকেলের মধ্যেই এই সুখবরটা ও ছড়িয়ে দিল এপাড়া ওপাড়া করে প্রায় গোটা গ্রামটায়। ওর বন্ধুরা শুনে কেউ কেউ অবাক হলো—কেউ কেউ আবার মুচকি মুচকি হাসলো তুতুলের আড়ালে। পুতুলের বিয়েতে কাকে কাকে নেমন্তন্ন করবে এই সব কথাও ভেবে রাখলো মনে মনে। কাল সকালেই সবাইকে নেমন্তন্ন করে আসতে হবে। মিণ্টি, রিণ্টি আর সিণ্টি ওদের তিন বোনকে তো আজ থেকেই বলা হ'য়ে গেছে। কাঠঠোকরার কথা শুনে ওরা তো অবাক। ওদের চোখ একবারে ছানাবড়া হয়ে গেছে। গর্বে আর আনন্দে তুতুলের বুকটা ফুলে উঠলো!

টক্ টক্ টক্ টকর টকর টকর ··
তুতুল···তুতুল, আজ থেকে ভাই
আমার তুমি মকর।

—বা! কি সুন্দর তোমার কথাগুলো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাঠঠোকরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তুতুল।

—কাল তো পুতুলের বিয়ে। তাই আমি কাঠ কাটতে চললুম—

—দূরে যেও না, আমাদের বাগান থেকে কাঠ কেটে আনো। বুঝলে!

মিষ্টি হাসিতে আরো যেন মধুর লাগে তুতুলের কথাগুলো। কাঠঠোকরা পাখীটা কি যেন চিন্তা করে। তারপর বলে, তোমাদের বাগানে ভালো কাঠ যদি না পাই···তা'হলে অন্য বাগানে চলে যাবো। আমার জন্তে তুমি ভেবো না।···আমি যাই···

ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গেলো কাঠঠোকরা। কি যেন বলতে ভুলে গিয়েছিল তুতুল। তাই ডেকে উঠলো—কাঠঠোকরা··শোনো··শোনো·····

—স্বপ্ন দেখছিস বুঝি। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মা ওর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল।

—মা···মা কাঠঠোকরাটা চলে গেলো···বলতে বলতে ধড়মড় ক'রে তুতুল উঠে পড়লো বিছানা থেকে। তখন সকাল হ'য়ে গেছে। বাইরের বাগানে শালিখগুলো ঝগড়া করছে। ভাল করে কিছু বুঝতে পারলো না তুতুল। দোর খুলে ছুট দিল আমবাগানে। ভালো ক'রে দেখলো চারদিক। কিন্তু, কোথাও দেখতে পেলো না কাঠঠোকরাকে! তবে কি সে অন্য কোনো বাগানে কাঠ কাটতে গেছে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই তো সে বলে গেলো। মনে মনে কথাটা বার বার বলল তুতুল। তারপর·····

কালকেই তার পুতুলের বিয়ে। কতো না আয়োজন তার। পড়ে আছে অনেক কাজ। এখন কি দাঁড়িয়ে থাকলে চলে! পোঁ-পোঁ ক'রে দৌড় দিল বাড়ীর দিকে। পুতুল-ঘরটা গোছাতে হবে ভালো ক'রে। সুন্দর ক'রে সাজাতে হবে বাসর ঘর। কিন্তু তার আগে মা'কে একবার জানিয়ে আসা দরকার, 'মাগো মা—আমার কাঠঠোকরা পাখীটা না, পুতুল বিয়ের কাঠ কাটতে গেছে!'

খুশীর আলো সোনা রোদের মতো তুতুলের দু'চোখে আবার ঝলমল ক'রে উঠলো।

পাকা

রবিদাস সাহারায়

আম পাকে জাম পাকে পাকে জামরুল,
দাদুর মাথায় ভরা পাকা পাকা চুল।
গদাধর দাস খুব পাকা খেলোয়াড়,
পাকা খাতা লেখে বসে কালী সরকার।
অকালে পেকেছে ঐ কচি ছেলেগুলি,
কচি মুখে শুনি তাই পাকা পাকা বুলি।
মামার রোচে না মুখে পাকা রুই ছাড়া,
লিখে হাত পাকিয়েছে তিনকড়ি ধাড়া।
পাকা রং শাড়ী পরে ঐ মেয়ে যায়,
পাকা বাড়ীটার দিকে ফিরে ফিরে চায়।
পাকা দেখা হয়ে গেল সেই মেয়েটার,
বুদ্ধিটা পাকা বটে সবচেয়ে তার
জটলা পাকায় লোকে গ লর ভিতর,
ঝুটমুট নয় ভাই, পাকা এ খবর।

মিঃ বাটলারের ছড়ি

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

মিঃ বাটলারের সঙ্গে আমার পরিচয় আকস্মিক। সেবার শীতশেষের এক বিকালে লণ্ডনের গ্রীন পার্কে বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্য করলাম যে, আমার সামনে ছড়ি হাতে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি যাচ্ছেন তাঁর পকেট থেকে কী একটা পড়লো ঘাসের উপরে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম একটা খাম। খামটা হাতে ক'রে জোর কদমে এগিয়ে গিয়ে হাজির হলাম ভদ্রলোকের পাশে।

'মাপ করবেন, বোধ হয় আপনার পকেট থেকে এটি পড়েছে।' বলে খামটা এগিয়ে ধরতেই তিনি হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন আমাকে।

এককথা দুকথার পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে আমি ভারতবাসী তখন তিনি সহজে ছাড়লেন না আমাকে। ট্যাক্সি ডেকে সাউথ কেনসিংটন পাড়ায় তাঁর বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন তিনি আমাকে। তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ পেতেই তো তারা আনন্দে মেতে উঠলো। ম্যাজিক তাদের দেখাতেই হবে। কফি পানের আগে হাত মুখ ধোবার নাম করে একবার বাথরুম থেকে ঘুরে এলাম, সেই ফাঁকে প্রস্তুত হয়ে এলাম একটা খেলা দেখানোর জন্য। কেক, বিস্কুট আর স্যাণ্ডউইচ সহযোগে গরম গরম কফি পান পর্ব শেষ হ'ল। ছেলেমেয়েরা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো আমার দিকে।

কোন রকম ভণিতা না ক'রেই আমি মিঃ বাটলারের সুদৃশ্য বেতের হালকা ছড়িটা চেয়ে নিলাম। দুই হাঁটুর মাঝ বরাবর আমার সামনে ছড়িটাকে দাঁড় করিয়ে বাঁ হাতে সেটাকে ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে তার উপরে ম্যাজিকের ভঙ্গীতে 'পাস' দিতে থাকলাম। এর পরে ওয়ান—টু—থি বলে বাঁ হাতটা সরিয়ে নিলাম ছ'ড় থেকে। অবাক কাণ্ড! ছড়িটা কিন্তু পড়লো না! ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। ব্যাপার দেখে ছেলে মেয়েরা তো বটেই মিঃ আর মিসেস বাটলারও খুব অবাক হলেন।

বুঝতে পেরেছ কেমন করে এই মজাটা ক'রেছিলাম? পার নি! —শোন তবে। সেদিন আমার সঙ্গে ছিল কিছুটা কালো শক্ত সরু সুতো। আমি বাথরুমে ঢুকে এই সুতো থেকে হাত দেড়েক টুকরো কেটে নিয়ে সেই টুকরোটাকে আমি আমার গায়ের কালো লম্বা কোটটাতে সেফটিপিন দিয়ে এমন ভাবে লাগিয়ে নিয়েছিলাম যাতে সুতোটা আমার দু হাঁটুর মাঝখানটাতে টান টান হয়ে থাকে। এই কালো সুতোর গায়ে হেলান দিয়েই ছড়িটা সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। গায়ে কালো কোট থাকায় আর ঘরের ভেতরে আবছা আলো থাকাতে কৌশল ধরা পড়ে নি। চেষ্টা ক'রে দেখ তোমরাও এ খেলা দেখাতে পারবে।

মুক্তাবতী সোনার মেয়ে

সুজিতকুমার নাগ

চলছে তরী অনেক দূরে
রাখাল ছেলের সাথে
এলো যে এক ছোট্ট পাখী
কিচির মিচির মাতে।

শুধায় রাখাল কে গো তুমি
অচিন দেশে যাবে ?
আমার সাথে গিয়ে তুমি
ফুলের মধু খাবে ?

এ দিকে এক মজা হল
মুক্তাবতীর ফুল,
রাখাল ছেলের হাতে এসে
নাচল দোদুল—দুল।

রাখাল ছেলে তাই তো অবাক
এ যে রাণীর মালা,
কোথায় গেল সেই পাখীটা ?
কে এনেছে বালা ?

মুক্তাবতী কেঁদেই আকুল
পথ যায় না দেখা,
কোথায় গেল ঘুমের বুড়ী
আমায় ফেলে একা ?

অচিন গাঁয়ের রাখাল ছেলে
সংগে নিলে মালা,
ভাসিয়ে দিলে জলেতে সেই
ঘুমপরীদের বালা।

মুক্তাবতী তীরে এসে—
বললে ডেকে ভাই,
আমায় নিয়ে সংগে যাবে
সাথী আমার নাই।

রাখাল ছেলে অবাক হয়ে
দেখলে শুধু আজ
মুক্তাবতীর চোখেতে জল
এই কি তারই সাজ ?

মুক্তাবতী সোনার মেয়ে
মেঘবরণ চুল,
দুই হাতেতে নেই কো কেন
কনক চাঁপার ফুল ?

রাখাল ছেলে মিষ্টি হেসে
ফেরত দিলে মালা,
বললে শুধু অবাক হয়ে
নেবে কি সেই বালা ?

না, না, ভীষণ ভয়ে
মুক্তাবতী বলে,
তাকে আমি ভাসিয়ে দেব
ঝরণা নদীর জলে।

রাখাল ছেলে বাজিয়ে বাঁশী
বনের পথে চলে,
মুক্তাবতী চলার সাথী
মুক্তা মাণিক জ্বলে।

কাঠঠোকরা

রাণী মজুমদার

আমাদের দেশে যত রকমের পাখী দেখা যায়—তাদের মধ্যে কাঠঠোকরার নাম খুব উল্লেখযোগ্য। এদের চালচলন, শারীরিক গঠন সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু কাঠঠোকরা সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সাধারণত শহরাঞ্চলে এদের দেখা যায় না। পাড়াগাঁর বনে জঙ্গলে বড় বড় গাছই এদের বিচরণক্ষেত্র। ঠোঁটের-সাহায্যে অবিরত কাঠ ঠোকরানো এদের প্রধান কাজ। আর সেজন্তেই এদের নাম দেওয়া হয়েছে—কাঠঠোকরা।

সাধারণত আমরা দু'জাতের কাঠঠোকরার সঙ্গে পরিচিত। এক জাতের কাঠঠোকরার দেহে কোন রঙের বাহার নেই—শুধু সাদা-কালো রং দেখা যায়। আর এক জাতের কাঠঠোকরার দেহ বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। এদের দেহের উজ্জ্বল রঙের বাহার দেখবার মত। এদের মুখ থেকে গলার দু'দিকে কয়েকটা কালো রঙের রেখা আছে আর মাথায় থাকে লাল রঙের ঝুঁটি এবং ডানায় পালকের রঙ হলদে। এই বর্ণ বৈচিত্র্য এদের দৈহিক সৌন্দর্য খুব বৃদ্ধি করে থাকে।

অন্যান্ত পাখীদের চালচলন থেকে কাঠঠোকরার চালচলন একেবারেই আলাদা। আর এদের শিকার-কৌশলও বড় অদ্ভুত।

গাছে যেসব কীট-পতঙ্গ থাকে কাঠঠোকরা প্রধানত তাদের শিকার করেই উদরসাৎ করে ? শিকার ধরবার জন্তে এদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে—শক্ত ঠোঁট এবং সরু, লম্বা, আঠালো জিভ। গাছের ছাল বা কাণ্ডের কোন গর্তের মধ্যে শিকার নজরে পড়লেই—এরা তার মধ্যে জিভটি ঢুকিয়ে শিকারকে আঠার সাহায্যে বের করে এনে মুখে পুরে দেয়। জিভ শিকারের নাগাল না পেলে—কাঠঠোকরা ঠোঁট দিয়ে খুব জোরে গাছের গা ঠোকরাতে থাকে। ভয় পেয়ে শিকার পালাবার চেষ্টায় গর্তের বাইরে আসা মাত্র—কাঠঠোকরা তাকে আক্রমণ করে।

কাঠঠোকরার গাছ ঠোকরাবার কায়দাও বিচিত্র। গাছের নীচু থেকে ঠোকরাতে ঠোকরাতে এরা ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে। ডগায় উপস্থিত হবার পর—এরা অন্য একটি গাছকে ঠিক একই ভাবে ঠোকরাতে থাকে। গাছের গায়ে গর্ত খোদাইয়ের কাজে এরা খুবই দক্ষ।

কাঠঠোকরা নিজের বাসা নিজেই বানায়। বাসা বানাবার সময় এদের খুব পরিশ্রম করতে হয়। বাসা বানাবার জন্তে নির্বাচিত

গাছের সর্বাঙ্গে ফাঁপা জায়গার সন্ধানে এরা ক্রমাগত ঠোঁট দিয়ে ঠোক্‌রাতে থাকে। কাজ হাসিল হলে—এরা ফাঁপা জায়গায় ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে সুন্দর একটি গোল গর্ত তৈরী করে। গ্রীষ্মকালেই স্ত্রী কাঠঠোকরা ডিম পাড়ে। এরা একসঙ্গে তিনটি ডিম পাড়ে। অন্যান্য পাখীর মত এরা বাসার মধ্যে খড়কুটা বিছিয়ে বিছানা তৈরী করে না। গর্তের মেঝেতেই এরা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে— বাচ্চা বেরোবার পর—এরা খাবার উদ্‌গিরণ করে বাচ্চাদের খাইয়ে বড় করে তোলে।

অন্যান্য পাখীরা গাছে যে ভাবে বসে—কাঠঠোকরা সে ভাবে গাছে বসতে পারে না; অর্থাৎ অন্যান্য পাখী গাছের ডালে আড়াআড়ি বসতে পারে, কিন্তু কাঠঠোকরার সে ক্ষমতা নেই। লেজে ভর দিয়ে কাঠঠোকরা সরু ডালে বসে। খাড়া গাছের কাণ্ডের গা বা ডালপালা আঁকড়ে কাঠঠোকরা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। গাছের গায়ে এরা অদ্ভুত কৌশলে গর্ত খোদাই করে। হাতুড়ির মত জোরে ঘা না মারলে গর্ত খোদাই করা যায় না। সে জন্যে এরা মাথাটিকে খোদাইয়ের জায়গা থেকে বেশ দূরে রাখে। কারণ, মাথা দূরে থাকলে সজোরে ঠোঁট দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে ঘা মারা যায়। পিছনে ঠেস না দিলে ঘা মারবার সময় দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে না। কিন্তু এরা লেজের সাহায্যে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে।

কাঠঠোকরার ওড়বার ক্ষমতা খুব বেশী নয়। এরা উড়ে একটানা বেশী দূর যেতে পারে না। ওড়বার সময় এরা খুব জোরে ডানা দু'টো কাঁপাতে থাকে এবং ডানা কাঁপাবার শব্দ ভাল ভাবেই শোনা যায়। কাঠঠোকরার ডাকে কোন মিষ্টত্ব নেই। এদের গলার স্বর যেমন জোরালো তেমনি বিকট। আত্মগোপনের সময় এদের উঁকি মারবার দৃশ্যটি খুব উপভোগ্য। শত্রুর আগমন টের পেলেই কাঠঠোকরা এমন ভাবে কাণ্ডের অপরদিকে লুকায় যাতে শত্রু তাকে দেখতে না পায়। আর মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখে—শত্রু আছে না চলে গিয়েছে।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ কাঠঠোকরাই মাংসভোজী। কিন্তু কয়েক জাতের কাঠঠোকরা জ্যান্ত গাছের রস পান করেই জীবন ধারণ করে থাকে। এদের আক্রমণে অনেক মূল্যবান গাছ অকালে প্রাণত্যাগ করে। অপর দিকে মাংসভোজী কাঠঠোকরা গাছের ক্ষতিকারক বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ উদরসাৎ করে গাছের বাঁচবার সুবিধা করে দেয়।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কাঠঠোকরা বাস করে। আমেরিকায় গাছের রসপায়ী এক জাতের কাঠঠোকরা দেখা যায়। এরা গাছের গায়ে ছোট ছোট গর্ত খোদাই করে রাখে। গর্ত গাছের রসে ভর্তি হলে এরা তা খেয়ে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পাশেই আর একটি গর্ত খোদাই করে। এভাবে এক-একটি গাছে কাঠঠোকরা ৫০০।৬০০টি গর্ত খোদাই করে থাকে।

পৃথিবীর নানা দেশে যে-সব কাঠঠোকরা দেখা যায়—তাদের বেশীর ভাগেরই মাথার উপরে ছোট বড় রঙীন ঝুঁটি দেখা যায়। শরীরের গঠন, মাথার ঝুঁটি এবং দেহের রেখা দেখেই অন্যান্য পাখী থেকে এদের তফাৎটা অনায়াসে বোঝা যায়। আবার এমন কয়েক জাতের কাঠঠোকরা আছে—যাদের আপাতদৃষ্টিতে কাঠঠোকরা বলে মনে হয় না, যেমন—কালিফোর্ণিয়া কাঠঠোকরা, লুইস কাঠঠোকরা, সুবর্ণপক্ষ কাঠঠোকরা, জেব্রা কাঠঠোকরা এবং কোন কোন জাতের রসপায়ী ডাউনী কাঠঠোকরা। এদের চালচলনও অন্যান্য কাঠঠোকরার মত নয়।

কালিফোর্ণিয়া কাঠঠোকরা খুঁটির গায়ের গর্ত খোদাই করে তার মধ্যে বাদামজাতীয় ফল লুকিয়ে রাখে—ভবিষ্যতে খাবার জন্যে। সুবর্ণপক্ষ কাঠঠোকরা পুরণো গাছের গায়ে গর্ত তৈরী করে বাসা বানায়। লুইস কাঠঠোকরা পুরণো গাছ থেকে কীট-পতঙ্গ শিকার করে উদর পূর্তি করে। আবার কখনও কখনও এরা উড়ন্ত কীট-পতঙ্গ শিকার করে খায়। এছাড়া বাদাম, ষ্ট্রবেরী, আপেল প্রভৃতি ফল এরা সুযোগ পেলে খেতে ছাড়ে না। গিলা কাঠঠোকরাও সময় সময় নানাবিধ শস্য, মাংসের খণ্ড এবং অন্যান্য খাদ্য যোগাড় করে এনে খায়। সাধারণত দেখা যায়, গিলা কাঠঠোকরারা এক জাতীয় পাতাশূন্য মনসাগাছে গর্ত তৈরী করে বাসা বানায়।

কয়েকজাতের কাঠঠোকরার মাথায় বাহারী ঝুঁটি থাকে না। তবে তাদের মাথার উপরিভাগে লাল, হলদে প্রভৃতি বিচিত্র রঙের পালক থাকে। শরীরের পালক এবং বিচিত্র বর্ণের জন্যে সহজেই এদেরকে কাঠঠোকরা বলে চেনা যায়। এইসব কাঠঠোকরার মধ্যে ড্রাইওবেটস, পিউবেসেনস, ডিলোসাস, অ্যালবোলার, ভ্যাটাল, পিকয়েডেস, আর্কটিয়াস, টেক্সাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, যে সব কাঠঠোকরার ঝুঁটি আছে—তাদের মধ্যে বৃহদাকৃতির কাঠঠোকরা হচ্ছে —ক্লিও ক্রোয়াল পাইলেটাস, ক্যাম্প ফাইলাস প্রিন্সিপ্যালস। এদের দেহাকৃতি একটি কাক বা তার চেয়ে একটু বড় হয়।

আশ্বিনের খবর

শ্রীঅতীন মজুমদার

ল্যাজ-ঝোলা ফিঙে নাচে হিজলের শাখে,
ঝুঁটি-বাঁধা বুলবুলি থেকে থেকে ডাকে!
ফুরুৎ-ফুরুৎ ওড়ে টুনটুনি ঐ
নদী পারে বালি-হাঁস করে হৈ-চৈ।
নীল-রং কে মাথায় আকাশের গায়,
দুধ-সাদা মেঘগুলো ভেসে ভেসে যায়।
খোকনের মত আজ দুষ্টু হ'য়ে
বাতাসটা এলোমেলো যায় যে বয়ে।

তারই দুষ্টামিতে দোলে কাশ বন,—
চখা-চখী তাই দেখে হয় উন্মন।
খুকুমণিটির মত শেফালী হাসে,
তাই দেখে মৌমাছি ছুটে ছুটে আসে।
তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে দূরে
এক ঝাঁক সাদা বক চলেছে উড়ে
চম্পকলতা রাজকন্তের দেশে!
—এ খবর দিল আজ আশ্বিন এসে।।

এ খবরে বল ভাই ঘরে থাকা যায়?
মন যে দেশান্তরী হয়ে যেতে চায়!

নীলকণ্ঠ

সাঁইত্রিশ

১৯৫০ সালে কলকাতায় অধ্যাত্ম-পত্র 'হিমাদ্রি' কার্যালয়ে একদিন কে একজন বলেন, শ্রীমুন্সী এবং আরও কোনও কোনও ভারতীয় নেতারা ১৯৫২ সালে শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব পালন করবেন। শ্রীঅরবিন্দের বয়স হবে যখন আশী। সেখানে উপস্থিত একজন বললেন: শ্রীঅরবিন্দ অতদিন মরলোকে থাকবেনই না। এ নিয়ে তর্কের প্রারম্ভেই একটা কাগজে শ্রীঅরবিন্দের মহৎ প্রয়াণের তারিখটি একটি কাগজে লিখে রাখতে দিলেন ভবিষ্যদ্বাণীকার। যাঁকে দিলেন রাখতে তাঁকে বলে দিলেন কাগজটা শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যাবর্তন-দিবসে খুলে দেখতে; তার আগে গোপন রাখতে। যাঁকে দিলেন তিনি দু'দিন পর ফিরিয়ে দিলেন কাগজ। বললেন: আমি কৌতূহল রাখতে পারবো না; আপনিই রাখুন এ কাগজ। তখন ভবিষ্যদ্বক্তা ভদ্রলোক আরেকজনের জিম্মায় রাখলেন কাগজটা।

১৯৫০-এর ৫ই ডিসেম্বার শ্রীঅরবিন্দ ফিরে গেলেন একদিন যেখান থেকে স্বেচ্ছায় এসেছিলেন তিনি। কাগজ খুলে দেখা গেল তাতে তারিখটি লেখা আছে—৫ই ডিসেম্বার ১৯৫০।

ভবিষ্যদ্বক্তা ভদ্রলোকের নাম কালীপদ গুহরায়। এখন কাশীতে আছেন কেদারঘাট ডাকঘরের ওপরে। মানস সরোবরও বলে বাইরের লোকে। এবারে কাশীতে কেবল গোপীনাথের সংগে নয়, কালীপদ গুহরায়ের সংগেও সাক্ষাৎ হয়েছে। এ যাত্রায় কাশী যাত্রা আমার সার্থক হয়েছে। গোপীনাথ এবং কালীপদ, সোহাগা এবং সোনা দর্শনজ্ঞাত এবং দর্শনপ্রাপ্ত অতল বিদ্যার সংগে অকূল আনন্দের গংগা-যমুনায় স্নান করেছি। ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

কিন্তু আমি যাঁকে ভালোবেসেছি সেই কালীপদ গুহরায় অধ্যাত্ম-বিদ্যার অধীশ্বর নন খালি। তিনি সেই মানুষ যাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার চেয়ে মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা অনেক বেশী। তিনি যাঁকে খুঁজছেন তাঁর দেখা পেয়েছেন কি না আমি জানি না। আমি যাঁকে খুঁজছি না, তাঁর দেখা আমি কালীপদ গুহরায়ের মধ্যে পেয়েছি। সাধারণ মানুষ আমরা। অসাধারণের স্পর্শে এলে ক্ষণকালের জন্যে যে চিরকালের স্পর্শ পাওয়া যায়, কালীপদ গুহরায়ের সান্নিধ্যে এবার তার স্পর্শ পেয়েছি, তাই যে আমি রোজ নগণ্য, সে আমি আজ ধন্য,—এ কথাই মনে হয়েছে গংগার বুকে ভাগীরথের আসনের কাছে পৌঁছে। মানুষ যে মানুষের চেয়ে কত বড়, এ কথা যে মানুষ জানে তেমনই একটি মানুষকে জেনে এসেছি এবার কাশীতে গিয়ে। কাশীতে না গিয়েও যেদিন তাঁর স্পর্শ পাবো সেদিন জানবো কাশী যাওয়া সত্যিই সফল হয়েছে তাঁর কৃপায় যাঁর কৃপায় পংগুর দু'পায় গজায় পাহাড় ডিংগোবার আশ্চর্য উপায়। যেখানেই তাকাও সেখানেই দেখো কালীকে, তবেই কালীঘাট দেখা হলো। না হলে খালি ঘাট দেখাই হলো; কালীঘাট দেখা হলো না আর। কাশীতে না গিয়েও বিশ্বনাথ-দর্শন হবে যখন, তখনই কাশীদর্শন হলো। না হলে একাশীবার বারাণসী গেলেও গংগায় স্নান করলেও সারাদিন শুধু সর্দিকাশি হলো;—কাশীপ্রাপ্তিও হলো, হলো না কেবল কাশীতে যেজন্যে যাওয়া সেই কাজটি। সে কাজ কি? সে কাজ হচ্ছে বিশ্বের যতেক অনাথের মধ্যে বিশ্বনাথকে দর্শন। সে কথা হচ্ছে, বিশ্বের একটি অনাথও যতক্ষণ অভুক্ত ততক্ষণ বিশ্বনাথের ভোগ অসম্পূর্ণ। বিশ্বের সমস্ত অনাথ যতক্ষণ না আশ্রয় পাচ্ছে ততক্ষণ বিশ্বনাথের মন্দিরে নেই বিশ্বনাথ। বিশ্বের প্রত্যেকটি অনাথকে ভালোবাসা বিশ্বনাথের সব চেয়ে ভালো বাসা,—একথা না বোঝা পর্যন্ত সমস্ত দর্শন মূঢ়ের মাথায় পাণ্ডিত্যের বোঝা মাত্র। মালা জপা সেই বোঝার ওপর শাকের আঁটি ছাড়া আর কি!

কালীপদ গুহরায় কি পেয়েছেন আমি জানি না। কালীপদ গুহরায় কি পাননি, তা জানি। তিনি অধ্যাত্ম ক্ষমতার দম্ভ এখনও পাননি। যেদিন পাবেন, সেদিন 'কালী'-পদ থেকে কালীপদ দূরে সরে যাবেন মুহূর্তে। সেদিন যেন কখনও না আসে কালী-পদে কালীপদের এ প্রার্থনা সত্য ও শাশ্বত হোক,—আমার দুই কালীপদেই এইমাত্র কামনা। আর কোনও কামনা নেই আমার। সে 'কালী'-পদেও না; এ কালীপদের কাছেও না।

কলকাতা থেকে কাশী যাবার আগে চুঁচুড়ায় একজনকে বলেছিলাম এবার কাশী গেলে কালীপদ গুহরায়ের সংগে দেখা করব। যাকে বলেছিলাম তিনি কাশীর প্রত্যেকটি ইটপাথরকে পর্যন্ত জানেন। অথচ তিনি আমাকে বললেন, তিনি কালীপদ গুহরায়কে জানেন না। আমি কাশী যাবার আগেই চুঁচুড়ার সেই একজন কালীপদ গুহরায়ের কাছে হাজির। কালীপদবাবুকে তিনি বললেন যে, আমি কলকাতায় তাঁর খোঁজ করেছিলাম। সব শুনে গুহরায় মশাই তিরস্কার করলেন তাঁকে: আপনি আমাকে চেনেন তবুও কেন কলকাতায় মিথ্যে বললেন যে, আমাকে চেনেন না? চুঁচুড়াবাসী জানালেন যে আমি কালীপদ গুহরায় সম্পর্কে কাগজে কিছু লিখতে পারি এবং যেহেতু কালীপদ গুহরায় তাঁর

সম্পর্কে একটি কথাও লেখা হোক কোথাও তা চান না। সেই হেতুই তিনি সেল্ফ, ডিফেন্সে মিথ্যে বলেছেন।

চুঁচুড়ার লোকটি কালীপদবাবুকে চেনেন না একথা মিথ্যে হলেও, একথা তাঁর মিথ্যা নয় যে, কালীপদ গুহরায় তাঁর সাধনা ও শক্তি সম্পর্কে নীরবতায় জেনুইনলি বিশ্বাসী।

কালীপদ গুহরায় এত জানেন, এটুকু জানেন না যে পদ্মের গন্ধ বাতাসে ছড়াবেই। যে মানুষ বড়মানুষের সংগ একা চায়, তার চেয়ে অমানুষ আর কে? শ্রীরামকৃষ্ণ রাম এবং কৃষ্ণ দুয়ের চেয়েই আমাদের অনেক কাছের মানুষ যে তার কারণ 'সময়' নয়। তার কারণ তিনি তাঁর মা-কে নিজের জন্যেই কেবল ডাকেননি, ডেকেছিলেন তোমাকে আমাকে তোমার আমার ভাসক্তি থেকে নিরাসক্তিতে উত্তীর্ণ করে নিয়ে যাবার জন্যে। বাল্মীকির লেখনীর মূল্য কি যদি তা শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনায় মুখর না হলো। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র ধরা পড়বেই বা আর কার প্রতিভার দর্পণে যদি সে চরিত্র আঁকবার দর্প এ পৃথিবীতে একমাত্র মানায় যাঁকে সেই বাল্মীকি না হন বল্লাকর থেকে রামায়ণকার!

কালীর কথা বলব কালীপদ গুহরায়ের কথা বলব না! পাথর খুঁজতে খুঁজতে পরশপাথর পেয়ে গেলাম যদি দৈবাৎ তাহলে তার কথা বলতে পারব না কারণ পরশপাথরের তা বলতে বারণ আছে! পরশপাথর তো বলতে চাইবেই না, তার কারণ সে শুধু পাথর নয়, পরশপাথর। তাকে বলতে হয় না, ছুঁতে হয় শুধু। সমস্ত বাসনাকে সে সোনা করে দেয়, মৃত্যুকে দেয় অমৃত করে, পঞ্চশরবিদ্ধ মানুষকে মুহূর্তে করে ঈশ্বরসিদ্ধ শিব, তার কথা যদি আমার একমাত্র বলবার কথা না হয়, তাহলে তো ঈশ্বরের কথাও বলা চলে না, দক্ষিণেশ্বরের কথাও না।

কালীপদ গুহরায়ের বক্তব্য যদি এই হয় যে, এখনও তাঁর সাধনা শেষ হয়নি, তাই তিনি থাকতে চান মনে, বনে, কোণে, তাহলে বলব একথা ঠিক এবং ঠিক নয়ও বটে। পুষ্পলুব্ধ মধুকর গুঞ্জরণে যদি ছায়াতল না কাঁপে, তাহলে বুঝতে হবে সে ফুল কাগজের কিংবা মৌমাছির ডানা ভাংগা। এই আকাশ, ওই বাতাস, এই পৃথিবী ওই শূন্য, এই বেদনা, ওই আনন্দ, এই পরিশ্রম, ওই অবকাশ যদি সেই এক-জনের কথা মনে না করায় তাহলে রকমের মধ্যে কোনো একজনকে কেন দাও কল্পনা কখনো সুধারাগের স্পর্শ? অগ্নিময়ী বাণীর অক্ষর তবে কেন আলো সাদা রক্ত হয়, স্নিগ্ধ নীলিমার পায়ে কেন উজাড় করে দাও।

হিমালয় থাক নিস্তব্ধ, সমুদ্র নিঃশব্দ হবে কেন!

কালীপদ গুহরায়, এখনও পর্যন্ত যত মানুষ আমি দেখেছি তাদের সকলের চেয়ে এত বড়, এত বড় নয় আমার চেয়ে আমার লেখনীও। কাশীতে এই প্রথম দেখা তাঁর সংগে, নাম শোনা তাও খুব বেশি দিনের নয়। এবারের দেখা আরও অল্প সময়ের জন্যে। সর্বসাকুল্যে তিন বা চারদিনের মতো, রোজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে

এই সময়টুকুর মধ্যে একটা মানুষকে দেখে তাঁর সম্পর্কে এত বড় কথা বলা যায় কি না, এ প্রশ্ন অনেকের মনে যেমন উঠতেই পারে, তেমন আমার মনে কখনই উঠতে পারে না। তার কারণ, আমার কথায় নয়, সমারসেট মমের কথায় বলি: কোনও কোনও লোক একটা কাটলেট খেয়ে বলে দিতে পারে মাংসটা কেমন; গোটা পাঁঠা খাবার তার দরকার হয় না। একটা চাল টিপলে ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি না একথা বলতে যার বাধে সেও রাঁধে বটে কখনও কখনও, কিন্তু রাঁধুনে নয় সে কখনই।

কালীপদ গুহরায়ের সাধনার চাল সিদ্ধ হয়েছে কি না একথা বলবার মতো রাঁধুনে আমি নই। সেকথা আমি বলছিও না। কালীপদ গুহরায় মানুষটার কথা বলছি। যে মানুষটাকে একজন শক্তিমান উপাধিতে ভূষিত করতে তিনি বলেছিলেন: সে কি স্নেহবান নই? [স্মৃতিচারণ: দিলীপকুমার রায়: পৃঃ ২৮৯]। যার তূণীরে স্নেহ নামক সেই আশ্চর্য বাণটি নেই স ভাগ্যবান নয় ভালোবাসার বাণেই যিনি বিদ্ধ হন শুধু তিনিই ভগবান।

বাঙলা দেশকে, বাঙালীকে ভালোবাসেন কালীপদ গুহরায়। নজরুলকে, সুভাষচন্দ্রকে ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন। নিজের দেশকে এবং দেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন না, তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না। নজরুল সম্পর্কে একটি নতুন সংবাদ তিনি এবার দিয়েছেন কাশীতে। নজরুলের অসুস্থতার উৎস, কোনও কোনও মহলে, সাধারণ মানুষের কখনও কখনও যে অসুখ হয়, তারই একটি বলে ধারণা করা হয়। কালীপদ গুহরায় বললেন, মানসিক রোগের আরোগ্যক হিসেবে বিশ্বখ্যাত ডেভিসের মতে—নজরুলের এ অসুখ সে অসুখ নয় যা অচিকিৎসিত অবস্থায় একসময়ে মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। কারণ সে অসুখ মানুষের মাথাই খারাপ হয় যে তা নয়, একটা সময়ের পর সে মারা যায়। নজরুলের ক্ষেত্রে সে সময় অনেকদিন পার হয়ে গেছে। তাই, ডেভিসের মতে এ অসুখ প্রতিভাবান ব্যক্তির অসুখ, চিকিৎসা-শাস্ত্র যার ব্যাখ্যার যোগ্য নয় এখনও।

নজরুলের অসংখ্য অনুরাগীদের একজন আমি। কালীপদ গুহরায়ের এই কথায় আমার মনে রবীন্দ্রনাথ গুঞ্জরণ করে ওঠে:

এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা।

গংগার ওপার থেকে ঝড়ের মাতাল হাওয়া আসছে মাটি উড়িয়ে নিয়ে। তার গর্জনে কান পাতা যায় না। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন কালীপদ গুহরায়। সামনে ছোট টেবল। তার এ পাশে আমি। চায়ের পেয়ালা দিয়ে ধুঁয়ো উঠছে ওপরে। দু'জনের মুখেই সিগারেট। আর কোনও লোক নেই। বারান্দায় শেড নামানো। রাত বারোটা পর্যন্ত চলবে গংগার দুলোখেলা।

ছাই মাখা দেখলেই যেমন মনে করি সাধু, তেমনই সিগারেট চা খাওয়া ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, চেয়ারে বসা লোক দেখলেই ধরে নিই, মেটেরিয়্যালিস্টিক মানুষ। কিন্তু যে জানে, সে জানে কোন ছাইয়ের নীচে কি আগুন চাপা আছে। যে জানে না, সে জানে শুধু, ভগবান আকাশে অথবা তারও উর্ধ্বে কোথাও বসে আছেন এবং তাঁকে পেতে হলে যেতে হয় বনে। তিনি যে মনে আছেন, এই সংসারের প্রতি কোণে জমে থাকা ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসীম করুণা। একথা তাকে বোঝাবার কেউ বোঝান যায় না তার কারণ এ বোঝবার নয়, বাজবার। এদেরই উদ্দেশ্য করে শ' বলেছেন: 'Beware of that man whose God exists in the heaven'.

কালীপদ গুহরায় ধুতিচাদর পরে, চা সিগারেট খেতে খেতে যা পেয়েছেন তা নেংটি এঁটে অঙ্গ ভস্ম ছাই মেখে বসে থাকলে কেউ পায় না। কি সেই বিশ্লেষণ অতীত অধিকার যা পেলে মানবজীবন ধন্য হয়ে যায়। কালীপদ গুহরায়ের চোখে জ্বলছে সেই পাবার দীপ্তি। সে দীপ্তি ভস্ম করে দেয় না। কাছে টানে। অতলস্পর্শ বড় দু'টো চোখ মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম অনাবিল উজ্জ্বল। জীবনে বড় কিছু না পেলে এ দৃষ্টি কোথায় পেলে তুমি কালীপদ গুহরায়,—এই আমার দুর্বিনীত প্রশ্ন। যতই দূরের বনের হোক কোকিল, বসন্ত যদি আসে তবে কেমন করে না ডেকে পারবে সেই গলা, যে গলায় জীবনের মালগার নিজের হাতে পরাবে একদিন জীবনদেব।

আমাকে আরম্ভেই নিরস্ত করতে কালীপদবাবু বললেন: আমি কিন্তু ভাই সাধুসাধু কিছু নই।

—নিশ্চয়ই নন,—আমি বলি, আপনি সাধু বলে তো এ অসাধু আপনার কাছে আসেনি।

আশ্বস্ত হন কালীপদ গুহরায়। সহজ হন তৎক্ষণাৎ। জিজ্ঞেস করেন: চা খাবেন?

কালীপদ গুহরায়ের ঠিকানা পেয়েছিলাম গোপীনাথের কাছে। মেঘের ঠিকানা চাতকের কাছে। আমি বললাম: শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান-মুহূর্ত আপনি আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, একথা সত্য?

সত্য। গুহরায় উত্তর দিলেন: ও-একটা ইনসপায়ার্ড মোমেন্টের উক্তি! ও-কিছু নয়।

বলতে পারলাম না তাঁকে মুখ ফুটে, কারণ তিনি জানেন, মানুষের মহত্তম সমস্ত ধ্বনিই ভগবানের ইন্সপায়ার্ড মোমেন্টের প্রতিধ্বনি মাত্র।

কালীপদবাবুর মনে নেই দিলীপকুমার রায়ের শিষ্যা ইন্দিরার ছবি দেখেই তিনি বলেন: 'বছর তিন-এর মধ্যে দারুণ ফাঁড়া আছে, কাটা শক্ত।' [স্মৃতিচারণ]। সে ফাঁড়া ইন্দিরার কেটেছে ঠিকই। কিন্তু সেই সংগে একথাও ঠিক যে, ১৯৫৪ সালে ইন্দিরা বেঁচে যায় নাভিশ্বাস ওঠবার পরে।

ইন্দিরার ছবি দেখে কালীপদ গুহরায় বলেছিলেন, 'A being of light I love'. কালীপদ গুহরায়কে প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল: 'A pair of eyes that tells of the supreme 'I'.

কালীপদবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি নাকি কলকাতায় কাকে চিঠি লিখেছেন যে নেতাজী শৌলমারীতে আছেন? কালীপদ গুহরায় প্রতিবাদ করলেন তৎক্ষণাৎ: না। না। আমি কখনও কাউকে একথা বলিনি। আমি শুধু দিলীপ রায়কে বলেছি যে, সুভাষচন্দ্র তাঁর খুব অন্তরংগ বন্ধু, তিনি একবার শৌলমারী গিয়ে সাধুকে দেখে আসুন। তাঁর দেখার দাম আছে।

তারপর অন্য একদিন একসময়ে হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: সুভাষচন্দ্রের জীবন বিপন্ন; তাঁর জন্যে প্রার্থনা করুন।

তুমি যতই নিজেকে আড়াল কর গৃহীর বেশে হে চিরসন্ন্যাসী, তোমার দু'চোখই বলে দিচ্ছে, তুমি সব দেখো তোমার তৃতীয় চোখে,—যে চোখ মৃত্যুর মুখ দেখে নী নেব আ.লোয় !

ঢাকার এক কলেজের অধ্যাপক গিয়েছিলেন কাশীতে। কালীপদ গুহরায় তাঁকে দেখে বললেন, চল্লিশ বছর আগে কলকাতার অমুক জায়গায় অমুক ঘরে আপনি এই এই কথা বলেন—মনে আছে আপনার ? অধ্যাপকের মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয় তাঁর, কারণ সে কিছু অসাধারণ কথা নয়। কিন্তু কালীপদ গুহরায়ের তা মনে আছে। তার কারণ সাধারণ কথা অসাধারণ কথার মতোই গেঁথে যায় এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কালীপদ গুহরায় কথা বলেন। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের ওপারে যেখানে স্মৃতির কথাই আছে কেবল। বিস্মৃতির কথা নেই।

অধ্যাপককে কালীপদবাবু বলে দিয়েছেন, কতদিন অধ্যাপক বাঁচবেন।

দিলীপকুমার রায় বলেছেন, কালীপদবাবুর জীবনে দু'টি বিদেহী আত্মা এসে দাঁড়িয়েছে। একথা সত্য কি না আমি জানি না। আমি জানি কেবল এই যে, মানুষ নিজেও জানে না, কখন কোন মুহূর্তে হাতের মুঠো ঠেকে যায় সেই পরশপাথরে, যে মুঠো তখন মণিকে জ্ঞান করে ধূলিমুঠি বলে। সেই পরশপাথর হাতে আছে কালীপদ গুহরায়ের, মূল্যহীনকে সোনা করবার রহস্য অবগত হয়েছেন বলেই ডক্টর গোপীনাথ যেমন তাঁর সংগে কথা বলে আনন্দ পান, তিনিও তেমনই আমার মতো অন্তঃসারশূন্য অহংকারের সংগে কথা বলতেও বিরক্ত হন না। কেন ? কারণ যে সিন্ধুগামী নদী সে যখন বয়ে চলে তখন মল এবং পরিমল,—দুইকেই সে সমান জ্ঞান করে, কৃপাসিন্ধুর অহৈতুকী কৃপায় !

দ্বিতীয় দিনে একবার, শেষ দিনে আরেকবার, মনে আছে, কালীপদবাবু বলেছিলেন যে, আপনার সংগে অত কথা বলে ফেলি কেন ? একথার উত্তর দিইনি তখন। এখন দিচ্ছি। যে আকাশ বৈশাখে বৈরাগী, সেই আকাশই আষাঢ়ে নবঘর্ষায় করুণ। কেন ? কারণ তাঁর মুখে কথার ফুল ফোটাতে পারার জন্যে বাইরে থেকে আঘাত নয়, অন্তর থেকে আহ্বান করতে হয়। উপদেশ শুনতে যাইনি তাঁর কাছে। গিয়েছিলাম অঞ্জলি ভরে জীবনগংগার জল পান করতে। শিবের জটায় যার বেরুবার পথ বন্ধ তাকে ভগীরথ আহ্বান করলে তখন মুক্তধারা হতে তার বাধা কোথায়। কালীপদ গুহরায়ের কাছে নৈতিক প্রশ্ন করলে হেসে উড়িয়ে দেন তিনি। রাজনৈতিক কথা পাড়েন। রাজনৈতিক কথা পাড়তে হয় তাই। বেরিয়ে আসে আধ্যাত্মিক সেই আসল মানুষটি ! স্বদেশপ্রেমের তীব্রতা থেকে উৎসারিত যাঁর বিশ্বপ্রেমের বন্যা বিশ্বনাথের প্রেমে আত্মহারা। দেশের জন্যে যাঁর দুঃখ, দেশকালের অতীত যিনি তাঁর পায়ের চিহ্নরূপে এখনও বর্তমান ? মানুষের জন্য যাঁর অশ্রুজলে মানুষের যিনি স্রষ্টা তাঁর ছবি ফুটে আছে আনন্দশতদল হয়ে ! কালীপদ গুহরায়কে দেখে আমার একথাই মনে হয়েছে যে, কখনও কখনও মানুষের জীবনের স্বরলিপি হতে পারে, হয়ে উঠতে পারে, ঈশ্বরলিপি। শুধু তা পড়বার মতো চোখ চাই। যে চোখ অন্তহীন অমায় দেখতে পায় কালীপদর দু'চোখে জেগে আছে, অনন্ত জ্যোৎস্নায় আনন্দপূর্ণিমা।

কালীপদ গুহরায়ের সংগে কিছুক্ষণ সংগ করলে সেই দৃষ্টি যার খোলে না সে নয় জিজ্ঞাসু। সূর্যমুখ যার মুদিত আলোয় পাপড়ি খোলে না সে নয় যেমন, কিছুতেই নয় সূর্যমুখী।

বন্ধ করা খামে প্রশ্নের উত্তর খাম না খুলে বসিয়ে দেবার অলৌকিক ক্ষমতা ব্যাখ্যা করছিলেন সেদিন কালীপদ গুহরায়। বলছিলেন, এটা কিছুই নয়। একটা স্পিরিটকে কনট্রোল করার ক্ষমতা মাত্র। এর সংগে ঈশ্বর সাধনার সম্পর্ক নেই বিন্দুমাত্র। এমন কি এটা, হাতদেখা, ঠিকুজি বিচারের জন্যে যেটুকু সংশ্রম করা দরকার, তা ছাড়াই করা যায়। কলকাতার একজন লোককে বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন তিনি। সে ঐ খাম বন্ধ করে উত্তর দেবার খেলাই দেখিয়েছিলো। গুহরায় মশাই তাকে ধমক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : যে স্পিরিটকে কনট্রোল করে এই জোচ্চুরির ব্যবসায় নেমেছ, সে স্পিরিট লিখতেও জানে না ভালো করে। এসব চালাকি ছেড়ে ঠিকুজি দেখে বা হাত দেখে বলবার পরিশ্রমটুকু করলেও তো বুঝি যে তবু পয়সা রোজগারের জন্য কিছু মাথার ঘাম পায়ে ফেলছ। এসব করে নিজেকে কত নীচে নামাও তা একবারও খেয়াল কর না ?

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, যে টাকার জন্যে এই নিম্নশ্রেণীর আত্মাকে ডেকে আনা, সেই টাকা তো সেই এনে দিতে পারে যে কারুর সিন্দুক থেকে। পারে না ?

পারে। কিন্তু সে টাকা আবার তাকে সিন্দুকে রেখে আসতে হবেই যে—

আচ্ছা, আবার প্রশ্ন করি আমি, আচ্ছা বলতে পারেন লোকে যে স্পিরিট দেখে সে পরিত্যক্ত বাড়িতে গভীর রাতে দেখে কেন ? দিনের আলোয় ট্রাম রাস্তায় দেখে না কেন ?

তার কারণ, দেখা দেবার জন্যে যে ক্ষমতার দরকার হয় তা কম স্পিরিটেরই আছে। যাঁদের আছে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া দেখা দেন না—

ঠিক কথা। আমরা মনে করি স্পিরিট বুঝি সর্বশক্তিমান। বুঝি না যে অনেক মানুষের চেয়েই তাদের ক্ষমতা কম। স্থূল দেয়াল ভেদ করে যেতে পারে সূক্ষ্ম দেহে সে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সে যা ইচ্ছে করতে পারে তাই। শুধু স্পিরিট নয়, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে কেবল সেই এক ; বাকী সবই অনেক ইচ্ছে করতে পারে পূরণ। কিন্তু পূর্ণ চৈতন্যের কৃপা ছাড়া পারে না এক কাণাকড়িও নাড়তে চাড়তে।

কাশীতে এমনই কয়েকটি স্পিরিটের দেখা পাওয়া গিয়েছিলো কয়েক বছর আগে একটি বাড়িতে। একটি বউ এবং দু'টি বা তিনটি মেয়েকে খুন করবার পর আত্মহত্যা করে একটি যুবক। এ ঘটনার দীর্ঘকাল পরে মধ্যরাত্রে সেই বাড়িতে তাদের আত্মার আবির্ভাব হয়। কাশীর বহু লোক এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। যে-বাড়িতে আমি কাশীতে গিয়ে উঠি, সে-বাড়ির কর্তা-গিন্নী এবং আরেক ভদ্রলোক যান ব্যাপারটা দেখতে। রাত বারোটায় গোলমাল আরম্ভ হয়। দরজা খুলে পুলিশ দেখতে পায় না কিছু। ভয় পায় সবাই, ভয় পায় না

কেবল বাড়ির বুড়ো বয়োবৃদ্ধ। যে এমন বাড়ি শোক পেয়েছে, ওদের বিরক্ত করো না।

কাগজে এই খবর পড়ে পাকিস্তান থেকে একজন মুসলমান ভদ্রলোক লেখেন যে, কাশ্মীর মতো জায়গায় এমন একজন লোক নেই যে বন্ধ করে দিতে পারে এই যুদ্ধ। ভাবি,—পাকিস্তানে বসে ওই কথা বলে বলবার জন্যে কাজ করছি। যেদিন লক্ষ লক্ষ দিনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হবে সেদিন বোঝা যাবে আমাদের কাজে কাজ হয়েছে। তারপর আর যুদ্ধ হবে না একবারও।

পাকিস্তানের সেই ভদ্রলোকের কথা সত্য হয়েছিলো, যদিও তার পরেও কখনও কখনও এ শব্দ শোনা গেছে আবার। [ক্রমশ।

ভালবাসা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন ?

ভালবাসা জিনিসটা কি একথা কাউকে জিগ্যেস করলে দেখবেন তাঁর উত্তরটা খুব পরিষ্কার নয়। আসলে, কথাটি সম্বন্ধে ধারণা অনেকেরই বেশ সুস্পষ্ট নয়। কেউ হয়ত ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাতে কথাটির ব্যবহার করেন, কেউ বা করেন তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ব্যক্ত করতে, কেউ আবার তাঁর কুকুরের প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ সেটি জানাতে বলেন—আমি ভালবাসি। এগুলি সবই মানুষের শুভবুদ্ধি। হৃদয়ের অভিব্যক্তি—কিন্তু ভালবাসা নয়। ভালবাসা পুরুষ ও নারীর মধ্যে অনুরাগের প্রগাঢ় বন্ধন। হ্যাভলক এলিস কথাটির চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন—'ভালবাসা সেক্স ও বন্ধুত্বের সংমিশ্রণ'। অনেকেই কিন্তু হয় সেক্স নয় বন্ধুত্ব এই দুটির একটি পেয়েই মনে করেন তাঁরা ভালবাসেন এবং ভালবাসা পেয়েছেন। সেক্স ছাড়া কি ভালবাসা হয় না? আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—না, হয় না, হতে পারে না। তাঁদের মতে, দেহকে বাদ দিয়ে ভালবাসার সম্পর্ক হয় না। মতবাদটি নতুন নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার ভালবাসাকে সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছিলেন—স্নেহ, মমতা, সম্মান, সৌন্দর্য, সহানুভূতি সকলের আগে। সেক্সের যদি এতই প্রাধান্য, তাহলে সেক্স-ই কি যথেষ্ট নয়? কোনো কোনো আদিম সমাজে ভালবাসা বলে কোনো কথা নেই। এটি মানুষকে সভ্যতার দান—বর্বরতার ঊর্ধ্বে তুলে তাকে মহৎ করার উদ্দেশ্যে। যৌনমিলনের মূল কথা সৃষ্টি—তার একটা স্বকীয় মর্যাদা ও উপযোগিতা আছে—কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করে ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তখনই যখন দু'টি আত্মা পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে আসে এবং একজন তার ঈপ্সিত জনকে অনুরাগের গাঢ় ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখার আকুতি অনুভব করে। এমন অনেক নরনারী দেখা যায় বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরও যাঁরা পরস্পরের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেন। এমনিই একজন নারী বলেন—আমরা একজন আর একজনকে এতটুকু পছন্দ করতাম না, তবু কালই আবার আমি তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী আছি—যদিও তাঁর জন্যে আমার নিজের ওপর ও তাঁর ওপর আমার কম বিতৃষ্ণা হবে না। প্রতিটি দিনের বেদনার মধ্যে দিয়ে এই নারী জেনেছিলেন যে যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তিই সব নয়। দিনের পর দিন একসঙ্গে বাস করতে হলে চাই বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্বস্ততা ও হাসি। প্রথম দর্শনে ভালবাসার মত এমন জিনিসও কিন্তু আছে। প্রথম দর্শনে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভূত হয়, হৃদয়বীণায় বেজে ওঠে সমবেদনার সুর। এই থেকেই জন্ম হয় কামনার, জন্ম হয় ভালবাসার। কখনও আবার কিছুই হয় না। পুরুষ যাকে তার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তার মধ্যে নাকি সে এই তিনটি বস্তুর যে কোনো একটি সন্ধান পায়—তার মনের গভীরে আঁকা তার মায়ের ছবি, নিজের প্রতিমূর্তি অথবা আশৈশব সযত্নে লালিত কল্পনা। কিন্তু যে [illegible] বিবাহবন্ধনে [illegible] থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। ভালবাসা, ধৈর্য ও [illegible]। পরস্পরকে বোঝার সুযোগ দিয়ে, স্নেহ ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গভীরতা ও পরিপুষ্টি লাভ করে। এর জন্য [illegible] সহনশীলতার প্রয়োজন। সকলেই কি ভালবাসতে পারে? বিভিন্ন অবস্থার মত মানসিক অবস্থারও কম বেশী দেখা যায়। যা সাধ্য, নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে যে নিজকে সম্পূর্ণভাবে দিতে শিখেছে কেবল সে-ই ভালবাসতে পারে। যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গায় এবং যে কোনো লোকের সঙ্গে এ জিনিস ঘটতে পারে। ভালবাসার জন্যে নিজের ব্যক্তিত্ব বা আত্মমর্যাদা যে বিসর্জন দিতে হবে এমন নয়। দু'জনের মধ্যে থাকবে এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ যা পরস্পরের ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দান করবে। ঝগড়া-ঝাঁটি হলেই যে ভালবাসার অভাব বুঝতে হবে তা নয়। ঝগড়াঝাঁটি নানা কারণে হয়ে থাকে। যৌন অক্ষমতা বা অতৃপ্তি যে একটা বড় কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু তাছাড়াও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে তাকে ঘরে বাইরে নানারকম ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয় এবং সারাদিনের পরিশ্রমের পর দৈহিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদের দরুণ অনেক সময় তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে। এই মেজাজে ঘরে ফিরে সামান্য কারণে বা অকারণে সে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে বসে। দু'জনের মধ্যে যখন সত্যিকারের ভালবাসা গড়ে ওঠে তখন তা সহজে বিনষ্ট হয় না। প্রকৃত ভালবাসার সহিষ্ণুতা অসীম, আঘাত সইবার ক্ষমতাও অপরিসীম। প্রকৃত ভালবাসা জানে যে, মানুষ মানুষ-ই, দেবতা নয়। প্রতি পদক্ষেপেই সে ভুল করতে পারে, অপরাধ করতে পারে। তাই সত্যিকারের ভালবাসা যেমন সহনশীল, তেমনই ক্ষমাশীল। ভালবাসার মধ্যে যেমন থাকে একটা অধিকারের মনোভাব আর কিছু পরিমাণ ঈর্ষা, তেমনই সেই সঙ্গে থাকে সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞান ও শালীনতাবোধ। যে বিবাহ ভালবাসার নিবিড় বন্ধনে দৃঢ়-সংবদ্ধ—ঈর্ষা সেখানে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যেখানে ভালবাসা নেই—সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সেখানে প্রবল ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে এবং পরস্পরের বিবাহিত জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। একবারের বেশী ভালবাসা কি সম্ভব? একনিষ্ঠ প্রেমের প্রশংসা করে ভাল ভাল কাব্য রচিত হতে পারে সত্যি—কিন্তু যে মানুষ একবার ভালবাসতে পারে তার পক্ষে একবারের বেশী ভালবাসাও অসম্ভব নয়। হৃদয়বৃত্তির যে কোমলতা, যে উন্মাদনা, যে উত্তেজনা মানুষকে ভালবাসায় প্রবৃত্ত করে তা কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না। যে মানুষ একবার ভালবাসে, সে অতীত-স্মৃতি বুকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—সে স্মৃতি যতই কেন না মধুর ও বেদনাবিধুর হোক। কবিরা ভালবাসার বেদনা ও জ্বালাযন্ত্রণার কথা বলে থাকেন, কিন্তু সত্যি বলতে কি, মানুষকে এত আনন্দ আর কিছুই দিতে পারে না।

সাহিত্য পরিচয়

স্তব্ধ প্রহর

অগ্রগণ্য কথাশিল্পীর সাম্প্রতিকতম রচনা এই উপন্যাসে জীবনের এক অপরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম যৌবনে ভালবেসে যাকে বরণ করে নিয়েছিল শোভনা তারই দুর্ঘটনায় মারা গেলে একটানা কালো হয়ে উঠলো তার সমস্ত জীবন, কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত প্রাণসত্তা বুঝি অপরিমেয় জীবনের প্রতি দুর্জয় সংগ্রাম করেও বুঝি বা অক্ষয় থাকে, সেজন্যই জীবনসংগ্রামে কত বিক্ষত শোভনা ভেঙে পড়ল না, ফুরিয়ে গেল না, বরং শিখলো মাথা তুলে দাঁড়াতে চরম হতাশাকে উপেক্ষা ক'রে অদম্য দৃঢ়তায়। নতুন করে বাঁচবার সংকল্পে পায়ে পায়ে এগোলো শোভনা, আবার এল তার জীবনে প্রেম মানুষের পথ চলায় যা সর্বোত্তম পাথেয়, নিখিলের চোখের আলোয় আবার রঙীন হয়ে উঠল ওর জগৎ, কিন্তু সার্থকতার মধুমুহূর্তে করচ্যুত হল ভরা পেয়ালা, নিখিল ও শোভনার মিলিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আবার উদয় হল অনুপম, শোভনার প্রবঞ্চক স্বামী। করুণা জয়ী হল প্রেমের উপর; স্তব্ধ প্রহরের অন্তহীন ব্যর্থতা চোখে মেখে চেয়ে দেখলো শোভনা ও নিখিল পরস্পরের দিকে। সমস্ত কাহিনীটি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে পরিসমাপ্তির কয়েকটি ছত্রে। এই অপরূপ শিল্পোত্তীর্ণ উপসংহারই সমগ্র রচনাটির প্রাণসত্তা, আর এখানেই ধরা পড়েছেন কথাশিল্পের যাদুকর 'প্রেমেন্দ্র মিত্র'। উপন্যাসটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ দাম—পাঁচ টাকা।

বিশ্ব বিবেক

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে এযাবৎ বহু রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, তার কোনটিই আলোচ্য রচনা সংকলনটির সঙ্গে তুলনীয় নয়। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রচিত উল্লেখযোগ্য সব রকমের রচনা থেকেই কিছু না কিছু সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। স্বামিজীর নিজস্ব রচনা ও বাণীরও সারাংশ গৃহীত হয়েছে এবং এই বিবিধ রচনার মাধ্যমে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এক সামগ্রিক রূপায়ণ করার প্রচেষ্টাই সংকলনকারগণের উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য মাত্র যে তাঁদের সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফলতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে; আলোচ্য সংকলন গ্রন্থটি পাঠে পাঠক বিবেকানন্দের বাণী, কর্মযোগ ও তাঁর সর্বজনীন মানবমুক্তি ও বিশ্বধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সংযোগে যে মহান ব্যক্তিত্ব রূপ পরিগ্রহ করেছিল স্বামিজীর মধ্যে তারই ধ্যানমূর্তিটি যেন ধরা পড়ে যায় পাঠক মননে, আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে। বিবেকানন্দের ভাস্বর জীবন ও গভীর চিন্তার যেন এক অনবদ্য সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় এখানে। সংকলনকারদের নৈপুণ্য ও আন্তরিকতায় বর্তমান গ্রন্থটি শুধু মূল্যবানই নয় প্রামাণ্যও হয়ে উঠতে পেরেছে। এই গ্রন্থের প্রকাশক নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ অতি শোভন, অপরাপর আঙ্গিক উচ্চমানের। আমরা এই মূল্যবান সংকলনটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। সংকলনকারদ্বয় অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর। প্রকাশনায় বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯ দাম—দশ টাকা।

সোভিয়েত পাঠকদের জন্যে ভারতীয় বই

গত ৪৫ বছরে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় লেখকদের রচিত মোট ৪৩৩টি গ্রন্থ রুশ ও অন্যান্য সোভিয়েত ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব বইয়ের মোট মুদ্রণ-সংখ্যা হল ১,৬৩,৪১,০০০ কপি।—এটা হল ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই তারিখের পরিসংখ্যান। বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে সোভিয়েত পাঠকের আগ্রহ খুব বেড়েছে। ১৯৫১—৫৫ সালের মধ্যেই ভারতীয় লেখকদের রচিত ৪৩টি বইয়ের অনুবাদ মোট ৩০,৭৬,০০০ মুদ্রণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬—৬০ সালে অনূদিত বইয়ের সংখ্যা ও মোট মুদ্রণ-সংখ্যা দুইই কয়েক গুণ বেড়ে যায়: এই সময়ের মধ্যে অনূদিত হয় ২৭২টি ভারতীয় গ্রন্থ এবং এগুলির মোট মুদ্রণ-সংখ্যা হল ১,০১১০,০০০, এসব বই অনূদিত হয়েছে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩টি জাতীয় ভাষায়।

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র রচিত "পাহাড়ী সন্ধ্যা" গ্রন্থের প্রচ্ছদ চিত্র। প্রকাশক রীডার্স কর্ণার। শিল্পী—নিমাই পাল। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

রবীন্দ্র রচনাবলী

বলা বাহুল্য, সোভিয়েত দেশে ভারতীয় লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বাধিক পঠিত। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার অব্যবহিত পরেই, তাঁর রচনাবলী রুশ অনুবাদে প্রকাশিত হয়—১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বেশ কিছুকাল আগেই। তারপর, ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলীর (গল্প, কবিতা ও পত্রাকারে লেখা নিবন্ধ) রুশ অনুবাদ পর পর দুটি সংস্করণে মুদ্রিত হয় এবং ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় এই একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ। এগুলি অনূদিত হয়েছিল মূল রচনাগুলির সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ মিলিয়ে—প্রধানতঃ ইংরেজি অনুবাদ থেকেই।

পরবর্তীকালে যখন বাংলাভাষায় সুশিক্ষিত এবং বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত সোভিয়েত ভারতবিদদের আবির্ভাব হতে থাকল, শুধু তখনই সরাসরি মূল বাংলা থেকে রুশ ভাষায় ও অন্যান্য সোভিয়েত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্য লেখকদের রচনার অনুবাদের কাজে খুব ব্যাপক ভাবে হাত দেওয়া হল। মূল বাংলা থেকে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নির্বাচিত রচনাবলী আট খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৫৫-৫৭ সালে রাষ্ট্রীয় কথাসাহিত্য প্রকাশালয় থেকে। এটির মুদ্রণ-সংখ্যা ছিল ১০,০০০। অতি অল্প সময়ে এই আট খণ্ড রচনাবলী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরই আরেকটি বৃহত্তর ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ নতুন রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই নতুন সংস্করণের শেষ দুই খণ্ডে থাকবে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পত্রাবলী ও বক্তৃতা। এই ১২ খণ্ডের রবীন্দ্র-রচনাবলীর অনুবাদকদের মধ্যে আছেন সের্গেই লিপকিন, ভেরা তুশ্নোভা, নিকোলাই তিখনফ, তাতিয়ানা স্পেন্দিয়ারোভা, ভিক্তর রোজদেস্তভেন্স্কি, এস, সেভের্‌সেফ প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতনামা সোভিয়েত কবি ও অনুবাদকগণ। এই সংস্করণ মুদ্রণের জন্যে তৈরী করার আগে সোভিয়েত-সম্পাদকমণ্ডলী

রীডার্স কর্ণার কর্তৃক প্রকাশিত শচীন সেনের "রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়" গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি মূল্য এগারো টাকা মাত্র।

ননী ভৌমিক, সমর সেন, শুভময় ঘোষ প্রভৃতি মস্কোপ্রবাসী ভারতীয় লেখকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পান। এই নতুন ১২-খণ্ড সংস্করণের প্রথম ছটি খণ্ড ১ লক্ষ কপি মুদ্রণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সমস্ত বিক্রয় হয়ে গেছে। এই রচনাবলীর সেট ছাড়াও আলাদা ভাবে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'ঠাকুরমার হাট', নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ প্রভৃতি। উপন্যাসগুলির মোট মুদ্রণ-সংখ্যা ১১,৪৭,০০০। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথের ১১২টি গ্রন্থ ২০টি জাতীয় ভাষায় মোট ৬৫,৭০,০০০ মুদ্রণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে (১লা জুলাই, ১৯৬২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী)।

পরিতোষ মজুমদারের "কাঁচের আয়না" গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট। প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস। শিল্পী—শ্রীগণেশ বসু। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রেমচাঁদ ও অন্যান্য

সোভিয়েত পাঠকসাধারণের মধ্যে প্রেমচাঁদের জনপ্রিয়তাও বিপুল। যুদ্ধপরবর্তী কয় বছরেই প্রেমচাঁদের ২০টি গ্রন্থ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ৮টি জাতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১১টি উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে মোট ৮ লক্ষ কপি। প্রেমচাঁদের 'গোদান', 'নির্মলা', 'রণক্ষেত্র' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প-সংগ্রহ 'মানসরোবর' সোভিয়েত পাঠকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। রাষ্ট্রীয় কথাসাহিত্য প্রকাশালয় থেকে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে প্রেমচাঁদের 'রঙ্গভূমি'। তাঁর 'অরণ্যকাহিনী' আর 'রামরাজার গল্প' বই দুটি সোভিয়েত শিশুদের খুব প্রিয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের মধ্যে সোভিয়েত পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত মুলকরাজ আনন্দ, কৃষণচন্দর, খাজা আমেদ আব্বাস, ভবানী ভট্টাচার্য, বৃন্দাবনলাল বর্মা, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, উপেন্দ্রনাথ অশক সুদর্শন, যশপাল, প্রভৃতি। মুলকরাজের কোনো কোনো বই ১৭টি সংস্করণ পর্যন্ত হয়েছে এবং তাঁর সমস্ত অনূদিত বইয়ের মোট মুদ্রণসংখ্যা পৌঁচেছে ১১,৮৩,০০০ কপিতে। কৃষণচন্দরের কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ ২৬টি সংস্করণ পর্যন্ত উঠেছে। ১৯৬১ সালে বিশিষ্ট মালয়ালী সাহিত্যিক তাকাঝী শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের দুটি উপন্যাস—'দুই কাহন ধান' আর 'মাছ' রুশ অনুবাদে প্রকাশিত হবার পর, সোভিয়েত পাঠকদের মধ্যে এঁর বই সম্পর্কে গভীর আগ্রহ জেগেছে। এঁর কয়েকটি ছোট গল্প ইতিপূর্বে সোভিয়েত পাঠকরা পড়েছেন। পাঠকদের চাহিদা মেটাবার জন্যে, পিল্লাইয়ের ওই দুটি উপন্যাস ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি 'রোম্যান গাজেতা' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সাহিত্য-পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা ৫ লক্ষ কপি।

নবজন্ম

প্রবীণ উপন্যাসিকের এই নবতম সৃষ্টি বিভিন্ন কারণেই উল্লেখ্য। ভূমিকায় গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে কাউন্ট লিও টলস্টয়ের অমর সাহিত্যকীর্তি Resurrectionকে অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী ; কিন্তু সুখের বিষয় যে তা সত্বেও কাহিনীটি মৌলিকত্ব হারায়নি, বরং বিষয়বস্তুর চিরন্তন মানবিকতা বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে। এক

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "অসমাপ্ত চতুষ্ক" গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ। শিল্পী—শচীন বিশ্বাস। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।
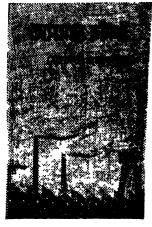
ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর করুণ পরিণতিই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য ; সরলা কিশোরী ঊষা ভালবেসেছিল একদিন রজতকে, নিজেকে উজাড় করে দিতেও দ্বিধামাত্র করেনি সে সেদিন, তারপর ঘনিয়ে এল দুর্যোগ তার জীবনে, প্রথম প্রেমের মাশুল দিতে গিয়ে বিকিয়ে গেল তার সমগ্র সত্তাটাই, তবু প্রেমাস্পদকে ছোট করতে পারল না সে, সব দোষ সব গ্লানিকে নিজের মাথায় তুলে নিয়ে তলিয়ে গেল জীবনের গভীর আবর্তে, পাপ-পঙ্কিল পিছল পথে হারিয়ে গেল এক অমলিন শুভ্র কুমারী, প্রেম-বিহ্বলা কিশোরী রূপান্তরিত হল ঘৃণ্য বারবধূতে। তবু সত্যকার প্রেম যে মৃত্যুঞ্জয়ী, তাই খুনের আসামী সেই ঘৃণ্যা রূপোপজীবিনী-র মুখেই আবার ধ্বনিত হতে শুনি, রজতের বিবাহ প্রস্তাবের উত্তরে—কেন এসব পাগলামো করতে যাচ্ছেন। কিসের প্রায়শ্চিত্ত আপনার ? পাপ করেছিলেন, যদি করেই থাকেন সে তো ঊষার কাছে, সে অবাগী বহুদিন মরে গেছে। ঊষার উপর যেটুকু অন্যায় করেছিলেন তার জন্য হিমিকে টেনে বেড়াবার দরকার নেই। মেয়েদের মন ঊষার এই কথাকটির মধ্য দিয়েই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে, আত্মবিসর্জী এই প্রেমের আলেখ্য শুধু হৃদয়গ্রাহীই নয় হৃদয়বেদ্যও। চরিত্র সৃষ্টিও নিপুণ হাতে করেছেন লেখক, নায়ক রজত, মনোরমা, চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি সবকটি চরিত্রই আপন আপন আবেদনে অনন্য। তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল বা মননশীল সাহিত্য সৃষ্টি না করে শুধুমাত্র মানুষের মনের শ্রেষ্ঠতম অনুভূতিগুলিকেই সহজ সরল ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক, তাঁর আবেদনও তাই এত মর্মস্পর্শী, এত আন্তরিক। বইটির আঙ্গিক যথাযথ ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

প্রকাশক—বিভূতি প্রকাশন, ২২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রেমের গল্প"

বর্তমান গ্রন্থটি স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক গল্প সংগ্রহ, মোট সাতটি গল্প চয়িত হয়েছে এতে, যার প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত। গল্পগুলি না পড়লে লেখকের অতুলনীয় লেখনীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, প্রেমের এক বিশেষ রূপ এদের মাঝে উদ্ঘাটিত সে রূপ সুগভীর প্রশান্তির। গভীরতা ও মাধুর্যই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, যে প্রেমের বাণী এরা বহন করছে তা আত্মত্যাগে মহান শান্তিতে সমৃদ্ধ। কান্ত-মধুর এই গল্পগুলির মাধ্যমে মরমী কথাশিল্পীর অপরাজেয় মহিমা যেন নতুন করে পাঠকের মর্মস্পর্শ করে। সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখ, হাসিকান্না যেন কোন এক যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় অপরূপ হীরকদ্যুতি মণ্ডিত হয়ে উঠেছে, পড়তে পড়তে মন ডুব দেয় গভীর থেকে গভীরে ; পাঠ শেষে অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ রসোপলব্ধিতে। গল্পগুলির মধ্যে, 'বেণীগির ফুলবাড়ী' ও 'অরন্ধন' বিশেষভাবেই উল্লেখ্য, মমতা-মধুর স্নেহময়ী নারীচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে উক্ত গল্প দুটির নায়িকাদ্বয়ের মাধ্যমে, প্রেম ও কল্যাণের যেন তারা মূর্ত প্রতিমা। রুক্ষ বর্ষণ জীবন সংগ্রামের সব গ্লানি যেন এক মায়াদণ্ডের স্পর্শে মুহূর্তে অপসৃত হয়ে যায় পাঠকের মন থেকে, এই স্নিগ্ধ-মধুর লেখনীর প্রসাদে ; এইখানেই বিভূতিভূষণ অপরাজেয়, এই তাঁর সর্বোত্তম পরিচয়। বইটির অঙ্গসজ্জা মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—বিভূতি প্রকাশন, ২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা মাত্র।

বাক্ সাহিত্য কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের "কবিত কাঞ্চন" গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আলেখ্য শিল্পী—কানাই পাল। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

আলোচ্য পুস্তকটি এক অনুবাদ গ্রন্থ। বিখ্যাত বিজ্ঞান সাধক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জীবন বিবৃত হয়েছে এখানে। সুবিখ্যাত এই জ্ঞান-তপস্বীর জীবন-কাহিনী শুধু শিক্ষাপ্রদই নয় অত্যন্ত

কৌতূহলোদ্দীপক, অনুবাদকের নিষ্ঠায় মূল গ্রন্থের স্টাইল কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি, তাঁর ভাষারীতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। শুধু একটি মাত্র বিষয়ে অনুযোগের অবকাশ রয়ে গেছে, মূল লেখকের উল্লেখ বইটিতে প্রায় নেই বললেই হয় অনুবাদকের নামটি মূল লেখকের ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে, বলা বাহুল্য এ ত্রুটি অমার্জনীয়। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এ ত্রুটি সংশোধিত হবে। শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই অনুবাদ গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কো: এ: ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। লেখক—Irmen garde Eberbe অনুবাদক—জয়ন্ত চৌধুরী। দাম—দুই টাকা।

অনেক সোনালী দিন

বর্তমানকালে বাঙলা সাহিত্যের দরবারে যাঁরা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠার অধিকারী রমাপতি বসু তাঁদের অন্যতম। লেখকের সাম্প্রতিক উপন্যাস অনেক সোনালী দিন পরিপূর্ণরূপে তাঁর সৃজনীশক্তির অন্যতম প্রধান পরিচায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপন্যাসটিতে লেখক এক বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের ভাষা রচনা করেছেন। হাসি, কান্না ভরা অফুরন্ত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ জীবনকেন্দ্রিক এক নিটোল গল্প তাঁর লেখনী অশেষ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে গেছে। চরিত্রচিত্রণে, কাহিনী বিন্যাসে প্রকাশভঙ্গিমায় তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাসটি সর্বতোভাবে সুখপাঠ্য, আনন্দদায়ক ও রসসমৃদ্ধ। কাহিনীর গতি সাবলীল, লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে জীবনের নানারূপ ধরা পড়েছে সেই অনুপম জীবনচিত্রই প্রতিভাত হয়েছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে জড়তামুক্ত এবং কৃত্রিমতাশূন্য। প্রকাশক, জ্ঞানতীর্থ, ১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। দাম তিন—টাকা মাত্র।

স্বনামধন্য কবি ও কথা শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রের "শুক্ল প্রহর" গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। প্রকাশক—গ্রন্থ প্রকাশ। শিল্পী—অজিত গুপ্ত। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

কত রঙ

সাম্প্রতিককালে বাঙলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন প্রভাত দেবসরকার তাঁদেরই মধ্যে একজন। 'কত রঙ' তাঁর একটি সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। একটি অতি সূক্ষ্ম জীবনচিত্র লেখক আলোচ্য উপন্যাসটিতে অঙ্কিত করেছেন। লেখকের সরস বর্ণনায়, প্রাঞ্জল ভাষায় ও বলিষ্ঠ প্রকাশশক্তিতে উপন্যাসখানি মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং তীব্র জীবনবোধ উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। উপন্যাসটিতে কোনপ্রকার অস্পষ্টতা, অসুস্থতার ছাপ মেলে না। তাঁর অনুভূতিশীল মনে বিচিত্র জীবন নানাভাবে রেখাপাত করেছে, তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। প্রকাশক—গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। দাম—চার টাকা মাত্র।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রশান্ত চৌধুরী রচিত "নদী থেকে সাগরে" গ্রন্থের প্রচ্ছদপট। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। শিল্পী—কানাই পাল। মূল্য আট টাকা মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
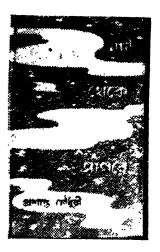
বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাসে যে ক'টি নাম অমলিন দীপ্তিতে বিরাজমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই তালিকায় এক উজ্জ্বল নাম। যাঁদের বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভা নানাভাবে দেশকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আসন তাঁদের অনেকেরই পুরোভাগে। সাহিত্যে সঙ্গীতে, অভিনয়ে নাট্যরচনায়, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে, কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রহসনে, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান যেমনই অভাবনীয় তেমনই পরম মূল্যবান। সাংস্কৃতিক জগতের এই দিকপাল নায়কের জীবনকাহিনী রচনা করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ সুশীল রায় এক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তথা সমকালীন যুগ সম্বন্ধে সুশীল রায়ের রচনা যেমনই তথ্যবহুল, তেমনই সারগর্ভ। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের এই গ্রন্থ যে কত দিক দিয়ে ভরিয়ে তুলবে তার তুলনা নেই। আজকে আমাদের এই সাংস্কৃতিক বিজয়বৈজয়ন্তীর দিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ এই অগ্রনায়কদের পূর্বসূরীদের, নতুন দিক বেয়ে পথপ্রদর্শকদের সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন অপরিহার্য। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে কত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁর মনীষা যে জাতীয় জীবনকে কত দিক দিয়ে আলো দিয়েছে এই জীবন-গ্রন্থটিতে তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক বিজয়াভিযানের এক সুন্দর আলেখ্য এখানে সুচিত্রিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে কোন কোন সময়ে কোন কোন ছবি তাঁর একটি সুদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে পরিবেশিত

হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকের প্রভূত পরিশ্রম, প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অনমনীয় অধ্যবসায়ের স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর ইতিহাস-চেতনা এবং জীবনচরিত রচনার মনোরম বৈশিষ্ট্যবান ভঙ্গী বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। এই সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থটির জন্ম আমরা বাঙলার অন্যতম শক্তিমান সাহিত্যকার ডাঃ সুশীল রায়কে অভিনন্দিত করি। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো, দাম—দশ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

পৃথিবীর মধ্যে গীতা অদ্বিতীয় ধর্মগ্রন্থ। ইহা নিত্য পাঠে মানব শুদ্ধচিত্ত হয়। ইহা ছোট আকারের গীতা—ইহাতে মূল শ্লোক ও উহার সুন্দর সরল বাংলা অনুবাদ আছে। প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য ও মনোরম। অনুবাদ—শ্রীকস্তুরচাঁদ লালওয়ানী, প্রকাশক—শ্রীকমলা দেবী, প্রজ্ঞানম—১১, ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—১'২৫।

জর্জ বার্ণার্ড শ'

জর্জ বার্ণার্ড শ'র জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জীবদ্দশাতেই বহু পুস্তকাদি রচিত হয়েছে; সম্ভবত আর কোন সাহিত্যিকেরই জীবন-কালে তাঁর সম্বন্ধে এত গ্রন্থাদি রচিত হয়নি আজ পর্যন্ত। কিন্তু শ'র সম্বন্ধে এতাবৎ যা গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই বিদেশী ভাষায়, বাংলায় তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য জীবন চরিত ছিল না, বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করে লেখক সে অভাব দূর করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটির এই নব সংস্করণ হাতে পেয়ে আমরা যুগপৎ হর্ষিত ও আশান্বিত হয়েছি, বাংলার পাঠক সমাজ এর দ্বারা তাঁদের বিদগ্ধ মনন ও শ' প্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছেন। বৈদগ্ধ ও মননশীলতার মূর্ত প্রতীক বার্ণার্ড শ'-এর এই জীবনী একাধারে কৌতূহল ও শিক্ষাপ্রদ, এই গ্রন্থ পাঠে বাঙালী পাঠকের মনে শ' সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বর্ধিত হবে বলেই আমরা আশা করি। জর্জ বার্ণার্ড শ'র জীবন, এই কালের বিস্ময়কর এক প্রতিভার জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের ইতিহাস, যা যে কোন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির কাছে শুধু কৌতূহলজনকই নয় শিক্ষা-প্রদও। আমরা এই মূল্যবান জীবনী গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—দশ টাকা।

হাসি কান্নার কাহিনী

অনুবাদ সাহিত্য ক্রমেই পুষ্টিলাভ করছে সব দেশেই, তবে বাংলা সাহিত্যে এর ক্রমবিকাশ বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়। নানা ধরণের বিদেশী বই অনূদিত হচ্ছে যার একাংশ উল্লেখ্য অপরাংশ গতানুগতিক, আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটি শেষোক্ত পর্যায়ের। কাহিনী গড়ে উঠেছে ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত একটি ছোট শহরের বাসিন্দা মেকলে পরিবারকে কেন্দ্র করে, কাহিনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখানো হয়েছে যদিও তার গতি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। অনুবাদকের ভাষা সাবলীল, মূল কাহিনীর বক্তব্যকে সহজেই পৌঁছে দেয় পাঠকের সামনে। বইটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—উইলিয়াম সরোয়ান, অনুবাদক—কালীপ্রসাদ বসু, প্রকাশক—হোমশিখা প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাঙলায় বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর সময়, স্বামিজীর জীবনী প্রকাশের উদ্যম বহুলাংশে বেড়ে যায়, বর্তমান গ্রন্থটিও তারই ফল। এই ছোট বইটিতে বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও তাঁর বাণীর কয়েকটি দিক আলোচিত হয়েছে। বাঙলার বর্তমান যুবশক্তি স্বামিজীর কর্ম ও বাণীর মাধ্যমে কি ভাবে পথের সন্ধান পেতে পারে, তারই প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন লেখক। দুর্নীতি ও কলুষের পঙ্কিল পরিবেশে আজকের মানুষ যখন স্বধর্ম ভ্রষ্ট হওয়ার পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, সে সময় বিবেকানন্দের ওজস্বিনী বাণী ও কর্মজীবনের ত্যাগপূত আদর্শের প্রসার ও প্রচার বিশেষ ভাবেই প্রয়োজনীয় এবং সেজন্যই এ ধরণের রচনামাত্রই সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হওয়ার যোগ্য, আশা করি আলোচ্য গ্রন্থটি সে সমাদরে বঞ্চিত হবে না। বইটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, প্রচ্ছদে স্বামিজীর ছবিটি আকর্ষণীয়। লেখক—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন) প্রকাশক—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ (২৪ পরগণা)। দাম—দুই টাকা মাত্র।

জোনাকি মন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প সংকলন; বর্তমানে ছোট গল্পের চাহিদা ও প্রচলন সমধিক এবং বোধ করি সেজন্যই বহু গল্পকারও সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন, এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার বহুর ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত নন, ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনাময় স্বাক্ষরে তাঁরা অনস্বীকার্য রূপেই চিহ্নিত, বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা নিঃসন্দেহে

বর্ষীয়সী সাহিত্য সাধিকা সুখলতা রাওয়ের ছোটদের "নানান" গল্প গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আলেখ্য। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। শিল্পী—অজিত গুপ্ত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

তাঁদেরই অন্যতম। মোট আটটি গল্প স্থান পেয়েছে এই সংকলনে, ঔজ্জ্বল্যে ও আন্তরিকতায় যারা সমভাবেই অনন্য। এক পরিশীলিত জীবন দর্শনের আভাস সুস্পষ্ট এদের মাঝে, মানুষের অন্তরের অন্দরমহলে যে সব আকাংখা, সংশয়, বেদনা ছোট ছোট ঢেউ তুলে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলে, লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে তারই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, আর সেজন্যই তাঁর রচনাও হয়ে উঠতে পেরেছে সফল ও সার্থক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগত অথচ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ এই লেখককে আমরা সানন্দ স্বাগত জানাই। বইটির প্রচ্ছদ শোভন,

ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—পরিতোষ মজুমদার। প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, দাম—দুই টাকা।

বিচিত্র মানবী

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে 'শ্রীপান্থ' এক সুপরিচিত নাম, তাঁর রচনার বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক তথ্য-সমৃদ্ধ। বর্তমান গ্রন্থে তিনি বৃহত্তর নারীসমাজের পটভূমিকায় কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করেছেন। যুগে যুগে দেশে দেশে মেয়েদের নিয়ে একদিন যে অকরুণ খেলা চলেছিল এবং আজও যা লুপ্ত হয় নি নিঃশেষে তারই কয়েকটি উজ্জ্বল ও তথ্যনিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন তিনি দরদী লেখনীর মাধ্যমে। বলা বাহুল্য এ বই নারী-সমাজের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, কতকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা, চরিত্র এবং তার আনুষঙ্গিক প্রথাসমূহের কৌতূহলকর কাহিনী মাত্র; কয়েকটি রচনা আবার সম্পূর্ণভাবেই বর্তমান কালের ঘটনা আশ্রয়ী, এর দ্বারা লেখক যুগ ও কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে অত্যন্ত সহজেই শাশ্বত নারীর মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন। পুরুষের লোভ ও লালসার যূপকাষ্ঠে যুগ-যুগান্ত ধরে মেয়েরা যে আত্মবলিদান করে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং আজও যে তার জের টানার বিরাম ঘটেনি, সেকাল ও এ-কালের কয়েকটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে সেই সত্যকেই তুলে ধরেছেন লেখক। লেখনীর যাদুতে কাহিনীগুলি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, লেখক যে একজন সিদ্ধ কথক, তাঁর রচনা পাঠে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—শ্রীপান্থ। প্রকাশক—গ্রন্থম্‌, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—পাঁচ টাকা।

সুজিতকুমার নাগের "রাত যখন নিঝুম" গ্রন্থটির প্রচ্ছদ চিত্র। প্রকাশক—সাহিত্য-ভবন। শিল্পী—সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

রাঙামাটির পাহাড়ে

আলোচ্য গ্রন্থটি উপন্যাস। পাঠক সাধারণের রুচি মাফিক সহজ সরল কাহিনী পরিবেশনে লেখক সিদ্ধহস্ত, বস্তুত এ জন্যই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তায় চিহ্নিত হতে সমর্থ হয়েছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর সে সুনাম অব্যাহত থাকবে। একটি সরলা আদিবাসী বালিকার জীবনায়ন করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। পাহাড়ী কিশোরী চুম্‌কী, আরণ্য জলপ্রপাতের মতই সহজ যার গতি, স্বচ্ছন্দ যার লীলা; ভালবাসল তরুণ কুঠিবাবু দেবব্রতকে, বিধির বিধানে প্রেম তার সার্থক হল না, ব্যর্থ প্রতীক্ষার প্রহর গুণে গুণে একদিন নিঃশেষ হয়ে গেল তার যৌবন, ঝরে গেল একটা টাট্‌কা ফুল ব্যর্থতার গ্লানিতে কুঁকড়ে গিয়ে। কাহিনীর পরিণতিতে বড় করুণ ও মধুর এক ছবি এঁকেছেন লেখক দরদী কলমে, পাঠকের সমবেদনা স্বতঃই উত্থিত হয়ে ওঠে ভাগ্যবিড়ম্বিতা দুঃখিনী চুম্‌কীর প্রতি, বিশেষত বহু বছর প্রতীক্ষার পরে দেবব্রতর সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ-এর বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী রূপেই উপস্থাপিত হয়েছে; বস্তুত এখানেই কাহিনীটি যেন পরিপূর্ণ ভাবেই সার্থক। প্রাগুক্ত চরিত্রগুলির মাঝে, চুমকীর চরিত্রই সবচেয়ে উজ্জ্বল ও মধুর, নায়ক দেবব্রতকে এর পাশে কেমন যেন নিষ্প্রভ মনে হয়। বইটির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শৈলেশ দে, প্রকাশক—গ্রন্থম্‌, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আধুনিক রুশ গল্প

আলোচ্য গ্রন্থটি এক অনুবাদ গল্প সংকলন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনা থেকে এগুলি অনূদিত ও সংকলিত, সোভিয়েট যুগের রুশ সংস্কৃতির এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই গল্পগুলির মাধ্যমে। সোভিয়েট জন-সাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই উভয়বিধ অবস্থারই ধারণা পাওয়া যায় গল্প ক'টি পড়লে। প্রাগুক্ত গল্পগুলির কয়েকটি বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য, উদাহরণ স্বরূপ 'মানুষের জন্ম' শীর্ষক গল্পটির নাম করা যেতে পারে, বর্তমান রুশীয় সমাজে বিজ্ঞানের যে কতটা অগ্রগমন ঘটেছে, এই গল্পটিতে তার ছাপ রয়েছে। বর্তমান সংকলনের অধিকাংশ রচনাই একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণের পরিচয়বাহী, আর সেইজন্যই পাঠকের মনে এরা একটা অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। অনুবাদিকার ভাব সহজ, ভঙ্গী সাবলীল, পাঠক সহজেই বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শ করতে সক্ষম হন। বইটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। অনুবাদিকা—ইলা মিত্র, প্রকাশনায়—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—পাঁচ টাকা।

ললিতা

সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'নীলকণ্ঠ' নামটি সুপরিচিত। তাঁর আধুনিকতম এই রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য: সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক পারিপাট্য ও লিখন চাতুর্যে কাহিনীটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, রহস্য রোমাঞ্চ জাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত না হয়েও এটি প্রায় সেই ধরণেরই সোৎসুক প্রত্যাশাসঞ্চারী। কাহিনী বয়নে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন লেখক, বিশেষত: বেনামী চিঠির লেখক কে কেন্দ্র করে যে রহস্যের কুহেলিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়, শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল প্রায় অব্যাহত থাকে। লেখকের ভাষারীতি আকর্ষণীয়, ভঙ্গী সাবলীল। বইটির ছাপা বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—নীলকণ্ঠ। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কুড়ানিয়া (দেশজ)—বৃক্ষবি, কুড়কবালী। ইহার আকৃতি অনেকটা আমরুলের মত, তবে পাতাগুলি ছোট।

কুণ—অশ্বত্থ বৃক্ষ।

কুণজ্জ—বনবেতো শাক।

কুণি—তুঁদ গাছ।

কুণ্ডপায়—সোমলতা।

কুণ্ডল—রক্তকাঞ্চন গাছ।

কুণ্ডলিনী—১ গুলঞ্চ, ২ আলকুশী, ৩ কাঞ্চন গাছ, ৪ সর্পিনী গাছ।

কুতৃণ—পানা।

কুৎসলা—নীলগাছ।

কুথ—কুশ।

কুদাল—পর্বতীয় বৃক্ষবি°, bauhinia variegata.

কুদানিয়া—hedysarum triflorum.

কুত্নমবেত (দেশজ)—এক জাতীয় বেতগাছ, calamus polygamus.

কুদ্দল—পর্বতীয় বৃক্ষবি°।

কুদ্দার, কুদ্দাল—কাঞ্চন গাছ।

কুধান্য—কয়েক প্রকার ধান্যবি°—কোরদূষক, শ্যামাক, নীবার, শান্তনু, তুবরক, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধূলিকা, নান্দীমুখ, কুরুবিন্দ, গবেধুক, বরুক, উদপনী, মুকুন্দক, বেণুযব।

কুনট—[হি° শনহুলী] সোনা গাছ, বানশালুই। আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়।

কুনটী—ধনিয়া।

কুনলী—বকবৃক্ষ।

কুনাশক—আলকুশী।

কুনীলী—তৈরিণী গাছ।

কুন্ত—গবেধুক, গড়বাড়ে ধান, coix barbata.

কুন্তল—যব।

কুন্তলবর্ধন—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ।

কুন্দ—১ কুন্দপুষ্প বৃক্ষ, jasmimum multiflorum. ২ করবীর গাছ, ৩ পদ্ম।

কুন্দক—কন্দুরু বৃক্ষ, boswellia thurifera.

কুন্দল—nymphæa cyanea.

কুন্দুরুক—কুন্দুরু বৃক্ষ।

কুন্দুরুকী—কুঁদরুকী গাছ, boswellia thurifera. পর্যায়—বিশ্বী, রতাফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডিকেরা, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমা, ফলা, পীলুপর্ণী।

কুলুরুমী—pistacia lentiscus.

কুপীলু—কারস্কার বৃক্ষ, তিন্দুক বিশেষ। ঝাঁকড়া কেঁদু। ইহার ফলের নাম কুঁচিলা।

কুব্জক—পুষ্পবৃক্ষবি°, trapa bispinosa. পর্যায়—ভদ্রতরুণী, বৃত্তপুষ্প, অতিকেশর, মহাসহ, কণ্টকাঢ্য, খর্ব, অলিকুল, সঙ্কুল, বারিকণ্টক।

কুব্জকণ্টক—শ্বেত-খদির। পর্যায়—শ্বেতসার, বাদর, সোমবল্কল।

কুমড়া—[স° কুষ্মাণ্ড, হি° কদ্দু, কদীমা, লৌকী, কোহড়া, কুম্ভরা, পেঠা, ম° ভোঁপলা, কোহড়া, উ° কখারু, পাণিকখারু, ও° ভরুং কোলু°] পলকুমড়া, দেশী কুমড়া benincasa cerifera, cucurbita hispida, c. alba. প্রকারভেদ—(১) দেশী কুমড়া [স° শ্বেতকুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল] ছাঁচি কুমড়া বা চালকুমড়া—প্রতানীলতা বিশেষ। ফুল পীতবর্ণ, ফল শাদা, গোলাকার লম্বা, (২) বিলাতী কুমড়া [স° পীত কুষ্মাণ্ড, কোচবিহারে ঘিয়কুমড়া] গুড়কুমড়া, মিঠা কুমড়া cucurbita maxima. (৩) ভুঁইকুমড়া—[স° ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিদারী, ক্ষীরবিদারী, হি° বিলাইখন্দ, উ: ভুই কখারু] কলম্বাদিবর্গের বৃহৎলতাবি°, ipomoea paniculata. মাটিতে মূল খুব মোটা হয়। পাতা অঙ্গুলাকার, ফুল আনীল রক্ত, ডাঁটা মসৃণ, বীজ কোণে-কোণে লোমশ।

কুমার, কুমারক—বরুণবৃক্ষ, capparis trifoliata.

কুমারিকা—কুমারী দ্র°।

কুমারী—[স° কুমারীলতা, কুমারিকা, উ° কুম্ভাটুয়া] রজনীগন্ধাদিবর্গের প্রতানীলতাবি°, smilax macrophylla, aloe indica, কণ্টকপূর্ণ, ফুল ছোট, ২ ঘৃতকুমারী, ৩ নবমল্লিকা, ৪ বড় এলাইচ, ৫ মেদিনীপুষ্প, ৬ তরুণীপুষ্প।

কুমারীপুত্র—পুত্রজীব, জীয়াপুঁতা (?)।

কুমুদ—[স° শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল] শালুক ফুল nymphea lotus. বড় শালুক n. pubescens, রক্তোৎপল n. esculenta. হেলা, শুঁদি। পর্যায়—কৈরব, চন্দ্রকান্ত, গর্দভ, কুমুৎ, ধবলোৎপল, কহ্লার, শীতলক, শশিকান্ত, ইন্দুকমল, চন্দ্রিকাম্বুজ, গন্ধসোম, শ্বেতকুবলয়।

কুমুদন্নী—বৃক্ষবি°, ইহার রস দুগ্ধের ন্যায় শাদা, বিষাক্ত।

কুমুদবীজ—সিতোৎপলবীজ, শুঁদিনালের বীজ। নিরম্বু উপবাসে অসমর্থ হইলে ইহা (রবিশস্য-জাত নহে বলিয়া) অনেকে খাইয়া থাকে।

কুমুদা—১ কুম্ভিকা, পানা, ২ গম্ভারী বৃক্ষ, ৩ শালপর্ণী বৃক্ষ, ৪ ধাতকী বৃক্ষ, ৫ কটফল।

কুমুদাদি—কুমুদ, শর্করা, ন্যগ্রোধ, সঙ্কট, কঙ্কট, গর্ত, বীজ পরিবাপ, নির্যাস, শকট, কচ, মধু, শিরীষ, অশ্ব, অশ্বত্থ, বল্বজ যবাষ, কূপ বিকঙ্কট ও দশগ্রাম।

কুমুদিকা—কট্ফল। পর্যায়—কটফল, সোমবল্ক, কৈটর্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রা, ভদ্রবতী।

কুমুদিনী—menyanthes cristata.

কুমুদ্বতী—১ পদ্মের বৃন্ত, ২ বৃক্ষবি° (ফল বিষাক্ত) villarsia indica.

কুম্বিয়া—বৃক্ষবি°।

কুম্ভ—ত্রিবৃৎ বৃক্ষ।

কুম্ভকারিকা—কুলত্থ বৃক্ষ।

কুম্ভজ—দ্রোণপুষ্পী।

কুম্ভতুম্বী—গোল লাউ, অলাবু দ্র°। পর্যায়—কুম্ভালাবু, গোরক্ষতুম্বী, গোরক্ষী, নাগালাবু, ঘটাভিধা, ঘটালাবু।

কুম্ভদাসী—পানা।

কুম্ভযোনি, কুম্ভযোনিকা—দ্রোণপুষ্পী বৃক্ষ।

কুম্ভলা—মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ।

কুম্ভবীজক—করঞ্জ বৃক্ষ, নাটা করঞ্জ।

কুম্ভাণ্ড, কুম্ভাণ্ডক—কুমড়া।

কুম্ভালাবু—গোল লাউ।

কুম্ভিকা—১ কচ্ছদেশীয় দাড়িম্ব, ২ পারুল গাছ, ৩ দ্রোণপুষ্পী, ৪ পানা। পর্যায়—বারিপর্ণী, শ্বেতপর্ণা, অশ্বকুম্ভী, পানীয়, পৃষ্ঠজ, আকাশমূলী, কুতৃণ, জলবল্কল, কুম্ভী, বারিমূলী, খমূলিকা, পর্ণী, পৃশ্নী, খমূলি, বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢ্যক।

কুম্ভিনী—১ মৃগেবারুবৃক্ষ, রাখাল শশা, ২ জয়পালবৃক্ষ, croton jamolgata.

কুম্ভী—[স° কুম্ভী, পর্পটদ্রুম] জম্বুকাদিবর্গের বৃহৎ তরুবিশেষ, careya arborea. উড়িষ্যা ও অন্য প্রদেশে অরণ্যে জন্মায়। বসন্তকালে সমস্ত পাতা ঝরিয়া নূতন পাতা জন্মায় ও ফুল ধরে। ফুল বড় বড় সাদা। ফল কলসীর আকার। ছাল খুব শক্ত। কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহার ছাল পরিতেন।

কুম্ভীক—১ পুন্নাগ বৃক্ষ, ২ পানা।

কুম্ভোদ্ভব তরু—বকপুষ্প বৃক্ষ।

কুরকা—শল্লকী বৃক্ষ boswellia thurifera.

কুরঙ্গিকা—মুদ্গপর্ণী।

কুরণ্ট, কুরণ্টক—পীতাম্লান বৃক্ষ, পীতঝাঁটি। পর্যায়—সৈরেয়ক, সৈরেয়, শ্বেতপুষ্প, কুরণ্টিকা, কটসারিকা, সহাচর, সহচর।

কুরণ্ড—সাকুরণ্ড বৃক্ষ।

কুরণ্ডক—নীলঝাঁটি।

কুরব—১ শ্বেত মান্দার, ২ লাল ঝাঁটি গাছ, ৩ পীতঝিণ্টি, ৪ তিলকগাছ (?)।

কুরবক, কুরুবক—১ রক্তঝিণ্টি, ২ কুরচি, ৩ কুরুবক পুষ্প।

কুরী—তৃণধান্য ভেদ।

কুরুকন্দক—মূলা।

কুরুট—সিতাবর শাক।

কুরুণ্ট—পীতঝাঁটি গাছ।

কুরুণ্টিকা—হস্তিনী বৃক্ষ, হাতী শুঁড়।

কুরুম—কুলপালক, কমলালেবু

কুরুম্বা, কুরুম্বিকা—[হি° গূমা] দ্রোণপুষ্পী।

কুরুম্বী—সৈংহলী বৃক্ষ।

কুরুবিন্দ—১ মুথা, ২ মাষকলাই, ৩ হিঙ্গুল, ৪ কুল্মাষ শস্য।

কুরুবিন্দক—কুধান্য বিশেষ।

কুরুবিল্লক—কুল্মাষ।

কুর্ণঞ্জ—কুলঞ্জন বৃক্ষ।

কুল—[স° বদর, বদরী, হি° বের, বৈর, ম° বোর, গু° মোটী বোরডী, ক° বেরণ্, তৈ° রেগু, উ° কুড়ি] কুল, বরুই zizyphus jujuba. অতি পরিচিত। কাণ্ড রেখা বন্ধুর। পাতা গোল, নিম্নপৃষ্ঠ লোমশ। বীজের শস্য বাদামের মত। চৈত্র মাসে গাছের ডাল কাটিয়া দিলে প্রচুর ফল জন্মায়। শীতকালে ফল হয়। অম্লমধুর। প্রকার ভেদ—(১) নারিকেল কুল, কুলের চেয়ে বড়, স্বাদ সুমিষ্ট। নারিকেলের মত আকার বলিয়া নাম। (২) বোম্বাই কুল—কুলের চেয়ে একটু বড়। অম্ল কম। (৩) সেয়াকুল—বহুকণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ। ফল অতি ক্ষুদ্র। কুলের মত ইহার ফলও শীতকালে হয়।

কুলক—১ গাবগাছ, ২ মউয়া ফুলের গাছ, ৩ কুপীলু, ৪ পটোল, ৫ পটোল-লতা।

কুলজ—পটোল।

কুলঞ্জ—গন্ধমূল বৃক্ষ, কুলঞ্জন।

কুলতি—কুলত্থ দ্র°।

কুলত্থ—[স° তাম্রবীজ, সিতেতর, কুলত্থিকা; হি° কুলথি, তা° কোল্লু, তে° ওয়ালাওয়ালে] কুলত্থ বা কুর্তিকলায়, কুলুথ dolichos bilflorus. ত্রিপত্র ক্ষুপবি°। শাখাপত্র রক্ত লোমান্বিত। ফুল ছোট হরিদ্রাবর্ণ, প্রত্যেক শিম্বীতে কলায় থাকে। ডাঙ্গা জমিতে জন্মায়। পৌষমাসে পাকে। প্রকার ভেদ ঠাকুরি কলায়। d. pilosus.

কুলত্থা—বনকুলত্থী। পর্যায়—দৃক প্রসাদা, অরণ্যকুলত্থিকা, লোচনচিতা, চক্ষুষ্যা, কুম্ভকারিকা, কুলত্থিকা, কুলালী প্রলাপহা।

কুলদ্রুম—১০ প্রকার। শ্লেষ্মাতক, করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, নিম্ব, বট, উড়ুম্বর, ধাত্রী, তেঁতুল।

কুলপত্র—দমনক বৃক্ষ, যাহাকে দোনা বলে।

কুলপালক—করুম, কমলালেবু।

কুলপি (দেশজ)—১ বৃক্ষবিশেষ, ২ আক গাছ।

কুলপুত্র, কুলপুত্রক—দমনক বৃক্ষ। [ক্রমশ।

নাচ গান বাজনা

সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল

আগামী ২ শে জুলাই কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবার্ষিকী দিবস। কলিকাতায় বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত দ্বিজেন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটী এই দিন থেকে শুরু করে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। এই আয়োজনকে সবাই অভিনন্দন জানাবে—সন্দেহ নেই। কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাটক আর কবিতায় নয়, তাঁর উদাত্ত সঙ্গীতের মধ্যেও বেঁচে থাকবেন চিরদিন।

তখন ইংরেজ আমল। সেই বিদেশী-শাসনের অক্টোপাশে ভারতবর্ষ জর্জরিত। এমনই এক শাসকের অধীনে কর্মরত এক বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের রচিত নাটকে যেদিন চারণ গেয়ে উঠল,—

'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—
আবার তোরা মানুষ হ' ?'

সেদিন অনেকেই চমকে উঠেছিল! সরকারী কর্মচারী হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। উচ্চশিক্ষার্থে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য সমাজ তাঁকে একঘরে ক'রে দেয়। কিন্তু তাতে তাঁর দেশপ্রেমের খাতে কিছু ঘাটতি পড়েনি। পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় পরিচিতি; তার প্রকাশ রয়েছে তাঁর স্বদেশী গানে যা বাংলা গানকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। কোমলতা ও বলিষ্ঠতার মিশ্রণে তাঁর স্বদেশী গান। দ্বিজেন্দ্রলালের 'স্বদেশ সঙ্গীত' সাধারণ জনচেতনার অসন্তোষের ঊর্ধ্বে একটি স্থির নিষ্ঠার অচঞ্চল ধ্রুবতারার মত বিরাজমান। তাঁর মাতৃভক্তির বন্দনা প্রথাসিদ্ধ পুরাণ কথিত হলেও ধ্যান-গম্ভীর মন্ত্র গুঞ্জরণের মত,'—[অধ্যাপক অরুণকুমার বসু]। দ্বিজেন্দ্রলাল গান রচনা করেছেন সংগঠনের আদর্শে—সচেতন শিল্পীরূপে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্য্যগাথার' অন্তর্গত 'আর্যবীণা' গ্রন্থে প্রায় ৩৮টি স্বদেশী গান আছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রকাশিত তাঁর Lyrics of India গ্রন্থে পরবর্তী জীবনের স্বদেশী সঙ্গীতের অগস্ত পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'The land of the sun'—এই লুপ্তপ্রায় গানটির মাঝে আমাদের অতি পরিচিত একটি গানের বীজ নিহিত ছিল। সেটি হচ্ছে :—

'ধন ধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,' এক সময় বাংলার বুকে উত্তেজনার জোয়ার বইয়ে দিয়ে তিনি গেয়েছিলেন,

'বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার আমার দেশ।'

দ্বিজেন্দ্রগীতি হ'ল সমবেত সঙ্গীত। তাঁর স্বদেশী গানে সজীবতা বা কর্মজীবনে অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। তাঁর ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক নাটকে যে সব স্বদেশী গান আছে সেগুলি এক সময় লোকের মুখে মুখে ফিরতো।

স্বদেশী গান ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁর 'কাব্য সঙ্গীতে'। 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে আসে', 'যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' প্রভৃতি গান কাব্য হিসাবে অপূর্ব।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভক্তিগীতিগুলি যেন এক একটি হৃদয়ের ফুল। তাদের মাঝে আছে পবিত্র আনন্দ—আছে সব কিছুর মাঝে সেই চিরসুন্দরকে অনুভবে পাওয়ার প্রত্যাশা। তাই কবি গেয়েছেন :—

'আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে
বাজো মৃদঙ্গ গম্ভীর ছন্দে
পাল তুলে দাও ভেসে যাক শুধ
সাগরে জীবন তরণী
উজসি উছলি উঠুক নৃত্য
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্যে
স্বর্গে উঠুক ধরণী।'

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রেমসঙ্গীতে, প্রেমসঙ্গীতের ভাষাও যে কত মার্জিত এবং সুন্দর হতে পারে তা আমরা এই গানটি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবো—

'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে।
আমার ত যত অন্তর ব্যথা
সযতনে তুমি নাশিবে।
রবিশশীতারা সুনীল আকাশ
সকলি দিয়াছে তোমারি আভাস।
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ
তুমি এসে ভালোবাসিবে।'

সঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি বিশেষ দিক হল তাঁর 'হাসির গান'। হাস্যরসস্রষ্টা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর হাসির গান অতুলনীয়, 'অবশ্য এদের মধ্যে নেই শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত উদার রসিকতা বা অন্তরের সহজ আনন্দে খেলা, প্রাচুর্যের ঐশ্বর্যে ঝলমল, সেক্সপীয়রের হাসির মত যা 'broad as ten thousand beeves at pasture' থাকার কথাও নয়, যেহেতু এদের আকার এবং প্রকার দুই-ই ভিন্ন।' [বিনায়ক সান্যাল]। এই ভিন্নতার কারণ হল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং দেশাচার, এই গানগুলির লক্ষ্য হ'ল আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তোলা—সুখোন্মত্ত, আত্মবিস্মৃত জাতিকে জীবনকাঠির স্পর্শে বাঁচিয়ে তোলা—অনুকরণলোলুপ, অন্ধ সমাজকে দেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী করে তোলা। পেশাদার বিদূষকের মত ভাঁড়ামি এ নয়, চপল হাসির তরল উচ্ছাসও নয়—বেদনার গভীরতম অনুভূতির উৎসমুখে এরা নিয়েছে জন্ম। তাঁর 'বিলাত ফের্তা', 'Reformed Hindoos', 'নন্দলাল', 'জিজিয়া কর', 'পাঁচটি এয়ার', 'তা সে হবে কেন', 'বদলে গেল মতটা', 'হিন্দু হতে পারতাম' প্রভৃতি গান ও কবিতা সেদিনের মেরুদণ্ডহীন সমাজে চাবুকের আঘাতের মত কাজ করেছিল, সেদিনের দায়িত্বহীন অন্ধ আত্মপ্রসাদের সর্বনাশা রূপ দেখে বেদনাজর্জরিত কবি হৃদয়ের বিস্ময়—

'হোল কি এ হোল কি, এ তো ভারি আশ্চর্য্যি
বিলেত ফের্তা টানছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছেন ভশ্চায্যি।
* * *
জহরচন্দ্র গোকুল মাইতি বাড়ছে লম্বা চওড়াতে
বিদ্যারত্ন দরকার শুধু বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।'

যে যুগে দ্বিজেন্দ্র গীতির শুরু সে যুগে বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নব যুগের সূচনা সবে দেখা দিয়েছে। সঙ্গীতে অভিনবত্বের ছোঁয়াচ থাকলেও চিরাচরিত নীতি ছিল বজ্রকঠিন। তা লঙ্ঘন করা খুবই কঠিন ছিল। আর ঠিক এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সনাতনপন্থীদের অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। আধুনিক বাংলা গানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রীতিনীতি নির্বিচারে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মত সহজ ও নিপুণভাবে ইউরোপীয় সঙ্গীতের মিশ্রণের দ্বারা, সুর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে খুব অল্প লোকই পেরেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ তেমন ধারালো হ'য়ে উঠতে পারেনি। পাশ্চাত্য সঙ্গীত অনুশীলন করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে এবং অর্জন করেছিলেন প্রকৃত শিল্পীর দক্ষতা। তাই তো ইউরোপীয় সঙ্গীতের ভঙ্গি ও সুরকে বাংলা গানে সার্থক ভাবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। তিনি কিছু পাশ্চাত্য সঙ্গীত অনুবাদও করেছিলেন। সে যুগে সকলে বিদ্রূপ করলেও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এ ব্যাপারে তিনি পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ সমর্থন—'দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দু সংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিন্দু সংগীত ব'লে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দু সংগীতের ভয় নেই, বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে।' (রবীন্দ্রনাথঠাকুর)

—উৎপলা মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)

রয়্যাল অপেরা হাউস

শ্রীকাঞ্চন চক্রবর্তী

কভেণ্ট গার্ডেন লণ্ডনের এমন একটা জায়গা যে, যে কোন ইংরেজকে জিজ্ঞেস করলেই সে সংগে সংগে বলবে খুব জানি। ঐ যেখানে অনেক কাল থেকে ফলফুলের বাজারটা বসে তার কথা বলছ তো। কিন্তু তোমরা বিদেশীরা জানো না বোধ হয় কভেণ্ট গার্ডেন আমাদের কাছে এত পরিচিত তার রয়্যাল অপেরা হাউসের দৌলতে।

আমাদের বাঙালীদের কেমন ধারণা থাকে যে অপেরা, যাত্রা বা পালাগানেরই এদেশী দোসর হবে। চিৎপুর অপেরা পার্টি কিংবা নিউ সত্যভামা অপেরা কোম্পানী ইত্যাদি এমন সব নামই বোধ হয় এই ধারণার জন্যে দায়ী, অর্থাৎ আদতে যেন লৌকিক ছাপটাই থাকবে বেশী।

মনে মনে ছবি ছিল, হয়তো রোমান এ্যাম্পি থিয়েটারের মত মধ্যে থাকবে আসর আর চারপাশে আসন। যাত্রার মত খোলা চণ্ডীমণ্ডপ অবশ্য আশা করিনি। শীতের দেশে এসে ওটুকু জ্ঞানগম্যি ইতিমধ্যেই হয়েছে। গরমের দিনে মুক্ত অংগনে অভিনয়ের নজীর এদেশে নেই তা নয়, তবে তা' নিশ্চয়ই অপেরা নয়।

কিন্তু সত্যি বলতে কি অপেরা হাউসে ঢুকে ভারি বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। এক নজরেই দেখে নিলাম মঞ্চ, পর্দা, আলোর ঝাড়, দেওয়ালের কারুকাজ আর থাকে থাকে সাততলা পর্যন্ত বসবার আসন একেবারে ভর্তি, ফাঁক নেই কোথাও।

অভিনয় দেখার পর কিন্তু ধারণা পালটাতে হল। যা দেখলাম তাকে জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলবো।

পালাগানের মতই বটে, গানে-গানেই কথা-বার্তা। কিন্তু কথা তো নয়, কেতাবী বাংলায় বলতে হয় সংগীত-নির্ঝর। বুঝলাম মানুষের মনের গভীরকে স্পর্শ করার সন্ধানটা সব দেশের তাবৎ সুরকারেরই জানা আছে।

তাই অপেরার নট-নটীরা শুধু অভিনয় নয়, সংগীতেও সর্বস্তর-পারংগম। এই দুটো গুণের সমন্বয় দুর্লভ বলেই তাঁদের সংখ্যাও একেবারেই অল্প। অথচ তাঁদের সম্মান সবজাতের শিল্পীর চেয়ে বেশী। তাই এদেশে অগুণতি থিয়েটার থাকলেও অপেরার সংখ্যা মাত্র দুটো।

এদের মধ্যে একটি সংস্থা দলবল নিয়ে সার্কাস পার্টির মত দেশের সর্বত্র অভিনয় দেখিয়ে বেড়ায়। যাত্রা কোম্পানীরা বোধ হয় এই ভ্রাম্যমাণ বৃত্তির দিক থেকেই 'অপেরা' কথাটাকে চালু করেছে আমাদের দেশে।

যাই হোক, এদেশে অপেরা বলতে লোকে কিন্তু এক ডাকে 'Royal Opera House'-এর কথাই বোঝে। সারা বছর ধরেই এখানে হয় অপেরা নয় ব্যালের প্রদর্শনী চালু থাকে। ব্যালে হল ইউরোপের উচ্চাংগ নৃত্যনাট্য। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে আমরা এরই ভারতীয় রূপটি দেখেছি।

ইউরোপে অপেরা ও ব্যালের এই মিতালি কিন্তু বেশী দিনের নয়। তা'হলেও লোকে এখন অপেরা অভিনয় ও ব্যালে নাচকে আলাদা করে দেখে না, দু'য়ে মিলেই অপেরা প্রতিষ্ঠান।

রয়্যাল অপেরা হাউসের এই ঐতিহ্য কিন্তু আজকের নয়। এখনকার এই প্রদর্শনীকক্ষের পত্তন হয়েছিল ১৮৫৮ সালে। এই একই চত্বরে আরও দুটো থিয়েটার বাড়ীর ইতিহাস ছিল প্রায় আড়াইশো বছর আগে থেকেই। এ দেশের অনেক নামকরা বাড়ীর ভাগ্যে যা ঘটে থাকে তেমনি ও দুটোও অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

১৮৪৭ সালে রয়্যাল ইটালীয়ান অপেরা এদেশে অপেরার স্থায়ী অনুষ্ঠান শুরু করে। তারপর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ অপেরার দল কোন না কোন সময় এসে এদেশের রসিক মনকে তৃপ্ত করে গেছে। সেই সব নটনটী, ব্যালেরিনা আর সংগীত ও নৃত্য পরিচালকদের নিয়ে নানান মজার গল্প আজও লোকে মমতার সংগে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে। শুনলে উপন্যাসের মত মনে হয়।

কিন্তু এই সাবেকী বাড়ীটার কথা ভাবতে কেন জানি না আরও ভাল লাগে। ও কত পরিবর্তন-বিবর্তনেরই না সাক্ষী হয়ে আছে।

এ্যামেরিকার একটি ব্যালে নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র শিক্ষার্থীরা গভীর অনুশীলনে রত।

মনে করুন না সেই সেকালে 'সিডান চেয়ারে' করে পৌঁছলেন বড়ঘরের বৌ-ঝিরা। একহাতে তুলে ধরেছেন, তাহলেও ঘাগরা লুটোচ্ছে মাটিতে। অন্য হাতে ভাঁজখোলা পাখা বক্ষদেশের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

কেউ এলেন জুড়ীগাড়ী হাঁকিয়ে হয়তো কোন দূর দূরান্ত থেকে! ঘোড়ার মুখে তখনো হয়তো ফেনা।

সে যুগ চলে গিয়ে এসেছে দু'চাকার 'hansom cab' এর আমল। তারও পট পরিবর্তন হয়েছে। আজকের যুগল দর্শক পৌঁছচ্ছেন মোটরে—ট্যাক্সিতে।

আদ্যিকালের আসরকে আলো করতো গ্যাসের রোশনাই। তারও আগে ছিল ঝাড়লণ্ঠন। আর আজ? ইলেকট্রিক আর ইলেকট্রনিক।

কত দুর্ভাবনাই না ছিল সেদিনকার অধিকারীর! গানের দল হয়তো রয়েছে মঞ্চের পেছনে, বাজনদারদের দল সামনে। দু'দলকে একই সংগে নির্দেশ দিতে হলে, সমস্যা কি কম!

পরম্পরা রাখার জন্যে সেদিনের 'call boy'কে সদাই তটস্থ থাকতে হয়েছে। মাস করিয়ে দিয়েছে কা'র কখন আসবে আসার পালা।

আর এখন? গানবাজনার দল অধিকারীর সামনেই থাকুক আর আড়ালেই থাকুক যায় আসে না কিছু। টেলিভিসানের দৌলতে তাঁর নির্দেশ যথাস্থানে পৌঁছে যাচ্ছে। মাইক্রোফোন সাজঘরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে মঞ্চে কখন কি ঘটছে। কা'কে কখন প্রবেশ করতে হবে—তাই নিয়ে আজ আর কোন গোল হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এককালে অপেরায় যাওয়া বড়ঘরের একটা ফ্যাসান ছিল। সেদিন সাজ্জা-সাজ না পরলে প্রবেশের সামাজিক অনুমতি ছিল না।

কিন্তু আজকের অপেরা সর্বস্তরের মানুষের সন্তুষ্টি বিধান করে। সান্ধ্যবেলার সাজের জিনিস আর নেই। গণতন্ত্রই করে দিয়েছে সকলের সমান আসন। বন্ধ নিয়েছে নিঃশব্দ বিদায়।

জগতের তাবৎ সমস্ত শিল্পের মত 'রয়্যাল' হলেও অপেরা হাউসকেও কখনো কখনো অবমাননার হাতে পড়তে হয়েছে। এ শতকের দু'টো মহাযুদ্ধের কথাই ধরা যাক না। ভাবলে দুঃখ লাগে প্রথম মহাযুদ্ধ গোটা বাড়ীটাকে 'খাট-পালং'-এর আড়ৎ করে ফেলা হয়। আর দ্বিতীয় যুদ্ধে এটা হল নাচকক্ষ, উদ্দেশ্য: আমেরিকার সেনাবাহিনীর মনোরঞ্জন করা। বুঝতেই পারছেন শিল্পের কি আকালটাই গেছে তখন! কোথায় অপেরা আর ব্যালে—কোথায় রইল সেই নটনটী আর সুরকার।

যুদ্ধের ডামাডোল চুকলে অপেরা হাউসে আবার সহজ জীবন সুরু হল এবং রয়্যাল অপেরার আজকের এই জনপ্রিয়তা যুদ্ধোত্তরকালেরই ঘটনা। এর আগে বিদেশ থেকে শিল্পীদের আনাগোনার ওপরই এখানকার অনুষ্ঠান নির্ভর করতো। কিন্তু এখন অপেরা ও ব্যালের দুটো স্থায়ী ইংরেজ দল সারা বছর ধরে এখানকার অনুষ্ঠান চালু রেখেছে। বিদেশী শিল্পীরা এখন শুধু নিছক অতিথি হয়ে আসেন মাত্র।

এদেশের লোকের আজ এই গর্ব যে, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানীর মত আজ তাঁদেরও নিজস্ব জাতীয় অপেরা আছে। ইংরেজ ব্যালের দলও কম কিছু নয়।

রয়্যাল অপেরা হাউস এই তো সেদিন জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার নতুন অধ্যায় সুরু করেছে। কিন্তু আজ এখানে যতসংখ্যক প্রদর্শনী হয়, অপেরার দেশ ইতালীও সেই সংখ্যার কাছে হার মানে। ব্যালের দেশ একমাত্র রাশিয়াকে বাদ দিলে আর কোন ইউরোপীয় মঞ্চই রয়্যাল অপেরার সংগে পাল্লা দিতে পারে না।

শুধু তাই নয় এখানকার তিন হাজার আসন প্রতিদিনই প্রায় ভর্তি থাকে। নামকরা কোন দলের অভিনয় থাকলে তো কথাই নেই। মাসখানেক আগে থেকে টিকিট না করে রাখলে প্রদর্শনী দেখার কোন আশাই নেই। এই তো ধরুন না জুলাই মাসে এখানে রাশিয়ার 'বলশোয়' অপেরা দল আসছে। মাসখানেক আগেই বুকিং সুরু হয়েছে। টিকিট পাওয়ার আশায় তিন দিন আগে থেকেই মেয়ে-পুরুষের লাইন পড়ে গিয়েছে। রাত্রিবাসও ওখানেই। তাহলেই বুঝুন! আমাদের দেশের টেষ্টম্যাচের টিকিট পাওয়ার লাইনের সংগে এখানকার তফাৎটা হল এই যে, ঠ্যালাঠেলি মারামারি এখানে নেই এবং কেউ বা ইজিচেয়ার, কেউ বা ইনক্লাইন চেয়ার পেতে আরামেই সময় হরণ করছেন। ফলাও করে এসব টেলিভিসানেও দেখানো হয়।

তবে রয়্যাল অপেরার এতখানি জনপ্রিয়তার আরও একটা কারণ হল এই যে এটি বিনা লাভজনক জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এদেশের শিল্প-সংরক্ষণ ও শিল্প প্রসারণ সংস্থা আর্ট কাউন্সিলের মোটা অংকের একটা বাৎসরিক বরাদ্দই আবার তা সম্ভব করেছে।

কাজেই এদেশের লোকের কাছে আর একবার যদি জিজ্ঞেস করা যায় যে, নাচগান থিয়েটারের মধ্যে সবচেয়ে কি ভালবাস তুমি? তাহলে একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই উত্তর দেবে—কেন? ব্যালে অপেরা!—"লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।"

আমার কথা (১০০)

শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়া

(প্রথম মহিলা সঙ্গীত পরিচালিকা)

সঙ্গীতের জগতে ২৬ বৎসর অতিক্রম করে যিনি প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন একদিন তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাতের মানসে হাজির হলাম তাঁর কাছে। যে প্রশ্নগুলি আমি তাঁর কাছে, তুলে ধরেছিলাম এক এক করে সেইগুলি উপস্থাপিত করছি। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল (১) চলচ্চিত্রে সঙ্গীত কি একান্তই অপরিহার্য? (২) সঙ্গীত পরিচালকই কি চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের স্থান কাল নির্ণয় করেন? (৩) আজকাল সঙ্গীতের মধ্যে পাশ্চাত্যের যে সুরের আভাস পাওয়া যায় তা একদিন আমাদের দেশীয় সুরের বিলুপ্তি ঘটাবে বলে অনেকের আশংকা, এ বিষয়ে আপনার মতামত কি? (৪) অতীত ও বর্তমান সঙ্গীত বা সুরের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? (৫) অতীতে আজকালকার মত এত যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তখনকার বহু গানই সঙ্গীতপিপাসু জনসাধারণ আজও মনে রাখে, অথচ বর্তমানে তা হয় না এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

এখানে বলে রাখি শ্রীমতী লাহিড়ী হচ্ছেন বাংলা দেশের চলচ্চিত্র জগতের প্রথম মহিলা সঙ্গীত পরিচালিকা তাই তাঁর কাছে এই প্রশ্নগুলি করেছিলাম।

উত্তরে যা তিনি বলেছিলেন: 'আপনার প্রশ্নের পরপর হয়ত উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না, তবে মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে চলচ্চিত্রে সঙ্গীত যে অপরিহার্য এ কথা আমি স্বীকার করি না। ধরুন না কেন 'পথের পাঁচালী'। কণ্ঠসংগীত না থাকলেও সুরসমৃদ্ধ চিত্রখানি বিশেষ করে দইওয়ালার পথ চলে যাওয়ার মুহূর্তে এবং দুর্গার মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার সময় এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টির মুহূর্তে যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল তা কোনদিন ভোলবার নয়। মনে হয় কণ্ঠসংগীত দিয়েও ওই রকম পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হত না। তবে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে চিত্রে সজীব করে তোলার জন্য মিউজিকের প্রয়োজন।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাই একটি চিত্রের যাবতীয় কিছু নির্ভর করে চিত্র পরিচালকের উপর, ছবিতে সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে কি না এবং থাকলে তার স্থান কাল পাত্র সব কিছুর নির্ণয় করেন পরিচালক এবং সঙ্গীত পরিচালক সুর ও গানের দিকটা লক্ষ্য করে থাকেন।

আজকালকার সুরে পাশ্চাত্যের প্রভাব এসেছে বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা অভ্রান্ত হয়ত হতে পারেন কিন্তু সে প্রভাব আজ নয় বহুদিন আগেই এসেছে এবং গুরুদেবের অনেক গানেও তা পাওয়া যায়। আসলে যেখানকার যা ভাল তাই নিয়ে যদি আমাদের সুরের ভাঁড়ার পূর্ণ করতে পারি দোষ কি?

অতীত ও বর্তমানের সমালোচনা করে সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কথাটা বললেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই কারণ আগেকার বহু সঙ্গীত যেমন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তেমনি ইদানীংকালের বহু গানই জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে। আসলে, শ্রীমতী লাহিড়ী বললেন, সঙ্গীতের উৎকর্ষ বৃদ্ধিলাভ করে পরিচালকের দক্ষতা ও রুচিসম্মত জ্ঞানের উপর। সঙ্গীত একটি চিত্রে কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করল সেইটাই বড় জিনিষ নয় আসলে সঙ্গীত সেই চিত্রের কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করতে কতটা সহায়তা করল সেইটাই বড় জিনিষ।

শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়ী

শ্রীমতী লাহিড়ীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন সিরাজগঞ্জ পাবনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডাঃ অন্নদাগোপাল চক্রবর্তীরও সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং তিনিও এইচ এম ভি এ শিল্পী তালিকাভুক্ত ছিলেন। প্রথমদিকে শ্রীমতী লাহিড়ী ক্লাসিকাল সঙ্গীতের চর্চা শুরু করেন। এবং পরে আধুনিক, ভজন ও অন্যান্য সঙ্গীত গাইতে থাকেন।

মাত্র সতের বৎসর বয়সে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি 'সুরভারতী' উপাধিপ্রাপ্ত হন। ১৯৪৬ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে তাঁর ডাক আসে এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কলকাতায় নয় ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের মারফৎ গান শুনিয়ে আসছেন। ১৯৪৭ সালেই তিনি মেগাফোন কোম্পানীতে যোগদান করেন এবং পরে কলম্বিয়া কোম্পানীতে তাঁর গান রেকর্ড হয়। বর্তমানে মেগাফোন কোম্পানীতে পুনরায় ফিরে এসেছেন। ১৯৪৮ সালে রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'পহেলা আদমী' ছবিতে ও অনুপম ঘটকের সুরে 'তুলসীদাস' ছবিতে কণ্ঠদান করেন। ঐ বৎসরেই তিনি প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী অপরেশ লাহিড়ীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীমতী লাহিড়ী আজ পর্যন্ত বহু ছবিতেই কণ্ঠদান করে এসেছেন। বর্তমানে তিনি শিক্ষয়িত্রী হিসাবে রবীন্দ্র-ভারতীর সঙ্গে যুক্ত আছেন। লোকসঙ্গীত নিয়েও তিনি নানারূপ গবেষণা করছেন তার নানারূপ উন্নতিবিধানের জন্য। শ্রীমতী লাহিড়ী স্বামী ও একমাত্র পুত্র খ্যাতনামা তবলাবাদক শ্রীমান বাপী লাহিড়ীকে নিয়ে তাঁর টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে এক হাতে সংসার ও অপর হাতে সঙ্গীতকে আঁকড়ে জীবনের সুমধুর দিনগুলি অতিবাহিত করছেন।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

কিংশুকরাগিণী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

চাকর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বীথি বিরক্ত হয়ে বললে—এখনই চা নিয়ে এলে? ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না।

কিংশুক তাড়াতাড়ি বললে—ঠাণ্ডা চা-ই ভাল। কোল্ড কয় কমক্লেকশন।

চাকর চলে গেল।

কিংশুক বললে—আচ্ছা ওকে কত মাইনে দাও?

না ওঠা অবধি চাকরকে ছাড়ছি না।

—আবার। না তোমার সঙ্গে আর কথা কইবো না।

সত্যিই বীথি চুপ করে গেল। চপ খাওয়া শেষ হয়ে গেল দেখে বীথি কেক-এর প্লেট এগিয়ে দিলে। কেকে কামড় দিয়ে কিংশুক মনে মনে বললে—এও তো কম ফ্যাসাদ নয়। চা ঢালবার দেখি নাম করে না। দরকার নেই চাকরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। বরং কথা চালু হোক, কথার পিঠে এক ফাঁকে চায়ের কথাটা তোলা যাবে। বীথি নিজে থেকেই চায়ের সরঞ্জামে হাত লাগাল। বাঁচা গেল পালা ভাঙতে আর দেরী হবে না।

—শুকদেব!—কাপ এগিয়ে দিয়ে বীথি বললে।

—হুঁ।

—আরও আগে এলে না কেন?—মদিরকণ্ঠে বীথি বললে।

—ভীষণ রোদ্দুর।—চারটের সময় যখন বেরোলুম মা বললেন, কোথায় যাচ্ছিস্ এই রোদ্দুরে?

—আঃ রোদ্দুরের কথা কে বলেছে।

—তবে?

—বলছি আমার কথা।

ঘুরে ফিরে সেই আমি। কোথায় চাকর আর কোথায় রোদ্দুর দুই-এরই শেষ হল কি না আমিতে। বীথি আবার বললে—আমি যে কতদিন ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—মহাবীর তো কালকেই বললে, তোকে মিস্ মণ্ডল চা-খেতে নেমন্তন্ন করেছে।—ও তো এর আগে বলেনি।

—ওর কথাতে বুঝি আসতে হবে?

—বাঃ নেমন্তন্ন না করলে আসি কি করে—।

বীথি বোধ হয় এই রকম কোন ঘটনা নাটক নভেলে পেয়েছে। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে—ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ, তুমি পুরুষ, ভীষণ, ভয়ানক উদাসী তোমাকে তো নেমন্তন্ন করেই আনতে হবে। তুমি কেন আসবে চোরের মত চুপি চুপি অন্ধকারে লুকিয়ে, আমারই ভুল আমারই অন্যায় হয়েছে। পুরুষ হয়েও কত ভাবে জানিয়েছ মনের ভাব, দেখা দিয়েছ নিত্য নতুন বেশে কলেজ যাতায়াতের পথে, জানিয়েছ রাগিণীকে—।

—রাগিণীকে! কি জানিয়েছি?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

—কি বলেছি মনে পড়ছে না তো। তখন—।

—হ্যাঁ, তনুও তাই বললে। বললে, শুকদেবদা তখন আবেগে কাঁপছে। তনু মাঝে মাঝে বেশ ভালো বাংলা বলে, আবেগ! আবেগই তো, আমি হলে বলতুম এক্সাইটেড্, খাপ খেত না, তনু বললে রাগিণী যখন শুনলো যে তোকে, মানে আমাকে তুমি—।

সর্বনাশ! রাগিণী দেখছি সবই তনুকাকে বলেছে আর তনুকাও সব কথা বীথিকে শুনিয়ে গেছে! ও মামা!! মহাবীর ঠিকই বলেছে জার্ম কেরিয়ার। না জার্ম কেরিয়ার নয় জার্ম পার্সোনি-ফাইড।

বীথি বলে চলেছে—মানে আমাকে তুমি—।

কিংশুক তাড়াতাড়ি বললে—না-না বিয়ের কথাটা ঠিক—।

—বিয়ে। রাগিণীকে তুমি বলেছ যে আমাকে বিয়ে···?—বাকী কথাটা শেষ না করে গালে হাত দিয়ে হাঁ করে কিংশুকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে—অথচ এই কথাটাই তনু ইচ্ছে করে আমাকে বলেনি।

—য়্যাঁ বলেনি! তবে কি বলেছে?

বীথি এবার কিংশুকের পা ঘেঁষে তার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের গালে রেখে বললে—তুমি আমাকে ট্রেণে তুলে দিতে গেছলে এইটে—।

—ট্রেণে তোলবার কথা তনুকা তোমায় বলেছে? অথচ আমি ভাবলুম বুঝি বিয়ের—কাঁদো কাঁদো স্বরে কিংশুক বিয়ের কথাটা উচ্চারণ করলো। ওর ইচ্ছে করতে লাগলো নিজের কান ধরে গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারে।

বীথি সান্ত্বনা দিয়ে বললে—দুঃখু করো না। ওরা ভারী হিংসুটে। ভারী ছোট ওদের মন। প্রেমের ওরা কি বুঝবে? তুমি কেঁদো না। নাই বা বললে তনু। এখন তো শুনলাম। তুমি তো বললে। তোমার কথা তোমার কাছ থেকেই প্রথম কানে এলো, এর বেশী আমি আর কি চাই।

—না-না আমি বলিনি।—মরিয়া হয়ে কিংশুক বললে।

—লাজুক ছেলে। এত লজ্জা! এখনও?

কিংশুকের চোখের সামনে কে যেন আকাশ-জোড়া রয়েল ব্লু-কালির বিরাট বিরাট জালা উপুড় করে দিলে। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কানের গোড়ায় কোটি কোটি ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে।

—কিংশুক।

সাড়া নেই। বীথি ভাবলে, সাড়া দেবেই বা কি করে। এত আনন্দের পর মানুষের সবকিছু অনুভূতি লোপ পেয়ে যায়। কেবলমাত্র মেয়েছেলে বলেই বীথির এখনও অনুভূতি লোপ পায় নি। এবার হাতটা আরও একটু জোরে গালের ওপর চেপে ধরে বীথি বললে—কিংশুক, কিংশুক। শোন—।

কাজ হল। হুঁ আর উঃ-র মাঝামাঝি একটা শব্দ কিংশুকের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

—কিংশুক। কিং—শুক।

—বল।—অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকার পর জ্ঞান ফিরে এলে গলার স্বর যেমন হয় তেমনি স্বর শোনা গেল।

—শুকদেব।

—অ্যাঁ।—এবার একটু জোরে। ক্রমেই সেন্স ফিরে আসছে।

—শুক।

—আমি এবার যাই।

—আর একটু বস।···শুক্, শুক্।

—কি?

—না না শুক নয় সুখ। শুধু সুখ, সুখ······।

গলাখাঁকারি শোনা গেল। দু'জনেই পেছনে তাকিয়ে দেখে দরজার গোড়ায় মহাবীর দাঁড়িয়ে। বন্ধুকে দেখতে পেয়ে কিংশুক যেন অকূলে কূল পেল।

চেঁচিয়ে উঠল—মহাবীর, তুই? আয়, আয়।

বীথি বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—চলে যেও না শুকদেবদা আমি আসছি। মহাবীরের দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনে চলে গেল।

কিংশুক মহাবীরের হাতটা জোরে চেপে ধরলো। মনে হল এই যেন ওর এ জগতে একমাত্র সম্বল।

মহাবীর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—ধরবার হাত অনেক আছে। এটার ওপর জোর ফলিয়ে লাভ কি?

—এত দেরী করলি।

—দেরী কোথায়, এখনও বোধহয় ছ'টা বাজেনি। এসেছি অবশ্য কিছু আগে। এনট্রান্সের ঠিক অপারচুনিটি পাই নি। যেখানে সেখানে ঢুকে তো সীন ম্যাসাকার করতে পারি না।

—কখন এসেছিস্?

—কোর্টে কেস্ উঠলে হলপ করে বলতে পারবো যে, ধর্মাবতার কায়দা মাফিক প্রপোজ করেছে কিনা শুনতে পাই নি কিন্তু বিয়ের কথাটা ঠিক শুনেছি—চলেই যেতুম কিন্তু ভাবলুম না, এসব ব্যাপারে সাক্ষী দরকার! কি জানি যদি এখনই শুভকর্মটা ঘটে, তাহলে ওরা সাক্ষী পাবে কোথায়? আড়ালেই থাকি সুযোগমত দেখা দেব। হাজার হোক বন্ধু লোক। তারপর দেখলুম তোর অষ্টোত্তর শতনাম শুরু হল। কিংশুক থেকে সুখে এসে যখন ঠেকেছে, তখন বুঝলুম এখন নামকরণই চলবে, তাই ঢুকে পড়লুম, ভাল করিনি? কারণ সুখের পরই সুখতলা আসে।

—চল্ পালাই।

—আবার আমাকে জড়াচ্ছ কেন, পালাতে হয় তুমি একলাই পালাও। আমার ঘাড়ে ব্লেম দিয়ে শেষে বলবে—কি করব বীথি মহাবীরটা হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল—তা হবে না। —চপ, কেক কি সব গিলে বসে আছ? নামগন্ধও নেই দেখছি।

প্রফেসার মণ্ডল ঘরে ঢুকলেন। বললেন—তারপর কিংশুক, তোমরা কতক্ষণ?

কিংশুক জবাব না দিয়ে হাসবার চেষ্টা করে ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে দিলে।

মহাবীর বললে—তা ঘণ্টাখানেকের ওপর।

—ডেইজি কোথায়? জর্জ···।

—সাব।—চাকর প্রবেশ করল।

—দিদিমণি কোথায়? বাপের গলার আওয়াজ পেয়ে বীথি ঘরে ঢুকে বললে—তুমি কখন এলে ড্যাডি।

—এই এলুম। তারপর এরা হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন? চা দাও।

হেসে বীথি বললে—দিয়েছি। চাকরকে বললে—জল চাপিয়ে খাবার নিয়ে এস।

চাকর চলে গেল।

—তুমি যে তাড়াতাড়ি চলে এলে?

প্রফেসার বললেন—মিটিং আজ হ'ল না।

জর্জ চপ কেক রেখে গেল।

বীথি বললে—নাও কিংশুকদা।

মহাবীর মনে মনে বললে—আমি? আমারই পয়সায় কেনা জিনিষ অন্যকে অফার করছে। অথচ আমাকে একটিবারও খেতে বলছে না।

—জান ড্যাডি কিংশুকদা বলছিল, বল না কিংশুকদা, এই ত ড্যাডি রয়েছে, লজ্জা করছে বুঝি?

কিংশুক কি জবাব দেবে বুঝতে পারলে না, কি বলছিলাম? সেই কথাটা তুলবে নাকি?

বীথি হেসে অভয় দিয়ে বললে—আচ্ছা, আমি বলছি। কিংশুকদা বলছিল ইংরাজীটা ভীষণ শক্ত ঠেকছে স্যারকেও বলতে পারছি না যদি—

—এতে লজ্জার কি আছে কিংশুক। তোমরা আমার ষ্টুডেন্ট, লাইক মাই সন্। ডেইজি কিছু বুঝতে না পারলে ষ্ট্রেট আমার কাছে চলে আসে। তোমরাও আসবে। তবে এ উইক-এ নয়, খাতাগুলো দু'চার দিনের মধ্যে শেষ করতেই হবে। কামিং উইক থেকে বিকেলের দিকে, এনি ডে।

বীথি কিংশুককে বললে—নাও হল তো। এবার লজ্জা ভেঙ্গেছে।

কিংশুক মহাবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে মহাবীরের ঘাড়ের ওপর মুণ্ডু নেই তার বদলে লেখা রয়েছে গ্রি-গ্র্যান্ড।

—আচ্ছা বস তোমরা। প্রফেসার উঠে দাঁড়ালেন।

মরিয়া হয়ে কিংশুক বললে—আমি এখন উঠি, একটু কাজ আছে।

—যাবে আচ্ছা, তাহলে কামিং উইক-এ বিকেলের দিকে এস। প্রফেসার চলে গেলেন।

বীথি বললে—যাবে'খন আর একটু বস না। মহাবীরবাবু, আপনার বন্ধুকে বলুন না।

এতক্ষণে মহাবীরকে মনে পড়ল, তাও কি জন্যে? না কিংশুককে আটকাতে। মহাবীর যেন রাখবার, বেঁধে আনবার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে। ওঃ! মহাবীর হাজরা এত আঘাতেও বুক তোর ঝাঁজরা হয়ে গেল না। মহাবীর উঠে দাঁড়াল—আমি যাচ্ছি তুই না হয় বস।

মহাবীর এরপরও সরাসরি বলতে পারলে না: তুই বস। একটা 'না হয়' ছাড়তে হল। যাই বলেও চলে যাওয়া যায় না। তাসের ঘরও চট করে ভেঙ্গে ফেলা যায় না। কিংশুকের নট কথন নট নড়ন অবস্থা দেখে মহাবীর আবার বললে—তুই তাহলে থাক, আমি চলি।

ঘরে ঢুকলে তমুকা। কিংশুক এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—এই তো তমুকা এসেছে, চলি হ্যাঁ, চল মহাবীর।

যেন রুগীকে একলা ফেলে রেখে চলে যাওয়া যাবে না বলে দুই বন্ধু এতক্ষণ তমুকার অপেক্ষায় ছিল। বীথি একবার তমুকার দিকে তাকিয়ে বললে—তাহলে ঐ কথাই রইল শুকদেবদা' কামিং উইক থেকে রেগুলার আসবে কিন্তু নইলে ড্যাডি ভীষণ রাগ করবেন।

কিংশুক আমতা আমতা করে বললে—স্যারের আবার অসুবিধে হবে কামিং উইকে—মানে। আমার আবার। কথাটা শেষ না করে কিংশুক মহাবীরের দিকে তাকাল।

শান্তকণ্ঠে মহাবীর বীথিকে বললে—আসবে। না আসে আমি ধরে নিয়ে আসব'খন। সইই যখন দিয়েছি তখন ওকেও তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাবো। পৃথিবী দেখুক মহাবীর হাজরা কতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

রাস্তায় বেরিয়ে কিংশুক বললে, তুই বিশ্বাস কর মহাবীর, পড়তে আসার কথাটা আমি বলিনি।

—ঠাকুর ঘরে কে না আমি ত'····· দ্যাট গুড ওল্ড স্টোরী!

—তুই বিশ্বাস করলি নি? ঠিক আছে। তবে শোন'—রাস্তার মাঝেই হাত ধরে মহাবীরকে দাঁড় করালো, বললে—ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কিংশুক দত্ত, আর কলাও খেয়েছি আমি, কিংশুক ডাট্। য়্যাণ্ড দ্যাটস্ দ্যাট।—বলে হন হন করে চলে গেল।

রাত্রে শৈলজা স্বামীকে বললেন—গিনী বলেছে পাশ করলে এখানকার কলেজে ভর্তি হবে। কলকাতায় আর যাবে না, কলকাতা ওর ভাল লাগে না।

—বল কি?

হেসে শৈলজা বললেন—কি করে লাগে বল। আ-হা বুঝছো না। আমি হাকিম-দিদিকে কথাটা বলতে দিদিও হেসে বললে—তা কি করে লাগে ভাই। নিজেদের কথাটা একবার ভাব দেখি। বেশ তো পড়তে চায়—এখানে পড়ুক। বললুম আপনাদের অমতে তো কিছু হবে না তাই বললুম।

কুঞ্জ রায় বুঝলেন, বললেন, সবই ভাল তবে কি জান ছেলেটা যেন কেমন কেমন—হ্যাকা হ্যাকাও বটে আবার বখাটে বখাটেও লাগে।

শৈলজা চটে গেলেন, বললেন—নিশ্চয়ই কেউ তোমার কাছে লাগিয়েছে। আমি কোনও কথা শুনবো না ঐখানেই মেয়ের বিয়ে দেব। হাকিমের একমাত্র ছেলে, বি-এ পাশ এমন জামাই এ বংশে আর এসেছে? তুমি কালকেই হাকিম সাহেবের কাছে কথা পাড়।

॥ ৮ ॥

গুই চাটুজ্জ্যের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। এদিককার ভোটে রাইমোহন আটচল্লিশ ভোটে এগিয়ে ছিলেন কিন্তু যখন পুরোন বাজারের ভোট গোনা শেষ হল তখন দেখা গেল মোট আশিটা ভোট পড়েছে তার মধ্যে দশটা ভোট রাইমোহনের বাকি সত্তরটা হেলেছে বিছে উকিলের দিকে, উকিল মেসোরই জয়জয়কার হল।

কাদা ঘোষাল আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে বললে—আপনি স্যার ঝুটঝুট গোড়া থেকে কেদরে পড়ে আছেন। বলি নি মাগীদের ভোট গোণা শেষ হোক, তারপর বোঝা যাবে। আপনি পাঁচজনের কথায় এ গরীবের কথাটা কানেই নিলেন না। কাদা ঘোষাল চুকলিখোর দুমুখো সাপ নয়। সে যেখানে খাটে জান ভিড়িয়ে দিয়ে খাটে—কি রে নিসিংহ বলবি তো স্যারকে ঠিক কি না। ও যে মোহনই হও বাবা পুরুষমানুষ পয়সা কড়িতে ভোলে। কিন্তু মেয়েছেলে অত সহজ মাল নয়। পয়সা নেবে কিন্তু ভুলবে না। আমায় স্যর আতর, ময়না এরা সব মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল, মাইরী বলছি যদি না তোমাদের ভোট দি তবে যেন গতরে পোকা পড়ে। ওরা বাবা জাত—।

বিছে উকিল তাড়াতাড়ি কাদাকে বাধা দিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনাদের জন্যেই জিতেছি। সেই জন্যেই তো পুরোন বাজারের ভার গুই চাটুজ্জ্যেকে না দিয়ে আপনাকে দিয়েছিলুম। কাল বেশ ভাল করে যাকে বলে দমভোর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

—সে তো হবেই স্যর। এ ক'দিন আহার নিদ্রা বন্ধ ছিল, আজ ঘুমোব প্রাণ ভরে। তা বলছিলুম কি এখন একটু মানে—গলা যেন কাঠ হয়ে আছে—কিরে নিসিংহ, কেতো, বলবি তো স্যরকে। একটা কিছু হলেই আমাকে ঠেকিয়ে দিবি, স্যর ভাববে আমি একলাই বুঝি যা পারি গুটিয়ে নিচ্ছি।

কেতো ওরফে কার্তিক বললে—বেশী নয় স্যর গোটা পনের হলেই হবে। এই একটু চা সোডা হতো, তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে।

রাগে দুঃখে রাইমোহনের বুক ফেটে কান্না এলো। শেষকালে কিনা মাগীগুলোই ডোবালে। এক সময় ওখানে কি টাকাটাই না উড়িয়েছি কি খাতিরই না কুড়িয়েছি। আর কেউ না জানুক সরকারদা'র মেয়েমানুষ ধানী বৌদি ত' জানে। নিজের চোখে তো ঠোটকাটি কাঁচি সব দেখেছে, তবে?

ভরা দুপুর, রাইমোহন তাঁর ধানী বৌদির বাড়ীর সামনে রিক্সা থেকে নামলেন। কতকাল এদিকে আসেন না। আশ্চর্য কত পরিবর্তনই না হয়েছে! কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন

বাইরে পরিবর্তনই হলেও বাসিন্দারা সেই আগের মতই আছে। পরনে রং বেরং-এর শাড়ী, গায়ে কেবলমাত্র আঁট সাট বক্ষবন্ধনী। দু'তিনটি মেয়ে দরজার সামনে গলিতে বসে কড়ি খেলছে আর মাঝে মাঝে রাস্তা ঘাটে কাকেও দেখলে নিজেদের মধ্যে অকারণে হেসে উঠছে। হাসির পাত্রটি এদেরই মত রসময় হলে কথারও তীর ছোঁড়াছুড়ি হচ্ছে। ঠিক আগে যেমনটি হতো। রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখা যায় ভেতরের উঠোনের বাঁধানো দিকটায় যেখানে রোদ্দুর নেই সেখানে গুটিকয়েক মেয়ে মাটিতেই শুয়ে আছে। যারা একটু রোগা বা যাদের গালভাঙ্গা তারা এই ভাবে ভিজে মাটিতে শুয়ে থাকে তাতে করে সন্ধ্যাবেলায় গালগুলো একটু ফোলা ফোলা দেখায়। ধানী বাড়ীউলী আগেকার মাসীদের মত আজও বলে'— ভাঙা গালে খোঁড়া নাগর আসবে। দেহ পেঁট্টাই না হলে কি দেখে লোক আসবে না। পান্তা খেয়ে মেঝেতে জল ঢেলে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুবি দুপুরে, শরীলে রস বসবে।

তা কাজ হয়, প্রথম প্রথম রস বসে শেষকালে ঐ সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বসে তারপর আরও পাঁচটা এসে জোটে, তারপর যা হবার তাই হয়।

আগের মতই টিয়াপাখী আর কাকাতুয়া দাঁড়ে বসে ছোলা লঙ্কা খাচ্ছে—মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। একপাল বিড়ালের কোন কোনওটা ঘুমুচ্ছে কোনোওটা বা মেয়েদের কোলে চড়ে আদর খাচ্ছে, কোনওটা আবার আদরের দাঁড়িয়ে ঠেলায় ট্রানজিষ্টার রেডিও সেট-এর এরিয়েলের মত লেজ তুলে আছে। এখনও সেই আগের মত ধানী মাসীর বাড়ীর বাসিন্দাদের সন্ধ্যে বেলায় দরজার গোড়ায় ষ্ট্যাণ্ড য়্যাট ইজ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঠিক আগের মত সব জানা সব চেনা অথচ এই চেনা জানার দলই তাকে ডোবালে।

রাইমোহন দরজার গোড়ায় নামতে মেয়েরা সব ভীড় করে এসে দাঁড়াল। পক্ষী তার বেলফুলকে চুপি চুপি বললে—মিনসে মাইরী এখনও পাকা আমটি রসে টইটম্বুর।

—চুপ কর, বাড়ীউলী মাসীর কাছে এয়েছে। আগে মাসীর কাছে আসতো। মালদার লোক, ভোটের জন্য সেদিন এসেছিল মনে নেই।

ওপরে গিয়ে একজন ধানী মাসীকে ঘুম থেকে তুললে। মাসী মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে ঘুমুচ্ছিল, গরম বলে দুপুর বেলা গায়ে গতরে কাপড় রাখা যায় না। দিবানিদ্রাটুকু গামছা পরেই সমাধা হয়। সেদিনও তাই কোমরে ছিল। ঘুম ভেঙ্গে উঠে আর একটা গামছা বুকে জড়িয়ে বারান্দায় এসে দেখে রাইমোহন দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি আলনা থেকে শাড়ীটা টেনে নিলে। হাজার হোক পুরোন আমলের মানী লোক। তা ছাড়া নিজেরও মান সম্মান আছে একটা।

—ওমা রাই ঠাকুরপো যে এস এস। হ্যাঁ গা ভোটের কি হল ?

—সেই কথাই তো জানতে এলুম। অতগুলো টাকা।

—ওপরে চল, সব শুনি।

—না ওপরে আর যাব না।

—তবে ভেতরে এসে রকটায় বসো। ওলো কানীর দল, চোখের মাথা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্, একটা আসন পিঁড়ি আনতে হবে না। ভুঁয়েতেই বসবে নাকি মানী লোকটা।

—ধানী বৌদি, সরকারদা'র হাত ধরে কড়েরাঁড়ী ধনদাসুন্দরী যেদিন বেরিয়ে এসে ক্যাংটেশ্বর তলায় মালা বদল করে সিঁথেয় সিন্দুর চড়িয়ে পুলপারে নতুন ঘর বেঁধেছিল সেদিন এই রাইমোহনই ছায়ার মত দাদাকে ঝড় বাতাস থেকে আগলে রেখেছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধানী বৌদি বললে—সে কথা কি ভুলবো ভেবেছ, কি মানুষই ছিল তোমার সরকারদা'। অষ্টপহর মালে টং কিন্তু বেলব্ জো নেই।

—দাদা বললে রাই ধনদাসুন্দরী নামটা পেল্লাই, কেমন গেরস্ত গেরস্ত গন্ধ একটু ছোট করে দে'ত ভাই। আমি তখন রং-এ। ফট্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—যা পেটে না পড়লে ত্রিভুবন অন্ধকার সেই নাম বৌদিকে দাও! ধান্যেশ্বরী। দাদা বলল—উঁহু আরও ছোট কর। বললুম, তবে তুমি ডেকো ধনী বলে বেশ লচক্‌দার হবে, আমি ডাকবো ধানী বৌদি বলে। দাদা এক বোতল মাল আমার মাথায় ঢেলে বললে—বেড়ে বলেছিস্। লোকে বাবার মাথায় জল দেয় আমি তোর মাথায় মাল ঢ'াললুম। খাসা মাথা তোর।

মেয়েরা কাছেই ছিল হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো। ধানী বৌদি দাবড়ি দিয়ে মেয়েদের থামিয়ে বললে—থামলি সব থামলি। হ্যাঁ ঠাকুরপো খাবে, আনাবো।

—না না খেতে আসিনি। আমি শুধু তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি। মাল ঢেলে দাদা বললে—কিন্তু খবরদার আমি না থাকলেও ইদিক পানে নজর দিবিনি। ফুর্তিফার্তা করতে হয় অন্য জায়গায় যাবি। এ তোর বৌদি হল কিন্তু, এ কথার খেলাপ আমি আজ অবধি করেছি বল ?

আধ হাত জিভ বার করে মাথা নেড়ে ধানী বৌদি বললে— না, মিথ্যে বলব নি, এখনও চন্দ্র-সূয্যি ওঠে দিন রাত হয়, সে নজরে তুমি কোনওদিন চাও নি। মানীর মান রেখে এয়েছো। এসব তো কোন যুগে ছেড়েছো তবু আজও দোল দুর্গোচ্ছবে কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছ। কেন, না আমার ধানী বৌদি। দাদা নেই তার ভাই আছে। আমিও সেনেহের চোখেই তোমায় দেখি। তাই তো বলি ছুঁড়ীদের আজ মাসীকে দু'পায়ে থেঁতলাচ্ছিস, কিন্তু মাসী কি দেব্য কাচী বাড়ীউলী জানে আর জানে রাই ঠাকুরপো। যার হাত ধরে বেরিয়ে এসে সংসার পেতেছিলুম সেই মানুষ যেদিন চলে গেল সংসারও তুলে দিলুম। বুকে টোকা দিয়ে বলব, কেউ বলুক দেখি তারপর থেকে ধনীর তক্তপোষ ছুঁতে পেরেছে। অথচ কি-ই আমার বয়স তখন বল। কিন্তু তেমন বাপে জন্ম দেয়নি ধনীকে, তোমার দাদাকে কথা দিয়েছিলুম সে কথার খেলাপ করিনি।

—তবে আজ কথার খেলাপ করলে কেন ? আমি যে সহরে আর মুখ দেখাতে পারব না। এতক্ষণে আমার বাড়ীর সামনে বিছে উকিলের লোকেরা ভূতের নেত্য করছে।

ধানী বৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি বেঁচে থাকতে তোমার বাড়ীর সামনে ভূতের নেত্য করবে।

—আমি যে গোহারাণ হেরেছি।

—চলো না, দেখি একবার হারামজাদা ব্যাটাদের। কেমন করে নাচে একবার দেখি।

পক্কী বললে—ও মাসী ঐ.টই যে নেম গো। যে পূজোর যে মন্তর। যে হারবে তার বাড়ীর সামনে সব ন্যাংটা হয়ে নাচবে। তোমার ঠাকুরপো জিতলে তার লোকেরাও তাই করতো।

—হ্যাঁ গা তাই বুঝি। তা তুমি হারলে কেন?

—তাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি কথার খেলাপ করে আমায় এ হেনস্থা করালে কেন? মুখ দে' বার করবার আগেই কড়কড়ে একশ' টাকা জলপানের দরুণ দিইছি, তার শোধ এমনি করে দিতে হয়? মাত্র আশিটা ভোট পড়েছে ইদিককার, তার মধ্যে আমার ভাগে পড়েছে দশটা আর সব বিছে উকিলেরই। তোমরা সব নেমকহারামী করেছ। বেটাছেলেরা আটচল্লিশটা ভোট বিছে উকিলের চেয়ে আমায় বেশী দিয়েছিল। কিন্তু ডোবালে কিনা তোমরা।

—মাইরী বলছি ঠাকুরপো, মরে তোমার সরকারদা সগ্গে গেছে, আমি—নরককুণ্ডে পচছি, তার নাম নিয়ে দিব্যি গেলে বলছি, ভোট তোমায় আমি দিইছি, যথাসাধ্য পই পই করে সবাইকে বলেছি মালও খাইয়েছি, তারা ভোটও দেবে বলে কথা দিয়েছে। পেত্যয় না হয় এই তো সব শতেক খোয়ারীর দল দাঁইড়ে আছে জিজ্ঞেস করো। কি লা বল না। সব যে চুপ করে রইলি। আবার এও বলি উকিল মোক্তারকে ভোট না দিয়েই বা করে কি। এখন কথায় কথায় যখন পুলিশ আর কোর্ট ঘর। আগের দিনেও দারোগা পাহারালার জুজুজুত যে না ছিল এমন নয়। একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে দারোগাকে ফেলে দিয়ে এলুম হপ্তা দু'য়েকের নিশ্চিন্তি। আর এখন শতেক দেবতা তার হাজার বায়নাক্কা। কে দানো আর কে দৈত্য বোঝবার উপায় নেই। এক পুলিশই সতের রকম। বলে ভেজালেস পাটির লোক, ভদ্দর লোকের ছেলে সব, রাতের বেলায় পাহারা দেয়। বাপের জন্মে শুনিনি। ভেজালেশ পাটি কি রে বাবা। কর তুষ্টি তাদের।—রোজ রোজ কাঁহাতক পারা যায়। মানুষের দেহ তো, আরাম ব্যায়রাম আছে। তা পান থেকে চূণ খসবার জো আছে।

একটি মেয়ে ফোঁস করে উঠলো—পরশুদিন দেখলে তো মাসী না হোক কি টানা পোড়েনটাই হল।

—তুই থামবি, দোব মুখে নুড়ো জেলে। জানো বিলিতি বাড়ীউলী তো পষ্টই বললে, এ নাইনে যখন কাজ করতে হ'বে তখন উকিল মোক্তার হাতে রাখতেই হ'বে। নইলে থানা আদালতের হ্যাপা পোয়াবে কে? আমরা বাপু বিছে উকিলকেই ভোট দেব। তা দিবি সে কথা আগে বল। না পুরো দুটো বোতল সাবড়ে তবে পেটের কথা বললে। দেখ কাণ্ড। বেবুশ্যে আর কাকে বলে। আত্তর তো মুখের ওপরই চোপা নেড়ে বলে গেল, মাসী তোমার রাই ঠাকুরপো বুড়ো হাবড়া মানুষ আজ আছে কাল নেই কাদা ঘোষালের বয়েস কাঁচা দলও ভারী। দশ বিশ বছর এখনও আসা যাওয়া করবে। সে যাকে বলবে তাকেই ভোট দেব। হাতে বল-ভরসা থাকা ভাল। রোদ ·বিষ্টিতে ছাতা ধরতে পারবে। ব্যবসাটা তো দেখতে হ'বে। ভোট আগে না পেট আগে। তাও বলি বাপু কথাটা মিথ্যে নয়, তোমার বয়স হয়েছে, কত হল বল দেখি। ষাট বছর হল? তুমি না এসে যদি ছেলে ছোকরাদের কাউকে পাঠাতে, তাহলে আর এ বিপত্তি হত না। হাজার হোক বয়সের একটা জেল্লা আছে তো, তোমার এ সবে আসাই বা কেন বাপু। বে-থা করনি, ঝাড়া হাত-পা মানুষ। মুঠো মুঠো পয়সা কামাচ্ছ, ভাই-ভাইপোদের নিয়ে আছো দিব্যি। গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গেলে কেন বল দেখি। তা ঠাকুরপো যা হবার হয়েছে, ও নিয়ে আর মন খারাপ করো না। এসো না একদিন, খাওয়া-দাওয়া করবে, দু'চারটে সুখ-দুঃখের কথা হবে। ওকি চললে, শোন ঠাকুরপো, আমি জানো যথাসাধ্যি,—মাইরি বলছি···

রাইমোহন পুরোনো বাজার থেকে সোজা চলে গেলেন দীনু দত্তর তেলকলে। দীনুবাবু তখন ঐখানে ছিলেন।

—দীনু শুনেছ ত' সব।

—শুনলুম। তোমার হার হবে, এ ভাবতেই পারিনি তাও বিছে উকিলের কাছে—

—বিছে উকিল নয়। বয়েস, বয়েস আমায় হারিয়েছে।

—বয়েস হারিয়েছে!

—হ্যাঁ, সে জেল্লা তো আর নেই, ভোট পাব কি করে? বুঝলে না? মাগীরা কি না—ওঃ—চলি।

[ক্রমশ।

বিকেলের রোদ

সলিল মিত্র

দুটো তরী একই ঘাটে ভিড়েছিল সেই একদিন
আবার স্রোতের টানে ভেসে গেল—ঠিকানা বিহীন :
কোন্ দ্বীপে, অরণ্যের গহীন নির্জনে :
সে-সব—অতীত স্মৃতি—কে আর সে-কথা মনে এনে
হৃদয় বিক্ষত করবে? যে-ঠিকানা গিয়েছে হারিয়ে
তাকে আর খোঁজা কেন এই ম্লান বিকেলের রোদে
আবার কি স্পষ্ট করে সে-ঠিকানা পাওয়া যাবে
ছায়াচ্ছন্ন গোধূলি-আলোতে?
হয় তো পাওয়া যেতে পারে,—লাভ আছে? সূর্য বসে পাটে—
শূন্য বোঝা—ফিরে চলো, বিকি কিনি শেষ হ'ল হাটে!

উইম্বলডন

সম্প্রতি উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার ৭৭তম অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে যে গবেষণা, উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিলো, আমেরিকার টেক্সাস কলেজের ছাত্র বাইশ বছর বয়সের যুবক চাক ম্যাকিনলের চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের পর তার উপর যবনিকা পড়েছে। ম্যাকিনলে ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলীকে সহজেই ৯—৭, ৬—১, ৬—৪ ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন।

ম্যাকিনলের জয়লাভে দীর্ঘ আট বছর পর টেনিসে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশীপের বিজয়ীর পুরস্কার পেয়েছে আমেরিকা। তা' ছাড়া, এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমারসনের পরাজয়ে এবার কারো পক্ষে 'গ্র্যাণ্ড শ্লাম' (অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ফরেষ্ট হিলস্ ও উইম্বলডন—এই চারটি প্রধান প্রতিযোগিতায় জয়ের গৌরব) পাওয়া সম্ভব হলো না।

এবারের প্রতিযোগিতায় জার্মান খেলোয়াড়রা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন, এ-বছর প্রতিযোগিতার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ফলাফল জার্মানীর বুনগার্টের কাছে এমারসনের (যিনি ইতিপূর্বেই অষ্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছেন এবং যাঁকে উইম্বলডনে বাছাই তালিকায় পুরুষদের বিভাগে শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছিলো) পরাজয়। তার আগে বুনগার্ট আট নম্বর বাছাই খেলোয়াড় ব্রিটেনের মাইক স্যাঙ্গস্টারকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন।

এবারে উইম্বলডনের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও আকর্ষণীয় খেলা হয়েছে স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা ও মেক্সিকোর র্যাফেল ওসুনার তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা। এই খেলায় পর পর দুটি গেমে পশ্চাদ্‌গামী হয়েও সান্তানা শেষ তিনটি গেম লাভ করে ওসুনাকে পরাজিত করেন। উইম্বলডন রাণার্স ফ্রেড ষ্টোলীর কাছে দু'নম্বর বাছাই খেলোয়াড় সান্তানার ষ্ট্রেট সেটে পরাজয়ও বিস্ময়কর ফলাফল।

উইম্বলডন বিজয়ী ম্যাকিনলে এর আগে ভারতে খেলেছেন (তবে কোলকাতায় নয়) এবং ১৯৬১ সালে দিল্লীতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিস কাপের খেলায় তিনি ভারতের রমানাথ কৃষ্ণানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ফ্রেড ষ্টোলীও একাধিকবার ভারতে খেলে গেছেন।

গতবারের তুলনায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা উইম্বলডনে খারাপ খেলেন নি। কিন্তু কৃষ্ণানকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে যে প্রত্যাশা ছিল, তা' অপূর্ণ রয়ে গেলো। ভারতের দু'নম্বর খেলোয়াড় জয়দীপ চতুর্থ রাউণ্ডে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ম্যাকিনলের কাছে পরাজিত হলেও উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের অভিভূত করেন। ম্যাকিনলে নিজেও জয়দীপের খেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উইম্বলডন টেনিসে মহিলাদের সিঙ্গলস্ ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ যুক্তরাষ্ট্রের বিলি জিন মফিটকে পরাজিত করে বিজয়িনীর গৌরব অর্জন করেছেন।

ইংল্যাণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

মহা অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। কখন কি হয় বিধাতারও অজ্ঞাত। ইংল্যাণ্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ তার সার্থক নিদর্শন।

লর্ডস্ মাঠে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ক্রিকেট-রসিকদের মনে অন্যতম স্মরণীয় খেলা হিসেবে এক অক্ষয় স্মৃতি রেখে গেছে। ইংল্যাণ্ডের সিলেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াল্টার রবিন্স খেলার শেষে বলেছেন, 'এর চেয়ে ভালো খেলা আমি দেখি নি, কখনো দেখবো এমন আশাও করি না।'

লর্ডস্ মাঠে এমন চিত্তাকর্ষক খেলা এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিসমাপ্তি সম্ভবত এর আগে দেখা যায় নি। শেষ মুহূর্তে সব কিছুই হ'তে পারতো। উপর্যুপরি দু'টি টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয়, ইংল্যাণ্ডের জয় অথবা পরাজয়, অথবা দু'পক্ষের সমান সমান অবস্থা। (যা'এর আগে এক মাত্র ব্রিসবেনে অষ্ট্রেলিয়া ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের টেষ্ট খেলায় হ'য়েছে)।

টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে ২৫৫ রাণ সংগ্রহ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কানহাই-র ৭৩, সোবার্সের ৪২ আর দলের সহ-অধিনায়ক হান্টের ৪৭ রাণ। ইংল্যাণ্ডের ফাষ্ট বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান একাই ৬৪ রাণে ৫টি উইকেট দখল করেন।

দ্বিতীয় দিনে ৩০১ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেট হারিয়ে ২৪৪ রাণ করে। মাত্র ২০ রাণে ইংল্যাণ্ডের প্রথম দু'টি উইকেট পতনের পর অধিনায়ক ডেক্সটার (৭০) এবং ব্যারিংটন (৮০) খেলার চেহারা পাল্টে দেন।

উইম্বলডন লন টেনিস মহিলা বিভাগে সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়নশীপের পুরস্কার হাতে অষ্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ

তৃতীয় দিনে ২১৭ রাণে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১০৪ রাণের মধ্যে পাঁচটি উইকেট (ম্যাকমরিস, কানহাই, হাণ্ট, সোবার্স ও সলোমন) হারিয়েও শেষ পর্যন্ত ২১৪ রাণ করে। বুচার ১২১ ও ওরেল ৩৩ রাণ করে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিনে ট্রুম্যান ও স্যাকলটন সংহারমূর্তি ধারণ করে ২৭ মিনিটে মাত্র ১৫ রাণের মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘটালেন, ট্রুম্যান ৫২ রাণে ৫ উইকেট এবং প্রবীণ স্যাকলটন ৭২ রাণে ৪ উইকেট পেলেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মোট রাণ হলো ২২৯। ইংল্যাণ্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজন ২৩৪ রাণ। হলও তৈরী। মাত্র ২৭ রাণের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান আউট; ৩১ রাণের মাথায় মাত্র ২ রাণ করে গিবসের বলে বোল্ড হলেন ডেক্সটার। এই সংকটে ব্যারিংটন ও কাউড্রে নিলেন বিপদ-ত্রাতার ভূমিকা। ৪৬ মিনিটে ৪১ রাণ যোগ হলো। কিন্তু দলের ৭২ রাণের মাথায় হলের নিক্ষিপ্ত 'গোলার' আঘাতে আহত কাউড্রে গেলেন হাসপাতালে। ক্লোজ এলেন ব্যাট করতে। দিনের শেষে ইংল্যাণ্ডের ৩ উইকেটে ১১৬ রাণ হোলো।

পঞ্চম দিনে বৃষ্টির জন্য লাঞ্চের আগে খেলা শুরু করা গেল না। লাঞ্চের পর ৬০ রাণ করে ব্যারিংটন আউট হলেন। পার্কস এবং ক্লোজ ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ডকে। ১৭ রাণে পার্কস আউট হবার পর টিটমাস। খেলা শেষ হতে যখন ৪৫ মিনিট বাকি, জয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজন ৩১ রাণ; তখন হল্ সংহারমূর্তি ধারণ করে পর পর দু' বলে টিটমাস ও ট্রুম্যানকে আউট করলেন। ৭০ রাণ করে গ্রীফিথের বলে ক্লোজও বিদায় নিলেন।

ইংল্যাণ্ডের সমর্থকদের মুখ পাংশুবর্ণ। মাত্র দু'টি উইকেট বাকি, তাও আবার বাঁ হাতে প্লাষ্টার করা আহত কলিন কাউড্রেকে নিয়ে, অ্যালেন ও স্যাকলটন সতর্কতার সঙ্গে খেলছেন। দিনের শেষ ওভার। জয়ের জন্য বাকি ৮ রাণ। হলের হাতে বল।

প্রথম বল—স্যাকলটন সুইপ করতে গেলেন, পারলেন না।

দ্বিতীয় বল—স্যাকলটন বলটি ঠেলে দিয়ে একটি রাণ নিলেন, কিন্তু এক মুহূর্ত দেরী হলেই হল তাঁকে রাণ আউট করে দিতেন।

তৃতীয় বল—অ্যালেন ফাইন লেগে বল পাঠিয়ে এক রাণ নিলেন।

চতুর্থ বল—তাড়াহুড়ো করে রাণ করতে গিয়ে ওরেলের নিক্ষিপ্ত বলে রাণ আউট হলেন স্যাকলটন। ৯ উইকেটে ২২৮।

পঞ্চম বল—অ্যালেন (অপর প্রান্তে আহত কাউড্রে) সুন্দরভাবে রুখে বল ঠেলে দিলেন। কোন রাণ হোলো না।

শেষ বল—হল্ এবার মরিয়া। হয় এস্পার, নয় ওস্পার। হলের শেষ বল অবিচলিত ভাবে ব্লক করলেন অ্যালেন।

খেলা শেষ। পুলিশের অবরোধ ভেঙে দর্শকরা ছুটে গেলেন প্যাভিলিয়নের সামনে; অভিনন্দন জানালেন ওরেল এবং ডেক্সটারকে। লর্ডস্ টেষ্টের মত টেষ্টই 'ক্রিকেটের জিয়নকাঠি।'

* * * *

লর্ডসের পর এজবাষ্টনের রণাঙ্গন। ইংল্যাণ্ড দল থেকে বাদ পড়লেন এডরিচ, কাউড্রে ও অ্যালেন। শূন্য স্থান পূর্ণ করলেন রিচার্ডসন, শার্প ও টনি লক। শার্পের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কাগজে কাগজে কঠোর সমালোচনা হোলো!

টসে জিতে ডেক্সটার ব্যাটিং নিলেন। দিনের শেষে ইংল্যাণ্ডের হোলো ৫ উইকেটে ১৫৭ রাণ। সোবার্স ৩টি উইকেট পেলেন। বৃষ্টির জন্য চা-পানের পর খেলা শুরু করা যায়নি।

দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টির জন্য ৪ ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকে। ২১৬ রাণে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। সোবার্স শেষ পর্যন্ত ৬০ রাণ দিয়ে ৫টি উইকেট দখল করেন। ক্লোজ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করে ৫৫ রাণ করেন।

তৃতীয় দিনেও বৃষ্টির জন্যে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। বর্ষণসিক্ত পীচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৪ উইকেটে মাত্র ১১০ রাণ করে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনে ট্রুম্যান ও ডেক্সটার মাত্র ১৮৬ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটান। ট্রুম্যান ৭৫ রাণে ৫টি এবং ডেক্সটার

উইম্বলডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গল্স চ্যাম্পিয়ান চাক মাকিনলে

ডেক্সটার

সোবার্স

৩৮ রাণে ৪টি উইকেট দখল করেন। দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করে ইংল্যাণ্ডও বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না; ৬১ রাণের মধ্যে রিচার্ডসন, ষ্টুয়ার্ট, ব্যারিংটন ও ক্লোজ ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নে। ডেক্সটার করলেন ৫৭। আবার আউট হলেন পার্কস্, টিটমাস্, টু্ম্যান। শেষ পর্যন্ত শার্প (৮১ নট আউট) এবং লক (২৩ নট আউট) রইলেন অপরাজিত। গ্রীফিথ ও গিবস্ ৩টি করে উইকেট দখল করলেন।
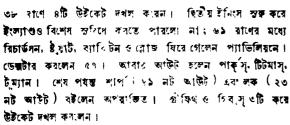
শেষ দিন। সকলেরই ভবিষ্যদ্বাণী এ-খেলা নিশ্চিত ড্র। মাত্র তিন হাজার দর্শক। গ্রীফিথ এবং হলের নতুন বলের বোলিং-এর বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামলেন শার্প এবং লক। নবম উইকেটে লক ও শার্পের জুটিতে ৫০ মিনিটে ৫০ রাণ ওঠে। যখন নবম উইকেটের জুটিতে ৬৩ রাণ যোগ হয়, তখন ইংল্যাণ্ডের নতুন রেকর্ড হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে ই-আর-টি হোমস্ এবং ডাব্লিউ ফেরিমণ্ড পোর্ট অব স্পেনে ৬২ রাণ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের নবম উইকেটে ৮১ রাণ যোগ হবার পর জুটি ভঙ্গ হয়। লক ৫৬ রাণ করে গিবসের বলে বোল্ড আউট হন। ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে ২৭৮ রাণে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। শার্প ৮৫ রাণে অপরাজিত থাকেন। শার্পের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে যাঁরা হৈ-হৈ করেছিলেন, তাঁরা স্বীকার করলেন,—'তাই তো, ছোক্‌রা তো বেশ ভালোই খেলেছে।'

৩০১ রাণ করলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয়ী হবে। খেলা আরম্ভ হোলো। সূচনায় বিপর্যয়। স্যাকল্‌টনের তৃতীয় বলে ক্যাঙ্ক বোল্ড। টু্ম্যানের বলে হাণ্ট ব্যারিংটনের হাতে খোঁচা দিয়ে ফিরে গেলেন। ২ উইকেটে দশ। কানহাই ও বুচার বেপরোয়া ভাবে খেলতে সুরু করলেন।

১৪ রাণ করে বুচার বোল্ড আউট হলেন ডেক্সটারের বলে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় কানহাই ২৬ ও সোবার্স ৬ রাণে অপরাজিত থাকেন।

টু্ম্যান

হাণ্ট

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের চ্যারিটি খেলার দৃশ্য। মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর অঘটন ঘটালেন টুম্যান। জয়লাভের দৃঢ় সঙ্কল্পে দুর্নিবার, অগ্নিবর্ষী টুম্যান সংহার মূর্তি ধারণ করে ২৪টি বলে মাত্র ৪ রাণ দিয়ে ৬টি উইকেট দখল ক'রে ৫৫ মিনিটের মধ্যে মাত্র ১১ রাণে দুর্ধর্ষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘটান।

তৃতীয় টেষ্টের নায়ক টুম্যানের মারাত্মক বোলিং-ই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চরম ভাগ্য বিপর্যয় এবং ইংল্যাণ্ডের সহজ জয়ের প্রধান কারণ। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৪৪ রাণে ৭টি উইকেট এবং দু' ইনিংস মিলিয়ে ১১১ রাণে ১২টি উইকেট দখল করেন। টুম্যান যিনি এ পর্য্যন্ত টেষ্ট খেলায় ২১৫টি উইকেট লাভ করেছেন, এই খেলার বোলিং অ্যাভারেজই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজ।

কোলকাতার ফুটবল

কোলকাতায় ফুটবল লীগের প্রথম ডিভিসনের বিরতি খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। খেলার মান এখনও যথাপূর্বম্। এ-বছর বিভিন্ন ফরোয়ার্ডদের গোল করবার অক্ষমতা এত বেশী প্রকট যে, অনেকেরই অভিমত এবারে 'অভিজ্ঞ গোলদাতা চাই' বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার সময় এসেছে। কোলকাতার মাঠে ফরোয়ার্ডরা যে ভাবে অনায়াসে একের পর এক গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন, তাতে কোলকাতা তথা ভারতের ফুটবলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সহজ গোল না দিতে পারার জন্য যে কোন সময়ে শীর্ষস্থানীয় দলগুলোকে অপ্রত্যাশিত ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আজকাল তিন ব্যাক, চার ব্যাক প্রথায় খেলার ফলে প্রথম থেকেই রক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্ত করে গড়ে তোলা হয়। এই ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে চকিত সট একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু চকিত সট যাঁরা করতে পারেন, অর্থাৎ সত্যিকারের 'শার্প স্যুটার' বলতে যা বুঝি, তেমন কাউকে কোলকাতার মাঠে দেখতে পাইনি।
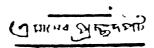
মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী—শ্রীসুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে দুর্বৃত্তদের] ঘাঁটি

'শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনের নর্থ এবং সাউথ ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম গভীর রাত্রিতে তালাবদ্ধ রাখার এক পরিকল্পনা রেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, গভীর রাত্রির পর হইতে ভোরের প্রথম ট্রেনের আসা বা [illegible]র সময়টুকুর মধ্যে এই [illegible] শনের [illegible] ফর্ম বাহির হইতে বহু সমাজবিরোধী দুষ্ট প্রকৃতির লোক আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন ধরণের সমাজবিরোধী কাজে এবং চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এই সব অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যাহাতে প্ল্যাটফর্মে আস্তানা গাড়িতে না পারে, এই কারণেই উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। সমাজবিরোধীদের রাত্রের আস্তানা হিসাবে উক্ত ষ্টেশন দুইটির প্ল্যাটফর্ম বহু বিশ্রুত। উদ্বাস্তু আগমনের পর হইতেই নানা শ্রেণীর দালাল, জুয়াচোর, ধাপ্পাবাজ, পেশাদার গুণ্ডা, ভদ্রবেশী গুণ্ডা, সম্ভ্রান্ত সমাজের সমাজবিরোধী বিভিন্ন ধরণের কারবারীর যাতায়াতে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মের নরক গুলজার হইয়া উঠে। এ যাবৎ তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই। যাহা হউক, বিলম্বে হইলেও কর্তৃপক্ষের এই চৈতন্যোদয়ের জন্য সাধুবাদ দিতেছি।'

—দৈনিক বসুমতী।

বস্তিজীবনের দুর্দশা

'পশ্চিমবঙ্গের শহর ও শহরতলীর বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, বস্তি এলাকায় খাটা পাইখানাগুলির বদলে স্যানিটারি পায়খানার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং রাজ্য সরকার ও পৌরসভা সমান হারে ওইগুলি নির্মাণের ব্যয় বহন করিবেন। বস্তি-বাসীদের জন্য রাজ্য সরকারের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে একটি শুভলক্ষণ। এই কলিকাতা শহরেই তিন হাজারের বেশী বস্তি আছে এবং শহরের মোট লোক সংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বস্তিতেই বাস করে। অথচ এই বিরাট জনসংখ্যার স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা আজও করা সম্ভব হয় নাই। এক-চতুর্থাংশ বস্তি হইতে জল-নিকাশের কোন ব্যবস্থা নাই। পানীয় জল সরবরাহের অবস্থাও শোচনীয়। পায়খানাগুলি কেবলমাত্র খাটা নয়, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রায় সাড়ে চার শো লোকের জন্য একটি মাত্র পায়খানা ও একটি মাত্র জলের কল আছে, এমন বস্তির অস্তিত্বও এখানে বিরল নয়। এই সব কারণে বস্তি এলাকায় কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। বস্তির এই অবস্থা পরিবর্তন কলিকাতা কর্পোরেশনও অসহায়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও বস্তির মালিকদের কিছু করিতে বাধ্য করা সম্ভব নয়। কর্পোরেশনের হাতে আইনগত অধিকার না-থাকায় অনেক আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী পরিবার আজও খাটা পায়খানার অবসান ঘটান নাই। শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে বস্তি আইন সংশোধন না করিলে রাজ্য সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত তেলামাথায় তেল দেওয়ার নীতিতে পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য পুরা পরিকল্পনাটির জন্য বরাদ্দ দুই লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। আমরা আশা করি রাজ্য সরকার বস্তি এলাকার অবস্থা উন্নয়নের জন্য যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং কর্পোরেশনকে আইনগত অধিকার ও আর্থিক সাহায্য দান করিয়া বস্তিগুলির উচ্ছেদ না-হওয়া পর্যন্ত কিছুটা বাসযোগ্য করিতে সচেষ্ট হইবেন।'
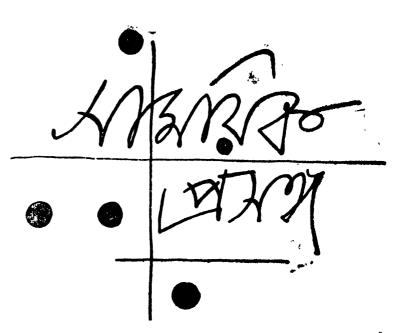
—আনন্দবাজার পত্রিকা।

পৌরপিতাদের ভাতা-প্রসঙ্গে

'কাউন্সিলারদের যে ভাতা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে সেটি পরিমাণে খুবই সামান্য। তবে এই সামান্য ভাতাও যদি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ঘরের উৎসাহী ও কর্মঠ তরুণগণকে কলিকাতার পৌর-কল্যাণের কাজে অগ্রসর হইয়া আসিতে সাহায্য করে, তাহা হইলে এই ভাতার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। কলিকাতার বাহির হইতে আগত উপার্জনকারীদের উপর কর ধার্য করার যে প্রস্তাব হইয়াছে সেটিও নীতি হিসাবে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কলিকাতা-কর্পোরেশন উহা আদায় করার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না সেকথা বুঝা যাইতেছে না। তার চেয়ে শহরতলী হইতে কলিকাতাগামী-ট্রেনের ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের মান্থলি টিকেট ও ভেণ্ডার টিকিটের উপর একটা লেভি চাপাইয়া একই উদ্দেশ্য অনেক সহজে সাধিত হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।'

—যুগান্তর।

বাঙালীর প্রয়োজন অপরিহার্য

'দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার সর্বোচ্চ পদাধিকারী নিয়োগে শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না নিজের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের বিরূপতায় তিনি নাকি সর্বক্ষণের জন্য চেয়ারম্যান মনোনয়নের কথা চিন্তা করিতেছেন। বাঙালী কর্মকর্তা ছাড়া দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ অগ্রগতি লাভ করিবে না। পরলোকগত সুকুমার সেনের আরব্ধ কর্মসূচীতে ঠিকমত

রূপ দেওয়ার মত বাঙালীর অভাবও নাই। কাজেই শ্রীখান্না কলিকাতায় আসিলে রাজ্য সরকার যেন পশ্চিমবঙ্গের দাবী উত্থাপনে নমনীয়তার পরিচয় না দেন।'
—লোকসেবক।

দেশদ্রোহিতার নিদর্শন

'বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট প্রভাবিত ছাত্র সংস্থার নবপর্যায়ে আরব্ধ কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করিলে কমিউনিষ্ট পার্টির দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। সংবাদে প্রকাশ, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচারপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর ও প্রাঙ্গণ আবার ছাইয়া গিয়াছে কোন একটি প্রচারপত্রের বয়ান ও বক্তব্য নাকি এইরূপ; যখন প্রশ্ন উঠে যুদ্ধ না শান্তি? আমাদের বেছে নিতে হয় নাকো ভ্রান্তি আমরা জবাব দিই শান্তি শান্তি শান্তি। কমিউনিষ্ট কবলিত ছাত্র ফেডারেশনের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত এই স্বস্তিবচন যে চীনা পুনরাক্রমণ রোধের সংকল্পের শিরে শান্তিবারি সিঞ্চন ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। দেশরক্ষা সংক্রান্ত পবিত্র সেই সংকল্পের বশবর্তী হইয়া ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ যখন সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্ত উদ্যোগী হইতেছেন, কমিউনিষ্ট পার্টি ঠিক সেই সময়ে ছাত্র সম্প্রদায়কে সম্মোহিত করিয়া তাহাদের মন হইতে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তার চিন্তা নিঃশেষে মুছিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের এই নিদারুণ সংকটক্ষণে চীনের শেখানো এই কুহক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাহারা ছাত্র সমাজকে তন্দ্রাহত ও মোহাচ্ছন্ন করিতে চায় তাহারা ছাত্রসমাজের শত্রু; দেশ ও জাতির বৈরী। নিজেদের দূষিত স্পর্শ জনসাধারণের দেহে সংক্রামিত করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই; তাহাদের অধিকার নাই প্রকাশ্য দিবালোকে স্বচ্ছন্দ বিচরণের অন্ধকারের জীব যাহারা বিষধর সর্পের ন্যায় অন্ধকার বিবরেই তাহারা পুনঃ প্রবিষ্ট হোক।' —জনসেবক।

পরীক্ষার ফল

'লোক দেখানো সিলেবাস এবং শুনিয়া শোভন প্রশ্ন জাহির করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার হলে লঙ্কাকাণ্ড ডাকিয়া আনিতেছেন—ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। কলেজে সিলেবাস শেষ হয় না এবং প্রশ্নপত্র অনাবশ্যক কঠিন হয়, উহাতে ভুল থাকে। ইহা শুধু ছাত্রদের নয়, সর্বসাধারণের অভিযোগ। অর্থনীতিতে এম, এ পরীক্ষায় ষ্ট্যাটিষ্টিক্স পত্রে পরপর দুই বৎসর একই অঙ্ক ছিল এবং অঙ্কটা ছিল ভুল। এবারও প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে ভুল ছিল। পড়ানো এবং প্রশ্ন রচনায় সতর্কতা অবলম্বনের পরিবর্তে গোপনে উহার যে চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করিয়াছেন তাহা আরও মারাত্মক। এবার বি, এতে ইংরেজীতে ১২, ইতিহাসে ৬, অর্থনীতিতে ৬ এবং তার উপর এগ্রিগেটে ৮ গ্রেস দেওয়া হইতেছে। বি, এস, সি-তে দেওয়া হইতেছে অঙ্কে ১২, কেমিষ্ট্রিতে ৬, ফিজিক্স ৬ এবং এগ্রিগেটে ৮। তাহাতেও না কুলাইলে রি-একজামিন এবং ট্যাবুলেটারের গ্রেস। কিন্তু একটা কথা। মার্কশীটে গ্রেস মার্কগুলি আলাদা দেখাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রেসে পাশ সারা ভারতের চোখে ইহা দর্শাইয়া দেওয়ার কি প্রয়োজন? অঙ্কেরা তো তাহা বুঝে না।'
—যুগবাণী।

ধন্যবাদ

'পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিলটি বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন স্পষ্টভাবে বলেননি যে, জনমতের চাপেই তিনি এই বিলটি প্রত্যাহার করলেন। তবে এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা যে কোন ব্যক্তিই অবগত আছেন। সে জনমতকে উপেক্ষা করে এই বিল ভোটের জোরে পাশ করিয়ে নিলে তার ফল শুভ হত না। এ সম্পর্কে পাঠকের স্মরণ আছে বোধ হয় আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলাম এবং তাতে বিলটি বাতিলের প্রস্তাব জানিয়েছিলাম; অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভা এতে সম্মত হওয়ায় আমরা তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'
—জনমত।

জ্ঞান লাভে এত বিলম্ব

'উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি, কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি ও ভিত্তির উপর গড়িয়া না তোলায় সকল জায়গা হইতেই বহুদিন ধরিয়া আপত্তি উঠিয়াছিল: কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে যাঁহারা মুরুব্বী সাজিয়াছেন, তাঁহারা কি সহজে ভুল স্বীকার করিবেন? তা করেন নাই বলিয়াই এতকাল চলিয়াছিল। এখন বহু ছেলেমেয়ের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, বহু অর্থের অপচয় ঘটাইয়া, বহু সময় নষ্ট করিয়া, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যথাযথ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক নয়, সুতরাং এ পথে আর অগ্রসর না হওয়ার কথা এখন তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক প্রশ্ন কোনটাই বা জনসাধারণের সকল অবস্থা বিবেচনা করত সুষ্ঠু নীতির উপর করা হইয়াছে?' —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

বৈরী পাকিস্তান

'আসাম ও ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ মুস্লিম আগমনের পেছনে পাকিস্তানী সরকারের প্ররোচনা ছিল সেকথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। একদিকে পাকিস্তান হইতে হিন্দু বিতাড়ন আর একদিকে পূর্ব ভারতে পাক-মুস্লিম প্রেরণ এই দুইটি কাজ কখনও অভিন্ন ছিল না এবং আজও নাই। আসাম ও ত্রিপুরাকে মুস্লিম মেজরিটি রাজ্যে পরিণত করাই পাকিস্তানের আসল মতলব। এই দুইটি রাজ্য হইতে অল্পসংখ্যক পাকিস্তানী চলিয়া যাইতে না যাইতেই পাকিস্তান কেন গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে তাহার কারণ সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাক-মুস্লিমের ভারত ত্যাগ একটা উপলক্ষ মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত জেলার হিন্দুদের বিদায় করিতে না পারিলে পাকিস্তানের আসল স্বপ্ন স্বার্থক হয় না। পাকিস্তানের কাছে হিন্দুরা পঞ্চমবাহিনী। সীমান্তবর্তী জেলাগুলি হইতে পাকিস্তান আবার ঐ পঞ্চমবাহিনী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে লঙ্কাকাণ্ড শুরু করিয়া দিয়াছে। পঞ্চমবাহিনীরা সীমান্ত হইতে চলিয়া গেলে নয়া দোস্ত চীনের দৌলতে বহু দিনের আকাঙ্খাটা যদি মিটিতে পারে। লাল চীন আবার ভারত আক্রমণ করিলেই পাকিস্তান তখন কোন মূর্তি ধারণ করিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।'
—সেবক (আগরতলা)।

খাদ্য-সঙ্কটের অবসান চাই

'চোদ্দ-পনের বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল; কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামান্য কিছু সুবিধা হওয়া দূরের কথা। ১৩৭০ সালে—নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্যবৃদ্ধি সারা দেশবাসীর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া আনিতেছে না কি? খাদ্য না পাইয়া মানুষ মারা গেলে কেহই এ স্বাধীনতা চাহিবে না ইহাও অনস্বীকার্য। ইংরাজ আমাদের দুইশত বৎসরাধিককাল পরাধীন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল বিশেষ করিয়া এক মাত্র এই কারণে যে, মানুষ খাইয়া-পরিয়া সুখে ছিল। ইহা অস্বীকার করা চলে না। যখনই তাঁহারা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে পেটে মারিতে চাহিয়াছে তখনই তাঁহাদের সিংহাসন টলিয়াছে। বাংলার দরিদ্র এবং সাধারণ মানুষের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের দুর্দশা আজ চরমে উঠিয়াছে। চাউল ক্রয় করিতে না পারিয়া বহু মানুষ শাক, পাতা, ওল, কচু খাইয়া জীবনধারণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। কতদিন এই ভাবে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে? অনাহারে তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবার অর্থ কি থাকিতে পারে।' —মেদিনীপুর হিতৈষী (মেদিনীপুর)।

বীরভূমের অবস্থা

'বীরভূমের রাজনগর, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, নানুর, সাঁইথিয়া, নলহাটী এবং মৌড়েশ্বর প্রভৃতি থানায় দরিদ্র-মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরে ঘরে অনাহার-অর্দ্ধাহারের সঙ্গে এই জেলায় বিভিন্ন শহর বা গ্রামাঞ্চলের মানুষও চাউলের অগ্নিমূল্য আর অভাবের তাড়নায় বিপর্যস্ত হইতেছে। সারা বীরভূমে চৌদ্দ লক্ষ অধিবাসীর অধিকাংশ আজ অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করিতেছে। বীরভূমের চাউল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত-পথ দিয়া কোন অতলে তলাইয়া যাইতেছে কে তাহার সংবাদ রাখে? সীমান্তে কি পরিমাণ চাউল যাইতেছে আর সেই চাউল পাকিস্তানে চোরাই-চালানদারদের সহযোগিতায় বীরভূমের লোভী মিল-মালিকের স্ফীত উদর অধিকতর স্ফীত করিতেছে—সরকারী শাসন-যন্ত্র এই ব্যাপারে কতখানি সচেতন এবং সক্রিয় তাহা কে বলিবে? এখনই সীমান্তে চাউল প্রেরণ বন্ধ করা যায় না কি? একটু সংবাদ নিলেই দেখা যাইবে, বীরভূম হইতে যে চাউল বাহিরে চালান যাইতেছে তাহার একটা বিরাট অংশই যাইতেছে পাক্-সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। সেখান হইতে অনায়াসেই চোরাই-চালানদারদের সহযোগিতায় এইসব চাউল পাকিস্তানে পাচার হইতেছে। এই জেলার কোন কোন মিল-মালিক এই কসাই-বৃত্তিতে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে—কালোবাজারের কালো অর্থের লোভে অধিকতর বেপরোয়া হইয়া এই হীন ও জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইহার ফলে এখানেও চাউলের বাজারে অগ্নিমূল্য বিরাজ করিতেছে! চোরাবাজারী অর্থের লোভে যাহারা দেশদ্রোহিতা করিতেছে, দেশের মানুষের মুখের গ্রাস লইয়া জঘন্য কসাই-বৃত্তিতে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের জন্য আইনের কঠোরতম প্রয়োগের কথাই চিন্তা করিতে হইবে। একথা সত্য যে সরিষা দিয়া এই ভূত তাড়ান যাইতে পারে সেই সরিষার মধ্যেই ভূত ঢুকিয়া আছে! তাই চতুর মিল মালিকরা যেমন আইনের ফাঁকী দিতে সক্ষম, পুলিশও তেমনি নীরব! একদিকে চাউলের বাজারের অগ্নিমূল্যে সাধারণ মানুষ বিপন্ন বোধ করিতেছে, অন্যদিকে বীরভূমের চাউল অন্য রাষ্ট্রে পাচার হইতেছে! এর উপর প্রাত্যহিক জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির কঠিন বন্ধন দিন দিনই দৃঢ়তর হইতেছে! এই অবস্থার চাপেই আজ বীরভূমের অবস্থান অসহনীয় আর বীরভূমের সাধারণ মানুষ জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত।

—বীরভূমবার্তা (সিউড়ি)।

গৃহ সঙ্কট

'আসানসোল জেলা হোক বা না হোক কিন্তু আসানসোল কোর্টের স্থানাভাব দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতেছে। সরকারী উচ্চ কর্তৃপক্ষ মহল এতদিন এবং এখনও এ বিষয়ে চোখ মুদিয়া আছেন। স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা কাজের অসুবিধা দীর্ঘদিন ধরিয়া ভোগ করিতেছেন তাঁহারা তাঁহাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কোনরূপ সুরাহা না করিতে পারিয়া অবশেষে তাঁহারা সাবরেজেষ্ট্রি অফিসটি দখল করিয়া স্থান সঙ্কুলানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে না তাঁহারা যে অসুবিধার মধ্যে আছেন সেই অসুবিধাতেই থাকিবেন, নূতন গৃহ নির্মাণ না করা পর্যন্ত আসানসোল আদালতের স্থানাভাবের কষ্ট কখনই মিটিবে না! ফৌজদারী আদালতটি দ্বিতল করিয়া এখনই স্থানাভাবের সমস্যা মেটান যায় এবং কোর্ট প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি বাড়ী নির্মাণের চেষ্টা করা উচিত। এ ছাড়া সরকারী কর্মচারী (কি উচ্চপদস্থ কি নিম্নপদস্থ) দের বাসগৃহ নির্মাণেও হাত দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিলম্ব করা চলে না অপরপক্ষে পুলিশ লাইনে ডি এস পি প্রভৃতির বাসগৃহ নির্মাণ করা উচিত। এবং বর্তমানে পুলিশ লাইনে পুলিশের জন্য যে মেসগৃহ আছে তাহা মানুষের বসবাসের অযোগ্য তাহারা যাহাতে মানুষের মত থাকিতে পারে সেইরূপ বাসভবন নির্মাণ করা আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাবরেজেষ্ট্রি অফিসটি কোর্ট প্রাঙ্গণ হইতে সরাইলে কোর্টের স্থানাভাবের সমাধান মিটিবে না কিন্তু জনসাধারণের চরম অসুবিধা হইবে। জনগণের সরকারের জনসাধারণের অসুবিধা যাহাতে না হয় তাহাই দেখা কর্তব্য। আমাদের অনুরোধ। সরকার সাবরেজেষ্ট্রি অফিসটি স্থানান্তরিত না করিয়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করুন।' —জি, টি, রোড (আসানসোল)।

পশ্চিমবঙ্গ ও ডি, ভি, সি,

'ডি, ভি সি, পশ্চিমবঙ্গকে হতাশ করিয়াছেন সব দিক দিয়াই। সেচের কথা ধরা যাউক। রবি ও খারিফ চাষে ডি, ভি, সি, সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। অতিরিক্ত আরও এক মিলিয়ন একরে খারিফ চাষের জন্য জল সরবরাহ করিতে ডি, ভি, সি, কখনও সক্ষম হইবেন না। আশা ছিল ডি, ভি, সি-র কল্যাণে দামোদর উপত্যকায় পশ্চিমবঙ্গে বারোমাস চাষ আবাদ হইবে। সে আশা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নৌ-চলাচল লক্ষ্য করিয়া ডি, ভি, সি-র যাত্রা শুরু হইয়াছিল। এগুলির পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপনান্তে ডি, ভি, সি, এখন শিল্পের জন্য জল, বিদ্যুৎ ও তাপ বিদ্যুৎ সরবরাহের পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার পরিণতিকে সাবাস না দিয়া পারা যায় না। যদি ধরা যায় যে,

ডি. ভি. সি-র বাঁধসমূহ একশত বৎসর টিকিয়া থাকিবে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাবদ পশ্চিমবঙ্গকে প্রতি বৎসর ৮৬ লক্ষ টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে একশত বৎসরে পশ্চিমবঙ্গকে অন্য ব্যয়সহ এ বাবদ ১১০০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। সুদের কথা বাদই দেওয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গ ডি. ভি. সি-র নিকট হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা অব্যাহত থাকিলেও এক শত বৎসরেও এই মূল্যের সম পরিমাণ কল্যাণ পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জুটিবে না। ডি. ভি. সি. ব্যয়বহুল, অক্ষম পরিচালনা হইতে মুক্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ যদি ডি, ভি, সি-র সুষ্ঠ ব্যবস্থা পরিচালিত করার সুযোগ পান তাহা হইলে হয়ত সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শিল্পের পরিবর্তনশীল পরস্পর বিরোধী দাবীসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সর্বাধিক কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য প্রয়াসী হইতে পারেন। ডি, ভি, সি-র বোধোদয় হউক। পশ্চিমবঙ্গের পথ বাধামুক্ত হউক।'

—দৃষ্টি (বর্ধমান)

কনজিউমার্স- কোঅপারেটিভ

'সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ নামক এক প্রকার সংস্থার জন্ম হইয়াছে। এই সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য হইল বাজার অপেক্ষা স্বল্পমূল্যে (সরকার নির্ধারিত দরে) জনসাধারণকে চাউল, ডাইল, চিনি, গম প্রভৃতি বিক্রয় করিবে। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই এবং এই সমবায় প্রথার প্রসারের উদ্দেশ্যকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এই গরীব দেশে প্রতিটি স্তরের মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি সেই দিনই মিটিবে যেদিন ব্যাপকভাবে সমবায় প্রথা চালু হইবে। সমষ্টিগত শক্তির জোরেই দারিদ্র্যের সহিত লড়াই করিতে হইবে। তাই এই কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ প্রথার প্রসার এবং এর সাফল্য আমরা কামনা করি। আসানসোল শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স গঠিত হইয়াছে এবং অবধারিত ভাবেই কিছু কিছু রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়ীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে এই সমবায় উদ্যোগে ইতিমধ্যে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু চিনির পারমিট লাভ করিয়াছিল কিন্তু শোনা যাইতেছে যে, ঐ সব চিনিগুলি ঠিক সমবায় নীতি মানিয়া বিক্রয় করা হয় নাই। প্রকাশ বাজার এলাকার এই ধরণের একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান এই চিনি বিক্রয়ে যথেচ্ছাচার করিয়াছেন হটন রোডের একটি কনজিউমার্স প্রতিষ্ঠান চিনির পারমিট গ্রহণ করিয়া সেই চিনি যে কি ভাবে বিক্রয় করিয়াছেন তাহাও জানা যায় নাই। মহিশীলার এই রূপ একটি তথাকথিত কো-অপারেটিভ সম্পর্কেও এই ধরণের নানা অভিযোগ শোনা যাইতেছে আমাদের মনে হয়, সরকারী কর্তৃপক্ষ এই কো-অপারেটিভগুলি সম্পর্কে যদি আরও সতর্ক এবং কঠিন না হন তাহা হইলে তাহাদের এই মহান প্রচেষ্টা কিছু সুবিধাবাদি লোকের কবলে পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং এই কো-অপারেটিভ সংস্থাগুলি রাজনীতির ডাণ্ডাগুলি খেলিবার আসরে পরিণত হইবে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে অবহিত অনুরোধ করিতেছি, কারণ এই সংস্থাগুলির সহিত বহু গরীবলোকের কষ্টার্জিত কিছু অর্থ জড়িত রহিয়াছে।'

—আসানসোল হিতৈষী (আসানসোল)

আষাঢ়, ১৩৭০ (জুন-জুলাই '৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৬ই জুন): ব্রহ্মপুত্রে প্লাবন অব্যাহত—গৌহাটিতে জলস্তর বিপদ-রেখা অতিক্রম।

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন): কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক লাডাক অঞ্চলে চীনা সৈন্যের নূতন অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার দীর্ঘ বৈঠকে রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

৩রা আষাঢ় (১৮ই জুন): 'পুরুলিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে দারুণ খাদ্যাভাব চলিয়াছে'—লোকসেবক সঙ্ঘ (পুরুলিয়া) সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষের বিবৃতি। শ্রীনগরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা: পাকিস্তানের দাবী অনুযায়ী কাশ্মীর বিভাগ বা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ (কাশ্মীরের উপর) কোনটাই গ্রহণ করা চলে না।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন): বোম্বাইয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবনের সহিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর দীর্ঘ বৈঠক। আসাম ও ত্রিপুরায় ভূমিকম্প।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন): বিহারে কংগ্রেসের সহিত ঝাড়খণ্ড দলের অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন। ত্রিপুরায় প্রথম বিধানসভায় কংগ্রেসী নেতৃপদে শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (ভাবী মুখ্যমন্ত্রী) নির্বাচিত।

৬ই আষাঢ় (২১শে জুন): কলিকাতার জনসভায় প্রখ্যাত আইনবিদদের ঘোষণা: ভারত প্রতিরক্ষা আইন সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বিরোধী।

ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বিপদ রেখারও আট ইঞ্চি ঊর্ধ্বে।

৭ই আষাঢ় (২২শে জুন): কেন্দ্রীয় সরকার (দিল্লী) কর্তৃক লাডাক অঞ্চলে চীনাদের নূতন চৌকি স্থাপনের কঠোর প্রতিবাদ।

৮ই আষাঢ় (২৩শে জুন): শ্রীমোরারজী দেশাই কর্তৃক রহড়ায় (২৪ পরগণা) বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন—পথিমধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বর্ণশিল্পীদের বিক্ষোভ।

৯ই আষাঢ় (২৪শে জুন): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম কর্তৃক জাতীয় টেলেক্স সার্ভিসের উদ্বোধন—কলিকাতা-দিল্লী, বোম্বাই-মাদ্রাজ নূতন যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন): পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব।

স্বর্ণবিধি লঙ্ঘনকারীদের সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য সরকারী ব্যবস্থা।

১১ই আষাঢ় (২৬শে জুন): নাবিক ধর্মঘটের ফলে বোম্বাই বন্দরে অচলাবস্থা।

১২ই আষাঢ় (২৭শে জুন): বোম্বাই-এ নাবিক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার (পশ্চিমবঙ্গ) ফল প্রকাশ—স্কুল ফাইন্যালে ৩২·৫ উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা ৫১·৮৮ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য।

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন): উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবীতে শীঘ্রই বেকার স্বর্ণশিল্পীদের আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন): রুশিয়ার সহযোগিতায় গুজরাটে তৈল শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা—ভারত-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষর।
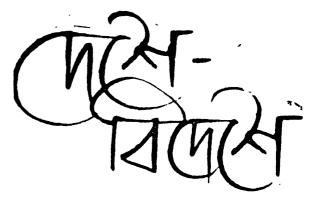
১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন): কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক অবিলম্বে দেশের জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার দাবী।

বর্ধমানের মহারাণী শ্রীমতী রাধারাণী মহতাবের (পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উপমন্ত্রী— বয়স ৫০) জীবনাবসান।

১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই): ত্রিপুরা, মণিপুর, পণ্ডিচেরী ও হিমাচল প্রদেশ—কেন্দ্র শাসিত এই কয়টি রাজ্যে লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতায় সর্বভারতীয় চিন্তাবিদ্ সম্মেলনের অধিবেশন সুরু—উদ্বোধক: প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু।

শ্রীনেহরু কর্তৃক নারিকেল ডাঙ্গায় (কলিকাতা) ডা: বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। ('বিধান দিবস'-এর অনুষ্ঠান)।

১৭ই আষাঢ় (২রা জুলাই): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীঅশোককুমার সেন (কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী) কর্তৃক 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ে নিরপেক্ষতা' সম্পর্কে ভাষণ দান—ভাষণ প্রসঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও প্রকৃত যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ।

ময়দানের (কলিকাতা) বিশাল জনসমাবেশে শ্রীনেহরুর ঘোষণা: চীনের সহিত মীমাংসা চাই; কিন্তু হামলা সহ্য করিব না।

১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই): 'পণ্য মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সমবায়ই একমাত্র পন্থা'—শ্রীগুলজারীলাল নন্দের (পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী চেয়ারম্যান) উক্তি।

১৯শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই): কলিকাতায় চিন্তাবিদ সম্মেলনে ডা: হরেকৃষ্ণ মহতাব ও কাকাসাহেব কালেলকরের ভাষণ—দেশের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই): পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রায় ২০ হাজার উদ্বাস্তুর ত্রিপুরা আগমন। (তিন মাসের হিসাব)

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই): মৎস্য ব্যবসায়ে মুনাফা শিকার বন্ধের জন্য সরকারী উদ্যম—কলিকাতা ও হাওড়ায় মৎস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি লাইসেন্স গ্রহণের নির্দেশ।

২২শে আষাঢ় (৭ই জুলাই): শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্বাচিত।

বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার শ্রীশৈলেন রায়ের (৫৩) জীবনাবসান।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই): পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল প্রত্যাহার—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক সিদ্ধান্ত ঘোষণা। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া কর্তৃক উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিভিন্ন পরাজয় সম্পর্কে তদন্ত কল্পে কমিটি গঠন।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত পৌরসভা সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের ক্ষোভ প্রকাশ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই'র মন্তব্য : স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রবর্তনের ফল ভাল হইয়াছে।

২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই) : আসাম ও ত্রিপুরা হইতে অবিলম্বে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের দাবী—জনসঙ্ঘ নেতৃমণ্ডলের প্রস্তাব।

২৬শে আষাঢ় (১১ই জুলাই) : পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলিতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ—মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিলের খসড়া অনুমোদিত।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) : ভারত-রক্ষা আইন সংবিধান বিরোধী—এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বেগ—শ্রীনেহরুর সহিত স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের বৈঠক।

২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই) : দক্ষিণ-আফ্রিকার জাহাজ ও বিমানের ভারত আগমন নিষিদ্ধ—ভারত-সরকারের কার্য ব্যবস্থা। দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহের সাক্ষাৎ—ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমনজনিত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা।

২৯শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই) : খাদ্যনীতি পরিবর্তনের দাবীতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (কলিকাতা) আট জন বামপন্থী নেতার তিন দিবসব্যাপী প্রতীক অনশন সুরু।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের প্রস্তাব—দিল্লীতে আইনমন্ত্রী শ্রীসেন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর সহিত ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংহের আলোচনা।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নূতন ইতিহাস—২৭ জন বিরোধী সদস্যের অনশন সত্যাগ্রহ—অবিলম্বে সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্তন দাবী—বিধান সভার অভ্যন্তরে প্রবল বিতণ্ডা। দণ্ডক উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান নিয়োগ সম্পর্কে কলিকাতায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীখান্নার বৈঠক।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : সরকারী খাদ্যনীতি পরিবর্তনের দাবী অগ্রাহ্য—বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের ঘোষণা—গম গ্রহণ করিলে খাদ্যসঙ্কট নাই বলিয়া মন্তব্য।

খাদ্যের প্রশ্নে কলিকাতা পৌরসভার চার জন সদস্যের অনশন। শ্রীশৈবাল গুপ্ত দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার নূতন চেয়ারম্যান মনোনীত।

বহির্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৬ই জুন) : সোভিয়েট নারী মিস্ ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভার (বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী) ভোস্তক-৬ মহাকাশযান যোগে পৃথিবী পরিক্রমা সুরু।

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন) : প্রফুমো পদত্যাগকারী বৃটিশ যুদ্ধ মন্ত্রী) কেলেঙ্কারী (মিস কিলারের সহিত অবৈধ সংযোগ সংক্রান্ত) প্রসঙ্গে কমন্স সভায় বিতর্কের সূচনা—বিরোধী নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসন কর্তৃক অভিযোগ পেশ।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন) : কর্নেল বিকোভস্কি ও মিস্ তেরেসকোভার (রুশ মহাকাশচারীদ্বয়) নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন) : আকস্মিক যুদ্ধ বন্ধের জন্য ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে 'হট লাইন' (জরুরী সংযোগ) চুক্তি স্বাক্ষর।

মিথ্যা ভাষণের (মিস্ কিলারের ব্যাপারে) দায়ে বৃটেনের প্রাক্তন যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ প্রফুমো কমন্স সভায় নিন্দিত।

৬ই আষাঢ় (২১শে জুন) : আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন হইতে বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে বহিষ্কার। ভ্যাটিকান সিটি হইতে ঘোষণা : কার্ডিনাল বাতিস্তা মন্তিনি (মিলান) নূতন পোপ নির্বাচিত।

৮ই আষাঢ় (২৩শে জুন) : মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির পশ্চিম জার্মানী সফর।

৯ই আষাঢ় (২৪শে জুন) : জাঞ্জিবারের (বৃটিশ রক্ষণাধীন) স্বায়ত্তশাসনাধিকার অর্জন।

১১ই আষাঢ় (২৬শে জুন) : বিশ্ব নারী সম্মেলনে (মস্কো) চীনা প্রতিনিধিদের নাজেহাল—ভারতের উপর চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মেলনে প্রবল উত্তেজনা।

১২ই আষাঢ় (২৭শে জুন) : ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকার্ণোর করাচী সফর শেষ—পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সহিত যুক্ত ইস্তাহারে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন) : পর্তুগালের সহিত মিশরের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন।

১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন) : ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাহায্যদানে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মধ্যে মতৈক্য—উভয়ের মধ্যে বৈঠক।

১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই) : লাওস সমস্যা মীমাংসার প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বৃটেনের মতদ্বৈধতা।

১৯শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই) : আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন হইতে পর্তুগালকে বহিষ্কার।

পর্তুগালের সহিত ইথিওপিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই) : তাত্ত্বিক বিরোধ মীমাংসায় মস্কো-এ প্রস্তাবিত চীন সোভিয়েট বৈঠক সুরু—বৈঠকের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই) : মার্কিন সরকার কর্তৃক কিউবার সহিত আর্থিক লেন-দেন নিষিদ্ধ।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই) : লণ্ডনে মালয়েশিয়া ফেডারেশান চুক্তি স্বাক্ষরিত—চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী : বৃটেন, মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্ণিও (বৃটিশ) ও সারওয়াক।

২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই) : মস্কো আলোচনায় (চীনা-সোভিয়েট অচলাবস্থা সৃষ্টির সংবাদ।

২৬শে আষাঢ় (১১ই জুলাই) : ইকুয়েডরে সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রেঃ জুলিও আরোসেমেনা পদচ্যুত।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে মস্কো-এ ত্রিশক্তি (ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েট) আলোচনা আরম্ভ।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : ভারতের জন্য অস্ত্র পাওয়ার আশায় কেন্দ্রের অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীভূতলিঙ্গমের নেতৃত্বে একটি মিশনের মস্কো উপস্থিতি।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : মস্কো-এ শ্রীভূতলিঙ্গম মিশনের (ভারত) আলোচনা সুরু।

তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নয়

[খ]

স্বামীর কথাগুলো শুনে সুলোচনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন এবং সব-কিছু যেন তাঁর কেমন গোলমাল হ'য়ে যায়। তবে কি ঐ পর্তুগীজ সুন্দরসাহেব একই ব্যক্তি নয়, যে কৃষ্ণনগরে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে এক রাত্রে হামলা দিয়ে পড়ে মৃন্ময়ীকে লুঠ করে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু আবার মনে হয় হয়ত আসলে সুন্দরসাহেবের কোন স্ত্রীই নেই। যাকে স্ত্রী বলে সে কানা কবিরাজের কাছে পরিচয় দিয়েছে আসলে সে তার স্ত্রীই নয়। সেই হয়ত মৃন্ময়ী, কিন্তু নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে উত্থানশক্তি রহিত বাকশক্তিও রহিত মৃন্ময়ী হবে কেন?

সুলোচনা সে সময় কথাটার আর উত্থাপন না করলেও—রাত্রে আহারাদির পর হরনাথ যখন নিজের শয়নকক্ষে বসে হুঁকাটি হাতে তামুক সেবন করছে সেই সময় সামনে এসে আবার কথাটি তুলল।

বলছিলাম কি, তুমি আর একবার ভাল করে খোঁজ করে দেখো।

কথাটা এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিল। তাই স্ত্রীর প্রশ্নে বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ কথাটা সুলোচনা?

বলছিলাম ঐ পর্তুগীজটার কথা!

ও সুন্দরসাহেবের কথা বলছো?

হ্যাঁ, কানা কবিরাজ না জানলেও অন্য কেউ নিশ্চয়ই তার খবর দিতে পারবে। এখানে যখন তার যাতায়াত আছে ও অনেকেই তাকে চেনে, খোঁজ করলে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হয়ত তার খবরটা পাওয়া যাবে।

তোমার কি স্থির ধারণা সুলোচনা, ঘাটে নৌকার 'পরে দণ্ডায়মান যাকে দেখেছো এবং সে ঐ একই ব্যক্তি যে সে রাত্রে কৃষ্ণনগরে তোমার দাদার বাড়িতে গিয়ে মৃন্ময়ীকে লুঠ করে এনেছে।

আমার ধারণা তাই।

পর্তুগীজরা সব প্রায় চেহারায় ও পোষাকে একই রকম দেখতে। সে কারণে তোমার ভুলও ত' হ'তে পারে।

হ্যাঁ, তা হতে পারে না এমন নয়। তবে আমার ধারণা, ভুল আমার হয় নি।

কিন্তু আর একটা কথা ভেবে দেখেছো কি?

কি?

ব্রাহ্মণ কন্যা মৃন্ময়ী। তাকে বিধর্মীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। একদিন দুদিন নয় ত' প্রায় মাসাবধিকাল হতে চলল, সেক্ষেত্রে তাকে যদি আবার ফিরে পাওয়া যায়ও ঘরে কি তাকে আর নিতে পারো?

সত্যিই। মিথ্যা ত' নয়।

মিথ্যা ত' বলে নি তার স্বামী।

আজ মৃন্ময়ীকে আবার ফিরে পাওয়া গেলেও ত' গৃহে স্থান দেওয়া যাবে না। জন্মের মতই ত' গৃহের দ্বার তার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ধর্মে পতিতা, সমাজ বহিষ্কৃতা আজ মৃন্ময়ী।

শুধু কি তাই—ব্রাহ্মণের কুমারী-কন্যা। বিধর্মী এক পুরুষের ঘরে এতদিন ছিল—আজ আর তার ধর্ম নেই, জাতি নেই, চরিত্র নেই। সে আজ আর তাদের কেউ নয়।

তার নিজের কোন দোষ নেই অথচ সে আজ তাদের কেউ নয়। তাদের সংসারে ত' নয়ই এত বড় হিন্দু সমাজেও আজ আর তার এতটুকু স্থান নেই।

আর একটি কথাও বলতে পারে না সুলোচনা। ধীরে ধীরে এক সময় স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে অন্ধকার বারান্দায় খুঁটিটা হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

অন্ধকার আকাশ।

কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত।

এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত তারাগুলো চোখে পড়ে। যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ছাড়া ছাড়া হয়ে রাত জাগছে। বিচিত্র হিন্দু সমাজ। বিচিত্র তার বিধান কানুন। নারীর জন্য স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ ব্যবস্থা আর পুরুষ একের পর এক স্ত্রী গ্রহণ করবে তাতে কোন দোষ নেই, কোন অপরাধ নেই। স্ত্রী বর্তমানে অন্য নারীতে ব্যভিচারী—তাতে কোন অপরাধ

সেই সমাজ বিধানে কিন্তু নারীর বেলায় সে কুলটা—অসতী। আশ্চর্য! ঐ অন্যায় বিধান যুগে যুগে সব নারীরাই মেনে আসছে কোন কথাই বলে নি আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতেও বলবে না।

সুলোচনা ও মৃন্ময়ীরা চিরকাল এমনি করেই মরবে—দলিত হবে—পিষ্ট হবে—এ যেন তাদের লিখিত ভাগ্য। এ দেশে হিন্দুর ঘরে জন্মে ঐটুকুও যেন তাদের প্রাপ্য।

মৃন্ময়ীকে আজ আর ঘরে নেওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া গেলেও নেওয়া যাবে না। নিজে ফিরে আসতে পারলেও হিন্দুর গৃহে আজ আর স্থান নেই। তার অপরাধ তার হিন্দু মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে নি যেদিন একজন বিধর্মী ডাকাত তাকে লুঠ করে নিয়ে আসে।

আশ্চর্য! সুলোচনাই বা আজ এসব কথা ভাবছে কেন? এ সব কথা ভেবেই বা লাভ কি! হাসি পায় সুলোচনার। সে সত্যিই পাগল নচেৎ এখনো মৃন্ময়ীর কথা ভাবে।

হরনাথ মুখে স্ত্রীকে যাই বলুক না কেন কথাটা সে ভোলে নি। সুযোগ বা সুবিধা হলেই তারপর থেকে সে সুন্দরসাহেবের খোঁজ করত। পরিচিত একে ওকে তাকে সুন্দরসাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করত।

মাসখানেক পরে আবার অকস্মাৎ একদিন সুন্দরসাহেবের সঙ্গে হরনাথের দেখা হয়ে গেল সুধামাধবের গদিতেই।

সুন্দরম এসেছিল কিছু স্বর্ণালঙ্কারের বদলে কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে। এবং বোধ হয় সেই সব কথাই হচ্ছিল নিম্নকণ্ঠে উভয়ের মধ্যে।

হরনাথ গদিতে প্রবেশ করতেই ওরা থেমে যায়।

সে রাত্রের পর হরনাথ আর সুধামাধবের চালের কারবারের গদিতে পা দেয় নি! কিন্তু পা না দিলেও সমস্ত খবরই রাখত হরনাথের সুধামাধব। আজ হরনাথকে গদিতে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি সুধামাধব বলে, হরনাথ যে—এসো—এসো, তারপর খবর কি! এক যুগ দেখা সাক্ষাৎ নেই—

হরনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বর্তমান পরিস্থিতিটা চাপা দেবারই চেষ্টা করছে সুধামাধব। হরনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুন্দরসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, এই ভালই আছি।

আমাদের ত' ভুলেই গিয়েছো—সুধামাধব বলে।

না, না—ভুলব কি হে?

ওদিকে সুন্দরম উঠে দাঁড়ায়, আমি কি তাহলে আজ উঠব—বাবুজী।

হ্যাঁ, এসো সাহেব—কাল পরশু এক সময় এসো।

তা আসবো না হয় কিন্তু টাকাটার যে আমার বড় প্রয়োজন। সুন্দরম বলে।

বেশত বেশত—কাল নিও না। কাল এসো।

কিন্তু বাবুজী, টাকাটা আজই পেলে ভাল হতো।

আঃ সাহেব কেন বিরক্ত করছো। বললাম ত' কাল এসো। এবারে সুধামাধবের কণ্ঠস্বরে যেন বেশ একটু বিরক্তিই প্রকাশ পায়।

সুন্দরসাহেব আর কথা বাড়ায় না। উঠে দাঁড়ায়, আচ্ছা তবে চলি বাবুজী—

সুন্দরম গদি থেকে বের হয়ে গেল। এবং সুন্দরম গদি থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরনাথও উঠে দাঁড়ায়।

বলে, চলি ভাই—

সে কি এখুনি চললে নাকি?

হ্যাঁ—

তা কেন এলে, কি বৃত্তান্ত কিছুই ত' বললে না। এলে আর চললে—

আজ চলি ভাই। আবার একদিন আসব।

হরনাথ আর কোন কথার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সোজা গদি থেকে বের হয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল।

সুন্দরম ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

দূর থেকে দেখতে পায় হরনাথ বিচিত্রভূষা সুন্দরম হন হন করে এগিয়ে চলেছে। হরনাথও দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ করে।

কিন্তু সাহেব এমন লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে চলেছে যে হরনাথ তার নাগাল পায় না। বেচারীকে শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে হয় এবং কাছাকাছি গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, সাহেব, ও সাহেব। প্রথমটায় হরনাথের ডাক শুনতে বোধ হয় পায় না সুন্দরম।

কিন্তু আবার যখন ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকে হরনাথ, সাহেব। ও সাহেব—সুন্দরম দাঁড়াল এবং ফিরে তাকাল হরনাথের দিকে।

আমাকে ডাকছিলে বাবুজী।

হ্যাঁ—

কেন বল ত'।

তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্য তোমাকে ডেকেছি।

আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কেন বাবুজী। কিন্তু বাবুজী, আপনাকে আমি কোথায় দেখেছি বলুন ত' আগে!···হুঁ, দেখেছি।

আমাকে?

হ্যাঁ, আপনাকে দেখেছি! দাঁড়ান, হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে। আপনাকে আমি দেখেছি ঠাকুরমশাই, মানে কবিরাজ মশাইয়ের ওখানে। তাই নয় কি বাবুজী। আপনার স্ত্রী খুব অসুস্থ ছিলেন আপনি কবিরাজ মশাইকে ডাকতে এসেছিলেন—

হ্যাঁ—আমি গিয়েছিলাম।

কেমন আছেন এখন আপনার স্ত্রী বাবুজী।

সে নেই স্বর্গে গিয়েছে—

আহা!

তোমার স্ত্রীরও ত' অসুখ শুনেছিলাম সাহেব, সে এখন কেমন আছে?

আমার স্ত্রী!

একটু যেন চমকে ওঠে কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরম।

হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীর। কথাটার পুনরাবৃত্তি করে হরনাথ।

সে ভালই আছে বাবুজী।

পক্ষাঘাত হয়েছিল শুনেছিলাম।

পক্ষাঘাত। কে বললে?

কবিরাজ মশাই বলছিলেন। বাক্‌শক্তিও ছিল না।

হ্যাঁ—এখন, এখন ভাল হয়ে গিয়েছে—আচ্ছা বাবুজী আমি চলি—সেলাম। কথাটা বলে সুন্দরম আর দাঁড়াল না।

হনহন করে সোজা চলে গেল।

হরনাথ স্পষ্টই বুঝতে পারে কতকটা যেন ইচ্ছা করেই তাকে এড়িয়ে চলে গেল সুন্দরসাহেব। তার স্ত্রীর প্রসঙ্গ নিয়ে কোন আলোচনা করতে চায় না বলেই যেন চলে গেল বলে মনে হলো তাকে এড়িয়ে।

হরনাথ সুন্দরসাহেব চলে যাবার পরও পথের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত। বুঝতে ঠিক পারে না কেন সুন্দরসাহেব তাকে এড়িয়ে গেল। ইচ্ছা করেই কি তাহলে সে তার স্ত্রীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। হয়ত তাই। কিন্তু কেন?

মিথ্যা নয় সুন্দরম ইচ্ছা করেই প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি হরনাথের কাছ থেকে সরে গিয়েছিল।

মনটা সেদিন থেকে সত্যিই সুন্দরসাহেবের বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। যেদিন করালীচরণ মৃন্ময়ীকে পরীক্ষা করে যাওয়ার সময় অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বলে যায়, ও বোধ হয় তোর সঙ্গে কথা বলতে চায় না তাই।

তারপর শেষ কথা বলেছিলেন, বেটা মূর্খ, গাড়োল।

কবিরাজের কথাগুলোর তাৎপর্য প্রথমটায় বুঝতে না পারলেও পরে ভাবতে ভাবতে সুন্দরমের মনে হয়েছে একটা অর্থ যেন কোথায় কথাগুলোর আছে। একটা বাঁকা অর্থ।

তারপরই মনে হয়েছে সুন্দরমের, সত্যিই কি সে মূর্খ, গাড়োল।

হয়ত তাই। সত্যিই হয়ত সে মূর্খ—গাড়োল।

আসল কথাটা সত্যিই সে বুঝতে পারে নি। কিন্তু সে বুঝতে পারে নি। ভাবতে ভাবতেই চকিতে একটা কথা মনে পড়ে যায়, তবে কি মৃন্ময়ীর সবটাই মিথ্যা—সবটাই ভাণ। না, না—সে কি করে হবে। দিনের পর দিন কেউ অমন মিথ্যা ভাণ করে পড়ে থাকতে পারে না তাই কি সম্ভব। কিন্তু যে ভাবেই ভাবুক সুন্দরম্ মনের মধ্যে যেন শান্তি পায় না। দুশ্চিন্তার কীট কোথায় যেন মনের মধ্যে অদৃশ্য বাসা বেঁধেছে, সর্বক্ষণ সেই কীটটা নিঃশব্দে ভিতরে ভিতরে বক্ষ ক্ষরণ করিয়ে চলে। একবার ভাবে সোজাই গিয়ে সে মৃন্ময়ীকে সব কথা জিজ্ঞাসা করে। আবার মনে হয় তাতেই বা লাভ কি! কি হবে আর তার সে কথা জেনে। যদি ব্যাপারটা সত্যিই প্রমাণিত হয় তারপর তার আর কি বাকী রইলো। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যে সে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখল এতদিন, সেই ঘরই যদি গুঁড়িয়ে গেল ত' কি আর তার রইলো। একটা শূন্যতা, একটা হাহাকার যেন সুন্দরমের বিরাট বুকখানাকে থেকে থেকে তোলপাড় করতে থাকে। ভেবে পায় না সুন্দরম কানা কবিরাজের কথাই যদি সত্য হয়ত, কেন! কেন মৃন্ময়ী এমন ব্যবহার তার সঙ্গে করবে। সত্য তাকে সে জোর করে লুঠ করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ত' কোন অসম্মান করে নি, কোন রকম দুর্ব্যবহারও তার সঙ্গে করে নি। তবে? তবে কেন এমন ব্যবহার করবে মৃন্ময়ী তার সঙ্গে। কিন্তু মনে মনে মৃন্ময়ী সম্পর্কে যাই ভাবুক সুন্দরম সোজাসুজি সামনে গিয়ে সে কথাটা মৃন্ময়ীকে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না।

এদিকে ব্যবসা করবে বলে আড়ৎ খুলেছিল চালের—চাল সংগ্রহের জন্য এমাদুল্লাকে নৌকা দিয়ে পাঠিয়েছিল সোজা একেবারে বাখরগঞ্জ। আজই সকালে নৌকা এসে ঘাটে ভিড়েছে। এখন আবার অর্থের প্রয়োজন। কারণ হাতের অর্থ চাল কিনতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই টাকার জন্যই সুন্দরম সুধামাধবের গদিতে গিয়েছিল। গিয়েছিল বটে কিন্তু মনের মধ্যে যেন আর কোন রকম সাড়া বা উৎসাহ পাচ্ছিল না। বিশ্রী একটা অনাসক্তি যেন সর্ব ব্যাপারে মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

সুধামাধবের গদি থেকে বের হয়ে সোজা সুন্দরম ঘাটের দিকেই চলে। ঘাটে পৌঁছাতেই প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। আবছা অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে। বিসমিল্লাবাহী নিজের নাওটার দিকে এগুতে যাবে হঠাৎ পাশ থেকে চাপাকণ্ঠে কার যেন ডাক শোনা যায়।

কাপিতান।

কে?

আবছা একটা ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে আসে সুন্দরমের সামনে।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সুন্দরম। আবার প্রশ্ন করে সে, কে?

আমি। ডি' কুনহা।

ডি' কুনহা?

হ্যাঁ, আমি মরি নি। হাতে ছোরা বিদ্ধ হয়ে বসে পড়েছিলাম সে রাত্রে ঘরের মধ্যে—তুমি ত' পালালে কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লাম।

ধরা পড়েছিলি?

হ্যাঁ, উপায় কি! তার পর যে মারটা খেয়েছি—মারতে মারতে অজ্ঞান করে নদীর ধারে মরা বলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাক সে কথা। এখানে এসে খোঁজ করে তোমার বা তোমার নাওর কোন সন্ধান না পেয়ে চুঁচড়োয় তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

মা।

হ্যাঁ··বুড়ি ভায়লা এবারে যাবে। খুব অসুস্থ—

কি হয়েছে মার।

তা জানি না, তবে তোমাকে দেখবার জন্য একবারটি পাগল হয়ে উঠেছে। তুমি পারত আজই রাত্রে রওনা হয়ে পড়, নচেৎ হয়ত তাকে দেখতে পাবে না।

[ক্রমশ

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

—রবীন্দ্রনাথ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র —

গত ১০ই জুন ওয়াশিংটনে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেছেন যে, রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধের উপায় উদ্ভাবন মানসে একটি শীর্ষসম্মেলনের আয়োজনে সম্মত হয়েছেন।

এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে এবং অন্যান্য দেশ পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা সুরু না করলে আমেরিকাও আর সে পরীক্ষা আরম্ভ করবে না।

তাঁর মতে বর্তমান যুগে সর্বাত্মক যুদ্ধ নিতান্ত অর্থহীন, কারণ বর্তমানে একটি পারমাণবিক বোমার যা ধ্বংসক্ষমতা গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সমগ্র বিমানবাহিনীর সাকুল্য বোম, বর্ষণের তা সমতুল। উপরন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণের যে বিষবাষ্প চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে তার ফলও মারাত্মক। ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও পরবর্তী বংশধরগণের জীবনে তা এনে দেবে রোগ এবং পঙ্গুতা।

শুধু তাই নয়। প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে এই অস্ত্রপরীক্ষার জন্য, অথচ পারমাণবিক অস্ত্র সঞ্চিত থাকলেও শান্তির পথ যে এতে প্রশস্ত হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আসলে শান্তির মণিকোঠার দ্বার কোন একটি চাবি দিয়ে খোলা কখনই সম্ভব নয়।

শান্তির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, শান্তি অর্থে শুধু এটাই বোঝায় না যে প্রতিটি মানুষ তার প্রতিবেশীকে ভালবাসতে বাধ্য। পারস্পরিক সহনশীলতাই হচ্ছে শান্তির মূল ভিত্তি এবং যখনই কোন দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ উপস্থিত হবে তখন তা সমাধান করতে হবে যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, ন্যায়-ভিত্তিক-শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে।

তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে অন্য সব বিষয়ে যত মতান্তরই থাকুক না কেন একটি ব্যাপারে তারা একমত। উভয়েই তারা যুদ্ধবিরোধী।

বর্তমান বিশ্বের উত্তেজনার কারণ হিসেবে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, কম্যুনিষ্টরা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলপূর্বক অন্য রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। তিনি এই জানিয়েছেন যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে বোঝাপড়ার পথের অন্তরায় অপসারিত হবে।

যত কঠিনই হোক, প্রেসিডেন্ট কেনেডির বাসনা যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টায় ক্ষান্তি দেবে না। তার মতে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রয়াস বর্তমানে অনেক আশাপ্রদ। তাই তিনি বলেছেন যে, মস্কোতে যে সম্মেলন হওয়ার কথা তাতে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বর্জন করার নতুন এক ব্যাপক চুক্তিপত্র সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি কুখ্যাত কু, ক্লাক্স ক্ল্যান দলভুক্ত কাপুরুষ শ্বেতাঙ্গ আততায়ী কর্তৃক মিসিসিপির দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রো নেতার হত্যাকাণ্ডকে অত্যন্ত মর্মান্তিক, শোচনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য ঘটনা বলে তীব্র নিন্দা করেছেন। নিহত নিগ্রো নেতার নাম মেডগার ইভান্স, বয়স ৩৭। মিঃ কেনেডির ভ্রাতা আমেরিকার এ্যাটর্নী জেনারেল মিঃ রবার্ট এফ, কেনেডি বলেন যে, এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, হত্যাকারী খুঁজে বার করার জন্য ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশনকে জ্যাকসন পুলিশের অধীনে নিয়োজিত করা হবে। সাধারণত ফেডারেল ব্যুরো 'ক্রিমিনাল কেস' সম্পর্কে তদন্ত করে না। এ কাজ রাষ্ট্রের পুলিশ কর্তৃপক্ষেরই করার কথা। তবে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক জাতীয় নীতির সহিত সম্পর্কযুক্ত বিধায় প্রেসিডেন্ট কেনেডি ফেডারেল পুলিশের হাতে তদন্তের ভার দিয়েছেন।

গত ১১শে জুন কংগ্রেসে এক বাণী পাঠিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডি আমেরিকা থেকে বর্ণ বৈষম্য বিদূরিত করার প্রস্তাব করেছেন। হোটেল, রেস্তোঁরা, সাধারণ প্রমোদাগার প্রভৃতি এবং স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে এই বর্ণ-বৈষম্য নীতি প্রযুক্ত হলে তা হবে আইন বহির্ভূত।

১৯৬৩ সালের প্রস্তাবিত সিভিল রাইট এ্যাক্টের সমর্থনে এই বাণী প্রেরিত হয়েছে। তাতে রয়েছে তিনটি ব্যবস্থার প্রস্তাবনা।

প্রথমত, মানবশক্তি উন্নয়নের প্রসার ও ব্যাপক শিক্ষার দ্বারা নিগ্রোদের বেকারত্বের সঙ্কোচন। দ্বিতীয়ত, কর্মে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে বর্ণ-বৈষম্যের উচ্ছেদ। তৃতীয়ত, ন্যায্য নিয়োগের নীতি সংক্রান্ত বিধি-প্রণয়ন যাতে নিগ্রো সহ আমেরিকার সকল নাগরিকের পক্ষে ন্যায় সঙ্গত কর্মলাভের সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি।

এই আইন যখন বলবৎ হবে তখন নিগ্রোদের পক্ষে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে বিষম অবিচারের বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে তার শেষ গ্রন্থিটুকু পর্যন্ত অপসারিত হয়ে যাবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন—

গত ১০ই জুন মস্কোতে হ্যারল্ড উইলসন যখন ক্রুশ্চেভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে বহু প্রকারের তত্ত্ব-আলোচনা হয়েছিল সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে সুরু করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং পূর্ব-পশ্চিমের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাও হয়েছিল দু'জনের মধ্যে।

আলোচনার সময় উইলসনের সঙ্গে ছিলেন লেবার পার্টির অন্যতম দুই নেতা—প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার এবং জন ষ্ট্যাচার

বাইকভস্কি

এম, পি। সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকোও এই আলোচনার সময় তাঁদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন।
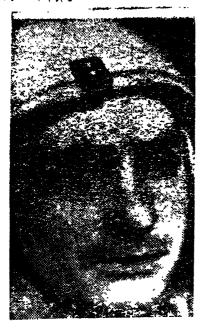
সোভিয়েট সরকার এবং সরকারী নীতির ব্যাখ্যাতা রাশিয়ার সংবাদপত্রগুলি প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আসন্ন মস্কো-সম্মেলনের ঘোষণাটিকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে।

মহম্মদ স্যার জাফরুল্লা খান এখন মস্কোয়। স্যার জাফরুল্লা বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘ জেনারেল এ্যাসেমব্লির সপ্তদশ অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে তিনি পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি।

স্যার জাফরুল্লার সম্মানার্থে গ্রোমিকো যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন তাতে বহু গণ্যমান্য অতিথি এবং মস্কোর কূটনীতিবিদদের আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। জাফরুল্লা খান কাশ্মীর প্রশ্নে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহানুভূতি যে পাকিস্তানের জন্য যাচ্‌ঞা করেছেন তা বলাই বাহুল্য। কাশ্মীর সম্পর্কে রাশিয়ার মনোভাব কারুরই অবিদিত নেই। প্রথম থেকেই রাশিয়া কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তা রাষ্ট্রসঙ্ঘ পর্যন্ত সমর্থন করে এসেছে। বর্তমানে চীনের সঙ্গে বে-আইনী চুক্তিমূলে কাশ্মীরের একটি বিশাল অংশ চীনের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে পাকিস্তান এখন রাশিয়ার সহানুভূতি লাভের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে, স্যার জাফরুল্লার এই মস্কো পরিদর্শন ভদ্রতার মসৃণ খানাপিনার বাইরে অন্য কোন ফল প্রসব করবে না।

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সচিব মানুভাই শা দিন কয়েক পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করে এসেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী নিকোলাই প্যাটোলিচেভ।

এই চুক্তি বলে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন রুবল অর্থাৎ বর্তমান অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতকে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ করবে—সেই লিষ্টে রয়েছে বিদ্যুৎশক্তি ও তার যন্ত্রাংশ, ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত উপকরণ, তৈল এবং খনি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ধাতুমল, রাস্তা তৈরী ও পরিবহন যন্ত্রাদি।

ভারত আরও অনেক কিছু ক্রয় করবে এই চুক্তির সাহায্যে। সোভিয়েট থেকে, কেমিক্যাল্‌স, অনেক রকম ধাতু, ধাতব জিঙ্ক প্রভৃতি, কাগজ, ঔষধ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আরও যা যা প্রয়োজনীয় তার প্রায় অনেক কিছু।

ভারত যা রপ্তানী করবে সোভিয়েট ইউনিয়নে তার ভেতর আছে কাঁচা চামড়া, সজী, তৈল, বাদাম, চা, কফি, মশলা, তামাক, পাট, তুলা, সূতীবস্ত্র, চর্মপাদুকা এবং কিছু কিছু যন্ত্রপাতি।

রাশিয়ার মহাশূন্যচারী যুগল-ভ্যালেরি বাইকভস্কি ও ভ্যালেণ্টিনা তেরেসকোভা যথাক্রমে ৫নং ভোস্তক ও ৬নং ভোস্তকযোগে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করে মহাকাশ যাত্রার ইতিহাসে এক নতুন বৈপ্লবিক ও অবিস্মরণীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। বাইকভস্কি ৮৪ বার এবং তেরেসকোভা ৪৯ বার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা করেছেন। বাইকভস্কি মহাশূন্যে প্রায় ১ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন যা পৃথিবী হতে চন্দ্রের দূরত্বের ১ গুণের কাছাকাছি।

এই মহাকাশ পরিক্রমা মানুষকে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের অনেক কাছে নিয়ে এসেছে। মানুষ এখন মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল পরিক্রম ও বাস করতে পারে এবং মানুষের গ্রহান্তরে পৌঁছানো এখন অসম্ভব নয় বলা চলে। কলম্বাসের আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ক্যারিবিয়ান উপদ্বীপে পৌঁছান না পর্যন্ত ৬ মাস ব্যাপী অজ্ঞাত, অনিশ্চিত যাত্রা আজিকার দিনের মহাকাশ পরিক্রমার মতই বিপদসঙ্কুল ছিল।

কলম্বাস যে দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করেছিলেন আধুনিক একটি

শ্রীমতী ভ্যালেণ্টিনা তেরেসকোভা

জাহাজের পক্ষে তা ৪ দিনে অতিক্রম করা সম্ভব। আর একটি শব্দাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন জেট সে পথ ২ ঘন্টায় পরিক্রম করে আসতে পারে। দূরত্ব এখন আর মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় নভশ্চারীযুগলকে মহাকাশ জয়ের এই বিস্ময়কর ভূমিকার জন্য মানবজাতির মহান দূত বলে বর্ণিত করা হয়েছে। বাইকভস্কি ভোস্তক-৫ যোগে ভারতবর্ষের উপর দিয়া পরিক্রমাকালে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, বার্মা, সিংহল ও অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অভিনন্দনবাণী পাঠান।

মস্কোর রেডস্কোয়ারে সোভিয়েট আকাশচারীযুগল বাইকভস্কি ও তেরেসকোভাকে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। লেনিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে এঁরা মস্কোর নাগরিকবৃন্দের অভিনন্দন গ্রহণ করেছেন। ক্রুশ্চভ যখন তাঁদের মঞ্চের উপরিভাগে নিয়ে এলেন জনতা তখন আনন্দে চিৎকার করে বলেছিল,—মোলোডটস্ অর্থাৎ সাবাস। বেশ হয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে বাইকভস্কি বলেছিলেন যে, সঠিক মুহূর্তে মিস তেরেসকোভা মহাকাশে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ক্রুশ্চভ হেসে বলেছিলেন,—তোমার স্ত্রীর কানে যেন এটা না ওঠে দেখো।

ক্রুশ্চভ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন যে, আমাদের একটি মেয়ে যাকে বলা হয় অবলা সে যা করতে পেরেছে বুর্জোয়া আমেরিকান সমাজের সমস্ত পুরুষ মিলেও তা' করতে পারে নি।

অবশ্য সোভিয়েট মহাকাশচারণার কাহিনী এভাবে তুলনা না করে' বললে আরও শোভন ও মর্যাদাদীপ্ত হয়। বিজ্ঞান এবং তার জয়যাত্রার ইতিবৃত্তে রাজনৈতিক আদর্শবাদের পাঁচফোড়ন না মেশানোই সঙ্গত।

সাম্প্রতিক আদমসুমারী অনুযায়ী বর্তমানে রাশিয়ার লোকসংখ্যা ২২ কোটি ৩০ লক্ষ। পৃথিবীতে 'এ' সংখ্যাটা তৃতীয়। প্রথম লাল চীন যার লোকসংখ্যা ৬৫ কোটি আর দ্বিতীয় হিসাবে ভারতের লোকসংখ্যা ৪৫ কোটি ৩০ লক্ষ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ।

রাশিয়ার জন্মহার সম্প্রতি আবার কমে আসছে প্রতি হাজারে মাত্র ১৫টি। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেখানে গর্ভপাতের কতকগুলি সুবিধা করে দিয়েছে বলেই জন্মহার কমের দিকে। স্বাস্থ্যের দরুণ গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয় আর এই নিয়মেরও খুব বেশী কড়াকড়ি নেই আজ। হিসাবে দেখা গেছে যে, জন্ম আর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুপাত প্রায় সমান। সরকারী ডাক্তারখানায় খরচ পড়ে সাড়ে পাঁচ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৮ টাকার মত।

ইটালী—

ভ্যাটিকান সিটি থেকে গত ২১শে জুন পোপ নির্বাচনের সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন আর্কবিশপ কার্ডিনাল গিয়োভানী বাত্তিস্তা মন্টিনি! ৮০ জন রোম্যান ক্যাথলিক কার্ডিনাল তাঁকে পোপ নির্বাচিত করলেন।

তিনি পোপ নির্বাচিত হওয়ার পর নিজের নামকরণ করেছেন পোপ ষষ্ঠ পল। পোপ ত্রয়োবিংশতি জন খৃষ্টান সমাজে যে একতাবদ্ধ সমতা আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন পোপ ষষ্ঠ পল তা অব্যাহত রাখবেন বলেই মনে হয়।

পোপ ষষ্ঠ পল

কার্ডিনাল মন্টিনিকে তাঁর সমাজের লোকেরা বলত যে, তিনি জনগণের কার্ডিনাল। তিনি উদারপন্থী বলে খৃষ্টান জগতে পরিচিত। সুতরাং তাঁর আমলে পোপ জনের অনুষ্ঠিত নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না।

প্যারিস—

কিছুদিন পূর্বে প্যারিসে সারা ভারত কনসরটিয়ামের একটি সভায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ ভারতকে তৃতীয় যোজনার তৃতীয় বর্ষে সাহায্য করার জন্য ১১৪'৮ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করতে রাজী হয়েছে। ভারত চেয়েছিল ১২৫০ মিলিয়ন ডলার। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের জন্য এরা যে সাহায্য দিয়েছিল তার পরিমাণ যথাক্রমে ১২১৫ মিলিয়ন এবং ১০৭৭ মিলিয়ন ডলার।

ভারতের স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় এবারকার সাহায্যের পরিমাণ নিঃসন্দেহে অনেক কম। প্রথম দু' বছরে চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকা বর্তমান ছিল না, কিন্তু গত বছর চীনের আক্রমণে ভারতের পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের জন্য আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সম্পদের ওপর যে চাপ পড়েছে তা কল্পনাতীত।

হিসেব করে দেখা গেছে যে, তৃতীয় যোজনার লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে ভারতের প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন। শেষ তিন বছরের জন্য প্রতি বছর সে হিসাবে যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন, তার পরিমাণ প্রায় দু' বিলিয়ন ডলার। তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যে তৃতীয় বছর চলছে এখন এবং আরও দু' বছর বাকী। সুতরাং এই সামান্য সাহায্য দিয়ে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী করা এবং সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা ভারতের পক্ষে যে বিশেষ কষ্টকর, তা অস্বীকার করা চলে না।

ইরাণ—

ইরাণে ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন থেকেই অনুভূত হচ্ছিল, কারণ সেখানকার ভূমি-ব্যবস্থা আজও সেই মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিকতার সীমানা ছেড়ে আধুনিক ব্যবস্থায় প্রসারিত হতে পারে নি।

ডঃ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে ইরাণের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও জাতীয়তাবাদী জনসাধারণ গতকাল রেজা শাহ-র সরকারের সমালোচনা করে' বলে এসেছে যে, সরকার সর্বপ্রকার প্রগতির পরিপন্থী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ যখন সরকারী উদ্যমে ভূমি-সংস্কার ও নারী-স্বাধীনতার ব্যবস্থা গ্রহণের আয়োজন হ'ল তখন তার বিরুদ্ধে সুরু হ'ল বিক্ষোভ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর রক্তপাত।

অশিক্ষিত একদল রক্ষণশীল মানুষকে ধর্মান্ধ মোল্লা ও জমিদারদের দল ক্ষেপিয়ে তুলে এই কাণ্ডের অবতারণা করেছে।

শাহ-এর হুকুমনামায় যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে কোন ভূম্যধিকারী একখানা গ্রামের বেশী রাখতে পারবে না। বাকী জমি ১৫ বছরের মেয়াদে ক্ষতিপূরণ সহ জাতীয়করণ করা হবে। জমির ধার্য মূল্য ১৫ বছরে পরিশোধ করতে সক্ষম হ'লে কৃষকগণ সেই জমি ক্রয় করে' নিতে পারবে। কৃষকদের জমি কেনায় সাহায্য করার জন্য প্রায় এক হাজার সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক এদের সহজ সর্তে ঋণ দেবার বন্দোবস্ত করবে।

এই পরিকল্পনায় ক্ষমতাশালী ভূস্বামিগণ রুষ্ট হলেন আর বিরক্ত হ'ল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। বুদ্ধিজীবী এবং উদারপন্থিগণ ভেবেছিলেন শাহ তাঁর পরিকল্পনা পার্লামেন্টে অর্থাৎ মজলিশে পাশ করিয়ে নেবেন। কিন্তু শাহ তা করেন নি। মজলিশ তিনি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে তিনি জনসাধারণের নিকট 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' উত্তর চেয়ে নিম্ন প্রশ্নগুলির ওপর ভোট চেয়ে বসলেন :

১। ভূমি জাতীয়করণ;

২। সরকারী কারখানার শেয়ার বিক্রয় দ্বারা ভূমি-সংস্কারের জন্য অর্থভাণ্ডার স্থাপন;

৩। বন-সম্পদ জাতীয়করণ;

৪। শিল্প শ্রমিকদের জন্য লভ্যাংশের ব্যবস্থা;

৫। একটি শিক্ষাবাহিনী সৃষ্টি করা যেখান থেকে প্রতি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষক প্রেরণ করা হবে;

৬। একটি নতুন নির্বাচনী কানুন রচনা করা, যদ্বারা স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে মজলিশের নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে।

এই ছ' দফা কার্যসূচীকে বলা হয়েছে 'উপর তলার বিপ্লব'। এর উদ্দেশ্য দেশকে লাল-বিপ্লবের ধ্বংস থেকে উদ্ধার করা।

বে-আইনী কম্যুনিষ্ট তুদে পার্টি এবং প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মোসাদ্দেকের ন্যাশেনাল ফ্রন্ট এই পরিকল্পনাকে নিতান্ত একটা ধোঁকাবাজী ব'লে বর্ণনা করেছে। ন্যাশেনাল ফ্রন্ট এই বলে' শাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, গণভোটের পূর্বে শাহ হাজার হাজার ছাত্র এবং ন্যাশেনাল ফ্রন্টের নেতৃস্থানীয় লোককে গ্রেপ্তার করেন এবং বহু ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে বিরোধী শক্তিগুলিকে তিনি দমন করার চেষ্টা করেছেন।

গণভোটে পঞ্চাশ লাখের ওপর লোক উপস্থিত হয়েছিল এবং তার ভেতর 'না' কলমে ভোট দিয়েছে মাত্র ৪১১৫ জন। ভোট অবশ্য আমাদের দেশের মত গোপন ব্যালেটে নেওয়া হয়নি, অফিসারদের সামনে বসে' ভোটারদের 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' লিখতে হয়েছে। সুতরাং একে স্বাধীন নিরপেক্ষ বলা যাবে না। কিন্তু তবু একথা সত্যি যে, দেশের কৃষক সম্প্রদায় মোটামুটি এ পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছে।

গণভোটের পর অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছিল হয়ত বা শেষ পর্যন্ত শাহ তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করবেন না। কিন্তু তেহেরাণ ও শিরাজে দাঙ্গার প্রকৃতি ও তা দমন করার পদ্ধতি থেকে মনে হয় শাহ তাঁর পরিকল্পনাকার্যকে একেবারে এড়িয়ে যেতে প্রস্তুত নন।

শাহের প্রতি সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য শিথিল হয়নি এবং যদিও সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে এই আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রতিরুদ্ধ করা হল তবু শেষ পর্যায়ে মোসাদ্দেকের দল আন্দোলনে শক্তিসঞ্চার করলে ইরাণের অবস্থা কী দাঁড়াবে বলা শক্ত।

শাহ যে সংস্কারের প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন তা ইরাণের মত দেশে আজ চরমপন্থী বলে মনে করা হচ্ছে। যদি তিনি এতে সফল হতে পারেন, তবে তা হবে এক বিরাট ঘটনা।

গ্রেট বৃটেন—

ক্রীশ্চিন কীলারের মাটিকে এখনও ধরমিকা পড়ে নি, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এখনও তার রেশ রয়েছে। যদিও ম্যাকমিলানের পদত্যাগের গুজবে অনেকটা ভাঁটা পড়েছে তবু ওয়াকিবহালদের ধারণা যে, তিনি অদূর ভবিষ্যতে অবসর গ্রহণ করবেন।

ইংরেজদের রসিকতাবোধ চিরকালই খুব প্রখর। কোন সঙ্কটাবস্থায়, তা' সে যুদ্ধ অথবা রাজার সিংহাসনত্যাগই হোক, কিংবা প্রফুমোর মত কোন পদস্থ মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করার ব্যাপারেই হোক, তাদের এই রসিকতার চেতনা কখনও ম্লান হয় নি। এ কথা অবশ্য কেউ বলবে না যে, ইংরেজ জাতি নৈতিক চরিত্রের নিরিখে বিশুদ্ধ দেবদূত বিশেষ। ব্যক্তিজীবনের নিভৃত আড়ালে নৈতিক শিথিলতা তাদের একটা স্বীকৃত অধ্যায়। দায়িত্বশীল

হ্যারল্ড উইলসন

বাইরের সাংবাদিকদের মতে ইংলণ্ডের অধিকাংশ কিশোরী বধূই গর্ভবতী হয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

রূপোপজীবিনীরা এখন আর ইংলণ্ডের কোথাও সদরে বেরিয়ে লোক সংগ্রহ করতে পারে না, আইনে তা' নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ এদের লীলা অভিসার চলছে নানা কৌশলে বিনা বাধায়। কোথাও নৈশ ক্লাবের অশ্লীল উলঙ্গ নৃত্য, কোথাও মেসেজবাথ, কোথাও মডেল আবার কখনও বা ফরাসী শিক্ষয়িত্রীর ছদ্মবেশে। ইংলণ্ডে কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কিন্তু সাধারণ জীবনের প্রকাশ্য নৈতিকতার প্রশ্নে কিংবা সরকারী চরিত্রের কোন শিথিলতার ক্ষেত্রে ইংরেজ জাতি অত্যন্ত কঠোর, অনমনীয়। ভিক্টোরীয় চিন্তাধারায় যে নীতিবোধের উদ্ভব তাতে কারুর পক্ষেই, এমন কি কোন মন্ত্রীর পক্ষেও উপপত্নী রাখা নিতান্ত নিন্দার্হ। অথচ ফ্রান্স, ইটালী এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এ প্রথা আজও বর্তমান রয়েছে।

ইংলণ্ডে আজ অবশ্য এ ব্যাপারে অতটা ভ্রূকুটি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারে শালীনতা রয়েছে আর আপন কর্তব্যকর্মে আছে নিষ্ঠা এবং সততা, ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ তার ব্যক্তিজীবনে যত খুশী প্রেম করে বেড়াক কেউ প্রতিবাদ করবে না, কোন আপত্তির ঝড় উঠবে না কোনখান থেকে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টারে আজ তাই পরিহাসের হাল্কা হাওয়ায় সকলে তামাসা করে বলে,—প্রফুমো একটি আস্ত গর্দভ। কমন্স সভায় মিথ্যা কথা বলে সে শয্যা-সঙ্গিনী করেছিল এমন একটি মেয়েকে যে একজন রাশিয়ানের প্রণয়িনী। শয্যা-সঙ্গিনী বেছে নেওয়ায় সে যদি আর একটু সাবধান হ'ত, একে না নিয়ে অন্য কাউকে, অন্য যে কোন মেয়েকে, তা হলে তাকে এভাবে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হ'ত না, পার্লামেন্ট পরিত্যাগ করতে হ'ত না।

ওয়েষ্টমিনিষ্টারে বর্তমানে এই প্যারোডিটি লোকের মুখে মুখে ফিরছে :

এ কি তুমি করলে বিশে—
বলে ক্রীশ্চিন
একেবারে ভেঙে দিলে
পার্টি মেশিন!
নগ্নবেশে সজ্জা
নয় তো কিছু লজ্জা
মিথ্যা বলা পার্লামেন্টে
সত্যি অশালীন।

তাকে প্রিভি কাউন্সিল থেকেও বিদায় নিতে হয়েছে।

সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নেই যে হ্যারল্ড উইলসন প্রতিরক্ষার পটভূমিকায় এনে সরকারকে আক্রমণ করেছেন, তিনি এ ঘটনার যৌন সম্পর্কের অধ্যায়কে আমল দেন নি।

লর্ড চ্যান্সেলারকে তদন্তের ভার দিয়ে শোভন কাজই করেছেন মিঃ ম্যাকমিলান। তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রফুমো কেলেঙ্কারীর সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রতিরক্ষা জড়িত নয়। ক্রিশ্চিন কীলার তার অভিসারিকা জীবনের কাহিনী কাগজওয়ালাদের কাছে বিক্রি করেছে এবং তাতে যে টাকা সে পেয়েছে তা' হাজারো পুরুষের কাছে দেহমূল্যেও সে পেতো না কখনও।

তার স্বীকারোক্তিতে আছে যে, আইভানভ তাকে প্রফুমোর কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছিল আমেরিকা কখন এবং কবে পশ্চিম জার্মানীকে হাইড্রোজেন বোমা সরবরাহ করবে। কাজেই লর্ড চ্যান্সেলারের রিপোর্ট সত্ত্বেও জনসাধারণের মন থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়নি। ফলে লর্ড ডেনিং-এর ওপর আবার তদন্তের ভার দিতে হয়েছে মিঃ ম্যাকমিলানকে এর সত্যি মিথ্যা যাচাই করে দেখার জন্য।

অপর দিকে ইংরেজদের জীবনের মনোরম অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে কোথাও ছেদ পড়ে নি। ষ্ট্রাটফোর্ড অন-এ্যাভনে সেক্সপীয়র মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে যে গ্রীষ্মকালীন অভিনয়োৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে। এ সময়টায় পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে অনেক পারদর্শক এখানে আসেন তাঁর নাটক দেখতে।

এ্যাভন নদীর তীরে এই তীর্থাসব, মহাকবির জন্মভূমি ষ্ট্রাটফোর্ড। এ্যাভন নদী নামেই শুধু নদী, প্রস্থের আয়তনে আমাদের দেশের অসংখ্য নালার মতই একটি ক্ষুদ্র, স্নিগ্ধ, মন্থর প্রবাহিনী। অদূরে রয়েছে একটি ছোট্ট কুটির, এখানেই নাকি সেক্সপীয়র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারই কাছাকাছি রয়েছে আর একটি কুটির, সেখানে জন্ম নিয়েছিল কবির প্রথম প্রেম। কবির স্ত্রী তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ইংলণ্ড সফরকালে ষ্ট্রাটফোর্ড অন এ্যাভনে গিয়ে জুলিয়াস সিজার নাটকের অভিনয় দেখে এসেছেন। অভিনয়-শেষে অভিনেতৃবৃন্দকে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রীতকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। অভিনেত্রী ডেম পেগী এ্যাশক্রফটও ছিলেন তাদের মধ্যে। ইনি আজ একটানা প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সেক্সপীয়র নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে আসছেন, বর্তমান লেখকের এখনও মনে আছে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনের ওল্ড ভিক থিয়েটারের কথা। সেদিন সে দেখেছিল সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট নাটক, আর জুলিয়েটের ভূমিকায় এ্যাশক্রফটের অভিনয়। মনে আছে তার আনন্দ-শিহরণের কথা, অনবদ্য অভিনয়ের নায়িকা এ্যাশক্রফটের কথা জুলিয়েটের ভূমিকায় যার তুলনা মেলা সত্যিই কঠিন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ও গভীর ভঙ্গীতে এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন কিছুক্ষণ। তাদের বুঝতে দেরী হয় নি যে, ইনি একজন সাধারণ শ্রেণীর ভি আই পি বা বিশিষ্ট অতিথি মাত্র নন, ইনি সত্যিকারের এমন একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক যুগে যুগে যাঁদের প্রভাব শিল্প ও সাহিত্যে অনপনেয়।

গত ২৩শে জুন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করার প্রাক্কালে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর বিদায়বাণীতে বলেছেন যে, গ্রেট বৃটেন ও ভারতের বন্ধুত্ব সম্পর্ক আগামী দিনগুলিতে যে দৃঢ়তর হয়ে উঠবে তাতে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ইংলণ্ডেশ্বরীকে, বৃটেনের অধিবাসীদের এবং বৃটিশ সরকারকে। তাঁদের আতিথেয়তায় কোন দিকে কোন ত্রুটির অবকাশ দেন নি তাঁরা।

রাধাকৃষ্ণণ

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে উনবিংশ শতকের প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক বিশপ বার্কলীর প্রথম সংকলিত এক গুচ্ছ পুস্তক উপহার দিয়েছেন। একজন বিজ্ঞ দার্শনিকের পক্ষে এটা বাস্তবিক উপযুক্ত উপহার।

পশ্চিম জার্মানী—

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ডঃ আদেনয়ার বিমানঘাটিতে প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি অভ্যর্থনার উত্তরে বলেছেন যে, আজ পরিবর্তিত বিশ্বে একদা শত্রু আজ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, আর তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় এসেছে এক সমদৃষ্টি কোণ।

২৫শে জুন তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়ে বক্তৃতায় বলেছেন যে, ন্যাটো-গোষ্ঠীর ভেতর একতা বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। নইলে পশ্চিম ইয়োরোপের রক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা সম্ভব হবে না। প্রকাশ্যে নামোল্লেখ না করেও প্রেসিডেণ্ট দ্য'গলের ভিন্ন রক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনার তিনি সমালোচনা করেছেন। ফ্রাঙ্কো-জার্মান চুক্তিতে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু ন্যাটো-রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ঐক্যে ভাঙন ধরাতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থায় তাঁর যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিম ইয়োরোপ আক্রান্ত হলে ফ্রান্স তার বরাদ্দ-সৈন্য নিয়ে ন্যাটো মৈত্রীকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে যদিও ইতিমধ্যে ফ্রান্স তার অনেক সৈন্য ন্যাটোর আওতা থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তাঁর মতে পূর্ব-পশ্চিম বার্লিনে অবাধ যাতায়াত থাকা উচিৎ এবং এ জন্য তিনি সোভিয়েট সরকারকে দোষারোপ করেছেন।

পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বনে চ্যান্সেলার আদেনয়ার এবং প্রেসিডেণ্ট কেনেডি একটি যুক্ত ইস্তাহারে এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, ন্যাটো সম্মিলনকে শক্তিশালী রাখতে হবে এবং যৌথ দায়িত্ব পরিত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া যাবে না।

পশ্চিম জার্মানী সরকার 'পাঁচজন বিজ্ঞ ব্যক্তি'কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। যাঁরা দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর সদা সজাগ দৃষ্টি রেখে চলবেন। এই পাঁচ জন 'ম্যাজিক ট্যাংগল' অর্থাৎ দ্রব্য-মূল্যে স্থিরতা, নিয়োগ ব্যবস্থায় উচ্চমান, বৈদেশিক বাণিজ্যে সমতা তথা সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন। তাঁদের আয় ও সম্পত্তির উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কেও অনুধ্যান করতে হবে। অর্থনীতিতে বিপজ্জনক লক্ষণ সমূহের প্রতি তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং সে সবের সম্মুখীন হওয়া ও নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবেন।

কমিটির সুপারিশ সমূহ বার্ষিক অথবা বিশেষ রিপোর্টের আকারে প্রকাশিত হবে।

কমিটি শ্রমিক-মালিক বিবাদ সম্পর্কেও বিবেচনা করবেন। এই বিবেচনা শুধু মজুরী সংক্রান্ত বিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

এই কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম জার্মান পার্লামেণ্টে একটি বিল আনা হয়েছে।

কমিটিতে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ছাড়াও শিল্পের মালিক ও শ্রমিক উভয়ের প্রতিনিধি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নেওয়া উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করে জার্মানের মালিকদের এক সংগঠন পশ্চিম জার্মান পার্লামেণ্টের প্রতিটি সদস্যের নিকট স্মারকলিপি পেশ করছেন।

এই ধরণের কমিটি ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই উপযোগী হবে। আমাদের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি সম্বন্ধীয় নীতি ও কর্মসূচীতে দোষত্রুটি এবং দ্রব্যমূল্যের অনিশ্চয়তা, বেকারি ও অসম বৈদেশিক বাণিজ্য জনিত ঝুঁকি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য নিযুক্ত

আদেনয়ার

অনুধ্যান ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। এটা ঠিক যে, পরিকল্পনা কমিশন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা-সমূহের ব্যাপারে 'ইভ্যালুয়েশন টীম' গঠন করে থাকেন; তবে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবার মত স্থায়ী তদারককারী কোন বিশেষজ্ঞ কমিটী আমাদের নেই।

পাকিস্তান—

পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানে মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালিয়ে, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 'জিগির' তুলে যে ভাবে মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে তার রাজনৈতিক অধিকার থেকে, যে-ভাবে পূর্ব-পাকিস্তানকে রূপান্তরিত করে তুলেছে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের একটি উপনিবেশে, তার বিরুদ্ধে আজ ধ্বনিত হচ্ছে জাগ্রত গণ-মানসের তীব্র প্রতিবাদ।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে রমিজুদ্দিন সাহেব এবং মেজর আসরাফউদ্দিন দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান রাজনৈতিক, মানবিক ও অর্থ নৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আজ আয়ুব খাঁ এবং তার অনুচর আমলাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে পড়েছে।

রমিজুদ্দিন আরও বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তার ন্যায্য অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

পাকিস্তান পত্তনের পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের উপর চলেছে এই অন্যায় ও অবিচার। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগই ব্যয় হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের কল্যাণে। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিবাদীরা এসে পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পদের উপর তাদের শ্রীবৃদ্ধির বনিয়াদ তুলেছে গড়ে। কেন্দ্রীয় দপ্তরের বড় বড় চাকরীও জুটছে তাদের ভাগ্যে। তা'ছাড়া আঞ্চলিক বিদ্বেষ বিষের জ্বালায় পূর্ববঙ্গের কোন যুবক পশ্চিম পাকিস্তানে ঠাঁই পাচ্ছে না। চাকরী পেলেও, বাড়ী ভাড়া পাচ্ছে না।

চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তাদের ঔদাসীন্য এবং করাচীর গোলাম মহম্মদ বাঁধের জমিতে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উপর অত্যাচারের কাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানকে বিক্ষুব্ধ করেছে আরও বেশী করে।

সব চাইতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন আসরাফউদ্দিন দেশরক্ষা ব্যবস্থার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে। ভারত উপমহাদেশের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলাই হল আমেরিকার লক্ষ্য। তা করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানে দুই থেকে তিন ডিভিসন সৈন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত করে রাখার উদ্দেশ্যে তা কার্যকরী করা হয় নি।

প্রতিরক্ষা দপ্তরে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মালিক প্রথম জিনিষটি এড়িয়ে যাবার জন্যে বলেছিলেন, দেশ বিভাগ কালে পূর্ব পাকিস্তানের কেউ সৈন্যবিভাগে ছিল না।

তীব্রকণ্ঠে উত্তর এসেছে আসরাফউদ্দিনের কণ্ঠ থেকে, 'মিথ্যা কথা!'

শেষ পর্যন্ত তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের ভুয়া প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের প্রশ্ন তুলে। ভারতের হাত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে তা' না হলে নাকি রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বোঝাতে কিন্তু পারেন নি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে বলে। রমিজুদ্দিন সাহেব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের কথা একটি 'জিগির' মাত্র।

বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে উপনিবেশবাদ হয়ে পড়েছে একেবারে অচল। দিকে দিকে এর বিরুদ্ধে উঠেছে প্রতিবাদ। পাকিস্তানেও তারই প্রতিধ্বনি মাত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে তা অনিবার্য কারণেই ছড়িয়ে পড়বে ধীরে ধীরে। পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠী এখন থেকে সাবধান না হলে সেই বিক্ষোভের লেলিহান শিখাকে নেভাতে পারবেন না। ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতী আর বেশী দিন চলবে না।

হাঙ্গেরী—

বুদাপেষ্টে এক বিরাট আন্তর্জাতিক মেলা হয়ে গেল। ভারতের ষ্টল মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল। ভারতে নির্মিত ডিজেল ইঞ্জিন হতে আরম্ভ করে চমৎকার বুটিতোলা রেশমী বস্ত্র, নানা কাপাস পশমী বস্ত্র, শ্লিপার, স্যাণ্ডেল এবং অন্যান্য অপূর্ব কারুকার্যখচিত অভিজাত হস্তশিল্প পর্যন্ত ষ্টলে প্রদর্শনীর জন্য আনা হয়েছিল। ভারতের ষ্টলের তদারককারী কর্মচারিগণ দর্শকগণকে উপাদেয় ভারতীয় চা-পানে আপ্যায়িত করেছিলেন। ষ্টল পরিদর্শনকারী বহু গণ্যমান্যদের মধ্যে হাঙ্গেরীর প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিলের সভাপতি মি: ইস্তভান, হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী মি: কাদার ও মিসেস কাদার এবং হাঙ্গেরীর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণের নাম উল্লেখ্য। তাঁরা সকলেই ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক জুবিন মেহতা কয়েকদিনের জন্য বুদাপেষ্টে এসেছিলেন। বুদাপেষ্ট একাডেমি অব মিউজিকের রঙ্গালয়ে একতান সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে হাঙ্গেরীর সঙ্গীতপ্রিয় জনসাধারণের তিনি প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছেন।

হাঙ্গেরীর খ্যাতনামা প্রাচ্যভাষাবিদ ডঃ এরভিন বাকটে বিগত ৮ই মে পরলোকগমন করেন। তিনি ১৯২৮ সালে লাদাক এবং পশ্চিম তিব্বতের বিস্তৃত এলাকা পরিভ্রমণ করেছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ এবং হাঙ্গেরীর অধিবাসী মাগ্যার (Magyar) জাতির উৎপত্তি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে তিনি এই পরিভ্রমণ করেছিলেন। যদিও তিনি মাগ্যার জাতির উৎপত্তি অন্বেষণে সফল হতে পারেন নি, তবুও তিব্বতীয় ভাষা সম্পর্কে তিনি ব্যাপক পড়াশুনা করেন এবং তিব্বতীয় ভাষায় এক অসাধারণ অভিধান রচনা করে যান। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, কলা, ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রায় কুড়িখানা বই লিখে গিয়েছেন, 'ইণ্ডিয়া' (২য় খণ্ড), 'সনাতন ধর্ম', 'দি আর্ট অব ইণ্ডিয়া', 'সংগ্রহ' ও রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত একখানা গ্রন্থ তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধ রচনা হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত হয়ে থাকে, ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পপ্রচারে তিনি সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি তাঁর মহান গুরু হাঙ্গেরীর বিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিদ সাণ্ডোর করোসি সোনার (যাঁর দেহ দার্জিলিং-এ সমাধিস্থ আছে) পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

ইরাক—

মোল্লা মোস্তাফা বারজানী'র নেতৃত্বে কুর্দিশ বিদ্রোহীদের যুদ্ধ এখনও থামে নি। কুর্দরা ককেসাসের দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি এবং তাদের এলাকা তুরস্ক, পারস্য ও ইরাকের মধ্যে বিভক্ত। গত ৩০ বছর ধরে মোল্লা মোস্তাফা বারজানী পৃথক কুর্দিশ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। আনুক্রমিকভাবে তিনি বাগদাদের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ যুদ্ধের নেতৃত্ব করে চলেছেন। এই বৎসরের গোড়ার দিকে ১৮ দিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর তিনি ইরাকের সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন।

আবদুল কাশেম নিহত হওয়ার পর আরেফ ও তাঁর সমাজতন্ত্রী বাথ পার্টি ইরাকের শাসনভার গ্রহণ করলে বাথ পার্টি আরব ও কুর্দিশদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে বলেছিলেন, নূতন সরকার প্রতিষ্ঠার পর বারজানী ও সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সুরু হয়েছিল। অনতিবিলম্বে আরেফের নূতন সরকার ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা কুর্দদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে প্রস্তুত নন। অন্যদিকে কুর্দিশদের স্বায়ত্তশাসন এবং ইরাকের ৩৬০ লক্ষ ডলার বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের একটা মোটা অংশ পাওয়ার দাবীতে বারজানী অনড় অটল থাকেন। ইরাক সরকার এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং বারজানীর প্রতি ২৪ ঘণ্টার এক চরমপত্র জারী করার পর বারজানীর সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করার জন্য কুর্দিশ অঞ্চলে ইরাকী সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। কুর্দিশ সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে বলে ইরাক রেডিও দাবী করে। ইরাক রেডিও আরও দাবী করে যে, বারজানী পলাতক আছে এবং সহস্র সহস্র কুর্দ উপজাতি নিহত হয়েছে।

যা হোক, যা ঘটেছিল তা হল এই যে, ইরাকী সৈন্যরা ট্যাঙ্ক ও জেটপ্লেন নিয়ে আসায় বারজানী এবং তাঁর ২০,০০০ সৈন্য প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে গেরিলা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পর্বত অঞ্চলে চলে যান।

রাশিয়া কুর্দিশদের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানালেও বাস্তব সাহায্য দানের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে খুব মন্থরগতিতে চলছে। ইয়েমেন, মিশরসহ আরব দেশসমূহ কুর্দিশ আন্দোলনের নিন্দা করেছে।

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের অভাব এবং সৈন্য সংখ্যার নিতান্ত অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বারজানী ইরাকী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কুর্দিশ জাতির স্বাধীনতা অর্জনের এই বীরোচিত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে কুর্দিশ এলাকার জন্য বারজানী যে স্বয়ং শাসনের প্রস্তাব দিয়েছেন তার মূলে রয়েছে এক ফেডারেশনের পরিকল্পনা। তাতে কুর্দিশ এলাকা একটি ভিন্ন জেলা বা প্রদেশে রূপান্তরিত হবে আর তার আওতায় থাকবে বিচার, কৃষ্টি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পৌরসভা এবং স্বায়ত্ত শাসিত বিষয়সমূহ, শ্রমদপ্তর, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এই ধরণের আরও অনেক কিছু।

আর কেন্দ্রীয় শাসনের হাতে থাকবে বৈদেশিক সম্পর্কিত বিষয়, প্রতিরক্ষা, মুদ্রা, তৈল, শুল্ক, ডাক ও তার বিভাগ, রেলওয়ে, আণবিক শক্তি, বেতার এবং টেলিভিশন।

বারজানীর প্রস্তাব অনুসারে ফেডারেল আইন-সভায় ইরাকের সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে কুর্দিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। স্থানীয় ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা থাকবে তাদের আর তারা দাবী করেছে যে, তৈল, শুল্ক প্রভৃতি ফেডারেল বিষয়গুলি থেকে যে রাজস্ব আদায় হবে তার একটা অংশ। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইরাকী সরকার একটা পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছে। তাতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রীকৃত করে ৬টি সুবায় বিভক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেকটি সুবা একজন করে গভর্ণরের অধীনে থাকবে। সুবাগুলি হবে এই সব এলাকা নিয়ে, যথা: মশুল, কিরকুক, সুলেমানিয়া (এর কম বেশী সবটুকুই কুর্দিস্তান নিয়ে গঠিত), বাগদাদ (যার শাসনকেন্দ্র হবে বাগদাদ শহর), হিল্লা এবং বসরা (যার শাসনকেন্দ্র হবে বসরা)।

সুলেমানিয়া গভর্ণমেণ্ট বা সুবার জন্য দু'টি ভাষা নির্ধারিত থাকবে, আরবী এবং কুর্দিশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কুর্দিশ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে কিন্তু আরবী দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষণীয় থাকবে। আর উচ্চস্তরে সমস্ত শিক্ষাই হবে আরবী ভাষায়।

কতকগুলি ইউনিট নিয়ে গঠিত হবে এক একটি গভর্ণেটে। একক হিসেবে গোড়ায় থাকবে গ্রাম। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে হবে এক একটি নাহিয়াট, আর কতকগুলি নাহিয়াট নিয়ে গঠিত হবে এক একটি কুধা এবং কতকগুলো কুধার সমষ্টি নিয়ে এক একটি লিওয়া।

এই ব্যবস্থায় গ্রাম থেকে শুরু করে লিওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি ইউনিটে একটি করে কাউন্সিল থাকবে। আর প্রতিটি গভর্ণেটে থাকবে একটি করে গভর্ণেট কাউন্সিল। প্রত্যেকটি গভর্ণেটের দপ্তর কর্তাগণ পদাধিকার বলে গভর্ণেট কাউন্সিলের সভ্য হবেন। গভর্ণেটের বা সুবার শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে গভর্ণরের হাতে আর তাকে শাসনকার্যে সাহায্য করবে একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। গভর্ণরকে নিয়োগপত্র দেবে ইরাকী গভর্ণমেণ্ট।

গভর্ণেট কাউন্সিলের কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা থাকবে। যথা: শিক্ষা, স্থানীয় ও গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন, গৃহনির্মাণ, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শ্রম, সংস্কৃতি এবং পূর্ত।

বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় এই প্রস্তাব কুর্দিশদের মনঃপূত হয় নি, কারণ এই তথাকথিত বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় গভর্ণেটগুলির প্রকৃত কোন স্বাধীনতাই থাকবে না। ইতিমধ্যে কুর্দি-বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আর এ জন্যে ইরাকী-সরকার দোষারোপ করে চলেছে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে।

মিশর—

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে এ্যাপারথিড নীতি বলবৎ রয়েছে আর আফ্রিকানদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তার প্রতিবাদে কতকগুলি আফ্রো-এশিয় দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগালকে রাষ্ট্রসংঘ থেকে বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা করছে। আদ্দিস আবাবার শীর্ষসম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগালের সঙ্গে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির কূটনৈতিক সম্পর্ক আর রাখবে না। জেনেভার আই, এল, ও সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হয় নি এবং তার মূলেও আফ্রো-এশিয় দেশগুলির হাত ক্রিয়াশীল ছিল।

এখন দক্ষিণ আফ্রিকা বুঝতে পারছে যে, সমগ্র সভ্য জগতের সহানুভূতি থেকে আজ সে বঞ্চিত। কালের পরিবর্তনকে আমলে আনতে চাইছে না বলে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ আফ্রিকার তাসের ঘর যে ঝড়ের হাওয়ায় ভেঙে পড়েছে আলাবামায়। ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে আজকের পৃথিবীতে জীবন্ত চলা সম্ভব নয়।

আর ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আরম্ভ হয়েছে একটা আতঙ্কের রাজত্ব। অত্যাচার আর নিপীড়নের অন্ত নেই। বিনা বিচারে কারাদণ্ড হচ্ছে অহরহ। সমগ্র ভারতীয় ও আফ্রিকান বসত এলাকাগুলি থেকে তাদের উচ্ছেদ করে সংরক্ষিত এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গুপ্তচরদের জাল চতুর্দিকে ছড়ানো, প্রাণ খুলে আলাপ-আলোচনা করারও সুযোগ নেই তাদের। দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকার এখনও ভিন্ন জাতির জন্ম ভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার স্বপ্নেই মশগুল। এই নীতির মাত্রাহীনতার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের শ্বেত সমর্থকদের মধ্যেও কেউ কেউ আজ সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছে।

আফ্রিকা—

শেষ পর্যন্ত সেনট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হ'ল না, ভেঙে গেল সেই ফেডারেশন।

যখন ফেডারেশন গঠিত হল, সূচনা হ'ল ৬০ লক্ষ কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের ওপর ২ লক্ষ শ্বেতকায়ের শাসনের তখন লেবার সদস্য জিম গ্রিফিথ বৃটিশ পার্লামেন্টে সখেদে বলেছিলেন, 'এ শুধু আগ্নেয়গিরির চূড়োর উপর একটা প্রাসাদ গড়া হ'ল।' মধ্য আফ্রিকার ফেডারেশন আজ ভাঙনের মুখে। শুরুতেই অবশ্য এর শেষের অঙ্ক অনুমান ঠিকই করা গিয়েছিল।

গত ১৩ই জুলাই দক্ষিণ রোডেশিয়ার শহর ভিক্টোরিয়া ফলস্-এ ছ'দিন সম্মেলন করার পর এক ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, দশ বছর পূর্বে যে মধ্য আফ্রিকার ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল এতদ্বারা তার অবসান হ'ল। সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন বৃটেনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ আর, এ, বাটলার।

নায়াসাল্যাণ্ড গত ১লা ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা লাভ করেছে আর তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন হেষ্টিংস বান্দা। নতুন সংবিধান অনুসারে উত্তর রোডেশিয়ার পার্লামেন্টে আফ্রিকানরাই এখন সংখ্যাগুরু এবং তাদের প্রধান নেতা হচ্ছেন কেনেথ কাউণ্ডা ও হ্যারি এন্ কম্বুলা।

সেন্ট্রাল বা মধ্য আফ্রিকান ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রী স্যার রয় ওয়েলেনস্কী শ্বেত-প্রাধান্যে বিশ্বাসী। কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী জনৈক শ্বেত কৃষক, উইনষ্টোন ফিল্ড, ফেডারেশন রক্ষা করার জন্ম স্যার রয়ের মত অত ব্যগ্র নন। তাঁর প্রধান চিন্তা কী ভাবে ৩৬ লক্ষ কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীর ওপর ২ লক্ষ সাদা মানুষের প্রভুত্ব কায়েম রাখা যায়।

উত্তর রোডেশিয়া শীঘ্রই স্বাধীনতা লাভ করবে এবং তার পার্লামেন্টেও আফ্রিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। উত্তর রোডেশিয়ার নেতৃদ্বয়ের ভেতর কেনেথ কাউণ্ডা অনেকটা প্রগতিপন্থী এবং নিজে তিনি গান্ধীপন্থী বলে দাবী করেন। ফেডারেশন ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে কাউণ্ডা এবং এন কম্বুলা উভয়েই একমত। তাঁদের সম্মিলিত চাপের মুখে স্যার রয় ওয়েলেনস্কীর বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ফেডারেশন ভেঙে দিতে বাধ্য হলেন।

স্বতন্ত্র দক্ষিণ রোডেশিয়ায় ফিল্ডের নেতৃত্বে সেখানে নিজেদের প্রভুত্ব অনেকটা সহজে আয়ত্তে রাখতে পারবে বলে সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের মনে স্বস্তির ভাব দেখা দিয়েছে।

মধ্য আফ্রিকার নায়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়ায় এখন আফ্রিকানদের হাতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আফ্রিকানদের মুক্তি সংগ্রাম শেষ হয় নি এখনও। এই সংগ্রামের নায়ক তরুণ আফ্রিকান নেতা যোশুয়া এন কোমো গত বছর আমেরিকায় জাতিপুঞ্জের উপনিবেশ সংক্রান্ত কমিটিতে বলে এসেছিলেন যে, বৃটেন যদি তার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণকায় মানুষদের সমান ভোটাধিকার প্রদান না করে, তবে দক্ষিণ রোডেশিয়ায় রক্তের প্লাবন রোধ করা যাবে না।

বহুদিন এন কোমোকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় আফ্রিকানদের স্বাধীনতার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে যেতে বদ্ধপরিকর। তাঁর জনপ্রিয়তা একমাত্র নায়াসাল্যাণ্ডের হেষ্টিংস বান্দার জনপ্রিয়তার সঙ্গেই তুলনীয়।

কিন্তু তবু কালো আফ্রিকায় এমন কতকগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ এখনও বিদ্যমান যেখানে অন্যান্য অনেক স্থানের মত গোষ্ঠী-বিরোধ তীব্রতা বিদ্যমান রয়েছে। তার সঙ্গে দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফিল্ডের কূটকৌশল ও নির্যাতনের ইন্ধন সংযুক্ত হয়ে এন কোমোকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী থেকে এখন তিনি পলাতক সাময়িক ভাবে নিরুদ্দেশই বলা চলে।

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মদিনে

অমিতা পালিত

নব জাগরণের অরুণ আলোয় তরুণ তব মন,
খুঁজিয়া ফিরেছে, আকাশে বাতাসে, বন হতে উপবন।
প্রেমে বিহ্বল স্বপ্নে পাগল, আপন চিত্ত মাঝে,
প্রকৃতির সেই বিমুগ্ধ ছবি সদা অন্তরে রাজে।
মানবের মাঝে বেঁধেছ রাখী, প্রীতির নবীন সুরে
বিশ্ব প্রেমে হয়েছ পাগল, নিকটে এনেছ 'দূরে'।
দ্বন্দ্ব তোমার জীবনে এসেছে, সমাজ দিয়েছে বাধা,
বেদনা তোমায় মুক্তি দিয়েছে নবীন সুরেতে সাধা।

সঙ্গীত আর সুর দিয়ে তুমি গেঁথেছ নূতন মালা,
বঙ্গ-জননীর আরতি করেছ, সাজায়ে নূতন ডালা।
স্বদেশ প্রেমের মন্ত্র তোমার এনেছে নূতন ধারা,
বঙ্গের কূল প্লাবিত করেছ; পাগল হয়েছে ধরা।
বেদনা ভুলিয়া, দুঃখ ভুলিয়া, ভুলি যত অপমান,
আজিকে শ্রাবণে গাহিব সকলে অমর কবির গান।
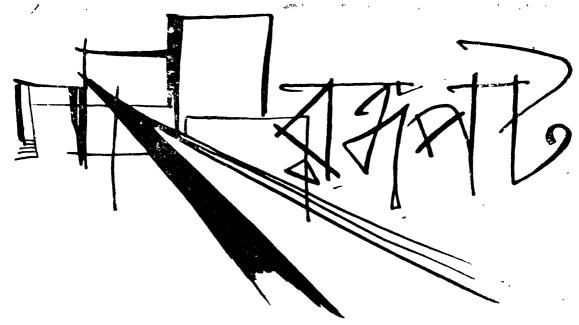
দমদম মঞ্চের অবিস্মরণীয় এক শিল্পী

অমল মিত্র

এদেশে বিদেশী রঙ্গালয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, শুধু কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজে ইংরেজ তার নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে নি। যেখানে সেনাবাহিনীর ছাউনী পড়েছিল, সেখানেই নাট্যশালারও অভ্যুদয় ঘটেছিল। সৈনিকরাই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। নিজেরাই তাঁরা অভিনয়ও করতেন। পরে সেনাবাহিনীর কর্মচারীদের সহধর্মিণীরাও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। অবশ্য বাইরে থেকেও অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হত।

উনিশ শতকের গোড়ায় এমনি বিরাট এক সেনাবাহিনীর পত্তন হয়েছিল কলকাতার উপকণ্ঠে দমদমায়। ছোট্ট কিন্তু সুন্দর এক রঙ্গালয়ও সেখানে গড়ে ওঠে। নাম দমদম থিয়েটার। কলকাতার কাগজে 'লিটল ড্রুরি' নামে পরিচিত হয়েছিল রঙ্গালয়টি। বিখ্যাত চৌরঙ্গী থিয়েটারকে 'ইণ্ডিয়ান ড্রুরি' নামে কাগজওয়ালারা অভিহিত করেছিল। ইংলণ্ডের নামজাদা নাট্যশালা ড্রুরি লেন থিয়েটারের নামানুসারেই এই নামকরণ। কাগজের 'লিটল ড্রুরি' নাম তার ব্যর্থ হয়নি, সার্থক হয়েছিল। একদা সুদূর বিস্তৃত হয়েছিল তার নাম। কলকাতায় সেদিন একাধিক নামকরা রঙ্গালয় থাকা সত্ত্বেও, এখানকার বহু নাট্যরসিক দর্শক যে দমদম থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যেতেন তার খবর কাগজে পাই। যেমন, ১৮২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারীর 'ইণ্ডিয়া গেজেট' বলে, এক অভিনয়-রাত্রে কলকাতায় বিরাট এক ভোজসভায় যোগদান করায়, সে-রাত্রে কলকাতা দর্শকরা দমদমায় অভিনয় দেখতে যেতে পারেন নি। তাই সেদিন টিকিট বিক্রীও ভাল হয়নি। বন-জঙ্গলে পরিকীর্ণ সেদিন ঐ অঞ্চল। যাতায়াতের পথ সুগম নয়। তবু, ঐ নাটকের অভিনয়ের আকর্ষণে কলকাতার দর্শকরা যেতেন পথকষ্ট স্বীকার করেও। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বিগত শতকের কলকাতা মঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মিসেস লিচের প্রথম আবির্ভাব ঘটে দমদম মঞ্চে। মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস গটলিয়েভ, মিসেস ব্র্যাণ্ড প্রভৃতি সে-যুগের আরো অনেক নামজাদা অভিনেত্রীও ঐ দমদম রঙ্গালয় থেকে এসে কলকাতা মঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন।

দিলীপকুমার ও আগা : বোম্বাই চিত্রজগতের দুই খ্যাতিমান চিত্রতারকা

তবে যাঁর অনবদ্য অভিনয়ে দমদম থিয়েটারের এত খ্যাতি, তিনি হলেন প্রথিতযশা শিল্পী সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান আর্টিলারির এক গোলন্দাজ সৈনিক চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিঙ। বিরাট প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা বাথ্‌ নগরের ছোট এক ডাক্তারখানার মালিক। ইচ্ছে তাঁর চার্লসকেও আপন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা। বালক ফ্র্যাঙ্কলিঙের কিন্তু দারুণ আকর্ষণ ছিল রঙ্গালয়ের প্রতি। চিন্তিত হলেন বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্কলিঙ। তাঁর মতে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং সম্মান তো পায়ই না, বরং কপালে জোটে '...more enemies through ignorance and fanatic illiberality, than good sence.'

পুত্রের সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা চলল তাই, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। লুকিয়ে গৃহত্যাগ করলেন চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিঙ। এমনি ছিল তাঁর নাটক অভিনয়ের ঝোঁক, রঙ্গালয়ের আকর্ষণ। যোগ দিলেন এক 'ট্রোলিং থিয়েটার কোম্পানী'তে। ঘুরতে ঘুরতে তারা বাথ্‌ নগরেরই অনতিদূরে কোন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছিল। সুদীর্ঘ আঠার মাস কাটল তাদের সঙ্গে। নানা স্থানে দলের সঙ্গে অভিনয় করে ঘুরলেন। অভিনয়ে ফাঁকি রইল না, কিন্তু পারিশ্রমিক প্রাপ্তিতে ফাঁক থেকে গেল অনেক। বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্কলিঙের কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেল। দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে ঘরে ফিরলেন ষোলো বছরের বালক ফ্র্যাঙ্কলিঙ। চলল এবার চাকরীর চেষ্টা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী মিললও শেষ পর্যন্ত।

মালা সিন্‌হা—ছায়াছবির বাইরে
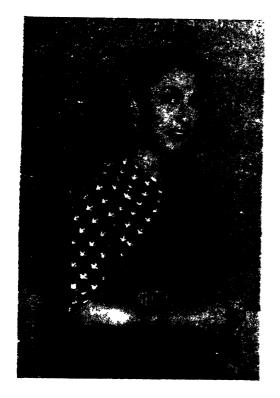
১৮১৭ সালে এদেশে এসে পৌঁছলেন। কর্মস্থল নির্দিষ্ট হল দমদমায়। ব্যারাকের অদূরে দমদম রঙ্গালয় মাত্র কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভিনয়ের ধারা তখন খুবই সাধারণ। যোগ দিলেন সেখানে গোলন্দাজ সৈনিক চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিঙ। অভিনয়ের ধারা গেল বদলে। সুদূর বিস্তৃত হল দমদম থিয়েটারের নাম। দূর প্রবাসে, বাংলার এক পল্লী অঞ্চলে, দীর্ঘকাল পরে চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিঙেরও চিরবাঞ্ছিত আশা সমাপ্ত হল। নতুন উদ্যমে নতুন উৎসাহে তিনি দমদম রঙ্গালয়ের অভিনয় পরিচালনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। যেন রঙ্গমঞ্চের একনিষ্ঠ সাধক তিনি। সেদিনের সকল দর্শককেই যেন তিনি সম্মোহিত করে রাখলেন। অভিনয়ের মান বাড়ল। 'রাইভালস,' 'ব্রোকন সোর্ড,' 'পেসেণ্ট বয়,' 'দি উইল,' 'দি ওয়াটার ম্যান,' 'রেজিং দি উইণ্ড,' 'রব্‌ রয়,' 'বোম্বাষ্টিস ফিউরিওসো,' 'দি হানিমুন' প্রভৃতি নানা নাটকের কঠিন ভূমিকাগুলিতে অংশগ্রহণ করতেন ফ্র্যাঙ্কলিঙ নিজে। কী বিয়োগান্ত নাটক, কী প্রহসন—যাতেই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীটি অংশগ্রহণ করতেন, তাই হত সর্বাঙ্গ সুন্দর। তাই তাঁর মৃত্যুর পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (৩০শে আগষ্ট, ১৮২৪) লিখেছিল—

'His powers were very versatile—for he was equally entertaining in high and broad comedy, and farce, and melo-drama, as in the tragic line.'

দমদমায় ছোট রঙ্গালয়টি অল্পদিনের মধ্যেই জমে উঠল। কলকাতায় সেদিন নামকরা রঙ্গালয় চৌরঙ্গী থিয়েটার পুরোদমে চলেছে। বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসন ও অন্যান্য আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় তার খবর। তারই পাশে কলকাতার উপকণ্ঠের ছোট ঐ রঙ্গালয়টির সমান স্থান অধিকার করে বসা বড় কম গৌরবের কথা নয়। সব-কিছু কৃতিত্বই কিন্তু ছিল ফ্র্যাঙ্কলিঙের। তাঁর জন্যেই রঙ্গালয়টি সেদিন অত সমাদর পেয়েছিল দর্শকদের কাছে। ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন তার প্রাণ। একা তিনি রঙ্গালয়টির জন্যে যা করেছিলেন, পরবর্তীকালে একমাত্র মিসেস লিচ তাঁর অনুবর্তিনী।

১৮২৪ সালে এই দমদমাতেই তাঁর মৃত্যু হল। ৩০শে আগষ্টের 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এ প্রকাশিত হল সে খবর। তারা লিখলে—

'At DumDum on the 25th August, Mr. Charles Frankling, Bombardier in the 2nd, Batt. Arty., aged 25 years. Many years a supporter of the Dum Dum Stage...'

বেদনাবিমূঢ় কলকাতা ও দমদমার দর্শকেরা। সামান্য এই গোলন্দাজ সৈনিকের নাম যেদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান পেয়েছিল এবং 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর সম্পাদক তাঁকে বর্ণনা করেছিলেন 'দি ওন্‌লি ট্র্যাজেডিয়ান আপন্‌ দি দমদম বোর্ডস' বলে। কর্মজীবনে সামান্য স্থান অধিকার করলেও, অভিনেতা ফ্র্যাঙ্কলিঙ উনিশ শতকের এখানকার ইংরেজ অধিবাসীদের বৈচিত্র্যকামী মনের সবটাই অধিকার

করে বসেছিলেন। মর্মাহত সম্পাদক তাই কালজয়ী এই শিল্পীটির বিষয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

'We have now cast our little Sprig of Rosemary upon the grave, of a lowly son of genius,—and in alluding to the Dum Dum Stage, have, we grieve to say, for the last time, mentioned its ornament—poor Frankling !'

দমদম রঙ্গালয়ের উজ্জ্বলতম আলোটি নিভল এবং বলা যেতে পারে তারপরেই এ রঙ্গালয়ের বিগত ঐতিহ্যের ওপর পুরু যবনিকা নেমে এল।

পলাতক

চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার সঙ্গে আপোষ যাঁদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ যাত্রিক গোষ্ঠীর স্থান তাঁদেরই মধ্যে। ছকে বাঁধা সীমায়িত গণ্ডীর ভিতর দিয়ে ছায়াছবিকে আবদ্ধ না রেখে চিত্রলোককে যাঁরা নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন সেই তালিকায় তাঁদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চাওয়া-পাওয়া, স্মৃতিটুকু থাক, কাঁচের স্বর্গ প্রমুখ যাত্রিক পরিচালিত বৈশিষ্ট্যবান ছবিগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করল 'পলাতক'।

পলাতকের গল্পাংশ জন্ম নিয়েছে বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক মনোজ বসুর বলিষ্ঠ লেখনী থেকে।

জমিদার আটি চাটুজ্যের ভাই এই মনোজ্ঞ কাহিনীর নায়ক। জমিদারবংশের সন্তান হয়ে সে তার জীবনকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করল, তার জীবনপিপাসু মনের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা, ফাঁকি, ছলনাকেই সামগ্রিক ভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে এই ছবিতে। পিতৃ-পিতামহের মত প্রচলিত বাঁধাধরা ছকের মধ্যে সে তার জীবনকে আবদ্ধ রাখে নি, জীবনকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে। সেই পিপাসুমনের পাওয়া না পাওয়ার বিচিত্র আনন্দ, ব্যাপক—বেদনা ছবিটির মধ্যে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

যাত্রিকগোষ্ঠী এমন একটি ছবি দর্শকসাধারণকে উপহার দিলেন যা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকমন ধরে রাখতে পারে, ঘটনা-সংস্থাপনে, চরিত্র-পরিচর্যায়, কাহিনী বিস্তারে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। কাহিনীর সুন্দর চিত্রনাট্য নাট্যরসকে চমৎকারিত্ব এবং পরিচালনার দক্ষতা এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ে এক অনবদ্য রসসৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। সমগ্র গল্পটি সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবে বলা হয়েছে, ফলে তার বক্তব্য ও আবেদন গভীরভাবে দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করে। প্রাকৃতিক শোভার অপূর্ব চিত্রায়ণ যুগপৎ মনে ও চোখে তৃপ্তি এনে দেয়। সমগ্র ছবিটিতে একটি স্নিগ্ধ সুর প্রবাহিত যা সারা ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

ভারতবিখ্যাত প্রযোজক শান্তারাম প্রযোজিত 'পলাতক'-এ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অনুপকুমার। তাঁর অভিনয় এক কথায় দর্শককে হতবাক করে দেয়। তিনি যে কতবড় শক্তিমান শিল্পী এই ছবিটিই তার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁকে অভিনন্দিত করি তাঁর এই অনবদ্য রূপসৃষ্টির জন্যে। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতবরণ, রবি ঘোষ, অনুভা গুপ্তও অভিনয়ে প্রভূত শক্তিমত্তার নিদর্শন রেখে গেলেন। সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী ও কৃতিত্বের স্পর্শসমৃদ্ধ। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভারতী দেবী, রুমা দেবী, অনুরাধা গুহ, স্মিতা সিংহ প্রভৃতির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

শেষ প্রহর

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রে সচরাচর যে সব ঘটনা ঘটে থাকে তাদের প্রায় প্রত্যেকটি এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কারণযুক্ত। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অপরাধবৃত্তির বিকাশ আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই পশ্চাৎপট কার্য-কারণের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত নয়। সকল ক্ষেত্রে না হলেও বহু ক্ষেত্রে এই উক্তির সত্যতার প্রমাণ মিলবে। দুর্নীতির যে ভয়াল প্রকোপে আমাদের সুস্থ সমাজ আজ বিষজর্জর তার উৎস সন্ধান করলে আমরা দেখব সমাজ নিজেই তার জন্যে দায়ী। জীবনের দিকদর্শী লেখক, বাঙলার সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সুবোধ ঘোষের রচনা অবলম্বনে নির্মিত চিত্র 'শেষ প্রহর' ছবিটির মধ্যে দর্শককুল এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাবেন। জঠরের জ্বালার জন্যে, ঋণমুক্তির

চিত্রনায়িকা সন্ধ্যা রায়

জন্যে, মুমূর্ষু ভ্রাতার চিকিৎসার জন্যে অতীশকে ছলনা, প্রতারণার আশ্রয় নিতে হ'লেও তার জীবনের একমাত্র সত্য ছিল প্রীতির প্রতি তার ভালোবাসা, সে ভালোবাসা তার জীবনের শুধু সত্যই নয়, একটি নিখুঁৎ সত্য, একটি জ্বালা সত্য, একটি সুন্দর সত্য। তার আত্মসমর্পণ—ফলে দলীয় সহকর্মীদের হাতে মৃত্যুবরণ সবকিছুর মূলেই এই ভালোবাসা।

একটি ত্রিভুজ প্রেমের চিত্তগ্রাহী মনোজ্ঞ গল্প এখানে পরিবেশিত হয়েছে অতিশয় নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। ছবিটির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে পরিচালক প্রান্তিকগোষ্ঠীর নৈপুণ্যে। ছবিটির আঙ্গিকে, বিন্যাসে, গঠনকৌশলে, প্রয়োগকুশলতায়, উপস্থাপন পদ্ধতিতে পরিচালকগোষ্ঠী কোন ফাঁক রাখেন নি। এই গতিসম্পন্ন কাহিনীর বলিষ্ঠ বক্তব্য বুদ্ধিজীবী দর্শকমহলে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগায়। বলিষ্ঠ বক্তব্য, কাহিনীর সারবত্তায়, পরিবেশ গঠনের কুশলতায় ছবিটি উচ্চাঙ্গের ও রসসমৃদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছে। আলোকচিত্র ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ছবিটি প্রশংসার অধিকারী।

অভিনয়াংশে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় যেমনই সার্থক তেমনই মনোমুগ্ধকর। তাঁদের অভিব্যক্তি, বাচনভঙ্গী, অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্র দু'টিকে জীবন্ত করে তুলেছে যার ফলে দর্শকচিত্ত জয়ে তাঁরা সক্ষম। শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয়ও যথেষ্ট শক্তির স্বাক্ষর সমৃদ্ধ। তাঁর অকৃত্রিম ও সাবলীল অভিনয় দর্শক-সাধারণকে যথেষ্ট পরিমাণ তৃপ্তি দেয়। অন্যান্য ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, বীরেশ্বর সেন, রবি ঘোষ, ছায়া দেবী, সুব্রতা সেন, ধীরাজ দাস, চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। ছবিটির সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শর্মিলা ঠাকুর—ছায়াছবির বাইরে

দুই নারী

নিছক আনন্দ বিতরণই চলচ্চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। হাসি-কান্না-সুখ-দুঃখভরা জীবনের এক নিখুঁৎ আলেখ্য তুলে ধরা চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম। সেই আলেখ্য জনজীবনে যত গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে তত তার সার্থকতা। তার প্রভাবের গভীরতাই তার সার্থকতা নিরূপণের চাবিকাঠি। চলচ্চিত্র সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ, মানুষের কাছে তার কল্যাণের জন্য, তার উন্নয়নের জন্যে বাণী পৌঁছে দেওয়ার এক বড় মাধ্যম হচ্ছে ছায়াছবি। ছায়াছবির নির্মাতাদের তাই দায়িত্ব অল্প নয়, এর পবিত্রতা এবং এর বৈশিষ্ট্যও অল্পমূল্যের নয়, যার মাধ্যমে সর্বসাধারণের উদ্দেশ বক্তব্য পেশ করা যায়। তার শুচিতা রক্ষা করে চলা চিত্রনির্মাতাদের অবশ্য কর্তব্য। চলচ্চিত্র আমাদের আনন্দ দেয় যেমনই সত্য, আবার এও ঠিক তেমনই সত্য যে, আমরাও সকল সময়ে চলচ্চিত্রের কাছে নিছক আনন্দই প্রত্যাশা করি না, তার মধ্যে আমরা কখনও দেখতে চাই জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ ছবি, আবার কখনও হাসি-খুশীতে ভরা একটি নিটোল গল্প যার মধ্যে হাস্যরস থাকবে প্রচুর কিন্তু নোংরামি থাকবে না। তাই এত বড় মাধ্যমকে যদি আমরা যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করে সত্যিকারের কল্যাণের পথে না নিয়ে গিয়ে তাকে এক আপত্তিকর কুরুচির আধার করে তুলি তাহলে অপরাধের অন্ত থাকে না।

দুই নারী ছবিটি প্রসঙ্গে এই আমাদের প্রধান বক্তব্য। কথাশিল্পী সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি জীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গড়ে উঠেছে।

দর্শক আকর্ষণ করার যতগুলি মোহিনীমায়া আছে প্রতিটির জালই সমাজের সরোবরে ফেলেছেন পরিচালক তাঁর গল্পের আঙ্গিকে, বিন্যাসে, বিশ্লেষণের দিকে তিনি দৃষ্টি আদৌ দিয়েছেন বলে মনে হয় না, তবে প্রণয় দৃশ্যগুলি ও নাচ-গান প্রমুখ প্রমোদ দৃশ্যগুলির সম্বন্ধে তিনি যে অতি আগ্রহ সহকারে আন্তরিক দৃষ্টি রেখেছিলেন সারা ছবিটিই সে কথার প্রমাণ দেবে। এ ছবিতে এদিক দিয়ে তিনি কিছুই বর্জন করেন নি। ক্যাবারে, নাচ-গান, মধুচন্দ্রিমা, চোরাকারবার প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের ভৌগোলিক ব্যবধানটিকে এক কথায় নস্যাৎ করে দিলেন।

ছবির মধ্যে আমরা আর কি পেলুম? পেলুম এক অতি দুর্বল চিত্রনাট্য। এক গতিহীন কাহিনী, জীবনের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য কতকগুলি প্রায় স্বপ্নবস্তুর এক সমারোহ। প্রারম্ভে জানানো হচ্ছে যে—যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যখন সমাজে ঘোর দুর্যোগ, কর্মহীনতা, অভাব, অনটন—আমাদের প্রশ্ন যে এ অবস্থা কি শুধু ঐ সময়টুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজকের সমাজ কি ঐ সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছে? আজকের দিনে কি সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে

প্রাচুর্য? মেসবাড়ী হলেই কি গোটাকতক অকালকুষ্মাণ্ড, কাণ্ডজ্ঞানহীন তরুণের সমাবেশ ঘটবে, মেসে কি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষেধ? এঁরা 'মেস' বলতে যে ছবি তুলে ধরেন, মহানগরী কলকাতার মেসগুলি কি সকল ক্ষেত্রেই তার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়? ব্যাবারে যা এঁরা দেখিয়েছেন তা এককথায় হ-য-ব-র-ল। মাধবচন্দ্রের মত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ জমিদার একবাক্যে শুধু তথাকথিত 'কাকা'র পরিচয়েই ছেলেটিকে জামাই করে ফেললেন? যে কোন মানুষ কন্যা বা পুত্রের বিবাহে অপর পক্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তবে কাজে অগ্রসর হন, আর মাধবচন্দ্র নিজে অমন সফল পুরুষ হয়ে এই রকম বালকসুলভ বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ করে ফেললেন? (কিম্বা হয় তো তাঁকে বোকা না বানালে 'গল্প' হয় না, এর সদুত্তর একমাত্র নির্মাতারাই দিতে পারেন)।

এই অসার রুচিবিসর্জিত দুর্বল ছবিটির মধ্যে একমাত্র উপভোগ্য বিকাশ রায়ের অভিনয়। তাঁর অভিনয়ই এই ক্লান্তিকর, বিন্দুমাত্র সাধুবাদের দাবীশূন্য ছবিটির কেবল দর্শনীয়। বলতে গেলে দর্শকবৃন্দকে শেষ অবধি তিনিই আটকে রেখেছেন। ছবিটির পর্বতপ্রমাণ ত্রুটির বহু অংশই চাপা পড়ে গেছে তাঁর অভিনয়ে এবং এই অসামান্য অভিনয়ের জন্যে দর্শকসাধারণের বিপুল সাধুবাদে তিনি বিভূষিত হয়েছেন। বিকাশ রায়ের পরেই যাঁর নাম উল্লেখনীয় তিনি সুপ্রিয়া চৌধুরী। কান্নিত সুপ্রীতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে। চরিত্রটির যথাযথ রূপায়ণে তাঁর আন্তরিকতার ও কৃতিত্বের অন্ত পাওয়া ভার। পাহাড়ী সান্যাল, কাজল গুপ্ত, কালী সরকার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরাও আপন আপন চরিত্রের প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এঁরা ছাড়া শিশির বটব্যাল, জহর রায়, অনুপকুমার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সমরকুমার, গোপাল মজুমদার, পতাকী মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নির্মলকুমার। সে অভিনয়ে না আছে বলিষ্ঠতা না আছে প্রাণের স্পর্শ। দ্বিতীয় বিবাহের ফুলশয্যার দিন তিনি বহুক্ষণ ধরে যে কান্না কেঁদেছেন সে কান্না দর্শক সাধারণের হৃদয়ে অনুকম্পা জাগায় না, উদ্রেক করে ক্রোধের, তবে তাঁর কান্নার সঙ্গে দর্শকসমাজ নিজেদেরও অশ্রু মিলিয়েছেন—তাঁরা কেঁদেছেন এই ভেবে যে, বাঙলা ছবির মান ও রুচি আর কত নীচে নামবে?

সাম্প্রতিক মঞ্চ-সংবাদ

সাম্প্রতিককালে মহানগরী কলকাতার প্রধান চারটি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও রজনীর পর রজনী অতিক্রমণ বাঙালীর মঞ্চপ্রীতির এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বাঙালীর সংযোগ নাড়ীর টানের মত, এক অচ্ছেদ্য হৃদয় বন্ধনের মত। আমাদের জাতীয় জীবনের কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সামাজিক, কি সাংস্কৃতিক দিকে রঙ্গমঞ্চের অনন্যসাধারণ অবদান বাঙালী কোনদিন ভুলতে পারে না, পারা সম্ভবও নয়।

যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চেরও সর্বৈব পরিবর্তন এসেছে। নাটকে, পরিচালনায়, অঙ্গসজ্জায়, বিন্যাসে, প্রয়োগপদ্ধতিতে স্বভাবতই কালোপযোগী পরিবর্তনের স্পর্শ পড়েছে। আজকের দিনের নাটকের ধারা আগেকার তুলনায় বিরাট ভাবে বদলেছে কিন্তু মঞ্চের সঙ্গে বাঙালীর যে হৃদয়ের বন্ধন তাতে এতটুকু পরিবর্তনের স্পর্শ লাগে নি, শিথিল হওয়া তো দূরের কথা বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে।

এখনকার চলতি নাটকগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, **বিশ্বরূপার 'সেতু'** রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করল তার তুলনা নেই। মাতৃত্বের জন্যে এক বুকফাটা হাহাকারকে কেন্দ্র করে এই নাটকের গল্প গড়ে উঠেছে। এই অপূর্ব প্রাণস্পর্শী নাটকটি যে অনুভূতিশীল দর্শকের চিত্ত কতখানি অধিকার করেছে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। শিশিরকুমারের পর বাঙলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নট প্রবীণ শিল্পী নরেশচন্দ্র মিত্র এই নাটকের পরিচালক। তিনি নিজে একটি চরিত্রেও কিছুকাল যাবৎ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাটকের রচয়িতা নাট্যকার কিরণ মৈত্র। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন তৃপ্তি মিত্র। অন্যান্য চরিত্রে আছেন অসীমকুমার, তরুণকুমার, মমতাজ আহমেদ, সন্তোষ সিংহ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, জয়শ্রী সেন, ইরা চক্রবর্তী প্রভৃতি

স্টার থিয়েটারে হচ্ছে **'তাপসী'**। একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীর জীবনকাহিনী এর উপজীব্য। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের এই রচনাটি নাটকের রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে সাহিত্যিক নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের কল্যাণে। ভূমিকালিপিও আকর্ষনীয়, যথা:—কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, নবকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু মঞ্জু দে, অপর্ণা দেবী, বাসবী

বাসবী নন্দী—ছায়াছবির বাইরে

নন্দী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস প্রভৃতি। তাপসীর প্রধান আকর্ষণ অনাদিকুমার দস্তিদারের সঙ্গীত পরিচালনা। সমগ্র আবহসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের গানের সুরযুক্ত।

রঙমহলের নাটক **'কথা কও'**। নাট্যকার সুনীলচন্দ্র সরকার, বাঙলার কবিকুলে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নাট্যকার হিসাবেও তিনি দক্ষতার ছাপ রাখলেন এই নাটকে। এই সঙ্গীতসমৃদ্ধ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন অসিতবরণ, সবিতাব্রত দত্ত, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মিত্র, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযুবালা, শিপ্রা মিত্র, দীপিকা দাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকান্তরিত সাহিত্যকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের **'তিতাস একটি নদীর নাম' মিনার্ভার** আকর্ষণ। একটি বিশেষ সমাজের আলেখ্য এই রচনাটির মধ্যে অঙ্কিত। এর বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন বিজন ভট্টাচার্য, নির্মল চৌধুরী, উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, শোভা সেন, নীলিমা দাস প্রভৃতি শক্তিমান ও শক্তিময়ী শিল্পীরা।

প্রযোজক অভিনেতা উত্তমকুমার ও সঙ্গীত পরিচালক ভূপেন হাজারিকা

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

অশান্ত ঘূর্ণি

খ্যাতিমান সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 'অশান্ত ঘূর্ণি'-কে চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপ দিচ্ছেন তাঁদের মধ্যে নীতিশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, জীবেন বসু, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সুখেন দাস, গীতা দে, রেণুকা রায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজেন সরকার ছবিটির সুর দিচ্ছেন।

ঘুম ভাঙার গান

ভারতের নবরূপায়ণে শ্রমিকদের বিরাট ভূমিকা অবলম্বনে 'ঘুম ভাঙার গান' ছবিটির কাহিনী রচিত হয়েছে। উৎপল দত্ত পরিচালিত এই ছবিটিতে শ্রমিকদের বাস্তব-জীবনের এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চরিত্রায়ণে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, মাধবী মুখোপাধ্যায়, নীলিমা দাস এবং জহর রায়। বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী রবিশঙ্করের সুরযোজনা এই ছবির মূল্যবৃদ্ধি করবে।

বিনিময়

দীপান্বিতা প্রোডাকসন্সের নিবেদন 'বিনিময়'-এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। এর চিত্তাকর্ষক কাহিনীর রচয়িতা ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। দিলীপ নাগ পরিচালিত এই ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসিতবরণ, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, কাজল গুপ্ত, গীতা দে, দীপালী চৌধুরী, গীতালি রায় প্রভৃতি।

এরা কারা

দেবী চিত্রমের 'এরা কারা' ছবিটির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। রূপায়ণে আছেন অসীমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র, নন্দিতা বসু প্রভৃতি। বীরেশ্বর বসু এই ছবিটির পরিচালক।

সপ্তর্ষি

সুন্দরম প্রযোজিত 'সপ্তর্ষি' চিত্রটি উমাপ্রসাদ মৈত্রের পরিচালনায় রূপ নিচ্ছে। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, নিরঞ্জন রায় এবং কাজল গুপ্ত প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। আলোকচিত্রায়ণের ভার নিয়েছেন দীনেন গুপ্ত।

শৌখীন সমাচার

নূরজাহান

বাঙলার অবিস্মরণীয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবর্ষে সেই মহান স্রষ্টার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ পিপলস ভয়েস তাঁর অন্যতম অমর

নাটক 'নূরজাহান' মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি পরিচালনা করলেন অতুল দত্ত। বিখ্যাত চরিত্রগুলি রূপদান করলেন অজিত সেনগুপ্ত, পান্না দত্ত, প্রদীপ ভট্টাচার্য, বাসুদেব বসু, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, লিলি চক্রবর্তী, সুতপা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

পথের ডাক

দিকপাল কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের ডাক' নাটকটি নিবেদন করলেন সুন্দরম সম্প্রদায়। নাটকের চরিত্রগুলির রূপ দিলেন মনোজ মিত্র, চণ্ডী চট্টোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, নীরেন ঘোষ, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করলেন বিশ্বনাথ চৌধুরী।

এ বাড়ী ও বাড়ী

বিশিষ্ট সাহিত্যিক জরাসন্ধের কৌতুকরসমিশ্রিত রচনা 'এ বাড়ী ও বাড়ী' মঞ্চস্থ করলেন বৈঠকী গোষ্ঠী। দক্ষ অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় নাটকটির পরিচালক। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জয়ন্ত ঠাকুর, দিলীপ সেন, দীপেন মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ ঠাকুর, তরুণ ঠাকুর, প্রণব বসু, সুনীত মল্লিক, অর্জুন মুখোপাধ্যায়, প্রণতি গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রা ঠাকুর, শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

চিকিৎসা সঙ্কট

পরশুরামের স্মরণীয় রচনা 'চিকিৎসা সঙ্কট' অভিনয় করলেন কালীঘাট বকবকম ক্লাবের সদস্যেরা। হরপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিলেন কমল চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ, দীপক রায়চৌধুরী, প্রতাপ পাল, অলক রায়চৌধুরী, সুদীপ গোস্বামী, গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মুকুল মণ্ডল, সুমিত মুখোপাধ্যায়, প্রবীর হালদার, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মানু মুখোপাধ্যায়, ইলা চৌধুরী।

জঞ্জাল

উমেশ নাগের 'জঞ্জাল' নাটকটি নিবেদন করলেন চারণ সম্প্রদায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করলেন শক্তি মুখোপাধ্যায়, অমর চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বসু, রূপক মজুমদার, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, মণি ভৌমিক, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী, তৃষ্ণা রায়চৌধুরী প্রমুখ শিল্পির্গ।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী হেমেন মিত্র, নৃপেন দত্ত, জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন ধর কর্তৃক গৃহীত

সুলতা চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

অপ্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধপ্রবণতা : যৌনশিক্ষার অভাব

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক বসুমতীতে 'শিশুদের যৌনশিক্ষা' সম্বন্ধে আমার লেখা একটি প্রবন্ধ ফাল্গুন '৬৮-র সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পর প্রবন্ধটির সত্যতাকে সমর্থন জানিয়ে একাধিক পাঠক-পাঠিকার লেখা যুক্তিগ্রাহ্য চিঠি প্রকাশিত হতে দেখে আনন্দিত হয়েছি। কেন না আমাদের দেশে যৌন-বিজ্ঞানের প্রতি ইচ্ছাকৃত উপেক্ষার মাশুল যে নিজেদেরই দিতে হচ্ছে সে কথা আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু এবং কিশোরদের মধ্যে যত অপরাধপ্রবণতার উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণে দেখা যাবে যৌনশিক্ষার অভাবই সেগুলির প্রধানতম কারণ। আলোচ্য প্রবন্ধে শিশু এবং কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা এবং তার সমাধানই আমাদের লক্ষ্য।

অপরাধের শ্রেণী মোটেই এক নয়। সাধারণত চুরি মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীর অপরাধের উদাহরণ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এ ছাড়া অপ্রাপ্তবয়স্কদের আর এক ধরণের মারাত্মক অপরাধের পরিচয় পাওয়া যায়—যৌন অপরাধ। বিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় অপরাধে অপ্রাপ্তবয়স্ক সমাজ যেন ডুবে গিয়েছে। দু'টি মহাযুদ্ধের দূষিত প্রতিক্রিয়া সমাজের ওপর যে ঝড় তুললো, তার ফলে অপরাধ যেন শিশু, কিশোর এবং তরুণদের শিরায় শিরায় নবচাঞ্চল্য জাগিয়ে তুললো। তার কারণ সমাজ। যাদের কাজ মিথ্যার বেসাতি, নারীদেহের ব্যবসা যাদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য—তারাই সমাজের যত্রতত্র গা-ভাসিয়ে বেড়াতে সুরু করলো, সমাজের অপ্রাপ্তবয়স্কদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব সীমাহীন।

অপরাধপ্রবণতা সেই দেশে তত বেশী, যে দেশে যত যৌনশিক্ষার অভাব। এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাই যদি হয় তাহলে যৌনশিক্ষার কেন্দ্রভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী কেন? এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর পাওয়া যাবে আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত শিশু অপরাধী লিন্ডসের 'Revolt of the modern youth' বইটি পড়লে। তিনি দেখিয়েছেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধ যেমন চুরি করা, খুন করা বা নারী ধর্ষণ করার প্রধানতম কারণ যৌনতা। ভারতে এইজাতীয় ঘটনার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রত্যহ সংবাদপত্রের পাতায় প্রাত্যহিক সংবাদ। ইংল্যাণ্ডের বারো-তেরো বছরের কিশোর-কিশোরীর দেহ চেতনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে Dr. Wendy Greengross একটি সভায় বলেছেন, (১) whole pattern of courtship had changed and that boys and girls now start courting—physical sexual union at 12 or 13 or perhaps even younger, courtship at this tender age going steady as it is called, according to her, is regarded as a status symbol. একটি উদাহরণ নেওয়া যাক, ১২ বছরের একটি বালক ১৩ বছরের সহপাঠীকে গুলী করে হত্যা করে—পুলিস তদন্ত করে জানলো যে দুই বন্ধুই একটি সুন্দরদেহ কিশোর বালকের (বয়স ১১) ওপর দৈহিক অত্যাচার করতো, ফলে এই দ্বন্দ্ব এবং হত্যাকাণ্ড।

যে কথা আগেও বলেছি যে শিশু এবং কিশোরদের যে পরিমাণে যৌনশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন তার সামান্য অংশও দেওয়া হয় না। অল্পবয়স থেকেই তাদের মন সংসারধর্মী হয়ে ওঠে, জন্ম সম্বন্ধে তাদের জানবার আকুল আগ্রহ চাপা দিয়ে রাখা হয় এবং আমোদ-প্রমোদের দিকে আগ্রহকে বিনষ্ট করে ফেলা হয়—ফলে ঔৎসুক্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। (২)

আমার পূর্ববর্তী প্রবন্ধটিতে লিখেছিলাম যে সন্তরণকালে যে স্বচ্ছ এবং অতি স্বল্প পোষাক ব্যবহৃত হয় তার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রকট হয়ে ওঠে ফলে কিশোর এবং কিশোরী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বর্তমানে নানা ছায়াছবির নগ্ন বিজ্ঞাপন যত্রতত্র দেখা যায়, বলা বাহুল্য সেগুলি অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে কামনার ইন্ধন স্বরূপ। আমেরিকায় সম্প্রতি গবেষণায় জানা যায় (৩) যে, সেখানের অপ্রাপ্তবয়স্কদের গুরুতর অপরাধের শতকরা ১২ ভাগের কারণ প্রধানত যৌনতা বা Sex! ৬ থেকে ২৫ বছরের নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ৫০০০ হাজার অপরাধের মধ্যে এই জাতীয় অপরাধের সংখ্যা ৩২৫০। অপরাধীদের বয়স :—

ছেলেদের বয়স	শতকরা ভাগ
১০—১৪	৫০
১৪—১৮	৫০

কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় ভারতের শিশু অপরাধীদের মোটামুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায় প্রথম স্থান বোম্বাইয়ের এবং দ্বিতীয় স্থান কলিকাতার। তথ্য নিয়ে প্রমাণ করা অসম্ভব নয় যে, এগুলির শতকরা ১০০ ভাগই যৌন-ঘটিত। সমাজের অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তালিকাটি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছে করলে সেটি দেখতে পারেন। (৪)

২। মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত বর্তমান প্রবন্ধকারের 'শিশুদের যৌনশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। Statesman, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৬২, দ্রষ্টব্য।

৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ই আগষ্ট ১৯৬২, দ্রষ্টব্য।

সার্ভিস কমিশনের কান্না

সংবিধানে অনেক কিছুই থাকে, কিন্তু সকল বিধান কি পালন করা হয়? পেনাল কোডের ধারানুযায়ী দুষ্টের দমনার্থে চোর, জুয়াচোর, পকেটমার শাস্তি পাইয়া থাকে। দোষ করিলে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদিও সকল দোষী যে স্বভাবের দোষে চুরি করিতেছে তাহা সত্য নহে। অভাবের তাড়নায়, কাজের অভাবে ও চাকুরীর আশায় থাকিয়া বিফল মনোরথ হইয়া কেউ কেউ চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সংবিধান অনুসরণ না করিয়া যাঁহারা শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে। অডিটর-জেনারেলরাই স্বীকার করিতেছেন, চাকুরী দেওয়া ও লোক নিয়োগের ব্যাপারে স্বজনপোষণ, আশ্রিতবাৎসল্য প্রভৃতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সঙ্ঘটিত হইতেছে। রাজ্য-সরকার সার্ভিস কমিশনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নিজ নিজ খুশীমত চাকুরী দান করিতেছেন। সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বহু অযোগ্য প্রার্থী যেখানে সেখানে নিযুক্ত হইতেছে। হিসাব-পরীক্ষক আপত্তি জানাইয়া দায়মুক্ত হইতেছেন। রক্ষক ভক্ষক হইলে হয় তো এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। সংবিধান রচয়িতাগণ সরকারী কাজে জন-নিয়োগের জন্য বেশ কয়েকটি সতর্কতামূলক বিধান সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার অবশ্যই অবগত আছেন। চাকুরীতে অযোগ্য প্রার্থী স্বেচ্ছায় নিয়োগের ফলে, সরকারী কাজ প্রায় অচল হইতে বসিয়াছে, সংবাদে প্রকাশ।

সরকারের কাজ চালাইতে হইলে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। প্রার্থীর সেই জ্ঞান আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পত্তন হয়। এই সংস্থা মারফৎ যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হইয়া থাকে। 'কমিশন'কে যদি সরাসরি সরকার উপেক্ষা করেন, কমিশনের অভিপ্রায় যদি সিদ্ধ না হয়, দেশের বেকার সমস্যাই বা কিরূপে সমাধান হইবে? শুনা যায়, প্রত্যেক প্রদেশে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নামক চাকুরীদানের কেন্দ্রসমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ করা হইয়া থাকে। এস্থলেও যোগ্য প্রার্থিগণ বঞ্চিত হইয়া থাকে। যেজন্য আমাদের দেশের বেকার সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একটি চাকুরীর জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত পড়িয়া থাকে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৮-৫৯ সনের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্টে কতকগুলি সরকারী কেলেঙ্কারী প্রচারিত হইয়াছে। কমিশন অভিযোগ করিয়াছেন: উক্ত বৎসরে সরকারী কাজে ১৪৯ জনকে নিয়োগের ব্যাপারে কমিশনের মতামত লওয়া হয় নাই। কমিশন কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অযোগ্যতা প্রমাণ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা উচ্চপদেই বহাল আছেন। ৬৭টি ক্ষেত্রে কমিশন লোক নিয়োগের সুপারিশ করিলেও বহু বিলম্বে এই সকল পদ পূরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অযোগ্য ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দেশের যুব-সম্প্রদায় চাকুরীর অভাবে বিপথগামী হইলে সরকারের মঙ্গল হইতে পারে না। জনশক্তি অকেজো হইয়া যায়।

চিকিৎসক রাজী নয়

মহাজনের উপদেশ Go back to village, 'অর্থাৎ গ্রামে ফিরিয়া যাও' শুনিয়া হয় তো সহরবাসীরা সহাস্যে উপহাস্য করিবেন। যতই আবর্জনায় পরিপূর্ণ হোক, নোংরা খাটাল ও বস্তীর প্রাচুর্য থাক কলকাতায়, তবুও সহরবাসের কয়েকটা সুখ-সুবিধা যে নাই তাহা বলা যায় না। সুতরাং অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলেই দেখা যায় গ্রামবাসীদের অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া সহরের দিকে পাড়ি জমাইতেছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, গ্রামের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ দিন দিন কমের দিকে যাইতেছে। গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির কল্যাণে বাঙলা দেশের গ্রামসমূহের যেরূপ বাসের অযোগ্য অবস্থা দাঁড়াইয়াছে দেখিলে শঙ্কিত হইতে হয়। এজন্য কলিকাতা হইতে খুব বেশী দূরে যাইতে হইবে না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগরীর ক্রোড়ে সহরতলীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৌখীন সহরবাসীও মাঝে-মিশেলে বনভোজনের লোভে যাইয়া হয় তো দেখিয়া থাকিবেন। সর্বত্রই যেন বনজঙ্গলে পরিণত। নালা-নর্দমার সংস্কার হয় না। পুকুর মজিয়া গিয়াছে। ঘাট ভগ্নপ্রায়। বন্ধুর আঁকা-বাঁকা পথ। দিনে মাছি এবং রাতে মশার বাধাহীন উপদ্রব। ক্ষীণ কুশ অসুস্থ শরীরের গ্রামবাসীদের আকৃতি দেখিলে ভয় হয়। যেন দুর্ভিক্ষের আসামী।

এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না, যদি না সংবাদপত্রে দেখিতাম, দেশের শিক্ষিত চিকিৎসকগণ না কি গ্রামে যাইতে রাজী না হওয়ার দরুণ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ মহা বিপাকে পড়িয়াছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামের নাম শুনিলে না কি চিকিৎসকরা আঁৎকাইয়া উঠিতেছেন। জনগণের সেবায় ব্রতী হইয়া স্থান-কাল-পাত্র বাছিতে সচেষ্ট হওয়া সমীচীন নয়! আমরা জানি, সরকারী-চিকিৎসকদের আয়ের পথ তেমন প্রশস্ত নয়। প্রাইভেট প্র্যাকটিশের ব্যবস্থা এখনও তাহাদের জন্য অনুমোদন হয় নাই। আমাদের স্বাস্থ্যদপ্তর অনেক ভাল ভাল কাজে হাত দিয়াছেন। গ্রামবিমুখ চিকিৎসকদের জন্য কিঞ্চিৎ উপরি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চিকিৎসকের অভাব হইবে না। এই সঙ্গে স্বাস্থ্য-দপ্তর যদি সাওলা দেশের গ্রামসমূহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন, দেশবাসী কৃতার্থ হইয়া যাইবে!

সেকেলে আমলের দলাদলিতে আত্মমগ্ন মিউনিসিপ্যালিটির হাতে পড়িয়া সোনার বাঙলার সবুজ গ্রামে আজ শুধুই অন্ধকারের কালো ছায়া। বিপন্ন অস্তিত্ব লইয়া বাঙলা দেশের গ্রাম নাভিশ্বাস ছাড়িতেছে। কে রক্ষা করিবে?

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধ

মূল্যবৃদ্ধির দাপটে দেশবাসী ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বর্ধিত হইতে হইতে বর্তমানে যে দরে চড়িয়াছে তাহা যেন কল্পনাতীত। শাসক সম্প্রদায়কে বাদ দিলে দেশে যে অগণিত জনসংখ্যা থাকে তাহাদের সাধ্যের একটা সীমা আছে। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও স্বল্প আয়ের হেতু অসামান্য নহে। হয় তো সরকারের পক্ষপুটে থাকিয়া সরকারী আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া সরকারী অর্থের অপব্যবহারে মত্ত থাকিলে জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানগম্যি লুপ্ত হইয়া যায়। নতুবা দেশের জনগণের দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া সরকার এখনও পর্যন্ত কোনপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্ট করিতে অগ্রণী হইতেছেন না কেন? দেশে এখনও জরুরী অবস্থা চলিতেছে। চীনারা যে পুনরাক্রমণ করিবে না, কে বলিতে পারে! সম্ভাব্য চৈনিক আক্রমণের আশঙ্কায় সম্প্রতি ভারত সরকার আমেরিকা ও ব্রিটিশ সরকারের সহযোগে বিমান-মহড়ার চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। জরুরী অবস্থা না থাকিলে আমাদের মোরারজী-সরকারই বা সঞ্চোজাত অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা দেশের মানুষের বিরোধিতার মধ্যেও অবশ্য অবশ্য চালু করিতে বদ্ধপরিকর কেন?

উদ্বৃত্ত না থাকিলে সঞ্চয় সম্ভব নয়। গ্রাস এবং আচ্ছাদনের, ভরণ এবং পোষণের জন্য যতটা আয়ের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ভারতবাসীর তাহা নাই বলিলেই চলে। আয়ের মাত্রাবৃদ্ধিরও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু দ্রব্যমূল্য কতকগুলি স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীর চক্রান্তে ক্রমে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেমন যেন উদ্দেশ্যমূলক নীরবতায় নির্বিকার আছেন আমাদের জনপ্রিয় কংগ্রেসী সরকার। শুধুমাত্র কয়েকটি নিয়ম করিয়া অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়। সরকারী চেষ্টায় বাজার দর অতি সহজে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, এমন নজীর বহু দেশে বর্তমান আছে। চোরাকারবারী, মুনাফাখোর ও ভেজালদাতা প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীদের গুলী করিয়া হত্যার সংবাদ মধ্যে মধ্যেই রুশ সংবাদদাতা টাস কর্তৃক প্রচারিত হইতেছে। দেশের মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলার পরিণাম ভাল হয় না! তদুপরি দেশে যদি অশিক্ষিত ও ক্ষুধার্তদের সংখ্যার আধিক্য থাকে, কোন স্বেচ্ছাচারী সরকার খুব বেশী দিন টিকিতে পারে না। কাঠামো ভাঙিয়া পড়িলে উপরের সুসজ্জিত মঞ্চপীঠের আয়ু আর কতকাল থাকে? আমাদের সরকার এখনও অবহিত না হইলে দেশের বাসিন্দাদের কাছে সরকারের মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে মূল্য হ্রাস পাইতে পারে।

।শোক সংবাদ।।

রাধারাণী মহতাব

পশ্চিমবঙ্গের সমাজকল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী এবং বাঙলার মহিলা সমাজের অন্যতমা নেত্রী বিশিষ্ট সমাজ-সেবিকা রাধারাণী মহতাব গত ১৫ই আষাঢ় মাত্র ৫০ বছর বয়সে লোকান্তরিতা হয়েছেন। বাল্যকালে বর্ধমানের মহারাজকুমার (বর্তমানের মহারাজাধিরাজ) উদয়চাঁদ মহতাবের সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইনি জয়লাভ করেন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। সমাজ, শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। মধুর, অমায়িক ও আত্মীয়সদৃশ আচরণের জন্যে সর্বস্তরে ইনি বিশেষ এক শ্রদ্ধার আসন অর্জন করেছিলেন। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজকে যুক্ত রেখে তিনি নানা ভাবে দেশ ও দশের সেবা করেছেন।

শৈলেন রায়

প্রখ্যাত গীতিকার ও কবি শৈলেন রায় গত ২২শে আষাঢ় ৫৩ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চলচ্চিত্রলোকের সঙ্গে তাঁর সংযোগ গড়ে ওঠে কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বছর আগে। অসংখ্য ছায়াচিত্রে বহু আলোড়নকারী ও মনোরম সঙ্গীত রচনা করে তিনি তাঁর প্রতিভার প্রভূত পরিচয় দিয়ে গেছেন।

ভবতোষ রায়

প্রবীণ সাংবাদিক ভবতোষ রায় গত ২০শে আষাঢ় ৭২ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। মাসিক পত্রিকা 'হিন্দু'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পত্রিকা সমালোচনা

নমস্কারান্তে নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠিকা জানবেন, এ বাড়ীতে মাসিক বসুমতী নিয়মিত আসে এবং এই জিনিষ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেই আমরা প্রত্যেকে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকি তারপর যখন সে হাতে আসে, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, তখনই হয় উৎকণ্ঠার অবসান। গত দু'তিন মাস যাবৎ আমরা লক্ষ্য করছি যে, মাসিক বসুমতী নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে—নতুন আঙ্গিকে এবারে তার রূপায়ণ। বলা বাহুল্য মাত্র যে এই নবরূপায়ণ অপূর্ব সফলতায় বিমণ্ডিত হয়েছে। বছর পনেরো ষোল আগে পুরাতন মাসিক বসুমতীকে পরিপূর্ণরূপে আধুনিক ভাবধারায় আপনি সুসজ্জিত করে তাকে পত্রিকাকুলের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সাময়িক জগতে এক যুগান্তর এনেছিলেন. আপনার কাছে আমাদের অফুরন্ত আশা, অনেক প্রত্যাশা, নবকলেবরের মাসিক বসুমতীর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আর নিবেদন করি যে এই আশ্চর্য কর্মের যিনি সুনিপুণ হোতা সেই প্রতিভাধর সম্পাদক অর্থাৎ আপনাকে। আপনার সম্পাদিত মাসিক বসুমতীর বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দান অতুলনীয়, সাহিত্যের পরিধি বিস্তারে বসুমতীর দান অগণ্য। জনমানসে সাহিত্য চেতনা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর, প্রবল থেকে প্রবলতর, তীব্র থেকে তীব্রতর করার ক্ষেত্রেও বসুমতীর অবদানের গভীরতার অবধি মেলে না। সেইজন্যেই পাঠকচিত্তে তার আসন যেমনই দৃঢ়, তেমনই স্থায়ী এবং তেমনই অটল। মাসিক বসুমতীর এবং আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কমনা করি। ইতি—সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।

সবিনয় নিবেদন,

আজ সুদীর্ঘকাল যাবৎ আমি মাসিক বসুমতীর একজন পাঠিকা। কর্মব্যপদেশে বহু বছর দেশের বাইরে থাকা সত্বেও মনেই হয় না যে দেশ থেকে আমি দূরে—এবং এর জন্যে দায়ী মাসিক বসুমতী। মাসিক বসুমতী জানতেই দেয় না আমাকে যে আমি দেশের বাইরে আছি। মাসিক বসুমতীর মধ্যেই আমি আমার দেশ ঘর আপনজনদের ছায়া প্রতিফলিত দেখতে পাই, শুনতে পাই তাদের কথা, জানতে পারি সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনায় ভরা বিচিত্র বারতা। মাসিক বসুমতী, আমরা সানন্দে লক্ষ্য করছি যে, যত তার বয়েস বাড়ছে ততই তার লাবণ্য ও শ্রী বিবর্ধিত হয়ে চলেছে। সত্যই এ রকম সর্বাঙ্গসুন্দর সাময়িকপত্র এ দেশে আর ক'টি আছে জানি না। বৈচিত্র্যে, অঙ্গসজ্জায়, অভিনবত্বে, উৎকর্ষে, বস্তু সম্ভারে—সকল দিক দিয়েই মাসিক বসুমতী অন্যান্য পত্র-পত্রিকাকে ম্লান করে দেয় এবং এই যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং এই বিরাট উন্নতি এর মূলে যে আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং কুশলী হাতের স্পর্শই মুখ্য দায়ী তা বলাই বাহুল্য। সম্পাদককুলের আপনি গর্ব ও গৌরব। মাসিক বসুমতীতে এই অপরূপ মহিমা, এই রূপলাবণ্য, এই মহান গরিমা আপনিই দান করেছিলেন আর সেই সঙ্গে রেখে গেলেন এক ঐতিহ্য যার মধ্যে আপনার অমরত্ব পাকা হয়ে রইল। মাসিক বসুমতীতে আমরা জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের ছোট গল্প পড়তে চাই। আমাদের নানা ইচ্ছা সর্বদাই আপ ন পূরণ করে এসেছেন। আশা করি এ ইচ্ছ'টুকু আপনার কাজে আমাদের অপূর্ণ থাকবে না। নমস্কারান্তে, ইতি—মাধুরী চক্রবর্তী, লক্ষ্ণৌ।

প্রতিবাদ

সবিনয় নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর বর্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত এই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতীর জীবনী পাঠ করে আমরা সবিশেষ আনন্দলাভ করেছি। এই জীবনীটির মধ্যে দু'টি ভুল আমাদের চোখে পড়েছে। সে দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আশা করি মাসিক বসুমতীর পরবর্তী সংখ্যায় এই ভ্রম সংশোধনটি প্রকাশ করে সুখী করবেন। প্রথম ভুলটি এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে। ব্যাঙ্কটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। হয়েছে ১৯৫২ সালে। এর রেজিষ্ট্রেশান নম্বর ৪এম/২৫।৩ ৫২। দ্বিতীয় ভুল—ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রীযুক্ত বসু এর চেয়ারম্যানের আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৬২ সালের ২৮এ জানুয়ারী পর্যন্ত উক্ত আসনে সমাসীন ছিলেন। কার্যনির্বাহক পরিষদ যখন পুনর্গঠিত হয় তখন স্বাস্থ্যগত কারণে শ্রীবসু পরিচালকপদ থেকেও অবসর নেন। ব্যাঙ্কের বর্তমান চেয়ারম্যান হচ্ছেন মেদিনীপুরের শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ মাইতি। শুভেচ্ছাসহ বিশ্বস্ত (স্বাঃ) আর কে পাঠক ব্যানার্জী, ইন্সপেক্টর ম্যানেজার, মেদিনীপুর কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, মেদিনীপুর।

মহাশয়,

'মাসিক বসুমতীর' অগণিত পাঠকের মধ্যে একজন নগণ্য পাঠক হিসাবে আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। যোগ্য মানুষের সম্পাদনায় একটি মাসিক পত্রিকা কত উন্নত হইতে পারে তার চরম নিদর্শন পেয়েছি বৈশাখ সংখ্যায়। প্রতিটি বিভাগই সর্বাঙ্গ সুন্দর। এবারের প্রচ্ছদপটটি যথেষ্ট মৌলিকতা দাবী করতে

পারে। 'নাচ-গান-বাজনা' বিভাগে জীবনী প্রকাশের জন্য আমি বাংলা তথা ভারতের দুই বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদের নাম উল্লেখ করিতেছি। 'আমার কথা' বিভাগে প্রকাশ করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীউষারঞ্জন মুখার্জী ১২০, সেলিমপুর রোড, ঢাকুরিয়া ও শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। সম্ভবত শেষোক্ত শিল্পী টালীগঞ্জে থাকেন। এই মহান দুই বাঙ্গালী শিল্পীর আত্মকথা সঙ্গীতপিপাসু ও রসিক জনের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিবে। 'মাসিক বসুমতী' সবদিক দিয়ে আরো উন্নতি করুক এই প্রার্থনাই করি। নমস্কারান্তে, দুর্গাশঙ্কর পাণ্ডা, তমলুক মেদিনীপুর।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী ইন্দিরা ব্যানার্জী, পোষ্ট বক্স নং ৩, 'জাকলকুঠী' জলপাইগুড়ি * * * শ্রীঅসীমকুমার মল্লিক, হাউস অব লেট জি, এন মল্লিক, বেতমন বাজার, মুঙ্গের, বিহার, * * * অদ্বৈত আশ্রম, ৫, দিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা—১৪, * * * শ্রীমতী এস ব্যানার্জী, ৫৩, বোধপুর পার্ক, কলিকাতা—৩১ * * * শ্রীঅমিতাভ সেনগুপ্ত, সারভেয়ার সয়াল 'ডি' কোলিয়ারী Exp. পোষ্ট—সয়াল, জেলা—হাজারিবাগ * * * শ্রীহরিদাস মজুমদার, ডাক—মহানন্দতলা, জেলা—মালদহ (পঃ বঙ্গ) * * * শ্রীভবানীচরণ চ্যাটার্জী, গ্রাম—খেড়ুয়া, ডাক—কোয়ারপুর, জেলা—বর্ধমান * * * শ্রীমতী মীনাক্ষী মুখার্জী, বাংলো নং-২৭ (Type IV) ডাক—পিপলানি, ভূপাল (মঃ প্রদেশ) * * * ডাঃ অজিত চৌধুরী সি, এ. এস, চ্যাংলং হেলথ ইউনিট, পোষ্ট—চ্যাংলং, তিরুপ ফ্রন্টিয়ার ডিভিসন, এন, ই, এফ, এ, ভায়া—মাকুরিটা * * * শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জী, মিনিষ্টার মেডিক্যাল ইটিসি, আসাম, শিলং * * * শ্রীমতী নমিতা সরকার, অবধায়ক—গোকুল সরকার, গ্রাম ও ডাক—দারা, জেলা—মেদিনীপুর * * * মহঃ আসংফ আলী, গ্রাম—কৃষ্ণপুর, ডাক—সন্ধিপুর, জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীপ্রদীপকুমার দে, অবধায়ক—ভবতোষ দে, ড্রাইভার, (লিচুতলা) ডাক—ভোলারডাবরী, জেলা—জলপাইগুড়ি * * * শ্রীভিকারীচন্দ্র সামন্ত, গ্রাম ও ডাক—কালাবা ব্যাঙ্ক, (রঘুনাথপুর হয়ে) কটক * * * গ্রন্থাগারিক, শ্রীরাম গ্রন্থাগার, গ্রাম—পাথর মোহরা, ডাক—মান বাজার, জেলা—পুরুলিয়া (পঃ বঙ্গ) * * * শ্রীমতী রমা সেন, অবধায়ক—ডা. এস, এন, সেন, ১৬, সেকেণ্ড মেন রোড, কস্তুরাবানগর, আড্যার, মাদ্রাজ-২০।

মাসিক বসুমতীর জন্য বাৎসরিক মূল্য সডাক ১৫৲ পাঠাইলাম। বিশেষ কারণে টাকা পাঠাইতে দেরী হইল। সেইজন্য আন্তরিক দুঃখিত। সুধারাণী চৌধুরী, (কাছাড়)।

Rs. 15/- is send for Monthly Basumati for the year 1370 B. S.—Sm. Lilabati Devi, Po. Lataguri, Jalpaiguri.

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। যথাসময়ে টাকা পাঠাইতে ভুল হইয়াছে। সেজন্য অত্যন্ত লজ্জিত। বীণা রায়, (মুখোপাধ্যায়,) জলপাইগুড়ি।

আমাদের গ্রন্থাগারের বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ পাঠাগার, বাঁকুড়া।

এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। সত্বর পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। প্রতিমা ধর, কানপুর।

I am sending herewith Rs. 15/- being annual subscription of Masik Basumati for 1370 B. S. Please send the copies regularly.—Krishna Roy, Kamrup, Assam.

বর্তমান বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া সুখী করিবেন। অসীমা প্রামাণিক, আসাম।

মাসিক বসুমতীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। শক্তিপদ পাত্র। রিহাবাড়ি, আসাম।

আমি এই বৎসরের জন্য ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। -শ্রীমতী আরতি দাস, উড়িষ্যা।

Herewith I am sending a sum of Rs. 15/- as the annual subscription for the year 1370. Kindly send the Masik Basumati from the month of Baisakh.—Sm. Mira Debi, Port Blair, Andaman.

১৩৭০ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলাম। প্রাপ্তি স্বীকারে বাধিত করিবেন। প্রভাবতী দেবী পশ্চিম-দিনাজপুর।

I am sending Rs. 30/- as subscription for the current year on my behalf and also on behalf of —Mrs. Nirmalya Basini Debi, Sriniketan, Bolpur.

Basumati (Monthly) teaches us to shoulder this awesome responsibility with dignity and maturity in this critical time at our country's history. Kindly renew my subscription for the current year. Rs. 15/- is sent herewith.—Miss. Mahasveta Dutta, Maharashtra.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। রেখা ভট্টাচার্য, আসাম।

Remitting herewith Rs. 15/- only being the subscription of Monthly Basumati. Please furnish the receipt for the said amount. Inspector of Schools, Tripura.

বর্তমান বৎসরের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া প্রাপ্য বইগুলি পাঠাইবেন। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, কটক।

বৈশাখ মাস হইতে এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম: নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন, শ্রীমতী অপর্ণা ত্রিবেদী, বোম্বাই।

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। পারুলবালা দেবী, জলপাইগুড়ি।

আমার এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। ইরা মজুমদার, তমলুক, মেদিনীপুর।

বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, প্রতিমা রাহা, কলিকাতা—২০।

বৈশাখ হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবার জন্য ১৫৲ পাঠাইলাম। শ্রীমতী মণিকা রায়চৌধুরী, রাঁচি।

মাসিক বসুমতী

।। শ্রাবণ, ১৩৭০ ।।

(জলরঙ)

পূজারিণী

—শ্রীমতী গৌরী রায় অঙ্কিত

সুস্থ ঝকঝকে দাঁতে মিষ্টি হাসি
SADHANA DASAN
SADHANA AUSADHALAYA DACCA-CALCUTTA
সাধনা দশন

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৪২শ বর্ষ | ১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৭০ | ৪র্থ সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

।। স্থাপিত ১৩২৯ ।।

ধর্ম লইয়া বিবাদ ঠিক খোসা লইয়া বিবাদের মত। যখন হৃদয়ের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হয়, তখন হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় এবং এইরূপ ঝগড়ার সূত্রপাত হয়।

ধর্ম পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটিয়েছে, মানুষের আর কোনো প্রচেষ্টাই তা করে নি; আবার ধর্মের মত আর কিছুই দীন-দুঃখীদের জন্ত এত হাসপাতাল ও আশ্রয়নিকেতন স্থাপন করে নি, ধর্মের মত আর কোনো মানবোদ্যোগ, শুধু মানুষেরই নয়, দীনতম পশু-পাখিরও এতটা সেবাযত্ন করে নি। ধর্মের মত আর কিছুই মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে নি, ধর্মের মত আর কিছুই মানুষকে এত কোমল করে নি।

ধর্মের নামে যত দোষারোপই করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে উহা ধর্মের দোষ নহে; কেবল ধর্মই কোনোকালে মানুষকে উৎপীড়ন করে নাই, ডাইনীকে পুড়াইয়া মারে নাই। তাহা হইলে কে মানুষকে এই সকল নৃশংস কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল?—উহা রাজনীতি, কখনও ধর্ম নহে, যদি এরূপ রাজনীতি ধর্মের নাম গ্রহণ করিয়া কাজ করে তবে সে দোষ কাহার?

আমার ধর্ম অথবা তোমার ধর্ম, আমার জাতীয় ধর্ম অথবা তোমার জাতীয় ধর্ম বলিয়া কোনো কিছু নাই। কোনোকালেই ধর্ম অনেকগুলি ছিল না। ধর্ম এক। অনন্তকাল ব্যাপিয়া এক অনন্ত ধর্ম বিরাজ করিতেছে এবং চিরকাল করিবে, তবে এই ধর্ম বিভিন্ন দেশে আপনাকে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিয়াছে মাত্র।

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা—সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে।

প্রকৃত ধর্ম একটি মাত্র—আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে, বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করে মরি।

যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ, যাহাদের মন অশান্ত, তাহারা ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পায় না। যাহারা অন্তরে সত্য, কর্মে পবিত্র যাহাদের ইন্দ্রিয়াদি সংযত, কেবলমাত্র তাহাদেরই মধ্যে আত্মার বিকাশ হয়।

প্রত্যেক কর্তব্যই পবিত্র এবং কর্তব্যানুরাগ ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠ স্তর। আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং মানুষের হৃদয়কে জাগরিত করিতে, তাহাদিগকে তাহাদের আত্মার মহিমা প্রদর্শন করিতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার করা প্রয়োজন হইয়াছে।

আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান, স্বর্গীয় অনন্ত অগ্নিশিখার আমরা স্ফুলিংগ। সুতরাং কেমন করিয়া আমরা কিছুই না হইতে পারি? আমরাই সব, আমরা সমস্তই করিতে প্রস্তুত, আমরা সমস্তই করিতে পারি এবং মানুষ অবশ্যই সব কাজ করিবে।

দুইটি বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস রাখিবে।

মানুষ এই জগতে পদ্মপত্রের ন্যায় বাস করিবে। পদ্মপত্র জলে

জন্মে কিন্তু কখনও জলসিক্ত হয় না; সেইরূপ মানুষ এই জগতের কেন্দ্রে কর্মে হস্ত স্থাপন করিয়া বাস করিবে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি সমগ্র হৃদয়টি ন্যস্ত করিয়া রাখিবে।

তোমার ভিতরে যে ঈশ্বর আছেন, তিনিই সর্বভূতে বিরাজিত। তুমি যদি ইহা না জানিয়া থাক, তবে তুমি কিছুই জান নাই। প্রত্যেক প্রাণীদেহই সেই বিরাট পুরুষের মন্দির। তুমি যদি তাহা দেখিতে পাও, ভাল, যদি না পাইয়া থাক, তবে তোমার এখনও আধ্যাত্মিকতা লাভ হয় নাই।

যদি আমরা প্রার্থনাকালে বলি যে ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা, কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক লোকের সহিত আমরা ভাইয়ের মত ব্যবহার না করি, তবে আর কি লাভ হইল?

পৃথিবীর যে কোনো ক্ষেত্রেই যে কোনো অমঙ্গল হউক, প্রত্যেকেই তাহার জন্য দায়ী। যাহা সকলের মধ্যে মিলন ঘটায় তাহাই পুণ্য, আর যাহা বিচ্ছেদ ঘটায় তাহাই পাপ।

তুমি অনন্তের অংশ। উহাই তোমার প্রকৃতি। অতএব তুমিই তোমার ভ্রাতার রক্ষক।

যখন তুমি অন্যকে আঘাত কর, তখন তুমি নিজেকেই আঘাত করিয়া থাক, কেন না তুমি ও তোমার ভ্রাতা এক।

যিনি নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দেখেন এবং নিজের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি উপলব্ধি করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী।

সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু।

প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু।

জ্ঞানই জীবন, অজ্ঞানতাই মৃত্যু।

কোনো ব্যক্তি বা জাতি অপর ব্যক্তি বা সমাজ হইতে পৃথক হইয়া বাঁচিতে পারে না। ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা অথবা রাজনীতির অজুহাতে যখনই এ জাতীয় কোনো চেষ্টা হইয়াছে, তখনই তাহার ফল নিতান্ত অশুভ হইয়াছে। যদি সেই অদ্বিতীয় ভগবান, যিনি মানুষের সকল মিলিত আত্মার মধ্যে আছেন, তাঁহার সেবা করিতে পারি, তবে আমি হাজারবার জন্মগ্রহণের দুঃখভোগ করিতে রাজী আছি। সর্বোপরি, আমার বিশেষ পূজা হইবে সেই ভগবানের, যিনি সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে,—পাপী, দীন-দরিদ্র ও দুষ্টের মধ্যেও—বিরাজমান।

কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতায়' হতে হবে। পড়েছ তো 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি—'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' দরিদ্র, অজ্ঞানী কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক। ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

আমি মুক্তি চাই না ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, 'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ'! বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা—ইহাই আমার ধর্ম।

যারা দুর্বল তারা ঈশ্বরকে পায় না। কখনও দুর্বলতাকে আশ্রয় করে না। তোমাকে বলী হতে হবে; অনন্ত শক্তি রয়েছে তোমার ভিতরে। এ নইলে কোনো কিছুকে জয় করবে কী দিয়ে? এ নইলে ঈশ্বরের কাছে আসবেই বা কী করে? সেই সঙ্গে অত্যধিক আমোদ-প্রমোদও তোমাকে পরিহার করতে হবে। ও রকম অবস্থায় মন কখনও শান্ত হয় না—চঞ্চল হয়ে পড়ে।

অনাবসাদ, চিত্তস্ফূর্তি অবসাদ আর যাই হোক না কেন, ধর্ম নয়। সদাহাস্য ও প্রফুল্ল ব্যক্তি ঈশ্বরকে পায়—শত প্রার্থনাতেও যা সম্ভব নয়। মন যাদের বিষণ্ণ নিরানন্দ, তারা ভালবাসবে কী করে? তারা যদি প্রেমের কথা বলে, সেটা মিথ্যে বলে—আসলে তারা অপরকে আঘাত করতেই চায়। ধর্মের ব্যাপারে যারা গোঁড়ামি করে তাদের কথাই ধর। তারাই সব চাইতে উন্নাসিক। তাদের ধর্মই হচ্ছে কথায় ও কাজে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করা।... ক্ষমতা লাভের প্রলোভনে তারা কালই রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারে। ক্ষমতার পূজা আর উন্নাসিকতার দাসত্ব করে করে তারা হৃদয় থেকে ভালবাসার শেষ বিন্দুটুকুও মুছে ফেলেছে। এ জন্যই সর্বদা নিজেকে দুর্ভাগা বলে মনে করলে কখনোই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যায় না। 'আমি কী দুর্ভাগা?'—এ কথা বলার মধ্যে ধর্ম নেই, আছে শয়তানি। প্রত্যেক মানুষকেই তার বোঝা বইতে হবে। তুমি যদি দুর্ভাগা হও, চেষ্টা কর দুর্ভাগ্যকে জয় করতে।

পাপের বীভৎসতার মাঝে শুধু বল—হে প্রভু, হে আমার প্রিয়তম! মৃত্যুর বেদনার মাঝে বল—হে প্রভু, হে আমার প্রিয়তম! পৃথিবীর সকল কদর্যতার মাঝে বল—হে প্রভু, হে আমার প্রিয়তম! তুমি রয়েছ আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আছো, আমি তোমাকে অনুভব করছি আমি যে তোমারই, আমাকে গ্রহণ কর প্রভু! আমি সংসারের নই, আমি তোমার, আমায় পরিত্যাগ করো না।

হীরের খনি ফেলে কাচের পাথর খুঁজতে যেও না। জীবনটা মহা ভাগের খেলা। তুমি কি পার্থিব সুখের সন্ধান করছ? তিনিই তো সমস্ত আনন্দের উৎস। যা সর্বোত্তম তার অন্বেষণ কর, যা সর্বোচ্চ তার প্রতি লক্ষ্য কর, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠকে লাভ করবেই।

দুর্বল ভীরু স্বার্থপর নির্জীবের না ইহকাল, না পরকাল। তেজস্বী বীর্যবান সংযমীই ধর্মলাভের অধিকারী। হে যুবকগণ, আগে নিজেদের উপর বিশ্বাস আনো। আত্মবিশ্বাস থাকলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আপনিই আসবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

অজ্ঞান জড়বৎ জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। পরাজয়ের জীবন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু শ্রেয়। ইহা ধর্মের মূল কথা। মানুষ যখনই কোনো কাজের জন্য উঠিয়া দাঁড়ায়, তখনই সে সত্য সন্ধানের পথে যাত্রা শুরু করে, অর্থাৎ সে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

ধার্মিক হইবার এই পথে দৃঢ়তা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আমি আমার নিজের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া লইব। আমি সত্যকে জানিব, অথবা এই চেষ্টায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিব, কারণ জীবনের এই দিক কিছুই নহে। ইহা চলিয়া যাইতেছে, ইহা প্রতিদিন বিলুপ্ত হইতেছে। কিন্তু অপর দিকে জয়ের প্রচুর আনন্দ রহিয়াছে। জীবনের সকল দুঃখ বা দুর্দশাকে জয়, জীবনকে জয়, সমগ্র বিশ্বজগতকে জয়। জীবনের একমাত্র এই পারেই সকল মানুষ দাঁড়াইতে পারে।

এই জগতের সুখ, দুঃখ ও ভাগ্যবিপর্যয় লইয়া মাথা ঘামাইতেছ কেন? যদি সাহস থাকে ত' ইহার অপর পারে চলিয়া যাও। জাগতিক আচার-অনুষ্ঠানের অতীতে চলিয়া যাও, জগৎ বিলুপ্ত হউক, তুমি স্থির দাঁড়াইয়া থাক এবং বল যে, 'আমি সকল অস্তিত্বের অতীত, জ্ঞানের অতীত, সকল শুভাশুভের অতীত, আমি তিনি, তিনিআমি, সোহহং।'

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে
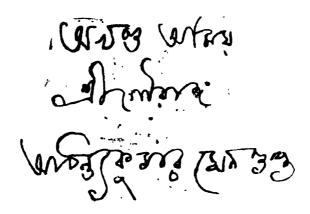
৬১

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর ভাগবত নিয়ে আরো আলোচনা হল। শ্রুতিবাক্য আর ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে ভাগবতের ঐক্য প্রমাণ করলেন। ভাগবত আর বেদান্ত দুই-ই ব্যাসের রচনা—ভাগবতই বেদান্তের ভাষ্য। সর্ববেদান্তসারই ভাগবত। প্রকাশানন্দের অন্তরে জাগিয়ে দিলেন ভক্তি, শাশ্বত আনন্দ। প্রকাশিত আনন্দের প্রতিমূর্তি বলেই প্রকাশানন্দ।

'এবে শোন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।' বললেন প্রভু, 'ভাগবতের প্রতি শ্লোকেই এই ভক্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। শুধু ভাগবতই বিচার করো, তা থেকেই বেদোপনিষদের সার রহস্য বুঝতে পারবে।'

'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥'

কাশীবাসী সন্ন্যাসীরা ভাগবতচর্চায় মন দিল। আরম্ভ করল নামকীর্তন। বারাণসী দ্বিতীয় নবদ্বীপ হয়ে গেল।

প্রভু পরিহাস করে বললেন, 'কাশীতে আমি ভাবকালি বেচতে এসেছিলাম, শুনেছিলাম গ্রাহক নেই, বস্তু বিকোবে না এখানে। কিন্তু তাই বলে কি মাল আবার দেশে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া চলে?' মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আর তপন মিশ্রকে লক্ষ্য করলেন: 'তোমাদের দুঃখ হল যে বোঝা নিয়ে ফিরে যাব, তাই তোমাদের ইচ্ছায় উজাড় করে সব বিনামূল্যে বিলিয়ে দিলাম।'

বারাণসীতে প্রচণ্ড কোলাহল উঠল, স্বয়ং ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। পূব দক্ষিণ পশ্চিম নিস্তার হয়েছে, এক বাকি ছিল কাশী, তাও এবার ত্রাণ পেল। দিগদিগন্তর থেকে লক্ষ-লক্ষ লোক দেখতে এল প্রভুকে, কিন্তু কোথায়, কোথায় তিনি আত্মগোপন করে আছেন? চলো সবাই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই কাতার দিয়ে। প্রভু যখন স্নানে যাবেন, যাবেন বিশ্বেশ্বর দর্শনে তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখব।

চন্দ্রশেখরের বাড়িতে প্রভু আছেন, আর চুপি-চুপি তপনের বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে নিচ্ছেন। কিন্তু স্নানের সময় লোকসমাবেশ এড়াবেন কী করে? আর যদি একবার জনতার মাঝখানে গিয়ে পড়ছেন, অমনি ধ্বনি তুলছেন, বলো হরি, বলো কৃষ্ণ।

'প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর।
তাহাই সকল লোক আসি হয় ভিড়॥'
'বাহু তুলি প্রভু কহে, 'বোল কৃষ্ণ হরি'।
দণ্ডবৎ পড়ে লোক হরিধ্বনি করি॥'

পাঁচ দিন থাকলেন কাশীতে। সনাতন সনাতন প্রশ্নের উত্তর পেল, আর প্রকাশানন্দ পেল প্রবোধানন্দ! প্রভু বললেন, এবার ফিরব নীলাচল।

তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর রঘুনাথ সবাই সুর তুলল, আমরাও যাব।

প্রভু বললেন, 'না, আমি এখন একা যাব। যাব সেই ঝাড়িখণ্ডের পথে। তোমরা যদি কেউ আসতে চাও পরে এস। আর তুমি,'—সনাতনকে লক্ষ্য করলেন: 'তুমি বৃন্দাবনে যাও। তোমার দু'ভাই সেখানে আছেন, তুমিও সেখানে গিয়ে সাধনভজন করো। আর যদি সেখানে আমার দীন-দরিদ্র কাঙাল ভক্তরা আসে তাদের প্রতিপালন কোরো। দিয়ো তাদের ভক্তি-উপদেশ।'

'কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন॥'

যে প্রভু পাত্রাপাত্রবিচার, আত্মপরজ্ঞান, দেয়া-দেয় বিচার ও কালাকালের অপেক্ষা না করে শ্রবণ-ঈক্ষণ ধ্যান-প্রণামে দুর্লভ ভক্তিরস অকাতরে দান করেন সেই ভগবান গৌর-ই আমার একমাত্র গতি।

'আপনি করি আস্বাদন শিখাইল ভক্তগণ
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান যারে-তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার ঐছে দাতা নাহি আর
গুণ কেহো নারে বর্ণিবারে॥'

যে ভক্তি লক্ষ্মীসমৃদ্ধ তার আর কামনার বস্তু কী থাকতে পারে? আর যে ভক্তি ধনবঞ্চিত তারই বা অন্য প্রার্থনীয় কী আছে?

'প্রিয়তম এবহি বরণীয়ো ভবতি।' প্রিয়তমজনই বরণের উপযুক্ত। ভগবানের প্রীতিপাত্র কে? যে ভক্তিতে অবস্থিত সে। আর যাকে ভগবান নিজে থেকে বরণ করেন সেই তো লাভ করে ভগবানকে।

ধ্রুবানুস্মৃতিও ভক্তি। 'স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।' ধ্রুবানুস্মৃতি বা তৈলধারার মত প্রগাঢ় ধ্যান হলে সকল গ্রন্থি বা চিত্তের রাগদ্বেষাদি কষায় নাশ হয়। ভক্তির আরেক নাম প্রজ্ঞা। যে জ্ঞানে ভগবানের স্বরূপ শক্তির লীলাবিলাসবৈচিত্রীর অনুভব জাগে তাই ভক্তি। প্রণিধানের অর্থও ভক্তি। 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা।' ঈশ্বরকে জানবার ও পাবার সুখসাধ্য উপায়ই ভক্তি। দুঃখলেশস্পর্শশূন্য অনুপম আনন্দ যা স্বতঃ পুরুষার্থ, পরমপুরুষার্থ, তাই ভক্তি। ভক্তিই হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎসার।

কাশীতে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন প্রভু। ঝারিখণ্ডের পথে চললেন নীলাচলের পথে। সঙ্গী শুধু বলভদ্র আর সেবক-ব্রাহ্মণ।

সনাতন চলল বৃন্দাবন।

রূপ মথুরায় এসে সুবুদ্ধি রায়ের দেখা পেল। সুবুদ্ধি রায়ই রূপ-অনুপমের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিল আর দেখাল ব্রজমণ্ডল।

কে এ সুবুদ্ধি রায়?

গৌড়ে 'অধিকারী' ছিল। তার অধীনে চাকরি করত হুশেন শা। হুশেন শা-কে দিঘি খনন করবার ভার দিল সুবুদ্ধি। কাজে ত্রুটি পেয়ে সুবুদ্ধি হুশেন শা-কে চাবুক মারল। পিঠের আঘাত এত গভীর হল যে ঘা শুকোলেও দাগ মিলিয়ে গেল না। তা হলে কী হয়, হুশেন শা যখন কালক্রমে নবাব হয়ে বসল তখন প্রথম-প্রথম সুবুদ্ধিকে সে অনেক সম্মান দেখাল, করল অনেক পরিতোষ। কিন্তু একদিন, হুশেন শার স্ত্রী দেখতে পেল সেই খোলা পিঠের কালো দাগ। স্বামীকে জিগগেস করল, এ দাগ কিসের?

'সুবুদ্ধি রায় একবার মেরেছিল?' আর ঢেকে রাখতে পারল না হুশেন শা।

'কী মেরেছিল?'

'চাবুক।'

সব শুনে স্ত্রী মরীয়া হয়ে উঠল। 'তুমিও সুবুদ্ধি রায়কে মারো।'

'প্রহার করব?'

'না, বধ করবে। একেবারে মেরে ফেলবে।'

হুশেন শা বললে, 'তা পারব না। সুবুদ্ধি রায় আমার পূর্ব মনিব, আমার পালনকর্তা, পিতৃতুল্য। তাকে প্রাণে মারা অধর্ম হবে।'

'তা হলে জাতে মারো।'

'জাতে মারলেও সে প্রাণে বাঁচবে না।'

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই নিবৃত্ত হল না। স্বামীকে দিবারাত্রি উত্তেজিত, উত্যক্ত করতে লাগল।

সুবুদ্ধি রায়কে ডেকে এনে তার মুখে করোয়ার জল ঢেলে দিল হুশেন শা।

সুবুদ্ধি রায়ের জাত গেল। কাশীতে এসে পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চাইল। কেউ বললে, তপ্ত ঘি খেয়ে প্রাণত্যাগ করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। কেউ বললে, নিজের ইচ্ছায় তো আর জল খায়নি, এ অবস্থায় অত বড় শাস্তি অবিধেয়। কী করে কোথায় যায়, সুবুদ্ধি অস্থিরচিত্তে দিন কাটাতে লাগল।

এমন সময় বৃন্দাবনের পথে কাশীতে মহাপ্রভু এলেন।

সুবুদ্ধি তাঁর কাছে গিয়ে সুবুদ্ধি চাইল।

প্রভু বললেন, 'নিরন্তর হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তুমি বৃন্দাবনে যাও, অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম

কীর্তন করো। এক নামাভাসেই তোমার পাপদোষ যাবে, আর নাম হতেই পাবে কৃষ্ণচরণ।'

অনন্যগতি, বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, জ্ঞানবৈরাগ্য-শূন্য, ব্রহ্মচর্যবর্জিত, সর্বধর্মত্যাগী অমানুষও যদি বিষ্ণুনাম জপ করে, তা হলে সেও অনায়াসে ধর্মনিষ্ঠদেরই দুর্লভ গতি লাভ করে। হরিনাম পরম পাবন, অশুচিকে শুচি করে, অতীর্থকে তীর্থ করে। হেলায়-অশ্রদ্ধায় এমনকি বাক্যপ্রপূরণে নামোচ্চারণ করলেও ফল হয়।

'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥'

শুধু নামে নয়, নামাভাসেও হবে। রত্ন যেখানেই রাখো, সিন্দুকেই হোক বা ছাইয়ের গাদায়ই হোক, তার সমান মূল্য। নাম তো বটেই, নামেবদ্ধ নামের অক্ষরগুলোও অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাই নামের মত নামাভাসেও প্রচণ্ড শক্তি। শূকরের দাঁতে আহত হয়ে যবন 'হারাম' 'হারাম' বলে ডেকে মুক্তি পেয়েছিল। বলছে, শূকর, ডাকা হচ্ছে রামকে। একেই বলে নামাভাসে মুক্তি। নামাভাসেরই যদি এত শক্তি তা হলে স্পষ্ট নামোচ্চারণ যে প্রত্যক্ষ ফল দেবে তাতে আর কার সন্দেহ? নামের উচ্চারণ যদি অশুদ্ধ হয়, এমন কি অসম্পূর্ণও হয়, কিছু এসে যাবে না, ঐ ভ্রমে ও ন্যূনতায়ও নামপ্রভাব অম্লান থাকে। সমস্ত প্রারব্ধ পাপের নাশও এই নামেই। আর নাম ও নামী অভিন্ন বলে নামীর যেমন মহিমা নামেরও তেমনি। আর নামের যদি কৃপা হয় কিছুই আর অপূরণ থাকে না, সমস্তই অফুরন্ত।

সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করল। প্রয়াগ অযোধ্যা হয়ে পৌঁছুল নৈমিষারণ্যে। সেখান থেকে মথুরায়। মথুরায় এসে শুনল প্রভু ব্রজভূমি দর্শন করে ফিরে গিয়েছেন। আরেক বার দেখা হবে ভেবেছিল, হল না।

কী করে জীবিকানির্বাহ হবে সুবুদ্ধির? জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে বাজারে বিক্রি করতে সুরু করল। কাঠ আনে কী করে? দড়ি দিয়ে বেঁধে, কাঁধে বয়ে। বেচে পায় কত? এক বোঝা মাত্র পাঁচ পয়সা, খদ্দের সদয় হলে, ছয়। তার থেকে এক পয়সা দিয়ে চানা কিনে নিজে খায় আর বাকি পয়সা বেনের দোকানে জমিয়ে রাখে। সে পয়সায় গরীব-দুঃখী সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করে। আর যদি সে বাঙালী বৈষ্ণব হয় তাহলে তার জন্যে গায়ে মাখবার তেল কেনে, শুখা রুটির বদলে দই-ভাতের জোগাড় দেখে। নিজের জন্যে কিন্তু শুকনো চানার বেশি নয়, না, কখনো নয়।

যে সুবুদ্ধি একদিন 'অধিকারী' ছিল, কত তার দাস-দাসী কত তার ভোগের উপকরণ, সে আজ কি না এক পয়সার চানা খেয়ে দিন কাটায়। প্রভুর কৃপায় সে বৈরাগ্যরঙিন হয়েছে। পরাপেক্ষা নেই, নিজেতেই নিজের নির্ভর, নেই বা সংসার ত্যাগ করে পালিয়ে চলে যাওয়া, নেই বা বিন্দুমাত্র অপ্রসাদ। যেটুকু সঞ্চয় সেটুকুও নিজের ভোগের জন্যে নয়, কাঙাল বৈষ্ণবের সেবার জন্যে।

রূপ ও অনুপম মথুরায় এলে সুবুদ্ধি রায় দেখা করতে গেল। দুই ভাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল দ্বাদশ বন। কিন্তু মাসখানেকের বেশি তারা থাকতে পারল না, সনাতন কাশীতে আছে খবর পেয়ে চলল কাশী। গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়ে প্রভু গিয়েছেন শুনে তারা সেই পথ ধরল। আর সনাতন চলল সটান রাজপথ দিয়ে। তাই কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হল না। প্রয়াগে পৌঁছে রূপ-অনুপম খবর পেল সনাতন মথুরায় গেছে আর সনাতন মথুরায় পৌঁছে জানল যদিও রূপ-অনুপম মথুরায়ই ফিরেছিল, তারা এখন প্রয়াগে।

সনাতনকে পেয়ে সুবুদ্ধির আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু কঠোর তপস্বী মহা বিরক্ত সনাতনের দেহ-সুখে স্পৃহা নেই, তাই সুবুদ্ধির স্নেহব্যবহার তার কাছে রুচিকর নয়। যে তীব্র বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, কী হবে তার দেহস্বাচ্ছন্দ্যে? বৈরাগ্যই তার দেহের বিশ্রাম, প্রাণের শান্তি।

ভগবান বললেন, যে পর্যন্ত বৈরাগ্য সঞ্চার না হয়, আমার লীলাকথা শুনতে শুনতে যে পর্যন্ত শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হয় সেই পর্যন্তই কর্মানুষ্ঠান করবে। নরকবাসী ও স্বর্গবাসী দুই ই মনুষ্যদেহ আকাঙ্ক্ষা করে কারণ মনুষ্যদেহেই জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভবপর। স্বর্গবাসী বা নরকবাসী কারু দেহই মোক্ষলাভের অনুকূল নয়। কামনা-বাসনা সত্ত্বেও ভক্তিযোগের দ্বারা যে নিরন্তর কৃষ্ণভজনা করে তার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে তার হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা-বাসনা নষ্ট হয়ে যায়। তারপর সর্বাত্মভূত আমি যদি সাক্ষাৎকৃত হই, আমাকে যদি ভক্ত দর্শন

করতে পারে, তার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, তার আর অহং-মম অভিমান থাকে না, তার সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় আর তার কর্মসমূহও বিনিঃশেষে ক্ষয় পায়।

রাত্রিদিন কুঞ্জে-কুঞ্জেই ঘোরে সনাতন, মথুরামাহাত্ম্য সংগ্রহ করে। আর উদ্ধার করে লুপ্ত তীর্থ।

এদিকে প্রভু ফিরলেন নীলাচলে, নির্জন বনপথে। সঙ্গে সেই বলভদ্র ভট্টাচার্য আর সেবক ব্রাহ্মণ। আগের মতই সেই কৃষ্ণনাম নেওয়ালেন পশুদের। আঠারো-নালাতে পৌঁছে খবর পাঠালেন ভক্তদের। মৃতদেহে প্রাণ আনলেন। ভক্তের দল এসে মিলল নরেন্দ্র সরোবরে। এল পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী। দু'জনেই মাধবেন্দ্রের শিষ্য, প্রভুর গুরুস্থানীয়, প্রভু তাই তাদের প্রণাম করলেন। এল স্বরূপ-দামোদর, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর আর গোবিন্দ। এল প্রদ্যুম্ন মিশ্র, কাশী মিশ্র, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত। এল হরিদাস। সকলে এসে প্রভুর চরণে পড়ল, প্রভু সকলকে আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হলেন।

ভক্ত সন্নিবেশে সুরু হল নর্তন কীর্তন। গ্রামে কোলাহল উঠল—মহাপ্রভু এসেছেন। ছুটে এল রামানন্দ, বাণীনাথ, সার্বভৌম। চলো যাই জগন্নাথ দর্শনে।

মন্দিরে এলেন প্রভু। তুলসী পড়িছা পদমূলে লুটিয়ে পড়ল। জগন্নাথের মালা-প্রসাদ এনে দিল।

'জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥'

আর সংসারকে জানালেন 'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত।'

ভাগবতই কৃষ্ণের প্রতিনিধি। কৃষ্ণ অপ্রকট হবার পর সমস্ত ধর্ম ভাগবতকেই আশ্রয় করেছে। যেমন কৃষ্ণ বিভু ও সর্বাশ্রয়, ভাগবতও তেমনি। কৃষ্ণ যেমন নিত্য সত্য চিন্ময় ও আনন্দময়, ভাগবতও তেমনি। 'প্রতিশ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয়।' কৃষ্ণ যেমন সমস্ত অর্থের আধারও, ভাগবতও তেমনি। কৃষ্ণ আর ভাগবতই দুইই সমান বৃহদ্বস্তু, সমানসর্বব্যাপক।

শৌনক প্রশ্ন করল সূতকে: 'হে সূত, যোগেশ্বর ধর্মবর্ম কৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে প্রস্থান করলে ধর্ম কার শরণাগত হল বলো।'

উত্তরে সূত বললে, 'কৃষ্ণ স্বধামে প্রস্থান করলে কলিকালে ধর্ম জ্ঞানহীন নষ্টদৃষ্টি নির্বিবেক জীবের জন্যে এই ভাগবতই পুরাতন সূর্যের নবীন আবির্ভাব।'

এই ভাগবতকথাই প্রভু শোনালেন সংসারকে। কখনো নিজমুখে, যেমন সনাতন-শিক্ষায়, কখনো বা ভক্তমুখে, যেমন রামানন্দ-প্রসঙ্গে।

'চৈতন্য-সমান আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাহি আর ত্রিজগতে অন্য॥'

গৌরলীলায় ডুব দিতে পারলেই কৃষ্ণলীলায় উত্তরণ। 'গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।'

শৌনক প্রশ্ন করল সূতকে: 'সমস্ত শাস্ত্র অনুশীলন করে যা মানুষের নিশ্চয় মঙ্গলসাধন বলে স্থির করেছ তা আমাদের কাছে প্রকাশ করো। এই কলিযুগে সকলেই অল্পায়ু, অলস, হীনবুদ্ধি, রোগক্লিষ্ট বিঘ্নব্যাকুল। বহুশাস্ত্র শ্রবণ করে তারা যে নিজ-নিজ মঙ্গলসাধন করবে তার সম্ভাবনা নেই। আর শুধু বহুশাস্ত্র শ্রবণ করলেই কি অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? তাছাড়া শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠেয় কর্মও বহুতর, সে সব কর্ম নির্ণয় ও সম্পাদন করা সহজ নয়। তুমি সকলশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। তা হলেই সকলের চিত্ত প্রসন্ন হবে। ভক্তকুলের পালনকর্তা ভগবান হরি মানুষের কোন মঙ্গলসাধন করবার জন্যে দেবকীগর্ভে জন্ম নিলেন? বিঘোর সংসারারণ্যে পথভ্রান্ত মানুষ যাঁর নামোচ্চারণ মাত্র মুক্তি লাভ করে, স্বয়ং ভয় যাঁর কাছে ভীত, ত্রিলোকপাবনী সুরধুনী যাঁর চরণ থেকে নিঃসৃত হয়ে সর্বজগতকে পবিত্র করছে, তার কলিকলুষনাশী যশঃকীর্তন কে না শুনবে? ভগবানের পুণ্যপ্রদ চরিত্রশ্রবণই তেজোবীর্যাপহারী এই দুস্তর কলিরূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হবার উপায়। কিন্তু কৃষ্ণ যখন স্বরূপে বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছেন তখন ধর্ম কার শরণাপন্ন হলেন?'

'শরণাপন্ন হলেন ভাগবতে, যা নিখিল বেদার্থের সারভাগস্বরূপ, যা ঘোর অন্ধকারে অধ্যাত্মপ্রকাশক দীপবর্তি।' বললেন সূত, 'যার আরেক নাম ভক্তি-দীপিকা। স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ধর্মের চেয়ে স্বার্থশূন্য ভগবদ্‌ভক্তি পরতরা। নারায়ণে ভক্তি হলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় আর সে জ্ঞানে শুষ্ক ও নিরর্থক তর্ক প্রবেশ করতে পারে না। যদি হরিকথায় ভক্তিই না জন্মায় তবে ধর্ম কী। তবে ধর্ম বৃথা শ্রম মাত্র। যাতে হরির তুষ্টি তাই ধর্ম। সুতরাং শ্রবণে কীর্তনে ধ্যানে-আরাধনে হরির সেবা করো। সেই সেবা থেকেই ধর্মে শ্রদ্ধা, ধর্মে অভিরুচি জন্মাবে। সেই ভাগবত সেবায় নষ্ট হবে সমস্ত

অমঙ্গল। আর যার ভাগবতী কথায় রতি হয়েছে সেই স্থিত হবে নিশ্চিত ভক্তিতে।'

ব্যাসের কাছেও নারদের সেই আবেদন: ভগবানের যশোবর্ণন ছাড়া কেবল ধর্মানুষ্ঠানে পরিতোষ নেই। শুধু মনোরম পদবিন্যাসে কী হবে যদি অন্তরে ভক্তি না থাকে, রতিরস না থাকে? ভক্তিহীন বাক্য কাকতীর্থের মত। রাজহংসেরা ভক্তির মানস সরোবরেই বিহার করে। ব্যাস, তুমি হরিভক্তি বর্ণন করো। হরিভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত না হলে অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও নিষ্ফল হয়ে যায়। এমন গ্রন্থ লেখ যার প্রতিশ্লোকেই অনন্তকীর্তি ভগবানের নামকীর্তন থাকে, অমন গ্রন্থই মানুষের পাপনাশে সমর্থ, অমন গ্রন্থই মানুষের আদরণীয়। ব্যাস, তুমি যথার্থদর্শী, সত্যরত, ব্রতসম্পন্ন, এখন লোকবন্ধনমোচন বাসুদেবের চরিত্র যোগবলে স্মরণ করে বর্ণন করো। অন্যবিষয় বর্ণন করতে গেলে বায়ুবলে ঘূর্ণ্যমান নৌকোর মত তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধি বিব্রত হবে, কোথাও স্থির থাকতে পাবে না। যে ভক্তিতে অধিষ্ঠিত সংসারে সেই একমাত্র স্থির। হরিকে ভক্তি না করে কেবল স্বধর্ম প্রতিপালন দ্বারা কে উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হয়েছে? সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরে কর্মার্পণই তাপত্রয়ের মহৌষধ। তুমি সেই বাসুদেবের যশ কীর্তন করো। এই কীর্তনই দুঃসহদুঃখপীড়িত জীবের নিস্তারের একমাত্র পথ।

সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই আজ গৌরেন্দুরূপে শচীগর্ভ সিন্ধু-মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন। সামান্য গোপরমণীর সমান তাকে জ্ঞান করছে, কৃষ্ণের উপর এই অভিমান করে রাধিকা রাসস্থলী ত্যাগ করল। কৃষ্ণ দেখল রাসমঞ্চে আর উল্লাস নেই। কী কারণ—খোঁজ নিয়ে দেখল রাধিকা অনুপস্থিত। যার প্রেমের বলে উল্লাস, উল্লাসের আতিশয্য, কৃষ্ণের মনে হল সেই প্রেম আস্বাদ করতে হবে। কেমন রাধার প্রণয়মহিমা কেমন বা আমারই মাধুর্য যা রাধিকা আস্বাদ করে, আর সেই আস্বাদানুভূতিতে তার কেমন সুখ, কী পরিমাণ সুখ। তা একবার আমাকে জানতে হবে। তারই জন্যে রাধিকার ভাব ও কান্তি নিয়ে এলেন মহাপ্রভু। ভক্তভাব অঙ্গীকার করে ব্রজপ্রেমরসনির্যাস আস্বাদন করে জগৎকে তা বিতরণ করলেন। নিজনাম বিনোদিয়া হয়ে নিজেও আস্বাদ করলেন, অন্য লোককেও আস্বাদ করালেন।

'আপনি আচরি ধর্ম শিখায় সবায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥'

একমাত্র নাম হতেই সর্বসিদ্ধি। নামেই মঙ্গল বিস্তার। দুঃসঙ্গবর্জন। কৈতবপরিহার। একমাত্র নাম হতেই ভগবানে শ্রদ্ধা রতি ভক্তি প্রেম। কৃষ্ণনামই জীবনভূষণ।

'অসাধু সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ।
ইহাতে জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥'

নামী বাচ্যস্বরূপ ভগবানই বাচকস্বরূপ নামরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। নামাশ্রয় ছাড়া নামীস্বরূপকে পাবার উপায়ান্তর নেই

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি॥'

গৌরহরি গোপীভাবাবিষ্ট কৃষ্ণ। রাধারসবিলাসী। রাধিকারসবিনোদী। রাধাভাবভাবিতানন্দ। রসরাজ-রূপে প্রেমের বিষয়, মহাভাববতীরূপে প্রেমের আশ্রয়। স্বমাধুর্য আস্বাদনের জন্যেই অবতীর্ণ। সেই আস্বাদনের উপায় নামসঙ্কীর্তনপ্রধান ভক্তিযোগ।

'মথিয়া সকল তন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র,
করে ধরি জীবেরে শিখায়।'

'তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন॥
যে পড়িল সেই ভাল আর কার্য নাই।
সবে মিলি কৃষ্ণ বলিবার এই ঠাই॥
পড়িলাম শুনিলাম এত দিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি॥'

[ক্রমশ।

সব সময় ভাল অবস্থা, সব সময় ভিতরে মায়ের দর্শন, শ্রেষ্ঠ সাধকদেরও হয় না—সে হবে সাধনার পাকা অবস্থায়, সিদ্ধির অবস্থায়। সকলের হয় মাঝে মাঝে ভরা অবস্থা, মাঝে মাঝে শূন্য অবস্থা। শূন্য অবস্থায়ও শান্ত হয়ে থাকা উচিত। —শ্রীঅরবিন্দ

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

(স্বামী বিবেকানন্দের Life and Mission হইতে)

২

ভারত কিরূপ তার একটি চিত্র—আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করবো। ভারতবর্ষ এক ঐশ্বর্যশালী প্রাসাদ—যেন ধ্বসে পড়েছে, মনে হবে এদেশের আশান্বিত হবার বুঝি কিছুই নেই। এরা এমন একটি জাতি—যারা মুছে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু, আপনারা শান্তভাবে অনুধাবন করুন—এ ছায়ার অন্তরালে অন্য কিছু দেখতে পাবেন। সত্যিকথা কি জানেন, যতক্ষণ আদর্শ বা লক্ষ্য (ideal), আহত না হয় বা নষ্ট না হয়ে যায়—ততক্ষণ যেমন মানুষটির বাঁচার আশা রয়েছে—তার প্রাণপুরুষ জ্যান্ত, বাইরের চেহারা সাধারণ দৃষ্টির সম্মুখে যাই থাক না কেন। যদি আপনার জামা কুড়ি বারও চুরি যায়—তাতে যেমন আপনার নিজের নষ্ট হওয়ার কোন কারণই থাকে না। আপনি সহজেই আরেকটি নতুন জামা আনতে পারেন। জামাটি বাইরের খোলস মাত্র—অতএব অবাস্তব। ধরুন, কোন ধনশালী লোক অপহৃত হলো তার মানে এই নয় যে—মানুষটি মরে গেলো—অথবা তার ব্যক্তিত্ব (vitality) নষ্ট হলো—মানুষটি বেঁচে থাকবে (survive)।

ভারতবর্ষে, জনসাধারণের এক বড় অংশ অনাহারে রয়েছে। নিজস্ব ভাষা তাদের নেই। ভারতীয় যে কোন লোকের গড়-পড়তা আয় মাসে দুই শিলিং মাত্র। আয় আরো একটু কমে গেলেই—হাজারে হাজারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সামান্য দুর্ভিক্ষ মৃত্যুর করাল ছায়া রূপে দেখা দেয়। সুতরাং ভারতের এই অবস্থার দিকে যখন লক্ষ্য করি—আশাহীন ধ্বংস দেখি, দেখি ভয়ংকর মৃত্যু (ruin)।

আমরা, ইতিহাসে দেখতে পাই, ভারতীয় সমাজ কখনও সম্পদের জন্য দাঁড়ায়নি। যদিও তারা প্রভূত সম্পদের অধিকারী, সম্ভবত অন্য যে কোন জাতি কোনদিন যে পরিমাণ সম্পদের কল্পনাও করতে পারে না—তথাপি এই জাতি কখনও সম্পদের পূজা করেনি। যুগে যুগে এরা এক পরাক্রমশালী জাতিরূপে পরিচিত, তবু দেখতে পাই ক্ষমতার জন্য এরা সংগ্রাম করেনি—কখনও বিজেতারূপে বহির্দেশে তারা যায়নি। নিজের সীমানার মধ্যে থেকেই তারা সন্তোষ লাভ করেছে। জাগতিক গৌরব ভারতীয় জাতি কখনও চায়নি। কাজেকাজেই সম্পদ এবং ক্ষমতা এই জাতির আদর্শ নয়। তবে কি? তারা ভুল করছে না ঠিক করছে—সে প্রশ্ন এইখানে আলোচ্য নয়। সে জাতি, সমস্ত মনুষ্যজাতির সন্তানদের মধ্যে বিশ্বাস করে,—অত্যন্ত জোরের সংগে বিশ্বাস করে যে, এই জীবন সদা-সত্য নয়—অনিত্য, ঈশ্বরই সত্য এবং তাদের এই ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করতে হবে—গভীরভাবে।

এমন দেশ কি আপনি কখনও দেখেছেন? যে দেশে চোরের দলও যদি গড়তে চান তবে তাও করতে হ'বে ধর্মের নামে। কতকগুলি নিয়মকানুন তৈরী করে বলতে হবে—এই হ'চ্ছে সহজ ও সরল পথে তাড়াতাড়ি ঈশ্বরলাভের উপায়। তবেই সদার ফল পাবেন—অন্যভাবে নয়। এতেই বুঝা যায়, সে জাতির সারবস্তু কি? সে জাতির আদর্শ হ'চ্ছে ধর্ম—এবং যেহেতু ধর্মে অবিচল, সেজন্য ভারতীয় জাতি জীবন্ত।

রোমের দিকে তাকান। রোমের আদর্শ ছিল, জাগতিক শক্তি এবং বিস্তৃতি। এবং যেহেতু তাতে আঘাত দেওয়া হয়েছে; রোম খণ্ডখণ্ড হ'য়ে গেলো—ধ্বংস হ'লো। গ্রীসের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তি (intellect) এবং যখনই তাতে আঘাত আসলো—তখনই গ্রীসের পতন হ'লো। বর্তমান সময়েও স্পেন এবং আধুনিক সমস্ত দেশগুলি সম্বন্ধেই এই একই কথা প্রযোজ্য। প্রত্যেক জাতিরই জগৎকে দেবার মতো এক একটি বিশেষ বাণী আছে। যতদিন সেই আদর্শ অবিকৃত থাকে—ততদিন সেই জাতি বেঁচে থাকে। কিন্তু আদর্শচ্যুত জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

অধুনা, সেই ভারতীয় প্রাণশক্তি আহত হয়নি—ভারতীয়েরা এখনও এই জীবনসত্তা ত্যাগ করেনি এবং আজিও তা প্রচুর মজবুত। মাভৈঃ জাতীয় আদর্শ জীবন্ত রয়েছে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে—তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের সংগে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে। ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকায় ধর্ম প্রচার করতে গেলে—

রাজনৈতিক উপায়ে বা পন্থায় কাজ করতে হবে। সংঘ তৈরী করো, সমাজ (society) তৈরী করো, ভোট, ব্যালট, প্রেসিডেণ্ট ইত্যাদি —কারণ এই হচ্ছে পাশ্চাত্য জাতির প্রাণধারা। অন্যপক্ষে, রাজনীতির কথাও ভারতে বলতে গেলে তা' বলতে হবে ধর্মের মাধ্যমে। বলতে হবে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গৃহ পরিচ্ছন্ন করে—সে এমন এক ক্ষমতা লাভ করে যাতে স্বর্গীয় তোরণদ্বার তার জন্য উন্মুক্ত থাকে অথবা সে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করে। এ হচ্ছে ভাবধারা বা ভাষার (Language) প্রশ্ন—যে যেভাবে বা ভাষায় বোঝে। প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজস্ব প্রবণতায় কথা বলতে হবে, তবেই তাদের হৃদয়ের কাছে যেতে পারবে। এবং ইহা অত্যন্ত সত্য।

যে মতের আমি পোষক, তাকে সন্ন্যাসী বলা হয়। সন্ন্যাসী মানে ত্যাগী—যে সব ত্যাগ করেছে। এমন কি বুদ্ধদেব যিনি যীশুখৃষ্টের ৫৬০ বৎসর আগের—তিনিও এই ভাবধারার পোষক—যথার্থ সন্ন্যাসী। তিনি এই ভাবধারার সংস্কারকদের অন্যতম। অতি প্রাচীন। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদে এই মতের বর্ণনা আছে। প্রাচীন ভারতে এমন রীতি ছিল যে, জীবন-সায়াহ্নে মানুষকে সমাজের বাইরে গিয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর হয়ে মুক্তির প্রচেষ্টা করতে হবে। এ হচ্ছে, সেই বৃহৎ ঘটনা—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি। পুরাকালে বৃদ্ধ লোকেরা তাই সন্ন্যাস অবলম্বন করতেন। পরবর্তীকালে, যুবাপুরুষরাও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে থাকেন। যুবকরা কর্মক্ষম—তাই তারা বৃক্ষের নীচে বসে নিজের মৃত্যু চিন্তায় বিভোর না হয়ে, নতুন নতুন মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। বুদ্ধদেব যুবা ছিলেন বলে এই মতের সংস্কার সাধন করেন। যদি তিনি বৃদ্ধ মানুষ হ'তেন, তবে উপাসনা করেই জীবন ত্যাগ করতেন।

এই ভাবধারা কোন চার্চের মত নয় বা পুরোহিতের মতও নয়। সন্ন্যাসী ও পুরোহিতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। ভারতবর্ষে পুরোহিতগিরি, অন্যান্য নানা ব্যবসার মতো এক সামাজিক ব্যবসা এবং বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। পুরোহিতের সন্তান পুরোহিত হবে—ঠিক যেমন কাঠমিস্ত্রীর ছেলে কাঠমিস্ত্রী হয়, কর্মকারের ছেলে কর্মকার। অন্যপক্ষে, সন্ন্যাসীদের সম্পদ থাকে না, তারা বিবাহও করেন না। তাদের জন্য আশ্রম জীবন আর গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ। এই ধর্ম ও সর্বত্যাগী জীবন—ভারতেরই বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে আমি পেয়েছিলুম। 'যত মত তত পথ' এই বাক্যের তিনি রূপকার। ইহা এক মহাগৌরবের বস্তু এই পথের বিভিন্নতা, কারণ যদি একটি মাত্র পথ থাকতো, সম্ভবতঃ তা' শুধু ব্যক্তিবিশেষেরই মনোমত হ'তো। যত পথ বেশী থাকবে, ততো বেশী লোকের সত্যকে জানা সম্ভবপর হবে। যদি আমি এক ভাষায় শিখতে না পারি, তবে অন্য ভাষায় চেষ্টা করতে পারবো এবং তা' না হ'লে আরো কোনো ভাষায়। এইভাবে তাঁর শিক্ষা সমস্ত মানবজাতির জন্যে।

এক্ষণে, যে ভাবধারা আমি প্রচার করি—সে তাঁরই ধারণার প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রতিটি শব্দ যা' আমি উচ্চারণ করি—তার মধ্যে যা' কিছু সত্য ও মহৎ—তা' তাঁরই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করার চেষ্টা মাত্র Prof. Max Muller এর লেখা তাঁর জীবনী আপনাদের অধ্যয়ন করতে বলি।

আচ্ছা, তাঁরই পদমূলে বসে, আমি এই ভাবধারাগুলি অনুভব করেছি। সেখানে প্রায় ষোল বৎসর বয়সের সময় আরো জনা বারো বালকের সংগে যাতায়াত করতাম। এই ছোট বড়ো বালকের দল, একত্রিতভাবে ধারণাবদ্ধ হ'য়েছিলুম—এই মহৎ আদর্শকে বিস্তৃত করে, ছড়িয়ে দিতে হবে। এবং শুধু মাত্র বিস্তৃতিই নয়—বাস্তব রূপ দিতে হবে। তার মানে, আমাদের হিন্দুদের আধ্যাত্মিকতা দেখাতে হবে বৌদ্ধের কারুণ্য, ক্রিশ্চিয়ানদের কর্মশক্তি, আর মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব এই সবের প্রকাশ করতে হবে—আমাদের বাস্তব জীবনে। এইখানে আমরা একবিশ্বজনীন ধর্মের (universal religion) ধারক ও বাহক রূপে এগিয়ে চলেছি। আমরা, এই শ্রীরামকৃষ্ণের ছাত্র, বালকের দল উচ্চারণ করলুম, 'আমরা আর অপেক্ষামাত্র করবো না।' প্রবাদ আছে, চলমান পাথরে মরিচা ধরে না। আমার জীবনের বিগত চতুর্দশ বৎসর, আমি কখনও কোন একজায়গায় তিন মাসের বেশী একসংগে অবস্থান করিনি—ক্রমাগত চলেছি। এই একইভাবে চলেছি, আমরা প্রত্যেকে।

এক্ষণে, এই সরল ছেলের দল, উক্ত আদর্শের অনুশীলন করে বাস্তব ফল পেতে লাগলো। বিশ্বজনীন ধর্ম। গরীবের প্রতি প্রচুর করুণা। কল্পনায় এইগুলি বেশ ভাল কিন্তু চর্চা করতে হবে তো। অতঃপর সেই পরম বেদনার দিন এলো—যেদিন আমাদের আচার্য দেহত্যাগ করলেন। আমাদের যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা করলুম। কিন্তু বিফল। আমরা সহায়হীন হলুম। কে বালকদের কথা শুনবে, কেউ নয়। ভারতে বালকেরা কেউ নয়। একটু ভাবুন—জনা বারো ছেলে জনসাধারণকে, মহৎ এবং বৃহৎ বাণী ও আদর্শের কথা বলছে—বলছে যে তারা জীবনে এই বাণীগুলি রূপায়িত করবে। সবাই হাসলো মাত্র। হাসি বিদ্রূপে অসহ্য হয়ে উঠলুম। কিন্তু যতই বাধা আসতে থাকলো—ততই আমাদের সংকল্প অনড় হ'লো।

অবশেষে, এক ভীষণ সময় এলো—আমার নিজের পক্ষে বিশেষ করে এবং আমাদের সকলেরই। আমার দুর্ভাগ্য এইরূপ। আমার পিতৃদেব এইসময়ে দেহত্যাগ করলেন, আমাদের পরিবার অসহায় হয়ে পড়লো। একদিকে আমার মা ও ভাইয়েরা উপবাসে দিন কাটাচ্ছে। আমিই ছিলুম পরিবারের আশাভরসা, যে তাদের জন্যে কিছু করতে পারে। অন্যদিকে আমার বিশ্বাস এই মহাপুরুষের (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) ভাবধারা কার্যে রূপায়িত করতে হবে—ইহা ভারতের পক্ষে ও জগতের পক্ষে মংগলজনক। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, আমার মানস জগতে এই দুই ভাবধারার সংঘর্ষ চলতে থাকলো! আমি ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম—পাঁচ-ছয় দিন রাত্রি একসংগে উপাসনায় কাটালাম। কি বেদনাজনক সেই দিনগুলি। আমার বালক হৃদয়ের করুণা আমার মনকে মা ও ভাইয়েদের প্রতি টানতে থাকলো, আমার আপনজনের কষ্ট, অসহ্য বোধ হ'তে লাগলো। অপরপক্ষে, আমার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন কেউ নেই। কে একটি বালকের কল্পনাকে সহানুভূতি দেখাবে? শুধু একজন।

তাঁর সহানুভূতি আমার আশা ও আশীর্বাদ স্বরূপা হ'লো। তিনি একজন মহিলা। আমাদের আচার্য—মহান সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী—এই বালকদের চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন। আমার জীবন্ত বিশ্বাস ছিলো এই মহাপুরুষের চিন্তাধারাই ভারতবর্ষকে জাতীয়তার পথে নিয়ে যাবে—এবং ভারতের এবং বিশ্বের বহুদেশের জন্য সুদিন আনয়ন করবে। এই গভীর আত্মবিশ্বাস থেকেই চিন্তা করলেম, কতিপয় ব্যক্তির কষ্ট ভোগ করা অনেক ভাল—তথাপি পৃথিবী যেন এই চিন্তাধারার আলোক থেকে বঞ্চিত না হয়। একজন জননী বা দু'টি ভাইয়ের মৃত্যু এর তুলনায় কত সামান্য।

ইহা বরং আত্মত্যাগ মাত্র। আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম সম্পাদিত হয় না। 'হৃদয় ভাণ্ড, খণ্ড করে'—রক্তক্ষরা বক্ষের ওপরে পদ স্থাপন করেই জগতে পরিবর্তন আসে। মহৎ প্রচেষ্টা কষ্টের মধ্য দিয়েই সফলীভূত হয়। অন্য কোন পথ নেই। আমি আপনাদের মধ্যে, যদি কেউ কোন মহৎ কার্য করে থাকেন, তাঁর কাছেই আবেদন করছি। এরজন্যে কি অপরিসীম মূল্য দিতে হয় কি গভীর বেদনা—অসীম নির্যাতন ভোগ করতে হয়—জানেন।

এইভাবে আমরা চলতে থাকলুম—এক ছেলের দল। আমাদের চতুর্দিকে থেকে শুধু আঘাত, শুধু অভিশাপ কুড়ালেম। অবশ্য আমাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরতে হয়েছে—কিন্তু কি পেয়েছি খড়কুটো, আবর্জনা। একখণ্ড শুকনো রুটি—কোথাও বা ভাঙা কুঁড়েঘর, কেউটে সাপের বাসস্থান—থাকবার জন্যে, সস্তা বলে সেইখানেই বাস করেছি।

এমনি করে কয়েক বৎসর কেটে গেলো। এর মধ্যে সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। তাঁর (ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের) বাণী ও চিন্তাধারা ক্রমে ছড়াতে থাকলাম। কিন্তু দশবৎসর কেটে গেলেও, একটু রবিরশ্মিও দেখতে পেলুম না। আরো দশ বৎসর গেলো। সহস্র বিঘ্ন এলো। একটু আশার রশ্মি যা ছিলো,—আমাদের পরস্পরের মধ্যে একতার বন্ধন আর ভালবাসার আকর্ষণ। আমার চারিপার্শ্বে, বিশ্বস্ত বহু নরনারীর সমাবেশ আমি আগামীকাল যদি শয়তানেও পরিবর্তিত হই—তবু আমাকে তারা ত্যাগ করবে না। এই আমার আশীর্বাদ। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-বিপদে, দুর্ভিক্ষে-শ্মশানে, স্বর্গে-নরকে, যারা আমার সহায়—আমার বন্ধু তারাই। এমন বন্ধুত্ব কি পরিহাস? এমন অকৃত্রিম বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে যে কোন মানুষ মুক্তি পেতে পারে। আমরা যদি এমন নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারি—তবে জানবেন এইখানেই জগতের সমস্ত পবিত্রতা একত্রীভূত; এই বসুধায় আপনার কোন দেবদেবীর আরাধনার প্রয়োজন নেই—যদি আপনার অন্তরে এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকে, এমন শক্তি, এমন ভালবাসা। সেই পরম সংকট-মুহূর্তে—আমাদের মধ্যে এই স্বর্গীয় গুণগুলি বিদ্যমান ছিলো। এই শক্তির জোয়ারই আমাদের নিয়ে গিয়েছিল—হিমালয় পর্বত থেকে কুমারিকা অন্তরীপ এবং সিন্ধুনদ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত।

আমরা এভাবেই ছিলুম। কোনো আপোষ নেই। এই আমাদের আদর্শ। এই লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতেই হবে—যদি রাজার সংগে দেখা হয়, যদি মৃত্যু আসেই—তাকে আমাদের প্রাণের কিছুটা দেবো। যদি চাষীর সাথে দেখা হয়—তাকেও তাই দেবো। যে জীবনে তার নিজের রাস্তা গড়ে তুলবে—তাকে কিছুটা ক্ষমই হ'তে হবে; কোমলতা এবং ভদ্রতা তার জন্যে নয়। জীবনে সর্বদা ইহা আপনারা দেখতে পাবেন। ক্রমে ক্রমে আমরা কিছুটা আকর্ষণ লাভ করতে থাকি। ইহা আমার জীবনের অভিজ্ঞতা;—যদি আপনি অন্যের মংগল কামনা করেন—তবে সমুদয় জগৎ বিরুদ্ধাচরণ করলেও আপনাকে আহত করতে পারবে না। যদি আপনি নিঃস্বার্থ ও কায়মনোবাক্যে অন্যের কল্যাণ চান তবে, ঈশ্বরের নিজের শক্তি আপনাকে আশ্রয় করবে।

আমাদের আচার্য বলেছিলেন—'আমি ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে এমন পুষ্প দিতে চাই, যে ফুলের সুবাস কেউ নেয়নি—যে পুষ্প অনাঘ্রাত। এমন ফল দিতে চাই, যা হাতের অঙ্গুলি স্পর্শ করেনি।' মহাপুরুষ আমাদের লক্ষ্য করেই, একথা বলেছিলেন। তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলেন। জগন্মাতার কাছ থেকে তিনি ইহা জেনেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস প্রগাঢ়।

অবশেষে, এইভাবে 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর'র মতো ঘুরতে ঘুরতে—দেহ জীর্ণ হ'তে থাকলো। সাত-আট দিন পরে হয়তো একবেলা খাবার জুটতো। কে একজন সামান্য ভিখিরীকে খাদ্য দেবে? বেশীর ভাগ সময় হাঁটতেই থাকতাম। মাইল দশেক পাহাড়ী রাস্তা কখনও বা একটু খাবারের জন্যে হাঁটতে হয়েছে। কখন কখন দাঁতভাঙা শক্ত রুটির টুকরো জলে ভিজিয়ে খেয়েছি।

তখন ভাবলুম, দেখি অন্য কোনো দেশে গিয়ে সন্তোষজনক কিছু করতে পারি কি না। এ হেন সময়েই আপনাদের দেশে ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্যোগ চলছে। শুনলুম, ভারত থেকে কাউকে পাঠানো হবে। আমি তখন বেকার—তৎক্ষণাৎ বললেম, 'যদি আমাকে পাঠানো হয়, আমি যাবো।' প্রথমে অর্থ জোগাড় কঠিন মনে হলো, কিন্তু দেখতে দেখতে তা সংগৃহীত হ'লো এবং আমি আমেরিকায় এলুম। মাসেক দিন আগেই এসে পৌঁছলুম। কাউকে চেনাশুনা না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। ধর্মীয় মহাসভার উদ্বোধন হ'লো এবং আমি দয়ালু বন্ধুদের সাক্ষাৎ পেলুম; তাঁরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমি অল্প কাজ করলুম; অর্থ সংগ্রহ করলুম, দু'খানা কাগজ চালু করলুম এবং আরো কিছু। আমেরিকায় কাজ হলে, আমি বিলেত যাই এবং সেখানে কিছু কাজ করি। একই সময়ে, আমি আমেরিকাতেও ভারতবর্ষের জন্যে কাজ করি।

কোন্ জাতীয় সভ্যতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবু, সেই সভ্যতাকে একটু নাড়া দিন এবং ইহা তার লক্ষ্যে পৌঁছোবে। ইহাকে বদলাতে যাবেন না। যদি কোন জাতির বিদ্যালয়, তার আচার-ব্যবহার সবই নিয়ে যান, তবে তার আর রইলো কি? এই সবই তো জাতিকে গ্রথিত রাখে।

আমাদের উভয়ের উভয়কেই সাহায্য করতে হবে। আরোও এগিয়ে যেতে হবে—সাহায্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন হতে হবে। হিন্দুরা যদি আপনাদের ধর্মীয় সাহায্য দেয়, তবে তাতে কোন্ বাধা-নিষেধ থাকবে না—সর্বপ্রকারে নিঃস্বার্থ। আমি দেবো—এইখানেই শেষ। আমার মন শক্তি সব—যা দেওয়ার

আছে, দেবো শুধু দেওয়ার আনন্দে। এইখানে অতি শিক্ষিত লোকের মধ্যে এমন বলতে শুনেছি, 'তোমাদের লক্ষ বৎসরের বিভালয়, আচারপদ্ধতি ত্যাগ করে, আমাদের জাঁকজমক নিয়ে সুখী হও। ইহা বোকামী মাত্র। ধর্ম এবং আশ্রমের শিক্ষায় পরিবর্তন করলে ভারতই থাকবে না। আর একটি বড় শিক্ষণীয় আছে। বস্তুত সাহায্য করার আপনি কে? আমরা পরস্পর পরস্পরের কি করতে পারি। আপনাদের প্রাণের শক্তিতেই আপনারা বড় হবেন। আমার নিজের শক্তিতেই আমি বাড়ছি। একথা জানবেন সব পথই এক জায়গায় গিয়ে মিশেছে।

আমি বিন্দুমাত্র অহংকার প্রকাশ না করে, আপনাদের সেই নিঃস্বার্থ বালকদের কথা বলছি। আজ ভারতে এমন কোন পুরুষ নেই বা মহিলা নেই—যে তাদের কথা না জানে অথবা তাদের আশীর্বাদ না করছে। এমন কোন দুর্ভিক্ষ দেশে হয়নি যেখানে তারা কাজ করেনি। এতেই মানব হৃদয়ে তাঁদের স্থান করে নিয়েছে, তাই বলছি, সর্বদাই সাহায্য করুন—পরম নিঃস্বার্থভাবে স্বার্থের লেশমাত্র থাকলে, না নিজের না অন্যের কারোই কাজে লাগবে না। কর্মের নিয়মে নিষ্কাম হলে মানুষের আশীর্বাদ—বিধাতার করুণা আপনার ওপর বর্ষিত হবেই।

কল্পনার জগৎ থেকে, বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই পরিকল্পনার মধ্যে আমি কি আবিষ্কার করেছি। প্রথমে, কয়েকটি কেন্দ্র গঠন করতে হবে। এই ভারতীয় সন্ন্যাসীদের শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জ্ঞান দিতে হবে। ধরুন, আমি আমার কোন লোককে পাঠালুম। সে ক্যামেরা নিয়ে গেলো—তার নিজেরই এই যন্ত্র সম্বন্ধে সব বিষয় শিখতে হবে। ভারতে আপনারা দেখবেন, প্রায় প্রত্যেক লোকই সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং কতভাবে যে তাদের শিক্ষা দিতে হবে, তার ইয়ত্তা নেই। এবং এতে কিসের প্রয়োজন? অর্থের। কল্পনা থেকে, বাস্তবে আসুন—প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে। আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি আপনাদের দেশে প্রায় চার বৎসর কাল। এবং প্রায় দু'বছর কাল ইংল্যাণ্ডে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি, এ দু'দেশে আমার বহু বান্ধব আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতেও গিয়েছেন এবং এই ভাবধারাকে পরিণত করেছেন বাস্তব রূপে। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলা হিমালয়ে গিয়ে একটি কেন্দ্র করে, সেইখানে, শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি তাঁদের আমার কাগজের একটি কপি (copy) দিয়েছি—এই টেবিলেও তার একটি সংখ্যা আছে 'জাগ্রত ভারত' (The Awakened India) তাঁরা সেখানে কাজ করছেন। ভারতে আমার একটি কেন্দ্র হ'চ্ছে কলকাতায়। অবশ্য প্রত্যেক বড় আন্দোলনেরই রাজধানী থেকে যাত্রা শুরু করা উচিৎ? রাজধানী কেন কেন্দ্র (Centre)? কারণ ইহা জাতির অন্তরাত্মা, সমস্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডে এসে জমা হয়, তারপরে দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে সম্পদও। সমস্ত ভাবধারা—শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা; কেন্দ্রের দিকেই জড়ো হয়—সেইখান থেকেই যাত্রা শুরু করে।

আমি আনন্দের সংগে আপনাদের বলছি, সে সূচনা আমি শক্তিপূর্ণভাবেই করেছি। কিন্তু এই একই কাজ, আমি সমান্তরাল ভাবে মহিলাদের মধ্যেও করতে চাই। আমার আদর্শের পরিপূরণে নারী-পুরুষ সকলেই সহায়তা করবেন। কিন্তু আমাকে, কে দেখাবে আলো, বহুদূর থেকে?

আমার গুরুর আশীর্বাদ। শ্রীশ্রীমায়ের করুণা।

অনুবাদক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে।

নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন না

বর্তমানে সাধারণ লোকেরা চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত ভাবেই কৌতূহলী। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, ওষুধ-বিষুধ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অভিজ্ঞ, আর সেজন্যই চিকিৎসকের পক্ষে সময় সময় চিকিৎসা করাটা বিড়ম্বনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক রোগীরা তাই শুধু এক পুরিয়া ওষুধ বা কয়েকটি বড়ি খেতে বলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। চিকিৎসক, রোগের প্রকৃত গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হতে হয়। আজকের রোগীরা এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি রিপোর্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আর আধুনিকতম ওষুধ-পত্রাদির নামও তাঁদের মুখস্থ। বলাবাহুল্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন রচনাদির মাধ্যমেই এ জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেন। আর সেজন্যই যে কোন শারীরিক অসুস্থতার আবির্ভাব মাত্রেই ছোটেন, মেডিক্যাল জার্ণালের পাতা খুলে লক্ষণ মেলাতে। এমন অনেক অতি উৎসাহী ব্যক্তি আছেন, যাঁরা চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনাদি পাঠ করে, ও বেতারে রোগ সম্বন্ধীয় টি-ভি প্রদর্শনী দেখে, আলোচ্য ব্যাধিগুলির সব লক্ষণ নিজেদের মধ্যে প্রকটিত হতে দেখেন। বলা বাহুল্য এ সবই কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু নার্ভীয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এর জন্য যথেষ্ট কষ্ট পান ও ততোধিক কষ্ট দেন তাঁর চিকিৎসককে। রোগীর পক্ষে রোগের কথা না ভাবাটাই হল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, যদি কোন গুরুতর বা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের রোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোন তথ্যবাহী আলোচনা শোনেন বা পড়েন, তাহলে স্বভাবতই নিরাময় হওয়ায় আশা আশঙ্কাজনক ভাবেই কমে গিয়ে এক ধরণের মানসিক বিষাদে আক্রান্ত হয়ে ওঠে তাঁর মন—যে কোন রোগীর পক্ষেই যা অশুভ ভবিষ্যতের স্বাক্ষরবাহী। কেউ কেউ আবার নিজের চিকিৎসা নিজেই করেন। মেডিক্যাল পত্র-পত্রিকার পাতা খুলে নিজেরাই রোগের লক্ষণ মেলান ও তদনুসারে ওষুধ-বিষুধ ব্যবহার করে চলেন দীর্ঘদিন ধরে, ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ প্রকৃত চিকিৎসকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। একথা বিশেষভাবেই স্মরণীয় যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনাদি পাঠে উপকৃত হতে পারেন শুধু তাঁরাই, যাঁরা ওই বিশেষ বিজ্ঞানটি সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষেই ওয়াকিবহাল; সাধারণ পাঠকের পক্ষে মেডিক্যাল জার্ণাল অপেক্ষা একটি সাহিত্যপত্র অনেক বেশী উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৮৭-৮৯। রাধার যখন এই হেন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তখনও কিন্তু পদচিহ্ন অনুসরণ করার বিরাম ছিল না ব্রজগোপীদের। চতুর্দিকে চোখ রেখে তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলেন মৃগনয়না প্রিয়-সখীরা। অকস্মাৎ তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন··চমকিতা। নয়নপ্রান্ত দিয়ে কি যেন তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। বেশী দূরে নয়, কাছেই···কি যেন পড়ে রয়েছে, না? ঝড় নেই বাদল নেই, অথচ আকাশ থেকে কেমন করে খসে পড়ল এই সৌদামিনী? ও-লো কি সুন্দর গো কি সুন্দর! কি মিষ্টি গো কি মিষ্টি! যেন ক্ষীর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে জ্যোৎস্নার দুধ। না না, এ যেন সোনায় বাঁধানো একছড়া রতন মালা, টুপ করে খুলে খসে পড়ে গেছে ত্রিলোক-লক্ষ্মীর মুকুটের থামি থেকে, অজান্তে।

লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চললেন মৃগনয়নারা। আর তাঁদের মস্তিষ্কে ভিড় জমাতে লাগল···উপমার দল। অপূর্ব যেমন উপমেয়, অদ্ভুত তেমনি উপমানের আবিষ্কার। তাই সেই অদূরস্থ পদার্থটিকে নানান মন ভাবতে, বসল নানান ভাবে। যথা,—

এ যেন ধরণী দেবীরই উগরিয়ে—তোলা সোনার সম্পত্তি। কি অমূল্য সৌভাগ্য!

এ যেন আপনা থেকে ফুটে-ওঠা কুমকুমের ফুলবাড়ী! কি রূপ, কি গন্ধ!

এ যেন এক হিরণ্ময়ী স্থলকমলিনী,···কোলে করে বসে রয়েছেন বিপিনলক্ষ্মী। কি নরম, কি ঠাণ্ডা!

এ যেন চাঁপাফুলের গোড়ে,···খসে পড়েছে ফুলের ধনুক থেকে। প্রিয়তমকে বশে আনতে আর কতক্ষণ!

এ যেন পৃথিবীর দেবীমুখে তিলকলেখা গোরোচনার। কি আদরের ধন।

কাননলক্ষ্মীর ভবনে এ যেন অ-তৈলপুর দীপকলিকা। হায় রে, ক্ষণে ক্ষণে বুঝি কমে আসছে তেজ।

এ যেন দিব্যৌষধির লতা,···ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জ্বলছে। আরো কাছে এলেন মৃগনয়নারা, এসেই বলে উঠলেন,—'আশ্চর্য, ব্যাপারখানা কি? ইনিই তো দেখছি তিনি। আমাদের বিসর্জন দিয়ে, বিদ্যুৎকে নিয়ে মেঘের মতন, চন্দ্রিকাকে নিয়ে চন্দ্রের মতন, প্রভাকে নিয়ে হীরের মতন,···এঁকেই নিয়ে না উধাও হয়েছিলেন গোকুলরাজার ছেলে?

কি অন্যায় গো কি অন্যায়। দারুর মত একেবারে নিদারুণ। খরমঞ্জরীর মত একলা এঁকে ফেলে দিয়ে সাফ, নিজে গেছেন পালিয়ে? কি কর্কশ প্রাণ গো! নিঃসহায়, সইতে হচ্ছে বিরহের যন্ত্রণা। না সই, তা নাও তো হতে পারে। হয় তো প্রেম-সমরের পরিশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছেন, ইনি, আর তিনি রয়েছেন কোথাও এখানে। তাই হবে সই তাই হবে। আমাদের পোড়া প্রাণ কাঁপছে বিচ্ছেদ-তত্ত্বের আতঙ্কে। তাই আমাদের চোখের সামনে তিনি আর উদয় হচ্ছেন না। কাছেই কোথাও রয়েছেন। কিম্বা আমাদের পদধ্বনি শুনতে পেয়েই সরে পড়েছেন বেরসিক।

না না, তা হতে পারে না। রসিক চূড়ামণি তা'হলে তো আগেভাগেই তাঁর ধন্যাতিধন্যা সহজ প্রিয়াটিকে নিয়ে সরে পড়তে পারতেন।

কি যে বল ছাই। কৃষ্ণ আমাদের সহজ-মানী পুরুষ, নিশ্চয় এমন কিছু অদাক্ষিণ্য কিম্বা দেমাক দেখেছিলেন এঁর, যে নিজেই নিয়ে যান নি এঁকে সঙ্গে করে।

না, এমন কাজ করতেই পারেন না তিনি। এ তো বেরসিকতার চরম। বিরহের দাবানলে এঁকে তিনি দগ্ধাবেন, অবশেষে নিজের অযোগ্য ভেবে এঁর উপর একান্ত কঠোর হবেন, একলাটি ফেলে নিজে হবেন অন্তর্ধান,···এ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়!

সেই তিনি যে ইনি, তাই বা কেমন করে জানছি? কৃষ্ণকে তো এখানে কই দেখা যাচ্ছে না। তিনিই যে ইনি···এ অনুমানও হতে পারে আমাদের ভ্রান্তি। এ-ও তো হতে পারে, আমাদের গর্ব ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে, সাক্ষাৎ মূর্তি গ্রহণ করে আসরে নেমেছেন শ্রীমতী মাধুরী দেবী,···উৎপাদন করছেন বিশ্বমাত্র।'

৯০। কথা কাটাকাটি করতে করতে আরো নিকটে উপস্থিত হয়ে গেলেন মৃগনয়নারা। তখনও সংশয়ে দুলছে তাঁদের মন। আবার বলে উঠলেন তাঁরা,—

'না তা-ও নয়। মলিন মৃণালিনীর মত লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন। এতটুকুও প্রকাশ নেই স্পন্দনের। ইনি কি করুণ রসের লক্ষ্মী, না মূর্তিমতী মূর্চ্ছাদেবী,···জন্ম নিয়েছেন প্রিয়ের বিরহ থেকে?' এই বলে তাঁরা আরো এগিয়ে গেলেন নিকটে।

৯১। তাঁরা এসে গেছেন···এই কথাটি বুঝতে পেরেই, আহা যেন পরগুণের নিকচি করেই, রাধার মূর্চ্ছাগর্ব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে গেলেন রাধাকে।

৯২। তিনি বিদায় নিতেই ঘুমভাঙার মত জেগে উঠলেন শ্রীরাধা। 'হা নাথ, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি'···করুণ গুঞ্জন করে উঠল রাধাকণ্ঠের অকুণ্ঠ কোমলতা। পরিচয়ের কোনো বিবেক নেই তাঁর চোখে। তারপরে যখন তিনি পাশমোড়া দিয়ে ফিরলেন, এবং পরক্ষণেই যখন তিনি চতুর্দিকের সখীদের মুখের উপর ফেললেন তাঁর শূন্য নয়নের চাহনি, তখন সখীরাও 'এই তো তিনি, এই তো তিনি'···বলতে বলতে, হর্ষ-বিষাদে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে তেমনি করে তাঁর কাছে প্রেমের ভরে ছুটে এলেন,—যেমন করে কলহ ভুলে কলহংস বধূরা ছুটে আসে কনক-কমলিনীর মূলে; অন্য নদীরা ছুটে এসে আশ্রয় নেয় সুরনদীর কোলে, যেমন করে বিভাব—অনুভাবাদি সমস্ত ভাবগুলি ছুটে এসে আঁকড়ে ধরে স্থায়ীরতিকে; সমস্ত শ্রুতিগুলি ছুটে এসে বিলীন হয় সপ্তস্বরের কৃতিতে, যেমন করে রস, ভাব, গুণ ও অলঙ্কারের সমগ্র সম্পদ ছুটে এসে ধরা দেয় সুকবির কবিতায়।

রূপকাদি অলঙ্কৃতি মিলিয়ে যায় অলঙ্কার উপমায়; যেমন করে চকোরীরা ছুটে এসে পান করে চন্দ্রমার জ্যোৎস্না; ভৃঙ্গেরা উড়ে এসে সেবা করে নবোত্থান-লক্ষ্মীকে; এবং কমলিনীরা ফুটে উঠে ধারণ করে কমলাকরের কিরণ-ধন।

মৃগনয়নারা সকলে এসে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন রাধাকে। এবং ঘিরে বসে,—কোনো সখী পল্লবের পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন তাঁকে, কেউ বাঁধতে লাগলেন চুল, হাত দিয়ে কেউ মুছিয়ে দিতে লাগলেন মুখের ঘাম। চন্দ্রাবলীর একটি সখী তার মধ্যে বলে উঠলেন,—'আমাদের মতন আপনাকেও কি দুর্দশাটাই না ভোগ করতে হল-! উঃ ভাবা যায় না। কোথায় গেলেন তিনি··· সেই আপনার প্রাণাধিনাথ সাথীটি?'

আর একটি সখী বললেন,—'আমাদের বিসর্জন দিয়ে আপনাকে নিয়ে ঐ যে তিনি উধাও হলেন, তাতে বেশ খানিকটা কমে গিয়েছিল আমাদের বিরহ-জ্বর: কিন্তু দিক্ আমাদের, এখন আপনার এই অভূতপূর্ব দশা দেখে সেই বিরহ-জ্বরটাই আবার বেড়ে উঠেছে দ্বিগুণ হয়ে। ছিঃ ছিঃ।'

সুহৃৎ-পক্ষীয়া সখীরা রাধার সুন্দর মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে এবার ধীরে ধীরে বললেন,—'তোমার মনের বা মুখের কোনো দিন তো আমাদের চোখে পড়েনি কোন দোষ। জগতের সবাই জানে, গুণের তুমি রত্নখনি। একমাত্র তোমাকেই তিনি ভালবাসেন, ···একথাও তো কারোর অজানা নেই। প্রসিদ্ধ একথা। কিন্তু এইটেই বড় আশ্চর্যের তাঁর মাথায় এমন কঠিন পরিকল্পনার উদয় হল কেমন করে?'

'যে বিষ থেকে ভালো ভালো ওষুধ তৈরী হয়, সেই বিষেরও গুণ নষ্ট হয়ে যায়, যদি মহাবিষ একবার তাকে ছোঁয়। আমাদেরও তাই হয়েছে সই তাই হয়েছে। তোমার এত বড় দুঃখের সামনে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে, উপে গেছে, আমাদের বুকের ভিতরকার দুঃখ।'

'অত ভেবে আর কি হবে সই, আমাদের বলো এই যন্ত্রণার বীজটি কি।'

১৩। প্রেম-প্রখরা শ্যামা বলে উঠলেন,—'কি সব প্রশ্নের ছিরি তোমাদের! ওলো, তাঁর প্রেমের স্বভাবটিই এই।···সে এক আশ্চর্য প্রেম। কেউ কি ঠিকানা করতে পারে সে প্রেমের? যাঁরা প্রেমে পড়েন তাঁদের কাছে সে প্রেম···বিষ তো বিষ, সুধা তো সুধা; একই জিনিষ। সে প্রেমের অনেক ভাব। তারা একসঙ্গে জ্বালায় আবার রসায়, মারে আবার বাঁচায়।'

১৪। শ্যামার বাণীস্রোত অবসন্ন হয়ে গেলে সখীদের বহু প্রযত্নে একটু যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন রাধা। গদ্গদে মুচির ভিতর থেকে গলানো সোনার মত, হৃদয়ের ঢাকনা খুলে আকুল হয়ে বেরিয়ে এল তাঁর হৈমস্রোত প্রেমের। সেই প্রেমের গুমরে-গুমরে ওঠা কান্না, সেই প্রেমের কোমল অস্ফুট গুঞ্জন যাঁরা শুনলেন, তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন; হাসি শুকিয়ে গেল তাঁদের মুখে। তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন, এক জায়গায় এসে তাঁরা মিলিত হলেন। এবং তারপরে রাধাকে সম্মুখে নিয়ে পুনর্বার তাঁরা নিজের নিজের মনোজ্বর বিকিরণ করতে করতে আরম্ভ করে দিলেন সন্ধান। দিশি দিশি খুঁজলেন। এবার কেবল চাঁদের আলোয় নয়, অন্ধকারেও তাঁরা খুঁজলেন। কুঞ্জে কুঞ্জে, ঘন গাছের ছায়ার তলায়, যেখানে যেখানে জমাট বেঁধে আছে অন্ধকার সেখানে সেখানে তাঁরা খুঁজলেন। কোনো বন বাদ পড়ল না। শেষে হতাশ হয়ে গেলেন। নিভে গেল উৎসাহের দীপ। ফিরলেন।

১৫। ফিরলেন যমুনার কূল ধরে। চলতে চলতে শেষে বসে পড়লেন যমুনার পুলিনে, অতিমসৃণ তার কর্পূর শুভ্রতায়। কৃষ্ণে সমর্পণ করে দিলেন মন। কৃষ্ণ-গুণে সমর্পণ করলেন চিন্তা। কৃষ্ণ-গান নন্দিত হল তাঁদের রসনায়। কৃষ্ণের অদর্শন···যেন প্রলয়-কালের মত দীর্ঘ।

তাঁরা কাঁদলেন। উৎকণ্ঠায়-ভরা কান্না। কোমল গুঞ্জন-ভরা গুমরে গুমরে-ওঠা কান্না। দূর থেকে তাঁদের মুখের সৌরভ পেয়ে ছুটে এল মধুকরবধূরা। তাদেরও গুণ গুণ যেন সমবেদনার ক্রন্দন।

১৬। বিপ্রলম্ভরসের এই কৃষ্ণগান-মাধুর্য কারোর ক্ষমতা নেই অনুকরণ করে। যার আঘাতে দন্তোলির হৃদয় গলে, যার আকর্ষণে তরুলতা পাহাড় মেলে ধরে তাদের অন্তঃকরণ, দেবী সরস্বতীও বোধহয় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিবৃত্ত হবেন সে মাধুর্যের অনুকথনের প্রচেষ্টা থেকে।

তথাপি, আমাদের নিবেদন করতে হয়েছে সেই কৃষ্ণগান-মাধুর্য-কথা। অনুসৃত হয়েছে শ্রীশুকদেবের ভণিতা,···তোতা-পাখীর মত।

ইতি রাসলীলায়াং কৃষ্ণান্তর্ধানং নাম অষ্টাদশঃ স্তবকঃ।

[ক্রমশ।

শেষ শয্যায়

সমরেন্দ্র ঘোষাল

ঈশ্বর! আমার অবধারিত মৃত্যুকে
আমার চোখের সামনে থেকে
অন্তত বারেকের জন্যও সরিয়ে নাও।

বিগত অনেক ফাগুন আর অনেক শ্রাবণেও
যে শুধু স্বপ্ন হয়ে আমার চেতনার প্রদেশ ভরাতো,
আজি সে অশরীর আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে।

ঈশ্বর! আমি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই—
আমার জীবনপাত্রে মৃত্যুর গরলতা ভরে নিয়ে পান করবো,
শুধু তার আগে তার অধরের পানপাত্রের—
সঞ্চিত লাবণ্যের সুধা
আমাকে বারেকের জন্য পান করতে দাও।
এতকাল যে শুধু রাত্রির অন্ধকার ছিল
আজ প্রত্যূষের উত্তপ্ততার আকাশ হয়ে
আমার সম্মুখে আমার সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

শতবর্ষের শিকরা গ্রাম

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

ইংরেজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ বা বাংলা ১২৬৯ সাল—যে ভাবেই বৎসরটাকে ধরুন না কেন, এ একটা স্মরণীয় বৎসর। অপরাপর স্মরণীয় কারণের মধ্যে এ বৎসরটা স্মরণীয় হয়ে আছে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-বৎসর রূপে। আর সেই বৎসরেরই মাত্র নয় দিন ব্যবধানে বাংলা মায়ের শ্যামল গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে জন্মেছিল অপর একটা শিশু, যে শিশু পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় অবগাহন করে সমগ্র জীবন দিয়ে অমৃতবাণী প্রচার করে মরজগতে অমর হয়ে রইলেন।

একজনের জন্ম মহানগরীতে আর অপরের জন্ম সুদূর পল্লীগ্রামের গ্রাম্য প্রাচুর্যের মধ্যে হলেও কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভে কলকাতার বুকেই তাদের মিলন হয়, খেলায়, আড্ডায় আর কুস্তির আখড়ায়। এ কুস্তির আখড়া ছিল কলকাতার সিমলা পাড়ার কাছে।

১৮৮১ সনে কলেজে আই-এ পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম পাঠ আরম্ভ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে আর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সঙ্গে।

এঁরা খাঁটি লোহা। অকলঙ্ক লৌহ। সর্বকর্মের প্রয়োজনে। বিরাট চুম্বক-স্তম্ভের আকর্ষণে লোহা গিয়ে সেই মহান স্তম্ভে মিলিত হয়ে যেমন চুম্বকত্বও লাভ করে। তখন লোহা তার বজ্র কাঠিন্যের সঙ্গে চুম্বকত্বও লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভে এসব অকলঙ্ক লৌহ দেবত্বের চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল; আর অপর সকলকে আকর্ষণ করবার শক্তি লাভ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হলেন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ নামে আর রাখালচন্দ্র ঘোষ নতুন জীবন পেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবারকার লীলায় একজন পাকা খেলোয়াড় তথা খেলোয়াড়দের দলপতি বা প্রধান পরিচালক।

নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে তিনি যে খেলা খেলিয়েছেন, বিশ্বজন বিস্ময়ে নরেন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করেছেন। দলের অপরাপর খেলোয়াড়দের যোগ্যতাও কম নয়। অযোগ্য খেলোয়াড় সঙ্গে নিয়ে কেউ দিগ্বিজয়ী হতে পারেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দও সে সুযোগ্য খেলোয়াড়ের অন্যতম। অপর সব সুযোগ্য সহকর্মীদের প্রসঙ্গ নিয়ে মহাভারত রচনার অধিকার আমাদের নেই। প্রদীপ্ত সূর্যের এক কণা কিরণও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাতেই আমাদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটে যায়। আমরা তাতেই পরিতুষ্ট থাকতে পারি। আমাদের এখনকার স্মরণীয় হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ জন্মগ্রহণে যেমন সমসাময়িক; তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাবহনে তাঁরা সহকর্মী, সহধর্মী।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জগতের পরমকল্যাণব্রতে স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। তিনি নিজে প্রতিষ্ঠাতা হয়েও প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃত্বের কর্ণধার করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে।

জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা পালনে, তপস্যার সঙ্গে কর্মের সংযোগ সাধন করে রামকৃষ্ণময় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি স্বামীজীর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য; তথা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সর্বাধ্যক্ষ সভাপতি। মিশন প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯২২ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর তিনি স্বামীজীর ভারপ্রাপ্ত কর্মীরূপে কর্মের গুরুভার বহন করেছিলেন।

তাঁরই জন্মস্থান হল শিকরা-কুলীন গ্রাম। সত্যিই এ গ্রাম গ্রামের মধ্যে কুলীন শ্রেষ্ঠ। শতাধিক বৎসরের পূর্বের সমৃদ্ধগ্রাম জমিদারের গ্রামরূপে কৌলীন্য লাভ করেছিল। এ-গ্রামের আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। গ্রামের উন্নতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপনা, পরিচালনার জন্য তিনি স্মরণীয়।

তাঁদের ঘর আলো করে ১২৬৯ সালের মাঘী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মেছিল এক দেবশিশু। আদর ক'রে তাঁরা তার নাম রাখলেন রাখাল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—'এ ব্রজের রাখাল'। এ রাখালই শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের রাজা মহারাজ। সঙ্ঘের কর্মের মধ্যে তাঁর প্রকাশ আছে, কিন্তু প্রচার নেই। শুধুমাত্র শ্রীগুরু আর গুরুভ্রাতার ভাবাদর্শ প্রচারে অতিশয় আজ্ঞাবাহী সৈনিকের মত নিয়মানুবর্তিতার বিকাশ বর্তমান।

ব্রজের রাখাল রাজার মত এঁরও জন্মভূমির প্রতি কোন আকর্ষণই রইল না। শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে এ সব জাগতিক প্রাচুর্য পরিহার করে তিনি পরবর্তীকালে ভারতের নানা স্থানে তপস্যা আর গুরুগত প্রাণ নিয়ে গুরুভ্রাতার আদেশে স্থাপিত কর্মকেন্দ্র পরিচালনা করেছিলেন। তিনি যে ব্রজের রাখাল তার সামান্য অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তাঁর শ্রীবৃন্দাবনধামের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে।

আসুন, সেই ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজের জন্মস্থান—পৈত্রিক ভিটা শিকরা-কুলীন গ্রাম দর্শন করে আসবেন, শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী স্মরণ উপলক্ষে।

কলকাতা-শ্যামবাজার থেকে বাসে করে ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে শিকরায়। আগে বসিরহাট যাবার পাকা রাস্তায় ছোট লাইনের গাড়ীর একটা স্টেশন ছিল শিকরা। অধুনা সে রেলপথ পরিত্যক্ত হয়ে বড় লাইনের পথ হয়েছে বসিরহাট-হাসনাবাদ পর্যন্ত। সে লাইন শিকরা থেকে মাইলখানেক দূর দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বাসের চলাচল এখনও অব্যাহত আছে।

শ্যামবাজার থেকে ছেড়ে দমদম বিমানঘাঁটির পাশ দিয়ে এসে পৌঁছে যাবেন বারাসতে। এ বারাসতে শেঠপুকুরে বাসখানা অপর একটা মন্দিরের একেবারে গা ঘেঁসে চলে যায় তার গন্তব্যপথে। এ মন্দিরটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপর এক গুরুভ্রাতার নামে নামাঙ্কিত। রামকৃষ্ণ শিবানন্দ মন্দির। স্বামী শিবানন্দ ছিলেন প্রাচীন রামকৃষ্ণ-সন্তানদের বা স্বামী বিবেকানন্দের তারকদা,' আর ভক্তদের কাছে মহাপুরুষ মহারাজ। তাঁরই জন্মস্থানে তাঁরই পিতৃদেব ৺তারকনাথ ঘোষালের আঙিনায় নবনির্মিত মন্দির। চলন্ত বাস থেকেই সেই মন্দির এবং মন্দিরের দেবতাকে

প্রণাম করে এগিয়ে চলুন। পথে পাবেন ধান্তকুড়িয়া, সমৃদ্ধ গ্রাম। অবশেষে বহুগ্রাম, বহু হাট, বহু মাঠ পার হয়ে পৌঁছে যাবেন শিকরা গ্রামে।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে বাসখানা তার গতি মন্থর করে একটা প্রাচীন বটগাছের তলায় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়বে। যোগীরাজ রাখাল-রাজার জন্মস্থান কি না; তাই গ্রাম্য পরিবেশের নীরবতা ভঙ্গ করবার অধিকার যেন বাসখানার নেই। নীরবে আপনিও সেখানে নেমে পড়ুন। এ সেই রাখালরাজের বাল্যক্রীড়া-বন্ধু বটগাছ। তিনি এবং তাঁর সহচরগণ নিশ্চয়ই এই বটগাছের আশেপাশে খেলা করেছিলেন। এখনও গ্রামের ছেলেরা সেখানকার খোলা জায়গায় বিকেলবেলায় খেলায় মেতে ওঠে।

এই বটগাছের তলায় একটি নির্দেশক বোর্ড আছে স্বামী ব্রহ্মানন্দ রোড। গ্রামবাসীর ব্রহ্মানন্দ সম্মানের প্রথম পরিচয়। এখান থেকে রাস্তাটা উত্তরদিকে গিয়ে পৌঁচেছে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের পাদমূলে। অতি নিকটে। পূর্বে আনন্দমোহন ঘোষ ও তাঁর ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণী কৈলাসকামিনীর বাসগৃহের যে সূতিকাগারে রাখালের চোখে জগতের আলোর প্রথম পরশ লেগেছিল, যে ঘর ছেড়ে পরবর্তীকালে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে দেহত্যাগ করেছেন। অনুগত ভক্তজন পরবর্তীকালে সেখানে পটপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে গুরু ব্রহ্মানন্দ আজ জগৎগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মনন করেছিলেন, জন্ম শতবর্ষ পূর্ণ হবার আগেই বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তত্ত্বাবধানে এখানে স্থাপিত হয়েছে মনোরম মন্দির।

ছোট এ মন্দিরটি বর্তমানে পরিপূর্ণ গ্রাম্য শোভায় সুশোভিত নানা রকম ফুলের গাছ সবুজ দূর্বাদলের খোলা বাগান, আর তার মধ্যমণি মন্দিরটি। মনে হবে একটি দ্রাবিড়ী ও বঙ্গীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রিত দেবমন্দির এ গ্রামাঞ্চলে এসে আত্মগোপন করে লুকিয়ে আছে আম, জাম, নারকেল প্রভৃতি গাছের আড়ালে। মূল মন্দিরের দক্ষিণে খোলা নাটমন্দির। মন্দিরের শোভা ইট-পাথরের কারুকার্যে নয়, শোভা বাড়িয়েছে নিখুঁত ধবধবে পরিষ্কার দেয়ালের উপরিভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল মহারাজ ও অপরাপর রামকৃষ্ণ সন্তানদের অনিন্দ্য সুন্দর চিত্রগুলি।

মন্দিরটি দক্ষিণ দেশীয় রূপ পেয়েছে বোধ হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের দাক্ষিণাত্য প্রীতির জন্য। এই দক্ষিণ দেশ থেকেই তিনি বাংলা দেশের জন্য অষ্টোত্তর শতনামী রামায়ণের গান ও সুর সংগ্রহ করে এনে বাংলাদেশে প্রচার ও প্রচলন করে গেছেন। দক্ষিণ দেশের পুরী ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থান তাঁর অতি প্রিয় ছিল। তাই তিনি ভুবনেশ্বরে নিজে তপস্যা করতেন এবং পরবর্তীকালে ভুবনেশ্বরে একটি মঠও স্থাপনা করেছিলেন সাধুদের তপস্যার জন্য।

ছোট মন্দিরটি আর নাটমন্দিরের ভাব গম্ভীর রূপে মুগ্ধ হয়ে আপনাকেও সেই নীরবতার সঙ্গে আত্মসংযোগ করে নিস্তব্ধ দর্শক হয়ে দীর্ঘ সময় দর্শন করতে হবে। মন্দিরের পূর্ব-উত্তর দিকে কাছেই রয়েছে আর একটি স্মারক-গৃহ। ঠিক ওখানটাতেই ছিল রাখালের বিদ্যাভ্যাসের স্থান। যে বিদ্যা তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের সহায়তা করেছিল সে স্থানটি সংরক্ষিত আছে সাধুদের ভজনের স্থান রূপে।

বর্তমান মন্দিরের পূর্বদিকে একটা পুকুর পাড়ে সেই পুরাতন কালীমন্দির, আর বোধনতলা। ঐ মন্দিরের সামনে রাখাল আর তার সমবয়সিগণ কালীপুজা আর পাঁচালির অভিনয় করত। প্রাচীন কালের একটা পুকুর কালীমন্দিরের দক্ষিণে শতবর্ষ ধরে তার পরিষ্কার জল বিতরণ ক'রছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

ঘোষ-পরিবারের দুর্গা-পুজায় প্রাচীন মন্দিরটি শতাব্দান্তে এখনও সুস্থ বৃদ্ধ সেবকের মত দাঁড়িয়ে আছে।

সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করে প্রাচীন পাকা ইমারতের পাশে অনেক আধুনিক গৃহের সন্ধান পাবেন। সর্বশেষে পুনরায় বাস চলার রাস্তায় এলে দেখতে পাবেন একটা আধুনিক কালের উপযোগী যাত্রী নিবাস বা অতিথিশালা। যাঁরা দূরান্তের যাত্রী, তীর্থবাস প্রয়াসী তাঁরা এ অতিথিশালায় অবস্থান করে স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অবকাশ পাবেন। যাঁরা অল্প সময়ের সদ্ব্যবহার করতে আসবেন তাঁরা মন্দির দর্শন আর শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিনের শেষে কর্মকোলাহলময় মহানগরীতে ফিরে আসবার যথেষ্ট সময় পাবেন।

ডবলিউ হওয়েল

যখন আমি রব না এ ধরায়
হৃদয় তোমার করো না ক্ষতাক্ত।
দিয়ো না দোষ নিজেকে আর মিথ্যেই
যে কাজগুলি ছিল অসমাপ্ত।
যখন মরণ এসে ধরবে আমার হাত
পারবে নাকো বাসতে ভালো আর—
কেন আরও ভালবাসি নি'কো
ভাববে তুমি, নেইক' প্রতিকার।

হয়ত তুমি করবে স্মরণ—
আমার চোখের জল
ফেলেছি যা তোমার প্রেমের লাগি,
যখন আমি থাকব না আর বেঁচে
দিয়ো না দোষ নিজেকে অভাগী।
ঝরে-যাওয়া দিনগুলি ফের পড়বে মনে
সামনে তোমার অনাগত অনন্ত।
হয়তো তবু শান্তি পাবে এই ভেবে
আমার এ প্রেম ছিল শুধু একান্ত।

অনুবাদ—ভাস্কর দাশগুপ্ত।

॥ আধুনিক ফরাসী উপন্যাস : কাম ও প্রেম ॥

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরাসী উপন্যাসের রসময় জয়যাত্রা সুরু হয় অষ্টাদশ শতকে ভলতেয়ারের 'ক্যাণ্ডিড' উপন্যাস রচনার মাধ্যমে—যার আবর্তন এ যুগের জঁ। পল সার্ত্রের রচনাতেও চোখে পড়ছে। ফরাসী উপন্যাসের জন্মকাল থেকে সুরু করে এই যুগের উপন্যাসগুলিতে পর্যন্ত একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তা হল কাহিনীসর্বস্ব উপন্যাসকে চিন্তার ভারে গুরুগম্ভীর ক'রে তোলা। অষ্টাদশ শতকে ভলতেয়ার, মাদাম দে লা ফয়িয়াৎ, স্তাঁদাল, কঁস্তা প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের রচনায় কামের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও তা তত স্পষ্ট নয়, যত স্পষ্ট প্রেমের পরিচয়। অবশ্য বলজাকের রচনায় এ দু'টিরই পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু বিশ শতকের ফরাসী ঔপন্যাসিকরা অত্যন্ত সচেতন।

আধুনিক ফরাসী ঔপন্যাসিকরা পাঠক-পাঠিকার মন কী ধরণের লেখা চায় তা বেশ ভালভাবেই জানেন এবং সেইজন্যেই অষ্টাদশ বা উনিশ শতকী ঔপন্যাসিক চিন্তন আর তাঁদের মধ্যে বেশী খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম পর্বে ফরাসী ঔপন্যাসিক শার্ল লুই ফিলিপ ১৯০০ সালে লেখেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'সঁ কার্ণাসের বুবু'—যার কাহিনীর পটভূমিকায় রয়েছে বেশ্যাবৃত্তি। এই উপন্যাসে একটি নিষিদ্ধ পল্লীর রাস্তায় এসে জড়ো হয়েছে কয়েকটি নারী এবং পুরুষ চরিত্র—যাদের মধ্য দিয়ে বাস্তব সমাজকে তুলে ধরেছেন ফিলিপ পাঠক সমাজের সামনে। এই উপন্যাসে প্রথম ফরাসী উপন্যাসের পূর্ববর্তী পথ পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করি। অবশ্য এমিল জোলাকে আমরা প্রেম-জীবনের রূপকার বলতে দ্বিধা করলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে কাম-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি সক্ষম ছিলেন।

আধুনিক ফরাসী উপন্যাসের যাত্রা শুরু আগেই বলেছি বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। নোবেল বিজয়ী তুগারের 'ভিয়েই কাঁস' উপন্যাসে মিষ্টিমধুর প্রেমের ছোঁয়া ক্ষণিকের জন্যে পাঠকের চেতনায় রস সঞ্চার করে। তবে একথাও ঠিক যে, এই উপন্যাস একান্তই কাহিনীপ্রধান যার ফলে প্রেম এবং কাম-এ দু'য়ের কোনটিকেই পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই। প্রেম সম্পর্কিত অনেক অপ্রিয় সত্য পল মোঁরার উপন্যাসে পাওয়া যায়।

জঁ। পল সার্ত্র ইদানীং কালের ফরাসী উপন্যাসের দিকপাল বলা যায়—বিশ্ব-সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি আজ সুপরিচিত। সার্ত্রের উপন্যাসে অস্তিত্ব বাদের প্রচারণা আছে। তিনি দার্শনিক হয়েও কর্মী। মানসিক জগতের জৈবিক প্রেরণাকে সার্ত্র অস্বীকার করেননি। দর্শন-চর্চার সুরু তাঁর প্রথম যৌবনেই—দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রী সহপাঠিনী সিমোন দে বোভিয়াকে সহচারিণী রূপে গ্রহণ করেছেন সার্ত্র। সার্ত্রীয় মনন মনস্তাত্ত্বিক। সার্ত্রের উপন্যাসে কামের রেখাপাত খুঁজতে যাওয়া বৃথা; প্রেম—তাঁর উপন্যাসে প্রনগ্ন নয়!

আধুনিক ফরাসী উপন্যাসের অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছে যুদ্ধোত্তর ফরাসী উপন্যাসগুলি! এই উপন্যাসগুলিতে যুগসচেতনতা খুবই বেশী—প্রেমের শুচিতার চেয়ে কামের জৈবিক উল্লাস উপন্যাসগুলির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। মানব-জীবনে প্রেমের স্ফূরণ তখনই যখন জীবন-তরঙ্গ শান্ত। কিন্তু কামের চাঞ্চল্য সব সময়েই। তাই যুদ্ধোত্তর জীবনে শান্তি খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা। মৃতের আর্তনাদে, ব্যভিচারের উল্লাসে, রিরংসার অবাধপ্রবাহে শান্ত প্রেমের মহিমা সমাহিত—জীবনে তখন কেবলই কামবৃত্তির উল্লাস! যুগ-সচেতন লেখকরা যথেষ্ট চেষ্টা করলেও যুদ্ধোত্তর যুগে তাই তাঁদের পক্ষে শান্ত প্রেম-কেন্দ্রিক উপন্যাসলেখা সম্ভব নয়। বিশ্বের প্রতিটি সাহিত্যই সে সময় বিক্ষুব্ধ। ফরাসী উপন্যাসও এই ধারার অনুপন্থী।

যুদ্ধোত্তর যুগে লিখিত ফরাসী ঔপন্যাসিক সেলিনের 'কাস কিস' উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন নিশ্চয়ই। এই উপন্যাসে সেলিন একজন সৈনিকের মুখ দিয়ে অজস্র খিস্তি বসিয়েছেন। এই উপন্যাসে চিন্তার খোরাক বেশী নেই।

এই যুগের আর একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক জঁ। বার্দলিয়ে তাঁর লে জিয়ো দেলা তের' উপন্যাসে যদিও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসের মূল অংশে রয়েছে যুদ্ধের সময় কয়েকটি জার্মান রমণীর পদস্খলন এবং তাদের অন্তরের কাহিনী। এই উপন্যাসে বার্দলিয়ের বাস্তবতাবোধ মেনে নিলেও একথা ঠিক যে পুরুষসঙ্গবিহীনা জার্মান রমণীদের একের পর এক মোরেলের অঙ্কশায়িনী করে যে যৌন অরাজকতাকে তিনি সমর্থন করেছেন তা দাম্পত্য প্রেমের সমস্ত শুচিতার মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করে।

পরিশেষে এই সম্পর্কিত আর একটি উপন্যাসের নাম করা যায়। উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। জঁ। দুবাক লিখিত ফরাসী উপন্যাস 'লে দঁতেল্ দে লঁ। গ্যের'। উপন্যাসটিতে প্রত্যক্ষ-ভাবে কামবাদের প্রচার করা হয়েছে। লেখক যুদ্ধকালীন অবসরে তাঁর উপন্যাসের নায়ককে দিয়ে যা করান তা হল রতি পূজা। যুদ্ধের দুঃসময়ে আত্মগোপনকারী তরুণ নায়ক বোমার গর্জন উপেক্ষা করে ন্যুড আঁকায় এবং মডেলের সঙ্গে রতিরঙ্গে মাতায় সম্পূর্ণ অনুশোচনাহীন। কামের আসরে এই জাতীয় নৈরাজ্যবাদের প্রশ্রয় দানের জন্যে দায়ী লেখক নন, সমসাময়িক জাতীয় পরিবেশ।

বস্তুত বিশ শতাব্দীর ফরাসী উপন্যাসে কাম ও প্রেমের স্ব-রূপে প্রকাশিত হলেও এ-কথা ঠিক যে ঔপন্যাসিকরা অত্যন্ত যুগ-সচেতন হওয়ার ফলে প্রেমের শুচিতাকে স্বীকার করে ও কামের উল্লাসকেই তাঁরা বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। আগেই বলেছি সে জন্যে লেখকদের দায়ী করা উচিত নয়—সমাজ পরিবেশই এই জাতীয় উপন্যাস রচনার মুখ্য কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আধুনিক কালের হয়েও আলবেয়ের কাম্যু, প্রস্ত এবং জঁ। পল সার্ত্রের দৃষ্টি অতীতচারী—তাঁরা প্রেমের স্বর্গীয়দ্যুতিতে অনুপ্রাণিত।

আহার সমাপনান্তে আমরা আবার মন্দির দর্শনে বাহির হই। প্রথমে গৌরী মন্দিরে উপনীত হই। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি খৃষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে, নির্মাণ করেন করবংশীয়া মহারাণী গৌরী দেবী। মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে কেদারকুণ্ডের পশ্চিমে কেদারগৌরীতে। অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান ভুবনেশ্বরের এই কেদারগৌরী, বুকে নিয়ে আছে দুইটি নির্ঝরিণী, পরিচিত গৌরী ও দুগ্ধকুণ্ড নামে। গৌরীকুণ্ডে স্নান ও দুগ্ধকুণ্ডের জলপান করে মুক্তি লাভ করে মানুষ বহু ব্যাধি থেকে। তাই সমবেত হন এখানে প্রতিদিন বহু স্বাস্থ্যকামী, স্নান করেন গৌরীকুণ্ডের পবিত্র জলে, পান করেন দুগ্ধকুণ্ডের নির্মল জল, দূর হয় তাঁদের রোগযন্ত্রণা, অবসান হয় ব্যাধির।

রাজা-রাণী প্রস্তর নির্মিত এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় নির্মাণ পদ্ধতি, পরিচিত গৌরীচব নামে। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই মন্দিরের আদি জগমোহন। বিভিন্ন তার পঞ্চরথ বিমানের আকৃতি আর গঠন পদ্ধতি।

দেখি, বিমানের কেন্দ্রস্থলের দুই পাশে, কুলুঙ্গির ভিতর গঙ্গা ও যমুনা দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন মকরবাহনে গঙ্গা আর কূর্মবাহনে যমুনা উত্তরের সম্মুখ ভাগেও। দেখি, দিকপালের মূর্তির, অনুরূপ মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দিকপালের মূর্তির।

দেখি, বাঢ় আর রেখের সংযোগ স্থল থেকে, উর্দ্ধে উঠে গিয়েছে একের পর এক ক্ষুদ্র রেখ দেউল, সন্ধিস্থলে নিয়ে প্রকোষ্ঠ। তাদের উপরে, বাঢ়ের আকৃতির দ্বিগুণ উর্দ্ধে, রচিত হয়েছে, রেখের চতুর্দিকে, একটি ছাঁচ। অলঙ্কৃত সেই ছাঁচের অঙ্গ পদ্মলতা ও সূক্ষ্মতম জালির কাজ দিয়ে প্রকোষ্ঠের উপরেও একটি আয়তক্ষেত্র ছাঁচ। তার উপরে, দুই থাকে, ক্রমহ্রস্বায়মান হয়ে উঠেছে মন্দিরের শীর্ষদেশ। নাই সেখানে কোন শ্রী, আমলকও নাই। দেখি মস্তক বার করে আছে সিংহও, রাহুপাগ বা কেন্দ্রস্থলের উদ্গত স্তম্ভের বুক থেকে। নাই এই বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার অন্য মন্দিরে।

দেখি, অন্তর্হিত হয়েছে দিকপতি আর পার্শ্বদেবতার মূর্তিগুলি, কিন্তু অক্ষত রয়েছে নাগ আর নাগিনীর। বিমানের পূর্ব ও পশ্চিম সম্মুখভাগে, নাগ আর নাগিনীর শীর্ষদেশে বামনাকৃতি বেতালরা উপবিষ্ট। দেখি, মুক্তেশ্বরের মন্দিরের মত দাঁড়িয়ে আছে উন্মুক্ত দ্বারের সামনে, অপরূপ ভঙ্গিতে একটি পরমা রূপবতী নারী মূর্তিও। কোনক পাগের অঙ্গে, মন্দির উত্তোলনে নিযুক্ত বামনের দল। পদকের বুকে নরমূর্তি, শার্দূলের মূর্তিও দেখি। রচিত এই বিমানের বাঢ়টিও মুক্তেশ্বরের বিমানের বাঢ়ের অনুকরণে। মুক্তেশ্বর আর তার নিকটের গৌরীকুণ্ডের আশেপাশের কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির ও পীঢ় দেউল দেখে আমরা কেদারেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। একটি পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে বিমান আর জগমোহন। কেশরী বংশের রাজারা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে। কেদারেশ্বর দেখে পরশুরামেশ্বরের মন্দিরে যাই। গোত্রহীন অন্য মন্দিরগুলি অনলঙ্কৃত ও লাভ করে নাই ভাস্করের হস্তের স্পর্শ। শুনি তাদেরই এক পীঢ় দেউলে আদি কবি বাল্মীকি বাস করতেন। জন্মগ্রহণ করেছিলেন নাকি এইখানেই এক ক্ষুদ্র মন্দিরে, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব ও কুশ। দেখি, গৌরীকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি পীঢ় দেউল, হনুমান বিরাজ করেন।

পরশুরামেশ্বর, অন্যতম প্রাচীনতম মন্দির ভুবনেশ্বরের দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধারণ্যের পশ্চিমে, মহাপবিত্র কেদারকুণ্ড থেকে এক ফার্লং দূরে, কেদার-গৌরী যাবার পথে, বুকে নিয়ে আপন বৈশিষ্ট্য। নির্মাণ করেন এই মন্দিরটি করবংশের নৃপতিরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে। আয়তক্ষেত্র এই মন্দিরের জগমোহন, নম্র পিরামিড আকৃতি বিশিষ্ট, শীর্ষে নিয়ে আছে ক্রমনিম্নমান ছাদ, দাঁড়িয়ে আছে ছাদ ছয়টি স্তম্ভের উপর। ব্যতিক্রম উড়িষ্যার অন্য জগমোহনের আকৃতি আর গঠন পদ্ধতির সঙ্গে। তার পশ্চিমদিকে আর দক্ষিণে দুইটি প্রবেশ দ্বার, ছাদের অঙ্গে আঠারোটি গবাক্ষ, প্রবেশপথ আলো-বাতাসের। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, বৌদ্ধ-চৈত্যের মত, বিভক্ত তার পঁচিশ ফুট দীর্ঘ ও আঠারো ফুট প্রস্থ অভ্যন্তর ভাগ, দুই সারি সমান্তরাল এক প্রস্তর স্তম্ভ দিয়ে, কেন্দ্রস্থলে আর গলিপথে। দাঁড়িয়ে আছে জগমোহনটি দেড় ফুট উঁচু পৃষ্ঠের (তলাপত্তনের) উপর।
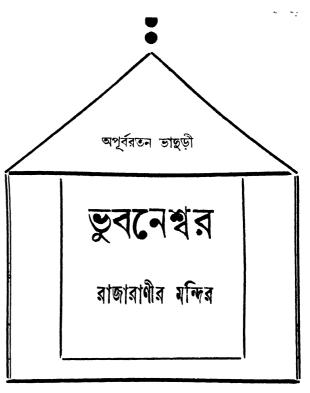
দেখি শীর্ষে নিয়ে আছে জগমোহনের পশ্চিম প্রবেশ পথ, গজলক্ষ্মীর মূর্তি, তার দক্ষিণে মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে শিবলিঙ্গ পূজার দৃশ্য। বামে, পোষাহস্তীর সাহায্যে বুনো হস্তী ধরার রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ বুনো হস্তীর একটি পদ, একটি শিকারী রজ্জু দিয়ে তার পিছনের পদ বন্ধনে নিযুক্ত। সম্মুখে, দীর্ঘ বল্লম হস্তে অপর একটি শিকারী হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। অপরূপ সুষ্ঠু গঠন এই হস্তী দুইটি জীবন্ত, মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখি। দ্বারের দুই পাশে প্রাচীরের গাত্রে, দুইটি জালির গবাক্ষ। অঙ্গে নিয়ে আছে গবাক্ষ দুইটি, নৃত্যের দৃশ্য। নৃত্য করে কত নর্তক, বিভিন্ন তাদের নৃত্যের ছন্দ; নৃত্য করে তালে তালে, কেউ বীণা বাজায়, কেউ ডমরু, কেউ হস্তে ধারণ করে আছে বসনের প্রান্ত। তাদের

উপরে, পাড়ের অঙ্গে, মূর্তি কত হস্তীর, দাঁড়িয়ে আছে তারাও বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গিতে। দেখি কৌপিনধারী সন্ন্যাসীদের শিবপূজার দৃশ্যও। উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গে বৃক্ষ আর লতা-পুষ্প ক্ষোদিত। অনুরূপ দক্ষিণের প্রবেশপথের অলঙ্করণ, কিন্তু শীর্ষে নিয়ে আছে প্রবেশ-পথ গণেশের মূর্তি, তার দক্ষিণে আর বামে চতুর্ভুজ নন্দী ও দ্বিভুজ মহাকালের মূর্তি। দ্বারের এক পাশে একটি জালির গবাক্ষ, অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত।

নাই কোন দ্বার উত্তর দিকে, রচিত হয়েছে একটিমাত্র গবাক্ষ। অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত সেই গবাক্ষটির অঙ্গও। উত্তর পশ্চিম কোণে একটি গণেশের মূর্তি দেখি। নাই অন্য কোন মন্দিরে এমন অপরূপ সৃষ্ঠ, গঠন, জীবন্ত গণপতির মূর্তি। দেখি মুগ্ধ হয়ে। ক্ষোদিত হয় তার সংলগ্ন, সপ্তমাতৃকার মূর্তি, সাতটি কপাটের অঙ্গে তাঁদের কারও হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল, কারও ত্রিশূল আর কুঠার। প্রাচীনতম সপ্তমাতৃকার মূর্তি উড়িষ্যার, বিস্মিত হয়ে দেখি। বিরাজ করেন জালির গবাক্ষের দক্ষিণে বৃহৎ কপাটের অঙ্গে, নয়টি দেবদেবী, তার বামে ছয়টি দেবদেবীর মূর্তিও, শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার প্রাচীনতম ভাস্করের। বিমানে উপনীত হই। একটি ত্রিরথ দেউল এই বিমানটি, দাঁড়িয়ে আছে ধরিত্রীর বুকের উপর, রচিত হয় নাই কোন পৃষ্ঠ। বিভক্ত এই বিমানের বাঢ় শুধু দুইটি অংশে, আকৃতিতেও সামন্তরিক, ঘনক নয়। বিভক্ত বাঢ় আর রেখের সংযোগস্থল গভীর প্রকোষ্ঠ আর অভিষেক দিয়ে। অপেক্ষাকৃত নীচু এর রেখের উচ্চতাও, তাই মহিমাময় বহুদৃপ্ত। অন্য মন্দিরের মত, মুখ বাড়িয়ে দেখি বসে নাই কোন সিংহ, বিমানের অঙ্গে, আমলক শিলা আর ঘাড় চক্রের মাঝখানে দেউল চারিণীর দলও নাই। উপনীত হই পূর্বদিকে। দেখি, পূর্ব সম্মুখ ভাগে বাঢ়ের অঙ্গে তিনটি বৃহৎ কুলুঙ্গি তৈরী হয়েছে, একটি রাহপাগের অঙ্গে, কেন্দ্রস্থলেও দুই প্রান্ত দেশে কোনক পাগের অঙ্গে, দুইটি ক্ষুদ্রতর প্রান্তদেশের কুলুঙ্গি দুইটি। অপসারিত হয়েছে প্রান্ত দেশের কুলুঙ্গির ভিতরের দিক্‌পালের মূর্তিগুলিও! কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গিতে, কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপের নীচে সিংহাসনে বসে আছেন দেব সেনাপতি কার্তিকেয়। তাঁর বাহন ময়ূর বিনাশ করছে একটি সর্পকে। দুই প্রান্তে, রেখ আর বাঢ়ের সংযোগস্থলে, দুইটি আমলক শিলা। দেখি অলঙ্কৃত রেখের গাত্র, কোণক পাগের অঙ্গ পর্যায়ক্রমে আমলক শিলা আর মনুষ্য মস্তক দিয়ে।

দেখি, অনুরূপ অলঙ্করণে অলঙ্কৃত বিমানের উত্তর আর দক্ষিণ সম্মুখভাগও। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের, অপসারিত হয়েছে সমস্ত মূর্তিগুলিই তাদের অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতর থেকে। অবশিষ্ট আছে শুধু দক্ষিণের সম্মুখভাগের কেন্দ্রস্থলের—কুলুঙ্গির ভিতরের গণেশের মূর্তিটি। মঞ্চের উপর উপবিষ্ট গণেশ। দেখি, অলঙ্কৃত কুলুঙ্গির ভিতরের সর্বোচ্চ চন্দ্রাতপের অঙ্গ আর বাঢ়ের সর্বোচ্চ পাড়ের অঙ্গ কত শোভন গঠন ময়ূরের মূর্তি দিয়ে। পাড়ের নিকটে, দীর্ঘ অনুভূমিক প্রকোষ্ঠের ভিতর প্যানেলের অঙ্গে দণ্ডায়মান নর ও নারীর মূর্তি। তাদের পিছনে জালির কাজ। সবার উপরে ঝালরের কাজ। দেখি বিমানের উত্তরের গাত্রে, কুলুঙ্গির ভিতর একটি অপরূপ শিকারের দৃশ্য। এক অশ্বারোহী সড়কি বিদ্ধ করছেন একটি ব্যাঘ্রকে, অপর এক অশ্বারোহী একটি হস্তীকে, তৃতীয় অশ্বারোহী সিংহের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করছেন হস্তে নিয়ে ঢাল।

দক্ষিণের গাত্রে, তোরণের প্রবেশ দ্বারে একটি গণেশের মূর্তি দেখি। তাঁর বামে একটি গন্ধর্ব, তাঁর পায়ের উপর একটি অপ্সরা উপবিষ্ট, দুই হাত দিয়ে ধারণ করে আছে অপ্সরা একটি ফলে ভরতি ঝুড়ি। দক্ষিণে, একটি নর ঝুড়ির ভিতর থেকে পুষ্পমাল্য বার করছে। তার পিছনে একটি লোক স্কন্ধে নিয়ে জামের গুচ্ছ, তার পিছনেও একজন খেজুর নিয়ে। সবার পিছনে একজন মুনি নিযুক্ত মালাজপে, একখণ্ড বস্ত্র দিয়ে আবদ্ধ তাঁর পদদ্বয়। অপরূপ এই দৃশ্যটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি উড়িষ্যার ভাস্করের, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। বিশিষ্ট এই মন্দিরের অঙ্গের অলঙ্করণ, ভাস্করের দান, অনুপম, রমণীয়, সুরুচিসম্পন্ন। সমপর্যায়ে পড়ে মুক্তেশ্বরের মন্দিরের গাত্রের অলঙ্করণের। কিন্তু মুক্তেশ্বরের মন্দিরের মত নাই মন্দিরে শার্দুলের মূর্তি, অলঙ্কৃত নয় তার অঙ্গ পলাখচিত ঝালরের কাজ দিয়েও। কিন্তু অনবদ্য, মহিমময় এই মন্দিরটি বুকে নিয়ে আছে উড়িষ্যার স্থপতির শ্রেষ্ঠ আর সুন্দরতম দান।

আমরা একে একে কোটী তীর্থেশ্বর, একটি পঞ্চরথ দেউল ও তীর্থেশ্বর দেখে একটি অর্ধভগ্ন গোত্রহীন মন্দিরের সামনে উপনীত হই। অনুরূপ এই মন্দিরটি পরশুরামেশ্বরের গঠনে আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে, তার দ্বিতীয় সংস্করণ সমসাময়িকও দেখি, অপসারিত তার সারা অঙ্গের কুলুঙ্গির ভিতর থেকে সমস্ত পার্শ্বদেবতার মূর্তিগুলি, অবশিষ্ট আছে শুধু উত্তরের গাত্রে, পার্বতীর মূর্তিটি পরিচায়ক তার পূর্ব গৌরবের। দাঁড়িয়ে আছে বিন্দু সরোবরের তীরেও অনুরূপ একটি মন্দির, অনুরূপ আকৃতিতে আর অঙ্গের অলঙ্করণে।

দেখি, কোটীশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুইটি পীঢ় দেউল, আর পাশেই একটি রেখ দেউল, পরিচিত সুবর্ণেশ্বর নামে। রাজা-রাণীর মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরতম মহামহিমময় রাজা-রাণীও সঙ্গে নিয়ে জগমোহন, সিদ্ধারণ্যের পূর্বদিকে এক ফার্লং দূরে বেষ্টিত হয়ে আছে চতুর্দিক, দিগন্তপ্রসারী ঘন সবুজ ক্ষেতে, প্রকৃতির এক রমণীয় পরিবেশে, পৃথক হয়ে আছে অন্য মন্দির থেকে। দাঁড়িয়ে আছে রাজা-রাণী নিঃসঙ্গ একাকী। নির্মিত এই মন্দিরটির সারা অঙ্গ রক্তবর্ণের সূক্ষ্মতম রাজা-রাণী প্রস্তর দিয়ে। তাই পরিচিত রাজা-রাণী নামে। নাই এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন বিগ্রহ। খুব সম্ভব স্থাপিত হয়েছিল এই মন্দিরটি শৈব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, কিন্তু বিঘ্ন হয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায়। নির্মিত হয় পরবর্তী যুগে। উড়িষ্যার গঙ্গবংশের রাজারা দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। রেখ পঞ্চরথ দেউল, এই মন্দিরের বিমানটি, দ্বিতল দাঁড়িয়ে আছে দুই থাকে বিভক্ত পৃষ্ঠের উপর। দুই অংশে বিভক্ত এই বিমানের বাঢ় ও জঙ্ঘা ও বারাণ্ডিতে। বিভক্ত জঙ্ঘা সাতটি ছাঁচে, বৃহত্তর তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থলের ছাঁচটি। বুকে নিয়ে আছে দ্বিতীয় জঙ্ঘা ক্ষুদ্র রেখ দেউলের প্রতীক।

দেখি অপরূপ রমণীয় এই বিমানের অঙ্গের অলঙ্করণ ও নিদর্শন সুন্দরতম সৃষ্টির, কীর্তির মহাগৌরবময় যুগের। দেখি, পৃষ্ঠের উপরে, অলঙ্কৃত করেন ভাস্কর মন্দিরের নিম্নতম প্রদেশ সুন্দরতম পদক দিয়ে, তাদের কারও অঙ্গে দেব-দেবীর মুখ, কারও মানুষের। বেষ্টিত

সেই পদকগুলি সুন্দর স্ক্রোলের পাড় দিয়ে। তাদের উপর রচিত হয় তিন থাকে কার্নিশ। তার উপরে জালের অভিষেপ। অভিষেপের উপরে প্রস্ফুটিত পদ্ম। তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত স্তম্ভগুলি। তাদের কেন্দ্রস্থলে কত বিভিন্ন লতা পল্লব, কত বিচিত্র পুষ্প। দেখি এই বিমানের রেখের অঙ্গে ফাঁদ গ্রন্থি, দেখি সুন্দরতম পুষ্পের ভূষণ আর সূক্ষ্মতম পলাযুক্ত ঝালরের কাজও, অনুরূপ মুক্তেশ্বরের বিমানের পড়ে সমপর্যায়েও। অনবদ্য, সুষ্ঠু গঠন, সুচারুসম্পন্ন রহস্যময় কিন্তু এই মন্দিরের মূর্তিগুলি, অপসারিত তারা মন্দিরের গাত্র থেকে, শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের, নিদর্শন তাদের সুন্দরতম সৃষ্টির, প্রতীক এক অমর কীর্তির।

অপসারিত হয়েছে মন্দিরের পিছনের কুলুঙ্গির ভিতরের মূর্তি। কিন্তু বুকে নিয়ে আছে তার দুই পাশের দুইটি অষ্টকোণ স্তম্ভ অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার; অঙ্গে নিয়ে আছে তাদের দুই পাশের উদ্‌গত স্তম্ভ ও অপরূপ ঝালরের কাজ, বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার মন্দিরের। দেখি, সুন্দরতম এই মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের কুলুঙ্গিগুলির দুই পাশের অষ্টকোণ স্তম্ভের অঙ্গে স্ক্রোলের কাজ আর তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ, সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত তাদের পাশের শীর্ষদেশের নাগ আর নাগিনীর মূর্তিগুলিও। কিন্তু অপসারিত হয়েছে তাদের ভিতরের পার্শ্বদেবতার মূর্তিগুলি। দেখি মেষবাহনে একটি শ্মশ্রু সমন্বিত অগ্নির মূর্তি, সামনে নিয়ে জ্বলন্ত হোমাগ্নির কুণ্ড। দেখি বৃষভবাহনে মহাদেবকেও। তাঁর এক হস্তে একটি পাশ অপর হস্তে রজ্জু, তাঁর দুই পাশে দুই অনুচর দাঁড়িয়ে আছে। দেখি দাঁড়িয়ে আছে কত নর আর নারী কত বিভিন্ন ভঙ্গিতে। দক্ষিণের সম্মুখভাগে, দেখি দাঁড়িয়ে আছে কত পীনোন্নতবক্ষা যৌবনমদে মত্তা নারী বৃক্ষের নীচে। ভূষিত তাদের অঙ্গ সূক্ষ্মতম মসলিনের বসনে, পরিদৃশ্যমান তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব তাদের বসনের অন্তরাল থেকে। সঙ্গে নিয়ে আছে তারা ময়ূর আর বানর। ওষ্ঠে ধরে আছে ময়ূর তাদের অঙ্গের ভূষণ। দেখি, একটি অপরূপ মাতৃমূর্তিও। বাম হস্ত দিয়ে তিনি ধরে আছেন তাঁর শিশু সন্তানকে, দক্ষিণ হস্ত বুলিয়ে দিচ্ছেন তার পক্ষে। অনবদ্য তাঁর গ্রীবার ভঙ্গিটি, বিকশিত তার আনন আর নয়ন তাঁর অন্তরের অপরিসীম বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তিতে। অনুপম দ্বিতীয় মাতৃমূর্তিটিও, দুই হাত বাড়িয়ে, স্পর্শ করে আছেন মাতা তার সন্তানের মস্তক। প্রতিফলিত তার আননে আর নয়নেও তাঁর অন্তরের ভাষা।

দেখি, পশ্চিম সম্মুখ ভাগে, একটি ভীষণদর্শন বটুকভৈরবের মূর্তিও। তাঁর দক্ষিণহস্তে শোভা পায় একটি অসি, বামহস্তের অসি দিয়ে তিনি ছেদন করেন একটি দানবের মস্তক। শূন্যে প্রক্ষিপ্ত তাঁর অঙ্গের যজ্ঞোপবীত। তাঁর দক্ষিণে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে, বামে একটি পুরুষ, তাঁর অনুচরবৃন্দ। অপরূপ এই মূর্তিগুলি উড়িষ্যার ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রতীক, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের।

জগমোহনে উপস্থিত হই। দেখি, দুইটি অপরূপ স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ দিয়ে আলোকিত জগমোহন। বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি গবাক্ষ পাঁচটি করে স্তম্ভ। অলঙ্কৃত তাদের দুই পাশের স্তম্ভের অঙ্গে কত অপরূপ নাগ আর নাগিনীর মূর্তি দিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে তারা, স্থাপিত তাদের পুচ্ছ তিনটি অজানা জন্তুর পৃষ্ঠের উপর। দাঁড়িয়ে আছে জন্তুগুলি তিনটি ক্ষুদ্র হস্তীর উপর। প্রবেশদ্বারের দুই পাশের স্তম্ভের অঙ্গেও দেখি, অপরূপ নাগ আর নাগিনীর মূর্তি। শীর্ষে নিয়ে আছে তার সাতটি ফণা। চৌকাঠের উপরে নবগ্রহের মূর্তি, লিনটেলের উপরে মহালক্ষ্মীর। দেখি, দাঁড়িয়ে আছে তিনটি সিংহ, জগমোহনের উত্তর দক্ষিণ আর পূর্ব গাত্রে। জীবন্ত এই মূর্তিগুলি।

দেখি সুন্দরতম এই জগমোহনের দ্বারের অঙ্গের অলঙ্করণও, বুকে নিয়ে আছে ডালি, সেল নাই আর পদ্মলতা। দুই পাশের উদ্‌গত স্তম্ভের নিম্নতম প্রদেশে শোভা পায় নন্দী আর মহাকালের মূর্তি। সঙ্গে নিয়ে আছেন মহাকাল একটি নারী। অনবদ্য এই জগমোহনের অঙ্গের অলঙ্করণও, সুন্দরতম শ্রেষ্ঠ দান উড়িষ্যার ভাস্করের, মুগ্ধ হ'য়ে দেখি! স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ভাস্করেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে জগমোহন বিহীন ভাস্করেশ্বর মেঘেশ্বরের পশ্চিমে। বিভিন্ন এই মন্দিরের গঠন প্রণালী, বিভিন্ন পরিকল্পনা। নির্মিত হয় এই মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে, নির্মাণ করেন গঙ্গবংশের রাজারা, দ্বিতল এই মন্দিরটি পীঢ় দেউল, শীর্ষে নিয়ে আছে নয়টি পীঢ়, পীঢ়ের শীর্ষদেশে আমলক আর কলস। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি ফুট স্কোয়ার একটি চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর তার আটচল্লিশ চূড়ার বহির্ভাগতন সাড়ে একত্রিশ ফুট। দেখি, নাই প্রবেশ পথের শীর্ষদেশে নবগ্রহের মূর্তি, লিনটেলের উপরে গজলক্ষ্মীর মূর্তিও নাই, দাঁড়িয়ে নাই তার চূড়ার অঙ্গে চারিটি সিংহও। দেখি, তার দক্ষিণ ও উত্তরগাত্রে কুলুঙ্গির ভিতর গণেশ আর পার্বতীর মূর্তি। গর্ভগৃহে, একটি নয় ফুট উঁচু অতিকায় শিবলিঙ্গ মেঝে ভেদ করে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে।

অনতিদূরে, মেঘেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। সপ্তরথ দেউল, দাঁড়িয়ে আছে মেঘেশ্বর একাম্রক্ষেত্রের পূর্ব সীমায়, একটি সুপ্রশস্ত বাঁধান প্রাঙ্গণের মধ্যে সঙ্গে নিয়ে জগমোহন, শীর্ষে নিয়ে আছে পঞ্চাশ ফুট উঁচু বিমান। বেষ্টিত হয়ে আছে প্রস্তরে রচিত প্রাচীর দিয়ে। দেখি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি বৃষস্তম্ভ, শীর্ষচ্যুত হ'য়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে তার বৃষটি মন্দিরের এক প্রান্তে। প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। দেখি নাই কোন পৃষ্ঠ এই বিমানের, জগমোহনেরও নাই। দাঁড়িয়ে আছে তারা তলাপত্তনের উপর। দেখি, নিম্ন বারাণ্ডার অঙ্গে কুলুঙ্গির ভিতর দিক্‌পাল ও দিক্‌পতিদের মূর্তিও। অপসারিত হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি, কয়েকটি স্থানচ্যুত হয়েছে। সুন্দরতম এই মূর্তিগুলিও দাঁড়িয়ে আছে কত বিভিন্ন সুচারু ভঙ্গীতে। দেখি, অলঙ্কৃত বিমানের গাত্র কত বিভিন্ন লতা পল্লব আর পুষ্প দিয়ে, লতার ফাঁকে ফাঁকে মনুষ্যানন। ভূষিত কত পশুর মূর্তি দিয়েও, মূর্তি গণ্ডারের, হরিণের, বানরের, আর ময়ূরের। মূর্তি দিয়েই রচিত হয় কত কাহিনীও। দেখি মুগ্ধ হ'য়ে বিমানের পূর্ব গাত্রে, কেন্দ্র স্থলের কুলুঙ্গির ভিতর একটি অপরূপ মূর্তি দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র। উপবিষ্ট কার্তিকেয় তার বাহন ময়ূরের পৃষ্ঠের উপর। জগমোহনে উপস্থিত হই। পীঢ় দেউল এই জগমোহনটি। তার প্রবেশ পথের দুই পাশে, অর্ধবৃত্তাকার স্তম্ভের অঙ্গে একটি অপরূপ নাগ আর নাগিনী দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষে নিয়ে সপ্তফণা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাস্করের এক শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। দেখি, নবগ্রহের মূর্তিও দ্বারের শীর্ষদেশে, লিনটেলের উপর লক্ষ্মীর মূর্তি। নাই কোন শিল্প সম্ভার জগমোহনের দুইটি স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষের অঙ্গে। অপরূপ কিন্তু জগমোহনের প্রাচীরের গাত্রের হরগৌরীর মূর্তিটি, ত্রয়ানন আর

ষড়্‌ভুজ এই হর বসে আছেন এক মহামহিমময় মূর্তিতে, পাশে নিয়ে গৌরী। অন্যতম শ্রেষ্ঠদান উড়িষ্যার ভাস্করের। দক্ষিণ গাত্রে একটি হনুমানের মূর্তিও দেখি। অঙ্গের উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, গৌতমগোত্রীয় স্বপ্নেশ্বর এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন, নির্মিত হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ১১৯০ থেকে ১১৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ছিলেন তিনি উৎকলের চোড় গঙ্গবংশের অধিপতিদের মহাসামন্তাধিপতি, বিবাহ হয় তাঁর ভগ্নী সুরমা দেবীর, উড়িষ্যার চোড়-গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র রাজারাজ দেবের সঙ্গে। অধিরোহণ করেন তিনি উড়িষ্যার সিংহাসনে ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে।

সমপর্যায়ে পড়ে এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সঙ্গে, অঙ্গের অলঙ্করণে আর মূর্তি সম্ভারে। স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। সর্বশেষে আমরা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বর, লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, উত্তর পূর্ব কোণে, পবিত্র পঞ্চকোষীর ভিতরে। লেখা আছে একাম্রপুরাণে লিঙ্গরাজের মন্দির থেকে কিছুদূরে একটি মন্দির নির্মাণ করবার জন্য শঙ্কর ব্রহ্মাকে আদেশ করেন। শঙ্করের আদেশে, ব্রহ্মা দেবস্থপতি, বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। তাই পরিচিত এই মন্দিরটি ব্রহ্মেশ্বর নামে। সভাকবি পুরুষোত্তম রচিত মন্দিরের অঙ্গের উৎকীর্ণ শিলালেখ থেকে জানা যায়, মাতা কলাবতীর আদেশে, কলিঙ্গাধিপতি কেশরী শ্রেষ্ঠ উদয়াটক বা উদ্যোতকেশরী এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ছিলেন তিনি কেশরীবংশের জন্মেজয় থেকে সপ্তমপুরুষ। খুব সম্ভব এই জন্মেজয়ই, কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা, মহাশক্তিশালী, যযাতিকেশরীর পিতা। তাই মনে হয় নবম শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বর, সঙ্গে নিয়ে জগমোহন চার ফুট উঁচু ভিত্তির উপর, পূর্বদিকে মুখ করে, কেন্দ্রস্থলে একটি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের বেষ্টিত হয়ে আছে দুইটি প্রাকারে, আজও অবশিষ্ট আছে বহিঃ প্রাকারের কিছু চিহ্ন। ভিতরের প্রাকারের চারিকোণে চারিটি মন্দির, দক্ষিণ প্রান্তে পবিত্র পুষ্করিণী।

পঞ্চরথ দেউল এই মন্দিরের বিমান বিভক্ত পাঁচটি ভূমিতে। দেখি, অঙ্গে নিয়ে আছে বাঢ়ের উপরিস্থিত প্রথম ভূমির প্রতিটি পগ রেখ দেউলের প্রতীক। অলঙ্কৃত কোণক পগের কেন্দ্রস্থল স্ক্রলের কাজ দিয়ে, তার চারিদিকে জন্তুর মূর্তি। দেখি নাই এই অলঙ্করণ কোণক পগের অঙ্গে অন্য কোন মন্দিরে, বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের। কেন্দ্রস্থলের রাহপগের অঙ্গে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি সিংহ, একটি অবনত হস্তীর উপর। হস্তীর পাশে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। রাহপগের অঙ্গে বনলতার বন্ধনী দেখি অনুরূপ সিংহ মূর্তি কোণক আর অনর্থপগের অঙ্গেও। দেখি, উচ্চ বারাণ্ডির অঙ্গে কুলুঙ্গির ভিতর নর আর নারীর মূর্তি, অনবদ্য তাদের গঠন সৌষ্ঠব অতুলনীয়, সুন্দরমূর্তি তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি। মেঘেশ্বরের মন্দিরের বারাণ্ডির অঙ্গেও দেবদেবীর মূর্তি দেখেছি। দেখি, অপসারিত কেন্দ্রস্থলের পার্শ্বদেবতার মূর্তিগুলি।

দেখি নিম্নতম প্রদেশে, অপরূপ দুইটি পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি ; দুই চন্দ্রাতপযুক্ত কুলুঙ্গির ভিতর। দেখি মূর্তি শিব আর ভৈরবেরও। অলঙ্কৃত পশ্চিম গাত্র একটি চামুণ্ডার মূর্তি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলের পাড়ের অঙ্গে দেখি একটি মুনি শিষ্যদের তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন। দেখি কত দেব-দেবীর মূর্তিও। কিন্তু নর আর নারীর মূর্তিই বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরের-মধ্যমণি। শোভন গঠনে জীবন্ত তারা, সজ্জিত বিভিন্ন বসনে, ভূষিত নানা মূল্যবান ভূষণেও। তাদের কারও হস্তে শোভা পায় কত বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র, কারও হস্তে প্রসাধনের দ্রব্য, কেউ হস্তে নিয়ে আছে কত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, উড়িষ্যার তৎকালীন সামাজিক জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। দেখি উত্তর আর দক্ষিণ গাত্রে পাঁচটি দাঁড়ান মূর্তিও, বৃহত্তম মূর্তি এই মন্দিরের। দেখি নাই কোন নাগিনীর মূর্তি। উত্তর পশ্চিম কোণে, রাহ আর কোণক পগের সন্ধিস্থলে একটি অপরূপ পরমারূপবতী নারী মূর্তি, দাঁড়িয়ে আছে নারী, যৌবনমদে মত্তা, হেলায়িত তার গ্রীবা, পীনোন্নত তার বক্ষ, দাঁড়িয়ে আছে এক লাস্যময়ী। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

জগমোহনে উপস্থিত হই। পঞ্চরথ দেউল এই জগমোহনটিও, বুকে নিয়ে আছে দুইটি স্তম্ভযুক্ত গবাক্ষ অঙ্গে নিয়ে আছে পাঁচটি মূর্তি, সুন্দরতম তাদের মধ্যে উত্তর দিকের নারী মূর্তিটি, নিবদ্ধ তার দৃষ্টি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রতি। দেখি, প্রবেশ পথের দুই পাশে, চৌকাঠের অঙ্গে অলঙ্কৃত বৃহৎ মূর্তি দিয়ে, মূর্তি দুই দ্বারপালের হস্তে নিয়ে অসি, বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত তাদের সর্বাঙ্গ, দাঁড়িয়ে আছেন তারা বীর বিক্রমে, আরোহণ করে আছেন কাল্পনিক জন্তু। ছাদের ঠিক নীচে, দেখি মৃগ, হস্তী ও রাজহংসের সারি তারা স্বল্প ব্যবধানে, শোভাযাত্রার অগ্রসর হচ্ছে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, মূর্তি দিয়ে রচিত হয়েছে কত কাহিনী প্রাচীরের গাত্রে। পূজা করছে পূজারীরা একটি শিবলিঙ্গকে, ভক্তেরা কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে আছে এক সাধুর সামনে, ধ্যানমগ্ন সাধু। দেখি মাতা সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি শিশুর মুখের প্রতি, উদ্ভাসিত তাঁর আনন তাঁর অন্তর্নিহিত করুণার মাধুর্যে। অপরূপ এই মূর্তিটি মুগ্ধ হয়ে দেখি। দেখি অগ্রসর হচ্ছে অশ্বারোহী সৈন্যের দল, কত পদাতিক সৈন্যেও, সজ্জিত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। কেন্দ্রস্থলে, একটি অপরূপ সুন্দরতম প্রস্ফুটিত পদ্ম বিলম্বিত দ্যুতি ছাদের অঙ্গ থেকে। সুন্দরতম এই ছাদের অলঙ্করণ প্রকৃষ্টতম দান উড়িষ্যার ভাস্করের।

অনুরূপ ব্রহ্মেশ্বর মুক্তেশ্বরের, বিমানের আর জগমোহনের অঙ্গের মূর্তিসম্ভারে আর অলঙ্করণে, পড়ে সমপর্যায়েও। তাই বুক নিয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বর ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উড়িষ্যার স্থপতির, শ্রেষ্ঠ প্রতীক, উড়িষ্যার ভাস্করেরও। অমর হয়ে আছে ব্রহ্মেশ্বর, মুক্তেশ্বর, লিঙ্গরাজ, অনন্তবাসুদেব আছে পরশুরামেশ্বর, বেতাল দেউল আর রাজারাণীও ইতিহাসের পাতায়। অমর হয়ে আছে একাম্রকানন ভুবনেশ্বর, মন্দিরময় নগর ভারতের, বুকে নিয়ে আছে অক্ষয় কীর্তি, কীর্তি কত মহাগৌরবময় যুগের। অমরত্ব লাভ করেন উড়িষ্যার কর বংশ, কেশরী বংশ আর চোড়গঙ্গ বংশের নৃপতিরা, করেন তার মহা অভিজ্ঞ স্থপতি আর সুনিপুণ ভাস্কর, জন্মগ্রহণ করেন তারা উড়িষ্যায় যুগে যুগে। তাঁদের সকলকে প্রণতি জানিয়ে পরিত্যাগ করি ভুবনেশ্বর, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, হয় নাই ম্লান।

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী ও শ্রীমতী এ, সি, চাটার্জি

বম্বে যাই ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে। বয়স তখনও বিশের কোঠায় উঠেছে কি না সন্দেহ; নূতন দেশে,—নূতন পরিবেশে—কিছুকাল আনন্দে কেটে গেল সমুদ্র দেখা ও নূতনত্বের মোহে।

তারপর দীর্ঘ প্রবাসে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একটানা, একঘেয়ে জীবন! বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনশূন্য বৈচিত্র্যহীন দিনগুলো কাটতে চায় না। মনে হয় কোথায় গেলে দু'টো মিষ্টি বাংলা কথা শুনে প্রাণমন শীতল হবে,—কোথায় পাবো একটি স্বদেশবাসীর দর্শন,—এত বড় বিস্তীর্ণ বম্বে সহরে? অনেক খুঁজে পেতে এই সহরের সামান্য ক'টি বাঙ্গালীর তালিকার শীর্ষদেশে পাওয়া গেল, শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম।

পূর্বাহ্ণে টেলিফোনে যোগাযোগ করে একদিন গেলাম তাঁদের ব্যালার্ড পীয়ারের চারতলার ফ্ল্যাটে। সেই চল্লিশ বৎসর পূর্বের কলকাতার বাসিন্দা আমরা ফ্ল্যাট বাড়ীর নামও শুনিনি কানে। একটা খাঁচা জাতীয় বাড়ীর খোপে খোপে যে পায়রার মত এতগুলি পরিবার পাশাপাশি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে, তা ছিল ধারণার অতীত। কলকাতায় দেখেছি,—যত কম ভাড়ার ছোট বাড়ীই হোক না কেন, প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা বাড়ী।

জীবনে প্রথম দেখা লিফটে চড়ে মুহূর্তে উঠে এলাম চারতলায়। সোজা উপরে উঠতে গিয়ে শরীরে কেমন একটা অনাস্বাদিত শিহরণ দরজায় ঘণ্টার বোতাম টেপায় উর্দিপরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিচারক দরজা খুলে এসে সেলাম করে আগবাড়িয়ে নিয়ে গেলো বাড়ীর সাজানো-গোছানো ছবির মত ড্রইংরুমে। গৃহকর্তা মোটাসোটা প্রৌঢ় মিঃ চাটার্জি হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানালেন—প্রসারিত বাহুতে, আসুন-আসুন বলে। বহু দিন পর বন্ধুজনের মুখে স্বদেশী ভাষা শুনে যেন কান-মন জুড়িয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর এলেন সকন্যা মিসেস্ চাটার্জি। দুটি কন্যা এবং তাঁদের মা যেন শ্বেতদ্বীপবাসিনী বিদেশিনী—তেমনি তাঁদের গাত্রবর্ণ; তেমনি তাঁদের মুখের ইংরেজী বুলি। মা ও মেয়েতে কথাবার্তা হচ্ছিল সবই মাতৃভাষার মতই অনর্গল ইংরেজীতে। নবাগতা আমার সঙ্গে কিন্তু মিসেস্ চাটার্জি কথা বলছিলেন পরিষ্কার বাংলায়।

খানিক আলাপ-পরিচয়ের পরই বুঝতে পারি, প্রায় আমার বয়সী মেয়ে দু'টি বাংলা বলতে অপারক। তারা মাকে বলে 'মামি,'—বাবাকে 'ড্যাডি,'—এবং তাঁদের সঙ্গে ইংরেজীতেই বাক্যালাপ চলে,—দাস-দাসীর সঙ্গে চলে হিন্দি। তারা আজন্ম বম্বেতে প্রতিপালিত, স্বদেশ বাংলার মাটিতে কখনও পা দিয়েছে কি না সন্দেহ! মেয়ে দু'টির নাম শুনেও চমক লাগে—বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান, একজনের নাম 'সিসিলি' অপরটি 'পমিলি' (সুশীলা ও প্রমীলা)।

সিসিলি-পমিলি দু'বোন সেদিনের বম্বের প্রগতিশীলাদের পুরোভাগে স্থান করে নিয়েছিল। সিসিলি বম্বের খ্যাতনামা আইনজীবী, অধুনা ভারত সরকারের 'অ্যাটর্নি জেনারেল' মিঃ দফতরীর পত্নী। পমিলি বিবাহ করে রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বম্বে নিবাসী বর্তমানে স্বর্গত মিঃ সেনকে।

অনেক নূতন জিনিস দেখা ও অনেক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পত্তন হয় মিঃ চাটার্জির বাড়ীতে। কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না,—কোন দিন সে পাড়ার বাসিন্দাদের চোখের দেখাও দেখেছি কি না সন্দেহ,—কিন্তু বম্বের অতি প্রগতিবান ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি রাজভাষা ও রাজ কায়দা দুরস্ত চাটার্জি পরিবারের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে।

তখনকার দিনের ভারত সরকারের অনারেবল্ মেম্বার ও পরে লণ্ডনস্থ হাই-কমিশনার স্যার অতুল চাটার্জির ছোট ভাই অমূল্য চাটার্জি। তিনি ছিলেন বম্বের এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ম্যানেজার এবং বম্বের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মধ্যমণি, সদাশয় এ, সি, চাটার্জি নামে খ্যাত। মিঃ ও মিসেস চাটার্জি ছিলেন তখন বম্বের বহু পুরাতন বাসিন্দা—দুজনেই অতি সজ্জন, অতি অমায়িক, অতি অতিথিবৎসল।

তাঁদের সাদর আমন্ত্রণে প্রায়ই যেতাম তাঁদের ওখানে। মিসেস্ চাটার্জির চাল চলন, শিক্ষা-দীক্ষা বম্বের মহিলা সমাজে ছিল অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা ছোটরা তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলতে চেষ্টা করতাম। তিনি ছিলেন যেমন চেহারায় সুন্দর,—তেমনি অন্তরেও। সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার ছিল অতি মধুর,—বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই আলাপ করতে পারতেন চমৎকার।

তাঁর গাত্রবর্ণ দেখে আমার কেমন বিদেশিনী বলে সন্দেহ হত। একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেললাম তাঁর পিতৃ-পরিচয়। মিষ্টি হেসে সব এড়িয়ে বলে ওঠেন, আমার পিতৃগৃহ? তা সে পশ্চিমে।

সন্দেহের নিরসন হল না, কিন্তু যাতায়াত চলতে থাকে একই

তাবে। হঠাৎ একদিন শুনি, ছোট মেয়ে পমিলির বিবাহ হবে আমাদেরই অতি পরিচিত মি: সেনের সঙ্গে। ইতিপূর্বেই তাঁদের বড় মেয়ে সিসিলির বিবাহ হয় গুজরাতী মি: দফতরীর সঙ্গে রেজিষ্ট্রেশন অফিসকক্ষে। তখন আমাদের দেশে রেজিষ্ট্রেশন বিয়ের প্রথম যুগ —ক'টাই বা হত এ রকম বিয়ে? দ্বিতীয় মেয়েটিও পছন্দ করল বৈদ্য ছেলে সেনকে। ব্রাহ্মণ-বৈদ্যে অসবর্ণ বিবাহ—এ বিয়েতেও রেজিষ্ট্রেশন ভিন্ন অন্য উপায় নেই! কিন্তু এবার মা-বাবা স্থির করলেন, অন্তত একটি মেয়ের বিবাহে তাঁরা একটু দেশীয় প্রথায় বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান করবেন। ডাকা হল বম্বের আর্য-সমাজী পুরোহিত। তাঁরা দলবল নিয়ে করেন 'হাভন' ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ। সেই হাভন-কুণ্ড সাতবার প্রদক্ষিণ করে হয় পমিলি সেনের বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত! জীবনে সেই প্রথম দেখি উত্তরের আর্য-সমাজীদের আধুনিক পাশ্চাত্য-সমাজসম্মত প্রাচ্য রীতিনীতি।

মি: চাটার্জির ছিল শিল্প-সংগ্রহের বাতিক। তাঁদের বাড়ীতে দেখেছি অসংখ্য পুরাতন অলঙ্কার, ছবি, মূর্তি। মতেনজো দারো, তক্ষশীলা, চীন, জাপান, হংকং, কত দেশ থেকে তিনি কত দ্রব্য আহরণ করে যত্নে সাজিয়েছিলেন নিজের কক্ষ।

হঠাৎ মি: চাটার্জি এক কাজ পান জেনেভায়—'ইউনাইটেড নেশনস্ অরগ্যানিজেশন্'এ। খুশী হয়ে তাঁরা অত দিনের বম্বে বাস তুলে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন জেনেভায়। অকস্মাৎ মি: চাটার্জি একদিন আসেন বম্বের শেষ প্রান্তস্থিত কোলাবা পয়েন্টে আমাদের বাড়ী, হাতে একটি বুদ্ধমূর্তি।

বল্লেন,—সব বিক্রি করে দিয়েছি, শুধু এই বুদ্ধটি আছে। এটি আমার অতি প্রিয়, আপনারা এটি রাখুন। আমি জানি, আমি যত যত্নে একে রক্ষা করেছিলাম, আপনারাও তাই করবেন। বুদ্ধটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম চীন থেকে।

সাদা চীনেমাটির উপবিষ্ট চৈনিক আকৃতি-বিশিষ্ট বুদ্ধ মূর্তিটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি মি: চাটার্জির হাত থেকে। আজও আমাদের ঘরে থেকে সেটি অমায়িক চাটার্জি দম্পতির কথা স্মরণ করায়!

এঁদের জীবন অঙ্কের পরিশিষ্টটি বড়ই করুণ! কয়েক বৎসর জেনেভা-বাসের পর একবার মি: চাটার্জি দু'মাসের ছুটিতে সস্ত্রীক আসেন কলকাতায়। বহুদিন পর নিজের দেশে এসে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান এদিক সেদিক।

একদিন ট্যাক্সি চড়ে আলিপুর ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন আলিপুরের দিকে। সঙ্কীর্ণ পুলের উপর দিয়ে যেখানে গোল হয়ে ট্রামলাইন রাস্তার এক পাশ থেকে অন্য পাশে গিয়েছে, সেখানে গিয়ে জোর ধাক্কা লাগে ট্রামের সঙ্গে ট্যাক্সির। দুটিই পাল্লা দিয়ে এ ওর আগে যাবার ফিকিরে ছিল। ফল হয় সাংঘাতিক। ট্যাক্সি থেকে ছিটকে মি: চাটার্জি তাঁর বার্ধক্যের ভারী দেহ নিয়ে, গিয়ে পড়েন ট্রামলাইনের ওপরে। ট্রামও তাঁকে আহত করে চলে যায় নিজের গতিতে। চালকের অসাবধানতায় চিরদিনের মত গেল একটি মূল্যবান নিরীহ প্রাণ! হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই হন তিনি অমর-পথ-যাত্রী।

এই ঘটনার পর মিসেস চাটার্জি এই আকস্মিক আঘাত সামলাতে চলে যান তাঁর পরিচিত পুরাতন বম্বে সহরে। সেখানে একটি মেয়ে বোর্ডিং-এর তত্ত্বাবধায়িকার কাজে কিছুদিন নিযুক্ত থেকে বার্ধক্যে পুত্র কন্যা, নাতি-নাতনী পরিবৃতা হয়ে সম্প্রতি চলে গেলেন সাধনোচিত ধামে।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়কে দেখি,—প্রথম বোম্বাই প্রবাসে,— ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে, রূপোলী পর্দায়।

তখন নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। হাত মুখ নেড়ে, নিঃশব্দে মনের ভাব প্রকাশ করা—এখন হাস্যকর মনে হলেও, তখন তাই ছিল স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে দৃশ্য-পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে অংশ বিষয়বস্তু লিখে দেখানোয় বিষয়টি বোঝাবার অনেক সাহায্য হত।

চলচ্চিত্র বলতে তখন ছিল বিদেশী ফিল্ম—বিদেশী ভাষায়, বিদেশী হাবে-ভাবে পরিস্ফুট,—দেখে মন ভরত না। 'ম্যাডান থিয়েটার' কর্তৃক গৃহীত সামান্য কয়েকটি দেশী ফিল্ম, সাড়ী-পরিহিতা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের অভিনয় দেখেই আমাদের তৃপ্ত হতে হত,—কারণ খাঁটি ভারত-দুহিতারা তখনও ফিল্মে অভিনয়ে পদক্ষেপ করেন নি।

এমনি দিনে বিজ্ঞাপনে দেখি,—বম্বের এক প্রেক্ষাগৃহে হবে 'হরিশ্চন্দ্র' ফিল্ম,—শৈব্যার ভূমিকায় অংশগ্রহণকারিণী—কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

এ চিত্র না দেখে কী থাকা যায়? কমলাদেবীর রূপ-গুণের খ্যাতি তখন বম্বের মহিলা-সমাজে সকলের মুখে মুখে। শুনি,— দাক্ষিণাত্য-কন্যা তিনি,—রূপে যেন রবি বর্মা অঙ্কিত একটি অনন্য নারী মূর্তি।

তারপর আর কী? টিকিট কেটে যথা সময়ে চিত্র দেখে হই আনন্দিত!

বহু দিন পর আবার শুনি কমলাদেবী ও তাঁর স্বামী—স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডুর ছোট ভাই,—হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে মিলে 'রয়েল অপেরা হাউসে' 'মীরাবাঈ' নাটক করবেন ইংরেজীর মাধ্যমে। মীরার ভজনগুলি অবিকৃতই গাওয়া হবে।

আবার আনন্দে নেচে উঠি। যেমন বিষয়বস্তু তেমনি অভিনেতা-অভিনেতৃ,—এ দেখা চাইই। আবার টিকিট সংগ্রহ করে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দেখি কমলাদেবীর সুষ্ঠ অভিনয় মীরা-রূপে। কমলাদেবী তখন তরুণী,—দুধে-আলতায় রং,—সুগঠিত দেহসৌষ্ঠব,—আর ইংরেজী জ্ঞান ও উচ্চারণ চমৎকার।

তারপর বহুদিন যাবৎ শুনি তাঁর নানা সমাজসেবী কার্যকলাপের বিবরণ। 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে'র সক্রিয় সদস্যা,—মাঝে মাঝে হন তার সভানেত্রী,—সংবাদপত্রে দেখি তাঁর কত ছবি, কত বক্তৃতার অনুলিপি।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, মিসেস্ হামিদ আলি, মিসেস্ কাজিন্স, হংস মেহতা, রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলাদের নিয়ে 'অল-ইণ্ডিয়া-উইমেন্স কনফারেন্স' নামে সংঘটি স্থাপিত হয়—প্রধানত ভারত-নারীর সামাজিক ও শিক্ষানৈতিক উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়, বম্বে

সহরে। তারপর এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত ভারতবর্ষের সহরে-নগরে।

বর্তমানে এর শতাধিক শাখা। কমলাদেবী এই সম্মেলনের প্রথম থেকেই এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হয়ে আজও করে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে এর সেবা। এর উন্নতিকল্পে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সমস্ত বড় বড় সহরে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পর, সেদিন আবার দেখি তাঁকে এ আই-ডব্লিউ-সি প্রতিষ্ঠিত টালীগঞ্জের মহিলা-শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধনী সভায়—এ যজ্ঞের হোতা-রূপে। বর্তমানে তিনি নিখিল ভারত-মহিলা-সম্মেলনের সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নব কার্যোদ্যম—'অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফট' বোর্ডের চেয়ারম্যান।

চল্লিশ বৎসরে মানুষের কত না পরিবর্তন! যাঁকে দেখেছি তরুণী, সুন্দরী— তিনি আজ বৃদ্ধা। চুলে প্রকৃতি প্রদত্ত চূণকাম, —গাত্রবর্ণে দু'-এক পোঁচ কালী মাখানো,—এখনকার মেয়েরা বিশ্বাসই করবেন না যে, তিনি কোন কালে সুন্দরী ছিলেন!

দৈহিক-সৌন্দর্য দু'দিনের কিন্তু আন্তর সৌন্দর্য চিরস্থায়ী। কমলাদেবীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব আজ আর কারো নজরে না পড়লেও তাঁর জীবনব্যাপী সমাজ-সেবার কাজে তাঁকে ভারত-নারীর ইতিহাসে দেবে এক অগ্রস্থান। তাঁর এ সৌন্দর্য, এ সৌরভ, রবে চির-অম্লান!

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় এক যুগের বোম্বাই প্রবাস আরম্ভ হয় জীবনের প্রারম্ভে। তখন সেখানে পরিচিত হই একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখ, আশা আনন্দে পরস্পর হয়ে পড়ি সংযুক্ত। এই পরিবার স্বর্গীয় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার। বম্বের শিববাবুর সঙ্গে পরিচয় বহু দিনের,—চোখের উপরে দেখতে পাই, একটি অক্লান্তকর্মী মেধাবীর কঠোর ব্যবসায়ী জীবন। দেখি ধীরে ধীরে একটি কপর্দকশূন্য যুবক নিজের চেষ্টায় কী ভাবে ওঠেন ব্যবসায়ের শীর্ষদেশে। হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকশনের সর্বেসর্বা, ক্রোড়পতি ভারতীয় ব্যবসা-জগতের দীপ্তসূর্য শিব ব্যানার্জি কেমন করে ওঠেন ধাপে ধাপে।

১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে বম্বেবাসের গোড়ার দিকের কথা—বম্বে সহরের কেন্দ্রস্থলে বাঙালী মহল্লায় 'ওয়াকার্স-বিল্ডিং'-এ বাস করেন মধ্যবিত্ত যুবক শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হঠাৎ তাঁর তরুণী স্ত্রী মারা গেলেন সেই বাড়ীতে।

শুনি সেই সাধ্বী-স্ত্রীর কথা শিববাবুরই নিজ মুখে। তিনি বলেন,—অল্প বয়সে ভাগ্যান্বেষণে এলাম বম্বে সহরে। পরীক্ষা পাশের ছাড়পত্র না থাকায় সহজে পাত্তা পাই না কোথাও। সারাদিন কাজের ধান্দায় ঘোরাঘুরির আর বিরাম ছিল না; শীতকালটা চলে যায় একরকম,—বর্ষাকালে দুঃখের আর সীমা থাকে না। বম্বের বর্ষা,—মনসুনের প্রথম ধাক্কায় বৃষ্টি নামে ত সাতদিনের মধ্যে আর সূর্যের মুখ দেখা যায় না। এক জোড়ার বেশী জুতো কেনার ক্ষমতা নেই,—সারা দিনে জুতো ভিজে ঢোল হয়ে ওঠে। পরদিন কী হবে? ঘুম থেকে উঠেই ত বাইরে যেতে হবে।—শিববাবুর সাধ্বী স্ত্রী সারারাত জেগে উনুনতাতে একটু একটু করে সেই জুতো শুকিয়ে রাখেন, পরদিনের জন্য।

শিববাবুরা সাত ভাই, দেশ হুগলী জেলার বাগাটি গ্রাম হলেও, জন্ম ও কৈশোর কাটে আসামের গোলাঘাট শহরে। পিতা শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পূর্বে সেখানে গিয়ে চাকুরী ও ব্যবসায়ে সম্মিলিত ভাবে, পরিবার নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছিলেন। শিববাবু ছিলেন তাঁর চতুর্থ পুত্র। শিববাবুর মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তিনি সেখানে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। মা নারায়ণী দেবী স্বর্গীয় স্বামীর সাজানো ব্যবসা বিক্রয় করে কিছু টাকা নিয়ে, নাবালক সন্তানসহ এসে বাগাটি গ্রামে বাস করেন। সামান্য গোনা টাকা হাতে,—তা দিয়ে মাথা গোঁজার স্থান ও কিছু জমি-বাগান কিনে কষ্টে ছেলেদের মানুষ করে তুলতে থাকেন। তিনি সেকালের নিরক্ষরা মেয়েদের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমতী ও হিসাবী ছিলেন। শিববাবুর জীবনে তাঁর প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। উত্তর জীবনে শিববাবুর পিতা মাতার নামে ও স্ব গ্রামের নামে অনেক অবদান।

পরবর্তী জীবনে শিববাবু অনেক সময়ই বলতেন,—শিশুকালে ছোট মাছ ভিন্ন অন্য কোনো মাছ খেয়েছি বলে মনে পড়ে না—মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্য মা যেদিন একটা হাঁসের ডিম ঘেঁটে ডালনা রেঁধে সাত ভাইয়ের পাতে দিতেন—সেদিন আমরা সারাদিন ভালো খাওয়ার আনন্দে নৃত্য করতাম।

একটু বয়স হলে তিনি পড়তে আসেন বর্ধমান টেক্‌নিকেল স্কুলে। প্রিন্সিপাল ছিলেন সেদিনের এক জবরদস্ত সাহেব, পরীক্ষার বৎসর কথায় কথায় শিববাবুর সঙ্গে তাঁর হয় মতদ্বৈধ,—তরুণ ছাত্রকে বলেন কোনো আপত্তিজনক কথা,—তারপর 'ইডিয়ট-ফুল-লায়ার' জাতীয় কিছু অম্লমধুর গালাগাল। ছাত্রটিও নীরবে ইংরেজের গালি সহ্য করার পাত্র নন,—দিলেন সাহেবের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুঁষি! রক্তারক্তি কাণ্ড! তারপর? তারপর শিববাবুর পরীক্ষা দেওয়া নাকচ; ও তিন বৎসরের জন্য 'রাষ্টিকেট'। শিবচন্দ্র তখন কলেজী পড়ায় ইতি দিয়ে বেরিয়ে পড়েন ভাগ্যান্বেষণে।

কলেজী-পাঠে ভাগ্যদোষে (?) অগ্রসর হতে না পারলেও শিববাবুর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা ছিল সহজাত-প্রখর। নিজে নিজেই বহু পুস্তক পাঠে তিনি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়িয়ে তোলেন। তারপর কিছুদিন রেলওয়েতে ইঞ্জিনীয়ারের পদে কাজ করে, সেখানেও তাঁর উপরওয়ালার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায়,—স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মতাবলম্বী,—এক কথায় দেন চাকুরী জীবনে ইস্তফা—আবার কাজের চেষ্টায় এসে পড়েন বম্বে সহরে। অপরিচিত যুবক,—অনেক ঘোরাঘুরির পর এসে মিলিত হন বম্বের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের সঙ্গে।

রেলওয়ের কন্‌ট্রাক্টার হিসাবে ওয়ালচাঁদ পূর্বেই পরিচিত হয়েছিলেন, অক্লান্ত কর্মী, সব রকম কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিরলস যুবক শিবচন্দ্রের সঙ্গে। তিনি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন, নিজের স্বাধীন ব্যবসায়ে সাহায্যকারীরূপে। ক্রমশ নিজের কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তায় শিববাবু হয়ে পড়ন ওয়ালচাঁদের দক্ষিণ হস্ত। প্রথম দিকে দশমাংশের অংশীদার হলেও, শীঘ্র হন ওয়ালচাঁদের বিস্তৃত ব্যবসায়ের সমান অংশীদার। বম্বের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ওয়ালচাঁদ-হীরাচাঁদের সুবিখ্যাত

বিরাট ইঞ্জিনীয়ারিং কার্যে রেলের লাইন পাতা,—পাহাড় ফুটো করে টানেল করা, নদীর ওপরে সেতু নির্মাণ ও বাঁধ দেওয়া,—ব্রীজ তৈরী করা,—অনেক রকম কাজেই শিববাবুর বুদ্ধি বিচক্ষণতা সর্বাধিক।

বম্বে থেকে পুণা যেতে ভেদ করতে হয় পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা। ঐ পাহাড় শ্রেণী যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন, বিরাট মাথা চ্যাপ্টা পাহাড়গুলি যেন একটি শক্ত নীরেট পাথরে তৈরী। মাঝে মাঝে বালি মাটি প্রভৃতি মিশ্রিত হলেও, বেশীর ভাগই দারুণ শক্ত পাথর। তেমনি একটি বিরাট পাহাড় বেড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠে,—বম্বে-পুণা রেল লাইন।

রেল-কর্তৃপক্ষের মনে হয়,—এই পাহাড় ভেদ করে একটি সুড়ঙ্গ তৈরী করতে পারলে সময়-সংক্ষেপ করা যায় অর্ধেক। বহু ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মকে ডাকা হয়, এ কাজের জন্য—বিদেশ থেকে আসে বহু বিশেষজ্ঞ,—কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সকলেই একবাক্যে বলে এ কাজ অতি কঠিন, পড়তা পোষাবে না।

কেবল মাত্র শিববাবু ও তাঁর ফার্ম এগিয়ে এলেন, এ কাজের ভার নিতে।

শিববাবুর প্রথমা পত্নী গত হয়েছিলেন নিঃসন্তানা অবস্থায়। এই মর্মন্তুদ ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এবার তিনি পুরীর একটি সর্বসুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী নাম্নী সুশীলা বৌটি স্বামীর বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে এসে পুরী-বৌ নামে খ্যাত ও মধুর স্বভাব গুণে সকলের প্রশংসা প্রাপ্ত হন। এঁর সঙ্গে তাঁর ঘটে প্রাণের সংযোগ এবং ইনি এসে পা দেবার পর, শিববাবুর সংসারে মা লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হতে থাকে অজস্র ধারায়।

পশ্চিম ঘাট পর্বতের শিখরে অবস্থিত 'খাণ্ডালা' শহরে আস্তানা গেড়ে শিববাবু অক্লান্ত ভাবে চালাতে থাকেন পাহাড় ভাঙা কাজ। এত শক্ত পাথর যে ডিনামাইট ভিন্ন মানুষের সাধ্য নেই এর ভিতরে অগ্রসর হবার। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে সুড়ঙ্গ তৈরী করা অতি বিপজ্জনক কাজ। এই বিপদ মাথায় নিয়ে শিববাবু মেতে উঠলেন রাত দিন কাজের নেশায়।

একদিন সুড়ঙ্গের ভিতরে একটি পাথরের কুচি এসে এমন ভাবে তাঁর চোখে ঢুকে গেল যে, জন্মের মত নষ্ট হয়ে গেল একটি চোখ। পরবর্তী সুদীর্ঘ জীবন তিনি কেবল একটি চোখে দেখেই করে গেলেন কত শত কাজ।

শিববাবু এই সুড়ঙ্গ তৈরীর কাজে অসামান্য সাফল্য লাভ করায় তাঁর ও তাঁর ফার্মের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ রাজত্বে তাঁরা বহু টাকার মিলিটারীর কাজ করেন,—অতি দক্ষতা ও তৎপরতার সঙ্গে।

এবার বিজয়লক্ষ্মী যেন আপন কণ্ঠহারে তাঁকে বরণ করে নেন। ধুলোমুঠো ধরেন ত হয় সোনা মুঠো! জীবনব্যাপী সাধনা ও উদ্যমের পান আশাতীত ফল। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের আর দক্ষিণ হস্ত নন তিনি, এবার স্থান পান তাঁর ব্যবসায়ের শীর্ষদেশে শিববাবুর পরিচালনায় হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন হয়ে ওঠে ভারতের প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম।

সব দিক দিয়েই দ্রুত গতিতে উন্নতি লাভ করে বম্বের স্লীটার রোডের চমৎকার বাগানওয়ালা বাংলোতে বাস করেন অনেক দিন। এখানেই তাঁর তিন কন্যা ও দুই পুত্রের জন্ম হয়। শেষকালে তাঁরা থাকেন বম্বের সব চেয়ে ফ্যাসানেবল্ ধনী-পাড়া কাম্বালা হিলে।

হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন ক্রমশ হাত দিতে থাকে অতি বিস্তৃত কাজে। 'শিপ-বিল্ডিং-ইয়ার্ড' স্থাপিত হয় বিশাখাপত্তনে,—সমুদ্রের ধারে—বাঙ্গালোরে স্থাপিত হয় 'হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফ্‌ট' নামে ভারতে প্লেন তৈরীর প্রথম কারখানা।

স্বাধীন ভারতের বর্তমান সরকার এসব কাজের অনেকটা নিজেদের হাতে নিলেও,—শিববাবুর অধীনে হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশনই এগুলোর জন্ম-দাতা।

নবীন ভারত গড়ে তোলার কাজেও শিব ব্যানার্জির অবদান প্রচুর। তাঁর পরিচালনায় হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন, গড়ে—ভিলাই ষ্টীল প্ল্যান্টের কারখানা, গঙ্গা ব্রীজ, রেহান ড্যাম, সুক্কুর ব্যারেজ, পুণা টানেল, কাণপুর ট্যানারি, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

বম্বের কর্ম-জীবনে অসামান্য সাফল্য লাভ করার পর শিববাবু চোখ ফেরান কলকাতার দিকে। প্রথমেই গড়িয়াহাট মার্কেটের পশ্চাতে অল্প দামে কেনেন এক ইংরেজ সাহেবের মস্ত সেকেলে বাড়ী। তখন ওদিকটা ছিল জঙ্গল,—মনুষ্যবাসের প্রায় অনুপযুক্ত। দূরদর্শী শিববাবু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে এ স্থান হবে দক্ষিণ কলকাতার সেরা স্থান। আজ গোল পার্কের উত্তরে ইনষ্টিটিউটের বিপরীতমুখী তাঁর বাগান ঘেরা বাড়ীখানা ধরেছে ইন্দ্রপুরীর শোভা।

তারপর কলকাতার বিভিন্ন স্থানে তিনি কেনেন বহু বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি। কত জনকে দেন চাকুরী,—কত লোকের কত উপকার,—কত পরিবারের করেন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর কার্যকলাপে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে,—সেদিনের ব্যবসা বিমুখ বাঙালীর মধ্যে তাঁকে অতি উচ্চাসন দিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন বাংলা মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে।

শিববাবু উত্তর জীবনে অগাধ ধন সম্পত্তির মালিক হলেও,—নিজে ছিলেন অতি সাদাসিধা ও বিষয় ভোগে নিস্পৃহ, মনটি ছিল করুণায় ভরা। তাঁর দেশের প্রতি, নিজের গ্রামের প্রতি আকর্ষণ ছিল অতি তীব্র। স্বগ্রামের মানুষ এসে প্রার্থী হয়ে তাঁর নিকট হাত পাতলে, তিনি কখনোই বিমুখ করতেন না। গ্রামের নিজ বাড়ীতে শারদীয়া দুর্গাপূজায় যোগদান করতে তাঁর আর আনন্দের সীমা থাকত না।

বাগাটি গ্রামে তাঁর দান,—মেয়েদের স্কুল, মেয়েদের বোর্ডিং, আর্ট, সায়েন্স ও কমার্স কলেজ। যাদবপুর টি, বি, হাসপাতালে মায়ের নামে দান,—নারায়ণী-দাতব্য ওয়ার্ড, এবং আরও অনেক সমাজ-সেবা কাজ।

কর্ম-বীরের কর্ম-জীবন কর্মের ভিতরেই হয় সমাপ্ত! সমস্ত জিনিষ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর কাজ। যখন সব সম্পূর্ণ হয়ে, পত্র-পুষ্পে ফল ভারে সুশোভন রূপ ধারণ করল,—যখন তিনি কৃতী সন্তানের হাতে সব ভার দিয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করবেন মনস্থ করছিলেন,—তখনই হঠাৎ একদিন হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চির নিদ্রায় অভিভূত হলেন তাঁর কলকাতাস্থিত গড়িয়াহাট রোডের বাড়ীতে। পাঁচটি সুসন্তান ও সাধ্বী স্ত্রীর আপ্রাণ চেষ্টায়ও তাঁকে ধরে রাখা সম্ভব হল না। কর্ম-যোগীর জীবন-প্রদীপ কর্ম-সাধনার মধ্যেই দপ করে নিভে গেল চির দিনের মত! [ক্রমশ।

হাতে তৈরী কাগজ

আশীষ বসু

এমন একটি দিনও যায় না যেদিন কোনও না কোনও কাজে কাগজ আপনাকে আমাকে ব্যবহার না করতে হয়। সকালে উঠেই খবরের কাগজ চাই, সকালের ডাকে চিঠি এলো, বাজার থেকে কাগজের মোড়কে জিনিষ এলো, নোট ছাপা হয়েছে কাগজে তা নাহলে তো সংসারই অচল।

আজকের পৃথিবীতে এত যে কাগজের ছড়াছড়ি একথা অবশ্য খুবই সত্য যে, তার অধিকাংশই কলে তৈরী কাগজ। তবু পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে হাতে তৈরী কাগজের চাহিদা কলের কাগজের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। যেমন জাপান, চীন, কোরিয়া।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলায় যারা কাগজ তৈরী করেন তাদের বলা হয় 'কাগজী' বা কাগজ তৈরীর কারিগর।

পৃথিবীতে কাগজ তৈরী ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম হয় চীনে, আজ থেকে প্রায় ১৮০০ বছর আগে 'হান' রাজাদের আমলে। চীনে জন্ম হয়ে এই কাগজ তৈরীর শিল্প ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে পাশের দেশগুলিতে অর্থাৎ জাপানে, কোরিয়ায়, ভিয়েৎনামে এবং পরে আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে।

ভারতবর্ষে হাতে তৈরী কাগজের প্রথম প্রচলন হয় যোড়শ শতাব্দীতে প্রধানত মধ্য এশিয়া এবং আরব দেশগুলি থেকে আগত আক্রমণকারী শক্তিগুলির মাধ্যমে এবং ব্যবসায়িক সূত্রে লেনদেনের মারফত। পুরোনো আমলে ভারতবর্ষে কাগজ তৈরী করতো প্রধানত মুসলমান শিল্পীরাই। এদেরই বলা হোত 'কাগজী'।

চীনে জন্ম হলেও কাগজ তৈরীর ক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগতিই সবচেয়ে বেশী এর কারণ জাপানের শিল্পপতিগণ মনে করেন জাপানবাসীর বেশী পরিমাণে কাগজ ব্যবহার করার অভ্যাস। কথাটা বোধ হয় খুব পরিষ্কার হোল না। বুঝিয়ে বলি, আমরা জানলা দরজার শার্সিতে কাচ লাগাই বেশীর ভাগ, কিন্তু জাপানীরা লাগায় কাগজ, বাড়ীঘর তৈরীর অন্যান্য নানা কাজে এমন কি দেওয়ালেও জাপানীরা প্রচুর পরিমাণে কাগজ ব্যবহার করে। জাপানী লন্ঠন তৈরী হয় কাগজে। জাপানী ছাতা সেও তৈরী হচ্ছে কাগজ দিয়েই। জাপানীরা এইভাবে তাদের নানা প্রয়োজনে কাগজকে লাগাচ্ছে। এর প্রধান কারণ জাপানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে বাঁশ বা কাগজ তৈরীর অন্যান্য কাঁচামাল আর জাপানী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি তাই দিয়ে বানায় কাগজ আর সেই কাগজের চাহিদাও হয় খুব।

জাপানে আমাদের যেমন এক একটি জেলা এই রকম এক একটি অঞ্চলকে বলে 'প্রিফেকচার।' এই রকম ১৫টি প্রিফেকচার বা জেলায় সাত হাজার কাগজ তৈরীর ছোট ছোট কারখানা আছে যেখানে এই বিপুল পরিমাণ কাগজ হাতেই তৈরী হয়। প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো কারিগর প্রতি বৎসর ত্রিশ হাজার মেট্রিক টনের মতো কাগজ তৈরী করে যার দাম আশী লক্ষ ডলারের মতো।
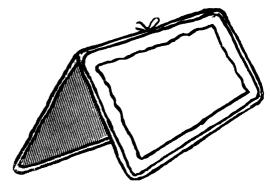
কাগজ শুকোতে দেওয়া হয়েছে রোদ্দুরে

জাপান ছাড়াও এশিয়ার মধ্যে চীন, কোরিয়া, হংকং, তাই-ওয়ান ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম, নেপাল, পাকিস্তান, ইরান প্রভৃতি অনেক দেশেই হাতে কাগজ তৈরী হয়। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে হাতে তৈরী কাগজ প্রস্তুতকারক হিসাবে ভারতবর্ষকে চতুর্থ স্থান দেওয়া যেতে পারে।
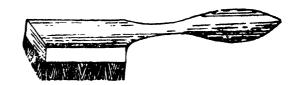
কাগজ ঠোকার ব্রাস

ভারতবর্ষে হাতে তৈরী কাগজের কারিগরের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক সাত হাজার। এ হিসাব ১৯৫৯-৬০ সালের। এখন কাগজীর সংখ্যা দশ হাজারের মতো হবে আশা করা যায়। ভারতবর্ষে হাতে তৈরী কাগজের একটি হিসাব দিই :—

সন	পরিবার বা ছোট কারখানার সংখ্যা	উৎপাদন (টনের হিসাব)	কারিগর সংখ্যা
১৯৫৬-৫৭	৯১	৭১০	২,৮০০
১৯৫৭-৫৮	১০৫	১০৫০	৩,২০০
১৯৫৮-৫৯	১৩১	১৬০০	৪,৫০০
১৯৫৯-৬০	১৬৬	২৬০০	৭,০০০
১৯৬০-৬১	২১৪	৪২০০	১০,০০০

আন্তর্জাতিক হিসাবে ৪২০০টন কাগজের দাম প্রায় ২·০১৭ মিলিয়ন ডলার। ভারতবর্ষে হাতে তৈরী কাগজ নির্মাণ কৌশল শেখাবার জন্য প্রায় দু'শর মতো স্কুল রয়েছে।

এবারে বলি পশ্চিম বাঙলার কথা। পশ্চিম বাঙলার হাতে তৈরী কাগজের চাহিদা ছিল খুব বেশী, বিশেষ করে নবাবী আমলে এবং ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে। কাগজ তৈরী হোত হুগলী জেলার

কাগজ বানাবার 'ট্রে'
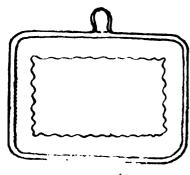
তারকেশ্বরের কাছে দশঘরায়, হাওড়ার মৈনানে, মুর্শিদাবাদের মহাদেব নগর, গাংগীনে, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে, মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ে, মহিষাদলে, বর্ধমানের আহমদপুর অঞ্চলে এবং আরও নানা জায়গায়। কালিম্পং অঞ্চলে নেপালী পদ্ধতিতে তৈরী হোত কাগজ, গাছের ছাল থেকে। এই গাছের ছালকে ইংরাজীতে বলে 'ডাফ্‌নী-বার্ক' অর্থাৎ ডাফ্‌নী-ছাল।

হাতে তৈরী কাগজ তৈরীর পদ্ধতি ছিল অতি সাধারণ এবং এর জন্ম ধরতে গেলে বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতির সাহায্যই লাগতো না। পশ্চিম বাঙলায় হাতে তৈরী কাগজ শুকোবার জন্ম যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা অনেকটা জাপানের 'তাও-সাকি' পদ্ধতির মতো অর্থাৎ কাগজ পিঠে পিঠে আড়াআড়ি ভাবে রোদ্দুরে দিয়ে শুকোনো।

কাগজ তৈরীর জন্ম কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে কাটা গেঞ্জীর টুকরো, সিসল গাছের আঁশ, খড়, বাঁশ বা বাঁশের টুকরো প্রভৃতি নানা জিনিষ। এগুলিকে কষ্টিক সোডা দিয়ে ভিজিয়ে রেখে ১০০° সেণ্টিগ্রেডের মতো তাপে মণ্ড তৈরী হয়
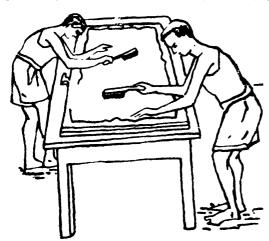
কাগজকে ব্রাস চালিয়ে মসৃণ করা হচ্ছে

এবং পরে সেই মণ্ডকে বিশোধন বা ব্লিচিং করা হয় কাগজ সাদা করার জন্ম। কম দামী কাগজ বিশোধন করার দরকার হয় না। এতে লালচে আভা থাকে এবং অপরিষ্কার কাগজে মসৃণভাবে লেখা সম্ভব হয় না।

কাগজ তৈরী করায় খুবই অভিজ্ঞ হাতের প্রয়োজন। নচেৎ কাগজ মোটা-পাতলা হবে, ভিজে থাকবে এবং তাতে আরও নানা দোষ এসে যাবে। এর জন্মে ছোট ছোট ব্রাস দিয়ে কাগজের মণ্ডকে কাগজ তৈরীর থালার ওপর 'দুরমুস' করার মতো ঠুকতে হয় এবং জঞ্জাল এড়াবার জন্ম ছাঁকনী ব্যবহার করতে হয়।

হাতে তৈরী কাগজের উন্নতির জন্ম পুণায় একটি উন্নত ধরণের গবেষণাগার রয়েছে।

কথা হোল, কলে যখন লাখ লাখ গজ কাগজ অল্পসময়ে সহজে বানিয়ে ফেলা যাচ্ছে তখন আপনার মনে হোতে পারে এত কষ্ট করে হাতে কাগজ তৈরী করার দরকার কি, আর জাপানের মতো শিল্পে অগ্রসর দেশ এতো কাগজ হাতে বানায়ই বা কেন!

কলে কাগজের মতো কাপড়ও হয় আর তা হয় যথেষ্ট তাড়াতাড়ি তবু বাঙলার মেয়ে হাতে তৈরী কাপড়ই পছন্দ করে বেশী কেন না তা মজবুত, টেঁকসই। হাতে তৈরী কাগজও টেঁকসই। ইউরোপের অনেক দেশে দলিলদস্তাবেজ, সার্টিফিকেট বা যেসব জিনিষ বহুদিন ধরে রক্ষা করা দরকার, তার জন্ম হাতে তৈরী কাগজই ব্যবহার করে। সরকারী নথি-পত্র হাতে তৈরী কাগজে রাখা হয় তা টেঁকসই বলে। এ কাগজ সহজে নষ্ট হয় না, পোকায় কাটে না।

দামের দিক থেকে বিচার করতে গেলে হাতে তৈরী কাগজের দাম কলে তৈরী কাগজের দামের চেয়ে কিছু বেশী ঠিকই। কিন্তু গুণাগুণ এবং প্রয়োজনের বিচারে সে বেশী দামটুকু দিতে খরিদ্দার পিছপাও হবেন না।

কাগজ মানুষের এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। কাগজ না থাকলে আজ আমাদের সভ্যতা হাজার বছর পেছিয়ে থাকতো। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারাগুলিকে সহরবাসীকে জানাবার জন্ম ধর্মতলায়, কালীঘাটে, শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়—পাথর পুঁতে খোদাই করতে লাগাতে হোত কারিগর।

তবে হাতে তৈরী কাগজ কলে তৈরী কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না কখনও আর তার দরকারও নেই। আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে যা কাগজ চাই, তার শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ কলে মিটিয়েও পাঁচ ভাগ হাতে তৈরী কাগজ মেটাতে পারে—আর মেটাতে পারে আমাদের উন্নত-ধরণের কাগজের চাহিদা, যে কাগজ উইপোকায় কেটে সাবাড় করে দিতে পারবে না।*

* স্কেচ করেছেন শ্রীসুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিস্ময়কর পালোয়ান জ্‌বিস্কো

সমর বসু

অদ্ভুত লড়াই, এবং অদ্ভুত তার সর্ত।

প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান নেই, এক পাশে তার কুস্তির মঞ্চ। মঞ্চে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন বিখ্যাত পেশাদার পালোয়ান, গ্রীকো-রোমান কুস্তিতে বিশ্ববীর রাশিয়ার আলেক্সো আবের্গ; অপরজন এক বিদেশী গুপ্তচর। চেহারা দুজনেরই দৈত্যের মতো।

ঘটনাটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার। ইউরোপের দেশগুলি তখন পরস্পর হানাহানিতে মত্ত, এক দেশের লোক আর এক দেশের লোককে বিশ্বাস করতে পারে না, শত্রু বলে ভাবে। সেই সময় এই বিদেশী গুপ্তচর রাশিয়ার পুলিশের খপ্পরে পড়ে। এক বছর অন্তরীণ থাকার পর তার প্রতি প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, লোকটি পেশাদার মল্ল। কর্তৃপক্ষ তখন তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু অনতিবিলম্বে এক নতুন অভিযোগে তাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। কর্তৃপক্ষ এইবার সর্ত দিলেন, যদি সে রাশিয়ার বিশ্ববীর আবের্গকে কুস্তিতে পরাস্ত করতে পারে, তবে তার মুক্তি; নতুবা তার প্রাণদণ্ডই বহাল থাকবে।

এই অদ্ভুত সর্তের কথায় প্রথমটায় বিদেশীর বুক কেঁপে উঠেছিল নিশ্চয়। কেন না, যত বড় পালোয়ান হোক, সমকক্ষ বীরের সঙ্গে লড়তে হলে উপযুক্ত মহড়া নিতে হবেই। এ ক্ষেত্রে বিদেশী গুপ্তচরটির সে সুযোগ হয়নি। অধিকন্তু এক বছর যুদ্ধবন্দী অবস্থায় থাকায় তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল বেশ কিছুটা। তবু শুধু প্রাণের দায়েই তাকে এই মারাত্মক প্রতিযোগিতায় রাজী হতে হয়েছিল।

মঞ্চের এক পাশে স্তূপীকৃত মুদ্রা, সেটা বিজয়ীর প্রাপ্য। রাশিয়ানরা ধরেই নিয়েছিল, এ যুদ্ধে বিদেশীরই পরাজয় ঘটবে। অতএব মুদ্রাগুলি আবের্গেরই প্রাপ্য। তারপরে সুরু হল কুস্তি। বিদেশের বিরুদ্ধ পরিবেশে বিদেশী মধ্যস্থের অধীনে লড়াই চালান সোজা কথা নয়। অনেক বড় বড় পালোয়ানও এজন্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে চায় না। অসাধারণ সাহস এবং আত্মবিশ্বাস না থাকলে দিগ্বিজয়ী পালোয়ান হওয়া যায় না। সব কিছু বুঝে বিদেশী গুপ্তচর মরিয়া হয়ে কুস্তি চালালেন। এক ঘণ্টা, তারপর দু' ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তবু কারো জয় পরাজয় ঘটল না। শেষে দু' ঘণ্টা তেতাল্লিশ মিনিটের মাথায় বিদেশী গুপ্তচরটি আবের্গকে আছাড় মেরে মাদুরে ফেললেন।

রাশিয়ানদের কাছে এ ঘটনা অভাবিত। তাই সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা চিৎকার করে উঠল, 'না না, আবের্গ ঠিকমতো হারেননি। আবার লড়তে হবে।' মহা মুস্কিল তো। এখন উপায়? গুপ্তচরের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল। বিজয়ীর প্রাপ্যস্বরূপ রিংয়ের পাশে রক্ষিত টাকা থেকে এক খাবলা তুলে নিয়ে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে সেই টাকার জন্য হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, আর সেই ফাঁকে গুপ্তচর উধাও! দিন কয়েক পরেই জানা গেল, এই বিদেশীই বিশ্ববিখ্যাত মল্ল স্তানিস্‌লস্ সিগানীভিৎস্ যিনি স্তান জ্‌বিস্কো নামে সমধিক পরিচিত। গুপ্তচর তিনি নন, ওটা ছিল রাশিয়ান পুলিসদের অনুমান।

বস্তুত জ্‌বিস্কোর মতো প্রতিভাবান ও দিগ্বিজয়ী মল্ল সে যুগে রাশিয়ার জর্জ হাকেন্‌স্মিদ ছাড়া ইউরোপে আর দেখা যায়নি। এমন কি কুস্তিত্বের বিচারে জ্‌বিস্কো ছিলেন হাকেন্‌স্মিদেরও ঢের ওপরে। দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় পালোয়ানরাও তাঁর সঙ্গে একবার লড়ার সুযোগ পেলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত। একদা 'বিশ্ববীর' হয়েও জ্‌বিস্কোর সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা না হওয়ায় আমেরিকার প্রখ্যাতনামা মল্ল চার্লস কাটলার দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, **'Whether I could have beaten the great Zbyszco at that time, is debatable, Stanislaus was in Europe, but, had he been on this side of the Atlantic, I undoubtedly would have accepted a match with him to decide the world like, even though I had any doubts about being able to beat him. He was a far greater wrestler than most critics have given him credit for, and must rate among the five leading grapplers of all time when selections of 'the greatests' are made.'**

জ্‌বিস্কোর আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী, আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পালোয়ান ডক্টর বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন রোলারও বলেছিলেন, **'Zbyszco is a much better man than people are willing to admit him,'** এমন কি, জ্‌বিস্কোর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় কুস্তির যাদুকর গামা পর্যন্ত তাঁকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বীর বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন! এ-হেন জ্‌বিস্কোর কুস্তি জগতে অভ্যুত্থানের কাহিনীটিও কম চমকপ্রদ নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজবাদী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশ পোল্যাণ্ড দ্রুততালে উন্নত হয়ে চলেছে বটে, কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত দেশটি ছিল ভয়ানক পশ্চাৎপদ। এরূপ পশ্চাৎপদ দেশে হঠাৎ কোনো বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভব আশা করা স্বাভাবিক নয়। তবু, কি আশ্চর্য, শরীর চর্চার ক্ষেত্রে এদেশ থেকেই কিংকাভালো, লাদিস্‌লস্ পিওলাসিন্‌স্কির সঙ্গে সঙ্গে জ্‌বিস্কোরও অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে জ্‌বিস্কোই ছিলেন সব চেয়ে জমকালো ব্যক্তি। তাঁর জন্ম হয় গালিসিয়া প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭১ অব্দে। তিনিই ছিলেন ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, বয়সে এবং দৈহিক ক্ষমতায়ও। তাঁর চেয়ে প্রায় দশ-বারো বছরের ছোট ভ্রাদেকও ছিলেন শক্তির ক্ষেত্রে দাদার অনুগামী এবং বিশ্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মল্ল। শৈশবে স্তান ছিলেন ভয়ানক রোগা আর দুর্বল। মেধাবী ছাত্র

হিসাবে তাঁর নামডাক থাকলেও ১৫ বছরের আগে তিনি শরীর চর্চা করেন নি। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ১৮৮৬ অব্দে দূরবর্তী সহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢোকার পরে তাঁর দেহ চর্চার দিকে ঝোঁক আসে।

এই বিদ্যালয়ে ইনডোর ডনকুস্তি এবং আউটডোর খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল। জ.বিস্কো স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, তাই আউটডোরের হট্টগোল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য ইনডোর ডনকুস্তির দিকে মন দিয়েছিলেন। এরপরে অল্পদিনের মধ্যেই নিজের দৈহিক উন্নতি লক্ষ্য করে দেহ চর্চা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলেন; দেখতে দেখতে তাঁর দৈহিক উন্নতি ঘটে গেল অভাবিত মাত্রায়।

১৮৮৯ অব্দে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন সময়ে স্কুলের বার্ষিক ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় জ.বিস্কো কুস্তিকে নির্বিবাদে ক্লাসের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ভারোত্তোলনে স্কুলের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে গেলেন। তারপরই ছুটি উপলক্ষে গ্রামের বাড়ি যান। এই তিন বছরে তাঁর দেহের এমন বদল হয়েছিল যে মা-বাবা পর্যন্ত প্রথমটায় তাঁকে ঠিক চিনে উঠতে পারেন নি। কনিষ্ঠ ভাই ভ্লাদেককে তিনি এ সময় থেকেই শরীর চর্চায় ব্রতী করিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁরই চেষ্টায় উত্তর জীবনে ভ্লাদেকও দিকপাল মল্ল হন।

১৮৯২ অব্দে জ.বিস্কো স্কুলের ডিগ্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়া সুরু করেন। ১৮৯৪ সালের জুন মাসে আইনের ডিগ্রী নিয়ে তিনি এটর্নী হিসাবে আইন ব্যবসায়ে মন দেন। কিন্তু জীবমাত্রই পরিস্থিতির অধীন; জ.বিস্কোও তার অমোঘ নিয়মে আইনের গণ্ডী থেকে ছিটকে পড়লেন শক্তি চর্চার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে এবং তারপরে দিগ্বিজয়ের পথে। এটর্নী হবার মাত্র তিন মাস পরেই, সেপ্টেম্বর মাসে, ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্যারিসে একটি বড় রকমের কুস্তির দঙ্গল হয়। জ.বিস্কো তাতে নাম দিলেন কিছুটা খেয়ালের বশে, কিছুটা সখ চরিতার্থ করার জন্য। কিন্তু কার্যকালে তিনি সবাইকে হারিয়ে ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হলেন। ঘটনাটা যেমন অভাবিত, তেমনি অসাধারণ! উৎসাহিত হয়ে তিনি আইন ছেড়ে দিয়ে কুস্তিকেই পেশা হিসাবে ধরলেন। তারপর সুরু হল তাঁর ইউরোপের দেশে দেশে পরিভ্রমণ এবং কুস্তিতে একটানা বিজয়ের ইতিহাস।

সেই সময়ে গ্রীকো রোমান কুস্তিতে বিশ্ববীর ছিলেন রাশিয়ার পাদের্স (Padders) যাঁর আসল নাম ছিল ইভান পাদৌব্‌নি (Ivan Paddoubny)। জাতিতে ছিলেন তিনি কসাক। দেহভার ৩১০ পাউণ্ড এবং স্ফীত বাহু ১১½ ইঞ্চি থাকা সত্ত্বেও মাথায় ৭৬ ইঞ্চি উঁচু ছিলেন বলেই পাদের্সকে তেমন বলিষ্ঠ মনে হত না যদিও দেহটা ছিল তাঁর ইস্পাতের মতোই সুদৃঢ়। তা ছাড়া তাঁর মতো ভদ্র, সভ্য, শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন মল্ল সেযুগে দেখা যেত না। সাতটি ভাষায় তাঁর দখল ছিল। মল্ল হিসাবে তাঁর চরিত্র ছিল আরো উল্লেখযোগ্য। বড় বড় কুস্তি সমালোচকরা বলেছিলেন, যুদ্ধের সময়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কখনো সম্যক শক্তি প্রয়োগ করতেন না এবং কাকেও চিৎ করার জন্য তেমন তাড়াহুড়াও করতেন না। উইলিয়াম পার্সলী (William Pursley) বলেছিলেন, 'In the ring, however, he was a gentle soul, pinning his opponent's shoulders with the care of a mother laying her baby in a cot.' তবে, দুই-একবার ঘটনাচক্রে তাঁকে যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে হয়নি, এমন নয়। একটি ঘটনার কথা বলি।

সেবার হেংলার সার্কাসের (Hengler Circus) কুস্তি দঙ্গলে ফ্রান্সের লরেন্ ল্য বুকারইসের (Laurent le Beaucairoic) সঙ্গে তাঁর কুস্তি হচ্ছিল। মাত্র ৬৮½ ইঞ্চি উচ্চতায় ২১০ পাউণ্ড ভারি এই ফরাসী বীর কুস্তিতে অন্তত কুড়ি বছরের অভিজ্ঞ ছিলেন। পাদের্স তাঁকে বারবার মাদুরে ফেললেও একবারও চিৎ করতে পারলেন না। হয় তো সেদিনের কুস্তিটা সমান সমানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ বুকারইস্ নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। তাঁর মাথায় কী যে খেয়াল হল, এক সময়ে তিনি পাদের্সের পাতলা কানে একটি ঘুসা মেরে দিলেন। রুশ মল্ল ভেবে নিলেন, ওটা ইচ্ছাকৃত কীর্তি নয়। তবু, প্রতিপক্ষকে সাবধান করার জন্য একবার শুধু তাঁর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। বুকারইস ভেবে নিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীকে চটাতে পারলে বোধ হয় বাজি মাৎ করা যাবে। অতএব, তিনি তাঁর তোয়াজি গোঁফে মৃদু টান দিলেন।

বস্তুত পাদের্সের ছিল 'কাইজারি' ঢংয়ের' এক জোড়া অতি স্থূল সুন্দর গোঁফ। মোম মাখিয়ে তাকে তিনি সর্বদা সুঁচাল রাখতেন। সেই গোঁফে টান পড়তেই তাঁর বক্ষঃস্থল থেকে এবার দূরাগত মেঘগর্জনের মতো একটা গম্ভীর ধ্বনি বেরিয়ে এল। ফরাসী মল্ল দমিত হলেন না, বরং আরো উৎসাহিত হয়ে গোঁফ ধরে এইবার এক প্রচণ্ড টান মেরে বসলেন! ব্যস! তারপরেই চক্ষের নিমেষে একটা ঘটনা ঘটে গেল!

যে স্থূলদেহী পালোয়ানটিকে হাজার চেষ্টা করেও এতক্ষণ পাদের্স চিৎ করতে পারছেন না বলে মনে হয়েছিল, কোন্ এক অপার্থিব শক্তির বলে পাদের্স সেই মানুষটিকেই এক টানে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেললেন। রিংয়ের দূরবর্তী কোণে পড়ে সেই আছাড়ে বুকারইসের হাঁটুও ভেঙে গিয়েছিল! এ হেন মহাবলীর সঙ্গে লড়াই না হওয়া পর্যন্ত জ.বিস্কো মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় আর এক তরুণ মল্লের আবির্ভাব ঘটে, যাঁর নাম জর্জ হাকেন্সমিদ (George Hackenschmidt) ১৯০০ অব্দ থেকে ইউরোপের নানা দেশে ঘুরে ঘুরে তিনিও অবিজিত বলে গণ্য হয়েছিলেন। জ.বিস্কো তাঁর সঙ্গেও শক্তি পরীক্ষায় আগ্রহান্বিত হলেন। এদিকে পাদের্সও ছিলেন হাকেন্সমিদের সঙ্গে লড়ার জন্য লালায়িত!

১৯০৭ অব্দে হাকেন্সমিদ যখন লণ্ডনে, তখন জ.বিস্কো এবং পাদের্স লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে হ্যাক্‌কে চ্যালেঞ্জ জ্ঞাপন করলেন। অ্যামেরিকার 'ইয়াংকি' জো রোজার্স (Yankee Joe Roggers) এবং ফ্রান্সের কনস্তান্ ল্য মারিনও (Constant le Marin) হ্যাক্‌কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু হাকেন্সমিদ একই জায়গায় সকলের সঙ্গে লড়তে রাজী না হয়ে শুধু শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে রাজী হলেন। অতএব, এই চারজনের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু মারিন সরে পড়ায় এবং রোজার্স অসুস্থ হওয়ায় শুধু জ.বিস্কো ও পাদের্সের মধ্যে লড়াই হল।

লণ্ডন প্যাভিলিয়নে এই দুই মহা মল্ল কুস্তিতে নামলেন, তাও আবার গ্রীকো রোমান ঢংয়ে—যে ঢংয়ে পাদের্স ছিলেন বিশ্বজয়ী। তাই সুরু থেকে জ.বিস্কোই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিলেন। সম্ভবত তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে উত্যক্ত হয়ে পাদের্স হঠাৎ এক প্যাঁচে পোলিশ বীরকে নিচে ফেলে দেন, যে প্যাঁচ মধ্যস্থের বিবেচনায় ছিল গ্রীকো রোমান ধারার বিধি বহির্ভূত। নিচে পড়ে জ.বিস্কোও গেলেন ক্ষেপে। তার ফলে মুহূর্তের মধ্যে সুরু হয়ে গেল প্রলয়ঙ্কর লড়াই। মারাত্মক জাপ্‌টাজাপ্‌টি লড়াইয়ের ফলে ষ্টেজ ফিটিংস সব ভেঙে চুরমার হতে লাগল। দু'জনকে ছাড়ানোর জন্য মধ্যস্থের বাঁশি বার বার ব্যর্থ হলে তিনি গেলেন গায়ের জোরে তাঁদের ছাড়াতে। কিন্তু তা কি তখন সম্ভব? দুই মত্ত মল্লের প্রবল ধস্তাধস্তির মধ্যে তিনিও জড়িয়ে পড়ে সাংঘাতিক মার খেলেন। তারপরই জড়াজড়ি অবস্থায় তাঁরা ষ্টেজের নিচে উপবিষ্ট একদল সাংবাদিকের ঘাড়ের ওপর পড়েন। তথাপি কুস্তি বন্ধ হল না। চারদিকের দর্শকদের মধ্যেও হৈ-চৈ চিৎকার সুরু হয়ে গেল এবং সকলের চেষ্টায় দু'জনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল।

ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট মধ্যস্থ সঙ্গে সঙ্গে জ.বিস্কোকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন। এমন কি, সেই সঙ্গে পাদের্সের প্রাপ্য অংশের টাকাও তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। এই অপ্রীতিকর ঘটনার পরে রুশ দৈত্য হতাশ মনে দেশে ফিরে যান এবং কার্যত কুস্তি জগৎ থেকেও অবসর-গ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এর পরেও হাকেন্সমিদের সঙ্গে জ.বিস্কোর প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯০৮ সালের জুন মাসে তাঁদের কুস্তি হবে বলে হাক্ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই অসুস্থ বলে সমস্ত চুক্তি ও প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে ফ্রান্সের এ-লা-শাপেল্ (Aix lax Chapelle) সহরে চলে যান। তারপর ১৯১৪ অব্দে অবসর নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর কখনো তিনি জ.বিস্কোর মুখোমুখি হননি যদিও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি আরো শতাধিক প্রতিযোগিতায় কুস্তি লড়েছিলেন।

আসলে, ইউরোপে অমিতবিক্রম জ.বিস্কো বরাবর অবিজিতই ছিলেন। তারপর ১৯০৯ অব্দে অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে অ্যামেরিকায় উপস্থিত হন এবং সেখানেও তিনি কৃতকার্যতার সঙ্গে অনেকের সঙ্গে লড়াই করেন। তাঁর অ্যামেরিকান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একমাত্র ডক্টর রোলারের সঙ্গেই তিনবার প্রতিযোগিতা হয় এবং তা বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণও হয়েছিল। তাঁদের প্রথম কুস্তির সর্ত ছিল যে, অ্যামেরিকানকে জ.বিস্কোর এক ঘণ্টার মধ্যে দুইবার হারাতে হবে অর্থাৎ জ.বিস্কোর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছিল যদিও পোলিশ মল্লের পক্ষে সে অঙ্গীকার পালন করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ক্যান্‌সাস্ সিটিতে। লড়াইটা একটানা দু' ঘণ্টার বেশি চলতে থাকায় পুলিস তা বন্ধ করে দিয়েছিল। তৃতীয় প্রতিযোগিতা হয়েছিল সীট্‌ল সহরে এবং দুইবার জয়ের ভিত্তিতে সে যুদ্ধের মীমাংসা হবার কথা স্থির ছিল। প্রথম দফায় জ.বিস্কো ডক্টর রোলারকে ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিটে চিৎ করেন। তারপর দ্বিতীয় দফার কুস্তি চলাকালীন, কি কারণে জানি না, কর্তৃপক্ষ তাকে হঠাৎ বন্ধ করে দেন।

কিন্তু সে সময়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মল্ল ফ্র্যাংক গচের সঙ্গে লড়া। গচ অবশ্যই জ.বিস্কোর কৃতিত্বের কথা জানতেন এবং সেইজন্যই বার বার চ্যালেঞ্জ পেয়েও প্রথম কিছুদিন তাঁকে এড়িয়ে চলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু তার আগে গচ সর্ত দিলেন যে, সে যুদ্ধে হার-জিত যাই হোক, তাঁর 'খেতাব' (title) নষ্ট হবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ১৯০৮ সালের ৩রা এপ্রিল শিকাগো সহরে তিনি তৎকালীন বিশ্বজয়ী পালোয়ান হাকেন্সমিদ্‌কে হারিয়ে 'বিশ্বজয়ী' খেতাব অর্জন করেছিলেন। এদিকে পোলিশ বীর গচের সঙ্গে লড়ার জন্য এতই উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, গচের দেওয়া সর্তেই লড়তে রাজী হয়ে গেলেন। ১৯০৯ সালের ২৫শে নভেম্বর বাফেলো সহরে তাঁদের সে যুদ্ধ এক ঘণ্টা চলার পরে সমান সমান শেষ হয়। তার ফলে গচ আবার শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে লড়তে বাধ্য হন। কিন্তু সে যুদ্ধেই জ.বিস্কোর প্রথম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে।

তাঁদের দ্বিতীয় যুদ্ধটি হয়েছিল ১৯১০ সালের ১লা জুন। কুস্তি সুরু হবার ক্ষণকাল পরেই ইউরোপীয় দিগ্বিজয়ীর মুহূর্তকালীন অসতর্কতার সুযোগে গচ তাঁকে হঠাৎ চিৎ করে ফেলেন। এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে পোলিশ বীর স্বভাবতই বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে যান, তার ফলে দ্বিতীয় দফার কুস্তিতেও তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। অবশ্যই, তাঁকে সবচেয়ে বেশি অপদস্থ হতে হয়েছিল ভারতীয় মল্ল বড় গামার হাতে।

সে সময় ভারতবর্ষ থেকে বড় গামা, ইমাম বখ্‌শ্, আহমদ বখ্‌শ্ এবং গামু জলন্ধরিয়া লণ্ডনে উপস্থিত থেকে যে কোনো পালোয়ানের সঙ্গে লড়াইয়ের আহ্বান জ্ঞাপন করছিলেন। অগাস্ট মাসে লণ্ডনে গামার হাতে ডক্টর রোলারের শোচনীয় পরাজয় ঘটার পরে সেপ্টেম্বর মাসে আল্‌হামব্রা দঙ্গলে জ.বিস্কো গামার সঙ্গে লড়াই করার জন্য উপস্থিত হন। ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁদের যুদ্ধ হয়। কিন্তু সেদিন ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট যুদ্ধ চলার পরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় যুদ্ধ স্থগিত থাকে এবং পরবর্তী ১২ তারিখে আবার যুদ্ধ হবার কথা ঘোষিত হয়। জ.বিস্কো সেদিন উপস্থিত না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুপস্থিত ও সেই সঙ্গে পরাজিত ধরে নিয়ে বিজয়ীর জন্য নির্ধারিত 'জন বুল চ্যাম্পিয়নশিপ বেল্ট' এবং ২৫০ পাউণ্ড গামাকে দিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনা যদি শুধু এটুকুই হত, তবে হয় তো বিশেষ কিছু বলার থাকত না। কিন্তু এই কুস্তি উপলক্ষে যে লজ্জাবজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষে শ্বেতাঙ্গ জাতির হাতে জ.বিস্কোকে যে নিদারুণ অপমান সইতে হয়েছিল, তা আলোচনার যোগ্য।

গামা-জ.বিস্কোর উল্লিখিত কুস্তির মূল ঘটনা অতি সাধারণ। হাত মেলানোর পরে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোলিশ বীর বুঝলেন, গামাকে যেমন ধারণা করা হয়েছিল, আসলে গামা সে থেকে বহু দূর। তিনি সহজ তো ননই, বরং দুর্মদ এবং অভাবিতভাবে অসাধারণ। তাঁর জোর (strength and stamina) এবং তোড় (defence) সীমানাহীন। তা ছাড়া তাঁর গতিভঙ্গিও অকল্পিত এবং বিস্ময়কর। যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়া এ হেন বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ চালান সম্ভব নয়। এ অবস্থায় পরাজয় রোধের একমাত্র উপায় আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে বিপক্ষকে ক্লান্ত, বিরক্ত ও হতোদ্যম

করা। জ.বিস্কো তাই করেছিলেন আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় মাদুরে বুক ঠেকিয়ে শুয়ে থেকে। গামা জ.বিস্কোর পিঠে চড়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, তবু চিৎ করতে পারলেন না। গামার বার বার আহ্বান এবং শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের টিকা টিপ্পনি ও বিদ্রূপবাণ সত্ত্বেও জ.বিস্কো একবারও দাঁড়িয়ে লড়তে সাহসী হন নি।

তারপর সরাসরি চিৎ হয়ে পরাজয়ের দায় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য দ্বিতীয় দিনের কুস্তি তিনি এড়িয়েছিলেন মাত্র। আশ্চর্য এই, প্রথমদিনের সেই কুস্তির কথা ইংরেজরা সহজে ভুলতে পারে নি এবং ২২'২৩ বছর পরেও পার্সি লংহার্স্ট (Percy Longhurst) হার্বার্ট ব্রুম্ (Herbert Broom) ইত্যাদির মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কুস্তি এবং ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা পর্যন্ত টিকা-টিপ্পনি করেছিলেন। কিন্তু জ.বিস্কোর সেই শোচনীয় কুস্তির জন্যে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের দায়িত্বও কম ছিল না। কেন না, গামার সম্পর্কে জ.বিস্কোর মনে তাঁরাই অতি মারাত্মক ভুল ধারণা ঢুকিয়েছিলেন।

সাধারণত, বড় বড় যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যেক যোদ্ধাকেই বিশেষ রকমের মহড়া নিতে হয় এবং যোদ্ধার মনে যাতে অকারণ ভয় বা দ্বিধা না ঢোকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু যোদ্ধার মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে গিয়ে কেউ যদি তার প্রতিপক্ষকে একেবারেই তুচ্ছ ও অবহেলার যোগ্য করে দেখায় এবং তার ফলে যদি যোদ্ধা তার সম্পর্কে সাবধানতা না নেয় কিংবা যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত না হয়, তবে দরদীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে ক্ষমার চোখে দেখা চলে না। একথা বলার কারণ, গামার সঙ্গে লড়াইয়ের পূর্বে জ.বিস্কো লণ্ডনে যথারীতি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই ভ্লাদেক এবং বিল্লরীন ছাড়া আরো দু'একজন বড় বড় মল্লের সঙ্গে নিত্য মহড়া চালিয়েছিলেন। তাছাড়া ক্ষিপ্রতা বাড়ানোর জন্য দৌড়, স্প্রিন্টিং, পাহাড় চড়া ইত্যাদিও করে চলেছিলেন। এমন সময় শ্বেতাঙ্গ সমাজেরই কিছু কিছু লোক জ.বিস্কোর মনে গামাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে প্ররোচনা দিতে থাকে। ডক্টর রোলার ও প্রসিদ্ধ সুইস মল্ল জন্ লেমের ভূমিকা ছিল এই বিষয়ে সর্বাধিক মারাত্মক।

গামার হাতে সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়েও ডক্টর রোলার প্রকাশ্যভাবে লিখলেন, যার সারমর্ম এই,—গামার জন্য এত ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমি নিজে জ.বিস্কোর সঙ্গে তিনবার লড়েছিলাম, গামার সঙ্গেও লড়েছি। তাতে দু'জন সম্পর্কেই আমার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার বলে নিশ্চিন্তভাবেই বলতে পারি, গামা জ.বিস্কোর সমকক্ষ নন এবং আসন্ন যুদ্ধে জ.বিস্কো তাঁকে হারিয়ে দেবেনই। আমার পরাজয়টা একান্তই আকস্মিক। আমি যখন আবার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নামব, তখন আমাকে হারাতে পারলে বুঝব, তিনি সত্যই পালোয়ান। জন্ লেম্ও ডক্টর রোলারের সুরে সুর মিলিয়ে লিখলেন, লোকে বলে গামা চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হওয়া অত সোজা নয়। ভারতীয়রা এখন পর্যন্ত এমন কিছুই করেন নি, যাতে তাঁদের আমল দেওয়া যায়। লোকে এঁদের নিয়ে কেন এত হৈ-চৈ করছে, তা বুঝে উঠতে পারছি না। অতএব জ.বিস্কো যদি এসব ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন, তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

জ.বিস্কোর গদী আঁকড়ে থাকার বিষয়েও মনে রাখতে হবে, সে যুগে পয়েন্টের গণনায় জয় পরাজয় নির্ধারিত হত না এবং নির্দিষ্ট নিয়মে চিৎ না করা পর্যন্ত কারো জয় গৃহীত হত না। তাছাড়া পেশাদারি কুস্তিতে মান-ইজ্জতের সঙ্গে সঙ্গে টাকা-কড়ির প্রশ্নও কম উল্লেখযোগ্য ছিল না। এমন অবস্থায় পরাজয় বাঁচানোর চেষ্টা কেনই বা করা হবে না? লক্ষণীয় এই যে গামার সঙ্গে পারবেন না বুঝেও জ.বিস্কো অন্য অনেক মল্লের মতো অবৈধ পন্থায় জয়ী হবার চেষ্টা না করে সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ প্রণালীতে শুধু আত্মরক্ষা করেছিলেন। জ.বিস্কো সমগ্র জীবনে কখনো কোনো কুস্তিতে দুর্নীতির সাহায্য নেন নি, এটি তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গত বলব, আমাদের দেশে অনেকের ধারণা, এমন কি স্বয়ং গামাও সে ধারণা থেকে মুক্ত ছিলেন না যে, জ.বিস্কোকে হারিয়ে ১৯১০ অব্দেই তিনি 'বিশ্বজয়ী' হয়েছিলেন। এ ধারণা সর্বৈব ভুল। তার কারণ, সে সময়ে জ.বিস্কো এই খেতাব পান নি,—এই খেতাবের অধিকারী ছিলেন গচ্। জ.বিস্কো গামার সঙ্গে লড়ার আগে গচের কাছে হেরে এসেছিলেন। তা ছাড়া, লণ্ডনের আল্ হামব্রা টুর্ণামেন্ট 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের' জন্যও অনুষ্ঠিত হয় নি। আর সেই টুর্ণামেন্টের পুরস্কার 'জন বুল চ্যাম্পিয়নশিপ বেল্ট' পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারও ছিল না। আমাদের আরো জেনে রাখা দরকার যে, 'বিশ্বজয়ী' নিরূপণের জন্য ইউরোপে আজো পর্যন্ত কোনো সংঘ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আজো পর্যন্ত এ বিষয়ে অ্যামেরিকান কুস্তি সংস্থার মতামত সর্বত্র গৃহীত হয়ে আসছে। অতএব, ইউরোপীয় মল্ল সমিতি গামাকে 'বিশ্বজয়ী' ঘোষণা করেছিল, এমন কথা সত্য হতে পারে না। বস্তুত একমাত্র গোবরবাবু ছাড়া ভারতের আর কোনো পালোয়ান 'বিশ্বজয়ী' হতে পারেন নি। ও খেতাবটি লাভ করা সহজ ব্যাপার নয়; গোবরবাবুও সহজে পান নি এবং তার জন্য তাঁকে দীর্ঘকাল পশ্চিম জগতে শত শত পালোয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। তাই আন্তর্জাতিক যোদ্ধা হিসাবে গোবরবাবুর স্থান প্রথম সারিতে, গামা ছিলেন তাঁর বহু বহু পশ্চাতে যদিও আমাদের দেশের লোকেরা এই মোটা কথাটাকে জানে না।

এবার গামার হাতে জ.বিস্কোর দ্বিতীয় পরাজয়ের কথা বলব। তাঁদের এই যুদ্ধ হয়েছিল পাতিয়ালার প্রসিদ্ধ কুস্তি দঙ্গলের শেষ দিনে ১৯২৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী প্রায় ৪০০০০ দর্শকের সামনে এবং গামার হাতে সেবার জ.বিস্কোকে হারতে হয় মাত্র ১ সেকেণ্ডের মধ্যে! বস্তুত তাঁর মতো অদম্য উৎসাহী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মল্ল পৃথিবীতে বেশি দেখা যায় নি। তাই যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবে লণ্ডনে তাঁকে নাজেহাল হতে হওয়ায় তার যোগ্য জবাব দেবার সংকল্প তাঁর মনে ছিল। কিন্তু তিনি সহসা সে সুযোগ পান নি; কেন না গামা দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো চেষ্টাই করেন নি, ভারতের বাইরেও আর যান নি। এদিকে জ.বিস্কো ১৯১১ অব্দে শিকাগো সহরে ভারতের কালা পরভাবাকে ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে হারিয়ে দেন, গোবরবাবুর সঙ্গেও বার কয়েক যুদ্ধে লিপ্ত হন। বার দুই তিনি 'বিশ্বজয়ী' আখ্যাও লাভ করেছিলেন। গামার সঙ্গে লড়ার জন্য ১৯২৬ অব্দে একবার ভারতেও এসেছিলেন, কিন্তু পাতিয়ালার সেই দঙ্গলের পূর্ব পর্যন্ত কিছুতেই তিনি তাঁর সম্মুখীন হবার সুযোগ

পান নি। শেষে পাতিয়ালার যুদ্ধে তাঁর এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে দর্শকদের মধ্যে আনন্দের ঝড় উঠে যায়।

কিন্তু যথার্থ প্রস্তুতি ছাড়াও যে ব্যক্তি গামার সর্ব প্রচেষ্টাকে ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ব্যর্থ করতে পারলেন, তিনি দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে সেই ব্যক্তির হাতেই এমন দ্রুত হারলেন কি করে? যথার্থ কুস্তি-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিষয়টি অনুধাবন করা দরকার। লক্ষ্য করার বিষয় যে, প্রথম বারের যুদ্ধে সমান থেকেও তাঁকে স্বজাতির কাছে নিদারুণ গাল-মন্দ খেতে হয়েছিল, দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে হেরেও তাঁর মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। বিষয়টি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিই।

ধরা যাক, দুই বীরের মধ্যে কুস্তি হচ্ছে। শক্তি, কৌশল, দম, সহিষ্ণুতায় দুই জনেই প্রায় সমান। এ ক্ষেত্রে উভয়কেই তাদের নিজ নিজ দেহ ও মনের শক্তিকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাতে হয় এবং কারো পক্ষেই চিন্তায় ও আঙ্গিক কৌশলে নিমেষের ভগ্নাংশ সময় কিংবা চুল পরিমাণ এদিক-ওদিক করা চলে না। করলে সেই মুহূর্তে তার পরাজয়ও অতি নিশ্চিত হয়ে যাবে। অথচ মানুষের দেহ ও মন পাথরের মতো নিশ্চল বা জড় বস্তু নয় বলে এরূপ ভুল কখনো কখনো ঘটাও স্বাভাবিক। আজ যে ভুল আমার ঘটল, কাল সে ভুল আপনারও ঘটবে না একথা কেউ হলপ্ করে বলতে পারে না; অন্তত জ্ঞানী, গুণী এবং অভিজ্ঞ মহল তা স্বীকার করবেন। পাতিয়ালার যুদ্ধে জ.বিস্কোও এরূপ এক অতি তুচ্ছ, অথচ অতি গুরুতর ফলপ্রসূ ভুল করেছিলেন।

সত্যি বটে, ভারতীয়রা বিদেশে বিদেশী ঢংয়ে প্রতিযোগিতা করতেন এবং বিদেশীরা সাধারণত এদেশে আসতেন না বলে এ দেশের ঢং তাঁরা বেশি জানতেন না। জ.বিস্কো তাই দ্বিতীয়বার গামার সঙ্গে লড়ার পূর্বে লাহোরের প্রসিদ্ধ সিরাজউদ্দিন পালোয়ানের কাছে দিন কয়েক ভারতীয় কুস্তির ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ওই সামান্য কটা মাত্র দিনে তিনি ভারতীয় কুস্তির সব কিছু শিখেছিলেন, এমন নয়। কিন্তু তাতেও হয় তো আটকাত না এবং জয়-পরাজয় যাঁরই হোক, দর্শকরা অন্তত প্রতিযোগিতাটিকে বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করতে পারতেন। কিন্তু সব কিছু ওলট-পালট করে দিলেন জ.বিস্কো নিজেই তাঁর অভাবিত ভুলের ফলে।

ভারতীয় কুস্তির সঙ্গে ইউরোপীয় কুস্তির মৌলিক পার্থক্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ভারতে আলগা ও ঝুরো মাটির ওপর লড়া হয়; ইউরোপে মোজা-জুতো পরে নরম গদীর ওপর লড়তে হয়। ভারতীয় মল্লরা বিদেশে গদীর ওপর লড়তে বাধ্য হলেও তাদের জুতো-মোজা পরতে বাধ্য করা হত না। পক্ষান্তরে জ.বিস্কোকে এ দেশে এসে ঝুরো মাটির ওপর লড়তে হয়েছিল বলেই ইচ্ছা থাকলেও তাঁর পক্ষে জুতো-মোজা পরা সম্ভব ছিল না। ফলত ভারতীয়দের জুতো-মোজা পরে গদীতে লড়তে বাধ্য করা হলে যে অসুবিধা হত, জ.বিস্কোকে জুতো ছেড়ে মাটিতে লড়তে গিয়ে সেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় কুস্তিতে দুই বা তিনবার লড়তে হয়, অথচ ভারতীয় নিয়মে মাত্র একবার। তার ফলে ইউরোপীয় কুস্তিতে একবার যদি বা ভুল ঘটে যায়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে তা শুধরে নেবার সুযোগ ঘটে। ভারতীয় নিয়মে তা সংশোধনের কোনো উপায় থাকে না। তাই, নতুন বিদেশী মল্লের পক্ষে ভারতীয় নিয়মে ভারতীয়কে হারিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এগুলি অবশ্যই কুস্তির বস্তুগত দিক, এ অসুবিধা এড়ানোর রাস্তা জ.বিস্কোর ছিল না। এর ওপরে চিন্তা এবং ধারণায়ও তাঁর ভুল ঘটেছিল। তা হচ্ছে, আত্মরক্ষাত্মক কায়দায় তিনি লণ্ডনের যুদ্ধটাকে অমীমাংসিত এবং দীর্ঘায়িত করেছিলেন। তাতে তাঁর ধারণা হয়, আক্রমণাত্মক যুদ্ধে গামাকে সহজে পর্যুদস্ত করা যেতেও বা পারে। অথচ তাঁর জানা ছিল না, আক্রমণাত্মক কুস্তিতে গামা যে পরিমাণ পশ্চাৎপদ, আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে সেই পরিমাণ তিনি দক্ষ। অর্থাৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে গামা ব্যর্থ হলেও আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে তাঁর জয় প্রায় ধ্রুব সত্য হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে জ.বিস্কো আক্রমণাত্মক যুদ্ধে ততটা দক্ষ ছিলেন না যতটা ছিলেন আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে! অতএব, নিজের চির অভ্যস্ত পন্থা ছেড়ে জ.বিস্কো যে পন্থায় অগ্রসর হলেন, সে পন্থা ছিল গামার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ! গামা তাই অক্লেশে জয়ী হতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ নিজের ভুল বোঝার আগেই জ.বিস্কোকে সোজাসুজি আশ্‌মান দেখতে হয়েছিল!

হয় তো জ.বিস্কো এমন ভুল আর করতেন না এবং সেই বিশ্বাসের জোরেই তিনি গামাকে আবার শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করেছিলেন যে কোনো পরিমাণ বাজীর সর্তে। তা ছাড়া, সে পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে তিনি ক্যাচ-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান বা গ্রীকো-রোমান কুস্তির উল্লেখ করেছিলেন। তার কারণ, এই দুইটি ধারাই দেশ-বিদেশের পালোয়ানদের মান নির্দিষ্ট করার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। কিন্তু গামা তাঁর এই আহ্বানে কোনো সাড়া দেন নি।

বস্তুত জ.বিস্কো কুস্তি-জগতে বিস্ময়কর মল্ল বলে স্বীকৃত এবং মল্ল হিসাবে তাঁর মর্যাদা বহু বহু 'বিশ্বজয়ী' পালোয়ানেরও ঊর্ধ্বে। তার কারণ, তিনি শক্তিমানের ধর্ম হিসাবে বিশ্বের সকল শক্তিমানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার্থ সর্বদা উদগ্রীব ছিলেন। তিনি জানতেন, স্বল্পসংখ্যক কুস্তিতে জয়ী হয়ে 'অবিজিত' নাম কামনার চেয়ে সর্বত্র লড়ে দুই এক জায়গায় হারলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং তা অধিকতর গৌরবজনক। তাই বয়স ও শ্রেণীর ভেদাভেদ পর্যন্ত গ্রাহ্য না করে সকলের সঙ্গে খুশী মনে যুদ্ধে নামতেন। পাতিয়ালায় গামার হাতে পরাজিত হবার পরে তিনি কেবল গামাকেই পাণ্টা যুদ্ধে আহ্বান জানান নি, সেই সঙ্গে গোবরবাবু, এমন কি ২৮ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছোট গামাকে পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেকেছিলেন। অথচ তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছরেরও বেশি।

দৈহিক শক্তিতে যেমন তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষদের ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, অতুলনীয় স্বাস্থ্যের বলে তেমনি তিনি বার্ধক্যকেও দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন বহুকাল। ১৯২১ অব্দে যখন তিনি প্রথম এডওয়ার্ড 'স্ট্র্যাংলার' লিউইস্‌কে হারিয়ে 'বিশ্বজয়ী' হন, তখন তাঁর বয়স ৫০ বছর হয়েছিল এবং ১৯২৫ অব্দে উয়েইন 'বিগ' মান্‌কে পরাজিত করে বিশ্ব প্রাধান্য পাওয়ার সময় বয়স ছিল ৫৪ বছর। অথচ ঐ দুটি প্রতিযোগিতার সময় তাঁর প্রতিপক্ষদ্বয়ের বয়স ছিল যথাক্রমে মাত্র ২৩ ও ২৬ বছর। পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর আর কোনো পালোয়ানই তাঁর মতো এত বেশি বয়স পর্যন্ত এত স্বাস্থ্য ও শক্তিকে বজায় রাখতে পারেন নি। কার্মার বার্ণস এবং রহিম

বথ.শ.কেও যথাক্রমে ৫০ ও ৬৩ বছরে অবসর নিতে হয়েছিল, কিন্তু জ.বিস্কো ৬৮ বছর বয়সেও বড় বড় প্রতিযোগিতায় পুত্র, এমন কি পৌত্রের বয়সী পালোয়ানদের সঙ্গে লড়ে ছিলেন। অবশ্যই, ইংল্যাণ্ডের স্যর টমাস পারবিল্সও তাঁর ৭৮ বছর জীবন-কালে অবিজিত ছিলেন ; এমন কি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিনের জন্য তাঁকে রোগভোগও করতে হয় নি। কিন্তু একথাও বলা দরকার যে, তাঁর শক্তির ক্ষেত্র শুধু গ্রেট বৃটেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কখনো কখনো একচ্ছত্র জয় কারো কারো মনে কী দারুণ হিংসার সৃষ্টি করে জ.বিস্কোর জীবনের একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে। সেবার পোল্যাণ্ডের ক্রাকার্ড সহরে এক বিরাট কুস্তির দঙ্গল হয়। নানা দেশের বহু পালোয়ান সমবেত হয়েছেন ; তুরস্কের কানিতি ছিলেন তাঁদেরই একজন। পোল্যাণ্ড জ.বিস্কোর নিজের দেশ, অথচ তিনিই অনুপস্থিত। শোনা গেল, তিনি ভিন্ন দেশের দঙ্গলে আছেন। বিদেশীয় পালোয়ানরা উৎফুল্ল হয়ে ভাবলেন, এবার তা'হলে প্রথম পুরস্কার মিলতে পারে। কানিতির আশা ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দঙ্গল সুরু হবার মুখে শোনা গেল, জ.বিস্কোও এসে পড়েছেন। শুনে সকলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তবু, কানিতি আশা করলেন, প্রাথমিক হিটে তাঁকে নিশ্চয়ই জ.বিস্কোর সঙ্গে লড়তে হ'বে না! কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, প্রাথমিক হিটে তাঁকেই পড়তে হল জ.বিস্কোর বিরুদ্ধে, এবং তাতে হারতেও হল সাংঘাতিকভাবে।

লজ্জা, দুঃখ, ঘৃণা ও ক্রোধে কানিতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং পরবর্তী প্রোগ্রাম মতো জ.বিস্কো যখন লড়াইয়ে মত্ত, তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর ২০০০ পাউণ্ডের জমার বই (Savings Book), নগদ ৮০ পাউণ্ড, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ প্রাপ্ত পদক, বেল্ট ইত্যাদি যা পাওয়া গেল নিয়ে বেরিয়ে এলেন। জ.বিস্কো ঘরে ঢুকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর যে খাওয়ার পয়সা পর্যন্ত নেই!

এদিকে আর এক মুস্কিল জমার বইয়ের টাকা তোলা যায় না। পদক, বেল্টেও নাম লেখা! বিক্রি করতে গেলে ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে! কানিতি তখন এক চিঠিসহ জমার বই এবং পদক, বেল্ট সব ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু নগদ টাকাটা? সেটা কিন্তু ছাড়লেন না, ওটা হয়ে গেল তাঁর চ্যাম্পিয়নশিপের জরিমানা!

জ.বিস্কো হাজার হাজার কুস্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ; প্রকৃতপক্ষে, ১৮ থেকে ৬৮ বছর পর্যন্ত, দীর্ঘ ৫০ বছরে তিনি যত কুস্তি লড়েছিলেন, অনেক বড় বড় চ্যাম্পিয়ন তার অর্ধেক সংখ্যক যুদ্ধেও নামেন নি। এদিক থেকেও তিনি ছিলেন এক শীর্ষস্থানীয় মল্ল। তারপরে শিক্ষা-দীক্ষায়ও তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। গোটা কয়েক ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর দখল ছিল। স্বভাব, চরিত্র এবং আলাপ-ব্যবহারেও তিনি সহজে মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারতেন। পেশাদার কুস্তিবিদ হিসাবে তাঁর উপার্জনও কম ছিল না। তা' ছাড়া এক হোটেলেরও তিনি মালিক ছিলেন। তাই বলে তিনি অর্থপিশাচ ছিলেন না। বহু সময়ে নিষ্ঠাবান কুস্তি শিক্ষার্থীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে দেহ গঠনে এবং কুস্তি-শিক্ষায় সাহায্য করতেন।

শারীরিক শক্তির পরীক্ষাও তিনি দিতেন। কাঁধের জোরে লোহার কড়ি বাঁকানোর মধ্যে আজ হয় তো অনেক ছল-চাতুরির পরিচয় আছে ; তাই, অতি সাধারণ লোকও এখন একাজের শো দেয়। কিন্তু গোড়ার দিকে যথার্থ শক্তিমান ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ কাজ দেখাতে পারত না। মল্ল হওয়া সত্ত্বেও জ.বিস্কো ১৯২৭ অব্দে ভারতে এ শক্তির পরিচয় দিয়ে দারুণ বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন।

দৈহিক গঠনেও বহু বড় বড় বলী তাঁর সমকক্ষ ছিল না। অনেকবার তাঁর দেহের মাপ গৃহীত হয়েছিল এবং তাতে স্বাভাবিক মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখা গেছে। কিন্তু প্রায় ৫৫ বছর বয়সে তাঁর যে মাপ ছিল, তা মোটামুটি এই :—

ভার	২৫৫	পাউণ্ড
দৈর্ঘ্য	৬১	ইঞ্চি
গলা	২২	ইঞ্চি
বাহু (সঙ্কুচিত)	২১	ইঞ্চি
গোছা (সঙ্কুচিত)	১৬	ইঞ্চি
কব্জি	৮½	ইঞ্চি
বুক (স্বভাবত)	৫৪	ইঞ্চি
বুক (প্রসারিত)	৫৭	ইঞ্চি
কটি	৪০	ইঞ্চি
উরু	৩০	ইঞ্চি
মোচা (Calf)	১৮	ইঞ্চি
নলি	১১	ইঞ্চি

সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত ধাতব দ্রব্য

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটুট অব মেরিন রিসোর্সেস-এর ডাঃ জন এল মেরো আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ১৪৪তম বার্ষিক অধিবেশনে বলেছেন যে, নিকেল, কোবল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, তামা প্রভৃতি খনি থেকে সংগ্রহ করার যে খরচ তার শতকরা ৫০ অথবা ৭৫ ভাগ খরচে এই সকল ধাতু সমুদ্রের তলা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। সমুদ্রের তলায় পিণ্ডাকারে প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল ধাতু সঞ্চিত রয়েছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে।

কোনখানে যে ঐ সকল ধাতব পিণ্ড সঞ্চিত রয়েছে তা টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে জানা এবং যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল পিণ্ড উত্তোলন করা যেতে পারে।

ডাঃ মেরো এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সারা বছরে যে পরিমাণ নিকেল ব্যবহার করা হয় তার শতকরা ৫০ ভাগ, কোবল্টের শতকরা ২১ ভাগ এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্য একবার চেষ্টার ফলে সংগৃহীত হতে পারে। এ পর্যন্ত সমুদ্র সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়নি বলেই এই সম্পদ সংগ্রহের জন্য চেষ্টাও হয়নি।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

বারো

বারান্দার অপরপ্রান্তে বসে কাঠুরে চৌধুরী সিগার টানছিল। এই মোটা চুরুটগুলো তার মুখে মন্দ মানায় না। সাদা সরু সিগারেট তার মুখে বড়ই বেয়াড়া দেখায়। অত বড় মুখে ঐ ছোট জিনিষটা কতকটা খেলার মতো মনে হয়। একবার এক বন্ধু তাকে এই কথা বলেছিল। সেই থেকে সে সিগার ধরেছে। মোটা বর্মা চুরুট। একটা শেষ করতে এক কল্কে তামাকের চেয়েও বেশি সময় লাগে।

কাঠুরে চৌধুরী আজ সময়ের অপব্যবহার করছে। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবা তার স্বভাব নয়, অথচ আজ তাকে তাই করতে হচ্ছে। ডাক্তার না ফেরা পর্যন্ত তাকে এই ভাবে বসে থাকতে হবে। আর কিছু করবার নেই।

তারপর!

কাঠুরে চৌধুরী জানেন যে তার পরের ঘটনা খুব সহজে মিটবে না। ভবিষ্যৎ একেবারে অনিশ্চিত। আজ যে লোকটা অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে, কাল সকালে তার জ্ঞান হবে কি না ভগবানই জানেন। জ্ঞান ফিরে এলেও এ সমস্যা সহজে মিটবে না। ঐ শয্যাশায়ী লোকটা কোন দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে কি না পরে তা জানা যাবে।

কাঠুরে চৌধুরী বুঝতে পেরেছে যে, আজ রাতে এ সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রচুর পরিমাণে মরফিয়া দিয়ে ডাক্তার তাকে বেহুঁস করে রেখেছেন। জ্ঞান হলেও সে তার যন্ত্রণা বুঝতে পারবে না। সকালের দিকে নেশার ঘোর কাটবে। তখন রোগীর জ্ঞান হবে ব'লেই আশা করা যায়। অন্তত দময়ন্তীকে ডাক্তার এই আশ্বাস দিয়ে গেছেন। আর কাঠুরে চৌধুরীকে আড়ালে বলেছেন অন্য কথা, সবই তাঁর ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছা যে কী, সে কথা কেউই জানে না। জীবন মরণ দুই-ই তাঁর ইচ্ছায়।

কাঠুরে চৌধুরীর কাল অনেক কাজ। যেখান থেকে হোক একটা পোর্টেবল এক্সরে যন্ত্র এনে খানকতক ছবি তুলতে হবে। মেরুদণ্ড যদি না ভেঙ্গে থাকে তাহলে সে উঠে বসতে পারবে, সোজা হয়েও দাঁড়াতে পারবে কয়েকদিন পর। মেরুদণ্ড ভাঙলেও অনেকে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সে-সব লোকের মেরুদণ্ড তাদের পিঠে নয়, চরিত্রে। জীবনে কারও মুখাপেক্ষী হবে না, এই রকম দৃঢ়তা মনে থাকলেই বলে, প্লাষ্টারে মুড়ে ফেলে রাখলে চলবে না। লোহার জামা পরিয়ে উঠাতে দাও; কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ল কেষ্টদার কথা। অফিসের তাড়ায় ট্রামের হাতল ধরে ঝুলবার চেষ্টা করেছিল, ভিড়ের চাপে ছিটকে পড়েছিল ফুটপাথের উপর। খানিকক্ষণ জ্ঞান ছিল না। তারপর রাস্তার লোক ধরাধরি করে তুলে তাকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দেয় হাসপাতালে যাবার জন্যে। কেষ্টদা অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সহকর্মীরা তাঁর চেহারা দেখে কিছু সন্দেহ করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক্সরে করে দেখা গেল

যে, মেরুদণ্ডের এক জায়গা ভেঙে গেছে। সেই কেষ্টদা' লোহার জামা পরে অফিস করেছেন।

কাঠুরে চৌধুরী জানে যে এই রকম মনের জোর সকলের থাকে না। এ অনেক ধাক্কা খাওয়া মন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানে সুরভিত। এই মনকে কাঠুরে চৌধুরী শ্রদ্ধা করে। এরাই তো পুরুষ। পুরুষের সঙ্গে নারীর প্রভেদ তো শুধু দেহের গঠনে নয়, মনের বলিষ্ঠতায়ও বটে। এই বলিষ্ঠ মনের জন্যেই তারা যুদ্ধ করতে পারে শত্রুর সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে। নারীকেও নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে।

সহসা তার নিজের কথা মনে পড়ল।

শৈশবে তার নিজের মেরুদণ্ডটা নিশ্চয়ই সোজা ছিল। তা না হলে আজ তার কোন অস্তিত্ব থাকত না। লেখাপড়া না শিখেও আজ সে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছে সগৌরবে।

তার লেখাপড়া হল না কেন?

সে অনেক কথা।

কে দায়ী?

কাঠুরে চৌধুরী নিজেকে কোনদিন দায়ী করে নি। দায়ী করেছেন সমাজকে। রাতারাতি এই সমাজটা যেন বদলে গেছে। মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা কিছুই যেন আর আগের মতো নেই। আগে যা অহংকারের বিষয় ছিল, এখন তা লজ্জার বস্তু হয়েছে। এখন গৌরবের ব্যাপার হয়েছে, আগে যে ঘৃণার জিনিষ ছিল। কিন্তু কেন এমন হল, এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। কাঠুরে চৌধুরীর মনে হয়েছে যে, এ প্রশ্ন নিয়ে এখন কেউ মাথা ঘামায় না।

উনিশশো একচল্লিশ সালের শেষ দিকের কথা তার মনে পড়ে। বছরখানেক আগে সে অক্ষর পরিচয় শেষ করে স্কুলে যাতায়াত শুরু করেছিল। ক্লাশের অন্য ছেলেদের তুলনায় একটু বেশি বয়স। চেহারাটাও ভাল। অনেক শক্ত-সমর্থ মজবুত চেহারা। কাজেই দলপতি হবার সুযোগ পেয়ে স্কুলটা তার ভালই লাগছিল।

এই সময়ে শোনা গেল যে, জাপানীরা কলকাতা সহরের উপরে বোমা ফেলবে। যুদ্ধের কথা কাঠুরে চৌধুরীর অল্প অল্প মনে পড়ে। যুদ্ধ বেধেছিল পশ্চিম ভূখণ্ডে, জার্মানী আর ইতালি সমস্ত ইয়োরোপের সঙ্গে লড়ছিল। হিটলার আর মুসোলিনি হয়েছিল সকলের আতঙ্কের বস্তু, কাঠুরী চৌধুরী খবরের কাগজে তাদের ছবি দেখত। হিটলারকে সে চার্লি চ্যাপলিনের ভাই বলে ভেবেছিল। আর দুঃখ পেয়েছিল দুই ভাইয়ের চরিত্রের তফাৎ দেখে। এক ভাই-এর ভ্রূকুটি দেখে যেমন ঘৃণা করত, ছবির পর্দায় অন্য ভাই-এর মুখ দেখে তেমনি আনন্দের সীমা থাকত না। শেষ পর্যন্ত সে নিজের ভুল বুঝে ফেলল। যে লোক সারা পৃথিবীর মানুষকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে, তার আপন ভাই কখনও সারা পৃথিবীর লোককে ভয় দেখাতে পারে না।

মুসোলিনির জীবনী তার পড়া হয় নি। বইখানা সে দেখেছিল, ছবি দেখেছিল। ক্লাশে ভাল ছাত্র ছিল বলে তাদের এক আত্মীয় তার দাদাকে বইখানা উপহার দিয়েছিল। যুদ্ধ তখনও বাধে নি, আর মুসোলিনিও খারাপ লোক বলে তখনও চিহ্নিত হন নি। ভাল পড়তে পারলে সে তখনই বইখানা পড়ে দেখত। কিন্তু তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে এই লোকটার চরিত্র নাকি রাতারাতি পাল্টে গেল। বইখানাও বাড়ি থেকেই উধাও হয়ে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী পরে কিছু কিছু শুনেছে। বাড়ির অনেক বই তার বাবা সরিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজ যেদিন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, সেইদিন থেকেই ভারতবাসীকে সতর্ক হতে হল। ভারতবর্ষ রাজভক্ত জাত। যুগে যুগে ধর্ম বদলেছে, ভাষা বদলেছে। বিশ্বাস ও মতও বদলেছে। তার বাবার বৈঠকখানায় কাঠুরে চৌধুরী যে আলোচনা মাঝে মাঝে শুনেছে, তাতে সে ঐ বয়সেই বুঝেছিল যে, বুদ্ধিমানেরা খুবই সতর্ক ভাবে পা ফেলেছেন। রাজা যদি বদল হয় তো নূতন রাজা যেন রাজদ্রোহী না ভাবেন। জাপান তখন সূর্যোদয়ের দেশ থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এ সব কথা ভাল করে বোঝবার আগেই তাদের কলকাতা ছাড়তে হল। সবাই বলল, কলকাতায় বোমা পড়বে। জাপানীদের তাক এমন ভাল যে, কিছুই রক্ষা পাবে না। হরিলুটের বাতাসার মত তারা উপর থেকে যখন বোমা ফেলবে, তখন তাক ভাল না হলেও ক্ষতি নেই। কাজেই ছাড়ো কলকাতা।

সেটা উনিশশো একচল্লিশের শেষ, না বিয়াল্লিশের প্রথম, কাঠুরে চৌধুরীর তা মনে পড়ে না। তারা যে তাদের অ্যানুয়াল পরীক্ষা দেবার আগেই কলকাতা ছেড়েছিল, তা মনে আছে। কেন না সে-বছর সে প্রোমোশন পায় নি। বর্ধমানে আবার পুরণো ক্লাশেই ভর্তি হয়েছিল। কলকাতার স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনলে সে উপরের ক্লাশে ভর্তি হতে পারত। কিন্তু তার বাবা তখন নানা কাজে এমনই ব্যস্ত যে, কলকাতা থেকে সার্টিফিকেট পাঠাতে পারলেন না। তার বদলে অনেক টাকা পাঠিয়ে লিখলেন যে, ভাল মাষ্টার রেখে শুধরে নিতে।

এই ব্যবস্থায় তার মা মোটেই খুশী হন নি। বলেছিলেন, টাকা দিয়ে একটা বছর ফিরে পাওয়া যায় না।

তার বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, শুধু বছর কেন, সবই ফিরে পাওয়া যায়। টাকা থাকলে পুরণো বছর কেন, নতুন বছরকেও ধরে রাখো, পছন্দ না হলে দু' পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যাও।

তার মা স্তব্ধ হয়ে এ কথা শুনেছিলেন, তারপর বলেছিলেন, তুমি এই কথা বলছ!

কেন, আশ্চর্য হচ্ছ কেন?

না, কিছু নয়।

কাঠুরে চৌধুরীর স্পষ্ট মনে আছে যে এই কথা বলবার সময় তার মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। সেদিন সে কিছুই বোঝে নি, অনেকদিন পরে সে এই দীর্ঘশ্বাসের কারণ বুঝেছিল কিছু কিছু। সেদিন তাদের সংসারে স্বচ্ছলতার অভাব নেই, অভাব শুধু শান্তির। কলকাতায় বোমা পড়েছিল কয়েকদিন, তারপর আর পড়ে নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তারা আর কলকাতায় ফিরতে পারল না। তার বাবা চাকরি ছেড়ে ব্যবসা ধরেছিলেন। সেই ব্যবসা নিয়ে নানা স্থানে ঘুরলেন। প্রচুর টাকা পাঠালেন মায়ের কাছে। কিন্তু তবু সংসারে শান্তি রইল না। সারাক্ষণ তখন মায়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ছে।

জরুরী ঘোষণা

আমাদের একশো বছরের সুনামের সুযোগ লইয়া কয়েকজন অসাধু লোক নানাবিধ মিথ্যা প্রচারের দ্বারা আমাদের খরিদ্দারগণকে ঠকাইতেছে। কোন কোন দোকানদার বেশী মুনাফার লোভে ইহাদের সাহায্য করিতেছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ '<u>লক্ষ্মীবিলাস</u>' কিনিবার সময় এই কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিবেন:—

(১) <u>ট্রেড মার্ক—শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি</u> (২) <u>সবুজ রঙের পিলফার প্রুফ ক্যাপ</u> (৩) <u>এম এল বোস এণ্ড কোং</u>

সব সময় ক্যাশ মেমো লইবেন এবং যদি কোনও দোকানদার আপনাকে 'শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি'র বদলে অন্য কোনও তৈল আমাদের বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করে, আমাদের বিস্তারিতভাবে জানাইলে আমরা সেই সকল জাল-বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

এম. এল. বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস

কলিকাতা

তারপর কী হতে কী হয়ে গেল, কাঠুরে চৌধুরী বুঝতে পারল না। একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখল, মা তখনও ওঠেন নি। জীবনে এ রকম ঘটনা কখনও ঘটে নি। ভোরবেলায় তো নয়ই, রাতেও নয়। কোনদিন কোন কারণে ঘুম ভাঙলেই শুনেছে, ঘুমোও। উসখুস করলেই বাতাস পেয়েছে, আর বিছানা থেকে নামলেই দেখেছে টর্চের আলো। এই মাকে কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কারণটা মনে পড়ে না। মার ঘুম ভাঙে নি। ডাক্তার এসে বললেন, আর ঘুম ভাঙবে না। সবার সঙ্গে কাঠুরে চৌধুরীও কাঁদল, তারপর ধীরে ধীরে ভুলে গেল এ সব কথা।

দময়ন্তী বোধ হয় এখনও তার মায়ের মৃত্যুটা ভুলতে পারেনি। বড় আকস্মিক মৃত্যু, বড় রহস্যময়। কাঠুরে চৌধুরী নিজে সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছে। তার কারণ আছে। সে মনে করেছে যে এই ঘটনা সম্বন্ধে সে-ই অনেক কিছু জানে। এতখানি জানে যে লীলাবতীর মৃত্যুকে সে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করতে পারেনি।

একদিন সকাল বেলায় তার কাছে খবর পৌঁছল যে নরোত্তম খেজ্জানির স্ত্রী মারা গেছেন। অসুখ নেই বিসুখ নেই, সহসা এক সকাল বেলায় এই দুর্ঘটনার সংবাদ এল। কাঠুরে চৌধুরী তাঁর প্রতিবেশী নয়। তবু এই অরণ্য রাজ্যেরই প্রজা। দেখা সাক্ষাতে বন্ধুত্ব জন্মেছে খানিকটা। তাই সে সহানুভূতি জানাতে গেল। যা শুনল, তাতেই বুঝল যে মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। লীলাবতীর দেহে বিষের ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেছে। কাঠুরে চৌধুরী বাজে লোকের কাছে একথা শোনে নি, শুনেছে ডাক্তারের মুখে। অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। অরণ্য রাজ্যেই থানা পুলিশ হয়নি। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নরোত্তমবাবু তাঁর স্ত্রীর সংকার করে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছিলেন।

দময়ন্তী তখন কলকাতায় ছিল। ছুটে এসে মাকে সে দেখতে পায়নি। দেখল তাঁর শেষকৃত্য। বিষের গল্প নরোত্তমবাবু তাকে নিশ্চয়ই বলেন নি! বাড়ির লোক জন বলেছে কি না তার জানা নেই।

এই সমাজ!

কাঠুরে চৌধুরী হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়েই নিভে গেল। তার মনে হল, তার নিজের মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে দময়ন্তীর মায়ের মৃত্যুর কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ শুধু এই জায়গায় যে সেদিন তার বাবা অনুপস্থিত ছিলেন। সে তার মায়ের মৃত্যুর কারণ হলেও তাঁকে হত্যার অপরাধ দেওয়া যায় না। আর লীলাবতীর বেলায় সেই অপরাধ কেউ নরোত্তমবাবুর কাঁধে চাপিয়ে দিলে তিনি আত্মরক্ষা করতে পারবেন কি না সন্দেহ। এই সমাজে সবই ঘটছে। অঙ্কের পদ্ধতিতে যা প্রমাণ করা যায়, মানুষের জীবনেও তা প্রমাণিত হচ্ছে। কিছুই অসম্ভব নয়। মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা আজকাল বদলে গেছে। তা না হলে—

কাঠুরে চৌধুরী আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। তা না হলে দময়ন্তী তাকে ভুল বুঝবে কেন! সে কি কোনদিন তার কাছে কোন অপরাধ করেছে!

সহসা তার অপরাধের কথা মনে পড়ল। করেছে অপরাধ। দময়ন্তীকে সে চরম অপমান করেছে। সেই দুর্বলতার জন্য অনেকদিন সে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে মনে মনে। আজও সে নিজেকে ধিক্কার না দিয়ে পারল না।

তেরো

কাঠুরে চৌধুরীর মনে আছে যে তার বাবা এসে তাদের কলকাতায় নিয়ে গেলেন না। নিয়ে গেলেন হাজারীবাগের স্কুলে। কলকাতার বাঙলা স্কুলে হোস্টেল নেই, ইংরেজী স্কুলেও নাকি অসুবিধা আছে। কলকাতার বাড়িতে থেকে কেন আগের মতো পড়াশুনো করা সম্ভব নয়, সে কথা জানতে চেয়ে তার দাদা বকুনি খেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দুই ভাই-এ হাজারীবাগের স্কুলে ভর্তি হল, স্থান পেল হোস্টেলে। স্কুল থেকে কলেজে গেল, কিন্তু হোস্টেলের জীবন তাদের শেষ হল না। কলকাতায় তারা ফিরতে পারল না।

নিজের ভাল নামটা কাঠুরে চৌধুরী ভুলে গেছে। মা সখ করে একটা সুন্দর নাম রেখেছিলেন। সেটা তার প্রকৃতির সঙ্গে মানায় নি। সবাই তাকে তার ডাক নামেই ডাকত। সে নামটাও কাঠুরের মতো খটখটে নাম। ফটিক। ঐখানে এসে যখন কাঠের কারবারে যোগ দেয় তখন তাকে লোকে ফটিক চৌধুরীই বলত। কাঠের ব্যবসায়ে হাত পাকিয়ে তার নাম হয়েছে কাঠুরে চৌধুরী। কে কবে কখন তার এই নাম রাখল, সে জানে না। যখন সে এই নাম শুনল, তখন দেখল যে সবাই তাকে কাঠুরে চৌধুরী বলে। ফটিক নামটাও লোকে আজকাল ভুলে গেছে।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ছে, তার দাদা তাকে কাঠের কারবার করবার পরামর্শ দিয়েছিল। তখনও সে ছোট, তার দাদারও এমন কিছু বয়স হয় নি। সে পরামর্শ বিবেচনার কথা নয়, অভিমানের কথা। জানালার গরাদে মুখ রেখে তার দাদা মাঝে মাঝেই কাঁদত। এই কান্না দেখলেই ফটিক বলত: ও কী হচ্ছে।

তার স্বর ছিল ধমকের মতো। ভয় পেয়ে তার দাদা বলত, কিছু না।

কিছু নয় মানে! তবে তোর চোখে জল কেন?

তার দাদা স্বীকার করত না যে মায়ের জন্য তার মন কেমন করছে। অন্য কথা বলত, ফটিককে ভোলাবার চেষ্টা করত। শেষে বিরক্ত হয়ে বলত, তুই কাঠের কারবার করিস।

কেন?

তোর মন তো কাঠের মতন, ঐ কারবারে তোর উন্নতি হবে।

এ কথা সে একবার নয় অনেকবার শুনেছে। কোন কোনদিন মনে হয়েছে যে তার দাদা বোধ হয় ঠিকই বলে। দাদার মতো নরম মন তার নয়, বরং অনেক পরিমাণে কঠিন। মার জন্যে মন কেমন করত কি না ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু মায়ের কথা মনে হলেই কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠত। একটা দুরন্ত আক্রোশে মন তার ভরে যেত। কিন্তু কার উপরে সেই আক্রোশ তা বুঝতে পারত না। অনেকদিন অনেক ভাবে ভেবেও সে কোন উত্তর পায় নি।

একদিন তার দাদা জিজ্ঞাসা করেছিল: মার কথা তোর মনে পড়ে না?

পড়ে।

দুঃখ হয়?

রাগ হয়।

উত্তর শুনে তার দাদা আশ্চর্য হয়েছিল : রাগ হয় কি রে!

মাকে যারা মেরেছে, তাদের আমি দেখে নেব।

মাকে তো কেউ মারে নি, মা আত্মহত্যা করেছিল।

সাধ করে কেউ মরে?

কাঠুরে চৌধুরী আজও ভেবে পায় নি, তার মাকে কে মেরেছে। তার বাবা না এই যুদ্ধোত্তর সমাজ? তার বাবার দোষ কতটুকু? তিনি তো এই যুগের হাওয়ায় গা ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুগটা আনল কে?

তারা দু' ভাই বেশ বুঝেছিল যে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত নয়। এমন কি কোন কৌতূহল রাখাও অন্যায় হবে। তাই তারা অতীত সম্বন্ধে নিস্পৃহ হবার চেষ্টা করেছে।

অতীত ভোলা যায়, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও উদাসীন থাকা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান বড় কঠিন, বড় নির্মম। মানুষকে কিছুতেই নিস্পৃহ থাকতে দেয় না। ফটিকরা দেখত, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য ছেলেরা কেমন ব্যস্ত হত। কত আগ্রহ, কত উল্লাস। ছুটির তারিখ ঘোষণা হলেই বাড়িতে চিঠি লিখত, দিন গুনত। বাড়ি থেকে চিঠি আসত, বাবা-মা দু'জনেই নিতে আসবেন, কিংবা বাবা একা, কিংবা আর কেউ। ফটিকদেরও লোক আসত, কিন্তু বাড়ি নিয়ে যেতে আসত না। গ্রীষ্মে তারা পাহাড়ে বেড়াতে যেত, হোটেলে থাকত কর্মচারীর সঙ্গে। শীতে যেত রাজগীর কিংবা মধুপুরে। মধুপুরে তাদের বাড়ি ছিল। পিতার সঙ্গে দেখা হয়েছে কচিৎ কদাচিৎ, দিন কয়েকের জন্যে, তার বেশি নয়।

এমনি করেই দাদা হাজারীবাগের পড়া শেষ করে রুড়কীর কলেজে ভর্তি হল ইঞ্জিনিয়ার হতে। আর ফটিক কোনরকমে সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করে হাজারীবাগের কলেজেই ভর্তি হল, ডিগ্রী হয় তো নিতে পারত, কিন্তু তার সুযোগ পেল না। যে ঘটনা ঘটল তা মর্মান্তিক, জীবনের স্রোতটাই তার একেবারে পাল্টে গেল। হাজারীবাগের কলেজ থেকে এল পালামৌয়ের জঙ্গলে। ফটিক চৌধুরী হল কাঠুরে চৌধুরী।

কিন্তু কাঠুরে চৌধুরীর হঠাৎ অন্য কথা মনে এল। এমন করে তাকে কেউ হত্যার অপরাধ দেয়নি। দময়ন্তী সত্যিই ভেবেছে যে, এই দুর্ঘটনায় তার সক্রিয় হাত আছে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব, সে কথা সে ভাবল না। তারা যে এই অঞ্চলে এসেছিল, সে তো কারও জানা ছিল না। আর জানা থাকলেই বা কী! সে এসে ওদের মোটরের ঘাড়ে পড়ে নি, রাস্তায় পাশ কাটাতে গিয়ে তারাই গড়িয়ে নীচে পড়েছে। হ্যাঁ, সে এক পাশে দাঁড়িয়ে তাদের রাস্তা ছেড়ে দিতে পারত। এরা এমন কাণ্ড করবে সন্দেহ করলে হয় তো সে তাই করত। কিন্তু এর ভিতর দুরভিসন্ধি কোথায়! কোথায় তার অপরাধ?

তাকে দেখে দময়ন্তীরা ভয় পেয়েছিল! তা পাক। তারাও

তো পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে পারত। এক পক্ষ অসাবধান হলে আর এক পক্ষকে সাবধান হতে দোষ কী! সাধারণত তাই তো হয়। সবাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। একজন আর একজনের ঘাড়ে এসে না পড়লে দুর্ঘটনা হয় না। কাঠুরে চৌধুরী এখানে কারও ঘাড়ে পড়ে নি। তবু দময়ন্তী তাকে দায়ী করছে এই দুর্ঘটনার জন্য।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, এই মনোভাবের পিছনে সেদিনের সেই লজ্জাকর ঘটনার প্রভাব আছে। সত্যিই সেই ঘটনার জন্য কাঠুরে চৌধুরীর অনুতাপের অন্ত নেই। অন্যায় সে অনেক করেছে, আরও করবে। অন্যায় করতে তার এতটুকু দ্বিধা হয় না। কিন্তু তার অন্যায় আচরণের পিছনে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে। জীবনের বন্ধুর পথে বার বার হোঁচট খেয়ে তার এই প্রত্যয় হয়েছে যে অন্যায় দিয়েই এই দুনিয়া চলছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদেই সে অন্যায় করে। কাঁটা দিয়ে সে কাঁটা তুলবে।

এই যে সেদিন সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই অরণ্যে চলে এল, এও তার অন্যায় হয়েছে! একটা গভীরতর অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে সে এই অন্যায় করেছিল।

কাঠুরে চৌধুরী আরও সূক্ষ্মভাবে এই ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখল যে, তার কোন অন্যায় হয় নি। অন্যায় যে সয়, সেও অন্যায়-কারীর মতো সমান অপরাধী। তাইতেই সে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল। তারপর? তারপর এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ইচ্ছা করে সে লেখাপড়া ছাড়েনি, লেখাপড়া ছাড়তে সে বাধ্য হয়েছিল। সে নিজে না ছাড়লে তার আত্মসম্মান বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। সাধারণ মানুষের আর কিছু না থাক। অহংকার করবার মতো শুধু তার আত্মসম্মান বোধটুকু আছে। নিজে থেকে তা জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। আদর্শ অনুসরণ করে মানুষ যেমন উন্নতি করে, তেমনি আত্মসম্মান বজায় রেখে সে সম্মানার্হ হয়।

কলেজে উঠে কাঠুরে চৌধুরী তার মায়ের আত্মহত্যার কারণ কিছুটা অনুমান করেছিল। তার দাদা চাপা স্বভাবের। সে জেনে থাকলেও কোনদিন কিছু বলেনি। সে জানত যে, বললেই বিপদ হবে। ফটিক একটা অনর্থ বাধাবে। তাই সেই ধীর স্থির ভাল মানুষ ছেলেটি ছোট ভাই-এর সঙ্গে এ নিয়ে কখনও আলোচনা করেনি। বরং সযত্নে এই আলোচনা সে এড়িয়ে গেছে।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ে, স্কুল ছুটির সময় যখন তাদের নেবার জন্যে প্রমথবাবু আসত, তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করত, আমাদের বাবা কেন এল না?

প্রমথবাবু টপ করে, এ কথার জবাব দিতে পারত না। টাক মাথায় একটুখানি হাত বুলিয়ে দুবার কেসে জবাব দিত, তাঁর শরীর ভাল নেই।

কী হয়েছে, জ্বর?

প্রমথবাবু আর কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বলত, না, ব্লাডপ্রেসার।

ব্লাডপ্রেসারের মানে সে বুঝত না। তবু বলত, চলুন, আমরা কবার দেখতে চাই।

ঐ বয়সেই তারা জেনে ফেলেছিল যে ছুটিতে তারা বাড়ি যাচ্ছে ।। তার দাদা তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝত, বলত, এবারে ামরা কোথায় যাচ্ছি প্রমথবাবু?

এই প্রশ্ন শুনে সে ভদ্রলোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। বলত, এবারে? াবারে নৈনিতালে ব্যবস্থা হয়েছে। চমৎকার পাহাড়। মাঝখানে লেক। আমরা নৌকোয় চড়ে খেলা করব।

কী খেলা?

প্রমথবাবু মুস্কিলে পড়ত। নৌকায় চড়ে কী খেলা যায় তা াহসা মনে পড়ত না। কিছু ভেবে না পেয়ে বলত, লুডো।

প্রতিবার প্রমথবাবুকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হত। প্রশ্ন করত ফটিক চৌধুরী। দু'-একবার ঠেকবার পরই প্রমথবাবু তৈরী হয়ে আসতেন। এক একবার এক এক উত্তর দিতেন। সে সব য মনগড়া উত্তর সে কথা ফটিক অনেক পরে বুঝেছিল। তার আগে একবার জেদ ধরেছিল; এবারে বাবাকে আসতেই হবে, না এলে আমরা কোথাও যাব না।

দাদা বলেছিল: অমন অবুঝ হলে কি চলে?

অবুঝ বললে ফটিক চৌধুরীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বলেছিল, অবুঝ মানে! সবার বাবা আসতে পারে, আমাদের বাবা কেন আসবেন না?

তাঁর সুবিধে অসুবিধেও তো দেখতে হবে!

তাহলে অন্য সময় আসেন না কেন, ... কেন।

Oatine Snow
Oatine Snow for DAY USE
প্রসাধনের প্রথম উপচার
ওটিন
স্নো
প্রসাধনের প্রথমেই চাই ওটিন স্নো ! এমন হাল্‌কা, ও কোমল, মেক-আপ ধরানোর পক্ষে এত চমৎকার যে এর তুলনা হয় না। দিনের সব সময় মুখখানি দেখাবে স্নিগ্ধ অমলিন আর দীর্ঘস্থায়ী মিষ্টিগন্ধে মন থাকবে সতেজ, ক্লান্তিহীন।
সুখবর ! আপনার প্রিয় ওটিন স্নো এখন সহজে সঙ্গে রাখার জন্য সুবিধেজনক টিউব প্যাকিং-এও পাওয়া যাচ্ছে।
ওটিন প্রসাধন সামগ্রী—প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে সুপরিচিত
মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড,
১৮২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল, এর পরের বারে বাবা না এলে তারাই যাবে কলকাতায়। মায়ের মৃত্যুর পরে তারা বাবাকে দেখেছিল, তারপরে আর দেখে নি। সে কত বছর আগের কথা। ফটিকের ভাল করে মনেই পড়ে না। প্রমথবাবু এ প্রস্তাবে রাজী হওয়াতে তার আনন্দের আর সীমা ছিল না।

কিন্তু পরের বারে কলকাতায় এসেও তার বাবার দেখা পায়নি। তিনি তাঁর বাণিজ্যের কাজে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তার দাদা কোন আঘাত পেয়েছিল কিনা কাঠুরে চৌধুরীর মনে নেই, নিজের দুঃখের কথা তার স্পষ্ট মনে আছে। তার চেয়েও গভীর দুঃখ পেয়েছিল একটা ছবি দেখে। বসবার ঘরের দেওয়ালে একটা বড় ছবি দেখেছিল। তার বাবার ছবি, কিন্তু তাঁর পাশে একটি মেমসাহেব। ফটিক জিজ্ঞেস করেছিল, ও কে দাদা?

তার দাদা বয়সে প্রবীণ না হলেও যেন বিচক্ষণ মানুষের মতো। সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল: জানিনে।

ফটিক প্রমথবাবুকেও জিজ্ঞাসা করেছিল: ও কে প্রমথবাবু?

প্রমথবাবুর মাথায় যেন বাজ পড়েছিল। টাকে হাত বুলোতে বুলোতে উত্তর দিয়েছিল: মেমসাহেব।

কোন মেমসাহেব?

আমেরিকার।

উত্তরটা ফটিকের পছন্দ হয় নি। বলেছিল: বাবার সঙ্গে ছবি তুলেছে কেন?

তাদের বর্ধমানের বাড়িতে তার মায়ের ছবি ছিল বাবার সঙ্গে। সেই ছবি এখনও তার দাদার কাছে আছে। এখানে তার বাবার পাশে একজন মেমসাহেবকে সে যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে বলল: চুপ করে রইলেন যে?

প্রমথবাবু বিব্রতভাবে বললেন: খুব ভাল মেমসাহেব।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে আছে, তার দাদা একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু পরে আরও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

এ বাড়ি তারা আগে দেখেনি এ বিরাট বাড়ি। ওপরে তালা দিয়ে বন্ধ নিচের তলাতেই তাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতায় তারা যে বাড়িতে ছিল, সে ভাড়াটে বাড়ি। সে বাড়ির স্মৃতি তারা ভুলে যায়নি।

এর পরেও ফটিক তার বাবার কথা ভেবেছে, ভেবেছে সেই মেমসাহেবের কথা। কিন্তু কলকাতায় যাবার নাম করলেই তার দাদা ক্ষেপে যেত। সেই ধীর স্থির মানুষটাও যেন বজ্র হয়ে উঠত। কিন্তু কথা বলত না।

সেই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল কয়েক বছর পরে। ফটিকের দাদা তখন রুড়কীতে চলে গেছে, আর প্রমথবাবুর বারণ না শুনে ফটিক এসেছে কলকাতায়। জোর করে তার বাবার সঙ্গে দেখা করেছে, আর বেরিয়ে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। সেদিনের কথা মনে হলে কাঠুরে চৌধুরীর রক্ত আজও গরম হয়ে ওঠে। এখনকার মতো সবল মন থাকলে সে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসত না, সেই মেমসাহেবকে গুলি করে আসত। তার মা কেন আত্মহত্যা করেছিলেন, সেই দিন সে কথা সে বুঝতে পেরেছিল। তার দাদা যে অনেক আগে বুঝেছিল, সে কথাও বুঝতে তার বাকি থাকে নি।

সেদিন কাঠুরে চৌধুরী খালি হাতে পথে বেরিয়েছিল। কিছু সে সঙ্গে নেয়নি। সম্ভব হলে পরণের জামা কাপড়ও সে ফেলে আসত। দীর্ঘপথ হেঁটে এসে হাওড়া ষ্টেশনে একটা ট্রেন ধরেছিল। টিকিট কাটবার পয়সা ছিল না, কেউ টিকিট চাইলে তাকে নেমে যেতে হত। হয়তো জেল খাটতে হত। ভেবেছিল হাজারীবাগে নামবে, কিন্তু তা পারেনি। ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরবেলায় ডেহরি অন সোনে নেমেছিল। হাজারিবাগে ফিরবে বলে আর একটা ট্রেণে উঠে পালামৌ জেলার একটা ছোট ষ্টেশনে এসে নামল। গভীর অরণ্যের কাছে ষ্টেশন। এই ষ্টেশন থেকে মালগাড়ি বোঝাই হয়ে কাঠ চালান যাচ্ছে।

ক্ষুধার্ত কাঠুরে চৌধুরী সেদিন কারও কাছে হাত পাতেনি। কাঠের গুদামের মালিকের কাছে এসে কাজ চেয়েছিল। বয়স অল্প হলে কী হয়, শরীর শক্ত ছিল। সারাদিন খেটে কয়েক পয়সা পেয়েছিল। সেই পয়সায় খাবার কিনে খেয়েছে। তার কাঠুরে চৌধুরী নাম হয়েছে আরও অনেক পরে।' [ক্রমশ।

পুতুল নাচ

—অশোককুমার ধর

আলোকচিত্র

লছমনঝোলা

—শ্যামশ্রী ঘোষ

জেলের জাল

—বি.বক সাহা

বন্দী

—রাখাল জানা

স্নেহ

শ্রীমতী সান্ত্বু বন্দ্যোপাধ্যায়

সবহারা

—এস. ধর

কবরী-রচনা

—দীপক ঘোস

একা

—শিবীশচন্দ্র ঘোষ

হাঁস-পুকুর

—বিবেক সাহা

অথৈ জল

—আর. কে হোম

নৃত্যের তালে তালে (ডেনমার্ক)

—স্যাস নিউজ
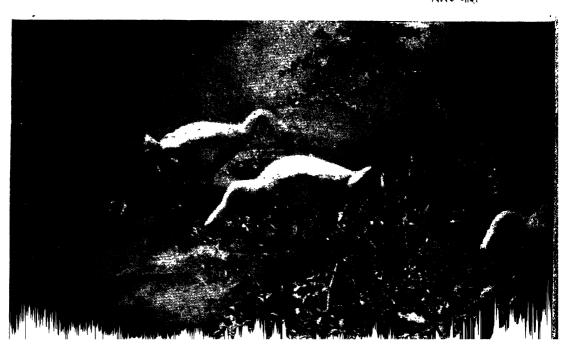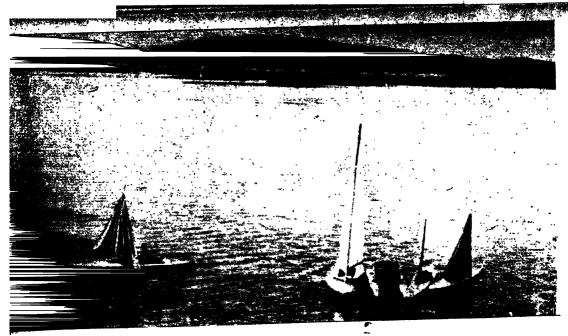
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু এবং দেশনায়ক জওহরলাল নেহরুর পত্র-বিনিময়

সুভাষচন্দ্রকে লেখা শ্রীনেহরুর পত্র

এলাহাবাদ
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

প্রিয় সুভাষ,

শান্তিনিকেতনে আমাদের ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি আলাপ হয়েছিল, আমার ভয় হচ্ছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে আমরা পারিনি। বাস্তবিকই পারিনি, কেন না বহু সংশয় আছে আর এও জানি না ব্যাপারগুলি কি রূপ নেবে। আমাদের এইগুলির সম্প্রসারণের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আবার একই সঙ্গে এই সম্প্রসারণ আমাদের উপর, বিশেষ করে তোমার উপর নির্ভর করছে।

আমি যা তোমাকে বলেছিলাম, তোমার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু মঙ্গল এবং কিছু ক্ষতি করেছে। আমি মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর পরে যে অনিষ্ট আসবে সেই আমার ভয়। আমি এখনো মনে করি, খতিয়ে দেখলে এই বিশেষ বিরোধ এইভাবে না ঘটলেই ভাল হোত। কিন্তু সে তো এখন অতীতের কথা, আমাদের ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হবে। এই ভবিষ্যতকে আমাদের ব্যাপক যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে, ব্যক্তিত্বের নিরিখে দেখলে চলবে না। ব্যাপারগুলো আমরা যেমনটি আশা করেছিলুম, তেমনি রূপ নেয় নি বলে আমাদের কারো পক্ষেই বিরক্ত হওয়াটা সঙ্গত হবে না। যা কিছুই ঘটুক, আমাদের আদর্শের জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠ যা কিছু তা দান করতে হবে। এটা মেনে নিলেও ঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয় এবং আমার মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

প্রথমেই আমাদের পরস্পরের মতামত যতটা সম্ভব পুরোপুরিই বুঝতে হবে। এটা যদি করা যায়, তাহলে প্রস্তাব গঠন করা তো অতি সহজ। কিন্তু অপরজনের উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে যদি আমাদের মন বিরোধ আর সন্দেহে পূর্ণ থাকে, তাহলে ভবিষ্যতকে রূপ দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। এই গত কয়েক বছরে আমি গান্ধীজী, বল্লভভাই এবং তাঁর মতাবলম্বীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছি। আমাদের মধ্যে বারংবার এবং দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে, আমরা পরস্পরকে যদিও দৃঢ় প্রত্যয় করাতে পারি নি, কিন্তু বেশ খানিকটা প্রভাবিত করেছি, আর আমার মনে হয়, পরস্পরকে আমরা অনেকখানি চিনতে পেরেছি। অনেকদিন আগে, ১৯৩৩ সালে, জেল থেকে খালাস পেয়েই আমি পুণায় গান্ধীজীকে দেখতে যাই, তিনি তখন প্রায়োপবেশনের ধকল থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন। আমাদের সংগ্রামের নানাদিক নিয়ে তখন দীর্ঘ আলাপ চলে, এবং পরে চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদান হয়, যা পরে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রগুলি এবং আলাপ-আলোচনায় আমাদের স্বভাবগত এবং মূলগত পার্থক্য প্রকাশিত হয়, আবার আমাদের মধ্যে বহু ঐক্যও দেখা যায়। তারপর থেকে গোপনে এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা চলেছে। কয়েকবারই আমার

সুভাষচন্দ্র বসু

জওহরলাল নেহরু

রাষ্ট্রপতি-পদ, এমন কি ওয়ার্কিং কমিটী ত্যাগ করবার উপক্রম হয়। কিন্তু এই ভেবে আমি বিরত হই যে, যখন ঐক্যই মূলত দরকার, তখন এটা সংকটকেই ত্বরান্বিত করবে। হয়তো আমার ভুল হয়েছিল।

এখন এই সংকট এমনভাবে এসে দেখা দিয়েছে যাকে দুর্ভাগ্যই বলা যায়। আমার নিজের কার্যপদ্ধতি স্থির করবার আগে তুমি কংগ্রেসকে কি তৈরী করতে, আর কি করাতে চাও—সে সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা থাকা উচিত। আমি তো এ ব্যাপারে একেবারে অকূল পাথারে পড়েছি। বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থী, ফেডারেশন প্রভৃতি নিয়ে বহু কথা হয়েছে, যতদূর মনে পড়ে যদিও তোমার রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ওয়ার্কিং কমিটীতে এই প্রশ্নগুলি-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কোন আলোচনা আমাদের হয় নি। জানি না, কাকে তুমি বামপন্থী আর কাকে দক্ষিণপন্থী বল। রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য প্রতিযোগিতা করার সময়ে, যেভাবে তোমার বিবৃতিতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছ, তাতে এই মনে হয়েছিল যে, গান্ধীজী আর ওয়ার্কিং কমিটীতে যাঁরা তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত বলে বিবেচিত হন, তাঁরাই দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা যাই হোন না কেন, তাঁরাই বামপন্থী। এটা আমার কাছে পুরোপুরিই ভুল বর্ণনা বলে মনে হয়। আমার মনে হয় যে তথাকথিত বামপন্থীদের অনেকেই তথাকথিত দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে বেশী দক্ষিণ মতাবলম্বী। তীব্র ভাষা, সমালোচনার ক্ষমতা এবং পুরাতন কংগ্রেসী নেতৃত্বকে আক্রমণেই রাজনীতিতে বামপন্থার পরীক্ষা হয় না। আমার মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের একটি প্রধান বিপদ এই হবে যে, যোগ্য এবং দায়িত্বশীল পদে এমন মানুষেরা গিয়ে বসবে, যাদের কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই বা যারা পরিস্থিতির সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারে না, আর উন্নত ধরণের বুদ্ধিবৃত্তির জন্যও তারা খ্যাত নয়। তারা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, তাতে মহা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর তখন প্রকৃত বামপন্থীরা ভেসে যাবেন। চীনের উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। যদি পারি তো আমি চাই না ভারত ঐ দুর্ভাগ্যের পথে চলুক।

আমার মনে হয়, বাম আর দক্ষিণ এই দুটি কথার ব্যবহারই সাধারণত একেবারে ভুল এবং বিভ্রান্তকারী। এই শব্দগুলির বদলে যদি আমরা নীতির কথা বলতাম, বোধহয় তাই-ই ঢের ভালই হোত। তুমি কোন্ নীতির পক্ষে? ফেডারেশন-বিরোধী—বহুৎ আচ্ছা। আমার মনে হয়, ওয়ার্কিং কমিটীর অধিকাংশ সদস্যই এই পক্ষে, এবং এই ব্যাপারে তাঁদের দুর্বলতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা তো শোভন নয়। ওয়ার্কিং কমিটীতে এই বিষয় নিয়ে পূর্ণ আলোচনা করা কি তোমার পক্ষে এর চেয়ে ভাল হোত না? এমন কি, এ বিষয়ে একটা প্রস্তাবও আনতে পারতে, তারপরে লক্ষ্য করতে তার প্রতিক্রিয়া। এটা ঠিকই যে, সহকর্মীদের সঙ্গে প্রথমে পুরোপুরি বিষয়টার আলোচনা না করে তাঁদের সবশুদ্ধ পিছনে হঠার জন্য দায়ী করা কচিৎ শোভন বলেই মনে হয়। তুমি যে ফেডারেশনের মন্ত্রিসভাগুলির এরই মধ্যে বিভেদের এক অদ্ভুত অভিযোগ করেছিলে, সে সম্পর্কে আমি যা বলেছিলাম, তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই নে। অধিকাংশ লোকই এটা অবশ্যম্ভাবী ভেবে নিয়েছে যে, তোমার ওয়ার্কিং কমিটীর সহকর্মীরাই দোষী।

তোমার মনে আছে, তোমার এবং ওয়ার্কিং কমিটীর কাছে য়ুরোপ থেকে আমি দীর্ঘ সব বিবরণী পাঠিয়েছিলাম। আমাদের ফেডারেশন সম্পর্কে মত কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম, আর নির্দেশ চেয়েছিলাম তুমি কোন নির্দেশ পাঠাও নি, এমন কি প্রাপ্তিস্বীকারও কর নি। গান্ধীজী আমার প্রস্তাবের প্রণালী সম্বন্ধে একমত, আমি শুনেছি ওয়ার্কিং কমিটীর অধিকাংশ সদস্যও তাই। আমি এখনো জানি না তোমার প্রতিক্রিয়া কি। কিন্তু আমাকে খবর দেওয়া ছাড়াও, তোমার পক্ষে এই বিষয় নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটীতে তন্নতন্ন আলোচনা এবং এক না এক ভাবে সিদ্ধান্ত করার কি ঐটেই সুযোগ ছিল না? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি এবং অন্যান্য ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটীতে তুমি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ভাব নিয়ে বসে আছ, যদিও কখনো কখনো বাইরে তোমার মতামত তুমি প্রকাশ করেছ। তার ফলে, তুমি পরিচালনাকারী রাষ্ট্রপতির চেয়ে সভাপাল হিসেবেই কাজ করেছ বেশি।

গত বছরের মধ্যে এ আই সি সি কার্যালয়ের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। তুমি তো ওটি দেখও নি, তোমার কাছে প্রেরিত চিঠি এবং তারগুলিরও কচিৎ কখনো জবাব পাওয়া যায়। তার ফলে বহু অফিস-সংক্রান্ত কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য পড়ে আছে। ঠিক এই মুহূর্ত, যখন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, তখন প্রধান দপ্তর আনাড়ীর মতোই কাজ করছ।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা আছে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আছে, আর আছে কিষাণ আর মজুর সমস্যা। এইগুলি সম্পর্কে বহু মত এবং বহু বিরোধ আছে। তোমার কি এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মত আছে যা তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে মেলে না? বম্বে ট্রেড ডিসপিউট বিলের কথাই ধর। এর কতগুলি বিধান সম্পর্কে আমি একমত নই। আমি যদি এখানে থাকতাম, তাহলে সেগুলি পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। তুমিও কি বিরোধী মতাবলম্বী নও, যদি তাই-ই হয়, সেগুলি বদলাবার জন্য চেষ্টা করেছিলে কি? বাংলা নিয়ে অনেকগুলি প্রদেশে, যে সাধারণ কৃষি পরিস্থিতি দেখা যায়, জানি না সে সম্পর্কে তোমার নির্দিষ্ট মত কি।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলি দ্রুতবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনের প্রসার খুব সম্ভব মহা সংকটের পথে নিয়ে যাবে, আর তাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি সহ আমরা সকলেই জড়িয়ে পড়ব। আমাদের কোন পথ গ্রহণ করতে হবে ভাবছ কি? বাংলায় তোমার যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের ইচ্ছা, গঠনতান্ত্রিকতার পথে যাবার বিরুদ্ধে তোমার প্রতিবাদের সঙ্গে একরকম খাপই খায় না। সাধারণভাবে, এটা দক্ষিণপন্থী নীতি বলেই মনে হবে, পরিস্থিতি যখন দ্রুত ঘোরালো হয়ে উঠছে, তখন তো আরো হবে।

তারপরে আছে পররাষ্ট্র নীতি, তুমি তো জানো, এদিকে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি, বিশেষত আজকের এই অবস্থায়। আমি যতদূর জানি, তুমিও তাই দিয়ে থাক। কিন্তু আমি সঠিক জানি না, কোন্ নীতি তুমি গ্রহণ করবে বলে ঠিক করেছ। আমি গান্ধীজীর মত সাধারণ ভাবে জানি, তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতও নই, যদিও আন্তর্জাতিক সংকটের দুই কি তিন বছর আমরা একসঙ্গেই চলেছি এবং চলতেও পেরেছি তিনিও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও আমরটা প্রায়ই মেনেও নিয়েছেন।

এইগুলি এবং আরও অনেক প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে এবং

আমি জানি, আরো অনেকে এই সব প্রশ্ন দ্বারা বিচলিত, তোমাকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও এর মধ্যে আছেন। এটা খুবই সম্ভব যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসে উত্থাপিত প্রশ্নের উপরে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ভোটও দিতে পারেন, আর তাতে নতুন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে।

ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের ব্যাপারে এক গাদা সমস্যার উদ্ভব হবে। সর্বশেষ সমস্যা হবে এই কমিটী গঠন, যেটি এ আই সি সি'র এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে। এই অবস্থায় সেটি খুবই শক্ত। এমন একটি কমিটী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, যার স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেই সব লোকের নীরব সম্মতির উপর যাদের দায়িত্বশীল মনে করা যায় না এবং যাদের প্রাধান্যের প্রধান যোগ্যতা হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনা করা। এমন কমিটী কারোই বিশ্বাসভাজন হবে না—সে বাম বা দক্ষিণপন্থী যাই-ই হোক না কেন। হয় সে কমিটীকে বাতিল করা হবে, নয় তো সে তুচ্ছতায় মিলিয়ে যাবে।

এটা খুব সম্ভব যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংগ্রামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বল্লভভাই, এমন কি গান্ধীজীও এতে আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়বেন। ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে এইটিই কেন্দ্রস্থান অধিকার করবে এবং অন্যদের দ্বারা গঠিত ওয়ার্কিং কমিটী নিষ্ফলভাবেই কাজ করে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। গত দশকে বা তারও আগে থেকে ওয়ার্কিং কমিটী ভারতে এবং এমন কি বাইরেও অতি উচ্চ আসন অধিকার করে আছে। এর সিদ্ধান্তগুলির কিছু অর্থ ছিল, এক কথায় শক্তি ছিল। সে বড় বেশি চিৎকার করে নি, কিন্তু যা বলত, তার আড়ালে ছিল শক্তি আর কাজের পরিচয়। আমার তো ভয় হয়, আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের অনেকেই আর কিছুর চেয়ে কড়া ভাষা ব্যবহারেই বেশি বিশ্বাসী। নরীম্যানের মত জনসেবক আমার কোনো প্রশংসাই পাবে না। আর এই ধরণের বহু কর্মী চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে।

আমরা একটা বিশ্রী ফাঁদে পড়েছি এবং এই মুহূর্তে তার থেকে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট উপায় আমি দেখিনে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে রাজী, কিন্তু ব্যাখ্যা এবং নেতৃত্ব তোমার কাছ থেকেই আসতে হবে, তখনি আমার পক্ষে তারা নিজেরা যোগ্য কি অযোগ্য তা স্থির করা সম্ভব হবে। অবস্থাটির সবগুলি লক্ষণ পর্যালোচনা করে, উপরে উল্লিখিত নানা সমস্যা খতিয়ে দেখে তাদের উপর একটি বিস্তারিত মন্তব্য লেখার জন্ত তাই তোমার কাছে প্রস্তাব করব। এটি প্রকাশের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যাদের সহযোগিতার জন্ত তুমি আহ্বান করছ তাদের এটি দেখানোই উচিত হবে। এমনি ধারা মন্তব্যই হবে আলোচনার ভিত্তি এবং এই আলোচনাই বর্তমানের কানাগলি থেকে পথ পেতে সাহায্য করবে। কথাই যথেষ্ট নয়, কথা তো অস্পষ্ট আর প্রায়ই বিপথে নিয়ে যায়, এরই মধ্যে অস্পষ্টতা তো ঢের পেয়েছি। ব্রিটিশ সরকারকে তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার প্রস্তাবটা আরো বিশদ করে যাতে জানাও তাই-ই আমার ইচ্ছে। ঠিক কি ভাবে এ ব্যাপারে এগোতে চাও, তারপরেই বা কি করবে? আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি তোমার এই ভাবধারা আদৌ পছন্দ করি না, কিন্তু যদি তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর, তাহলে হয়ত আগের চেয়ে ভাল করে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হতে পারে।

সংবাদপত্রে তোমার বিবৃতি আমি দেখেছি। সেটা এতই অস্পষ্ট যে তোমার অবস্থা কি সেটা আমার পক্ষে বোঝাই দায়। তাই পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্ত আমার এই অনুরোধ।

জনগণের কার্যে আদর্শ এবং নীতি জড়িত থাকে। আর সেগুলিতে থাকে পরস্পরকে বোঝাবুঝি এবং সহকর্মীর প্রতি বিশ্বাস। যদি বিশ্বাস এবং বোঝাবুঝির অভাব ঘটে, তাহলে সহজভাবে সহযোগিতায় সুবিধা করা শক্ত। আমার যত বয়স বাড়ছে, আমি তত সহকর্মীদের মধ্যে এই বুঝাবুঝি আর বিশ্বাসের প্রতি ক্রমেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। সবচেয়ে চমৎকার আদর্শ দিয়ে আমার কি হবে, যদি না সংশ্লিষ্ট মানুষের উপর আস্থা থাকে? বহু প্রদেশে দলাদলি এর উদাহরণ, সাধারণত যাঁরা স্পষ্টবাদী এবং সম্মানভাজন মানুষ, তাঁদের মধ্যেই আমরা চরম তিক্ততা এবং প্রায়ই একেবারে বিবেকবর্জিত ভাব দেখতে পাই। এ জাতের রাজনীতি আমি হজম করতে পারি নে, আমি এসব থেকে বহুদিন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমি কোন গোষ্ঠী বা দ্বিতীয় মানুষের সমর্থন ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে কাজ করছি, যদিও আমি বহু লোকের বিশ্বাসভাজন হতে পেরে যথেষ্টই সুখী। আমার মনে হয়, এই প্রাদেশিক অবনতি এখন অখিল ভারতীয় স্তরে স্থানান্তরিত বা প্রসারিত হচ্ছে। আমার কাছে এটা সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার বিষয়।

তা হলে এই কথায়ই আমরা ফিরে আসছি: রাজনৈতিক সমস্যার আড়ালে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এবং এইগুলির ব্যবস্থা করাই বেশি শক্ত। পরস্পরের কাছে পূর্ণ সরলতাই হচ্ছে এর একমাত্র উপায় এবং আমি তাই আশা করি যে, আমরা সবাই পুরোপুরি সরল হব।

তুমি এই চিঠির জবাব এখনি দেবে তা আশা করি নে। কয়েক দিন সময় লাগবে বই কি। কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে প্রাপ্তি স্বীকার করে খবর দেবে।

তোমার প্রীত্যর্থী

জওহর

শ্রীনেহরুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র

চউরাম্, গয়া জিলা

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

কলকাতায় বসেই তোমার দীর্ঘ চিঠিখানি পাই। তুমি আমার ত্রুটিগুলির উল্লেখ করেছ। সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও একথা বলতে পারি যে, কাহিনীর আর একটা দিকও আছে। অধিকন্তু, আমাকে যে বাধাগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, সেগুলি কারও ভোলা উচিত নয়। এই চিঠিতে সে সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই নে—তার খানিকটা কারণ এই যে, তাতে মতদ্বৈধের সৃষ্টি করবে, আর খানিকটা এই যে, তাতে অন্ত লোকের উপর কটাক্ষ করতে হবে। এখন আসল বিষয় হচ্ছে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের কার্যসূচী। ১২ তারিখে জয়প্রকাশ তোমার সঙ্গে দেখা করে কার্যসূচী সম্পর্কে আমার মত জানাবে। আমারও ঐ সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা পারব বলে মনে হয় না। যা হোক, এই মাসের বিশ তারিখে তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে দেখা করতে চেষ্টা করব।

রাজকোট প্রভৃতি সম্পর্কে তোমার বিবৃতি দেখেছি। চমৎকার

বিবৃতি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে একটি ত্রুটি আছে। বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাদের ফাঁদে গিয়ে ধরা দেব না। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে রাজ্যগুলির সমস্যা নিয়ে যখন লড়াই চালাব, তখনি স্বরাজের প্রস্তাব নিয়ে সোজাসুজি বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধে আহ্বান করতে হবে তোমার বিবৃতিতে সেই ভাবধারাটি আমি পাই নি। স্বরাজের কাজ ফেলে দিয়ে শুধু দেশীয় রাজ্যের সমস্যা নিয়ে যদি বৃটিশ সরকার আর দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে শুরু করি, তাহলে আমার মনে হয়, আসল লড়াই থেকে সরে গিয়ে বিপথে চালিত হবার দায়িত্বে পড়ছি। দেখা হলে আরো কথা হবে।

তোমার প্রীত্যর্থী
সুভাষ
জিয়ালগোরা পোঃ জেলা মানভূম, বিহার
এপ্রিল ১৫, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে তিনি তার প্রতিলিপি অন্যান্যদের মত তোমার কাছে পাঠিয়েছেন কি না জানি না। যদি তুমি তা না পেয়ে থাক সেজন্য সর্বশেষ পরিস্থিতি তোমাকে জানাচ্ছি। তোমার মতামত ও আমার ভবিষ্যৎ কর্মক্রম সম্পর্কে তোমার উপদেশ পেলে খুশী হব।

মহাত্মাজী একটি সমসত্বমূলক ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করার পক্ষে। তিনি চান আমি প্রথমে কমিটীর সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করি এবং তারপর আমার কার্যসূচী ঘোষণা করি। তারপর রায়ের জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মুখীন হই।

আমি মহাত্মাজীকে বার বার জানিয়েছি একাধিক কারণে আমি এরকম কমিটী গঠন করতে পারি না। তাছাড়া আমার নিজস্ব কর্মসূচী প্রণয়ন ও ঘোষণার দায়িত্ব কংগ্রেস আমায় দেয় নি। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে (পন্থের প্রস্তাবানুযায়ী) আমায় ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করতে শুধু বলা হয়েছে।

কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে আমি এই বলে শেষ করেছি যে, সব কিছু ব্যর্থ হলে ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের দায়িত্ব তাঁরই গ্রহণ করা কর্তব্য—কারণ সমসত্বমূলক ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন তা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। শেষ দুটি চিঠিতে আমি এ কথাই বলেছি জোর দিয়ে যে তাঁরই গ্রহণ করা উচিত এই দায়িত্ব।

আমি জানি না মহাত্মাজী স্বয়ং ওয়ার্কিং কমিটী ঘোষণা করবেন কি না। যদি করেন তাহলে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটবে; কিন্তু যদি তিনি তা না করেন? সেক্ষেত্রে বিষয়টি যাবে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সামনে। এরকম পরিস্থিতিতে তাঁরাই বা কি করবেন আমি জানি না।

আমার ধারণা পত্রালাপের মাধ্যমে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাবে না। আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোন একটা মীমাংসায় পৌঁছাবার শেষ চেষ্টা করব। কিন্তু রাজকোটের ব্যাপারে গান্ধীজীর গতিবিধি এখন অনিশ্চিত এমন কি রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তিনি কলকাতা আসবেন কি না তারও কিছু ঠিক নেই। অবশ্য তিনি একটি তারবার্তায় আমায় জানিয়েছেন যে, তিনি আসবার 'প্রাণপণ প্রয়াস' পাবেন।

এখন গান্ধীজী যদি ওয়ার্কিং কমিটী গঠন না করেন, সেক্ষেত্রে আমি গান্ধীজীর সাক্ষাৎ সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখব। এই মুলতুবী কি রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের সমর্থন পাবে? নাকি আমার বিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ উত্থাপিত হবে? অনেকেই মনে করেন যে আমাদের সাক্ষাৎকার ও মীমাংসার শেষ চেষ্টা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন না হওয়াই ভাল। যদি মহাত্মাজী ২৭ তারিখের পূর্বে—ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক যখন বসার কথা—কলকাতায় পৌঁছতে না পারেন তবেই অধিবেশন স্থগিত রাখার দরকার হবে। এখন এই অধিবেশন সম্পর্কে তোমার মত কী?

মহাত্মাজী যদি ইতিমধ্যেই আমাদের পত্রাবলী তোমাকে পাঠিয়ে না থাকেন তাহলে আমি তা পাঠিয়ে দিতে পারি।

আর একটি কথা। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানে আসা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে? তাহলে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে পারে এবং কী ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে সম্পর্কে তোমার পরামর্শ আমি পেতে পারি।

চিঠিটা সংক্ষেপে ও খুব তাড়াতাড়ি লিখে এক বন্ধু মারফৎ পাঠাচ্ছি। আমি জানি না সর্বশেষে পরিস্থিতি সঠিক জানাতে পারলাম কি না—আশা করি পেরেছি।

যদি তুমি আসবার মত সময় করে উঠতে পার, তাহলে সময় বাঁচাবার জন্য তুমি তুফান এক্সপ্রেস (এইট ডাউন) ধরতে পার। বিকাল ৪-৩০ মিনিটে সেটি ধানবাদ পৌঁছায়। তুমি বম্বে মেলে ফিরে যেতে পার। মধ্যরাত্রে সেটি ধানবাদে আসে ধানবাদ থেকে জামাডোবার দূরত্ব ৯ মাইল স্টেশনে তোমার জন্য গাড়ি থাকবে।

প্রীতিবদ্ধ
সুভাষ
জিয়ালগোরা পোঃ
এপ্রিল ২০, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

অদ্য আমি মহাত্মাজীকে দুটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, একই দিনে তাঁকে পাঠানো চিঠিতে তার একটির বক্তব্য পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমার চিঠি ও টেলিগ্রামের প্রতিলিপি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

টেলিগ্রামটিতে (আমাদের পত্রালাপ এখন প্রকাশ না-করার কথা যাতে) তোমার নাম ব্যবহার করেছি। আশা করি তোমার আপত্তির কিছু নেই তাতে।

গান্ধীজীর জ্বরের খবরে আমি উদ্বিগ্ন হলাম। আশা করি শিগগিরই তা সেরে যাবে কিন্তু ভগবান না-করুন, তাঁর জ্বর যদি এর মধ্যে না ছাড়ে তাহলে আমি কী করব? এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ প্রত্যাশা করি। এখন তাঁর শরীর এত দুর্বল জেনে উদ্বেগ বোধ করছি তুমি এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে কিছু লিখবে আমায়। আমি আগামীকাল—একণে কলকাতা যাচ্ছি।

প্রীতিবদ্ধ
সুভাষ

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার]

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ১২ নম্বর বাড়ী, স্বদেশী যুগের একটি ঐতিহাসিক মন্ত্রণাগৃহ—বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ এখানে আসেন যখন—তখন জাতীয়-আন্দোলনের পূর্ণ প্রকাশ। 'বন্দেমাতরম' প্রেস ও সংবাদপত্র উহার সংলগ্ন ক্রীক রো-তে ছিল। বহুবার পুলিশের বিষদৃষ্টি পড়ে এই বাড়ীটার ও বাড়ীর কর্তা ত্যাগব্রতী কর্মনায়ক স্বর্গত রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিকের উপর। অবিচার ও অত্যাচারও বাদ যায় না। তিনি 'রাজা' হয়েছিলেন উল্লসিত মুগ্ধ জনতা কর্তৃক—কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দানের কথা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে ভারতবর্ষের প্রথম নয়জন ডেটিন্যুর অন্যতম ছিলেন এই 'রাজা'। সুরাট কংগ্রেস প্রতিনিধি দল, বরিশাল সম্মেলন, বিপ্লব-আন্দোলন, বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবসায় আরম্ভ, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সমস্ত আয়োজনের ব্যয়ভার ছিল তাঁহার। বংশের অলিখিত নিয়মমাফিক নয় বৎসর বয়সে পিতা প্রবোধচন্দ্রকে হারানোর পর ফ্যাসানের নেতা, কবিগুরু দোসর ও পরবর্তী কালের বিলাতী-পণ্য বর্জন আন্দোলনের মুখ্য-নেতা ৺হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের নিকট প্রতিপালিত হন ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধচন্দ্র। প্রচুর বিলাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন খুল্লতাত—চুপি চুপি ইংল্যাণ্ডে গেলেন মেজকাকা ব্যারিষ্টার মন্মথনাথের নিকট—কেমব্রিজ-ট্রিনিটি কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন—কিন্তু স্নেহময়ী পিতামহীর আহ্বানে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে কলিকাতায় ফেরেন সুবোধচন্দ্র।

এই স্বনামধন্য পুরুষের আদি-নিবাস ছিল হুগলী জেলার কাঠাগোড় গ্রাম। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মল্লিকপুর এঁদের পূর্বপুরুষদের অবদান। বংশের ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন পুরন্দর খাঁ। হোসেন শাহর দরবারে মন্ত্রী ছিলেন এই বংশের একজন—তিনি 'মল্লিক' উপাধি পান প্রপিতামহ রাধানাথ মল্লিক রীড সাহেবের সঙ্গে হুগলী ডকিং কোম্পানীর পত্তন করেন— পয়সা এল প্রচুর প্রতিপত্তি বাড়ল খুব—জমিদারী হল অনেক—কিন্তু দান-দাতব্য ও রাজরোষে বর্তমান শতকের প্রথমভাগে দেশব্যাপী সম্মান ছাড়া আর সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল।

রাজা সুবোধচন্দ্র ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলপ্রভা বসুমল্লিকের অন্যতম সন্তান হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক। নয় বৎসরের বালক পিতাকে দার্জিলিং এ চিরকালের মতন হারিয়ে কলিকাতায় এলেন কপর্দকহীন অবস্থায়। দলিল অনুযায়ী পনের বৎসরের মধ্যে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর মূলধন পনের লক্ষ না হওয়ায় শ্রীমতী বসুমল্লিক স্বামী-প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা গ্রহণে আপত্তি তোলেন—কিন্তু সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখেন। এগার বৎসর বয়সে প্রবীরচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের শিশুশ্রেণীতে ভর্তি হন। ১১২৬ সালে রাণীভবানী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া ১১২১ সালে প্রবেশিকা ও ১১৩২ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে আই-এ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়ার সময় তিনি আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা ও অনুশীলন দলের অন্যতম মধ্যমণি হিসাবে ধৃত হন। ভগ্নীপতি প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের তত্ত্বাবধানে থাকা ও বিলাতে অধ্যয়ন—এই দুই সর্তে পনের দিন পরে তিনি মুক্ত হন। ১১৩৩ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং এক বৎসর এক পাদ্রীর গৃহে থাকেন। ১১২৪-৩৭ সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ-ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হন। মিডল-টেম্পল-এ ব্যারিষ্টারীর টার্ম শেষ করেও পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। শ্রীবসুমল্লিক কেমব্রিজ মজলিসের সভাপতি ছিলেন ও কলেজের রোয়িং ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ইংল্যাণ্ড হ'তে ফিরে তিনি দুই বৎসর কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী ইতিহাস-অধ্যাপক হিসাবে কার্য করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়, দেবব্রত ধর ও আর, গুপ্ত (D.I.G.S) অমলেশ ত্রিপাঠী, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র নাম উল্লেখযোগ্য। ১১৪১সালে

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক

তিনি হিন্দু কলেজে (দিল্লী) যোগদান করেন এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

১৯৫৮ সালে তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের রেজিষ্ট্রার হিসাবে যোগদান করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আগ্রহে অধ্যক্ষ ডঃ ত্রিগুণা সেন ও শ্রীবসুমল্লিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের আয়োজন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

প্রবীরচন্দ্রের লেখার আগ্রহ বরাবর ছিল। 'পরিচয়' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ ও বিদেশী সংবাদ লিখতেন এবং পুস্তক-সমালোচনা বিভাগের তিনি অন্যতম সমালোচক ছিলেন। দেশবরেণ্য বৈদান্তিক স্বর্গত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র ও শ্রীবসুমল্লিকের পিসতুতো দাদা পরলোকগত কবি মনস্বী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখার বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীকে তিনি ১৯৩১ সালে বিবাহ করেন।

ডাঃ শৈলেশচন্দ্র রায়

(বিজ্ঞান কলেজের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক)

বঙ্গ জননীর যে সকল সুসন্তান কিশোর বয়স হতে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে স্বাধীনতা সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন ডাঃ শৈলেশচন্দ্র রায় তাঁহাদের অন্যতম। ছাত্রাবস্থায় কিশোর বালক শৈলেশচন্দ্রের মনে একদা যে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যেই তার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও তাঁর দেশাত্মবোধ মুহূর্তের জন্যও ম্লান হয়ে যায় নাই।

ডাঃ শৈলেশচন্দ্র রায়

স্বর্গত অখিলচন্দ্র রায় ও মনোরমা দেবীর তৃতীয় সন্তান শৈলেশচন্দ্র রায় ১৯০৪ সালে ঢাকা জেলার মালিতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে স্বীয় গ্রামে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া পরে ঢাকা সহরে পাকোজা স্কুলে আসিয়া ভর্তি হন। ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষার্থী তখন তিনি।

দেশজোড়া তখন অসহযোগ আন্দোলন, সেই উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে পরীক্ষার কথা ভুলে অংশগ্রহণ করলেন আন্দোলনে। দেশমাতৃকার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে শিক্ষাকে অগ্রাহ্য না করে পর বৎসর ১৯২২ সালে পাশ করলেন প্রবেশিকা পরীক্ষা। ১৯২৪ সালে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হতে আই, এস-সি পাশ করে ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ডিগ্রি লাভ করবার পর রাজনৈতিক জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন পুনরায়। ১৯৩০ হতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভোগ করেন কারাজীবন। এই জেল জীবনেই তিনি এম-এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৮ হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত অধুনা বিলুপ্ত ঢাকার "শ্রীসঙ্ঘ-"এর সঙ্গে পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে রাজনৈতিক জীবন ছেড়ে ডাঃ জে সি ঘোষের প্রেরণায় শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। ৩৭ বৎসর বয়সে স্বর্গত দেশ নেতা অনিল রায়ের জ্যেষ্ঠতাতপুত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪৫ সালে ভিটামিন 'সি'-এর উপর থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে ঘোষ ট্র্যাভেলিং বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা যান। দুই বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কিছুদিন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চে যোগদান করেন। প্রায় তিন চার মাস উক্ত সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার পর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে লেকচারারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে উক্ত বিভাগের রীডারের পদ লাভ করেন। ১৯৬২ সালে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। অদ্যাবধি তিনি ঐ পদেই বহাল আছেন।

রাজনৈতিক জীবনে নেতাজীর আদর্শ, শিক্ষা-জীবনে ডাঃ জে সি ঘোষের প্রেরণা তাঁর মনে যে দেশাত্মবোধ ও শিক্ষানুরাগ সঞ্চার করে তা এখনও অটুট আছে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক কাজে তাঁর এক বিশেষ আনন্দ। ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে গবেষণার কাজে আজ তিনি নিবিষ্ট।

জ্যোতিষ-সম্রাট রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

[নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত জ্যোতিঃশাস্ত্র-সভার সভাপতি]

প্রগাঢ় জ্ঞানদীপ্ত পরলোকগত পিতার যোগ্য উত্তরসাধক—হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের অন্যতম প্রতিভূ—অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—সহৃদয়, অসাধারণ মেধাসম্পন্ন এবং সনাতন ব্রাহ্মণতনয় রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি, জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ১৯১০ সালের ৬ই অক্টোবর ঢাকা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জিলার সপ্তগ্রাম কিন্তু চট্টগ্রামের 'চন্দ্রনাথ মন্দির' দর্শনে গিয়া জনৈক পূর্বপুরুষ বিবাহসূত্রে নোয়াখালির স্থায়ী বাসিন্দা হন। রমেশচন্দ্রের পিতা নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত জ্যোতিঃশাস্ত্র সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি স্বর্গত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য জ্যোতিভূর্ষণ মহাশয় প্রথমে কুমিল্লা, ঢাকা ও পরে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন।

রমেশচন্দ্র নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া সিটি ও বিদ্যাসাগর কলেজে উচ্চশিক্ষা সমাপন করেন। কিশোর বয়স হইতে তিনি পিতার নিকট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিবিজ্ঞান শিখিতে থাকেন। পিতার অসুস্থতার জন্য ও তাঁহার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি আরও পড়াশুনা করিতে অসমর্থ হন।

তিনি ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার সহিত ভারতীয় ভাষাসমূহের আদি জননী সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, বেদ ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। প্রখ্যাত তান্ত্রিক ও যোগী স্বামী যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট তিনি তন্ত্র ও যোগাভ্যাস শিক্ষা করেন। ২৮ বৎসর বয়সে সস্ত্রীক তিনি স্বর্গীয় তান্ত্রিকাচার্য সারদামোহন ভট্টাচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তজ্জন্য সেই বয়স হইতে তিনি আহার-বিহার ও কথাবার্তায় সংযত জীবন যাপন করিতেছেন।

রমেশচন্দ্রের ব্যারিষ্টার হইবার স্পৃহা বরাবর ছিল কিন্তু ১৮ই জুন ১৯৩৬ সালে পিতার স্বর্গারোহণের পরে তাঁহাকে পিতার পূর্বনির্দেশিত পথে ও দৈবাদেশে বর্তমান কর্মজগতে আসিতে হয়। অবশ্য তিনি দুই মাস এবিষয় চিন্তা করেন। উক্ত বৎসরেই তিনি নিখিল ভারত জ্যোতিঃশাস্ত্র সভার সভাপতিপদে বৃত হন। তাঁহার জ্যোতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষবিষয়ক প্রগাঢ় জ্ঞান আজ শুধু ভারতবর্ষে নহে—সাগরপারেও সমাদৃত।

জ্যোতিষ-সম্রাট রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯৩৮ সালে ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডলের সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভারতাচার্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এবং ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের উপস্থিতিতে রমেশচন্দ্রকে 'জ্যোতিষ-শিরোমণি,' ১৯৪৭ সালে বারাণসীধামের পণ্ডিত মহাসভা প্রদত্ত 'জ্যোতিষ-সম্রাট' (পদ্মশ্রী মহামহোপাধ্যায় ৺পণ্ডিত হরিহরকৃপালু দ্বিবেদীর পৌরোহিত্যে) উপাধিসমূহ প্রদান করা হয়। ১৯৩৬ সালে এম, আর, এ, এস (লণ্ডন) সম্মান অর্জন করেন।

জ্যোতিষ-সম্রাটের হস্তরেখা বিচার, গণনা, তন্ত্রসাধন বিষয়ক অভাবিত ও অজানিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ, ভারতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, সন্তোষের মহারাজার কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচনে পরাজয় ও তাঁহার মৃত্যু, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জির নিকট মতামত প্রকাশ ও তান্ত্রিকক্রিয়ার দ্বারা মামলায় জয়লাভে সাহায্য ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এই পর্যন্ত পণ্ডিত রমেশচন্দ্রের নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফেরেন নাই। বহু দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী ও নিঃস্বদের তিনি নিয়ত সাহায্য করিয়া থাকেন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত আছেন। প্রতিটি দর্শনীয় জিনিষের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ও উহার শিক্ষামূলক বিশ্লেষণ ও সমাধান—তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার লেখা জন্মমাস রহস্য বা দ্বাদশ রাশিবিজ্ঞান (বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়), Interpretation of Dreams, Questions & Answers, শতকুণ্ডলী ইত্যাদি পুস্তকগুলি বহুজনসমাদৃত।

শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায়

[মহীয়সী মহিলা]

ভাল কেরাণী হওয়ার চেয়ে ভাল মা হওয়ার সম্মান, নামজাদা ইঞ্জিনীয়ার অপেক্ষা আদর্শ গৃহিণীর মর্যাদা আজ বোধ হয় আমাদের সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। অফিসে তারা কেরাণী, স্কুলে শিক্ষয়িত্রী, কিন্তু সংসারে সম্রাজ্ঞী। শ্যামলা বাংলা মায়ের বুকে স্নেহময়ী বঙ্গজননীর কল্যাণময়ী মূর্তি সংসারে যে শ্রী আনে, তার তুলনা বোধ হয় বিশ্বে আজও বিরল বিশ্ব-সংসারের মাতৃত্ব নিয়ে বাংলার ঘরে ঘরে আজও এমন জননী রয়েছেন। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে যুগের দাবী নূতনের আহ্বান জানালেও বঙ্গজননীর বুকে চিরন্তন স্নেহময়ী জননী মূর্তি যে বাংলার ঘরে ঘরে আজও বর্তমান—শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায় তার অন্যতমা উজ্জ্বল প্রমাণ।

বরিশাল জেলা সহরে এক প্রতিষ্ঠাবান বংশে ১৯১৬ সালে

শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায়

জন্মেছিলেন শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকে অপার ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও ঠাকুমা দিদিমার আদর্শেই মানুষ হয়েছিলেন তিনি। আদর্শগত ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করেই বিদেশী ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ না করে ভর্তি হলেন দেশী স্কুলে। বরিশাল সদর স্কুল হতে বাল্যশিক্ষা শেষ করে উড়িষ্যায় এসে ভর্তি হলেন তিনি। এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের আদুরে মেয়ে বিভা। বাবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন সহর নূতন দেশ দেখে বেড়ালেও স্বীয় জন্মভূমি বরিশালের কথা ভুলতে পারেননি কোনদিন। বরিশালের নদী, গ্রাম, সর্বোপরি তাঁর ঠাকুমা দিদিমা যে মোহ সৃষ্টি করেছিলেন, জীবনে তা ভুলতে পারেননি আজও। বয়স বাড়তে লাগলো, কিশোরী মেয়ে যৌবনের পথে পা বাড়ালেও ঠাকুমা দিদিমার আদর্শই যেন বড় করে দেখা দিয়েছিল জীবনে। স্কুলের পড়া অপেক্ষা ঘরের ও পরের শেখানোতেই ভরে উঠলো মন। বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীপুজা, সোমবারের ব্রতকথা কোনটাই বাদ রইলো না কুমারী-জীবনে। ৺সরস্বতী অপেক্ষা ৺লক্ষ্মীর প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হলেন বিভা মুখোপাধ্যায়।

সরস্বতীর আসন থেকে লক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠা করতেই মনস্থ করলেন বাবা-মা। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয় বলেই ভাগ্য নিয়ে দুর্ভোগ ভুগতে হয় শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের। বর্ধমান জেলার স্বর্গত রতন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ হয়ে এলেন তিনি। তাঁর স্বামী তখন তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের অধীনে প্রথম শ্রেণীর অফিসার! ঠাকুমা দিদিমার আদর্শে গড়ে ওঠা বিভা জয় করলেন স্বামীর সংসার। আনন্দ পেলেন শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-দেবর, সুখী হলো সমগ্র পরিবার। পিতৃকুলে বা শ্বশুরকুলে অভাব-অভিযোগ না থাকলে সামান্য অভিযোগ ছিল স্বীয় জীবনে।

উচ্চশিক্ষিত স্বামীর পাশে সামান্য একটু ডিগ্রির মোহ ব্যথিত করে তুললো মনকে। অশান্ত মনকে শান্ত করে মনস্থ করলেন পরীক্ষা দিতে।

১১৩৫ সালে সকলের অজান্তে ঘরকন্নার মাঝে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন শ্রীমতী বিভা। সকল দুঃখ জয় করে মহা আনন্দে সংসার করছেন তিনি। শুধু নিজের ঘরে নয় পরের ঘরেও সমান ভাবে সমাদৃতা তিনি। সকল সন্তানের মা বলেই বোধ হয় আপন কোলে সন্তান দেন নাই বিধাতা। কোন ছেলের অসুখ—ঔষধ কিনছেন তিনি, কোন ছেলের খাওয়া জোটে নি—খাবার জোগাচ্ছেন তিনি। কার গায়ে জামা নেই—জামা কিনছেন তিনি। আজ আর তিনি একক ছেলের মা নন, সকল ছেলেরই মা।

অসীম সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলেন শ্রীমতী বিভা। সম্ভ্রান্ত পিতার ঘরে জন্ম নিয়ে গৃহবধূ হয়ে এসেছিলেন উপযুক্ত স্বামীরই ঘরে।

শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায়ের স্বামী শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বর্তমান ইনস্পেক্টর জেনারেল। ভারত-সরকারের নৌ-বহরের ভাইস এড্‌মিরাল শ্রীঅধর চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের সহোদর।

ব্যক্তিগত-জীবনে দরিদ্রসেবা ও সমাজসেবাই শ্রীমতী বিভার একমাত্র আদর্শ বা ব্রত।

মন ছুটে যায়

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আজি কল্পনা-বায় মন ছুটে যায়
কোন্ সুদূরের পারে।
ওগো কোন্ তরুণীর মধু-যামিনীর
মর্মের অভিসারে।
কোন্ সাগরের ওপারে
বালুচর ছাড়ি ওধারে,
কোন্ অলকার যক্ষ-প্রিয়ার
ছিন্ন মালার ধারে!
আজি কল্পনা-বায় মন ছুটে যায়
কোন্ সুদূরের পারে॥

ওগো কোন্ গোধূলির আলোক অধীর
ছুঁয়ে যায় বেলাভূমি?
কোন্ আলেয়া রে মরণের পারে
জীবনেরে যায় চুমি!
কোন্ কুন্দশুভ্রা তরুণী
করিছে ফাগুন হরণ-ই,'
ওগো কোন্ উপবনে পরী নিজ মনে
বাজাইছে ঝুমঝুমি।
ওগো কোন্ গোধূলির আলোক অধীর
ছুঁয়ে যায় বেলাভূমি॥

ও সে কোন্ জোছনায় মন ছুঁয়ে যায়
কোন্ অপরূপ মায়া!
রাগিণী শুনায় কিসের সেথায়
মিছে হয়ে যায় কায়া॥
গেঁথে দেয় প্রেম কুসুমে,
স্বর্ণ-মধুর সুষমে
নর্ম করিতে কর্ম ভুলিয়া
ছায়াপথ ফেলে ছায়া।
ওগো কোন্ জোছনায় মন ছুঁয়ে যায়
কোন্ অপরূপ মায়া॥

জয়শ্রী বসু
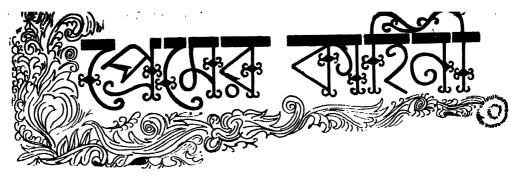
রাজকুমারী পোকাহোণ্টাস

উত্তর আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশ তামাকের জন্য বিখ্যাত। 'ভার্জিনিয়া টোবাকো' না হলে ভাল সিগারেট তৈরী হয় না। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে একটি অভিযাত্রী দল নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন উপনিবেশের পত্তন করতে। রাণী এলিজাবেথ ছিলেন 'ভার্জিন কুইন' অর্থাৎ কুমারী রাণী। এই ভার্জিন কুইনের সম্মানে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে এই প্রদেশটির নামকরণ করেন ভার্জিনিয়া। ভার্জিনিয়া নামটির সঙ্গে তাই একসঙ্গে জড়িত আছেন রাণী এলিজাবেথ ও স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে।

স্যার ওয়াল্টার ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান গুণী লোক, রাণীর আস্থাভাজন প্রিয়পাত্র। রাজনৈতিক নানা কারণে তাঁর যখন পতন হ'ল, তিনি বন্দী হয়ে কারাগারে (Tower of London) নিক্ষিপ্ত হলেন। ওয়াল্টার র‍্যালের পরে আরেকটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ক্যাপ্টেন জন স্মিথ ভার্জিনিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মহা বিপদে পড়লেন। সেখানকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের অধিপতি ছিলেন পাউহাটন। এই রাজার মেয়েই আমাদের কাহিনীর নায়িকা রাজকুমারী পোকাহোণ্টাস।

সাদা পাল তোলা জাহাজে চড়ে সাদা জাতের লোকেরা এখানে এসে জায়গা দখল করে বসতি করবে, রেড-ইণ্ডিয়ানরা এবং তাঁদের রাজা পাউহাটন বিশেষ পছন্দ করেনি। তাই এই বহিরাগত অভিযাত্রীদের নিয়ে চলত নানা রকম আলোচনা। সেই আলোচনার কিছু কিছু যেত পোকাহোণ্টাসের কানে। কিন্তু সে সময় পোকাহোণ্টাস বয়সে বালিকা মাত্র। এ নিয়ে সে মাথা ঘামাত না।

ক্যাপ্টেন জন স্মিথের বিপদের কথা বলি। তিনি রেড-ইণ্ডিয়ানদের খাদ্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন। ধরা পড়লে বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয়ই আছে তা ক্যাপ্টেন স্মিথের জানা ছিল। কিন্তু এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে নিয়মিত খাদ্য সংগ্রহ করাও সহজ নয়; নিতান্ত দায়ে ঠেকে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েও তিনি রেড-ইণ্ডিয়ানদের ভাণ্ডার থেকে খাদ্য চুরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বরাত খারাপ, ধরা পড়ে গেলেন।

তাঁকে বিচারের জন্য ধরে নিয়ে আসা হ'ল রেড-ইণ্ডিয়ানদের রাজা পাউহাটনের দরবারে। দরবারের এক পাশে বসেছিল পাউহাটনের প্রিয় কন্যা পোকাহোণ্টাস—তার বয়স তখন ১১ বছর। পাউহাটনের ইশারার সঙ্গে-সঙ্গে একদল রেড-ইণ্ডিয়ান ক্যাপ্টেন স্মিথকে ধরে নিয়ে বেঁধে শুইয়ে দিল এক পাথরের খণ্ডের উপর। বিরাট কাঠের গদা হাতে কয়েক জন রেড-ইণ্ডিয়ান তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল, পোকাহোণ্টাস বুঝল ঐ অসহায় শ্বেতকায় ব্যক্তিটিকে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে হত্যা করা হবে। ঐ পাথরের ওপর এই ধরণের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পোকাহোণ্টাস আরও কয়েক বার দেখেছে। সে তাই আতংকে শিউরে উঠল। এই নির্ভীক বন্দীকে দেখে পোকাহোণ্টাসের বড় ভাল লেগেছিল। ক্যাপ্টেন স্মিথেরও ভাগ্য ভাল তিনি বালিকা পোকাহোণ্টাসের দিকে তাকিয়ে একবার প্রশান্ত হাসি হেসেছিলেন, কারণ এতগুলি বীভৎস নিষ্ঠুর মুখের ভেতর হঠাৎ বালিকার মুখের কমনীয়তা দেখে একটু ক্ষণিকের সান্ত্বনা বা তৃপ্তি পেয়েছিলেন, মরুভূমির বুকে হঠাৎ একটু মরুদ্যান দেখে তৃপ্তি পাওয়ার মত। রেড ইণ্ডিয়ানরা বন্দী স্মিথকে পিটিয়ে মারা সুরু করতে যাবে, এমন সময় পোকাহোণ্টাস চীৎকার করে ছুটে গিয়ে স্মিথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'না, না এঁকে তোমরা মারতে পারবে না। এঁকে আমার চাই।'

আদরিণী মেয়ের আব্দার রাখতে পাউহাটন ক্যাপ্টেন স্মিথের প্রাণরক্ষা করলেন, কিন্তু একেবারে মুক্তি দিলেন না। তাঁকে রেখে দেওয়া হ'ল রাজকুমারীর ফরমাস খাটবার ভৃত্যরূপে। পোকাহোণ্টাস তাঁকে যখন যা করতে বলবে তিনি তাই করবেন। ক্যাপ্টেন স্মিথকে পোকাহোণ্টাসের খুবই ভাল লেগেছিল। কৃতজ্ঞ ক্যাপ্টেন স্মিথও তাঁর প্রাণরক্ষাকর্ত্রী বালিকাকে যথাসাধ্য খুশী রাখতে চেষ্টা করতেন। কিছুদিন পরে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন।

কয়েক বছর পর। পোকাহোণ্টাস তখন আর বালিকা নয়, তখন তাকে তরুণী বলা যেতে পারে। ইংলণ্ড থেকে এলেন জন রল্‌ফ নামে এক তরুণ যুবক। এখানে এসে জন রল্‌ফ তামাকের চাষ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রাজকুমারী পোকাহোণ্টাস জামিন রূপে বন্দী হয়েছিলেন ঔপনিবেশিক ইংরেজদের হাতে। জন রল্‌ফকে দেখেই পোকাহোণ্টাসের মনে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন জন স্মিথের কথা। জন স্মিথের সদ্‌গুণগুলি সবই ছিল জন রল্‌ফের মধ্যে, জন রল্‌ফকে পোকাহোণ্টাসের খুব ভাল লেগে গেল।

পোকাহোণ্টাস তখন ছিলেন ভার্জিনিয়ার ইংরেজ উপনিবেশের গভর্ণর স্যার টমাস গেট্‌স্‌-এর রক্ষণাধীনে; স্যার টমাসের মেয়েরাও

খুবই ভালবাসতেন রাজকুমারী পোকাহোণ্টাসকে। একদিন ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে পোকাহোণ্টাস জন রলফকে বললেন, 'আমি আপনার তামাক চাষের সহায়তা করতে পারি কি? এ বিষয়ে আমার খুবই ভাল অভিজ্ঞতা আছে। কারণ, আমার বাবার তামাকের ক্ষেতে আমি অনেক কাজ করেছি।'

নিজের ক্ষেতে রাজকুমারীকে খাটানোর কথা ভেবে সঙ্কোচ বোধ করলেন জন রলফ। কিন্তু পোকাহোণ্টাসের নাছোড়বান্দা আগ্রহ এড়াতে পারলেন না কিছুতেই। জন রলফের তামাক ক্ষেতে তাঁর সঙ্গে নিয়মিতভাবে কাজ করতে লাগলেন পোকাহোণ্টাস।

ইংলণ্ড থেকে আসবার পথেই জন রলফের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল, তাই তিনি নিঃসঙ্গ এবং বিষণ্ণ বোধ করতেন। পোকাহোণ্টাসের দৈনন্দিন সাহচর্যে তাঁর জীবন যেন মাধুর্যে ভরে উঠল। পোকাহোণ্টাস যেন তাঁর মনের মত কাজ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল।

এইভাবে দিন যেতে লাগল। তারপর স্যার টমাস গেট্‌সের জায়গায় নতুন গভর্ণর এলেন স্যার টমাস ডেইল। পোকাহোণ্টাসের খবর শুনে তিনি ঠিক করলেন, কয়েকজন ইংরেজ বন্দীর বিনিময়ে পোকাহোণ্টাসকে তাঁর পিতা পাউহাটনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। পোকাহোণ্টাসের চলে যাওয়ার কথা শুনে জন রলফের মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি এইবার বুঝতে পারলেন, কত গভীরভাবে তিনি পোকাহোণ্টাসকে ভালবেসে ফেলেছেন, পোকাহোণ্টাস চলে গেলে তাঁর জীবন শূন্য হয়ে যাবে। তিনি তখন পোকাহোণ্টাসকে প্রেম নিবেদন করে, তাঁর পাণিপ্রার্থনা করলেন। পোকাহোণ্টাস সানন্দে রাজী হলেন।

কিন্তু তাঁদের মিলনের পথে বাধা দেখা দিল। প্রথমে আপত্তি করলেন রেভারেণ্ড মিঃ বাক, কিন্তু তিনি পোকাহোণ্টাসকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং তার নতুন নাম দিয়েছিলেন রেবেকা। তিনি শেষ পর্যন্ত মত দিলেন।

গভর্ণর স্যার টমাস ডেইল প্রথমে খুবই অস্বস্তি বোধ করলেন। কারণ রেবেকা (ওরফে পোকাহোণ্টাস) রাজকুমারী, কিন্তু জন রলফ একজন সাধারণ ঘরের ছেলে। তাছাড়া রলফ ইংরেজ আর পোকাহোণ্টাস আদিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ান—এঁদের বিয়ে কি করে হতে পারে?

বিজ্ঞ পরামর্শদাতারা গভর্ণরকে বোঝালেন ইংরেজ জন রলফ যদি রেড-ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে বিয়ে করে তাহলে ফল ভালই হবে, কারণ এর মধ্য দিয়ে ভার্জিনিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজ ঔপনিবেশিকের পাকাপাকি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সুতরাং বিবাহের অনুমতি মিলল। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে খুব ঘটা করে বিবাহ হ'ল।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে পুত্র টম ও ভার্জিনিয়ার কয়েকজন ইণ্ডিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী পোকাহোণ্টাস স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ডে গেল। এদের বিশেষ আগ্রহ করে নিয়ে গেলেন গভর্ণর স্যার টমাস ডেইল, কারণ তিনি জানতেন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে পারলে রাজা জেম্‌স্ খুবই খুসী হবেন।

ইংলণ্ডে গিয়ে পোকাহোণ্টাসের আনন্দের আর সীমা রইল না। কি সুন্দর বড় বড় দালানকোঠা, কি চমৎকার সব মানুষ আরও কত রকমের সুন্দর দেখবার জিনিষ! অভ্যর্থনাও খুব পেল পোকাহোণ্টাস ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন মুখরিত হয়ে উঠল পোকাহোণ্টাসের প্রশংসায় ও আলোচনায়। যেমন অমায়িক তেমনি সুন্দরী পোকাহোণ্টাস, তার ওপর ভার্জিনিয়ার সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের একচ্ছত্র রাজার কন্যা পোকাহোণ্টাস।

তাকে দেখবার জন্য সবাই উৎসুক, তার সঙ্গে এতটুকু আলাপের সুযোগ পেলেও যেন জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ইংলণ্ডের রাজা তখন জেম্‌স্, রাণী অ্যান। রাজকুমারী পোকাহোণ্টাসকে দেখে ও তার সঙ্গে আলাপ করে দু'জনেই মহা খুসী।

জন রলফ এবং পোকাহোণ্টাসের জন্মগত প্রভেদটা লণ্ডনে এসে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল পোকাহোণ্টাস অভিজাত মহলে নিমন্ত্রণ পেতে লাগল রাজকুমারী হিসাবে, কিন্তু বাদ পড়লেন জন রলফ। কারণ তিনি সাধারণ বংশজাত, উঁচু মহলের নিমন্ত্রণে তাঁর স্থান নেই। অনেক নিমন্ত্রণ, অনেক অভিনন্দনের ভিতর দিয়ে ব্যস্ত দিনগুলি কেটে যেতে লাগল। কিন্তু কয়েক মাসের ভেতর একটি ইচ্ছা পূর্ণ হল না—পোকাহোণ্টাসের জীবনে প্রথম দেখা শ্বেতকায় পুরুষ ক্যাপ্টেন জন স্মিথ, যিনি পোকাহোণ্টাসের কল্পনায় একজন বীর রূপে সারা মন জুড়ে ছিলেন। অবশেষে যখন ক্যাপ্টেন স্মিথ দেখা করতে এলেন, তখন যেন রূঢ়ভাবে স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল পোকাহোণ্টাসের, তিনি দেখলেন ক্যাপ্টেন আর তরুণ নন, বার্দ্ধক্যে ম্লান।

অসামান্য সম্মান আর আদর পেল পোকাহোণ্টাস কিন্তু এদেশে তার স্বাস্থ্য টিকলো না। তাছাড়া ভার্জিনিয়ার সেই প্রকৃতি ঘেঁসা সহজ সরল জীবন বুঝি তাকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকত। ভার্জিনিয়ায় যে পোকাহোণ্টাস একটি বারও অসুস্থ বোধ করেনি ইংলণ্ডে এসে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এমন কি কিছুদিনের জন্য শয্যাশায়িনী হয়ে থাকতে হোল।

জন রলফের মনে হ'ল নূতনত্বের মোহ কেটে গেছে, ইংলণ্ডের জীবন আর ভাল লাগবে না পোকাহোণ্টাসের। জন রলফ বললেন পোকাহোণ্টাসকে, 'এখানে তোমার মনও টিকবে না, শরীরও টিকবে না, চল এবার আমরা ভার্জিনিয়ায় ফিরে যাই।'

পোকাহোণ্টাস বলল, 'তাই চল।'

কিন্তু জাহাজে উঠেই সে অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। সেই অসুখেই তার মৃত্যু হ'ল।

মাতৃভূমি ভার্জিনিয়ায় আর ফিরে যেতে পারলে না রাজকুমারী পোকাহোণ্টাস।

সাপ হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি—মূলাধার (physical centre) তার একটি প্রধান স্থান—সেখানে কুণ্ডলিত অবস্থায় সুপ্ত হয়ে থাকে। যখন সাধনার দ্বারা জাগ্রত হয়, তখন উপরের দিকে ওঠে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। মায়ের শক্তির অবতরণে সে এর মধ্যে স্বর্ণময় হয়েছে, অর্থাৎ ভাগবত সত্যের আলোয় ভরা।

—শ্রীশ্রীঅরবিন্দ

রূপের জয়

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

লণ্ডন চিরকালই সুন্দরী রমণীর উপাসক। আজ যেমন কোনো সুন্দরী চিত্রতারকাকে দেখবার জন্তে সারা লণ্ডনের লোক নিজেদের কাজকর্ম ভুলে তার পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আগেকার দিনেও কোনো নামজাদা সুন্দরী পথে বেরুলে অনেকটা সেইরকম অবস্থাই ঘটত। দু'শো বছর আগে দু'টি রূপসী বোন এলিজাবেথ ও মেরিয়া যখন লণ্ডনের পথে বা অন্য কোথাও বেরুত—কাণ্ড ঘটে যেত তখন তাদের দেখবার জন্তে। দর্শনকামী লোকের চাপে কখনো ড্রইংরুমের চেয়ার টেবিল ওল্টাত, কখনো বা পথের ধারের বেড়া বা রেলিং ভাঙত। কিন্তু সবচেয়ে বেশী যা ভাঙত তা হল লোকের হৃদয়—সে ভাঙা আর সহজে জোড়া লাগত না। ১৭৫২ সালের লণ্ডনে লোকের মনকে টানবার মত অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তুর যে অভাব ছিল তা নয়, কিন্তু এই দু'টি বোনের একটুকরো হাসি বা এক নজর চাহনির লোলুপতায় কাঙ্গালের উম্মাদনায় লোকে তাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া করত।

আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ১৭৫১ সালে এই দুই বোন লণ্ডনে আসে। মেরিয়ার বয়স তখন ১৮ বছর, আর এলিজাবেথের ১৭। লণ্ডনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজের যুবকদের হৃদয় তারা জয় করে নিলে; নাম হয়ে গেল তাদের 'রূপসী'। রাশি রাশি কবিতা লেখা হয়ে গেল তাদের রূপের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায়, আঁকা হয়ে গেল তাদের শত শত ছবি। রূপমুগ্ধ লণ্ডন যেন তাদের নিয়ে কি করবে ভেবে পেল না। অথচ এই দু'টি বোনের দারিদ্র্যের তখন সীমা নেই—ধার করা জামা কাপড় পরে তারা ভদ্রসমাজে বেরোয়। লণ্ডনে এসেছে তারা থিয়েটারে অভিনয় করার উদ্দেশ্যে।

দুই বোনের মধ্যে বড় বোন মেরিয়া ছিল বেশি সুন্দরী, কিন্তু তার রূপের দেমাকে সে ছিল ডগমগ। ৫ই মার্চ ১৭৫২ সালে কভেণ্ট্রির ষষ্ঠ আর্ল জর্জ উইলিয়ামের সঙ্গে মেরিয়ার বিয়ে হল। মেরিয়ার স্বামী ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ। মেরিয়া ছিল পোষাক ও প্রসাধনপ্রিয়। তাদের বাড়ীতে এই কারণে পোষাকনির্মাতা ও প্রসাধনসামগ্রী বিক্রেতাদের ভিড় লেগে থাকত। এদের সঙ্গে মেরিয়ার মেশামেশি মেরিয়ার স্বামী পছন্দ করতেন না। তাঁর মনে জাগত সন্দেহ।

সুন্দরী রমণীরা অনেক সময় নির্বোধের মত কাজ করে বসে। মেরিয়াও বেশ খোলাখুলি ভাবেই এর ওর সঙ্গে প্রণয় করতে সুরু করে দিল। তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন ভাইকাউণ্ট বোলিনব্রোক। ইংলণ্ডের বৃদ্ধ রাজাও মেরিয়ার রূপে মুগ্ধ হলেন। মেরিয়া একদিন হাইড পার্কে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে তার রূপলোলুপ দর্শনার্থীর চাপে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার যোগাড়। রাজা এই কথা শুনে ভবিষ্যতে মেরিয়াকে লণ্ডনের পথে-ঘাটে রূপোন্মাদ জনতার কাছ থেকে আগলাবার জন্তে তাঁর একদল দেহরক্ষী পাঠিয়ে দিলেন।

অতুল রূপ থাকা সত্ত্বেও মেরিয়া ক্লিওপেট্রার মত নানা রকম প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার না করে থাকতে পারত না। লোকের মন হরণ করবার জন্তে সে তার চোখের পাতা, ভুরু ইত্যাদি সবুজ ও কালো রঙে এঁকে চোখ দু'টিকে দু'টি মারাত্মক অস্ত্রে পরিণত করত। তার ড্রেসিং টেবিলে জ্বরের ওষুধ, জেমস পাউডার ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে থাকত ছোট বড় নানা আকারের শিশি। এর কোনোটিতে থাকত ফ্রান্স থেকে আনা গন্ধদ্রব্য, গায়ের রঙ সাদা করবার জন্তে স্পেন থেকে আনা ভ্যানিলা ক্রীম, ক্যাকাও ও বাদামের পঙ্ক থাকত কোনো-কোনোটিতে। কোনোটিতে থাকত গালে ও ঠোঁটে লাগাবার রুজ, আর কোনোটিতে থাকত হোয়াইট লেডের পাউডার। কেউ ঘরে ঢোকবার আগেই কিন্তু মেরিয়া এগুলি তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলত।

এই হোয়াইট লেডই শেষ পর্যন্ত মেরিয়ার কাল হল এবং ১৭৬০ সালে তার মৃত্যু ঘটাল। মেরিয়ার বয়স তখন মাত্র সাতাশ বছর। এই প্রসাধন দ্রব্যটির বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে মেরিয়া শয্যা নিলে—সম্বল হল তার আয়নাটি এবং গভীর ও মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। ঘরে আলো জ্বালতে দেবে না মেরিয়া, জ্বলবে কেবল একটি স্তিমিত দীপ। নিজের রূপ সম্বন্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সচেতন মেরিয়া তার বিছানার চারিদিকের পর্দাও তুলতে দেবে না—পাছে কেউ তার রোগকলঙ্কিত মুখ ও দেহ দেখে ফেলে!

তার ছোট বোন এলিজাবেথের ভাগ্যে কিন্তু আরো কিছু সুখ ও দীর্ঘজীবন ঘটেছিল। ১৭৫২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি হ্যামিল্টনের ষষ্ঠ ডিউক জেমসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সে এক ভারি চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। এলিজাবেথের প্রেমে পড়ে জেমস তাকে বিয়ে করবার জন্তে এতই অধীর হন যে, এক বল-নাচের আসর থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় তিনি তাকে মে ফেয়ার চ্যাপেলে বিয়ে করেন এবং বিয়ের আংটি না থাকায় বিছানার পর্দার রিং তাঁর নবপরিণীতা বধূর আঙুলে পরিয়ে দেন।

তার পরের ঘটনাগুলি বায়স্কোপের ছবির মত দ্রুত ঘটে গেল। ডিউক অব হ্যামিল্টন মারা গেলেন। এলিজাবেথ হল ফ্রান্সিস এগার্টনের বাগদত্তা। কিন্তু বিয়ে করলো না তাকে সে, কারণ, এগার্টনের নিষেধমত সে তার দিদি মেরিয়ার কাছে যাওয়া আসা বন্ধ করতে রাজী হল না। তারপরে ১৭৫৯ সালের ৩রা মার্চ সে লর্ণের মার্কুইস জন ক্যাম্পবেলকে বিয়ে করলো।

কোনো কোনো ব্যাপারে দুর্বল মনের পরিচয় দিলেও আপদ-বিপদের সম্মুখীন হলে এলিজাবেথের ভেতর এক অনমনীয় দৃঢ়তা জেগে উঠত। ১৭৬৮ সালের মার্চ মাসে উইলকিস দাঙ্গার সময় লণ্ডনের এক বিশৃঙ্খল জনতা রাত্রি একটার সময় এলিজাবেথের বাড়ী চড়াও হয়ে বাড়ী আলোকিত করার দাবী জানায়। এলিজাবেথের স্বামী মার্কুইস অব লর্ণ—যিনি তখন ডিউক অব আর্জাইল হয়েছেন—বাড়ী ছিলেন না। এলিজাবেথ তখন সন্তানসম্ভবা। সেই বিশৃঙ্খল জনতার সামনে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ তাদের দাবী মানতে অস্বীকার করলে। তিন ঘণ্টা ধরে সেই বিশৃঙ্খল মারমুখী জনতা তাদের দাবী জানাতে থাকে—লোহার ডাণ্ডা দিয়ে দরজা-জানলায় আঘাত

করতে থাকে, বাড়ীর গেট উপড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু এলিজাবেথ জানিত একটু খোসামোদেই যে এলিজাবেথ সহজেই গলে যেত, তার এই দুর্জয় সাহসের কাছে সেদিন উন্মত্ত জনতা হার মানলো। অবশ্য এলিজাবেথের অপরূপ রূপও যে সেদিন জনতাকে বিমুগ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এলিজাবেথের বয়স তখন মাত্র ৩৪ বছর জীবনের সুখভোগের দিন শেষ হতে তখনো তার যথেষ্ট দেরী ছিল। প্রতি সপ্তাহেই হয় কোনো বলনাচের মজলিশে, নয় কোনো তাসের আড্ডায় যোগ দিয়ে এই রূপসী নারী আনন্দ উপভোগ করে বেড়াত। উইলকিস দাঙ্গা তখনো চলেছে, জনতা মাঝে মাঝে পথে লোকের গাড়ী আটকায়—কিন্তু এলিজাবেথের তাতে ভয় ছিল না।

১৭৯০ সালে ৫৬ বছর বয়সে এলিজাবেথের মৃত্যু হয়।

এতদিন পরে আজ সেদিনের এই রূপসীদের ছবির দিকে চেয়ে আমরাও তাদের রূপের প্রশংসা না করে পারি না, মনে হয় যেন আমাদের দিকে চেয়ে এখনো তারা তাদের সেই মনোমোহিনী হাসি হাসছে।

থেক না অন্যমনা

অমরনাথ চক্রবর্তী

অবনতমুখী আরক্ত কল্পনা
এ নিভৃতক্ষণে থেকো না অন্যমনা।
স্পন্দিতবুকে যে ছন্দ বাঁধা আছে
তারি তালে আজ আমারো রক্ত নাচে,
একান্তে তাই এসেছি তোমার কাছে,
এখন তোমার কোন বাধা মানবো না।

ভীরু হৃদয়ের পোষমানা ভালবাসা
কেমন করে সে হয়েছে সর্বনাশা।
কোথায় বা গেল ভুল করবার ভয়,
কী ইন্দ্রজালে দূর হল সংশয়,
উদ্ধত সব নিষেধ করেছে জয়,
জেগেছে যে তার সুগভীর প্রত্যাশা।

বন্যার বেগ লেগেছে আজকে প্রাণে
সংকোচ সব ভেসে যাবে তারি টানে।
বাঁধের শাসন যে করেনি অন্যথা
তারি ঢেউয়ে আজ তীব্র অবাধ্যতা;
ঘূর্ণির স্রোতে উদ্দাম মত্ততা—
ছুটেছে কোন-সে অজ্ঞেয়তার পানে।

এই দুর্যোগে পিছুর ভাবনা ভুলে
তরীর বাঁধন দিতে হবে আজ খুলে।
দূর অলক্ষ্য দিয়েছে দারুণ ডাক,
ভাল মন্দের হিসেব তোমার থাক,
এই কল্লোলে লাভ-ক্ষতি ডুবে যাক,
তরণী ছুটুক ঢেউয়ের দোলায় দুলে।

নাই জানা হ'লো কী যে হবে তারপরে,
তবু ক্ষণকাল পাব-তা পরস্পরে।
হয় তো আমরা ভিড়বো নতুন দেশে
এ-মাটির বুকে আকাশ যেখানে মেশে;
অথবা লুপ্ত হয়ে যাব নিঃশেষে
চিহ্ন না রেখে মৃত্যুর গহ্বরে।

কিংবা হয় তো মেনে নিতে হবে হার,
শ্রেয় মেনে নেব নিরাপদ এই পার।
নৌকা ফেরাব শ্রান্তিতে সন্ত্রাসে,
আস্থা হারাব অজানার আশ্বাসে;
সঞ্চিত পুঁজি, পরিচিত গৃহবাসে
কৃপণের বাঁচা চলবে নিত্যকার।

অবনতমুখী আরক্ত কল্পনা,
এখন ভাবি না সে সব সম্ভাবনা।
আমার মাতাল আজকে পেয়েছে ছাড়া
পালেতে লেগেছে ঝোড়ো বাতাসের তাড়া,
অকূল ঠেকেছে সব হিসেবের বাড়া,—
আজ আর তুমি থেকো না অন্যমনা।

বিবাহে বৈচিত্র্য

এম, আবদুর রহমান

A golden chain let down from heaven
Whose links are bright and even,
That falls like sleep on lovers
and confines
The soft and sweetest minds
in equal knots.

স্বর্গ হতে ঝরে পড়া একগাছি মালা,
প্রতিটি গাঁথনি যার নিখুঁত উজ্জ্বল—
নিদ্রার মত আবেশ লইয়া আসে
প্রেম-মদিরায় দিল্ করি' বিহ্বল।
কোমল ও মধুরতর দু'টি তনু মন
সৃষ্টি করে অগোচরে সুদৃঢ় বন্ধন।

বিবাহ কি

বিবাহ কি এবং কেন, প্রবন্ধের শুরুতেই সে-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিবাহ-শব্দের ধাতুগত অর্থ:—[বি— (পরস্পর রূপে)—বহ (পাওয়া) + ঘঞ্ (ভাবে)] :—পরস্পর রূপে পাওয়া। ধর্ম, সমাজ ও আইন অনুমোদিত ক্রিয়া-কর্ম ও অনুষ্ঠানের দ্বারা, যৌন-অধিকারপ্রযুক্ত কতকগুলি দায়িত্ব ও চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্কহীন অথবা সম্পর্কযুক্ত নারী ও পুরুষের পরস্পরের (পাওয়ার) মধ্যে স্বামী-স্ত্রী রূপে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, স্বীকৃত হয়—যে দাবী দাওয়া, আর সেই সম্পর্ক স্থায়ী করবার আশায় তাদেরকে মিলন-ডোরে বাঁধবার জন্য যে অনুষ্ঠান হয়—তাকে বিবাহ বলা যেতে পারে।

বিবাহের বহু নামের মধ্যে এক নাম পাণিগ্রহণ অপর নাম পাণিপীড়ন। বিবাহকালে বরকে কনের হস্ত ধারণ করতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রপাঠের সঙ্গে পাত্রীকে স্পর্শ করে, তাকে প্রতিশ্রুতি ও অভয় দিয়ে তার সকল প্রকার দায়িত্ব মৌন সম্মতিতে গ্রহণ করতে হয়। আমাদের মনে হয় পাণিগ্রহণ অপেক্ষা—বর্তমান যুগে পাণিপীড়ন শব্দটি অধিকতর মানানসই। কারণ এ যুগে কন্যার মাতা-পিতাকে রীতিমত পীড়ন করার পর গ্রহণ করা হয় তাদের কন্যার পাণি।

বিবাহ, উদ্বাহ, পরিণয়, পাণিগ্রহণ বা পাণিপীড়ন প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে যে নামটিই শ্রুতিমধুর প্রযোজ্য হোক না কেন, সমাজ আশা করে বিবাহের মাধ্যমে দম্পতির মন, প্রাণ হবে এক এবং অভিন্ন।

ফার্সী কবি বলেছেন : মান্ তু শুদাম, তু মান শুদী
মান্ তান্ শুদাম, তুজাঁ শুদী :

অর্থাৎ আমি হই তুমি আর তুমি হও আমি, আমি হই দেহ আর তুমি হও প্রাণ হিন্দু বিবাহের মূল মন্ত্র তো ইহাই :—

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

তোমার হৃদয় আমার হোক আর আমার হৃদয় হোক তোমার। বৈদিক যুগের স্ত্রীর প্রতি পুরুষের উক্তি সামাহং ঋকত্বং দ্যৌরহং পৃথিবীত্বং। আমি সামবেদ (সঙ্গীত), তুমি ঋকবেদ (কবিতা) আমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী (অথর্ববেদ ১৪ ২।৭১)

আইনের ভাষায় : I take thee to be my lawful wife. বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ বলেছেন : বিবাহ একটি 'আশীর্বাদ।' মানবজাতির পক্ষে বিবাহ যে একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিবাহ-সম্পর্ক সম্বন্ধে Louis Koufman Ausfucher বলেছেন : Marriage is that relation between man and woman in which the independence is equal, the dependence mutual and the obligation reciprocal. অর্থাৎ কিনা বিবাহের দ্বারা নর-নারীর মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে যার ফলে একে অপরের অধিকার দাবী-দাওয়া ও নির্ভরশীলতা হয় পরস্পরের অনুবর্তী।

জনৈক ইংরাজ কবি পরিণয়-প্রেমের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন আমরা তা' উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন :—

আবার বার্ণার্ড শ'-এর মত মনীষী মানুষও বলেছেন : সমগ্র বিবাহ প্রথাটাই একটা প্রকাণ্ড জুয়াচুরি। তাঁর মতে বিবাহ-প্রথা আইন অনুমোদিত বেশ্যাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নয় (১)

Chaucher বলেছেন : Marriage is a misery and woe : বিবাহ দুঃখ-কষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙলার এক সঙ্গীতকার গেয়েছেন :—বিয়ে ক'রে কাজ নাই, সে যে গলায় দড়ি ভাই।

বিবাহ কেন ?

সন্তান-প্রজনন-দ্বারা সৃষ্টিরক্ষা, মানবগোষ্ঠীর বিবৃদ্ধি, সন্তানের বৈধতা নির্ণয় এবং বংশের বিশুদ্ধিতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণ বিবাহের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন : The main purpose of marriage is to replenish the human population of the Globe. (২) অর্থাৎ বিশ্বের মানব-সমাজের সংবৃদ্ধিকরণ, বিবাহের প্রধানতম উদ্দেশ্য। মুসলিম কানুন কেতাবে বলা হয়েছে : Marriage......which has for its object the procreation and legalizing of children (৩) অর্থাৎ শাদীর মূল মতলব হচ্ছে প্রজনন ও সন্তানের বৈধতা স্থিরীকরণ।

মানব-জীবনের সে সকল অপরিহার্য কর্তব্য আছে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তন্মধ্যে অন্যতম। এজন্য পরিণয়-কার্যকে ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত করা হয়েছে। বিশ্বের সকল-ধর্মের অভিমত এই আদর্শের অনুসারী। বিশ্বনবী হজরত মোহম্মদ (দঃ) বলেছেন : তোমা

১। মাসিক বসুমতী ১৩৬৮, কার্তিক পৃ: ১১১
২। Marriage and Morals. page 109,
৩। Principles of Mahomedan Law by Sir D. F. Mullah,

বিয়ে করবে; এ'র দ্বারা আমার ওমতদের (অনুবর্তীদের) সংখ্যা বাড়বে।

হিন্দু বিধান শাস্ত্রে বলা হয়েছে: পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা অর্থাৎ পুত্রলাভের জন্যই ভার্যাগ্রহণ। কারণ পিণ্ডদানের জন্ম চাই পুত্র, 'পুত্রপিণ্ড্য প্রয়োজনম্।'

সন্তান লাভ বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, কাম-সংহিতা, সমাজ-বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও রাষ্ট্র বিধানের সঙ্গে বিবাহের কার্যকরী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বিবাহের ভাল এবং মন্দ

বিবাহ আদম জাতির মধ্যে প্রেম, প্রীতি, শান্তি এবং মৈত্রী স্থাপনের পক্ষে সহায়ক। ইহার দ্বারা সামাজিক বন্ধন এবং শৃঙ্খলা সুদৃঢ় হয়, মানুষ হয় পূর্ণাঙ্গ। আর তার ফলে সাধিত হয় বিশ্বের অশেষ কল্যাণ। স্ত্রীকে বাঙলা পরিভাষায় বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। ইংরেজরা আর এক ধাপ উপরে উঠে বলেছে Better half.

বিবাহ বন্ধন না থাকলে মানব-সমাজে শয়তান নাচতো নগ্ন মূর্তিতে, ধর্ম-কর্ম, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া, শিক্ষা-সভ্যতা জগৎ হতে হতো বিলুপ্ত। ব্যভিচার, বিশৃঙ্খলা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভয়াবহ রূপে দিতো দেখা। বিশ্বভুবনে শান্তি সুখের নাম নিশানা থাকতো না। কিন্তু এতো ভালো হওয়া সত্ত্বেও এর একটা মন্দ দিকও আছে। অনেক সময় অনেকের পক্ষে বিবাহ একটা মস্ত বড় বোঝা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, ক্ষেত্র বিশেষে স্বামীর পক্ষে অবাঞ্ছিতা স্ত্রী এবং স্ত্রীর কাছে অবাঞ্ছিত স্বামী এবং উভয়ের পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান দুর্বিষহ দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সংসার হয়ে পড়ে তাদের কাছে অশান্তি-পূর্ণ, জীবন হয়ে পড়ে বিষময়। এরূপ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ক'রে এক পারস্য কবি বলেছেন:—

এ্যয় বেরাদর হালেমান্ তুর্ফাতাবাস্ত,
দর্ গুলুএম্ সুন্নতে পয়গাম্বারাস্ত।

শুন, শুন ভাইরা আমার যত,
মোর বিবাহ কলসী বাঁধার মত,
গলায় আমার ঝুলছে নিরন্তর।
এই বিবাহের বিধান দেছে মোদের পয়গাম্বর।

জনৈক ইংরেজ-সাহিত্যিক বলেছেন, **Marriage is a blessing to a few, a curse to many, and a great uncertainty to all.** বিবাহ কিছু সংখ্যক মানুষের পক্ষে আশীর্বাদ, অধিকাংশ লোকের পক্ষে অভিশাপ এবং বাদবাকী আর সকলের পক্ষে নিদারুণ অনিশ্চয়তা স্বরূপ ···

প্রবাদে পরিণয়

ফরাসী দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত মঁসিয়ে মরিস মালু বিবাহ সম্পর্কে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করেছেন, তার প্রায় সবগুলিতেই বিবাহের মন্দ দিকের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।(৪) আমরা তাঁর এবং আমাদের সমিতির সংগ্রহের কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করছি

গ্রীস দেশের লোকে বলে, বিবাহ এমন একটা বেদনাদায়ক চিজ, যে মানুষ তাকে খোঁজ করে নেয়।

আরববাসীরা বলে: শাদী হচ্ছে এমন একটি বালাখানা যারা সেখানে যায় নি, তারা তার ভেতরে যেতে চায় আর যারা ভেতরে ঢুকেছে, তারা বেরিয়ে আসতে চায়। তারা আরও বলে: বিবাহিত জীবন যা' কারা-জীবনও তাই।

স্প্যানিশ প্রবাদ:—বিবাহ হচ্ছে তরমুজের মত। তরমুজের মতই দৈবাৎ কোন কোনটি ভাল হয়।

পোলিশ প্রবাদ: বিয়ের আগে কাঁদে মেয়েরা আর বিয়ের পরে কাঁদে পুরুষগুলো।

ইংরেজরা বলে: বিবাহের পর স্বামী আর স্ত্রী উভয়ে মিলে একটি আজব জানোয়ার বনে যায়। তাদের আর একটি প্রবাদ: **Wedlock is a Padlock.**

ফরাসী প্রবাদ: রান্নাঘরে দাম্পত্য-প্রেমের আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি করে ······

মশ্হুর প্রচলিত আমাদের হিন্দুস্থানী প্রবাদ দিল্লীকা লাড্ডু। যো খায়েগা ওভি পস্তায়েগা, আউর যো-না-খায়েগা উহভি পস্তায়েগা।

থাইল্যাণ্ডের প্রবাদ: মেয়েরা হাতির পিছনের দু'টো পা, আর পুরুষরা সামনের পা।·····

চীন দেশের প্রবাদ: যদি একদিনের জন্ম সুখী হতে চাও, মদ খাও। যদি একমাসের জন্ম সুখী হতে চাও বিয়ে কর আর যদি বরাবরের জন্ম সুখী হতে চাও বাগান কর।

রগচটা পুরুষের চোখে নারী

সন্তকবি তুলসীদাস ছিলেন স্ত্রীজাতির উপরে হাড়ে হাড়ে চটা। তিনি তাঁর একটি দোঁহায় বলেছেন:—

দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
(পাঠান্তরে দিনকা বাঘিনী, রাতকা ডাকিনী)
পলক পলক লোহু চুসে—
দুনিয়া সব বাওরা হো কর
ঘর ঘর বাঘিনী পুষে।

• • • •

নারীদের সুনজরে দেখতে পারেন নি দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি। বিভিন্ন সাহিত্যে তার অভিব্যক্তি দেখা যায়। অমর কবি হোমার নারীকে রাজ্য ধ্বংসকারিণী বলে মন্তব্য করেছেন।

সাধু-সাহিত্যিক **St. August** বলেছেন: **We have to beware of Eve in every woman** একথা জেনে নারীদের সম্পর্কে পুরুষকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি, কারণ সেকালের খৃষ্টান-পাদ্রীরা বলতেন—**'Adultry thy name is woman.'** কারণ এই নারী হল **'Devils gate, betrayer of the tree, the first deserter of Divine Law.**

'Mulier est hominis Contucio'

নারী শয়তানের সঙ্গী প্রলোভনের প্রতিমূর্তি।

আমাদের সাহিত্যে ও প্রবাদে নারীকে সব সময়ে ভাল বলেনি 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী', 'স্ত্রী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়', 'দেবতারাই বুঝতে পারেন না তাদের, মানুষ কোন ছার।' 'পথি নারী বিবর্জিতা' প্রভৃতি উক্তিগুলি বহু প্রচলিত। বাঙলার সঙ্গীতে পাই—

৪। যুগান্তর ২৪ ১'৬১

'কামিনী কাল নাগিনী ফণি—বিষম বিষ,
যার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড শোষে না জেনে কেন হস্ত দিস।'

ইসলামের হাদিস-শাস্ত্রে (Theology) নারীজাতিকে সম্মান এবং সম্পদে উচ্চস্থান দিলেও, তাদেরকে 'শয়তানের ফাঁদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ, পাদ্রী-পুরোহিত প্রভৃতি কওমের এক শ্রেণীর মানুষ স্ত্রীজাতিকে করেন ভয়, করেন ঘৃণা, করেন অবিশ্বাস। তাঁদের এবম্বিধ মানসিকতার মূলে যে সত্য কাজ করছে, তার জন্ত সামগ্রিকভাবে নারীজাতিকে দোষী করা যায় না। আর যায় না বলেই পুরুষ জাতি নারীসমাজকে বর্জন করতে পারে নি।

মুসলিম ও খৃষ্টানদের আদি জননী যে হাওয়াবিবিকে (Eveকে) নিয়ে আদমজাতির এই উদ্ভব, সেই মা-হাওয়াই হজরত আদমকে (দঃ) স্বর্গ ত্যাগ করবার সময়ে বলেছেন: Thou to me art all things under heaven, all places thou. তুমি আমার সর্বসুখ, তুমি যখানে থাক সেইখানেই আমার স্বর্গ।

নারী, জননী—স্বর্গ তার পদতলে।

দুনিয়া জাহানের বুকে নারী প্রথমে এসেছে পত্নীরূপে, তারপর হয়েছে সে মানুষের মা। এই মায়ের পায়ের তলেই বেহেস্ত্: আলজান্নাতু তাহ্‌তে আক্‌দামিল্ উম্মাহাৎ বলেছেন আমাদের প্রিয় পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।

ভারতের ঋষিরা বলেছেন: মাতৃদেবো ভব,—জননীকে পূজা দেবে দেবতার মত।

নারীর সঙ্গে পুরুষের নানান সম্পর্ক মাতা, কন্যা, জায়া এবং অন্যান্য বহু প্রকার সম্পর্ক ও সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে নারী এত নিকট-নিবিড় গভীর এবং অচ্ছেদ্যভাবে পুরুষের সঙ্গে জড়িত যে, কোন একজন পুরুষ বা পুরুষ জাতের শ্রেণী বিশেষ নারীর সাহায্য ও সাহচর্য ব্যতিরেকে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করতে সক্ষম হলেও সার্বিক ভাবে নারীকে পরিহার করে চলা পুরুষের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। এজন্য বিজ্ঞবর হাক্সলী (Julian Haxley) বলেছেন:—Man and woman are complimentary to each other without the one, the other can not go. নর-নারী একে অপরের আকাঙ্ক্ষার পরিপুরক, তাদের একজনকে বাদ দিয়ে অপরের চলে না।

পত্নী সচিব ও সখা

ডা: স্মাইলস্ (Dr. Samuel Smiles); নারী পুরুষের এই সম্পর্কের কথা আরও খোলসা করে বলেছেন: She is the guide and councellor of youth and confident and companion of manhood in her various relations of mother, sister, lover and wife. নারী মাতা, ভগ্নি, প্রিয়তমা ও পত্নীরূপে, পুরুষের পরিচালক ও পরামর্শদাতা, বিশ্বস্ত বন্ধু ও সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একান্তভাবে জড়িয়ে আছে তার (পুরুষের) জীবনে। কিন্তু এই সম্পর্ক—যে সব সময়ে সকলের জীবনে মধুময় ও মনোরম হয়েছে তা' নয়। পৃথিবীর কোবিদ-সমাজের কেউ কেউ নারী-সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেও তাঁদের অধিকাংশই নারীর স্তুতিগান গেয়েছেন—দেবীরূপে কল্পনা ক'রে, দিয়েছেন নারীকে প্রভূত সম্মান, সম্রাট নারীর হাতে তুলে দিয়েছেন রাজ্য, ধনী তুলে দিয়েছেন তাঁর ধনভাণ্ডার।

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান

বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রায় প্রতিটি ফরমানের পাশে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের শীলমোহর থাকতো। স্বর্ণমোহর ও রূপার তঙ্কায় আঁকতো নূরজাহানের নাম। একটি শীলমোহরের বয়ান এইরূপ: বাদশাহ জাহাঙ্গীর নূরজাহানের মহব্বতের দৌলতে দুনিয়া ও 'আখেরাতের' (পরলোকের) এবং হৃদয়ের সকল দিক হতে উন্নত স্তরে নিজেকে অসীম মনে করে—এই উন্নতি ও আনন্দের উৎস-স্বরূপা নূরজাহানের নাম নিজের নামের সঙ্গে শাহী-শীলমোহরে যুক্ত করে অত্যন্ত খুশী।(৫)

অমর কবি হাফেজ তাঁর প্রিয়ার তিলের জন্য দিতে চেয়েছিলেন উপহার সমরখন্দ ও বোখারাকে।

ধনকুবের স্যার এডওয়ার্ড ষ্টান কুমারী সিসিলটাক্‌কে বিবাহ কালে যৌতুক দিয়ে ছিলেন পনেরো কোটি টাকা। এ খবর ১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারীর।(৬)

কাবুলীরা দাবী করেছিল বাদশাহ আমানুল্লা খাঁয়ের কাছে আপনি বেগম সুরাইয়াকে তালাক দিন, তাঁকে ত্যাগ ক'রে আমাদের রাজা হ'য়ে থাকুন:

বাদশাহ আমানুল্লা জনগণের দাবী গ্রহণ করেন নি, তিনি রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, বেগম সুরাইয়াকে ত্যাগ করেন নি।

সেদিনের ভারত-সম্রাট এবং ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড মিসেস সিমসনকে পত্নীত্বে বরণ করবার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন।

নারী ও সিংহাসন

ইতিহাসে এরূপ নজীর আরও আছে। পুরুষ যেমন নারীর জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না নারীও তেমনি পুরুষের জন্য তার সব কিছুই দান করতে পিছপাও হয় না। আমরা সে সব কাহিনী বারান্তরে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো।

রাজা-বাদশাহ ধনীক-বণিক নারীর চরণে অর্ঘের ডালি দিয়েছে যুগে যুগে। আজও সে ডালি বন্ধ হয় নি কিন্তু নারীর সবচেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে কবি এবং শিল্পীরা। তাঁরা তার দেহ-সৌন্দর্যের ও রূপ সুষমার ছবি এঁকেছেন সুন্দর হতে সুন্দরতম ক'রে, কবিতা-কাব্যে-গানে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন: বলেছেন:

কি সুন্দর তুমি নারী,
তোমার মহিমা, তোমার গরিমা গাহিতে নাহিক পারি।

* * * *

বিশ্ববিধাতা বন্ধু জনের চিত্ত-বিনোদ-জন্য
কোন উপহার পায়নি খুঁজিয়া তোমা ছাড়া কিছু অন্য।(৭)

৫। জাহাঙ্গীরের ফরমান—প্রবন্ধ—শ্রীচিত্তপ্রিয় মিত্র—দেশ ১৩৬১, ১০ই ফাল্গুন ৩২১।৩৩০
৬। আনন্দবাজার পত্রিকা ৫।১।৫
৭। কবি গোলাম মোস্তাফার

ঋষি কবি জয়দেব গেয়েছেন :—

ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং

ত্বমসি মম ভব জলধিরত্নং ।···

নারীর প্রতি এবম্বিধ স্তুতিগাথা গেয়েই ক্ষান্ত হন, বহু ইতস্তত ক'রে তিনি যে শেষ বাক্য লিখতে দ্বিধা করছিলেন—তাঁর অবচেতন মনে যে ব্যাকাংশ উঁকি মারছিল, শেষ পর্যন্ত তাঁর কলমের ডগায় বে'র হ'ল সেই পদ :—

দেহি পদ পল্লব মুদারম ।(৮)

তৃপ্ত হ'ল বুঝি পুরুষ, সাফল্যের গৌরবে বুঝি ভ'রে উঠলো নারী-মন ।

* * * *

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন :—

অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা ।······

······নারী সে যে মহেন্দ্রের দান

এসেছে ধরণী তলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান ।(৯)

বিদ্রোহী কবি নজরুল বললেন :—

জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী

সুষমা লক্ষ্মী, নারীই ফিরিছে রূপে রূপ সঞ্চারি ।(১০)

* * * *

নারীর প্রেমমুগ্ধ রাজা-বাদশাহ ধনীক সমাজের এই হুর-পরীরা এবং কবিদের কল্পনা-রাজ্যের এই দেবীরা ধূলি-ধরণীর বুকে বাস্তব-জীবনের সকল ক্ষেত্রে কল্পনা-রাজ্যের দেবীও অপ্সরা হয়ে থাকতে পারে নি । মনীষী বার্ণার্ড শ'য়ের ভাষায় She ceases to be a poets dream and becomes a solid eleven stone wife. কবির স্বপ্ন টুটে গেছে যখন সেই নিরেট আড়াইমুণে স্ত্রী হয়ে দেখা দিয়েছে কবির বাস্তব-জীবনে । শ' সাহেবের এক নাটকের নায়িকা বলছেন : You see, I shall have to live always to your idea of my divinity and I don't think that I would do that if we were married. দেখ, তুমি চাও যে, আমি হর-হামেশা তোমার কল্পনা-রাজ্যের রাণী হয়ে থাকি কিন্তু আমাদের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেলে আমি তো সব সময়ে তোমার কাছে সেরূপ দেবী হয়ে থাকতে পারব না ।(১১)

কল্পনা-রাজ্যের প্রিয়া আর বাস্তব জগতের পত্নী

বার্ণার্ড শ'-এর অ'কিত ছবি যে কতখানি জলজ্যান্ত সত্য, তার নজিরের অভাব নেই। একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে নিউইয়র্কের বিখ্যাত নাট্যকার মিঃ আর্থার মিলারের জীবন-ইতিহাস থেকে। বছর চার পাঁচ আগেকার কথা। মিলারের বয়স তখন চল্লিশ। বিয়ে করেছিলেন তিনি ত্রিশ বৎসর বয়স্কা লাবণ্যময়ী সিনেমাশিল্পী শ্রীমতী মারিলিন মনরোকে। মাথায় তাঁর রেশম নরম সোনালী চুল, যৌবন জোয়ারে উচ্ছসিত তনু, রূপে রঙে অপরূপা, লাস্যময়ী। নাট্যকার মিলার মুগ্ধ ও মোহিত হলেন মনরোকে দেখে। শেষ পর্যন্ত শাদীও হল তাঁদের।

মিলারের শিল্পী বৌ 'গামলা'

বিয়ের পর তাঁরা যখন বিলেতে মধুযামিনী যাপন করতে গেলেন সেই সময়ে এক ইংরেজ সাংবাদিক মিঃ মিলারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : হলিউডের রক্ত মাংসের এই সুন্দরীকে বিয়ে করে কিরূপ বোধ করছেন ?

মিলার তার উত্তরে বলেছিলেন : মনে হচ্ছে যেন 'গামলা'র মধ্যে রয়েছি। চার বছর শেষ হতে না হতে (১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে) তিনি আবার এক সাংবাদিককে বলেছিলেন—আমাদের বিবাহিত জীবন শেষ হয়ে গেছে ।

রূপসী মারিলিন মনরো তাঁর স্বামীর লেখা 'মিস্‌ফিট্' (বেমানান) ছবিতে অভিনয় শেষ করার পর, প্রকাশ করলেন যে তাঁদের মধ্যে শীঘ্রই 'তালাকের' (Divorce) মামলা হবে ।

'মিস্‌ফিট' নাটকটি মিলার লিখেছিলেন বিশেষ করে তাঁর ঐ স্ত্রীকে উদ্দেশ করে। মনরো ছিলেন মিলারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আর মিলার ছিলেন মনরোর তৃতীয়বারের স্বামী। মিলার এখানে মশহুর নামা নাটক লেখক। তিনি ১৯৪৯ সালে পেয়েছিলেন পুলিটজার পুরস্কার তাঁর Death of a Sales man নাটকের জন্ত ।(১২)

৮। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ ।

৯। মহুয়া ।

১০। সাম্যবাদী ।

১১। Man and Superhuman by G. B. Shaw.

১২। আনন্দবাজার পত্রিকা ১০-১২-৬০ এবং পঃ বঃ স্বঃ অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ ।

জীবনের শেষ পর্যায়ে, এ্যালবার্ট আইনষ্টাইন জন-মন-ধন্ত, ও বহুসমাদৃত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। একদিন এক সান্ধ্য-উৎসব সভায়, উপস্থিত থাকা কালে, গৃহকর্ত্রী তাঁকে বাতায়ন সামীপ্যে নিয়ে গিয়ে, আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দে'শ করে বললেন, আমি ভীনাস গ্রহটিকে দেখতে পাচ্ছি ; সুন্দরী রমণীর মতই মনোরমা ওটি ।—দুঃখিত, বললেন আইনষ্টাইন, যে তারকাটিকে আপনি দেখাচ্ছেন, সেটি ভীনাস নয়, জুপিটার।—ও ডাঃ আইনষ্টাইন, সোল্লাসে বলে উঠলেন গৃহস্বামিনী, আপনি সত্যই অনন্ত, এত দূর থেকেও আপনি তারকাদের লিঙ্গ নির্ণয় করতে পারছেন ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বাসন্তী মঞ্জিল

অজিতকৃষ্ণ বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমার মুখে হয় তো খানিকটা অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করেছিলেন, অথবা লক্ষ্য করছেন বলে কল্পনা করেছিলেন নিমাই মিত্তির। তাই বললেন, 'আপনি হয় তো ভাবছেন আমি বাড়িয়ে বলছি বা বানিয়ে বলছি। কারণ আপনার মন ভাবছে হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের কথা, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সমস্যার কথা, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা। হয় তো কিপলিং-এর সুরে আপনার মনে হচ্ছে হিন্দুরা হিন্দু আর মুসলিমরা মুসলিম, এদের দুয়ে কখনো মিলতে পারে না। কিন্তু যে কালের কথা বলছি সেকালে এ ধরণের ভেদবুদ্ধির অংকুরও গজায় নি ধনপতিবাবু। সেকালে হিন্দু জমিদার মনিবের জন্যে লড়াই করে মুসলিম লেঠেল অম্লানবদনে জান দিয়েছে, মুসলিম জমিদারের জন্যে জান কবুল করে লড়েছে হিন্দু লেঠেল। মুসলিম পরবে পরমানন্দে যোগ দিয়েছে হিন্দু, আর হিন্দুর পার্বণে প্রাণের আনন্দে যোগ দিয়েছে মুসলিম। যোগ দিয়েছে সহজ প্রাণের সহজ তাগিদে, একটা মহান উদার আদর্শ স্থাপন করছে এই ভাব নিয়ে নয়। তখনো 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'—বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করো, এই মতলব কাজে লাগায় নি আমাদের ইংরেজ শাসকবৃন্দ। কিন্তু সেকালের জন্যে এখন আর হায় হায় করে লাভ কি ধনপতিবাবু? ইতিহাসের চাকা তার নিজের জোরেই ঘুরবে, তাকে রুখতে পারবে না কেউ। অতএব কাহিনী শুনুন। সিরাজ চলে গেল নন্দনপুর, নন্দন চৌধুরীর কাছে।'

সিরাজকে বেশ কিছুদিন দেখেন নি নন্দন চৌধুরী। খুশী হয়ে বললেন, 'কি রে সিরাজ? চাচাকে বুঝি অ্যাদ্দিন বাদে মনে পড়ল?'

সিরাজ হেসে জবাব দিল, 'মনে তো আপনাকে হর রোজ আর হামেশাই পড়ে চাচা, কিন্তু কাজ-কারবারের এমন ভিড়, ইচ্ছে থাকলেও আসবার ফুরসৎ মেলে কোথায়? এবার ছট করে চলে এলাম, রথও দেখে যাবো, কলাও বেচে যাবো। ছোট্ট একটু কাজ-কারবারের ব্যাপার আছে, সেই সঙ্গে একটু বেড়িয়ে যাওয়াও হবে। তবে, মুশকিল কি জানেন চাচা? আপনার এখানে এলে ফিরে যেতে আর মন চায় না।'

হো হো করে হেসে নন্দন চৌধুরী বললেন, 'বেশ তো, এবার বেশ একটানা কিছুদিন থেকেই যা না। তোর চাচীও খুব খুশী হবেন। এই তো সেদিনও বলছিলেন, সিরাজ ছেলেটাকে অনেকদিন দেখি নে।'

নন্দন চৌধুরীর স্ত্রী নিঃসন্তানা। সিরাজকে তিনি আপন সন্তানের কাছাকাছি স্নেহ করেন। সিরাজও তাঁকে মায়ের মতোই ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। সে বলল, 'চাচী কোথায় চাচা? তাঁকে একবার আদাব জানিয়ে আসি।'

'তোর চাচী এখন ঠাকুরঘরে পুজো-আর্চায় ব্যস্ত আছেন, বেরুতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে রে সিরাজ।' বললেন নন্দন চৌধুরী। 'আদাব তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আর অ্যাদ্দিন পরে এসেছিস যখন, চট করে তোকে ছেড়েও দিচ্ছি নে। নাসির ভাইয়াকে আজই লিখে পাঠাচ্ছি সিরাজ ক'টা দিন থেকে যাবে আমার কাছে।'

'যেমন আপনার মর্জি, চাচা।' হেসে বলল সিরাজ।

ব্যবসা-সংক্রান্ত যে কথাটার ছুতো সিরাজ নন্দনপুরে এসেছে

নন্দন চৌধুরীর কাছে, দুপুরবেলায় পাশাপাশি খেতে বসে চাচা নন্দন চৌধুরীর কাছে সেই কথাটা পাড়ল সিরাজ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়।' বলে সেই প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন নন্দন চৌধুরী। 'এই কথাটুকু বলতে তুই অ্যাদ্দূর ধাওয়া করে এলি নাকি রে পাগল ছেলে? তা ভালোই করেছিস। তবু তো এই উপলক্ষ করে তোর আসা হল, তোকে দেখলাম আমরা।'

'আমরা' মানে তিনি এবং তাঁর সহধর্মিণী সুরমা, যিনি আপন হাতে আহার্য পরিবেশন করছিলেন স্বামীকে আর সন্তানস্থানীয় এবং সন্তানোপম স্নেহভাজন সিরাজকে। পরম নিষ্ঠাপরায়ণা গোঁড়া হিন্দু মহিলা সুরমার কাছে সিরাজ ছিল অন্য ধর্মী, 'বিধর্মী' নয়। স্বামীর পাশে বসিয়ে তাকে খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁর মনের কোণে কোনো রকম দ্বিধা ছিল না, শুধু নিষিদ্ধ মাংস খাওয়া না হলেই হ'ল।

আসল যে উদ্দেশ্যে এসেছে, সেই প্রসঙ্গটা কি ভাবে নিজের মতলব সম্বন্ধে কোনোরকম সন্দেহ না জাগিয়ে উত্থাপন করা যেতে পারে, খেতে খেতে সেই কথাটাই ভাবছিল সিরাজ।

বিধাতা তার সহায়, তাই কথাটা নিজেই পাড়লেন নন্দন চৌধুরী। বললেন, 'আজ বিকেলবেলা তোকে একটা তাজ্জব চিজ দেখাব, সিরাজ। এমন চিজ তুই দেখিস নি কখনো, আর কখনো দেখবি নে।'

ভীষণ কৌতূহলী হয়ে সিরাজ প্রশ্ন করল, 'কি চিজ, বাবা?'

নন্দন চৌধুরী বললেন, 'এক আশ্চর্য মানুষ। ছোকরা বয়সে বোধ হয় তোরই মতো হবে। হয় তো বা তোর চাইতে দু'চার বছর কমও হতে পারে। আমার হঠাৎ উড়ে-আসা নতুন অতিথি। কুস্তি লড়বে আমাদের নয়া বছরের কুস্তির মেলায়। হয় তো—'

'হয় তো কি চাচা?'

'কুস্তির লড়াইতে শেষ পর্যন্ত হয় তো এই ছোকরাই বাজি মারবে।'

'আচ্ছা?' বলল সিরাজ, ভারি জোর আগ্রহ দেখিয়ে, যেন 'চাচা' নন্দন চৌধুরীর প্রিয় এই নতুন অতিথি কুস্তিগীরটি নববর্ষের কুস্তি প্রতিযোগিতায় বাজি মারলে সিরাজের চেয়ে বেশী খুশী কেউ হবে না।

সেদিনই বিকেল বেলা এই নতুন ছোকরা অতিথি অর্থাৎ তরুণ কুস্তিগীর মোহনের সঙ্গে সিরাজের আলাপ করাতে গেলেন নন্দন চৌধুরী। রোদটা তখন পড়ে এসেছে, পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়েছে লাল সূর্য, আর সবুজ মাঠে একটা সুপুষ্ট মহিষের সঙ্গে কসরৎ করছে মোহন।

'এই মেজাজী মোষটাকে মোহন ছোকরার জন্যে যোগাড় করতে হয়েছে।' বললেন নন্দন চৌধুরী। 'আমি শখ করে যে ক'টি পালোয়ান পুষে আসছি, তারা কেউ ওর সামনে পাঁচ মিনিটের বেশী দাঁড়াতে পারে না, এমন কি, মহিন্দার সিং, যাকে বসির ভীম বলতাম অ্যাদ্দিন, সে-ও নয়। ওদের সঙ্গে লড়াই করে মোহনের সুখ হয় না, তাই লড়াই করবার জন্যে ও আমার কাছে একটা পাগলা মোষের জন্যে আর্জি পেশ করেছিল। ঠিক পাগলা মোষ জোটে নি, তবে এ মোষটা মেজাজী, ঠিকমতো খেপিয়ে তুলতে পারলে এর মেজাজটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। তখন ওর শিং ধরে ধস্তাধস্তি করে মোহন। ঐ চেয়ে দেখ।

তাই চেয়ে দেখল সিরাজ। কিছুক্ষণ নানা রকম ধস্তাধস্তি কসরতের পর সেই ক্রুদ্ধ মহিষটার দু'টি শিং বজ্রমুষ্টিতে ধরে দেহের সমস্ত শক্তি দু'হাতে একত্রিত করে সেই বিশালকায় জন্তুটিকে এমন ভাবে উল্টে ঘাসের ওপর ফেলে দিল মোহন, যে সিরাজ বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠল, 'তাজ্জব!'

চিৎপাতের পর ধড়মড়িয়ে উঠে মহিষটা রুখে না এসে কি ভেবে ছুটে অন্যদিকে চলে গেল, তা সেই জানে। এতক্ষণ মহিষ-মর্দনের খেলায় মত্ত মোহন খেয়াল করে নি এদিকে, এবার সিরাজের চীৎকার শুনে পিছন ফিরে তাকাল। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে সিরাজ। সিরাজ না হয়ে সে যদি সিরাজী হতো, তা হলে সেই মুহূর্তে প্রেমে পড়ে যেত মোহনের। অমন স্নিগ্ধ, সুললিত, সুন্দর মুখশ্রী যার, তার দেহে এমন অবিশ্বাস্য শক্তি! খোদার এ কি আশ্চর্য কুদ্‌রত!

মোহনের সঙ্গে সিরাজের আলাপ করিয়ে দিলেন নন্দন চৌধুরী। আলাপ করে আরো মুগ্ধ হল সিরাজ। এত বিনয় আর এত গভীর আত্মপ্রত্যয়, এত শক্তি আর এমন প্রশান্ত মাধুর্যের অপরূপ সমন্বয় কখনো কল্পনা করতে পারত না সে, নিজের চোখে মোহনকে না দেখলে।

তরুণ পালোয়ানদের মধ্যে এক তার প্রাণের বন্ধু বাদশা ছাড়া অন্য কারও এমন সুপুষ্ট, সুগঠিত দেহ আর কখনো দেখে নি সিরাজ। মোহনের শরীর দেখে আর ঐ মেজাজী মহিষকে খেপিয়ে তুলে তার সঙ্গে মোহনের অমন অবলীলাক্রমে লড়াই দেখে সিরাজ ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বাদশার জন্য। অসম্ভব, মোহন যদি আগামী কুস্তি প্রতিযোগিতায় তার পূর্ণ শক্তি বজায় রেখে লড়তে পারে, তাহলে বাদশার পক্ষে জয়লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। সিরাজ নিজে কুস্তি লড়তে না জানলেও কুস্তির জগতে পাকা জহুরী, দেখেছে অনেক কুস্তি আর অনেক কুস্তিগীর। অপ্রত্যাশিত কোনো অঘটন না ঘটলে বিজয়মাল্য এই মোহনেরই গলায় দুলবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না সিরাজের মনে। মোহনকে দেখেই তার ভালো লেগেছিল অসামান্য, মোহনের জয়লাভে সে খুশীই হত, যদি না থাকত তার প্রিয়-সখা কুস্তিগীর বাদশা। মোহন বিজয়ী হলে অপমানে বাদশা হয় তো আত্মহত্যাই করবে, হেঁট হয়ে যাবে মল্লগুরু বসির পালোয়ানের মাথা, দুঃখের দরিয়ায় ভেসে যাবে বসির পালোয়ানের প্রাণের দুলালী নাসিম! না, না, তা কিছুতেই হতে দেওয়া যেতে পারে না, সিরাজ ভাবল মনে মনে, কিন্তু সে ভাব ফুটতে দিল না বাইরে, মুখে ফুটিয়ে রাখল হাসি।

'দঙ্গলে তুমি জরুর বাজি মারবে, মোহন।' বলল সিরাজ।

মোহন সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন নিঃসংশয় কণ্ঠে বলল, 'জানি।' একটি ছোট্ট শব্দের সীমায় অসীম আত্মবিশ্বাসের সুর। দম্ভ নয়, গর্ব নয়, শুধু সহজ সরল আত্মবিশ্বাস। যা নিশ্চিত ঘটবে, তা সে আগে থেকে জানে এই মাত্র।

খাতির জমাবার আশ্চর্য যাদুকর ছিল সিরাজ। প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই সে হৃদয় জয় করে নিল মোহনের। মোহন জানল— আর জেনে আনন্দে আত্মহারা হল—কুস্তি প্রতিযোগিতায় তার

জয়লাভ কামনা করে সিরাজ, আর বিজয়ীর পুরস্কার হিসেবে যে এক হাজার টাকা দেবেন কুস্তি রসিক ধনকুবের চৌধুরীরা, তার ওপর সিরাজ দেবে পাঁচশো টাকা, অবশ্য যদি মোহন বিজয়ী হয়। বিজয়ী সে হবেই সে বিষয়ে নিজের মনে কোনো সন্দেহ নেই, তাই চোখের সামনে দেড় হাজার টাকা দেখতে লাগল অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুক কুস্তিগীর মোহন। দেড় হাজার টাকা, আর বিরাট সম্মান।

সে রাতে যে মহলে সিরাজের থাকবার আমীরী ব্যবস্থা হল, সিরাজ বলল, 'চাচা, মোহন থাকবে আমারি মহলে, ঘুমোবে আমার পাশের ঘরে। আমার তো সমবয়সী, ওর সঙ্গে আজ চাঁদনী রাতে ছাতে বসে বসে অনেক কথাবার্তা কইব।'

'বেশ।' বললেন নন্দন চৌধুরী, আর সেই ব্যবস্থাই হল।

সেই মহলের দোতলায় সিরাজের শোবার ঘর। তারি পাশের ঘরে শোবার ব্যবস্থা হল মোহনের। আকাশে চাঁদ, পূর্ণ চাঁদ। মেঘ নাই। সেই পূর্ণ চাঁদের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় যেন সংকোচ আর প্রভেদের বাধা ঘুচে গেল দু'জনের মাঝখান থেকে।

সিরাজ সৌখীন মানুষ, বড়লোকের ছেলে, তার জন্যে দামী সৌখীন খাটে দামী শয্যা। কিন্তু আরামের শয্যায় শুতে পালোয়ান মোহনের আপত্তি, তাই তার আর্জি মতোই তার বিছানা ছিল শক্ত, অসৌখীন।

সিরাজ বলল, 'মোহন, শক্ত বিছানার জন্যে তোমার এত জেদ কেন?'

'আরাম হারাম হ্যায়।' বলল মোহন পালোয়ান। 'আরাম শরীর আর মনকে নরম করে দেয়, আলসেমি এনে দেয়। আরামকে তাই হরদম এড়িয়ে চলি দুশমন ভেবে। কুস্তিতে যে বাহাদুর হবে, তাকে আরামে গা ঢেলে দিতে নেই, সিরাজ সাহেব।'

'সাচ্চা বলেছ মোহন, কিন্তু আরামে গা ঢেলে দেওয়া, আর মেহনত কসরতের পর আবার নতুন মেহনত কসরতের জন্ত তৈরি হবে বলে একটু আরাম করে তাজা হয়ে নেওয়া ঠিক এক কথা নয়—আচ্ছা, মোহন!'

'বলুন, সাহেব।'

'তোমার মুলুক, তোমার খানদান, তোমার ওস্তাদের নাম, সব কিছু জানতে ইচ্ছে করে।' বলল সিরাজ। 'কোথায় তুমি পয়দা হয়েছ, কোথায়—'

'সে সব কথা থাক, সাহেব।' সবিনয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলল মোহন। নিজের চারিদিকে একটা রহস্যের কুয়াসাকে জিইয়ে রাখতে চায় রহস্য-রসিক তরুণ পালোয়ান মোহন। বুঝি জন্ম-মাহাত্ম্যে সে মহত্ব দাবি করতে পারে না বা চায় না, নিজেকে মহত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় আপন পৌরুষে, আপন বাহুবলে। এ যেন মহারথী কর্ণের মতো বলতে চায়: 'কুলে জন্মটা হচ্ছে দৈবায়ত্ত, সেটা আমার হাতে নয়। আমি নিজের সাধনায় আয়ত্ত করেছি পৌরুষ—সেই আমার গর্ব, সেই আমার গৌরব।'

সিরাজ বলল, 'তোমাকে দোস্ত বলে মেনেছি আমি। যা জানাতে চাও না তা জানতে চাই নে। যদি কোনোদিন জানাও তো জানব। নইলে নয়। কিন্তু মোহন, দোস্ত হিসেবে তোমায় আমি হুঁশিয়ার করে দেওয়া দরকার মনে করছি। তুমি এ মুলুকে নয়া আদমি, জানো না এ মুলুকের হালচাল, জানো না কত রকমের মুশকিল এখানকার আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে।'

চৌধুরীদের অতিথি হয়ে এখানে থাকা মোহনের পক্ষে নিরাপদ নয়, এই কথাটা মোহনকে বুঝিয়ে দিল সিরাজ। বুঝিয়ে দিল চৌধুরীদের আশ্রিত পালোয়ানেরা মোহনের ভীষণ শত্রু, মোহনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে তারা প্রতিহিংসায় সুযোগ খুঁজছে এবং সেই সুযোগ পাওয়া তাদের পক্ষে শক্ত হবে না।

'আজই আমি তাদের সঙ্গে দোস্তি করে তাদের মনের মতন কথা
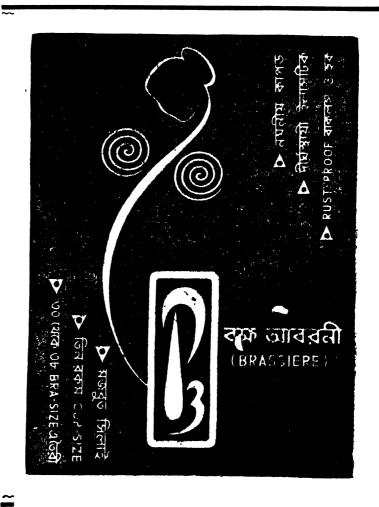
বলে জেনে নিয়েছি তাদের মনের গোপন কথা, তাদের সব মতলব সব ষড়যন্ত্র।' বলল সিরাজ। 'তারা তোমার সর্বনাশ করবার জন্য গোপনে গুণীন লাগিয়েছে, যারা নানা রকম তন্তর-মন্তর, তুকতাক জানে।'

এই তান্ত্রিক গুণীনরা ভয়ংকরী মন্ত্রের গণ্ডী বানিয়ে দিয়েছে চৌধুরী-বাড়ির মস্ত এলাকা ঘিরে, এই গণ্ডীর ভেতরে মোহন যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ সে থাকবে ঐ তান্ত্রিকদের সর্বনাশী শক্তির আওতায়, আর সেই শক্তি ধীরে ধীরে শুষে নেবে তার রক্তের জোর; দুর্বল করে ফেলবে তার স্নায়ু, পেশী, কলিজা, হৃদযন্ত্র, মগজ; দেহে ঢুকিয়ে দেবে দুরারোগ্য ব্যাধি। তার ফলে কুস্তিতে বিজয়লাভ তো অসম্ভব হবেই, ধ্বংস হয়ে যাবে তার বাকি জীবন। এই ভীষণ গণ্ডীর বাইরে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গোপন নিরাপদ আশ্রয় না নিলে তার আসন্ন ভবিষ্যৎ অতি ভীষণ এবং পরবর্তী ভবিষ্যৎ আরো ভয়ানক, এই বিশ্বাস সরলবিশ্বাসী মোহনের মনে দৃঢ় করে দিল সুচতুর সুকৌশলী সিরাজ।

ভয় দেখাতে সে যে এমন পাকা ওস্তাদ, সেকথা এর আগে কখনো কল্পনা করতে পারে নি সিরাজ। অবশ্য এমন সার্থকভাবে সে যে ভয় দেখাতে পেরেছে, তার কারণ ভয় দেখতেও পাকা ওস্তাদ মোহন। লৌকিক শক্তিকে ভয় করে না বাহুবলে মহাবলী মোহন; কিন্তু সে ভাবল তান্ত্রিকদের অলৌকিক শক্তির কাছে বাহুবল অসহায়। এই অসহায়ত্বের জাজ্বল্যমান উদাহরণরূপে কয়েকটি শোচনীয় 'সত্য ঘটনা'ও রচনা করে শোনাল কাহিনী বানাতে পাকা ওস্তাদ সিরাজ।

'কুস্তির বাজি তোমার জেতা চাই-ই দোস্ত মোহন। তা নইলে কলিজায় বড় জবর চোট পাবো আমি।' বলল সিরাজ, 'বাহাদুর হলে যে পাঁচশো টাকার ইনাম তোমাকে দেবো বলেছি, তা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে না পারি, তাহলে কলিজা আমার খান খান হয়ে যাবে, মোহন, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে দিল।'

'তাহলে আমি এখন কি করব ভাইসাহেব? বলুন, কি করব আমি?' চিন্তিত কণ্ঠে শুধাল মোহন।

কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করার ভাণ করে সিরাজ বলল, 'তোমাকে এই সর্বনেশে গণ্ডীর বাইরে এমন জায়গায় পালিয়ে গিয়ে কুস্তির খেলা শুরু না হওয়া তক গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে যে এই গুণীনরা বা এই পালোয়ানেরা জানতে না পারে তুমি কোথায় আছ। গণ্ডীর ভেতরে তোমাকে না পেলে গুণীনরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

'তাহলে চৌধুরী হুজুরকে বলি সব কথা। উনি যদি কোথাও আমার ব্যবস্থা করে দেন এই গণ্ডীর বাইরে।'

'ক্ষেপেছ মোহন? চাচাকে একথা কখনো বলতে আছে? এই পালোয়ানরা চাচার অনেক দিনের পেয়ারের গোলাম, আর তোমার সঙ্গে চাচার জান-পহচান তো হল নতুন, এই সেদিন মাত্র। ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে চাচা সেকথা কানেই তুলবেন না, উল্টে তোমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠবেন শুধু। তাতে তো তোমার পক্ষেই খুব খারাপ হবে। তাছাড়া আরেকটা কথাও ভেবে দেখলাম, মোহন।'

'কি কথা, ভাইসাহেব?'

সসম্ভ্রম অন্তরঙ্গতা মাখানো এই সম্বোধনের সুযোগ সিরাজই করে দিয়েছে সরলপ্রাণ তরুণ পালোয়ান মোহনকে।

যে কুস্তি প্রতিযোগিতায় লড়ে বিজয়ীর পুরস্কার জয় করে নেবার আকাঙ্ক্ষা মোহনের, তার উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক এই চৌধুরীরা। পুরস্কার জয় করবে সে নিজের পৌরুষে, নিজের যোগ্যতার বলে, চৌধুরীদের সহায়তায় বা কৃপায় নয়। সুতরাং তার পক্ষে এই চৌধুরীদেরই আতিথ্য গ্রহণ করে থাকা সম্মানজনকও নয়, শোভনও নয়—এক কথায় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই 'আরেকটা কথা' বেশ কায়দা করে মোহনকে বুঝিয়ে দিল, বোঝাতে ওস্তাদ সিরাজ। বোঝাল এমন ভাবে যে না-বোঝা সম্ভব হল না মোহনের পক্ষে।

চৌধুরীদের আতিথ্যে বড় ভালো, বড় নিশ্চিন্ত ছিল মোহন। এবার কোথায় আশ্রয় নেবে এই ভেবে সে বিষম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তাকে সেই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দিয়ে হাতে যেন স্বর্গ পাবার রাস্তা বাতলে দিল সিরাজ। সে রাস্তাটি হল সিরাজের সেই বাগানবাড়িতে অজ্ঞাতবাস, 'নীলনয়নীর দীঘির' কিনারায়। ঘন জনবসতি থেকে বেশ দূরে সেই অজ্ঞাতবাসের পরম আশ্রম, অতি সুন্দর, সুখপ্রদ আশ্রয়। শক্তিচর্চার সব রকম সুব্যবস্থা সেখানে মিলবে, মেজাজী মোষেরও অভাব হবে না। পালোয়ানী আহার্যেরও প্রাচুর্য আছে সেখানে। মালীরা আর ভৃত্যেরা সিরাজের হুকুমে মনিবের মতোই মানবে আর সেবা করবে মোহনকে, সেই এলাকার বাইরে কেউ জানবে না এখানে অজ্ঞাতবাস করছে আগামী কুস্তি প্রতিযোগিতার নিশ্চিন্ত বিজয়ী মল্ল মোহন।

খুশী হল, পরম নিশ্চিন্ত হল মোহন। বলল, 'চৌধুরী হুজুরকে তা হলে বলতে হয়, ভাইসাহেব।'

'না, মোহন।' বলল সিরাজ। 'চাচা জানলেই চাচার পালোয়ানরা নিশ্চয় জেনে যাবে। আর তাহলেই সর্বনাশ। যে জন্যে তুমি গা-ঢাকা দিচ্ছ সে কাজটাই হবে না।'

'তবে?'

'চাচাকে শুধু বলবে তুমি যাচ্ছ, কুস্তির সময়ে এসে হাজির হবে। কোথায় যাচ্ছ, কোথায় কাটাবে এই বাকি দিনগুলি সে কথা চাচাকে বলার দরকার নেই। তুমি আমার সামনে কথাটা পেড়ো, আমি চাচাকে বুঝিয়ে বলব। সব ঠিক হয়ে যাবে'খন।'

মোহন আর এখানে থাকতে চাইছে না জেনে দুঃখিত হলেন নন্দন চৌধুরী। শুধালেন, 'কেন, তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? অথবা শুধু মোষে কুলোচ্ছে না, এখন লড়বার জন্যে একটা বাঘ দরকার?'

সিরাজ হেসে বলল, 'তা নয় চাচা। অসুবিধে-টসুবিধে কিছু নয়। ও-কিছু দিনের জন্যে উধাও হয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়, কুস্তির মেলায় হঠাৎ এসে হঠাৎ চমক লাগিয়ে দেবে বলে।'

'মানে, ইংরেজিতে যাকে বলে সেন্‌সেশন (sensation) ?'

'তাই, চাচা।'

একটু ভেবে নন্দন চৌধুরী বললেন, 'পালোয়ানী মগজ একটু খামখেয়ালীই হয়ে থাকে, এতে অবাক হতে নেই। উধাও হতে চাচ্ছ, বাধা দেবো না, কিন্তু তোমার জন্তে দরজা আমার খোলাই রইল, যখন দরকার বা যখন খুশী ফিরে এসো। কিন্তু কোথায় গিয়ে থাকবে এখন ?'

মোহন সবিনয়ে জানাল সেটা সে গোপন রাখতে চায়, হুজুর যদি কিছু মনে না করেন।

'না না, কিছু মনে করব না। কিন্তু কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে যাও মোহন। দরকার হতে পারে।' বললে নন্দন চৌধুরী।

'আমার সঙ্গে টাকা আছে চাচা। আলাদা হয়ে যাবার সময়ে আমি ওকে দিয়ে দেবো'খন। কিছুদূর ওর সঙ্গেই যাই।' বলল সিরাজ। 'রথ দেখাও হল, কলা বেচাও হল। কাজ-কারবারের কথা হল, আপনাদের দেখে গেলাম। তার ওপর ফাউ এই মোহনকে দেখা।'

চাচা ও চাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোহনকে সঙ্গে করে চৌধুরী-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সিরাজ। গাড়ি এগিয়ে চলল সিরাজ আর মোহনকে নিয়ে।

গাড়িতে যেতে যেতে সিরাজ শুধাল, 'শাদি করেছ মোহন ?'

মোহন বলল, 'না, ভাইসাহেব।'

'পেয়ার ? মুহব্বত ?'

কুরসৎও হয়নি, মওকাও মেলেনি, জানাল মোহন। তারপর চলল আরো কথাবার্তা। কোনো সুন্দরীর সান্নিধ্য পায়নি মোহন, অন্তরঙ্গতা তো নয়ই, বুঝে নিল সিরাজ। কুস্তি আর কশরতের কঠোর চর্চাতেই এ-পর্যন্ত মেতে রয়েছে মোহন। নারী-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নেই তার, নারী সম্পর্কে একেবারেই সে আনাড়ি। সিরাজ ভাবলে এই ভালো।

এখানে কিছুদূর পিছু হটে একটি নারী-ঘটিত ব্যাপারের বিবরণ দিয়ে নেওয়া দরকার। ব্যাপারটি ঘটেছিল সিরাজের নন্দনপুর যাত্রার দিন দু'চার আগে। বিবরণটি সংক্ষেপেই দেওয়া ভালো।

বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে কবিগুরুর বিখ্যাত 'অভিসার' কবিতাটি, যার শুরু :

'সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত।'...

রাত্রি তখন গভীর। পথের প্রদীপগুলো হাওয়ায় নিবে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে দরজা বন্ধ, শ্রাবণ আকাশে রাতের তারা ঢেকে গেছে ঘন মেঘে।

যৌবন-মদে মত্তা নগরীর রূপসী নটী বাসবদত্তা চলেছেন একাকিনী অভিসারে। পায়ে নূপুর, হাতে দীপ। তারপর :

'সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা।'

ভেঙে গেল উপগুপ্তের ঘুম, তাঁর ক্ষমাসুন্দর চোখে লাগল রূঢ় দীপের আলো। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন মোহিনী বাসবদত্তা। ভুলে যেতে চাইলেন তাঁর অভিসারের কথা, আমন্ত্রণ জানালেন উপগুপ্তকে :

'চলো আমার ঘরে।'

কিন্তু রাজি হলেন না উপগুপ্ত। বললেন, 'সুন্দরি, এখনো আমার সময় হয় নি। যেদিন সময় আসবে, সেদিন নিজে থেকেই যাবো তোমার কুঞ্জে।'

এবার কবিতা থেকে প্রতিশ্রুত বিবরণে আসা যাক। বিনা নোটিশে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন রূপসী বিমোহিনী তহমিনার কুঞ্জে এসে হাজির সিরাজ—বিখ্যাত ধনী অভিজাত ব্যবসায়ী নাসির আমেদ সাহেবের একমাত্র বংশধর সিরাজ, সৌখীন সিরাজ, দিলদরিয়া সিরাজ, দরাজহস্ত সিরাজ।

'চোখে কি ভুল দেখছি, সিরাজ সাহেব ?' নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে না পেরে দু'টি পেলব হাতে রগড়ে রগড়ে আবার সিরাজের দিকে তাকিয়ে বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে শুধাল তহমিনা।

'না, তোমার চোখ ভুল দেখেনি তহমিনা বিবি। সত্যিই আমি এসেছি তোমার কাছে।' হেসে বলল সিরাজ।

'এ আমি জানতাম, সিরাজ সাহেব।' অনেক দিনের নিরাশা ভঙ্গের হাসি হেসে বলল তহমিনা।

'কি জানতে, তহমিনা ?'

'একদিন আপনি আসবেন।' বলল তহমিনা। আশাপূরণের তৃপ্তিতে ভরা তার কণ্ঠস্বর।

সিরাজ বলল, 'আমি জানতাম না, তহমিনা বিবি। কিন্তু এলাম। না এসে পারলাম না।'

'আপনার বড়ী মেহেরবাণী।'

'মেহেরবাণী আমার নয়, তহমিনা। আমি এসেছি তোমার মেহেরবাণী ভিখ্ মাঙতে।' বলল সিরাজ।

দু'টি অপরূপ সুন্দর পাতলা গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মতো দু'পাটি দাঁত ঝকমকিয়ে উঠল তহমিনার।

'তোবা! তোবা! সে কি কথা সাহেব ? বাঁদী আপনার হুকুম তামিল করতে হামেশা তৈয়ার।' বলল তহমিনা। তার বিলোল কটাক্ষ হয়ে উঠল বিলোলতর। [ক্রমশ।
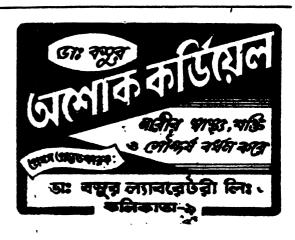
পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে নয়—অর্গানের সুরে। কে যেন নিচের ঘরে নিপুণ হাতে হিম বাজিয়ে চলেছে।

যন্ত্রসঙ্গীতে আমার পারদর্শিতা, যন্ত্রবিজ্ঞানে আমার দক্ষতার মতই সীমিত। তবু বিভিন্ন সংগীত যন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটির ধ্বনিই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

কর্ণেট ও ম্যাণ্ডোফোনের সুর মাদকতা জাগায় আমার প্রাণে, ফ্লুট আর পিকোলোর ধ্বনিতে আমার মন যায় উদাস হয়ে, সারাদিনের ক্লান্তি শেষে মধ্যরাতে গীটারে রবীন্দ্রসংগীতের সুরে আমি আবার আপন হারানো সত্তা পাই ফিরে কিন্তু কোন শারদপ্রাতে রাত পোহাবার ক্রান্তি ক্ষণে পরম নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে অর্গানের পবিত্র সুরধ্বনি যদি কানে আসে তা হলে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের সেই কথাটি পড়ে মনে—When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy.

: ঘুম ভাঙল ?

সম্বিৎ ফিরল কার কণ্ঠস্বরে। অন্য গ্রহ পরিক্রমা শেষে আমি এই মাত্র যেন ফিরলাম মর্ত্যভূমিতে। মনে পড়ল আমি আজ জেনেভার চেমিন বেল্যমির একটি পেঁসিয়ঁর ঘরে শুয়ে আছি। আমার পাশের শয্যায় পূর্ব আফ্রিকার গোয়ানিজ জেলে পিটার। যার সঙ্গে আমার আলাপ চব্বিশ ঘণ্টাও পুরনো হয় নি।

মনে পড়ল পিটারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গতকাল জুরিখ এয়ার পোর্টে। জেনেভার যাত্রী। আমার মতই ট্যুরিষ্ট এবং বয়সেও তরুণ সুতরাং আমাদের পরিচয় সখ্যতায় পরিণত হতে বিলম্ব হয় নি।

পিটার আবার জিজ্ঞাসা করল : ঘুম ভাঙল ? কাল বলছিলে না, তোমার বেলা দশটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

মনে পড়ে গেল আজ সকালে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ কমিটার একজন মুখপাত্র আমার জন্ত সকাল দশটায় গাড়ি পাঠাবেন। জুরিখের আন্তর্জাতিক প্রেস ইনষ্টিট্যুট থেকে আমার কথা জানিয়ে ওঁরা টেলিফোন করেছিলেন রেডক্রশকে।

পিটার জানালার শার্সী থেকে ভেলভেটের পর্দাটা সরিয়ে দিল। জেনেভার আকাশ তখন প্রোষিতভর্তৃকা রমণীর মুখের মতই বিষাদমানা।

'ওঠ বাবা বেলা যায়' এই একটিমাত্র কথাই নাকি লালাবাবুর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পিটারের একটি সতর্কবাণীই আমার কাছে পর্যাপ্ত। ঘড়ির দেশ জেনেভার লোকেরা নিশ্চয়ই সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে না! অতএব—

আমার এই পেঁসিয়নটিতে আর যাই হোক পরিবেশটি পারিবারিক মমতা দিয়ে ঘেরা। দোতলা আর তিনতলায় গেষ্টদের ঘর। নিচেরতলায় ল্যাণ্ডলেডি থাকেন সপরিবারে।

ব্রেকফাষ্টের জন্তে নিচের তলার ঘরে নামতেই সুরের উৎস হোল আবিষ্কৃত। অর্গানের সামনে বসে এক সপ্তদশী। অনুমানে বোঝা গেল তিনি ল্যাণ্ডলেডির কন্যা। দক্ষতা থেকে সহজেই বোঝা যায়, তার এই সংগীতানুরাগের উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের পাত্র চাই কলমে 'যন্ত্রসংগীতে পারদর্শিনী' বিশেষণটি যোগ করবার জন্য নয়। আপন মনের মাধুরী সেথানে মেশান। দুয়ারে যখন প্রস্তুত গাড়ি তখন ঠিক বেলা দশটা। Chemin des colombettes ধরে গাড়ি চলল Place des nations-এর দিকে।

আন্তর্জাতিক রেডক্রশ ভবনের ইনফরমেশন অফিসার ভদ্রলোকের নামটা ভুলে গেছি। কিন্তু চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে। একটু কৃশ, দীর্ঘাকৃতি, কেশবিরল মস্তক। বয়স অনুমানে মনে হয় অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করতে বেশী বিলম্ব নেই।

জুরিখের প্রেস ইনষ্টিট্যুটের অফিসে বসে ভদ্রলোক সম্পর্কে জনশ্রুতি শুনেছিলাম : তিনি ভারতবর্ষ একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছেন। একবার নাকি নমিয়া বুদ্ধে মেগে নিয়েছিলেন তাঁর নাকি পাদনখকণা। জেনেভার বাজারে গুজব রটেছিল তিনি নাকি আর খৃষ্টান নন—বৌদ্ধ।

বিচিত্র মানুষ। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছেন। ভারতবর্ষ থেকে এসেছি শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আবেগে।

ছোটবেলা থেকে সুইজারল্যাণ্ডের মানুষটি শুনে এসেছিলেন ভারতবর্ষ গোল অর্ধসভ্য কৃষ্ণকায় মানুষের দেশ। ইতিহাস বলে, মহেঞ্জোদড়োতে নাকি হাজার হাজার বছর আগেকার সভ্যতার শিকড় আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের ফসিল নিয়ে মাথা ঘামাক অ্যানথ্রোপলজির ছাত্ররা, সুইজারল্যাণ্ডের এই মানুষটি ইংরাজ সিভিলিয়ান বন্ধুদের কাছে শুনেছেন, ভারতে এখনও রাজপথে নির্ভয়ে বিচরণ করে বন্য হস্তীরা। প্রতি গৃহ সেখানে সর্পকুলের ঠিক নিরাপদ আবাসকেন্দ্র। আর অর্ধউলঙ্গ মানুষেরা গলায় ট্যালিসম্যান পরে ঘুরে বেড়ায়। পরে মিস মেয়ো পড়ে তিনি জেনেছিলেন তাঁর বিশ্বাসই অভ্রান্ত।

সেই সময় তরুণ বয়সে চাকুরী তাঁকে ভারতবর্ষ পাঠাল। মনে মনে উল্লসিত হলেন। সভ্য ইওরোপের মানুষ হিসাবে অর্ধসভ্যদের মাঝে কাটানোর এক রোমান্টিক আনন্দ আছে।

উনি বললেন : আমি আমার পাশ্চাত্য মন দিয়ে ভারতবর্ষকে বিচার করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু একদিন বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে আমি অন্যমানুষ হয়ে গেলাম।

মহাকাল মন্দিরের মাঝে তখন গম্ভীর মন্দ্রে বাজছিল সন্ধ্যারতি। 'ঊর্ধ্বে যায় দেখা অন্ধকার হর্ম্য পরে সন্ধ্যারশ্মি রেখা।' দূরে মণিকর্ণিকার ঘাটের চিতার অগ্নি রক্ত তিলক এঁকে দিয়েছিল ভাগীরথীর স্বচ্ছ জলে।

বললেন : জানেন। সেই মুহূর্তে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। গেলাম ভুলে গেলাম আমি হাজার হাজার মাইল দূরে এক বিখ্যাত জনপদের মানুষ, যেখানে বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যেখানে প্যান ইজ ডেড। প্যানের বাঁশী আর বাজবে না। মনে হল আমি কোটি কোটি ভারতবাসীরই একজন। যাদের সমস্ত পার্থিব দুঃখ এই বিরাট বিশাল মহাতীর্থের মাঝে এসে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়।

কতক্ষণ বসে রইলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব শক্তি ভুলে গেলাম। দেখলাম আমারই মত কত মানুষ বসে আছে। বেশভূষায় তাদের দারিদ্র্য উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। কিন্তু মুখে চোখে সেই অহংকার যাকে আপনারা ভূমা বলেন—দি ইনফাইনাইট, দি ইটার্ণাল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। জেরুসালেমের মৃত্তিকা পিসাতে আনা হলে, তা থেকে নাকি ফুল ফুটেছিল। ভারতবর্ষের মাটি তাঁর মনের মালঞ্চে ফুল ফুটিয়েছে তেমন করে।

প্রশ্ন করলাম : আপনি কি বৌদ্ধদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ?
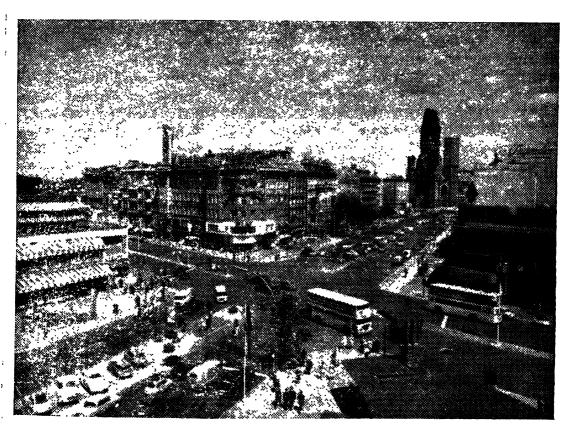
পশ্চিম বার্লিনের পিকাডালি—কুরফুরস্টেনডাম।

: না। বরঞ্চ খানি হয়েছিলাম শঙ্করাচার্যের জায়দর্শনের প্রতি।

: আপনি তো কেরলের মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদের সঙ্গে দেখা করেছেন? জানেন, উনি শঙ্করাচার্যের বংশের ব্যক্তি?

: হ্যাঁ। কিন্তু উনি কি শঙ্করাচার্যের সেই মহান ঐতিহ্যের অধিকারী?

: ভারতবর্ষের কোন বিষয়টি আপনাকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছে?

উত্তরটা শুনে আমি যে বিস্মিত হব তা তিনি জানতেন। তাই প্রথমেই তিনি সসঙ্কোচে প্রকাশ করলেন সে-কথা।

: আপনারা নব্য-ভারতীয়েরা এ-কথা শুনে আশ্চর্য হবেন জানি। তবু আমি বলছি। আকৃষ্ট হয়েছি আপনাদের পুরাতন দিনের জাতিভেদ প্রথার প্রতি। আমার মনোভাবটি বোঝাতে পারতাম আমার মাতৃভাষা জার্মানে। ইংরাজীতে ঠিক ভাল করে বলতে পারব না। আমরা ইওরোপীয়ানরা হাফ-ইনটেলেকচুয়াল। সামগ্রিকভাবে জীবনে বুদ্ধিবাদকে বরণ করে নেবার জন্য আবাল্য শিক্ষা চাই। যতদূর জানি একদিন আপনাদের দেশে তাই ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলেরা শিশুকাল থেকেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠত। তার মনের বিকাশ হত সর্বাঙ্গীণ।

বললেন: বিজ্ঞান আজ মানুষকে শক্তি দিচ্ছে, প্রজ্ঞা নয়। প্রজ্ঞাহীন শক্তি অন্ধ দৈত্যের মত এগিয়ে আসছে। তার পদভারে আজ পৃথিবী কম্পমান।

কথায় কথায় উঠল রেডক্রশের কথা। মানব সেবায় আন্তর্জাতিক এই সংগঠনটির অবদান আজ কারুর অগোচর নয়।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম: একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবু অনেকদিন থেকে কৌতূহল। হাঙ্গেরির বিপ্লবের সময় রেডক্রশের গাড়ি বোঝাই করে অষ্ট্রিয়া থেকে যা যেত তা নাকি গুঁড়ো দুধ আর ওষুধপত্র নয় রাইফেল আর স্টেনগান?

ভদ্রলোক স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠলেন: মিথ্যা মিথ্যা। এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা আর হতে পারে না। আমাদের প্রতিটি গাড়ি চেক করা হোত অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোত।

বললাম: কম্যুনিষ্টরা যে প্রচার করে তারই সত্যতা আপনার কাছে যাচাই করার জন্য একথার অবতারণা। অপরাধ হলে মার্জনা করবেন।

স্ফুলিঙ্গটি নিভে গেল।

উনি বললেন: না না। এতে মনে করার কি আছে। চলুন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই রাষ্ট্রসংঘের এক ইনফরমেশন অফিসারের—যিনি আপনাকে সব ঘুরে দেখাবেন।

প্রাচীন কালের সাগ্নিক ঋষিদের বিবরণ আছে ভারতীয় পুরাণে। তাঁরা অহোরাত্র অগ্নি জ্বেলে বসে থাকতেন নিজেদের চতুর্দিকে। জেনেভার রাষ্ট্রসংঘের যে ইনফরমেশন অফিসারটির সঙ্গে পরিচয় হল তিনিও সাগ্নিক। তবে তাঁর অগ্নি অনামিকা ও তর্জনীর মধ্যদেশে।

মিনিট পনেরর মধ্যে তিনি যখন গোটা পাঁচেক সিগারেট ভস্মীভূত করেছেন, তখন সবিনয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: এত সিগারেট খান, আপনার স্ত্রী কিছু বলেন না?

ভদ্রলোক বললেন: আমার স্ত্রী এখন বাপের বাড়িতে। চলুন, আপনাকে নিয়ে যাই ইন্টারন্যাশনাল লেবর অর্গানিজেশনের অফিসে। সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে মিঃ ঘটকের—আপনার দেশের লোক।

মিঃ ঘটক জেনেভায় অনেক ঋতু পরিবর্তন দেখেছেন। আই. এল. ও তে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আগমন নৈমিত্তিক ব্যাপার। মিঃ ঘটক তাদের সকলেরই পরিচিত।

মিঃ ঘটক জিজ্ঞাসা করলেন: কেমন লাগছে?

বললাম: বড় শীত পড়েছে। আপাতত কাহিল অবস্থা।

মিঃ ঘটক বললেন: শীতের হয়েছে কি? কিছুদিন থেকে যান না, দেখবেন বরফ পড়ছে। আর সুইজারল্যাণ্ডে বরফই তো দেখবার।

জেনেভার এই আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন বা 'ইলো'র ঐতিহ্য চল্লিশ বছরের পুরনো। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে সভ্যতা চেয়েছিল নতুন শিক্ষা গ্রহণ করতে। সে শিক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শান্তির। ১৯১৯ সালের শান্তি চুক্তির প্রথম ফসল আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের মতে এক দেশের দারিদ্র্য অন্য দেশের সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই পুঁজিবাদের মূল সমস্যাগুলি দূর করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এখন শ্রমিক সংগঠনের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর আশীটি দেশের প্রতিনিধি আছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে। প্রতিটি দেশের চারজন করে প্রতিনিধি—সরকারী দু'জন, মালিকের একজন, ট্রেড ইউনিয়নের একজন।

এদেরই নিয়ে বসে সম্মেলন। সম্মেলনে আলোচিত হয় বিভিন্ন দেশের সামাজিক সমস্যাবলী। সম্মেলনে গৃহীত হয় কনভেনশন। এ পর্যন্ত সদস্যরা প্রায় উত্থাপিত করেছে দু' হাজারের মত কনভেনশন। তার মধ্যে গৃহীত হয়েছে ১৪টি। এর মধ্যে আছে দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী কোন শ্রমিককে খাটান চলবে না—আছে সবেতন ছুটি দেবার বিধান। নিষিদ্ধ হয়েছে রাত্রে কারখানায় মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন পরিচালনার ভার একটি কার্যকরী সমিতির ওপর। তাতে থাকেন দশজন শ্রমিক প্রতিনিধি, বিশজন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধি, দশজন মালিক প্রতিনিধি।

মিঃ ঘটক বললেন: আমাদের এই অফিসে আমরা সব মিলিয়ে ন'শ জন কর্মচারী। আমাদের রিসার্চ সেকসন আছে, ইনভেষ্টিগেসান আর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স সেকসন আছে। আর আছে পাবলিকেশন সেকসন।

মিঃ ঘটকের সঙ্গে ঘুরে দেখতে গেলাম শ্রমিক সংগঠনের অফিস বিরাট চারতলা বাড়ি। জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের ভবনটির তুলনায় বাড়িটি পুরনো ধরণের। স্থাপত্যে নব্য রীতির ছাপ এই বাড়িটিতে পড়েনি।

এর আগে দেখে এসেছি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানিজেশন। সংস্থাটি 'ইলো'র তুলনায় অর্বাচীন। ১৯৪৮ সালে এর সৃষ্টি। বিশ্বের ৬০টি দেশ থেকে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি জেনেভার এই দপ্তরে বসে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশ্বের জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংগঠনের সংগ্রাম অস্বাস্থ্য ও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বিশ্বের ১৩০টি দেশকে আজ এই সংগ্রামে সাহায্য করে চলেছে এই সংগঠন। বছরে পনের মিলিয়নেরও ওপর তার জন্ম খরচ করে এই সংস্থা।

লাঞ্চের সময় হতেই ইনফরমেশন অফিসার সেই ভদ্রলোক এসে হাজির।

: আপনি আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন।

মি: ঘটকের কাছে বিদায় নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তরের ভবনে এসে পৌঁছলাম। চারিদিকে সবুজ জাজিম পাতা উদ্যানের মাঝে এই ভবনটি গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী। সম্মুখভাগে পাঁচটি বৃহদায়তন থাম। দরজা দিয়ে ঢুকতেই বিরাট লবি—সম্মুখে ইনফরমেশন ডেস্ক।

ক্যান্টিন জানালার এক পাশে টেবিল নিয়ে আমরা বসলাম। জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে পাশে লেক, পরপারে পাহাড়ের পর পাহাড়। দূরে তুষার শুভ্র পর্বতচূড়া।

ক্যান্টিনের ভেতরে তাকালাম। নানা ভাষা নানা বেশ, নানা পরিধানের ভিড়। একই টেবিলে নাইজেরিয়ার তরুণের পাশে হয়ত জার্মান তরুণী, কাল ভারতীয়ের সঙ্গে একই টেবিলে আলোচনায় রত কোন বার্মিজ।

বললাম: বিবিধের মাঝে মিলনের যে স্বপ্ন যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছেন মনীষীরা তা যে সফল হতে পারে, তা দেখার জন্যে আসতে হয় এখানে।

উনি বললেন: সত্যিই তাই। রাষ্ট্রসংঘের দপ্তরে আমার কাজ হল প্রায় একযুগ। আমি হল্যাণ্ডের মানুষ। জাতীয়তাবাদী ছিলাম মনে মনে। কিন্তু আজ ভুলে গেছি আমার রাষ্ট্র পরিচয়। এখানে ও প্রশ্ন কেউ করে না। আমি এই বিশ্বরাষ্ট্রের একজন অধিবাসী। এটাই আমার একমাত্র পরিচয়।

বললেন: শুধু আমি নই সকলেই। আমি একজনকে জানি। আমেরিকার মেয়ে। প্রথম যখন এল, তখন বিদ্বেষ ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে। সে ঘৃণা সে অন্তরে পুষে রেখেছিল দীর্ঘদিন। কিন্তু তারপর দেখলাম সেই মেয়েই বিয়ে করেছে ঘানার এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে।

প্যালাইস দেস নেশন্স-এর ক্যান্টিনে বসে বসে এই কথাই ভাবছিলাম। আমি অন্ধ জাতীয়তাবাদী নই। স্বদেশের কুকুরের চেয়ে বিদেশের ঠাকুরকে আমি শ্রদ্ধা করি অধিকতর। আমার দেশকে আমি ভালবাসি কিন্তু আমার দেশ সকল দেশের রাণী বলেও আমি আজ আত্মতৃপ্তিতে ডগমগ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা পাই না। আবার আমরা অতি হীন, এই দাস্য মনোভাবও আমার কাছে সমধিক বর্জনীয়।

অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষ কখনই অন্ধ জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় দেয়নি। ভারতবর্ষ তার অমৃতের অধিকার বন্টন করেনি শুধু আপনার পুত্রের মাঝে। ভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস যে, এই দেশের মানুষই জাতীয়তাবাদকে সীমিত করতে করতে এনে ফেলেছে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতায়। সেখানে দর্জিপাড়ার সঙ্গে কালীঘাটের যে নিত্য বিরোধ তার হেতু শ্রেষ্ঠতা নিয়ে।

মনে ভাবলাম এ কথা শুধু চিন্তা করতে পারছি পৃথিবীকে দেখেছি বলেই। প্যালাইস দেস নেশন্স-এর কর্মীরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে বলেই হয়ত আজ বুঝতে পেরেছে। বর্ণে বর্ণে নাইকো বিভেদ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

আজ যদি আমার জীবনের পরিসর চারিদিকের ঘেরাটোপে ঢাকা থাকত তাহলে দর্জিপাড়ার রোয়াকে বসে আমিও হয়ত মনে মনে গর্ব অনুভব করতুম, আমাদের মত শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। আমি তাহলে হয় তো ইষ্টবেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানের পরাজয়ে কেঁদে বুক ভাসাতাম।

: আপনাকে আর একটা রোল দি।

খেয়াল ছিল না। দেখি অফিসার আমাকে প্রশ্ন করছেন।

একটু লজ্জিত হয়ে রোলে মাখন লাগাতে লাগাতে বললাম: ধন্যবাদ।

আমার সুইজারল্যাণ্ড আসার সংবাদ পেয়ে আমার বহু শুভাকাঙ্ক্ষী ও বান্ধবরা আমাকে পত্র লিখেছিলেন। সে পত্রের প্রথমে ও অন্তে আমার শুভকামনা ছিল এবং পুনশ্চ দিয়ে সর্বশেষে যে কথাটি লেখা ছিল তা হল: আমার জন্য পারিলে একটি হাতঘড়ি আনিবে। দামের জন্য ভাবিবার কিছু নাই। দেখা হইবামাত্র দাম চুকাইয়া দিব।

পিটার আমাকে যেদিন জিজ্ঞাসা করল: আমি ঘড়ি কিনতে যাব কি না।

সেদিন আমি উত্তর দিলাম: না। আমি একটিও ঘড়ি কিনছি না।

এ-কথা শুনে পিটার আশ্চর্য হল। কারণ জেনেভাতে এসে ঘড়ি না কেনা যেন কৃষ্ণনগর এসে এক হাঁড়ি সরভাজা না কিনে বাড়ি ফেরার সামিল।

পিটারকে বললাম: আমার কাছে যা অর্ডার আছে, তাতে করে অন্তত গোটা দশেক ঘড়ি আমাকে কিনতে হবে। তাই ঠিক করেছি একটিও ঘড়ি কিনব না। তবে তুমি যদি ঘড়ির দোকানে চল, আমি তোমাকে অনুগমন করতে পারি।

পিটার বলল, শুনে সুখী হলাম। তাহলে চল, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।

ঘড়ির শহর জেনেভা। প্রতি বছর জেনেভা সারা পৃথিবীর বাজারে যত ঘড়ি সরবরাহ করে তার পরিমাণ তিন কোটি। জেনেভা শহরের ষাট হাজার মানুষ আজ এই শিল্পে নিয়োজিত। ১৫৫০ সালে জেনেভাতে যখন ঘড়িশিল্পের উষাকাল তখন ঘড়ি ছিল একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়েরই লভ্য বস্তু। বহুমূল্য হীরক ও স্বর্ণখচিত লকেটের ভেতর ঘড়ি পরে যাঁরা উৎসব সভায় উপস্থিত হতেন, তাঁদের সকলের বাস সমাজের ওপরের তলায়। সেদিন ছিল ঘড়ি ঐশ্বর্যের দম্ভ, জীবনযাত্রার অপরিহার্য সঙ্গী হিসাবে তার আবির্ভাব অনেক অনেক পরে।

জেনেভার ডালহৌসি স্কোয়ার প্রেশিবেল এয়ারের এই পথে যেতে যেতে প্রায়ই তাকিয়ে থেকেছি সুসজ্জিত বিপণি শোভার দিকে। বিচিত্র প্যাটার্ণের বিবিধ মূল্যের ঘড়ির সমারোহ। প্রতিটি দোকানেই ইংরাজী জানা সেল্সম্যান, সাগর পারের হাজার হাজার ট্যুরিষ্টের ভিড়ে বিপণিগুলি এখন পূর্ণ।

পিটারের ঘড়ি কেনা শেষ হলে আমরা এসে দাঁড়ালাম মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ব্রিজে। দূরে পর্বতশৃঙ্গ মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের ওপর অপরাহ্নের প্রৌঢ় সূর্য বিছিয়ে দিয়েছে কিরণ উত্তরীয়। এ পাশে রুশো আইল্যাণ্ডে ফরাসী জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক রুশোর প্রস্তর-মূর্তি দেখা যাচ্ছে বার্চ গাছের অবগুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে।

জেনেভা দেখে একদা এই মহানায়ক নাকি বলেছিলেন: As a residence I have not found its equal in all the world.

শুধু রুশো কেন গোটা ইওরোপের চিন্তানায়কদের বার বার আকর্ষণ করেছে জেনেভার মাটি, জেনেভার হ্রদের কাকচক্ষু জল, মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক পর্বতচূড়া। প্রথমে এলেন বায়রন আর শেলী। লেক জেনেভার তীরে কটেজ নিয়ে বায়রন কি নতুন করে আবৃত্তি করেছিলেন তাঁর 'ইনক্যানটেশন'?

When the moon is on the wave
And the glow-worm in the grass,
And the meteror on the grave,
And the wisp on the morass,
When the falling stars are shooting,
And the answerd owls are hooting,
And the silent leaves are still
In the shadow of the hill,
Shall my soul be upon thine,
With a power and with a sign.

হয়ত খুবই সম্ভব। কারণ শেলী আর বায়রন তখন ইংলণ্ডের নীতিবাদী মহলে দু'টি ঘৃণিত নাম। দুঃখ-সন্তাপ আর অভিমান বুকে নিয়ে দুই কবি সেদিন এসেছিলেন লেক জেনেভার জলে অবিম্বিত জীবনের প্রতিবিম্ব দেখতে (১৮১৬)। এর পরে এলেন জর্জ ইলিয়ট (১৮৪১)। নাস্তিক্যবাদী জর্জ ইলিয়ট ছিলেন পলাতক। প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি আদর্শমত প্রচার করেছেন। এই ছিল তাঁর অপরাধ। পরে আরও এসেছেন অনেকে—জন এভিলিন, ভল্‌তেয়ার, নেকার, গিবন, মহামতি রুশো। জেনেভার দ্বার সকলের জন্যই ছিল উন্মুক্ত—আজও যেমন তা আছে বিশ্ববাসীর জন্যে।

লেক জেনেভার জলে আজও কান পাতলে শোনা যায় সপ্তসিন্ধুর কলতান। টেমস, সেইন, রাইন আর ডানিয়ুবের জলে ভরা হয়েছে লেক জেনেভার মঙ্গলঘট; তার গভীরতা অতলান্তিকের।

সমাপ্ত

আমি পুরুষদের পছন্দ করি

সোনালী দেবী

'আমি পুরুষদের পছন্দ করি': প্রকাশ্যে একথা বললে পর স্বভাবতই অপরাপর মহিলারা আমার দিকে এভাবে তাকাবেন যেন আমি একটা 'নাথুরাম গড্‌সে'; বা তার চেয়েও ঘৃণ্য কোন জীব। এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বহু মেয়েই পুরুষজাতি সম্বন্ধে এক অবিমিশ্র অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন। এই ধরণের মহিলারা সমগ্র মানব জাতির অর্ধাংশ সম্পর্কে বিরূপ হয়েও যে শেষ পর্যন্ত কেন এবং কিভাবে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেন সেটা সত্যই ভাববার বিষয়। সম্ভবত নারীজাতির স্বভাবজ খলতাই এর কারণ, বহু মেয়েই পুরুষকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও ম হতে উদ্‌গ্রীব এবং দাম্পত্য জীবনের সুখসুবিধা ভোগে আগ্রহী, এঁরা এত নিপুণতার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে পারেন যে সম্ভবত'ক্যাসানোভার মত প্রেমিক প্রবরের পক্ষেও তাঁদের ছলনা ধরে ফেলা সম্ভবপর হত না। আজকের দিনেও পুরুষের জীবনসংগ্রাম মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী কঠোর, তার প্রধানতম কারণ পুরুষের স্বভাবজ আদর্শবাদ, নারী যে অধিকতর সুবিধাবাদী, ও বাস্তববোধসম্পন্ন। একথা অনস্বীকার্য রূপেই সত্য, আর সেজন্যই আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতের সময় নারী স্বচ্ছন্দে নিজের আদর্শকে বলি দিয়ে পার্থিব সুখ সুবিধার পূর্ণ সুযোগ নিতে সক্ষম, যেটা পুরুষের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না। এই বাস্তববোধহীনতার জন্যই কঠোর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে পুরুষ নারী অপেক্ষা অনেক অসহায়। পুরুষের স্বভাবে ভাণ বা কৃত্রিমতারও স্থান নেই, নিজের পৌরুষ জাহির করতে তাই আজও পুরুষ আদিম পুরুষের পন্থাই অনুসরণ করে থাকে সচরাচর, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইভের কন্যারা হয়ে উঠেছে ক্রমবর্দ্ধিততর মাত্রায় 'সোফেস্টিকেটেড' বা কৃত্রিমতা আশ্রয়ী; নিজের অধিকার বা সুযোগ সম্বন্ধে আজকের নারী অনেক বেশী সচেতন এবং সেজন্যই স্বভাব সরল পুরুষের কাছে সে রহস্যময়ী রূপে প্রতিভাত হতে চায়। নারী চায় যে পুরুষ তাকে পবিত্রা দেবী বলে মনে মনে পুজো করুক আর সংসারের সব মালিন্যের ঊর্ধ্বে রাখতে প্রয়াসী হোক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে সে নিজের আসল চেহারাটাকে সযত্নে গোপন করে রাখতে সক্ষম, যার ফলে আজও পুরুষের মনে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। পুরুষের স্বভাব ঋজুতার আর একটি নিদর্শন হল তার সাধুতা, একজন পুরুষ সচরাচর তার শত্রুর উপরও অশোভন সুযোগ নিতে কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু মেয়েদের সে বালাই নেই, মেয়েরা প্রিয়জনের জন্য প্রাণপাত করতেও যেমন ডরায় না, তেমনি নিজেদের স্বার্থে অপরের ক্ষতি করতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে না। বস্তুত মেয়েদের পৃথিবী একটা খুব সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমিত, ব্যক্তিগত একটা গণ্ডী টেনে তারা নিজেদের দুনিয়া রচে নেয়, তার বাইরে সব কিছুরই প্রতি তারা উদাসীন, কিন্তু পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়, বাইরের বিস্তৃত পটভূমিতেই তার ব্যক্তিত্বের মুক্তি নিহিত, গণ্ডী সে ব্যক্তিত্বকে করে খণ্ডিত, অবমানিত। কোন বড় আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করা তাই পুরুষের পক্ষে যত সহজ মেয়েদের পক্ষে তা নয়। নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষকে বিচার করতে গিয়ে তাই মেয়েরা আঘাত পায়, বিচলিত হয় বার বার, কিন্তু একথা ভেবে দেখে না যে পুরুষের স্বভাবজ প্রকৃতিই এর জন্য দায়ী। পুরুষের স্বভাবে যে বিশ্বজনীনতা বর্তমান তারই প্রভাবে আজও সে অনন্য ও অপরাজেয়। জগতের বিস্তৃততর পটভূমিকাতেও সেজন্যই আজও পুরুষের অগ্রগমন রয়েছে অব্যাহত।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

১৬

সেই ছোট বিমানকে পঞ্চানন বলেছিল, জানিস, হারাণ মাষ্টারমশাইকে ওঁর বউ মারেন।

—যাঃ। অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিল বিমান। ঐ দুর্দান্ত প্রকৃতির মাষ্টারমশাই—যিনি কথায় কথায় ছেলেদের শাস্তি দেন—শুধু তাই নয়—শাস্তি দিয়ে আনন্দ পান—তাকে কেউ মারছে একথা কল্পনাও করা যায় না—

—সত্যি, আমি নিজের চোখে দেখেছি, পঞ্চানন ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে, কাল ওঁদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম চেঁচামেচি শুনে উঁকি দিয়ে দেখি—মাষ্টারমশাই ঐ শীতের রাতে গামছা পরে উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন—আর ওঁর স্ত্রী সমানে চেঁচাচ্ছেন। মারের ভয় না থাকলে কি আর কেউ এই শীতে খালি গায়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে।

—মারেন—হারাণ মাষ্টারমশাইকে ওঁর স্ত্রী মারেন? বিস্মিত বিহ্বল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করেছিল বিমান।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ওঁর স্ত্রীকে তো দেখিস নি—এই একটা লাস—ফুঁ দিলে মাষ্টারমশাই তালপাতার সেপাইর মত উড়ে যাবে—কিন্তু···

মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না বিমান—সেদিন ওর মনে হয়েছিল গায়ের জোরেই যদি সবাইকে দাবিয়ে রাখা যায়—তবে হারাণ মাষ্টারমশাইকে আমরা দাবিয়ে রাখি না কেন? আমি তো একাই পারব—না পারি তোরাও হাত মেলাবি আমার সঙ্গে। কথাটা মনে মনে ভাবে—সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই মাথা নাড়ে। ওর মনে হয়, ঠিক নয়—গায়ের জোরেই সব কিছু করা যায় না।

সেদিন পঞ্চানন এসে বলল, জানিস, হারাণ মাষ্টারমশাই আর ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে কবিতা লিখেছি একটা।

নামেই কবিতা। ছন্দ, মিল, কিছুই নেই। তবে একটা জিনিস আছে খুব মজার। হাসতে হাসতে বিমান বলেছিল, খুব ভাল হয়েছে।

—বোর্ডে লিখে রাখি। পঞ্চানন বলে।

—বোর্ডে! একটু ইতস্তত করেছিল বিমান। ওর রুচিতে বেধেছিল।

—হ্যাঁ, স্কুলের সবাই খুব মজা করে পড়বে। কিন্তু খবরদার আমার নাম বলিস নি—তাহলে সরোজ তখনই মাষ্টারমশাইকে বলে দেবে—

—মাষ্টারমশাইকে বলে দেবে। ওঃ, বলে দিলেই হল আর কি? দে, আমি নিজে লিখে দিচ্ছি। এক মুহূর্তে জ্বলে উঠেছিল বিমান।

ও নিজেই লিখেছিল। লিখতে কি রকম হাতটা টেনে যাচ্ছিল—লিখতে ইচ্ছে হচ্ছিল না—তবুও লিখেছিল—

সেদিন স্কুল বসবার আগে ছেলেরা একবারও মাঠে যায় নি—সবাই দলে দলে এসে লেখাটি পড়েছিল আর হেসেছিল—ওদের সেই পৈশাচিক হাসিতে দশ বছরের মনটা কুঁচকে উঠেছিল—নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছিল—প্রায় প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল জীবনে আর কখনও লিখবে না—ঠিক তখনই···হ্যাঁ ঠিক তখনই সরোজ এল।

ওকে দেখেই অন্য ক্লাশের ছেলেরা পালিয়ে গেল—এই ক্লাশের ছেলেরা বই নিয়ে চুপচাপ বসল—পরিবেশটাই বদলে গেল এক মুহূর্তে। অনর্থক রাগে সমস্ত গা জ্বালা করতে থাকে বিমানের; সরোজের সেই মুখভঙ্গী—যেন সে-ই পৃথিবীর পবিত্রতার একমাত্র রক্ষক—মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওর ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে বোর্ডে যা খুসী তাই নোংরা কথা লেখে।

সরোজ সকলের দিকে একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বোর্ডটা মুছে পরিষ্কার করে দেয়—ঝাড়ন, চক গুছিয়ে রাখে আর একটি কথাও না বলে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে।

আর তার পর থেকেই···

আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে বিমান। বলে, আকাশ, তুমি একটা গল্প জান? এক গ্রামে দু'টো পাড়া ছিল। পুব পাড়া আর পশ্চিম পাড়া। দু' পাড়ায় খুব রেষারেষি। এ পাড়া যা করবে ও পাড়া করবে ঠিক তার উল্টো।

একদিন পুব পাড়া পুজো করছে নৈবেদ্য সাজিয়ে উঠোনে

রাখামাত্র কাক পায়খানা করে দিল। কি হবে? কি হবে? সবাই পড়ল মহাভাবনায়। তখন পুরোহিত বললেন, পশ্চিম পাড়ার লোকরা এ অবস্থায় পড়লে কি করে জেনে আসতে পার।

গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর আনা হল। ওরা ফেলে দেয়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই নৈবেদ্য দিয়েই পুজো করব।

ঠিক এই গল্পের মতই মনোভাব ছিল আমার। আমি জানতাম সরোজ ঠিকই করছে। ক্লাশের দুষ্টু ছেলেদের শাসন করা, ক্লাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আরও নানারকম খুঁটিনাটি কাজ—এ সব তো ভালই, কিন্তু তবু ও যা করত তারই বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম আমি।

বোর্ডে নোংরা কথা লিখলে সবচেয়ে বেশী বিরক্ত হত এবং সেইজন্যই আমি রোজ নোংরা কথা লিখে রাখতাম। এর দরুণ অনেক খাটতে হত আমাকে। স্কুল খোলামাত্র যেতাম, লিখে রেখে বাড়ী ফিরে আসতাম—পরে বই-খাতা নিয়ে ঠিক ঘণ্টা পড়বার কিছুক্ষণ আগে যেতাম। দারোয়ান সাহেবকেও কিছু দক্ষিণার ব্যবস্থা করে দিতে হয়েছিল···এখন মনে পড়লে হাসি পায় কিন্তু তুমি তো জান আকাশ, নোংরা কাজে কি রকম উত্তেজনা! তুমি যখন কালো মেঘ জমাও, তখনই তো গর্জন কর আনন্দে।

১৭

পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী—একটানা এতদিনের মধ্যেও কিন্তু কোনদিন সরোজ বিমানকে সন্দেহ করেনি। প্রতিদিনই শহীদের মত মুখ করে বোর্ড মুছেছে। ঝাড়নটা এত জোরে নীচে ফেলেছে যেন কারো মুখে থাপ্পড় মারল, কিন্তু একটি কথাও বলেনি।

ওর ঐ নীরব ধৈর্য দেখে মনে মনে ওর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে বিমান আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন দ্বিগুণ ঘৃণা এসেছে। নোংরা কথা বলতে, খারাপ কাজ করতে ইচ্ছে হয়েছে শুধু সরোজের জন্য—সরোজকে প্রতিপক্ষ ভেবে।

সরোজ বোর্ড মুছছে আদর্শবাদের জন্য, কাউকে ভালবেসে নয়—এমন কি জীবন বা পবিত্রতার প্রতিও ওর প্রীতি নেই। ও আদর্শবাদের নৌকোয় চড়ে ভাসতে চায়—নিজেকে ভাবে 'নোংরা' জগতের রক্ষাকর্তা—যে যে বাঁচতে চাও আমার নৌকোয় চলে এস। যার ভেতরে কিছু নেই সে-ই আদর্শবাদের মুখোস পরে থাকে।

কিছু নেইক সরোজের মধ্যে কিছু ছিল না,—একথা বলা ভুল। ছিল—আর স্কুলের কর্তৃপক্ষের মত তো অনেকই ছিল। আর সবই ভাল।

সরোজ পড়াশুনোয় ভাল—ক্লাশে হয় প্রথম নয়ত দ্বিতীয় হত। ওর স্বভাব ভাল—চুপচাপ, শান্ত, প্রতিবারই গুড কনডাকটের প্রাইজ পেত। টিফিনের সময়ে বসে পড়ত গান্ধীর জীবনী।

ও এতো ভাল বলেই যেন বিরক্তিতে, রাগে আমি আরও খারাপ হতাম। যেন একটি অদৃশ্য প্রতিযোগিতা—কে কত ভাল হতে পারে? কে কত খারাপ হতে পারে?

প্রতিটি শিক্ষক আমার প্রতি বিরক্ত ছিলেন—কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেতেন না। আমার বাবা স্কুলে অনেক টাকা দান করেছিলেন আর তাছাড়া, পড়াশুনোতে আমিও খারাপ ছিলাম না। ভালভাবে পাশ করে বেরিয়ে যেতাম।

সব শিক্ষকদের মধ্যে ড্রিল শিক্ষকই ছিলেন আমার ওপরে সবচেয়ে চটা। খেলাধুলোয় আমি খুব ভাল ছিলাম—অথচ বাইরের কোন টিমের সঙ্গে খেলা হলে আমি কিছুতেই যোগ দিতাম না—স্কুলেই যেতাম না সেদিন। যেভাবেই হোক বাবাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিতাম।

একবার, দু'বার, তিনবার—ড্রিল মাষ্টারমশাই আমার চালাকী ধরে ফেলেছিলেন—কিন্তু বলবার কিছু নেই। তাই তিনি নিষ্ফল রাগে ফুঁসতেন—আর অকারণে গালিগালাজ করতেন আমাকে।

একদিন তিনি আমাকে একান্ত ডেকে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন, কেন রে? ভাল খেলিস, তবে শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগ দিস না কেন? সবাই কত ভাল বলবে—কত নাম হবে—ভাল লাগে না···

—না, না, না। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে বলেছিলাম।

১৮

সত্যি বলছি আকাশ, আজও তোমাকে বলছি লোকের প্রশংসা যেন আমার গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিত। সেই পাঁচবছর বয়স

থেকেই আমি যেন জানতুম কত অন্তঃসারশূন্য এই ভাল বলা। কোন মূল্যই নেই।

লোকে একে অপরকে ভাল বলে স্বার্থের জন্য, বাহাদুরির জন্য, নিজেকে ভালমানুষ প্রমাণ করবার জন্য।

চাইনি···চাইনি···কারো ভালো লাগা চাইনি জীবনে শুধু একজনের ভাল লাগা চেয়েছিলাম কিন্তু সে যেন জোনাকীর জ্যোছনাকে চাওয়া—কালোর চাওয়া আলোকে।

না, ভুল বললুম। জোনাকীর তো তবু কিছু আলো আছে—আমার কিছুই ছিল না—আমার ওপরে ছিল পেঁয়াজের খোসার মত নোংরামী, আর চরিত্রহীনতার খোসা—ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে আর কিছুই থাকবে না।

প্রথম যেদিন আমি তাকে দেখেছিলাম—মনে হয়েছিল নরকের আগুন চারিদিকে জ্বলছে—পচা মড়া পোড়ার বীভৎস গন্ধ—আর সেই গলা দুর্গন্ধ মাংস রক্ত মেখে বসে আছে একটি বীভৎস পশু··· নরকের আগুনের ধোঁয়ায় তার রং কালো। অন্ধ সেই পশুটা হঠাৎ দেখতে পেল প্রথম উষার আলো।

দেখতে পেয়েছিলাম,—অন্ধ চোখেও আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আর কি আশ্চর্য, কি স্পর্ধা জেগেছিল মনে—ইচ্ছে হয়েছিল ঐ হাসি আমাকে ভাল বলুক।

পরক্ষণেই দ্বিগুণ যন্ত্রণায়, তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলেছিলাম—না, না, না।

১৯

ছোট বিমান বড় হল, পাশ করল, স্কুল ছাড়ল। ভর্তি হল কলেজে।

কলেজটা ছিল আমাদের সহর থেকে অনেকটা দূরে। আমাদের সহর তো তেমনি সহর—আধা সহর, আধা গ্রাম। গ্রাম ও সহর আশ্চর্যভাবে মিশে গেছে একসঙ্গে। সিমেন্ট-বাঁধান পাকা রাস্তা যেতে যেতে হঠাৎ মিশেছে কাঁচামাটির পথে—দু'পাশে আম-কাঁঠালের সারি। মাঝে মাঝে গাছগুলি এমন জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, দেখলে নিবিড় বনের একটা ছোট বোন বলে মনে হয়। ভাল করে তাকালে দেখা যায়, সবই আমাদের চেনা ঘরোয়া গাছ—আম, জাম, সুপুরি, কাঁঠাল। পাগলী-মেয়ের মাথার এক ঝাঁকড়া চুলের মত অযত্নরক্ষিত।

আরও লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেই বনের মধ্যেই ভাঙ্গা জীর্ণ দালান আর তার চেয়েও জীর্ণতর অধিবাসী।

আমাদের সেই সহরের বুক দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছিল—সেই হচ্ছে কলকাতার চৌরঙ্গী কাম-বড়বাজার। তারি দু'ধারে দোকানপাট, লোকজন, আলো, ব্যস্ততা। চৌরঙ্গীর মতই ভাল ভাল বড় বড় দোকান, রাত্রে ঝকঝকিয়ে আলো ছড়িয়ে হাসতে থাকে। ঠিক তারই পাশে টিনের শেড দেওয়া ঘিঞ্জি মুদির দোকান—বড় বড় ময়লা বস্তায় চাল, ডাল, নোংরা টিনে গুড়। রাত্রে জ্বলে মিটমিটে আলো, কোন কোন দোকানে কেরোসিনের টেমিও জ্বলে।

ভিড় কিন্তু এইসব দোকানেই বেশী—নোংরা জামা-কাপড় পরণে, ময়লা চটের থলে নিয়ে—লোক এসে জমে এই দোকানে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে, বচসা করে, চেঁচামেচি করে।

পাশেই একটু দূরেই ঝকঝকে দোকানগুলি চুপচাপ। ধপধপে পাজামা, পাঞ্জাবী, চোখে চশমা, কিংবা সার্ট প্যাণ্ট পরণে সেলসম্যান দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও পাশের চেয়ারে বসে বই পড়ে—মাসের গোড়ার দিকে খুব ভিড় নয় কিন্তু ব্যস্ততা—স্লিপ নিয়ে আসে এক একজনের চাকর। অমনি লোকটি খুব ব্যস্ত হয়ে সব মেলাতে, গোছাতে, হিসেব করতে শুরু করে। মাঝে মাঝে আসে মেয়েরা, তা অবশ্য আমাদের কলেজে পড়বার সময়ে সংখ্যায় খুবই কম হত, পরে মেয়েদের আসবার রেওয়াজই বেশী হয়েছিল। মেয়েরা আসত, স্লিপ মিলিয়ে জিনিষ নিত, একটা সাইকেল-রিক্সায় জিনিষপত্র তুলে নিজে উঠে গড়গড়িয়ে চলে যেত।

ওখানকার কথা মনে পড়লে আগেই দোকানগুলির কথা মনে হয়। এইরকমই একটি দোকানে···

যাক্। সে সব কথা।

এই চওড়া বাঁধান রাজপথটাই মিশেছিল একটা কাঁচামাটির পথে। মাটির রং পাঁশুটে। আকারে আঁকাবাঁকা। সেই রাস্তাটা অনেক অনেকদূর এগিয়ে হঠাৎ বেশ সোজা আর চওড়া হয়ে গেছে। সেখানেও মাটি—কিন্তু, সেই মাটিতে সুর্কি ঢেলে পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পথটা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে লোহার গেট। গেটের রং এককালে বোধ হয় লালই ছিল—এখন তার বিবর্ণতার মধ্যে কোন রং খুঁজে পাওয়া কঠিন। অনেকটা জায়গা—কোমর উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—কিন্তু পেছনের দিক—যেদিকটা খেলার মাঠ—ছেলেদের ও প্রফেসরদের হোস্টেল—সেদিকটা অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। সামনের দিকটাও ভাঙ্গবার মুখে—ছেলেরা গেট দিয়ে ঢোকে না যে যেদিক দিয়ে পারে বেড়া ডিঙ্গিয়ে শর্টকাটে এসে ঢোকে।

এই আমাদের কলেজ। সহর থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে। এখানে ছেলেমেয়ে

একসঙ্গে পড়ত। তা ছাড়া মেয়েদের পড়াশুনো করবার আর কোনও উপায় ছিল না।

—উপায় ছিল না, তাই, আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে বিমান, দেখলে তো আকাশ, মানুষ প্রয়োজনে কত সহজে নিজেদের সঙ্কীর্ণতা ভুলতে পারে—নইলে আমাদের তখনকার সেই গেঁয়ো সহর—যেখানে ছেলেমেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলাও চলত না—তখনই একসঙ্গে পড়ত তারা। মানুষ প্রয়োজনের দাস।

মেয়েরা প্রায়ই আসত সাইকেল রিক্সাতে। দুটি মেয়ে মিলে এক একটি রিক্সা মাসিক ভাড়াতে ঠিক করে রাখত। গড়গড়িয়ে রিক্সা ঢুকত লাল গেট দিয়ে। ঢুকেই বাঁহাতি আর একটি ছোট গেট, সেইখানে নেমে যেত ওরা। সেই গেট দিয়ে ঢুকেই ওদের কমনরুম।

—আমি একদিন ওদের কমনরুমে ঢুকেছিলাম, বিমান ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে, তখন আমাদের সময়ে বেশী মেয়ে পড়ত না—সব ক্লাশে মিলে তিনটি কি চারটি—তাই ওদের সম্বন্ধে আমাদের একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল—আমি গিয়েছিলাম দেখতে—ওরা সারাক্ষণ যে ঘরটায় থাকে সে ঘরটি কেমন—খুব সাধারণ কৌতূহল—কিন্তু সেখানে গিয়েই···যাক, সে সব ত' পরের কথা···

সেই ছোট বিমান বড় হল—কলেজে ভর্তি হল—কলেজে ঢুকে প্রথম দিকে ওর খুবই ভাল লাগছিল সবাইর সঙ্গে হৈ-হৈ করা—খেলাধূলোয় যোগ দেওয়া কিন্তু, দু'মাস যেতে না যেতেই···

২০

এই দুই মাসে অনেক ঘটনা ঘটল···কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে সলিল নামে একটা ছেলে একদিন বলল, আজ আমাদের বাড়ীতে যাবেন ?

সলিলের সঙ্গে আমার বেশী ভাব ছিল না। তাই একটু অবাক হয়ে বললাম, কেন বলুন তো।

—জ্যাঠাইমা যেতে বলেছিলেন।

আরও অবাক হয়ে বললাম, আপনার জ্যাঠাইমা আমাকে কি করে চিনলেন ?

—তা জানি না। ও কি রকম গম্ভীর কাটা কাটা কথা বলে, জ্যাঠাইমা বলেছিলেন—শুধু বলেন নি—বিশেষ ভাবে বলেছিলেন।

—কি বলেছিলেন ?

—বলেছিলেন, জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ছেলে কি তোদের সঙ্গে পড়ে ?

আমি বললাম, হ্যা।

—তাহলে তাকে একবার নিয়ে আসিস।

ওঃ। বাবার পরিচয়ে। এবারে কৌতূহল হল আমার। বাবাকে

কে এত ভালবাসেন যে আমাকেও দেখতে চাইছেন! তবে কি বাবার অতীতে শুধুমাত্র মালতী মাসী নেই আরও আছে, শুধু পাপ নেই পুণ্যও। তাই হবে। নিছক খারাপ লোক তো হয় না। অন্তত সাহিত্যে তো তাই পড়ি।

হায়, তখন কি জানতাম সাহিত্য আর জীবনে হাজার মাইল ব্যবধান।

সলিল আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল কিন্তু সমস্ত রাস্তা একটিও কথা বলে নি। ওর মুখভাব দেখে মনে হয় কি যেন একটি ভীষণ বিরক্তি-পূর্ণ কাজ ওকে করতে হচ্ছে। আমি নিমন্ত্রিত তবুও কত অযাচিত।

ওর সঙ্গে গেলাম। গিয়ে তবে বুঝতে পারলাম ওরা কত গরীব। সলিলকে অনেক দিন ছেঁড়া জামা পরে কলেজে আসতে দেখেছি—অতটা খেয়াল করি নি।

বড় রাস্তা থেকে সরু পায়ে-চলা পথ চলে গেছে—খানিকটা গিয়েই গাছও আগাছার জঙ্গল। তারই মধ্যে ভাঙ্গা পুরাণ দালান।

ছোট দালান। ভাঙ্গা হলেও বোঝা যায় তৈরী করবার সময়েই সম্পূর্ণ শেষ করা হয় নি। দু'খানা ঘর একটু বাসযোগ্য। জানালার পাল্লা নেই—কাপড় টাঙ্গিয়ে রেখেছে।

আমরা যে ঘরটায় বসলাম সেটাই বোধ হয় রান্না ঘর। এক কোণে কালো কালিমাখা তোবড়ানো কতকগুলি এনামেলের বাসন—একটা ধামা দিয়ে কি কতকগুলি ঢেকে রাখা হয়েছে—মাছি উড়ছে—ঐ ঘরেই একটা ভাঙ্গা তক্তপোষে এক জরাজীর্ণ বুড়ো প্রাণপণে কাসছিলেন। তক্তপোষে ময়লা ছেঁড়া কাঁথা সব মিলে এমন একটা নোংরামী যে দেখলেই ঘেন্নায় বমি আসে।

ঐ ঘরে আমি কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে বসে রইলাম। বেশ খানিকক্ষণ পরে একজন ভদ্রমহিলা এ-ঘরে এলেন—চুল রুক্ষ। পরনে ময়লা কাপড় তবুও বোঝা যায় যৌবনে ইনি খুবই সুন্দরী ছিলেন।

উনি এসে চুপ করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি ত' চুপচাপ। বুঝতে পারছিলাম না—কি বলব—

—আমাকে আপনি ডেকেছিলেন? অনেকক্ষণ পরে আমিই কথা বললাম।

—হ্যাঁ, বাবা।

গলা শুনে বুঝতে পারলাম উনি কাঁদছেন—কিন্তু, কান্নার কারণ···

—কেন? প্রশ্ন করি, কোন উত্তর নেই।

—আমাকে কেন ডেকেছেন? কিছু বলবেন? দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার—এই পরিবেশ—তার ওপরে এই শীর্ণা মহিলার এই অদ্ভুত কান্না—সব মিলে এত বিশ্রী··এত বিশ্রী···

তখনও তো মনটা দুমড়ে বেঁকে যায় নি—তাই অসহ্য মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছিল যদি আলাদীনের মত আশ্চর্য প্রদীপ পেতাম তবে এই মুহূর্তে বদলে দিতাম—পরিষ্কার, ঝকঝকে, তকতকে। এই মহিলার গালে ঐ রেখাগুলি থাকবে না—টসটসে পাকা আমের মত দেখাবে—ওঁর মুখ—মাতৃস্নেহ ঝরে পড়বে চোখ দিয়ে—এই ঘরে এসে পড়বে সূর্যের আলো—দখিণা হাওয়া···

—তোমাকে একটা কথা বলব বলেই ডেকেছি বাবা, কিন্তু বলতে পারছি না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন উনি।

আমার কি রকম ঘৃণা ও বিরক্তি এসে যায়! ভদ্রমহিলার ওপরে সমস্ত পৃথিবীর ওপরে, নিজের ওপরে। কালাপাহাড়ের মত সব ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে হয়।

—না বলতে পারেন তো আমি চলে যাচ্ছি—উঠে দাঁড়াই।

—না, না, শোন, ভদ্রমহিলা যেন গলে গিয়ে একতাল নোংরা গোবরের মত আমার সামনে পড়লেন···একটা কথা শোন।

—বলুন।

—এ ঘরে এস।

ওঁর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে গেলাম। এখানে এসে অব্দিই একটা চাপা গোঙানি শুনছিলাম—আমার কি রকম মনে হয়েছিল—ওটা এ বাড়ীরই আর্তনাদ।

বাড়ীর নয় বাড়ীর মেয়ের। পাশের ঘরে ছেঁড়া, নোংরা বিছানায়, শুয়ে আছে একটি মেয়ে। শুয়ে আছে বললে ভুল হয় যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। থেকে থেকে চাপা আর্তনাদ। বোঝা যায় নিজেকে সংযত করবার খুবই চেষ্টা করছে মেয়েটি—দাঁত দিয়ে ঠোঁট এত জোরে চেপে রেখেছে যে, দাঁতের পাশে লাল রক্তের দাগ—বোজা চোখের চারপাশের নীল শিরাগুলি ফুলে উঠেছে—থমকে থমকে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে—অনেকক্ষণ পরে, সে যন্ত্রণা যেন চোখে দেখা যায় না। এতক্ষণের মনে হওয়া অনুভূতি কিছুই না এই দৃশ্যের কাছে।

—কি হয়েছে এঁর!

—হতভাগী···

এতক্ষণে···এতক্ষণে কালো পর্দাটা নড়ে উঠল। মালতী মাসীর কান্না—আর এই মেয়েটির যন্ত্রণা···কিন্তু আমি—আমাকে কেন···

—আমাকে বলছেন কেন? ভ্রূ কুঁচকে ভীষণমুখে বলি।

উনি খুব ভয় পেয়ে যান—রোগা, অশক্ত দেহ কাঁপতে থাকে।

সেদিকে তাকাতে পারি না। এত ঘৃণা বোধ হয়। ওঁর ওপরে, পৃথিবীর ওপরে, নিজের ওপরে।

—না, না, মানে কিছু মনে করো না বাবা···

এই সময়ে মেয়েটি যন্ত্রণায় আবার আর্তনাদ করে উঠল। এত জোরে ঠোঁট চেপে ধরল যে দাঁতের পাশ দিয়ে ঠোঁট কেটে দু' ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

—ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি। এখানে কাছাকাছি কোথায় ডাক্তার আছেন—শান্তকণ্ঠে বলি এবারে। ওর ঠোঁটের দু' ফোঁটা রক্ত দেখেই আমার মন স্থির হয়ে গেছে। একে বাঁচাতে হবে, এ রক্তের অনেক দাম—

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার পথেই বাধা পাই। ভদ্রমহিলা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর দু' চোখে আতঙ্ক।

—না, না, ডাক্তার নয়···উনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন।

—কেন? মরে যাবে যে—

—বিধবা মেয়ে···

২১

এরই নাম শৈবালদি, একে আমি বাঁচিয়েছিলুম। সেদিন জোর করে ডাক্তার ডেকেছিলুম, ভ্রূ কুঁচকে ওর মাকে বলেছিলাম, যদি ডাক্তার ডাকতে না দেবেন, তবে আমাকে ডাকলেন কেন? বাবার
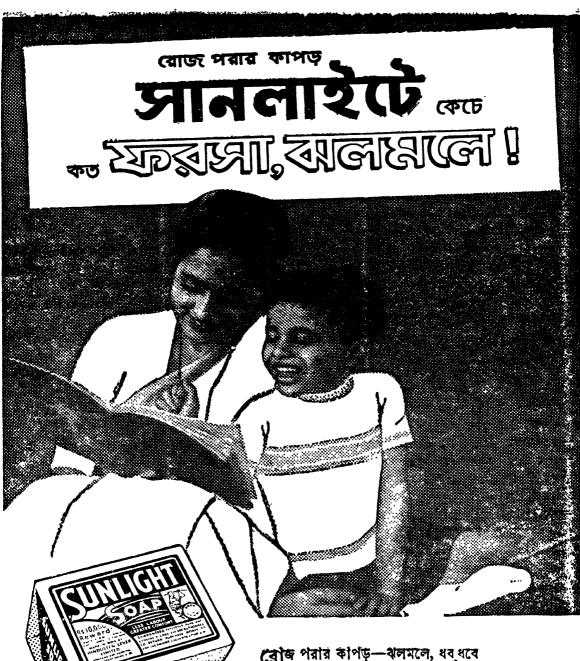
রোজ পরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT
SOAP

কাউকে কথা ছেলেকে জানাবার জন্য। না, না, বাবা ··কি যে বলবেন ভেবে পান না শৈবালদির মা।

সত্য সত্যই উনি কিছু ভেবে ডাকেন নি। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। বাবার কাছে কোন খবর পাঠাবার সাহস তাঁদের ছিল না। শুনতে পেয়েছিলেন আমি সলিলের সঙ্গে পড়ি, তাই দিশেহারা হয়ে আমাকেই একবার ডাকিয়েছিলেন।—আমি চোখের সামনে এঁকে মরতে দিতে পারি না, তাও এভাবে···দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলাম। তখন আমার বয়স আঠারো বছর।

ডাক্তারবাবু সব কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনার বিপদ আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু কি করব বলুন আমাদের হাত-পা বাঁধা—কেউ জানলে ডাক্তারী লাইসেন্সটি চলে যাবে।

—তাই বলে মেয়েটি চোখের সামনে মরে যাবে।

—মরে যাবে? আলতাভাবে সিগারেটটি চেপে ধরলেন ডাক্তারবাবু। মরবে কেন?

শৈবালদির যন্ত্রণা আর কষ্টের কথা বললাম, ওঃ, তাহলে বোধ হয় নিজেই কিছু করছে—সর্বনাশ! ও নিজেও মরবে আর আমি গেলে আমারও হাতে দড়ি।

—ডাক্তারবাবু, আমারও চোখে জল এসে যায়। যা হোক একটা কিছু করুন।

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন, প্রথম তো—তাই। খুব ভালবেসেছেন, না? করা যায়—বুঝলেন ব্যবস্থা করা যায়। দুনিয়ায় এইটি হলে হয়কে নয় করা যায়, বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে কল্পিত টাকার শব্দ করেন।

—কত লাগবে? গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম।

—দেখে তো মনে হয় ছাত্র। ডাক্তারবাবুও গম্ভীর হয়েছিলেন, এই সব হচ্ছে বাঘের বিয়ে। সাংঘাতিক কাজ, এ দিতে পারবেন কি?

—পারব। স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলাম এবং পেরেছিলামও।

সেদিন চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম জেলখানা থেকে আমাদের কোয়ার্টারে ফেরবার পথে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায়। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। অন্ধকার—ও জায়গাটা ঘন অন্ধকার, ভিজে গামছার মত আমাকে জড়িয়েছিল। ভাল লাগছিল—খুবই ভাল লাগছিল।

মনটা খালি—এ রকম খালি মন আমার একদিনও হয়নি। তারপর···

হঠাৎ কি জানি কেন মনে হল, সময় উপস্থিত হয়েছে। আসছে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু অনুভব করছি··

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েই তাঁর মুখোমুখি হলাম।

—তুই এখানে? অন্ধকারে ফর্সা মুখটা ঝকঝকিয়ে উঠেছে।

—কিছু টাকা দাও।

—টাকা? তিনি অবাক হয়ে বললেন, তা অন্ধকারে—বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে··

—অন্ধকার! বাড়ীর বাইরে! খুব জোরে হেসে উঠলাম। অন্ধকারেরই যে কাজ, আর বাড়ীর বাইরেই।

—কি? হয়েছে কি তোর? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি তাকান।

বলতে যাচ্ছিলাম, মদ খেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু বলি না—বলতে পারি না।

—আমার কিছু হয়নি কিন্তু আর একজনের হয়েছে, তার নাম শৈবাল।

—শৈবাল! ফিসফিসিয়ে ওঠে সেই কণ্ঠ!

আর সেই একটা কথা থেকেই আমি বুঝতে পারলাম, ঘটনাটা সবই সত্যি।

পরক্ষণেই ফ্যাকাশে মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ঘনিয়ে ওঠে।

—কে বলল তোমাকে এসব কথা! এসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? শৈবাল কে? আমি চিনি না···।

আরও অনেক কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে খুব শান্তকণ্ঠে বলি, তুমি চেন!

একটু থেমে আবার বলি, আর, তুমি জান।

—আমি চিনি ··আমি জানি···আমি···না···

—আমাকে টাকা দাও। স্থির কণ্ঠে দাবী জানাই—

একেবারে চুপ করে যান উনি, কোন বিহ্বল প্রতিবাদও শোনা যায় না।

—তাড়াতাড়ি দাও। দেরি করো না।

—এখনই? কি করে···

—বাড়ী থেকে নিয়ে এস। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

আশ্চর্য। সেই ফর্সা মুখটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। জানতাম—আবার ফিরে আসবে—

সেদিন মনে হয়েছিল সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। টাকাটা হাতে নিয়ে যেতে যেতে মন প্রায় স্থির করে ফেলেছিলাম—ওদের হাতে টাকাটা তুলে দিয়েই চলে যাব এখান থেকে—সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াব পথে পথে। লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে করে খাব—পাহাড় পর্বত বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াব—

কিন্তু, সে সব কিছুই করি নি। বাবারই তো ছেলে আমি। বরং, ঐ টাকা থেকে কিছু পকেটে রেখে দিলাম—আর—

আর, সেদিনই প্রথম মদ খেলাম। তরল পদার্থটা পেট, বুক জ্বালা করে নামতে থাকে। এই জ্বালা আমার মনের জ্বালা ভুলিয়ে দেয়। ভাল লাগে—খুবই ভাল লাগে—

তারপর, কি রকম একটা আচ্ছন্ন ঘুম ঘুম ভাব। পাঁচ বছর বয়স থেকে আজ এই আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত যে পোকাটা মনটাকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছিল সে আজ এই প্রথম—ঝিমিয়ে পড়ে।

কি আরাম। কি আরাম। তবে তো এই ভাল—এমনি ভাবে একে নেশায় বুঁদ করে রাখা। এই তো পথ পাওয়া গেছে—মুক্তির পথ।

সে রাত্রে বাড়ীতে ফিরে মনের আনন্দে ঘুমিয়েছিলাম—অত তৃপ্তির ঘুম আজ পর্যন্ত কখনও ঘুমুই নি।

পরদিন সকালে অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলে কি রকম একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল—কিন্তু, মাদকতাময় গত রাত্রির স্মৃতি ও প্রায় আগত রাত্রির আনন্দ উত্তেজনায় কল্পনায় মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ি।

মা চা নিয়ে এলে অনেকদিন পরে মার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলি। অবাক হয়ে তাকান তিনি। হয়ত অনেক রাতে বাড়ী ফেরার সঙ্গে এই অহেতুক উল্লাসের কোন সঙ্গতি খুঁজে পান না বলেই।

চা খেয়ে শৈবালদির বাড়ী যাই। অনেকটা ভাল আছে। ঘর দুয়ারও অনেক পরিষ্কার।

কিংবা—এক রাতেই আমার চোখ একটু বদলে গিয়েছিল কি?

সেই প্রথম শৈবালকে 'দিদি' বলে ডাকি—ওর মাকে জ্যাঠাইমা। 'দিদি' সম্বোধনে শৈবালদি একটু আপত্তি জানিয়েছিল—মৃদু হেসে উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তবে কি বলে ডাকব—মাসীমা—

তখন অবশ্য এ কথা মনেই এসেছিল মুখে বলতে পারি নি—বলেছিলাম অনেকদিন পরে—বলেছিলাম, তোমাকে 'মাসীমা' বলাই উচিত ছিল—ভুল হয়ে গেছে 'দিদি' বলা।

শৈবালদিরও তখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে ছি ছি করে হেসে উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন 'দিদি' বলার পেছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল।

—তাতে 'মাসী' বললেও আটকাত না কিছু। উত্তর দিয়েছিলাম আমি।

এ সব অনেক পরের ঘটনা। মোটের ওপর দুজনেই তখন নেবে গিয়েছিলাম—কিংবা...

কিংবা উঠেছিলাম।

১১

ওদের বাড়ী থেকে কয়েক পা এগুতেই সলিলের সঙ্গে দেখা হল। ও এদিকেই আসছিল। কাল যখন সলিল আমাকে ডেকেছিল তখন তাকে আমি এ বাড়ীরই ছেলে ভেবেছিলাম। তারপরে আর ওর কথা ভাবিনি। ওকে যে এ বাড়ীতে আর একবারও দেখিনি সে কথাও মনে হয়নি।

সলিলের সামনা সামনি দাঁড়াতেই পেছন থেকে আমাকে কেউ ডাকল। ফিরে তাকিয়ে দেখি শৈবালদির মা।

—কি বলছেন? ওঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি।

—বাবা, তোমাকে একটা কথা বলছি—বল, তুমি রাখবে।...

—হ্যাঁ। নিজের অজানতেই আমার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। আবার কি কথা।

—এই মানে—শৈবালের কথা সলিলকে কিছু বলো না—ও কিছু জানে না।

জানে না। আমার এত হাসি পায় যে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করতে হয়। কি ভাবেন এঁরা আমাদের। আমরা কিছুই জানি না—কিছুই বুঝি না...

না জানবার না বুঝবার মত আশীষময় ভাগ্য নিয়ে তো আমরা জন্মাই নি—

—আচ্ছা, কিছু বলব না। বলে চলে আসি।

সলিল এ বাড়ীর আসছিল—কিন্তু আমাকে চলে যেতে

দেখে আমার সঙ্গে কথা বলতে ছুটে যাবে—ওর মুখ বিরক্ত বিষণ্ণ। অন্য দিকে ফেরান। বুঝতে পারি ও কিছু বলতে চায়—বলতেও পারছে না—কি বলতে চায় তাও বুঝি।

—শৈবালদি ভাল আছে, ডাক্তারবাবু বলে গেলেন কোন ভয় নেই।

আমার হঠাৎ বলা কথায় চমকে ওঠে ও। এক মুহূর্ত, ওর মুখের বিরক্তি, বিষণ্ণতা, অন্যমনস্কতার কুয়াশা ধুলে যায়। জ্বলজ্বল আগ্রহ আর প্রতীক্ষা সেই দুই চোখে।

—ডাক্তার। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন? ও যেন ভয়ে চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ। এসেছিলেন। উত্তর দিই, আমি ডেকেছিলাম।

—তুমি ডেকেছিলে? কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ওর কণ্ঠ—আর প্রাপ্তির আলোতে মুখখানা অন্য রকম দেখায়।

সলিল দেখতে রীতিমতো কুৎসিত—কিন্তু সেই সময়ে ওকে দেখায় অপরূপ। সেদিকে তাকিয়ে আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি।

বুঝতে পারি, সলিল সব জানে। বুঝতে পারি, সলিল শৈবালদিকে ভালবাসে।

আকাশ, আজ এতদিন পরে সলিলের কথা মনে হয়ে আমার দু' চোখ জলে ভরে আসছে। তখন নিজেকে নিয়েই মত্ত ছিলাম সলিলের দিকে তাকাবার সময় ছিল না। আর তাকালেও ওর হৃদয়ের রহস্য বোঝবার মত মনের প্রস্তুতি ছিল না। দানবীর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম—দেবীর সৌন্দর্য কি করে বুঝব?

কারণ, আজ এতদিন পরে ঐ হাসি দেখবার পরে স্পষ্ট বুঝতে পারি সলিলের মন। কি গভীর ভাবেই না ও ভালবেসেছিল শৈবালদিকে—কি অসহ্য কষ্টই না ও পেয়েছে—দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

সলিল ও শৈবালদি পাশাপাশি বাড়ীতে থাকত। ছেলেবেলা থেকে ওরা একসঙ্গে খেলেছে এই ভাবেই বড় হয়েছে। দুই বাড়ীর আর্থিক অবস্থাও প্রায় একই রকম। কাজেই কারো কাছে কিছু গোপন বা লুকানোর কিছু ছিল না। যেদিন সলিলদের বাড়ীতে চাল না থাকায় ঠিক সময়ে রান্না হয় নি—শৈবালদি ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে। শৈবালদিদের রান্না না হলে সলিলের মা এসে শৈবালকে ডেকে নিয়ে গেছেন। আরও ছেলেবেলায় ওরা ক্ষিদে পেলে বনের মধ্যে গিয়ে কল পাকুড় খুঁজে খেত। ওরা সমবয়সী। শৈবালদি হয়ত দু'-এক মাসের বড়।

ন' বছর বয়সে শৈবালদির বিয়ে হয়ে গেল। তখন সেই বিয়ের রাতে কনে সজ্জায় সজ্জিতা শৈবালদিকে হঠাৎ যেন খুব অপরিচিতা মনে হল সলিলের। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে কি একটি অব্যক্ত যন্ত্রণা—যে যন্ত্রণার ভাষা সে নিজেও জানে না···

—সেই রাতে প্রথম মনে হল শৈবালদি আমার থেকে আলাদা, আর সেই যে বিভেদ শুরু হল আজ পর্যন্ত তা বেড়েই চলছে—ঘুচল না—কোন দিন ঘুচবে না জানি—সেই সঙ্গে ভাষাহীন যন্ত্রণা যা ন' বছর বয়সে প্রথম মনে এসেছিল—তা ভাষা পেল—রূপ পেল—পেল বিরাট আকৃতি—আজ সে আমার দেহ, মন, পৃথিবী, আকাশ, পাতাল সব জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে—ত্রিপাদ বামনের মত বিশাল তার দেহ—এক ফোঁটা জায়গা আমার জন্যে ছেড়ে দেয় নি—

শৈবালদি ও সলিল একটি সময়ে একই রকম অবস্থা হলেও ওরা ছিল আলাদা জাতের। বর্ণমূলক জাতির কথা বলছি না। সেদিকেও অবশ্য মিল ছিল না। শৈবালদি ব্রাহ্মণ—সলিল কায়স্থ।

শৈবালদির বাবা পড়ন্ত জমিদার ডুবে যাওয়া জাহাজের মত যা কোনদিন তোলা যাবে না, যে ক'টি ছাদটি ভেসে আছে তাও ডুববে।

সলিলেরা নিম্নবিত্ত গরীব। সলিলের বাবা ছিলেন ম্যাট্রিক পাশ। স্থানীয় একটি মিশ প্রাইমারী স্কুলে কাজ করতেন। মাইনে যা পেতেন তাতে তিনটি প্রাণীর চলে যেত কোন রকমে—কিন্তু মাসের মাথেই স্কুল ঠিক সময়ে মাইনে দিত না—তখন যে ক'দিন মাইনে পেতে দেরী সে ক'দিনই কষ্ট মাঝে মাঝে অনশন পর্ব।

সলিলের বাবার একটা প্রিন্সিপল ছিল তিনি কিছুতেই ধার করবেন না। মৃত্যু সময়ে তাঁর মুখে এক ফোঁটা ওষুধ পড়ে নি—কিন্তু তবুও তিনি ধার করেন নি।

—জীবনেও না মরণেও না—সলিল বলেছিল।

শৈবালদির বাবা ছিলেন উলটো। যতক্ষণ পারতেন ধার করতেন, শুধু তাই নয় ধার করবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওঁর। ধার পেলেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে একগাদা বাজার নিয়ে আসতেন—মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ। প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত। সেদিন তাঁর চীৎকার ও গন্ধে চারপাশ সচকিত হয়ে উঠত। কি ভাগ্যি যে পাশাপাশি আর কোন লোক ছিল না। তাহলে হয়ত একটি ঝগড়া হয়ে যেত।

আবার যেদিন হাতে কিছু নেই সেদিন বাড়ী ঠাণ্ডা—লোকটিও ঠাণ্ডা। চুপচাপ। হাওয়ায় যেন পাতাটি নড়ে না।

চেহারার দিক দিয়েও আকাশ পাতাল তফাৎ। শৈবালদির বাবা খুব ফর্সা—মায়ের রং অতটা না হলেও মুখ চোখ খুব সুন্দর। শৈবালদি বাবা মার রূপই পেয়েছিল সে নিজেও অপূর্ব সুন্দরী।

সলিল বলেছিল, এমনি ভাবেই আমরা বড় হয়েছিলাম। আমি জানতাম, আমি গরীব। গরীবিয়ানা ভাবেই মানুষ হতে হবে—

ও জানত ও বড়লোক—জমিদার। ভাগ্যের বিপাকে গরীব হয়ে আছে এই কিছুদিনের জন্য—যেমনি মেঘে ঢাকা থাকে সূর্যের আলো আবার মেঘ সরে যাবে—সূর্যের আলো ফুটবে—চারি দিকে আনন্দ আর প্রাচুর্যের বন্যা···।

সলিল বলত, আমি ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনো করতুম—আমরা অনেকদিন হয়ত শুধু মাত্র আলুসেদ্ধ আর ভাত খেতাম তবুও বাবা বাজার না করে আমার জন্যে বই কিনে আনতেন—

শৈবালদি পড়াশুনো করা দূরে থাক—নিজের নামও লিখতে শেখে নি—যা আজকালকার দিনে অধিকাংশ মেয়ে জানে। ও শুধু শরীরের যত্ন করত। কত কিছু যে মাখত কত কিছু যে করত অবাক হয়ে শুধু দেখতাম। জঙ্গল থেকে কিসের পাতা তুলে আনত, বেঁটে মাথায় দিত। ঘণ্টার ঘণ্টার মুখে রকমারী জিনিস মাখত।

ও যে এতে খুসী হত তা নয় বরং খেলার মাঝখানে বারবার উঠতে খুবই বিরক্ত হত। কিন্তু, তবু উঠতে হত এ বিষয়ে শুধু ওর মার নয়

বাবারও কড়া নজর ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে, এই মেয়েকে দিয়েই তিনি হারানো ঐশ্বর্য ফিরে পাবেন। রূপের বদলে রূপো।

ন' বছর বয়সে বিয়ে হল শৈবালদির, বিয়ে ঠিক হবার পর থেকেই ওকে দিদি বলতে বাধ্য করেছিল সবাই মিলে—

—কেন দিদি বলব? প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, ও তো আমার চেয়ে বড় নয়।

উত্তরে শুনেছিলাম, বড় না হলেও দিদি বলতে হবে—কারণ, ও মেয়ে। মা বলেছিলেন, মানুষের মেয়েকে কেউ নাম ধরে ডাকবি!

অবশ্য কারো কথা আমি শুনতুম না, সলিল বলেছিল, কিন্তু সত্যি সত্যিই বিয়ের দিন দামী গয়নায় শৈবালদিকে এত বড় দেখাতে লাগল—এত অপরিচিতা—এতদূরের যে আমি তখনই মনে মনে ওকে দিদি বললাম।

তারপর, দ্বিরাগমনে স্বামীর সঙ্গে এলে তো স্পষ্ট দ্বিধাহীন ডাকে 'দিদি' বললাম আর ওর স্বামীকে জামাইবাবু।

এক বছর পরেই শৈবালদি বাপের বাড়ীতে ফিরে এল বিধবা হয়ে, জ্যাঠামশাই-র সমস্ত স্পেকুলেশন বানচাল করে। অপয়া বৌকে জায়গা দেবেন না বলেছেন শৈবালদির শ্বশুর—আর শাশুড়ী কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করেছেন রাক্ষসী বৌকে—যে বৌ এক বছরের মধ্যেই ছেলেকে খেয়েছে।

শৈবালদি ফিরে এল—আর ও বাড়ীতে যেন জ্বলতে থাকে নরকের আগুন। সারাদিন শুধু মেজাজ আর মেজাজ। জ্যাঠামশাই চেঁচাচ্ছেন, লাফাচ্ছেন, অভিশাপ দিচ্ছেন। জ্যাঠাইমা দুম দুম করে বাসন ফেলছেন—অনুপস্থিত কাকে গালিগালাজ দিচ্ছেন অনবরত।

শুধু শৈবালদি নির্বিকার। আমি তখন বড় হয়েছি। দশ বছর বয়স হলেও গরীবের ঘরের ছেলেরা যেমন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় তেমনি বড় হয়েছি। শৈবালদির নির্বিকার ভাব দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ভাবতাম, ও হয়ত এই এক বছরে এত কষ্ট পেয়েছে যে, এ সব কিছুই ওর গায়ে লাগে না।

পরে বুঝেছিলাম, তা ঠিক নয়। আসলে শৈবালদি নিজেকে নিয়েই নিজে বিভোর ছিল, অন্যদিকে তাকাবার সময়ও ছিল না তার। সমস্ত দিনই রূপচর্চা করছে—কখনও হাত, কখনও মুখ, কখনও পা, কখনও চুল। এক একটি অঙ্গ যেন ওর এক একটি প্রিয় সন্তান। তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে যত্ন করে তবে ওর তৃপ্তি।

ওর দিকে তাকিয়ে আমার কি রকম দম বন্ধ হয়ে আসত। ওর কি শুধু দেহ? মন বলে কিছু নেই? হাত, পা, নাক, চোখ, মুখ ব্যস! শেষ হয়ে গেল সব।

শৈবালদির মা অনবরত গালাগালি দিতেন, মর্, মর্, মরণ হয় না কেন তোর, বিধবা মেয়ের অত সাজ কিসের লা!

শৈবালদি শুনতেই পেত না।

সলিল বলে, তারপরে অনেকদিন আমি ওর কোন খবর নিইনি।

পাশাপাশি থেকেও আমরা কি রকম ভাবে পরস্পরকে ভুলে থাকি, তাই না? আমাদের ছোট্ট সংসারেও নানারকম বিপর্যয় শুরু হল। বাবা মারা গেলেন, সেবারে আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা—পড়া ছেড়ে পাদচারণ শুরু করলাম চাকরির জন্য। অনেক কষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করলাম। ছাপাখানার কাজ। কাজ শিখিয়ে দেবে আর কিছু হাত খরচ দেবে।

কি কষ্টে যে কেটেছে ক'দিন। ভাল করে দু' বেলা খেতে পেতাম না। আমি তবুও বা না পেতাম, মায়ের তো আধপেটা আহার। বুঝতে পারতাম সবই, তবুও কিছু বলতাম না। বলে কোন লাভ নেই।

তারপরে কাজ শিখলাম। ঠিকমত মাইনে পেতে থাকলাম, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক বেশী, কিছু জমল। মনে শান্তি এল, শরীরে সুখ—তখন মনে হল পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলি। রাত জেগে জেগে পড়লাম, পাশ করলাম।

আমাদের প্রেসের কাজ—খবরের কাগজের কাজ। রাতের সিফ্‌টে কাজ হয় বেশী, আমি রাতের সিফ্‌টে কাজ নিলাম—কলেজে ভর্তি হওয়া আটকাল না।

সেদিন ফেরার পথে এটুকু বলে সলিল চুপ করল।

আমি একটু হাসলাম। বুঝলে আকাশ, সলিল যেটুকু আসল কথা তাই তো বলল না—তাই আমি একটু হাসলাম। ওর মুখোসটা খুলতে গিয়ে আবার চেপে দিল দেখে একটু হাসলাম।

—হাসছিস কেন? সলিল জিজ্ঞেস করল।

—আমার মনে খুব আনন্দ হয়েছে।

—আনন্দ! অবাক হয় সলিল। শৈবালদির অবস্থা দেখে আর যাই হোক আনন্দ হয় না।

—আনন্দ। কেন জান, আরব্য উপন্যাসের গল্প জান তো। সেই যে এক রাত্রির সুলতান হয়েছিল! ও আমাকে কৃতজ্ঞতার আবেগে তুমি করে বলেছিল—আমি সেটাই চালু করি।

—না তো, কি শুনি?

—প্রত্যেকদিন··· [ক্রমশ।

কি করণীয়?

যে কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে, বা যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলে, আগে সমস্ত অবস্থাটা সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হোন; তারপর ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নিন সামগ্রিক ব্যাপারটাকে, তারপর পূর্ণোদ্যমে লেগে যান অবস্থাটা আয়ত্তে আনতে। এইভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হলে, যে কোন দুরূহ কর্মেই সাফল্য লাভ অনিবার্য। মনকে সুদৃঢ় রেখে কাজে হাত দিলে, পরিণতি আশাপ্রদ হতে বাধ্য। সাহসের দ্বারা দুস্তর বাধা-বিঘ্নকেও অতিক্রম করা যায়। অতএব যে কোন বিষয়ে সফলতা অর্জন করতে হলে, সাহসী হোন; মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, সমস্ত পরিস্থিতিটা ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করুন, সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ পথ অনুসরণ করুন ও সদুপদেশে কর্ণপাত করুন। এইবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে কাজে হাত লাগান।

বিজ্ঞান বার্তা
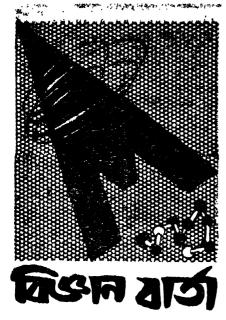
অধ্যাপক নীলস বোর

রাণী মজুমদার

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক নীলস বোর গত ১৮ই নভেম্বর '৬২ কোপেনহেগেনে ৭৭ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিজ্ঞান-জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। পরমাণু-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। অধ্যাপক বোরকে বলা হয় 'আধুনিক পদার্থ বিদ্যার জনক।'

নীলস হেনরিক ডেভিড বোর ১৮৮৫ সালের ৭ই অক্টোবর ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ক্রিষ্টিয়ান বোর কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বোর তাঁর বাবার পরীক্ষাগারে যাবার সুযোগ পেতেন। ২২ বছর বয়সে বোর জলের তলটান (Surface tension) সম্বন্ধে অনুশীলন করে ডেনিস বৈজ্ঞানিক সমিতি থেকে একটা স্বর্ণপদক পুরস্কার পান। এই সময়ে বোর এবং তাঁর ভাই হ্যারাল্ড খেলাতেও দক্ষতা অর্জন করেন। সারা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় খেলোয়াড় হিসাবে তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করে বোর চলে যান ইংল্যাণ্ডে। সেখানে তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড আর্নেষ্ট রাদার ফোর্ডের সঙ্গে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯১৩ সালে বোর প্রচার করেন—পরমাণুর সঙ্গে সৌরজগতের সাদৃশ্য আছে; যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করেই ইলেকট্রনগুলি (ঋণাত্মক তড়িৎকণিকা) বিভিন্ন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। ৪৯ বছর পূর্বেই বোর পরমাণুর গঠন রহস্যের সমাধান করেন। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে গবেষণার জন্যে অধ্যাপক বোরকে ১৯২২ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—তার আগের বছর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন অধ্যাপক আইনষ্টাইন।

আইনষ্টাইন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অধ্যাপক নীলস বোর সম্বন্ধে বলেছিলেন—কেউই জানেন না তাঁকে (অধ্যাপক বোরকে) বাদ দিলে পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমার যে সব সহকর্মী খুব অমায়িক—তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক বোরও অন্যতম। তিনি সব সময়েই একটা ইতস্তত-এর ভাব নিয়ে কথা বলেন—কখনও দৃঢ় প্রত্যয়ীর মত কথা বলেন না।

ডেনমার্কের সর্বত্রই অধ্যাপক বোর প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন। সবাই তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। একবার একজন আমেরিকান পদার্থ-বিজ্ঞানীর স্ত্রী কোপেনহেগেনে বাসে চড়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর পাশে বসেছিলেন একজন ডেনিস বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কথা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীর স্ত্রী বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলেন যে, তাঁর স্বামী অধ্যাপক নীলস বোরের অধীনে কোপেনহেগেনে গবেষণা করছেন। এই কথা শোনামাত্র বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে মাথার টুপি খুলে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

১৯১২ সালে অধ্যাপক বোর মারগ্রেথ নরলুণ্ডর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। অবসর সময়ে বোর স্কিয়িং, নৌকা এবং সাইকেল চালনায় আনন্দ পেতেন। হাঁটাপথে বেড়াতেও তিনি ভালবাসতেন। ৫৪ বছর বয়সেও অধ্যাপক বোর অসলোতে অনুষ্ঠিত স্কি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করেন। খেলাধূলা করবার সময়েই তিনি একবার দারুণ শোক পান। কাট্টেগাটে নৌ-চালনার সময়ে তাঁর বড় ছেলে জলে ডুবে মারা যান। অধ্যাপক বোরও সেই সময়ে নৌকায় ছিলেন। কিন্তু স্রোতের টান প্রবল হওয়ায়—বোরের বন্ধুরা তাঁকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধা দেন।

১৯৩৯ সালে অধ্যাপক বোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে তিনি পরমাণুর বিভাজন তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

তারপর অধ্যাপক বোর ডেনমার্কে ফিরে আসেন। ডেনমার্ক জার্মানীর দখলে যাবার পর অধ্যাপক বোর ডেনমার্কে তাঁর ইনষ্টিটিউটে গবেষণা চালাবার সুযোগ কিছুদিন পেয়েছিলেন। কিন্তু জার্মানীর সন্দেহ হয় শত্রুপক্ষের সঙ্গে অধ্যাপক বোরের সংযোগ রয়েছে। সেই জন্যে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে বন্দী করবার উদ্যোগ করা হয়। কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক বোর সস্ত্রীক এক জেলে-নৌকায় চেপে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনে পলায়ন করেন।

প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অধ্যাপক বোরকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে আসবার জন্যে ষ্টকহোমে একটি মস্কুইটো বোমারু বিমান পাঠান। বিমানে অক্সিজেনের মুখোস কার্যকরী করতে না পারায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁকে ঐ অবস্থাতেই বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। যুদ্ধের শেষে অধ্যাপক বোর তাঁর দিনগুলি নীরবেই কাটাতে থাকেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে তিনি আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস করবার উপায় হিসাবে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি বিনিময়ের আবেদন জানিয়ে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে একটি খোলা চিঠি প্রেরণ করেন। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে জেনেভায় শান্তির জন্যে পরমাণু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া সহ পৃথিবীর ৬০টি দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর

বিশ্বাস ছিল—বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার দ্বারাই মানব-জাতির প্রকৃত উন্নতি করা সম্ভব।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের শান্তির উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি বিকাশের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার আবেদনে সাড়া দিয়ে ফোর্ড মোটর কোম্পানী 'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই পুরস্কারের মূল্য ৭৫,০০০ ডলার। ১৯৫৭ সালের ২৪শে অক্টোবর অধ্যাপক বোরই প্রথম এই পুরস্কারলাভের গৌরব অর্জন করেন।

কেবল একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসাবেই নয়—শান্তিবাদী মানব প্রেমিক হিসাবেও তিনি ছিলেন সমগ্র পৃথিবীর নমস্য।

এণ্ডোক্রিন অর্কেস্ট্রা ও পিটুইটারী

সুব্রত পাল

মানব শরীরের অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিগুলি একটি নিবিড় অন্তর্লীন সম্পর্কসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ। এই সম্বন্ধ কোথাও সৌহার্দ্যের কোথাও বিরোধের। তবু এই পারস্পরিক মৈত্রী ও বিরোধের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম সমতা এবং সুষমা রয়েছে যার ফলে দেহের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার সুমিতি এবং শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন থাকে। বিভিন্ন এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের এই সুষমাকেই বলা হয় এণ্ডোক্রিন অর্কেস্ট্রা। আর পিটুইটারী গ্রন্থিকে এই এণ্ডোক্রিন অর্কেস্ট্রার প্রধান যন্ত্রী হিসাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

অর্থাৎ শরীরের অন্তঃক্ষরণকারী গ্রন্থিসমূহের মধ্যে পিটুইটারীর স্থান সবার উপরে। এই গ্রন্থি শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে; অধিকন্তু এই গ্রন্থিটি অন্যান্য অন্তঃক্ষরী গ্রন্থির নিয়ন্ত্রণকর্তা। আকারে ক্ষুদ্র হলেও শরীরের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষায় এর গুরুত্ব অসাধারণ। এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের 'টিউবার সাইনেরিয়ম' নামক অঞ্চলে অবস্থিত। এর প্রধান দুটি অংশ—একটি সম্মুখভাগ অপরটি পশ্চাদ্ভাগ। ক্রিয়াকলাপ, গঠনতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্বের দিক থেকে এই দুটি অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন যদিও এরা পরস্পর নিবিড়ভাবে সংলগ্ন। সম্মুখভাগ থেকে প্রায় এগারটি বিভিন্ন ধরণের হর্মোন নিঃসৃত হয়। এদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) শরীরবর্ধক হর্মোন
(২) থাইরয়েড উদ্দীপক
(৩) অ্যাড্রিনাল উদ্দীপক
(৪) প্যারাথাইরয়েড উদ্দীপক
(৫) যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক
(৬) স্তন্য বিবর্ধক
(৭) অগ্ন্যাশয় উদ্দীপক।

শরীরবর্ধক হর্মোন শরীরের সমানুপাতিক বৃদ্ধির জন্যে অত্যাবশ্যক। এর অভাবে বা স্বল্পক্ষরণের হেতু শরীরের বৃদ্ধি অবরুদ্ধ হয় এবং বামনত্ব দেখা দেয়। আবার অত্যধিক ক্ষরণের ফলে শরীর অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়ে ওঠে। অতিকায়ত্ব এবং বিষমকায়ত্বের সৃষ্টি হয়। পিটুইটারী হর্মোন ঘটিত বিভিন্ন ব্যাধি নিয়ে ইতিপূর্বেই 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় বিশদ আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৬৮, পৃঃ ৭৮৭ হর্মোন বিভ্রাট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোন থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই হর্মোনটি থাইরয়েড গ্রন্থির কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে। অধিকন্তু বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি ক'রে থাইরক্সিন-সংশ্লেষণের গতি বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে রক্তে থাইরয়েড হর্মোনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে থাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ অবদমিত হয় এবং ফলে থাইরক্সিন ক্ষরণও হ্রাস পায়। এইভাবে 'পিটুইটারী থাইরয়েড চক্রের' পারস্পরিক সহযোগিতায় থাইরক্সিন ক্ষরণের সুমিতি রক্ষিত হয়। পিটুইটারী গ্রন্থি কেটে ফেলে দেখা গেছে, থাইরয়েড গ্রন্থি ক্রমশ অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

অ্যাড্রিনাল উদ্দীপক হর্মোনের অভাবে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। পিটুইটারী গ্রন্থি এই হর্মোনের সহায়তায় অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের গঠনগত অখণ্ডতা এবং ক্রিয়াগত সামঞ্জস্য রক্ষা করে। দেহ থেকে পিটুইটারী গ্রন্থি উৎপাদন করলে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ক্ষরণশীল কোষগুলিতে ক্ষয় বিকৃতির সূচনা হয় এবং হর্মোন ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। ঈদৃশ অবস্থায় পিটুইটারী নিষ্কাশ অথবা কর্টেক্স উদ্দীপক হর্মোনের যথাযথ প্রয়োগ বিকৃতিগ্রস্ত কোষগুলিকে পুনশ্চ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। আবার স্বাভাবিক গতিতে বর্ধনশীল প্রাণীর দেহে কর্টেক্স উদ্দীপক হর্মোন প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, কর্টেক্সের ক্ষরণশীল কোষগুলি আকার ও আয়তনে দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ক্ষরণক্রিয়াও অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এইসব পর্যবেক্ষণ থেকে পিটুইটারী এবং অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের সুনিবিড় সম্পর্কই সপ্রমাণ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'হাইপোথ্যালামাস' নামক মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্র পিটুইটারী এবং অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের পারস্পরিক সম্পর্কের দূতগিরি করে থাকে। রক্তে কর্টিকয়েড হর্মোনের মাত্রা যখনই হ্রাস পায়, হাইপোথ্যালামাসের স্নায়ুকোষগুলি তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে ওঠে এবং এই উদ্দীপনার ফলে স্নায়ুকোষ থেকে 'নিউরোহিউমার' নামক একটি স্নায়বিক হর্মোন ক্ষরিত হয়। এই স্নায়ুরস 'রাসায়নিক বার্তাবহ'রূপে রক্তধারায় মিশে পিটুইটারী গ্রন্থিতে পৌঁছায় এবং পিটুইটারীর পুরোভাগকে উত্তেজিত ক'রে বর্ধিত মাত্রায় অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স উদ্দীপক হর্মোনের ক্ষরণ ঘটায়। কর্টেক্স-উদ্দীপক হর্মোন তখন স্বকীয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে কর্টিকয়েড হর্মোনের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, রক্তস্রোতে কর্টিকয়েড হর্মোনের মাত্রা বেড়ে গেলে উপরিবর্ণিত ঘটনাক্রমের ঠিক বিপরীতগুলিই সংঘটিত হয়। এইভাবে পিটুইটারী-হাইপোথ্যালামাস অ্যাড্রিনাল চক্রের মাধ্যমে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের ক্ষরণক্রিয়ার সৌষম্য রক্ষিত হয়।

প্যারাথাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোনটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির গঠনগত অখণ্ডতা এবং ক্ষরণক্রিয়ার প্রধান নিয়ামক। আবার পিটুইটারীর এই প্যারাথাইরয়েড উদ্দীপক হর্মোনের পরিমাণ নির্ভর করে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রার ওপর। এই পারস্পরিক সহ-অবস্থানকে বলা হয় পিটুইটারী-প্যারাথাইরয়েড চক্র। পিটুইটারী ক্ষরিত অগ্ন্যাশয় উদ্দীপক হর্মোন প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন ক্ষরণকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে বলে জানা গেছে।

পিটুইটারীর যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক হর্মোনগুলির ক্রিয়াকলাপ বিচিত্র

এবং এদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পিটুইটারী থেকে প্রধানত তিনটি যৌনগ্রন্থি উত্তেজক হর্মোন নিঃসৃত হয়—

(ক) ফলিকল-উত্তেজক (F. S. H.)

(খ) লিউটিনাইজিং (Luteinising Hormone)

(গ) প্রোল্যাক্টিন (Prolactin)

এই হর্মোনগুলি যৌনগ্রন্থিগুলির বিকাশ ঘটায় এবং যৌনগ্রন্থির ক্ষরণক্রিয়া উদ্দীপিত ক'রে মানবদেহে যৌবনের মাধুর্য এবং কমনীয়তার সঞ্চার করে। প্রথম হর্মোনটির প্রভাবে স্ত্রী-যৌনগ্রন্থি অর্থাৎ ওভারীর গ্রাফিয়াল ফলিকল্ এবং তার অভ্যন্তরে ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয় এবং তারা ক্রম-পরিণতির পথে এগিয়ে চলে। অবশেষে এই হর্মোনেরই প্রভাবে ডিম্বাণুর বহিষ্কার ঘটে। এই গ্রাফিয়াল ফলিকল থেকেই সৃষ্ট হয় ঈস্ট্রোজেন নামক স্ত্রী-যৌন হর্মোন। ডিম্বাণু নির্গত হয়ে গেলে গ্রাফিয়াল ফলিকল্ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আর সেই স্থানে লিউটিনাইজিং হর্মোনের প্রভাবে গড়ে 'কর্পাসলুটিয়াম্' নামক একটি পীতাভ কোষ-বিশিষ্ট উপাদান। এই সব পীতাভ কোষ থেকে প্রোল্যাক্টিন নামক হর্মোনের প্রভাবে ঈস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরণ নিঃসৃত হয়। নারী দেহের রূপলাবণ্য, মাসিক ঋতুচক্র এবং সন্তানধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায়ের ওপর এই দুটি হর্মোনের ভূমিকার কথা 'জীবন, যৌবন ও হর্মোন' (মাসিক বসুমতী, পৌষ ১৩৬৯) প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রোল্যাক্টিন নামক হর্মোনটি স্তনের দুগ্ধক্ষরী নালীগুলিকে বর্ধিত হতে সহায়তা করে; ফলে যৌবনাগমে এবং সন্তান ধারণকালে স্তনের বৃদ্ধি হয় এবং সন্তানজন্মের পর স্তন যুগল পীযূষধারায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। যৌনগ্রন্থি-উদ্দীপক হর্মোনগুলি পুরুষদেহে টেষ্টিসের অভ্যন্তরে শুক্রকীটের সৃষ্টি করে এবং সেগুলির মধ্যে প্রাণোদ্দীপনা সঞ্চার করে দেয়। অধিকন্তু পুং-হর্মোন টেষ্টোষ্টেরোণের ক্ষরণও এই সকল যৌনগ্রন্থি উদ্দীপক হর্মোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পিটুইটারীর পশ্চাদ্ভাগ থেকে নিঃসৃত হয় পিটুইট্রিন। এর দুটি উপাদান পিটোসিন এবং পিট্রেসিন। পিট্রেসিন ধমনী সঙ্কোচন ঘটিয়ে রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয় আর পিটোসিন গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান প্রসবের পর গর্ভাশয়ের মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটায়। এতদ্ভিন্ন, পশ্চাৎ-পিটুইটারী থেকে 'অ্যান্টিডাইয়ুরেটিক হর্মোন' নামে আরও একটি রসোপাদান নিঃসৃত হয়। এর অভাবে ডায়াবেটিস্ ইনসিপিডাস নামক রোগ হয়। এই রোগে শর্করাবিহীন অতি তরল মূত্র অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হতে থাকে। পিটুইটারী কাহিনীর এইখানেই পরি-সমাপ্তি এবং এই সঙ্গে ধারাবাহিক হর্মোন কথারও আপাতত ইতিপাত ঘটলো। কিন্তু আগেই বলেছি হর্মোন কাহিনী বিচিত্র এবং গভীর। এর প্রতিবিন্দুতেই সিন্ধুর স্বাদ। সেই স্বাদটুকুই আমার প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকাদের দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। 'রহস্যের কুহেলিকাজালে' আবদ্ধ হর্মোনতত্ত্বের স্বরূপ পাঠক-পাঠিকাদের সম্মুখে কতটুকু উদ্ঘাটন করতে পেরেছি তার বিচার করবেন বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাগণ। প্রবন্ধের প্রত্যন্ত দেশে উপস্থিত হয়ে আমি শুধু সকলকে তাঁদের সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা দানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা

বর্তমানের মানুষ জীবিকার শৃঙ্খলে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, কাজের বাঁধাধরা সময় ছাড়াও তারা কাজের দাসত্ব করে থাকে, অধিকাংশ ব্যক্তিই অফিসের ফাইল বাড়ীতে বহন করে নিয়ে যান দিবসান্তে এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রামের সময়টুকুও তাতেই ব্যয় করে থাকেন; এই অভ্যাস শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই খানিকটা সময় খেয়াল-খুসীতে কাটানো প্রয়োজন, সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর সন্ধ্যার সময় যে অবসরটুকু পাওয়া যায় সেটাকে অপচয় করলে শরীর ও মনের স্বাভাবিক সুস্থতা বজায় রাখা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। মানুষ যে ক্রমেই কাজের চাকায় বাঁধা যন্ত্র বিশেষে পরিণত হচ্ছে, এর জন্য অবশ্য আধুনিক জীবনযাত্রার মানকেই দায়ী করে যেতে পারে, সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। এমন অনেক বস্তুই আজ আমাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় যা আমাদের পূর্ববর্তীগণের ধারণাতেও আসতো না এবং সেজন্যই আজকের এক মধ্যবিত্ত গৃহকর্তা শুধু খাওয়া-পরার সমস্যা নিয়েই বিচলিত থাকেন না, ভাড়া করা ফ্যান, রেডিও, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদির খাতে মাসান্তে যে বরাদ্দ ধরে দিতে হয় তা নিয়েও মাথা ঘামান। মধ্যবিত্ত কেরাণী বধূর মন আজ আর শুধু অন্নবস্ত্রের সংস্থান পেয়েই সন্তুষ্ট হয় না দৈনিক বাজারের মত সাপ্তাহিক সিনেমা টিকিটের দামটুকুও আজ তার অবশ্য প্রাপ্য। সিনেমা-থিয়েটার, ফ্যাসন মাফিক শাড়ী, ব্লাউজ, নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রীর খাতে প্রতিমাসে বেশ উল্লেখযোগ্য একটা অঙ্ক বেরিয়ে যায় এবং তারই জোগান দেওয়ার জন্য সারাদিন অফিসে ফাইল ঘাঁটার পরও বাড়ীর কর্তাকে ফাইলের গন্ধমাদন বয়ে আনতে হয় বাড়ীতে, কিম্বা অফিস থেকে বেরিয়েই ধাবমান হতে হয় প্রাইভেট টিউশনি সামলাতে। এত করেও যে সব সময় শেষরক্ষা হয় তা নয়, কারণ এমন মধ্যবিত্ত সংসার আজ দুর্লভ যেখানে মাসের শেষ কটা দিন 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' এই বাক্যটির সার্থকতার স্বাক্ষরবাহী হয়ে ওঠে না। বর্তমান জীবনযাত্রায় তাই অধিকাংশ মানুষেরই না আছে সুখ না আছে স্বস্তি এবং একজন্যই নার্ভের রোগগ্রস্ত এ মানুষের সংখ্যাও আজ ক্রমবর্ধমান। কর্মের মত অবকাশও যে প্রত্যেক মানুষের জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয়, এ সত্য অনস্বীকার্য সুতরাং সেই অবকাশ মুহূর্তগুলোকে জীবিকার প্রয়োজনে খণ্ডিত করতে পরিণাম অশুভ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। দাম্পত্যজীবনেও এর বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে, সারাদিন পরে বাড়ী ফিরে স্ত্রী সন্তানাদির সাহচর্যে খানিকটা সময় অতিবাহিত করতে না পারলে স্বভাবতই তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, যার ফলে গার্হস্থ্য জীবনের সুর কেটে যায়, সংসারের সঙ্গে যোগ ক্রমেই একটা যান্ত্রিকতার ভাব ধারণ করে, সুস্থ, সুন্দর সমাজজীবন গড়ে ওঠার পক্ষে যা সহায়ক নয় একেবারেই। অবকাশের মধুর মুহূর্তগুলি পূর্ণভাবে উপভোগ করলে মানুষের কর্মশক্তিও দ্বিগুণিত হয়, সন্ধ্যার আনন্দ ও রাত্রির নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ করে তোলে, ফলে পরবর্তী দিনের জন্য যথেষ্ট কর্মশক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে। 'কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা' ইংরাজী এই প্রবাদ বাক্যটিকে জীবনে সার্থক করে তুলতে পারলে যে সত্যই লাভবান হওয়া যায়, একথা বর্তমানের জীবিকা পাগল মানুষ যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করেন, ততই মঙ্গল।

[একাঙ্ক]

নীরেন ভঞ্জ

চরিত্র

সূত্রধর

[সংস্কৃত নাটকে যার উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি 'সূত্রধার'—
সূত্রধর (> ছুতার) না।]

বিশ্বেশ্বর, শিউভজন রামরতন, ডাক্তার অধ্যাপক
মুটে, পরিমল, সেক্রেটারী।

[মঞ্চের পর্দা ওঠার আগে 'বাদ্যধুন' শোনা গেল—প্রথমে দ্রুত ও পরে ধীর লয়ে। পর্দা উঠলে দেখা গেল মঞ্চের ডান দিক থেকে বাঁদিক পর্যন্ত দেওয়াল এবং দেওয়ালের মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা। সময় তখন সকাল দশটার কাছাকাছি।]

(সূত্রধর প্রবেশ করলো)

সূত্রধর। নমস্কার। আপনারা আজ আমাদের সামান্য আয়োজনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে অলঙ্কৃত করেছেন। আপনাদের নানা রকমের কাজ থাকা সত্ত্বেও আজকের সভায় যোগদান করার জন্যে আমি সকলকে জানাচ্ছি ঐকান্তিক ধন্যবাদ।

মাপ করবেন, আমার পরিচয়টি আপনাদের এখনও জানান হয়নি। আপনারা মনে রেখেছেন কিনা জানি না, একটু ভেবে দেখুন আমাদের দেশে নাটকের জন্মক্ষণ থেকেই আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে।

আমাদের আয়োজন ক্ষুদ্র, কিন্তু উৎসাহ প্রচুর। (মঞ্চের আলো নিভে গেল।) দাঁড়াও, দাঁড়াও, আলো আলো—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। (আলো জ্বলে উঠলো।) মাপ করবেন। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়ে) এঁরা সকলে ব্যস্ত হয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করবার সুযোগ এঁরা আমাকে একা নিতে দিতে চান না। (নেপথ্যে বাজনার সুর বাঁধার শব্দ হোল।)—যাই হোক আমারও সেরকম কোন দুরভিসন্ধি নেই।

(বেয়ারা শিউভজন ঢুকে মাথা চুলকে হাই তুললো।)

(শিউভজনকে)—শিউভজন, তুমি এসে গেছ! ক'টা বাজলো? (নিজের হাতঘড়ি দেখলো।)

[ভেতরে স্টেশনে ট্রেণ আসার আগে ঘণ্টা বাজার মত প্রথমে দ্রুত ও পরে ধীরে ঘণ্টা বাজলো 'ঢং-ঢং' করে আটবার।]

(নিজের হাতঘড়িতে কান দিয়ে) নাঃ, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। বোধ হয় অফিসের সময় হয়ে এলো, আমি চলি এখন—নমস্কার।

[প্রস্থান।

[শিউভজন খাটিয়া এনে একটা দরজার সামনে রাখলো ও অফিসের নাম-লেখা একটা বোর্ড দেওয়ালে টাঙিয়ে দিল। বোর্ডে লেখা 'রামরতন এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।' শিউভজন খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে একজন ধুতি-পাঞ্জাবীপরা ভদ্রলোক ঢুকলেন—হাতে কাগজ ও ফাইল নিয়ে। এঁর নাম শ্রীবিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী। বয়স ২৬২৭। তিনি শিউভজনকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকবেন কিনা ভাবছেন, হঠাৎ শিউভজন লাফিয়ে উঠে পড়লো।]

শিউভজন। কাকু মাগুচস্তি ?

বিশ্বেশ্বর। শেঠজী হ্যায় ?

শিউ। অছি, কাঁই কি ?

বিশ্ব। হাম্ ভেট্ করনে মাংতা।

শিউ। সাহেব নমাজ পড়ুচস্তি।

বিশ্ব। নমাজ কাঁহে ?

শিউ। মু কই পারিবুনি।

বিশ্ব। হাম্ অন্দর জানে শেখ্তা ?

শিউ। তেমে টিকে রুয়।—তেমের কাড অছি ?

বিশ্ব। জরুর, (কার্ড দিল, শিউভজন তা উল্টেপাল্টে দেখলো।)

শিউ। মু আউচস্তি কার্ড দেইকিরি।

[শিউভজন দড়ির খাটিয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে দরজা দিয়ে না ঢুকে মঞ্চের একদিক দিয়ে ভেতরে চলে গেল। বিশ্বেশ্বর ফাইলগুলো হাত বদল করে পায়চারি করতে লাগল।

কিছু পরে শিউভজন ফিরে এলো এবং বিশ্বেশ্বরকে হাতের ইসারায় অপেক্ষা করতে বলে নিজে খাটিয়ায় শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বিশ্বেশ্বর খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে মাটিতে বসে পড়ল।

কিছু পরে ঘরের মধ্যে পুজোর ঘণ্টা বাজার মতো শব্দ হলো। বিশ্বেশ্বর উঠে পড়লো, কিন্তু শিউভজন তখনও ঘুমুচ্ছে।]

বিশ্ব। (অধৈর্য হয়ে) ক্যা ভাইসাব, নিদ্ যাতা হ্যায় ?

[শিউভজন ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো। তখনও ভেতরে ঘণ্টা বাজছে। শিউভজন খাটিয়াকে মঞ্চের ভেতর রেখে এলো।]

বিশ্ব। ক্যা নাম ভাই ?

শিউ। শিউভজন সিং।

বিশ্ব। জিলা ?

শিউ। ছাপ্‌রা। (ঘরের দেওয়ালে হাত দিল।)

—তেমে দিয়ালে টিকে হাত লাগাও।

(বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে দেওয়ালে হাত দিল।)

বিশ্ব। কাহে ?

শিউ। দিয়াল কোলাপ্‌সিপিল অছি পরা—

[বলতে বলতে আধখানা দরজা শুদ্ধ দেওয়াল ঠেলে মঞ্চের একধারে বাইরে নিয়ে গেল। সেই দেখাদেখি বিশ্বেশ্বর অপরাংশ অন্য দিকে নিয়ে গেল।]

[দেওয়াল সরে যেতে দেখা গেল রামরতনবাবু দর্শকের দিকে পিছন ফিরে হাঁটু গেড়ে বসে নিচু হয়ে কি করছেন। বিশ্বেশ্বর রামরতনবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে তিনি সোজা হলেন বটে তবে তখনও হাঁটু গেড়ে এবং দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে তাঁর গদিতে বসে রইলেন। ওঁকে দেখলে নমাজ পড়ছেন বলে মনে হবে। ওঁর বয়স ৪৫ বছরের ভেতর হতে পারে।]

রাম। (পিছন ফিরেই) নমস্কার—বসুন।

বিশ্ব। (আমতা আমতা করে) আপকা নমাজ—(রামরতনবাবু দর্শকদের দিকে ফিরলেন।)

রাম। আজ্ঞে না। আবার হিন্দি কেন বিশ্বেশ্বরবাবু ?

বিশ্ব। মাপ করবেন—কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে। মানে, হিন্দি রাষ্ট্রভাষা কিনা।

রাম। বাংলা তো কবির ভাষা—

বিশ্ব। হ্যাঁ রামমোহন রায়ের ভাষা—

রাম। কেন প্রতাপাদিত্যের ভাষা—

বিশ্ব। হ্যাঁ রামকৃষ্ণর ভাষা—

রাম। যদুভট্টের ভাষা—

বিশ্ব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা—

রাম। গ্রামের যত চাষা—

বিশ্ব। আপকা বাত বহুত খাসা।

রাম। আপনার কাজ কতদূর এগোলো ?

বিশ্ব। খোঁজখবর—সংখ্যান পরিসংখ্যান সব হয়ে গেছে।

রাম। দাঁড়ালো কি ?

বিশ্ব। এখনও পর্যন্ত যতটুকু জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয় মৌমাছির চেয়ে মাছির সংখ্যাই বেশী।

রাম। অথচ দেখুন আমরা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছি—মৌমাছি অতিশয় পরিশ্রমী।

বিশ্ব। শুধু তাই নয় ওরা মাছিদের চেয়ে অনেক সুখী।

রাম। আমার মনে হয় আমাদের দেশের লোকেদের মৌমাছি প্রথায় মানুষ হতে হবে।

বিশ্ব। কেন কুকুরের কথা আমরা ভাবতে পারি।

রাম। ভাববার কি আছে ? আমরা রাস্তায়-ঘাটে যথেষ্ট কুকুর দেখি। কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়—এ-তো আমরা জানি।

[ডাক্তার চ্যাটার্জী এলেন। এঁর বয়স ৩৫-এর মধ্যে।]

রাম। আসুন ডাক্তার চ্যাটার্জী। (ডাক্তার বসল।)

ডাক্তার। বিশ্বেশ্বরবাবু কতক্ষণ ?

বিশ্ব। আভি আয়া। ডাগ্‌তার সাব, আপ্‌কা কুত্তা ক্যায়সে হ্যায় ?

ডাঃ। কিসের কুত্তা ?

বিশ্ব। এ্যায়সাই, খাস কুত্তা—বাংলায় যাকে কুকুর বলে।

রাম। আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি। (চলে গেলেন।)

বিশ্ব। আপনার কুকুর নেই ?

ডাঃ। না।

বিশ্ব। আপনাকে কুকুরে কামড়েছে কখনও ?

ডাঃ। একবার কামড়েছিল।

বিশ্ব। আপনি করলেন কী ?

ডাঃ। আমার অন্য পা থেকে খানিকটা মাংস কেটে একটু দূরে ছুঁড়ে দিলুম—আর কুকুরটা সেইটের লোভে আমার পা ছেড়ে ছুটে গেল।

বিশ্ব। কথায় বলে লোভে পাপ।

ডাঃ। পাপে মৃত্যু—

বিশ্ব। মৃত্যু কেন ?

ডাঃ। ঠিক সেই সময় একটা বাস এসে কুকুরটাকে চাপা দিয়ে চলে গেল।

বিশ্ব। মরে গেল?

ডাঃ। তখনি মরে নি। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু পথেই নাকি কুকুরটা মারা গিয়েছিল।

বিশ্ব। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) মৃত্যু বড়ই করুণ! (কিছু পরে) কুকুরের কিন্তু কামড়ানো অভ্যাসটা না থাকলে—

ডাঃ। ভয় নেই।

বিশ্ব। কী রকম? কুকুরের দাঁত ভেঙে দেবেন?

ডাঃ। না ও-সব চলতো প্রাচীন ব্যাবিলনে। আমরা কুকুরের মুখে ঠুলি পরানোর বন্দোবস্ত করছি।

বিশ্ব। কুকুর তাহলে ডাকবে কি করে?—খাবে কি করে? ঠুলি মুখে নিয়ে তো আর খেতে পারবে না।

ডাঃ। সে বিষয়ে কি আর কিছু না করেছি?

[হাতে মোড়া নীল কাগজের নক্সা বার করলেন। বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।]

এই ধরুন কুকুর—এই ধরুন তার মুখ—আর এই ধরুন তার ঠুলি। আর এই হচ্ছে ঠুলির মাপজোপ আর এই ঠুলির **lowest tender**-এর দর। (নক্সাটি আবার জড়িয়ে নিলেন।) কুকুরের আসল দোষ কী জানেন?

বিশ্ব। বড় চ্যাঁচায়।

ডাঃ। তা নয়।

বিশ্ব। বড় নোঙরা—

ডাঃ। তাও বলা যায় না।

বিশ্ব। ওদের সংযমের অভাব।

ডাঃ। ঠিক সে কথা বলতে পারি না। আমার অভিজ্ঞতায় আমি অনেক জিতেন্দ্রিয় কুকুর দেখেছি।

বিশ্ব। তা হলে মশাই বলতে পারছি না।

ডাঃ। আসল কথা হচ্ছে কুকুর জাত প্রভুভক্তি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে। যেন একটু বেশী আত্মপ্রকাশের চেষ্টা।

[এঁদের কথায় ছেদ পড়লো ভেতরে রামরতনবাবুর কুকুরটার চিৎকারে।]

বিশ্ব। যাই বলুন ডাক্তারবাবু কুকুর কিন্তু মৌমাছির মত স্ত্রৈণ নয়।

ডাঃ। মৌমাছিকে স্ত্রৈণ বলছেন কেন?

বিশ্ব। বলব না। রাণী মৌমাছির সেবায় সারা জাতটা প্রাণপাত করতে ছোটাছুটি করে।

ডাঃ। সেটা কী শুধু মৌমাছির বৈশিষ্ট্য? এ ব্যাপারে ওদের সঙ্গে ইংরেজদের অনেক মিল আছে। আর শুধু ইংরেজ কেন অনেক দেশেই স্ত্রী জাতির প্রতি কিছুটা সম্মানের ভাব দেখানো হয়।

বিশ্ব। জার্মানেরা কিন্তু অন্য রকম—ওরা স্ত্রী জাতির প্রাধান্য স্বীকারই করে না। আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে—'বিশ্বাসঃ নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।'

ডাঃ। আপনার দৃষ্টিভঙ্গীটা একটু প্রাচীন।

বিশ্ব। তা হতে পারে, কিন্তু যা সত্য তার জয় সব সময়।

ডাঃ। সত্য কোনটা?

বিশ্ব। যা মিথ্যে নয় তা সত্য।

ডাঃ। আর মিথ্যে কী?

বিশ্ব। যা সত্য নয় তা মিথ্যে।

ডাঃ। উদাহরণ?

বিশ্ব। এই ধরুন ২৪ ঘন্টার মধ্যে কিছুটা রাত কিছুটা দিন, যখন দিন তখন রাত নয় আর যখন রাত তখন দিন নয়।

ডাঃ। ভোষ্টক পোপোভিচের ২৪ ঘন্টায় দিনরাতের ভাগ কিরকম হয়েছিল?

বিশ্ব। ভোষ্টক ঘুরছিল পৃথিবীর বাইরে।

ডাঃ। পৃথিবীর মধ্যে মেরুঅঞ্চলে গ্রীষ্মকালে যে কোন ২৪ ঘন্টার মধ্যে কতোটা রাত আর কতোটা দিন?

বিশ্ব। আমি মেরু অঞ্চলের কথা বলছি না।

ডাঃ। আচ্ছা বেশ খাদ্য উৎপাদন কে করে?

বিশ্ব। মানুষ।

ডাঃ। বেশী মানুষ বেশী খাদ্য উৎপাদন করবে নিশ্চয়ই?

বিশ্ব। খাদ্য উৎপাদন করার মত জমি থাকে তো নিশ্চয়ই করবে।

ডাঃ। আপনার দেশে জমি আছে খাদ্য উৎপাদন করার মতো?

বিশ্ব। আছে।

ডাঃ। মানুষ যথেষ্ট বেশী আছে?

বিশ্ব। আছে।

[টেলিফোন বেজে উঠলো। ভেতর থেকে রামরতনবাবু এসে টেলিফোন ধরলেন।]

রাম। (টেলিফোনে) কথা বলছি। না—না উটের **sample** এখন পাঠাবেন না। উটের কুঁজ তো থাকবেই। কুঁজ আর কি করে বাদ দেবেন বলুন (হাসলেন)? সেটা মন্দ কথা নয় একটা কুঁজ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার কথাটা ভাববার মতো। আচ্ছা নমস্কার। (টেলিফোন রাখলেন।)

বিশ্ব। উটের কুঁজ নিয়ে এতো ভাববার কি আছে? হোমিওপ্যাথি করলেই হয়—

রাম। হোমিওপ্যাথিতে উটের কুঁজ যাবে?

বিশ্ব। যাবে না কেন? যদি আঁচিল খসে যায়—তাহলে কুঁজ যাবে না কেন? কুঁজ তো একটা বড় জাতের আঁচিল।

ডাঃ। (বিরক্ত হয়ে) দেখুন বিশ্বেশ্বরবাবু, অনধিকার চর্চা করা আপনার একটা প্রধান দোষ।

[রামরতনবাবু নিজের কাজে মন দিলেন]

বিশ্ব। কেন অনধিকার চর্চা কেন?

ডাঃ। আমি যদি কুঁজকে একটা টিউমার জাতীয় বলে প্রমাণ করে দি।

বিশ্ব। টিউমার আর আঁচিলে তফাৎ কি মশাই?

ডাঃ। তা যদি আপনি বুঝবেন তাহলে তো আপনিই প্রেসক্রিপসন লিখতেন আর, আমি ফাইল বগলে ঘুরতাম। উটের কুঁজ সারাতে একমাত্র প্লাষ্টিক্ সার্জারী ছাড়া কোন উপায় নেই।

রাম। (কাগজ থেকে মুখ তুলে) বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনি তাহলে নিশ্চিত হয়েই বলছেন যে, মৌমাছির চেয়ে মাছি বেশী?

বিশ্ব। (উৎসাহিত হয়ে) নিশ্চয়ই। এই দেখুন না, আমি কতকগুলো খাবারের দোকানের ছবি তুলেছি (ফাইল থেকে বার করে কতকগুলো ছবি দেখালেন) আর এই দেখুন

কতকগুলো মৌচাকের x-ray-photo তুলেছি (x-ray-plate দিলেন)। আর এই দেখুন এই ছবিতে dustbin-এর পাশে একটা ফুলের টব বসিয়ে ছবি তুলেছি। (ছবিটা দিলেন) এতে দেখুন dustbin-এ কতো মাছি অথচ ফুলের টবে একটাও মৌমাছি নেই। একমাস ধরে দু'টো জিনিষ পাশাপাশি রাখা সত্ত্বেও এই অবস্থা।

ডাঃ। আসল কথা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। মাছি এবং মৌমাছি উভয়ের আসার জন্য পরিবেশ রচনা করতে হবে।

বিশ্ব। মাপ করবেন, পরিবেশ পরিবেশন সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। যা নেই তা পরিবেশ সৃষ্টি করলে কী করে আসবে ? তাছাড়া পরিবেশ না থাকলেও তো অনেক কিছু জোটে। এই ধরুন না একটি অফিসে পাঁচ বছর ধরে 'no vacancy' লেখা ঝুলতে দেখেছি, কিন্তু তবুও রোজ সেখানে বেকার লোকের ভিড় জমে।

ডাঃ। (মাটির দিকে চেয়ে কী দেখে ভয়ে চেয়ারের ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।) ওরে বাবাঃ ওটা কী ?

[বিশ্বেশ্বরবাবু কিছু দেখার আগেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।]

রাম। কী হোল আপনি চেয়ারে উঠলেন কেন ?—আর বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায় গেলেন ? (মাটির দিকে দেখে) হাঃ হাঃ হাঃ—আপনারা 'মণি'কে দেখে ভয় পেয়েছেন—।

ডাঃ। মণি কী মশাই—ও তো জ্যান্ত ফণী।

রাম। ও কিছু বলবে না। আমায় অনেকক্ষণ দেখেনি বলে এসেছে। আমার চৌকির নীচে চলে গেছে ওখানে থাকবে এখন। আপনি নেমে বসুন। (চেঁচিয়ে) ও বিশ্বেশ্বরবাবু—

ডাঃ। বিশ্বেশ্বরবাবু তো পালিয়ে বাঁচলেন—এখন আমি কী করি ?

রাম। আপনি নির্ভয়ে নামুন না।

ডাঃ। নির্ভয়—সভয় আমি কোন রকম ভয় নিয়েই নামতে পারবো না ওই সাপটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত।

রাম। (হেসে) আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওকে বাড়ীর ভেতর দিয়ে আসছি।

[চৌকির নীচে থেকে একটা সাপ ধরে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ডাক্তার নেমে চেয়ারে বসলেন। বিশ্বেশ্বরবাবু ফিরে এসে বসলেন।]

ডাঃ। আপনি তো মশাই দিব্যি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে ছিলেন।

বিশ্ব। (ডাঃ চ্যাটার্জির কথা কানে না তুলে) রামরতনবাবু সাপ পুষেছেন—তাহলে কী বলতে হবে ওঁর বাড়ীটা একটা জঙ্গলের মধ্যে, না ওঁর বাড়ীটাই জঙ্গল ?

ডাঃ। (রেগে) আপনি বড় বাজে বকেন।

বিশ্ব। আমি বাজে কথা বলি না আপনি আহাম্মকের মত কথা বলেন।

ডাঃ। আমি আহাম্মক হলে আপনি ভীতু।

বিশ্ব। আপনি গোঁয়ার—

ডাঃ। বোকা—

বিশ্ব। একগুঁয়ে—

ডাঃ। পাজি—

বিশ্ব। ছুঁচো। (রামরতনবাবু ফিরে এলেন)

ডাঃ। শুয়োর।

রাম। হ্যাঁ ভাল কথা, বিশ্বেশ্বরবাবু ঐ dustbin-এর ছবিতে একটি শুয়োরের ছবি কেন ?

বিশ্ব। ওটা বড় গোঁয়ার। ময়লা খেতে এসেছিল dustbin-এ তাড়া দিলেও যাচ্ছিল না কিছুতে।

ডাঃ। ছবি তোলার কিছু না জেনে গাধার মত ছবি তুললে অমনিই হয়।

বিশ্ব। আপনি আমায় গাধা বলছেন ?

ডাঃ। আপনি আমায় শুয়োর বললেন যে।

বিশ্ব। আমি শুয়োর বললাম না আপনি বললেন ?

রাম। আপনাদের এতোখানি আত্মাভিমান কেন ? মানুষ কি পশু নয় ? মানুষ তো উন্নততর পশু, আর পশু মানুষের বন্ধু।

ডাঃ। পরিবেশ সম্বন্ধে তাহলে আপনি কি বলেন রামরতনবাবু ?

[রামরতনবাবু স্থির হয়ে চোখ বুজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দৈবাদেশে যেন বাণী পেয়ে একসঙ্গে বলে গেলেন।]

রাম। যে দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনের সর্বত্র জড়িয়ে রয়েছে পল্লবিত শাখার উদ্ধত বিক্রমে, তা আজ মৃত্যুঞ্জয় অসীমতায় সফল হয়ে উঠুক। পরিবেশের আকর্ষণ আজ সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে জেগে উঠেছে নতুন জীবনের বাণী। এ জিজ্ঞাসার জয় সুনিশ্চিত।

ডাঃ }
বিশ্ব } ঠিক কথা।

ডাঃ। আমরা তা ভাবিনি আগে—

বিশ্ব। আমাদের তর্ক সত্যিই অর্থহীন হয়ে যায় আপনার বাণী শুনে।

[অধ্যাপক প্রবেশ করলেন। বয়স ত্রিশের কাছে। ভিতর থেকেই তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল—'ইধার আও, ইধার আও।' অধ্যাপকের পিছনে ঝাঁকামুটে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে ঢুকলো।]

অধ্যাপক। (মুটেকে) হিঁয়া উতারো। (মুটে ঝাঁকা থেকে এক রিম আন্দাজ কাগজ মাটিতে নামিয়ে রাখল।) (মুটেকে) ই লেও। (মুটেকে একটা টাকা দিলেন—সে চলে গেল।) (রামরতনবাবুকে) এই নিন আপনার উদ্বোধনী ভাষণ।

[রামরতনবাবু খাট থেকে না নেমে নীচু হয়ে কাগজের বাণ্ডিল তুলতে গিয়ে ভার সামলাতে না পেরে খাটেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বর, ডাক্তার ও অধ্যাপক ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। দর্শকদের দৃষ্টি থেকে রামরতনবাবু ঢাকা পড়ে গেলেন।]

বিশ্ব। লাগল ?

ডাঃ। আঃ, সরুন না। লাগলে আমি ত' আছি।

অধ্যাপক। আপনি অত ভারি জিনিষ তুলতে গেলেন কেন ? আমি ত' ছিলাম—আমায় বললেই পারতেন।

[ভিতর থেকে একজন লোক এলো—বিলাতী হোটেলের হেড ওয়েটারের সাজে। সে একবার দেখে গিয়ে ভিতর থেকে কিছু কাপড় ডাক্তারের হাতে দিয়ে চলে গেল।

রামযতনবাবুর চারপাশের লোকেরা কিছু পরে সরে গেলে দেখা গেল রামযতনবাবুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ ও হাত কাপড় দিয়ে গলা থেকে ঝোলান।

ডাক্তার, বিশ্বেশ্বর ও অধ্যাপক যে যার জায়গায় গিয়ে বসলেন—যেন কিছুই হয়নি।]

রাম। ভাষণটা কি ভাবে সুরু করেছেন?

বিশ্ব। আপনি যেন ওটা আবার তোলার চেষ্টা করবেন না।

ডাঃ। অতো কথা না বলে ওটা ওঁর কাছে এগিয়ে দিলেই তো পারেন।

অধ্যাপক। আচ্ছা—আচ্ছা—আমিই পড়ে শোনাচ্ছি। (কাগজের তাড়া থেকে সব ওপরের কাগজখানা বার করলেন)

(কাগজ পড়তে লাগলেন) 'বন্ধুগণ, আজ আমি আপনাদের 'সমাজ ও সেবা' সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে চাই। সমাজ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের সেবার কথা মনে পড়ে। সেবাও আবার বহুপ্রকার। তবে আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আপনারা আমার সঙ্গে স্বীকার করবেন যে সেবার শ্রেষ্ঠ রূপ শুশ্রূষা। যে মানুষ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন—যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ান—তাঁকে আরাম দিতে গেলে সেবারই প্রয়োজন।

'আমরা যখন কিছু সেবন করি, তখনও আমরা বিনয় করে বলি সেবা করার কথা। প্রাচীনপন্থীরা আজও বলেন—'আপনার সেবা হয়েছে?' তাছাড়া সেবা যে আমাদের ধর্ম তা সামান্য 'সেবাধর্ম' কথাটি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন মন্দিরে ও মঠে তাই 'দেবদাসী' প্রথা প্রচলিত ছিল।

'হে ভারত, ভুলিও না মূর্খ ভারতবাসী তোমার ভাই। সমাজ মানে তো শুধু সমার্জিত ব্যক্তির সমষ্টি নয়। সমাজে মূর্খ আছে, দরিদ্র আছে, রুগ্ন আছে—অপগণ্ড আছে। সমাজ তো আমাদের নিয়েই। আমি বা আমরা কে? শাস্ত্র বলেছে—'সোঽহম'—আমি সেই। সুতরাং একমাত্র আত্মসেবার মধ্য দিয়েই আমরা সমাজ-সেবা করতে পারি।' (থামলেন)

বিশ্ব। বহুৎ খুব—বহুৎ খুব! আপনে একদম কামাল কর দিয়া মাষ্টারজী!

ডাঃ। সত্যিই অপূর্ব ভাষণ। প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তি ক'টির পর আর কিছুই বলার প্রয়োজন হয় না।

অধ্যাপক। আমি সেইটেই করেছি। ভাষণের প্রথমেই আমি বক্তব্যের চুম্বক রূপ দিয়ে দিয়েছি। এর পর আর কিছু না বললেও চলে।

রাম। কিন্তু সাধারণ লোকে কি বুঝবে?

অধ্যাপক। (বেশ জোর দিয়ে বললেন) বোঝাতে হবে!

রাম। ভাষণ শেষ করলেন কী ভাবে?

(অধ্যাপক কাগজের তাড়া থেকে শেষ কাগজটি বার করে পড়লেন।)

অধ্যাপক। 'তাই আমাদের রাজপুতানা থেকে উট আনতে হবে বাঙলা দেশে। বাঙলা জল-কাদা প্লাবন-বন্যার দেশ। এখানে উটের মতো উঁচু জন্তু প্রয়োজন অনেক। আর বাঙলার শেয়ালদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে রাজপুতানার মরু অঞ্চলে অরণ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সেখানকার মরু অঞ্চলে শেয়ালের ডাকে মানুষের মন ছায়াবৃত হবে অরণ্যের স্বপ্নে। এ বিষয়ে আমি আর আজ আপনাদের বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। শুধু আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই ভাবে আমরা সমাজ ও সেবা এবং সেবা ও সমাজ ও সেবার উন্নতি সাধন করতে পারি।' (থামলেন।)

[সকলে একসঙ্গে হাততালি দিলেন। নেপথ্যে আগের মতো ট্রেনের ঘণ্টা বাজলো—শেষের দিকে ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ করে এগারবার।]

ডাঃ। অশ্রুতপূর্ব!

বিশ্ব। অচিন্তিতপূর্ব!

রাম। অকল্পিতপূর্ব!

[দরজার কাছে একজন ভদ্রমহিলা এলেন। এঁর সাজ-পোষাক আধুনিক। এঁকে যুবতী বলা যায়। এঁর নাম শ্রীপরিমল পাকড়াশী। এঁর নাম পুরুষের হলেও অভিনেত্রীকে দিয়ে চরিত্রটির অভিনয় করান হবে।]

পরিমল। আসতে পারি?

রাম। বিলক্ষণ। (পরিমল এগিয়ে এসে বসল।)

অধ্যাপক। তুমি আসবে তা আবার অনুমতি নিতে হবে?

ডাঃ। আমরা তো সবাই ঘরের লোক—।

রাম। নিশ্চয়ই, তুমিই তো আমাদের প্রেরণা—

ডাঃ। অনুপ্রেরণা—

অধ্যাপক। পরিকল্পনা—

ডাঃ। উন্মাদনা—

অধ্যাপক। চর্যাপদ—

ডাঃ। হাওয়া অফিস—

অধ্যাপক। সর্বার্থসাধক—

বিশ্ব। শক্তি হ্যায়।

পরিমল। (লজ্জায়) থাক—থাক—আপনারা আমাকে বড়ো লজ্জায় ফেলে দিচ্ছেন। আমি অতি সামান্য—

রাম। তুমি কবি—

পরিমল। না না, কাব্যকুসুমের সামান্য কীট বলতে পারেন।

ডাঃ। এটা অতি-বিনয়।

অধ্যাপক। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।'

বিশ্ব। বাণীদেবীকা প্রতিনিধি!—মাফ কী জিয়ে, আপকা সাদি হো গিয়া?

পরিমল। আমি অব্রতদার—

বিশ্ব। (উত্তর না শুনে) আপ গানা জানতি?

পরিমল। (সলজ্জ) আজ্ঞে না—

বিশ্ব। নাচ?

পরিমল। না। (আরো লজ্জা পেলো)।

রাম। উনি চিরকৌমার্যের ব্রত নিয়েছেন।

বিশ্ব। (অবাক হয়ে) ক্যা!—কুমার!—আপকা নাম?

পরিমল। পরিমল পাকড়াশী।

রাম। (চেঁচিয়ে) সেক্রেটারী—সেক্রেটারী।

[হেড ওয়েটার বেশ সেক্রেটারীর প্রবেশ।]

আমার এই ভাবণটা নিয়ে ফাইল করে রাখ।

[সেক্রেটারী কাগজের বোঝা মাথায় নিয়ে চলে গেল।]

অধ্যাপক। (পরিমলকে) কী হে কবি, নতুন কী কবিতা লিখলে ?

পরিমল। রামরতনবাবুর 'উদ্বোধনী' সভার জন্তে যে উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত লিখতে বলেছিলেন—সেটা এনেছি।

ডাঃ, বিশ্ব, অধ্যাপক } আমরা শুনি।

রাম। বেশ তো পড়ো না—সকলে শুনুক।

পরিমল। (চারিদিক দেখে) অরিন্দমবাবু নেই, থাকলে সুরটাও দিয়ে দিতে পারতেন।

অধ্যাপক। আমরা শুনি—পরে সুর দেওয়া হবেখন।

পরিমল। (ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কাগজ বার করে পড়ল।)

তেরোক্কে তেরো
তেরো দু' গুণে ছাব্বিশ
তিন তেরঙ উনচল্লিশ
চার তেরঙ, বাহান্ন
পাঁচ তেরঙ, পঁয়ষট্টি
ছ' তেরঙ, আটাত্তর
সাত তেরঙ, একানব্বই
আট তেরঙ, একশো চার
ন' তেরঙ, একশো সতেরো
তেরো দশকে একশো ত্রিশ ॥

অধ্যাপক। অপূর্ব !

পরিমল। 'চোদ্দকে চোদ্দ
চোদ্দ দু' গুণে আটাশ
তিন চোদ্দং, বিয়াল্লিশ
চার চোদ্দঙ, ছাপ্পান্ন ॥'

রাম। সত্যিই অদ্ভুত হে—

বিশ্ব। আমি কিন্তু এতে 'ধারাপাত'-এর ছাপ পাচ্ছি।

অধ্যাপক। ধারাপাত কেন—অনাদিকাল থেকে আমরা এই সুর শুনে আসছি। সত্য তো চিরন্তন—তাকে যুগ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না।

বিশ্ব। এতে আধুনিক কবিতাকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

অধ্যাপক। শুধু কবিতা হলে ব্যঙ্গ বলতাম। কিন্তু এ সত্যের বাণী।

ডাঃ। বিশ্বেশ্বরবাবু তো বলেন হিন্দি—পড়েন হিন্দি—উনি বাঙলা সাহিত্যের কী বুঝবেন ?

রাম। বুঝুন না বুঝুন, এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে, এই গানে ও ছন্দে যুগের বাণীই প্রকাশ। এমন মধুর ছন্দে এতো বড় সত্য এর আগে কেউ লিখেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই।

অধ্যাপক। আমরা যা অনুভব করছি যে বাণী আমাদের মন-প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভাষার মাধ্যমে তার প্রকাশ আজ প্রথম হোল। পরিমল তুমি অদ্বিতীয় ! আহা কী ছন্দ, কী সুর (আবৃত্তি করলো)।

'তেরো ক্ক তেরো
তেরো দু' গুণে ছাব্বিশ।'

[অধ্যাপকের সঙ্গে ডাক্তার এবার যোগ দিল।]

অধ্যাপক, ডাঃ } 'তিন তেরঙ, উনচল্লিশ
চার তেরঙ, বাহান্ন
পাঁচ তেরঙ, পঁয়ষট্টি
ছ তেরঙ, আটাত্তর
সাত তেরঙ,—
সাত তেরঙ,'—

[দু'জনে চুপ করে যেতে পরিমল ধরিয়ে দিল।]

পরিমল। 'সাত তেরঙ, একানব্বই'

[রামরতনবাবু যোগ দিলেন।]

অধ্যাপক, ডাঃ, রামরতন } 'আট তেরঙ, একশো চার
ন তেরঙ,—
ন তেরঙ,—'

[পরিমল আবার ধরিয়ে দিল এবং এবার নিজেও যোগ দিল।]

পরিমল। 'ন তেরঙ, একশো সতের।'

[এবার থেকে পরিমল প্রথমে বলতে লাগল এবং আর সকলে তার পুনরাবৃত্তি করলো—পাঠশালার ছেলেদের মত। শুধু বিশ্বেশ্বর যোগ দেয়নি।]

পরিমল
অধ্যাপক
ডাঃ
রামরতন

'ন তেরঙ, একশো সতের
তের দশকে একশো তিরিশ।'

[এবারে বিশ্বেশ্বর যোগ দিল।]

সকলে। 'চোদ্দকে চোদ্দ
চোদ্দ দু' গুণে আটাশ
তিন চোদ্দং, বিয়াল্লিশ
চার চোদ্দং, ছাপ্পান্ন।'

[ভিতরে তালে তালে বাজনা বাজতে লাগল।]

'পাঁচ চোদ্দং, সত্তর
ছ' চোদ্দং, চুরাশি
সাত চোদ্দং, আটানব্বই
আট চোদ্দঙ, একশো বারো
ন' চোদ্দঙ, একশো ছাব্বিশ
চোদ্দ দশকে একশো চল্লিশ॥'

[ভিতরে আগের মত ষ্টেশনে ট্রেন আসার ঘণ্টা বাজল। শেষের দিকে ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ করে বারো বার বাজল।

বিশ্ব। অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব!

ডাঃ। চমৎকার!

অধ্যাপক। তুমি শুধু কবি নও পরিমল—তুমি কাব্যের রজনীগন্ধা, কাব্যের তাজমহল। তোমার কাব্যের মাঝে মানুষের জীবনের বাণী, এই যুগের সুর, বেদনার অশ্রু থেকে স্ফটিকে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে। রামরতনবাবু কী বলেন?

[রামরতনবাবু আবার চোখ বুজে স্থির হয়ে মোহাবিষ্টের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে যেন দৈবাদিষ্ট হয়ে একদমে বাণী উচ্চারণ করলেন।]

রাম। কাব্যের মধ্যে মনের জিজ্ঞাসা পরিসমাপ্তির চেয়ে অবরোধক নেতিবাদ। অন্তর্নিহিত জ্বালার মধ্যে তমসাচ্ছন্ন রজনীর পরিকল্পনার মাঝে উজ্জ্বল হয়ে চতুর্দশ যোজনার সূচনায় অভিনবত্ব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। জটিলতার জাল অতল জলের আহ্বান অন্তরতম প্রদেশের শেষ পরিচয়।

ডাঃ। খুব সত্য।

অধ্যাপক। এ সম্বন্ধে আমাদের কারুর দ্বিমত নেই।

[বিশ্বেশ্বর গালে হাত দিয়ে কি ভাবছে।]

কী বিশ্বেশ্বরবাবু, কী ভাবছেন?

বিশ্বেশ্বর। পেয়েছি—

ডাঃ। কী পেলেন?

বিশ্ব। অনুপ্রেরণা—উন্মাদনা—চর্যাপদ—ঘটোৎকচ।

(উঠে দাঁড়িয়ে) 'পনেরোকে পনেরো
পনেরো দু'গুণে ষাট
তিন পনেরঙ, দু'শো চল্লিশ
চার পনেরঙ, উনিশশো বিশ॥'

অধ্যাপক। বলো—বলো—আরো বল—সকলে বলো।

[এবার প্রথমে বিশ্বেশ্বর বললো ও পরে সকলে বলল। শুধু রামরতনবাবু শ্রোতা।]

বিশ্ব
অধ্যাপক
ডাঃ
পরিমল

'ষোলকে বত্রিশ
ষোল দু'গুণে চৌষট্টি
তিন ষোলঙ, দু'শো ছাপ্পান্ন
চার ষোলঙ, দু'হাজার আটচল্লিশ।'

[সেক্রেটারী ও শিউভজন খাবারের প্লেট নিয়ে এল। সকলের হাতে প্লেটের খাবার দিয়ে নিজেরাও নিল।

রামরতনবাবু খেতে লাগলেন আর সকলে প্লেট হাতে নিয়ে রইল।]

অধ্যাপক। থামলে কেন সব—বলো—বলো—

[রামরতনবাবু খেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আর সকলে বিশ্বেশ্বরের কথার পুনরাবৃত্তি করলো।]

বিশ্ব
অধ্যাপক
ডাঃ
পরিমল
সেক্রেটারী
শিউভজন

হবো ক আটিষ্ট

[সূত্রধর ছুটে এলো। মঞ্চের অন্তরালের লোকদের বললো।]

সূত্রধর। পর্দা ফেলো—পর্দা ফেলো—

[মঞ্চের পর্দা ধীরে ধীরে নামছে।

সূত্রধর ও রামরতনবাবু ছাড়া সকলে আবৃত্তি করছে। রামরতনবাবু খাচ্ছেন। পর্দা পড়তে দেরী হচ্ছে বলে সূত্রধর ব্যস্ত ও বিরক্ত।]

বিশ্ব
অধ্যাপক
ডাঃ
পরিমল
সেক্রেটারী
শিউভজন

'পাঁচ সতেরঙ, এককোটি আটাত্তর লক্ষ
পঁচিশ হাজার সাতশ বিরানব্বই।'

[আবৃত্তি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পর্দা দু'ধার থেকে এসে মিশে গেল।]

---

* মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে ৩০শে নভেম্বর ১৯৬২ সালে অভিনীত।

'পলাতকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

স্মৃতি দত্ত

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কবি, আনন্দের কবি, সৌন্দর্যের কবি। আবার সেই কালজয়ী মহাকবির প্রতিভাতেই রূপায়িত হয়েছে সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না-বেদনাভরা কাহিনী। তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভার আলোচনা না করে, কেবলমাত্র 'পলাতকা' কাব্য পরিক্রমণেই আমরা এই সত্য উপলব্ধি করব। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নগণ্যতা ক্ষুদ্রতার মাঝেও যে কখন কখন এক অপরূপ মধুরের আভাস পাওয়া যায়—যার প্রসাদে সাধারণ মানুষ অসামান্য হয়ে ওঠে, 'পলাতকা' কাব্য সেই পলাতক অনুভূতির প্রকাশ। তাই এই কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যথার্থ রূপ, সেই সাথে মানুষের অসীমের প্রতি অনন্ত জিজ্ঞাসা, যা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে কালে কালে, লোক হতে লোকান্তরে।

এই কাব্যের প্রথম কবিতা 'পলাতকা'। গন্ধবিধুর সমীরণে দোলায়িত মর্মরিত এক পরিপূর্ণতার মাঝে হরিণশিশু আর কুকুরছানা পরিতৃপ্ত, অতর্কিতে ফাগুনের দখিন হাওয়া কী কথা যে কয়ে গেল হরিণশিশুর কানে কেউ তা জানে না, সেই নিজেই তা জানে না। অকারণ আকুলতায় হরিণ হল উতলা। সকল চেনা জানার আগল ভেঙ্গে অজানার ডাকে তরী সে ভাসাল সেই সাগরে, যার কূল মেলে না। পেছনের আনন্দের গান, বেদনাকাতর ব্যাকুল আহ্বান তাকে ধরে রাখতে পারল না, সে ছুটে চলে তারি উদ্দেশে, যেখানে রয়েছে তার আপন থেকে আরো আপনজন। কুকুরের মূক প্রশ্নে প্রকাশ হয়েছে বিশ্বের নিষ্ফল কান্না 'যেতে আমি দিব না তোমায়'। মানুষের হৃদয়েও বাসা বেঁধেছে সেই বিহ্বল হরিণ আর স্তব্ধ মর্মাহত কুকুরছানার অনুভূতি। তাই সে খুঁজে ফেরে সুদূর মধুরকে,- যে কেবল তাকে ব্যাকুল বাঁশরীর সুরে ডেকে বেড়ায়। তাকে পাওয়া গেল না, দেওয়া হল না, এই ব্যথায় প্রাণ হয় উতলা। চেনা চোখের জলের চেয়ে এ বেদনা গভীর, জানা সুখের সাথে তাকে মেলান গেল না।

'মুক্তি' কবিতায় এই গভীর ব্যথাই অপরূপ হয়ে উঠেছে আমাদেরই চেনাঘরের বধূর বুকে। বাংলা দেশের সাধারণ ঘরের বৌ কেবল কাজের যন্ত্র নয়, নয় কেবল প্রয়োজনের উপচার। তারও প্রাণে জাগে মহানের স্পর্শানুভূতি, না পাওয়ার বেদনা। কাজের চাকার নিষ্পেষণে নিয়মের বদ্ধ দোরে ঘা খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় সেই গভীর ব্যাকুলতা। আপন মনে প্রশ্ন জাগে, ঘরের কোণে পাঁচের মুখের লক্ষ্মী সতী শোনাটাই তার জীবনের পরম সার্থকতা কি না। যেদিন কাজের চাকা থামল, ভাঙ্গল কর্তব্যের নিগড়,—সেদিন বেরিয়ে এল এক পরিপূর্ণ নারী গৃহকোণ ছেড়ে বিশ্বলোকে, বাইশ বছর পরে তার হল নবজন্ম লাভ, দীর্ঘ বছরগুলিতে এসেছে বহু পলাতক মুহূর্ত, বসন্তের দিনকে তা করেছে বিহ্বল, হঠাৎ কাজে হয়েছে ভুল; এত কাল পরে মহাকালের বীণা বেজে উঠল তার হৃদয়তন্ত্রীতে। মরণ-দ্বারে এসে সেই সাধারণ-ঘরের বধূ বিশ্বসভায় খুঁজে পেয়েছে তার আত্মপরিচয়।

'আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।'

তার প্রাণের মাঝে যে সুধা আছে, কাছের লোক, ঘরের লোক তার খবর পেল না দাম দিলে না। মৃত্যুর আবির্ভাব তাকে দিয়েছে সেই মান। তাই মৃত্যু তার কাছে এল মধুর হয়ে বধূর বেশে। তাই ত' বাঁশীর সুরে লাগল মিলনের রাগিণী।

'কালো মেয়ে'র কুরূপা নন্দরাণী অনাদরে পীড়িত, করুণ, আকুল নয়নে আকাশের বাণী শোনে কানে। তারই পাশে মেসের ঘরে বসে জীবনযুদ্ধে হারমানা এক যুবক আপন মনে বাজায় রাখালিয়া সুরে বাঁশের বাঁশী, তারও তানে লাগে বিহ্বল উদাস করা সুর। সম্পূর্ণ অপরিচয় ও পরিবেশের ভিন্নতার মাঝেও ঘটে সুরের ঐক্য। মরচে পড়া খোলা জানালা আর বাঁশীর সুর—দুই-ই ব্যর্থতার মাঝে আনে অসীমের বাণী।

এই সুরের ধারাই ছুটি আনে কর্মক্লান্ত মানুষের জীবনে। প্রাত্যহিক দিনযাপনের গ্লানির মধ্যে প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন মুক্তি মেলে শিশুর চঞ্চলতায়, পাগলের ঘরে, ছেঁড়া চিঠির পাতায়। এ কথাই কবি বলেছেন, 'আসল', 'ভোলা', 'ঠাকুরদাদার ছুটি' ও 'ছিন্ন পত্র' কবিতায়।

'আসল' কবিতায় আট বছরের বালক সুদূরের বাণী শুনছিল ভাঙা জঞ্জালে ভরা পোড়ো জমির মধ্যে। ষাট বছর নানা অভিজ্ঞতায় হিসাবী, যুক্তিবাদী, শৈশবের আনন্দ গেছে হারিয়ে, কর্মের জালে ক্লান্ত হয়ে পড়ে মন, আপন অন্তরের আলোর সন্ধান পায় সেইখানে, যেখানে:—

'তারার মত আপন আলো নিয়ে বুকের তলে
যে মানুষটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,

প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মত সীমাহীনের হাতে
সকল সুরে বাজে দিনে রাতে,
যাঁর চরণের স্পর্শে
ধূলায় ধূলায় বসুন্ধরা উঠল কেঁপে হর্ষে,—
আমি যেন দেখতে পেতাম তাঁরে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।'

কবি মহেশ পাগলের ঘরে অনুভব করছেন সেই আসল মানুষটির স্পর্শ। প্রয়োজনের জগতে যে নিজেকে মানাতে পারল না, মান পেল না কাজের লোকের ভীড়ে, সেই এল মহামানবের বাণী নিয়ে। সুর নেই, ছন্দ নেই, নেই কোন বৈভব, তবুও প্রাণের বাণী এসে পৌঁছেচে প্রাণে, তাই রোগা, খোঁড়া কুকুর পেল আপন-পর জ্ঞানহীন পাগলের ঘরে সযত্ন আশ্রয়। জাত না-জানা সুর্মি এল বুকের মাঝে আনন্দের বন্যা নিয়ে।

প্রবীণতার পাকা দেওয়ালে আলো প্রবেশের ফাঁক নেই, কিন্তু বয়েসের এই পর্দা ঘেরা শান্ত ঘরে এক চিরশিশু খেলা করে, 'ভোলা' কবিতায় তারই প্রকাশ। শিশু অবোধ খেলা, অকারণ পুলকে মেতে ওঠে। বিজুর বাবা শৈশবের সেই আনন্দ সুধারস পেয়েছেন বিজুর সান্নিধ্যে, তাই তারই সাথে চলে তাঁর কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি, কাজের মানুষ তাকে বলে বাড়াবাড়ি। একদিন বিজু গেল মৃত্যুর ওপারে, প্রবীণতা হল গাম্ভীর্যে স্তব্ধ। কিন্তু হৃদয়ার শিশু আছে—সেই প্রবীণের মাঝে আনন্দরসাবিষ্ট শিশুকে জাগিয়ে রাখত, ভোলা শুধু ভোলা—এই একমাত্র পরিচয়েই ফিরিয়ে দিল, সেই আনন্দ।

'আমার প্রাণের চিরবালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর,
বয়েসের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।'

'ঠাকুরদাদার ছুটি' কবিতাতেও ঠাকুরদাদা ছুটি পান দামাল শিশুর অত্যাচারের মাঝে। শৈশবের আনন্দ, যুক্তি-তর্কের বেড়া ডিঙিয়ে চলে আপন প্রাণের আবেগে। আকাশের আলো, বনের শ্যামলিমা, শরতের শিউলি, শিশিরের মাঝে জলে-স্থলে যে মধুর অকারণ পুলক নাচে, শিশুর মাঝে সেই আনন্দেরই প্রকাশ। দুরন্ত শিশুর চঞ্চলতায় খুশির হাওয়া লাগে, ঠাকুরদাদার কাজের জালে-বাঁধা জীবনে।

এই মুক্তির অন্বেষণ চলেছে 'ছিন্নপত্র' কবিতাতেও; যৌবনের খোলা হাওয়ার দ্বার রুদ্ধ করে ধনলোভী, মানপ্রত্যাশী মানুষ কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দেয়, ভেতরে ভেতরে জমে ওঠে ক্লান্তি। আপন খেয়ালে টের পায় না, অন্তরে তার লুকিয়ে আছে কী যেন এক কান্না। ফাঁক থেকে গেল, ভরল না সব। কাজের দিনে—নানা কাজে বাজে না হৃদয়ের মাঝে মহাকালের বাণী। ক্লান্তিভরা যাত্রাশেষে হঠাৎ মনে পড়ে 'ছিন্নপত্রের' ভাষা—যা সকল শূন্যতা ভরে হারিয়ে যাওয়া বসন্তকে ফিরিয়ে দেয়, বাস্তবতার দিনে যা অবহেলায় জীর্ণ সেই জিজ্ঞাসাই সকল কথার উপরে জেগে থাকে—'মনু রে কি গেছ ভুলে,' এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হল,—দেওয়া গেল না এ জীবনে—এ ব্যথাই গভীর হয়ে ওঠে।

মানুষের জীবনে কত মানুষের ভীড়; বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ লাগে পরস্পরের, এরই মাঝে একজন বিশেষ মূল্যবান হয়ে ওঠে আরেকজনের কাছে আপন পরিচয়ে, সং ক্ষুদ্রতার মাঝেও তার একার আত্মার আত্মীয়। এই যে আমাগোনা—তার আসাটা যেমন অকারণ—যাওয়াটাও তেমনি অবাঞ্ছিত, তারা চলে যায়, কিন্তু হারিয়ে যায় না, অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বুকদোলায় দোলে, 'চিরদিনের দাগা,' 'শেষ গান,' 'শেষ প্রতিষ্ঠা,'—এই কবিতাগুলির মধ্যে এ কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'চিরদিনের দাগা' কবিতার শৈল অনাদরে বেড়ে উঠেছে। অকারণ বিরাগের কারণ ঘটিয়েছে তার আপন অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে, তার জন্ম আদর জম হয়েছিল প্রতিবেশী দাদার বুকে, তাকেই সে আপন খেলার সাথী করে পেল। ভাগ্য বিড়ম্বিতা যেদিন সুপ্রসন্ন ভাগ্যের আশা পেল—তখনই হল তার মৃত্যু জ্যাঠাজড়ুবিতে। দাদার জন্ত ছিল তার আন্তরিক নিমন্ত্রণ, সে দুষ্টু সর্বনাশী হারিয়ে গেল চিরকালের মত, শুধু রেখে গেল দাদার প্রাণে যাবার আমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণের কবি। সাধারণ মানুষের জীবনে সমাজের অত্যাচার, শাস্ত্রের অশাস্ত্রীয় পীড়ন কত দুঃসহ—কবি তা অনুভব করেছেন, তীব্র কশাঘাত করেছেন সেই অন্যায়কে, 'মায়ের সম্মান,' 'নিষ্কৃতি,' 'ফাঁকি,' 'মুক্তি' কবিতার মধ্যে তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আমাদের সমাজে সহায় সম্বলহীন আশ্রিতা নারী ও তার সন্তানের স্থান যে কোথায়, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 'মায়ের সম্মান' কবিতায়। সেই সঙ্গে উদার প্রতিশোধের দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন কবি, অপূর্বদের মাসী বোনের আশ্রয়ে এসে—

'পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে,
কেউ বা বলে ওঠে, 'আপদ জুটল কোথা থেকে,'
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশী পরিশ্রম'।

কিন্তু তার সন্তান কানাই, বলাই মানে না কোন বাঁধন—জানে না কোন অনুশাসন। দুরন্ত প্রাণ আপন আবেগে বিঘ্ন ঘটায় যুক্তিবাদীর ঘরে। বিনা দোষে অপরাধের বোঝা তাদের বেড়ে চলে, বেড়ে চলে শাস্তির পরিমাণ, ক্রমে অভিজ্ঞতা সাবধান করে দিল তাদের, স্তব্ধ হল তারা, শান্ত হল। শেষে একদিন মিথ্যা চুরির অপরাধে অপমান মাথায় বয়ে মা ছেলে বেরিয়ে এল আশ্রয় ছেড়ে। ভাগ্যের চাকা ঘুরল। কানাই, বলাই মান পেল সমাজ সংসারে। অপূর্ব এবার ধরা পড়ে চুরির দায়ে, কিন্তু পরিত্রাণের উপায় খোঁজে বিতাড়িত ভাইদেরই কাছে। যে অসম্মানের আগুন থেকে বাঁচাতে পারেনি মায়ের সম্মান, তা জলে উঠল নূতন করে। মা এসে অপূর্বদের ক্ষমা করলেন, ছেলেদের রোধ করলেন প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে।

'নিষ্কৃতি' কবিতায় পরিস্ফুট আমাদের সমাজের অন্যায় বিধান—যা প্রাণের দাম দেয় না, চলে কেবল শাসনের চাকায় পীড়নের চাপে। মঞ্জুলিকা সংপাত্রস্থ হল বিধিমতে প্রাণের ইচ্ছাকে বলি দিয়ে। দু'দিন পরে বিধবা হয়ে সে ফিরে এল, অসহনীয় দুঃখের দহনে মা গেলেন মারা, কন্যার চলে অক্লান্ত পিতৃসেবা, প্রাণে জাগে যৌবনের আকুলতা। এদিকে শাস্ত্রমতে বাবা চলেছেন বিয়ে করতে। শাস্ত্রের বিধান কেবল দুর্বলের পীড়নে। আত্মনিগ্রহের চরম সীমায় পৌঁছে মঞ্জুলিকারও কাটল সকল বাঁধন। বাবার বিয়েই যেন তাকে এগিয়ে দিল পুলিনের সাথে পালিয়ে যেতে।

সস্নেহ সহানুভূতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এক রুগ্না বধূকে, সে ভয়ে উঠেছে নতুন করে চলার আনন্দ, ভরা মনে সবার অভাবকে ভরাট করে দিতে চায় তার মন।—

'সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারি ভার বইবে কেমন করে।
সংসারে ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে—
ভরতে হবে বিশ্বের কল্যাণে।'

ষ্টেশনে অল্পসময়ের দেখা রুক্মিণীর অভাবটুকু দূর করবার জন্যে তার প্রচুর আগ্রহ, বিনুর স্বামী বুদ্ধিমান, তিনি রুক্মিণীকে ডেকে তাড়িয়ে দিলেন চুপিচুপি দুই টাকা দিয়ে, বিনু টের পেল না। অসীম বিশ্বাসে ভরামনের আনন্দে সে চলে গেল দৃষ্টিলোক থেকে, শুধু থেকে গেল স্বামীর স্মৃতিলোকে ফাঁকি দেবার বেদনা।

'মালা' কবিতায় দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের সেই বিশ্বাসের কথা, যা জানায়—মহৎকে পাবার জন্য ধন নয়, মান নয়, কোন ক্লেশের অবকাশও নেই, যারা গুণী, যারা মানী, তারা বিজয় করে নিল, কিন্তু ফাঁক থেকে গেল, প্রাণ ভরে না তাতে। বরণমালা তারই প্রাপ্য—

'আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে,
* * *
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে,
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে,
হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা।'

একান্ত করে পাওয়া ভরে ওঠে উজাড় করে দেবার আনন্দে।

'হারিয়ে যাওয়া' কবিতাটি ভাবে ছন্দে অত্যন্ত সরস। ছোট্ট বামীর অসহায় অজ্ঞতার মাঝে কবি দেখেছেন বিশ্বের ভয় বিহ্বলতা। হাতের দীপ নিভে যাওয়াতে বামী অসহায় হয়ে কেঁদে উঠেছে, 'হারিয়ে গেছি আমি,' এ বিরাট বিশ্ব দম্ভ-দৃঢ়তায় মুখর কিন্তু তার মাঝেও আছে শিশুর অসহায় অজ্ঞতা। বিশ্বের আলো চন্দ্র, সূর্য, তারা যদি হঠাৎ নিভে যায়—সেদিন এই বিরাটও বুঝি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আকুল হয়ে কেঁদে উঠবে—'হারিয়ে গেছি আমি।' ছোট্ট মেয়ের কান্নার মধ্য দিয়ে কবি বিশ্বের অন্তরে প্রবেশ করেছেন, 'সেখানে বেদনায় বিধুর, অজ্ঞতায় সরল, আশঙ্কায় চঞ্চল অথচ সহজ বিশ্বাসে সুস্থির যে সত্তা বিরাজ করছে, তাকে প্রকাশ করেছেন।'

পলাতকা কাব্য আলোচনায় দেখতে পেলাম, রবীন্দ্রনাথ ভাষা দিয়েছেন তাদের, যাদের জীবনের চাকা ঘোরে রাঁধার পরে খাওয়া, আর খাওয়ার পরে রাঁধার একঘেয়েমিতে, বিদ্রূপ করেছেন শাস্ত্র আওড়ান স্বার্থসর্বস্ব হৃদয়হীন প্রৌঢ়কে, অনুভব করেছেন সদা কর্মব্যস্ত মানুষের ক্লান্তিকে। দেখেছেন শৈশবের চাপল্যে তাদের মুক্তির পথ। ব্যর্থ নগণ্য জীবনের মাঝে শুনেছেন সুন্দরের পদধ্বনি, তাই রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানীর কবি, গুণীর কবি, কবি সাধারণ মানুষেরও।

ভারতভূমি

বাসন্তী গোস্বামী

পুণ্য মাতৃভূমি, ধন্য ভারতভূমি
নতশিরে আজ শ্রদ্ধা ভরে তাই ত তোমায় নমি
ধন্য আমার মানব জনম এই দেশেতে
জন্ম আমার মহা গৌরবের
জীবন আমার পরম সুখের
মৃত্যু আমার মহাশান্তির
তোমার উদার বক্ষে,
আমাদের তরে প্রত্যহ ঝরে তোমার আশীর্বাদ
থাকো সচেষ্ট নিত্য তুমি যে পুরাতে মোদের সাধ
পুণ্য আমার দেশ
নাহিক হেথায় বিবাদ, ঈর্ষা,—
নাহিক হেথায় দ্বেষ
নাহিক হেথায় জটিলতা কোন
কুটিলতা হেথা নাই
সবাই আমরা একতাবদ্ধ
সবাই আমরা ভাই,
নাহিক তোমার অতুলসজ্জা নাহি ঐশ্বর্যরূপ
স্নিগ্ধ, সৌম্য, শ্যামল রূপেতে তুমি যে অপরূপ
তব মহীয়ান সন্তানেরা আছে চারিদিক ঘিরে
তারাই তোমার মহা ঐশ্বর্য,
ধন্য তাদের মাঝারে
সব দুঃখ মোরা জয় করে লই তোমার আশীষেতে
জীবন মোদের পরম সুখের তোমার স্নেহেতে।

একটি ফুটকির জন্যে

শ্রীমতী স্মৃতি ঠাকুর

কালীঘাটের একটা সরু গলির মধ্যে, আধো অন্ধকার এক বাড়ীর রাস্তার দিকের জানলার ধারে বসে সকালবেলা বিমল খবরের কাগজের চাকরীর বিজ্ঞাপনগুলোর উপর চোখ বোলাচ্ছিল, এমন সময় পিয়ন এসে একটা রেজিষ্ট্রী চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটা খুলে ও তাজ্জব বনে যায়। মনে করতে চেষ্টা করে সকাল বেলা কার মুখ দেখে উঠেছিল? মনে পড়লো চোখ খুলেই দেয়ালের উপর একটা টিকটিকি দেখেছে। টিকটিকিটা ছাড়া আর কেউই ঘরে ছিল না, তবে কি টিকটিকির মুখ খুব লাকি? ও নিজের মনে ভাবতে ভাবতে চিঠিটা হাতে রান্নাঘরে ছুটে যায় সুখবরটা মাকে দিতে, 'ও মা, মা শোনো, এই ত্যাখো কত টাকা পেয়ে গেছি!'

মায়ের কথাটা বিশ্বাস হয় না। বলেন, 'সকাল থেকে ঠাট্টা করিস না যা কাজ করতে দে।'

'আরে এই ত্যাখো, যমুনা পিসীমার অ্যাটর্নী ভবতোষবাবু চিঠি দিয়েছেন, গত বুধবার দিন যমুনা পিসীমা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। ওঁর তো নিজের বলতে কেউ নেই তাই মারা

বাবার কিছুদিন আগে ওঁর বহু যত্নে সঞ্চিত প্রায় ৫০৮'১৩ টাকা আমাকেই উইল করে দিয়ে গেছেন। ভবতোষবাবু তাই আমাকে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন। তবে এখন কিছুদিনের জন্যে ভবতোষবাবুকে কলকাতার বাইরে একটা বিশেষ জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে, তাই উনি ফিরে এলে তবে দেখা করতে লিখেছেন। চিঠিটা তুমি সাবধানে তুলে রেখে দাও। আমি একটু ঘুরে আসছি।'

বিমল সার্টটা গায়ে চড়িয়ে, মাথায় দু'বার চিরুণী চালিয়ে নিয়ে, কোন রকমে চটি জুতোয় আধখানা পা গলিয়ে তাড়াতাড়ি কোরে বেরিয়ে পড়লো। খবরটা বন্ধুমহলে প্রচার না করা পর্যন্ত ও স্বস্তি পাচ্ছে না মোটে। প্রথমেই যাবে সহপাঠিনী নন্দিতাদের বাড়ী। ওর যে কোন খবর আগে নন্দিতাকে দেওয়া চাই। ক্লাসফ্রেণ্ডদের মধ্যে নন্দিতার সঙ্গে ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা। একদিন মেঘ-মেদুর বরষার দিনে ওরা দুজনে ক্লাস পালিয়ে গিয়ে ঢুকছিল এক কফি-হাউসের কোণে। সেদিন এরা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা কোরেছিল, যতদিন না বিমল নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, দুজনেই দুজনের জন্যে প্রতীক্ষা কোরে থাকবে; আর পরস্পর পরস্পরের কাছে কোন কথাই গোপন করবে না। সেই থেকে ওরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা রেখে চলে।

নন্দিতা বড়লোকের মেয়ে। দেখতেও এক কথায় বলা যায় সুন্দরী। এম, এ অবধি পড়েছে। আর গান, বাজনা, অভিনয়, বোনা, সেলাই, সৌখীন রান্না এসব বেশ ভালই পারে, উপরন্তু নিজেদের মোটরখানা ড্রাইভ কোরে প্রায়ই ওকে ঘুরতে দেখা যায়। তাই গুণমুগ্ধের সংখ্যার অভাব নেই, কিন্তু বিমলের থেকে অনেক ভাল ভাল ছেলেকে ও আমল দেয় না। এর জন্য সকলেই আশ্চর্য হয় কি পেয়েছে ও বিমলের মধ্যে যে এতো ভাল ভাল ছেলে থাকা সত্বেও ও বিমলের জন্যই বসে আছে।

বিমল ও নন্দিতা এক সঙ্গেই এম, এ পাস করেছে। এখন বিমল একটা চাকরীর চেষ্টা করছে। কিন্তু আজকালকার দিনে চাকরী পাওয়া বিশেষ শক্ত ব্যাপার। বিমলের দুশ্চিন্তায় আজকাল ভাল ঘুম হয় না। সারাদিন অফিসে অফিসে চাকরীর জন্য ঘুরে হন্যে হয়ে যায়। অধিকাংশ জায়গায় বাইরে থেকেই বিদায় দেয় দারোয়ান, বলে দেয় সাব এখন জরুরী মিটিং করছেন দেখা হবে না, নয় তো সাব এখন নেই।

খবরের কাগজ দেখে দেখেও অনেক এ্যাপ্লিকেশন পাঠায়, তাদের মধ্যে দু' এক জায়গায় ওকে ইণ্টারভিউ দিতে ডেকেও ছিল, কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে ওর মত বেকার ভদ্রসন্তানের সংখ্যা বড় অল্প নয়। তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে যে কয়েকজনকে পরীক্ষা করা হোলো তার মধ্যে বিমলের নামটাও পড়ে যায় বটে, তবে নানান প্রশ্নে নাজেহাল করলেও শেষ পর্যন্ত চাকরী আর কেউ দেয়নি। সম্ভবত আজকালকার প্রথা অনুযায়ী নিজেদের লোক ভিতরে ভিতরে আগেই ঠিক করা ছিল। দু' এক জায়গায় তো প্রায় অপমান করেই ওকে ফিরিয়েছে। তবু চাকরীর চেষ্টা না করে উপায় নেই এমন পয়সা নেই যে কোন রকম ছোট খাট বিজনেস করতে পারে। বিমলের বাবা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের যে টাকা ক'টা রেখে গিয়েছিলেন তা ওর লেখাপড়া শিখতে এবং মায়ে ছেলে কোনরকমে দিনযাপন করতেই প্রায় খরচ হয়ে গেছে যা আছে তাতে যতদিন না একটা চাকরী পাচ্ছে বিমল, ততদিন চালিয়ে নিতে হবে সংসারটা। তা ছাড়া যতদিন না ও একটা কোন ব্যবস্থা করতে পারে রোজগারের নন্দিতা অপেক্ষা করে থাকবে ওর জন্যে।

বিমলের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিতা বলে, 'মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন, আজ কোন সুখবর নিয়ে এসেছ? সেদিন যেখানে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলে তারা বুঝি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়েছে?'

'উঁহু হোল না আন্দাজ কর দেখি, আর কি হতে পারে?'

'তবে তোমার সেই দূর সম্পর্কের কাকা না কে আছেন বলেছিলে? যিনি বামারলরীতে বড় পোষ্টে কাজ করেন, ইচ্ছে করলে তোমাকে ওখানে একটা কাজ করে দিতে পারেন, তিনি বুঝি কিছু কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?'

'ও না। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, কাকা বলে ডাকি। আমাকে তো তিনি একদম আমলই দিলেন না। বললেন এখানে কাজ পাওয়া তো শক্ত ব্যাপার, তুমি বরঞ্চ অন্য কোথাও চেষ্টা কর।'

বিমল ভুরু নাচিয়ে বললে, 'এ এমন একটি অভাবনীয় ব্যাপার যা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।'

নন্দিতা ঠাট্টা করে বলে, 'তাহলে তুমি বোধ হয় আর কাকেও বিয়ে করতে যাচ্ছ। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পেয়েছ মনে হচ্ছে।'

'এইবার অনেকটা কাছাকাছি এসেছ। অর্ধেক না হোক সিকি ভাগ রাজত্ব পেয়েছি বলতে পারো। আর রাজকন্যা? সে তো আমার জন্যে মালা নিয়ে বসেই আছে। রাজত্ব পেলেই তাকে ঘরে তুলি।'

'তাই বুঝি? রাজকন্যাকে বিয়ে করলে তবে রাজারা জামাইকে রাজত্ব দেন। তা তোমাকে বিনা রাজকন্যায় রাজত্ব দিল কে?'

'আমার এক পিসিমা ছিলেন তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন। তাঁর কেউই ছিল না তাই তাঁর জমানো পঞ্চাশ হাজারের উপর টাকা তিনি আমাকেই দিয়ে গেছেন।'

'সত্যি! চল তবে মা বাবার কাছে সুসংবাদটা দিয়ে আসি।'

'আর সেই সঙ্গে শুভ আশীর্বাদটাও চেয়ে নেব আমরা কি বল?'

নন্দিতার মুখটা লজ্জায় একটু রক্তিম হয়ে উঠলো।

টাকা পাবার কথাটা আত্মীয়-বন্ধু মহলে প্রচার হতে, হৈ হৈ পড়ে গেল। বাড়ীতে লোকজনের আসা-যাওয়া বেড়ে গেল। সকলেই ওদের বেশ খাতির করে চলতে লাগলো। ওদের যে এতো হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আছে তা এই প্রথম ওরা জানতে পারলো।

বিমলের পিতৃবন্ধুর কানেও ওর টাকা পাবার কথাটা কেমন কোরে কে জানে পৌঁছে গেল। সপ্তাহখানেকের মধ্যে বিমলের কাছে ওঁর এক চিঠি এসে হাজির। টাকা পাওয়ার জন্য কংগ্র্যাচুলেশন জানিয়ে আর ভাল পোষ্টে ওকে একটা চাকরী করে দিতে পারবেন এমন সম্ভাবনা জানিয়ে ওকে শীঘ্রই দেখা করতে লিখেছেন। 'কোন দিন

যে ওকে অবজ্ঞা দেখিয়ে বিদায় করেছিলেন তা বোঝবার যো নেই চিঠি দেখে।

বিমল একবার ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু আবার ভাবলে অযথা সেন্টিমেণ্ট নিয়ে কোন কাজ হয় না গিয়েই দেখি একবার কি ব্যাপার। যেতে সত্যিই একটা চাকরী পেয়ে গেল। শুধু তাই নয় বাড়ীতে নেমন্তন্ন কোরে প্রায়ই ওকে খাওয়াতে লাগলেন ওঁরা। উদ্দেশ্য অবশ্যই ওঁর একটা আছে। ওঁর একমাত্র ভাগ্নীটির জন্যে একটি সুযোগ্য পাত্র খুঁজছিলেন। বিমলের অবস্থা ফিরে যাওয়ায় এখন ওকে ওদের সমান 'পজিসনে'র এবং ওঁর ভাগ্নীকে বিয়ে করবার উপযুক্ত বলে ওঁর মনে হচ্ছে। তাই ভাগ্নী রুমার সঙ্গে ওর আলাপও করিয়ে দিয়েছেন। একথা অবশ্য এখনও কারুর কাছে প্রকাশ করেননি। ওঁর ধারণা কিছুদিন মেলামেশা করলে বিমল নিজেই একদিন রুমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে। কিন্তু ওঁর প্ল্যানটা যে একদম কাজে লাগলো না, সেটা টের পেলেন যখন বিমল নন্দিতার সঙ্গে ওর বিয়ের নেমন্তন্নটা করতে এলো এবং ওঁদের বাড়ীর সকলকেই বিয়েতে যাবার জন্যে বার বার করে অনুরোধ করে গেল।

মেজাজটা খুব বিগড়ে গেলেও সামলে নিলেন। কি আর করা যাবে। বিমল রুমাকে বিয়ে করবে কিনা আগে থাকতে না জেনে, উনি নিজের মনে সব প্ল্যান করছেন সে দোষ তো আর ওর নয়। যাক গে যা হয়ে গেছে—।

তারপর একদিন সব আমোদ উৎসব চুকে গেলে বিমল এ্যাটর্নী বাড়ী গিয়ে যখন টাকাটা পেল দেখে চিঠিতে লেখা টাকার অঙ্কগুলো ও ঠিকই পড়েছিল, তবে উত্তেজনার জন্যে তার মাঝের দশমিক বিন্দুটাকে ও একদম খেয়াল না করে ৫০৮·৯৩ পাঁচশো আট টাকা তিরানব্বই নয়া পয়সাকে ও ভেবেছে পঞ্চাশ হাজার আটশো তিরানব্বই টাকা। তাই মনে খুব স্ফূর্তি ছিল এখন ভবতোষবাবু সেটা দেখিয়ে দিতে চোখে পড়লো।

প্রথমে মনটা একটু দমে গেলেও বিমল ভেবে দেখলে এখন যদি বিমল টাকাটা নাও পেতো তাহলেও কিছু এসে যেতো না, কেন-না যা পাবার তা একটা ফুটকি না দেখার জন্যই ও পেয়ে গেছে। ও পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে গেছে দেখে সকলেই ওকে খাতির করতে আরম্ভ করেছে। ওই জন্যে একটা ভাল চাকরী পেয়ে গেছে। নন্দিতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে এবং এখন ওরা ভাল ফ্ল্যাটে থাকে। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। আর মা-ও এতদিন অনেক কষ্ট করে ওকে মানুষ করেছেন, এখন তিনি খুব সুখী হয়েছেন।

সবই ওই একটি ফুটকির জন্যে।

চার

শিক্ষানবিশীর প্রথম বছরে বাহ্যিক ত্রুটিহীনতার দিকে সর্বাধিক লক্ষ্য আর রইল না, লড়াইটা আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। অহংকার আর আত্ম-ইচ্ছার বিরুদ্ধে একক সংগ্রামের রূপ নিয়েছে এবার। সন্ন্যাসিনীর পোশাক পরেছে যেদিন থেকে, গ্যাব্রিয়েল নামটা আর শোনেনি। সেদিন থেকে সে সিস্টার লুক, এখনও কিন্তু নিজের সংগে তাকে একাত্ম করে নিতে পারেনি। অনেক সময় মনে হয় যেন অপরিচিত কারো সংগে কথা কাটাকাটি করছে, যে সব অবাধ্য স্বভাবগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদ তার, সেগুলো যেন তার নয়, আর কারো। ওরই মধ্যে বিবেকটা চেনা কেবল। তার নতুন কার্যকলাপগুলো সে নিরীক্ষণ করে দেখে, সিস্টার লুক বলে একজনের অতি-পরিশ্রমে অর্জিত উন্নতির রেকর্ড রাখে চলচ্চিত্রের ক্যামেরার মত। না আছে দয়া মায়া, না আছে কোন পক্ষপাতিত্ব।

এই গঠনমূলক বছরটায় কোন শিক্ষানবীশ মাদার হাউসের বাইরে যাবে না এই নিয়ম। ধর্মজীবনের লালনক্ষেত্র এই হাউস, আর চাপ দিয়ে, রাশ টেনে, উৎসাহ যুগিয়ে ছাঁচ গড়ে তোলে কমিউনিটি। দ্বিধাগ্রস্ত শ্বেত-শুভ্র মূর্তিগুলো ধীরে ধীরে শক্তিময়ী হয়ে ওঠে।

পস্‌চুল্যান্ট থাকাকালীন কমিউনিটির গঠনটা বুঝতে পারত না ঠিক। সিঁড়ির একটা ধাপ পেরিয়েছে, এখন সিস্টারদের শ্রেণী-বিভাগীয় গঠনটা অনেকখানি স্পষ্ট। নতুন একদল পস্‌চুল্যান্ট এসেছে, তারা এখন তার নীচে—তাদের চেয়ে কথা বলার অগ্রাধিকার আছে তার। আর ঠিক তার ওপরে নবব্রতারা, বছরের শেষে ওরা আবার তাদের পর্যায়ে উঠবে। সুপিরিয়র আর মিসট্রেসদের মত চিরব্রতা যাঁরা, তাঁরা সর্বোচ্চ স্তরের, তাঁদের মধ্যে কোন ত্রুটি, কোন অপূর্ণতা নেই। বৃদ্ধ আর অনাথ শিশুদের হাসপাতাল, স্কুল আর হোমগুলো তত্ত্বাবধান করেন তাঁরা। ডিউটির বাইরে নিজেদের মধ্যে আর সুপিরিয়রদের সংগে ছাড়া আর কারো সংগে কথা বলার নিয়ম নেই তাঁদের। সবার ওপর রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের প্রশান্ত মূর্তিটি মধ্যমণির মত প্রতিষ্ঠিত, মহাকাশের কেন্দ্রে সূর্য যেমন। অব্যবহিত উর্ধ্বতন মিসট্রেসের অনুমতি না নিয়েও যে কোন সিস্টার তাঁর সংগে কথা বলতে পারে।

অর্থাৎ কমিউনিটির মধ্যে সবার সঙ্গে সবার অবাধে কথা বলার অধিকার নেই। কিন্তু যদিও এজন্য সিস্টাররা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তবুও এই কমিউনিটির মধ্যেই আছে সবাই, সব সময় এরই অংশ হয়ে আছে। এরই সংগে বাঁধা তাদের ঘুম, তাদের কাজ, তাদের খাওয়া, তাদের উপাসনা। এ থেকে পালানো চলে না। কমিউনিটির সংগে যীশুর উপস্থিতি অংগাংগি ভাবে জড়িত। যীশুর চরণে সেবিকা হতে যারা এসেছে গুরুতর কোন কারণে সুপিরিয়রের অনুমোদন ছাড়া কমিউনিটির জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না তারা। কারো ইচ্ছা হতে পারে এক কোণে গিয়ে বসে একা একা পড়ি বা ধ্যান করি, তা কিন্তু হবার নয়। সব চেয়ে কঠিন শিক্ষার পাঠ হ'ল এটাই—সব বয়সের, সব শ্রেণীর মেয়েদের সংগে মিলে-মিশে থাকার শিক্ষা। এদের মধ্যেই থাকতে হবে তাকে সদা-সর্বদা···চারপাশে আর কেউ কোথাও নেই, সে একা বসে ভাবছে কিছু—এমন কোনদিনও ঘটবে না! এই অনুভূতিটাই সিস্টার লুকের কাছে সব চেয়ে বেশী বেদনাদায়ক। নিজের মনোনীত এই প্রকৃতি-বিরোধী জীবনের আর সব দিকের থেকেই। তার মতে সাপ্তাহিক অগ্নি-পরীক্ষা ঐ কুল্‌পাও এত কষ্ট দিতে পারে না।

কুল্‌পার অর্থ সব সিস্টারদের সামনে নিজের অসাফল্যগুলো জানানো। ইচ্ছাকৃত দোষের চেয়ে অবহেলায়, ভুলবশত কিংবা অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য যে সব দোষ-ত্রুটি ঘটে যায়, সেগুলোই প্রধান এখানে। নিজের যত কিছু দোষ-ত্রুটির কথা মনে পড়ল বলা হয়ে গেলে সিস্টারদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, যে দোষ-ত্রুটিগুলোর কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে সেগুলো দোষীর হয়ে উল্লেখ করা তাঁদের

কর্তব্য। এ দায় পরহিতের দায়, দোষী সিস্টারটি নিজের দোষ শুধরে নিয়ে পূর্ণতা অর্জন করতে পারেন যাতে। মিসট্রেস ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কুল্‌পার উদ্দেশ্যই হ'ল পরহিতৈষণা, তিতিক্ষা ও নম্রতার শিক্ষাদান।

সিস্টার লুকের মতে কিন্তু এ একটা ব্যক্তিগত অগ্নিপরীক্ষা।

রবিবারে আর ফিস্টডেগুলোয় ছাড়া আর সব দিন চ্যাপ্টার হলে কুল্‌পার অনুষ্ঠান হয়—শাস্ত্রীয় পাঠের জন্ত অধিকাংশ সিস্টারই সেখানে সমবেত হ'ন যখন সেই সময়। কুল্‌পার জন্ত প্রত্যেক নানের নির্দিষ্ট দিন ও সময় আছে, প্রতিদিনের সভায় জনা দশ-বারো সিস্টারের কুল্‌পা শোনা যায়। যে বারো জনের পালা থাকে, সাষ্টাংগে প্রণতা হয় তারা, হাউসের সুপিরিয়র যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর হাতুড়িটা ছ'বার ঠোকেন ততক্ষণ ওঠে না। তারপর দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা যে সে উঠে বসে এক হাঁটুর ওপর ভর রেখে, যন্ত্রণাদায়ক বলাটা শুরু করতে হয়, মাই মাদার, আমার কুল্‌পা বলছি আমি···

সিস্টার ডেমিন্‌সাস অপরাধ স্বীকার করছে নিজের—দশবার অপ্রয়োজনে কথা বলেছে সে, রোগীর বাক্স থেকে একটা চকোলেট খেয়েছে, রিক্রিয়েশন-রুমের জানলা খুলে দিয়েছে আর কেউ আরও বাতাস চায় কিনা জিজ্ঞাসা না করেই!

সিস্টার জেন ডি ক্রাইস্ট অপরাধী করছে নিজেকে—দারিদ্র্য-সাধনার ব্রত ভেঙেছে সে··খাবার ঘরে ছ'বার দুধ চল্‌কে পড়েছে হাত থেকে, উপাসনায় যাওয়ার বিলম্ব বোধ করতে অতিরিক্ত জোরে হেঁটেছে, দরজা বন্ধ করতে গিয়ে শব্দ করে ফেলা সত্ত্বেও মাটি চুম্বন করে তিনটি গ্লোরিয়া বলতে ভুল হয়ে গেছে তার।···

নিজের পালা না আসা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাকেই নেহাৎ তুচ্ছ মনে হয়, বিবেক দংশনটা নেহাৎ গাজুরি, যেন নিতান্তই অর্থহীন। তারপর নিজের পালা যখন আসে, অবমাননার দায়ে চৈতন্ত হয় অহংকার কতটা জীবন্ত এখনও, প্রকৃত বিনয় শেখার এখনও কত বাকি!

অথচ এই সাপ্তাহিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই বিনয় শেখানো, আঘাতে উত্তাপে গড়ে তোলা।

প্রথম প্রথম কুল্‌পার দৃশ্যে ফরাসী বিদ্রোহের সময়কার গিলোটিনের দিনগুলোকে মনে পড়ে যেত। দর্শক নানরা পশমের বোনার বদলে শাস্ত্রীয় পাঠের গ্রন্থ নিয়ে বসেন, মনে হবে সব সময়ই পাঠে তন্ময়। কিন্তু সামনে ঐ কুল্‌পার দৃশ্য চেনা বড়···একদিন যা নিজেদেরই কণ্ঠে কুল্‌পার স্বীকারোক্তি ছিল, আজ তারই বিবেচনা করতে বসেছেন! সেই একই বিবরণ, সেই একই ভাষা···স্মৃতিতে ধাক্কা লেগে মৃদু আলোড়ন ওঠে!

দোষ স্বীকার করা হয়ে গেলে যাঁরা আরও কিছু দোষ দেখেছেন বা শুনেছেন তাঁরা উঠে দাঁড়াবেন—একজন, দু'জন, তিন জন—কিন্তু তার বেশী নয়। নিয়ম-কানুন কুল্‌পারও আছে। একজন নানকে কোন অধিবেশনে তিনবার মাত্র তাঁর সিস্টাররা অভিযুক্ত করতে পারেন, কিন্তু ধর্মজীবনে যে সিস্টার তাঁর চেয়ে ছোট তার কোন অধিকার নেই কোন বিস্মৃত অপরাধের উল্লেখ করবার।

কয়েক মাস পরে অবমাননার দাহটা জয় করতে না পারলেও কুল্‌পার ভয়াবহতা অনেকটা সয়ে এল যখন, সিস্টার লুক খেয়াল করল কোন সিস্টারকে এভাবে অভিযুক্ত করার জন্ত বেশ কিছুটা সাহসের দরকার। যীশু যে সীমায় এসে থেমেছিলেন সে সীমারেখাও অতিক্রম করে যেতে হয়। দোষ-ত্রুটি যা চোখে পড়েছে অন্তের, পরহিতের দায়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয় তারা, অথচ তিনি শুধু বলেছিলেন একজন বিশ্বাসঘাতকতা করবে: দ্বাদশ জনের একজন; আমার সংগে এক ডিসে সে হাত ডুবিয়েছে। আর কিছু বলেন নি, নাম পর্যন্ত না—অথচ তাঁর অজানা তো কিছুই ছিল না।

কুল্‌পার মাধ্যমে কমিউনিটির গঠনটা বোঝা যায় কিন্তু। কোন কোন সিস্টার একই বাহ্যিক আচারগত ত্রুটি স্বীকার করেন বার-বার। দেখে দেখে সিস্টার লুক অনুধাবন করতে শুরু করেছে মঠ-জীবনের কোথায় আছে মাংসপেশীগুলো, অন্তরটা, অনুভূতিগুলো।··· অতিরিক্ত জোরে হাঁটার অপরাধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের অপরাধিনী করেন যে সব নানরা, পূর্ব-জীবনে তাঁরা খেলাধূলোর উৎসাহী ছিলেন।···চিন্তাপ্রিয় নানরা আপন ভাবনার মেঘে হারিয়ে ফেলেন নিজেদের, প্রায়শ খাবার ঘরে নানা ভুল-চুকের স্বীকৃতি জানান তাঁরাই—টেবিলে অন্তদের দিকে জিনিস সরিয়ে দিতে ভুল হয়ে গেছে···অন্যমনস্ক হয়ে কফি-মগে দুধ ঢালতে গিয়ে চল্‌কে পড়েছে!···কয়ার নান আছেন একজন—সেন্ট সিসিলিয়ার মত দেগান্ত—নিয়মিত নিজেকে অভিযুক্ত করেন তিনি, শিক্ষয়িত্রীদের মিটিংয়ের সময় পাখীর গান অন্তমনা করে দেয় তাঁকে···রাত্রে গেছো-ব্যাঙগুলো ডাকে যখন, গ্রাণ্ড সাইলেন্স ভেঙে হঠাৎ অন্তমনে ফিস-ফিস করে ওঠেন তিনি, শোন, শোন!

অতিমাত্রায় ভাবালু সিস্টারদের মধ্যে সাহস যাদের সবচেয়ে বেশী তারাই পারে এক সংগে উঠে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে পরস্পরের সান্নিধ্য পাবার জন্ত নিজেদের পথ থেকে সরে গেছে তারা, কিংবা রিক্রিয়েশনে এমন ভাবে কথা বলেছে নিজেদের মধ্যে অন্তরা বাদ পড়েছে যাতে। যতই বেদনাদায়ক হোক, পরস্পরের প্রতি এই বর্ধমান আসক্তির কথা স্বীকার করলে এই ব্যক্তিগত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্ত যথেষ্ট সাহায্য পায় তারা, শুধুমাত্র নিজেদের চেষ্টায় এতটা সুফল ফলত না।

···এখন থেকে সমস্ত মঠ লক্ষ্য রাখবে তারা যেন পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে বহু দূরে থাকে!

মঠের বাগানের দস্তুরমাফিক জ্যামিতিক নক্সায় সাজানো ফুলের কেয়ারির মধ্যে যখন-তখন একটা বুনো ফুল মাথা তোলে যেমন, মঠ-জীবনের বাধা-নিষেধের মধ্যেও তেমনই এমন এক-একটা স্বতঃস্ফূর্ত আসক্তি প্রায়ই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে··সমূলে তাকে বিনষ্ট করে ফেলতে সারা মঠের সাহায্য চাই।

নিজের কুল্‌পার পরে নতজানু হয়ে যখন কোন সিস্টারের কণ্ঠস্বর শোনে, যে সব দোষ-ত্রুটিগুলো খেয়াল করে নি সে, শান্তকণ্ঠে তারই ফিরিস্তি দিচ্ছে—কখনও কখনও সিস্টার লুক মুহূর্তের জন্ত ভুলে যায় নাইট ডিউটিতে সে ঐ সিস্টারটির সংগী নার্স। চেনা গলাটা হঠাৎ অপরিচিত শোনায়, মনে হয় যেন কমিউনিটির কণ্ঠস্বর শুনছে।

···নিজের অসম্পূর্ণতায় কমিউনিটি দুঃখ করছে যেন।···

তাদের সবাইকে মিলিয়েই কমিউনিটি, তাই তাদের ক্রটিতে কমিউনিটি অপূর্ণ।

...অমনি একটা ভয়ের অনুভূতি কাঁপিয়ে দেয় তাকে।...রক্তে এড্রিনালিনের জোর বাড়ে।

মুহূর্তের জন্য নিজের অস্তিত্বটাই বিলুপ্ত হয়ে যায়...সে আর সিস্টার লুক নয় যেন, সংসার-জীবনে তারই নাম গ্যাব্রিয়েল ভ্যান ডি মাল ছিল না যেন! পলকে মনে হয় বিরাট এক জৈব দেহের নিঃসংগ একটি কোষমাত্র সে, বাক পর্যায়ের নীচে কোথাও তার স্থান।...ঐ জৈব দেহের সামগ্রিক দৃষ্টি তারই কল্যাণে নিয়োজিত। তারই কল্যাণে সে কথা বলে, চিন্তা করে, সযত্ন বদান্যতায় তত্ত্বাবধান করে তার, আর সেই সংগে এক অপরিজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকের দিকে নিয়ে যায়।

...ভয়টা আসে যেমন হঠাৎ, যেতেও তেমনি দেরী হয় না—চঞ্চল ছায়ার মতই সরে যায় আবার।

...কমিউনিটিকে ভয় করা কি করে সম্ভব? তাহলে তো নিজের আত্মাকেই ভয় পেতে হয়, অথবা ১০৭২ সংখ্যাটাকে।

কুলপা শেষে সমবেত কণ্ঠে ডি প্রোফানডিস গাইবার সময় সিস্টার লুক প্রতিটি শব্দ সযত্নে উচ্চারণ করে, হুঁশ থাকে না স্বরটা তার অন্যদের চেয়ে এক পর্দা বেশী চড়ে যাচ্ছে, মনের মত করে নিজের বলা শোনার তাগিদে, অন্তরের গভীরতম আকুলতা নিয়ে তোমার কাছে কাঁদছি আমি, হে প্রভু...

বছরের মাঝামাঝি সময়—মেয়েরা যখন অনেকটা শক্ত হয়েছে কথা পুরোপুরি হয় নি—সুপিরিয়র কুলপায় গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে শুরু করলেন। যে ক্রটি বার বার ঘটছে তার জন্য পাঁচটি এভ বলতে হ'ত আগে, এখন সে ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দাম্ভিকতা বর্জনের অভ্যাস করে—খোলাখুলি, খাবার ঘরে।

সিস্টার লুক ভাবতে চেষ্টা করে এই শাস্তিগুলো ওদের গড়ে তোলার শেষ পর্যায়, তাই এত নির্দয়। এর পর ওরা ব্রতভীষ্ম গ্রহণ করবে, মাদার হাউস ছেড়ে ছোট ছোট কনভেন্টে চলে যাবে তারপর। সেখানে লৌকিক জগতের অনেক কাছে থাকবে ওরা, অনেক প্রলোভনও ছড়ানো থাকবে সামনে। কিন্তু প্রকাশ্যে যখনই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় এতখানি চৈতন্য তখন থাকে না যে পলকে তীব্র হয়ে ওঠা অবমাননার অনুভূতিটাকে জয় করতে সাহায্য করবে।

চার রকম কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আছে। বছর শেষ হয়ে আসছে যত, খাবার ঘরে প্রায়ই সবগুলো এক সংগে পালিত হচ্ছে—প্রাচীনতমা দশটি নানের পদচুম্বন, স্যুপ ভিক্ষা, সব সিস্টারের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ জানানো—সে যেন তোলি কলকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে, আর দু' বাহু প্রসারিত করে নতজানু হয়ে বসে পাঁচটি এভ, পাঁচটি প্যাটার ও পাঁচটি গ্লোরিয়া বলা।

বহির্বিশ্বে এমন কোন শিক্ষা, এমন কোন প্রস্তুতি কি আছে এর সংগে যার তুলনা চলে? কোন না কোন আকারে নিয়মানুগ জীবনে তো সেখানেও আছে, কিন্তু কাদের? কি উদ্দেশ্যেই বা? তুলনীয় কিছু একটা খুঁজতে গেলেই ব্যালে নাচের কথা মনে আসে। বিশেষ পেশীগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হয় তাতে, যার ফলে শুধু আঙুলের আগায় ভর দিয়ে নক্ষত্র-বেগে ঘুরতে পারে নাচিয়েরা, কতক্ষণ যে পারে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না যেন। উড়ন্ত পাখী যেমন হাল্কা ভাবে নেমে আসে, ব্যালে নর্তকীও শূন্যে লাফিয়ে উঠে আবার তেমন করে নেমে এসে দাঁড়ায় দু' পায়ের ঐ আঙুলের আগায় ভর দিয়ে, একটু বেদনাও বোধ করে না। এ অসাধ্য সাধন সম্ভব হয় শুধু শিক্ষার গুণে। কিন্তু ব্যালেরিনাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় প্রায় শিশুকাল থেকে। নাচ শেখার আগে একুশটা বছর সাধারণ ভাবে কাটাতে হয় না তো তাদের, যা বিঘ্ন ঘটাবে! তার এই জীবনের সংগে তাদের জীবনের তফাৎ এইখানেই।

প্রথম যেবার স্যুপ ভিক্ষা করে নিতে হ'ল, সমস্ত অতীত বিরোধিতায়, চীৎকার করে উঠতে চাইছিল যেন। ভিক্ষা পাত্রটা মাদার সুপিরিয়রের বাঁ পাশে রেখে নতজানু হয়ে জোড় হাতে অপেক্ষা করেছিল তাতে দু' চামচ স্যুপ না পড়া অবধি, পরবর্তী বয়োজ্যেষ্ঠার কাছে সেটা পাততে তারপর, তারপর তাঁর পরবর্তী জনের কাছে—বাটিটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অমনি চলবে। বিবেকের শাসন না মেনে চকিতে নিখুঁত পরিবেশনে সাজানো বাড়ীর খাবার টেবিলটাকে মনে পড়ে গেল...বহু বছরের পরিচয় তার সংগে। ছ' জন নান যদি দু' চামচ ভরে দেন বাটিটি অনায়াসে ভর্তি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই প্রথম বার তিনজন কিছু খেয়াল না করে এক চামচ দিয়েই নিজে খেতে শুরু করে দিলেন আবার। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের কোণ থেকে নিজের বাটিটা তুলে নিতে নিতে বাড়ীর স্যুপ-রাখা পাত্রটাকে মনে পড়ে গেল...আর সেই রূপোর বড় চামচটা—একবার ডুবিয়ে নিয়ে ফেলে দিলেই এক একটা স্যুপপ্লেট ভরে যেত...ধোঁয়া উঠত স্যুপটা থেকে।

বাটিটা ভর্তি হতে নিজের জায়গায় ফিরে এসে গিলে ফেলল স্যুপটা, জানে শেষ বিন্দুটি অবধি খেয়ে ফেলতেই হবে।...আর তারোটা এঁটো বাটি থেকে কেমন করে সেটা এসে পড়েছে তা না ভাবার চেষ্টা করছে সে ভাবনাটা সরিয়ে রাখতে।...খুঁৎখুঁতে বিমুখ মনটার যে চিহ্ন ফুটেছিল মুখভাবে, তলানিটুকু অবধি খেয়ে ফেলার ফাঁকে সেটাও মুছে ফেলল চেষ্টা করে। একটি মাত্র বিদ্রোহী দৃষ্টি ঐ ভৌতিকর অবমাননাকে পুনরায় স্মরণ করে আনবে।

...কিন্তু এও নিশ্চিত যে আর একবার সমস্তটুকু সুষ্ঠুভাবে করতে সে কিছুতেই পারবে না, স্বয়ং ভগবানের সম্মানেও না।

অথচ শিক্ষানবিশীর শেষ ক'টা মাসে এ প্রায়শ্চিত্ত কয়েকবারই করল সে, সুষ্ঠুভাবেই করল। স্যুপ ভিক্ষা করে নিল, নতজানু হয়ে দশটি প্রাচীনা নানের পদচুম্বন করল, তাকে যাতে সাহায্য করেন ভগবান সেজন্য প্রার্থনা করবার অনুরোধও জানাতে হ'ল সব সিস্টারের কাছে—অপমানের দাহে ভিতরটা জ্বলছে, তবুও। স্যুপের বাটিটি ক্ষুধাতুরা নানদের পাশে রেখে তাঁদের বিরক্ত করতে হয়, চুম্বন করবে বলে ইসারা করতে হয় পা বাড়িয়ে দেবার জন্য—পুল্‌পিটের ধর্মপাঠ থামিয়ে দিতে বাধ্য হয় যখন ঐ হীন অনুরোধ জানাতে, সে কি আর কিছু বেশী হৃদয়বিদারক!

যে ক্রটির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে সেটা তার মধ্যে থেকে এমনই লুপ্ত হয়ে যায় যেন কেটে কেউ বাদ দিয়ে দিল। একই অপরাধে দু'বার প্রায়শ্চিত্ত তাকে প্রায় করতেই হয় না, কিন্তু নতুন আর পাঁচটা সর্বদাই থাকে। এই অভিজ্ঞতাগুলোর অবশ্যম্ভাবী ফল হোলি

নিয়মকে কঠোর ভাবে মানতে শেখা, আর এখন নিজের বেদনার মধ্য দিয়ে দেখতে শিখে এ শিক্ষার বাইরে আরও কিছু দেখতে পায় সে। দেখতে পায় তার মধ্যে গ্যাব্রিয়েল ভ্যান ডি'মালের মত ক্ষয়ে আসছে ক্রমেই, সেই দাম্ভিক মেয়েটার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ! সে জায়গায় মনের মধ্যে একটা নিরহংকার কোণ পুষ্ট হয়ে উঠছে দিনে দিনে, সেদিকে তাকিয়ে আজকাল বারবার নম্রতার আভাস পায় সিস্টার লুক।

ব্রত নেবার আগে এই শেষের ক'টা মাসে কয়েক বারই প্রকৃত বিনয় সে দেখেছে, যদিও তখন উপলব্ধি করেনি কি দেখল। কয়েকজন শিক্ষানবীশ খাবার পরে প্রায়শ্চিত্ত করে যখন, মাঝে মাঝে তাদের দলের সাদা রোবের মধ্যে এক-আধটা কালো রোব এসে মেশে—স্থির, প্রশান্ত দেখে চমকে যেতে হয়।···তিনি যখন স্যুপ ভিক্ষা করে ফেরেন, তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বিস্ময়টা প্রায় প্রকাশ হয়েই পড়ে। ইনি কি এমন করে থাকতে পারেন!···ওর বিস্ময়-বিহ্বল চোখ দুটি অনুসরণ করে ফেরে ঐ কালো পোশাক-আবৃত লাবণ্যময়ী মূর্তিটিকে···টেবিলের চারপাশে ঘুরছেন···হাতে বাটিটি···আস্তে আস্তে পূর্ণ হয়ে উঠছে। জানে না যেন আর মহাকাশের মত বিস্তৃত এক হৃদয়ের দিকে, যে হৃদয় স্বেচ্ছায় এই ইন্দ্রিয় নিগ্রহের অনুমতি প্রার্থনা করে নিয়েছে! যে বিনয় পূজার ফুলের মত প্রসন্ন মনে ভগবানের চরণে নিবেদন করা যায় তার স্বরূপ কি তাই দেখাতে ওদের!···পরিচিতের দায়ে।

সে বছর নার্সিং ডিগ্রী আর সাইকিয়াট্রিতে ডিপ্লোমা পেল যেমন, সংগে সংগে মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের উপাদানও জমল প্রচুর। যুক্তিবাদী মনটা দ্বন্দ্বের বস্তুগুলোর তুচ্ছতায় কটাক্ষ করে প্রায়ই। তখন নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হয় ভগবানের চোখে অকিঞ্চিৎকর বলে কিছু নেই, এই মহামূল্য জগৎ ক্ষুদ্র বস্তুর সৃষ্টি···এখানে যে গুরুত্ব তারা পায়, বাইরের জগতের তা স্বপ্নেরও অগোচর। প্রতিটি তুচ্ছ কাজ বা গোপন ইচ্ছাকে কাটতে হয় নিয়মের ধারে, মোজাইকের মেঝের ছোট ছোট পাথরগুলোর মত নিখুঁত ভাবে পালিশ করতে হয়। একটা একটা করে দেখলে কোন মানেই নেই তাদের, কিন্তু তারাই একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে একটা বিশিষ্ট আকার নেয়।

···এই আকারই নানের গঠন, তাই নিজে সে তা দেখতে পায় না।

রিক্রিয়েশনে একদিন গাছের তলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে বৃত্তাকারে বসে ওদের দলটা বিন ছাড়িয়ে পরিষ্কার করছিল। ওর চোখ দু'টো বৃত্তটাকে ঘিরে ঘুরে এল।···তরুণ সতেজ মুখগুলো—কোলভরা বিনের দিকে ঝুঁকে আছে, দ্রুত হাত চলে যাদের রিক্রিয়েশনের বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে অন্যদের তুলনায় বেশী বিন জড়ো করতে পারছে তারা। যীশুর কাজে তাদের সময়টার অধিক সদ্ব্যয় হ'ল!·চেয়ে চেয়ে অবাক লাগে। সেদিন যে আর বাগানে পায়চারি করার অনুমতি নেই সেজন্য কেউ একটা আফশোসের কথাও বলেনি। এপ্রোণ-ঢাকা কোল থেকে চোখ তুলে কেউ ফুলে ভরা চেস্টনাটের গাছের দিকে তাকায় নি, মাথার ওপর মন্থরগতিতে ভেসে চলা গ্রীষ্মের মেঘের দিকেও না। পীড়ন নেই, জোরজবরদস্তি নেই, নিয়মশৃংখলার মধ্যেও পূর্ণশ্রীর অভাব তবু কখনও ঘটে না।

···ভাবতে গিয়ে কি একটা অনুভূতির তীব্রতায় চোখে জল এসে যাচ্ছে প্রায়।

আবার এও মনে হচ্ছে এই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা নিয়মানুবর্তিতা, এটা একটু বাড়াবাড়ি। এরপর যেসব কনভেন্টে যাব আমরা সেসব জায়গাও সুরক্ষিত, সেখানে যতটা নিয়মশৃংখলা দরকার হবে আমাদের এগুলো সে তুলনায় অতিরিক্তই।

১৯২৭ সালে সেই গ্রীষ্মের দিনে সে জানতেও পারে নি আরও দশ বছরের কিছু বেশী সময়ের মধ্যেই তাদের সুশৃংখল এই জগতটা ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের মত কেঁপে উঠবে···যে দেওয়ালগুলোকে রক্ষাপ্রাচীর মনে করে এসেছে এতদিন, সেগুলো চিড় খেয়ে যাবে অনেক জায়গায়···ভেঙে পড়বে সারি সারি ভাঙা পাথরের স্তূপের মত! আজ যারা পাশে বসে আছে, সেই নিধন যজ্ঞে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে তারা—বহু বছর কোন খবরই পাওয়া যাবে না। অবশেষে কয়েকজনকে আবার দেখা যাবে এক এক করে লৌহাবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে—পোল্যাণ্ড থেকে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে, চীন থেকে!··ঐ জনা কয়েকই মাত্র···বহু দুঃখে, বহু দুর্ভোগ সয়ে। নতুন গড়ে ওঠা সব কটা নিরীশ্বরবাদী নিরানন্দ দেশেরই প্রথম শিকার তারা!··পরনে তাদের সাধারণ পোশাকের ছদ্মবেশ, তার ভাঁজে ভাঁজে সেণ্টদের জীর্ণ ছবিগুলো ঢুকিয়ে সেলাই করা জপের মালা জুতোর মধ্যে লুকোনো।

তাদের সহিষ্ণুতার কাহিনী শুনে চমকে উঠবে পৃথিবী, খবরের কাগজে ছাপা সেই সব পুণ্য বস্তুগুলোর ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে বিস্মিত হয়ে ভাববে শুধু, এগুলো কি করে উদ্ধার করে আনল ওদের! ওরা বিশ্বাস করে তাই মনে প্রাণে···ঐ ফিনিক্স সিস্টাররা(১)···বিশ্বাস করে ঐ পবিত্র বস্তুগুলোই ফিরিয়ে এনেছে ওদের সেই সব বধ্যভূমি থেকে।

বিন পরিষ্কার করতে বিশ্রী লাগে তার, তবুও সেই কাজেই ঝুঁকে আছে। একবারও ভেবে দেখেনি কিন্তু নিয়ম পালন করে সে নিজেও চলেছে। মনের মধ্যে একটু বিদ্রোহের সুর ছিল—কাজটা ভৃত্যসুলভ···সে বিদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করতে আঙুলগুলোকে আরও দ্রুত চালনা করল।···আর একটা অতীত স্মৃতিকে দমন করল প্রাণপণে···ওদের রাঁধুনি বাড়ীর রান্নাঘরের দরজায় পেরেক ঠুকে লিখে রেখেছিল, 'এখানে ছোটদের প্রবেশ নিষেধ।'

ভেবে দেখলে কিন্তু সিস্টারদের সংগে বেড়াতে বেড়াতে লাগসই কথা হাতড়ে বেড়ানোর চেয়ে এ সময়টা বরং শাকসব্জি পরিষ্কার করে কাটিয়ে দেওয়া ঢের ভাল—কথা বলতে গেলেই প্রসংগটা সব সময় আর তিনজনের মনোমত হওয়া চাই কি না। দু'জন দু'জন করে বেড়াতে পেত যদি, যদি এক সময় কেবল একজনের সংগে কথা বলা চলত। এই যে চারজন একত্রিত হওয়া অবধি কোন কথা নয়, এ বড় নির্দয় শাসন।

১। ফিনিক্স আরব মরুভূমিবাসী এক জাতীয় পাখীর নাম। প্রসিদ্ধি আছে এই ফিনিক্স পাখী পাঁচ ছ'শো বছর বেঁচে থেকে নিজেই পুড়ে মরত এবং সেই চিতাভস্ম থেকে পুনর্যৌবন নিয়ে উঠত। কেবল ফিনিক্স পাখীর সংগেই তুলনা চলে এই সিস্টারদের।

সাপ্তাহিক স্নানের লাইনে যে মেয়েটি তার পরেই থাকে তার দিকে চেয়ে দেখল, বৃত্তটার ওদিকটায় বসেছে। চোখোচোখি হয়ে যায় যদি দৃষ্টিতে তার এমন ভাব ফুটবে যেন হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সান্ত্বনা চাইছে সে।···আমাকে তুলে ধর সিস্টার লুক, কাল আমার কুল্পার দিন··ভয় করছে বড়। দৃষ্টিটা সরে এসে আইরিশ মেয়েটির ওপর পড়ল—রিক্রিয়েশনে ও সব সময় তার কাছাকাছি সরে আসে। ব্রত গ্রহণের দিন ওর আত্মীয়স্বজনরা কেউ আসতে পারবেন না, তীব্র বেদনার অনুভূতি জড়িয়ে আছে কথাটায় অথচ যখনই প্রসংগটা ওঠে সেইন্টের মত হাসে মেয়েটি।

···আইরিস চোখ দুটো বলে, বুঝতেই পার আয়ারল্যাণ্ড থেকে বেলজিয়ামে একবার ঘুরে যেতে খরচ পড়ে কতটা···কাজেই অধ্যাত্মপথে একাই চলব আমি···একেবারে একা···অবশ্য তোমরা তো রইলেই সিস্টার লুক।

ব্যস, ঐ পর্যন্তই।

তারপর আরও দু'জন এসে মিলবে যখন ওদের সংগে আর যে বয়োজ্যেষ্ঠা সে কথা আরম্ভ করবে, কথাটা ব্যক্তিগত কথার অনেক ঊর্দ্ধে থাকবে। যেমন সিস্টার ইউডোক্সির জয়ন্তী উপলক্ষে তৈরী জ্যাপানী লন্ঠনের কথা, পর্বদিনের জন্য ক্যানসার রোগীদের হাতের তৈরী কাগজের ফুলগুলো যে ভারি সুন্দর হয়েছে সে কথা, বা আর কোন এমনি সাধারণ কথা···নারী হৃদয়ের কোন গোপন স্থানে ফাটল ধরবে না যাতে।

নির্দয় শাসন বটে, কিন্তু সুবিবেচিত। এমন যদি হয় এখানকার যে কোন একজন বাইরের জগতে যেতে পারেন, সারা কমিউনিটির মধ্যে একটিমাত্র মানুষই পারবেন। জাগতিক সংস্পর্শের যে কোন ঝুঁকি নেবার শক্তি একমাত্র তিনিই রাখেন—তিনি সুপিরিয়র জেনারেল, কোন আসক্তি তাঁকে স্পর্শ করবে না।

···কারণে-অকারণে বারেবারেই রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের কথা মনে আসে, খাবার ঘরে চোখ তুলে তাকিয়ে সত্যি যেদিন তাঁকে দেখেছিল সেই থেকেই।

একটা প্রায়শ্চিত্তের দিন ছিল সেটা। হাসপাতাল থেকে উপাসনায় আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে, সে স্যুপভিক্ষা করে নিচ্ছিল। যেমন উচিত শুরু করেছিল, পদমর্যাদায় যিনি সবচেয়ে বড় তাঁর থেকে। সেদিন সে মানুষটি ছিলেন সুপিরিয়র জেনারেল, সেই সবে ফিরেছেন ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আর পোল্যাণ্ডের শাখা-হাউসগুলোর বাৎসরিক পরিদর্শন সেরে।···চ'চামচ স্যুপ ভিক্ষা করে নেবার জন্য নতজানু হয়ে বসে অপেক্ষা করতে করতে হতাশ নিষ্প্রভ দু'টি চোখ তুলে তাকিয়েছিল হঠাৎ, ভাবেনি অবশ্য তার দিকে কেউ তাকাতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে সাধারণত যে নান যত বেশী পদমর্যাদার, তিনি তত অধ্যবসায়ের সংগে ছোট সিস্টারটিকে সাহায্য করেন, যাতে যে ত্রুটি ঘটেছে সেজন্য অনুশোচনা হয় তার। অনেকেই দেয়, স্যুপটুকু অবহেলা ভরে দিয়ে দেন কোন মতে···শুধুই ভ্রুকুটি করেন, বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়েছেন যেন। সেদিন কিন্তু সুস্মিত মুখে সুপিরিয়র জেনারেল তারই দিকে চেয়েছিলেন। এমন প্রশান্ত হাসি প্রায় ভুলেই গেছে সিস্টার লুক।

···হাসিটা যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল তাকে।

সুপিরিয়র জেনারেলের নীরব অভিব্যক্তি বলছে যেন, আহা বেচারি! কি হয়েছে?

সেবার—কেবল সেই বারই, প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে আর একটু হলেই কেঁদে ফেলত সিস্টার লুক।

সেই যে ঐ দীর্ঘ কৃশ মূর্তিটিকে ঘিরে চোখ দুটো বাঁধা পড়ল, যখনই চ্যাপেল খাবার ঘরে বা ওদের রিক্রিয়েশনে উপস্থিত থাকেন সুপিরিয়র জেনারেল, অপলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাঁকে। ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলে অনেক কিছু খুঁটিনাটি চোখেও পড়ে।

রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসেন না কখনও, যত ক্লান্তই হোন। এ অন্তর্শক্তির প্রমাণ পেতে বেশ কিছুদিন লেগে গেল, যে শক্তি দিয়ে আরামকে ছেঁটে ফেলা যায়। ষ্টাডি-হলে রিক্রিয়েশনে কিংবা হাসপাতালে রেভারেণ্ড মাদার কর্মনিরতা নানদের যখন দেখতে আসেন, সিস্টার লুক চেষ্টা করে এমন জায়গায় থাকতে যাতে তাঁর পিঠের দিকটা দেখতে পায়। মসৃণ পিঠের ওপর লম্বা কালো ভেলটা সোজা হয়ে ঝুলে থাকে সব সময়, গ্রানাইটের খাড়া পাহাড়ের মত শক্ত হয়ে থাকে। যে চেয়ারে বসে থাকেন তার পিছনের হেলান আর তাঁর পিঠের মধ্যে ব্যবধান থাকে বেশ একটু। আয়েস করে কখনও বসেন না, তবু আশ্চর্য এই বসার ভংগীতে আড়ষ্টতাও কখনও থাকে না, সর্বদাই কেমন শান্ত নিরুদ্বিগ্ন দেখায় তাঁকে।

চ্যাপেলে তাঁর আর একরকম শক্তি দেখে সিস্টার লুক। ধ্যানের সময় কোনদিন তাঁকে প্রথমেও শাস্ত্রীয় পাঠের বইখানির দিকে চাইতে হয় না, সোজাসুজি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হ'ন, অন্য প্রেরণা যোগাতে বই-এর সাহায্যের দরকার হয় না। প্রার্থনা-ডেস্কে নতজানু হওয়ামাত্রই পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন ঈশ্বরের প্রতি। ধ্যান সমাহিতা ঐ শ্রদ্ধার্হ মূর্তিটি ও চুরি করে করে দেখে আর মনে পড়ে যায় প্রাচীন শিল্পীদের হাতে বিবিধ ছাঁদে আঁকা এক ছবি: একখানি ঊর্দ্ধাননের 'পরে স্বর্গের করুণাধারা নেমে আসছে স্বর্ণরশ্মির মত। মাদার ইমানুয়েলের ধ্যানস্থা মূর্তিটি দেখার পর সহজেই অনুধাবন করা চলে শিল্পীদের এ ছবির প্রেরণা কোথায়।···সুপিরিয়র জেনারেল যখন ধ্যান করেন···সূর্যোদয়ের আগে সেই ধূসর ঊষায়···কল্পনা করা কঠিন নয় উজ্জ্বল দু'টি বাহু ঝুঁকে এসেছে তাঁর দিকে···দেখা যাচ্ছে যেন।

রিক্রিয়েশন ঘরেই কিন্তু মাদার জেনারেলের শক্তির মূলাংশ অনুভব করার সুযোগ ঘটে, অন্তত সিস্টার লুকের ধারণা তাই। রিক্রিয়েশনের যে সময়টা সব চেয়ে ভীতিপ্রদ ছিল, সেটাই এখন মানব-ধর্মের রহস্যালোকে অভিযানের মত লাগে।

আস্তে আস্তে সিস্টার লুক রিক্রিয়েশনের অর্থ বুঝেছে। কমিউনিটির অন্য সব দিক বুঝেছে যেমন।

প্রথম প্রথম বুঝত না দিনের মধ্যে দু'বার এই সমবেত হওয়ার মূল্য কি। এখন বোঝে অহং জয়ের মেরুদণ্ড এটা, মঠ-বাসের সূক্ষ্ম-কঠোর কলা আয়ত্ত করার জন্য দরকারী ব্যায়াম। আগে আগে এ সময়টাকে মনে হত একটা স্থাণু বৃত্ত, সেখানে সেলাই হয় কেবল। আধ্যাত্মিক ক্ল্যাসাষ্ট্রোফোবিয়া হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম যেদিন যেভাবেও মাদার যোগ দিলেন তাদের সংগে, সেইদিন সে ধারণা বদলালো।

ইচ্ছ-অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই, রিক্রিয়েশনে যোগ দিতেই হবে সবাইকে এবং সেখানে বসতে হয় সব সময় বৃত্তাকারে। উদ্দেশ্য—অন্য আর সব ক্ষেত্রের মতই অন্য সবার সম্বন্ধে সচেতন থাকা। তাই সবাই সবায়ের মুখোমুখি থাকে, স্মিত হাসি ও কথার আদান-প্রদান চলে যাতে। সবাইকে মিলিয়ে রিক্রিয়েশান পূর্ণ হবে, বাইরে কেউ পড়ে থাকবে না, সিস্টার লুকের মত যারা তাই চায়, তারাও না। নামটা যাই হোক, শিথিলতার একটিমাত্র প্রকাশ বোধ হয় এখানে ইচ্ছামত যে কোন চেয়ারে বসতে পারা যায় এবং এই একমাত্র জায়গা জ্যেষ্ঠত্বের ক্রমানুসারে বসবার কড়াকড়ি যেখানে নেই। আগে এলে যে কোন চেয়ারে ইচ্ছামত বসা যায়, ক্রুসিফিক্সের নীচের চেয়ারটা ছাড়া অবশ্য, যে চিরব্রতা নান সভানেত্রীত্ব করবেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট থাকে সেটা।

ছেঁড়া সার্জের স্কার্টের যে টুকরোগুলো দিয়ে ভেসট্যৈ(২) তাঁর সমস্ত জীবননৈপুণ্য প্রয়োগেও পরিধানযোগ্য কিছু তৈরী করতে আর পারেন না, সেলাই রাখার থলি তৈরী হয় তা' দিয়ে। সিস্টাররা যে যার থলি নিয়ে রিক্রিয়েশনে এসে বসেন। যার যার নম্বরটা তার থলির ওপর দ্রুত হাতের চেন স্টিচ্ দিয়ে লেখা—সময় অপচয় করা হয়নি, ফেদার স্টিচ বা ক্রস্ স্টিচের মত সৌখীন কিছু নয়। থলির মধ্যে আছে রিক্রিয়েশনের বৃত্তে বসে করবার মত কোন কাজ, কোলের ওপর হাত মুড়ে অলস হয়ে বসে থাকা নিয়ম নয়। বসে করবার মত কোন হাতের কাজ থাকে সবার জন্য—রিপু হোক, বোনা হোক। আত্মমগ্ন হয়ে যেতে পার এমন কোন কাজ হলে চলবে না, যেমন চিঠি লেখা কি বই পড়া—চারপাশের অন্য সিস্টারদের থেকে মনোযোগ সরে যাবে তাহলে।

সাধারণতই সিস্টারদের থলিতে মোজা মেরামতির কাজ থাকে হাতে বোনা কালো মোজাগুলো মজবুত হয় খুবই কিন্তু সব সময় পরে থাকতে থাকতে ছিঁড়ে যায় সহজেই। রিপুর কাজ সব শেষ হয়ে যায় যখন, কোন বোনার কাজও হয় না, ওরা কাঠের লাটাইয়ে সুতোর দড়ি বোনে। একটা কাঠের চাকতির ওপর দিকে চারটে কাঁটা পোঁতা আর মাঝখানে ফুটো করা। সেই কাঁটাগুলোয় সুতো পরিয়ে পরিয়ে দড়ি বুনতে হয়, লাটাইয়ের ফুটো দিয়ে একটু একটু করে দড়ি তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে। সিস্টারদের বেল্টে কাঁচি ঝোলাবার মত মাপের হলে কেটে দিতে হয় সেখান থেকে, নতুন করে আবার শুরু করতে হয়। স্যাক্রিষ্টি সিস্টাররা শুধু চ্যাপেলের বেদী সাজাবার কাপড়-চোপড় আর পবিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ মেরামত করেন। এই একটামাত্রই সুচারু এবং কিছুটা জটিল কাজ করার অনুমতি আছে রিক্রিয়েশনে।

মাঝে মাঝে সিস্টার লুকের চোখ দু'টো দুঃসাহসিক দ্রুততায় বৃত্তটাকে ঘিরে ঘুরে আসে সংগিনীদের মুখে নিজের অন্তরের বিদ্রোহী অনুভূতির আভাস খুঁজে। খোঁজে যা সেটা ছাড়া আর সব কিছুই চোখে পড়ে—শুশ্রূষাকারিণী আর শিক্ষিকা সিস্টারদের মুখের স্মিত-হাসি··রান্নাঘরের বা লণ্ডীর সিস্টারদের পাশে জায়গা বেছে নিয়েছে। ওরা ওদের মুখ ফোটাবার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে যাতে তারা লাজুক ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে। দেখে এখানে ইচ্ছামত বসবার অনুমতি থাকা সত্বেও আইরিশ সিস্টাররা সে সুযোগ নেয়নি, ছাড়া ছাড়া যে যেখানে হোক বসেছে। অথচ ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা শোনার থেকে কিছুক্ষণের জন্যও রেহাই পাবার লোভই স্বাভাবিক ছিল। এই তো সবে শিখছে তারা, কাজেই এমন অনর্গল কথা ভাষা বোঝা অসম্ভব তাদের পক্ষে। পরস্পরের দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসে যখন ওরা, সে হাসি এক-ফালি সূর্যালোকের মত বৃত্তের ওদিক থেকে এদিকে এসে পড়ে··মুহূর্তের জন্য বৃত্তের দু'দিকের দু'টি বিন্দু এক হয়ে যায়। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

২। সেলাই দপ্তরের ভারপ্রাপ্তা প্রধানা যে নান থাকেন তাঁকে ভেসট্যৈ (vestiaire) বলে। সেলাই সংক্রান্ত সব দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত—সব নানদের পোশাক তৈরী থেকে ছেঁড়া পোশাক মেরামত পর্যন্ত সব কিছু।

বিচিত্রময় মন

সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

মন মন মন
মন বলে আছে এক ধন
অপরূপ নিরাকার।
এ জগতে
কেহ পারে না বুঝিতে
কেমন মূর্তি তার।।
প্রবঞ্চনায়
শঠতায় আর নীচতায়
সর্বত্র সে কর্ণধার।
কখনও বা সাধুবেশে
ছাই ভস্ম গায়ে মেখে
সেই মন মিলে হয় একাকার।।
সতে অসতে
ভালো মন্দে
সর্বপিছে রয়েছে সে মন।
তাহারি নির্দেশে
মনুষ্য বেশে
জীব আবর্তিত হতেছে অনুক্ষণ।।
কত সাধ জাগে মনে
নানা স্বপ্নের জাল বুনে
পুলকে জাগে শিহরণ,
কভু বা চোখের জলে
দুঃখ বেদনার হোমানলে
দগ্ধ করিছে সেই মন।।
এই ভাবে চলে মন
নানা কাজে অনুক্ষণ
বিশ্বের সর্বত্র সর্বখানে।
করিতে পারে না কিছু
দেহ সে যে থাকে পিছু
জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে।।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শর্মিলা, তুমি যেখানেই থাক, ফিরে এস। টাকার প্রয়োজন হ'লে জানাতে দ্বিধা করো না। আমি আর বাবলু তোমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। সারাটা জীবন থাকব।

এক আধ বার নয়, এই ধরণের বিজ্ঞাপন ক্রমাম্বয়ে মাসের পর মাস প্রকাশিত হয়েছে। অখ্যাতনামা পত্রিকায় নয়, কুলীন দৈনিকের পাতায়। চোখে পড়ার মত জায়গায়।

সম্ভবত এ বিজ্ঞাপন তোমার চোখে পড়ে থাকবে। হয়তো লজ্জায় হয়তো দ্বিধায় কিংবা মধুরতর জীবনের লোভে তুমি আর পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাও না। পিছু হেঁটে হেঁটে চৌকাঠ ডিঙিয়ে আমার সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে ফিরে আসবার ইচ্ছা তোমার নেই।

কিন্তু বিশ্বাস করো, যতবার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, ততবার মনে মনে তদগতচিত্তে ঈশ্বরকে ডেকেছি, শর্মিলার সুমতি দাও ঠাকুর আর যেন এই বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে ভুলে, স্মরা অঙ্গের কাদা মুছে সে ফিরে না আসে। তার চলে যাওয়াটা কোন রকমে সহ্য করেছি, কিন্তু ফিরে আসাটা সহ্য করা অসম্ভব।

বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরা বাবলু মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে ককিয়ে কেঁদে উঠেছে। চীৎকার করে কেঁদেছে, মা, মা, মা। মা কোথায়, মার কাছে যাব।

তাকে কোলে তুলে নিয়ে এসেছি। কোঁচার খুঁট দিয়ে তার দু'টো চোখ মোছাতে মোছাতে বাইরের বারান্দায় নিয়ে এসে তাকে রাত্রির আকাশ দেখিয়েছি। কালো আকাশে অজস্র সোনার চুমকি। চেয়ে চেয়ে দেখেছি। নিরীক্ষণ করে। যে নক্ষত্রটি অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ, সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছি, ওই যে তোমার মা বাবলু। ওখানে যে যায়, সে আর ফেরে না। তোমার মাও ফিরবে না।

কান্না ভুলে গিয়ে বাবলু এক আশ্চর্য কথা বলেছে। আমার কোল থেকে ঝুঁকে পড়ে বলেছে, আমি ওখানে যাব বাবা, ওই তারাগুলোর মাঝখানে।

তাকে সান্ত্বনা দিয়েছি, যারা ভাল কাজ করে তারা ওখানে যায় বাবলু। তুমি বড় হও, ভাল কাজ কর, তবে তো যাবে ওখানে। ওই আলোকমালার মধ্যে।

এই মিথ্যাভাষণের জন্য মধ্য রাত্রে বার বার নিজেকে অভিসম্পাত দিয়েছি। মনে হয়েছে বাবলু নিষ্ঠুর সত্যই শুনুক। সে সত্য যতই মর্মান্তিক হোক, সন্তানের সেটা জানার অধিকার আছে। নয়তো আজকে রাত্রের জমাট অন্ধকার বুকে নিয়ে বাবলু বেড়ে উঠবে। অসত্য আর অন্যায়ে হেলান দিয়ে শুরু হবে তার জীবনযাত্রা। নিজের জননীর সম্বন্ধে অলীক এক কল্পনা তার ভবিষ্যতের দিনগুলো উজ্জ্বল করে তুলবে। কিন্তু কতটুকু এই ঔজ্জ্বল্যের পরমায়ু! বেলাভূমিতে জলের রেখার মত ক্ষণস্থায়ী।

ঠিক এই মুহূর্তে তুমি কোথায় আছ আমি জানি না, জানা। আগ্রহও আমার খুব ক্ষীণ। যে জীবনে তুমি অভ্যস্ত, যে জীবন তোমার আদর্শ, এত সহজে তোমার অনুশোচনা জাগবে, এমন ভ্রান্ত ধারণা আমার নেই। সাপিনী খোলস ত্যাগ করে যেমন নতুন খোলস ধারণ করে আরো শক্তিশালী হয়, আরো তেজোদীপ্ত, তেমনি তুমিও হয়তো এই অবাঞ্ছিত সংসার পিছনে ফেলে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছো নতুন দীপ্তিতে, নতুন উদ্দীপনায়।

সংসার তোমার কাছে খোলসের চেয়েও বেশী কিছু নয়।

কিন্তু সত্যিই কি সংসারকে কোনদিন তুমি ভালবাস নি। এ সংসারে ঢোকার মুখে তোমার চোখে মুখে অনুরাগের যে রং দেখেছিলাম, সে রং কি কৃত্রিম। শুধু প্রসাধনের একটা অঙ্গ। কোন ইচ্ছা, কোন কামনা তুমি হৃদয় দিয়ে লালন কর নি। তোমার সংলাপ, তোমার দৃষ্টি, তোমার সেদিনের মোহ সবই কি নিপুণ অভিনেত্রীর ছলাকলা। এ সবের উৎস হৃদয়ের কোন নির্ভেজাল অনুভূতি নয়।

জানি না শমিলা। তোমাকে আমি চিনি না। তোমাকে বুঝি কোন দিনই চিনি নি।

একটা গল্প শোন। হয়তো এ কাহিনী তোমার কাছে একটু চেনা চেনা মনে হবে। কিন্তু এ কাহিনী শুনে তুমি শিউরে উঠবে না তা জানি, কারণ হৃদয়ের আবেগ, বেদনা, সব তুমি নির্মম ভাবে ছেঁটে ফেলে দিয়েছো। দয়া, মায়া, মমতা এ-সব তোমার কাছে, অর্থহীন উচ্ছ্বাস। তা না হলে, এ-ভাবে একটা সংসার ভাঙবার আগে তুমি একটু ইতস্ততঃ করতে শমিলা। একটু দুঃখ চিন্তা করতে।

এই শহরেই নামহীন এক সড়ক। গলির মোড়ে গ্যাসের বাতি একটা আছে বটে, কিন্তু সব দিন সেটা জ্বলে না। ফলে, আশপাশের বাড়ীর জানলা থেকে ছিটকে আসা আলোর রেখাই গলিটুকুর সম্বল। এই গলির বাসিন্দাদের ভাগ্যও এই গলির মতন আলো-ছায়ার রহস্যে ঘেরা।

সারাদিন গলিটা নিঝুম, মৃতপ্রায়। সন্ধ্যা হলেই অজগর ঘুম ছেড়ে গলিটা জেগে ওঠে। দু'পাশে কাজল, কজে, পাউডারে, আলতায় সাজানো দেহের রাশ। বেলফুলের গন্ধ। নুপুরের ঝঙ্কার, হারমোনিয়মের সুর। এখানে মানুষ দেহ টিপে টিপে যাচাই করে। নারীদেহের কেনাবেচা চলে। মূল্যের দামে বিবেক বিক্রি হয়।

এই গলিতেই একদিন অন্য সুর শোনা গেল। অন্য ভাষা।

একেবারে কোণের বাড়ী থেকে একটি ভদ্রলোক বেরোবার মুখেই বাধা পেল। আলো-অন্ধকারে কে একজন দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোক বিরক্ত ভাবে হাত নাড়ল, তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, আজ আর নয়। আবার কাল আসব। আজ আমায় বাড়ী যেতে হবে। আজ মেজাজটা বড় খারাপ।

অন্ধকারে করুণ একটা মিনতি মূর্ত হয়ে ওঠে, একটু দাঁড়ান বাবু, একটা কথা শুনে যান।

আঃ, কেবল ঝামেলা। আজ নয়, আবার কাল দেখা যাবে।

কিন্তু পায়ে পায়ে মূর্তি আরো কাছে এগিয়ে এল।

আমায় এখান থেকে উদ্ধার করুন বাবু। এ নরক থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন।

ভদ্রলোক এবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ যেন নতুন কথা। এতদিন তো সবাই জানত সংসারই নরক। সেই নরক থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কয়েক ঘণ্টার জন্য সবাই আসে স্বর্গের ফূর্তি লুটতে। এখানে উর্বশী মেনকা, রম্ভা, পারিজাত আর অমৃত। দুঃখ বিস্মৃত হবার এমন আনন্দলোক পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

কি ব্যাপার? ভদ্রলোকের সুর একটু নরম।

সব বলছি বাবু, আপনি আমাকে এ গলি থেকে বাইরে নিয়ে চলুন। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কে কোথা দিয়ে দেখে ফেলে ঠিক নেই।

ভদ্রলোক জোর পায়ে গলি পার হয়ে গেল। আভাসে বুঝতে পারল মেয়েটিও পিছন পিছন আসছে।

মোড়ে গিয়ে ভদ্রলোক থামল। মেয়েটিও। আবক্ষ ঘোমটা। হাতে একটা স্যুটকেশ। একেবারে গলির বাস উঠিয়ে দিয়ে আসছে, হাবে ভাবে এমনই মনে হল।

কি বলবে বল। ভদ্রলোক পকেট থেকে সিগারেটের কৌটো

ওর বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছিল

বের করল। নেশাটা বেশ জমে বসেছিল, আচমকা এই হাঙ্গামায় তাল কেটে গেল।

আমাকে কোথাও একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন। যে কোন বাড়ীতে। না হয় ঝিগিরি করে পেট চালাব।

কিন্তু তুমি কে? ভদ্রলোকের গলা একটু রুক্ষ হয়ে উঠল।

নাম বললেই চিনতে পারবেন, এমন কেউ নই। ওই অন্ধকার গলিতে এসে উঠেছি দিন সাতেক, কিন্তু বিশ্বাস করুন অন্ধকারের একটু ছাপ আমার দেহে লাগে নি। নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই। নতুন ভাবে বাঁচতে চাই।

দুত্তোর, হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ভদ্রলোক আছড়ে ফেলল ফুটপাথের ওপর। খানিকটা আগুন, খানিকটা ছাই ছড়িয়ে সিগারেটটা নিভে গেল।

বিরক্তকণ্ঠে ভদ্রলোক বলল, জ্বালালে বাবা। হুইস্কির নেশাটা একেবারে খতম। তা আমার কাছে এসেছ উদ্ধারের আবেদন নিয়ে। আমি তোমাকে উদ্ধার করব এমন গুরুদেব আমায় ঠাওরালে কি করে?

আপনি তো ভদ্রলোক।

জামা কাপড়গুলো ফর্সা পরি, এই পর্যন্ত। ওই গলি তো আমারও জীবন। তুমি পদ্মর নাম শুনেছ? রোগা পদ্ম? আমি তার কাছেই যাই।

মেয়েটি কি বুঝল কে জানে। একটু বুঝি ভাবল, তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, কিন্তু আমি এ ধরণের মেয়ে নই। ভুলিয়ে এরা আমায় এখানে এনে তুলেছে। বাপের অসুখ এই কথা বলে। আপনি আমায় বাঁচান।

আরে বাঁচানো মারার মালিক কি আমি। বাপের ঠিকানা দাও, তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিচ্ছি। যত ঝামেলা বাবা আমার ঘাড়ের ওপর।

মেয়েটি কয়েক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, একজনকে একটা টাকা দিয়ে বাবার খোঁজে পাঠিয়ে ছিলাম, সে এসে বলল, বাবা নেই। দেশে চলে গেছে।

তোমার কথা তো বড্ড গোলমেলে ঠেকছে। কি ব্যাপারটা বল দিকিনি। চট পট বল, মাঝরাতে মেয়েছেলে নিয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে, পুলিশ এসে হাঙ্গামা করবে।

আপনার বাড়ীতে কে আছে?

ভদ্রলোক দুটো চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল অবগুণ্ঠনবতীর দিকে। বিস্ময়ের ধাক্কাটা একটু সামলে নিয়ে বলল, কেন বল তো?

আজ রাতটা আপনার বাড়ীতে কাটিয়ে কাল ভোরে কোথাও চলে যেতাম।

ভদ্রলোক উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল। হাত নেড়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, আমার বাড়ীতে কেউ নেই। ঝি-চাকরদের সংসার। একটা রাত কাটাবার পক্ষে অসুবিধা কিছু নেই। তা ছাড়া আমি অপবাদের তোয়াক্কাও করি না।

ভদ্রলোক ড্রাইভারের পাশে বসল। মেয়েটি স্যুটকেশ কোলে নিয়ে ভিতরে।

সে-রাতে আর কোন কথা হ'ল না। এ পাশে বাড়তি একটা ঘর ছিল। ভদ্রলোকের নির্দেশে চাকররা মেয়েটির শোবার বন্দোবস্ত করে দিল।

পরের দিন।

ভদ্রলোক বিছানায় হেলান দিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল, মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল।

ভদ্রলোক চোখ তুলে অনেকক্ষণ আর চোখ নামাতে পারল না।

এত সকালেই স্নান সেরে নিয়েছে। খোলা চুল পিঠের ওপর। নিটোল, নিখুঁত মুখ। গায়ের রংয়ে আবিরের ছোঁয়া। আয়ত অপূর্ব দু'টি চোখ। চিবুকের তিলটি পর্যন্ত মনোহর।

হাত দিয়ে সামনের চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বলল, বস।

মেয়েটি বসল।

বলল, আমার কথা শোনবার সময় হবে আপনার?

আমার অফুরন্ত সময় কি বলবে বল? সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন কাজ নেই আমার।

মেয়েটি মুখ তুলে একবার চাইল ভদ্রলোকের দিকে তারপর বলল, কাল আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছি বাবু। বাপের অসুখের ছল করে কেউ আমাকে ধরে নিয়ে আসে নি।

তবে?

আমি নিজেই বেরিয়ে এসেছি।

সেই মামুলী কাহিনী। সমাজ জীবনের পাতায় পাতায় হাজার বিবরণ ছড়ানো। খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। নতুনত্ব কিছু নেই। কাল রাতে যাও বা একটু অভিনবত্বের ঘোর ছিল, আজ সকালে মেয়েটির কথা শোনার পর সব যেন ফিকে, পাংশু মনে হ'ল।

তাহ'লে কাল ও-সব কথা বলেছিলে কেন? আর ওখান থেকে চলে আসবার জন্যই বা এত ব্যগ্র কেন?

ও-ভাবে না বললে আপনি হয়তো ফিরেও চাইতেন না। আর ওখান থেকে সত্যিই আমি চলে আসতে চাই। ও জীবন আমি বরণ করতে চাই না।

কারণ?

মেয়েটি ভাল করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। মনে হ'ল, নিজের জীবনের অন্তরঙ্গ একটা অধ্যায় উন্মোচিত করবে। কোন কথা বুঝি লুকাবে না।

কিন্তু মেয়েটি অল্প কথায় শেষ করল। বলল, আমি যার সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম, সেই আমাকে ওখানে রেখে পালিয়েছে।

এ কাহিনীও চিরাচরিত। এ রকম ঘটনা এ সব অন্ধকার কানা গলিতে অজস্র ছড়ানো।

ভদ্রলোক মেয়েটির দিকে চেয়ে বলল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এখন কি করবে? যাবে কোথায়? নিজের বাড়ীতে?

মেয়েটি মুখ নীচু করে ভাঙা গলায় উত্তর দিল, সেখানে আমার ঠাঁই হবে না।

তা হ'লে? সুন্দরী মেয়ের বিপদ অনেক। চলতে চলতে যেখানে থামবে, দেখবে সেও আর এক অন্ধকার গলি। তোমার জন্য সেখানে আর এক অন্ধকার জীবন অপেক্ষা করছে।

মেয়েটি হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। ছুটে এসে ভদ্রলোকের পা চেপে ধরল, আপনি আমায় বাঁচান। সুস্থভাবে সংভাবে বাঁচার পথ বলে দিন।

মেয়েটির কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্য করে উঠল, খুব ভাল লোকের কাছে আশ্রয় খুঁজছ তুমি। রোজ সন্ধ্যায় আমি কোথায় যাই ত তোমার অজানা নেই। বাপ কিছু পয়সা আর শহরে গোটা তিনেক বাড়ী রেখে গিয়েছিলেন। আমি সুযোগ্য পুত্র, সে সবের সদ্গতি করছি। আমি নিজেই দাঁড়িয়ে আছি চোরাবালির ওপর, এখানে আমি তোমায় টেনে তুলব কোথায়?

মেয়েটি পা ছাড়ল না। বলল, এই বাড়ীর এক কোণে আমি থাকব। দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেবেন। যতদিন না কোন আস্তানা জোগাড় করতে পারি, এইটুকু দয়া আমায় করুন।

ভদ্রলোক চেষ্টা করে পা দুটো ছাড়িয়ে নিল।

আমার অবশ্য ইজ্জতের ভয় নেই। কিন্তু তুমি এক বাড়ীতে আমার সঙ্গে থাকলে লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি করে? বাজারে আমার সুনামের মূল্য কানাকড়িও নয়।

আপনার কাছে আমার কোন ভয় নেই। আর লোকের কাছে দেখাবার মতন মুখ তো আমার এমনিতেই নেই। নতুন করে লজ্জা পাবার ভয়ও নেই।

মেয়েটি রয়ে গেল। মেয়েটির নাম শর্মিলা। সে ভদ্রলোকটিও তোমার অচেনা নয়।

এসব কথা, এত সব কথা তোমার মনে আছে কিনা জানি না শর্মিলা। হয় তো পিছনের সব কিছু নির্মম হাতে মুছে ফেলে তুমি এগিয়ে চলেছ। কিন্তু বিশ্বাস কর সেদিন তোমায় আশ্রয় দেবার পিছনে আমার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। শুধু তোমার একান্ত অনুরোধেই এমন কাজ করেছিলাম।

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক পরের দিন।

পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে। প্রায় পথ রোধ করে।

বেরোচ্ছেন।

হ্যাঁ, হাসলাম, কোথায় যাচ্ছি তাও তোমার অজানা নয়।

একটা কথা ছিল।

আবার কথা।

তুমি ইতস্তত করে বললে, আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ হয়েছে। মাথাটা ঘুরছে। বার কয়েক বমিও হয়েছে। মাঝে মাঝে আজকাল আমার এ রকম হয়। কিন্তু আজ বড্ড ভয় করছে। আজকের দিনটা আপনার না গেলে চলে না।

চেয়ে চেয়ে তোমার আপাদমস্তক দেখলাম। চোখে মুখে যাতনার চিহ্ন সন্দেহ নেই। মনে হল কঠিন একটা ব্যাধির ভার তুমি কষ্টে বহন করছো।

শুধু কি তোমার দুটি চোখে যাতনার চিহ্নই দেখেছিলাম, তার সঙ্গে অনুনয়ের লিপিও ফুটে উঠেছিল।

কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম। আগের রাতে রোগা পদ্মর সঙ্গে একটু মন কসাকষি হয়ে গেছে। সেইজন্যই একটু আগে চলে এসেছিলাম। অবশ্য এমন রাগ-বিরাগের খেলা হামেশাই হয়। বাড়ীর বৌয়ের সঙ্গেই হয়, আর ওরা তো বাইরের লোক। সম্পর্কটা দেওয়া-নেওয়ার রূপোর তারে গাঁথা।

তাই অভিমান করে দু-একদিন না গেলে ইজ্জৎটা বাড়বে।

তোমাকে বললাম, তাহ'লে কি ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করব?

তুমি বললে, না, আজকের দিনটা দেখি।

পাঞ্জাবী খুলে ফেললাম। তোমাকে নিয়ে ছাদে এসে বসলাম।

আকাশে নক্ষত্রের রোশনাই। জমজমাট আসর। নীচের কোলাহল এত ওপরে স্তিমিত। একটা মাদুর পেতে দুজন বসলাম। তোমাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আলো অন্ধকারে তোমার যৌবন-পুষ্ট শরীরের কাঠামো চোখে পড়ছে।

হঠাৎ তুমি আমার কোলের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লে। অস্ফুট গলায় বললে, একটু মাথাটা টিপে দেবেন ... দারুণ যন্ত্রণা।

নারীজাতির ছলাকলায় আমি অনভ্যস্ত নই, কিন্তু বিশ্বাস কর শর্মিলা, তোমার সেদিনের অভিনয় আমি সত্যি বলেই মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তীব্র একটা যন্ত্রণায় সত্যিই তুমি কাতর।

সেদিন ছাদ থেকে নেমেছিলাম অনেক পরে। একেবারে অন্য মানুষ হয়ে। বাইরের মন খুঁজে আহ্লাদ পেয়ে ... মনে মনে ভেবেছিলাম, যে আকর্ষণে লোকলজ্জা, সমাজভয় সব মাড়িয়ে বাজারের কালি মুখে মেখে প্রতি সন্ধ্যায় বাইরে ছুটি, সে আকর্ষণের উপকরণ বাড়ীতেই রয়েছে।

শর্মিলাকে আপন করে নিতে আমার কোথায় বাধা। ত্রিকুলে কেউ নেই। কোন দিক থেকে সমাজের রক্তচক্ষু পথ রোধ করে দাঁড়াবে না।

কথাটা কিন্তু বলেছিলাম অনেক পরে।

ডাক্তার এসেছিল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তোমার শরীরে কোন রোগের অস্তিত্ব পায় নি।

এক সময় তুমিই হেসে একান্তে আমাকে বলেছিলে, রোগ তো আমার দেহে নয়, ডাক্তার কি করে সন্ধান পাবে? রোগ আমার মনে।

তোমার মনে?

হ্যাঁ, আমার রক্তে, আমার স্নায়ু শিরায়, আমার সত্তায় নীড় বাঁধার নেশা। একবার ঠকেছি বলে কি বার বার ঠকবো। একবার মানুষ চিনতে ভুল করেছি বলে কোনদিনই মানুষ চিনতে পারব না।

আমি বলেছি, কিন্তু আমার স্বরূপ তোমার জানা। অহঙ্কার করার মতন চরিত্র আমার নেই। তোমার যোগ্য হতে পারি এমন সম্পদও নেই।

তাই তোমাকে ভাল লেগেছে। তোমার চার পাশে অস্বচ্ছ কুয়াশা নেই। তুমি যা, তুমি তাই। তোমার মধ্যে ভাণ নেই। তুমি নিরাবরণ।

রেজেষ্ট্রি অফিস থেকে যখন ফিরলাম তখন তোমার রাজ্যেশ্বরী রূপ। কালো চুলের মাঝখানে রক্তরেখা। ব্রীড়াবনতা বধূর সলজ্জভাবের পরিবর্তে মহীয়সী মূর্তি।

জানি না, বাড়ীর ঝি-চাকরের দল অলক্ষ্যে হয় তো মুখ টিপে

হেসে থাকবে, কিন্তু আমার আর কোন দিকে চোখ ছিল না। চোখ আর মন দু'টোই তোমার সমর্পণ করেছিলাম।

কয়েকটা বছর কোথা দিয়ে কাটল আমি টেরও পাইনি।

মাঝে মাঝে নিজেকে বিশ্লেষণ করেছি। হ'তে পারে, তুমি সুন্দরী, যৌবনময়ী, কিন্তু তোমার সামান্য একটু স্পর্শ বল্গাহীন একটা জীবন মুহূর্তে সংযত হয়ে গেল কোন রহস্যে? মদ ছাড়লাম, বাইরের নেশা ছাড়লাম। পুরোপুরি গৃহস্থ সাজলাম তোমার কল্যাণে।

নিজের মনেই ভেবেছি। আমার তৃষিত অন্তর বুঝি এমনই এক জীবনই কামনা করছিল। পথে যেতে যেতে লোকের সাজানো সংসার দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি। পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। যার চেয়েছি সাধারণ এক দাম্পত্য জীবন। সুখ-দুঃখের মালায় গাঁথা।

ইচ্ছা করলেই হয়তো গৃহী হ'তে পারতাম। এ দেশে আর যা কিছুর দুর্ভিক্ষ হোক অনূঢ়া মেয়ের অনটন ঘটে না। কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম আশপাশের সবাই আমাকে ভাল করেই চেনে। আমার সাধ্য-শিকার কাহিনী। সজ্ঞানে তারা কেউ মেয়ে দেবে, এমন আশা কম।

দূর থেকে মেয়ে আমদানী করা যেত, কিন্তু একদিন না একদিন তার কাছেও ছদ্মবেশ খুলে পড়ত। চরিত্রহীনতার বিশ্রী কঙ্কালটা প্রকট হ'ত তার চোখের সামনে। তখন নতুন করে বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা জাগত। সেই বিশ্রী অবস্থার কথা চিন্তা করেও শিউরে উঠতাম।

তোমার কাছে আমার এ ভয় ছিল না। তোমার নিজের ভাষাতেই আমি নিরাবরণ। এমন জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যার চেয়ে পঙ্কিল স্থান কল্পনা করাও দুরূহ। আমার জীবনযাত্রার সঙ্গেও তোমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। দুজনের মাঝখানে ছলনার কোন ব্যবধান নেই। অযথা রোমাঞ্চ সৃষ্টির কোন প্রয়াস নয়।

তারপর বাবলু এল। আমার পৌরুষ আর তোমার কমনীয়তা মন্থন করে। তখন আমরা আগের বাড়ী ছেড়ে অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ীতে চলে এসেছি। লোকলজ্জার ভয়ে পাড়া বদল করিনি, পুরোনো ঋণের দায়ে বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত ছোট খাটো একটা ব্যবসা শুরু করেছি। মুনাফা বাবদ যেটুকু আসে ছোট সংসারের ক'টা প্রাণীর স্বচ্ছন্দে চলে যায়।

নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ উঠল। তুমি আমার নজরকে ফাঁকি দিতে পারনি। প্রথম দিনেই আমি টের পেয়ে গেলাম।

বিকেলবেলা চেক বইটা নেবার জন্ত বাড়ী এসেছি, দেখলাম তোমার সাড় নেই, চেতনা নেই। জানলার গরাদ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ। পা টিপে টিপে তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পাশেই নাচের স্কুল। মেয়েদের। জানলার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটি মেয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে নাচছে। শাড়ীটা শরীরে আঁটো করে বাঁধা। পায়ে ঘুঙুর। তবলার বোলের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে চলেছে।

শর্মিলা।

বার তিনেক ডাকের পর তোমার চমক ভাঙল।

যেখানেই আমি চমকে উঠলাম। মুখের এ ভাব, চোখের এ চাউনির সঙ্গে আমি পরিচিত। অন্ধকার গলির বাসিন্দাদের মুখে-চোখে এ ভাব আমি দেখেছি।

কি দেখছিলে? কণ্ঠস্বর সংযত করলাম।

মেয়েটা বেশ নাচে। বেশ তাল জ্ঞান আছে।

তুমি কিন্তু নিজেকে সংযত করতে পারনি। তোমার কথায় টানে মনের উদ্দাম আবেগ সঞ্চারিত।

এই শুরু, কিন্তু শেষ নয়।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখি তুমি নেই। পাশের ঘরে অল্প-অল্প কিসের শব্দ।

সন্তর্পণে উঠে পড়েছি। পা টিপে টিপে চৌকাঠ বরাবর গিয়ে দেখেছি, তুমি শাড়ীর আঁচল কোমরে বেঁধে লাস্য ভরে নেচে চলেছো। তোমার জ্ঞান নেই। চোখমুখের চটুল ভঙ্গী। অদৃশ্য অশ্রুত তবলার তালে তালে পা মিলিয়ে চলেছো।

শর্মিলা! বিস্ময় নয়, ক্রোধ। নির্মম ক্রোধে কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুহাতে মুখ চেপে বসে পড়লে মেঝের ওপর।

কাছে গিয়ে তোমার পিঠে হাত রাখলাম। সান্ত্বনার সুরে বললাম, এ কি সুরু করেছো তুমি? ভদ্রঘরের বৌ, সন্তানের জননী এ চাপল্য তোমার সাজে নাকি?

অনেকক্ষণ পরে তুমি মুখ তুললে। আরক্ত দুটি চোখ। মুখে তীব্র গন্ধ। যে গন্ধ আমার জীবন থেকে আমি নির্বাসিত করেছি, তাকে তুমি বরণ করে নিয়েছো।

এ কি, এ জিনিষ তুমি কোথায় পেলে।

তুমি কোন উত্তর দিলে না? একটু ভাবতেই আমি বুঝতে পারলাম, বাবলু হবার পর কিছুদিন তোমার শরীর খারাপ চলেছিল, সেই সময় ডাক্তারের নির্দেশে ব্র্যাণ্ডির বোতল আনা হয়েছিল। শরীর চাঙ্গা করার জন্য যে ওষুধের প্রয়োজন ছিল সেটা তুমি মনকে চাঙ্গা করার কাজে লাগিয়েছ।

আমি এ ঘরে চলে এলাম। পিছন পিছন তুমি এলে। আমি সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। বিছানায় এ পাশ ও পাশ করতে করতেই শুনতে পেলাম তোমার কান্নার শব্দ। সারাটা রাত তুমি কেঁদেছিলে।

মাস দুয়েক সব চুপচাপ। আমার মনে হয়েছিল, বুঝি চোখের জলে তোমার পুরোনো দিনের কামনা বাসনা ধুয়ে মুছে গেছে। বিগত দিনের ক্লেদাক্ত ছবিটা নিশ্চিহ্ন।

কিন্তু, ভুল, ভুল করেছিলাম।

একদিন গলির মোড়েই দেখা হ'য়ে গেল।

মাঝখানে সিঁথি। কোঁকড়ানো চুল কানের ওপর এসে পড়েছে। পানের ছোপে তরমুজের বিচির মত দাঁতের সার। দুটি চোখ আরক্ত। গিলে করা পাঞ্জাবী। কালা পাড় ধুতি পরনে।

সেই প্রথমে আমাকে দেখতে পেল। এগিয়ে এসে বলল, এই যে সোমনাথ স্যার।

ও পাড়ার বিখ্যাত লোক। মানুষ খুন থেকে মেয়েছেলে পাচার কোনকাজই দুঃসাধ্য নয়। বৈ ছলা খামাবার জন্য এ ধরণের লোক মজুত থাকে। নামটা, নামটাও মনে পড়ল করালী। করালীপ্রসাদ।

কি খবর করালী, এদিকে?

করালী মুখ চোখের বিশ্রী ভঙ্গী করে হাসল, আপনি তো শুনলাম স্যার একেবারে পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছেন। রোগা পদ্মর ক'দিন কি কান্না। এখন অবশ্য সামলে নিয়েছে। আমি এসেছিলাম পটলীর কাছে।

পটলী? একেবারে অস্পষ্টও নয়, আবছা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে নজর চালাবার মতন, কিছু বোঝা গেল, কিছু গেল না।

হ্যাঁ স্যার, ওই যে আপনার কাছে রেখেছেন একেবারে বৌ সাজিয়ে। শর্মিলা নাকি নতুন নাম দিয়েছেন।

জানা ঘটনা। শর্মিলার অতীত সম্বন্ধে কোন লুকোচুরি কোথাও ছিল না। তবু ভ্রূটা কুঁচকে গেল। রক্ত জমল মুখে। করালীর মুখে পুরোনো সম্বোধন যেন কুৎসিত রূপ নিল।

হঠাৎ?

হঠাৎ নয় স্যার। ক'দিন ধরেই শশী বাড়ীউলি আসতে বলছিল। পটলী বুঝি খানদুয়েক চিঠি লিখেছে তাকে। ও-পাড়ার সকলের জন্য মন কেমন করে। একবার দেখতে চায় সবাইকে। সোহাগী, বিরজা, ছোট ফুলী আশেপাশে যারা থাকত। তা ছাড়া ওর একটা টিয়া আর বেড়ালও থাকত, তাদের কথাও জিজ্ঞাসা করছিল।

খুব গম্ভীর গলায় শুধু বললাম, হুঁ।

ওসব মেয়েছেলে কি আর ভাল হয় স্যার। ক' বছর আপনার কাছে চুপচাপ ছিল, এই কত। ওর বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছিল, পথে বুঝি আপনার সঙ্গে দেখা, আপনাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একেবারে পাটরাণী সেজে বসেছিল। এখন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই আমায় বলছিল, মাঝে মাঝে এসে তুমি আমায় বেন্দাবন পালিত লেনে নিয়ে যাবে করালী। দুপুরবেলা, কেউ জানতে পারবে না। ঠাটের বৌ সেজে প্রাণ যাচ্ছে আমার।

আমি দেরী করিনি। তখনই করালীকে সঙ্গে ডেকে এনেছিলাম। বুঝেছিলাম এখন শুধু মাঝে মাঝে দুপুরবেলা যাবার নেশাটা তোমার রক্তে ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক যেমন করে সুটকেশ হাতে অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে তুমি আলোকিত পথে আসার চেষ্টা করেছিলে, একদিন তেমনি এই আলোর দেশ থেকে সরে গিয়ে আবার সেই অন্ধকার গলিতে গিয়ে ঢুকবে।

আত্মজের চেয়েও যার মমতা অন্ধকার গলির বেড়াল আর টিয়াপাখীর ওপর বেশী, সংসারের কোন বন্ধনই তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। তোমার সংসার সংসার খেলা শেষ হয়ে গেছে শর্মিলা। তোমার ক'দিনের নেশা কেটে গেছে।

আমাকে দেখে তুমি চমকাও নি, চমকালে আমার কণ্ঠস্বর শুনে.

যে সুটকেশ হাতে করে তুমি আমার সংসারে এসে দাঁড়িয়েছিলে সে সুটকেশ আর নেই। তার চেয়ে বড় একটা সুটকেশ তোমার সামনে টেনে নামিয়ে দিয়ে বললাম, যা তুমি নেবে, এর মধ্যে গুছিয়ে নাও। করালী নীচে অপেক্ষা করছে।

প্রথম কয়েক মিনিট ব্যাপারটা তুমি আদৌ বুঝতে পার নি। যখন পারলে সারা মুখে একটা কালোছায়া নেমে এল।

আমতা আমতা করে বললে, কিন্তু আমি তো—

বাধা দিয়ে বললাম, এই মুহূর্তে হয়তো সম্পূর্ণভাবে সরে যাবার জন্য তৈরী হও নি, কিন্তু আমি জানি যাবার সুর তোমার কণ্ঠে গুনগুনিয়ে উঠেছে। আজ নয় কাল, তুমি যাবেই। যেতেই যদি হয়, তবে যত শীঘ্র যাও ততই মঙ্গল। সংসার, স্বামী, সন্তান যাকে বাঁধতে পারে না, তাকে বাঁধবার রজ্জু পৃথিবীতে নেই।

চুপচাপ তুমি দাঁড়িয়ে রইলে শর্মিলা। মেঝের দিকে চোখ রেখে। তারপর হঠাৎ বললে, আমি কিন্তু এ জিনিস কল্পনা করি নি। করালীকে ডেকেছিলাম, তার সঙ্গে হয়তো একবার ঘুরে আসতাম পুরোনো পাড়ায় তার বেশী নয়।

হাসলাম। অনেকদিন এমন ছাদ কাঁপিয়ে হাসি নি। আওয়াজে করালী নীচে থেকে সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়াল।

তোমার কি ধারণা আমি এক সময়ে লম্পট ছিলাম বলে, আমার সংসারের কোন পবিত্রতা নেই? এটা এমন জায়গা নয়, যেখানে খুশীমত আসা যাওয়া চলতে পারে।

শর্মিলা তুমি অনুনয় করে কি বলতে গিয়েই থেমে গেলে। পাশের স্কুলে নাচের আসর বসেছে। উদ্দাম নূপুরের শব্দ। তবলার বোল। সঙ্গে কে যেন গানও ধরেছে।

করালী তাগিদ দিল, নাও, কি করবে কর। আমি কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব। দেরী হয়ে গেলে আবার মাসীর মুখনাড়া খেতে হবে।

আস্তে আস্তে তুমি ফণা তুললে। বাঁশীর সুরে কালনাগিনী যেমন ভাবে ল্যাজে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। পাশের ঘরের দিকে যেতেই ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম।

ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? তোমার পথ এদিকে।

বাবলু, আমার বাবলুকে আমি নিয়ে যাব।

না, তোমার বাবলু নয়। তোমার বেড়াল, তোমার টিয়া, তোমার রাতের নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া জীবন! বাবলু যখন তোমার কোলে এসেছিল, তখন তুমি জননী ছিলে, দু'টো হাত দিয়ে আঁকড়ে ছিলে সংসার। আজ তোমার সে আকর্ষণ শ্লথ, তুমি বিশেষ কোন সংসারের নয়।

আরে পটলী হল কি তোমার? এমন কত বাবু পায়ের কাছে পড়ে থাকবে। নাও, চল, চল। ওসব সংসারধম্মো করবে বয়স গেলে। করালী সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল।

নৃত্যের বিরতি নেই। আবহসঙ্গীতের চড়া সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে। তোমার রক্তেও বুঝি মাদল বেজে উঠল। ঘর ছাড়ার ছন্নছাড়া সুরের লহরী।

করালীর পিছন পিছন তুমি দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে।

মুহূর্তের জন্য একটু বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। এবার, এবার কি কর্তব্য। কি বলব প্রতিবেশীদের? বাবলুকে কি বোঝাব।

সেদিন পাঁজির পাতায় একটা শুভযোগ ছিল। শুভযোগটা শুধু পাঁজির পাতাতেই নয়, আমাদের ভাগ্যেও। লক্ষ্য করেছিলাম দলে দলে পুণ্যার্থীর দল চলেছে গঙ্গাস্নানে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে।

সেই পুণ্যলগ্নটুকু কাজে লাগালাম।

সন্ধ্যার একটু পরেই চেঁচামেচি শুরু করলাম। তুমি যখন যাও, তখন ভাগ্যক্রমে চাকর-বাকররাও বাইরে ছিল। সম্ভবতঃ তারাও গঙ্গায় অবগাহনের এমন সুযোগটুকু ছাড়ে নি।

চীৎকারে চাকর-বাকর জড়ো হ'ল। কিছু কিছু প্রতিবেশীও এসে জুটল।

বললাম, শর্মিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুপুরবেলা কাউকে না বলে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল, এখনও ফিরে আসে নি।

পাড়ার ছোকরারা দল বেঁধে ছুটল। এঘাট ওঘাট। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে চেহারার বর্ণনা। থানা পুলিশ অবধি গড়াল। কোথাও তুমি নেই।

দু'একজন প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশী জাল ফেললেন মকরবাহিনীর বুকে। তোমার লাশ পাওয়া গেল না। সবাই সিদ্ধান্ত করল, খরস্রোতে তোমার দেহ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। প্রতিবেশিনীরা একযোগে স্বীকার করল, তোমার মতন সাধ্বী রমণী এ যুগে বিরল।

আমি কোন কথা বলি নি। শোকে মুহ্যমান, এই ভাব নিয়ে বাবলুকে বুকে আঁকড়ে চুপচাপ বসে থেকেছি।

প্রতিবেশীরাই পরামর্শ দিয়েছে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। কিছু বলা যায় না, যদি কোন দুর্বৃত্তের কবলে দূরে কোথাও চলে গিয়ে থাক, তাহলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কোনরকমে যদি ফিরে আসতে পার, নিজের ছত্রখান সংসারে।

বাবলু তোমায় ভুলে যাবে। নিজেকে মাতৃহীন কল্পনা করেই সে বড় হয়ে উঠবে। আমার স্মৃতিতেও তুমি হয়তো বেশীদিন বেঁচে থাকবে না। তুমি আমাকে পঙ্কিল পিচ্ছিল পথ থেকে ফিরিয়েছ, সে গৌরবটুকু তোমার। সে গৌরব থেকে কোন দিনই তোমায় বঞ্চিত করব না।

আমার কেবল একটা ভয়, শর্মিলা। একটা বিরাট ভয়।

আবার যদি কোনদিন অন্ধকার জীবনে ক্লান্তি আসে তোমার? সুর আর সুরার পরিবেশে বিতৃষ্ণা জাগে? জানলা দিয়ে কোন গৃহস্থ-বাড়ীর পরিপাটি নিটোল সংসারের ছবি দেখে নিজের ফেলে-আসা সংসারে ফিরে আসতে সাধ হয়? পায়ে-পায়ে আবার যদি আমার দরজায় এসে দাঁড়াও, নতুন জীবনের প্রত্যাশী হয়ে, তাহ'লে বাবলুকে কি আমি বোঝাব, কি বলব পড়শীদের, নিজের যে হৃদয়কে সবল মুঠিতে চেপে ধরে তোমাকে উপেক্ষা করার ভাণ করেছি, তাকে কি ভাবে শান্ত করব?

তাই বলছি, শর্মিলা, এতগুলো বিপর্যয় ঘটাতে তুমি আর ফিরে এস না। তোমার চলে-যাওয়া সহ্য করেছি, কিন্তু তোমার ফিরে আসা দুঃসহ। সেটা আমি আর বাবলু, কেউ সইতে পারব না।

হিমালয়ের ঘুম ভেঙেছে।

ত সহস্র বছর পর হিমালয়ের ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে।

এই শত শত যুগের ভিতর কত যোগী, মুনি তার ক্রোড়ে বসে চরম সত্যের সন্ধান পেয়েছে, হিমালয় তার কিছুই টের পায়নি।

দস্যুর তাণ্ডব দলনে এ ঘুম ভেঙেছে। দস্যু চীন।

হিমালয়ের সন্তানরা ছুটোছুটি করছে এদিক-ওদিক। গৌরবর্ণ, নিটোল স্বাস্থ্য, সদা প্রফুল্ল হাসিমুখে পার্বত্য পুত্র-কন্যার দল ছুটোছুটি করছে। আত্তোর সুন্দরী, মিশমি যুবতী নির্ভয়ে করেছে চলাফেরা। লাদাকের শান্ত পরিবেশে হাসিভরা মুখে লামার দল গেয়েছে মহামতি বুদ্ধের জয়গান, যে গানের শুরু হয়েছে আজ থেকে ঠিক আড়াই হাজার বছর পূর্বে। গিরিশৃঙ্গে সূর্যালোক উদ্ভাসিত করেছে মহাদ্যুতির মন-মাতানো অনুপম রূপ। দূরাগত বহুযাত্রী সেই রূপকেই গ্রহণ করেছে বিশ্বস্রষ্টার প্রতীকরূপে। রোদনাশ্রুতে বরণ করেছে হৃদয়-দেবতারূপে। ঐ উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে তুষারাবৃত শ্বেতাসনে আসীন মহাযোগী মহেশ্বরই কি একদিন বিশ্বজগতে পেয়েছিলেন ত্যাগের মহিমা? ত্যাগ থেকেই সুখ—হিমালয়ের এ মহান শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীতে একদিন ছড়িয়েছিল শান্তির মহাবাণী। তাই যোগীর বসন গৈরিক। গেরুয়া মানেই ত্যাগের নিশানা।

শুধু হিন্দুস্থানের হিন্দুরাই নয়, বিশ্ব-দরবারে ত্যাগের সিম্বল্ গেরুয়া রঙটি পরম শ্রদ্ধার প্রতীকরূপে সর্বজনস্বীকৃত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সবাই সন্ন্যাসের এ বসনকে জানায় সম্মান। এ সম্মান আজকের নয়।

সভ্যতার প্রথম সূর্যোদয়ের দিন থেকে গৈরিক রঙের এ মর্যাদা দিয়ে এসেছে ভারত সন্তান।

একটি দু'টি দিন নয়। বারোটি বছর কঠোর পরিশ্রমে ব্রহ্মচর্য পালনের পর যোগীকে দেওয়া হয় এই পবিত্র বেশ। গেরুয়া ধারণ যত সহজ মনে হয়, আসলে কাজটা তত সহজ নয়।

তাই হিমালয়ের শিখর থেকে দলে দলে লামা যখন সমতল ভূমির দিকে নেমে আসছিল তখন সরলমতি পার্বত্য সন্তানদল হৃদয় প্রাণ মন দিয়ে জানালো তাদের সাদর অভ্যর্থনা। আশ্রয় দিল নিজেদের পর্ণকুটীরে। খাবারের প্রাচুর্য তাদের কোনো দিনই ছিল না। তবুও ঘরের অতিথির সেবায় কোনো ত্রুটি ঘটতে দিল না। শুধু অতিথি নয় গৈরিক বসনধারী মহামতি বুদ্ধের পূজারী ভিক্ষু। তার সেবার ভারটুকু নিতে কুটীরের সবাই যেন ব্যস্ত। সেবার সুযোগটুকু পেয়েই তারা কৃতার্থ। কোনো বাড়ী থেকে চালের পাতাটুকু, কোন ঘর থেকে মাখনটুকু চেয়ে-চিন্তে যে যা জোগাড় করতে পেরেছে দিনান্তে তাই দিয়ে করে এসেছে অতিথি সেবা।

মনে প্রাণে তারা বিশ্বাস করে ঐ গৈরিক বসনাবৃত ভিক্ষুর সেবার ভিতর দিয়েই তারা যেন করছে মহামতি বুদ্ধের পরিচর্যা। লামা, বৌদ্ধ ভিক্ষুই তো মহামতি বুদ্ধের জীবন্ত প্রতীক। শীতের রাতে মাখন চায়ের পিরিচ হাতে তুষারস্নাত কুটীরে বাপ-দাদা-ঠাকুর্দার গল্পে তারা যে এ কথাই শুনে এসেছে। সরল মন হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধাবনত। ভক্তিপ্লুত হৃদয় সর্বস্ব উজাড় করে দিতে চেয়েছে ঐ গৈরিক বসনাবৃত সুপুরুষদের পায়ে। দু'হাত তুলে ভিক্ষু জানিয়েছে আশীর্বাদ।

অসুখ-বিসুখে, শোকে-আনন্দে এরা শুধু মহামতি বুদ্ধেরই শরণাগত হয়েছে। শোকে সান্ত্বনা, বিপদে অভয়, হতাশায় নব প্রেরণা পেয়েছে বুদ্ধের সন্তানদল ঐ ভিক্ষুদের বিহার থেকেই।

এদের ভিতর অনেককে আবার মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে তিব্বত, কেউ কেউ নীচে নেমে গেছেন শ্রীনগর, জম্মু। সাহসী দু'পাঁচজন দার্জিলিঙ, দিল্লীতেও গেছেন ব্যবসায়ের কাজে। মূলধন অল্পই। জ্ঞান আরও অল্প। তাদের খবর না পেয়ে ভীতিবিহ্বল চিত্তে এই সরলমতি পার্বত্য সন্তানদল ছুটে গেছে ভিক্ষুর বিহারে, শরণ নিয়েছে পথচারী গৈরিক বসনধারী লামার চরণে।

আশ্চর্য ব্যাপার! ঠিক খবর এসে গেছে।

এমন কি সশরীরেও অনেকে ফিরে এসেছে।

হিমালয়ের গুহাতে বহু লামা শত শত বছরব্যাপী যোগাসনে মগ্ন রয়েছেন। তিনশো বছরের লামার অলৌকিক কাহিনী শুনেছি একাধিক বিদগ্ধ দার্শনিকের মুখে। তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁদের কথা অবিশ্বাসের কোনো কারণই নেই। সম্পূর্ণ গুহাটা তাঁরা অঙ্গুলি হেলনে দোলাতে পারেন। যে বিশ্ববন্দিত দার্শনিক এর প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়েছেন, বিচরণকালে দেখেছি তাঁর মুখে বিস্ময়জড়িত শ্রদ্ধা। সেই লামার দল নীচে নেমে আসছে।

উত্তেজনার শেষ নেই।

একদিকে শত্রুর আক্রমণের বিরক্তিকর অকারণ ব্যস্ততা। অপরদিকে অতিথি সংকারের নতুন কাজ। হিমালয়ের পদপ্রান্ত কর্মব্যস্ততায় হঠাৎ হয়ে উঠলো মুখরিত।

যত শক্তিশালীই হোক না কেন অভিজ্ঞতায়, সামর্থ্যে, শক্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তুলনা বিরল। সাহসে তাদের নেই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী। এ খবর কে না জানে?

দুর্বার স্রোতই আসুক বা সাগরের প্লাবনের শক্তিশালিনী জলধারাতেই হোক অহিফেনখোর ঘুমন্ত নেশাগ্রস্ত শত্রুবাহিনী কোন্ পথে প্রবেশ করবে এ দুর্ভেদ্য হিমালয়ের দুর্গ ভেদ করে?

কিন্তু কি আশ্চর্য?

দুর্গ ভেদ না করলেও দস্যু লুকিয়ে এ ফাঁক ও ফাঁক দিয়ে যেন ঢুকে পড়েছে। অনধিকার প্রবেশ তো বটেই। কিন্তু ঢুকলো কি করে? কোথেকে জানলো তারা এ বন্ধুর পথের প্রবেশ পথ? গোপনীয় না হলেও সে পথ নিশ্চয়ই নয় সর্বজন পরিচিত।

সত্যি একটু অবাক লাগারই কথা নয় কি? এ পথ চেনা যে অত সহজ ব্যাপার নয়। স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া অবলীলাক্রমে চলাফেরা করা যেন সত্যিই একটা দুঃসাধ্য কাজ। তা ছাড়া এ পথে তো কেউ অচেনা পথচারীকে চলতেও দেখে নি।

বৃদ্ধ অতীশ এতক্ষণ বসে সেই কথাই ভাবছিল। লড়াই-এর বেশী কিছু তার নেই জানা। লড়াই যুদ্ধকে সে ঘৃণা করে। বেশ কিছুদিন পূর্বে সে একবার শুনেছিল কোথায় যেন লড়াই বেধেছে। বহু লোক মারাও গেছে। তার আগেও একবার ও রকম একটা গুজব শুনেছিল। দু'কুড়ি বছরের ভিতর বার দু'এক ওরকম কানাঘুসো গুজব এসেছে তার কানে। কোনোটাই তাকে চিন্তিত করে নি। পাঁচ কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় সে এটা ঠিক জেনেছে যে হিমালয়ের নখাগ্র স্পর্শ করার সাহসটুকু নেই কারুর। ধূলিকণায় পদক্ষেপ তো তার পরের কথা।

লামার দলকে উপর থেকে নামতে দেখে বৃদ্ধ একদিন মুখ ফুটে তাদের জিজ্ঞাসাই করে বসলো, কি হয়েছে বলতে পারো? হঠাৎ হিমালয়ে এ চঞ্চলতা এলো কোত্থেকে?

বিস্ময়ে তারা বৃদ্ধের অজ্ঞতায় হতবাক হয়েছে। লোকটা কোথাকার বেকুব বলো তো! দস্যু চীন ভারত আক্রমণ করেছে। অতর্কিতে দেশ লুণ্ঠন করতে এসেছে, এ বৃদ্ধ তার কোনো খবরই পায় নি? বলি ঘুমিয়ে ছিলে এত দিন? প্রশ্ন করে আগন্তুক পথচারী।

কুটীর ছেড়ে বেরোয় সে।

এতজন লামা সন্ন্যাসীর থাকার, খাওয়ার আয়োজন পারবে কি করে উঠতে স্থানীয় যুবকদল? লাঠি ছাড়াও আজকাল সে ভালো ভাবেই হাঁটাচলা করতে পারে। হাতে কাজ থাকলে কখনও তার বয়সের কথা মনেই থাকে না।

গ্রামের লোক মিলিত ভাবে সন্ন্যাসীদের সেবার ভার গ্রহণ করলো। মহামতি বুদ্ধের সন্তানদের পদধূলি পড়েছে এ গ্রামে। এ গ্রাম পবিত্র হয়ে গেল যে। একসাথে এতজন গৈরিক বসনধারীর সমাবেশ কখনও ঘটে নি এ ছোট্ট পাহাড়ের ছায়াঘেরা গ্রামটিতে। বৃদ্ধ অতীশের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে যেন নবযৌবন ফিরে পায়। নতুন উৎসাহে সে ছুটোছুটি করে। ভিক্ষুদের সেবায় যেন কোনো ত্রুটি হয় না কারুর।

গ্রামের ছোট্ট বিহারে আর ক'জন ভিক্ষুর জায়গা হবে? তাই ঘরে ঘরে গৃহীদের সাথে মিলে-মিশে থাকার ব্যবস্থা নির্ধারণ। কেউই বাধ্য হন কেউ না জানান সামান্য আপত্তি।

সন্ন্যাস জীবনের কঠোর-ব্রত। আকাশের তলায় করতে হবে বসতি। উপরের আচ্ছাদন শুধু নীলাকাশ। গৃহীদের সাথে তারা থাকবেন কি করে?

অতীশ শুধু এ গ্রামের নয়, এ অঞ্চলের প্রায় সব লামাদেরই মুখচ্ছবি ও পরিচয় জানে, কারুর সাথে আছে অন্তরঙ্গতা, কারুর সাথে বা শুধু চাক্ষুষ পরিচয়। সে তো আর আজকের লোক নয়— পাঁচ-কুড়ি বছর ধরে সে এই হিমালয়ের বুকের ওপরের ঐ কুটীরখানি আগলে পড়ে আছে। ধ্যান-ধারণা আরাধনা সবই নিয়ন্ত্রিত শুধু ঐ ছোট্ট গ্রামখানি ঘিরে।

সাপ ধরতে জানেন বুদ্ধপুত্র? সাপ?

হিমালয়ের এই জনপদের সন্ন্যাসীটির পিতৃদত্ত একটা নামও ছিল। কিন্তু সবাই সে নাম ভুলে গেছে। ভক্তির আধার, তপস্যার আদর্শবলে সরলমূর্তি এ পর্বতজনপদের সমস্ত গ্রামবাসীর হৃদয় জয় করেছিল। সকলের কাছে তার পরিচিতি শুধু অতীশ নামে।

রোজই দু'বেলা এসে বৃদ্ধ সকলের তত্ত্বাবধান করে যায়।

দু'টি-চারটি অপরিচিত নতুন মুখ দেখে তাদের কাছে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে।

শৈশব থেকেই লামা বৌদ্ধভিক্ষুদের সাথে তার অন্তরঙ্গতার ছিল না কোনো অন্ত। মেহাৎ বারা বয়সে কাঁচা তাদের মুখগুলোয় নিজেই তাকে একটু কাছে গিয়ে তাকাতে হয়। পরিচয়টুকু পেলেই অতীশ তাঁদের চিনে ফেলেন।

ক'দিন থেকে দু'টি লোকের চালচলন হাবভাবে অতীশ লক্ষ্য করছে কিছু অভিনবত্ব। নিজে লামা না হলেও লামার নিয়ম কানুন বিচার পদ্ধতি এমন কি তাদের হাঁটাচলাটুকু পর্যন্ত অতীশের নখদর্পণে।

ছাঁচে ফেললে একটা জিনিষ যেমনভাবে তৈরী হয়ে আসে, এ লামা-জীবনও ঠিক সেই রকম। এদের জীবনযাত্রা প্রণালী সব একরকম। এর ভিতর নেই কোনো চুলচেরা অভিন্নতা। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে অতীসের মনে হয় এ দু'টি জীবনকে যেন কেউ জোর করে লামা করে দিয়েছে। পাঁচ কুড়ি বছর ধরে জীবনে সে অনেক কিছুই দেখে আসছে। চোখের ভাষায় একটা মানুষের চরিত্র সে পড়তে পারে। লামাদের চোখের সে সরল দৃষ্টি এ দু'টি লোকের নেই কেন? তবুও অতীস তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করে না। জিজ্ঞাসা করা অপ্রাসঙ্গিক, অনুচিত। ঠিক হয়ে যাবে, যথাসময়ে মহামতি বুদ্ধ এদের চোখেও দেবেন ধ্যানস্তিমিত সরল ভাবটুকু।

প্রার্থনার সময়েও অতীস লক্ষ্য করে এ দু'টি প্রাণীর অকারণ চঞ্চলতা। যেন কিছুতেই এদের মন বসে না। শিশুর মতন এ চঞ্চলতা দেখে বৃদ্ধের মনে মায়া হয়। মনে মনে ভাবেন, এ দু'জনের সন্ন্যাসজীবন নিশ্চয়ই এখনও পূর্ণ হয় নি। নিশ্চয়ই বেচারারা গৃহবন্ধন মুক্ত হতে পারে নি। না হলে কেন এদের এ চঞ্চলতা? প্রার্থনাতে পর্যন্ত কেন নেই এদের পূর্ণ মনোযোগ।

একদিন দু'জনের ভিতর একজন ভিক্ষু হঠাৎ তার কুটীরে গিয়ে হাজির।

অতীস একটু অবাক হলো।

'মহামতি বুদ্ধের জয় হোক।' বলে সে ভিক্ষুকে জানাল সাদর সম্ভাষণ।

ভিক্ষু প্রত্যভিবাদন নিবেদন করে কুটীরে প্রবেশ করলো।

কুটীরের চারিদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিপাত করতে করতে অত্যন্ত সচকিত ভাবে ভিক্ষু অতীসের কাছ ঘেঁসে এসে বসল। তারপর ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলো, 'সাপ ধরতে জানেন বুদ্ধপুত্র? সাপ?'

অতীসের প্রত্যয় দৃঢ় হলো। এ ভিক্ষু নির্ঘাৎ উন্মাদ। তবুও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ধরার কথা জিজ্ঞাসা করছেন?'

ভিক্ষু অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'সাপ। দেখেছেন কেউটে, গোখরো, জলঢোড়া, লাউডগা, বেত আছড়া, চন্দ্রবোড়া সাপ? আমি ধরতে বেরিয়েছি কেউটে, জানেন ধরতে?'

অতীস নির্বাক ভাবে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে বসে রইলেন। তার বলার কিছুই নেই।

ভিক্ষু নিজেই বলতে লাগলো, 'শুনুন তাহলে, কেউটে ধরা এমন বিশেষ কিছুই শক্ত কাজ নয়। বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে তাকে মারতে চাই না। জ্যান্ত ধরতে চাই। আমি বাঁশী-বাজী সাপুড়ে। বাঁশ বাজিয়ে সাপ ধরে থাকি। যে বাঁশের মিষ্টি সুরে শুধু সাপ নয় শক্ত কট্টর হৃদয়ও গলে যায়। শুনতে চান আমার বাজনা?'

অতীস জানে না তাকে কি বলতে হবে। একটা বদ্ধ উন্মাদকে আর বলার কি আছে?

সে শুধু অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। কাছে-পিঠে একটা জনমানবও নেই যে অতীসের ডাকে সাড়া দিতে পারে। তবে এ লামা কোনো ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না।

—'খবর পেলে ডাকতে ভুলবেন না বুদ্ধপুত্র। শুনেছি আপনার এ গ্রামে সাপ ঢুকেছে। সাপ। বিষধর কেউটে। তাই ছুটোছুটি করছি। খবরটুকু পেলেই একটা ডাক দেবেন। সাপ ধরার মন্ত্র আমি জানি।'

আর টুঁ আওয়াজটুকু না করে লামা অতীসের পদধূলি নিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিল। হাসিমুখটুকু দেখে অতীসের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। এ হাসিমুখ কখনই উন্মাদের নয়।

রহস্যটা ক্রমশই যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

তবে ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

ওদিকে দ্বিতীয় লামাটি প্রায়ই গ্রামীণ বিহার থেকে অন্তর্ধান হয়। কেউ অবশ্য সে খবরে বিশেষ গা দেয় না। এত শত বুদ্ধপুত্র, এত লামা, গৈরিক বসনধারী ভিক্ষু এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, কার সবার দিকে মনোযোগ দেবার অত সময় আছে?

সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হলেও বৌদ্ধ লামাটি যে সাধারণ লোক নয় বা ভিক্ষু নয় এ বিষয়ে অতীসের মনে নেই লেশমাত্র সন্দেহ। বাইরে সে অবশ্য কিছু বলল না। বলার কি আছে? কাকে বলবে? কে শুনবে?

হিমালয়ে এসেছে চঞ্চলতা। নতুন চঞ্চলতা। দস্যু চীনকে তাড়াতে হবে। হাতিয়ার মেলে ভালোই। হাতিয়ার ছাড়াও এরা যুঝতে জানে। চল্লিশ কোটি সন্তান শুধু বাহুবলেও বহু দস্যুকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না কি?

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গ্রামে গ্রামে সমবেত হয়েছে গ্রামবাসী। চোখে তাদের জ্বলছে অগ্নিশিখা—শত্রুর আক্রমণের প্রতিবাদের অটল সঙ্কল্প নিয়েছে তারা মনে মনে। বিভেদ ভুলেছে। এতদিনের নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার কথা ভুলেছে। সামাজিক আচার বিভেদ ভুলেছে, মিশমির পাশে দাঁড়িয়েছে আভোর, লাদাকীর পাশে দাঁড়িয়েছে মিশমি। হৃদয়ে প্রাণে মনে সব হয়ে গেছে এক। উদ্দেশ্য এক। গন্তব্য পথ এক। লক্ষ্য এক—দস্যু চীনের দমন।

'দমন করতে হবে চীনের স্বেচ্ছাচারী রাজ্যজয় স্পৃহা, দমন করতে হবে তাদের অন্যায় অত্যাচার, শেষ করতে হবে তাদের জিঘাংসা প্রবৃত্তি। পবিত্র ভারতভূমি যে হাজার হাজার বর্গমাইল

তারা অন্যায় ভাবে, দুনিয়ার আইন অমান্য করে তাঁর বিচারকে অগ্রাহ্য করে আপন করতলগত করে রেখেছে, সে ভারত তুখণ্ড করতে হবে পুনরধিকার। হিমালয়ের পূত অঙ্গ কখনই ছাড়া হবে না দস্যুর হাতে। মায়ের এ অপমান যে সন্তান সহ্য করতে পারে সে সন্তান কুসন্তান। তার প্রাপ্য শুধু প্রাণদণ্ড, দেশবাসীর কাছে সে ঘৃণ্য কীট, মহামতি বুদ্ধ তাকে কখনই করবেন না ক্ষমা।'

বৃদ্ধ অতীস যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এতগুলি কথা তিনি জীবনে কখনই একসাথে বলেন নি।

গ্রামীণ বিহারের চারিদিকে সমবেত জনতা শুনলো যেন তাদেরই প্রাণের কথা। তাদের মনের কথাটুকুই যেন রূপ পাচ্ছিল অতীসের মুখ দিয়ে।

মন্দিরের প্রার্থনায় চঞ্চলতা আসার কারণ থাকতে পারে। ধর্মে সবার মতি সমান হয় না। কিন্তু দেশপ্রীতি যে ধর্মেরও মহা উর্ধ্বে। অতীস প্রথম থেকেই লক্ষ্য করে আসছিল সেই দু'টি লামার অকারণ চঞ্চলতা।

প্রথমটিকে সে শুরু থেকেই দেখেছে অনুপস্থিত। কিছুক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করেছে দ্বিতীয়টির অন্তর্ধান।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গ্রামবাসীর দল ধীরে ধীরে ফিরে যেতে লাগলো আপন কুটীরে। অতীসের কি একটা খেয়াল হলো। বিহারের পিছনে পাহাড়ের গা ঘেঁসে যে উঁচু ছোট জনহীন শৃঙ্গটি আছে তার কাছে গিয়েই সে যেন শুনতে পেল একটা মানুষের অস্পষ্ট আর্তনাদ। গুঞ্জন বললেই ঠিক হয়।

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ সেদিকে অগ্রসর হল। বৃক্ষহীন প্রস্তরখণ্ডে এসে সে যা দেখলো তাতে তার প্রাণটা যেন হঠাৎ উড়ে গেল। সে দেখলো সেই অর্ধোন্মাদ লামাটি হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। [illegible] আর্তনাদ আসছে তারই মুখ থেকে। তার পাশে পড়ে রয়েছে আহত অপর লামা। সেই দ্বিতীয় লামাটি।

পা টিপে টিপে অতীস লামার কাছে গেল। সংজ্ঞা হারায় নি এখনও মনে হচ্ছে।

অস্পষ্ট ভাষায় ফিস্‌ফিস্ করে সে অতীসের কানে কানে বলল, 'বন্ধু ধরেছি সাপ। আসল কেউটে। জ্যান্ত বীণ বাজানো বৃথা শিখি নি। ঐ যে ঐ পড়ে রয়েছে কেউটে। মরে নি এখনও ওকে ধরো।'

অতীস ধীরে ধীরে দ্বিতীয় লামাটিকে গিয়ে ধরে ফেলল। পালাবার তার কোনো পথ ছিল না।

ধীরে ধীরে দু'জনে মিলে তাকে বিহারের সামনে খাড়া করলো।

তার কাছ থেকে বেরুলো কার্তুজহীন শূন্য দু'টো পিস্তল, কতকগুলো মানচিত্র আর দু'টো ছোট ছোট বাক্স।

লামাবেশধারী ডিটেক্‌টিভ অফিসার অমিতাভ এসে সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, 'এর এই বাক্স দু'টি ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। একে বলা হয় ট্রানসিস্টর। এতে দু'টো সেট আছে। একটা খবর পাঠাবার একটা নেবার। এই মেশিন দিয়েই এ কেউটে পাঠাতো সব গোপনীয় খবর।'

অতীস এতক্ষণ যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না।

ভক্ত বুদ্ধপুত্র দু'হাতে মহামতি বুদ্ধকে প্রণতি জানিয়ে শুধু বলল, 'ইস্ কি অনাচার! গৈরিক বসনের এ কি অপরিসীম অপমান।'

ডিটেক্‌টিভ অফিসার অমিতাভ বললেন, 'ঠিক বলেছেন বুদ্ধপুত্র, শুধু গৈরিক বসনের নয়, এ প্রতারণা মানব সভ্যতার গ্লানিভরা অপমান। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল।'

কৃষ্ণসাগর-গর্ভে প্রাচীন নগরী

ওয়াই. গুরিয়েফ

প্রাচীন নগরী দিওস্‌কুরিয়া ও সেবাস্তোপোলিস্ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল? শতাধিক বৎসর এই প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। প্রাচীন গ্রীক ভূগোলবিদদের বিবরণ থেকে জানা যায়, দিওস্‌কুরিয়া ও সেবাস্তোপোলিস্ ছিল ককেসাসের কৃষ্ণসাগর-উপকূলের দুইটি বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র। গ্রীক ভূগোলশাস্ত্রীরা নগরী দুইটির সঠিক 'ঠিকানাও' লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কিন্তু সেই ঠিকানা অনুযায়ী খননকার্য চালিয়েও কোনো বৃহৎ জনপদের ধ্বংসাবশেষের কোনো আভাস মেলে নি। হালে ঐ দুইটি হারানো নগরীর সন্ধান মিলেছে। সুখুমি বাঁধের পুনর্নির্মাণের কাজ চলবার সময় কর্মীদল বৃহৎ দুর্গ-প্রকোষ্ঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। কোন্ এক দানবীয় শক্তির আঘাতে দুর্গের প্রাচীরগুলি ভেঙ্গে ধসে আলাদা হয়ে একদা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আব্‌খাসিয়ার গুলিয়া হিস্টরি ইনস্টিটুটের পরিচালনাধীনে সুখুমি উপসাগরে অনুসন্ধানের অভিযান শুরু হয়ে গেল। ডুবুরীদের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা জলের তলের এক বিস্তীর্ণ আয়তন পরীক্ষা করতে সক্ষম হন। লুপ্ত নগরী দুইটির রহস্য এতদিনে উদঘাটিত হয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে, বর্তমানের সুখুমি উপসাগর এককালে একটি বৃহৎ নিম্নভূমি ছিল। কেলাসুরি ও গুমিস্তা নদীর ব-দ্বীপ দুইটি মিলে গড়ে তুলেছিল এক অনুকূল মোহনা উপসাগর। এইখানেই খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন গ্রীকরা একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এই উপনিবেশের নাম দিয়েছিল তারা দিওস্‌কুরিয়া। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক প্রবল ভূমিকম্পে বহু নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেল। কেলাসুরি নদী পশ্চিমে সরে গিয়ে সরাসরি সাগরে গিয়ে মিশল। সাগর-প্রান্তে নদীসৃষ্ট প্রস্তরখণ্ডের ও বালুকার স্বাভাবিক বাঁধ ভেঙ্গে ধসে পড়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ে নিম্নভূমির উপর। এইভাবে দিওস্‌কুরিয়ার ধ্বংস হল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত রোমান দুর্গ সেবাস্তোপোলিসেরও অনুরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করতে হল। উপকূল-ভাগের প্রায় ৩২ কিলোমিটার আয়তন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝাঁজরা হয়ে গেল। ধসে-পড়া দুর্গের তিন মিটার চওড়া দেয়ালগুলি ও ইমারতের ধ্বংসাবশেষগুলি সেই বিপর্যয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। জলের তলায় খননকার্য চালিয়ে অনেক কিছু জানতে পারা গিয়েছে। ক্রমে উপকূল-রেখা ঝাঁজরা হয়ে যাওয়ার কারণ এখন স্পষ্ট। বিজ্ঞানীদের নির্দেশ অনুযায়ী নদীর মোহনাগুলি থেকে বালু আর নুড়ি (ইমারত তৈরির মালমশলা) সংগ্রহের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন নগর নগরীকে কৃষ্ণসাগর যে এমন করে গ্রাস করেছে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কেননা এই সাগরপৃষ্ঠ ক্রমশ উন্নীত হয়ে চলেছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

পরদিন ভোর হ'তে না হ'তে ভবতারণ ভট্টাচার্য এসে হাজির।

—দীনু বাসি মুখে জল দিয়েছ?

—তুমি এই সাত সকালে!

—রাইমোহন ম'ল।

—ম'ল কি? দীনু দত্ত ভবতারণের কথাটা বুঝতে পারলেন না।

—তবে আর বলছি কি। ও খাওার জায়গা। ফটিক ঘোষ জ্যান্ত মানুষ ভোটে জিতে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। রাইমোহন দিব্যি ছিল, ভোটে নামল, হারলো, হয়ে গেল। তুমি তো দাঁড়াবে বলে লাফাচ্ছিলে, কি হত এবার বুঝতে পারছো। হারলেও যমপুরী জিতলেও যমপুরী, দেখ না বিষ্টু উকিলের অবস্থাটা। এখন লাফাচ্ছে এরপর পাছা চাপড়াতে হবে।

—ব্যাপারটা কি?

—দাঁড়াও বসে একটু দম ফেলে নি। একটু জিরিয়ে বললেন—শুনলুম, কাল বিকেলে ঘরে ঢুকে রাইমোহন দরজা দিয়েছে। খায়নি ডাকলে সাড়া দেয়নি। জানলার ফাঁক দিয়ে কালীমোহন দেখে বসে বসে মাল খাচ্ছে। তা থাক, এ তো আর নতুন কথা নয়। সকালেও সাড়াশব্দ নেই দেখে বাইরে থেকে একপাশের জানলা খুলে দেখে, রাই মেঝেতে গড়াচ্ছে। বার দুই দাদা, দাদা বলে জোরে ডাকলে তারপর কেমন সন্দেহ হল। লোকজন ডেকে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখে, মরে পড়ে আছে। বোতলে বোতলে ঘরের মেঝেয় ছয়লাপ। সঙ্গে সঙ্গে থানায় লোক ছুটলো আমি তোমায় খবর দিতে এলুম।

—বল কি! কি সর্বনাশ! রাই মারা গেছে!

—তবে? স্থান কাল কিছু নেই বলে যে চেঁচাও, হাতে-নাতে ফল পাইয়ে দিলে ত'। তুমি তো লাফাচ্ছিলে—

—দীনু দত্ত শিউরে উঠে বললেন—উফ্! ভাগ্যে তুমি বাধা দিয়েছিলে, কে জানে তেরে গেলে—। উফ্, বড় বাঁচান বাঁচিয়েছ—বলে ভবতারণের হাত দু'টো ধরলেন।

—কিছু না, কিছু না। আমি বাঁচাবার কে? নিমিত্ত মাত্র। যে বাঁচাবার সেই বাঁচায়, তবে মঙ্গলময়ের ইচ্ছেয় এ ভালোই হলো। চোখে আঙুল দিয়ে তোমায় দেখিয়ে দিলে ও জায়গা তোমার জন্যে নয়। তোমার জন্যে অন্য স্থান, তুমি এম-এল-এ হও।

—আমার তাই আর এ সবে থাকবার ইচ্ছে নেই।

—সে সব পরে হবে। এখন চলো, ওদিকে যাওয়া যাক্। কালী অকূল পাথারে পড়েছে, বন্ধুর কাজ করবে চলো। যে যাবার সে ত' গেছেই, এখন লাসের গতি করতে হবে তো। চল, মর্গে যেতে হবে।

রাইমোহনবাবু মারা যাওয়াতে দত্ত ও বাহাদ'র মধ্যে যে মন কষাকষি দেখা দিয়েছিল, সেটা দূর হ'ল।

কুঞ্জ বাহাই দীনুবাবুর কাছে গিয়ে বললেন—কি অলুক্ষণে জায়গা রে বাবা। ভালো হয়েছে আপনি দাঁড়াননি। কিসে কি হয়, বলা যায় না।

৯

এত বড় একটা ব্যাপার কালেভদ্রে ঘটে। কাজেই বলতে গেলে সহর তোলপাড় হ'য়ে গেল। কিছুদিন বাদে মাসকেলের বিয়ে। সে ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না কোন আসনটা ভাবী বধূর পক্ষে সুবিধে হবে যাতে চট করে সর্দির ধাত ধাতস্থ হয়। রাইমোহনবাবুর মৃত্যুতে আসনের ভাবনা গুটিয়ে গেল; কিংশুকও ভুলে গেল যে গত 'উইক-এ এনিডে' বিকেলের দিকে প্রফেসারের বাড়ী যাবার কথা ছিল। কেবল ভুলতে পারলেন না শৈলজা। তিনি স্বামীকে খোঁচাতে লাগলেন।

—বিষ্টুবাবুকে নিয়ে যাও এবার।

—যাব যাব। কি একটা কাণ্ড হয়ে গেল বল দেখি। একটু থিতু হোক সব।

—এদিক থিতু হতে হতে ওদিক যে হাতছাড়া হয়ে যাবে। গেছে কি না তাই বা কে জানে। হাকিম সাহেব না বলে বসে বাপু এই তো আপনারা এখানকার লোক সব। আপনাদের ঘরের মেয়ে নিলে সুসাইটিতে মুখ দেখাতে পারব না। কাজেই আর দেরী নয়, এই বেলা যাও।

আরও একজন ভুলতে পারেনি সে হচ্ছে বীথি। একটা 'উইক' পার হ'য়ে গেছে আরও একটা 'উইক'-ও পায়ে পায়ে শেষ হবার জন্যে শনিবারের দিকে এগোচ্ছে অথচ কিংশুকের দেখা নেই। নিজে গিয়ে পাকড়াও করে আনবে তা করতেও ভরসা পাচ্ছে না। বড় মাছ প্রথমেই হ্যাঁচকা টান মারলে সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে, এ জ্ঞান বীথির টনটনে। অথচ টোপ গিললো বা টোপ সাবড়ে চিরতরে ভাগলো তাও ফাৎনা দেখে বোঝবার উপায় নেই। একেবারে ছিপ ফেলে বসে থাকাও চলে না।

মহাবীরের সামনেই বীথি বাপকে বললে—ড্যাডি, শুকদেবদা এসেছিল ?

প্রফেসার কাগজ পড়ছিলেন, মুখ তুলে বললেন—কে শুকদেব ?

—কিংশুক সেই যে আসবে বলেছিল।

—ও, হ্যাঁ—না তো।

—দেখলে তোমায় বলে গেল আসবো, অথচ এলো না। মহাবীরবাবু আপনার বন্ধুকে ধরে আনবেন। ড্যাডিকে বলে গেল অথচ এলো না। ছেলেরা ভীষণ ফাঁকিবাজ হয়।

—সবাই কি আর হয় ? এই ত' আমাদের মহাবীর। ভেরী গুড বয়, পারফেক্ট।

—আহা মহাবীরবাবুর কথা ছেড়ে দাও। উনি বলতে গেলে এ বাড়ীরই একজন। ওর সঙ্গে আর সবার তুলনা হয় না। বীথি পূর্ণদৃষ্টিতে মহাবীরের দিকে তাকালো। মহাবীর আবার আগের কথা ভুলে গিয়ে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখল, যেন সার্চলাইটের আলো এসে পড়েছে।

প্রফেসার বললেন—ছেলেটি একটু সাই। সেই জন্যেই হয় তো আসে নি। হয় তো ভুলে গেছে।

—সাই না হাতী। তবে তোমাকে বলে গেল কেন ? তুমি এই রকম লিনিয়েন্ট বলেই ছেলেরা তোমাকে মানে না।

—কে বললে মানে না। জানিস রাস্তা ঘাটে আমাকে দেখলে সব সিগারেট ফেলে দেয়। আজকাল এর চেয়ে রেসপেক্ট আর কি দেখাবে। বলে হাসতে লাগলেন।

—না বাবা হাসির কথা নয়। তুমি বললে এস, অথচ এলো না—মহাবীরবাবু আপনার বন্ধুকে ধরে নিয়ে আসবেন।

প্রফেসার কপটক্রোধে বললেন—হ্যাঁ ধরে নিয়ে এসো তো, আচ্ছা করে ধমক লাগাব'খন।

বীথি বললে—মনে থাকবে ত' মহাবীরবাবু।

—থাকবে।

—ভুলে গেলে দেখবেন মজা।—আদুরে গলায় বীথি বললে। মজা দেখবার আগেই মহাবীর মজে গেল।

রাস্তায় মন কষাকষির পর থেকে মহাবীরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলেও বাক্যালাপ ছিল না, কাজেই সন্ধ্যের পর পড়ার ঘরে ঢুকে কিংশুক যখন দেখল টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে মহাবীর কড়িকাঠ গুণছে তখন সে খুসীই হলো।

—কি রে। তুই কখন এলি ?

—এই কিছুক্ষণ আগে।

—ভাল করিছিস। সেদিনের পর থেকে মনটা ভারী খারাপ হয়ে আছে। তোর কাছে যেতেও ভরসা হচ্ছিল না, কি জানি যদি হাঁকিয়ে দিস। অথচ একটা রুক্ষু ঝামেলা থেকে দু' জনের মধ্যে মিস আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং।

—তবে আর চেঁচিয়ে মরি কেন। মিস্ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং-এর ট্যাপ রুটটি হচ্ছেন একটি মিস্। মিলিয়ে দেখ মহাবীর যে বলে মেয়েরাই হচ্ছে রুট অব অল ইভিলস্, তা টু দি লেটার মিলে যায় কি না। আমি

ব্রাদার ফ্রী এণ্ড ফ্রাঙ্ক কথা বলব, আমারও সেদিন থেকে মন খারাপ হয়েছিল কিন্তু ঠিক করেছিলুম ভাঙব না।

এসে ত' দেখা গেছে মেয়েরা বিয়ের ব্যাটেরা জন্য পারগেটিভ নিয়ে বসে আছে। হঠাৎ আজ প্রফেসার এমন একটা কথা বললেন যে না এসে থাকতে পারলুম না।

—আমার কথা কিছু বললেন বুঝি।

—না, ঠিক তোকেই কোন কথা নয়, তবে তোর মত ছেলেও ইনক্লুডেড। রাইমোহনবাবুর কথা উঠলো, প্রফেসার বললেন, দেখ, মেয়েরা কেউ কাছে পিঠে নেই, তোমাকে তাই খুলে বলছি, ম্যান টু এ ম্যান, ব্যাচিলর লাইফ-এর মত লাইফ হয় না। কিন্তু মুশকিল কি জান, যারা টু মাচ ইমোশনাল আর সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে। উইক নার্ভ যাদের, তাদের বিয়ে করা উচিত। রাইমোহনবাবুরও ওয়াইফ থাকলে বেঘোরে এভাবে মরতেন না। যাহা এই কথা শোনা, তাঁহা তোর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ডোণ্ট মাইণ্ড, তুইও খুব অভিমানী—যাকে বলে সেণ্টিমেণ্টাল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলুম, নো আই মাস্ট গো টু হিম্।—বলে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো, দেখি তোর হাত দুটো।

কিংশুক টেবিলের ওধার থেকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলে মহাবীর হাত দুটো ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বললে—কিং, গুড এগ আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ মোর দ্যান এনিথিং আণ্ডার দি সান্।

কিংশুকের চোখ দুটো ভিজে উঠলো, গলায় শ্লেষ্মা জমা হ'লো। কোনওরকমে বললে—আই নো, আই নো।

—অ্যাণ্ড আই হ্যাভ ক্যাপ্টেন ফ্যাকাল্টি টু লুক ইউ। নো নট আই বাট উই। ইয়েস, যারা দুজনের জন্যে ফুল রেসপনসিবিলিটি নিয়েই বলছি, উই ক্যান্ট অ্যাফোর্ড টু লুক ইউ। তাই বলছিলুম, তুই বিয়ে কর। ইয়েস ব্রাদার, আফটার কাম ক্যালকুলেশন এণ্ড কুল ডেলিবারেশন্—আমি বলছি বিয়ে কর্।

কিংশুক হাত টেনে নিয়ে বললে—বিয়ে! মানে বীথিকে—

—ও নো, বীথিকে কেন? বীথি ছাড়া কি আর মেয়ে নেই। ইটস্ এ ভেরী ব্যাড সিমটম্। আমি কোথায় চেষ্টা করছি ওর খপ্পর থেকে বাঁচাতে—আর তুই ডে ইন অ্যাণ্ড ডে আউট ঐ নাম জপ করে চলেছিস। তোরই বা অপরাধ কি, ছোঁড়াগুলো অষ্টপ্রহর কানের গোড়ায় ঢ্যাঁ-ভ্যাঁ করলে মানুষ ঠিক থাকতে পারে। বীথি বীথি যে করিস, কি আছে বলত ওর? সী ইজ কমপোজড অফ ক্যালসিয়াম সোডিয়াম্, সালফার, কার্বন, অ্যাণ্ড ওয়াটার ইয়েস্ মোষ্টলি ওয়াটার, বাট নো হার্ট। নো, বীথি তোর জন্যে নয়, ইন ফ্যাক্ট কারুর জন্যেই নয়, লেট আস ড্রপ হার। কত মেয়ে আছে। ডোণ্ট মাইণ্ড, আমার মনে হয়, মানে তোর মনের কথা আঁচ করেই বলছি ইউ লাইক রাগিণী: ওকেই না হয়—। তোর বাড়ীতেও আপত্তি হ'বে না।

কিংশুক গলা চড়িয়ে বললে—গিনী। নো নেভার আই হেট হার। জানিস সেদিন বিজে উকীলের বাড়ীতে নেমন্তন্নে গিয়েছিলুম। ছাট র‍্যাস্কেল কাজলের সঙ্গে গিনী যে ভাবে—লাইক রাগিণী। খবরদার ও নাম তুই আমার সামনে করবি নি। আমি বীথিকে বিয়ে করব সেও ভি—। ওকি উঠলি যে।

—না, আর থেকে লাভ নেই, তুই মরবি বলে ডিটারমিণ্ড, তোকে বাঁচাবে কে? এত ভাবে বোঝালুম তবু ভবি ভোলবার নয়। সেই বীথি। চলি। হ্যাঁ, ভাল কথা, একবার যেও ওখানে। তুমি পুড়ে মরবার জন্যে হাঁকপাক করছ, সে তোমায় পোড়াবার জন্যে আগুন জ্বালিয়ে কুলোর বাতাস দিচ্ছে। ঘুরে ফিরে সেই এক কথা বলে, বীথিকে বিয়ে করব।

কিংশুক খাপ্পা হ'য়ে বললে—না রে বাবা আমি তা মীন করে বলি নি। লোকে বলে না বিষ খাবো সেও ভি আচ্ছা তবু তোর ভাত খাব না। কি খায়? কিছুই খায় না। না ভাত না বিষ। দু'টোই তার কাছে অখাদ্য। এবার বুঝলি, কি মনে করে বলেছি কথাটা। একটা কথা বলে যদি তা উইথ ফুট নোট এক্সপ্লেন করতে হয় বিশেষ করে তোকে তা'হলে তার চেয়ে ট্র্যাজিডি আর নেই।··ছঁ, বিয়ে। বরং তুই একদিন করবি, হয়ত ঐ বীথি মণ্ডলকে বিয়ে কিংশুক দত্ত···নেভার। কখনও না। কভি নেহি। বীথি তো কোন ছার, রাগিণী এসে সাধাসাধি করলেও, টু ইউজ ইওর ওয়ার্ডস্, নো-ও, এ বিগ ফুল মাউথ নো। কাগজ কলম আন সই করে দিচ্ছি।

মহাবীর বললেন—দ্যাট গুড দি দি স্পিরিট। আর এটাও জানবি আমিও তোর সঙ্গেই আছি। তা'হলে একবার যাস। অবশ্য আমার বলবার কথা বললুম। কিন্তু চাই যে তুই যাবি না।

—কোথায়?

—প্রফেসারের ওখানে।

—আমি যাব না। বলে দিস্ সে আসবে না।

—হ্যাঁ রে, ঠিক বলছিস্ ত যাবি না। দেখিস্ বাবা আমি বলে বললুম সে আসবে না, তারপর তুই যদি সঙ্গে সঙ্গে হাজির হ'স।

—বলছি ত যাব না। শুধু আজকাল কেন কোনদিনই নয়।

—মনে কর রাস্তায় তোকে জিজ্ঞেস করলে, এলে না কেন? তখন কি বলবি?

—স্যার আত্মপাগলা লোক তাঁর মনেই নেই। কই কালই ত দেখা হল, কিছু বললেন না তো।

—স্যার নয়, স্যার নয়। ও। মানে মিস্ মণ্ডল, বীথি।

—বলব আমার খুশী যাব না। আর যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে যা প্রাণে চায় তাই বলব। সী ইজ এ ভ্যাম্প।

মহাবীর আহত হ'য়ে বললেন—না না কিং, দ্যাটস্ ব্যাড। আফটার অল রেসপেক্টেবল ঘরের মেয়ে, তাকে ভ্যাম্প বলা ঠিক নয়।

—তুই-ই তো সেদিন বললি, সব ভ্যাম্প, ব্লাড সাকার।

—না না ও নয়, ওর দিদি নীতি। তুই ভুল শুনেছিস্।

—এই একটু আগে যে বললি সী ইজ কমপোজড অব ক্যালসিয়ম্ কার্বণ, হ্যানা-ত্যানা, বাট নো হার্ট। তা হার্ট যার নেই সেই তো ভ্যাম্প।

—ওটা মেয়েদের অ্যানাটমির কম্পোজিশন্। একটা জেনারেল ব্যাপার।

—বা বাবাঃ।

—হুঁ। তাহলে ঐ কথাই রইলো। দেখা হলে যদি জিজ্ঞেস করে বলিস্, হ্যাঁ, মহাবীর বলেছিল। আমায় যেন ফলস্ পজিশনে ফেলো না। তারপর যা বলবার আমি বলব'খন। যাস্‌নি যাস্‌নি। যত যাবি ততই জড়িয়ে পড়বি। প্রফেসার মণ্ডল অত্যন্ত ভালমানুষ কেমন একটা টান পড়ে গেছে তাই যাই, নইলে। তা'বলে কি ও ভ্যাম্প? ও নো। তা বলব না। কিন্তু বলব, ডোণ্ট গো, য'স্‌নি।

মহাবীরের প্ল্যানটা হচ্ছে টিকিট না কেটে হাউস ফুল বোর্ড ঝোলানো সিনেমা হলে গিয়ে লোকে চেষ্টা করে যেন তেন প্রকারেণ টিকিট জোগাড় করবার, তা সে যে দামেই হোক। তারপর যখন পায় না তখন যে ছবির নাম শুনলে নাক সিঁটকে উঠত, বাড়ী ফিরে না গিয়ে 'দূর ঘোড়ার ডিম' বলে সেই ছবি দেখতে ঢুকে পড়ে। তেমনি বীথি যখন কিংশুকের পানে হাত বাড়িয়েছে, তখন যেন তেন প্রকারেণ যদি কিংশুককে হাতের নাগালের বাইরে রাখা যায়, তাহলে যাকে দেখে বীথি নাক সিঁটকে উঠত 'দূর ছাই' বলে, তার দিকে হাত বাড়ালেও বাড়াতে পারে।

রাত্রে শৈলজা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, বিছেবাবুর সঙ্গে কথা হল।

—হুঁ।

—কি বললে বিছেবাবু?

—ঐ হাড়হাভাতে বজ্জাত ছোঁড়াটার সঙ্গ যেন গিনী না মেশে।

—এই কথা বিছে উকীল বললে?

—বিছে উকীল বলবে কেন, আমি বলছি।

—কি এমন তুমি দেখলে যাতে এই কথা বলছ।

—তোমার মত স্ত্রী আমি যোগ থাকতে কানা নই, পাঁচহাত কাপড়েও আমার কাছা হয়? সাধে বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তোমার কথায় মেয়েটাকে এখানে ভর্তি করলুম এখন ভালয় ভালয় একটা বছর কাটলে বাঁচি। ঐ ছোঁড়াটাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিও না। আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল ছোঁড়াটা এক নম্বরের বখাটে। ঠিক তাই।

—কে বললে বখাটে? এ নিশ্চয় কেউ তোমার কান ভাঙিয়েছে।

—কান ভাঙিয়েছে? আমি কি সাতে পাঁচে লোকের কান বেচে ব্যবসা করে খাই আমার কান ভাঙাবে? এতবড় হিম্মৎ কোনো শালার নেই। ঐ বিছে উকীলের মুখ থেকে শোনা সব। সে নিজের ভাইপোর নামে মিছে কথা বলবে? কি স্বার্থ তার। তার ছেলে নেই পুলে নেই নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। সে মিছে কথা বলেছে বলতে চাও।

শৈলজা দমে গেলেন, বললেন—কি বললে বিছে উকীল।

—বললুম, গিন্নীর তো আপনার ভাইপোটিকে ভারী পছন্দ। বড় ঘরের ছেলে, বি, এ, পাশ দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। গিন্নীর ভারী ইচ্ছে জামাই করে।
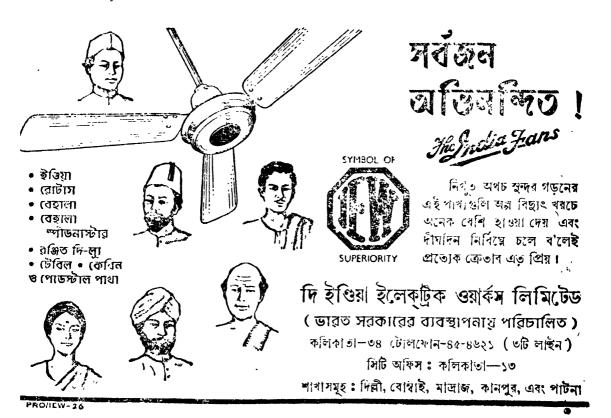
শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বললেন—কুঞ্জবাবু, আপনি আমার বড় ভাই-এর মত। আমি উকীল, বাবাকে মামা প্রমাণ করাতে আমার আটকায় না। কিন্তু আপনাকে ঠকাতে পারবো না। এ মুখো হ'বেন না, হাতে তুলে গু খাবেন না! শুনে চোখ ছানাবড়া।

বললুম—গিন্নী তো মশায় কাজলকে মাথায় তুলে নাচছেন। পারেন ত নিজেই—!

শৈলজা বাধা দিয়ে বললেন—এই কথা তুমি বললে?

কুঞ্জবাবু মুখ ভেংচে বললেন—না, বলবে না। ধেই ধেই করে নাচোনি? মেয়েটারই বরং যথেষ্ট সহবৎ আছে দেখেছি, তোমার মত নয়। হাজার হোক আমারই তো মেয়ে।···বললুম, ব্যাপার কি বলুন ত মশায়?

বিচ্ছে উকীল বললেন—কি বলব, ঘরের কথা বলাও যায় না, সয়াও যায় না। তবে কিনা আপনারাও এর মধ্যে না বললে জড়িয়ে পড়বেন তাই বলছি। দেখবেন, দয়া করে যেন চাউর করবেন না; দাদার আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কি বলব মশাই, দাদা আমার শিবতুল্য লোক। কিন্তু বৌদির জন্য সারাজীবন জ্বলে মরলেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আয় করেছেন সব ঢেলেছেন শ্বশুরবাড়ীতে। এখনও ছোট শালীর বিয়ের দেনা শুধছেন পেনসনের টাকা থেকে। আর না ঢেলে উপায় আছে, জ্বালিয়ে মারবে না তা হলে। ঐ বৌদিই ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে করে দিয়েছে। হতভাগা কলকাতায় থাকলে জেলে যেত। সাধে কি আর বৌদি এখানে এসেছে। আমাদের কাছে অবধি ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়। বলে ওর কুষ্ঠিতে আছে এম-এ পাশ করলে বাঁচবে না। ভাবলুম হবেও বা, তা'ছাড়া আমাদেরও ছেলেপুলে নেই ঐ সব পাবে। উড়নচণ্ডে না হলে কষ্ট হবে না। কি দরকার এম-এ পড়ার। চালচলন কোনদিনই ভালো না! এখানে এসে তো ধরাকে সরা জ্ঞান করলে। দাদাকে দেখি ছেলের কাণ্ড দেখে দাঁত কড়মড় করেন অথচ বৌদির জন্যে কিছু বলতেও পারেন না।

আমায় একদিন আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—বিচে, কাজলের বিয়ের মধ্যে থেকো না। তোমার বৌদি যা প্রাণে চায় তাই করুক। থাকলে বিপদে পড়বে। মনে রেখো আমিও নেই।

ভাবলুম কি ব্যাপার! যিনি আজ অবধি শত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছেন তিনি আজ একথা বললেন কেন? সব পরিষ্কার হ'ল পরশুদিন রাত্তিরে। রাত প্রায় একটা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। দাদার গলা শুনতে পেলুম, ভাবলুম স্বামী-স্ত্রীর কথা হচ্ছে আমার না শোনাই উচিত। শুনি আমার নাম হচ্ছে। সত্যি কথা বলছি মশাই, আর থাকতে পারলুম না উঠে পড়লুম, কি ব্যাপার। শুনি·····

বৌদি বললেন—তুমি ঠাকুরপোকে এই কথা বললে?

দাদা বললেন—বলব না। তোমাদের জন্যে শেষে বেচারীর নাক কান কাটা যাক্ আর কি।

বৌদি নাকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, আমার ঐ একটা মাত্র ছেলে তাও তোমার দু'চক্ষের বিষ।

—পাঁচ সাতটা হলে হয় ত বিষ হত না। এক পালের মধ্যে এক আধটা বিগড়ে গেলে তবু ভালোগুলোর মুখের দিকে চেয়ে কনসোলেশ্যন্ পাওয়া যেত। নিন্দেয় কান পাতা যায় না। তবুও লেখাপড়া শিখতো, এক ভাবে মনকে বোঝান যেত। হতভাগা বি, এ, টাও পাশ করতে পারলে না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আমার নষ্ট করলে। লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার পথ নেই। কত গাধা ঘোড়া বি, এ, পাশ করে যাচ্ছে!

কান্না থামিয়ে বৌদি বললেন—লোককে জানতে দেবে কেন বি, এ, পাশ করে নি।

—কি বললে?

—বললুম, লোককে জানতে দেবে কেন যে বি, এ, পাশ করে নি।

—লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, কি বলব।

—বলবে বি, এ, পাশ।

—যদি বলে কোন বছরে পাশ করেছে। সার্টিফিকেট দেখাও।

—এই বুদ্ধি নইলে কি আর অফসেট (অফিসিয়েটিং) হাকিম হও, দাঁড়ে বসতে না বসতে নামিয়ে দেয়। বলি হাকিমের ছেলের সার্টিফিট দেখতে চাইবে এমন বুকের পাটা কার আছে শুনি। যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, বলো ঐ বিশ্বাসের ঝি বসে আছে ছেলের মা ওর কাছে যাও। তারপর আমি দেখব'খন।

একথা শুনে দাদার মুখে কথা জোগাল না। তিনি বৌদির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বৌদি বলে চললেন—কোনও কথা শুনব না আমি! ছেলের বিয়ে দেবই। রাহাগিন্নীর সঙ্গে আমি কালই পাকা কথা বলে কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

—বিয়ের পর যখন তারা জানতে পারবে তখন?

—তখন কি? মেয়ে ফিরিয়ে নেবে? নিক্। ইস্ তা আর হয় না। যতই স্বাধীন হও আর আইন করো ফিরে ফিরতি বিয়ে দিতে ম্যাও আছে। কিছুই করবে না। প্রথমে একটু চোটপাট করলেও করতে পারে তারপরে কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকতেই হবে। তোমার সেই বাঙ্গাল মুন্সেফ বন্ধু, গাভা না কোথাকার কুলীন বললে, দত্ত-ক গুপ্ত ভেবে মেয়ের বিয়ে দিয়ে শেষকালে জানতে পারলে যে বারুই। বলি জামাই ফেলে দিয়েছে। তাকেই ত' শেষে অমুক যায়গার নাম করা কায়েত বলে জামাই এর পরিচয় দিতে শুনেছি। লোকে জাত গিলে ফেলছে আর এতো ভারী একটা সার্টিফিট যা গাধা ঘোড়ায় পায়। বলে একটু থেমে তিনি আবার কান্না জুড়লেন—কি লোকের হাতেই পড়েছিলুম। জীবনে সাধ আহ্লাদ বলে কিছু আছে জানতে পারলুম না। হা পোড়া কপাল আমার!

দাদা আস্তে আস্তে বললেন—আচ্ছা তোমার পাপ পুণ্যের ভয় নেই, মেয়ের বাপ-মাকে ঠকাতে তোমার বুক কাঁপবে না।

—ঠকাচ্ছি কোথায়? রাহাগিন্নী তো আমায় জিজ্ঞেস করেনি যে হ্যা দিদি ছেলে তোমার কি পাশ। তাহলেও না হয় ঠকাবার কথা উঠত। বিশ্বাস না হয় ডেকে জিজ্ঞেস করো। রাহাগিন্নীই বরং যখন কাজলের মুখে শুনলে যে, সব সার্টিফিট পুড়িয়ে ফেলেছে তখন বললে—বেঁচে থাকো বাবা। গুচ্ছের পাশ করলেই কি মানুষ

হয়। বেঁচে থাক। কাজল প্রণাম করতে কি আশীর্বাদই না তখন করলে। সে আবার জিজ্ঞেস করবে ছেলে তোমার কি পাশ। হাকিমের ছেলেকে জামাই পাবে ও কোনদিন ভাবতে পেরেছিল। একদিন কাজল ও বাড়ীতে না গেলে রাহাগিন্নী খবর নিতে লোক পাঠায়। রাগিণীও কাজলদা' বলতে অজ্ঞান। তারা যদি জানে যে ছেলে গোমুখ্যু তবুও আপত্তি করবে না। দোহাই তোমার আমি হাত জোড় করে বলছি তুমি বাপ হয়ে বাদ সেধো না। আমি সব একরকম গুছিয়ে এনেছি, তুমি আর বাগড়া দিও না।

দাদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ মায়ে পোয়ে বেশ গুছিয়েই এনেছো। আমাকেও শেষ পর্যন্ত মানিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে নিও। তবে একটা অনুরোধ, হাত জোড় করেই বলছি, বিছে আমার বাপ-মা মরা ছোট ভাই, ওকে আর সতীলক্ষ্মী বৌমাকে এর মধ্যে গুছিয়ে নিও না, এইটুকু দয়া করো।

বিছে উকীলের চোখ দু'টো জলে ভরে এসেছিল, মুছে বললেন—বললুম না, দাদা আমার শিবতুল্য লোক। সবই বললুম আপনাকে এখন যা ভাল বোঝেন করবেন।

কুঞ্জ রাহা বললেন—শুনলে তো, বলি এখনও ইচ্ছে আছে ঐ বাঁদরটাকে জামাই করবার? থাকে ত' বল। কালই পাকা কথা বলে ফেলি।

শৈলজা পড়লেন অকূলপাথারে। কি জবাব দেবেন? তাঁর বহুদিনের সাধ জামাইটি বড় ঘরের ছেলে হবে, ডিগ্রী থাকবে, দেখতে রাজপুত্রকে হার মানাবে। যে দেখবে সেই একবাক্যে বলবে না জামাই এনেছে রাহাগিন্নী! ভূ-ভারতে এমন জামাই আর কেউ আনতে পারেনি। কাজলকে দিয়ে সেই সাধ প্রায় পূর্ণ, প্রায় কেন সম্পূর্ণই হতে চলেছিল। একটু খুঁতখুঁত ছিল রোগা আর কালো বলে। ভগবান যেমন ঐটুকু খুঁত দিয়েছিল তেমনি আবার অন্যদিক দিয়ে দু'হাতে ঢেলে দিয়েছেন। হাকিমের ছেলে! এটা তো শৈলজা কল্পনাই করতে পাবে নি। হাকিমের দেয়ান। প্রথম দিন এই কথা ভেবে শরীরে যে শিহরণ জেগেছিল, আজও তা পুরো না জাগলেও ডবল হাফ জাগে, মানে গা শিরশির করে। কিন্তু এ কি শুনলুম? যাদের কাছে বড় গলায় বলেছি ডিগ্রীর কথা তারা যে এখন ডিক্রী নেবে। কিন্তু হাকিমের ছেলে? এটা তো আর মিথ্যে নয় এখানে ত' মার নেই। হাকিমের ছেলের সাতখুন মাপ। তার ডিগ্রী আছে কি না, কে শুধোবে? তার কিছু না থেকেও সব আছে। পাশ ধুয়ে কি জল খাবো? এই যে তুমি স্বামী হেন ধন, কোন্ ডিগ্রী আছে তোমার? অথচ মা লক্ষ্মী অপরাধ নিও না, জাঁক করছি না' তোমার কৃপাতেই সব হচ্ছে, দশবিশটা হাকিমকে তুমি পুষতে পারো। ঐ দীনু দত্ত বিদ্যের কোন মানোয়ারী জাহাজ। না হোক বি, এ, পাশ, একেবারে মুখখ্যুও তো নয়। বা ছাড়া কত 'বড় কবি ঠাকুর—না কবি ঠাকুর নয়—কি যেন—দূর ছাই মনেও থাকে না।

—কি গো এখন যে আর কথাটি নেই। বাঁদর, বাঁদর একটা বুঝলে।

আবার অকূলে ভেসে গেলেন শৈলজা। এবারে নাকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—জানি না বাপু, আমার হয়েছে শতেক জ্বালা। আর পারি না।

—পার না তো সব তাতে মাথা গলাতে যাও কেন?

—বলি মেয়ের একটা মতামত নেই।—হাকিমের বেয়ান হবার সুযোগ একেবারে হাতছাড়া করতেও মন চাইল না শৈলজার। মেয়ের কথা তুললেন। ছেলের নামে যদি পোয়াতি বাঁচে।

—মেয়ের আবার মত কি?

—না, তা থাকবে কেন? মেয়ে এ্যাদ্দিন কলকাতায় থেকে আজ কলকাতায় যেতে চাইছে না, সে হুঁস আছে।

কুঞ্জ রাহা সেকেণ্ড কয়েক ভেবে হাতের কাগজটা দলা পাকিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেললেন—ধ্যুৎ তোর, সংসারের ক্যাঁথায় আগুন।

—তা আমার ওপর চোটপাট করলে কি হবে, মেয়েকেই জিজ্ঞেস কর না।

—তাই করব।

করলেনও।

—তোর মা ঐ কাজল ছোঁড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে। তোর মতটা কি বল দেখি।

সিধে স্পষ্ট কথা। রাগিণীও সোজা বাপকে জিজ্ঞেস করল—তোমার মত কি বাপী?—বলে দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের জন্যে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—না।

হাঁপ ছেড়ে রাগিণী বললে—তোমার যা মত আমারও তাই মত। আমার আবার নিজের কি মত থাকবে? তুমি যা বলবে তাই হবে।

—ঠিক বলছিস তো?

—তুমি আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচ। আমি এখন দু' চক্ষের বিষ হয়েছি।—বলে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—আরে না না, শোন গিনী। কোথায় গেলে গো। সব কি মরেছে। খেপী, খেপী, রামগতি—। [ক্রমশ।

ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে নারীর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। পুরুষের প্রেমেই বিকশিত হয় নারী; যখন তার জীবন থেকে প্রেম অপসৃত হয়, তার সৌন্দর্য, তার মাধুর্যও বিলুপ্ত হয়ে যায়। নারীর গভীরতম সত্তায় স্পন্দন তোলে প্রেম, প্রেমের প্রভাবেই উন্নত হয়, পরিণত হয় তার ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতিকে নিজের পথে চলতে দেওয়াতেই নিহিত আছে প্রকৃত কল্যাণ। নারী পুরুষকে সাথী করে চলতে চায় জীবনের পথে, আর আজীবন সে অনুগত থাকতে চায় একের প্রতিই। সব সময়ে তা সম্ভব হয় না অবশ্য, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে বহুগামিতা নারীর স্বভাববিরুদ্ধ।

—ভিনসেণ্ট ভ্যান গগ।

স্বদেশ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

শৈলেনকুমার দত্ত

মাটি আর মানুষকে ভালবাসার আভিধানিক অর্থ হল স্বদেশ-প্রেম। যাঁরা জন্মভূমিকে ভালবাসেন, দেশবাসীকে ভালবাসেন তাঁরাই স্বদেশ প্রেমিকের আখ্যা পান। এদিক থেকে যেমন আখ্যা পেয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী তেমনি পেয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি যেমন ছিলেন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, গীতিকার—ঠিক তেমনি ছিলেন দার্শনিক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক। আর এর থেকেও বড় পরিচয় হল তিনি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। রূপোর চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি জানতেন—তিনি বাংলা দেশের লোক—একটি দরিদ্র দেশের নাগরিক। পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় মানুষ হলেও তিনি জানতেন—এ দেশের প্রতিটি নিরক্ষর অধিবাসী তাঁর একান্ত আপন জন। তাই কাব্যে যেমন বলেছেন, এই সব ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—দেশপ্রেমিক হিসেবেও ঠিক তেমনি এগিয়ে এসেছেন সবল কর্মক্ষমতা নিয়ে। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মন্তব্য যা দেশকে আঘাত দিয়েছে—দেশবাসীকে ব্যথিত করেছে—তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করেছেন। কখনও মনে—কখনও মননে।

দেশের চরম বিপর্যয়ের দিনে নিরাপত্তা বা শান্তি সম্পর্কে একজন সমাজ বিজ্ঞানী বা একজন রাজনীতিবিদ যেমন চিন্তা করেন—একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবির চিন্তাধারা এর থেকে নিশ্চয়ই আলাদা। কবিগুরুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে যেমন গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন—ঠিক তেমনি ভাবেই তার সমাধানের পথও আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সত্যদৃষ্টি আর উদার মানবতাবোধের পটভূমিকায় সে পথের সমাধানও হয়েছে সুন্দরভাবে। এই শীর্ষবিন্দুতে মহৎ কবি হিসেবে তাঁর চিন্তাধারা আর মহৎ সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর কর্মধারা এসে মিলিত হয়েছে। এইখানেই স্বদেশ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

কবি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ যে এত বড় দেশপ্রেমিক হয়েছিলেন এর মূলে যুগের এবং তাঁর বংশের প্রভাবও ছিল প্রচুর। অনেক ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ যুগকে ভারতে জাতীয়তাবাদের যুগ বলে চিহ্নিত করেন। আর তাঁর বংশের প্রভাবের কথা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে নিজেই স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর পিতা এবং পরিবারবর্গই ছিলেন তাঁর দেশপ্রেমের উৎস। মাইকেলী যুগে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার বানে স্বদেশপ্রীতি দেশের লোকের অন্তর থেকে মুছে যেতে বসেছিল ঠিক সেই সময়েই ঠাকুরবংশে এ অনুরাগ প্রকাশ পায়। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত হলেও ঠাকুরবংশেই দেশপ্রেমের উৎস পরিলক্ষিত হয়। মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর দেবেন্দ্রনাথের যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল—পুত্রদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়।

মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসে তাই স্বদেশী মেলায় একটি গান পাঠ করে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ প্রেমিক জীবনের প্রথম বীজ বপন করেন। তাঁর প্রথম জীবনের এই অভিব্যক্তিটুকু 'সভ্যতার সংকটে' তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—'সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন, সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম, তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল···আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন কী ধর্মমতে, কী লোক ব্যবহারে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম।'

স্বদেশী যুগের এই আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা যেমন পরিবর্তিত হয় সাহিত্যেও অনুরূপ প্রভাব দেখা গেল। স্বদেশী প্রচারের জন্যে তিনি লিখলেন—

'নিজ হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।'

কিন্তু কর্তব্য এইখানেই শেষ নয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লিখলেন—'একথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে; কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনি ত' নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না।' (দেশীয় রাজ্য) তাঁর স্বদেশী যুগের এই সব রচনা দেশব্যাপী উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল। দেশের মানুষের চিন্তাধারা নিত্য নতুন ভাবে চিত্রিত হতে লাগল তাঁর সাহিত্যে। স্বজাত্যভিমানের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত তাঁর দেশপ্রেমকে সংস্থাপিত করলেন বিশ্বপ্রেমের পটভূমিকায়। তাই বিদেশী সরকারের সে কঠোর শাসনেও দেখতে পেলেন নতুন এক সম্ভাবনার মুখ। দেশবাসীর সামনে স্থাপন করলেন এক নতুন চিন্তাধারা···'It is be true that the spirit of the west has come upon our fields in the guise of a storm, it is nevertheless scattering seeds that are immortal.' (Nationalism).

কী মজা !

প্রত্যেক দোকানে

আছে প্রচুর

শিশুদের খাদ্য—গ্ল্যাক্সো।

সহরের প্রত্যেক দোকানে।

মা বলেছেন

'সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।'

আর, আপনি ত' জানেনই

গ্ল্যাক্সো খেয়ে আমি

বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান হ'য়ে

বেড়ে উঠব।

সত্যিই, কী মজা !

মায়ের দুধের সব গুণই রয়েছে গ্ল্যাক্সোতে··· যা আপনার শিশুর বলিষ্ঠভাবে বেড়ে ওঠার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

বিনামূল্যে বাংলায় লেখা গ্ল্যাক্সো শিশু পুস্তকের জন্য ডাকখরচ বাবদ ৫০ নয়া পয়সার ডাকটিকিট পাঠান :— গ্ল্যাক্সো, ৫০ হাইড রোড, কলিকাতা—২৭।

গ্ল্যাক্সো—শিশুদের আদর্শ দুগ্ধ-খাদ্য

GLY-I BEN

স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই একে একে নানান আন্দোলনের সূত্রপাত হতে লাগল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাংলা দেশে বেশ একটা নতুন জাগরণ দেখা গেল। সরকারী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশশুদ্ধ লোক অখণ্ড বাংলা এবং বাঙালী জাতি অখণ্ড—এ প্রচার ঘোষণা করলেন। সারা বাংলা জুড়ে শুরু হল আন্দোলন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সর্ববাদী-শিরোধার্য নেতা। ১৬ই আগষ্ট তাঁরই সহায়তায় বাংলা দেশ জুড়ে পালন করা হল হরতাল। অরন্ধন। রোগী—আতুর—বৃদ্ধ ছাড়া কেউ রাঁধা ভাত-তরকারী খেলেন না। বাড়ীতে বাড়ীতে উনুন জ্বলল না। সকালে সকলে মিলে গঙ্গাস্নান করে ভাই ভাই বলে ধনী-দরিদ্র—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হাতে হাতে রাখী বাঁধলেন। বিলাতী পণ্য বর্জনের পণ গ্রহণ করলেন।

কবিগুরু এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়ে এসে দাঁড়ালেন 'সবার পুরোভাগে।' লিখলেন রাখী বন্ধনের গান—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান!
বাঙলার ঘর বাঙলার মাঠ
বাঙলার বন বাঙলার হাট
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান!
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান!
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান!

লিখলেন—

আমি ভয় করবো না ভয় করবো না
দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই,
মরবো না।

এবং সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের বীর্যকে—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ—
দুই নয়নে স্নেহের হাসি—
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।

বৃটিশ সরকার তাই এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কবিগুরু আবার লেখনী ধরলেন—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে!

কিন্তু তিনি শুধু যে গান লিখেই ক্ষান্ত হলেন তা নয়। কবি হিসেবে যেমন রচনা করলেন অনবদ্য সঙ্গীত, দেশপ্রেমিক হিসেবে তেমনি শুরু করলেন পদযাত্রা। সকালে স্নান করে নগ্ন পায়ে শুধু একখানি চাদর গায়ে দিয়ে পথের দু'ধারে মুটে-মজুর দীন-দুঃখী-ভিক্ষুক সকলকে বুক দিয়ে আলিঙ্গন করে ভাই বলে সকলের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। বস্তীতে গিয়ে হাড়ি-ডোম মুচি মুসলমানদের বুকে টেনে নিয়ে ভাই বলে সম্বোধন করলেন। সমস্ত বাংলা দেশের মানুষ সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন নতুন চোখে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর ১৯১৭ সালে ইংরেজ সরকার অত্যাচারের এক নতুন উপায় আবিষ্কার করেন। ভারত-রক্ষা আইনের অজুহাতে বহু নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকে তাঁরা বিনা বিচারে বন্দী রাখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ দীপ্ত ভাষায় এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদের প্রসঙ্গ তুলে তখনকার বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রবীন্দ্রনাথের অনেক নিন্দা করলেন। তাঁর কথার প্রতিবাদ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে-সঙ্গে রোনাল্ডসের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে Modern Reviewতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সে প্রবন্ধের ফুটনোটে তিনি লিখলেন—'নির্জন কক্ষে লোকদের আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রথা জনগণের নিকট সতর্কতাবলম্বন না হইয়া প্রতিশোধ বৃত্তি চরিতার্থকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার মুক্তি লাভের পরেও আটক আসামীকে পুলিশের অনুসরণে যেভাবে বিব্রত করা হয় তাহা···সেই কার্যের জন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহারা অস্বীকার করিলেও যাহারা বিব্রত হয় তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।'

১৯১৭ সালের এ অত্যাচারের অব্যবহিত পরেই শুরু হয় জালিয়ানওয়ালাবাগের ইতিহাস বিখ্যাত বর্বর হত্যাকাণ্ড। যে নির্মমতা চার্চিলকেও বিস্মিত করেছিল। তিনি নিজে একথা স্বীকার করে গেছেন—'জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনার মত ঘটনা বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর কদাচ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না।' (ভারতবর্ষের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার রায়)

পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় করবার জন্যে ইংরেজ সরকার ১৯১৯ সালে যে রাউলাট আইন পাশ করেন মহাত্মা গান্ধী সে আইন তুলে নেবার জন্যে চেম্‌সফোর্ডকে অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হয়। শুধু তাই নয়। গান্ধীজীর দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ইংরেজ সরকার পাঞ্জাবের দুই বিখ্যাত নেতা ডক্টর কীচলু আর ডক্টর পালকে বন্দী করেন। এতে সারা দেশে একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হল এবং এই জনসাধারণের হাতে কয়েকটি অফিস ও একটি ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত হল। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গও প্রাণ হারালেন। তারপর ১৩ই এপ্রিল তারিখে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে একটি সভার আয়োজন হল। এতে প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। কিন্তু জেনারেল ওডায়ার এ সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। কয়েকদিনের সংগৃহীত সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের দিকে। সমস্ত গেট বন্ধ করে দিয়ে তারপর দশ মিনিট ধরে অবিরাম গুলিবর্ষণ করার আদেশ দিলেন। দশ হাজার নিরস্ত্র লোক এক কোণে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে চললেন। সমস্ত জনতা যখন নিহত আর

কোনারকের নারীমূর্তি

—আশুতোষ সিংহ

শিকার

—রামকিঙ্কর সিংহ

মাসিক বসুমতী
শ্রাবণ / '৭০

পাহারা

—মোনা চৌধুরী

তিন কন্যা

—আশুতোষ সিংহ
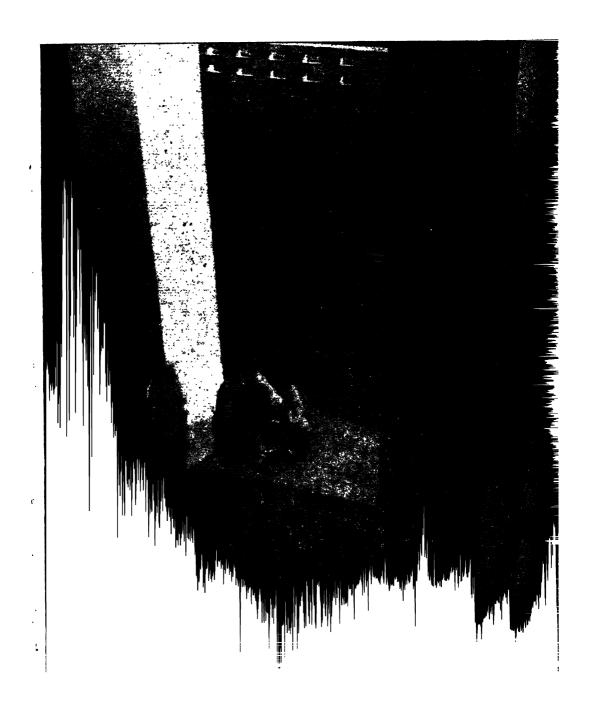
[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে আপনার নাম, ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

আহত হয়ে নির্বাক হয়ে পড়ে রইলেন, জেনারেল ওয়াডায় তখন ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বললেন—'আমি স্থির করেছিলাম যে সমবেত জনতা যদি সভা চালাতে থাকে, তাহলে আমি সকলকেই মেরে শেষ করব।'

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের সে ক্ষেত্রে যখন গলিত শবদেহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, ইংরেজ সরকার তখন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন—সংবাদ যাতে পাঞ্জাবের বাইরে ছড়াতে না পারে।

কিন্তু এত চাপাচাপি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এ সংবাদ পেলেন মে মাসের শেষাশেষি। এ সংবাদ পাবামাত্র তিনি কলকাতায় এলেন ২৭শে মে তারিখে। এসে নেতাদের ধরলেন—এর প্রতিবাদ করা চাই। চলুন সকলে অমৃতসরে। সাহিত্যের নিভৃত আরাধনা ছেড়ে কবি এসে দাঁড়ালেন দেশবাসীর পাশে। প্রতিবাদে মুখর করতে চাইলেন ভারতের আকাশ-বাতাসকে।

কিন্তু তাঁর এ ডাকে কেউ সাড়া দিতে চাইলেন না। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের ভয়ে তখন সকলে মুহ্যমান। কিন্তু কবিকে কেউ টলাতে পারল না। দেশের অসহায় অবস্থায় নেতাদের এই ভাবে চুপ করে থাকায় তিনি অত্যন্ত ব্যথা পেলেন। তিনি নিজেই এ সম্বন্ধে বলেছেন—'অবশ্য এসব প্রচেষ্টা মিটিং-এ যে বিশেষ কিছু দল ছিল তা নয়, শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদে যথাসময়ে না করলে সেটা নিজের প্রতিও অন্যায়' (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)

সব শেষে গান্ধীজীও যখন কবির সঙ্গে পাঞ্জাব যেতে রাজী হলেন না, তখন তিনি চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করলেন। বিবেকের অসহ্য পীড়নে স্থির করলেন ইংরেজের দেওয়া নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করবেন। ২৯শে মে তারিখে রাত্রে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে যে চিঠি লিখলেন তার তুলনা নেই। সে চিঠি শুধু সেদিনের প্রতিবাদপত্রই নয়—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দলিল। তিনি লিখলেন—"These are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from his Majesty the king at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.'

এ পত্রের কথা যেদিন দেশে প্রচারিত হল সেদিন দেশবাসী কবির স্বদেশপ্রীতি, দেশবাসীর প্রতি তাঁর ভালবাসা, সম্মান, মর্যাদাবোধ এবং সাহস আর তেজের পরিচয় পেয়ে তাঁর চরণে মাথা নত করল।

কিন্তু কবি শুধু উপাধিবর্জন করেই নিজের কর্তব্য সমাধান করে দিলেন না। সারাজীবন মনে করে রাখলেন এ বীভৎসতার কথা। এ ঘটনা তাঁকে কতখানি আঘাত দিয়েছিল তা তিনি নিজেই বলে গেছেন—'শুনে যে কি প্রবল কষ্ট অসহ্য হয়েছিল তা আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হতে লাগল—এর কোনো উপায় নেই? কোনো প্রতিকার নেই? কোনো উত্তর দিতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তাহ'লে জীবনধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)

তারপর শান্তিনিকেতনে নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনে চিঠি লিখলেন—রাণী অধিকারীকে—'আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম সহ্য করতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবেই আছ। পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।' (ভানু সিংহের পত্রাবলী)

ইংরেজ সরকারকে যন্ত্র-তন্ত্র আক্রমণ আর এই উপাধি পরিত্যাগ করায় ইংরেজরা রাগে জ্বলে উঠেছিল। তাদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যানে' যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা হল—'স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁর নামও পঞ্জাবের জঙ্গলে কেউ কখনো শোনেনি···তিনি গবর্ণমেণ্টের পলিশির সমর্থন করলেন কি না করলেন···তার জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই! বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ নাইট রইলেন কি সাদাসিধে বাঙালী বাবু রইলেন তাতে ব্রিটিশ শাসনের মানের হানি বা ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা এতটুকু টসকাবে না।'

এতে ব্রিটিশ সরকারের নিরাপত্তা যেমন এতটুকু টসকাল না রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারারও তেমনি এতটুকুও পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি পরের বারেই লণ্ডনে গিয়ে মণ্টেগুকে বললেন—জেনারেল ওয়াডারের শাস্তির জন্য ভারতবাসী তত আকুল নয়···ভারতবাসী চায় এ নৃশংস ব্যাপারের ইংরেজ জাতি নিন্দা করুক—moral condemnation of the crime by the British Nation। এবং লণ্ডনে ঐ সময়ে জেনারেল ওয়াডার-সংক্রান্ত পার্লামেণ্টে যে বিতর্ক সভা হয় রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের বিচারে স্তম্ভিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে সি, এফ, এণ্ড্রুজকে চিঠি লেখেন—'এ বিতর্কমূলে যে কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, এদেশে যাদের মধ্যে থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাঁদের আমলারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক না কেন তাতে তাঁদের মনে কোন রকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।'

(পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ : অমল হোম)

জালিয়ানওয়ালাবাগের এ হত্যাকাণ্ডের পরেও দেশে যত আন্দোলন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সব কিছুতেই যোগদান করেছেন। ১৯৩০ সালে যখন তিনি লণ্ডনে এসে পৌছান তখন সংবাদ পেলেন—ভারতবর্ষে দারুণ ব্যাপার। জানতে পারলেন গান্ধীজীর লবণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। শোলাপুরে মার্শাল আইন জারি হয়েছে। বড়লাটের অর্ডিনান্সের বলে কংগ্রেসকে বেআইনী গণ্য করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইংরেজের উস্কানিতে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা বেধেছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাই তিনি ওখানকার 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'র সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রতিবাদ করে বললেন···the present complications can not be dissipated by repression and a violent display of physical power। তারপর ভারতসচিব ওয়েজ উডবেনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। কোয়েকার সভায় নিমন্ত্রিত

হয়ে বক্তৃতা দিলেন...**Realise yourselves in own place and recall the time when your own brothers in America wanted to secure their freedom with their blood.**

তাঁর গভীর দেশপ্রেমের নমুনা এইখানেই শেষ নয়। মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৩৬ সালে যখন বাংলার হিন্দুদের ওপর দারুণ অবিচার চলল—রবীন্দ্রনাথ তখন কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের পর্বের বিরুদ্ধে টাউনহলের জনসভায় যোগদান করলেন। প্রতিবাদী পক্ষে এ আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে প্রতিবাদ পত্রে নাম স্বাক্ষর করলেন। রাজনৈতিক স্বার্থসেবীর দল ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কবি হিসেবে যাঁর জগৎজোড়া যশমান তিনি কেন এসব দলে মিশে নিজের অমর্যাদা করছেন! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। যুক্তির সাহায্যে এই এ্যাওয়ার্ডের গলদ তুলে ধরলেন সকলের সামনে।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন আলোচনা করলে এমন আরও অনেক নমুনা মিলবে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি যেমন আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—পরোক্ষভাবে ঠিক তেমনি সমস্ত জীবন ধরে ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্মে-ধর্মে প্রমাণ রেখে গেছেন তাঁর গভীর দেশপ্রেমের নমুনা। এই সূত্রেই গান্ধীজীর সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। রবীন্দ্রনাথই গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' নাম দেন—মহাত্মাও কবিকে 'গুরুদেব' বলতেন। এই গুরুদেবের কাছেই ছুটে আসতেন চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, জহরলাল প্রমুখ, দেশপ্রেমিকেরা। নিজের নিজের প্রয়োজনে তাঁর অমূল্য উপদেশ নিতেন। এ সমস্ত উপদেশের মূল্য সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁরাই বেশী বুঝতে পেরেছিলেন।

স্বদেশী মেলা কিছুদূর অগ্রসর হবার পর যখন সন্ত্রাসবাদ দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথ তখন আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রব বিচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু তা বলে দেশ সেবা বন্ধ করেন নি। গ্রামে গ্রামে পল্লী-সংস্কার করতে শুরু করেন। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কুটিরশিল্পের উন্নতি বিধান সমস্তই এই সময় তাঁর পরিচালনায় আরম্ভ হয়। কৃষিশিল্পের উন্নতিবিধানের জন্যে তিনি নিজের জামাইকে ইউরোপ পাঠান। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসে তিনি যাতে দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারেন।

এক কথায় জ্ঞানের উন্মেষ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। দেশকে তিনি এত গভীর ভাবে ভালবাসতেন, এবং দেশের প্রতিটি মানুষকেও তিনি এত গভীর ভাবে ভালবাসতেন যে, কোনরকম অপমানকর মন্তব্যই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কয়েদে বন্দী অবস্থায় পার্লামেন্টের সদস্যা মিস্ রাথবোন জহরলালকে যে পত্র দেন, রবীন্দ্রনাথ তারও তীব্র প্রতিবাদ করেন। সে-চিঠির তেজোদীপ্ত জবাব তাঁর ক্ষুব্ধ স্বদেশানুরাগের অবিস্মরণীয় বাণীরূপ হয়ে আছে।

শুধু মাটি আর মানুষ নয়—এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ঋষি, সাধকদের ওপর রবীন্দ্রনাথের যে ভক্তি ছিল, তাকে যদি স্বদেশ-ভক্তি বলতে বাধা না থাকে—তাহলে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ অতীতেও কোনদিন জন্মান নি—ভবিষ্যতেও কখনও জন্মাবেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ঘুম

সুলতা সেনগুপ্ত

ঘুমপাহাড়ে ঘুমের বুড়ী মেঘের চাদর দিয়ে মুড়ি
ঘুমিয়ে থাকে লক্ষ্মীমেয়ের মতো
ঘুমের দেশে রাতের আঁধার চোখ দু'টি তাই খোলেই না তার
ঘুমিয়ে থাকে বছর শত শত
সেথায় গিয়ে ভ্রমণকারী আস্তে ধীরে চালায় গাড়ী
মরণ ছোঁয়া খাদের ধারে ধারে
চুপিচুপি বাতাস চলে ফিস্‌ফিসিয়ে গল্প বলে
শান্ত সবুজ পাতার ঝাড়ে ঝাড়ে।

ঘুম ভাঙাতে নেয় কে ঝুঁকি দুষ্টু পালায় দিয়ে উঁকি
ঝর্ণা বিভোর ঘুমপাড়ানী গানে
পাইন, সেগুন, শালে, ধূপে স্বপ্ন ঘোরে নানা রূপে
'ঘুম' কে ছেড়ে যায় না কোনোখানে
ঘুমপাহাড়ের ঠাণ্ডা মাটি ঠিক যেন রে শীতলপাটি
বোলছে ডেকে, আয় রে বাছা ঘুমো
ঘুম পাহাড়ের ঠাণ্ডা পাথর বিলোয় যেন মায়ের আদর
দোলায় দিয়ে মায়ের স্নেহ চুমো

ঘুমের পিসি, ঘুমের মাসী মনের সুখে বারোমাসই
হিম-কুয়াশায় দিচ্ছে হামাগুড়ি
তাই কখনো চোখ খোলে না ঘুমপাহাড়ের বুড়ী।

বিজ্ঞানসাধক প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীনিরঞ্জন সেন

বিজ্ঞানসাধক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুমহান কীর্তির সঙ্গে তোমরা বিশেষ ভাবেই পরিচিত।

স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন বিজ্ঞানসাধক। স্বাধীন ভাবে চলমান জীবন চালানোর তিনি সারথি ছিলেন।—বাঙ্গালী কেউ চাকুরীপ্রিয় থাকুক তা তিনি চাইতেন না—চাইতেন বাঙ্গালী ব্যবসা করুক। বিদেশের ওষুধপত্রের আশায় কেউ বসে থাকুক এ-ও তিনি চাইতেন না—তার জ্বলন্ত উদাহরণ তাঁর সুমহান কীর্তি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান—'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ।'

তাঁর কর্মনৈপুণ্য ও ত্যাগ সত্যিই প্রমাণ করে দেয় তিনি বাঙ্গালীর দরদীমনের মানুষ।

সত্যদ্রষ্টা সাধক পুরুষ তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন প্রতি সাধনার ক্ষেত্রে। 'নব্য রসায়নের জনক' বলে স্বীকৃতি পান। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি'র প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'বিজ্ঞান কলেজ' খোলার প্রধান উৎসাহী ও সাহায্য-কারী। জাতিভেদ প্রথাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। ত্যাগ ছিল তাঁর জীবনের পরম সাথী। ভোগ-বিলাসিতাকে তিনি 'ত্যাগ-সমুদ্রে'র অতলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। শোন—তিনি কি বলতেন,—

'যে দেশের লোক পেট ভরে খেতে পায় না, সে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা শুধু অপরাধ নয়—মহাপাপ⋯।'

কর্তব্যই ছিল তাঁর কাছে বড়। কর্তব্যের কাছে আত্মসমর্পণই পূর্ণতার স্বাক্ষর। তিনি ছিলেন চিরকুমার।

সাধারণ মানুষ যেমন সাদাসিধা থাকে তার চেয়ে শতগুণ সাদাসিধা থাকতেন তিনি। তারই একটা ঘটনা বলি শোন :

তিনি একদিন লেবরেটরিতে কাজ করছিলেন লুঙ্গি ও একটা ছোট্ট জামা পরে। বয়স তখন বেশই—কাজেই, কাজের ফাঁকে তিনি একটু বসেছেন—সেই সময়ে একজন বিদেশী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন লেবরেটরিতে। কিন্তু ঐ অবস্থায় বিজ্ঞান-সাধককে দেখবেন তা তিনি আশা করেননি। তাই তাঁকে (প্রফুল্ল-চন্দ্রকে) দপ্তরী ভেবে চলে আসছিলেন, তখন তাঁর ছাত্ররা বিদেশী ভদ্রলোককে সঙ্গে করে এনে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

বিদেশী ভদ্রলোক তো অবাক! যাঁকে দপ্তরী ভেবে চলে এসেছিলেন তিনিই বিজ্ঞানসাধক আচার্যদেব। এত সাদাসিধা—!

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আচার্যদেব খুলনা জেলার 'রাড়ুলী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হরিশ্চন্দ্র রায়। তিনি গ্রাম থেকে কিছুদিন পড়াশোনা করার পর কলকাতায় এসে 'হেয়ার স্কুলে' ভর্তি হন। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি 'মেট্রোপলিটন কলেজে' ভর্তি হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'গিলক্রাইষ্ট' বৃত্তি পান এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যান।

সেখানে ৬ বছর 'এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে' শিক্ষা লাভ করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—ডি, এস, সি উপাধি পান।

দেশে ফিরে এসে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। ঐ সময়ে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন উক্ত কলেজের অধ্যাপক। সহকর্মী রূপে পেয়েছিলেন তাঁকে।

শোন—ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান সাধকের ইচ্ছা ছিল তিনি ঐতিহাসিক হবেন। কিন্তু তিনি হলেন বিজ্ঞানসাধক—বহু তথ্য আবিষ্কারক।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ রচনা করে পাশ্চাত্য দেশবাসীদের কাছেও তাঁর উন্নত মনের পরিচয় দিয়েছেন। দেখিয়েছেন পাশ্চাত্য দেশবাসীদের ভারতের রসায়ন শাস্ত্রের আদি পর্ব ও উন্নতির প্রতিটি সোপান।

তিনি ছিলেন আদর্শ গুরু। তাঁর ছাত্রদের নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই তবুও বলছি,—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জি, মাণিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর ও মেঘনাদ সাহা।

আদর্শ গুরু শিক্ষা ও প্রেরণার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের মধ্যে তাই তাঁরাও (ছাত্ররা) বিরাট মহীরুহ রূপে দাঁড়িয়ে আছেন তোমাদের সামনে।

তিনি ছিলেন আদর্শ দেশসেবক। আর্তের সেবায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁর চিন্তা ছিল উন্নতমূলক। সারা জীবন গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। গঠনমূলক তাঁর পরিকল্পনা।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন ৮৩ বছর বয়সে কৃতী ও উদার মহামানবের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়!

তবুও তিনি বেঁচে আছেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টির মাধ্যমে। তোমাদের মানসে বিজ্ঞানসাধক আচার্যদেবের স্থান চিরদিন থাকুক—এই আমার একান্ত কাম্য।

শূন্যে ভাসমান মোমবাতি

যাদুকর বি দাস

যাদুকর একটা মোমবাতিদানে জ্বলন্ত মোমবাতি সহ ষ্টেজে এলেন। তারপর ধীরে ধীরে মোমবাতির তলা থেকে বাতিদানটা সরিয়ে নিতেই দেখা গেল মোমবাতিটা শূন্যে ভাসমান অবস্থায় রয়ে গেলো। খেলা শেষে মোমবাতিটা দর্শকদের হাতে দিয়ে দেখালেন যে ওটা আসল মোমবাতি কোন কৌশল নেই।

ছবি দেখলেই ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারবে। একটা সরু ষ্টীলের তার (গীটারে যে তার ব্যবহার করা হয়) কালো রঙ করে তার একদিকে একটা সীসার টুকরো লাগান থাকবে। খেলাটা দেখাবার সময় কালো কোট পরে দেখাতে হবে। কোটের ভিতরের দিকে সীসার টুকরোটা থাকবে এবং তারের আর এক মাথা কোট ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে থাকবে। ষ্টেজে আসার আগেই যাদুকর জ্বলন্ত মোমবাতিটা ঐ তারে গেঁথে নিয়ে আসবেন। বাতিদান সরিয়ে নিলেও তখন মোমবাতি আর পড়ে যাবে না। বাতির জ্বলন্ত শিখা সামনে থাকায় পেছনের কালো তার দর্শকদের নজরে পড়বে না। খেলা শেষ করার আগে মোমবাতিটা সামনে টেনে নিলেই তার খুলে যাবে এবং সীসার ওজনটা থাকার জন্যে কোটের ভেতরের দিকে চলে যাবে। বলা বাহুল্য তারটা সুতো দিয়ে কোটের সাথে লাগান থাকবে নইলে ওজনসহ তার নীচে পড়ে গেলে সব মাটি।

[এর আগে অনেকগুলো খেলা তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছি। আশা করি সেগুলো তোমাদের ভালোই লেগেছে। কি ধরনের ম্যাজিক তোমরা শিখতে চাও জানালে ভবিষ্যতে সেইভাবে লেখার চেষ্টা কোরবো, চিঠি দিয়ে জানাতে ভুলো না। ভবিষ্যতে তোমাদেরই মধ্যে থেকে হয়ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর তৈরী হবে। আমরা সেই দিনটির জন্যেই তো অপেক্ষা করে আছি।]
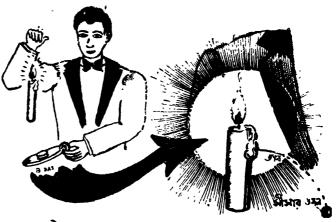
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

শিবানী যা ভেবেছিল, হলোও ঠিক তাই। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেলো, ইন্দ্রনাথের দাঁত চাপা গলার ডাক, আবদুল !

ডাকটা চাপা কিন্তু থিয়েটারের অভিনেতাদের ভেতরে টেনে নেওয়া কণ্ঠ যেমন গিয়ে পেছনের শেষ শ্রোতাটির কানেও পৌঁছে, ইন্দ্রনাথের এই চাপা দাঁতের ডাকও আবদুল এ বাড়ীর যেখানেই থাকতো শুনতে পেতো। কিন্তু সে কাছাকাছিই ছিল ; থাকেও সে তাই। সাহেব যতক্ষণ বাড়ী থাকে, ততক্ষণ সাহেবের ডাকের সীমার বাইরে আবদুল কখনও যায় না। আর এখন তো সে সাহেবের এই ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল ! তার খালি পায়ে ত্রস্ত-ব্যস্ত শব্দ বারান্দা পার হয়ে গেল তক্ষুনি।

শিবানী ঘরে ঢুকে আর বাতি জ্বালল না। টানা বারান্দায় চার চারটা নিওন আলো একসঙ্গে জ্বলছিল। তার আলোই ঘরে এসে পড়ছিল। দেখল, কাচ্চি ঘরের মাঝখান জুড়ে আঁচল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়াল সে। মাথার কাঁটা টেনে খুলতে খুলতে ভাবতে লাগল, ইন্দ্রনাথ কখন ফিরেছে। নিশ্চয়ই খুব বেশীক্ষণ নয়। ওর অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে কাচ্চি ঘুমিয়ে পড়ার পর ইন্দ্রনাথ এসেছে। না'হলে ইন্দ্রনাথ ফিরে, বারান্দার সব ক'টা আলো জ্বালিয়ে নিজের ফেরাটা চড়া করে তুলে যেভাবে পায়চারি করছে, তাতে আগে ঘুমিয়ে না পড়লে কখনই কাচ্চি এ ভাবে ওর ঘরে ঘুমোত না। বরং শঙ্কিত হয়ে জেগে বসে থাকত।

ইন্দ্রনাথের ফেরার খবর সে জানে না। হয়ত কিছু আগে মাত্র এসেছে। তবু রাত বারোটায় আসা অবশ্যই ইন্দ্রনাথের সন্ধ্যা রাতে বাড়ী আসা। তা যাই হোক—খোঁপার শেষ কাঁটাটা টেনে তুলে হাতের কাঁটাগুলো ড্রেসিং টেবিলের উপর ফেলে দিল শিবানী—ইন্দ্রনাথ কখন এসেছে সেটা কিছু বড় কথা নয়। সে দু'ঘণ্টা আগে আসতে পারে। পারে চার ঘণ্টা পরে আসতে। ও যে আজ দেরী করে এসেছে এটাই ওকে ভীষণ তৃপ্ত করে তুলল। এই যে ইন্দ্রনাথ দেখল, রাত বারোটা বেজে গেছে ও এখনো বাড়ী আসেনি। তারপর শব্দ পেলো গাড়ী থামবার। ওকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ী চলে যাবার—ব্যস্ ! নইলে ইন্দ্রনাথ যদি আজ এসে দেখত শিবানী চুপচাপ বসে আছে বা বই পড়ছে তবে ক্ষোভের সীমা থাকত না শিবানীর। ওর সকালবেলার সেই কথা—'আমিও রাত দু'টোয় ফিরতে পারি, তিনটেয় ফিরতে পারি—তিনদিন না ফিরতে পারি', জবাব মুহূর্তে শূন্য হয়ে যেত ইন্দ্রনাথের কাছে।

কিন্তু কাচ্চি করছে কী ! দু'হাত উপরে তুলে রাতের জড়তা ভাঙল শিবানী—এখনও কাচ্চি ওর মুখ ধোবার গরম জল নিয়ে আসতে পারলো না। ঘাড়টা একাত-ওকাত করল—কেমন যেন লাগছে ঘাড়ে। বোধ হয় বেমোচড়ে শুয়েছিল নয়তো কাল সিনেমা-হলে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। হলের ঠাণ্ডাটা খুব বেশিই ছিল। ঘাড়ে কাচ্চিকে দিয়ে একটু উইণ্টাজেন মালিশ করাতে হবে···কাচ্চিটা বড্ড ঢিলে, আবদুলের মতো চটপটে নয়। আবদুল খাসা চাকর। খাস বেয়ারা হবার উপযুক্ত। নিঃশব্দ, চতুর, বুদ্ধিমান। প্রভু যদি কেউ হতে চায় তো তার এমনি ভৃত্যই চাই। কাজেকর্মে চতুরতায় আবদুলের সঙ্গে কাচ্চির তুলনাই চলে না কোন রকম। আর কথা ? কাচ্চির কথা থামানো এক এক সময় কষ্টসাধ্য হয়। সে সাবধান সাহেবের কাছে—ওর কাছে একেবারেই নয়। শিবানী যদি আবদুলের কম কথা বলার উল্লেখ করে, তবে কাচ্চি ভারি বিস্মিত হয়। বলে, আবদুল কথা বলবে কার সঙ্গে ? সাহেবের সঙ্গে ?

শিবানী চটে ওঠে কাচ্চির বড় বড় চোখ করা বিস্ময় দেখে। বলে, তবে তুই আমার সঙ্গে এত কথা বলিস কেন ?

কাচ্চি নির্বিকার ভাবে জবাব দেয়, তুমি যখন মেমসাহেব

তখন কী তোমার সঙ্গে কথা বলি?—সাহেবের কাছে কী তোমার সঙ্গে কথা বলি?—ঘরে বলি। যখন মা ডাকি তখন বলি। ভীষণভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায় কাচ্চি, যখন মেমসাব ডাকি তখন কক্‌-খনো কথা বলিনে। বলি? তুমিই বল মা?

মেমসাব ডাকে যখন তখন কথা বলে না, যখন মা ডাকে তখন কথা বলে, এ জবাবের আর উত্তর হয় না। শিবানীও যেন হেরে যায় কাচ্চির কাছে। যাই হোক, মানুষটা ভালো কাচ্চি। আর ভালোর চাইতে ভালো কী হতে পারে?

কাচ্চির অপেক্ষায় দুই হাঁটুর উপর থুতনী চেপে বসে রইল শিবানী, পুবের জানালা দিয়ে এসে পড়া রোদের ফালিটার দিকে তাকিয়ে।

সমস্ত বাড়ীটা নিঃশব্দ। ভোরবেলাকার ব্যস্ততার কোন সাড়া উঠছে না কোথাও। কোনদিনই ওঠে না। কিন্তু ওদের সংসার চাকাও ঘুরতে আরম্ভ করে সকাল থেকে সব সংসারের মতই। ভোর পাঁচটায় উঠে আবদুল বেড-টি তৈরী করে। দুই হাতে দুই ট্রে নিয়ে এসে মেমসাহেবের ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। টোকা দেয় দরজায়। কাচ্চি এলে তার হাতে তুলে দেয় একটা ট্রে, আর একটা নিয়ে সে চলে যায় ইন্দ্রনাথের ঘরে। মালী লেগে যায় বাগানের কাজে। সামনে ফুলের বাগান, পেছনে সজীর। মালীর হাতের খুরপি বিশ্রাম পায় না। জলের ঝারি নামে না। তার হাতের খুরপি খুচ খুচ শব্দে মাটি খুঁড়ে চলে। বাবুর্চি প্লাসটিকের মস্ত থলে ঝুলিয়ে ছোটে বাজারে। ভোরবেলাকার প্রথম পর্ব এই। তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্ব। আটটা বাজে। সাহেব, মেমসাহেব ওঠেন। আবদুল আর কাচ্চি তৎপর হয়ে ওঠে গৃহস্বামী আর গৃহস্বামিনীর পরিচর্যায়। বাবুর্চি তার গ্যাসচুল্লী একটার জায়গায় জ্বালিয়ে দেয় দু'টো। বাবুর্চির সাহায্যকারী ছোকরাটা ছুটোছুটি করে সাহায্য করে চলে তাকে। দুটি ব্যক্তির জন্য যেখানে এতগুলো লোক খাটে সেখানে বাঙ্গালী বাড়ীতে হৈ-হট্টগোল বাধলেও সাহেববাড়ীতে বাধে না। ইন্দ্রনাথ সাহেব। তাই তার সংসার চাকা ঘুরছে কিন্তু শব্দ উঠছে না।

এখন দ্বিতীয় পর্বের কাজ আরম্ভ হয়েছে শিবানীর সংসারে। কাচ্চি আর আবদুল সাহেব মেমসাহেবের প্রাতঃকালীন কাজ একটার পর একটা করে চলেছে। বাবুর্চি তার এক গ্যাসচুল্লীতে চাপিয়ে দিয়েছে মুরগীর সুপ। এক হাঁড়ি জলের ভেতর মুরগীর টুকরো, ছেঁচা পিঁয়াজ, আদার কুচি আর গোটাকয় কাঁচামুগের ডাল টগবগ করে ফুটছে। আর এক চুল্লীতে সে কর্ণফ্লেকের জন্য দুধ জ্বাল দিচ্ছে। ইলেকট্রিক টোষ্টারে রুটি ঢুকিয়ে পটপট শব্দে চাবি ঘুরিয়ে রাখছে লো'তে নিয়ে। কখন সাহেব মেম উঠবে কে জানে। আজ রবিবার। ব্রেকফাষ্ট খাবে শিবানীও। অফিস থাকলে সে শুধু এক কাপ চা খায় আর কিছু নয়। ডিম ফাটিয়ে ডিমের খোল দু' ফাঁক করে ফ্রাই প্যানে বেকন-এর উপর ঢালতে ঢালতে বাবুর্চি রবিবারের লাঞ্চের কোর্সের কথা ভাবছে। মালী ফুল সাজাচ্ছে ঘরে, বারান্দায়, উপরে, নীচে।

একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো শিবানীর ঘরে।

মালী বোধ হয় বেলফুলের মস্ত এক ঝাড় বেঁধে ওর জানালা বরাবর বারান্দায় রেখে গেল ওর এই গন্ধটুকু পাওয়ার জন্যই। শিবানী যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো বেলফুলের উপর মালী প্রচুর জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ফুলগুলো জলে ভেজা। প্রতিটি পাপড়ির ভাঁজে ভাঁজে টলটল করছে ফোঁটা ফোঁটা জল। দক্ষিণের বাতাস ফুলের সুবাস ঢালা জলবিন্দু তুলে নিয়ে নিয়ে এখন ওর ঘরের ভেতর বয়ে যাবে—ঈষৎ বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল শিবানী—আঃ! যতদামী সেন্টই হোক, তাজা ফুলের গন্ধের কাছে লাগে না। তখনকার দিনে সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা মহার্ঘ সব আতর নির্যাস থাকতেও একটি তাজা গোলাপ যে হাতে রাখতেন, তা এই জন্য। এখন থেকে ও সেন্টঢালা রুমাল নয়—তাজা গোলাপ রাখবে বেরুবার সময়।

বেগম আর সম্রাজ্ঞীদের হাতে ফুল ধরা ছবির মতো নাকি?

তা কেন। খোঁপায় গুঁজবে।···কিন্তু খোঁপাটা দূর হয়ে যায় বড্ড! ওটুকু ফুলের গন্ধ মাথা ঘুরে সামনে আসতে আসতে ফুরিয়ে যাবে। ছেলেরা ফুল গোঁজে তাদের কোটের ফ্লাওয়ার বাটনে। সেটা বেশ নাক বরাবর হয়। আচ্ছা···কাঁধের শাড়ির উপর লম্বা সুন্দর একটি ব্রোচ দিয়ে ফুলটা এঁটে দিলে কেমন হয়? শাড়িও বিন্যস্ত থাকবে, ফুলের গন্ধটিও সামনা বরাবর পাওয়া যাবে।

আজকাল রেওয়াজ নেই ব্রোচ আঁটবার?

শিবানী ওসব রেওয়াজ-টেওয়াজ মানে না।

কাঁধে ফুল গোঁজা দেখলে সব হাসবে?

তা ও:ক দেখলে হাসবে, সিনেমার নায়িকাকে—দেখলে আরম্ভ করবে—এ তো জানা কথা। এই যে মাথার উপর বাজারের ঝুড়ি উপুড় করে তাতে চুল জড়িয়ে খোঁপা করছে তাতে হাসছি না আমরা? ওরা কী গ্রাহ্য করছে? ও কাঁধে ব্রোচ এঁটে তাতে ফুল গুঁজলে কে হাসবে ওরই বা তা গণ্য করবার কী আছে। হ্যাঁ ঠিক ও কালকে গোলাপ এঁটে বেরুবে কাঁধের শাড়িতে।

ও মা, তুমি এখনও বিছানায় বসে! গরম জলের প্যান হাতে ঘরে ঢুকল কাচ্চি।

শিবানী উঠে দাঁড়াল খাট থেকে। বলল, বসে থাকব না তো করব কী? মুখ ধোবার গরম জল আনতে গেছিস তো গেছিসই। এতক্ষণ গরম জলে চা'ল ছেড়ে দিলে ভাত ফুটে যাবার কথা।

কাচ্চি গরম জলের প্যান নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে তার কথা শোনা যেতে লাগল, দেরী কী আমার জন্য? তোমার ঐ নচ্ছাড় পুষির জন্য। আসছি জল নিয়ে, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে দিলে পায়ের উপর এক থাবা। তুমি বলবে, ওটা ওর খেলা। আর আমার তো প্রাণ যায়। পায়ের উপর কী যে থাবা দিলে—লাফিয়ে উঠলাম—গেল প্যানশুদ্ধ জল হাত থেকে পড়ে। হাত পা যে পুড়ে যায়নি সেই মহাভাগ্য। ফের গরম জল করে তবে তো এলাম। তোমার আদুরে ছানা, মারবার তো জো নেই। মিউ মিউ করে নাকিকান্না জুড়ে দেবে—

বেড়াল ছানাটা কাচ্চির পেছন পেছন এসে ওর দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে মিউ মিউ করছিল। ছানাটাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল শিবানী। বলল, ওমা, তোর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম রে পুষি! ছিলি কোথায়?

জবাব দিল কাচ্চি। থাকবে আবার কোথা ও। তুমি বিছানায়

গেলে রাগ কর, এটা খুব বোঝে। তাই তুমি না ওঠা পর্যন্ত আমার পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে।

শিবানী কাচ্চির কথা শুনছিল না। সে বেড়ালছানাটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে যাচ্ছিল, কাল রাতে ঘুমিয়েছিস কোথায়? মারেনি তো তোকে কেউ? দুধ খেয়েছিস?

কাচ্চি বেরিয়ে এলো স্নানের ঘর থেকে। বলল, আমার ঘরে দিব্যি বিছানা দিয়েছ—সন্ধ্যা হতে না হতে গুটি গুটি শুয়ে পড়েন তিনি। যা আরামের বিছানা।...

কাচ্চি ঘর গুছোনোয় হাত দিল।

শিবানী পুষিকে নামিয়ে দিয়ে গিয়ে ঢুকল স্নানের ঘরে।

স্নানান্তে মায়ের পাঠানো নতুন শাড়ি পরল সে। তারপর ভিজে চুল পিঠে ছেড়ে পূবদিককার জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো জন্মদিনের সূর্যকে প্রণাম করতে। শ্রাবণ মাসের আকাশ। গাছের মাথায় রোদ ঝকঝক্ করলেও সাদা কালো মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের গায়। এই রোদ সরে গিয়ে এক্ষুনি হয়ত এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবে কিংবা হয়ত রোদ যাবেও না। রোদের উপর দিয়েই ঝম্‌ঝম্ করে এক ঝাঁক বৃষ্টি উড়ে চলে যাবে। শ্রাবণে সূর্য যেন পূর্ণ তেজে কখনই ওঠে না। ভিজে মাটির মতো তার শরীরটাতেও যেন ভিজে ভেবভেবে ভাব থাকে। এরকম ভিজে স্যাঁতসেঁতে সূর্য শিবানীর ভালো লাগে না। ও যদি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে জন্মাত! প্রতিদিন অবশ্যি এই সূর্যের কথা ওর মনেও থাকে না। শুধু পূজা বা উৎসবের দিনগুলোতে মনে হয়। তাও মনে হয় বাড়ীতে কোন ঠাকুর ঘর নেই বলে। চোখ বুজে প্রার্থনা করবার কোন স্থান নেই বলে। থাকলে সেখানেই গিয়ে নিশ্চয় সে প্রণাম করত। ঠাকুর ঘর নেই—সূর্যই কী আছে! গাছের মাথায় মাথায় রোদ খেলছে ঐটুকু। তার পরই তো সব বাড়ীর সার—চোখ বন্ধ করল শিবানী সূর্যপ্রণাম করবার জন্য। কোন মন্ত্র নয়—কোন শব্দ নয়, কথা নয় শুধু স্তোত্রের সুর গুন গুন করে টে'নে চলল সে। সকাল বেলা ঠাকুমার মুখের যে স্তোত্রপাঠ শুনে সে জাগত। তারপর শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে কান পেতে শুনত। শুনতে শুনতে সুর শব্দ ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠাকুমা সংস্কৃত শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণ করতেন না—ও নিজেও শুদ্ধ উচ্চারণ জানে না। তাই স্তোত্রগুলোর সুরটাই সে কখনো মনে মনে, কখনো বা গুন গুন করে টেনে তার মনের অর্ঘ দেবতার পায়ে অর্পণ করে। পদের জন্য কিছু ঠেকে থাকে না। সুরই তাকে মুহূর্তে নিয়ে পৌঁছে দেয় সেই উচ্চ জায়গায় যেখানের হাওয়া নির্মল—যেখানে যাওয়ার শক্তি শব্দ রাখে না। ঠাকুমা ওকে শব্দ দিয়ে যেতে পারেন নি, কিন্তু সুর দিয়ে গেছেন। বড়টাই দিয়ে গেছেন!

যার আনন্দ শিহরণ এক লহমায় ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় তাকে। সে আনন্দ ঝংকারে ঝংকৃত হতে হতে বলে উঠতে পারে, এ জীবন আনন্দের! বিশ্ব আনন্দের! সংসার আনন্দের!

মা!

কাচ্চির ডাকে চোখ মেলে শিবানী ঘরের দিকে ফিরল।

কাচ্চি বলল, কী করছ মা। সাহেব কখন তৈরী হয়ে গিয়ে খাবার ঘরে বসেছেন। বাঃ, কী সুন্দর শাড়ি পাঠিয়েছেন দিদিমা! কী সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে। কাছে এসে প্রণাম করল কাচ্চি শিবানীকে।

শিবানী বুঝল তার জন্মদিনের প্রণাম হলো এটা।

শিবানী ড্রেসিং টেবিলের টুলের উপর বসল। এ জীবন আনন্দের, বিশ্ব আনন্দের, সংসার আনন্দের মনে হলেও এই মুহূর্তে মর্ত্যের মাটিটা কিছু শক্তই ঠেকতে লাগল শিবানীর কাছে। ইন্দ্রনাথ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে এখন তার কাছে গিয়ে বসতে হবে। ওর জন্মদিনের কথা ইন্দ্রনাথ কখনো বিস্মৃত হয় না। আজও নিশ্চয়ই হয়নি। ঠিক মূল্যবান কোন উপহারও সে নিশ্চয়ই এনেছে। হয়ত উপহারের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েই টেবিলে বসেছে। ও গেলে সেটা ওর দিকে ঠেলে দেবে এক আঙুলে। এই এক আঙুলে ঠেলে দেওয়াটা যে অবহেলার নয় তা প্রমাণ দেবে উপহারটার টাকার অঙ্ক। সে অঙ্ক ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে মেলে না আরো যা বলবে তা হলো, তোমার জন্যে যত টাকাই খরচ করি—আমার কাছে তা কিছু নয় হয়ে যায়। কত বড় অঙ্কের উপহার আমি কত তুচ্ছ ভাবে দিতে পারি দেখ। একদিন ছিল ইন্দ্রনাথের দেওয়া মুক্তোর মালা গলায় পরে ওর মনে হতো ইন্দ্রনাথের গলায় জড়ানো হাত। তার হাত যেমন ওর গলা থেকে খুলতে ইচ্ছে করত না। তার দেওয়া মালাও না। কিন্তু আজ তার দেওয়া উপহার ওর পক্ষে হাত বাড়িয়ে নেওয়াও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

মা, সাহেব অপেক্ষা করছেন যে—

আসছি। তুই যা। আসছি বলে কাচ্চিকে সে বিদায় দিল। কিন্তু তেমনি বসে রইল টুলের উপর। ইন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছে। কাল রাতে ওর মন কী ইন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করছিল?

ও ঘরে প্রবেশ করল। আরো বার দুই হাঁটল ইন্দ্রনাথ বারান্দার এমাথা ওমাথা। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, আবদুল।

আবদুলের ত্রস্ত-ব্যস্ত পায়ের শব্দ ইন্দ্রনাথের ঘরের দিকে চলে গেল।

শিবানী ঘরের বাতি জ্বালল না। বারান্দার সব কটা আলো জ্বলছিল। তাতেই ওর ঘর আলোকিত ছিল। কাচ্চিটা মেঝের উপর অকাতরে ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক। বাতি জ্বাললেই জেগে যাবে। দরকার কী। কাচ্চিকে তো প্রয়োজন নেই ওর। ও খেয়ে এসেছে। ঘুমোক কাচ্চি। নিঃশব্দে চলাফেরা করে শাড়ি-কাপড় ছাড়ল। নাইটকোট পরল। বারান্দার দিককার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে। আবদুলের চলার সঙ্গে তার হাতের থালার উপরকার বোতল গ্লাসের ঠোকাঠুকির আওয়াজ উঠতে লাগল। ঠুন ঠুন, ঠুং ঠাং; ঠুন ঠুন ঠুং ঠাং।

ইন্দ্রনাথের ঘরের ভেতরটা শিবানী এতটুকুও দেখতে পাচ্ছে না। দু' ঘরের মধ্যখানে ভারী পর্দা ঝুলছে? তাতে তার চোখ বন্ধ। তবু সে বোজা চোখে ভারী পর্দাটানা ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে লাগল শব্দ মিলিয়ে মিলিয়ে। আবদুল তার হাতের থালা ঘরের দেয়াল ঘেঁষা টেবিলটার উপর রাখল। হুইস্কির বোতল তুলে চাবি দিয়ে টেনে মুখ খুলল। গ্লাসে

ঢালল। গ্লাসটার তলার দিকে টলটল করছে সোনালীরঙ মদ। এবার যেটার মুখ আবদুল চাবি দিয়ে টানছে, সেটা ঠাণ্ডা ঘামে ভেজা সোডার বোতল। হুস্ করে বেরিয়ে কিছুটা টেবিলের উপর নিশ্চয়ই পড়ল। আবদুল তাড়াতাড়ি গ্লাসে ঢেলে দিল। কড়া সোনালীরঙের মদ তরল হতে হতে ফিকে হয়ে গ্লাস ভরে গেল। সেই ভরা গ্লাস তুলে নিয়ে ইন্দ্রনাথের আরাম কেদারার পাশে ছোট্ট কাচের টেবিলটার উপর রাখল আবদুল। এগিয়ে দিল হাতের কাছে সিগারেটের টিন আর লাইটার। কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে টেবিলে যে ক' ফোঁটা সোডার জল পড়েছিল সেটা মুছে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। থালার উপর রইল হুইস্কির বোতল আর মেঝের উপর রইল বরফ ভর্তি কাচের গামলার ভেতর ঠাসা, আরো গোটা তিন চার সোডার বোতল। এরপর ইন্দ্রনাথ নিজেই ঢালবে, খুলবে, নেবে। কিন্তু তা' হলেও যতক্ষণ ইন্দ্রনাথ না বিছানায় যাবে, আবদুল শোবে না। দোতলার সিঁড়ির মুখে সে ঠিক ঝাড়ন কাঁধে নিয়ে বসে থাকবে। ইন্দ্রনাথ যদি ডাকে তবে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হাজির দেখবে তাকে।

আবদুল ইন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার বাতি সব নিভিয়ে দিল। শিবানীর ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। সমস্ত বাড়ী এখন অন্ধকার। এক ইন্দ্রনাথের ঘরে পুরু সেডে ঢাকা আলো জ্বলছে। চড়া আলো নয়। অন্ধকার-অন্ধকার ভাবের আলো।

ইন্দ্রনাথ পায়চারি করছে। একবার ছোট্ট কাচের টেবিলটার কাছে যাচ্ছে। গ্লাস তুলে এক চুমুক খাচ্ছে। ফের গ্লাসটা টেবিলে রেখে হাঁটছে।

শিবানী ভাবছিল উঠে দরজা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু বাধল। ইন্দ্রনাথ ঘরের ভেতর হাঁটছে—এ অবস্থায় একটা লোকের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় কী করে!

রাত বাড়তে লাগল। ইন্দ্রনাথ নিজেই মদ ঢালতে আর সোডা খুলতে লাগল। শিবানী চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল এখন চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথের ঘরের দিকে। দু' ঘরের মধ্যখানের পর্দাটা দুলছে না। ভারী বলে বেশী সময় স্থির হয়েই থাকছে। মাঝে মাঝে এক-আধবার বাতাসের চাপ জমে উঠলে ওলট-পালট খাচ্ছে কখনো তলার দিকটা, কখনো পুরো পর্দাটা। ইন্দ্রনাথ সিল্কের স্লিপিং পাজামা পরেছে···হাতের ঘড়িটা খোলেনি···তার পরিপাটি চুল এখন অবিন্যস্ত···মাঝে মাঝে বাঁ হাত চুলের ভেতর চালাচ্ছে···ঘড়ির প্ল্যাটিনামের ডায়েলটা চোখে পড়ছে মাথার পেছনের অন্ধকারে। স্লিপিং সার্টের ঢিলে হাতটা কনুই-এর কাছে নেবে গেছে। পাতলা লালচে লোমে ভরা দুটো ফরসা বলিষ্ঠ হাত—না, ও হাত দুটো এখন দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু—এ হাত দুটো ও চেনে—ওর শরীর চেনে। ওকে জড়িয়ে ধরার সময় হাতের লালচে লোমগুলো সব ফুলে ওঠে এ হাত দুটোর···

শিবানীর শরীরের রোঁয়া কেশর ফুলালো।

ইন্দ্রনাথ নতুন এক গ্লাস ঢালল। তার স্লিপারের শব্দ ওর ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে যেন একবার থামল—আবার ঘুরে চলে গেল।

ইন্দ্রনাথ কী ওর ঘরে আসবে।

ইন্দ্রনাথের পায়ের শব্দ ঘরের শেষ মাথায় চলে গেলে শিবানী ডাকল, কাচ্চি।

এক ডাকেই ধড়ফড় করে উঠে পড়ল কাচ্চি। কথা বলতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল সাহেবের ঘরে বাতি জ্বলতে দেখে। তাড়াতাড়ি আঁচল গুটিয়ে উঠে এলো শিবানীর কাছে। ফিস্‌ফিস করে বলল, তুমি কখন ফিরলে মা? আমায় তোলনি কেন?

দরকার হয়নি তাই তুলিনি। খাবার জল দে একগ্লাস।

তুমি খাবে না?

খেয়ে এসেছি।

বাতি জ্বালব?

না।

কাচ্চি এত ফিস্‌ফিস করে খাটের উপর উপুড় হয়ে কথা বলছিল যে তার সঙ্গে কণ্ঠের সমতা রাখতে গিয়ে শিবানীর জবাবও অত্যন্ত নীচু গলায় হয়ে যাচ্ছিল।

জল নিয়ে এলো কাচ্চি। জল খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিলে ইন্দ্রনাথের ঘরের দিকে তাকিয়ে তেমনি চাপা গলায় বলল, হাত পা কোমর টিপে দেবো একটু?

দরকার নেই। তুই ঘুমোগে যা।

চলে গেল কাচ্চি।

কাচ্চিকে ও তুলে দিল কেন? যে কাচ্চির ঘুম ভাঙবে বলে ও বাতি না জ্বালিয়ে শাড়ি-কাপড় ছাড়ল নিঃশব্দ পায়ে—তাকে তুলে জল চাওয়ার মতো তেষ্টা কী ওর পেয়েছিল? না ও কাচ্চিকে তুলে দিল চলে যাবার জন্য?

কান দুটো গরম হয়ে উঠল শিবানীর—ও কী ইন্দ্রনাথের আসবার জন্যে প্রস্তুত হলো?

ও কী ইন্দ্রনাথের জন্য কাল রাতে প্রতীক্ষা করেছিল?

তার লালচে লোম ঢাকা হাত দুটো কী ওকে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল?

তুলেছিল।

এসেছিল ইন্দ্রনাথ?

না, আসেনি।

কিন্তু এখন ইন্দ্রনাথ ওর জন্য অপেক্ষা করছে। তার হাতে মূল্যবান উপহার আছে। আর দেরী করলে এক্ষুনি অধৈর্য হয়ে ফের ডেকে পাঠাবে সে শিবানীকে।

তা ডেকে পাঠাক আর না পাঠাক—ওকে তো এখন যেতেই হবে ইন্দ্রনাথের কাছে। তার সামনে বসতে হবে। কথা বলতে হবে এটা ওটা সেটা—নয়ত বিরাজ করবে স্তব্ধ নীরবতা। আজ রবিবার—সমস্তটা দিন সামনে—

ডাক এলো দরজার বাইরে থেকে, মেমসাব।

কে আবদুল?

জী···ফোন।

আসছি। উঠল শিবানী। [ক্রমশ।

সাহিত্য পরিচয়

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে ভারতীয় পুস্তকসমূহের প্রদর্শনী

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম সহর নিউইয়র্কের জনসংখ্যা ৭৭ লক্ষ ৮০ হাজার। পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকেই এঁরা এসেছেন—সকল অঞ্চলের লোকই এখানে রয়েছে। সুতরাং এখানকার পৌর-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার বা 'নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে' এর হাজার হাজার সদস্য ও পাঠকদের মনোরঞ্জন করার জন্য যে নানাদেশের নানাভাষার নানা রকমের পুস্তক থাকবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। এজন্যই নানাদেশের পুস্তক প্রদর্শনী এখানে লেগেই আছে। সম্প্রতি এই গ্রন্থাগারে অষ্টম আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। ২৮টি দেশের ৮০০ পুস্তক প্রকাশক এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিউইয়র্কের ফিফ্থ এভিন্যুস্থিত বিরাট গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে সাম্প্রতিককালের ৫ হাজার পুস্তক ও সাময়িকপত্র প্রদর্শিত হয়েছে। উপন্যাস এবং অন্যান্য গ্রন্থও এর মধ্যে ছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিনিধি অ্যাডলে ষ্টিভেনসন। বহু ভারতীয় পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা ছিল এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। মি: ষ্টিভেনসন ও অনেকেরই অভিমত—এই সকল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা দর্শকবৃন্দের মনে ভারত সম্পর্কে নূতন ধারণা সৃষ্টি করেছে। গত ১ই জুন থেকে ১২ই জুন পর্যন্ত ওয়াশিংটনে সাফল্যের সঙ্গে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়ার পরেই ঐ মাসেই দুই সপ্তাহের জন্য নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর ডিরেক্টার মি: এডওয়ার্ড জি ফ্রেচেভার ঐ লাইব্রেরী ভবনে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। পুস্তকের মাধ্যমে একের সঙ্গে অন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় মি: ষ্টিভেনসনের এই ধারণা তিনিও অনুমোদন করেন। মি: ফ্রেচেভার বলেন যে, পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই এই গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করা হয়। এই সংগ্রহের পরিমাণ বিরাট। রাষ্ট্রসংঘের গ্রন্থাগারের অনুপূরক হচ্ছে এই গ্রন্থাগার। কূটনীতিবিদ্‌দের কোন পুস্তকের প্রয়োজন হলে তাঁরা সেই গ্রন্থের খোঁজ এই নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়ে থাকেন। এই প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্যোক্তা আমেরিকার পুস্তক বিক্রেতা সমিতি বা আমেরিকান বুক সেলার্স অর্গ্যানাইজেশন সমিতির প্রেসিডেন্ট মি: আইগর ক্রপটকিন জানিয়েছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের একশো' লাইব্রেরীকে এই সমিতি 'ইউ এস ইনফরমেশান এজেন্সীর' সহযোগিতায় দশহাজার পুস্তক দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। এ সকল পুস্তক গত বছর প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পুস্তক আদান-প্রদানের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীতে আগত একজন গ্রন্থাগারিক বলেছিলেন পুস্তক হচ্ছে দেশের দর্পণ। দেশের গ্রন্থ দেশবাসীর জীবনযাত্রাপ্রণালী, চিন্তাধারা, আদর্শ, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মুকুর। দেশের শিল্প ও সাহিত্যের ধারা প্রতিফলিত হয় ঐ দেশের পুস্তকে। এই অষ্টম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারত সরকারও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আটটি টেবিলের উপর ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সুন্দর সুন্দর পুস্তক সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। 'দি ওয়ে অব বুদ্ধ,' 'দি ফেস অব নিউ ইণ্ডিয়া,' 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,' 'মেওয়ার পেণ্টিং' ইত্যাদি ছাড়া ভারতীয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য, শিশুসাহিত্য, গান্ধী সাহিত্য এবং অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক বহু পুস্তকও এই বিভাগে প্রদর্শিত হয়। এলাহাবাদের গর্গ ব্রাদার্স এবং বোম্বাই-র টেকনিক্যাল প্রেস পাবলিকেশন নামে পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান এই সকল গ্রন্থ সরবরাহ করেছেন। জনসাধারণ ও গ্রন্থাগারিকদের এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগ সম্পর্কে আগ্রহ বেড়ে চলেছে। গ্রন্থাগারের প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগের প্রধান মি: নিশ এই কথা বলেছেন। এই বিভাগে ভারতের পনেরোটি বিভিন্ন ভাষায় রচিত পুস্তক রয়েছে। বহু বিদ্বজ্জন, তথ্যসন্ধানী এবং সাংবাদিক এই সকল পুস্তকের সন্ধান ও সাহায্য নিয়ে থাকেন। ভারত-সম্পর্কে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের লেখা বহু পুস্তক এখানে রয়েছে। ১৮৪৮ সালে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর বিদেশ থেকে পুস্তক সংগ্রহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। মি: নিশ বলেন যে, এখানে ভারতের যে এক সেট প্রাচীন সংবাদপত্র রয়েছে তা পৃথিবীর আর

খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ডক্টর সুশীল রায় রচিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির প্রচ্ছদ আলেখ্য। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, দাম—দশ টাকা মাত্র।
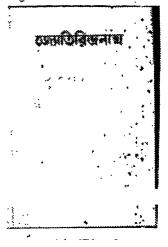
কোথাও নাই। ভারত থেকে বিদ্বজ্জনেরা এখানে এসে এই সব সংবাদপত্র থেকে নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। এই গ্রন্থাগারের একটি বিভাগ রয়েছে ম্যানহাটনের ডোজেন সেন্টারে। সেখানে ৭০টি বিভিন্ন ভাষায় রচিত ৪০,০০০ জনপ্রিয় পুস্তক রয়েছে। সারা বছরে এই সকল পুস্তকের পাঠক সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, এই সকল বই তাঁরা বাড়ী নিয়ে পড়ে থাকেন। গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগে প্রতিদিন আট হাজার পাঠক তথ্য সংগ্রহের জন্য এসে থাকেন এবং গ্রন্থাগারের নানা অনুষ্ঠানে ও পুস্তক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গ্রন্থাগারের ৭০লক্ষ পুস্তকের মধ্যে থেকে পাঠকের আপন পছন্দমত পুস্তক বেছে নিতে হয়। এই ৭০ লক্ষ পুস্তকের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ রয়েছে গ্রন্থাগারের ৩০টি শাখায়। এই সকল পুস্তক তিন হাজার ভাষা ও উপভাষায় রচিত। যে সকল পুস্তকের তাকে এদের রাখা হয়েছে সেগুলি পাশাপাশি সাজালে এর মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৮০মাইল। এক একটি পড়বার ঘরের আয়তনই হচ্ছে অর্ধ একর। এই গ্রন্থাগারের একটি প্রদর্শনী বিভাগও আছে। মাঝে মাঝে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি এবং অন্যান্য নিদর্শন যেমন, জর্জ ওয়াশিংটনের নিজের হাতে লেখা বিদায় বাণী এবং গুটেনবার্গ প্রথম যে বাইবেল ছাপা হয়েছিল তার কপি এমনি সব দুর্লভ সম্পদ প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, কর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বহুবিধ রচনাদি প্রকাশিত হচ্ছে, আলোচ্য গ্রন্থটিও তার অন্তর্ভুক্ত। এই পুস্তকে লেখক স্বামীজীর লোকশিক্ষামূলক সুচিন্তিত ভাষণাদির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের মহিমময় পটভূমিতে ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ভবিষ্যৎ ভারতের কর্মধারা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পন্থার সন্ধান দিয়েছেন স্বামীজী। তাঁর যে সব প্রবন্ধাদি ও বক্তৃতাবলীর মাধ্যমে তার প্রতিই পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। লেখকের আন্তরিকতায় তাঁর উদ্দেশ্য সফলতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে; বর্তমান জাতীয় সঙ্কটে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মূল্য অসীম, বস্তুত তাঁর প্রদর্শিত পথানুসরণেই শুধু আজ ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুর্ণজাগরণ সম্ভব এবং সেটাই আজকের ভারতীয় সরকার ও জনসাধারণের প্রধানতম কর্তব্য। কয়েকটি বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক সুচারুভাবে নিজের বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন পাঠকের সামনে, জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশের মর্মোদ্ধার করতে এতটুকু বেগ পেতে হয় না পাঠককে। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বামী সুন্দরানন্দ, প্রকাশক—বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা—৬, দাম—তিন টাকা।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বিবেকানন্দ—জীবন ও জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট। প্রকাশক—কন্টেম্পোরারি পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। শিল্পী—মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়। দাম—দুই টাকা মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক প্রবন্ধ পুস্তক, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে যোগসূত্র বর্তমান তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক। বাঙলার দিক্‌পাল ঔপন্যাসিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বস্তুত সাহিত্যের আকাশে যখন মধ্যাহ্ন ভাস্করের মতই তিনি বিদ্যমান, সে সময়েই আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রনাথের। বিকাশোন্মুখ কিশোর কবিকে প্রথিতযশা প্রবীণ সাহিত্যিক সেদিন অবজ্ঞা করেন নি। স্বহস্তে জয়মাল্য প্রদান করে স্বাগত জানিয়েছিলেন অকুণ্ঠিত চিত্তে; রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে ঘটনা বিবৃত করেছেন তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে। এই দুই বিরাট প্রতিভার পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে সাধারণের মনে স্বভাবতই যে কৌতূহল জাগে, বর্তমান গ্রন্থে তা অনেকাংশেই পরিতৃপ্ত হওয়ার মত উপাদান রয়েছে। বঙ্কিম সাহিত্যের সহিত কবির প্রথম পরিচয়, লেখকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত, বঙ্কিম সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিমত ইত্যাদি বহু বিষয়েই আলোকপাত করেছেন লেখক। সাধারণ ও জিজ্ঞাসু এই উভয়বিধ পাঠকই বর্তমান গ্রন্থটি পাঠে পরিতৃপ্ত হবেন। বিশেষত সাহিত্য শিক্ষার্থীর কাছে এ গ্রন্থ মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। লেখকের শৈলী সহজ ও সাবলীল হওয়ায় তাঁর রচনা সমধিক সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, এম-এ। প্রকাশক—সাহিত্য সদন, এ১২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে বহুবিধ রচনা এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে ও হয়ে চলেছে, কিন্তু একটি গ্রন্থের মাধ্যমে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা কম এবং সেজন্যই আলোচ্য গ্রন্থটিকে এক্ষেত্রে বিশিষ্ট বলে অভিহিত করাটা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রচনাদির মাধ্যমে লেখক রবীন্দ্রনাথের কাব্য, উপন্যাস, দার্শনিক চিন্তাধারা, নাট্যপ্রবাহ, ছোট গল্প ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর সাহিত্যের একটা সামগ্রিক রূপায়ণ করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য আমাদের জাতীয় সম্পদ, তার ঐশ্বর্যে আমরা গর্বিত, তার সৌন্দর্যে আমরা মোহিত, তাঁর সাহিত্যের মর্মে প্রবেশ করতে

হলে যথাযোগ্য পথের দিশা পাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই ধরণের প্রবন্ধগ্রন্থে সে প্রয়োজন সাধিত হয় এবং সেজন্যই বর্তমান পুস্তকটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও সাহিত্য শিক্ষার্থীর কাছে মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—শচীন সেন, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি, প্রকাশক—রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম—এগারো টাকা।

পঞ্চায়েতী রাজ

ভারতে পঞ্চায়েতী শাসন ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়, পৌরাণিক আমল থেকে এই ধারায় ভারতে শাসনপ্রণালী চলেছে, লেখকের মতে আজ এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক পঞ্চায়েত তন্ত্রের কাঠামোটাকে ভেঙ্গে গড়ে নেওয়ার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে, আর সে প্রচেষ্টাও ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, লেখক সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। আজকের যুগে গণতন্ত্রের কৌলীন্য অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু ভারতের মত বিরাট দেশে যে ঠিক গতানুগতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না সে কথাও অনস্বীকার্য। নানা জাতি, নানা ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষাভাষী অধ্যুষিত এই মহাদেশে গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হলে পঞ্চায়েতী শাসনপ্রণালী অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই, লেখক এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে সেই শাসনতন্ত্রকেই পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে, এলাকায় এলাকায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ও গ্রামসভা থেকে লোকসভা পর্যন্ত সমস্ত জনপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপনেই যে একমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম একথা অবশ্য স্বীকার্য। নব ভারতের শাসনতন্ত্রের রচয়িতা ও যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কাছেই আলোচ্য গ্রন্থটি এক বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। এটি নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের। লেখক—এস কে দে। (সুরেন্দ্রকুমার দে) প্রকাশনায়—বুক্‌ল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শিশির সান্নিধ্যে

নাট্য জগতের অবিস্মরণীয় প্রতিভা 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী' এক অন্তরঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে; বলা বাহুল্য এটা তাঁর জীবনকাহিনী নয়, জীবনের গোধূলিতে তাঁর সান্নিধ্যে আসার যে সুযোগ পেয়েছিলেন লেখকদ্বয় তারই এক নিখুঁত রূপায়ণ হয়েছে এর মাধ্যমে। ব্যক্তি শিশিরকুমার ও শিল্পী শিশিরকুমার এতদুভয়েরই সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মায় লেখাটি পড়লে, প্রকৃতপক্ষে 'আলাপচারী শিশিরকুমার' বললেই বোধ হয় বর্তমান রচনার প্রকৃতিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, এই রচনায় বিভিন্ন ধরণের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই তুলে ধরা হয়েছে তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে। শিশিরকুমার ছিলেন জীবনশিল্পী, সাহিত্যের কাল্পনিক চরিত্রসমূহকে 'রক্তমাংসের' মানুষের মতই জীবন্ত করে তিনি তুলে ধরতেন সকলের চোখের সামনে, মানব মনের সূক্ষ্মতম ভাবব্যঞ্জনাও রূপ পরিগ্রহ করত তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে, সেই অতুলনীয় প্রতিভা যে মৃত্যুতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এ চিন্তামাত্রই অসহ, কাজেই তাঁর স্মৃতি চির অম্লান রাখতে হলে এ ধরণের রচনাদির প্রয়োজনই সমধিক, আর সেজন্যই বর্তমান গ্রন্থটিকে শুধু সুপাঠ্য রচনা মাত্রেরই পর্যায়ে ফেললে চলবে না, শিশিরকুমারের ব্যক্তিমানসের এক মূল্যবান দলিল বলেই ধরে নিতে হবে। লেখকদ্বয়ের আন্তরিকতায় রচনাটি এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে, তাঁরা সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়ে এই স্মৃতিচারণ করে গিয়েছেন, এই ধরণের রচনা সফল করে তুলতে যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নাট্য ও নাট্যরূপায়ণ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যাদিও ছড়িয়ে রয়েছে এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। বলা বাহুল্য সে গুলো নাট্যাচার্য শিশিরকুমারেরই সুচিন্তিত অভিমত, এইভাবে আলোচ্য রচনায় একই সঙ্গে তাঁর স্মৃতিপূজা ও নাট্য জগতের পক্ষে প্রামাণ্য তথ্যাদিও সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখকদ্বয়—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। প্রকাশক—গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—ছয় টাকা।

একটি সোনা মন

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা, কিন্তু এই রচনায় তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়া চলে। উপন্যাসখানির মূল চরিত্র-এর নায়িকা টুকলা, বস্তুত কাহিনীর প্রাণসত্তাই নিহিত এই একটি চরিত্রের মাঝে। সবল, ঋজু ও প্রাণোচ্ছল এক তরুণী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখিকার কুশল কলমের টানে টানে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নিরাশার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও যে অপরাজিতা, হার মানে না, কোন মালিন্যই পারে না যাকে মলিন করে তুলতে এমনই এক বিজয়িনী নারীসত্তাকে তুলে ধরেছেন লেখিকা টুকলা চরিত্রটির মাধ্যমে। 'একটি সোনা মন' এই ছিল টুকলার সর্বোত্তম সম্পদ আর শুধু এই সম্পদটির জন্যই শেষ পর্যন্ত রুদ্রের

বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ স্বামী সুন্দরানন্দের রচিত 'জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থটির প্রচ্ছদ-চিত্র। প্রকাশক—বিবেকানন্দ সোসাইটি। দাম—তিন টাকা মাত্র।
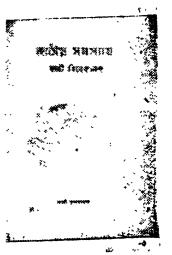
দক্ষিণ মুখের আশীর্বাদ নেমে এল ওর উপর; সুখী হল টুকুনা, দয়িতকে পেল সম্পূর্ণভাবে, উপলব্ধি করতে পারল জীবনের মধ্যে জীবনাতীতকে। নারী-হৃদয়ের এক বিচিত্র মধুর রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন লেখিকা বর্তমান কাহিনীর মাধ্যমে; রেখার আঁচড়ে ফুটিয়েছেন যেন এক রস-শতদলকে পরতে পরতে। আন্তরিকতায় অনন্য, ঋজুতায় ধন্য কাহিনী রসজ্ঞ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ রুচিস্নিগ্ধ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—তপতী রায়। প্রকাশনায়—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—ছয় টাকা।

অনিকেত

এক অসামাজিক প্রেমের করুণ কাহিনী রূপায়িত হয়েছে আলোচ্য কাহিনীতে। বিধির বিড়ম্বনায় যে মেয়ে হতে পারলো না কল্যাণী গৃহবধূ তার মর্মস্পর্শী হৃদয়-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই রচনার ছত্রে ছত্রে; নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতিই যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে নায়িকা পামার মাধ্যমে। পামা ঘর বেঁধেছিল নয়নের সঙ্গে একদিন, নতুন আশা-আকাংখার প্রজ্জ্বলিত দীপবর্তিকা হাতে নিয়ে। কিন্তু সমাজের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে নিভে গেল সে আলো। কঠোর সত্যের মুখোমুখি হয়ে বুঝলো পামা যে তার প্রেম পায় নি সত্যকার মর্যাদা, তাই আর ভুল করে ভুলের বোঝা বাড়াতে চাইলো না ওর মন, মুক্তি দিয়ে গেল ও নয়নকে, মুক্তি নিল নিজে। ভালবাসার অপমান যে প্রেমিক কখনই সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ হতে দেয় না এই মহৎ সত্যকেই স্বীকৃতি দিল পামা প্রেমাস্পদকে চিরতরে ছেড়ে গিয়ে। চরিত্র-সৃষ্টিতে নিপুণ লেখক, পামার স্বচ্ছ-সুন্দর ঋজু প্রকৃতি, তাঁর কলমে একটা বিশেষ মর্যাদা নিয়েই পরিস্ফুট হয়েছে, পাশাপাশি নয়ন, কানাই প্রভৃতি চরিত্রও উজ্জ্বল আপনাপন বৈশিষ্ট্যে। লেখকের ভাষা সহজ, ভঙ্গী সাবলীল, কাহিনীর গতি স্বচ্ছন্দে বয়ে গিয়েছে এদের সহায়তায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগত হলেও লেখক বেশ একটি প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যতের অঙ্গীকার এঁকে দিয়েছেন পাঠক-মননে। বইটির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সাত্যকি। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—আড়াই টাকা।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলোয় আলোয় পূর্ণিমা' গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। —শ্রীভারতী পাবলিশার্স। শিল্পী—সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

কমিউনিজমের অ, আ, ক, খ

আজকের দুনিয়ার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, ব্যক্তি-স্বাধীনতা না সাম্যবাদ? মানুষ এর কোনটিকে বেছে নেবে তা সঠিক করে বলার সময় এখনও আসে নি, সেটা এখনও ভবিষ্যৎ-এর উপরই নির্ভরশীল, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সাম্যবাদ বা কমিউনিজমের উপর ভ্রান্ত ধারণাদির অবসান ঘটানোর প্রয়োজন সমধিক, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই বিষয়েই সহায়ক। কমিউনিজমের তত্ত্বগত রূপ নয়—তার বাস্তব প্রকৃতিকে দেখানোই এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য, আর সেক্ষেত্রে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফলতায় পরিণত হয়েছে। দুইশতের উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গীতে লেখক সাম্যবাদের গতি, প্রকৃতি ও ব্যবহারিক কার্যকারিতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন এর আন্তর্জাতিক রূপটিকে, সেক্ষেত্রে সাম্যবাদ যে সুবিধাবাদেরই নামান্তর একথা জোরের সঙ্গেই বলেছেন তিনি। সাধারণ পাঠক ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু এই রচনাটি পাঠে কৌতূহলান্বিত হয়ে উঠবেন, সাম্যবাদের সর্বগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে আলোচ্য গ্রন্থটি যেন এক ছোট্ট অথচ সুদৃঢ় পাঁচিল। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—হর্জ, ডব্লু, ক্রনিন, প্রকাশক—পরিচয় পাবলিশার্স, ৩।১, নফর কোলে রোড, কলিকাতা—১৫, দাম—পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

রাজকন্যা

প্রাচীন ইতিহাসের কবর খুঁড়তে গিয়ে অধ্যাপক প্রতাপবাবু আবিষ্কার করলেন দু'টি শবাধার ও একটি জরাজীর্ণ পুঁথি, শবাধারে রক্ষিত দু'টি ম্যামি যার একজন নারী একজন পুরুষ। শবাধারের মূর্তি দু'টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেই বিস্ময়ে চমকে উঠল সকলে। অধ্যাপকের কন্যা ইরা ও তার বাক্‌দত্ত স্বামী প্রিয়তোষেরই প্রতিমূর্তি যেন তারা। ধীরে ধীরে রহস্য উন্মোচিত হতে লাগল কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিটির মাধ্যমে। ইরার মনে জেগে উঠল জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি, রাজকন্যা স্বাতী ও আধুনিকা ইরা এক হয়ে গেল কখন। জাতিস্মর হয় কি হয় না সে সম্বন্ধে বহু বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এই বিষয়ে কৌতূহল স্বতঃসিদ্ধ। কাজেই এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী সহজেই পাঠকের মনে স্থান করে নেয়; লেখকের কুশল লেখনীতে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশেষ ভাবেই আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে উঠেছে। গতানুগতিকতার ধারা অনুযায়ী নয় বলেই এই রচনা সফল হয়ে উঠতে পেরেছে স্বচ্ছন্দেই। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রণব রায়। প্রকাশক—রোমাঞ্চ গ্রন্থালয়, ১২, হরীতকী বাগান লেন কলিকাতা-৬। দাম—তিন টাকা।

যুক্তরাষ্ট্র-সম্পর্কিত বাঙলা গ্রন্থ

যে সকল দেশের মহান অবদানে বিশ্বের প্রগতি ক্রমোন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে এক বিশেষ

উল্লেখের দাবীদার। সকল দিক দিয়ে অন্যান্য দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে উৎকর্ষলাভ করছে তার ফলে সারা পৃথিবী নানাভাবে সার্থকতায় ভরে উঠেছে। আমেরিকার নানাবিষয়ক প্রগতির সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ আমাদের আলোচ্য। আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন, সমবায় আন্দোলন ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনখানি গ্রন্থে আলোচ্য বস্তু অতীব দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং প্রাঞ্জলভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থগুলি অযথা ভারে আক্রান্ত নয় অথচ প্রতিটি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সুবিস্তৃত ও সহজবোধ্য আলোচনা গ্রন্থগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রচনার কৃতিত্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে পাঠকচিত্তে আর কোন জিজ্ঞাসা থাকে না। জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু সমাজ এই গ্রন্থগুলির দ্বারা উপকৃত হবেন। গ্রন্থগুলির মুদ্রণ উচ্চাঙ্গের, অঙ্গসজ্জা মনোরম, প্রচ্ছদ অঙ্কন প্রশংসনীয়। শেষোক্ত গ্রন্থটির রচয়িতা সোশ্যাল সিকিউরিটির কমিশনার উইলিয়াম এল, মিচেল। প্রতিটি গ্রন্থ লেখকের বিপুল অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ বহন করে। গ্রন্থগুলির প্রকাশক—ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশান সার্ভিস, ৭, চৌরঙ্গী, কলকাতা—১৩।

বীর সাধক বিবেকানন্দ

'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী' উপলক্ষে যে সব গ্রন্থাদি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থ তারই অন্যতম। স্বল্প পরিসরে বেশ সুন্দর ও সংহতভাবে ভাবতের এই মহান কর্মযোগীর জীবন ও বাণী রেখান্বিত করেছেন লেখক। স্বামীজীর আদর্শ ও তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় জন্মলাভ করে বইটি পড়তে পড়তে, বলা বাহুল্য গ্রন্থকারের আন্তরিকতাই এর জন্য দায়ী। সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে লেখনী চালনা করেছেন তিনি, আর সেজন্যই তাঁর রচনা একটা অকৃত্রিম সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ অতি সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুজিতকুমার নাগ। প্রকাশক—আদিত্য প্রকাশালয়, ২৮, জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯, দাম—দু' টাকা।

নীলকণ্ঠী

শক্তিমান কথাশিল্পীর বলিষ্ঠ এই উপন্যাস সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যের পরিসরে এক উল্লেখ্য অবদান। ভাগ্যবিড়ম্বিতা এক বিদ্রোহী নারীচরিত্রের নিখুঁত রূপায়ণ করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের সামান্যা এক কন্যা মণিমালা; সংসারের আর পাঁচটি মেয়ের মতই ধন্য হতে চেয়েছিল স্বামী-পুত্র পরিবৃত একটি নীড় রচনা করে, আশা ছিল তার পরিমিত, আকাঙ্খা সীমিত, কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্যের অকরুণ আঘাতে সূচনাতেই ধ্বংস হয়ে গেল সব, নববধূর বাসকসজ্জার অম্লান শতদলের পাপড়িগুলি ঘৃণার দহনে শুকিয়ে ঝরে গেল দল মেলবার আগেই, এক রাত্রের ঘৃণিত অভিজ্ঞতায় নবযৌবনা এক তরুণীর নিষ্পাপ হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ করে জন্ম নিল সংসারের কঠোর অভিজ্ঞতায় দীক্ষিত এক কুলিশ কঠোর মন, নবজন্ম হল মণিমালার। তারপর বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলল জীবন, অত্যাচার ও পাপের আবর্তের মাঝে পাক খেতে খেতে যে নারী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিতা হওয়ার সংকল্পে ব্রতী হল সে আর একজন, আকণ্ঠ বিষে জর্জরিতা সে এক ভয়ঙ্করী নীলকণ্ঠী; অপরূপ ও ভীষণ তার জীবন, অর্থ ও প্রতিপত্তির শিখরে দাঁড়িয়ে তার মুখে তখন বিজয়িনীর হাসি, সে হাসি ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করে, সে হাসি দুনিয়ার সব পবিত্রতা সব অমৃতকে বিষে পরিণত করতে চায়। কিন্তু সত্যই কি তা সম্ভব? সুপ্রতিষ্ঠিত কথাকারের কুশল লেখনীমুখে নিঃসৃত হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর, 'পাপের বেতন মৃত্যু,' এই আপ্তবাক্যের সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে কাহিনীর সমাপ্তিতে। যখন এক বিষের জ্বালায় আর এক বিষের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে মণিমালা। স্বরচিত পাপচক্রের ফাঁদে নিজের আত্মজকে ধরা পড়তে দেখেই বুঝেছে মণিমালা যে সে হেরে গেছে, ভাগ্যের বঞ্চনাকে সার্থকতায় পরিণত করার জন্য যে বাঁকা পথটাকে সে অনুসরণ করে এসেছে বরাবর, সেটাই বোধ হয় শেষ পথ নয়। বিষজর্জরিতা নীলকণ্ঠী তাই হাতে তুলে নিয়েছে বিষেরই পাত্র। বিষের মাঝেই অমৃতের আস্বাদে হয়ত বা এতদিনে তৃপ্ত হল তার অশান্ত আত্মা। অপরূপ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। কঠোর বাস্তবের এক বিচিত্র রূপকথাকে, 'মণিমালা' চরিত্রটি সত্যই জীবন্ত, তার জীবন তার পরিণতি সবই পাঠকমনে গভীর দাগ কাটে। বর্তমান কথাসাহিত্যের আসরে আলোচ্য রচনা নিঃসন্দেহে এক চিহ্নিত স্থানের অধিকারী। আমরা গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য দাবী করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অ্যালবার্ট হল

কলকাতার সংস্কৃত কেন্দ্রে অবস্থিত অ্যালবার্ট হল আজও টিকে আছে তবে রূপান্তর ঘটেছে তারও, বর্তমানে এটি অ্যালবার্ট হল কফি হাউস, শত সহস্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সভা-সমিতির প্রাণকেন্দ্র আজ আধুনিক সরাইখানা, এই অ্যালবার্ট হলের জীবনকথাই বিবৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। শতাব্দী পারের অ্যালবার্ট হলের জীবনধারা বৈচিত্র্যময়, একদিন যুগস্রষ্টা মনীষিবৃন্দের উদাত্ত বাণী এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়, তরুণতর সম্প্রদায় আগ্রহে

বাংলা ছোটগল্প সংকলন 'কালকের ঝড়' গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। প্রকাশক—সংখাদি পাবলিকেশান্‌স প্রাইভেট লিমিটেড। শিল্পী—পূর্ণেন্দু পত্রী।

ভিড় জমিয়েছে তা শোনার জন্ম, জ্বালিয়ে নিয়েছে অন্তরের দীপ-শিখাটিকে সযত্নে। আজও তারাই ভিড় জমায় এখানে, 'কফি হাউসে'র কোণে কোণে আজও যারা দলে ভারী তারা ছাত্র-ছাত্রী, কলেজ পালিয়ে ও না পালিয়ে আজও তারাই সাজিয়ে রেখেছে অ্যালবার্ট হলের আসর। তাই রূপান্তরিত 'অ্যালবার্ট হল' আজও বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতির মৌচাক স্বরূপ হয়েই বর্তমান। কত মানুষের মিছিল এখানে, কত আশা-আকাংখার জন্ম হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে তার কিছু বা পাচ্ছে সমাপ্তি সার্থকতায়, কিছু বা বিলীন হয়ে যাচ্ছে বুদবুদের মত; নিস্পৃহ চোখে তা চেয়ে চেয়ে দেখছে বৃদ্ধ 'অ্যালবার্ট হল,' যেন এক ঐতিহাসিক দলিলের নির্বাক সাক্ষী সে। অতি নিপুণভাবে 'অ্যালবার্ট হলের' জীবনায়ন করেছেন লেখক, তার চরিত্র, তার পরিবেশ সবই জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকমনে, লেখনীমুখে নর-নারীর হৃদয় দোলার যে প্রক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি ফুটে উঠেছে তা যেমন উজ্জ্বল তেমনই গভীর আবেদনসমৃদ্ধ। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রকাশনায়—মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

অমিয় বাণী

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও তাঁর অনুগামী শিষ্যবৃন্দের অমূল্য উপদেশাবলী সংগৃহীত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত অপরাপর রামকৃষ্ণ শিষ্যদের অমৃতময় বাণীসমূহের সঙ্গে সকলে ইচ্ছাসত্ত্বেও সব সময় পরিচিত হতে সক্ষম হন না, আলোচ্য গ্রন্থে সে সুযোগ ঘটবে, শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বরূপ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ ও সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলীর সারাংশ সংকলিত হয়েছে এতে; পরমহংস দেবকে বুঝতে হলে তাঁর এই সন্ন্যাসী সন্তানগণের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটা অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেদিক থেকে দেখতে গেলে বর্তমান গ্রন্থটি মূল্যবান বলেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। আমরা বইটি পড়ে আনন্দলাভ করেছি ও এর বহুল প্রচার কামনা করি। আঙ্গিক সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সংকলন কর্তা—শ্রীরোপদ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, দাম—দুই টাকা।

কথা কও

আলোচ্য নাটকটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই অনেকের পরিচয় ঘটেছে, কারণ নাটকটি বর্তমানে কলকাতার এক প্রসিদ্ধ সাধারণ রঙ্গালয়ে সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়ে চলেছে। একটি বঞ্চিতা মেয়ে এই নাটকের মূল চরিত্র, অপরাপর চরিত্র বিকাশ লাভ করেছে এই চরিত্রটিরই প্রয়োজনে। নায়িকা কণা চরিত্রের উদ্ঘাটনে লেখক সত্যই কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, নাটকের কাহিনীতে বৈচিত্র্য না থাকলেও বেশ একটা বলিষ্ঠতা আছে আর আছে স্বচ্ছন্দ গতি যার ফলে পাঠক মনকে শেষ অবধি টেনে রাখতে পারে। মাঝে মাঝে ডায়লগে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে, না হলে সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে নাটকটি সত্যই সুপাঠ্য। এর আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—সুনীলচন্দ্র সরকার। প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ দাম—দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

একটু কিছু বলো

আলোচ্য উপন্যাসের লেখক আজ জনপ্রিয়তায় বিশেষ ভাবেই চিহ্নিত; তাঁর অধিকাংশ রচনারই মূল প্রসাদগুণ সাবলীলতা, বলা বাহুল্য আলোচ্য রচনাতেও এই গুণটি অনুপস্থিত নয়। একটি ভাগ্যবিড়ম্বিতা তরুণীর দুঃখময় জীবনে একদিন দেখা দিয়েছিল আশার হাতছানি, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আপন নীড় বাঁধার স্বপ্নে বিহ্বলা হয়ে উঠেছিল তরুণী অনুশীলা; কিন্তু নির্মম ভাগ্য সে স্বপ্ন সফল হতে দেয়নি তাই মৃত্যুর তুহিন শীতল গ্রাসে শেষ হয়ে গেল সব, কাহিনীর করুণ পরিসমাপ্তি সত্যই হৃদয়স্পর্শী। লেখকের আন্তরিকতায় তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল, কাহিনী বয়নে তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বইটির প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শৈলেশ দে, প্রকাশক—অভিযান প্রকাশনী, সি ৪২, বাঘা যতীন পল্লী, কলিকাতা—৩২ দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাউল

শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন মেঘের পথিক এসে—
আমার ধ্যানের মাঝে গানের সুরে—
না শোনা সে রাগিণী বাজল আমার প্রাণে
তাই তমালের কুঞ্জবনে তোমারই সুর কাঁপে।
তোমার সাথে মিলন লাগি মন
বীণাখানি বাজায় আমি তোমার দেওয়া সুরে,
রচল যে গো সুরের পথ, দোঁহার উপকূলে,
বাউল সুরে ডাকলে মোরে
কোন অসীমের কূলে।

সাগর কূলে আসি
দেখেছি তোমার ছায়াখানি
দুলতেছিল সাগর বুকে, আমার ধ্যানের মাঝে
মুক্ত জলের পরে।
সুরের মাঝে তাই খুঁজে পাই বাণী
আমার না রচা গানখানি।
মেঘের পথিক, ওগো পথিক তুমি এলে
বিরহিণীর প্রাণের অন্তঃপুরে।

উদ্ভিদ্‌-অভিধান

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কুলবর্ণা—রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউরী।

কুলসঙ্কয়—পরিপেল বৃক্ষ, কেউটা মুতা

কুলসৌরভ—মরুবক বৃক্ষ, নাগদানা।

কুলালী—বনকুলত্থ বৃক্ষ।

কুলাহক—[হিং কালাগাগরা] রক্তবর্ণ কোকিলাক্ষ শাক, কুলখাড়া। পর্যায়—কোকিলাক্ষ, কাকক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুবালিকা, ইক্ষুগন্ধা।

কুলাহল—কুকসিম গাছ।

কুলি—কণ্টকারী বৃক্ষ।

কুলিক—কাকাদনী বৃক্ষ, কোকিলাক্ষ।

কুলিকা—হাড়জোড়া।

কুলিকাখ্য—কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ।

কুলিঙ্গাক্ষী—পেটিকা বৃক্ষ, পেটারী।

কুলিঞ্জন—চবিদা দীর্ঘ শাকবিশেষ alpinia galanga. ডাঁটায় অনেক পাতা হয়। ফুল আরক্ত।

কুলিবেগুন—solanum longam.

কুলিশ—হাড়ভাঙ্গা গাছ।

কুলিশদ্রুম—স্নুহী বৃক্ষ, শিশু গাছ।

কুলী—১ কণ্টকারী বৃক্ষ, ২ বৃহতী, ৩ কুলকাঁটা, কোকিলাক্ষ।

কুলীনক—বনমুগ।

কুলুথ—কুলত্থ দ্রং।

কুলেখাড়া—কোকিলাক্ষ দ্রং।

কুলেচর—ক্ষুদ্র শাক বিশেষ।

কুল্মাষ—১ অর্ধপক্ব যব dolichos biflorus. ২ রাজমাষ, ৩ মষাকৃতি শস্যযুক্ত বৃক্ষ, কাশ্মীর দেশে তুরগ নামে পরিচিত, ৪ বনকুলত্থী।

কুল্যা—স্থূলবার্তাকু।

কুব—১ উৎপল, ২ জলজপুষ্পমাত্র।

কুবকালুকা—ঘোলী শাক।

কুবল—১ বদরী বৃক্ষ zizyphus jujuba, ২ বদরী ফল, ৩ উৎপল।

কুবলয়—১ উৎপল, ২ নীল ও শ্বেতোৎপল।

কুবলী—কুলগাছ।

কুবুস্তিকা—কাঁটা করমচা caesalpinia bonducella.

কুবেদ, কুবেরক—তুঁতগাছ।

কুবেরাক্ষী—১ পারুল গাছ, ২ লতা করঞ্জ, ৩ সাদা পারুল [হিং শ্বেত পাডরী]। ৪ পেটারীগাছ।

কুবেল—লাল শুঁদি।

কুশ—[হিং ডভ, কশ] দীর্ঘায়ু তৃণ বিশেষ eragrostis cynosuroides, poa ciliaris. p. roxb. অত্যন্ত অনুর্বর জমিতেও কুশ জন্মায়। পূজার্থ কুশ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে আসন প্রস্তুত হয়। পাতা সরু। সোজা ডাঁটা। (২) দর্ভ বা শরদর্ভ। (৩) হরিদগর্ভ—হরিদ্বর্ণ ফুল, ফল, মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—কুথ, দর্ভ, পবিত্র, যাজ্ঞিক, হ্রস্বগর্ভ, বর্হি, কুতুপ, সূচাগ্র, যজ্ঞভূষণ।

কুশপুষ্প—গ্রন্থি পর্ণ, কুশ ও পুষ্প।

কুশলী—১ অশ্মন্তক বৃক্ষ, ।। ২ ।। ক্ষুদ্রাম্লিকা।

কুশসোদর—চালতা।

কুশা—১ মধুকর্বটী, ২ কুশতৃণ।

কুশাঞ্জলি—ঘোড়া বা ময়না, রোহিতক বৃক্ষ।

কুশিংশপা—কপিলশিংশপা বৃক্ষ।

কুশিক—১ শালগাছ, ।। ২ ।। বয়ড়া গাছ, ৩ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ।

কুশাম্ব—শিলাভেদ।

কুশেশয—পদ্ম।

কুশেশয়া—১ পদ্ম, ২ কর্ণিকার বৃক্ষ।

কুষ্ঠ—[সং বাপ্য, হিং কুট, গুং উপলেট, তাং কোষ্ঠম্‌, তেং গোস্তমু, ফাং কুস্ত-ই-তলখ্‌] কুড়। কাশ্মীর প্রদেশে এই উদ্ভিদ জলাশয়ে জন্মে saussurea lappa, aplotaxis auriculata. দেশমানজ্যাদিবর্গ। গন্ধ শাক বিং। কাশ্মীরে এর নাম 'চাইকোট'। শালের ভিতর ইহার শিকড় রাখিলে সুবাসিত হয় ও কীটাদি হতে রক্ষা পায়। প্রকার ভেদ—১ তিক্ত কুষ্ঠ, ২ মধুর কুষ্ঠ। পর্যায়—রুজা, কুষ্ঠ, পরিভাব্য উৎপল ব্যাপ্য, অরণ, গদাখ্য, গদাহ্বয়, গদাহ্বর, কৌবের, ভাস্বর, কাকল, নীরুজ, বৈটিক, রুক্সা, গদ, আময়, বাণীরজ, পাপন, পাকল, পদ্মক।

কুষ্ঠকেতু—মার্কণ্ডিকা বৃক্ষ।

কুষ্ঠগন্ধিনী—অশ্বগন্ধা।

কুষ্ঠঘ্ন—ওষধিবৃক্ষ বিং। হিতাবলী।

কুষ্ঠঘ্নী—১ কাকোডুম্বরিকা, ২ সোমরাজী।

কুষ্ঠনাশন—১ ক্ষীরীশ বৃক্ষ, ২ শ্বেত সর্ষপ, ৩ বারাহী কন্দ, ৪ কুষ্ঠ-নাশক ওষধি।

কুষ্ঠনাশিনী—১ সোমরাজী, ২ হাকুচ।

কুষ্ঠনোদন—রক্ত খদির।

কুষ্ঠবৈরী—চালমুগরা। পর্যায়—শৈলরোহী, মহাগদ, বৈবস্বত।

কুষ্ঠসূদন—আরগধ বৃক্ষ, সোঁদাল, cassia fistula.

কুষ্ঠ হন্ত্রী—বাকুচী বৃক্ষ

কুষ্ঠহর—গুয়ে বাবলা।

কুষ্ঠহা—১ পটোল, ২ ছাতিম।

কুষ্ঠারি—১ খদির acacia catechu, ২ বিট খদির a. fernesiana, ৩ পটোল trichosanthes dioeca.

কুষ্মাণ্ড—[হিং কোহেরা, ওং পানীকখাক] কুমড়া। প্রকার ভেদ—১ সাচি কুমড়া, ২ কুষ্মাণ্ডী—গিমা কুমড়া, গোল সাচি কুমড়া, ৩ শীত-কুষ্মাণ্ড—বিলাতী কুমড়া। পর্যায়—ঘৃণাবাস, তিমিষ, গ্রাম-কর্কটী, পুষ্পফল, কুষ্মাণ্ডক, কর্কারু, শিখিবর্ধক, কুষ্মাণ্ডী, কর্কোটিকা, বৃহৎফলা, সুফলা, নাগপুষ্পফল, কুষ্ফলা, গুণী।

কুষ্মাণ্ডক—কুষ্মাণ্ড।

কুষ্মাণ্ডিকা—কুষ্মাণ্ডী।

কুষ্মাণ্ডী—১ গিমা কুমড়া, ২ কাঁকরোল।

কুসুম—১ [সং কোশ ম্র লাক্ষাবৃক্ষ, হিং গোসাম, গৌসম, ওং কুসুম] কোসাম, কুকুম schbicheria trijuga. অরিষ্টাদি বর্গের বৃক্ষ বিং। মধ্যভারতে জন্মে। শীতকালে পাতা ঝরিয়া যায়। বসন্তকালে নূতন পত্রোদ্গম ও পুষ্প হয়। ফুল পীতবর্ণ, বীজ হইতে তৈল হয়। ২ সোমরাজ্যাদি বর্গের গাছ। কাঁটায় ভরা। বীজে তৈল আছে karthamus tinotorium.

কুসুমপঞ্চক—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল এই পাঁচটিকে কন্দর্পের ফুল বলে।

কুসুম ফুল—কুসুম্ভ দ্রং।

কুসুমমধ্য—চালতা গাছ। ফুল প্রথমে গোলাকার হইয়া বিকশিত হয়, পরে গুটাইয়া আসিয়া ফলরূপ ধারণ করে। ফুলটি অভ্যন্তরে থাকিয়া যায় বলিয়া কুসুমমধ্য নাম হইয়াছে।

কুসুমা—শঙ্খপুষ্পী।

কুসুমাধিপ—চাপাফুলের গাছ।

কুসুম্ভ—[সং গ্রাম্য কুঙ্কুম, হিং কসুম্, করর, গুং কসুম্ভ, তাং সেন্দুরকম্ তৈং অগ্নিশিখা, কুসুম্বচেট্] কুসুম ফুল, carthamus tinctorius, c. oxycantha, crocus indicus. ক্ষুপ ফলপাকান্ত। শরৎকালে বীজ বপন, শীতে পুষ্পিত। পাতা লম্বা, সরু, কণ্টকময়। ফুল কুঙ্কুমবর্ণাভ। বীজ সাদা, চিক্কণ, একদিক মোটা একদিক সরু। কোচবিহারের লোকে কুসুম শাক অন্যান্য শাকের ন্যায় আবাদ ও ভোজন করে। বীজ হইতে তৈল হয়। ফুলের রং হইতে পট্টবস্ত্রের রং হয়। প্রকারভেদ—মহাকুসুম্ভ, ২ হ্রস্বকুসুম্ভ, ৩ বন্যকুসুম্ভ। পর্যায়—লট, মহারঞ্জন, কমলোত্তর, কমলোত্তম, বহ্নিশিখ কুক্কুটশিখ, পাব পীত, পদ্মোত্তর, বস্ত্ররঞ্জন। অগ্নিশিখ।

কুস্তুম্বুরু—ধনে গাছ।

কুহলি—পুগপত্রিকা, পান (?)।

কুচীকান্ত—mimosa octandra.

কুচ্ছলিঙ্গ—কুকুর শোঁকা গাছ।

কূট—ক্ষুদ্র ক্ষুপ বিং।

কূটজ—কুড়চী। বীজের নাম ইন্দ্রযব।

কূটশাল্মলী—[সং রোচনা, কুৎসিত-শাল্মলী, ওং কাশিমালা] জীবন্তী, কাপলা

কূদ্দাল—রক্তকাঞ্চনপুষ্প বৃক্ষ।

কূর্চশীর্ষ, কূর্চশীর্ষক—১ নারিকেল গাছ, ২ জীবক বৃক্ষ।

কূলক—ক্ষুদ্র ক্ষুপ বিং।

কৃকর—করবীর বৃক্ষ।

কৃকলা—পিপ্পলী।

কৃচ্ছ্রারি—বিল্ববৃক্ষভেদ।

কৃতচ্ছিদ্রা—ঝিঙ্গা।

কৃতত্রা—ত্রায়মাণাবৃক্ষ, বালাডুমুর।

কৃতমাল—১ সোঁদাল, ২ কর্ণিকার বৃক্ষ, ছোট সোঁদাল।

কৃতবেধক—ঘোষাতকী লতা, শ্বেতঘোষা।

কৃতবেধন, কৃতবেধনা—ঘোষাতকী লতা, ঝিঙ্গা।

কৃপা—লবঙ্গলতা, luvunga scandens.

কৃমিকণ্টক—১ বিড়ঙ্গ, ২ চিরতা।

কৃমিকোষ—মাজুফল (?)।

কৃমিঘ্ন—১ বিড়ঙ্গ, ২ পলাণ্ডু, ৩ কোলকন্দ, ৪ পালিতা মাদার, ৫ ভেলা।

কৃমিঘ্না—১ হরিদ্রা, ২ ধূম্রপত্রা বৃক্ষ, ৩ বিড়ঙ্গ।

কৃমিফল—যজ্ঞডুমুর গাছ।

কৃমিবৃক্ষ—কেওড়া, কোশাম, কোশাম্র বৃক্ষ।

কৃমিশাত্রব—১ বিড়ঙ্গ, ২ রক্তপুষ্পক, পালিতা মদার।

কৃমীলক—বনমুগ।

কৃমুক—গুবাক বৃক্ষ।

কৃশশাখ—ক্ষেত্রপর্পটি।

কৃশাঙ্গী—প্রিয়ঙ্গু লতা।

কৃশিকা—আখুকর্ণী লতা, ইঁদুরকানি গাছ।

কৃষ—কেলেঘ। আশুধান্য বিশেষ nigella indica. করমর্দক বৃক্ষ, করমচা গাছ। পর্যায়—নীলীবৃক্ষ, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, নীল-পুনর্নবা, কৃষ্ণজীরা, গাম্ভারী, কটুকা, রাজসর্ষপ, পর্পটি, সোমরাজী।

কৃষ্ণক—কৃষ্ণ সর্ষপ।

কৃষ্ণকন্দ—রক্তোৎপল, রাঙ্গসুঁদী।

কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণকেলি—[সং কৃষ্ণকলি, সন্ধ্যামণি, হিং গুলবাজী, গুলব্বাস, ওং রঙ্গানি ইং four-o'-clock flower] কেষ্টকলি mirabibis jalapa. আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত। লাল, সাদা, হলদে তিন রকমের ফুলের তিন শ্রেণী গাছ আছে। ফুলে ঈষৎ সুগন্ধ।

কৃষ্ণকপোতী, কৃষ্ণকপোতিকা—বৃক্ষবিং। বৃক্ষ রোমশ, রস ইক্ষুরসের ন্যায়।

[ক্রমশ।
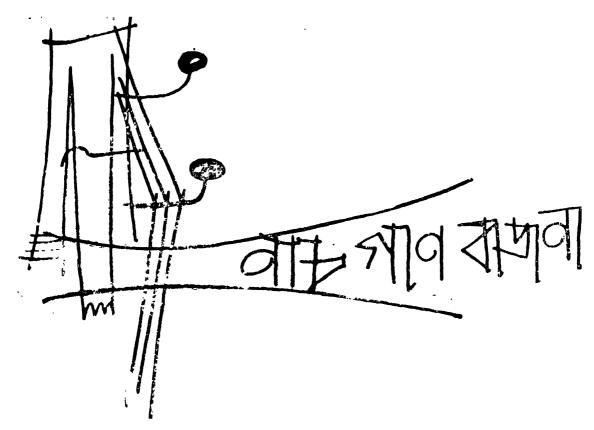
রাগ বনাম ভাষা

শ্রীদামোদর ভট্টাচার্য

সঙ্গীতে ভাষা একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়া আছে। সঙ্গীতে ভাষার অপরিহার্যতার কথা সত্যই অনস্বীকার্য। ভাষা হইতেছে ভাবের প্রকাশক—এ কথা যথেষ্ট নির্ভরতার সঙ্গেই বলা যায়। সুতরাং সঙ্গীতে ভাষাকে উপেক্ষা করা যায় না। এই ভাষার মাধ্যমে ভাবরসকে যত তাড়াতাড়ি অনুভব করা যায় শুধুমাত্র সুরের দ্বারা বা রাগের দ্বারা সেই অনুভূতি সহজে আসে না, আসিলেও ইহা ভাষার মাধ্যমে যতখানি প্রাণবন্ত ও রসাশ্রিত হয় কেবলমাত্র সুরের বা রাগের দ্বারা তা হয় না। যদি কেবলমাত্র সুরের দ্বারা বা রাগ মাধ্যমে ইহা হইত, তবে সঙ্গীতে বাণীর প্রাধান্য থাকিত না, থাকিত সুরের প্রাধান্য।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রাগাশ্রয়ী এবং কেবলমাত্র সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুভাবে রাগ প্রকাশের মাধ্যমেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহা যদি সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে পূর্ববর্তী যে সমস্ত সঙ্গীত-সাধকেরা সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি শুধুমাত্র নিছক খাম-খেয়ালের বশবর্তী হইয়া না সঙ্গীতে ভাষার প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া? সঙ্গীতে ভাষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে এবং থাকিবেও। ইহা ছাড়া সঙ্গীতে তালের বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে ভাষার অপরিহার্যতার কথা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না; কারণ তাল সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে গেলে সুসংবদ্ধভাবে স্বরসহ বাণীর সংযোজনা একান্ত প্রয়োজন। বাণী সহযোগে ভাবরসটিকে গায়ক যত সহজে আয়ত্তে আনিতে পারেন বা শ্রোতা যত তাড়াতাড়ি ভাবরসে সিক্ত হয়, রাগাশ্রয়ে পরিপূর্ণভাবে তাহা হয় না। এইজন্য শ্রোতাদের গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গীত পরিবেশনের সময় বলিতে শুনা যায় যে, 'চল মন গঙ্গা যমুনা তীর' গানখানি শোনান। তবে সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করিতে গেলে রাগের বা সুরের প্রাধান্যকেও বাদ দেওয়া যায় না। সুর বা রাগ রঞ্জকতা সৃষ্টি করে, আর ভাষা ভাব আনয়ন করে আর লয়দারীতে করে সহযোগিতা।

ভাষা যেমন ভাবকে করে সুসমৃদ্ধ, রাগ বা সুরও তেমনি ভাষাকে রঞ্জকতা প্রদান করিয়া সুসমৃদ্ধ করে; সুতরাং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাষা ও রাগ পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে এবং এই দুয়ের সহযোগিতায় সঙ্গীত হয় প্রাণবন্ত। যদিও যে কোন রাগ সুসংবদ্ধ স্বরের দ্বারাই স্বমহিমায় পরিস্ফুট হয়, তথাপি একথা যথেষ্ট নির্ভরতার সঙ্গেই বলা যায় যে, উপযুক্ত ও প্রাণবন্ত বাণী সহযোগে রাগরূপটি যেমন সহজলভ্য ও সুষ্ঠুভাবে স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়, গায়ক-গায়িকারা ও শ্রোতৃবৃন্দ যেভাবে বিমুগ্ধ হন, শুধুমাত্র রাগের মাধ্যমে ইহা কখনও সম্ভব নয় বরং সুদূরপরাহত। যদি রাগ মাধ্যমে এই ভাবরসটিকে পাওয়া যাইত, তবে গায়ক-গায়িকারা বাণীর পরিবর্তে তুম দেরে দেরে দানি প্রভৃতি

তারাই রাগটিকে প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবরসে সমাহিত হইতেন বা শ্রোতৃবর্গকে ভাবরসে সমাহিত করিতে সমর্থ হইতেন। সুসংবদ্ধ স্বরের সমন্বয়েই রাগ প্রকাশ সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় বটে, তবে ঋতুরাগে ইহার যথেষ্ট ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন—বর্ষায় বসন্ত। এই রাগটি পরিবেশন [illegible] ঋতু প্রকাশের যথোপযুক্ত বাণী সংযোজনা। যাঁরা এই ঋতু রাগটি পরিবেশন করিয়া থাকেন। তাঁরা ছাড়া, আর ভাবেন রাগটির প্রকাশের জন্য গায়ক-গায়িকারা যেন ঋতুর প্রকাশক্ষম বাণী সংযোজনার মাধ্যমেই এই ঋতুরাগটিকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সঙ্গীত পরম আনন্দের বস্তু, এই সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করিতে গেলে, সর্বোপরি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে গেলে, সুসমন্বিত ও ভাবপূর্ণ বাণীর সংযোজনা একান্তই প্রয়োজন। অতীতের ও বর্তমানের সঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে একথা যথেষ্ট সংসাহসের সঙ্গেই বলা যায় যে, অতীতে সঙ্গীতের মাধ্যম হিসাবে যে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাণী বা ভাবের সংযোজনা পরিদৃষ্ট হয়, বর্তমানের সঙ্গীতে সেই ধরণের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাণীর সংযোজনা খুবই অল্প বলিয়াই মনে হয়।

ভাষা সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার—'যাহা হউক, সাধারণভাবে রসাস্বাদনে নানারূপ পবিত্র ভাষাই উত্তম কার্যকারিতা দেখায়। যদিও সুমধুর স্বরের দ্বারা আকর্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়, কিন্তু এই সঙ্গে একটা সচেতন ভাবাপ্লুত অবস্থা সৃজনে উত্তম নৈতিকতাদায়ক ও আদর্শবোধক ভাষাই যে অসীম শক্তিশালী, তাহা সত্যরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। তবে এখানে ভাষা নিজ সমৃদ্ধির জন্য যেমন রাগকে আশ্রয় করে, রাগও তেমনি নিজ রঞ্জকতার এক বিশেষ অলঙ্কার হিসাবে ভাষাকেও একান্ত আপন বোধে গ্রহণ করে। সুতরাং রস-প্রবাহ সংরক্ষণে রাগ ও রচনা উভয়েরই উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।' (সঙ্গীত অনুসন্ধিৎসা—সঙ্গীতাচার্য শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)।

সুতরাং ভাষা যেমন ভাব আনয়ন করে সেইরূপ ভাবও ভাষাকে করে প্রাণবন্ত। তবে একথা সুনিশ্চিত যে, আগে ভাব ও পরে ভাষা। সঙ্গীতে রাগ বা স্বরের যত প্রাধান্যই থাকুক না কেন, ভাব সুনির্বাচিত ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ-ক্ষমতা পায় ও রাগ বা স্বরের সমন্বয়ে ইহা প্রাণবন্ত হইয়া গায়ক-গায়িকা ও শ্রোতৃবৃন্দকে বিমোহিত করে। তবে সঙ্গীত পরিবেশনে সুন্দর, সুচিন্তিত ও আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাণী সংযোজনাই গায়ক-গায়িকাদের আশা করা উচিত বা শ্রোতৃবৃন্দ তাহাই আশা করেন। তবে শুধুমাত্র ঋতুরাগ প্রকাশে ঋতু-প্রকাশক্ষম বাণী সকলেই আশা করেন এবং এ আশার যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। সঙ্গীত সাধনার বস্তু ও নির্মল আনন্দের নির্ঝর, ইহার মাধ্যমে সেই পরম পুরুষ ধ্যানের দেবতাকে লাভ করিতে গেলে রাগ বা স্বরসহ সুন্দর সুরুচিসম্পন্নভাব সমন্বিত বাণীর সংযোজনা একান্ত অপরিহার্য।

তিমিরবরণ পরিচালিত 'শিশুতীর্থের' অর্কেষ্ট্রার শিল্পিবৃন্দ।

তিমিরবরণের পরিচালনায় 'শিশুতীর্থ'

সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির মহিমা বিবর্ধনে যাঁদের ভূমিকা গৌরবময় তিমিরবরণ সেই তালিকায় এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর অনন্য প্রতিভা ও সৃজনীশক্তি তাঁকে জনপ্রিয়তার সমুন্নত শীর্ষে সমাসীন করেছে। সুরপিপাসুদের চিত্ত ভরিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের গুরুত্ব কম নয়। সম্প্রতি নিউ এম্পায়ারে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি সমবেত বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি ১৯৩০ সালে লেখা জার্মানীতে। এটি 'চাইল্ড' নামে মূলত ইংরাজী ভাষাতেই লিখিত হয়, পরে কবিগুরু তার বঙ্গানুবাদ করেন। দুর্যোগ, ঝঞ্ঝা, হিংসা, হানাহানির ভয়াল কুটিল আক্রমণের হাত থেকে, সর্বৈব বিপর্যয়ের হাত থেকে মানবতার পরিপূর্ণ মুক্তি এই কবিতার উপজীব্য। প্রেমের কাছে হিংসার নতি স্বীকারের মধ্যেই জীবনের পরম সত্যের উদ্‌ঘাটন ঘটেছে এখানে। জীবনের সীমাহীন পথের তোরণ দুয়ার গেছে খুলে। এই ভাবগর্ভ কবিতার যথাযথ বাদ্যরূপদান যেমনই দুরূহ তেমনই প্রভূত শক্তিসাপেক্ষ, কিন্তু আমরা এখানে আনন্দের সঙ্গে মন্তব্য করছি যে তিমিরবরণ সেই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণরূপে সফলকাম হয়ে বাঙলার শিল্পীসমাজ ও রসিকসমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আনুমানিক পঁয়ত্রিশ জন শিল্পীর সমবেত বাজনায় এবং দক্ষ

শিল্পী তিমিরবরণের অভিজ্ঞ পরিচালনায় সমগ্র রূপায়ণটি এক অভিনব বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিত্বের আশ্চর্য সমন্বয় হয়ে উঠেছে। প্রায় সাত আটটি যন্ত্রের অপরূপ ধ্বনিতরঙ্গে, সুরের ঝঙ্কারে, বলিষ্ঠ গ্রন্থনায়, দর্শক-সাধারণ এক অভূতপূর্ব পরিতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছেন। দুই ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি সর্বতোভাবে দর্শকের রসিকচিত্তকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলেছে। এই প্রচেষ্টাটিকে তিমিরবরণের অসামান্য প্রতিভার এক ভাস্বর স্বাক্ষর বলে অনায়াসে গণ্য করা যায়। ঐ অনুষ্ঠানের শিল্পীদের মধ্যে কমলেশ মৈত্র, ইন্দ্রনীল এবং সন্তোষচন্দ্রের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিমিরবরণের স্বনামধন্য পুত্র ইন্দ্রনীল অনাগত কালের যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। যশস্বী পিতার প্রতিভাধর পুত্র তিনি। তাঁর ভবিষ্যত বিপুল সফলতায় আবৃত হোক।

ঐদিনকার অনুষ্ঠানের শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। সচরাচর কোন অনুষ্ঠানে রাজ্যপালকে সূচনা থেকে সমাপ্তি অবধি উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না। সেদিন অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ সংবাদ এখানে পরিবেশনযোগ্য—সেদিন অনুষ্ঠানান্তে জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার সময় শিল্পীদের সঙ্গে রাজ্যপালও নিজের কণ্ঠটি মিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর বিশুদ্ধ বাঙলা উচ্চারণ ও সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠ বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

গিটার

অনেকে মনে করেন যে গিটার যন্ত্রটি খাস্ ইওরোপীয় যন্ত্র। বস্তুতপক্ষে তা নয়। যন্ত্রসঙ্গীতের ইতিহাসে বীণার অধ্যায় খুললে দেখা যাবে এই উক্তির যথার্থতা। সকলে জানেন এবং মানেন বীণা ভারতীয় যন্ত্র। আমরা আজ দুই রকম প্রধান বীণা দেখতে পাই—(১) রুদ্রবীণা (২) সরস্বতী বীণা। এ'ছাড়াও বিচিত্রবীণা নামে একপ্রকার বীণা দেখা যায়, কিন্তু তার তত গুরুত্ব নেই প্রাচীনকালে কিন্তু রুদ্র ও সরস্বতী বীণা ছাড়াও বহু প্রকারের বীণা ছিল। সেগুলির গুরুত্ব কতখানি ছিল তা আজ বিশেষ বোঝা যায় না। তবে যাই হোক না কেন, প্রধান বীণা দু'টির মর্যাদা ও গুরুত্ব সর্বাগ্রে ছিল। বর্তমান যুগেও বীণার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে উক্ত বীণা দু'টিরই কথা মনে পড়ে। প্রাচীন কালের বহুবিধ বীণার মধ্যে অন্যতম ছিল ত্রিতন্ত্রী বীণা। নাম থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, এতে মাত্র তিনটি তার থাকত—ছিলও তাই।

প্রাচীনকালে ভারত যখন পারস্য দেশের সঙ্গে মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ ছিল তখন আমীর খুসরু নামক বিখ্যাত পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ এই ত্রিতন্ত্রী নামটি বদল করেন। তিনি যে নাম দেন তা হল 'সেতার'। 'ত্রি,' শব্দের অর্থ হল তিন, কিন্তু পারসীয়ানরা একে বলেন 'সে' আর তন্ত্রকে আমাদের মত তাঁরা 'তার' বলেন। এখন যাকে সেতার বলি তার আদি রূপ হল ঐ ত্রিতন্ত্রী বীণা। এখন সেতারে থাকে সাতটি তার কিন্তু তখন থাকত তিনটি তার। যাই হোক, আমরা আপাতত এই তিন তার বিশিষ্ট সেতার নিয়েই আলোচনা করব।

ত্রয়োদশ শতাব্দী (1300 A. D.) কিংবা আরও কিছু পরে পারসীয়ানরা এই যন্ত্রটিকে তাঁদের দেশে নিয়ে যান। শোনা যায় যে, তাঁরা নাকি এই যন্ত্রের য[illegible] শী[illegible] করেন। ওদিকে, আরবীয়ানরা আবার এই [illegible] প্রতি [illegible] হন। তাঁরা [illegible] শুরু করেন। [illegible] হল। আরবীয়ানরা এ[illegible] এর নাম রাখলেন 'গিতার'।

School of Universal [illegible] রচয়িতা Dr. Adolf Bernard Marx [illegible] ত্রিতন্ত্রী বীণা [illegible] রাজ্যের লিডীয়া প্রদেশ থেকে [illegible] সেতার যন্ত্রটি নিয়ে গ্রীস দেশে উপস্থিত হ[illegible] রোমান্ ও গ্রীক্ পুরাণজ্ঞ উইলিয়াম স্মিথ বলেন যে, গ্রীক্ দেবত[illegible] হাতেও এইরকম ত্রিতন্ত্রী বীণা দেখা যায় (আমাদের [illegible] যেমন [illegible] সরস্বতীর হাতে বীণা দেখা যায় এবং যার থেকে 'বীণাপাণি' কথাটি এসেছে)। শ্রীস্মিথ, বলেন যে, মিশর ইত্যাদি দেশেও নাকি এই রকম যন্ত্র দেবতাদের হাতে দেখা যায়। ডঃ মার্কস (Dr. Marx) আরও বলেছেন যে, সুদূর চীনেও এই সেতারের প্রচলন ছিল [illegible] এ হল বহু আগেকার কথা। ত্রিতন্ত্রী বীণা সম্বন্ধে সন্ধান করলে এই রকম তথ্য সব পাওয়া যায়

শিশুতীর্থ বাদ্যানুষ্ঠানে সমাগতা বিশিষ্টা অতিথি মাননীয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, তাঁর বামে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি ঠাকুর, দক্ষিণে শ্রীমতী ইভা দত্ত।

যাই হোক, খৃষ্টীয় ৮০০ শতাব্দীতে আরবীয়ানরা স্পেন অধিকার করেন। এই সময় সেখানে যাবনিক সভ্যতা প্রসারলাভ করে। এর সঙ্গে গিটার-যন্ত্রও স্পেন সমাজে প্রচারিত হয়। পরে স্পেন থেকে সমগ্র ইওরোপ ভূখণ্ডে গিটার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। ইওরোপে স্পেন হল গিটার-প্রধান স্থান। সম্প্রতিকালে হাওয়াইয়ান গিটারের চলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মনে হয় পরবর্তীকালে ইওরোপ থেকে গিটার হাওয়াই দেশে গিয়ে থাকবে।

শুধু গিটার নয় আরও বহু যন্ত্র এককালে ভারতবর্ষ থেকে পাশ্চাত্যে গিয়ে পড়েছিল এবং দেশ ভেদে নাম ও অবয়বের পরিবর্তন ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বেহালা, মুচঙ্গ ইত্যাদি। যে সময় পশ্চিমে 'Jewish Harp' প্রচলিত ছিল, শোনা যায় তার বহু পূর্বে নাকি ভারতবর্ষে মুচঙ্গ যন্ত্র প্রচলিত ছিল; বলা বাহুল্য যে 'Jewish Harp' এবং মুচঙ্গ একই যন্ত্র।

অতীতে ভারতবর্ষে বড় কম শত্রুর আগমন হয় নি। ইতিহাস বলে যে, এই আক্রমণে এবং জয়-পরাজয়ে একের সঙ্গে অপরের আদান-প্রদান হয়েছে—সে ফল যাই হোক না কেন। পরাভূত দেশে যা-কিছু ভাল জিনিষের সন্ধান তারা পেয়েছে তা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে; আর প্রতিদানে হয়ত তাদের দেশীয় কিছু সংস্কার, সম্পদ দিয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বেলজিয়াম-এর ব্রাসেলস্ সহরের সঙ্গীতশালার অধ্যক্ষ শ্রী এফ্., জে, ফেটিস্ (F. J. Fetis) মহাশয়ের কথা—

There is nothing in the west which has not come from the east.

—শ্রীপ্রভাকর সেন

আমার কথা (১০১)

নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিভা ও নিরলস কর্মশক্তি যা মানুষকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে, তাদের প্রত্যেকটির সুস্পষ্ট প্রকাশ যাঁদের মধ্যে ঘটেছে শিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম।

১৯১১ সালের ৫ই মার্চ নীরেন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় অবনীনাথ সেনগুপ্ত ময়মনসিংহে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।

নীরেন্দ্রনাথ পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। নীরেন্দ্রনাথ প্রথমে ময়মনসিংহের সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ও পরে এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি নৃত্যের প্রতি এত আকৃষ্ট হ'ন যে, লেখাপড়ায় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। নৃত্যই তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা হয়ে উঠেছিল।

আজ বিশ্বের দরবারে যে ক'জন বাঙ্গালী সম্মানের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বাংলা তথা ভারতের পরম গর্ব উদয়শংকরের বিরাট নৃত্য-প্রতিভাই নীরেন্দ্রনাথকে বিশাল নৃত্য-জগতে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শিল্পী জীবনের প্রথমে নীরেন্দ্রনাথ কোন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পীর নিকট নৃত্য-শিক্ষালাভ করেন নি। উদয়শংকর রচিত অনেক নৃত্য-পুস্তক পাঠ করে আপন প্রচেষ্টায় নিজের নৃত্য অনুশীলন করতেন। দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত তাঁর চলত এই একনিষ্ঠ নৃত্য-সাধনা।
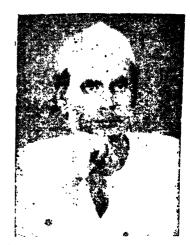
নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তারপর একদিন এল তাঁর সর্বসমক্ষে নৃত্য প্রদর্শনের আহ্বান। ময়মনসিংহের প্রত্যেকটি পূজামণ্ডপে অনবদ্য 'আরতি' নৃত্য প্রদর্শন করে নৃত্য-জগতে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

এরপর আসতে শুরু হল নৃত্য প্রদর্শনের অসংখ্য আমন্ত্রণ। তিনিও প্রতিটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সর্ব সাধারণের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন এবং দর্শকসমাজকে অকুণ্ঠ পরিতৃপ্তির দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে লাগলেন।

বহু ছেলে ও মেয়ে নৃত্য শিক্ষার প্রবল আগ্রহ নিয়ে আসা যাওয়া ক'রত। তাদের নিয়ে একটি নৃত্য সংস্থা গড়ে তোলবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর এই সাধ সংকল্পকে সফল করতে ময়মনসিংহের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী, মহারাণী লীলাবতী দেবী ও তদানীন্তন পুলিস সুপার হীরালাল দাশগুপ্ত, আই, পি, হীরেন গুপ্ত প্রভৃতি গুণগ্রাহীদের নাম। এঁদেরই সহৃদয় সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'নীরেন্দ্রনাথ ও ময়মনসিংহ এ্যামেচার মিউজিসিয়ান এ্যাসোসিয়েশান'।

১৯৪০ সালে তিনি মহারাণী লীলাবতী, মিঃ হিগিন্স্ ও অন্যান্য কলামোদীদের সাহায্যে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষার জন্য ইম্ফল যাত্রা করেন এবং মণিপুরী নৃত্যগুরু অমুবি সিংহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শিক্ষান্তে চলে আসেন মহানগরী কলকাতায়।

শিশির বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বাটা কোম্পানীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বাংলার নির্ভরযোগ্য নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ভারতীয় নৃত্য কলা মন্দির'।

১৯৪৭ সালে নীরেন্দ্রনাথ শ্রীমতী স্বপ্না গুপ্তাকে বিবাহ করেন। বর্তমানে দুই পুত্রের পিতা।

তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নয়

[৭]

ডি' কুনহার মুখে মা ভায়লার কথা।

অনেক অনেক দিন পরে যেন একটা কথা শুনলো সুন্দরম। অনেক দিন যেন এক যুগ পরে একটা স্নেহের ডাক তার মনটাকে বিচিত্র একটা দোলা দিয়ে গেল। বিশাল বুকটা যেন সুন্দরমের দুলে উঠলো। কতকাল হবে ভায়লার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। একবার চোখের দেখাও দেখে না সে ভায়লাকে।

অথচ, শৈশবে ঐ ভায়লা না হলে তার একটি মুহূর্তও চলতো না। যখনই যা হয়েছে ছুটে গিয়েছে ঐ মায়ের কাছে। মাকে গিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। মা-ই ছিল তার সবার বড় আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ হঠাৎ একদিন কেমন করে যেন ছিঁড়ে গেল।

সেদিনটার কথাও স্পষ্ট মনে পড়ে সুন্দরমের। বাপ রোজারিও তাকে প্রথম নৌকাতে নিয়ে গিয়েছিল। ভায়লা প্রথমটায় কিছুতেই রাজী হয় নি। হতে চায় নি।

বাধা দিয়েছে। বলেছে রোজারিওকে, না কিছুতেই না। ওকে আমি কিছুতেই দরিয়ায় নিয়ে যেতে দেবো না। সেখানে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। দরিয়ার কোন গৃহ-আকর্ষণ নেই। একবার দরিয়ায় গেলে আর কেউ ফিরে আসে না।

হাঃ হাঃ করে দরাজ গলায় হেসে উঠেছে রোজারিও।

রোজারিও! চেহারাটা আজও মনে পড়ে সুন্দরমের। বিরাট লম্বা দৈত্যের মত চেহারা। ঝকঝকে পোষাক—কোমরের একদিকে তলোয়ার, একদিকে গাদা পিস্তলটা। ডান হাতে একটা চামড়ার পেটি তাতে ঝকঝকে ইস্পাতের নাল বসান।

গায়ের রংটা রোজারিওর টকটকে লাল হয়ত এক সময় ছিল, পরে রোদে পুড়ে পুড়ে কেমন যেন তামাটে হয়ে গিয়েছিল। বিরাট পাকান সাদা গোঁফ। মাঝে মাঝে গোঁফের দুপ্রান্ত পাকিয়ে পাকিয়ে সরু করত।

জ্ঞান হওয়া অবধি সুন্দরম বাপকে খুব কমই দেখেছে।

নয় মাসে ছয় মাসে দুচার দিনের জন্য হৈ হৈ করে রোজারিও এসে হাজির হতো। হাঃ হাঃ করে গলা ছেড়ে হাসত।

বিরাট একটা পাত্রে এক গাদা রুটি মাংস খেত।

বাপকে দেখে কেমন যেন ভয় ভয়ই করত সুন্দরমের। বড় একটা বাপের কাছে ঘেঁষত না।

বাপও তাকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। কাছে কখনো ডাকেও নি। কিন্তু সেবারে যখন এলো বছর তিনেক বাদে। হঠাৎ এসে হাজির হলো এক গভীর রাত্রে। ঘুমিয়ে ছিল জানতে পারে নি সুন্দরম, কখন এসেছে তার বাপ।

সুন্দরম তখন অনেকটা বড় হয়েছে। ষোল বছর বয়স তখন তার। ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। দেহের সভাগ পেশীতে পেশীতে যৌবন সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে।

মনে আছে সে সময়টা সুন্দরমের। কিছু একটা করতে চায় মন তখন তার। মনটা সর্বদা কিছু একটা করবার জন্য ছটফট করে। ঠিক সেই সময় তিন বছর বাদে আবার একদিন এসে এক রাত্রে হাজির হলো কাপ্তান রোজারিও।

ভোরবেলা দেখা হলো পিতা পুত্রে।

বাপও বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে থাকে ছেলের সদ্য জাগ্রত যৌবনের দিকে এবং ছেলেও চেয়ে থাকে যেন নতুন দৃষ্টি নিয়ে দৈত্যের মত বাপের চেহারাটার দিকে, এবং সেই দিনই প্রথম আশ্চর্য একটা কথা মনে হয়েছিল সুন্দরমের, বাপ রোজারিও অমন টকটকে লাল, তার মায়ের রংটা অনুরূপ, তবে তার এমন কষ্টিপাথরের মত কালো মিশমিশে চেহারা কেন?

ছেলে যখন পরস্পরের গাত্রবর্ণের কথা ভাবছে বাপ তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে ওঠে, সাবাস।

তারপরই এগিয়ে এসে বাঘের মত দুই থাবা দিয়ে ছেলের দুকাঁধ চেপে ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বলে ওঠে—নাউ মাই সান···কালই আবার আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে দরিয়ায় যাবি বেটা।

দরিয়ায়!

হ্যাঁ—সমুন্দর—Sea.

হ্যাঁ, যাবো।

কিন্তু ভায়লা কথাটা শুনে বেঁকে বসল। বললে, না, কিছুতেই না। ছেলেকে সে দরিয়ায় যেতে দেবে না।

মার কোন নিষেধেই কান দেয়নি সুন্দরম সেদিন। শেষ রাত্রের দিকে পরের দিন গোপনে রোজারিওর সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসেছিল। সোজা এসে গঙ্গার ঘাটে নোঙর করা তার চিরদিনের স্বপ্নের বিশমাল্লাবাহী নৌকাটায় লাফিয়ে উঠে বসেছিল।

আবছা আবছা অন্ধকার তখনো চারিদিকে ছম্ ছম্ করছে।

শীতকাল সে সময়টা। ছমছমে তরল অন্ধকারের সঙ্গে রাত্রি-শেষের কুয়াশা মিশে ছিল। ঝাপসা চারিদিক। তারই মধ্যে রোজারিও নাও ছেড়ে দিল।

পাঁচ দিন পর্যন্ত তারপর গঙ্গায়। সুন্দরমের চোখে যেন ঘুম ছিল না। ব্যাকুল তৃষিত নয়নে সে সর্বক্ষণ চেয়ে থাকত সামনের দিকে—দরিয়া—কালাপানী কোথায়, কোথায় সমুন্দর।

বার বার রোজারিওকে শুধিয়েছে, সমুন্দর কোথায়?

দেখবি। দেখবি বেটা, ব্যস্ত কেন!

শেষটায় সাত দিনের দিন এক প্রত্যুষে হঠাৎ ঘুমটা সুন্দরমের ভেঙ্গে গেল অদ্ভুত একটা দোল খেতে খেতে যেন।

দুলছে। বিরাট বিশমাল্লাবাহী নাওটা দুলছে। দোল দোদুল দোল। ঘুম ঘুম চোখে প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাপারটা। উপলব্ধিতে ঠিক যেন পৌঁছায় না। কিন্তু সে বিচিত্র দোল খেতে খেতে বেশীক্ষণ শুয়েও থাকতে আর পারে না সুন্দরম। উঠে বসে, আশ্চর্য।

অন্যান্য দিনের মত আকাশে সেদিন কিন্তু এতটুকু কুয়াশাও ছিল না। ঝকঝকে পরিষ্কার চারিদিক। অদ্ভুতভাবে টলতে টলতে বাইরে এসে দাঁড়াল সুন্দরম।

প্রথম ভোরের আলো তখন ভালো করে চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। শেষ আঁধার ও প্রথম আলোর একটা ঝাপসা যবনিকা যেন চারিদিকে থির থির করে কাঁপছে। কানে আসে একটা অদ্ভুত গর্জন—একটানা একটা গর্জন।
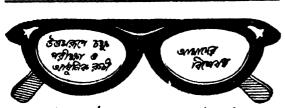
সেই গর্জন শুনতে শুনতেই হঠাৎ চোখে পড়ল সুন্দরমের বহুদূরে আবছা দিকচক্রবালে একটা বিচিত্র বস্তু। রক্তরাঙা অর্ধগোলাকৃতি যেন একটা কি। ক্ষণে ক্ষণে সেটার আকার বদলাচ্ছে।

এই অর্ধেক কলসীর আকার, তার পর মুহূর্তেই অর্ধেক থালি যেন, তার পরই সহসা একটা গোলাকার আগুনের ঢেলা উপরের দিকে লাফিয়ে উঠল। আর তার পরই সুন্দরমের বিস্ময়বিমুগ্ধ দুই চোখের দৃষ্টির সামনে অনন্ত পারাবারহীন এক জলধি যেন উদ্‌ঘাটিত হলো।

মাথার উপরে প্রবল সূর্যকরস্পর্শে আলোকিত নীল আকাশটা গোলাকৃতি হয়ে নেমে গিয়েছে দূর দিগন্তে। তাছাড়া যে দিকে তাকাও শুধু জল জল আর জল। নীল জলরাশি আথালি পাথালি করছে কিসের একটা চাপা বিক্ষোভে যেন। বড় বড় ঢেউ উঠছে ভাঙ্গছে আর সেই ভাঙ্গা গড়ারই একটানা উচ্ছ্বাস—গর্জন। গুম্‌··গুম···গুম··গুম।

বিরাট বিশমাল্লাবাহী নাওটা যেন সেই জলধিবক্ষে একটা ছোট্ট মোচার খোলার মত দুলছে আর দুলছে।

রোজারিও কখন পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি সুন্দরম।

হঠাৎ রোজারিওর কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকাল।

এই কালাপানী—সমুন্দর বেটা—

মনে আছে সুন্দরমের বহুক্ষণ তারপরও বিস্ময়বিমুগ্ধ সে দাঁড়িয়েছিল সেই পারাপারহীন উচ্ছ্বসিত জলধির দিকে তাকিয়ে।

ষোল বছর মাত্র বয়স তখন তার। তারপর আর সে দীর্ঘ দু বছরের মধ্যে ফিরে যায়নি ভায়লার কাছে। দরিয়ায় ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে। অবিশ্যি মনে পড়েছে সুন্দরমের মধ্যে মধ্যে ভায়লার কথা। তার মার কথা। তার স্নেহের কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই দুরন্ত সমুন্দরের উত্তেজনা তার নিত্য নব নব রূপ ও ঐশ্বর্য যেন তাকে মার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

নেশা। একটা যেন নেশা ধরে গিয়েছিল সুন্দরমের। সেই নেশার মধ্যে আকণ্ঠ যেন ডুবে গিয়েছিল। তারপর একদিন সমুন্দরের মধ্যেই হঠাৎ ঘনিয়ে এলো কাপ্তান রোজারিওর শেষ সময়। প্রত্যেক মানুষেরই শেষ সময় একদিন ঘনিয়ে আসে রোজারিওরও ঘনিয়ে এসেছিল।

বছর কয়েক আগে শয়তান ডি' সুজার সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে বুকের বাঁ দিকটায় তার ডি' সুজার তলোয়ারের একটা আঘাত লেগেছিল।

শেষ পর্যন্ত ডি' সুজাকে হত্যা করে ডি' ক্রুজের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল বটে রোজারিও কিন্তু নিজের বুকের আঘাতটা তখনকার মত সামলে গেলেও পরে মধ্যে মধ্যে একটা ব্যথা দেখা দিত ঐ পুরাতন ক্ষতস্থানটায়। গ্রাহ্য অবিশ্যি করেনি কাপ্তান রোজারিও এতটুকু। কিন্তু গ্রাহ্য না করলেও একদিন ঐ পুরাতন আঘাতটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

সন্ধ্যার দিকে মারা গেল রোজারিও। মাত্র ঊনিশ বছরের যুবক তখন সুন্দরম। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিজের কেবিনে ডেকে এনে রোজারিও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলেছিল, অতঃপর যেন সবাই তার

ছেলেকেই নাওর কাপ্তান বলে মেনে নেয়। তারাও মেনে নিয়েছিল তাদের কাপ্তানের শেষ কথাটা।

মধ্যরাত্রিতে তারপর কাপ্তান রোজারিওর মৃতদেহটা সকলে মিলে জলেই সমাধি দিল।

আর রাতারাতি নাওর কাপ্তান হলো সুন্দরম। ঐ ঘটনারও বছর দুই বাদে মাত্র একদিনের জন্য সুন্দরম সপ্তগ্রামে গিয়েছিল। ভায়লার তখন অনেক বয়েস হয়েছে। অসংখ্য বলিরেখা পড়েছে মুখে। ভায়লা ছেলের হাত ধরে বলেছিল, আমাকে এখানে একলা ফেলে আর দরিয়ায় ফিরে যাসনে সুন্দর।

যাবো না ত' কি করব?

নাওটা বেচে দে। টাকা দেবো আমি, এখানেই কোন একটা ব্যবসা কর।

হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল সুন্দরম।

দরিয়ার নেশা তখনো তার দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

আশ্চর্য!

সেই অদ্ভুত দরিয়ার নেশা তার কেটে গেল।

কেটে গেল ঐ মৃন্ময়ী তার জীবনে আসার সঙ্গে সঙ্গে। মৃন্ময়ীকে নিয়ে জীবনের এক নতুন স্বপ্ন যেন উদ্‌ঘাটিত হলো তার দু' চোখের সামনে।

ভায়লার যে ব্যবসার কথায় বিদ্রূপের সঙ্গে হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল সুন্দরম, আজ সে সেই ব্যবসাই শুরু করেছে। আর শুরু করছিল সে মৃন্ময়ীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য। কিন্তু মৃন্ময়ী—কোনদিনই কি সে তাকে পাবে।

হঠাৎ ঐ সময় আবার ডি' কুনহার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সুন্দরম।

কাপিতান—

উঁ!

কি ভাবচো কাপিতান?

ডি' কুনহা।

বল!

সত্যিই মা খুব অসুস্থ?

হ্যাঁ—বুড়ি একটিবার তোমাকে দেখবার জন্য একেবারে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একবার যাও, দেখা দিয়ে এসো।

আবার যেন নতুন ক'রে মনে পড়ে ভায়লার মুখখানা সুন্দরমের।

ধীরে ধীরে সে বলে, যাবো।

কবে যাবে কাপিতান!

আজই। এখুনি—

চল—তা হলে আর দেরি করো না।

না আর দেরি কি, চল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নাও ভাড়া করে ডি' কুনহাকে সঙ্গে নিয়ে সাতগাঁর দিকে রওনা হয়ে পড়ে সুন্দরম।

পরের দিন সকালের দিকে নাও এসে ঘাটে লাগল।

অনেক বছর পর এখানে পা দিল সুন্দরম। অনেক বদলে গিয়েছে আশ পাশের সব কিছু। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। রাস্তায়ও কত মানুষের ভিড়। সেই বাড়ি। এই কয় বছরে আরো জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। মাঝারী আকারের ভিতরের একটা ঘরে রোগশয্যায় শুয়েছিল ভায়লা। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সুন্দরম, মা—

কে।

সঙ্গে সঙ্গে শয্যার উপর উঠে বসে ভায়লা, কে।

মা—আমি সুন্দরম্।

সুন্দর—দু'হাত বাড়িয়ে দেয় ভায়লা।

এগিয়ে এসে শয্যায় বসে দু-হাতে মাকে বুকের 'পরে টেনে নেয় সুন্দরম।

ভায়লার দু-চোখের কোণ বেয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

মা—

বেটা।

কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হয়ে ভায়লা বলে, সুন্দরম বেটা—

কি মা।

আমার দিন হয়ে এসেছে আমি বুঝতে পেরেছি। তাই যাবার আগে একটা কথা তোকে আমার বলে যেতেই হবে।

কি কথা মা।

বলব। বলব—

মা।

হঁ—আর গোপন রাখব না কথাটা তোর কাছে। এতকাল গোপন রেখেছি কিন্তু আর রাখব না।

কি কথা মা।

বলব। [ক্রমশ।

রাখালের গান

(ক্রীষ্টোফার মার্লো)

এস আমার সঙ্গে, রহ পরাণ-প্রিয়া হ'য়ে
জানব দু'জন কেমন ধরায় আনন্দ যায় বয়ে।
এ-বন ও-বন তাহার মাঝে সবুজ-ঢাকা মাঠ।
মহান রবি চুমোয় ভরেন তাহাদের ললাট।

বসব সুখে তুমি-আমি বনের শীতল ছায়ে
গো-চারণে দেখব রত যত রাখাল ভায়ে।
ছোট্ট নদী পাশেই তাদের কুলকুলিয়ে চলে
বনের শাখে গানে পাখি মনের কথা বলে।

গাঁথব আমি তোমার লাগি বনফুলের মালা।
(আমাদের ঐ-বনে ফুলের অভাব নাই ত বালা!)
রাখাল সখায় মালা গেঁথে দিতেম খেলার ছলে
ভালই হবে এখন দেব প্রাণ-প্রেয়সীর গলে;

শহর গিয়ে তোমার লাগি আনব দামী শাড়ি
রাখাল-পাড়া দেখতে তাহা করবে কাড়াকাড়ি।
বাদল দিনে মাথার টোকা, খড়ম শীতের দিনে—
আর মনে পড়ে না প্রিয়া আনব কি কি কিনে।

স্মরণ হোল চুলের কাঁটা—রূপোর—হোক্ গে দাম
এনে দোবই যদি আমার পুরাও মনস্কাম;
ভালো থালা নক্‌সা-কাটা আনব তোমার লাগি
দেখ কেমন হবে তুমি রাখালের সোহাগী!

এ' ছাড়া আমাদের ঘরে আমোদ লেগেই আছে
সন্ধ্যা হ'লেই বাদ্য বাজে একসাথে গায়, নাচে।
সব মিলিয়ে দেখ যদি খুশিই তুমি হবে
আমার প্রিয়া হতে তোমার দ্বিধা আর না রবে।

ভাবানুবাদ: জীবনকৃষ্ণ দাশ।

ভালোবাসতে চেও না

বিমলচন্দ্র সরকার

শুনছো মেয়ে: ভালোবাসতে চেও না
শান্তির সান্ত্বনা কোথাও পাবে না
ভালোবাসাবাসি এ তো শুধু
মিথ্যা শব্দের যোজনা
আসলে আমরা ত' ভালোবাসি না
অসুস্থ প্রেমের করি অভিনয়।
শুনছো মেয়ে: বুকের সুধা দিয়ে
দু'দিনের খেলাঘরে
মনের মানুষ যায় না পাওয়া
মিছে জীবনের কলরব
ক্ষয় ক্ষতিই তার বিনিময়!
তাই শুনছো গো মেয়ে:
আকাশের স্বপ্ন বুকে চেপে
কি হবে ফেলে ঐ কাজল চোখের জল?
তার চেয়ে এই ভালো
মনের গভীরে ডুবে থাকো
ওগো মেয়ে: ভালোবাসতে চেও না
এ' সংসারে মনের মানুষ পাবে না।

নীলকণ্ঠ

আটত্রিশ

পৃথিবীটা কার,—এই ছেলেমানুষী প্রশ্নের মধ্যে যে ছেলেমানুষতর উত্তর লুকিয়ে আছে, সে বলছে, পৃথিবী টাকার। বলে ভাবছে, মানবজীবনের শেষ কথা বলা হয়ে গেল বুঝি! টাকা ছাড়া বাঁচা যায় না যে কেবল এইমাত্র বক্তব্য নয় ওই প্রশ্নের আস্তিনের মধ্যে উত্তরের ট্রাম্পকার্ড গোঁজা এ যুগের সুবচনীতে। টাকা ছাড়া একটি মুহূর্তেরও মূল্য নেই এতটুকু অর্থ, টাকাই চলবার চাকা। টাকার ধ্যান। টাকার জ্ঞান, টাকার স্বপ্ন· টাকাই সব। নারায়ণ নয়, নগদনারায়ণই আরাধ্য। টাকাই সাকার ব্রহ্ম· শুনতে শুনতে মনে হয় সত্যই সবার উপরে মানুষ নয়, সবার ওপরে কাঞ্চনই কাম্য. এই বাস্তব সত্যের ওপর যারা উঠেছে, মণিকে যারা মণি বলে মানে নি, তাদের জীবন সাধারণ মানুষকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে নি। অসাধারণ সেই মানুষও যে সংসার করেছে, ভার নিয়েছে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের, অর্থ রোজগার করেছে দু'হাতে কিন্তু খরচা করেছে চতুর্ভুজে সে-কথা বলতে গেলে শুনবেন, ওঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম। ওঁরা কোটিকে গোটিক। ওঁরা সংসারের বাইরে।

না। তারাকিশোর চৌধুরী,—যেদিন হাইকোর্ট থেকে হাজার হাজার টাকার ব্যবহারজীবন তুচ্ছ করে বেরিয়ে গেলেন বৃন্দাবনের পথে সেদিন তিনি আপনার আমার মতোই সংসারী লোক ছিলেন। অর্থের প্রয়োজন আপনার আমার চেয়ে কিছু কম ছিলো না তাঁর সেদিন এবং পয়সা রোজগার করতে না পেরে হতাশ ভগ্নোত্তম বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেরুন নি তারাকিশোর। সাফল্যের সুমেরুশিখরে দণ্ডায়মান তারাকিশোরকে আরও বড় সাফল্যের আলেয়া যখন আহ্বান জানাচ্ছে, তখন সে কোন আলো তাঁকে টেনে নিয়ে গেল নিশ্চিতের কূল থেকে অনিশ্চিতের অকূলে। সেই পরমার্থের আলো মিথ্যা? আর অর্থের আলেয়াই সব।

সাধারণবুদ্ধি মানুষের কথা বাদ দিচ্ছি। অসাধারণ বুদ্ধি অপরিমিত সাফল্যের সমার্থক ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ পর্যন্ত তারাকিশোরকে বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন তারাকিশোর চলে যেতে চাইছেন বুঝি ডক্টর ঘোষ থাকতে ব্যবহারজীবিকার শীর্ষে উঠতে না পারার অভিমানে। তাই তারাকিশোরকে বলেছিলেন রাসবিহারী: আর কয়েকদিনের মধ্যে আমি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিচ্ছি, তখন আপনার আয় হবে লাখ টাকার ওপর মাসে। তারাকিশোর কিছু বলেন নি. হেসেছিলেন। সেই হাসি,—যে হাসি অনিন্দ্যসুন্দর এক মানুষ নৌকার ওপর থেকে তাঁর কীর্তির পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন যখন জলে বন্ধুত্বের মহিমাকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে তখন হেসেছিলেন।

সে হাসি যে অর্থ ও সামর্থ্যের প্রতি পরমাশ্চর্য এক উপহাসি, তা বুঝতে অসাধারণ ধী রাসবিহারীরও সময় লেগেছিলো। লাগবারই কথা। যে বুদ্ধিতে আইনের অদৃশ্য বন্ধন মুক্ত হয় এ হাসির ব্যাখ্যা সে বুদ্ধিতে করা অসম্ভব। গজ আর ইঞ্চির ফিতেয় হিমালয়ের বহিরঙ্গ মাপা যায় হিমালয়ের নিরুপম নিভৃত অন্তরে অনুপ্রবেশ করতে হলে ধূর্জটির করুণা চাই। সে করুণা কোটিকে গোটিক যার আধারে নামে, সেই শুধু সেই ধনে ধনী হয়, যে ধনে ধনী হলে মানুষ মণিকে মণি বলে মানে না। তারাকিশোর ডাক শুনতে পেয়েছিলেন যাঁর তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করার সাধ্য ছিলো না। এই জগতের যিনি রাজা তাঁর চিঠি তখন এসে পৌঁছেছে ভাগ্যবান তারাকিশোরের কাছে। বিনা আহ্বানের সেই আমন্ত্রণ লিপির স্পর্শ হৃদয়াকাশের আঁধারের গায়ে গায়ে প্রতিমুহূর্তে ফুটিয়ে চলেছে নব নব তারা। সে তারা যার গহনে একবার জ্বলে তাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই সুরু ও সারাহীন এক অনাদি ধারার।

তারাকিশোরের জীবনে ঝড় উঠেছিলো—পরাণসখা বন্ধুর অভিসার। ব্যবহারিকজীবনের অর্থ-সামর্থ্য অসার হয়ে গিয়েছিলো। রাসবিহারী ঘোষ তা বোঝেন নি। বুঝলেন সেইদিন, যেদিন তারাকিশোর সত্যি সত্যি বিদায় নিতে এলেন কর্মজীবন থেকে। বার-লাইব্রেরিতে এলেন সহজীবীদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। অদ্বিতীয় রাসবিহারী উঠে এলেন দ্বিতীয়র কাছে। প্রণাম করতে এলেন বয়সে ছোটো তারাকিশোরকে। তারাকিশোর বাধা দিতে গিয়ে পারলেন না; বাধ্য হলেন বয়সে বড় রাসবিহারীকে পায়ের ধুলো নিতে দিতে। রাসবিহারী বললেন: বয়সে আমি বড়। কিন্তু আর সবেতেই যে বড় তাঁকে প্রণাম করতে না পারলে আমি যত ছোটো তার চেয়েও অনেক ছোটো হয়ে যাব আজ।

রাসবিহারী যা বললেন না, তা হচ্ছে, যে মানুষ তার বয়স, তার কীর্তি, তার বিত্তার চেয়ে অনেক বড়, সে মানুষের দেখা মেলে মানব-জীবনের মহত্তম সৌভাগ্যে। যদি কোটিকে মেলে গোটিক এমন কীর্তির চেয়ে মহৎ মানুষের দেখা মেলে তবে তাকে প্রণাম করলে যা মেলে তা বিত্তা, বুদ্ধি, অর্থ, সামর্থ্য, প্রতাপ, কৌশল,— মেলে না আর কিছুতেই।

কাশীতে এমনই একটি অবিস্মরণীয় পুরুষ তাঁর জীবন-শতদল মেলে ধরেছিলেন দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে।

তাঁর পুণ্য, পবিত্র, প্রাতঃস্মরণীয় নাম, সতীশচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভোরের আকাশ যাঁরা ভরে দিয়েছিলেন গানে, চিন্তায়, উদ্দীপনায়, রক্তে, কর্মে, সাধে, সাধনায়, আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। তাঁর 'ডন' পত্রিকা সেই সংগ্রামী বংগের স্মরণীয় শংখ। এ শংখের মুখে সেদিন যাঁরা ফুঁ দিয়েছিলেন তাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের চেয়ে খ্যাতনামা লোক ছিলেন প্রায় সবাই। কিন্তু তাঁরা কেউ ওই পত্রিকার পতাকা উড্ডীন রাখতে পারতেন না, ডন সমিতি ও পত্রিকার প্রাণবায়ু মহাত্মা সতীশচন্দ্রকে না পেলে। তাঁকে ঘিরে রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে যে তরুণ যাত্রীদল বেরিয়েছিলো স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সতীশচন্দ্র এবং 'ডন' ছাড়া তার প্রকাশ হতো না এমন প্রোজ্জ্বল। সেই প্রলয়রাতের প্রদীপশিখা ছিলেন সতীশচন্দ্র। সে শিখাকে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন যিনি, তিনি পবিত্র জীবনের সব চেয়ে প্রাণবন্ত প্রতীক প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বংগদেশ ও জীবনে বিজয়কৃষ্ণের দান বিবিধ ও বিশাল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তাঁর 'মাস্টারপিস' হচ্ছে,—আচার্য সতীশচন্দ্র।

এই সতীশচন্দ্রের কথা আমাকে বলছিলেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। বলছিলেন,—গুরুর কথা শিরোধার্য করে, অর্ধশতাব্দী ধরে একটি মানুষ কাশীতে কাটিয়ে গেলেন দোতলাবাড়িতে কারুর কাছে কপর্দকশূন্যাবস্থাতেও কখনও একটি কানাকড়ি হাত পেতে না চেয়ে,—তাঁরই দীপ্ত দিব্য ইতিবৃত্ত। সতীশচন্দ্রের জীবনী আমাদের ছাত্রদের পাঠ্য নয়। তাঁর 'ডন' কাগজের নামও শোনে নি আজকের ছেলেমেয়েরা। তার বদলে তাদের গেলানো হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস। দেশের কথা যারা জানলো না তারা বিদেশের কাহিনী মুখস্থ করে উগরে দিয়ে আসছে পরীক্ষার খাতায় তোতাপাখীর মতো। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যারা প্রথম শ্রেণীর নম্বর পাচ্ছে। তারাই জীবনের পরীক্ষায় ডেকে আনছে দারুণ বিপর্যয়।

মহৎ মানুষের জীবনের চেয়ে মহত্তর ইতিহাস নেই। সে ইতিহাস বইয়ের পাতায় নয়, চোখের পাতায় পড়তে হয়,—জানি। কিন্তু যারা চোখের পাতায় তা পড়বার দুর্লভ ভাগ্য করে এল না। সেই ধনী জীবনের প্রতিধ্বনি থেকে বঞ্চিত রাখব কেন তাদের?

কীর্তির চেয়ে যিনি মহৎ, ইতিহাসের চেয়ে যে তিনি বৃহৎ, এ শিক্ষাই তো জীবনের শিখায় অনির্বাণ জাগ্রত।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণকে অভিমান মাখা গলায় বলেছিলেন আচার্য সতীশচন্দ্র একদা যে, তিনি অযোগ্য তাই অধ্যাত্ম সাধনার পথ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবেন বলে 'ডন' কাগজের ভার তাঁর ওপর চাপিয়েছেন গুরুদেব। ঈশ্বর অনুরাগের রঙে রাঙা বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন: 'না রে তোর সাধনা আমার দায়িত্ব। ও কাগজ তোকে আমিই

করতে বলেছি, যেদিন বুঝব, সেদিন আমিই বলব, কাগজ বন্ধ করতে।'

এই মহাপ্রাণ গুরুর আদেশেই সম্পূর্ণ নিঃসম্বল সতীশচন্দ্র কাশীতে অর্ধশতাব্দী কাল কাটিয়ে গেছেন কখনও কারুর কাছে নিজেকে নীচু না করে। নিজে থেকে না চেয়ে একটি কপর্দকও। সে কাহিনী আরব্যোপন্যাসের এক হাজার রূপকথার একটি পাতার মতোও অলীক নয়, অথচ অলৌকিক। এমন গুরুনির্ভরতার দিব্য দীপ্ত দিগ্বিজয়ের জ্যান্ত প্রমাণ তা, যে, তারপর বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ 'তর্কে বহুদূর' অবিশ্বাস করা অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়, বলেই বিশ্বাস হয়। চোখের ওপর সেই ঘটনা যিনি একের পর এক ঘটতে দেখেছেন, ডক্টর গোপীনাথ এমনই একজন। তিনি আমাকে কাশীতে, কাশীর চেয়েও মহত্তর তীর্থ, সতীশচন্দ্রের আবাস-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তাঁর বিশ্বাস-উজ্জ্বল বাণীতে এঁকে দেখান। সে কাহিনী শুনে আমার মনে হয়েছে যে কোনও মানুষ যদি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে 'পূর্ণ'-র ওপর তাহলে অন্নপূর্ণ যিনি, তিনি তাঁর দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন স্বয়ং, না ডাকতেই সাড়া দেবার স্বেচ্ছার্পিত বাধ্যবাধকতায়। এই কলিতে সেই কাশীতেই যখন এ অঘটন আজও ঘটে, তখন কে বলে তিনি দাঁড়িয়ে সেই জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপারে যাঁর পায় যতক্ষণ না পৌঁছয় মানুষ,—ততক্ষণ সে একান্তই নিরুপায়।

বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন সতীশচন্দ্রকে, 'সারা জীবন দোতলাবাড়িতে থাকবি। কারুর কাছে হাত পাতবি না। বুঝতে পর্যন্ত দিবি না তোর প্রয়োজন। তোর প্রয়োজন মিটোবার জন্যে যা আসবে তাকে ফেরাবি না।' দোতলাবাড়ির ওপর থাকা মানে রাজার হালে থাকা। অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন গুরুবাক্য সতীশচন্দ্র। অক্ষরে অক্ষরে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

এমনও হয়েছে একবার যে বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছে কয়েক মাসের। বাড়িওয়ালা সভয়ে সেকথা জানিয়েছেন সতীশ-ভক্তদের। সতীশচন্দ্র বলেছেন, এসে যাবে টাকা। এসেছে টাকা। গুণে গুণে সেই কটি মুদ্রা, বাড়ি ভাড়া মিটোবার জন্যে ঠিক যে কটির দরকার। এমনও হয়েছে আবার যে, টাকা এসেছে টেলিগ্রাফিক মানি অর্ডারে, বিনা প্রয়োজনে। ফিরে গেছে টাকা গুরুর নির্দেশে। যে পাঠিয়েছিলো, সে নিজে এসেছে, অনুনয় বিনয় করেছে, টাকা কটা দয়া করে সতীশচন্দ্র যদি নেন। গুরু নির্দেশ অমান্য করা অসম্ভব। তাই অনুনয় বিনয়ে পাষাণ গলেনি। তারপর লোকটি ব্যর্থমনোরথ হয়ে চলে গেল, গুরুকে প্রশ্ন করেছেন শিষ্য; লোকটাকে দুঃখ দিলে কেন? নিলেই হতো তো টাকা কটা। গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন টাকা কটা কোন্ উপায়ে আহৃত। সতীশচন্দ্র বুঝেছেন। ও অর্থ নিলে কি ভয়াবহ অনর্থ ঘটতো সাধনায়!

গুরুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হবার পরেও, গুরুর কাছে না জিজ্ঞেস করে সতীশচন্দ্র এ ঘর থেকে ও ঘরে যাননি কখনও। স্থূলদেহে যতদিন বেঁচেছিলেন গুরুতনু আচার্য সতীশচন্দ্র।

মহাভারতের মহত্তমা, কুন্তী ঠিক এই কথাই বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পায়ে প্রার্থনা জানাতে গিয়ে। বলেছিলেন: হে পাণ্ডবসখা, আমার জীবন থেকে কখনও দুঃখের মেঘ সরিও না, কারণ, তা হলেই আমি তোমাকে ভুলে যাব। সর্বস্ব না দিলে সর্বস্বধন পায় না কেউ। পৃথিবীটা কার এই প্রশ্নের অবধারিত যে উত্তর ওই প্রশ্নের মধ্যেই বিধৃত, পৃথিবী টাকার, সে কথা ঠিক। কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই আছে আরেক পৃথিবী, এ বিশ্বের মধ্যেই রয়েছে আরেক বিস্ময়, —বিশ্বনাথের বাসভূমি যেখানে অর্থের ওপরে জেগে আছে পরমার্থের পিপাসা! অন্নচিন্তা যেখানে অন্তচিন্তার, অনন্তচিন্তার বাধা নয় আজও। সেই কাশীতে তোমায় যেতেই হবে। যদি একাশিতে পা দেবার পর নয়; যেতে হবে যৌবনে। দেহে শক্তি, মনে তৃষ্ণা, চোখে দৃষ্টি, বাহুতে বল, হৃদয়ে ভক্তি যখন অটুট, তখনই গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁর দরজায়। বলতে হবে, বিশ্বের শেষ অনাথ পর্যন্ত যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছে বিশ্বদেবকে, ততক্ষণ মানুষেরই নয় কেবল, বিশ্বনাথেরও মুক্তি নেই, কাশীর মন্দির থেকে তাঁর বেরুবার নেই পথ। কাশী ছাড়া আর কোথায় আছে সকল মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার হাত থেকে চিরন্তন মুক্তি। বিশ্বনাথ ছাড়া তিনি আর কে যিনি অন্নপূর্ণ হয়েও, বিশ্বের সমস্ত অনাথের মুখে যতক্ষণ না উঠছে অন্ন, ততক্ষণ আছেন উপবাসী।

এই কাশীতেই, কাশীর দিদিমার বাড়ির সামনে অন্ধগলির অন্ধকারে লালকাপড় পরা সেই মহিলার কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আর সব কথা, আর সকলের কথা বিস্মৃত হই আমি। বিস্মিত হই কেবল সেই সতী শ্রেষ্ঠার আচরণে। যৌবনে স্বামী পরিত্যাগ করে এই মহিলাকে। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে সে। কাশীতে পড়ে থাকেন মহিলা। ছত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। যদি অন্ন মেলে তবে খান। না হলে খান না। তারপর সুদীর্ঘকাল বাদে দীক্ষা নেবার সময় মহিলাকে তাঁর গুরু বলেন, স্বামীর অনুমতি চাই। স্বামীর অনুমতি নিতে যান কাশী থেকে অনেক দূরে স্বামীর কর্মস্থলে। দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম পুত্র বলে: আজ জানলাম তুমি আমাদেরও মা। তা তুমি কেন পরের অন্নে পালিত হবে? আমি তোমার অন্ন-বস্ত্রের ভার গ্রহণ করব আজ থেকে। উত্তরে উন্নতমাথা সেই দারিদ্র্যাভরণভূষিতা অপরূপা বলেন: তোমার বাবাই আমার ভার নিলে না। তোমার কাছ থেকে আমি কেন নেব করুণা?

এই জগতের যিনি মালিক তাঁর নাম করুণাময়। এই মহিলার কথা কি একবারও মনে পড়বে না তাঁর!

এই কাশীতেই আবার অনেকে যায়, ভৃগু, আসল ভৃগুর সন্ধান মেলে কি না তাই জানতে। কাশীতে যারা বিশ্বনাথজীর মন্দিরে যায় তাদের বুঝি; যারা ডালকামুণ্ডিতে যায় বাঈজীর ঘরে তাদেরও বুঝি। কিন্তু যারা হাত-পা দেখাতে যায়, ঠিকুজিকুষ্ঠী তৈরী করাতে যায় তাদের বুঝি। যাঁকে জানলে ভূত-ভবিষ্যতের অতীতকে জানা যায়। পৌঁছন যায় জন্মমৃত্যুর ওপারে। তাঁর কাছে না গিয়ে তাঁর থেকে অনেক দূরে যাই, কি জানতে? না, আমার নাতি পাস করবে কি না পরীক্ষায়? অংকে সে একটু খারাপ করেছে। আশ্চর্য! সিন্ধুতে ডুব দেব শামুকের জন্যে? কৃপাসিন্ধুর কাছে ভিক্ষা করব মেয়ের পাত্র, ছেলের চাকরি।

কাশীতে এখন আর কে আছেন জানি না, ছিলেন একজন। তিনি এখন আর বেঁচে নেই। স্কুলের মাষ্টারমশাই ছিলেন নামে। আসলে নামকরা ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সেবার নির্বাচনে হেরে যান। সেবার তাঁর কুষ্ঠী গণনার জন্যে ডাক পড়ে মাষ্টারমশাইয়ের। তিনি বলেন, কোনও আশু পরিবর্তন তাঁর চোখে পড়ছে না। যাঁরা জানেন তাঁরা হেসে ফেলেন।

পরাজিত প্রফুল্ল সেন যে মন্ত্রী থাকতে পারেনই না, এই বদ্ধমূল ধারণাই সেদিন তাদের উচ্চহাসির কারণ ছিলো। পরবর্তীকালে মাষ্টার-মশাইয়ের কথাই ঠিক হয়। প্রফুল্ল সেনমশাই হেরে গিয়েও স্বপদেই বহাল থাকেন যে,—এ-তথ্য পরিবেশন করা এখন বাহুল্য মাত্র।

এই মাষ্টারমশাইয়ের কথা আমাকে কাশীতে যাঁর বাড়িতে আমি উঠি সে-বাড়ীর কর্ত্রীও বলেন। তাঁর এক বান্ধবীর স্বামী এক স্কুল-মিসট্রেসের পাল্লায় পড়ে স্ত্রীকে এতদূর অবহেলা করতে আরম্ভ করেন যে, তিনি আত্মহত্যায় উদ্যত হন। মাষ্টারমশাইয়ের কাছে তাঁকে নিয়ে যান আমার আশ্রয়দাত্রী। মাষ্টারমশাই প্রত্যেকটি ঘটনা অবিকল বলে যান। তারপর বলেন এ গ্রহ কাটাবার জন্তে যা করা দরকার, তা করা সম্ভব হবে না প্রবঞ্চিত মহিলার পক্ষে। কারণ মাষ্টারনী সম্পূর্ণ গ্রাস করে বসে আছে তাঁর স্বামীকে।

এই ভবিষ্যদ্বক্তা ভদ্রলোকের একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে তিনি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করতেন। এঁর ঘরে অনেক দুষ্প্রাপ্য জ্যোতিষ পুঁথি ছিলো বলে জানা গেছে। সেগুলি কি সরকারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হচ্ছে কি না জানি না। কেবল কালীপদ গুহরায়ের কাছে শুনেছি যে ওঁর ধারণায় মাষ্টারমশায় কোনও স্পিরিট কনট্রোল করতেন। তার প্রমাণ এক এই যে, অত কথা কেবল কোষ্ঠী বিচার করে, হাত বা মুখ দেখে বলা অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রমাণ,—ওই অপরিচ্ছন্নতা।

কিন্তু আমার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অন্য। কাশী যাবে হাত দেখাতে? বুক খুলে দেখাতে যাব না বিশ্বকে, মানবহৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক ধ্বনিত হচ্ছে যেখানে অনাদিকাল ধরে বিশ্বনাথ-বাণী: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। [ক্রমশ।

স্বাধীনতা উৎসবের সংকল্প

নরেন্দ্র দেব

চল্লিশ কোটি কণ্ঠ তোমরা
জনে জনে ডেকে শোনাও আজ,
মেহনৎ করে খেটে খেতে হবে
নিজে করা চাই নিজের কাজ।
গাঁইতি, কোদালে, শাবলে সবলে
গড়ে তোলো দেশে নূতন পথ,
জাতের জোয়াল ভেঙে চলো নিয়ে
সামনে এগিয়ে জীবন-রথ।
পদাঘাতে বাধা বিচূর্ণ করো,
চলো উচ্ছল পূর্ণ বেগে:
হাঁকো হুংকারে, নিদ্রিত যারা
নব চেতনায় উঠুক জেগে।
স্বাধীনতা নয়, রাষ্ট্র-বিলাস
গণতন্ত্রের ছদ্ম-বেশে
চাই শক্তির বজ্র-বোধন।
হানা দেয় দ্বারে শত্রু এসে!
আলস্য ছেড়ে উঠে এস ছুটে,
মুক্তি লগ্ন যাবে কি বৃথা?
সারা ধরণীরে ঘরণী করিয়া
বিশ্বেরে করো চমৎকৃতা।
শ্রমের মূল্য দিতে শেখো সবে
চাষী মজুরের বাড়াও মান,
কপালের ঘাম মুছে যারা খাটে
সম্মান পাক তাদের দান।
অলস বিলাসী পুঁজিবাদী যারা
গরীবে শুষিয়া মুনাফা লোটে
পাঠাও তাদের কারখানা ঘরে,
মিশুক কায়িক শ্রমিক-জোটে।
দেশের স্বার্থ বড় সব চেয়ে
আত্ম-স্বার্থ ভোলাও সবে,
গ্রামীণ সমাজে সকলের কাজে
নিজের দু'হাত মেলাতে হবে।
বহু ভাষাভাষী দেশকে কোরো না
স্বেচ্ছাচারের রঙ্গভূমি;
কালের অমোঘ চক্রের তলে
তা'হলে পিষ্ট হবেই তুমি।
বেদ পুরাণের দিন গেছে চলে
নব বিজ্ঞান মেলিছে শাখা,
যন্ত্রযুগের মন্ত্র প্রধান
বিজলী-বাষ্প কলের চাকা!
হাল গরু ছেড়ে ট্র্যাক্টার ধরো,
মেটাও মোটরে মাটির চাষ,
খড়ের ছাউনি কাঁচাঘর ছেড়ে
পাকা ইমারতে জমাও বাস।
বন্যার মুখে বাঁধ বেঁধে আজ
সাজ-ফসল ফলাও জলে,
আকাশের দেশে উড়ে চলে যাও,
ঘোরো গ্রহে গ্রহে কৌতূহলে।
পদযাত্রার বাহাদুরী আর
চলে না এখন, সময় দামী,
সপ্ত-সিন্ধু লঙ্ঘিতে হবে
বানাও বিমান ক্ষিপ্রগামী।
দেশে দশে মিলে করো এ নিখিলে,
শান্তিতে সহ-অবস্থান,
এক পৃথিবীতে মানুষের চিতে
স্পন্দিত হোক একটি প্রাণ।
বারুদ কিন্তু রেখো শুকই,
অস্ত্র শাণাতে ভুলো না তুমি,
বিংশ শতকে অহিংসরূপে
দাঁড়াবে তবেই জন্মভূমি!

ক্ষতিপূরণদানের ব্যবস্থা একবার চালু হইলে টাকা পাইবার আশায় ওই ধরণের বে-আইনী কাজ করিতে আরও অনেকে প্রলুব্ধ হইতে পারে। তাহা ছাড়া রাস্তার উপর ব্যবসা করিতে পারিলে, জমির খাজনা ও ঘরভাড়াও বাঁচিয়া যায়। ফলে যে-সব ব্যবসায়ী আইন মানিয়া সৎভাবে ব্যবসা করে; তাহারা অসম প্রতিযোগিতার কাঁপরে পড়ে।' —আনন্দবাজার পত্রিকা।

মৎস্য বিভ্রাট

'কলিকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকার মাছের বাজারের খুচরা দোকানীদের লাইসেন্স করার মেয়াদ বুধবার শেষ হইয়া গেল। অথচ খুব সামান্যসংখ্যক দোকানদারই এ যাবৎ লাইসেন্স করাইয়াছেন। হাজার হাজার খুচরা দোকানদারকে (যাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অক্ষর পরিচয়ও নাই) এই বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত করাইবার চেষ্টা হয় নাই। প্রচারের অভাবে অনেকেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝেন নাই। এদিকে আড়তদারদের উপর সরকারী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, লাইসেন্সবিহীন কোন খুচরা মৎস্যবিক্রেতাকে যেন আড়তদাররা মাছ বিক্রয় না করেন। তার ফলে বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতা ও হাওড়ায় মাছের পাইকারী বাজারে নূতন বিভ্রাট দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। শুধু কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার বহু মৎস্যবিক্রেতাই নয়, এই দুইটি পৌর এলাকার বাহিরে শহরতলীর যেসব খুচরা মৎস্যবিক্রেতা তাঁদের সরবরাহের জন্য এই সব পাইকারী বাজারের উপর নির্ভরশীল (তাঁদের লাইসেন্স আদেশের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে) তাঁরাও মাছ পাইবেন না। অর্থাৎ এই সব মৎস্যবিক্রেতার বিক্রয় করার অধিকার যদি বা থাকে ক্রয় করিবার অধিকার থাকিবে না। এমনতর নির্বোধ সরকারী আদেশ যদি অবিলম্বে সংশোধন করা না হয় তাহা হইলে মাছের বাজারে আরেক দফা কেলেঙ্কারী ঘটিবে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, রাজ্য সরকার শেষ 'মুহূর্ত' এক বিজ্ঞপ্তি দিয়া তাঁদের পূর্বকার আদেশ সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সকল জটিলতা দূর হইবে কি না সন্দেহ।' —যুগান্তর।

পাকিস্তানের কীর্তিকলাপ

'পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ জানাইয়াছেন যে, গত পাঁচ বছরে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাকিস্তানীরা ২৭৫ জন ভারতীয়কে পাকিস্তানে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই ২৭৫ জনের মধ্যে কতজন ছাড়া পাইয়াছে এবং যারা ছাড়া পায় নাই তাদের মুক্তির জন্য প্রতিবাদপত্র পাঠানো ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার আর কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন উত্তর হইতে তা জানা যায় নাই। কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকদের অন্য একটি রাষ্ট্র যে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং তারপরও সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া যে আলোচনা চলিতে পারে—এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বোধ হয় একমাত্র এদেশেই সম্ভব। আমরা এই অদ্ভুত মনোভাবকে নিজেদের পরম ঔদার্য বলিয়া আত্মতৃপ্তি বোধ করিতে পারি। কিন্তু পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকরা ইহাকে নিছক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। এবং সেই জন্যই তাঁদের জঙ্গী, উগ্র মেজাজ দিনের পর দিন উগ্রতর হইয়াই চলিয়াছে।' —দৈনিক বসুমতী

পথের পাঁচালী

'কী শহর, কী গ্রামাঞ্চল—সর্বত্রই রাস্তাঘাট নির্মাণের সময় যানবাহন চলাচলের কথাই প্রধান হইয়া দেখা দেয়। কাজেই নূতন নূতন পরিকল্পনা রচনার সময় পায়ে-চলার পথ রাখিবার কথা সাধারণত মনে থাকে না। জনবহুল রাস্তায় শহরের ফুটপাথের মতই হাঁটিয়া যাতায়াত করিবার ব্যবস্থা রাখা দরকার। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যেখানে সজাগ, নাগরিকেরা সেখানে নির্বিকার। তাই রাস্তার উপর বে-আইনীভাবে দোকানঘর গড়িয়া উঠে, ডানলপ ব্রিজের নিকট বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে বালির ব্যবসা চলে এবং কলিকাতার রাস্তায় দিনের পর দিন আবর্জনার পাহাড় জমিয়া থাকে। এই সব কারণে রাস্তা অনেক সময় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। রাস্তাঘাটের উপর যাহারা দোকান ফাঁদিয়া বসে, সম্ভব হইলে তাহাদের অন্যত্র পুনর্বাসনে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু

কুড়ি বৎসর লাগিবে

'পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্ম-সংস্থান কেন্দ্রসমূহে ছয় হাজার স্বর্ণশিল্পী তালিকাভুক্ত হইয়াছে। উহাদের শতকরা গড়ে চার জন মাত্র এতদিনে বেকার নাম খণ্ডাইয়াছে। পাইকারী হারে আত্মহত্যা চলিলেও এই হিসাবে সকলের চাকুরি পাইতে লাগিবে বিশ বৎসর।' —লোকসেবক।

ভেজাল ব্যবসায়ীর কঠোর দণ্ড

'বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে, ১১টি ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক, ডিরেক্টর ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত করার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদের সাজা হইয়াছে, সশ্রম কারাদণ্ড

হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড হইয়াছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী দণ্ডপ্রাপ্ত-প্রতিষ্ঠান ও উহার মালিক প্রভৃতির নামও প্রকাশ করিয়াছেন। এই সব ক্ষেত্রে নাম প্রকাশ পাওয়া একান্ত আবশ্যক, কারণ ক্রেতাগণ সতর্ক হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারী বলিয়া দণ্ডিত প্রতিষ্ঠানগুলির যে নামের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠান নাই। ইহা সুখের কথা বিশেষ এই কারণে যে, কিছুকাল পূর্বে বোম্বের (মহারাষ্ট্রের) কোন কোন দায়িত্বশীল মহল হইতে পশ্চিমবঙ্গের তৈরী ঔষধ নিম্নমানের ও ভেজাল বলিয়া একটা ঢালাও অভিযোগ তোলা হইয়াছিল। তখনই বাংলার নাম করা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে উহার প্রতিবাদ করা হয়। এখন দেখা যাইতেছে কতগুলি অখ্যাত ও ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের তৈরী ভেজাল ঔষধই হয় তো বা বাংলার বাহিরে চালান গিয়া থাকিবে। বাংলার কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা ও সুনামরক্ষার দিক হইতেও ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারীদের কঠোর দণ্ডদান আবশ্যক। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিধান সভায় বলেন যে, খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগে ১৯৬০-৬১-৬২ সালে ৩ হাজার ২০ জন ব্যবসায়ীকে বিচারে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে এই জুন মাস পর্যন্ত ৪৮৪ জনকে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশা করেন সাজার ভয়ে খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইতে পারে। অবশ্য, যদি সাজাটা ভয় পাওয়ার মতো আদর্শ সজা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে খাদ্যে ভেজালদারদের সাজার পরিমাণ ও-রকম প্রকাশ পায় নাই। এক্ষেত্রেও কঠোর দণ্ড আবশ্যক।'

—জনসেবক।

মরণ ফাঁস

'পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ভারত-বিদ্বেষ। সুতরাং ভারতের যে চরমতম শত্রু সেই-ই এখন পাকিস্তানের পরম বন্ধু। আমেরিকা ইংলণ্ড ভারতকে সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের উপর এখন চরম গোঁসা। সিয়াটো সেন্টো চুক্তিতে যোগদান শুধু ভারতকে কি করিয়া বে-কায়দায় ফেলা যায় এই লক্ষ্য করিয়াই হইয়াছিল। সুবিধা হয় নাই। এখন তাই প্যাঁচের নূতন মহড়া। একটা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি যে শুধু অপর এক দেশের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়াই পরিচালিত হয় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিই তাহার প্রমাণ। পাকিস্তান কিন্তু মহা ভুল করিতেছে। আগ্রাসী পররাজ্যলিপ্সু সাম্রাজ্যবাদী চীন আজ ভারতের ঘাড়ে থাবা বসাইবার চেষ্টায় অগ্রসর। সুযোগ পাইলে সে যে পাকিস্তানের দুর্বল স্কন্ধটি মুচড়াইয়া মুখে পুরিবে—ইহা অপেক্ষা রূঢ় সত্য আর কিছু নাই। কিন্তু দোস্তির পুলকে এবং বিদ্বেষে অন্ধ পাকিস্তান আজ সেই রূঢ় সত্য ভুলিতে বসিয়াছে। নিজের হাতে নিজের গলায় যে ফাঁস আজ চৈনিক চাতুরীতে পাকিস্তান পরাইতে বসিয়াছে—সে ফাঁস হইতে মুক্তির সম্ভাবনা আজ যদিও বা কাটিয়া থাকে সময় চলিয়া গেলে তাহা মরণ-ফাঁস-রূপে তাহার গলায় আটকাইয়া পড়িবে।'

—বীরভূমের ডাক (রামপুরহাট)।

পুচ্ছ তুলে নাচা

'বিমলাপ্রসাদ চালিহা দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন এবং দিল্লীর বড় কর্তারা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন এই চিত্র ও সংবাদ ফলাও করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। চীনারা আবার বন্দুক কামান নিয়া সীমান্তে আসিয়া জড়ো হইয়াছে ইহাতে চালিহার ভয় পাওয়ারই কথা। দুধে-ভাতে যাহাদের নির্বিবাদে বেশ ভালভাবে চলিতেছে, আবার এ যুদ্ধের সম্ভাবনায় তাহারা সরিষাপুষ্প সন্দর্শন করিবে ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বিমলা চালিহার পুচ্ছ কয় কিলো তেল দিল্লীতে মাখানো হইয়াছে সেই সংবাদটি আজও পাওয়া গেল না ইহাই দুঃখ। চীনারা আবার আসিলে পুনরায় পলাইতে হইবে এবং তখন পুচ্ছ যতটা সম্ভব উচ্চে তুলিয়া রাখিতে হইবে; তার জন্য আগে হইতেই যথেষ্ট তেল মালিশ করিয়া রাখা ভাল। পলায়নে যাহারা ফার্স্ট হইবে তাহাদের জন্য পদ্মশ্রীর ব্যবস্থা করিয়া আসিতে চালিহা সাহেব ভোলেন নাই তো?'

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

ক্রেতা সমবায় প্রসঙ্গে

'মহকুমার বুকে সরকারী ন্যায্য মূল্যের চাউলের দোকানসমূহের চেহারা দেখিলে আঁৎকাইয়া উঠিতে হয়। ইছাপুর পলতা অঞ্চলে দোকানসমূহের সম্মুখে দুই তিন দিন পূর্বে 'কিউ' দিয়া একাধিক রাত্রি জাগিয়া, তবে কিছু চাউল সংগ্রহ করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তাহাও অদৃষ্টে জুটে না। খোলা বাজারে চাউলের মূল্য ১৩৫০-এর মন্বন্তরের কথাই শুধু স্মরণ করাইয়া দেয় বার বার। সরকার হইতে অবশ্য দ্রব্যমূল্য রোধের কিছু কিছু চেষ্টা করা হইয়াছে। ক্রেতা সমবায় বিপণি স্থাপন করিয়া মুনাফাবাজি বন্ধ, ন্যায্য মূল্যে খাঁটি দ্রব্য দিবার জন্যই এই পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্বাগ্রে যাহা প্রয়োজন, মুনাফাবাজ অসাধু ব্যবসায়িগণের অসাধুতা রোধ করা। সরকার যদি না মুনাফাখোর অ-সাধুতা অবিলম্বে রোধ করেন তাহা হইলে ক্রেতা সমবায় পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরে বহুবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে।'

—বারাকপুর বার্তা (পলতা)।

চুক্তিভঙ্গের নিদর্শন

'পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্ষাকালীন অধিবেশন সুরুর আগেই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি লইয়া তীব্র লড়াই সুরু হইবে ইহা বোঝা গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের দাম অগ্নিমূল্য। অন্যান্য জিনিষপত্রের দরও তথৈবচ। জরুরী অবস্থার গোড়ায় এ বৎসর ব্যবসায়ীরা আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাঁহারা লাভ কম লইয়া কারবার করিবেন। কিন্তু কেহই সে প্রতিশ্রুতি রাখেন নাই। গত বৎসর ধানের উৎপাদন কম হওয়ায় দর বৃদ্ধির অনিবার্যতা সম্পর্কে সকলেই এক মত ছিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে বড় বড় ব্যবসায়ীর অধিক লাভের প্রবৃত্তি চাউলের দরকে বর্তমান পর্যায়ে তুলিয়াছে। শুধু খাদ্য শস্যের ব্যাপারে নয়, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের উর্ধ্বগতি এইভাবে জনচিত্তকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। চিনির কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া আকস্মিক ভাবে শতকরা ২২ভাগ দাম বাড়াইয়া মূল্য নির্ধারিত করার মধ্যে যে অসাধু ষড়যন্ত্র রহিয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না।'

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)।

সহানুভূতির অভাব

'আমরা বহু স্থান হ'তে সংবাদ পাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ থেকে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অকৃতকার্য ছাত্রদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনেক প্রধান শিক্ষকই ভর্তি করতে রাজী হচ্ছেন না। তাঁরা নাকি প্রাইভেটে পরীক্ষা দিতে ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছেন। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পাশের হার লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে রেগুলার ছাত্রদের চেয়ে অনেক কম! এ অবস্থায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ভাল এবং উচিতও। প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণ কেন প্রতিবন্ধক হচ্ছেন, তা বুঝতে পারছি না। একি নিজেদের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য? শিক্ষার খাতিরে শিক্ষক হিসাবে এ বিষয়ে সহানুভূতি-শীল মন কাম্য।'

—যুগবার্তা (হুগলী)।

বিদ্যোৎসাহিতার দৃষ্টান্ত

'সরকার ঋণ হিসাবে বৃত্তি মঞ্জুর করিয়া অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সুবিবেচনাপ্রসূত—সন্দেহ নাই। এরূপ বৃত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতাস্থ শ্রীহট্ট সম্মিলনী (Sylhet Association) অনুরূপভাবে—যদিও অতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে—ছাত্রদের সাহায্যদানের নিমিত্ত একটি 'ফাণ্ড' খুলিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে বৃত্তি (ঋণ) নিয়া স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত, ডঃ ত্রিগুণা সেন ও ডাঃ পরেশ দত্ত প্রভৃতি বিদেশে গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন। সরকার অবশ্য ব্যাপকতার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সাহায্যদান করিতে পারিবেন।'

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

বহিঃশত্রু অপেক্ষা অন্তঃশত্রু ভয়াবহ

'ভারত সরকার—পাক সরকার নহেন, মিথ্যা প্রচারণার হীন কারবার তার নয়। এ-বিষয়ে লালচীন ও পাকিস্তান সমস্তরের। বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যা প্রচার, হিংসার উন্মাদনা সৃষ্টি প্রভৃতি মানবতা-বিরোধী কাজে উভয়েই এক ও সমান। উভয়েই একই রকম অনাস্থাভাজন, অশ্রদ্ধেয়। উপরে যাহা বলা হইল তাহা বহিঃশত্রুর চরিত্র। বহিঃশত্রু যত খারাপ হউক তার ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র সবই পরিষ্কার, কারণ সে আসিবে আক্রমণ করিতে আমাদের সর্বতোমুখী সর্বনাশের শুভ উদ্দেশ্য নিয়া। সেখানে অস্ত্রে অস্ত্রে পরিচয় হইবে। তাহারা যত শক্তিমান হউক, আমাদের পক্ষে বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু অন্তঃশত্রু তাহা নহে। সে পদে পদে অন্ধকার হইতে বাধা দিবে, বন্ধু সাজিয়া ধ্বংসের কাজে সক্রিয় হইবে। ইহারা বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিবে। তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনে সব রকম ভূমিকা গ্রহণ করিবে। এ-বিষয়ে কম্যুনিষ্টগণ সর্বাধিক শক্র। ইহারা ভারতের শত্রু লালচীনের দোস্ত, ইহারা ভারতের শত্রু পাকিস্তানের দোস্ত। ভারতের অভ্যন্তরে কোটি কোটি স্বধর্মাবলম্বী মুসলমান অনেকেই পাকিস্তানের দোস্ত। এরা এ দেশের শত্রুবৎ। ভারতের অভ্যন্তরে কম্যুনিষ্ট ও এই মুসলমানদের মধ্যে একই রকম দোস্তী রহিয়াছে।'

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে

'বাসের ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষিত হইয়াছে। দরিদ্র সাধারণ মানুষের উপর আবার চাপ বৃদ্ধি হইতে চলিল। উক্ত দ্রব্যমূল্যের চাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝায় মানুষ সংসার নির্বাহ করিতে হিমসিম খাইতেছে—আছে অশ্রু সঞ্চয়ের ধাক্কা? এই অবস্থায় যত সামান্যই হউক না কেন ভাড়া বৃদ্ধিতে স্বাভাবিক ভাবে মানুষের বিপদ বাড়িবে জীবন ধারণ ও সংসার পালন অচল হইবে। এই অবস্থা কোনক্রমেই শুভ নয়। আমরা সরকারকে ভয়ংকর কিছু ঘটিবার পূর্বেই আর একবার ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখিতে বলি। এই কথা তাঁহারা জানিয়া রাখুন সাধারণ মানুষের আর অতিরিক্ত খরচের ক্ষমতা নাই।'

—জনমত (জলপাইগুড়ি)

সমাজসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

'এবারেও যথারীতি অর্ধেকের উপর ছাত্র সব রকম পরীক্ষাতেই ফেল হইয়াছে। ইহাদের গতি কি হইবে—কাহারও-ই দুর্ভাবনা নাই। অথচ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে ইহারা হয় তো অনেকেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারিত। আচ্ছা, সমাজসেবী বলিয়া যাঁহারা নিজেদের বিজ্ঞাপন দেন, তাঁহাদের কি এ বিষয়ে কিছুই করণীয় নাই? বৃত্তিমূলক শিক্ষার সর্বত্র ব্যবস্থা না হইলে, বেকার সমস্যা যে আরও ভয়াবহ হইবে, ইহাও কি তাঁহারা বুঝেন না?'

—পল্লীবাসী (কালনা)।

বিভীষণ হইতে সাবধান

'ভারতের সীমান্তে শত্রুর জঙ্গী দাপট ভারতের শান্তি বিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। অথচ ভারতের অভ্যন্তরেই চীন-দরদীরা এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। গতবৎসর চীন কর্তৃক সীমান্ত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই চীন-দরদীরা জনমতের চাপে বিবরে মুখ লুকাইয়া ছিল—আজ সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া তাহাদের কেহ কেহ সরকারের সমালোচনায় এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার 'পবিত্র দায়িত্ব পালনে' আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। ইহারা সম্ভাব্য চীনা-আক্রমণ এবং সীমান্তে চীনা ফৌজ সম্পর্কে নীরব! কিন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশের সমর-সজ্জার সংবাদে প্রতিবাদমুখর! কম্যুনিষ্ট পার্টির ছাত্র-সংস্থাটির কিছু কিছু সদস্য কলিকাতার রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নানা মুখরোচক শ্লোগানে মুখর! কিন্তু ভারত-সীমান্তে চীনাফৌজের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ইহারাও নীরব! অন্তত বাংলা দেশের জাগ্রত সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ইহাদের এই পরোক্ষ প্রচার বরদাস্ত করে নাই—ইহাই সুসংবাদ। জাতি যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপন্ন, তখন এই দেশীয় দুষমনদের প্রতি উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে সর্বনাশ হইতে পারে। সমগ্র জাতিকে আজ একদিকে সীমান্তে চীনা ফৌজের প্রতিরোধে যেমন দৃঢ় সংকল্প হইতে হইবে, তেমনি দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুর গুপ্তচরদের সম্পর্কেও সচেতন ও সতর্ক হইতে হইবে। সামগ্রিক জাতীয় চেতনাই বিদেশী শক্তির অনুগ্রহপুষ্ট দালালদের উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম।'

—বীরভূম বার্তা (সিউড়ি)।

রাণী এলিজাবেথ

গ্রেট বৃটেন—

গ্রীসের রাজা পল ও রাণী ফ্রেডারিকা গত ৯ই জুলাই লণ্ডনে এসে পৌছেছেন। এর আগে কেণ্টের ডিউক পত্নীর কন্যা প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রিয়ার বিবাহের সময় রাজা-রাণী এসেছিলেন। গ্রীসে এই ব্যাপারটা গুরুতর বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল, কারণ গ্রীক জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছিল গ্রীসের প্রিন্সেস ও রাণী আলেকজান্দ্রার বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে এলে তাঁদের প্রতি যথোচিত সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয় নি। অভিযোগ নিয়ে উত্তেজনা এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, গ্রীসের প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রশ্ন নিয়ে পদত্যাগ করতে হয়। প্রকাশ যে, গ্রীস ও ইংলণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রীসের রাজা ও রাণীকে তাঁদের বিগত সফরের খুব অল্পদিন পরেই লণ্ডনে সফর করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা গ্রীসের রাজা ও রাণীর বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য এই সফরের সুযোগ গ্রহণ করে, যদিও ইংল্যাণ্ড সরকার রাজা-রাণীকে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যাপারে কোনো আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি করেন নি। প্রকৃতপক্ষে যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন, সেখানেই বিক্ষোভকারীরা ছিল এবং পুলিশকেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। গ্রীসের রাজা পল যখন ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সহকারে বাকিংহাম প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে অশালীন কুরুচিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এতে ইংল্যাণ্ডের রাণী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তৃতীয় জর্জের আমল থেকে রাজকীয় পরিবার সব সময় রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে অবস্থান করে আসছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে অভাব-অভিযোগের সুযোগ নিয়ে রাজা বা রাণীর প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন বা অসৌজন্য প্রকাশ করা এর আগে কখনো হয় নি। প্রায় এক শতাব্দী পরে এই প্রথম বৃটিশ রাজের সম্মুখে এই ধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন হয়। গ্রীসে তথাকথিত অত্যাচার ও রাজনৈতিক

বন্দীদের আটক রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। জনৈক গ্রীক নাবিক নেতার বৃটিশ স্ত্রী মিসেস বেটি এমবাটিলস গ্রীসে বন্দী তাঁর স্বামীর একখানা ফটো বক্ষে ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং গ্রীসের রাজার নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁর স্বামী একজন কমিউনিষ্ট নেতা, তাঁকে দশ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে গত মহাযুদ্ধের পর গ্রীসে বিদ্রোহ পরিচালনা করবার জন্য।

লণ্ডন এখন আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণকারী কয়েকটি বিখ্যাত বিচারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে অভিযুক্ত আণবিক বিজ্ঞানী ইতালীয় সন্তান গুসেপ মার্টোলিকে ওল্ড বেলিকোর্টের বিচারে শেষ অবধি মুক্তি দেওয়া হয়। মার্টেলি স্বীকার করেছেন যদিও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং বার্তা পাঠানোর বহু উপকরণও তাঁর অধিকারে ছিল (যেমন পোর্টেবল ট্রান্সমিটার, হলো ও ইত্যাদি) কিন্তু এই যোগাযোগ তিনি ইচ্ছে করেই রক্ষা করে যাচ্ছিলেন, তার একমাত্র কারণ সময় বুঝে তাদের স্বরূপ উদঘাটিত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জুরীর দ্বারা এই বিচার হয়। এই জাতীয় অন্যান্য বিচারগুলি ইংল্যাণ্ডে এখনও জুরীদের দ্বারাই হয়ে থাকে।

ষ্টিফেন ওয়ার্ড

ন'ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিটব্যাপী চিন্তা ও আলোচনার পর তাঁদের দ্বারা মার্টেন্স নির্দোষী বলে ঘোষিত হলেন। এই দীর্ঘকালীন আলোচনাই প্রমাণ করল যে ইংল্যাণ্ডের জুরী ব্যবস্থা কত গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইংল্যাণ্ডের জুরী অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং সর্বতোভাবে দায়িত্বপরায়ণ।

এখানে জুরী প্রথা শুধু আবেগ সর্বস্বতা এবং নিছক সংস্কারের বশীভূত নয় কারণ তা হলে মার্টেন্সের মুক্তি বাস্তবে পরিণত হোত না।

ষ্টিফেন ওয়ার্ডের বহুলপ্রচারিত বিচারে পতিতাবৃত্তির আয়ে জীবনযাপনের অভিযোগে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। বিচারের শেষ দিনে যখন বিচারক তাঁর চার্জ শেষ করলেন এবং জুরীরা তাঁদের সিদ্ধান্ত জানালেন, ওয়ার্ড তখন বিচারালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। ঘুমের বড়ি সেবন করে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং সেই অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

জুরীদের সিদ্ধান্তের পর ওয়ার্ডের এ্যাটর্নী ঘোষণা করেছিলেন যে, এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করবেন। ঔষধ সেবন করার পূর্বে ওয়ার্ড বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে প্রচুর নির্দেশ রেখে গেছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ২২ বছর বয়স্কা বান্ধবী জুলিয়া গালিভারের নামও উল্লেখযোগ্য। তবে সেই নির্দেশগুলির বিষয়বস্তু অজ্ঞাত।

ওয়ার্ড আর জ্ঞান ফিরে পান নি। বিচারের অন্তিমশাস্তি ঘোষণা বন্ধ করে তিনি তার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এই আত্মহত্যা বন্দী হবার পূর্বে ক্লিওপেট্রার সর্পদংশনে আত্মহত্যার কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—

গত ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল, ভারতে যেমন হয় ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস আর ২৬শে জানুয়ারী রিপাব্লিক ডে। প্রায় দু'শো বছর পূর্বে এমনি দিনে, ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই, তেরটি আমেরিকার উপনিবেশ ফিলাডেলফিয়ায় সমবেত হয়ে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে ঘোষণা করেছিল নিজেদের স্বাধীনতা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে বন্ধনমুক্তি! সেদিন তাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন সেই বিখ্যাত দলিলে যাকে বলা হয় ডিক্লারেশন অব রাইটস্ বা স্বাধিকারের ঘোষণাপত্র। আর এই ঘোষণাপত্রে তাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন এমন একটা শতাব্দীতে যখন সভ্য পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রয়েছে নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাতন্ত্রের শাসন। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁরা ঘোষণা করলেন ব্যক্তিমানুষের সাম্য ও স্বাধীনতার কথা, ঘোষণা করলেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মৌলিক কতকগুলি অধিকারের কথা যার সীমারেখা কোন গভর্ণমেণ্ট লঙ্ঘন করতে পারবে না। সেই ঘোষণাপত্রে বলা হল:

প্রতিটি মানুষ সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে; স্রষ্টা তাঁকে কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা এবং এই সকল অধিকার অর্জন করার জন্য শোষিত জনসাধারণের অনুমোদন নিয়ে জনসাধারণের মধ্য থেকে সরকার গঠন করা হয়।

যখন কোন সরকার এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ধ্বংসমূলক হয়ে দাঁড়ায়, তখন জনসাধারণের অধিকার থাকে সরকারের পরিবর্তন বা অবলুপ্তি ঘটিয়ে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠা করার।

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবীদের মানব এবং নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র এই মহান ঘোষণার ভিত্তি রচনা করেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের মুখবন্ধে এই সকল মূলনীতি বর্ণিত আছে। এমন কি রাষ্ট্রসংঘ তার মানব অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে এই দলিলের সাহায্য নিয়েছে অনেকখানি।

বস্তুত ১০০ বছর পূর্বে আব্রাহাম লিঙ্কন এই ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন,—

'ইহা কেবল এই দেশের জনসাধারণকে স্বাধীনতা দিয়েছিল তা নয়, আগামী দিনে সকল সময়ের জন্য পৃথিবীতে ইহা আশার সঞ্চার করেছিল। এতে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সময়ে সমগ্র মানব সমাজের স্কন্ধ হতে পরাধীনতার বোঝা অপসারিত হবে।'

নিগ্রোদের সমাজে আজকের দিনের মার্কিনীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তার অধিকারী রাষ্ট্রনায়ক কেনেডি। আমেরিকার আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিগ্রোরা কাকে ভোট দেবে, এ প্রসঙ্গে এক নির্ভরযোগ্য সাধারণ মত থেকে মিঃ কেনেডির নামই ঘোষিত হয়েছে। নেলসন, রকফেলার, রোমনি, গোল্ডওয়াটার প্রমুখ মিঃ কেনেডির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিবৃন্দের মধ্যে জানা গেছে যে ৩০ : ১-এ প্রেসিডেণ্ট কেনেডি এগিয়ে আছেন। আগামী নির্বাচনে রিপাব্লিকান পার্টি এই তিনজনের যে কোন একজনকে মনোনয়ন দেবেন। জানা গেছে যে, প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যে ভাবে নিগ্রোদের হৃদয় জয় করেছেন আব্রাহাম লিঙ্কনের (যিনি একজন অতি উৎসাহী রিপাব্লিকান ছিলেন)

মিঃ কেনেডি

পর ইতিহাসে তার নজীর অনুপস্থিত। ১৯৬৪ সালে আগামী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬০ সালে অর্থাৎ গত নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি কেনেডি একলক্ষ উনিশ হাজার ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। নিগ্রো মহলে তাঁর এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার যদি সেই সময়ে প্রকাশ ঘটত তাহলে এক লক্ষ উনিশ হাজার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াত বারো লক্ষ উনআশি হাজারে।

এই সমীক্ষা কার্য পরিচালনা করেছেন নিউজ উইক পোল অর্গানিজেশান।

সাম্প্রতিক বর্ণিত বিবাদ-বিসম্বাদে কেনেডি যে ভূমিকা গ্রহণ করলেন তা অতুলনীয়। এই বর্ণমূলক সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে পরিপূর্ণ সমানাধিকার স্থাপনে অসাধারণ শক্তি ও মনোবলের যে পরিচয় তিনি দিলেন তার ফলে উনিশ লক্ষ নিগ্রোর মধ্যে যে ভালবাসা ও আস্থা তিনি অর্জন করলেন সে দিক দিয়েও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের প্রথম আনা হয় ক্রীতদাস হিসাবে। সপ্তদশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাস-ব্যবসায়ের বিলোপ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাস হিসাবে দুই লক্ষেরও বেশী নিগ্রোর আগমন ঘটেছে। ঘানা, নাইজিরিয়া, গিনি, আইভরি কোস্ট প্রমুখ পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো অঞ্চলগুলি থেকে এই হতভাগ্য নিগ্রো সন্তানদের তাদের মাতৃভূমির স্নিগ্ধ বক্ষ থেকে—নিষ্ঠুরভাবে সম্পদশূন্য করে আনা হয়েছে। আবার আফ্রিকার দক্ষিণ বা পূর্বাংশ থেকে দেখা গেছে কদাচ কোন ক্রীতদাস পৃথিবীর অন্যস্থানে আনা হয়েছে। দাস-ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসায়ে কত লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড যে লাভ করেছে তার ইয়ত্তা মেলে না। এরা পশ্চিম আফ্রিকার সমস্ত উপকূল জুড়ে দাস-ব্যবসার ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল যার সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে দুর্গের। ঘানা, নাইজিরিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে এখন যে কেউ এই ঘাঁটিগুলির অবশেষ দেখতে পাবেন। এদের কতকগুলিকে আবার এখনও 'দুর্গ'ই বলা হয়। আক্রার বৃহৎ ডেনিশ দুর্গটিতে সেদিন দাস ক্রয় করা হোত আর জাহাজে ওঠা পর্যন্ত এইখানে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হোত। এখন এই দুর্গভবনটি রাষ্ট্রপতির অবকাশ যাপনের এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নকর্মে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আটলান্টিকের উপর ভাসমান জাহাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ক্রমাগত চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েও এবং অতি নির্দয় নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পরিবেশের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলার সময় নিগ্রো জাতি পরিচয় দিয়েছিল এক অভূতপূর্ব প্রাণপ্রাচুর্যের। এদিকে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ক্রমশই দাসত্বের কঠোর পেষণে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হতে লাগলো। আরও আশ্চর্যের বিষয় অপরদিকে বহু দূরদেশ থেকে আগত নিগ্রোদের বংশ খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল শুধুমাত্র সঙ্গীতে এবং নৃত্যেই নয় খেলাধূলা, মুষ্টিযুদ্ধ, ব্যায়াম প্রভৃতি সর্ববিধ ক্ষেত্রে আমেরিকার জীবনধারায় এক অম্লান ছাপ রাখতে সমর্থ হল। শুধু আমেরিকাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুষ্টিযোদ্ধারাও (হেভি ওয়েট, মিডল ওয়েট, ব্যান্টাম ওয়েট) নিগ্রোকুলভুক্ত। তাদের মধ্যে জো লুইস ও প্যাটার্সনের মতই চিরস্মরণীয় নামের অধিকারী একাধিক জনের উল্লেখ করা চলে। নিগ্রোদের আধ্যাত্মিক এবং জাজ সঙ্গীতের প্রসিদ্ধি আমেরিকা ছাড়িয়ে দিক থেকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পল রোবসন, লুই আর্মষ্ট্রং, মিস এ্যাণ্ডারসান প্রমুখ আজ বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটি নাম। নিগ্রোদের মধ্যে বহু সুধীবর ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরও আবির্ভাব ঘটেছে।

আজকের দিনে একমাত্র গাত্রবর্ণ ছাড়া নিগ্রোদের সঙ্গে আমেরিকানদের কোন পার্থক্যই নেই। ব্যবহারিকজীবনে তারা পুরোপুরি আমেরিকান।

গত ২৬শে জুলাই মস্কোয় ত্রিশক্তি চুক্তির প্রারম্ভিক স্বাক্ষর এখন সারা আমেরিকায় বড় খবর। এই চুক্তিতে ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণ ছাড়া আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিউবার সমস্যা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, পাশ্চাত্য আণবিক গোষ্ঠীর নেতা মিঃ কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান এবং প্রাচ্য আণবিক গোষ্ঠীর নায়ক মঃ ক্রুশ্চেভ এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের জন্যে শীঘ্রই এক বৈঠকে মিলিত হবেন। সারা জগৎ ও মানবতার পক্ষে পরম বিপজ্জনক যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এই সমাধান সেই সমস্যার।

আণবিক বিস্ফোরণের আংশিক নিষেধবার্তা এই চুক্তির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। সমগ্র আণবিক অস্ত্র বর্জন এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের বার্তাবহ হয়ে দেখা না দিলেও লণ্ডন, বন, দিল্লী প্রমুখ বিভিন্ন দেশের রাজধানীর ন্যায় ওয়াশিংটনেও এই চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদ এক অদ্ভুত আনন্দ এনে দিয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট দ্য গল এই চুক্তি মানতে রাজী নন। তিনি বলছেন যে, ফ্রান্স তার নিজের পরীক্ষাকর্মে ছেদ টানবে না। এই আংশিক নিষেধেও সে কর্ণপাত করবে না। আজ এই চমকিত জগৎ সত্যিই বিরক্তিবোধ করছে।

দ্য গল

রাশিয়া—

মহাভারত মূল সংস্কৃত থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করার ব্যাপারে সোভিয়েট পণ্ডিতরা খুব শ্রমসাপেক্ষ কাজ করেছেন। ২ লক্ষ পংক্তির একটি মহাকাব্য অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়। বহু

বছরব্যাপী কাজের শেষে বিশিষ্ট সোভিয়েট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভি, আই, কাইয়াখফ এই মহাকাব্যটির প্রথম দু'টি পর্বের রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তুর্কমেনিয়ার প্রবীণ পণ্ডিত বি, এল, স্মিরনফ এই মহাকাব্য থেকে বাছাই করা কতকগুলি পর্বাধ্যায় রুশ অনুবাদে প্রকাশ করেছেন।

সোভিয়েট পাঠকদের সঙ্গে মহাভারতের মোটামুটি পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্যে সোভিয়েট ভারতবিদরা মহাভারতের কাহিনীগুলি নানা ভাবে বর্ণনা করেছেন। ১৯৫৮ সালে ২০ হাজার কপির সংস্করণে প্রকাশিত হয় জি, এফ, ইলিনের 'অতীতের বীর নায়কদের প্রাচীন কাহিনী।' লেনিনগ্রাদের দু'জন তরুণ ভারতবিদ ই, এন, তিওমকিন ও ভি, জি, এরমান—লিখিত মহাভারতের একটি সারানুবাদ গত বছরে প্রকাশিত হয়েছে। ৯ হাজার কপির সংস্করণে প্রকাশিত এই বইটি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। এই সারানুবাদে তিওমকিন ও এরমান যথাসাধ্য মূল গ্রন্থের রচনাশৈলী ও ভাষাবৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। বইটির শেষে বহু সংস্কৃত শব্দের ও নামের ব্যাখ্যামূলক তালিকা অভিধানের আকারে যোগ করা হয়েছে।

মহাভারত এই ভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে সংস্কৃতির যোগ ঘটিয়ে চলেছে।

গত ২০শে জুলাই মস্কোর অন্যতম সুন্দর পার্ক সোকোলনিকিতে ভারতের যে জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে তাতে প্রতিদিন দর্শকের ভীড় বেড়ে যাচ্ছে!

গোটা প্রদর্শনীটা এমন ভাবেই সাজানো হয়েছে যাতে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্পোন্নয়নের একটা সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দর্শকগণ পান।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন মঃ ক্রুশ্চেভ ও তাঁর

ইন্দিরা গান্ধী

নিকিতা ক্রুশ্চেভ

গত ভারত ভ্রমণের সময় ভিলাই ষ্টীল ওয়ার্কস পরিদর্শন স্মরণ করেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জাতীয় উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম-জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেখা গেছে সোভিয়েট ইউনিয়নই রৌরকেল্লা ও দুর্গাপুরের তুলনায় ভিলাইয়ের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে।

ভারতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পরেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরিক্রমা শুরু হয়। এই ভ্রমণটি অত্যন্ত কালোপযোগী হয়েছে। ভারত সীমান্তে চীনের আক্রমণ প্রসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, এই আক্রমণ ভারতকে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে; ভারতের স্কন্ধে এক দুঃসহ বোঝা চাপানো হয়েছে এবং তার শান্তিমূলক নানাবিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে প্রয়োজনবশতঃ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সেই দিকে এখন তার প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয়িত হচ্ছে। অর্থাৎ তার কাযধারা একটা মোড় নিতে বাধ্য হয়েছে। এ শুধু ভারতের পক্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর।

পাকিস্তান—

ভারতকে ভীতিপ্রদর্শন ও তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য পাকিস্তান সম্প্রতি চীনের সঙ্গে গোপন বিমান চুক্তি করেছেন। চুক্তি যে শুধু বিমান চলাচলের জন্য তা বলা বাহুল্য। রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে স্বনামধন্য ভুট্টো সাহেব ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন, পাকিস্তানের উপর ভারত আক্রমণ চালালে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ (নিশ্চয়ই লাল চীন) তার পাশে এসে দাঁড়াবে। এই চুক্তির ফলে পাকিস্তানী বিমান চীন হয়ে জাপান যেতে পারবে এবং তার পরিবর্তে চীনা বিমান ঢাকা ও করাচী হয়ে আফ্রিকা এবং আলবানিয়া যাবার অধিকার পাবে, কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্তানকে 'সিয়াটো' যুক্ত করা হয়েছিল। আজ পাকিস্তানকে কমিউনিষ্ট চীন এশিয়ার ও আফ্রিকায় লাফ দিয়ে পড়বার জন্য স্প্রীংবোর্ড হিসেবে ব্যবহারের অবাধ সুযোগ পাচ্ছে, ভারতের

ভুট্টো

পক্ষে ইহা বিপজ্জনক তো বটেই, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ও আফ্রিকার পক্ষে ইহা চরম উদ্বেগজনক। মস্কোর সঙ্গে পিকিং-এর বিচ্ছেদ যতই বাড়বে, ততই চীন এশিয়াতে তার প্রভাবের ঘাঁটিগুলোকে মজবুত করে তুলছে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় উত্তর ভিয়েৎনাম ও নিরপেক্ষ লাওস মারফত সে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে রয়েছে, পাকিস্তানকে হাতের মুঠোয় পাওয়ায় ভারতসহ উত্তর ও পশ্চিমমুখী অভিযান করা তার পক্ষে অনেক সহজ হবে, বিমান পথ খোলা হলে ইহার দূরত্ব কমে যাবে, তার আঘাতের দ্রুততাও বাড়বে।

চীন—

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চীন বিরোধী মৈত্রী সৃষ্টি করে নিজেদের জনগণ এবং চীন প্রমুখ অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশসমূহের স্বার্থ বিক্রয় করতে চলেছে এই মর্মে চীনা সরকার সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে। যে নির্দয় এবং কঠোর ভাষা এই আক্রমণে ব্যবহার করা হয়েছে তা শেষ অবধি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সর্বপ্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে পরিণত হবে কি না এ নিয়ে কূটনৈতিক জগতে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের চুক্তিকে চীন ছলনা ও প্রতারণা বলে বর্জন করার পরই এই আক্রমণ শুরু হয়েছে। এই চুক্তির উপর চীনের আক্রমণের কারণস্বরূপ জানা যায় যে, চীনের মতে এই চুক্তি চীন প্রমুখ দেশগুলির পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ, মাটিতে বা বায়ুমণ্ডলে আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ দেশগুলির সুবিধা হবে কিন্তু ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণের ক্ষেত্র ও আয়োজন চীনে নেই, অতএব পরীক্ষাদির দ্বারা আণবিক অস্ত্রসম্ভারের উন্নয়ন কাজের সুবিধা থেকে চীন এবং ঐ জাতীয় দেশগুলি বঞ্চিত হবে।

মিশর—

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং সিরিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ এখনও বিদ্যমান। সিরিয়ার নতুন রাষ্ট্রনীতি এবং গত সপ্তাহে অতর্কিত আক্রমণের পরবর্তী সেনাধ্যক্ষ জেনারেল হাফেজ প্রকাশ্যে এই বিদ্রোহকে উদ্দীপিত বা উত্তেজিত করার অভিযোগ রাষ্ট্রপতি নাসেরকে অভিযুক্ত করেছেন। সিরিয়ার সরকারের পুনর্গঠন বিষয়ে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য গত সপ্তাহে কায়রোয় অনুষ্ঠিত ইরাকের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আতাসী এবং প্রেসিডেন্ট নাসেরের মধ্যে সর্বপ্রকার আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সিরিয়ার বাথিষ্ট-নাসের বিসম্বাদের ফাটল প্রতিদিনই প্রসারতা লাভ করছে এবং মিশর, সিরিয়া ও ইরাকের নিয়মক্রমিক মিলনের সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের কৃষিমন্ত্রী কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপন্ন বৃদ্ধির সংখ্যা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫২ সালে এর মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ২·৫২ কোটি (মিশরীয়) পাউণ্ড। ১৯৬২ সালে দেখা গেল ঐ সংখ্যা পরিণত ৪·২৮ কোটি পাউণ্ডে এবং এও আশা করা যায় যে, ১৯৭০ সালের শেষ ভাগে ঐ সংখ্যা দাঁড়াবে ৫·১২ কোটি পাউণ্ডে। মরুভূমির বুক থেকে নব নব ভূমির উদ্ধার সাধন এবং উন্নততর প্রণালীতে ভূমিকর্ষণ এই কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপক বৃদ্ধি সামগ্রিকভাবে সম্ভবপর করে তুলেছে।

প্রেসিডেন্ট নাসের ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হন ১৯৫২ সালের বিপ্লবের পর। এই বিপ্লবের একাদশ বার্ষিক পূর্তি উৎসব উদযাপিত হল গত ২৭শে জুলাই সারা মিশর জুড়ে।

ঘোষিত হয়েছে যে, বিদ্রোহের একাদশবর্ষ পূর্তি পর্যন্ত ৬,২৮,১৩৭ ফেডান জমি ২,৩১,৮৬২ ভূমিহারাদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩,৩১,০০০ ফেডান মরুভূমির বক্ষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিদ্রোহের আগে চাষীদের গড়ে আয় ছিল মাথাপিছু প্রায় ৩৬৫ পাউণ্ড, এখন সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ১৫৪২ পাউণ্ডে —ভারতের মাথাপিছু আয়ের প্রায় পাঁচগুণ।

প্রেঃ নাসের

ফিলিপাইনস—

ম্যানিলা শীর্ষসম্মেলন মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকার্ণো ও ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট ম্যাকাপাগাল তিনটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের ফলে ১৭ কোটি মালয়ীকে লইয়া 'মাফিলিন্দো' নামে একটি নূতন রাষ্ট্রগোষ্ঠী বা কনফেডারেশন গঠিত হ'ল এবং

রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্ণো

মালয়েশিয়া পরিকল্পনা সম্পর্কেও এতে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও প্রগতির জন্য একযোগে কাজ করার শপথও তাঁরা গ্রহণ করেছেন। মালয়ীদের সজ্ঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ইতিহাসে এই প্রথম।

মালয়েশিয়ায় যোগদানের ব্যাপারে উত্তর বোর্ণিওর অধিবাসীদের যথার্থ অভিপ্রায় নিরূপণ করার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সচিবকে অনুরোধ করা যেতে পারে—তাঁরা যুক্তভাবে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। আরও বলা হয়েছে যে, টুঙ্কু আবদুল রহমান মালয়েশিয়া ফেডারেশান গঠন স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছেন, সময়োচিত ঘোষণা অনুসারে (নির্ধারিত তারিখ ৩১শে আগষ্ট) ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়াকে রক্ষা করার জন্য ইন্দোনেশীয় বাহিনী প্রকাশ্য প্রস্তুতিকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তর বোর্ণিও মালয়েশিয়ার পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়ার অংশভাবে গঠিত হবে এই কারণ অবলম্বন করে ইন্দোনেশিয়া যতক্ষণ না মালয়েশিয়াকে আক্রমণ করতে চাইছে ততক্ষণ ইন্দোনেশিয়া কি ভাবে মালয়েশিয়া দ্বারা আক্রান্ত হবে তা জানা যায় না? ইতিমধ্যে টুঙ্কু আর এক চাল চেলেছেন। পশ্চিম ইরিয়ান সম্বন্ধে সোয়েকার্ণো যেমন বলেছেন যে, পশ্চিম ইরিয়ানের ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি হবার পরে সেখানকার অধিবাসীদের গণভোট নেওয়া হবে। সেই রকম ক্রমেই মালয়েশিয়ায় যোগ দেবার পর সেখানকার অধিবাসীদের মত নেওয়া হবে!

ভ্রমণবিলাসী

—সুজিত সেনগুপ্ত অঙ্কিত

মোহনবাগানের একাদশবার লীগ বিজয়

ভারত জোড়া নাম। জনপ্রিয় মোহনবাগান। এবার তাদের গৌরবময় ইতিহাসে আর একটা অধ্যায় সূচিত হয়েছে। মোহনবাগান এবার নিয়ে একাদশবার অর্থাৎ ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে তারা লীগ বিজয়ের অধিকারী হয়ে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। লীগের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর আগে কোন দলের পক্ষে এত বেশীবার লীগ বিজয় করা সম্ভবপর হয় নি।

একেবারে শেষ খেলায় চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রশ্ন জড়িত থাকায় মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের মিলনকে কেন্দ্র করে মাঠে এক নতুন উন্মাদনা দেখা যায়। দর্শকদের আনন্দের বন্যা বইতে থাকে। মাঠ সম্পূর্ণ উৎসব মুখরিত হয়ে উঠে।

মোহনবাগানের এবারকার সাফল্যে দলের অধিনায়ক চুণী গোস্বামীর অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁর নেতৃত্ব দলের সাফল্য নিয়ে এসেছে। সাবাস চুণী গোস্বামী!

অপর জনপ্রিয় দল ইষ্টবেঙ্গল দল শেষ খেলায় বি এন আর দলের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে লীগের 'রাণার্স আপ' হয়েছে।

এবার লীগের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক।

এবার প্রথম ডিভিসনে ১৫টি দল যোগদান করে। এর মধ্যে পোর্ট কমিশনার্স নবাগত। লীগের খেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। এবার খুব বড় রকমের হাঙ্গামা দেখা যায় নি।

জার্ণেল সিং

চুণী গোস্বামী
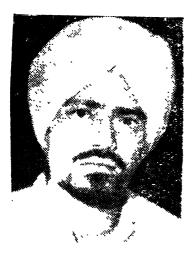
মোহনবাগান গতবারের বিজয়ী। আর ইষ্টবেঙ্গল 'রাণার্স আপ।' মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল এবার হরিহর আত্মার মতন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্নে সমান তালে এগিয়ে চলে। তবে শেষ সময় ইষ্টবেঙ্গল দলকে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে।

মোহনবাগানে সেরা খেলোয়াড়রা আছেন। তাদের সূচনা বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু খ্যাতনামা সেণ্টার ফরওয়ার্ড মঙ্গল পুরকায়স্থ আহত হবার পর থেকে দলটি ঠিক তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারে নি। চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্নে সমান তালে এগিয়ে চললেও প্রথম দিকে তাদের খেলা দেখে দলের সমর্থকদের মন ভরে নি। জার্ণেল সিংকে দিয়ে সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কাজ চালাবার চেষ্টা হলেও—সূচনায় এই প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয় নি। তবে তাঁর

সুকুমার সমাজপতি

আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় নি। কিন্তু মন্থর গতিই তাঁর এই নতুন স্থানে খেলার পথে অন্তরায় ঘটায়। কিন্তু শেষের কয়েকটি খেলায় জার্ণেল সিং উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। অলিম্পিক গোলরক্ষক থঙ্গরাজ এবার যোগদান করায় দলের সমর্থকরা বিশেষ উৎফুল্ল হলেও তাঁর খেলা দেখে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর খেলায় আস্থার অভাব দেখা গেছে। আক্রমণ রচনার উৎস দলের অধিনায়ক চুনী গোস্বামী সূচনায় বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও পরে তাঁর খেলার উন্নতি দেখা গেছে। এবার দলের অরুময় ও কেনের খেলা সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। অরুময় তাঁর নিজ স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নামকরা খেলোয়াড়দের মধ্যে সুনীল নন্দীর নাম পড়ে। কিন্তু তাঁর খেলা স্বাভাবিক পর্যায়ে হয়নি।

খ্যাতনামা খেলোয়াড় বলরাম, অরুণ ঘোষ, সুনীল নন্দী, চিত্ত চন্দ্র প্রমুখ চলে যাওয়ায় ইষ্টবেঙ্গল দলকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। তাদের দল গঠন করতে এবার বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়। লীগের প্রথম ভাগের খেলা তাদের মোটেই ভাল হয় নি। তবে দ্বিতীয় ভাগের খেলার বিশেষ উন্নতি দেখা গেছে। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে দল গঠন করে ইষ্টবেঙ্গল এবার যে ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশেষ অনুপ্রেরণা দেখা গিয়েছে। দলের রক্ষণ ভাগে রামবাহাদুর, অমিয় ব্যানার্জীর খেলাই সকলকে বেশী আনন্দ দিয়েছে। তাঁরাই দলের রক্ষণভাগের স্তম্ভ স্বরূপ। পুরোভাগে সুকুমার সমাজপতির অবদান সর্বাধিক। এবার তিনি দলকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার তুলনা হয় না। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে তরুণ ও উদীয়মান সেণ্টার ফরওয়ার্ড অসীম মৌলিকের খেলা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। গোল করা ব্যাপারে তিনি কৃতিত্বের ও সুযোগ সন্ধানীর পরিচয় দিয়েছেন। রাইট ইনে শিমু চ্যাটার্জীর খেলার সুখ্যাতি করা চলে। তবে লেফট ইন নিয়ে ইষ্টবেঙ্গলকে এবার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর জন্য তাদের সিংহলের জাতীয় খেলোয়াড় নুরকে নিয়ে আসা হয়। তিনি মর্যাদার খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করলেও—তাঁর খেলা দেখে দর্শকরা মোটেই খুশী হতে পারেন নি।

আপ্পালা রাজু

রামবাহাদুর

এবার বি এন আর দলের খেলার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বলরাম ও অরুণ ঘোষ যোগদান করায় তারা মাঠের আসর বেশ গরমই করেছিল। সূচনা তাদের বেশ ভাল হলেও পরে তাদের খেলায় ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে। তারা বড় দলকে ঘায়েল করলেও আখ্যাত দলের কাছে সহজেই হার মেনেছে। বি এন আর দলের রক্ষণভাগে গোলরক্ষক দীপক দাস, বলরাম ও অরুণ ঘোষের খেলাই সকলের প্রশংসা লাভ করে। তাদের পুরোভাগে আপ্পালারাজুর কৃতিত্বই সর্বাধিক। তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা। অপর রেলওয়ে দল ইষ্টার্ণ রেলের খেলাও এবার উল্লেখযোগ্য হয়। তবে তাদের খেলার মহিমা বোঝা ভার। কবে কেমন খেলবে বলা কঠিন। তারা যেমন বড় বড় দলকে কাবু করেছে—সেই রকম আবার ছোট দলের কাছে হার মেনেছে। তাদের খ্যাতনামা খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জী স্বাভাবিক ভাবে খেলতে পারেন নি। রক্ষণ ভাগে গোলরক্ষক পি বর্মণ ও পুরোভাগে কাজল মুখার্জীর খেলা সকলকে আনন্দ দিয়েছে।

এককালের খ্যাতনামা দল মহমেডান স্পোর্টিং-এর আর সে নামডাক নেই। তাদের নামটাই শুধু আছে। তারা এবার মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। ছোটখাট দলের মধ্যে উয়াড়ী ও হাওড়া ইউনিয়নের খেলাই প্রশংসার যোগ্য হয়। আর কোন দল উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেনি। ঐতিহ্যের অধিকারী পুলিসের সূচনাতেই দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিলো। তারা এবার প্রথম ডিভিসন লীগ থেকে অবনমনে বাধ্য হয়েছে। আগামী বছর তাদের দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে হবে।

এবার কালীঘাট ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হয়েছে। তৃতীয় ডিভিসনে কুমারটুলি ইনষ্টিটিউট, চতুর্থ ডিভিসনে ইউনিয়ন স্পোর্টিং প্রথম স্থান লাভ করেছে।

জাপান ট্রাক ও ফিল্ড এসোসিয়েশন প্রাক অলিম্পিকের ব্যবস্থা করেছে। তারা ১৫টি দেশের ৪৬ জন কৃতী পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলীটকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৬ জন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী। নিম্নে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারীদের নাম দেওয়া হ'লো :

পোলভল্ট—জন পেকেল (আমেরিকা)।
হাতুড়ী ছোঁড়া—হ্যারল্ড কোনলী (আমেরিকা)।
ম্যারাথন দৌড়—বি এডারেন (আমেরিকা)।
উচ্চ লম্ফন—ভ্যালেরী ব্রুমেল (রাশিয়া)।
ডেকাথলন—চু ইয়ং (ফরমোজা)।
৩০০০ মিটার দৌড়—মাইকেল জ্যাজি (ফ্রান্স)।
১ মাইল দৌড়—পিটার স্নেল (নিউজিল্যাণ্ড)।
মহিলাদের উচ্চ লম্ফন—ইয়োল্যান্ডো বালাস (রুমানিয়া)।
মহিলাদের দৈর্ঘ্য লম্ফন—তাতিয়ানা শেলকানোভা (রাশিয়া)।

অলিম্পিকের ন্যায় একটা বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য জাপান যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে তাতে তারা সাফল্য অর্জন করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আই এফ এ শীল্ডের ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত

বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ডের খেলা ২৩শে আগষ্ট থেকে সুরু হবে। উদ্যোক্তারা আশা রাখেন যে, ২১শে সেপ্টেম্বর ফাইন্যাল খেলার ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ বছর ৪৩টি দলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের নামকরা দল যোগদান করায় শীল্ডের আকর্ষণ এবার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এবার ক্রীড়াসূচীতে ছয়টি দলকে বাছাই করে সরাসরি তৃতীয় রাউণ্ডে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উপরের দিকে আছে ইষ্টবেঙ্গল, ইণ্ডিয়ান নেভি ও বোম্বাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে এবং নীচের দিকে আছে অন্ধ্র পুলিস, মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ও মোহনবাগান। ক্রীড়াসূচীর উপরের দিকে দ্বিতীয় রাউণ্ডে মহীশূর একাদশ ও ইষ্টার্ণ রেলকে এবং নীচের দিকে বি এন আরকে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ৩৪টি দল প্রথম রাউণ্ডেই খেলবে। বহু ঐতিহ্যের অধিকারী মহমেডান স্পোর্টিং দলকে এবার প্রথম রাউণ্ডেই খেলতে হবে।

এবার ক্রীড়াসূচী রচনার পদ্ধতি দেখে কেহ কেহ খুশী হতে পারেন নি। সাধারণত পূর্ববর্তী বছরের বিজয়ী ও বিজিতকে উভয়ার্ধে রাখা হয়। কিন্তু গতবারের বিজয়ী মোহনবাগান ও রাণার্স আপ অন্ধ্র পুলিসকে একই ধারে রাখা হয়েছে।

কোন অপ্রত্যাশিত ফলাফল না হ'লে উপরের দিকের কোয়ার্টার ফাইন্যালে ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে মহীশূর একাদশের এবং ইণ্ডিয়ান নেভীর সঙ্গে বোম্বাই সেন্ট্রাল রেলের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নীচের দিকের কোয়ার্টার ফাইন্যালে অন্ধ্র পুলিসের সঙ্গে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারের এবং মোহনবাগানের সঙ্গে বি এন আর দলের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক।

আশা করা যায় যে, এবার শীল্ডের আকর্ষণীয় খেলা দেখা যাবে।

উদ্বৃত্ত খেলোয়াড়দের অন্য রাজ্যে খেলার প্রস্তাব

বোম্বাইকে ভারতের ক্রিকেটের মক্কা বলা চলে। ভারতীয় ক্রিকেটে বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অবদান অনস্বীকার্য। বোম্বাইকে বাদ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল গঠন করা কেউ কল্পনা করতে পারেন না। এক বোম্বাই থেকেই ভারতীয় টেষ্ট দল গঠন করা চলে। বোম্বাই বার বার রঞ্জী ক্রিকেট 'ট্রফি' জিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব করেছে। এক রাজ্যের উদ্বৃত্ত খেলোয়াড় অন্য রাজ্যে খেলতে পারবেন।

বর্তমান নিয়ম অনুসারে জন্মগত অথবা চাকুরী অথবা বসবাসের অধিকারে যে সকল ক্রিকেট খেলোয়াড় কোনও এক রাজ্য এসোসিয়েশনের পক্ষে খেলার অধিকারী—সেই সকল খেলোয়াড় যদি রঞ্জী ট্রফি অথবা দলীপ সিংজী ট্রফিতে নিজ নিজ রাজ্য এসোসিয়েশন দলে খেলবার জন্য নির্বাচিত না হন—তা হলে সেই সকল খেলোয়াড় অন্য রাজ্য দলে খেলতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়দের যোগ্যতা ও নিয়ম সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশন অন্যান্য রাজ্য এসোসিয়েশনের মতামত চাইবেন। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী একজন খেলোয়াড় কেবলমাত্র একটা রাজ্য এসোসিয়েশনে খেলতে পারেন। ফলে কোন কোন অঞ্চলে নামকরা খেলোয়াড়ের সংখ্যাধিক্য দেখা যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাজ্য এসোসিয়েশনের দল গঠনে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রস্তাবে রাজ্য এসোসিয়েশনের দলগত শক্তির সমতা আনবে এবং প্রতিযোগিতাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রস্তাব দেওয়া হ'লো :—(১) প্রত্যেক রাজ্য এসোসিয়েশন নিজ রাজ্য দলের জন্য ১৮ জন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় নির্ধারিত করে রাখবেন। (২) যে সকল খেলোয়াড় ঐ নির্ধারিত তালিকায় স্থান পাবে না—তাঁরা নিজেদের নাম বোর্ডে 'রেজিষ্টারী' করে রাখবেন (৩) যে কোন রাজ্য এসোসিয়েশন দলে শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঐ 'রেজিষ্টারী' করা খেলোয়াড়ের তালিকা থেকে খেলোয়াড় বেছে নিতে পারবেন। (৪) স্থানীয় খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবার জন্য নিয়ম করা হবে যে কোন রাজ্য এসোসিয়েশন চারজনের বেশী পেশাদার অথবা 'রেজিষ্টারী' করা খেলোয়াড় নিজ দলে নিতে পারবেন না।

বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রস্তাব সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। এতে একদিকে ভারতের ক্রিকেট খেলার মান উন্নত হবে—অন্য দিকে বিভিন্ন রাজ্যে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নজরুল

আমরা যদি কেউ না জন্মাতাম, যদি এক লাইনও কেউ না লিখতাম বাঙলা দেশের কোন ক্ষতি হোত না ঐ একটি মানুষই চিরদিনের মতন্ত্রা রাখতেন। রবীন্দ্রনাথের গান—ও হল বেদমন্ত্র।

বৃটেনের নতুন চিত্রান্দোলন
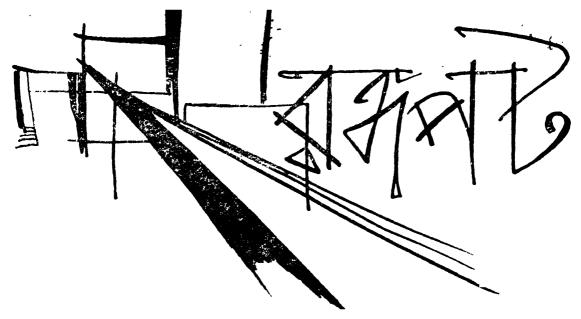
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বৃটিশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মহৎ সিনেমা সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়ার অভাব চিরকালই। ফরাসীরা, ইতালীয়ানরা, পোলিশরা, জাপানীরা কিম্বা সাম্প্রতিককালে বাঙালীরা চলচ্চিত্রকে শিল্পে যে সম্মানিত স্থান দিয়েছে, বৃটিশেরা তা কোন দিনই দেয়নি।

এখনো বৃটেনে বেশীরভাগ শিক্ষিত লোক মনে করে যে সংস্কৃতির দরবারে সিনেমার স্থান হচ্ছে গৌণ। ফ্রান্সে কিম্বা ইতালীতে যখন কোন প্রতিভাধর পরিচালক একটি চলচ্চিত্রের কাজ করেন তখন তিনি তা উপন্যাস রচনার নিষ্ঠা নিয়েই করেন। বৃটেনে অনুরূপ প্রতিভাসম্পন্নরা যান রঙ্গমঞ্চ কিম্বা টেলিভিসানে। তাই ঐ সব দেশগুলির উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্রে যে নতুন নতুন পরীক্ষা, স্বতঃস্ফূর্ততা,

সুচিত্রা সেনের সম্বর্ধনা সভায় শ্রীমতী সেনের সঙ্গে (বাঁ দিক থেকে) অসিত চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপাল রেড্ডি ও সত্যজিৎ রায়কে দেখা যাচ্ছে

কল্পনা ও কবিতার মনোমুগ্ধকর পরিচয় পাওয়া যায়, বৃটিশ চলচ্চিত্রে এতদিন তা ছিল দুর্লভ।

ফলে যুদ্ধোত্তর দিনের 'বিগ বনকার্টার' এবং ঐ ধরনের মিলনান্ত ও প্রহসনমূলক ছবির উচ্ছ্বসিত ফসল ফলিয়ে তার জীবনস্রোতে যেন ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে টেলিভিসান এসে দর্শকদের অন্দরে টেনে নিয়ে গেল, বড় বড় ফিল্ম কোম্পানীগুলি তাদের পূর্ব-নির্দিষ্ট ফিল্ম উৎপাদনের সংখ্যা কমিয়ে ফেললো। প্রথাগত সব টোটকায় আর কাজ হল না। চেষ্টা হতে লাগল নতুন নতুন আঙ্গিকের সব ভেল্কি। এলো ষ্টিরিও ফোনিক শব্দের খেলা। পর্দার আয়তন গেল বেড়ে। ছবি হয়ে উঠলো ত্রিমাত্রিক, এলো সিনেরামা। ব্যয়বহুল ও জমকালো হয়ে উঠল দৃশ্যপট। দর্শকদের প্রলুব্ধ করার জন্যে ব্যাপক হয়ে উঠলো বিজ্ঞাপনের অভিযান। তবু দর্শকদের উৎসাহে বহু প্রত্যাশিত জোয়ার এলো না।

হতাশ কর্মকর্তারা প্রায় বেপরোয়া হয়ে বৃটিশ ফিল্ম ইতিহাসে এই প্রথম বিষয়বস্তুতে নতুন কিছু আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিষয়বস্তু সম্পর্কে এত নিস্পৃহ হয়ে থাকার কারণ সম্পর্কে প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক ও পরিচালক লিণ্ডসে এণ্ডারসন বলেছেন, 'ইংরাজ চরিত্রের ঘৃণ্যতম ক্রটি হচ্ছে যুক্তিবাদ, আপোষের সাংঘাতিক অভ্যাস, কোন বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে না নেবার 'গুণ'। বেঁচে থাকার পক্ষে এ হয় তো মন্দ উপায় নয়, কিন্তু অগ্রগতির পক্ষে তা মহা ক্ষতিকর। বৃটিশ সিনেমার প্রধান বিপদ তার সেন্সার কিম্বা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নয়। প্রকৃত বিপদ হচ্ছে লোকে বিচলিত হতে কিংবা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে রাজি নয়।'

শুধু সৌভাগ্যক্রমে, বাজের তাগিদে বৃটিশ সিনেমা শিল্পের এই মুমূর্ষু অবস্থার সময়েই সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক দল তরুণ লেখক তাঁদের সমাজ চেতনামূলক নাটক ও উপন্যাস রচনা করে যুগের চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিলেন। তাঁদের সেই অনুপ্রেরণাতে টনি রিচার্ডসন, কারেল রেইজ, জ্যাক ক্লেটন, জন লেসিঙ্গার প্রভৃতি একদল তরুণ চিত্রপরিচালক গত চার বছর ধরে 'লুক ব্যাক ইন্ এ্যাঙ্গার', 'রুম এ্যাট দি টপ,' 'দি এ্যাংগ্রি সাইলেন্স,' 'স্যাটারডে নাইট এ্যাণ্ড সানডে মর্নিং', 'এ কাইণ্ড অফ লাভিং', 'দি লোনলিনেস অফ লং ডিষ্টেন্স রানার', 'দিস স্পোর্টিং লাইফ', 'দিস এল সেপ্‌ড রুম' প্রভৃতি ছবিগুলির পরিচালনা ও প্রযোজনা করে বৃটিশ ফিল্ম শিল্পের মরা গাঙে বান এনেছেন।

এই ছবিগুলি শুধু যে বক্স অফিসে সাফল্যই এনেছে তাই নয়, অনেকদিন পরে গত বছর বার্লিন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে 'এ কাইণ্ড অফ লাভিং' বৃটিশ ছবি হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠের জয়মাল্য অর্জন করেছে।

কয়েকটি ছবির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেই বোঝা যাবে এই নতুন ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য কি।

যেমন এ্যালান সিলিটোর লেখা একটি উপন্যাস ও একটি ছোট গল্পের চিত্ররূপ 'স্যাটারডে নাইট ও সানডে মর্নিং' এবং 'দি লং ডিষ্টান্ট রানারের' মধ্যে যথাক্রমে বর্ণিত হয়েছে নটিংহামের শ্রমিকজীবনের প্রেমসংঘাত ও আশা নিরাশার দুরন্ত জীবন। আর পরের কাহিনীটিতে তরুণ অপরাধীদের সংশোধনাগার বোরষ্টেলের এক দুঃসাহসী ও উচ্চাভিলাষী তরুণের কাহিনী। একটি দূর পাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্যে সে কর্তৃপক্ষের কড়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চরম সুযোগ পেল।

'লুক ব্যাক ইন এ্যাংগারে' সেই তরুণদের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে যারা পুরোনো সবকিছু ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও বিদ্রূপকারী। কিন্তু তাদের নিজের কোন আদর্শ বা লক্ষ্য নেই। তারা শুধু অন্যের প্রতি এতটুকু বিবেচনা না দেখিয়ে অশান্ত ও বেয়াদপ জীবনযাপন করে।

'দিস স্পোর্টিং লাইফের' নায়ক একজন কীর্তিমান রাগবী ফুটবল খেলোয়াড়। কি চরিত্রে, কি দৈহিক শক্তিতে সে অনন্য আক্রমণাত্মক ও উদ্ধত। কিন্তু মনের গহনে সে স্পর্শকাতর ও

সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার অনুষ্ঠান মণ্ডপে

স্নেহপ্রেমের ভিখারী। তাই বাইরের শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন কিন্তু নিজ অন্তরের পরিচয় তার অজানা। উত্তর ইংলণ্ডের শ্রমজীবী প্রধান সামাজিক পরিবেশের পটভূমিতে এক অদ্ভুত নারী যে তার বাড়ীওয়ালী। তার সংগে সম্পর্কের বৈচিত্র্যে, সংঘাতে, সংস্কারে, আশা ও নিরাশায় এই চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এক হিসাবে এটি প্রণয় কাহিনী। কিন্তু অসংখ্য চরিত্র, রাগবী উন্মাদ জনতা, রাগবী লীগের কর্মকর্তারা, হারজিতের জুয়াড়ীরা, খেলার জগতের শোষক ও শোষিতদের যে এমন এক কাহিনী যা মনকে দীর্ঘকালের জন্যে বিচলিত, উদভ্রান্ত ও চিন্তিত করে তোলে।

নতুন চিত্র আন্দোলনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

ব্রিটিশ সিনেমার এই নতুন প্রাণবন্যাকে কেউ বলেছেন 'ঢেউ শুধু নয়, নতুন ঢেউ,' কেউ বলেছেন 'নতুন বাস্তববাদ'। কিন্তু এসব নামের গড্ডালিকায় এই নতুন চিত্রান্দোলনের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। অন্যান্য মহৎ শিল্পের মতই এই আন্দোলনের পথিকৃৎদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের অভিযানে তাঁরা প্রথমে সংগ্রহ করেছেন এমন সব কাহিনী যার আবেদনে অভিনবত্ব আছে। তার জন্য তাঁরা লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করেন নি। বইটির সংস্করণ সংখ্যা গুণে দেখেন নি। দ্বিতীয়ত তাঁরা সাবেকী তারকাপ্রথা বর্জন করেছেন। ফলে তাঁদের নতুন অভিনয়-প্রতিভা খুঁজে বার করতে হয়েছে।

এই নবাবিষ্কৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বাইরে থেকে আনা

সুচিত্রা-সম্বর্ধনা।

আর, ডি, বনসাল আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় তিনটি বিভিন্ন ভঙ্গীমায় বিশ্বসমাদরে বিভূষিতা সুচিত্রা সেন

টথের পাতা-বাহার গাছের মত না হয়ে, যেন কাহিনীর নতুন মাটিতে সজীব সৃষ্টি বলে মনে হয়েছে। পরিচালকের সংগে তাঁরা একটি টিম বা সহযোগী দলের মত কাজ করেছেন।

কেবল পরিচালক জেগলি ক্যারন 'দি এল শেপড রুম'-এ এর ব্যতিক্রম করে সাবেকী প্রথায় ছবিটিকে তারকাখচিত করতে যান এবং ঠিক সেই কারণেই ছবিটি অন্যথা সফল হলেও ভূমিকার এই লক্ষণীয় ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সংলাপে তাঁরা সমকালীন বাকপ্রণালী চালু করেছেন এবং যৌন ও সামাজিক জঞ্জালকে সঠিক অনুপাতে রেখেও ছবির অগ্রগতির সংগে সংগে চমক ও বিস্ময়কে তীব্র করে তুলতে পেরেছেন।

সবচেয়ে বড় কথা, বাস্তবতা মানেই যে তা কোন কারখানা অঞ্চলের মজুরের জীবনকে নিয়ে হতেই হবে এ সনাতনী কুসংস্কারকে এঁরা প্রশ্রয় দেননি। বাস্তবতার অর্থ সমগ্র সামাজিক জীবনে,—উচ্চ-মধ্য-নীচ সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেণী-জীবন কী তাই দেখানো। সমাজের সর্বস্তরের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে মানুষকে চিন্তিত করা বা তার সমাধানের পথ দেখানো এক সাধারণ দর্শকের চিন্তাশক্তির ওপর এইটুকু আস্থা রাখা যে তারা তা অনুধাবন করতে পারবে।

এই নতুন আন্দোলনকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক হবার জন্যে লিণ্ডসে এণ্ডারসন আরো বলেছেন, 'যদি আমরা দীর্ঘকাল ধরে দলিলচিত্র রচনার লক্ষ্য নিয়ে ছবি তুলি, তাহলে প্রতিনিধিত্বমূলক হলেও তার পরিধি নিশ্চয়ই সীমিত হয়ে যাবে। সমাজতত্ত্ব পরিবেশনের উদ্দেশ্য থাকা আরো ক্ষতিকর। প্রতিনিধিত্বমূলক হলে ট্রাজেডিকে বাদ দিতে হবে। কারণ ট্রাজেডি হচ্ছে একান্ত, তার প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ নেই। তা ব্যষ্টির সমষ্টির নয়।'

'স্পোর্টিং লাইফ' ছবিটির প্রস্তুতির সময় চিত্র-নির্মাতা এ বিষয়ে সর্বদাই সচেতন ছিলেন যে, তাঁরা কোন প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি তুলছেন না। একটি ঘটনাকে নিয়ে ছবি তুলছেন। তারা কোন একজন শ্রমিকের জীবন নিয়ে নয়, একজন অনন্যসাধারণ মানুষ (অতএব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ) এবং এক বিচিত্র নারীর সংগে তার অসাধারণ সম্পর্ক নিয়ে ছবি তুলছেন,—এককথায় তাঁরা সমাজতত্ত্ব করছেন না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাশিয়ায় আজ শিল্পীমনের যে বিদ্রোহ জাগছে তা হচ্ছে শিল্প-সাহিত্য, সিনেমা-নাটক সর্বত্রই শিল্পীদের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দলিল রচনার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক কিম্বা সমাজতত্ত্বমূলক সৃষ্টি করতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অর্থাৎ ক্ষেতে-খামারে, কারখানায়-বন্দরে, রণক্ষেত্রে কিম্বা শিল্পীর ষ্টুডিয়োতে মানুষ যা কিছু করছে তা দেখাতে হলে তাদের যূথবদ্ধ, নিয়মানুবর্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে দেখাতে হবে! সেখানে সমষ্টির ভিড়ে ব্যষ্টি হারিয়ে গেছে। এখানে সবই সর্বাত্ম; একান্ত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব সেখানে নেই। আর সমষ্টির জীবনে বিপর্যয় থাকতে পারে কিন্তু ব্যর্থতা নেই। বাঁক আছে কিন্তু পেছিয়ে পড়া নেই।

এই নবচিত্র আন্দোলনের আগে একটা ধারণা প্রবল হয়ে

কাঞ্চনকন্যার নায়ক নায়িকার ভূমিকায় রূপদানরত অরুণ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

উঠেছিল যে ট্রাজেডির মূলে মানুষের যে ব্যক্তিগত সম্ভ্রম ও মূল্যবোধ থাকে, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও আণবিক বিজ্ঞানের যুগে তা দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকের যুগের শিল্পে ট্রাজেডির স্থান নেই। উপরোক্ত ছবিগুলির অধিকাংশই সেই ধারণার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ।

পরিশেষে আসে রাজনীতি। যে কোন সফল শিল্পেরই কোন না কোন একটা বক্তব্য থাকে। হয় তা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার পক্ষে নয় বিপক্ষে। তাই সকল শিল্পসৃষ্টি মাত্রেরই শিল্পগত তাৎপর্য আছে এ কথা তো বলাই বাহুল্য; তার সংগে রাজনৈতিক তাৎপর্যও আছে। কিন্তু তার উল্টোটা অর্থাৎ রাজনীতি মাত্রেরই শিল্পগত তাৎপর্য আছে একথা সত্যি নয়।

বৃটেনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবাধ। ঠিক সেই কারণেই রাজনীতি প্রচারের সুযোগও সীমিত। অবাধ স্বাধীনতা বলেই এখানে উগ্রতার স্থান নেই। তাই কোন চিত্রপরিচালক যদি তাঁর ছবিতে রাজনীতিকে মাত্রাহীন করতে চান তা হলে লোকে তা গ্রহণ করবে না। মনে হয় আলোচিত ছবিগুলিতে পরিচালকেরা সে বিষয়ে পরিমিতি বোধেরই পরিচয় দিয়েছেন।

'লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।'

শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

বাঙলার চিত্রলোকের গর্ব ও গৌরব

সাম্প্রতিককালে চিত্র-জগতের মাধ্যমে বাঙলার প্রতিটি নরনারীর আনন্দে অভিভূত হওয়ার মত যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি সুচিত্রা সেনের আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ। শ্রীমতী সেনের এই সাফল্য শুধু চিত্রশিল্পেরই গৌরব নয়, এই গৌরবে সারা বাঙলার সমান অধিকার। মস্কোর বিচারে শ্রীমতী সেনের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রূপে নির্বাচনে বিশ্বের দরবারে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব আর একবার প্রমাণিত হল। সেইজন্যই আমরা বলছি, এই বিজয়গৌরব কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে দেশের জীবন—সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত তিনি অনবদ্য ভাবে ফুটিয়ে তুলছেন তাঁর অভিনয়ে এ গৌরবে তাই এ দেশের প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার।

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রজগতের ঐতিহ্য এবং গরিমা অল্পমূল্যের নয়। শিল্পের সাধনায় এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনে এ দেশের চলচ্চিত্র পারদর্শিতা কম দেখায় নি। এ দেশের চলচ্চিত্র-জগতের মাধ্যমে যে কত অসংখ্য প্রতিভাধর শিল্পী, কত শক্তিমান কুশলীর, কত যুগান্তকারী চিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে তার ইয়ত্তা মেলে না।

বাঙলা দেশের ছায়াছবির ইতিহাসে আজ শ্রীমতী সেন নিজেই একটি নব সংযোজিত অধ্যায়। ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ, গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল বাঙলা দেশের ছায়াচিত্রের দুর্যোগও আজ অবশ্য কম নয়। তার ভাগ্যাকাশে বর্তমানে কালো মেঘের সমাবেশ ঘটেছে, নানা প্রকার সমস্যা ও অসহায় অবস্থার সে সম্মুখীন। এমন একাধিক ছবিও মুক্তি পাচ্ছে যেগুলি কুরুচি ও অসারতায় ভরপুর, যার ফলে বাঙলাছবির মান মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই জন্যেই, বিশেষভাবে সেই কারণেই এই সম্মানের মূল্য এত বেশী।

"সেতু" নাটকে অংশগ্রহণকারী মহিলা শিল্পীবৃন্দ

শ্রীমতী সেনের অভিনয়ের মধ্যে আমরা পাই এক স্বতঃস্ফূর্ত জীবনপ্রকাশ, পাই একটি অসাধারণ চরিত্র আলেখ্য, পাই কৃত্রিমতা বিবর্জিত এক সুনিপুণ চরিত্রায়ণ। তাঁর অঙ্গসঞ্চালন, বচনবিন্যাস, অভিব্যক্তি, দৃষ্টিনিক্ষেপ, চলাফেরা প্রভৃতি সকল কিছুর মধ্যেই প্রতিভা, শক্তি ও শিল্পবস ছাড়াও বিশেষভাবে যে বস্তুটির সন্ধান মেলে তা হচ্ছে ব্যক্তিত্ব।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে—যে ছবিতে অভিনয় করে সুচিত্রা সেন এই আন্তর্জাতিক সম্মানে বিভূষিতা হলেন সেই ছবির কাহিনীও বর্তমান বাঙলার এক শক্তিমান কথাশিল্পীর লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে। তাঁর নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। মাসিক বসুমতীর জনপ্রিয় লেখকদের তিনি অন্যতম।

শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের এই সম্মানলাভে তাঁকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং তাঁর উত্তরোত্তর সম্মান, শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

ছায়াসূর্য

অভিনেতা, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবার চিত্র পরিচালকরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। বাংলার চিত্র পরিচালককুলে বয়সের অনুপাতে আজ তিনি কনিষ্ঠতম কিন্তু শক্তিমত্তায় কোনক্রমেই কনিষ্ঠ নন, নানাদিক দিয়ে তিনি বরিষ্ঠ, অন্তত আর তাঁর প্রথম ছবি 'ছায়াসূর্য'ই এ কথার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে চলে। খ্যাতনাম্নী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর একটি ক্ষুদ্রায়তনের গল্প অবলম্বন করেই এর চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। দুটি বোনকে কেন্দ্র করে কাহিনী রচিত। দুই বোনের চরিত্র একেবারে পরস্পরবিরোধী একের সঙ্গে অন্যের কোথাও কোন অংশে মিল নেই এবং এই বৈপরীত্যই ছবির মূল উপজীব্য। হাসি, কান্নায়, আবেগে, অনুরাগে, সুখে, দুঃখে বিভিন্ন ঘটনার স্রোতে এই বৈপরীত্যকেই ভিত্তি করে পরিচালক কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দুই বোনের পরিণতিও পরস্পরবিরোধী এবং সেই পরিণতির মধ্যেই চিত্রের সমাপ্তি। ছবিটির মধ্যে সগৌরবে মুক্ত জীবনেরই জয়গান গাওয়া হয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস অনুভূতিশীল রসবোদ্ধার দলও সেই জীবনবন্দনায় আপন আপন কণ্ঠ মিলিয়ে দেবেন। ছকে বাঁধা গতানুগতিক জীবনযাত্রার একচুল এদিক ওদিক ঘটলেই যেন হাহাকার পড়ে যায়। একি হল—একি হল রব ওঠে কিন্তু এই বদ্ধজীবনে বৈচিত্র্য নেই, রসের স্পর্শ নেই, মুক্তজীবনে আছে অসীমের ঠিকানা। রূপের স্পর্শে রসের প্রলেপে এই সত্যটি সগৌরবে পার্থপ্রতিম প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর চিত্রে। সারা ছবিটি তাঁর প্রতিভার ছাপ বহন করেছে। ছবিটি কোথাও ভারগ্রস্ত নয়, কোথাও একঘেঁয়েমির বা গতানুগতিকতার চিহ্ন মেলে না। সারা ছবিটি প্রাণ প্রাচুর্যে এবং সাবলীলতায় ভরপুর। আঙ্গিক বিন্যাসে, প্রয়োগনৈপুণ্যে পার্থপ্রতিম বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র ছবিটিতে তিনি যথেষ্ট সময় এবং রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটির শিল্পসজ্জা এবং অলঙ্করণের দিকেও তাঁর মনোযোগের অভাব ছিল না। দুটি বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত ছবিটির মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে এবং এক অপরূপ পরিবেশ গঠনে সহায়তা করেছে।

অভিনয়ে শর্মিলা ঠাকুর যথেষ্ট দক্ষতা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে তাঁর অভিনয়ে। অন্যান্য

'সৌভনিক' প্রযোজিত 'বাঁশরী'র একটি দৃশ্যে নিবেদিতা দাস, কৃষ্ণ কুণ্ডু ও নিমু ভৌমিক

শিল্পীরাও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, রবি ঘোষ, মলিনা দেবী, গীতা দে, কল্যাণী ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়।

বিনিময়

দীপান্বিতা পিকচার্সের নিবেদন 'বিনিময়' ছবিটি বাঙলা দেশের সনাতন গতানুগতিক ধারাবলম্বী বৈচিত্র্যবিহীন ছবিগুলির তালিকায় আরও একটি সংখ্যা যোগ করল। পূর্ণ দৈর্ঘ এই ছবিটির মধ্যে না পাওয়া যায় কোন নতুনত্বের সন্ধান, না মেলে কোন বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের প্রেমকে কেন্দ্র করে সেই সনাতন ধারায় গল্পটিকে সাজানো হয়েছে এবং দর্শকের অতি পরিচিত নির্দিষ্ট পন্থায় গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। যেমন অদ্ভুত পরিচালনা, তেমনি বিস্তৃত গল্প। কাহিনী কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল ভাল কিন্তু এই অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ভালর রেশটুকু মিলিয়ে গেল। একের পর এক দেখা দিতে লাগল দুর্বলতা, দৈন্য, সারশূন্যতা। চরিত্রগুলির প্রতিও যথাযথ সুবিচার হয় নি। কোন কোন চরিত্রের বিকাশই ঘটেনি। কাহিনী বর্ণনে, বিন্যাসরীতিতে, প্রয়োগকুশলতায় পরিচালক দিলীপ নাগ সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। পরিচর্যায় এবং প্রয়োগে তাঁর ব্যর্থতার ছাপই প্রকট। নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও কয়েকটি 'শট' কিন্তু বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। আলোকচিত্রী দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং সুরকার কালীপদ সেন প্রশংসাযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কাজল গুপ্ত। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন অসিতবরণ, অমর মল্লিক, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, দিলীপ দে, মণি শ্রীমানী, শিশির মিত্র, শিশির বটব্যাল, পরিতোষ রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, গীতা দে ভারতী দেবী, গীতাঞ্জলি রায় ও আশা দেবী প্রভৃতি। মনে দাগ রেখে যাওয়ার মত অভিনয়নৈপুণ্য কোন শিল্পীই প্রদর্শন করতে পারেন নি অবশ্য বলাবাহুল্য এর জন্যে শিল্পীদের কোনক্রমেই দায়ী করা চলে না। এই ধরণের বাঙলা ছবি তোলার অর্থ টাকার শ্রাদ্ধ করা।

শৌভনিক নিবেদিত 'বাঁশরী'

নাট্যকলার অনুশীলনে এবং নাটকের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের পুণ্য সাধনায় মহানগরীর যে সকল বিখ্যাত নাট্যসংস্থাগুলি মগ্নচিত্ত 'শৌভনিক'-এর নাম তাদেরই মধ্যে উল্লেখের দাবীদার। একাধিক নাটক উপহার দিয়ে এঁরা আপন বৈশিষ্ট্যের এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশরী' মঞ্চস্থ করে এঁরা আপন সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং প্রভূত জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হয়েছেন। 'বাঁশরী' রবীন্দ্রনাথের একটি অতি উচ্চ আঙ্গিকের রচনা, লেখনীর মাধ্যমে একটি বিরাট বক্তব্যের প্রকাশ, জীবনের একটি দিকের এক পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য নিখুঁতভাবে অঙ্কিত, অভিনয়ের ক্ষেত্রে তা যেমনই দুরূহ, তেমনি জটিল। শৌভনিক গোষ্ঠীকে আনন্দের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করি যে এই দুরূহ প্রচেষ্টায় সফলকাম হয়েছেন এবং এক সর্বাঙ্গসুন্দর রসসমৃদ্ধ অবদানে ভরিয়ে তুলতে পেরেছেন দর্শকের রসপিপাসু চিত্ত। তাঁদের নাট্যো-পহার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মন ধরে রাখে। সর্বোপরি সমগ্র প্রচেষ্টায় পাওয়া যায় এক গভীরতা ও রসোপলব্ধির ছাপ, পাওয়া যায় আন্তরিকতা ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন, লক্ষ্য করা যায় মহৎ শিল্পসৃষ্টির ব্যাকুলতা। এঁদের অভিনয়ে 'বাঁশরীর' মূল সুর কোথাও এতটুকু ব্যাহত হয় নি, রসবিচ্যুতি বিন্দুমাত্র ঘটে নি; সমগ্র নাটকে কোথাও কোন ফাঁক মেলে না। অভিনয়ে, প্রয়োগনৈপুণ্যে, রসসৃষ্টিতে, উপস্থাপন পদ্ধতিতে, বিন্যাসে সকল দিক দিয়েই শৌভনিকের নিবেদন রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী দেখা দিয়েছে এক বলিষ্ঠ নাট্যোপহার রূপে মুঠো মুঠো অভিনবত্ব নিয়ে এবং রসসঞ্চারের পূর্ণ-প্রতিশ্রুতি বহন করে।

অভিনয়াংশে নিঃসন্দেহে বিপুল অভিনন্দন দাবী করতে পারেন নিবেদিতা দাস। তাঁর প্রাণস্পর্শী অভিনয় বাঁশরী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। রবীন্দ্র-সৃষ্ট বাঁশরীর অন্তর্নিহিত রূপটি তাঁর কাছে অপ্রকট নয় তারই প্রমাণ পেলে তাঁর সাবলীল অভিনয়ে। স্ন্যাসীর ভূমিকায় বৃন্দ কুণ্ডুর অভিনয় সার্থক। সন্ন্যাসীচরিত্রের ভাবগম্ভীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল রূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর পরম উপভোগ্য অভিনয়ে। গোপেন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে সোমশঙ্কর চরিত্রটির মহিমা ও ব্যক্তিত্ব মূর্ত হয়ে উঠেছে, সুন্দর অভিনয়ে চরিত্রটির তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। ক্ষিতীশের চরিত্রে সুধাংশু মণ্ডলের অভিনয় যেমনই অকৃত্রিম তেমনই উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গানও সুগীত। আলোকসম্পাতের কাজও সাধুবাদার্হ।

সংবাদবিচিত্রা

এ সংখ্যার সংবাদবিচিত্রায় প্রথমেই যে সংবাদটি পরিবেশন করছি বাঙলা চিত্রানুরাগীমহলে তার মূল্য অল্প নয়। বাঙালী অভিনেত্রীর আন্তর্জাতিক সম্মান লাভের সমসাময়িক সময়েই বাঙলা চিত্র সম্পর্কিত এই শুভ সংবাদটিও ঘোষিত হয়েছে। লণ্ডনে যাতে নিয়মিত বাঙলা ছবি প্রদর্শিত হয় তার জন্যে একটি ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হতে চলেছে, লণ্ডনের দর্শক সমাজের বাঙলাছবির প্রতি আগ্রহ, ঔৎসুক্য এবং অনুরাগ এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে। এর কার্যাদি পরিচালিত হবে লণ্ডনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাঙালী অধিবাসীদের এবং কলকাতার কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর প্রযোজকদের দ্বারা। লণ্ডনে এর একটি কার্যালয় স্থাপিত হবে এবং একজন সবেতন কর্মসচিব নিযুক্ত হবেন। লণ্ডনে স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দার সংখ্যা এখন এক লক্ষ এবং অস্থায়ীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। এক একটি ছবি লণ্ডনে প্রদর্শিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যয় সমূহের পরও চল্লিশ হাজার টাকা লাভ করতে পারবে বলে অনুমান করা যায়। অতএব শুধু সাংস্কৃতিকই নয় সেই সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনাও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির পিছনে বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীঅসিত চৌধুরীর ভূমিকা এবং অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুক্তরাজ্যের চিত্রজগতে বাঙালার যে সুসন্তান আপন প্রতিভায় এবং নৈপুণ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর নাম উমেশ মল্লিক। বৃটেনের ছায়ালোক এঁর দ্বারা নানাভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে। কাহিনীকার ও প্রযোজক হিসেবে সেখানকার চিত্রমহলে আজ ইনি যথেষ্ট সম্মান ও জনপ্রিয়তার অধিকারী। লেখক এবং চিত্রনাট্য সম্প্রদায়ের ট্রেড ইউনিয়ান 'দি স্ক্রীণ রাইটার্স গিল্ড' এঁকে প্রধান সভ্যরূপে বরণ করে এঁকে সম্মান জানিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ছয় কোটি টাকার ব্যয়বহুল ছবি 'ট্রিস্তন এ্যাণ্ড টেম্পেষ্ট'-এর নির্মাণকার্যে ব্যস্ত এবং ঐ ছবিটিকে কেন্দ্র করেই অদূর ভবিষ্যতে তিনি কলকাতা আসছেন।

হিন্দী চিত্ররাজ্যের সম্রাজ্ঞী মীনাকুমারী বাঙলাছবিতে অভিনয় করতে ইচ্ছুক। বাঙলা দেশের যথেষ্ট ঐতিহ্যাশ্রিত ও গৌরবোজ্জ্বল ছায়ালোকের তারকাতালিকায় আপন নাম অন্তর্ভুক্ত করে মহীয়সী বাঙলাকে এবং তার বিশ্ববরেণ্য ভাষাকে সম্মানাঞ্জলি দেওয়ার বাসনা আজ তাঁর মনে উদয় হয়েছে। সম্প্রতি বোম্বাইতে স্বনামধন্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীদিলীপ সরকার এবং চিত্রনাট্যকার শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিদুষী অভিনেত্রী মীনাকুমারী কথাপ্রসঙ্গে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। পরিকল্পিত ছবিটি বাঙলা এবং হিন্দী উভয় ভাষাতেই গৃহীত হোক এই তাঁর কামনা।

'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি ভাল আমাদের দর্শক সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নাটকটি প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা আজ বাহুল্যমাত্র। এই সমাদৃত নাটকটির রচয়িতা উৎপল দত্ত। শিল্পী, পরিচালক, প্রয়োগকর্তা হিসাবে যিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয়দাতা। আনন্দের সংবাদ এই যে সঙ্গীত নাটক আকাদামির বিচারে এই নাটকটি শ্রেষ্ঠরূপে নির্বাচিত হয়েছে এবং নাট্যকারকে তিন হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়েছে। শ্রীউৎপল দত্তের এই সাফল্য বাঙলা নাট্যরসিক এবং নাট্যামোদীদের যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দিত করবে।

গত ৩১এ জুলাই ফিল্ম প্রোডিওসার্স গিল্ড অফ ইণ্ডিয়ার নব-নির্বাচিত কার্যনির্বাহকমণ্ডলী তাঁদের প্রথম অধিবেশন [illegible]

দক্ষিণ থেকে বামে—সর্বশ্রীমতী রেণুকা রায়, সুলতা চৌধুরী, অনুরাধা গুহ, শুক্লা দাস, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি—ছায়াছবির বাইরে

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
Glucose
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
কোলে বিস্কুট
প্রাইভেট
কলিকাতা-১০
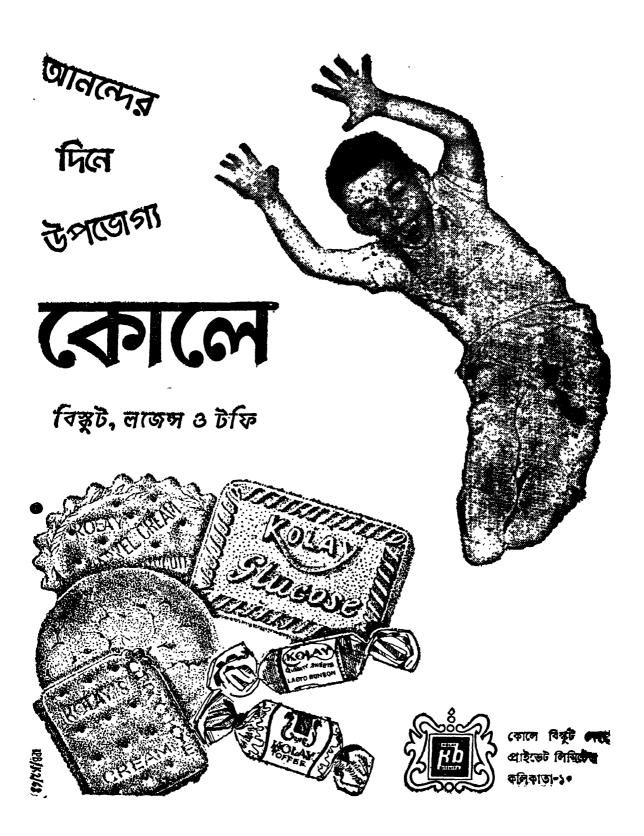
সভাপতি নির্বাচিত করেছেন বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনায়ক ও প্রযোজক দিলীপকুমারকে। শ্রীজে, বি, এইচ ওয়াদিয়ার ভবনে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশান্তারাম দিলীপকুমারের নাম প্রস্তাব করেন। গিল্ডের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হলেন শ্রীবিমল রায়।

বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে মালাডের গাওয়ান রোডটি পরলোকগত সঙ্গীতনায়ক পান্নালাল ঘোষের নামে পরিবর্তিত করার প্রস্তাব উঠেছে। সুর-সরস্বতীর অন্যতম বরপুত্র পান্নালাল অত্যন্ত অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সুরের রাজ্যে এঁর অবদান একদিকে যেমন সীমাহীন অন্যদিকে তেমনি অনন্যসাধারণ। আলোচ্য গাওয়ান রোডের একটি গৃহেই তিনি বহু বছর বাস করেছেন ও তাঁর পরিবারবর্গ এখনও বাস করছেন। সম্প্রতি তাঁর ৫৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় মিউনিসিপ্যাল কংগ্রেস পার্টির নেতা ডঃ বি, পি, ডিগবী সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মহারাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রী শ্রী ডি, এস, দেশাই। তিনিও পান্নালালের উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে তাঁর স্মৃতি যাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয় সে দিকে যত্নবান হতে অনুরোধ করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি উভয়ে পান্নালালের বাসভবনে পদার্পণ করে তাঁর যন্ত্রাদি পরিদর্শন করেন ও শিল্পীপত্নী প্রখ্যাত নেপথ্যগায়িকা পারুল ঘোষ কর্তৃক আপ্যায়িত হন।

যে সকল শক্তিময়ী অভিনেত্রীদের দ্বারা আজকের দিনের বোম্বাইয়ের ছায়ারাজ্য যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ, বিকশিত ও পরিপুষ্ট বিদুষী শিল্পী লীলা নাইডুর নাম আজ সেই তালিকায় নিঃসন্দেহে উল্লিখিত হওয়ার দাবীদার। বিদেশী ছবিগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের ছবিগুলির একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ তিনি করেছেন। এই তুলনার বিষয়বস্তু কিন্তু সচরাচর পন্থানুসারী নয় অর্থাৎ আঙ্গিক, নির্মাণ পদ্ধতি বা বিন্যাসরীতি নয়। শ্রীমতী নাইডু নির্মাণব্যয় অবলম্বন করে তুলনায় প্রবৃত্ত হয়ে এক নতুন আলোকপাতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি হিসাব করে দেখেছেন যে আমাদের দেশের নির্মাণব্যয় অনেক সস্তা। উপমাস্বরূপ লীলা বলেছেন যে, ক্লিওপেট্রার নির্মাণে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে ঠিক সেই অনুরূপ ছবি যদি এ দেশে গৃহীত হোত তা হ'লে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থেই সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হোত।

শৌখীন সমাচার

বারো ভূতে

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা 'বারোভূতে' মঞ্চস্থ করলেন ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বিখ্যাত অভিনেতা বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেন সুস্মিত ঘোষাল, প্রবীর নাগ, স্বরূপ ঘোষাল, সব্যসাচী নাগ, সুদীপ ঘোষাল, শ্যামল ভট্টাচার্য, শিবব্রত বসু, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্র সান্যাল, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন গুপ্ত, অঞ্জন ঘোষ ও অনুরাধা নাগ।

অভিযান

খ্যাতনামা সাহিত্যিক রমাপতি বসুর দেশাত্মবোধক রচনা 'অভিযান' মঞ্চস্থ হল 'রূপভাস্বর'-এর প্রযোজনায়। শচীন বসু নাটকটি পরিচালনার ভার নেন, বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন মিহির সরকার, ভোলা বসু, মলয় সাহা, লতিকা দাশগুপ্ত ও তারা ভাদুড়ী প্রভৃতি।

বিশ বছর আগে

বিধায়ক ভট্টাচার্যের বিখ্যাত নাটক 'বিশ বছর আগে' সম্প্রতি নিবেদন করলেন 'রূপ ও ছন্দ' গোষ্ঠী। নাটকটির পরিচালনভার গ্রহণ করেন সুললিতমোহন গোস্বামী। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করেন দেবী চক্রবর্তী, শ্যামল মিত্র, রাসবিহারী দাস, অসিত মিত্র, নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল কুণ্ডু, রাণু রায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মীরা হাজরা, গীতা নাগ, চিত্রিতা মণ্ডল প্রভৃতি।

সংক্রান্তি

নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটকটি অভিনয় করলেন তরুণ নাট্যসম্মিলনী (হাইকোর্টে'-র সদস্যবৃন্দ)। অভিনয়াংশে ছিলেন সুজিত দত্ত, তপন মিত্র, অজিত দত্ত, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ রায়, মীনা ভট্টাচার্য, কল্পনা রায় ইত্যাদি। মণি ভট্টাচার্য নাটকটি পরিচালনা করেন।

নাগমণি

কথক নাট্য-সম্প্রদায় উপহার দিলেন 'নাগমণি'। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকের রচয়িতা। রূপায়ণে ছিলেন বিশু রায়, শক্তি মুখোপাধ্যায়, শচী দত্ত, রঞ্জন চক্রবর্তী, রথীন বসু, দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য বসু, সঞ্জয় হালদার, অরূপ চক্রবর্তী, তৃষ্ণা রায়-চৌধুরী, দেবিকা রায়-চৌধুরী ইত্যাদি। নাটকটির পরিচালক ছিলেন শক্তি মুখোপাধ্যায়।

এই সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী, নৃপেন দত্ত, বীরেন ধর ও প্রতাপ দাস কর্তৃক গৃহীত।

এলবামে

সুধীর বেরা

মর্মের গহনে তিলে তিলে
যে স্বপ্ন আঁকিয়াছিলে দোঁহে
সে আজ নিয়েছে মূর্তি
কায়াতে মায়াতে।

সে মূর্তির প্রেমরূপ
ছায়ারূপে—
আলোক-চিত্রের পটে থাক বাঁধা
দূর বন্ধুর প্রীতির অভিষেকে।

শ্রাবণ, ১৩৭০ (জুলাই—আগষ্ট, '৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই): সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে অনশনকারী ৪ জন এম্‌-এল্‌-এ'র (পশ্চিমবঙ্গ) অনশন ত্যাগ। কলিকাতা পৌরসভায় আরও ৫ জন কাউন্সিলারের অনশন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সামান্য রদবদল—বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী কে, সি, রেড্ডীর পদত্যাগ—ডাঃ কে, এল, রাও সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত—খনি ও জ্বালানী দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীপদে শ্রী ও, ভি, আলাগেসান।

২রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই): কলিকাতা পৌরসভা কাউন্সিলারদের (নয় জন) অনশন ভঙ্গ।

কলিকাতায় কবি ও নাট্যকার ডি, এল, রায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন—অনুষ্ঠানে কবিপুত্র শ্রীদিলীপ রায় কর্তৃক দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন।

৩রা শ্রাবণ (২০শে জুলাই): কলিকাতা পৌরসভায় প্রস্তাবিত বহিরাগতদের 'জীবিকা কর' বাতিল।

খাদ্যশস্যের কালোবাজার রোধে ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় নির্দেশ।

৪ঠা শ্রাবণ (২১শে জুলাই): কেন্দ্র কর্তৃক ভারতীয় আকাশে ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত বিমান প্রতিরক্ষা শিক্ষণ মহড়ার প্রস্তাব অনুমোদিত।

ত্রিপুরায় নবাগত উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের (দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য স্থানে) দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণ।

৫ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই): পশ্চিমবঙ্গের সেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব বিধান সভায় ভোটাধিক্যে নাকচ।

কর ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ: রাজভবনের নিকট ৮৮ জন গ্রেপ্তার।

৬ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই): বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের (৫৮) লোকান্তর।

সুপ্রীম কোর্টে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধির বৈধতা চ্যালেঞ্জ।

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন: ৭৬ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার।

৭ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই): আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্বের সমাপ্তি: তৃতীয় দিনে ১৫ জন মহিলা সমেত ৮৩ জন গ্রেপ্তার।

৮ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই): উত্তর সীমান্তে (ভারত) বিপুল সংখ্যায় চীনা সৈন্য সমাবেশ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী: চীন যে কোন সময় আবার আক্রমণ চালাইতে পারে।

কর্মচ্যুত স্বর্ণশিল্পীদের রাজ্যব্যাপী (পশ্চিমবঙ্গ) আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত—প্রথম দিনে কলিকাতায় ৩৫ জন গ্রেপ্তার। আগরতলায় ত্রিপুরা বিধান সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

৯ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই): আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে কলিকাতায় ৪৫ জন স্বর্ণশিল্পীর গ্রেপ্তার বরণ।

১০ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই): তৃতীয় দিনে আন্দোলনে লিপ্ত ৪৮ জন স্বর্ণশিল্পী গ্রেপ্তার।

ভারতের সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানেরও রণসজ্জা।

১১ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই): সীমান্ত সঙ্কটের দরুণ বিদেশ সফর বাতিল করিয়া স্থলবাহিনীর প্রধান জেঃ চৌধুরীর দিল্লী উপস্থিতি। বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৮৪) পরলোকগমন।

১২ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই): সীমান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশ জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে সামরিক প্রধানদের সহিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের বৈঠক।

কলিকাতায় আরও ৮২ জন স্বর্ণশিল্পীর গ্রেপ্তার বরণ।

১৩ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই): কৃষিকার্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার আহ্বান—কলিকাতার কৃষি-শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলনে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের ভাষণ।

আলোচ্য দিনে কলিকাতায় ১০৪ জন স্বর্ণশিল্পী গ্রেপ্তার।

১৪ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই): আরও ১০০জন স্বর্ণশিল্পীর গ্রেপ্তার বরণ। সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সহিত দিল্লীতে আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার আলোচনা।

১৫ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট): উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রীর সহিত মতানৈক্যের দরুণ ছয়জন মন্ত্রীর পদত্যাগ।

সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে সামরিক প্রধানদের সহিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের আবার বৈঠক।

১৬ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট): খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী (কেন্দ্রীয়) শ্রীপাতিলের পদত্যাগ।

পাক্ ফৌজ কর্তৃক কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন।

১৭ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট): ২৪ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীপাতিল (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) কর্তৃক পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার।

শ্রীনেহরুর নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এর পত্র—আণবিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণের জন্য বিশ্ব সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব।

১৮ই শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট): স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী (কেন্দ্র) শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সতর্কবাণী: শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কালং নদীর জলোচ্ছ্বাসে আসামের নওগা শহরের প্রায় অর্ধাংশ প্লাবিত।

১৯শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট): ভারত রক্ষা আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ—সুপ্রীম কোর্টে মামলার শুনানী সুরু।

২০শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট): ম্যাকমোহন লাইন বরাবর চীনাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি—নেফা অঞ্চলে চীনা টহলদারদের অনুপ্রবেশ।

কলিকাতায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধিদের বৈঠকের সমাপ্তি—বেরুবাড়ী পাকিস্তানকে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা সম্পন্ন।

২১শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট): পূর্ব পাকিস্তানে চীনা অধিনায়কের

উপস্থিতির সংবাদ। চীনা বাহিনী কর্তৃক আবার ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন।

২২শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট): কলিকাতায় মাছের কারবারীদের জন্য লাইসেন্স প্রথা চালু—লাইসেন্স পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন বাজারে পুলিশের হানা। আরও ৪১৫ জন স্বর্ণশিল্পীর গ্রেপ্তার বরণ।

২৩শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট): ভারত কর্তৃক চীনা বিমানের ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘনের প্রতিবাদ।

আলোচ্য দিনে ২৬১ জন স্বর্ণশিল্পী গ্রেপ্তার।

২৪শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট): মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন সহ) পদত্যাগের আগ্রহ প্রকাশ।

স্বর্ণশিল্পী আন্দোলনের শেষ দিনে ৫২৫ জন গ্রেপ্তার।

২৫শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট): দিল্লীতে শ্রীনেহরুর মন্তব্য: চীন ও পাকিস্তান একযোগে ভারত আক্রমণ করিতে পারে।

২৬শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট): মধ্যমগ্রাম ষ্টেশনে মালগাড়ী দুর্ঘটনা—তিনজন রেলকর্মীর শোচনীয় মৃত্যু।

২৭শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট): বিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের (৭৩) জীবনাবসান।

২৮শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট): 'নবভারত গঠনে নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করুন'—স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির প্রতি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের আহ্বান বাণী। মোহনবাগান দলের পুনরায় লীগ (ফুটবল) বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন।

২৯শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট): দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবসের অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান—লালকেল্লা (দিল্লী) হইতে জাতির উদ্দেশে শ্রীনেহরুর উদ্দীপ্ত ভাষণ—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক আত্মত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণের আহ্বান।

স্বাধীনতা দিবসে বসুমতী কার্যালয়ে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (দৈনিক বসুমতী সম্পাদক) কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

৩০শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট): লোকসভায় শ্রীনেহরুর জরুরী বিবৃতি: চীনারা সীমান্তের আরও নিকটে চলিয়াছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৭৮) লোকান্তর। পৌরকর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে বোম্বাই-এ পরিবহন ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্মীদেরও ধর্মঘট।

৩১শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট): সিরাজুদ্দীন কোম্পানীর সহিত প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমালব্যের যোগাযোগ প্রসঙ্গে লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি—মালব্যজীর সততায় প্রধানমন্ত্রীর আস্থা।

বহির্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই): সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ।

২রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই): আণবিক পরীক্ষা বন্ধের ব্যাপারে ত্রিশক্তি (ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েট) সম্মেলনের (মস্কো) আশাপ্রদ অগ্রগতি।

৩রা শ্রাবণ (২০শে জুলাই): মস্কোয় চীন-সোভিয়েট আলোচনা (আদর্শগত বিরোধ সংক্রান্ত) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সংবাদ।

৪ঠা শ্রাবণ (২১শে জুলাই): শ্রীমতী সুচিত্রা সেন (ভারত) মস্কোয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত।

৫ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই): লণ্ডনের আদালতে ডাঃ ষ্টিফেন ওয়ার্ডের (মিস কিলার কেলেঙ্কারীর প্রধান নায়ক) বিচার আরম্ভ।

৮ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই): পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে মস্কো বৈঠকান্তে (ত্রিশক্তি) চুক্তি সম্পাদিত ভূ-নিম্ন ছাড়া আকাশ ও সমুদ্রগর্ভে পরীক্ষা বন্ধ।

৯ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই): প্রচণ্ড ভূমিকম্পে যুগোশ্লাভিয়ার স্কপলি সহর বিধ্বস্ত—প্রায় দশ হাজার নর-নারী ও শিশু হতাহত হওয়ার সংবাদ।

১২ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই): মস্কোর ত্রিশক্তি চুক্তির বিরুদ্ধে চীনের বিষোদ্গার। 'মস্কো চুক্তিতে ফ্রান্স স্বাক্ষর করিবে না'—প্রেসিডেন্ট দ্য গলের সদম্ভ ঘোষণা।

১৪ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই): লণ্ডনের আদালতে কিলার কেলেঙ্কারীর নায়ক ডাঃ ওয়ার্ড অপরাধী সাব্যস্ত।

১৫ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট): ম্যানিলা বৈঠকের অগ্রগতি: মালয়, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক 'মাফিলিন্দো' কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব।

১৬ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট): গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় লাহোর জেলে খান আবদুল গফুর খানের অনশনের সিদ্ধান্ত।

১৭ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট): আদালতের দণ্ডভোগের পূর্বেই অতিমাত্রায় ঘুমের ঔষধ সেবনে লণ্ডনের হাসপাতালে ডাঃ ওয়ার্ডের প্রাণবিয়োগ।

১৯শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট): মস্কো-এ ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিবত্রয় কর্তৃক আংশিক আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ চুক্তিস্বাক্ষর—বিশ্বের সর্বত্র আশার সঞ্চার। ম্যানিলা বৈঠকে মালয়েশিয়া গঠন সম্পর্কে মতৈক্য। (বৈঠকের অংশীদার মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন)।

২২শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট): মস্কোর ঐতিহাসিক ত্রিশক্তি চুক্তিতে ভারতের স্বাক্ষর।

২৪শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট): সিকিমের সন্নিহিত চুম্বি উপত্যকায় বিপুল চীনাসৈন্য সমাবেশ।

২৬শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট): আমেরিকা কর্তৃক নেভাদার ভূগর্ভে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ।

৩০শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট): বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রফুমোর (প্রাক্তন যুদ্ধমন্ত্রী) শূন্য আসনে রক্ষণশীল প্রার্থীর জয়লাভ।

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—শ্রীসুধীর দাস।

১৫ই আগষ্টের স্মরণে
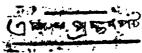
পুণ্যদিবস ১৫ই আগষ্ট তারিখের পুনরাগমন আমাদের জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় তিথি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। বিগত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টে ভারতমাতা সাম্রাজ্যবাদীর ঔপনিবেশিক লৌহশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করেন। ভারতবর্ষ এই বিশেষ লগ্নে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু কবির ভাষায় বলা যায়, আরম্ভের আগেও এক আরম্ভ আছে। যেমন প্রদীপ জ্বালাইবার পূর্বে সলিতা পাকাইবার কাজটি সারিয়া রাখিতে হয়। আমরা প্রদীপের প্রোজ্জ্বল শিখায় আলোকিত হইয়া সলিতা পাকানোর প্রস্তুতি-পর্বকে যেন ভুলিয়া না যাই। স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে যে সকল বীর দেশপ্রেমিক আত্মাহুতি দিয়াছেন তাঁহাদের শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে স্মরণ করা আমাদের প্রধানতম কর্তব্য। দধীচির অস্থিতেই দেবরাজ ইন্দ্র মৃত্যুবজ্র নির্মাণ করিয়া দৈত্যকুলের বিনাশ সাধন করেন। শত-সহস্র শহীদের তাজা রক্তে আমাদের স্বাধীনতার বেদীমূল গঠিত হইয়াছে। দেশ-প্রেমিকের মরণ-বরণে; কবি, সাহিত্যিক ও সম্পাদকের কারাবরণে এবং শত শত ভারতললনার দুঃখবরণে দেশ-মাতৃকার মুক্তিসাধন সম্ভব হইয়াছে। সশস্ত্র রাজশক্তির সহিত কোটি কোটি নিরস্ত্র নরনারীর সংঘাতে ভারতের জনশক্তিই জয়ী হইয়াছে। মৃত্যুপণ যুদ্ধে শহীদের আত্মবলিতে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে আমরা স্বাধীনতার নামে যে কি লাভ করিলাম তাহাও বিবেচনা ও আলোচনার বিষয়। একটা জাতকে স্বাধীন নামে অভিহিত করিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই—জনগণের জীবনের সমস্যা সেই জাতি চিরতরে মিটাইয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, বাসস্থান, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য ইত্যাদি প্রধান প্রধান সমস্যা হইতে জাতি মুক্তি পাইয়াছে। যদিও ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় উপরি উক্ত সমস্যাসমূহ এখনও যেন সদাজাগ্রত রহিয়াছে। দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হইয়া তৃতীয় পর্যায়ের পত্তন হইতে চলিল, তবুও আমাদের জাতির জীবনের একটি সমস্যারও সমাধান হইল না। এই জন্য আমরা কাহাকে দায়ী করিতে পারি? রাষ্ট্রের পরিচালনায় যাঁহারা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের কি তবে অক্ষম ও অযোগ্য বলিতে হইবে। অন্যান্য দেশ, যাহা সম্ভব করিতে পারিতেছে আমরা মোটা মোটা টাকা কর্জ পাইয়াও তাহা কেন ফলপ্রসূ করিতে পারিতেছি না, দস্তুরমত চিন্তনীয়। নেহরুর বন্ধু দেওয়ান চমনলাল সম্প্রতি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীর নিরক্ষর জনগণের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই এক তৃতীয়াংশ নিরক্ষর আছে। লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। জাতীয় সমস্যার পরিসমাপ্তি হইল না, অথচ জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সমানে চলিয়াছে। সুতরাং পরিণামে যে জাতির ভাগ্য ভাল হইতে পারে না, যে-কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই স্বীকার করিবেন। কেন না এখনও আমাদের দেশে—

(১) অনাহারে ও অপুষ্টিতে মৃত্যু হইতেছে। সরকার স্বীকার না করিলেও সর্বজনবিদিত।

(২) সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র দুর্মূল্য। এক জোড়া কাপড়ের মূল্য বর্তমানে বারো টাকার কমে হয় না।

(৩) দেশবাসীর যোগ্য বাসস্থান নাই। কদর্য 'স্লামে'র আধিক্যই ইহার প্রমাণ। নোংরা বস্তীর প্রাচুর্যই সাক্ষ্য।

(৪) অশিক্ষার অন্ধকারে দেশ আচ্ছন্ন। অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। নিরক্ষরতার প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ প্রায় প্রথম স্থানের অধিকারী। আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষক সমস্যা বানচাল।

(৫) দারিদ্র্য দেশবাসীর অঙ্গের ভূষণস্বরূপ পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। 'পুওর ইণ্ডিয়ান' নাম এখনও ঘুচিল না।

দেশের মানুষ সরল বিশ্বাসে অন্ধভক্তিতে কংগ্রেসকে ভোট প্রদান করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। এখনও যাঁহারা শাসকের গদীতে আসীন, তাঁহারা সর্বসাধারণের মনোনয়নের পাত্রপাত্রী। এতটা দরাজ সুযোগ ও কোটি কোটি দরদী সমর্থক পাইয়াও কংগ্রেস যদি জাতীয় জীবনের মূল সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রতি যথাযথ দৃকপাত না করেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সমাধানের সূত্র উদ্ভাবনের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না বা ব্যর্থ হইতেছেই বা কেন? আমরা কি ধরিয়া লইব, শাসকসম্প্রদায়ের অধীন যাঁহারা হাতে-কলমে কাজ করিতেছেন তাঁহারা পুরাপুরি অযোগ্য ও অপদার্থ! তবে কি সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নিম্নের গুণাগুণ বিদ্যমান? যথা:—

(১) দুর্নীতিপরায়ণতা ও অসদাচরণ।

(২) স্বজন-পোষণ।

(৩) উর্ধ্বতনের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের নামে চাটুকারিতা ও পদলেহনবৃত্তি এবং অধস্তনের প্রতি নিয়মশৃঙ্খলার নামে চরম অবজ্ঞা ও দুর্ব্যবহার।

(৪) সরকারী নামে সর্বত্র সুযোগ ও সুবিধাগ্রহণ।

(৫) বিশ্বাসঘাতকতা।

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও করের বোঝায় বর্তমানে দেশের মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন। দেশবাসীর সংসারে অনশন ও অর্ধাসন চলিতেছে। ভারত সীমান্তে চীনাশত্রু ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

এ হেন পরিস্থিতিতে আমাদের তথাকথিত দেশনেতাদের অনশনের চমক দেশবাসীর কাছে হঠকারিতা ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে? সম্প্রতি কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে আবার গদিত্যাগের পদত্যাগ পত্র পেশের ধুয়া উঠিয়াছে। শীতাতপ বা

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরার মায়া ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসী শাসক সম্প্রদায় এত দিনে প্রকৃত 'দেশ-সেবা'র কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর।

১৫ই আগষ্টের স্মরণীয় দিবসে আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যার পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

শিক্ষার হেরফের

যে কোন বিষয়ক কর্মসম্পাদনে আগ্রহ এবং সদিচ্ছা অপরিহার্য ইহা অস্বীকার করা যেমন কোনক্রমেই চলে না, তেমন ইহাও সকল সময়ে মনে রাখা উচিৎ যে, ইহারা অপরিহার্য হইলেও একমাত্র নয়। যে কোন পরিকল্পনাকে রূপদানের ক্ষেত্রে, যে কোন ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণে আগ্রহ ও সদিচ্ছা ব্যতীত আরও কয়েকটি মূলধন বিশেষ প্রয়োজন, যথা—উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভূতিশীল মন এবং বিশ্লেষণধর্মী বিচারভঙ্গী। হাল আমলের শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি ও স্বরূপই আমাদের এই মন্তব্য করিতে বাধ্য করিল। এক্ষণে, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে ধারায় প্রবাহিত হইতেছে ইহা যে কোনক্রমেই শুভফলদায়ক নয়—এ বিষয়ে যে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই আমাদিগের সহিত একমত হইবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের এবং তাহাদের অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগী করিয়া তোলার একটি বিশেষ রীতি ও প্রণালী আছে যাহা অনুসরণ করিলে তাহাদের অন্তরে শিক্ষালাভ সম্পর্কে আপনা হইতেই এক দুর্বার বাসনার জন্ম হয় এবং তাহার দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যতের আলোকোজ্জ্বল দুয়ারগুলি অর্গলমুক্ত হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্ররা এক বাধ্যবাধকতার কবলগ্রস্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করে ইহা তাহাদের পক্ষে যে কতখানি ক্ষতিকর, তাহাদের দেহ ও মন উভয়ের উপরই সে কতদূর দূষিত প্রভাব বিস্তার করে তাহার তুলনা মেলা ভার। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন আজই নহে বহুবর্ষ পূর্বেও অনুভূত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙলার বরেণ্য শিক্ষাচার্যগণ শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া মহতী কীর্তির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, তথাপি বিংশ শতাব্দীর অর্ধভাগ বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত হইবার পরেও শিক্ষানীতির দৈন্য ও দুরবস্থা ঘুচিল না।

জাতীয় জীবনে শিক্ষা যে কতখানি অপরিহার্য, শিক্ষার অভাব মানুষকে যে কতখানি অসহায় করিয়া রাখে, শিক্ষার দৈন্য একটি সমাজকে যে কি ভাবে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশার দিকে আগাইয়া দেয় ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি সে বিষয়ে আমাদের বহু দৃষ্টান্তের সহিত পরিচিত করাইয়াছে।

আমাদের সরকার শিক্ষাবিস্তারে যে পরাঙ্মুখ ইহা আমরা কদাচ বলি না। শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁহারা নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, বহু বিদ্যা-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাব নিশ্চয়ই পরিলক্ষিত হইল না।

তবে কি কারণে শিক্ষাজগৎ রাহুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে না, কি জন্য তাহার সুন্দর আকাশ হইতে দুর্যোগের কালো মেঘ অপসারিত হইতেছে না, কি হেতু তাহার শত সমস্যাকণ্টকিত অবস্থা ঘুচিতেছে না—কে বা কাহারা ইহার জন্য দায়ী? এই সকল প্রশ্নগুলির উদ্ভব নিশ্চয়ই এই পরিপ্রেক্ষিতে অস্বাভাবিক নয়।

মুখ্যত ইহার জন্য দায়ী বর্তমান নীতিই। সরকারের বর্তমান নীতিতে আন্তরিকতা আছে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তাহাতে যথোপযুক্ত দক্ষতার অভাব বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। কার্য পরিচালনার দৈন্য, যথাযথ অভিজ্ঞতার অভাব, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই এই নিদারুণ অবস্থার প্রধান স্রষ্টা। দেশের শিক্ষার মান বিবর্ধনের জন্য, তথা শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে বুদ্ধি, প্রতিভা, দক্ষতা, কর্মোদ্যম এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন সেইগুলি হইতে বাঙলা দেশ বঞ্চিত হইত না, শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাকে অন্ধকার এই ঘোর সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইত না।

কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক, কি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-জগতের সকল ক্ষেত্রেই সমান হাহাকার। সকল ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং অদূরদর্শিতার এক অভাবনীয় মিছিল। নিম্নশ্রেণীর দিকে লক্ষ্য না করিয়া উচ্চতর শ্রেণীর পরিবর্তনসাধন প্রচেষ্টার সহিত দুর্বল ভিত্তির উপর ইমারত নির্মাণেরই তুলনা চলে। এই সকল গোলযোগ হইতেই সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে আজ উচ্ছৃঙ্খলতা, অনিয়ম, দুর্বিনীত মনোভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তাহাতেও শেষ নাই তখন আবার কঠোর হস্তে অবাধ্য ছাত্র দমন শুরু হয়, ফলে দেখা যায় সামান্য সমস্যার সমাধান করিবার পথে পদার্পণ না করিয়া উত্তরোত্তর নানাভাবে তার বিবর্ধন সাধনই ঘটিয়া ছাত্রসমাজের সর্বনাশ করা হইতেছে।

শিক্ষকদের বিষয়ও এখানে অনুল্লেখ্য নয়, জাতীয় জীবনে তাঁহারা এক বিরাট সম্মানজনক আসনে সমাসীন। জাতির হৃদয়ে শিক্ষাদাতার পূজার কখনও ছেদ পড়ার কথা নয়। জাতিগঠনে তাঁহাদের ভূমিকা যেমনই বিরাট তেমনই পবিত্র। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষ হইতেও যে বিরাট ব্যর্থতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিত হইতে হয়। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরীক্ষায় ছাত্রদের ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতাবরণ। আমরা অস্বীকার করি না, সহস্র সমস্যা ও দুর্ভাবনার বেড়াজালের ভিতর দিয়া শিক্ষকসমাজকে দিনযাপন করিতে হয়। তাঁহাদের চিন্তার আকাশ মেঘমুক্ত নয়। ফলে প্রয়োজনীয় শ্রম ও শক্তি প্রয়োগে তাঁহারা বাধ্য হইয়া বিমুখ হন, তাঁহাদের কার্যে আন্তরিকতা অপসৃত হয়, একটা যান্ত্রিক বা প্রথাগত ভাবে শিক্ষাদানপর্ব চলে—তাহাতে প্রাণের স্পর্শ থাকে না, সজীবতা থাকে না, থাকে না কোন স্পন্দন। ইহাতে আদর্শকে, নীতিকে, বিবেককে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইতেছে। নীতিহীনতার দ্বারা সমস্যার সমাধান কখনও ঘটে না, তাহার জন্য অন্যায়ের সহিত, অবিবেকের সহিত, অবিচারের সহিত সংগ্রাম প্রয়োজন। ছলনা, আদর্শশূন্যতা, ফাঁকি সেই সংগ্রামের হাতিয়ার নয়—সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্য, মনোবল এবং একতাই এই যুদ্ধের প্রধান আয়ুধ নতুবা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ এইভাবে শ্মশানে পরিণত করার বহ্ন্যুৎসব বন্ধ করার অন্য কোন আশু উপায় আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত নাই। তবে, প্রচলিত শিক্ষানীতিরও অবিলম্বে পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই আমরা মনে করি এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীমতী রবিন্সন ক্রুশো

কাল্পনিক রবিনসন ক্রুশোর কাহিনী অবগত আছেন অনেকেই কিন্তু তাঁরই মহিলা সংস্করণের সত্য কাহিনী জানেন ক'জন? ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের এক চিহ্নিত দিন অমর হয়ে থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসে মহিলা এক রবিনসন ক্রুশোর দীর্ঘকালব্যাপী নির্বাসনের ভূমিকাস্বরূপ। সান নিকোলাস দ্বীপের নির্জন গিরিতটে, ক্যাপ্টেন জর্জ নিডেভারের জাহাজ এসে ভিড়ল একদিন, মেক্সিকান সরকারের আদেশে ওই পার্বত্য দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দকে সভ্য দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন নিডেভার।

গোলমালে এক তরুণী-দ্বীপবাসিনী মাতার সঙ্গচ্যুত হয়ে পড়ে তার একমাত্র শিশুপুত্র, ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে গিয়ে বলল সে—আমার ছেলে পড়ে রয়েছে দ্বীপে, আমি তাকে নিয়ে আসতে চললাম, দয়া করে অপেক্ষা করুন। মেয়েটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে, আর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে সাঁতরাতে শুরু করল এই কথা বলেই।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় ক্যাপ্টেন কোন সাহায্যকারী দল পাঠাতে সমর্থ না হলেও, বহুক্ষণ অপেক্ষা করলেন তার জন্য। তারপর জাহাজের ধর্মযাজকের উদ্দেশে বলে উঠলেন—ঠাকুর আর তো বিলম্ব করা চলে না, তা'হলে হয়তো ঝড়ের বেগে আমাদের জাহাজের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবে।

—ঠিক বলেছেন, উত্তর করলেন ধর্মযাজক মহোদয়।

—তবে সমুদ্র শান্ত হলে দিন কয়েকের ভেতর আর একবার খোঁজ নিতে হয়তো আসা সম্ভবপর হবে।

কিন্তু কার্যত তা আর হয়ে ওঠেনি, কারণ নিডেভারের জাহাজ সেই ঝড়ের মুখেই বিনষ্ট হয়, দ্বীপে মনুষ্যবাসের আভাস মাত্র পাওয়া যায়নি বহুদিনাবধিও, সেই হতভাগিনীকে মৃতা বলেই ধরে নিয়েছিল সকলে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এক বিস্ময়কর সংবাদ পৌছল 'সান্তা বার্বারা'র অধিবাসীবৃন্দের কাছে, জনহীন সান নিকোলাসে নাকি বিচিত্র পদচিহ্ন দেখা গিয়েছে, এক শিকারী দল মারফৎ এল এই খবর। বহু বছরের পুরোনো ঘটনাটির স্মৃতি জেগে উঠলো আবার, একদল অনুসন্ধানকারী বেরিয়ে পড়ল নবোদ্যমে।

প্রথমটা ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হল তাদের, কিন্তু তৃতীয় দফায় অভিযান চালানোর সময় সাফল্যমণ্ডিত হল তাদের প্রয়াস, পেলিকান পাখী ও গাংচিলের পালকে আবৃত এক বিচিত্র মানবী এগিয়ে এল তাদের সামনে সঙ্কুচিত ভাবে।

এই সেই নিখোঁজ রমণী, বছরের পর বছর যার কেটে গিয়েছিল জনহীন পরিত্যক্ত ওই শৈলদ্বীপে।

আনন্দের অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তার যুগল আঁখি, কিন্তু কথা বলল না সে একটিও—কারণ বনজ লতা পাতা ফল মূলে সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে প্রাণ শক্তিটাকে যদিও জীইয়ে রেখেছিল হতভাগিনী, বাক্‌শক্তি ছিল না ওর।

সান্তা বার্বারা'র অধিবাসীরা মেয়েটিকে রাজকীয় সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করল, তারা ওর নাম দিল 'জুয়ানা মারিয়া'।

পরে সেই পালকের বিচিত্র পোষাকটি ওই রমণীর মাতৃহৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্মারক হিসাবে পবিত্র 'ভ্যাটিকান' প্রাসাদে রক্ষিত হল।

কিন্তু সন্তানের জন্য জীবন বিপন্ন করলেও হতভাগিনী খুঁজে পায়নি তাকে কোনদিনই, সম্ভবত 'জুয়ানা মারিয়া' তীরে পৌছবার আগেই বন্য জন্তুর কবলে পড়ে গিয়েছিল শিশুটি।

উপরোক্ত ঘটনাটি বহুদিন আগে ঘটে গেছে কিন্তু আজও তার স্মৃতি এক মাতৃহৃদয়ের আকৃতিকে মূর্ত করে রেখেছে মানুষের মনে।

॥ শোক সংবাদ

শিশিরকুমার মিত্র

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতের বৈজ্ঞানিক দিকপাল ভারতে বেতার ও উচ্চাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রদূত জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র গত ২৭শে শ্রাবণ ৭৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র শিশিরকুমার ১৯১৯ সালে বিজ্ঞানে ডক্টরেট লাভ করেন ও তিন বছর পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় (সর্বোন) থেকেও ডি, এস, সি উপাধি লাভ করেন। জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তিনি অধ্যাপনায় নিমগ্ন ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে (১৯১৬) তিনি পদার্থবিদ্যায় লেকচারারের পদ লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি খয়রা অধ্যাপক হন পরবর্তীকালে 'রাসবিহারী ঘোষ' অধ্যাপকপদ লাভ করেন। ভারতবর্ষে রেডিও রিসার্চ কমিটীর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। হরিণঘাটার আয়োনোস্ফিয়ার ফিল্ড ষ্টেশনটির প্রতিষ্ঠার মূলে আছে তাঁর একক সাধনা। ১৯৪৭ সালে তাঁর বিশ্ব আলোড়নকারী গ্রন্থ 'আপার এ্যাটমোস্ফিয়ার' প্রকাশিত হয় এবং দিকে দিকে সাড়া পড়ে যায় ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও 'পদ্মভূষণ' সম্মান লাভ করেন। বৈজ্ঞানিক

গবেষণা ও অধ্যাপনা ব্যতীত জনজীবনে আরও ব্যাপকভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, এশিয়াটিক সোসাইটি, রোটারী ক্লাব, ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা প্রভৃতির সভাপতির আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটির তিনি একজন পরিচালক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক শিশিরকুমারের সঙ্গে সাহিত্যজগতে যোগসূত্রও কম নয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রিক ছোটগল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানের দুরূহ, জটিল তত্ত্বগুলিকে সহজ প্রাঞ্জল ভঙ্গীমায় সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তোলায় ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। শিশিরকুমারের মৃত্যুতে আজকের ভারতের জাতীয়জীবনে এক দিকপাল মনীষীর আসন শূন্য হয়ে গেল।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বাঙলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, প্রথিতযশা চিত্রনাট্যকার এবং বাঙলা সাহিত্যের কল্লোল যুগের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গত ৬ই শ্রাবণ ৫৮ বছর বয়সে পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করেছেন। সাহিত্যের এবং পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে নানা অলিন্দে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপণ ঘটেছে। শিশুচিত্তে এক বিরাট আসন তাঁর ছিল অধিকারগত। শিশুমনকে ধর্মমুখীন করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর লেখনীর অবদান অনস্বীকার্য। এক অসাধারণ শক্তিবর্ষী লেখনী ছিল তাঁর জন্মলব্ধ। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ প্রায় চল্লিশ বছরের। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি সর্ববিষয়ক রচনায় তাঁর লেখনী ছিল সদা অগ্রণী এবং যথেষ্ট ক্ষমতাবান। চলচ্চিত্রজগতেও তিনি দেখা দিয়েছেন চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার, গীতিকার, চিত্র-পরিচালক এবং অভিনেতারূপেও। বেতার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য। বিদ্যার্থীমণ্ডল ও পল্লীমঙ্গল আসরের তিনি প্রতিষ্ঠাতা, গল্পদাদুর আসর তিনি বহুদিন পরিচালনা করেন। সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর দক্ষতার ছাপ বিদ্যমান। গল্প-ভারতী পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক। একদিকে রোম্যাণ্টিক রচনায় তিনি যেমনই ছিলেন সিদ্ধহস্ত, অন্যদিকে অগ্নিবর্ষী রচনায় তাঁর লেখনী ক্লান্তিহীন। তাঁর প্রয়াণে প্রতিভার জগতে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হ'ল।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবিখ্যাত বর্ষীয়ান সঙ্গীতজ্ঞ, ধ্রুপদ-গীত পদ্ধতির নব পথ-প্রদর্শক এবং বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত (বন্দ্যোপাধ্যায়দের) ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবদৃপ্ত সঙ্গীত সাম্রাজ্যের শেষ একচ্ছত্র সম্রাট আচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১১ই শ্রাবণ ৮৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি পুত্র। বাল্যকাল থেকেই এঁর সর্বজনবন্দিত সাধনার সূত্রপাত। অল্পকালের মধ্যেই সুর-সরস্বতীর বরপুত্ররূপে পরিচিত হন ও এঁর খ্যাতি দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যুগপৎ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে গোপেশ্বর ছিলেন পারদর্শী। অভিনয়ক্ষেত্রেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একদা অভিনয়েও তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি বর্ধমানের মহারাজার সভাগায়ক নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এঁকে যথাক্রমে সঙ্গীত সরস্বতী ও সঙ্গীতনায়ক উপাধি দান করেন। বিশ্বভারতী এবং ক্যালকাটা এ্যাকাডেমী অফ মিউজিক এঁকে যথাক্রমে দেশিকোত্তম এবং ডক্টরেট ইন মিউজিক প্রদান করেন। সুবিখ্যাত সঙ্গীত সঙ্ঘে ইনি দীর্ঘকাল মার্গসঙ্গীতের অধ্যাপনা করেন ও বিষ্ণুপুরের রামশরণ মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষের আসনে সমাসীন ছিলেন। দিনেন্দ্র অধ্যাপকের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। দিল্লী সঙ্গীতনাটক আকাদামীর তিনি অন্যতম নির্বাচিত সদস্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস প্রমুখ কয়েকটি মূল্যবান সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র। সঙ্গীতনায়কের এই তিরোধান সঙ্গীতজগতে এক গভীর অভাব সূচিত করল।

শরৎসুন্দরী সরকার

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দেশনেতা ডাঃ সরসীলাল সরকারের সহধর্মিণী শরৎসুন্দরী সরকার মহাশয়া গত ১৬ই শ্রাবণ ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি অত্যন্ত দয়াশীলা ও পরহিতব্রতা ছিলেন। এঁর অমায়িক আত্মীয়তাপূর্ণ আচরণ এবং মধুরপ্রকৃতি এক দৃষ্টান্তের বস্তু ছিল। এঁর তিন পুত্র ডাঃ সুধাংশুলাল সরকার, বিখ্যাত সংবাদপত্রসেবী ও গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীকানাইলাল সরকার এবং শ্রীহিমাংশুলাল সরকার আপন আপন ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ কথাশিল্পী বিদগ্ধ নাট্যকার ও নাট্য ঐতিহাসিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩০শে শ্রাবণ ৭৮ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ১৮ বছর বয়স থেকে ইনি সাহিত্যজগতের সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ ৬০ বছর তিনি ক্রমান্বয়ে বাঙলা সাহিত্য ও নাট্যজগতের সেবা করে প্রভূত সম্মান ও খ্যাতির অধিকারী হন। বাঙলা সাহিত্যের বিগতযুগের দিকপাল কথাশিল্পীদের মধ্যে ইনি ছিলেন একটি গৌরবময় আসনের অধিকারী। এঁর বহু নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়ে দর্শকসমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। এঁর লেখা 'স্বয়ংসিদ্ধা'র চলচ্চিত্ররূপও দর্শকচিত্তে এক অমলিন ছাপ রেখে গেছে। বাঙলা দেশের সেকালের বিখ্যাত নাট্যবিষয়ক সাময়িকী নাট্যমন্দির এবং তৎকালীন সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকরূপে ইনি যথেষ্ট স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'গিরিশ অধ্যাপক'রূপে বরণ করে সম্মানিত করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুষারকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন, মাসিক বসুমতী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা সন '৭০ শ্রীসাধনা কর লিখিত কুরুক্ষেত্রের কথা (কাহিনী) পড়লাম। তাতে দু'টি বিষয়ের তিনি যে আলোচনা করেছেন তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে না হওয়ায় মেনে নিতে পারলাম না। যেমন···'বৈমাত্রেয়—দুই ভাই চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য।' লেখিকা এখানে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যকে বৈমাত্রেয় ভাই বলিয়াছেন কিন্তু মহাভারত সংক্রান্ত বই আলোচনা করিয়া আমরা যাহা পাই তাহাতে কোথাও বৈমাত্রেয় ভাই কথার উল্লেখ পাই না। সত্যবতীর গর্ভজাত দুই সন্তান চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য 'অর্থাৎ দুই সহোদর ভ্রাতা' লেখিকা আরো বলেছেন··· 'ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, পাণ্ডু শাপগ্রস্ত, বিদুর দাসীপুত্র—তিনজনেই অযোগ্য। তবে? রাজা হইবে কে? কেমন করিয়াই বা চলিবে এত বড় রাজত্ব?' উপরিউক্ত লেখা হ'তে আমরা যতদূর পেলাম তাতে হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসন তখন শূন্যেই ছিলো। কারণ বিধাতার নির্বন্ধক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন্মান্ধ, তিনি রাজকার্য পরিচালনায় অযোগ্য; মহামতি বিদুর দাসীপুত্র সুতরাং তিনিও আইনত রাজ্য হইতে বঞ্চিত! বাকী রইলেন পাণ্ডু। আমাদের মতবিরোধ এই পাণ্ডুকে নিয়ে। পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন সত্য কিন্তু তাহা রাজা ও রাজ্যজয়ের অনেক পরে। সুতরাং রাজসিংহাসন অধিকার করবার সময় শাপগ্রস্তের প্রশ্নই উঠে না। তবে এটুকু নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে সে সময় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন জনের মধ্যে পাণ্ডুই ছিলেন রাজা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি; এবং মহামতি ভীষ্মের উপদেশানুসারে, পাণ্ডুর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং রাজপদে পাণ্ডু প্রতিষ্ঠিত হন। পাণ্ডু যদি রাজা নাই হইয়া থাকেন তা হইলে তাঁহার দিগ্বিজয় যাত্রা কি মিথ্যা? দশার্ণ জনপদ, মগধ, মিথিলা, বিদেহ, বারাণসী, সুহ্ম প্রভৃতি রাজ্য যে তিনি জয় করিয়া ছিলেন ইহাও কি মিথ্যা? তা ছাড়া লেখিকার 'কুরুক্ষেত্র কথা' (কাহিনী) বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। পড়ে তৃপ্তিও পেয়েছি। নমস্কারান্তে, ইতি—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সবিনয় নিবেদন, আপনার সম্পাদিত 'মাসিক বসুমতী'র অসংখ্য পাঠক ও অনুরাগীদের মধ্যে আমরা দু'জন। 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' এই বিভাগ খুলবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! কারণ এই বিভাগে অগণিত পাঠক-পাঠিকা তাঁদের অভাব-অভিযোগ, আবার তাঁদের প্রিয় পত্রিকার জয়গান করবার সুযোগ পান এবং পাচ্ছেন। বর্তমানে আপনার কাছে গোটাকতক অনুরোধ আছে, সেগুলো আপনার অনুমোদন পেলে খু-উ-ব খুসী হ'বো। (১) পত্রিকা মাসের প্রথমে অন্যান্য পত্রিকার মতো প্রকাশ করা। (২) আপনার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস দেওয়া। সত্যি বলছি, আমরা আপনার একজন 'ফ্যান'। দয়া করে আমাদের বিমুখ করবেন না। 'রোজালিণ্ডের প্রেমে'র পর আপনার আর পুস্তক বেরিয়েছে কি? বেরিয়ে থাকলে নাম ও প্রকাশকের নাম জানিয়ে বাধিত করবেন। অবশ্য তারপরে 'চন্দন কুঙ্কুম' বেরিয়েছে বোধ হয়। তাই না? (৩) পাঠক-পাঠিকাদের জন্য একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ খোলা। (৪) নিম্নলিখিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের আত্মকথা দেখতে চাই (ক) ভারতের শ্রেষ্ঠ সুরকার ও গায়ক শ্রীশচীনদেব বর্মণ ও সুগায়ক মান্না দে'র। বর্তমানে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' খুবই সুন্দর লাগছে। তবে মাঝখানে খাপছাড়া বলে মনে হবে। 'মাসিক বসুমতী'র বর্তমানে উপন্যাসের মধ্যে শ্রীসুবোধ চক্রবর্তীর 'মৌনমন' পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে গেছি। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। নীলকণ্ঠবাবুকে তাঁর রম্যরচনা 'বার্ধক্যে বারাণসী' বন্ধ করতে বারণ করবেন। খুবই সুন্দর লাগছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ছোট গল্পের মধ্যে ভালো লেগেছে উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য-এর 'অভিনেত্রী'। গল্পটি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। তাঁর কোন বই বেরিয়েছে কি? বেরুলে জানাবেন। 'অজাতশত্রু'র লেখা পড়ে আনন্দ পাই। তিনি আজকাল লেখেন না কেন? তাঁর লেখাসহ বিবেকবাবুর লেখা নিয়মিত পরিবেশন করবেন। চিঠিটা ছাপলে বাধিত হবো। নমস্কার জানবেন। ইতি—শ্রীস্বপনেন্দু সেন ও শ্রীদিলীপ ঘোষ। ৫০, দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী।

বেচতে চাই

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, আমি নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতীগুলি একত্রে বা পৃথকভাবে প্রতি কপি ১৲ (এক) টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কেহ কিনিতে ইচ্ছুক থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন। উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যায় 'পাঠক-পাঠিকা'-র চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত করিলে বাধিত থাকিব। বিজ্ঞাপিত করিতে যদি খরচ লাগে, তাহা কত লাগিবে জানাইলে সেইমত চিন্তা করিব। নমস্কার জানিবেন। ইতি—লক্ষ্মীপ্রসাদ ঘোষাল। ১৪বি, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬।

১৩৫৯—জ্যৈষ্ঠ থেকে চৈত্র। ১৩৬০—বৈশাখ থেকে চৈত্র। ১৩৬১—বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র থেকে চৈত্র। ১৩৬২—আশ্বিন থেকে ফাল্গুন। ১৩৬৩—বৈশাখ থেকে চৈত্র। ১৩৬৪—বৈশাখ থেকে চৈত্র। ১৩৬৫—বৈশাখ থেকে চৈত্র। ১৩৬৬—বৈশাখ থেকে চৈত্র। ১৩৬৭—বৈশাখ থেকে চৈত্র।

শারদীয়া বসুমতী, (প্রতি কপি ২৲)—১৩৬২, ১৩৬৪

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

সচিব, রাজনগর সাধারণ পাঠাগার, ডাক—রাজনগর, জেলা—বীরভূম * * * শ্রীমতী সন্তোষিণী দাস, অবধায়ক : ডঃ বি, কে, দাস, বাটেলি টি এষ্টেট, ডাক—মজবত, জেলা—দারাং, আসাম * * * গ্রন্থাগারিক ক্যালটেক্স ক্লাব লাইব্রেরী, ২২ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, (চার তলা), কলকাতা * * * শ্রীমতী সবিতা চক্রবর্তী, অবধায়ক : শ্রীপি, সি, চক্রবর্তী, আই-এ-এস, কমিশনার, রেওয়া (মধ্যপ্রদেশ) * * * শ্রীমতী মঞ্জু মহলানবীশ, চাপান টি এষ্টেট, ডাক—চইবাড়ী, জেলা—গোয়ালপাড়া, আসাম * * * শ্রীব্রজনাথ মৈত্র, "ধীর সমীর কুঞ্জ" (বংশবাটা), ডাক—বৃন্দাবন, জেলা—মথুরা, উত্তরপ্রদেশ, * * * শ্রীএস, সি, গঙ্গোপাধ্যায়, সিঙ্গল্ ইউনিট বাংলো, ডাক—ডালমিয়ানগর, বিহার * * * ডাঃ শচীন্দ্রকুমার সরকার, জেলা ও ডাক—গোপালপুর, জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ * * * সচিব, জয়নগর ফ্রি. রিডিং রুম, (লাইব্রেরী), ডাক—জয়নগর, মজিলপুর মিত্রপাড়া, ২৪ পরগণা * * * শ্রীমতী মালা বিশ্বাস, অবধায়ক—শ্রীসুধীরকুমার বিশ্বাস, ৫২।২৫ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, বরানগর, কলকাতা-৩৬ * * * শ্রীফণীন্দ্র ঘোষ, চাপার টি এষ্টেট, তুই বাড়ী, গোয়ালপাড়া, আসাম * * শ্রী পি, বি, গুপ্ত, অবধায়ক : ইউ, পি, সুগার কোং লিঃ, ডাক—সেওরাহী, জেলা—দেওরিয়া, উত্তরপ্রদেশ * * * শ্রীগোলোকবিহারী চট্টরাজ, ডাক—বোলপুর জেলা—বীরভূম * * * শ্রীমতী সীতা ঘোষ, অবধায়ক—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, মুন্সেফের আদালত, ডাক—ঘাটাল, মেদিনীপুর * * * শ্রীমতী ইন্দুলেখা মাইতি, অবধায়ক—শ্রীসীতারাম মাইতি, ডাক—রঘুনাথবাড়ী, মেদিনীপুর * * *. সচিব, ষ্টাফ ক্লাব বক্সার সেন্ট্রাল জেল, সাহাবাদ, বিহার * * * শ্রীসুবিমল ঘোষ, ১৩০ ডেন্টাল ইউনিট, অবধায়ক ৫৬ এ, পি, ও * * * শ্রীমতী সুচিত্রা মজুমদার, ২৬ সার্কাস এ্যাভিনিউ, কলকাতা—১৭ * * * শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এ্যাসিষ্টাণ্ট কন্‌ট্রোলার, ষ্টেশনারী, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেশনারী অফিস, ৩১ মিলার্স রোড, মাদ্রাজ—১০ * * * গ্রন্থাগারিক, বেলোনিয়া পাবলিক লাইব্রেরী, ডাক—বেলোনিয়া, ত্রিপুরা, * * * গ্রন্থাগারিক, খোয়াই সাধারণ গ্রন্থাগার খোয়াই, ডাক—গৌকী, ত্রিপুরা * * * সচিব হুমকল জনকল্যাণ সমিতি লাইব্রেরী, ডাক—হুমকল, মুর্শিদাবাদ * * * প্রধান শিক্ষক, এরোয়ালী সিনিয়ার বেসিক স্কুল, ডাক—এরোয়ালী, জেলা—মুর্শিদাবাদ * * * শ্রীমতী অর্চনা ভট্টাচার্য অবধায়ক ডাঃ নারায়ণ ভট্টাচার্য সাম্‌সিং টি, জি, ডাক—মাটেলি, জেলা—জলপাইগুড়ি।

Herewith Rs. 15·00 as annual subscription in advance for the Monthly Basumati. Mrs. Anasuya Choudhury. Gaya.

I am sending herewith Rs. 15·00 as one year's subscription from Baisakh to Chaitra 1370 B. S. Mrs. Leelabati Mukherjee. Udaipur. Rajasthan.

নূতন বৎসরের গ্রাহক মূল্য বাবদ ১৫·০০ পাঠাইলাম। নিয়মিত প্রতিমাসে পুস্তক পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মিসেস বড়ুয়া, কলিকাতা।

This is in payment of annual subscription of the Monthly Basumati for one year from Jaista. Please continue supply of the magazine. Principal, Lady Keane Girls' College শিলং, আসাম।

মাসিক বসুমতীর মাঘ সংখ্যাখানি আমার হারাইয়া গিয়াছে। উক্ত সংখ্যার মূল্য বাবদ ১·২৫ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। পত্রিকাখানি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সেক্রেটারী, তরুণ সঙ্ঘ, সিলদা, মেদিনীপুর।

১৫·০০ পাঠাইলাম। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অঞ্জলি বর্মণ, কাঁথি, মেদিনীপুর।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫·২৫ নয়া পয়সা পাঠাইলাম, বৈশাখ সংখ্যা হইতে পাঠাইবেন। এই পত্রিকাখানি উপস্থিত বাংলা পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রমিলা রায়। নারীসেবা সঙ্ঘ, পুরী।

আমার মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দানে সুখী করিবেন,—এস, গুহঠাকুরতা, জলপাইগুড়ি।

১৯৬৩-৬৪ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা, ২১·৬২ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। সেক্রেটারী, পাবলিক লাইব্রেরী, আসাম।

Rs. 15·00 as subscription for one year from Ashar 1370 to Jaista 1371 is sent herewith. Please send paper regularly—Sasanka Sekhar Mukherjee, Katrasgarh, Manbhum.

I am sending herewith Rs. 15·00 as my annual subscription. Dr. N. Ghatak. Agra.

Sending herewith the sum of Rs. 15 00 as my yearly subscription for Monthly Basumati. Kindly acknowledge receipt. Sm. Tula Rani Mitra. Kirkee, Poona-3.

Remitting annual subscription of Monthly Basumati. Please send paper regularly. Headmaster, S. S. High School. Hiranpur. (S. P.)

আপনাদের পত্র পাইয়া ১৩৭০ সালের বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ পাঠাইলাম। পুনরায় বার্ষিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি।

Sending herewith Rs. 15·00 being the annual subscription of Monthly Basumati for the current year. Secretary. Progati Sangha. Kokrojhar, Goalpara, Assam.

আমার গত বৎসরের চাঁদা নিঃশেষিত হওয়ায় বর্তমান বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫·০০ পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। শ্রীমতী পুষ্প সাধু, গৌহাটি, আসাম।

Rs. 15·00 is sent in payment of annual subscription for Monthly Basumati. Please send paper regularly. Sm. Malina Mukherjee. President, Mahila Pathagar, Jalpaiguri.

আমি আমার ১৩৭০ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী আশা দেবী শ্রীরামপুর, হুগলী।

শোভাযাত্রা

ব্রদ মুখোপাধ্যায়

অঙ্কিত

একমাত্র ভিক্স্ ভেপোরাব
দেহের সর্দি আক্রান্ত সব তিনটি অংশেই অবিলম্বে কাজ করে...

রাতারাতি সর্দি দূর করে'

আপনার সর্দির যন্ত্রণা অবসানের জন্য ভিক্স্ ভেপোরাব সারারাত আপনার নাক, বুক ও গলার মধ্যে দুভাবে কাজ করে। আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে তোলে, সুনিদ্রার সহায়তা করে।

নাক দিয়ে জল পড়া, গলায় ব্যথা, কাশি, বুকে দমবন্ধ ভাব—সর্দির এইসব প্রাথমিক লক্ষণ দেখলেই ভিক্স্ ভেপোরাব ব্যবহার করবেন। একমাত্র ভিক্স্ ভেপোরাব দেহের সর্দি-আক্রান্ত সব তিনটি অংশেই অবিলম্বে কাজ করে—নাক, গলা ও বুকের মধ্যে, যাতে রাতারাতি সর্দির সব যন্ত্রণা উপশম হয়। শোবার সময় নাকের ওপর, গলা, বুক ও পিঠের ওপর ভিক্স্ ভেপোরাব মালিশ করুন। সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন ভিক্স্ ভেপোরাব আপনার ত্বক্ গরম করে তুলছে। ঐ একই সময়ে আপনার নিজের শরীরের তাপ ভেপোরাবকে দ্রুত ঔষধিযুক্ত ভাপে পরিণত করে যা নাক দিয়ে সারারাত আপনি প্রত্যেক শ্বাসের সঙ্গে টানতে থাকেন। যখন আপনি নিদ্রায় অভিভূত এই আশ্চর্য্য ২-ধারা ক্রিয়ার কাজ চলতে থাকে এবং যেখানে সর্দির আঘাত সবচেয়ে বেশী সেই নাক, গলা ও বুকের গভীর অংশে এক স্বস্তিদায়ক আরাম আনে। সকাল হতেই দেখা যায় আপনার সর্দির চরম জের কেটে গেছে ও আবার আপনার দিব্যি প্রফুল্ল ও সুস্থ লাগছে।

সর্দি আক্রান্ত দেহের এই সব অংশে ভিক্স্ ভেপোরাব সরাসরি ব্যবহার করবেন

নাকের মধ্যে ও চারপাশে ভেপোরাব মালিশ করুন।
গলায় ও বুকে ভেপোরাব মালিশ করুন।
সারা পিঠে ভেপোরাব মালিশ করুন।

পারিবারিক ইকনমি সাইজ শিশি

চলতি নীল শিশি

সুবিধাজনক সবুজ টিন

পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে—
রাতারাতি সর্দি দূর করে

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪২শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭০ — ৫ম সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

।। স্থাপিত ১৩২৯ ।।

কোনো জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যর্থ বলে কোনো জিনিস নেই। শতেকবার মানুষ নিজেকে আঘাত করবে, শতবার সে সহ্য করবে, কিন্তু পরিশেষে সে উপলব্ধি করবে যে সে-ই ঈশ্বর!

ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি—এ দুয়ের মাঝখানে যেন আর এমন কিছু না আসে, যাতে তোমায় তাঁর দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিতে পারে। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অনুরাগী হও, তাঁকে ভালবাস, জগতের লোকে যে যা বলে বলুক গ্রাহ্য করো না।

যতদিন না এই অহংভাব গঠিত জগতটাকে ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন আমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না, কেউ কখনও পারে নি, আর পারবেও না। সংসার ত্যাগ করা মানে—এই অহংটাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা দেহের না হয়ে যাই।

আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ করি তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে ঠিক কর—যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে—তা হলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডটাও তোমার পক্ষে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্য সারাজীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্য জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই।

যতই ক্ষমতালাভ হবে ততই দুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কোনো বাসনা করা যেন ভীমরুলের চাকে কাটি দেওয়া। আর বাসনাগুলো সোনার-পাতা-মোড়া বিষের বড়ি, এইটে জানার নামই বৈরাগ্য।

জীবনের সমগ্র রহস্য হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তোমার কি হবে—এ ভয় কখনও করো না, কারও উপর নির্ভর করো না। যখন তুমি অপরের সাহায্যের আশা-ভরসা ছেড়ে দাও, কেবল সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত!

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে নিজেকে দুর্বল ভাবা। তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই, উপলব্ধি কর যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। যে-কোনো বস্তুতে তুমি শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি তোমারই দেওয়া।

তোমার যা টাকাকড়ি, তা তোমার নিজের মনে করো না, আপনাকে ভগবানের ভাণ্ডারী বলে মনে করো। তার প্রতি আসক্তি রেখো না। নাম, যশ, টাকাকড়ি এ সব ত' ভয়ানক বন্ধন স্বরূপ। স্বাধীনতার অপূর্ব মুক্ত বায়ু সম্ভোগ কর; তুমি ত'

মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত, অবিরত বল 'আমি সদানন্দ-স্বভাব, আমি মুক্ত-স্বভাব, আমি অনন্ত-স্বরূপ, আমার আত্মাতে আদি-অন্ত নাই, সবই আমার আত্মস্বরূপ।'

বাসনারূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই তা একেবারে চলে যাবে—উহা ত' একটা ভ্রমমাত্র। যাঁর মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনিই কেবল 'আজাদ' বা মুক্ত।

কোনো ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমানভাবে ভালবাস—তা হলে সব বাসনা চলে যাবে।

আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা করবার কি আছে? আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির হও; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোনো কপটতা রেখো না।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি করুণা রাখবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিঁপড়ের জন্য পর্যন্ত নিজের দেহ ত্যাগ করতে রাজী থাকেন, কারণ তিনি জানেন দেহটা কিছুই নয়।

যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন।

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ সে ব্যক্তি তাঁকে এত দ্বেষ করত যে, ঐ দ্বেষ বশে সে সর্বদা তাঁর চিন্তা করত। ক্রমাগত বুদ্ধের চিন্তায় তার চিত্তশুদ্ধিলাভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ করবার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

আর কাল বিলম্ব না করিয়া ত্যাগব্রতী কর্মীদল দলে দলে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ুক। আমাদের শাস্ত্রের বীর্যপ্রদ অভয় মন্ত্রগুলি সাধারণবোধ্য সহজ ও সরল ভাষায় সর্বত্র প্রচার করুক আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপ, গ্লোব, ছায়াচিত্র প্রভৃতির সহায়তায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির মূলতত্ত্বগুলি শিক্ষা দিক।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হউক। কিন্তু যে সংস্কৃত ভাষা আমাদের সকল কৃষ্টি-সাধনার উৎস-স্বরূপ, যাহার আভিজাত্য ও মর্যাদা অতুলনীয় তাহা যেন কখনো বর্জিত না হয়।

আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। বেদান্ত মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের গ্রন্থে মহাসাম্যবাদ আছে, কিন্তু কার্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, হৃদয়হীন। তথাপি ইহারই মধ্য দিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমি শাস্ত্রজ্ঞ নই, দার্শনিক নই, এমন কি সন্ন্যাসীও নই। আমি দরিদ্র, দরিদ্রকে ভালবাসি। তাহাকেই আমি মহাত্মা বলি যিনি দরিদ্রের বেদনায় ব্যথিত। কে তাহাদের কথা ভাবে? তাহারা শিক্ষার আলোক পায় না। কে তাহাদের নিকট শিক্ষার আলোক লইয়া যাইবে?

এই সকল দরিদ্র, মূক জনসাধারণই তোমাদের দেবতা হউক। তাহাদের জন্য চিন্তা কর, কাজ কর, আর অবিশ্রাম প্রার্থনা কর।

প্রভু তোমাদের পথ দেখাইবেন।

ধর্মকে কেন্দ্র করেই স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করতে হবে। ধর্ম-নিরপেক্ষ অন্য সকল শিক্ষাই গৌণ।

নারী জাতির উন্নতি হইলে তাহাদেরই সৎকর্ম প্রভাবে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তখনই দেশে সংস্কৃতি, জ্ঞান ও ভক্তির স্ফুরণ হইবে।

ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভব হইবে না। একপক্ষ পক্ষীর ঊর্ধ্ব আকাশে উত্থান সম্ভবপর নয়। সেইজন্য রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেইজন্য নারীভাবসাধন, মাতৃভাব প্রচার।

ভারতীয় নারীর সর্বোত্তম আদর্শ সীতা। ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনিই হইবেন চিরন্তন আদর্শ। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতীয় নারী নিজ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে।

ঐ চরিত্রটিই যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র আর্যাবর্তের সম্মিলিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে।

সেই মহামহীয়সী নারী মূর্তিমতী পবিত্রতা হইলেও পবিত্রতর স্নেহ-মাধুর্যে অনন্যা। মাতা বসুমতীর মত তিনি ধৈর্যশীলা, নারীকুলে অতুলনীয়া, জায়ারূপে পাতিব্রত্যের ধৃতি সংস্কৃতা—এই সীতা।

অতএব পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আমাদের নারীজাতিকে অতি আধুনিক করিতে গিয়া যদি সীতার আদর্শ হইতে আমরা বিচ্যুত হই তবে সমগ্র শিক্ষাপ্রয়াসই ব্যর্থ হইবে।

পাশ্চাত্যের মেয়েদের দেখিয়া অনেক সময় আমার স্ত্রীলোক বলিয়াই বোধ হয় না। ঠিক যেন পুরুষ মানুষ। গাড়ী চালায়, আফিসে যায়, প্রফেসারি করে—ইত্যাদি। একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতির কমনীয় মাধুর্য দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত হইও না। বরং গর্ব অনুভব কর।

এদেশের নারী, এদেশের পরিচ্ছদে ভারতের ঋষি-মুখাগত ধর্মপ্রচার করিলে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহান তরঙ্গ উত্থিত হইবে। সে তরঙ্গ সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে প্লাবিত করিয়া দিবে।

[প্রাচীন ভারতবর্ষে গার্হস্থ্য জীবনে পঞ্চ ঋণের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সেই ঋণ পরিশোধ করিবার বিধানও রহিয়াছে শাস্ত্রে।]

ঐ শাস্ত্রিক বিধান গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। উহারই মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সমস্যার সমাধানসূত্র নিহিত রহিয়াছে।

পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্র ধরিয়া বীর পূজার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যাইতে পারে। দেবার্চনায় দেবদেবীর নানা মূর্তি চিরদিনই ব্যবহৃত হইয়াছে এই দেশে। সেই সকল মূর্তির নানা ভঙ্গিমার সহায়তায় চিত্রবিদ্যা, মৃৎশিল্প প্রভৃতি অতি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

হিন্দুর ধর্মসংস্কারের ঘনীভূত প্রকাশ থাকে দেবমন্দিরে। সেখানকার বেদীমূলের পূর্ণঘট, ঊর্ধ্বমুখীন মৃৎপ্রদীপ—শিল্পশিক্ষার কী অপূর্ব উপাদান। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল আর্যাবর্তে। যজ্ঞবেদীর আকৃতি ছিল শত বিচিত্র ধরণের, বিচিত্র আয়তনের। বেদীতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া। সেই সবের সহায়তা লইয়া আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করা যাইতে পারে, অতীতের ও বর্তমানের সুসামঞ্জস্যে সুগঠিত করা যাইতে পারে।

পশুপালন স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গীভূত হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

৬২
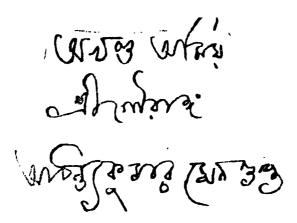
সন্ন্যাসগ্রহণের পর ছ'বছর যে লীলা করলেন তা প্রভুর মধ্যলীলা। শেষ আঠারো বছরের লীলার নাম অন্ত্যলীলা। মধ্যলীলায় প্রভু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছেন কিন্তু অন্ত্যলীলায় নীলাচলের বাইরে পা বাড়ান নি। অন্ত্যলীলার আঠারো বছরই নীলাচলে।

বৃন্দাবন থেকে প্রভু নীলাচলে এসেছেন এই সংবাদ পৌঁছুল গৌড়ে। স্বরূপ দামোদরই পাঠালেন সংবাদ। গৌড়ীয় ভক্তেরা সকলেই আনন্দিত। সকলে চলল শ্রীক্ষেত্রে গৌরমিলনের আকাঙ্ক্ষায়। শচীমাতাও আনন্দিত। মন বলে উঠল, চলো তুমিও চলো। কিন্তু তিনি কী করে যান? বিষ্ণুপ্রিয়াকে তবে কে দেখে?

প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে আছে রূপ। তার সেখানে কৃষ্ণলীলা নাটক লেখবার অভিলাষ হল। গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক লিখে ফেলল। কিন্তু প্রভু যদি নীলাচলে গিয়ে থাকেন আমিও তবে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। অনুপম বললে, আমিও যাব। দুই ভাই প্রয়াগ হয়ে কাশী হয়ে পৌঁছুল গৌড়ে। গৌড় থেকেই যাত্রা করব নীলাচল।

এমন বিধান, গৌড়ে এসে অনুপম অসুস্থ হয়ে পড়ল। রূপ অনেক পরিচর্যা করল কিন্তু অনুপম তারকব্রহ্ম নাম করতে-করতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হল।

রূপের তাই দেরি হয়ে গেল, গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ নিতে পারল না। সে চলল একাকী। চলল অনন্য লক্ষ্য।

পথে যেতে-যেতে সে তার নাটকের কথা ভেবেছে কখনো বা খসড়া করেছে। নাটকের কথাই তো কৃষ্ণের কথা। আর কৃষ্ণ এখন কোথায় সশরীরে? নীলাচলে।

পথে সত্যভামাপুরে একরাত্রি বিশ্রাম করল রূপ। রাত্রে স্বপ্ন দেখল। দেখল এক দিব্যরূপা নারী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমাকে চিনতে পারলে?'

'পেরেছি।'

'কৃপা করে দর্শন দিয়েছি তোমাকে।' বললে সে অলোকরূপসী। 'আমি সত্যভামা।'

'আদেশ করুন।'

'আমার নাটক আলাদা করে লেখ। ব্রজলীলা আর দ্বারকালীলা মিশিয়ে দিও না। আলাদা করে লিখলেই তোমার দুই নাটক সার্থক হবে।'

এই নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারল রূপ। যেন মাধুর্য আর ঐশ্বর্যকে একত্র না করি।

ব্রজে কৃষ্ণের লীলা মাধুর্যময়ী আর দ্বারকায় ঐশ্বর্যময়ী। ব্রজে ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুগত, কিন্তু দ্বারকায় ঐশ্বর্য স্বতন্ত্র, মাধুর্যনিরপেক্ষ। সুতরাং এদের বর্ণন-বন্দন আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভাবতে-ভাবতে হরিদাসের বাসায় এসে উঠল রূপ। কাশী মিশ্রের বাড়ির দক্ষিণে নির্জনে হরিদাসের বাসা।

আগে হরিদাসকে দেখি পরে মহাপ্রভুকে দেখব। আগে ভক্তকে স্বীকার করি পরে ভগবানকে স্বীকার করব।

ভাগবতেও আগে ভক্তের কথা পরে ভগবানের।

রূপে অশেষ দৈন্যভাব। সে দৈন্যভাবেই রূপবান। এ দৈন্য মৌখিক নয়, এ একেবারে অস্থি-মজ্জায়। অন্তরের স্তরে-স্তরে। উদ্যোগ করে প্রথমেই প্রভুর কাছে গেলে বোধ হয় অহঙ্কারের মত দেখায়।

তাই আগে হরিদাসের কাছে গিয়ে বসি। ভক্তের কৃপা না পেলে ভগবানের কৃপা পাব কী করে ?

'আরে, তুমি ?' হরিদাস লাফিয়ে উঠল : 'প্রভু আমাকে আগেই বলেছিলেন তুমি আজ আসবে।'

'কোথায় বললেন ?'

'আমার বাসায়, এইখানে।'

'এইখানে ?'

'হ্যাঁ, প্রত্যহ প্রাতে জগন্নাথের উপলভোগ দর্শন করে আমার বাসায় এসে পদধূলি দেন। তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। প্রভুর সময় হয়েছে আসবার।'

আর বলতে-বলতেই প্রভু এসে উপস্থিত।

উপস্থিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রূপ দণ্ডবৎ হয়ে পায়ে পড়ল। হরিদাসও দণ্ডবৎ হল। প্রভু আগে হরিদাসকে আলিঙ্গন করলেন। পরে রূপকে।

তারপরে তিন জনে বসলেন ঘন হয়ে। কুশল প্রশ্নের পর সুরু হল কৃষ্ণকথা।

কৃষ্ণ আমার নিত্যকিশোর। 'কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ।' তার প্রৌঢ়ত্ব নেই বার্ধক্য নেই রুগ্নত্ব নেই বয়োমালিন্য নেই।' 'রসময় মূর্তি—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।' রসের সদন—অশেষ বিশেষে রস আস্বাদন করছে। পূর্ণরসস্বরূপ, পূর্ণানন্দস্বরূপ। কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন। কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে লোভ উপজায়।

'তারপর সনাতনের খবর কী ?'

'তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।' বললে রূপ, 'আমি এলাম গঙ্গাপথে আর উনি রাজপথ দিয়ে গিয়েছেন।'

'আর অনুপম ?'

'গৌড়ে গঙ্গাতীরে দেহ রেখেছে।'

প্রভু রূপকে হরিদাসের বাসায় থাকতেই উপদেশ করলেন। উপদেশ করে চলে গেলেন নিজগৃহে।

গৌড়ীয় ভক্তরা আগেই চলে এসেছে, তাদের নিয়ে প্রভু এলেন রূপের কাছে। রূপ সকলকে দণ্ডবৎ করল, ভক্তরাও আলিঙ্গন করল রূপকে।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে প্রভু বললেন, 'তোমরা কায়মনে রূপকে কৃপা করো। যাতে তোমাদের কৃপাতে রূপের প্রাণে শক্তিসঞ্চার হয়। আর শক্তিসঞ্চার হলেই তো রূপ কৃষ্ণরস ও কৃষ্ণভক্তি সম্যক ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

ভক্ত কৃপাস্পর্শে রূপের মধ্যে তত্ত্বপ্রকাশিকা শক্তি প্রস্ফুটিত হোক।

প্রভু যাকে কৃপা করেছেন তাকে স্নেহ করতে কার অসাধ হবে ?

প্রত্যহই প্রভু এসে হরিদাস আর রূপের সঙ্গে মিলিত হন, ইষ্টগোষ্ঠী করেন—মানে করেন কৃষ্ণালোচনা। মন্দির থেকে যে প্রসাদ পান তাই বণ্টন করে দেন।

রথের আগের দিন তো ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচামন্দির মার্জন করলেন, আইটোটার বাগানে করলেন বন্যভোজন। রূপ দেখল ভক্তরা প্রসাদ পাচ্ছে আর বলছে হরি-হরি। রূপের পাশে হরিদাস, হরিদাসও দেখল। ওরা, রূপ আর হরিদাস, নিজেদের হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করে, তাই ভক্তদের সমান পঙক্তিতে না বসে দূরে বসেছে। দূরে বসেই দেখল ভোজনলীলা। সকলের আহার হয়ে গেলে গোবিন্দকে দিয়ে প্রভু পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ভুক্তাবশেষ। প্রভুর শেষ প্রসাদ দেখে ওদের আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠল। আর আমাদের পায় কে। প্রেমে মত্ত হয়ে নাচতে লাগল দু'জনে।

আরেক দিন, রূপের বাসায়, ভক্ত সমাবেশে প্রভু বলে উঠলেন : 'কৃষ্ণকে ব্রজের থেকে বার কোরো না। ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ কোথায় কখনো যায় নি।'

এর তাৎপর্য কী ?

তাৎপর্য প্রকট লীলায় কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যান কিন্তু অপ্রকট লীলায় বৃন্দাবনেই বন্দী থাকেন। অর্থাৎ যে ঘটনার উপলক্ষে কৃষ্ণকে ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে সে সব ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা কোরো না। শুধু ব্রজলীলাতেই আবদ্ধ রেখো। তোমার নাটক ব্রজলীলায় সুরু, ব্রজলীলায় শেষ। তাতে মথুরা-দ্বারকার কীর্তি কাহিনী যেন না থাকে। তোমার নাটকে বৃন্দাবনই নন্দিত হোক।

রূপ বিস্ময় মানল। সত্যভামা বলে গেল, আমার পুরলীলার নাটক আলাদা লেখ। এখন রাধাবিভাবিত-চিত্ত প্রভু বলছেন, ব্রজলীলার নাটক যেন পৃথক হয়। দুই ধামের দুই কৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্ন ভাবে একই আদেশ করলেন।

তাই হবে।

দুই ভাবে ভাঙব নাটককে। পৃথক পৃথক নান্দী প্রস্তাবনা লিখব। ঘটনাবিন্যাসও দু'রকম। দু'রকমের ভাবগৌরব।

চলো রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য দেখে আসি।

কিন্তু নৃত্যের সঙ্গে-সঙ্গে ঐ কোন শ্লোক তিনি আবৃত্তি করছেন? 'যঃ কৌমার হরঃ—' সবই সেই রকম আছে, আমিও আছি, আমার মনোহারী প্রেমিকও আছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ম্লান হয় নি, তবু প্রথম যৌবনোন্মেষে যে জায়গায় দু'জনের মিলন হয়েছিল সেই জায়গায় সেই মিলনটির জন্যেই আমি উৎকণ্ঠিত।

প্রভু ভাবছেন তিনি রাধা আর জগন্নাথ কৃষ্ণ। আর এ স্থান যেন কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রে মিলনে রাধার তৃপ্তি নেই, চলো, ব্রজে ফিরে যাই আমাদের সেই নিভৃত নিকুঞ্জে, সেইখানে আমাদের সেই আদিম মিলনমুহূর্তটি কুড়িয়ে নিই।

প্রভু কেন এই শ্লোক পড়ছেন কে জানে!

রূপ জানে। রূপ বুঝেছে। সে তখুনি তার অর্থশ্লোক রচনা করল। 'প্রিয়র সোঽয়ং কৃষ্ণঃ।' কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাধা বলছে সহচরীকে, দেখ, ইনি সেই বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ আর আমিও সেই রাধা। আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, দীর্ঘ বিরহের পর বলে এই মিলন প্রায় প্রথম সঙ্গমের মতই রমণীয়, তবু আমার মন সেই যমুনা পুলিনচারী কৃষ্ণকেই শুধু কামনা করছে। আর চাইছে এ স্থানের পরিবর্তে সেই মধুবন যেখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাত আর ঘুরে বেড়াত আর যেখানে বাঁশির পঞ্চম স্বরে পুলিনকানন শিহরিত হত রোমাঞ্চিত হত ধারণ করত মধুরিমা।

'সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥'

শ্লোকটি একটি তালপাতায় লিখে রূপ তা ঘরের চালের মধ্যে গুঁজে রাখল। সমুদ্রস্নান করতে গিয়েছে, প্রভু হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন চালের মধ্যে তালপাতা গোঁজা। টেনে এনে দেখলেন তাতে একটি শ্লোক লেখা। আহা, কী মধুর সে শ্লোক। প্রভুর যে গোপন ভাব একমাত্র স্বরূপ দামোদরের জানা তা রূপ টের পেল কী করে?

স্নানান্তে ফিরল রূপ। এ কি, প্রভু দাঁড়িয়ে! দণ্ডবৎ করল আভূমি।

প্রভু অঙ্গনে নেমে এসে রূপকে এক চড় মারলেন। ক্রোধের চড় নয় স্নেহের চড়। দৃঢ় আলিঙ্গন করে ধরলেন। বললেন, 'তুমি আমার অন্তরের গোপন কথা কী করে জানলে? তোমাকে কে বোঝাল?'

শ্লোকটা পড়তে দিলেন স্বরূপকে। আশ্চর্য, কী করে জানতে পারল আমার নিগূঢ় তত্ত্ব?

'শুধু তোমার কৃপা শক্তিতে।' বললে স্বরূপ, 'তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব কার সাধ্য কে বোঝে? শ্লোক উচ্চারিত হোক শব্দের বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হোক, নিহিত সত্যকে বুঝতে হলে তোমার কৃপার দরকার।'

'হ্যাঁ,' সমর্থন করলেন প্রভু, 'প্রয়াগে যখন রূপকে দেখি, মনে হল এ যোগ্য পাত্র। তাই আমি একে কৃপা করে শক্তিসঞ্চার করেছি, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ দিয়েছি। রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে তুমি একে বুঝিয়ে দিও।'

'ওর ঐ শ্লোক দেখেই আমি আপনার কৃপা বলে সিদ্ধান্ত করেছি।' বললে স্বরূপ। 'ফল দেখেই ফলের কারণও বোঝা যায়। কারণে যে গুণ বর্তমান তাই কার্যে প্রতিফলিত। রূপের প্রতিভা যেখানে কার্য আপনার কৃপাই সেখানে কারণ। ভগবানের কৃপা ছাড়া প্রতিভা অসম্ভব।'

হাঁসকে দময়ন্তী বললে, তুমি এত সুন্দর হলে কী করে? অনুমান করো। স্বর্গে নদী বয়, সেই নদীতে স্বর্ণকমল ফোটে, সেই স্বর্ণকমলের মৃণাল আমি ভোজন করি। তাতেই আমার দেহের এই কান্তি-পুষ্টি, সৌন্দর্য-মাধুর্য।

শয়ন-একাদশী থেকে সুরু করে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত চার মাসের নাম চাতুর্মাস্য। চাতুর্মাস্যের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দেশে ফিরে গেল। কিন্তু রূপ ফিরল না। প্রভুর চরণে শরণ নিয়ে থেকে গেল নীলাচলে।

একদিন নাটক লিখছে রূপ প্রভু এসে উপস্থিত হলেন। প্রণাম-আলিঙ্গনের পর প্রভু জিগগেস করলেন, 'কী লিখছ?' বলেই এক পত্র ধরে টান মারলেন।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর। যেন মুক্তোর সার। সপ্রশংস প্রভু অক্ষরের স্তুতি করলেন। যেমন অক্ষর তেমনি রচনা। কী অপূর্ব শ্লোক! 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং—'

'কৃ' আর 'ষ্ণ' এই দু'টি অক্ষর কী অমৃতে তৈরি বলতে পারো কেউ? এই দুটি শব্দ যদি একত্র হয়ে জিহ্বাগ্রে নাচতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত শত মুখে শত শত জিহ্বায় এই নাচের আসর বসুক, যদি এক কানে তা প্রবেশ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত শত কানে তা বিস্তৃত হোক, আর যদি একবার তা চিত্ত প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয় অন্য-অন্য ইন্দ্রিয়ের শত শত ঘরে খিল পড়ে যায়।

অর্থাৎ এক মুখে কত বলব অসংখ্য মুখ অসংখ্য জিহ্বা পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়। দুই কানে নামসুধা কতটুকু পান করব ধ্বনির অমৃত ধরবার জন্যে অসংখ্য কান দাও। আর ইন্দ্রিয়সমূহ কত প্রবল কত সক্রিয় কিন্তু নামের সামনে তাদের আর অস্তিত্ব নেই, তারা তখন মন্ত্রশান্ত বিলয়তন্ময়। নদীতে বান এলে খাল-বিল জলা-নালা জলে একাকার হয়ে যায় তেমনি নাম সমুদ্র উথলে উঠলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ডুব মারে তলিয়ে যায় অতলে। এমন কৃষ্ণ নাম কোন মধুতে প্রস্তুত।

হরিদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'শাস্ত্রে আর সাধুমুখে কৃষ্ণনামের অনেক মহিমা শুনেছি কিন্তু এমনটি কখনো শুনি নি। যেমন নাম তেমনি তার ব্যাখ্যা। মধুরে-মধুরে কোলাকুলি।'

এখন একবার রামানন্দ আর সার্বভৌম দেখুক। তারা কী বলে।

তাদের কাছে প্রভু রূপের গুণ বর্ণন করলেন। তোমরাও বিচার করো রূপ কেমন লিখেছে। ভাবে ছন্দে রসে কাব্যে কেমন উতরেছে তার রচনা!

ঈশ্বরের বোধ করি এই রকমই রীতি। ভক্তের কোনো ত্রুটিই গায়ে মাখেন না। নেন না কোনো অপরাধ। অল্প সেবাকেই বহু বলে মানেন। ভক্তের কাছে হারেন। ভক্তের হাতে দান করে দেন নিজেকে।

'ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে, আত্মপর্যন্ত প্রসাদ॥'

আর তিনি এমন, দুর্জনের প্রতিও অসূয়া প্রকাশ করেন না। তিনি স্বীয় স্বভাবেই নির্মলমতি।

ভক্তদের নিয়ে একদিন বসলেন রূপ-হরিদাসের বাসায়।

রূপকে বললেন, 'তোমার শ্লোক দু'টি পড়ো।'

লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইল রূপ। 'লজ্জাতে না পঢ়ে রূপ—মৌন ধরিল।' তখন স্বরূপ দামোদর পড়ল। 'প্রিয়র সোঽয়ং কৃষ্ণঃ—'

সকলে চমৎকার মানল।

ভট্টাচার্য বললে, 'তোমার হৃদয়ের কথা তোমার কৃপা ছাড়া অন্যে জানবে কী করে? রূপ গোস্বামীতে যে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে সবই তোমার কৃপাস্পর্শে।'

'তা'ছাড়া আবার কী।' সায় দিল রামানন্দ। বললে, 'আমার মত সামান্য মানুষে প্রভু শক্তি সঞ্চার করলেন। আর তাঁর কৃপাশক্তিতে আমি সে-সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলাম যার অন্ত ব্রহ্মারও সুদুর্লভ। একমাত্র তোমার প্রসাদেই, প্রভুর দিকে তাকাল রামানন্দ: 'তোমার হৃদয়ের অনুবাদ সম্ভবপর।'

প্রভু রূপকে বললেন, 'আহা, দ্বিতীয় শ্লোকটি পড়ো যে শ্লোকে মানুষ শোক-দুঃখ ভুলে যায়—'

দ্বিতীয় শ্লোকটি রূপ নিজে পড়ল। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে—'

সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল।

'কী বই লিখছ' জিগগেস করল রামানন্দ, 'যার মধ্যে আছে এই সিদ্ধান্তখনি?'

স্বরূপ বললে, 'কৃষ্ণলীলা। ব্রজলীলা আর পুর-লীলা দুই লীলা আগে একত্র ছিল। এখন পৃথক হয়ে গিয়েছে। এখন বিদগ্ধমাধব আর ললিত-মাধব। দুইই নাটক। বিদগ্ধমাধবে ব্রজলীলা আর পুরলীলা ললিতমাধবে। আর দুই নাটকেই পরিপূর্ণ প্রেমরস।'

[ক্রমশ।

দিন কি এমন হবে এ ভারতে, দিন কি এমন হবে!
গাইবে সবাই, মিলি এক ঠাঁই, একি গান একি স্বরে।
ভূমি কি সাগরে, শান্তি কি সমরে,
স্বদেশে বিদেশে, স্ববশেতে ঘরে,
তুলিয়া গলা রে, গাবে বঙ্গভবে
ভাই ভাই যেন সবে।
দিন কি এমন হবে॥

কুমারি হইতে, হিমাদ্রি লইয়া,
উঠিবে সে তানে, বাঁশরি বাজিয়া,
উঠিবে হৃদয় মরমে নাচিয়া
পরশি সে সুর তবে।
দিন কি এমন হবে!! —গোবিন্দচন্দ্র রায়

পর্তুগীজ পাদ্রী ও বাংলা-সাহিত্য

ভূপেশ দাশ

আমরা আতা, নোনা, আনারস, পেঁপে, পাঁউরুটি, সাবু খাই, কামিজ, সায়া পরি; বালতি, আলমারী, গামলা, সাবান, তোয়ালে ব্যবহার করি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি যে, এগুলো সম্পূর্ণ বিদেশী জিনিস এবং জিনিসগুলো আমদানী করেছিল পর্তুগীজরা। যে অনবদ্য বস্তু আজ তামাক-বিড়ি-সিগারেট-নস্যি-দোক্তা-খৈনি-জর্দা প্রভৃতি বিবিধ নেশার জিনিসরূপে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে পর্তুগীজরাই তা সর্বপ্রথম চালু করে আমাদের দেশে। বাংলা ভাষায় এই ধরণের একশতেরও বেশী পর্তুগীজ শব্দ রয়েছে। সেগুলো এমন বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে আছে যে বিদেশী বলে তাদের চেনাই শক্ত।

আসকাতরা, আলপিন, বোতাম, বাসন, বোমা, কামরা, কেরাণী, চাবি, খোঁপা, কপি, ফিতা, ফালতো, গস্ত, গরাদ, গুদাম, গীর্জা, জানালা, নীলাম, মার্কা, মস্করা, মিস্ত্রি, পাচার [করা], পিপা, পেরেক, বেস্ত, তিজেল, টোকা (তালপাতার ছাতা), বারান্দা, বেহালা, বরগা, বিস্কি—এগুলো বহুল প্রচলিত কয়েকটি পর্তুগীজ শব্দ! পর্তুগীজরা অনেক নতুন নতুন জিনিস এদেশে আমদানী করেছিল। বাংলায় ঐ সমস্ত জিনিসের পর্তুগীজ নামই রয়ে গেছে। যদিও দু'একটাকে একটু-আধটু সংস্কৃতগন্ধী করে নেবার চেষ্টা হয়েছে। যেমন তামাক। পণ্ডিতের হাতে পড়ে ওটা তাম্রকূট দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা পর্তুগীজ নামেই ঐ সব জিনিস বা শব্দকে গ্রহণ ক'রে ভাষার সজীবতা ও গ্রহিষ্ণু ভাবটি বজায় রেখেছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার জলপথ যেদিন আবিষ্কৃত হ'ল সেদিন থেকেই পূর্ব-এশিয়ার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু সৌভাগ্যেরও সূচনা হয়েছে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয় এই সময় থেকেই। য়ুরোপীয় বণিকদের মধ্যে তখন পূর্ব-গোলার্ধে বাণিজ্য বিস্তারের প্রবল লোভ ও ঔৎসুক্য। ভারতবর্ষের মাটিতে সর্বপ্রথম পদার্পণ করল পর্তুগীজরা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এল জার্মান, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং সবশেষে ইংরেজ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা দেশ পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসে। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে তারা বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করেছিল। পর্তুগীজ বণিকদের একটি বৃহৎ অংশই ছিল জলদস্যু। এদের নির্মম অত্যাচারে সমগ্র নিম্নবঙ্গ বিভীষিকার মধ্যে দিন কাটাত। সুন্দরবনের সুবিস্তৃত সমৃদ্ধ জনপদ এদেরই অত্যাচারে শ্মশানপুরীতে পরিণত হয়। সাধারণের কাছে এরা হার্মাদ নামেই পরিচিত ছিল।

বণিকদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা। এঁরা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। পর্তুগীজ বণিকের বাংলা দেশে ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্যেই মেতেছিল। তাদের কাছ থেকে গঠনমূলকই কিছুই পাওয়া যায় নি। যেটুকু পাওয়া গেছে তা মিশনারীদের দান।

পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা এদেশে এসে দেখলেন বাংলা ভাষায় লিখিত গদ্যের একান্ত অভাব। দলিল, চিঠিপত্র বা এই জাতীয় কিছু কিছু জিনিস ছাড়া গদ্যের প্রচলন কোথাও নেই। বইপত্র বা লেখা হয় সবই কাব্য। প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যেই দেখা যায় গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পদ্যই অগ্রজ। বাংলা দেশে তখনো অগ্রজেরই আধিপত্য। য়ুরোপে কিন্তু তখন গদ্যের প্রচলন ব্যাপকভাবেই সুরু হয়ে গেছে। য়ুরোপীয় জাতি হিসাবে পর্তুগীজ পাদ্রীরা গদ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই অবহিত ছিলেন এবং লিখিত ভাষায় গদ্যই যে সাধারণ পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করার সহজ ও সরল পন্থা, এ বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। অবশ্য তাঁরা ধর্ম প্রচারের আগ্রহেই বাংলা গদ্যের চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, সখের খাতিরে নয়। তা হ'লেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, লিখিত ভাষার বাহন হিসাবে বাংলা গদ্যের স্বরূপ উপলব্ধি ও বিস্তারের পথে পর্তুগীজ পাদ্রীরাই পথিকৃৎ। যে যুগে ব্যাপকভাবে গদ্য গ্রন্থ লিখবার কল্পনাও এদেশের কারো মনে জাগে নি সে যুগে উপাদানের স্বল্পতা সত্ত্বেও ব্যাকরণ, শব্দকোষ ইত্যাদি সংকলন করা সাধারণ ব্যাপার নয়।

আনুমানিক ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হুগলী ও হুগলীর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য পর্তুগীজদের ফর্মান দেন। সেখানে স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচার করবার অধিকারও তারা পায়। পর্তুগীজ পাদ্রীরা এই অধিকারটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। পূর্ববঙ্গেরও একাধিক অঞ্চলে পর্তুগীজ প্রবর্তিত রোমান ক্যাথলিক গীর্জা গড়ে ওঠে।

পাদ্রীদের গদ্য চর্চা তথা বইপত্রের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের বিশদ-বিবরণী পাওয়া যায় না। তবে চিঠিপত্র ও পরবর্তী যুগে লিখিত বিবরণী থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা খুবই চমকপ্রদ। পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা যে ব্যাপকভাবেই গদ্য তথা বাংলা ভাষার চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথমতম যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে ১৫৯৯ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে লেখা একখানা চিঠি। জেসুইট-সম্প্রদায়ভুক্ত পাদ্রী ফ্রান্সিস্কো ফেরনান্দেস ঢাকা জেলার সোনারগাঁর নিকটবর্তী শ্রীপুর থেকে অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেন্তোকে এই চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি খৃষ্টানধর্মের মূল কথাগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে ছোট একখানা বই এবং একখানা প্রশ্নোত্তরমালা লিখেছেন। এই বই দু'টি বাংলায় অনুবাদ করেছেন তাঁর সহকর্মী পাদ্রী দোমিনিক-দে-সুজা।

ঐ সময়েরই আরেকজন বাংলা জানা ধর্মযাজকের নাম পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন দোমিনিক সোসা। তিনি বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে একখানা বই লেখেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মমত খণ্ডন করে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই এর উদ্দেশ্য।

তারপর সুদীর্ঘকালের জন্য ইতিহাস নিস্তব্ধ। আশী বছরের কোন ঐতিহাসিক উপাদানই আমাদের হাতের কাছে নেই। কিন্তু পাদ্রীরা যে চুপ করে বসে নেই তা জানি, বাংলার রোমান

থেকে। চিঠিতে তিনি গোয়ার প্রভাসালকে লিখেছেন যে, তিনি নিজে, ফাদার ইগনেশিয়াস গোমেস ও মানোয়েল সারায়েবা বাংলা ভাষা উত্তমরূপে শিখেছেন এবং অভিধান, ব্যাকরণ, স্বীকারোক্তি ও প্রার্থনা'র বই বাংলা ভাষায় লিখেছেন। খৃষ্টধর্ম-মতেরও অনুবাদ তাঁরা করেছেন বাংলায়।

এ চিঠিরও চল্লিশ বছর বাদে উল্লেখ পাই ফাদার বারবিয়েব-এর। তিনি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বাংলায় একখানা প্রশ্নোত্তরপুস্তক লেখেন। এর পরে ১৭৪৩—১৭৭৮ সালের মধ্যে লেখা খান দুই বাংলা ধর্মপুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখক হচ্ছেন বেন্টো ডি সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা।

কিন্তু এ সমস্তই হচ্ছে পরোক্ষ উল্লেখ। এর থেকে শুধু আমরা অনুমান করতে পারি বিদেশী পাদ্রীরা কি রকম উৎসাহ নিয়ে বাংলা ভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় লোকদের মধ্যে ধর্মপ্রচার। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক এতে বাংলা ভাষা যে অনেক দিক থেকে উপকৃত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

পাদ্রীদের লেখা মাত্র তিনখানা পুস্তক পাওয়া গেছে। এই তিনখানা পুস্তকই য়ুরোপীয় প্রচেষ্টা-প্রসূত প্রাচীনতম বাংলা পুস্তক। এদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন হচ্ছে দোম আন্তনিয়ো লিখিত ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ। অপর দু'খানি হচ্ছে পাদ্রী মানো-এল-দা-আসসুম্পসাম-এর লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' [Crepar Xaxtrer Orthbhed] ও বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-শব্দকোষ—'Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez'।

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদের লেখক দোম আন্তনিয়ো ছিলেন ভূষণার জমিদারপুত্র। বাল্যকালে ইনি (১৬৬৩ খৃঃ) মগ দস্যুদের দ্বারা অপহৃত হন। ফাদার মনো এল দেব রোজারিও নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী তাঁকে উদ্ধার করে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেন। দোম আন্তনিয়ো পরবর্তীকালে একজন প্রভাবশালী খৃষ্টপ্রচারকে পরিণত হন এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলের ত্রিশ হাজার লোককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। জনৈক ব্রাহ্মণ ও জনৈক রোমান ক্যাথলিকের মধ্যে কল্পিত প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে খৃষ্টধর্মের উৎকর্ষ দেখিয়ে ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ বইখানা লেখা হয়েছে।

ফাদার মনোএল-দা-আসসুম্পসাম সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পরিচয় প্রায় কিছুই জানা যায় না। এই কীর্তিমান পাদ্রী সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা গেছে—তিনি ছিলেন পর্তুগালের এভোরো শহরের অধিবাসী এবং পূর্বভারত মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। তাঁর কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকার ভাওয়াল পরগণায় লিখিত হয়। গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে খৃষ্ট-মহিমা বর্ণনই এর বিষয়বস্তু। বইখানার ভাষা তৎকালীন ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলের মৌখিক ভাষা। তবে সর্বাংশে মৌখিক নয়। সাহিত্যিক সাধুভাষার আধারে মৌখিক ভাষায় লিখিত। মানোএল-এর অপর পুস্তক ব্যাকরণ ও শব্দকোষ এই জাতীয় পুস্তকের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে অভিনন্দনযোগ্য।

উক্ত তিনখানা পুস্তকই ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহরে ছাপা হয়। ভাষা যদিও বাংলা, হরফ ছিল রোমান। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের তিনটি মুদ্রণ বা সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় চন্দননগরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও শহরে।

পর্তুগীজ পাদ্রীদের সমবেত চেষ্টার ফলে যে সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছিল আজ আমরা তার অতি স্বল্প পরিচয়ই পাচ্ছি। সত্য বটে, তাঁরা বাংলাগদ্যের উৎকর্ষ সাধন করে সাহিত্যিক রূপ দিয়ে যেতে পারেন নি এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁদের প্রভাবও সুদূরপ্রসারী নয়। কিন্তু গদ্যকে লিখিত ভাষায় স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁরাই ছিলেন পথিকৃৎ। তাছাড়া রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে পর্তুগীজদের এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে না হ'লে পরবর্তীকালের ইংরেজ মিশনারীদের গদ্যগঠনের কাজ পর্তুগীজ পাদ্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হত। প্রথম প্রচেষ্টার পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সঞ্জাত যে অভিজ্ঞতা পর্তুগীজরা বহু বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় লাভ করেছিল ইংরেজরা সেই অনায়াসলব্ধ অভিজ্ঞতার [illegible] তাদের প্রয়াস সৌধ নির্মাণ করেছিল। সাহিত্যের জমিতে পর্তুগীজরা বুনেছিল বীজ আর ইংরেজেরা কেটে নিল তার ফসল।

রৌদ্ররেখাগুলি

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

বহুদূরের বৃষ্টি এল; অনেক চেনা হাওয়া
শব্দ করে ঝরে পড়লো কুটিরগুলি ঘিরে
শিশুর মত মাথা নাড়ায় অবাধ্য সেই তরু,
বাতাস যেন গুরুমশাই, শাসন গুরুতর;
অন্যদিকে বৃষ্টি নামে চিকণ জলধারা।

স্বপ্ন দেখতে চমকে উঠি, হঠাৎ স্মৃতিরেখা
দীপ্ত হয়ে ঝলসে ওঠে অনেক মুখের ছবি;
যাদের কাছে অন্তবিহীন প্রেমিক হ'তে চেয়ে
ভালোবাসা মুখ ফেরাবে; শান্ত সরলতা
আমার বৃষ্টি, আমার হাওয়া, চেনা সে সব মুখ।

শ্রান্তিহীন জলের ধারা, ঝর্ণা ঝরে পড়ে
একূল ওকূল চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে হাওয়া
আকাশ, তাকে দেখা যায় না, ছিল না কোনোদিন.
ছিল না ছবি, ব্যর্থ মুখ, সজল শ্যাম ছায়া!
ব্যাকুল মেঘ কাঁপছে ত্যাখো ব্যর্থ হাহাকারে:
'আবার কবে দেখতে পাবো রৌদ্র রেখাগুলি।'

ব্যবসায়ে ঠাকুর পরিবার

ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনে আমরা নানা বিচিত্র ভূমিকায় দেখেছি। তাঁকে শুধু সুমহান কবি, সাহিত্যিক বা দার্শনিকরূপে দেখি নি—দেখেছি জমিদার, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা এবং বাংলার গ্রামে সমবায় প্রথা প্রবর্তনের অগ্রণীরূপে। কিন্তু তাঁর এই বহুমুখী কর্মোদ্যমের আর একটা দিকের কথা আমরা খুব কমই জানি—তা' হচ্ছে ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ এবং ভূমিকা গ্রহণ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলধারার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগ অবশ্য খাপ খায় না। এ যেন তাঁর জীবনপ্রবাহের স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে ভ্রষ্ট এক ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ধারা। কিন্তু মানুষের জীবনের উপর বংশের প্রবল প্রভাবের কথা যদি মানা যায়, তবে রবীন্দ্রনাথ কবি না হয়ে ব্যবসায়ীও হতে পারতেন। তিনি যে এককালে জমিদারী এবং সাহিত্যসেবা তাঁর জীবনের এই দু'টি প্রধান বৃত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন ব্যবসাবৃত্তির দিকে ঝুঁকেছিলেন, তার মূলে তাঁর বংশের ব্যবসায়িক ঐতিহ্য যে অনেকটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের কলিকাতায় আগমন হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, কলিকাতা নগর স্থাপনের সমসময়ে। কলিকাতায় এসেই তাঁরা এই উদীয়মান ব্যবসাকেন্দ্রের বিপুল বাণিজ্যচক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। অবশ্য তখনকার কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রের বৃহৎ বাণিজ্য ছিল পর্তুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে সহকারিতা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ পঞ্চাননই সর্বপ্রথমে কলিকাতায় এসে বসবাস স্থাপন করেন এবং বিদেশাগত জাহাজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ ব্যবসাই ঠাকুরপরিবারের সমৃদ্ধির মূল ভিত্তি। তাঁর পুত্র জয়রাম স্বতন্ত্র আমীনবৃত্তি অবলম্বন করেন, কিন্তু জয়রামের এক পুত্র গোবিন্দরাম কন্ট্রাক্টরী ব্যবসা করতেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের কন্ট্রাক্ট পেয়ে বহু অর্থ উপার্জন করেন। জয়রামের অন্য পুত্র নীলমণি এবং নীলমণির পুত্র রামমণিরও বড় কারবার ছিল।

রামমণির পুত্রই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন দ্বারা দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হন। রামলোচনও ব্যবসায়ী ছিলেন যদিও ব্যবসায়ের অর্থে বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ প্রথমে কোম্পানীর অধীনে লবণের দেওয়ান ছিলেন পরে স্বাধীন ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হলেন। তিনি ভারতীয়দিগের মধ্যে শুধু ইউরোপীয় প্রথায় পরিচালিত আধুনিক ব্যবসায়ের নয়,—যৌথ ব্যবসায়েরও অগ্রণী। তিনিই ভারতীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম কোম্পানী স্থাপন করে যৌথ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি কার, টেগোর এণ্ড কোং নামে এক 'সমাজ' (তখনকার দিনে ব্যবহৃত কোম্পানী শব্দে বাংলা প্রতিশব্দ) স্থাপন করলেন। তা' ছিল আজিকার দিনের 'বামার লরী', 'গিলাণ্ডার,' 'আরবুথনট' ইত্যাদি কোম্পানীর মত প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্সী হাউস।

দ্বারকানাথের বহুমুখী ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ভাবলে আজকের দিনেও আশ্চর্য লাগে। তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্ক, লডেবল সোসাইটি নামে একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানী, রাণীগঞ্জ কয়লার খনি, রামনগরে চিনির কল, শিলাইদহে নীলের কুঠি, ষ্টীম টাগ কোম্পানী নামে এক বাষ্পীয় জাহাজের পরিবহন ব্যবসা স্থাপন করেছিলেন। এই সব ব্যবসাই ছিল বহু অংশীদার নিয়ে গঠিত। কিন্তু তখনও জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী আইন প্রচলিত হয় নাই। সেজন্য অংশীদারদের দায়িত্ব ছিল অসীমিত। এই সব কারবারের মধ্যেই বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্বলতা,—একযোগে কাজ করবার অক্ষমতা ফুটে বের হয়েছিল।

তাই দ্বারকানাথের মৃত্যুর পূর্বেই (১৮৪৬) প্রায় সব কোম্পানীই ফেল পড়ল। অংশীদারদের দায়িত্ব অসীমিত হওয়ায় এই সব কারবারের বিপুল ক্ষতিভার তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর ব্যবসায়ের মধ্যে না গিয়ে এই পিতৃঋণ শোধে আত্মনিয়োগ করলেন। ব্যবসায়ে দ্বারকানাথের এই অসাফল্য বাঙ্গালীর বাণিজ্য-বৃত্তির উপর দারুণ আঘাত হেনেছে, সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী ধনীরা আর ব্যবসার দিকে অগ্রসর না হয়ে ভূ-সম্পত্তির উপর অর্থনিয়োগ করতে লাগলেন। এইরূপে বাঙ্গালীর বাণিজ্য-বৃত্তির সমাধির উপর জোড়াসাঁকো, ভূকৈলাস, চোরবাগান, শোভাবাজার, কলুটোলা, হাটখোলা ও কাশিমবাজারের বড় বড় রাজবাড়ী গড়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে ঠাকুর পরিবারের এই ব্যবসায়িক ঐতিহ্য প্রায় লোপ পেয়েছে। তখন বাংলা জুড়ে তাঁদের বৃহৎ জমিদারী। শিলাইদহের নীলকুঠি জমিদারী কাছারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে নীলচাষীদের স্থান নিয়েছে জমিদারীর রায়তবৃন্দ। এই বিপুলায়তন জমিদারীর পরিচালনাভার রবীন্দ্রনাথের উপর পড়ল। যদিও নীলকরেরা বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন, তবুও নীলের ব্যবসা এবং জমিদারীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। জমিদারী ব্যবসা নয়, তা একটা সম্পূর্ণ পৃথক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। ব্যবসার চেয়ে রাজ্যশাসনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বেশী। জমিদারীতে আয় আছে, ব্যয় আছে, কিন্তু তার কোনও 'প্রফিট' এবং 'লস' নেই। তার কোনও উদ্বৃত্ত হয় না। ব্যবসায়ে আছে এই 'প্রফিট' এবং 'লস' এবং তাদের উদ্বৃত্তের নামই মুনাফা এবং ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য এই মুনাফা অর্জন। ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার খরিদ্দারের ব্যবসার বাইরে কোনও যোগাযোগের দরকার নেই।

জমিদারী ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ অপরিহার্য। রাজত্বের মত জমিদারী প্রথার মধ্যেও প্রজার সুখ-সুবিধা দেখবার দায়িত্ব জড়িত আছে, খরিদ্দার সম্বন্ধে ব্যবসায়ীর এরূপ কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। জমিদারের ক্রিয়াকর্ম, দোল দুর্গোৎসব, গুণীজনকে বৃত্তিপ্রদান, প্রজাকে

রক্ষা এবং তার আপদ-বিপদে সাহায্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতেন। অবশ্য অনেক জমিদার জমিদারীর বাইরে বাস করতেন। তাঁদের জমিদার আর জমিদারী থাকত না; তা' হয়ে দাঁড়াত মুনাফা অর্জনের একটা যন্ত্র, এক প্রকার ব্যবসা,—যেমন হয় বিদেশী সরকারের রাজ্য শাসন—শোষণই যার মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের জমিদারীব্যবসা হয়ে দাঁড়াতে পারে নাই, তার কারণ এই জমিদারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগ।

তবুও অল্পদিনের জন্য হলেও রবীন্দ্রনাথ যে একবার আসল ব্যবসায়েই নেমেছিলেন তার মূলে ছিলেন তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ। বোধ হয় তাঁরা সকলেই অনুভব করেছিলেন যে, শুধু জমিদারীর উপর নির্ভর করে এই বহুবিস্তৃত পরিবারের পক্ষে বেশীদিন তাঁদের জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা সম্ভব হবে না, অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে। দ্বারকানাথের স্মৃতি এবং পূর্বপুরুষগণের ব্যবসায়িক ঐতিহ্যও যে ব্যবসার দিকে তাঁদের আকর্ষণ করবে তাও স্বাভাবিক। কিন্তু ওর পিছনে একটা আদর্শবাদও যে কাজ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই সময় থেকেই ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে খোঁচা দিচ্ছিল এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে একটা ব্যবসার উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ভাই-ফোঁটা' নামক গল্পটিতে তার একটু আভাষ পাওয়া যায়। তাঁর ভাষাতেই বলি, 'তখন ব্যবসা-খ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল, বাণিজ্য ছাড়া দেশের মুক্তি নাই এবং ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিল কেবলমাত্র মূলধনটার যোগাড় হইলেই উকিল, মোক্তার ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপ দাদা সকলেই এক দিনেই সর্বপ্রকার ব্যবসা পুরাদমে চালাইতে পারে' (ভাই-ফোঁটা)। ব্যবসা-খ্যাপা মানুষদের তিনি যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে কবি এবং সাহিত্যিক এই দু'টি কথা বসিয়ে দিলেই তাঁদের ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশের অন্যতম কারণ পরিস্ফুট হবে।

এই ব্যবসা-খ্যাপামী সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথকেও পেয়ে বসল। কিন্তু তাঁদের মানসিক গঠন ছিল ব্যবসা কার্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী? বলেন্দ্রনাথ ছিলেন কল্পনাবিহারী আশাবাদী যুবক। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি তাঁর গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আর সুরেন্দ্রনাথেরও স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সাহিত্যের দিকে ব্যবসায়ে নয়। তাঁরা উভয়ে মিলে কুষ্টিয়ায় ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী নামে এক কারবার খুললেন। প্রথমে তাঁদের কাজ ছিল ধান পাট ইত্যাদি শস্য খরিদ বিক্রীর কারবার, যাকে বলা হয় 'বাধি' (পূর্ববঙ্গে 'রাখি') কারবার। ই· বি· রেলওয়ে (তখনকার দিনে গোয়ালন্দ লাইনের নাম) এবং গড়ুই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় কুষ্টিয়া সেকালে একটা বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। অবশ্য আশে পাশে তাদের বহু বিস্তৃত জমিদারী এবং শিলাইদহের সান্নিধ্য ও যে কুষ্টিয়ায় তাঁদের ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন করতে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে তাঁরা আর একটা কাজেও হাত দিলেন। তখন এই অঞ্চলে প্রচুর আখ উৎপন্ন হত। সেজন্য কুষ্টিয়াকে কেন্দ্র করে এক বৃহৎ গুড় শিল্প গড়ে উঠেছিল। রেন উইক নামে এক ইংরেজ কোম্পানী এক আখ মাড়াই কল প্রস্তুত এবং বিক্রী করবার এক বৃহৎ ব্যবসা গড়ে তুলেছিল। ঠাকুর কোম্পানী রেন উইক কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আখ মাড়াই কল তৈরীর কাজে অবতীর্ণ হয়ে ইংরেজ কোম্পানীর একক্ত্ব ভেঙ্গে দিলেন। এই সঙ্গে তাঁরা আখের গুড় প্রস্তুতের কাজেও হাত দিলেন।

প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথই কারবার চালাতেন। রবীন্দ্রনাথ মূলধন ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ক্রমে কলিকাতায় বৃহত্তর ব্যবসা ক্ষেত্রের আকর্ষণে এই ব্যবসা ছেড়ে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে যোগ দিলেন। কুষ্টিয়া কারবারের পরিচালন ভার গিয়ে পড়ল বলেন্দ্রনাথের ঘাড়ে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পাশে দাঁড়াতে হ'ল। তাঁরা উভয়েই ছিলেন ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ। ফলে তাঁরা এক অজানা সমুদ্রে পড়ে হাবু-ডুবু খেতে লাগলেন। শীঘ্রই তাঁরা মৈত্রেয় নামে এক হাঙ্গরের কবলে পড়লেন। মৈত্রেয় তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করে ম্যানেজারের পদ অধিকার করলেন এবং কিছুদিন তাঁদের অজ্ঞাতসারে রক্তমোক্ষণ করে অবশেষে একদিন বহু টাকা তছরূপ করে সরে পড়লেন।

এর পর বলেন্দ্রনাথও অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কিছুকাল রোগ ভোগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন (১৮৯১)। ঠাকুর কোম্পানীর সম্পূর্ণ দায় এবং দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর গিয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ ব্যবসাটা বাঁচাবার জন্য বহু চেষ্টা করলেন। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী ডুবে গেল, রেখে গেল রবীন্দ্রনাথের উপর এক বিপুল ঋণের বোঝা। এই ভরাডুবির সময় রবীন্দ্রনাথ যে মহানুভবতার দৃষ্টান্ত দেখালেন, তা' ব্যবসায়ীসুলভ নয়—তা' রাজোচিত। যজ্ঞেশ্বর নামক তাঁর এক ক্ষুদ্র কর্মচারীর সাধুতা এবং কর্মকুশলতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে ডেকে এই বৃহৎ ব্যবসা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। পরবর্তীকালে যজ্ঞেশ্বরের হাতে এই ব্যবসাই এক সমৃদ্ধ কারবারে পরিণত হয়েছিল।

ব্যবসা ক্ষেত্রে কবির এই অসাফল্যে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর যতই ক্ষতি হয়ে থাকুক না কেন, পৃথিবীর মানুষের তাতে হয়েছে লাভ। কারণ কবিত্ব ও ব্যবসা এ দু'টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন এমন কি পরস্পরবিরোধী বৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন—'ভাগ্যি আমি ব্যারিষ্টার হই নি।' কিন্তু ব্যারিষ্টার হ'লেও তাঁর কাব্য জীবনের হয়ত কোনও ক্ষতি হ'ত না। "আমরা মাষ্টার, উকিল, ব্যারিষ্টার, চাকুরে ইত্যাদি বহুপ্রকার বৃত্তিজীবী কবি ও সাহিত্যিক দেখেছি, কিন্তু ব্যবসায়ী কবি বা সাহিত্যিকের কথা শুনি নি। কারণ ব্যবসার মত আর কোনও বৃত্তি মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে এমন করে ধ্বংস করে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ সকল ব্যবসায়ে ঢুকলেন, তখন তিনি কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও গীতাঞ্জলী এবং তাঁর বহু মহান সৃষ্টি তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। যে বিরাট কবিপ্রতিভা এই সৃষ্টিকে সম্ভব করেছিল, তা' যে ব্যবসার উষর মরুপথে শুকিয়ে যায় নি,—তা' যে এই সাময়িক রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষত ভাবে কাব্য জগতে ফিরে আসতে পেরেছিল,—তা' পৃথিবীর মানুষের সৌভাগ্য।

বলেন্দ্রনাথ : প্রবন্ধশিল্পী

শক্তিব্রত ঘোষ

দ্বিধাহীন, কিন্তু অনিবার্য এবং নিশ্চিত : উনিশ শতকের বাংলাদেশ সেই অগ্নিবিন্দুটিকে চিনতে ভুল করে নি। ঠাকুরবাড়ি। প্রতিভার ও ক্ষমতার স্থাপত্যে সমর্থ জোড়াসাঁকোর সেই শিল্পাশ্রম এবং বলেন্দ্রনাথ সেখানকার আশ্রমিক। রক্তে যে উত্তরাধিকার নিয়ে এলেন, তার নাম কালচার। সহজ স্বচ্ছতা, চারুশ্রী চেতনা, অবনম্র অথচ ধ্রুব বিশ্বাসী-মনন, আর নিরাসক্ত চিত্তের বৈরাগ্য—প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে যুক্ত, তথাপি বিচ্ছিন্ন ও আলাদা—এবং এদের মিশ্রণজাত সংকরত্বই ঠাকুরবাড়ির কালচারের পরিচয় চিহ্ন।

রক্তে ঐতিহ্যের উত্তাপ, চোখে সৌন্দর্যালোকের পিপাসা। সেখানে শিল্পের সোনার ঘটগুলি সারি সারি সাজানো, মঙ্গল-লোকের ধূপগন্ধগুচ্ছ হাওয়া ভেসে আসছে, কিন্তু বন্ধ দরজা। আর কি আশ্চর্য, সেই দরজার বাইরে বিষাদ কী গভীর : পঙ্গুত্ব, ক্যাপামি, অর্থাৎ অস্বাভাবিকত্ব। এই অনড় জড়তা, এই উপহাসের হাত থেকে মুক্তি আসবে কেমন করে? সম্ভবত এই প্রশ্ন ছিল চার্ল্স ল্যাম্বেরও। কিন্তু ভেতরে ছিল অপরিমেয় বিত্তোৎসাহ; ছিলেন কালিদাস, বাণভট্ট। আর অবারিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর শাসন নিয়ে।

স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথ; সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিণতি তাঁর অনর্জিত ছিল। তবু বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বিশিষ্ট তাঁর নাম, বোধ হয় এই জন্যে যে, তাঁর নিরুপম বাণীভঙ্গীর মধ্যে স্বাধীন আলো বিচ্ছুরিত হতো।

বাণীভঙ্গী বা স্টাইল। সংস্কৃত আলংকারিকদের 'রীতি'র সঙ্গে এর সংজ্ঞার সাম্য নেই। স্টাইল সম্পর্কে সবচেয়ে পুরনো কথা বোধ হয় এই যে, তাতে শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব আভাসিত হবে। বাইরের উপাদান শিল্পীর মনে একটা বিশেষ ভাবাবেদন সৃষ্টি করবে, অর্থাৎ বহিরঙ্গ শিল্পীর অন্তরঙ্গের নির্দেশে আবর্তিত হবে। এই আবর্তনের ফলজাত সৃষ্টি যে 'বিশিষ্টভাব', পরচিত্তে তার যথাযথ সংক্রমণের সার্থকতার মধ্যেই স্টাইলের নিহিত আদর্শ। তা' ছাড়া রোমান্টিকতা ও বাস্তবতা নামধেয়, যে দু'রকমের প্রবৃত্তি সাহিত্যক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল এবং ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির যে দ্বৈতধারার প্রবাহ, স্টাইলের চরিতার্থতার ক্ষেত্রে এই দু'য়ের অন্বয় এক প্রাথমিক প্রয়োজন।

এই আন্তরধর্মই শ্রেষ্ঠ স্টাইলের একমাত্র সত্য নয়, শব্দ ও বাক্য যোজনার কৃতিত্বের ব্যাপক ভূমিকাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়! ফ্লবার্ট বোধ হয় এই বিষয়ে সবচেয়ে বিস্ময়কর নিষ্ঠা দেখিয়েছেন; তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মহৎ আঙ্গিকের আধার ভিন্ন মহৎ ভাবনার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়, তেমনি মহৎ ভাবনা অপরিহার্য মহৎ আঙ্গিক রচনার জন্য। বাক্যকে ভাবের অবিকল প্রতিরূপ করে গড়ে তোলার যে নিষ্ঠার তিনি অধিকারী, তাঁর স্টাইলের সঙ্গে তার যোগ এবং ফ্লবার্ট-প্রসঙ্গ একটা দৃষ্টান্তমাত্র স্টাইল সম্পর্কিত সেই সূত্রের যেখানে শব্দ-প্রয়োগ ও বাক্যযোজনার আর্টকে সাহিত্য-শিল্পের পক্ষে একটা বড় রকমের সাধনার বিষয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। তত্ত্বের দিক থেকে স্টাইলের এই সংক্ষিপ্ত অথচ নির্বাচিত পটভূমিকায় বলেন্দ্রনাথের রচনার আলোকিত প্রতিষ্ঠা; এবং 'আজন্ম রচনা-রসিক' বলে প্রিয়নাথ সেন যে বলেন্দ্র-প্রতিভার নির্দেশনামা রচনা করেছেন, এই সূত্রে তার অর্থ সারবান হয়ে উঠতে পারে।

স্টাইলের আদি ও চরম পরিচয় ভাষায়; বলেন্দ্রনাথের ভাষা ছিল তাঁর সাধনার ফল। এই কথাগুলি মোটামুটিভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের এবং তাঁর ভাষা কি ভাবে কারিকরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য হয়ে উঠেছিল, সেই তথ্য বিশ্লেষণেও রামেন্দ্রসুন্দর উৎসাহীর ভূমিকা নিয়েছেন। আর সমালোচকরা মেনে নিয়েছেন বলেন্দ্রনাথের রচনার পেছনকার সচেতন অনুশীলনের পর্বকে। অনুশীলনের সেই জনান্তিক অধ্যায় তাঁর ভাষা ব্যবহারকে কেবলমাত্র বৈয়াকরণিক বা যান্ত্রিক করে তোলে নি; সেই মূঢ় সম্ভাব্যতার হাত থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন সহজে : দুর্লভ সেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারে; এবং ভাষার দ্বৈতধর্ম—গতিধর্ম ও সঞ্চারণধর্ম—অচিরেই তাঁর রচনায় প্রতিষ্ঠিত হলো। তবু অনন্যপরতন্ত্রতা বলেন্দ্রনাথে অনুপস্থিত, এই সময়ে প্রকাশিত 'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'কল্পনা'র আবেগ ও আদর্শের আকর্ষণ অমোঘ ছিল তাঁর কাছে, অত্যন্ত কাছের আলোক-বলয় রবীন্দ্রনাথের।

সোনার কাঠি বলে যদি কিছু থাকে, বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার অপর নাম সৌন্দর্যবোধ। সৌন্দর্যকে দেখবার একটা মৌলিক শক্তি আছে, আর এই শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন সংস্কৃতকাব্য ও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যমহল থেকে। এবং তাঁর স্বভাবগত সৌন্দর্য পিপাসা আর সংস্কৃতকাব্যের প্রভাবের সঙ্গেই তাঁর স্টাইলের তথা ভাষার সমস্যা জড়িত, এ-জাতীয় অনুমানে অসঙ্গতির ভাগ কম! অধ্যাপক বিশী বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ও সৌন্দর্য সম্ভোগের মধ্যে 'কীটসীয় দৃষ্টি ও মন' আবিষ্কার করেছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে এ-হেন আবিষ্কারের পরিতৃপ্তি সংশয় রাজ্যের আবাসিক; কিন্তু সরলভাবে এ কথা মেনে নেওয়ায় ক্ষতির ভাগ কম যে. তাঁর রচনার আভিজাত্য মোটামুটিভাবে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যবোধের সততার সঙ্গে সংযম-শালীনতার যে অভেদসূত্র নির্ণীত এ তারই পরিণাম মাত্র। ফলত সংযম নামক একটি প্রবৃত্তিতে তাঁর এই অধিকার সৃষ্টিকে সামঞ্জস্যের সুদেহ দিয়েছে, অখণ্ড চেতনার মানসিক বিশ্বাস তার প্রাণবিন্দু, যাকে 'অন্বয়' বললে অন্যতর মানে হবে না, ভাব ও রূপ, বক্তব্য ও প্রকাশ, ভাষা ও রীতি, বস্তু ও মনন প্রভৃতির অন্বয়, যাকে খুব অর্গ্যানিক বলে কখনো কখনো মনে হতে পারে।

এই অখণ্ডতাবোধের এক কৌতূহলোদ্দীপক স্বপক্ষ বলেন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে প্রধানত তাঁর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে। বিচিত্রের ডাকে তিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে বিষয়-বৈচিত্র্য বলেন্দ্র-রচনার গৌরব, তথাপি ব্যক্তিত্বের ফলন-জাত ঐক্য তার সাধারণ ধর্ম। অথচ এ-সম্পর্কে মতান্তর নিষ্ফল যে, বলেন্দ্রনাথ মূলত অতীতাশ্রয়ী। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত তাঁর পলায়নী মনোভাবের উত্থাপন যা ভ্রমাত্মক। 'ক্ষণিক শূন্যতা' প্রবন্ধটি এই সূত্রে তাঁর মনোভাবের ধারক এবং ভুলের প্রতারক হাতকে সংবৃত রাখবার জন্যেই 'ক্ষণিক শূন্যতা' বিশিষ্ট মনোযোগের প্রয়োগ ক্ষেত্র হওয়া উচিত। কালের হিসাবে অতীতই সমগ্র ও অখণ্ড; অতীত-চারণ, ফলত বলেন্দ্র-নিয়তিমাত্র।

তাছাড়া আছে নাট্যকারের দীপ্তি, বুদ্ধির বন্ধুত্ব। পরিজ্ঞাত তাঁর

ক্ষুদ্র, নিঃসঙ্গ বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তুলবার রহস্য, বর্ণনার অর্থযুক্তি ও তার চিত্রধর্মে দীক্ষা, রসমূল্য সম্পাদনে বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ-প্রক্রিয়া।

জীবনের রসতীর্থের অনুরাগী বৈরাগ্যের স্পৃহাহীনতায় উজ্জ্বল। সাহিত্যে। জীবনে। সাহিত্যজীবন তো ব্যক্তিজীবনেরই অনুবাদ। আসক্তি ও নিরাসক্তি একরকমের পরিভাষা, যা আমরা ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করি। শিল্পবোধই বলেন্দ্রনাথের ধর্ম, এই বিবেচনার বশবর্তী হবার হেতুও যথেষ্ট; ফলত, এই পরিভাষা অদ্বৈত সম্পর্কে শিল্পধর্ম তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সহজসূত্রে ব্যবহারসাধ্য এবং বলেন্দ্রনাথের সাধনার সত্যও এই পরম অদ্বয়েরই বিগ্রহমাত্র।

তথাপি কখনো কখনো মনে হতে পারে যে বলেন্দ্রনাথের ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঋজু, একমুখী এবং তাতে সংঘর্ষের সম্ভাব্য সূত্রগুলি প্রায়শ উপেক্ষিত। বোধ হয় বিষয়ের অখণ্ড অদ্বৈতসত্য বিগ্রহরূপে স্থাপিত বলেই বলেন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে অত্যন্ত অসহায়। অথচ দ্বৈতভাবই (duality) পদার্থের ধর্ম। বাহির ও ভিতর,—পদার্থমাত্রেই এই দ্বৈতধর্মে স্থিত এবং এই দ্বিত্বই সৃষ্টিশীল রচনায় মৌলিক আধার। বলেন্দ্রনাথ বিষয়ের এই মৌলিক সত্যটিকে হয় তো যথেষ্ট বিবেচনা দ্বারা গ্রহণ করেন নি, যার স্বাভাবিক পরিণাম বক্তব্যের অতিশয় সরলীকরণ হতে বাধ্য, অথচ বিষয় চারিত্রের আভ্যন্তরীণ প্রবাহ ও প্রতিরোধ তাকে সমগ্র করে তুলবার পক্ষে সহায়ক ও তার দ্বান্দ্বিক জঙ্গমতা রস-ভাবনার সার্বিকতার পরিপোষক। এর প্রধান কারণ সম্ভবত পক্ষপাতিত্ব, যা অত্যন্ত দুর্বল ও মৃদু, কেন না পক্ষপাতিত্ব যে কোন রচনার একটি সাধারণ গুণ, যাকে বলা যায় 'বক্তব্য' এবং লেখক সেই বক্তব্যকে তীব্র ও শাণিত উপযুক্ততা দান করবার জন্যই আপাত-নিরপেক্ষতার দ্বারস্থ, অর্থাৎ প্রতিপক্ষও সেখানে মর্যাদায় প্রসাধিত। প্রতিপক্ষের প্রতি মনোযোগ কাজেই আত্ম-পক্ষের ভিত্তি রচনা মাত্র, নিয়মতন্ত্র হিসাবে লেখকরা যা মোটামুটি ভাবে মেনে চলেন।

বলেন্দ্রনাথের সত্যিই কি কোন 'বক্তব্য' ছিল? তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহ থেকে বিচিত্র নামের প্রবন্ধ যখন অনুসরণ করা যায়, তখন ঐক্য চিন্তাকেই তাঁর একমাত্র ধ্যানবস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। এবং বলা বাহুল্য, ধ্যানের এই বিশিষ্টশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল; যে কোন সাধনার অর্থই সম্ভবত রক্তাক্ত আত্মার যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্য নিবিষ্টতা। এই যন্ত্রণার স্বরূপ-বিভেদ সম্ভব, বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও শিল্পের কান্না গুরুতর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত, তথাপি তাঁর সৃষ্টি যদি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আর্তনাদকে নিপুণভাবে বর্জন করে থাকে, তবে না ভেবে উপায় কি যে সেটা সচেতনেতা দ্বারা শাসিত, অথবা তিনি ইতিমধ্যেই সমাহিতি অর্জন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিগুলি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং মাত্র উনত্রিশ বৎসরের যুবকের পক্ষে তার নগ্ন নির্জন স্পর্শ অতিক্রম করে সমাহিত হওয়া কতখানি সম্ভব? অথচ তাঁর রচনায় বার বার যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জর্জরতা নিয়ে অনুপস্থিত, তা প্রায় সাধারণ সত্য। প্রধানত এই দিক থেকে তাঁর রচনাবলীকে কতখানি ব্যক্তিগত রচনা বলা উচিত তা ভেবে দেখা দরকার, কেন না 'পার্সোনাল রেসে' বলেই তাঁর সমুদয় রচনার মৌলিক প্রতিষ্ঠা।

আমরা প্রায় প্রত্যেকেই এ বিষয়ে সচেতন যে 'ব্যক্তিগত' শব্দটি অত্যন্ত উদার; এবং এর বিধিবদ্ধ কোন সংজ্ঞা নিবেদন করা বোধ হয় অসম্ভব। বিচিত্র প্রবন্ধে সংকলিত প্রবন্ধগুলির চেয়েও রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন পত্রাবলী (আঙ্গিক নির্দিষ্টতা মুছে নিলে যেগুলি রচনাসাহিত্য হিসাবে স্মরণীয়) বা অন্তবিধ কোন কোন রচনা অনেক বেশি পার্সোনাল। ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গ তার অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে বলেও বটে, আবার তার অনুকূল রীতিচর্চার জন্যও বটে। ব্যক্তিগত ভাবের নির্মিতিও অবশ্য ব্যক্তিগত আখ্যায় ভূষিত হয়ে থাকে, কিন্তু রোমান্টিক মন্ময়তায় যে ব্যক্তিস্বভাব উন্মোচিত, তা আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত। অভিজ্ঞতা প্রধানত নিরাসক্তি উদ্বোধক, অথচ আসক্তিস্পৃষ্টতাই রোমান্টিক ধর্মের কুললক্ষণ।

বলেন্দ্রনাথের আসক্তিহীনতা সম্পর্কে কোথাও কোথাও আমরা যে সোচ্চার, তার অবশ্য কারণ আছে। সেটা মূলত একটা শিল্পগুণ হিসাবেই বলেন্দ্রনাথে প্রমূর্ত। নতুবা তিনি যে অনেকাংশে মুগ্ধমতি তাতে সন্দেহ কি। বিস্ময়বোধ তাঁর এক চরিত্রধর্ম এবং রোমান্টিক লক্ষণের সঙ্গে তার বৃত্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত। ফলত, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি রোমান্টিক গোত্রের, আর রোমান্টিক রচনা যে-অর্থে পার্সোনাল, বলেন্দ্ররচনাও সেই অর্থে ব্যক্তিগত এবং তাঁর নিরাসক্তি মননচর্চা দ্বারা অর্জিত।

অন্যভাবেও অবশ্য এর উৎসসন্ধান সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় ক্লিষ্ট মনকে তিনি হয় তো কোন এক আশ্বাস শোনাতে চেয়েছিলেন, নন্দনচর্চার দ্বিতীয় জগতে দ্বিতীয় জীবনের মধ্যে। এই জন্যই ঘন হতে পেরেছিল তার নিবিষ্টতা, চিরদিন এই শিক্ষানবিশী নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের বাইরে ঠাকুর পরিবারে আর কোথায় এত উজ্জ্বল? এ-ও একরকমের প্রতিক্রিয়া অবশ্য জীবনের বর্ণোজ্জ্বল সফল দিকগুলির মধ্যে তবু তাঁর অনুসন্ধান নিরন্তর। এ স্বাভাবিক; কিন্তু তাঁর এক রুদ্ধ কুঠরী ছিল, অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর, এক অমোঘ প্রতিরোধের মতো, তবু আত্মহননের সংগীতে বলেন্দ্রনাথ অনুৎসাহী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এই কবরগর্ভ থেকে এক রকমের নির্মোহ জন্ম নেয়, যা প্রতিক্রিয়ারই সন্ততি, ব্যক্তিকে তা প্রায় আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তা প্রধানত সোচ্চার। তখন তার অভিব্যক্তি যতটা প্রখর হয় ততটা প্রগাঢ় নয়, পরিহাস প্রবণতা তার প্রায় সামান্য ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। মমতাহীন দৃষ্টির আড়ালে বেদনা থাকে অবশ্য, বিশ্বাস-প্রাণতা অবিশ্বাসী আত্মপ্রকাশের অন্তরালে বন্দী প্রেরণার মতো অবসিত হয়। অর্থাৎ প্রকরণগত দিকে এ-জাতীয় শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে, রোমান্টিক কল্পচারিতার রাজপথে তাঁরা আগ্রহ দেখান না, কেন না জীবনের নিষ্ঠুরতা থেকে যে অভিজ্ঞানে তাঁদের অধিকার বর্তে, সেখানে এর ভূমিকা প্রধানত প্রতারকের। নিষ্ঠুরতাকে নির্মম অভিজ্ঞতারূপে ধারণ করবার মতো বয়স বলেন্দ্রনাথ অর্জন করতে পারেন নি বলে হয় তো এই প্রত্যাশিত লক্ষণগুলি লুপ্তাকারে থেকে গেছে, নতুবা কিছু আয়ু, যা তাঁকে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির উপযোগী করে তুলতে পারতো, তাঁর ভূমিকাকে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বে স্থাপন করবার পক্ষে সহায়ক হতো। সম্ভাবনার ওপর সাহিত্যের বিচার সম্পাদিত হওয়া উচিত নয় অবশ্য, কিন্তু বলেন্দ্রনাথ বোধ হয় তাঁর শিক্ষানবিশীর পরিপূর্ণ ফললাভ করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রত্যয়ে স্বক্ষেত্রে পদচারণ শুরু করে যেতে পারেন নি।

রোগ ও মনীষী

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

আপনি খুব ভুগছেন, না? হাঁপানি, যক্ষ্মা, ক্যানসার, আলসার, হার্ট-ডিজিজ···হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে যান, তালিকা বাড়াতে আমার আপত্তি নেই। রোগ নেই এমন মানুষ আছে নাকি জগতে? সোনার পাথরবাটি সে তো মশায়! সেই গৌতম বুদ্ধের এক গল্প আছে, না? যে বাড়ীতে কেউ কখনো মরে নি এমন বাড়ী থেকে সরষে নিয়ে এস। এ বাড়ী, ও বাড়ী, সে বাড়ী,—প্রতি বাড়ী ঘোরা হোল সার, কিন্তু সরষে আর মিলল না।

মানুষের সাথী যেমন রোগ, তেমনি রোগের সাথে আছে যন্ত্রণা। যন্ত্রণা জীবনের মূল্য। আপনি যে বেঁচে আছেন সেটা মালুম হয় যন্ত্রণা বা বেদনার মারফৎ। যন্ত্রণা বা বেদনার জ্বালায় এপাশ-ওপাশ করছেন, চীৎকার করছেন—আর বুঝছেন, হ্যাঁ, বেঁচে আছি বটে। স্রেফ বেঁচে থাকাটাও যে একটা কত বিরাট কাজ তা' বুঝে আনন্দিত হচ্ছেন। আপনি কর্মী, আপনি সৈনিক যেন—ডন কুইকজোটের মত একটা শিভালরীর 'স্পিরিট' জেগে উঠে সাথে সাথে—অদৃশ্য সহস্র জীবাণু দ্বারা সংগঠিত দুর্ধর্ষ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আপনার এই সংগ্রাম—যন্ত্রণা তার ক্ষতচিহ্ন উপহার। কিন্তু আপনি কিছুতেই হঠছেন না, হেমিংওয়ের বুড়ো জেলের কথা আপনার যেন মনে হচ্ছে Man is not made for defeat।' মনীষীরা জীবন দিয়ে বুঝেছেন একথা। রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীই তো বলে গেছেন—'বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ।' আর তার ফাউ বা ফেউ, যা-ই বলুন না কেন, যন্ত্রণা বা বেদনা লেগে আছেই পিছনে। তাই বলছিলাম, রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন (কি ভাবছেন, আত্মহত্যা করবেন? আহা দেখবেন, কেউ যেন শুনতে না পায়! প্রথমত, কাপুরুষের লজ্জা, দ্বিতীয়ত, আইনের কটাক্ষ।), ঘাবড়াবেন না, বা—রবীন্দ্রনাথের নীরজার মত অক্ষয় বড়ালের 'এষা' কাব্যটিও চাইবেন না, দয়া করে আমার লেখাটি পড়ুন। কত মনীষী রোগের যন্ত্রণা, জীবন যন্ত্রণায় ভুগেছেন, তবু ক্ষান্ত হন নি বরং অপ্রতিহত উদ্যমে প্রতিভার বিকাশে ঘটিয়ে গেছেন, অর্থাৎ নিজের প্রকাশ। সকলের কথা কি মনে পড়ছে, ছাই! তবু যাঁদের কথা সত্য সত্য মনে পড়ছে তাঁদের কথাই বলি।

প্রথমেই রোগশীর্ণ নিউটনের কথা মনে পড়ছে। কি ক্ষীণকায় স্বাস্থ্য। খাওয়া সহ্য হয় না, বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, ঘরের ভিতর অস্বস্তি। বেঁচে থাকার মধ্যে এতটুকু যদি স্বস্তি থাকে! তবু নিউটন শরীর নিয়ে বিব্রত হন নি। গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে চিন্তা করতে করতে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কার করে ফেললেন, অথচ অসুখের পীড়ন তাঁকে বাধা দিতে পারল না।

ভলটেয়ারের মত চালু ও করিৎকর্মা লোক ক'জন আছেন এ জগতে? ইংলণ্ড ঘুরলেন, ফ্রান্সে থাকলেন, প্রুশিয়া গেলেন, কত কাঠ, খড়, কেরোসিন পুড়লো, স্বয়ং স্বতন্ত্র অনন্ত মর্যাদায় সুইজারল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হলেন; রাজনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি, সাহিত্যচর্চা, ঘড়ির ব্যবসা—জীবনে কত কি করলেন, অথচ—লোকটার ছবি দেখেছেন? লিটন স্ট্রেচি খুব সুন্দর বলেছেন, 'His long, gaunt body, frantically gesticulating, his skull like face, with its mobile features twisted into on eternal grin, its piercing eyes sparkling and darting—all this suggested the appearance of a corpse galvanized into an incredible anination'. যেন ঘাটের মড়া আর কি! অথচ লোকটি সজীবতার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই তো বলি, শরীর খারাপ, এই বুঝি ওজন কমল, রোগা হয়ে গেলেন, এসব ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি কত কি করতে পারেন।

আমেরিকার ২৬তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের বাল্য নাম টেডি। টেডি রুগ্ন-শীর্ণ, হাঁপানিতে জর্জর। রাত্রিবেলায় প্রায় দেখা যেত, তাঁদের বাড়ীর গাড়ী ডাক্তারের কাছে তাঁকে নিয়ে চলেছে। ছেলের ভবিষ্যৎ যে কি হবে তা বাপ-মা ভেবে কূল পান না, যাকে বলে দিশেহারা। ছেলে প্রায় অকর্মা হয়ে পড়ল। তাঁর বাবা তাঁকে স্নেহ করতেন। একদিন তিনি উপদেশ দিলেন, মনের জোর থাকলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, মূক বলতে পারে কথা। টেডি অদম্য উৎসাহে শরীরচর্চায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর বাসনা সিদ্ধ হোল। যিনি খেলার মাঠের ধারে ঘেঁষতেন না, তিনি দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠলেন। আমেরিকার দেশনায়ক হয়ে উঠলেন। তাঁর মত চিন্তাশীল মানুষও কম আছে। বই পড়া তাঁর নেশা। সে সময় তিনি একজন সেরা পড়ুয়া ছিলেন।

ইংরেজ কবি কীটস তরুণ বয়সে যক্ষ্মায় মারা গেলেন। একদিকে মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে, তার যন্ত্রণা ও ক্লান্তি জীবনকে ম্রিয়মাণ করে তুলেছে, অন্যদিকে প্রেমের রক্তরাগ আশ্বাসহীন পাণ্ডুর জীবন যন্ত্রণার মধ্যে মুহ্যমান হয়েছে, তবু সেই ছোটখাট মানুষটির অন্তরের প্রেরণা ও প্রতিভা হারিয়ে যায় নি, সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-সৃষ্টির স্বর্ণ স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

মোপাসাঁ ভীষণ সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মাথার অসহ্য যন্ত্রণা, চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসে। লিখে প্রচুর টাকা রোজগার করছেন, কিন্তু রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করেন। বড় বড় ডাক্তারকে দেখান। কিন্তু রোগমুক্ত আর হন না। রোগের যন্ত্রণায় তিলে তিলে কষ্ট পেতে থাকেন। অসহ্য হয়ে ওঠে, গলায় ক্ষুর বসান। চাকর দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। হাসপাতালে পাঠানো হয়। রোগের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যান মোপাসাঁ। বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের অন্যতম জনক ও শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি রোগের যন্ত্রণায় ভুগেছেন, তবু তাঁর কলম ছাড়েন নি।

ইংরেজ কবি উইলিয়াম কাউপার সমস্ত সমাজ থেকে দূরে

বালক বিদ্যাসাগর

শ্রীকালিদাস রায়

কত রূপে হেরি তোমা বহুরূপী হে মহাসাগর !
দুঃখের আঁধার রাতে দীপ্ত চূড় তরঙ্গে ভাস্বর ।
পূর্ণিমার চন্দ্রিকায় করুণাক্ত আনন্দে উজ্জ্বল,
সংগ্রামে ঝঞ্ঝার সাথে উদ্বেল উচ্ছল ।
বিগলিত মর্মের নীলিমা
মিশিয়া ব্যোমের অঙ্গে খুঁজিয়াছে অনন্তের সীমা ।

তোমার ঘটনা-ঘন জীবনের কথা

স্মরিয়া স্তম্ভিত কভু কখনো বা পাইয়াছি ব্যথা ।
সকলি ভুলিয়া গেছি, স্মরি যবে জীবন তোমার
একটি নগণ্য তুচ্ছ চিত্র মনে জাগে বারংবার :

দরিদ্র-সংসারে তৈল বাতি কোথা পাবে ?
গৃহে তাই আলোর অভাবে
পথের আলোর পাশে পুঁথিখানি হাতে,
পড়িছ তদ্‌গত চিত্তে দাঁড়াইয়া একা ফুটপাথে ।
জন কোলাহলময় পাশে রাজপথ
নিনাদি' চলিয়া যায় কত অশ্বরথ ।
রজনী ঘনায়,—
কার্তিকের মুঠা মুঠা শ্যামাপোকা ঝরে তব গায়,
উড়িছে শলভকুল মাথার উপরে ।
বাহ্যজ্ঞান শূন্য তুমি মগ্ন তুমি পুঁথির অক্ষরে ।

কত লোক আসে যায়, চাহিল কি কেহ অপলকে ?
চিনিল কি মহামানবকে ?
দেখিল কি সর্বংসহ দৈন্যহিম মাঝে,
স্ফুলিঙ্গাবস্থায় বহ্নি 'এধাপেক্ষ' হইয়া বিরাজে !*

* স্ফুলিঙ্গাবস্থয়া বহ্নিরেধাপেক্ষ ইব স্থিতঃ । কালিদাস

একাকী নির্জনে বিষণ্ণ মনে বাস করতেন । জীবনযন্ত্রণা একদিকে তাঁকে সমাজ বিমুখ করে তুলেছে, অন্যদিকে রোগের যন্ত্রণা তাঁকে বেদনাখিন্ন বিধুর করে তুলেছে । মিসেস আনউইন তাঁর সহৃদয় সঙ্গিনী হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন । সাধারণ তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মত সরল আন্তরিকতায় মাখা অনেকগুলি কবিতা তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ভাণ্ডারে উপহার দিয়ে গেছেন ।

মার্শাল প্রুস্ত প্যারিসে চিলেকোঠার এক ঘরে থাকতেন । বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন । হাঁপানির হাঁপর তাঁর বুককে সব সময় মন্দ্রিত ও স্পন্দিত করে তুলেছে । বেশি কথা বলতে পারেন না, বাইরে চলাফেরা ভালোভাবে করতে পারেন না । নিজের মধ্যে নিজে বন্দী থাকতেন । কিন্তু তাঁর প্রাণে যে আছে অদম্য প্রতিভা । বন্দী বিহঙ্গের মত তা মুক্তি খোঁজে । নিজের মনের গভীরে ডুব দেন । মনের প্রতিটি ভাব-ভাবনা আলো-আঁধারি স্বপ্ন কল্পনাকে তিনি ভাষার বন্ধনে বেঁধে ফেলেন, লেখেন এক নতুন ধরণের উপন্যাস ।

সমার সেট মমের যক্ষ্মা হয়েছিল । একদিকে যক্ষ্মার আক্রমণ অন্যদিকে ডাক্তারী পেশা ছেড়ে অনিশ্চিত সাহিত্যিক পেশাকে বরণ করে নিয়ে দুর্বিপাকে পড়েন, কিন্তু প্রতিভা অদম্য । তাই সমস্ত কিছু দুর্বিপাক অতিক্রম করে তিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সহ উত্তীর্ণ হলেন তাঁর লক্ষ্যে ।

আরও কত উদাহরণ দোব বলুন ? মনে পড়ছে ব্রণ্টী ভগ্নীদ্বয়ের কথা, তরু দত্তের কথা, ল্যাম্বের কথা, কোলরিজের কথা, হ্যাট হ্যামসুনও এই তালিকায় আসছেন ; মিল্টন অন্ধ হয়ে গেলেন, এডিসন ছিলেন বধির, হেলেন কেলার অন্ধ হয়েও দমলেন না । সুভাষচন্দ্রের প্লুরিসি হল, চিত্তরঞ্জনের যক্ষ্মা ; মহাত্মা গান্ধী প্লুরিসিতে আক্রান্ত হলেন, রাজেন্দ্র প্রসাদ হাঁপানিতে ভুগতে লাগলেন । রবীন্দ্রনাথ জীবনে পেলেন কত শোকের বেদনা; শেষজীবনে রোগের আক্রমণে হলেন শয্যাশায়ী, তবু রোগশয্যায়ও তাঁর কবিতাকে ভুললেন না । তাই বলছিলাম, রোগে ভুগছেন, ঘাবড়াবেন না, দমবেন না—অমৃতের পুত্র মানব আপনি ।

যৌনচেতনা ও সমকামিতা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিশ্ববিখ্যাত যৌনবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীগণ নরনারীর সমকাম সম্বন্ধে অজস্র গবেষণা করেছেন এবং এখনও করছেন। যৌনচেতনা পুরুষ এবং নারীর মনে সমকামের যে উৎসমুখ খুঁজে দেয় তার পেছনে আরও অনেক কারণের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে Freud, Ferenezi, Stekel, Moll প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বয়ঃসন্ধির সময় যৌন-চেতনা দেখা দেওয়ায় সমকামিতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।—লেখক]

কৈশোরকালের অব্যবহিত পরে তরুণ ও তরুণীর দেহে যে বয়ঃসন্ধিক্ষণ দেখা দেয় তাকে নব যৌবনেরই যাত্রা শুরু বলে চিহ্নিত করা যায়। এই সময় অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলি নতুনতরভাবে তাদের রসের ক্ষরণ করে। এই সময়ে জীবনে আসে এক বিচিত্র উন্মাদনা—সে সময়ে তরুণ-তরুণী নিজের দেহকে সবচেয়ে বেশী করে ভালোবাসে। নিজের দেহকে পরিপূর্ণভাবে জানতে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী হয়। তার ঠিক পরবর্তী অবস্থাতেই তরুণ চায় তরুণের সঙ্গ—তরুণী চায় তরুণীর সঙ্গ। এই অবস্থাকেই ফ্রয়েড বলেছেন 'stage of homo-sexuality'—বা সমকাম! এই সময়ে তরুণ-তরুণী উভয়েই যৌন সচেতন হয়ে ওঠে।

সমকামিতা সম্বন্ধে বহু যৌনবিজ্ঞানী গবেষণা করলেও তাঁদের মন্তব্য সর্বত্র সমান নয়। সমকামকে কেউ বলেছেন স্বাভাবিক, কেউ বলেছেন অস্বাভাবিক—কারও কারও মতে নর-নারীর সমকামপ্রবণতা সহজাত, আবার কেউ কেউ বলেন এটি একান্তই অভিজ্ঞতাজাত। প্রবন্ধটিতে তাঁদের অভিমত আলোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রখ্যাত চিকিৎসক Conolly Norman তাঁর Sexual Preservation' নামক প্রবন্ধে জোর দিয়ে বলেছেন যে বয়ঃসন্ধিক্ষণে (১) তরুণ-তরুণীর মনে যে বিপুল যৌনচেতনা দেখা দেয়, তা কোন নির্দিষ্ট বয়সের জন্য বসে থাকে না। তাঁর মতে এই উদ্দাম যৌনচেতনাকে যে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। সে পথ ভ্রান্তও হতে পারে আবার সঠিকও হতে পারে। এবং সেই পরিবেশে তারা এক একটি অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে, অনেক বয়েস পর্যন্তও যা অব্যাহত থাকে।

মনস্তত্ত্ববিদ Moll-ও Norman-এর অভিমতকে সমর্থন জানিয়ে বলেছেন যে, বালক-বালিকার মধ্যে সমকামিতা প্রায়ই দেখা যায়। এবং ধীরে ধীরে যখন বয়স বাড়ে তখন সমকামের ইচ্ছা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। Moll স্বীকার করেছেন যে, সমকামিতার প্রবল আকর্ষণ কখনও কখনও ভয়াবহতার সন্ধান দেয়। তাঁর এই মত যে কতদূর সত্য তা একটি ঘটনার উল্লেখেই বোঝা যাবে। (২)

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিবাহ পরামর্শদাতৃ (Marriage guidance counsellor) Dr. Wendy Greengross সম্প্রতি একটি তথ্য উদ্‌ঘাটিত করে বলেছেন যে ইংল্যাণ্ডে একটি ১২ বছরের বালক তার একজন ১৩ বছর বয়স্ক সহপাঠীকে গুলী করে হত্যা করে—গোয়েন্দা বিভাগের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই দু'টি বালক (হত্যাকারী ও নিহত) একটি সুন্দরদেহী ১১ বছরের বালকের ওপর নিজেদের যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি ঘটাত। ফলে তারা দু'জনেই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে এবং তারই পরিণতিস্বরূপ এই হত্যাকাণ্ড।(৩)

১৯০১ সালে ফ্রয়েডের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে ফ্রয়েড স্বীকার করেছেন যে বয়ঃসন্ধিক্ষণে তরুণ-তরুণীরা সমকামী হয়ে ওঠে—এই ব্যাপারটি একরকম শারীরিক ধর্ম! প্রত্যেক মানুষের মনেই এই প্রবণতা থাকে এবং পরিবেশ অনুসারে তার উল্লাস অথবা নিবৃত্তি ঘটে। সাধারণত সুস্থচেতনায় তরুণ-তরুণীরা সমকামে লিপ্ত হয় না।

Ferenezi-র মতে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলে মেয়েদের যৌনচেতনা সম্পূর্ণ সমলৈঙ্গিক নয়!—Ambisexuality' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন না নারীর না পুরুষের। তিনি অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদদের সম্পূর্ণ স্বীকার না করে বললেন বয়ঃসন্ধিক্ষণে তরুণ-তরুণীর কাম-প্রবৃত্তিকে সমকামিতা না বলে উভকামিতা বলাই ভালো। Stekel ও Ferenzi-র অভিমত সমর্থন করেছেন। ফ্রয়েডের মন্তব্যকে তাঁরা কেউ-ই সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মতে জন্মের পূর্বে শিশু উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় থাকে এবং গর্ভে অবস্থান কালেই তাদের একটির অপুষ্টি ঘটে! তাই প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নারী-পুরুষের সব ভাবের মিশ্রণ কম বেশী দেখা যায়।

এইজন্যে দেখা যায় যে জেলে, জাহাজে অর্থাৎ যেখানে নারী-সাহচর্য পাওয়া একরকম দুর্লভই বলা চলে সেখানে প্রায় প্রত্যেক পুরুষের মনেই সমকামপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, অনেক সময় দেখা যায় প্রবাসী স্বামী স্ত্রীর অভাবে সমকামী হয়ে ওঠে!

১। সমকামিতা সম্বন্ধে আলোচনায় বয়ঃসন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে দু'-একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিস্থলে যে ক্ষণিকের উদ্দামতা প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অপরূপ স্বপ্নমদির ভাব জাগিয়ে তোলে শেলী তাকেই বলেছেন Grand passion, কাম-তত্ত্ব বিশারদগণ যাকে বলেছেন Adolescence—বৈষ্ণব কবিরা যাকে বলেছেন 'নব্য-যৌবন'—তাকেই আমরা বলি—'বয়ঃসন্ধিক্ষণ!' বয়ঃসন্ধির এই স্বল্পক্ষণে যুবকেরা তাদের একক শয্যায় উদ্দাম বাসনায় রাত কাটায়, আর স্বপ্ন দেখে শয্যা-সঙ্গিনীর—আর যুবতীরা সে-সময়ে মনের নিভৃত বেদীতে বীরপূজা করে। বয়ঃসন্ধির সেই মুহূর্তে তরুণ-তরুণীর মানর অবস্থা সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত হলো—'A pleasant sense of Anticipation.

২। 'নর-নারী' পত্রিকা কার্তিক ১৩৬১ দ্রষ্টব্য।

৩। Statesman ১১ই মার্চ ১৯৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'প্রতাপ' নামে একটি সংবাদপত্রে একবার একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো, সমকামের সুস্পষ্ট উদাহরণ সেটি। খবরটিতে দেখা যায় যে বয়েজ স্কাউটদের শিবিরে শিবিরে, শিক্ষকদের ভিতরে অনেকে উর্ধ্বতম অফিসারদের তুষ্টি সাধনের জন্যে সুন্দর সুন্দর ছেলেদের পাঠাতো। প্রাচীন রোমে এর প্রচলন ছিল খুব বেশী। এমন কি, সক্রেটিস, প্লেটোও এই স্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। বিখ্যাত লেখক অসকার ওয়াইল্ডকে সমকামিতার জন্যে জেলে যেতে হয়েছিলো। শোনা যায় বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক রুশো, সোপেনহাওয়ার, নিটসে প্রভৃতিরাও সমকামী ছিলেন।(৪)

এমন অনেক পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা বয়ঃসন্ধির সীমা পেরিয়ে এসেও এবং স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করেও সমকাম প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বংশধারার কথা বলেছেন। ফ্রয়েডও স্বীকার করেছেন যে সমকামপ্রবৃত্তি একটি সাময়িক ব্যাপার, তা যখন স্থায়িরূপ লাভ করে কোন পুরুষের ক্ষেত্রে, তখন বুঝতে হবে যে তার পেছনে বংশধারা ক্রিয়াশীল। Moll-ও এই অভিমতের ধারক।

Krafft, Ebing, Nacki, Iwan Bloch প্রভৃতিরা শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে বয়ঃসন্ধিকালে সমকামিতা স্বাভাবিক; কিন্তু বিবাহের দীর্ঘদিন পরেও (৬০।৬৫ বছর বয়সেও) এবং পুত্রকন্যা লাভের পরেও যদি কেউ সমকামে লিপ্ত থাকে তবে বুঝতে হবে সে অসুখে ভুগছে এবং এটি তার বংশানুক্রমিক ব্যাপার।

৪। একান্ত প্রয়োজনীয়—লেখক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত।

সমকামিতা কেবল পুরুষদেরই একচেটিয়া অধিকার নয়, বরং অনেকের মতে পুরুষের চেয়ে নারীর সমকাম প্রবৃত্তি অনেক বেশী। অনুপাত হলো ৩ : ১। তার মানে একজন পুরুষ সমকামী হলে তিনজন নারী হবে সমকামী। মেয়েদের সমকামিতার প্রক্রিয়ার আলোচনা এখানে না করলেও চলবে। পুরুষদের সমকাম প্রবৃত্তি যে কারণে মনে জাগে, মেয়েদেরও সেই কারণেই এবং পুরুষেরাও যেমন সমকামের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে উদ্দাম হয়ে ওঠে, নারীও এ ব্যাপারে তেমনি বেপরোয়া।

সমকামিতা ভালো কী মন্দ, মানব-শরীরের ওপর তার প্রভাব কেমন তথা সমাজের পক্ষে তার প্রভাব ক্ষতিকর কী সুফলপ্রদ—এ নিয়ে আজও আলোচনার শেষ নেই। তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এই সিদ্ধান্তটি প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, বয়ঃসন্ধিক্ষণে তরুণ এবং তরুণীর মনে যে সমকামপ্রবৃত্তির স্ফুরণ ঘটে তা স্বাভাবিক। কিন্তু তার স্থায়িত্ব সাময়িক। সমকাম যদি জীবনের সবটা দখল করতে চায় তাহলে বুঝতে হবে সেক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই সমস্যার সমাধান করতে চিকিৎসক আছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো, যৌন-চেতনা ও তদনুযায়ী সমকামিতা তরুণ-তরুণীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এ কথা যেমনি সত্য, তেমনই সত্য হলো মাত্রাধিক্য সর্বক্ষেত্রেই অনিষ্টকর। কারণ অত্যধিক সমকামিতা শরীর ও মনের সুস্থতার মূলে কুঠারাঘাত করে, সমাজের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে—সেক্ষেত্রে, সমকামিতা যে শুধু আপত্তিকর তাই নয়, অপরাধমূলকও নিঃসন্দেহে।

দুই দৃশ্য

সমরেন্দ্র ঘোষাল

ঘন কফির উত্তপ্ত পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে
মেয়েটি বলল : 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত নই।'
প্রজ্বলিত চারমিনারটা দু' আঙুলে চেপে ধরে
ছেলেটি ছাই ঝাড়ল। তারপর সঘন একটা রিং
শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটির সংলগ্ন হল।

'তুমি দেখো আমার কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলবে'
—দীপ্ত কণ্ঠে জানাল ছেলেটি।

মেয়েটি আবার মাথা নাড়ল।

'না কিছুতেই নয়। যে আসছে আমি বাজী রাখছি
সে কখনই সোমা নামের অধিকারী হতে পারে না।
কেন না সে যে হবে তোমারই মত উন্নত শীর্ষ
সুন্দর সুঠাম এক বলিষ্ঠ পুরুষ।'

কফি-ঘরের ভারী বাতাসকে সহসা চমকে দিয়ে
ছেলেটি প্রতিবাদ জানাল : 'কখনই নয়।
সে হবে স্নিগ্ধা তোমারই মত কোমলমনা
কমনীয় এক শান্ত রমণী।
এ আমার তোমার বিরুদ্ধে সদর্প চ্যালেঞ্জ।'

উদ্বিগ্ন ছেলেটি এখন চোখে নিয়ে জিজ্ঞাসার ছায়া
ডাক্তারের চেম্বারে। স্ত্রীরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
সুধীর সেনের চেম্বারে।

চোখে মুখে বিষাদের ছায়া
যেন দীর্ঘকাল সম্ভোগের সমুদ্র দেখে নি।

'তাহলে কি সত্যিই তাই, সত্যিই কি তাই ডাক্তার সেন ?'
অবিশ্বাসের অন্ধকার ঘনায় ছেলেটির দুই চোখে।
'কোন সন্দেহই নেই।' প্যান্টের পকেটে হাত পুরে
একটা ক্যাপস্টান ধরিয়ে ধোঁয়াটা বাতাসে
মেলে দিয়ে বললেন ডাক্তার সেন।

'ভেরি সরি। আসলে ওটা একটা টিউমার
সি ওয়াজ নো ক্যারিং।'
ছেলেটির মনে হল সে যেন একতাল
নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

পাশের ঘরে মেয়েটি তখনও অপেক্ষারত
সংবাদের আশায়।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

দীপক বসু

১৩ই অগাষ্ট ১৯৬৩; সময় প্রায় সাড়ে বারোটা। বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা ও অধ্যয়নের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলেছে। হঠাৎ টেলিফোনযোগে ভেসে এল চরম দুঃসংবাদ—বিশ্ব-বিশ্রুত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র পরলোকগত হয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে সারা বিজ্ঞান কলেজে নেমে এল শোকের ছায়া। সব কিছু যেমনি ছিল, তেমনি পড়ে থাকল; যিনি যে অবস্থায় ছিলেন বেরিয়ে পড়লেন। শুধু বিজ্ঞান কলেজেই নয়, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও একই অবস্থা। গন্তব্যস্থল সকলেরই এক—বালিগঞ্জের ১নং হিন্দুস্থান রোড। এখানেই অধ্যাপক মিত্র বেলা পৌনে বারোটায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিবিদ—কেউই বাদ ছিলেন না। বিকেল প্রায় ৫টার সময়ে শবদেহ তাঁর প্রধান কর্মস্থল বিজ্ঞান কলেজের ইন্‌ষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স এ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্সে নিয়ে আসা হল। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। সবাই ভেঙ্গে পড়েন প্রিয় অধ্যাপকের প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিজ্ঞান কলেজে প্রায় পঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ গৌরবময় কর্মজীবনের অবসান ঘটিয়ে অগণিত ছাত্র ও বন্ধুদের শ্রাবণের অশ্রুধারায় ভাসিয়ে পুষ্পমাল্য, চন্দন ও ধূপ-ধূনায় সজ্জিত শিশিরকুমারের মরদেহ ধীরে ধীরে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে অন্যান্য স্থান হয়ে কেওড়াতলার দিকে যাত্রা করল।

১৮৯০ সালে কলকাতায় শিশিরকুমারের জন্ম। ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় ভাগলপুরের জিলা স্কুল, টি, এন, জে, কলেজ ও তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর শিশিরকুমার বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯১৬ সালে স্যার আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর বিভাগের উদ্বোধন করলে অধ্যাপক মিত্র সেখানে পদার্থ-বিদ্যায় লেকচারার নিযুক্ত হন। এই সময়ে স্যার সি. ভি. রমণ পালিত অধ্যাপকরূপে এখানে ছিলেন। তখনকার তরুণ বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। শিশিরকুমারও অধ্যাপক রমণের সংস্পর্শে আসেন এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে গবেষণা করে ১৯১৯ সালে ডি. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন। এর পরই ডঃ মিত্র উচ্চতর গবেষণার জন্য ফরাসী দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন, সেখানে বিখ্যাত আলোক-বিজ্ঞানী প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্যাব্রীর কাছে কাজ করে ১৯২৩ সালে ডি. এস. সি. ডিগ্রী পাবার পর ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ রেডিয়ামে মাদাম কুরীর কাছে গবেষণা করেন। অতঃপর সেখান থেকে ন্যান্সীতে ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ফিজিক্সে অধ্যাপক গাটনের কাছে যান, এখানেই ডাঃ মিত্রের বেতার সংক্রান্ত গবেষণার সূত্রপাত।

১৯২৩ সালে দেশে ফিরে এসে ডঃ মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হ'লেন। এখানে তিনি বেতার বিষয়ে শিক্ষণ ও গবেষণা দুই-ই সুরু করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পরিষদের এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন। তবে তখনও বিজ্ঞান কলেজের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি! গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। ছয় বৎসর এই পদে থেকে ১৯৬২ সালে ডঃ মিত্র পদার্থবিদ্যায় জাতীয় অধ্যাপকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ফিরে আসেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাতীয় অধ্যাপক-রূপে গবেষণার কাজ পরিচালনা করে গেছেন।

যদিও অধ্যাপক মিত্র প্রথম জীবনে গবেষণা আরম্ভ করেন আলোকরশ্মি নিয়ে, তবে যে বিষয়ে অবদানের জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন তা' হ'ল 'আয়নমণ্ডল'। তাঁর এই কাজ সম্বন্ধে বুঝতে হ'লে আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার।

এ কথা আজ সবাই জানেন যে, আমাদের পরিচিত সকল পরমাণুই তিন প্রকার কণিকার দ্বারা গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে বা 'নিউক্লিয়াসে' আছে 'প্রোটন' ও 'নিউট্রন' কণিকা। এই কেন্দ্রের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে 'ইলেকট্রন' কণিকা। এদের মধ্যে ইলেকট্রন হ'ল নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী প্রোটন হ'ল পজিটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী আর নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা, যে কোন পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা এমন থাকে যে, ইলেকট্রনজনিত নেগেটিভ বিদ্যুৎ ও প্রোটন-জনিত পজিটিভ বিদ্যুৎ পরস্পর সমান। ফলে সম্পূর্ণ পরমাণুটি নিজে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ, এখন কোন উপায়ে যদি পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বা প্রোটন সরিয়ে

নেওয়া যায়, তবে পরমাণুর এই নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যাবে, পরমাণুটি যথাক্রমে পজিটিভ বা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী হয়ে পড়বে। এইরূপ বিদ্যুৎ-ধর্মী বিশিষ্ট পরমাণুকে বলা হয় 'আয়ন'।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডল প্রধানত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এ ছাড়া অবশ্য সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাসও আছে। আবার, আমাদের এই পৃথিবীতে জীবনধারণ সংক্রান্ত অধিকাংশ ঘটনাই সূর্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, এই সূর্য থেকে আগত শক্তিশালী অতিবেগুনী-রশ্মি ও রঞ্জনরশ্মি উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পরমাণুগুলিকে আয়নে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ফলে উচ্চ বায়ুমণ্ডলের মোটামুটি ৫০ কিলোমিটার থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এইরূপ আয়ন দ্বারা গঠিত এবং এরই নাম 'আয়নমণ্ডল'। আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান যা ধারণা তা নিম্নরূপ। এই অঞ্চল প্রধানত চারটি স্তরে বিভক্ত। ইংরেজী অক্ষর D, E, F ও F নামে তারা অভিহিত হয়, এই স্তরগুলি ভূপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি যথাক্রমে ৮০ কিঃ মিঃ, ১২০ কিঃ মিঃ, ২২০ কিঃ মিঃ এবং ৩৫০ কিঃ মিঃ উপরে অবস্থিত। আয়নমণ্ডলের অস্তিত্ব আজকাল আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। কারণ এর অভাবে দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ একেবারে অসম্ভব; আর বেতার ছাড়া এখন তো আমাদের একেবারেই চলে না। হ্রস্ব দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দূরাগত বেতার তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে আসে, অর্থাৎ বেতার তরঙ্গের প্রতি এই অঞ্চল আয়নার মত কাজ করে। আয়নমণ্ডল না থাকলে এই সব তরঙ্গকে আমরা কোন উপায়েই ধরতে পারতাম না।

এই কয়টি স্তরের মধ্যে E. F. ও F স্তরের আবিষ্কারের কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের প্রাপ্য। আয়নমণ্ডলীর সর্বনিম্ন অর্থাৎ D স্তরটি সম্বন্ধে কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বটে, কিন্তু এর প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেউই নিশ্চয় করে কিছুই বলতে পারছিলেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তখন এ নিয়ে দ্রুত কাজ চলছিল। যে সব গবেষণা থেকে অবশেষে D স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল, তার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারে ডঃ মিত্রের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কাজ অগ্রগণ্য। যে প্রচলিত উপায়ে E ও F স্তরগুলির আবিষ্কার হয়েছিল, D স্তরের আবিষ্কার সে ভাবে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। শুধু পরীক্ষা কার্য চালিয়েই ক্ষান্ত হন নি। সূর্যরশ্মির সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের ঐ অঞ্চলে কি ভাবে আয়নের সৃষ্টি হতে পারে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। D স্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডঃ মিত্র ও তাঁর সহকর্মীদের মতবাদ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজ মেনে নিয়েছে।

এদিকে, E স্তরটি যদিও আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু ঐ উচ্চতায় কি ভাবে আয়নের সৃষ্টি হতে পারে, তা ছিল একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। কেউই প্রথমে কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। E স্তরের উৎপত্তি অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর সহকর্মীরা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মতবাদ পরে কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তিত মতবাদই এখনও প্রচলিত।

আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে কাজ করতে করতে অধ্যাপক মিত্রের দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হয় রাত্রির আকাশের আলোর প্রতি। ঘোর অমাবস্যার রাত্রে শহরের অত্যুজ্জ্বল আলোকমালার থেকে অনেক দূরে গিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অল্প হলেও, আকাশে কিছুটা আলো আছে। স্বভাবতই মনে হবে, অগণিত নক্ষত্ররাজিই হ'ল এই আলোকের উৎস। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে যে, আকাশের সমস্ত নক্ষত্র থেকে আগত আলো ছাড়াও সেখানে কিছুটা অতিরিক্ত আলো বর্তমান থাকে। সূর্যাস্তের অনেক পরেও রাত্রির আকাশে এই আলোর অস্তিত্ব অধ্যাপক মিত্রকে বিস্মিত করেছে। এর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, উচ্চবায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন পরমাণুর আয়নই হ'ল এর জন্য দায়ী। এর পরেই ড. মিত্রের 'এ্যাকটিভ নাইট্রোজেন' সম্বন্ধে বিখ্যাত সম্পূর্ণ নূতন মতবাদ প্রচারিত হয়।

এতক্ষণ যা বলা হল, তা ছাড়াও অধ্যাপক শিশির মিত্র ও তাঁর সহকর্মীদের বহু গবেষণামূলক কাজ ভারতীয় ও বিদেশী বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। তার আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়।

অধ্যাপক মিত্র নিজেকে শুধু গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখেন নি। দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর অবদান অপরিসীম। ভারতবর্ষে বেতার বিজ্ঞান শিক্ষণ ও গবেষণা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৯২৩ সালে ইউরোপ থেকে ফিরবার প্রাক্কালে সেখানে বেতার বিজ্ঞানের পরিস্থিতি দেখে তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টির বলে তিনি বুঝেছিলেন যে, বিজ্ঞানের এই শাখা শীঘ্রই অত্যন্ত উন্নতিলাভ করবে। তাই দেশে ফিরেই তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যার একটি বিশেষ পত্র হিসাবে বেতার বিজ্ঞান শেখাবার ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই হ'ল প্রথম, যেখানে বেতার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শুধু শিক্ষণই নয়, শীঘ্রই এখানে ঐ বিষয়ে একটি গবেষণাগারও স্থাপিত হয়। পরে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের অন্যান্য স্থানেও এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

কিছুকাল পরেই অধ্যাপক মিত্র বুঝলেন যে বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির গুরুত্ব যে রকম তাড়াতাড়ি বাড়ছে, তাতে আমাদের দেশে এর প্রসারের মোটেই সুব্যবস্থা হচ্ছে না, তাই ১৯৩৫ সালে তিনি নিজে ইংলণ্ডের বেতার সম্পর্কীয় গবেষণাগারগুলি পরিদর্শনের জন্য যান। সেখানে কয়েকজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের একটি চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন—ইংলণ্ডের রেডিও রিসার্চ বোর্ডের মত একটি সংসদ ভারতবর্ষে গঠন করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না। বলাবাহুল্য তাঁরা সকলেই ডঃ মিত্রকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতামত নিয়ে অধ্যাপক মিত্র খুব উচ্চাশার সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে, যখন তাঁর প্রস্তাব এদেশের কর্মকর্তাদের কাছে পেশ করলেন, প্রথমেই তা অগ্রাহ্য করা হ'ল। কিন্তু এতে তিনি দমে যান নি। তিনি জানতেন, গঠনমূলক কাজে সব সময়েই বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। তাই গভীর আশা নিয়ে তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর স্বপ্ন সফল হল। ভারত সরকারের

সদ্যগঠিত 'বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা' অধ্যাপক মিত্রের প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। ১৯৪২ সালে এই সংস্থার অধীনে তৈরী হল 'রেডিও রিসার্চ কমিটি'। প্রথম পাঁচ বৎসর ডঃ মিত্র এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে বিদেশে যুদ্ধকালীন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উন্নতি পরিদর্শনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত 'ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনের' সদস্যরূপে ১৯৪৪ সালে অধ্যাপক মিত্র আবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা সফরে যান। সেখানে বেতার বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। ১৯৪৫ সালে দেশে ফিরে এসে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার একটি অংশমাত্র হিসাবে রাখলে দেশকে বেতার বিজ্ঞানে যুগোপযোগী করা যাবে না। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে প'ড়ে লাগলেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বেতার বিজ্ঞানের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নূতন বিভাগ খুলবার জন্য। কয়েক বছর ধরে উপরওয়ালাদের বোঝাবার পর তাঁর চেষ্টা সফল হ'ল। ১৯৪৯ সালে তৈরী হল 'ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স এ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স' নামে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিভাগ এবং ডঃ মিত্র তার প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। তাঁর সৃষ্ট এই বিভাগে তিনি দীর্ঘকাল বেতার বিজ্ঞান শিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১৯৬০ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের সভাপতির ভাষণে উচ্চ বায়ুমণ্ডল গবেষণার ক্ষেত্রে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের অবদানের কথা উল্লেখ ক'রে অধ্যাপক মিত্র বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের এই নূতনতম অবদানের সুযোগ থেকে ভারতের বঞ্চিত থাকা এখন অত্যন্ত অযৌক্তিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, পরে কেরালার ত্রিবান্দ্রম থেকে রকেট নিক্ষেপ সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত দেখে তিনি কিরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, তা' তাঁর সহকর্মীরা জানেন।

আয়নমণ্ডলের গবেষণাক্ষেত্রে অধ্যাপক মিত্রের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৮ সালে তিনি লণ্ডনের 'রয়্যাল সোসাইটির সদস্য' নির্বাচিত হ'ন। খুব অল্পসংখ্যক ভারতীয়ই এই গৌরবের অধিকারী। সুযোগ্য ছাত্রদের সহায়তায় গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এদেশে তিনি নিজেই নির্মাণ ক'রেছিলেন। পরে ডঃ মিত্র ও তাঁর সহকর্মীদের কাজে আকৃষ্ট হ'য়ে অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় নানা প্রকার যন্ত্রপাতি উপহার দিয়েছেন। কলকাতার সন্নিকটবর্তী হরিণঘাটাতে অধ্যাপক মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগারে এই সব যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে এবং পূর্ণোদ্যমে কাজ চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ডঃ মিত্রের আয়নমণ্ডলের গবেষণাগার প্রাচ্যদেশে এই জাতীয় গবেষণাগারের মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় কেন্দ্র যা ১৯৩২-৩৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মেরুবৎসরের কর্মসূচীতে যোগদান করেছিল।

অধ্যাপক শিশির মিত্রের জীবনে আর এক অক্ষয়কীর্তি তাঁর লেখা জগদ্বিখ্যাত বই—'দি আপার এ্যাটমস্ফীয়ার'। সহকর্মীদের সহায়তায় কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৪৭ সালে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ সালে পরিবর্ধিত আকারে এর পুনঃপ্রকাশ হয়। দেশে-বিদেশে বেতার বিজ্ঞান কর্মীদের কাছে বইটি অপরিহার্য। ১৯৫৫ সালে রুশভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে, বিদেশের বিজ্ঞানীরা এই বইখানিকে বাইবেলের মত গণ্য করেন। এটা ছাড়াও অধ্যাপক মিত্রের লিখিত মনোগ্রাফ প্রবন্ধ ইত্যাদি অসংখ্য আছে যা বিজ্ঞানজগতে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন অধ্যাপক মিত্র, সহজ বাংলায় লিখিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর বহু প্রবন্ধ আছে, ডঃ শিশির মিত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা কোনদিনও তা ভুলতে পারবেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক মিত্র যে ছাত্রগো[illegible] গঠন করেছিলেন, তাঁরাই আজ ভারতের 'বিভিন্ন স্থানে" বেতার [illegible]ন পরিচালনা করছেন। তাঁদের অনেকেই বিদেশে গিয়েই [illegible]ত অর্জন করেছেন।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বহু সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন— রেডিও রিসার্চ কমিটির চেয়ারম্যান (১৯৪৩-৪৮); বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির সদস্য (১৯৩৮-৪২); ভারত সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ প্ল্যানিং কমিটির সদস্য (১৯৪৪-৪৬); ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্য (১৯৪৪-৪৫); ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যার সভাপতি (১৯৩৪), সাধারণ কর্মসচিব (১৯৩৯—১৯৪৩), সাধারণ সভাপতি (১৯৫৫); ইণ্ডিয়ান ফিজিকাল সোসাইটির সভাপতি (১৯৫০-৫২); এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯৫১-৫৩); ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব এরোনটিক্স এ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্সের সভাপতি (১৯৫৩); ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের সভাপতি (১৯৬০); আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের জাতীয় কমিটির সদস্য (১৯৫৭-৫৮); ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী; বহুসংখ্যক দেশী ও বিদেশী বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশ্য 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থের সাধারণ সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আজকে আমরা যে যুগের মানুষ, তাকে 'বেতার বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্সের যুগ' বলা হয়। ভারত যে এ যুগে মোটেই পিছিয়ে নেই তার একমাত্র কারণ ডঃ মিত্রের দূরদৃষ্টি, অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও সংগঠনীশক্তি। তাঁকে এদেশে 'বেতার বিজ্ঞানের জনক' বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। ভারতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। যে কয়জন মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন অধ্যাপক মিত্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর মৃত্যুতে ভারত এক উজ্জ্বলতম রত্নকে হারালো; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হারালো তার কীর্তিমান অধ্যাপকদের একজনকে। বিজ্ঞান-সরস্বতীর বরপুত্র ভারতের গৌরব এই মহান সাধকের প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

জোসেফ কনরাড

শ্রীঅসিত মৈত্র

বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র এবং সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি প্রায় কিছুই নেই। কিন্তু ইংরাজীতে এই শ্রেণীর সাহিত্যের সমৃদ্ধি এবং প্রসারতা অতুলনীয় এবং এইসব নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্য প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যকর্ম বলে ধরা হয়। ইংরাজী সাহিত্যে এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে পোল্যাণ্ডের জোসেফ কনরাড এবং আমেরিকার হারমান্ মেলভিলের নাম সর্বপ্রধান, অবশ্য কনরাডই বেশী প্রসিদ্ধ। বর্তমানে ইংরাজী সাহিত্যে যাঁরা সমুদ্র এবং নাবিকদের নিয়ে লিখে থাকেন তাঁদের ওপর কনরাডের প্রভাব সমধিক পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে বর্তমান ইংলাণ্ডের একজন বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এবং সমুদ্র-সাহিত্য বিশেষজ্ঞ অলিভার ওয়ারনার সাহেব এক জায়গায় বলেছেন।

'No one will even again be able to write a serious story about the sea without having in his mind the chastening thought of the best of Conrad.'

অবশ্য যদিও তাঁর বেশীরভাগ গল্প এবং উপন্যাসে সমুদ্র, জাহাজ এবং নাবিকদের জীবনের বিচিত্র কথাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ The Mirror of the Sea-তে ঐ সম্বন্ধে বলেছেন যে, ঐ সবের ধ্যান-ধারণাই 'The soul of my life'। তা' হলেও তাঁকে শুধু মাত্র একজন বিখ্যাত সমুদ্র-সাহিত্যিক হিসাবে ধরলে আমরা ভুল করব; সর্বকালের জগৎ প্রসিদ্ধ অমর কথাশিল্পীদের শ্রেণীতেই তাঁর স্থান।

জোসেফ কনরাড ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়কর প্রতিভা! যদিও তাঁর মাতৃভাষা ইংরাজী নয় এবং প্রথম জীবনে ইংরাজী কিছুই জানতেন না, প্রায় ২১ বৎসর বয়সে ইংরাজী ভাষা প্রথম শিক্ষা করতে থাকেন তা' সত্ত্বেও ইংরাজীতে লিখেই তিনি জগজ্জোড়া নাম কিনেছেন এবং ইংলাণ্ড, আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচকেরা ইংরাজী সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত অমর কথাশিল্পীদের সমশ্রেণীতেই তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন। আরো একটি আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর ইংরাজী ভাষায় দখল এত অসামান্য যে, একজন ইংরাজকেও না বলে দিলে তাঁর লেখা পড়ে মোটেই ধরতে পারবে না যে, এ বিদেশীর লেখা এবং তিনি তাঁর রচনাশৈলীর জন্য এত বিখ্যাত যে, ইংরাজী ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপকেরা তাঁদের ইংরেজ আমেরিকান ছাত্রদের, অর্থাৎ যাদের মাতৃভাষা ইংরাজী, তাদের ভাল ইংরাজী শিখবার জন্য তাঁর লেখা ভাল করে পড়বার উপদেশ দিয়ে থাকেন। একজন বিদেশীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় লিখে এতখানি প্রসিদ্ধ হওয়া এবং খ্যাতি অর্জন করা পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিই অসাধারণ নয় কি?

*　*　*　*

হয়ত কোনো কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য বুঝতে তাঁদের জীবনী জানবার বিশেষ দরকার হয় না। কিন্তু কনরাড সম্বন্ধে ঐ কথা বলা চলে না। তাঁর সাহিত্য তাঁর জীবনের সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, জীবনী না জানলে তাঁর সাহিত্য ভাল বোঝা যাবে না। বস্তুতপক্ষে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতেই তাঁর দীর্ঘ নাবিক-জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জীবনবেদ প্রতিফলিত হয়েছে।

*　*　*　*

কনরাড ১৮৫৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর তখনকার দিনের জার শাসিত রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীন পোল্যাণ্ডের পোডোলিয়া প্রদেশের অন্তর্গত বার্ডিচ্ভ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম জোসেফ থিয়োডোর কনরাড নালেজ কোরজেনিওস্কি এবং তিনি তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতার নাম ছিল অ্যাপোলো নালেজ কোরজেনিওস্কি এবং মাতার নাম এভালিনা ডোবোরস্কা। তাঁর পিতা ছিলেন এক প্রাচীন বনেদী বংশের মধ্যবিত্ত অবস্থার ভূস্বামী। তাঁর দু'টি ঝোঁক ছিল প্রবল; একটি ছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবল অনুরাগ, দ্বিতীয় অনুরাগ সাহিত্যে। উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র পিতার এই দু'টি গুণই লাভ করেন।

তাঁর বয়স যখন মাত্র নয় বৎসর তখনকার একটি স্মৃতি জোসেফ কনরাডের স্মৃতির মণিকোঠায় চিরকাল জাগ্রত ছিল, সেটি হল তাঁর পিতা অনুদিত সেক্সপীয়ার রচিত The Two Gentlemen of Verona তিনি উচ্চৈঃস্বরে বাপের কাছে পাঠ করতেন…এইটুকু বয়সের ছেলের অপূর্ব আবেগমুখর আবৃত্তি শুনতে শুনতে তাঁর পিতার পুত্রগর্বে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত এবং কিছুক্ষণ পরে তিনি আবেগে পুত্রকে কাছে টেনে নিয়ে পরম স্নেহে এবং আনন্দে আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতেন। অ্যাপোলো ভিকটর হিউগোর Travaillers de la Mer নামক পুস্তকটিও পোলিস্ ভাষায় অনুবাদ করেন। হিউগো কিশোর কনরাডের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন এবং তাঁরই প্রভাবে কনরাডের ছেলেবেলায় তাঁর সুপ্ত নাবিক মন জেগে ওঠে।

তাঁর ছোটবেলার কথা যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, শয়নে-স্বপনে তিনি কেবলই দূর দেশে যাবার কথা চিন্তা করতেন এবং জাহাজে করে কেমন দেশে-দেশান্তরে অ্যাডভেঞ্চার করে ঘুরে

বেড়াবেন এই চিন্তায়ই রাত্রিদিন বিভোর থাকতেন। তাঁর ছোটবেলা সম্বন্ধীয় একটি গল্পে জানা যায় যে, একদিন তিনি মধ্য আফ্রিকার একটি ম্যাপ দেখিয়ে তাঁর মা-বাবাকে বলেছিলেন, 'যখন আমি বড় হব, নিশ্চয়ই ওখানে যাব।' এবং আশ্চর্যের বিষয় তিনি বড় হয়ে সত্যিই ওখানে গিয়েছিলেন এবং শুধু আফ্রিকায় নয়, সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তিনি বহুবার যাতায়াত করেছেন এবং সম্ভবত পৃথিবীর সমস্ত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশী ভ্রমণ করেছেন।

১৮৬২ সালে কনরাডের পিতা পোলিস্ জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য গ্রেপ্তার হন এবং প্রথমে তাঁকে উত্তর রাশিয়ায় এবং পরে দক্ষিণে তেরনিকভে নির্বাসিত করা হয়। এখানেই কনরাডের মা মারা যান। মাতার মৃত্যুর পর ১৮৬৬ সালে কনরাড্ তাঁর মামার বাড়ী পোলিস্ ইউক্রেনের অন্তর্গত নোভোফাস্টভে চলে আসেন এবং তাঁর মামার সঙ্গে বাস করতে থাকেন। এখানে বছর দুই কাটাবার পর তিনি আবার তাঁর পিতার কাছে চলে যান। তাঁর পিতাকে এখন সর্তাধীনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং কনরাড্ তাঁর পিতার সঙ্গে প্রথমে লেমবার্গ এবং পরে ক্রাকাওতে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই ১৮৬৯ সালে কনরাডের পিতার মৃত্যু হয়।

এর পর ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে কনরাড্ পড়াশুনা করতে থাকেন। তাঁর পড়াশুনা দেখাশুনার জন্য একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। এই গৃহশিক্ষককে কনরাড্ খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন। তাঁর কাছে তিনি হঠাৎ একদিন তাঁর মনের ইচ্ছা, অবশ্য ইচ্ছা নয় সঙ্কল্পই বলতে হয়, প্রকাশ করেন যে, সমুদ্র তাঁকে সব সময় আকর্ষণ করে এবং তিনি জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে চান

এইখানে পড়াশুনা করতে করতেই মাত্র ১৫ বৎসর বয়সের সময় কনরাড্ হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে নাবিকের চাকরীর খোঁজে বাড়ী থেকে পালিয়ে যান।

অবশ্য পরে জানতে পেরে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর খোঁজ করে তাঁকে ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসেন—সুতরাং তাঁর তখনকার মত জাহাজে চাকরী করা স্থগিত থাকে। কিন্তু তিনি বাড়ীতে এসেও সমুদ্রে যাবার জন্য এত জেদ করতে লাগলেন যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর ভবিষ্যৎ ভেবে ভীত হয়ে পড়লেন। আরো তাঁদের ভয়ের কারণ তাঁদের বংশে কেউই জাহাজে নাবিকের কাজ করেন নি এবং পুরুষানুক্রমে তাঁরা জমি-জায়গা দেখাশুনা এবং চাষবাস করেই জীবন কাটাচ্ছেন!

অবশেষে ১৮৭৩ সালে তাঁর সমুদ্রে যাবার অদ্ভুত ঝোঁক দেখে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁকে সমুদ্র ভ্রমণের অনুমতি দেন।

এর পরবৎসর, তখন কনরাডের বয়স মাত্র ১৭, তিনি মার্সেল্স্ অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি দ্রুত ফ্রেঞ্চ বলতে পারতেন এবং শীঘ্রই সেখানে গিয়ে নাবিকগিরির প্রথম পাঠ নিতে লেগে গেলেন। প্রথম প্রথম তিনি ফ্রান্সের আশেপাশে যে সব ছোট ছোট জাহাজ ঘুরে বেড়ায় তাতে কাজ করতেন। এই রকম করে নাবিকগিরিতে বৎসরখানেক হাত পাকিয়ে পরবৎসর তিনি মেক্সিকো উপসাগরে প্রথম দূর সমুদ্রযাত্রা করেন। এর পরবৎসর তিনি এক বাণিজ্য জাহাজে কাজ নিয়ে সুদূর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে চলে যান। এই জাহাজের নাম ছিল Saint-Antoine। এই জাহাজেরই এক কর্মিকান্ অফিসারের নাম ডোমিনিক্ কারভনি। এই লোকটি ছিল এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক···কিছুটা গর্ব, অকপট বন্ধুত্ব এবং অভিজ্ঞ নাবিকত্ব মিশিয়ে এই লোকটির চরিত্র ছিল সত্যিই বিচিত্র। এর অদ্ভুত চরিত্র কনরাড্‌কে বড়ই আকৃষ্ট করে। তাঁর রচিত The Mirror of the Sea, The Arrow of Gold, Nostromo, The Rover, The Rescue এবং Suspense প্রভৃতি গ্রন্থে এই কারভনির চরিত্র নানা রঙে রঞ্জিত করে তাঁকে অমর করে গেছেন।

* * * *

এর পর ১৮৭৮ সালে তিনি এক বৃটিশ জাহাজে নাবিক হন। এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলল, কেন না ছোট থেকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বৃটিশ নাবিক হবার জন্য।

এর পর তিনি প্রায় আরো ১৬ বৎসর জাহাজে জাহাজে কাজ করেন। অবশ্য তিনি একটানা কোনো জাহাজে লেগে থাকেন নি—একটার পর একটা বহু জাহাজে কাজ করেছেন, অবশ্য জাহাজগুলির বেশীর ভাগই ছিল বৃটিশ জাহাজ। এইসব জাহাজে কাজ করতে করতে ১৮৮৩ সালে তিনি এইসব বৃটিশ জাহাজে প্রথমে প্রধান মেটের পদে এবং এর কিছুদিন পরে ১৮৮৮ সালে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হয়ে নিয়মিত কাজ করে যেতে থাকেন এবং এই সময়ই ১১শে আগষ্ট, ১৮৮৬ সালে তিনি বৃটিশ নাগরিক অধিকার লাভ করেন এবং ইংলণ্ডেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকেন।

এইসব বৃটিশ জাহাজে কাজ করতে করতেই ইংরেজ নাবিকদের কাছ থেকে তিনি প্রথম ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন।

কনরাড্ প্রায় দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সমুদ্রে নাবিকের কাজ করবার পর ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৯৪ সালে এই কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি সমুদ্রকে যেমন নিবিড় ভাবে জানতে এবং বুঝতে পেরেছেন তেমনি পৃথিবীর হেন দেশ নেই যে ভ্রমণ করেন নি। এমন কি আমাদের কোলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইও ঘুরে গেছেন এবং এশিয়া, আফ্রিকার এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের নানা দেশের নানা জাতির লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা তাঁর মত আর কোনো সাহিত্যিকেরই নেই এবং এ সমস্তই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত। অবশ্য এইসব ভ্রমণের সময় মালয়, জাভা, মরিশাস এবং মশলা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশই তাঁর মনকে বেশী আকৃষ্ট করে এবং এইসব দেশ সম্বন্ধে তিনি যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা খুব অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঘটে। এইসব দেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই Almayer's Folly, An outcast of the Islands, Lord Jim এবং The Rescue প্রভৃতি পুস্তকে প্রতিফলিত হয়েছে।

অবশ্য তাঁর এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরকাল খুব সুখে-শান্তিতে কাটে নি, এর মধ্যে প্রচুর কষ্ট, মাসে মাসে জাহাজডুবি, ভীষণ সামুদ্রিক টাইফুন

প্রভৃতি নানা ধরণের জীবন মরণ সমস্যামূলক বিপদ তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে।

অবশ্য আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সময়ের মধ্যে প্রথম দিকে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র স্থান পায় নি যে, তিনি ইংরেজীতে লিখবেন এবং এই লেখাই তাঁকে জগৎজোড়া নাম দেবে!

যে ইংরেজীতে লিখে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন সেই ইংরেজী ভাষা তিনি কিরূপে শেখেন সে সম্বন্ধ তিনি নিজেই সব বলে গেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু মিষ্টার মেগ্রোজকে তিনি বলেছিলেন, 'After hearing it spoken, and when I could talk enough, I read. I have a thick green-covered volume of Shakespeare I bought with my first earnings.' এ সম্বন্ধে তিনি আরো যা যা বলছেন তাতে জানতে পারা যায় ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীটস্ ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তিনি ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ে এবং মিলের লেখা Political Economy পড়েও অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেন। ফেনিমুর কুপারকে তিনি ছোট থেকেই পোলিস্ অনুবাদ মারফৎ জানতেন। তিনি Notes on Life and Letters-এ আরো বলেছেন যে, তাঁর পিতা অনূদিত সেক্সপীয়ারের Two Gentlemen of Verona ছাড়াও পোলিস ভাষায় অনূদিত চার্লস ডিকেন্সের Nicholas Nickleby মারফৎ তাঁর ইংরেজী সাহিত্যের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। যখন তিনি মূল ইংরেজীতে ডিকেন্স পড়তে শিখলেন তখনও তাঁর ডিকেন্সের ওপর অনুরাগ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নি—বিশেষত ডিকেন্সের Bleak House তিনি খুবই পছন্দ করতেন।

ইংরেজী ভাল করে শিখবার পর তিনি ইংরেজী ভালমন্দ যা বই পেতেন বিষয় নির্বিচারে তাই পড়ে যেতেন। ইংরাজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি হেনরী জেমস্, ম্যারিয়েট্, ডবলু, ডবলু, জেকবস্ প্রভৃতিকে খুব পছন্দ করতেন। ফরাসী সাহিত্যের আলফাঁস দোঁদে, ফ্লবার্ট, মোঁপাস, আনাতোল ফ্রাঁস্ এবং রাশিয়ার সাহিত্যিকদের মধ্যে টুর্গেনিভের তিনি ভক্ত ছিলেন।

* * * *

১৮৮৯ সালে তিনি তাঁর ৩১ বৎসর বয়সে দীর্ঘ ১৫ বৎসর সমুদ্রে কাটাবার পর লণ্ডনে কিছু দিনের ছুটিতে বিশ্রাম করতে এলেন। ছোটবেলা থেকে কনরাডের ইংল্যাণ্ড এবং ইংরাজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। অবশ্য পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি ইংলণ্ডের সহানুভূতির জন্যই তাঁর এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্ধিত হয়েছিল। এই শ্রদ্ধাই তাঁকে প্রথমে ইংরেজের জাহাজ, ইংরাজ জাতি, ইংরাজের দেশ এবং অবশেষে ইংরেজী ভাষার দিকে আকৃষ্ট করে।

লণ্ডনে এই স্বল্পকাল স্থায়ী ছুটির সময়ই তাঁর মনে হঠাৎ তাঁর দীর্ঘ নাবিক জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি উপন্যাস লিখবার ঝোঁক হয়।

কনরাডের সাহিত্যিক প্রস্তুতি ছিল খুব ভাল। তিনি একজন ভাল ভাষাবিদ্ ছিলেন এবং ফরাসী ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর অদ্ভুত ভাল পড়াশুনা ছিল।

এই সময় তিনি মালয়কে কেন্দ্র করে তাঁর প্রথম উপন্যাস Almayer's Folly লিখতে সুরু করেন। অবশ্য এর আগে তিনি The Black Mate নামক একটি ছোটগল্প লিখেছিলেন।

প্রথমে প্রথমে তাঁর বিদেশী ভাষা ইংরেজীতে লিখতে বেশ কষ্ট হো'ত। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে ধীরে ধীরে লিখতেন। এই সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'not so much sentence by sentence as line by line.'

এই সময় তাঁর ছুটি ফুরিয়ে যায় এবং তিনি আবার জাহাজে ফিরে যান এবং জাহাজে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাকী অংশটা লিখতে থাকেন। এইভাবে বহু পরিশ্রম করে পাঁচ বৎসরে তিনি তাঁর এই প্রথম উপন্যাস শেষ করেন।

এটা তাঁর লেখা শেষ হলে লণ্ডনের বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান Fisher Unwinকে পাঠিয়ে দেন। Fisher Unwin বিখ্যাত লেখক এডওয়ার্ড গার্নেটকে বইটা প্রকাশযোগ্য কি না বিচারের ভার দেন। গার্নেট নতুন প্রতিভা আবিষ্কার এবং তাদের উৎসাহদানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কনরাডের এই পুস্তকে প্রতিভার স্ফুরণ দেখতে পান এবং Fisher Unwinকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য উপদেশ দেন। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই কনরাড আর গার্নেটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়।

Almayer's Folly ১৮৯৫ সালে প্রকাশ হয় এবং এই পুস্তক তিনি তাঁর পরলোকগত মামার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

এই পুস্তক প্রকাশে জন গলস্‌ওয়ার্দীও তাঁকে খুব উৎসাহিত করেন এবং পরবর্তীজীবনে কনরাড তাঁর এই উৎসাহবাক্য চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণে রেখেছিলেন। এর পরবৎসর তাঁর An Outcast of the Island প্রকাশ হয়। এই পুস্তক প্রকাশের তিন সপ্তাহ পরেই তিনি ২২ বৎসর বয়স্ক মিস জেসি জর্জ নামক লণ্ডনের এক পুস্তক-ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। কনরাড যদিও তাঁর বিবাহের কিছুদিন আগে থেকেই তাঁর দীর্ঘ বিশ বছর করা নাবিকের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন তা' হলেও তাঁর ভ্রমণের নেশা কাটে নি, বিবাহের পরও সস্ত্রীক বহুবার ইংল্যাণ্ডের বাইরে নানা দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই বিবাহের ফলে কনরাডের দু'টি পুত্র-সন্তান লাভ হয়।

কনরাড প্রথম থেকেই লিখে তাঁর সতীর্থ লেখকদের কাছে সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁরা প্রথম থেকেই কনরাডের প্রতিভায় চমকিত হয়ে যান এবং তাঁর প্রতিভাকে উচ্চ সম্মান দিতে থাকেন এবং বছরের পর বছর তাঁর সম্মান শুধু বাড়তেই থাকে। এইচ, জি, ওয়েলস্, আর, বি, কানিংহাম গ্রাহাম, হেনরী জেমস্, ষ্টিফেন ক্রেন, ডবলু, এইচ, হাডসন এবং এডওয়ার্ড টমাস প্রভৃতি নামকরা সাহিত্যিকেরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

কিন্তু তাঁর যেমন যশ অর্জন হচ্ছিল, অর্থাগম তেমনি ছিল না। অবশেষে ১৯০৫ সালে, প্রধানত এডমণ্ডগস্ এবং রোদেনষ্টাইনের চেষ্টায় তিনি একটি নিয়মিত সরকারী ভাতা পেতে থাকেন এবং এতে তাঁর অর্থকষ্ট কিছুটা দূর হয়। আরো কিছুদিন পরে ১৯১৪ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত তাঁর Chance নামক পুস্তক ওখানে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করায় তাঁর বেশ অর্থাগম হতে থাকে। যদিও Chance নামক পুস্তকটির সাহিত্য-কীর্তি

তাঁর রচিত অন্যান্য পুস্তক হতে বেশী নয় তা'হলেও এই পুস্তকটিই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং তাঁকে আর্থিক সমৃদ্ধি এনে দেয়। এরপর কনরাড্ আর কোনদিন অর্থকষ্টে পড়েন নি।

কনরাডের শেষ জীবন প্রধানত সাহিত্য-সেবাতেই অতিবাহিত হয়। যদিও তিনি মূলত নাবিকই ছিলেন এবং সমুদ্র, জাহাজ প্রভৃতি নিয়েই তাঁর কারবার ছিল তা'হলেও পরে মানুষকে নতুন করে আবিষ্কার করবার সাধনাই তাঁর জীবনে প্রবল হয়ে ওঠে, এ সম্বন্ধে The Mirror of the Sea নামক গ্রন্থে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, '...but to deal with men is as fine an art as to deal with ships. Both men and ships line in an unstable element, are subject to subtle and powerful influences, and want to have their merits understood rather than their faults found-out.' জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি ক্রমাগত লিখেই যান।

কনরাড্ তাঁর সারা জীবনে তেরটি সম্পূর্ণ উপন্যাস এবং Suspense নামক একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস (এটা লিখতে লিখতেই অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যান)। সাতটি ছোটগল্পের বই, তিনখানি নাটক, দু'টি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এবং দু'টি প্রবন্ধ পুস্তক লিখেছেন।

তাঁর বেশীর ভাগ গল্প এবং উপন্যাস মালয়, মশল্লা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পূর্বদেশীয় দেশ ও সমুদ্রের পটভূমিকায় রচিত।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে Almayer's Folly, The Nigger of the 'Narcissus,' Lord Jim, Nostromo, The Secret Agent, Under Western Eyes, Chance, The Rover প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত। ছোটগল্পের মধ্যে Youth, Heart of Darkness, The End of the Tuther, Typhoon, Amy Foster, Falk, Tomorrow প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর লেখা নাটকের মধ্যে Laughing Anne and one day more বিখ্যাত। আর, তাঁর আত্মজীবনীমূলক দু'টি গ্রন্থ A Personal Record এবং The Mirror of the Sea নামক গ্রন্থ দু'টিও অপূর্ব। এ'ছাড়া তাঁর নিজের জীবনের কতকগুলি ঘটনা এবং নানা বিষয়ের ওপর মন্তব্য প্রকাশ করা Notes on Life and Letters এবং Lost Essays বলে দু'টি প্রবন্ধ পুস্তক আছে।

মানুষ হিসাবে কনরাড্ কিরূপ ছিলেন এ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন; এ সম্বন্ধে জন গলসওয়ার্দী তাঁর রচিত Castles in Spain নামক গ্রন্থে কনরাড্ সম্বন্ধে যা' বলেছেন উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন, 'My memory is of a dark-haired man, short but extremly graceful in his nervous gestures, with brilliant eyes, now narrowed and penetrating, now soft and warm, with a manner alert yet caressing, whose speech was ingratiating, guarded and brusque by turn. I had never seen before a man so masculinely keen yet so femininely sensitive. ..

Fascination was Conrad's greatest characteristic—the fascination of vivid expressiveness and zest, of his deeply affectionate heart, and his far-ranging subtle mind.'

* * * *

শেষ জীবনে কনরাডের প্রায় সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছিল... পৃথিবীব্যাপী তাঁর যশ-সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আর্থিক অবস্থাও খুব স্বচ্ছল হয়েছিল এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন অসম্ভব।

এইরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তির মধ্যে হঠাৎ একদিন ৩রা আগষ্ট ১৯২৪ তারিখে এই বীর সাগর-শিশু তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস Suspense অসম্পূর্ণ রেখেই ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত কেণ্ট-এ বিশপবোর্নের তাঁর নিজ বাড়ীতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীব্যাপী শোকোচ্ছ্বাসের স্রোত বয়ে যায় এবং শুধু তাঁর স্বদেশ পোল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর সর্বদেশের জনসাধারণই তাঁর মৃত্যুতে একান্ত প্রিয়জন বিয়োগ বেদনা অনুভব করে। ক্যান্টারবেরীতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর সমাধিপরিস্থ প্রস্তরফলকে তাঁর পুরো নাম লেখা আছে এবং স্পেনসারের এই কয়টি লাইন উৎকীর্ণ করা আছে'—

'Sleep after toyle, port after stormie seas,
Ease after warre, death after life, does greatly please.'

হাত

দু'খানি সুগোল বাহু, দু'খানি কোমল কর,
স্নেহ যেন দেহ ধরি সেথায় বেঁধেছে ঘর,
রূপ নাকি কাছে টানে, গুণ বেঁধে রাখে হিয়া,
আমারে সে ডাকিতেছে ছোট হাতখানি দিয়া
এ দুখানি শুভ্র বাহু মালা করি পরি গলে,
এ হাত উঠাবে স্বর্গে, ডুবাবে বা রসাতলে!

—কামিনী রায়

বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রতীক

শ্রীভাগবতদাস বরাট

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ প্রণালী আমাদের দেশে চালু আছে। প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, ব্রাহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণভাবে অনুসৃত পদ্ধতি ছাড়াও দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে বহু বিচিত্র অনুষ্ঠানাদি বিবাহ সংস্কারের মধ্যে এসে গেছে। তা' ছাড়া এই লোকাচার ও কুলাচার স্থান বিশেষে এমনভাবে মিশে গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি যে কি ছিল তা' জানতে পারা অধুনা দুরূহ।

বিচিত্র বিবাহ পর্যায়ে অনেকক্ষেত্রে মানুষ ব্যতীত বৃক্ষলতা এবং একাধিক প্রতীকচিহ্নকে পতিত্বে বরণ করা হয়। সাধারণত দ্বিতীয়া স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় দার পরিগ্রহ কালে বিভিন্ন স্থানে প্রথমে একটি গাছের সঙ্গে পরিণয় কার্য সম্পন্ন হওয়ায় পর নির্ধারিত কন্যার সাথে পাত্রের উদ্বাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলা দেশে কোনখানে একটি পুষ্পবৃক্ষের সাথে এবং কোথাও বা কলাগাছের সাথে প্রথমে বিবাহ-কার্য সমাধা করে নির্দিষ্ট কন্যার পাণিগ্রহণ করার নিয়ম প্রচলিত। পাঞ্জাবে হিন্দুদের মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত। তবে সেখানে ফুলগাছের পরিবর্তে আখ কিম্বা বাবলা গাছের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সমাপন করা হয়। অন্য দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর তৃতীয়া পত্নী গ্রহণকালে এই বৃক্ষ-বিবাহ প্রথার প্রচলন।

হিমাচল প্রদেশে কোন পাত্রকে তৃতীয় পক্ষ গ্রহণকালে প্রথমে পল্লবিত আম্রবৃক্ষের সঙ্গে বিবাহের পর দার পরিগ্রহের বিধান আছে। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লোকাচারে এই বিধান পরিদৃষ্ট হয় যে, তেজবরে কোন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া স্থিরীকৃত হলে কন্যার পিতা প্রথমে একটি আখগাছকে শাস্ত্রসম্মত ভাবে সম্প্রদান করবেন। তারপর উক্ত পাত্র হস্তে সম্প্রদান করবেন স্বীয় কন্যাকে।

মাদ্রাজের কয়েকটি জাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু আছে যে, পত্নী বিয়োগান্তে পুনর্বিবাহকালে পুরুষ প্রথমে কদলীবৃক্ষকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করার পর নির্দিষ্ট কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করবে।

মুণ্ডারি, কোল, ভিল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির মধ্যে এই প্রথা বলবৎ যে, বিবাহের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান গাত্রহরিদ্রার সময় পাত্রকে একটি আমগাছের সঙ্গে এবং পাত্রীকে একটি মহুয়া গাছের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ দিতে হবে। পরে যথাবিধি কন্যা সম্প্রদানাদি অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। পশ্চিমাঞ্চলের কুর্মি জাতিদের লোকাচার অনুযায়ী প্রথমে আম ও মহুয়া গাছের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর পাত্র নিরূপিত পাত্রীকে গ্রহণ করবে।

বাংলা দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে গৌরীদান পুণ্য কর্মরূপে খ্যাত। অনেক সময় যথাকালে সৎপাত্র না পাওয়ায় কন্যার পিতা গৌরীদানের অক্ষয় পুণ্যলাভের লোভে আসন্ন-যৌবন কিশোরী কন্যার সঙ্গে একটি কলাগাছের আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দিয়ে রাখতেন সেই কন্যা পরে বয়ঃপ্রাপ্তা হলে সৎপাত্রের সন্ধান করে পুনরায় তাকে দান করা হত।

নেপালের নেওয়ার জাতির কন্যাদের বয়স কালে প্রথমে একটি শ্রীফল বা বেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় এবং বিবাহের পরই উক্ত ফলটি নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে কন্যাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হতে রক্ষা করা হয়। তাতে পরবর্তীকালে ঐ কন্যার একাধিকবার বিবাহের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে।

কাংড়া জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত যে, বিবাহকালে পাত্র অপছন্দ হলে পাত্রী নিজ মনোনীত পাত্রের সাথে অরণ্যে পালিয়ে যাবে। তারপর কন্যা অরণ্য মধ্যে একটি যে কোন গাছের সামনে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে সেই বৃক্ষকে পতিত্বে বরণ করবে। কন্যার অভিভাবকরা কন্যার সন্ধানে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করে বৃক্ষমূলে প্রজ্বলিত আগুন দেখে বুঝতে পারবে যে, নির্বাচিত পাত্রকে কন্যার অপছন্দ এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে সে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তখন প্রথা অনুযায়ী পূর্ব স্থিরীকৃত বিবাহ সম্বন্ধ নাকচ হবে এবং কন্যার মনোনীত পাত্রের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হবে।

গোয়া ও গুজরাটের কোথাও কোথাও বিবাহের প্রাক্কালে পুষ্প-বৃক্ষের সাথে কন্যার বিবাহ হয়ে থাকে। পরে মনোনীত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা হয়।

শুধু যে ভারতের মধ্যে বৃক্ষ বিবাহ প্রচলিত তা নয়। সাভিয়ায় আপেল বৃক্ষের সাথে কন্যার বিবাহ-উৎসব পালিত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন সভ্য জাতির মধ্যে প্রাচীন প্রথানুসারে এখনো বৃক্ষ বিবাহ প্রচলিত। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি সভ্য দেশেও প্রাচীনকালে বৃক্ষবিবাহের প্রচলন ছিল।

উদ্ভিদ বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য বহুপ্রকার বিবাহ দেশ বিদেশে বহুকাল হতে পালিত হচ্ছে। যেমন ভারতের বিভিন্ন স্থানে শালগ্রামশিলা বা তৎ প্রতিনিধি তুলসীবৃক্ষের সাথে ধর্মকার্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তেমনি প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার রমণীরা তাঁদের উপাস্য প্রধান দেবতা 'বেল' দেবের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়াকে অত্যন্ত ভাগ্যের কথা বলে মনে করেন। এই দেব-বিবাহে বিবাহিতা কন্যা দেবতার মন্দিরসংলগ্ন সুসজ্জিত কক্ষে স্বর্ণখচিত পর্যাঙ্ক ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য সম্ভার যাহা দেবভোগে নির্দিষ্ট থাকত তা ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু দেবতার পত্নী হলে সেই নারীকে আর অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখা চলত না। আসিরিয়ার উপাস্য দেবতা 'নাবু'র সঙ্গে বৎসরান্তে একটি কুমারীর আনুষ্ঠানিক বিবাহ হত। মিশরের দেবতা 'এমনে'র একজন মানবী পত্নী থাকতেন। আমাদের দেশে 'দেবদাসী' প্রথা এরই প্রতিরূপ।

আফ্রিকায় আকাম্বা জাতির কন্যাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবাহ পূর্বপুরুষদের কোন এক বিদেহী আত্মার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ার রীতি আছে। পরে তাকে যথাবিহিত বিধান অনুযায়ী পাত্রস্থ করা হয়। জলদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে আফ্রিকার ধীবর শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের একটি কন্যাকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। বিবাহের এরূপ বহু বিচিত্র প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আজও প্রচলিত আছে।

হাসি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর সহিত মানবমনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এমন কি কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, মানবের মন না থাকিলে এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। মানব বিষয়ী, এগুলি বিষয়। বিষয়গুলি প্রতিনিয়ত মানবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এরূপভাবে আঘাত করিতেছে যে, মানবের মন তাহা দ্বারা আলোড়িত না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহার ফলে মানবমনে বিভিন্ন অনুভূতির উৎপত্তি।

বাহ্যপ্রকৃতির তরঙ্গগুলি যদি চিরকাল একই রূপ হইত তাহা হইলে মানবের মন তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া যাইত এবং তাহার ফলে কোনও অনুভূতিই থাকিত না। কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তরঙ্গগুলি মনকে কখনও দোলাইতেছে, কখনও দুলাইতেছে, কখনও বা বিষম আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া টুটিয়া ফেলিতেছে। তাই মানব হাসে, তাই কাঁদে, তাই ভয় পায়।

মানবমনের একটি বিশেষত্ব এই যে, সে সংসারের বিষয়গুলির বাস্তবিক সংঘটন এবং আশানুযায়ী সংঘটন এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেইজন্যই সে হাসে অথবা কাঁদে। কোনও গভীর বিষয়ে আমাদের আশা ব্যর্থ হইয়া গেলে আমরা কাঁদি এবং কোনও সামান্য বিষয়ে আমাদের ইচ্ছানুরূপ ঘটনা ঘটিলে আমরা হাসি। সংসারের নয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়ের মধ্যেও মানব একটা সাধারণ মানদণ্ড (standard) বাঁধিয়া লইয়াছে। কোনও একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত হইলে সে অজ্ঞাতসারে এই মানদণ্ডের সহিত তুলনা করে এবং উহা হইতে কোনোরূপ বিচ্যুতি দেখিলে হাসে অথবা কাঁদে। জীবনে বিয়োগ ও মিলন সর্বপ্রধান জিনিস। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু অথবা অনুরূপ ঘটনা মানবের মনকে একবার আক্রমণ করিলে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে এবং যখন সে বন্ধন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠে তখন মানব কাঁদিয়া সান্ত্বনা পায়। আবার যখন আমরা একটি মূর্খের কার্যকলাপ দেখি তখন আমাদের মনের ভাব তাহার প্রতি সমঞ্জস হইবার পূর্বে যে অবসরটুকু থাকে সেই অবসরে হাসিয়া আনন্দ উপভোগ করি।

আমরা যে সাধারণ মানদণ্ডের কথা বলিলাম তাহা হইতে কোনও একটি বিষয় অন্যরূপ হইলে তাহা মনকে একটি বিশিষ্ট প্রকারে আন্দোলিত করে। যদি কোনও ঘটনা এত গভীর হয় যে উহা ঐ পরিমাপ অতিক্রম করিয়া যায় তাহা হইলে উহা বিষাদজনক (tragic) হইয়া উঠে এবং যে ঘটনা ইহার অনেক নিম্নে থাকে তাহা হাস্যোদ্দীপক (comic)। এইজন্য দেখা যায় অসামঞ্জস্যই হাস্যের প্রধান কারণ, অন্যান্য কারণ ইহার অঙ্গীভূত। কোনও একটি বিষয়ে আমাদের মন কোনও একটি বিশেষ ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে, কিন্তু পরে যাহা ঘটে তাহা ঠিক অন্যরূপ। একজনের জ্বর হইয়াছিল, তিনি অন্য একজনকে ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করায় শেষোক্ত ব্যক্তি বলিলেন—'বৃহৎ অট্টালিকাচূর্ণ।'

এক শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন, 'দেখ ছোকরা, আলেকজাণ্ডার তোমার মত বয়সে তোমার চেয়ে একশ' গুণ বেশী জ্ঞানী ছিলেন।'

ছাত্র উত্তর করিল, 'তা বটে, তবে এরিস্টটলের মত একজন লোক তাঁর শিক্ষক ছিলেন।'

এইরূপে দেখা যায়, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি মূর্খের মত কার্য করে, একজন লোক বীরপুরুষের মত বক্তৃতা করিয়া যদি কাপুরুষের মত কার্য করে, তাহা হইলে আমরা হাসি। কৃপণের দানশীলতা, লম্পটের সচ্চরিত্রতা, তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তির তোষামোদে ঘৃণা বিষয়ে বক্তৃতা হাস্যোদ্দীপক। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একজন মূর্খকে একটি কঠিন বিষয়ের প্রসঙ্গে যখন বলেন, 'এ কথা আপনার আর কি বুঝতে বাকী আছে,' তখন তিনি নিজের মনেই হাসিতে থাকেন।

একজন অভিমানোদ্ধত মূল্যবান পরিচ্ছদধারী যুবক চলন্ত ট্রামগাড়িতে কায়দা করিয়া উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল, রাস্তার কাদা তাহার দেহে ও পরিচ্ছদে লাগিয়া গেল। যুবকটি যতই কর্দমাক্ত স্থানগুলি নানারকমে গোপন করিতে চেষ্টা করিল রাস্তার লোকজন ততই হাসিতে লাগিল। একজন পৌত্তলিকতাকে নিতান্ত ঘৃণা করেন, তাঁহার নিকট একজন ঘোর পৌত্তলিক আসিয়া শিবঠাকুরের স্বপ্নপ্রাপ্ত মাদুলীর গুণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। রঙ্গমঞ্চে একজন অভিনেতা হঠাৎ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলেন, অপর একজন অভিনেতা তাঁহার বক্তৃতাটি শ্রোতার গোচরে তাঁহাকে মনে করাইয়া দিল। একজন অভিনেতা বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা উল্টাইয়া অথবা একসঙ্গে মিশাইয়া বলিয়া ফেলিল, তখন অপর একজন রঙ্গমঞ্চেই অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিল, 'আঃ তুমি ওটা এখন বললে কেন, ভীষ্মের বক্তৃতার শেষ কথা 'চল তবে ত্বরা করি' বলা শেষ হ'লে তবে তোমার 'অতিথি আজি এ পুরে' বলা উচিত ছিল।' এ সমস্ত ঘটনাগুলিই হাস্যোদ্দীপক। সেক্সপীয়রের 'মিডসামার নাইটস্ ড্রীম' নামক নাটকের মধ্যে যে নাটকাভিনয়টি আছে তাহা এই প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়িতে পারে।

অসামঞ্জস্য কেবল যে ঘটনাতেই হয় তাহা নয়, কখনও কখনও কেবলমাত্র কথা হইতেও উদ্ভূত হয়। 'রক্ষীশূন্য কক্ষ' না বলিয়া 'কক্ষশূন্য রক্ষী' বলিলে হাসি পায়। এইরূপ 'নাবড়া'রকেল' 'বক্ষের জলে চক্ষু ভাসিয়া যাওয়া' ইত্যাদি। এইরূপ হাস্যোদ্দীপক উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে এগুলির একটি চমকপ্রদ ক্রিয়া আছে। wit-এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সিড্‌নি স্মিথ বলিতেছেন যে, কতকগুলি ঘটনা কিঞ্চিৎ অসাধারণভাবে বর্ণিত হয় এবং তাহা মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। একটি বৃহৎ ভুঁড়িসংশিষ্ট লোককে চলিতে দেখিলে রাস্তার লোক বলে ভুঁড়িটি আগে আগে যাইতেছে লোকটি পিছু পিছু যাইতেছে। একটি লোক মারা গিয়াছে না বলিয়া 'পটোল তুলেছে' অথবা 'শিঙা ফুঁকেছে' বলিলে হাসি পায়;

অসামঞ্জস্য হাস্যের কারণ বলিয়া অজ্ঞতাও হাস্যের একটি বিষয়, কেন না ইহা কথিত সাধারণ পরিমাপের অনেক নিম্নে থাকে। সেকালে কোনও পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় প্রথম আসিয়া যখন

মোমবাতিকে কলাগাছের খোড় অথবা রাস্তার জলের কলকে শিব-ঠাকুর বলিত তখন হাস্য সংবরণ করা যাইত না। সেকালের পুঁথিপড়া পণ্ডিতগণের সংসারানভিজ্ঞতা প্রভৃত অনেক হাস্যোদ্দীপক ঘটনা কোনও কোনও পুস্তকেও লিপিবদ্ধ আছে। আবার দেখা যায় একই কার্যের বিভিন্নরূপ কারণ থাকে। যাহার বহুদর্শিতা নাই সে অজ্ঞতাবশত সেই কার্য দেখিয়া সকল স্থানেই নিজের অনুরূপ কারণটি আরোপ করে ইহা হাস্যের বিষয়। এই সূত্র অবলম্বনে 'কি ভায়া, শাল নাকি?' 'তুমভি মেওয়া খায়!?' ইত্যাদি রূপ বাজে গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

সংসারের ব্যাপারগুলির বাস্তবিক সংঘটন এবং আশানুরূপ সংঘটন ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই প্রভেদ থাকে। মানব নানারূপ সুখময় বস্তু কল্পনা করে, কিন্তু পরক্ষণে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা দেখিয়া হাসি পায়। এ স্থলে ঈশপের গল্পে গোয়ালিনী কুমারীর বিবাহ প্রস্তাবে অনিচ্ছাসূচক মস্তক কম্পন ও দুগ্ধভাণ্ড পতনের বিষয় আমাদের স্মরণ হয়। মানব সংসারের বিষয়গুলিকে তাহার অধীনে আনিতে চায়, কিন্তু অবশেষে বিষয়গুলি মানবের প্রভু হইয়া উঠে। মানব বুঝিতে পারে যে তাহার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তথাপি সে অসম্ভব বস্তুর কল্পনা অথবা প্রয়াস হইতে বিরত হয় না। অবশ্য ক্ষমতার মধ্যে প্রয়াস দোষের নয়, কিন্তু তাহাও অতি দ্রুত কল্পিত হইলে হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠে। অসম্ভব ব্যাপারের প্রয়াসের উদাহরণ আমরা ইতিহাস হইতে এমপিডক্লস্, ক্লিওম্ ব্রোটাস, রাসেলাস প্রভৃতি অনেক দিতে পারি।

মানব যে বিষয়ে দুর্বল সেই বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বিদ্রূপ করা হয় তাহাও হাস্যের কারণ। তোষামোদে বোধ হয় মানবমাত্রেই মুগ্ধ হয়, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে তোষামোদ-প্রিয়তা এতই প্রবল যে, তাঁহাদের মধ্যে যে জিনিসটির একান্ত অভাব কোনও লোক তাঁহাদের সেই জিনিসটি আছে বলিলে অত্যন্ত খুশী হন এবং এমন কি অন্য লোক না বলিলেও তাঁহাদের মনে মনে দৃঢ় ধারণা থাকে যে, তাঁহাদের বাস্তবিকই সেই জিনিসটি আছে। একজনের বক্তৃতা কাহারও ভাল লাগে না তথাপি তাঁহার দৃঢ় ধারণা এই যে, তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। একজন বৃদ্ধ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার সময় তিনি যে তখনও একজন যুবক আছেন একথা তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়া যায় এবং তাঁহার কার্যকলাপ অন্য লোকের পক্ষে হাসির খোরাক যোগায়।

মানবের বৃথাড়ম্বর প্রিয়তা হাস্যের একটি চিরন্তন উপাদান এবং এ জিনিসটিকে বিদ্রূপ করিতে কালজয়ী বিষ্ণুশর্মা ও ঈশপ কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নাই। অপিচ তাঁহারা মানবজাতির দোষ ও ভ্রমগুলিকে ইতর প্রাণীর মধ্যে সংক্রমিত করিয়াছেন। বানরের স্বভাবচপলতা, কচ্ছপের মন্দগতি, শৃগালের বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে, তাহাদিগকে কথা বলাইয়া, গল্পরচনা করা হইয়াছে। ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভ, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক, অথবা আকাশে উড্ডয়নেচ্ছু কচ্ছপের গল্প পড়িতে পড়িতে আমরা যতটা উপদেশ পাই ততটা হাসিতে থাকি। এ গল্পগুলিতে নৈতিকদর্শনকে যদিও প্রাকৃতিক ইতিহাসে পরিণত করা হইয়াছে তথাপি ইহাদের মধ্যে হাস্যরস মিশ্রিত না থাকিলে ইংরাজ সমালোচক হেজলিট এরূপ কথা বলিতেন না যে, 'আমি ইউক্লিডের জ্যামিতি অপেক্ষা ঈশপের গল্পের রচয়িতা হইতে ইচ্ছা করি।'

শুধু কথা ব্যতীত অনেক সময়ে আকার ইঙ্গিতেও হাস্য আনয়ন করা হয়। অভিনয়ে বিদূষকগণ কখনও হস্তসঞ্চালন, কখনও ভ্রূকুঞ্চন, কখনও বিকট চীৎকার প্রভৃতি দ্বারা হাস্য আনয়ন করে। এরূপ হাস্য র‍্যাবেলিসের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। এরূপ হাস্যের টান অনেক সময়ে আদিরসের দিকে থাকে এবং অভিনয়ে যতটা কৃতকার্য পাঠকালে ততটা নহে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঠিক অন্য ধরণের আর এক প্রকার হাস্য আছে তাহা কেবল উন্নত ও শিক্ষিতমন বিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। সংসারে অনেক গুরু বস্তু আছে এবং অনেক লঘু বস্তুও আছে; মন যখন কোনও একটা গভীর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছে তখন তাহাকে পরক্ষণেই কতকগুলি অতি সামান্য বিষয়ের আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় এবং মানব তাহাতে স্বভাবতই হাসে। চার্লস ল্যাম্ব এবং ইংরাজীর বিখ্যাত গল্পলেখক স্যর টমাস ব্রাউনের হাস্য এইরূপ অবস্থা হইতে উদ্ভূত। এই পৃথিবী তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী, কিন্তু তাঁহাদের মন আর একটি কল্পনাময় পৃথিবীতে সর্বদা বিচরণ করিতেছে, তাঁহারা এই দুইটি পৃথিবীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অক্ষম। এরূপ মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি—হাস্য। কিন্তু ইঁহাদের মনে হাস্যের সহিত বিষাদের তরঙ্গও প্রতিনিয়ত কখনও যুগপৎ উঠিতেছে, কখনও একটি তরঙ্গ অপর একটিতে বিলীন হইয়া তাহা হইতে পুনরায় উঠিতেছে এবং কখনও বা একটি তরঙ্গ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইবার পূর্বেই অন্য একটি আসিয়া তাহাতে আঘাত করিতেছে। কখনও সাধারণ ভাবে হাস্যোদ্দীপন, কখনও প্রকারান্তরে, কখনও সামান্য কথা দ্বারা, কখনও আকার-ইঙ্গিতে এবং কখনও বা হাসাইতে হাসাইতে পাঠককে একটি উর্ধ্বতন রাজ্যে লইয়া গিয়া বিষাদের গভীর সমুদ্রে নিমজ্জন। কিন্তু যখন তাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন তখন দেখা যায় সেই হাস্যের বাহ্য আবরণের পশ্চাতে বিষাদের কলঙ্করেখা ক্রমশ প্রকট হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে এবং কখনও বা বাহ্য আবরণটি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমরা সেই কলঙ্করেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের হাস্যে ক্রন্দন আছে কিন্তু ক্রন্দনে হাস্য নাই। তাঁহাদের হাস্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা অসাধ্য। তাঁহাদের হাস্য, বিষাদ, সহৃদয়তা, চিন্তা ও অনুভূতির সংমিশ্রণ। প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ইঁহাদের হাস্য অপেক্ষা বিষাদ অধিক কেন? তবে কি সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ অধিক? পূজ্যপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সুখ না দুঃখ' প্রবন্ধটি লিখিয়া কোনও একটির দিকে অধিক টান দিয়াছেন আশঙ্কা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন কেন? সেক্সপীয়রের 'কিং লীয়র' নাটকের বিদূষক, না, 'বিষাদক' বলিব?

সাধারণ জীবন বিকৃত দেখিলে স্থলবিশেষে হাসি পায়। দুই তোতলার কলহ শুনিলে অথবা তোতলা ক্রুদ্ধ হইয়া কথা বলিতে না পারিলে শিশুগণ হাসে। জীবন বিকৃত দেখিলে হাসি পায় বলিয়া কতক লেখক সাধারণ জীবন হইতে কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটাইয়া হাস্য আনয়ন করিয়াছেন। মোলিয়রের পুস্তকগুলিতে

অনুরূপ হাস্য আছে, কিন্তু ঘটনাগুলি কিছু অসাধারণ, বাস্তব জীবনে সেরূপ ঘটনা ঘটে কি না সন্দেহ। সেরূপ হাস্যোদ্দীপক ঘটনা ঘটাইবার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিতে হয় তাহা সব সময়ে হয়ত বাস্তব জীবনে সত্য নহে।

অতিরঞ্জন ব্যাপারটিও জীবন বিকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতিরঞ্জনপ্রিয়তা মানবমাত্রেই দেখা যায়, কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক। একটি ঘটনায় যে ব্যাপারটুকু যোগ করিয়া দিলে হাস্য আনয়ন অথবা বৃদ্ধি করা যায় তাহা যোগ করিতে অনেকে কসুর করেন না। অতিরঞ্জনের দৃষ্টান্ত আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক দেখিতে পাই।

ক্ষুদ্র বস্তুকে মহৎ অথবা মহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র করিয়া বর্ণনা করিলে হাসি পায়। এস্থলে 'বিষবৃক্ষে' হুকার বর্ণনা স্মরণ হয়। এইরূপে 'প্যারডি' অর্থাৎ ব্যঙ্গানুকরণ হাস্যের একটি কারণ। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'জন্মভূমি' গানটির অনুকরণে চশমা প্রভৃতি বিষয় লইয়া গান রচিত হইয়াছে এবং মাইকেলের লেখার অনুকরণে 'টেবুলিলা সূত্রধর কাপড়িল তাঁতী' এবং ছুচুন্দারীবধ কাব্য রচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় অসদৃশ বস্তুর উপমাতেও হাসি পায়।

অসামঞ্জস্য হাস্যের কারণ বলিয়া ভণ্ডামিও হাস্যের কারণ। একজন হাতে মালা জপিতেছে, কিন্তু অন্তরে কাহার সর্বনাশ করিবে তাহাই ভাবিতেছে। অনেক স্থলে দেখা যায় এরূপ লোকের চাতুরী ধরা পড়িলে তাহারা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া পুনরায় একটি নূতন চাতুরীর কল্পনা করে তাহাও হাস্যোদ্দীপক। মোলিয়রের মক ডক্টর এইরূপ চরিত্রের লোক। এরূপ ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত আমরা বেন জনসনের নাটকগুলিতে অনেক পাই। এরূপ লোকের কার্যকলাপ দেখিয়া হাসি পায়, কিন্তু তাহার সহিত ঘৃণা মিশ্রিত থাকে এবং যাহাদের মূর্খতাকে লইয়া ইহারা ক্রীড়া করে তাহাদের কার্য দেখিলেও হাসি পায়, কিন্তু তাহার সহিত সহানুভূতি মিশ্রিত থাকে।

মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা একেবারে জানে না অথবা অতি অল্পই জানে এরূপ বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে কথোপকথন বড়ই হাস্যোদ্দীপক। একজন বাঙালী একজন হিন্দুস্থানীর সহিত হিন্দীতে কথা বলিতে গিয়া সমস্তটাই বাঙলা বলিতেছেন, কেবল ক্রিয়া পদের সময় 'হ্যায়' কথাটি যোগ করিয়া দিতেছেন এবং মাঝে মাঝে একটা 'লেকিন' অথবা 'মগর' যোগ করিয়া দিয়া মনে করিতেছেন তিনি খুব হিন্দী বলিতেছেন। এই ধরণের একজন বাঙালীকে কোথা হইতে তিনি কিছু হিন্দী শিখিতে পারিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিবেন, 'হিন্দুস্থানমে থাক্ থাক্ কর্‌কে কুছ্ কুছ্ হিন্দী শিখ্‌ খা।'

এক সময়ে একখানি গ্রামোফোনের রেকর্ড শুনিয়াছিলাম। একজন বাঙালী ক্যানভাসার হাওড়া হইতে পশ্চিমগামী রেলগাড়ীতে উঠিয়া বাঙলায় বক্তৃতা করিতেছেন এবং গাড়ীতে হিন্দুস্থানী যাত্রী থাকায় তাহাদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে উহার হিন্দী তরজমা করিয়া দিতেছেন। তিনি বাঙলায় 'বিলাসে ব্যসনে আর কি কাটবে?' বলিয়া হিন্দীতে তরজমা করিলেন 'বিলাসমে ব্যসনমে আউর কি কাটে গা?' পক্ষান্তরে কোনও হিন্দুস্থানী যদি 'কীলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া' বলে তাহাও এইরূপ হাস্যোদ্দীপক। একজন স্কচ পাদ্রী স্বল্প বাঙলা শিখিয়া ইংরাজী উচ্চারণে ও টোনে বাইবেলের গান ধরিলেন—

> গৌয়াল গরে কে
> শোঁয়েচেন জাব্‌পাটয়েটে
> ঔনি যীশু মুক্‌টিডাটা
> ঔনি ভাগটের ট্রাটা।

দ্ব্যর্থবোধক কথার ক্রীড়া দ্বারা যে হাস্য আনয়ন করা হয় তাহাকে ইংরাজীতে pun বলে। বক্তা এক অর্থে কথাটি প্রয়োগ করিতেছেন এবং শ্রোতা ইচ্ছাপূর্বক অথবা অনিচ্ছায় তাহা অন্য অর্থে গ্রহণ করিতেছেন। পাঠকের এস্থলে গোপাল ভাঁড়ের 'কৃষ্ণপ্রাপ্তির' কথা স্মরণ হইতে পারে। বুভুক্ষু ব্যক্তির নিকট কেহ সন্দেশ আনিয়াছে বলিলে তিনি যত আনন্দিত হন, সে সন্দেশটা কোনও ময়রা-দোকানের না হইয়া সংবাদপত্রের অথবা কোনও পুস্তক বিক্রেতার হইলে ততোধিক দুঃখিত হন।

প্রশ্ন—আপনার ঠাকুরের (অর্থাৎ পিতাঠাকুরের) নাম কি?

উত্তর—আজ্ঞে শালগ্রাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে' এবং সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের প্রথম অঙ্কে ইহার কতকগুলি উদাহরণ আছে।

একজন একটি প্রশ্ন করিতেছে অন্য ব্যক্তি তাহা ভুল শুনিয়া অথবা আদৌ না শুনিয়া প্রশ্নটি অনুমান করিয়া লইয়া যে উত্তর দেয় তাহাতে হাসি পায়।

প্রশ্ন—'পুঁটুলিতে কী?'

উত্তর—'রাধানগর যাচ্ছি।'

এক ধনী ব্যক্তির পুত্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল অনেক চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হইল না দেখিয়া পিতা একদিন হতাশ হইয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একজন বধির চাটুকার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'খোকাকে এখন কে দেখচে?'

পিতা বিরক্তির সহিত অস্ফুটস্বরে উত্তর করিলেন, 'দেখবে আর কে—যম।'

চাটুকার কথাটি ভাল করিয়া না শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ উনি খুব ভাল ডাক্তার শুনেছি, উনি যে রোগীকে দেখেন তাকেই ভাল করে দেন।'

মানবমাত্রেরই একটা বিবেচনাশক্তি আছে এবং বিভিন্ন মানব বিভিন্নভাবে চিন্তা করে। অবশ্য কদাচিৎ একজনের মত অন্যজনের মতের সহিত মিলিয়া যায়, কিন্তু এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের নিজেদের কোনও মতামত নাই অথবা থাকিলেও স্বার্থের খাতিরে অথবা নৈতিক সাহসের অভাবে তাহা প্রকাশ করেন না, তাঁহারা সমস্ত বিষয়ে অন্য কোনও কোনও লোকের চিত্ত সমর্থন করিতে থাকেন। এরূপ লোকের কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া হাসি পায়।

এজন্য রাজাদের মোসাহেবগুলি চির বিদ্রূপ স্থল। সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে অথবা বলে উঁচুদিকে চলে ইহা যদি রাজার মত হয় তাহা হইলে ইহাদের মতও তাহাই।

জোভের পদকের মত সংসারের প্রত্যেক জিনিসের দুইটি দিক আছে তাহাদের একটি দিক আনন্দময় ও অপর দিক বিষাদময়। একটি যষ্টির দুই প্রান্ত যেমন কখনও পৃথক করিতে পারা যায় না এ দুইটিও তদ্রূপ। নির্মল হাস্য (humour) এই দুইটি দিক সমান দৃষ্টিতে দেখে। এই দৃষ্টি কেন্দ্রচ্যুত হইলে একদিকে যেমন অতি তুচ্ছ ও কৃত্রিম হাস্যে পরিণত হয় অন্যদিকে তেমনি নিরবচ্ছিন্ন বিষাদে পরিণত হয়। মানব তাহার নিজের নিকট অতি মহৎ, কিন্তু পৃথিবীর সহিত তুলনায় সে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নগণ্য শক্তিহীন জীবমাত্র এবং মানবজীবনের ইহা অ ি সাধারণ বৈরতা। নির্মল হাস্য এই উভয় দিকের উপর সমান সহানুভূতি রাখিয়া কোনোটিকে প্রধান হইতে দেয় না। সেক্সপীয়রের হাস্য ঠিক এই ধরণের। প্রথমে দেখা যায় ম্যালভোলিও তাঁহার তুলাদণ্ডের হজ্রপের প্রান্তে ঝুলিতেছে এবং পরক্ষণেই দেখা যায় সে তাঁহার হৃদয়ের অপরিসীম সহানুভূতি লাভ করিয়াছে।

হাস্যে এইরূপ অপরিসীম সহানুভূতি না থাকিয়া যদি নৃশংসতা মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে তাহা কঠোর বিদ্রূপের আকার ধারণ করে। কখনও কখনও এরূপ বিদ্রূপের বিষযুক্ত শর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়, উহা অতি জঘন্য। জুভিনাল এরূপ বিদ্রূপের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ এবং তিনি ড্রাইডেন ও পোপের মহাজন। ড্রাইডেনের বিদ্রূপে উদারতা মিশ্রিত আছে বলিয়া যদিও তিনি এ দোষে সর্বতোভাবে দুষ্ট নহেন, এ্যাডিসনের উপর পোপে যে বিদ্রূপ তাহা সাহিত্য হিসাবে যত মধুর নৈতিক হিসাবে ততোধিক ঘৃণিত। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্রূপে এত দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা! ছিল বলি পোপের বিদ্রূপ এত হেয়, কিন্তু বায়রণের 'ভিসন অ জাজমেন্ট' এরূপ উদারভাবে লিখিত যে তাহা পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের ঘৃণার ভাব আসে না। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রতি কাব্যবিশারদের ব্যঙ্গ বিদ্বেষপ্রসূত নয়।

এই বিদ্রূপ ক্রমশ ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া সমাজ এবং সমাজকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর উপর সংক্রমিত হইতে দেখা যায়। সৃষ্টিরহস্য অদ্যাবধি কেহ ভেদ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ পারিবেও না তথাপি মানবের স্বভাব এই যে সে উহা ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ প্রয়াসে অকৃতকার্য হইয়া কাহারও মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হাস্য থা, সিডনী স্মিথ কাহারও হাসিকান্নার সংমিশ্রণ ও অপরিমেয় সহানুভূতি যথা; সেক্সপীয়র কাহারও বা গভীর সন্দেহ যথা মন্টেন ও বেকন এবং কাহারও বা নৃশংস বিদ্রূপ যথা সুইফট্। সংসারে সুখ ও দুঃখ বোধ হয় সমান পরিমাণেই আছে তথাপি মানব দুঃখকে সংসার হইতে বিতাড়িত করিতে চায় এবং না পারিলে তাহার মনের বিভিন্নরূপ অবস্থা হয় যথা—কাহারও হাস্যের চিরন্তন তরঙ্গ, কাহারও অতলস্পর্শ জলধির গম্ভীরতা, কাহারও-বা হাসিকান্নার সংমিশ্রণ অথবা ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব ও তিরোভাব। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় হাসি অপেক্ষা কান্না, সহানুভূতি অপেক্ষা বৈরতা এবং সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহের ভাগ অধিক। এরূপ বিষাদ (melancholy) ও সন্দেহ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্লেটোর মধ্যে আছে, ইহা মন্টেনের মধ্যে আছে, ইহা সেক্সপীয়র মিলটন বেকন প্রভৃতির মধ্যে আছে এবং কাহার মধ্যেই বা নাই? মন্টেনের সম্বন্ধে একটি রচনাতে ইমারসন্ বলিতেছেন—Who shall forbid a wise scepticism, seeing that there is no practical question on which anything more than an approximate solution can be had? অর্থাৎ যে কোনও ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধে যখন একটা কাছাকাছি সমাধান ছাড়া অকাট্য সমাধান হয় না তখন বিচারসঙ্গত সন্দেহবাদকে কে নিবারণ করিতে পারে?

কখনও কখনও হাস্যের একটা উদ্দেশ্য থাকে কখনও বা থাকে না। সেক্সপীয়র, অ্যারিস্টোফেনস্, মোলিয়র, সুইফট প্রভৃতির হাস্যের একটি মহত্ত্ব এই যে, উহা উদ্দেশ্যমূলক (means to an end)। কিন্তু ইহার বিপরীত একরূপ হাস্য আছে তাহা নিরুদ্দেশ্য। ইহা উত্থিত হয়, তরঙ্গিত হয় কিন্তু ইহার কোনও গতি নাই, ইহা একটি ঘূর্ণিতে আত্মহারা হয়। এরূপ কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের চক্ষে সংসারের প্রত্যেক জিনিস হাস্যময় অথবা হাস্যের সম্ভাবনাপূর্ণ। এরূপ নিরুদ্দেশ্য হাস্যের মূল্য কিছুই নাই তথাপি দেখা যায় কোনও কোনও গ্রন্থকার—যথা সিডনী স্মিথ—এরূপভাবে উহা প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা সাহিত্যে চিরন্তন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির হাস্যের মধ্যে স্থানে স্থানে হয়ত সামাজিক দুর্নীতির উপর কটাক্ষ আছে, কিন্তু তাহা সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া নির্মল য (humour) শ্রেণীর অন্তর্গত।

হাস্যের যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইল তাহা ব্যতীত অন্য অনেক রূপ কারণ আছে এবং সেগুলি এই কারণগুলির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অধিকাংশস্থলে ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আকার ইঙ্গিত প্রভৃতির দ্বারা হাস্যোৎপাদনের সহায়তা হয়। আরও দেখা যায় একই ঘটনা কেবল বর্ণনার তারতম্যে হর্ষ অথবা বিষাদ আনয়ন করে। কতকগুলি লেখক আছেন তাঁহাদের হাস্য বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার। চসারের হাস্য কিঞ্চিৎ বায়ব ধরণের এবং আমাদের স্পর্শকে প্রতারিত করে।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে। আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোন বাধা-বন্ধন স্বীকার করি নি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায় নি, আমি আমার বেগে প কেটে চলেছি।

—নজরুল ইসলাম

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

১৯২৬ সালে শিমলা বাসকালে পরিচিত হই স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ও লেডি মিত্রের সঙ্গে। সেবারে শিমলায় আমরা ম্যালের উপরে 'ভিনগেট' নামে একটি সুদৃশ্য বাড়ীতে ছিলাম। ঐ পাহাড়টির চূড়ায় ছিল স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী,—তাঁদের প্রায়ই দেখতে পেতাম, আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তার উপরে উঠে যেতে।

স্যার ভূপেন্দ্রনাথ ইংরাজ-দপ্তরে ভারতের ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে কর্মচারী হিসাবে প্রবেশ করেন অল্পবয়সে। তিনি সেখানে হিসাব সংক্রান্ত কাজে এত কৃতিত্ব দেখান যে, ঐ চাকুরীতে ক্রমোন্নতির পর মধ্যজীবনে হন বাজেট ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা,—পরে অলঙ্কৃত করেন ইংরেজ সরকারের প্রায় সর্বোচ্চ পদ—'অনারেবল্ মেম্বারের' আসন। সে পদের উপরে ছিলেন একমাত্র রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর।

সেদিনে সামান্য দু'একজন তীক্ষ্ণধী ভারতীয় অনারেবল্ মেম্বারের পদ অধিকারের গৌরব অর্জনে সক্ষম হতেন,—তাও বেশীরভাগই 'আই. সি. এস.' থেকে। সাধারণ কর্মচারীর এই অসাধারণ পদে উন্নীত হওয়া ছিল অসামান্য বুদ্ধির পরিচায়ক। স্যার ভূপেনের আশ্চর্য দক্ষতা ছিল ভারত গভর্ণমেন্টের বাজেট প্রণয়নে। তাঁর তৈরী বাজেটে কেহ কখনও কোনো ভুল-ত্রুটির সন্ধান পেত না! বিশাল ভারত সাম্রাজ্যে এমন নির্ভুল আয়-ব্যয়ের হিসাব করা সত্যই স্যার ভূপেনের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী জাতির গৌরব।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অতি মিশুক, অমায়িক ও হাসি-খুসী প্রকৃতির। ভারত সরকারের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হয়েও তিনি তাঁর পূর্ব বন্ধু'দের ভুলে যান নি; রবিবার তাঁর বাড়ীতে বসত তাসের আসর,—সেখানে তাঁর পূর্ব বন্ধুদের সর্বদাই ডাক পড়ত। স্যার ভূপেন রবিবার দিন অনেক সময় তাস খেলে কাটিয়ে দিতে বড়ই ভালবাসতেন।

সরকারী তকমা আঁটা জমকালো পোবাক পরিহিত পরিচারক, চাপরাশী, আরদালীতে ছিল তাঁর পর্বত-শীর্ষের প্রকাণ্ড সরকারী বাড়ীখানা পরিপূর্ণ। ইংরেজী কেতায় সেখানে প্রায়ই ডিনার পার্টি, ইভনিং পার্টির ব্যবস্থা করতে হত তাঁর উচ্চপদেরই আনুষঙ্গিকরূপে।

বিলিতী কায়দায় সাজানো এই বাড়ীর কর্ত্রী লেডি মিত্র ছিলেন একেবারেই সেকেলে প্রাচীন হিন্দু মহিলা। তাঁর পরিচর্যার জন্য ছিল আলাদা হিন্দু পাচক-ভৃত্য। শুনেছি, বয়-বাবুর্চি-খানসামার সাজানো ডাইনিংরুমের পর্দাটিও নাকি তিনি কখনও স্পর্শ করতেন না।

একবার লেডি মিত্র দিলেন এক 'পর্দা-পার্টি'। সেই পার্টিতে যাবার সৌভাগ্যলাভ করে জীবনে ঐ প্রথম এবং শেষ দেখি ঐ ধরণের পার্টি। ছোট-বড় বহু রাজকর্মচারীর স্ত্রীদের সঙ্গে এখানে হয় পরিচয়। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙ্গালী। গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়ায় সমস্ত বিকেল কেটে গেল মহানন্দে,—সন্ধ্যার অন্ধকারে এলো বিদায়ের পালা।

জবরজং পোষাকধারী পাঞ্জাবদেশীয় বিপুল-বপু চাপরাশিগণ অদ্ভুত সুরে চীৎকার করে বাইরে থেকে ডাকতে লাগলো,—অমুক বাবুকা অমুক কোঠিসে লেনে আয়া হো-ও-ও! হোর পর একটি অনাবশ্যক হাস্যকর টান।

ঘোমটা টেনে গৃহিণীরা একে একে বিদায় নিতে থাকেন। এখানে দু-একটি গল্প শুনি, কোন কারণে কোন বাড়ী থেকে গৃহিণীকে নিতে না এলে কি হবে? প্রাণ গেলেও স্বামীর নাম মুখে আনবেন না, কারণ সেদিনের উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা সমাজে তা ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ভদ্রমহিলা একা বাড়ী যাবার কথা কল্পনাও করতে পারেন না,—লিখে জানাবারও যদি ক্ষমতা না থাকে তখন উপায়? ক্রন্দন ভিন্ন তাঁর আর গতি কি? এই ধরণের হাস্যকর ব্যাপারও নাকি মাঝে মাঝে ঘটতো। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পর মেয়েদের এ রকম অসহায়, নিরুপায় অবস্থার কথা, একদম অবিশ্বাস্য আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হয় না কি?

শিমলাবাসের অনেকদিন পর আবার স্যার ভূপেনের সাক্ষাৎ পাই বম্বের কোলাবা অবজারভেটরীতে। তখন লেডি মিত্র ছোট ছোট দু'টি ছেলেমেয়ে রেখে চলে গেছেন পরপারে,—স্যার ভূপেন এসে পৌঁচেছেন বৃদ্ধত্বের কোঠায়! অবজারভেটরীর বাড়ীতে তাঁকে ও বম্বে-প্রবাসী কিছু পরিচিত বাঙ্গালীকে করি চায়ের নিমন্ত্রণ।

কাজের মানুষ, পাঁচ জায়গায় কাজ সেরে আসতে যায় চায়ের সময় পেরিয়ে। অবশ্য আগেও বলেছিলেন চায়ের ব্যাপার সেরে নেবেন অন্যস্থানে, আমাদের নিকট আসবেন শুধু গল্প করতে। এসে বল্লেন, চা-জলযোগ ত' সেরেই এসেছি—কিছু খাবো না।

সমস্ত দিন বসে কত খাবার বাড়ীতে করা, অনুরোধ জানাই সামান্য একটু চেখে দেখার। সম্মত হয়ে বলেন,—নিয়ে এসো।

অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ছিল চিঁড়ের পুলি। পুলিপিঠে দেখে বলেন,—এ তো খেতেই হবে, রসগোল্লা-সন্দেশের দর্শন ও সব জায়গায়ই পাওয়া যায়, কিন্তু পিঠে-পুলি আর কোথায় মেলে? দাও গোটা কতক। তারপর সেই পুলি এত খেতে লাগলেন যে ভয় পেয়ে যাই।

এর কিছুদিন পরেই তিনি লণ্ডনের হাই কমিশনার হয়ে এ দেশ ত্যাগ করেন। অতি সুনামের সঙ্গে দেশে-বিদেশে সমস্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করে যখন অবসর নেবার সময় হয়ে এলো, তখন তিনি অতি ক্লান্ত। বিদেশে পরিচিত বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা হলে বলতেন, শীঘ্রই দেশে যাচ্ছি মরবার জন্য।

সত্যই অবসর গ্রহণের পর পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই কলকাতায় নিজ বাড়ীতে হয় তাঁর একটানা কর্মবহুল জীবনের অবসান!

তিনি কি ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ করেন? তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর আয়ুর সীমা-রেখা? নাকি সমস্ত জীবন আয়-ব্যয়ের হিসাব কষে কষে মস্তিষ্কটি এত পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নিজের আয়ুর আয়-ব্যয়ের হিসাবও তাঁর হয়ে যায় জলের মত স্পষ্ট!

ডাঃ এ, সি, দাশ

কোথায় বাংলার এক কোণে ফরিদপুর জেলার অজ্ঞাত, অখ্যাত, অন্ধকার ক্ষুদ্র গ্রাম,—আর কোথায় নগরীশ্রেষ্ঠা, দেশের সেরা ধনিগণের আবাসস্থল, আলো-ঝলমল সুন্দরী বোম্বাই! ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাশ নামে এক বাঙ্গালী যুবক ঐ ছোট্ট গ্রামটি ছেড়ে নানা স্থানে ভাগ্য-পরীক্ষার পর আসেন বম্বে সহরে,—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সফলতা অর্জনের আশায়।

সাহসখানা কম নয়। বম্বে সহরকে তখন ভারতবর্ষের বিলেত বলা চলে। পার্সী, গুজরাতী, মারাঠী, খৃষ্টান, মুসলমান অধ্যুষিত বম্বে সহরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য আচার-আচরণের পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিলেতী সভ্যতায় নিমজ্জিত এ হেন সহরে ডাঃ দাশের মত একটি অজানা-অচেনা হোমিওপ্যাথের নিজের চেষ্টায় বিশিষ্ট স্থান করে নেওয়া,—ও দেশে প্রায় অজ্ঞাত এক নূতন ধরণের চিকিৎসায় সাফল্যলাভ করা—এ কি কম কৃতিত্ব?

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী, অক্লান্ত পরিশ্রমী ডাঃ দাশ বম্বে সহরে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছিলেন। পার্সী, গুজরাতী খৃষ্টান মহলে তাঁর এত খ্যাতি, এত পসার হয়, যে শেষ জীবনে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করে,—'চেষ্টার অসাধ্য কর্ম নেই' এই প্রবাদ-বাক্য সফল করেন। হোমিওপ্যাথি বিদ্যায় তাঁর পড়াশোনা এবং পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ।

দীর্ঘ বম্বে প্রবাসে পরিচিত হই ডাঃ দাশ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে। সমস্ত পরিবারটি এত মিশুক ও অমায়িক যে,—দু'দিনেই যেন তাঁদের পরমাত্মীয় বলে গণ্য হই!

বিস্তীর্ণ ভারতের এক প্রান্তে বাংলা দেশ,—অন্য প্রান্তে বম্বে। ঐ সুদূর প্রবাসে স্বল্প সংখ্যক বাঙ্গালীর মধ্যে হৃদ্যতা জন্মাত যেন বর্ষার বারিধারার মতই অক্লেশে ও অবিচ্ছেদে। বাঙ্গালী চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি,—এই পরকে আপন করার সুন্দর ক্ষমতাটি, বাংলার বাহিরে না গেলে উপলব্ধি করা যায় কী?

দু'টি পরিবার মিলে-মিশে একাকার। একের সুখ-দুঃখে, দু'দিন পূর্বেরও অপরিচিত, অনাত্মীয়,—অন্যে অংশ গ্রহণ করে সমভাবে,—ভাবতেও কত ভাল লাগে! আর আত্মীয়-বান্ধবহীন দূর-বিদেশে এতে যে মনে কত সাহস, কত আনন্দ দেয়,—তা জানেন ভুক্তভোগী সকলেই।

অনেক মহারাষ্ট্রীয়দের এক অদ্ভুত প্রথা,—তারা শীত গ্রীষ্ম বারো মাস স্নানের সময় মাথায় গরম জল ঢালে। শরীরে ইচ্ছা হলে ঠাণ্ডা জল দেওয়া চলে, কিন্তু মাথায় সব সময়ই দেওয়া চাই কবোষ্ণ জল! জানা নেই, এইজন্যই কিনা মারাঠীদের চুলে পাক ধরে অতি অল্পবয়সে।

বাঙ্গালী আমরা—আমাদের মাথা সাধারণতই একটু গরম। তাই আমাদের প্রথা আলাদা। আমরা জানি, শরীরে গরম জল দিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু মাথাটি বেশ করে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিলে, তবেই হবে রাত্রের সুনিদ্রা! অসুখ-বিসুখে, ১০৫ ডিগ্রী জ্বরে, অথবা সুস্থ শরীরে বারো মাস প্রতিদিন আমরা মাথায় দিই শীতল জল, যা শোনামাত্র অনেক মারাঠী শিহরিত-কলেবরে বলবেন—তোবা, তোবা! ঠাণ্ডা জল শিরে? ফল—নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া!

বম্বেতে একবার এমনি বিপদে পড়ি। শরীর দারুণ অসুস্থ,—মারাঠী ডাক্তার ও মারাঠী নার্সের হাতে দেহ সমর্পিত। তাদের অভিধানে রোগীর মাথা ঠাণ্ডা জলে ধোবার কথা অজ্ঞাত। তিনদিন মাথায় তেল-জল না পড়ে যখন মন-মেজাজ-মাথা সব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে,—ঘুম দেশ থেকে পালিয়ে যায়,—তখন চতুর্থ দিনে দুপুরে নার্সকে বলি,—শীঘ্র ঠাণ্ডা জলে মাথাটা ধুইয়ে দাও,—মাথার যন্ত্রণায় প্রাণ যায়!

নার্স বড় বড় চোখ করে চিত্রাপিতের ন্যায় রইলো দাঁড়িয়ে। অনেক পীড়াপীড়িতে বলে,—ডাক্তারের হুকুম না হলে আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। কাল সকালে আবার তিনি এলে,—তাঁর নির্দেশ নিয়ে, কাল তোমার কথামত কাজ করবো। কিন্তু মাথায় ঠাণ্ডা জল দিলে নিউমোনিয়া হয়,—এ কী তোমার জানা নেই?

উত্তরে আমরা বারো মাসের প্রতিটি দিন, অসুস্থ কি সুস্থ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা জলে ধুই বলায়,—অত্যন্ত বিস্মিত হয়। ওরা নাকি সপ্তাহে মাত্র একদিন চুল ভেজায়, কারণ ঐ দিন ওরা চুলে তেল দেয়। অন্যান্য দিন মস্তক শুষ্ক রেখে, শুধু নিম্নাঙ্গ ধুয়েই স্নানের কাজ শেষ করে,—তাতে ওদের মাথাও গরম হয় না,—ঘুমেরও ব্যাঘাত হয় না!

আরও একদিন অনিদ্রায় কাটাতে হবে? বিমর্ষ চিত্তে ভাবি,—নিজেদের সোনার দেশ ছেড়ে এ কী কাঠখোট্টার দেশে এলাম? এখন কী করি? ভাবতে ভাবতেই এসে পড়েন বম্বের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দাশের স্ত্রী। হাসি-খুশী সদানন্দময়ী মহিলা সখীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। রুগ্ন-শয্যায় শুয়ে বলি তাঁকে দুঃখের কাহিনী।

তিনি তৎক্ষণাৎ বালতি ভরে ঠাণ্ডা জল ও গামলা আনিয়ে সযত্নে মাথা ধুইয়ে দিয়ে গেলেন। নার্স অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে

যখন দেখল,—নিউমোনিয়ার বদলে সে দুপুরে ঘুমিয়ে কেমন সুস্থ অনুভব করি,—তখন বলে, তোমরা বাঙ্গালীরা সব দিক দিয়েই এক অদ্ভুত জাত।

ডাঃ দাশ ও তাঁর পরিবারের সকলের আন্তরিকতায়, সহর থেকে দূরে কোলাবা অবজারভেটরীর নিঃসঙ্গ দিনগুলি হয়ে ওঠে আনন্দ-মুখর! একত্রে পিক্‌নিকে যাওয়া,—ঘন ঘন একত্রে খাওয়া-দাওয়া,—প্রায় প্রতিদিনের মেলা-মেশায়,—সুদীর্ঘ এক যুগের বম্বে প্রবাসে শেষের দিকের দিনগুলি যেন পাখা মেলে উড়ে যেতে থাকে।

তাঁদের নিকট শুনি,—ডাঃ দাশের তখনকার অদ্ভুত চিকিৎসার কথা। কত যে দীর্ঘস্থায়ী জটিল রোগ তিনি হোমিওপ্যাথির দু'এক ফোঁটা জলে সারিয়ে দিতেন, তার স্থিরতা নেই। হাঁপানী, পেটের রোগ, টিউমার, ক্ষত প্রভৃতি নিরাময়ে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পার্সী, গুজরাতী, বোরা কমিউনিটিই বম্বের সবচেয়ে বিত্তশালী নাগরিক। বম্বের ব্যবসা ক্ষেত্রে ওরা রাজা-উজির। তাদের ভিতর ডাঃ দাশের ছিল অসাধারণ প্রতিপত্তি। তারপর আশে-পাশের রাজা-রাজড়াদের মধ্যে এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

নেপালের রাণীর পেটে টিউমার, এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে তার অপারেশন ভিন্ন অন্য উপায় নেই। কিন্তু রাণী সাহেবার স্নায়বিক দৌর্বল্য অত্যন্ত অধিক থাকায় তাঁর অপারেশন অসম্ভব, কাজেই ডাক পড়ে স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথ ডাঃ দাশের। তিনি কিছুদিনের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রাণীকে ব্যাধিমুক্ত করেন। সেই থেকে দেখি প্রতিবৎসর ডাঃ দাশের বাড়ী কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ সুদূর নেপাল থেকে আসে,—মণে মণে খাঁটি ঘি, বিশাল ব্যাঘ্রচর্ম, আর অর্থের কথা তাঁরাই জানেন।

এইরূপে তিনি গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি রাজপরিবারেও আজীবন যোগ্যতার সঙ্গে চিকিৎসা করেন ও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। গল্‌ষ্টোন, এপেণ্ডিসাইটিস্, টন্‌সিলাইটিস্, জটিল স্ত্রীরোগ প্রভৃতি বহু রোগ তিনি বিনা অস্ত্রে আরোগ্য করেন।

একদিন যে যুবকটি কপাল ঠুকে প্রায় কপর্দকশূন্য ভাবে এসেছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্য বম্বে সহরে,—নিজ বিদ্যা ও অধ্যবসায়ের গুণে, প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি উত্তরজীবনে হয়ে ওঠেন সেখানকার সর্বোৎকৃষ্ট ডাক্তারদের অন্যতম। ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁকে প্রচুর বিত্তে বরণ করে নেন।

তাঁর দুই পুত্রকে তিনি আধুনিক এ্যালোপ্যাথিতে সুদক্ষ করে, তারপর নিজের অগণিত রোগীর মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালাবার ভার দিয়ে যান। দুই পুরুষ যাবৎ তাঁদের বম্বে-বাস আজও অব্যাহত। বাংলার বাহিরে তিনি নিজ কৃতিত্বে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করে কিছুদিন পূর্বে স্বর্গীয় হলেও, আমাদের মধ্যে রেখে-গেছেন স্মৃতির সৌরভ।

ডাঃ দাশের অল্পবয়স থেকেই ছিল পৈতৃক 'বহুমূত্র রোগ'—কিন্তু তিনি কখনও 'ইনসুলিন' প্রভৃতি এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার না করে, নিজের হোমিওপ্যাথিতেই আস্থা রেখে প্রায় ৬৫।৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেশ কর্মক্ষম ছিলেন। তারপর হঠাৎ হয় তাঁর পক্ষাঘাতের আক্রমণ! বাক্‌শক্তি-রহিত অবস্থায় কিছুকাল অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়ে, ঐ রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে বম্বেতেই ত্যাগ করেন শেষ নিঃশ্বাস!

ডাঃ দাশ বম্বে সহরের কেন্দ্রস্থলে স্বীয় ব্যবসার সুবিধার জন্য একটি প্রকাণ্ড ভাড়াটিয়া ফ্ল্যাটে বাস করলেও,—বম্বের সহরতলী 'আন্ধেরী'তে একটি ও বম্বের নিকটবর্তী জনপ্রিয় শৈলাবাস 'পাঁচগণি'তে একটি,—মনোরম বাড়ী নির্মাণ করান। শেষ জীবনে মাঝে মাঝে সহরের গণ্ডগোলের গণ্ডীর বাহিরে, পশ্চিমঘাট পর্বত-মালার শীর্ষে অবস্থিত,—প্রাকৃতিক দৃশ্যে অতুলনীয়, শীতল পাঁচগণিতে থেকে কর্মক্লান্ত জীবনের ক্লান্তি অপনোদন করতেন।

বম্বের মত পাশ্চাত্য-রীতি-অনুকরণ প্রিয়তার দেশে আজীবন বাস করেও,—ডাঃ দাশ ও তাঁর পত্নীর ধর্ম-প্রবণতা অনুকরণীয়। তাঁদের উভয়েরই ছিল স্বধর্মে গভীর শ্রদ্ধা। হিমাচল প্রদেশের কোন রোগী ডাঃ দাশের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ডাক্তারবাবুকে দেন একটি তৎপ্রদেশীয় 'শালগ্রাম-শিলা'।

দাশ-দম্পতি সে অমূল্য দান শ্রদ্ধায় মস্তকে ধারণ করে,—করেন নারায়ণের নিত্য ভোগ-পূজার ব্যবস্থা। তারপর বম্বের সহরতলী 'খার' নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর,—অত্যন্ত কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁরা সর্বদা যোগাযোগ রাখেন সেখানকার আশ্রম ও সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে।

তাঁদের অসীম সৌভাগ্য যে, একবার স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত সর্বশেষ শিষ্য,—সাধক মহাপুরুষ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর আগমন হয় বম্বের রামকৃষ্ণ আশ্রমে। ডাঃ দাশ ও তাঁর সহধর্মিণী সেই সময় তাঁর নিকট দীক্ষিত হয়ে ধন্য হন!

কুমুদিনীকান্ত বসু

১৯২৩।২৪ খৃষ্টাব্দে বম্বে-প্রবাসে পরিচিত হই স্বর্গীয় কুমুদিনীকান্ত বসুর সঙ্গে। তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারত সরকারের 'ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস, ডিপার্টমেণ্টের' বম্বে শাখার প্রধান কর্মচারী।

তিনি অতি সদালাপী, সামাজিক মেলা-মেশায় উৎসাহী, বন্ধু-বৎসল, সুদর্শন, অমায়িক ভদ্রলোক। বম্বের উন্নত সমাজে ছিলেন মিঃ কে, কে, বোস নামেই সমধিক পরিচিত। দিনান্তে আপিসের বোঝা মাথা থেকে নামার পর, তিনি এ বাড়ী, সে বাড়ী, সব বন্ধু-বান্ধবের খবর নিয়ে বেড়াতেন প্রফুল্ল চিত্তে। আমরা ছিলাম সহর থেকে দূরে,—স্বজন-স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, বোধ হয় সেইজন্যই আমাদের নিকট আসতেন ঘন ঘন।

বিক্রমপুরের বারদী গ্রামের বিখ্যাত বসু পরিবারে তাঁর জন্ম। ঢাকা স্কুল অব ইঞ্জিনীয়ারিং থেকে পাঠ সমাপ্ত করার পর, তখনকার প্রথানুযায়ী পিতামাতা তাঁর অল্পবয়সেই বিবাহ দেন, কিছুদিনের মধ্যে একটি পুত্রের জন্ম হয়; কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের গতানুগতিক জীবন তাঁর অসহ্য মনে হয়।

নবীন যুবক—মনে তাঁর বড় হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সামাজিক, পারিবারিক কোন বাধাই তিনি মানতে রাজী নন—দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

মানুষটি যে কোন প্রকারে বিদেশে গিয়ে বড় হয়ে দেশের শীর্ষস্থানে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় বদ্ধপরিকর।

জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, উচ্চাভিলাষী গরীব ছাত্রদের জন্ম সে সময়ে দান করেছিলেন কয়েকটি সহস্র মুদ্রার বৃত্তি, বিদেশে যাওয়ার পাথেয় হিসাবে। এই বৃত্তির সর্ত ছিল,—উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে এসে সমর্থ হলে, বৃত্তিধারী স্বেচ্ছায় স্বোপার্জ্জিত অর্থে ঋণ পরিশোধ করবেন এবং অন্ত একটি যোগ্য ছাত্র পুনরায় ঐ বৃত্তি লাভ করবেন।

দৃঢ়-চিত্ত কুমুদিনীকান্ত পূর্বোক্ত চুক্তিতে ঋণ-স্বরূপ ঐ সহস্র মুদ্রার বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কর্ম-জীবনে কড়া-ক্রান্তিতে ঐ ঋণ পরিশোধ করেন !

অভিভাবকদের অমত,—স্ত্রীর অশ্রুজল, দেশাচার-লোকাচারের বাধা,—সব অগ্রাহ্য করে মাত্র তিন-চার শত টাকা মূলধন নিয়ে তিনি দেন তখনকার দিনের অতি লম্বা পাড়ি। জলপথে একেবারে পৃথিবীর অপরপ্রান্তে অবস্থিত আমেরিকায় গিয়ে মাটিতে পা দেন।

অপরিচিত পরিবেশে, সামান্ত অর্থ হাতে, মিঃ বোস অনেক কষ্টে স্থান করে নেন একটি ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ছুটিতে ছুটিতে করেন অর্থোপার্জন। তাঁর নিজের মুখেই শুনি,—কোন ছুটিতে হোটেলের বাসন ধোয়া এবং সিদ্ধ আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজ,—কোনো ছুটিতে টিনজাত-খাদ্য-সংরক্ষণের কারখানায়,—কোনো বার বা অন্ত উপায়ে অর্থোপার্জন করে ছুটিটা কাটিয়ে দিতেন। দেশ থেকে অর্থ সাহায্য করার বিশেষ কেহ নেই,—স্বাবলম্বী যুবক অতদিন পূর্বে আমেরিকার মত ধনী দেশে স্বোপার্জিত অর্থে নিজের পড়া ও থাকা-খাওয়া চালাতে থাকেন দীর্ঘকাল,—এ কী কম মানসিক শক্তির পরিচায়ক ?

এখন আমরা প্রায়ই নবীন যুবকদের মুখে শুনি, মুরুব্বির জোর ছাড়া,—অথবা ব্যাকিং-বিনা উন্নতি করা অসম্ভব। কিন্তু তখনকার দিনে কত দেখা যেত মিঃ বোসের মত স্বাবলম্বী যুবক,—যাঁরা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সামান্য অবস্থা থেকে উঠেছেন সমাজের শীর্ষস্থানে। আজকের যুবকদের একথা ভুললে চলবে না,—নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রম ও উদ্যমই মানুষের বড় হওয়ার প্রধান সহায় !

দীর্ঘ এগারো বৎসর এভাবে আমেরিকায় কাটিয়ে, মিঃ বোস কোচিনের 'কোকোনাট অয়েল ফ্যাক্টরীতে' চাকুরী নিয়ে প্রায় এক যুগের পর আবার ভারতে ফিরে আসেন। এ কাজ তিনি বেশী দিন করেন নি,—কিছুদিনের মধ্যেই পান ভারত গভর্ণমেণ্টের ষ্টোরস্-ডিপার্টমেণ্টে 'পারচেজ-অফিসারের' কাজ।

প্রথম সরকারী কর্মস্থল হয় তাঁর বোম্বাই। এখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে। একত্র গল্প-গুজব, একত্র পিক্‌নিকে যাওয়া, একত্র আহার,—তাঁর কত কথাই না আজ মনে পড়ে। মিঃ বোস আমেরিকা থেকে শুধু পূর্ত-বিদ্যাই সংগ্রহ করেন নি,—ও দেশের রন্ধনবিদ্যাও ভালভাবেই আয়ত্ত করে এসেছিলেন। নানা প্রকার আমেরিকান রান্না নিজের হাতে প্রস্তুত করে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের খাওয়াতে ভালোবাসতেন।

বম্বে-কলকাতা-করাচী-দিল্লী প্রভৃতি স্থানে যোগ্যতার সঙ্গে সরকারী চাকুরী নিষ্পন্ন করে অবসরগ্রহণের পর তিনি রাজধানী দিল্লীকেই অবশিষ্ট জীবনের আবাসস্থল রূপে মনোনয়ন করেন।

নূতন দিল্লীর এক বিশিষ্ট স্থানে বাসের জন্ম তিনি নির্মাণ করান এক মনোরম হর্ম্য। দিল্লী তাঁর এত ভাল লাগত যে তিনি আর কোথাও যেতে চাইতেন না।

এদিকে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতায়ও বহুদিন পূর্বে নিজ বিচক্ষণতায় কিনে রেখেছিলেন কিছু জমি।

চাকুরী জীবন সমাপ্তির পর আমরা যখন কলকাতায়,—বহুকাল পর আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেহ তখন বার্ধক্যের আক্রমণে কিঞ্চিৎ দুর্বল হলেও, মনের দিক থেকে তিনি তখনও সতেজ, সবল।

বলেন, কলকাতা আমার একটুও ভাল লাগে না। জমিটায় একখানা বাড়ী করার ইচ্ছায় এখানে এসেছি। বাড়ীর কাজ শেষ হলেই দিল্লী ফিরে যাব। প্রথম পুত্রটির অকাল-মৃত্যুর পর তাঁর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অতি আদরিণী ঐ একমাত্র কন্যার জন্য কলকাতায় বাড়ী নির্মাণের অভিপ্রায়েই তাঁর শেষ বয়সে এখানে আগমন; তিনি সেই ৭০।৭২ বৎসর বয়সেও ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ঐ বাড়ীর জন্ম অমানুষিক পরিশ্রমে মেতে ওঠেন। নিজের হাতে কেনা-কাটা,—নিজের অধীনে মিস্ত্রী খাটানো। আর তাড়াতাড়ি বাড়ী শেষ করে দিল্লী ফিরে যাবার কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা !

কিন্তু দিল্লী ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা আর তাঁর পূর্ণ হল না। বাড়ীর কাজ কোন প্রকারে শেষ করে, দু'দিনও সে-বাড়ীতে বাস করেছেন কি না সন্দেহ—হঠাৎ সুস্থ, সবল মানুষটির হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একটি কঠোর কর্মযোগীর জীবনের উপরে হয় চির-যবনিকাপাত !

মিঃ বোস ছিলেন অত্যন্ত স্বাবলম্বী, দৃঢ়চিত্ত, সাহসী, একরোখা, সবল মানুষ—যে গুণগুলির আমাদের মধ্যে ক্রমশই অভাব দেখা যাচ্ছে। এইজন্যই কি আজ বাঙালী ছেলেরা অন্ত দেশের ছেলেদের সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষায় ওসব কাজে পিছিয়ে পড়ছে ?

[ক্রমশ।

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

—রবীন্দ্রনাথ

মাসিক বসুমতী

ভাদ্র / '৭০

মর্ম্মর ও মানবী

— [illegible] দাস

নবাব-বাহাদুর

—[illegible]নাথ ভড়

[ছবি পাঠানোর সময় ছবির পিছনে নাম, ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

কান্না

—বিশ্বজিৎ সেন

হাসি

—চিত্তরঞ্জন মণ্ডল

খেলা

—কালীসহায় বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাক

–রবীন্দ্রনাথ সরকার

মাধবী

—এডনা লরেনজ

চিংড়ির লড়াই

মাসিক বসুমতী
ভাদ্র / '৭০

—রামকিঙ্কর সিংহ

জরুরী ঘোষণা

আমাদের একশো বছরের সুনামের সুযোগ লইয়া কয়েকজন অসাধু লোক নানাবিধ মিথ্যা প্রচারের দ্বারা আমাদের খরিদ্দারগণকে ঠকাইতেছে। কোন কোন দোকানদার বেশী মুনাফার লোভে ইহাদের সাহায্য করিতেছে। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ '<u>লক্ষ্মীবিলাস</u>' কিনিবার সময় এই কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিবেন ঃ—

(১) <u>ট্রেড মার্ক—শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি</u> (২) <u>সবুজ রঙের পিলফার প্রুফ ক্যাপ</u> (৩) <u>এম এল বোস এণ্ড কোং</u>

সব সময় ক্যাশ মেমো লইবেন এবং যদি কোনও দোকানদার আপনাকে 'শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি'র বদলে অন্য কোনও তৈল আমাদের বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করে, আমাদের বিস্তারিতভাবে জানাইলে আমরা সেই সকল জাল-বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

এম. এল. বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

লক্ষ্মীবিলাস হাউস

কলিকাতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

চোদ্দ

খুব বেশিদিন কাঠুরে চৌধুরীকে মজুরের কাজ করতে হয় নি, তার কর্তব্য নিষ্ঠা দেখেই কাঠের গুদামের মালিক তাকে হিসাব রাখার কাজে নিয়োগ করলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল, ফটিক এ কাজে টিকে থাকবে না। সে যে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তা তার চেহারাতেই লেখা আছে। হয় তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, দুদিন কষ্ট পাবার পরই আবার ফিরে যাবে। এ রকম ঘটনা বুড়োরা আগেও ঘটতে দেখেছেন। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী ছাতু খেয়ে কাঠের গুদামে পড়ে রইল, হাত পুড়িয়ে যখন রান্নার চেষ্টা করল, তখনই বুঝলেন যে, এ ছেলে ফিরবে না। হয় তো তার ফেরার পথ নেই, কিংবা জায়গা নেই। তখন তিনি তাকে হিসাব লিখতে দিলেন

একদিন খবর এল, এক সাহেব তাঁর কাঠের কারবারের জন্যে একজন অভিজ্ঞ লোক নেবেন—একজন টিম্বার স্পেশালিষ্ট। খবর পেয়ে তার কাঠের গুদামের মালিক বললেন, যা যা, লেগে যা ওখানে।

ফটিক ভয় পেয়েছিল: কাঠের সম্বন্ধে আমি কী জানি।

কেই বা কী জানে!

তারা স্পেশালিষ্ট চাইছে, তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে যে লজ্জা করছে।

তবে লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের ছেলে এইখানেই সারাজীবন পড়ে থাক।

ভদ্রলোক বাঙলা জানেন না। হিন্দীতে এই বিরক্তি প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। ফটিকও তার কাজে মন দিল।

খানিকক্ষণ তার কাজ-কর্ম দেখে বুঝলেন যে ফটিক তার গুদাম ছেড়ে যাবে না। বললেন: সাহেব কত মাইনে দেবে? একশো, দেড়শো? বড় জোর দু'শো। দু'শো টাকার জন্যে দেরাদুনের পাশ করা ছেলে লাফিয়ে আসবে, কী বলিস! এই জঙ্গলে বাস করবার জন্যে তাদের ঘুম হচ্ছিল না তো!

কিন্তু—

কিন্তু কী! কাঠের কাজে আবার জানবার কী আছে! এ অঞ্চলের কাঠ সব চিনে ফেলিস নি?

উঠে দাঁড়িয়ে বুড়ো একটা কাঠের গুঁড়িতে লাথি মারলেন। বললেন: এটা কী?

আসন।

এটা?

বীজা।

এটা?

হলদু।

ওটা?

কেন্দু।

বিড়ি পাতা হয় কোন্ গাছে?

এইটে।

লাক্ষার পোকা লাগায় কোন্ গাছে ?

কুল আর পলাস।

বুড়ো বললেন : শাল গাছের বয়েস বলতে পারবি ?

না।

আহাম্মক।

ফটিক চুপ করে রইল।

বুড়ো বললেন : যা মুখে আসে তাই বলবি।

সে তো ভুল হবে।

যে জিজ্ঞেস করবে, সেও তোর মতো পণ্ডিত। বেরো এবারে।

সেই কাঠের গুদামের মালিক তাকে আর বসতে দেয় নি। ঠেলে বার করে দিয়েছিল! আর ফটিক চৌধুরীকে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল সেই সাহেবের সামনে।

আশ্চর্য হয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুমি টিম্বার স্পেশালিষ্ট ?

ফটিক হার স্বীকার করতে আসে নি। হেরে গিয়ে সে তার পুরণো মনিবের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তাকে জিততেই হবে। এই রকমের একটা দৃঢ়তা সে ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে ফেলেছে। সংযত সবিনয়ে উত্তর দিল : ইয়েস স্যার।

সাহেব তার বয়স অনুমান করবার চেষ্টা করে আরও বিস্মিত হলেন, বললেন : কাঠের কাজ কোথায় শিখলে ?

প্রথম দেরাদুনে, তারপর এইখানে।

দেরাদুনে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কিছুদিন গিয়েছিলুম।

কথাটা মিথ্যা নয়। একবার তারা ছুটির সময় দেরাদুনে ছিল। তখন এই ইনস্টিটিউট দেখে তার ভাল লেগেছিল। অনেকবার গিয়েছিল জাদুঘর দেখতে। কত রকমের গাছ, তার কত নাম, কত বয়স, কত বিভিন্ন আকার প্রকার। তার খুব ভাল লাগত। তার আগ্রহ দেখে এক ভদ্রলোক অনেক কিছু বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। এই তার অভিজ্ঞতা।

সাহেব বললেন : সত্যি নাকি ?

আজ্ঞে।

এখন কী কর ?

একটা কাঠের গুদামে চাকরি করি।

সত্যি ?

ফটিক চুপ করে রইল।

সাহেবের মনে হল, তাঁর হিসাবের বোধ হয় ভুল হচ্ছে। চেহারা দেখে এই ছেলেটির বয়সের অনুমান ঠিক হচ্ছে না। দেহটা যেমন সবল, মুখটা তত কঠিন হয় নি! অনেকেরই এ রকম হয়। অনেক বয়স পর্যন্ত তাদের ছেলেমানুষ দেখায়। বললেন : তুমি কাঠ দেখে তার বয়স বলতে পার।

হিসেব করে বলতে পারি।

হিসেব করে ?

আজ্ঞে, এর ফরমুলা আছে।

আই সী।

বলে সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : এস, আমার সঙ্গে।

সাহেবকে অনুসরণ করে ফটিক তাঁর কাঠের গুদামে এসে উপস্থিত হল। বিরাট গুদাম, বহু লোক সেখানে কাজ করছে। কাঠের বহর দেখে ফটিক আশ্চর্য হয়ে গেল। তার চেয়েও বেশি চিন্তিত হল নিজের পরীক্ষার কথা স্মরণ করে। সাহেব তাকে একটি মোটা গুঁড়ির কাছে এনে জিজ্ঞাসা করলেন : এই গাছের বয়স কত বলতে পার ?

ফটিক এক মুহূর্ত দেরি করল না, বলল : একটা ফিতে আর কাগজ-পেনসিল চাই।

সাহেব নিজেই তা সংগ্রহ করে আনলেন।

ফটিক গুঁড়ির দু' প্রান্তের ব্যাস মেপে কাগজে লিখল। সাহেবের সাহায্য নিয়ে লম্বাটাও মেপে নিল। তারপর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সরল করে একটা উত্তর বার করে ফেলল। গম্ভীরভাবে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : বাহাত্তর বছর।

সাহেব খুব মনোযোগ দিয়ে তার হিসাব দেখছিলেন। কিন্তু বাঙলায় লেখা বলে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আশ্চর্য হয়ে বললেন : কী করে বার করলে ?

আমাদের একটা দেশী হিসাব আছে।

ফটিককে বেশ গর্বিত দেখে সাহেব খুশী হলেন, বললেন : তোমার মতোই একজন লোক চাইছিলাম।

ফটিক এবারে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল : আমি জানি স্যার।

সাহেব বললেন : তোমার কত টাকা পেলে চলবে ?

সেটা আপনিই বিবেচনা করবেন।

একশো ? দেড়শো ?

ফটিক কোন উত্তর দিল না।

সাহেব বললেন : এখন দেড়শো নাও. ছ' মাস পরে দু'শো নিও।

ফটিক বলল : ভেবে দেখি স্যার।

তোমার কি মাইনে পছন্দ হল না ?

আজ্ঞে, ত নয়।

তবে ?

আমার বর্তমান মনিবকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব।

আচ্ছা।

বলে সাহেব তাকে বিদায় দিলেন।

ঠাকুর সাহেবের গোলায় ফটিক ফিরে এল। ঠাকুর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : কি রে, কী হল ?

বিষণ্ণ ভাবে ফটিক বলল : কিছু না।

ফেল হয়ে গেলি ?

ফটিকের আত্মসম্মানে বুঝি আঘাত লাগল, দৃপ্তভাবে উত্তর দিল : না।

তবে ?

ওখানে চাকরি করব না।

কেন ?

এ কথার উত্তর ফটিক দিল না।

ঠাকুর সাহেব বললেন : মাইনে কম দেবে বুঝি ?

না।

তবে কী হয়েছে বল না হতভাগা।

ফটিকের দু'চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল, বলল, আমি মিথ্যা কথা বলে চাকরি পেয়েছি।

ঠাকুর সাহেব তাকে কাছে ডেকে নিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর বললেন : পাগল ছেলে।

ফটিক সত্যিই সাহেবের কাছে গেল না, সাহেব এলেন তার কাছে। তাকে সরিয়ে দিয়ে সাহেবকে ঠাকুর সাহেব কী বললেন, সে শুনতে পায় নি। কিন্তু সাহেব তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন। চাকরি দিলেন দু'শো টাকায়।

ছলছল চোখে ফটিক বলেছিল আপনি ভুল করছেন স্যার, কাঠের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে।

সাহেব হেসে বললেন, আমিও জানি নে।

কাজ করতে করতে সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাড়িতে তোমার কে আছে ?

কেউ নেই।

সাহেব আড়চোখে ফটিকের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন : আমারও কেউ নেই।

তারপরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : বাড়ি আছে তো ?

না।

তাহলে আরও ভাল।

কেন ?

আমি একা থাকি, সঙ্গীর অভাবে এক একদিন কষ্ট হয়। তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে।

সেদিন কাজের শেষে ফটিক সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাংলোয় এসে উঠল। আজও সেই বাংলোয় আছে। সাহেব নেই, ফটিকই এখন বাংলোর মালিক। সেই ফটিক কাঠুরে চৌধুরী নামে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু তার পুরনো দিনগুলো এখনও সে ভুলতে পারে নি। ভুলতে পারে নি তার মনিব গ্রে সাহেবের কথা। বারান্দায় বসে কাঠুরে চৌধুরী তার পুরনো দিনের কথা ভাবছে।

অপর প্রান্তে দময়ন্তী কি ঘুমিয়ে পড়ল।

পনর

দময়ন্তীর বাবা নরোত্তম খেমলানির সঙ্গে কাঠুরে চৌধুরীর পরিচয় হয়েছে অনেকদিন পরে। ভদ্রলোক গ্রে সাহেবের কাছে এসেছিলেন একাধিকবার। বেড়াতে আসেন নি, বন্ধুতা করতেও আসেন নি। যে জন্যে আসতেন কাঠুরে চৌধুরী তা জানত। গ্রে সাহেব নিজেই তাকে বলেছিলেন।

এদিকে নরোত্তমবাবু ভাবতেন যে সাহেব খুব চাপা স্বভাবের লোক। ভাল লোকও। মানে বোকা মানুষ। ঠিক মতো টোপ ফেলতে পারলে সাহেব টপ করে গিলে ফেলবেন। তাই অনেক আশা নিয়ে নরোত্তমবাবু সাহেবের কাছে আসতেন।

একদিন কাঠুরে চৌধুরী সাহেবকে বলল : ঐ ভদ্রলোকের হাবভাব আমার ভাল লাগছে না।

আমারও না।

তবে ওর সঙ্গে অমন করে মিশছেন কেন ?

ও মেশে বলে।

বেশ কথা তো ! ও মেশে বলেই আপনি মিশবেন !

সাহেব হাসছিলেন।

কাঠুরে চৌধুরী বলল, যদি আপনার কিছু বলতে লজ্জা করে তাহলে আমি বলে দেব।

কী বলবে ?

এখানে তাঁর আর আসা উচিত নয়।

কেন ?

আমি তাঁকে ভাল চোখে দেখছি না।

সাহেব উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

কাঠুরে চৌধুরী লজ্জা পেয়ে বলেছিল, তাঁর কোন দুরভিসন্ধি আছে।

সাহেব বললেন : দুরভিসন্ধি কি না জানি না, অভিসন্ধি আছে।

কাঠুরে চৌধুরী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সাহেব বললেন : নরোত্তম আমাকে মাইকার ব্যবসায়ে নামাতে চায়।

সর্বনাশ : ও তো ফটকার ব্যাপার। আপনি রাজী হন নি তো ?

সাহেব হাসছিলেন ছেলেমানুষের মতো।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : যে রকম ভাল মানুষ আপনি!

হাসতে হাসতেই সাহেব বললেন : তাকে কী বলেছি জান? বলেছি চৌধুরীকে ধর। সেই তো সব দেখাশুনো করে, যদি ভাল বোঝে নেমে পড়ব।

খুব ভাল কথা বলেছেন। আমার কাছে ও ঘেঁসবে না।

কেন?

আমি ওর অবস্থা জানি যে। পলাশ আর কুল গাছে পোকা লাগিয়ে আর চলবে না। বুনো লাক্ষার দাম পড়ে গেছে। বিদেশ থেকে সিনথেটিক ল্যাক আসছে। তার রঙ ঢের ভাল?

তাই নাকি!

পরম উৎসাহে কাঠুরে চৌধুরী বুনো লাক্ষার দোষ বোঝাতে লাগল। পথে যেতে যেতেই খারাপ হতে শুরু করে। কলকাতা বন্দরে পৌঁছয় যখন তখন তার দাম পাওয়া যায় না। বিদেশ এই লাক্ষা আর নিচ্ছে না।

সত্যি?

নরোত্তমবাবু তাই অন্য ব্যবসার কথা ভাবছেন। কোডারমার মাইকা হল মরীচিকা, অভ্রের মতোই চিক চিক করে। আমি ওর মধ্যে নেই।

হঠাৎ তার গ্রে সাহেবের দিকে নজর পড়তেই লজ্জা হল। বুড়ো সাহেব হাসছেন। তার বুঝতে দেরি হল না যে, এ সমস্ত কথাই সাহেবের জানা। তাকে শুধু পরীক্ষা করছেন। কাঠুরে চৌধুরী পালিয়ে গিয়েছিল।

এই কাঠুরে চৌধুরীই একদিন সাহেবকে এসে বলল : আর আমি চাকরি করব না।

তবে কী করবে?

স্বাধীন ব্যবসা।

মূলধন?

আছে।

মাইনের টাকা বুঝি অনেক জমেছে?

কাঠুরে চৌধুরী তার নিজের শরীরের দিকে তাকাল। যেন তার বলিষ্ঠ দেহই তার বড় মূলধন।

সাহেব বললেন : জানি। তবে ওর চেয়েও তোমার বড় মূলধন আছে।

কী?

সততা। ঐ জিনিষটির অভাব না হলে তোমার ব্যবসা কোন দিন ফেল হবে না।

গ্রে সাহেব তাকে স্বাধীন ব্যবসার অনুমতি দেন নি। দিয়েছিলেন নিজের ব্যবসারই চার আনা অংশ। ঝিনে-পয়সায়

দেন নি, দিয়েছিলেন দাম নিয়ে। কাঠুরে চৌধুরী বলেছিল, দানের জিনিষের দাম হয় না, অথচ নিয়ে শুধু মন ছোট হয়।

সাহেব বলেছিলেন, খুব খাঁটি কথা। নিজেদের স্বাধীনতার ব্যাপারটাও তো দেখতে পাচ্ছ। দেশের ক'টা লোক এই এত বড় জিনিষটার মর্ম বুঝল!

কাঠুরে চৌধুরী লজ্জা পায় এই কথা শুনলে। কোন উত্তর দেয় না।

কিন্তু বুড়ো গ্রে সাহেব বলে আনন্দ পায় আজ-কাল। বলেন, তোমাদের দেশের লোক যদি এই স্বাধীনতার মর্যাদা দিত, তা'হলে কি আমি এখনও ব্যবসা করে খেতে পারি। তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করতে পার না।

এ-কথা যে মিথ্যা নয়, তা' কাঠুরে চৌধুরী জানে। তাই চুপ করে শোনে।

সাহেব বলেন, তোমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনা হয়েছে। খুব ভাল কথা, খুব আনন্দের কথা। বড় বড় বাঁধ তৈরি হচ্ছে, কারখানা তৈরি হবে। কন্‌ট্রাক্ট পাচ্ছে বিদেশী কোম্পানী। কেন পাচ্ছে? তোমাদের নিজেদের কিছু নেই বলে? তা মোটেই নয়। কিছু থাকলেও তোমরা কন্‌ট্রাক্ট পেতে না। তোমাদের যে নৈতিক চরিত্র নেই, তা তোমরা ভাল করেই জান। তোমরা বাঁধ তৈরি করলে এক বর্ষাতেই সে বাঁধ ভেসে চলে যাবে। তোমরা শুধু জিনিষ চুরি কর না, পরিশ্রমও চুরি কর। অন্যের শ্রমের মূল্যেও গায়ের জোরে ভাগ বসাও। তোমাদের দেশের উন্নতি ভগবান করবেন।

বুড়ো সাহেব এই সব কথা বলেন সন্ধ্যাবেলায় মদের গ্লাস হাতে নিয়ে। কাঠুরে চৌধুরীকেও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বলেন, খাও খাও, সারাদিন ভূতের মতো খেটেছ, একটু এনার্জি পাবে।

প্রথম দিকে কাঠুরে চৌধুরী ভয়ে ভয়ে খেয়েছে। আজকাল আর ভয় পায় না। প্রায় সমান সমানই খায়। সাহেব রহস্য করে বলেন, চেলা ভাল তৈরি হচ্ছে।

তারপরেই বলেন, আমার নামই তোমার গুডউইল। যতদিন ঠকাবে না, ততদিন তোমার ব্যবসার মার নেই। গভর্ণমেন্টের কাজ ধরতে যেও না। প্রাইভেট কাজই তোমাকে বেশি পয়সা দেবে।

তারপর এই মন্তব্যের কারণ বোঝাতেন। বলতেন, তোমাদের গভর্ণমেন্ট ভাল মাল চায় না, চায় সস্তা মাল। যে সবচেয়ে সস্তায় মাল দিতে পারবে, তার কাছ থেকেই মাল নেওয়া হয়। বেশি দামের ভাল মাল নেবার ক্ষমতা নেই। টেণ্ডার কমিটী সৎ হলে ভাববে, ঝামেলার কী দরকার। অসৎ নামের ভয়ে তারা সস্তায় মাল নেবে। আর অসৎ কমিটীর ব্যাপার অনুমান করতে পার। কাজেই ভাল মাল গভর্ণমেন্টে চলবে না।

কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞেস করত: চিরদিনই কি এই নিয়ম?

তা হলে কি আমরা আসতাম ব্যবসা করতে! আমরা যে যুগে এসেছি তখন প্রাইভেট খদ্দের ক'টা ছিল? সবই তো গভর্ণমেন্ট সাপ্লাই। দামের পরোয়া নেই। ভাল মাল দাও। তোমার কায়েমি অর্ডার। যে জিনিষের অর্ডার পেতাম, তার চেয়ে ভাল মাল আমরা দিতাম। মাল পেয়ে যেন সবাইকে সুখ্যাতি করতে হয়। আর এখন?

কাঠুরে চৌধুরী সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাহেব বলেন, রেষারেষি করে কম দাম দিয়েছি টেণ্ডারে। সে দামে মাল দিলেই লোকসান। কিংবা ঐ মুনাফায় কোম্পানী চলে না। তখন গোঁজা মিল দাও। যে কাজের জন্যে মাল যাচ্ছে সে কাজই হয় তো হবে না। হলেও তা মজবুত হবে না। যারা মাল পাস করবে তাদের পায়ে ভেট চড়িয়ে কাজ হাসিল কর। এর নাম কি ব্যবসা? ছি!

গ্রে সাহেব নাক সিঁটকে বলতেন, ব্যবসায় ঘেন্না ধরে গেছে।

কাঠুরে চৌধুরী বলত। তাহলে আমরা কী করব?

তোমরা!

সাহেব অনেকক্ষণ ধরে ভাবতেন। তারপর বলতেন, এ রকম দিন থাকবে না। এই আশা নিয়ে বাঁচবে।

তারপর বলতেন, কেন এমন হল জান?

না।

এ যুগের লোক রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। তাদের সময় কম, ধৈর্য কম। অভিজ্ঞতাও কম। যা কম থাকলে ভাল হত, তা কম নেই। অহংকার, লোভ আর অসাধুতা।

গ্রে সাহেব মদ খেতে খেতে এইসব কথা বলতেন, আর কাঠুরে চৌধুরীও হাতে মদের গ্লাস নিয়ে সব শুনত। কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করত, তাহলে আমরা কী করে পয়সার মুখ দেখব?

সাহেব বলতেন, বেশি পরিশ্রম করে বেশি রোজগার কর। রাতারাতি বড় লোক হবার স্বপ্ন না দেখলে সত্যিই বড় লোক হতে পারবে।

এই গ্রে সাহেব একদিন আদিবাসী ওরাঁওদের হাতে খুন হয়ে গেলেন। সে এক নোংরা গল্প। সে গল্প আজ কাঠুরে চৌধুরী সযত্নে এড়িয়ে গেল। আজ তার মনের অবস্থা অন্য রকম। নোংরা জিনিষ ভাবতে তার ইচ্ছা হচ্ছে না।

গ্রে সাহেবকে সে খুবই সম্মানের চোখে দেখেছিল। আরও বেশি সম্মান দিল তার মৃত্যুর পরে। বুড়ো একখানা উইল করে গিয়েছিলেন। তাতে তিনি তাকে কিছুই দেন নি। সবাই অন্য রকম ভেবেছিল।

দেশে তাঁর আত্মীয়-পরিজন ছিল না, ছিল এই দেশেই। তারা কখন কী ভাবে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, সে কাহিনী তিনি একদিন বলেছিলেন। সেদিন তাঁর মন খারাপ ছিল, মদ খেয়েছিলেন বেশি, তারপর তাঁর হৃদয়ের দুয়ার একেবারে খুলে গিয়েছিল। সে সব কথাও কাঠুরে চৌধুরীর আজ ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

তখন সে গ্রে কোম্পানীর আরও চার আনা অংশের মালিক হয়েছে। আধাআধি মালিক। সাহেবের টাকার দরকার ছিল না, কিন্তু কোম্পানী যাতে টিঁকে থাকে সেইজন্যেই শেয়ার ছেড়ে দিচ্ছিলেন। সাহেবের মৃত্যুর পর কাঠুরে চৌধুরী শুধু কোম্পানীর মালিকের এই বাড়িটি পেল। জমা টাকা পেল ম্যাক্লাস্কি গঞ্জের একটা নার্সারী স্কুল। সাহেব কেন এমন উইল করেছিলেন তা কেউ জানত না। যে জানত সে চুপ করে রইল।

ম্যাক্লাস্কি গঞ্জের সেই নার্সারী স্কুল আজও গ্রে কোম্পানীর পয়সায়

চলছে। আট আনা অংশের লাভ সেই স্কুলের খরচে যায়। ছাত্রের অভাবে সেই টাকা পুরোপুরি খরচ হয় না, জমা থাকে।

নরোত্তম খেমলানি কাঠুরে চৌধুরীকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, বুড়ো সাহেব যে এইরকম বেইমানি করবেন তা ভাবা যায় নি।

কাঠুরে চৌধুরী বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি কার কথা বলছেন?

কেন, আপনার গ্রে সাহেব।

তিনি আবার কী বেইমানি করলেন?

করেন নি! শুনলাম, এই কোম্পানীটা নাকি একটা স্কুলের জন্যে লিখে দিয়েছেন?

লিখবেনই তো।

নরোত্তমবাবু বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করলেন। বললেন, বলেন কি?

কাঠুরে চৌধুরী বলল: নিজের টাকা নিয়ে যা খুশিই তাই করবেন।

ধর্মত আপনাকেই সব দেওয়া উচিত ছিল।

কেন?

আপনিই তো সব দেখাশুনো করছেন, বলতে কি আপনার জন্যেই কোম্পানী চলছে।

বিরক্ত ভাবে কাঠুরে চৌধুরী বলল: দিলেই বা আমি কেন নেব। আমি তো ভিখিরি নই।

নরোত্তমবাবু খুব ভাল করে কাঠুরে চৌধুরীকে দেখলেন। তার মুখ দেখে মনে হল না যে সে না-পাওয়া আঙুর টক ভাবছে। তাই উত্তর দিলেন, তা বটে, তা বটে।

কাঠুরে চৌধুরী বিশ্বাস করে যে গ্রে সাহেব তাকে সম্মান করে গেছেন, তাকে অসম্মান করবার ইচ্ছা থাকলেই কোম্পানীর বাকি আট আনা অংশ তার নামে লিখে যেতেন।

আজ তার বাংলোয় নরোত্তম খেমলানি নেই, তাঁর কন্যা দময়ন্তী বসে আছে বারান্দার অপর প্রান্তে। ঘরের ভিতর তার স্বামী অচেতন। কাল সকালে তার জ্ঞান ফিরে আসবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তার রাতে এই বাংলায় থাকবেন, কিন্তু এখনও এসে পৌছন নি। তাঁর জন্য ব্যস্ত হয়েও কোন লাভ নেই।

অরণ্যে অন্ধকার জমে আছে ঘন হয়ে। একটানা ঝিঁঝি ডাকছে। আর কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

[ক্রমশ।

॥ ষ্টীমারে ॥

শক্তি মুখোপাধ্যায়

নদীর ওপারে উঁচু নির্জন বালুতটে কী করুণ অন্ধকার
নেমেছে ত্যাখো;
জোনাকির ভিড় করে উড়ে উড়ে আলো দেয় শরীরের।
এখন রাত্রি কত! যাত্রী সময় দেখে ঘড়িতে;
ঢেউ-এর শব্দের মত অশান্ত কোলাহল এখন ষ্টীমারে।
আমরা সবাই কত কাছাকাছি, তবু—
অন্য কোন হৃদয়ের ঠিকানা জানি না।
আকাশের তারাগুলো কৌতূহলী চোখে
আমাদের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করে।
সব ভালোবাসা যদি এখানেই শুরু হত
সব পাওয়া এখানেই শেষ!

ধূপছায়া শাড়ী পরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে
ডেকের ওপর;
কাজলের চোখে তার কী নিবিড় নীরবতা
নেমেছে ত্যাখো।
দু' একটি ভাসমান নৌকা এখন
নদীটির বুক ছুঁয়ে আছে;
নিটোল অন্ধকারে বিদগ্ধ হৃদয়ের
কত গান অশ্রুত লেখা।
তপতী কোথায় আজ। কী করুণ অন্ধকার নদীর ওপারে!
এমনি অনেক রাত দুরন্ত পদ্মার কালো জল ছুঁয়ে
হৃদয়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছি আমরা সেদিন।

পদ্মার কালো জল, রাত জাগা পাখি আর মাঝিদের গান,
গোয়ালন্দ'র ঘাটে আজন্ম বোবা মেয়েটির
অপরূপ চোখ দু'টি, মনে পড়ে, ডেকের ওপরে তপতী
ধূপছায়া শাড়ী পরে নিবিড় উচ্ছ্বাসে বলেছিল,
সব ভালোবাসা যদি এখানেই শুরু হত
সব পাওয়া এখানেই শেষ!
শেষ কি হয়েছে! স্মৃতি, আজও তাই ভিড় করে
অন্ধকারে জোনাকির মত—
পদ্মার কালো জল, মুখরিত চাঁদপুর, তপতীর ধূপছায়া শাড়ী!

বেদ-বাণী

অনুবাদ—রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্‌বেদ

১।৬৪।১ তব মহারথে ঝঞ্ঝা-পতাকা উড়িতেছে সনসনি,
ক্ষণে ক্ষণে ঘোষে রথনির্ঘোষে মেঘডম্বর ধ্বনি ।
খর বিদ্যুৎ হে দেব মরুৎ, সারথি তোমার রথে,
ঝলকিত গতি, মিলায় পলকে জলদ-বিছান পথে ।

১।৬৪।১০ সর্বদর্শী হে দেব মরুৎ, ঝটিকাপক্ষবান্,
পরশে তোমার সুখ-বেদনায় বসুধা কম্পমান ।
ইন্দ্র তোমারে দানিল অস্ত্র, চন্দ্র ভোজ্য পেয়,
শোভে ওর করে কার্মুক-শর, কবচে রুচির দেহ ।

১।৬৪।১১ সহসা গ্রাসিল রবি শশী তারা পুঞ্জিত কালো মেঘে,
সে ঘন আঁধারে রণ-অভিসারে মরুৎ প্রবেশে বেগে ।
ঝঞ্ঝা-রথের চক্রে ঝলকে বক্র অনল-ফণী,
রোষ-গর্জনে গগনে গগনে ঘোষে গম্ভীর ধ্বনি ।
তিমির ভয়াল সে জলদজাল নিমেষে ভিন্ন করি
প্রকাশিলে পুন চন্দ্র তপন বিশ্ব আলোকে ভরি ।

১।৬৪।১২ কলুষ-শোধন, রিপু-নিরোধন, চিত্তবোধন কারী,
হে দেব ভীষণ কর আগমন বরষি অমৃত-বারি ।
মুখর মন্ত্রে রচিনু তোমার শুভ বন্দনা-গান,
সাজানু অর্ঘ্য সোমসুধারসে হে মরুৎ কর পান ।

১।৬৪।১৩ যে মহাপুরুষে রক্ষিলে তুমি হে দেব মরুত্বান,
লভিয়া সিদ্ধি, সম্পদরাশি সবারে সে করে দান ।
ধাবিত তাহার তেজ-তুরঙ্গ সাধিবারে কল্যাণ ।

১।৬৪।১৪ হে মরুৎ, মোরা লভি যেন সুত সকল কর্মদক্ষ,
হোক সে মহান পুরুষ প্রধান ভ্রষ্ট না হয় লক্ষ্য ।
হোক সে বিজয়ী আপন বীর্যে পালিয়া ধর্ম, নীতি,
জরাব্যাধিহীন শত হেমন্ত শাসন করুক ক্ষিতি ।

১।৬৪।১৫ সিন্ধু প্রবাহে এস হে মরুৎ, রক্ষিত উষাকালে,
ধ্বনিছে তোমার বন্দনা গান জগৎ-যজ্ঞশালে ।
বিলালে তোমার বিপুল বিভব আকুলি বিশ্বলোক,
ক্রমবর্ধন সে দানে সবার পিপাসা তৃপ্ত হোক ।

১।৬৫।১ সহসা অগ্নি লুকালো আপনা না জানি কি লীলা ছলে,
বিশ্বভুবন তিমির মগন, গৃহে দীপ নাহি জ্বলে ।
যজ্ঞ বেদীকা হুতাশনহীন, স্তব্ধ মন্ত্রগীতি,
ভয় বিহ্বল মানব সকল, হাহাকারে ভরে ক্ষিতি ।
খুঁজি পাঁতি পাঁতি অমরবৃন্দ ভূতল, ভূধর ঘেরি,
লভে সন্ধান গিরিগুহাতলে তব গতিরেখা হেরি ।

১।৬৫।২ কোথায় তোমার শয়ন, গমন, লুকালে কাহার ঘরে ?
হে দেব বহ্নি, বিহনে তোমার বিশ্ব বিষাদে ভরে ।
ইন্দ্র তোমারে সন্ধানি ফিরে নিখিল ভূমণ্ডল,
সুজাত অগ্নি আছিল লগ্নি অকূল সিন্ধুজলে !

১।৬৫।৩ হে দেব বহ্নি, অমিত দীপ্তি, সবার তৃপ্তিদাতা,
সর্বজীবের পালিকা যেমন বিপুলা বসুধা মাতা ।
তুমি সে প্রতীক মঙ্গল কাজে, তুমি সে ভাগ্যোদয়,
সকল কর্মে পন্থা-দিশারী বিনাশ সর্ব ভয় ।—
পর্বত সম সুদৃঢ়, মহান, শিখরে বিকরে জ্যোতি,
ধাও বেগবান সিন্ধু সমান, কে পারে রোধিতে গতি ।

১।৬৫।৪ সহোদর যথা ভগ্নীরে তার সোহাগে পোষণ করে,—
তুমি সিন্ধুর বন্ধু সমান, রক্ষণ কর তারে ।
ঝটিকা বাহনে প্রবেশে কাননে বহ্নি বিপুল বেগে,—
নিমেষে ভস্ম ওষধি-শস্য পাবক পরশ লেগে ।

১।৬৫।৫ অমরা হইতে গোপনে অগ্নি নামিল ধরণীতলে,
হংসের মতো ভাসে অবিরত অকূল সিন্ধুজলে ।
সন্ধানি তারে মর্তমানব লভিল দিব্যজ্ঞান,
সাধিল জগতে অগ্নি সহায়ে অর্বুদ কল্যাণ ।
উষালোকে উঠে নর-নারী জাগি জগৎকর্মশালে,
দিবা অবসানে পাবক পরশে মঙ্গল দীপ জ্বালে ।

১।৬৬।১ হেরি বিচিত্র বৈভব তব সূর্য কিরণ সম,
উজ্জ্বল প্রাণ পুত্র সমান,—অগ্নি সে প্রিয়তম ।
লেলিহান তব শিখা-তুরঙ্গ, হে দেব অশ্বারোহী,—
ধেনু সম ধীর গৃহবহ্নির মোরা ক্ষীরোধারা দোহি ।

শ্রীজওহরলাল নেহরুকে লিখিত পত্রাবলী

রোমাঁ রোলাঁর পত্র

ভিল্‌নাভ (ভো) ভিলা অলগা,
১১ই মে, ১৯২৬

প্রিয় মঁশিয়ে জওহরলাল নেহরু,

আপনার ও আমাদের সকল বন্ধু গান্ধীর চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার নাম আমরা জানতাম। মাত্রই দিন কয়েক আগে হিন্দুস্থান টাইমস-এ প্রকাশিত একটি বক্তৃতার সূত্রে আবার আপনার নাম আমাদের চোখে পড়েছে।

আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমার বোন ও আমি, দু'জনেই খুব খুশী হব। আপনি ও শ্রীমতী নেহরু কি পরিষ্কার আবহাওয়া দেখে আগামী সপ্তাহের এক বিকেলে ভিলা অলগায় এসে চা-পান করতে ও ঘণ্টাকয়েক কাটিয়ে যেতে পারবেন? আগামী ১৯শে মে বুধবার থেকে ২২শে মে শনিবারের মধ্যে কবে এলে আপনাদের সব চাইতে সুবিধে হয়, দয়া করে জানাবেন। নির্ধারিত দিনে আবহাওয়া যদি ভাল না থাকে, সেক্ষেত্রে শুধু তারিখটা পিছিয়ে দিয়ে সকালবেলায় একটা তার করে দিলেই হবে।

শ্রীমতী নেহরু শীগগিরই সুইজারল্যাণ্ডের আবহাওয়ার সুফল পাবেন আশা করি।

আপনার ছোট্ট মেয়েটি জেনেভার আন্তর্জাতিক স্কুলে পড়ছে না? তার শিক্ষয়িত্রী মিস হার্টকে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনার মেয়ে যে অত্যন্ত স্নেহশীলা এবং সুদক্ষা একজন শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়েছে, এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

প্রিয় মঁশিয়ে নেহরু, আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

ভিলা অলগা বাগানবাড়িটি হচ্ছে হোটেল বায়রনের খুব কাছে (আর একটু উঁচুতে)। নৌকাযোগে যদি আসেন, তবে ভিলনাভের ঘাট থেকে মিনিট দশেকের পথ। আর রেলগাড়িতে যদি আসেন তাহলে ভেভি-র স্টেশনে নেমে স্টেশনের সামনে ভেভি-ভিল্‌নাভ লাইনের বিদ্যুৎচালিত ট্রাম পাবেন: ট্রামে (ভিল্‌নাভের দিকের) উঠে বলবেন, যেন হোটেল বায়রন স্টপে আপনাদের নামিয়ে দেয়।

ভিলনাভ (ভোদ.) ভিলা অলগা
মার্চ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬

প্রিয় বন্ধু,

আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না, তাই আপনি বিদায় নেবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না। তবে, যতক্ষণ আমরা কাছাকাছি আছি, তারই মধ্যে আপনাকে, আপনার স্ত্রীকে ও আপনার প্রিয় স্বদেশকে আমার সপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাতে চাই।

স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে আপনার যে কষ্ট হচ্ছে, তারই কথা আমি ভাবছি। কামনা করি, এই বসন্তে মিসেস নেহরুর স্বাস্থ্যোন্নতি হক এবং স্বদেশে ফিরে গিয়ে যে মহান সংগ্রামে আপনাকে যোগ দিতে হবে, শান্ত চিত্তে যেন তাতে গিয়ে আপনি যোগ দিতে পারেন।

জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগতির পথে যা-কিছু বিঘ্ন আমাদের এই প্রতীচ্যভূমির মত ভারতবর্ষও আপনার নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে এক 'গণ-ফ্রণ্ট' গড়ে তুলতে পারবে বলে আশা করি।

আমাকে বলা হয়েছে, 'বিশ্ব শান্তি সম্মেলন'-এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আপনাকে ও গান্ধীকে যেন আমি অনুরোধ জানাই। সম্ভবত আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনটি হবে বৃহৎ ও শক্তিশালী। বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর শান্তিকামী সমস্ত শক্তি এর দ্বারা সংহতি লাভ করবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু বড় বড় সংস্থা এবং ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এতে যোগ দিয়েছেন। (ইংল্যাণ্ডে যোগ দিয়েছেন লর্ড রবার্ট সিসিল, মেজর অ্যাটলি, নর্মান এঞ্জেল, ফিলিপ নোয়েল বেকার, আলেকজাণ্ডার ও অধ্যাপক ল্যাস্কি। ফ্রান্সে যোগ দিয়েছেন হেরিও, পিয়ের কত, জুহঁ, কাশ্যাঁ, রাকাম, অধ্যাপক লাঁজেভাঁ প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ। চেকোশ্লোভাকিয়ায় যোগ দিয়েছেন বেনেস, হোডজা। স্পেনে যোগ দিয়েছেন আজানা, আলভারেজ দেল ভাগো প্রভৃতি। বেলজিয়মে যোগ দিয়েছেন লুই দ্য ব্রুকের, আঁরি লাফঁতাইন প্রভৃতি।) পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বলে উঠবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অনুগ্রহ করে আপনার ভারতীয় বন্ধুদের কাছে এ বিষয়ে কথা বলবেন ও তাঁদের আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। তাঁদের ও আপনার উত্তর আমার কাছে অথবা যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী বিশ্ব-কমিটির সদরদপ্তরের ঠিকানায় (পারী ১০, ২৩৭ রু লাফায়েত) পাঠাতে পারেন। আমাকে এই কমিটির অবৈতনিক সভাপতি করা হয়েছে।

আশা করি আপনার ও ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পত্রালাপ অক্ষুণ্ন থাকবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ সম্পর্কে অবহিত থাকাটা প্রতীচ্যের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এমন অনেক লোক আছে, ইচ্ছে করে এ বিষয়ে যারা নীরব থাকে, আর নয়ত মিথ্যে খবর রটায়।

আন্তরিকতার সঙ্গে আপনার করমর্দন করি। প্রিয় বন্ধু, আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকুক, আপনি সুখী হন এবং ভারতবর্ষের যে আদর্শ নিয়ে আপনি সংগ্রাম করছেন, তা জয়যুক্ত হক।

অনুরক্ত
রোমাঁ রোলাঁ

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পত্র

টেলিগ্রাফ হাউস,
হার্টিং, পিটার্সফীল্ড,
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৬

প্রিয় মিঃ নেহরু,

অত্যন্তই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার ইংল্যাণ্ড সফরকালে আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার সম্ভব হবে না। আমার স্ত্রী অসুস্থ; উষ্ণতর জলবায়ুর দেশে তাঁকে যেতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও যাবার জন্ত যেটুকু সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার, তাঁকে সেটুকুও সুস্থ করে তোলা যাচ্ছিল না; এই জন্তেই এতদিন পর্যন্ত আমি এখানে আটকে ছিলাম। এইবারে আমি বেরিয়ে পড়ব। আপনার কাজের প্রতি, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজবাদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াসের প্রতি, আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি বর্তমান। সে-কথা অবশ্তই আপনি জানেন। সরকারের দিক থেকে দেখলে সময়টা অবশ্য বিশেষ অনুকূল নয়; তবুও আশা করি, আপনার সফর ফলপ্রসূ হবে।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

ভবদীয়
বার্ট্রাণ্ড রাসেল

এইচ, জে, ল্যাস্কির পত্র

দি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স
এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স,
লণ্ডন, ডব্লু. সি, ২,
৬ই নভেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় নেহরু,

খবর পেলাম যে হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে দেখা করে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্ত আপনার উপরে চাপ দেওয়া হচ্ছে। খুবই আশা করছি যে, তাঁর কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট ও লিখিত অনুরোধ না পেলে এ-কাজ আপনি করবেন না।

অন্যথায় আমার মনে হয়, সহজেই এর গুরুতর অপব্যাখ্যার আশঙ্কা রয়েছে। সেটা খুবই ক্ষতিকারক হবে।

সানুরাগ শুভেচ্ছা জানাই।

ভবদীয়
হ্যারল্ড জে, ল্যাস্কি

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের পত্র

৩, এল্‌ম কোর্ট, টেম্পল্ ই, সি, ৪,
৩রা মার্চ, ১৯৩৭

প্রিয় নেহরু,

সময় করে আমাকে এরূপ দীর্ঘ ও সুন্দর একখানি চিঠি লিখেছেন সে আপনার বিশেষ অনুগ্রহ। চিঠিতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে; তা ছাড়া বর্তমানে আমার দেশবাসীর যা প্রয়োজন সেই জয়ের আশা ওতে ব্যক্ত হয়েছে; সুতরাং চিঠিটা 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশ করব স্থির করেছি।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির ও পার্টির কর্মকর্তাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের ঐক্য আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে। এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই করে নি।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে আপনি যেরূপ অদ্ভুত অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন তাতে আমার ঈর্ষা হয়। কর্মপ্রেরণার বিরাট প্রভাব সত্যিই আমার ঈর্ষার বস্তু। ওরকম একটি আন্দোলন এখানে হলে ভালই হয়। কিন্তু সম্ভবত আমাদের মধ্যে একটু বেশি কৃত্রিমতা ঢুকেছে এবং আমাদের গণতন্ত্র অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। নির্বাচনে আপনাদের অদ্ভুত সাফল্যের জন্তে আপনাকে ও কংগ্রেসকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। অতঃপর কংগ্রেসের অধিবেশনে আপনারা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট প্রবর্তন সম্পর্কেই বা আপনারা কি অভিমত প্রকাশ করেন তা জানবার আমাদের বিশেষ আগ্রহ থাকবে।

আমার বিশ্বাস সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকাল ভারতে যে সমস্ত ফ্যাসিস্ট কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আপনারা তার দৃঢ় বিরোধিতা করবেন। আমরা আপনাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারব বলে মনে করি নে, কারণ সাম্রাজ্যবাদজনিত পরিস্থিতির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের পার্টি এখনও সচেতন নয়, কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করার এবং এ ধরণের আন্দোলনের দায়িত্ব বোঝাবার চেষ্টা করছি।

'ট্রিবিউন' পত্রিকায় ভারতের খবরাখবর বেশি করে প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আপনি নানা কাজকর্মে দারুণ ব্যস্ত থাকেন; তবু যদি মাঝে মাঝে দু'একটা চিঠি কিংবা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠান খুব ভাল হয়।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনার একান্ত
স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্

লণ্ডন
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় মিঃ নেহরু

আপনার দীর্ঘ এবং সুন্দর চিঠিখানা পেয়ে কি যে খুশী হলাম আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার মনে হয়েছে আমরা উভয়েই এত ব্যস্ত বলে আমাদের যোগাযোগ নষ্ট হবার ভয় আছে এবং ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার বিবরণ আমার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান, যদিও এই মুহূর্তে, আপনি বোধ হয় সংবাদপত্রে দেখেছেন, আমি দেশের সমস্যা আর লেবার পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে এমন ডুবে গেছি যে, ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক ব্যাপারে খুব একটা মন দেওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে।

যা হোক, লণ্ডনে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের সভায় বলতে পেরে আমি খুশী হয়েছি।

এখানে অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠছে এবং লেবার পার্টির জাতীয় সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়বার ক্রমবর্ধমান ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। আমি এরই বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছি এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সম্মেলনে একটি অন্যতর সমাবেশ সৃষ্টি করার আমি পক্ষে। আমি কি

করছি বিস্তারিত বলার দরকার নেই, কেন না আপনি ট্রিবিউনেই সবকিছু পাবেন, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে দেশে যথেষ্ট সমর্থন মিলছে। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে একথা বলতে পারব না, আমার আশা যে, কয়েক মাসের মধ্যেই সত্যই কিছু একটা করে ফেলতে পারব!

বেশি লিখতে পারছি নে বলে ক্ষমা চাইছি, এর কারণ আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।

আপনার বিশ্বস্ত
ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্

হাউস অব কমন্স
১১ই, অক্টোবর ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু,

নেহরু আপনার দিক থেকে ব্যবস্থা পাকাপাকি হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম সেই জন্যেই এর মধ্যে আর আপনাকে চিঠি দিই নি। ইতিমধ্যে আমি এদিকে যতটুকু পারি তা করবার চেষ্টা করেছি। জেটল্যাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর প্রয়াস পেয়েছি। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু কিছু প্রস্তাবও করেছি। কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে মনে হল সেগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে আপনার অনুমোদন আছে। সেগুলি তিনি [জেটল্যাণ্ড] ভাইসরয়কে কেব্‌ল করে জানাবেন বলেছিলেন, আমি আশা করি তিনি তা করেও ছিলেন কিন্তু সেটা হল আপনার সঙ্গে ভাইসরয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারের আগের দিনের ঘটনা। আমার ত' মনে হয় কংগ্রেসের কাজের স্বপক্ষে আমরা বেশ ভাল রকমের প্রচার করতে পেরেছি। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে এই প্রচারকার্যকে বিস্ময়কর রকমের ভাল বলা চলতে পারে। কিন্তু স্বভাবতই এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, সাধারণ জনমতের উপর বৈপ্লবিক রকমের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। আমি মন্ত্রিসভার সমীপে কয়েকটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছি। তাতে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও যুদ্ধসম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেছি। এই প্রসঙ্গে 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা'র কথা বলে সে সুযোগে এই নীতি আমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত মনোভাবে কতটা প্রকাশ পাচ্ছে সে প্রশ্ন তুলেছি। কাজেই আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে মন্ত্রিসভা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন, যদিও ঘটনাবলীর দ্রুত অগ্রগতি, তার বাস্তব অবস্থা ও ভাৎপর্য সম্পর্কে তাঁরা কতটা অবহিত তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শ্রমিক দল—আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আমি আর এই দলের সদস্য নই—এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন এবং সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন। হয়ত আর কয়েক দিনের মধ্যেই বিষয়টি হাউস অব কমন্সের সম্মুখে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। প্রচারকে জোরদার করার এও একটা উপায়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি বুঝেছি সম্ভাব্য যতটুকু তার বাইরে কিছু আশা করা আশাতীতের কোঠায় পড়বে। এই সরকার একটি অর্থহীন ভঙ্গীর চেয়ে বেশী কিছু করবেন না,—এইটুকুই আশা করা চলতে পারে। উইনস্টন চার্চিলের অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারতের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের তালিকায় তো আর একটি নাম যোগ হয় নি। যদিও একটা সুবিধে এই যে, তিনি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাবলী বিচার করে থাকেন। রাশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে স্বতন্ত্র একটি মর্যাদা দিয়েছে।

আপনার ও কংগ্রেসের উদ্দেশে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা নিষ্প্রয়োজন যে তাঁদের দাবির উত্তরে, সত্যকার কাজ হবে না এমন কিছু তাঁরা যেন কিছুতেই গ্রহণ না করেন। কাজ চাই, তবেই বোঝা যাবে তার পিছনে ফাঁকা বুলি নেই। তবেই কথায় আসবে বিশ্বাস। কংগ্রেসকে দাবির ব্যাপারে পর্বতের মত অচল অটল থাকতে হবে। আর তার ফলে ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় জাতির জনসাধারণের কল্যাণ হবে। বলা বাহুল্য, আমি গৌণ কোন বিষয়ের উল্লেখ করছি না। আমি জানি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মুখ্য দাবি একবার স্বীকৃত হলে, গৌণ ব্যাপারগুলির ব্যাপারে আপ্‌সে আপনার আগ্রহের অভাব হবে না।

এখন দাবির ব্যাপারে দৃঢ় না হলে কোনদিনই এমন কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাবে না যা আমাদের দুই জাতিকে যুক্ত করবে এবং তা না হলে আমার আশঙ্কা—বোধ হয় আপনারও—একপক্ষে হিংসামূলক কর্মপদ্ধতি ও অপরপক্ষে দমননীতির আকারে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও হিংসা প্রকাশ পাবে।

ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে যা মনে হয় সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। 'দি ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলি আপনি হয়ত দেখে থাকবেন। তা থেকে আপনি বুঝবেন আমার মনের গতি কোন দিকে। যদিও এই প্রসঙ্গে বর্তমানে সেন্সার সম্পর্কিত কড়াকড়ির কথা মনে রাখতে হবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মতামতের আর কোন পরিবর্তনই হয় নি এর মধ্যে। কিন্তু বুঝতে পারছেন অনেক কথা যত খোলাখুলি বলতে ইচ্ছে করে, ততটা বলা যায় না। আমি যতক্ষণ বর্তমান যুদ্ধকে সমর্থন করছি ততক্ষণ এমন কিছু বলতে পারি না, জার্মান বেতার যা উদ্‌ধৃত করে এই দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবার সুযোগ পায়!!

এটা খুবই স্পষ্ট যে জার্মানি ও রাশিয়ার নব-রূপায়ণের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ফরাসী সরকার কর্তৃক একটি সুবৃহৎ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দমননীতি অবলম্বন, ইতালির কার্যকলাপ, ভারত সম্পর্কে আমাদের সরকারের মনোভাব, ঔপনিবেশিক সমস্যাবলী—এসবই প্রমাণ করছে, দালাদিয়ের গতকাল যা বলেছেন, যে, এ যুদ্ধ আদর্শের লড়াই নয়। তাঁর একথা একটি দুঃখদায়ক ও মারাত্মক সত্যের স্বীকৃতি। কিছু লোক আছেন অবশ্য যাঁরা এখনও মনে করেন যে আমরা লড়ছি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য। কিন্তু এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আগের মত বর্তমান যুদ্ধও আদর্শের অছিলায় সাম্রাজ্যবাদের প্রাণরক্ষার্থে সংগ্রাম। সন্দেহ নেই, এ লড়াই মরণপণ লড়াই। আর যদি দেখা যায়—যা মোটেই অসম্ভব নয়—রাশিয়া, আমাদের ও জার্মানির—উভয়েরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তবে অবস্থা খুবই খারাপ হবে। অবশ্য এসব থেকে আরও বোঝা উচিত যে, ভারতের জনগণের সঙ্গে একটা সুমীমাংসার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করা কর্তব্য।

যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার এতাবৎকাল যা করেছেন তার চেয়ে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা যদি না করেন এবং এ যাবৎ উক্ত শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতিগুলিকে সত্যিই যদি কার্যে রূপায়িত না করেন তাহলে এদেশের জনমতের মধ্যে গভীর ও বিস্তৃত পার্থক্য রয়েই যাবে। দমননীতির দ্বারা তা প্রকটতর হবে মাত্র। তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনই চোখে পড়ে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী বর্তমান সরকারের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়তর করে তুলেছে এবং বর্তমানে সরকার-পরিবর্তনের

কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু একমাত্র সেই পরিবর্তনের দ্বারাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনী[illegible] সম্ভব।

এই ঘোর কা[illegible]টি রূপালী পাড় অবশ্য আছে! অনেক লোকই—তাঁদের মধ্যে অ[illegible] গোঁড়া সংরক্ষণশীল টোরিরাও আছেন—ভাবতে শুরু করেছেন যে আমাদের এই জীর্ণ সভ্যতার অন্তকাল আসন্ন। তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন নতুন এক সভ্যতার ভিত্তিপত্তনে যোগ দেওয়ার জন্য, যাতে কোন কায়েমী স্বার্থ—এমন কি তাঁদের নিজেদেরও থাকবে না। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা জানতে উৎসুক যে কিসের জন্যে লড়ছি আমরা। বর্তমানে ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির জন্যেই শুধু যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয় তবে ভারতের মত এখানেও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠবে। এই কথাই সরকারকে বোঝাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমার বিশ্বাস এমন কি মন্ত্রিসভার মধ্যেও কিছুটা জাগরণের ভাব দেখা যাচ্ছে। মুশকিল হচ্ছে, চিরকাল যা হয়েছে, পুরোপুরি জেগে উঠতে খুবই দেরি হয়ে পড়বে। আর এই কারণের জন্যেও আমি চাই কংগ্রেস তার ঘোষণা সম্পর্কে পর্বতোপম দৃঢ়তা অবলম্বন করবে। তাতে সরকারকে এই কথাটা বোঝাতে আমাদের সুবিধে হবে যে, কাজ করতেই হবে এবার, ওঁরা [ভারতীয় জনগণ ও কংগ্রেস] অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট থাকতে নারাজ। এই ধরণের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস আর নেই তাঁদের।

আপনার ও কংগ্রেসের উদ্দেশে আমার শুভেচ্ছা নিবেদন করি। দীর্ঘ আলাপের সুযোগ যদি পাওয়া যেত!

আপনার
ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স

৩নং কুইন ভিক্টোরিয়া রোড নিউ দিল্লী
(ব্যক্তিগত ও গোপনীয়)

প্রিয় জওহরলাল, এপ্রিল, ১৯৪২

আপনার কাছে এই আমার শেষ আবেদন। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বটা রয়েছে আপনার উপর। আর এই সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করছে আমাদের দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক; সুতরাং এর প্রভাব হবে অপরিসীম এবং সুদূরপ্রসারী।

আমরা এই দুই দেশের লোককে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে নিয়ে যেতে পারি ও নিশ্চয় নিয়ে যাব এবং সেটা আমাদের দু'জনকে করতেই হবে,—আমি আমার কার্যক্ষেত্রে, আপনি আপনার কার্যক্ষেত্রে।

যে সুযোগ এখন এসেছে তা আর আসবে না। এ সুযোগ না নিলে হয়ত অন্য পন্থা অবলম্বন করা হবে; কিন্তু একথা জানবেন, দু'দেশের মধ্যে হৃদ্যতা বজায় রাখবার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর মিলবে না।

একমাত্র আপনার নেতৃত্বই পারে এই কাজটি সম্পাদন করতে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রকৃত নেতার পক্ষে সকল রকম ঝুঁকি ও বাধাবিঘ্নের—ঐ সব তো যেন আছেই—সম্মুখীন হবার এই তো সময়।

আপনার যোগ্যতা ও সামর্থ্য আমার জানা আছে। এই সময়ে তার সদ্ব্যবহার করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ।

প্রীতিশীল
ষ্ট্যাফোর্ড

এলেন উইলকিনসনের পত্র

হাউস অব কমন্স, লণ্ডন,

প্রিয় জওহরলাল, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬

(আশা করি নামটা এবারে ঠিকমত লিখতে পেরেছি।)

টাইপ-করা চিঠি পাঠাচ্ছি, এর জন্য মার্জনা কর। টাইপ-করা চিঠি পাঠাবার কারণ তোমার চিঠি পাবার পর থেকে কাজের চাপে আমি নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে বিমানযোগে বার্লিনেও দৌড়তে হয়েছিল।

পৃথক ডাকে তোমাকে এক কপি টাইম অ্যাণ্ড টাইড পাঠাচ্ছি। তোমার সফর সম্পর্কে অধ্যাপক ল্যাস্কি এতে যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা তোমার ভাল লাগবে মনে করি। অধ্যাপক ল্যাস্কির মন্তব্যের সঙ্গে আমরা সবাই একমত।

শান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার সম্ভাব্য উপায়াবলী সম্পর্কে জেরাল্ড হার্ড যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখছেন, এর পরে প্রকাশের জন্য টাইম অ্যাণ্ড টাইড পত্রিকায় তোমার পক্ষে একটি প্রবন্ধ দেওয়া সম্ভব হবে কি না, লেডি রণ্ডা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। ব্রিটেনের উপনিবেশসমূহ ও 'সর্বহারা' দেশগুলির মধ্যে একটা ব্যবস্থা করা সম্পর্কে লয়েড জর্জ যে পন্থা অবলম্বন করবেন বলে তুমি শুনেছিলে, পার্লামেন্টের বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য সেই পন্থা অবলম্বন করছেন। তুমি তোমার বক্তৃতায় বলেছিলে, 'ঔপনিবেশিক দেশগুলির সম্পর্কে কী করা হবে? যা ঘটবে, সে সম্পর্কে, এবং প্রভুর পরিবর্তন অপর অপর কোনও প্রভু তারা চায় কি না, এ-বিষয়ে কি তাদের কথাই বলতে দেওয়া হবে না?' তোমার এই কথাগুলিতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, লেডি রণ্ডাকে আমি তা জানাই। 'মৈত্রীভাব' সৃষ্টির এই যে সদিচ্ছামূলক চেষ্টা এ-দেশে চলছে, এ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দেশগুলির মনোভাবের কথা যাতে সবাই জানতে পারে তার জন্য এ-বিষয়ে তুমি লিখবে কি না, লেডি রণ্ডা তা জানতে চান। যত কড়াভাবে খুশি, তুমি লিখতে পার। তুমি যদি সময় করতে পার, তাহলে এ-বিষয়ে তোমার লেখা উচিত বলেই আমার মনে হয়। অবশ্যই এই লেখার জন্য টাকা দেওয়া হবে। তবে আশঙ্কা করি, টাকার অঙ্কটা বড় হবে না। লেডী রণ্ডা মনে করেন, প্রবন্ধটির শব্দ-সংখ্যা হবে মোটামুটি এক হাজার। তোমার যদি মনে হয় যে ভারত-যাত্রার আগে তোমার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব হবে না, তবে জাহাজে বসে লিখে সেখান থেকে পাঠিয়ে দিতে পারবে, তাহলে লেডি রণ্ডাকে এক ছত্র লিখে জানিয়ে দিও যে কাজটা তুমি করবে। তাঁর অফিসের ঠিকানা হল ৩২, ব্লুমসবেরি ষ্ট্রীট ডব্লু, সি, ১।

কমলা যে আগের চাইতে ভাল আছে এবং হয়ত বা বিপদ কাটিয়ে উঠেছে, এ-খবর পেয়ে খুবই সুখী হয়েছি।

তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। তোমার সফরের ফলে অবিশ্বাসীদের যে কতখানি উপকার হয়েছে, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে।

তোমাদের দু'জনকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই।

তোমাদের
এলেন

[*এম, সি, সরকার এ্যাণ্ড সান্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত জওহরলাল নেহরুর পত্রগুচ্ছ হইতে সংকলিত।]

ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালী মনীষী]

পৃথিবীর মেধাবাজ্যে বাঙলা দেশ বিপুল গৌরবের এবং অশেষ স্বীকৃতিতে ভরে উঠেছে যে ক্ষণজন্মা বাঙালীদের কল্যাণে, সুধীবর ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল নাম। আন্তর্জাতিক সুধীসমাজে এঁর প্রতিভার সমাদর বঙ্গ বন্দনারই নামান্তর মাত্র। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই দলে যাঁদের প্রতিভায় কেবল বাঙালীই সমৃদ্ধ হয় নি সেই প্রতিভার রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে দিক থেকে দিগন্তরে, সেই রশ্মিতে অবগাহন করে অজ্ঞানতা দূর করেছে বিশ্বজন।

মুখোপাধ্যায়দের আদি নিবাস যশোহর। ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করলেন রাধাকমল। পিতৃদেব স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অষ্টম এবং কনিষ্ঠ পুত্র তিনি। ভারতবন্দিত মনীষী ইতিহাসশিরোমণি ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ।

১৯১০ সালে অর্থনীতিতে এম, এ, পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করলেন। সেই বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রবর্তন হয়। এর পর মোয়াট মেডেল লাভ করেন ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান (১৯১৫) পরবর্তীকালে পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করেন।

এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯১৬ পর্যন্ত বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭ সালে লাহোরের সনাতনধর্ম কলেজের অধ্যক্ষের আসন অধিবৃত হল পঁচিশোত্তীর্ণ এই কৃতী বাঙালীর দ্বারা। ১৯১৮ থেকে ২১ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপকের আসন লাভ করেন। তারপর শুধু ভারত নয় পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানায় বক্তৃতাদান ও অধ্যাপনার জন্যে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনেও তাঁকে সগৌরবে সমাসীন দেখা গেছে ১৯৫৫ থেকে ৫৭ পর্যন্ত।

দ্য ইনষ্টিটিউশনাল এ্যাপ্রোচ টু ইকনমিক থিওরি এবং সোসাল ইকলজি এই বিষয় দু'টির জন্মদাতা তিনি এবং ইয়োরোপ ও অ্যামেরিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় দু'টি সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। বার্থ কন্ট্রোল এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং বাক্য দু'টির সঙ্গে আজকের মানুষের বিন্দুমাত্র অপরিচয় নেই। কিন্তু এই আন্দোলনের পথিকৃৎ রাধাকমল। শেষোক্ত কথাটির তিনি জন্মদাতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সংবাদপত্রের ভাষায় তিনি ইণ্ডিয়ান ম্যালথাস। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি অনুষদে বক্তৃতাদানের জন্যে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আমন্ত্রিত হন। বৃটিশ ইনষ্টিটিউট অফ সোসালজির তিনি প্রথম ভারতীয় বক্তা। কোপেনহেগেন এফ, এ, ওর অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান কমিশনের তিনি একমাত্র এশীয় চেয়ারম্যান। ইণ্টারন্যাশানাল কংগ্রেস অব কনট্রোল্ড পেরেণ্টহুডের দিল্লী অধিবেশনের শাখা সভাপতির মাল্য এঁর কণ্ঠে অর্পিত হয়! এই কংগ্রেসের কোন শাখায় সভাপতির পদে এশীয় ডিমোগ্রাফারদের মধ্যে ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ বৃত হন নি।

ভারতীয় অর্থনীতি সংস্থায় ইনি সভাপতি হলেন ১৯৩২ সালে। ভারতবর্ষের প্রথম পপুলেশান কনফারেন্সের ইনিই আহ্বায়ক এবং ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পপুলেশান রিসার্চের ইনি সচিব হলেন ১৯৩৬ সালে। ১৯৪৫ থেকে ৪৭ পর্যন্ত অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রূপে গোয়ালিয়ার রাজ্যের সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন। ওয়াশিংটনের বিশ্ব খাদ্য পরিষদ সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার্থ ভারত সরকার প্রেরিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর ইনি ছিলেন অন্যতম (১৯৪৭), আই, এল, ওর টেকনিক্যাল কমিটির (১৯৪৭-৪৮) ও ভারত সরকারের শিল্প উপদেষ্টা বোর্ডের ইনি সদস্য ছিলেন (১৯৪৮-৪৯)। অ্যামেরিকান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটির তিনি সম্মানিত সভ্য। ইণ্টারন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অফ সোসালজির তিনি সহকারী সভাপতি। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের তিনি সদস্য ছিলেন। অল ইণ্ডিয়া এ্যাডাল্ট এজুকেশান বোর্ড, উত্তর প্রদেশের প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স অফ সোসাল ওয়ার্কস্, ঐ প্রদেশের সঙ্গীত নাট্য ভারতী এবং ললিত কলা আকাদামীর সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। উক্ত প্রদেশের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রণয়নের উপদেষ্টা পরিষদের তিনি চেয়ারম্যান।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশনে মূল

ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সভাপতির আসনে এঁকেই দেখা গেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বহু বছর যাবত ইনি এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন. ইনি সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেছিলেন। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

অর্থনীতি এবং সমাজবিদ্যা বিশেষজ্ঞ রাধাকমলের কাছে সংস্কৃতির অন্যান্য দুয়ারগুলো রুদ্ধ নয়, তার নানা অলিন্দে মিশে আছে তাঁর বলিষ্ঠ চরণচিহ্ন, তার অন্যান্য বিভাগের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর প্রচেষ্টা যথোচিত উল্লেখের দাবীদার। 'উপাসনা' এবং 'উত্তর ভারতী' পত্রিকা দু'টি তাঁর সম্পাদনাতেই আত্মপ্রকাশ করে। দরিদ্রের কন্যা, বাঙলা ও বাঙালী, ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী, বিশাল বাঙলা, বর্তমান বাঙলা সাহিত্য, বিশ্বভারত, মাইগ্র্যান্ট এশিয়া, থিওরি এ্যাণ্ড আর্ট অফ মিষ্টিসিজম, দ্য লর্ড অফ দ্য অটাম মুনস, দ্য কালচার য়্যাণ্ড আর্ট অফ ইণ্ডিয়া, দ্য হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়ান সিভিলিজেশান এবং আরও প্রায় পঁচিশখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। শাশ্বত ভিখারী নামক উপন্যাস এবং নিদ্রিত নারায়ণ নামক নাটকটিও তাঁরই লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে।

দেশ ও জাতির কল্যাণকর্মে আজীবন উৎসর্গিত এই লব্ধকীর্তি মনীষীর বিরাট গৌরবদীপ্ত ঘটনাবহুল জীবনের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান এই অল্পপরিসরে সম্ভবপর নয়। আজ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের বা যুক্তরাষ্ট্রের কোন সমাজবিজ্ঞানী নিছক দর্শনশাস্ত্র নিয়ে গ্রন্থরচনা করেন নি। সারা এশিয়ার পরম গর্বের কথা এই যে—সে অভাব ইনি পূরণ করেছেন (ডাইমেনসান্স অফ দ্য ভ্যালুম যন্ত্রস্থ)।

শ্রীঅধরকুমার চট্টোপাধ্যায়

[রিয়ার এ্যাডমিরাল ভারতীয় নৌবহর]

প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পদার্থবিদ্যার অনার্সের ছাত্র অধরকুমার চট্টোপাধ্যায়। পূজার ছুটির অবকাশযাপনের উদ্দেশ্যে গেলেন দিল্লী। দেশ তখন পরাধীন, বৃটিশ সরকারের অধীনে সামরিক বিভাগে বাঙ্গালী অফিসারের সংখ্যা তখন নগণ্য। ১৯৩২ সালে সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন, কৃতিত্বের সঙ্গে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন পরীক্ষায়। ছাত্র-জীবনের রোমান্টিক দিনগুলিতে খেয়ালের বশে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক রিয়ার এ্যাডমিরাল শ্রীঅধরকুমার চট্টোপাধ্যায় আজ ভারতের গৌরব, বঙ্গসন্তানের প্রেরণা। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বাগড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বরিশাল জেলা হলেও সেখানকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। তাঁর পিতৃদেব বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কর্মব্যপদেশে উড়িষ্যা এবং বিহারে থাকার দরুণ শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বাল্যের শিক্ষা উত্তর প্রদেশেই সম্পন্ন করতে হয়।

১৯৩০ সালে কটকস্থ রেভেনশ গভ: কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই-এস-সি ক্লাশে ভর্তি হন। ১৯৩২ সালে উক্ত কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে

রিয়ার এ্যাডমিরাল শ্রীঅধরকুমার চট্টোপাধ্যায়

পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ বি-এস-সি ক্লাশে ভর্তি হন। বি-এস-সি ক্লাশে পাঠকালীন পূজার ছুটির অবকাশযাপনে দিল্লীতে গিয়ে সামরিক বিভাগে অফিসার পদের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তিনি। অপরিকল্পিত অবস্থায় খেয়ালের বশে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সসম্মানে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সামরিক বিভাগে নৌ-শাখার অফিসার ট্রেনিং-এর জন্য মনোনীত হলেন শ্রীচট্টোপাধ্যায়। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে নৌবিভাগে নির্বাচিত হয়ে প্রথমে বোম্বাইতে ডাফরিন জাহাজে তিন মাস কাল ট্রেনিং নেওয়ার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হলেন বিলেতে। ৩ বৎসরাধিককাল [illegible] ট্রেনিং শেষ করে ১৯৩৫ সালে ফিরে [illegible] পুনরায় ১৯৪০ সালে শ্রীচট্টোপাধ্যায় সাবমেরিন [illegible] কোর্স [illegible] যোগ্যতা অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন এবং ১৯৪৭ সালে ষ্টাফ কোর্স শেষ করেন। ঐ একই সালে তিনি ভারতে ফিরে এসে নৌ-সদর কার্যালয়ে নৌপরিকল্পনার ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি ফ্লাগশিপ আই-এন-এস দিল্লীর কমাণ্ডার হন এবং পরে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম ক্রুজারের ভারতীয় কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাই কমিশনে নৌ-উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। অতঃপর ভারতে ফিরে পুনরায় দিল্লী ক্রুজারটির কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি বোম্বাইয়ের কমোডোর ইনচার্জের কার্যভার গ্রহণ করেন। দুই বৎসরাধিকাল উক্ত পদে বহাল থাকিয়া শ্রীচট্টোপাধ্যায় যুক্তরাজ্যের ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে একটি শিক্ষা কোর্স সম্পূর্ণ করেন। ১৯৫৮ সালে ভারতে ফিরে ডেপুটী চীফ অফ ন্যাভাল ষ্টাফ নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সালে ইনি রিয়ার এ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হন।

শ্রীকুলপ্রসাদ সেন

[কলকাতার প্রাক্তন পোস্টমাষ্টার জেনারেল ও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালার পরিচালক]

প্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে শতহস্ত দূরে থেকে কল্যাণকর কর্মের সাধনায় যাঁরা সমাহিত, রুচিশোভন মন, বিনয়নম্র আচরণ এবং সৌজন্যবোধ যাঁদের সহজাত, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী যাঁদের জীবনেতিহাসকে আরও আলোকিত করে তুলেছে কুলপ্রসাদ সেনের নাম অনায়াসে সেই তালিকায় উল্লেখিত হওয়ার দাবী রাখে।

আধুনিক বিহারের অন্যতম রূপকার ও বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের সদস্য স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কুলগৌরব পৌত্র কুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয় ১৯০২ সালের ২৪-এ জুন, বাঙলা ১৩০৯ সালের ১০ই আষাঢ় তারিখে।

পিতৃদেব স্বর্গীয় প্রমোদনাথ সেন ছিলেন কৃতবিদ্য ব্যারিস্টার দুর্ভাগ্যবশত তাঁর নিজস্ব অবদানে বেশীদিন তিনি দেশকে ভরিয়ে যেতে পারেন নি। ১৯০৭ সালে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে গতায়ু হলেন। কুলপ্রসাদ তখন পাঁচ বছরের শিশু। মা স্নেহলতা দেবী একজন স্বর্গীয়া মহিলা। একানব্বই বছর বয়স্কা এই মহীয়সী বহুজনের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী ছিলেন তাঁর বান্ধবী, সেই সূত্রে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে এঁদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে ওঠে। প্রবন্ধ মিভিলিয়ান স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্তের তিনি অন্যতমা কন্যা। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে তাঁর পাঠ পরিচয় ঘটে, বিলাতের পূর্ব পর্যন্ত মাতৃভাষার সঙ্গে তাঁর একবিন্দু পরিচয় ছিল না। সেন পরিবারের কর্ণধার বধূ হিসাবে তিনি মাতৃভাষা চর্চা শুরু করলেন এবং পরে বাংলা ভাষায় একটি ছোট গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। ইংরাজী ভাষাতেও তাঁর লেখা একটি গল্প গ্রন্থ আছে। অগ্রজ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত আয়কারের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার। অনুজা মালতী দেবী হচ্ছেন উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীর সহধর্মিণী।

আই, এস, সি পরীক্ষার নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। ফলে চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়া হল না। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে চলে গেলেন সুরুল। সেখানে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে যে সাতে-চোদ্দটি উদ্যমী তরুণ কংগ্রেসের গঠনমূলক প্রচারকর্মে অংশগ্রহণ করেন কুলপ্রসাদ তাঁদেরই একজন। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২১ সালের শেষ ভাগে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে এঁরা তখন বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনের কাজে অংশগ্রহণ করলেন। মিঃ এল্মহার্স্ট এসে শ্রীনিকেতনের কাজ শুরু করার পর সেখানকার প্রথম ছাত্রদের তালিকায় কুলপ্রসাদের নামও যুক্ত হল। কিছুকাল পর শ্রীনিকেতন ত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন ও স্কটিশ চার্চ থেকে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে বি, এস, সি পরীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন (১৯২৫)। এম, এস, সি পড়ার সময় ডাক বিভাগের কর্মে যোগদান করলেন। গৌরবময় কর্মজীবনের সূত্রপাত। ডাকঘরসমূহের তত্ত্বাবধায়করূপে তাঁর কর্ম শুরু। তারপর নানা স্থানে নানা দায়িত্বপূর্ণ আসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিত থেকে ডাক বিভাগের সর্বোচ্চ আসন অলঙ্কৃত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন ও বিপুল দক্ষতার কর্মশক্তি ও প্রগতিধর্মী মনের পরিচয় দিয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা, শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতিতে বিভূষিত হন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর করদরাজ্য সমূহের ভারতরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির সময়ে রাজস্থানের কয়েকটি রাজ্যের ও গোয়ালিয়রের ডাক বিভাগের কার্য পরিচালনার ভার ভারত সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাতীয় সঞ্চয় পরিষদ এঁর অনন্য অবদানে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আসামের ডাক ও তার বিভাগের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন, কিন্তু আসামীদের বঙাল-খেদা নীতির ফলে শেষ পর্যন্ত বোধ করি একমাত্র বাঙালী হওয়ার অপরাধেই (?) তাঁকে ভারত সরকারের অন্যান্য বহু অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বাঙালী কর্মীদের মতই আসাম ছেড়ে চলে আসতে হয়। তাতে ইনি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন না। ক্ষতিগ্রস্ত হল আসাম রাজ্য, একজন অতুলনীয় প্রশাসকের সংস্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত হল (বাঙালীর প্রতিভা চিরদিনই সারা ভারতকে শক্তি জুগিয়ে এসেছে এবং আজও তা সমানভাবেই জুগিয়ে আসছে)। ডাক বিভাগের শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর তিনি ছিলেন চীফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার। এই সময়ে তাঁর কার্যক্ষেত্র হল দিল্লী। তারপর ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার পোস্টমাষ্টার জেনারেল নিযুক্ত হলেন। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে সরকারী কর্ম থেকে অবসর নিলেন। ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকেই তিনি এর সঙ্গে জড়িত। অবসর নেওয়ার পর ডাক এল এই পরিকল্পনাটিকে সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত করতে, খসড়াদি তৈরী করা, বাড়ীগুলি অধিকার করা, সংগ্রহশালা গড়ে তোলা প্রভৃতি এই কর্মবীরের দ্বারাই হয়েছে। নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত এ্যাকাডেমীর তত্ত্বাবধায়কের আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রবীন্দ্র ভারতী সংগ্রহশালার পরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত হন আজও তিনি সসম্মানে সেই আসনে সমাসীন। সংগ্রহশালাটি তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে চলেছে।

বংশীবাদনে এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে ইনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের অধিকারী।

স্নেহলতা দেবীর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মা ইন্দিরা দেবীর বান্ধবী ছিলেন। এই পারিবারিক বন্ধুত্বের বন্ধনকে পুত্র আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় করে তুললেন ঐ পরিবারের কন্যাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সমান অংশীদার রূপে গ্রহণ করে। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা জয়শ্রী সেন পরম শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র বাঙলা দেশের বীমা ব্যবসায়ের পথিকৃৎ, একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা।

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[প্রখ্যাত সাহিত্যিক (বিখ্যাত প্রকাশক)]

বলিষ্ঠ লেখনী, সহানুভূতিশীল মন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির সার্থক ত্রিধারা সঙ্গম ঘটেছে যাঁদের মধ্যে এবং যার ফলে পাঠক সমাজে যাঁরা সগৌরবে পেয়ে চলেছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা আর অভিনব জনপ্রিয়তা খ্যাতনামা কথাশিল্পী গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁদের

অন্যতম। বাঙলা দেশের সাহিত্য জগতের একটি উল্লেখযোগ্য আসন আজ তাঁর অধিকারগত। এই আসন তাঁর অধিকারে এসেছে অসামান্য প্রতিভার বিনিময়ে।

১৯০৯ সালের ১১ই নভেম্বর কলকাতায় গজেন্দ্রকুমারের জন্ম। তিন ভ্রাতার তিনি কনিষ্ঠ। পিতৃদেব স্বর্গত মণীন্দ্রকুমার মিত্র যখন লোকান্তরিত হলেন গজেন্দ্রকুমার তখন তিন বছরের শিশু। মাতৃদেবী গতায়ু হয়েছেন ১৯৫৫ সালে।

১৯১৬ সালে কাশীযাত্রা করেন। বিদ্যালয় শিক্ষা সেখানেই লব্ধ হয়। ১৯২২ পর্যন্ত কাশীবাস স্থায়ী হয়। ১৯২৭ সালে জগবন্ধু ইনষ্টিটিউশান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

স্কুলজীবন শেষ হবে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রতালিকায় নিজের নামটিও যুক্ত করলেন গজেন্দ্রকুমার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেন নি।

বৈচিত্র্যের মধ্যেই সাহিত্যিকের বিকাশ, সাহিত্যিকের সাধনার মূলমন্ত্রই হল বৈচিত্র্য ও জীবন। গজেন্দ্রকুমারের কর্মজীবন বা জীবনকর্মও দেখছি বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। তাঁর জীবনের গঠনপর্বে যে কত বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লেগেছে তার তুলনা মেলা ভার। আজকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্তিমান সাহিত্যসাধকের জীবনের ত্রিশটি বছর পিছিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় একটি আশাবাদী, উদ্যমশীল তরুণ নানা বৈচিত্র্যের পরশে নিজেকে ভরিয়ে তুলছে। পরবর্তীকালে সেই বৈচিত্র্যেই সাহিত্যের রূপ দিয়ে সে ছড়িয়ে দিল পাঠক সমাজের ঘরে ঘরে।

সুপ্রসিদ্ধ বুক কোম্পানীর পাঠ্যপুস্তকের প্রচারক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৪০ পর্যন্ত এই কর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে সুবিখ্যাত মিত্র ও ঘোষের প্রতিষ্ঠা হল। ১৯৩৬ সালে এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র হ'ল। মিত্র অর্থে গজেন্দ্রকুমার নিজে এবং ঘোষ অর্থে বিদ্যালয় জীবনের

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সতীর্থ (পরব জীবনেরও) এবং বর্তমানকালের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সুমথনাথ ঘো বাঙলার প্রকাশকদের মধ্যে মিত্র ও ঘোষ আজ একটি প্রথম শ্রেণীর স্থানাধিকারী।

১৯২৯ থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত জমির দালালি, বাড়ীর দালালি, বীমার দালালি, ক্যাটারিং এবং আরও নানাবিধ ব্যবসায়ের মধ্যে জীবনের কঠোরতার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। সেই সংগ্রাম তাঁকে একটুকু নোয়াতে পারে নি, পারে নি তাঁর মনোবল বিন্দুমাত্র নষ্ট করতে তাই শেষে জীবন তাঁরই সামনে তুলে ধরে তার রূপ-রস-গন্ধ ভরা অনুপম সম্পদ। হাত মেলায় শিল্পীর সঙ্গে। জীবনের সঙ্গে শিল্পীর ঘটল এক অনবদ্য মিলন।

অন্যের নামেও বহু গ্রন্থ তিনি লিখে দিয়েছেন। শিশু-সাহিত্যের নানা বিভাগে তাঁর পদার্পণ ঘটেছে। বাংলা গ্রন্থ নিয়ে প্রচারের কাজে দিল্লী পর্যন্ত সর্বপ্রথম গজেন্দ্র মিত্র এবং সুমথ ঘোষই গমন করেন।

গজেন্দ্রকুমারের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ শিশুপাঠ্য দু'টি নাটক। তখন তাঁর বয়েস কুড়ি। প্রথম গল্পসঙ্কলন বেরুল দশ বছর পরে (স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম)। প্রথম উপন্যাস 'মনে ছিল আশা'-র প্রকাশ আরও দু'বছর পরে। 'মাসিক বসুমতী'তে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর 'রাত্রির তপস্যা'। তাঁর স্বনামে লিখিত গ্রন্থাদিরই সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। তাঁর রজনীগন্ধা নামক গল্পটি হিন্দী ভাষায় 'বন্ধন' নাম নিয়ে রূপায়িত হল ১৯৪০—৪১ সালে। বাংলা চিত্রজগতে তাঁর কাহিনীর যোগাযোগ ঘটল ১৯৫২ সালে। রাত্রির তপস্যা, কঠিনমায়া, জ্যোতিষী, সূর্যমুখী প্রমুখ বাংলা ছবিগুলির কাহিনীকার ইনি প্রথম দু'টির, তৃতীয়টির এবং চতুর্থটির পরিচালক যথাক্রমে সুশীল মজুমদার, চিত্ত বসু এবং বিকাশ রায়।

অধিকাংশ লেখকের জীবনী অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে তাঁদের রচনা শুরু হয় কবিতা থেকে, কিন্তু এঁর বেলায় শুরু হ'ল গল্প থেকে।

প্রকাশক সংস্থার সঙ্গে ইনি বহুদিন যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেস, সাহিত্যিক পরিষদ সেবা সমিতি, রাইটার্স ক্লাব প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত আছেন।

১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে এ্যাকাডেমী পুরস্কার প্রদান করলেন। 'কলকাতার কাছেই' গ্রন্থটি তাঁকে এই সম্মান এনে দিল।

এঁর অগণিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কলকাতার কাছেই, উপকণ্ঠে, বহ্নিবন্যা, সোহাগপুর, আকাশলিপি, নারী ও নিয়তি, প্রভাতসূর্য, মনে ছিল আশা, ভাড়াটে বাড়ী, নবদল, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্, মালাচন্দন প্রভৃতি গ্রন্থাদির নাম বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

ইতিহাসকে উপজীব্য করে বাঙলা গল্প ও উপন্যাসকে সমৃদ্ধতর করে তোলার মহান কর্মে এঁর ভূমিকা কোনক্রমেই অনুল্লেখ্য নয়। সাধারণ পাঠকের মনে গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে ইতিহাস-চেতনা জাগিয়ে তোলার এবং ইতিহাসের বদ্ধ নীরস পাতাগুলোর ভিতর থেকে বহু বিস্মৃত মানুষ, ভুলে যাওয়া কাহিনীকে সরস ও চিত্তাকর্ষক লেখনীর দ্বারা জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে যে সকল সাহিত্যকার পাঠকচিত্তে এক অবিস্মরণীয় দীপ্তি নিয়ে চিরকালের দাবী নিয়ে বিরাজ করবেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁদেরই স্বজাতি, তাঁদেরই সগোত্র।

এবার কি বলা যায়, কি করে গোপন মতলবের কথাটা পাড়া যায় বেহেস্তের হুরী তহমিনার কাছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগল সিরাজ। রূপ-ব্যবসায়িনী রূপসীর কাছে এ ধরণের প্রস্তাব উপাপন করার ভাষা, কায়দা বা তরিকা তার জানা নেই, এ ধরণের কাজ কখনো করেনি সে। তহমিনার কাছে আসবার জন্য যখন বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিল তখন ভাবতে পারেনি তহমিনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আসল কথাটা পাড়বার মুহূর্তে সংকোচ, দ্বিধা, সংশয় এসে এমনভাবে বাধা দেবে। দুরন্ত-যৌবনা রূপসী তহমিনা। তার দু'টি আশ্চর্য ঐশ্বর্যই তার প্রচুর উপার্জনের প্রধান মূলধন। প্রচুর অর্থবান রূপ-যৌবন-সৌখীন পুরুষদের কাছে—এদের আকর্ষণ আরো দুনিবার করে তুলবার নানা ছল-কলায় অসামান্য পারদর্শিতা তহমিনার জন্মগত।

সংস্কৃত জানা ছিল না সিরাজের, জানা ছিল সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, নারীর চরিত্র বোঝা পুরুষের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু রূপ-ব্যবসায়িনী তহমিনা তো চরিত্রহীনা, তার আবার চরিত্র কি? তাকে বোঝা কঠিন হবে কেন? তার তো কাম্য শুধু টাকা, টাকা আর টাকা, যা তাকে প্রচুর পরিমাণে দিতে প্রস্তুত সিরাজ. টাকা দিয়ে যে ছিনিমিনি খেলতে পারে অনায়াসে আর সিরাজ যে তা পারে, তহমিনার তা একটুও অজানা নয়। তবে এ সংকোচ কেন সিরাজের? যে কথাটা পাড়তে এসেছে, সে কথাটা সে পাড়তে পারছে না কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথাটাই ভাবতে লাগল সিরাজ আমেদ।

ভেবে ভেবে মনে হল তার ভয়টা এই যে মনের বাসনাটা ঠিক কায়দা মতো এবং মওকা মতো পেশ করতে না পারলে হয় তো মুখের ওপর সোজা 'না' বলে দেবে মর্জিনা বাইজির মর্জিওয়ালী মেয়ে তহমিনা। বড় খামখেয়ালী, অনিশ্চিত মেজাজের মেয়ে তহমিনা। এর প্রমাণ সিরাজ দেখেছে কয়েকবার। টাকা দিলেই তহমিনাকে পাওয়া যায় না, তহমিনার মর্জি না হলে অনেক টাকার প্রলোভনকে সে অনায়াসে অম্লান বদনে পায়ে ঠেলে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ নিজের অসামান্য আকর্ষণ সম্বন্ধে সে অসামান্য সচেতন। আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান পাবার অসম্মান সইতে সহজে রাজি নয় সিরাজ।

হঠাৎ ভীষণ লজ্জিত হয়ে উঠল তহমিনা, অথবা লজ্জার নিখুঁত ভাণ করল বলে মনে হলো সিরাজের। লজ্জা পাওয়া তহমিনার পক্ষে তত সহজ নয়, লজ্জার পাকা ভাণ করা যত সহজ, এ কথা ভালো রকম জানত সিরাজ। এই তো অল্প কিছুদিন আগে ঝুলন উপলক্ষে এক নাচ আর গানের মাইফেল বসেছিল এক বনেদি জমিদার-বাড়িতে। নিমন্ত্রিত হয়ে সিরাজ গিয়েছিল মাইফেলে।

জমিদার-বাড়ির নাচ-ঘর। মেঝের ওপর ফরাস পাতা, ধবধবে সাদা ফরাস। কয়েকটা বেশ পরিপুষ্ট চেহারার তাকিয়া ও ফরাসের ওপর যথাস্থানে যথাভাবে ছড়ানো। মাথার ওপরে ছাদ থেকে ঝুলছে দামী ঝাড়লণ্ঠন, তাতে জ্বলছে অনেক বাতি। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে নাচ দেখছেন গৃহস্বামী জমিদার।

তিনি মদ্য পান করেছেন বটে, কিন্তু শুধু একটুখানি নেশা-

হওয়ার মতো। মাতাল হবার মতো নয়। অন্য তাকিয়াগুলোকে সদ্ব্যবহার করে নাচ দেখছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কয়েকজন, এবং বিশিষ্ট অতিথিরা।

নাচছিল আধা-বিদেশিনী রূপসী তহমিনা। নাচটা হয়তো ঠিক ঝুলন-পূর্ণিমার উপযোগী নয় বলে সিরাজের মনে হয়েছিল। ক্ষীণ ক'টি থেকে গোল্ফ পর্যন্ত লম্বিত রুপোলি চুমকি বসানো ঘন নীল ঘাগরা পরা ছিল তহমিনার। দেহের উর্ধ্বভাগ ঘিরে সোনালী রং-এর পুরু ওড়না আলগা করে জড়ানো। ওড়নার একটি কোণ একটু বেশী ঝুলে পড়ে পৌঁচেছে তহমিনার হাঁটুর কাছাকাছি। তার সারা পিঠ জুড়ে ঝুলে ছড়িয়ে পড়েছে আশ্চর্য ঢেউখেলানো সোনালী চুল।

তবলা মধ্যলয়ে বাজছিল, আর তারই সঙ্গে পায়ের আর দেহের ছন্দ মিলিয়ে নাচছিল তহমিনা। ঘুঙুর ছিল না তার পায়ে, কিন্তু আশ্চর্য নাচের যাদুতে সবার কানেই যেন বাজছিল ঘুঙুরের ধ্বনি।

দু'হাতে একটি ফুলের মালা দোলাতে দোলাতে নাচছিল তহমিনা। নৃত্যচ্ছন্দে এগিয়ে এসে অপরূপ ভঙ্গিতে মালাটি মাইফেলের হোতা গৃহস্বামী জমিদারের হাতে উপহার দিয়ে সরে যেতে লাগল তহমিনা, তার খেয়াল রইল না তার সোনালী ওড়নার বেশী ঝুলে পড়া দিকটা হঠাৎ কি ভেবে পিছন থেকে হাতের মুঠোয় ধরে ফেললেন জমিদার, আর সেই আঁচলে বেঁধে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন একখানা একশো টাকার নোট। নাচ দেখে খুশী হয়েছেন তিনি।

তহমিনা নৃত্যচ্ছন্দে সরে যেতেই আলগা জড়ানো ওড়নাটি তার দেহে থেকে খসে রয়ে গেল জমিদারের হাতে, ঘর ভরতি নাচ-দর্শন-মশগুল কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে তহমিনার দেহের উর্ধ্বভাগ এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে পড়ল। সারা ঘরময় খেলে গেল মুগ্ধ বিস্ময়ের শিহরণ। হঠাৎ লজ্জায় যেন লাল হয়ে উঠল তহমিনার মুখ, দু' হাতে বুকের ওপর তাড়াতাড়ি আড়াআড়ি করে রেখে যেন লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করল তহমিনা, তারপর ঐ ভাবেই পাশের শূন্য ঘরে সাময়িকভাবে পালিয়ে গেল। আসরের অনেকের মনে হলো সত্যিই হঠাৎ বড় লজ্জা পেয়েছে রূপসী নর্তকী। কিন্তু সিরাজ জানতো তহমিনার লজ্জাটা ভাঁওতা মাত্র, নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে দেখাতেও তহমিনার কিছুমাত্র শরম নেই, বেপরোয়া নির্লজ্জতাকে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্যই কায়দা করে গভীর লজ্জার ভাণ করবার দক্ষতা তার অসীম।

পাশের যে ঘরে লজ্জায় পালিয়ে গিয়েছিল তহমিনা, সেটা সে রাতের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল তহমিনার জন্যেই। সেই ঘরে একা বসেছিল তহমিনা-জননী মর্জিনা বাইজি। বসে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল নাচের আসর। অতীতের এহেন আসরে নাচত মর্জিনা, যখন তার রূপ ছিল, যৌবন ছিল; এখন যৌবন নেই, শুধু বিগত রূপের অতি সামান্য খানিকটা আভাস অবশিষ্ট আছে। এই জমিদার বাড়িতেই বর্তমান জমিদারের বাবার আমলে এমনি ঝুলন উপলক্ষেই অনেক রাত পর্যন্ত নেচে অনেক আসর মাত করে গেছে মর্জিনা। আজ সেই আসরে নাচছে তার মেয়ে, আর সে দেখেছে আসরের পাশের ঘরের নেপথ্য থেকে, তাকে লক্ষ্য করছে না আসরের কেউ।

অপরূপ যে ঐশ্বর্য তহমিনা সযতনে গোপন রেখেছিল সোনালী ওড়নার আড়ালে, সোনালী আড়াল হঠাৎ খসে পড়ায় তা এতগুলো কৌতূহলী চোখের সামনে প্রকট হয়ে পড়েছিল, সেই লজ্জাতেই পালিয়ে গেছে সেই ঐশ্বর্যের অধিকারিণী তহমিনা। তহমিনার সেই লজ্জা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছিলেন আসরের সবাই।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নতুন নাচের জন্য যে নতুন বেশ পরে এলো তহমিনা সুন্দরী, তা দেখে কে বলবে একটু আগেই সে সহসা অসংবৃতা হয়ে পড়ার লজ্জায় ছুটে নেপথ্যে পালিয়ে গিয়েছিল! তার নতুন বেশে আবরণ-ক্ষমতার চাইতে হালকা স্বচ্ছতা বেশী; নতুন নাচের লীলায়িত হিল্লোলে যখন তার সারা দেহ দুলে দুলে উঠতে লাগল, তখন এই স্বচ্ছতার আড়ালে আলোছায়ার খেলায় মাঝে মাঝে আভাসে দেখা দিতে লাগল সোনালী দেহের উজ্জ্বলতা। এ আবরণও যদি দৈবাৎ মুহূর্তেকের জন্য খসে পড়ে, তা হলে হয়তো আবার নিদারুণ লজ্জার ভাণ করবে তহমিনা, আর সেই ভাণকে ভাণ বলে বুঝতে পারলেও আবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে দর্শকবৃন্দ। নৃত্যপরা রূপসী তহমিনার দিকে তাকিয়ে এই কথাই সে রাত্রে মনে হয়েছিল সিরাজের। তহমিনার গৃহে এই প্রথম এসে অনতিদূর অতীতের সেই রাত্রির কথাই তার মনে পড়ে গেল!

হঠাৎ তহমিনা ভীষণ লজ্জিতকণ্ঠে বলে উঠল, 'ছি ছি, কি লজ্জা বলুন তো সিরাজ সাহেব! আপনাকে যে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, কথায় কথায় তা একদম খেয়ালই করি নি। গোস্তাকি মাফ হয়। আসুন, অন্দরে চলুন, সাহেব। আম্মা ভারি খুশী হবেন।'

কিন্তু না, ভেতরে যেতে রাজি নয় সিরাজ। অপরূপা মোহময়ী তহমিনার দুরন্ত যৌবনের যাদুকে ভয় করে যুবক সিরাজ, ভয় করে তার দুর্বার আকর্ষণ শিরায় শিরায় প্রবলভাবে অনুভব করে বলেই। তহমিনার আমন্ত্রণে সিরাজের মনে হলো রূপসী বাঘিনী যেন তার কাম্য শিকারকে আহ্বান জানাচ্ছে, 'এসো আমার গুহার ভেতরে।'

আম্মা, অর্থাৎ মর্জিনা বিবি, কি করছেন তাই শুধাল সিরাজ।

'তসবির দেখছেন বসে বসে।'

হেসে বলল তহমিনা, 'তসবির দেখা মস্ত নেশা হয়েছে আম্মার। এমন মশগুল হয়ে থাকেন!—অন্দরে আসুন দেখাব আপনাকে।'

কিসের তসবির দেখতে মশগুল হয়ে থাকে মর্জিনা বিবি? অথবা কাদের তসবির? সেগুলো হাতে আঁকা ছবি, না ফোটোগ্রাফ? অথবা দু' রকমে মেশানো? সেই ছবির পর ছবি দেখে কি কল্পনায় বিগত যৌবনে ফিরে যায় বিগতযৌবনা মর্জিনা বিবি, যার কটাক্ষে এককালে বহু পুরুষের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠত? কৌতূহল উদ্দাম হয়ে উঠল, কিন্তু সেই কৌতূহল সংযত করে রাখল সিরাজ। এর ফাঁদে পা দিলেই সেই অন্দরে যেতে হবে তাকে, যে অন্দরে যেতে সে রাজি নয়।

সিরাজ বলল, 'না, অন্দরে যাবো না, তহমিনা বিবি। এসো, এই বাইরের ঘরেই বসি।'

তহমিনা তার ভয় দেখে হেসে বলল, 'এত ভয় কিসের, সিরাজ সাহেব? অন্দরে গেলে কি তহমিনা আপনাকে গিলে খাবে?'

তামাসার প্রশ্ন তামাসার জবাব দাবি করে। সিরাজও তাই তামাসার সুরেই জবাব দিল। বলল, 'যদি খায়?'

গভীর হতাশার নকল ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তহমিনা বলল, 'হায় রে হায়! সে সাধ্য কি আর তহমিনার আছে? চলুন, ভয় নেই আপনার।'

তবু সিরাজকে অচল দেখে আবদারের সুরে তহমিনা আবার বলল, 'চলুন।'

সিরাজ মৃদুকণ্ঠে, চুপি চুপি, যেন দেয়ালকেও শোনাতে চায় না কথাটা, এইভাবে বলল, 'অনেক কথা আছে তহমিনা বিবি, তোমার সঙ্গে, শুধু তোমারই সঙ্গে। তোমার আমার সামনে সে সব কথা বলতে চাইনে। তাই এসো এই বাইরের ঘরেই বসি।'

তহমিনা মনে মনে খুব খুশী হয়েছে বোঝা গেল তার মুখের প্রসন্ন হাসি দেখে। বিজয়িনীর হাসি। তার চুম্বকী আকর্ষণ এড়িয়ে বেশীদিন থাকতে পারেনি সিরাজ, ধনকুবের ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ী-পুত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী সিরাজ আমেদ। অসামান্য সুপুরুষ না হলেও সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান আর সপ্রতিভ নওজোয়ান সিরাজ আমেদ। একাধিক আসরে তাকে দেখেছে তহমিনা, জেনেছে শুনেছে তার পরিচয়, দামী এবং সম্ভাব্য শিকার রূপে সিরাজ আকৃষ্ট করেছে তহমিনাকে। আকর্ষণের ফাঁদে তাকে বন্দী করবার চেষ্টার ত্রুটি করেনি তহমিনা, নানা আসরে তাকে সুযোগ দিয়েছে অন্তরঙ্গ হবার, তার নাচে, হাস্যে, লাস্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে অভিজাত সৌখীন রসিকদের রেওয়াজ মাফিক বখশিশ বা উপহার দেবার সুযোগও দিয়েছে, সে সুযোগ গ্রহণ করে নি সিরাজ। সিরাজের কাছে ব্যর্থ হয়েছে তার মোহিনী ছলাকলা, সেই ব্যর্থতার ব্যথায় ভরে ছিল তহমিনার মন, তহমিনা যেন পরাজিত বোধ করছিল নিজেকে। এই পরাজয় বেদনাবোধই তার মনে জ্বালিয়ে রেখেছিল সিরাজ-বিজয়ের কামনা। সেই সিরাজ আজ যেচে এসেছে তার ঘরে, তার কৃপা ভিক্ষা করতে, এই ভেবে বিজয় গর্বে আনন্দে ভরে উঠেছে তহমিনার মন।

খুশী মনে হাসিমুখে তহমিনা যেন 'অগত্যা' রাজি হয়ে বলল, 'আচ্ছা সাহেব। যেমন আপনার মর্জি। আর হুকুম।'

তহমিনা বিবি তার নিবাস-নিকুঞ্জে বাইরের ঘরেই নিয়ে বসাল পরম আদরের অতিথিকে। চমৎকার নক্‌শাওয়ালা নরম গালিচা পাতা ঘরের মেঝের ওপর, তার ওপরে কয়েকটা মখমলে মোড়া তাকিয়া শোভা পাচ্ছে। নানা রঙের বাহার, আর রঙে রঙে কি চমৎকার সামঞ্জস্য! রুচি আছে বটে তহমিনার। দেখে খুশী হল সিরাজ। ঘরের ভেতরে মানুষের তৈরি কৃত্রিম রঙের বাহার, আর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিরাজ দেখল বিশ্বস্রষ্টার তৈরি নানা রঙের নয়নাভিরাম বৈচিত্র্য—সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী, সাদা, গোলাপী, কমলা আরো কত নাম-না-জানা রং। চমৎকার পরিবেশে বাস করে সুন্দরী তহমিনা।

'মেহেরবাণী করে একটু বসুন, সাহেব। আমি এখখুনি আসছি।' বলল সুন্দরী।

সুখস্পর্শ সুন্দর নরম গালিচার ওপর বসে একটা তাকিয়ার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সিরাজ আশা করছিল তহমিনাও বসে পড়বে তার মুখোমুখী। বলল, 'কোথায় যাবে তহমিনা বিবি? আম্মাকে ডাকতে নাকি?'

'না সাহেব, আপনি মানা করলেন যে। তা না হলে তো আপনাকেই অন্দর নিয়ে যেতে পারতাম। একটু বসুন মেহেরবাণী করে। আমি এলাম বলে।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল তহমিনা। বাইরের ঘরে একটু একা বসবার সুযোগ পেয়ে খুশী হল সিরাজ; কি কথা কেমন করে বলবে তহমিনাকে। তারই রিহার্শাল দিতে লাগল মনে মনে।

কিন্তু কি বিপদ, কথা ভালো করে গোছানো হবার আগেই ফিরে এলো তহমিনা। সুন্দরী একবার ভেতরে গিয়ে যেন আরো সুন্দরী হয়ে এসেছে বলে মনে হলো সিরাজের। লক্ষ্য করে বুঝল দু'চোখে সুর্মার প্রলেপ হয়েছে স্পষ্টতর, আর কপালের ঠিক মাঝখানে নতুন দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটি কালো টিপ।

ঝকঝকে সুন্দর একটি রূপোর তৈরি পানপাত্রে স্নিগ্ধ পানীয় নিয়ে এসেছে তহমিনা। তার পিছনে এসেছে দাসী, রূপোর থালায় কিছু পরম উপাদেয় আহার্য নিয়ে। পানীয় আর আহার্যের পাত্র দুটি সিরাজের সামনে রেখে তহমিনা বলল, 'সাহেবের হাত ধোবার পানি নিয়ে আয় ফুলমনি।'

দাসী ফুলমনি রূপোর ভৃঙ্গারে জল এনে দিল।

এগুলোর সদ্ব্যবহার করে আগে সিরাজ ঠাণ্ডা হয়ে নিক—অনেক হয়রান হয়ে এসেছে সে—তারপর যা কথা হবার হবে। তার আগে কোনো কথা শুনতে রাজি নয় তহমিনা। তহমিনার ইসারায় ভেতরে চলে গেল দাসী, সিরাজের সামনে মুখোমুখী গালিচার ওপর বসে পড়ল তহমিনা।

'এত নাশ্‌তা কি হবে, তহমিনা?' শুধাল সিরাজ। সম্বোধন থেকে 'বিবি' শব্দটা সে ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছে, না অজ্ঞাতসারে বাদ পড়ে গেছে, বুঝতে পারল না, কিন্তু তহমিনার মুখ এই 'বিবি'হীন সম্বোধন শুনে খুশীর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'খেতে হবে।'

'কিন্তু এত তো খেতে পারব না, তহমিনা।'

'আমার কথা রাখবার জন্যেও পারবেন না, সিরাজ সাহেব?'

'না' বলতে সাহস করল না সিরাজ, ইচ্ছাও হলো না তার, কারণ তহমিনার মর্জিকে খুশী না করলে তহমিনাও তার আর্জি মঞ্জুর নাও করতে পারে, তা ছাড়া 'এত খেতে পারব না' কথাটা সে নিছক ভদ্রতার খাতিরেই বলেছিল।

'তুমি যখন খেতে বলছ তখন খাবো বই কি।' বলল সিরাজ। বলে একবার তাকাল পরিপূর্ণ পানপাত্রটির দিকে। মদ আস্বাদন কখনো করেনি সিরাজ, কিন্তু তা ছাড়া বহু রকমের পানীয়ের স্বাদ এবং চেহারার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রচুর। তবু তহমিনার দেওয়া এই পানীয় তার কাছে নতুন লাগল। অপূর্ব সুন্দর এর রং; চেহারা দেখে সিরাজের মনে হলো এর স্বাদও হবে পরম উপভোগ্য।

তহমিনা হেসে বলল, 'ভয় নেই সাহেব, শরাব দিইনি আপনাকে। জানি শরাব আপনার চলে না।'

'কি করে জানলে, তহমিনা?'

'শুনেছি। দেখেওছি। আপনাকে দিয়েছি পাঁচমিশালী ফলের রস, আমার বড় পেয়ারের। আপনি শরাব ছোঁন না। শরাব আমিও—'

'ছোঁও না?' বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল সিরাজ।

সিরাজের বিস্ময়ের ভঙ্গি দেখে কৌতুক অনুভব করে হেসে বলল, 'ছুঁই, কিন্তু শুধু হাত দিয়ে। শরাবের ছোঁয়া লাগে না আমার গলায়, জিভে, ঠোঁটে।'

'সে কি কথা, তহমিনা বিবি?' এবার সিরাজের কণ্ঠে বিস্ময় আরো জোরালো, আর এই বিস্ময়ের ধাক্কা লেগেই বোধ হয় সম্বোধনে আবার 'বিবি' যুক্ত হয়ে গেল।

'সত্যি কথা, সাহেব।' বলল তহমিনা। আবার একটু হাসি তার সুন্দর মুখখানাকে যেন আরো সুন্দর করে তুলল।

'কিন্তু কেন, তহমিনা?' প্রশ্ন করল সিরাজ। রূপোপজীবিনী সুন্দরী হয়েও শরাব পান করে না তহমিনা, এ যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না, অথবা বলতে পারল না তহমিনা। তারপর বলল, 'কেন? সে কথা আজ থাক, সিরাজ সাহেব।'

সিরাজ বলল, 'থাক তহমিনা। তুমি নিজে থেকে যা বলতে চাও না, তা শুনতে চাইনে। কোনোদিন মর্জি হলে শুনিও, তার আগে হেঁয়ালিই থাকুক।'

'এই দেখুন, কথায় কথায় আবার আপনাকে আনমনা করে আটকে রেখেছি। জানি না কি হয়েছে আজ আমার।' বলল তহমিনা। 'এবার আর কোনো কথা নয়। এদের ওপর এবার মেহেরবাণী করুন সাহেব।'

সিরাজ কিছু বলবার উপক্রম করতে না করতেই নিজের দুই বন্ধ ঠোঁটের ওপর ডান হাতের তর্জনী চেপে তহমিনা ইশারা করল: 'চুপ।'

সেই ইশারা দেখে বাধ্য ছেলের মতো সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল সিরাজ আমেদ। চুপ করে নাশ্‌তা খেতে লাগল। আশ্চর্য সুস্বাদু। সে কি নাশ্‌তার নিজ গুণে, না সুন্দরী তহমিনার বাহুতে? পানপাত্রে চুমুক লাগাল সিরাজ। অতুলনীয় সেই পানীয়, মিশ্ররসের সুস্বাদ। তহমিনার পরমপ্রিয় সেই পানীয় এক চুমুকের আস্বাদনেই সিরাজের প্রিয়তম হয়ে উঠল। সিরাজ টেরই পেলো না কখন কেমন করে খালি হয়ে গেল নাশ্‌তার রূপোর থালা আর রূপোর সেই অতি সুন্দর পানপাত্র।

'আরেকটু নিয়ে আসি, সিরাজ সাহেব?'

'আর পারব না, তহমিনা।'

'সত্যি বলছেন তো?'

'সত্যি বলছি।'

তহমিনার আদেশে দাসী এসে নিয়ে গেল নাশ্‌তার থালা আর পানপাত্র। ভূমিকা শেষ হয়ে গেল, এবার এলো আসল কথার সময়, যে জন্যে আজ তহমিনার কুঞ্জে সিরাজের প্রথম আগমন। মনোযোগিনী হয়ে সিরাজের মুখের পানে তাকিয়ে তহমিনা বলল, 'এবার বলুন সাহেব, কি হুকুম আমার ওপর?'

'একটা মস্ত বাগানবাড়ি কিনেছি, জানো তহমিনা?' বলল সিরাজ।

'কই, জানি না তো, সিরাজ সাহেব।' বলল তহমিনা। 'এ খবর শুনতে পাইনি, কারণ আপনারা সম্পত্তি কিনবেন এ তো একটা খবরই নয়, সম্পত্তি কেনা তো আপনাদের হামেশার ব্যাপার! তা ভালোই হলো, আপনার নিজের মুখ থেকেই শুনলাম। খুব মস্ত বাগানবাড়ি?'

'খুব মস্ত।' বলল সিরাজ। 'আর খুবসুরত।'

সুর্মা-সুন্দর দু'টি আয়ত চোখের বিদ্যুৎমাখা কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করে তহমিনা বলল, 'আমার মতো?'

বাগানবাড়িটা তহমিনার মতো সুন্দর কি না, তহমিনার এ প্রশ্নের জবাব চট করে দিল না সিরাজ, সম্ভবত দিতে পারল না বলে। কয়েক মুহূর্ত একাগ্র দৃষ্টিতে তহমিনার আশ্চর্য সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে সিরাজ বলল, 'একটা সত্যি কথা বলব, তহমিনা?'

'বলুন, সাহেব।' একটু ইতস্তত করে, অথবা করবার ভাণ করে তহমিনা বলল।

'তোমার মতো খুবসুরত খোদার দুনিয়ায় আমি আর কিছু আজতক দেখতে পাই নি, তহমিনা।'

তহমিনা মনে-মনে খুশী হয়েও মুখে অবিশ্বাসের ভাণ করে বলে উঠল, 'সে কি কথা, সাহেব। আপনার বিবি?'

অর্থাৎ আপনার স্ত্রী-ও কি রূপে আমার সমান ন'ন?

'আমার বিবির কথা থাক তহমিনা।' বলল সিরাজ।

স্ত্রীকে এই পণ্যা-নারীর সঙ্গে তুলনার লড়াইতে নামাতে রাজি নয় সিরাজ। সে-কথাটা অবশ্য মুখে বলল না সে।

'আমার নতুন কেনা বাগানবাড়ির কথা বলি শোনো, তহমিনা।' বলল সিরাজ।

'বলুন, সাহেব।'

'অনেকখানি লম্বা আর অনেকখানি চওড়া জায়গা জুড়ে এই বাগানবাড়ি। শুধু বাগান আর বাড়িই নয়, এর ভেতর আছে ফল গাছের এক মস্ত বাগিচা। ফুলের বাগানে দেশী আর বিদেশী হাজারো রকম ফুল—গোলাপ, গন্ধরাজ, যুঁই, বেলফুল, হাস্নুহানা, ডালিয়া, ক্রিসেন্থিমাম, আরো কত কি। আমার বাগানের ফুলগুলো তোমায় দেখলে খুশী হবে, তহমিনা।'

রোমাণ্টিক কথা, কিন্তু কথাটা বেরিয়েছিল সিরাজের মুখ থেকে নয়, বুকের ভেতর থেকেই।

সিরাজের বুকের কথা গিয়ে আঘাত করল তহমিনার বুকে।

'আমায় নিয়ে যাবেন আপনার বাগানে, সাহেব?' বলে উঠল তহমিনা।

'সেই আর্জিই তো তোমায় জানাতে এসেছি, তহমিনা।' বলল সিরাজ। তারপর আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে বলল, 'শুধু বাগানে নয়, আমার বাগানবাড়িতে তোমায় নিয়ে রাখতে চাই, এক হপ্তা, দু' হপ্তা, অথবা তিন হপ্তা, কিম্বা এক মাস। কিন্তু লুকিয়ে, গোপনে। বাইরের কেউ জানবে না তুমি আমার বাগানবাড়িতে আছ। এখান থেকে বেরোবে বাংলার বাইরে কোথাও যাবার নাম করে, তারপর

বাংলার বাইরে না গিয়ে উঠবে গিয়ে আমার বাগানবাড়িতে। সেখানে তোমার সব রকম আরামের ব্যবস্থা আমি করে দেবো। টাকার জন্তে ভেবো না। টাকা তোমাকে আমি অনেক দেবো, তহমিনা, শুধু যদি বাগানবাড়িতে গিয়ে আমার কথা রাখো। রাজি?'

'একটু ভেবে দেখি, সিরাজ সাহেব,' বলল তহমিনা।

তহমিনাকে ভেবে দেখতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় দিয়ে সিরাজ বলল, 'কি ভাবছ তহমিনা? মজিনা বিবিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও?'

'না, যদি যাই তো আম্মাকে নিয়ে যাবো না, সিরাজ সাহেব। আম্মা থাকবে বাড়িতেই।' বলল তহমিনা। 'বাড়ি একেবারে ফাঁকা রেখে যেতে চাই না, আর তার দরকারও নেই।'

'তবে কি ভাবছ?'

'গেলে আমার সঙ্গে নেবো ফুলমনিকে। মার কাছে থাকবে ফরিদা।' বলল তহমিনা। 'ফরিদা আম্মার পুরোনো ঝি, আম্মার মেজাজ মর্জি যেমন বোঝে তেমনি খুশী রাখতে পারে, আম্মাকে সামলাতে পারে।'

'আর ফুলমনি?'

'ফুলমনি নতুন, আমাকেই সামলাতে হিমশিম খায়, আম্মাকে সামলাবে কি?' বলে হেসে উঠল সুন্দরী তহমিনা। কি আশ্চর্য রূপ সে হাসির। মুগ্ধদৃষ্টিতে তহমিনার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভাবল সিরাজ।

'তাই বলছিলাম, যদি যাই, তো আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো ফুলমনিকে।' বলল তহমিনা। 'অবশ্য যেতে হলে ফুলমনিকে একজনের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নিতে হবে।'

'কে সেই একজন, তহমিনা বিবি?'

'ফুলমনির মনের মানুষ।' বলল তহমিনা নিচু গলায়, যেন তার ইচ্ছে নয় কথাটা বাড়ির ভেতরে তার নবীনা দাসী ফুলমনির কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে।

কথাটা শুনে বেশ মজা লাগল সিরাজ আমেদের। দাসীরও মন আছে, আর মনের মানুষ আছে, এ কথাটা তাহলে বোঝে তহমিনা বিবি। মনে মনে ভাবল সে। কিন্তু ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্নও হয়ে উঠল।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল সিরাজ।

'সে কি? কেন সর্বনাশ, সর্বনাশ কিসের। সিরাজ সাহেব?' চমকে উঠে প্রশ্ন করল তহমিনা।

'তুমি, অর্থাৎ তোমরা, যে আমার বাগানবাড়িতে যাচ্ছ, সে খবরটা জানাজানি হয়ে যাবে যে।'

'তা হবে কেন? কে ছড়াবে সেই খবর।'

'তোমার ঐ ফুলমনির মনের মানুষ।'

আবার হাসল তহমিনা, সিরাজকে আবার মুগ্ধ করে। বলল, 'সে যে নিজেই জানবে না। অন্তকে জানাবে কি করে?'

'নিজে জানবে না কেন? ফুলমনি জানলে তার মনের মানুষ জানবে না খবরটা?' বলল উদ্বিগ্ন সিরাজ। 'বিশেষ করে যখন মনের মানুষকে ছেড়ে কিছুদিনের জন্তে দূরে সরে থাকতে যাচ্ছে ফুলমনি।'

'ফুলমনি নিজেই যে জানবে না সে কোথায় যাবে আমার সঙ্গে। মনের মানুষকে বলবে কি করে?' বলল তহমিনা। ফুলমনির মনের মানুষ জানবে আমার সঙ্গে বাইরে বেড়িয়ে আসতে যাচ্ছে ফুলমনি—এক, দুই, তিন বা চার হপ্তার জন্তে। একটু বিরহ সইতেই হবে তাদের দু'জনকে। তাতে ফুলমনির মনের মানুষ মন বা মেজাজ খারাপ করবে না। সে জানে আমার মেজাজ খুশী করে ফুলমনি যদি তার চাকরি বজায় না রাখতে পারে, তাহলে মনের মানুষকে অমন হালে রাখতে পারবে না সে।'

'সে কি? ফুলমনির মনের মানুষ কি ফুলমনির পয়সায় খায় না কি?'

'হ্যাঁ। ফুলমনিকে ভালো মাইনে দিই আমি। তা থেকে সে ওর মনের মানুষকে বেশ সাহায্য করতে পারে, আর করেও থাকে।'

মনের মানুষ। তার মানে তাকে নিয়ে এখনো ঘর বাঁধেনি ফুলমনি। অর্থাৎ পেয়ার চলছে, শাদি হয়নি এখনো, হবার নিশ্চয়তা নেই, বাসনাও নেই হয়তো কোন পক্ষেরই। সিরাজের ধারণা ছিল পুরুষমানুষই অর্থব্যয় করে মনের মানুষীর পিছনে; মনের মানুষের জন্ত নিজের রোজগারের টাকা খরচ করে কোনো মেয়েমানুষ, এ কথাটা তার একেবারে জানা ছিল না। হয়তো জানা থাকা উচিত ছিল, কিন্তু জানত না সিরাজ।

কিন্তু না, দাসী বাঁদীর কথা নিয়ে এত মাথা ঘামালে চলবে কেন? ওদের মন থাকুক, মনের মানুষও থাকুক যেমন খুশি।

হঠাৎ সিরাজের নজর পড়ল তহমিনার দুটি আশ্চর্য চোখের তারার দিকে। তহমিনাকে আগে একাধিক আসরে দেখেছে সিরাজ, দেখেছে তার চঞ্চলকরা নাচ, আর রূপের বিদ্যুৎ-চমক। কিন্তু এত কাছাকাছি আগে কখনো আসেনি, যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় তার চোখের তারা দুটির অপরূপ নীলত্ব। তহমিনার দুটি চোখের তারার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল সিরাজ।

'কি দেখছেন সিরাজ সাহেব?'

'দেখছি তোমার আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ, তহমিনা।'

'আমার কি শুধু চোখ দুটোই আশ্চর্যসুন্দর, সিরাজ সাহেব? আর কিছু নয়?' দুষ্ট হাসির ঝিলিক খেলে গেল ঐ আশ্চর্য দুটি চোখে।

একটু অপ্রতিভ হলো সিরাজ। তার মনে হলো সে হয়তো ভুল করে ফেলেছে, কোনো সুন্দরীকে সম্ভবত ঠিক অমন ভাবে বলতে হয় না, ও ভাবে সৌন্দর্যের গণ্ডি নির্দেশ করে দিলে সুন্দরী-যশপ্রার্থিনীরা সম্ভবত ক্ষুণ্ণ হয়, তাদের রূপটার গৌরবকে খাটো করা হয়েছে ভেবে। কিন্তু এ অবস্থায় ঠিক যে কি বলাটা উচিত, শোভন এবং কলা সম্মত তা ভেবে পেল না সিরাজ আমেদ। অথচ চটপট জবাব না দিতে পারলে জবাব দেবার কোনো মানে হবে না, বেরসিক বলে ভাববে সুন্দরী তহমিনা।

এই ভেবে সিরাজ বলল, 'না না, শুধু চোখ কেন, তোমার সব কিছুই সুন্দর, তহমিনা। কিন্তু আশ্চর্য নীল তোমার দুটি চোখের তারা। আমার হাতের আংটির এই নীলার চাইতে তোমার চোখের নীল অনেক বেশী চমৎকার?'

কিছুক্ষণ সিরাজ আমেদের মুখের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে তহমিনা বলল, 'আপনি তামাশা করছেন, সিরাজ সাহেব।'

'তামাশা নয়, তহমিনা। আল্লা কসম, তামাশা করছি না তোমার সঙ্গে।' তারপর কিছুক্ষণ বাদে বিস্মিত কণ্ঠে, যেন কোনো পুরোনো স্মৃতি মনে করেই বল উঠল, 'কি তাজ্জব! কি অদ্ভুত মিল!'

'কিসের সঙ্গে, কার সঙ্গে মিল, সিরাজ সাহেব?'

সিরাজ ভাবছিল তার না দেখা সেই নীলনয়নী মেয়েটির কথা, যার নামানুসারে তার কেনা বাগানবাড়ির বড় পুকুরটির নাম নীলনয়নীর দীঘি।

কিংবদন্তীতে বা গুজবে যা শোনা যায় তা থেকে মনে হয় সেই সুন্দরী মেয়েটির শোচনীয় অকাল মৃত্যুর কারণ হয়েছিল তার চোখের তারা দুটির নীলত্ব। এক নীলনয়নীর মৃত্যু-চিহ্নিত দীঘির ধারে সিরাজ অতিথি হতে নিয়ে যাবে আরেক নীলনয়নী সুন্দরীকে। কিন্তু সে কথা তহমিনাকে বলা বুদ্ধির কাজ হবে না। কারণ বাগানবাড়িতে যাবেই, এমন পাকা কথা এখনো দেয় নি তহমিনা, তখনো তার যাওয়া সম্বন্ধে একটা 'যদি'র প্রশ্ন সে রেখে দিয়েছে। ঐ দীঘির জলে সাঁতার কাটতে গিয়ে ঐ বাগানবাড়ি সম্পত্তির ভূতপূর্ব মালিক পরিবারের নীলনয়নী মেয়েটির মৃত্যু ঘটেছিল, সে প্রসঙ্গ উঠে পড়লে ভীতি জাগতে পারে পারে নীলনয়নী তহমিনার মনে, সেটা কিছু অস্বাভাবিক বা অভাবনীয় নয়: ভীতির আভাস মাত্র জাগলেই হয় তো যেতে রাজি হবে না তহমিনা সুন্দরী, আর তা'হলেই ব্যর্থ হবে সিরাজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা।

'বললাম যে এই আংটির নীলার সঙ্গে।' ব'লে হাতের আংটির নীল পাথরটার দিকে তহমিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সিরাজ।

একটু হেসে মাথা নাড়ল চতুরা তহমিনা। বলল, 'কিন্তু আমার মন বলছে আপনি অন্য কথা ভাবছেন সিরাজ সাহেব। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আপনার যে মিলের কথা মনে পড়েছে সে আপনার এই আংটির নীলা নয়, অন্য কিছু।'

'না না, অন্য কিছু আবার কি?' ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল সিরাজ।

সিরাজের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তহমিনা বলল, 'জানি সাহেব, আপনি ভাবছেন বেহস্তে চলে যাওয়া একটি মেয়ের কথা, যার দুটি চোখের তারাও আমারি মতো নীল ছিল।'

'তাজ্জব।' বলে উঠল সিরাজ আমেদ। 'তুমি কি মনের কথা পড়তে পারো তহমিনা?'

তহমিনা হেসে বলল, 'না, তা সব সময়ে পেরে উঠি না সিরাজ সাহেব, তবে দুই আর দুই দেখলে হিসেব করে বুঝতে পারি তাদের যোগ করলে চার হবে। কিন্তু আমার দুটি চোখের তারা নীল, একি আজ আপনি পয়লা টের পেলেন, সিরাজ সাহেব?'

'তোমার নাচে যখন আসর মেতে ওঠে, তখন তোমার চোখের দিকে ক'জন তাকায় তহমিনা?' বলল সিরাজ। 'আর চোখের দিকে যদিই বা কখনো এক লহমার জন্যে তাকিয়ে ফেলে, সেই চোখের তারার রং ঠাওর করবার মতো নজর, মেজাজ বা ফুরসং তখন কোথায়? তবু হয়তো কখনো কোনো মুখ থেকে আমার কানে খবর এসে পৌঁচেছে তোমার চোখের তারা কালো নয়, বাদামী নয়, নীলা, কিন্তু সে খবরটা আমার মনে দাগ কাটেনি। অমনতরো শোনা থেকে জানায় আর নিজের চোখে দেখে জানায় আসমান জমিন ফারাক, তহমিনা, সে কথা এত কাছ থেকে তোমার চোখ দেখে আজ প্রথম বুঝলাম।'

'তাহলে আমার আন্দাজ ঠিক, সিরাজ সাহেব?'

ধরা পড়ে গেছে, অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না, বুঝল সিরাজ। নীলনয়নীর দীঘির জলে নীলনয়নীর মৃত্যুকাহিনী অনেকেরই জানা, সে কাহিনী এসে পৌঁচেছে তহমিনার কানেও। অতএব এখন আর ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে সাফল্য লাভের আশা কোথায়? তাই বলল, 'হাঁ, তহমিনা।'

তহমিনা বলল, 'শুনেছি সেই নীলনয়নীর মেয়ে এখনো বিকেল-বেলায় ঐ দীঘির জলে নাইতে আসে, সাঁতার কাটে।'

'হাঁ, অমন একটা গুজব আছে বটে। আর তাই জন্যে ঐ সম্পত্তি আমি বাগাতে পেরেছি, নইলে এ সম্পত্তি রায়েদেরই থাকত এখনো।' বলল সিরাজ। 'তাই কাউকে বোঝাতে যাইনি ও গল্প মিথ্যে, ও গল্প গাঁজাখুরি। বরং জোরে মাথা নেড়েই সায় দিয়েছি সেই গুজবে, যাতে আরো বেশী লোক তাতে বিশ্বাস করে, গুজব আরো জোরালো হয়।'

তহমিনা বলল, 'কিন্তু শুনেছি কেউ কেউ নাকি দীঘির পাড়ে নিজের চোখে দেখেছে সেই নীলনয়নীকে দীঘির জলে সাঁতার কেটে উঠে আসতে। ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকাতেই হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে নীলনয়নী।'

হো-হো করে হেসে উঠে সিরাজ বলল, 'গাঁজা, গাঁজা, একেবারে গাঁজা। ভীতু মানুষেরা চোখে ভুল দেখেছে, অথবা এ হলো ভুতুড়ে গল্প বানিয়ে ভীতু মানুষদের ভয় দেখাবার চেষ্টা।'

সিরাজের উদ্দেশ্য তহমিনার মনে কিছুটা ভয় যদি ঢুকেও থাকে, সে ভয়টাকে দূর করা। অন্তত যথাসম্ভব হাল্কা করে দেওয়া। কিন্তু তহমিনার কথা শুনে সে বুঝতে পারল সেই চেষ্টার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। ভয় নেই তহমিনার।

'যদি আপনার বাগানবাড়িতে যাই তাহলে ফুলমনিকে সঙ্গে নেবো বলেছিলাম, সিরাজ সাহেব।' হঠাৎ যেন কি ভেবে বলে উঠল তহমিনা। 'এখন তুলে নিলাম যদি টা। আপনি মেহেরবাণী করে ডাকতে এসেছেন, আপনার ডাক আমি মাথায় তুলে নিলাম। আমি যাব আপনার বাগানবাড়িতে মেহমান হতে, আমার সঙ্গে যাবে ফুলমনি।'

এ কথাটা তহমিনার পাকা কথা, এ কথার আর নড়চড় হবে না পরিষ্কার অনুভব করল সিরাজ আমেদ। অনুভব করল তহমিনার মুখের কথায় অনুরোধ রক্ষার ভাণ, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ঐকান্তিক আগ্রহের সুস্পষ্ট সুর। সিরাজের মনে হলো তহমিনাকে তার বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখবার জন্যে যতখানি গরজ তার মনে, সিরাজের বাগানবাড়িতে গিয়ে কিছুদিন আর কিছু রাতের অতিথি হবার তার চাইতে বেশি গরজ তহমিনার। অসীম খুশীতে ভরে উঠল সিরাজের মন। আর সেই খুশীতেই সে প্রাণপণে চুপ করে রইল, পাছে মুখ খুলতে গেলে খুশীর বাড়াবাড়িতে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে রাজি হওয়া সুন্দরীকে বিগড়ে দিয়ে আবার গররাজি ক'রে ফেলে।

'আমার কি ইচ্ছে করে জানেন সিরাজ সাহেব?' শুধাল তহমিনা।

মাথা নেড়ে সিরাজ জানাল, সে জানে না, কি ইচ্ছে করে তহমিনার।

তহমিনা বলল, 'ইচ্ছে করে নীলনয়নী এখনো ঐ দীঘিতে বিকেল-বেলা সাঁতার কাটতে আসে, এ গল্প যেন সত্যি হয়। যেন একদিন আমার মুখোমুখী দেখা হয়ে যায় নীলনয়নীর সঙ্গে। আর আমার চোখে চোখ পড়তেই অমনি হাওয়ায় মিলিয়ে না যায় নীলনয়নী।'

আশ্চর্য! এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! যে কারণে তহমিনার ভয় এবং আপত্তি হবে বলে ভয় করেছিল সিরাজ, ঠিক সেই কারণেই আগ্রহ দুর্বার হয়ে উঠেছে তহমিনার মনে! কল্পনার চোখে সিরাজ দেখতে পেল তার বাগানবাড়িতে আগামী কোনো গোধলি বেলায় নীলনয়নীর দীঘির পাড়ে দুই নীলনয়নীর মুখোমুখী দেখা—একজন জীবন নদীর এপারে; একজন ওপারে। একজনের নাম তহমিনা; অন্য জনের নাম জানে না সিরাজ, জানে কেবল যে নামে যে গুজবে বিখ্যাত হয়ে আছে সেই নাম—নীলনয়নী। মুখোমুখী দেখা, কিন্তু তারপর? তারপর আর অগ্রসর হতে পারল না সিরাজের কল্পনা, থেমে রইল সেইখানে। এর পর কি বলতে বা কি করতে হবে, ঠিক করে উঠতে পারল না সিরাজের কল্পনায় দীঘির পাড়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দুই নীলনয়নী।

'আমিও সাঁতার কাটব বিকেল বেলায় আপনার বাগানবাড়ির ঐ দীঘির জলে।' বলল তহমিনা। 'আসবে নীলনয়নী। নীল চোখ দিয়ে তাকাবে আমার নীল চোখের দিকে। হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না আমায় দেখে ভয় পেয়ে।'

আশ্চর্য মেয়ে তহমিনা! সে নিজে ভয় পাবে না বিদেহিনী নীলনয়নীকে দেখে, তার একমাত্র ভয় পাছে তাকে দেখে ভয় পেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় বিদেহিনী।

'ইন্‌শা-আল্লা, যদি দেখা মেলে নীলনয়নীর, যদি কথা হয় ওর সঙ্গে, তাহলে—'

'তাহলে কি, তহমিনা?'

'তাহলে অনেক কথাই জানতে চাইব তার কাছে, সিরাজ সাহেব।' বলল তহমিনা।

কি সেই অনেক কথা, এ প্রশ্ন করে তহমিনাকে বিরক্ত বা বিব্রত করল না সিরাজ। সে সব কথা গোপন থাকুক তহমিনার মনে। সে যে যেতে রাজি হয়েছে, শুধু রাজি নয়, আগ্রহান্বিত হয়েছে, এই যথেষ্ট সিরাজের কাছে যথেষ্টর চাইতেও অনেক, অনে—ক বেশী। সিরাজের মনে হলো হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছে সে।

[ক্রমশ।

দু'টি কবিতা

অশোক মুখোপাধ্যায়

হে প্রেম

যদি কোনদিন দেখা হয়
সেই স্রোতস্বিনীকে তুমি বোলো,
আমি তার বুকে ঢেউ হতে চেয়েছিলাম
কিন্তু তৃষ্ণার সমুদ্রে সে কোথায় হারিয়ে গেল।

যদি কোনদিন দেখা হয়
সেই স্রোতস্বিনীকে তুমি বোলো,
তার উদ্দীপ্ত জোয়ার আমাকে ভাসাতে চেয়েছিল
কিন্তু এখন আমি
উপলখণ্ড হয়ে বেলাভূমিতে পড়ে আছি।

যদি কোনদিন দেখা হয়
সেই স্রোতস্বিনীকে আমি বলব,
তুমিই তার তৃষ্ণা,
তুমিই আমার বেলাভূমি,
এবং তুমিই আমাদের প্রেম,
সন্ধ্যার সূর্যের মত
যাকে আমরা রাতের আঁধারে হারিয়েছি।

দুই তমাল তরুর ফাঁকে উঁকি দেওয়া চাঁদের মত তোমাকে
আবার আমরা নক্ষত্রের অরণ্য থেকে খুঁজে আনব।

একটি ধবল নদী

একটি ধবল নদী ছিল তাকে কোন
ভগীরথ এসে তার পুণ্য শঙ্খধ্বনি
শুনিয়ে করবে এক বহতা জাহ্নবী
এই কথা ভেবে তার নগ্ন রোমাঞ্চিত
অবয়ব তুলে দিল স্মিত আকাঙ্ক্ষায়
আকর্ণবিস্তৃত হাসি লম্পটের হাতে।

একটি ধবল নদী ছিল আহা দ্যাখ
এখন সে শুকনো এক দিনের মতন
ধূ ধূ করা বালিতটে রিক্ত অবয়বে
কি করুণ মমতায় শুয়ে পড়ে আছে।

টমাস মান

সুনীলকুমার নাগ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যাবার দশ-বারো বছর পরে ইয়োরোপীয় সাহিত্যের একখানা ইতিহাস পড়বার সময় জার্মান সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের একটি উক্তি দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আলোচনার সুরুতেই লেখক তাঁর পাঠককে সজাগ করে দিয়েছেন এই কথা বলে যে, ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যে সমস্ত দেশ প্রথম সারির অর্থাৎ ফ্রান্স, ইতালী, ইংলণ্ড, নরওয়ে এবং সুইডেন—এদের প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা যদি জার্মানীর কাছ থেকেও ঐ ধরণের উন্নত পর্যায়ের সাহিত্য আশা করেন এই কারণে যে শিল্প-সভ্যতার সমস্ত দিকেই জার্মানী আশ্চর্য উন্নতি লাভ করেছে—তা' হলে তাঁরা হতাশ হবেন। জার্মান সাহিত্যের পাঠককে একটা কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যের মান-বিচারের যে কোনো সংজ্ঞা অনুযায়ীই হ'ক না কেন ফ্রান্স, ইতালী, ইংলণ্ড বা নরওয়ের চাইতে অন্ততঃ পঁচিশ বছরের পিছিয়ে-পড়া দেশ হলো জার্মানী।

পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই লেখকের কথাটা মেনে নিতে পারি নি। কারণ, তখন মনে হয়েছিল যে যুদ্ধ থেমে গেলেও লেখক নিশ্চয়ই বেশ কিছু পরিমাণে রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, কারণ লেখক ইংরেজ। কিন্তু তারপর থেকে যতই দিন যাচ্ছে এবং অনুবাদের মাধ্যমে জার্মান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছে, ততই লেখকের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করছি।

জার্মানীর সাহিত্যে জনপ্রিয় স্রষ্টার সংখ্যা, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের তুলনায় এতই কম যে অবাক লাগে। কিন্তু তবু জার্মানীর সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানা না থাকলে যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায় একথা অবশ্য স্বীকার্য। কেন? কারণ প্রথম সারির সাহিত্য স্রষ্টার সংখ্যা জার্মানীতে কখনোই খুব বেশি দেখা না গেলেও, যে ক'জনরেই আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা পৃথিবীর অনেক দেশের প্রথম শ্রেণীর লেখকগণের চাইতেই অনেক বিষয়ে মহত্তর এবং বিরাটতর স্রষ্টা। জার্মান সাহিত্যের বিগত যুগে আমরা পেয়েছি গ্যেটে, সোফালিস, শিলার এবং হাইনে-কে যাঁদের সৃষ্টি আজ বিশ্বমানবের সম্পদ বলেই স্বীকৃত। আর এ যুগেও অন্তত তিনজন আমরা এমন সাহিত্য-স্রষ্টা পেয়েছি যাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের জীবদ্দশাতেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন—এঁরা হলেন হাউপ্টম্যান, হারমান হেসে, এবং টমাস মান। তা' ছাড়া অয়েরবাক, সুদারমান, স্টেফান জাইগ এবং বের্টোল্ড ব্রেখ্‌টের প্রসিদ্ধিও বাড়তির দিকে।

বর্তমানে আমাদের আলোচ্য হলেন টমাস মান (৬ই জুন, ১৮৭৫—১২ই আগষ্ট, ১৯৫৫।)

জীবদ্দশাতেই টমাস মানকে খাস জার্মানীর সাহিত্য-রসিক মহলই স্বয়ং গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনা গ্যেটের প্রতিভার বহুবিস্তৃতি, তার ব্যাপকতা বা গভীরতার সঙ্গে ততটা দেখা যায় না, যতটা অন্যান্য সাধারণ দিকে দেখা যায়। যেমন টমাস মানও গ্যেটের মতো বিত্তশালী, বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠাবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ; টমাস মান গ্যেটেরই মতো প্রায় কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ; উভয়েই দীর্ঘজীবন ভোগ করে গেছেন। উভয়েই প্রেরণালাভের জন্যে ইতালীর দিকে তাকাতেন। এবং তারপর, যেটা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা—

গ্যেটে এবং টমাস মান উভয়েই শতাধিক বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও একটা আশ্চর্য প্রেরণা অনুভব করেছিলেন গোটা জার্মান-জাতির অস্থিরতা, নিখিলের অপার রহস্যময়তা উপলব্ধি করবার জন্যে মরমিয়া উপায়ের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—তাই উভয়ের সৃষ্টির মধ্যেই অনেক সময় একই অনুভূতির স্পন্দন দেখা যায়। গোটে জার্মানীর রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা বিরাট ওলট-পালটের সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন—টমাস মানের বেলাতেও ঠিক তাই-ই ঘটেছে। তবে কি না, গ্যেটে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর টমাস মান নিষ্ক্রিয় থেকেও স্বদেশের তদানীন্তন আধা-বর্বর রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। কি ভাবে, সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা দরকার। টমাস মান কি গোটের মতো গান বা লিরিক কবিতা লিখতে পারতেন?—নিশ্চয়ই নয়। গ্যেটের মতো নাটক? তা'ও নয়। গ্যেটের মতো ধর্ম, দর্শন বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ? অবশ্যই নয়। গোটে ছবি আঁকতে পারতেন, আর টমাস মান তাঁর বড়ো ভাইয়ের আঁকা ছবির দিকে বিমুগ্ধদৃষ্টিতে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন; কখনো নিজে আঁকবার দুঃসাহস করেন নি। বক্তা হিসেবে অবশ্যই দু'জনেই প্রায় সমান ছিলেন বলা যায়—যদিও আইনের জ্ঞান গোটের অনেক বেশিই থাকবার কথা। দু'জনেই অদ্ভুত রকমের গুণগ্রাহী ছিলেন মুক্তকণ্ঠে অপরের (অর্থাৎ অন্য লেখকদের) প্রশংসা করতেন। এবং এ বিষয়ে দু'জনের মাত্রা-জ্ঞানের অভাবটাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। যেমন গ্যেটে ঘোষণা করেছিলেন: লর্ড বায়রণ এ শতাব্দীর (উনবিংশ শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ কবি, আমার চাইতে ঐ যুবকটি শ্রেষ্ঠতর; ঠিক তেমনি টমাস মান বলতেন: আ, যদি হেসের মতো লিখতে পারতাম।

গোটের সঙ্গে টমাস মানের এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে দেখা যাচ্ছে মান কোনো কোনো বিষয়ে গ্যেটের সমান হলেও অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর স্থান গ্যেটের অনেক নীচে। আর কতকগুলি ব্যাপারে তো ওঁকে গোটের সঙ্গে আদৌ তুলনা করাই চলে না। যেমন, কবিতা ও সঙ্গীত রচনা, ছবি আঁকা বা বিজ্ঞান সাধনার প্রসঙ্গ। কিন্তু এতো কথার পরেও একটি বিষয় থেকে যাচ্ছে; সে হ'লো উপন্যাস। গ্যেটে এবং মান উভয়েই উপন্যাস রচনা করেছেন, কাজেই এক্ষেত্রে তুলনার পরে দেখা যাবে আলোচনার পাল্লাটা মানের দিকেই মাথা নোয়াচ্ছে। যদিও এ কথা সত্যি যে, গ্যেটের ছোট রোমান্টিক উপন্যাস দি সরোস অব ভেরথার টমাস মান পড়তে-পড়তে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন এবং গ্যেটে একখানা সুবৃহৎ উপন্যাসও (হ্বিলহেল্‌ম মেইস্টার) রচনা করেছিলেন, কিন্তু মানের বাডেনব্রুক্‌স, দি ম্যাজিক মাউন্টেন বা ডাঃ ফাউস্টাস গল্প হিসেবে যে শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জার্মানীর লুবেক শহরের মান পরিবার চার পুরুষ ধরেই বিখ্যাত। মানের ঠাকুরদাদার বাবা দেশের প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিয়ে এবং কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর সময়ে বেশ বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঠাকুরদাদা ছিলেন একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ, এক সময়ে জার্মানীর হয়ে নেদারল্যাণ্ড রাষ্ট্রদূতের কাজও করেছেন। মানের বাবা পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন তা' ছাড়া দু'বার লুবেক সহরের মেয়রও হয়েছিলেন। টমাস মান যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন ওঁদের চার পুরুষের বিরাট ব্যবসার গতি ধাপে ধাপে মন্দের দিকে নেমে আসছিল।

টমাস মান ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। ওঁদের দু'টি বোনও ছিলো। কিন্তু তারা দু'জনেই আত্মহত্যা করে। পৈতৃক ব্যবসার অবস্থা মন্দের দিকে যেতে সুরু করলেও বাল্য এবং কৈশোর পর্যন্ত মানের কখনো কোন আর্থিক অভাব ঘটেনি। যথা সময়েই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন টমাস মান। কিন্তু বাঁধাধরা পড়াশুনোয় ওঁর নিদারুণ অমনোযোগিতা দেখে মাস্টার মশায়রা প্রায় সকলেই অত্যন্ত বিরক্তবোধ করতেন। বছর বারো বয়স থেকেই দেখা যেতো পাঠ্যবই মান কদাচিৎ পড়ছেন, কিন্তু অপাঠ্য (!) বই দু'চারখানা সব সময়েই তাঁর পড়ার ঘরে লুকোনো অবস্থায় পাওয়া যেতো। এ হেন ব্যক্তি যে পনেরো বছর বয়স থেকেই গল্প, কবিতা এবং নাটক লিখতে আরম্ভ করবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি। পনেরো বছর বয়সেই মান অন্য কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে একখানি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এবং প্রথম তিন বছর 'পল টমাস' এই ছদ্মনামে লিখতেন এই পত্রিকায়। তারপর ওঁর যখন আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হলো সেই সময় দেখা যায় স্বনামে প্রথম লেখা বেরুলো—একটি কবিতা।

মান পরিবারের চার পুরুষের ব্যবসার ক্রমাবনতি ঘটতে ঘটতে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছলো যে, স্কুলের পড়াশুনো শেষ করবার পরেই মানকে চাকুরীর সন্ধান করতে হলো। লুবেক ছেড়ে মিউনিকে এসে একটা বীমা কোম্পানীতে কেরাণীর চাকুরী নিলেন মান, আর চলতে লাগলো লেখার কাজ। একটি বড়ো গল্প ('পতিত') কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করেছিলেন মান। চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গেই পড়াশুনোও চলতে লাগলো। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প এবং অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশুনো শেষ করে চলে এলেন রোমে বড়ো ভাই হাইনরিশের কাছে। হাইনরিশ ছবি আঁকতেন, টমাস মান মাঝে মাঝে অবাক হয়ে দেখতেন সেই ছবি, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই পড়াশুনোয় ডুবে থাকতেন। এই সময়ে মান প্রধানত ফরাসী, ইতালীয়, রুশ, নরওয়ে এবং সুইডেনের সাহিত্য পড়তেন। দু'ভাই মিলে অল্প কিছুদিনের জন্যে প্যালেস্টাইনও ঘরে এসেছিলেন। যীশুর স্মৃতি-বিজড়িত জায়গাগুলিতে গিয়ে পড়লে হাইনরিশকে রীতিমতো বেগ পেতে হতো ভাইকে সেখান থেকে সরিয়ে আনবার জন্যে। মানের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হলো ওর বেইশ বছর বয়সে ('লিটল হার ফ্রিডেমান')। ঐ বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং প্রকাশকের তরফ থেকে জোর তাগিদ আসতে থাকে আরো লেখার জন্যে।

এর প্রায় বছরখানেক বাদে মান যখন রোম থেকে মিউনিকে ফিরলেন দেখা গেলো মাঝারী ধরণের একটি সুটকেশ নিয়ে উনি প্রায় সময়ই ব্যস্ত থাকেন। বাড়ীর লোকজন কিছুটা আশ্চর্যবোধ করছিলেন যখন জানতে পারলেন যে, সুটকেশ ভর্তি বিরাট কাগজের বাণ্ডিলটা আসলে একটি পাণ্ডুলিপি। এতো বড়ো পাণ্ডুলিপি। হ্যাঁ, এতো বড়ো পাণ্ডুলিপি। অবশ্য এমন আর কিই বা বড়ো, তরুণ মান কিছুটা

যেন কৈফিয়তের সুরে লজ্জার সঙ্গে উত্তর দিতেন, কাগজের একপিঠে তো লেখা। মাত্র আঠারো শ' সত্তরখানা কাগজ। বেশি মনে হচ্ছে? কিন্তু ব্যাপারখানাও তো সোজা নয়। একটি বৃহৎ পরিবারের ঠিক চার পুরুষের প্রায় গোটা ইতিহাস—মানে কল্পিত কাহিনী লিখতে হয়েছে যে। অনেকখানি লিখে ফেলবার জন্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কিছু-নরম সুরে এমনি ধারা কথা শুধু যে বাড়ীর লোকজনকেই বলতে শোনা গিয়েছিলো মানকে তা'নয়, রাজধানী বার্লিনে তাঁর যে প্রকাশক প্রথম উপন্যাস প্রকাশের সাফল্যের পরে ক্রমাগতই জোর তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখতেন আরও লেখার জন্যে, তাঁকেও চিঠির পরে চিঠি দিতে হতো অমনি সুরে।

প্রকাশক প্রথমেই জানালেন যে, বইখানা ছাপাতে পারলে উনি খুবই আনন্দবোধ করবেন, তবে কিনা আয়তনটা দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু মান জানালেন, কোন অংশ কমাবো, কার অংশ কমাবো? ঠাকুরদার, নাকি বা বাবার, না ছেলের? কারো কথাই তো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজনের কথা বাদ দিলে যে অন্য সকলের কথাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাণ্ডুলিপির ভেতরেও বাবা তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে লিখছেন: ঐ যুবকটিকে বিয়ে করবি জানিয়েছিস, কিন্তু দেখ, তা' কি করে হবে, তা' তো হবার নয় বাছা, আমরা কেউই যা খুশী তাই করতে পারি না, আমরা কেউই আলাদা নই, স্বাধীন নই, আমরা সবাই মিলে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল এবং আমরা প্রত্যেকে এর এক-একটি অংশ বিশেষ।

যাই হ'ক, প্রকাশক শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন মানের বইখানা ছাপতে। একটি ছত্রও বাদ না দিয়ে, পুরু এণ্টিক কাগজে মোটা মোটা দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হলো টমাস মানের দ্বিতীয় উপন্যাস সুবৃহৎ 'বাডেনব্রুকস'। যাঁরা সং সমালোচক তাঁরা বইয়ের আয়তন দেখেই চটে গেলেন—কারণ ওই বিরাট বইটা তাঁদের পড়তে হবে, তবে তো তার সমালোচনা লিখবেন। পাঠক এবং ক্রেতা সাধারণ চটে গেলেন বইয়ের দাম দেখে। প্রকাশক যে নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেই ছেপেছিলেন বইখানা সে কথা আমরা আগেই দেখেছি। কাজেই প্রকাশক এমন উচ্চ মূল্য ধার্য করেছিলেন 'বাডেনব্রুকস'-এর জন্যে যে কোনো মতে এক কপি বিক্রি হলে যাতে অন্তত তিন কপির খরচটা উঠে আসে।

প্রকাশক পরে বলেছিলেন যে, একজন তরুণ এবং উঠতি লেখককে হাতে রাখবার জন্যেই উনি এ বই প্রকাশের ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন। লাভের কিছুমাত্র আশাই তাঁর ছিল না, পনেরো, বিশ বছরে হয় তো খরচটা উঠে গেলেও যেতে পারে এইমাত্র আশা করতেন তিনি। এ'টা ১৯০০ খৃঃ অব্দের কথা। কিন্তু বইয়ের ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ প্রকাশক মশায়ের সমস্ত আন্দাজ এবং অনুমান ভুল প্রমাণিত হলো বছর ঘুরে না আসতেই। তিন হাজারের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। প্রকাশক এবার প্রকৃত ব্যবসায়ীর মতো সস্তা দামের একটি এক খণ্ডে পাতলা কাগজে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করলেন। সেই যে বিক্রি সুরু হলো 'বাডেনব্রুকস' বত্রিশ বছর এক জার্মান ভাষাতেই এ বইয়ের প্রায় বারো লক্ষ কপি বিক্রি হ'লো। তারপর এ' বই মানের অন্য সমস্ত বইয়ের মতই হিটলার অ-জার্মান ঘোষণা করে জনসমক্ষে আগুনে পোড়ালেন।

কিছু কিছু গোঁয়ার এবং ছিটগ্রস্ত মানুষ বোধ হয় সমাজের সর্বস্তরেই দেখা যায়। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই এদের সংখ্যাধিক্যটা দেখা যায় সব চাইতে বেশি। এঁদের মাথায় একবার যে ধারণাটা এসে যায় সেটা যে একেবারেই অভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশেরও উপায় থাকে না আর কারো। তাই একনায়ক হিটলারের আমলে জার্মানীতে বিংশ শতাব্দীর জার্মানীর যাঁরা সবচাইতে স্মরণীয় প্রতিভা সাহিত্যক্ষেত্রে হিটলার তাঁদের দু'জনকেই জার্মানীর পক্ষে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। এঁদের একজন হলেন হারমান হেসে আর দ্বিতীয়জন হলেন বর্তমানের আলোচ্য টমাস মান।

এক কথায় বলতে গেলে 'বাডেনব্রুকস' হ'লো একখানি পারিবারিক উপন্যাস, চারটি পুরুষের সুদীর্ঘকাল ধরে এর বিস্তৃতি। এই সময়ের মধ্যে দেখা যায় একটি পরিবার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্রমশ সমৃদ্ধিশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠছে এবং তারপর আবার ধীরে ধীরে কালের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবে চতুর্থ পুরুষে এসে দেখা যায় পরিবারটি নির্মূল হয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে। লুবেক সহরের বাডেনব্রুকস পরিবারের এই কল্পিত কাহিনী যে বহুলাংশে মান পরিবারের সত্য কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত, তা সহজেই অনুমেয় তবে শেষের অংশটি নয়। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনের সমস্ত দোষগুণেরই প্রকাশ ঘটেছে এ' বইতে। সে হিসেবে এ যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা জগৎ।

মান পরিবারের প্রথম তিন পুরুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল ব্যবসায়, বাডেনব্রুক্স পরিবারেরও তাই। বাডেনব্রুক্স পরিবারে তৃতীয় পুরুষ থেকে অবক্ষয়ের হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছিল, মান পরিবারের বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত জার্মান পরিবারের গঠনপ্রণালী তথা তার শক্তির উৎসের পরিচয় জানবার জন্যে 'বাডেনব্রুক্স' একখানি অবশ্য পাঠ্য উপন্যাস। একটি সুন্দর পরিবার গড়ে তুলতে হলে ব্যক্তিগত স্বার্থ যে কতোখানি ভুলে থাকতে হয়, ক্ষুদ্রবৃহৎ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তারও জটিলতাকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে মান তাঁর পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিশ জন মানুষ এক জায়গায় থাকলে যেমন তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা একটি পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি আবার সেই বিশ জনের মিলিত একটি রূপ আছে। বিভিন্ন বিচিত্রধর্মী ভাবধারণা, প্রেমপ্রীতির তীব্রতা, তথা, হিংসা, দ্বেষ এবং স্বার্থবুদ্ধি—এ'সবগুলি যে কী ভাবে মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে একটি পৃথক সত্তার রূপ নিয়ে বংশ পরম্পরায় এগিয়ে চলতে থাকে তা' মানের এই উপন্যাসে ছবির মতো ফুটে বেরিয়েছে!

বাডেনব্রুক্স-এর ধরণের পারিবারিক উপন্যাস বর্তমান শতাব্দীতে আরো অনেক লেখা হয়েছে; তাদের মধ্যে যে ক'খানা আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে 'বাডেনব্রুক্স' শিল্পসৃষ্টি হিসেবে তাদের কারো চাইতেই পিছিয়ে পড়া নয়। গল্সওয়ার্দীর সুবৃহৎ পারিবারিক উপন্যাস 'ফরসাইট সাগা,' কোপীরাসের 'দি বুক অব দি স্মল সোলস্'; মার্টিন ড গার্ডের 'দি থিবল্টস,' উনসেটের খৃষ্টিন 'লাভর‍্যান্সডাটার,' ভার্জিনিয়া উলফের 'দি ইয়ার্স' বা পারিবারিক উপন্যাসের পথপ্রদর্শক এ্যান্টনি ট্রলোপের রচনাবলী—এদের কারো চাইতেই মানের

রচনার গুরুত্ব কম নয়, যদিও বাডেনব্রুক্স তাঁর প্রথম যৌবনের রচনা।

বাডেনব্রুক্স প্রকাশিত হবার পরের বছর থেকে মানকে জীবিকা নির্বাহের জন্যে লেখা ব্যতীত কখনো আর অন্য কোনো কাজ করতে হয় নি। মূল জার্মান ভাষায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'বার বছর তিনেকের মধ্যেই অন্য চার পাঁচটি ইয়োরোপীয় ভাষাতেও এ' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে অনেক পরে—প্রায় তেইশ বছর পরে।

লুবেকে চার পুরুষের ব্যবসায়ে বিপর্যয় ঘটলো এবং মানের বাবার মৃত্যুর পরে মান পরিবার সবাই মিউনিকে চলে এলেন। এবং এখানেই আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলতে লাগলো। ১৯০৫ সালে মান বিয়ে করলেন মিউনিকের এক অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী পরিবারের একমাত্র মেয়েকে। কাজেই মিউনিক মান পরিবারের পক্ষে নতুন জায়গা হলেও লেখক হিসেবে মানের খ্যাতি এবং বিবাহ-সূত্রে বিরাট একটি স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এ দু'য়ের ফলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই মিউনিকে মান পরিবার সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠলো।

বাডেনব্রুক্স প্রকাশিত হবার পরে একটানা তেত্রিশ বছর মানের কেটেছে সাফল্যের মধ্যে। একদিকে সাফল্য যেমন এসেছে আর্থিক এবং পারিবারিক দিকে অন্য দিকে তেমনি লেখার দিকে। এই সময়ের মধ্যেই মান তাঁর শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন। যেমন 'টোনিও ক্রোগার' (১৯০৩)। মান পরবর্তী-কালে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'এ স্কেচ অব মাই লাইফ' (১৯৩০)-এ বলেছেন যে, ঐ ক্ষুদ্র কাহিনীটি রচনার কালেই গল্পের ভেতর কী ভাবে সঙ্গীতের রসসৃষ্টি করতে হয় তা' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। 'রয়্যাল হাইনেস' (১৯০৯) একখানি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস—কিন্তু জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে এখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে গণ্য হয়েছে। যোগ্য সমালোচকগণ মনে করেন যে, মানের শিল্পবোধ এ রচনাতে অতি প্রচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও রচনাটির ব্যর্থতার কারণ এর অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের সুর। ব্যঙ্গধর্মী রচনায় মান কখনোই যথেষ্ট পটুতা দেখাতে পারেন নি।

১৯১৩ সালে মানের আর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস 'ডেথ ইন ভেনিস' প্রকাশিত হবার পরে গোটা ইওরোপের সাহিত্যরসিক মহলে আর একবার আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এবং অনেকের মতে বিংশ শতাব্দীতে এমন কি এখন পর্যন্ত এ'খানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র উপন্যাস। গুস্তাভ নামে একজন প্রখ্যাত লেখকের কল্পিতকাহিনী হলো এর বিষয়। গুস্তাভ ভেনিসে বসবাস করেন। ওদেরও চারপুরুষের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এ কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া পাওয়া যায় আর একটি বিচিত্র মানবিক প্রবৃত্তির পরিচয়। একটি পরিবার বাইরে থেকে ভেনিসে এসেছে বেড়াতে। তাদের একটি ছোটো ছেলেকে গুস্তাভের খুবই ভালো লাগে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রীতির সম্পর্কে দেখা দিলো দারুণ তীব্রতা। এবং এই তীব্রতার জন্যেই দেখা যায় শেষ অবধি ছেলেটিও মারা গেলো, গুস্তাভও মারা গেলো। কারণ ভেনিসে হঠাৎ প্লেগ দেখা দিয়েছিলো। গুস্তাভ নিজে বা ঐ ছেলেটির পরিবার ভেনিস ছেড়ে চলে গেলে প্লেগের কবলে না-ও পড়তে পারত। কিন্তু ছেলেটির প্রতি গুস্তাভের আকর্ষণ এতই তীব্র যে ওরা একাধিক বার সহর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করলেও গুস্তাভ এক-একবার এক-একভাবে সে আয়োজন পণ্ড করে দিতে লাগলো।

'ডেথ ইন ভেনিসে'র পরেই মানের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন' (১৯২৪)। অনেকের মতে বাডেন-ব্রুকস নয়, ম্যাজিক মাউন্টেনই মানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। বিক্রয়ের দিক থেকে এ বই, এ শতাব্দীর সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাস-গুলির অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানের শিল্পনৈপুণ্য তথা জীবনবোধের এবং বুদ্ধিবত্তার যে পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে এ উপন্যাসে, সে বিষয়ে সকলেই একমত। বাডেনব্রুক্স-এর দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমরা দেখতে পাই টমাস মান আশ্চর্য দক্ষতায় সঙ্গে টোনিও ক্রুগারের সঙ্গীতের রেশটি ফেলেছেন এবং তার সঙ্গে 'ডেথ ইন ভেনিসে'র বিশ্লেষণধর্মিতার মিশ্রণের ফলে 'ম্যাজিক মাউন্টেনে'র পাঠক শুধু কাহিনীতে নয়—রচনার প্রতিটি বাক্যের দ্বারাও ম্যাজিকের মতোই প্রভাবিত বোধ করেন।

'ম্যাজিক মাউন্টেন' রচনার একটু পূর্ব-ইতিহাস আছে। ১৯১২ সালে মান একটা স্যানাটোরিয়ামে গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে। তিন সপ্তাহ মান ছিলেন সেখানে। এখানে থাকা অবস্থাতেই একটি রোগীকে দেখে মান প্রথমত এ কাহিনী রচনার জন্যে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ঠিক ছিল একটি ছোট উপন্যাস হবে। কয়েক পৃষ্ঠা রচনার পরেই মনে হলো, না, অতো অল্পে জিনিষটা মনোমতো তৈরী করা যাবে না। তাই বছরখানেক পরে আবার নতুন করে লেখা আরম্ভ করলেন। কিন্তু এবারও কিছুদূর এগোবার পরে মান দেখলেন, অনেক কিছুই এসে যাচ্ছে মনে। তাড়াহুড়ো না করে সে সবের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যে আরো অনেক চিন্তার প্রয়োজন এবং কাজটা ধীরে ধীরে করা দরকার, তাই শেষ পর্যন্ত করেছিলেন মান। দীর্ঘ দশ বছরেরও ওপর একটু একটু করে লিখে তিনি যখন 'ম্যাজিক মাউন্টেন' শেষ করলেন তখন আকৃতিতে যেমন বিরাট হয়ে পড়লো, বিষয়বস্তুতেও তেমনি অভিনবত্ব প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠক এবং সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

'ম্যাজিক মাউন্টেনে'র প্রধান চরিত্র হ্যানস ক্যাষ্ট্রপ। হ্যানস ঘটনাচক্রে রোগী হিসাবে লোকালয়ের অনেক দূরে এবং উঁচুতে একটা স্যানাটোরিয়ামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। কয়েক সপ্তাহ হ্যানস-এর এখানে থাকবার কথা ছিলো কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেলো কয়েক বছর স্বেচ্ছায়ই ও সেখানে কাটালো। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে ইয়োরোপ বা হয়তো বলা যায় গোটা পৃথিবীর সভ্যতায় যে সঙ্কট দেখা দেয় এ উপন্যাসে মান তারই একটি সুষ্ঠু চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সমস্যার একেবারে ভেতরে প্রবেশ করলে অনেক সময়ই দেখা যায় যে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না আমরা, কারণ আমরাও সেই সমস্যারই অঙ্গবিশেষ হয়ে পড়ি। সেই জন্যেই 'অবজেকটিভলি' বিচার করবার সুবিধার জন্যে যে কোনো সমস্যাকে বুঝবার জন্যে তার বাইরে থেকে দেখবারও একটা পদ্ধতি অনেকে অবলম্বন করে থাকেন। মানও তাই করেছেন। তাঁর উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই পর্বতশীর্ষের স্যানাটোরিয়ামের রোগী বা

রোগিণী। হানস তাদের কেন্দ্রবিন্দু। এদের জীবনে সক্রিয়তা বলতে বোঝায় পরস্পরের সঙ্গে বিদগ্ধজনোচিত আলাপ-আলোচনা করা—এ ছাড়া আর কারোই কোনো কাজ নেই। সাধারণত দেখা যায় যে, কোনো ঘটনা বা আলোচনা নানা বহির্মুখী শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে তার প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু মানের এই বইতে ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটেছে। প্রত্যেক আলোচনাই গিয়ে কাহিনীর মধ্যমণি হানসের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে—ফলে বলা যায় যে, মান তাঁর সময়কার দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সদ্য শিল্পোন্নত পৃথিবীতে মানুষের যে আত্মিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তারই একটা বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ম্যাজিক মাউণ্টেনে উপস্থিত করেছেন। একটি ধ্বংসোন্মুখ শিল্পসভ্যতার আত্মবিনাশকারী নানা দিকের চিত্রসৃষ্টিতে এ' বই বিগত আটত্রিশ বছর ধরেই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মানের পরবর্তী উপন্যাস 'ডিসঅরডার এণ্ড আর্লি সরো' (১৯২৬) প্রধানত তাঁর নিজের সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত। নামধামের মিল না থাকা সত্ত্বেও এ কাহিনী যে একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব মান পরিবারের সঙ্গে পরিচিত একাধিক মনস্বী সে, কথা বলেছেন। মান তাঁর বড়ো মেয়েটিকে অত্যধিক ভালোবাসতেন—সেই বালিকা কন্যাই কার্যত এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের প্রায় সবটা জুড়ে রয়েছে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে অপত্য স্নেহের নানা বিচিত্রপ্রকাশ। দু'বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২৯ সালে মান তাঁর সাহিত্য-সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

মারিও এণ্ড দি ম্যাজিসিয়ানে (১৯৩০) মান কিছুটা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার অনুভূতি নিয়ে এবং পূর্ববোধে উদ্দীপিত হয়ে একনায়কতন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করলেন। এটা হিটলারের আবির্ভাবের তিন বছর আগের ঘটনা।

১৯৩০ সালে মান একটি বিরাট বিষয়বস্তু নিয়ে সুবৃহৎ একখানা বই রচনা করবার জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঘটনাটার সূত্রপাত হয়েছিল নিতান্ত সাধারণ একটা ব্যাপার থেকে। এক বন্ধুর সঙ্গে বাইবেলের জোসেফ-এর কাহিনী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল মানের মিউনিকের বাড়ীতে এসে।

আলোচনার মধ্যে প্রসঙ্গত জোসেফ এসে পড়লেও কয়েকদিনের মধ্যেই সাহিত্য পত্রিকাদিতে খবর বেরুলো যে, জোসেফের উপাখ্যান অবলম্বনে মান বড়ো একখানা বই লেখবার জন্যে তথ্যপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত। জোসেফ সম্পর্কে প্রায় শতাধিক বিভিন্ন বই মান দু' সপ্তাহের মধ্যে তাঁর লেখাপড়ার ঘরে এনে জমা করলেন। তার মাস চারেক পরে সুরু হলো লেখার কাজ। লেখা এবং পড়া প্রায় সমান গতিতেই চলতে লাগলো। ১৯৩৩ সালে প্রায় সাড়ে তিন বছরের চেষ্টায় মান তাঁর জোসেফ সিরিজের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন—'জোসেফ এণ্ড হিজ ব্রাদার্স'।

১৯৩৩ সাল থেকে মানের জীবনের একটা মোড় ঘুরলো। তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে নিয়ে সুন্দর সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেলো হিটলার এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের জুলুম হেলনের ফলে। কয়েক বছর পূর্ব থেকেই মান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য সংস্থার আমন্ত্রণে কখনো ইংলণ্ড, স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন কখনো বা সুইজারল্যাণ্ডে যেতেন বক্তৃতা দেবার জন্যে। ১৯৩৩ সালে যখন নাৎসী দল জার্মানীতে রাষ্ট্রশক্তি দখল করলো সে সময়ে মান হল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ঐ রকমভাবে আমন্ত্রিত হয়ে একটি সাহিত্যসভায় বক্তৃতা দানের জন্যে। সেখানে থাকতেই খবর বেরুলো হিটলারের সরকার তাঁর পক্ষে জার্মানীতে প্রবেশ করা বেআইনী ঘোষণা করেছেন। উপরন্তু বাডেনব্রুকস সহ তাঁর সমস্ত রচনাবলী বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে এবং প্রকাশ্যে আগুনে পোড়ানো হয়েছে। প্রথমটা মানের ধারণা হয়েছিল যে নাৎসী দলের কয়েকজন উগ্রমস্তিষ্ক যুবকের ক্ষিপ্রতার ফলেই এমনধারা হচ্ছে স্বদেশে, নাৎসী দলের বড়ো নেতারা নিশ্চয়ই শীঘ্র তাঁদের সিদ্ধান্ত নাকচ করবেন। কিন্তু তার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। উপরন্তু মানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি—জার্মানীর ভেতর কোথায় কি আছে না আছে তা সব অনুসন্ধান করা আরম্ভ হয়ে গেলো। বলাই বাহুল্য সে সব বাজেয়াপ্ত করলো হিটলারের সরকার। শুধু তাই নয়, প্রথমে শুধু মানের পক্ষে জার্মানী প্রবেশ বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল এবার আর এক ঘোষণায় মানের জার্মান নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হলো।

এদিকে মানের ভাই এবং ছেলেমেয়েরা চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন হিটলারের নীতির বিরোধিতা করে খবরের কাগজে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেবার জন্যে। কিন্তু মান সে কথায় কান দিলেন না। উনি শুধু বললেন যে—আমি নিজেকে Non-Political বলে মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করলেন যে, বারো বছর পূর্বেই আমি একখানা ছোট বই লিখেছিলাম 'রিফ্লেকশনস অব এ নন-পলিটিক্যাল-ম্যান,' দেশের সরকার আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে এবং নানাভাবে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বলেই আমি অকস্মাৎ আমার নীতির পরিবর্তন করবো এ' কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তা' হলে তো এই কথাই বোঝাবে যে হিটলারই আমার নীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে, অর্থাৎ কিনা আমি হিটলারের বুদ্ধি মতো চলি। কিন্তু তা আমি বাস্তবিকই চলি না। সব ব্যাপারটা আমাকে আর একবার ভালোভাবে বুঝতে হবে, চিন্তা করতে হবে, তারপর যা হয় হবে।

হিটলারের বর্বরোচিত আচরণের বিরুদ্ধে মান সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয়ে রইলেন। মান সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে এসে বসবাস সুরু করলেন। এ সময়ে ছোটোখাটো লেখা ব্যতীত জোসেফ সিরিজের তৃতীয় খণ্ড রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ড কয়েক মাস পূর্বেই রচনা শেষ হয়েছিল, ১৯৩৪ সালে প্রকাশ লাভ করলো। জুরিখে থাকতে মান একদিন একখানা চিঠি পেলেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। কি ব্যাপার? না বছর পাঁচেক পূর্বে ওঁরা মানকে যে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছিলেন, এখন বুঝতে পেরেছেন যে মান তাঁর উপযুক্ত নয়—তাই সে প্রদত্ত উপাধি ওঁরা নাকচ করে দিলেন। এ সমস্তই যে নাৎসীদের প্রভাবে ঘটছিল তা' আর মানের বুঝতে বাকী ছিলো না। তাই চিঠিখানা উপস্থিত কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের পড়ে শোনালেন মান এবং তারপর খুব খানিকটা হাসলেন। বন্ধুরা ম্রিয়মাণ হয়ে চলে গেলেন।

১৯৩৪ সালেই মানের একখানি গল্পের বইও প্রকাশিত হলো—

দি নকটারনস।' ছ' বছর পরে প্রকাশিত হলো জোসেফ সিরিজের তৃতীয় খণ্ড 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট।' প্রকাশ্যে নাৎসীদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে কোনো বিবৃতি বা রেডিওতে কোনো বক্তৃতাদি না দিলেও গোটা পৃথিবীর দেশ-বিদেশের মনস্বী ব্যক্তিরা সব সময়েই মানকে চিঠিপত্র দিতেন হিটলারের নানা কুকাজের সমালোচনা করে। ১৯৩৭ সালে সে সমস্ত পত্র এবং তার উত্তরে লেখা মানের চিঠিগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো—'এ্যান এক্সচেঞ্জ অব লেটার্স।' বলাই বাহুল্য, বাইরে থেকে প্রকাশিত মানের কোনো বইয়েরও জার্মানীতে প্রবেশের হুকুম ছিলো না। কারণ, নাৎসীদের মতে ও সমস্ত অ-জার্মান।

১৯৩৮ সালে মান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে আশ্রয় নিলেন। মার্কিন সরকার মানকে পাবার সঙ্গে সঙ্গে 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে'র জার্মান সাহিত্যের উপদেষ্টার পদে নিয়োগ করলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা মনিকাতে বসবাসের জন্যে একটা বাড়ীর বন্দোবস্ত করা হলো মানের জন্যে। কয়েক সপ্তাহ মান কাটালেন সে বাড়ীতে। তার পরেই মার্কিন দেশের বিভিন্ন সহরে ঘুরে ঘুরে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন বিভিন্ন বক্তৃতায়। আটত্রিশের মাঝামাঝি এই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো '—দি কামিং অব ডেমোক্রাসি।' কয়েক সপ্তাহ পরেই একই ধরণের আর একখানি বই বেরুলো মানের, 'দিস পীস'।

প্রায় জ্যোতিষীর মতো ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলেন মান—যুদ্ধ যে এসে গেলো। আপনারা কি অস্ত্রের ঝনাৎকার শুনতে পাচ্ছেন না। হিটলার, গোয়েরিং, গোয়েবলস কার কথার কোনটা অসার, কোনটা ফাঁকি, কতটুকু সত্যি, কতটুকু তৈরী হয়ে নেবার জন্যে কালহরণ করবার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, মান তাঁর শ্রোতাদের প্রতিটি বক্তৃতায় সে সমস্ত বিশ্লেষণ করে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কোথাও কেউই তাঁর কথায় খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না। তার সবচাইতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো ১৯৩৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হিটলার যেদিন সমস্ত আবেদন নিবেদন এবং সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে পোলাণ্ড আক্রমণ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধালেন। বিশ্ববাসী দেখলো জার্মানী একটা মহাযুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরী, কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই এমন কি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্যেও তৈরী নয়!

একদা 'রিফ্লেকশনস অব এ নন-পলিটিক্যাল ম্যান' লিখে যিনি শিল্পী ও সাহিত্যিকদের রাজনীতির বাইরে থাকবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, এবার দেখা গেলো সেই মানের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। শিল্পী এবং সর্বস্তরের লেখকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে ঘোষিত হলো। মানের এই জাতীয় বিষয়বস্তুর ওপর বিভিন্ন বক্তৃতা 'দিস ওয়ার' ১৯৪০ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো।

১৯৪৪ সালে মান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন। এবং এই বছরই বি, বি, সি, থেকে একাধিক বক্তৃতায় জার্মান নাগরিকদের কাছে আবেদন জানান নাৎসীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করবার জন্যে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে আবার দেখা গেলো মান ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায়ও ধ্বংসস্তূপ দেখছেন, কোথাও বক্তৃতা দিচ্ছেন। যুদ্ধ শেষ হবার বছর খানেক পূর্বেই জোসেফ সিরিজের চতুর্থ এবং শেষ খণ্ড—'জোসেফ দি প্রোভাইডার' প্রকাশিত হয়েছিলো। জার্মানী নাৎসী-কবলমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মানের রচনাবলী আবার লাখে লাখে ছাপা হতে সুরু হলো বিভিন্ন প্রকাশকের তত্ত্বাবধানে। লেখক হিসেবে মান এ সময়ে স্বদেশে প্রধানত চারটি বিভিন্ন রূপে পূজিত হতেন। প্রথমত বাডেনব্রুকস এর রচয়িতা; কালের অতীত, বর্তমান, তথা ভবিষ্যৎ তিনটি দিকেই যাঁর দৃষ্টি সমান অভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত 'ডেথ ইন ভেনিস'-এর লেখক অতি আধুনিক মনোবিশ্লেষণমূলক সাহিত্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক মান। তৃতীয়ত, ম্যাজিক মাউন্টেনের বিস্ময় উদ্রেককারী পরিবেশ ও মানসিকতার ব্যাখ্যাতা মান। মানের এই তিনটি প্রধান রূপ হিটলারের আবির্ভাবের পূর্বেও স্বীকৃতিলাভ করেছিল। এবার যুদ্ধ শেষে স্বদেশে তাঁর আর একটি রূপের প্রতিষ্ঠা হলো—তা হলো জোসেফ সিরিজের রচয়িতা হিসেবে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বাইবেলের উপাখ্যানের এই আধুনিক রূপ অবিলম্বে জার্মান জনমানস জয় করে ফেললো। পরাজয় জার্মান জাতির পক্ষে এবং জার্মান সাহিত্যের পক্ষে যতোটা গ্লানির বলে মনে না হয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি হয়েছে বিভিন্ন মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর বিভিন্ন অংশের অধিকার এবং আদর্শগতভাবে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাগে জার্মানীর বিভাজন। পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুই জার্মানীর শাসন কার্যালয়েরই সর্বোচ্চ পদগুলি যদিও জার্মানদের দ্বারাই অধিকৃত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়; সে হলো বছরের পর বছর এই বিভক্ত অবস্থা চলছে এটা জার্মান জনসাধারণের অভিপ্রেত নাকি নিছক ওপরতলার ব্যাপার।

যাই হ'ক, যুদ্ধ থেমে যাবার বছরখানেক পর থেকেই উভয় জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই মানের কাছে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ আসতে লাগলো পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য। কিন্তু কোন অঞ্চলে যাওয়া যায়? এই একটা প্রশ্নই কয়েক বছর ধরে মান ভাবলেন, তারপর ১৯৪৯ সালে স্বীকৃত হলেন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার গ্যেটে প্রাইজ গ্রহণ করবেন দুই জার্মানীর কাছ থেকেই। প্রথম এলেন পশ্চিম জার্মানীতে তারপরেই পূর্ব জার্মানীতে। এর ফলে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে মানের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেলো।

মান যখন '৪৯ সালে গ্যেটে প্রাইজ গ্রহণ করবার জন্যে স্বদেশে গিয়েছিলেন তার কয়েকমাস আগে, '৪৮ সালের শেষের দিকে ওঁর আর একখানি যুগান্তকারী উপন্যাস প্রকাশিত হলো—'ডাঃ ফাউস্টাস'। এ বইখানি সম্বন্ধে আমরা সবার শেষে আলোচনা করবো। এ' ছাড়া মানের অন্যান্য বইগুলির মধ্যে 'দি ট্রান্সপোর্টেড হেডস' (১৯৪০), 'দি বিলাভেড রিটার্নস' ('৫১); 'দি হোলি সিনার'; 'দি ব্ল্যাক সোয়ান' এবং 'দি কনফেশনস অব ফেলিক্স ক্রাল,' 'কনফিডেন্স ম্যান' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারাজীবনে মান কয়েক খণ্ড প্রবন্ধও রচনা করে গেছেন তার মধ্যে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনো-বিজ্ঞানীদের ওপর তাঁর নিবন্ধগুলি সবচাইতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

১৯৫২ সালে মান আমেরিকা ত্যাগ করে আবার চলে-[illegible]

সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত জুরিখের এই বাড়ীটিই ছিল মানের স্থায়ী ঠিকানা।

শিল্পী হিসেবে মান যে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এ কথা অনেকেই আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর দোষ বা গুণ হেনরী জেমস, জেমস জয়েস বা আন্দ্রে জিদের সঙ্গে তুলনীয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে মান যে আশ্চর্য রুচি-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়, যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মানের যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী তাও কম বিস্ময়ের নয়। রোগী হতে কেউই চায় না। রোগকে কারোই ভাল লাগার কথা নয়। ম্যাজিক মাউণ্টেনের গোড়ার কথা এই রোগ। রোগ সারাবার জন্যে সবাই একটা স্যানাটোরিয়ামে আসতো। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে একজন (নায়ক হান্স) আবিষ্কার করলো যে রোগের অন্য একটা ক্ষমতা আছে, রোগ জীবনের দরজা খুলে দিতে পারে। মানবমনের এ রকম অসংখ্য প্রকোষ্ঠ আছে রুগ্ন অবস্থায় শয্যার নিষ্ক্রিয়তা ভিন্ন যেদিকে স্বাভাবিকভাবে কখনোই আমাদের নজর যায় না। রোগের মধ্য দিয়ে এই নতুন রাজ্যের সন্ধান পেয়েই হান্স সানন্দে সমর্পণ করলো নিজেকে রোগের কাছে। এই প্রতীকধর্মী ব্যাপারটাকে অনেকেই গ্যেটের ফাউস্টের শয়তানের সঙ্গে মিতালী স্থাপনের তুলনা করেছেন।

জার্মান মানসিকতা যে ফাউস্টীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত এ বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। যে দুর্বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে নাৎসীরা জার্মানীর ধ্বংস সম্পূর্ণ করলো সুদূর আমেরিকাতে বসে মান সে সমস্তই বুঝবার চেষ্টা করতেন। এবং নিজের জীবদ্দশাতেই যে দেশকে তিনি কৃষিপ্রধান থেকে শিল্পপ্রধানরূপে গড়ে উঠতে দেখেছেন; জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্তক্ষেত্রে মানবপ্রতিভার চরম প্রকাশ বলে যে দেশের কীর্তিকে দেশে দেশে নন্দিত হতে দেখেছেন—সেই প্রিয় পিতৃভূমির বিরাট বিরাট শিল্পসমৃদ্ধ নগর, শত শত বছরের শ্রম এবং সাধনা বহন করে যে অসংখ্য সৌধ এবং প্রতিষ্ঠান—এ সবের ধ্বংসকার্য মানের মতো একজন মনস্বীর চিন্তাধারায় আলোড়ন তুলবে না, তাও কি হয়। মান ঠিক করলেন যে জার্মান মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং এই পূর্ব ঘোষিত এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন একখানি উপন্যাস রচনা করলেন ডাঃ ফাউস্টাস; ডাঃ ফাউস্টাস ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছিলো।

ডাঃ ফাউস্টাস উপন্যাসের নায়ক আদ্রিয়ান লেভারকান একজন সঙ্গীতবিশারদ। আদ্রিয়ানের জীবনকথা আমরা শুনতে পাই তার বাল্যবন্ধু সেরেনুসের মুখ দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল যখন নিশ্চিতভাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে যেতে আরম্ভ করলো, অর্থাৎ ২৭শে মে ১৯৪৩-এ সেরেনুস তার বন্ধুর কাহিনী বলতে সুরু করলো। আদ্রিয়ানের কাহিনীর মাঝে মাঝে টমাস মান আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে জার্মানীর তিলে তিলে পরাজয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। উপন্যাসের শেষ হচ্ছে জার্মানীর চূড়ান্ত পতনের দিনে—অর্থাৎ যেদিন জার্মানী আত্মসমর্পণ করলো। সেরেনুস একেবারে ছেলেবেলা থেকে আদ্রিয়ানের বিশেষ কতকগুলি গুণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলো, কিন্তু আদ্রিয়ান নিজে তা জানতো না। আদ্রিয়ান ও সেরেনুস দু'জনকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হিসেবে চিত্রিত করেছেন মান। আদ্রিয়ান হ'লো ফাউস্টধর্মী জার্মান—প্রতিভাবান, সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী, জীবনে উচ্চাভিলাষী এবং তার এই উচ্চাভিলাষের পথে সে কোনো অন্তরায়কেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে প্রস্তুত নয়। কাজেই প্রতিভা এবং উচ্চাভিলাষ অনেক সময়েই তার মধ্যে মত্ততার লক্ষণ এনে দেয়। আর সেরেনুস হ'লো জার্মানদের দ্বিতীয় টাইপ—বিদ্বান, মানবতন্ত্রী, মানুষের মঙ্গলের জন্যে নিজেকে অর্থাৎ নিজের ভাবধারণাকে সংযত করবার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে, তবে অসাধারণ কোনো প্রতিভার লক্ষণ ওর মধ্যে নেই এবং নেই বলে সেরেনুসের মধ্যে কোনো প্রকার হীনমন্যতাও দেখা যায় না।

বাল্য এবং কৈশোরের সন্ধিক্ষণে আদ্রিয়ান যেদিন তার সঙ্গীত প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হ'লো, সেরেনুস লক্ষ্য করলো তার বন্ধুর মধ্যে পরিপূর্ণ উন্মত্ততার প্রকাশ। আদ্রিয়ানের প্রতিভা যেমন সত্য, তার মত্ততাও ঠিক তেমনি, সেরেনুস আরো লক্ষ্য করলো যে এই দু'টি জিনিস শুধু সত্য নয়, ওতপ্রোতভাবে যুক্তও বটে। একদিনের প্রচণ্ড উন্মত্ততার পরে আদ্রিয়ান আবার শান্ত হ'লো বটে, কিন্তু একটানা চব্বিশ বছর ধরে চলতে লাগলো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে ওঠে আদ্রিয়ান এবং তা কারণে অকারণে কখনো বা প্রচণ্ড মাথাধরা এবং তারপরেই অনিবার্যভাবে আদ্রিয়ান একটি অত্যাশ্চর্য সুরসৃষ্টি করে। 'আদ্রিয়ান এবং টেম্পার' নামে একটি পরিচ্ছেদে এক অভিনব কথোপকথন রয়েছে, সেরেনুসের মতে এটা তার বন্ধুর নিজেরই রচনা—এর সঙ্গে গ্যেটের ফাউস্টের সঙ্গে যেখানে মেফিস্টোফিলিসের চুক্তি হচ্ছে তার তুলনা করা চলে। টেম্পারের সঙ্গেও আদ্রিয়ানের চুক্তি হলো একটানা চব্বিশ বছর তার প্রতিভা অলৌকিক সুরসৃষ্টি করে চলবে। তারপর, হ্যাঁ, তারপর একসময় অকস্মাৎ টেম্পার জয় করবে ওকে, অর্থাৎ আদ্রিয়ান উন্মাদ হয়ে যাবে—হলোও ঠিক তাই।

টেম্পারের সঙ্গে এই যে কথোপকথন আদ্রিয়ানের এ জিনিসটাকে অনেকেই ডস্টয়েভস্কির 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এ শয়তানের সঙ্গে আইভানের কথোপকথনেরও তুলনা করে থাকেন। শয়তানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আইভান যেমন অবোধ শিশুদের জীবন যন্ত্রণার জন্যে ঈশ্বরকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল—আদ্রিয়ানও তেমনি টেম্পারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে বার বার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো—এবং পর পর তিন বারই তার এই প্রেম অপরের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

আদ্রিয়ানের কাহিনীকে অনেকেই জার্মানীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জার্মানী যেমন শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বলে মনে হয় তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ নিয়ে নিজেই ধ্বংস ত্বরান্বিত করবে বলে—এও অনেকটা তাই। সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবার পরেও আদ্রিয়ান আরো দশ বছর বেঁচে ছিলো। স্থিরবুদ্ধি সেরেনুস শান্তভাবেই দেখেছে প্রতিভার যাতনা, তার স্ফূর্তি, তার অপব্যবহার এবং তার পরিণাম—এক চোখে দেখেছে সে তার বন্ধুকে, আর এক চোখ তার রয়েছে দেশের দিকে, পিতৃভূমির দিকে—সেখানেও যে প্রতিভার অপব্যবহার ঘটেছে, তাই তার পরিণাম, পিতৃভূমির ধ্বংসস্তূপের দিকে লক্ষ্য রেখে সেরেনুস বলছে: আবার আলো করে দেখবো।

শ্রদ্ধা বৃত্তি

সুরেশচন্দ্র নন্দী

শ্রদ্ধা মানব হৃদয়ের অন্যতমা বৃত্তি বা মনোনিষ্ঠ ধর্ম। বৃত্তি লইয়াই মানব জন্মগ্রহণ করে। বৃত্তি শূন্য মানব নাই। বৃত্তি কি বা কাহাকে বলে? চিত্ত মধ্যে কোন বস্তুর চিন্তা উদয় হইলে, সেই বস্তুর আকারগত যে চিন্তাপ্রবাহ, উহাই বৃত্তি নামে পরিচিত। মানব চিত্তে অসংখ্য চিন্তা বা বৃত্তির উদয় ও বিলয় হইতেছে।

চিন্তা কি? কোন বিষয় মীমাংসা বা স্থিরীকরণ মানসে বা স্মরণ করিবার জন্য মনের মধ্যে যে আন্দোলন বা আলোড়ন তাহাই চিন্তা। পরম শিবশঙ্কর বলিয়াছেন, বুদ্ধির বিকাশ স্বরূপ চিন্তা মানসিক ব্যাপার বা মনের কর্ম।

চিন্তাদয়স্তথা ব্যাপারা মানসা বস্তু।

শিবোপনিষৎ ৯।৮

চিন্তা এক প্রকার শক্তি বিশেষ। উহা প্রাকৃতিক শক্তি কেন্দ্রান্তর্গত শক্তি। এই শক্তি আমরা আমাদের খাদ্য হইতেই লাভ করি।

মানবচিত্তে বৃত্তির আবির্ভাব হয় কেন? সংস্কার ও বাসনার প্রভাবেই উহার আবির্ভাব বা জন্ম হয়। চিত্ত বাসনা শূন্য হইলেই বৃত্তি বা চিন্তাপ্রবাহও তৎক্ষণাৎ চিত্তমধ্যে বিলয় হয়। বৃত্তিগুলি ক্রমশ অধোমুখী হইলেই মগ্ন চৈতন্যাত্মক মনের উপর সমস্ত কর্ম, সুখ, আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধির যে সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট ছাপ পরিস্ফুট হয় তাহারই নাম সংস্কার। মন যখন কোন বিষয়ের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখনই চিত্তমধ্যে সংস্কারের আবির্ভাব হয়। সংস্কার পূর্বকৃত কর্মের স্মরণাত্মিকা শক্তি বিশেষ। উহাই জীবন এবং সুখ-দুঃখের স্মৃতির মূল কারণ। উহাই স্মৃতিকে প্রবুদ্ধ করে, অর্থাৎ পূর্ব জীবনের সকল প্রকার কর্ম ঘটনাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃস্তন্য পান করে। এ জন্মে কেহই তাহাকে শিক্ষা দেয় নাই তাহারই ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়। তবে কি করিয়া তাহার স্তন্যপানে প্রবৃত্তি জন্মে? সংস্কারই নবজাতককে আহারে প্রবৃত্তি দিয়াছে। প্রবৃত্তি কি? মহর্ষি অক্ষপাদ গোতম বলেন, বাক্য, বুদ্ধি (মনঃ) ও শরীরের যে আরম্ভ অর্থাৎ কর্মপ্রচেষ্টা তাহাকেই প্রবৃত্তি বলে।

প্রবৃত্তির্বাগ বুদ্ধি শরীরারম্ভ ইতি

ন্যায়দর্শন ১ অঃ ১ম আঃ ১৭ সূত্র।

সাংখ্য শাস্ত্র বলেন, পূর্বজন্ম কর্মার্জিত যে সংস্কার তদ্দারাই শরীর, আয়ু ও ভোগ সাধিত হয়।

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তকা

সাংখ্যদর্শন ৫ অঃ ১২০ সূত্র।

শ্রুতি বলিয়াছেন, দেহীজীব জন্ম-সংস্কার দ্বারা যেমন স্থুল ও সূক্ষ্ম বিবিধ রূপ ধারণ করে আবার তেমনি ধর্মাধর্ম এবং বাসনাদির দ্বারা শব্দাদি গুণের সংযোগ হেতু তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, এইরূপও দেখা যায়।

স্থূলানি সূক্ষ্মানি বহূনি চৈব
রূপানি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতু রাপরোঽপি দৃষ্টঃ।

শ্বেতাশ্বতোপনিষৎ ৫।১২

কুম্ভকারের চক্র যেমন চলন সংস্কারবশত স্বয়ংক্রিয় হয়, অর্থাৎ আপনা-আপনি স্বীয় স্বভাববশত ঘূর্ণায়মান হয়, তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষেরও দেহাদিতে সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে; সেই সংস্কার শক্তির মূলেই তাহাদের দেহ সম্বন্ধীয় কার্য সকল সাধিত হয়। কিন্তু সেই সকল কর্মে আর তাঁহারা লিপ্ত হন না। যেমন সুগন্ধি ফুল ঘরের মধ্যে সমস্তদিন রাখিবার পর শুষ্ক হইলে ফেলিয়া দিলেও সেই ফুলের গন্ধ যেমন ঘরের মধ্যে থাকে, তেমনি ভোগবাসনা ক্ষয় হইলেও তাহার সংস্কার কিছুদিন থাকে। এই সংস্কারবশতই জীবকে পুনরায় দেহধারণ করিতে হয়।

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ।

সাংখ্যদর্শন ৩য় আঃ ৮৩সূত্র

অতএব এই কারণে সংস্কার স্মৃত্যাত্মিকা মনোবৃত্তির গুণ বিশেষ।

বাসনা কি? শ্রুতি বলিতেছেন, বিষয়ের দৃঢ় ভাবনা বা চিন্তার দ্বারা মানুষের মন যখন পূর্বাপর বিচার শূন্য হয় এবং কেবল বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ ও প্রাপ্তির নিমিত্ত যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা উহারই নাম বাসনা।

দৃঢ় ভাবনায়া ত্যক্ত পূর্বাপর বিচারণম্।
যদাদাং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা।

মুক্তিকোপনিষৎ ২।৫৫

অতএব বাসনাও চিত্তবৃত্তি বিশেষ। এই বৃত্তির চিত্ত গ্রন্থিকে সম্বন্ধ করে। চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থার নাম বাসনা। বাসনার প্রকৃতি স্থূল। এই জন্য শ্রীভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত শিষ্য ও সেবক শ্রীহনুমানকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, হে মারুতি! মুনিগণ বলিয়াছেন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ানুরূপ চিত্ত বৃত্তি বিশেষের নাম বাসনা।

ভাব সচ্চিৎ প্রকটিতা মন্মুরূপাঞ্চ মরুতে!
চিত্ত সোৎপত্তি ও পরমাং বাসনাং মুনয়োবিদুঃ॥

মুক্তিকোপনিষৎ ২।২৪

বাসনার জন্ম হয় কিরূপে? পূর্ব বাসনাবশতই চিত্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। চিত্ত বিষয়ের রূপ রস স্পর্শ গন্ধ শব্দাদি পদার্থের প্রতি ধাবিত হইলেই তদ্দারা বাসনার জন্ম হয়। এই প্রকার বীজাঙ্কুরের ন্যায় চিত্তের বিষয় প্রবণতা বাসনা আবার বাসনার দ্বারা বিষয় প্রবণতা জন্মে।

বাসনাবশতঃ প্রাণ স্পন্দস্তেন চ বাসনা
ক্রিয়তে চিত্ত বীজস্য তেন জাঙ্কুরক্রম। মুক্তিকোপনিষৎ ২।২৬

শ্রুতি বলিতেছেন, চিত্তরূপবৃক্ষের প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই দুইটিই স্বীয় বীজ স্বরূপ। উভয়ের একটি ক্ষীণ হইলেই উভয়ই সত্বর ক্ষীণ হইয়া বিনষ্ট হয়।

যেবিজে চিত্ত বৃক্ষস্থ প্রাণস্পন্দন বাসনে।
একাস্মিংশ্চতয়োঃক্ষীণে ক্ষিপ্রংদ্বে আপিনশ্যতঃ॥

মুক্তিকোপনিষৎ ২।২৭

শুভ অশুভ ভেদে বাসনা দ্বিবিধ। শুভ বাসনা সাত্ত্বিকী—উহা পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর ক্ষয়কারিণী,—মোক্ষদায়িনী। অশুভ বাসনা—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা ভেদে ত্রিবিধ। উহা বন্ধনকারিণী—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর জনয়িত্রী। এই জন্য শ্রীভগবান শ্রীরামচন্দ্র শ্রীহনুমানকে উপলক্ষ করিয়া বিশ্ববাসীকে উপদেশ দিয়াছেন, অশুভ অর্থাৎ মলিনা বাসনা জন্মের কারণ এবং শুভ বা শুদ্ধ বাসনা জন্মনাশিনী। যে বাসনা অজ্ঞানের কারণ, অহঙ্কারের কারণ স্বরূপ এবং জন্মের নিদান, পণ্ডিতগণ তাহাকে অশুভ বা মলিনা বাসনা বলিয়াছেন। যেমন ভৃষ্টবীজে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ অশুভ বা মলিন বাসনা দ্বারা পরমার্থ লাভ হয় না।

মলিনা জন্ম হেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধতা জন্ম বিনাশিনী
অজ্ঞান সুঘা না কারু ঘনাহঙ্কার শালিনী।
পুনর্জ্জন্মকারী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ
পুন র্জ্জন্মাষ্ট রং ত্যক্তা স্থিতিঃ সংভৃষ্টবীজবৎ।

মুক্তিকোপনিষৎ ৫৯ ৬০ ৬১

মন, সংস্কার, বাসনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

শ্রীভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাসনা দ্বারা সম্বদ্ধ তাহাকেই প্রকৃত বদ্ধ বলা যায়, আর বাসনা ক্ষয়ের নামই মুক্তি।

বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ

মুক্তিকোপনিষৎ ৬৬

শ্রুতি বলিতেছেন, কর্মনিবৃত্তির দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হয়। বাসনার নিবৃত্তি হইতে মানব সংস্কার মুক্ত হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মানবের মোক্ষলাভ হয়।

ক্রিয়ানাশাস্তবেৎ চিন্তনাশোঽস্মাদ বাসনাক্ষয়।
বাসনা প্রক্ষয়ো মোক্ষঃ জীবন্মুক্তি বিষ্যতে॥

অধ্যাত্মোপনিষৎ ১৫

বাসনা সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্র পুনশ্চ বলিয়াছেন, বিষয়ের দৃঢ় ভাবনার দ্বারা যখন পূর্বাপর বিচার তিরোহিত হয় এবং কেবল বিষয় গ্রহণের নিমিত্তই ইচ্ছা হইতে থাকে, সেই ইচ্ছাবিশেষের নাম বাসনা।

দৃঢ় ভাবনায় ত্যক্ত পূর্বাপর বিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা স প্রকীর্ত্তিতা

মুক্তিকোপনিষৎ ২।৫৫

হে কপিশ্রেষ্ঠ! যখন মানব মন দৃঢ়তা সহকারে বিষয়চিন্তা করে তখন শীঘ্রই অন্য বিষয়ক বাসনা অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ক বাসনা পরিত্যক্ত হইয়া ঐ একমাত্র মলিন বা অশুভ বাসনাই মানব মনে স্থিতিলাভ করে। বাসনার মাহাত্ম্য অতি বিচিত্র। বাসনা স্বীয় স্বভাব কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বাসনার দ্বারা বশীভূত হইয়া সম্বস্তুর উপলব্ধি করিয়াও ঐ অশুভ বাসনায় বিমুগ্ধ হয়, সে ব্যক্তি মত্ততাবশত দুর্দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষ যেমন সকলকেই ভ্রান্ত বলিয়া মনে করে, সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভাবিতং তীব্রসংবেগাদাত্মনা যত্তদেব সঃ।
ভবত্যাশু কপিশ্রেষ্ঠ বিগতেতর বাসনঃ॥ ৫৬
তদৃগ্‌রূপো হি পুরুষো বাসনা বিষয়ীকৃতঃ।
সংপশ্যতি যদৈবৈতৎ সদ্বাস্থিতি বিমুহ্যতি। ৫৭
বাসনা বেগবৈচিত্র্যাৎ স্বরূপং ন জ্ঞাতাতিতৎ
ভ্রান্তং পশ্যতি দুর্দৃষ্টিঃ সর্ব্বং মদবশাদিব॥

মুক্তিকোপনিষৎ ৫৬।৫৮

মনের নামান্তর অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ কি? মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সমবায়ে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অন্তঃকরণ। আচার্য শ্রীভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণের জন্ম হইয়াছে।

আকাশদিগতাঃ পঞ্চ সাত্ত্বিকাংশাঃ পরস্পরম্।
মিলিত্বৈবান্তঃকরণ মভবৎ সর্ব্বকারণম্॥

সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ৩৪৩

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অন্তঃকরণ চারি বৃত্তিযুক্ত।

অন্তঃকরণমেকং তচ্চতুর্বৃত্তি সমাশ্রিতম্!

শান্তিগীতা ২।৩৮

সেই চারি বৃত্তি কি কি? মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। শ্রীভগবান আদিত্যদেব, শ্রীভগবান আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, এই অন্তঃকরণই বৃত্তি ভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে পরিচিত।

অন্তঃকরণ মনো বুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাঃ

ত্রিশিখি ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩

তদন্তঃকরণ বৃত্তি ভেদেন স্যাচ্চতুর্বিধম্।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্ত ইতি স্তূচ্যতে॥

সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ৩৪৫

এই কারণেই মনের নামান্তর অন্তঃকরণ।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি—

সাংখ্যাচার্য ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন স্বরূপগত অর্থাৎ নিজস্ব বৃত্তিযুক্ত।

স্বলিক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।

সংখ্যোকারিকা ২৯ সূত্র

সেই বৃত্তিত্রয় কি কি? শ্রীভগবান কপিল বলিয়াছেন, বুদ্ধি, অধ্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান, অহঙ্কারের অভিমানাত্মিকা অর্থাৎ অহং জ্ঞান এবং মনের সঙ্কল্পাত্মিকা বৃত্তি।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ।

সাংখ্যদর্শন ২।১৩

অভিমানোঽহঙ্কারঃ!

ঐ ২।১৬

মন সঙ্কল্পক।

সাংখ্যকারিকা ২৯ সূত্র

শ্রীভগবান আচার্য শঙ্কর ও আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী এই কারণেই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির, অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির ও অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার নামকরণ করিয়াছেন।

সঙ্কল্পাত্মন ইত্যাহুর্বুদ্ধিরর্থস্য নিশ্চয়াৎ।
অভিমানাদহঙ্কারশ্চিত্তমর্থস্য চিন্তনাৎ॥

সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ৩৪৬

মনোনাম সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তিঃ।
বুদ্ধিনাম—নিশ্চয়াত্মিকাঽন্তঃকরণ বৃত্তিঃ॥
অনুসন্ধানাত্মিকা ঽন্তঃকরণ বৃত্তিঃ চিত্তম্।
অভিমানাত্মিকাঽন্তঃকরণ বৃত্তি অহঙ্কার॥

বেদান্তসার। ৫২।৫৩

সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ অর্থাৎ নির্মল ও প্রকাশাত্মক হেতু অন্তঃকরণ একাধারে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত চারিস্বরূপ গত বৃত্তি যুক্ত। এই বৃত্তিগুলি নিজ নিজ কার্য দ্বারা অর্থাৎ অন্তঃকরণ যখন সঙ্কল্প করে, তখন মন—যখন নিশ্চয় ভাব প্রকাশ করে, তখন বুদ্ধি, যখন অহং ভাব প্রকাশ করে তখন অহঙ্কার—যখন চিন্তা করে তখন চিত্ত নামে পরিচিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একই মানব যেমন ভিন্নভিন্ন কর্ম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়, তেমনি অন্তঃকরণ এক হইলেও তাহার নিশ্চয়, সংশয়, স্মরণ ও অহঙ্কাররূপ বৃত্তি ভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার পৃথক পৃথক নামে পরিচিত হয়।

অতএব অন্তঃকরণ যখন সঙ্কল্প করে তখন মন নামেই পরিচিত হয়। সঙ্কল্পের ন্যায় চিন্তাও মনের ধর্ম, সেই জন্য মনেই চিত্তের অন্তর্ভাব সম্যকরূপে সিদ্ধ হয়। মনের দ্বারা মানব বাহ্য ফল কামনা করিয়া থাকে। মনই কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং উহার ফলভোগ করে। অতএব মনই সর্ব বিষয়ের কারণ একমাত্র মন দ্বারাই সকল মানব অন্তরবাহ্য বিষয় অবগত হয়, সর্ব বিষয় শ্রবণ করে, গন্ধ গ্রহণ করে, দর্শন করে, বাক্য প্রয়োগ করে, স্পর্শ প্রভৃতি কর্ম করে।

যে মনের দ্বারা এতগুলি কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই মনের স্রষ্টা কে? ঋষি আঙ্গিরস বলিয়াছেন, সেই (পরম) পুরুষ হইতেই মন এবং ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে।

এতস্মাজ্জায়তে মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।

মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।৩
কৈবল্যোপনিষৎ ১৫

ঋষি পিপ্পলাদ ভরদ্বাজপুত্র সুকেশার প্রশ্নোত্তরে এই কথাই বিশদভাবে উপদেশ দিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন, তিনি (পরম পুরুষ) প্রথমে প্রাণ অর্থাৎ সর্ব প্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি করেন। এই প্রাণ হইতেই শ্রদ্ধা, বায়ু, জ্যোতি, অপ, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ও সৃষ্টি করেন।

সপ্রাণম সৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাংখং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম মনঃ। প্রশ্নোপনিষৎ ৬।৪

এই মন কোথায় থাকে? ঋষি উদ্দালক অরুণিপুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, হে সৌম্য! মন প্রাণেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রাণমেনবোপশ্রয়তেপ্রাণ বন্ধনং হি সোম্যমন

ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।৮২

শ্রীভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি দেহিগণের দেহমধ্যে নিয়ত বাস করে।

ইন্দ্রিয়াণিন্দ্রিয়ার্থশ্চ স্বভাবশ্চেতনামনঃ।
প্রাণাপানৌচ জীবশ্চনিত্যং দেহেষুদেহিনাম্॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ২৩৬'১৪

মাধবাচার্য বিদ্যারণ্যও উভয় ঋষি বাক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

প্রানাদভ্যন্তরং মনঃ

পঞ্চদশী

প্রাণের অভ্যন্তরে মনের অধিষ্ঠান বিষয়ে ঋষি উদ্দালক অরুণি শ্বেতকেতুকে এক উদাহরণ দ্বারা পুনশ্চ উপদেশ দিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন, সূত্রদ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া সেই বন্ধন স্থানকেই আশ্রয় করে, তেমনি এই মন চতুর্দিকে বিচরণ করিয়া যখন অন্যত্র আশ্রয় না পায় তখন প্রাণকেই আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া থাকে।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেন প্রবন্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এব মেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধা প্রাণমেবোপশ্রয়াতে প্রাণ বন্ধনং সোম্য মন ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।৮।২

অতএব মন প্রাণের অভ্যন্তরেই অধিষ্ঠিত।

মন ও ইন্দ্রিয়গণ যেমন পরম পুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রিয়াদির করণরূপ বৃত্তিসমূহও সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঋষি পরাশর বলিয়াছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা প্রধান ব্রহ্মশক্তি।

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা ব্রহ্মণ প্রধানা ব্রহ্ম শক্তিয়ঃ

বিষ্ণু পুরাণম্ ১ ২২।৫৬

শ্রীভগবান আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, গৃহ যেমন গৃহীর আশ্রয় দেহও তেমনি ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়।

আশ্রয়শ্চক্ষুরাদীনং গৃহবদ গৃহ মেধিনাম্॥

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ৫৩৮

ঋষি আঙ্গিরস বলিয়াছেন, প্রাণিগণের সমগ্র চিত্ত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং

মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৯

চিত্ত যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত, দেহ যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিগণের আশ্রয়, চৈতন্যস্ফুরণযুক্ত অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ পরব্রহ্মের আশ্রয়।

আশ্রয়শ্চেতে সো ব্রহ্ম।

বিষ্ণু পুরাণম্ ৬.৭।৪৭

অখণ্ডাকার বৃত্তিঃ সা চিদাভাসসমন্বিতা।
আত্মাভিন্নং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য কেবলম্॥

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ৭১১

অতএব দেখা গেল মন যেমন প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তিও তেমন শ্রীভগবানকেই আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীভগবান কপিল এবং শ্রীভগবান পতঞ্জল অন্তঃকরণের পঞ্চবিধ বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। [আগামীবারে সমাপ্য।

বিজ্ঞান বার্তা

হিন্দু-বিজ্ঞান ও পরমাণুবাদ

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে যেটুকু মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তাও যথাসময়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলে প্রচারিত না হওয়ার দরুণ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের সৃষ্ট বিজ্ঞানেতিহাসে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তানায়কদের করা হয়েছে যথেষ্ট অনাদর। অভিযোগ করার উপায় নেই, হিন্দু-বিজ্ঞানীদের সঠিক সময়কাল সম্বন্ধে আজও সকলে একমত হতে পারেন নি. এই কারণেই বোধ হয় পার্টিংটন (Partington) তাঁর রসায়নের ইতিহাস গ্রন্থে (History of Chemistry) প্রাচীনকালে পরমাণুবাদের বিকাশে ভারতের প্রধানত্বে কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করে লিখেছেন—'The theory of atoms goes back to the early Greek Philosophers' ভারত সম্বন্ধে তিনি একেবারে নীরব নন, তাঁর মতে—'মোটামুটি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও পরমাণুবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, এই জ্ঞান ভারতবর্ষ গ্রীসের কাছ থেকে পেয়েছিল অথবা স্বতন্ত্র-ভাবে নিজেই বর্ধিত করেছিল তা যথেষ্ট বিতর্কমূলক বিষয়। এক ছায়াচ্ছন্ন কণাদকে এর জন্মদাতা বলা হয় কিন্তু সম্ভবত পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পরমাণুবাদের আবির্ভাব ঘটে।'

ভারতীয় পরমাণুবাদের অভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব কোন অংশে কম নয়। হিন্দু-বিজ্ঞানী পাতঞ্জল ও কণাদের সময়কাল খুব কম করে ধরলেও দেখা যায় গ্রীসীয় পরমাণুবাদের প্রধান বিশ্লেষণকারী ডেমোক্রিটাসের (Demokritos) আবির্ভাব কিছু পরে হয়েছিল। অবশ্য আরিষ্টটলের (Aristotle) মতে গ্রীসীয় বিজ্ঞানী লিউকিপাস (Leukippos) পরমাণুবাদের সঠিক প্রতিষ্ঠাতা! আনুমানিক হিসাবে লিউকিপাস ভারতীয় বিজ্ঞানী কণাদের সমসাময়িক। সাংখ্যকারিকার ভূমিকায় হিন্দু-বিজ্ঞানীদের প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন অধ্যাপক উইলসন (Prof. H. H. Wilson),—তাঁর মতে,—'হিন্দুরা তাদের চিন্তাধারা গ্রীসের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিল, এ কথা অসম্ভব মনে হয়। যদি কোন ঋণের প্রশ্ন ওঠে তাহলে বলা যায় বোধ হয় গ্রীসই ভারতের কাছে ঋণী ছিল, যাই হোক গ্রীসীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখিয়ে আমরা বলতে পারি—প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীস একই সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে পরমাণুবাদের জন্ম দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা ও গ্রীসীয় চেতনার সঙ্গে নব্যযুগীয় পরমাণুবাদের সামঞ্জস্য—বিস্ময়জনক।

আধুনিক পরমাণুবাদের জন্মদাতা বলা হয় ডল্টনকে তাঁর কিছুদিন মাত্র আগে বিজ্ঞানী গ্যাসেণ্ডি (Gassandi)) প্রাচীন পরমাণুবাদের মূলসূত্রকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করে এই তথ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে নব্যযুগীয় বিজ্ঞানীদের সচেতন করেন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই পদার্থের আদি কণার রহস্য বিশ্বজগতের এক পরম বিস্ময়। জ্ঞানের সন্ধানে এবং কৌতূহলের তাড়নায় প্রাচীন দার্শনিকেরা চিন্তার মাধ্যমে এর সমাধানের জন্য যে চেষ্টা করে গেছেন, মৌলিক পদার্থের ধারণা সঠিক না থাকায় তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় এবং গ্রীসীয় বিজ্ঞানীরা প্রায় এক সঙ্গেই স্বতন্ত্রভাবে যে পরমাণুবাদের জন্ম দিয়েছিলেন, ডল্টনের মতবাদকে তারই এক অনুবৃত্তি বলা যায়। তৎকালীন জ্ঞানের অগ্রগতিই ডল্টন সাহেবের প্রকাশ ভঙ্গিমার প্রধান সহায় ছিল।

সাংখ্য দর্শনের উদ্গাতা হিন্দু-বিজ্ঞানী কপিলের পরমাণুবোধ প্রাচীন মৌলিক পদার্থের চেতনার সঙ্গে ছিল একসূত্রে গাঁথা। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম—মৌলিক পঞ্চক দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্বজগৎ, এই ধারণা তিনি স্বীকার করে নিয়ে অণু পরমাণুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন। এই মৌলিক পদার্থ পঞ্চকের সঙ্গে আজকের জগতের মৌলিক পদার্থের আকাশ-পাতাল তফাৎ। প্রাচীন চেতনা অনুযায়ী এই মৌলিক পদার্থ ব্যাপকভাবে জগতের প্রতিনিধিত্ব করতো। ক্ষিতি অর্থে যাবতীয় কঠিন পদার্থ, অপ অর্থে যাবতীয় তরল পদার্থ, মরুৎ অর্থে যাবতীয় মারুত পদার্থ এবং তৎসঙ্গে তেজ অর্থে তাপশক্তি এবং ব্যোম্ অর্থে আকাশকে বোঝায় জল, পৃথিবী ও আকাশ নিয়েই আমাদের এই বিশ্বজগৎ; সুতরাং এই প্রতিনিধিত্ব দুর্বোধ্য হলেও অগ্রাহ্য করা যায় না। কপিলের মতবাদ অনুসারে এই পাঁচটি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অণু—বিভিন্ন পরমাণু (tanmatras) দ্বারা গঠিত। মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন গুণাবলী তাদের অণু-পরমাণুর সংযোজনের ওপর নির্ভর করে।

কণাদের বৈশেষিক সূত্রে হিন্দু পরমাণুবাদের আর এক নতুন বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাই। মৌলিক পদার্থ হিসাবে আকাশকে তিনি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে আকাশ বায়ুর সাহায্যে তরঙ্গের মাধ্যমে শব্দ পরিবহন করে এবং মৌলিক পদার্থ মাত্র চারটি, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। তেজের আবার দুটি প্রকাশ—আলো এবং তাপ। কণাদের এই যুগান্তকারী ঘোষণা প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞান গবেষণার এক সুন্দর নিদর্শন। কণাদ অণুর ওপর—সংখ্যা, সমষ্টি, স্বাতন্ত্র্য, আয়তন, আকর্ষণ, তারল্য ইত্যাদি বিভিন্ন গুণাবলী আরোপ করেছিলেন। অণুর বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শের অনুভূতিও তাঁর

বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। কণাদের মতে অণু চিরকালীন, তাকে ধ্বংস করা যায় না। অণু সর্বদাই দলবদ্ধভাবে থাকে এবং দলবদ্ধভাবেই সে পরিবর্তনশীল। কণাদের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় পরমাণুর সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনি কপিলের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর হয়েছিলেন, কেবলমাত্র অণু (Molecule) এবং পরমাণুর (Atom) প্রভেদ তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয় নি। এক্ষেত্রে কপিলের অণু এবং 'তন্মাত্রস্' (Tanmatras) এর ধারণা একদিক দিয়ে অধিকতর কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

কপিল এবং কণাদের সময়কাল যথাক্রমে আনুমানিক ৬০০ এবং ৫০০ খৃষ্টপূর্ব। আনুমানিক হিসাবে এই সময়েই গ্রীসীয় পরমাণুবাদের জন্মদাতা লিউকিপাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। লিউকিপাস ছাড়াও পরমাণুবাদের গ্রীসীয় চেতনার ক্রমবিকাশে এমপিডোক্লিস (Empedocles—C. 490-430 B. C.) এবং ডেমোক্রিটাস (Democritus—C. 460 to 370 B. C.) এর দানও উল্লেখযোগ্য।

কপিলের ধারণার সঙ্গে এমপিডোক্লিসের পরমাণুবাদের সামঞ্জস্য খুবই বেশী। এমপিডোক্লিসের মৌলিক পদার্থ পঞ্চককে স্বীকার করেন নি—তাঁর মতে মৌলিক পদার্থ মাত্র চারটি। এই একটি দিকে এমপিডোক্লিসের সঙ্গে কণাদের পরমাণুবাদের খুবই মিল আছে। কণাদের পরমাণুবাদের সঙ্গে গ্রীসীয় দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতবাদের তুলনা করা যায়। ডেমোক্রিটাসের মতে, পদার্থ অতি ক্ষুদ্র কণার দ্বারা গঠিত, যা ঘূর্ণনশীল, চিরকালীন, যাকে ধ্বংস করা যায় না, গুণ অনুসারে এক কিন্তু আকার আয়তন এবং পরিমাণে পৃথক অনেকের মতে ডেমোক্রিটাসই সর্বপ্রথম অণুর ওজন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন কিন্তু এই তথ্য বিতর্কমূলক।

ভারতবর্ষে আমরা আবার পরমাণুবাদের সন্ধান পাই জৈন গ্রন্থে—৪০ খৃষ্টাব্দে। জৈন গ্রন্থে অণু এবং পরমাণুর বিশ্লেষণ অত্যন্ত উন্নত। জৈন দর্শনে পদার্থের নাম পুদ্গল (Pudgala)—যার অবস্থান দু'রকম। প্রথম হল অণু এবং দ্বিতীয় হল স্কন্ধ (Skandha)। দলবদ্ধ অবস্থানকে স্কন্ধ বলা হয়। জৈন গ্রন্থের অণু এবং স্কন্ধের সঙ্গে যথাক্রমে বর্তমান জগতের পরমাণু (Atom) এবং অণুর (Molecule) তুলনা করা চলে।

পদার্থের আকর্ষণ, বিকর্ষণ এবং সংযোজন সম্বন্ধে জৈনগ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। দু'টি বিপরীত ধর্মী পদার্থই কেবলমাত্র সংযোজিত হতে পারে। তখনকার দিনে এই বিপরীত ধর্মকে বোঝান হতো খুব সাধারণভাবে, যেমন মসৃণ এবং অমসৃণ। পদার্থ দুই প্রকার ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক, সমধর্মী পদার্থ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হলে কখনই নিজেদের মধ্যে মিলতে পারে না। তারা তখনই মিলতে পারে যদি তাদের একটির চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষমতা অপরটির দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের বেশী হয়। অণু এবং স্কন্ধের গুণাবলীর পরিবর্তন সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের সংযোজনের ওপর। ১৮০০ সালের পরে আবিষ্কৃত রাসায়নিক বার্জেলিয়াসের (Berzelius) মতবাদের (Dualistic Hypothesis) সঙ্গে, ৪০ সালের এই জৈন মতবাদের সামঞ্জস্য প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের এক গৌরবময় নিদর্শন।

এবার ডল্টন সাহেবের পরমাণুবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'এক কথা বলা যাক। ডল্টনের মতে—'মৌলিক পদার্থ অতি ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত যারা যে কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম এবং একই মৌলিক পদার্থের অণু সর্ববিষয় (বিশেষ করে ওজনে) সমগুণসম্পন্ন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুর ওজন বিভিন্ন। অণুর ওজন অনুসারে মৌলিক পদার্থের প্রকার ভেদ করা যায়।' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় হিন্দু-বিজ্ঞানীদের পরমাণু বোধ ডল্টনের চেয়ে খুব বেশী পেছিয়ে ছিল না। অবশ্য ডল্টন সাহেবের পরমাণুবাদও ত্রুটিশূন্য নয়, তিনি অণু এবং পরমাণুর প্রকার ভেদ নির্ণয় করতে পারেন নি। সেদিক দিয়ে প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞানী কপিল যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

নব্যবিজ্ঞানের প্রথম পথপ্রদর্শক বয়েল (Sir Robert Boyle), সাহেব ১৬৬১ সালে বলেছিলেন—'those theories of former philosophers, which are now with great applause revived, as discovered by these latter ages'.

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব স্মরণ করলে পরমাণুবাদের ক্রমবিকাশে একথার সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনই সংশয় থাকে না।

ক্ষণিক

শ্রীবীণা ঘোষ (সেনগুপ্ত)

এলোমেলো হাওয়া বয়ে যায় পাইনের বনে,—
ডাক দিয়ে যায় বসন্তের কোকিল।
দুপুরের উজ্জ্বল কমলা রদ্দুর
নিয়ে আসে মনে ব্যাকুলতা।
আনন্দের স্বরূপ হয়ে সে আসে
মহান গৌরবে মৃদু হেসে।
আর? আর রডোডেন্ড্রন্ গুচ্ছের মতো
রাংগা হয় তার মন—
যেখানে সূর্য হার মানে তার কাছে।
একটা মৌমাছি গুনগুনিয়ে সুর তোলে মনের মাঝে,
বকুবকু বকুলের দুরুদুরু কামনা জাগিয়ে।
বিধাতার সৃষ্টি অপরূপ লাগে তার চোখে।
তারপর বিদায় নেয় সেই ক্ষণ
কুয়াশায় ঘিরে আসে চারিদিক,
দৃষ্টি প্রসারিত হয় না সমুখ পানে।
মুহূর্তেই মিথ্যা হয়ে যায় এই পৃথিবীটা।
বিস্বাদ লাগে গানের কলি, জলের শব্দ,
পাখীর কাকলি।
একটা রিক্ততার, পেয়ে না পাওয়ার বেদনায়
ঝাপসা হয়ে আসে তার চোখ,
আনন্দ তখন বয়ে গেছে আর এক কোন
পাইনের বনের হাওয়াতে।

প্রভাত দেবসরকার

খেতে খেতে অমর কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠলো। পাশে বসে ছোট ভাই খাচ্ছিল, তার দিকে চেয়ে দেখলে দিব্যি খাচ্ছে সে, মাথা নিচু করে এক মনে, যেন কখনো এমন খাওয়া পায় নি। দৃশ্যটা অমরের খারাপ লাগলো।

দিদির বাড়ী ভাই-ফোঁটায় খেতে এসে এমন খারাপ আর কোনদিন লাগে নি। ঐ ছোট ভাই-এর মতনই একমনে খেয়েছে। সেদিন খাওয়াটা আজকের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, বরং কম, আয়োজন উপকরণ স্বল্পই।

আর আজ? অমর চেয়ে চেয়ে গুণে গুণে দেখলে, শেষ নেই যেন! দিদি কি কাণ্ড করেছে, আমিষ-নিরামিষের কোন পদই বোধ হয় বাদ যায় নি! দুই ভাইকে খাওয়াতে যজ্ঞ করেছে!

খেতে খেতে মুখ তুলে অমর বললে, 'মাংসটা খুব ভাল হ'য়েচে দাদা, চিংড়ী মাছটাও!'

অমর অতদূরে পৌঁছয় নি, দৃষ্টিতে অনেকটা খাওয়া হ'য়ে গেছে। বললে, 'তুই খা, চেঁচাসনি।'

অমর চেয়ে দেখলে, মাংসের ঝোল-মাখা হাতটা চেটে কেমন যেন অবাক বোধ করলে দাদার নির্লিপ্ততা দেখে। খাওয়ায় হঠাৎ এমন অরুচি কেন? পাতের ওপরে নীচে উপকরণ যেমন ছিল তেমনি সাজান আছে। খেতে বসে' দাদা কি ভাবছে?

পরিবেশক এসে জিজ্ঞেস করলে, আর কিছুর দরকার আছে কি না, কোন জিনিষ ভাল লাগলে দ্বিতীয়বার দেবে কি না। অমর মাথা নাড়লে।

সমর তাড়াতাড়ি বললে, 'মাংস আর একটু, চিংড়ী মাছ আর একটা, ডিমের বড়া—'

অমর ধমকে উঠলো, 'না না, তুমি যাও! এই তো আমার পাতে আছে নে, কত খাবি খা!'

পরিবেশক চলে যেতে সমর আর একবার দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, কেমন কঠিন আর নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। দাদাগিরি ফলাচ্ছে!

এক সময় অমর বললে, 'খাস নি কখনো, অমন হ্যাংলার মত করচিস কেন!'

হ্যাংলামো কোথায়, কখন করলে সে, সমর বুঝতে পারলে না। দাদা আজ বড্ড খিটখিট করছে। দিদির বাড়ীতে এসে কি নেমন্তন্ন বাড়ীর মত চুপচাপ মুখ বুজিয়ে খেয়ে উঠে যাবে, নিমন্ত্রিতের মত ব্যবহার করবে?

অবুঝের মত সমর বললে, 'কি হ'য়েছে?'

'কিছু হয়নি, খা!' অমর বিরক্ত হয়ে বললে।

নিঃশব্দে খাওয়ার একটা শব্দ যেন ঘরময় দিশাহারা হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল, ঘর ছেড়ে কিছুতে যেন সরতে পারছে না।

অনেক বড় ঘরে, অনেক আলো জ্বালিয়ে, অনেক উপকরণ দিয়ে দুই ভাইকে খেতে দেওয়া হ'য়েছে। খাওয়ার ঘর এত বড় খুব কম বড়লোকদের আছে। দিদি নতুন বাড়ীতে উঠে এসে ঘর-দোর সুন্দর করে কেতাদুরস্ত করে সাজিয়েছে।

সে তুলনায় অমররা রোজ একফালি দালানে হাঁটু মুড়ে পা মুড়ে জড়াজড়ি করে' বসে গোগ্রাসে খায়। কখনো গলায় আটকায়, কখনো বিষম খায়। এত সংকীর্ণ জায়গাটা যে পরিবেশন ক'রতে গিয়ে মা দু'-বেলা বিরক্ত হন—'আর একটু গুছিয়ে বসতে পারিস না সব, কোন্‌খান দিয়ে যাই বল দিকি?'

ভাড়াটে বাড়ীতে অমরদের বসবাসের খুবই অসুবিধে। সুজনের সেই প্রবাদের মত তেঁতুল পাতায় অবস্থান। তিন ভাগ জলে আর এক ভাগ স্থলে কুলাবে কি ক'রে?

এখন জামাইবাবু খুব বড় বাড়ী করেছেন। এক সময় দিদিরা

তাদের মত ছোট বাড়ীতে থাকতো। মেছোবাজারের গলির মধ্যে দিদিদের সেই বাসা বাড়ীটার তুলনায় ভবানীপুরের বাড়ীতে অমররা স্বর্গে বাস করছে! কি বাড়ীতে দিদিরা এককালে ছিল, রাতদিন আলো জ্বালিয়ে রাখতে হত, জানালা খুললে ভেজাল তেলের গা-গুলোন গন্ধ আসতো. দিদির বার মাস অসুখ করতো. জামাইবাবু এসে প্রায় বলতেন—নিরুপমার কাল থেকে খুব অসুখ করেছে, ছোট মেয়েটাও পড়েছে! কলকাতায় বাসা ক'রে খুব শিক্ষা হ'য়েছে, একটা দিন সুস্থির হ'তে দিলে না!

তখন জামাইবাবুর এই আক্ষেপের সঙ্গে অমররা সমবেদনা প্রকাশ করলেও, মনে মনে কোথায় যেন একটা খোঁচা বোধ করতো। মা বাবাকে দুঃখ ক'রে বলতেন, আসলে জামাই-এর কলকাতায় বাসা করা ইচ্ছে নয়, খুকীর জেদে বাসা করেছে!

তা বলে দিদি নিরুপমা খুব জেদী ছিল না। আর পাঁচ জন মেয়ের মত, বউ-এর মত শ্বশুর-শাশুড়ীর বাধ্য ছিল, তাঁরা যা বলতেন যা করাতেন, যেমন রাখতেন তেমনই ছিল। শ্বশুরবাড়ীতে দিদির খুব নাম হয়েছিল, দিদিকে সবাই ভাল বলতো। জেদ করে নিজের সুখের জন্যে কলকাতায় বাসা করবার মেয়ে দিদি নয়। মেসে থাকতে, ট্রেনেও দেশে যেতে জামাইবাবুর খুবই কষ্ট হতো, তা ছাড়া—

সে কারণটা অনেক পরে অমররা জেনেছিল। দিদি বলে নি, তবুও তাদের কানে এসেছিল। ভাইয়ে ভাইয়ে বনিবনা হয়নি, জায়ে জায়েও মনকষাকষি হত, দিদির ওপর শ্বশুর-শাশুড়ী বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না (কেন না জামাইবাবুর রোজগারই বেশী ছিল, বলতে গেলে তিনিই অত বড় সংসার একলা চালাতেন), যত দোষ তখন দিদির।

শ্বশুরবাড়ীতে একান্নবর্তী পরিবারে কোন বউ-এর যদি খ্যাতি হয় তো বুঝতে হবে হয় সে বউটা খুব বোকা, ভালমানুষ, নয় তো খুব চালাক, চতুর। আর সংসারে ভাল-নামের কোন মূল্য নেই—যারা ভাল বলে তারাই আবার সামান্য ত্রুটিতে বদনাম করে, মন্দ বলে, একটুও বিবেচনা বা বিচার করে না। তার থেকে সংসারে কোন নাম না-থাকাই ভাল, ভাল, মন্দ কেউ কিছুই বলবে না।

শ্বশুরবাড়ীতে দিদির যত তাড়াতাড়ি নাম হয়েছিল তত তাড়াতাড়ি নাম প'ড়েও গিয়েছিল। বোকা, ভালমানুষ লোকেরা নাম বজায় রাখতে পারে না সংসারে।

জামাইবাবু কলকাতায় বাসা করতে দিদির খুব নাম খারাপ হয়েছিল—দিদির শ্বশুরবাড়ীর লোকরা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু সবাইকে বলে বেড়াত, ভূপতির বউটা বড্ড স্বার্থপর, শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখে না, কলকাতায় বাসা করে দিব্যি ফূর্তিতে আছে আজকালকার মেয়ে।

অথচ সে কত'দনের কথা, তিরিশ বছর তো বটে। এখনকার মত হলে তো আরো কত কথা হতো। দিদি তখন বোধ হয় সবে চারুপাঠ ধরেছে, তাও ঘরে বসে, বিয়ে হয়ে গেল। দিদির বিয়ের কথা অমরের স্পষ্ট মনে আছে—দিদির লেখাপড়া, কি গান-বাজনা কোন কথাই ওঠে নি, কেবল টাকা আর গয়নার কথা হয়েছিল, অনেকদিন ধরে যাওয়া আসা চলেছিল। বিয়ে ভেঙে গেল, গেল! বাবা অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে পণের টাকা, দানের গয়না, বরের ঘড়ি, আংটি, বোতাম সংগ্রহ করেছিলেন। কতটুকু বয়েসে দিদির বিয়ে হয়েছিল আজ লোকে কল্পনা করতে পারবে না।

দিদি মোটেই জেদী ছিল না। জামাইবাবু দিদির কথা শুনে কাজ করবার জন্যে বয়ে গেছে। তিনি ভাল বুঝেছিলেন বলে বাসা করেছিলেন মেছোবাজারের ঐ গলিটায় ছেলেপুলে এনে তুলেছিলেন। ভাল বাড়ী ভাড়া নেবার মত তখন জামাইবাবুর অবস্থা ছিল না।

সে বাড়ি আর এ বাড়ী আকাশ পাতাল তফাৎ! মেছোবাজারের বাড়ীতেও ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন খেয়েছে অমর। তখন সমর আসতো না, ও খুব ছোট ছিল, অমর একলাই আসতো, কখনো খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো দু' একজন সমবয়সী ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতো। সেই অন্ধকার ঘর দু'টো সারাদিন ভাইদের নিয়ে উৎসব আনন্দে বড় মুখর হ'য়ে উঠতো, দিদির জীবনে অতি অল্প বয়সে যে আলো নেই, বাতাস নেই, গন্ধ নেই সে-কথা মনেই হ'ত না। জামাইবাবুও তখন খুব জব্দ হ'তেন, শালাদের জন্যে একদিন কাজ কামাই করতেন!

আজকের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হ'বে কি অকিঞ্চিৎকর সে'সব

উপকরণের সামগ্রী—দু'টো ক'রে নিমকি-সিঙ্গাড়া, একটা ক'রে সন্দেশ আর একটা করে রসগোল্লা কি পানতুয়া, জলখাবার ভাইয়ের কপালে ফোঁটার সঙ্গে ; সন্ধ্যেবেলায় লুচি, মাংস কি মাছ, দই, সন্দেশ, তাই মনে হত কত ! অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না । দিদি সব সময় সামনে বসে পাহারা দিত পাছে অমররা কিছু ফেলে রাখে, না খায় ।

'আর না দিদি, আর না, পারছি না, পেট ফেটে যাবে !'

তখন কতই বা বয়স দিদির, তবু কত যেন গিন্নীবান্নি, রুগ্ন শরীরে সারাদিন সব ক'রে পরম বিজ্ঞের মত বলতো, 'পেট-ফাটার ওষুধ আমার কাছে আছে, ও'টুকু খেয়ে নাও লক্ষ্মী ছেলের মত !'

সমরের জন্যে ডিমের বড়া, চিংড়ী মাছ আর মাংস নিয়ে ঠাকুর আবার এল । সমর হাত নেড়ে 'না না' করতে লাগল ।

অমর ধমক দিলে, 'কি হ'চ্ছে, এই চাইলি আবার না করছিস ?'

মুখ নিচু করে গোঁজ মুখে সমর বললে, 'খেতে পারবো না আর ।'

'তখন তা' হ'লে বললি কেন ? খেয়ে নে, নষ্ট হ'বে ?' খাবার নষ্ট অমর নিজে কম করে নি, খাওয়ার আগে সে বুঝতে পারে নি খেতে বসে তার এমন খারাপ লাগবে । খেতে পারছে না ।

ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিল, অমর জোর করে সমরের পাতে খাবারগুলো দেওয়ালে । সে খেতে পারছে না বলে ও খাবে না কেন ? ছেলেমানুষ এখন ওদেরই তো খাবার সময় । অমরের মত হ'লে কেউ আর বড়লোক বোনের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে আসতো না ।

সমরের বয়সে সে-ও অমনি ছিল । খাই-খাই না করলেও ভাল খেতে বড় ভালবাসতো ! দিদির বাড়ী গিয়ে ভাল খাওয়া নিয়ে কি মান-অভিমান ঝগড়া না হ'তো ! নতুন বউ, নতুন শ্বশুরবাড়ী, দিদি বেচারা লজ্জায় একশেষ ভাই-এর খাওয়া নিয়ে! অজ পাড়া-গাঁ, বাজার-হাট থেকে অনেক দূর, ইচ্ছে করলেও আত্মীয়-কুটুম্বের জন্যে ভাল খাওয়া যোগাড় করা যায় না ।

সেবারে বেশ রূঢ় ক'রে অমর দিদিকে শুনিয়েছিল, 'তোর বাড়ী কি এই খেতে আসি নাকি ! কিছু না পারিস দু'খানা লুচি আর একটু মোহনভোগ তো করতে পারিস !'

দিদি ভাইয়ের কথা অত গায়ে মাখেনি, বললে, 'লক্ষ্মীটি আজ এই খা, বুঝিস তো পাড়া-গাঁ, কাল চেষ্টা করবো !'

দিদির হাত থেকে মুড়ির বাটিটা এক রকম কেড়ে নিয়ে অমর রাগ ক'রে বলেছিল, 'আর যদি কখনো তোর বাড়ি আসি ! বোনের বাড়ী এলে ভাইকে কেউ কখনো শুকনো মুড়ি খেতে দেয় না !'

কথায় কথায় দিদিও সেদিন চটে গিয়েছিল, বলেছিল, 'না আসিস না আসবি, তুই না এলে আমার ভারি বয়ে যাবে !'

দিদির বাড়ী ভাল-খাওয়া নিয়ে সে একটা কেলেঙ্কারী ! অবুঝের মত সেদিন অমর কিন্তু গোঁ ছাড়ে নি । দিদির বাড়ী যখন, তখন রোজ যা খায় আজ তা' খাবে কেন, আপ্যায়নের সামগ্রী ভিন্ন হ'বে না কেন ? দিদি বড় কৃপণ, ভাইকে যথোচিত খাতির করছে না ! সেদিন দিদির বাড়ী সবাই ভাই-বোনের ঝগড়া শুনেছিল, কি সব মনে করেছিল কে জানে, মুখে অমরের পক্ষ নিয়ে বলেছিল, 'সত্যিই তো নিরুপমার ভারি অন্যায়, ভাই এসেছে, গঞ্জ থেকে সন্দেশ-রসগোল্লা আনিয়ে রাখতে পারে নি ! ভাই তো আর রোজ আসবে না !'

দিদির এক জায়ের অমরের পক্ষ নিয়ে এ-কথা বলায় দিদি আরও চটে গিয়েছিল, বলেছিল, 'তুই আজই চলে যা ! অত যদি লোভ, দিদির বাড়ী আসিস নি ।'

অমরও রাগ করে তখুনি তখুনি চলে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু দিদির সেই জা-টি আটকেছিলেন, নিজে থেকে মোহনভোগ আর লুচির ব্যবস্থা করেছিলেন, নিজের দিদির চেয়েও ভাল !

ছি: ছি: আজকে ভাবলে লজ্জা পায় । অপ্রস্তুত দিদি একা হয় নি, সেও যে হ'য়েছিল সেদিন সে খেয়ালটা হয় নি । সেদিন পারে নি বলেই করে নি, এই তো আজ দিদি ভাল খাবার কি আয়োজন না করেছেন ! কত খাবে থাক্ না ভায়েরা !

সমর লজ্জা পেয়েছে, খাওয়ার হাত ছোট করে ফেলেছে, অনেক যেন ভেবে চিন্তে হাত বাড়াচ্ছে ।

অমর ভাইয়ের লজ্জা ভাঙাতে তাড়া দিয়ে বললে, 'নে নে খা, হাত চালা : বসে বসে কি ভাবছিস্ ?'

সমর দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, দাদা সত্যি বলছে না, আর কিছু—ভৎ'সনা করছে ?

অমর বললে, 'চেয়ে দেখছিস কি, খেয়ে নে ; দিদি অনেক কিছু ব্যবস্থা করেছে । মনে পড়ে, গত বছর এই সব খেয়েছিলি ?'

দাদার মত অত না বুঝলেও ভাই-ফোঁটায় দিদির বাড়ী খাওয়াটা যে ক্রমেই লোভনীয় হ'য়ে উঠছে এটা সমর বুঝতে পারে । বছরে একদিন হ'লেও দিদি খুব খাওয়ায় আজকাল । বলতে হয় না ! দিদির বাড়ী ভাল খাওয়া নিয়ে একদিন দাদার রাগের কথা সকলেই জানে ।

আজকের সঙ্গে তুলনায় সে-ই দিদিই কি হ'য়েছে !

অত মানুষ মিলিয়ে দেখে না । দেখলে সংসারের চেহারা অনেক বদলে যেত । এই দিদির কথা ধরা যাক । দিদি তখন ভাই-ফোঁটায় শুধু খাওয়াতো না, ভাইয়েদের জামা-কাপড়ও দিত, শুধু খাইয়ে খুসী হ'তো না ! অথচ দিদির অবস্থা তখন এমন কিছু ভাল ছিল না । সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, জামাইবাবু চাকরি করতেন, একসঙ্গে ক'ভাই মিলেমিশে থাকতেন উইক-এণ্ডে দেশে যেতেন : তার মধ্যে দিদি কত করে বৎসরান্তে ভাইয়েদের জন্যে উপহার সংগ্রহ করতেন । খাইয়ে কাপড় দিয়ে দিদি তখন কি খুসী হ'তো ।

আজ দু'বছর দিদি কাপড় দিচ্ছে না । কিন্তু খাওয়াচ্ছে খুব । আয়োজনের ত্রুটি করছে না । কেন কাপড় দেয় না, এ'কথা জিজ্ঞেস করা যায় না । তখন হ'লে ঝগড়া করে অমর বলতে পারতো, 'ভাই-ফোঁটায় কাপড় দিবি না কেন ? আসবো না তোর বাড়ী, আর !'

এখন ওসব কিছু বলা যাবে না । বরং না এলে তারাই অপরাধী হ'য়ে পড়বে । দিদির কি, দিদির পক্ষে বলবার আজকাল লোকের অভাব নেই । জামাইবাবু কত বড় লোক, কত বড় তাঁর বাড়ী, গাড়ি হ'য়েছে, তাঁর দেওয়া অন্ন কত লোকে খাচ্ছে, কত পরিবার পালন হ'চ্ছে ! সামান্য দু'জন ভাই যদি না এল খেতে, তাঁদের বয়ে গেল । দিদির ভাই হবার লোকের অভাব হ'বে না ।

তবু এত যখন খাওয়ায় একটা কাপড় দিতে কি ? কেন দিদি দেয় না, অমর ভেবে দেখেছে, কোন কারণ খুঁজে পায় না । হয় তো ভাবে বাজে খরচ, ভাই-ফোঁটায় ভাল-মন্দ খাওয়াটাই যথেষ্ট !

কিন্তু মনকে সব সময় বোঝান যায় না। ভাইয়ের ওপর দিদির স্নেহের কথা অমরের খুব মনে পড়ে। ভাই-ফোঁটার উপলক্ষ ছাড়াও দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে অমরকে জামা-কাপড় যোগাত। অমর জানতো দিদি সে-সব জামাকাপড় কোথা থেকে পেত! তখন দিদিদের একান্নবর্তী পরিবার, দিদির ছোট দেওরের সবে বিয়ে হ'য়েছে, বিয়েতে অনেক জামাকাপড় পেয়েছে, তত্ত্ব-তালাসে পায়ও অনেক! দিদি তার মধ্যে থেকে সরিয়ে ভাইকে দিত। বলতো, এখানা নিয়ে যা, ঠাকুরপো পরে না। দিদি তখন গিন্নী না হোক, ছোট দেওরের প্রিয়।

দিদির বিয়ের পর অমরদের অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে যায়। সে-সময় নানাভাবে দিদি তাদের সাহায্য করতো। নিজেরা খুব বড়লোক না হোক, তবু তার মধ্যে থেকে লুকিয়ে-ছাপিয়ে ভাইকে দিতে দিদি ছাড়তো না।

আর ও দিদিকে খুব ভাল বলত। কোন উপলক্ষে দিদিকে তাদের বাড়ীতে আনতে তার কোনদিন উৎসাহের অভাব হ'তো না। দিদি হেসে হেসে আনন্দে গর্বে বলতো 'তুই কি আমায় শ্বশুরবাড়ী যেতে দিবি না, কি পাগলা ছেলে রে তুই!'

সাধে আর অমর দিদিকে ছাড়তে চাইতো না। শ্বশুরবাড়ী খেটে খেটে দিদির কি চেহারা হ'য়েছিল। অমন সোনার প্রতিমার খড় বেরিয়ে পড়েছিল! দিদি খুব দেখতে সুন্দর ছিল, কিন্তু শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ত্ব'একটা ছেলেমেয়ে হ'য়ে দিদি কি বিশ্রী দেখতে হয়ে গিয়েছিল! গাল চড়িয়ে, চুল উঠে গিয়ে কেমন যেন একরকম হ'য়েছিল, দিদির শ্বশুরবাড়ীটাই খারাপ অমর ভাবতো। ছোট ছিল, তখন অত বুঝতো না। মা বলতো, খুকীর অম্বলের অসুখ তাই অমন!

অম্বলের অসুখ দিদির বারো মাস লেগেই ছিল! কত নাকি ডাক্তার-বদ্যি করে সারে নি। বাপের বাড়ি এলে দিদির অসুখ নিয়ে মা খুব ভাবতেন, কত লোককে যে দৈব-ওষুধের কথা বলতেন তার হিসেব ছিল না।

একবার অমরও ওষুধ সংগ্রহ করে এনেছিল। দিদির অসুখের জন্যে তারও চিন্তা ছিল। দিদিকে আড়ালে ডেকে ওষুধটা দিয়ে অমর বললে, 'ত্ব'বেলা খাবার পর খাবি, দেখবি অম্বল টম্বল সব সেরে যাবে!'

অসুখের জন্যে অনেক ওষুধ দিদি খেয়েছে, আর না হয় একটা খেলে, পরীক্ষা করলে! দিদি জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় পেলি, কে দিলে?'

অমর যেন খুব কষ্ট ক'রে ওষুধটা সংগ্রহ করেছে, বললে, 'সে তোর জেনে দরকার নেই, তুই খা তো।'

দিদি হেসে বললে, 'যদি বিষ হয়? খ-তো অমনি খেলেই হল!'

এক ঝটকায় দিদির হাত থেকে ওষুধের মোড়াটা নিয়ে অমর রেগে বললে, 'আমি তোকে বিষ খাওয়াবো, এই তুই ভাবিস?'
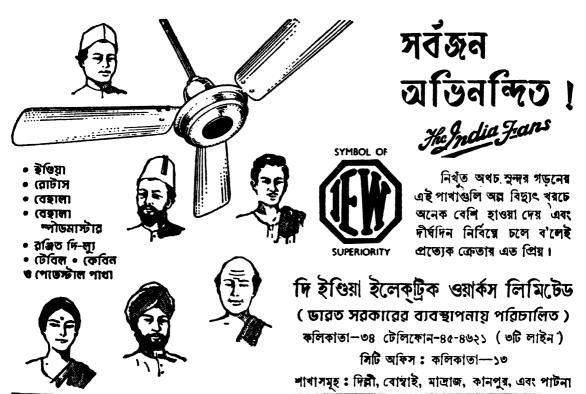
তারপর অনেক অনুরোধ করে ভাইয়ের অভিমান ভাঙিয়ে ওষুধটা দিদি খেয়েছিল। পরের দিনই বলেছিল, 'না রে, তোর ওষুধটা খুব ভাল, কাল রাত্তিরে একদম বুক জ্বালা করে নি।'

অমর খুব হেসেছিল। তার খুব আনন্দ হয়েছিল দিদির রোগ উপশমের কথা শুনে। অথচ ওষুধটা এমন হাতি-ঘোড়া কিছু ছিল না। রেলের গাড়ীতে এক ক্যানভাসার অনুনাসিক সুরে সবার চোখের ওপর অম্বলের ওষুধের মোড়াটা তুলে বলেছিল, '···পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা, অম্ল, পিত্ত, যেমনই রোগ হোক না কেন···'

অমরের দিদির কথা মনে পড়েছিল। মাত্র এক আনা পয়সা খরচ করে ওষুধটা সংগ্রহ করে এনেছিল। দিদিকে দিয়েছিল এই ভেবে, নিশ্চয়ই এ ওষুধ খেয়ে দিদি নীরোগ হয়ে যাবে। ওষুধটা দিদিই প্রথম খাবে।

কিন্তু তার অনেক পরে দিদির অম্বলের অসুখ সেরেছিল। একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে দিদিরা যেবার হাওড়ায় উঠে এসেছিল, জামাইবাবু চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে সুরু করেছিলেন, দিদির হাতে পয়সা জমেছিল, স্বাধীনভাবে সংসার করেছিল তখন। এক সংসারে দিদির খুব কষ্ট হ'তো, দিদিকে মুখ বুজে খাটতে হত—খাওয়া-দাওয়ারও খুব কষ্ট ছিল। দিদিকে অনেকদিন পেঁয়াজ আর পান্তা খেতে হত। জামাইবাবু ভালমানুষ ছিলেন, বড় ভাজের কর্তৃত্বের ওপর কিছু বলতেন না। দিদিও কিছু বলতো না। একান্নবর্তী পরিবারের বউ হিসেবে এও যেন একটা কর্তব্য, সমস্ত অসুবিধা এবং অনাদরকে অকাতরে সহ্য করা। মা বলতেন, 'খুকীর শরীরের আর দোষ কি, সারাদিন গাঁজা-পাঁজা বাসন মেজে বেলা দু'টো আড়াইটের সময় পেঁজ-লঙ্কা দিয়ে পান্তা খেলে সহ্য হ'বে কেন! ওই ক'রে কোনদিন মরবে!'

সে সব কথা দিদির এখন হয় তো মনে নেই। সে-সব কষ্টের দিনও আর নেই। দিদি এখন বেশ মোটা হ'য়েছে, অম্বলের অসুখ কবে সেরে গেছে, দেখতেও প্রতিমার মত হ'য়েছে।···

ঠাকুর বা পরিচারক অনেকক্ষণ কেউ আর আসে নি। পাতে যা আছে তাই নিয়ে দুই ভাই পাশাপাশি বসে মুখ বুজিয়ে খাচ্ছে। মোজেকের মেজে সতরঞ্চের ছকের মত! ঘরে অনেক জিনিষপত্র, হাঁড়ি-কুড়ি, কৌটো-বাটা, ভাঙা ছাতা, ছোট ছেলের ভাঙা প্যারামবুলেটর, কাঠের ঘোড়া কত কি! আসল খাবার ঘর নয়, ভাঁড়ার ঘরের এক অংশ বোধ হয়।

সমর চোখ তুলে চাইলে, দরজার দিকে মুখ করে উৎকর্ণ হল। কিসের যেন একটা শব্দ আসছে।

অমর বললে, 'কি রে ওদিকে কি দেখছিস্ অমন ক'রে?'

সমর বললে, 'শুনতে পাচ্ছ না!'

'পাচ্ছি!' অমরও কান খাড়া করলে।

'কি বল দিকি?' অনেক বয়স হ'য়েছে তবু ছেলেমানুষী ভাব এখনো যায় নি সমরের।

'কি আবার খাবার ঘরে জামাইবাবুর বন্ধুরা খাচ্ছে! খুব আমোদ করছে।' বেশ যেন বিরক্ত হ'য়ে অমর বললে।

আবার এক ছেলেমানুষী প্রশ্ন করলে সমর, 'আচ্ছা, আমাদের ওদের সঙ্গে খেতে দিলে না কেন বল তো? বেশ টেবিল চেয়ারে খাওয়া যেত!'

'দিদিকে বললি নে কেন?'

'ওরে বাবা! টেবিল চেয়ারে খেয়ে আমার দরকার নেই।'

সমর খাবার লোভে দিদির বাড়ী এলেও দিদির সঙ্গে ওর তেমন ভাব নেই। ঐ সম্পর্ক হিসেবে যেটুকু। অমরের মত দিদিকে সে জানে না, মেশেও নি কোনদিন, মনে মনে বোধ হয় ভয় করে।

অমর বললে, 'কেন, এই তো বেশ খাচ্ছি এক ঘরে একলা একলা!'

সমর দাদার মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হাসলে। টেবিল-চেয়ারে খেতে ভয় করে বলে এভাবে চোরের মত একলা একলা একটা গুদাম ঘরে বসে খেতে তার ভাল লাগে না, বরং লজ্জা করে। তাও দিদি যদি একবার-আধবার এসে তাদের খাওয়া-দাওয়া দেখতো। সব ঠাকুর-চাকরের ব্যবস্থা। ভাই-ফোঁটায় নেমন্তন্ন করে দিদি অনেকদূরে সরে থাকে।

সমর বললে, 'জামাইবাবুর বন্ধুদের ভাই-ফোঁটা বুঝি?'

অমর বললে, 'দূর-র ব্যবসার লোক সব।'

'ব্যবসার লোক তো দিদি ওখানে কেন?'

'সে দিদি জানে, পাতান ভাই বোধ হয়।' নিজেকে যেন শ্লেষ করে অমর বললে।

নতুন বাড়ী করে পাড়ায় পরিচিত হয়ে দিদি ভাই-ফোঁটার দিন আরো অনেককে নেমন্তন্ন করে। অমররা তাদের কাউকে চেনে না, চেনানোর কোন দরকারই হয় না। দিদি যেন নিজের ভাই দু'টিকে আড়াল করে রাখতে চায়। উৎসবটা আসলে যেন তাদের নিয়েই নয়। মেছোবাজারের গলির মধ্যে দিনের বেলায় আলো জেলে সারাদিন অভুক্ত থেকে ভাইদের খাওয়ানোর মধ্যে যে আন্তরিকতা আজকে তা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। দিদি তো আজ আর তাদের পর্যায়ে তাদের মত নেই, দু'টো ভাই নিয়ে ছোট একটা সংসার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? এখন দিদির সামাজিক পরিধি এবং প্রসারতা অনেকখানি। দিদিকে এখন সবাই চায়, দিদি-দিদি করতে পেলে বর্তে যায় কত লোক।

কিন্তু এমন দিনও ছিল যখন তারা ছাড়া দিদিকে সংসারে কেউ দিদি বলে জানতো না। দিদি ডাকের জন্যে দিদি কত করে ভাইদের শ্বশুরবাড়ী থেকে ডেকে পাঠাত। এতটুকু রুগ্ন শরীরে ভাইদের যত্ন-খাতির আদর করবার জন্যে আপ্রাণ করতো। তাদের মত অবস্থায়, তাদের মত চেহারায়, তাদেরও মত মনোভাবের তাদেরই দিদি আজ যেন কি—

অমর বুঝতে পারে, সমর এখনো সব বুঝতে পারে না। তাই বোকার মত জিজ্ঞেস করলে, 'কই দিদি তো একবারও এল না।'

সমর বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'এসে কি করবে, খাইয়ে দেবে?'

'তা নয়।' সমর অপ্রস্তুতের মত বললে।

ও-ঘরে খুব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। খুব হৈ-হল্লা হচ্ছে, আনন্দের ঢেউ আসছে। দিদির গলা পাওয়া যাচ্ছে, কাকে যেন খাবার জন্যে অনুরোধ করছে। 'না ভাই, তা বললে শুনছি না, ওটা আমি নিজে হাতে করেছি, খেতেই হবে।'

হঠাৎ যেন গলায় কি আটকে গেল, অমর জোরে জোরে গলা ঝাড়া দিলে। বড় মাছের তো কাঁটা হয় না, মাংসের হাড়ও গলায় আটকাবে না, তা হ'লে এটা কি! হয় তো সত্যি কিছু আটকায় নি, অমরের মনের ভুল!

ভয়ে ভয়ে সমর বললে, 'জল খেয়ে নাও!'

গলাটা ঠিক করে নিয়ে অমর বললে, 'না রে কিছু হয় নি।'

সমর বললে, 'মনে আছে গত বছর ভাই-ফোঁটার দিন আমার গলায় কাঁটা বিঁধেছিল? কিছুতে যায় না, কলা, ভাত কত কি খেয়ে তবে কাঁটা গেল! দিদির কি রাগ, যেন আমি ইচ্ছে করে গলায় কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছি। বললে, আসতে আসতে খেতে পারিস না! শুনে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল! উঃ, গলায় কাঁটা ফোঁটা কম কষ্ট!'

ঠিক ভাই-ফোঁটার দিন নেমন্তন্ন খেতে খেতে নয় তবে আর একদিন দিদির বাড়ীতে অমরের গলায় মাছের কাঁটা আটকে ছিল। দিদির সে কি ব্যস্ততা ভাইয়ের গলা থেকে কাঁটা নামিয়ে দেবার জন্যে। যত রকম প্রক্রিয়া ছিল সব হল, শেষটা টোটকা-টুটকী সারাদিন ধরে। দু'দিন দিদির চোখে ঘুম ছিল না, দণ্ডে দণ্ডে এসে জিজ্ঞেস করছে, কি রে, আরাম পাচ্ছিস? সেদিন এক সংসারে চোরের মত রাতদিন মুখ বুজে খাটলেও ভাইয়ের কষ্টে দিদির গলা বেরিয়েছিল, কেন ওর জন্যে কি বড় মাছ আনা যেত না, এতটুকু চারা পোনা আনবার আর সময় হল না!

তার গলায় কাঁটা ফোটা নিয়ে সেদিনও এক কাণ্ড করেছিল দিদি। ভাসুর-জা কাউকে বলতে ছাড়েনি; তার ভাইয়ের যে যথোচিত সম্মান বা মর্যাদা রাখা হয় না বোনের বাড়ি, সে-কথা শুনিয়েছিল। তার ভাই বলেই অবহেলা! আরো অনেকের ভাইয়ের খাতির-যত্ন, আদর-আপ্যায়নের কথা সেদিন তুলেছিল। বেশ অশান্তির সৃষ্টি হ'য়েছিল।

আজ যদি সত্যি তার গলায় কাঁটা ফুটতো, অমর ভাবলে, তা'হলে কি খবর পেয়ে দিদি এসে ভাই-ফোঁটার নেমন্তন্নে গোগ্রাসে খাওয়ার জন্যে রাগ ক'রে বলতো, কাঁটা আটকাবে না তো কি, ধীরে-সুস্থে খেতে হয়? সমরের চোখের জল পড়েছিল, তার কি হ'তো? কে জানে।

ভাইকে তাড়া দিয়ে অমর বললে, 'নে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে! বাড়ি যাব চল!'

সমর একবার পাতের দিকে একবার দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'এখনো খাওয়া হয় নি!'

'তোকে নিয়ে আর পারা যাবে না, এমন করিস যেন কোনকালে

খাস নি। তোর সঙ্গে আর কোনদিন আসবো না।' পাত ছেড়ে উঠে পড়ার অবস্থা সমরের।

সমর নির্বিকার, বললে, 'ঠাকুর দই-মিষ্টির কথা বলে গেল।'

আবার এক তাড়া দিয়ে অমর বললে, 'আর দই-মিষ্টি খায় না ওঠ। বাড়ী গিয়ে খাস!'

কথাটা সমর ভুলে গিয়েছিল, আজ তাদের বাড়ীতেও একটা ছোট-খাটো উৎসব হচ্ছে। দাদার শালারা আসবে, খাবে, হৈ-হুল্লোড় করে চলে যাবে। দাদার শালাগুলো বেশ, সমরের সঙ্গে খুব ভাব। বৌদিও খুব ভাল, নিজের বোনের মতন, খুব ভালবাসেন। তাদের সংসার মাথায় করে রেখেছেন।

এখন সমরের মনে হ'চ্ছে, ভাল খাওয়া যেখানে হোক এক জায়গায় হলেই হয়, বাড়ীতেই বরং ভাল, সেখানে এমনি একটা ঘরে বিধবাদের মত বসে খেতে হ'তো না। আর পদ। কম হ'লেও তা অনেক আরামের, শান্তির! দিদির বাড়ী এসে এমনি করে মুখ বুজিয়ে খেতে ভাল লাগে না! যেন খেতে দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে: জাতে-ঠেলা মানুষ যেন।

কথাটা আর একবার সমর ঘুরিয়ে বললে, 'দিদি আসুক। বলে যাবে না?'

'বলবার কি আছে? এসেছিস্, খেয়েছিস্, চলে গেছিস, আবার কি।'

তবু দিদির জন্তে অপেক্ষা না করাটা কি ভাল হ'বে? দিদি যখন নেমন্তন্ন করে' ডেকে এনেছে? দিদি হয় তো খাবার টেবিলে ওদের নিয়ে ব্যস্ত আছে। তারা তো আর দিদির নিজের ভাই নয় যে, আদর-আপ্যায়ন না করলে কিছু মনে করবে না। হয় তো ওদের মধ্যে এমন সব লোক আছে আত্মীয়তার সূত্র ছাড়া যাদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ এমন সূত্রে বাঁধা যা অনেক বেশী শক্ত! রক্তের সম্বন্ধ ছাড়াও সংসারে আরো অনেক রকমের সম্বন্ধ থাকে যাকে সর্বাগ্রে স্থান না দিলে নিজেরই ক্ষতি! রক্তের সম্বন্ধ কি মানুষকে তুলে ধরে?

অমর বড় বেশি ব্যস্ত সব ব্যাপারে। সে-ই যখন চুপচাপ মাথা গুঁজে এসে বসেছে তখন চুপচাপ খাওয়া শেষ ক'রে উঠে গেলেই ভাল। নিজে না পারে ছোটভাইকে খেতে দিক্! এবার দিদি অনেক কিছু আয়োজন করেছে, দেখিয়ে 'দিয়েছে ভাই-ফোঁটায় খাওয়া কাকে বলে!

বলতে-বলতে দই মিষ্টি নিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকলো। পাতে-পাতে দিলে। অমর 'না-না' করলে, কিন্তু ঠাকুর শুনলে না। বললে, 'মা বলে দিয়েছেন, দেখে-শুনে খাওয়াতে। না খেলে আমাকেই বোকবেন!'

সমর সাগ্রহে বললে, 'তাই নাকি, দিদি বলেছে নাকি?'

ঠাকুর বললে, 'ও-ঘরে বাবুরা খাচ্ছেন, সব সাহেবী-খানা, হোটেল থেকে এসেছে, তার সঙ্গে এ-সবও আছে—সব বাবু তো আবার সমান নয়, সবার খাতিরও এক নয়! গেছলুম, তাই মা বললেন, আপনাদের দেখতে!'

অমর বললে, 'তুমি তো দেখলেই আগাগোড়া আবার নতুন ক'রে কি দেখবে? যাও।'

তবু ঠাকুর দাঁড়িয়ে রইল, বললে, 'না বাপু, আপনাদের খাওয়া না হলে আর কোথাও যেতে পারব নি! মা রাগ করবেন।'

অমর বললে, 'আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে তুমি যাও।'

ঠাকুর একান্ত প্রভুভক্ততায় বললে, 'আপনাদের খাওয়া হ'য়েছেন তো? পেট ভরেছেন?'

অমর হেসে বললে, 'খুবই ভরেছেন!'

এবার ঠাকুর নিজের কথা জিজ্ঞেস করলে, 'রান্না-বান্না কেমন হ'য়েছে বাপু? আমরা পুরোণ লোক যেমন জানি তেমনি বেঁধেছি, সাহেববাড়ীর মত রাঁধতে পারবো কেন?'

অমর হেসে বললে, 'বেশ! সাহেববাড়ীর খানা তো আমরা খাচ্ছি না!'

ঠাকুর উৎফুল্ল হ'য়ে বললে, 'সাহেববাড়ীর রান্না একটু এনে দেব নাকি বাবু? মার কাছ থেকে চেয়ে?'

দুই ভাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রলে। কেমন যেন লজ্জা বোধ করলে। এ যেন ঘুস দিয়ে কিছু করানোর মত। নিজের কাছে বড্ড ছোট হ'য়ে যেতে হয়। ছি, ছি।

অমর বললে, 'না না, থাক! তা ছাড়া আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে!'

মুখে বললেও মনে কোথায় যেন একটা ভার থেকে যায়। দিদি আজ তাদের ভিন্ন করেছে, খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারে সবার সঙ্গে বসান নি। তারা যা খেয়েছে তার চেয়ে আরো ভাল খাওয়া অন্তের জন্তে বরাদ্দ করেছে, তারা বাদ গেছে। দিদির চিরকালের স্নেহ থেকে তারা বঞ্চিত হ'য়েছে। কেন?

অমর একরকম ভাইয়ের হাত ধরে তুলে দিলে, বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'নে নে ওঠ, খেয়ে আর আশ মিটছে না।'

ওদিকে খাবার ঘরের পর্দা ঠেলে সাহেবী-খানার গন্ধ আসছে। অমরের মনে হল হঠাৎ যেন একটা ভূমিকম্প সুরু হ'য়েছে। সব যেন কেমন নড়ছে, কাঁপছে, দুলছে।...

সমরকে সিঁড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে অমর দিদির কাছে বিদায় নিতে এল। একেবারে না বলে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়, হাজার হোক বোন তো! ভাববে—

না, ভাবাভাবির কিছু না থাকলেও একটা রীতি আছে। নিমন্ত্রিত কেউ গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা না করে যায় না—মুখে অন্তত বলে বেশ হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে, চমৎকার হ'য়েছে!

অমর দালানের এক ধারে এসে দাঁড়াল। অন্দরে বিশেষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা জড় হ'য়ে রহস্যালাপ করছেন, আপ্যায়নের খুসীটা উপ্‌চে পড়ছে। ওদিকটা খুব আলো।

অমর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কোথা থেকে যেন অনেক ছায়া এসে জমা হয়েছে। দৃষ্টিটা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে অমর। খুঁজে খুঁজে পেলে না। দিদি ওখানে নেই, জামাইবাবু আছেন, পরিতৃপ্ত অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করছেন। ভাই-ফোঁটা উপলক্ষে আজ অনেক লোককে দিদির বাড়ী নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে, অমর ওদের কাউকে চেনে না।

ছায়াটা গায়ে জড়িয়ে অমর সরে এল। ওদের মধ্যে যেচে গিয়ে কাজ নেই। ওরা বিশেষ খানার বিশেষ ব্যক্তি সব। দিদির কি জামাইবাবুর আপন জন।

ঘুরে দালানের আর এক প্রান্তে এসে দাঁড়াল অমর। এখানে দালানটা বড় একটা জাহাজের ডেকের মত। সামনে অবারিত মাঠ, হু-হু হাওয়ায় আর শূন্য অদৃশ্য ঢেউ-এ জাহাজ দুলছে যেন।

অমর ক্ষীণ স্বরে ডাকলে, 'দিদি!'

একবার, দু'বার, তিনবার! দিদি পিছন ফিরে দেখলে।

কাছে এসে অমর বললে, 'আমরা যাচ্ছি।'

দিদি বললে, 'যাচ্ছিস? আচ্ছা!'

অমর পিছন ফিরলে। দিদি ডেকে বললে, 'খেইচিস তো? পেট ভরেছে?'

অমর মাথা নাড়লে। দিদি বললে, 'রান্না-টান্না কেমন হয়েছে?'

অমর ছোট করে বললে, 'ভাল!'

দিদি আক্ষেপের সুরে বললে, 'আমি কিছু দেখতে পারি নি, ঠাকুর-চাকরে যা করেছে!'

অমর বললে, 'আমাদের কোন অসুবিধে হয় নি।'

দিদি কি কথার কি উত্তর যেন দিলে, পিছন ফিরে হাসতে লাগল। কাকে নিয়ে হাসি অমর বুঝতে পারলে না। দালানের শেষে সিঁড়ির মাথায় এসে অমর পিছন ফিরে দেখলে, দিদি বহু লোকের মধ্যে মিশে বেশ আলাপ করছে, যেন মধ্যমণি। মনেই হয় না দিদির বয়স হয়েছে, দিদির ছেলেরা মেয়েরা বিয়ের যুগ্যি হয়েছে।

দিদি আজকাল খুব সপ্রতিভ হ'য়ে উঠেছে। লোকজনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতে পারেন।

কোথায় সেই অম্বলের অসুখ, কোটরগত চোখ, অকাল বার্ধক্য? দিদিকে আজকাল চেনাই যায় না। আর চিনলেও অমরদের দিদি ব'লে মনে হয় না!

যারা জানে, মানুষের অতীত মনে রাখে, তারা বলবে অমরের দিদি সব দিক থেকে বদলে গেছে, স্বাস্থ্যে, সামর্থ্যে, অর্থে, চালচলনে, এমন কি কথাবার্তায়।

অমরের খুব মনে পড়ে। মনে হয় এই সেদিনের কথা যেন। দিদি সেবার খুব রোগে ভুগে তাদের বাড়ী এসেছিল শরীর সারাতে। অমরদের বাড়ীর গায়ে একটা পার্ক ছিল। অনেক বলে কয়ে একদিন দিদিকে পার্কে ঠেলে পাঠান হল। সকাল-বিকাল বেড়ালে শরীর ভাল হবে। কিন্তু দেখ না দেখ দিদি বাড়ী ফিরে এল। কি ব্যাপার?

দিদি বললে, 'আরে রাম রাম! অত সব বাইরের লোক, ওখানে যেতে আছে? লজ্জা করে।'

সেদিন অমর দিদিকে নিয়ে পড়েছিল, 'কেন, বাইরের লোক তা কি হ'য়েছে! তোমার লজ্জার কি আছে?'

কে শোনে, পার্কে আর দিদিকে পাঠান যায় নি। মা-ও মেয়ের সঙ্গে একমত হ'য়ে সেদিন বলেছিলেন, 'খুকী ঠিক বলেছে যত সব বেহায়া কাণ্ড কারখানা! এত পার্কের হাওয়া খেয়ে বিবিআনা করে কাজ নেই। বাড়ীওলাকে বলে ছাদের সিঁড়িটা বরং খুলিয়ে নিস, কাজ হ'বে!'

কি লাজুক, আর জড়ভরত আর গেঁয়ো গেঁয়ো ছিল দিদি! একসঙ্গে পাঁচজন লোক দেখলে ঘরের মধ্যে এসে মুখ লুকোত। একবুক ঘোমটা টেনে দিত। এখন কে বলবে সেই দিদি একদিন নিজেকে এমন সংস্কৃত করে নিতে পারবে। খুব প্রগতিশীলা হ'য়ে উঠেছে অমরের দিদি!

চাকার মত মানুষের সুখ দুঃখ নাকি আবর্তিত হয়। ওপর নীচ করে। মানুষ নিজেও। দিদিরা ওপরে উঠে গেছে, অমররা সেই নীচে পড়ে আছে। চাকা যদি ঘুরে যায় তা হ'লে হয় তো আবার সেই নন্দনপুরের দিদিকে, মেছোবাজারের এক গলির মধ্যে উদয়-অস্ত আলো জালিয়ে কুণ্ঠিত অবস্থানের দিদিকে ফিরে পাওয়া যাবে। ছোট ভাইয়ের হাত থেকে চার পয়সার ওষুধ নিয়ে ভাববে, কোন বিশল্যকরণী সংগ্রহ হয়েছে, হেসে-কেঁদে ভাইকে আশীর্বাদ করবে চিরজীবী, চিরসুখী হতে! কেবল চাকাটা ঘুরতে বাকি।

সমর দাদাকে বললে, 'অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে! কি হলো?'

অমর পা চালিয়ে বললে, 'হঠাৎ যেন একটা চোঁয়া ঢেঁকুর দিলে রে। এই বয়েসে আর গুরুপাক খাওয়া সহ্য হয় না।'

সমর হাসলে। খেতে না খেতেই বদহজম। দাদা অকালে বড় বুড়িয়ে গেছে। মুখে বললে, 'একটা সোডা খেয়ে নিও।'

'তাই নেব চল, মোড়ের মাথায় ঐ দোকানটা থেকে।' অমর বললে।...

* * * *

এ বছরেও অমরের দিদি ভাই-ফোঁটায় নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে। বালীগঞ্জ প্লেস থেকে লোক এসেছিল, বলে গেছে—এবার ফোঁটায় হাঙ্গামা নেই; সন্ধ্যের দিকে কেবল খাওয়ার নেমন্তন্ন, দু' ভায়ের।

ভাই-ফোঁটার নেমন্তন্ন দিদি চিরকালই করে, এবছরও করেছে। নতুন কিছু নয়। তবু এই সময়টা কেমন নতুন নতুন মনে হয় নেমন্তন্নটা দুগ্গা পুজোর মতন, লক্ষ্মী পুজোর মতন, কালী পুজোর মতন একটা সানন্দ আশা থাকে: বোনেরা ডাকবে, ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দেবে। বোনেদের প্রীতির চিহ্ন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা হয়ে জ্বল জ্বল করবে।

চন্দন লাগানো দিদির বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা কি সুন্দর দেখতে লাগে। মাথা বাড়িয়ে কপালে ফোঁটা নিতে চোখ বুজে আসে আনন্দে, পুলকে, গর্বে!

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

২১

আগেই বলেছি কলেজে যোগ দিয়ে প্রথম কয়েক মাস বেশ ভাল লাগছিল। কলেজের সব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া—খেলার ক্লাবে সেক্রেটারী—হৈ-হৈ রৈ-রৈ—যেমনি সব ছাত্ররা কাটায় তাদের ছাত্রজীবন। কিন্তু দু'টো ঘটনা ঘটে সব উল্টে গেল। একটি শৈবালদি'র সঙ্গে পরিচয় হওয়া—আর একটি সরোজের ফিরে আসা।

শৈবালদি'র সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি বুঝতে পারলাম, বুঝতে আগেই পেরেছিলাম—নতুন উপলব্ধি করলাম—আমার রক্তে শ্বেত-কণিকা নেই—লোহিত কণিকা নেই—সব নীল কণিকা। বিষে বিষে নীল। পাপের বিষ, মিথ্যার বিষ, লোভের বিষ।

বুঝতে পারলাম—আমার মুক্তির পথ নেই। মুক্তির মূল্যেই শয়তান আমাকে দিয়েছে—সম্পদ, ঐশ্বর্য, ভোগ আর একরাত্রির সুলতান হবার অধিকার।

তিন মাসের জন্যে সরোজ বাইরে গিয়েছিল, অবশ্য আগে আমরা অন্যরকম শুনেছিলাম। সরোজ খুব ভালভাবে পাশ করেছিল—এই জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিল ও। ওর বাড়ীর অবস্থাও ভাল। শুনেছিলাম কলকাতার কলেজে পড়বে।

ভর্তি-ও হয়েছিল, আবার কেন যে ফিরে এল তা জানি না।

ও ফিরে আসাতে আমার সব কিছুই বদলে গেল। কলেজে সর্দারী করবার যে মোহ আমাকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসছিল,—এক মুহূর্তেই তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম!

সরোজ এসে গেছে। ওই এখন ছেলেদের নিয়ে জটলা করবে, করবে সভা-সমিতি। প্রফেসরদের অনুপস্থিতিতে ক্লাশ ম্যানেজ করা, তাঁদের কাছে যাতায়াত করা, কাউকে অভিনন্দিত, কাউকে বিতাড়িত করা, লাইব্রেরী থেকে বই দেবার ব্যবস্থা করা—সবই এখন করবে সে।

ও হচ্ছে চিরন্তন মণিটার।

ওর সেই অত্যন্ত 'ভাল' মূর্তি,—ধোপায় ধোয়', ইস্ত্রিকরা আলমারীর তাকে কাগজে মুড়ে তুলে রাখা ভালর দিকে তাকিয়ে আমার গা জলে যেতে থাকে।

আর যখন দেখি সবাই মিলে সেই ভালকে নিয়ে নাচানাচি করছে তখন মনে হয় খুব জোরে হেসে উঠি।

আমি দেখতে পাই সবাইর মুখে রঙীন মুখোস—সেই মুখোসগুলো নেড়ে ওরা লাফালাফি করছে 'ভাল'কে নিয়ে প্রশংসা করছে সেই মুখোসেই, আর মুখোস সরিয়ে নিলে—

যাক্, সে সব কথা। সরোজ ফিরে এল এবং এসেই ওর সেই ধীর, স্থির একান্ত ভালভাবে একটি সমিতি স্থাপন করল। কলেজের ছাত্রই বেশীর ভাগ সভ্য। বাইরের ছেলেরাও অনেক ছিল।

সরোজ সমিতির নাম দিয়েছিল—সমাজ-কল্যাণ-সমিতি। আমার চেনা অনেক ছেলেই ছিল ওতে। নিধু তিনবার ম্যাট্রিক দিয়ে পাশ না করতে পেরে চাকরির চেষ্টা করছিল। সে-ও একজন সভ্য ও বলত, সমাজ-কল্যাণ না হোক নিজেদের কল্যাণ ত' হয়। চা জলখাবারটা ওখানেই সারি। আর, এতো সমাজেরই কল্যাণ—আমরাও তো সমাজেরই।

ওরা একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সরোজের নিজেরই যথেষ্ট টাকা ছিল। তাছাড়া, ভাল ভাল লোক ছিল পৃষ্ঠপোষক। কেন যে তারা পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল তাও আমি জানতাম—জানতে চাই নি—তবুও জেনেছিলাম—হায় রে মুখোস!

আমি প্রথমে ওদিকে অতটা খেয়াল করি নি, তখন রাতের সমারোহ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। একদিন আমাদের ক্লাশের একটি ছেলে বললে, জানিস্, সরোজ বলেছে, বিশেষ করে তোর মত ছেলেদের ভাল করবার জন্যই ও সমাজ-কল্যাণ-সমিতি করেছে।

—কি রকম?

—সরোজ বলছিল তোর মধ্যে নাকি অনেক গুণ আছে—শুধু—

—কি? চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম এক মুহূর্তের জন্য। করুণা! সরোজ রায় আমাকে করুণা করতে চায়। এত স্পর্ধা!

আমার রাগে ভয় পেয়ে গিয়েছিল ছেলেটি। ভাল কথা বলতে এসে এ কি ফ্যাসাদে পড়ল সে! আস্তে আস্তে বলে, কেন রাগ করছিস! ও তো তোর প্রশংসাই করছিল।

শনি তুঙ্গী, তুলা বক্রী—

খারাপ যাবেই !

চারু মাসীমা বললেন, 'রাশিচক্র দেখে ছাই হবে। আমি বলছি না ওসব বাজে, তবে তোর কী হয়েছে জানতে ঠিকুজী-কুষ্ঠী দেখার দরকার পড়ে না।'

[illegible] ভেঙ্গে গেছে, হাতপা উঠছে না, [illegible] দেখছি তোকে দিয়ে [illegible] আমি বললাম, 'শুধু এই তাহলে আমার দোষ?' উত্তরে মাসীমা বললেন, [illegible]—তাহলেই ধরা পড়বে।'

আমি বললাম, 'ডাক্তার দেখিয়ে ছাই হবে!' কিন্তু মাসীমার আবার সিংহরাশি ; কাজেই না গিয়ে আমার উপায় থাকল না। ডাক্তারটির বেশ বিবেচনাশক্তি আছে। বললেন, 'তোমার কিছু হয়নি। আসলে পুষ্টির অভাবেই তোমার মধ্যে ক্লান্তি আর অবসাদের ভাব এসেছে। তোমার হরলিক্স খাওয়া উচিত।'

আমি হরলিক্স খাব? সে তো [illegible] রুগীদের খেতে বলে। সেই রাত্রেই শাস্ত্রী-মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে সব বললাম। ওঁর কথা শুনে আমি অবাক। বললেন, 'সব সময় ডাক্তারের কথা শুনে চলবে।'

ভাল একটা দিন দেখে আমি হরলিক্স খেতে শুরু ক'রে দিলাম। কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ঠিক হয়ে যেতে আরম্ভ করল। এর আগে আর কখনো আমি এতটা ভাল বোধ করিনি। চারু মাসীমাও আবার হেসে কথা বলতে লাগলেন। ভাগ্যিস, ডাক্তার আমাকে হরলিক্স ধরিয়েছিলেন!

হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

JWT/HL 4022

—ওর প্রশংসা কে চায়? ঘৃণার মুখ বাঁকাই, তারপর···কি বলছিল তোদের পতিতপাবন হরি—জগাই-মাধাই উদ্ধার করবে।

—জগাই-মাধাই কোথায়? শুধু তো একটি।

—ঐ তো হল। আমি একাই দু'টি। দু'টি নয় দু'-হাজার-দুলাল।

রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। একটা কিছু করতে হবে—কিছু একটা। সারাদিন ভাবলাম—বিকেলে ওরই ক্লাবঘরের পাশে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিলাম সমাজ অকল্যাণ সমিতি।

হয়ত, আমার দ্বারা ঐটুকুই হোত—শুধু একটা সাইনবোর্ড টাঙান। কিন্তু, এই অদ্ভুত সাইনবোর্ড দেখে দলে দলে সবাই এসে জমায়েত হল। এ কি কাণ্ড। অকল্যাণ করবার জন্ম কেউ সমিতি করে কি? আর যারা অকল্যাণ করে তারা প্রকাশ্যে সমিতি করা দূরে থাক নিজেরাও অপ্রকাশ্যে থাকতে চায়।

—সাইনবোর্ড নামিয়ে দাও। কয়েকটি ছেলে বলে—সরোজ সে দলে ছিল।

—নামিয়ে দেব? ভ্রূ কুঁচকে বলি, কেন? আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই কোরাসে ধ্বনি ওঠে, না, নামাব না।

তাকিয়ে দেখি, বেশ কয়েকটি ছেলে জমায়েত হয়েছে আমার পাশে। সব ক'টিই দুষ্ট প্রকৃতির—খারাপ—কিন্তু স্বাস্থ্যবান।

হ্যাঁ, বলং বলং বাহুবলং। সেটাই এখানে কাজে লাগল। আমাদের রুখে দাঁড়াতে দেখে ওরা চুপ করে গেল।

এইভাবেই গড়ে উঠল আমার সমাজ অকল্যাণ সমিতি। যারা এখানে জমায়েত হল তাদের আমি ডাকি নি—পছন্দও করতাম না। তারা নিজে থেকেই এল। বোধ হয় ভাবল—আমরা একই ডালের পাখী।

এল তো, আমিও আপত্তি করলাম না। বেশ আছি। এই ভাল। কাদার জীব—কাদাতেই শুয়ে থাকব।

আমার মনটাকে কেউ কোনদিন দেখে নি—এমন কি আকাশ, তুমিও দেখ নি। তা'হলে দেখতে পেতে—কি দারুণ পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুকনো হয়ে গিয়েছিল। সে পিপাসা অমৃতের। কিন্তু অমৃত পাই নি—পেয়েছি বিষ। নীলকণ্ঠের মত শুধু কণ্ঠে সেই বিষ ধারণের ক্ষমতা ছিল না আমার। আমার দেহ মন জ্বলে গেছে—জ্বলে গেছে সমস্ত পৃথিবী।

আমার যে সব বন্ধুরা আমাকে ঘিরে থাকত তাদের আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু, তবুও ওরাই আমার সঙ্গী—আমার বন্ধু। তাই ওদের চেয়ে দ্বিগুণ ঘৃণা করতাম নিজেকে।

আমি ওদের সঙ্গেই বসতুম এককোণে আমরা পাঁচ ছয়জন। আমাদের কলেজে সহ-শিক্ষা ছিল। দু'টি মাত্র মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ত। ওরা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসত। প্রফেসর না থাকলে শিষ দিত—অশ্লীল ভঙ্গী করত। রাগে বিরক্তিতে আমার শরীর জ্বলে যেত—বলতাম, চুপ কর্।

—তুই একটা ভীরু। বিদ্রূপের হাসি হাসত ওরা।

আমার সুরুচি ও শালীনতাবোধ ওদের কাছে উপহাসের বিষয়—মনের দুর্বলতা।

একদিন বঙ্কু একটা চিঠি ছুঁড়ে দিল একটি মেয়ের গায়ে। তখন ক্লাশে খুব ব্যস্ততা। প্রফেসর বেরিয়ে গেছেন। সব শেষের পিরিয়ড। ছাত্রা সবাই বাড়ী যাবার জন্ম ব্যস্ত।

সেই গোলমালের সুযোগে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিল বঙ্কু। ঘটনাটা জানা ছিল না—বাধা দিতে পারি নি। চুপ করে রইলাম।

বেরিয়ে এসে বললাম, বঙ্কু এদিকে শোন।

সেদিন ওকে যা মার মেরেছিলাম সে কথা মনে হলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। সে মার তো শুধু ওকে নয়—তা নিজেকেও।

কেন জগৎ যে পথে চলবার, সে পথে চলে না?

কেন মানুষ যে পথে চলবার নয়, সে পথে চলে?

২২

কলেজ থেকে পাশ করে যখন বের হলাম তখন আর ঠিক পুরো মানুষ নই—অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু। নিজেই বুঝতে পারতাম সে কথা, নিজের মনেই স্বীকার করতাম। কিন্তু, সে বিষয় নিয়ে কেউ সামান্য ইঙ্গিত করলেও সহ্য করতাম না।

এতদিন ছিলাম চুপচাপ। পাঁচটা কথা বললে একটিরও উত্তর নেই—কিন্তু এখন হঠাৎ খুব কথা বলতে শুরু করলাম। অবশ্য একটা কারণও ছিল। বাবা আমাকে একটা দোকান করে দিলেন। সেখানে চানাচুর থেকে শুরু করে চাল ডাল সবই পাওয়া যেত।

প্রথমে উনি চেয়েছিলেন ওঁরই কাজে অর্থাৎ জেল ডিপার্টমেণ্টে ঢুকি। অবশ্য তখন ঢোকা আগের মত সহজ ছিল না। তবু ওঁর রূপোর চাবিকাঠি দিয়ে দরজা খুলেছিলেন উনি।

—জানিস, একটা খুব সুখবর আছে। একদিন মা খুব উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন।

তখন বি, এ পাশ করে পাঁচ ছ'মাস বসে আছি বাড়ীতে।

—শুনছিস, আমার সাড়া না পেয়ে মা আবার ডাকেন।

কোন উত্তর দিই না।

—তোর একটা ভাল চাকরী হয়েছে, আমার নীরবতায় দমিত না হয়ে খবরটা জানান মা। ভাবেন, এবারে নিশ্চয়ই কিছু বলব।

তবুও কোন কথা বলি না। পরদিন বাবা আমাকে ডাকলেন। একঘণ্টা ধরে বোঝালেন কোথায় ইণ্টারভিউ, কি ভাবে ইণ্টারভিউ দিতে হয়, তিনি নিজে কি কি উত্তর দিয়েছিলেন সব শেষে ইণ্টারভিউ লেটারটা হাতে দিয়ে বলেন, সাবধানে রেখে দিস।

—তুমি-ই রেখে দাও। এমন সিন্দুকে রেখে দাও যার চাবি নেই।

—মানে?

—আমি চাকরি করব না।

ভেবেছিলাম, বাবা খুব রেগে যাবেন কিন্তু তিনি খুব শান্তকণ্ঠে বললেন, তবে কি করবি? ব্যবসা।

—তা' করতে পারি।

—আচ্ছা, তাই ভাল।

খুব সহজে মিটে গেল—এত সহজে যে, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। নিজের কথার ওপর শ্রদ্ধা হল, কথা বলতে ভাল লাগল।

বেশ বড় দোকান। বোবা হয়ে ব্যবসা চলে না। তা ছাড়া কথা বলতে ভালই লাগত আমার। বদ্ধগুহার মুখ খুলে দিয়েছে, ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে জল।

কত রকম লোক আসত দোকানে, আমি তাকিয়ে থাকতাম তাদের মুখের দিকে—ওপরের মুখোসটা খুলে দেখতে চাইতাম মুখ।

একদিন এক ভদ্রলোক এলেন। শহরের অন্তপ্রান্তে থাকেন, বেশ খানিকটা দূরে। তবু তিনি আমার দোকান থেকেই সব জিনিষ কিনতেন। এমন কি কোন জিনিষ না থাকলে ফের নিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। একবার এক মাস অপেক্ষা করেছিলেন একটি ষ্টোভের জন্ম। কিন্তু পাশের দোকানেই ছিল একটা—উনি নেন নি।

সেদিন এসে নানা কথা বলে তারপরে বললেন, যা রটে তা কিছু বটে—এই চলতি কথাটা পাল্টাবার সময় এসেছে।

—মানে? এই হঠাৎ-বলা তত্ত্বকথায় একটু অবাক হয়ে বলি।

—আজকাল যা রটে, তা' কিছুই না বটে।

আর কোন কথা বলি না। মনে হচ্ছে যেন বুঝতে পারছি—ইঙ্গিত পাচ্ছি মনোভাবের।

—ওরা বলে আপনি নাকি চরিত্রহীন, একটু দ্বিধাভরা কণ্ঠে বলেন ভদ্রলোক—কিছু মনে করবেন না একথা বলছি বলে।—আমি আপনাকে জানতে চাইছি।

ওঁর শেষের কথাটা আমি শুনতেই পাই না। তার আগেই খুব জোরে হেসে উঠেছি।

—বেশ, বেশ। অনেকদিন থেকেই শুনতে চাইছিলাম এই কথাটা।

—কি? ভদ্রলোক এই অকারণ উল্লাসের কারণ না বুঝতে পেরে অবাক হন।

—চরিত্রহীনতার অপবাদ। তার মানে চরিত্র জিনিষটা এককালে আমার ছিল। খুব আনন্দ হচ্ছে শুনে। কিন্তু···

—কিন্তু কি?

—চরিত্রটা কি তা' আমাকে বলতে পারেন। বলতে পারেন এর অন্বয়। ব্যুৎপত্তি? অর্থ!

ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন।

—চরিত্রকে কি গঙ্গাজলে শোধন করে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখা যায়! গভীর বিদ্রূপ বেজে ওঠে আমার কণ্ঠে।

আমার সদানন্দ সদালাপী দোকানী-মূর্তির সঙ্গে এই বিদ্রূপপরায়ণ ব্যক্তির সামঞ্জস্য করতে পারেন নি বলেই এতক্ষণ ভদ্রলোক চুপ করেছিলেন, এখন আশ্বস্থ হয়ে বলেন, ওরা বলবে—চরিত্র হচ্ছে সেই জিনিষ, যা সরোজ রায়ের আছে বিমান মিত্রের নেই।

—স্বীকার করছি, এক মিনিট থমকে গিয়েছিলাম। এ'কথা আমি জানি। জানি সরোজের যা আছে, আমার তা' নেই। কিন্তু, কি সেই বিশিষ্টতা। তা গ্রহণীয়, না বর্জনীয়!

পরক্ষণেই জোরে হেসে উঠি। বলি, তার মানে দুর্বলতা।

—দুর্বলতা?

—নয় তো কি? নিশ্চয়ই। যে দুর্বল, সে নিজের ওপর নিজে নির্ভর করতে পারে না—তাকেই কোন কিছুর সাহায্য নিতে হয়। আদর্শবাদ তেমনি একটা অবলম্বন।

আগেই বলেছি, আমার তখন কথা বলবার নেশা চেপেছিল, অনেকদিন চুপ করে থাকবার পরে—কে যেন তখন আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলাত। সারাদিন বকবক করতাম—সন্ধ্যেবেলা লাল টকটকে গ্লাশভরা পানীয় নিয়ে একেবারে চুপ। আশ্চর্য। একটি কথাও বলতাম না। যে দোকানে যেতাম তারা জানত আমার কতটুকু চাই—ঠিকমত দিয়ে যেত—বাড়ীতে আমার খাবার ঢাকা থাকত টেবিলে—ব্যস। কোন কথা কইবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু, বাইরে সারাদিন আমি কথা বলতাম। কি নিয়ে বক্তৃতা না করেছি—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, আজ আমার ভাবলে হাসি পায়। সবচেয়ে মজা এই যে, সবাই আমার বক্তৃতা শুনত—বাহবা দিত।

তাই, ভদ্রলোককে এ'টুকু বলেই চুপ করে যেতে পারলাম না। বললাম, স্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিকই থাকে। অস্বাভাবিকদেরই প্রয়োজন হয় নানা ভণিতার।

আবার বললাম, আমি জানি জীবন। আমি চাই যৌবন। মানুষ বেঁচে থাকবে—ভোগ করবে। আদর্শবাদের খোলস পরব কেন?

২৩

সেদিনও কথা বলবার নেশাতেই অত কথা বলে গিয়েছিলাম, দোকান থেকে ফেরবার পথে দেখি আমাদের কোণের মাঠটা যাকে আমরা বলি 'সভা-সমিতির মাঠ' সেখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছে—কি রকম কৌতূহল হল—দেখি কি ব্যাপার।

···এখন আর গান হবে না। আপনারা অনর্থক অনুরোধ করবেন না, এখন সমাজ-কল্যাণ-সমিতির বক্তৃতা। সবশেষে হামিদ-খাঁর গান···

মাইকে সরোজের গলা। এত লোক জমায়েত হবার কারণ অবশ্য বুঝতে পারলাম—হামিদ-খাঁ স্থানীয় শিল্পী। কিন্তু বাইরে ওঁর এত নাম যে, ঘরের লোকের ভাগ্য হয় না ওঁর কণ্ঠ শোনবার।

খুবই চালাক ছেলে সরোজ। পরে রাজনৈতিক নেতা হতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। জানে যে সমাজ-কল্যাণ-সমিতির বক্তৃতা শুনতে লোক আসবে না একটিও—তাই, বিয়েবাড়ীর লুচি পোলাওর মত অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হামিদ-খাঁ।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সূর্যের লালচে গরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বসন্তের সন্ধ্যা। বসন্তের আলো। চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব ভাল লাগল। মাঠের চারিদিকে নাম না জানা বুনো ফুল ফুটেছে। ঠিক সূর্যের কিরণের মত অজস্র, আর একই জাতের।

আকাশের আলোর মত পৃথিবীর আলো। অনেক দিন পরে বিকেলের দিকে তাকালাম। মধুঋতুর মধুমাখা বিকেল। ভাল লাগল। খুবই ভাল লাগল। আর সেই মধুর অবসাদে ক্লান্ত হয়েই যেন বসে পড়লাম ঐ মাঠে। এখন, এখানে বসে সব শোনা যায়—বক্তৃতা, চিৎকার, গান, নীতিবাদ।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সরোজ। আমি যখনকার কথা বলছি—তখন আজকালের মত মাইক এত সুলভ ছিল না। বিশেষত ঐরকম মফঃস্বল শহরে। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে 'মাইকটা'র দিকে।

আমি জানি, এখানে যারা এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই ঐ যন্ত্রটা চেনে না—শুধু ওকেই দেখবার জন্যই এসেছে।

হাওয়ায় সরোজের চুলগুলি উড়ছে। পেছনে হাত দু'টি মুঠো করা। সমস্ত মিলে এক [illegible] সরল তীরের মত ছন্দ। শ্রোতাদের দিকে তাকায় না—তাকায় না আকাশের দিকে। নিজের মনেরই কোন স্বপ্নমদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলতে শুরু করে,···আমরা বিংশশতাব্দীর সুসভ্য সমাজবদ্ধ মানব। আজ গর্ভস্থ শিশু ভ্রূণ অবস্থা থেকেই সভ্যতার আশীর্বাদ লাভ করে। নবজাতকের জন্য সুন্দর, সুরম্য বাসস্থান, অভিজ্ঞ ধাত্রী, শিক্ষিত চিকিৎসক। নবগঠিত দেহ, নবগঠিত মন সমাজের অযাচিত স্নেহধারায় ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

বিনামূল্যে, বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রার্থনায় সমস্তই পায় সেই শিশু। তাকে রক্ষা করে সমাজ—প্রকৃতির প্রবল আক্রমণ, পশুর হিংস্রতা, মানবের বিদ্বে থেকে বাঁচিয়ে সেই অসহায় জীবকে বড় করে তোলে।

মানব-মানবীর প্রেমে জন্ম নেয় একটি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর জীবন—আর সমাজের প্রেমে সে লাভ করে যৌবন।

প্রতিদানে কি পায় সমাজ?

মানব তাকে দেয় অকৃত্রিম নিষ্ঠা, প্রেম ও শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ অঞ্জলি।

—কি সব বাজে কথা বলছ: চুপ কর।

হ্যাঁ, আমারই গলা। ভিড়ের মধ্যে আমারই গলা বেজে ওঠে।

সরোজ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে এই কোণের দিকে। চিনতে পেরেছে—বুঝতে পেরেছে কে? আমার গলা ওর কখনও ভুল হবে না।

এক মুহূর্ত নীরবতা। সব লোক তাকিয়ে আছে এই দিকে। যেন কি এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে—ভিড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কথা বলছে কোন কাপুরুষ! সাহস থাকে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বল। গমগমিয়ে ওঠে মাইক।

তখন উঠি আমি। উঠতে হয়। সমবেত লোকের দৃষ্টি যেন আমাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয়। উঠেই ভীষণ হাসি পায় আমার। আমি—বিমান মিত্র—যে কি না প্রয়োজনেও একটা কথা বলত না—সে আজ দাঁড়িয়েছে একটা সভায়—প্রতিবাদ করতে—বক্তৃতা করতে।

এই পৃথিবীতে সবই সম্ভব।

—মাননীয়, সম্বোধনটার ওপরে একটু জোর দিই আমি। আমি জানি, একটু বিদ্রূপের হাসি লেগে আছে আমার চোখের তারায়—ঠোঁটের কোণে।—মাননীয় বক্তা, যে বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করছেন সেই বিষয়বস্তু এত খেলো যে, তা' নিয়ে কোন কথা বলবার মানেই হয় না। কাজেই, সে কথার প্রতিবাদ করছি না আমি। আমি শুধু বলতে চাইছি ওঁর শেষ কথাটা—মানব সমাজকে দেয় অকৃত্রিম নিষ্ঠা, প্রেম ও শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ অঞ্জলি—সর্বৈব মিথ্যা। একটা মাইক সামনে নিয়ে মিথ্যা কথা ঘোষণা করবার কোন অর্থ হয় না।

একটু থেমে গম্ভীর ভাবে বলি, মানব চিরদিন সমাজকে ঘৃণা করেছে। প্রকৃত পুরুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে বারবার সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে—বলিষ্ঠ নর বিদ্রোহ করেছে যুগে যুগে।

উৎসুক জনতার চোখে কৌতূহল ও কৌতুকের আলো। ভালো লাগছে—ভালো লাগছে ওদের কথা কাটাকাটি—বৈচিত্র্য এনেছে বক্তৃতার একঘেঁয়েমীতে। একটানা কিছু লোক ভালবাসে না। এইজন্যেই সমাজ এত বিরক্তিকর।

আকাশ অনেক নীচে নেমে এসেছে। বিকেলের লালচে রঙ মিলিয়ে গেছে—গভীর ধূসর প্রায় কালো পৃথিবী।

তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে সরোজ। ইস্পাতের তীর। মুখটি তেমনি ইস্পাত-কঠিন, নিশ্চল-শীতল। চোখদু'টি বুজে নেয় একবার। ও যেন কিছুই শোনে না—কিছুই শুনতে পায় না—বুঝতে পারে না। নিজের বক্তৃতার অনুসরণে বলতে থাকে, আদিম পৃথিবীতে আদিম মানব ছিল একান্তই অসহায়। অপরাপর পশুর তুলনায় নিতান্তই দুর্বল। মাথায় শিং নেই, দাঁতে ধার কিংবা বিষ নেই। সে দ্রুত দৌড়তে পারে না। পারে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের তলায় লুকিয়ে থাকতে। অতি কোমল, অতি অসহায় এই জীব।

সেই অসহায় মানব প্রকৃতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারী হিংস্র পশুর আক্রমণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে আত্মরক্ষা করল। একক নয় যুক্তপ্রচেষ্টা। একজনের নয় দশজনের, হাজারজনের, লক্ষ লক্ষ জনের বুদ্ধি ও মেধা একত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে গুহা। গুহা থেকে কুটির—গ্রাম। সৃজিত হয় সমাজ···

ঠিক তেমনি। সাদা সিগারেটের ফাঁকে একটু হাসি। স্কুলের সেই বারো বছরের ছেলেটির সঙ্গে বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই। কালো রঙ আর স্থির কালো দু'টি চোখের বারো বছরের ছেলেটি কি বলেছিল? কিন্তু কেন? জীবন সম্বন্ধে যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই সে কেন জীবন নিয়ে বড় বড় কথা বলে।

···সমাজের কাছে আমরা ঋণী। মাতৃঋণের মত সামাজিক ঋণও শুধতে হবে আমাদের···

চুপ কর। চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। কিছু জান না তুমি। মাতৃঋণ! সামাজিক ঋণ! কোন ঋণ নেই আমাদের কারো কাছে, কেউ কাউকে কিছু দেয় না। সবাই নিজের খেয়াল-খুশীতে চলে! কি করেছে আমাদের মা আমাদের জন্য। কি করেছে সমাজ···

···সমাজ কি বন্ধ করতে পেরেছে অবিবাহিতার মাতৃত্ব?

হ্যাঁ, কখন আমিই জোরে বলে ফেলেছি। বুঝতে পারি। চার পাশের সবাই একটু শিউরে ওঠে। আর যা ওদের স্বভাব—চোখ বুজে মাথা নেড়ে অস্বীকার করতে চায় সব। কিন্তু, আমি থামি না—থামতে পারি না···

—সমাজ কি বন্ধ করতে পেরেছে পুরুষের পরদারগমন। ভ্রূণহত্যা? সমাজ কি বন্ধ করতে চেয়েছে পতিতাবৃত্তি? কি করতে পেরেছে সমাজ কুলকামিনীর স্বেচ্ছাকৃত গৃহত্যাগ। কি করতে চেয়েছে সমাজ সরলা হৃদয় যখন পড়েছে ছলনার ফাঁদ?

এ'টুকু বলেই আমি সেদিন চলে আসি। জানি, এর পরেই হবে অনেক প্রতিবাদ, অনেক চীৎকার, অনেক গোলমাল, অনেক নীতিকথা সে সব শুনতে আমি চাই না। তাই হচ্ছে চিরন্তন পৃথিবী।—আমি এক শাশ্বত আত্মা।

২৪

এইবারে আমার নিন্দে ছড়িয়ে পড়ল শহরময়। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম আমি। আমি নাকি দিনরাত মদ ডুবে থাকি আর মেয়ে দেখলে তো কথাই নেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ি।

মেয়েরা এমন কি মেয়েদের মা, ঠাকুরমারাও কখনও আমার দোকানে আসতেন না। রাস্তা দিয়ে যখন যেতাম বুঝতে পারতাম অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ আমার দিকে। জানালার আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে।

এই নিন্দের মূলে আরও একটি কারণ ছিল—শৈবালদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা। তখন চলিত নিয়ম অনুসারে শৈবালদি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল—অন্ততঃ আমার মতে নয়। কারণ, ওর মুখে আমি মুখোস দেখিনি। তাই ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়েই চলেছিল।

শৈবালদি' সেই পুরোণ বাড়ীটা ছেড়ে দোতলা একটি নতুন বাড়ীতে থাকত। ওর গা ভরা ঝলমল করত গয়না। এমনিতেই সুন্দরী—আর প্রসাধনে, যত্নে, ঐশ্বর্যে যেন ঝলমল করতে থাকত।

সেবারে শৈবালদি'র সেরে উঠতে প্রায় এক মাস লেগেছিল। ওকে ওষুধ, পথ্য, সবই আমি কিনে দিতাম। ওর বাবা বাতে পঙ্গু। দোকান অনেক দূরে। এতদিন কি করে ওরা চালাত, জানি না—

আমাকে প্রায়দিনই যেতে হত। শৈবালদি'র সঙ্গে গল্প করতাম। একদিন তখন শৈবালদি' অনেকটা ভাল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা শৈবালদি,' তুমি এমন বিপদে কি করে পড়লে?

শৈবালদি' চুপ করে রইল। ভাবলাম, ও বুঝি রাগ করল। কিন্তু না, একটু পরে হেসে উত্তর দিল, ওসব কথা বড়দের জিজ্ঞেস করতে নেই।

—ওঃ! তুমি তো ভারী বড়।

—হঁ্যা, বড়ই তো। তোমার কত বছর বয়স?

—আঠারো।

—আমার কুড়ি। আর, মেয়েদের কুড়ি বছর মানেই বুড়ি।

—আজকাল আর তা নয়। হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, আজকাল কুড়ি পার হলেই মেয়েরা বয়স ঘুরিয়ে দেয়। আবার আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামে বয়স—উনিশ—আঠারো—সতেরো···

একটু থেমে আবার বলেছিলাম, বয়স তো দিন-ঘণ্টা হিসেবে হয় না। বয়স হয় অভিজ্ঞতায়।

—অভিজ্ঞতায়। শৈবালদি' হেসেছিল, তাহ'লে তো আমি শুধু বুড়ি হই নি মরে গেছি। কোন অভিজ্ঞতা বাদ আছে আমার! বিয়ে হল, স্বামীর ঘর করলাম, বিধবার জীবন···তারপর···এই··নরক—

—তবে? অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল।

—কি?

—আসল জিনিষটাই পাইনি যা জীবনে পাওয়া একান্ত দরকার।

—কি?

—ভালবাসা।

—ভালবাসা। বিদ্রূপভরে বলি, ঐ বাজে একটা কথা। যা শুধু চারটে অক্ষরেই আছে—প্রকৃতপক্ষে যার কোন অস্তিত্ব নেই।

—তুই কি বলিস রে! বেশী ভাবাবেগেই শৈবালদি' 'তুই' করে বলে ফেলে। বলেই লজ্জা পায়, কিছু মনে করো না, ভাই।

—শৈবালদি', আমার দিদি নেই—তুমি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত মনে কর—'তুই' করে বল—

আমি জানি না—আজও বলতে পারি না, আকাশ, কি করে সেদিন ঐ কথাগুলি বলেছিলাম। বলি নি, আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল।

বোধ হয় আমার মনে চিরদিনই একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল—এইরকম একটি দিদির—স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, ঝলমলে যে আমার চেয়ে একটু বড়। আমার ব্যথার ব্যথী,—আনন্দের সাথী।

কথাগুলি বলেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু শৈবালদি'র দিকে তাকিয়ে মন ভরে উঠেছিল। কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের জ্যোতিতে সেই রোগ-দুর্বল ফ্যাকাশে মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটা অন্যরকম আলো ওর মুখে—একেই বোধ হয় বলে অলৌকিক জ্যোতি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে। শৈবালদি'রও ভাইবোন নেই। ও একা—আমারই মত নিতান্তই একা।

সেদিনই শৈবালদি'কে ভালবেসেছিলাম। তারপরে, শৈবালদি'র অনেক পরিবর্তন হয়েছে—তাকে সবাই ঘৃণা করেছে—এমন কি শৈবালদি'র বাবা-মা—যাঁরা ওর টাকায় দু'বেলা আরাম করে খেয়েছেন, লোক রেখে কাজ করিয়ে জীবনে এই প্রথম শৈবালদির মা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চুপ করে বসে থেকেছেন—আর সেই অবারিত অবসরের জন্যই বোধ হয় সারাক্ষণ বকবক্ করতেন, আর শৈবালদি'কে গালাগালি করতেন।

—মর। মর। তুই মর। শৈবালদি'র মা বলতেন, নিজের মুখ পুড়িয়ে যে সুখে থাকতে চায়, সোনাদানা পরে হেসে বেড়ায়,—তার মরণই ভাল। মরলে নরকেও ঠাঁই হবে না।

আমি একদিন সলিলের ওখানে যাচ্ছিলাম। যাবার পথে শুনতে পেলাম শৈবালদি'র মা ঐ রকম একনাগাড়ে বলে যাচ্ছেন।

সোজা ঢুকে গিয়ে ডাকলাম, জ্যাঠাইমা।

শৈবালদি'র মা তখন বারান্দায় বসে কিছু খাচ্ছিলেন। তাকাতেই চোখে পড়ল। একটা কাঁসার থালায় দু'টি রাজভোগ।

আমাকে দেখে খুব অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি থালাটা এককোণে সরিয়ে রেখে বললেন,—আয়, বোস।

জ্যাঠাইমার শরীর অনেক ভাল হয়েছে। এখন দেখে শৈবালদি'র মা বলেই মনে হয়। বাড়ীঘরও কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে—তবে সেদিকে কেউ বিশেষ নজর দেয় না বলেই মনে হল।

আমি এক কোণে বসলাম। জ্যাঠাইমা চেঁচিয়ে বললেন, ওরে চিনু, বিমানকে একটা ডিসে দু'টো রাজভোগ দিয়ে যা।

আমার গোড়া থেকেই খুব হাসি পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বারান্দার দেওয়ালগুলিও যেন হাসছে। এইখানে একদিন তুমুল ঝগড়া হয়েছিল শৈবালদি'র মা ও বাবায়। বোধ হয় মারামারি-ই হত—নিতান্তই আমি ছিলাম বলে অতটা গড়াতে পারে নি। বিরোধের ব্যাপার—এক পেয়ালা চা। এক কাপ চা চেয়েছিলেন উনি—তাতেই জ্যাঠাইমা এমন গালিগালাজ শুরু করলেন যে···

রাজভোগ খেতে খেতে বললাম জ্যাঠাইমা, কাকে গালাগালি করছিলেন।

কিছু বলতে পেরে জ্যাঠাইমা বেঁচে গেলেন। এতক্ষণ নীরব রাজভোগ দু'টি পাথরের নুড়ির মত তাঁর মনে চেপে ছিল। বললেন, কাকে আবার বলব। আমার অদৃষ্টকে। এই রকম মেয়ে যে পেটে ধরেছে···

—সেইজন্যই তো রাজভোগ খেতে পারছি। হাসতে হাসতে বাধা দিলাম।

জ্যাঠাইমার মুখটা এক নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে মায়া হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সব কথা—এক নিমেষেই কঠিন হয়ে উঠল মন।

—জ্যাঠাইমা, পাপ করলে লোক নরকে যায়, কিন্তু পাপের ধন যারা খায় তাদের কি হয় বলতে পারেন?

একটুখানি চুপ করে থেকে বললাম, তাদের নরকেও স্থান হয় না—এই পৃথিবীতেই একটু একটু করে পচে মরে।

—ওখান থেকে বেরিয়েই দেখলাম, সলিল দাঁড়িয়ে আছে। বললে, তুই এসেছিস! আমি তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।

—কেন রে?

—একটা বিশেষ কথা আছে।

—কি?

—আমি শৈবালকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।

—সে কি? চেঁচিয়ে উঠলাম, পাগল হয়ে গেছিস নাকি?

—না, গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় ও, পাগল হই নি। একটা চাকরি পেয়েছি।

আমি অবাক হয়ে চুপ করে থাকি। ও আমার দিকে তাকিয়ে এবারে একটু হাসে।

—কলেজে যখন প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে পাড় তখন তোকে একদিন আমি শৈবালদের বাড়ীতে ডেকে এনেছিলাম···তোকে তখন আমি অনেক কথা বলেছিলাম—আমার নিজের সম্বন্ধে আর ওর সঙ্গে ছেলেবেলার সম্পর্কে নিয়ে আর তুই···

—আমি বলেছিলাম, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু তুই ওর প্রেমে পড়েছিস কি না তা তো বললি না···

—হ্যাঁ। হাসে সলিল, তুই প্রশ্ন করেছিলি। উত্তর দিই নি আমি। তারপরে চারবছর একসঙ্গে পড়েছি—তুমি থেকে স্বাধীন 'তুই' তে নেমেছে—অনেক অন্তরঙ্গতা হয়েছে কিন্তু তুই আর কখনও জিজ্ঞেস করিস নি।

—জিজ্ঞেস করি নি, কারণ উত্তর পেয়ে গিয়েছিলাম।

সলিল শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তবে বিয়ে করবার কথা শুনে চমকে উঠলি কেন?

—এখন! এতদিন পরে? এই অবস্থায়?···

—তুই ছোট ছোট তিনটে প্রশ্ন করলি; কিন্তু এর উত্তর অনেক বড়! 'এখন' মানে কি বলতে চাইছিস্?

চুপ করে রইলাম। 'এখন' মানে কি ও বুঝতে পারে নি। ও কি জানে না শৈবালদি'র অবস্থা।

···এই বিকেলে যদি ওর বাড়ী যাই তবে দেখতে পাব শৈবাল' সেজেগুজে ফুলদানীতে সাজান ফুলটির মত বসে আছে। গেলে খুব খুশী হবে। চা খাওয়াবে—গল্প করবে—জোরে জোরে হাসবে। তারপরে সন্ধ্যে হয়ে এলেই শৈবালদি' গম্ভীর হয়ে যাবে। তুমি অনুভব করবে—তোমার ওঠা উচিত। তবুও যদি তুমি বসে থাক উস্‌খুস্ করবে শৈবালদি'—তারপরে বলবে—হ্যা স্পষ্ট ভাবে তোমাকে উঠতে বলবে।

তোমার কৌতূহল হলে তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার। দেখবে খানিকটা পরে একটি লোক এসে শৈবালদি'র দরজায় ধাক্কা দিল। লোকটির হাতে বেলফুলের—কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে পাবে কমদামী সেন্টের তীব্র গন্ধ। এই-ই শৈবালদি'র রক্ষক। সঙ্গে আরও চার পাঁচটি আছে—তারা বন্ধু। হৈ-চৈ করে আড্ডা চলবে রাত বারোটা, একটা, দু'টো পর্যন্ত···

—এখন মানে কি তুই শৈবালের—সলিলের হঠাৎ বলা কথায় চমকে উঠি। পরক্ষণেই জোরে বলে উঠি, হাঁ, শৈবালদির রক্ষকের কথা বলছি ; আর শৈবালদি' তো এক হাত নয় ২৩হাত ঘুরেছে।

—আমি জানি।

—সবই যদি জানিস তবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বন্দী করতে পারলি না? রাগে চেঁচিয়ে উঠি, কম দুঃখে তো ও ঘর ছাড়ে নি।

···সত্যি সেই সব দিনগুলির কথা মনে হলে আমার এখনও চোখে জল আসে। শৈবালদি'কে সেবারে ভাল করে তুললাম—আর শুরু হ গঞ্জনা, যন্ত্রণা। এতদিন এদের প্রতিবেশী বলে কিছু ছিল না— সব কোথা থেকে গাদা-গাদা আত্মীয় ও প্রতিবেশী হাজির হতে থাকে—সকলের মুখেই এককথা—যা শুনছি তা' কি সত্যি।

সেই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক সহজ। এর ওপর জ্যাঠাইমার দিনরাত গঞ্জনা ও চীৎকার।

—মরে যা, বেরিয়ে যা, আমার হাড় জুড়োক। কালামুখী।

আরও কত রকম গালিগালাজ। শৈবালদি'কে খেতে দিতেন না জ্যাঠাইমা—মাঝে মাঝে মারতেন।

একদিন শৈবালদি' কোন কথা না বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল সেই ডাক্তারের কাছে। এরি মধ্যে ওদের বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। ডাক্তার ওকে আশ্রয় দিল। তারপরে গতানুগতিক ইতিহাস···

- সেদিন কি করছিলে তুমি? বিদ্রূপভরে বলি, ঘুমুচ্ছিলে?

—না, ঘুমুই নি। সলিলের কণ্ঠ প্রশান্ত সেদিনও আমি ওকে ভালবেসেছিলুম। সেদিন কেন, ওর বিয়ের দিন থেকেই ওকে আমি ভালবাসি। যে মুহূর্তে ওকে বিয়ের সাজে দেখলাম, তখনি ও আমার খেলার সঙ্গিনী থেকে প্রিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তারপরে ও বিধবা হয়ে এল। দিন দিন ভালবাসা আমার বেড়েই চলল,—কিন্তু প্রকাশের উপযুক্ত সময় হয় নি বলে প্রকাশ করি নি। এতদিনে সময় হয়েছে···

—আশ্চর্য?

—তুই কেন আশ্চর্য হচ্ছিস। আমি ওকে ভালবেসেছি—ওর আত্মাকে। বাইরের খোলসটাকে নয়।

—এতদিনে ওর আত্মাও হারিয়ে গেছে···বলতে গিয়ে চুপ করে যাই। দেখা যাক্, কি হয়!

সলিলের প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল শৈবালদি'। সেই বাঁধাধরা কথা। সলিলকে সে ভাইয়ের মত দেখছে—কাউকে ভাল না বাসলে যে-কথা বলে মেয়েরা।

আসল কথা, এখানকার এই আরাম-সুখ ছেড়ে কোন এক অখ্যাত গ্রামে (সলিল যেখানে শিক্ষকের পদ পেয়েছিল) যেতে রাজী হয় নি শৈবালদি'। বেশ তো আছি, কেন যাব? এইরকম একটি ভাব। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাববার জন্য শৈবালদি'র মাথায় ছিল না।

সলিল চলে গিয়েছিল ওর ব্যবস্থানুসারে। মা বাড়ীতে ছিলেন—মাসে মাসে টাকা পাঠাও।

আকাশ, আজ এতদিন পরে সলিলকে যেন বুঝতে পারি। বুঝতে পারি ওর শেষ কথাটির অর্থ। ও যাবার সময়ে বলেছিল, শৈবাল রইল, ওর কোন দরকার হলে আমাকে জানাবি।

—তুই কি? রেগে বলেছিলাম এই প্রত্যাখ্যানের পরেও তুই বলছিস, তোকে শৈবালের দরকার হবে।

—আমি-ই তো বলছি। আমি-ই তো বলব। আমি যে ওকে ভালবাসি।

[ক্রমশ।

কিশোর ও বালক সম্প্রদায়ে ধূমপানের ব্যাপক প্রবণতা

বালক ও কিশোর সম্প্রদায়ের মধ্যে ধূমপানের যে ব্যাপক প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা সত্যই ভয়াবহ। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আজ প্রায় শতকরা পঞ্চাশজনই ধূমপায়ী, কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে অভ্যাস ছিল মুষ্টিমেয় ক'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে আশঙ্কাজনক ভাবেই। আগে কদাচ কখনও কোন বালককে ধূমপানরত অবস্থায় দেখা গেলে, শিক্ষক চকিত হয়ে উঠতেন ও সঙ্গে সঙ্গে একটি বক্তৃতা দ্বারা অপরাধীকে ধূমপানের মত নৈতিক অপরাধ থেকে বিরত করাটাকেই যথেষ্ট বলে মনে করে নিতেন ; অবশ্য তখনকার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু বর্তমানে এই অভ্যাস এত দূর মূল গেড়েছে যে, এ সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একটি বৃহদায়তন আধুনিক বিদ্যালয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গিয়েছে যে, এমন বহু বালক আছে যারা মাত্র দশ বারো বছর বয়স থেকেই এই কদভ্যাসের বশীভূত এবং একথা মনে করার যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, এই সব তরুণ ধূমপায়িবৃন্দ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করলে যে কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতই ধূমপানে পারঙ্গম। ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করার পর, কোন কোন বালককে সনিঃশ্বাসে এমনও মন্তব্য করতেও শোনা গেছে—হায় আমি যদি ধূমপানে বিরত হতে পারতাম। একটি কদভ্যাস মাত্র বললে ধূমপান সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা হয় না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুচিন্তিত অভিমতে এই অভ্যাস সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার অন্যতম কারণই যে ধূমপান, এ সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সুতরাং শুধু নৈতিক মানদণ্ডেই নয় ভবিষ্যৎ জাতি স্বাস্থ্যমানের পরিপ্রেক্ষিতেই আজ এই কদভ্যাসের বিচার হওয়া সমুচিত। শুধুমাত্র বক্তৃতা ও তিরস্কারের দ্বারা এই অভ্যাসকে দূরীভূত করার চেষ্টা না করে, এর পরিণাম সম্বন্ধে কিশোর সমাজকে অবহিত করে তোলার প্রয়াসেই প্রত্যেক সমাজ-সচেতন ব্যক্তির আত্মনিয়োগ করা উচিত। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা আয়োজিত বিধিবৎ শিক্ষাদানের ক্লাশ খোলা প্রয়োজন যাতে বালক ও কিশোর বিদ্যার্থীরা এর প্রকৃত অপকারিতা সম্বন্ধে যথোচিত অবহিত হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। গৃহে অভিভাবক-বৃন্দেরও উচিত ধূমপানের অনিষ্টকর প্রভাব সম্বন্ধে পরিবারস্থ বালক ও কিশোরগণকে তথ্যনিষ্ঠ করে তোলা। পীড়ন বা শাসন অপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ উপদেশাদিই যে এই কদভ্যাস দূরীকরণে অধিকতর কার্যকরী একথা যেন তাঁরা কখনও না ভোলেন। মোট কথা সমগ্র জাতির মেরুদণ্ডই তার তরুণতর শাখা, আর সেই শাখাকে সুদৃঢ় রাখতে হলে ধূমপানের এই ব্যাপক প্রবণতাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা আজ একান্ত প্রয়োজন।

ইউস্‌লেশ্‌ বিউটি

গ্য মোপাসাঁ

সুন্দর দু'টো ঘোড়া গাড়ীটাকে টানতে টানতে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঝক্‌ঝক্‌ করছে গাড়ীটা।

তখন বৈকাল সাড়ে পাঁচটা। জুন মাস শেষ হতে চলেছে। কড়া রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চওড়া চাতালটায়।

বাড়ী ফেরার পথে স্বামী সবেমাত্র জুড়ী গাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় স্ত্রী উপর থেকে নীচে নেমে আসে। স্ত্রীর দিকে তাকাতেই স্বামীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। গোলাকার মুখ, দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙ, বড়ো বড়ো কটা চোখ, মাথায় ঘন কালো চুল—এক কথায় বলতে গেলে স্ত্রী পরমাসুন্দরী।

স্বামীর দিকে না তাকিয়েই স্ত্রী গাড়ীতে উঠে পড়ে, যেন স্বামীকে সে দেখতে পায়নি। স্ত্রীর এই দাম্ভিকতায় স্বামীর মনে সেই পুরানো ঈর্ষা আবার মাথা চাড়া দেয়, সেই প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী ঈর্ষা যা এতোদিন ধরে তাকে তিলে তিলে দগ্ধে মারছে। স্ত্রীর কাছে এসে স্বামী জিজ্ঞেস করে, 'বেড়াতে যাচ্ছো?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছ', স্ত্রীর উত্তরের মধ্যে অবজ্ঞার সুর ফুটে ওঠে।

'বয়াস্ দ্য বোলং-এ?'

'খুব সম্ভব সেখানেই।'

'তোমার সঙ্গে যেতে পারি?' স্বামী জিজ্ঞেস করে।

'গাড়ীর মালিক তো তুমিই।'

স্ত্রীর কথা বলার ধরণে কিছুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে স্বামী গাড়ীর মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর পাশে বসে। গাড়োয়ানকে বলে দেয় কোথায় যেতে হবে।

যতক্ষণ না গাড়ীটা রাস্তায় আসে ততক্ষণ ঘোড়া দু'টো মাথা নেড়ে সামনের পা দু'টো দিয়ে মাটি ঘসতে ঘসতে চলে। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে থাকে—কেউ কোন কথা বলে না।

কি ভাবে আরম্ভ করা যায় স্বামী তাই নিয়ে চিন্তা করে। কারণ স্ত্রীর যে রকম তিরিক্ষে মেজাজ তাতে কথা বলতে সাহস হয় না। চালাকি করে যেন হঠাৎ লেগে গেছে, স্ত্রীর হাতের ওপর হাত রাখতেই স্ত্রী হাত সরিয়ে নেয়। স্বভাববিরুদ্ধ হলেও স্বামী চুপ করে বসে থাকে। একটু পরে স্ত্রীকে ডাকে।

'কী চাও?' স্ত্রী প্রশ্ন করে।

'তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

স্বামীর কথায় উত্তর না দিয়ে স্ত্রী পেছন ফিরে ঘুরে বসে, যেন কোন রাজরাণী বসে আছে গাড়ীর মধ্যে।

গাড়ীটা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। দীর্ঘ রাজপথের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড থিলেন সমেত বিশাল স্মৃতিস্তম্ভটা আকাশের পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের লাল আভা পড়েছে স্তম্ভটার ওপর—মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে সূর্যদেব ডুব দিচ্ছেন ওরই পেছনে।

ঘোড়ার চকচকে সাজ ও বাতির ঝকঝকে কাচের ওপর রোদ পড়ে দু'দিকে ঠিকরে পড়ছে—যেন দু'টো আলোর রেখা। একটা চলেছে শহরের দিকে, আর একটা বনের দিকে।

স্বামী স্ত্রীকে আবার ডাকে।

আর ধৈর্য ধরে থাকতে না পেয়ে স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলে, 'বার বার বলছি আমাকে বিরক্ত করো না, একটু শান্তিতে থাকতে দাও। নিশ্চিন্ত হ'য়ে গাড়ীটা যে একা ব্যবহার করবো, এই সামান্য অধিকারটুকুও আমার নেই দেখছি।'

স্বামী ভাণ করে যেন স্ত্রীর কথা শুনতে পায়নি। স্বামী বলে—'আজ তোমায় যে-রকম সুন্দর দেখাচ্ছে, ঠিক এতটা সুন্দর এর আগে কখনও মনে হয়নি।

স্ত্রী রেগে বলে—'তোমার চোখের রোগ হ'য়েছে তুমি ভুল দেখছো। স্পষ্ট করেই বলছি ঠিক আগের মতো তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্কই নেই।'

স্ত্রীর কথা শুনে স্বামী রাগে কাঁপতে থাকে। বদ মেজাজটা আবার মাথা চাড়া দেয়। স্ত্রীকে প্রশ্ন করে, 'কী বলতে চাও তুমি?'

চাকার আওয়াজ হওয়া সত্ত্বেও চাকররা যাতে শুনতে না পায় তাই স্ত্রী চাপা গলায় জবাব দেয়, 'কী বোঝাতে চাই? শুনবে না কি সে-কথা? শোন তবে বলি—তোমাকে আর একবার চিনতে পারা যায়। সব কথাই কি আমাকে বলতে বলো?'

'হাঁ, সব কথা।'

'যেদিন থেকে তোমার ঐ হীন স্বার্থপরতার বলি হলাম সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার মনের সব কথা?'

রাগে স্বামীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে বলে—'হাঁ হাঁ সব, তোমার মনের সব কথা।'

স্বামীকে সুপুরুষ বলা চলে। মাথায় বেশ কিছুটা লম্বা, চওড়া কাঁধ, মুখে বড়ো বড়ো দাড়ি। একদিকে আদর্শ স্বামীর ন্যায়, অন্যদিকে স্নেহপরায়ণ পিতার ন্যায় দিন কাটিয়ে এসেছে এতো দিন।

এতক্ষণ পরে এই প্রথম স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে—'কতকগুলো অপ্রিয় কথা শুনবে কেবল। কিন্তু জেনে রাখ আজ আমি সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত। কাউকে আমি ভয় করি না, তোমাকে তো মোটেই না।'

স্বামীও স্ত্রীর চোখের ওপর চোখ রাখে। ভাবাবেগে কাঁপতে কাঁপতে বলে—'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'না, মাথা খারাপ আমার হয়নি। এগারো বছর ধরে তুমি যে শাস্তি আমাকে দিয়ে আসছো, মা-হওয়ার সেই ঘৃণিত শাস্তির বলি হতে আমি আর রাজী নই। আর আর স্ত্রীলোকদের মতো আমি জীবন যাপন করতে চাই। সে অধিকার আমার আছে।'

কালো হয়ে ওঠে স্বামীর মুখ, বলে—'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমার কথা খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারছো। কোলের ছেলেটার বয়স মাত্র তিন মাস, আজও আমি সুন্দরী রয়ে গেলাম। শত চেষ্টা করেও আমার দৈহিক সৌন্দর্যের কোন ক্ষতিই করতে পারলে না। এটা তুমি বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছো। তাই আজকে যখন তুমি আমাকে বাইরের সিঁড়ির ওপর দেখলে তখন তোমার মনে হ'লো আমার আবার একটা সন্তান হোক'

'কী যা তা বলছো?'

'ঠিকই বলছি। আমার বয়স এখন ত্রিশ। এগারো বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে। এই এগারো বছরে সাত সাতটি সন্তানের জননী হয়েছি আমি। তুমি আশা কর, আরো দশ বছর এইভাবে চালালে। পরে আমাকে ফেলে পালাবে।'

স্ত্রীর হাতটা ধরে মোচড় দিতে দিতে স্বামী বলে—'তোমাকে এইভাবে আর কথা বলতে দিতে পারি না। ওসব কথা শুনতেও আমি চাই না।'

'শেষ পর্যন্ত আমি বলবই। আমার সব কথা বলা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তোমাকে চুপ করে সব শুনতে হবে। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে আমি গলা ছেড়ে বলতে আরম্ভ করবো, ওপরে চাকর দু'টোও শুনতে পাবে। ওরা আছে বলেই আমি তোমাকে গাড়ীতে উঠতে

কি চাও? স্ত্রী প্রশ্ন করে।

দিয়েছি, কেন না তুমি চুপ করে শুনতে বাধ্য হবে। যা বলি শোন—মনে মনে আমি তোমাকে ঘৃণা করি। হাবভাবে সে-কথা তোমাকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি। দেখ, মিথ্যা কথা আমি বলি না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে বিয়ে করেছো, ঋণগ্রস্ত পিতামাতাকে বাধ্য করেছো তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে। কারণ তোমার টাকা আছে, আর আমরা গরীব। আমার চোখে জল দেখেও আমার বাবা-মা বাধ্য হ'য়েছিলেন তোমার হাতে আমাকে তুলে দিতে।

'তুমি আমায় বিয়ে করো নি, আমায় কিনেছো। যখন থেকে আমি তোমার অধীন হলাম, যেদিন থেকে আমি হলাম তোমার সাথী, সেদিন থেকেই আমি তোমার রূঢ় ব্যবহার সব ভুলে গেলাম। নিজেকে তৈরী করতে লাগলাম তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। মনে মনে ঠিক করলাম আমি কর্তব্যপরায়ণা হবো, নিষ্ঠাবতী হবো, হবো আদর্শ ঘরণী—তোমায় আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবো। কিন্তু তুমি আমার সেই আশায় ছাই ঢেলে দিয়েছো। কারণ তুমি আমায় করলে সন্দেহ। তুমি হীন গোয়েন্দাগিরি করলে আমার সঙ্গে—আমাকে করলে অপমান, নিজেকেও করলে অপমান। বিয়ে হবার পর আট মাসও কাটলো না তুমি আমায় করলে অবিশ্বাস, এমনকি সে-কথা আমাকে জানাতেও দ্বিধা বোধ কর নি। কী লজ্জার কথা! পাঁচ জনে আমায় দেখে মুগ্ধ হয়, সভাগৃহে যাবার জন্যে আমার আমন্ত্রণ আসে, দেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে কাগজে কাগজে আমার সুখ্যাতি ছড়ায়—এর কোনটাই তোমার সহ্য হয় নি। তাই আমার কাছ থেকে এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছো। ঐ জঘন্য চিন্তাটাই মনে মনে পোষণ করেছো, ভেবেছো যে যতদিন না আমার মনে পুরুষদের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে ততদিন পর্যন্ত সন্তানের বোঝা টেনেই আমার জীবনটা ফুরিয়ে যাক। না, না, অস্বীকার করো না। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি, পরে অনুমান করলাম; এমনকি তুমি গর্ব করে এ সব কথা তোমার ভগ্নীকে ফলাও করে বলেছো; সেই আমাকে বলেছে। কেন না সে আমাকে ভালোবাসে—সেও তোমার ঐ গেঁয়ো আচরণে ঘৃণা বোধ করে।

'আমাদের অতীত দিনের ঘটনাগুলো একবার ভাবো—দরজায় তালা দেওয়া, দরজা ভাঙার কথা! এই এগারো বছর ধরে তুমি আমার প্রতি পশুর ন্যায় আচরণ করেছো। আমি লক্ষ্য করেছি যখনই আমার গর্ভে সন্তান এসেছে তখনই আমার প্রতি হয়েছে তোমার বিরাগ। কয়েক মাস ধরে তোমার দেখা পাওয়া যেতো না। সন্তান হবার সময় তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছো মাঠের মধ্যে গাঁয়ের বাড়ীতে। সুস্থ শরীর নিয়ে যখন ফিরে এসেছি এবং মনে করেছি বাহির জগতের সঙ্গে মেলামেশা করবো, তখনই তুমি তোমার ঐ জঘন্য প্রবৃত্তি নিয়ে আমাকে নানার উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করেছো। কোনদিনই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নি। তুমি আমাকে উপভোগ করতে চাও নি, তুমি চেয়েছো আমাকে করূপা করে তুলতে।

'যে অদ্ভুত ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে আমি বহুদিন

সুখ চেষ্টা করে আসছি শেষ পর্যন্ত সেই অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটে। আমার সন্তানসম্ভাবনায় তুমি যখন নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ, আমি তখন সেই সন্তানকে গর্ভে ধারণ করি। আমার প্রতি তোমার অনুরাগ ছিলো। কিন্তু আমি যে আর একটি সন্তানের মা হতে চলেছি তারই আনন্দে সেই অনুরাগ সাময়িকভাবে বিদূরিত হয়।

'ওঃ! কতবার, কতবার দেখেছি তোমাকে উল্লসিত হতে। আনন্দের ঢেউ দেখেছি তোমার চোখে, তোমার মুখে। তোমার রক্তে গড়া ওরা যে তোমারই সন্তান এ কথা ভেবে তুমি ওদের ভালোবাসো তা নয়। আমাকে তুমি জয় করেছো, ওরা হলো সেই জয়ের ফলস্বরূপ—শুধু ঐ একটি কারণে তুমি ছেলেমেয়েদের ভালোবাসো। আমার দেহের ওপর, আমার যৌবনের ওপর, আমার সৌন্দর্যের ওপর, আমার রূপলাবণ্য, আমার প্রশংসাবাণীর ওপর, আমার সব কিছুর ওপর ওরা হলো তোমার জয়ের প্রতীক। ওদের নিয়ে তুমি গর্ব করো, গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাও। ওদেরকে সঙ্গে করে দুপুরে সিনেমা দেখে আস। সব সময় তোমার সঙ্গে ছেলেদের দেখে লোকে ভাবে কতই না ভালোবাসো তুমি ছেলেমেয়েদের।'

স্বামী স্ত্রীর কব্জিটা ধরে সজোরে মোচড় দিতে থাকে, স্ত্রী যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলে।

স্বামী বলে, 'ছেলেমেয়েদের আন্তরিক স্নেহ করি আমি। এইমাত্র আমাকে যা বললে মা'র দিক থেকে তা লজ্জার বিষয়। তুমি আমার দাসী আমি তোমার মনিব। আমার খুসিমতো যে কোন সময় যা ইচ্ছে তাই তোমার কাছ থেকে দাবী করতে পারি। আইন আমার দিকে।'

স্ত্রীর আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধরে মোচড় দিতে থাকে। স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে; বৃথা চেষ্টা করে হাত ছাড়িয়ে নিতে।

স্বামী বলে, 'তোমার থেকে আমি ঢের বেশী শক্তি ধরি। আমি তোমার প্রভু, এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো।'

হাতের মুঠো কিছুটা শিথিল হলে স্ত্রী বলে, 'তুমি কী আমাকে পতিব্রতা স্ত্রী বলে মনে করো?'

স্বামী আশ্চর্য হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।'

'আমি যে মিথ্যা কথা বলতে পারি, তা তুমি বিশ্বাস করো? গির্জায় গিয়ে শপথ করে যা বলবো, সত্য বলে তা মেনে নিতে পারবে কি?'

'না।'

'আমার সঙ্গে গির্জায় যাবে কি?'

'কেন?'

'চলই না, সব দেখতে পাবে।'

'একান্তই যদি যেতে চাও, তবে চলো।'

স্ত্রী গাড়োয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'গির্জার দিকে গাড়ী চালাও।'

গাড়োয়ান গাড়ী চালাতে চালাতে কিছুটা নীচু হয়ে কানটা মাত্র বার করে কর্তামা'র কথাগুলো শোনে?

স্বামী বা স্ত্রী কেউ কোন কথা বলে না। গির্জার সামনে গাড়ীটা থামলে স্ত্রী গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। ছুটে গির্জার মধ্যে চলে যায়। পেছনে পেছনে স্বামীও স্ত্রীকে অনুসরণ করে।

স্ত্রী সোজা চলে আসে বেদীর কাছে। হাঁটুমুড়ে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকে। পেছনে দাঁড়িয়ে স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্য করে। দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, থেকে থেকে শরীরটা দুলে উঠছে।

স্বামী স্ত্রীর কাঁধের উপর হাতটা রাখে। সম্বিত ফিরে আসে স্ত্রীর। সে উঠে দাঁড়ায়, স্বামীর দিকে চেয়ে বলে—'আমার যা বলার আছে এইখানে তা বলবো। যা ইচ্ছে হয় তুমি করতে পার। আমি আর কোন কিছুরই ভয় করি না। ইচ্ছে করলে আমাকেই মেরে ফেলতেও পার।'

'শোন, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটি তোমার নয়, কেবলমাত্র একটি। ঈশ্বরের সামনে শপথ করে বলছি, মাত্র একজন তোমার সন্তান নয়। এতোদিন ধ'রে সন্তানধারণের যে বোঝা তুমি আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আসছো, ঐ একটিবার মাত্র তারই প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। কে সেই লোক তা কোনদিনই জানতে পারবে না। ভালোবেসে বা উপভোগের জন্যে নয়, শুধু তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যেই আমি তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। একটি সন্তানের পিতা সে। আমার সাত-সাতটি ছেলেমেয়ে, খুঁজে বার করবার চেষ্টা করো কোনটা তোমার নয়। যতক্ষণ না লোকে প্রতারণার কথা জানতে পাবে ততক্ষণ প্রতিশোধের কোন সার্থকতা লাভ করা যায় না। এতোদিন পর আজ তুমি আমায় বলতে বাধ্য করলে। আমার বলা শেষ হ'য়েছে।'

কথাটা শেষ করেই স্ত্রী সোজা চলে আসে দরজার দিকে। স্ত্রী আশঙ্কা করেছিলো যে পেছনে ছুটে এসে স্বামী হয় তো ওকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেবে। কিন্তু সে-রকম কিছুই হ'লো না। গাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে ওঠে স্ত্রী, রাগে ও ভয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। গাড়োয়ানকে বলে, 'বাড়ী চলো।'

ঘোড়া দু'টো কদম চালে চলতে আরম্ভ করে।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী যেন ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত বসে বসে সময় গুণতে থাকে, স্ত্রীও খাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত নিজের ঘরে অপেক্ষা করে। স্ত্রী ভাবে—স্বামী কী বাড়ী ফিরেছে? এখন সে কী করছে?

নিঝুম বাড়ীটা। স্ত্রী বার বার ঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়িতে যখন আটটা বাজছে, তখন দরজার ওপর দু'বার টোকা দেওয়ার শব্দ হয়। খানসামা ঘরে এসে জানিয়ে যায় খাবার সময় হয়েছে।

'কর্তাবাবু কী বাড়ী ফিরেছেন?'

'হ্যাঁ, তিনি খাবার ঘরে বসে আছেন।'

স্ত্রী মনে মনে ভাবে কয়েক সপ্তাহ আগে কেনা রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে খেতে যাবে। একটা দুর্ঘটনার কথা সে মনে মনে ভেবে রেখেছে এবং সে-টা যে ঘটবেই আগে থেকে সে যেন তা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু স্ত্রীর মনে পড়ে যায় যে খাবার ঘরে ছেলেমেয়েরা সকলেই বসে আছে। তাই কেবল স্মেলিং সল্টের শিশিটা সঙ্গে নেয়।

প্রথানুযায়ী স্বামী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘাড় হেঁট করে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করে আবার চেয়ারে বসে। যার ডান দিকে বসে তিনটে ছেলে ও তাদের শিক্ষক, বাঁ দিকে বসে আছে তিনটি মেয়ে ও তাদের শিক্ষয়িত্রী। তিনমাসের শিশু সন্তানটি আছে ওপরে, আয়ার কাছে।

খাবার ঘরে তখন বাইরের কোন লোক ছিলো না। কারণ অতিথি ঘরে থাকলে ছেলেমেয়েরা কেউ খেতে নামে না।

খাবার আগে ছেলেদের মাষ্টার মশাই প্রার্থনা করে। প্রার্থনা শেষ হলে খাওয়া আরম্ভ হয়।

মা ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে থাকে। মানসিক চঞ্চলতা যে এইভাবে তাঁকে ব্যাকুল করে তুলবে এ ধারণা আগে হয় নি।

এদিকে বাবা তিন ছেলে ও তিন মেয়েকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে। সন্দিগ্ধ মনে একের পর এক প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে যায়—এধার থেকে ওধার পর্যন্ত।

স্বামী সামনে থেকে মদের গ্লাসটা সরিয়ে দেয়। কিন্তু গ্লাসটা ভেঙে যাওয়ায় টেবিল ক্লথের ওপর মদ ছড়িয়ে পড়ে। গ্লাস ভাঙার শব্দে স্ত্রী চমকে ওঠে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এই প্রথম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চারিচক্ষের মিলন হয়। এর পর থেকেই দু'জনার মধ্যে ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময় হতে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐ প্রকার বিব্রত ভাব দেখে মাষ্টার মশাই নিজেই কথা বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। স্বামী স্ত্রী কোন আলোচনায় যোগ দেয় না। সাধারণত স্ত্রীলোকেরা যা করে থাকে, সেই নারীসুলভ প্রবৃত্তিবশত স্ত্রী চালাকি করে মাষ্টারের দু' একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয় না। মানসিক চাঞ্চল্যবশত স্ত্রী কোন কথা খুঁজে পায় না। তা ছাড়া নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে ওঠে। ডিস আর চামচের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

হঠাৎ স্বামী স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার ছেলে-মেয়েদের সামনে শপথ করে বলতে পারবে যে, যে-কথা আজ তুমি আমায় শোনালে তা সত্যি?'

যে ঘৃণ্য ভাবধারা স্ত্রীর শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে, সেই ঘৃণিত ভাব আবার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। ডান হাতটা ছেলেদের এবং বাঁ হাতটা মেয়েদের মাথার ওপর তুলে ধরে এতটুকু দ্বিধা না করেই স্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে বলে—'ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত দিয়ে আমি শপথ করে বলছি, তোমাকে যা বলেছি তা সত্যি।'

স্বামী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রাগে তোয়ালেটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দেয়। চেয়ারটা পেছনের দিকে সরিয়ে দিয়ে কোন কথা না বলে স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মা ছেলেমেয়েদের বলে, 'বাবা যা বলে গেলেন, তা নিয়ে তোমরা বেশী মাথা ঘামিও না। আজকে উনি বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। দু' একদিনের মধ্যেই আবার প্রকৃতিস্থ হবেন।'

স্ত্রী সহজ অবস্থায় ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সাধারণত মায়েরা যেমন গল্প বলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভোলাবার চেষ্টা করে, স্ত্রীও মন-ভোলানো কথা বলে ছেলেমেয়েদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে

খাওয়া শেষ হ'লে স্ত্রী বৈঠকখানায় চলে আসে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা বয়সে বড়ো তাদের সঙ্গে বসে গল্প করে। শোবার সময় হ'লে তাদের চুমু খেয়ে নিজের ঘরে চলে আসে।

স্বামীর প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে থাকে। স্বামী যে শুতে আসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছেলেমেয়েরা এখানে নেই। আজ যে করেই হোক স্বামীর হাত থেকে এই মাংস দিয়ে গড়া তার দেহটাকে বাঁচাতে হবে—যেমন করে বাঁচিয়ে এসেছে তার প্রাণটাকে।

কয়েক সপ্তাহ আগে কিনে আনা রিভলভারটা গুলি ভরে জামার পকেটে রাখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, বাড়ীটা নিঝুম হয়ে পড়ে। জানলায় পর্দা ঝুলছে, খড়খড়িগুলো বন্ধ। পথ দিয়ে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী চলে যাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

স্ত্রী অপেক্ষা করে। স্বামীকে আজ তার কোন ভয় নেই। সব কিছুর জন্যেই আজ সে প্রস্তুত। কী ভাবে জীবনভোর স্বামীর মন তিলে তিলে দগ্ধ করা যায়, সে-পথ সে আজ খুঁজে পেয়েছে!

পর্দার ঝালরের তলা দিয়ে ঊষার প্রথম আলো দেখা দিলো জানলার মধ্যে দিয়ে, স্বামী ফিরে এলো না। স্বামী ফিরে না আসায় স্ত্রী আশ্চর্য হয়, বুঝতে পারে যে স্বামী আর ফিরে আসবে না। দরজা বন্ধ করে স্ত্রী বিছানায় চলে আসে। শুয়ে শুয়ে আপন মনে চিন্তা করে, অনুমান করতে পারে না স্বামী কী করতে পারে।

চা দিতে এসে ঝি একটুকরো কাগজ দিয়ে যায়—স্বামীর চিঠি। চিঠিতে সে লিখেছে—আমি অনেক দূর বেড়াতে যাচ্ছি। উকিলবাবুকে বলে গেলাম তোমার হাত খরচের টাকাটা দিতে।

থিয়েটার হল। একটা অঙ্ক শেষ হলো। এখন বিশ্রামের সময়। পুরুষেরা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে—মাথায় টুপী, গায়ে ওয়েষ্ট কোট, ওয়েষ্ট কোটের তলায় সাদা সার্টের সামনের দিকটা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। সোনার ও মুক্তোর বোতামগুলো চকচক করছে। পুরুষেরা বক্সের দিকে তাকিয়ে আছে, মহিলাদের পরণে সাধারণ
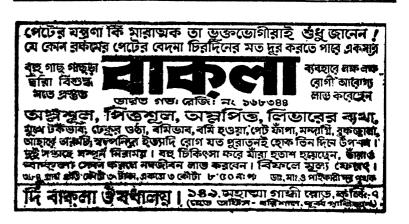
পোষাক, গায়ে হীরে ও মুক্তোর গহনা—মনে হ'চ্ছে যেন আলোক-মালায় সজ্জিত উচ্চ গৃহে সাজানো ফুটন্ত ফুলের মতো। কোলাহল মুখরিত হলঘরটাকে বাহার করে তুলেছে ওদের মুখশ্রী।

হলটা ঘিরে ঐ যে প্রদর্শনীর মেলা বসেছে, 'অর্কেষ্ট্রার' দিকে পেছন ফিরে দুই বন্ধু সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছে—আলোচনা করছে ওদের ঐ লাবণ্য, ঐ বিলাসিতা, ওদের ঐ অলঙ্কারের মধ্যে কোনটা নকল এবং কোনটা আসল।

দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তার সঙ্গীকে বলে, 'দেখ, দেখ, কাউণ্টেসকে আজও কি রকম সুন্দরী দেখাচ্ছে!'

সঙ্গীটির বয়েস হ'য়েছে। সে বন্ধুর কথা শুনে দূরবীণের মধ্যে দিয়ে উল্টো দিকের বক্সের মহিলাটিকে লক্ষ্য করে। ভদ্রমহিলাকে এখনও যুবতী বলে মনে হয়, ওর ঐ মন-নাচানো, প্রাণ-মাতানো সৌন্দর্য হলঘরের পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ওদের মনে অনুভূতি জাগায়। মুখের ফ্যাকাসে রঙের জন্যে ভদ্রমহিলাকে প্রতিমা বলে মনে হচ্ছে। ঘন কালো চুলের মধ্যে ছোট মুকুটটা তারার মতো ঝলমল করছে।

কিছুক্ষণ মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থেকে সঙ্গীটি বলে, 'হ্যাঁ, ভদ্রমহিলাকে সুন্দরী বলা চলে।'

ওর কত বয়েস হবে বলে তোমার মনে হয়?'

'বলছি। হিসেব করে ওর সঠিক বয়েস বলতে পারবো। ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখে আসছি। ও যখন নাবালিকা তখন ও সকলের সামনে বেরুতো। কত আর হবে, ত্রিশ। খুব বেশী হলে ছত্রিশ।'

'অসম্ভব! আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমি ঠিকই বলছি।'

'দেখে তো মনে হয় পঁচিশের বেশী নয়।'

'সাত সাতটি সন্তানের মা।'

'বিশ্বাস করতে পারি না।'

'বেশী আর কি! সাতজনই বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে আমি ওদের বাড়ীতে যাই। নির্ঝঞ্ঝাটে সুখী পরিবার। একটা আদর্শ সংসার গড়ে তুলেছে ঐ মহিলাটি।'

'কি আশ্চর্য! কোনদিনই কি ওর সম্বন্ধে কিছু শোনা যাই নি?'

'কোনদিনই না।'

কিন্তু ওর স্বামী? অদ্ভুত লোক সে, নয় কি?'

'হ্যাঁ এবং না—দু'টোই। ওদের মধ্যে এমন কিছু ঘটেছে, যা সাধারণত সব সংসারেই ঘটে থাকে। সাদা চোখে যা দেখতে পাওয়া যায় না—কিন্তু মনে মনে অনুভব করা যায়।'

'কি সে ঘটনা, জানো নাকি?'

'আমি কিছুই জানি না। এতোদিন ও আদর্শ স্বামীর ন্যায় জীবন কাটিয়ে এসেছে, এখন ও নিঃসঙ্গ। শেষের দিকে, যখন ও এখানে ছিলো ওর মেজাজটা হ'য়ে উঠছিলো রুক্ষ, একটুতেই চটে উঠতো। কিন্তু যে দিন থেকে ভদ্রলোক এই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই সংসার সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন হয়ে উঠেছে। লোকে মনে করে কোন গণ্ডগোল হয়েছে বোধ হয়—কোথাও রয়েছে তীব্র দংশনের ক্ষত।

দুই বন্ধুর মধ্যে দার্শনিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলে, আলোচনা চলে অজানা কোন গোপন বিষয়বস্তু নিয়ে—যা পরস্পরের স্বভাব বিরুদ্ধ, যা দু'জনার মধ্যে দৈহিক বিরাগের সৃষ্টি করে, প্রথম প্রথম সাদা চোখে দেখা যায় না, শেষ পর্যন্ত সমস্ত সংসারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

দূরবীণের মধ্যে দিয়ে কাউণ্টেসকে লক্ষ্য করে প্রথম বন্ধুটি বলে, 'ঐ মহিলাটি যে সাত সন্তানের জননী এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।'

দ্বিতীয় বন্ধুটি বলে, 'এগারো বছরের মধ্যেই মহিলাটির সাত সাতটি সন্তান হয়। এরপর আর কোন ছেলেপুলে হয় নি। এখন সে বাইরের এই আমোদ-প্রমোদ নিয়েই মেতে আছে। এ বুঝি আর চট করে শেষ হবে না।'

'বেচারী।'

'ও-কথা বলছো কেন?'

'ওহে বন্ধু, একটু ভেবে দেখ—এগারো বছর ধরে ঐ মহিলাটির মাতৃত্বের কথা। কী জঘন্য! ওর জীবন-যৌবন, ওর লাবণ্য-সৌন্দর্য, ওর আশা-ভরসা, ওর সাধ-আহ্লাদ, জীবনের মধুময় দিনগুলো—সবই বলি দিতে হয়েছে তোমাদের ঐ ঘৃণ্য মাতৃত্বের পায়ে। শেষ পর্যন্ত মহিলাটিকে করে তুলেছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা,' করে তুলেছে সন্তান প্রসবের যন্ত্র বিশেষ।'

'এতে তোমার আমার কী করার আছে? এইটাই তো স্বাভাবিক ধর্ম।'

'সত্যি কথা এইটাই হলো স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু আমি বলবো—এই স্বাভাবিক ধর্ম আমাদের শত্রু এর সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়তই যুদ্ধ করতে হয়। কেন না এই স্বাভাবিক ধর্ম ক্রমাগত আমাদের পশুতে পরিণত করার চেষ্টা করছে। এ নিয়ে তুমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হতে পারো—নিশ্চিন্ত হ'তে পারো যে, ভগবান এই পৃথিবীতে এমন কিছুই সৃষ্টি করেন নি যা অমলিন, যা সুন্দর, যা মার্জিত-রুচিসম্পন্ন—আদর্শ হিসাবে যা আমরা মেনে নিতে পারি। যা কিছু ভালো, তা বেরিয়েছে মানুষের মাথা থেকেই! আমরা—মানুষেরাই, গান গেয়ে, ব্যাখ্যা করে, কবির ন্যায় প্রকাশ করে, শিল্পীর ন্যায় কল্পনা করে শিক্ষিত লোকের ন্যায় (যাঁরা প্রায়ই ভুল করে থাকেন) প্রকৃতির এই বিস্ময়কর সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে কিছুটা লাবণ্য, কিছুটা সৌন্দর্য এবং কিছুটা মনোমুগ্ধকর ও রহস্যময় ভাব-ধারা প্রবর্তন করেছি।

তোমাদের ভগবান বীজাণু ভর্তি করে তৈরী করেছেন এই নিকৃষ্ট প্রকৃতি মানুষগুলোকে, যারা কয়েক বছর পশুজনোচিত আনন্দ ভোগ করে বৃদ্ধ ও পঙ্গু হয়ে পড়ে—হয়ে পড়ে কুৎসিত ও জরাগ্রস্ত। মনে হয় ভগবান এদের সৃষ্টি করেছেন শুধু কদর্য ভাবে কয়েকটা সন্তানের জন্মদান করে ক্ষীণজীবী পোকার মতো মরবার জন্যে। হ্যাঁ, এই কথাই আমি জোরের সঙ্গে বলবো যে, কামের ভাবে শুধু কয়েকটি সন্তানের জন্মদান করবার জন্যেই ভগবান ওদের সৃষ্টি করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই হীন ও অপ্রীতিকর সৃষ্টির চেয়ে উপহাসের বিষয়বস্তু আর কী থাকতে পারে? যে সৃষ্টির বিরুদ্ধে মানুষের কোমলবৃত্তি সকল চিরকাল ধরে বিদ্রোহ করে আসছে, চিরকাল ধরে

বিদ্রোহ করবে। তোমার ঐ মিতব্যয়ী সৃষ্টিকর্তার আবিষ্কৃত মানব-দেহযন্ত্রগুলো কেবলমাত্র দু'টো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

'মানুষের কর্মধারার মধ্যে যেগুলো প্রীতিকর, যেগুলো নিষ্কলঙ্ক, সেই পবিত্র কর্মধারাগুলোকে তিনি বেছে নিলেন না কেন? যে মুখ খাদ্যগ্রহণ করে আমাদের পুষ্টিসাধন করে, সেই মুখ থেকেই আমাদের মনের চিন্তাধারা নিঃসৃত হয়। শরীরে আপনা থেকেই চামড়া গজায় আর ঐ চামড়ার দ্বারাই আমাদের কল্পনা সারা শরীরে প্রবাহিত হয়। যে নাসিকা ফুসফুসে বাতাস বয়ে নিয়ে যায়, সেই নাসিকাই আবার প্রকৃতির যত কিছু গন্ধ আমাদের মস্তিষ্কে বহন করে আনে। যে কান দিয়ে কথাবার্তা শুনি, সেই কানই আবার সংগীতের মধুর মূর্ছনা বহন করে আনে—আমাদের দৈহিক সুখ দেয়।

'কেউ হয় তো বলতে পারে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কটা যেভাবে পুরুষ মর্যাদা দিয়ে মহিমান্বিত করে তুলেছে ভগবানের সেটা অভিপ্রেত নয়। যা' হোক মানুষ ভালোবাসতে শিখেছে। তোমাদের ঐ চতুর দেবতাটির প্রতি যোগ্য উত্তর হলো প্রেম। মানুষ কাব্যের মাধ্যমে এই প্রেমকে এতই অলঙ্কৃত করেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে নারীজাতি যে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য, সে-কথা তারা ভুলে যায়। আমাদের মধ্যে যারা নিজেদের প্রতারণা করবার মতো মানসিক শক্তির অধিকারী নয়, তারাই ঐ সম্পর্কের মধ্যে পাপ আবিষ্কার করে এবং উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়লিপ্সাকে পরিমার্জিত করে তুলে ধরে। এটাও ভগবানকে উপহাস করার অন্য একটা পন্থা।

'প্রকৃতির নিয়মে পশুদের যেমন বাচ্চা হয়, সাধারণ মানুষেরও সেই রকম প্রাকৃতিক নিয়মে সন্তান জন্মলাভ করে।

'মহিলাটিকে লক্ষ্য করো। ঐ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মহিলাটি জীবনের এগারো বছর কাটিয়েছে কেবলমাত্র কাউন্টের বংশবৃদ্ধি করবার জন্য—ঘৃণার কথা নয়?'

বন্ধু হেসে উত্তর করে, 'আমি বুঝি যে তোমার কথার মধ্যে অনেক কিছু সত্যি আছে। কিন্তু খুব কম লোকই তোমার কথাটা মেনে নেবে।'

প্রথম বন্ধুটি কথা বলায় মুখর হয়ে ওঠে, 'তুমি কি জান যে আমি ভগবানকে কিরূপে কল্পনা করি? এক বিরাট সৃজনশীল কায়ারূপে—যাঁর সম্যক পরিচয় আজও আমার কাছে অজ্ঞাত। তিনি ঐ অনন্ত, অসীমশূন্যে আমাদের পৃথিবীর মতো অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন—যেমন করে বিশাল সমুদ্রে একটা মাছ লক্ষ লক্ষ ডিম ছড়িয়ে দেয়। তিনি সৃষ্টি করেই খালাস, কারণ সৃষ্টি করাই তাঁর একমাত্র কাজ। কিন্তু তাঁর ঐ সৃষ্ট বীজের সংমিশ্রণের ফল পরিণামে কি বস্তুতে দাঁড়ালো তা' না জেনেই তিনি অবিরত সৃষ্টি করে চলেছেন।

'সৌভাগ্যের কথা যে মানুষের চিন্তাধারা স্থান ও কালের ওপর নির্ভর করে। আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়েই তার গতিবিধি—যে ঘটনাগুলো হঠাৎ ঘটে, আগে থেকে যার কোন আভাস পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত তা-ও এই পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গেই বিলীন হয়ে যায়। পৃথিবীর নিত্য-নূতন আবির্ভাবের সঙ্গে সংমিশ্রিত হ'য়ে এই পৃথিবীতে অথবা অন্য কোথাও হয় তো তার পুনরাবির্ভাব ঘটে—একই রূপে অথবা ভিন্ন রূপে।

'ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীটা আমাদের কাছে অস্বস্তিকর বলে মনে হয়, আনন্দের উৎস বলে মনে হয় না। এই পৃথিবীর কাছ থেকে আহার বা আশ্রয় পাই না। তার একমাত্র কারণ ভগবানের বুদ্ধি-বিপর্যয়। আমরা সভ্য ও মার্জিত হয়েও যে ভাগ্যের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে যাই তার মূলেও রয়েছে ভগবানের নির্বুদ্ধিতা।'

অপর বন্ধুটি আবেগময়ী বাণী মন দিয়ে শুনছিলো। সে জিজ্ঞেস করে, 'তাহ'লে তোমার বিশ্বাস যে মানুষের চিন্তাধারা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া মাত্র?'

'হ্যাঁ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া মাত্র। নতুন সংমিশ্রণের ফলে যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে যা চোখে দেখা যায়, না ঘর্ষণে অথবা বহির্জগতের কোন বস্তুর আচম্বিত সান্নিধ্যে যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ঠিক তেমনি বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ক্রিয়া করে।

'তুমি নিজের দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বললে এর তাৎপর্য বুঝতে পারবে। তোমার কথাই যদি ধরে নেওয়া যায়, যদি মেনে নেওয়া হয় যে মানুষের চিন্তাধারা ভগবানের চিন্তাধারা থেকেই উৎসারিত, (আমরা যে অবস্থায় আছি এবং যা হ'য়েছি ভগবানের তা' অভিপ্রেত নয়) তাহ'লে কি ধরে নেব যে আমাদের ভগবান চেয়েছিলেন যে আমরা উলঙ্গ অবস্থায় বনে বনে ঘুরে বেড়াই, গাছের ওপর অথবা

গুহার মধ্যে বাস করি, জীবজন্তুর কাঁচা মাংস আহার করে অথবা গাছের পাতা চর্বণ করে উদর পূর্তি করি?

'একটু মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীটা আমাদের জন্যে সৃষ্টি হয় নি। যে চিন্তাধারা আমাদের মস্তিষ্কে আশ্চর্য ভাবে উদ্ভূত হয়—হয় তো তা দুর্বল, বিশৃঙ্খল, চির কাল হয় তো তাই থাকবে,—সেই চিন্তাধারা মনে করিয়ে দেয় যে আমরা যেন এই পৃথিবীতে দুঃস্থ অবস্থায় চিরকালের জন্য নির্বাসিত হ'য়েছি।

'আমাদের পৃথিবীটার কথাই ভাব। বসবাস করবার জন্যেই ভগবান আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা বলতো কেবলমাত্র পশুদের বাস করবার জন্যেই কী এই পৃথিবীটা সৃষ্টি হয় নি? বন-জঙ্গলে ভতি নয় কি এই পৃথিবীটা? আমাদের জন্যে কী আছে এখানে? কিছু না। ওদের জন্যে? সব কিছু। স্বভাবের তাড়নায় খাওয়া, শিকার খুঁজে বেড়ানো, পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করা ছাড়া আর কিছুই করে না তারা। ভগবান কোনদিনই চান নি যে তাঁর সৃষ্ট জীবেরা সভ্য হোক, নম্র হোক। মৃত্যুর কথা, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হওয়ার কথাটাই মাত্র জানতেন। বাজপাখী কি পায়রা বা তিতির শিকার করে খায় না? ভেঁড়া, ছাগল, হরিণ—ঐ নিরামিষাশী প্রাণীদের কি আমরা বিশেষ কোন কাজে লাগাই না।

'আমাদের বিষয়ই ধর না কেন। আমরা যত সভ্য হচ্ছি, যত ভদ্র হচ্ছি, যতই আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান বাড়ছে আমরা ততই ঐ প্রাণীদের সহজ প্রবৃত্তিগুলো দমন করছি। জয় করছি ঐ হীন, নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলোকে। ভগবান কিন্তু চেয়েছিলেন যে ঐ বৃত্তি সকল আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠুক।

'পশুতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমরা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছি, অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছি—ঘর-বাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ, মোটর-ইঞ্জিন, অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। শিল্প ও বিজ্ঞান ছাড়াও আমরা গল্প লিখি, কবিতা রচনা করি, সাহিত্য সৃষ্টিও আমাদের আবিষ্কার।

'এই থিয়েটারটার কথাই ভাব না কেন? ভগবান এ-টা সৃষ্টি করেন নি। থিয়েটারের কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি। আমাদের মাথা থেকেই বেরিয়েছে, আমরাই তৈরী করেছি এই থিয়েটার।

'এইবার এই মহিলাটির কথাই ধরা যাক। ভগবান চেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্ট জীব ঐ মহিলাটি বন্য পশুর চামড়া গায়ে জড়িয়ে উলঙ্গ অবস্থায় গুহার মধ্যে বাস করুক। এখন কী সে আরো ভালো অবস্থায় নেই? কিন্তু ভদ্রমহিলার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে এ কথাই বলতে হয় যে, কেউ কী জানে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে ভদ্রমহিলার মতো একজন সঙ্গী পেয়েও, বিশেষ করে সাত সাতটি সন্তান হওয়ার পরও ভদ্রমহিলার স্বামী কেন স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য মেয়েমানুষের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়? বলতে পারবে কেউ?'

অন্য বন্ধুটি উত্তরে বলে, 'কারণ একটা আছে আর বোধ হয় এইটাই একমাত্র কারণ যে ভদ্রলোক হয় তো দেখেছেন একসঙ্গে থাকতে গেলে শেষ পর্যন্ত খরচই বাড়বে। তুমি এতক্ষণ যে দার্শনিক তত্ত্ব কথা শোনালে ভদ্রলোকও হয় তো সেই তত্ত্ব কথাটাই ভেবে দেখেছেন। তাই সাংসারিক অর্থ সমস্যার জন্যেই হয় তো তিনি চলে গেছেন।

থিয়েটার হল থেকে গাড়ীটা ফিরে চলেছে বাড়ীর দিকে। স্বামী আর স্ত্রী গাড়ীর মধ্যে চুপ করে পাশাপাশি বসে আছে। হঠাৎ স্বামী স্ত্রীকে ডাকে।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, 'কী চাও?'

'ব্যাপারটা যে অনেকদিন হয়ে গেল।'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'সেই শাস্তির কথা। যে মহা শাস্তি আজ ছ' বছর হলো তুমি আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছো।'

'তুমি কি করতে বলো? ও-বিষয়ে আমার কিছুই করবার নেই।'

'আমাকে বল, ওদের মধ্যে কোন্টা?'

'না, কখনো তা' বলবো না।'

'ঐ সন্দেহ মন থেকে দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি যে ওদের দিকে তাকাতে পারি না, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না, ওদের মধ্যে কোন্টা আমায় দেখিয়ে দাও। কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে ক্ষমা করবো, আমার নিজের ছেলের মতো ওকেও ভালোবাসবো।'

'সে অধিকার আমার নেই।'

'তুমি কি বুঝতে পারছো না যে এই জীবন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। যখনই আমি ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকাই, তখনই মনের মধ্যে ঐ চিন্তাটা উদয় হয়, আমাকে সব সময় জ্বালিয়ে মারে। চিন্তা করতে করতে আমি যে পাগল হয়ে যাব।'

'বুঝতে পারছি যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে তোমাকে।'

'ওঃ, যথেষ্ট! তুমি কি ভেবেছো মন থেকে ঐ চিন্তা সরিয়ে রেখে ভয় পেয়ে আমি চুপ করে আছি? তার থেকেও বড় কথা, ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা আমার সন্তান নয় এ-কথা জেনেও তোমার সঙ্গে একত্রে বাস করার বিড়ম্বনা মেনে নিয়েছি? না, তা নয়। ওদের মধ্যে একজন আমার সন্তান নয়, যাকে আমি আজও খুঁজে বার করতে পারলাম না, যে আপন সন্তানদের ভালোবাসা থেকে আমাকে নিয়তই বিরত করছে। এ যে কি মর্মান্তিক জ্বালা তা' তুমি বুঝবে না।'

'না, সত্যিই দেখছি তোমাকে যথেষ্ট অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে।'

'প্রতিদিনই কি আমি সে-কথা তোমায় বলি নি, বলি নি যে আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে? আমি যদি ওদের ভালোবাসতেই না পারলাম, তাহ'লে একসঙ্গে এই বাড়ীতে বাস করার কি সার্থকতা আছে বলতে পারো? তুমি আমার প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছো। তুমি বেশ ভালো করেই জান যে, আমি ওদের মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। একদিন আমি ওদের বাবা ছিলাম, একদিন ছিলাম আমি তোমার স্বামী। আগে যা ছিলাম আজও তাই আছি। স্বীকার করছি যে তোমার প্রতি আমার মন বিদ্বেষে ভরে উঠেছিলো, কেন না তুমি অন্য ধাতের মানুষ। যে-কথা তুমি আমাকে জানিয়েছো সে-কথা আমি

ভুলি নি, কোনদিনই আমি ভুলতে পারবো না। কিন্তু সে'দিন থেকে তোমার সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তা করি নি। তোমাকে প্রাণে মারতে পারি নি, কেন না তাহ'লে আমার আর কোন উপায় থাকতো না, কোনদিন জানতে পারতাম না যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনটা আমার নয়। শুধু এই কারণে আমি মুখ বুজে আছি। তুমি হয় তো বিশ্বাস করবে না যে, কি অশান্তি ভোগ করছি আমি। কারণ প্রথম দু'টি ছাড়া অন্য সন্তানদের ভালোবাসতে সাহস হয় না, সাহস হয় না আদর করে চুমু খেতে। 'এ কি আমার সন্তান?' এই চিন্তায় তা'দের কোলে নিতে পারি না, ছ'বছর ধরে তোমার সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করে আসছি। সত্যি করে আমায় বলো, কথা দিচ্ছি তোমার প্রতি অবিচার করবো না।'

গাড়ীর ভেতরটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেও স্বামী বুঝতে পারে যে, স্ত্রী কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কি একটা বলবার যেন চেষ্টা করছে।

'তোমায় অনুরোধ করছি আমায় সত্যি কথাটা বল' স্বামী বলে।

স্ত্রী আরম্ভ করে, 'তুমি যতটা ভেবেছো বোধ হয় তার থেকে অনেক বেশী দোষী আমি। মা হওয়ার দায় আমার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। আমার পাশ থেকে তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার ঐ একটি মাত্র উপায় ছাড়া আর কিছু আমার জানা ছিলো না। ভগবানের নামে শপথ করে এবং ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত রেখে সেদিন তোমায় যা বলেছি তা মিথ্যে—নিছক মিথ্যে। তোমার প্রতি আমি কোন অন্যায় করি নি।'

স্ত্রীর হাতটা শক্ত করে চেপে ধ'রে স্বামী জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

স্বামী বলে, 'মহাবিপদে ফেললে তুমি। সন্দেহের দোলায় আমার মন দুলছে। মিথ্যে কথা কোনটা? সে দিনেরটা, না আজকেরটা? কি করে আজ আমি তোমায় বিশ্বাস করি? তোমার মতো একজন মেয়েছেলেকে লোকে আর কি করে বিশ্বাস করবে? আমি ভেবেছিলাম তুমি হয় তো একজনের নাম বলবে।'

একসময় ওরা বাড়ীতে এসে পৌঁছায়। সিঁড়ির কাছে এলে স্বামী গাড়ী থেকে নামে, স্ত্রীর হাত ধরে নামায়। দোতলায় উঠে স্বামী স্ত্রীকে বলে, 'তোমার সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা বলার আছে।'

'বলতে পারো আমার কোন আপত্তি নেই।'

স্বামী আর স্ত্রী দু'জনে একটা ছোট ঘরে এসে বসে। চাকর আলো জেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

স্বামী আরম্ভ করে, 'আমি কি করে বুঝবো যে কোন্‌টা তোমার সত্যি কথা? ঐ কথাটাই আমি কতবার তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছি, কোন উত্তরই পাই নি তোমার কাছ থেকে। আজ তুমি বলছ—ও-সব মিথ্যে কথা। ছ'বছর ধরে তুমিই আমাকে বাধ্য করেছো ঐ কথাটা বিশ্বাস করতে। আমার মনে হয় এখন তুমি মিথ্যে কথা বলছো, কিন্তু কেন বলছো তা' আমি জানি না। বোধ হয় আমার ওপর দয়া করে, না?'

'তা যদি না করতাম, এই ছ'বছরে আমার আরও চারটে ছেলে হ'তো।'

'মা হ'য়ে এ-কথা কেউ বলতে পারে?'

'সাত সন্তানের মা হয়েছি তাই আমার কাছে যথেষ্ট, যে সন্তানেরা এখনও জন্মায় নি তা'দের জন্যে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। আমরা সভ্য জগতের মানুষ, সাধারণ মেয়েমানুষের মতো বংশবৃদ্ধি করাটা আমরা স্বীকার করি না।'

স্ত্রী উঠে দাঁড়াতেই স্বামী ওর হাতটা ধরে বলে, 'একটা কথা। সত্য যা তাই বল।'

'সত্যি কথাই তোমায় বলেছি। তোমায় অপমান আমি করি নি।'

স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। স্ত্রীকে বাস্তবিক সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘন কালো চুলের মধ্যে ছোট্ট মুকুটটা তারার মতো চিক্ চিক্ করছে।

স্বামী স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখে কোন কথা নেই। আজ স্বামী বুঝতে পারে স্ত্রীর প্রতি কেন তার বিদ্বেষ ভাব ছিল।

স্বামী বলে, 'আমি তোমায় বিশ্বাস করি। আগে হয় তো করতে পারি নি কিন্তু এখন করি।'

স্ত্রী স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'এখন থেকে তাহ'লে আমরা দু'জন বন্ধু হলাম।'

স্বামী স্ত্রীর হাতের ওপর চুমু খেয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আজ থেকে আমরা দু'জন বন্ধু হলাম।'

অনুবাদক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র।

ভবিতব্য

শিপ্রা দত্ত

কুন্তলাদি'কে অনেকেই আপনারা চেনেন। দেখেছেন তার চেয়েও বেশী সংখ্যক লোক, রং তাঁর কালো, রোগা ছিপছিপে গড়ন, মুখশ্রী ভাল নয়। তার উপর সব সময়ই তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূ। সিন্দূরের ছোট বিন্দুটা জ্বলজ্বল করে ঐ ছোট্ট কালো কপালটিতে। আধপাকা আধকাঁচা অলকদামের মধ্যে সীমন্তের রক্তিমাভা স্পষ্ট দেখা যায় অনেক দূর হ'তে। আধুনিকাদের মত সিন্দূরের রেখার লুকোচুরি নেই কেশগুচ্ছের আড়ালে। কথা বলেন কুন্তলাদি' এত আস্তে যে, মুখের কাছে কান না লাগালে বুঝি শোনা যায় না।

সোমার মেজদি'ই একমাত্র কুন্তলাদি'র নানা প্রলাপ কাহিনী ধৈর্য ধরে শুনতেন। তাই কুন্তলাদি'র বাঁধাধরা দৈনন্দিন জীবনে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলেই তিনি ছুটে আসতেন সোমাদের বাসায়। সোমা চা এনে সামনে রাখলেই—চায়ের ধূমকুণ্ডলীর মত—কুন্তলাদি'র মনের পাকে যে গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকতো, তা যেন সোমার মেজদি'র কাছে প্রকাশ না করে তিনি সোয়াস্তি পেতেন না। কুন্তলাদি'র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই তাঁর পরিচয় অর্থাৎ জীবন কাঠামোটা একটু দেওয়া দরকার। নতুবা কুন্তলাদি'র প্রতি সুবিচার করা হবে না।

কুন্তলাদি' বিদুষী। সংস্কৃতে এম-এতে ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট! স্বর্ণপদক প্রাপ্তা। কিন্তু কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তাঁর নাকি চাকরী টেঁকে না। ইংরাজী ভাষাতেও ভাল দখল আছে। কারণ ছোটবেলা হতেই মিশনারীদের কাছে তিনি মানুষ হয়েছেন। ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা থাকার দরুণ টিউশনিও জোটে তাঁর অনেক। কুন্তলাদি' কাজ করেন কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে। তাঁর ধারণা অফিসে সবাই বুঝি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসে অথবা তিনি তাদের সমালোচনার বস্তু। অফিসে দুইটি মেয়ে বা দুইটি ছেলে বা একটি মেয়ে ও একটি ছেলেকে একত্রে কোন বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতে দেখলেই—কুন্তলাদি' ক্ষেপে যেতেন এবং আপন মনে তাদের উদ্দেশ্যে গালমন্দ করতেন।

সবাই জানে কুন্তলাদি'র মাথার কিছু গোলমাল আছে। তাই তাঁর এ ধরণের আচরণে তারা কিছু মনে করতো না। পরন্তু তাঁকে কেউ ঘাঁটাতেও চায় না। কারণ নাড়া পড়লেই পরিবেশটা ঘোলা না করে কুন্তলাদি' ছাড়বেন না—এটা সবাই জানে। কুন্তলাদি'র ধারণা তাঁর সহকর্মী কেউই ভদ্রসন্তান নয়। পোষাকেই কেবল ভদ্র হয় না। ভদ্র হয় আচারে, ব্যবহারে, আলাপে—যা নাকি তিনি তাঁর অফিসের কোন সহকর্মীর মধ্যেই পেতেন না বলে অভিযোগ করতেন। কুন্তলাদি'র তাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল। তাদের নামের পাশের ডিগ্রীর ছাপগুলিও নাকি খাঁটি নয়। ওখানেও কালোবাজারের ছোঁয়াচ তিনি অনুভব করতেন। তাই এক ছত্র শুদ্ধ ইংরেজী নাকি কারও লেখনী দিয়ে বের হয় না। সোমার মেজদি' বিনা প্রতিবাদে কুন্তলাদি'র সব অভিযোগ শুনে যেতেন। কারণ প্রতিবাদে আবহাওয়াটা কেবল বিষাক্ত হবে, সংশোধিত হবে না—এ তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। তা ছাড়া কুন্তলাদি'র জীবনের আর একটি গোপন ইতিহাস সোমার মেজদি' জেনেছিলেন। তাই তিনি কুন্তলাদি'র প্রতি একটা অনুকম্পাই অনুভব করতেন।

কুন্তলাদি'র মনের এই হীনমন্যতার কারণ কিন্তু আর কেউ জানতো না। কুন্তলাদি' এক বিহারী কুলীর মেয়ে। কুন্তলাদি'র বাবাকে তাঁর শৈশবকালেই এক খুনের মামলার আসামী হয়ে যাবজ্জীবনের জন্য কালাপানিতে চলে যেতে হয়েছে। আর তিনি ফিরে আসেন নি। কুন্তলাদি'র শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে মিশনারীদের আশ্রয়ে। মেধাবী ও নিম্নজাতের ছাত্রী বলে সারাজীবন পড়া ও থাকার সুব্যবস্থা পেয়েছেন। আত্মীয়স্বজন কোন কূলে কেউ তাঁর আছে কি না জন্মাবধি জানেন না কুন্তলাদি'।

কি ভাবে যে বিহারী খুনী আসামীর মেয়ে কুন্তলাদি' বিহারের রুক্ষ মাটির মায়া কাটিয়ে শ্যামল বাংলার কোলে এসে আস্তানা গেড়েছেন—তা কিন্তু কেউ জানে না। সোমার মেজদি'র কাছেও তা রহস্যাবৃত। শুধু তাই নয় দীর্ঘকাল মিশনারীদের আশ্রয়ে থেকে—প্রাপ্তবয়সে সেই নাগপাশই বা কি করে তিনি ছিঁড়ে এসেছেন, তাও সবার কাছে অজ্ঞাত। এ ধরণের কোন প্রশ্ন কুন্তলাদি'র মত ভাবপ্রবণ মেয়ের কাছে করা সঙ্গত নয়। তাই স্রোতের মুখে আগাছার মত কুন্তলাদি'র জীবন ভেসে বেড়াচ্ছে।

কুন্তলাদি'র জীবনে শুকতারার মত উদয় হয়েছেন নীরোদবাবু। পাত্র হিসাবে তাঁকে মোটামুটি সুপাত্রই বলা চলে—যদিও কুন্তলাদি'র মত অতগুলি ডিগ্রী তাঁর নামের পাশে সারি বেঁধে নেই। নীরোদবাবুকে যে কুন্তলাদি' কি ভাবে জোটালেন, তা সত্যি আশ্চর্যজনক। সৌম্য, ফর্সা, দোহারা চেহারা তাঁর। সুন্দর মুখশ্রী। ভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। শান্ত স্বভাব। ৩নং আইনের বিয়ের চুক্তিতে

আবদ্ধ হয়েছেন। নীরোদবাবু ম্যাট্রিক পাশ করে টেক্‌নিক্যাল কি একটু পড়েছিলেন। তবে শেষ পরীক্ষা দিয়ে ছাপটা আয়ত্ত করতে না পাবায়, চাকরীর বাজারে অপাংক্তেয় হয়ে রয়েছেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধির জোরে সেই বিদ্যের শানে টুকটাক অল্প-স্বল্প পয়সা তিনি রোজগার করেন। হয়ত নীরোদবাবু কুন্তলাদি'কে বিয়ে করেছিলেন রোজগারী স্ত্রী পাবেন বলে। এ ধরণের কোন প্রশ্ন করা রুচি-বিরুদ্ধ। তাই ওঁদের এই অসামঞ্জস্য মিলনও সবার মনে কৌতূহল জাগায়। দু'জনের কেবল আকৃতিগত ও বংশগত পার্থক্য নয়—স্বভাবত উভয়ের মধ্যে মিলের অভাব। কুন্তলাদি' খর স্বভাবের—নীরোদবাবু স্থির, ধীর, বিনয়ী, পরোপকারী। গাছে চড়েও নীরোদবাবুর মুখে কথা নেই। তবু ভগবানের বিধানে এমন দুই বিপরীতমুখী প্রকৃতির মানুষও একই গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে।

কুন্তলাদি'র দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেও কিছু বৈচিত্র্য আছে। ভোর রাত্রে উঠে রান্না সেরে কুন্তলাদি' দৈনন্দিন কাজ শুরু করেন। টিউশনি—অফিস—টিউশনি—আবার টিউশনি। টিউশনি ফেরৎ বাজার করে বাড়ী ফিরে রান্না করে খেয়ে সমান। নিজে এক হাতে সব কাজ করেন। নেই সম্প্রীতি পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রীতে কখনও ঝগড়া হওয়ার খবর কাকপক্ষীতেও শোনে নি। নীরোদবাবু মিশুক লোক। পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার সঙ্গেই তাঁর সমান হৃদ্যতা। কিন্তু কুন্তলাদি যতক্ষণ বাড়ী থাকেন—ততক্ষণ নীরোদবাবু কোথাও যান না এবং তাঁর বাসার ধার-পাশেও কেউ আসে না। কিন্তু কুন্তলাদি'র অবর্তমানে নীরোদবাবুর অন্যরূপ। তাঁর প্রাণখোলা হাসি যেন সারা পাড়া মেতে ওঠে। নানা বাড়ীর মা-মাসীদের কাছেও ভালো খাবার আসে। আর তার সঙ্গে ছোটদের নানা জিনিষ তৈরী করে দেবার আব্দার। সবার তিনি প্রিয়। সবার মাঝেই তাঁর বিশেষ আসন পাতা রয়েছে।

কুন্তলাদি'র মনে সন্দেহের ধোঁয়া ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত মনকে সমাচ্ছন্ন করলো। তিনি তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে তারা কমিউনিষ্ট এ ধরণের মিথ্যে রিপোর্ট দিলেন লালবাজার হেড অফিসে। তার আগেই তিনি নানাভাবে কর্তৃপক্ষকে সহকর্মীদের আচরণের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে প্রতিকার পান নি। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন তাদের উপরও। তাই কয়েকজন পদস্থ কর্মচারীর নামও পুলিশের খাতায় উঠালেন। কিন্তু এভাবে আর দিন চলে না। অনুসন্ধানের জন্য পুলিশের লোক এসে জেনে গেল কুন্তলাদি'র সব রিপোর্টই ভিত্তিহীন। পদস্থ কর্মচারীরা এ ভাবে অপদস্থ হওয়ায় কুন্তলাদি'কে মিথ্যে রিপোর্ট দেওয়ার অপরাধে ছাঁটাই করল। কুন্তলাদি তখনও চাকরীতে স্থায়ী হন নি। তার উপর এ ধরণের অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি তাঁকে পেতে হলো।

কুন্তলাদি'র দুঃসহ বেকার জীবনে মস্তিষ্কের গোলমাল যেন আরও দেখা গেল। চাকরী হারিয়ে কুন্তলাদি বহু অফিসের দ্বার হতে দ্বারে ঘুরেছেন। কিন্তু কোথাও কিছু জোটাতে পারেন নি। কারণ সরকারী অফিসের হাজার হাজার লোকের আত্মীয়-বন্ধু ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন অফিসে। তাই কুন্তলাদি'র কর্মচ্যুতির খবরটা সর্বত্রই বাতাসের সঙ্গে ছড়িয়েছিল। তাই চাকরীর সৌভাগ্য কুন্তলাদি'র অদৃষ্টে আর দেখা গেল না। নীরোদবাবু জুটিয়ে নিলেন একটা কাজ। যদিও ডিগ্রীর অভাবে সেই যোগ্যতা নীরোদবাবুর ছিল না। তবুও তাঁর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়েই কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেই চাকরী দিয়েছিল,—যা নীরোদবাবু সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন।

কুন্তলাদি যখন দেখলেন পরাধীন কোন রকম টিউশনি বা চাকরী তাঁর অদৃষ্টে নেই, তখন তিনি আইন পড়তে শুরু করলেন। স্বাধীন আইনজীবী হবেন—এই তাঁর ইচ্ছা। যদিও দুর্জন লোকে অপবাদ দিয়ে থাকে যে কুন্তলাদির মাথার কয়েকটা স্ক্রু নাকি ঢিলা। কিন্তু বরাবরই দেখা গেছে, তিনি পরীক্ষা-বৈতরণী অনায়াসে অতিক্রম করেন। তাই এইবারও হল না তার অন্যথা। আইন পাশ তিনি করলেন। কিন্তু কেউই তাঁকে জুনিয়ার নিতে চান্ না। অবশেষে বৃদ্ধ অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ প্রকাশবাবুর সহায়তায় প্রতিশ্রুতি নিয়ে কুন্তলাদি কোর্টে আনাগোনা শুরু করলেন। কিন্তু এখানেও বাধে সংঘর্ষ। তিনি মক্কেলের স্বার্থ দেখেন না। দেখতে চান মক্কেলের দোষত্রুটি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মক্কেলরা। তারা প্রকাশবাবুকে জানায়—এমন জুনিয়ার তারা নেবে না। প্রকাশবাবু কুন্তলাদিকে বোঝাতে চান—মক্কেলের স্বার্থ দেখাই উকিলের কর্তব্য।

কুন্তলাদি বলে, 'কিন্তু মক্কেল যদি অন্যায় করছে বুঝি—তবু তাকে সৎপথের সন্ধান দেব না?'

বৃদ্ধ প্রকাশবাবু হেসে উত্তর দেন, 'এ তুমি ভুল পথে এসেছো মা। এ পথ ধর্ম-যাজকের পথ নয়। ন্যায়-অন্যায় বিচার করার মালিক আমরা নই। আমরা কেবল আমাদের সমস্ত বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে আমাদের মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করবো, যেমন করছে স্বপ্না, মায়া, গায়ত্রী। এরাও তো তোমার মত আইনজ্ঞ হয়ে আমার থেকে কাজ শিখছে। তোমার বিরুদ্ধে সব মক্কেলেরই যদি একই অভিযোগ থাকে—তবে আমি তোমাকে কাজ শেখাতে পারবো না।

কুন্তলাদি'র চরিত্রের হীনমন্যতা যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হয়ে বৃদ্ধকে বলে দিলেন মুখের উপর—'তা নয় স্যার, আমায় আপনি পছন্দ করেন না বলেই ওভাবে তাড়াতে চাইছেন। নতুবা এমন অন্যায় কাজ করতে বলতেন না কখনও!'

এত বড় অপমান সহ্য করেও প্রকাশবাবু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'সন্তানের কাছে সব মা-ই সমান। আমার চোখে তাই তোমরা চারজনই সমান। অপ্রিয় সত্য তো আমাকে বলতেই হবে। এতে অপছন্দ—পছন্দের প্রশ্ন ওঠে না।'

কুন্তলাদি' সরল উদারচেতা, প্রশান্তবাবুকে অহেতুক রূঢ় কথা বলে অপমান করলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশবাবুর দুয়ারও বন্ধ হয়ে গেল কুন্তলাদি'র সামনে।

এদিকে হঠাৎ একদিন নীরোদবাবু ট্রাম-বাসের সংঘাতের মধ্যে পড়ে তাঁর জীবন হারালেন। কুন্তলাদি সেদিন সত্যিই অনাথা হোলেন। কোন কূলে কোন আত্মীয় তাঁর আছে কি না—তিনি তা জানেন না। শ্বশুরকূলে যাঁরা আছেন—তাঁরা কোনদিনই কুন্তলাদিকেই গ্রহণ করেন নি—আজও তাঁর এই চরম দুর্দিনে কেউ পাশে এসে দাঁড়ালো না। চারিদিক হতে যেন বিপদের ঘন

কুয়াশায় কুন্তলাদিকে ঢেকে দিল। সম্বলহীন কুন্তলাদি যেন মূক বধির হয়ে গেলেন। পৃথিবীতে যার আত্মীয়-বন্ধু নেই—তার মত হতভাগ্য জীব বিরল।

কুন্তলাদি'র মত ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম-এ ও এল-এল বি পাশ মহিলাও আপন কৃতিত্বে জীবনে উন্নতির অনেক সোপানই অতিক্রম করেছিলেন। সুশ্রী, ভদ্র, উচ্চবংশের স্বামীও পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নি। চরিত্রের একটি দোষই তাঁকে জীবনের এই পরিণতিতে ঠেলে দিয়েছে।

আহ্বান

শ্রীলীলা ঘোষ

আজি মোরে পারের বাঁশি ডাকিতেছে
শুনিতেছি দিনের পারাবারে।
আজি দূর অভিমান মোর ঝরাপাতা পথে নিশীথ অন্ধকারে
সৃষ্টিছাড়া গৃহহীন শত শত পথিকের সাথে
চলিতে হইবে মোরে, দিবস-নিশীথে।
কোটি ছায়াপথ মায়াপথ দিয়া
আজি পরিক্রমা মোর বিশ্বের অন্তরালে।
মোর যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল বিশ্বের দেউলে
বাকী যাহা ছিল মোর, জীবনের পথে
তাহা শেষ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গেলাম
আজি মহাবিশ্বতটে—
সন্ধ্যা আলোকে।

ব্যাঙের ছাতা অখাদ্য নয়

রাণী মজুমদার

ব্যাঙের ছাতা খাওয়া তো দূরের কথা—আমাদের দেশে অনেকেই এটি স্পর্শ করতে পর্যন্ত ঘেন্না পান। সম্ভবত ব্যাঙ কথাটার জন্তে তাঁদের এত ঘেন্না। অনেকের বিশ্বাস—বৃষ্টি-বাদলার দিনে আশ্রয় নেবার জন্তে ব্যাঙ এই ছাতা তৈরী করে। এই ধারণা থেকেই 'ব্যাঙের ছাতা' নামের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—ব্যাঙের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আসলে এটি ছত্রাকজাতীয় একরকম উদ্ভিদ।

আমাদের দেশে আনাচে-কানাচে অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। কোথায়ও কিছু নেই—হঠাৎ দেখা গেল—কোন জায়গায় মাটি ফুঁড়ে অল্পসময়ের মধ্যে প্রচুর ব্যাঙের ছাতা বেরিয়েছে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি তারা পূর্ণাকৃতি লাভ করে। হঠাৎ স্থাপিত কোন সংস্থাকে বিদ্রূপ করে বলা হয়—ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে। ব্যাঙের ছাতায় কোন সবুজকণিকা বা ক্লোরোফিল নেই—সেজন্তে এরা নিজেদের খাদ্য তৈরী করতে পারে না—খাদ্যের জন্তে অন্তের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। খড়ের গাদা, পুরানো গাছের গুঁড়ি, উইয়ের ঢিবি, গোবর গাদা, মরা বা পচা উদ্ভিদ—এমন কি মৃত প্রাণীর দেহেও ব্যাঙের ছাতা জন্মায়।

আমাদের দেশে সাধারণত যে সব ব্যাঙের ছাতা দেখা যায়—সেগুলিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। বিষাক্ত
২। অবিষাক্ত।

ইচ্ছা থাকলেও—অনেকে বিষাক্ত ও অবিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা নির্ণয়ের দ্বিধায়—এটি খান না। অবিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খুবই সুস্বাদু এবং সুখাদ্য। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় ব্যাঙের ছাতা এখনও স্থান পায় নি। বাজারে সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা বিক্রী করবার জন্তে অনেকে নিয়ে আসে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাঙের ছাতার চাষের ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে চালু হয় নি। অবশ্য কেউ কেউ হয় তো নেহাৎ সখের খাতিরে ব্যাঙের ছাতার চাষ করে থাকেন।

ব্যাঙের ছাতা কেবল সুস্বাদু ও সুখাদ্যই নয়, এর খাদ্য-মূল্যও আছে। তাছাড়া এটি খুবই সহজলভ্য। খাদ্য হিসাবে ব্যাঙের ছাতাকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে চালু করতে পারলে—লাভ ছাড়া লোকসানের আশঙ্কা নেই। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খুব মারাত্মক। ভুল করে কখনও এটি খেলে—জীবন-হানির আশঙ্কাও থাকে। সেজন্তে ব্যাঙের ছাতা খাবার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে চিনে নিতে হবে—কোন্‌টা বিষাক্ত আর কোন্‌টা অবিষাক্ত। কয়েকবার চিনে নিলে—পরে নিজের চিনতে আর কোন অসুবিধা হয় না।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্মান, চীন, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করে প্রচুর পরিমাণে ব্যাঙের ছাতা উৎপাদন করা হয়। সেসব দেশে খাদ্যহিসাবে এর ব্যাপক চাহিদা আছে। শুধু তাই নয়—ঐসব দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে শুকনো ব্যাঙের ছাতা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা হয়।

সাধারণত ব্যাঙের ছাতার উপরকার আঁশ ছাড়িয়ে গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ হবার পর ব্যাঙের ছাতা মাংসের মত তলতলে হয়ে যায়। তখন সেগুলিকে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ডালনা বা তরকারী রেঁধে খাওয়া হয়। অনেকে ব্যাঙের ছাতা বেসন দিয়ে ভেজে কাটলেট বা ফ্রাই তৈরী করে খান। সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা কুঁড়ি অবস্থায় কিংবা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়া ভাল। কারণ—ফোটবার পর দুই-তিন দিনের মধ্যেই ছাতার নীচে পর্দার ভাঁজে ভাঁজে লাল, কালো প্রভৃতি রঙের খুব ছোট ছোট পোকা জন্মায়।

যে সব ব্যাঙের ছাতার গায়ের রং রকমারি বা যেগুলির গলার কাছে বাটির মত বেষ্টনী থাকে, যেগুলির ছাতা ছিদ্রযুক্ত ও দুর্গন্ধময়—সেগুলি বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা। বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা সহজেই ভেঙে যায় এবং কারো কারো ডাঁটা কিছুটা ফাঁপা থাকে।

সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতার গায়ের রং দুধের মত সাদা হয় এবং ডাঁটাগুলি সম্পূর্ণ নিরেট। কয়েকটি বাদে অধিকাংশ সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতায় আঁশ সহজে দেখা যায় না। আঁশশূন্য ব্যাঙের ছাতা খুব সুস্বাদু। ছাতুকোঁড়, কোঁড়ক, পাতালকোঁড়, ভুঁইফোড়, ভুঁইচম্পা, আঁধারমাণিক, ওল, ভুঁইপদ্ম, দুর্গাছাতু, কাঠছাতু প্রভৃতি নামে পরিচিত ব্যাঙের ছাতাগুলি সুখাদ্য এবং সুস্বাদু।

ব্যাঙের ছাতার স্পোর বা বীজরেণু থেকে নতুন ব্যাঙের ছাতার

উৎপত্তি হয়। স্পোর বা বীজরেণু থেকে সূক্ষ্মসূতার জালের মত এক রকম পদার্থ কাঠ, খড়, মাটি প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলি ছত্রাক-সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্র-জালের প্রতিটি গ্রন্থি থেকে এক-একটি ব্যাঙের ছাতা আত্মপ্রকাশ করে। এগুলি হচ্ছে বীজাধার। ব্যাঙের ছাতার নীচের দিক থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসংখ্য স্পোর বা বীজরেণু চারদিকে ছড়ায়। যে খড়কুটা বা মাটিতে ব্যাঙের ছাতা জন্মেছে—সেখান থেকে সেগুলি তুলে এনে অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় পচা কাঠ-খড় মিশ্রিত মাটিতে রুয়ে দিলে—এদের ফলন খুব ভাল হয়। এই ভাবে ইচ্ছামত ব্যাঙের ছাতা উৎপাদন করা যেতে পারে।

টাওয়ার অফ লণ্ডন

শ্রীঅঞ্জলি বোস

টাওয়ার অফ লণ্ডন ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়। অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিরাট টাওয়ারটি টেমস নদীর ধারে। একাদশ শতাব্দী থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত সে দেখে চলেছে টাওয়ার প্রাঙ্গণে বিচিত্র ঘটনাবলী।

বিজয়ী উইলিয়ামের তৈরী এই টাওয়ার। উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডন নগরীকে সুরক্ষিত করা। একদিন যা ছিল শুধুমাত্র ইটে ঘেরা প্রাচীর, কালে কালে তা পরিখাবেষ্টিত বিরাট দুর্গে পরিণত হল।

'টাওয়ার হিল' ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেই আপনার চোখে পড়বে লণ্ডনের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী চার চূড়াওলা এই টাওয়ার আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একে বলা হয় 'হোয়াইট টাওয়ার' বা 'কিপ'। একদিন এর মধ্যেই ছিল রাজপ্রাসাদ, ধনাগার, অস্ত্রাগার, কারাগার, ট্যাঁকশাল, মানমন্দির এমন কি চিড়িয়াখানা পর্যন্ত।

তেরটি টাওয়ারের সম্মিলন এই টাওয়ার অফ লণ্ডন। এখানে ঢুকতে হলে আপনাকে বাইওয়ার্ড টাওয়ারের তলা দিয়ে আসতে হবে, যেখানে দেখবেন দু'পাশে দুটি প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। পোষাক তাদের সেই ষোড়শ শতাব্দীর আমলের—দেখে আপনার ভালই লাগবে।

প্রহরীদের সিংহদ্বার পেরিয়ে এলে বাঁ দিকে দেখবেন বেল টাওয়ার। ফিশার, হোয়াইট টাওয়ারের জন্মদাতা বিশপ অফ রচেষ্টার, সেন্ট জেমস মোর, প্রিন্সেস এলিজাবেথ, জেমস, ডিউক অফ মনমাউথকে এই বেল টাওয়ারে বন্দী রাখা হয়েছিল।

বেল টাওয়ারকে বাঁ দিকে রেখে আর একটু এগিয়ে এসে ডান দিকে দেখবেন একটি লেখা—'ট্রেটারস্ গেট'। ঠিক সেন্ট টমাস টাওয়ারের নীচেই গেটটি। এটিই নাকি আগে টাওয়ারে ঢোকার প্রধান ফটক

ছিল। ডিউক অফ বাকিংহাম, সেণ্ট টমাস মোর, এ্যান বোলিন, ক্রমওয়েল, আর্ল অফ এসেক্স, লেডি জেনগ্রে, প্রিন্সেস এলিজাবেথ সকলেই এই গেট পেরিয়ে গেছেন হয় কারাগারে, নয় মৃত্যুবরণ করতে। তাই এর নামকরণ হয়েছিল 'ট্রেটারস্ গেট'।

এর সামনেই ব্লাডি টাওয়ার। দ্বিতীয় রিচার্ডের সময় এটি তৈরী হয়। এখানেই পঞ্চম এডওয়ার্ড ও তাঁর ভাই ডিউক অফ ইয়র্ককে হত্যা করা হয়। স্যার ওয়ালটার র‍্যালেও দীর্ঘ বারো বছর এখানে বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছেন।

ব্লাডি টাওয়ারের পাশেই ওয়েকফিল্ড টাওয়ার। এখানেই আছে 'রিগেলিয়া' অর্থাৎ রাজচিহ্ন। বিশেষ করে অভিষেকের সময় যেগুলি ব্যবহার করা হয়।

সেণ্ট এডওয়ার্ড নামে রাজমুকুটটি অনেক দামী চুনী-মুক্তো দিয়ে তৈরী। দ্বিতীয় চার্লস তাঁর অভিষেকের সময় এটি মাথায় ধারণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেক মুকুটটিতে তিন হাজার হীরে, তিনশো দামী পাথর ছাড়াও আছে 'ষ্টার অফ আফ্রিকা' নামে একটি বিরাট হীরে, একটি পদ্মরাগমণি যেটি পেড্রো দি ক্রুয়েল নোভারেটের যুদ্ধের পর ব্ল্যাক প্রিন্সকে উপহার দিয়েছিলেন। আর সবচেয়ে যে মণিটি রাজমুকুটের মাঝে 'জ্বল জ্বল' করছে, তা হল সেই বিখ্যাত কোহিনূর। এ ছাড়াও মণিমুক্তোখচিত ছোট-বড় অন্যান্য মুকুটের সংখ্যাও কম হবে না।

এই ওয়েকফিল্ড টাওয়ারের গ্রেট হলের ভেতর অষ্টম হেনরীর দ্বিতীয় স্ত্রী এ্যান বোলিনের বিচার হয়েছিল।

ওয়েকফিল্ড থেকে বেরিয়ে এসে সোজা খানিকটা গেলেই ডানদিকে পড়বে হোয়াইট' টাওয়ারের ঢোকার পথ। ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায় কত পুরোনো টাওয়ারটি। প্রথম জেমস পর্যন্ত সব রাজা-রাণীই এই প্রাসাদে বাস করে গেছেন। অভিষেকের আগে এই প্রাসাদে এসে থাকা আর অভিষেকের দিন এই প্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা করে ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এ্যাবিতে যাওয়াই ছিল রাজপরিবারের প্রচলিত প্রথা।

তবে টাওয়ারের সারা ইতিহাসটাই বেদনায় জড়ানো। দ্বাদশ থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত বিশিষ্ট রাজবন্দীদের নিয়ে এর সময় কেটেছে। টাওয়ারের প্রথম বন্দী হলেন রালফ, ফ্লেমবাউ আর শেষ বন্দী ছিলেন হিটলারের প্রতিনিধি রুডলফ হেস ১৯৪১ সালে।

কুইন এলিজাবেথ দি ফার্স্টকেও তাঁর বোন মেরী এই টাওয়ারে বন্দী করে রেখেছিলেন। শোনা যায়, ব্যুচাম্প টাওয়ার আর বেল টাওয়ারের মধ্যবর্তী যোগাযোগ পথটিতে এলিজাবেথ বন্দী অবস্থায় পায়চারী করতেন। তাই এই পথটির নাম হয়েছে 'এলিজাবেথ ওয়াক'।

টাওয়ারের অস্ত্রাগারটি দেখার মত। মধ্যযুগ থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র নানাভাবে সাজানো আছে। অস্ত্রাগারটিকে একদিক থেকে মিউজিয়ামও বলা যেতে পারে। সবার ওপরতলাতে আছে ইংলণ্ডের রাজাদের নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র। নরম্যান চার্চের ধরণে সেণ্ট জন্স চার্চ নামে একটি ছোট গির্জাও এখানে আছে।

হোয়াইট টাওয়ারের উল্টোদিকে ব্যুচাম্প টাওয়ার। ওখানে যাবার পথে আপনাকে একটুখানি দাঁড়াতে হবে—ডানদিকে দেখবেন রেলিং-এ ঘেরা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো একটা ছোট্ট জায়গা। হ্যাঁ, এই সেই জায়গা। এখানেই উইলিয়াম লর্ড হেষ্টিংস, এ্যান বোলিন, মার্গারেট, কাউণ্টেস অফ সল্‌সবেরী, অষ্টম হেনরীর পঞ্চম স্ত্রী ক্যাথারিন হাওয়ার্ড, জেন, ভাইকাউণ্টেস রচফোর্ড, গিলফোর্ড ডাডলের স্ত্রী লেডি জেনগ্রে প্রত্যেকেই একে একে ঘাতকের নির্মম ছুরির কাছে মাথা পেতে দিয়েছেন।

এঁরা প্রকাশ্যে মৃত্যুবরণ করতে চান নি বলে টাওয়ারের ভেতরে এঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তা না হলে প্রকাশ্য 'টাওয়ার হিলে' এঁদের যেতে হত যেমন একদিন গিয়েছিলেন সপ্তম হেনরীর মন্ত্রী ডাডলী, তাঁর পুত্র, পৌত্র, মোর, ফিশার, আর্ল অফ এসেক্স প্রভৃতি আরো অনেকেই।

এখানে একটু দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন ব্যুচাম্প টাওয়ারের দিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই টাওয়ারটিকেও কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল। এখানেও বহু সম্ভ্রান্ত রাজবন্দীর কাহিনী আছে।

হ্যাঁ, র‍্যাভেন্‌সের কথা না বলা হলে টাওয়ার অফ লণ্ডনের কথা শেষ হল না। 'র‍্যাভেন্‌স্' হচ্ছে দাঁড়কাক। একদিন সারা লণ্ডনেই এদের দেখা যেত। খুব স্বাভাবিক যে এরা টাওয়ারে বাসা বাঁধতো। কিন্তু এখন এদের সংখ্যা একেবারেই বিরল। তাই টাওয়ার কর্তৃপক্ষ ছ'টি র‍্যাভেন্‌স্‌কে অতি যত্ন সহকারে খাঁচার মধ্যে রেখেছেন। তার কারণ হল এদেশে একটি কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, যেদিন র‍্যাভেন্‌স্‌রা টাওয়ার ছেড়ে চলে যাবে সেদিন ব্রিটিশ রাজত্বও শেষ হবে।

'লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।'

বঙ্গ সাহিত্য সাধনায় নারী

অমিতা পালিত

পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যায় তোমার বাল্মীকি ব্যাস যেখানে ব্যূহ রচনা করেছেন, নারী যেখানে প্রবেশ করতে পারে নি।

মাত্র ঋক বেদে অল্প কিছু নারী ঋষির লেখা কবিতা পাওয়া যায়। প্রাচীন রোম, গ্রীক ও সংস্কৃত-সাহিত্যের মধ্যেও নারীর কোন দান নেই।

মোগল আমলে পার্শি-সাহিত্যে জেবউন্নিসা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার কবি চন্দ্রাবতীর নাম পাওয়া যায়।

বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে পুরুষ এতদিন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ইংরাজি সাহিত্যে জেন অস্টেন, জর্জ এলিয়ট, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং এঁদের উনবিংশ শতাব্দীর আগে আমরা পাই নি। অতএব দেখা যায় যে, দেড়শত বৎসর পূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাহিত্যে কোথাও নারীর বিশেষ কোন দান নেই। সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে মহিলা লেখিকার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষ প্রসারলাভ করে নি। কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের অন্তঃপুরের মধ্যে

ইহা গণ্ডিবদ্ধ ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে শিক্ষা-লাভের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

রামমোহন প্রমুখ মনীষিগণের চেষ্টা ও মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। তৎকালীন হিন্দুসমাজ ও সংস্কার মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উদার ভাবাপন্ন ছিল না। সে সময় সরকারী শিক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন বেথন সাহেব। ১৮৪৯ সনের ৭ই মে এদেশীয় মনীষিগণের সহায়তায় ইনি কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারপরই এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও মহিলাদের অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এই সমস্ত লেখিকাদের রচিত কবিতাবলী 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকামিনী দাসী রচিত চিত্ত-বিলাসিনী নামক কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, এই রচনা প্রকাশের দশ বছরের মধ্যে (১৮৫৬-৬৬) আরও সাতজন গ্রন্থকর্ত্রীর দেখা পাই।

(১) বামাসুন্দরী দেবী (২) হরকুমারী দেবী (৩) কৈলাসবাসিনী দেবী (৪) মার্থা সৌদামিনী সিংহ (৫) রাখালমণি দত্ত (৬) কামিনীসুন্দরী দেবী (৭) বসন্তকুমারী দাসী। এঁদের মধ্যে কামিনীসুন্দরী দেবী মহিলাদের মধ্যে প্রথম নাটক রচয়িত্রী।

সে সময়কার শিক্ষা ও প্রতিকূল সমাজজীবনের অবস্থা বিচার করলে এই মহিলা লেখিকাদের উদ্যম ও সাধনা সম্পূর্ণ অলৌকিক বলে মনে হয়।

কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজ ও কেশবচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টা স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করে। একদিকে এই শিক্ষার প্রসার অপর দিকে তাঁদের লিখিত বই ও পত্র-পত্রিকা দ্রুত প্রকাশ হতে থাকে। এই হল ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বামাবোধিনী, অবলা বান্ধব ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে মহিলাদের পাঠ্য উপযোগী বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হতো, ফলে মহিলাদের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে এবং শীঘ্রই বাংলা দেশে মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হল।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শিল্প ও সুষমার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন ঠাকুর পরিবারের এক অসামান্যা মহিলা রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী। ইনি একাধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নাটক, প্রবন্ধ ও বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনা সমস্তই রচনা করে গেছেন। অপূর্ব প্রতিভার যাদুস্পর্শ এবং পারিপার্শ্বিক অনুকূল অবস্থাই তাঁকে চরম সার্থকতা দান করেছে।

বঙ্গ মহিলাদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তিনি নিজে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন।

এর পর আরও কয়েকজন মহিলার পরিচয় পাই যাঁদের দান বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে রেখেছে।

জ্ঞানদা দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, সরলা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী, কুচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী, কামিনী শীল, সুশীলাবালা দেবী ও বনলতা দেবী ইত্যাদি এঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও সাহিত্যচর্চা করে গেছেন যেমন—বঙ্গমহিলা, অনাথিনী, হিন্দু ললনা, ভারতী, বালক, পরিচারিকা, মহিলা, বঙ্গবাসিনী, বিরহিণী, পুণ্য ও অন্তঃপুর ইত্যাদি।

যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচনায় বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহিলা রচিত বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক বিশ্লেষণে।

স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ চন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। অনুরূপা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর উপন্যাসে প্রাচীন পরিবার ব্যবস্থায় নারীর স্থান ও সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছিল।

সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর মধ্যে নারীর এই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সীমা লঙ্ঘন এবং বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক পর্বের ঔপন্যাসিকাদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, সাবিত্রী রায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ও সুলেখা সান্যালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এঁদের রচনা আলোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলা উপন্যাসে নারীর বিশিষ্ট বক্তব্য ও নিজস্ব দান আছে।

নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনের বিচিত্র বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে বর্তমান জীবন-সংগ্রামের ব্যাপক অভিজ্ঞতার মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কনে বাংলা উপন্যাস জগতে এঁরা এনেছেন যুগান্তর।

স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যে মহিলাদের দানের ক্রমোন্নতি ও আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে—প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, কাব্য ও কথা-সাহিত্য ইত্যাদি নানা শাখায়। তথাপি এইটুকু বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতা যে অনুপাতে বিস্তার লাভ করেছে লেখিকাদের সংখ্যা সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে সে অনুপাতে বৃদ্ধিলাভ করে নি।

এর যথাযথ কারণ কি? প্রতিভার অভাব না উপযুক্ত সুযোগের অভাব? বিদ্যাচর্চায় এঁরা যথেষ্ট সংখ্যক হলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁদের সংখ্যা এত সামান্য কেন?

সাধারণত মেয়েরা যাঁরা লেখাপড়া করেন তাঁদের সংসার এবং সমাজের দাবী মেটাতে গিয়ে তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে একাগ্র চিত্তে সাহিত্য রচনা ও সাহিত্য-সৃষ্টির সুযোগ পান না।

'বঙ্গ-সাহিত্য সাধনায় নারী' প্রবন্ধ আলোচনায় দেখা গেল নারী প্রথমে ছিল পর্দার অন্তরালে অন্তঃপুরবাসিনী, পুরুষকে দিয়ে এসেছিল প্রেরণা।

তারপর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে নারী প্রথম বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ লাভ করল এবং সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। এই অভিযান আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে অনুকূল পরিবেশে এবং সুধীজনের সহায়তায় এই কামনা করি।

সন্ন্যাসিনীর পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর থেকে যে কথাগুলো বারবার ঘুরে-ঘুরে এসে আঘাত করে তাকে, এক কনফেসন্তালে ছাড়া বলতে অবধি পারে না যে কথা, সেই কথাগুলোই এখন এত জোরে চেঁচিয়ে ওঠে তার চিন্তায় যে, সশংকে তাকাতে হয় চোখ তুলে—আর কেউ শুনে ফেলল কি না।···এখানে আমার স্থান নেই! ···এই রিক্রিয়েশনের জীবনটার সংগে মিলই হয় না আমার। ···আমি বলিষ্ঠ নই তেমন···

এই সময় একদিন রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল ওদের রিক্রিয়েশনে যোগ দিতে এলেন। সেইদিন থেকে এই ভীতিপ্রদ, বিরক্তিকর সময়টার রূপ একবারে বদলে গেল সিস্টার লুকের চোখে। ওরা তখন রিপু করার কাজ শুরু করেছে হাতে···কথাবার্তাও চলছে ছেঁড়া-ছেঁড়া, মুহূর্ত কয়েক পরে সুপিরিয়র জেনারেল এলেন। সবাই উঠে দাঁড়াল তখনই, তিনি এগিয়ে যেতে বাও করল। অন্য সময় যে রকম আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তেমন কিছু নয়, রিক্রিয়েশনে বড় সিস্টার যিনিই থাকেন তাঁকে যেভাবে অভিবাদন জানায় তেমনি। মোটামুটি একটু মাথা নোয়ানো কেবল।

তিনি স্মিত হেসে বললেন, আমি আটকে পড়েছিলাম। ঐ ঘণ্টাধ্বনির কর্তৃত্ব যে তাঁর ওপরও সমান প্রযোজ্য হাসিটুকু সেই কথাই জানালো। বসে কোলের ওপর সেলাইয়ের থলিটা রেখে সেলাইটা বার করে নিলেন। সিস্টার লুক দেখল একটা মোজা সেটা, কিন্তু রেভারেণ্ড মাদার কখনই নিজে এ ভাবে ছিঁড়ে থাকতে পারেন না। গোড়ালির জায়গাটায় মস্ত একটা গোল গর্ত শুধু। এ কেবল বাগানের বা লণ্ড্রীর নানদের স্যাবোসের ধাক্কাতেই হওয়া সম্ভব।

সেটাই প্রথম সিস্টার লুককে রিক্রিয়েশনের প্রকৃত অর্থ বোঝাল। সুপিরিয়র জেনারেল যখন এসে বসেন···চেয়ারের পিঠে পিঠ কখনও ঠেকে না···ভাব-ভংগীতে উচ্চশিক্ষার ছাপ, সেই মানুষটিকেই দেখা যায় সনিষ্ঠ নিপুণতায় কোন অতি সাধারণ সিস্টারের মোজা রিপু করছেন। হাত দু'খানি আপাতত বদান্যতার ব্রতে লিপ্ত। সে বদান্যতা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায় তারপর। এই কণ্ঠস্বর একদিন তাদের বলেছিল, এ জীবন প্রকৃতি বিমুখ—প্রায় এক বছর হয়ে গেল। আজ সে কণ্ঠে ঘনিষ্ঠ সুর আরও। এক এক করে কথা বলছেন তাদের সংগে···সব বিভাগের কাজ-কর্ম নিয়েই এমন ভাবে কথা বলছেন যেন প্রত্যেকের পাশেই দাঁড়িয়ে কাজ করেন তিনি। লণ্ড্রীতে···যেখানে পুরানো বয়লারগুলোর জন্য আবার অসুবিধা হচ্ছে। শিশু হাসপাতালে··· যেখানে সম্প্রতি এমন ঘাম দেখা দিয়েছে যে নার্সদের ডিউটি দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশ্য সবার মনে দাগ কাটুক। কি একটা শক্তি, তাঁর মধ্যে থেকে নিঃসৃত হয়, রিক্রিয়েশনের বৃত্তটাকে ঘিরে তার গতিপথটা যেন সাদা চোখেই দেখা যায় একেবারে।···হাসতে যাদের বিশেষ দেখা যায় না তাদের মুখে হাসি ফুটেছে···মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাচ্ছে···শুভ্রবস্ত্রাবৃতা যে শিক্ষানবীসদের কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রমে চেপে রাখা স্নায়বিক দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ছে বারবার ব্রত নেবার দিন এগিয়ে আসছে যত তাদেরই কণ্ঠে প্রশান্তির সুর লেগেছে এখন।

পরে পরে সিস্টার লুক দেখেছে রেভারেণ্ড মাদারের চোখ দু'টো চুম্বক যেন, যত গভীরেই লুকোনো থাক দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলোকে আবিষ্কার করে ফেলে ঠিক তারা। আর আবিষ্কার করলে প্রশমনের বিধিও তাঁর জানা। নীরবে যে যুদ্ধ করছে অন্তরের সংগে সব সময় যে তাকে ডেকে কথা কন তাও নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। হয় তো অন্য একজনকে কিছু বলেন আর সেই সংগে তার সংগেও কথা বলা হয়ে যায়।

মনের প্রকৃত চিকিৎসক ইনিই। অন্যদের মনের এই অতিপ্রাকৃত অনুভবের এমন পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা করতে কোন মনস্তত্ত্বের ডক্টরেটও পারবেন না। আত্মত্যাগে কৃশ মুখখানি···ঝুঁকে পড়ে মোজার গোড়ালি রিপু করছেন···সে মুখের দিকে তাকালে সংশয় থাকে না যে যীশুর অনুলিপি দেখছে! সেটা এমনই ত্রুটিহীন যে বোঝা যায় না অনুলিপি বলে।···প্রভাবটা এত শক্তিশালী ছিল মনে, এত গভীরে

নাড়া দিয়েছিল যে, বহু বছর পরেও মাদার হাউসের বহু যোজন দূরে কোন শীতের দেশের মঠের ঠাণ্ডা পরিবেশে রিক্রিয়েশনে বসে স্থানীয় মাদার সুপিরিয়রের আকৃতির ওপর ইচ্ছে করে ক'টা রেখা টেনে রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের প্রতিমূর্তি এঁকে নিত আর ঐ কালো চোখের নিরসন-দক্ষতা অনুভব করত আবারও! যে চোখের দৃষ্টি মর্মভেদ করে অন্তর্দ্বন্দ্বগুলোর ওপর গিয়ে পড়ে।

সংশ্লিষ্ট কোন হাউসের বা তাঁদের কোন মিশনের কোন নান কিছুদিনের জন্য আসেন যখন, রেভারেণ্ড মাদার রিক্রিয়েশনে নিয়ে আসেন তাঁকে। ওদের ভবিষ্যতের এক টুকরো ছবি দেখাতে যেন। তাঁরা সর্বদা সম্মানের আসন পান রেভারেণ্ড মাদারের ডান পাশে। তা' বলে তাঁর সমস্ত মনোযোগের ওপর আধিপত্য করতে তিনি দেবেন না কখন তাঁকে, যত ব্যগ্র উচ্ছ্বাসই তিনি তাঁদের স্কুল, হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামগুলোর সাফল্যের কথা ব্যক্ত করুন। দূরবর্তী জায়গায় ভগবানের কাজে ব্রতী হয়ে যাবার যে কি তৃপ্তি তার পূর্বাভাসটুকু পেতে ওদের যতক্ষণ লাগে তার বেশী এক মুহূর্তও কথা বলতে দেবেন না তাঁকে। তারপরই আবার ওদের সংগে কথাবার্তায় ফিরে যাবেন এমনই দক্ষ এবং সূক্ষ্ম কৌশলে বাধা যে দিলেন কেউ বুঝতেও পারবে না। দূরাগত মিশনারী সিস্টারদের চেয়ে ওদের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলোর বিষয় তিনি এক চুলও কম মনোযোগী নন। তাঁর অনন্যসাধারণ স্মিত হাসি সেই আশ্বাসই বয়ে আনে।

পাঁচ

ব্রত নেবার আগে এক সপ্তাহ নির্জন বাস শেষ হয়ে গেল।

সপ্তাহান্তে মিস্ট্রেস ওদের চ্যাপটার হলে নিয়ে এলেন শেষ নির্দেশ দিতে।

সাদা স্ক্যাপুলার আর ভেল এবার কালোগুলোর স্থান নেবে, সেই ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা দিলেন। অলটারের ওপর ঈশ্বরের কাছে এবং এই ত্রিবার্ষিক পর্যায়ে সুপিরিয়র থাকবেন যিনি তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকারের লিখিত প্রতিজ্ঞা পাঠেরও। এই তিন বছর পরে চিরব্রত গ্রহণ করবে ওরা। এখন থেকে যেখানেই পাঠানো হোক তাদের এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা লেখা পার্চমেন্ট কাগজটিও সংগে যাবে, মৃত্যুর পর তাদের যুক্ত করে দিয়ে দেওয়া হবে চিরতরে। ব্রোঞ্জের যে ক্রুশফিক্সটি নানদের বুকের ওপর ঝোলানো থাকে সেটি অলটারে দেওয়া হবে তাদের, সাদা কয়ার কেপটাও। দীক্ষিতা নানমাত্রেই সর্বদা এটি পরেন চ্যাপেলে।

ওদের দেখাবার জন্য মিস্ট্রেসের নিজের কেপটি সেখানে ছিল। সেলাইয়ের জোড় পড়ে নি কোথাও, পাশে খোলা নেই। মাথা গলিয়ে পরতে হয়, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঝুল, অল্প অল্প কুঁচি দেওয়া, পিছন দিকটা একটু বেশী লোটানো। বিশাল আস্তিনগুলো প্রায় মেঝে ছুঁয়েছে, সুপিরিয়রকে অভিবাদন করতে হাত তোলার সংগে সংগে সেগুলো ছড়িয়ে গিয়ে পাখীর ডানার মত দেখায়।

আরও একটা জিনিস তারা পাবে। মিস্ট্রেস পকেট থেকে নিজেরটা দেখালেন বার করে—ছোট রিং একটা, পাঁচটা চেন ঝুলছে তা' থেকে, আর প্রতি চেনের আগায় এক একটা সূচোলো হুক। সপ্তাহে দু'বার ডরমিটোরির আলো নিভে গেলে কয়েক মিনিট যে অদ্ভুত শব্দ শোনা যায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এবার।

নিয়মানুবর্তিতার এটাও অংগ। বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্র। প্রতি বুধ ও শুক্রবার রাত্রে সিনেরেয়ে বলার সময়টুকুতে প্রত্যেক দীক্ষিতা নান অনাবৃত কাঁধের ওপর এটি দিয়ে আঘাত করেন। কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে আত্মনিগ্রহের অমিতাচার না হয়ে যায় এই হুক দেওয়া চেন ব্যবহার করার ভাণ করা অথবা ব্যবহার না করা যতটা অন্যায়, অতিব্যবহারও ততটাই।

সিস্টার লুক স্থির চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে এটা আমার কাজে লাগবে খুব···হঠাৎ অয়েসটার খাবার ইচ্ছে হবে যখন অথবা যখন জাগতিক কোন কামনা দিনে আমার দেহকে, রাত্রে আমার স্বপ্নকে পীড়ন করবে···আমি ব্যবহার করতে পারব এটা। কিংবা সর্বাধুনিক মেডিক্যাল বইগুলো দেখার ইচ্ছে থিয়েটার, সিমফ্যানি বাজনা বা আর্ডেন্সে পাহাড়ে চড়ার বাসনা উত্যক্ত করবে যখন আমাকে, তখনও।

ঐ ছোট চেন আর সূচোলো আঁকশি অন্য ভাবনার খোরাক যোগাবে।

চেষ্টা করছে ভাববে না এমন একটা নিয়মের বিরুদ্ধে যাবার সংক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া কি হতে পারত; তবু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর রাগত কণ্ঠস্বর জোরালো হয়ে উঠছে। মনে হ'ল যেন বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন—উন্মাদের দল···ভগবানের দেওয়া স্বাভাবিক জীবন থেকে মনকে সরিয়ে নিতে নিজেদের আছড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছে কোথায়! ···নিজেকে তিনি জাগতিক জীবন থেকে কোনদিন সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন নি, তাই তাঁর ধারণাই নেই আধভাঙা খোলার ওপর মাংসল অয়েসটার চিন্তায় কতখানি প্রকট হয়ে উঠতে পারে—বিশেষত জানা আছে যখন কোন অলৌকিক ঘটনাবলে খাবার ঘরে কাঠের টুকরোটার ওপর তেমন একটা এসে না পড়ে যদি তো কোনদিনও আর একটাও খেতে পাবার সম্ভাবনা নেই···যৌন-প্রবৃত্তি এর দশভাগের একভাগও বিচলিত ক'রে না।

মিসট্রেস বলছেন, আত্মনিগ্রহের এই নিভৃত প্রায়শ্চিত্ত আমাদের সঙ্ঘে সমর্থিত এই সর্তে যে, ব্যবহারটা পরিমিত থাকবে। সারা ধর্মজীবনে তোমরা সপ্তাহে দু'বার এই প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু যে শারীরিক শক্তিতে প্রয়োগ করবে, জোরটা তার ওপর দিও না। জোর দেবে আধ্যাত্মিক অর্থটার ওপর—পাপের আসল অনুতাপ সেটাই।

আমাদের বাকি ধর্মজীবন ধরে···

মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যে দশটা ধর্মজীবন সে কাটিয়ে এসেছে। হোলি রুলের নির্দেশমত বাঁচবার এই দেড়-বছরব্যাপী প্রয়াসটার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল।

···প্রতিদিনের নয়, প্রতি মুহূর্তের প্রয়াস···তাই করতে হয়।

এ যেন দীর্ঘস্থায়ী একটা জ্বর ভোগকে মনে আনার চেষ্টা! জ্বর ভোগটা করেছে সেই, অথচ ঠিক যেন ধরতে পারে নি কেমন কেটেছে অবস্থাটা। জ্বরের ঘোরে যেমন তেমনি এক্ষেত্রেও অসংলগ্ন বকেছে অবিরত···কি করতে ইচ্ছে করছে সবচেয়ে···কি খেতে··· কি বলতে। তারপর ঠিক তার বিপরীত কাজ, বিপরীত খাওয়া,

বিপরীত কথার দিকে চালনা করেছে নিজেকে—নিজেকে খুসী না করে ঈশ্বরকে খুশী করতে।

শিক্ষানবিসীর উক্ত উত্তেজনায় সন্দেহ প্রায়ই সবিক্রমে প্রশ্ন করে! সত্যই কি এ পথে আসবার ডাক পড়েছিল আমার? এ জীবন গ্রহণের প্রয়াস না করছি যতক্ষণ জানতে পারছি কি করে তাঁর ডাক শুনেছি কি না! কিন্তু তারপরেই বা আর জানতে পারছি কি করে—আমার ঐ প্রয়াসটাই তো বদলে দিচ্ছে আমায়···জিজ্ঞাসা যে করবে সেই মনটাকেই তো ত্যাগ করতে হচ্ছে!

দলের অন্য মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয় সিস্টার লুক—ওদের মুখে যে পরিবর্তন দেখছে ওর নিজের মুখেও কি প্রতিবিম্ব ফুটছে তার! জ্বর থেকে সেরে ওঠার পর যেমন পরিষ্কার দেখায় মুখখানা তেমনি একটা ভাব ফুটেছে সবার মুখে। তরিতরকারীর বাগানে কাজ করে যারা তাদের রুক্ষ স্বাস্থ্যবান মুখেও একই রকম পবিত্রতার ছাপ।

মিসট্রেস একদিন বলছিলেন, আত্মকেন্দ্রিকতা জয় করে তবেই আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভ সম্ভব। কাজেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিহার করবার চেষ্টা কোর সর্বদা। আভ্যন্তরীণ হোক বা বাহ্যিক হোক—কোন কিছু ব্যক্তি প্রাধান্য সৃষ্টি করছে মানেই ব্যক্তিমন প্রতিষ্ঠা করছে নিজেকে। আর তার অর্থ পূর্বজীবনের মনটাকে এখনও দাবিয়ে ফেলতে পারি নি।

তবু সিস্টার লুকের ধারণা এই বিশেষ জীবনই বিচ্ছিন্ন করেছে তাদের—পরস্পরের কাছ থেকে শুধু নয়, সারা জগৎ থেকেই—বিশেষত্ব দিয়েছে। হ্যাবিট পরার ফলে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় সেটা যদি নাও থাকত—ধর যদি হ্যাবিট না পরত ওরা এই বিশেষত্ব তবুও চোখে পড়ত। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়মে বাঁধা··· আমাদের কথায় 'আমার' শব্দটার ব্যবহার নিষেধ···আমাদের ভাষায় 'পারব না' কথাটার স্থান নেই। যে বিবেক মানুষের জন্মসূত্রে পাওয়া—যা নৈতিক ভাল-মন্দর অনুভববেদ্য চেতনা—এখানকার নিয়মে তাকে কঠিনতর শিক্ষা দিয়ে প্রত্যহ দু'বার সবলতর করে তোলার চেষ্টা করতে হয়, সে যাতে প্রবলতম অন্তরেন্দ্রিয় হয়ে ওঠে।

দলের দু'টি মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, শোনা যাচ্ছে ওরা নাকি ব্রত নেবে না। সম্ভবত ধূলার ধরণীতে ফিরে যাবে আবার···ওদের বিবেকই বলেছে পৃথিবীর মায়া ওরা কাটাতে পারে নি। তাদের আগ্রহান্বিত মুখগুলো আর সবারই মত তবু—স্নিগ্ধ, পবিত্র। প্রথম ঢুকেছিল যখন, আজকের এই সূক্ষ্ম পবিত্রতা সেদিন ওদের মুখে ছিল না। নানদের শান্ত, ঋজু চলার ভংগিমা, অংগভংগীহীন সম্বন্ধপদহীন ভাসা, চোখ নীচু করে থাকার অভ্যাস—শিক্ষাগুলো ভুলতে কতদিন লাগবে? এই দেড় বছরের লৌহ-শৃংখলা ভাঙতে প্রথম প্রথম ভারি অসুবিধা হবে ওদের। ভেবে সহানুভূতি হচ্ছে।

হে প্রভু, গ্রহণ কর আমায়···

ব্রত গ্রহণানুষ্ঠানে দু'শো সিস্টার তাদের সঙ্গে গাইছেন। অলটারের দিকে এগিয়ে যাবার আগে নেভের মাঝখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হ'ল তারা।

জাগতিক জীবনের কাছে তাদের মৃত্যু···দর্শকদের আসন থেকে নিষ্পলকে তাকিয়ে আছেন যে আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের কাছে তাদের মৃত্যু···এখনও শিক্ষানবিসীর সাদা পোশাকের আবরণের নীচে পুরোনো মনটার কাছে তাদের মৃত্যু—এই প্রণাম তারই দৃশ্য প্রতীক।

তিন দল কয়ার উচ্চসপ্তকে গ্লোরিয়া প্যাট্রি(১) ধরেছে—গান শুরু হতেই ওরা উঠে দাঁড়াল, অলটারের দিকে এগিয়ে চলল সুধীর, সুষম পদক্ষেপে।

কয়ার সিস্টারদের সুর থেকে সুর ধরে নিয়ে মনসিগনরের নেতৃত্বে গান শুরু হয়েছে গুরুগম্ভীর স্বরে···ওদের চলার ভঙ্গীতে যেন তারই আভাস।

···তোমার সেবিকাকে রক্ষা কর প্রভু, তুমিই তার ভরসা। সে যেন ভাল হতে পারে, বিনীতা হতে পারে। বাধ্যতার বাঁধনে যেন আনন্দ খুঁজে পায়, শান্তি যেন তাকে ঘিরে থাকে। নিরন্তর প্রার্থনায় হৃদয় যেন ব্যাপৃত থাকে তার। সব শেষে প্রার্থনা করি হে প্রভু, তার অর্ঘ তুমি গ্রহণ কর···

···আর আমার দিক থেকে হে প্রভু, মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে যা যা করি আমি তা' তোমারই চরণে নিবেদিত···কানে যখন অন্তিম নিঃশ্বাসের শব্দ আসে···হাত দু'টো যখন বিছানার চাদরে এলিয়ে পড়তে দেখি! মৃত্যুর সব চিহ্নগুলো যখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির বিশ্বাস অনুযায়ী তাড়াতাড়ি কোন ফাদারকে ডেকে আনি···তোমার আর তার মধ্যে মিলনের সেতু হবেন বলে···অপার্থিব সেই মুহূর্তে তোমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি নিঃসন্দেহে···তোমাকে নিবেদন করবার মত আমার হৃদয়ভরা ভালবাসা আছে শুধু···আর আমার এই আঙুলগুলো কাজ জানে···দেহে শক্তি আছে···অবিশ্রান্ত ঘুরে ঘুরে কাজ করতে পারি, ক্লান্তি আসে না—এ ছাড়া কিছুই আমার নেই। কিছুই না। হে প্রভু তোমাকে দেবার আমার···

চিরব্রতা নান একজন অভ্যস্ত হাতে কালো স্ক্যাপুলারটি পরিয়ে দিয়ে পাশে নীচের দিকে বোতামগুলো আটকে দিলেন। ক্রুশিফিক্স, চামড়ার বেল্ট আর জপমালা এল একে একে। তারপর সাদা কয়ার কেপটা, কাঁধের ওপর পড়ে নিজের ভারেই বড় বড় ভাঁজে মেঝে পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ল। কালো ভেলে এবার ধবধবে কয়ফটা ঢাকা পড়েছে আর পিনের ছোট্ট বাক্সটিও কালো-মাথা পিনে ভর্তি হয়েছে নতুন করে। উঁচু অলটারের ওপর সামনে খোলা কাগজে নিজের নিজের ধর্মনাম সই করল ওরা।

অনুষ্ঠান-সমাপ্তির সংগীত শুরু হল তারপর: তোমার এই দয়া আমার মনে যেন চিরস্থায়ী হয় প্রভু···তুমি আমায় গ্রহণ করেছ, তুমিই এখন রক্ষা কর···

বসবার ঘরে এসে প্রথমটায় বাড়ীর কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না এত ভীড়।

১। পিতা ও পুত্র এবং আত্মা পরমেশ্বরের জয় হোক—আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে এবং যুগে যুগে সতত যেমন হইবে, তথাস্তু।

একপাশ থেকে পিসীমা চোখ মুছতে মুছতে ডাকছিলেন, গ্যাব্রিয়েল আমরা এদিকে।

শুনতে পেয়েও কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়ায় নি। শান্ত ধৈর্যে ধীর পায়ে সারা ঘরটা ঘুরল ওদের দেখতে না পাওয়া অবধি। যে নামে ওরা ডাকছিল সে নামে ও আর সাড়া দেয় না, অভ্যাসবশে অবচেতনাতেও না।

এক বছর আগে সন্ন্যাসিনীর পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় যেমন দেখেছিল বাবাকে, আজও তেমনই দেখাচ্ছে।

বললেনও ঠিক একই কথা, গ্যাবি, আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছ তুমি!

সবই এক ধরণের···সেই এক বছর আগের সেই দিনটিরই মত সব কিছু। কানে যে সংগীতের সুর বাজছে সেটাই পৃথক কেবল।

ভাবল বলে, এটা সম্ভবত কালো স্ক্যাপুলার পরার ফল বাবা। মনে নেই মা সব সময় বলতেন কালো পরলে রোগা দেখায়।

সাক্ষাতের সময় উত্তীর্ণ হতে আত্মীয়রা বিদায় নিলেন। নবদীক্ষিতারা মঠে ফিরে এল যখন কালো ভেল আর কালো স্ক্যাপুলারের মর্ম প্রকাশ পেল আরও এক ভাবে। এখন পসচুল্যান্টের দল সাদা রোব পরা নভিসদের দল নীচে তাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তারা চোখ তুলে। ওরা এখনও শপথ গ্রহণ করে নি। আর ওপরের স্তরে—বহুদূরে পূর্ণদীক্ষিতারা চিরব্রতা তাঁরা। পোশাকে এখন আর কোন প্রভেদ নেই তাঁদের সংগে, তবু নীরবতার প্রথা পৃথক করে রেখেছে তাদের।

প্রাথমিক পর্যায়ের দীক্ষিতাদের সংগে চিরদীক্ষিতাদের কি যে পার্থক্য বাইরের কেউ বলতে পারবে না কোনমতেই, পুরোনো নামমাত্রেই কিন্তু এক লহমায় বলতে পারবেন কে কি। নবব্রতা কেউ নজরে পড়ে গেলে—লম্বা করিডরের একপাশে কি শ্বেত-পাথরের সিঁড়ির মাথায়—ত্রুটির খোঁজে চোখ দু'টো তাঁদের সজাগ হয়ে ওঠে। এমনই মুহূর্তে চিনতে পারেন মনে হবে যেন ওরা কাঁধ থেকে বুক পিঠ দু'দিকেই বোর্ড ঝুলিয়ে ঘুরছে—তিনটে ভাষায় তাতে লেখা: আমরা একদিনের দীক্ষিতা। বড় সিস্টারদের এই ষষ্ঠেন্দ্রিয় অবাক করেছিল তাকে প্রথমটায়, তবে বেশীদিন নয়।

নতুন দীক্ষিতাদের পরদিন সকালেই অন্যান্য হাউসে পাঠানো হবে। আগের দিন শেষ বারের মত তারা সবাই একসংগে রিক্রিয়েশনে একত্রিত হ'ল—সেদিনই ব্রতগ্রহণের প্রাথমিক প্রভাবের চিহ্নগুলো নজরে পড়ল সিস্টার লুকের। রোজকার মতই সবাই ছোট কালো থলিগুলো নিয়ে এল···ক'জনের চোখে যেন স্বপ্নচারিণীর দৃষ্টি—সবই করছে কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নেই যেন। মিস্ট্রেসকে অভিবাদন করল···খোলা চোখের দৃষ্টি যেন কোন সুদূর জ্যোতির দিকে স্থির। সবচেয়ে কাছের চেয়ারটায় বসে পড়েছে, আগের মত ইতস্তত তাকিয়ে খোঁজে নি কোথায় বসা শ্রেয়—হয় তো সাদা রোবপরা কোন নভিসের পাশে···তার ততক্ষণে সিস্টারের পরিবর্তনটুকু সয়ে গেছে, যদিও গতকাল অবধিও দু'জনকে ঠিক একই রকম দেখাত।

এরা প্রচ্ছন্ন মিষ্টিক, পৃথক করছে নিজেদের। এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোথায় যেন শুনেছিল সিস্টার লুক। সিস্টার উইলিয়ামের কাছে কি? সাধারণ ছাত্রী ছিল যখন।

নিজের রিপুর কাজটা বার করে ডান'দিকের মেয়েটির দিকে চেয়ে মন্তব্য করল, হাসপাতালের করিডরে ছুটোছুটি করতে করতে এত তাড়াতাড়ি ছেঁড়ে মোজাগুলো!

মনটা কিন্তু স্মরণে আনবার চেষ্টা করছে কেবলই সেই কণ্ঠস্বরটাকে যা বলেছিল: কাজ আর ধ্যান-ধারণা পাশাপাশি চলে সেখানেই—এই আমাদের সংঘে যেমন, সেখানে এই মিসটিসিজম্ বা অতীন্দ্রিয়বাদের দিকে ঝোঁক সব সময়ই একটা সমস্যা। অথচ নতুন দীক্ষিতাদের মধ্যে এটা চোখে পড়ে প্রায়ই আর অল্পবয়সী কোন নান বাহ্যত সোজাসুজি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে রয়েছে এটা দেখতে সুন্দরও বড়। কিন্তু তার ফল দাঁড়ায় এই যে, এই সান্নিধ্যের আনন্দে যতক্ষণ সে বিভোর হয়ে থাকে ততক্ষণ যেন অন্যের মন, অন্যের হাত-পা তার কাজগুলো করে চলে। তবে বলা শক্ত এটা সত্যি কোন পৃথক অবস্থা কি না কিংবা আমরা যে অজান্তেই মাঝে মাঝে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ি এও তারই একটা রূপ।

অল্প নানেরা যে নীরব হয়ে রয়েছে মিসট্রেসের চোখ এড়ায় নি তা। কাল কে কোন কাজের দায়িত্ব নিয়ে কোন হাউসে যাচ্ছে খোঁজ নিলেন। প্রতি হাউসের মাদার সুপিরিয়রদের অল্পের মধ্যে নিপুণ বিবরণ দিয়ে স্বপ্নালু মেয়েগুলোকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন—যেখানে বৃত্তাকারে বসে সেলাই করছে সবাই সেইখানে। সিস্টার লুক গোপন কৌতুকে দেখছে মিসট্রেস এডিলার স্পেনীয় ভিক্ষুণী সংঘের সেন্ট্ থেরেসার সংগে এই সব মাদার সুপিরিয়রদের একজনের তুলনা খুঁজে পেয়েছে সেন্ট্ থেরেসা একজন বিখ্যাত মিসটিক ছিলেন যদিও, তবু বাস্তবধর্মী ছিলেন, বিচক্ষণ ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে একদল ঊর্ধ্বলোকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি নভিসকে বলেছিলেন, আমাদের আর সেন্টের দরকার নেই এখানে, ঝাঁট দেওয়া, ঘসাঘসি করে পরিষ্কার করার জন্যে অনেক পরিশ্রমী হাত চাই বরং।

সিস্টার লুক নিজে কিন্তু এই কালো স্ক্যাপুলার আর বুকের ওপর ঝোলানো নতুন জলজ্বলে ক্রুশিফিক্সের জন্য আধ্যাত্মিক অবস্থাতে কোন অসাধারণত্ব এসেছে এমন প্রমাদে পড়ে নি। কেবল ভারি স্বস্তি একটা—অদীক্ষিত নভিস-জীবনের প্রবল প্রচেষ্টার সমাপ্তি, অনন্ত করুণায় ঈশ্বর তার সামান্য অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন। এখন থেকে সে তাঁর, এখন থেকে যা ঘটবে তার সবই তাঁর সম্মতিতে ঘটবে।···সব ঘটবে তাঁর গৌরবের জন্য আর ওর হিতের জন্য—মিসট্রেসরা প্রায়ই বলেন তাই।

এর পর খাবার ঘরে এই নবব্রতাদের অন্তঃপরিবর্তন আরও বেশী চোখে পড়ল। নিয়মমত সার দিয়ে খাবার ঘরে ঢুকছে যখন ত্রুটিহীন হবার কি ঐকান্তিক আগ্রহ ফুটেছে তাদের সর্বাংগে। এটি কোথাও সিস্টার লুকের মধ্যেও নেই, সামনের সিস্টারটির পায়ের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি—মিছিলের সংগে সম-লয়ে পা ফেলে এগিয়ে আসছে যখন। প্রার্থনারম্ভের ইংগিতের আগে ক্রুশচিহ্ন করবার জন্যে প্রস্তুত করেছে নিজেকে। যুদ্ধারম্ভের ইংগিত পাওয়ার আগে সৈনিক যেমন নিজের মনে গোপনে এক,

দুই, তিন। 'আমেন' বলে চোখ তুলে মনে হল চিরব্রতাদের মুখে কেমন যেন একটা অবসাদের ছাপ দেখছে। অনেকখানি ব্যবধানে সুপিরিয়রের লাগোয়া টেবিলে বসেছেন যদিও, তবু বহিরাবরণের তলায় তলায় কি ঘটছে—নতুন দীক্ষিতাদের মধ্যে কয়েকজন যে বিচ্ছিন্ন করছে নিজেদের, ওঁরা অতিমাত্রায় সচেতন সে বিষয়ে।

বছর কয়েক পরে সেও বুঝবে এ অবসাদের উৎস কোথায়। কমিউনিটিতে নতুন দীক্ষিতাদের গ্রহণ করতে অনেকখানি মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়, এ অবসাদ তারই ফল। সেও একদিন নিয়মের অবরোধ ভেঙে ছোট ছোট 'ব্রাইড'দের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাবে। দৃশ্যপটে নূতনের আবির্ভাব···শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত তাদের উৎসর্গ-উৎসুক—দেখে তীব্র যন্ত্রণা-মিশ্রিত গর্ব অনুভব করবে সেও।

আচারে-ব্যবহারে সবিক্রম ত্রুটিহীন পূর্ণতা দেখানোর জন্যই সচেষ্ট ছিল ওরা সারাদিন কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কমিউনিটির আর সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নভিসদের মিসট্রেসের আপিসের বাইরে করিডরে অপেক্ষা করতে করতে তার অনেকখানিই মিলিয়ে গেল। মিসট্রেসের সংগে এই তাদের শেষ নিভৃত সাক্ষাৎ—কি কথা বলবে আপনমনে তার মহড়া দিতে দিতে মন সহজেই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে চাইছে। এই বিদায়ক্ষণের আগে পর্যন্ত তিনি ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করেছেন।···সিস্টার লুকের মত আর দু' একজনের ছাড়া চোখের জল বাঁধ মানছে না কারো।

নিয়ম-শৃংখলার এই উৎস-মুখ থেকে কাল তারা অনেক দূরে দূরে অচেনা হাউসে ছড়িয়ে পড়বে—নতুন নান হিসেবে জীবন শুরু হবে তাদের। সেখানে নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ই নিজের। মাদার হাউসের মত কেউ তাদের ওপর সতর্কদৃষ্টি রাখবে না, দারিদ্র্য আর বাধ্যতার সংকীর্ণ পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলছে কি না দেখবে না—জনা কুড়ির বেশী সিনিয়র নান থাকেন না সেখানে সম্ভবত। জাগতিক প্রলোভনও অনেক বেশী কাছাকাছি থাকবে। ধর্ম-জীবনের শৈশবে যে মাদার হাউস লালন-পালন করল এখন থেকে শুধু স্মৃতিতে তার স্থান। তিন বছর পরে চিরব্রত নেবার ডাক যতক্ষণ না পড়ে ওরা কেউ আর ফিরবে না এখানে। আর এই তিন বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি সমুদ্রপারে কোন মিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাউকে—ভারতে, চীনে, কি কংগোয়—তা'হলে স্থানীয় মাদার সুপিরিয়রের কাছে চিরব্রত নিয়ে নেবে সে। দেশে কিছুদিন ছুটিতে আসার অনুমতি পাবার আগে পর্যন্ত আসা হবে না মাদার হাউসে। এই দেড় বছরের পরিশ্রমে তাদের অন্তর-বাহির আজ অবশ্য মাদার হাউসের হোলি রুলকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এও সত্যি যে এ গ্রহণ ভংগুর, অস্থির···যে কোন একটা বড় মৈত্রীবন্ধনের মতই। তাদেরও তো এক ধরণের মৈত্রীবন্ধনই এবং বৃহত্তম মৈত্রীবন্ধনও তো বটে—স্বয়ং ভগবানের সংগে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় নি তারা?···ওদের রিক্তমুখে সেই ভাবই ফুটেছে।

মাদার হাউস যে ছেড়ে যেতে হচ্ছে সিস্টার লুকের নিজের মনে সেজন্য বিমুখী প্রতিক্রিয়া। সে যাচ্ছে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পড়তে। ভবিষ্যতে যে ভগবানের কাজে অনেক দূরে কোথাও মিশনারী নার্সের জীবন প্রার্থনা করে সে এটা তার সেই লক্ষ্যের প্রথম পদক্ষেপ। এখন আট মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটা মেয়েদের স্কুলে থাকতে হবে, যদিও সম্পূর্ণ যোগ থাকবে তার মাদার হাউসের সংগেই। মাদার হাউসে এই দু'শো জন নানের চোখের সামনে ছিল আর এবার থাকবে কয়েকজন মাত্র সিস্টারের সংগে, তাঁদের অধিকাংশ অধ্যাপিকা।···অন্তরটা কেন যেন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। হয় তো এই সুবৃহৎ সম্প্রদায় থেকে ছোট্ট সম্প্রদায়ে পালিয়ে যেতে পারছে ভেবে এবং পড়াশুনার লম্বা ঘণ্টাগুলোয় মঠ-জীবন থেকে মুক্তি পাবে।···নাকি ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা নেবার পথে পা বাড়ালো এবার, তাই। কংগোর নার্সিং তদারকীতে পাঠাতে কমিউনিটি যে যোগ্যতা চায় এ ডিপ্লোমা তারই ছাড়পত্র।

মিসট্রেসের কাছে বিদায় নিতে এসে নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বসে বসে ভাবছিল সেলাই দপ্তরের ভেসটো সিস্টার ইউডোক্সির সংগে সাক্ষাতের কথা। তাঁর কাছে নিজের প্রার্থনা বইখানা, লিটল্ অফিস আর ধ্যান-ধারণার বইগুলো দিয়ে আসতে গিয়েছিল, বাক্সে গুছিয়ে দেবার জন্য। গুহার মত এই সেলাই ঘরে আগে কখনও আসে নি। বৃদ্ধা নানটি কাজ করেন সেখানে, কমিউনিটিতে তাঁর চোখের তুলনা দেওয়া হয় গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর দৈত্যের সংগে—কপালের মাঝখানে যার মস্ত একটা চোখ। নানদের ছাবিট মেরামত আর রদ-বদল করে আর নভিস আর পসচুল্যান্টদের বিরাট একটা দলের হাসপাতালের চাদর ইত্যাদি সব কাপড়-চোপড় মেরামতির কাজ তদারক করে ধর্মজীবনের পঞ্চাশটা বছর কাটল তাঁর।

খাবার ঘরে আর উপাসনায় উপস্থিত থাকতেই হয় সবাইকে, কিন্তু তা'ছাড়া সিস্টার ইউডোক্সিকে তাঁর নিস্তব্ধ কর্মকক্ষের বাইরে বড় একটা দেখাই যায় না। অথচ সিস্টারদের গোপন জীবনের জানবার মত অনেক কথাই তাঁর জানা। যার পোশাক মেরামত করেন তার সারা জীবনটাই পড়ে ফেলতে পারেন ঐ পোশাকটা থেকেই—তাকে না দেখেই তার পূর্ণতা—অসম্পূর্ণতার বিচার করতে পারেন। স্কার্ট হেমের পিছনে ছেঁড়া দেখে বলতে পারেন সিঁড়ি নামবার সময় স্কার্টের পিছন দিকটা একটু তুলে নিতে গাফিলতি ঘটেছে—অবিবেচনায় দামী জিনিস নষ্ট হল মানে দারিদ্র্য-শিক্ষায় ত্রুটি ঘটল। পুণ্যজীবন বলতে যা বোঝায় সিস্টার ইউডোক্সি তার চেয়েও বেশী কিছু। হোলি রুলের মূর্তিমতী মানবিক প্রকাশ যেন মিসট্রেসদের থেকেও গভীরভাবে বোধ হয়।

অল্পবয়সী নানরা বলাবলি করে চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে শুধু হোলি রুল নয় তার যত কিছু উপাধি আর খুঁটিনাটি সব কিছুই সিস্টার ইউডোক্সির মধ্যে ধরা পড়েছে এসে।

দরজার সামনে সিস্টার লুক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। যাবে সে আর তার সুটকেশ গুছিয়ে দিচ্ছেন আর একজন—ভাবতেই একটা শিশুসুলভ বিদ্রোহ এসেছে মনে, শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। স্থির নিশ্চয় হল যখন মুখের হাসি থেকে বিদ্রোহের আভাসটুকুও মিলিয়ে গেছে তখন টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে অনুচ্চে বলেছিল যীশুখৃষ্টের জয় হোক।

ভেসটোর চোখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ছুঁচে সুতো পরাতেও চশমা লাগে

না। চোখ তুলে তাকালেন, মুহূর্তে হ্যাবিট ভেদ করে সোজা তার মোজা থেকে আঁট টুপীটা পর্যন্ত সব দেখে নিলেন যেন—কি রকম মজবুত আছে দেখতে। কাছে আসতে ইশারা করে গজের ফিতেটা তুলে নিলেন। ১০৭২ নম্বরের কার্ডখানা সামনে পড়ে, ঢোকার দিন থেকে তার সব দৈহিক মাপ লেখা আছে তাতে। এক বছর আগে সন্ন্যাসিনীর পোশাক নিল যখন কোমরের যা মাপ ছিল এখন তার চেয়ে তিন ইঞ্চি কম।

মাপ নিয়ে ভেসটো একটা শব্দ করলেন বিস্ময়ে।

সিস্টার লুক কথা হাতড়াচ্ছিল মনে মনে, এমন একজন মানুষের কাছে নিরাপদে বলবার মত কোন কথা। স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ নিয়ে কোন কথা বলতে গেলেও এমন ভাবে বলতে হবে যেন সেলাই বিভাগের সমালোচনার মত না শোনায় কিংবা এমনও না মনে হয় এতটা রোগা হয়ে গেছে বলে করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করছে।

অবশেষে অনেক ভেবে-চিন্তে বলল, আমার মনে হয় সিস্টার এ স্কার্টটা আর একটু ছড়ানো হলে হত।

বৃদ্ধা নানটি তার স্কার্টের ঢিলে পটিটা পরীক্ষা করছেন, ১০৭২ নম্বরের পোশাকের কার্ডে কোমরের নতুন মাপটা লিখছেন—শিরাবহুল হাতখানা কাগজের ওপর নড়ছেই না প্রায়, জায়গা বাঁচাতে এত ছোট হরফে লিখছেন। তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হ'ল পঞ্চাশ বছর ধরে এই বিশাল কনভেন্ট জগতের এক কোণে জগদীশ্বরের কাজ করে চলেছেন সিস্টার ইউডোক্সি সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। ছোট ছোট সংগ্রামী মেয়েগুলোর স্কার্টের পটি ছোটই করে চলেন, ওদের সংযম আর কৃচ্ছ্রসাধনের প্রমাণই তাঁর হাতের ছোট করা পটি। তারপর অনেক বছর পরে বৃদ্ধটা একটা সংঘের সমতায় পৌঁছে গেলে কোমরের চারদিকে একটু মেদ জমতে পারে—তখনই প্রথম পটির মাপটা বাড়াবার সুযোগ ঘটে। মাথার ওপরের সিঁড়ি বেয়ে কত দল নান উঠল-নামল···ছড়িয়ে পড়ল সারা বেলজিয়ামের নানা স্কুল-হাসপাতালের পথে··বাইরেও—ভারতে, আফ্রিকায়, দূরপ্রাচ্যে। সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের কাজের মিছিল চলেছে। এই বৃদ্ধা নানটির কাছে তার অর্থ বড় বড় ঝুড়ি-ভরা মেরামতের কাপড়···শেষ নেই তার, একের পর এক আসছেই।

··সিস্টার ইউডোক্সি চোখ তুলে তাকাবার আগেই মনের উত্তেজনাটুকু দমন করে নিতে পেরেছিল।

—আজ রাত্রে সালভে রেজিনার পর তোমার ড্রেসিং টাঙে নতুন আর একটা স্কার্ট পাবে তুমি কাল চলে যাবার আগে এ স্কার্টটা সেখানে রেখে যেও।

সিস্টার লুক অভিবাদন করে সামনে থেকে সরে এসেছিল। আত্মত্যাগের পরিপূর্ণ মূর্তিটি তখন অভিভূত করে ফেলেছে তাকে। বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে প্রার্থনা করেছিল ভগবানের কাছে তার কাজের পরিধি একটু বিস্তৃত হয় যেন। এত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ঈশ্বরের সেবা করতে সে পারবে না।

মিসট্রেসের ঘরে ঢোকার পালা এল। মিসট্রেস তাঁর ডেস্কে বসে। হিমশীতল সুন্দর মুখে সামান্য একটু লালচে ভাব, একটু উষ্ণতা। কঠিন সংযমের আবরণ ভেদ করেও বিদায়কালীন অনুভূতি স্পর্শ যে একটু করেছে তারই ইংগিত। স্মিত হাসিতে অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত হ'ল একটু, সিস্টার লুকের হাতে ছোট চামড়ার থলি দিলেন একটা—আঁকশি দেওয়া চেন আছে তাতে। অল্পবয়সী যে মেয়েগুলোকে সংযম আর দৃঢ়তা শেখালেন এতদিন, তাদের চলে যাবার সময় এই তাঁর উপহার।

বললেন, সংযম আর শৃংখলার কথা যা বলেছি ভুলো না যেন।

শুনে ও হঠাৎ বলে ফেলল, কিন্তু এ শৃংখলা সিস্টার, আমার জন্যে নয়। আমার জীবন সাধারণ জীবন—সংঘের জীবন। অবশ্য আপনার চোখে তো পড়েছেই। একবারও মোজাসুজি কথা বলতে পেরে আরাম লাগছে যেন। কনভেন্ট-ভদ্রতার পোশাকী ভাষা ছেড়ে সোজা কথা সাধারণ ভাবে বলে দেওয়া।

—আমার সব সময় মনে হয়েছে তোমার মানিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে সিস্টার লুক। তোমার মত অল্প কয়েকজনই কোন দিন ক্ষমা চাও নি।

—তার জন্যে প্রশংসা পেতে পারি বলে জানি না সিস্টার। সংঘ-জীবনের যা-কিছু করণীয় সব মেসিনের মত করে যাই আমি। অবশ্য উপাসনাগুলো ছাড়া—ওদের নিজেদেরই একটা অবিরাম আবেদন আছে···

মিসট্রেস মাথা নাড়লেন, এতো পথ নয় সিস্টার, মেসিনের মত হলে তো চলবে না। তবু আমি খুসী হলাম যে, তুমি আমায় বললে আর আমিও তোমায় বুঝতে পেরেছি সিস্টার, বিশ্বাস কর।

একটু থেমে বোধ হয় ভাবলেন তাঁর কথাগুলো, খুব সাধাসিধে ভাবে বললেন তারপর, অনেক দিন আগে এক সময় আমার কাছেও সংঘের জীবন শুধুই যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছিল। জানতাম যে এমন জোর করে যোগ দেওয়ার কোন মূল্য নেই—ঈশ্বর এতে খুসী হবেন না।···জানতাম বলেই কষ্ট পেতাম। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে যুঝতাম প্রাণপণে। খৃষ্টের কথা ভাবতাম, সাধারণ শিষ্যদের তিনি কাছে টেনে নিতেন। নিজেকে বোঝাতাম খুব সম্ভবত মাছের গন্ধ অসহ্য লাগত তাঁর আর সেই অতিসাধারণ শিষ্যদের ছেলেমানুষী কথাবার্তাও। তবু···ছবির মত নীতি-গল্পগুলোয় তাদের সঙ্গে সর্বদাই আছেন তিনি, বারবার···যে গল্প তারা বুঝতে পারবে এমন গল্প। অথচ তিনিই মাত্র বারো বছর বয়সে মন্দিরের পণ্ডিতদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলেন।···সংঘের গোড়াপত্তন সেখানে মাই সিস্টার, আমাদের আদর্শের উদাহরণ।

সিস্টার লুক ভাবছে, মিসট্রেস যদি না বলতেন এ কথাগুলো!

এ শিক্ষা জীবনে ভুলতে পারবে না সে, যে ভাবে পেল এ শিক্ষা তাও না।

মনে হচ্ছে যেন সংযমের মুখোসটা এক পলকের জন্য খুলে ধরলেন মিসট্রেস, তাঁর অভিজাত মুখের ওপর বহু শতাব্দীর সংবেদনশীল বনেদিয়ানার ছাপ চোখে পড়ে গেল।··আঁসটে গন্ধের উল্লেখে সে মুখের পাতলা নাকটা কুঁচকে গেছে! ক্ষুদ্রতর সংঘে পাঠাতে পারবে ভেবে, সংঘের সাধারণ জীবন থেকে অব্যাহতি পাবে ভেবে এতক্ষণ আনন্দ হচ্ছিল, এখন লজ্জা করছে, অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে।

—কখনও কখনও মনে হয় সংঘকে অন্যায় ভাবে শোষণ করছি আমি···এত যে সুযোগ-সুবিধে নিচ্ছি, বিনিময়ে কিছুই দিচ্ছি না।

—এ কথা যখন বলতে পেরেছ তুমি শিখতে পারবে।—শেষ

বাঘের মত হাসলেন মিসট্রেস তার দিকে চেয়ে, তারপর আবার নিয়মানুগ আবরণের আড়ালে গোপন করে ফেললেন নিজেকে।

—এই যে যাচ্ছ সিস্টার, সুপিরিয়রের সংগে সব সময় মন খুলে কথা বোলো। তোমার নতুন মঠ সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলব, প্রত্যহ সকালে দিন শুরু করবার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নি[illegible]। সিস্টারদের কাউকে ভাল লাগবে তোমার, কাউকে বা লাগ[illegible]। এক একজনের কাছ থেকে মনটা সরে আসতে চায় প্রথম [illegible]… তেমন যদি হয় তা'হলে তাদের জন্তে কিছু করবার চেষ্টা কোর— বিদ্বেষের অমোঘ ওষুধ ওটাই। নিজেকে এবং তাকেও জয় করে নেবার এমন ভাল উপায় আর নেই। নতুন মঠে সবচেয়ে বয়স্কা সিস্টারদের দলে পড়বে তুমি—সামনে যে কাজই দেখবে করে দিতে চেষ্টা করবে…কারো অসুখ করলে বেডপ্যান পরিষ্কার করে দিতেও দ্বিধা কোর না। করবেও খুব সাধাসিধে ভাবে…কেউ যেন লক্ষ্যও না করে- কেবল ঈশ্বর দেখবেন।

আরও ধীরে ধীরে বললেন, আর তোমার সম্বন্ধে—ডাক্তারের মেয়ে হিসেবে আরামের মধ্যে ছিলে তুমি, সামাজিক সম্মান-প্রতিপত্তির মধ্যে ছিলে—আর এসে পড়েছ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে।…যীশুর সেই ছোট্ট গাধাটি হ'তে চেষ্টা কোর, নিজের পথ সে নিজেই চলত, কাউকে খোঁচাখুঁচি করতে হত না তাকে। যা কিছু ভার সব তুলে নেবে নিজের কাঁধে, মনেও যেন বেসুর না বাজে। সেই ছোট্ট গাধাটির মত করে…ধরণীর আশাকে সে যেমন জেরুজালেমের গড়ানে পাথুরে পথ দিয়ে বয়ে নিয়ে এসেছিল।

দু'চোখ ভরা জল…

আঁকশি দেওয়া চেনের গোছা শুদ্ধ থলেটা শক্ত মুঠোয় ধরা…

সিস্টার লুক মিসট্রেসের আপিস থেকে বেরিয়ে এল যখন সতীর্থদের সংগে কোন তফাৎ ছিল না তার।

পরদিন ম্যাসের পর মাদার হাউস থেকে রওনা হ'ল তারা।

সেদিন চ্যাপেলে চোখ নামিয়ে থাকার কথা মনে রইল না তাদের। সিস্টার লুক অপলক তাকিয়ে [illegible] রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলের দিকে কৃশ মানুষটি উপাসনায় তন্ময় হয়ে আছেন নিজের প্রার্থনা ডেস্কে। নবব্রতাদের দিক থেকে সবাই আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাঁকে জেনেও উপেক্ষা করেছেন আজ [illegible]—আজকের এই চুরি করে দেখা ধারণাটা যে তাদের পক্ষে দরকারী, তা' যেন তিনি জানেন।… এদিকে চ্যাপেলের জানলাগুলো দিয়ে রূপোলী ঊষার তির্যক আলো এসে পড়েছে… সারি সারি সিস্টার[illegible], নিশ্চল…এক সংগে এত সিস্টার আর কোথাও [illegible] কেবল সংগীত-প্রধানার দেহটা—দু'টি কয়ার দলের মধ্যে [illegible] করছেন।

স্তবগান ধ্বনিতে সমস্ত চ্যাপেল আ[illegible]।

সিস্টার লুক মনে মনে [illegible] ইচ্ছানুসারে যখন যেখানেই আমি যাই এই সহজ সুন্দর [illegible] বোধ করব।

কয়ার সিস্টারদের [illegible] চ্যাপেলের বাইরে এলে, পৌঁছোতে [illegible]। [illegible] তাদের আবার অল্প একটু ট্রেন দেওয়া হলে [illegible] এসেছ।

দরজার দিকে ধীরে ধীরে [illegible] যেতে যেতে ওরা শুনতে পেল ইটালিয়ান সংগীত শুরু হ'ল—[illegible] প্রার্থনা-স্তোত্র।

…শান্তির পথে [illegible] শান্তিতে, আনন্দে, স্বাস্থ্যে [illegible] প্রত্যাবর্তন করতে পারি আমরা।

সিস্টার ইটালিয়ান [illegible] স্যুটকেশগুলো সদর দরজার পাশে সারি [illegible] পৃথক বাসে ওঠার আগে পরস্পরকে চোখের ভাষায় বিদায় সম্ভাষণ জানাল ওরা।…কারো কারো পথ আফ্রিকা—[illegible] বহুদূরে—বহুদূরবর্তী কোন শাখায়। [illegible] স্টেশনে।

দেওয়ালের ওধার থেকে [illegible] গান গাইছেন।

সিস্টার লুক মনে মনে [illegible] প্রার্থনায় যোগ দিল।

…মুক্তির দেশে আমাদের [illegible] করুন… [ক্রমশ।

অনুবাদিকা : [illegible] মুখোপাধ্যায়।

রেল গাড়ী চলে

শ্রীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঝক্ ঝক ঝকা-ঝক রেল গাড়ী চলে।
কোন দূর দেশে যায় ঠিক তালে তালে।
ভোঁস ভোঁস ভোঁস ভোঁস ধোঁয়া ছাড়ে আকাশে।
গার্ডের হুইসল বেজে ওঠে বাতাসে,
পাখী যেন উড়ে চলে ডানা তার মেলে—
ঝকা-ঝক ঝকা-ঝক রেল গাড়ী চলে।

ঝুম-ঝুম, ঝুম-ঝুম, ব্রিজের ওপরে,
খুব নীচে দেখা যায় জেলে মাছ ধরে।
ঝকা-ঝক ঝকা-ঝক চাষ ক্ষেত ধরে,—
রেল গাড়ী ছুটে চলে প্রাণপণ জোরে,
ছুটে এসে খোকাখুকু দেখে দলে দলে।
ঝকা-ঝক, ঝকা-ঝক রেল গাড়ী চলে।

রেল গাড়ী ছোটে রূপকথারই দেশে—
অচেনা ফুলের বাস, ভেসে আসে বাতাসে,
হাট, মাঠ, বন, দীঘি সব কিছু ছাড়িয়ে—
রেল গাড়ী ছুটে যায় নিজেকেই হারিয়ে।
স্বপ্নের দেশে যায় ঠিক তালে তালে।
ঝকা-ঝক, ঝকা-ঝক রেল গাড়ী চলে।

Otine
Snow
for
DAY USE
প্রসাধনের প্রথম উপচার
ওটিন
স্নো
প্রসাধনের প্রথমেই চাই ওটিন স্নো ! এমন হাল্কা, ও কোমল, মেক-আপ ধরানোর পক্ষে এত চমৎকার যে এর তুলনা হয় না। দিনের সব সময় মুখখানি দেখাবে স্নিগ্ধ অমলিন আর দীর্ঘস্থায়ী মিষ্টিগন্ধে মন থাকবে সতেজ, ক্লান্তিহীন।
সুখবর ! আপনার প্রিয় ওটিন স্নো এখন সহজে সঙ্গে রাখার জন্য সুবিধেজনক টিউব প্যাকিং-এও পাওয়া যাচ্ছে।
ওটিন প্রসাধন সামগ্রী—প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে সুপরিচিত
মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড,
১৮২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

একোনবিংশতি স্তবক

১। কোমল-মঞ্জুল স্বরে রোদন করতে লাগলেন অবলাগণ। মৃগ-পক্ষীদের কর্ণে পৌছল ঐ ক্রন্দন। ভাল লাগল তাদের। ক্রন্দনও এত শ্রুতিমধুর হয়! তারপরেই তাদের হৃদয় পুড়ে গেল।

এ কি প্রিয়-কীর্তির কীর্তন?···না ক্রন্দনভরা কণ্ঠের করুণতা? ললিত গীতের মত এই ক্রন্দন···যেন আবাদ করে ফেলল স্থাবর-জঙ্গমের হৃদয়।

মূর্তিমান বিরহ-রসের মত যেই প্রকট হলেন এই রোদন, অমনি তাঁর ব্যথায় ব্যথী হয়ে তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে তাঁকে গীতের আকারে রূপায়িত করে দিলেন স্বর-তাল-মূর্ছনা ও শ্রুতিদেবীগণ।

'জয়তি জয়তি জয়   জয়তু জয়তু প্রিয়
ব্রজ তব জনমে হে স্বামী
ও কমলা-নিবেশনে   মোরাও বসতি করি
তবে কেন পরাভব মানি?
আগো, এ তোমার কেমন ভালবাসা?
গহন বনে ফেলে রেখে
আড়াল হলে নয়ন থেকে, হায় রে,
তোমার কৃপা কেবল মোদের আশা।
আমরা ব্রজ-বধূ   তোমারেই জানি শুধু
দেখা দাও ভরিয়া নয়নী।
কাননে কাননে খুঁজেছি তোমায়
কুঞ্জের মন্দিরে,
প্রতি পথে পথে তরুলতিকায়
ভিজিয়া অশ্রুনীরে।
একবার দেখা দাও বঁধু দেখা দাও
আপনজনে দেখা দাও,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হয়েছি
নয়নে তোমার তুলিয়া নাও।
···দেখা দাও ভরিয়া নয়নী।'

এই ভাবে ব্রজবধূদের অধর থেকে ঝরে পড়তে লাগল···রোদন-সঙ্গীত গোপী-গীতা।

সেই গীতাই যেন করুণ ঝঙ্কারে আবার বলে উঠল,—'হে প্রিয়, বিষাক্ত শরের মত শাণিত তোমার কটাক্ষ। ঐ কটাক্ষের আঘাতে তুমি কি কুচি কুচি করে ছিন্ন করে দাও নি আমাদের মত প্রেম-কিঙ্করীদের মন? সে বধ কি বধ নয়? আমাদের বধ করাই যদি তোমার অভীষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে কেনই বা বৃথা আমাদের রক্ষা করতে গেলে?

ঝঞ্ঝা কালিয়-জলে   খরতর বাদলে
তড়িত অনলে বারে বারে
বৃযাকাশ-অহি-মুখে   আরো কত মহা-দুখে
কেন নাথ, বাঁচালে সবারে?

যদি বল,···'ব্রজবাসীদের সঙ্গে দৈবাৎ তোমরাও বেঁচে গেছ'··· তাহলে বলবো হরি হরি, এ কি তুমি করলে? পরুষ পদাবলী দিয়ে একবার বিনাশ করে, আবার কেন আমাদের বাঁচাতে গেলে প্রাণে? কৌতূহল ছাড়া তোমার এই কাজের কোন কারণ তো ভেবে পাই নে আমরা। হে প্রিয়, পরম স্বেচ্ছাচারী তুমি। এ তোমার মৃতসঞ্জীবন খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাঁচিয়ে তুলতে এতটুকুও পরিশ্রম লাগে না তোমার। এইটেই আশ্চর্য যে দূরে থেকেও এখনও বেঁচে রয়েছি আমরা। তোমার দর্শনই আমাদের জীবন; তুমি ছাড়া আর কি অন্য জীবন হয়?

বল্লব-বংশীয় তুমি, বল্লব-বংশীয়াদের হত্যা করতে ভয় হবে কেন তোমার? স্বজন বা সগোত্রীয়দের হাতে সম্পদ থাকলে ওতো যে কেউ পাবে, অনুগত হয়ে দাঁড়াতে।

বিশ্বরক্ষার জন্য সাধ্যসাধনা করে ব্রহ্মা তো আর তোমাকে পৃথিবীতে প্রকাশ করেন নি! তাই বলছি, আমাদের মত যারা বিশ্বগত জীব, যারা মোহের ঘোরে মরছে, হায় হায় তাদের কেন রক্ষা করছ না তুমি?

প্রভু, ভব-ভয়ে আমরা আর্ত, তবু জেনে রেখো, প্রেমার্ত আমরা তোমার। দয়া করে আমাদের মাথার উপর রাখো তোমার ঐ কমলাকর-লালিত পাণিপল্লব। আমাদের অভয় দাও, পূর্ণ কর আমাদের অভিলাষ।

···আপন জনের গর্ব তুমি ভাঙতে চাও, গরব তুমি ভেঙেছ। ব্রজের দুঃখ বিনাশ করে এবার তো তুমি বীর হয়েছ, ধীর হয়েছ; ভয় তো তোমার ঘচে গেছে। তবে আর দেরী কেন? প্রসন্ন নয়নে কিঙ্করীদের পানে ফিরে চাও। দেখা দাও প্রভু দেখা দাও।

ব্রজ-দুঃখ-নাশন   করি মৃদু হাসন
নিজ-জন-মান কর চূর্ণ
কমল-আনন তব   দরশয় মাধব
অধীনী-পরাণ করি পূর্ণ।
যে পদ কমল দু'টি   ধেনু পাছু চলে ছুটি
অনুগত-জন-দুখ হারী
দলিত ভুজগ-ফণ   কমলা-নিকেতন
রাখ হৃদি তাহে কামে বারি।

তোমার ঐ মধুর চেয়েও মধুর বাণীর মোহিনী দিয়ে হে জীবননাথ, আমাদের দু'কান ভরিয়ে দাও। যুগ যুগ ধরে যে উপবাসী হয়ে রয়েছে আমাদের কান।

তোমার ঐ সুধায়-ধোয়া হাসিতে-ভরা অধরখানির অমৃত দিয়ে, ওগো বন্ধু, আমাদের আদর কর, ওগো বন্ধু দয়া করে শোষণ করে নাও তোমার অদর্শনের দুঃখ-শোক।

জ্ঞানীরা, বাণীশ্বরেরা প্রতিদিন রটনা করেন···তোমার কথামৃত শ্রবণ সুমঙ্গল, তোমার কথামৃত সন্তপ্তের জীবন, তোমার কথামৃত মৃতের সঞ্জীবন। কিন্তু আমরা যাঁরা তোমায় ভালবাসি, আমরা বুঝতে পারি না সুখদ না সুদুঃখদ তোমার বাণী, বিষ না সুধা।

হায় নাথ, যাঁরাই তোমার প্রেমে পাগল, তাঁরাই জানেন, হাঁ, তাঁরাই জানেন···তোমার চরিত আর তোমার বচন···বাইরে তার সুধার সার, অন্তরে তার ক্ষুরের ধার।

চল চল আঁখি তব হসিত বিহার নব
গোপন মরম-কথা-রাশি
ধেয়ান উজ্জ্বল করি যায় যবে মনে পড়ি
মন নাথ, হয় যে উদাসী।

আমাদের মত মানবীদের উপর কখনো তো একটি কণাও খসে পড়ল না তোমার ভালবাসা! পোড়া চোখে তো কই একটি তিলও দেখতে পেলুম না তোমার ক্লান্তি।

ধেনু সনে যবে তুমি ছাড়ো গো বরজ ভূমি
কমল-কোমল পদ চারি
পাষাণ-তৃণাঙ্কুরে সে পদ পাছে গো ঝরে
ভাবিলে যে ব্যথা লাগে ভারি।

হায় রে, কোথায় গেল তোমার নব পদ্মপলাশের মত সৌন্দর্যের খনি সেই চরণযুগ, আর কোথায় বা সেই তৃণাঙ্কুর?···কী খর, কী তীক্ষ্ণ! স্মরণটিও যে মরণ!

সমস্ত দিন ওগো সমস্ত দিন···বনে বনে ক্লান্ত হয়ে ফিরছেন আমাদের ভালবাসার বৈভব! কি কষ্ট গো, কি যন্ত্রণা। আমাদের মর্মে মর্মে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে শিউরে ওঠা সমস্ত হৃদয়ব্রণ:

দিন যবে হয় শেষ উড়ায়ে কাজল কেশ
গোখুর-পরাগ মুখে মাখি
তেয়াগি কাননভূমি ব্রজে যবে ফেরো তুমি
নয়নে নয়নে তব রাখি
মানসের অগোচরে সহসা কুসুম শরে
হানিয়া ব্যাকুলি তোলো হিয়া
জাগে মনে কত আশ সর্বনাশা অভিলাষ
কল্পলতা ওঠে কুসুমিয়া।

হে কান্ত, তখন মনে হত,···'তিনি আসবেন, আজই আসবেন··· রজনীতে···আসবেন আমাদের মন্দিরে'। তারপরে সমস্ত রাত কেটে যেত ক্লান্ত প্রতীক্ষায় বিরহে।

কোনদিন হে প্রভু, কোনদিন তুমি আমাদের সুখদ হও নি। নিয়েছ, কিন্তু কোথায় তোমার দান? আজো যে প্রিয় কীর্তিটি তুমি করে বসলে, হায় রে, তারো তো এই হল পরিণাম।

কমলজ-অর্চিত প্রণত কাম পুর
ধরণী-শোভন সুখকারী
বিপদি ধেয়ান-ধেয় চরণ-কমল প্রিয়
হিয়া পরি রাখ দুখহারী।

আমাদের স্তন-পূর্ণকুম্ভের উপরে হে প্রিয় নিধান কর তোমার পাদপদ্ম। তোমার অঙ্গের স্বেদবিন্দু ঐ পদ্মের মধুস্রাব, তোমার নখরের চন্দ্র-দ্যুতি ঐ পদ্মের কেশরজাল, লীলাচঞ্চল তোমার ঐ অঙ্গুলিগুলি ঐ পদ্মের পাপড়ি।

তোমার অধরসুধা বাড়ায় সুরত ক্ষুধা
আন প্রতি রতি করে শান্ত
নিনদ-বেণু যারে ঘন ঘন চুমে বারে
দেহ সে অধর-সুধা, কান্ত।

'যে মুখ পান করেছে মুরলী, সে মুখ তোমরা পান কোরো না', অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না প্রভু, বোলো না। মৌমাছিতে মুখ দিয়েছে, ও খেলে জ্বর ছাড়ে না,···তাই বলে মধু কি কেউ খায় না? খাওয়া কি কেউ ছেড়ে দেয়?

দিবসে কাননে গেলে তোমা না দেখিতে পেলে
যুগসম ক্ষণে ভাবে প্রাণী
ও মুখ-দরশ-বারী পলক-সৃজন-কারী
সে বিধিরে জড় বলি মানি।
···দেখা দাও ভরিয়া নয়ানী।'

২। যৌবন-সঙ্গীতের মধ্যপথে এমন সময়ে ছেদ পড়ল অকস্মাৎ। যে ব্রজসুন্দরীরা, পতিদের দ্বারা নিরুধ্যমানা হয়ে মূর্চ্ছাতে গুণদেহ পরিত্যাগ করে লাভ করেছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সমুচিত দেহ,···অভিমানভরা কণ্ঠে তাঁরা এবার ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—

'পতি পুত্র সুহৃৎ সহোদর···তৃণের মত জ্ঞান করে, ছেড়ে এলেম সমস্ত; ছুটে এলেম তোমার চরণে। আর তুমি শঠ, নিশীথে তুমি আমাদের কিনা ত্যাগ করলে বিপিনে? ছিঃ!'

কলা-পণ্ডিতারা সকলে মিলে এবার ধুয়ো তুললেন,—

'তোমার ঐ মৃদু হাসির ভাণ, তোমার ঐ সুন্দর চোখের চাহনি, তোমার ঐ মদন-উদয় নিভৃত প্রেমের ভণিতা, আর তোমার ঐ সুঠাম ভুজের প্রসর বুকের সৌন্দর্য,···হে মোহন, ভাবতে ভাবতে মহা-মোহিত হয়ে পড়ছে আমাদের হৃদয়।

সকলেই জানে,—'ব্রজকাননবাসিদের আনন্দের জন্যে তোমার এই মহাপ্রকাশ।' হে প্রভু, ব্যভিচার না হয় যেন সেই প্রথিত প্রথার। ক্ষয় কর প্রভু, ধ্বংস কর সমস্ত ব্যাধি আমাদের হৃদয়ের।

হে বিভু, আমরা ভয়ে ভয়ে ভেবে মরি, কী যন্ত্রণাই না পাচ্ছে তোমার চরণকমল! কতই না আঘাত পেয়েছে আমাদের স্তনমণ্ডলের কঠিনতায়! কিন্তু এখন বুঝছি, মিছে ওসব ভাবনা। বনে বনে চলে, তৃণাঙ্কুর দিয়ে বিঁধিয়ে, ঐ চরণকমল দিয়েই ব্যথা দিচ্ছ তুমি আমাদের। সুখও তুমি পাচ্ছ।

হয় তো তুমি বলবে,—'সত্যিই কঠিন তোমাদের স্তনমণ্ডল, তারা কোমল হবে কেমন করে আমার পায়ের পরশ লেগে? তৃণাঙ্কুরেরাও যে হয় না। তাই তো আমার ব্যথা···।'···ওগো, চাহনিতে যাঁর বজ্র গলে তাঁর পক্ষে এ বলা মিথ্যে-বলা হবে না। আমাদের মত নিষ্ঠুর যাদের হৃদয় তাদের স্তনমণ্ডল কি বজ্রের চেয়েও কঠিন নয়?

হে প্রিয়, ফুলের চেয়েও নরম তোমার মন আজ যে এত মহাকঠোর হয়ে উঠেছে, তার কারণটা কি আমাদের এই অতি দারুণ হৃদয়ের মিলন-বাসনার যথেচ্ছাচারিতা নয়?

'এক সঙ্গে এতগুলি বধূ-বধ,···অত্যন্ত অন্যায় অত্যন্ত অসমঞ্জস'···

এ বলাও আমাদের পক্ষে মিথ্যা-বলা বৃথা-বলা হবে ; কারণ, আমরা জানি আমাদের বেরিয়ে-যাওয়া প্রাণগুলোকে তুমিই শুধু আটকিয়ে রেখেছ জোর করে।

বুঝতে পারছি কুহক দেখানই তোমার একমাত্র কৌতুক। আমাদের হৃদয়ে একদিকে যেমন প্রকট হচ্ছ, পরিস্পন্দিত হচ্ছ, তেমন অন্য দিকে আশ্চর্য, নিরুদ্ধ করে দিচ্ছ প্রাণ-নিষ্ক্রমণের পথ। একি তোমার দুরন্ত কৌতুক ?

হে প্রিয়, আর বোধ হয় আটকে রাখতে পারলে না প্রাণগুলোকে। ওরা আমাদের বলছে,—'তোমরা তো অনেক গবেষণা করেছ, কই দর্শন পেলে না তো তাঁর। তাঁর সন্ধানে এবার নিজেরাই বেরুচ্ছি আমরা।'

'আমার ইচ্ছায় আমাকে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্নে ব্যর্থ হয় সমস্ত উদ্যম।' ··প্রভু, তোমার মনের অমন দশা ত্যাগ করো, প্রভু, ত্যাগ করো ; বেরিয়ে যেতে দাও আমাদের প্রাণ। হে জীবননাথ, অচিরাৎ জীবনগুলো বেরিয়ে গেলে,···অবশ্য করে তাদের দেখো। তোমায় খোঁজা যেন ব্যর্থ না হয় তাদের। কিঙ্করদের নিবেদনে কখনও মুখ ফেরান না প্রভু।

ধীরে ধীরে রোদন-রীতির এই কোমলতা, অস্ফুট অব্যক্ত এই ক্রন্দনের গুঞ্জনগান চোখে জল নিয়ে এল পশুপক্ষীদের বধূদের, দীর্ণ করে দিল বৃক্ষবল্লীদের হৃদয়।

কৃত্রিম কঠোরতায় নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে নিকটেই বিরাজ করছিলেন প্রণয়ী গোকুলরাজনন্দন। তাঁর পক্ষেও সহ্যাতীত হয়ে উঠল এই রোদন-রীতির অপূর্বতা।

পুনর্বার বিলাপ করে উঠলেন, কণ্ঠ ছেড়ে পুনর্বার কেঁদে উঠলেন, কখন উচ্চে কখন কোমলে প্রিয়-গুণ কীর্তন করে উঠলেন ব্রজগোপীরা। তাঁরা প্রতীক্ষা করে রইলেন সেই সুখদ মুহূর্তটির প্রথম আবির্ভাবকাল, যেটিকে শেষ পর্যন্ত আসতেই হবে,··হয় প্রাণের বহির্গমনের, নয় পরাণ-প্রভুর শুভাগমনের মধ্য দিয়ে।

৩। ব্রজগোপীদের ভক্তিভাবের অনির্বচনীয়তায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে ফুটে উঠল পুলক-কদম্ব। তিনি নিবৃত্ত হলেন তিরোধান থেকে। আবির্ভূত হলেন মূর্তিমান রতোৎসবের মত।

এবং তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর করুণারুণ কটাক্ষশরে যেন সমূলে উন্মূলিত হয়ে গেল মহাভাবময়ীদের অন্তঃক্লান্তি-লতিকার সমারোহ; আর তাঁর জ্যোৎস্না-ঢালা হাসিতে যেন বিগলিত হয়ে গেল তাঁদের মানস-পীড়ার অন্ধকার। চৌদিকে মধুরিমা মধুরিমার গরিমা, গরিমার গভীরতায়···তাঁদের মনে হল তাঁরা যেন কখনও কোনদিন অনুভব করেন নি ক্রন্দনের অবসন্নতা ; যেন তাঁদের মধ্যে প্রতিফলন হচ্ছে পরিমিতি-হারা এক চৈতন্যের, যেন তাঁরা এই প্রথম দর্শন পেয়েছেন সেই বিশ্রুত-মঙ্গল অঙ্গলক্ষ্মী-সৌভাগ্যের এবং বিরহের আবেশে তাঁদের ঐ উন্মত্ত অনুসন্ধান···সব যেন এক স্বপ্নবিলাস। তাঁদের মনে হল,···নামহারা এক বন্ধু যেন অনন্ত প্রেমানন্দ—রসধারায় ধুইয়ে দিচ্ছেন তাঁদের হৃদয় ; যেন শীতল করে দিচ্ছেন তাঁদের বিরহানল-তপ্ত দেহ, বেরিয়ে-যাওয়া জীবনগুলিকে পুনর্বার স্থাপন করে দিচ্ছেন স্বস্থানে ; আর এমন জ্যোতির্ময় করে স্থাপন করে দিচ্ছেন তাঁদের হৃদয়ের সুখভাবটিকে, যে তাঁদের মনও যেন বলছে, কোনদিন তাঁরা কানেই শোনেন নি বিরহের নাম। তাঁদের মনে হল,···যেন প্রিয়তম একলাই একই মুহূর্তে সঘন আলিঙ্গন করছেন সকলকেই ; গৌরব-রাঙা মধুর অধরটিকে কপোল সংযুক্ত না করেই যেন তিনি সকলের গালেই যুগপৎ প্রকাশ করে দিচ্ছেন বিলাসরসের চুম্বন-চাতুরী ; ঐ স্থানটিতেই বিরাজ করেও যেন তিনি এসেছেন কোথা থেকে কে জানে···এসেছেন সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ,···পীতাংশুককিরণকান্ত···বিলোল বনমাল। তাঁরা বুঝতেই পারলেন না কোথা থেকে তিনি এসেছেন। তাঁদের হৃদয়াকাশ থেকে ? না। তবে কি পৃথিবীর তলদেশ থেকে, না। বনান্তর থেকে ? তাও তো নয়। তাঁদের মন বললে,··· কোথাও নয়, কোথাও নয় এইখানেই তিনি ছিলেন।

৪। কি জানি কেন, অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখলে কুমুদিনীদের যেমন হয়, অনাবৃষ্টির পর গগনে নব মেঘের উদয় দেখলে চাতক-যুবতীদের যেমন হয়, সারা বন দাউ-দাউ করে জ্বলছে এমন সময় হঠাৎ নির্মেঘ বর্ষণ হলে সারঙ্গরমণীদের যেমন হয়, পরলোকে প্রবেশের পর আত্মাকে ফিরে আসতে দেখলে সূক্ষ্ম দেহগুলির যেমন হয়,···তেমনি অবস্থা হল কৃষ্ণ-কটাক্ষবতীদের।

নওলকিশোরকে দেখে, এক সঙ্গেই তাঁরা সমুল্লসিতা হয়ে উঠলেন, এক সঙ্গেই সমুত্থান করলেন প্রমোদের বিপুল আবেগে দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হলেন সমস্ত সন্তাপ। উৎকণ্ঠা···যেন তাঁদের সখী হয়ে দাঁড়ালেন কৃষ্ণাভিসারে।

দু'হাতের অঞ্জলির মধ্যে কৃষ্ণের পদ্মহাতখানিকে ধরে ফেললেন একজন। কৃষ্ণের মদ কুষিত স্কন্ধের কিনারায় আর একজন লতিয়ে রাখলেন বাহু। আর একজন নিজের পাণিটিকে হিরন্ময় পিচদানীতে রূপান্তরিত করে ধরে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বুল।

একটি বরসুন্দরী নিজের তপ্ত স্তনমুকুল দু'টির উপর স্থাপন করলেন শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণ কমল। ভাবী ক্রীড়োৎসব রসের মঙ্গল সূচনা করেই যেন দু'টি স্বর্ণকুম্ভের মুখের উপর রেখে দিলেন তিনি নতুন ধরণের এই নব কিশলয়। মরি মরি, সুন্দরী হয়ে উঠলেন আরো সুন্দরী।

কত অঘটনই না ঘটে ! তাই যেন ব্যাপার দেখে বাক্য হারিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন একটি বিলাসবতী ভ্রূকুটি-কুটিল ভালে দোল খেয়ে গেল তাঁর ভুরুর ঢেউ ; তরুণারুণ হয়ে উঠল কাজল আঁকা নয়ন কোণের চাঞ্চল্য,···যেন হানতে লাগল কন্দর্পের পুলকের গরল-মাখা বাণ। দাঁত কামড়াতে লাগলেন দেখতে দেখতে।

একটি গোপী···চোখে আর পাতা পড়ে না,···অবিশ্রান্ত পান করতে লাগলেন পরাণ বঁধুর মুখ কমলের রস-মাধুরী। পিপাসারও শেষ নেই, মাধুরীরও অপূর্ণতা নেই।

একটি গোপী লোচন পথে কৃষ্ণকে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে, পাছে আবার তিনি পালিয়ে যান এই ভয়ে, নয়ন বঙ্কিম নত করেই রইলেন। আর তারপরে বিশেষ ভাবে নয়ন নিমীলিত করেই যেন সুচির আলিঙ্গন দান করতে লাগলেন তাঁকে। জ্যোৎস্নায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল চাঁদের মত তাঁর মুখ।

কি অদ্ভুত ক্ষমতা এই প্রেমের আবেগের ! নয়ন-সম্মুখে কৃষ্ণকে রাজমান দেখেই একটি গোপী নুয়ে পড়লেন। কাঞ্চনমঞ্জরীর মত

KALPANA.J.R.00

তিনি নুয়ে পড়লেন। গায়ের পাশ থেকে দু'টো হাত আর উপরে ওঠাতে পারলেন না, কাঁপতে লাগলেন থর থর। আহা, সে যেন সংগ্রামোৎসব-কৌতুকে গর্বোদ্ধত পুষ্পায়ুধের চম্পক-ধনুঃ-কম্পনের ছবি। তারপরে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে মনোমোহিনী ভঙ্গিমায় তিনি তুলে ধরলেন তাঁর অঙ্গুলি; লীলালস ভাবখানিকে লোপ পাইয়ে দিতেই যেন, বাঁকিয়ে উল্লসিত করে তুললেন তনুলতা; অব্যক্ত আনন্দের জ্যোৎস্না ফুটে উঠল চন্দ্রমুখে; তারপরে হাত দু'টিকে সরিয়ে মাথার সীমানায় এনে হাসতে হাসতে মণ্ডল রচনা করলেন চকোরেক্ষণা। তারপরেই সুন্দরী আর একটু সুন্দরীপনা ফলিয়ে, বাঁ-হাতের দু'টি আঙুল এলিয়ে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুললেন। সঙ্কেতমুদ্রার মত এই ভঙ্গীই যেন বলে উঠল,—

'ওলো লজ্জা, দন্তের রত্নালোকে পথ দেখতে পাবে, দয়া করে বেরিয়ে যাও।'

আর একটি গোপী, এনীর মত বড় বড় কালো চোখ তাঁর, হাত ঘুরিয়ে বেণীটিকে সামনে এনে নিবিষ্ট করলেন তাঁর উন্নত দু'টি পয়োধরের মাঝখানে। তারপরে চোখ বুজে, বাহু দিয়ে নিবিড় ভাবে পীড়ন করতে করতে আলিঙ্গন দিতে লাগলেন সেই বেণীটিকেই। রোমাঞ্চের কঞ্চুক পরল তাঁর দেহ। এতেও কিন্তু শানালো না। হাতে ছিল লীলাকমল। মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সেইটিকেই তিনি শুঁকতে লাগলেন। ধেয়ে এল মধুকরী। ডান হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে তাড়া দিতে লাগলেন মুহুর্মুহুঃ। ঘেমে উঠল গাল, শিউরে উঠল শরীর। পদ্মমুখী শেষে চুম্বন করতে লাগলেন লীলা-কমলটিকেই বারংবার।

আর একটি চকোরনয়না স্থিরদৃষ্টিতে এতক্ষণ চেয়েছিলেন, দেখছিলেন কান্ত-মুখের কান্তি। হঠাৎ নয়নাঞ্চলে আলস্য লোল হয়ে গেল তাঁর চাহনি। তিনি তাঁর বাহু দিয়ে লতার মত জড়িয়ে ধরলেন তাঁর প্রিয় সখীর কাঁধখানি। কী যেন পেয়ে গেছেন, কী যেন মহা ধন! মেতে উঠলেন। মহাধনময়ীর যেন প্রমত্ত মূর্তি।

কনক কঙ্কণের ঝঙ্কার তুলে হঠাৎ এক গোপী খুলে ফেললেন তাঁর কবরী,···তারপরেই আবার তৎক্ষণাৎ বেঁধে ফেললেন কবরী। কি হল কি হল বলে চেঁচিয়ে উঠলেন সখীরা। তিনি বললেন,—

'না-না কিছু হয় নি, দেখছিলুম অন্ধকার ভেবে, ওখানে এখনও লুকিয়ে আছে কিনা আমার অভিমান।'

আর একটি গোপী···বাম কর্ণকুহরে কনিষ্ঠা অঙ্গুলিটিকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে লীলাভরে যেই দূর করতে গেলেন কণ্ডূতি, অমনি ঝম্‌ঝম্ করে বেজে উঠল তাঁর বাম হাতের বলয়। সখীরা হেসে উঠলেন, বললেন,—

'সই-লো-সই, অনঙ্গ-সঙ্গরের জয়ঘণ্টা ওমা তুই-ই বুঝি বাজিয়ে দিলি?'

আর একটি তনুগাত্রী···ডান হাতের লালিত্য ফুটিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে ঘোরাচ্ছিলেন লীলাকমল। ঝুম-ঝুম করে বাজছিল চুড়ির গোছ। হেসে উঠলেন সখীরা, বললেন,—

'ও-মা দেখেছিস, উনিই যেন মদন-রণে জয়ী হয়েছেন,···ঢেউ তুলছেন নতুন লাবণ্য-নদীতে আকাশের।'

একদিকে উল্লসিত প্রেমের আনন্দ, অন্যদিকে রুষ্ট অভিমান,···প্রচণ্ডভাবে ঘেমে উঠেছিলেন একটি সুন্দরী। ওড়নার অঞ্চল দিয়ে তিনি হেলাভরে, অথ, লীলাভরে বাতাস করতে লাগলেন নিজের লাবণ্যলোল দেহখানিকে। কন্দর্পের পতাকা যেন পৎ পৎ করে উড়তে লাগল বাতাসে।

একটি সুন্দরী···প্রেমের আগুনে তিনি বিলক্ষণ ঝলসেছেন,···হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল,—'ও হরি, এতক্ষণে দর্শন পেলুম, এবার তো তা' হলে পুষ্পবৃষ্টি করতে হয়।' অতএব তিনি হাসতে লাগলেন। সে কী তাঁর মিষ্টি-মিষ্টি ফুল-ছড়ানো হাসি। অন্তরের অভিলাষ-লতিকায় যত ফুল ধরেছিল সব যেন ঝরকে ঝরকে বাইরে ঝরে পড়তে লাগল ঔৎসুক্যের বাতাস লেগে।

একটি গোপী···শিশু-হরিণীর মত নয়ন তাঁর,···চোখ ভরে গেল আনন্দিত অশ্রুতে। 'ওরে তুই ধন্য, কৃষ্ণকে তুই দেখেছিস'···বলতে বলতে তিনি যেন প্রেমের আবেশে মনে মনেই দৃঢ় আলিঙ্গন করতে লাগলেন চোখ দু'টোকেই ঘন ঘন।

কাঞ্চন-প্রতিমার ভ্রম জন্মিয়ে ঘুর ঘুর করছিলেন একটি রূপবতী। তাঁর উপর কৃষ্ণের চোখ পড়তেই হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করল স্তম্ভ। তবে কি তাঁকে স্পন্দনহারা করে দিল ত্রিভুবনের ললনা-ললাম-সৌভাগ্যের গুরুগৌরব?

আর একটি সুন্দরী, আমূল-মুকুলিতা বসন্ত শাখার মত, বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিতা হয়ে উঠলেন। বিরহদশায় শ্রীমদনের যতগুলি বাণ বিঁধেছিল তাঁর হৃদয়ে, সব ক'টিকেই কি অনিন্দ্যনৈপুণ্যে টেনে বার করে নিয়ে এল চুম্বক-মণির মত কৃষ্ণরূপ।

সোনার পদ্মপাতায় যেন চক্‌চক্ করছে জলের কণা,···ঘামে ভিজে এমনি দেখতে হল আর একটি চমূরু-নয়নাকে। আহা, চন্দ্রমা দেখেছেন তিনি কৃষ্ণ-বয়ানে, আর জল ঝরছে চন্দ্রকান্ত-মণির মত তাঁরও পরাণে।

চকোরের মত মুগ্ধদৃষ্টিতে কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে হঠাৎ চম্পক লতিকার মত থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলেন একটি সুন্দরী। মদন-ঐরাবত তবে কি তাঁর প্রবেশ করেছে হৃদয়ে? ভূমিকম্পের সৃষ্টি করছে মত্ততায়?

কুহু-কুহু-বোলী আর একটি গোপীর হঠাৎ থেমে গেল কণ্ঠ-কাকলী! সখীরা হেসে উঠলেন, বললেন—

'ও মা স্বরভঙ্গ হল নাকি তোর? যে গলায় বীণা বাজে, সে গলায় যে মেঘ ডাকছে! আশ্চর্যি।'

[ক্রমশ।

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

কিংশুকরাগিনী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

১০

রাগিণী চলতি মাসের সিনেমা পত্রিকার সবচেয়ে সেরা বিভাগ 'হাঁড়ির খবর' তন্ময় হয়ে পড়ছে। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে। ধারে কাছে বিরক্ত করবার জন্যে কেউ নেই। এই বৃষ্টিতে কেউ আসবে না। পত্রিকা পড়বার এর চেয়ে ভালো সময় আর কি হতে পারে। রাত্তির বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর একলা ঘরে দরজায় খিল এঁটে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ার কথা অনেকের মনে আসবে। কিন্তু তার ফল ভালো হয় না। পড়ে মাথা গরম হয়ে যায়। পেট ভুটভাট করে, ঘুম আসে না, সারা রাত কানের গোড়ায় বাজতে থাকে, আমি যে কত একলা। তার চেয়ে দিনের বেলা অনেক ভাল। মাথা পেট থেকে উঠলেও ঠাণ্ডা হবার সময় মেলে।

বৃষ্টির তোড় কমে এলো। রাগিণী একসময় বই থেকে মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকাল।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে প্রায় না পড়ার মতনই। রাস্তায় অল্প অল্প লোক চলাচল সুরু হয়েছে। পশ্চিমের আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে ঢালবে। জুবিলি ট্যাঙ্ক ভরে উপচে পড়ছে। জল যেন পোষ্ট-অফিসের গায়ে এসে ঠেকেছে। তারপরই বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল। ওর মনোময়কে আসতে দেখা গেল। পত্রিকা আর পড়া হল না। রাগিণী ঘরের মধ্যে বসে বসে দেখতে লাগল। কেমন কাদা বাঁচিয়ে গর্ত ডিঙিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে কিংশুক এগিয়ে আসছে। গাড়ী ঘোড়া এলে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াচ্ছে। রাগিণী স্পষ্ট দেখল ওদের বাড়ীর কাছ বরাবর এসে একবার মুখ তুলে বাড়ীটার দিকে প্রাণভরে চাইল। কাছাকাছি থাকলে রাগিণী দেখতে পেত একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকখানাকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে এল। রাগিণী দেখল কিংশুক হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখে নিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। কৌতূহল হওয়াতে রাগিণী বারান্দায় এসে দেখে কিংশুক উধাও। গেল কোথায়? হয় কোনও বাড়ী বা দোকানে ঢুকবে নয় রাস্তায় থাকবে, গলি ঘুচি তো ধারে কাছে নেই। বৃষ্টিটাও যেন একটু জোরে এল। রাগিণী এধার ওধার ভালো করে তাকিয়ে দেখল কোথায়ও কিংশুক নেই। এমন সময় নজরে এলো উল্টো দিক থেকে বীথি আসছে।

বীথিকে দেখেই কি কিংশুক থমকে দাঁড়িয়েছিল? ওকে এড়াতে চায়? তাই যদি হয় তা'হলে গেল কোথায়? তবে কি···?

কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এলো। খেপী ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, তার হাত থেকে ফুল ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে রাগিণী বললে—দেখে আয় তো নীচে কে দাঁড়িয়ে আছে। চেনা লোক হলে ভেতরের ঘরে বসিয়ে আমায় ডাক দিবি।

—ওমা কে দাঁড়িয়ে আছে গো!

—চোর ডাকাত কেউ হ'বে।

খেপী চোখ বড় করে বললে—চোর ডাকাত কি গো! রামগতিকে বল না। না হয় মুক্তোকে।

—তোকে বলছি তুই যা। চোর ডাকাত হলেই বা, তোকে খেয়ে ফেলবে? গেলি, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক করবি।—বলে হাত ধরে খেপীকে খানিকটা টেনে নিয়ে গেল।

—টেনো নি, টেনো নি, পড়ে যাব যে, যাচ্ছি যাচ্ছি। আমার মরণ হয় না। চোর ডাকাতের সামনে যাবার বেলায় খেপী আর তত্ত্ব নে যাবার বেলায় মুক্তো।

একটু পরেই নীচে থেকে খেপী চেঁচিয়ে বলল—ওমা এ যে শুকদেব দাদাবাবু গো। অ-দিদিমণি তুমি কেমন ধারা লোক বাছা। শুকদেব দাদাবাবুকে বলছ চোর ডাকাত।—গলার আওয়াজে খেপী বাড়ী মাথায় করে নিলে।

শুকদেব দাদাবাবু! তা'হলে যা ভেবেছে তাই। মনের উত্তেজনা কোনরকমে চেপে রাগিণী বারান্দা থেকে চাপা গলায় বললে—চুপ করলি। মা ঘুমুচ্ছে না।

শৈলজার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। শুয়ে সব শুনলেও কোনও কথা বললেন না। আসুক শুকদেব আগে যেমন আসতো তারপর যা আছে অদৃষ্টে। ভবিতব্য কে খণ্ডাবে! হাকিমের বেয়ান হওয়া কল্পনাতেই রয়ে গেল।

নীচে নেমে এসে রাগিণী বললে—আমি কি ভাল করে দেখেছি। যা মাকে ডেকে দে। মুক্তোকে বল চা-এর জল চাপাতে। শীগগির চা নিয়ে আসবি।

ঘরের মধ্যে ঢুকেও কিংশুক নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। বীথি

দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে। যদি দেখে থাকে। তা'হলে নির্ঘাৎ এই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। ও যা মেয়ে। ওদিকে আবার রাগিণীও আসছে। ওঃ ভগবান? যত লাঞ্ছনা কি আমার অদৃষ্টেই লেখা আছে। কেনই বা মরতে এ বাড়ীতে ঢুকে পড়লুম। বোঁ করে অন্ত ধা' দিয়ে চলে গেলে বীথি কি করতে পারতো? বড় জোর একবার নাম ধরে ডাকত। চলে যেতুম, যেন শুনি নি, পেছনে পেছনে ধাওয়া ত' করতে না, আর এখন? নিশ্চিন্ত মনে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে, জানে শিকার ফাঁদে পড়েছে। দুই দিকে দুই রায়বাঘিনী মধ্যিখানে অসহায় এক হরিণশিশু। এসব ক্ষেত্রে হরিণশিশুরও পালাবার পথ থাকে, যদি দুই বাঘিনীই একসঙ্গেই অকুস্থলে আসে তখন কার হরিণ এই নিয়ে বাধে চুলোচুলি আর সেই অবসরে শিকার পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেও বাঁচাতে পারে। সামান্য একটা হরিণশিশুর ভাগ্যে যা সম্ভব, ওর বেলাতে তারও সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া যে কোন শাবক দর্শনেই বাঘিনীদের জিভে জল আসে মৃগ-শাবক হলে তো কথাই নেই, কিন্তু এ বাঘিনীদের একটির আবার এ শাবককে অরুচি। সে অবলীলাক্রমে অসহায় জীবটিকে অপর বাঘিনীর হাতে তুলে দিয়ে বলবে, তোর জিনিষ নিয়ে যা ভাই পালিয়ে যাচ্ছিল, আটকে রেখেছি।

কিংশুক চেয়ার ছেড়ে উঠে রাস্তার ধারের জানলায় এসে দাঁড়াতেই পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝতে পারল, বীথি এসে হাজির হয়েছে। এখন আর ঢং করে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই বরং রাগিণী আসবার আগেই তাড়াতাড়ি দু'জনের ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়াই ভাল। ঘরে দাঁড়িয়ে কিংশুক দেখে বীথি নয় রাগিণী।

মুখে হাসি টেনে এনে বললে—মানে বিষ্টির জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিলুম—তোমাদের মানে আপনাদের কি ভেতরে ডেকে আনলে।

—দাঁড়িয়ে কেন? বস। আমি আবার আপনি হলুম করে থেকে?

—রাগিণী হেসে বললে

বাইরের দিকে চেয়ে কিংশুক বললে—না আর বসব না। বিষ্টি থেমেছে। যাই।

—কোথায় থেমেছে? বাড়ী যেতে যেতে ভিজে যাবে।

দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে কিংশুক বললে—না, এক দৌড়ে চলে যাবো।

বাইরে থেকে খেপীর গলা শোনা গেল—ওমা মোড়লবাড়ীর দিদিমণি যে গো!

থমকে দাঁড়িয়ে কিংশুক রাগিণীকে জিজ্ঞেস করলে—কে?

শান্তকণ্ঠে রাগিণী বললে—বীথি, প্রফেসার—।

—প্রফেসর এম· এম-এর মেয়ে!—বলে হতাশ হয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বসে পড়ল।

বীথিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে খেপী বললে—অ-দিদিমণি, তোমার সই এয়েচে গো।

রাগিণী বললে—শীগগির চা নিয়ে আয়।

—আনছি গো আনছি। বলে খেপী চলে গেল।

—তারপর বীথি, তুই যে হঠাৎ। বস।

—কিংশুককে ধরবার জন্য এসেছি।

এমনভাবে কথাটা বললে যেন কিংশুক ফেরারী আসামী সেইজন্যেই নামের আগে 'শ্রী' নেই পরে পদবী বা 'দাদা' নেই, না থাপ না হাতল শুধু ফলা শুধু নাম।

—শুকদেবদা'র অপরাধ? রীতিমত উৎকণ্ঠা রাগিণীর কণ্ঠে।

—ওকেই জিজ্ঞেস কর।

রাগিণী কিংশুককে জিজ্ঞেস করলে—আঃ কি আবার করে বসেছ?

—এমনভাবে কথাটা বললে যেটা নিতান্ত আপনজন ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

কথাটা বীথির কানে ভাল ঠেকল না। কিংশুক একথা শুনে হাঁ করে রাগিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এমন কথা যে রাগিণী বলতে পারে এটা শুনেও ও বিশ্বাস করতে পারছে না। তারপর ওর মুখে-চোখে আলো ফুটে উঠলো। হাত উল্টে বললে—কই কিছুই করি নি ত'। কি করলুম আবার।

উত্তর শুনে মনে হল যেন খোকাটি।

বীথি বললে—কর নি! ড্যাডীকে বলে আস নি যে, তার কাছে বিকেলের দিকে পড়তে যাবে।

—ঈস দেখেছ, একদম ভুলে গেছি। কিংশুক জিভ বার করে বললে—স্যর কি ভাবছেন? না সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। স্যর গিন্নী ঐ জন্যেই আমি নিজে থেকে স্যরকে কিছু বলি নি। জানি আসব বলে ভুলে যাব। বলে বীথিকে বললে—কেবল তুমি তখন নিজে থেকে স্যরের সামনে কথাটা বললে বলেই বারণ করি নি।

বীথি শুনে জ্বলে উঠলো। এ যে সবই ফাঁস করে দিলে, রাগিণীও মুখ টিপে হাসছে, অসহ্য! বললে—আমি ড্যাডীকে বললুম?

কিংশুক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—বল নি বুঝি! তাহলে হয়ত আমি বলেছি।

রাগিণী বললে—তাহলে ভাই শুকদেবদার আর কোন অপরাধ নেই। তুই যখন নিজেই স্যরকে—

বীথি রাগিণীর কথার মাঝখানেই বললে—মহাবীরবাবু তোমাকে আমাদের বাড়ী যাবার কথাটা রিমাইণ্ড করিয়ে দেয় নি।

কিংশুক পড়ে গেল অকূল পাথারে। কি জবাব দেবে? যদি বলে হ্যাঁ। তাহলে বীথি চেপে ধরবে, যাও নি কেন? যদি বলে না তাহলে গিয়ে মহাবীরকে চেপে ধরবে বল নি কেন? কিংশুকের একবার মনে হল বলে দেয় যে মহাবীর কিছু বলে নি। তারপর ও ঠেলাটা বুঝুক। বড্ড তড়পায়। এবার একটু টিট হোক। তারপরেই মহাবীরের কথাটা মনে পড়ল—বলবি, হ্যাঁ বলেছিল। আমায় যেন ফলস্ পজিশনে ফেলো না। তারপর যা বলবার আমি বলব'খন। কিংশুক ভাবতে লাগল—কি বলি।

বীথি আবার বললে—কি চুপ করে রইলে যে, মহাবীরবাবু বলেছিল, তবে গেলে না কেন? ড্যাডী তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন।

—হ্যাঁ-মানে-না মহাবীর আমায়—।

রাগিণী বললে—মিথ্যে তুই শুকদেবদাকে লজ্জায় ফেললি বীথি। মহাবীরবাবু ওকে বলে নি।

—বলে নি ?

—না, এতো বোঝাই যাচ্ছে। সেও হয়ত ওর মত ভুলে গেছে। শুকদেবদা কি করে বলে যে মহাবীরবাবু বলে নি। হাজার হোক বন্ধুলোক ত',—বলে মাথা নেড়ে বললে কেমন তাই না শুকদেবদা।

কিংশুক দ্বিগুণ উৎসাহে মাথা নেড়ে বলল—বাঃ! তা নয় তো কি, তাই তো।

রাগিণী বললে—দেখলি ?

—দেখলুম। বাইরে থেকে আওয়াজ এলো।

সবাই পেছনে তাকাল, কেউ নেই।

রাগিণী উঠতে উঠতে বললে—কে ?

—উঠো না, আমি, আদম, প্রথম পুরুষ।

দরজার আড়াল থেকে কাজলের মুখ বেরিয়ে এল। রাগিণী অপ্রসন্নমুখে চেয়ারে বসে কিংশুকের দিকে তাকাল। কিংশুক তাকিয়ে আছে কাজলের দিকে যেন কোন অদ্ভুত জীবকে দেখছে।

ঘরে ঢুকে বীথির দিকে চেয়ে কাজল বললে—অনেকক্ষণ থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকবার মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলুম—।

কাজল যে সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে রাগিণীকে বাদ দিয়ে ওরই দিকে চেয়ে আছে এতে বীথি খুশী হল, গর্ববোধ করলো। বললে—ঢোকেন নি কেন ? আমি আছি বলে ?

—না, না, তা নয়।

কিংশুক টিপ্পনী কাটলো,—বোধ হয় হাঁচি পড়েছিল।

রাগিণী হো-হো করে হেসে উঠল। এত জোরে যে, বোঝা গেল ওটা স্বাভাবিক নয়। কিংশুক খুশী হল রাগিণীকে হাসাতে পেরেছে বলে।

কাজলও হেসে ফেলে কিংশুকের কথাটা লঘু করে বললে—আমি কোডি, যখন-তখন ঢুকে পড়াটাকে বলি প্রবেশ আর বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত হওয়াটাকে বলি আবির্ভাব। একটার ভেতরে আছে জবর-দখলের ভাব আর একটায় স্বাভাবিক প্রকাশ। আমি সেই আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলাম।

বীথির ভারী ভাল লাগল। এর কথা শোনা ছিল, রিটায়ার্ড ডি, এম-এর ছেলে। দূর থেকে দেখাও হয়েছিল বার কয়েক। আজ সামনা-সামনি এসে পরিচয় পাওয়া গেল।

বললে—কথা যে এমন চমৎকার করে বলা যায় তা জানতুম না।

রাগিণী বললে—কথা হয়ত চমৎকার। কিন্তু গোড়ায় বললেন আপনি কোডি, এখন চমৎকার যে কথাগুলো বললেন সেগুলো শোনাল কিন্তু 'কবিদের ধার করা কথা, কোডিদের নয়।

কাজল বললে—ঠিক বলেছ রাণু। সবাই কোডিদের কথা বোঝে না—তাই সাধারণের সঙ্গে কবিদের ভাষায় কথা বলতে হয়। কথাটা শুনেও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না রাগিণী। কাজল যে সবার সামনে রাণু বলে ওকে ডাকবে তা ওর কল্পনার বাইরে ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিনকার কথা। যেদিন কিংশুকের সামনেই ওর কাঁধে হাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে রাণু বলে ডেকেছিল। বুঝতে পারল এই একটু আগে কিংশুকের কথায় অমন অনাবশ্যক ভাবে হেসে ওকে উপহাস করবার জবাব হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যেন এইটুকুই বুঝিয়ে দিলে যে, প্রয়োজন হলেই সেদিনকার সেই অভিনয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে ও পেছপাও হবে না। লজ্জায়, অপমানে নিজেরই বাড়ীতে বাইরের লোকের সামনে মাথা হেঁট করে রাগিণী বসে রইল: কথা বলবার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলল।

রাণু! কিংশুক মনে মনে বললে—শুকদেব শুনলে তো। দিন কয়েক আগে ওপরের ঘরে এ সম্বোধন শুনেছ। তখন ওরা ছাড়া কেবলমাত্র তুমি ছিলে। এখন কেবলমাত্র তুমি নও আরও একজন শুনলো, এর পরেই যে সর্বজন শুনতে পাবে সেটাও কি বলে দিতে হবে। আর তার অর্থ কি তা না বললেও বুঝতে পারার বয়েস তোমার হয়েছে। অথচ তুমি কি না এই একটু আগেও ওর ব্যবহারে কথাবার্তায় বেশ তেতে উঠেছিলে। ভেবেছিলে এবার বুঝি তুমিই রাণু বলে ডাকবে। মেয়েদের কম্পোজিশ্যনে কার্বন ক্যালসিয়াম নেই হে, স্রেফ আছে জল তাই দাগ কাটে না।

কিংশুক বললে—বীথি ঠিকই বলেছ। সত্যিই উনি কথা চমৎকার করে বলতে জানেন। রাগিণীকে যে রাণুতে দাঁড় করান যায় এটা কোনদিনই আমাদের মাথায় আসে নি। অথচ কথাটা কত সুন্দর শুনলেই ছোট্ট মিষ্টি একটি কিশোরীর কথা মনে পড়ে। রাণু!—তারপর হেসে বললে—আমরা ডাকি গিনী বলে। রাণুর পাশে এ নামটা রীতিমত গিন্নীবান্নীর মত। আর শুনলে সবাই হাসবেন আমি ছেলেবেলায় ওকে ডাকতুম গিন্নী বলে। রাগ করে মুখ গোঁজ করে থাকলে বলতুম রাগিণী রাগ করলি। গিনী মুখটা তোল, ও গিন্নী একটু হাস না ভাই। এখন গিন্নী বলে ডাকলে সবাই তেড়ে মারতে আসবে। গিন্নী বলে আর ডাকা চলবে না। কিন্তু রাণু বলতে কোন বাধা নেই, চিরজীবন ও নামে ডাকা চলে।

রাগিণী মুখ তুলে কিংশুকের দিকে তাকাল, মুখে শুধু হাসিই নয় চোখ দু'টোও জলে চিকচিক করছে। বললে—আঃ কি হচ্ছে শুকদেবদা। বলে উঠে দাঁড়াল।

—কোথায় চললে? কিংশুক বললে।

—দেখি চা-র কত দেরী।

কিংশুক হঠাৎ হাত ধরে বললে—না না দেখতে হবে না। বস।

বীথির এটা ভাল লাগল না। তার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো।

কাজল বললে—বস, বস রাণু। চা-র জন্য ব্যস্ত হতে হবে না।

এমন ভাবে কথাটা বললে যেন কিংশুক নয় ও নিজেই রাগিণীর হাত ধরে বসবার জন্যে বলছে।

কিংশুক তখনও হাত ধরে আছে। কোনও দিকে দৃকপাত নেই। রাগিণী হাত ছাড়িয়ে বসে পড়ল। যে গ্লানি মনের মধ্যে জমে উঠেছিল কিংশুকের ছোঁয়া লেগে তা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন আর মাথা তুলে বসতে লজ্জা নেই, হাসতে বাধা নেই। ভালো লাগছে। সবাইকে সব কিছুকে, এমন কি কাজলের মুখের রাণু সম্বোধনের জ্বালাও আর নেই। ও রাণু বলেছে বলেই 'গিন্নী' ডাক কানে এসেছে।

কিংশুক বীথিকে বললে—তাই বলে ভেবো না যে সব নামই কাটছাট করলে চমৎকার শোনায়। এই ধর আমার নাম। ছোট করে এক অক্ষরে দাঁড় করিয়ে বল কিং। এ যুগে অচল। জনবুলেরা ভাল বললেও জনসাধারণ রিভোল্ট করবে। তারপর ধর শু। জনসাধারণ শুনে ভাল নাম বলে হাততালি দিলেও আমি রিভোল্ট করব। রাগিণী মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কিংশুক দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বললে—বাকী রইল ক। অক্ষরটি ব্যঞ্জনবর্ণের হলে কি হয় রসকষ নেই, একেবারে সুক্তো।—তারপর বীথিকে সম্বোধন করে বললে—তোমার নামই সরো। কাজলবাবু, যতই—ভাল কথা বীথি তুমি একে চেন? ইনি হচ্ছেন—।

—আমি চিনি। জবাব দিলে কাজল।

বীথি বললে—আপনি আমায় চেনেন?

—হ্যাঁ। আপনাকে না চেনাটা একটা অপরাধ। আপনি প্রফেসার মণ্ডলের কন্যা, নাম মিস বীথি মণ্ডল। বাড়ীতে সবাই ডেইজী বলে ডাকে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন। আমার কাছে অবশ্য আপনি পরিচিত ইজি নামে।

বীথি খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে বললে—ইজি? কি সুন্দর। ডেইজী নামটাকেই সুন্দর ভাবতুম ইজি আরও ভাল, যাকে বলে—।

কিংশুক বললে—সুন্দরতর।

বীথি বললে—ঠিক বলেছ।

কাজল বললে—হ্যাঁ সহজ, বাতাসের মত সূর্যের আলোর মত সমুদ্রের উর্মিলতার মত। যা ইজি তাই সুন্দর।

এ প্রশংসার পর উর্বশীও পাশে বসবার অনুমতি দেবে।

বীথি মুগ্ধদৃষ্টিতে কাজলের দিকে চেয়ে বললে,—আপনি শুনেছিলুম কবি এখন দেখছি তা মিথ্যে নয়।

—তা মিথ্যে। আমি কবি নই।

—কবি নন? তবে যে শুনেছিলুম—।

—আমি কোডি।

—কোডি।

—হ্যাঁ যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে কোডিতা ঘোষণা করতে পারি।

—কোডিতা কি?

—শুনুন তাহলেই বুঝবেন।···সুরু করি—বলে পকেট থেকে নোটবুক বার করে পাতা খুলে রাগিণীকে বললে—উইথ ইওর পারমিশন্ রাণু।···

খেপী চা ও জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কাজল নোটবুক বন্ধ করে বললে—আঃ! চা! টা! রইলো কোডিতা।

কিংশুক বললে—পড়লেন না?

—নিশ্চয়ই পড়ব। তবে খাওয়াটা আগে তারপরে কোডিতা। আশ্চর্য হচ্ছেন। এইখানেই কবিদের সঙ্গে কোডিদের তফাৎ। কবিদের খাদ্য হচ্ছে দখিনা পবন, ফুলের সুবাস, চাঁদের কিরণ। ওর মধ্যে ভিটামিনের নামগন্ধ নেই, তাই ওরা আই মীন্ ওদের রচনা অমন রিকেটি। য একটা শব্দে বলা যায়, তা বলতে ওদের স্ট্যাঞ্জার পর স্ট্যাঞ্জা লাগে। কোডিরা যা খায় তার মধ্যে থাকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, তাই তাদের সৃষ্টি বলিষ্ঠ য়্যাণ্ড ইজি। কবিরা যা এক পাতায় বলে আমরা তা একটা শব্দে প্রকাশ করি।

কিংশুক বললে—যাকে বলে স্যাঁক্রার ঠুক ঠাক কামারের এক ঘা। কবিরা হচ্ছে স্যাঁকরা আধুনিক কোডিরা হচ্ছে কামার, কেমন তাই তো?

—ঠিক বলেছেন। আপনার কোডি সেন্স আছে। চেষ্টা করলে কোডিতা বেরুলেও বেরুতে পারে।

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০
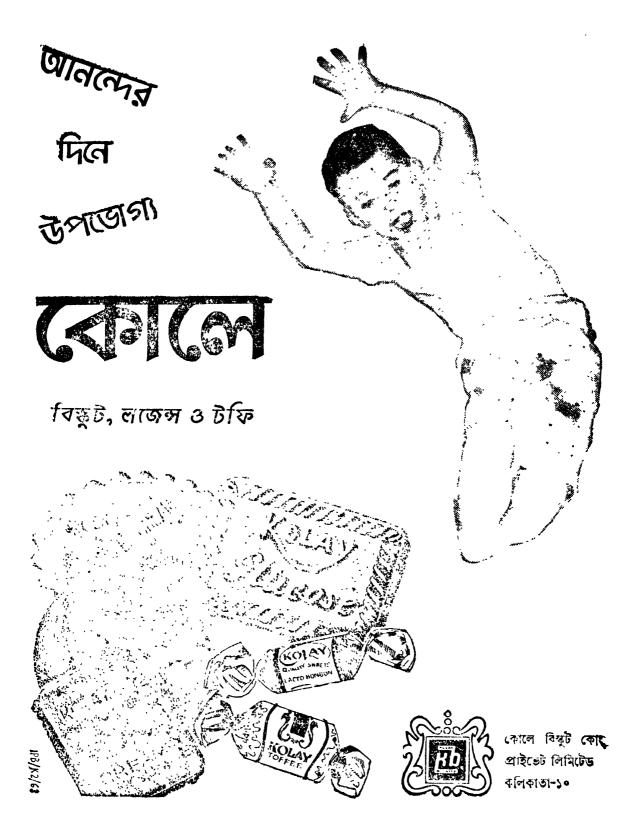
রাগিণী চা তৈরী করতে করতে বললে—খেপী, আর একটা কাপ-ডিস নিয়ে এস।

—ও মা তাই তো, চারজনা লোক রয়েছে দেখছি। আমাদের দাদাবাবুর কাপ-ডিস তো আনা হয় নি।—বলতে বলতে চলে গেল।

কাজল হাসতে হাসতে বললে—ওল্ড উইচ, পুরোন মেড সার্ভেন্টরা ভারী য়্যাফেকশনেট হয়।—দাও, ফ্যাঙ্কস্। বসে চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে বললে—আঃ টি, টক্, য়্যাণ্ড টোব্যাকো, কোভিদের জীবনের তিনটি টি। টী ফর ইনস্পিরেশন, টক ফর এক্সপ্রেশন য়্যাণ্ড টোব্যাকো ফর ইমজিনেশন। বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে কিংশুককে বললে—চলবে। ও চলে না বুঝি। এটা চলা চাই নইলে কোভি হতে পারবেন না। সিগারেট ধরিয়ে আর এক চুমুক চা খেয়ে বললে—আঃ চা-টা নাইস হয়েছে। চা! কোভিতা এসে গেল, বলে আবৃত্তি করতে লাগল—

পাতা···কুঁড়ি···
ঈভ ··তুলছে···
ঝরি···লালমুখ···
ঝমাঝম···কড়কড়···করাং···সুঁই···সুঁই···সোঁ সোঁ···
হি : হিঃ হিঃ···হাড় কাঁপানো···
থামা···
···শ্যেনদৃষ্টি ···
লালমুখ ··· বেত ··· সপাং সপাং
আঃ !···মার গিয়া···
রক্ত !···
সোয়াইন···হাত চালাও···
হাত চলে···কুলী···
রক্ত···চা···পাতায়···কুঁড়িতে···
শিকার···ভাল···ফরেন মার্কেট
দখলে···কুলী···রক্ত···চা···

—আবৃত্তি থামিয়ে বীথিকে বললে—এই হচ্ছে কোভিতা বুঝলেন কিছু?—বীথি জবাব দিতে ইতস্তত করছে দেখে কাজল বললে—প্রথমটায় বুঝতে কষ্ট হয় তারপর সহজেই বোঝা যায়। কিংশুকবাবু বুঝলেন?

—হ্যাঁ প্রথমটায় বুঝতে কষ্ট হয় তারপর বুঝে ফেললে সহজেই বোঝা যায়।

—এক্সাটলি।

খেপী কাপডিস্ রেখে ভেতরে গিয়ে শৈলজাকে বললে—একবার বোটকখানাটা ঘুরে এসো মা ঠাকরোন চাঁদের হাট বসেছে। আমাদের দাদাবাবু হাত পা নেড়ে থ্যাটার করছে আর সবাই হাঁ করে শুনছে। দাদাবাবু আমাদের এতও জানে।

আমাদের দাদাবাবু। কথাটা শৈলজারই শেখান। ওদের বলেছিলেন—ওকি সব চাষাড়ে বুলি। নাম করে দাদাবাবু বলা।—তবে কি বলব?—বলবি আমাদের দাদাবাবু।

খেপীর মুখে 'আমাদের দাদাবাবু' কথাটা শুনে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সত্যিই ছেলেটা অনেক কিছু জানে। কিন্তু উনি যা বেঁকে বসেছেন, মনোবাঞ্ছা আর পূর্ণ হবার নয়। হাকিমের বেয়ান হবার সাধ এ-জীবনে অপূর্ণই থেকে গেল।

শৈলজা দূর থেকে দেখলেন কাজল হাত-পা নেড়ে 'থ্যাটার' করছে আর বীথি হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কাজলের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া বীথির আর কোন উপায় ছিল না, কারণ কাজলের অজগর দৃষ্টি ওর মুখের ওপর নিবদ্ধ। বীথির পাশে রাগিণী কাজলের পাশে কিংশুক। শৈলজা যদি কাছে যেতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে কাজল হাত-পা নেড়ে গলার স্বর উঁচু-নীচু পর্দায় খেলিয়ে যা বলতে চাইছে তার চেয়ে অনেক বেশী কথা অনেক ভাল করে কিংশুকের চোখের তারায় প্রকাশ পাচ্ছে। রাগিণীর চোখে-মুখে সে ভাষা রূপ নিচ্ছে।

কাজলের কোভিতা ঘোষণা শেষ হল। শৈলজা যেন এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন; চাঁদের হাট ভেঙ্গে দিয়ে আর লাভ কি। তবুও যে ক'দিন আসে, সে ক'দিন লাভ। হাকিম-বাড়ীর যাতায়াতের পাটটা অন্তত চালু থাকবে পাড়া-প্রতিবেশীরা একটু সমীহ করে চলবে।

—পড়া শেষ হল?—শৈলজা বললেন।

সিগারেট এতক্ষণে য়্যাশ-ট্রের ওপর নিঃশব্দে পুড়ছিল, সেটা তুলে নিয়ে শেষ টানটি দিয়ে কাজল বললে—হ্যাঁ। মাসীমা, আজ নারকোল নেই কেন? নারকোলকোরা না হলে চিঁড়ে ভাজা খাওয়া যায়; আমি কিন্তু মোটেই খাই নি। কিংশুক ও বীথির সামনে কাজলের সিগারেট টানাটা শৈলজার ভালো লাগলো না। কি জানি ওরা কি ভাবছে। বারণও করতে পারলেন না। কাজল মার সামনে অবধি সিগারেট টানে, শৈলজা তো মাসী তা-ও পাতানো।

কিন্তু মার সামনে টানাটা স্বতন্ত্র কথা। আজ এই মুহূর্তে শৈলজার মনে হল কিংশুক ও বীথির চোখে যেন তিনি ছোট হয়ে গেলেন। মনে আসতে লাগলো কর্তার কথাগুলো। মনটা বিষিয়ে উঠল। সত্যিই বখাটে ছেলে। কাজলের কথার জবাব না দিয়ে বীথিকে বললে—তোমার মা কেমন আছে?

—একটু ভাল।

—ভাল হলেই ভাল; অনেকদিন ভুগছে। তারপর শুকদেব, তুমি অনেকদিন বাদে এলে। খুড়ীমাকে বুঝি আর মনেই পড়ে না। তরুদিদি কেমন আছে। অনেকদিন যেতে পারি নি। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। বস, তোমাদের আবার চা পাঠিয়ে দি।

বীথি উঠে দাঁড়িয়ে বললে—না মাসীমা আর চা খাবো না। বিষ্টি থেমে গেছে এইবার বাড়ী যাই।

—যাবে, আচ্ছা এসো! শুকদেব শুনে যেও। বলে তিনি চলে গেলেন।

বীথি দাঁড়িয়ে আছে দেখে কাজল বললে—বসুন, রাণু তোমার বন্ধুকে থাকতে বলো। এমন সুন্দর কাফে আবহাওয়া এখানে এসে পাই নি। আপনার বাড়ী থাকবে, এ বাড়ীও থাকবে, কিন্তু আজকের বিকেলটা আর থাকবে না। যতক্ষণ থাকে ততটুকুই লাভ। বসুন মিস ভল।

বীথি বিস্ময়ে বলে উঠলো—মিস্ ডল।

কাজল বললে—হ্যাঁ। আমার কাছে আপনি মিস্ মণ্ডল নন, মিস্ ডল।

কিংশুক বললে—মণ্ডল থেকে ডল, না সত্যিই অপূর্ব। কাজলবাবু আপনার তুলনা নেই, কাটছাঁটে আপনার হাত আছে। আর কিছু না হোক দর্জির দোকান করলেও আপনি হাজার হাজার টাকা আয় করতে পারবেন। ওয়াণ্ডারফুল কাটার। মণ্ডল থেকে ডল যেন খেজুর গাছের ভেতর থেকে নলেন গুড় বেরিয়ে এল।

রাগিণী ও বীথি দু'জনেই হাসতে লাগলো। কাজল হাততালি দিয়ে বললে—ব্রাভো: ব্রাভো:! আপনার ভেতরে এলিমেন্ট আছে দিন কতক যদি কাছে পাই তাহলে আপনাকে কোডি করে ছেড়ে দেব।

রাগিণী হাসতে হাসতে বললে—বেশ তো থাকো না কিছুদিন শুকদেবদা।'

কিংশুক বললে—জানা রইল, সময় পেলেই স্মরণ নেবো।

বীথি বললে—চল কিংশুক।

—কোথায়?

—আমাদের বাড়ী, আমায় পৌঁছে দেওয়াও হবে আর ড্যাডী থাকলে কেন আসতে পার নি তাও বলতে পারবে।

কিংশুক রাগিণীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—তোমাদের বাড়ী। হ্যাঁ চল।

কিংশুক যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে শান্তকণ্ঠে রাগিণী বললে—যাবার আগে একবার মার সঙ্গে দেখা করে যাও। বলে গেলেন মনে নেই।

—ইস। তাই তো। দেখেছ আর একটু হলে বীথির সঙ্গে চলেই যেতুম।

রাগিণী বললে—একটু বস বীথি, মা বোধ হয় গা ধুতে গেলেন। মা কেন দেখা করতে বললেন সেটা শুনেই যাক শুকদেবদা'। একবার এ বাড়ীর বার হলে আর কি এ মুখো হবে? মাঝখান থেকে আমি মার কাছে বকুনি খেয়ে মরব—ও ভুলে গেল বলে তুইও ভুলে যাবি।

এরপর আর কিংশুককে যেতে বলা যায় না। হয় অপেক্ষা করতে হয় না হয় চলে যেতে হয়।

বীথি বললে—তবে থাকো।

কাজল বললে—চলুন আমি যাচ্ছি।

—আপনি?

—কেন আপত্তি আছে?

—না, না, মানে গিনী আবার—।

—রাণু তার বন্ধুর জন্যে এটুকু স্যাক্রিফাইস্ করতে কুণ্ঠিত হবে না।

—তবে চলুন। তাহলে আজ সন্ধ্যেবেলায় আসছ।

কিংশুক ভেবে বলল—উঁহু, আজ হবে না। এ উইকেই হবে না। কামিং উইক-এ আবার কলেজ খুলছে। তারপরের উইক থেকেই আবার হৈ-হৈ সুরু হবে।

—কিসের হৈ হৈ। হৈ হৈ নিয়ে থাকলেই ইংরেজীতে পাশ করতে পারবে?—বীথির কণ্ঠে অভিভাবিকার সুর ফুটে উঠল।

রাগিণী গম্ভীরভাবে বললে—ঠিক বলেছিস, ছেলেরা ভীষণ হৈ হৈ করতে ভালবাসে, ওদের জন্যেই তো স্কুল কলেজের কোর্স ফিনিশ হয় না। তা তোমাদের কিসের হৈ হৈ শুকদেবদা'।

—মাসকেল, মানে আমাদের আনন্দর বিয়ে।

—ঠিক কথা আনন্দদা'র বিয়ে ত' এসে গেছে। বন্ধুর বিয়ে হৈ হৈ করতে না পারলে ভীষণ মন খারাপ হয়। জানিস বীথি, নীতিদি'র বিয়ের খবর যখন কলকাতায়।—

বীথি কথার মাঝেই বললে—তাহলে আমি ড্যাডীকে বলব যে তোমার ছাত্রিটি হৈ হৈ নিয়ে ব্যস্ত। চলুন কাজলবাবু।

কাজল একটা হাত দরজার দিকে এগিয়ে বললে—আপটার ইউ সিনোরিটা।

ওরা চলে গেলে কিংশুক বললে—ও: খুব বাঁচিয়েছ গিনী। এখন গেলে রাত দশটার আগে ছাড়া পেতুম না।

—যাবার জন্যে ত' পা বাড়িয়ে ছিলে, মার কথাটা মনে করিয়ে না দিলে ঠিক চলে যেতে।

কিংশুক একটু চুপ করে থেকে বললে—যেতাম ঠিকই তবে একেবারে চলে যেতুম না। খুড়ীমার কথা বলে মাঝপথে বীথির হাত থেকে পালিয়ে এসে সোজা বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়তুম। এঘরে যারা থাকতো তারা জানতেও পারতো না।

—কারা থাকতো এ ঘরে?—বিস্মিত হয় রাগিণী বললে।

—তোমরা, তুমি আর কাজলবাবু ভদ্রলোক সত্যিই অদ্ভুত, শিক্ষিত, বড়লোকের ছেলে, অনেক কিছু জানে। তোমার ভারী সুন্দর নাম দিয়েছে রাণু। রাণু, ভারী সুন্দর নাম।

রাগিণী তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—ও নাম তুমি মুখে এনো না। ও নামে ডাকতে তোমার মুখে আটকালো না?

কিংশুক শান্তকণ্ঠে বললে—কই আর আটকালো দিব্যি বললাম রাণু।

—আমি রাণু নই।

—তবে কি? গিনী?

রাগিণী দৃঢ়স্বরে বললে—না তাও নই।

—গিনী নও, রাণু নও, তবে কি?—তবে কি গিন্নী?

—মনে থাকে যেন'—বলে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। [ক্রমশ।

সুধীরচন্দ্র দে

আমাকে কালাটিং চা বাগিচায় বদলি করেছে, এই সংবাদ টাবুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে অনেকে এসে হা-হুতাশ করতে লাগলো। আমি যেন ঘোর বিপদের মধ্যে যাচ্ছি। আমি বেশ বুঝতে পারলাম এই কালাটিং-এ বদলি হলে আমাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। জায়গাটি অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু তখন তার সম্যকরূপ ধারণা করতে পারি নাই। আমার দু' তিন জন বিশেষ ভক্ত টাবুতে ছিলো তাদের একজন ত' শুনেই একেবারে হায় হায় করে উঠলো, তার চোখ মুখ কালো হয়ে গেল। তখনই আমি নিশ্চয় করে বুঝলাম যে, কালাটিং-এ যাওয়া আর যমের দক্ষিণ দুয়ারে ঢোকা একই কথা। তারা আমাকে আবার ভরসা দিয়েও বলল, 'ঘাবড়াও মৎ, ভগবানজী রক্ষা করেগা—হিম্মৎ মৎ ছোড়।'

ওখানে একজন সাহেব ম্যানেজার আছেন শুনেছিলাম, মনের কোণে তাই একটু আশার আলো মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল যে, সাহেব যখন ম্যানেজার তখন নিশ্চয় শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের প্রতি সাধারণ কয়েদীদের মতন কঠোর ব্যবহার করবেন না। আমরা শারীরিক পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত নই এ নিশ্চয় বিবেচনা করবেন এবং হাল্কা কাজ আমাকে দেবেন। তখনও কানা মিণ্টো সাহেবের প্রকৃত পরিচয় পাই নাই।

যা হ'ক একজন কয়েদী জমাদারের সঙ্গে পরের দিন সকালে লপসি খাওয়ার পরেই কম্বল বিছানা থালা বাটি নিয়ে কালাটিং-এর পথে রওনা হলাম। শুনলাম প্রায় তিন মাইল পথ পাহাড় ও জঙ্গলময়—খানিকটা নাকি উঁচু পাহাড়ও ভাঙ্গতে হবে। আন্দামানের জঙ্গলে ভয়ের কারণ কম, কারণ এখানে জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক বা কোন হিংস্র জন্তু নাই। একমাত্র বুনো শুয়ার ছাড়া। তারাও সংখ্যায় কম এবং দিনে জঙ্গল থেকে বার হয় না। জঙ্গলের সরু পথ দিয়ে জমাদারের পিছনে পিছনে যেতে যেতে একটা সরু রেল লাইন অতিক্রম করলাম। এখানে জঙ্গল থেকে কাঠ বয়ে আনবার জন্যে সরু 'গেজের' একটা ছোট লাইন পাতা আছে। খোলা ছোট ছোট গাড়ীতে কাঠ বোঝাই করে ছোট্ট ইঞ্জিনে টেনে সমুদ্র তীরে নিয়ে যায়। কাঠের আগুনে ইঞ্জিন চলে। অনেক সময় স্থানীয় আদিবাসী কাফ্রিদের দ্বারাও গাড়ী ঠেলা হয়।

যখন আমরা রেল লাইন পার হই তখন হঠাৎ চোখে পড়লো যে, একজন ভীষণদর্শন, ছ'ফুটের উপর লম্বা, বলিষ্ঠ, গাঢ় কালো রং-এর খোঁচা খোঁচা চুল আন্দামানের আদিবাসী কাফ্রি বড়ো বড়ো কলার কাঁদি, শশা ইত্যাদি নিয়ে একখানা গাড়ীর মধ্যে বসে আছে। আমি হঠাৎ ভীষণ আকৃতির দানবতুল্য তাকে দেখে আঁতকে উঠলাম। জমাদার বুঝিয়ে বললো, ভয়ের কারণ নাই, সরকার বাহাদুর এক শ্রেণীর আদিবাসীদের সভ্য করবার জন্য তাঁদের বড়ো বড়ো ঘর বা 'হোম' তৈরী করে দিয়েছেন। জমিজমা, লাঙ্গল ইত্যাদি চাষ করবার ও স্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। কিন্তু লেখাপড়া শিখতে চায় না। সভ্য হবার পরিবর্তে তারা আফিং খেতে শিখেছে। কিছু কিছু চাষ করে, এই সব কলা, শশা ওরাই জন্মিয়েছে এগুলো সাহেবদের বাংলোয় ও বাজারে চালান দেয়। এই লোকটি সেই 'হোমে'র একজন আদিবাসী।

যা হ'ক আমরা দু' তিন ঘণ্টা ধীরে ধীরে চলার পর একটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে উঁচু টিলার উপর কিছু দূরে কালাটিং টাবুর উঁচু কাঠের ঘর দেখতে পেলাম। তিন দিকেই দেখলাম উঁচু পাহাড় ও ভীষণ জঙ্গল। সূর্যকিরণ এক মাত্র দুপুরবেলায় টাবুতে কিছু পাওয়া যায়। লোকের বসতি হতে বহু দূরে জঙ্গল কেটে আন্দামানের এই কালাপানির সৃষ্টি হয়েছে। আন্দামানের সর্বত্র হতে দুর্দান্ত, বদমায়েস কয়েদীদের জন্য এই কালাপানির মধ্যে ছোট একটি কালাপানির জন্ম।

টাবুর চারিদিকে পাহাড় জঙ্গল থাকায় মাটি খুব স্যাঁৎসেঁতে। স্থানও ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর। জায়গার চেহারা দেখেই মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল। আন্দামানে শীত ইত্যাদি ঋতু নাই। বর্ষা ও গরম—কিন্তু এখানে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করলাম।

সন্ধ্যায় খাওয়ার পরেই সব কয়েদী ব্যারাকের কাঠের মেঝেতে তিন সারি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। রাত্রে একটি মাত্র কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলে। অন্যান্য টাবুতে কয়েদীরা রাত ৯-১০টা পর্যন্ত গল্প-গুজব করে সুখ-দুঃখের কথা বলে। দু'জন একই স্থানের হলে কেবল দেশের গ্রামের গল্প মনের সাধে করতে থাকে। যাদের এ জীবনে আর দেখতে পাবে না, শত্রু হ'ক, মিত্র হ'ক, তারাই তখন কয়েদীদের সমস্ত মন জুড়ে থাকে। দেখতে না পাওয়ায় দুঃখ বর্ণনা করেই মেটায় এখানে। দেখলাম একজনও সুস্থ নয়, গল্পের পরিবর্তে সকলেই কাশছে। সে-কাশি আর থামিতে চায় না। অনেকে দেখলাম কাতরাচ্ছে। সকলেরই শরীর জীর্ণ-শীর্ণ। শুনলাম, অনেকের কাশির সঙ্গে রক্তও পড়ে। বুঝলাম এটি যক্ষ্মারোগের একটি ডিপো। আমি কিছুদিন এখানে থাকলে আমিও একজন যক্ষ্মারোগী হবো। মনে বড় ভয় হল। সে-রাত্রে কিছুতেই আর ঘুম হলো না, কেবলই বাড়ীর স্নেহময়ী মা-দিদিমার কথা, আত্মীয়-বন্ধুদের কথা মনে উঠতে লাগলো। শেষরাত্রের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছিল কিন্তু ভোরের কাশির জোর শব্দে তন্দ্রাও ছুটে গেল।

অদৃষ্টের সুদূরপ্রসারী হস্ত আমাকে গৃহের, দেশের স্নেহ, ভালবাসার আবেষ্টনী থেকে টেনে এনে এই যক্ষ্মার কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে। জেল, কালাপানি, এতদিন একেবারে অসহনীয় হয় নাই—কারণ জানতাম যে ব্রত আমরা গ্রহণ করেছিলাম, এই সব ভোগ তারই অঙ্গ। কিন্তু একেবারে যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যু—সে যে ফাঁসী অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। মৃত্যু ও ব্রতের অঙ্গ হতে পারে কিন্তু যক্ষ্মার গ্লানি, যন্ত্রণাভোগ? অদৃষ্টের

এই অদ্ভুত বিচারের সমন্বয় ও সমাধা মনের মধ্যে আর করে উঠতে পারলাম না।

রাত প্রভাত হল। নিয়মমাফিক ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীরা হুড় হুড় করে উঠে ছুটে মেঝের তলে নীচের গুদাম থেকে পাত্রায় বা ছোট শিশিতে করে দুর্গন্ধময় কি এক তেল নিয়ে হাতে পায়ে বেশ করে মালিশ করতে লাগলো। আমাকেও ঐ তেল এনে হাতে-পায়ে মাখতে বললো—না মাখলে চা-বাগিচায় গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মচ্ছোড়ে (একপ্রকার ছোট সঙ্গীন মার্কা মশক) কামড়ে শরীরে বিষ ঢেলে দেবে; আর শরীর ফুলে উঠে ভয়ানক অসুখ করবে ইত্যাদি। কিন্তু সে-তেলের গন্ধে তেল আনবার প্রবৃত্তি আমার হলো না।

লপ্‌সি খেয়ে গুদাম থেকে এক একখানা কোদালি নিয়ে সকলে চা-বাগিচায় গেল। আমি কোদাল নিয়ে সঙ্গে গেলাম। সেখানে দেখি চওড়া লাল ফিতার উপর 'টিণ্ডাল' লেখা ঝক্‌ঝকে চাকতি গলায় ঝুলিয়ে এক মাদ্রাজী কয়েদী টিণ্ডাল গম্ভীর মুখে কয়েদীদের কাজ মেপে মেপে দিচ্ছে। আমাকেও তিন সারি চা-গাছের মধ্যের দুই ফালি মাটি মেপে (মনে হয় কুড়ি গজ) কোপাতে দিলো। পরমালু টিণ্ডাল, নতুবা মিণ্টো সাহেব সাজা দিবে। বাগানে ঢুকবার পরেই অসংখ্য মচ্ছোড় এসে হাত-পা, সমস্ত দেহে কামড়াতে সুরু করলো। সে দংশনের বিষে কোদাল ফেলে হাত-পা সমস্ত শরীর ডলামলা করতে লাগলাম। এবার বুঝলাম দুর্গন্ধ তেল মাখার মর্মকথা। বেলা একটু বেশী হলে মচ্ছোড়ও একটু কম হ'ল।

বাগিচার চারিদিক হ'তে কোদালের শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে কাশির ধারাবাহিক শব্দ উঠতে লাগলো। মিণ্টো সাহেবকে দেখলাম সব কয়েদী যমের মতন ভয় করে। মিণ্টোর ও তাহার অনুচর পরমদয়ালু পরমালুর দয়ার লাথি-চড়-কিল হতে অব্যাহতি পাবার জন্য তারা প্রাণপণে শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়েও মাটি কাটছে। কয়েদী হলেও তাদের আত্মার মর্যাদা রক্ষার জন্য সাধ্যের অতীত শ্রম করছে। প্রাণ যায় যাক, আত্মমর্যাদা রক্ষা হ'ক। কয়েদীরও আত্মমর্যাদা আছে।

আমরা প্রথমবার জেল হতে বাইরে আসবার সময় সকলে স্থির করেছিলাম যে, আমাদের যে কোন কাজই করতে দেওয়া হোক্ না কেন, আমরা সহজে বিশেষভাবে পরিশ্রম না করে যতটুকু কাজ করতে পারি তাই করবো, এতে যে কোন সাজা দিক্ না কেন, তা' বরং সহ্য করবো। জেলের মধ্যেও বরাবর এই নিয়মে চলেছি। আমি খানিকটা মাটি কুপিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই, আবার একটু কোপাই এইভাবে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে টাবুতে গিয়ে খাবার খেয়ে বিশ্রামান্তে আবার এসে একটু মাটি কোপাই, এইভাবে চলতে লাগল।

কয়েকদিন পর দেখলাম আমার ক্ষুধা একদম কমে গেল, খেতে প্রবৃত্তি হ'ত না। যক্ষা রোগীর কফ, থুথুতে সব স্থান নোংরা। খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। এই সময় বাঁকুড়া জেলা নিবাসী রাখাল দাস নামক একজন প্রৌঢ় কয়েদীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। সাড়ে ছ' ফুটের ওপর লম্বা, প্রশস্ত বুক, চওড়া মোটা হাড়ে-গাঁথা কাঠামো। তবে এখন একেবারেই শরীর মাংসশূন্য। কাশিতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, একটু জ্বরও বোধ করেন। রাখাল দাস আমাকে সাধ্যমত একটু আরাম দিতে চাইতেন সকল বিষয়ে। মশার কামড়ে আমার হাত-পা ফুলে উঠেছিল, তিনি তেল গরম করে রোজ দুপুরে টাবুতে এলে, আমার হাতে পায়ে বেশ করে মালিশ করে দিতেন, বেশ আরাম পেতাম। ক্রমে ক্রমে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তখন আমি তাঁকে রাখালদা' বলে ডাকতাম; তিনিও আমাকে ছোট ভাইয়ের মত সব বিষয়ে যত্ন করতে লাগলেন। টাবুর নিকটেই একটা ছোট পুকুরের মত গর্তে কতকগুলি মাছ দেখা যেত—তখন জল খুব কমে যাওয়ায়, রাখালদা' ও আমি দু'জনে মিলে এক রবিবারে গর্তে নেমে মাছ ধরলাম।

রাখালদা' লোহার কটোরা বা বাটীতে মাছের ঝোল পাক করলেন, বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। রাখালদা'র উপদেশমত আমি সেই ওকারজনক, দুর্গন্ধময় তেল এখন থেকে হাতে পায়ে একটু একটু মালিশ করতে লাগলাম। ফলে মশকের দংশন থেকে আংশিক মুক্তি পেলাম; কিন্তু কোনদিনই পুরো কাজ করতে পারতাম না। সেজন্য পরমালু টিণ্ডাল খুব অসন্তুষ্ট, কিন্তু মুখে বিশেষ কিছু বলতো না।

একদিন শুনলাম মিস্টো সাহেব বাগান পরিদর্শনে আসবেন। আমি ভাবলাম এই সুযোগে সাহেবকে দুঃখের কথা বলব, এসব কোদাল চালান কঠিন কাজে আমি অভ্যস্ত নই; আমাকে অন্য কাজে দেওয়া হ'ক। কানা মিস্টো বাগিচার ছোট রেলট্রলি চেপে এলেন। দেখতে পেলাম বাগান পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। মধ্যে মধ্যে ট্রলি থেকে নেমে এদিক ওদিক ঘুরেও দেখতে লাগলেন; চোখে মোটা নীল গগল্‌স্‌ পরেন কানা চোখ ঢাকবার জন্য। হাতে একটা মোটা লাঠি সর্বদাই থাকে, সৌখীনত্বের জন্য নয়, বেশ মোটা শক্ত লাঠি রাখেন আত্মরক্ষার জন্য।

শুনলাম এক কয়েদী তাঁর একটা চোখ কয়েক বৎসর পূর্বে শেষ করে দিয়েছে! এখন অপর চক্ষুটি রক্ষার জন্য সাহেব খুবই স-চষ্ট, সজাগ। মারধোর করা নাকি অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। কয়েদীর খুব নিকটেও আর যান্‌ না। দূর থেকে আলাপ করেন। সাহেব আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না। তখন আমিই একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে আমার কথা বললাম।

ইংরাজিতে বলা শুরু করতেই সাহেব বলে উঠলেন, 'হিন্দিমে বোলো।'

আমি কয়েদী তারপর রাজদ্রোহী, সুতরাং দেবভাষা ইংরাজিতে কথা বলার অধিকার আমার নাই। আমি ইংরাজিতেই বললাম, 'হিন্দি আমার জানা নাই সুতরাং ইংরাজিতে বলা ভিন্ন আমার উপায় নাই।'

যা হোক সাহেব আমার কথা শুনে কিছুই উত্তর করলেন না। আমার মনে যে আশার একটু ক্ষীণ আলো ছিল, তা দপ করে নিভে গেল।

টাবুর কিছুদূরে বেশ উঁচু পাহাড়। শুনলাম সেখানে বেশ বড়ো একটা মিষ্টি জলের ঝরণা আছে! তার জলই টাবুতে সকলে পান করে। এক রবিবারের ছুটির দিনে সকালে রাখালদা' বললেন যে, ঐ ঝরণাতে চিংড়ি মাছ ধরতে যাবেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে বললেন।

শুনলাম ঝরণার স্রোতের মধ্যে ছোট বড় অনেক পাথর আছে। সেই সব পাথরের তলে ও পাশে হাতের আঙুলের মত মোটা মোটা অনেক চিংড়ি মাছ থাকে। হাত দিয়ে ধরা যায়। আমিও কি ব্যাপার দেখবার জন্য সঙ্গে চললাম। রাখালদা' সঙ্গে একটা দেশলাই ও কিছু নুন নিলেন। প্রথমে তো আমি জানতে পারি নি। জঙ্গল পাহাড় ভেঙ্গে খানিকটা উঁচুতে ওঠার পর ঝরণার দর্শন পেলাম। বেশ বড় ঝরণা, অতি পরিষ্কার জল। কুলকুল শব্দ করে নীচের দিকে ছুটে সমুদ্রের খাড়িতে পড়েছে।

রাখালদা' জলে নেমে হাতড়ে হাতড়ে বেশ ক'টা চিংড়ি মাছ ধরে ধরে ডাঙ্গায় ফেলে দিলেন। চারদিকে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা। রাখালদা'র দেখাদেখি আমিও জলে নেমে ক'টা চিংড়ি অতিকষ্টে ধরলাম। আরও কয়েক জন মাছ ধরছে দেখলাম। সকলেই প্রাণখুলে কথাবার্তা বলে, হাসাহাসি করে বেশ আনন্দ ভোগ করছে। মাছ দেখলাম পরিমাণে বেশ ভালই হয়েছে। ঝরণার ঠাণ্ডা জলে রাখালদা'র অসুস্থ শরীর আরো খারাপ হবে ভেবে তাঁকে তাড়া দিয়ে জল হতে তুললাম। তখন রাখালদা' তাঁর নুন, পেঁয়াজ বের করলেন আর গাছের শুকনো ডাল পাতা দিয়ে আগুন জেলে মাছগুলো পুড়িয়ে নিলেন পরে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন পেঁয়াজ দিয়ে খাবার ব্যবস্থা করলেন—আমাকেও খেতে হবে বললেন।

রবীনসন্‌ ক্রুশোর মতন বন্য জীবন বেশ উপভোগ করলাম। বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম দু'জনে। তখন কয়েদীর গ্লানি ও পরাধীনতার ভাব থেকে মুক্ত স্বাধীনতার রাজ্যে আরও খানিক সময় ঘোরাঘুরি করে দুপুরে টাবুতে ফিরলাম।

পরের দিন রাখালদা' আমার বিছানার পাশেই তাঁর বিছানা সরিয়ে এনে শুলেন, দু'জনে বেশ গল্পগুজব করবার জন্য। রাখালদা'র ক'দিন ধরে কাশি বৃদ্ধি হ'ল, জ্বরও সর্বদাই যেন লেগে থাকে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে ভয়ানক অসুস্থ। আমি তাঁকে কাজে যেতে নিষেধ করলাম তিনি কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না, পরমালুর ভয়ে সকাল বেলায় যথারীতি কাজে চলে গেলেন। দুপুরে এসে সেই যে খেয়ে শুয়ে পড়লেন, আর উঠতে পারলেন না। আমি বিকেলে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখি প্রবল জ্বরে বেহুঁস। জমাদারকে ডেকে দেখালাম এবং তাকে সিক রিপোর্ট করে হাসপাতালে পাঠাতে বললাম। রাত্রে জ্বর কিছুটা কমলো বটে, কিন্তু কাশির প্রকোপ কমলো না। পরমালু টিণ্ডাল এসে দেখে গেল। এখানেই মারা গেলে ওদের 'পরে দোষারোপ হবে ভেবে রাখালদা'কে হাসপাতালে পাঠাতে রাজী হল। এ নরক থেকে বের হয়ে হাসপাতালে

গিয়ে চিকিৎসিত হতে পারবে জেনে রাখালদা' অসুখের মধ্যেও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

পরের দিন রাখালদা'কে তিন মাইল দূরে ব্যাম্বু ফ্লাট হাসপাতালে দু' জন লোক দিয়ে পাঠান হ'ল। যাবার সময় রাখালদা'র আমার দু'খানি হাত ধরে সে কি কান্না! যেন চিরজন্মের জন্য বাড়ী ছেড়ে, ভাই ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি যেন তাঁকে হাসপাতালে গিয়ে একবার দেখে আসি। পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাখালদা' কম্বল বিছানা নিয়ে রওনা হলেন। তাঁর বিদায়ের সময়ে আমারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। রাখালদা' নিজের দাদার মতই স্নেহ যত্ন করে দাদার স্থানই অধিকার করেছিলেন এই কয়েকমাসের মধ্যে। তাঁকে বিদায় জানিয়ে আপনজনের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করলাম।

পরের দিন আমার কোদাল নিয়ে মাটি কাটবার সময় বাঁ পায়ের পাতার ঠিক ওপরে সামনের দিকে কোদাল লেগে অনেকখানি কেটে গেল। কোদালের চোটও খুব লাগলো। টাবু দূরে; কাছে-পিঠে কোন লোকই নেই। পায়ের ক্ষত দিয়ে প্রবলভাবে রক্ত পড়তে লাগলো। একেবারে অসহায় অবস্থায় ক্ষতের মুখ চেপে ধরে বসে পড়লাম, আর কিছু না পেয়ে চায়ের কচিপাতা হাতের তালুতে চেপে চেপে দলা বানিয়ে ক্ষতের মুখে দিয়ে খুব চেপে ধরে রাখলাম। অনেকক্ষণ ধরে এই প্রক্রিয়া চললো—দেখলাম রক্ত জমে বেয়ে পড়া বন্ধ হয়ে গেল। সে ভীষণ অবস্থা! একেবারে একলা! সাহায্য দূরে থাকুক আহা উঁহু করবার লোকও কেউ নাই নিকটে। তখন টাবুতে ফিরবার সময়ও হয় নি। হাঁটতে গেলেই পুনরায় রক্ত পড়তে পারে ভেবে বাগিচাতেই বসে থাকলুম। মন অবসাদে চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলো। বৈকাল হতেই আঁধার নেমে আসতে থাকে। চারিদিকে পাহাড়, আর তার উপর ঘন কালো জঙ্গল! যেন প্রেত-পুরী! চিন্তা করতে লাগলুম, মানুষ নিজের কর্মফল ভোগ করে না তার অদৃষ্টের লিখন মত তার ভোগ হয়! সেই পুরাতন প্রশ্ন! তবুও এই প্রশ্ন মনের মধ্যে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

ছেলেবেলা থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে ও পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে মনে একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে, একটা সর্বশক্তিমান শক্তি আছে। যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে ও রক্ষণ করেছে। ক্ষুদ্রতম কীটের উপরেও যার প্রতিনিয়ত দৃষ্টি আছে। সমুদ্রের তলে পর্বতের সুউচ্চ শিখরে কীট পতঙ্গের খাদ্যের ব্যবস্থা করছে! কতকগুলি নিয়মাধীনে বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি, স্থিতি-প্রলয় নিয়মিত ভাবে সম্পাদন করছে। আমিও এই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান দৃষ্টির বাইরে নই। সেই মহাশক্তি আমার কর্মে বা ভাগ্যে আমার যা প্রাপ্য তা' নিশ্চয় আমাকে দেবে। মনে মনে বললাম—

'Not a complaint not a curse,
Let thy holy will sweep over me.'

'কোন নালিশ নেই, নেই কোন অভিশাপ, তোমার পবিত্র ইচ্ছা আমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হোক—ওঁ শান্তি!

মনের হতাশ ভাব অনেকটা কেটে গেল। ধীরে ধীরে কোদাল নিয়ে টাবুতে ফিরলাম। পায়ে ভয়ানক বেদনা ও রাত্রে জ্বর এ'ল। পরের দিন আর কাজে যেতে পারলাম না। রাত্রে মশাতে ঘায়ের ওপর কামড় দেবে বা ডিপোর বীজাণু ক্ষত দিয়ে প্রবেশ করবে শরীরে এই ভয়ে খানিকটা উনুনের ছাই এনে ক্ষতের উপরে দিয়েছিলাম। আমার জ্বর হওয়ায় এই প্রেতপুরীতেই মারা যাব ভয় হ'ল। বেরী সাহেবের সেই ভবিষ্যৎ-বাণী, যে আমাদের দেহ দিয়ে এখানকার চা-বাগিচার সার হ'বে—সে ভবিষ্যৎ-বাণীই বুঝি প্রথম আমার দেহের ওপর দিয়েই সফল হবে। অদৃষ্টের কি পরিহাস—জীবনের কি অচিন্তনীয় পরিণতি! সমস্ত দিন বিছানায় পড়ে রইলুম, কেউ এসে জিজ্ঞাসাও করলো না যে কেমন আছি। আর দেশে বাড়ীতে তলে!···

ঘায়ের রক্ত অবশ্য চায়ের পাতাতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরমালু টিণ্ডাল এসে দেখে গেল। কি খেলাম মনে নেই। সাবু, বার্লি, বিস্কুট নিশ্চয় নয়, বোধ হয় ভাতের মাড় নুন সহযোগে একটু খেয়েছিলাম। পরের দিন দেখি সকালেই জমাদার এসে আমাকে বিছানা গুছিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে হাসপাতালে যেতে বললো। এই বার্তা শুনে ক্ষত জ্বর শরীরের দুর্বলতা সব পালিয়ে গেল। আনন্দে মন প্রাণ ভরে উঠলো, আমি যেন নবজীবন পেলাম। নূতন উদ্যমে হাসপাতালের পথে পা বাড়ালাম। আমার ক্ষতই আমাকে এই জীবন্ত নরক থেকে উদ্ধার করলো।

পথে কয়েকবার বিশ্রাম করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে হাসপাতালে
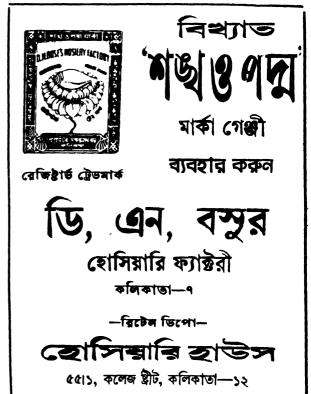
পৌঁছলাম। বৈকালের দিকে পাহাড়ের ওপর প্রশস্ত উপত্যকায় সুদৃশ্য ব্যাম্বু ফ্লাট হাসপাতাল বড়ই মনোরম। তখনই ভর্তি হয়ে শয্যা নিলাম, বহুদিন পরে খাটের ওপর নরম শয্যায় আরামে শুয়ে যেন স্বর্গসুখ ভোগ করলাম। ক্ষতে ওষুধ দেওয়া হল, ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার কেসের আমার দু' বন্ধু অবনী চক্রবর্তী ও নগেন্দ্র চন্দ্র আমার পূর্বেই অসুস্থ হয়ে এই হাসপাতালে এসেছে। সকলে এক ঘরেই পাশাপাশি খাটের উপর শুলাম। কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকটি বারে বারে এসে আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না? কি চাই? এই সব জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগলেন। আমরা যেন মাননীয় অতিথি; সকলেই দেখলাম আমাদের জন্ম ব্যস্ত। খবর নিয়ে জানলাম যে, কম্পাউণ্ডার ভদ্রলোকের নাম দেবেন্দ্রনাথ দত্ত। যশোর জেলার—আমার গ্রাম থেকে বেশী দূরে নয়—বার তের বৎসর পূর্বে খুনের অপরাধে কালাপানীতে এসেছেন। এখন 'ফ্রি' টিকেট নিয়ে স্বাধীনভাবে কম্পাউণ্ডারী করে জীবিকা অর্জন করছেন। দেশ হতে স্ত্রীকে আনিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় আছেন। আমাদের কেসের সব ইতিহাসই জানেন বললেন।

এই হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার সাহেব হচ্ছেন বাঁকুড়া নিবাসী ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম-বি, অতি ভদ্র। পূর্ণ সহানুভূতি নিয়েই তিনি আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন। শুনলাম। তিনি হাসপাতালসংলগ্ন বাংলোতে সস্ত্রীক বাস করেন—তখন মনে হয় দু'টি সন্তান হয়েছে। রাত্রে এসে অনেক কথাবার্তা বলতেন—এসব কাজ কি আমাদের সহ্য হয়? অসুখ ত' করবেই ইত্যাদি। দিনে আমাদের রুটীন মাফিক একবার দ্রুত দেখে যেতেন।

হাসপাতালে ভাল খাবারের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর গায়ের রং কালো হলেও অতি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ ছিলেন। অতি ভদ্র অমায়িক, সব কয়েদীকেই যত্ন করতেন। রাত্রে তিনি রোজই বাসা হতে লুচি, তরকারী, সন্দেশ, হালুয়া প্রভৃতি পাঠিয়ে দিতেন—

আমরা যেন মহাসম্মানীয় লোক। রাত্রে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে চেয়ারে বসে অনেক গল্প করতেন। অসুখ তখন আমাদের কারও নেই। আমার ক্ষতও প্রায় সেরে উঠেছে। আমরা রাজদ্রোহী কয়েদী তা'তে আবার বাঙ্গালী, তিনিও বাঙ্গালী, এজন্য আমরা তাঁকে আমাদের সঙ্গে বেশী মিশতে নিষেধ করেছিলাম; তিনিও সেই সব কারণে দিনে বাসা হ'তে সব রোগীদের সামনে খাবার পাঠাতেন না। আমরা মনের আনন্দে কয়েক দিন রাজভোগ খেয়ে রাজ-শয্যায় শুয়ে 'আশ্চর্য-প্রদীপে'র আলাদিনের মত সুখ ভোগ করে নিলাম। পরে শুনেছি চাকুরী হতে অবসর নিয়ে তিনি মেদিনীপুর সদরে স্বাধীনভাবে ডাক্তারী করতেন। খুব ইচ্ছা থাকলেও তাঁর সঙ্গে একবারও ফিরে এসে দেখা করতে পারি নি। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর যত্ন ভালবাসা আত্মীয়সুলভ ব্যবহার কখনই ভুলবার নয়।

আর একজন সহৃদয় বাঙ্গালীর স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ না করলে নিজের কাছেই নিজে অপরাধী হব। হাসপাতালের সংলগ্ন এক ঘরে একজন বৃদ্ধ কর্মকার বাস করতেন। তিনিও বাঁকুড়ানিবাসী তিনি বহু পুরাতন কয়েদী। স্বাধীনভাবে 'ফ্রি' টিকেট নিয়ে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ও অন্যান্যদের সাহায্যে টুকটাক কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন। তাঁহার নাম রামচরণ কর্মকার, কাঁসা পিতলের ঝালাই-এর কাজ করতেন। অর্ধশতাব্দীর পরেও তাঁর চেহারাটি বেশ মনের পটে পরিষ্কার দেখতে পাই। পাতলা কালো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলেন বার্ধক্য হেতু। তিনি একদিন এসে আমাদের হাত জড়িয়ে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন আর পরম আদরে বসিয়ে কিছু খাওয়ার জন্ম বিশেষ করে অনুরোধ করতে লাগলেন। গরম রুটি ও তরকারী খেলাম। কুমড়ার ডাঁটা ও পাতা দিয়ে তরকারী করেছিলেন। এমন সুন্দর, সুস্বাদের তরকারী বহু দিন খাই নাই। বাহান্ন বছরের পরেও সেই কুমড়ার শাকের আস্বাদ আজও মুখে লেগে আছে।

ব্যাম্বু ফ্লাট হাসপাতালে রাখালদা'র খোঁজ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তাঁর অনুরোধ মত। কিন্তু য দৃশ্য দেখলাম তা'র বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হাসপাতাল হতে কিছুদূরে যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদের হাসপাতাল। খোঁজ নিয়ে একদিন গেলাম, দেখি ঘরের মেঝেতে সারি সারি কম্বলের উপর যক্ষ্মারোগীরা বসে কাশছে। তাদের সামনে একটি করে নারকেলের মালা রাখা আছে থুথু ফেলবার জন্যে। না আছে বিছানা, পুষ্ট-খাদ্য, না আছে ওষুধ রাখালদা' কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন আমাকে দেখে। মিথ্যা আশা তাঁকে দিয়ে চলে এলাম। ছ'সাত দিন ব্যাম্বু ফ্লাট হাসপাতালে আনন্দে থাকবার পরে হঠাৎ কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হ'ল যে, আমরা বাঙ্গালী রাজদ্রোহী কয়েদী বাইরের হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি? এইবার হয়ত আবার একটা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করবো। পুলিশ পাঠিয়ে আমাদের ধরে জেল হাসপাতালে আনা হ'ল। যমরাজের দক্ষিণ দুয়ার হতে আবার বেরী সাহেবের দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে এলাম।

দশ-বার বৎসর পূর্বে এখানে ইউরোপীয় কয়েদীদের ভারত হতে এনে রাখা হত। তারা না কি দলবদ্ধ হয়ে জেল ভেঙ্গে বাইরে এসে রসদ্বীপের ছোট দুর্গটি আক্রমণ করেছিলো। আমরা শুনেছিলাম যে, সেই হতে সাহেব কয়েদীদের আর এখানে পাঠান হত না। আমাদের নিয়ে কর্তৃপক্ষের সে ভয়ও ছিলো। কিন্তু জেলের সকলে আমাদের সকলকেই বাঙ্গালী বলে ডাকতো। পাঞ্জাবী, মারাঠী, ইউ, পির ছেলেদেরও বাঙ্গালী বলে ডাকতো। রাজদ্রোহী কয়েদী যখন তখন নিশ্চয়ই বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী 'ফোবিয়া' তাদের পেয়ে বসেছিলো। আর কয়েকটি স্মৃতিকথা বলেই এই কালাটং কাহিনী শেষ করবো।

উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল ছিলেন পূর্ব হতে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জন জেলে এক ব্লকে একসঙ্গে হলেই তাঁদের মধ্যে ঝগড়া ও ছোটখাট একটু মারামারি হত। আবার পরক্ষণেই মিটমাট হয়ে উভয়ের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা চলতো। আমরা এই দৃশ্য বেশ আমোদ উপভোগ করতাম।

হৃষীকেশদা' বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁকে ঘানি টানতে দিলে,

ঘানি যখন শেষের দিকে শক্ত হয়ে উঠত তখন দেহের কষ্ট দূর করবার জন্ম তিনি বেদান্তের আশ্রয় নিতেন। ঘানির হাতল ঘুরোবার সময় প্রথমের দিকে সহজেই বেশ তেল বের হয় কিন্তু পরে ক্রমেই ঘানির সরষে বা নারকেলের শাঁস শক্ত হয়ে উঠে তখন হাতল ঘুরোতে খুব জোর দিতে হয়—খুব কষ্ট হয়, তখন তিনি 'আনন্দময়োঽহং, নির্বিকারোঽহং, আত্মাস্বরূপোঽহং উপাধিরহিতোঽহং' ইত্যাদি বেশ জোরে আওড়াতেন। পাঞ্জাবের নন্দগোপাল ছিলেন লম্বা চওড়া যুবক। বেশ গম্ভীর, স্বল্পভাষী। বাবু রামচরি স্বাস্থ্যবান যুবক, চটপটে, বেশ ইংরাজি বলতেন, খুব মেলামেশা করতেন। লেধারাম ঐ রামহরিরই মতন। হেমচন্দ্র কানুনগো ফ্রান্সে গিয়ে প্রথমে মার্সেলিজে জাহাজ থেকে মাল নামানো ওঠানোর কুলীর কাজ করতেন, অন্য দেশের বিপ্লবী দলে থেকে বোমা তৈরী করতে শিখে এসেছিলেন। তাঁর গোঁফ দাড়ি খুবই বিরল ছিল। কয়েকটা দাড়ি বহুদিনের অবহেলায় খুব লম্বা হয়ে বিশ্রী দেখাচ্ছিল।

বিনায়ক সাভারকার ব্যারিষ্টার ছিলেন, খুব জ্ঞানী, জেলের মধ্যেই বাংলা শিখেছিলেন আমাদের কাছে। তিনি খুব ধীর স্থির ও নম্র স্বভাবের রসিক লোক ছিলেন। লোককে হাসাতেও পারতেন প্রচুর। তিনি সুযোগমত হেমদা'র কাছে এসে তাঁর দাড়ি ধরে কাতরকণ্ঠে বলতেন: 'হেমবাবু ভারতবর্ষের দোহাই দিচ্ছি আপনার এক গাছা দাড়ি কাটুন।' সকলে আমরা হেসে উঠতাম।

উপেনদাকে জেলের বাইরে জলের কলের পাহারায় দিয়েছিল, কেউ যাতে জল অপচয় না করে। একদিন আন্দামানের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর ইটালিয়ান ক্যাপ্টেন ঘোড়ায় চড়ে এসে তাঁকে বললো: 'লোকের পিছন দিক হতে বোমা মেরে তাকে মেরে ফেলা কি কাপুরুষতা নয়?'

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: 'একটা জাতিকে নিরস্ত্র করে তাকে যথেচ্ছ শাসন করা কি কাপুরুষতা নয়?'

সাহেব আর কোন কথা না বলে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

উল্লাসকরদা'কে ইট তৈয়ারীর কাজে দিয়েছিল। মাঠে রৌদ্রে কষ্টে তাঁর মাথা খারাপ মত হয়েছিল—পরে জেলে এনে যখন দেয়ালের গায়ে হাতকড়ি দিয়া রাখা হল, তখন দেখা গেল তিনি ভয়ানক জ্বরে অজ্ঞান হয়ে হাতকড়ি লাগান অবস্থায় ঝুলছেন। আমাদের কে একজন দেখে চিৎকার করে জমাদারকে বললে হাতকড়ি খুলে দেওয়া হ'ল।

তার কিছুদিন পূর্বে ফাইলে বসে খাবার সময় এক শিখকে ডেকে বলেছিলেন: 'ভাই ঐ দেখ মা কাঁদছেন?'

শিখ কয়েদী কিছুই দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে তাঁকে বলল: 'কৈ কিছুই ত' দেখতে পাচ্ছি না।'

তখন তিনি আবার বললেন: 'দেখ ভাই মা আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কেবল কাঁদছেন।' এই বলে তিনি কেঁদে উঠলেন।

এর পরেই তাঁর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল।

আলিপুর কেসের বীরেন সেন ছিলেন মনে হয় সর্ব কনিষ্ঠ। রোগা শরীর, গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু এই নম্র ছেলেটির মনটি ছিল ইস্পাতের মত শক্ত ও দৃঢ়। কোন কিছুতেই ভয়ডর ছিল না। বীরেন একটু ধীরে ধীরে খেত, সুতরাং আর সকল কয়েদীর যখন খাওয়া হয়ে যেত, বীরেন তখনও খাচ্ছে। অপর কয়েদীদের খাওয়া শেষ হলেই পাহারাবত জমাদার 'উঠ যাও' বলে হুকুম দিত। তখন সকলেই উঠে যেত। বীরেন কিন্তু উঠত না।

জমাদার ধমক দিত। পরে এই অপরাধে তাকে জেলহাজতও ভোগ করতে হয়েছে কয়েক বার, কিন্তু বীরেন বরং আরও ধীরে ধীরে খেতে সুরু করলো। পরে জমাদার তাকে আর কিছুই বলতো না। সাধারণ কয়েদী হলে তাকে লাঠির ঠোকা সহ্য করতে হত। যা'হক এই খুব ধীরে ধীরে, চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার দরুণ বীরেনের স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়ে উঠলো স্বাস্থ্যের সঙ্গে শরীরের কান্তিও সুন্দর হল।

বীরেনের ভাই সুশীল সেন এর পূর্বেই একটি বোমা নিয়ে নদীর পাড়ে উঁচুতে উঠতে যাওয়ার সময় হঠাৎ বোমাটি ফেটে যাওয়ায় মারা যায় শুনেছিলাম। এই দু'ভাই সিলেটের বানিয়াচঙ্গ গ্রামের প্রসিদ্ধ শিক্ষিত সেন পরিবারের সন্তান। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই পরিবারের শুনেছি দানের পরিমাণ কম নয়। বীরেন এখন কোথায় কি করে জানতে ইচ্ছা হয়।

ননীগোপাল ব্যানার্জি নামে একটি ছেলে রাজনৈতিক অপরাধে ১৯১৩তে সেলুলার জেলে এসেছিল। তাকে একটি সুকুমার বালক বলাও চলত। তারও রোগা শরীরে জোরাল মন ছিল। পুন: পুন: জেলে অপরাধ করায় বহু সাজা সে ভোগ করে—পরে তাকে কটের জাঙ্গিয়া কোর্তা পরতে দেওয়া হয়। সে পরে না—উলঙ্গই থাকে—সেই অবস্থায় তাকে ধরে নিয়ে কয়েদীদের সামনে আনা হয় তাকে লজ্জা দেবার জন্ম। কিন্তু ননী এতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। পরে তাকে বেত মারার আদেশ হয় কিন্তু আমরা জানাই যে ননীকে বেত মেরে রক্তপাত করলে আমরাও বহু পরিমাণে রক্তপাত ঘটাব। বেত আর মারা হয় না, তবে তাকে ভয় দেখাবার জন্ম বেত মারার প্রহসন করা হয়। জানি না, বীরেন, ননী আজ কোথায়? বীর হৃদয়ের এই দু'টি বালক আমার মনে পরম স্নেহের স্থান নিয়ে আছে।

এর পর আমাদের সায়েস্তা করবার জন্ম কালাপানী হতে জাহাজ ভারতের বিভিন্ন জেলে পৃথক পৃথক করে পাঠান হয়। আমাকে প্রথমে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল জেলে—পরে পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলে রাখা হয় এক বৎসর। সেখানে নূতন করে একলাই লড়াই করতে হয়—সে কাহিনী পরে লিখছি।

রেডক্রশের জন্মকথা

শ্রীস্বরূপ সিংহ

তোমরা রেডক্রশের প্রতীক চিহ্ন প্রায়ই দেখে থাকো। কিন্তু এর সম্বন্ধে অনেক কিছুই অজানা আছে মনে হয়।

সেবা ধর্মের মহান প্রতিষ্ঠান এই রেডক্রশ। সারা পৃথিবী জুড়ে এই প্রতিষ্ঠান লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সেবা করে চলেছে।

তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে, এই সমিতির জন্মের মূলে রয়েছেন একজন সামান্য ব্যবসায়ী। জ্যা হেনরী ডুনাণ্ট, সুইজারল্যাণ্ডের এক বণিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পাবার জন্য সম্রাট তৃতীয়
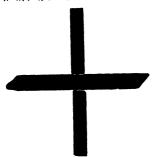
নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। সেদিন ছিল ১৮৫৯ সালের ২৪শে জুন। ঘটনাচক্রে এসে পড়লেন উত্তর ইটালীর সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধ করতে আসেন নি তিনি। হাজার হাজার সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতপ্রায় দেখে ডুনাণ্টের প্রাণ কেঁদে উঠল। নিজের কাজ ভুলে তিনি এদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। দেশে ফিরেই কয়েক বৎসর পরে তিনি 'সলফেরিনোর স্মৃতি' নামে একটি বই লিখলেন। তখনকার দিনে চিন্তাবিদ-মহলে বইটি খুব সমাদর লাভ করল। জেনেভার পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ডুনাণ্টের প্রস্তাবগুলি খুবই সমর্থন করে। 'যুদ্ধ ছাড়া শান্তির সময়ে কি সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের সরকার কি এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সম্মতি দিতে পারে না।' তাছাড়া খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি লিখলেন,—

'যুদ্ধক্ষেত্রে আহতরা শত্রু নয়; তাদের হত্যা করা চলবে না। হাসপাতাল, নার্স, ঔষধের গুদাম কখনই আক্রান্ত হবে না।'

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রস্তাবগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৬৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ডুনাণ্টকে সভাপতি করে যুদ্ধে আহতদের সেবা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটী গঠিত হল। এই কমিটীই পরে আন্তর্জাতিক রেডক্রশে পরিণত হয়। সেদিনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আজ বিশালাকার ধারণ করেছে। সেদিনের চারা গাছ আজ বিরাট বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তোমরা হয় তো ভাবছো, যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা পরিচর্যা করা এদের এই একটাই কাজ। কিন্তু মোটেই তা নয়! প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন, বন্যা-ভূমিকম্পের সময় এই সমিতি দুর্গতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। ব্যাপক মহামারী দেখা দিলে রেডক্রশ রোগীদের শুশ্রূষার ভার নেয়। যুদ্ধে যারা বন্দী হয় তাদের যথাস্থানে পৌঁছে দেবার ভার এদের হাতেই আছে।

দুঃখ-দুর্দশা আমাদের কাছে চিরদিনই মাথা উঁচিয়ে থাকবে। সেজন্যে রেডক্রশের কাজ কোনদিনই শেষ হবে না!

মানুষ-মাত্রেরই আর্ত আতুরদের প্রতি দরদী মনোভাব থাকবেই। তাই যুগ যুগ ধরে রেডক্রশ তার সেবার মহিমায় অমর হয়ে থাকবে। হয়ত জানো না, এই বছর রেডক্রশের একশত বৎসর পূর্ণ হয়েছে, শতবার্ষিকী উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই উপলক্ষে।

'ক্রিস্‌মাস ক্যারল' ঃ চার্লস ডিকেন্স

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী

প্রায় একশো বছর আগের কথা। 'ক্রিস্‌মাস ক্যারল' তখন সবেমাত্র ছেপে বের হয়েছে।

বইখানা ছেপে বের হওয়া মাত্র অদ্ভুত সাড়াও পাওয়া গেছে। তাই লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে 'ক্রিস্‌মাস ক্যারলে'র নাম। যে পড়ছে সেই বলছে, ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে এমন বই এর আগে আর লেখা হয় নি। লেখককে এজন্যে সহস্র ধন্যবাদ!

কথাটা মিথ্যে নয়। কারণ 'ক্রিস্‌মাস ক্যারল' সত্যি সত্যিই সে যুগের ছেলে-বুড়োর মন কেড়ে নিয়েছিলো। আর কেড়ে নিয়েছিলো বলেই যতো দিন যেতে লাগলো, ততোই বইখানার আদর বাড়তে লাগলো। বইখানার নাম শেষে দেশ থেকে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়লো —পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বইখানার অনুবাদ বের হলো।

তারপর?

তারপর দীর্ঘ কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন আমেরিকার এক ধনী ব্যবসায়ী লণ্ডনে বেড়াতে এলেন। ব্যবসায়ীর নাম জে, পি, মর্গান।

লণ্ডনে বেড়াতে এসে তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপলো! তিনি 'ক্রিস্‌মাস ক্যারলে'র পাণ্ডুলিপি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

যে প্রেসে বইখানা বহু বছর আগে ছাপা হয়েছিল, তিনি খোঁজ নিয়ে সেই প্রেসে হাজির হলেন। প্রেসের ম্যানেজারকে বললেন, আপনি কি 'ক্রিস্‌মাস ক্যারলে'র পাণ্ডুলিপিখানা দিতে পারেন?

মর্গানের কথা শুনে প্রেসের ম্যানেজার তো অবাক!

মর্গান মৃদু হেসে বললেন, আপনি যদি পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করে দেন, তাহলে যা দাম চাইবেন, তাই দিয়ে কিনে নিয়ে যাবো!

মর্গানের অনুরোধে প্রেসের ম্যানেজার কাজে হাত দিলেন।

যে-ঘরে বই ছাপা হয়ে যাবার পর পুরনো পাণ্ডুলিপি রেখে দেওয়া হতো, সেই ঘরে কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুরনো পাণ্ডুলিপির গাদার ভেতর থেকে বের হলো ক্রিস্‌মাস ক্যারলের কালিঝুলি-মাখা পাণ্ডুলিপিখানা!

পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে জেনে প্রেসের ম্যানেজার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন!

মর্গানের গম্ভীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো! তিনি পাণ্ডুলিপিখানা হাতে নিয়ে খস্ খস্ করে একখানা চেক লিখে ফেললেন। পাণ্ডুলিপির বদলে দু'লক্ষ টাকার চেকখানা হাতে নিয়ে প্রেসের ম্যানেজার মিষ্টি হাসি হেসে মর্গানকে ধন্যবাদ জানালেন।

'ক্রিস্‌মাস ক্যারলের' লেখক—চার্লস ডিকেন্স।

ডিকেন্সকে কিশোর বয়স থেকেই নিদারুণ দারিদ্র্যের সংগে যুদ্ধ করতে হয়েছে। যখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর তখন একদল পাওনাদার তাঁর বাবা আর মায়ের নামে আদালতে মামলা জুড়ে দিলেন। বিচারে দেনার দায়ে তাঁদের জেল হলো।

কিশোর ডিকেন্স তখন কি আর করেন! তিনি তখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চাকরীর সন্ধানে।

শেষে তিনি একটা কাজ পেলেন। কাজ পেলেন এক কারখানায়। ঠিক হলো, এই কাজের জন্যে তিনি সপ্তাহে ছ'শিলিং বেতন পাবেন।

সপ্তাহে ছ' শিলিং। কতোই বা আর বেতন। তবু তিনি না বলতে পারলেন না। পেটের দায়ে ঐ সামান্য বেতনেই কাজ করতে লাগলেন।

এতো অল্প বেতনে লণ্ডনের মতো শহরে দিন কাটানো তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠলো। তিনি কোনও রকমে আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু জীবনের চলার পথে থমকে দাঁড়ালেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করেই হোক্ তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে,—মানুষ হতে হবে।

বছর দু'ই এ ভাবে কাটানোর পর তাঁর বাবা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি নোতুন করে সংসার পাতলেন।

ডিকেন্স কাজ ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন—ইস্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু এতো সুখ তাঁর বেশী দিন সহ্য হলো না।

তাঁদের অবস্থা আবার খারাপ হলো। তিনি বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরীতে ঢুকলেন।

চাকরী পেলেন এক উকিলের কেরাণী হিসেবে।

নামে কেরাণী, কাজে চাকর। কারণ তাঁকে ঐ উকিলের বাড়ীতে চাকরের কাজ করতে হতো। তবু তিনি মুষড়ে পড়লেন না। ঐ কাজ করতে করতেই অবসর সময়ে কষ্ট করে শর্টহ্যাণ্ড শিখে ফেললেন।

শর্টহ্যাণ্ড শেখার পর তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল!

তিনি তখন উকিলের কেরাণীর কাজ ছেড়ে দিয়ে নোতুন চাকরী নিলেন।

চাকরী নিলেন এক পত্রিকা অফিসে। এখানে তিনি সংবাদ সংগ্রহের কাজ পেলেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তাঁকে প্রায়ই গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হতো। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর সময় তিনি নানান ধরণের লোকের সংস্পর্শে এলেন। এভাবে তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাই পরবর্তী জীবনে তাঁর সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিলো!

তখন লণ্ডন থেকে 'মান্থলি ম্যাগাজিন' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বের হতো। তাতে ইংল্যাণ্ডের নামকরা লোকরা লিখতেন।

ডিকেন্স একদিন একটা গল্প লিখে গল্পটা ছদ্মনামে 'মান্থলি ম্যাগাজিন' পত্রিকার ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন। ফেলে দিয়ে এলেন বেশ ভয়ে ভয়ে। ভাবলেন, এ গল্প কি আর ছাপা হবে।

গল্পটা ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে আসার পর থেকে পত্রিকা ছেপে বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেশ অস্বস্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন।

সময় মতো 'মান্থলি ম্যাগাজিন' ছেপে বের হলো!

ডিকেন্স তার এক কপি কিনে পাতা উল্টাতে লাগলেন! পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ তিনি তাঁর পাঠানো গল্পটা ছাপার অক্ষরে দেখতে পেলেন।

গল্পটা ছাপা হয়েছে দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না।

তারপর?

তারপর 'স্কেচেজ অফ্ বজ' নামে আরো সাতটা লেখা ছদ্মনামে পরপর ঐ পত্রিকায় পাঠালেন।

আশ্চর্যের কথা সব কটি লেখাই 'মান্থলি ম্যাগাজিনে' ছাপা হয়ে বের হলো! এভাবে সাহিত্যিক বজের নাম ইংল্যাণ্ডের পাঠক মহলে ছড়িয়ে পড়লো। চার্লস ডিকেন্সকে তখন ক'জন চেনে?

লোকের মুখে মুখে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে লেখক বজের নাম। অনেকেই বলেন, বজের মতো লেখক খুবই কম দেখা যায়। ডিকেন্স এ কথা শুনে মনে মনে হাসেন।

ডিকেন্স এতোদিনে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হলেন। তিনি তখন সংবাদ সংগ্রহের কাজ ছেড়ে দিয়ে গল্প আর উপন্যাস লেখার জন্যে কলম ধরলেন।

তারপরে তাঁর কলম থেকে বের হলো—অলিভার টুইষ্ট, নিকোলাস নিকলবি, ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ, ডেভিড কপারফিল্ড, দি টেল অফ টু সিটিজ, ক্রিস্‌মাস ক্যারল··প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস।

তাঁর লেখা পড়ে ইংল্যাণ্ডের লোকে বিস্মিত হলেন!

তাঁর নাম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক হিসেবে ইংল্যাণ্ডের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

বড় বড় সমালোচকেরা তাঁর লেখা পড়ে বললেন, সাধারণ লোকের সুখ-দুঃখ আর বেদনা নিয়ে এমন গল্প আর উপন্যাস এর আগে আর লেখা হয় নি, এই সব গল্প ও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্র কল্পনার রঙে রঙানো নয় বাস্তব ও জীবন্ত।

ডিকেন্সের সাহিত্যিক খ্যাতি ক্রমে দেশ থেকে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়লো। যখন তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাস পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হলো তখন পৃথিবীর লোক তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে এগিয়ে এলেন—তিনি অমর হয়ে রইলেন।

মজার ছড়া

মায়া দত্ত

তাল পাতাতে তাল নেই যে
বনেতে নেই বাঘ
তাই না শুনে ভজন মামা
ভীষণ করে রাগ।
রাগের চোটে বকুবাবাজী
দৌড়ে গেল চলে,
রাগ ভাঙ্গাতে রামুদাদা
ডুবল গিয়ে জলে।
জলের তলায় ছিল যে ভাই
মস্তো একটা বাঘ
তাই না শুনে ভজন মামা
আর করে নি রাগ।

বাঙালী বীরের কাহিনী

শ্রীমৃণালকান্তি বসু

আজ তোমাদের কাছে এমন একজন বাঙালী বীরের কাহিনী বলবো—যাঁর কথা হয় তো অনেকেই ভুলে গেছো। তাঁর নাম সংগ্রাম সাহ। খাঁটি বাঙালী। তখন বারভুঁইয়া আর নেই। পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলায় চলেছে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার। চিন্তাভারাক্রান্ত মোগল সম্রাট আওরংজেব। তাঁর চিন্তা দূর করতে এগিয়ে এলেন সংগ্রাম সাহ। ভার নিলেন দস্যু বিতাড়নের। তাঁর কেল্লা হলো গান্ধিয়া গ্রামে। গ্রামটি বরিশালের দক্ষিণ প্রান্তে শাহবাজপুর পরগণায় অবস্থিত। তার ছাউনি পড়লো চট্টগ্রামের উপকূলে আর ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামে। এই বাঙালী বীরের অসমসাহসিকতা ও রণচাতুর্যে ভীত ও বিপন্ন হয়ে পড়লো জলদস্যুরা বাধ্য হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলো। কেউ বাঙলা ছেড়ে গেল, কেউ বা বাঙলায় রয়ে গেল আর মন দিল চাষ-বাসে। আওরংজেব সংগ্রাম সাহকে সম্মানিত করলেন। জায়গীর স্বরূপ দিলেন তাঁকে খাসনওয়ারা মহাল পরগণে ভূষণা মামুদপুর!

বিজয়ী বীর শান্তি-শৃঙ্খলা এনে যে সময়ে বিশ্রামের আয়োজন করছেন, সে সময়ে দিল্লী থেকে ডাক পড়লো। বিপন্ন আওরংজেব; তাঁকে বাঁচাতে হবে। যে যশোবন্ত সিংহ সম্রাটের প্রধান সহায়ক তিনি দাঁড়িয়েছেন সম্রাটের বিরুদ্ধে। যোধপুরপতি যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছেন শাহজাদা আকবর। মোগল সম্রাটকে সন্ধি প্রার্থনা করতে হয়েছে সামান্য রাজপুতের কাছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। ছুটে গেলেন প্রৌঢ় বাঙালী বীর সংগ্রাম সাহ। সম্রাট তাঁকে সেনাপতি করলেন। তাঁর সেনাপতিত্বে প্রতি যুদ্ধে জয়ী হোলো বাদশাহ বাহিনী। রাঠোরগণ প্রমাদ গণলো, ভীত হয়ে পড়লো। সেদিন বাঙালীর কাছে শির নত করলো দুর্ধর্ষ রণকুশলী রাজপুত বীরগণ। বাঙালী বীরের বিজয় কাহিনী ধ্বনিত হোলো সমগ্র উত্তরাপথে, বাঙালীর যশোগাথায় সেদিন মুখরিত সমগ্র ভারত।

বীর সংগ্রাম সাহের স্থাপিত জয়স্তম্ভ 'সংগ্রামের দেউল' আজো সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর কীর্তি কাহিনী ফরিদপুর জেলার মথুরাপুর গ্রামে। আজ যেমন বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন ভারতের সেনাপতি জয়ন্ত চৌধুরী; মোগল আমলেও তেমনই বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছিলেন বীর সংগ্রাম সাহ!!

সাতটি চাঁপা

শ্রীমতী শান্তি বসু

রাজার বাড়ির আঙিনায়
একটি পাশে, নিরালায়
সাতটি চাঁপা ফুটে আছে
আলো করে চাঁপাগাছে
তার মাঝেতে, একটি পারুল।
সাতটি ভাই একটি বোনে
কি কথা কয় কানে কানে
কত সুখ দুখের কথা
জানায় যত মনের ব্যথা
অভিমানে হয় আকুল।
দুখিনী এক মায়ের তরে
বেদনায় অশ্রু ঝরে
সাতটি ভাই দেখে স্বপন
জ্যোৎস্না ঢালে চাঁদটি তখন।
জাগো জাগো, বোনটি পারুল।
ভাঙাকুঁড়ের আঙিনাতে
রাণী শোয় আঁচল পেতে
আকাশের তারারে শুধায়
বলতে পার কোথায়
আমার সাতটি চাঁপা, পারুল?
ফুলপরীরা এসে কাছে
বলে রাণী আছে আছে
রাজার বাড়ির আঙিনায়
একটি পাশে নিরালায়
তোমার সাতটি চাঁপা, পারুল।

পাপরী ভরণে

—বিশ্ববন্ধু বসাক

একাকিনী

—দ্বিজেন নাগ

মাসিক বসুমতী
ভাদ্র / '৭০

স্নানের আগে
- দুলাল সরকার

হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি

—শিব দাস

দোলন চাঁপা

—সুশীল সান্যাল

অবাক

—সন্তু ঘোষ

ডাল হ্রদ

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

লিভারপুলের ম্যাজিক

যাদুরত্নাকর এ সি সরকার

বিলাতে থাকাকালে লিভারপুল সহরের এক ছাত্র মজলিশে দেখেছিলাম একটা খুব মজাদার যাদুর খেলা। বৃটিশ হোটেল নামক একটা ইংরেজ পরিচালিত হোটেলে ছিল আমার লিভারপুলের আস্তানা। ওই হোটেলের পাশে ছিল একটা ছোট পার্ক মতন খোলা জায়গা, সেই খোলা জায়গাতে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছিলাম একদিন সকাল বেলায়। রাস্তার ধারে ফুটেছিল অসংখ্য ড্যাফোডিল ফুল। সুন্দর তাজা ফুলগুলি দুলছিল সকালের ঝির ঝিরে হাওয়ায়। বেশ লাগছিলো আমার। সুন্দর সকালের নরম রোদ ঝির ঝিরে হাওয়া আর সুন্দর ফুলের মেলার মাঝে হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম একজনের ডাকে। 'গুড মর্নিং মিঃ সোরকার, আই অ্যাম জর্জ আর্মষ্ট্রং এ ষ্টুডেন্ট অফ দি লোকাল কলেজ।'

প্রত্যভিবাদন করতে যুবকটি আমার সামনে খুলে ধরলো তার অটোগ্রাফের খাতা। 'ইয়োর অটোগ্রাফ প্লিজ।'

পকেট থেকে কলম বের করে গোলাপী খাতাতে করে দিলাম সই—সঙ্গে দিলাম শুভেচ্ছা বাণী। বিদায় নেবার আগে সে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো সেদিন সন্ধ্যায় তাদের ছাত্র মজলিশে। নির্ধারিত সময়ে সে নিজে এসে হোটেল থেকে আমাকে নিয়ে গেল তাদের বৈঠকে।

সে এক মজার বৈঠক। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে জনা পঁচিশেক। সবারই বয়স কুড়ি বছরের মধ্যে। আমি যেতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানালো। মজলিশের সম্পাদক জর্জ আর্মষ্ট্রং এক এক করে সবায়ের সঙ্গে করিয়ে দিল আমার পরিচয়। তাদের অনুরোধে এই বৈঠকে 'আধুনিক যাদুবিদ্যার অগ্রগতি' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিতে হল আমাকে। আমার অনুমতি নিয়ে এলিজাবেথ রিকার্ড নামে একটি ১৮।১৯ বছরের মেয়ে দেখালে একটি চমৎকার ম্যাজিক এই অনুষ্ঠানে।

একটা টেবিলের উপরে পড়ে ছিল সেদিনের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান কাগজখানা। এই কাগজের একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলিজাবেথ বানালো একটি ঠোঙ্গা—চানাচুরের ঠোঙ্গার মতন। তার পরে 'হোকাস পোকাস'—আব্রা ক্যাটাব্রা···ম্যাজিকের মন্ত্র পড়ে এই খালি ঠোঙ্গার ভেতর থেকে টেনে বের করলো একটা সিল্কের ইউনিয়ন জ্যাক বা ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা। অবাক হয়ে হাততালি দিলো সবাই, আমি হাততালি দিলাম মেয়েটির সুন্দর দেখানোর কায়দার তারিফ করে।

এই অদ্ভুত খেলাটা কেমন করে সম্ভব হল জানো? কাগজটা থেকে যে পাতাটা এলিজাবেথ ছিঁড়ে নিয়েছিল তাতেই ছিল কারসাজি। দেখে একটা পাতা মনে হলেও আসলে তাতে ছিলো দু'টো পাতা। একটা পাতার ওপরে উপযুক্ত সাইজের একটা সিল্কের পতাকা রেখে তার ওপরে সে বিছিয়ে দিয়েছিল আর একটি পাতা। মাঝখানে পতাকাটা রেখে সে দু'টো কাগজে আঠা দিয়ে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছিল যে, কোনভাবেই কারসাজি বোঝা সম্ভব হয় নি একটুও দূর থেকে। সেইদিনকার কাগজ নিয়ে খেলাটা দেখানোতে সন্দেহ করবার আর কোন ফুরসৎ পায় নি দর্শকেরা। ঠোঙ্গা তৈরী করার পরে সে ভেতর দিককার কাগজ ছিঁড়ে সহজেই বের করতে পেরেছিল পতাকাটা। তোমরা অভ্যাস করে দেখ খুব মজা করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ !

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার মানসপুত্র নরেন,
বিবেকানন্দ বিলে,—
তব করুণায় সত্য সে পেলো
কানে সে মন্ত্র দিলে।
নর মাঝে তুই নারায়ণ পাবি
বল কি বাসনা? দেবো যাহা চাবি।
নরেন খুঁজেছে এতদিন যাঁকে
দেখলো সে 'দ' দ্বারে!

ছুটেছে সাগর পারে।

জড়ের জড়তা কেটে গেল সব
দিব্যদৃষ্টি পেলে,
'যত মত তত পথ' যে তুমিই
বিশ্বকে বলে গেলে।
জগ [illegible] ঐ 'কামারপুকুরে'
এলে ঝংকার জাগায় সুরে!
রাম ও কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ
ভক্তের ভগবান;
তব পদধূলি ধন্য যেথায়,—
এ প্রাণের এ প্রণাম।

অশোক-পলাশে লালে লাল হল
ঘাট-মাঠ প্রান্তর,
আবির্ভাবের পুণ্য এ তিথি
মোদের ধরণী 'পর;
কোকিলের কুহু এ মধুর গানে,
জাগিছে যে সাড়া সবাকার প্রাণে,
তুমি যে সবের প্রিয় নারায়ণ
তোমার ও কোলে সবে,—
পেলো স্নেহ ঠাঁই, দিলে মহাবাণী,
বিবেকের উৎসবে!

যা কিছু জড়তা ক্ষুদ্র নীচতা,
সকলি মুছিয়া তুমি,—
ভাগীরথী তীরে তীর্থ গড়িলে
রাণী রাসমণি ভূমি;
মানসপুত্র নরেন তোমার
চিকাগোয় গেল সাগরের পার,
হিন্দু ধর্মর বিজয় পতাকা
উড়ালো বিশ্ব মনে,—
প্রণাম তোমায় হে রামকৃষ্ণ!
স্মরি এ জন্ম ক্ষণে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

কৃষ্ণকটজ—দুগ্ধকরবী দ্র° ।

কৃষ্ণগন্ধা—শোভাঞ্জন বৃক্ষ ।

কৃষ্ণগর্ভ—কট্‌ফল বৃক্ষ ।

কৃষ্ণচূড়া—[স° সিদ্ধেশ্বর, গু° সন্ধ্যাপবী, ক° কোমরী, কোচিন চায়না—তোসাকন্দ, মালাবারে—তিসিতিনদারু । সিংহল—মেনোরামল] caesalpinia pulcherrima, poinciana pul. লাল ও পীতবর্ণের দুই রকম ফুলের দুই রকম জাত। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফুল ধরে। প্রকার ভেদ—বিলাতী কৃষ্ণচূড়া, রাধিকাচূড়া—সুবৃহৎ পুষ্প বৃক্ষ poinciana regia. মাদাগাস্কার দ্বীপ ইহার আদিস্থান। মরীসস দ্বীপ হইতে এ দেশে আনীত। ফুল বড় বড়, লাল ও হলদে রং মিশ্রিত। গ্রীষ্মকালে ফুল হয়। ২ গুঞ্জ, কুঁচ ॥ বিশ্ব ॥

কৃষ্ণজীবক, কৃষ্ণজীরা—কাল জিরে nigella indica. পর্যায়—সুষবী, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কালা, উপকুঞ্চিকা, সুষবী, কুঞ্চিকা, উপকুঞ্চি, কৃষ্ণা, জরণা, শালী, বহুগন্ধা, পৃথুকা।

কৃষ্ণঝাঁটি—ফুলগাছ ।

কৃষ্ণতণ্ডুলা—কর্ণ স্ফোটালতা ।

কৃষ্ণতিল—কাল তিল sesamum majus.

কৃষ্ণতুলসী—তুলসী ocymum sanctum.

কৃষ্ণদন্ত—কাশ্মীর বৃক্ষ, গাম্ভারী বৃক্ষ ।

কৃষ্ণধত্তূর, কৃষ্ণধুস্তূর, কৃষ্ণধত্তূরক, কৃষ্ণধুস্তূরক—কৃষ্ণবর্ণ ধুতুর, কনক ধুতুরা ।

কৃষ্ণপর্ণী—কাল তুলসী ।

কৃষ্ণপাক—করমচা ।

কৃষ্ণপিণ্ডীতক, কৃষ্ণপিণ্ডীর—বৃক্ষ বি° । পর্যায়—বরাহ ।

কৃষ্ণপুষ্প—কাল ধুতুরা ।

কৃষ্ণপুষ্পিকা—প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ ।

কৃষ্ণ ফল, কৃষ্ণফলপাক—করমর্দ, করমচা ।

কৃষ্ণফলা—১ সোমরাজী, ২ আলকুশী ।

কৃষ্ণবাবুই—কালতুলসী ocimum sanctum.

কৃষ্ণভূমিজা—গোমূত্রিকা তৃণ ।

কৃষ্ণমল্লিকা—কালতুলসী ।

কৃষ্ণমালুক—কৃষ্ণার্জক, কালতুলসী ।

কৃষ্ণমুগ—কালমুগ phaseolus melan uspermus.

কৃষ্ণমুষলী—তালমূলী দ্র° ।

কৃষ্ণমূলী—শ্যামালতা ।

কৃষ্ণরুহা—জতুকালতা (?) ।

কৃষ্ণল—১ গুঞ্জা বৃক্ষ, ২ গুঞ্জাফল, কুঁচ ।

কৃষ্ণলা—১ গুঞ্জা, ২ শ্বেতগুঞ্জা ।

কৃষ্ণবর্বর—বর্বরবৃক্ষ বি° কালতুলসী ।

কৃষ্ণবল্লী—১ কৃষ্ণতুলসী, ২ শ্যামালতা (শাবিধা নি°) ।

কৃষ্ণবীজ—১ কালিঙ্গ, তরমুজ, ২ রক্তশিগ্রুবৃক্ষ, লাল সজনে গাছ

কৃষ্ণবৃন্তা—১ পাটলা বৃক্ষ, ২ মাষপর্ণী, ৩ গাম্ভারী বৃক্ষ ।

কৃষ্ণবৃন্তিকা—১ গাম্ভারী বৃক্ষ, ২ পেটিকা বৃক্ষ, ৩ মাষপর্ণী ।

কৃষ্ণবেত্র—কালিয়ালতা ।

কৃষ্ণব্রীহি—ধান্য বিশেষ ।

কৃষ্ণশণ—শণবৃক্ষ বিশেষ ।

কৃষ্ণশারিবা—শ্যামালতা ॥ সুশ্রুত ॥

কৃষ্ণশারিবা—অনন্তমূল দ্র° ।

কৃষ্ণশালি—কাল ধান ।

কৃষ্ণশিগ্রু—কৃষ্ণশোভাঞ্জন, কাল সজিনা ।

কৃষ্ণশিম্বিক—কাল শিম ।

কৃষ্ণশিরীষ—কাঁটা শূন্য গাছ বি° । albizzia amara baw. গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয় ।

কৃষ্ণসখ—১ অর্জুন বৃক্ষ, ২ কৃষ্ণজীরা ।

কৃষ্ণসর্ষপ—রাইসরিষা ।

কৃষ্ণসার—১ স্নুহিবৃক্ষ, ২ শিংশপা বৃক্ষ, ৩ খদির বৃক্ষ ।

কৃষ্ণসারথি—অর্জুন বৃক্ষ

কৃষ্ণসারা—শিশু গাছ ।

কৃষ্ণস্কন্ধ—তমাল বৃক্ষ ।

কৃষ্ণা—১ নীল গাছ, ২ দ্রাক্ষা, ৩ নীলপুনর্ণবা, ৪ কালজীরা । ৫ গাম্ভারী, ৬ কটুকী, ৭ মারিষা, ৮ রাজসর্ষপ, ৯ কাকোলী, ১০ সোমরাজী ।

কৃষ্ণাঞ্জনী—কালাঞ্জনী বৃক্ষ, কালীকর্পাসিকিনী ॥ রাজনি° ॥

কৃষ্ণার্জক—কালতুলসী । পর্যায়—কালমাল, মালূক, কৃষ্ণমালূক, কৃষ্ণমল্লিকা, গরঘ্ন, বনবর্বর, বর্বরী, জাতি, কৃষ্ণবল্লী, করালক ।

কৃষ্ণাবাস—অশ্বত্থ বৃক্ষ ।

কৃষ্ণাহ্বা—পিপ্পলী ।

কুঞ্চিকা—রাজিকা, রাইসরিষা।

কুক্ষেক্ষু—কাজনি আক।

কুক্ষেয়ক—পদ্মপুষ্প।

কেউ, কেঁউ—[সং কেমুক, উং কউকউকা] হরিদ্রাদিবর্গের আরণ্য-বিশেষ costus speciosus. প্রায় ৪ হাত উঁচু হয়। পাতা চওড়া, ফুল সাদা বড় বড়। পাতা সাপের কুণ্ডলের আকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরে। তেঁতুগাছকেও কেহ কেহ কেঁউ বলে, diaspyros melanoxylon. (কেন্দু দ্রং)।

কেঁত্র (দেশজ)—কাল টেঁপারী গাছ, solanum nigram.

কেঁদ (দেশজ)—কেন্দু দ্রং।

কেঁরেয়াশিম—শিম বিং, dolichos lignosus.

কেউ—[সং কেমুকা] বর্ষজীবী উদ্ভিদ costus speciosa smith. শিকড় আলুর মত বর্ষার শেষে ফুল ও ফল হয়।

কেওড়া—[সং কোশাম্র, সুকোশক] কেয়া souneratia apetala.

কেতক, কেতকী—[সং শ্লেষ্মঘ্না, হিং কেবড়া, ওং কেবড়ো, মং শ্বেত-কেবড়া, ফং করজ্] কেয়াফুলের গাছ, pandamus odoratissimus. আরণ্যগাছ, গাছ অধিক বড় হয় না। ডালে গাছ হয়। 'ছিন্নরুহা' বটগাছের মত কাণ্ড থেকে শিকড় বাহির হইয়া মাটির ভিতর যায়। পাতা দীর্ঘ লম্বা, পাতার ধারে কাঁটা আছে করাতের মত। এক গাছে স্ত্রীপুষ্প হয় তাকে কেতকী, কেতকীক, সিতকেতকী বলে, অপর গাছে পুংপুষ্প হয়—তাকে স্বর্ণকেতকী, হেমকেতকী বলে। ফুল সাদা ও পাতার মধ্যে থাকে এজন্য 'দলপুষ্পা', পুংপুষ্প অত্যন্ত সুগন্ধি, পরাগবহুল, এজন্য 'ধূলি পুষ্পিকা'। ফল নারিকেলের মত বড়। ইহার ফুলে শিবপূজা হয় না। বর্ষাকালে ফুল ফোটে। পর্যায়—সূচীপুষ্প, হলীন, জম্বুল, জম্বুক, ক্রকচচ্ছদ, তীক্ষ্ণপুষ্পা, বিফলা, মেধ্যা, কণ্টদল, শিবদ্বিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা,, পাংশুলা।

কেদারক—ষাটধান।

কেন্দড়া (দেশজ)—জলাভূমি জাত গাছ, commelina nudiflora

কেন্দু—[সং কাকেন্দু] গাব diaspyros melamonylon, d. embryopteris তমলাদিবর্গের বৃক্ষ বিং। পাতা মসৃণ মোটা। ফুল সাদা সুগন্ধযুক্ত। ফল রোমশ, মিষ্ট। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। কাঁচা ফলের আঠায় ধীবরেরা জাল রং করে। বৃক্ষ চিরশ্যামল। প্রকার ভেদ—মাকড়কেন্দু—মাকড়া গাব [সং কাকতিন্দুক]।

কেন্দুক—১ গাব গাছ, ২ তাল বিশেষ।

কেমুক—কেঁউ গাছ। পর্যায়—পেচুক, পেচুলী, পেচু, পেচিকা, দলসারিণী কেচুক ।। রত্নমালা ।।

কেয়া—কেতকী দ্রং।

কেয়াকাঁটা—ছোট শেওড়া গাছ, pandanus faetidus. পল্লীগ্রামে বেড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ফুল দুর্গন্ধযুক্ত।

কেরই—বড় কেরই, ছোট কেরই, শ্বেত কেরই euphobia pilucifera, e. microphylla heyne, e, thy mifoliaburm.

কেলিক—অশোকবৃক্ষ।

কেলিকদম, কেলিকদম্ব—কদম দ্রং।

কেবিকা, কেবী—পুষ্পবিশেষ। পর্যায়—কবিকা, ভৃঙ্গারী, নৃপবল্লভা, ভৃঙ্গনারী, মহাগন্ধা, রাজকন্যা, অতিবাহিনী।

কেশকার—ইক্ষুবিশেষ।

কেশগর্ভক—শ্যোনাক বৃক্ষ।

কেশধৃৎ—ভূতকেশ নামক তৃণবিশেষ ।। শব্দচিন্তামণি ।।

কেশপর্ণী—আপাঙ।

কেশমথনী—শমীবৃক্ষ।

কেশমুষ্টি—১ বিষমুষ্টি বৃক্ষ, কঁচলে, ২ [হিং বিষদোড়ি] মহানিম্ববৃক্ষ।

কেশর, কেসর—১ নাগকেশর, ২ বকুল বৃক্ষ, ৩ পুন্নাগ বৃক্ষ, ৪ তিচ্ছ বৃক্ষ, ৫ নীপ, কেলিকদম্ব।

কেশরঞ্জন—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ, কেশরাজ।

কেশর দাম—জলে ভাসা শাক বিশেষ, কাঁচড়া দাম jussiena repens. শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

কেশরাজ—শাক বিশেষ, কেশুরে, কেশুর দ্রং।

কেশরাম্ল, কেসরাম্ল—১ মাতুলুঙ্গক বৃক্ষ, ২ দাড়িম্ব, ৩ বীজপুর, টাবানেবু।

কেশরিয়া, কেশরিয়া—[সং কেশরাজ] সোমরাজ্যাদি বর্গের লতা বিশেষ; eclipta alba. সরু, ফুল শাদা ও ছোট ছোট। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ফল হয়। এই গাছের রস বালা কালিতে মেশায়।

কেশরী মুতন্সা— Fine bristylis schoe noides.

কেশরুহা—ভদ্রদন্তিক, বৃক্ষ।

কেশরায়ুধ—আম্রবৃক্ষ।

কেশবালয়—অশ্বত্থ বৃক্ষ।

কেশহন্ত্রী ফলা—শমীবৃক্ষ ।। শব্দচন্দ্রিকা ।।

কেশাহ্বা—নীলগাছ।

কেশিকা—শতাবরী বৃক্ষ, শতমূলী।

কেশিনী—১ জটামাংসী, ২ চোরপুষ্পী।

কেশী—১ নীলীবৃক্ষ, ২ ভূমিকেশ বৃক্ষ, ভুঁইকেশ।

কেশুর— [সং কশেরু] মুস্তাদি বর্গের তৃণ বিং, scirpus grossus. বড ডাঁটার মত গাছ, কেবল গোড়ার কাছে পাতা হয়, নীচে কন্দ হয়।

কেশুরিয়া—বর্ষজীবী শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম। eclipta alba. এর সঙ্গে অনেকে ভৃঙ্গরাজের গোল করে ফেলে। কেশুরিয়ার ফুল শাদা, ভৃঙ্গরাজের ফুল পীতবর্ণ, আগষ্ট থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

কৈংশুক—কিংশুক দ্রং।

কৈটর্য—১ কট ফল, ২ নিম্ব ৩ মহানিম্ব, ৪ মদন বৃক্ষ, ময়না গাছ।

কৈড়র্য—১ কট ফল, ২ করমচা, ৩ পুতিকরঞ্জ, নাটা গাছ, ৪ কটকী গাছ।

কৈরব—১ কুমুদ, ২ শ্বেতবর্ণ উৎপল, শুঁদি।

কৈরব—১ ভূনিম্ব, চিরতা, ২ শম্বর চন্দন।

কৈবর্তিকা—মানবদেশের প্রসিদ্ধ লতা। পর্যায়—সুরজা, লতা, বল্লী, দশাক্রহা, রঙ্গিনী, বল্লরঞ্জা, সুভগা। [ক্রমশ।

বই বাঁধাই—কয়েকটি কথা

মানুষের পড়বার-জানবার জন্যে যতকাল থেকে বই সৃষ্টি হয়েছে, বই বাঁধানো বা পুস্তক-গ্রন্থনও চলে এসেছে পাশাপাশি। যতক্ষণ বাঁধাই না হলো, কোন রচনাই (মুদ্রিত হলেও) বই-এর মর্যাদা ঠিক পেলো না। আজকাল নিত্য-নতুন বই তৈরী হচ্ছে—অন্যদেশের ন্যায় এদেশেও। আর এর অর্থই হলো বাঁধাই বা পুস্তকগ্রন্থনের কাজ বেড়ে যাওয়া। বলতে কি, বই বাঁধাই বর্তমান সময়ে একটি মস্ত শিল্পে পরিণত হয়েছে—অসংখ্য কর্মী বা কারিগর এই থেকে রুজি-রোজগার করছেন। ইতিহাসেরই নজীর রয়েছে—প্রাচীন যুগে মুদ্রণ শিল্প যখন কল্পনা-বহির্ভূত ছিল, সেই সময় গাছের ছাল, ভূর্জপত্র কিংবা তালপাতায় পুঁথি লেখা হতো। সেই সব লিখিত সম্পদ সংরক্ষণের জন্যে কোন না কোন ধরনের বাঁধাই-এর ব্যবস্থা সেদিনেও ছিল। অবশ্য আজকের দিনের পুস্তক-বাঁধাই অতীত আমলের পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। শুধু ভিন্নতর বললেই হলো না, বর্তমান ব্যবস্থাদি যথেষ্ট উন্নততর বটে; এক্ষণে এই ক্ষেত্রটিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, যার মূল্য অনস্বীকার্য। মুদ্রণের বই বাঁধানো হয়ে গেলো যখন, তখনই বই তৈরীর কাজ পুরো শেষ হলো বুঝতে হবে। ফর্মা ছাপা হলেই বই ঠিক বই হলো না—পরিবেশনের আগে পুস্তকের উপযুক্ত গ্রন্থন চাই। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে বই-বাঁধাই শিল্পের প্রচুর উন্নতি হয়েছে। বর্তমান শতকের গোড়া থেকেই এদেশে শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। রকমারী পুঁথি-পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়ে চলে সেই থেকেই। একদিকে মুদ্রণ-শিল্পের অগ্রগতি ও অন্যদিকে পুস্তক-প্রকাশনের মাত্রা বৃদ্ধি—এই দুইটি পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায়। বই বাঁধাই বা পুস্তক গ্রন্থনের কাজও যুগপৎ আগাইয়া চলে আর তা বেশ সাফল্যের সঙ্গে। একটু আগেই বলতে চাওয়া হলো—বই বাঁধাই এ যুগে একটি বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে। কত রকমের বাঁধাই কাজ আজকের দিনে চলতি। যত মূল্যবান বই হবে, বাঁধাই তত মজবুত ও পরিপাটি না হলে হয় না। সাময়িক পত্র-পত্রিকা যে-গুলো বই-এর আকারে বের হয়, সেই সকলের কিংবা ছোট-খাট সাধারণ বই-এর বাঁধাই সাধারণ হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদির গ্রন্থনে বিশেষ যত্ন নিতেই হবে। বই বা পুঁথি-পুস্তকের সহজ কাটতি চাইলেও বই-এর ভালো বাঁধাই নিতান্ত কাম্য। একদিক থেকে খাতা-পত্র আর বই বাঁধানোর কাজ ঘরে ঘরেই হয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের সকলকেই প্রায় এই দিকে নজর দিতে হয়—সূচ-সুতো, মলাট, আঠা—এসব সংগ্রহ করে অনেককেই বই, খাতা বাঁধাই করতে দেখা যায়। পুরানো বই-এর বেলাতেই এই কাজটি বেশি করে তারা করে থাকে, বই বাঁধাই-এর চেয়েও খাতা বাঁধাই তাদের একটি বড় কাজ। কিন্তু বাড়ীর বাঁধাই-এর কাজ কারখানার মতো এতটা চমৎকার হয় না, মানতেই হবে। গ্রন্থাদি যতদূর সম্ভব শক্ত, দীর্ঘ স্থায়ী ও আকর্ষণীয় করতে হলে সুদক্ষ শিল্পী বা কারিগরের হস্ত দিয়ে কাজটি হওয়া চাই। বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হওয়ার বাঁধাই শিল্প কর্মের আজ রূপান্তর ঘটেছে। শিল্পীর প্রযত্ন ও কুশলতা গুণে ছেঁড়া পুরানো বই পর্যন্ত নতুনের পর্যায়ে এসে গেছে, এমনও লক্ষ্য করা যায়। বাঁধাই কাজটি আসলে একটি হাতের কাজ সন্দেহ নেই। সহরে সহরে অসংখ্য বই বাঁধাই'র কারখানা গড়ে উঠলেও এখন অবধি এটা ক্ষুদ্রশিল্প বা কুটির-শিল্পেরই পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রে একটা সুবিধা—এই কাজ শিখবার জন্যে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন যে-টা, তা হলো কর্মীর শ্রম নিয়োগের ইচ্ছা আগ্রহ। বিভিন্ন ধরণের বাঁধাই পদ্ধতি জানা হয়ে গেলে পর কাজ করতে করতে আপনি নৈপুণ্য অর্জন করা যায়। যে-দেশে বেকার সমস্যা এতটা তীব্র, সেখানে বই বাঁধাই নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত অনেকেরই পেশা হিসাবে গণ্য হতে পারে। বাঁধাই কাজ শিখবার জন্যে সরকার ক্ষেত্রবিশেষে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন, যেমনটি আরো বেশি করে হলে আরো ভালই হয়। লাইব্রেরী বা পাঠাগারগুলোতে তো বটেই অনেক বাড়ীতেও পুঁথি, পুস্তক সংগ্রহ করার রীতি চালু আছে। কিন্তু সংগ্রহ করা এক জিনিস আর সংরক্ষণ অন্য কথা—প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি বোধ হয় সমধিক কঠিন। গ্রন্থাদি সংরক্ষণের প্রশ্ন উঠলেই সেগুলোর ভালোরকম বাঁধাই'র প্রশ্নটি ওঠে। সেলাই, বাঁধাই বা মেরামতি কাজে বিলম্ব ঘটলে চলবে না। শক্ত মলাট দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধাই হলে বই-এর জীবন বাড়বেই, এটুকু বলা যায়। চামড়ার বাঁধাই হলে বই স্বভাবতই আরো জোরদার হবে? সেজন্যে মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সাধারণভাবে বাঁধাই না করে, গোড়াতেই বেশ মজবুত করে নেওয়া সমীচীন।

কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা কথা সাহিত্যের পুরোধা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকৃত, বস্তুত বঙ্কিমের রচনাই বাংলা সাহিত্যকে প্রথম প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করে তুলেছিল, বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিয়েছিল সংস্কৃতের প্রভাব থেকে, প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাকে স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী এক ভাষারূপে; ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি বাংলা গদ্যের জনক বলা যায়, বঙ্কিম তাহলে বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ, সাহিত্যের

ক্ষীণ স্রোতস্বিনীতে জোয়ার তিনিই এনে দিয়েছিলেন একদিন, সে হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি চিরকালীন ও সার্থক। আলোচ্য গ্রন্থ বঙ্কিমের সাহিত্যিক অবদানকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে, কথা সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা দিতে ব্রতী হয়েছেন লেখক এবং বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। লেখকের আন্তরিকতা ও সযত্ন অনুশীলনের ফলে তাঁর রচনা সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে, কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে পাঠক অনায়াসেই অবহিত হয়ে উঠতে পারেন আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করলে। সাহিত্য জিজ্ঞাসু ও শিক্ষার্থী এই উভয়বিধ পাঠকই উপকৃত হবেন বর্তমান পুস্তকটি হাতে পেয়ে। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আট টাকা।

বিপ্লবী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ শত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত নানাবিধ রচনার অন্যতম বর্তমান নাটিকাখানি, স্বামীজীর ঘটনাবহুল জীবনের কিয়দংশ বাছাই করে সৃষ্টি করা হয়েছে একে, নাট্যকারের আন্তরিকতায় এই রচনা স্বচ্ছ ও সুপাঠ্য। নাটক রচনার প্রাথমিক কয়েকটি প্রয়োজন সম্বন্ধে লেখক ওয়াকিবহাল, সেজন্যই এ নাটক অভিনয়োপযোগী, বলা বাহুল্য লোক শিক্ষায় বাহন হিসাবে অভিনয়ের একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে সেই ভূমিকার পটভূমিতে এ ধরণের মহৎ জীবনীমূলক নাটকাদির প্রয়োজনও অনস্বীকার্য, এবং এদের মূল্যায়ন করতে হলেও সেদিক থেকেই বিচার করা সমুচিত। বর্তমান নাটকটিরও প্রাণসত্তা সেটাই। নাটকটিতে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে একটু বা মাত্রাতিরিক্ত রূপেই, মনে হয় এক্ষেত্রে নাট্যকার আর একটু সংযমের পরিচয় দিলে ভাল করতেন। ছাপা, বাঁধাই ও

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শঙ্কর সম্পাদিত বাক্‌ সাহিত্য কর্তৃক প্রকাশিত 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি। শিল্পী—কানাই পাল। মূল্য-দশ টাকা মাত্র।

চিত্রিতা দেবীর 'দুই নদীর তীরে' গ্রন্থের প্রচ্ছদ আলেখ্য।

প্রচ্ছদ সাধারণ; লেখক—অমল সরকার, প্রকাশক—ভারতী পাবলিশার্স, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধর্মের প্রকৃত চেহারাটি যে কি, সে সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন লেখক আলোচ্য-গ্রন্থে।

সাহিত্যে আগ্রহী পাঠকের চিত্তে রবীন্দ্র-রচনাবলী তাঁর ধর্ম-চেতনা সম্পর্কে যে আগ্রহের সৃষ্টি করে তারই নিরসনকল্পে লেখকের এই প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাকে পর্যালোচনা করে লেখক তাঁর ধর্মচিন্তার মূল্যায়ন করেছেন, [illegible] থাকে মহীরুহের সম্ভাবনা, রবীন্দ্রনাথের [illegible] যে ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ধর্ম [illegible] লেখকের মূল বক্তব্য। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই লেখক তাঁর রচনাকে, ক্ষেত্র, বীজ, অঙ্কুর, বিকাশ, কুসুম ও ফল এই ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধর্মের সঙ্গে দর্শনের যে মিলন ঘটেছে যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার মাধ্যমে লেখক সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিপুণভাবে। শিক্ষার্থী ও জিজ্ঞাসু এই উভয়বিধ পাঠকই সেজন্য বর্তমান গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন। লেখকের ভঙ্গী আন্তরিক, ভাষা স্বচ্ছন্দ। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—তারকনাথ ঘোষ। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

নিশিকুটুম্ব

বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত কাহিনী লেখকের পরিবেশন চাতুর্যে বিচিত্রতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; চৌর্য-বিদ্যা নাকি এক কালে চতুষষ্টি কলার অন্যতম বলেই পরিগণিত হত, চৌর-চক্রবর্তী খেতাব পেত অভিজ্ঞ মহাজন যেমনটি নাকি একালে আর পাঁচরকম কলাবিদেরা পেয়ে থাকেন, এই রকম এক চোর-চূড়ামণির জীবনায়ন করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। নদীর জলে ভেসে-আসা ছেলে সাহেব মানুষ হল বারবধূর কোলে, পরিণত হল সুদক্ষ চোরে;

প্রবীণ ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতের নৌ-শিল্প' গ্রন্থের প্রচ্ছদপট। প্রকাশক—চিত্রাবমহল। মূল্য—পনেরো টাকা মাত্র।

সাহেব চোরের নাম জারি হয়ে গেল বাদা অঞ্চলের নোনা মাটিতে, চোরেরা যেন নিজে তাকে ওস্তাদ বলে। পুণ্যের পাশাপাশি চলেছে যে পাপের সংসার তার খুঁটিনাটি জানা হয়ে গেল আধুনিক এই চোর-চক্রবর্তীর। তবু মনের কোন তলা থেকে মাঝে মাঝে, কেন মাথা তুলতে চায় বুকের মাঝে বাস করা একটা অবুঝ বিবেক? বিশেষ তারা ... সাহেব, সিঁধেল চোরও কি তা'হলে মানুষই শুধু আর কিছু না? এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করবে। অপরূপ সচ্ছন্দ ভাব সঙ্গ জীবনের বাঁকা পথের পথিক একদল মানুষের ছবি এঁকেছেন লেখক; অজানা এক জগত-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন যে মানুষ সবাই মানুষ, তার হাসি-কান্না সুখ-দুঃখও মূলতঃ এক ও অভিন্ন, সেইজন্যই বাইরের পোষাকটা খুলে ফেললেই বেরিয়ে আসে চিরন্তনী মাতৃহৃদি, পাকাচোরের অন্তরালে বাস করে ব্যাকুল পিতৃ-হৃদয়, নামজাদা চোরচূড়ামণির চোখ জলে ভরে ওঠে পথে-ঘাটে মাতৃ-হৃদয়ের স্পর্শে। অজানা এক জগতের এই অপরূপ রূপকথা রসজ্ঞ পাঠকের মন স্পর্শ করবে সন্দেহমাত্র নেই, কাহিনীর গতি অনায়াস সরল ও কৌতূহলোদ্দীপক, পড়তে পড়তে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরণের বিষয়বস্তুকে রসোত্তীর্ণ করে তোলা বড় সহজসাধ্য কর্ম নয় এবং লেখকের সমস্ত কৃতিত্ব এখানেই। ভাষা-রীতি স্বচ্ছন্দ ও উপভোগ্যরূপেই সরস। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—মনোজ বসু। প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মেঘের উপর প্রাসাদ

বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবনে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে যে অভিশাপ নেমে এসেছে, আলোচ্য উপন্যাসে তাকেই রূপায়িত করেছেন কুশল কথাশিল্পী। দেশভাগের পর বাঙলার সামাজিক কাঠামোটা যে একেবারেই ঘুণ ধরে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে মূলত সেটাই লেখকের বক্তব্য। এক মধ্যবিত্ত পূর্ববঙ্গীয় পরিবারের কন্যা দীপ্তির মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন আজকের সমাজ-জীবনের করাল ভাঙনে বিপর্যস্ত গোটা নারী সমাজকেই। বস্তুত সামাজিক অবক্ষয়ের এক মর্মস্পর্শী চিত্র বললেই বোধ হয় বর্তমান রচনার সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভবপর। রোগগ্রস্ত বেকার পিতাকে যথা সম্ভব সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই একদা ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছিল দীপ্তি, সৎভাবে কিছু উপার্জন করার স্বপ্ন সেদিন তার চোখে, কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গ হতে বিলম্ব হল না, নারীমাংস লোভী শকুনের দল ছেঁকে ধরল তাকে, বুঝিয়ে দিল অবিলম্বেই আজকের পৃথিবীতে দারিদ্র্যের নেই কোন সান্ত্বনা, কোন অবকাশ। চোখ মেলে এক নতুন জগতের দিকে চাইল দীপ্তি, যেখানে মানুষ অবিশ্বাস্য ভাবে রূপান্তরিত হয় পোকায়, যেখানে লোভ হাত মেলায় হিংস্র কামনার সাথে, যেখানে পাপের কলুষকে লোলুপ জিভটা চেটে চেটে খায় মানুষের বাঁচার সুন্দর স্বপ্নটাকে। সাধারণ মানুষের জীবনের অতি বাস্তব এই রূপকথা সুদক্ষ সাহিত্যিকের কুশল কলমের মুখে অপরূপ কথা হয়ে উঠেছে; জীবন বোধের গভীর দ্যুতিতে অভিষিক্ত এই রচনা আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-জীবনের এক ভয়াবহ অভিশাপকে মূর্ত করে তোলে পাঠকের মননে। কাহিনীর গতি অতি বলিষ্ঠ, দুর্বার বেগে টেনে নিয়ে যায় কাহিনীকে। চরিত্র চিত্রণেও যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন লেখক, দীপ্তি, তৃপ্তি, গৌরাঙ্গবাবু, অভয়, অমিয়, প্রভৃতি উপন্যাসের এই মূল চরিত্রগুলি তো বটেই এমন কি ছোটখাট সাধারণ চরিত্রগুলিও যেন আপনাপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য হয়েই ফুটে উঠেছে। লেখকের অনবদ্য শৈলী ও তাঁর রচনার অসামান্য উৎকর্ষের আর একটা দিক, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও তীক্ষ্ণতা যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছে এই ভাষার প্রসাদগুণে। সাম্প্রতিক কথা সাহিত্যের পরিসরে, আলোচ্য উপন্যাসের সন্দেহাতীত রূপেই এক উল্লেখ্য অবদান। প্রচ্ছদ রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক—এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম-সাত টাকা।

ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট। প্রকাশক এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য—আট টাকা মাত্র।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বের বিস্তৃত পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের ছবি এত বিরাট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সে সম্বন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা করতে পারা বড় সহজসাধ্য নয়, আলোচ্য গ্রন্থের লেখকদ্বয় সেই দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়েছেন। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বহির্জগতে কবি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, তাকেই বিশ্লেষণ করে দেখাবার প্রচেষ্টা হয়েছে বর্তমান রচনায়। এই প্রচেষ্টা যে বড় সহজসাধ্য নয়, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাফল্যপূর্ণ পরিণত না হলেও লেখকদ্বয়ের আন্তরিকতায় মণ্ডিত, সংক্ষিপ্ত হয়েও যেজন্ত এই রচনা প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইটি পড়ে আনন্দলাভ করবেন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখকদ্বয়—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। প্রকাশক—রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি-৬। দাম—তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রজ' গ্রন্থটির প্রচ্ছদ চিত্র।

কর্মযোগী বিধানচন্দ্র

আলোচ্য জীবনী গ্রন্থে কর্মবীর বিধানচন্দ্রের বেশ একটা সুন্দর ছবি পাওয়া যায়, মূলত কিশোর পাঠ্য হলেও এই রচনা প্রসাদগুণে বয়স্কজনেরও মনোরঞ্জন করবে। ছোটর মধ্যে ৺বিধানচন্দ্র রায়ের এক প্রামাণ্য জীবন কাহিনী রূপেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ। ৺বিধানচন্দ্রের পারিবারিক পরিবেশ জীবন ও কর্মধারার এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় বিবৃত হয়েছে এই রচনার মধ্যে, স্বাধীনতার পূজারী বিধানচন্দ্রের অনমনীয় মনোবলের সূত্র যে এক গরিমাময় পটভূমি হতে বিস্তৃত হয়েছে, বাংলার ঐতিহাসিক চরিত্র রাজা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সম্বন্ধে অবহিত করে লেখক তা সপ্রমাণিত করেছেন। এক উল্লেখ্য জীবনী গ্রন্থ হিসাবেই আদৃত হওয়ার দাবী রাখে এই রচনা। লেখকের শৈলী সহজ ও সাবলীল। আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

পাহাড়ী সন্ধ্যা

আলোচ্য গ্রন্থটি এক সংক্ষিপ্তাকার উপন্যাস, বিষয়বস্তু মামুলী ধরণের হলেও লেখকের মুন্সীয়ানায় উপভোগ্য। নগাধিরাজ তুষারমৌলী হিমালয়ের কোলে অবস্থিত শৈলাবাসটিতে বেড়াতে গিয়েছিল এক তরুণ চিত্রী, পাহাড়ী বালিকার সঙ্গে তার প্রেম ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীই বর্তমান আখ্যানের বিষয়বস্তু, পরিণতিতে বেশ একটা বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়, বস্তুত উপন্যাসটির সমাপ্তিতে যে চমক এনে দিয়েছেন লেখক তাই এর প্রাণসত্তা। সাধারণ পাঠক বর্তমান গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। প্রকাশক—রীডার্স কর্ণার। ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিনয় চৌধুরী রচিত 'লক্ষ তারার অন্ধকার' গ্রন্থটির প্রচ্ছদের প্রতিলিপি।

কাচের মানুষ

আলোচ্য কাব্য-সংকলনটি কাব্যানুরাগী পাঠককে আনন্দ দেবে। দিনেশ দাস কাব্য-সাহিত্যের আসরে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, যে জীবনবোধ তাঁর রচনার প্রাণসত্তা বর্তমান গ্রন্থের কবিতাসমষ্টি তা থেকে বঞ্চিত নয়। আধুনিক যুগ-জীবনের অভিশাপে জর্জর কাচের মানুষের বিরুদ্ধে কবির অভিযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে ওই নামের কবিতাটির মাধ্যমে, সক্ষোভে তিনি তাই বলেন—সে আলো কোথায় পাব, কার অন্তরে, কোথায় সে স্বচ্ছ আলো আলোর ভিতরে, এরা কেউ হীরে নয়, কাচের মানুষ সব, এদের যা কিছু আলো ধার-করা, চুরি-করা সব, একটু নড়লেই দেখি কোথায় মিলিয়ে যায় আলোর উৎসব। কবিতাগুলির প্রধানতম আকর্ষণ স্বচ্ছতা, অত্যন্ত ঋজু ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ এদের আপাত দুর্বোধ্যতার সস্তা মোহকে সহজেই এড়িয়ে গিয়েছে এরা, কবির বক্তব্যে নেই কোন অস্পষ্টতা, কোন দ্বিধা। সহজ সুষম ভঙ্গীতে তিনি বলে গেছেন মনের কথা, আর সেজন্যই তা স্বচ্ছন্দে পৌঁছে গেছে পাঠকের মননে। স্নিগ্ধ আঙ্গিকে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থটি রসজ্ঞজনের কাছে আদৃত হবে বলেই আমাদের

আশা। লেখক—দিনেশ দাস, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২. দাম—তিন টাকা।

রাত যখন নিঝুম

ছোটদের জন্য লেখা এ বই বড়দেরও আনন্দ দেবে, বৈঠকী ভঙ্গীতে বলা কয়েকটি গল্প একত্র গ্রথিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কল্পনা বিলাসী সদা মামা মুখে গল্প বানান, বাড়ীর কুচো-কাঁচার দল রুদ্ধশ্বাসে শোনে সে সব গল্প তাঁকে ঘিরে বসে। বর্ণনা কৌশলে জীবন্ত হয়ে ওঠে পরিবেশ, গল্পের গরু গাছে ওঠে না এ প্রবাদ মিথ্যে হয়ে যায়, কারণ সদা মামার হাতে আছে মায়াদণ্ড তার স্পর্শ যেমন খুসী, যেখানে খুসী চলে যায় কাহিনী, সঙ্গে নিয়ে যায় হয়ত বা কিশোর শ্রোতৃবর্গের কচি কচি মনগুলোকেও। অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই হিসাবে আলোচ্য রচনা বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য, যাদের জন্য এ রচনা তারা একে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। লেখকের বাচনভঙ্গী আকর্ষণীয়। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুজিতকুমার নাগ, প্রকাশনায়—সাহিত্য ভবন, ২১, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজবজ, দাম—একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রথম ভালোবাসা

কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা একত্র সংকলিত হয়েছে আলোচ্য কাব্য গ্রন্থে। কবি সুনিপুণ ব্যঙ্গে সাম্প্রতিক কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাকে মূর্ত করে তুলেছেন। কবির ভাষা ঝরঝরে, বক্তব্য স্পষ্ট, তাঁর লক্ষ্য সরাসরি পাঠকের মর্মভেদ করে। কয়েকটি কবিতা রীতিমত উপভোগ্য, কয়েকটি লিমেরিক জাতীয় যাদের মধ্যে ব্যঙ্গ ও বেদনা সার্থক ভাবেই রূপায়িত। আমরা এই ব্যঙ্গ কাব্য সংকলনটি পড়ে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—সরিৎশেখর মজুমদার (বুদ্‌গঙ মুনি) প্রকাশক—গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। কলিকাতা। দাম—দু'টাকা।

তিন কাহিনী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের এই রচনা সংকলনটি হাতে পেয়ে অনেকেই খুশী হবেন। আলোচ্য সংকলন গৃহীত উপন্যাস তিনটি পূর্ব প্রকাশিত ও বহু প্রশংসিত, কাজেই তাদের সমালোচনা নতুন করে করবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। শুধু সংকলনটি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে এনেছে সে সম্বন্ধেই কিছু বলার অবকাশ থেকে যায়, সংকলিত রচনাত্রয় বৈচিত্র্যে বিভিন্ন কিন্তু জাতে এক, এরা বিশেষ করে যে কথাটি প্রকাশ করে তার ভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও মূলত তা এক ও অভিন্ন যেন একই রাগিণীর সুর বাজিয়েছেন লেখক ভিন্ন ভিন্ন তান কর্তবের মাধ্যমে। লেখকের ভূমিকা এখানে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার, অবিচল ভঙ্গীতে তিনি দেখে চলেছেন জীবনের বিচিত্র বিকাশ নানা চরিত্র নানা ঘটনার মাধ্যমে, কখনও তা তাঁকে স্পর্শ করছে কখনও করছে না, যেন অতল জলধির কূলে বসে ঢেউ গুণছেন তিনি, যার আদি নেই অন্ত নেই। চরিত্র সৃষ্টিতে যে অপরূপ কৌশল ও প্রাণধর্মিতা লক্ষণীয় তা একান্তরূপেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ বনফুলকে এখানেই চিনতে পারেন পাঠক পুরাপুরি। ঔজ্জ্বল্যে, প্রকাশভঙ্গী বৈচিত্র্যে ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণমূলক ভাবধারায় রচনাগুলি উপভোগ্য ও মর্মস্পর্শী, পড়তে পড়তে শক্তিমান কথাশিল্পীকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেন পাঠক। বনফুলের অপরাজেয় শৈলী রচনাগুলিকে এক অপরিমেয় মর্যাদা দান করেছে। প্রচ্ছদ শোভন ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন লেখক—বনফুল। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯, দাম—ছয় টাকা।

ঘনিষ্ঠ তাপ

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে সম্প্রতি যতদূর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এমনটি বোধ হয় একমাত্র ছোটগল্প ব্যতীত সাহিত্যের আর কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় না, আলোচ্য কাব্য গ্রন্থটিও সেই স্বাক্ষর বহন করে। কবিতাগুলি দ্বিবিধ কিছু সরাসরি গদ্য কবিতা ও কিছু লিরিক ধর্মী, শেষোক্ত পর্যায়ে যে কবিতাগুলি পড়ে তারা নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী, এমন কি যে স্বাতন্ত্র্য পরিবেশিত হয়েছে এদের মাধ্যমে তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' ব্যতীত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। একটা আশ্চর্য সুষমা, একটা অব্যক্ত আবেদন বর্তমান এই লিরিক্যাল রচনা গুচ্ছের মাঝে. পড়তে পড়তে পাঠক যেন একাত্ম হয়ে ওঠেন কবির সঙ্গে। সাম্প্রতিক কাব্য-সাহিত্যের পরিসরে, 'অরুণ মিত্র' নিশ্চয়ই এক চিহ্নিত স্থানের অধিকারী। কাব্য-গ্রন্থটির আঙ্গিক রুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অরুণ মিত্র, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—তিন টাকা

নবীন কবিদের উদ্দেশে

আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত, হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশী দিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে, তেমনই সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক গ্রহপুঞ্জ, তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল করে থাকার কোন প্রয়োজন হবে না ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখায়, রচনায় শুধু এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—তোমরা এস অনাগত কবির দল, আমি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা ভোরের পাখী, তাদের গান শুনিও। —নজরুল ইসলাম
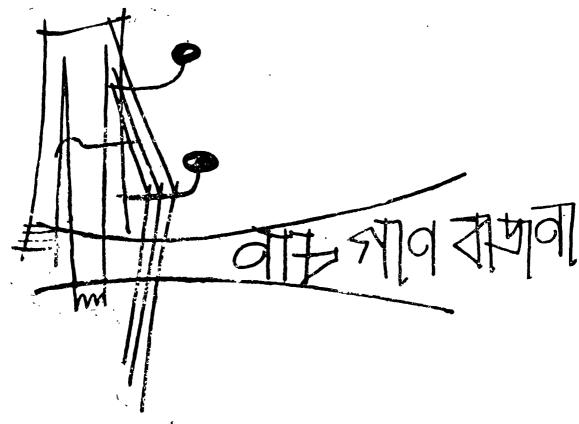
সুরগুরু যদুভট্ট

শ্রীজয়দেব রায়

রবীন্দ্রনাথের সুরগুরু ছিলেন যদুনাথ ভট্টাচার্য—'যদুভট্ট' নামেই তিনি বাংলার সুরজগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। শুধুমাত্র কবিগুরুর সুরগুরু রূপেই নয়, বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্রমবিকাশে যদুভট্ট তাঁর নিজের অবদানের জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছেন। ধ্রুপদ গানকে কালোয়াতী পর্যায় থেকে ললিতলীলায় নিয়ে গিয়েছিলেন যদুভট্ট—রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্মরণ ক'রে বলেছেন—

'ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মতো তাল ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম বিখ্যাত যদুভট্ট।'

কবি তাঁর কাছে গান কতদূর শিখেছিলেন জানা যায় না। কারণ কবিই বলেছেন—'মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই সেইজন্যে গান শেখাই হ'ল না।'—কিন্তু 'অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায়' সুরলক্ষ্মীর অভিষেক তিনি করতে পেরেছিলেন যদুভট্টেরই সস্নেহ অনুপ্রেরণায়।

বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরে তাঁর জন্ম হয়, পিতার নাম মধুসূদন ভট্টাচার্য। মধুসূদন ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যদুনাথ কিন্তু শাস্ত্র পাঠ করলেন না, সঙ্গীতশাস্ত্র কণ্ঠে ধারণ করলেন। বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের লীলাভূমি—সকল লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে সেখানে গান। শিশুবয়সেই তিনি যে সকল গান সুকণ্ঠে গেয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিতেন। মধুসূদন পুত্রের সঙ্গীতানুরাগ দেখে তাঁর সুরশিক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

বিষ্ণুপুরে মল্লবংশীয় রাজারা বহুদিন ধরে রাজত্ব করতেন, সঙ্গীত ও ললিত কলায় তাঁদের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। নিজেরা বংশানুক্রমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করতেন। জ্ঞানী, গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের সসমাদরে দরবারে আশ্রয়ও দিতেন।

বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিং কাহিনী প্রসিদ্ধ নায়ক। লালবাঈ নামে এক নৃত্যগীত-পটীয়সী সুন্দরীকে উপপত্নীস্বরূপ রেখে তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। ইসলাম ধর্মের আক্রমণ থেকে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্যে রাণী স্বহস্তে রাজাকে হত্যা করে 'পতিঘাতিনী সতী' আখ্যা লাভ করেছিলেন।

রঘুনাথ ছিলেন অতিশয় সঙ্গীত প্রেমিক—লালবাঈ-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও সঙ্গীতেরই মাধ্যমে। রঘুনাথ দিল্লী থেকে সেনী ঘরোয়ানার বাহাদুর সেন ও পীরবক্সকে বিষ্ণুপুরে আনয়ন করেন। এই ভাবেই বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চা শুরু হ'ল। বাহাদুর সেনের পদপ্রান্তে বসে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-রসিকরা সুরচর্চা শুরু করলেন।

বাহাদুর সেনের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। গদাধরের শিষ্য-প্রশিষ্য সকলেই বাহাদুর সেনের সুরধারা বহন করে এনেছেন। এই সুরধারার নামই 'বিষ্ণুপুরী ঘরোয়ানা'। এই শিষ্য-প্রশিষ্যদের

মধ্যে আছেন কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁদের ধারা বহন করে এনেছেন নাজির ভ্রাতৃদ্বয়, শ্যামচাঁদ গোস্বামী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তী, রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। যদুভট্ট ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ রামশঙ্করের কাছে খুব বেশীদিন সঙ্গীতানুশীলনের সুযোগ পান নি। এই ঘরোয়ানারই নীলমণি চক্রবর্তী ছিলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সভাগায়ক।

রামশঙ্করের অন্যতম শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তখন পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভা অলঙ্কৃত করে আছেন। ক্ষেত্রমোহনের রচিত সঙ্গীতের উপপত্তিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীতের তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করে। যদুভট্ট কর্মসন্ধানে কলিকাতায় এলে ক্ষেত্রমোহন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যদুভট্ট তখন আবার সঙ্গীতে দীক্ষা নিলেন, ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহে তিনি নবোদ্যমে সঙ্গীতানুশীলন শুরু করলেন। এবার তিনি গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধ্রুপদচর্চায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলেন। শুধু বাংলা দেশে নয় গোয়ালিয়র, আলোয়ার, রামপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন সুরলীলাক্ষেত্রে গুণীদের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ তিনি ক্রমান্বয়ে লাভ করেছিলেন।

জন্মভূমি বিষ্ণুপুরেও ক্রমে তাঁর খ্যাতি এসে পৌঁছাল। বিষ্ণুপুরে তখন গোপাল সিংহ জমিদারী পরিচালনা করছিলেন, যদুভট্টের সম্মানার্থে তিনি এক বিরাট আসরের আয়োজন করেন। কথিত আছে সেখানে যদুভট্ট একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা গান গেয়েছিলেন।

এরপর যদুভট্ট ব্রাহ্ম-সমাজের আমন্ত্রণে কলিকাতায় এলেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রয় পেলেন। আর এখানেই তিনি সুর-ভগীরথ রবীন্দ্রনাথকে শিষ্যরূপে পেয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে গেলেন। দ্রোণাচার্য যেন সাক্ষাৎ পেলেন সব্যসাচীর, বর্ষিত হল অজস্রধারায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, তৃপ্ত হল বঙ্গবাসীর কর্ণ। কবি ও তাঁর সুরশিল্পী ভ্রাতারা সকলেই যদুভট্টের পদপ্রান্তে বসে সুরের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে ঘিরে সেদিন ঠাকুরবাড়িতে একটি দুর্লভ সুরতীর্থ রচিত হয়েছিল। কবি বলেছেন—

'যখন যদুভট্ট আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে. কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগ-রাগিণীর আলাপ।'

যদুভট্ট হিন্দী ও বাংলা দুই ভাষাতেই বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত হিন্দী ধ্রুপদগানের সুর অনুকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁদের পরিমণ্ডলীর অন্যান্য গীতরচয়িত্রীগণ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

যদুভট্টের বাহার-চৌতাল-দ্রুতগতিতে রচিত ধ্রুপদ ছিল—

ফুলি বন ঘন মোর আয় বসন্ত রি,
অব বহত পবন মন্দ মন্দ সমীরণ মন ভাবে;
জয় মধুপবৃন্দ নিয়ত কর গুঞ্জার,
নই নই কলিয়ন পর জায় চুবক্ (মধু) হরত।

রবীন্দ্রনাথ ঐ সুর তাল-লয়ে রচনা করেন—

আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশিদিন সুখে শোকে,
সেই চির আনন্দ, বিমল চির সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান—

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে।

বাহার তেওরা দ্রুতগতিতে রচিত।

ঐ গানটি যদুভট্টের নিম্নের গানটির সুর, তাল, লয় অনুসরণে রচিত—

আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্ত মেঁ,
হর মকুর পর যুথ মধুপ মদহর নিরত কর রব কুঞ্জ মেঁ।
কহি কোয়ালিয়া কুঞ্জ করহি আমুবাকে ডার রঙ্গ মেঁ,
কহি বেলি চামেলি গুলাব গেঁদা চম্পক হিরঙ্গ মেঁ॥

শুধু হিন্দী গানই নয়, যদুভট্ট বাংলায় অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। সে আমলে মহর্ষি পরিবারের রচিত অধিকাংশ ব্রহ্মসঙ্গীতে সুর সংযোজনও করেছিলেন যদুভট্ট।

দেশ রাগিণীতে সুরফাঁকা তালে রচিত তাঁর একটি কাব্য সৌন্দর্যময় গান—

দেখিয়ে হৃদয়মন্দিরে, ভজ না শিবসুন্দরে।
কি প্রেমে ভুলিয়ে তাঁরে, কর অযতন?
এখন করহ সাধন।
এই সে পতিতপাবন, এই সে জগৎতারণ
এই যে পরমকারণ, করহ তাঁরে স্মরণ॥

যদুভট্টের সঙ্গীতশিক্ষাদানের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হলে, তাঁর প্রচেষ্টায় যদুভট্টই সেখানকার প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন।

যদুভট্ট ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের সভাও বহুদিন অলংকৃত করেছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজাই তাঁকে 'রঙ্গনাথ' সঙ্গীত-উপাধি প্রদান করেছিলেন।

আমার কথা (১০২)

শ্রীউষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রাতের অন্ধকার মুছে দিয়ে হাসিমুখে ধরণীর বুকে নেমে আসে ঊষা। উদিত হয় সূর্য। প্রকৃতির কোলে ভেসে ওঠে সৌন্দর্য। চিরন্তন সৌন্দর্যময়ী ঊষার আলোকে নিত্য-নূতন প্রতিভা নিয়েই জন্মায় মানবসন্তান। কেউ জ্ঞানে কেউ বা গানে। এমন এক ঊষার শুভলগ্নে গানের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন শ্রীযুক্ত উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর পরগণার পট্টী গ্রামে স্বর্গত লালমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীউষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। বাল্যের শিক্ষা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন বরিশাল সহরে। পিতৃদেব লালমোহন ছিলেন তদানীন্তন স্থানীয় সঙ্গীত-আসরের অন্যতম দিকপাল। সঙ্গীতজ্ঞ পিতার সঙ্গীত প্রতিভার ধারা

শ্রীউষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন পুত্র। রক্তের সম্পর্কের সঙ্গে মিলে গেল সুরের ঝঙ্কার। ৬ বৎসর বয়সেই বাজাতে শিখলেন এস্রাজ। সঙ্গীতানুশীলনের সঙ্গে স্কুলে অধ্যয়নও চলতে থাকে যথারীতি।

১৯৩৭ সালে বরিশাল টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে বি-এম কলেজে ভর্তি হলেন তিনি। ১৯৪০ সালে আই-এ এবং ১৯৪২ সালে বি-এ পাশ করে ১৯৪৩ সালে কলিকাতায় চলে এলেন উষারঞ্জন। কলেজী শিক্ষা সমাপনান্তে গানের সাধনায় মন দিলেন পূর্ণোদ্যমে। প্রথম জীবনে পিতৃদেব এবং স্বর্গত বিপিন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অর্জিত শিক্ষাকে মূলধন করে কলকাতা এসে ছাত্র হলেন বাঙলার দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীর। উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষায় খেয়াল-ঠুংরীর আসরে আসন পেলেন উষারঞ্জন। ১৯৪৪ সালে বেতারশিল্পী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে আজও সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন আকাশবাণীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে। তারপর মুরারী সম্মেলন, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন এবং জাতীয় সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতি সঙ্গীতের আসরে সঙ্গীত প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে লাগলেন একের পর এক। আজ তিনি গানের শিক্ষকই নন, ছাত্রও বটে। বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আমীর খাঁরও ছাত্র তিনি। শিক্ষা ও শিক্ষণ নিয়েই দিন কাটাচ্ছে তাঁর। দক্ষিণ কলিকাতার 'বাণীচক্র' নামে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষায়তনের অন্যতম শিক্ষক তিনি। পারিবারিক জীবনে সহধর্মিণী জ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায় ও তিনটি কন্যা নিয়ে সুন্দর শান্তিময় সংসারে অধিষ্ঠিত তিনি। স্ত্রী জ্যোৎস্না দেবী পেশাদারী গায়িকা না হলেও সৌখীন গায়িকাদের অন্যতমা। সঙ্গীত সাগরে সন্তরণ করেও খেলার আসরে উষারঞ্জন অনুপস্থিত নন। ফুটবল, ক্রিকেট এবং টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর দক্ষতা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

সঙ্গীত অনুশীলন

(স্বর্গত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।)

প্রশ্ন—ভারতীয় সঙ্গীতে প্রধান ব্যবহার্য স্বর কতগুলি ?

উত্তর—ভারতীয় সঙ্গীতে দ্বাদশ স্বর ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত। স র গ ম প ধ ন, এই সাতটি শুদ্ধ স্বর এবং কোমল ঋ জ্ঞ দ ণ ও কড়ি হ্ম এই পাঁচটি বিকৃত স্বর।

প্রঃ—স্বর ও সুরের পার্থক্য কি ?

উঃ—স, র, গ, ম প্রভৃতিকে স্বর বলে। স্বরের শ্রুতিমধুর সমন্বয়কে 'সুর' বলে। 'রাগ-রাগিণী'কে প্রচলিত কথায় 'সুর' আখ্যা দেওয়া হয়।

প্রঃ—স্বরসমূহের কিরূপ সমন্বয়ে রাগ সৃষ্টি হয়, উদাহরণ সমেত লিখ।—

উঃ—কেবলমাত্র শুদ্ধ স্বরের বিভিন্ন সমন্বয়ে রাগ সৃষ্টি হয়, যথা, বিলাওল, দেওগিরি, দেশকার প্রভৃতি। শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সমন্বয়েও রাগ সৃষ্টি হয়, যথা—ভৈরব, ভৈরবী, মূলতান, পুরবী ইত্যাদি।

প্রঃ—রাগ ও রাগিণীর প্রভেদ কি ?

উঃ—যে সুর শুনিলে মনোরঞ্জন হয় তাহাই 'রাগ'। 'রাগিণী'ও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রে বর্ণিত রাগ ও রাগিণীর পার্থক্যের সামান্য তাৎপর্য আছে। শাস্ত্রের নির্দিষ্ট 'রাগিণী' অধুনা রাগ বলেই উল্লিখিত হয়। 'রাগ' ও 'রাগিণী' যথাক্রমে পুরুষ ও নারীরূপে কল্পিত হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে। গম্ভীর অথচ মধুররসাত্মক সুরকে রাগ এবং কোমল ও করুণরসাত্মক সুরকে রাগিণী বলে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কার্যত এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম আছে।

প্রঃ—রাগালাপে শ্রুতির ব্যবহার কিরূপে হয় ?

উঃ—সপ্তস্বরের অন্তর্বর্তী সূক্ষ্ম স্বরগুলিই শ্রুতি। কোমল, অনুকোমল, অতিকোমল—প্রত্যেকটিকেই 'শ্রুতি' আখ্যা দেওয়া হয়। রাগ হিসাবে এই সকল শ্রুতির ব্যবহার হয়। ভৈরবীর ঋ ও জ্ঞ কোমল, তোড়ি কিংবা মূলতানের ঋ ও জ্ঞ কোমল হইতে পৃথক। তীব্র বা কড়ি মধ্যমের সংস্পর্শে যে কোমল গান্ধার হয়, তাহা সাধারণত অতিকোমল এবং শুদ্ধ মধ্যমের সংস্পর্শে যে কোমল গান্ধার ব্যবহার হয়, তাহা সাধারণত অনুকোমল।

প্রঃ—আন্দোলিত স্বর কাহাকে বলে ?

উঃ—দুইটি স্বরের মধ্যে পরস্পর দোলন হইলে আন্দোলিত স্বর বলে।

প্রঃ—গমক কাহাকে বলে ?

উঃ—আশ ও মীড় যোগে 'গমকের' সৃষ্টি হয়। ইহা সাধনা সাপেক্ষ। কণ্ঠে ও যন্ত্রে বহুদিন সাধনা করিলে ইহা আয়ত্ত হয়।

প্রঃ—'খাণ্ডারবাণী' ধ্রুপদ কাহাকে বলে ?

উঃ—কথাবহুল দ্রুতগতির ধ্রুপদকে খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ বলে। বাঙলা দেশে 'খাণ্ডারবাণী' ধ্রুপদ বিশেষ প্রচলিত ছিল। স্বনামধন্য যদুভট্ট অনেক 'খাণ্ডারবাণী' ধ্রুপদ রচনা করেন।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

ফোন যখন এসেছে তখন ও ঘরে যেতেই হবে।

উঠল শিবানী।

এরকম একটা ডাক না এলে শিবানী এখন ঘর হতে বেরুতে পারত না। ইন্দ্রনাথের সামনে যেতে পারত না। কাল রাতে যার স্পর্শের জন্য, যার সান্নিধ্যের জন্য মনে মনে কাঙাল হয়ে উঠেছিল তার চোখের ছোঁয়াতেও আজ ঘেন্না করছিল ওর। কাল রাতে যাকে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে দেখে চোখ তৃপ্ত মানছিল না—আজ তার মুখ দেখতে হবে বলেই ঘর ছেড়ে বেরুতে পারছিল না সে। বেরুতও না। কাঞ্চি আবার ডাকতে এলে তাকে আদেশ করত ওর চা এখানে এনে দেবার জন্য। শুনে কাঞ্চির ঘাড়ের শিরা এক মুহূর্তের জন্য একটা অবাধ্যতার গোঁয়ে টান হয়ে উঠত। তার মনঃপূত হতো না শিবানীর এ আদেশ। জন্মদিনের সকালেই শিবানীর এই যুদ্ধ ঘোষণা। পুরুষ মানুষের কত রকম চলতি ও কত রকম মতি গতি হয়। মেয়ে মানুষের কী তার সঙ্গে সমান তালে পাঁয়তারা কষলে চলে! তবে সংসারটা ভূতের নৃত্যক্ষেত্র হয়ে ওঠে না। বাব মুখো পুরুষের বাইরে থাকার সময়টা যতই রাগ হোক, ঘরে এলে সে রাগ বুঝে শুনে খাটাতে হয়। যদিও মুখে সে এখন কিছুই বলত না। কোন কথা কখন বলতে হয়, আর বলতে হয় না সে কাঞ্চি বেশ জানে। এখন সে চলে যেত শিবানীর আদেশ পালন করতে। কথাগুলো বলত শিবানীর অলস সময়ের পরিচর্যার সময়। চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বা পায়ের তলায় গোলাপজল মেশানো গ্লিসারিন মালিশ করতে করতে।

কিন্তু ঘরে বসে চা খেলেই কী সে ইন্দ্রনাথের মুখ দেখা থেকে রেহাই পেতো?

পেতো না।

ইন্দ্রনাথ তার ঘরে এসে উপস্থিত হতো। উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করত, অসুখ করে নি তো? হয়ত আরো কাছে এগিয়ে আসত ওর দিকে···তাড়াতাড়ি নানা দিকে ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে থাকা নতুন শাড়ি দু-হাতে চেপে চেপে ঠিক করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল শিবানী। যেন নইলে ইন্দ্রনাথ এক্ষুণি তার ঘরে এসে উপস্থিত হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসত।

নতুন শাড়ির মিষ্টিগন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বেড়ালছানাটাও চলল শিবানীর পায় পায়।

বন্ধঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে যেমন মুহূর্তে বাইরের মুক্ত বাতাস এসে বন্ধ ঘরের দূষিত হাওয়া তাড়িয়ে নিয়ে যায়, বাইরে বেরিয়ে আসতেই বাইরের আলো হাওয়া স্পর্শে শিবানীর মনের ভেতরকার তিক্ত বিষাক্ত ভাবটাও যেন ঠিক তেমনি করে' উড়িয়ে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতর কামনা-বাসনা, রাগ, জ্বালা, ব্যর্থতা যেন চার দেয়ালের চাপে ওর মনের উপর চেপে বসেছিল। বাইরের আকাশ মনের আকাশও বড় করে দিল শিবানীর। তাই সে দেয়। নইলে আকাশ নিজে যত বড়ই হোক মানুষের কাছে বড় থাকত না।

চারদিকে তাকাল শিবানী। চকচকে ঝকঝকে রোদে বারান্দা ভরে গেছে। লম্বা লম্বা টেবিলগুলোর উপরভাগে রাখা ফুল আর টবে রাখা দেশী বিলাতি পাতাবাহারের গাছ বাতাসে দুলছে··· বিলিতি কাপড়ের পর্দাগুলোর ফুল পাতাগুলো সত্যকারের তাজা ফুল মনে হচ্ছে···পেতলের ভাসগুলোতে রোদ ঠিকরে পড়ে সোনার মত জ্বলছে···

জী···ফোন···

আসছি—ঈষৎ অপ্রতিভ ভাব খেলে গেল শিবানীর কণ্ঠে। পায়ের গতি বাড়িয়ে বলল, ধরতে বলেছ তো?

জী হ্যাঁ।

হঠাৎ রোদে ভরা বারান্দার উপর এসে পড়ল শ্রাবণের আকাশ

থেকে এক মস্ত কালো মেঘের ছায়া। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝাপ্টা মারল শিবানীর মুখের উপর···হঠাৎ ভীষণ ফাঁকা লাগতে লাগল শিবানীর নিজেকে। সামনের ভাস থেকে ফুল পাতাসুদ্ধ একটা ডাল তুলে মাথায় গুঁজল। যদিও সে বসবার ঘরে ঢুকে সোজা গিয়ে ফোন হাতে তুলে নিল কোন দিকে না তাকিয়ে, তবু সে দেখল হাত তিন চার দূরের সোফাটায় ইন্দ্রনাথ চোখের উপর পত্রিকা মেলে বসে আছে। একেবারে পুরো দেয়াল মুখ করে না দাঁড়ালেও, মুখটা শিবানী দেয়ালের দিকেই তেরচা করে রাখল। ফোনে মুখ রেখে বলল, হ্যালো···

ওপিঠ থেকেও এলো, হ্যালো···

পুরুষ কণ্ঠ। গলাটা ধরে উঠতে পারল না শিবানী। বলল, আপনি কাকে চান?

শিবানী দেবী আছেন?

কথা বলছি—

ও, আচ্ছা! শশব্যস্ত কণ্ঠ ভেসে এলো, নমস্কার, নমস্কার—

নমস্কার।

শিবানী দেবী আপনার সঙ্গে—

আপনি কে কথা বলছেন?

আমি···আমি···কণ্ঠস্বরটা যেন মাথা চুলকাচ্ছে।

শিবানী নাম শোনবার অপেক্ষায় রইল—

—আমার নাম··থামল সে।

ভ্রূ কোঁচকালো শিবানী।

লোকটি বলল, এ ভাবে হঠাৎ নাম বললে আপনি আমাকে ঠিক ধরে উঠতে পারবেন না—

গলার স্বর কঠিন হল শিবানীর। বলল, আপনার নাম ঠিক ধরে উঠতে না পারলেও আপনার কথাগুলো ঠিক ধরে উঠত পারব বুঝি—

না—না, তা বলছি নে। তা বলছি নে···যেন দু' হাত কচলাচ্ছে সে—হঠাৎ ঝপ্ করে যদি চিনতে না পারেন তাই ভেবেছিলাম··· কিন্তু না, পরিচয়টা আমার প্রথমেই দিয়ে নেওয়া উচিত ছিল···আমি দুঃখিত। আই এ্যাম সরি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত—আই এ্যাম ভেরী সরি শিবানী দেবী। আচ্ছা, আপনার মিঃ দত্তরায়কে মনে আছে?

মিঃ দত্তরায়? মনে করতে চেষ্টা করল শিবানী নামটা। মিঃ দত্তরায়···

ঐ তো, চিনতে পারছেন না তো?

একটু কুণ্ঠিত-কণ্ঠেই শিবানী বলল, মিঃ দত্তরায়···ঠিক ধরে উঠতে পারছি নে।

জানতাম পারবেন না। আপনারা একেবারে নিষ্ঠুরভাবে ভুলে যেতে পারেন···আরে আরে, ফোন ছেড়ে দেবেন না একটু সূত্র ধরিয়ে দিলেই আপনি চিনতে পারবেন আমাকে। তারপর গভীর সুরে 'বলল,···আপনার দিদির বিয়ের রাতে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আর সেই রাত থেকে আমি আপনার কী বলব··গ্রেট এ্যাডমায়ারার···একজন একেবারে···মানে মুগ্ধ ভক্ত যাকে বলে—

ফোনটা নামিয়ে রাখতেই যাচ্ছিল শিবানী কিন্তু হঠাৎ দ্রুত গলায় 'আরে আরে' শব্দ দুটোর সুরের টানে চিনে ফেলল শিবানী গলাটা। নীরেন—ওর দিদি ইন্দ্রাণীর স্বামী। নীরেনের স্বভাবটাই এই রকম। হয়ত নিজের কোন কথা নেই। দিদি ফোনটা ধরে দিতে বলেছে। আর সে ফোন ধরে স্বর পাল্টে ফাজলামো জুড়ে দিয়েছে। ওর বুঝতে পারাটা বুঝতে দিল না শিবানী। চার হাত ফারাক ইন্দ্রনাথ বসে। তার কান এ দিকেই পাতা আছে। সে কানে গরম সীসে ঢালবার এমন সুযোগ কী শিবানী ছাড়তে পারে। আস্তে করে বললো, আপান আমার একজন মস্ত এ্যাডমায়ারার···মুগ্ধ ভক্ত আর আমি আপনাকে নিষ্ঠুরের মতো ভুলে গেছি···তরল কণ্ঠে তরুণীর মত হেসে উঠল সে।

ইন্দ্রনাথের হাতের কাগজে পাতা উল্টাবার যে খসখস শব্দ হচ্ছিল তা থেমে গেল।

নীরেন বুঝল শিবানী ধরে ফেলেছে।

শিবানী বলে চলল। থেমে থেমে এমন ভাবে বলে চলল যেন উত্তর প্রত্যুত্তর চলছে, আপনি কৃতজ্ঞ আমার প্রতি? কেন? ও, আপনি ভেবেছিলেন, আপনি আমার একজন মস্ত মুগ্ধ ভক্ত শুনে চটে মটে আমি ফোন ছেড়ে দে'বো? না, না তা কেন। প্রথমে চিনতে পারি নি বলে সত্যি দুঃখিত আমি—মিট করব? বেশ তো কোথায় মিট করতে চান বলুন?

ভীষণ ভাবে হেসে উঠল নীরেন। বললো, আরে—উল্টে তুমিই দেখছি আমায় টলাতে শুরু করলে—

—নাও হয়েছে সরো—নীরেনের হাত থেকে ফোন টেনে নিল ইন্দ্রাণী। বলল, ফোনটা একটু ধরে দিতে বলেছি, তা ফোন ধরে কী আরম্ভ করেছে!

ঠিক আছে। বলে খুব হাসল শিবানী।

তোদের চা খাওয়া হয়েছে?

না। বেড টি হয়েছে। ব্রেকফাস্ট হয় নি।

ছিঃ ছিঃ, দেখ তো কতটা সময় অযথা আটকে রাখল তোকে। ইন্দ্রনাথবাবু নিশ্চয়ই তোর জন্ত চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

আমরা ছুটির দিন ব্রেকফাস্ট একটু দেরীতেই খাই।

আচ্ছা শোন, আজ দুপুরে কী ইন্দ্রনাথবাবুর কিছু প্রোগ্রাম আছে তোর জন্মদিনের জন্ত?

না তো।

তবে আমার এখানে চলে আয়। ইন্দ্রনাথবাবু তো আসবেন না জানিই। তাই তার কথা বলছি নে। তুই চলে আয়। দুপুরে এখানে খাবি—কেমন?

আচ্ছা।

মার পাঠানো শাড়ি পেয়েছিস?

হ্যাঁ—

আমিও তোর জন্ত একটা শাড়ি কিনেছি। চমৎকার আকাশ রং-এর। আকাশ রংটা তোকে ভীষণ মানায়। তোর জামাইবাবু বলছে তোর নাকি শাড়িটা একেবারেই পছন্দ হবে না। আমি বলছি হবেই। ইন্দ্রনাথবাবু তোকে কী দিল রে? আচ্ছা, সে এলে শুনব। তুই তাড়াতাড়িই চলে আসিস—এখন রাখছি কেমন?

আচ্ছা।

ইন্দ্রাণী ফোন ছেড়ে দিল।

কিন্তু শিবানী দিল না। কানের ওপর কড়-ড়-ড়, কড়-ড়-ড়, কড়-ড়-ড় শব্দ হতে লাগল আর সে মাউথপিসে মুখ রেখে আশ্চর্য সুরে বলল, আমার জন্মদিন আপনি জানলেন কী করে? বলেছিলাম আমি? আপনি মনে রেখেছেন? কী কাণ্ড!

লাঞ্চ? কোথায়? আচ্ছা। শাড়ি? ছিঃ ছিঃ এ কিন্তু ভারী লজ্জায় ফেললেন আমাকে। আচ্ছা, সকাল সকালই আসব। ক'টায়? আপনি বলুন ক'টায় আসব। বারোটার মধ্যে? আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বারোটায় আসব—কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করল শিবানী—একটুও এদিক ওদিক হবে না...

নমস্কার। ফোন রেখে ইন্দ্রনাথের দিকে তেরচা দৃষ্টিতে একবার তাকাল শিবানী। দেখল তার মুখের সামনে দু' হাতে ধরা পত্রিকার পাতাটা একেবারে স্থির।

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং

আবার ফোন বেজে উঠল।

ইন্দ্রনাথের হাতের কাগজ এতটুকু নড়ল না।

শিবানী যে ক'পা গিয়েছিল, সে ক'পা আবার এগিয়ে এসে ফোন ধরল। বললো, হ্যালো।

কে, শিবানীদি'?

হ্যাঁ।

আমি ললিতা—

বুঝতে পারছি। বল কী খবর? এই সাত সকাল যাকে বলে সে সময়?

বাঃ, আজ তোমার জন্মদিন নয়?

জন্মদিনের অভিনন্দন জানাচ্ছ?

না। দূর থেকে অভিনন্দন জানালে আমার হবে না—

হেসে উঠল শিবানী। দূর থেকে অভিনন্দন জানালে তোমার হবে না?

না হবে না—কিছুতেই হবে না। তোমার যত প্রোগ্রামই থাক, আমাকে তার ভেতর থেকে সন্ধ্যা, রাত, সকাল, দুপুর যখন হোক একটা সময় দিতেই হবে—কোন সময়টা দেবে তাই বল?

দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, রাত যখন হোক একটা সময় তোমাকে আমার দিতেই হবে...যেন গভীরভাবে ভাবতে লাগল শিবানী। বললো, এই মাত্র একজনের লাঞ্চের নেমন্তন্ন নিয়ে ফেললাম—

তবে রাত্রে?

রাত্রে?

হ্যাঁ।

ডিনার?

না বাপু ডিনার নয়। সাহেব মানুষ নই, ডিনার খাওয়াতে পারব না। ডাল-ভাত-মাছ পিঁড়ি পেতে বসে খাবে নতুন শাড়ি পরে। জান, তোমার জন্ত এমন এক সাত বাজার খুঁজলেও মেলে না শাড়ি কিনেছি, যার দাম তুমি কিছুতেই বলতে পারবে না। এমন কী আন্দাজ করে যে আমার দেওয়া উপহারের মূল্যটা বের করে ফেলবে, তাও পারবে না।

হেসে উঠল শিবানী।

ললিতা বলল, হাঁ, আমি দাম যাচাইকারীদের হার মানাবার প্রতিজ্ঞায় সাত সপ্তাহ, সাত সাত বাজার ঘুরে শাড়ি কিনেছি। আমাদের বাড়ীর সবাই হার মেনেছে। তোমাকেও হার মানতে হবে।

খুব ভালো। খুব ভালো। প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। কতগুলো প্রবৃত্তি আছে আমাদের যার সংশোধন সত্যি দরকার। আর তার ভেতর উপহারের দাম আন্দাজ বা যাচাই করার প্রবৃত্তিটা শোধরাবার প্রয়োজন সর্বপ্রথম। কিন্তু কথা হলো, আমি কী আজ শাড়ির গাঁটরী নিয়ে বাড়ী ফিরব।

আমি তোমাকে সাহায্য করব। এখন বল কখন আসছ?

ঐ যাঃ ভুলেই গিয়েছি বলতে আমি যে মার কাছে এসেছি। আমি কিন্তু আমার মার বাড়ীতে তোমায় ডাকছি। তুমি আবার আমার শ্বশুরবাড়ী—বলেই হেসে বলল, তোমার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উপস্থিত হবে না। মা'র বাড়ী চেন তো? তুমি না চিনলেও তোমার ড্রাইভার চেনে। আমাকে অনেকবার পৌঁছে দিয়েছে।

আমি চিনি।

কখন আসছ?

সন্ধ্যা সাতটা?

বেশ। আচ্ছা—থামল ললিতা।

আর কিছু বলবে?

মা বলছিলেন দাদাকে বলতে—

মিঃ সেনকে বলতে চাচ্ছ?

আমাদের এমন ঘরোয়া কথার ভেতর দাদাকে তোমার মিঃ সেন বলাটা কেমন যেন ভীষণ কানে বাজছে—বড্ড সাহেব হয়ে যাচ্ছ—

এগুলো সাহেব হওয়া নয়। অভ্যাসের ব্যাপার।

আমি দাদাকে মিষ্টার টিষ্টার বলতে পারব না।

এ না পারাটাও অভ্যাসের ব্যাপার। সে যাক্। তুমি মিঃ সেনকেও ডিনারে বলতে চাচ্ছে—আমি জানি মিঃ সেন তোমার এ নেমন্তন্ন খুশী হয়েই নিতেন কিন্তু উপস্থিত মিঃ সেন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে একটু বাইরে গেছেন—

ও, আচ্ছা। কিন্তু তুমি অমন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার মতো কথা বলছ কেন শিবানীদি'?

ভাষা ফরম্যাল হচ্ছে?

ঘরোয়া ভাষা হচ্ছে না—

ঘরোয়া ভাষাটা বড্ড ঢিলে হয়ে গেছে আমাদের। জায়গা নেয় বেশী। সময় নেয় বেশী। ঘরোয়া ভাষাটাকে আমাদের কিছু খাপানো দরকার হয়ে পড়েছে—কিন্তু একথাটা এতো সংক্ষিপ্ত কথায় বোঝানো যাবে না। দৃষ্টান্ত সহযোগে বোঝাতে হবে। তাই অন্য সময়—ব্রেকফাস্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বাবুর্চি এবার বসে পড়েছে। ছাড়ছি।

আচ্ছা। ঠিক সাতটায় এসো কিন্তু।

হ্যাঁ।

এবারও ফোন রেখে ঘুরে দেখল শিবানী ইন্দ্রনাথের হাতের পত্রিকা বাতাসশূন্য স্তব্ধ প্রকৃতির গাছের পাতার মতো স্থির। এবার সে চোখের কোণ দিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকায় নি পুরো দৃষ্টিতেই তাকিয়ে ছিল। কারণ তার চোখের সামনে কাগজ ধরা পাশের কাঠ রংএর পালিশ করা কাচ ঢাকা টেবিলটার উপর কাল ভেলভেট মোড়া বাক্সটা তাই এবার চোখে পড়ল শিবানীর। তক্ষুনি সেটার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।

বয় বাবুর্চি তৎপর হলো—

ইন্দ্রনাথ ধীর পায় জুতোর মচমচ শব্দ তুলে এসে টেবিলে বসলো।
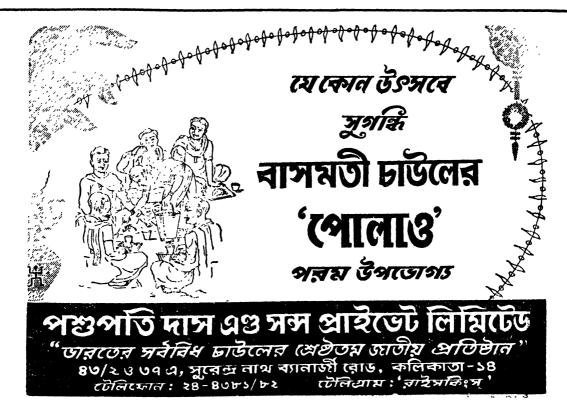
ছুরি কাঁটা প্লেট চামচের শব্দ ছাড়া বাড়ীটার কোথাও কোন শব্দ নেই মনে হতে লাগল। প্রথম যখন ইন্দ্রনাথ কথা বলল, তখন একটু চমকেই শিবানী প্লেট থেকে মুখ তুলল।

ইন্দ্রনাথ বলল, শুধু আমি এখানে নেই বললে কেন—একেবারে মরে গেছি বললেই পারতে!

গম্ভীর কণ্ঠে শিবানী বলল, অসুবিধে ছিল। উপস্থিত মানুষকে অনুপস্থিত করে সামলানো যায়, কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে মৃত বলে সামলানো যায় না। আর তা ছাড়া···আজ আমার জন্মদিন। বন্ধুরা নানা প্রোগ্রাম করেছে—ডিনার লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছে, মারা যাওয়ার কথা বললে সব পণ্ড হতো। দৌড় ঝাঁপ করে সব ছুটে আসত···

শিবানীর মুখের ওপর পড়ে থাকা ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিটার যদি রেখা টানা যেত তবে রেখাটা শিবানীর বাঁ চোখ বাঁ ভুরু কেটে নাকের উপর দিয়ে ডান দিকের চিবুকে এসে নামত।

ডবল ডিমের পোচ আর বেকন চামচে দিয়ে তুলে তুলে চেটেচুটে খেয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছল শিবানী।

ক্রিং···

ফোনের বেল একবার ক্রিং করে বেজে উঠতেই একরকম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। খাবার ঘরের পর্দা ঠেলে বসবার ঘরে এসে কোন ধরার মধ্যে বেলটা আর একবারের বেশী বাজতে পারল না।

শিবানী সরে যাওয়া পর্দার ভেতর দিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইন্দ্রনাথ তার ভারী গলা আরো ভারী করে বলল, হ্যালো···

···

মিসেস সেন?

···

আপনি?

···

অমল বোস?

···

হার বস?

···

বন্ধু! আই সি···কিন্তু তিনি মারা গেছেন।

···

আজ্ঞে—

···

হ্যাঁ, তিনি মারা গেছেন।

···

আজ—

···

এই মাত্র—আপনি মিসেস সেনের বন্ধুদের সবাইকে খবরটা দিন। আপনারা না আসা পর্যন্ত ডেড্ বডি আমি নিচ্ছি নে—

বেশ করে চেয়ার ঠেসে বসে ইন্দ্রনাথ সিগারেট ধরালো। বললো, দেখা যাক তোমার শোকাকুল বন্ধুদের আমি সামলাতে পারি কি না।

ইন্দ্রাণী বলল, একা না পারলে, আমি তো রয়েছিই— [ক্রমশ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন

'যে তিন জন পুরোনো মন্ত্রীকে নতুন অতিরিক্ত দপ্তরের ভার দেওয়া হইল ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা যোগ্য হইলেও এতগুলি দপ্তরের চাপ তাঁরা বহন করিতে পারিবেন কি না, সেই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠিবে। জনগণের দিক হইতে বিশেষভাবে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। যে নাটকীয় কায়দায় কামরাজ পরিকল্পনা ঘোষিত এবং অনুসৃত হইয়াছে এবং যেভাবে ৬ জন সেরা মন্ত্রী ও ৬ জন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ঘোষিত হইয়াছে, তা'তে অ'সন্ন ভারতবর্ষে আরও নাটকীয়, আরও চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটিবে, এমন আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে পুরানো মন্ত্রীরা নতুন বোতলের মধ্যে দপ্তরের সুধা পান করিবেন। দেশে এবং বিদেশে এত বড় প্রত্যাশার পর মনে হইতেছে সমগ্র ঘটনাটাই যেন পর্বতের মূষিক প্রসবের মত! কিন্তু এভাবে বৃহৎ ভারতবর্ষের অতি জটিল সমস্যা মিটিবে না। যদি প্রধানমন্ত্রীর কোন দুঃসাহসিক পরিকল্পনা এবং বৈপ্লবিক কর্মপন্থা না থাকিয়া থাকে, তবে, এই জোড়াতালির সংসার আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। পণ্ডিতজী সম্ভবত জোড়াতালির নীতিতে অতিরিক্ত বিশ্বাসী। কিন্তু এই নীতি কিছুকাল চলিতে পারে স্বাভাবিক সময়ে। ভারতবর্ষের এই দুঃসময়ে এবং অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে এই ধরণের জোড়াতালি কেবল অবাঞ্ছনীয় নহে, ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ, শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাইবে কামরাজ পরিকল্পনায় সৎ কাম কিছু হইল না, কিন্তু দুষ্কর্মের পাহাড় জমিয়া উঠিয়াছে!'

—দৈনিক বসুমতী।

প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রসঙ্গে

'লোকসভায় ভারত সরকারের শ্রম, কর্মসংস্থান ও পরিকল্পনা-দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী সি আর পট্টভিরমণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার এমনভাবে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আইনটির সংশোধন করিতে চান, যাহার ফলে কর্মচারীদের স্বেচ্ছামূলক অর্থপ্রদানের হার শতকরা ১২ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। শ্রীরমণ বলেন, যাঁহারা এই হারে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা অবশ্য সঞ্চয় হিসাবে অর্থপ্রদান হইতে রেহাই পাইবেন। শ্রীরমণের এই উক্তি পাঠ করিয়া যাঁহারা অবশ্য সঞ্চয় ব্যবস্থার জন্য বিব্রত বোধ করিতেছেন, তাঁহারা কিছুমাত্র স্বস্তি বোধ করিবেন না। অবশ্য সঞ্চয় সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, যাঁহাদের আয় হইতে কোন সঞ্চয়ই হয় না, তাঁহাদের উপরও এই সঞ্চয়ের দায় চাপিয়াছে। এখন তাঁহাদিগকে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড দেয় টাকা ছাড়া অবশ্য সঞ্চয় হিসাবে আয়ের শতকরা ৩ ভাগ জমা দিতে হইতেছে। ইহাতেই তাঁহারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছেন। এরূপ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আইন সংশোধন করিলেই যে তাঁহারা আয়ের শতকরা ১২ ভাগ প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে জমা দিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তারপর এই শ্রেণীর লোকেরা অবশ্য সঞ্চয়ে যে টাকা জমা দিতেছেন, তাহার উপর সুদের হার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে জমা দেওয়া টাকার সুদের হার অপেক্ষা বেশী। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অবশ্য সঞ্চয় আপাতত পাঁচ বৎসরের জন্য প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে অতিরিক্ত অর্থ জমা দেওয়ার মেয়াদ কতদিন হইবে, তাহা কেহই জানেন না। কাজেই গভর্ণমেণ্ট অবশ্য সঞ্চয়ের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যাহা করিতে চাহিতেছেন, তাহার দ্বারা নিম্ন-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোন সুবিধাই হইবে না বলিয়া মনে হয়।'
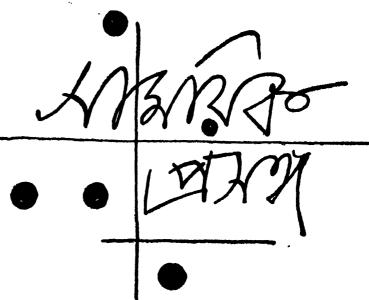
—আনন্দবাজার পত্রিকা।

জলের অপর নাম জীবাণু

'নিশ্চয়ই কলিকাতা নগরীর লোকদের জন্য প্রথম ভাগের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ কলিকাতায় একথা কেউ হলফ করিয়া বলিতে পারেন না যে, জলের অপর নাম জীবন। বরং করপোরেশনের চীফ এনালিষ্টের রিপোর্ট (এবং এক বৎসরের পুরাতন তালুকদার কমিটীর রিপোর্টও) প্রমাণ করিতেছে যে, আমাদের প্রবন্ধের শিরোনামাই সত্য। কিন্তু জলের এই নাম বদল কি এক দিনেই ঘটিয়াছে? অথবা করপোরেশনের কর্তারা দীর্ঘকালের চেষ্টায় এই নূতন প্রথম ভাগ রচনা করিয়াছেন? কারণ, কলিকাতায় জীবাণুদুষ্ট জলের গোড়ার কথা হইতেছে, প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং করপোরেশনী রাজনীতি। জীবাণু শুধু টালা-পলতার পাইপ, কিম্বা জলের ট্যাঙ্কেই জন্মলাভ করে নাই, খোদ করপোরেশনের শরীর হইতেও এই জীবাণু সঞ্চারিত হইতেছে। তালুকদার কমিটীর রিপোর্টটি যদি কেউ খুলিয়া দেখেন তা' হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কলিকাতার জল কেন এবং কিভাবে দূষিত হইতেছে। প্রথমত, গঙ্গার জল যে 'প্রিসেটলিং ট্যাঙ্ক' বা জলাধারগুলিতে রাখিয়া পরিশীলনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হয়, সেগুলি পলি পড়িয়া 'সম্পূর্ণভাবে বুজিয়া গিয়াছে।' পঞ্চম জলাধারটিতে জলের তলানী জমিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাও পুরাপুরি কাজ করিতেছে না বলিয়া জলে

দূষিতাংশ ৩০ হইতে ৪০ ভাগ থাকিয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়ত, তালুকদার কমিটী দেখাইয়াছেন যে, শেষ পর্যায়ে জল সম্পূর্ণ পরিশীলনের যে ব্যবস্থা আছে তাও মান্ধাতার আমলের এবং প্রায় অকেজো। কলিকাতায় জলের পাইপের অবস্থার কথা অনেকেই জানেন। সে পাইপ এমন পুরাতন এবং জরাজীর্ণ যে, বহু জায়গায় পাইপের জল যেমন বাহির হইয়া পড়িতেছে (শতকরা ২৫ ভাগ জল এইভাবে ভূগর্ভেই চুয়াইয়া যায়), তেমনি অনেক জায়গায় দূষিত জল, কর্দম ও জীবাণুর প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। তা'ছাড়া, কোনো কোনো অঞ্চলে জল অতি ক্ষীণধারায় পাইপ হইতে নির্গত হয় এবং পাইপের মধ্যে ময়লা দূষিত পদার্থ, কিম্বা কৃমি ও কীট জন্মানো কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু এ সবের খবর কে লইতেছে! পৌর কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, পাইপের মধ্যে সাপ বা কেঁচো থাকা সম্ভব নয়। ইহাই পরম আশ্বাসের কথা বলিয়া মানিতে হইবে! এর পর যদি জীবাণু কিছু থাকে, অথবা জল যদি পুরাপুরি নিরামিষ না হয় তাতে পৌরকর্তৃপক্ষও উদ্বিগ্ন নন, জনসাধারণেরও আপত্তি করা উচিত নয়। অবশ্য চীফ এনালিষ্টের রিপোর্টের একটি অংশের জন্য দায়িত্ব নাগরিকদেরই নিতে হইবে। তাঁর রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে, রাস্তার কলের জল যতটা দূষিত এবং পানের অনুপযুক্ত, তার চেয়ে বেশী দূষিত হইতেছে বাড়ির কলের জল। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে, বাড়িতে যে পাইপগুলিতে জল আসে তা' বাড়িওয়ালাদের কল্যাণে বহু দিন যাবৎ জীর্ণ হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে এবং বাড়ির ট্যাঙ্কগুলিও নিয়মিত পরিষ্কার রাখা হয় না। কিন্তু সমস্ত মিলাইয়া জল দূষিতকরণের জন্য মুখ্যত নিশ্চয়ই দায়ী করপোরেশন। মানুষকে বিষ পান করাইলে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে দণ্ডিত হইতে হয়। কিন্তু যেহেতু করপোরেশন এই বিষ দিতেছেন প্রতিদিন এবং স্বল্প মাত্রায়, এবং এক সঙ্গে ৬০ লক্ষ লোককে সেই জন্যই কি নরহত্যার চেষ্টা বলিয়া ইহা আখ্যাত হইবে না? অথবা সভ্যতার মানদণ্ডে এই নগরীর পরিচালকদের বিচার হইবে না?' —যুগান্তর।

পদত্যাগের পর

'পশ্চিমবঙ্গের কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তি মন্ত্রিত্ব খোয়াইবেন। নূতন মন্ত্রিসভায় অংশভাগীদের সংখ্যা যে বিশ-একুশের উর্ধ্বে উঠিবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। এতবড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় অনেকের হয়তো আহার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। তবে যাহাদের কপালজোর আছে, তাঁহাদের সদগতি অবধারিত। মন্ত্রিত্ব ছাড়াও *বিলি-ব্যবস্থার বহুবিধ সুযোগ আছে।'* —লোকসেবক।

পাকিস্তানী দুরভিসন্ধি

'পাকিস্তানী মুসলমানদের মত পাকিস্তানী হিন্দুরাও যে রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সেই হিসাবে গণতান্ত্রিক সভ্য রাষ্ট্রের রীতি ও নীতি অনুযায়ী সম পরিমাণ সুখসুবিধা ও সুযোগ লাভের অধিকারী। অথচ কার্যত দেখা যাইতেছে যে, এক সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিক যখন অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের দ্বারা বিনা দোষে বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইতেছে, উৎপীড়িত সম্প্রদায়কে রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্র তখন তাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটি পর্যন্ত উত্তোলিত করিতেছে না, ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও যথাসর্বস্ব অবলীলাক্রমে বলি প্রদত্ত হইতেছে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে। বলাবাহুল্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এই দুষ্কার্যের স্বপক্ষে পাকিস্তান সরকারের ইহা প্রত্যক্ষ প্ররোচনা দুষ্কৃতকারীরা যদি নিশ্চিতরূপে এ কথা না জানিত যে, সরকারী সমর্থন তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহা হইলে দিনে দুপুরে এই দস্যুতার কার্যে লিপ্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে কদাচ সম্ভব হইত না।' —জনসেবক।

অযোগ্যতার দৃষ্টান্ত

'সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা এবং অসঙ্গত জিদ গবর্ণমেণ্ট ও শাসক পার্টির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হয় তার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত নববারাকপুর হল্ট স্টেশন। বনগাঁ লাইনের এই ছোট স্টেশনটিতে টিকিট বিক্রয়ের সুব্যবস্থা নাই। একজন কনট্রাক্টর টিকিট বিক্রয় করিবেন এবং ভোর ছয়টা হইতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত তাঁহাকে দৈনিক কাজ করিতে হইবে। পারিশ্রমিক মাসে মবলগ একশত টাকা। ইহা মানুষের অসাধ্য কাজ। যাহারা পারিবে ভাবিয়া আসে, তাহারাও শেষ পর্যন্ত সরিয়া পড়ে। একদিকে চলিয়াছে বিনা টিকিটে যাত্রী ধরার অভিযান, অপরদিকে যে স্টেশনে দৈনিক বহু সহস্র যাত্রীর যাতায়াত সেখানে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। সরকারী কর্মচারীদের জিদের নিদর্শন—শিয়ালদহ হইতে বনগাঁগামী রাত্রি ৮টার ট্রেনটিকে ইহারা কিছুতেই এই হল্টে থামিতে দিবে না। এক মিনিট বাঁচাইবার নামে প্রতিদিন শিকল টানিয়া দশ মিনিট সময় নষ্ট। একদিকে প্রচার হইতেছে অহেতুক শিকল টানা অপরাধ, তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও হইয়াছে, অপর দিকে বহুশত যাত্রীকে প্রতিদিন শিকল টানায় এবং সমর্থনে বাধ্য করা হইতেছে। এরা কার মুণ্ডপাত করে, রেলের জেনারেল ম্যানেজারের, না নেহরু এবং তাঁর কংগ্রেসের?' —যুগবাণী।

জীবন সায়াহ্নের সিদ্ধান্ত

'প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর জীবন সায়াহ্নে এসে আবার নতুন করে কংগ্রেসকে ত্যাগের যে দীক্ষা দেবার প্রস্তাব করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ হলেও পরিণতির কোন পরিষ্কার বিচার করা এখনও সম্ভব নয়। গত ১৬ বৎসরে কংগ্রেসের প্রধানতম প্রহরীদের সংখ্যা ও গুরুত্ব উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। ফলে উহা সংগঠনের গুরুত্ব ও মর্যাদার উপর আঘাত এনেছে। দেশ বিভাগের আগে যাঁরা কংগ্রেসের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী ও *স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, আজ তাঁরাই কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা।* দুর্ভাগ্য পণ্ডিত নেহরুকে আজ তাঁদের উপর নির্ভর করতে হয়। কামরাজ নাদারের প্রস্তাবকে তাঁকে ঐতিহাসিক বলতে হয়। আর মোরারজী, পাতিল, বিজু পট্টনায়কের প্রশংসার কাছে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ইতিহাস ও জ্ঞানের কি অদ্ভুত পরিবর্তন। মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র, ডাঃ খান সাহেব, আবদুল গফুর খান, ভুলাভাই দেশাই, ডাঃ আনসারি, রফি আমেদ কিদোয়াই, সরোজিনী, আচার্য নরেন্দ্র দেব, আচার্য

কৃপালনী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিবর্তে আজ কাদের পরামর্শ তাঁকে গ্রহণ করতে হচ্ছে সুতরাং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা' ভাল কি মন্দ তা' তাঁকে বুঝিয়ে দেবার বা বলবার মত আজ আর একটিও মানুষ কংগ্রেস সংগঠনে নেই। আর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ রাখে নি কংগ্রেস সংগঠন সুতরাং এক ঐতিহাসিক না বলতে পারি, গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে বলব, কিন্তু এদেশের পক্ষে উপকারী একথা বলতে পারব না।' —জনতা।

অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য

'কংগ্রেস যদি দেশপ্রেমিক নীবদের প্রতিষ্ঠান হইত, চীন ও পাকিস্তানকে অন্তত চীন পাকিস্তান চুক্তির পরও, একই ব্রাকেটে টানিয়া আনিয়া শত্রুর সুন্দর শত্রু হিসাবে গণ্য করিয়া প্রতি রাজ্য সীমান্তে একই রূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। তাহা হইলে এত আশঙ্কার কারণ থাকিত না। সংখ্যায় খুব কম হইলেও আমেরিকার আধুনিক অস্ত্র সুসজ্জিত, এ্যাংলো আমেরিকান গোষ্ঠীর প্রশ্রয়পুষ্ট পাকিস্তানকে ছোট শত্রু মনে করাও ঠিক হইবে না তাহা ছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির সমর্থক ও সংরক্ষণে সহায়ক বলিয়া কার্য কারণে খণ্ডিত ভারতের বুকে যে ছয় কোটী মুসলমান আছে তাহারা অন্তত তাহাদের অনেকে বিপদের দিনে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সুতরাং ভারতের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য অবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রতি রাজ্যে বিশেষভাবে পঃ বঙ্গ ও আসামে—অকম্যুনিষ্ট সর্বদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। যাহাদের মনোবৃত্তি ও নীতিতে দেশ রক্ষার জন্য অহিংসার চেয়ে যে কোন পথকে প্রকৃষ্টতর বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব, ভারতে সেরূপ লোক দ্বারাও সরকারের পরিচালনা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়।'

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

ধূর্তের অছিলা

'ধূর্তের অছিলার অভাব হয় না। ত্রিপুরা বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার নির্বাচন ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট দলের ভণ্ডামীর কথাই বলিতেছি। স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার পদে নির্বাচন পর্ব একই দিনে অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করিলে কম্যুনিষ্টদের বিপাকে ফেলা যাইত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিনে নির্বাচন হওয়ায় কম্যুনিষ্টরা কাঁকতালে বিষ ও অমৃত উভয়ই ঢালিবার সুযোগ লইয়াছে। কম্যুনিষ্ট দলপতি ও সহকর্মীদের ভারত রক্ষা আইনে আটক রাখার প্রতিবাদে স্পীকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণে যাহাদের সতীত্বে আঘাত লাগিয়াছিল, ডেপুটী স্পীকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া কিন্তু তাহাদের সিঁথির সিঁদুর অক্ষুণ্ণই রাখিতে চাহিয়াছিল। স্পীকার নির্বাচনের পূর্বে ইঁহারা সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু ডেপুটী স্পীকার নির্বাচনে সেদিনকার নীতি বর্জন করিতে একটুও ইতস্তত করিলেন না। সমস্ত ব্যাপারটি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে—কোন নির্দিষ্ট নীতিকে কম্যুনিষ্টরা আঁকড়াইয়া থাকে না। অবস্থার পরিবর্তনে পার্টির সংগঠনী শক্তিকে জোরদার করার পক্ষে যে কোন সুযোগ তাহারা লইবেই—যেমন স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার নির্বাচন ব্যাপারে তাহাদের নীতি পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের উচ্চাসনে প্রধান মন্ত্রীর প্রতি কম্যুনিষ্টদের আস্থা আছে, কিন্তু কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট-এর উপর নাই। স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার নির্বাচন ব্যাপারেও কম্যুনিষ্টরা প্রায় ঐ রকমই নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। আসলে ইহাদের সকলই ভাঁওতা। যেমন আটক বন্দীদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করিয়া ইহারা ভণ্ডামী করিয়াছে, স্পীকার নির্বাচন দিনে সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনে সভাকক্ষ ত্যাগ না করিয়াও পর পর ভণ্ডামী দেখাইল। মুস্লিমদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে দল ভারত বিরোধী পাকিস্তানের পক্ষ লইয়া ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে পারে সেই দল কত বড় ভণ্ড তা কী আজ কাহারও বুঝিবার বাকী আছে?'

—সেবক (আগরতলা)।

শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি

'দৈনন্দিন জীবনের যাহা নিত্যপ্রয়োজনীয় যেমন চাউল, আটা, চিনি, মাছ ইত্যাদি সর্বরকম জিনিষের তথা খাদ্যসামগ্রীর মূল্যমান আজ এমন পর্যায়ে যাহা সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। দেশের বৃহৎ পরিধির কথা না বলিয়া যদি আমরা এই জেলা ও তার সহরাঞ্চলের কথা বলি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইতিমধ্যেই গ্রামে ও সহরে বহু বাড়ী বা পরিবার আছে যেখানে একবেলা অন্তত অন্নের হাঁড়ি উনুনে চাপান হয় না। সরকার অবশ্য চাউল ঘাটতি বলেন কিন্তু আমরা দেখি বেশী দাম দিলে চাউল বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়; সকল জিনিষই তাই; অর্থাৎ সবই আছে কেবল সাধারণের মূল্য দিবার ক্ষমতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। গ্রাম ও সহরাঞ্চল হইতে এই ধরণের সংবাদ অহরহ আসিতেছে। এমন অঞ্চল বহু আছে যেখানে অনাহার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা চলিতেছে। সাধারণ খোলা বাজারে ন্যায্য মূল্যে মিলে না—সরকারের ন্যায্য মূল্যের দোকানেও মাল থাকে না—এ হেন অবস্থায় অন্যায্য দিবার মত ন্যায্য লোকও নাই—কেবলমাত্র অন্যায্য দিবার ক্ষমতা রাখে এরকম অন্যায্য ক্রেতাই অন্যায্য দোকানদারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে তাহা হইলে বেশীর ভাগ ন্যায্য মানুষের ন্যায্যভাবে বাঁচিবার উপায় কি? শাসন-যন্ত্রে সমাসীন পদস্থ ব্যক্তিগণ কি তাহা ভাবিয়াছেন? মানুষ যদি এইভাবে বাঁচিবার প্রয়াসে বার বার ধাক্কা খাইতে দেখে তখন যতই বলা হউক না কেন, দেশ যে তাহাদের এই বোধ তাহারা হারাইয়া ফেলে এবং তাহা পরিণামে মারাত্মক হয়। আমরা দেশের এই সংকট সময়ে সরকারের সাধারণ মানুষের এবম্বিধ অবস্থার প্রতিই শুধু দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি না—উপরন্তু সরকার অন্তত যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যাহাতে সাধারণ মানুষও ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য ঐ সমস্ত ব্যবস্থার যঁহারা স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত তাহাদেরও কর্তব্য কর্মে মন রাখিতে অনুরোধ জানাই।' —বীরভূম বার্তা (সিউড়ি)।

মন্ত্রী পদত্যাগের হিড়িক

'সরকারী প্রশাসনের মধ্যে থাকিয়া জনসংযোগ রক্ষার কার্যে বেশ সুফল পাওয়া যায় না বলিয়াই নাকি মন্ত্রিগণকে স্ব স্ব পদ ত্যাগ করিয়া সংগঠনের কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে; এবং সেই আহ্বানে সাড়াই হইতেছে এই সমস্ত পদত্যাগের হিড়িক। এখন কথা হইতেছে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিলেই যে জনসংযোগ বৃদ্ধি পাইবে বা জনগণের এক মহা কল্যাণ সাধিত হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সমস্ত মন্ত্রিগণের অনেকেই পূর্বে দেশকর্মী হিসাবে মফঃস্বলে কাজকর্ম করিতেন ও মফঃস্বল অঞ্চলের সাধারণ ব্যক্তিদের সহিত একাত্ম হইয়া তাহাদের সুখদুঃখের সাথী হইয়া পড়িয়াছিলেন। মন্ত্রিত্ব রক্ষা করিয়াও পার্টিকর্মী হিসাবে মফঃস্বলে আসিয়া জনসংযোগ রক্ষা করা যায় ও জনগণের অভাব অভিযোগের খবর সংগ্রহ করা যায়। প্রত্যেক রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা আদৌ হইতেছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিটার্ন টিকিট কাটিয়া মন্ত্রীরা মফঃস্বল সফরে বাহির হন। মফঃস্বলে নানা অসুবিধার অজুহাতে আদৌ অবস্থান করিতে চাহেন না। যে কয়েকঘণ্টার জন্যেও বা আগমন করেন তাহাও কেবল মাত্র জীপ বা মোটরগাড়ী চলাচলের উপযোগী সামান্য কয়েকটি স্থানে। সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্টের উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করিয়াই মন্ত্রী মহাশয়েরা রাজত্ব চালাইতেছেন। রিপোর্টভিত্তিক রাজত্ব যেমন হয় বর্তমান রাজত্বে। হাল তাহাই হইয়াছে। পরিকল্পনা হইতেছে, পুনরায় কিছুদিন পরে তাহা পরিত্যক্ত হইতেছে, নূতন করিয়া প্রকল্প রচিত হইতেছে। গৌরী সেনের অর্থ বরবাদ হইলে কাহার কি আসে যায়। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহাতে যে খুব বেশী জনসাধারণের উপকার হইবে তাহা মনে হয় না। জনসংযোগ রক্ষা করা বা জনগণের স্থায়ী কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই হইল প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কথা; তাহা সে যে পদেই থাকুক না কেন। পার্টি সংগঠনের কথা বলিতে গেলেও তাহাই। আসল কথা দেশের বা পার্টির প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে কয়েকটি সত্যিকারের জননেতা ও আদর্শবাদী কর্মী বাছাই করিতে হইবে। কাতারে কাতারে পদত্যাগ করিলেই পার্টির বা জনগণের কিছুই সুরাহা হইবে না।'

—জনমত (ঘাটাল)।

অনাস্থার সূত্র

'মোরারজী দেশাই মহাশয় করের গন্ধমাদন কেন আমাদের উপর চাপাইয়াছেন, কেন বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা চালু করিয়াছেন তাহার সাফাই গাহিতে গিয়া বলিয়াছেন—চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্যই এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে! সমাজবাদী বুলি যাঁহারা আওড়ান, যাঁহারা স্বার্থত্যাগের জন্য দেশবাসীর নিকট প্রতিদিন আহ্বান জানাইতেছেন, তাঁহারা দুর্নীতি দূর করিতে পারিলে আধ পয়সাও কর চাপাইতে হইত না। দেশরক্ষার সমূহ ব্যয় উহা হইতেই আসিত।' প্রতি রাজ্যে মন্ত্রী সংখ্যা এক চতুর্থাংশে হ্রাস করিলে বৎসরে বহু কোটি টাকা সাশ্রয় হইত। লণ্ডনে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মচারী ১২০০ হইতে ছাঁটাই করিয়া ১২ করিলে কাজও ভাল হইত, বিরাট অপব্যয়ও হইত না। সরকারী পরিকল্পনাগুলিতে অপব্যয় বন্ধ করিলে, আয়কর ফাঁকি বন্ধ করিতে পারিলে, বৃহৎ কোম্পানীগুলির বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকি বন্ধ করিলে, অনাদায়ী প্রায় ৩০০ কোটি টাকা আয়কর আদায় করিতে পারিলে, দরিদ্রের উপর করের বোঝা এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় চাপাইয়া প্রাণ কণ্ঠাগত করিতে হইত না। দেশরক্ষার জন্য দেশের মধ্যে যে সততা, নিষ্ঠা এবং ঐক্যের পরিবেশ প্রয়োজন তাহা নেতারা রচনা করেন নাই। দুর্নীতি দমনে সত্যকার চেষ্টা তাহাদের কোথায়! মাছের দাম কমাইবার জন্য লাইসেন্স চালু করিয়া তাঁহারা কি দাম কমাইতে পারিয়াছেন? সরকারের কোনও চেষ্টাই ফলপ্রসূ হইতেছে না কেন? কেন চোরাকারবারী আর গাঁটকাটায় তাঁহাদের চোখরাঙানীর কানাকড়িও দাম দিতেছে না? ইহার আসল কারণ কি ইহাই নয় যে, সরিষার মধ্যেই ভূত আছে? এই ভূত না তাড়াইলে তাঁহারা চীনাভূত তাড়াইবেন কি করিয়া? ইতিহাসের শিক্ষা ভুলিয়া না গেলে একটা বিশাল দেশের নেতারা এরূপ মূর্খের ন্যায় আচরণ করিতে পারেন না। জানি, অনাস্থা প্রস্তাব ধোপে টিকিবে না, ইহার প্রভাব জনমন হইতে মুছিয়া যাইবে না।'

—মেদিনীপুর হিতৈষী (মেদিনীপুর)।

চিনি লইয়া ছিনিমিনি

'গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা রাজ্যে চিনি নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ করিয়াছেন। এই নিয়ন্ত্রণবিধির ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এক নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। অন্য দিকে ধনিক শ্রেণীর প্রয়োজন অবাধে কালোবাজারীতে চিনি বিক্রয় হইতেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণবিধির সুযোগে এই শিল্প এলাকার কতিপয় কুখ্যাত চিনি ব্যবসায়ী পুরাতন মজুত চিনি কালোবাজারীতে বিক্রয় করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা মুনাফা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্ত মহল হইতে শোনা যাইতেছে। ইহা ছাড়া আসানসোল বাজারে প্রকাশ্যেই ব্যবসায়ীরা ২'০০ সের মূল্যে চিনি বিক্রয় করিয়া কালোবাজারীকে প্রশ্রয় দিতেছে। অপর দিকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে যে রেশন কার্ড দেওয়া হইয়াছে, সেই কার্ডে চিনি পাওয়া যাইতেছে না। অর্থাৎ সরকার অনুমোদিত দোকানগুলিতে খাদ্য বিভাগ সময়মত চিনি সরবরাহ করিতে না পারায় সাধারণ মানুষ এবং ছোট ছোট চায়ের দোকানের মালিকদের দুর্গতির অন্ত নাই। সরকারের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা যে সরকারের হাতে চিনি মজুত থাকিতে এবং নিয়ন্ত্রণবিধি প্রয়োগ করার পরও খোলাবাজারে বে-আইনীভাবে চিনি বিক্রয় করার অধিকার কে তাহাদের দিয়াছে? রেশন কার্ড বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রচুর গলদ রহিয়াছে, কারণ সুযোগ-সন্ধানীরা অনায়াসে ভুয়া কার্ডে অতিরিক্ত চিনি সংগ্রহ করিয়া সহজেই কালোবাজারীতে বিক্রয় করিতে পারিবে। এই সমগ্র নিয়ন্ত্রণবিধিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে সরকারকে আর একটু কঠিন হইতে হইবে এবং সৎ পরিদর্শক নিয়োগ করিয়া কার্ডের বিলি ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতে হইবে নতুবা সরকারের এই প্রচেষ্টা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।'

—আসানসোল হিতৈষী (আসানসোল)।

এম সি সি বর্তমানে ইংলণ্ডের পুনর্গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নিকট 'রাবার' হারানোর জন্য ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্ণধাররা বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এম সি সি দলের ভারত সফরের খেলোয়াড় নির্বাচন দেখেই বেশ বুঝা গেছে তাঁরা অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের দল গঠনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র এবং ভারত সফরটা একটা ট্রায়াল হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তাই তরুণ ও প্রবীণ খেলোয়াড় সংমিশ্রণে এম সি সি দলটি গঠিত হয়েছে।

যাই হোক আশা করা যায় আকর্ষণীয় ও উচ্চাঙ্গের ক্রিকেট খেলা দেখা যাবে।

এম সি সি দলের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে

এম সি সি দলের ভারত সফর

শক্তিশালী এম সি সি দল ভারত সফরে আসছে। এই সফরের জন্য মনোনীত পনের জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান কলিন কাউড্রে এই দলের অধিনায়ক। মাইক স্মিথ সহ অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন।

এম সি সি দলের সকল ব্যাটসম্যানই অভিজ্ঞ এবং তাঁদের ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হয়েছে। চার জন 'ফাস্ট বোলার' অর্থাৎ ব্যারী নাইট, লাটার, প্রাইস ও জোন্স এবং তিন জন 'স্পিন বোলার' অর্থাৎ মার্টিমোর, টিটমাস ও উইলসন দলভুক্ত হয়েছেন।

নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে চার জনের অর্থাৎ জোন্স, প্রাইস, উইলসন ও বিঙ্কস নবাগত। তাঁদের এখনও ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হয় নি।

ডেক্সটারের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল গত সফরে ভারতের বিরুদ্ধে 'রাবার' হারায়। এবার সকলেই আশা করেছিলেন যে তারা আরও শক্তিশালী দল গঠন করে ভারত সফরে পাঠাবে। ফ্রেডি ম্যাটন, ডেক্সটার, ব্রায়ান ক্লোজ, ব্রায়ান ষ্ট্যাথাম, টনি লক, টম গ্রেভনী ও বারবার দলে না থাকায় ভারতের ক্রীড়ামোদীরা বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন। ইংলণ্ডের সাংবাদিকরাও দল গঠন সম্পর্কে মোটেই খুশী হতে পারেন নি। সেখানকার সংবাদপত্রে দল সম্পর্কে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে।

ভারতের ক্রিকেট কর্ণধাররা অবশ্য দল গঠন সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এখন থেকেই বেশ ঢাকঢোল পিটাতে আরম্ভ করেছেন। কোন রকমে একটা দল আনতে পারলেই হ'লো। পয়সার অভাব এখানে হবে না। কিন্তু ক্রীড়ামোদীদের কাছে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ভারত যখন ক্রিকেটে ইংলণ্ডের আভিজাত্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন, তখন কেন তারা সকল খ্যাতনামা খেলোয়াড় সমন্বয় দল গঠন করে ভারতে পাঠাবে না। এর যোগ্য প্রত্যুত্তর হবে, আবার ভারত ইংলণ্ড দলকে পর্যুদস্ত করতে পারলে। বহু অর্থের প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে কোন রকমে একটা দল আনার সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' লাভ

ক্রিকেটে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তাদের বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান টেষ্ট পর্যায়ে তারা ৩-১ খেলায় জয়ী হয়ে 'রাবার' লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এবারকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ইংলণ্ড সফরের গুরুত্ব অনেকখানি। বর্ণবিদ্বেষের বেড়াজাল তাঁরা ভেঙ্গে দিয়ে ক্রীড়ামোদীদের মনকে বিশেষ করে জয় করেছেন। তাঁদের খেলা এখানকার ক্রীড়ামোদীদের স্মৃতিপটে বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু 'রাবার' লাভের গৌরবের অধিকারী হয় নি—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবার আকর্ষণীয় ও উচ্চাঙ্গের ক্রিকেট খেলার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন—তার তুলনা করা চলে না। ইংলণ্ডের সাংবাদিকরা ফ্রাঙ্ক

পেনাং-এ এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক অভিলাষ সিং। তিনি কোর অফ সিগন্যাল দলের হয়ে খেলেন।

ওরেলকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সেরা 'শুভেচ্ছা দূত' হিসাবে অভিহিত করেছেন।
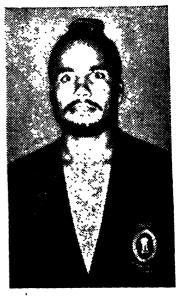
ওয়েলের বয়স ৩১ বছর। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটে তাঁর অবদান বিশেষ করে দু'বছর পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া সফরে তাঁর নেতৃত্ব ও সন্ত সমাপ্ত টেষ্ট পর্যায়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাফল্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওভালই তাঁর সর্বশেষ টেষ্ট ম্যাচ। তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ওরেল যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেলেন—তা চিরদিনই ক্রীড়ামোদীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওরেল ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রথম ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলা সুরু করেন। এ পর্যন্ত তিনি ৫১টি টেষ্ট খেলায় যোগ দিয়েছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেই পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচে অধিনায়কত্ব করার তাঁর সুযোগ ঘটেছে। ক্রিকেট জীবনের শেষ টেষ্টে জয়ী হওয়া ওরেলের পক্ষে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সাফল্যের জন্ত ব্যাটিং-এ কনরাড হাণ্ট, রোহন, কানহাই, বেসিল বুচার ও গারফিল্ড সোবার্সের এবং বোলিং-এ ফাষ্ট বোলার গ্রিফিথের অবদানই সর্বাধিক। তরুণ উইকেট রক্ষক ডেরিক মারে ২৪টি উইকেট রক্ষকের অংশীদার রূপে অর্থাৎ 'ক্যাচ' ধরে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এর আগে অষ্ট্রেলিয়ার ওয়ালী গ্রাউট ও দক্ষিণ আফ্রিকার জন্ত ওয়াই ২৩টি উইকেটের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন।

আবার কলকাতায় ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ

আবার ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ। কলকাতায় কি ষ্টেডিয়াম গঠন হবে না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষ্টেডিয়াম গঠনের পরিকল্পনা 'কোল্ড ষ্টোরেজে' থেকে যাবে।

সম্প্রতি বিধান পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ষ্টেডিয়াম নির্মাণের উত্তোগ আয়োজন সম্পর্কে যে ফিরিস্তি দাখিল করেছেন তাতে কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা যে, তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করতে দেড় লক্ষ টন সিমেণ্ট আর এক কোটি ঘন ফুট পাথরকুচি লাগবে। শুধু কি তাই এই সব মালপত্র বহন করতে চার বছর ধরে প্রত্যেক দিন ৩০ খানি করে ওয়াগান দরকার হবে। দেশের জরুরি অবস্থার দরুণ ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ আরম্ভ হচ্ছে না বলে মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন। তিনি সব শেষে আশার বাণী ছড়িয়েছেন যে কলকাতার ষ্টেডিয়াম নির্মিত হবেই। কিন্তু কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। তাঁরা অবিলম্বে ষ্টেডিয়াম দেখতে চান।

সরকার ষ্টেডিয়াম গঠন সম্পর্কে যতই আগ্রহ প্রকাশ করুন না কেন, কোন আন্দোলন ছাড়া কলকাতার ষ্টেডিয়াম গঠন হবে বলে মনে হয় না। ষ্টেডিয়াম দাবী কমিটির আন্দোলনের ফলে সরকার কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই ষ্টেডিয়াম দাবী কমিটিকে আবার কলকাতায় ষ্টেডিয়াম গঠন সম্পর্কে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাদের এই আন্দোলনের ফলে সরকার আবার যদি কিছুটা সক্রিয় হয়।

টোকিও অলিম্পিকের কর্মসূচী

১৯৬৪ সালে টোকিওতে বিশ্ব অলিম্পিকের আসর বসবে। পনের দিনব্যাপী এই ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে। এর প্রস্তুতি এর মধ্যেই টোকিওতে সুরু হয়েছে। জাপানের সব জায়গাতেই একটা উৎসবের আওয়াজ এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে। টোকিওতে প্রাক-অলিম্পিকের ব্যবস্থা হয়েছে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের

শেষ টেষ্টের পর ওভালের দৃশ্য......

জন্য জাপান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ক্রীড়াবিদদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জাপান বিশ্ব অলিম্পিকের সার্থক রূপ দেবার জন্য যে চেষ্টা করছে— তা সফল হোক এটাই সকলে চান। বিশ্ব অলিম্পিকের কর্মসূচী নিম্নে দেওয়া হ'লো :—

১০ই অক্টোবর উদ্বোধন উৎসব ; ১৪ই থেকে ২১শে অক্টোবর এ্যাথলেটিকস (ন্যাশনাল স্টেডিয়াম) ; ১১ই থেকে ১৫ই অক্টোবর রোয়িং (টোডা রোয়িং কোর্স)।

১১ই, ১৩ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৮ই, ১৯শে, ২১শে ও ২৩শে অক্টোবর :—বাস্কেটবল (জিমন্যাসিয়াম এনেক্স)।

১১ই থেকে ২১শে ও ২৩শে অক্টোবর :—মুষ্টিযুদ্ধ (কোরাকুয়েন্জ আইস প্যালেস)।

২১শে থেকে ২৩শে অক্টোবর—ক্যানোয়িং (লেক সাগামি)।

১৪ই, ১৬ই থেকে ২০শে ও ২২শে অক্টোবর সাইকেল প্রতিযোগিতা (হাচাইয়োজি, রোড রেস কোর্স।

১৩ই থেকে ২৩শে অক্টোবর—ফেন্সিং (ওয়েসেডা মেমোরিয়াল হল)।

১১ই থেকে ১৬ই, ১৮ই, ২০শে, ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর— ফুটবল (ন্যাশনাল ষ্টেডিয়াম ও অন্যান্য মাঠ)।

১৮ই থেকে ২৩শে অক্টোবর—জিমন্যাষ্টিক (টোকিও মেট্রোঃ জিমন্যাসিয়াম)।

১১ই থেকে ১৪ই, ১৬ই থেকে ১৮ই অক্টোবর ভারোত্তোলন (সিবায়া পাবলিক হল)।

১১ই থেকে ১৭ই, ১৯শে, ২১শে ও ২৩শে অক্টোবর হকি (কোমাজাওয়া হকি মাঠ)।

২০শে থেকে ২৩শে অক্টোবর জুডো (ইয়োগি ন্যাশনাল জিমন্যাসিয়াম)।

১১ই থেকে ১৪ই, ১৬ই থেকে ১৯শে অক্টোবর—কুস্তি (কোমাজাওয়া জিমন্যাসিয়াম)।

১১ই থেকে ১৮ই অক্টোবর—সুইমিং ও ডাইভিং (ইয়োগি ন্যাশনাল স্টেডিয়াম)।

১১ই থেকে ১৫ই অক্টোবর—মডার্ণ পেন্টাথালন (আসাকা স্যুটিং রেঞ্জ)।

১১ই থেকে ১৫ই, ১৭ই থেকে ১৯শে ও ২১শে থেকে ২৩শে অক্টোবর—ভলিবল (কোমাজাওয়া ভলিবল কোর্ট)।

১১ই থেকে ১৮ই অক্টোবর—ওয়াটার পোলো (মেট্রো : ইণ্ডোর সুইমিং পুল)।

১২ই থেকে ১৫ই এবং ১৯শে থেকে ২১শে অক্টোবর— ইয়াটিং (এনোসিমা ইয়াটহারবার)।

১৬ই থেকে ১৯শে, ২২শে থেকে ২৪শে অক্টোবর— ইকোয়েসট্রিয়ান স্পোর্টস (ইকোয়েসট্রিয়ান পার্ক)।

১৫ই থেকে ২০শে অক্টোবর—স্যুটিং (আসাকা স্যুটিং রেঞ্জ) ;

২৪শে অক্টোবর—সমাপ্তি উৎসব।

● আই এফ এ শীল্ডে যোগদানকারী চন্দননগর দলের খেলোয়াড়গণ

খেলাধুলায় রাজনীতির স্থান নাই

খেলাধূলায় রাজনীতির কোন স্থান নেই। এই একটা জায়গা যেখানে সকলকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়।

কলকাতার ক্রীড়া-সাংবাদিক ক্লাব বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন, বেসরকারী সংস্থা, পৌরপিতা, সাংবাদিক, ক্রীড়া-সাংবাদিক, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের জন্য একটা ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে।

প্রতিদিনকার খেলায় ক্রীড়ামোদীদের আনন্দের খোরাক জোগায়। এর মধ্যে পৌরপিতাদের খেলার মাঠে আবির্ভাব সত্যই অভিনব। কংগ্রেস ও বামপন্থী পৌরপিতাদের মিলনকে কেন্দ্র করে মাঠে বিপুল দর্শকমণ্ডলী হাজির হন। মেয়র ও ডেপুটী মেয়র খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য মাঠে উপস্থিত থাকেন।

পৌরপিতাদের প্রথম খেলাতেই অধ্যাপকদের কাছে পরাভূত হতে হলেও তাঁদের খেলায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোন অভাব ছিল না।

যাই হোক ক্রীড়া-সাংবাদিকদের এই নতুন প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য।

হকিতে ভারত হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে

ভারত হকিতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে তার বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ভারত সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকের কথা স্মরণ রেখেই ফ্রান্সের লিয়ঁতে আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ভারতীয় দল প্রেরণ করা হয়েছে। এই সঙ্গে ভারত কেনিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করবে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রবীণ কোচ শ্রীযুক্ত মুখার্জী শিক্ষা দান করেছেন। তিনি খেলার পদ্ধতি পরিবর্তনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের অত্যধিক ড্রিবলিং ইত্যাদি না করে সরাসরি আক্রমণের পদ্ধতি অনুসরণে অভ্যস্ত করা হয়েছে। ভারতীয় হকি মহলের ধারণা যে ভারত উন্নত ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন।

ভারতের এবারকার সফরকে অলিম্পিকের প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই সফরের অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলের বিশেষ কাজে লাগবে। ভবিষ্যত দল গঠনে এই সফর সাহায্য করবে এবং বর্তমান ক্রীড়া পদ্ধতির কোন ত্রুটি দেখা গেলে সেটাও ভারত সংশোধন করতে পারবে।

আই এফ এ শীল্ডের উদ্বোধন

ভারতের প্রাচীন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে। এবার প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়াবার জন্য আই এফ এ চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। ভারতের বিভিন্ন স্থানের খ্যাতনামা দলকে আনার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন উচ্চাঙ্গের খেলা দেখা যায় নি। শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বাইরের যে সব দল আত্মপ্রকাশ করছে—তাদের খেলায় ক্রীড়ামোদীদের মন ভরে নি। তবে আশা করা যায় খ্যাতনামা দলের আবির্ভাবে এবং শীল্ডের খেলার আরও কিছুটা অগ্রগতির পর খেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চম টেষ্টের পর ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক আলাপরত

গ্রেট বৃটেন—

এদিকে জোর গুজব যে, প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান বসন্তকালের আগমন পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেবেন এবং কোন মতেই তিনি এ বছরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঝুঁকি নেবেন না। কারণ, কনজারভেটিভদের মধ্যে অনেকে ভাবছেন, আগামী বসন্তকালের পূর্বে তাঁদের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘ জমে উঠেছে তা' অনেকাংশে কেটে যাবে এবং তখন হাওয়া অন্য দিকে ঘুরে যাবে। ইতিমধ্যে পিটার র‍্যাচম্যান নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কতকগুলি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে এবং এই ঘটনায় ম্যাকমিলান গভর্নমেণ্ট আরেক দফা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। জানা গিয়েছে ঐ পিটার র‍্যাচম্যান নামে ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব ছিল, নানারকম জুয়াচুরির দ্বারা প্রচুর অর্থ উপায় করে সে সেই টাকা ইংলণ্ডের বাইরে পাঠাচ্ছে গভর্নমেণ্টের প্রাপ্য আয়কর বেমালুম ফাঁকি দিয়ে। লেবার পার্টির নেতা (ইংলণ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী?) মিঃ হ্যারল্ড উইলসন গৃহনির্মাণ দপ্তরের মন্ত্রী স্যার কিথ জোসেফের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি পিটার র‍্যাচম্যানের মতন ঠগেরা যারা সরল লোকদের ঠকিয়ে এই রাস্তার গুণ্ডাদের পালন দিয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দশা এবং বাসস্থানের অভাবের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার অভিযোগে গভর্নমেণ্টকে অভিযুক্ত করেছেন। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর পর্যন্ত স্কারবরোতে লেবার পার্টির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব আলোচিত হবে ইতিমধ্যেই সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রধানতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ ও অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পার্টির ভিতরে কিছু বামপন্থী সদস্য ন্যাটো জোট থেকে বৃটেনকে সরিয়ে আনতে এবং বৃটেন থেকে আমেরিকার পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটি উচ্ছেদের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। তবে এইসব প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়।

বৃটেনের প্রাক্তন সমর-মন্ত্রী প্রফুমোর পদত্যাগের ফলে ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এ্যাভনের জন্য পার্লামেণ্টারী আসনে কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। তবে এই উপনির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টির ভোটসংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। গত সাধারণ নির্বাচনে কনজারভেটিভ প্রার্থীরূপে প্রফুমো এই আসনে প্রায় ১৫ হাজার ভোটে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু এই উপনির্বাচনে কনজারভেটিভ প্রার্থী মিঃ আঙ্গাস ম্যাগে মাত্র ৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। বৃটেনের এই পার্লামেণ্টারী উপনির্বাচনে একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, যা আমাদের দেশে অভাবনীয় বলে মনে হবে। উক্ত নির্বাচনে বৃটেনের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রফুমো ও কীলার কেলেঙ্কারীর প্রসঙ্গকে প্রচারকার্যে টেনে আনা হবে না। যে আসন থেকে প্রফুমো স্বয়ং নির্বাচিত হয়েছিলেন সেখানে বিরোধী দলগুলির এইরূপ সিদ্ধান্ত তাঁদের গভীর রাজনৈতিক পরিপক্কতা এবং সংযমের পরিচয় স্বরূপ। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি কি এই ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করবেন?
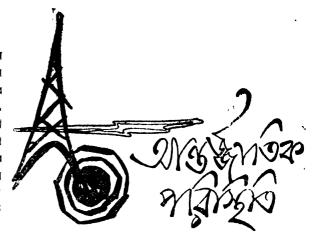
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—

আমেরিকার প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের নেতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের এককালের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় এবং মুষ্টিযোদ্ধ রেভারেণ্ড ইউজিন কারসন গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে শ্বেতকায় নাগরিকদের এক মিছিল পরিচালনা করে গেপ্তার বরণ করেছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদের বিচার বিভাগীয় সাবকমিটীতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি সাক্ষ্যদানের সময় প্রোটেষ্টাণ্ট, ক্যাথলিক ও ইহুদী সম্প্রদায়ের চব্বিশটিরও বেশী নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমর্থনযুক্ত একটি যুগ্মবিবৃতি কমিটীর সম্মুখে পাঠ করেছেন। ঐ বিবৃতিতে বর্ণবৈষম্যকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দনীয় কার্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারতকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান এবং আরও কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত বহু-পরিচিত এ্যাড ইণ্ডিয়া ক্লাবের বৈঠক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে যে, আরও নতুন ৩টি দেশ (যাদের নাম জানানো হয় নি) এ্যাড ইণ্ডিয়া ক্লাবে যোগদান করেছে। এই সংস্থার পক্ষ থেকে ভারতবর্ষকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ১০০০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য (১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ, এ বছর শেষ হবে) ভারতের সাহায্যের প্রয়োজন হবে ৬০০ কোটি টাকার। অতএব এই সাহায্য বৃদ্ধি ভারতের প্রয়োজনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্লাবের অন্যতম প্রধান সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব সাহায্যের পরিমাণ ১৮৫ কোটি থেকে ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করেছেন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী প্যারিস বৈঠকে নিজের প্রতিশ্রুত ২০ কোটির বদলে ভারতকে ৫০ কোটি টাকা সাহায্যদানে স্বীকৃত হয়েছেন। এ ছাড়াও পশ্চিম জার্মানী জাহাজ ক্রয়ের জন্য ভারতকে আরও অর্থ সাহায্যদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যে অর্থ ১০ বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। গ্রেট বৃটেন এবং জাপানও অতিরিক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তারও পরিমাণ হবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এ্যাড ইণ্ডিয়া ক্লাবে যোগদানকারী নতুন ৩টি দেশ যাঁদের নাম বলা হয় নি তাঁরাও ১৫ কোটি টাকা সাহায্য দেবেন। জানা গিয়েছে, এই ৩টি দেশ নিজেদের নাম প্রকাশ করতে চান না এবং

ইচ্ছে করেই তাঁদের নাম তাঁরা গোপন রেখেছেন। অষ্ট্রিয়া ও ইটালি তাঁদের পূর্ব প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। এ সব ছাড়াও গ্রেট বৃটেন এবং পশ্চিম জার্মানীর সাহায্যদানের সর্তগুলি অনেক শিথিল করা হয়েছে। যেমন, গ্রেট বৃটেন যে সাহায্য দেবেন, প্রথম ৭ বছর তার কোন সুদ লাগবে না। পশ্চিম জার্মানীকে তার অর্থ ২০ বছরে পরিশোধ করার কথা। কিন্তু তা' বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ২৫ বছর। সমগ্র সাহায্যের দুই পঞ্চমাংশ কোন নির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা সূচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকবে না। মোট সাহায্যের মধ্যে ৭৫ কোটি টাকা প্রথম ১০ বছরের ভিতর পরিশোধযোগ্য, বাকীটা পরিশোধের মেয়াদ ১৫ থেকে ২০ বছর।

সোভিয়েট ইউনিয়ন—

মস্কো:—১৯৪৯ সালে লালচীনের আবির্ভাবের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাসে এই প্রথম তার খবরের কাগজগুলিতে মাও সে-তুং এবং চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ব্যঙ্গ করে আঁকা পশ্চিমী সংবাদপত্রে প্রকাশিত কার্টুন পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে বেরিয়েছে মাও-সে-তুংয়ের খোলাখুলি সমালোচনা। কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম একটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র অন্য একটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের নেতাদের হেয় করার জন্য পশ্চিমী জগতের আঁকা কার্টুন ব্যবহার করলেন। 'জা রুবাজন' (Za Rubazhon) নামে একটি সোভিয়েট পত্রিকাতে সর্বশেষ সংস্করণে ভারত সীমান্তে চীনের সৈন্য সমাবেশ এবং পাক-চীন বন্ধুত্ব প্রসঙ্গ আমেরিকার এবং ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারত সীমান্তে চীনের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ এর দ্বারা এই প্রথম সোভিয়েট পত্রিকায় স্থান লাভ করল। পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ চুক্তির প্রতি চীনের বিরোধিতার তীব্র সমালোচনা করা হয়। পত্রিকাটির সর্বমোট ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৩টি পৃষ্ঠাই ব্যয়িত হয় চীনকে গালাগালি করতে। পত্রিকাটি বলেছে যে, অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ চুক্তির বিরোধিতা করে চীনা নেতারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল মিলিটারী চক্রকেই সমর্থন করেছে। ঐ পত্রিকায় 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' থেকে একটি কার্টুন পুনর্মুদ্রণ করা হয়, যে কার্টুনটিতে মাও সে তুং এবং প্রেসিডেণ্ট দ গলকে একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ এবং অনাক্রমণ চুক্তির তিনমুখো এক রাস্তার উল্টো দিকে দৌড়ুতে দেখা যাচ্ছে। কার্টুনটির ইংরাজী শিরোনামা ছিল, 'They go their own way' অর্থাৎ 'এক পথের পথিক'। এ ছাড়াও ঐ রুশ পত্রিকাটিতে চীনকে নিন্দা করে অষ্ট্রিয়া, নাইজেরিয়া এবং থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত বহু রচনা হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবশালী তত্ত্বগত সাময়িক পত্রিকা 'কম্যুনিস্থাস' (Communisthas) মস্কোয় চীন-সোভিয়েট আলোচনা বৈঠকের ব্যর্থতার পর চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটি চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 'ট্রটস্কীপন্থী' রূপে বর্ণনা করে এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগে চীনের পার্টিকে অভিযুক্ত করা হয়। লক্ষণীয় যে, এই প্রকার অভিযোগের সঙ্গে দিল্লীতে ডাঙ্গের বিবৃতির খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। ঐ বিবৃতিতে শ্রীডাঙ্গেও ঠিক এই অভিযোগ করেন যে, চীনের পার্টি, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

'দি কম্যুনিষ্টস্' নামে রাশিয়ার আরেকটি সাময়িক পত্রিকা শান্তিপূর্ণসহ-অবস্থানের নীতি ত্যাগ এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য চীনকে দোষারোপ করেছে। বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে যাঁরা চীনকে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্ররোচনা সৃষ্টিকারী বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত তাঁরা 'কম্যুনিষ্টস'র ন্যায় গুরুত্বসম্পন্ন একটি পত্রিকার এই প্রকার মন্তব্যে নিশ্চয়ই দারুণ ফাঁপরে পড়বেন।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' এতদিন পর চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে সরাসরি চীনের নিন্দা করছে। পত্রিকাটি বলেছে যে ভারত সীমান্তে চীন উত্তেজনার সৃষ্টি করছে এবং শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করার নীতিকে অস্বীকার করছে। 'প্রাভদা'র মতে, চীনের এই প্রকার মনোভাব শান্তি বা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার অনুকূল নয়।

পশ্চিম জার্মানী—

ইদানীং কয়েকটি রাষ্ট্রে গুপ্তচরবৃত্তির কতকগুলি চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়েছে। দেখা যাচ্ছে পশ্চিম জার্মানীও এদিক থেকে পিছিয়ে নেই। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় আদালত তিনজা ফেলফি এবং হানস ক্লিমেন্স নামে পশ্চিম জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন উচ্চপদস্থ অফিসারকে যথাক্রমে ১০ এবং ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এঁরা পশ্চিম জার্মানীর গোয়েন্দা বিভাগ সম্পর্কে ১৫ হাজার গোপন দলিল সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে পাচার করেছে এবং পশ্চিম জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের কাজ করছে এমন ৯৫টি বেনামী গুপ্তসংস্থার নাম এবং গোয়েন্দা বিভাগ সম্পর্কে আরও বহু গোপন তথ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই বিচার ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে এবং জার্মানীর তিনটি রাজনৈতিক দল পশ্চিম জার্মানীর গোয়েন্দা সংস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন করে ঢেলে সাজাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

পশ্চিম জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধিনায়ক রেইনহার্ড গেলেন—তিনি এক সময়ে ছিলেন হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর একজন জেনারেল। এই পরিস্থিতির ফলে তাঁকে আগামী অক্টোবর মাসের গোড়াতেই পদত্যাগ করতে হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে সম্প্রতি একটি চমৎকার নাটক এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জার্মানীর হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্র-সমিতি ছিল এর উদ্যোক্তা। ভারতীয় মেডিকেল ছাত্রী কুমারী ঊষা শালিগ্রাম ভগবদ্গীতা হ'তে অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ভারতীয় অতিথি—অধ্যাপক শ্রীমুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশর্মা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং শিক্ষা

সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীমোহন থাক্কার এবং কুমারী ঊষা শালিগ্রামের পরিচালনায় বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটকটি জার্মান ভাষায় অভিনীত হয়। শ্রীঅশোক তেরেদেশাই স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরিত্রে রূপদান করেন শ্রী এম, দেশাই। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হিডেলবার্গের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানটি তাঁদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

পশ্চিম জার্মানীর প্রতি ছয়টির মধ্যে একটি পরিবারের জন্য পৃথক বাসগৃহ বা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে অর্থমন্ত্রী ডঃ লুডউইগ এরহার্ডের নেতৃত্বে এক ব্যাপক উচ্চাকাঙ্ক্ষাযুক্ত গৃহ-নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনাটির সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব গভর্ণমেণ্ট বহন করবেন। আনুমানিক ৬০ বিলিয়ন জার্মান মার্ক পরিকল্পনার নির্মাণ খাতে ব্যয়িত হবে। এই বিরাট পরিমাণ অর্থ এক অভিনব সঞ্চয় চুক্তির সাহায্যে সংগ্রহ করা হবে। যাঁরা বাসগৃহ পাবেন তাঁরা প্রতি বছর নিজেদের আয় থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসঞ্চয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন এবং প্রতি বছর ঐ সঞ্চয়ের টাকা জমা দেবেন এবং এই ভাবে তাঁর বাড়ীর মূল্য শোধ হয়ে গেলে তখন তিনি নিজেই মালিক হয়ে যাবেন। এই সর্তে যাঁরা চুক্তি করবেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য গৃহ বরাদ্দের গ্যারাণ্টি থাকবে। এই পরিকল্পনায় ১৯৬০ সালে সমগ্র গৃহ-নির্মাণ খাতের শতকরা বিশ ভাগ অর্থ অর্থাৎ ৩.২ বিলিয়ন জার্মান মার্ক ব্যয় করা হয়েছে। এই ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১ সালে দাঁড়িয়েছে ৪.৪৭ বিলিয়ন। আশা করা যাচ্ছে ক্রমশ এই পরিকল্পনায় খরচ আরও বৃদ্ধি করা হবে। এই নতুন বাড়ীগুলোতে কেন্দ্রীয় তাপ এবং গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা সহ প্রায় সব রকম আধুনিক ব্যবস্থাই থাকবে।

আফ্রিকা—

দাকার (সেনেগাল): বিভিন্ন আফ্রিকান রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ গত ১১ই আগষ্ট এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে আঙ্গোলায় পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য আঙ্গোলার বিপ্লবী নেতা মিঃ হলডেন রবার্টোকে সরাসরি সাহায্যদান এবং কঙ্গোয় কর্মরত বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

ইউ-পি-এ পার্টির নেতা মিঃ হলডেন রোবার্টো এক বিরাট সুশৃঙ্খল গেরিলা বাহিনী গঠন করেছেন। অন্যান্য বন্ধু আফ্রিকান রাষ্ট্রের উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত এবং বলীয়ান হয়ে এই বাহিনী প্রায় দু'হাজার বর্গমাইলব্যাপী 'Rotten Triangle' নামে এক বিরাট এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছে। মিঃ রোবার্টোর আফ্রিকানদের উপর খুব প্রভাব রয়েছে এবং মুলাত্তোরা যাঁরা হচ্ছেন এক কথায় আঙ্গোলার অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তাঁদের মধ্যে আঁদ্রেদের সমর্থকই বেশী। গত আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনে মিঃ আঁদ্রেদে বিপ্লবী নেতা রোবার্টোর সঙ্গে তাঁর বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার আবেদন জানান, কেন না, তাঁদের এই বিরোধ প্রায়ই আত্মঘাতী সংঘর্ষের রূপ নেয়। 'Rotten Triangle'-এর দক্ষিণে মলাঞ্জী তুলা উৎপাদনের প্রধান ঘাঁটি। ১৯৬১ সালে এই স্থানে পর্তুগীজ সৈন্যদের কাছে বিদ্রোহীদের বড় রকমের বিপর্যয় ঘটেছিল। এবার মিঃ রোবার্টো সেই মলাঞ্জী

অধিকারের পরিকল্পনা করেছেন। আদ্দিস আবাবার শীর্ষ সম্মেলনে আঙ্গোলার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে, কিন্তু সে সাহায্য আঙ্গোলার কোন্ দলকে দেওয়া হবে তা ঠিক হয় নি। ইতিমধ্যে সালাজার তাঁর বন্ধু স্পেনের ফ্রাঙ্কোর একটি সিদ্ধান্তে বেশ বেসামাল হয়েছেন। ফ্রাঙ্কো ঠিক করেছেন, শীঘ্রই স্প্যানিশ গিয়ানায় স্পেনের উপনিবেশ রাইও মুনি এবং ফের্ণান্দো পো'র স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পর্তুগালকে তার উপনিবেশে স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে কোন অস্ত্র সাহায্য না দেবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার সদস্য রাষ্ট্রদের সম্প্রতি যে অনুরোধ জানিয়েছেন, ঠিক তার অব্যবহিত পরেই ফ্রাঙ্কো-স্পেনের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। বৃটিশরা যেমন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের নরমপন্থীদের খাতির-যত্ন করতেন, ঠিক সেই পুরানো কৌশল অবলম্বন করেছেন সাম্রাজ্যবাদী সালাজার। তিনি পর্তুগীজ উপনিবেশের নরমপন্থী নেতাদের আপোষ মীমাংসার জন্য খাস পর্তুগালে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

দাকারে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত বিষয়েও আলোচনা হয়। আফ্রিকান ইউনিয়নের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচনের ভার মে মাসে তিউনিসে যে রাষ্ট্রপ্রধানদের সভা হবে তার উপর অর্পণ করা হয়। এ ছাড়া সম্মেলনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতাদের যোগ দিতে অনুরোধ জানানো হয় এবং ঐ অধিবেশনে বর্ণ বৈষম্য এবং আফ্রিকা খণ্ডে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইবার ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়।

নেপাল—

হিমালয়-দুহিতা নেপাল রক্ষণশীলতার অন্যতম দুর্গ। সম্ভবত তার প্রাচীনপন্থী চরিত্রের জন্যই নেপালের গণলোকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এসেও পিছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করেছে এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। ১৯৫১ সালে রাণাশাহীর পতনের পর রাজকীয় গণতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটে এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে হিমালয়-শৃঙ্গের সুউচ্চ আবেষ্টনীর বাইরে বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার নতুন করে আত্মপরিচয় ঘটতে থাকে। গত ১৭ই আগষ্ট ১৯৬৩ তারিখে নেপালের রাজা মহেন্দ্র নেপাল রাজ্যে নতুন 'মুলকি আইন' প্রবর্তন করেছেন। এই সর্বাত্মক সামাজিক সংস্কার আইনের দ্বারা নেপালে নবযুগ বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপিত হবে। রাজা মহেন্দ্র প্রবর্তিত এই আইন নেপালের পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় আধুনিকতার গতিবেগ সঞ্চার করবে। আধুনিক বিশ্বে সমাজ-জীবন এবং পরিবার সংগঠনে যে দূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে মহেন্দ্র প্রবর্তিত সমাজ সংস্কার আইন আধা-সামন্ততান্ত্রিক নেপালকে সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

'এই নতুন আইনের বলে নেপালে বহু বিবাহ, শিশু বিবাহ, অসমান বিবাহ ও জাতিভেদের কড়াকড়ি ইত্যাদিই কেবল লোপ করা হয় নি, অধিকন্তু ডাইভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার পর্যন্ত স্বীকার করা হয়েছে।'

একশ' দশ বছর আগে নেপালের প্রথম রাণা প্রধানমন্ত্রী জঙ

নেপালের রাজা মহেন্দ্র

বাহাদুর ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে যে সমস্ত আইন প্রবর্তন করেছিলেন অদ্যাবধি নেপালে সেগুলিই চলে আসছিল। বর্তমান সংস্কার আইনের দ্বারা সেই সব পুরাতন বিধি-বিধানের অবলুপ্তি হল। এক শতাব্দীরও পূর্বে যে আইন রচিত হয়েছিল আজ তা স্বভাবতই জীর্ণ এবং যুগধর্মের বিরোধী হয়ে পড়েছে। বিশেষত নেপালের নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া ও সংবিধানের দিক থেকেও ঐ সব সেকেলে সামাজিক প্রথা ও বিধি-বিধান চলতে পারে না। এই সংবিধানে সকলকে সমান অধিকার এবং সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। নর-নারী নির্বিশেষে সামাজিক বিচার পেতে হলে নিশ্চয়ই এ যুগে আর একাধিক বিবাহ, শিশু বিবাহ ইত্যাদি চলতে পারে না। ৫০ বছরের পুরুষ ১০ বছরের বালিকাকে বিবাহ করবে এমন প্রথা ভয়াবহ। সুতরাং নতুন আইনে এই সমস্ত নিষিদ্ধ হয়েছে এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে বয়সের সর্বোচ্চ বৈষম্য ধরা হয়েছে ২০ বছর। মেয়েদের সর্বনিম্ন বয়স ধরা হয়েছে ১৪ এবং ছেলেদের ১৮ বছর, বহু বিবাহ ইত্যাদি বে-আইনী এবং দণ্ডনীয় করা হয়েছে। জাতিভেদের কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ঘটেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃতির দ্বারা।

কোন দুরারোগ্য ব্যাধি, পাগলামি, অন্ধতা, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসম্মত করা হয়েছে। বলা-বাহুল্য যে, যদিও কোন দেশে একমাত্র আইন পাশ করলেই সামাজিক প্রগতি ঘটে যায় না, তথাপি এই সমস্ত সংস্কার আইন নেপালের গোটা সমাজ জীবনের পক্ষে যুগান্তকারী, যে সমাজ রক্ষণশীলতা,

বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং বহু নারীদের দাসত্ব ও লাঞ্ছনাপূর্ণ আচরণের দ্বারা কলুষিত ছিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বন্ধন ছিন্ন করে নেপাল আধুনিক, উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রের গৌরব অর্জন করুক—প্রতিবেশী এবং বন্ধুরূপে ভারতের জনগণ এই কামনা করে। রাজা মহেন্দ্রকে যদি ভাবী নেপালের মানুষ মনে নাও রাখে, তবে অন্তত এই একটি মাত্র কারণে বর্তমান সামাজিক বিপ্লব সাধনের জন্য আগামী দিনের ইতিহাসে তিনি বরণীয় হয়ে থাকবেন।

পাকিস্তান—

পাকিস্তানের রাজনীতিতে সম্প্রতি যা' সব ঘটছে সেগুলো লক্ষ্য করবার মতন। পাকিস্তানে বিরোধী দলগুলির একটি মিলিত জোট বা ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গঠনের জোর চেষ্টা চলছে। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পুনরুত্থানবাদ বিরোধী মুসলীম লীগ—এরাই হচ্ছে পূর্বপাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধান বিরোধী শক্তি হল মন্ত্রিত্বের বিরোধী মুসলীম লীগ অর্থাৎ জামিয়াৎ-ইয়ু-ইসলাম এবং নিজামী ইসলাম, যার নেতা হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সর্দার বাহাদুর খান। মৌলানা ভাসানীর পার্টি ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ এবং নুরুল আমিনের পুনরুত্থানবাদ বিরোধী মুসলীম লীগ (যাঁরা গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হলে, তবে মুসলীম লীগের পুনর্গঠন করতে চান) মন্ত্রিত্ববাদী মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলকে একত্রিত করে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করছেন। কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টের মিলিত কর্মসূচী গ্রহণের পথে মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের একটি দাবী বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁরা চান, পাকিস্তান পশ্চিমী শিবিরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ত্যাগ করুক। কিন্তু অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই প্রকার দাবীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। এটা সুনিশ্চিত যে, পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলি যদি তাঁদের এই রকম কয়েকটি মত পার্থক্য অতিক্রম করে কোন মিলিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন, তবে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠবে।

পাকিস্তানে স্কুল এবং কলেজে ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামরিক শিক্ষাদাতা অফিসারগণ এই শিক্ষাকার্য পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন খেলার মাঠ এবং স্কুল ও কলেজগুলির প্রাঙ্গণ এই কাজে ব্যবহার করা হবে। পাকিস্তানের নীতি যে কিরূপ মিলিটারীমুখীন হয়ে উঠছে এই ঘটনার দ্বারাই তা' স্পষ্ট বুঝা যায়।

সম্প্রতি চীন থেকে ফিরেই পাকপররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জেড, এ, ভুট্টো যে বিবৃতি দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কোয়েটায় আয়ুব খানের বক্তৃতা দেখে মনে হচ্ছে পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে কোন গোপন বুঝাপড়া হয়েছে। পাকিস্তানের দখলাধীন কাশ্মীরের এক বিরাট অংশ চীনকে উপঢৌকন দেবার পর পিকিংয়ে পাক-চীন বন্ধুত্ব গড়ার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চীন এবং পাকিস্তানের মিলিত আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানে সাংবাদিকদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের আয়ুবী খড়্গ নেমে এসেছে। সাংবাদিকদের লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা করেছেন আয়ুব খান। সোজা কথায়, যে সব সাংবাদিক পাক-গভর্নমেন্টের স্তাবকতার উর্ধ্বে সংবাদ-সততার মূল্য স্থাপন করবেন তাঁদের জব্দ করার জন্য এই লাইসেন্স দানের ফিকির বার করা হয়েছে। উদ্দেশ্যটি বেশ পরিষ্কার। যাঁরা আয়ুব

প্রেঃ আয়ুব খান

গভর্নমেন্টের সমালোচনা করবেন, তাঁদের লাইসেন্স থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং এই ভাবে সংবাদপত্রের টুঁটি চেপে ধরা হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় কখনও এই ধরণের হস্তক্ষেপ করা হয় না। এমন কি চীনের ভারত আক্রমণের পরেও কম্যুনিষ্ট প্রেসের স্বাধীনতাতেও কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নি। যে কোন স্বাধীন দেশে সংবাদপত্র হচ্ছে স্বাধীনতার একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। স্বাধীন সংবাদপত্র দেখে গণতন্ত্রের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের ডিক্টেটরী শাসনের পক্ষেই সংবাদপত্রের স্বাধীন সমালোচনায় এরূপ বিচলিত বোধ করা সম্ভব, তাই আজ পাকিস্তানে সংবাদপত্র আয়ুবের কোপদৃষ্টিতে পড়েছে এবং আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নেদারল্যাণ্ডস্—

বিগত মন্ত্রিসভার কৃষিমন্ত্রী ক্যাথলিক নেতা মিঃ ভিক্টর মারিজনেনকে রাণী জুলিয়ানা প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করবার পর নেদারল্যাণ্ডসের মন্ত্রিসভায় দীর্ঘদিনের সঙ্কটের অবসান ঘটেছে। মারিজনেন কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভা গত সপ্তাহে কার্যভার গ্রহণ করেন। নেদারল্যাণ্ডসে মন্ত্রিসভার সঙ্কট কিছু নতুন নয়। কয়েক বছর অন্তর অন্তর সেখানে এই সঙ্কট দেখা যায়। সর্বশেষ সঙ্কট ঘটে ১৯৫৬ সালে যখন প্রায় ৪ মাসের জন্য কোন ক্যাবিনেট গঠিত হয় নি। তখন পুরাতন ক্যাবিনেটকেই অন্তর্বর্তীকালীন কাজ চালিয়ে নিতে বলা হয়। এবারেও ক্যাবিনেটের শূন্যতা স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ৭০ দিন। নেদারল্যাণ্ডসে মন্ত্রিসভার এই স্থায়িত্বহীনতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, যে কারণে দ গলের পূর্বেকার ফ্রান্সে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গড়ে উঠতে পারে নি অর্থাৎ অসংখ্য রাজনৈতিক পার্টি এবং পার্লামেণ্টের নির্বাচনে বিশেষ ভোটিং পদ্ধতির ফলেই কোন একটি পার্টির পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হয় না, সেই কারণেই নেদারল্যাণ্ডসেও স্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠনের পথে অন্তরায় স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য বাধ্য হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করতে হয়। গত মে মাসের শেষ ভাগে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে অন্যূন ৬০ লক্ষ নাগরিক ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রায় ১৭টি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষে ভোটদান করা হয়। নির্বাচনের ফলাফল এমনই অপ্রত্যাশিত হয়েছে যে, বিশিষ্ট দল ক্যাথলিক পিপলস পার্টি মাত্র ১টি আসন লাভ করেছে এবং অন্যতম বৃহৎ দল লেবার পার্টির বিপুল পরাজয় ঘটেছে। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী কিভাবে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন তা স্থির করতেই দু'মাস সময় লেগেছে এবং অবশেষে তিনি কয়েকটি গোষ্ঠীকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এই কোয়ালিশন শেষ পর্যন্ত কতদিন টিকবে তা বলা মুস্কিল

যুগোশ্লাভিয়া—

বেলগ্রেডে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ চীনকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, চীন যখন নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার কথা বলছে তখন সে রাশিয়ার কাছে ঋণ চাইছে। তিনি বলেন যে, এক্ষেত্রে চীনের নীতি হচ্ছে, 'আমাদের সম্পদ তোমাদের ঋণ।'

মঃ ক্রুশ্চভ যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণে এখানে এসেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো ও তাঁর পত্নী ব্যক্তিগতভাবে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে ভোজসভায় সম্বর্ধিত করেছেন। ভোজসভায় বক্তৃতাকালে মঃ ক্রুশ্চভ পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিকে অভিনন্দিত করে বলেন যে, যদিও এর দ্বারা নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার মীমাংসা হয় নি, তথাপি উক্ত চুক্তি সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পথে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রপতি টিটো উক্ত চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন এর দ্বারা যুক্তি ও বিবেচনারই জয় হয়েছে এবং এটা প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় সূচনা করছে। টিটো আরও বলেন যে এমন কিছু লোক আছে (চীনকেই লক্ষ্য করে বলা) যারা রুশ-যুগোশ্লাভ সক্রিয় সহযোগিতায় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে মঃ ক্রুশ্চভের যুগোশ্লাভিয়া পরিদর্শনের প্রাক্কালে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার গভর্নমেণ্ট কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 'মত ত্যাগী টিটো গণ' রূপে বর্ণনা করা হয়।

মার্শাল টিটো

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—

সারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নিপীড়ন ও অশান্তির যে আগুন জ্বলে উঠেছে শেষ পর্যন্ত বর্তমান গভর্নমেন্টও সেই আগুনে পুড়ে ছাই হতে পারে। প্রধান কারণ, জনসংখ্যার সুবিপুল মেজরিটি শতকরা ৭০ জনের বিরুদ্ধে চালিত হচ্ছে দিয়েমের এই নগ্ন অভিযান। রাষ্ট্রসংঘে সিংহলী প্রতিনিধি ভিয়েৎনাম সরকারের দমন-নীতির তীব্র নিন্দাবাদ করেছেন এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অবস্থা জ্ঞাত হতে বলেছেন। ভারত সরকারের কমনওয়েলথ সেক্রেটারী মিঃ গুণদভিয়া সায়গনে প্রেসিডেন্ট দিয়েমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এ সম্পর্কে ভারত সরকারের উদ্বেগ জানান। কম্বোডিয়া এ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘকে নীরব না থাকতে অনুরোধ জানিয়েছে। থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইন সরকার দিয়েমের বৌদ্ধ পীড়ন নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। মার্কিন গভর্নমেন্টও অবস্থার এরূপ অবনতিতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ নল্টিং, যিনি একজন দিয়েম ভক্তরূপে পরিচিত, তাঁকে ফিরিয়ে এনে তাঁর স্থলে রাষ্ট্রসংঘস্থিত প্রাক্তন মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ হেনরী ক্যাবট লজকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যে দিয়েম গভর্নমেণ্টের মধ্যেও ফাটল দেখা দিয়েছে। গত ২৩শে আগষ্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভু ভন মাউ বৌদ্ধ নির্যাতনসহ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পদত্যাগপত্র নাকি এখনও সরকারীভাবে গৃহীত হয় নি, তবে তাঁকে তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতি মধ্যে সৈন্যদলের মধ্যেও ফাটল ধরেছে। বৌদ্ধ এবং ক্যাথলিক সৈন্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। সায়গনের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে বিন টুয়ং প্রদেশে ক্যাথলিক ও বৌদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষে বাট জন সৈন্য নিহত এবং একশ কুড়ি জনের আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে সাতজন অফিসার। পদত্যাগী মন্ত্রী মাউকে সায়গনের ছাত্ররা বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছে। সায়গন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সমাবেশে মাউ বক্তৃতা করেন ছাত্ররা স্বাধীনতা বিশেষত ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করে। মিঃ মাউ একজন বৌদ্ধ। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে কূটনীতিকদের কাছে তিনি বলেছেন যে, তীর্থযাত্রার জন্য তিনি ভারতে যাবেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে দিয়েম পরিবারের লোকেরা উচ্চতম সরকারী পদগুলো কুক্ষিগত করে রেখেছে। বাষট্টি বছর বয়স্ক বর্তমান প্রেসিডেণ্ট নো দিন দিয়েমের ছোট ভাই নো দিন নু (বাহান্ন) হলেন প্রেসিডেণ্টের পরামর্শদাতা এবং সরকারী সেনা, রাজস্ব ও গুপ্ত পুলিশ-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কর্তা। রাষ্ট্রপতি দিয়েম অবিবাহিত। ছোট ভাই নু'র সুন্দরী স্ত্রী ম্যাডাম নু জাতীয় পরিষদের সদস্যা। আপন রূপে গর্বিতা, ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য প্রমত্তা এই নারী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধ হত্যার একজন প্রধানা পৃষ্ঠপোষণকারিণী। এই মহিলা ছিলেন বৌদ্ধ দিয়েমের ভ্রাতা নু'কে বিয়ে করবার পর ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছেন সম্প্রতি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী প্রজ্জ্বলিত আগুনে আত্মাহুতি দিলে এই মহিলা বলেছেন, 'মাত্র একজন? তিরিশ জন আগুনে পুড়ে মরুক, আমি হাততালি দেব।'

বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন এই মহিলা। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে, প্রয়োজন হলে বৌদ্ধদের

ম্যাডাম নু

আরও দশগুণ মারা হবে। বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য ইনি এক নারী প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করেছেন। সাধারণ সৈন্যের তুলনায় এই নারী-সৈন্যদের দ্বিগুণ বেতন দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া ম্যাডাম নু দশ লক্ষ ক্যাথলিক নারীকে নিয়ে বৌদ্ধ বিরোধী এক সংহতি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। নারী প্যারামিলিটারী বাহিনীকে উৎসাহ দানের জন্য প্রায়ই তিনি স্বয়ং তাদের প্যারেড পরিদর্শনে যান। রাষ্ট্রপতি দিয়েম এবং তাঁর ভায়ের (অর্থাৎ তাঁর স্বামীর) উপর তাঁর প্রভূত প্রভাব রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত পদে রয়েছেন ম্যাডাম নু'র পিতা মিঃ ট্রান ভান চুং স্বয়ং। তিনিও পদত্যাগ করেছেন এবং এক বিবৃতিতে বলেছেন, যে সরকার আমার পরামর্শ এবং আমার অনুমোদনকে উপেক্ষা করেন, আমি সেই সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম। নিজের কন্যার বৌদ্ধ বিরোধী উন্মত্ততা দেখে ইনি মর্মাহত। কন্যার কার্যের নিন্দা করে এক পক্ষকাল পূর্বে ওয়াশিংটন থেকে কন্যাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনই জবাব পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনস্থিত দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ নো তোন ভান্ডও তাঁর সরকারের স্বৈরাচারী নীতির জন্য পদত্যাগ করেছেন। অপর দিকে রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় রাজধানী ভাটিকানের সংবাদপত্র 'অস্সের ভাতারো রোমানো' দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ক্যাথলিক গভর্নমেণ্টের অত্যাচার ও হিংসাত্মক কার্যের তীব্র নিন্দাবাদ করেছেন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ইদানীং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে রাজনৈতিক ঘূর্ণিঝড় ঘূরপাক খাচ্ছে, আগামী কিছুকাল দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্বচ্ছ আকাশ তার দ্বারা ধূলিকীর্ণ হবে। মিলিটারীর সদম্ভ বুটের আঘাত ভগবান বুদ্ধের করুণাঘন মূর্তির ধ্যানভঙ্গ করছে—এর পরিণাম মোটেই শুভ নয়।

হলিউডে নাট্যোদ্যম

ছায়ার রাজ্যে কায়া

ছায়া নয় কায়া। পর্দা নয় মঞ্চ! বায়স্কোপ নয় থিয়েটার। চলচ্চিত্রের স্বপ্নরাজ্য হলিউড। চিত্ররাজ্যের মায়াপুরী। চিত্রামোদীদের কাছে সাগরপারের নন্দনউদ্যান। অগণিত ছবি, সংখ্যাতীত শিল্পীর জন্মদাতা হলিউড। সেই হলিউড সম্পর্কে একটি নতুন সংবাদ সাত সমুদ্র তের নদীর লক্ষ তরঙ্গ অতিক্রম করে ভারতের আকাশে বাতাসে মাটিতে ছড়িয়ে গেছে। পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে, গিয়ে উঠেছে মানুষের কানে কানে। ছায়ারাজ্য হলিউড অভিনয়ের ক্ষেত্র এবার কায়ারাজ্যে পরিণত হয়ে আবার নতুন এক মায়ার সৃষ্টি করতে চলেছে।

হলিউডের অধিবাসীদের মধ্যে মঞ্চপ্রীতি এখন এক প্রবল আকার ধারণ করছে। আগে যে মঞ্চপ্রীতি ছিল না তা নয়, তবে বর্তমানে তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। আগে সামান্য গণ্ডীর মধ্যে হলিউডের নাট্য প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল, তার দিগন্তের পরিধি কিন্তু তখন বিস্তৃত ছিল না। এবং গতিপথ ছিল তার সঙ্কীর্ণ। এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল ঠিক এক যুগ আগে। সেই রঙ্গমঞ্চগুলিকে এরপর উন্নততর করে তোলার ভার এল শ্রমিক সঙ্ঘ, অভিনেত্রী সম্প্রদায় প্রভৃতির হাতে, তাঁরা রঙ্গমঞ্চগুলির মানোন্নয়নে আত্মনিয়োগ করলেন। অভিনয়ে, নাটকনির্বাচনে, প্রযোজনায় প্রয়োগনৈপুণ্যে, উপস্থাপনকুশলতায় সকলদিক দিয়েই এর উন্নয়নকার্য শুরু হয়ে গেল।

মহৎ সাধনা নিষ্ফল হওয়ার নয়। ১৯৫৯ সালে সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটল। সৃষ্টির বর্তিকার সার্থক রূপশ্রী নিয়ে এল সফলতার স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সটেনসান সার্ভিস ও চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন মঞ্চবিদ্‌দের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নাট্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। উপরোক্ত মঞ্চবিদ্‌দের মধ্যে পরিচালক জন হাউসম্যান, রবার্ট রায়্যান, শিল্পী দম্পতি পল নিউম্যান ও জোয়ান উডওয়ার্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লস এ্যাঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (U C L A) দিলেন একটি মঞ্চ ও ১৫০০০ ডলারের একটি ধন-ভাণ্ডার! চিত্রজগত দিলেন প্রতিভা অর্থাৎ কর্মী—কুশলী শিল্পী। বিলম্বিত লয়ে এদের

এলিজাবেথ টেলার

যাত্রা শুরু। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল যে ১৯৬০ সালের শারদীয় মরশুমের পূর্বেই একটি ছয় সপ্তাহের মরশুমে এই প্রচেষ্টা জনসমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। মঞ্চগৃহের আসনগুলি দেখা গেল প্রতিরাত্রেই পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আসন সংখ্যা ৫৪০।

নাটকগুলি জমাটি, চিন্তার উদ্রেককারী এবং নিশ্ছিদ্র। দর্শক নাটকের মধ্যে রসের সন্ধান পেলেন, পেলেন আনন্দের, পেলেন এক উল্লেখযোগ্য বক্তব্যের। আপন আপন সহানুভূতির ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে শুরু করলেন প্রচেষ্টাগুলির উদ্দেশে। সমগ্র পরিকল্পনাটি এক বিরাট অভাবনীয় সাফল্যের রূপ নিল। আজও তার জয়যাত্রা অব্যাহত।

এই ভাবেই, এই পথ অনুসরণ করে, এই ধারা অবলম্বনে মহাকবি সেক্সপীয়রের 'Measure for Measures,' পিরাণ্ডেলোর 'Six charactors in search of an author,' ও'নিলের 'The iceman cometh,' মাসুর 'The Egg' নাটকগুলি অভিনীত হয়ে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে হলিউডের নাট্যরসিক জনগণকে। এই সকল সম্প্রদায়ে আগেই বলা হয়েছে বহু পেশাদারী চিত্র ও টেলিভিসন শিল্পীও জড়িত আছেন।

এই মঞ্চ সম্প্রদায় শুধু যে সংস্কৃতির উপাসনায় এবং রসসৃষ্টিতে মগ্ন তা নয় নাট্যাভিনয়কে কেন্দ্র করে একটি রুচিকর পরিবেশ গঠনে ও সাধারণের মনে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আগ্রহ সৃজনেও এঁদের ভূমিকা অনুল্লেখ্য নয়।

দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে মঞ্চগুলিরও, যদিও ঠিক সমান অনুপাতে নয়। এখন কুড়িটি রঙ্গমঞ্চের সন্ধান আমরা পাচ্ছি তাদের মধ্যে সবগুলির দুয়ার সকল সময়ে উন্মুক্তও থাকে না। ভৌগোলিক বিচারে তারা ঠিক হলিউড চিত্র রাজ্যের মধ্যে সীমিত নয়—তাদের সীমা উত্তর এবং পশ্চিম হলিউড, বেভারলি হিলস এবং লস এ্যাঞ্জেলসের দক্ষিণ-পশ্চিমে তিরিশ মাইল দূরবর্তী লঙ বীচ অবধি এদের সীমা বিস্তৃত। এই মঞ্চ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মঞ্চগুলির মধ্যে লা পামাস থিয়েটার, করোনেট থিয়েটার, এ্যাক্টর্স থিয়েটার এবং প্লেয়ার রিঙ-এর নাম উল্লেখনীয়। এদের আয়তন সমান নয়, আসনের সংখ্যা দেখেই তা অনুমান করা যায়। কোনটির আসন সংখ্যা ৫০ আবার কোনটির ৪৫০। গড়ে ২৫০ ধরে নেওয়া যায়। অল্প আয়তনের দিকে ছোট হলেও ব্যবসায়িক সাফল্য ও শিল্পরসসৃষ্টির দ্বারা মঞ্চের উৎকর্ষ সাধনে এদের কৃতিত্বের দিকে দৃষ্টি দিলে কোন মতেই এদের ছোট বলা চলে না। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোম্পানী অফ এ্যাঞ্জেলসের নাম নানাকারণে উল্লেখের দাবীদার। এর জন্ম ১৯৬০ সালে। খুব সামান্য পরিবেশে — রূপোর চামচ মুখে নিয়ে, নয় এর জন্মবার্তা মহাসমারোহে ঘোষিত হয় নি, শুভ শঙ্খের ধ্বনিতরঙ্গে এর জন্মকে কেউ স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসে নি। কয়েকজন অভিনেতা সদস্যরা সভ্য হলেন পাঁচ ডলার অঙ্কের নিয়মিত চাঁদার চুক্তিতে। মহড়া চলত বিভিন্ন গোলায়, খামারে, গ্যারেজে তারপর অভিনয়ের জন্যে একটি ছোট থিয়েটার ভাড়া নেওয়া হ'ল। আজক চিত্র ও টেলিভিসান জগত থেকে আগত তার সদস্য সংখ্যা ৪৫। আজ তার নিজের বাড়ীর অভাব ঘুচেছে। তার নিজস্ব গৃহে সগৌরবে অভিনীত হয়েছে লর্কার 'Blood wedding' এবং শ'র 'Don Juan in Hell.'

এই স্থায়ী মঞ্চগুলি ছাড়া 'ফ্রি ওয়ে সার্কিট' নামে ভ্রাম্যমাণ নাট্য সম্প্রদায় সাড়ম্বরে বিদ্যমান। 'Death of a salesman' এঁদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান।

আর্থিক ক্ষেত্রেও এঁরা সফলতা লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ভাণ্ডার এঁদের প্রথম বাধার মোচন করে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশান থেকেও এঁরা অর্থ সাহায্য লাভ করে আপন আপন গঠনমূলক পরিকল্পনার রূপায়ণে যত্নবান হন।

এঁদের জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক কল্যাণময় হোক, শুভ হোক, নিয়ত এই কামনা নাট্যামোদী মাত্রেই করে থাকেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

হাসি শুধু হাসি নয়

আমাদের সমাজের প্রায় সর্ব অঙ্গে দুর্নীতি যে কি বিরাট জাল বিস্তার করেছে তার তুলনা মেলা ভার। সমাজের কাঠামোয় তার বাসা ফলে মানুষের মনের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে তারই ব্যাপক প্রভাব। আজকের মানুষের জীবনে এর অভিশাপ ক্রমশই যেন অনতিক্রম্য হয়ে উঠছে। চতুর্দিকে ছলনা, প্রতারণা, বঞ্চনা মানুষের জীবনকে সর্বতোভাবে বিষিয়ে তুলছে। তবু এই নিদারুণ দুর্যোগেও মানবিকতা, সুদবৃত্তি, মহত্ত্ব একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, তাই পৃথিবীর ভারসাম্য বোধ হয় এখনও বজায় আছে। ইন্দ্রাণী প্রোডাকসান্স নিবেদিত 'হাসি শুধু হাসি নয়' চিত্রের মধ্যে এই মহান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে।

ভি-আই-পি এবং ক্লিওপেট্রাখ্যাত রিচার্ড বার্টন

হাস্যরসে ছবির সূচনা, হাস্যরসে ছবির সমাপ্তি, মধ্যে সারা ছবিটিতে প্রচুর হাসির উপকরণ আছে কিন্তু হাসির অর্থ সাধারণ ক্ষেত্রে যা ধরে নেওয়া হয় সেইটেই শেষ কথা নয়। হাসির অর্থ আরও ব্যাপক, আরও গভীর, আরও সুদূরপ্রসারী।

বক্তব্য মহান, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কোন চমৎকারিত্বের সন্ধান মেলে না, পরিচয় ততোধিক দুর্বল। স্থানে স্থানে যুক্তি অনুপস্থিত বিন্যাসরীতি, গঠন কৌশল, ঘটনা সংস্থাপন প্রশংসার দাবী করতে পারে না। ফলে, ছবিটির মাধ্যমে তার মূল বক্তব্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে নি। তবু, যে মনোভাবের পরিচয় নির্মাতারা দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্হ। আমাদের সমাজে ভদ্রতার, সভ্যতার এবং মনুষ্যত্বের মুখোস পরে যারা ঘুরে বেড়ায়, শ্রদ্ধা সম্মান আকর্ষণ করে সকলের, তাদের আসল আকৃতি (এবং প্রকৃতি) যে কি ভয়ঙ্কর জঘন্য এবং কুৎসিত সেই আলেখ্য পরম নিষ্ঠার সঙ্গে উদঘাটিত করে তুলেছেন এই ছবির পরিচালকগোষ্ঠী। কিন্তু, সকল ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যবিধান করতে এঁরা পারেন নি সেই জন্যে ছবিটি মহৎ বক্তব্যে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সার্থকতায় পর্যবসিত হতে পারল না।

পরিচালনার ক্ষেত্রে কয়েকটি অসঙ্গতি অত্যন্ত চোখে লাগে। যেমন প্রথম দিকে হাওড়া ষ্টেশন দেখছি আলোকিত, বোঝা গেল যে কাল সন্ধ্যা, পরমুহূর্তে ব্রীজ অতিক্রম করার পর পথে দেখা যাচ্ছে

মহানগরীর সেটে দৃশ্যগ্রহণের অবসরে সঙ্গীত পরিচালক, নাট্যকার ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়

দিনের আলো। যে মানুষ কলকাতার বাইরে থেকে এল এবং বাসস্থান সংগ্রহ করতে না পেরে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে কিন্তু একটি বাক্সও দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ সে কি একবস্ত্রে বেরিয়ে এল? গান গেয়ে ঐ ভাবে বিশাল জনসমুদ্র গড়ে তোলা শুধু কল্পনাই নয় কি? এই চিন্তায় বাস্তবের সমর্থন পাওয়া যায় কি? তারপর যে লোক কি করে ভীড় জমাতে হয় সে কলাকৌশল জানে, নেচে-গেয়ে রীতিমত তামাসা সৃষ্টি করতে পারে, সেই লোককেই পরমুহূর্তে পকেটমারের কবলে পড়বার পর অত বোকা দেখানোর কোন অর্থ হয় কি? সেই সময়ে তাকে যতদূর অজ্ঞ এবং মূর্খ করে তোলা সম্ভব তাই করা হয়েছে। যে ধনকুবের—সে ট্যাক্সি চড়ে বেড়াচ্ছে কেন, তার কি নিজের গাড়ী থাকতে পারে না?

অভিনয়াংশে অবিস্মরণীয় নৈপুণ্য অবশ্য কেউই দেখাতে পারেন নি। তবু নায়কের ভূমিকায় জহর রায়, খলচরিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বজিৎ সু-অভিনয় করে দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী, সমরকুমার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী, মণি শ্রীমানী, পারিজাত বসু, খগেন পাঠক, পদ্মা দেবী, শিপ্রা মিত্র, কল্যাণী ঘোষ, জয়শ্রী সেন, কবিতা রায়, গৌরী মজুমদার, রাজলক্ষ্মী দেবী, অনুরাধা গুহ প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ছবিটির পরিচালক নবগোষ্ঠী এবং সুর সংযোজক শ্যামল মিত্র।

বোম্বাইয়ের নৃত্যপটীয়সী চিত্রাভিনেত্রী হেলেন

সংবাদবিচিত্রা

স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত গুণী সম্বর্ধনা সপ্তাহের শেষ দিবসে বাঙলার সুপ্রসিদ্ধা শিল্পী ও প্রযোজিকা শ্রীমতী কানন দেবীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সপরিবারে চিত্রনট সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রবীণ চিত্র পরিচালক শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র। প্রাদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীবিজয়সিংহ নাহার শিল্পীকে একটি গজদন্তনির্মিত অশোকস্তম্ভ প্রীতির স্মারক হিসাবে উপহার দেন। বাঙলা দেশের ছায়াচিত্রের সমৃদ্ধ ইতিহাসের একটি বিরাট অধ্যায় কানন দেবী অধিকার করে আছেন। তার গৌরব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অল্পমূল্যের নয়। সুদীর্ঘকাল চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে তার উন্নয়নমূলক নানা প্রচেষ্টায় তিনি সর্বদাই অংশগ্রহণ করে আসছেন। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করি।

*

নর্তকীখ্যাত প্রযোজক মুকুন্দ ত্রিবেদী বর্তমানে বাংলায় প্রযোজক হরি জেলোকার সঙ্গে প্রযোজনার ব্যাপারে হাত মিলিয়েছেন। এঁদের সম্মিলনে পদ্মশ্রী পিকচার্স গঠিত হয়েছে। পদ্মশ্রী পিকচার্স একটি হিন্দী ছবি তুলবেন। পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে বাঙালী পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়কে। নায়কের ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে বাঙলা দেশের আধুনিক চিত্রজগতে জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শীর্ষে অধিষ্ঠিত একজন বাঙালী শিল্পীকেই। তাঁর নামটি এখানে আমরা ঘোষণা করলেই আপনাদের মধ্যে এক অভিনব আনন্দের শিহরণ বয়ে যাবে। তিনি উত্তমকুমার।

* * * *

স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম মহান সৈনিক বীরাগ্রগণ্য ভগৎ সিংয়ের তেজোদৃপ্ত উৎসর্গিত জীবন কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণের সংবাদ ইতিপূর্বে প্রচারিত হয়েছে। এই চিত্রের নাম-ভূমিকায় অবতরণ করছেন মনোজকুমার। এই চিত্রের একটি বিশেষ আকর্ষণ হবে লোকান্তরিত যোদ্ধার মাতৃদেবীর রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ। দেশবরেণ্য পুত্রের জীবনীচিত্রে রত্নগর্ভা মাতার আত্মপ্রকাশ ছবিটির সৌষ্ঠব ও গৌরব সর্বতোভাবে বৃদ্ধি করবে। ছবির প্রারম্ভে দেখান হবে যে, প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে ভগৎ সিং জননী জলন্ধরের অন্তর্গত খাটকর খালান গ্রামবাসিনী শ্রীযুক্তা বিদ্যাবতী দেবী তাঁর সমুদয় স্বর্ণালঙ্কার এবং পুত্রের শিরস্ত্রাণ উপহার দিচ্ছেন। পৃথিবী থেকে অসময়ে যাঁদের বিদায় ঘটলেও ভাবীকালের মানুষদের মধ্যে যাঁদের জীবন চিরদিন উদ্দীপনা এনে দেয়, জাতীয় চেতনার উদ্দীপন করে, স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে, বরেণ্য ভগৎ সিং তাঁদেরই একজন।

* * * *

ন্যাশানাল এক্সিবিটার্স ফেডারেশান অফ জাপান নিজের দেশে জেনকোরেন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বর্তমানে জানা গেল এঁরা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ-কর অবলুপ্তির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।

নির্বাক যুগের সাগরপারের চলচ্চিত্র জগৎ যাঁদের বলিষ্ঠ অবদানে পুষ্ট হয়ে উঠেছে, দর্শকচিত্তে যাঁদের প্রভাব ছিল অনতিক্রম্য যাঁদের

সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেয়সী চিত্রে রাধার রূপদাত্রী

অভিনয় একদিন সারা চিত্রজগতে এনেছে বিরাট আলোড়ন, পলা নেগ্রির নাম তাঁদেরই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী রাখে। অভিনয় জগতের সঙ্গে আজ বহুকাল তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন। চিত্রামোদীদের মনে আজ তিনি শুধু স্মৃতি। আজ শুধু ইতিহাস। আজকের দর্শকের কাছে তিনি শুধু একটি নাম মাত্র। আশা ও আনন্দের কথা ওয়াল্ট ডিজনী প্রোডাকসানের প্রচেষ্টায় এই পঁয়ষট্টি বছর-বয়স্কা শক্তিময়ী অভিনেত্রীকে আবার রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে। সুদীর্ঘকাল পরে আবার তাঁর প্রত্যাগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে দিক থেকে দিগন্তরে। 'মুন স্পিনার' নামক পরিকল্পিত একটি রহস্যচিত্রে তিনি অংশগ্রহণ করবেন। প্রথিতযশা শিল্পীর পুনরভ্যুদয়কে আমরা স্বাগত জানাই।

* * * *

স্বর্গত রুশীয় লেখক বোরিস পাস্তারনাকের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্ব আলোড়নকারী এবং বহু সমালোচিত উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো'র চলচ্চিত্র রূপায়ণের বারতা চিত্রাভিজ্ঞাসুদের অজ্ঞাত নয়। বর্তমানে ঘোষিত হয়েছে যে, এম জি. এম নিবেদিত এই চিত্রটির পরিচালনভার গ্রহণ করবেন খ্যাতিমান চিত্রপরিচালক ডেভিড লীন। চিত্রনাট্য রচনার ভার অর্পিত হয়েছে খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার রবার্ট বোল্টের প্রতি।

* * * *

যুক্তরাষ্ট্রের মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশানের সুযোগ্য সভাপতি মিঃ এরিক জনষ্টনের সাম্প্রতিক ৬৮ বছর বয়সে লোকান্তর চিত্র জগতে এক বিরাট ক্ষতি ঘটাল এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ থাকে না। তাঁর মত সুযোগ্য কর্ণধারের নেতৃত্বে চলচ্চিত্রালোক যেভাবে সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল তাঁর বিভিন্ন কর্মই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। ভারতের সঙ্গেও তাঁর ছিল নিবিড় যোগ। ভারতের চিত্র জগতের উদ্দেশে তাঁর মৈত্রী ও সহযোগিতার হস্ত সর্বদাই প্রসারিত ছিল। গত

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'দেয়া-নেয়া'র সেটে ছবির নায়িকা বম্বের তনুজা প্রযোজক সুরকার শ্যামল মিত্র, তরুণকুমার এবং দিলি চক্রবর্তী

নভেম্বর মাসে তিনি সস্ত্রীক ভারতে আসেন এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। মার্কিনী চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসের মাধ্যমে এবং আপন অনবদ্য কর্মে চিত্রামোদীদের অন্তরে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

* * * *

ভি. আই. পি. এবং ক্লিওপেট্রা খ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বার্টন (৩৯) সম্প্রতি স্বর্গত কবি টমাস ডিলানকৃত একটি চিত্রনাট্যের স্বত্ব ক্রয় করেছেন বলে জানা গেল। রবার্ট লুই ষ্টিভেনসানের 'দি বীচ অফ ফ্যালেসা' অবলম্বনে এই চিত্রনাট্যটি রচিত। বর্তমানের অভিনেতা এবং ভবিষ্যতের প্রযোজক অভিনেতা বার্টন এই পরিকল্পিত চিত্রে অভিনয়েও অংশগ্রহণ করবেন। জেমস মেসনের জন্যেও একটি ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে।

* * * *

এডি ফিশার (৩৬) কে কেন্দ্র করে হলিউডে এখন নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছে। নানা সংবাদ তাঁকে কেন্দ্র করে প্রচারিত হচ্ছে। সম্প্রতি আমরা তাঁর সম্বন্ধে যে সংবাদ পেলুম সেটি হচ্ছে এই গায়ক অভিনেতা এবার হোটেলের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করবেন। বর্তমানে উঠে যাওয়া নাইট ক্লাব 'কিরো' কে তিনি ক্রয় করছেন বলে শোনা গেল। খুব সম্ভব, এই নাইট ক্লাবের তিনি নব নামকরণ করবেন—'এডিস।'

'হাসি শুধু হাসি নয়' চিত্রের একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও কল্যাণী ঘোষ

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

কাঞ্চনরঙ্গ

বাঙলা দেশের নাট্যামোদীদের কাছে কাঞ্চনরঙ্গ নাটকটি সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। রসগ্রাহী এবং অনুভূতিমান দর্শক মহলে এই নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এবং প্রসিদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা নাটকটিকে ছায়াচিত্রে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র এই নাটকের রচয়িতা। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতরণ করছেন গঙ্গাপদ বসু, শোভেন মজুমদার, কুমার রায়, শান্তি দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সমীর চক্রবর্তী, তৃপ্তি মিত্র, সুব্রতা দেবী, লতিকা বসু প্রভৃতি।

বাদশা

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বাদশা' কাহিনীটি চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে অগ্রদূতের পরিচালনায়। সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন বিকাশ রায়, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, প্রেমাংশু বসু, শ্রীমান শিবশঙ্কর এবং সন্ধ্যারাণী দেবী প্রভৃতি।

রাধাকৃষ্ণ

রাধাকৃষ্ণের পবিত্র লীলা অবলম্বন করে প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় 'রাধাকৃষ্ণ' ছবিটির রূপ দিচ্ছেন। এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীগৌরচন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপ দিচ্ছেন অসিতবরণ, নীতিশ সেন, শ্যাম লাহা, সমরকুমার, শীলা পাল, প্রতিমা চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, রেণুকা রায়, কেতকী দত্ত প্রভৃতি।

শৌখীন সমাচার

পথের দাবী

সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্রের অমর রচনা 'পথের দাবী' মঞ্চে উপস্থাপন করলেন দ্য বেঙ্গিং উনাঙ্গ ডাইরেক্টরস (ফুড) এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন সদস্যরা। অমল দত্তের পরিচালনায় এর বিখ্যাত চরিত্রগুলির রূপ দিলেন শান্তি চক্রবর্তী, অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রণব দাশগুপ্ত, চরণদাস মিত্র, মণি ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, যূথিকা ভট্টাচার্য, শিখা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সাজাহান

বাঙলার অমর নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের সুবিখ্যাত নাটক 'সাজাহান' নাটকটি হুগলী জেলার আরামবাগ বিভাগের কর্মচারিগণ কর্তৃক অভিনীত হল। এর অনবদ্য চরিত্রগুলির রূপদান করলেন সুবোধ ঘোষ, সুধীর সেন, তরুণ দাশগুপ্ত, বিমল চক্রবর্তী, গোপাল মাকড়, কৃষ্ণগোপাল দাস, গৌর দত্ত, নাগর চৌধুরী, দীনবন্ধু দাস, নিখিল দাস, মেনকা দেবী, ছন্দা দেবী, শোভা শীল প্রভৃতি।

সংক্রান্তি

উত্তর কলকাতার প্রাচীন গ্রন্থাগার বান্ধব ভবন লাইব্রেরীর ৫৪তম বার্ষিক উৎসব পরম সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন মনু মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মনু মুখোঃ, বিশ্বনাথ মিত্র, সুনীল কুণ্ডু, পাঁচু বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ দাস, সমরেন্দ্র সান্যাল, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, বাণু রায়, চিত্রিতা মণ্ডল, আশা দেবী ইত্যাদি।

প্রত্যাবর্তন

ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক উপসমিতি মঞ্চস্থ করলেন 'প্রত্যাবর্তন' নাটকটি। ভবেন পালের পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন রামানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসকুমার চক্রবর্তী, নিরঞ্জন বসু, রতন ভট্টাচার্য, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত ঘোষ, নিতাই শীল, দিবাকর ভট্টাচার্য, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি চট্টোপাধ্যায় ও মানসী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বারো ঘণ্টা

রূপারূপ নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি 'বারো ঘণ্টা' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। কিরণ মৈত্র এই নাটকটির রচয়িতা। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করলেন আভাষ নাথ, সুশীল মুখোপাধ্যায়, বিজন চট্টোপাধ্যায়, সুনীল নাথ, নরেশ ভট্টাচার্য, অণিমা মজুমদার প্রভৃতি।

'মাসিক বসুমতী'র বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী, মোনা চৌধুরী এবং বীরেন ধর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

যদি আপনাদের প্রেমের প্রবলটানে আমাকে আমার একাকীত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়—তা হলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেকদিন আগে মৃত্যুর খিড়কী দুয়ার ছেড়ে পালিয়ে গেছে। —নজরুল ইসলাম

ভাদ্র, ১৩৭০ (আগষ্ট—সেপ্টেম্বর, '৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট): বোম্বাই-এ মিউনিসিপ্যাল কর্মীদের ধর্মঘটে ট্যাক্সিচালকদেরও যোগদান—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকান্নামওয়ারের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবীদের নগরীর আবর্জনা পরিষ্কারের প্রচেষ্টা।

২রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট): লোকসভায় নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে আচার্য কৃপালনীর আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা সুরু।

আসামে চালিহা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন।

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): বোম্বাই-এ সর্বাত্মক হরতাল—নগরীর জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত—মূল্যবৃদ্ধি ও অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উক্তি: শৌলমারীর সাধু নেতাজী নাহেন।

৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট): বোম্বাই-এ দশ দিন পর পৌরকর্মী ধর্মঘট প্রত্যাহৃত।

সরকারী খাদ্য ও মূল্যনীতির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ—কলিকাতায় ৫০ জন গ্রেপ্তার।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ভোটাধিক্যে (৬১-৩৪৬) অগ্রাহ্য।

'যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় নেতাজীর নাম নাই'—রাজ্যসভায় পররাষ্ট্র বিভাগীয় উপমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং এর উক্তি।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রত্যাহার দাবী।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট): অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস্ কে পাতিল প্রমুখ ছয়জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং শ্রীকামরাজ নাদার (মাদ্রাজ), বক্সী গোলাম মহম্মদ (কাশ্মীর) ও শ্রীবিজু পট্টনায়ক (উড়িষ্যা) সহ ছয়জন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ—'কামরাজ প্রস্তাবের ভিত্তিতে শ্রী নেহরু কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত ঘোষণা।'

'স্বামী বিবেকানন্দই এদেশে প্রথম সমাজতন্ত্রের বাণী উচ্চারণ করেন'—হাওড়ায় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে 'বসুমতী'র সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের পদত্যাগের প্রস্তাবে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া—মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনে দিল্লীতে কর্মতৎপরতা।

৯ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট): মধ্যপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমন্দলয় কর্তৃক মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গ্রহণ

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট): আসাম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিধান সভায় আনীত অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

ভারত সফরে নেপালের রাজা মহেন্দ্র—দিল্লীতে যথোচিত সম্বর্ধনা।

১১ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট): হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত রাজা মহেন্দ্রর নিবিড় আলোচনা।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, অর্থমন্ত্রী পদে শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী, কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী পদে সর্দার শরণ সিং নির্বাচিত।

১৩ই ভাদ্র (৩০শে আগষ্ট): কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃহত্তর পরিকল্পনা (২০ কোটি টাকার) অনুমোদন।

দিয়েম সরকারের (দক্ষিণ ভিয়েৎনাম) বৌদ্ধ নির্যাতনে ভারত সরকারের উদ্বেগ।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট): মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আয়তন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৫ই ভাদ্র (১লা সেপ্টেম্বর): কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কয়েকটি দপ্তরের পুনর্বণ্টন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নূতন আদেশ: আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের হস্তে নূতন ডাক ও তার দপ্তরের দায়িত্ব (অস্থায়িভাবে) অর্পিত।

১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর): শ্রীনগরের নিকট ভয়াবহ ভূমিকম্প—এক শতাধিক নিহত ও প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তি আহত।

সুপ্রীম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়: ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী আটক বন্দীর আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার নাই।

প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীগুরুস্বামীর (৬০) লোকান্তর।

১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর): স্বনামধন্য আইনজীবী শ্রী পি আর দাশের (৮২) জীবনাবসান।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): দিল্লীতে সর্বভারতীয় বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের অনুষ্ঠান—শ্রী নেহরু ও লর্ড এটলির উক্তি: বিশ্ব-সরকার ছাড়া মানবজাতির বাঁচবার উপায় নাই।

১৯শে ভাদ্র (৫ই সেপ্টেম্বর): নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ৭৫তম জন্মদিবস পালন—আলোচ্য দিনটি ভারতের সর্বত্র 'শিক্ষক দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): পাঞ্জাবের কায়রন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী অগ্রাহ্য—পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) বিবৃতি।

বিধান সভায় (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের বিবৃতি: খাদ্য-সঙ্কটের কথা আদৌ সত্য নহে—সঙ্কট চাউলের। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সরকারী (কেন্দ্র) কমিটী কর্তৃক স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধি পর্যালোচনার ব্যবস্থা।

২১শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর): কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ স্মৃতিফলক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষোভ—দুর্বৃত্তদের উগ্র ধর্মান্ধতার নিন্দা—কলিকাতায় স্বামীজী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের ভাষণ—মূর্তি স্থাপনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যহানির অজুহাত হাস্যকর বলিয়া মন্তব্য।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপনে (মার্কিন সাহায্য ছাড়াই) ভারত কৃতসঙ্কল্প—শ্রীনেহরুর উক্তি।

সামরিক তথ্য বিনিময়কালে তিন জন পাক কর্মচারী (ভারতস্থ) গ্রেপ্তার—মুক্তির পর দিল্লী ত্যাগ—একজন ভারতীয় আটক।

২৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ্ ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের (৮৩) জীবনাবসান।

ভারতের বুকে পাকিস্তানের গুপ্তচরবৃত্তির বিরাট চক্রজাল—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

জরুরী অবস্থায় ডাক ও তার বিভাগের গুরুত্ব—কলিকাতায় ডাক-তার কর্মী প্রতিনিধি সমাবেশে ডাক ও তার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেনের বক্তৃতা।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা সংশোধনের আশ্বাস—কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টিতে শ্রীনেহরু ও শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ঘোষণা।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): প্রত্যূষে আগ্রার নিকট নাগপুর—দিল্লী নৈশ ডাকবাহী বিমান ধ্বংস—সমস্ত আরোহী (মোট ১৮) নিহত।

গুজরাটের ডঃ জীবরাজ মেটা মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

বহির্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট): দিয়েম সরকারের (দক্ষিণ ভিয়েৎনাম) বৌদ্ধ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সায়গনে বৌদ্ধদের প্রবল বিক্ষোভ।

২রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট): মৌলবী তমিজুদ্দীন খানের (পাক জাতীয় পরিষদ—স্পীকার) ঢাকায় পরলোকগমন।

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট টিটোর সহিত সফরাগত রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের হৃদ্যতাপূর্ণ বৈঠক।

৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট): বৌদ্ধ আন্দোলন দমনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সামরিক আইন জারী।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট): ক্যাথলিকধর্মী দিয়েম সরকারের বৌদ্ধ নির্যাতন নীতির প্রতিবাদে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ভু ভান মাউ'র পদত্যাগ।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট): মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমানের ঘোষণা: ইন্দোনেশিয়া বা ফিলিপাইন যাহাই করুক, মালয়েশিয়া গঠিত হইবেই।

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট): লাহোরে খাকসার নেতা আল্লামা মাসারেকির (৭৫) জীবনাবসান।

১১ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট): ওয়াশিংটনে লক্ষাধিক নিগ্রো নরনারীর সমাবেশ ও বিভিন্ন অধিকারের দাবীতে বিক্ষোভ।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): করাচীতে পাক-চীন বিমান চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট): সিঙ্গাপুরের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ—সারওয়াকেরও কথিত স্বাধীনতা অর্পণ।

মস্কো-ওয়াশিংটন জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থা ('হট লাইন') চালু।

১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর): পাক-মার্কিন সম্পর্ক বিষয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জর্জ বলের আলোচনা।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): বৃটিশ গায়নায় জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণা।

১৯শে ভাদ্র (৫ই সেপ্টেম্বর): আলাবামায় নিগ্রো শ্বেতাঙ্গদের দাঙ্গায় ১৬ জন আহত।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগে লণ্ডনে প্রফুমো কেলেঙ্কারীর নায়িকা মিস্ ক্রিষ্টিন কীলার গ্রেপ্তার।

২১শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর): দক্ষিণ ব্রেজিলে বিধ্বংসী দাবানল—প্রায় ২৫০ জন নিহত: চার শতাধিক আহত। হনৌদ্বীপে ঝড় প্রকোপে ৫০ জন নিহত।

আমেরিকার অনিচ্ছার দরুণ বোকারো ইস্পাত কারখানা বিষয়ে ভারতকে সাহায্য দানে সোভিয়েটের আগ্রহ প্রকাশ।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বৌদ্ধ নির্যাতন প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে আলোচনার উদ্যোগ।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): চার জন ভারতীয় কূটনীতিককে পাকিস্তান হইতে বহিষ্কার।

২৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): প্রেস অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে পাকিস্তানে সাংবাদিকদের ধর্মঘট।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): নিগ্রো বিদ্বেষ বন্ধ করিতে আলাবামার গভর্ণর ওয়ালেসের প্রতি প্রেসিডেন্ট কেনেডির হুকুমনামা।

আলজিরিয়ার গণভোটে নূতন শাসনতন্ত্র অনুমোদিত।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): আয়ুব (পাক প্রেসিডেন্ট) কর্তৃক পাকিস্তানে প্রেস অর্ডিন্যান্স স্থগিত রাখার সুপারিশে সম্মতি।

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।
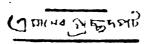
কামরাজ-প্রস্তাব ও ভারত সরকার

বর্তমানকালের ভারতীয় রাজনীতির জগতে যে ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব এবং সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা হইল কামরাজ-প্রস্তাব। অন্ততঃ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি-গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কামরাজ-প্রস্তাব যে সাড়া জাগাইয়াছে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে এই ষোড়শ বৎসরের রাষ্ট্র-ইতিহাসে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত।

সুদীর্ঘ সাধনায় শত শত আত্মদানে, অক্লান্ত সংগ্রামে ভারতীয় নারীর মহিমায়, ভারতীয় সন্তানের শৌর্য বীর্য অসংখ্য ভারতের প্রাচ্যগগনে এক পুণ্য প্রভাতে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সূর্য উদিত হইলেন। পরাধীনতার বন্ধন মোচন হইল। এই দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনের পর দেশের শাসনভার পাইয়া কংগ্রেস সরকার সকল দিকে সমানভাবে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর হইতে একটির পর একটি বৈদেশিক সমস্যা: তদুপরি কাশ্মীর-সমস্যা পূর্ব পাকিস্তানে অকথ্য হিন্দু-নির্যাতন এবং সর্বোপরি আভ্যন্তরীণ অন্ন সমস্যা, বেকার সমস্যা প্রভৃতি সহস্র সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষকে, সদ্যক্ষমতালব্ধ কংগ্রেস সরকারকে। ইহার ফলে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টি প্রয়োজনানুপাতে পতিত হইতেছে না। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

খ্যাতোত্তীর্ণ জননায়ক শ্রীকামরাজ নাদার দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক গগনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশেষ। বর্তমানে তিনি সর্বভারতীয় মন্ত্রিজগতের উদ্দেশে পদত্যাগ করিয়া গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাইয়াছেন। সুখের বিষয় এই প্রবীণ, বহুদর্শী, বিজ্ঞ রাজনীতিকের আহ্বান নিষ্ফল হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের ছয়জন মন্ত্রী এবং ছয়টি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিগণ এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। আরও একাধিক মন্ত্রী পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, বর্তমানে ভারত সরকারের পদত্যাগী মন্ত্রীর সংখ্যা হইল নয়জন। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে ভিন্ন কারণে আরও তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীঅশোককুমার সেন

আমাদের মতে, অতি উপযুক্ত সময়েই এই ঘটনা ঘটিল। ভারতের চতুর্দিকে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, ভীষণ ভয়ালের বিষাণ ধ্বনিতরঙ্গ তুলিতেছে, ভয়ঙ্করের কুৎসিত আলেখ্য আজ প্রকটমান, এই দুর্যোগঘন মুহূর্তে জাতিগঠন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জাতিগঠন কার্য সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ না হইলে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা কখনও সার্থক হইতে পারে না (হওয়া সম্ভবও নহে)। দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ সম্বন্ধে জাতির অন্তরে পরিপূর্ণ চেতনার জাগরণ যতক্ষণ না হয় জাতিগঠন কার্য ততক্ষণ অসম্পূর্ণ থাকে। এই বিপদের সময় জাতীয়-চেতনা অপরিহার্য। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে এও এক মহান আয়ুধ। ইহার শক্তিমত্তা আগ্নেয়াস্ত্রাদি অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নহে। জাতিগঠনকার্যে পরিপূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিলে সরকার তবেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সফল হইতে পারিবেন।

কামরাজ নাদার

জাতিগঠন বিরাট প্রশ্ন ইহা নিঃসন্দেহ তাহার পরই প্রশ্ন আসে যে, এই কার্য কাহার দ্বারা সফল হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোন কুশলী হস্তের স্পর্শের প্রয়োজন? এই কার্য তাঁহারাই সফল হইতে পারিবেন যাঁহারা এক সহানুভূতিশীল মন এবং উন্নত ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী—এই কয়টি গুণের সহিত আরও একটি মুখ্য গুণের এ ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। মন্ত্রিবর্গ মন্ত্রিত্ব করিয়া শাসনযন্ত্রের হাল দক্ষতার সহিত ধারণ করিলেন। বহু সমস্যার সম্মুখীন হইলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাধানের কৃতিত্ব অর্জন করিলেন, উন্নয়নমূলক কিছু কার্যও করিলেন. এইবার আরও বৃহত্তর জগতে পদার্পণের জন্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইল। সাধারণ মানুষ এইবার

তাঁহাদের আরও নিকটে পাইবে, তাহাদের সুখ দুঃখ আনন্দ, বেদনার এক ভাগীদার হিসাবে তাঁহাদের ভাবিবার সুযোগ পাইবে।

এই পদত্যাগের ফলে, অর্থনীতির দিক হইতেও পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে—সরকার লাভবানই হইয়াছেন। এই ব্যয়-সঙ্কোচের দ্বারা প্রতি মাসে কয়েক সহস্র টাকার নিশ্চিত ব্যয়ের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। জনসাধারণের লাভ হইল যে, সংগঠনের কার্যে তাঁহারা কয়েকজন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিকে পাইলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ফলে কংগ্রেস সরকার সকল দিকে প্রয়োজনানুপাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহার ফলে বহু করণীয় কার্য অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যেগুলি এই সঙ্কট ঘন মুহূর্তে সম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। মন্ত্রীপদে সমাসীন থাকিয়া যাঁহারা প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন সেই অভিজ্ঞতা এবং অটুট মনোবল মূলধন করিয়া এইবার সংগঠনের কার্যে তাঁহাদের অবতরণ নিঃসন্দেহে বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। সংগঠনের নানাদিক পরিপূর্ণ করিয়া তোলার দায়িত্ব এখন তাঁহাদের।

গদীনসীন হইয়া থাকার ফলে নানা ক্ষেত্রে আপন আপন দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ মেলে না। একটি নির্দিষ্ট বাঁধাধরা ছকের মধ্যে চলিতে হয়। সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করা ইচ্ছা সত্বেও সংবিধানের নির্দেশে ইঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে ইঁহাদের প্রতিভা, কর্মশক্তি এবং নৈপুণ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে না। শক্তির

হুমায়ুণ কবির

জওহরলাল নেহরু

যথাযথ স্ফুরণের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় এক বিরাট বাধা। বহু যোগ্য কর্মী বা ব্যক্তিকে নানা কারণে অনেক কল্যাণকর কার্য করিতে দেওয়াও হয় না, ইহার ফল সকল দিক দিয়াই ক্ষতি সূচিত হয়, উহাই ক্রমে তিলে তিলে এক বিরাট আকারে পরিণতি লাভ করে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোন কোন মন্ত্রী স্বীয় দপ্তর ছাড়া অন্য দপ্তরেরও ভার পাইলেন। তন্মধ্যে ডঃ হুমায়ুন কবির এবং শ্রীঅশোককুমার সেনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীদিগের মধ্যে বাঙালী মাত্র এই দুইজন। উভয়েই স্বীয় দপ্তর ছাড়া অতিরিক্ত দপ্তর পাইলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ডক্টর কবির এবং ডাক ও তার বিভাগের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রীসেন যে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়া দেশবাসীকে লাভবান করিবেন এ বিশ্বাস আমরা অন্তরে পোষণ করি। শ্রীঅশোককুমার সেন শুধুমাত্র বিচক্ষণ আইনজ্ঞই নহেন, নানা বিষয়ক পাণ্ডিত্যের তিনি অধিকারী। তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ জননেতা হিসাবেও তিনি বিপুল-জনপ্রিয়তার অধিকারী। অতএব ডাক ও তার বিভাগেও তিনি যে প্রভূত দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিবেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

এই সকল বিষয়গুলি লইয়া গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে অনায়াসে উপনীত হইতে পারি যে কামরাজ-প্রস্তাব বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে সকলদিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ, কল্যাণকর এবং সময়োপযোগী হইয়াছে।

সমস্যা জর্জর বাঙলা ও বাঙালী

দেশের গণতন্ত্রী সরকার যে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী শাসক ও মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠীর হাতে ক্রীড়নকের রূপ ধরিয়াছিল, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও রাষ্ট্র-মন্ত্রী প্রভৃতিদের কাজের নমুনা প্রতিনিয়ত সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রথী-মহারথী হইতে শুরু করিয়া চুনোপুঁটিরা পর্যন্ত নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কয়েকটি অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারীর মামলা এই বাবদে দায়ের হইয়া আছে। কামরাজ-পরিকল্পনার প্যাঁচে পড়িয়া উপরওয়ালারা এখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সিঁদ কাটিতে বদ্ধপরিকর। সরকারী কাজ চুলায় ফেলিয়া দিয়া প্রকৃত দেশসেবার কাজে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। সহসা এই শ্মশান-বৈরাগ্য কেন যে আসিল, সাধারণের বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। অনেকে অনেক প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, এত বিলম্বে চৈতন্যোদয় রহস্যজনক ঠেকিতেছে। কেন না, কোন কোন অসাধু ব্যক্তি উপরের খাইয়া গাছকে নিঃস্ব করিয়া তলার খাইতে নামিয়া আসে। গাছের ফল শেষ হইলে বৃন্তচ্যুত পতিত ফল খাইতে উদ্যোগী হয় তাই বলিতেছিলাম 'প্রকৃত দেশ সেবা,' 'সাংগঠনিক কর্মসূচী' ইত্যাদি গালভরা কথাগুলি শুনিলে বড়ই ভীত হইতে হয়। মনে সংশয় আসে। গালভরা শব্দে লোকের মন-ভুলানো কথার অন্তরালে কাজের বালাই কতটা থাকিবে, বলা যায় না। 'প্রকৃত দেশ সেবা' যে কি বস্তু তাহার আস্বাদ দেশবাসী এখনও পাইল না, অতীব দুঃখের বিষয়। তবে হয় তো এখনও গাঁজা খাওয়াইতে পারিলে রোগীকে বাঁচানো যাইতে পারে। সত্যকার আন্তরিক সেবার আদর্শ লইয়া কোমর বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারিলে হয় তো বা আগামী নির্বাচনে অন্যান্য প্রভাব ও শক্তিশালী পার্টির সহিত ভোট দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া যায়। মাত্র কয়েকটা সাম্প্রতিক উপ-নির্বাচনে বোধ করি কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ হইয়াছে কংগ্রেস-মহলের কর্তা, উপকর্তা, ও অধঃকর্তাদের।

দেশের লোকের স্বার্থ জনসাধারণের সমস্যার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের দ্বারা কোন পার্টির আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কংগ্রেসী শাসক-সম্প্রদায় দেশবাসীর স্বার্থ ও সমস্যার জন্য কতটা চিন্তা করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পশ্চিম বাঙলার কথাই ধরা যাইতে পারে। এই স্কন্ধকাটা প্রদেশটি বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাঙলার বিধান সভায় কতিপয় সদস্য আপন আপন এলাকার অধিবাসীদের দুর্দশা-বর্ণনা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণ এক বেলা আহার করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। মূল কলকাতার সীমানার মধ্যেকার অবস্থা যদি এইরূপ বেদনাদায়ক হয়, তবে গোটা প্রদেশ কি পরিমাণ দুর্দশাগ্রস্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। তাই হয় তো সর্বাধিক প্রচারিত বাঙলা দৈনিক সংবাদের শিরোনামা দেয়,—'সরকার যেদিকে চায় সেদিকেই আগুন জ্বলে।'

ইহা কি সত্য! চাল, চিনি, মৎস্য ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া সরকার সাধারণের সহিত সেই মামুলী খেলা চালাইয়া যাইতেছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াও একটা সরকার যে কি ভাবে গদী দখল করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, পশ্চিম বাঙলার দিকে দৃকপাত করিয়া সারা বিশ্ব দেখিতে পাইতেছে। সরকারী মুখপাত্রদের মুখে ভিত্তিহীন পরিসংখ্যার বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। সরকারী ট্যাক্সের ভার যাহারা বহন করিবে, সেই জনসাধারণের প্রতি যেন কোন কর্তব্যই নাই আমাদের সরকারের। চাউলের মূল্যবৃদ্ধির কারণ বর্ণনার মাহাত্ম্য শুনিয়া দেশের লোকের উদরপূর্তি হয় না। দেশবাসী চায় ন্যায্যমূল্যে—

(১) দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন।
(২) সরকারী নিয়মে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ।
(৩) পরিধানের বস্ত্র।
(৪) যোগ্য বাসস্থান।
(৫) চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমস্যার অন্ত নাই। আমরা মাত্র প্রাথমিক কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। এখানে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতে হয়, পশ্চিম বাঙলার সীমান্ত আদপেই সুরক্ষিত নহে। বৈদেশিক আক্রমণের মুখে ও আভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিম বাঙলার জরাগ্রস্ত আত্মা বর্তমানে নাভিশ্বাস তুলিতেছে। এজন্য প্রয়োজন যোগ্য চিকিৎসকের। রোগ জটিল হইলে দেখা যায় মাঝে মাঝে ডাক্তার বদল করিয়া সাঙ্ঘাতিক ফল ফলিয়াছে। মরা-রোগী আধুনিক যুগোপযোগী ঘষামাজা ইলেকট্রিক সলিউশনে জীয়াইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু প্রশ্ন এই, এ পোড়া দেশে অকেজো বৈঠকী পলিটিক্স আর কতদিন চলিবে! এখনও যোগ্য

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির অ-বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা দিবস পালনের উৎসব চিত্র।

মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেছেন, মিস ষ্টিফ্লার পশ্চিম জার্মান কনসল ইহাতে সাহায্য করিতেছেন।

মিঃ স্মার্না (রাশিয়ান), মিঃ মাইকেল স্নাইডার (আমেরিকান) দক্ষিণ হইতে, এবং পতাকার তলে মিঃ রিয়াবনকোভ, (রাশিয়ান) এবং পশ্চাতে শেষে উমিচিতা (জাপানী) ভারতের পতাকা অভিবাদন করিতেছেন। সকলেই বাংলানবীশ। সভাপতি ডাঃ ভবতোষ দত্ত (ডি, পি, আই) ও সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে দণ্ডায়মান।

ও কর্মক্ষম মানুষের ততটা অভাব হয় নাই বাঙলা দেশে। হয় তো সুযোগ ও সুবিধা দিলে এই সকল গুণী ও জ্ঞানীদের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

দলাদলি, ক্ষমতা-লোলুপতা, স্বার্থসিদ্ধি, স্বজন-পোষণ কথাগুলি ভুলিয়া যাইবার দিন আসিয়াছে। যাহারা এখনও ভুলিতে চান না, তাঁহাদের মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন।

শোক সংবাদ ॥

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক মনস্বী শিক্ষাবিদ ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় গত ২৩এ ভাদ্র ৮৩ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের নৌ-বিদ্যা, শিক্ষাপ্রণালী এবং ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে এঁর গবেষণা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় এবং এ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান রচনাদি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক। ছাত্রজীবনে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরাজী ও ইতিহাসে ইনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করে দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট অর্জন করেন। রিপন কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতাধীনে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, বারাণসী হিন্দু, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি অধ্যাপনা ও বক্তৃতা দান করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি ইতিহাস বিভাগের প্রধান ও এমারিটাস অধ্যাপক ছিলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধি দ্বারা সম্মানিত করে। সেখানে তাঁর নামে একটি অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৭ সালে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং বিরোধী পক্ষের নেতা নির্বাচিত হন। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যদের তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের গোয়ালিয়র অধিবেশনে ইনি মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

প্রফুল্লরঞ্জন দাস

ভারতীয় আইনজগতের দিকপাল মহারথী প্রফুল্লরঞ্জন দাস গত ১৭ই ভাদ্র ৮৩ বছর বয়েসে দেহান্তরিত হয়েছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বনামধন্য অনুজ প্রফুল্লরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এসে ১৯০৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৭ সালে ইনি পাটনায় স্থায়ী বাসিন্দা হন এবং আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে তাঁর 'খ্যাতি' দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। মতবিরোধের ফলে ১৯২৯ সালে তিনি পদত্যাগ করেন ও পুনরায় স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ধুরন্ধর আইনজ্ঞ হিসাবে প্রভূত যশের ইনি অধিকারী হলেও সাহিত্য ক্ষেত্রেও ইনি অল্প দক্ষতার পরিচয় দেন নি। 'মথ এ্যাণ্ড দ্য ষ্টার' নামক তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ রসিক সমাদরে বিভূষিত। দেশবন্ধুর 'নারায়ণী' পত্রিকাতেও তিনি কবিতা লিখতেন। সারা ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা ইউনিয়ন, পাটনা বাঙালী সমিতি এবং সারা ভারত লন টেনিস সমিতির সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুষারকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পত্রিকা সমালোচনা

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করছি আপনি 'মাসিক বসুমতী'র সব রকমেই উন্নতিসাধন করছেন, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। এখন ছবি এবং অক্ষর আগের থেকে অনেক পরিষ্কার ছাপা হয়ে থাকে। মলাটেও আধুনিক শিল্পীদের আঁকা ছবি ছাপা হয়। অনেক রকম ভাল ভাল রচনা থাকে, তার মধ্যে দু' সাতখানা ইন্টারেষ্টিং উপন্যাসও থাকে এবং আগের থেকে তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হয়ে থাকে। কাপ্তেন ক্রিটমস 'নান ষ্টোরির' অনুবাদ 'পূর্ণ প্রাণে চাওয়া যাহা' আমার খুব ভাল লাগছে। সাধারণত ইংরাজী থেকে অনুবাদ করা গল্পগুলো একটু আড়ষ্ট ধরণের হয়ে থাকে কিন্তু প্রণতি মুখোপাধ্যায় এমন সুন্দর ভাবে অনুবাদ করছেন যে মনে হচ্ছে গল্পটা বাংলাতেই লেখা। তার জন্য তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। ইতি—স্মৃতি ঠাকুর, ১০, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করবেন। আমি আপনার 'মাসিক বসুমতী'র একজন একনিষ্ঠ পাঠিকা। এ বাড়ির প্রত্যেকেই বইখানির জন্য প্রতি মাসেই আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করে থাকে। এই বইখানিতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হয়েছি এবং হচ্ছি। বিশেষ করে 'কাল, তুমি আলেয়া'. এই অনন্যসাধারণ উপন্যাসখানির শক্তিশালী লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা আবার কবে পাব? 'মাসিক বসুমতী'র পাতায় আপনার লেখা দেখতে চাই। বর্তমানে প্রকাশিত 'মৌন মন' ও 'স্বপ্ন প্রান্তে' উপন্যাস দু'খানি খুব ভাল লাগছে। এই ক্রমোন্নত মাসিক পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি—গৌরী দে। জামার স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বর্ধমান।

মহাশয়, আপনাদের প্রেরিত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মাসিক বসুমতী' পাইয়া বিলক্ষণ আনন্দিত হইয়াছি। গ্রাহকদের সহিত আপনাদের সম্পর্করক্ষার ঐতিহ্যপূর্ণ আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইতি—প্রবোধচন্দ্র দে। সিনিডি কোলিয়ারী, পোঃ কাতরাসগড়, ধানবাদ।

সবিনয় নিবেদন, আমি 'মাসিক বসুমতী'র একজন নিয়মিত পাঠিকা। মাসিক বসুমতীর রচনাবলী, বিশেষ করে প্রবন্ধগুলির প্রতি আমার আকর্ষণ খুব বেশী। বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে আমার আগ্রহ চরিতার্থ করার জন্য সম্পাদক হিসেবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। বিদেশী সাহিত্যের ওপর আপনার পত্রিকায় সুনীলকুমার নাগ এবং রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারগর্ভ তথা মননশীল প্রবন্ধ নিয়মিত আগ্রহ সহকারে পড়ি এবং যথেষ্ট শিক্ষালাভও যে করি—একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। বিশেষ বিশেষ বিদেশী লেখকদের ওপর লেখা সুনীলবাবুর প্রবন্ধ এবং বিশেষ বিশেষ বিদেশী সাহিত্যের ওপর লেখা রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে সুন্দর। সেজন্য উভয়কেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি—সুচরিতা সেন, নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া।

সবিনয় নিবেদন, 'মাসিক বসুমতী'র বহু পাঠকদের মধ্যে আমি একজন। শুধু তাই নয়, যাঁরা 'মাসিক বসুমতী'র আন্তরিকভাবে উন্নতি কামনা করেন সেই শুভার্থীদের মধ্যে নিজেকে অন্যতম মনে করি। আমার সামান্য পড়াশুনা থেকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ভারতবর্ষে যত মাসিক পত্রিকা আছে, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হিসাবে আপনার সম্পাদনায় 'মাসিক বসুমতী' শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। পাঠক হিসেবে আমার একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে, জানি না আমার সে আশা পূরণ হবে কি না। প্রথমতঃ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীউমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী 'আমার কথা' মারফৎ জানতে চাই। দ্বিতীয়তঃ, রম্যসঙ্গীতে বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় শিল্পী শ্রীশ্যামলকুমার মিত্রের জীবনী 'আমার কথা'র মাধ্যমে পড়তে চাই। আশা করি আমার এ অনুরোধটুকু অপ্রয়োজনীয় চিঠির মত waste paper box-এ ফেলে দেবেন না। ইতি—প্রদীপকুমার ঘোষ। ৫।১১ সি, কালীচরণ ঘোষ রোড, সিঁথি, কলিকাতা-৫০

সবিনয় নিবেদন, চৈত্র সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে আপনাদের বিজ্ঞাপিত উপন্যাস 'বাতাসী মঞ্জিলের' আরম্ভের কিস্তি আমার ও আমার বন্ধুদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। আশা হইতেছে ইহা একটি আকর্ষণীয় উপন্যাস হইবে। Legendary figure বাতাসী বিবি সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনে খুবই কৌতূহল রহিয়াছে। আপনার লেখা উপন্যাস বসুমতীতে বহুকাল পড়ি না। শীঘ্র একটি ধারাবাহিক উপন্যাস বসুমতীতে আরম্ভ করিলে আমরা—অর্থাৎ আমি ও আমার বন্ধুগণ আনন্দিত হইব। বসুমতীতে প্রতি মাসে একটি Humorous feature দিলে ভাল হয়। বসুমতী আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মাসিক পত্র। এত বৈচিত্র্য অথচ এত ভাল লেখা আমরা কোনও মাসিক পত্রে পাই না। আপনি এজন্য আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইতি—সাধন রায়। সোদপুর, কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীরমেশ সোম, ১০-এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৪ * * * শ্রীদেবদাস কুণ্ডু, অবধায়ক—রাখাল বাজোয়ার, রানার গ্রাম—পারোয়া, ডাক—ঝালদা জেলা—পুরুলিয়া * * * সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণ আশ্রম, মার্গ, নয়াদিল্লী * * * লীলাবতী মুখোপাধ্যায়, অবধায়ক—শ্রী এস. কে, মুখোপাধ্যায়, ১৫৭ অশোকনগর, উদয়পুর, রাজস্থান * * * শ্রী জে, বন্দ্যোপাধ্যায়, কোয়ার্টার নং টাইপ 1/111-B, ১৩০ 'বি' সেকটার, ডাক—পিপলানী, ভূপাল, মধ্যপ্রদেশ, * * * সচিব, জেলা গ্রন্থাগার, দার্জিলিঙ * * * শ্রী এ, কে, দত্ত, বি, ই, অবধায়ক—গ্যানন ডানকালি এ্যাণ্ড, কোং লিঃ, ডাক—বীরভদ্র (হৃষীকেশ হয়ে), জেলা—দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ) * * * রায় দিগিন্দ্রনাথ সাহা বাহাদুর, ১৬৮ শ্যামচাঁদ রোড, ডাক—শান্তিপুর, (নদীয়া), পশ্চিমবঙ্গ * * * সচিব বিদ্যাসাগর জনকল্যাণ সঙ্ঘ, গ্রাম এবং ডাক ক্রোই (মোহনপুর হয়ে) জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীশ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এ্যাকাউণ্টস রিক্রিয়েশান ক্লাব, মেটাল এ্যাণ্ড ষ্টীল ফ্যাক্টরী, ডাক—ইছাপুর, ২৪পরগণা * * * শ্রীমতী মায়া মজুমদার, অবধায়ক—ডাঃ তপন মজুমদার, ডাক—ঝুমরি তিলাইয়া, জেলা—হাজারিবাগ * * * শ্রীমতী বিমলাবালা বড়াল, বড়াল কুটির (পূর্ব রেল পাথর হলি ড হোমের সম্মুখে), ক্যাস্টার্স টাউন, ডাক—বৈদ্যনাথ, দেওঘর (সাঁওতাল পরগণা), বৈদ্যনাথধাম * * * শ্রীমতী সুকুমারী পালিত, অবধায়ক—অধ্যাপক কে, সি, রায়চৌধুরী, ইউনিভার্সিটি স্টাফ কোয়ার্টার্স, ব্লক-'সি,' ফ্ল্যাট ৪ ডাক—তারাবাগ, বর্ধমান * * * ডক্টর কে এল, মুখোপাধ্যায়, সেকিয়োক টি এস্টেট, ডাক—মিরিক জেলা দার্জিলিঙ * * * শ্রীকুমুদ দত্ত, অবধায়ক—প্রয়োজনী টেলার্স, মল্লিক বাজার, ডাক—বাটানগর, ২৪-পরগণা * * * শ্রীমতী বীণাপাণি, বিশ্বাস, অবধায়ক—শ্রী এ, কে, বিশ্বাস, নেতাজী রোড ডাক, আলিপুর-দুয়ার, জেলা—জলপাইগুড়ী * * * শ্রীরামচরণ প্রসাদ স্বত্বাধিকারী, পঙ্কজ ফ্লাওয়ার মিলস চক বাজার ডাক বাড়—(পাটনা) জেলা—পাটনা, বিহার * * * শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সিংহ কার্জ, লাইফ ইনসিওরেন্স করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া, কুচবিহার, ডাক ও জেলা কুচবিহার * * * সচিব, শুভেন্দু স্মৃতি পাঠাগার, ডাক—মাজুটি (বেনাগড়িয়া এস. ভি হয়ে), বিহার * * * সচিব, ষ্টীল এক্সপোর্ট রিক্রিয়েশান কমিটী ৪১, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা—১৬, * * * শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক রুকনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাক—রুকনপুর, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ * * * গ্রন্থাগারিক, সুভাষ গ্রন্থাগার, গ্রাম এবং ডাক কোটিয়া (গোপীবল্লভপুর হয়ে) জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীসুধীরকুমার বিশ্বাস, আই, এ, এস, ন্যাশানাল এ্যাকাডেমি অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, মুসৌরী উত্তর প্রদেশ * * * শ্রীঅরূপ চৌধুরী, ১, এ্যালেনবি রোড, নয়াদিল্লী—১, * * * শ্রীউমাপদ মণ্ডল, বি, এ, শিক্ষক, কাইজুরি হাইস্কুল, ডাক—কাইজুরি, জেলা—২৪-পরগণা * * * শ্রীজ্যোতি দেব, কন্ট্রোলার ব্রুক বণ্ড টী কোম্পানী, তীর্থনিবাস, লচিতনগর, ডাক—গৌহাটি, আসাম * * * শ্রীঅনিলবরণ সেনচৌধুরী, গ্রাম—ভজীদীঘি, ডাক—বাইদত্ত-বলরামপুর, জেলা—পূর্ণিয়া।

বর্তমান বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫'০০ পাঠাইলাম, আশা করি নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, ডুবরাজপুর, বীরভূম।

Sending herewith Rs. 15·00 being the annual subscription of Monthly Basumati for one year. Please send paper every month. Secretary, District Library, Darjeeling.

আপনার দ্বিতীয় স্মারক পত্র পাইয়া ১৩৭০ সালের বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫'০০ পাঠাইলাম। আমি ৩০ বৎসরের উপর পত্রিকা লইতেছি। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী সরোজবালা রায়, সিংভূম।

বার্ষিক মূল্য ১৫'০০ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পাটনা—৬।

আপনাদের স্মারক পত্র পাইলাম। ১৫'০০ বার্ষিক মূল্য বাবদ পাঠাইলাম। চাঁদা পাঠাইতে দেরি হওয়ায় দুঃখিত। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার বসু, কানপুর, (ইউ পি)।

Remitting Rs. 15 00 being the subscription to Monthly Basumati for one year. Please send the copies regularly. Secretary, Chulsa Tea Co. Staff Club. Matelli. Dooars.

Herewith sending Rs. 15·00 as the annual subscription of Monthly Basumati, you kindly continue sending the magazine as usual. The Labour Welfare Officer. R. I. Ltd. Dalmianagar, Shahabad.

I am a subscriber of your Monthly Basumati, I am sending Rs. 15 00 as annual subscription for the year 1370 B. S. Hope you will kindly send me copies from Baisakh. Naba Kumar Singha, Karkai Midnapur.

I hereby remit Rs. 15·00 as my annual subscription (renewal) for Monthly Basumati. Please send me Monthly Basumati as usual. Sm. Leela Rani Dey, Kashiara, Burdwan.

Herewith Rs. 15 00 for one year's subscription of the Monthly Basumati beginning from Baisakh. I am an old subscriber Please send copies as usual. K. C. Majumder. Sultanpur. U. P.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫'০০ পাঠাইলাম। দয়া করিয়া প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অধ্যক্ষ, পল্লী সংগঠন, শ্রীনিকেতন, বীরভূম।

১৫'০০ মনি অর্ডার যোগে পাঠাইলাম। যথা নিয়মে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সেক্রেটারী, গোবিন্দরামপুর, অশ্বিনীকুমার হাইস্কুল, ভুবননগর চব্বিশ পরগণা।

Remitting herewith Rs. 15·00 only the yearly subscription for Masik Basumati. Please let me have it as early as possible. Dr. K. L. Mukherjee, Mirik, Darjeeling.

শ্রীশ্রীদুর্গা (এলিফ্যাণ্টা, বোম্বাই) —শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত অঙ্কিত

বেশভূষার
দৈনন্দিন সুষমায়

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৪২শ বর্ষ — ১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭০ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত ক'রয়া তোলাই ধর্ম।

ঈশ্বরানুভূতিই ধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য। ঈশ্বরকে পূজা করিতে শেখাই সর্বোত্তম শিক্ষা।

ধর্ম অর্থই শক্তি।··· আকাশের মত সীমাহীনতা আর সমুদ্রের মত অতল গভীরতা লাভেরই নাম ধর্ম।

ধর্ম মানুষকে অনন্ত জীবন দান করে, মানুষকে দেবতায় পরিণত করে। মনুষ্য সমাজ হইতে ধর্ম অন্তর্হিত হইলে মানুষকে পশুতে পরিণত হইতে হইবে। মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সুখ নহে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইতেছে অধ্যাত্ম জ্ঞান, যাহার দ্বারা শান্তি এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ হয়।

ধর্মের পরিণাম ধর্ম। যে ধর্মের দ্বারা শুধু জাগতিক মঙ্গল সাধিত হয়, উহা আর যাহাই হউক, ধর্ম নহে।

মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবে, অনুভব করিবে, তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার কথা বলিবে, ইহাই ধর্ম।

ধর্ম বক্তৃতায় মতবাদে বা গ্রন্থে অবস্থিত নহে। উপলব্ধিই ধর্মের প্রাণ। ধার্মিক হইতে শেখা যায় না, ধার্মিক হইতে হয়।

হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।

* * *

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

তিনি আছেন সকল জীবের মধ্যে, তিনি চিন্তা করছেন সকলের মনের মধ্যে দিয়ে, তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি আমাদের নিজেদের চেয়েও আমাদের অধিক নিকটে। এটা জানাই ধর্ম, এরই নাম বিশ্বাস, ঈশ্বর এই বিশ্বাসই আমাদের অন্তরে জাগরিত করুন।

ধর্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র ও অকপট প্রেমই ধর্ম। যদি দেহ-মন শুদ্ধ না হয় তবে মন্দিরে গিয়া শিবপূজা করা বৃথা। যাহাদের দেহ-মন পবিত্র, শিব তাহাদেরই কথা শুনেন। আর যাহারা অশুদ্ধস্বভাব হইয়াও অপরকে ধর্মশিক্ষা দিতে যায় তাহারা অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। বাহ্যপূজা মানসপূজার বহিরঙ্গ মাত্র। মানসপূজা ও চিত্তশুদ্ধিই আসল জিনিস। এইগুলি না থাকিলে বাহ্যপূজায় কোনো ফললাভ হয় না।

মনকে নিয়ত ঈশ্বরাভিমুখী কর; অন্য কোনো কিছুরই মনকে বশে রাখার অধিকার নেই। মন অবিরাম ঈশ্বর চিন্তা করবে—যদিও কাজটা খুবই শক্ত, তবুও অনবরত অভ্যাসের ফলে কী না হয়:··· কোনোরকম জাগতিক বা মানসিক সুখভোগের চিন্তাও মনে স্থান দিও না—কেবল ঈশ্বরচিন্তা। মন যদি অন্য কিছু চিন্তা করতে চায়,

তাকে বেশ করে এক ঘা লাগিয়ে দাও, দেখবে মন ফিরে গিয়ে ভগবানের নাম করছে। একটা পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে তেল ঢালবার সময় যেমন তা অবিচ্ছিন্নভাবে পড়তে থাকে, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ঘণ্টাধ্বনি যেমন একটা নিরবচ্ছিন্ন শব্দের মত শোনায়, ঠিক তেমনি মন ছেয়ে যাবে ঈশ্বরের পানে অবিশ্রান্ত নির্ঝরধারার মত।

স্বার্থপর লোকেরা ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারে না। আমরা যতই ছড়িয়ে পড়ব এবং মানুষের কল্যাণ করব, ততই আমাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ হবে—শুদ্ধ হৃদয়েই তো ঈশ্বরের বাস। আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চক্রিয়ার উল্লেখ আছে—যাকে বলা হয় 'পঞ্চ-যাগ'। প্রথমে পাঠাভ্যাস। প্রত্যেক মানুষেরই প্রতিদিন কিছু সদগ্রন্থ পাঠ করা কর্তব্য। দ্বিতীয়ত ঈশ্বর দেবদূত বা সাধুসন্তদের পূজা। তৃতীয়ত পিতৃপুরুষদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন। চতুর্থত মনুষ্য সাধারণের প্রতি কর্তব্য পালন। মানুষ যতক্ষণ না দরিদ্র বা নির্বাস্তুর জন্যে গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছে ততক্ষণ তার নিজের গৃহসুখ উপভোগ করার অধিকার মানুষের নেই।...শুধু নিজের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করার অধিকার মানুষের নেই—খাদ্য পরের জন্যে, কেবল উদ্‌বৃত্তটুকু সে পাবে।...প্রাচীন যুগের হিন্দুগণ প্রথম ফসল অর্ঘ্য দিত ঈশ্বরকে। সব কিছুরই প্রথম জিনিসটা দিতে হয় দুঃস্থকে—যা বাকী থাকবে সেটা আমাদের। দরিদ্রগণ তো নারায়ণেরই প্রতিনিধি, দরিদ্রের কষ্টভোগে তাঁরই কষ্টভোগ। দান ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কেবল ভোজনবিলাসে মত্ত, সে পাপী। পঞ্চমত পশুপাখির প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন। সমস্ত পশুর সৃষ্টি হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে, মানুষ তাদের বধ করবে, নিজের খুশিমত ব্যবহার করবে—এ সব হচ্ছে শয়তানের নীতি, ভগবানের নয়। প্রতিদিন তাদের খাদ্য দিতে হবে, এদেশের প্রত্যেক শহরে হাসপাতাল থাকবে যেখানে অসহায় খঞ্জ ও অন্ধ গরু-ঘোড়া-কুকুর-বিড়ালের আদরযত্নের ব্যবস্থা থাকবে।

যারা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করে তারা তথাকথিত কর্মীদের অপেক্ষা বিশ্বের অধিকতর কল্যাণসাধন করে। যে সম্পূর্ণ আত্মশুদ্ধি লাভ করেছে সে একদল ধর্মপ্রচারকের চেয়েও অধিক পরিশ্রমী। পবিত্রতা ও নীরবতার গভীরেই শক্তির মূল উৎস।

বাজে কথা শোনা-বলা নয়—শুনবো ঈশ্বরের কথা, বলবো ঈশ্বরের কথা। বাজে বই না পড়ে পড়বো ভাগবত-কথা।

বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু মূল নীতি ও তত্ত্ব বিষয়ে উহারা সকলেই এক।

পূর্বাপেক্ষা উদারতর মনোভাব লইয়া এখন ধর্ম অনুশীলন করিতে হইবে। ধর্ম বিষয়ে সর্বপ্রকার সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক এবং বিরোধমূলক মনোভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক জাতি অথবা উপজাতির নিজস্ব বিশেষ একজন ঈশ্বর আছেন এবং তাহাদের সেই ঈশ্বর ব্যতীত অপর জাতিসমূহের ঈশ্বর মিথ্যা—এরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা শুধু অতীতেই চলিত, বর্তমানে এরূপ ধারণা সর্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

বিবেকানন্দস্তোত্রম

শ্রীবিনয়গোবিন্দ কাব্যতীর্থেন রচিতম্

ওঁ—জ্ঞানী ঋষিকল্পঃ খলু মনস্বী বিবেকবান্,
ন—রেন্দ্রঃ প্রাণপ্রিয়ঃ শ্রীগুরুপদনিবিষ্টাঃ,
মো—হনাশকরণায়াবতীর্ণো মহীতলে
ততস্ত্বমেব শরণং মে বিবেকানন্দ! ॥ ১ ॥

ভ—গবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তবাচার্য্যদেবঃ,
গ—তস্তিমিরাতীতং ব্রহ্মপদং যোগেন যঃ,
ব—দনিঃসৃতগিরা চেতন্যং নির্ম্মলম্।
তে—জোরাশিমালাকা সর্বেষ্বপি শিষ্যগণাঃ
ততস্ত্বমেব শরণং মে বিবেকানন্দ! ॥ ২ ॥

বি—রক্তো যৌবনে সদৈব মায়াপাশবিমুক্তঃ,
বে—দবেদান্তাদিনানাশাস্ত্রপারংগমঃ,
কা—মিনীকাঞ্চনভোগেচ্ছনিশং নির্লিপ্তঃ।
ন—বনীতং মনসাং তমার্ত্তজনদুঃখাচ্ছক্র—
ন্দা—ন্দানারতং জননারায়ণ সেবাপরায়ণঃ।
য়—মুক্তা ভারতমাতা ধন্যা কৃতার্থা চ।
ততস্ত্বমেব শরণং মে বিবেকানন্দ। ॥ ৩ ॥

[হুগলী-কলেজিয়েট স্কুল" পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

(স্বামী বিবেকানন্দের Life and Mission হইতে)

আমার সামান্য পদ্ধতিতে, আমি কি করতে চেষ্টা করেছি—তা' অনুভব করতে হ'লে কল্পনার নেত্রে আপনাদের ভারতের কথা চিন্তা করতে বলবো। বিষয়টি বিস্তৃতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করবার মতো অবসর এই সভায় নেই। অথবা একটি বিদেশীজাতির সমস্ত রকম খুঁটিনাটি নিয়ম-প্রণালীর বিচিত্রতা অনুভব করা, আপনাদের পক্ষে—এই অল্প সময়ে সম্ভবপরও নয়।

আপনারা দেখেছেন, সবকিছুর ওপরে অনন্ত ধর্মীয় কুতত্ত্বের প্লাবন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অবিরাম বয়ে চলেছে। আমার এমন একটি বৎসরের কথাও মনে পড়ে না—যে বৎসর না, ভারতে নতুন নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। শ্রেণীসৃষ্টি ধ্বংসের লক্ষণ নয়—এ হচ্ছে জীবনের চিহ্ন—প্রাণের প্রবাহ। শ্রেণীসংখ্যা বাড়তে দিন—যতদিন না আমাদের প্রত্যেকের এক একটি পৃথক শ্রেণী তৈরী হ'য়ে যায়। তা' নিয়ে ঝগড়া করার আমাদের কিছু নেই।

এক্ষণে আপনাদের দেশের কথা ভাবুন। আমি কোনো সমালোচনা করতে চাই নে। এখানে—সামাজিক আইন, রাজনৈতিক গঠন—প্রত্যেক কিছু গড়ে উঠছে ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে। আপনাদের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি, কি পরিচ্ছন্ন, আপনাদের কি সুন্দর সুন্দর নগর-নগরী; আর কত বিভিন্ন উপায়ে মানুষ অর্থ রোজগার করতে পারে। মানব জীবনকে নিঃশেষে উপভোগী করবার মতো, কতশত বিচিত্র পন্থা। কিন্তু এইখানে যদি কোনও লোক বলে, দেখুন, আমি এই গাছের তলায় বসে উপাসনা করবো, আমি আর কোন কাজ করবো না,—তাকে ধরে শূলে দেওয়া হবে। তবেই দেখুন, বেচারার কোন উপায়ই নেই। এই সমাজে, সেই শুধু বাঁচতে পারবে—যে ব্যক্তি কর্মরত; যে ব্যক্তি জীবনকে ভোগ করার কাজে ব্যতিব্যস্ত—যে অন্য কিছু ভাববে তার ধ্বংস অনিবার্য।

আবার, ভারতের দিকে দৃষ্টি দিই—সেখানে যদি কোনও লোক বলে, আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বাকি জীবন উপাসনা করে কাটাবো। তবে সবাই বলবে, আচ্ছা যাও—ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন। তার আর কিছু বলার প্রয়োজন হবে না। কেহ বা তার জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় আনবে, কেহ বা অন্য সামগ্রী এবং এভাবে সে ভালই থাকবে। কিন্তু কেহ যদি বলে, আমি ভোগে-বিলাসে জীবন কাটাবো—তখন? সব গৃহের দরজাই তার জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি বলি, উভয় দেশের ধারণাই অসত্য। আমি কোনও যুক্তি দেখি নে, এখানে কোনও লোক কেন ঈশ্বরের আরাধনা করবে না। সে যদি চায়, বেশীর ভাগ মানুষের মতে জোর করে তাকে চলতে বাধ্য করা হবে কেন? কোনো যুক্তিই দেখি নে। আবার ভারতেই বা কেন—কোন লোকই অর্থ উপার্জন করবে না, অথবা জীবনকে কাণায় কাণায় উপভোগ করবে না। আপনারা দেখছেন, কি ভাবে এক বিরাট জনশ্রেণী বিপরীত মতের অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে। এই অত্যাচার মুনি-ঋষিদের। এই অত্যাচার শক্তিশালীর, ক্ষমতাবানের, বুদ্ধিজীবী ও বাস্তববাদীদের। শক্তিমানের এবং বুদ্ধিমানের অত্যাচার বহুগুণ বেশী জোরদার। সবলের অত্যাচার অনেক নিয়ম-কানুনের নিগড়ে জড়িত—সাধারণ সরল লোকেদের তা' অতিক্রম করার সাধ্য কোথায়?

আমি বলি, এই সব বন্ধ করতে হবে। একজন মাত্র—আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সৃষ্টির জন্যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে ভূপাতিত করার মূল্য কি? যদি এমন এক সমাজ গঠন করা সম্ভবপর হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সৃষ্টি হ'লে অবশিষ্ট জনগণ সুখী হবে—তাহাই মংগলজনক। যদি এই নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ মানবকে আত্মনির্যাতন করতে হয়—তবে তা' অন্যায়। জগতের মুক্তির জন্যে, কোন এক ব্যক্তির দুঃখভোগ করা সহস্র গুণ শ্রেয়।

আমার বলা কর্তব্য—আমি সন্ন্যাসীগিরির বড়ো সমর্থক নই। এদের অনেক সদগুণ আছে; আবার দোষও আছে। তাই গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর মধ্যে সাধারণ কোনও নিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু ভারতে সাধুগিরি বিরাট শক্তি সঞ্চয় করেছে। আমরা—সন্ন্যাসীরাই বড়ো শক্তির প্রতিনিধিত্ব করি। সন্ন্যাসী রাজপুত্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

ভারতে এমন কোনও নরপতি নেই যিনি কোনও গৈরিক বস্ত্রপরিহিত সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে আসন গ্রহণ করবেন। নরপতি আসন ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াবেন। ইহা ভাল নয়—এতো ক্ষমতা যে কোনও ভাল ব্যক্তিরও থাকা উচিত নয়। অবশ্য সন্ন্যাসীর জীবন, জনসাধারণের নমস্য, কারণ তাঁরা ঈশ্বর উপাসনার সংগে, জ্ঞানেরও পূজারী। তাঁরা জ্ঞান এবং সংস্কারের কেন্দ্রমণি। ধর্মের প্রতিনিধি। গোঁড়ামী দূরীভূত করার পক্ষপাতী। ভারতেও অনুরূপ। কিন্তু শক্তির এত বেশী সমাবেশ ভালো নয়—আরো উত্তম পন্থা নির্ণয় করতেই হবে। ধৈর্য ধরে এই কাজে অগ্রসর হতে হবে। ভারতে গিয়ে আপনারা যে-কোন ধর্মীয় অনুশাসন যে-কোন গৃহীকে শেখাতে যাবেন। হিন্দু—বের হয়ে, আপনার কথা শুনে—মুখ ফিরিয়ে নেবে। সমস্ত জগৎ তাদের দিলেও তারা বলবে, আমরা ভালই আছি। তোমার জগতে দরকার নেই। সেই সত্যিকার মানুষ—সে যা' শিখেছে, তাই পালন করতে চায়। এতে আমি বলতে চাই, সে এক অসাধারণ শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা তাকে শুধু সংস্কৃত করতে পারি—অন্য আকারে ধর্মীয় অন্তর্নিহিত প্রাণধারা নষ্ট করতে পারি নে। ভারতীয় ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের হাতে ইহাকে শুদ্ধ করার দায়িত্ব দিলে জনসাধারণের জীবনমান অনেক উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছাবে। আপনারা জানেন, কাগজে-পত্রে এই কার্যের পরিকল্পনা বেশ সুন্দরভাবেই করা হ'য়েছে—একই সমান্তরালভাবে আমি এই ভাবধারাগুলিকে কল্পনা থেকে বাস্তব জগতে রূপায়িত করতে চাই।

দৈবক্রমে, আমার শিক্ষকরূপ এক আশ্চর্য জীবনময় আচার্যের সাক্ষাৎ মিলেছিল। তিনি বুদ্ধিমূলক উপাধির দিকে বড়ো যান নি—যৎসামান্য পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই সোজা জ্ঞান বা সত্যলাভের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল। নিজের ধর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ) প্রচেষ্টার সুরু হয়। ক্রমে অন্য ধর্মের অন্তর্নিহিত, সত্য অনুসন্ধানের চিন্তা জাগে এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই একের পর এক সকল শ্রেণীর বা ধর্মসম্প্রদায়ের সংগেই তিনি যুক্ত হন। সেই সময়ের জন্যে, তারা যা বলতো, তাই তিনি করতেন—এই বিভিন্ন শ্রেণীর অনুসরণকারীদের সংগে তিনি বাস করতেন। একে একে সেই সেই শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ অন্তর্নিহিত আদর্শের অর্থ অন্তরে অনুভব করতে-থাকেন। অল্প কয়েক বছর পরে তিনি অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যেতেন। যখন তিনি সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে কাটিয়ে এলেন, তখন সব মতই ভাল—এইরূপ তাঁর ধারণা জন্মালো। ইহাদের কাহারও বিরুদ্ধ সমালোচনা করার কিছুই তাঁহার রইলো না—এই বিভিন্ন পথ একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের আচার্য একজন প্রবীণ মানুষ, যিনি কখনও অঙ্গুলিদ্বারা একটি মুদ্রাও স্পর্শ করেন নি। প্রদত্ত অতি সামান্য খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন, সামান্য কয়েক গজ কার্পাস বস্ত্র—তাঁর পরিধেয় মাত্র। অন্য দামী সামগ্রী তাঁকে দেওয়া হ'তো না। এই অত্যাশ্চর্য আদর্শ নিয়ে মুক্ত জীবনযাপন করতেন তিনি। ভারতীয় সন্ন্যাসীর জীবন মুক্ত—আজ হয় তো তিনি রাজপুত্রের মিত্র, তাঁর সংগে ভোজনাদি করেন এবং আগামী কাল তিনি ভিক্ষুকের সংগে বৃক্ষতলে নিদ্রা যান। তাঁকে সবার সান্নিধ্যেই আসতে হবে—তাঁকে সবসময় চলার ওপরেই থাকতে হবে।

আমাদের আচার্য এই মহান সন্ন্যাসী, ছেলেবেলায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, অত্যন্ত শৈশবকালে। যখন তিনি যৌবনে উপনীত হন এবং সমস্ত ধর্মীয় প্রভাব তাঁর মধ্যে বিকশিত, সেই সময়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর সংগে দেখা করতে আসেন। যদিও শৈশবে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তথাপি বয়স না বাড়া পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। সেই সময়ে এসে স্ত্রীকে বললেন 'শোনো, আমি তোমার স্বামী, এই দেহের ওপর তোমার একটা অধিকার আছে। কিন্তু আমি যদিও বিবাহিত—জৈবিক জীবন কাটাতে পারবো না। এই ব্যাপারে তোমার মত কি?'

সেই রমণী অনেক কাঁদলেন এবং বললেন—'ঈশ্বরের নিকট তুমি সত্বর পৌঁছাও—ভগবান তোমাকে করুণা করুন। আমি রমণী হয়ে তোমাকে পথভ্রষ্ট করব না। যদি পারি তোমাকে সাহায্য করবো। তোমার কাজ তুমি করো।' তিনি সেই রমণী—শ্রীশ্রীমা।

স্বামী চলে গেলেন এবং সন্ন্যাসী হলেন তাঁর নিজের ভাবধারায়। দূর থেকে রমণী যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে থাকলেন এবং পরবর্তীকালে যখন সেই ব্যক্তি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষে রূপান্তরিত হ'লেন—সেই রমণীই হ'লো তাঁর প্রথমা শিষ্যা এবং শেষ জীবন সেই পুরুষের দেহের সেবা করেই কাটান। সেই মহাপুরুষ এমন অবস্থার মধ্যে পৌঁছে ছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ভোলা তাপসে পরিণত হয়েছিলেন। কোন সময়ে যখন কথা বলতেন, সমাধির এমন স্তরে পৌঁছতেন যে,জ্বলন্ত অংগারের ওপরে বসেও তিনি কিছুই অনুভব করতেন না। জ্বলন্ত অংগার! দেহের সমস্ত চৈতন্য ও বোধশক্তি কোন অসীমে মিশে যেতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমার গুরু—তিনি আমার পিতার চেয়েও বেশ'—আমি গুরুর সন্তান এবং শিশু সর্বপ্রকারে। আমি তাঁর বাধ্য এবং তিনি আমার পূজ্য। আচার্য। তিনি আমাকে দেখালেন মুক্তির পথ। আমি তাঁরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

আমি বিশ্বাস করি—পুরুষদের যে অসাধারণ সাড়া এসেছে, ভারতীয় নারীরা, ইংলিশ এবং আমেরিকান মহিলারাও সমভাবে এই কার্যভার গ্রহণ করবে। কোন পুরুষই নারীদের হুকুম করবে না অথবা কোন নারীও পুরুষকে নয়। প্রত্যেকেই স্বাধীন। কিসের বাঁধনে তারা গ্রথিত থাকবে—ভালবাসার। নারীরা তাদের ভাগ্য গড়ে তোলবে—পুরুষের চেয়ে ভালভাবে এবং আমি সুরুতেই কোন ভুল করতে চাই না। কারণ আজকের যে কোন ক্ষুদ্র ভুলই পরে বড় হয়ে দেখা দেবে এবং উত্তরাধিকারী হিসেবে ভবিষ্যতে তা রোধ করবারও অবকাশ থাকবে না। সুতরাং শুধু পুরুষের দ্বারাই আমি কাজ চালাতে চাই না—নারীকেও নিয়োগ করতে হবে। নইলে জোর করে, কোনো মতবাদ তাদের ওপর চালিয়ে দেওয়া হ'তে পারে। আমার সে সুযোগ আছে। আমি আপনাদের আমার গুরুপত্নীর কথা বলেছি। তাঁর প্রতি আমার গভীর ভক্তি। তিনি কখনই আমাদের ভ্রান্ত করেন না। সুতরাং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া চলে।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'

অনুবাদ—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থাপত্যশিল্পে রামায়ণ মহাকাব্যের রূপায়ণ

শ্রী হিমাংশুভূষণ সরকার

দ্বীপময় ভারতের কবিকুল রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া বিপুলায়তন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাস্কর এবং শিল্পিগণও মন্দিরগাত্রে সেই কাহিনীকে শাশ্বতরূপ দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিভার স্বাক্ষরচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে প্রাম্বানান, পনতরণ বা পুহন এবং আঙ্কোর ভাট মন্দিরগুলির প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ রামচিত্রাবলীর অপূর্ব শিল্পায়নে। সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাস্কর্য এবং দেবায়তনে যে-রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল, সেই আলোচনার প্রাথমিক পর্ব হিসাবে আমাদিগকে এই অপূর্ব মন্দিরগুলির নির্মাণকাল এবং তাহাদের পটভূমিকা জানিতে হইবে।

যবদ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত প্রাম্বানানের শৈব মন্দিরগুলি খুব সম্ভবত নবম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। পূর্ব যবদ্বীপের পনতরণ মন্দির উহার কয়েকশতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের অভগ্ন অংশে এবং বিচ্ছিন্ন প্রস্তরগাত্রে যে-সমস্ত তারিখ উৎকীর্ণ আছে তাহাতে মনে হয় যে এই মন্দির ১৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। ইন্দোচীনের বা পুহন মন্দিরটি মহারাজ পঞ্চম জয়বর্মণের (৯৬৮—১০০১ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় বিশ্ববিখ্যাত আঙ্কোর ভাটের মন্দিরের নির্মাণকাল সম্বন্ধে শিলাসাক্ষ্য এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণাবলী নীরব। আধুনিক পণ্ডিতগণ সাধারণত এই মন্দিরকে দ্বিতীয় সূর্য বর্মণের রাজত্বকালের (১১১২ হইতে আনুমানিক ১১৫২ খৃঃ অঃ) স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে গণ্য করিয়া থাকেন। এই বিভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন দৃশ্যে রামায়ণের যে কাহিনী অঙ্কিত হইয়াছে তাহার তুলনামূলক আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার বিবরণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে দ্বীপময় ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধীয় একখানি ইংরাজী পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সম্বন্ধে একখানি বৃহত্তর বাংলা পুস্তক রচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে।

প্রাম্বানানের মন্দিরগুলি শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। উহার মন্দিরগাত্রে বিংশতিসংখ্যক রামায়ণ-চিত্রাবলী পরিবেশিত হইয়াছে। উহাতে রামায়ণের আদিপর্ব হইতে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরগণের লঙ্কাতীরে আগমনকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে, পরবর্তী কাহিনীসমূহও সন্নিকটবর্তী ব্রহ্মামন্দিরে অঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্ত চিত্রাবলীর ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। প্রাম্বানান মন্দিরের রামায়ণ চিত্রাবলী যেস্থলে শেষ হইয়াছে, পনতরণ মন্দিরের কাহিনী তাহার একটু পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত মহাকাব্যের বালকাণ্ড-কাহিনী দ্বীপময় ভারতের শিল্প ও সাহিত্যে রূপায়িত হয় নাই।

প্রাম্বানানের রামায়ণ কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর চিত্র লইয়া; সন্নিকটে দেবগণ রহিয়াছেন এবং গরুড়পক্ষী বিষ্ণুকে একটি নীলপদ্ম প্রদান করিতেছেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে চিত্রের দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট দেবমূর্তিগুলি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণের। তাঁহারা বিষ্ণুকে শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অতঃপর আমরা মহামুনি বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পাই; তিনি মহারাজ দশরথের সাক্ষাৎপ্রার্থী। মহারাজকে প্রমোদ-উদ্যানে প্রধানা মহিষী, চারি পুত্র এবং একটি কন্যার সহিত দেখা যাইতেছে। ডাঃ স্টুটের হেইম্ বলিয়াছেন যে দশরথের এক কন্যার উল্লেখ আছে হিকায়ৎ-রচনাবলীতে। চন্দ্রাবতীর বাংলা রামায়ণেও কুকুয়া-নাম্নী এক কন্যার সন্দর্শন লাভ করি। নবম শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন ভারতীয় গ্রন্থে দশরথের কোন কন্যার উল্লেখ পাই না। রামায়ণের কোন কোন প্রাচীন সংস্করণে সীতাকে দশরথের কন্যারূপে বর্ণনা করা হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে উহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কারণ সীতা দশরথের কন্যা হইলে প্রাম্বানানের চিত্রাবলীতে ধনুক-প্রতিযোগিতার কোন প্রয়োজন থাকিত না। যাহা হউক দশরথ মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা তাড়কা-রাক্ষসীর নিধনচিত্রটি দেখিতে পাই। অতঃপর সকলে বিশ্বামিত্রের কুটীরে উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র সেখানে রাক্ষস নিধনে ব্যাপৃত হইলে মুনিগণ তাঁহাকে সম্বর্দনা করিলেন।

রাক্ষসগণের মধ্যে মারীচ সমুদ্র পর্যন্ত তাড়িত হইল এবং অপর একটি রাক্ষস নিহত হইল। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা বিশ্বামিত্র, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র এবং মহারাজ জনককে দেখিতে পাই। ঋষি বিশ্বামিত্রের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র ধনুক আকর্ষণপূর্বক সীতাদেবীকে লাভ করিলেন। বিবাহের পর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং পথিমধ্যে পরশুরামের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। পরশুরাম ধনুক আকর্ষণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিলেন। পরবর্তী দৃশ্যে আমরা দেখিতে পাই যে পরশুরাম পরাজিত হইয়াছেন।

ফসুম পেনের স্মর—যাদুঘরে কাম্বোডীয় রামায়ণের কয়েকটি দৃশ্য অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। উহার মধ্যে জনক কর্তৃক সীতার আবিষ্কার, রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ এবং বিবাহের পর পরশুরামের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। আঙ্কোর ভাটের প্রাচীর গাত্রে আমরা দেখিতে পাই যে চিত্রটির

কেন্দ্রস্থলে একজন যুবক ধনুর্বাণ হস্তে লক্ষ্যভেদ করিতেছেন। জেমর শিল্পিগণের এই চিত্রায়ণে একটি ঘূর্ণায়মান চক্রের পশ্চাতে একটি পক্ষী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ধনুর্বাণহস্তে যে-যুবকটি দণ্ডায়মান তাহার সম্মুখে স্বর্ণজ্জ্বতা একজন নারীকে দেখা যাইতেছে। নিকটে একজন ব্রাহ্মণও সমুপস্থিত; তাঁহার জটাজাল পশ্চাতে সংবদ্ধ রহিয়াছে। এই দৃশ্যটি স্বভাবতই দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু অনেকেই ইহাকে মহারাজ জনকের সভায় ধনুর্বাণ-প্রতিযোগিতার দৃশ্য বলিয়া মনে করেন।

প্রাম্বানানের শিল্পিগণ অতঃপর প্রাক্ বনবাস কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন কিন্তু রাজমহিষী কৈকেয়ী উহাতে বাধা প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রের বনবাস দাবী করিয়া বসিলেন। তিনি চাহিলেন যে রাজমুকুট ভরতের করতলগত হউক। পরবর্তী দৃশ্যে ভরতকে সিংহাসনে আসীন দেখিতেছি; চতুর্দিক আনন্দোৎসবে মুখর। ইহার পরবর্তী দৃশ্যে আমরা ম্রিয়মাণ দশরথ ও কৌশল্যাকে দেখি। অতঃপর রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে চলিলেন। ইত্যবসরে দশরথের মৃত্যু হইল এবং তাঁহার দেহের সংকার করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল। কৌশল্যা এবং ভরত ব্রাহ্মণদিগকে দান-ধ্যান করিতে লাগিলেন।

পরবর্তী চিত্রে দেখিতে পাইতেছি যে ভরত বনবাসী রামচন্দ্রকে রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। দৃশ্যটি এই বনে সংস্থাপিত করা হইয়াছে। রামচন্দ্র রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভরতকে তাঁহার পাদুকা দিয়া দিলেন; উহাই শূন্য সিংহাসনে রামচন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করিবে। পরবর্তী চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, জনকনন্দিনীসহ বনবাসযাত্রীরা অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছেন। এই সময় বিরাট কর্তৃক সীতা নিগৃহীত হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করিলেন। এই দৃশ্যটি আঙ্কোর ভাটেও রূপায়িত হইয়াছে। সেখানে শিল্পী একটি বনের দৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন; উহার অভ্যন্তরে একজন রাক্ষস বামবাহুতে করিয়া একজন নারীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

রাক্ষসটি ধনুর্বাণধারী দুইজন পুরুষের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। পুরুষদ্বয় স্বভাবতই রাম-লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহই নহেন, কিন্তু উহার পরিকল্পনায় সংস্কৃত রামায়ণকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করা হয় নাই। ইহার পরে প্রাম্বানানের শিল্পিগণ আর কয়েকটি দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা আমরা আঙ্কোর ভাটে দেখিতে পাই না। কারণ পরবর্তী দৃশ্যটি রাম, সীতা এবং বায়সের বিখ্যাত কাহিনী। সীতা বৃক্ষশাখে মৃগমাংস শুকাইতে দিয়াছেন; পক্ষীটিকে তাড়াইতে গেলে উহা সীতাকে আক্রমণ করিল। জনকনন্দিনী তখন শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইলেন। শ্রীরাম ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। উহা পক্ষীটিকে সর্বত্র অনুসরণ করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বায়সপক্ষীটি অবশেষে শ্রীরামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করিল, কিন্তু নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইতে পারে না বলিয়া সে রামচন্দ্রকে তাহার একটি চক্ষু উন্মূলিত করিতে দিল। চিত্রে পক্ষীটির মস্তক ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহার পরবর্তী দৃশ্য শূর্পণখাকে লইয়া। শ্রীমতী শূর্পণখা সুন্দরী নারীবেশ পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। রামচন্দ্র তাহাকে লক্ষ্মণের নিকটে প্রেরণ করিলে লক্ষ্মণও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না।

ইহার পরবর্তী দৃশ্য সেই বিখ্যাত স্বর্ণমৃগের কাহিনী, ইহা প্রাম্বানান এবং আঙ্কোর ভাট উভয়স্থলেই আছে। আমরা প্রাম্বানান চিত্রে দেখিতে পাইতেছি যে শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণমৃগকে অনুসরণ করিতেছেন আর একদিকে দেবর লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীরাম সেই মায়ামৃগকে নাশ করিলে রাক্ষস মারীচ মায়ামৃগের দেহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠধ্বনি অনুকরণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতাদেবী সেই আর্তধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ইহার পরবর্তী চিত্রে আমরা দেখিতেছি যে রাবণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জনকনন্দিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন।

প্রাচীন যবদ্বীপীয় শিল্পী অতঃপর রাবণ এবং জটায়ুর সংগ্রাম মন্দিরগাত্রে অঙ্কন করিয়াছেন; জটায়ু এই সংগ্রামে পরাজিত হইলেন। রাবণ সীতাদেবীকে পুনরায় লইয়া যাইবার পূর্বেই তিনি জটায়ুকে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান করিলেন; মুমূর্ষু জটায়ু উহা রামচন্দ্রকে দিলেন। ইহার পরবর্তী দৃশ্য রাম, লক্ষ্মণ এবং কবন্ধের কাহিনী; উহা প্রাম্বানান এবং আঙ্কোর ভাট উভয়স্থলেই বিদ্যমান। প্রাম্বানানের শিল্পী কবন্ধকে অদ্ভুতরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন; কারণ তাহার স্কন্ধের উপর একটি মস্তক থাকিলেও শিল্পী দ্বিতীয় আর একটি মস্তক উদরের উপর সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আঙ্কোর ভাটের শিল্পী এই দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ততার সহিত মূলানুসরণ করিয়াছেন। প্রাম্বানানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই বিকটাকার রাক্ষস মূর্তি হইতে একটি দিব্য দেহ বহির্গত হইয়া মুক্তিলাভ করিতেছে। অতঃপর রাম-লক্ষ্মণ অরণ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে একটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন; উহা ছিল শাপগ্রস্ত তপস্বী।

প্রাম্বানানের চিত্রাবলীর পরবর্তী দৃশ্যে আমরা রাম, লক্ষ্মণ এবং হনুমানকে একত্র দেখিতে পাই; পরে তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া যান। প্রাম্বানান মন্দিরগাত্রে একটি অদ্ভুত দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে যাহা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোন মন্দিরে বিদ্যমান নাই। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীমান লক্ষ্মণ একটি বাঁশের জলাধার পূর্ণ করিতেছে। রামচন্দ্র এই জল পান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহা তিক্ত। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে উহা সুগ্রীবের অশ্রু। রামচন্দ্র তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। আঙ্কোর ভাটে এই আখ্যায়িকাটির শেষাংশ পর্বতাঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ সমাসীন; সুগ্রীব মুকুট মস্তকে তাঁহাদের সহিত আলোচনায় রত। বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া সুগ্রীব বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করিতেছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রাম্বানানে একটি অতিরিক্ত দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা পুয়ন বা আঙ্কোর ভাটে নাই। শ্রীরামচন্দ্র সপ্ততালবৃক্ষ ভেদ করিয়া নিজের শৌর্য সম্বন্ধে সুগ্রীবের সন্দেহ নিরসন করিতেছেন। সুগ্রীব এবং বালির দ্বৈরথ সংগ্রাম এই তিনটি মন্দিরগাত্রেই রূপায়িত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাম্বানানের দৃশ্যাবলীতে

একটি অতিরিক্ত ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে যাহা আঙ্কোর ভাট বা পুয়নে নাই। প্রাম্বানান মন্দিরে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রামচন্দ্র প্রথমে সুগ্রীবকে সাহায্য করেন নাই, কারণ তিনি সুগ্রীব এবং বালির মধ্যে কোন আকৃতিগত পার্থক্য দেখিতে পান নাই। সুতরাং সুগ্রীব পরাজিত হইলেন। রামচন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী সুগ্রীব এইবার কণ্ঠে পত্রমাল্য ধারণ করিয়া নূতন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন; এইবার রামচন্দ্রের শরাঘাতে বালি নিহত হইলেন।

বালির মৃত্যু যে বা পুয়নের চিত্রে অনুমান করিয়া লইতে হয় আঙ্কোর ভাটের ক্ষুদ্র একটি দৃশ্য ইহা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে; খেমর শিল্পিগণের চিত্রে সুগ্রীবের কণ্ঠে পত্রমাল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এইবার সুগ্রীব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পত্নীলাভ করিলেন; বানরদিগকে আনন্দোৎসবে মত্ত দেখা যাইতেছে। অতঃপর রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব যুদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ সভায় মিলিত হইলেন। সুগ্রীবের পশ্চাৎদিকে মর্কটবাহিনীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সুগ্রীব বলিলেন যে, তাঁহারা সীতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন। বানরগণের পত্নীগণকে প্রাম্বানানে মানবীরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে; মন্দিরগাত্রের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য বানরদের প্রাসাদ কৌতুকপ্রদ চিত্রও অঙ্কিত করা হইয়াছে। বা পুয়ন এবং আঙ্কোর ভাটের মন্দিরগাত্রে এই অতিরিক্ত দৃশ্যগুলি অঙ্কিত হয় নাই।

প্রাম্বানান বা পুয়ন এবং আঙ্কোর ভাটের শিল্পিগণ অতঃপর অশোকবনের দৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন। প্রাম্বানানের মন্দিরগাত্রে দেখিতে পাইতেছি যে একজন চেড়ী অরণ্যাশ্রয়ী হনুমানের দিকে সীতা এবং ত্রিজটার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহার পরেই হনুমানকে জনকনন্দিনীর সহিত আলোচনায়রত দেখা যাইতেছে। সীতা এবং হনুমানের দৃশ্যটি আঙ্কোর ভাটেও অঙ্কিত হইয়াছে। এই দৃশ্যে রাক্ষসী ব্যতীত অপর যে মানবী মূর্তিটি দেখা যাইতেছে তাহা বিভীষণ পত্নী সরমার বলিয়া অনুমিত হয়। বা পুয়নের মন্দিরগাত্রেও চেড়ীগণ পরিবৃতা সীতাকে অশোকবনে দেখা যাইতেছে। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে হনুমান রহিয়াছেন, হস্তে রহিয়াছে চূড়ামণি। চূড়ামণিটি আঙ্কোর ভাটের শিল্পীও অঙ্কন করিতে বিস্মৃত হন নাই।

প্রাম্বানানে সীতা এবং হনুমানের সাক্ষাৎকারের পরবর্তী দৃশ্য হইল হনুমানের বন্ধনদশা। রাক্ষসেরা হনুমানকে বন্দী করিয়া তাহার লাঙ্গুলে ছিন্নবস্ত্র পরাইয়া দিতেছে। উহা তৈলসিক্ত করিয়া অগ্নিসংযোগ করা মাত্র হনুমান লম্ফপ্রদান পূর্বক 'জ্বলন্ত মশালের' মতো গৃহাদির উপর দিয়া চলিলেন। অতঃপর লঙ্কাদহনকার্য সম্পন্ন করিয়া মর্কটকুলশিরোমণি হনুমান তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবকে বর্ণনা করিলেন। রামচন্দ্র সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন, কারণ তিনি রামচন্দ্রকে সমুদ্রের পরপারে লঙ্কায় যাইবার কোন পন্থা নির্দেশ করিতে পারিলেন না। তখন সন্ত্রস্ত হইয়া বরুণদেব তাঁহাকে লঙ্কায় যাইবার জন্য সেতুনির্মাণ করিতে বলিলেন। যদিও সমুদ্রের প্রাণিগণ এই কার্যে বাধা প্রদান করিল তথাপি সেই নির্মাণকার্য বন্ধ হইল না। লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং বানরবাহিনী অতঃপর লঙ্কায় সমুপস্থিত হইলেন। আঙ্কোর ভাটের চিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ রাবণের অনুজ দলত্যাগী বিভীষণকে সম্বর্ধনা জানাইতেছে। এই দৃশ্যটি ব্যতীত অপরাপর প্রধান ঘটনাবলী, যেমন হনুমানের অশোকবনে আত্মগোপন। সীতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার। হনুমানের লাঙ্গুলের অগ্নিতে লঙ্কাদহন, রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার অভিজ্ঞতার বর্ণনা, সেতুবন্ধন ইত্যাদি দৃশ্য পনতরণের মন্দিরগাত্রে অধিকতর বিশদভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনে হয় যে হনুমান কর্তৃক লঙ্কাদহন, প্রমোদ-উদ্যানের উৎসাদন এবং রাক্ষসগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ পনতরণের শিল্পিগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

এইবার রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড আরম্ভ হইল। ইহার ঘটনাবলী বা পুয়ন। আঙ্কোর ভাট এবং পনতরণের মন্দিরগাত্রে নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বা পুয়নের একটি দৃশ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ রূপায়িত হইয়াছে। রাবণ রথে আরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের দিকে তীরনিক্ষেপ করিতেছেন। রামচন্দ্র তাঁহার একপদ হনুমানের স্কন্ধে এবং অপর পদ তাহার লাঙ্গুলে রাখিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত। হনুমানও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া রাবণের রথের অশ্বটিকে আহত করিতেছেন; আশ্চর্যের বিষয় যে ঐ অশ্বটির মস্তক মনুষ্যের মত। পণ্ডিতপ্রবর ফিনো মনে করেন যে রাম-রাবণের এই দ্বৈরথ সংগ্রামটি রামায়ণের উনষষ্টিতম সর্গের প্রতিধ্বনি (৫, ১২২) রাবণের সহিত হনুমান এবং নীলের সংগ্রামও অঙ্কিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সুগ্রীব এবং বজ্রদংষ্ট্রা, রথারূঢ় রামচন্দ্রের (যাহা সংস্কৃত মহাকাব্যে নাই) একজন রাক্ষস সেনাপতির সহিত যুদ্ধ, সুগ্রীব এবং কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ এবং রাম ও মকরাক্ষের যুদ্ধ বিশদভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তরবারি, বর্শা, বৃক্ষের শাখা, বর্ম এবং অসংখ্য যোদ্ধার বাহুল্যে চিত্রগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। আঙ্কোর ভাটের দৃশ্যগুলিও এই দোষমুক্ত নহে। একজন ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে সংস্কৃত রামায়ণের সহিত সংশ্লিষ্ট দৃশ্যটির তুলনা করিলে অনায়াসেই চিত্র হইতে পুলস্ত্যপুত্র মহোদর এবং অঙ্গদের সংগ্রামটিকে চিনিয়া লওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, নীল ও প্রহস্ত, হনুমান ও নিকুম্ভ এবং সুগ্রীব ও কুম্ভকর্ণের সংগ্রামের দৃশ্যগুলিও অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন ঘটনাবলী বা পুয়নের মন্দিরে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধকাণ্ডের চিত্রাবলী খেমর শিল্পিগণ একঘেঁয়ে করিয়া তুলিয়াছেন,; পনতরণের অনুরূপ চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দর, যদিও ওয়েয়াঙের প্রভাব সেখানে সুস্পষ্ট।

বা পুয়নের শিল্পিগণ নাগপাশে আবদ্ধ রামলক্ষ্মণের মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে গরুড়পক্ষীর আবির্ভাবে সর্পকুল অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। রাম-রাবণের যুদ্ধ বা পুয়ন এবং আঙ্কোর ভাটের মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বানর সেনাপতি নীলের বিস্ময়কর চঞ্চলগতি এবং তৎপরতা আঙ্কোর ভাটে সুন্দররূপে রূপায়িত হইয়াছে। আঙ্কোর ভাটের একটি দৃশ্যকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; দুঃখের বিষয় উহার একটা অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান বলিয়া মনে করিলেও ইহা সীতার অগ্নিপরীক্ষা বলিয়াই অনুমিত হয়।

এমন কি, একজন ফরাসী পণ্ডিত দাবী করিয়াছেন যে তিনি চিত্রটিতে বিভীষণ, সুগ্রীব এবং হনুমানের মূর্তি সনাক্ত করিতে পারিয়াছেন। সে যাহাই হউক, অগ্নির লেলিহান জিহ্বাকে ভুল করিবার সম্ভাবনা কম। পণ্ডিতপ্রবর কিনো এই দৃশ্যটি বা পুয়ন মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেও ইহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অতঃপর কুবেরের পুষ্পকরথ বিজয়ীদলকে লইয়া অযোধ্যায় চলিল। রথটি হংসবাহিত এবং দৃশ্যটির অলংকরণ প্রশংসনীয়। এই দৃশ্যটি বা পুয়ন এবং আংকোর ভাট উভয় স্থলেই সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রাম্বানান মন্দিরের সন্নিকটে যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন চিত্রাংশ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল: লঙ্কায় বানরবাহিনীর অভিযান, বানরদলের সহিত কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ এবং চিতার উপর শায়িত রাবণের দেহ। অনেকগুলি চিত্রের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনো সম্ভবপর হয় নাই।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য খুব বেশী নাই। বাল্মীকি রামায়ণের কোন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা ক্ষেত্র বিশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং স্থল বিশেষে নূতন ঘটনাবলীর অবতারণা করা হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে বা পুয়ন এবং আংকোরভাটের চিত্রাবলী বাল্মীকি রামায়ণের প্রায় শেষ পর্যন্ত অবরোহণ করিয়াছে, কিন্তু প্রাম্বানান এবং পনতরণের চিত্রাবলী তাহার বহু পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে। একটি বিষয়ে এই চিত্রাবলীর মধ্যে সঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে: কেহই সংস্কৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড হইতে কোন দৃশ্য পরিবেশন করেন নাই। বস্তুতপক্ষে যবদ্বীপীয় শিল্পিগণ রামায়ণের প্রথমের অংশটি যতটা বিশদভাবে রূপায়ণ করিয়াছেন, ক্ষের শিল্পিরা ঠিক ততটা নিষ্ঠা সহকারেই শেষের অংশটি অঙ্কন করিয়াছেন। মনে হয় যে কাম্বোডিয়ার শিল্পিগণ রামায়ণের এমন একটি সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছিলেন যাহা বাল্মীকি রামায়ণের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাম্বানানের চিত্রাবলীতে কয়েকটি দৃশ্য আছে যাহার ব্যাখ্যা মালয়দেশীয় রামায়ণ হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পনতরণের চিত্রগুলি কাব যোগীশ্বর বিরচিত প্রাচীন যবদ্বীপীয় রামায়ণ কাকাবিনের সহিত আত্মিক যোগসূত্রে গ্রথিত। এই কাকাবিন আবার অংশত ভট্টিকাব্যের অনুবাদ এবং অংশত উহার যবদ্বীপীয় রূপায়ণ সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রামায়ণ চিত্রাবলী পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে সম্ভবত আসা যায় যে দ্বীপময় ভারত চম্পা এবং কাম্বোডিয়াতে বিভিন্ন গোত্রীয় রামায়ণ প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত রামায়ণের উদ্ভবস্থল কোথায়, কিরূপে ইহারা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইল এবং পরে আবার সম্পর্কহীন হইয়া গেল, যাওয়ার পথে ইহারা কতটুকুই বা গ্রহণ করিল আর কতটুকুই বা পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়া গেল তাহা দীর্ঘকাল পরে আজ আর জানিবার উপায় নাই।

৺জগন্নাথ

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

মন্দিরে নয়—সিন্ধুনীরে
পেয়েছি তোমায় জগন্নাথ,
পাষাণ-কারার, রুদ্ধ প্রাচীরে
রহিবে কেমনে বিশ্বনাথ?
বিশ্বমাঝে ব্যাপ্ত তুমি
গুপ্ত নহে অন্ধকারে,—
পূজারি তোমায় বন্দী করেছে,
ভাবে সে মিথ্যা অহঙ্কারে।
নিখিলের নাথ নিখিল নিলয়ে
হৃদয়-সিংহাসনে,
তুমি চেয়ে আছ আমাদের পানে
করুণা-বিকচ নয়নে।
ঊর্মিমালার দোদুল দোলায়
তোমার রথের ধ্বনি,—
সাগরের পানে চেয়ে থাকি আর
কান পেতে আমি শুনি।

একি উচ্ছ্বাস, একি উত্তাল
লহরীমালার খেলা,…
তারি মাঝে বুঝি ক্ষুদ্র মানব
ভাসায়েছে তার ভেলা।
বুকে করে তারে তীরে এনে দাও
ছোট তাহার কুটীরে,—
কি গান তাহার হৃদয়ে বাজাও
চির দিনমান অধীরে।
বধির শ্রবণ, অন্ধ নয়ন
শোনে নি দেখে নি চেয়ে,
তাই বুঝি তারে শুনাইছ গান
দিয়েছ নয়ন ছেয়ে।
অনিমেষে আমি চেয়ে থাকি আর
শুনি যে তোমার গান,
শোক, ব্যাধি, জরা দূরেতে পালায়
উল্লাসে ভরে প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯০৮ সালে। নাটক রচনার পেছনে রয়েছে একটু ইতিহাস। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন লাইব্রেরীর দোতালায় খড়ের ঘরে ছেলেদের নিয়ে। এক সময় এই ছেলেদের মধ্যে দেখা দেয় উচ্ছৃঙ্খলতা; তখন কবিগুরু তাদের কিছু না বলে একটি নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন ঐ ঘরে বসেই। প্রত্যেকদিন তিনি নূতন নূতন সুর দিয়ে গান রচনা করতে লাগলেন, আর সান্ধ্যকৃত্যের পর ছেলেদের সঙ্গে বসে তাদের গান শিখিয়ে দিতেন; এই যাদুমন্ত্রে কোথায় গেল তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা আর কোথায় গেল তাদের অসংযম! ছেলেরা মহানন্দে গান শিখে নিল। এইভাবেই রচিত হল 'শারদোৎসব' নাটকটি। রবীন্দ্রনাথ একদিন এই নাটকটি সবাইকে পড়িয়ে শোনালেন নাট্যঘরে একটি সভার আয়োজন করে।

শরৎকাল; নির্মল আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে; সূর্যের আলোয় চারদিকে ধরেছে সোনালি রঙ। আশ্বিনের ছুটির আমেজ লেগেছে ছেলেদের মনে; তারা আর ঘরে থাকতে চাইছে না, তাদের মন ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে বনে, মাঠে মাঠে। গান করতে করতে তারা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল; সেই নগরের ধনী কৃপণ লক্ষেশ্বর ছেলেদের এই আনন্দ-কোলাহলে হিসেব কষা ভুল হচ্ছে দেখে তাদের তাড়া করল। এই গোলমালে একটি ছেলে মজা করবার জন্যে লক্ষেশ্বরের কানে-গোঁজা হিসেব লেখার কলমটি রাখল লুকিয়ে। এমন সময় ছেলেদের ঠাকুর্দা এসে তাদের গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে চললেন পঞ্চাননতলার মাঠে ঘুরিয়ে আনতে। তারা কোলাহল করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকলে আবার সেখানে লক্ষেশ্বর এসে হাজির হল তার হারানো কলম নিতে। কলম পেয়ে লক্ষেশ্বর আবার বাড়ী গিয়ে বসে গেল হিসেব কষতে; এমন সময় উপনন্দ বলে একটি ছেলে তার কাছে এলে লক্ষেশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করল যে তার প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়েছে কি না; এর উত্তরে উপনন্দ দিল তার প্রভুর মৃত্যু-সংবাদ। সংবাদ শুনেই লক্ষেশ্বর রেগে আগুন; তখন উপনন্দ তাকে শান্ত করে বলল যে সেই তার প্রভুর ঋণশোধ করবে। একদিন উপনন্দ ছিল পথের ভিখিরী; তার প্রভু তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন। এ-উপকার উপনন্দ কোনোদিন ভুলতে পারে নি। তাই সে জানাল যে, সে লক্ষেশ্বরের দাসত্ব করে প্রভুর ঋণশোধ করবে। পাছে উপনন্দ তার ঘাড়েই চাপে, এই আশঙ্কায় ধনী লক্ষেশ্বরের মুখ শুকিয়ে গেলে উপনন্দ জানাল যে, সে লক্ষেশ্বরের অন্নপ্রার্থী নয়। স্থির হল, উপনন্দ পুঁথি নকল করে যে টাকা পাবে, তা মাসের তিন তারিখের মধ্যে সে লক্ষেশ্বরকে দিয়ে দেবে।

উপনন্দ চলে গেলে লক্ষেশ্বরের ছেলে ধনপতি এসে তার বাবাকে বলল যে সেও ছুটি পেলে বেতসিনীর ধারে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আনন্দোৎসব করতে পারে। ঐ বেতসিনীর কথা শুনে লক্ষেশ্বর আঁৎকে উঠল; কারণ ঐ নদীর ধারেই সে গজমোতির কৌটা পুঁতে রেখেছিল। লক্ষেশ্বর বাড়ীর কাউকে বিশ্বাস করত না, এমন কি বালক ধনপতিকে পর্যন্ত। তার কেবলই মনে হত, তার ধনের সন্ধানের জন্য যেন সবাই সচেষ্ট। লক্ষেশ্বর তার ছেলেকে সেখানে যেতে না দিয়ে নামতা মুখস্থ করতে বলে নিজে গেল বেতসিনীর তীরে।

এদিকে ছেলের দল নিয়ে ঠাকুর্দা গিয়েছেন নদীর তীরে। সবাই মিলে গান করছে, এমন সময় তারা এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে ঘিরে ধরল তার চারদিকে। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্য তিনি বের হয়েছেন। এ-কথা শুনে ঠাকুর্দার বেশ ভাল লেগে গেল; তিনিও সন্ন্যাসীর পিছু ধরলেন ছেলেদের সঙ্গে। যেতে যেতে এক গাছতলায় পুঁথি লেখায় নিরত উপনন্দকে দেখে ছেলেরা তাকে বলল তাদের সঙ্গে আসতে; কিন্তু বালক উপনন্দ কাজের তাগিদ দিলে সন্ন্যাসী তার পাশে বসে জিজ্ঞাসায় জানতে পারলেন যে, উপনন্দ এমন সুন্দর দিনেও বসে বসে কাজ করছে তার প্রভুর ঋণশোধের জন্য।

ঠাকুর্দা শুনে দুঃখ করে বললেন, আজ নূতন উত্তরে হাওয়ায় নদীর পারে কাশের বনে ঢেউ দিচ্ছে, ধানের খেত সবুজ রং-এ ভরে গেছে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে; এরই মাঝে ঐ ছেলেটি ঋণশোধের জন্য কাজ করেই যাচ্ছে! সন্ন্যাসী সব শুনে বললেন:—

'ছেলেটি তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে. তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি! তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক। এই বলে সন্ন্যাসী যেই পুঁথি নকল করতে লেগে গেলেন, অমনি ঠাকুর্দা আর ছেলের দলও বসে গেল পুঁথি নকল করতে। উপনন্দকে ঋণমুক্ত করে তাকে নিয়ে নৌকো-বাচ করতে যাবে—এই হল ছেলেদের ইচ্ছে।

সন্ন্যাসী উপনন্দের কাছে জানতে পারলেন, যাঁর বীণা শোনার জন্য তিনি এসেছেন, সেই বীণাচার্য সুরসেনের আশ্রিত হচ্ছে উপনন্দ। এক শ্রাবণের প্রবল বৃষ্টিতে লোকনাথের মন্দিরে আশ্রয়প্রার্থী উপনন্দকে নীচজাতি ভেবে মন্দিরের পুরোহিত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন; ঠিক সেই সময় সেই মন্দিরে বীণাবাদনে নিরত সুরসেন এই ব্যাপার দেখে মন্দির ছেড়ে বালকের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে এলেন

নিজের ঘরে। সেই থেকে উপনন্দ বীণাচার্যের কাছেই মানুষ। আচার্য উপনন্দকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লেখার বিদ্যে শিখিয়ে গেছেন। সন্ন্যাসী সুরসেনের বীণা শুনতে না পেয়ে মনে কষ্ট হলেও বললেন, 'বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।'

এই সময় হঠাৎ লক্ষেশ্বরকে সেখানে আসতে দেখে ছেলের দল গেল পালিয়ে। লক্ষেশ্বর এসেই পোঁতা-গজমোতির জায়গায় উপনন্দকে বসে থাকতে দেখে ভীষণ আশঙ্কিত হয়ে তাকে সেখান থেকে উঠে যেতে বললে উপনন্দও তার জবাব দিয়ে বললে যে, সে লক্ষেশ্বরের জায়গায় বসে লিখছে না। তাদের বচসার মধ্যে সন্ন্যাসী লক্ষেশ্বরকে সন্দেহের কারণ জিজ্ঞাসা করলেই লক্ষেশ্বর তাঁকে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে অপমানিত করে। এতে ঠাকুর্দা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন আর উপনন্দ সহ্য করতে না পেরে 'রঙ-বাটা নোড়া' দিয়ে তার মুখ থেঁতো করে দিতে চাইলে।

ঠাকুর্দা ও উপনন্দের ভাবগতিক দেখে লক্ষেশ্বর লুকালো সন্ন্যাসীর পেছনে। সন্ন্যাসী উভয়কে শান্ত করে বললেন যে কত দেশের মানুষকে তিনি ভুলিয়েছেন, কিন্তু লক্ষেশ্বরের কাছে তাঁর হয়েছে পরাজয়। লক্ষেশ্বরের তিনখানা জাহাজ তখনও সমুদ্রে; পাছে সন্ন্যাসীর অভিশাপ লেগে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়, এই ভেবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে ঠাকুর্দাকে বলল, তাঁকে তার ঘরে নিয়ে যেতে। লক্ষেশ্বর আরও বলল যে সন্ন্যাসীকে সে কিছু ভিক্ষে দেবে। লক্ষেশ্বরের কাছ থেকে ভিক্ষে পাওয়া যাবে ভেবে সন্ন্যাসী মহা খুশী। ঠাকুর্দা ও সন্ন্যাসীকে এগুতে বলে দিয়ে লক্ষেশ্বর গেল আবার উপনন্দের কাছে, সেই জায়গা থেকে তাকে ওঠাবার জন্যে। উপনন্দ সেই স্থান ত্যাগ করে লক্ষেশ্বরকে জানাল যে এইভাবে তাকে যে অপমানিত করা হল, সেই অপমান সহ্য করেই সে ঋণ-স্বীকার থেকে মুক্ত হল। এই বলে উপনন্দ সে-স্থান থেকে উঠে গেলে লক্ষেশ্বর দেখল যে তার দিকে কতকগুলো ঘোড়সওয়ার আসছে। তা দেখে মহা উদ্বিগ্ন হয়ে সন্ন্যাসীকে হাতে-পায়ে ধরে উপনন্দের সেই পরিত্যক্ত স্থানে তাঁকে বসিয়ে বলল যে তিনি যেন কোনো কারণেই বা কারো কথাতেই ঐ স্থান ত্যাগ না করেন। তার কথামতো কাজ করলে সন্ন্যাসীকে যে সে আরও খুশী করে দেবে, এ-কথা জানাতেও সে ভুলল না। তার হঠাৎ এই ভাব দেখে ঠাকুর্দা কারণ জিজ্ঞাসা করলে লক্ষেশ্বর জানাল যে তাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে। রাজা মনে করেন, সে অনেক টাকা পুঁতে রেখেছে; সেই জন্যই রাজা প্রজাদের জলদানের ছলে অনেক জায়গা খুঁড়ছেন লক্ষেশ্বরের পোঁতা-টাকা বের করবার জন্তে।

এই সময় দূত এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে জানাল যে তাঁর অসামান্য ক্ষমতার কথা শুনে মহারাজ সোমপাল তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী এবং তিনি যদি একবার মহারাজের কাছে যান, তবে মহারাজ বিশেষ বাধিত হবেন।

সন্ন্যাসী দূতকে জানালেন যে, যেখানে তিনি বসে আছেন ঠিক সেইখানেই তাঁকে অচল হয়ে বসে থাকার এক প্রতিশ্রুতি তিনি একজনকে দিয়েছেন; সুতরাং রাজার প্রয়োজন থাকলে তাঁকেই একবার সন্ন্যাসীর কাছে আসতে হবে। দূত প্রস্থান করলে লক্ষেশ্বর বুঝল যে রাজসমাগমের সম্ভাবনা নিশ্চিত। সে তখন সন্ন্যাসীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল, আর সন্ন্যাসীও ঠাকুর্দাকে বললেন যে তিনি যেন ততক্ষণ ছেলেদের নিয়ে আসর জমিয়ে রাখেন এই কথায় ঠাকুর্দা ছেলেদের কাছে চলে গেলেন। লক্ষেশ্বর আবার মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে সন্ন্যাসীর কাছে মাপ চাইল এই বলে যে, সে তাঁকে অপূর্বানন্দ বলে চিনতে না পেরে বড়ই দুঃখিত।

সন্ন্যাসী ক্ষমা করলে লক্ষেশ্বর তাঁর কাছে জানতে চাইল যে শরৎকালীন বাণিজ্য যাত্রায় কোন্ জায়গায় গেলে তার সুবিধে হবে। এ-কথায় সন্ন্যাসী বললেন যে তিনিও সেই সন্ধানেই ফিরছেন। এই কথায় লক্ষেশ্বরের মনে সন্দেহ হল, বোধ হয় সন্ন্যাসী সেই গজমোতির সন্ধান পেয়েছেন। সে তাঁর কাছ ঘেঁসে জিজ্ঞাসা করল যে সন্ন্যাসী কিছু সন্ধান পেয়েছেন কি না।

এর উত্তরে সন্ন্যাসী কিছু পাওয়ার কথা বললে লক্ষেশ্বরের সন্দেহ গভীরতর হল এবং সন্ন্যাসীর পা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করল যে সেই জিনিসটা কি। সন্ন্যাসী তখন তাকে জানালেন যে লক্ষ্মীর পদ্মটির উপরই তাঁর আকর্ষণ। এ-কথায় লক্ষেশ্বরের লোভ গেল বেড়ে। সে প্রকাশ্যেই বলল যে এ-বিষয়ে বিশেষ খরচপত্র আছে, তা ছাড়া সন্ন্যাসী একাও পেরে উঠবেন না; তাই ভাগে ব্যবসা করার প্রস্তাব করল লক্ষেশ্বর।

সন্ন্যাসী তখন তাকে জানান যে এ-কাজে লক্ষেশ্বরকে সন্ন্যাসী হতে হবে। অনেক চিন্তার পর লক্ষেশ্বর রাজি হয়ে গেল। এই সময় দূরে রাজাকে আসতে দেখে লক্ষেশ্বর একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

এই সময় সামন্তরাজ সোমপাল এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বললেন যে তিনি বিজয়াদিত্যের অধীনে সামন্তরাজ হয়ে তাঁর প্রতাপ সহ্য করে থাকতে পারবেন না। এ কথায় সন্ন্যাসী জানালেন যে, তাঁর পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছেন বলে তাঁকে বশ করার জন্যই তাঁর এই সন্ন্যাস গ্রহণ। এতে সামন্তরাজ ভারি খুশি হলে সন্ন্যাসী বললেন যে, সেই রাজচক্রবর্তী সম্রাটকে সামন্তরাজ সোমপালের সভায় তিনি ধরে আনবেন। সোমপাল জানালেন যে, এই শরৎকালে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে তাঁর বড়ই ইচ্ছা। এ কথা শুনে সন্ন্যাসী বললেন যে, এর কোনো দরকার নেই; কারণ সম্রাট বিজয়াদিত্যকে, তিনি শীঘ্রই ধরে আনবেন। বিজয়াদিত্যকে দিয়ে সামন্তরাজ কি করবেন, এ-কথা সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে সোমপাল বললেন যে বিজয়াদিত্যের অহংকার চূর্ণ করে যে-কোনো সাধারণ কাজে তাঁকে লাগিয়ে দেবেন। এর উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন যে, বিজয়াদিত্য তো সাধারণ মানুষ, তাঁর সাজসজ্জাতেই লোকে ভুলে গেছে।

সামন্তরাজ এ-কথায় হেসে বললেন, বিজয়াদিত্য রাজপোষাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচজনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করেন, এই ভুলটা দিতে হবে ভেঙে।

সন্ন্যাসীও এই কথায় সায় দিয়ে বললেন,—'তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষী গৃহস্থরা বনে গিয়ে সীতার পূজা করে

সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষীদের সঙ্গে এক সঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়। সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে খাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে-পায়ে ধরে বললে, এ কথনোই হতে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে যে ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে। এই জন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড় ভয়ে ভয়েই থাকে—কোন দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

বিজয়াদিত্যের এই মিথ্যেটা প্রকাশ করে দেবার জন্য সামন্তরাজ সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করলে সন্ন্যাসী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে বললেন। এই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে সামন্তরাজ সোমপাল ফিরে গেলেন তাঁর রাজপ্রাসাদে।

এর মধ্যে উপনন্দ সন্ন্যাসীর কাছে এসে তার মনোব্যথার কারণ জানিয়ে বলে যে, তার প্রভুর ঋণ শোধ করতে না পারায় তার বুকে যেন পাথর চেপে বসে আছে। সে অসংকোচে বলে যে, প্রাণ দিয়েও যদি সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করতে পারত, তবে সমুজ্জ্বল শরতের দিনটি তার পক্ষে হত সার্থক; হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কোনো মহাত্মা যদি তাকে কিনে নিত তা হলে ঋণ শোধ হত। সন্ন্যাসী বিজয়াদিত্যের কথা পাড়লে উপনন্দ জানাল যে তার মতো ছেলেকে তিনি কোনো দাম দিয়েই কিনবেন না। এর উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন যে বিনা মূল্যে কেনবার ক্ষমতা যদি তাঁর থাকে তবে বিনামূল্যেই তিনি কিনে নেবেন; পক্ষান্তরে, উপনন্দের ঋণশোধ করে দিতে না পারলে বিজয়াদিত্যের এত ঋণ জমবে যে, তাঁর রাজভাণ্ডার হবে লজ্জিত। এই কথায় উপনন্দ আশ্বস্ত হয়ে বলল যে সে অনর্থক সময় আর নষ্ট না করে যতদিন মহারাজ বিজয়াদিত্য তাকে না নিচ্ছেন, ততদিন পুঁথি নকল করে কিছু ঋণশোধ করবে। এই শুনে সন্ন্যাসী বললেন যে, বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেওয়াই উচিত; কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এই কথায় উপনন্দ পেল মনে নূতন বল। পরে সন্ন্যাসী উপনন্দকে বললেন ছেলের দলকে ডেকে আনতে।

উপনন্দ চলে গেলেই লক্ষেশ্বর এসে সন্ন্যাসীকে জানায় যে সে তাঁর চেলা হতে পারবে না। সে কত কষ্টে কত কাল ধরে কিছু টাকা সংগ্রহ করেছে, আর সন্ন্যাসীর এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরতে পারবে না। সন্ন্যাসী তার কথায় সায় দিলে লক্ষেশ্বর তাঁকে ঐ জায়গা থেকে উঠতে বললে, সন্ন্যাসী উঠে গেলে মাটির ভেতর থেকে গজমোতির কৌটা বের করে লক্ষেশ্বর সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে বলল, আমি তোমাকেই এই গজমোতি দেখালাম; তোমাকে দেখিয়ে আমার মনটা কিছু হাল্কা হল; কিন্তু লক্ষেশ্বরের এমন সাহস হল না যে সন্ন্যাসীর হাতে কৌটটি দেয়। এই গজমোতির জন্যই তার রাতে ঘুম হয় না; এটাকে সে বেচতেও পারছে না, আর রাখতেও পারছে না। মহারাজ বিজয়াদিত্যের কাছে বিক্রী করা যায় কি না তার পরামর্শ নিয়ে লক্ষেশ্বর চলে যাবার সময় বলে গেল, সে সন্ন্যাসীর চেলা হতে পারবে না।

লক্ষেশ্বর চলে যাবার পর ঠাকুর্দা এলেন সন্ন্যাসীর কাছে। তাঁদের মধ্যে জগতের মাহাত্ম্য নিয়ে নানা আলোচনা হতে থাকলে হঠাৎ লক্ষেশ্বর সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সোনার পদ্মের পরামর্শ চলছে ভেবে সন্ন্যাসী ও ঠাকুর্দাকে সে ভারি হুঁশিয়ার মনে করল এবং যদিও তার একবার ইচ্ছে হয়েছিল যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে যোগ দেবে; কিন্তু ঠাকুর্দার সঙ্গে সোনার পদ্ম নিয়ে আলোচনা করায় লক্ষেশ্বরের আর ইচ্ছে হল না যে সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে একযোগে কাজ করে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে সোনার পদ্মটির কথা সে ভুলতে পারল না।

এর মধ্যে ছেলের দল সেখানে এলে স্থির হল যে, সবাই মিলে শারদোৎসব খেলবে। সন্ন্যাসী হবেন এই উৎসবের পুরোহিত। ছেলেরা কাশ ফুল, ধানের মঞ্জরী ও শিউলি ফুলের মালা দিয়ে সন্ন্যাসীকে সাজাতে আরম্ভ করল। সন্ন্যাসী বললেন যে আজ সবাইকে সোনালি রঙের কাপড় পরতে হবে। তিনি আরও বললেন, প্রকৃতি আজ সর্বত্র সোনা ঢেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে অন্তরে বাইরে না মিলতে পারলে শরতের উৎসবে যোগ দেওয়া যাবে না। তিনি সোনার রঙের কাপড় দিয়ে ছেলেদের সাজিয়ে আনতে বললেন ঠাকুর্দাকে বেতসিনীর তীরে বটতলার পোড়ো মন্দিরে গিয়ে। এর মধ্যে আবার একবার ঘুরে গেল লক্ষেশ্বর তার একই আবেদন-নিবেদন নিয়ে। ছেলের দল সোনালি রঙের কাপড় পরে আর সাদা সাদা ফুল নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এলে সন্ন্যাসী শারদ-লক্ষ্মীর অর্ঘ্য সাজিয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করলেন। পরে শারদোৎসবের আবাহন গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করতে বললেন ছেলেদের ঠাকুর্দার সঙ্গে, যাতে তাদের গানে বনলক্ষ্মী জেগে ওঠেন।

ছেলেরা শারদোৎসবের গান গাইতে গাইতে বন প্রদক্ষিণ করে সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে এল। তিনি তাদের দেখে বললেন, 'তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর।' এই বলে সন্ন্যাসী আগমনীর গান গেয়ে সবাইকে বললেন, 'ঐ দেখ শারদা দেবী তোমাদের সামনে সাদা সাদা ভাসমান মেঘ, সোনার আলো, শিশির ভেজা বাতাস নিয়ে আসছেন।' ঠাকুর্দা শারদার বরণগান গাইলেন। এই গানটি সমস্ত বনে বনে ও নদীর ধারে গাইতে বলায় ছেলেরা সব চলে গেল গান করতে করতে।

এই সময় হঠাৎ দেখা গেল লক্ষেশ্বরকে গেরুয়া কাপড় পরে সেখানে আসতে। সে এসে সন্ন্যাসীর হাতে গজমোতির কৌটা দিয়ে অতি সাবধানে রাখতে বলল। লক্ষেশ্বরের এই মতি পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে তার এই মতির পরিবর্তন সহজে হয় নি। সম্রাট বিজয়াদিত্য সসৈন্যে আসছেন; কাজেই তার ঘরে আর কিছু রাখার উপায় নেই। সন্ন্যাসীর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না জেনে লক্ষেশ্বর তাঁর কাছেই সব রেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়। এই সময় সামন্তরাজ সোমপাল হাঁপাতে হাঁপাতে সন্ন্যাসীর কাছে এসে বললেন যে রাজা বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে এবং সৈন্যদলও আসছে। তাই শুনে সন্ন্যাসী বললেন, বোধ হয় শরতের আনন্দ তাঁকে ঘর থেকে বের করেছে; তিনি রাজ্যবিস্তারে বেরিয়েছেন। সন্ন্যাসীর মুখে বিজয়াদিত্যের রাজ্যবিস্তারের কথা শুনে রাজা সোমপাল বড় ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর উপর বিজয়াদিত্যের কোনো আক্রোশ থাকতে পারে ভেবে রাজচক্রবর্তী হবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য

সোমপাল সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হলেন। ইতিমধ্যে বিজয়াদিত্যের মন্ত্রিগণ এসে 'মহারাজাধিরাজ বিজয়াদিত্যের জয় হোক' বলে মাটিতে প্রণাম করলে সন্ন্যাসীর গাত্রসংলগ্নে সোমপাল বলে উঠলেন যে তিনি তো বিজয়াদিত্য নন, তাঁরই চরণাশ্রিত সামন্তরাজ। শেষে ভুল ভাঙলে তিনি দেখলেন, সন্ন্যাসীই স্বয়ং বিজয়াদিত্য; তখন লজ্জা, ভয়, সংকোচে তাঁর মুখ গেল শুকিয়ে। সন্ন্যাসী তখন তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, রাজা হওয়া অত্যন্ত কঠিন; রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

এই সময় উপনন্দ সন্ন্যাসীর কাছে আসতেই সামনে সামন্তরাজ সোমপালকে দেখে সে ফিরে যেতে চাচ্ছিল; তখন সন্ন্যাসী তাকে ডেকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে এ-ক'দিন পুঁথি লিখে সে তিন কাহন পারিশ্রমিক পেয়েছে; সন্ন্যাসীকে তা দেখালেই তিনি বললেন, 'আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করছি, এ আমার তারই দক্ষিণা।' সন্ন্যাসী এই অর্থ নিতে চাইলে উপনন্দ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল। তাই দেখে সন্ন্যাসী বললেন, আমি এ অর্থ নেব বৈ কি! তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতেই লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ। এই ব্যাপার দেখে লক্ষেশ্বরের মনে দারুণ আশঙ্কা হল এই ভেবে যে এইবার তার গজমোতির কৌটাটি নিশ্চয়ই খোয়া গেল। তার মনের কথা বুঝতে পেরে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠীকে হাজার কার্ষাপণ দিতে বললেন লক্ষেশ্বরকে। উপনন্দ তাই দেখে সন্ন্যাসীকে বলল, তবে কি শ্রেষ্ঠীই তাকে কিনে নিলেন। এর উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন, 'উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।' এই বলে তিনি সকলকে ডেকে বললেন যে তাঁর পুত্র নেই বলে সবাই আক্ষেপ করত, কিন্তু সন্ন্যাসধর্মের জোরে যে পুত্রটিকে লাভ করেছেন, তার মূল্য অতুলনীয়। এর পর সন্ন্যাসী লক্ষেশ্বরের হাতে তার গজমতির কৌটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন যে তার কাছে তাঁর কিছু প্রাপ্য আছে। এ-কথায় লক্ষেশ্বরের মুখ গেল শুকিয়ে। সন্ন্যাসী বললেন যে তার কাছে এক মুষ্টি চাল পাওনা আছে, কাজেই রাজার মুষ্টি কি সে ভরাতে পারবে? লক্ষেশ্বর এই কথার উত্তরে জানাল যে সে তো সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিল। সন্ন্যাসী তখন তাকে বললেন যে তবে তার আর ভয় নেই। পরে লক্ষেশ্বর চলে যাবার সময় কিছু উপদেশ চাইলে সন্ন্যাসী বললেন যে উপদেশ নিতে তার এখনও দেরী আছে। তাই শুনে লক্ষেশ্বর চলে গেল।

এরপর শারদোৎসবের ছেলের দল 'সন্ন্যাসী ঠাকুর সন্ন্যাসী ঠাকুর' বলে ছুটে আসতে আসতে সামনেই সামন্তরাজকে দেখে পালাতে উদ্যত হলে রাজসন্ন্যাসী বললেন যে তাদের পালাতে হবে না; যার জন্য তারা পালাচ্ছে সেই পলায়ন করুক। এই বলে সামন্তরাজকে উৎসব-সভা প্রস্তুত করার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী ছেলেদের সঙ্গে মিশে গেলেন। ছেলেরা বলল যে তারা বনে পথে পথে সব জায়গায় শারদোৎসবের গান গেয়ে আসছে, এবার সন্ন্যাসীর কাছে গেয়ে তা শেষ করে শারদোৎসব-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করবে; এই বলে তারা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে শারদোৎসবের গান শেষ করল।

এবার এই নাটকটির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে প্রবন্ধটির উপসংহার করব। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে নানা ফুলে-ফলে, আলোকে-বাতাসে পৃথিবীতে উৎসবের সাড়া পড়লে মানুষ যদি অন্তরের সঙ্গে তা গ্রহণ না করে, তবে তার জীবনে একটি বিশেষ জায়গায় ফাঁক রয়ে যায়: সে একটি পবিত্র ও নির্মল আনন্দ থেকে হয় বঞ্চিত। মানুষ নিত্যই তার প্রয়োজনের খাতিরে মানুষের সঙ্গে মেশে; কিন্তু যেদিন তার মিলন হাটের মেলা বা বাটের মেলা হয় না, সেইদিন তার মিলন উৎসবের আকার ধারণ করে। এই বিচিত্র বিশ্বকে যদি চিত্তভরে না দেখা যায়, তবে বিরাটের সঙ্গে কখনও মিলন ঘটবে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের মিলনে হয় সমগ্রতার উপলব্ধি। নব নব ঋতু আবির্ভূত হয়ে চারদিক নূতনের সাড়া জাগায়, তখন তারা মানুষকেও আহ্বান করতে ভোলে না: মানুষ যদি তাদের ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে সমস্ত জগৎ ও তার আনন্দ থেকে হয় বঞ্চিত। লক্ষেশ্বর অর্থবান বণিক হয়েও আসল বিমল সুখানুভূতি থেকে চিরদিন বঞ্চিত; আর অতুল ধনের অধিরাজ বিজয়াদিত্য নিজেকে ভুলে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের আধার শতদল পদ্মটিকে পাবার জন্যে। এই পদ্মটি একটি হালকা সৌখীন বস্তু নয়, এর পরিচয় রয়েছে উপনন্দের তপস্যার মধ্য দিয়ে। প্রভু যে ঋণ করে গেছেন তার পরিশোধের দায়িত্বগ্রহণ করে উপনন্দ সেই চিরসুন্দরেরই উপাসনা করেছে। উপনন্দের মধ্যে এই প্রেমঋণ পরিশোধের প্রবৃত্ত দেখে রাজসন্ন্যাসী ভাবলেন, এই তো আত্মোৎসর্গের মূল সৌন্দর্য। শারদোৎসবের মধ্যে রয়েছে এই ঋণশোধের পালা এবং তাতেই হয়েছে সুন্দরের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণশোধ করিতেছে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ পরিশোধের এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই—প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাড়িয়ে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাড়িয়ে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।'

ঋণশোধেই যে যথার্থ ছুটি বা মুক্তি তা সত্য হয়ে উঠেছে উপনন্দের মধ্য দিয়ে। নিজের মধ্যে যতই অমৃতের প্রকাশ হয়, ততই বন্ধনের হয় মুক্তি। কাজ ফাঁকি দিয়ে তপস্যার মধ্যে কোনো পরিত্রাণ লাভ করা যায় না। রাজসন্ন্যাসী সেই জন্যেই উপনন্দকেই বলেছেন, 'তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।' সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মীকে পেতে হলে চাই দুঃখের সাধনা; নতুবা চিরসুন্দরের সঙ্গে মিলন হয় না। যে জাতি বা মানুষের মধ্যে এই তপস্যার অভাব অথবা দুঃখস্বীকারে রয়েছে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় না—চিরসুন্দরের প্রেমাকর্ষণ করা তো দূরের কথা।

আলফ্রেড নোবেল

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

সুইডেনের অধিবাসী বিশ্ববিখ্যাত অ্যালফ্রেড নোবেলের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে লোকের ধারণা আছে খুব কমই। জনসাধারণ জানে যে, তিনি ডিনামাইটের আবিষ্কারক এবং প্রসিদ্ধ দাতা। তাঁর দানের উপর নির্ভর করে প্রতি বছর নোবেল পুরস্কার বিতরিত হয়।

অ্যালফ্রেড নোবেল ছিলেন নির্জনতাপ্রিয়, অতি উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী। তিনি কোনপ্রকার খ্যাতি পছন্দ করতেন না। তিনি কিরূপ বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন, তা তাঁর উইলের রচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মূলধন কোন নিরাপদ স্থানে গচ্ছিত রেখে যে সুদ পাওয়া যাবে তা প্রতি বছর সেই সব লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, যাঁরা পূর্ব বৎসর মনুষ্যজাতির জন্যে সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন করেছেন। মোট সুদ পাঁচটি সমভাগে ভাগ করতে হবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্যে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে পুরস্কার দিতে হবে। আর এক ভাগ পুরস্কার দেওয়া হবে সাহিত্যে, পুরস্কার পাবেন তিনি, যাঁর রচনা ঐ বিভাগে আদর্শবাদী বলে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করবে। পঞ্চম পুরস্কার দেওয়া হবে তাঁকে, যিনি সব দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব আনবার জন্যে ও সৈন্যসামন্ত কমানোর জন্যে কিংবা বিলোপ করবার জন্যে সবচেয়ে ভাল কাজ করবেন এবং শান্তি-সহায়ক সভা-সমিতি উন্নয়নের ব্যবস্থা করবেন। পরিশেষে তিনি বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, পুরস্কার বিতরণ করবার সময় যেন কোনরূপ জাতিবর্ণ বিচার না করা হয়, যেন পৃথিবীর যোগ্যতম ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করেন।

সুইডেনের দক্ষিণ প্রদেশের কৃষকদের বংশধর এই নোবেলরা। পূর্বে এই বংশ নোবেলিয়াস উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বংশের এক ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সর্বপ্রথম নোবেলিয়াস উপাধি গ্রহণ করেন, কারণ তিনি নোবেলফ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর উত্তরকালে কোন বংশধর উপাধিটি সংক্ষেপ করে নোবেল-এ পরিণত করেন।

অ্যালফ্রেড নোবেলের পিতা ইম্যানুয়েল নোবেল ছিলেন অনন্যসাধারণ। স্কুল-কলেজে বিশেষ শিক্ষা না পেলেও তাঁর প্রতিভা ছিল। তিনি অন্য কোন বিদেশী ভাষা জানতেন না। এমন কি, কোন রকমে লিখতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন করিৎকর্মা, যা শিখেছিলেন তা নিজের চেষ্টাতেই। তাঁর কাজকর্মের অনেক প্রকার কল্পনা ছিল; কয়েকটি অবাস্তব হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যেত। চৌদ্দ বছর বয়সে জাহাজে চাকুরী পেয়ে তিন বৎসরের জন্যে সমুদ্রযাত্রা করেন। ফিরে এসে তিনি স্থপতির নিকট শিক্ষানবিশী করেন এবং স্টকহলমের একটি স্থপতি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা করে ঐ বিষয়ে শিক্ষা করেন। পঁচিশ বছর বয়সে নিজেই স্বাধীনভাবে কাজ সুরু করেন। কিন্তু কাজকর্ম খারাপ হওয়ার দরুণ ১৮৩৩ সালে তাঁকে দেউলিয়া হতে হয়। নতুন করে ব্যবসায়জীবন সুরু করবার জন্যে ১৮৩৭ সালে রাশিয়াতে যান। সেখানে একটি যন্ত্রের কারখানা খোলেন। কাজ ভালই হচ্ছিল, বিশেষত ক্রিমিয়ান যুদ্ধ সুরু হওয়ার দরুণ। সাবমেরিন মাইন দিয়ে রাশিয়ার সমুদ্রতট সুরক্ষিত করবার জন্যে, জাহাজ তৈরীর জন্যে এবং আরও অন্যান্য কাজে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্ট তাঁদের কথা রাখেন নি। এই ভাবে তিনি ১৮৫৯ সালে আবার দেউলিয়া হলেন। হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হয়ে দেশে ফিরে এলেন। যদিও এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছিল এবং নতুন করে কাজ সুরু করা সহজ ছিল না, তাহলেও অদম্য উৎসাহ ও নতুন কল্পনা নিয়ে আবার শিল্প-সংক্রান্ত কাজে মনোনিবেশ করলেন। এবার নিজের পুত্র অ্যালফ্রেডের নিকট থেকে এ বিষয়ে সাহায্য লাভ করেন।

১৮৩৭ সালে সুইডেন থেকে রাশিয়াতে যাবার সময় তাঁর পত্নী ও তিন পুত্র স্টকহলমেই ছিলেন। তাঁরা ১৮৪২ সালে সেণ্ট-পিটার্সবার্গে যান। তিন ছেলেই খ্যাতিলাভ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রবার্ট বাকুর প্রসিদ্ধ পেট্রোলিয়াম শিল্পের উন্নয়ন করেন। মধ্যম পুত্র লুডভিগ সেণ্টপিটার্সবার্গে পৃথিবী-বিখ্যাত অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার প্রতিষ্ঠাতা।

তৃতীয় পুত্র অ্যালফ্রেডের জন্ম হয় ১৮৩৩ সালের ২১শে অক্টোবর। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি কোন স্কুলে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন নি। কেবলমাত্র এক বছরের জন্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপরেই পরিবারের সঙ্গে সেণ্টপিটার্সবার্গে চলে যান। সেখানে তিন পুত্রই গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন। এ শিক্ষাও বন্ধ হয়ে যায় ১৮৫০ সালে যখন অ্যালফ্রেডের বয়স মাত্র ষোল বৎসর। এই বয়সেই তিনি ছিলেন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেক উন্নত। এই সময়েই তিনি হয়েছিলেন অভিজ্ঞ রসায়নবিদ্ ও প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্। সুইডিস ও রুশ ভাষা ছাড়াও জার্মান, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা জানতেন। সাহিত্যে যথেষ্ট অনুরক্ত ছিলেন, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যে। এ বয়সেই জীবন-পরিচালনা সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করে নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা এ-সময়কার চিঠিপত্র দেখলে মনে হয়, তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন, কাল্পনিক, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু রুগ্ন। তিনি একা থাকতেই ভালবাসতেন।

পিতার অবস্থা এসময়ে সচ্ছল হওয়াতে তিনি অ্যালফ্রেডকে আরও শিক্ষার জন্যে দু'বছরের মেয়াদে বিদেশে পাঠালেন। অ্যালফ্রেড নোবেল আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি কাটাতেন প্যারিসের কোনও গবেষণাগারে রসায়নশাস্ত্রের চর্চাতে। ফিরে এসে অ্যালফ্রেড পিতার কারখানাতেই নিযুক্ত থাকেন ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ পিতা দ্বিতীয়বার দেউলিয়া না হওয়া পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি নাইট্রোগ্লিসেরিন নিয়ে গবেষণা সুরু করেন।

প্রথম বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ১৮৬২ সালের মে কিংবা জুন মাসে। নাইট্রোগ্লিসেরিন তৈরীর জন্যে স্টকহলমের নিকটে একটি ছোট কারখানা নির্মিত হয়। কিন্তু কারখানাটি ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিস্ফোরণে উড়ে যায়। এ ঘটনায় কয়েকটি জীবন নষ্ট হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন অ্যালফ্রেড নোবেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এমিল। এই দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ পিতা একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। এরপর পিতা কাজকর্মের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়েন এবং ১৮৭২ সালে মারা যান।

কিন্তু দুর্ঘটনার দরুণ অ্যালফ্রেড নোবেলের উৎসাহ মোটেই কমে নি। এক মাসের মধ্যেই তিনি আবার সুইডেনে নাইট্রোগ্লিসেরিন তৈরীর একটি কোম্পানী গঠন করেন। কিছুদিন পরেই নরওয়েতেও একটি সমিতি গঠিত হয়। এরপর তিনি বিদেশে যান তাঁর আবিষ্কারের জন্যে পেটেন্ট লাভ করতে এবং বিস্ফোরক তৈরীর জন্যে সমিতি গঠন করতে। কয়েক বছরের মধ্যেই নাইট্রোগ্লিসেরিন উৎপাদন একটি বিখ্যাত শিল্পে পরিণত হলো। এইসব সমিতি গঠনের জন্যে তাঁকে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতে অনবরত ঘুরতে হতো। এসব সত্ত্বেও তিনি ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিলেন, যার ফলে উন্নততর বিস্ফোরক ডিনামাইট আবিষ্কৃত হলো। নতুন বিস্ফোরকের জন্যে পেটেন্ট লাভ করেন ১৮৬৭ সালে। তারপর পর পর অনেকগুলি আবিষ্কার করেন। এইভাবে একেবারে নিঃস্ব অবস্থা থেকে অ্যালফ্রেড নোবেল অতি ধনশালী হলেন। কিন্তু তিনি কখনও সুখী হন নি। মানুষের সংস্পর্শ কখনও তাঁর পক্ষে সুখের হয় নি।

এ সম্বন্ধে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'তুমি আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছ। কিন্তু তারা কোথায়? ভ্রান্ত মায়ার গভীরে কিংবা টাকার ঝনঝনাতে? তুমি নিশ্চয় জেনো, অনেক বন্ধুবান্ধব কেউ লাভ করবে সেইসব কুকুরের ভিতরে যাদের সে অন্তের মাংস দিয়ে খাওয়াবে অথবা সেই সব পোকাকৃমির মধ্যে যাদের খাওয়াবে সে নিজের শরীর দিয়ে।'

তাঁর প্রকৃতি ছিল বিষাদগ্রস্ত, ভাবপ্রবণ ও উদাসীন। কখন কখন তিনি কিছুদিনের জন্যে অজ্ঞাতবাস করতেন। তাঁর অতি নিকট-সঙ্গীরাও বলতে পারতো না তিনি কোথায় থাকতেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তিনি নিরালা থাকবার প্রেরণা অনুভব করেন। তিনি থাকেন বনে-জঙ্গলে গাছপালার মধ্যে। এই সব নির্বাক বন্ধুরাই ছিল তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কাজেই যখনই সুবিধা পেতেন তিনি নগর ও সহর থেকে পালিয়ে যেতেন।

যদিও তিনি উচ্চশিক্ষিত ও রসিক ছিলেন এবং সুইডিস ছাড়াও জার্মান, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা অনর্গল বলতে পারতেন, তাহলেও এসব সামাজিক গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মিশুক ছিলেন না। এমন কি প্যারিসেও তাঁর পরিচিত ব্যক্তি ছিল খুব কমই। তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন গবেষণাগারে। নিজের কাজে এত মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, খাবার কথাও অনেক সময় ভুলে যেতেন। প্রসিদ্ধ লোক হিসেবে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী জানতে চাইলে তিনি বলতে রাজী হতেন না। তাঁর ফটো তুলতে কিংবা ছবি আঁকতে দিতেন না। সম্মানসূচক উপাধি তিনি পেয়েছেন খুব কমই। যা কিছু পেয়েছেন সে সম্বন্ধেও ঠাট্টা করে বলতেন যে, তাঁর সুইডিস নর্থস্টার লাভ করবার কারণ হলো, তাঁর রাঁধুনীর রান্না একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের মুখরোচক হয়েছিল। ফরাসী উপাধি পেয়েছিলেন, কারণ মন্ত্রিসভার একজন সভ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্রেজিলিয়ান অর্ডার অফ দি রোজ লাভ করেছিলেন, কারণ ঐ দেশের সম্রাটের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিনি সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেকে সুইডেনের অধিবাসী বলেই মনে করতেন। কিন্তু নয় বৎসর বয়সেই তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যান, তারপর যখনই স্বদেশে আসতেন মাত্র কয়েকদিনের জন্যে বাস করতেন। তিনি কোথাও স্থায়িভাবে বসবাস করেন নি। ১৮৫১ সালে যখন পিতা সেন্টপিটার্সবার্গের আবাস তুলে দিয়ে সুইডেনে ফিরে এলেন, তখন থেকে অ্যালফ্রেড নোবেল শিল্প সংক্রান্ত কাজে নানাদেশে ঘুরে বেড়াতেন। অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হতো রেলগাড়ীতে, ষ্টীমারের কামরায় ও হোটেলে। প্রথমে তিনি হামবুর্গের নিকট গবেষণাগার ও বাসস্থান তৈরী করেছিলেন। ১৮৭৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানীর নিকটে আর একটি বাসস্থান নির্মাণ করেন। ১৮৯০ সালে ইটালীতে আরও একটি বাড়ী খরিদ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সুইডেনে একটি বাড়ী করে শেষ জীবনে সেখানেই কাটাবেন। এই উদ্দেশ্যে বফর্স-এ একটি বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু সকল পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ইটালীর বাড়ীতে।

স্থায়ী বাসস্থানের অভাব নোবেলের মনকে বিশেষভাবে পীড়িত করতো। যেখানেই তিনি বাস করতেন, নিজেকে বিদেশী বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বিশ্ববাসী। কিন্তু অন্তরে তাঁর জন্মভূমির প্রতি বিশেষ টান ছিল। অ্যালফ্রেড নোবেলের ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ ও অনুরক্ত পুত্র খুব কমই আছে। তিনি মাতাকে রীতিমত পূজা করতেন। বড়দিনের উপহার পাঠাতেন মাতাকে এবং মা যাদের স্মরণ করতে চাইতেন তাদেরও। তিনি মাকে অনেক টাকাপয়সা দিতেন। বৃদ্ধা নিজের ইচ্ছামত সাহায্য করতে এবং সৎকাজে ব্যয় করতে পারতেন। মরবার সময় তিনি সকল সম্পত্তি অ্যালফ্রেডকে উইল করে দিয়ে যান। কিন্তু অ্যালফ্রেড দাবী ত্যাগ করে সমস্ত ধনসম্পদ মায়ের স্মৃতিতে দান করেছেন এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে উপহার দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন শান্তিবাদী। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করবার উপায় সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সংশয় ছিল। নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির কাজে প্রচার করবার জন্যে একটি সাময়িক পত্রিকাকে সাহায্য দিতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, এরূপ পত্রিকাকে সাহায্য করা আর টাকা জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। তিনি কোন শান্তি-সহায়ক সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন না। তিনি এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, এই সব সভাসমিতির চেয়ে তাঁর বিস্ফোরক তৈরীর কারখানাই যুদ্ধ শীঘ্র বন্ধ করে দেবে। যদি এমন দিন আসে যখন দুই দল সৈন্য পরস্পরকে এক সেকেণ্ডে ধ্বংস করে দিতে পারে, তখন সভ্যজগৎ যুদ্ধ থেকে বিরত হবে এবং সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন

করবে। অবশ্য একটি চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, যুদ্ধ বন্ধ করবার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হবে, যদি সব দেশ একত্রিত হয়ে সেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করে যে দেশ প্রথমে শান্তি ভঙ্গ করে লড়াই সুরু করবে

নোবেলের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ ছিল সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে। নোবেলের মধ্যে ছিল কবির গুণ—গভীর অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি। কুড়ি বছর বয়সের পূর্বেই তিনি ইংরেজীতে অনেক কবিতা লিখেছেন। ইংরেজ কবি শেলী দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন। পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পসংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে আর সাহিত্যে তেমন মনোনিবেশ করতে পারতেন না। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে পুনরায় এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্র থেকে একটি অসমাপ্ত উপন্যাস পাওয়া যায়।

নানা কাজকর্মের মধ্যেও নিজেকে নিঃসঙ্গ, পীড়িত ও ভগ্নোৎসাহ মনে করতেন। তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। তিনি ছিলেন রুগ্ন ও দুর্বল। হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভ্রাতা লুডভিগকে এক পত্রে লিখেছেন, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ডাক্তারের উচিত ছিল অ্যালফ্রেড নোবেলের ন্যায় হতভাগ্য অর্ধজীবনের পৃথিবীতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা। তাঁর নিঃসঙ্গতা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর অভাব সম্বন্ধে লিখেছেন,—

'নয় দিন ধরে আমি পীড়িত। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে হচ্ছে। মাইনে করা চাকর ছাড়া আর কোন সঙ্গী নেই। কেউ আমার খবর নেয় না। আমার মন সীসার মত ভারী হয়ে আছে। যখন চুয়াল্ল বছর বয়সে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে এরূপ নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে এবং কেবল মাইনে করা চাকরই সবচেয়ে বেশী সমবেদনা দেখায়, তখন তাঁর অন্তরের গভীর বেদনা অধিকাংশ লোকই ধারণা করতে পারবে না। চাকরের চোখে আমার প্রতি অনুকম্পা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাকে আমার অনুভূতি বুঝতে দিচ্ছি না।'

ঘনিষ্ঠভাবে অনেকদিন কাজ করেছেন এরূপ অনেক লোক তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ফ্রেঞ্চ ডিনামাইট কোম্পানীর লোকজনের প্রতারণার জন্যে ১৮৯০ সালে অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়। পরে প্যারিসে যেয়ে তিনি কোম্পানীকে রক্ষা করেন। আর একটি বিষয়ে যথেষ্ট হতাশ হতে হয়—সে হলো স্যার ফ্রেডেরিক অ্যাবেল ও প্রফেসর জেম্‌স্ ডেওয়ারের সঙ্গে করডাইট সংক্রান্ত মামলায়। ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে সর্বপ্রথম ধূমহীন নাইট্রোগ্লিসেরিন গান-পাউডার আবিষ্কার করেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্যার ফ্রেডেরিক অ্যাবেল ও প্রফেসর ডেওয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন—কি প্রকার নির্ধূম চূর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট এ বিষয় নির্ণয়ের জন্যে। অ্যাবেল ও ডেওয়ার নোবেলের কাছে এ-সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। এক বছরের মধ্যেই নোবেলের আবিষ্কারের বিস্তৃত গোপনীয় বিবরণ এবং তিনি এ-সম্বন্ধে আর কি উন্নতি করবেন, এ সব খবর তাঁরা জানতে পারেন। একই সময়ে তাঁরা নাইট্রোগ্লিসেরিন পাউডার সংক্রান্ত গবেষণা করেন, নোবেলের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকারের গানকটন নিয়ে। তারপর তাঁরা নোবেলকে কিছু না জানিয়ে করডাইট নামে নির্ধূম বিস্ফোরক চূর্ণের পেটেণ্ট লাভ করেন।

নোবেল মামলা করেন, কিন্তু পরাজিত হন। আপিল কোর্টের লর্ড জাস্টিসকে বলেন, আইনঘটিত জটিল ব্যাপারে তাঁকে বিবাদীদের পক্ষ সমর্থন করতে হচ্ছে। তাহলেও তিনি স্বীকার করেন যে, বাদী নোবেলই এ-বিষয়ে পথিকৃৎ। বামনকে দৈত্যের পিঠে উঠতে দিলে বামনই দৈত্যের চেয়ে বেশী দূরে দেখতে পায়। এ বিষয়ে যিনি প্রথম পেটেণ্ট লাভ করেছেন তাঁর প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন। নোবেল আশ্চর্যজনক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন। দু'জন চতুর রসায়নবিদ্ তাঁর পেটেণ্টের বিষয়সমূহ আয়ত্ত করে এবং প্রায় অনুরূপ দ্রব্যসমূহ প্রয়োগ করে একইরূপ ফলপ্রদ বস্তু আবিষ্কার করেছেন। যদি সম্ভব হতো, নোবেলকে এই গুরুত্বপূর্ণ পেটেণ্টের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করতে পারলেই ভাল হতো।

আরও দু'টি কারণে নোবেল বিষণ্ণ হলেন। ১৮৮৮ সালের ১২ই এপ্রিল ভ্রাতা লুডভিগ এবং ১৮৮৯ সালে ৭ই ডিসেম্বর মাতা পরলোকগমন করেন।

অ্যালফ্রেড নোবেলের জীবনের শেষ মুহূর্ত অতি বিষাদময়। ফরাসী পরিচারকবর্গ পরিবৃত হয়ে ১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি ইটালীর বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। নিকটে কোন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছিল না। শেষ সময়ে বোধ হয় বাক্‌শক্তি খানিকটা রুদ্ধ হয়েছিল এবং বিদেশী ভাষার স্মৃতিও লোপ পেয়েছিল। শৈশবের ভাষায় কয়েকটি কথা বলেছিলেন, কিন্তু কথাগুলি ফরাসী পরিচারকবর্গের নিকট হয়েছিল অবোধ্য।

নোবেল প্রায় তিন কোটি টাকার ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন। তাঁর ধনসম্পত্তি ছিল বিভিন্ন দেশে—সুইডেন, নরওয়ে, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ইটালী ও রাশিয়াতে।

অ্যালফ্রেড নোবেলের রচিত উইলের সর্ত অনুসারে ১৮৯৫ সালের ২৭শে নবেম্বর 'নোবেল প্রতিষ্ঠান' স্থাপিত হয়। নোবেলের মৃত্যুর পর, তিনি কোন্ দেশের অধিবাসী এই নিয়ে হয় প্রথম বাদবিতণ্ডা। তারপর অনেক বাধাবিঘ্ন ও উইলের আইনঘটিত সমস্যা দূর করে নোবেল প্রতিষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণকারী সমিতিসমূহের কার্যক্রমের বিধিব্যবস্থা সুইডিস গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুর করা হয় ১৯০০ সালের ২৯শে জুন, অর্থাৎ নোবেলের মৃত্যুর প্রায় চার বছর পর। ১৯০১ সাল থেকে পুরস্কার বিতরণ সুরু হয়। পুরস্কারের টাকা, নোবেল স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা দেওয়া হয় প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ নোবেলের মৃত্যু-তারিখে। ঐ তারিখ সুইডেনের অধিবাসীদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সভ্যদেশ হিসাবে সুইডেনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। একটি পুরস্কারের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর নির্ভর করে।

রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্যে দুইজন প্রার্থী নির্বাচন করেন সুইডিস অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স, চিকিৎসাবিদ্যার জন্যে ক্যারোলিন ইনস্টিটিউট, সাহিত্যের জন্যে সুইডিস অ্যাকাডেমী এবং শান্তির জন্যে নরওয়েজিয়ান স্টর্টিং (নরওয়ের পার্লামেণ্ট) কর্তৃক গঠিত নোবেল কমিটি। এই সব সমিতির প্রত্যেকে তিন থেকে পাঁচ জন সভ্য নিয়ে

একটি কমিটী, নোবেল কমিটী গঠন করেন। এই সব কমিটীই নিজ নিজ বিভাগের প্রার্থী মনোনয়ন করেন। প্রত্যেক সমিতি নানা প্রকার অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ ও পুরস্কার বিতরণের অন্যান্য কাজে সাহায্য করবার জন্যে একটি করে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে বলে নোবেল ইনস্টিটিউট। সুইডিস অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের অবশ্য দু'টি প্রতিষ্ঠান আছে—একটি রসায়নের এবং অপরটি পদার্থ বিজ্ঞানের জন্যে। এই সব কমিটীর সভ্য বিদেশীও হতে পারেন। কোন ব্যক্তি পুরস্কারের জন্যে নিজে আবেদন করতে পারেন না। প্রত্যেক বিষয়ে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ, সমিতি এবং পূর্বে পুরস্কার পেয়েছেন এরূপ লোকই প্রার্থীর জন্যে সুপারিশ করতে পারেন। প্রত্যেক পুরস্কার বিতরণকারী সমিতি ঐ বিষয়ে নানা দেশের বিশেষজ্ঞ ও সংস্থার অভিমত আহ্বান করেন। উপযুক্ত বিবেচিত হলে একটি পুরস্কার দু'টি সমভাগে ভাগ করে দু'জনকে দেওয়া হয়। যদি এরূপ বিষয় পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত হয়, যা দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে সম্পাদন করেছেন, তাহলে একটি পুরস্কারই সম্মিলিত ভাবে তাদের দেওয়া হয়। উপযুক্ত বিবেচিত হলে কোন প্রতিষ্ঠানও পুরস্কৃত হতে পারে। কোন বছর কোন বিষয়ে যোগ্য প্রার্থী না পেলে, ঐ বছর ঐ বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয় না। ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সব প্রস্তাব পেশ করতে হয়। বিভিন্ন বিভাগের নির্বাচন ঘোষণা করা হয় ১লা অক্টোবর থেকে ১৫ই নবেম্বরের মধ্যে। যিনি কোন বিষয়ে পুরস্কার পান, তাঁকে পুরস্কার পাওয়ার ছ'মাসের মধ্যে ঐ বিষয়ে স্টকহলমে কিংবা শান্তির বিষয় হলে ক্রিশ্চিয়ানিয়াতে বক্তৃতা দিতে হয়।

ভারতের দুই কৃতী সন্তান এ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন —১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে এবং ১৯৩০ সালে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ পদার্থ-বিজ্ঞানে। রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের জন্যে। তাঁকে পুরস্কার দেবার সময় উল্লেখ করা হয় যে, তিনি তাঁর কবি-কল্পনাকে নিজের ইংরেজীতে যেরূপ নিপুণতার সঙ্গে গভীর অনুভূতি সম্পন্ন মনোরম ছন্দে ব্যক্ত করেছেন, তা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে রইলো।

বিভিন্ন বস্তুতে আলোর বিচ্ছুরণের ব্যাখ্যা করে মতবাদ প্রচারের ফলেই রমণ পুরস্কৃত হন। রমণ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় নানা পদার্থে আলো বিচ্ছুরণ করে প্রমাণ করলেন যে, এক রঙের আলোর বিচ্ছুরণ হলে বিচ্ছুরিত আলো থেকে খানিকটা ভিন্ন রঙের আলো বিক্ষিপ্ত হয়, যার পরিমাণ নির্ভর করে মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যের উপর। এই বিষয়কেই রমণ এফেক্ট বলেন। এই উপায়ে বিভিন্ন বস্তুর আণবিক গঠন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বৈজ্ঞানিক জগতে এই আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্র

শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত

হে মহাভারত! গর্ব মোদের মোদের জন্মভূমি,
যদিও জননী হও আমাদের বড় বিস্ময় তুমি।
বসি পদতলে নত করি শিরে,
চাহি ও হৃদয় পাঠ করিবারে,
কুহক বিছায়ে রহিলে গোপন, বিদারিতে নাহি পারি,
কোথায় আমরা, স্বর্গ, নরক, অথবা গগনচারী।

শীতাতপ ঘেরা অমরাবতীর মর্ম কেন্দ্র হতে,
ত্যাগ মহিমার বাণী নিঃসৃত, নেমে আসে বায়ুস্রোতে
বিভূতিভূষণ মহাদেব সাজি,
উঠিতে বসিতে খাই ভিকবাজি,
ছিন্ন কন্থা, জীর্ণ বসন, জঠরে অনল জ্বালা,
'স্বর্ণ বিহীন' সোনার ভারতে গাঁথি স্বপ্নের মালা।

সুরাসুরে মিলি অমৃতের ভাগ, মনুষ্যে নাহি বণ্টে,
ক্ষীরোদ মথনে সব হলাহল গণদেবতার কণ্ঠে।
তথত,ইতাউশ তক্তাপোষের,
সম জ্ঞান করি মন্ত্রের জোরে,
শ্রীকর-কমল 'করের' কাঁপনে জুড়ালে সকল জ্বালা,
মিলিবে ভাগ্যে অনেক অশ্রু-অর্ঘ্য ফুলের মালা।

শহীদ বেদির স্তম্ভে উড়িয়া গণতন্ত্রের ধ্বজা,
করিবে ঘোষণা সবাই সমান নাহি হেথা রাজা প্রজা।
একদা কোনও পান্থ বিদেশী,
জ্ঞান অন্বেষে বেদি মূলে আসি,
পতাকা ভাষা পড়িয়া লিখিবে অতি সুললিত ভাবে,
অধ্যাত্মের উৎস ভূমি এ বেঁচে রব ইতিহাসে।

চল্লিশকোটি সন্তান লয়ে জননী জন্মভূমি,
অন্ন, বস্ত্র, বেকারীর ভারে সদা বিব্রত তুমি।
দু'চারিটি তবু থাক দুধে-ভাতে,
আমরা জোগাব জল, বিছানে,
ক্ষুব্ধ চিত্ত করিতে শান্ত, ভুলিতে জঠর জ্বালা,
সোনার ভারত হেরিব মানসে গাঁথি স্বপ্নের মালা।।

শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়

দাড়ির অপূর্ব গাথা শুনিয়া সকলে স্বর্গ-মর্ত্যের সাগর পারে উত্তরণ লাভ করে। এই গাথা যিনি রচনা করিলেন, তিনিও গোঁফ-দাড়ি সম্বলিত একজন অতি প্রাচীন ঋষি: সারা বিশ্ব-জগৎ যাঁহাকে আজিও ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে।

এই দাড়ির অস্তিত্ব বহু প্রাচীন কালের। খট্টাঙ্গপুরাণকার ঋষি খর্বট খল্লাট এই দাড়ির বিশেষত্বে আকৃষ্ট হইয়া 'দাড়ি-মাহাত্ম্য' নামক শ্লোক রচনা করিয়া সেই যে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, এ পর্যন্ত আর তাঁহার আবির্ভাব ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট 'দাড়ি-মাহাত্ম্য' পুঁথিখানি অরণ্যময় পৃথিবীর বুকে লুকানো ছিল, তাহার পর বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রাচীন পৃথিবী নূতন রূপ লইয়াছে। নব্য যুগের একজন ভূ-তত্ত্ববিদ (তিনি মহাভাগ্যবানই বলিতে হইবে) মহর্ষি খর্বট রচিত ভূর্জপত্রগুলি মাটির তল হইতে প্রথম আবিষ্কার করেন। এই পুঁথি দেখিবার জন্য দুনিয়ার যত নর-নারী আসিয়া ভিড় জমাইল মহা কৌতূহলে। সেই পুঁথির মধ্য হইতে শুধু দাড়ির ইতিহাসই নয়, গুচ্ছ গুচ্ছ দাড়িও তাহার মধ্যে পাওয়া গেল এবং এক কণা শ্মশ্রু গ্রহণ করিবার জন্য সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। শক্তিবান এবং অর্থবানের মধ্যে সেই দাড়ির গুচ্ছ বণ্টন হইয়া গেলে অতি সাধারণ মানুষেরা মাথা নীচু করিয়া ফিরিয়া গেল। মাত্র জনকয়েক ধুরন্ধর কালোবাজারী নিজেদের ব্যবসা পাকা করিবার জন্য এই দাড়ির খবর বিশ্ব-ভুবনে প্রচার করিল। আজো এই দাড়ির গুণ-কীর্তনে আকাশ-বাতাস মুখরিত। দাড়ি মানুষের মনে আশার প্রদীপ জ্বালে। এই দাড়ি-মাহাত্ম্য কথা অজ্ঞানকেও জ্ঞানী করে।

পৃথিবীর সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্য শুভ্র-শ্মশ্রু গুম্ফ ছায়াতলে থাকিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। হোমাগ্নির শিখার পার্শ্বে বসিয়া লম্বমান দাড়ির গুচ্ছ বেণিবদ্ধ করিয়া ঋষিগণ বেদের টীকা লিখিতে বসিতেন। ধূপ-গুগ্গুলাদির গন্ধে চারিদিক আমোদিত, প্রকৃতির স্নিগ্ধ সুন্দর রূপ। প্রকৃতির সহিত দাড়ির শ্মশ্রুগুলিও আনন্দে নৃত্য করিত।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মার যে দাড়ি ছিল,—একথা পুরাণে লেখা আছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী দেবদূত সংগীতজ্ঞ মহর্ষি নারদেরও দাড়ি বর্তমান। রামায়ণকার কবিগুরু বাল্মীকির রচনার খ্যাতি তাঁহার দাড়ির জন্যেই সর্ব দেশকালপাত্রে সমভাবে বর্তাইয়াছে। মহামুনি বেদব্যাস, সকল ঋষির পূজ্য যিনি তাঁহারও গণ্ডদেশে শুভ্র দাড়ি বর্তমান ছিল। মুনি-ঋষিদের দাড়ির গুণেই চারটি বেদ চার ভাগে ভাগ হইয়াছে। বেদ-উপনিষদ-পুরাণ প্রাচীন সমুদয় গ্রন্থের মধ্যেই দাড়ির মহিমা শোনা যায়। বস্তুত, সে যুগে দাড়ির প্রকৃত কদর ছিল এবং পুরুষের সৌন্দর্যও দাড়ির উপরেই বেশ কিছুটা নির্ভর করিত। তাই মুনি-ঋষিগণ দাড়িকর্তন না করিয়া অধিক দাড়ির আবাদ করিতেই ভালবাসিতেন।

মহাদেবের পিঙ্গল জটাজালে গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধিমান ভগীরথ শিবের তপস্যা করিয়া শিবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া তাঁহার জটা ও দাড়ি ছিঁড়িয়া গঙ্গাকে মুক্ত করিয়া দেন। রামায়ণে দেখুন। কিষ্কিন্ধার রাজা বালি, যিনি দশাননকে আপন লেজ দ্বারা সাত পাক ঘুরাইয়া সমুদ্রজলে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, তিনিও দাড়িধারী ছিলেন কল্পনা করিলে অন্যায় হইবে না। আবার সেই দশানন যখন সীতাকে হরণ করিল, তখন দাড়িহীন শ্রীরামচন্দ্র কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বলা বাহুল্য, রামচন্দ্রের যদি দাড়ি থাকিত তাহা হইলে তাঁহার দয়িতাকে রাবণ কখনই হরণ করিতে পারিত না। আরো নিদর্শন দেখুন, হনুমান মহাভক্ত বলিয়া দেশে দেশে যাঁর পূজা চলিয়া আসিতেছে, তিনিও ওই দাড়ির বলেই লঙ্কাদগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

দ্রৌপদীর জন্য মহা দম্ভভরে ভীম যখন হিমালয়ের পাদদেশ হইতে কমল আনিতে গেলেন, তখন দাড়িওলা হনুমানের সহিত তাঁহার দেখা হইল। হনুমান একগাছি দাড়ির কেশ ছিঁড়িয়া কহিলেন, হে ভীম, তুমি আগে এই কেশ তুলিয়া তোমার বীরত্ব দেখাও, পরে পদ্ম তুলিতে যাইও। ভীম সেই কেশ নড়াইতে হিমসিম্ খাইয়াছিলেন। —এ কথা খর্বট রচিত 'দাড়ি-মাহাত্ম্য' নামক অপূর্ব শ্লোকে লেখা আছে।

অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। বর্তমানেই দেখুন, দাড়িকে কোন বীরসন্তান ঘৃণা করে না। এই দাড়ি রাখাই পাঞ্জাবীদের বৈশিষ্ট্য। নির্ভীক পুরুরাজকে গ্রীকগণ আক্রমণ করিতে আসিয়া যে কী দুর্দশায় পড়িয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখা আছে। ইঁদুরের মত তাহারা ঝিলমের জলে প্রাণ হারাইল। যাহারা নামেমাত্র প্রাণে বাঁচিয়াছিল তাহারা পুরু-সৈন্যের দাড়ির আড়ালে প্রাণ বাঁচাইল বটে, কিন্তু ডাঙায় উঠিয়া তাহাদেরও মরিতে হইল। ইতিহাস যাহাই বলুক না কেন, আলেকজাণ্ডারের পলায়নের পিছনে এই দাড়ির সমস্যাই বলবৎ ছিল।

কিন্তু যেদিন পুরু-সৈন্যেরা শ্মশ্রুমুক্ত হইল, সেইদিন হইতেই তাহাদের দুর্দশার সূচনা হইল এবং ভাগ্যের রবিও [illegible] শ্মশ্রুর অন্তরালে আত্মগোপন করিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের

ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল এবং তাহাদের শ্মশ্রু-বিলাসই ইহার কারণ। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী ইঁহারা আদি শ্মশ্রুবান। পরবর্তী যুগে : বাবর, আকবর, শাজাহান, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি মুঘল সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরদেরও লম্বা-লম্বা দাড়ি ছিল। এই দাড়ির জন্যই তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার সফল হইয়াছিল। অধিকন্তু, সুন্দরী মমতাজকেও এই দাড়ির ধকল সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বুদ্ধিমান শিবাজীর দাড়িধারী ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করার পিছনেও ছিল ওই দাড়ির কৌশল। অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের চেয়ে (আলমগীর নহে) শিবাজীর দাড়িটিই অধিক দীর্ঘ ছিল।

পলাশী প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়ের পিছনেও ওই দাড়িরই রহস্য। তিনি দাড়িহীন না হইয়া যদি দাড়িধারী হইতেন, তাহা হইলে পলাশীর মাঠে নূতন করিয়া ভারতের ইতিহাস লেখা হইত। ইংরাজের রাজ্য সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল সুদূরপরাহত।

আর অধিক প্রমাণ খাড়া করার প্রয়োজন কি? বিনা যুদ্ধে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল, ইহার পিছনেও যে দাড়ির কৃতিত্ব কতখানি ছিল, তাহা খট্টাঙ্গপুরাণ পাঠে জানা যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দাড়ি ছিল না, নেহরুজীও দাড়িহীন তাহা জগতের সবাই জানে। কিন্তু ইংরাজেরও দাড়ি ছিল না; তাহা হইলে কি করিয়া ভারত স্বাধীন হইল? ভারত স্বাধীন হওয়ার পিছনে আবুল কালাম আজাদের ত্রিভুজাকৃতি দাড়ি, দাড়িই ভারতকে স্বাধীন (দাড়ি-মাহাত্ম্যেই আজাদ-হিন্দ গৌরব অর্জন) করিয়াছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু দাড়িহীন রবীন্দ্রনাথকে কল্পনা করা যায় না। তাঁহার অজস্র শ্মশ্রুর গুণেই তাঁহার কবিত্বের বিকাশ। অরবিন্দ ঘোষের নাম নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর তিনদিন পরও তাঁহার দেহ জ্যোতির্ময় ছিল কী কারণে, তাহা আপনারাই কল্পনা করুন। মহাত্মা গান্ধীর অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার গণ্ডদেশে যদি দাড়ি থাকিত, তাহা হইলে গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইত না। সুরাবর্দী সাহেব অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হইয়াও তিনি নাজেহাল হইলেন সে কেবল তিনি দাড়িহীন বলিয়াই। কাশ্মীরের 'শের' অবশেষে কারাবাস করিলেন, তিনি দাড়িকে অবহেলা করিয়া অতি আধুনিক হইয়াছিলেন বলিয়া।

যুক্তরাজ্যে আব্রাহামের (লিঙ্কনের) কথাটাই ভাবিয়া দেখুন। ইলেক্‌সনে বার বার পরাজিত হইয়া অবশেষে এক কুমারীর উপদেশে দাড়ি রাখিয়া ইলেকসনে জয়লাভ করিলেন। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস দুই জনের অসামান্য খ্যাতির পিছনে ছিল চাপ-চাপ দাড়ির কারসাজি। এই দাড়ির কাছে দেশ-কাল-পাত্রের কোন বিচার নাই। দাড়ি সে কেবল দাড়িই। এই পৃথিবীতে সাম্য বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইল এই দাড়ি। ইহা হইতেই দাড়ির প্রয়োজনীয়তা কি সুস্পষ্ট নহে?

এই দাড়ির গুণপনার কথা আর কী বলিব! এর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রূপ। প্রবীণ বয়সে ইহার রূপ পুঞ্জীভূত পেঁজা তুলার ন্যায় শ্বেত-শুভ্র। ইহাতে আবার রোজ পাঁচসিকা করিয়া যদি সুগন্ধি আতর ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তো তার আর কথাই নাই। তখন এই দাড়ি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণই করিবে না, মনও বিমুগ্ধ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দাড়ি কাঁচায়-পাকায় মিশেল। ইহার সৌন্দর্যও মানুষকে মুগ্ধ করে। যেন গঙ্গার সঙ্গে যমুনার মহামিলন! তৃতীয় শ্রেণীর দাড়ির কথা বলিলে কাক ও কোকিল লজ্জা পাইবে। কুমারী মেয়ের অক্ষির কালো কেশরাশি এবং আলকাতরা যেন সেই দাড়ির বর্ণ নকল করিয়াই বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর দাড়ির কথা সকলেরই জানা আছে। কিশোর বয়েসে অতি কোমল রোঁয়ার মত গণ্ডদেশে তাহার অবস্থান। প্রথমে লজ্জা এবং পরে ওই দাড়িই গৌরব বৃদ্ধি করে। এইভাবে দাড়িকেও বারোটি মাসের মত বারো ভাগে ভাগ করা চলিতে পারে। নিম্নে দাড়ির আরো কিছু বিবরণ দেওয়া হইল।

মনে কর, কোন একজন প্রেমিক প্রেয়সীর প্রেমে বিভোর এবং কালের কুটিল নিয়মে সেই প্রেমে বিরহ আসিয়া দেখা দিল। প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে সৃষ্টি হইল অসামান্য ব্যবধান। তখন প্রেমিকের চক্ষু দিয়া যদি অঝোরধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই নয়নাশ্রু দাড়িতে আসিয়া আশ্রয় লইবে। অসহ্য গ্রীষ্মে যখন একটু শীতল বাতাসের জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন দাড়ির চামর দুলাইয়া হৃদয় ঠাণ্ডা করা যাইতে পারে। মনে কর, কোন কারণে তোমার প্রিয়া তোমারই সামনে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেছে (তোমার প্রিয়া যেহেতু নারী, সেজন্য ক্রন্দন-শক্তি তাহাদের অসাধারণ) আর কান্না থামাইবার সকল চেষ্টাই তোমার ব্যর্থ হইতেছে। তখন হে প্রেমিকবর, তোমার যদি দাড়ি থাকে, তাহা হইলে তোমার দাড়ি দিয়া তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া দেখিও, তোমার প্রেয়সীর মুখে তখন আর হাসি ধরিবে না। আর এই কার্য করিলে তোমার গালের দাড়ি দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। সেই দাড়ি চাঁচিয়া যদি তাঁতীবাড়ী লইয়া যাও, তাহাতে উৎকৃষ্ট পশম-বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া তাহারা তোমাকে উপহার দিবে।

'এটমের' যে প্রতাপে আজ পৃথিবী প্রকম্পিত, যে মানব সমাজ আজ 'ফ্লু'র প্রকোপে অতিষ্ঠ, সে সমস্যা তোমাকে কিছুই করিতে পারিবে না—যদি তোমার জীবাণুনাশক দাড়ি বর্তমান থাকে। এমন দাড়ির কথা কেহ জানিতে চাহে না (আশ্চর্য !!!) এবং জানিলেও দাড়ির সম্বন্ধে মানুষের মনের সন্দেহের আজো কোন অবসান ঘটে নাই। সেই জন্যই মহর্ষি খর্বট দাড়ির সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

আমাদের ভারতের প্রাপ্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে অবশ্যই দাড়ি রাখিতে হইবে। ভবসিন্ধু পারাবার হইতে হইলে দাড়ির এই অকাট্য উক্তিকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। সুতরাং উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করিতেছি, বিধাতার এই অপূর্ব সৃষ্টি রক্ষা করিয়া সর্ব কল্যাণার্থে দাড়ি রাখিতে অনুরাগী হও। মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য খট্টাঙ্গপুরাণ হইতে শ্লোক তুলিয়া আমি নিশ্চয় একটি মহৎ কার্য করিয়া গেলাম। এইবার দাড়ি রক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি খর্বট রচিত খট্টাঙ্গপুরাণ হইতে আপনাদের সুবিধার জন্য মন্ত্রটি তুলিয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আপনারা এই মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিয়া দাড়ি বৃদ্ধির সহায়ক হউন। ত্রি-সন্ধ্যায় পুত্র-স্ত্রী কন্যাসহ উৎফুল্ল মনে এই মন্ত্র জপ করিলে অমরত্ব প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা আছে।

নমঃ হে দাড়িধারী, তোমার সৌন্দর্যে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। মুখের বিশেষত্ব বিলম্বিত দাড়ি, তোমার জ্যোতির্ময় রূপে আমি নিজেকেই ভুলিয়া গিয়াছি। মৃদু বাতাসে যখন শ্মশ্রুগুলি মৃদু মৃদু দুলিতে থাকে, তখন মনে হয় জগতে এই দাড়ির তুল্য বস্তু আর নাই। হে ঈশ্বর, কৃপা করিয়া আমাকে দীর্ঘ দাড়িধারী কর। দাড়ির গুণাগুণ কে বর্ণনা করিবে? কাল-ঘন দাড়ি সকলেরই মনোহরণ করে। পঞ্চভূতের তুমি ত্রাণকর্তা। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই দাড়ির মাঝেই নিহিত। গহন রাত্রির শেষে সূর্যোদয়ের মত হে দাড়ি তুমি আমার গণ্ডদেশে আবির্ভূত হও। মহাজ্ঞানী মহাজনেরা তোমারই পদবন্দনায় আত্মহারা। সুতরাং তোমার বন্দনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে তোমার প্রচার গোপন থাকিবে না। তোমারই নাম গাহিয়া মানুষ জন্মাইবে এবং তোমার নাম করিতে করিতেই মানুষ ইহধাম ত্যাগ করিবে। এ হেন দেশে তুমিই একমাত্র ভরসা। দাড়ি-মঙ্গল কথাকে একমাত্র অমৃতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মহর্ষি খর্বট এই অমৃত আমাদের দান করিয়া গিয়াছেন।

সুমেরু বৃত্তে সবুজ বলয়

মিখাইল কাপলিন

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে তুন্দ্রা। (মেরু অঞ্চলের বৃক্ষশূন্য বিশাল প্রান্তরকে বলে তুন্দ্রা।) এই তুন্দ্রা অঞ্চলে স্মরণাতীত কাল থেকে লোকে বল্‌গা হরিণ পালন করে, ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার ধরে, মৎস্য শিকার করে। বিগত কয়েক দশক ধরে তুন্দ্রায় চাষবাস ও গবাদি পশু প্রজননের কাজ চলছে সাফল্যের সঙ্গে। তুন্দ্রা-ভূমির উপর প্রকৃতি দেবী বড়ই অপ্রসন্ন। এখানে তাপাঙ্ক শূন্য ডিগ্রীর নীচে; গভীর চিরতুষার স্তর; দীর্ঘস্থায়ী, কঠোর, কঠিন শীত ঋতু; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যৎসামান্য; বর্ষাকালে দমকা বাতাস। উদ্ভিদ জন্মাবার কাল বড়ই স্বল্প মেয়াদের—দুই থেকে তিন মাস মাত্র। এই বিশাল ভূখণ্ডের কিয়দংশ অনিবিড় অরণ্যে আবৃত। প্রকৃতির এইটুকু দাক্ষিণ্যই জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক—বল্‌গা হরিণের দল আহার্য পায়, প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার হাত থেকে ঘরবাড়িগুলি রক্ষা পায়, গ্রাম ও জনপদগুলিতে আবহাওয়া বজায় থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তুন্দ্রার এই বনগুলি ছোট ছোট এবং দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়। নতুন গাছপালা লাগিয়ে এই দ্রুত অবলুপ্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দুষ্কর। তুন্দ্রা অঞ্চলে তবে বনীকরণের কাজ কি ভাবে ত্বরান্বিত করা যায়? বন ও তুন্দ্রার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কটা কি? এই বিষয়ে অধ্যাপক বরিস্ তিখোমিরফের অভিমত শোনা যাক। ইনি সুমেরু অঞ্চলের উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। এই সোভিয়েত বিজ্ঞানী সোভিয়েত সুমেরুর বহু এলাকা পরিদর্শন করেছেন, সুদূর আইসল্যাণ্ড ও উত্তর আমেরিকার কানাডীয় দ্বীপপুঞ্জের উদ্ভিদ জগৎ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর 'তুন্দ্রায় বনবনানীর অভাবের কারণ ও প্রতিকার' গ্রন্থে বরিস্ তিখোমিরফ সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রীষ্মকালে সুদূর উত্তরের বল্‌গা হরিণরা সুমেরু মহাসাগরের উপকূলের দিকে চলে গিয়ে তুন্দ্রা চারণভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শরৎকালে তারা দক্ষিণের অরণ্যগুলি অভিমুখে যাত্রা করে এবং শীত ঋতু কাটিয়ে দেয় বিরলবৃক্ষ অরণ্যে ও আরণ্য-তুন্দ্রা অঞ্চলে। তাদের সব সময়েই আহার্যের চাহিদা থাকে। ধূসর শেওলা তাদের কাছে চমৎকার আহার্য। কিন্তু মুশকিল এই ঐ জাতীয় শেওলা জন্মায় বড় ধীরে ধীরে—বছরে কয়েক মিলিমিটার মাত্র। সুতরাং বল্‌গা হরিণদের কাছে অরণ্য এক অপরিহার্য আশ্রয়। আহার্য ছাড়াও বনবনানী তাদের প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া ও তুষারের হাত থেকে রক্ষা করে। সুতরাং বনের শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে, অর্থাৎ থেকে থেকে গাছপালা লাগাতে হবে। কিন্তু যত সহজে বলা হল কাজটা তত সহজ নয়। উত্তর অক্ষাংশের নিজস্ব নিয়ম আছে। উক্ত বীজগুলি শেওলার বৃন্তে ও ছোটো ছোটো পাতায় আটকে থাকে, জমিতে গিয়ে পৌছতে পারে না। ভোর্কুতার দক্ষিণে অবস্থিত সিভায়া মাস্কা ষ্টেশনের কাছাকাছি একটি পরীক্ষামূলক জমিতে গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে শেওলার আবরণ ধ্বংস করে ঘাসের চাপড়া আল্‌গা করে দিলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে কোনো বাধা আর থাকে না। অধিকন্তু গবেষণার ফলে জানতে পারা গিয়েছে, অরণ্য ও তুন্দ্রার শেওলাতে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে। সুতরাং এই শেওলা চারা-গাছের পক্ষে এক চমৎকার উর্বরকের কাজ করে। তুন্দ্রা অঞ্চলে বন তৈরির কাজে যেসব উদ্ভিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ তারা হচ্ছে ফিনিশ ও সাইবেরীয় দেবদারু, দারুরীয় শেওলা, অ্যাশ, বার্চ, নীল হানিসাকল পুষ্পলতা ও আরও কয়েক প্রকার ঝোপ-ঝাড়। তুন্দ্রাসংলগ্ন অরণ্যগুলির উত্তর অংশে ইতিমধ্যেই ৩০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার প্রস্থের একটি অরণ্য-বলয় গড়ে উঠে এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা প্রাচীরের কাজ করছে। এই শরৎকালে লেনিনগ্রাদে বিজ্ঞানীদের এক নিখিল সোভিয়েত আলোচনা-চক্রে অরণ্য-তুন্দ্রার বিবিধ সমস্যা নিয়ে মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইন্দো-এ্যাংলিকান কাব্য

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

ইংরাজী কাব্যছন্দে ভারতবাসীর আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য। Cambridge History of English Literature-এর চতুর্দশ খণ্ডে S. F. Oaten লিখিত Anglo-Indian Literature নামক প্রবন্ধে মুখ্যত আলোচিত হয়েছে প্রবাসী ইংরাজদের সাহিত্য-কীর্তি। Father Thomas Stephens-এর চিঠি (ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ) থেকে সুরু করে Sir Thomas Roe (সপ্তদশ শতাব্দী), Sir William Jones, John Leyden, James Tod, Sir William Hunter, Sir Edwin Arnold প্রভৃতি ভারতভ্রমণকারী ও সাময়িকভাবে বাসকারী ইংরাজের গদ্য পদ্য রচনার আলোচনা করেছেন ওটেন সাহেব। পরিশেষে যদিও তিনি মধুসূদন ও তরু দত্তের কথা উল্লেখ করেছেন তবু এ-সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যেরই একটি উপধারা বলে গণ্য হয়েছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ এই যা। ওটেন সাহেব স্পষ্টই বলেছেন, Anglo-Indian literature is, for the most part, merely English literature strongly marked by Indian local colour.' অপরপক্ষে আমরা যে সাহিত্যের আলোচনা করতে যাচ্ছি তা ইংরাজী ভাষায় রচিত হলেও বিশেষভাবে ভারতের সম্পদ, ভারতীয় ধ্যান-ধারণা, ভারতীয় জীবন, সমস্যা, দৃশ্যাবলী ও জীবনযাত্রার প্রকাশ। ওদের ভাষায়, ভারতে তার রূপ কিঞ্চিৎ ভিন্নতর দাঁড়িয়ে গেছে এ-কথাও স্মরণীয়, রচিত হয়েছে বলে ইংরাজরা কখনও এ সাহিত্যের দাবীদার হবে কি না জানি না, আপাতত তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কাজেই ইংরাজের প্রাধান্যসূচক Anglo-Indian নামটি দিয়ে এ-সাহিত্যকে অভিহিত করা ঠিক হয় না, Anglo-Indian শব্দে আবার একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা মনে জাগে। অপর পক্ষে Indo-Anglican Literature নামে একখানি সংকলন গ্রন্থ গত শতাব্দীতেই (১৮৮৩) প্রকাশিত হয়েছিল, আলোচ্য সাহিত্য-সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থপ্রণেতা কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই নামটিই পছন্দ করেন, এটিই বলতে গেলে চালু হতে চলেছে। ইন্দো-এ্যাংলিকান কথাটির বাংলা কেউ কেউ করেছেন 'ভারতীয় ইংরেজী,' কথাটি শুনতে মিষ্টি নয়, উচ্চারণেও সুবিধা হয় না। তাই বাংলায় আমি সর্বভারতীয় ইংরাজী নাম 'ইন্দো-এ্যাংলিকানই' রক্ষা করলাম।

ইন্দো-এ্যাংলিকান সাহিত্যের সুরু হয় মোটামুটি ভাবে ১৮২০ সাল থেকে। এ সময় থেকেই ভারতীয়েরা এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা সুরু করেন। যদিও প্রবাসী ইংরাজদের লেখা আদৌ গণনার মধ্যে আনা হচ্ছে না তবু এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁদের থেকেই ভারতীয়দের মধ্যে প্রেরণা এসেছে ইংরাজীতে আত্মপ্রকাশের; খোদ ইংলণ্ডের কবিরা প্রভাবিত করেছেন রচনাকে কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রেরণা যুগিয়েছেন কতক প্রবাসী ইংরাজ সাহিত্যিক। আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রায় দেড়শ' বছরের সাহিত্যকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নেব।

১৮২০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি—শুধু কাব্যধারাটিরই অনুবর্তন করব—মাত্র তিন জন; ডিরোজিও, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও মাইকেল মধুসূদন।

হেনরী ডিরোজিও (১৮০৭-১৮৩১), পর্তুগীজ পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তান, মনে-প্রাণে খাঁটি ভারতীয় ছিলেন; অসাধারণ মনীষা ও প্রাণশক্তির অধিকারী এই যুবক মাত্র তেইশ বছরের জীবনে শুধু ইন্দো-এ্যাংলিকান সাহিত্যে নয় নবভারতের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্থান অধিকার করেছেন। কতকগুলি সুন্দর প্রকীর্ণ কবিতা ছাড়া তিনি একখানি দীর্ঘ কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন—'The Fakir of Jhungheera। স্বামীর চিতায় আরোহণোদ্যতা 'নলিনী'র ভাগ্য-বিড়ম্বিত জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী। বর্ণনায় যথেষ্ট শক্তি ও খাঁটি কবিত্বের পরিচয় রয়েছে, ভারতীয় জীবন ও সমাজের ছবি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থখানির ভূমিকায় ভারতের দুর্দশার জন্যে কবি বেদনা প্রকাশ করেছেন:

My country, in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast,
Where is that glory, where that reverence now ?

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইংরাজী কবিতা লিখে তৎকালে নাম করেছিলেন সত্য কিন্তু তেমন কবিত্বশক্তির পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি। তাঁর মত আরও অনেকের মূল গলদ ছিল এইখানটায় যে তাঁরা ইংরেজের চোখে ভারতকে দেখতে চেয়েছিলেন। কাশীপ্রসাদ দেব-দেবীর যে স্তুতি রচনা করেছেন তা আমাদের অন্তরস্পর্শ করে না যেমন করে না রাজা রবি বর্মার অঙ্কিত পৌরাণিক ছবিগুলি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৩-১৮৭২) বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের পূর্বে মনে-প্রাণে ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা করেছেন। 'মেঘনাদ' ও 'বীরাঙ্গনা'র মত সৃষ্টি ইংরাজীতে রেখে যেতে পারেন নি সত্য কিন্তু তাঁর The Captive Ladie (১৮৪৯) যথেষ্ট শক্তি ও সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে। পৃথিরাজ ও সংযুক্তার কাহিনী নিয়ে রচিত এ-কাব্যে রোমান্টিক কবিকুল বিশেষ করে বাইরনের প্রভাব স্পষ্ট।

১৮৭০-১৯০০ এ পর্যায়ে ইন্দো-এ্যাংলিকান সাহিত্যের অনেকখানি অগ্রগতি দেখা যায়। প্রথমেই নাম করতে হয় তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) ও তাঁর জ্যেষ্ঠা অরু দত্তের (১৮৫৪-১৮৭৪)। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে এঁদের জন্ম। বাড়ীতে ছিল কবিত্বের পরিবেশ; তাঁদের পিতৃ-পিতৃব্যরা মিলে Dutt Family Albam নাম দিয়ে প্রায় দু'শ কবিতা সম্বলিত একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তরুর ছয় বৎসর বয়সেই তাঁর পিতা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও হিন্দু শিক্ষা-দীক্ষা থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। তরুর বয়স

যখন ১৩ এবং অরু ১৫ তখন গোবিন দত্ত কন্যাদের নিয়ে বিদেশে যান এবং ফরাসীদেশের এক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। বছর দুই পরে এঁরা ইংলণ্ডে এসে কেম্‌ব্রিজে ভর্তি হন। আরও দু'বছর পরে দেশে ফিরে আসেন। অল্পদিন পরেই অরুর মৃত্যু হয় ক্ষয় রোগে। তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দুই বোনের রচনা 'A Sheaf Gleaned in French Fields' (১৮৭৫)। ১৬৫টি ফরাসী রোমাণ্টিক কবিতার ইংরাজী অনুবাদ, ৮টির অনুবাদ করেছিলেন অরু বাকীগুলির তরু। অরুর শুধু এই কয়টিই রচনা, কিন্তু তা মোটেই তুচ্ছ নয়। Victor Hugo-র 'Morning Serenade' এর প্রথম স্তবক :

Still barred thy doors ; the far east glows,
The morning wind blows fresh and free
Should not the hour that wakes the rose
Awaken also thee ?

মূলের স্বাদ-গন্ধ নিয়ে আসা এমন সহজ স্বচ্ছন্দ অনুবাদ শুধু মূল কবির সঙ্গে সাধর্ম্য নয় ভাষা ও ছন্দের উপর পরিপূর্ণ অধিকারের পরিচয় বহন করে। তরুর অনুবাদ শুধু পরিমাণে নয়, গুণেও শ্রেষ্ঠতর। অনুবাদ যে সর্বত্র নিরঙ্কুশ তা নয়, ছন্দে ও ব্যাকরণে ত্রুটি, উপযুক্ততম শব্দটির অভাব এ সমস্ত যে নেই তা নয়, তবু ঐ বয়সে দু'টি বিদেশী ভাষা নিয়ে তাঁরা যা করলেন তার তুলনা বিরল। Edmund Gosse লিখেছিলেন, 'If modern French literature were entlrely lost, it might not be found impossible to reconstruct a great number of poems from this Indian version.'—কম কথা নয়। তরুর মৌলিক রচনা Ancient Ballads and Legends of Hindustan প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৮২ সালে। মাস দশেকের পরিশ্রমে সংস্কৃত সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত থেকে স্মরণীয় কাহিনী ও দৃশ্যাবলী সংগ্রহ করে অন্তরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগে রাঙিয়ে উপহার দিয়েছেন দেশী-বিদেশী পাঠককে। যে প্রতিভাবলে তিনি তাঁর ফরাসী উপন্যাসে ফরাসী রমণীর মতই ভাবতে ও লিখতে পেরেছেন সেই প্রতিভাবলেই নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী হয়ে গিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতীয় দেব-মানবের কাহিনীর মর্মে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর শৈশব-শিক্ষাও অবশ্য এ বিষয়ে আনুকূল্য করেছিল। উমার বর্ণনা শুনুন, পাখা-বিক্রেতার কাছে দেবী হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন,

She stretched her hand,
'Oh what a nice and lovely fit !
No fairer hand, in all the land,
And lo ! the bracelet matches it.'
Dazzled the pedlar on her gazed
Till came the shadow of a fear,
While she the bracelet arm upraised
Against the sun to view more clear.
Oh she was lovely, but her look
Had something of a high command
That filled with awe.

এখানে শুধু সুন্দরী রমণী নয় মহিমময়ী দেবীর বর্ণনা পেয়েছি, জোরালো আকর্ষণীয় বর্ণনা। ক্ষিপ্র ত্বরিত বার্তালাপ রচনায়ও তরু দত্ত দক্ষতা দেখিয়েছেন। পরিচিত প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত :

The champac, bok, and South-sea pine,
The nagessur with pendent flowers
Like ear-rings,—and the forest vine
That clinging over all, embowers,.....

ছন্দ ভাষা বর্ণনরীতি ইত্যাদিতে রোমাণ্টিক কবিদের প্রভাব দেখা গেলেও তরুর কাব্যে একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই ফুটে উঠেছে, কেবলই মনে হয় একটা বিরাট সম্ভাবনা অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল। যা তিনি রেখে গেছেন তাইতেই H. A. L. Fisher মন্তব্য করছেন,...'this child of the green valley of the Ganges has by sheer form of native genius earned for herself the right to be enrolled in the great fellowship of English poets.'

রমেশ দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মধারা আমাদের আলোচ্য নয়, কবি রমেশচন্দ্রের কথাই শুধু বলব। কবি হিসাবে রমেশ দত্তের কীর্তি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ। মহাভারতের দু' লক্ষ ও রামায়ণের আটচল্লিশ হাজার ছত্রকে তিনি চার হাজার করে আট হাজার ছত্রের মধ্যে ধরার অসাধারণ চেষ্টা করেছেন ; ফলে দুই গ্রন্থের বহু সুন্দর অংশ বর্জিত হয়েছে, মহাকাব্যগুলির একটা উদ্‌ধৃতাংশমালা শুধু পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত গদ্য বর্ণনা কাহিনীর সূত্র রক্ষা করেছে। আবার টেনিসনের Locksley Hall এর ছন্দ গৃহীত হওয়ায় অনুষ্টুপের চালগতি ও সরলতা ঠিক ভাবে সঞ্চারিত হওয়ার গুরুতর বাধা হয়েছে। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এই অনুবাদ একটা বিরাট কীর্তি হিসাবে অক্ষয় হয়ে আছে। আজও দেশে বিদেশে লক্ষ লক্ষ লোক রমেশচন্দ্রের এই ঋজু পরিচ্ছন্ন অনুবাদের মাধ্যমেই রামায়ণ মহাভারতের স্বাদ গ্রহণ করেছে। স্থানে স্থানে মহাকাব্যের দার্ঢ্য ও বিরাটত্ব সুন্দর প্রতিফলিত হয়েছে। একটি অংশ—অর্জুনের হস্তে কর্ণ নিহত হলে তাঁকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলে জানতে পেরে যুধিষ্ঠিরের শোক !

Hissing forth his sigh of anguish like a crushed and wounded snake, sad Yudhisthir to his mother thus his inward feelings spake :

'Didst thou, mother, bear the hero fathomless like ocean dread,

Whose unfailing glistening arrows like a countless bellows sped,

Didst thou bear that peerless archer all-resistless in his car,

Sweeping with the roar of ocean through the shattered ranks of war ?.....

এ পর্যন্ত যাঁদের কথা আলোচনা করলাম তাঁরা সকলেই বঙ্গবাসী। নবযুগ যেমন সর্ব প্রথম বাংলা-সাহিত্যেই এসেছে, ইঙ্গো-অ্যাংলিকান

সাহিত্যও তেমনি বাংলায়ই প্রথম স্ফূর্তি লাভ করে। কিন্তু বোম্বাই বা মাদ্রাজ বেশিদিন পিছিয়ে থাকে নি। বোম্বের পার্শী লেখক মালাবারী (১৮৫৩-১৯১২) তাঁর The Indian Muse in English Verse প্রকাশ করেন ১৮৭৬ সালে। আত্মজীবনীমূলক এই কাব্য গ্রন্থে যে শক্তির বিশেষ প্রকাশ পেয়েছে তা হল তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের। তাঁর একজন শিক্ষকের ছবি :

'With pointed paws his fierce moustache
hid twirt,
And at his culprit the direst vengeance hurt;
Sharp went the whizzing whip, fast flew the cane,
And he fairly caper'd in his wrath insune.

আর একজন বিশিষ্ট কবি নাগেশ বিশ্বনাথ পাই। দাক্ষিণাত্যের লোক হলেও তিনি আইন-ব্যবসায় নিয়ে বোম্বাইতে স্থায়ী হন। The Angel of Misfortune তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি। সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করে ৫০০০ ছত্রে, অমিত্র-ছন্দে রচিত এই কাহিনী-কাব্য স্থানে স্থানে কাব্যাংশে চমৎকার হয়েছে এবং সর্বত্রই অমিত্র ছন্দ সার্থক হয়েছে। এই পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথাও বলতে হয়। স্বামীজীর মৌলিক ইংরাজী কবিতার সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু ভাবের দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ নতুন সুর নিয়ে এসেছেন। দৃপ্তভঙ্গিতে বৈদান্তিক আত্মতত্ত্ব ও মুক্তির এষণাকে রূপ দিয়েছেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপে কবিতাগুলো উদ্দীপনাময় হয়ে উঠেছে।

The Song of Sannyasin-এর খানিকটা—

Thus, day by day, till karma's powers spent
Release the soul for ever. No more is birth,
Nor I, nor thou, nor God, nor man.....

(১৯০০—১৯২০)

মনমোহন ঘোষ (১৮৬৭—১৯২৪, শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) একজন খাঁটি কবি! বিলেতে শিক্ষা পেয়ে মাতৃভাষার ন্যায় ইংরাজী অধিগত করেন, শুধু ইংলণ্ড নয় ইউরোপীয় কাব্যসম্ভারের স্বাদ ও সংস্কার গ্রহণ করে বিলেতে থাকাকালীন-ই বন্ধুদের সঙ্গে কাব্যচর্চা শুরু করেন। সচেতন মনে ভারতীয় শিক্ষাসংস্কারের তেমন প্রভাব না থাকলেও মনের গভীরে তা কাজ করেছে। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করলেও একরকম নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন মনমোহন, স্ত্রীর পীড়া ও মৃত্যুতে একাকীত্ব বেদনাময় হয়ে উঠেছে, কাব্যই ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের ও আত্মউত্তরণের একমাত্র উপায়। 'Primavera' নামে সংকলন গ্রন্থে কয়েকজন ইংরাজ কবির সঙ্গে মনমোহনেরও কবিতা ছিল। তাছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় একখানি মাত্র সংগ্রহ 'Love Songs and Elegies' (১৮৯৮) প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংগ্রহ 'Songs of Life and Death-এ' (১৯২৬) বাকী সব কবিতার স্থান হয় নি। অনেক অসম্পূর্ণ রচনা এখনও অপ্রকাশিত আছে। অজস্র গীতিকবিতায় মনমোহন আপন অন্তর নিংড়ে দিয়েছেন। তাঁর কবিতার নির্মিতি ত্রুটিলেশহীন; একটা করুণ স্নিগ্ধতা তাঁর প্রায় সকল কবিতার মধ্যেই অনুভব করা যায়। বিলেতে থাকতে মাতৃভূমির কথা মনে করে লিখছেন,—

Lost is that country, and all but forgotten
'Mid these chill breezes, yet still, oh, believe me,
All her meredian suns and ardent summers
Burn in my bosom.....

আর একটি কবিতার একটি অংশ—অন্তর্বেদনা ও প্রকৃতিচিত্রণ উভয়ই লক্ষণীয় :

Over thy head, in joyful wanderings
Through heavens wide spaces, free,
Birds fly with music in their wings,
And from the blue rough sea
The fishes flash and leap;
There is a life of loveliest things
O'er thee so fast asleep.

সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯—১৯৪৯)। গত শতাব্দীর শেষ দশকীয় ইংরাজ কবিকুলের সান্নিধ্যে সরোজিনীর কবিত্বের স্ফূর্তি। মনমোহনের মত তিনিও একজন খাঁটি গীতি কবি। কিন্তু মনমোহনের নিবিড় পশ্চিমী-শিক্ষা তাঁর ছিল না। তাঁর কবিতায় আমরা যে জিনিসটি বিশেষ করে পাই সে হল সুললিত ইংরাজী কাব্যছন্দে ভারতীয় নারীর অন্তর্বেদনা, ভারতজননীর কথা ও ভারতীয় দৃশ্যাবলী। তাঁর সংগ্রহ-গ্রন্থ তিনটি—The Golden Threshold (১৯০৫), The Bird of Time (১৯১২) ও The Broken Wing (১৯১৭)। তৃতীয় গ্রন্থ-প্রকাশের পর সরোজিনীর কাব্য-রচনা আকস্মিক বন্ধ হয়ে যায়, প্রাণধর্মী প্রেরণা শুকিয়ে যায়। কবিধর্মে সরোজিনী রোমান্টিক—লালিত্য ও সঙ্গীত তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। পাল্কীবাহক, বাউল, জেলে এদের কথা পল্লীসঙ্গীতের ভঙ্গিতে সুন্দর চিত্রকল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বেশির ভাগ কবিতাতেই আবেগের তীব্রতা দেখা যায়, সেই সঙ্গে প্রকাশের জোর, যেমন—

Why did you turn your face away?
Was it for love or hate?.....
Still for Love's sake I am foredoomed to bear
A load of passionate silence and despair.....

আবেগের সংহত প্রকাশও সরোজিনী দিয়েছেন তাঁর গোড়ার দিকের রচনাতেই, যেমন তাঁর To a Buddha Seated on a Lotus' নামে বিখ্যাত কবিতাটিতে। নানা দিক থেকে কবিতাটি একটি নিরঙ্কুশ সৃষ্টি। প্রথম অংশটি :

For us the travail and the heat,
The broken secrets of our pride,
The strenuous lessons of defeat,
The flower deferred, the fruit denied;
But not the peace, supremely won,
Lord Buddha, of thy Lotus-throne.

শ্রীঅরবিন্দের (১৮৭২—১৯৫০) বহুমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টি দূরে থাক, তাঁর 'কাব্যকৃতির উপর কিছুমাত্র সুবিচার করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Songs to Myrtilla'

প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'Savitri' সমাপ্ত হয় ১৯৫০ সালে। দীর্ঘ ৫৫ বছরের কবিজীবনে তিনি বহুতর গীতিকাব্য, কাহিনীকাব্য, নাটক ও মহাকাব্য রচনা করেছেন, সংস্কৃত ও বাংলা কাব্য থেকে অনুবাদ করেছেন, প্রকাশ কলার বিভিন্ন দিক বিশেষ করে ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত লেখা কাব্যে (Urvasie Love and Death প্রভৃতি) রোমান্টিকতার প্রাবল্য দেখা যায়—সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ছড়াছড়ি, অবশ্য Baji Prabhouতে আবার মরণজয়ী বীর্যবত্তা ও যুদ্ধের দামামা, আর দেখা যায় Blank-verse-এর উপর পরিপূর্ণ অধিকার। ১৯০৫—'১০-এর ছোট বড় কবিতায় সুর অন্য রকম, অধ্যাত্ম ভাবনা ও অনুভূতিই প্রধান উপজীব্য। এই পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা Ahana সমিল Hexameter-এ রচিত। এই কবিতায় কবির সমগ্র বিশ্বদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে, দু'টি ছত্র নমুনাস্বরূপ :

Deep in our being inhabits the voiceless invisible Teacher,
Powers of his godhead we live ; the creator dwells in the Creature.

তৃতীয় পর্বে (১৯১০-৫০) পণ্ডিচেরীর একান্তবাসে যে সৃষ্টি (Six Poems, Transformation and Other Poems, Poems Past and Present, Last Poems, Savitri ইত্যাদি) তাই হল শ্রীঅরবিন্দের কবি-প্রতিভার পরাকাষ্ঠা। স্বচ্ছ ঋষির দৃষ্টি নিয়ে লেখা এই সমস্ত কবিতায় মানবীয় উচ্ছ্বাস নেই, তত্ত্বচিন্তার ভারও নেই, আছে প্রতীতির স্বচ্ছতা ও প্রকাশের ঋজুতা। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে প্রায় ২৫০০০ ছত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নবতর বিন্যাস ঘটিয়ে লিখিত বিখ্যাত 'Savitri' মহাকাব্য শুধু ইন্দো-এ্যাংলিকান সাহিত্য নয় কাব্য-সাহিত্যেরই একটি বিরাট কীর্তি।

অধ্যাপক Raymond Frank Piper লিখছেন, 'During a period of nearly fifty years before his passing away in 1950, he (Sri Aurobindo) created what is probably the greatest epic in the English language and the longest poem in any language of the modern world. I venture the judgement that it is the most comprehensive, integrated, beautiful, and perfect cosmic poem ever composed.'

সাবিত্রীর স্বাদ উদ্ধৃতির সাহায্যে পাওয়া সম্ভব নয়, তবু নমুনাস্বরূপ ক্ষুদ্র একটি অংশ উদ্ধার করা যাচ্ছে। দেবর্ষি নারদের মুখে বৎসরান্তে সত্যবানের মৃত্যু অবধারিত শুনে সাবিত্রী গম্ভীর হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না, মাতার অনুনয়ের উত্তরে জবাব করলেন,—

Once my heart chose and chooses not again......
Death's grip can break our bodies, not our souls ;
If death take him, I too know how to die.
Let fate do with me what she will or can ;
I am stronger than death and greater than my fate,......

(১৯২০-৬০)

হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮—) সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা, সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বেদান্ত, সুফীবাদ ও পশ্চিমী শিক্ষায় তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠিত। খোলা মনে সবকিছুর মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা তাঁর আছে, শ্রীঅরবিন্দ দর্শন থেকে মার্ক্সবাদ সবই তাঁর মনকে নাড়া দেয়। ফলে বহু বিচিত্র ভাব-অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে-নাট্যে। তিনি কিছু মিষ্টিক কবিতাও লিখেছেন, প্রেমের কবিতা অজস্র। The Feast of Youth (১৯১৮)-এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ দেখেছিলেন, 'the beginnings of a supreme poetic utterance of the Indian soul in the rhythms of the English tongue.' এই প্রতিশ্রুতি কবি রক্ষা করেছেন, অব্যাহত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। পঞ্চাশোর্ধ্বে প্রকাশিত 'Spring in Winter' গ্রন্থেও যথেষ্ট সজীবতা ও প্রাণস্ফূর্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের একটি কবিতায় বিরহের বেদনা :

Heart-martyrdoms
I bear for your sake, my Beloved !......
There is a stab-sense
Bleeding me white
Each time I write
A lyric bemoaning your absence !

শব্দ ও ছন্দের উপর হরীন্দ্রের অধিকার বরাবরই নিরঙ্কুশ। প্রকাশ-কলার উপর আরও বেশি অধিকার রাখেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের কে. ডি সেথনা। ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় এবং সাধকোচিত নিষ্ঠা সহকারে তিনি কাব্য রচনা করে চলেছেন। তাঁর সঙ্কলন গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য The Secret Splendour (১৯৪১) ও The Adventure of the apocalypse (১৯৪১)। দ্বিতীয় গ্রন্থটির একটি ইতিহাস আছে কবি বুকের ব্যথায় প্রায় দু'মাস শয্যাশায়ী ছিলেন, ঐ সময়ে প্রতি রাত্রিতে ঘুমঘোরে তিনি বিনাচেষ্টায় বিভিন্ন ছন্দে কবিতা লিখে গেছেন—'I was writing with a kind of automatic energy. It was as if I were a mere gate through which poems strode out' আশ্চর্যের বিষয় ব্যথা দূর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা আসাও বন্ধ হয়ে যায়। Apocalypse থেকে ক্ষুদ্র একটি উদ্ধৃতি :

.....man's orb
Of vision can never absorb
The adventure of the apocalypse—
Until this passion inward dips
Where hides, behind both dazzle and dark,
Perfection's pigmy, the soul-spark
Plunged in the abyss to grow by strange
Cry of contraries....

নিবিড় একটি অধ্যাত্ম উপলব্ধির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এই কয়টি ছত্রে। পণ্ডিচেরী আশ্রমের আর একজন কবি নীরোদবরণ কতকগুলি সার্থক মরমী কবিতা লিখেছেন মোটামুটি এই সুরে।

I came from deeps of untrodden snow,
A winter bird ;
Each note of mine is a silver glow
A magic word......

দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ইংরাজী ছন্দে হাত পাকিয়েছিলেন তাঁর The Quest Eternal (১৯৩৬) ঠিক মরমী কাব্য নয়, গভীর তত্ত্বপূর্ণ রচনা, অনেকটা ভারী।

ইন্দো-এ্যাংলিকান কবিদের মধ্যে অনেকেই আবার তত্ত্বদর্শন বে মরমিয়াবাদ এড়িয়ে গেছেন ও সাম্প্রতিক ইউরোপীয় ভাবচিন্তার তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করেছেন। বিদেশী ভাষা বলেই হয়ত কাব্যের কারুকলা সম্পর্কে এঁরা বেশি সজাগ, কিন্তু প্রকাশ নৈপুণ্যেই মহৎকাব্য সৃষ্টি হয় না, মহতী প্রেরণা ও বলার মত কিছু থাকা চাই। অধুনা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অজস্র কবিযশপ্রার্থী ইংরাজীতে কবিতা লিখছেন। এই চেষ্টা তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁদের লেখা অনেকের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে তাঁদের মধ্যে জি কে চেট্টুর, মাঞ্জেরী ঈশ্বরণ, বিজয় তুঙ্গ, ভি এন ভূষণ, ডোম মরেজ, নিসিম এজকিল, পি লাল, বার্জর বি, পেমাস্টার, প্রদীপ সেন, দেবকুমার দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জি কে চেট্টুর কয়েকখানি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ The Shadow of God (১৯৩৫)ই শ্রেষ্ঠ। যুক্তিবাদ ও অবিশ্বাস দিয়েই তিনি শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের দুয়ারে এসে হাজির হন। তাঁর সমস্ত রচনায় একটা বেদনার সুর ছড়িয়ে আছে। নমুনাস্বরূপ দু'টি ছত্র :

Grant us, O Lord, the wisdom here to see
Beyond this passionate futility.

জে বিজয়তুঙ্গ (সিংহলে জন্ম ভারতে স্থায়ী হয়েছেন) আর একজন সফলকাম কবি। সাংবাদিক হিসাবে বহু দেশ ঘুরেছেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপরই তাঁর আশাবাদ ও আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত :—

Man, be thrilled, and thrilled, be silent, and silent, pray
Remember that behind all your cromium casements
A single flower petal can make your heart throb,
And the beat of a forlorn lamb, and the look of a cradled child.

তরুণ কবিদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন Dom Moraes. তিনি Hawthornden পুরস্কারও লাভ করেছেন। শুধু ভাব-অনুভূতি নয় প্রকাশ নৈপুণ্যেও তিনি পরিপক্কতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য ও শব্দের জোর সহজেই মনকে টেনে নেয়। শুনুন :

It was not war but mutual defeat
Our couquerors shrivelled in the island sun.
Lighter than leaves, they drifted to our feet,
Dying of peace, and not as some have done,
Fighting.

তরুণদের সকলের পরিচয় দেবার অবকাশ হল না। বর্তমান প্রসঙ্গে আর এক শ্রেণীর কবির উল্লেখ না করলে ইন্দো-এ্যাংলিকান কাব্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁরা হলেন সে সমস্ত কবি যাঁদের স্থান মুখ্যত কোন প্রাদেশিক সাহিত্যে হলেও নিজের কবিতার অনুবাদে ও কিছু-কিছু মৌলিক রচনায় আলোচ্য সাহিত্যের কতকটা জায়গা অধিকার করে নিয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমেই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরুর মৌলিক ইংরাজী কবিতা খুবই কম, কিন্তু বাংলার ইংরাজী করতে গিয়ে অনেক অদলবদল করেছেন ; স্থানে স্থানে, হয়ত বা ইংরাজ পাঠকদের দিকে তাকিয়ে, সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি করে ফেলেছেন ; পরিবর্তনটা বেশী হয়েছে নাটকে ; বাংলা বিসর্জন ও ইংরাজী 'Sacrifice' ঠিক এক বই নয়, দ্বিতীয়টিকে তাঁর ইংরাজী সৃষ্টি বলেই গণ্য করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের পরে একে একে নাম করা যায় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, হুমায়ুন কবীর, শুভো ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির। অন্য প্রদেশবাসীদের মধ্যে এই শ্রেণীতে পড়েন প্রধানত মালয়ালম কবি কে এম পানিকর ও মহিলা কবি বলমানী আম্মা, গুজরাতী কবি উমাশঙ্কর যোশী, কানাড়া কবি ভি কে গোকক ও মারাঠী পি এস রেজ।

একসঙ্গে দু'টি ভাষায় কাব্যসৃষ্টি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু একটি মাত্র ভাষা মূলে বিদেশী হলেও সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে নেওয়া যেতে পারে না এ-কথা মনে করার কিছুমাত্র উপায় থাকে না যখন ইন্দো-এ্যাংলিকান সাহিত্যের শতাধিক বছরের ফসলের হিসাব নিই। ভারতীয় প্রকৃতি, ভারতীয় জীবন ও ভারতের গভীর নিবিড় অধ্যাত্ম-অনুভূতি সবই স্বচ্ছন্দ প্রকাশ পেয়েছে ইংরাজী কাব্যছন্দে। তা'ছাড়া এ-কথাও মানতে হবে যে ইন্দো-এ্যাংলিকান সাহিত্যই বিশেষ ভাবে সর্বভারতীয়। অন্য যে কোন প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে আজ এ সাহিত্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা কম নয়।

যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকীত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়—তা হ'লে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কী দুয়ার ছেড়ে পালিয়ে গেছে।'

—নজরুল ইসলাম।

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুরেশচন্দ্র নন্দী

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ।

সাংখ্যদর্শন ২।৩৩

পাতঞ্জলদর্শন ১।৫

সেই পঞ্চবিধবৃত্তি কি কি? উভয় ঋষিই যথাক্রমে উহাদের নাম এইরূপ বলিয়াছেন, (১) প্রমাণ (২) বিপর্যয় (৩) বিকল্প (৪) নিদ্রা (৫) স্মৃতি।

প্রমাণ: বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়।

পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ ৬

এই বৃত্তিগুলি ক্লিষ্টা অর্থাৎ ক্লেশদায়িনী, অক্লিষ্টা অর্থাৎ ক্লেশ-ক্ষয়কারিণী ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

এই বৃত্তিগুলির পরিচয় সংক্ষেপে এইরূপ,—ভ্রমশূন্য নিশ্চয় জ্ঞানোৎপাদক হেতু অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও অগম অর্থাৎ পূজনীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্যকে প্রমাণ কহে।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।

পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ ৭

মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ যুক্ত পদার্থ সকল পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলে যে জ্ঞান জন্মে তাহার অংশ অব্যপদেশ্য অর্থাৎ পূর্ব বিগত শব্দ জ্ঞানজ নহে, তাহা যদি অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যম্।

অব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।

ন্যায় দর্শন ১ম অঃ ১ম আঃ ৪ সূত্র

প্রমাণ চারি প্রকার, যথাক্রমে উহাদের নাম, (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) ও শব্দ।

প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।

ন্যায় দর্শন ১ম অঃ ১ম আঃ ৩ সূত্র

ভ্রমশূন্য নিশ্চয় জ্ঞানোৎপাদক হেতুই প্রমাণ নামে পরিচিত।

প্রমাণ বৃত্তি চতুর্বিধ, (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) ও শব্দ। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে পরিচিত। * ইহা ষড়বিধ, যথাক্রমে উহাদের নাম ঘ্রাণজ, রসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন এবং মানস।

হেতু বা তর্কের দ্বারা কোন বস্তুর অনুভবকে অনুমান কহে। সাদৃশ্য জ্ঞান হেতু যে জ্ঞান তাহাই উপমান। শব্দ দ্বারা যাহা প্রমাণীকৃত হয়, তাহাই শব্দ। ভ্রমাত্মক জ্ঞানই বিপর্যয় বৃত্তি নামে পরিচিত। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম জ্ঞান।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপ প্রতিষ্ঠম্।

পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ ৮

বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও যেমন শব্দদ্বারা বস্তু পরিচিত হয়; তাহাই বিকল্প বৃত্তি। যেমন আকাশকুসুম, অশ্ব ডিম্ব প্রভৃতি।

শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তু শূন্যো বিকল্পঃ।।

পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ ৯

জাগ্রত ও স্বপ্নবৃত্তি তমোগুণের দ্বারা আবৃত বা আচ্ছন্ন হইলে চিত্ত যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাই নিদ্রাবৃত্তি।

সৎ সম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম,

তৎপ্রত্যক্ষমনিমিত্তং॥

পূর্বমীমাংসা দর্শন ১ম অঃ ১ম পাদ ৫ সূত্র

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা।।

পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ ১১০

পূর্বানুভূত বিষয়বস্তুর পুনঃ প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহার জ্ঞানকে স্মৃতি বৃত্তি বলে।

অনুভূত বিষয়া সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।।

পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ ১।১১

মনই ইহাদের মূল। শ্রীভগবান মহেশ্বর বলিয়াছেন, শুদ্ধ অশুদ্ধ ভেদে মন দ্বিবিধ। বিষয়াভিলাষ এবং কামনাযুক্ত মন অশুদ্ধ। কামনা ও বিষয় সম্পর্কশূন্য মনই বিশুদ্ধ।

মনো হি দ্বিবিধংপ্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ।

অশুদ্ধং কাম সংকল্পং-শুদ্ধং কাম বিবর্জ্জিতম্।।

ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষৎ ৫।২

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ ১

শ্রীভগবান কপিল বিশুদ্ধ মনের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন, দেহাদিতে 'আমি' এবং দেহ সম্পর্কীয় যাবতীয় বস্তুতে 'আমার' অভিমান হইতে উৎপন্ন কামলোভাদি অর্থাৎ প্রাপ্তি কামনা ও ভোগস্পৃহাদি মলিনতামুক্ত মনই বিশুদ্ধ এবং উহাই সুখ দুঃখ—দ্বন্দ্বাতীত ও সর্বত্র সৎ ভাবাপন্ন হয়।

অহং মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্মলৈঃ।

বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমম্।।

ভাগবত ৩।২৫।১৫

মনই সদসৎ কর্মে লিপ্ত হয়। মন সপ্তভূমির উপর বিচরণ করে। এই সপ্তভূমি কি কি? লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, কপোল ও শিরোদেশ। শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, মন যখন সংসারে থাকে তখন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি এই তিনভূমি মনের বাসস্থান। মনের তখন উর্ধ্বদৃষ্টি থাকে না। কেবল কামিনী-কাঞ্চনে মন আবদ্ধ থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩য় খণ্ড ৫১ পৃঃ

অর্থাৎ এই তিন অবস্থায় মন অশুদ্ধ অর্থাৎ অসৎকর্মে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং বন্ধনজালে আবদ্ধ হয়।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই মন যখন জ্যোতির অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করে, তখন উহা শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকে।

জ্যোতিরাভ্যন্তরিং মনঃ

তন্মনোবিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

গীতাসার ২৮

* শ্রীভগবান জৈমিনী বলিয়াছেন, অস্তিত্বশীল বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়াদির যোগে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।

শ্রীভগবান কপিল বলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে মনই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ ; বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহা বন্ধনের, আর সেই পরমাত্মার রমিত থাকিলে মুক্তির কারণ হয়।

চেতঃ খল্বস্য বান্ধায় মুক্তয়েচাত্মনোমতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসিমুক্তয়ে।

ভাগবত ৩।২৫।১৫

এই জন্যই শ্রুতি, স্মৃতি, ঋষি ও শাস্ত্র মনকে বন্ধনমুক্তির, মঙ্গল অমঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন। মন যখন বিষয়াসক্ত হয় তখন বন্ধনের এবং বিষয়শূন্য হইলেই মুক্তির কারণ হয়।

মনএব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধনং বিষয়াসক্তিমুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ॥

ত্রিপুরাতাপিন্যুপনিষৎ ৫।৩
ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ ২
বিষ্ণুপুরাণম্ ৬।৭।২৮
সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ ৩৫১

শ্রীভগবান দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন, একমাত্র মনই সমুদায় মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ। জীবের মন যখন একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে, তখনই মঙ্গলের কারণ হয় অর্থাৎ মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে।

মন এব বিদুঃ প্রাজ্ঞাঃ সিদ্ধাসিদ্ধান্ত এব চ।
যদাদৃঢ়ং তদা মোক্ষো।

জীবন্মুক্তি গীতা ২২

তন্ত্র বলিয়াছেন, কামক্রোধাদি দোষযুক্ত মনই পাপকর্মে লিপ্ত হয়। মন তন্ময়মনস্ক হইলে পুণ্য ও পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না।

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকে।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র ৪৫

মন ত্রিগুণের আধার। সেই হেতু মনের বৃত্তিগুলিও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণধর্মযুক্ত। যে মানব যেরূপ কর্ম করে, তদনুসারে তাহার সত্ব রজঃ কিম্বা তমঃ গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই ব্রাহ্মণবেশী জড়ভরত সৌবিররাজকে বলিয়াছিলেন, সত্বাদি গুণত্রয় কর্মাধীন।

কর্ম্মবশ্যাগুণাহ্যেতে সত্বাদ্যাঃ।

বিষ্ণুপুরাণম্ ২।১৩

সুতরাং অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিও গুণভেদে সাত্ত্বিকী রাজসিকী ও তামসী হইয়া থাকে। এই কারণে মন যখন অসংকর্মে লিপ্ত হয়, তখন তাহার বৃত্তিগুলি ক্লিষ্টা অর্থাৎ ক্লেশদায়িনী। শ্রীভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত সেবক হনুমানকে ক্লেশদায়িনী বৃত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন, আমি কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি বৃত্তিই চিত্তের ধর্ম। এই প্রকার বৃত্তিগুলিই পুরুষের ক্লেশদায়িনী এবং বন্ধনের কারণ।

পুরুষস্য কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখ-দুঃখদি লক্ষণশ্চিত্ত ধর্ম্মঃ।
ক্লেশ রূপত্বাদ্বন্ধো ভবতি। —মুক্তিকোপনিষৎ ২।২

পক্ষান্তরে, যখন সংকর্মের অনুষ্ঠান করে, তখন অক্লিষ্টা অর্থাৎ ক্লেশক্ষয়কারিণী মোক্ষদায়িনী হয়।

এইজন্যই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা ভক্ত উদ্ধবকে উপদেশ দিয়াছেন সত্বকর্ম দ্বারা ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের ক্রিয়ার দ্বারা মানুষ ও অসুর এবং তমোগুণের ক্রিয়ার দ্বারা জড়পদার্থ বা তির্যক-গতি লাভ হয়।

সত্ব সঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুর মানুষান্।
তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ।

—ভাগবত ১১।২২।৫১

সত্ব নামক অন্তঃকরণ সত্ব, রজঃ ও তমো গুণভেদে তিন প্রকার। এই কারণেই সত্বজ ভাবসমূহও তিন প্রকার, তন্মধ্যে আস্তিক্য, মনোনৈর্মল্য ও সুখ্যরূপে, ধর্ম বিষয়ে রুচি প্রভৃতি সাত্বিক অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয় ; সুতরাং ইহারা সাত্বিক সত্বজ ভাব। আর কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহারা রাজস সত্বভাব এবং নিদ্রা, আলস্য, অনবধানাদি ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহারা তামস-সত্বজ ভাব বলিয়া পরিচিত।

সত্বাখ্যমন্তঃকরণং গুণভেদাত্রিধাতম্।
সত্বঃ রজস্তম ইতি গুণাঃ সত্বাত্ত্ব সাত্বিকাঃ॥ ২০
আস্তিক্যশুদ্ধিধর্ম্মৈকরুচি প্রভৃতয়োমতাঃ।
রজসো রজসা ভাবাঃ কামক্রোধমদাদয়ঃ॥ ২১
নিদ্রালস্য প্রমাদাদি বঞ্চনাদ্যাস্ত তামসাঃ।
প্রসন্নেন্দ্রিয়তা রোগ্যানালস্যাদ্যাস্ত সত্বজাঃ॥ ২২

শিবগীতা ১।২০, ২১, ২২

শ্রুতি বলিতেছেন, জীব সঙ্কল্প, স্পর্শ, দর্শন ও মোহের বশে শুভাশুভ কর্ম করিয়া থাকে। তাহার কৃত কর্মানুসারেই দেবতা, মানুষও তির্যক প্রভৃতি স্থানসমূহে স্ত্রী-পুরুষ ও ক্লীব দেহ প্রাপ্ত হয়।

সঙ্কল্পন স্পর্শন দৃষ্টি মোহৈ প্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মি বিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেন দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভি সম্প্রপদ্যতে॥ ৫।১১

শ্রীভগবান শঙ্কর ত্রিগুণের বর্ণরূপও প্রকৃতির পরিচয়ে নররূপী শ্রীভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, সত্বগুণ শুক্লবর্ণ, সুখ ও জ্ঞানের কারণ ; রজোগুণ দুঃখের কারণ, রক্তবর্ণ ও চঞ্চল স্বভাব এবং তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ জড় এবং দুঃখও অজ্ঞানের কারণ।

সত্বং শুক্লং সমাদিষ্টং সুখ জ্ঞানাস্পদং নৃণাম্।
দুঃখাস্পদং রক্ত বর্ণং চঞ্চলঞ্চ রজো মতম্॥

শিব গীতা ১৫

বৈবস্বত পুত্র ধর্মরাজ যম-শিষ্য নচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন, সত্বগুণ সম্পন্ন শান্ত বৃত্তিযুক্ত মানবই সমাহিতমনা ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হন। তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়সমূহও সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় বশবর্তী হয়। সেই মানবের মনই প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্বসংযমন রজ্জু স্বরূপ। সেই মানবই সংসার পথের পার স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকে।

যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতিযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণিবশ্যানি সদাশ্বাবৈ সারথেঃ॥
বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ-প্রগ্রহবান্নঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

কঠোপনিষৎ ৩।৬, ৯

কারণ শুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন শান্তবৃত্তিযুক্ত সাধু ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর পদকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

সাধূনাঞ্চ স্থিতির্যত্র মানসী সর্ব্বদা—

শিবোপনিষৎ ১।১৪

শান্তবৃত্তিযুক্ত মানবই শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তির অনুশীলন দ্বারাই পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। বৃত্তির অনুশীলনের নাম ধর্ম। সাত্বিক বৃত্তির অনুশীলন করিয়া ধর্মাচরণ করিলে চিত্তবৃত্তি শ্রদ্ধা-ভক্তি নম্র হইয়া সুখ শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করে। এই কারণেই শ্রীভগবান শঙ্কর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, যে সকল পুরুষ ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্মশীল হইয়া সৎ পথানুগতবৃত্তি অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তির অনুশীলন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভ করিয়া সুখী নয়। তাঁহারাই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান অর্থাৎ পবিত্রাত্মা।

ঈশ্বরাভিমুখো ভূত্বা ধর্ম্মাভিমুখ এবতু।
সৎ পথানুগতাং বৃত্তিং সেবন্‌ম সুখমিহত্তে। শিবোপনিষৎ ৩০;১৩
বৃত্ত্যাবিশুদ্ধয়া কলঙ্ক পরিশূন্যয়া।
শীল লাঞ্ছিতয়া যে বৈ ভবতিপূর্ণ শশীতয়া। শিবোপনিষৎ৫২।১১

পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী

শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ

আজ বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের চিন্তাধারা বস্তুত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পরিচালিত। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সে যুগে মানুষের চিন্তাধারা প্রসার পেয়েছিল দর্শন, সাহিত্য, বেদ ও উপনিষদে। এই বাংলা দেশে বহু বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতের জন্ম হয়েছিল যাঁদের অবদান বেদ, উপনিষদ, দর্শন ও সাহিত্যে অতুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের দান বাংলা ভাষার সম্যক পরিপুষ্টি সাধন করেছে। তদানীন্তনকালে বাংলার গ্রামে গ্রামে আরো' কত না পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল—তাঁদের সকলের নাম অনেকের অবিদিত। এঁদের মধ্যে একজনের জন্ম হয়েছিল বাংলার কোন তদানীন্তন বর্ধিষ্ণু গ্রামে কলিকাতার অতি সন্নিকটে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী। ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্বর্তী 'হরিনাভি' গ্রামে এক অবস্থাপন্ন কায়স্থ পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নীলমণি ঘোষ এবং মাতার নাম মনোমোহিনী ঘোষ।

পিতা নীলমণি ঘোষের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল হরিনাভি গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামে চাংড়ী পোতায় (যাহা পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে নামকরণ হয়ে এখন সুভাষ গ্রাম নামে পরিচিত)। নীলমণি ঘোষ হরিনাভি নিবাসী রাধাকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা বিন্দুবাসিনীকে প্রথমে বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান না হওয়াতে প্রথমা স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর জীবিত অবস্থায় রাধাকৃষ্ণ দত্তের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা মনোমোহিনীকে দ্বিতীয় স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন।

মনোমোহিনীর গর্ভে দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রমানাথ ও কনিষ্ঠ মন্মথনাথ এবং তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। রমানাথ হরিনাভি গ্রামে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রতিষ্ঠিত—Harinavi Anglo Sanskrit School-এ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তাঁর মত মেধাবী ছাত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে এণ্ট্রান্স; এফ-এ; বি-এ; এবং এম-এ পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সহিত বৃত্তিসহকারে উত্তীর্ণ হইয়া তথনকার বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকট অতীব খ্যাতি অর্জন করেন এবং 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত হন। তথনকার দিনে কলিকাতা শহরে পণ্ডিতদের তর্কসভা আয়োজিত হইত—যাহাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পণ্ডিত উপস্থিত হতেন। এমন একটি সভায় দক্ষিণ ভারতের বিদুষী রমাবাঈ সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন। তিনি রমানাথের অতীব পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন 'আমি সরস্বতী নই, আপনিই সরস্বতী।'

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রমানাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দু'জনে একসঙ্গে দক্ষিণ ভারত থেকে বৈদিক ব্যাকরণ আনিয়ে বেদ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। রমানাথ ঋকবেদ সংহিতার ব্যাখ্যা প্রণয়ন আরম্ভ করেন কিন্তু কেবলমাত্র ২৬ বৎসর বয়সে অকালমৃত্যুতে তাহা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হন নি। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরবর্তীকালে সেই অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন রমানাথের বয়স কেবলমাত্র ২৬ বৎসর, যখন তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি মাত্র কয়েক দিনের ছুটী নিয়ে নিজের কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের জন্য হরিনাভি গ্রামে নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে সান্নিপাত রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এত অল্পবয়সের মধ্যে তিনি তথনকার বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই অল্প-সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। রমানাথের স্ত্রী স্বামী বিয়োগের পর বহুকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের কোন সন্তান নাই।

রমানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্মথনাথের তিন পুত্র—প্রথম যুগলকিশোর, দ্বিতীয় নন্দকিশোর ও তৃতীয় কৃষ্ণকিশোর। তাঁহারা উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন কলিকাতায় নিজ গৃহে বাস করেন।

রমানাথের মাতামহ রাধাকৃষ্ণ দত্তের চতুর্থ কন্যা সত্যভামার সহিত হরিনাভির পার্শ্ববর্তী গ্রাম কোদালিয়া নিবাসী হরনাথ বসুর বিবাহ হয়। হরনাথের তিন পুত্র প্রথম—যদুনাথ, দ্বিতীয় কেদারনাথ (সাবজজ) এবং তৃতীয় জানকীনাথ (কটকের গভর্ণমেন্ট প্লীডার)।

জানকীনাথের আট পুত্র ও ছয় কন্যা। পুত্রদের মধ্যে প্রথম সতীশচন্দ্র (ব্যারিষ্টার), দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র (ব্যারিষ্টার) এবং চতুর্থ সুভাষচন্দ্র—যিনি পরবর্তীকালে 'নেতাজী' নামে অভিহিত হন।

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যাথলিক বান্ধবী

জীবনে একবার রোমান ক্যাথলিক পাড়ায় ক্যাথলিকদের মধ্যে কিছুদিন বাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাদের আচার-আচরণ, ভদ্রতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি মনে গভীর দাগ কেটে আজও উজ্জ্বল!

সরকারী চাকুরীতে বম্বে থেকে পুণা বদলী। বাড়ীর দারুণ অভাব,—অফিস কোয়ার্টারগুলি সব ভরা,—কোথাও সুবিধা মত বাড়ী পাওয়া যায় না।

অনেক খুঁজে পুণা ক্যান্টনমেণ্টে রোমান ক্যাথলিক গির্জার সন্নিকটে ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে যে নূতন খৃষ্টান পল্লী গড়ে উঠেছিল,—তারই কেন্দ্রস্থানে পাওয়া গেল একটি সুন্দর আধুনিক ফ্ল্যাট।

বাড়ীর মালিক চাকুরী জীবনে অবসরপ্রাপ্ত মিঃ মাচাডোর নিজ বাড়ীর লাগোয়া, দোতলায় সুন্দর ফ্ল্যাটখানা। একমাস বয়সের একটি শিশু কোলে,—একেবারে সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা, ভিন্নধর্মী মানুষদের মধ্যে এসে নূতন বাসা বাঁধি।

বাড়ীওয়ালার স্ত্রী মিসেস্‌ মাচাডো যেন প্রথম দিনটি থেকেই আমাদের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে একেবারে আপনার করে নিলেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ উপকূলবর্তী কতকগুলি দেশ বহুদিন আগে থেকেই পর্তুগীজ অধিকারে আসে। রোমান ক্যাথলিক গোঁড়া খৃষ্টান পর্তুগীজ পুরোহিত সম্প্রদায় প্রথমেই সেখানকার সরল, সাধু, শান্তিপ্রিয় ভারতীয়দের ছলে-বলে যে কোন প্রকারে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। এভাবে গোয়া, দমন, দিউ, মাঙ্গালোর, কারোয়ার, ধারোয়ার প্রভৃতি স্থানের বহু অধিবাসী খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে।

ধারোয়ার, মাঙ্গালোর, গোয়া প্রভৃতি স্থানের ভারতীয় খৃষ্টধর্মাবলম্বিগণ পুণার স্বাস্থ্যকর উৎকৃষ্ট আবহাওয়া ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সর্বপ্রকার নাগরিক সুবিধায় আকৃষ্ট হয়ে পুণায় গড়ে তোলেন একটি নূতন কলোনী। এই কলোনীতেই স্থান পেয়ে হই আনন্দিত।

খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যাকে,—বর্ষীয়সী খৃষ্ট কন্যা মিসেস মাচাডো কত যে তাঁদের ধর্মের কাহিনী শোনাতেন পরম আগ্রহে—সে সব শুনে ভারী আনন্দ পেতাম। বলতেন—গোয়ায় সেণ্ট জেভিয়ারের মমীর কথা। সেণ্ট জেভিয়ার খৃষ্ট জগতের এক প্রধানতম সাধু। এই পরহিতব্রতী অতি উচ্চস্তরের সাধুর দেহ তাঁর মৃত্যুর পর গোয়ায় মমী করে রাখা হয়েছে। জীবিতকালে সমস্ত জীবন তিনি পরহিতব্রতে উৎসর্গ করেছিলেন,—মৃত্যুর পরও তাঁর দেহ শত সহস্র জনের পরম উপকার করে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। মানবকুলে কদাচিৎ এরূপ সাধু-মহাত্মার জন্ম হয়; ধন্য এই সন্তগণ—জাতি, ধর্ম, সময়ের অনেক উর্ধ্বে। প্রতি বৎসর এই মমী একবার করে বাহিরে আনা হয়,—তখন সকল ধর্মের শত শত অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ পরম ভক্তিভরে ঐ মৃতদেহ স্পর্শ করে হয় রোগমুক্ত।

সেণ্ট ভিনসেণ্ট, লিটল্‌ ফ্লাওয়ার প্রভৃতি আরও কত সাধু-সন্তের কথা তাঁর নিকট শুনি। শুনি তাঁদের চার্চের কথা। তিনি প্রতি রবিবার প্রৌঢ় স্বামী ও পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিতা হয়ে গির্জায় যান,—কিছুতেই এর অন্যথা হবার উপায় নেই।

চার্চের নানা প্রকার কাজ করে দেন পরম ভক্তিভরে। মেরী মাতারও এঁরা পরম ভক্ত। এঁরা এত ধর্মবিশ্বাসী যে একটু আঙ্গুল কেটে গেলেও, তাতে ওষুধ দিয়ে মেরীমাতার ছোট একটি ছবি দিয়ে ক্ষতস্থান আবৃত করে তার ওপরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন। অসুখে-বিসুখে ডাক্তারের সঙ্গে সমভাবে ডাক পড়ে গির্জার 'ফাদারের'। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা পুণ্যাত্মা ফাদার এসে শিয়রে বসে ধর্মপুস্তক পাঠ করে শোনালেই হবে তাঁদের ব্যাধি-মুক্তি!

ঐ কলোনীতে প্রতিটি ধার্মিক খৃষ্টধর্মাবলম্বীর বাড়ীতে দেখেছি,—বাড়ীর প্রধান ঘরটিতে একটি বড় যীশুখৃষ্টের ছবি ফুল দিয়ে সাজানো। আশেপাশে মেরীমাতা ও সাধু-সন্তদের ছবি। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে সুদৃশ্য আধারে জ্বলে মোমবাতি। আবার দেখেছি ওদের জপের কালো লম্বা মাথাটি যীশুখৃষ্টের ছবির পাদদেশে সংরক্ষিত। হিন্দুর পূজা ও ওদের পূজায় প্রভেদ নেই বিশেষ কিছু। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যেমন বাড়ীতে গঙ্গাজল রাখেন ও তার স্পর্শে পবিত্র হন, ওঁরাও তেমনি রাখেন জর্ডনের জল ও উপাসনার পূর্বে তার স্পর্শে দেহ-মন পবিত্র করেন। হিন্দুর মতই ওঁদেরও দরিদ্রকে ভিক্ষাদান, দুঃখীর দুঃখ দূর করা পরম ধর্ম।

মিসেস মাচাডোর অনেক ছেলে-মেয়ে। তার মধ্যে বড় মেয়ে ও বড় ছেলেটি চার্চের কাজে জীবন উৎসর্গ করে। মেধাবী বড় ছেলেটি স্কুলে গ্রহণ করত উচ্চস্থান,—প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তার আর গতানুগতিক পড়াশোনা পছন্দ হয় না। চার্চের পুরোহিতের পদের

প্রাশায় যোগ দেয় তাদের ধর্ম-মণ্ডলে। শুনি,—বারো বৎসর তাকে চার্চের অধীনে কঠোর সংযমে জ্ঞান ও ধর্মের চর্চায় কাটাতে হবে,—তবে সে পাবে গির্জায় 'ব্রাদারের' স্থান। 'ফাদারের' স্থান পাবে আরও পরে—পরিণত বয়সে। আজীবন পালন করতে হবে কৌমার্যব্রত, ত্যাগ করতে হবে সর্ব প্রকার বিলাসিতা,—অর্থাৎ হিন্দুমতে আমরা যাকে বলি সন্ন্যাস-গ্রহণ। কিশোর-বালক যেন সন্ন্যাস নিয়ে মায়ের বুক খালি করে চলে গেল ওদের 'ডর্মিটারীতে।' সুন্দরী বড় মেয়েটিও আজীবন কুমারী থেকে চার্চের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে হল বদ্ধপরিকর।

তাদের মা কত খুসী! মিসেস্ মাচাডো বলেন,—ভগবানের অসীম করুণা আমার ওপর। আমাদের প্রত্যেকটি সন্তান যদি ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করত,—তাহলে আমার চেয়ে বোধ হয় কেহই অধিক আনন্দিত হত না।

হিন্দু-মা ও খৃষ্টান-মায়ে এখানেই অত্যন্ত তফাৎ মনে হয়। আমরা হলে বোধ হয় কেঁদে-কেটে শয্যা নিয়ে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিতাম। আর মিসেস মাচাডো কেমন হাসিমুখে ছেলে-মেয়েদের ধর্মজীবনে উদ্বুদ্ধ করলেন—চোখের সামনে দেখে অবাক হই।

সমস্তক্ষণই মিসেস মাচাডোর সঙ্গে চলে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা; এ বিষয়ে তাঁর নেই ক্লান্তি—নেই উৎসাহের অবধি। মাঝে মাঝে তিনি নিয়ে যান অনতিদূরবর্তী তাঁদের গির্জায়। গির্জার গম্ভীর সৌন্দর্য, মেরী-মায়ের অলৌকিক মূর্তি, যীশুখৃষ্টের ভাব-সমৃদ্ধ চিত্র মনে ভক্তি জাগায়। মিসেস মাচাডোর একটি বর্ণনা কিছুতেই বোধগম্য হয় না,—তিনি বলেন, প্রতিদিন গির্জার উপাসনার পর আমরা আস্বাদন করি আমাদের পরম পিতার জৈব উপাদান (Flesh & Blood)।

কী করে তা সম্ভব? আমিও বুঝি না, তিনিও বোঝাতে পারেন না। অনেক সময়, অনেক বাক্যব্যয়ের পর তাঁর বহু কথা থেকে যেটুকু মর্ম গ্রহণ করতে পারি, তা এই—গির্জার উপাসক-উপাসিকা উপাসনা অন্তে চোখ বন্ধ করে মুখ খুলে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে ধ্যানমগ্ন হন। সেই সময় পুরোহিত কিছু তরল ও কঠিন পদার্থ প্রত্যেকের জিহ্বাগ্রে স্থাপন করেন, ইহারই নাম যীশুখৃষ্টের Flesh & Blood.

কৌতূহলের আমার আর অন্ত নেই—আবার জানতে চাই কী সে জিনিষ, যা তোমাদের জিহ্বায় দেওয়া হয়? আস্বাদনে তোমাদের বোঝা উচিত অথবা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

অনেক চিন্তার পর মিসেস মাচাডো বলেন,—আমরা তা কখনও মাননীয় ফাদারকে জিজ্ঞাসা করি না। তবে আমার যা মনে হয়, খুব ভাল ময়দার তৈরী পাতলা একটি ছোটপাত বহু পুরাতন মদে ডুবিয়ে জিভে দেওয়া হয়। আমরা তা চিবুই না, জিভের ওপর জিনিষটি আপনি গলে যায়।

দক্ষিণ ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এঁরা যেমন ধার্মিক তেমনি সঙ্গীতপ্রিয়। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দেখা যায় পিয়ানো, বেহালা, গীটার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র; ঘরে ঘরে ছেলে-মেয়েরা পাশ্চাত্য-সঙ্গীত বিশারদ। সন্ধ্যার পর প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকেই ওঠে পিয়ানো ও বেহালার মধুর ঐকতান বাদন। এই কলোনীতে ছিলেন প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত পরিবার এবং সাদাসিধা জীবনযাপনে অভ্যস্ত।

খৃষ্টান প্রতিবেশিনীদের নিকট প্রবাসে যে সাহায্য, যে সহানুভূতি পাই, জীবনে তা ভুলবার নয়। অসুখে-বিসুখে, দুঃখে-বিপদে কী-না করতেন তাঁরা বিদেশী, বিধর্মী, নবাগতা, অপরিচিতার জন্য! মিসেস্ মাচাডো যখন-তখন বলতেন,—তুমি পূর্বজন্মে নিশ্চয় আমার সহোদরা ছিলে, আমি ভাবি—পূর্ব জন্ম কেন? এ জন্মেই ক্যাথলিক বান্ধবী বাড়ীওয়ালী মিসেস্ মাচাডো এবং পাশের বাড়ীর মিসেস্ রডরিক্স আমার নিজের বোন।

একবার গ্রীষ্মে কলকাতায় এসে পুণার বন্ধু-বান্ধবদের জন্য নিয়ে যাই অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে প্রচুর লিচু ও পটল। বাঙ্গালীর প্রিয় মিঠাই সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতি ছানার খাবার এখন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও চল্লিশ বৎসর পূর্বে বম্বে-পুণার কোনো দোকানে এর চিহ্নও দেখা যেত না। রসনা-তৃপ্তির জন্য তখন রসগোল্লা প্রভৃতি ঘরে করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। ওদেশের খাবারের মধ্যে বরফি, পেঁড়া প্রভৃতি ক্ষীরের খাবারই বেশী, হালুইকর বেশীরভাগ গুজরাতী। একবার পুণার প্রকাণ্ড এক মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা ছানার খাবার কর না কেন? কেবল নানা রকম হালুয়া আর লাড্ডু-পেঁড়া কত খাওয়া যায়? বাংলা মিষ্টি রসগোল্লা-পান্তুয়া তৈরী কর, নিশ্চয় অনেক বিক্রী হবে!

দোকানী-প্রভু জিভ কেটে, নাক-কান মলে, বোবা তোবা বলে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন, যেন কী এক মহাপাপ বাক্য শ্রবণ করলেন! অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে তিনি বললেন, মানুষ কাটা যেমন পাপ, দুধ কাটাও সেইরূপ পাপকর্ম! ও আমাদের কানেও শুনতে নেই, দুধ কেটেই ত' তোমরা ছানা কর, ও সব কাটা-ছেঁড়ার কাজ আমাদের দিয়ে হবে না!

অদ্ভুত যুক্তি শুনে হতভম্ব। যাক্ 'যস্মিন দেশে যদাচার' মানতেই হবে। ঐ কারণেই ও দেশের বাঙ্গালী কলকাতায় এলে যাবার সময় নিয়ে যেতেন, ছানার খাবার—ভাজা মুগের ডাল, খেজুর গুড়, লিচু, পটল প্রভৃতি ও দেশের অপ্রাপ্য অথচ বাঙ্গালীর মুখরোচক সেরা জিনিষগুলি।

একবার গ্রীষ্মে কলকাতায় এসে প্রচুর লিচু, পটল প্রভৃতি নিয়ে এসে বন্ধুদের বাড়ী পাঠাই। দু'-একদিন পর খৃষ্টান প্রতিবেশিনীরা বলেন,—গায়ে কাঁটা ফলটি (লিচু) খেতে খুব ভাল, কিন্তু সবুজ ফলটি (পটল) তো তত ভাল নয়, বোধ হয় পাকে নি, শক্ত ছিল।

হা ভগবান! জানা ছিল না যে, তাঁরা জীবনে কখনও লিচু-পটল আস্বাদন করা দূরে থাক, চোখেও দেখেন নি, পটলগুলো কাঁচাই খেয়েছেন! এই সরল, নিরহঙ্কার, পরোপকারী, ভারতীয় খৃষ্টানদের সঙ্গে কয়েকটা বৎসর মনের আনন্দে কোথা দিয়ে কেটে গেল, বোঝা গেল না। ঐ বাড়ী নেবার সময় পরিচিত অনেকেই বলেছিলেন,—ফিরিঙ্গীপাড়ায় থাকা, ও কি ধাতে সইবে? কিন্তু আমাদের সমাজে অপাংক্তেয় ফিরিঙ্গীরা যে এত অভিভূত করবে—স্মৃতির কোঠায় যে তারা এতটা স্থান দখল করবে, পূর্বে কে তা জানত?

সুধীরঞ্জন দাশ

জীবন-সায়াহ্নে এলাম সুধীজন-সমাকীর্ণ শান্তিনিকেতনে। এখানে এসে আরও কত সুধীর সঙ্গে হই পরিচিত। সুধী-প্রধান আমাদের সুধীরঞ্জনদা'। এত পাণ্ডিত্য, এমন জ্ঞান, এমন মধুর স্বভাবের মানুষ ক'জন মেলে? কি অমায়িক, কি নিরহঙ্কার, কি কঠোর কর্মী মানুষ—শান্তিনিকেতনকে তিনি ভালবাসেন যেন নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী। এখানকার প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি উৎসবে, তাঁকে দেখি অক্লান্ত-কর্মী হোতারূপে। বয়স এগিয়ে এসেছে প্রায় সত্তরের নিকট, কিন্তু এখনও এমন কর্মক্ষম যেন নবীন যুবক।

বিশ্বভারতীর মধ্যে ও আশেপাশে কেউই তাঁর স্নেহধারা থেকে বঞ্চিত নয়। প্রত্যূষের প্রার্থনা থেকে রাত্রি পর্যন্ত এখানকার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি সকলকে করেন উদ্বুদ্ধ—কতজনকে দেন কত প্রশ্নের উত্তর, হাসিমুখে ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন কতজনের অভাব-অভিযোগ, বিরক্তির ভ্রূকুটি বোধ হয় তাঁর অভিধানে নেই—কাজেই তিনি এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অতি প্রিয় উপাচার্য।

তাঁর চরিত্রের এই মাধুর্য কী ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই প্রথম দিকের শিক্ষার ফল,—না গুরুদেবের নিজের হাতে গড়ার ফল? হয়ত বা দুইই। গুরুদেব কি বুঝেছিলেন তাঁর হাতের তৈরী এই ছাত্রটি বড় হয়ে তাঁরই বিশ্বভারতীর ভার নিয়ে শেষজীবনে দেবে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা?

সেদিনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার রূপই ছিল আলাদা। ভগবানের নিকট প্রার্থনা,—আবার সেদিন ফিরে আসুক। অক্লান্ত-কর্মী সুধীরঞ্জনদা'র সুষ্ঠু পরিচালনায় আবার আমাদের এখানকার ছেলে মেয়েরা আগের মতই—বা ততোধিক জীবনে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। দেশে দেশে তারা জ্ঞানে-বিদ্যায়-ধর্মে-কর্মে শীর্ষস্থান অধিকার করে দেশ-মাতৃকার গৌরব বাড়াক!

সুধীরঞ্জনদা'র বংশ পরিচয়ে জানি, তিনি পূর্ববঙ্গস্থিত বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামের বিখ্যাত দাশ পরিবারের কুল-প্রদীপ। পিতা—৺রাখালচন্দ্র দাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের 'গ্রাজুয়েট।' তিনি আজীবন ছিলেন কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের এক দায়িত্বশীল কর্মী। দেশবন্ধু স্বনামধন্য ৺চিত্তরঞ্জন দাশ, সুধীরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র।

সুধীরঞ্জন দাশ শান্তিনিকেতনে পড়তে আসেন তাঁর দশ বৎসর বয়সে। এখানে প্রথম আসার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী,—তাঁর প্রাঞ্জল সুখপাঠ্য ভাষায় লেখা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গিরিডিতে গিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, কারণ তখনও পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানকার পরীক্ষা কোন মর্যাদা পায় নি।

তরুণ বয়স থেকেই সুধীরঞ্জন দাশের সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ হয়, তা ছাড়া তিনি ছোট বয়স থেকেই সুঅভিনেতা ও সুগায়ক হিসাবে নাম করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ ও বঙ্গবাসী কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে বি-এ পাশ করেন। তারপর বিলেত। এখানেই তাঁর বিদ্যাবত্তার উৎকর্ষ চরমে ওঠে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির এল, এল, বি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রের গৌরব অর্জন করে ও দেশের, বাংলার ও ভারতের মুখোজ্জ্বল করেন।

তারপর ব্যারিষ্টারী পাশ করে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে যোগ্যতার সঙ্গে কর্ম লিপ্ত হন। তাঁদের বংশটাই যেন আইনজীবীর জীবাণুপূর্ণ। এই দাশবংশে যত অধিক এবং বিরাট আইনজ্ঞের জন্ম হয়েছে, তেমন বোধ হয় অন্য কোথাও দেখা যায় না। সুধীরঞ্জন দাশও আইনের অলি-গলির খবরে হয়ে ওঠেন বিশারদ।

প্রথম কর্মজীবনে তিনি ব্যারিষ্টারীর সঙ্গে কলকাতা আইন কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন বৎসর তিনেক। তাঁর আইন-জ্ঞানের বিচক্ষণতার খবর ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের জজের গৌরবময় পদে বৃত হন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন অলস্কৃত করে আইনজীবীর উন্নতির শিখর দেশে ওঠেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁকে দেন আরও উচ্চস্থান। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁকে নিয়ে আসা হয়—'ফেডারেল পাবলিক' কোর্টে'র জজ হিসাবে। কিছুদিনের মধ্যেই এই বিচারালয় রূপায়িত হয় ভারতের সুপ্রীম কোর্টরূপে,—এবং প্রতিভাদীপ্ত সুধীরঞ্জন দাশ এখানে প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে। তিন বৎসর যোগ্যতার সঙ্গে এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে।

তাঁর মত বিদ্বান, আইনজ্ঞ কর্মীর কী অবসর আছে? তিনি আমাদের দেশের গৌরব—জাতির সম্পদ। বিশ্বভারতীতে ঐ সময় দেখা দেয় নানা সমস্যা। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে মনোনয়ন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে। তখন থেকে একদিনও বিশ্রাম সুখ উপভোগ না করে আজও তিনি বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে করে চলেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। করুণাময় ভগবান যেন তাঁকে আরও বহুদিন সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রেখে দেশের ও দশের মঙ্গল করেন।

সুধীরঞ্জনদা' শুধু যে বিশ্বভারতীর কাজই করে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে তা নয়, দেশের নানা সমস্যা-সংক্রান্ত, সভা-সমিতিতে প্রায়ই নিযুক্ত হন কর্ণধাররূপে—এজন্য তাঁকে অনেক সময়েই ছুটাছুটি করে বেড়াতে হয় ভারতের সর্বত্র। তাঁর এই প্রচণ্ড কর্ম প্রেরণার উৎস, তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী স্বপ্না দাশ। স্বপ্নাদেবী স্বামীর এই বিরাট কর্মযজ্ঞে কল্যাণময়ী রূপে তাঁর মঙ্গল হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন অবিচ্ছেদ্যভাবে।

শান্তিনিকেতনে এসে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবের একজন, সুধীরঞ্জন দাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে বিস্মিত হই, আরও বিস্মিত হই যখন শুনি, তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে বেতন গ্রহণ করেন মাত্র এক টাকা! তাঁর উচ্চহারে বেতনের বরাদ্দ টাকা জমা হয় একটি তহবিলে। সেখান থেকে বিশ্বভারতীর বিশেষ প্রয়োজনে মানব-কল্যাণে ব্যয়িত হয় সেই অর্থ।

এমন সদাশয়, বিদ্বান, দানবীরের জীবনের সামান্য দু' একটি পরিচয়ে মনের মণিকোঠার সম্পদ বাড়িয়ে নিজেকে মনে করি ধন্য!

দুই কবি ও মৃত্যু

শচীন্দ্রনাথ বসু

পথের ধারে এক মৃত পশুর দেহাবশেষ, হঠাৎ সেখানে এসে পড়ে কবির মনে যে দার্শনিক ভাবনার উদয় হল দু'টি বিভিন্ন কবিতার তা বিষয়বস্তু। একটির নাম 'কঙ্কাল', স্থান রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী গ্রন্থে,' অন্যটির রচয়িতা শার্ল বোদলেআর, আখ্যা 'পশুর মৃতদেহ।' মৃত্যু ও ক্ষয়ের এই দৃশ্যে দু'জনের মনে প্রথমে একই প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কবিতা দু'টি আমরা যা পেলাম তাতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

সবুজ ঘাসের উপর খড়ি-সাদা হাড়গুলি কালের অট্টহাসির মত আঘাত করল রবীন্দ্রনাথের মন: সে যেন দেখিয়ে দিচ্ছে সব প্রাণীর এই একই হীন পরিণতি—পশু ও কবির ভাগ্য অভিন্ন:

'তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধূলায় অনাদরে।'

কিন্তু অবিলম্বে কবি আত্মসংবরণ করলেন, অস্বীকার করলেন শূন্যতার এই পরিহাস। জীবনের যত সোনালি ফসল, ভাবনা ও অনুভবের অমর অভিজ্ঞতা শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তা শূন্যে মিলিয়ে যাবে না। কবির কণ্ঠে অকস্মাৎ যে গান উৎসারিত হয়েছে, অন্তরের গভীরে মৌন অনন্তের যে ধ্বনি বেজেছে, দুঃখের জড়তার মধ্যে আশা ও আনন্দের যে আভাস মিলেছে তা সবই মিথ্যা নয়, শুধু মাংসের কারাগারে বন্দী নয়। অর্থহীন নয় সৃষ্টির এই আয়োজন —'আমি নহি বিধির বৃহৎ পরিহাস।' কবির এই কথার প্রতিধ্বনি মেলে এক বিজ্ঞানীর বাক্যেও; 'দেহের সামান্য নিঃশ্বাসটুকুর চেয়ে বেশী কিছু আছে মানুষের মধ্যে,' লিখেছিলেন চার্লস ডারউইন।

বাংলা কবিতাটি ছয় স্তবকে সম্পূর্ণ এবং তার মধ্যে চারটি এই প্রতিবাদে মুখর। ফরাসী কবিতাটি দীর্ঘতর এবং সর্বত্র মৃত্যুর কদর্যতা ও হতাশায় ভারাক্রান্ত। কবি এক পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করছেন তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে—কিন্তু কি ভয়াবহ সেই স্মৃতি! কথাটা একদা তিনি তুললেন একটি প্রশ্ন দিয়ে (কি প্রসঙ্গে কে জানে) মনে কি পড়ে সেই সুন্দর গ্রীষ্ম প্রভাতে পথের ধারে কি দেখেছিলাম আমরা—পশুর গলিত দেহ কঠিন পাগুলি শূন্যে তুলে পড়ে আছে, জ্বলন্ত ধড় থেকে নিঃসৃত হচ্ছে বিষের ঘাম...?' এই বলে কবি ত্রিশ লাইন ধরে বর্ণনা করছেন সেই জঘন্য পচন-দৃশ্য—কেমন করে সূর্যতাপে ভাজা হচ্ছিল মাংসপিণ্ডটি, অসহ্য পূতিগন্ধে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে আসছিল ইত্যাদি। গলন্ত দেহ ঘিরে ভন ভন করছে অসংখ্য মাছি, খোলা পেট থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে কালো ক্রিমি। একটি কুকুর মানুষ দু'টিকে আসতে দেখে ভোজ ছেড়ে এক পাথরের পিছনে গা ঢাকা দিল। সমস্ত নারক-দৃশ্যটি রোদের তাপে কেঁপে কেঁপে উঠছে প্রাণীদেহের স্পন্দনের মত। অবশেষে যখন এই প্রশ্নের তাড়না অসহ্য হয়ে উঠেছে কেন এত কাল পরে কবি এই বীভৎস স্মৃতি মনে করলেন, তখন আমরা আসি কবিতার সেই ভয়ংকর লাইনগুলিতে। প্রিয়তমাকে বলছেন তিনি:

'ওগো আমার চোখের তারা, স্বভাবের সূর্য
পরী আমার, কামনা আমার,
একদা তোমারও পরিণতি এই ঘৃণ্য কলুষে
এই কদর্য সংক্রমণে...'

শুধু একেবারে শেষে কবি সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন একটুখানি—তাও তাঁরই নিজের ভঙ্গিতে, 'প্রিয়তমে, পোকারা যখন তোমাকে কুরে কুরে খাবে তখন তাদের বলো আমার ক্ষয়িত প্রেমের মূর্তি, তার ঐশ্বরিক রসটুকু ধরা আছে আমার হৃদয়ে।'

এই দুই কবির স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং কবিতা দু'টির ধারাও যে বিভিন্ন হবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে মানবিক, নানা সংকটেও মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নি; বোদলেআরের চোখে মনুষ্যচরিত্র বিদ্বেষপরায়ণ, নির্বোধ। 'অনায়াসে স্বভাববশে মন্দ করি আমরা। ভাল যা কিছু তার সৃষ্টি একমাত্র শিল্পে', লিখেছিলেন তিনি।

তাঁর নিজের শিল্পও কত বিভিন্ন সাময়িক কাব্যের তুলনায়! তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করতেন বিষাদ ও বিকটের থেকে। তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল ফুনেব্র (করুণ), তেনেব্র (আঁধার) ইত্যাদি শব্দের প্রতি, এগুলি যে তিনি বারে বারে ব্যবহার করতেন তা শুধু মিলের খাতিরে নয়। এই কাব্যে মনোরম প্রকৃতির উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা আমরা পাই না, যা প্রায়ই পাই রবীন্দ্রকাব্যে। রবীন্দ্রনাথ বারে বারে পৃথিবী ঘুরে প্রকৃতির সৌন্দর্য বৈচিত্র্য সর্বান্তঃকরণে আহরণ করেছেন; ফরাসী কবির রচনায় প্রাচ্য দেশের স্বাদ প্রায়ই প্রকট, ঐ সব অঞ্চলের আকাঙ্ক্ষার ভারাক্রান্ত তাঁর কাব্য, কিন্তু এর অন্তরালে প্রত্যক্ষ পরিচয় অতি সামান্য। তার এক ইতিহাস আছে।

অল্পবয়সে যখন লেখক হওয়ার নেশা ধরেছিল, তখন অভিভাবকরা এই ভূত ছাড়াবার আশায় তাঁকে বিদেশে পাঠাবেন স্থির করলেন। দেশ ঠিক হল ভারত, স্থান কলকাতা। এত জায়গা থাকতে এই বিশেষ রোগ সারাতে ভারতই কেন তাঁরা বেছে নিলেন তা জানা নেই—হয় তো দেশত্যাগটাই বড় বিবেচনা ছিল, গন্তব্যস্থান গৌণ। যাই হোক, বোদলেআর তার অনেক আগেই জাহাজ থেকে নেমে পড়লেন মরিশাস দ্বীপে, সেখানে মাত্র তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় অপূর্ব অফুরন্ত ভাণ্ডার হয়ে রইল তাঁর কবি-মনে। এই অভিজ্ঞতাটুকু না পেলে বোদলেআর লিখতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের প্রভূত রচনা সাহিত্যের সর্ব ক্ষেত্রে বিস্তৃত, কিন্তু বোদলেআরের প্রসিদ্ধি প্রধানত একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। বইখানির নাম 'বিষের ফুল' এবং এর জন্য আইনের দণ্ড পড়েছিল তাঁর উপর। ভারতীয় কবির দীর্ঘ জীবন সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়েছিল আরও নানা রচনায়, নানা কাজে, কিন্তু বোদলেআরের লাতিন মন সর্বদা বয়ে বেড়াত বিরক্তির বোঝা, যে বিরক্তিকে তিনি বলেছেন, 'আমাদের এত রকম দোষের মধ্যে সবচেয়ে গর্হিত'। তাঁর কাব্যে বারে বারে তিনি ফিরে এসেছেন এই প্রসঙ্গে, যথা,

'অনির্বাণ বিরক্তির খপ্পরে পশুর শিকারের মত গোঙায় মন', 'হায়, কাল আবার আমাকে বাঁচতে হবে—কাল, তার পরের দিন এবং আরও কত কাল···'। ধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল সহজ, কিন্তু গোঁড়া ক্যাথলিক বোদলেআর বাইবেল-উক্ত আদি পাপে এত গভীর বিশ্বাসী ছিলেন যে, তার থেকে তাঁর মধ্যে এত অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন অলডাস হাক্সলির কথায়, 'খৃষ্টানের মুকুর-প্রতিবিম্ব' অথবা 'উল্টো খৃষ্টান'। এবং এই কারণই, হাক্সলি বলছেন, তাঁকে ঠেলে দিয়েছে তাঁর মাতাল নিগ্রোনীর দিকে, তার 'বিকট ইহুদিনী'র (বোদলেআরের নিজের ভাষা) কোলে।

স্বাচ্ছন্দ্য ও আভিজাত্যের প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিজের সঙ্গে বা জগতের সঙ্গে কোনও বিরোধ ছিল না, মনোবিজ্ঞানীর চোখে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ তিনি। বোদলেআরও সম্পত্তি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে এবং অভিজাত চালচলন তাঁরও ছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র সম্পত্তি তিনি দু'হাতে উড়িয়েছেন এবং তাঁরই বন্ধু তেওফিল গোতিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, 'তাঁর শিষ্টতা এত অত্যধিক ছিল যে তা প্রায় কৃত্রিম।' দেশ বা সমাজের প্রতি কোনও রকম বন্ধন তাঁর চোখে নিদারুণ অবজ্ঞার বস্তু, পারিবারিক স্নেহ-মমতা কখনও জানেন নি তিনি, শুধু বাল্যে মায়ের ভালবাসা ছাড়া। কিন্তু তারপর মা আবার বিয়ে করলেন, পূজার প্রতিমা পড়ল ধূলায় এবং বোদলেআর আর সারাজীবনে তাঁকে ক্ষমা করতে পারলেন না। প্রতিভার সঙ্গে প্রায়ই যেসব বিচ্যুতি দেখা যায় তার কারণ খুঁজতে যাঁরা শিল্পীর প্রথম জীবনে প্রবেশ করে মনোবিশ্লেষণী গবেষণা করতে ভালবাসেন এটা তাঁদের পক্ষে এক মূল্যবান তথ্য। (বোদলেআরের অনুরূপ অভিজ্ঞতার আরও দু'টি উদাহরণ বায়রন ও শোপেনহাউআর।) এবং 'বিচ্যুতি'র অভাব বোদলেআরের মধ্যে মোটেই ছিল না। সর্বদা দেহের পীড়ায় ও ঋণে বিপর্যস্ত, মদ ও আফিমের দাস এবং গাঁজা সম্বন্ধেও কৌতূহলী, 'গহন, করুণ আনন্দের' এই পূজারী (তাঁর নিজের ভাষা) শেষ পর্যন্ত পরিণত হলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসহায় এক প্রাণীতে যে আয়নায় নিজের চেহারাও চিনতে পারত না।

বস্তুত, এই দুই কবির চেয়ে অভিন্ন দু'টি লোক কল্পনা করা দুঃসাধ্য। একজন যে কঙ্কালের সাদা শুকনো হাড়কে বানিয়েছেন মৃত্যুর প্রতীক এবং আর একজন ভেবেছেন অর্ধগলিত দেহের কথা এরই মধ্যে এ সত্য সবচেয়ে বেশী প্রতীয়মান।

কিন্তু লেখকের রচনায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণ ছায়া দেখতে চাইবার ভুল আমরা করব না। কবিকুলের মধ্যে সর্বদা এক সূক্ষ্ম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকে ব্যক্তিগত পার্থক্য সত্ত্বেও, তারা জগতের আর সকলের থেকে স্বতন্ত্র। বোদলেআর যে সহজ সুন্দর কাব্য-ভাব প্রকাশ করেন নি তা নয়; প্রিয়ার সঙ্গে তিনি মধুর স্মৃতিও স্মরণ করেছেন:

'সন্ধ্যার আঁধারে আগুনের পাশে বসে
আমরা বলেছি কত মৃত্যুহীন কথা।'

এবং খুঁজলে রবীন্দ্রনাথের রচনায় হতাশা ও দুঃখবাদী মেজাজও নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় বোদলেআর যে বড় কবি তা তিনি অনায়াসে স্বীকার করতেন। এই কাব্যকে বলা হয়েছে 'আধুনিকতার আত্মা'। অনেক কাব্য-বিচারকই এই উক্তির সঙ্গে ঝগড়া করবেন না, 'পশুর মৃতদেহ,' কবিতার মত কবিতা সত্ত্বেও —অথবা হয় তো সেই কারণেই।

কিন্তু বোদলেআর ও রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ তুলনা বা বিচার আমার অসাধ্য, সে চেষ্টা আমি করছি না। তা ছাড়া, মৃত্যুও এমন কিছু নতুন বিষয় নয় কবির দৃষ্টিতে, সাহিত্যের উষাকাল থেকেই প্রায় সব লেখক কোনও না কোনও সময়ে মৃত্যুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছেন। গ্রীসের বিয়োগান্ত নাটকে তো বটেই, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের আদিতে ইরাকে মাটির ফলকে খুঁদে লেখা মানুষের প্রাথমিক এক সাহিত্যও মৃত্যুর হতাশায় ভারাক্রান্ত। 'কি হীন পরিণতি আমাদের এই দেহের হোরেশিও', লেখা হয়েছিল 'কঙ্কাল' বা 'পশুর মৃতদেহ' রচনার অনেক আগে, কিন্তু তারও একই বাণী। সুতরাং এই দুই কবিতার বিষয়বস্তুতে কোনও নতুনত্ব নেই; আশ্চর্য হল চিত্রিত দৃশ্যের সাদৃশ্য এবং তার সঙ্গে যখন আমরা কবিতা দু'টির বিভিন্ন চরিত্রের তুলনা করি এবং মনে রাখি রবীন্দ্রনাথের দর্শন, তখন এ সম্ভাবনা সহজেই মনে জাগে যে হয় তো 'পশুর মৃতদেহ' থেকেই 'কঙ্কাল' জন্ম নিয়েছে', হয় তো দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিবাদ। এর পক্ষে কোনও প্রমাণ আছে কি না তা রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন।

হে নূতন এস তুমি

শান্তশীল দাশ

নূতন দিনের আলো ডাক দিল, 'জেগে ওঠ ওরে,
পুরানো দিনের যত অবসাদ হতাশার গ্লানি
সব ধুয়ে মুছে ফেলে নবারুণ দ্যুতি দেহে মনে
মেথে নিয়ে যাত্রা শুরু হোক নব জীবনের পথে।

সম্মুখে আসন্ন ঝড়, আসুক সে, হোক্ না ভীষণ,
তুমি তার চেয়ে বড়ো, অমিত শক্তির উৎস তুমি;
তোমার সারথী হোক 'পার্থসখা, সমস্ত ক্লীবতা
ছিন্ন ক'রে জয়রথ চলুক অদম্য গতি নিয়ে।'

নূতন, তোমার দীপ্তি যাত্রা পথে পাথেয় আমার,
মাতৃমন্ত্রে মৃত্যুঞ্জয় নিঃশঙ্ক অপরাজেয় আমি;
আমার অন্তর ভরা সত্য শিব সুন্দরের গান,
তোমার আশিস্ বর্মে ঢেকে দাও আমার শরীর।

হে নূতন, এস তুমি, জানাই স্বাগত সম্ভাষণ,
দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে করি আজ তোমাকে বরণ।
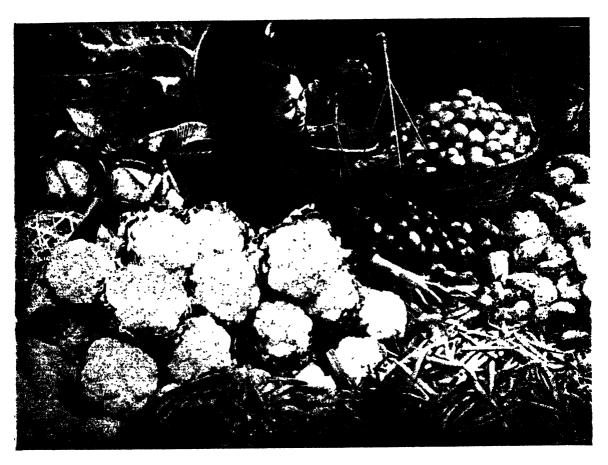
মাসিক বসুমতী
আশ্বিন / '৭০

ঘড়ি
স্মৃতিলেখা গুপ্ত

বাজার দর কত ?

—নীরোদ রায়

মাসিক বসুমতী

আশ্বিন / '৭০

ছাইদানি

—রথীন রায়

—বিমল সরকার

মাসিক বসুমতী
আশ্বিন / '৭০

পিছু ডাকছো কেন ?

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

হর কি প্যারী
—সত্যেন ঘোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ষোল
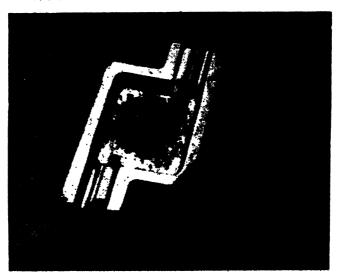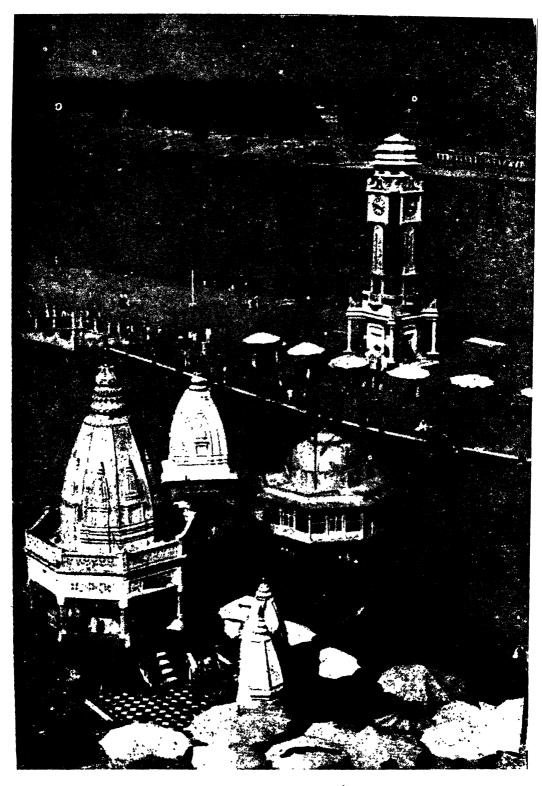
নিকটে একটা রিন-ঠিন শব্দ শুনে দময়ন্তী চমকে উঠল। এতো কাচের চুড়ির আওয়াজ। এত রাত্রে কাঠুরে চৌধুরীর নির্জন বাঙলোয় কাচের চুড়ির শব্দ কেন পাওয়া যাবে! দময়ন্তী সোজা হয়ে বসল। তারপর তাকাল চারিদিকে।

ছি ছি, কী নির্লজ্জ! কাঠুরে চৌধুরী একটা আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে কথা কইছে। সেজেগুজে খোঁপায় ফুল গুঁজে মেয়েটা এসেছিল, হাসছিল এতক্ষণ। কাঠুরে চৌধুরীর কথা শুনে তার হাসি মিলিয়ে গেল। সে কি বকল মেয়েটাকে! তাই হবে। দময়ন্তীর সামনে আসার জন্যেই বোধ হয় বকুনি খেল। কাঠুরে চৌধুরী তাকে কি বলল, শোনা গেল না। কিন্তু মেয়েটা ম্লানমুখে ফিরে গেল।

ঘৃণায় দময়ন্তীর দেহ রি-রি করে উঠল। কী অশ্লীল, কী অসভ্য, কী বন্য! যেমন বর্বরের মতো চেহারা, তেমনি আদিম প্রবৃত্তি। একজন ভদ্রমহিলার সম্মান রাখতেও লোকটা জানে না। তার চরিত্র যখন এইরকম, তখন তার আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল না কি!

কাঠুরে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে দেখল, তার কোন ভাবান্তর নেই। লজ্জা পেয়েছে বলেও মনে হল না। লোকটা যে এত নির্লজ্জ তা আগে বুঝতে পারে নি। বেহায়াপনারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা লোকটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

দময়ন্তীর সেই বীভৎস সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল। শিউরে উঠল সারা দেহ। মানুষ কত কদর্য হতে পারে, সেইদিন সে প্রথম জেনেছিল। কাঠুরে চৌধুরীর কাছে দময়ন্তী সেদিন এই বাড়িতে প্রথম এসেছিল।

স্বেচ্ছায় সে আসে নি, কাঠুরে চৌধুরীও তাকে জোর করে ধরে আনে নি। তবু সে কেমন করে এখানে এসে উপস্থিত হল, সে-কথা আজ ভাল মনে পড়ছে না। ভাবতে ইচ্ছাও করছে না। এই লোকটার সম্বন্ধে কোন কথাই তার ভাবতে ইচ্ছা করছে না।

কিন্তু দময়ন্তী তাহলে চুপ করে কি করবে! একেবারে চুপ করে থাকা যায় না। কিছু না কিছু মনে আসবেই। তার স্বামীর অবস্থার কথা ভাবতে বসলে সে পাগল হয়ে যাবে। তার চেয়ে কাঠুরে চৌধুরীর কথাই ভাল। সে কথায় ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকলেও বিভীষিকা নেই। স্বামীর কথা ভাবতে দময়ন্তীর ভয় করছে।

কাঠুরে চৌধুরীর কাছে সে একবারই এসেছিল। এসেছিল তাদের নিজেদের গাড়িতে চড়ে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে. কাঠুরে চৌধুরী তাকে ডাকতে যায় নি, আনতেও যায় নি তার বাবা তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কেন করেছিলেন, সেকথাও মনে পড়ছে। তার বাবা তার সঙ্গে পার্টনারশিপে মাইকার বিজনেসে নামছেন। তার মাকে বলেছিলেন, ব্যবহার একটু কাঠখোট্টা বটে, কিন্তু লোকটা যে উদ্যোগী তাতে সন্দেহ নেই, আর পাঁচটা বাঙালীর মতো মোটেই নয়। চাল-চালিয়াতি নেই, দেখে তার ভিতরের অবস্থা বোঝা ভারি কঠিন।

তার মা বলেছিলেন : বোঝবার আমার দরকার নেই।

আমার আছে।

রাগতভাবে তার মা বলেছিলেন : তবে তুমিই বুঝতে চাও।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হতে পারে নি। তার কারণ কাঠুরে চৌধুরীকে তিনি আজকাল প্রায়ই বাড়িতে আনছেন এবং যত বেশি আনছেন, লীলাবতী ততই ক্ষেপে যাচ্ছেন। তখন পর্যন্ত ঐ লোকটা এমন কোন গর্হিত কাজ করে নি যে তাকে একেবারে অসহ্য মনে হওয়া উচিত। কিন্তু তার চেহারায় ও কথাবার্তায় এমন একটা ন্যাড়া ভাব যে কিছুতেই তাকে ভাল লাগে না। দময়ন্তী তাই আড়ালে থাকত, আড়ালে থাকতেই তার ভাল লাগত।

কিন্তু কারণে ও অকারণে তার বাবা তাকে ডেকে পাঠাতেন। জিজ্ঞাসা করতেন : তোর মা কোথায়?

মা উল বুনছেন।

আমাদের খবর পেয়েছে তো?

দময়ন্তী সত্য কথা জানে। খবর পেয়েছে বলেই দু'জনে ভিতরের ঘরে বসে আছে। কিন্তু সে কথা বলা ঠিক হবে না বলে উত্তর দেয়, বলছি।

কিন্তু এই খবর দিতে গিয়ে দময়ন্তীও আর ফেরে না।

খানিকক্ষণ পরে বাবা আবার ডেকে পাঠান। বলেন : কি রে, কী হল তোদের?

দময়ন্তী এবারে তার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছে, বলে : মা চায়ের ব্যবস্থা করছেন।

বেয়ারা কোথায় গেল?

আছে।

তবে?

তাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

—নরোত্তমবাবু বললেন : বুঝি না বাপু, দেখাতে তোমাদের এতক্ষণ লাগে।

দেখছি। বলে দময়ন্তী পালিয়ে আসে।

কাঠুরে চৌধুরীর গলাও দময়ন্তী শুনতে পায়। থাক না ওঁদের আবার কষ্ট দিচ্ছেন কেন।

কষ্ট কী! ভিতরের ঘরে না বসে বাইরের ঘরে এসে বসবেন।

সেও তো কষ্টের কথা। আমাদের যেমন অফিসে বসতে কষ্ট হয়।

বলে হাহা করে হেসে ওঠে। তার এই হাসিতে ঘরের সার্সিগুলো থর থর করে কাঁপে।

লীলাবতী জিজ্ঞাসা করেন : লোকটা অমন হাসছে কেন রে?

জানি না।

কী জিজ্ঞেস করলেন?

তুমি আসছ না কেন।

লীলাবতী একটু ভেবে বললেন : আমরা যে যেতে চাইছি না বোধ হয় বুঝতে পেরেছে।

দময়ন্তী একথার উত্তর দিল না।

কী ভেবে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : তুই বস, আমি একটু ঘুরে আসি। বলে তিনি বসবার ঘরে এসে বসেন।

কাঠুরে চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলে : শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দেওয়া হল।

নরোত্তমবাবু বলেন : দময়ন্তী কোথায়? বলে দরজার দিকে তাকালেন।

দময়ন্তী মার পিছনে এগিয়ে এসেছিল। চেরা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছিল ভিতরটা। কিন্তু ভিতরে আসার সাহস পায় নি। কী উত্তর দেন, তাই শোনবার জন্যে শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

লীলাবতী বললেন : তার শরীরটা আজ ভাল নেই।

সে কি, এই তো সে দু'বার এল! শরীর খারাপের কথা তো বলল না!

শরীর খারাপের কথা মেয়েরা বলতে চায় না, ওটা বুঝে নিতে হয়।

কাঠুরে চৌধুরী বলে উঠল : খুবই খাঁটি কথা। তাঁকে বিশ্রাম করতে দিন।

দময়ন্তীর মনে আছে, কাঠুরে চৌধুরী চলে যাবার পর মা ঝগড়া করেছিলেন তার বাবার সঙ্গে, বলেছিলেন : ঐ লোকটাকে কেন বারে বারে ডেকে আন?

বলেছি তো, ওকে পার্টনার নিয়ে নতুন বিজনেসে নামছি।

আর কি লোক নেই এ অঞ্চলে?

আছে, কিন্তু পয়সাওয়ালা লোক বেশি নেই। কাজের লোক তো—

বাধা দিয়ে লীলাবতী বলেন : ঐ একমাত্র বড় লোক!

তাঁর বিদ্রূপের সুরটি নরোত্তমবাবুর কানে জ্বলে ওঠে। বলেন : এ সব ব্যাপার তুমি কতটুকু বোঝ!

একেবারে বুঝি না ব'লো না। জগদীশকে যেদিন আমি নিমন্ত্রণ করেছি, সেদিন থেকেই তোমার এই বাড়াবাড়িটা দেখতে পাচ্ছি।

কী!

নরোত্তমবাবু যেন রুখে উঠলেন।

লীলাবতী আরও শান্তভাবে বললেন : তুমি ভেবো না যে তোমার মতলব আমি বুঝতে পারি নি। তোমাকে আমি স্পষ্ট জানিয়ে রাখছি যে, আমি বেঁচে থাকতে কোন অন্যায় হতে আমি দেব না।

নরোত্তমবাবু নিশ্চয়ই কোন শক্ত কথা বলতেন। কিন্তু তার সুযোগ পেলেন না। বারান্দা থেকে দময়ন্তী ডাকল : খাবার দেওয়া হয়েছে বাবা!

দু'জনেই খানিকটা অন্যমনস্ক হলেন। নরোত্তমবাবু উঠে দাঁড়ালেন গজ গজ করতে করতে ; কী যে ভাব মানুষকে বুঝি না, কেন এ সব কথা মনে আসে তাও জানি নে।

লীলাবতী কোন উত্তর দিলেই আবার বিবাদ বাধত। তার আগেই দময়ন্তী বলল : আজ কী রান্না হয়েছে মা?

লীলাবতীর বুঝতে বাকি রইল না যে মেয়ে তাঁদের মাঝখানে পড়ে ঝগড়া বন্ধ করতে চাইছে। ভালই করেছে তাঁর বলার কথা তিনি বলেছেন। আর এ অভিযোগের যে কোন উত্তর নেই, তাও তিনি জানেন। নরোত্তমবাবু নীরব রইলেন।

সেই ঘটনাটা ঘটেছিল আরও কিছুদিন পরে। তখন জগদীশ মেজদার সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেছে। যেমন সুপুরুষ চেহারা,

চুল সম্বন্ধে
কি খুব
চিন্তিত ?

তেমনি ভদ্র ব্যবহার। কাঠুরে চৌধুরীর একেবারে বিপরীতধর্মী। সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার জন্যে এমন ভাবে ক্ষমা চাইল যে, দময়ন্তীর লজ্জাই করেছিল। মনে হয়েছিল যে তার মা তাকে নিমন্ত্রণ করেই এই লজ্জায় ফেলেছেন। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই।

লীলাবতী তাকে বলেছিলেন: মাঝে মাঝে এস।

আসব।

না না ভদ্রতা নয়, আমি তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করছি না। তুমি আমার দেশের ছেলে, কৃতী ছেলে, তোমাকে দেখলেও আনন্দ হয়।

নরোত্তমবাবু গম্ভীর ভাবে বসেছিলেন। তিনি কোন অনুরোধ করেন নি। তাঁর দিকে চেয়ে জগদীশ বলেছিল: এদিকে কাজ পড়লেই আসব।

লীলাবতী বলেছিলেন: কাজ! কাজ তো তৈরি করে নিতে হয়। সরকারী লোক শুনি বিনে কাজেই সর্বত্র যাতায়াত করে।

জগদীশ একথার উত্তর দেয় নি। দময়ন্তীর মুখের দিকে চেয়ে শুধু বলেছিল: আসব।

দময়ন্তীর মনে হয়েছিল, জগদীশ এ কথা তাকেই বলল, তাকেই আশ্বাস দিয়ে গেল আবার আসবার। সে তো কোন অনুরোধ জানায় নি, তবে কী তার মনের কথা দু' চোখে ছলছলিয়ে উঠেছিল! লজ্জার তার সীমা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য! এ লজ্জায় গ্লানি নেই এতটুকু, রোমাঞ্চ ছিল আবেগের।

দিন কয়েক পরেই নরোত্তমবাবু নিমন্ত্রণ করলেন কাঠুরে চৌধুরীকে, বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ। লীলাবতীর সমর্থন না পেয়ে নিজেই উদ্যোগ আয়োজন করলেন, উদ্বিগ্ন ভাবে বাহিরে পায়চারি করলেন অনেকক্ষণ, তারপর তার আসবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বুঝে অভিযোগে মুখর হলেন। বললেন: তোমাদের ব্যবহারের জন্যেই এইরকমটা হল।

মানে?

মানে, সেদিন তোমরা তাকে অপদস্থ করতে আর বাকি রাখ নি।

লীলাবতীও কঠিন ভাবে বললেন: যাকে তাকে বাড়ি এনে তুলবে, সেটাও আমাদের পছন্দ নয়।

নরোত্তমবাবু বললেন: ব্যবসাটা তা'হলে তুলে দিলেই পারি।

ব্যবসার জন্য তোমার তো অফিস আছে, লোকজন আছে। বাড়ির এসবার পরে মেয়েকে ডাকবার কী দরকার!

নরোত্তমবাবু রাগে অধীর হলেন। এ কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে বললেন: কী বললে?

লীলাবতী বললেন: যা বললাম তার চেয়ে বেশি তুমি জান। তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর, আমি কী বললাম।

দময়ন্তী বড় অস্বস্তি বোধ করছিল। তার মনে হচ্ছিল যে এই বিপদের জন্য সেই দায়ী। তাড়াতাড়ি বলে উঠল: একটু বেড়াতে যাবে মা?

মা বললেন: তুই যা।

এক যাবার জন্য যে এ কথা বলে নি, বলেছে তার মাকে এখান থেকে সরাবার জন্যে। বলল: আমি একা যাব না। তুমি এস।

লীলাবতী বললেন: আমার এখানে একটু দরকার আছে।

দময়ন্তী আব্দার ধরল: তা'হলে বাবা এস।

নরোত্তমবাবু হয় তো তার সঙ্গে যেতেন, কিন্তু লীলাবতী বলে উঠলেন, তোমার সঙ্গেই আমার দরকার।

তারপর দময়ন্তীকে বললেন: তুই একটু বেড়িয়ে আয়।

দময়ন্তীর একা বেরবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু লীলাবতী নিজে তাকে বাড়ির গাড়িতে তুলে দিয়ে বুড়ো ড্রাইভারকে ডেকে দিলেন। বললেন: সারাদিন মেয়েটা বাড়িতে বসে আছে, একটু ঘুরিয়ে আন।

এই সন্ধ্যার কথা মনে হতেই দময়ন্তীর সারা দেহ শিউরে উঠল।

সতেরো

তাদের ড্রাইভারকে দময়ন্তী কী বলেছিল মনে করতে পারে না। ড্রাইভার কিছু জানতে চেয়েছিল কি না, তাও মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সে কাঠুরে চৌধুরীর কথা ভাবছিল। জগদীশের মতো কাঠুরে চৌধুরী নিশ্চয়ই রাঁচীতে থাকে না। এই অঞ্চলেই যখন ব্যবসা করে তখন বাড়িও নিশ্চয়ই এই দিকে। বোধ হয় ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছিল: মিষ্টার চৌধুরী কোথায় থাকেন?

আর কিছু নয়, কোন প্রশ্ন কোন কৌতূহল কোন বাসনা নয়। বোধ হয় এইটুকু শুনেই ড্রাইভার অনেক কিছু অনুমান করেছিল। তার বাবার সঙ্গে এই লোকটির ঘনিষ্ঠতা, নিমন্ত্রণ, আজকের অনুপস্থিতি, ইত্যাদি। এই বৃদ্ধ আরও কিছু সন্দেহ করেছিল কি না কে জানে? সায়াহ্নের অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায় তাকে এনে একটি বাঙলোর সামনে উপস্থিত করল।

বিস্মিত দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করেছিল: এ কোথায় আনলে?

এ কথার জবাবের আর দরকার হয় নি। তার আগেই কাঠুরে চৌধুরী নেমে এসেছিল তার বারান্দা থেকে। হাত বাড়িয়ে বলেছিল: আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার।

দময়ন্তী প্রথমটায় বুঝতে পারে নি, এ কী হল। ঠিক এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তো সে আসে নি। কী করবে, কী বলবে, সে ভেবে পেল না।

কাঠুরে চৌধুরী তাকে বারান্দার উপরে ডেকে আনল। একখানা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল: বসুন।

সামনের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী শিউরে উঠল। মদের বোতল আর গেলাস। কাঠুরে চৌধুরী একা বসে মদ খাচ্ছিল। কতটা খেয়েছে জানা নেই, তবে গেলাসটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাঠুরে চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠল। সেই বীভৎস হাসি। চারিদিকের অরণ্য আর অন্ধকার দেখে দময়ন্তীর এবারে ভয় হল।

ভয় পেলেন না কি?

ভয়ে ভয়ে দময়ন্তী বলল: না, ভয় কিসের!

আপনি তো ভয় পেয়েছেন দেখছি। ওরে ও লবাট। হতভাগা কোথায় গেলি? দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল: বসুন।

দময়ন্তী একবার তাদের গাড়ির দিকে তাকাল, তারপর বসল। কাঠুরে চৌধুরী তার নিজের জায়গায় বসে বলল: ভয় নেই, এ সব বাজে জিনিষ আপনাকে খেতে বলব না।

ভৃত্য লবাট এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়ে দময়ন্তীকে বলল: কী খাবেন? শেরি, না শ্যাম্পেন?

না না, আমি কিছুই খাব না।

কেন?

আমি এ সব খাই নে।

সে হয় না। আমার কাছে এসে আপনি শুকনো মুখে ফিরে যাবেন, তা কিছুতেই চলবে না। ওরে লবাট, কী আনবি তা'হলে?

যা বলবেন।

দময়ন্তী কাতর স্বরে বলে উঠল: আমাকে মাফ করবেন, আমি ও সব খাই নে।

সে কি, অমন বাপের মেয়ে হয়ে একেবারে নিরামিষ।

কাঠুরে চৌধুরীর এ মন্তব্য দময়ন্তী বুঝল না। তার বাবাকে সে কোনদিন মদ খেতে দেখে নি। বাড়িতে কোন সরঞ্জামও দেখে নি। তাই কোন উত্তর দিতে পারল না।

তবে কী খাবেন বলুন।

লবাট তাকে রক্ষা করল বলল তবে একটু সরবৎ আনি।

দময়ন্তী যেন হাপ ছেড়ে বাঁচল, বলল: সেই ভাল।

কাঠুরে চৌধুরী এক চুমুকে তার গেলাসটা শেষ করে বোতল থেকে আবও খানিকটা ঢেলে নিল। সোডা মেশালে না, জলও না। বলল: এর সঙ্গে কিছু মেশালে আমার পানসে লাগে, পেট ভরলেও মন ভরে না।

পেট ভরে আপনি—

কাঠুরে চৌধুরী আবার হাসল হা-হা করে। দময়ন্তী চমকে উঠল।

পোলাও কালিয়া পেলে কী কেউ ডাল ভাত খেয়ে পেট ভরায়! থাক সে কথা। এবারে আপনার খবর বলুন।

আমার খবর? আমার কোন খবর নেই।

সে কি! কষ্ট করে এলেন এতদূর, অথচ কিছু বলবার নেই, এ কোন কথা হল!

দময়ন্তীর হঠাৎ মনে পড়ল যে আজ তাদের বাড়িতে কাঠুরে চৌধুরীর নিমন্ত্রণ ছিল। তার বাবা অনেকক্ষণ অধীর ভাবে অপেক্ষা করে হতাশ হয়েছেন। মনে পড়ল যে এই ঘটনা নিয়েই তার বাবা মার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত দেখে সে বেরিয়েছে। কাঠুরে চৌধুরী যে ইচ্ছা করেই এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছে, এখন তা বুঝতে পারল। বলল: আজ বিকেল বেলায় তো আমরা আপনার অপেক্ষা করেছিলাম।

আপনারা বলবেন না, বলুন আপনার বাবা। আপনার মা নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করেন নি

দময়ন্তী বিস্মিত হল। সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারল না।

কাঠুরে চৌধুরী হঠাৎ বলে উঠল: আপনি যে আমার কথা ভেবেছিলেন, মানে—এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল: মানে, আমার জন্যে—একটু ইতস্তত করে বলল: অপেক্ষা করেছিলেন, তা ভাবতে পারি নে। আমি তো আপনাকে একটু এড়িয়ে চলতেই দেখেছি কি না!

দময়ন্তী বলতে পারল না যে ঠিকই দেখেছেন, জেনেছেন সত্য কথাই। সে সত্য হলেও বড় অপ্রিয় কথা। অপ্রিয় কথা বলতে নেই। দময়ন্তী চুপ করে রইল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আপনার বাবার কথায় আমি বিশ্বাস করি নে। তাঁর স্বার্থ তো আমার জানা আছে, তাই তাঁকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। আপনি অপেক্ষা করছেন জানলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম।

দময়ন্তী বিব্রত বোধ করল। তার সম্বন্ধে বাবা আবার কিছু বলেছেন না কি? কী বলেছেন তিনিই জানেন, দময়ন্তীকে কিছুই বলেন নি।

লবাট এই সময়ে তার সরবৎ এনে উপস্থিত করল। দময়ন্তী খুশী হল। এই সরবৎটুকু খেয়েই সে উঠতে পারবে। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী বলল অন্য কথা: এই সরবৎ খাইয়েই বিদেয় করবি না কি? কী রান্না করেছিস?

মুরগির রোষ্ট করেছি।

ক'টা মুরগি?

মাথা চুলকে লবাট বলল: আজ্ঞে একটা।

একটা! একটায় কী হবে।

আমি জানতাম না যে আর কেউ খাবেন।

বোকা কোথাকার। গোটা দুই আরও কেটে ফেল, এখনও সময় আছে।

নিজের আর বাড়ীর জন্যে উৎসবের সময় এমন উপহার কিনুন যা বারোমাস আপনার বাড়ী উৎসবের আনন্দে ভরে রাখবে। ন্যাশনাল-একো রেডিও থাকলে ভারত ও বহির্ভারতের আমোদ-প্রমোদ···গান-নাটক···আর উৎসব দিনের বিচিত্র অনুষ্ঠানের আনন্দে বাড়ী মুখর হবে। এই রেডিও কত নিখুঁত তা দেখে আর শুনেই বুঝতে পারবেন।
আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো রেডিও বিক্রেতাকে বললেই তিনি বিনা খরচায় বাজিয়ে শোনাবেন এবং আপনার যা কিছু জানবার জানাবেন।
মডেল নং বিটি-৭৫৭ঃ ৭+২ ট্র্যানজিস্টর ও ডায়োড, ৪ ব্যাণ্ড, ভেনীয়ার কাঠের ক্যাবিনেট, ড্রাই ব্যাটারী সেট
দাম ঃ ৪১৫৲ টাকা
মডেল নং ইউ-৭৬৪ ঃ ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, প্লাস্টিক ক্যাবিনেট
দাম ঃ ২৭০৲ টাকা
মডেল নং এ-৭৭৯ ঃ ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ভেনীয়ার ক্যাবিনেট
দাম ঃ ৩৯৫৲ টাকা
মডেল নং ইউ-৭৫৫ ঃ ৬ নোভাল ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ভেনীয়ার ক্যাবিনেট
দাম ঃ ৩৭৫৲ টাকা

দময়ন্তী আঁতকে উঠেছিল, এবারে আর্তনাদ করে উঠল : আপনি এ-সব কী করছেন ! আমাকে যে এখুনি ফিরতে হবে।

এখুনি !

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল। সেই উদ্দাম উন্মত্ত হাসি। পায়ের নিচের কাঠের মেঝে থর থর করে কেঁপে উঠল। দময়ন্তীর হাতের গেলাসটা হয় তো ফস্কে পড়ে যেত, কোনরকমে সেটা সে ধরে রইল।

কাঠুরে চৌধুরী তার গেলাসে আরও খানিকটা মদ ঢালল। বলল : অমন আলগোছে বসেছেন কেন, ভাল করে বসুন।

সত্যিই দময়ন্তী এতক্ষণ সোজা হয়ে বসেছিল। এক রকম অদ্ভুত অস্বস্তিতে সে কিছুতেই সহজভাবে হেলান দিয়ে বসতে পারছিল না। এইবারে কাঠুরে চৌধুরীর চোখের দিকে চেয়ে তার আদেশ পালন না করে পারল না। লোকটার চোখ যেন বাঘের মতো জ্বলছে। না বসলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

হাতের গ্লাসটি ঢক ঢক করে শেষ করে কাঠুরে চৌধুরী আর একবার হেসে উঠল। এই তার স্বাভাবিক হাসি। এই অন্ধকার অরণ্যের ভিতর আতঙ্কে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে? শৈশবে দময়ন্তী হায়নার হাসির কথা পড়েছে। সে হাসি ভয়ের না আনন্দের, দময়ন্তী তা জানে না। কাঠুরে চৌধুরীর হাসি শুনে দময়ন্তীর ভয় করছে। মনে হচ্ছে, এ হাসি যেন মানুষের নয়, মানুষের হাসিতে এত ভয় থাকে না।

হাসি থামবার পর সে বলল : আপনার নামটি ভাল। দময়ন্তী। কোন বাঙালী মেয়ের আমি এ নাম শুনি নি।

দময়ন্তী কোন উত্তর দিল না।

একটু চিন্তা করে বলল : দময়ন্তী বড় দুঃখী নাম। মহাভারতের দময়ন্তী জীবনে কোন সুখ পায় নি। অথচ স্বামী পেয়েছিল মনের মতো।

দময়ন্তী আবার সোজা হয়ে বসল।

অন্যমনস্কভাবে কাঠুরে চৌধুরী বলল : সংস্কারে আমরা আজও বিশ্বাস করি বলেই এ নামটা এড়িয়ে চলি। তারপরেই আবার সহজ হয়ে বলল : কুছ পরোয়া নেই। আপনার স্বামী যদি মনের মতো না হয়, তাহলে জীবনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন।

দময়ন্তী লজ্জায় সঙ্কুচিত হল। ছি ছি, এসব কী কথা ! এ লোকটার কি সভ্যতার জ্ঞান একেবারে নেই !

কাঠুরে চৌধুরী থামল না। ঢক ঢক করে আরও খানিকটা মদ গিলে বলল : আপনার মার বোধ হয় এখনও মত হয় নি, আপনার বাবা আকারে ইঙ্গিতে আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল : আপনার বাবা আপনাকে এখানে পাঠান নি তো ?

না।

তবে সত্যিই আমার খুশী হওয়া উচিত।

দময়ন্তী এবারে উঠে দাঁড়াল, বলল : আমাকে মাফ করবেন, আমি এবারে আসি।

সে কি !

কাঠুরে চৌধুরী হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে ফেলল, বলল : এখুনি যাবে কি ! বলে নিজের দিকে তাকে আকর্ষণ করল।

দময়ন্তী হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল : বাড়িতে কাউকে বলে আসি নি, আজ আমাকে যেতে দিন।

কাঠুরে চৌধুরী তার হাত ছেড়ে দিল না, উঠে দাঁড়িয়ে বলল : বাইরে ভাল না লাগে ঘরের ভিতরে এস।

বলে তাকে ঘরের দিকে টানল।

লজ্জায় ভয়ে আতঙ্কে দময়ন্তীর কান্না পেল, ফুঁপিয়ে ডাকল : ড্রাইভার।

দময়ন্তীর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছিল। কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে। তাকে কোথাও বসিয়ে দেওয়া দরকার।

ড্রাইভার শুনতে পায় নি, কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী তার কান্নার স্বর শুনেছিল। বলল : ভয় নেই। চল তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

বলে সে নিজেই তাকে তাদের গাড়িতে তুলে দিল।

দময়ন্তী তার দু' হাত জুড়ে তাকে নমস্কার করবার চেষ্টা করেছিল। ঠিক পেরেছিল কি না মনে নেই। তারপর সেই হাতেই মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

[ক্রমশ।
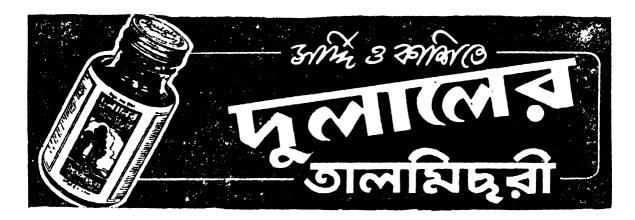
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র

[দৈনিক বসুমতীর বর্ত্তমান বৎসরের শারদীয়া সংখ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করা হইল। পত্রটি কাহাকে লেখা তাহা অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ আত্মীয়বৃন্দের কাহারও কোন দায়গ্রস্ত কর্মচারীকে লিখিত। অতি স্বল্পায়তন এই পত্রটির মধ্যে রবীন্দ্র-মানসের একটি বিরাট মহিমান্বিত দিক আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অসামান্য হৃদয়সম্পদের অধীশ্বর হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই পত্রের প্রতিটি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুঁজিপতিদের দলে তাঁহাকে ভিড়াইয়া তাঁহাকে বুর্জোয়া প্রমাণ করিবারও বহু চেষ্টা চলিয়াছে। এই ক্ষুদ্রায়তন পত্রটি সেই ভ্রান্তধারণার মূর্ত প্রতিবাদ। অন্যের দুঃখে কাতর রবীন্দ্রনাথের পরোপকারবৃত্তি সকল সময়েই প্রবল ও জাগ্রত ছিল। এতৎসহ প্রকাশিত অন্যান্য পত্রগুলি মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—স

ওঁ

রামগড়
হিমালয়

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন

আমি বহু দূরে আছি চিঠি আপনার পাইতে বিলম্ব হইল। আপনার সার্টিফিকেট এখান হইতে ডাকযোগে ফেরৎ পাঠাইয়াছি এবং কন্যার বিবাহে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিবার জন্য কলিকাতায় কর্ম্মচারীকে লিখিয়া দিয়াছি। ইতি ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে লিখিত মহাকবি নবীনচন্দ্রের পত্র

কলিকাতা,
১০ গোমেস লেন
১৬ই অক্টোবর, ১৮৯৬

শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজা,

আপনার একান্ত-সচিবের নিকট হইতে একটি পত্র ও স্বয়ং আপনার নিকট হইতে আর একটি পত্রের যথাযথ শ্রদ্ধা সহকারে প্রাপ্তি স্বীকার করি। মহাপূজা উপলক্ষে আপনি ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই ইহার মধ্যে আমি কোন পত্রাদি আপনাকে দিই নাই।

আপনার মত একজন বিদগ্ধ ও নমস্য পুরুষকে পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়া বাঙলা সাহিত্য আজ নানাভাবে উপকৃত এবং প্রভূত উন্নয়নের পথে অগ্রগমনশীল। আপনি আপনার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার দ্বারেষা মহৎ সাহিত্য সৃজনের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির ঐশ্বর্যবৃদ্ধির প্রয়াসী ইহা যেমনই অবাস্তব তেমনই গর্বের বস্তু। অধুনা আপনি আমাদের সাহিত্যের পালকপিতার আনন্দের সমাসীন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন এবং আত্মতত্ত্বের জগতে আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বিচরণ আপনি অশেষ সহৃদতার চোখে দেখিয়াছেন। আপনি সুদীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিয়া স্বজাতির এবং দেশীয় সংস্কৃতির বৈভববৃদ্ধি করুন ইহাই কামনা।

গীতা এবং চণ্ডী আমার নিছক অনুবাদ মাত্র। মৌলিকতা বিশেষ নাই বলিলেই চলে। এতৎসহ একটি মুদ্রিত সমালোচনী পাঠাইলাম। পাঠান্তে আমার মৌলিক রচনাদি সম্পর্ক সকল বৃত্তান্ত বা অপরের ধারণা অবগত হইবেন।

আপনার শ্রীহস্তে এক সেট গ্রন্থ উপহার দিবার বাসনা আমার মধ্যে এক তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছে। সদ্য প্রকাশিত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস গ্রন্থত্রয়ে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা প্রচারিত হইয়াছে।

মহারাজ, এইবার আপনার সমক্ষে একটি অভিযোগ আনয়ন করি। এ বৎসর মহাপূজা উপলক্ষে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম কেন? আপনার দরবারে আসনলাভের সৌভাগ্য কেন যে আমার ঘটিল না বুঝিলাম না।

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—

আপনার বশংবদ

স্বাঃ নবীনচন্দ্র সেন

পত্রের উত্তর

প্রাসাদ,

২১শে অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয়বরেষু,

নবীনবাবু, আপনার ১৬ই অক্টোবরের পত্রের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। আপনি যে গ্রন্থগুলি আমাকে উপহার দিতে চাহিয়াছেন সেগুলি লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিব। গ্রন্থগুলি আপনার ঈশ্বরদত্ত রচনাশক্তির পরিচায়ক সেদিক দিয়া শুধু আমার নিকটেই নহে সারা বাঙলার সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট সমাদরের সহিত গৃহীত হইবে। তদুপরি আমার প্রতি আপনার সহানুভূতি ও প্রীতির চিহ্ন বহন করিয়া উপহার স্বরূপ ঐ মহান গ্রন্থগুলি আসিবে—ইহা অতীব আনন্দের বিষয় এবং এই কারণে গ্রন্থগুলির মূল্য আমার নিকট অপরিসীম।

মিরারে প্রকাশিত ভবিষ্যতের রাজনীতি সম্বন্ধে আপনার দুইখানি পত্রই আমি পাঠ করিয়াছি। পত্রদ্বয় সত্যই আকর্ষণীয় এবং সারগর্ভ, চিন্তার খোরাক জোগায়। আপনার ব্যাখ্যাটি অতি প্রাঞ্জল ও মনোরম। বর্তমানকালের রাজনীতির আলোয় আপনি ভবিষ্যতের যে চিত্র দেখিতে পাইয়াছেন তাহা আপনার দূরদর্শিতা প্রমাণ করে।

এবারের মহাপূজার অনুষ্ঠানাদি পরিচালনায় আমি নিজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি নাই। পরিবারের তরুণ সদস্যেরা তাঁহাদের বান্ধবাদিকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক, ভবিষ্যতে, আপনি নিশ্চয়ই সাদর আহ্বান পাইবেন। আপনার মত বাঙলার একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথীর আগমন তো সকল দিক দিয়াই অভিপ্রেত এবং বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষিত।

আমার বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

স্বাঃ যতীন্দ্রমোহন টেগোর

রাজা দক্ষিণারঞ্জনকে লিখিত প্রখ্যাত সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্র

কলিকাতা,

১২ই ডিসেম্বর, ১৮৬৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ২৪-এ সেপ্টেম্বরের পত্রই আমার নিকট লিখিত আপনার সর্বশেষ লিপি। ঐ পত্র আপনি ফয়জাবাদ হইতে লিখিয়াছিলেন।

আমার প্রাপ্য সম্বন্ধে আপনার শরণাপন্ন হওয়ায় আপনি আমায় আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যাহাতে আমার প্রাপ্য আমার হস্তে আসে তজ্জন্য যথা করণীয় আপনি করিবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগকে যাহা বলার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আপনি যথাকর্তব্য করিবেন বলিয়া আমায় নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন।

আপনি ব্যস্ত মানুষ। নানা কাজে সদাই ব্যাপৃত। বিরাট কর্ম-দায়িত্ব আপনাকে পালন করিতে হয়, এই কথা ভাবিয়া আমার মনে হয় যে, এ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিবার বোধ করি অবকাশ পান নাই এবং আপনার গুরুদায়িত্ব এবং ব্যস্ততা উপলব্ধি করিয়া এ সম্বন্ধে আমিও আপনাকে বিরক্ত করি নাই।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের তো কোনরূপ উৎসাহই এ সম্বন্ধে দেখিতেছি না। কবে আমি লক্ষ্ণৌ হইতে অবসর লইয়াছি তথাপি আমার সম্বন্ধে ইঁহারা এত উদাসীন যে, আমার প্রাপ্য বেতন দিতে এখনও ইঁহাদের সময় হইল না। ইহার অর্থ আমাকে যুগযুগান্ত ধরিয়া অপেক্ষা করিতে বলা ছাড়া অন্য কি হইতে পারে শেষে কি আইনের আশ্রয় লইয়া প্রাপ্য অর্থ উদ্ধার করিতে হইবে?

যাহা হউক, পুনরায় বিষয়টি আপনার দৃষ্টিগোচর করিলাম।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমি পূজার পর হইতে ভালই আছি (মধ্যে কিয়ৎকাল ব্যতীত)। আমার পরিবারে অবশ্য আধিব্যাধি চলিতেছে।

তথাকার অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশে এতৎসহ শুভেচ্ছা পাঠাইতেছি।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী

স্বাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী

শম্ভুচন্দ্রকে লেখা মনীষী কৃষ্ণদাস পালের পত্র

প্রিয় শম্ভু,

প্রত্যুষে পত্রিকায় তোমার প্রবন্ধের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া পাঠ করিলাম। উহা তোমার নিকট পাঠাইতেছি, পড়িয়া পরে আমায় প্রত্যর্পণ করিও।

তোমার অনুরক্ত

স্বাঃ কে পাল

প্রিয় শম্ভু,

কপির বিশেষ প্রয়োজন। অদ্যকার মন্তব্যগুলি একবার পাঠাইতে পার? বড় ভালো হয় তাহা হইলে।

গ্রাম্য উন্নয়ন তদন্ত সম্পর্কে তুমি তো কিছু লিখিলে না। বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তোমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বলি এবং ঐ সম্পর্কে কিছু লেখার আবশ্যকতা অনুভব করি।

তোমার অনুরক্ত

স্বাঃ কে ডি পাল

(ব্যক্তিগত)

শুক্রবার

প্রিয় শম্ভু,

ভীতিপ্রদর্শনের পর এইবার সি, বি, রেল কোম্পানী মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। অতএব, আমাকে এখন ঐ মামলাটির ব্যাপারেই অত্যন্ত

ব্যস্ত থাকিতে হইবে। অন্য কার্যে মনোযোগ দিবার বিশেষ অবসর পাইব না। আমি আশা রাখি, সম্পাদকীয় কার্যে অবশ্যই তুমি আমার চিন্তার অপনোদন করিবে। প্রার্থনা করি, যেন তোমার সহযোগিতা অবশ্যই পাই।

বাবু রাজেন্দ্র দত্ত এবং ডঃ সরকারের সহিত একবার যোগাযোগ করিও ও তাঁহাদের এই সকল সমাচার জানাইও। আমার সহিত যথাশীঘ্র সাক্ষাৎ করিও।

তোমার অনুরক্ত

স্বাঃ কে ডি পাল

শম্ভুচন্দ্রকে লেখা কবি উমেশ দত্তের পত্র

অফিস অফ দ্য জাস্টিসেস অফ দ্য পীস,
৩ চৌরঙ্গী রোড,
২৯. ৮. ৭৩

প্রীতিভাজন শম্ভুবাবু,

আপনার পত্রিকার প্রকাশমান সংখ্যাটির জন্য আমি কোন রচনা শেষ পর্যন্ত দিতে পারিলাম না বলিয়া সবিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছি জানিবেন। অফিস সংক্রান্ত কার্যের চাপ এত বাড়িয়া গিয়াছে যাহা বোঝানো অসম্ভব, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হওয়ায় অন্যান্য জগত হইতে যেন ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছি। আমাদের প্রধান হগসাহেবের আগমনের পর কবিতা লেখা তো বন্ধই হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা প্রবলতর কিন্তু উপায়শূন্য। যাহা হউক পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে যথারীতি কবিতা লিখিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

কৃতজ্ঞতাসহ

স্বাঃ ও সি ডাট

শম্ভুচন্দ্রকে লেখা কালীপ্রসাদ দে'র পত্র

দ্য ন্যাশানাল ম্যাগাজিন,

৩২, কালিদাস সিংহ লেন,
মীর্জাপুর,
কলিকাতা, ১৮ই জুন, ১৮৭৮

মহাশয়েষু,

ওরিয়েন্ট্যাল ম্যাগাজিন নামে একটি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইল। অদ্য প্রভাতে তাহাদের মুদ্রিত বিবরণাদি পাইলাম, উহা পাঠে উহাদের ভাবধারা ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে অবহিত হইলাম।

আপনার অবগতির জন্য এই নবজাত পত্রিকাটির বিবরণী পাঠাইতেছি।

শ্রদ্ধাভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

স্নেহধন্য

স্বাঃ কালীপ্রসাদ দে

এ এম ক্যামেরণকে লেখা লালবিহারী দে'র পত্র

কলিকাতা,
কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার,
ডিসেম্বর ১৬, ১৮৬১

পরম প্রিয়বরেষু,

ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আপনার অতি মূল্যবান রচনাদি 'রিফর্মার'-এ নিয়মিত প্রকাশ করিতে পারিলে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিব; আগামীবর্ষের শুরু হইতেই রিফর্মার ইণ্ডিয়ান এম্পায়ারের আকার ধারণ করিবে এবং বারো পৃষ্ঠার হইবে। তবে প্রতি পৃষ্ঠায় দু'টি কি তিনটি করিয়া কলম থাকিবে সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। আপনার রচনাগুলি 'সাহিত্য' শীর্ষক সাধারণ শিরোনামার অন্তর্গত হইতে পারে বলিয়াই আমার মনে হয়। যদি আপনার কোনপ্রকার অসুবিধা না হয় তাহা হইলে প্রুফগুলি আমি আপনাকেই দেখিয়া দিতে অনুরোধ করি। অবশ্যই শ্রীরামপুর হইতে ডাকযোগে প্রুফগুলি আপনার নিকট প্রেরিত হইবে। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রচনায় নিশ্চয়ই বহু বিদেশী হরফের ব্যবহার থাকিবে বলিয়া মনে হয়। রোম্যান হরফ ছাড়া সাধারণ মুদ্রণাগারে অন্য কোন অভারতীয় হরফ থাকে না, আপনি কি কি হরফ ব্যবহার করিবেন তাহা পূর্বাহ্নে জানাইলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি। যদি নাও পারি তাহাও তাহা হইলে আপনাকে জানাইয়া দিতে পারি।

আপনার বশংবদ

স্বাঃ লালবিহারী দে

কলিকাতা,
এপ্রিল ২২, ১৮৬২

পরম প্রিয়বরেষু,

আপাতত কার্যের চাপে আপনাকে লেখা বন্ধ করিতে হইতেছে জানিয়া বিশেষরূপে বেদনাহত হইলাম। যাহা হউক, আমাদের প্রতি আপনার সহানুভূতি ও আনুকূল্যকে আপনার সহস্র কর্মব্যস্ততা হরণ করিতে সক্ষম হইবে না সে বিশ্বাস রাখি।

শুধু দূরত্বের ব্যবধানেই অদ্যাপি আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়া উঠিল না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আগ্রহ আমার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান জানিবেন। করি করি করিয়াও কিছুতে করা হইয়া উঠিতেছে না। যাহা হউক, অচিরে একদিন দেখা হইবেই এই বিশ্বাস—

আপনার বশংবদ

স্বাঃ লালবিহারী দে

কলিকাতা
ডিসেম্বর ২৮, ১৮৬১

পরম প্রিয়বরেষু,

গতকল্য অশেষ কৃপাপরবশ হইয়া আপনি যখন আমার গৃহে পদার্পণ করিলেন ঠিক সেই সময়েই আমি গৃহের বাহিরে ভাবিয়া নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হইতেছে। আপনার রচনার প্রথম কিস্তিটি যেটি দিতে আসিয়াছিলেন ও যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পাইয়াছি জানিবেন। আপনার হস্তাক্ষর অতি স্পষ্ট ও সুন্দর তাই প্রুফ আমিই দেখিয়া দিব, শুধু বিশেষ বিশেষ অংশগুলি আপনার নিকট পাঠাইব।

আপনার বশংবদ

স্বাঃ লালবিহারী দে

মহারাজা প্রদ্যোতকুমারকে লেখা রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথের পত্র

দি বেঙ্গলী — ১২৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
১৮৫৯ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত — কলিকাতা,
টেলিফোন নং ৯৩৭ — ২২-এ এপ্রিল, ১৯১৬

প্রিয় মহারাজা,

সংবাদ পাইলাম আপনি একটি মোটর গাড়ি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। আমার গাড়িটি খুব ভাল অবস্থাতেই আছে। তাহার মধ্যে কোনপ্রকার গোলযোগ দেখা দেয় নাই। ভাল কাজই দেয়। গাড়িটির প্রতি যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয়। সেই গাড়িটি আমিও বেচিতে চাই। অতএব···।

আপনার প্রাসাদে বা এমারেল্ড বাওয়ারে কবে সাক্ষাত হইবে জানাইবেন। সেইদিন আমাদের পূর্বেকার পরিকল্পিত ব্যাপারগুলি লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি। সেই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে আমার মনে হয় আর একটি সাক্ষাতকারই যথেষ্ট। কথাবার্তা তো হইয়াই গিয়াছে। বিষয়গুলিও আমার নিকট আর অপ্রাঞ্জল নহে। অতএব এখন শুধু একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

আশা করি কুশলে আছেন। — আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্র

মহাশয়,

উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য ম্যাগাজিনের কপিটি আপনাকে হাইকোর্টে পৌঁছাইয়া দেওয়ার যে মৌখিক নির্দেশ আপনি সেদিন অনুগ্রহপূর্বক এখানে আগমন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে আমাদের একটু অসুবিধায় ফেলিতেছে। গ্রন্থাগারের কপি আমরা ইতিমধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছি। কিন্তু ডাকে, কিছু হাতে পাঠাইলে আমাদের কার্য পরিচালনা অসুবিধাগ্রস্ত হয়। আমাদের প্রতি আপনার সহানুভূতির অন্ত নাই। আমরা বুঝিলাম যে পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি উহা দেখিতে চান, উত্তরপাড়ায় গিয়া দেখিবার মত দেরী করিতে ইচ্ছুক নন। ইহা অপেক্ষা বড় পৃষ্ঠপোষণা আর কি হইতে পারে? আমরা গ্রন্থাগারে যেমন পাঠাই তেমনই যথারীতি পাঠাইব। অধিকন্তু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে প্রতি সংখ্যা হাইকোর্টে পৌঁছাইয়া দিব।

আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। — আপনার বিশ্বাসভাজন
বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সমীপে — স্বাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী

মহারাজা প্রদ্যোতকুমারকে লেখা দেশনায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্র

টেম্পল চেম্বার্স,
কলিকাতা,
আগষ্ট ৩, ১৯১৬

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, আপনার অভিনন্দন পত্রের জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ। আমি কাউন্সিলে যে আসন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আশা করি আপনার স্মরণ আছে। আপনারই হস্তক্ষেপের ফলে। আমার প্রতি আপনার পত্রে যে সানুকূল মনোভাব এবং গভীর আস্থা ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে তজ্জন্য আমার গর্বের অবধি নাই জানিবেন।

আপনাদের
স্বাঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু

মহারাজা প্রদ্যোতকুমারকে লেখা দিনাজপুরের মহারাজার পত্র

বিষয়:—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

দিনাজপুর,
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১

প্রিয়বরেষু,

মহারাজা বাহাদুর, মতিবাবুর পত্রে জানিতে পারিলাম যে, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের কক্ষে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে এক শোকসভা আয়োজিত হইতেছে। আমার মতে, এই শোকসভা শিশিরকুমারের ন্যায় দেশের এক নমস্য সন্তানের কেবল কয়েকজন বন্ধু এবং অনুরাগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সাধারণ ভাবে হউক, অর্থাৎ জনসাধারণের জন্য ইহার দ্বার যেন রুদ্ধ না থাকে। কারণ শিশিরকুমার সারা দেশের সম্পদ। তাঁর মৃত্যু এক জাতীয় ক্ষতি।

আশা করি আপনি এবং পরিবারস্থ সকলেই কুশলে কালাতিপাত করিতেছেন।

আপনাদের
স্বাঃ গিরিজানাথ রায়

মিঃ কে, সি, দে'কে লেখা মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের পত্র

বিষয়:—নব্যভারতের ভাস্করগুরু হিরণ্ময় রায়চৌধুরী

২২-এ জানুয়ারী, ১৯১৬

প্রিয়বরেষু,

শ্রীযুক্ত দে. শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরীকে আপনার সহিত যথেষ্ট আনন্দ সহকারে পরিচয় ঘটাইয়া দেওয়ার সুযোগ পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। ইনি বিলাত হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন শক্তিমান ভাস্কর। বর্তমানে সরকারী চারু ও কারু বিদ্যালয়ের সহাধ্যক্ষের পদপ্রার্থী। স্যার উইলিয়াম রিচমণ্ড, মিঃ ফ্ল্যাম্পটন এবং অন্যান্য দিকপালবৃন্দ ইঁহার প্রতিভা, শক্তিমত্তা ও স্বকীয়তা সম্বন্ধে যেখানে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছেন সেখানে আমার পক্ষ হইতে সে বিষয়ে কিছু বলার অপেক্ষা থাকে না। আপনি যদি আপনার পক্ষে সম্ভব এমন কোন উপায়ে ইঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন তাহা হইলে যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিব। ইঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত প্রশংসাপত্রগুলির একটি মুদ্রিত প্রতিলিপি আপনার অবগতির জন্য পাঠাইতেছি।

আপনাদের
স্বাঃ পি, সি, টেগোর

মাননীয় শ্রীযুক্ত কে, সি, দে, সি, আই, ই, আই, সি, এস সমীপে

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[বর্তমান বাঙলার প্রবীণতম কবি]

জগৎ কবি সভার অন্যতম অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র প্রকৃতির বরপুত্র কীটসের জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল—সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য। বর্তমান বাঙলার জীবিত-জ্যেষ্ঠ কবি। প্রকৃতির একান্ত উপাসক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকও সেদিন সন্ধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে বললেন, —'আমার জীবনই হচ্ছে কবিতা, কবিতাই হচ্ছে জীবন।' গত ফাল্গুনে অশি বছর পূর্ণ করেছেন তিনি। তাঁর এই দীর্ঘজীবনকে এক নিরবচ্ছিন্ন একটানা কাব্য সাধনার একটি মহান ইতিহাসের নামান্তর বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

কুমুদরঞ্জনের আদিনিবাস শ্রীখণ্ড। কোগ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে। বর্তমানে কোগ্রামেরই তিনি স্থায়ী বাসিন্দা। কোগ্রাম তাঁর জন্মভূমিও। ১২৮৯ সালের ১৯-এ ফাল্গুন (মার্চ ১৮৮৩) কবি কুমুদরঞ্জন প্রথম পরিচিত হলেন পৃথিবীর আলো-হাওয়া-বাতাসের সঙ্গে। পিতৃদেব স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মল্লিক।

উপনয়নের পর কলকাতায় আসেন। শিক্ষালাভ এইখানেই হয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯০৫ সালে বি, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচায়কস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯০৬ সালে কোগ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী নবীনচন্দ্র ইনষ্টিটিউশানের দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণ করেন। পরের বছরই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন, সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর সগৌরবে ঐ আসনে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অবসর নেন। তাঁর সঞ্চয়ের ঝুলি তখন ভরে উঠেছে অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্রের সুগভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধায়।

বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি কুমুদরঞ্জনের কবিতা রচনা প্রথম শুরু হয় দশ-বারো বছর বয়সে। মাতুল বিখ্যাত এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার যতীন্দ্রনাথ মল্লিকের প্রেরণা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র যখন সেই সময় কবিতা প্রথম প্রকাশিত হল ('কবি হেমচন্দ্রের প্রতি')।

আজও তাঁর লেখনী অশ্রান্ত গতিতে বাঙলা সাহিত্যের অনবদ্য ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলছে। শ্রদ্ধাস্পদ কবির রসঘন দরদী ভক্তির আপ্লুত চিত্ত সরস্বতীর ধ্যানমুখর। এই সুদীর্ঘকাল ধরে নিয়মিতভাবে বাঙলার কাব্যলোককে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এবং অবদান বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

আজকের পাঠক সাধারণ, অনেকেই হয় তো জানেন না যে কবি কুমুদরঞ্জন গল্প প্রমুখ গদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর গদ্যও যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই প্রাঞ্জল। কুমুদরঞ্জনের কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে শতদল, বনতুলসী, উজানী, একতারা, বীথি, তূণীর, নূপুর, বনমল্লিকা, রজনীগন্ধা, অজয়, স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নগরের কোলাহল থেকে তিনি দূরে থাকেন, তাঁর অবস্থান ছায়া, নদী, বনঘেরা পল্লীর পরম রমণীয় পরিবেশে, পল্লীর চোখ দিয়েই তিনি বিশ্ব দেখেছেন, পল্লীর মানুষগুলির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বদেবতাকে। প্রকৃতি তাঁকে দিয়েছে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, অনুভূতিতে ভরপুর সৃষ্টিধর্মী একটি হৃদয় জন্মসূত্রে তিনি পেয়েছেন ভক্তিরসে প্লাবিত অফুরন্ত ভালবাসা ভরা একটি নিটোল মন। বিদেশ যাওয়ার একবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। ব্যবস্থা করেছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। কিন্তু যাওয়া হয় নি।

প্রদেশ কংগ্রেস প্রবর্তিত গুণী-সম্বর্ধনা সপ্তাহের প্রথম বর্ষে যাঁরা সম্বর্ধিত হন ইনি তাঁদের অন্যতম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সম্মান নিবেদন করেছেন জগত্তারিণী পদক প্রদান করে।

প্রত্যহ ভোর সাড়ে চারটেয় তিনি শয্যাত্যাগ করেন। সাড়ে পাঁচটা অবধি আরাধনায় নিমগ্ন থাকেন। তারপর সূর্য প্রণাম। তারপর লেখা চলে ৯টা পর্যন্ত মধ্যাহ্নে দু'টো থেকে চারটে পর্যন্ত তাঁর লেখার সময়।

কথাপ্রসঙ্গে সেদিন সোমনাথের প্রসঙ্গের অবতারণা করলুম। বললুম সোমনাথের সঙ্গে যেন আপনার আত্মার যোগ! ঠিক অনুভূতিগ্রাহ্য স্তর সেটা নয়, তারও পরবর্তী স্তর। সোমনাথের প্রতি আপনার এক বিরাট আকর্ষণ পাঠকের চোখে ধরা পড়ে।

কবির কাছ থেকে উত্তর এল—ন' বছর বয়সে সোমনাথের ইতিহাস প্রথম শুনে আমি কেঁদে ফেলি, সে কান্না তোমরা ধারণা করতে পারবে না, সে শেষে থামানো যায় না। সেই থেকে সোমনাথের উপর আমার এক অদ্ভুত আকর্ষণ। আবার যেদিন স্বাধীন ভারত সরকারের দ্বারা সোমনাথের সংস্কারকার্য সুসম্পন্ন হল, সেদিন যে কি আনন্দ আমার তা প্রকাশ করা সাধ্যাতীত, সে আনন্দকে চেপে রাখা যায় না। ন' বছর বয়েস থেকে সোমনাথের সঙ্গে আমার একটা অন্তরের যোগাযোগ আর আজও তা অবিচ্ছিন্ন।'

অল্প কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন, কিন্তু কথাগুলি অল্প হ'লেও তার গুরুত্ব মোটেই অল্প নয়। আজকের নাস্তিবাদের যুগে এই কথাগুলি এক অপরিমাপ্য মূল্য বহন করে এবং এই গভীর ভাবসমৃদ্ধ কথাগুলির মধ্যেই কবির জীবন রহস্যের এক বিরাট অংশ সূর্যের আলোর মতই প্রকট হয়ে উঠছে।

প্রমথনাথ বিশী

[প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী, শিক্ষাবিদ, বিধান পরিষদের সদস্য]

সাহিত্যের নানা অলিন্দে, সমান দক্ষতার সঙ্গে যাঁরা সৃজনী শক্তির বলিষ্ঠ পরিচয় রেখে চলেছেন, বিশিষ্ট সাহিত্যকার, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী সেই তালিকায় একটি মুখ্য নাম।

কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, রসরচনা, প্রবন্ধ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা নিবন্ধ প্রমুখ সাহিত্যের নানা দিকের যে উৎকর্ষসাধন ও ব্যাপক কল্যাণ ঘটেছে (এবং ঘটে চলেছে) তাঁর কুশলী হাতের স্পর্শে, তা তাঁর সব্যসাচীসম আশ্চর্য প্রতিভারই অসামান্য নিদর্শন-বিশেষ।

রাজসাহীর অন্তর্গত জোয়াড়ী গ্রামে ১৯০২ সালের ১১ই জুন তাঁর জন্ম। পিতৃদেব স্বর্গীয় নলিনীনাথ বিশী মহাশয়। ন'বছর বয়েসে তিনি শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বিশ্বভারতীতে যোগ দিলেন ছাত্র হিসাবে। আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৭ সালে, রাজসাহী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৯ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পরীক্ষাতে সাফল্য লাভ করলেন (১৯৩২)। ১৯৩৩ থেকে ৩৬ পর্যন্ত ইনি রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহকারী ছিলেন। ১৯৩৬ সালে সুরেন্দ্র-নাথ (তখন রিপণ) কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন। ১৯৪৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন সহকারী সম্পাদক হিসাবে। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। ১৯৪৮ সালে জনপ্রিয় 'কমলাকান্তের আসর'-এর প্রতিষ্ঠা ঘটল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁকে নানা ভূমিকায় দেখা গেছে। দেখা গেছে প্রবক্তা রূপে, দেখা গেছে রীডারের কর্মপালনে, দেখা যাচ্ছে অধ্যাপকের পরম সম্মানিত আসন অলঙ্করণে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক' নিযুক্ত হলেন। জীবনের ষাট বৎসর পূর্তি দিবসে ১৯৬২ সালের ১১ই জুন তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হলেন।

প্রমথনাথ বিশী

মুদ্রিতাক্ষরে এঁর রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় তাঁর একটি ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ দেওয়ালী, ১৯২৫ সালে প্রথম উপন্যাস দেশের শত্রু, ১৯৩১ সালে প্রথম আলোচনা-গ্রন্থ রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ এবং ১৯৩৫ সালে প্রথম নাটক ঋণং কৃত্বা আত্ম-প্রকাশ করে। জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার, পদ্মা চলনবিল, অশ্বত্থের অভিশাপ, কোপবতী, কেরী সাহেবের মুন্সী, প্রাচীন আসামী হইতে, প্রাচীন পারসিক হইতে, বিদ্যাসুন্দর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঘৃতং পিবেৎ, ভূতপূর্ব স্বামী, মৌচাকে ঢিল প্রমুখ উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ ও নাটকগুলির সার্থক রচয়িতা তিনি। রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝর, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, রবীন্দ্র স্মরণী, মাইকেল মধুসূদন, চিত্রচরিত্র, বাঙলা সাহিত্যের নরনারী, বাঙলার কবি, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন প্রমুখ প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, জ্ঞানগর্ভ এবং তথ্যবহুল আলোচনাগ্রন্থগুলি তাঁর লেখনী থেকেই জন্ম নিয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিভাষা কমিটী, বিশ্বভারতীর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, প্রদেশ কংগ্রেসের, রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়, চারুচন্দ্র কলেজের কর্ম-নির্বাহ পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য।

অক্লান্তকর্মা এই মানুষটির জীবনেতিবৃত্তে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে খেলাধূলার সঙ্গে ইনি চিরকাল সম্পর্কশূন্য, বাল্যজীবনেও ক্রীড়াবিদ্যার সঙ্গে তাঁর কোন মিতালি ঘটে ওঠে নি।

আড্ডা এবং কথোপকথনের মধ্যে এই সদাহাস্যময় সুরসিক এবং বন্ধুবৎসল মানুষটি পেয়ে থাকেন প্রভূত আনন্দ, প্রগাঢ় তৃপ্তি।

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী

[ভারতে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী]

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতবর্ষে মহিলাদের মধ্যে প্রথম রাজ্যপালের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন বাঙলার মেয়ে সরোজিনী নাইডু। আজ দীর্ঘ ষোল বছর পর ভারতীয় নারী সমাজ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে এগিয়ে এলেন বাঙলার মেয়ে সুচেতা কৃপালনী। আজকের ভারতে রাজনৈতিক জগতে সুচেতা কৃপালনী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। একদিকে সমাজসেবিকা, সুবক্তা, বহু কল্যাণকর কর্মের উৎস হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি সমাসীনা। অন্যদিকে তাঁর প্রখর প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্যও এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

১৯০৮ সালে সুচেতা কৃপালনীর জন্ম। পাঞ্জাবের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের তিনি কন্যা। শ্রীমতী কৃপালনীর ছাত্রীজীবন অসামান্য কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে মেধার পরিচয় দেন। এরপর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল ইনি অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৭ সালে ইনি ভারতবর্ষের জননায়ক আচার্য জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনীর সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হন। সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি যোগ দিলেন

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী

১৯৩১ সালে। দেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর অবদানও অল্পমূল্যের নয়। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর অত্যল্প-কালের মধ্যেই তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর জননেত্রীরূপে সর্বভারতীয় বিপুল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৪০—৪১ এবং ১৯৪৩—৪৫ সালে তিনি কারাবরণ করেন। আধুনিক যুগের নারী সমাজের প্রগতির মূলে এঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শ যেমনই গভীর তেমনই বলিষ্ঠ।

১৯৩৯—৪০ সালে ইনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কিত দপ্তরের এবং ১৯৪১—৪২ সালে কংগ্রেসের মহিলা-বিভাগের সেক্রেটারীর আসনে সমাসীনা ছিলেন। ১৯৪৫ সালে কস্তুরবা স্মৃতিভাণ্ডারের ইনি সংগঠন-সম্পাদিকা নিযুক্ত হন।

১৯৪৬ সালে ভারতীয় গণপরিষদে সুচেতা দেবী অন্যতমা সদস্যা নির্বাচিতা হন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নোয়াখালিতে অসহায় ও নিপীড়িতদের কল্যাণমানসে জীবনপণ করে তিনি যে মানবিকতার এবং অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয় দীপ্তিতে বাঙালীর হৃদয়ে জাগরূক এবং শক্তির উপাসক বাঙলা দেশের মেয়েদের নানাভাবে প্রেরণা দেবে।

১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতমা ছিলেন। ১৯৪৮-৫১ ইনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতমা সদস্যা ছিলেন।

আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস ত্যাগ করে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করলে শ্রীমতী সুচেতাও কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন ও নবগঠিত রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে ঐ দলটির উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি লোকসভার সদস্যা নির্বাচিতা হন। কিছুকাল কংগ্রেসের বাইরে থাকার পর আবার তিনি কংগ্রেস দলে যোগ দেন। ১৯৫৮ থেকে ৬০ সাল পর্যন্ত ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার সগৌরবে পালন করেন। ১৯৬০ সালে ইনি উত্তর প্রদেশের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর তিনি ঐ মন্ত্রিসভাতেই আবার যোগ দেন। শ্রম ও সমাজ উন্নয়নের তিনি ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিতা হয়ে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের তিনি উন্মোচন করলেন।

শ্রীবীরেন মিত্র

[উড়িস্যার নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী]

কামরাজ পরিকল্পনায় ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জগতের যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হ'ল, তার ফল নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রধান কারণ দেখা যাচ্ছে যে, এই পরিবর্তনের ফলে ভারতের দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রের কর্ণধারের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন দু'জন বাঙালী। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন বাঙলার মেয়ে সুচেতা কৃপালনী। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন বাঙলার ছেলে বীরেন মিত্র।

উড়িষ্যার জনসাধারণে্য নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্রের জনপ্রিয়তার সীমা নেই। সর্বসাধারণের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্তরঙ্গ সুহৃদ, দরদী সজ্জন, মনের মানুষ, আপনজন। স্বীয় রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও কল্যাণই এই লোকপ্রিয় নেতার দিবসের চিন্তা, রজনীর স্বপ্ন, ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা।

শ্রীবীরেন মিত্র

আইনজীবী বিপিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের পুত্র বীরেন মিত্র কটক জেলার রঘুনাথপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭ সালে। কটকের র‍্যাভেন্স কলেজ থেকে ইনি বি-এ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন। কলেজ-জীবনে ছাত্রনেতা হিসাবেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে ও তাঁর নেতৃ-জীবনের সূচনা এইখানেই। কলেজ ছাড়া

পর ইনি কটক মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ধর্মঘটের ব্যবস্থা করেন ও নিজে সেখানে প্রধান ভূমিকায় দেখা দেন। এজন্যে তাঁর ভাগ্যে কারাবাস জোটে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তাঁকে পুরোভাগে দেখা গেল, বলা বাহুল্য লাভ হ'ল কয়েক বৎসরের কারাবাস।

উড়িষ্যার মুটিয়াদের ত্রিশদিনব্যাপী বিখ্যাত ধর্মঘটটিও ইনিই পরিচালনা করেন।

১৯৫২, '৫৭, '৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনগুলিতে ইনি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে উৎকল প্রদেশ কংগ্রেসের ভার গ্রহণ করলেন। ১৯৬১ সালে উড়িষ্যার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করলে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর আসনে দেখা গেল শ্রীবীরেন মিত্রকে।

দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে ইনি অতি অল্প বয়সেই আসেন এবং তার ফলেই সুভাষচন্দ্রের ভাবাদর্শ এঁর সমগ্র চিন্তাধারায় এক অনতিক্রম্য প্রভাব বিস্তার করে।

[বাউলচাঁদী সুর]

রাগিণী দেশমল্লার—তাল আড়খেমটা।

● ● ●

হয় দুনিয়া ওলট পালট,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া, শিক্ষে ধারে,
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে।
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা,
কে এখন আর ভিক্ষে দেবে?
যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসি ধোরে ওঠেন তবে!
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ব'বে?
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেরা,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে, জো বাঙালি, ড্যাম, গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।।
আমি স্বপনে জানি নে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হোয়ে হিঁদুর ছেলে, টাঁসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।

এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ কোরে আর কে বোঝাবে!
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
হোলো কর্মকাণ্ড, লণ্ডভণ্ড,
হিঁদুয়ানি কিসে রবে?
যত দুধের শিশু, ভোজে ঈশু,
ডুবে মোলো ভবের টবে।
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
এক, 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন 'এ, বি,' শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটা চামচ ধোর্‌বে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।

যা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই! তারা মোলেই দফা রফা,
এককালে সব ফুরিয়ে যাবে।
যখন আসুর শমন, কোর্‌বে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে?
বুঝি 'হুট' বোলে, 'বুট' পায়ে দিয়ে,
'চুরুট' ফুঁকে স্বর্গে যাবে।
ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা,
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম হবে।
তায় নীলকরেরদের মেজেষ্টরি,
কেমন কোরে ধর্মে সবে?
ও ভাই! তত দিন তো খেতে হবে,
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো,
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে,
কেমনে সে শুক্‌নো খাবে?

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বিবেক রসায়ন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

সংসারে শ্রেষ্ঠ দান কি? আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্রকার বলেন, 'অভয়-দানই শ্রেষ্ঠ দান, গো-দান, ভূ-দান বা অন্ন-দান কোন দানই ইহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না'। কিন্তু ভয়ভীত মানবকে অভয় দান করিতে পারেন কে? যিনি স্বয়ং অভয় হইয়াছেন। এই জন্য মহাপুরুষরাই অভয়দাতা হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থরূপে আমাদের মধ্যে শক্তি ও সাহস উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারেন। তাঁহারা দীপশলাকার মত, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আমরাও সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। আমরা তখন নিজেদের মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হই। আমাদের সমস্ত শক্তি সহসা জাগ্রত হয়। বাস্তবিক সংসারে 'বড়লোক' তাঁহারাই, যাঁহারা অপরকে বড় করিয়া তুলিতে পারেন।

গীতায় শ্রীভগবান যে কথা বলিয়াছেন, কোন ঐতিহাসিকই সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। পৃথিবীর সকল দেশেই যে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। আর প্রায়ই দেখা যায়, যখনই এইরূপ বিপর্যয় ঘটে, তখনই কোন মহামানব বা বিপ্লবী চিন্তানায়কের আবির্ভাব হয়। সুতরাং ইঁহাদের আবির্ভাবের মূলে যে যুগ-প্রয়োজন রহিয়াছে, সে কথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। ইঁহারা এক হিসাবে চিকিৎসকও বটেন, কারণ, ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে ইঁহারাই রোগমুক্ত করেন। অবশ্য, ইঁহারা সকলেই কার্যক্ষেত্রে সমান সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। যিনি যে পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি সেই পরিমাণে অপরের নিকট হইতে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন জাতি কিয়ৎ পরিমাণে আত্মস্থ হইলেও ভারতীয় সাধনার সামগ্রিক রূপটি হয় তো কোন মনীষীর ধ্যানে প্রতিফলিত হয় নাই। ধর্ম যে উপলব্ধির বস্তু, বিচার বা বিতর্কের বস্তু নয়,—এই সত্যও প্রতীচ্য শিক্ষাভিমানী বাঙালী বিস্মৃত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য-লাভের ও তাঁহার মুখনিঃসৃত ভাগবতী কথা শ্রবণের ফলে শিক্ষিত বাঙালীর অভিমান সেদিন চূর্ণ হইয়াছিল। আবার বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘাতে আলোড়িত-চিত্ত, যুক্তিবাদী ও সংশয়বাদী নরেন্দ্রনাথের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে যে রূপান্তর সাধন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর জীবনে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আমাদের মনে জাগাইয়াছিল ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। আর এই শ্রদ্ধাবোধ আমাদের মধ্যে আনিয়া দিয়াছিল বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যে নিজেকে পাপী বলিয়া মনে করে সেই পাপী হইয়া যায়।' ইহা তো বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি। আর ইহাই তো মনস্তত্ত্বসম্মত কথা। 'মানুষ অধম নয়, হেয় নয়, পাপী নয়, সে ব্রহ্মময়ীর সন্তান'—এই আশার বাণীই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শুনাইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রীরামপ্রসাদের গানেও আমরা এই বাণীই শুনিয়াছি।

পরলোকগত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলিয়াছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ যে আশা ও বিশ্বাস, বীর্য ও পৌরুষের বাণী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহা শুধু আস্তিককে নহে, নাস্তিককেও সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু হৃদয় ও কর্ণের পক্ষেই নহে, মনের পক্ষেও পরম রসায়ন। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশে 'রসায়ন' কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা আধুনিক কালে 'কেমিস্ট্রি' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'রসায়ন' কথাটির ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীনকালে 'রসায়ন' বলিতে বুঝাইত এক প্রকার ভেষজ বা ঔষধ—যাহা জরাক্লেশ ব্যাধিকে নাশ করে। রামায়ণেও এই অর্থে 'রসায়ন' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়। রসায়নার্থী ব্যক্তিরা প্রায়ই শোধিত পারদের ব্যবহার করেন বলিয়া পারদেরও এক নাম রস।

আমাদের দেশে 'রসেশ্বর দর্শন' নামে একটি দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছে পারদ ও গন্ধকের প্রয়োগের দ্বারা মানুষ অমরতা লাভ করিতে পারে। আমরা জানি, দেহের যেমন রসায়ন আছে মনেরও তেমনি রসায়ন আছে। ভাগবতে বলা হইয়াছে, ভগবানের কথা 'হৃৎকর্ণরসায়ন'। যখন আমাদের মন নৈরাশ্য পীড়িত বা বিষাদ অভিভূত হয়, তখন আমাদের এই মনের রসায়নের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই এই মনের রসায়ন পরিবেশন করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী বাণী দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত বা সংশয়াকুল মানুষের মনের পক্ষে অতুলনীয় রসায়ন। আজ আমাদের জীবনে এই রসায়নের প্রয়োজন যে কতখানি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থের পক্ষে নিত্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। এখানে 'অধ্যয়ন' বলিতে বোঝায় শাস্ত্রপাঠ। অধ্যয়নের দ্বারাই আমরা ঋষি-ঋণ পরিশোধ করি। কিন্তু শুধু শাস্ত্রপাঠ নয়, সেই সঙ্গে শাস্ত্রার্থেরও চিন্তন করিতে হইবে। আর এই চিন্তনের ফলেই আমরা দেহে ও মনে বীর্যবান ও শক্তিমান হইব। শাস্ত্রে এমন উক্তির অভাব নাই যাহার অর্থ চিন্তা করিলে আমাদের মনে অপরিমিত বলের সঞ্চার হয়। যেমন 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', (বলহীন বা ব্রহ্মচর্যহীন ব্যক্তি কখনও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না), অথবা 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ নাত্মানমবসাদয়েৎ' (আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধারসাধন করিবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন হইতে দিবে না), অথবা 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' (ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে লাভ করিয়া পরমাত্মাকে জান) ইত্যাদি। এ সকল বাক্য যে মন্ত্রাত্মক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীজীর তেজঃপুঞ্জ মূর্তির ধ্যান এবং তাঁহার বাণীসমূহের চিন্তন করিলেও আমাদের সকল জাড্য, আলস্য, মোহ, প্রমাদ নিমেষে দূরীভূত হয়। স্বামীজীর দৃপ্ত আহ্বান, যেমন,—

'জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে'

আমাদের সুপ্তির জড়িমা দূর করে। তাঁহার সেই অভয় বাণী—

'সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

জপ করিলে আমাদের মধ্যে মহাশক্তির বিকাশ হয়।

বর্তমান যুগে তিনিই আমাদিগকে 'অভীঃ' মন্ত্র নূতন করিয়া দীক্ষা দিয়াছেন, আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, 'দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু'। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তকে প্রয়োগ করিয়া আমাদের মধ্যে জাগাইয়াছেন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ, বীর সন্ন্যাসীর গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, 'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না, তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র।' বাস্তবিক, স্বামীজীর বাণী যেমন হৃদয় দৌর্বল্য বা সাময়িক অবসাদ এক মুহূর্তে দূর করিয়া আমাদের মনে উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার করে, আর কাহারও বাণী তেমন করে না।

আমাদের রক্ত যখন দূষিত হয়, তখনই দেহে বিবিধ বিকৃতি প্রকাশ পায়। যিনি শুধু সেই বিকৃতিগুলির চিকিৎসা করেন, তিনি উত্তম চিকিৎসক নহেন। অবশ্য রুগ্ন ব্যক্তিকে দুই ভাবে চিকিৎসা করা যায়, দোষের সংশোধনের দ্বারা বা ধাতুসমূহের সংশমনের দ্বারা। প্রথমটি curative treatment, দ্বিতীয়টি palliative. স্বামীজী প্রচলিত অর্থে সমাজ সংস্কার করিতে চাহেন নাই, মানুষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন ; আমাদের সমাজদেহের রক্তশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন, বিকৃতিসমূহকে দূর করিতে চাহেন নাই। ইহাকেই তিনি বলিয়াছেন আমূল সংস্কার root and branch reform. আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি হইবে? স্বামীজী বলিয়াছেন, 'বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।' আমরা যদি সত্যই বীর্যবান, প্রজ্ঞাবান ও শক্তিমান হইবার সংকল্প গ্রহণ করি, যদি সর্ববিধ অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি, যদি চালাকির আশ্রয় না লইয়া চরিত্রবলে বলীয়ান হইতে পারি, যদি স্বামীজীর বাণীর মধ্যে নবজন্ম লাভ করিতে পারি, তবেই তাঁহার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে এবং তাঁহার শতবার্ষিক উৎসব সার্থক হইবে।

●●● পরিবার পরিকল্পনার কয়েকটি দিক ●●●

সন্তোষ রায়চৌধুরী

ইদানীং কয়েক বছরে পরিবার পরিকল্পনা কথাটি বিশেষ করে শহরাঞ্চলে খুব চালু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলেও যে চালু হয় নি তা নয়। কিন্তু সেখানে ব্যাপক প্রচারের সুযোগ অনেক কম বলেই কথাটা তত ব্যাপ্তিলাভ করে নি। অবশ্য শহরেই হোক আর গ্রামেই হোক বিষয়টা এখনো অনেকের কাছে হেঁয়ালি হয়ে আছে তাই এতে গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম। পরিবার-পরিকল্পনা কথাটাও বাংলায় একটু ধোঁয়াটে ভাবকেই সূচিত করে, এর বদলে পরিবার নিয়ন্ত্রণ কথাটা ব্যবহৃত হলে হয় তো অনেকটা বোঝার সুবিধা হতো সাধারণ মানুষের।

সাধারণ মানুষ বলতে এখানে আমি অবশ্য তাদেরই কথা বলছি যারা এদেশের জনসমষ্টির মাত্র ১৫ হতে ২০ শতাংশ, অর্থাৎ যারা সরকারী বিজ্ঞাপন পড়তে পারে ও তার অর্থ গ্রহণ করতে পারে। বাকী যে বিরাট জনসংখ্যা পড়ে রইল তাঁদের কথা বলছি না কারণ এঁদের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব ও এর জন্য তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে চৈতন্য আনয়নের কোন মাধ্যম সরকারী ব্যবস্থায় এখনো নেই। অথচ সেটার ব্যবস্থাই করা উচিৎ ছিল আগে। কারণ এঁদের মনে সংস্কারের দৃঢ়মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরাতে পারে যে শিক্ষা, তা এঁদের নেই। ফলে জন্ম জন্মের মত ব্যাপার যার মূল হোতা হলেন স্বয়ং বিধাতা,—সেই সংস্কারকে বিজ্ঞান দিয়ে স্থানচ্যুত করা বড় কঠিন। বিশেষ করে এদেশে যেখানে যৌন সম্বন্ধীয় আলোচনা বা শিক্ষা পাপের মত পরিত্যাজ্য।

কাজেই দেশের জনসংখ্যায় মাত্র এক পঞ্চমাংশ নিয়েই যা কিছু সমস্যা। তাই বোধ হয় পরিবার-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যা কিছু প্রচেষ্টা তা বিশেষভাবে শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলের হাসপাতালগুলোর মতই শহরাঞ্চলের পরিবার-পরিকল্পনার ক্লিনিকগুলো এক একটা প্রহসন মাত্র। বাড়তি আয়ের সুযোগ হবে বলে ডাক্তারেরা পরিবার পরিকল্পনার বিশেষ শিক্ষা নিয়েছেন কাজেই তার শিকার সাধারণকে হতেই হবে—হচ্ছেও। কারণ হাসপাতাল সংলগ্ন ক্লিনিকগুলো আরো ভয়াবহ, সেখানে শালীনতা বজায় রেখে শিক্ষাগ্রহণ অসম্ভব। সেখানকার বিশেষ দিন বিশেষ ক্ষণের ব্যবস্থায় ডাক্তারদের মর্জিমাফিক নিয়ম-শৃঙ্খলায় রোগীরা অজ্ঞানতাবশতই যদি কোন ত্রুটি করে ফেলে তাহলে ভদ্রতাও বজায় রাখা সম্ভব নয়।

'ওষুধ দেবার' বলে নাওয়া-খাওয়া, অফিস, আদালত, সব কিছু শিকেয় তুলে রেখে এক পায়ে হুজুরদের কাছে হাজির থাকতে হবে,—অনেক ক্ষেত্রে গাঁটের কড়ি গুণে দিয়েও। একটু মৌখিক ভদ্রতা, একটু আন্তরিক সহানুভূতি যেখানে সংস্কারের হিমালয়ে ফাটল ধরিয়ে জ্ঞান ভাগীরথীর ধারা বইয়ে দিতে পারে জাতির জীবনে সেখানে শুষ্ক নিয়মের রুক্ষ প্রয়োগ কী নিদারুণ ভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এ কথা বোধ হয় তাঁরা ভেবে দেখেন না।

বস্তুত আমাদের দেশে পরিবার-পরিকল্পনা বা নিয়ন্ত্রণের সরকারী আয়োজনে সমারোহের অন্ত নাই, বাজেট আছে কোটি কোটি টাকা ; বর্ণোজ্জ্বল বিজ্ঞাপ্তির আছে বহুল প্রচার, ডাক্তারদের শিক্ষা দেবার আছে নিয়মিত ব্যবস্থা, ক্লিনিক খোলায় আছে তাগাদা। কিন্তু সমস্ত বিষয়টার মধ্যে আছে একটা নিয়মরক্ষার

প্রয়াস। আরো অনেক দেশ এমনি করে এমনি হয়েছে কাজেই আমাদেরও এমনি করতে হবে। ফলে এই নিয়ম সর্বস্বতার মধ্যে ফলের কথা থাকে নি, থেকেছে আয়োজনের কথা। কত টাকা বাজেট গেল, কত ডাক্তার এ বৎসর এ বিষয়ে শিক্ষিত হলো, কতো ক্লিনিক খোলা হল তার সংখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে সরকারী হিসাবে। তার সেই সঙ্গে আছে তাদের সংখ্যা যারা প্রাণের ত্যাগিদে গিয়েছে এই ক্লিনিকগুলোয়।

আলোচনার মাধ্যমে মহিলাদের পরিবার-পরিকল্পনার বিষয় সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে আছে, গ্রামাঞ্চলেও মহিলা সমিতির মাধ্যমে হয়েছে। কিন্তু সেখানে সন্তান সহ মহিলাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ—এমন কি দুগ্ধপায়ী শিশুদেরও চাড়পত্র দেওয়া হয় না। ফলে স্বভাবতই সেখানে যাঁদের সন্তান সম্ভাবনা আছে বা সন্তানবতী তাঁরা যেতে পারেন না। যান তাঁরাই যাঁরা সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারিয়েছেন অনেক দিন আগে অথবা শেষ সন্তান জন্মেছে অনেক দিন পূর্বে। কাজেই সে আলোচনায় নিয়মরক্ষাই হয়, অন্য কিছু হয় না।

অন্য দিকে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের শেষ কথা হলো বন্ধ্যাকরণ। ওষুধপত্র বা উপকরণের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ শেষ কথা তো নয়ই, বরং অনেক ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া এ দেশে দম্পতির জন্য পৃথক ঘর তো দূরের কথা, গোটা পরিবারের জন্যই অনেক সময় একখানির বেশী ঘরের চেয়ে বেশী বরাদ্দ থাকে না, সেখানে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধুমাত্র মেয়েরা বা ব্যবহার্য ওষুধ গ্রহণ ছাড়া উপকরণের সাহায্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অবাস্তব। অথচ শুধু ওষুধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ঐ ওষুধের উৎপাদকরাও পুরোপুরি নিঃসন্দেহ নন। ফলে ওষুধের কার্যকারিতা পুরোপুরি নির্ভর করে মেয়েদের সন্তান ধারণ ক্ষমতার তারতম্যের উপর।

আবার বন্ধ্যাকরণের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান সমস্যা আছে। প্রথমটি হলো আইন, দ্বিতীয় অর্থনৈতিক ও তৃতীয় মানসিক প্রতিক্রিয়া।

(১) পরিবার পরিকল্পনার আয়োজন হচ্ছে রাজকীয় কিন্তু সে সম্বন্ধীয় আইন সংশোধনের কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে হয় বেশী বয়স দেখিয়ে নয় তো স্বাস্থ্য খারাপ বলে, অন্যথায় বহু সন্তানের জননী হিসেবে অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই অসত্যের আশ্রয় নিয়ে যখন জনক বা জননীকে বন্ধ্যা করা হয় তখন ইতিমধ্যেই তারা বহু সন্তানের পিতা-মাতা।

(২) অর্থনৈতিক দিকটাও ভয়াবহ। ইচ্ছা থাকলে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অনেকের পক্ষে বন্ধ্যাকরণ সম্ভব হয় না। হাসপাতালগুলো এ ব্যাপারে প্রায় নীরব থাকে। কোথাও কোথাও নিখরচায় বন্ধ্যাকরণ হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানাভাবে যে অর্থ লাগে তাও কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে একটা পরিবারের গোটা মাসের আয় ব্যয়িত হয়। এ দিকটায় সরকার উদাসীন। ফলে নার্সিংহোম বা ব্যক্তিগত ক্লিনিকগুলোর পৌষ-পার্বণ হয় মধ্যবিত্তের সর্বনাশের মধ্য দিয়ে।

(৩) আজন্ম সংস্কারকে যুক্তির জোরে পিছু হটিয়ে বন্ধ্যাকরণ হয় তো সম্ভব হয় অনেকের ক্ষেত্রেই, কিন্তু শেষরক্ষা হয় খুব কম লোকেরই, অনেকের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাকরণের পর দেখা যায় মানসিক প্রতিক্রিয়া, দাম্পত্য-জীবন যার ফল হয় বিষময়। এটা রোধ করা যেতে পারে তখনই যখন শিশুকাল হতে শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই জাতীয় শিক্ষা মজ্জাগত হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশ সংস্কার হতে দৃঢ়মূল, অশিক্ষাও হতে দৃঢ়মূল। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' কথাটিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা নাই, বরঞ্চ 'জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে' কথাটায় নিজেদের কোন হাত নেই এ বিষয়ে সবই সেই বিধাতার হাতে—ফলে নিজেদের করণীয় কিছু থাকে থাকতে পারে না,—এগুলোই মজ্জাগত হয়ে আছে আমাদের মধ্যে।

বিশ্বের লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের কিছু কম লোক যেমন বাস করে ভারতে তেমনি বিশ্বের অশিক্ষিতের এক তৃতীয়াংশও বাস করে এখানে। ফলে সরকারী প্রচার ব্যবস্থার মধ্যে ফাঁক থেকে যায় অনেকখানিই। সে ফাঁক বন্ধ হতে পারে তখনই যখন এদের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে—অন্যথায় নয়।

অথচ বিংশ শতকের এই সপ্তদশকেও পাশ্চাত্য দেশে এমন বহুলোক আছে জন্মনিয়ন্ত্রণে যাদের বিশ্বাস নেই, এ ব্যাপারে আছে একটা 'পরোয়া নাই' ভাব অথবা 'ভগবান জানেন' বলে বিশ্বাস। তার প্রমাণ আছে সম্প্রতি প্রকাশিত কোন কোন সমীক্ষায়। ফলে সাধারণই আমাদের মত দম্পতির সন্তান-সংখ্যা কত হওয়া ভাল এ সম্বন্ধে দ্বিধার অন্ত নাই। আমাদের দেশে এই দ্বিধা আবার শুধু সন্তান সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয় কটা ছেলে বা কটি মেয়ে হলে ভাল হয় সেটার হিসাবেও এর মধ্যে ধরতে হবে। আর সে সংখ্যায় ছেলেদেরই প্রাধান্য হবে অনিবার্য কারণে। আগেকার দিনেও মানুষে এদেশে কোন পরিকল্পনা না করেও জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছে নানা উপায়ে। ফলে নানা উপায় হয়েছে উদ্ভাবিত ও দেশী বিদেশী গাছ-গাছড়া ব্যবহৃত হয়ে এসেছে নানা সময়। সে সব উপায় সম্বন্ধে সাধারণত লোকে শিক্ষা পেয়েছে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ হতেই বেশী, মেয়েরা শিক্ষা পেয়েছে বান্ধবীদের কাছে, মা-ঠাকুমার কাছে; চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না বললেই চলে। এখন অনেক প্রচার, অনেক ক্লিনিক, অনেক হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও সে ধারায় খুব বেশী একটা পরিবর্তন আসে নি। বরঞ্চ নিজে নিজে পাণ্ডিত্য দেখাবার ঝোঁক বেড়েছে। অশিক্ষার মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে এই জানার মাত্রার কোন যোগ না থাকাই স্বাভাবিক।

এই সব দিক থেকে বিবেচনা করলে যদিও মনে হতে পারে যে, পরিবার-পরিকল্পনা এদেশে বিশেষ করে গ্রাম ভারতে চালু হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। (কারণ শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা ও সুযোগ সুবিধার পরিমাণ বেশী বলে শহরে হয়ত ব্যাপ্তি লাভ করতে পারে সার্বজনীন ভাবে।) তবু মনে হয় প্রধান তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে হয় তো পরিবার-পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় জীবনে আসতে পারে আমূল পরিবর্তন।

প্রথম ব্যবস্থা হচ্ছে সাক্ষর নিরক্ষর সকল মানুষের মনের পরিবর্তন আনার উপযোগী মাধ্যম সৃষ্টি করা। যাতে করে সব সংস্কার যথাসম্ভব ত্যাগ করে মানুষের মন জন্মনিয়ন্ত্রণ অভিমুখী

হয়, এজন্য দরকার ছোট ছোট প্রচারফিল্ম তৈরী করে গ্রামে শহরে ঘুরে ঘুরে দেখান. বিষয়টি বয়স্ক শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে রাখা, ছাত্র পাঠ্য সমাজ শিক্ষার বইয়ে এই ধারণার সৃষ্টি যাতে হতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা, বিয়ের সময় বিশেষ করে রেজেষ্ট্রি বিয়ের সময় জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে শপথ গ্রহণ করা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ-বিধি শিক্ষা দান প্রসঙ্গে। হাসপাতালে, ক্লিনিকে বা অন্য নানা প্রতিষ্ঠানে যেখানে পরিবার-পরিকল্পনা প্রচারের ব্যবস্থা আছে সেখানে কোন বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে ব্যবস্থা দানের পরিবর্তে সারাদিন ধরে খোলা রাখার ও সুযোগ সুবিধামত যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আর যাঁরা উপদেশ বা শিক্ষা দেবেন তাদের আচরণ আরো সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কর্মীদের হতে হবে জনসেবক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সমাজ-উন্নয়ন সংস্থার কর্মীদের কথা, এরা প্রথম সরকারী কর্মচারী পরে সমাজ উন্নয়ন কর্মী। ফলে প্রথমেই সরকারী কর্মচারীর দাপট সহ্য করতে হয় জনসাধারণকে, পরে আসে জনসেবার কথা। এটা কোথাও বাঞ্ছনীয় নয়। পরিবার-পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীদের আসলে হতে হবে জনসেবক।

মহিলা কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে কেন্দ্রগুলিতে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের পক্ষে পুরুষ কর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা সঙ্গত মনে না হতেও পারে স্বাভাবিক কারণেই। আর পুরুষ কর্মী হোন বা মহিলা কর্মী হোন সবারই এ কথাটা মনে রাখা দরকার যে, একটু দরদ, একটু আন্তরিকতা, একটু সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষা দিলে যে শিক্ষা সাধারণের কাছে অমৃতের স্বাদ এনে দিতে পারে, তাই কারো কারো কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলে মনে হতে পারে, রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার পাওয়ার পর।

তৃতীয় বা শেষ ব্যবস্থা হলো—প্রয়োজনীয় ঔষুধ ও উপকরণ এবং বন্ধ্যাকরণের ব্যবস্থা সহজ ও সুলভ। সেব্য ঔষুধের দিকে বেশী নজর দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবহার্য ঔষুধ ও উপকরণের ব্যবহার অধিকাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে সহজসাধ্য না-ও হতে পারে এ কথাটা মনে রেখেই সেব্য ঔষুধের ব্যবস্থা করা দরকার। ঔষুধ ও উপকরণ যে বিনামূল্যে অনেক কেন্দ্রে পাওয়া যায় এ কথাটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই কেন্দ্রের নিকটতম প্রতিবেশীও জানে না। যারা জানে তারাও নির্ধারিত দিন ও সময়ে বার বার অল্প অল্প ঔষুধ ও উপকরণ আনার ঝামেলার জন্য ব্যবহার অনিয়মিত হয়ে ওঠে। সুযোগ, সুবিধা ও সময়মত ঔষুধ ও উপকরণ যাতে পাওয়া যায় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা দরকার। সেই সঙ্গে বন্ধ্যাকরণের ব্যবস্থা কোথায় কোথায় আছে এবং কি পরিমাণে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, ব্যয় কত ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য মাঝে মাঝে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বাঞ্ছনীয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র হতে ছুটি ও আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সরকারী হাসপাতালগুলিতে বিনামূল্যে বন্ধ্যাকরণের ব্যবস্থাও সর্বসাধারণের অনায়াস লভ্য হওয়া চাই।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে সরকার ও কর্মীরা সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সাধারণের সহযোগিতা যে মিলবে তা বলাই বাহুল্য। অন্যথায় আরো অনেক পরিকল্পনার মতই এটাও বাজেট ও পরিসংখ্যানের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। যেটুকু কাজ হবে সেটা হবে মানুষের নিজের প্রয়োজনেই।

দুটি বিলাতী কবিতা

প্রেমিকের পাঠ

(আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ ১৮৯২—)

জল পাথরের বুকে ভারী রূপো সেজে
বসে আছে।
বসে আছে ভারী রূপো হয়ে
পাথরের অস্বীকৃতি চেপে।
জল তো পড়ে না। শুধু ভরে, আর ভরে।
প্রতিটি ফাটল, প্রতি ফাঁক, প্রতি ত্রুটি পাথরের
পূর্ণ ক'রে দেয় জল।

নদী তো চলে না থেমে,
নদী তার রূপোলী সত্তাকে চেপে ধরে
নীচে পাথরের বুকে,—
পাথর জানায় অস্বীকৃতি।

যা দেখছ, ঝাঁপ দেয়, লাফ দেয় রোদের সোনায়,
সে তো নয় নদী, সে যে পাথরের নদী-অস্বীকার।।

অস্ত্র পরীক্ষা

(উইলফ্রেড ওয়েন ১৮৯৩-১৯১৮)

ছেলেটিকে দাও এই বেয়নেট-সঙ্গীন ফলক,
দেখুক, কেমন ঠাণ্ডা ইস্পাত তার পিচ্ছিল ঝলক,
কেমন খাপখোলা রক্ত-বুভুক্ষায়। নীল হিংসা ভরা
উন্মত্ত কি উচ্ছ্বাস! সূক্ষ্ম মাংস ক্ষুধা দিয়ে গড়া।
ছেলেটিকে ধার দাও বেয়নেট। সে দেখুক বুলেটে ঘা দিয়ে
অন্ধ, বোবা ঠাণ্ডা গুলি, ইচ্ছা যার ভাঁচ কলজে মারার চিবিয়ে,
কিংবা দাও, সূক্ষ্ম দন্ত দাঁতওয়ালা কার্ট্রিজ মালা,
দুঃখ আর মৃত্যুর ধার নিয়ে, যার ধার অন্তহীন-জ্বালা।
ছেলেটির দাঁত শুধু হাসে শুধু আপেল পাওয়ার আনন্দেই।
নিটোল আঙুলে তার নখরের কোন চিহ্ন নেই।
দয়াল ঈশ্বর তার দুই পায়ে দেন নাই ক্ষুর।
গভীর কুঞ্চিত কেশে জাগে নি তো শৃঙ্গের অঙ্কুর।।

অনুবাদ—অমিয় ভট্টাচার্য

জলবায়ু ও আবহাওয়ার প্রভাব

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায়, সপ্তাহের দিনে দিনে বায়ুমণ্ডলের নানা অবস্থার যে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে, তার সমষ্টিকে আবহাওয়া বা climate বলা যায়। বায়ুচাপ, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহের দিক ও মেঘের বা রৌদ্রের প্রাচুর্য বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। আবার বহুবৎসর ধরে এই সব পরিবর্তনের গড়পড়তা পরিমাপকে জলবায়ু বলা যায় (weather)।

বংশধারা এবং উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণের উপর যেমন স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে—আবহাওয়া জলবায়ুর উপরেও কতকটা সেইরকম করে। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ যেমন দরকার, খাদ্যকে আত্মীকরণও তেমনি দরকার। আবার শরীর থেকে তাপ কি পরিমাণে ও কি ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা অনেকাংশে নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। সুতরাং শক্তি উৎপাদনের হারও, অর্থাৎ মানুষের কার্যক্ষমতার মাত্রাও তার উপর নির্ভর করে।

যে আবহাওয়ায় শরীরের তাপ শীঘ্রই কমে যায় তাতে শরীরের বৃদ্ধিও দ্রুত ঘটে, প্রাপ্তযৌবন অবস্থা অল্পবয়সেই আসে এবং রোগ প্রতিরোধের শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। আবার শারীরিক ও মানসিক শক্তির স্ফূর্তিও সেখানে বেশী হয়। এককথায়, স্বাস্থ্য সেখানে সক্রিয় অবস্থায় থাকে। অন্যপক্ষে শরীর থেকে যে অবস্থায় তাপ সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না সেখানে ঠিক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এইজন্য গরম দেশে লোক বেশী শ্রমশীল হয় না। সেখানে শরীরের কাজগুলি একটু মন্থরতালে চলে এবং চাপ ও পীড়ন (stress & strain) কম হয়। শীতপ্রধান দেশে শীতের সঙ্গে লড়াই করতে হয় বলে শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি বেশী হয় ও তাকে পূরণ করার জন্য শরীর মনের উপর বেশী তাগিদ পড়ে

স্থানীয় তাপমাত্রা যেমন শরীরের ক্রিয়াশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে, বায়ুমণ্ডলের ঝড়ঝাপটাও অন্যভাবে তাকে প্রভাবিত করে। কারণ, ঝড়ের সময় বায়ুর তাপ, চাপ ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ (humidity) হঠাৎ বদলে যায়। এর ফলে শরীরের তন্ত্রগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ার তাল ব্যাঘাত পায়, যদিও কি কি ভাবে তা ঘটে, তা সঠিক বলা যায় না। তবে এর সঙ্গে নানারকম সংক্রামক রোগের আক্রমণের কিছু সম্পর্ক আছে। অবশ্য সকল মানুষ এই পরিবর্তনে সমান ভাবে প্রভাবিত হয় না। কারুর কারুর পক্ষে এরকম ঝোড়ো আবহাওয়ায় বাস করা প্রায় অসম্ভব হয়। বাসের জন্য তাদের অন্য জায়গায় সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

মানুষের তৈরী ডিজেল বা পেট্রোল এঞ্জিন তাতে ব্যবহৃত দাহ্য থেকে যতটা শক্তি পাওয়া সম্ভব, তার শতকরা ৩৭ ভাগ ও ২৫ ভাগ যন্ত্রশক্তি উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারে। মানুষ গৃহীত খাদ্যের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র এইভাবে অঙ্গচালনায় ও অন্যভাবে কাজে লাগায়। বাইরের তাপমাত্রার উপর এঞ্জিনের কার্যকারিতা বেশী নির্ভর করে না, কিন্তু মানুষের বেলা তা খুবই করে। এই অসুবিধার জন্য প্রাণীশরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার জন্য কতকটা জটিল কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে। প্রধানত vasomot বা স্নায়ুগুলির সাহায্যে চর্মে রক্ত সরবরাহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এই কাজ করা হয়। রক্তের তাপসঞ্চালন শক্তি যেমন বেশী, তার সঞ্চালনের বেগও তেমনি বেশী; সুতরাং আভ্যন্তরিক তাপ সহজেই শরীরের চর্মে পৌঁছায় এবং বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে অনেকাংশে কমে যায়। আবশ্যক হলে চর্মে রক্তপ্রবাহের বেগ স্বাভাবিকের চেয়ে ৩০ গুণ বাড়তে পারে। এতেও তাপ যথেষ্ট না কমলে, ঘর্মগ্রন্থিগুলি ঘর্মনিঃসারণ করে তার বাষ্পীভবনের ফলে তাপ কমাতে সাহায্য করে।

এই নিয়ন্ত্রণক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে পারে; যেমন পরিশ্রমের ফলে তাপ উৎপাদন বেড়ে গেলে, কিংবা হঠাৎ খুব গরম জায়গায় আসলে। আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা জায়গায় গেলে শরীরের তাপ উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে গিয়ে তাপের সমতা বজায় রাখে। বাইরের তাপাধিক্য ১০ দিনের বেশী স্থায়ী হলে তাপ উৎপাদনের হার কমে যায় এবং ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ হয়; এমন কি মৃত্যুও হতে পারে (heat-stroke death)।

শরীরের নানা সঞ্চালন ও গতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ এবং রোগ-প্রতিরোধের জন্য যে সব রাসায়নিক ক্রিয়ার দরকার হয়, খাদ্যের বিশ্লেষণে তা আমরা পাই। সেই সব ক্রিয়াগুলির সাহায্যে তাপের উৎপাদন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গ্রীষ্মকালে বাইরের তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব ক্রিয়ার উগ্রতাও কমে এবং খাদ্য ও অক্সিজেনের চাহিদা কমে যায়।

গরম আবহাওয়ায় প্রাণীশরীরের বৃদ্ধিও কম হারে চলে। খাদ্যের চাহিদা ৯১° ডিগ্রি তাপমাত্রায় যা হয়, ৬৫° ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রায় তার দ্বিগুণ হয়। গৃহপালিত পশু এজন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বা গ্রীষ্মকালে তেমন বাড়ে না। তাদের মাংসের স্বাদও অনেক খারাপ হয়। শীতপ্রধান দেশে ও শীতকালে এর বিপরীত হয়। মানুষের মধ্যেও এই তারতম্য সহজেই ধরা পড়ে।

শরীরের তাপ কমার হারের উপর আবার যৌন-আচরণ এবং সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতাও নির্ভর করে। ৬৫° ডিগ্রি তাপমাত্রায় এই ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী হয়। ৯০° ডিগ্রি তাপমাত্রায় শরীরের বৃদ্ধিহার যেমন কমে তেমনি উৎপাদিক-শক্তিও কতকটা কমে। এ-অবস্থায় সন্তান বা বাচ্চাগুলি অপেক্ষাকৃত শীর্ণ হয় ও সংখ্যায় কম হয়। যৌনগ্রন্থিগুলির ক্রিয়াও এই সঙ্গে কম হতে দেখা যায়। ১০-১৪ দিন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত আর্দ্র তাপ লাগাবার পর অনেক প্রাণীর শুক্রকোষে শুক্র উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কমে যায়। মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে, ঠাণ্ডা থেকে গরম দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে প্রথম ঋতুস্রাব সুরু হয়। এ সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। আবার বাইরের তাপমাত্রা ৬৫°

ডিগ্রি, মেয়েদের সন্তান-উৎপাদনের শক্তি সবচেয়ে বেশী থাকে। ৭০° ডিগ্রির উপরে বা ৪০° ডিগ্রির নিচে বাস করলে এই শক্তি অনেকটা কমে যায়। অবশ্য উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হ'লে বা ছেলেবেলায় রোগে ভুগলে, এই শক্তি অন্য কারণে কমে।

রোগপ্রবণতার দিক থেকেও দেখা যায় যে, ঠাণ্ডা আবহাওয়া এই প্রবণতা কমায় আর গরম-ভিজা আবহাওয়ায় একে বাড়ায়। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব বা অল্পতা, ভাইটামিনের অভাব এবং শারীরিক ক্লান্তি বা অবসাদই শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তিও কমিয়ে দেয়। একথা আংশিকভাবে সত্য। তবে মনে রাখতে হবে যে, সংক্রামক রোগ গরম-ভিজা আবহাওয়াতেই মানুষকে বেশী কাবু করে। শীতপ্রধান দেশের লোক সাধারণত জরা ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক ক্ষয়জনিত রোগেই বেশী মরে।

পরীক্ষার ফলেও দেখা গেছে যে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় লোকের রোগ ভোগ কম হয়। নিউমোকক্কাস জীবাণু সমান পরিমাণে সংক্রমণের পরে দেখা যায় যে, যেসব ইঁদুরকে ৯০° ডিগ্রি তাপে রাখা হয়, তাদের অধিকাংশই মারা যায়, আর যাদের ৬৫° ডিগ্রি তাপে রাখা হয় তারা রোগকে অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুর সংক্রমণেও দেখা যায় যে, উচ্চতাপে বাসকারী ইঁদুরের মৃত্যুর হার নিম্নতাপে বাসকারীদের তুলনায় চার গুণ বেশী। টাইফয়েড ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে ঠাণ্ডা অবস্থায় শরীরে রোগ প্রতিরোধক এন্টিবডির পরিমাণ গরম অবস্থার প্রায় দ্বিগুণ বেশী হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও এইরকম তফাৎ অনেক সময় দেখা গেছে। নাতিশীতোষ্ণ দেশে বাসকারীরা গরমকালেই শ্বাসযন্ত্রের রোগ শীতকালের তুলনায় বেশী ভোগে। শীতকালে ঠাণ্ডা লাগার' ফলে রোগ বেশী হয় না। এমন কি এপেণ্ডিসাইটিস রোগেও গ্রীষ্মকালে মৃত্যুহার শীতকালের তুলনায় দ্বিগুণ বেশী হয়। যক্ষ্মারোগও গ্রীষ্ম সুরু হলে তাকে সারানো কঠিন হয়।

কাউগিলের নানা পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে খাদ্যে শ্বেতসার ও চিনির পরিমাণ যত বেশী থাকে, থায়ামিন ভাইটামিনের (Vitamin B) চাহিদা ততই বেশী হয়। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, ৯১° ডিগ্রি তাপে বাস করলে থায়ামিনের চাহিদা ৬৫° ডিগ্রি তাপের তুলনায় দ্বিগুণ হয়। অর্থাৎ ঠাণ্ডায় বাস করলে থায়ামিন, ইনোসিটল, প্যারা এমিনো বেঞ্জোয়িক এসিড, চোলিন ও বায়োটিন ভাইটামিনের অভাব ততটা বোধ হয় না। কাঁচা আটা, ময়দা ও চালে যে 'বি' ভাইটামিন থাকে, তার কতক অংশ এগুলি তৈরীর সময়, আর কতক অংশ এগুলি পাক করার সময় নষ্ট হয়। একজন্য গরম দেশের লোকে এর অভাবে বেরিবেরি এবং পেলাগ্রা রোগে ভোগে। ঠাণ্ডা দেশের লোক মাংস বেশী খায় ও তা থেকে আবশ্যক মত ভাইটামিন সংগ্রহ করে।

জলবায়ু ও রোগপ্রবণতা:—মিলস্-এর মতে দু'একটি ছাড়া অধিকাংশ রোগই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বেশী ঘটে বা বেশী প্রবল হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ডায়াবিটিস রোগের ঘটনাস্থান সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ বা উষ্ণদক্ষিণ অঞ্চলবাসী নিগ্রোরা এই রোগে ভুগলেও তারা অপেক্ষাকৃত শীত-অঞ্চলে গেলে এই রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তাদের মৃত্যুর হারও প্রায় ১০ গুণ বাড়ে।

ধমনীর কাঠিন্য (arterio-scleresis) রোগও উত্তরাঞ্চলবাসীদের মধ্যে বেশী প্রবল হয়। গলগণ্ড রোগ এবং পার্নিশাস এনিমিয়া রোগেও তারাই দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের চেয়ে বেশী ভোগে।

ইউরোপেও শীতপ্রধান মধ্যাঞ্চলবাসীদের মধ্যে ডায়াবিটিসে মৃত্যুর হার বেশী হয়। দক্ষিণ আমেরিকায়, ঠাণ্ডা আর্জেণ্টিনা ও চিলি প্রদেশে এই রোগের প্রকোপ বেশী হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, ডায়াবিটিস রোগীদের শীতপ্রধান দেশে বাস করা স্বাস্থ্যের হানিকর। পার্নিশাস এনিমিয়া, থাইরয়েড গ্রন্থিপ্রদাহ এবং এডিসন রোগও ঠাণ্ডা জলবায়ুতে প্রায় দ্বিগুণ প্রবল হয়। হৃদযন্ত্রের অপটুতা ও কোন কোন বাতরোগ শীতপ্রধান অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়।

ধমনীর কাঠিন্য সাধারণত বৃদ্ধ বয়সের রোগ। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশে এর প্রকোপ অল্পবয়স্কদের মধ্যেও দেখা যায়। চর্মের ও মুখের ক্যান্সার ছাড়া অন্য অধিকাংশ স্থানের ক্যান্সার রোগও নাতিশীতোষ্ণ বা ঠাণ্ডা জলবায়ুতেই বেশী দেখা যায়। ডায়াবিটিসের মতই এর distribution। যেসব ইঁদুর সহজেই ক্যান্সারপ্রবণ তারাও গরম জলবায়ুতে থাকলে এই রোগে কম ভোগে এবং ভুগলেও ঠাণ্ডা-দেশবাসীদের তুলনায় তাদের রোগ ধীরে ধীরে বাড়ে। লিউকিমিয়া রোগও ঠাণ্ডা দেশে বেশী দেখা যায়।

সংক্রামক রোগগুলির বেলায় কিন্তু অন্য ব্যাপার। তাদের ক্ষেত্রে উষ্ণপ্রধান দেশেই এই সব রোগের প্রকোপ বেশী হয়। ঠাণ্ডা দেশের তুলনায় গরম দেশেই এদের প্রকোপ বেশী। আবার ঝড় বা বায়ুগুলের চাপের অসাম্যও এই সব রোগের প্রবলতা বাড়ায়। শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং বাত রোগের উপর জোরালো হাওয়ার প্রভাব বেশী দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে এই অবস্থা শীতকালেই হয়। আবার শীতকালেই এই সব রোগের উৎপাত বাড়ে। উষ্ণপ্রধান দেশে ঠিক এর বিপরীত ঘটে। যেখানে ঝড় বা ঘূর্ণিবায়ু প্রবল, যেমন ফিলিপাইন, জাপানের পূর্ব-উপকূল, বঙ্গোপসাগরের উপকূল, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলি, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল,—সেসব জায়গায় লোকে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রামক রোগে বেশী কষ্ট পায়।

বাইরের জলবায়ুর সঙ্গে শরীরের তাপনিয়ন্ত্রণ শক্তির ও রোগ প্রবণতার এই নিবিড় সম্পর্ক রোগ চিকিৎসায় কাজে লাগান হয়েছে। ধমনী-কাঠিন্য, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদপিণ্ডের অপটুতা রোগীরা কিছুদিন গরম জায়গায় গেলে ভাল থাকে ও রোগলক্ষণগুলি শতকরা ৩০—৪০ ভাগ কমে যায়।

ঠাণ্ডা জলবায়ুতে সাধারণ মানুষের দুই রকম অসুবিধা হয়। শীতবোধ কমাবার জন্য তাকে শারীরিক পরিশ্রম বেশী করতে হয়। গরম জলবায়ুতে কাজের তুলনায় এই অবস্থায় তার শক্তিক্ষয় বেশী পরিমাণে হয়। আবার শক্তিক্ষয় যত বাড়ে, শরীরের পটুতা (efficiency) ততই কমে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে শীতকালে গ্রীষ্মকালের তুলনায় শক্তির বেশী ব্যয় হয়। তাপ এবং কর্মশক্তি উৎপাদনের জন্য শীতকালেই শরীরের উপর বেশী stress পড়ে। সুতরাং এসব রোগীদের অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় গিয়ে বাস করাই নিরাপদ।

নানারকম স্নায়ুরোগ ও মানসিক রোগেও বঞ্ঝাহীন ঈষদুষ্ণ স্থানে বাস করা হিতকর। কারণ তাতে স্নায়বিক উত্তেজনা কম

আশু চট্টোপাধ্যায়

আর একটা মাত্র চিঠি লেখা বাকী। রণধীর উঠে বারকয়েক পায়চারি করে নিল। অর্ধরাত্রি অনেকক্ষণ অতীত হয়ে গেছে, তবু শীতের সকাল সহজে আসবে না। এই যা রক্ষা, হাতে সময় রয়েছে যথেষ্ট; আর যতক্ষণ পৃথিবীর হাওয়া বুকের মধ্যে টেনে নেওয়া যায়, যদিও সে-হাওয়ায় সমস্ত সত্তা শিরশির করে ওঠে, রণধীরের পক্ষে সে-হাওয়ায় আর বিন্দুমাত্র জীবনী শক্তি নেই।

তবু রণধীর আর একবার খোলা জানলাটার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের আকাশ কালো তাতে একটুকু রঙ নেই। হয়ত ফিকে কুয়াশার সামান্যতম রহস্য থাকলেও সে তার মধ্যে প্রাণান্তকর একঘেয়েমির ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণের সন্ধান পেত। কিন্তু আজ পৃথিবী তার কাছে অত্যন্ত চেনা। নগ্ন বাস্তবতার রূঢ় রূপ সে দেখেছে। আর কিসের আকর্ষণ বাকী রইল।

সুতরাং সে চলে যাবে, এই নির্দয় উদাসীন পৃথিবী ছেড়ে রণধীর নিরুদ্দেশ অসীমের পথে পাড়ি দেবে আজ রাত্রেই। এ যাবৎ সে নিজের নামের অমর্যাদা করে নি, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট বীর ভাবে যুদ্ধ করে এসেছে। সে যে আয়েসী শ্রমবিমুখ একথা তার অতিবড় শত্রুও বলতে পারবে না। কিন্তু এই ঈর্ষাকাতর স্বার্থপর জগতে সাপেক্ষা চেষ্টা করলেও কিছুমাত্র সাফল্য পাওয়া যায় না পাওয়া যায় কেবল কৌতুক-মিশ্রিত অবজ্ঞা, তার দুর্দশাতে সকলে তৃপ্তি লাভ করে।

কাজেই এই অদ্ভুত পরিবেশ ছেড়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ভাবনা শুধু স্ত্রী-পুত্রের জন্য। এই মৃত্যু-সংবাদ যখন তাদের কাছে পৌঁছুবে তখন কি কঠিন আঘাত তারা পাবে! আর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু এ-যাবৎ দুঃখ ছাড়া রণধীর ত' তাদের আর কিছু দিতে পারে নি। আজ যদি রোগ ভোগের পরই সে মারা যেত তা'হলেই বা তারা কি করত! শেষ সময়ে দেখা হত এই যা। শোকোচ্ছ্বাসের পর তাদের ভার পড়ত এবং এবার পড়বেও ভাগ্যের হাতে। যদি তাদের অদৃষ্টে ভিক্ষাবৃত্তিই থাকে, কে তাদের তা থেকে পরিত্রাণ করবে।

রণধীর অস্থির হয়ে আবার বার কতক ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। ওইটুকু ঘরের মধ্যে এত হেঁটে তার পায়ে ব্যথা হয়েছে, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। সারাদিন, বলতে গেলে, সে কিছুই খায় নি। যে-কটা পয়সা বাকী ছিল তা দিয়ে বিষ কিনে এনেছে এবং তার পূর্বে কেনবার অনুমতিটুকু পাবার জন্য কম পরিশ্রম ও হাঙ্গামা সহ্য করতে হয় নি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যে সংগ্রহ করা হয়েছে এই যথেষ্ট? আগামী কাল বেঁচে থাকবার মত তার আর সঙ্গতি নেই। চিঠি লেখবার জন্য কয়েকটা কাগজও কিনে আনতে পেরেছে। সন্ধ্যার পর থেকেই দরজায় খিল লাগিয়ে সুরু করেছে মাঝে মাঝে চিঠি লেখা আর মাঝে মাঝে পায়চারি।

দু'একজন বন্ধুকে লেখা হয়ে গেছে। তারাই অসময়ে সাহায্য করেছিল। কিন্তু কত সাহায্য তারা করবে, সহৃদয়তা দেখাবারও ত' একটা সীমা আছে। কোনো আত্মীয়কেই সে চিঠি লিখবে না। রণধীরের মৃত্যুর পর তারা বাইরে শোক প্রকাশ করে মনে-মনে যত খুসী হাসুক।

বাকী আছে শুধু স্ত্রীকে চিঠি লেখা। সেইটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ক্লান্তিতে আর অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছে। ভাবল বিছানায় শরীরটা একবার এলিয়ে দেয়। কিন্তু সাহস হল না। শরীরের যা অবস্থা তাতে একবার শুলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর না হবে বাকী চিঠিটা লেখা, না হবে তার অতি প্রয়োজনীয় সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করা। সকালের আগে সে ঘুম ভাঙবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন আর চিরনিদ্রার অবসর থাকবে না।

চিরনিদ্রা কথাটা মনে হতেই সে একটা অপরিসীম তৃপ্তি পেল। আর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থাকবে না সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্যর্থ চেষ্টার বোঝা নিয়ে অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত অবস্থায় ধূলিধূসর পথে অবিরাম ঘোরা-ফেরার অবসান হবে। মৃত অবস্থার অনুভূতি টের পাওয়া সম্ভব নয়, তবু রণধীরের মনে হতে লাগল চিতার উপর হাত-পা ছড়িয়ে শোয়ার মত আরাম বুঝি আর কিছু নেই। আগুনের লেলিহান জিহ্বা এই রুক্ষ পৃথিবীর অংশ তার অপদার্থ দেহটাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে এই চিন্তাতেও যেন সে শান্তি পেল। কল্পিত চিতাগ্নির রক্ত-আভা তার মনে হয় ত' কিছুক্ষণের জন্য রঙ ধরাল। তাই সে বিছানায় বসে পড়ে এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরাল। দু'টো কমদামী সিগারেট সে কিনে এনেছিল।

পা-দু'টো সামনে প্রসারিত করে দিয়ে ভাবতে লাগল প্রথম যৌবনে সে কত উচ্চাশাই পোষণ করেছিল! আর বিয়ের সময় দেখেছিল রঙিন স্বপ্ন। সবই ব্যর্থ হয়েছে। পুরুষের ভাগ্যের কথা না কি দেবতারাই বলতে পারেন না। দুর্ভাগ্য বাঙলা দেশে সে

হয়। সঙ্গে সঙ্গে এলকোহল, চা, কফি, তামাকের ব্যবহার কমালে সুফল আরও বেশী হয়।

ব্রঙ্কাইটিস, সাইনাস-প্রদাহ এবং শীত-কাতরতাও এই ভাবে নিবারণ বা নিরাময় করা যায়। শুধু ভ্যাকসিন, ভাইটামিন বা খাদ্যের সাহায্যে এই সব রোগে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। স্থানত্যাগ সম্ভব না হলে উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদের সাহায্যে ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া থেকে শরীরকে, বিশেষত হাত-পা'কে, রক্ষা করতে হয়।

গরম ভিজা জলবায়ুতে বাসকালে যদি যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত হয়, তবে রোগীকে সেখানে বেশীদিন রাখা ভাল নয়। আবার কোন ঝোড়ো আবহাওয়ায় সরানও তার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। শুকনো অথচ ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝাহীন আবহাওয়ায় বাসই তার পক্ষে ভাল। তবে প্রথম বৎসরের শীতকালে তাকে 'ঠাণ্ডা লাগা' থেকে রক্ষা করাও খুব দরকার।

বাতরোগেও ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া এড়িয়ে চলা খুবই দরকার। নাতিশীতোষ্ণ ও ঝঞ্ঝাহীন আবহাওয়াই এই সব রোগীর পক্ষে ভাল।

জন্মেছে, তাই অর্থোপার্জনের সব দরজাই তার সামনে বন্ধ। আর যে যুগ পড়েছে তাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ না হলে কিছুতেই বেঁচে থাকা যায় না, সংসারের ভার নেওয়া ত' দূরের কথা। তাই যে প্রিয়লোকগুলিকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকা যায় না, তাদের শেষ পর্যন্ত দূর পল্লীগ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে সে এক বন্ধুর বাড়ির এই অব্যবহৃত অন্ধকার ছোট ঘরটি চেয়ে নিয়েছিল এবং যা-হোক কিছু খেয়ে অবিরাম হেঁটে ঘুরে বেড়াত—লক্ষ্মীর করুণাকটাক্ষ লাভের চেষ্টায়।

কিন্তু সাফল্যের একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মিও তার জীবনের দিগন্তে এসে ধরা দিল না। অনেক সময় সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছে বাঙালী ভদ্রসন্তানেরা মুটেদেরও অধম। যাদের মগজকে বাহন করে ভারতবর্ষ চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্বজয় করেছে তাদের এইবার রিক্সাওয়ালা, মুটে, আলুওয়ালা হয়ে যাওয়াই ভাল। এইসব কাজের শিক্ষা আর যোগাযোগও যদি তার থাকত তাহলে বোধ হয় আজ এমন করে স্ত্রী-পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হত না।

এখন সে চিন্তায় লাভ নেই। রিক্সা টানতে বা মোট বইতে সে পারবে না। আলুর ব্যবসা করতে হলেও মূলধন চাই এবং যদিও কোনো বন্ধু মুনাফার মোটা অংশে ভাগ বসিয়ে টাকা দিতে রাজি হয়, অভিজ্ঞতার অভাবে সমস্ত টাকাটাই লোকসানের খাতায় যাবে। তার চেয়ে স্ত্রীকে চিঠিটি লিখে ফেলে তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে সরে পড়াই ভাল, সাহসের অভাবে আবার হয়ত সংকল্পের পরিবর্তন হতে পারে। সিগারেটের ধোঁয়ায় স্নায়ুগুলি যেন সতেজ হয়ে উঠেছে।

সিগারেটের শেষ অংশটুকু মাটিতে চেপে নিবিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বন্ধুর বাড়িটাতে শেষসময়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কোনো লাভ নেই। তারপর সে কাগজ পেনসিল নিয়ে বসল। কিন্তু কি বা লিখবে! সত্য কথা লিখতে হলে লিখতে হয়, তোমাদের ভার নেওয়া আমার কর্তব্য; কিন্তু অপদার্থ আমি অপারগ হয়ে ভীরুর মত পালাচ্ছি। আনুষঙ্গিক অন্যান্য কথা চিনির প্রলেপ। মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে ন্যাকামী মানায় না।

পাশের বাড়িতে সশব্দে তিনটে বাজল। চারটের মধ্যে তাকে সব শেষ করে ফেলতে হবে। তারপরেই শেষরাত্রির উচ্ছৃঙ্খল বাতাস ভোরের আগমন ঘোষণা করতে থাকবে। রক্তে এমন হয়ত উদ্দীপনা

আসবে যে মৃত্যুচিন্তা সম্ভব হবে না। সে জন্য এমন বিষ এনেছে তাতে মৃত্যু হবে যন্ত্রণাহীন। বিছানায় বসে অসীম সাহস ভর করে মুখে ফেলে দিলেই সে শুয়ে পড়বে। তারপরেই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান, পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কের শেষ। সে দ্রুত হাতে চালিয়ে চিঠিটা শেষ করতে লাগল।

চিঠিটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘই হয়ে গেল, ক্লান্ত হাতও আবেগে বল্গাহীন হয়ে ছুটে চলল। অনেক রকমে যার সঙ্গে কথা শেষ হয় না, তার সঙ্গে এই শেষ কথা বলা। পেটের এবং মনের দুই ক্ষুধা নিয়েই আজ সে পৃথিবী থেকে চলল। অন্য ইচ্ছা করলেই সে থাকতে পারে হয়ত আগামী কালকের দিনটি গত কালের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে অনেক অংশে বেশী উজ্জ্বল হতে পারে। চলবার একটা পথের সন্ধান সহসা মিলে যাওয়াও বিচিত্র নয়, তখন প্রেমসমাগমে মনোভূমি সরস শ্যামল হয়ে উঠতে পারে; তবু সংকল্প স্থির করল সে চলে যাবে, আগামী কালের সত্য ব্যর্থ স্বপ্ন ইতিপূর্বে সে অনেকবার দেখেছে ভাগ্যের হাতে খেলনা হয়ে থাকতে আর সে রাজী নয়।

চিঠিগুলিকে পাশাপাশি ভাল করে সে সাজিয়ে রাখল। তারপর সেগুলির পাশে বিষের শিশিটি রেখে নিশ্চিন্ত মনে একগ্লাস জল খেয়ে বাকী সিগারেটটি ধরিয়ে নিয়ে আর একবার পায়চারি শুরু করল। পৃথিবীর জলবায়ুর সঙ্গে এই তার শেষ সম্পর্ক, পৃথিবীর বুকে এই তার শেষ পরিভ্রমণ। সে পূর্ণ আগ্রহের সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া গিলতে লাগল। ভগবান তথাগতের কথাই যেন সত্য হয়, তার সত্তার এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়ে যায়, তার ক্লান্ত পথ চলার উপর পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। শেষবারের মত সে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল এবং শূন্যমনে জনবিরল রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দ্রুতপায়ে গিয়ে বিছানায় বসল এবং ক্ষিপ্রহাতে শিশিটা তুলে নিয়ে তার ভিতরের তরল পদার্থটুকু মুখে ঢেলে দিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আলোটা ইচ্ছা করেই নিভিয়ে দেয় নি, যাবার আগে পৃথিবীকে শেষবারের মত দেখে নেবার জন্য। মনে হল ধীরে ধীরে আলোটা স্তিমিত হয়ে আসছে। তারপর চারপাশ ঝাপসা মনে হতে লাগল। একবার সে উঠে বসবার শেষ চেষ্টা করল, কনুয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঠলও। তারপর বালিশের উপর ঢলে পড়ল।

কতক্ষণ পরে তা বোঝা শক্ত, তার মনে হল তার চারপাশে অনেকে যেন কথাবার্তা বলছে? মৃত্যুর পর আত্মা জীবিতদের কথা শুনতে পায় একথা সে শুনেছিল।

তার বন্ধু যেন বলছে, 'তাহলে ডাক্তারবাবু, কি মনে করছেন?'

এক অপরিচিত কণ্ঠ বলছে, 'বিষের কোনো ক্রিয়াই হয় নি, বেশ সুস্থই আছেন দেখছি।'

বন্ধু বলল, 'কিন্তু চিঠিগুলো রয়েছে, বিষের একটা শূন্য শিশিও পাশে পড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, অথচ···'

ডাক্তার তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'একেই বলে শাপে বর, মশায়রা। আজকাল ওষুধের বাজারে প্রায় সবই জাল হচ্ছে। বুঝতে পারছি, ভদ্রলোক জাল বিষ কিনেছিলেন।'

রণধীরের আর চোখ খোলবার প্রবৃত্তি হল না। সে মনে মনে বলল, ধরণী দ্বিধা হও!

কালপুরুষ

'মহারাণী কটন মিলসের' ডাক্তার অরিন্দম মুখার্জী। লম্বা চওড়া চেহারা, চোখে চশমা, মাথায় টাক। মুখে সিগারেট সব সময় আছেই। বস্তুত বাইরে তাঁকে মুখে সিগারেটহীন হিসাবে কল্পনাই করা যায় না। অরিন্দম বিবাহিত কি অবিবাহিত, তা মিলের লোক আজ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। তাঁকে শুধালে তিনি শুধু হাসেন আর বলেন ধরে নিন না যা মনে হয়। আর নাই যদি হয়ে থাকে, তবে কি আবার বিয়ের বয়স আছে?

উত্তর আসে অপর পক্ষ থেকে: রেখে দিন মশাই। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব আছে না কি? বলুন, তা হলে আজ থেকেই লেগে যাই।

গম্ভীর হয়ে আসে অরিন্দমের মুখমণ্ডল। খানিক পরে তিনি বলেন—আচ্ছা পরে বলব। এই 'পরে বলা' তাঁর আর কোনদিন শেষ হয় নি। শেষ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবের দল অনুরোধ করাই ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা লক্ষ্য করে দেখত, মাঝে মাঝে দু'তিন দিন ডাক্তার যেন কোথায় চলে যান, আবার একা একা ফিরে আসেন। আর একটা আশ্চর্যের কথা, ডাক্তারী প্রচারপত্র, পুস্তিকা প্রভৃতি ছাড়া তাকে কোন চিঠিপত্র ডাক্তারের নামে আসে না। কাজেই বন্ধুদের দলে নানারকম জল্পনা-কল্পনার ঢেউ ওঠে এবং ধীরে ধীরে তা অনন্তে মিলিয়েও যায়।

লছমী ওখানকারই এক কুলি রমণীর মেয়ে। ডাক্তারের বাড়ীতে কাজ করতে এসেছিল তখন প্রায় বছর দশেক বয়স। ছোট মেয়েটা ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াত ডাক্তারের পায়ে পায়ে; আর স্বপ্নের মায়াস্পর্শ বুলিয়ে দিত ডাক্তারের চোখে। ডাক্তার তাকে মেয়ের মতই স্নেহ করতেন; তার জন্যে শাড়ী, ব্লাউজ, জুতো এমন কি পাউডার-স্নো পর্যন্ত এনে দিতেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সেজন্যে শুধু যে ডাক্তারকেই বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হত তাই নয়, লছমীর মা-বাবাকেও ওদের সমাজে কম বক্রোক্তি হজম করতে হত না। শাড়ী, সায়া, জুতোর বাহার ঈর্ষার উদ্রেক করত তাদের অনেকের মনে। হরিমতীর মা তো একদিন লছমীর মাকে মুখের ওপর স্পষ্টই বলে ফেলল—তোমার মেয়ে তাই ভাগ্যবতী, তাই অমন ঘরে পড়েছে। ওর আর ভাবনা কি? আর আমার হরিমতীর দেখ দিকি!

হরিমতীর বিয়ে হয়েছিল বেশ ছোটতেই। ছেলেও ছিল অল্পবয়সের। তখন বোঝা যায় নি, পরে যত বয়স বাড়তে লাগল জামাইয়ের গুণপনা প্রকাশ পেতে লাগল। মাতাল হয়ে এসে [illegible] কোন দিন হরিমতী[illegible] এমন মারত, পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যেত। কিন্তু তারা দু' চোখ ভরে নি-খরচায় পরের ওপর দয়ে একটু আমোদ উপভোগ ছাড়া আর কিছুই করত না। পুরুষের দল বলত—মেয়েমানুষকে আলগা দিলে চলে না ভাই। এখনকার দিনকাল ভাল না। মাঝে মাঝে অমন একটু-আধটু দরকার—না কি বলো—প্রশ্নকর্তা সমর্থন চাইত উপস্থিত সকলের কাছ থেকে। তা আর বলতে—সমর্থনে ভেসে আসত মিলিত কণ্ঠস্বর। মেয়েরা যারা আসত, তারাও বলত হরিমতীরই বিরুদ্ধে। বলত—মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছ, স্বামীর হাতে মার খেয়েছ, তাই বলে চীৎকার করে পাড়া মাথায় করবে! এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড তো বাপের জন্মে দেখি নি।

ছোটবেলায় সম্ভব হয় নি যা, বড় হয়ে তা হয়েছিল। হরিমতী এখন আর নির্বিবাদে মার সহ্য করত না; অসহ্য হলে পালিয়ে আসত এখানে—মায়ের কাছে। মা এবং বাবা দু'জনে অবশ্য

এখানে থাকতে বলত। এমন কি বলত, আবার ওর বিয়ে দেবে। কিন্তু দু' তিন দিন পরেই হরিমতীর স্বামী এসে শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেই ওরা দু'জনে সব ভুলে যেতো এবং হরিমতীকে ফিরে যেতে বলত।

সেদিনও হরিমতী এমনি পালিয়ে এসেছে। লছমী-ও বেশ সেজে-গুজে গিয়েছে ওর মায়ের কাছে। এমন সময় হরিমতীর মা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলো লছমীদের ঘরে। হরিমতীর কপালে তখনও মারের দাগ মিলিয়ে যায় নি।

হরিমতীর মা লছমীর শাড়ীখানার আঁচলটা হাতে তুলে নিয়ে বললো—বাঃ! কাপড়খানা তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে।

হরিমতী পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে লছমীর সাজ-সজ্জা আর ভাবছে অনতিদূর অতীতের দিনগুলোর কথা—যখন দু'জনে একসঙ্গে খেলা করেছে, মিল-এরিয়ার মধ্যে। তাকে রতন ছোঁড়াটা ঐ রকম একখানা কাপড় দিতে চেয়েছিল বলে মায়ের সে কি বকুনি। তবু তো সে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা নাকি ওদের চেয়ে জাতে ছোট, তাই তার মা রাজী হয়নি; কিন্তু বাবার অমত ছিল না। হরিমতী ভেবেই পায় না—ডাক্তার লছমীকে এত শাড়ী, সায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি দেয় কেন।

হরিমতীর মায়ের প্রশ্নের উত্তরে লছমী বলল—হ্যাঁ, বারো টাকা দাম। বাবু কলকাতা থেকে এনে দিয়েছেন।

ঈর্ষান্বিত বিদ্রূপের ভার সামলাতে পারল না হরিমতী, তাই সে বলে ফেলল—পাউডারও নিশ্চয় কলকাতার—আমি হলে দু'পায়ে দলে লাথি মেরে বেরিয়ে আসতাম।

দ্বন্দ্বের আভাস বুঝতে পেরে মা মেয়েকে নিয়ে সরে পড়তে পড়তে বললে—সে সৌভাগ্য তো আর করো নি মা।

লছমীর মা শুধু একটা বিরক্তিকর দৃষ্টি মেলে ধরলো ওদের দু'জনের গমনপথের দিকে। তারপর কোন কথা না বলে নীরবে একাকী ঘরের ভিতর ঢুকে গেল—উঠোনে লছমী তখনও সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে।

একটু পরে লছমী মায়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল—মা, আমি চললাম। ডাক্তারবাবুর আসার সময় হল।

লছমী চলে গেল। ঘরে ফিরে গিয়ে হরিমতীর মা মেয়ের সঙ্গে এই সব কথাই আলোচনা করছিল।

মেয়ে বলছে মাকে—ডাক্তার ওকে অত কাপড়-জামা দেয় কেন, সেটা কি আর কারো বুঝতে বাকী আছে? তার উপর এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে থা করে নি—এ অবস্থায়—

—কি বুদ্ধি তোর মা! লেখাপড়া শিখলে তুই হাকিম হতে পারতিস্। আমারও তো তাই মনে হয়। আর মা-মাগীই বা কেমন! ছিঃছিঃ অত বড় এক সোমত্ত মেয়েকে এক বিয়ে-না-করা পুরুষমানুষের কাছে একা দিয়ে রেখেছে! ও আসুক আজ একবার—বলে খানিক শূন্যে আস্ফালন করে প্রতিপক্ষের অভাবে এক সময় নিজেই চুপ করে গেল।

হরিমতীর বাপ শুনল সন্ধ্যেবেলা। শুনে বিজ্ঞের মত বলল—এর একটা বিহিত করতেই হবে আমাদের। এ ভাবে ডাক্তার একটা মেয়ের সর্বনাশ করবে, এ আমরা কখনই সহ্য করব না।

হরিমতীর বাপ গিয়ে তখনই কুলি লাইনে ডাক্তারের বিরুদ্ধে মনগড়া নানা কাহিনীর সাহায্যে প্রচার করে এল—আমাদের ছোট জাত পেয়ে ডাক্তার একটা মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করছে। এ কি তোমরা সহ্য করবে, ভাই সব!

সমস্বরে উত্তর এল—না, কখনই না। ডাক্তার বলে কি আমাদের মাথা কিনে নিয়েছে?

তা' হলে শোন—বলল হরিমতীর বাপ—আগামী কাল সন্ধ্যেবেলা আমার ঘরের সামনে একটা মিটিং ডাকছি। সেখানে সবাই যাবে, ওখানে বসেই পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে স্থির করা যাবে। আজকের মত তা' হলে আসি। মনে থাকে যেন, কাল সন্ধ্যেবেলা।

কথাটা লছমীর বাবাও শুনেছিল। কোন কথা বলে নি। তবে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়ে ডাক্তারকে সাবধান করে দিয়ে এসেছিল যে, তার মেয়ে লছমীকে ঘিরে একটা প্রকাণ্ড গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে ক্রমে ক্রমে।

ডাক্তার সকালবেলা রাউণ্ডে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে শুনে এলেন কুলিদের মধ্যে চাপা অসন্তোষের গুঞ্জন। রতন ছেলেটা ডাক্তারবাবুর খুব ভক্ত ছিল—আজও সে তেমনি আছে। যেমনি বলিষ্ঠ চেহারা, তেমনি বাকভঙ্গী, রেখে-ঢেকে কথা বলতে জানে না। তাকেই ডাক্তারবাবু শুধালেন—হ্যাঁ রে রতন, এসব কি শুনছি! তোরা সব নাকি মিটিং করছিস্ আর আমার নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছিস্!

রতন সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেলল—আমি কিন্তু ওদের দলে নেই। এসব করে বেড়াচ্ছে ওই হারামজাদা,—ওই যে গো হরিমতীর বাপ। জানেন ডাক্তারবাবু, ও কিন্তু আমাকে বলতে সাহস করে নি! এমন কি এ ধারেই আসে নি। জানে তো আমাকে। সেই যে সেবার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম, আপনিই তো লেখাপড়া করে ওকে বাইরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। ও ব্যাটা মরত তখন,—ভালই হত।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তারবাবু। রতন আবার শুধাতে তিনি বললেন—আমাদের কাজই তো বাঁচানোর চেষ্টা করা ওর পরমায়ুর জোরে ও বেঁচেছে। দরকার হলে এখনও ডাকলে যেতে হবে বৈ কি!

অবাক চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ রতন, তারপর বলল—থাক্ আপনার কোন ভয় নেই, ডাক্তারবাবু আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, আপনার গায়ে আঁচটি লাগতে দেব না, এই বলে রাখলাম।

মিটিং হয়েছিল পরের দিন সন্ধ্যেবেলা। রতনও উপস্থিত ছিল সেখানে। রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি জানি কেন আসল প্রস্তাবটা তুলতে সাহস হয় নি হরিমতীর বাপের। রতনকে সে যমের মত ভয় করে আজও।

যে জন্যে মিটিং ডাকা, সেই কথাই যখন উঠল না, তখন রতন তাতে বেশ কৌতুক অনুভব করল। ব্যঙ্গ তিক্ত কণ্ঠে সে বলল—আমাদের ঘরে ছেলেমেয়েদের অবস্থা তো তোমরা সবাই জানো তবু যদি দু'একটি মেয়ে কি ছেলে একটু সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মা[illegible] মানুষ হয় সেটা কি তোমরা চাও না? ডাক্তা[illegible] কি করেন নি, যার জন্যে আমরা অনর্থক তাঁকে ছোট [illegible] বড়

করছি। তা ছাড়া যা আমরা দিতে পারি না, তা কেড়ে নেওয়ার অধিকারও আমাদের নেই। যারা জীবন কান্নাই জীবনের অর্থ নয়, হাসির জোয়ারও জীবনেরই অঙ্গ। অতএব, যার ভাগ্যে যেটুকু জুটেছে, আমার ভাগ্যে তা জুটল না বলে হিংসা করে অপরের প্রাপ্যটুকু কেড়ে আনবার জন্তে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি করব কেন?—বলে বসে পড়ল রতন। সভার মধ্যে আবার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। অপেক্ষাকৃত কমবয়সীরা বলল—রতনটা বেশ বলতে শিখেছে তো! কালে ও আমাদের লীডার হবে, মেম্বার হবে। ভারী বয়সীরা বললে—ছোঁড়াটা বখাটে হয়ে গেল। তা বলে মা-বোনকে নিয়ে ফুর্তি করবে, আর তাই সহ্য করতে হবে?

হরিমতীর বাবা আর কিছু বলল না। শুধু একবার বিষদৃষ্টি মেলে তাকাল রতনের দিকে।

খানিক পরে সভা ভেঙে গেল। রতন গেল সবার শেষে। সে বিজয়ী, এতগুলো লোককে সে একটি কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত বশে এনে ফেলেছে। আশ্চর্য! হাত তুলে সে বিধাতার উদ্দেশে প্রণাম জানাল—সবই তাঁর লীলা।

বাড়ী ফিরে এসে হরিমতীর বাপ এই সব কথাই ভাবছিল, আর রতন ও ডাক্তারের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছিল। হঠাৎ সে বিছানার উপর ঢলে পড়ল—বুকের মধ্যে কেমন করছে বলে।

মেয়েকে বলতেই সে ছুটে যেতে চেয়েছিল ডাক্তারের কাছে। কিন্তু বাপ বারণ করল। হরিমতীর মা শেষে এক তাড়াতে স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েকে পাঠাল ডাক্তারের কাছে।

খবর পেয়েই ডাক্তার ছুটে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। পরীক্ষাতে বললেন—বিশেষ কিছু নয়। কোন কিছু নিয়ে বোধ হয় বেশী ভাবনা-চিন্তা করেছে। হার্টের উপর চাপ পড়েছে বেশী। একটু বিশ্রাম দরকার। আর ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রাত্রেই গিয়ে ডাক্তারকে সব কথা বলবার জন্তে এসে বসেছিল রতন। ডাক্তারবাবু ফিরে এসে রতনকে বললেন—ভালই হল, রতন শোন তো এই ওষুধটা হরিমতীর বাপের জন্তে ওদের ঘরে দিয়ে যাবি।

ওষুধটা হাতে নিয়েও রতন বসে রইল। ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, কিছু বলবি রতন?

রতন বলল, সেদিনের মিটিংয়ের সব কথা। শেষে বলল—দেখি, ওরা কী করে!

ডাক্তার বললেন—কী আর করবে? ক'দিন পরেই ওরা আবার দল পাকাবে। —আমি থাকতে নয়।

অবাক হয়ে ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন এক নীচ বংশজাত মানব-নন্দনের মুখের দিকে। প্রতাপক্রান্তের মহিমায়, স্বার্থ-বলিদানের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে, যে-মুখ ভাস্বর লালিত্যময়।

রতনকে তাড়া দিয়ে ডাক্তারবাবু উঠিয়ে দিলেন, যা ওষুধটা ওর দরকার।

সেদিন একটা বেনামী চিঠি এল ম্যানেজারের অফিসে। তাতে লেখা আছে—ডাক্তার একটা নীচজাতীয়া মেয়েকে ঘরে রেখেছে এবং আমরা মনে করি তার প্রতি ডাক্তারের আচরণ অবৈধ। অবিলম্বে এর ব্যবস্থা না করলে ফল ভাল হবে না। ডাক্তারকে সাবধান করে দেবেন।

ম্যানেজার চিঠিটা পেয়ে হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তারপর ডাক্তারকে ডেকে চিঠিখানা দেখিয়ে বললেন—বলুন তো, কার উপর আপনার সন্দেহ হয়, তাকে একবার চাকরিবাজী দেখিয়ে দিই। বুঝলেন ডাক্তারবাবু, আজকাল এই সব ছোটজাতের ছেলেমেয়েরা একটু লেখাপড়া শিখে, চাকরী-বাকরী করতে নেমে যেন এক একজন লাট-বেলাট হয়ে উঠেছে। ওদের ডেকে একটু ভাল কথা বলেছেন কী দেখবেন, একদিন আপনারই মাথায় লাঠি মারবে। ওদের বিশ্বাস নেই, বুঝলেন?—যাক্ বলুন কে এমন কাজ করতে পারে?

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ডাক্তারবাবু, এ হয় তো হরিমতীর বাপের কাজ। সেদিন যে ও একটা মিটিং পর্যন্ত করেছিল এই নিয়ে কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি।

Is it? কই আমি তো জানি নে। আচ্ছা এই হরিমতীর বাপের জন্তে আপনি বাইরের হাসপাতালে একবার ট্রিটমেন্ট রেকমেণ্ড করেছিলেন না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার ঠিক মনে আছে তো।

এই দেখুন তবে। এইমাত্র যা বললাম তা ফলছে কি না—true

to every letter of it.—ওদের উপকার কখনও করবেন না। শেষের কথাগুলো টেনে টেনে বললেন ম্যানেজার।

হঠাৎ ম্যানেজার কলিং বেল টিপলেন। দারোয়ান হাজির সঙ্গে সঙ্গে। পরুষ-কণ্ঠে বললেন ম্যানেজার—রঙ্গলালকো বোলাও। রঙ্গলাল হরিমতীর বাপের নাম।

এই অবসরে ডাক্তার বললেন—এখনই কি আপনি এর ব্যবস্থা করবেন? না না, আমার একটা কথা রাখুন—গরীব মানুষ—ভাতে মারবেন না।

হো হো করে হেসে ম্যানেজার বললেন—আচ্ছা ডাক্তার, তাই হবে।

রঙ্গলাল আসতেই ম্যানেজার কর্কশকণ্ঠে বললেন—কয়েকদিন আগে' তুমি মিল এলাকার ভিতর মিটিং করে লোকদের উত্তেজিত করেছিলে?

ডাক্তারের মুখের দিকে একবার তাকাল রঙ্গলাল। হ্যাঁ-না কোনটাই তার মুখ দিয়ে বেরোল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দ্বিতীয়বার ম্যানেজার বলতে না বলতে দারোয়ান ধাঁ করে এক চড় কষিয়ে দিল তার গালে, আর বলল—আরে শালা, বোলতা হায় নাহি কাহে?

হ্যাঁ হুজুর—করেছিলাম। কান্নার সুরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল রঙ্গলাল।

জানো—আমার হুকুম না নিয়ে মিল এলাকায় মিটিং করা বে-আইনী?

জানি, হুজুর! তবে এটা ঠিক মিটিং ছিল না—

ম্যানেজার ওর শেষের কথাগুলোকে লুফে নিয়ে মুখ ভেংচে বলে উঠলেন—মিটিং ছিল না, ছিল ডাক্তারের নামে কুৎসা রটানোর ষড়যন্ত্র। ইচ্ছা করে ধরে চাবকাই। ডাক্তারকে কথা দিয়েছিলাম তাই। নতুবা আজ কী যে হত বলা যায় না। যাক—যাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান বের করে নিয়ে গেল গলায় এক ধাক্কা মেরে। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে স্প্রিংয়ের কাটা দরজার পাল্লাটাকে দু'হাতে ধরে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল রঙ্গলাল। সঙ্গে সঙ্গে এক হ্যাঁচকা টানে দারোয়ান তার হাত দু'টো ছাড়িয়ে নিল।

বেরিয়ে এসে রঙ্গলাল বললে—দারোয়ানজী একটু জল খাবো।

জল খাবো! ভেংচিয়ে উঠল দারোয়ান—জল খাবো। দু' পা এগিয়ে যাও না চাঁদ—ঐ টিউব-ওয়েল থেকে খাওগে। তোমার চাকর আমি?

এবার সরে পড়ল রঙ্গলাল। গালটা তার ফুলে উঠেছে। আঙুলের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে: ঘাড়টাতেও একটা ব্যথা বোধ হচ্ছে।

অসময়ে ম্যানেজার ডাকাতে সহকর্মীদের মনে স্বভাবতই একটা কৌতূহল হয়েছিল। রঙ্গলাল কাজে ফিরে যেতেই সবাই শুধাল—কী হল? কী বললে ম্যানেজার সাহেব?

রঙ্গলাল কোন প্রশ্নেরই জবাব দিল না। কিন্তু এ অপমানের জ্বালা নীরবে এভাবে সহ্য করাটাও তার পক্ষে একান্ত দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়াল।

আবার ফন্দী আঁটতে লাগল—কী করে ডাক্তারকে জব্দ করা যায়। লছমীর ভাগ্যে এখন সে-ও ঈর্ষা করতে সুরু করল। একই সঙ্গে মানুষ হয়ে, একই অবস্থায় সংসারে বাস করে কেন সে এত ঐশ্বর্য ভোগ করবে? আর তার মেয়েই বা কোন্ অপরাধে এমনভাবে টেনে চলবে জীবনটাকে?

এবার আর মিল-এরিয়ার মধ্যে নয়—দূরে। যা কিছু কথাবার্তা হয় অতি গোপনীয়। রঙ্গলাল ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি মিল-এলাকায় বিন্দুবিসর্গ জানতে পারে না।

কিন্তু দেয়ালেরও কান আছে, তাই কেমন করে জানি রটে গেল, রঙ্গলাল সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে নতুন কোরে ফন্দী আঁটছে।

ডাক্তার যেমন মাঝে মাঝে চলে যেতেন আবার দু'তিন দিন পরে ফিরে আসতেন, তেমনি সেদিনও রাত দশটার ট্রেনে নেমেছিলেন। ষ্টেশন-সংলগ্নই মিল এবং মিলে ঢুকবার মুখেই বাসা তাঁর।

বাসামুখো পা বাড়াতেই অপরিচিত একজন কে যেন এসে সানুনয় অনুরোধ জানাল—ডাক্তারবাবু, আমার বাড়ীতে আমার এক আত্মীয়ের খুব অসুখ—যদি একবার যেতেন দয়া করে।

এত রাত্তিরে আমি বাপু যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং ওষুধ লিখে দিচ্ছি। কাল সকালে না হয় যাব।

লোকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। কাল সকাল পর্যন্ত টেঁকে কি না সন্দেহ। কান্নার সুরে অস্পষ্ট হয়ে গেল তার কাতর প্রার্থনা; শেষে একটু সুস্থির হয়ে বলল—তা'হলে আপনি যাবেন না? একটা ডাক্তার অভাবে লোকটা মারা যাবে—এবার সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ডাক্তারের মন টলল, করুণা এল লোকটার উপর। শেষে আর দ্বিমত করতে পারলেন না। বলেই ফেললেন—কই চলো দেখি। ষ্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দু'জনে দু'খানা রিক্সা নিলেন। পিছনে সেই অপরিচিত লোকটি। ডাক্তারবাবুর রিক্সা আগে আগে। পিছনের আরোহীর নির্দেশে রিক্সা গিয়ে উঠল একটা একতলা বাড়ীতে।

ডাক্তারবাবু যখন ষ্টেশনে নামেন, সেই একই ট্রেনে রতনও নেমেছিল। কিন্তু ডাক্তার তাকে দেখতে পান নি।

অপরিচিতের আহ্বানে ডাক্তারকে পা বাড়াতে দেখেই তার সন্দেহ হল। সে তার সাইকেলটা নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে রিক্সার পিছনে পিছনে এগিয়ে চলল। ডাক্তার ভিতরে ঢুকলেন দেখে, সে বাড়ী চিনে নিয়ে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরে ফিরে এল। সোজা এসে থানায় উঠল! থানা-অফিসারকে বলতেই তিনি চমকে উঠলেন—এঁ্যা কী সর্বনাশ! থানার রেজিস্টার অনুযায়ী বাড়ীটা যে একটা কুখ্যাত পাড়ার ভিতরে তাই নয়, অধিকন্তু লোকটির বর্ণনা যা শুনলেন তাতে সেও একজন চরিত্রবান নিরপরাধ ব্যক্তি বলে মনে হল না। তাই তিনি অবিলম্বে পুলিশের ব্যবস্থা করে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন।

কু-কথা বাতাসের আগে ধায়। গুন্ডা কেন কী [illegible] পুলিশের আগমন-বার্তা টের পেয়ে গিয়েছিল। তাই মিথ্যে [illegible] ঘর ফাঁকা করে যেদিকে যে পেয়েছে, সেইদিকে সে নিরুদ্দেশ হয়ে [illegible]

ও সি যখন পৌঁছলেন তখন ডাক্তারবাবু ঘরে এক [illegible] রেখে

শুধালেন ও সি—ওরা কোন কিছু ক্ষতি করে নি তো আপনার? ঠিক সময়মতই এসে পড়েছি—না কি?

ডাক্তারও হেসে বললেন—না, কোন ক্ষতি করে নি। বোধ হয় করতও না। কিন্তু আপনি—মানে—আপনারা খবর পেলেন কী কোরে?

—এই যে, এই ছেলেটি খবর দিয়েছে—বলে ও সি এগিয়ে দিলেন সামনের দিকে রতনকে।

—রতন! রতন—তুই আজ আমাকে এমন একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করলি! কী বলে যে তোকে আশীর্বাদ করব ভেবে পাই নে। আয়, কাছে আয়! কাছে আসতে রতনের চিবুকে ছু'তিন বার সস্নেহে চুম্বন করলেন। আবেগভরে বললেন—জানেন দারোগাবাবু, ভুল কোরে জন্ম হয়েছিল এ ঘরে এ ছেলেটির।

আবেগ-মমতার ধার সাধারণত দারোগা পুলিশে ধারে না। সেটা তাদের পি আর বি-তে নেই; অবশ্য তার বিরুদ্ধেও কিছু নেই। কিন্তু অলিখিত আইন হিসাবে চলে আসছে পুলিশ-সমাজে—কঠোর কর্তব্য-বাদে না কি ওগুলোর স্থান অবাঞ্ছিত। পুলিশের খাতায় যেদিন নাম লিখিয়েছে, নীলকণ্ঠের মত ওগুলোকে সেদিন থেকেই হজম করার বিদ্যাটা ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করে নিয়েছে।

তাই নির্মম হয়েই পুলিশের অফিসারকে বলতে হল—ডাক্তারবাবু চলুন, বাসায় চলুন। রাত প্রায় বারোটা বাজতে চলল।

—এত রাত হয়েছে! এতক্ষণে ঘড়ি দেখার কথা মনে হতেই হাতঘড়িটা দেখলেন তিনি। তাই ত'! চলুন চলুন।

বাড়ীর বাইরে আসতেই ও সি বললেন—আমাদের গাড়ী আছে, চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।

—না, না:—আমি দিব্যি রিক্সাতে যেতে পারব। সঙ্গে রতন তো আছেই।

ও সি কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন—রতনও গাড়ীতেই যাবে। সাইকেলটা তুলে দিক গাড়ীতে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সবাই এসে নামলেন মিলের গেটের সামনে।

ও সি বিদায় নেবার আগে বললেন—ডাক্তারবাবু, কাল সকালের দিকে আপনাকে একবার বিরক্ত করব। একটা ষ্টেটমেণ্ট নিতে হবে আপনার এই ঘটনা সম্পর্কে।

আচ্ছা, বেশ আসবেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

২৫

মাঠে দাঁড়িয়ে শহরের প্রায় সব লোকের সামনে চেঁচিয়ে বলেছিলাম, মানুষ সমাজকে ঘৃণা করে? সমাজ মানুষকে বাঁধতে পারে নি। কি করতে পেরেছে সমাজ পুরুষের পরদার গমনে? সমাজ কি বন্ধ করতে পেরেছে ভ্রূণ হত্যা! পতিতাবৃত্তি! রমণীর স্বেচ্ছাকৃত গৃহত্যাগ!

আরও অনেক কথা বলেছিলাম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। যা খুশী বলে গিয়েছিলাম।

পরদিন সমস্ত শহরে চি-চি পড়েছিল। চরিত্রহীন অনেকেই হয়—কিন্তু সে কথা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্য সভায় বলা—কি স্পর্দ্ধা। আমার দুঃসাহসের উপযুক্ত শাস্তিও দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ওঁরা।

—দিদামণি,' তৈরী থেকো। বিশু এসে বলে। ছেলেটি ওখানকার নামকরা গুণ্ডা।

—কিসের জন্য।

—মার খাবার জন্য।

—মার খাবার!

—হ্যাঁ, তবে আমরাও তৈরী আছি। আসুক না, কাউকে মাথা নিয়ে যেতে হবে না।

আমি এদের ডাকি নি, ওদের দলের অনেককেই চিনি না, তবু ওরা স্বেচ্ছায় আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। কারণ, ওদের মতে আমি ওদের দলেরই একজন।

চুপ করে রইলাম। অস্বীকার করবার উপায় নেই। নরকে বাস করে নরকের সঙ্গীদের বাদ দেওয়া চলে না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মারামারি হল না। কি করেই বা হবে। মারামারি যারা করবে তারা তো সবই আমার দিকে।

—কয়েক জনকে টলাতে এসেছিল টাকা নিয়ে, ধাঁতানি খেয়ে পালিয়ে গেছে শালারা। বিশু হাসতে হাসতে বলে।

—হ্যাঁ, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। মুখেই রবরবা। এমনিতে তো পাটকাঠি, টিপলেই গেল। আরেকজন বলে।

সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে যখন খুশী ওরা আসত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার দোকানে আড্ডা দিত। আমি যেন একটা ছোট শিশু। আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করাই ওদের কাজ। ওরা জানত, আমি অনেক কিছু জানি না—আর জানাতে চেষ্টাও করত না।

আমাকে বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করলে কি হবে—দুর্নামের হাত আমি এড়াতে তো পারি না। এই দলের অনেকে ছোট খাট ডাকাতি করেছে, একজন রাগের মাথায় খুনও করেছিল। তাছাড়া, মেয়েদের দেখলে শিস দেওয়া, অশ্লীল মন্তব্য করা, পেছনে পেছনে গিয়ে চিঠি ছুঁড়ে দেওয়া, এসব তো নিত্যনৈমিত্তিক।

এরাই আমার বন্ধু। কাজেই···

বাবা তো অনেকদিনই আমার সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। মা একদিন বললেন—তোর জন্যে তো শহরে মুখ দেখানোর যো নেই।

—সে কি, কণ্ঠে অনেকটা বিস্ময় আমদানী করে বলি, তুমি তো কালই কাকে যেন বলছিলে, আমার মত ভাল ছেলে পৃথিবীতে কম আছে।

—তাই তো বলতে হয়, মা রাগে যেন ফেটে পড়েন, আমি তো নিজের মনে জানি, তুমি কি? চোরের মা জোরে কাঁদতে পারে না···।

—সেইজন্যই তার ছেলে চোর হয়। যদি সে জোর গলায় বলতে পারত, হ্যাঁ, আমার ছেলে—চোর—তোমরা একে ধরে নিয়ে যাও—শাস্তি দাও—তা'হলে··

কথাটা শেষ করবার আগেই মা উঠে চলে যান। আমি একটু হাসি। সত্যি কথা কেউ সহ্য করতে পারে না।

আমি-ই কি সহ্য করতে পারি? সত্যি-কথা বলতে গেলে, আমি-ই তো অনেক নীচে নেমে গিয়েছিলাম। রাত্রে মদ এবং দিনে মদের চেয়েও ঘৃণ্য সঙ্গী একটু একটু করে আমার অজান্তেই আমাকে নামিয়ে দিচ্ছিল··।

তখন মনে হত আমি যা করছি তাই ঠিক। একটু একটু করে বিষ খেয়ে মেয়ে পরিণত হয় বিষকন্যায়। আমার মনের রক্তও ঠিক তেমনি নীল হয়ে গিয়েছিল।

তখন কাদা মাখতাম—কাদায় থাকতাম—ময়লা পোকাগুলি

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

কামড়ে কামড়ে খেত আমাকে—ভাল লাগত সেই একটু একটু যন্ত্রণা। আকাশের দিকে তাকাতে পারতাম না, আলো সহ্য করতে পারতাম না অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে মনে হত এই তো আরাম—এই তো জীবন এই তো সুখ—

তখনই ওকে দেখলাম—ওকে নয় ওর হাসি—মনে হল, নরকের আগুন চারিদিকে জ্বলছে—পচা মড়ার বীভৎস গন্ধ আর সেই মৃতদেহের গলা দুর্গন্ধ মাংস রক্ত মেখে বসে আছে একটি বীভৎস পশু। নরকের আগুনের ধোঁয়ায় তার রং ধূসর কালো। অন্ধ সেই পশুটা হঠাৎ দেখতে পেল প্রথম উষার আলো। দেখতে পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। আকুল আর্তনাদে বলতে থাকে, না, না, না, এ আমি দেখতে চাই না। এ আমি সইতে পারি না। আমি বেশ আছি—আনন্দে আছি। তোমাকে দেখে আমার সমস্ত দেহ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, গনগনে আগুনের মত ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তুমি যাও দূর হয়ে যাও শেষ হয়ে যাও—আমার পৃথিবীতে তোমার অস্তিত্ব নেই···

ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিগুণ আনন্দে আমি সেই কাদাগোলা, কৃমিভরা গর্তে ডুবে গেলাম—ফিরে যেতে চাইলাম সেই পুরোণ আনন্দে—কিন্তু···না···কিন্তু···কোথায় যেন সুন্দর কি কাটল···

সেদিন সকালে মনটা খুব ঝিমিয়ে ছিল। আগের রাতে অনেক বেশী খেয়েছিলাম—উত্তেজনার আনন্দে একের পর এক পাত্র শেষ করে দিয়েছিলাম—কাল যত আনন্দ আজ তত অবসাদ।

ইচ্ছে হচ্ছিল আলমারী খুলে একে একে সব জিনিষগুলি ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিই। ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ মাথায় তো অনবরত কেউ হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে—বাইরে যদি এই শব্দটা জোরে হত, তবে হয়ত মনের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতুম।

মাথার এই 'ঝন ঝনাৎ' শুনতে পেতাম না—আর শুনতে না পেলেই তো সব ঠিক—দুনিয়া 'আচ্ছা' হায়—শোনা নিয়েই যত গণ্ডগোল।

মনের ঠিক এই অবস্থায় ওরা এসে দাঁড়াল। দু'টি মেয়ে—খাতা, পেন্সিল, কলম, সুতো কতকিছু চাই ওদের। আমি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি নি—কিন্তু দু'টি মেয়ে—দু'টি জড়ানো শাড়ী দেখেই পা থেকে মাথা অব্দি জ্বলে যায় আমার—

যে বাচ্চা ছেলেটা আমার দোকানে কাজ করে সে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। ওর ঐরকম কাণ্ড দেখে আরও রেগে যাই।

—চুপ কর। চুপ করে বোস। ধমকে বলে উঠি।

ছেলেটা একবার আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে টুলটায় গিয়ে বসে।

—আপনারা অন্য দোকানে যান। বলি আমি। ওদের দিকে আমি তাকাই না।

—কেন বলুন তো! শ্রীর কিন্তু খুব মিষ্টিকণ্ঠে প্রশ্ন হয়।

কৈফিয়ত চাইছেন? রাগে আমার মেজাজ আরও খারাপ হয়ে যায়। আমি চরিত্রহীন। ওঁরা আমার দোকানে আসতে ভয় পান। আবার আজ দয়া হয়েছে তো এসেছেন। কৃতার্থ হয়ে গেলাম আর কি।

মেয়েদের কাছে আমি জিনিষ বিক্রী করি না—

—পাগল না কি? সেই কণ্ঠই পুনরায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

—পাগল আর একটি গলায় উচ্চারিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছাসময় উচ্ছ্বসিত হাসি।

সেই হাসির ধ্বনিতে মুখ তুলে তাকাই। তাকাতে বাধ্য হই। সামনেই একটি লম্বা, রোগা, মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ময়লা রং, কর্কশ অমাংসল দেহ। মাথার প্রচুর চুল এক নজরেই চোখে পড়ে। রুক্ষ চুলগুলি একটি অর্ধ বিনুনিতে জড়িয়ে পিঠের ওপর পড়ে আছে। সব চেয়ে অদ্ভুত ওর চোখ।

ছোট ছোট দু'টি চোখ পরস্পরের কাছাকাছি যেন দু'জনে দু'জনকে সন্দেহভরে দেখে নিতে চাইছে—বিরক্তি বিদ্বেষ ও কুটিলতায় ভরা চোখ দু'টি—আজন্ম শত্রুতার বন্ধনে বন্দী।

এই মেয়েটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্য এখানকার মেয়েদের আমি ভাল চিনি না—তবুও একে দেখেই মনে হল ও এখানকার নয়···

ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতেই বিস্ময়ে চোখ দু'টি যেন আটকে গেল। চোখ ফেরাতে পারলাম না—

একটি ঊর্ধ্বশিখা হাসি। মাটি থেকে একটা হাসির তরঙ্গ যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। একটি বিশ্বপ্লাবী হাসির তরঙ্গ।

সে মেয়ের চোখে হাসি, চুলে হাসি। ঠোঁটে হাসি, বুকে হাসি। হাতের আঙুলগুলি নেচিয়ে ওঠে হাসির ছন্দে, পায়ের পাতার শিরাগুলি ওঠে কেঁপে। মুক্তোঝরা হাসি।

সে হাসিতে অসীমের বাণী—আকাশের সুর। নির্মল নীল আকাশ, পূর্ণিমার লাবণ্য-লেখন, নক্ষত্রের রহস্যময় অতীন্দ্রিয়তা।

স্তব্ধ বিস্ময়ে সেই হাসির দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ ফেরাতে পারলাম না—ফেরাবার কথা মনেও হল না···

—পাপড়ি, থাম। পাগলের মত হাসিস না···

—পাগল! মেয়েটি আবার হেসে ওঠে, আমি পাগল। প্রিয়াদি, তুমি আজ সবাইকেই পাগল বলছ।

প্রিয়া···পাপড়ি···ওঃ, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ওদের কথা তো আমি শুনেছি। 'প' নাম যেঁষা চারটি মেয়ে—বাইরে থেকে পড়তে এসেছে একই কলেজে—চারটি মেয়ে চার রকমের, কিন্তু প্রত্যেকেই একটু অদ্ভুত ধরণের।

কাল-ই তো ওরা বলছিল। কি বলছিল যেন···তখন অতটা খেয়াল করে শুনি নি···হ্যাঁ বলছিল, অপূর্ব একটা সুন্দরী মেয়ে এসেছে মাইরী, যেন রূপকথার রাজকুমারী···

হ্যাঁ রে, শুধু রাজকুমারীকেই দেখলি, পাশে যে ভূতকুমারী তাকে দেখলি নে···

দেখি নি আবার, বক্তা উত্তর দেয়, আরে, ওর জন্যই তো রাজকুমারীর চেহারা তো অত খুলেছে। রূপ বটে একখানা—মনে হয় যেন বাঁশবনের শাঁকচুন্নী ঘুরে বেড়াচ্ছে···

তা হলে এই সেই জগাই বর্ণিত 'শাঁকচুন্নী।' তবে কি পাশেরটি-ই রাজকুমারী!

না, রাজকন্যার মত দূরে থাকে—তার কাছাকাছিও যেতে পারে না—নিতান্তই সাধারণ চেহারা। রং উজ্জ্বল শ্যাম। যাদকে

চাপা দিয়ে রাখলে যে রকম রং হয় তেমনি। মাঝারি গড়ন। ছোট একটি কালো মুখ। একটা নিঁখুত চামড়া মুড়ে গেছে সমস্ত মুখময়, কোথাও একটু দাগ নেই। সুগঠিত ছোট নাক। উজ্জ্বল দু'টি চোখ। চোখের তারা দু'টি যেন উজ্জ্বল পাথর। হাসির আঘাতে বারবার ঝিক-ঝিকিয়ে উঠছে পাথর দু'টি।

ঠোঁট দু'টো একটু মোটা—একটু খোলা। সেই ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটে সবসময়ই বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ঝকঝকে এক টুকরো হাসি।

আপনি দোকানদার আমরা ক্রেতা—আমাদের কাছে আপনি জিনিষ বিক্রী করতে বাধ্য—মেয়েটি··(হ্যাঁ, ওর নাম আমি বুঝতে পেরেছি—প্রিয়া) বলে—

—বাধ্য! হঠাৎ আমার হাসি পায়। এতো দেখছি সরোজের মেয়ে-সংস্করণ। ও কি জানে না যে মানুষ সব সময়ই বাধ্য আবার কখনই বাধ্য নয়। বাধ্য হবার জন্য শেকল সে নিজে তৈরী করেছে—আবার শেকল ভেঙে পালাবার বুদ্ধিও।

—বাধ্য না হলে কি করবেন? একটু হেসেই বলি।

—কি করব?···কি করব! দুঃসহ চাপা রাগে মেয়েটি যেন ফেটে পড়তে চায়।

কারো ঐ রকম রাগ আমি জীবনে দেখি নি।

—না, না, প্রিয়াদিকে রাগিয়ে দেবেন না, প্রিয়াদি রেগে গেলে অজ্ঞান হয়ে যায়, বলেই খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মেয়েটি। হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াকে।

আশ্চর্য! ওর হাসির ছোঁয়াচে যেন সবই বদলে যায়। প্রিয়ার মুখটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমার মনের বিদ্রূপ-ভাবও কোথায় যায় মিলিয়ে।

আমি নিজে উঠে ওদের জিনিষপত্রগুলি দিই।

ওরা চলে গেল। দিনটাকে বদলে দিয়ে গেল এক মুহূর্তে।

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তা'র কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।

আশ্চর্য! আমারও মনে পড়ল কতদিন আগের পড়া কবিতা। তা'হলে কি আমার আত্মা মরে যায় নি! আমি তো জানতুম সে ভূত হয়ে শেওড়া গাছে বাসা বেঁধেছে।

ভাল লাগল। ভাল লাগল আকাশ, আলো, রাস্তা, দোকান এমন কি নিজেকেও। বাচ্চা ছেলেটাকে ডাকলাম। ও ভয়ে ভয়ে এসে কাছে দাঁড়াল। ওর ভয়ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল আমার। একটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললাম, মিষ্টি খাস।

ও অবাক হয়ে তাকায়।

—তোর বাড়ীতে কে আছে রে?

—মা, বাবা, চারটে ভাই, দু'টো বোন।

—বাঃ! বাঃ, অনেক পোষ্য তোর। মাইনে তো এখানে পাস মাত্র কুড়ি টাকা। কি করে কুলোয়?

—বাবা কাজ করে, মা ঝিয়ের কাজ করে, ভাইরা···

মোটের ওপর ওদের বাড়ীতে সবাই কাজ করে, শুধু তিন মাসের একটি বোন ও ছোট একটি ভাই ছাড়া।

ভাল লাগল ওর কথা শুনতে। পৃথিবীতে কত রকম লোক আছে—কত রকম তাদের জীবনযাত্রা। পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা, সমুদ্র, বরফ, বালি, জন্তু, গাছ, মানুষ—কত বিচিত্র জিনিষই না এই পৃথিবীতে আছে।

মরুভূমির বুকে বসে পৃথিবীকে শুধু মরুময়ই ভাবছি কেন?

ঠিক এমনি সময়ে আমাদের দলের কয়েকটি ছেলে ছুটতে ছুটতে এল! এসেই আমার পিঠে এক থাপ্পড়। একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

—মাইরি, যা শুনছি সব ঠিক।

কোন উত্তর দিই না। ওদের দিকে তাকাতে কি রকম ঘৃণা হয়।

—খাসা ছুঁচো 'মাল'—ঐ দলের সেরা 'মালটাই' নাকি এসেছিল···

—না, না, তোর রাজকুমারী আসে নি, আরেকজন বলে, খাঁকচুন্নীটা এসেছিল আর ঐ চলানী মেয়েটার হাসি··

—চলানী! আমার কানে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দেয়। চলানী··কিন্তু··

—সত্যি। অত বড় বুড়ো মেয়ে কি চলানী। সব সময়েই ন্যাকা হাসি হাসছে···

—মেয়েটা নির্ঘাত খারাপ··দেখিস না ছেলে দেখলেই ঢলে পড়ে··

চলানী·· ঠিক বলেছে জগাই। হাসি-খুশী চলানী···ঐ রকম সরলতা কখনও স্বাভাবিক হতে পারে না! ন্যাকা হাসি··ছেলেদের দেখলেই হাসছে—ঠিক···ঠিক।

রোদের তেজ বাড়তে থাকে। ওরা অনেকক্ষণ নিজেরাই বকবক করে চলে যায়। চলানী··হাসি-খুশী চলানী মেয়ে···অবিশ্বাস ও বিরক্তির কালোছায়া ঘনিয়ে ওঠে আমার মনে। মুখচ্ছকরা একটা অবিশ্বাস্য অংশ অভিনয় করে গেছে মেয়েটি—এত সহজ—এত স্বাভাবিক অভিনয় যে মনে হয় সত্যই ও তাই। না, না, এও মুখোস—হাসির মুখোস পরে আছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে।

কিন্তু··না কোন 'কিন্তু' নেই। পাঁচ বছর বয়স থেকে যে জীবনকে দেখে আসছে সে আজ এই অভিনয়ভরা হাসিকে চিনল না। ছিঃ ছিঃ··

সেদিনই প্রথম দিনের বেলা মদ খেলাম। দুপুরে ভাত না খেয়ে খালি পেটে খেলাম এক গেলাস। খুব ভাল লাগল। এতক্ষণ মাথাটা ভারী হয়েছিল—এখন এত হাল্কা মনে হল নিজেকে, যেন দু'টো পাখা গজিয়েছে—আকাশে উড়ে যেতে পারি··

তারপরে বাড়ী থেকে খেয়েদেয়ে দোকানে এসে বসলাম আর দোকানে বসেই দেখলাম তাকে—যাকে ভুলে ছিলাম সারাদিন।

ফুরফুরে রঙিন প্রজাপতির মত হাল্কাপায়ে ও এসে দাঁড়াল। একেলা একা এসেছে।

—শুনছেন!

কোন সাড়া দিলাম না—অন্যদিকে মুখটা ফেরালো। কে ওকে বলেছে আমার দোকানে আসতে।

হঠাৎ খিলখিল শব্দ—বিনা আঘাতে বেজে চলেছে একটা জলতরঙ্গ—একা নয় একাধিক। সাতটি ঘণ্টি হাসতে শুরু করেছে। আলমারীর জারগুলি হাসছে পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে··

এই হাসির আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে মুখ ফেরাই। এ কি হাসি। এ যে সাতরঙা রামধনু—তেমনি অদ্ভুত তেমনি সুন্দর, তেমনি পবিত্র। এই হাসি যদি মুখোস হয় তবে মুখ কোথায়? মনে হচ্ছে মুখের ঐ চামড়াটা তুলে নিলেও মুখটা হেসে যাবে হেসেই যাবে ··

—হাসছেন কেন? রুক্ষকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠি।

—দেখুন না বুড়োটা কিরকম ঘাড় নাড়ছে।

কোণের একটা পুতুল। একটা বুড়ো মুখভঙ্গী করে ঘাড় দোলাচ্ছে তো ঘাড়ই দোলাচ্ছে। ঐটে দেখেও হাসছে। আশ্চর্য।

—কি চাইছেন আপনি?

—ওঃ, দেখুন ভুলেই গেছি। মেয়েটি তাড়াতাড়ি একটা কাগজ আমার হাতে দেয়।

—সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিষের ফর্দ।

—আমার দোকানে কেন এসেছেন? আরও তো দোকান আছে! ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তিভরে বলি।

—মা বললেন যে··ঐ তো আমাদের বাড়ী।

আমার দোকানের ঠিক উল্টোদিকেই একটা ছোট বাড়ী। এতদিন বাড়ীটা খালি পড়েছিল। আজ তাকিয়ে বুঝতে পারলাম বাড়ীতে কেউ এসেছে—জানালায় পর্দা লাগান।

—ঐ তো মা দাঁড়িয়ে আছেন। পাপড়ি আঙুল তুলে দেখায়।

পর্দা সরিয়ে সত্যিই একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে তীব্র উৎকণ্ঠা।

—মা বললেন···। বলতে বলতেই ও হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বাইরে পালিয়ে যায়।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে—আমি অবাক হতে না হতে সামনের বাড়ীতে দাঁড়ান মহিলা তীরের মত নেমে এসেছেন, পাপড়ি··পরি··

আমিও দোকানের সামনে এসে দাঁড়াই। ভদ্রমহিলা ব্যাকুল বিহ্বলকণ্ঠে বলেন, ওকে ধর, ফিরিয়ে আন।

এইবারে বুঝতে পারি—মেয়েটি পাগল। একদম উন্মাদ পাগল নয়। তা'হলে স্কুলে কলেজে পড়তে পারত না। কিন্তু মাথায় একটু ছিট আছে। আর তাই···

দ্রুতপায়ে ওর পেছনে গিয়ে বলি, আপনাকে মা ডাকছেন।

—মা ডাকছেন? এক মুহূর্ত দেরী না করে মেয়েটি ছুটে ফিরে চলে। মাকে জড়িয়ে ধরে ঠিক তেমনি হাসতে হাসতে।

—ওরকম করে ছুটতে আছে? মা ওকে আদর করে বলেন।

আমি চলে আসছিলাম—ওর মা আমাকে ডাকলেন।

—তোমাকে একটা কথা বলব বাবা।

—কি। বলুন।

মেয়েটির এই রকম অদ্ভুত রীতি—মায়ের সঙ্গে এই ধরণের সম্পর্ক আমার খুবই ভাল লাগছিল—আর ভাল লাগছিল বলেই দারুণ অবিশ্বাস ও বিরক্তিতে মন পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ-এ

একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট

খুলতে পারেন

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসারে ১০০ বছর

ব্যাঙ্ক চার্জ লাগেনা—
বরং বছরে ৩% হিসেবে
সুদ পাওয়া যায়

আজই আপনার নিকটবর্তী শাখায় দেখা করুন ঃ

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

···যা স্বাভাবিক নয়, সত্য নয়···তাই এরা করছে··যা স্বাভাবিক নয়··সত্য নয় তাই এরা দেখাতে চাইছে···যা···।

—বাবা, আমি বড় বিপদে পড়েছি—তোমার কাছে সাহায্য চাই।

বিপদে পড়েছি—সাহায্য চাই—এত সহজ ভাবে কেউ সাহায্য চায় কি। চিনির মোড়কের আড়ালে যে তেতো কুইনিন আছে সেটাই আসল। যে খাচ্ছে সেও তা জানে—কিন্তু, তবু চিনির মোড়কটা চাই-ই চাই। সেই চিনির মোড়কটা কোথায়?

—বিপদ হচ্ছে এই যে, আমার কেউ নেই মেয়েটাও আধপাগলা—

কোন্ দেশের অধিবাসী এরা! এই বিধবা মা আর কুমারী মেয়ে। জানে না এভাবে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেললে নিজেদের কতটা ছোট করা হয়। জানে না, পৃথিবীর সব লোক বেলুনের মত নিজেকে ফুলিয়ে রেখেছে··প্রত্যেকে এক একটি বেলুন··হাওয়ায় ভাসছে—উড়ছে··ফুটো হয়ে গেলে—হাওয়া বেরিয়ে গেলে আর কিছুই থাকবে না—তাই সে যতটা পারে নিজেকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে চলে।

—তাই বলছিলাম, তোমার দোকান থেকেই সব জিনিষ নেব কিন্তু তুমি যদি দয়া করে তোমার বাচ্চা ছেলেটাকে দিয়ে সব পাঠিয়ে দাও—

—হ্যাঁ, দেব। উত্তর দিলাম। ভ্রূ কুঁচকে, খুব গম্ভীরভাবে।

উনি ভাবলেন বোধ হয় বিরক্ত হয়েছি। অপ্রতিভ হয়ে বললেন, কিছু মনে করো না বাবা, ওর বাবা বেঁচে থাকলে এ-অবস্থা হত না। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি—কিন্তু··প্রথম দিন থেকেই তোমাকে দেখে এত ভাল ছেলে বলে মনে হয়েছে···

—কি? কি বললেন? চেঁচিয়ে উঠি। আমি ভাল··আমাকে ভাল ছেলে বলে মনে হয়েছে···

—হাঁ, তুমি তো খুব ভাল। উনি ঠিক তেমনি সরল একাগ্র কণ্ঠে বলেন, দেবতার আশীর্বাদ আছে তোমার মুখে—

—দেবতার নয় দানবের। জোরে হেসে উঠি। না হেসে পারি না।

—আপনি কতদিন এসেছেন এখানে? ফের প্রশ্ন করি।

—বেশীদিন নয়।

—তাই।

—কি?

—জানতে পারেন নি আমি কি? কয়েকদিন থাকুন, লোকরা ঠিক আপনাকে জানিয়ে দেবে।

উনি হঠাৎ স্থির চোখে আমার দিকে তাকান। সেই চোখে কি আশ্চর্য সরলতা। এক মিনিট চুপ করে থেকে বলেন, লোকের মুখের চেয়ে নিজের চোখকেই বেশী বিশ্বাস করি।

পাপড়ি এতক্ষণ ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলে, মা, মা, দেখে যাও। কি মজা।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর সেই উদ্ভাসিত হাসি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করি—আমি জানি তুমি ভাল। সোনার পাত্রে ছাই রাখলে সে পাত্র মলিন হয় না—তুমি একদিন আসবে আমার কাছে।

হিরণ্ময় পাত্র! হায় রে···একটু হেসে নিজের জায়গায় এসে বসি। কিন্তু বার বার ঐ একটি কথাই মনে হয়—হিরণ্ময় পাত্রের রং মলিন হয় না।

বাজে। বাজে। সামনের সাদা ছোট বাড়ীটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই। শুধু মেয়ে নয় মা-ও পাগল।

তবু সারাদিন কি রকম একটা ভাল লাগা—দেবতার আশীর্বাদ আছে তোমার মুখে··দেবতার আশীর্বাদ···

সন্ধ্যা হয়ে এল। সামনের বাড়ীর জানালায় জ্বললো একটি আলো। ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে আর স্থির থাকতে পারি না—মনে হয় আলোটা আমাকে ডাকছে···।

আস্তে আস্তে ওদের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াই। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার পাগলের মত ছুটে যেতে থাকি—কি জানতে চাইছিলাম আমি—কি··

ছুটতে ছুটতে চলে যাই সেই দোকানে—আমার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু একি? সাদা গেলাসে লাল পানীয় হাসছে। সে কি হাসি। মদে মাদকতা নেই—আছে হাসি।

গেলাসটা ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তখন চাঁদ আকাশের মাঝামাঝি। আজ কি পূর্ণিমা—পূর্ণিমা না হলেও তার কাছাকাছি কোন তিথি। সমস্ত আকাশ হাসিয়ে হাসছে চাঁদ।

ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকি। পথের প্রতিটি ধূলিকণা হাসছে। দু'দিকের গাছের পাতায় পাতায় হাসি।

সেই হাসির হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলতে থাকি। চলছি তো চলছি-ই। হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। সেই বাড়ী, সেই জানালা, সেই পর্দা।

পর্দাটা দুলে দুলে হাসতে থাকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। সেই হাসিতে যেন পাগল হয়ে যাই।

প্রতি রাত্রে এই এক নেশা। সমস্ত রাত আমি ঘুরে বেড়াই সারা শহর। নিস্তব্ধ রাতের এই এক রূপ। সব বাড়ীগুলি ঘুমিয়ে থাকে—মাঝে মাঝে জ্বলে এক-একটি বাড়ীতে ক্ষীণ আলো। আকাশের তারা ঘুমোয়—আকাশ ঘুমোয়—পৃথিবী ঘুমোয়—শুধু জেগে থাকে চাঁদ—আর নীচে জাগি আমি।

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে চলে গেলাম—আমাদের শহরের পাশের নদী খুব বেশী চওড়া নয়—কিন্তু প্রবল এর স্রোত। বড় বড় নৌকো ছাড়া এখানে কিছুই চলতে পারে না।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকাগুলি ঘুমুচ্ছে—প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত।

কি শান্ত, কি সুন্দর এই স্তব্ধ নীরব পৃথিবী,
নিদ্রিত আত্মার মত।

[ক্রমশ।

লোকালয়ের একধারে বট অশ্বত্থ কুঁচলে গাছের জটলায় মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচু মন্দিরের চূড়োটা—সিন্দুরমাখানো লাল ত্রিশূল অন্ধকারে ঢেকে গেছে—ওপাশে একটা কাঁদর; ছ'দিকে ঘন আঁধারমাখা বিষকরমচা—তমাল—আমগাছের ভিড়, নীচেকার জমিতে সেঁয়াকুল বৈঁচির ঘন ছোপ—ছ' একটা শিয়াল এদিক-ওদিকে খুবলে কি খাচ্ছে। মাঝে মাঝে ধকধক করে নীল আগুনজ্বালা চোখ। কি খুঁজে ব্যর্থ হয়ে চীৎকার করে—হয়া—হয়া! হুক্কি-হয়া।

নৈশ অন্ধকারে—দিকদিগন্তে ওই আর্তনাদটা কেঁপে কেঁপে হামিরহাটীর ঘন শালবনের দিকে মিশে যায়। ওই পাশে অশ্বত্থ গাছের নীচে ধিকি ধিকি জলছে কাঠের গুঁড়ির আগুন—আশেপাশে স্তূপাকার ছাই জমেছে। সামনে বসে আছে বাবা ত্রিকালনাথের দেবাংশী কালভৈরব কালানন্দ বাবা, মাথায় একটা জটের স্তূপ—চোখ ছ'টো গঞ্জিকার প্রসাদে 'করমচার' মত রক্তবর্ণ। গর্জন করে ওঠে—আবার এসেছিস মাগী?

এই মধ্যরাত্রে মহাশ্মশানে কেউ আসে না। বহু যাত্রী সমাগম হয় দিনের বেলায়। জাগ্রত দেবতা পাতালফোঁড় শিব ওই ত্রিকালনাথ! মন্দির—নাটমন্দির—দখলম সব ভিড়ে ভরে যায়, দরদালানে টাঙান বিশাল ঘণ্টা বাজে ভক্তদের হাতের টানে ঢং-ঢং-ঢং!

মাঠ—বনসীমা—কাঁদরের জল কেঁপে ওঠে। গরুর গাড়ী করে আসে ছেলে-মেয়ে—বৌ-ঝিদের দল; বাঁকুড়া সদর থেকে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে হানা দেয় সরকারী কর্মচারী—মাড়োয়ারী গদিয়ানের দল। বাবা ত্রিকালনাথের জাগ্রত মহিমার কথা সবাই জানে। তারই দেবাংশী ওই সিদ্ধপুরুষ কালানন্দ।

কিন্তু মেয়েটা নাচায়. এককালে যৌবন ছিল—আজও অভাব অনটন দুঃখের জের টেনেও যেতে যেতে রয়ে গেছে সেই উজ্জ্বল স্রোতের কিছুটা। বহুদিন আগেই একটা খুনখারাপির মামলায় ফেঁসে মরদটা ভেগে গেছে—তারপর থেকেই সুরু হয়েছে ওকে নিয়ে কাকশিয়ালের ছেঁড়াছিঁড়ি। রতনমণি অবশ্য তার বিনিময়ে কিছু মূল্য পেয়েছে। সেই অভাব আর নেই—এখন কিছু জোতজমির মালিক, ঘরে ছ'টো ধানের কড়কড়ে মরাই বাঁধা। গায়ে ছ' চারখান গহনাও করেছে। এ এলাকার ধনী জমিদার থেকে সুরু করে ছত্রী দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দাররাও তার হাতধরা। হঠাৎ সেই রতনমণির কি যেন ধর্মে মতি হয়েছে, কালানন্দের কাছে দীক্ষা নেবে; গুরু কৃপায় যদি হারানো স্বামীর সন্ধান পায়। এত বকা ঝকা—গালি গালাজেও থামে নি মেয়েটা, জোড়হাত করে ধুনির সামনে বসে আছে।

—তুমি ইচ্ছা করলেই পারো ঠাকুর! বলে দাও কেনে—সেটা বেঁচে আছে কি না?

ওর দিকে চেয়ে আছে কালানন্দ, মিটি মিটি আগুনে লালচে হয়ে উঠেছে রতনের পুরুষ্ট মুখ—নধর দেহ। কেমন যেন ঝিমঝিম করে ওঠে সারা মন।

—ব্যোম! ব্যোম!··হাতের কলকেটায় ধুনি থেকে একচিমটে লাল আঙরা তুলে বেদম টান দিয়ে চিত্তশুদ্ধি করবার চেষ্টা করে।

—যা, পরে দেখবো।

রতনমণি চলে গেল হেলে দুলে; আজও ওর দেহের সেই মত্ততাণ্ডব নিঃশেষ হয় নি। এখনও ধুনির আগুনের মত ধিকিধিকি বুকজ্বলা নেশার আগুন রয়েছে ওর বুকে।

চক্রবর্তী-দের জমিদারীর অন্তর্গত ওই ত্রিকালনাথ শিব।

জমিদারী গেছে—ওই ত্রিকালনাথের মন্দিরের আয় থেকেই টিমটাম করে চলতো—শনি-মঙ্গলবারে যাত্রী সমাগম হয় বেশী; নাটমন্দিরের মাঝখানে ওইটুকু ছায়াঘন গাছের প্রাচীর ঘেরা; জলের সঙ্কর রয়েছে একটা মস্ত দীঘি। জোড়জোড় করে হাট বসিয়ে ফেললো চক্রবর্তীরা। সপ্তাহে দু'দিন, যাত্রীরা পুজো দিতেও আসে হাট করেও নিয়ে যায়; রথ দেখা আর কলাবেচা দুইই হয় একসঙ্গে। ক্রমশ দু'টো পয়সা আয় বাড়ছে। এমনি দিনে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লো ওই জটাজুটধারী ভৈরব। রক্তবাস পরণে—কপালে মোটে সিঁদুর মাখানো; হাতে ঝনঝন্ বাজে ত্রিশূল আর চিমটে—বাহুতে গলায় একরাশ মালা—রুদ্রাক্ষ; গম্ভীরার কাছে ঝোপের জঙ্গলের মধ্যে ছড়ানো মাটির ঘোড়া—হাতী—ধর্মরাজের থানে; গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে—জয় ভৈরব শিব শম্ভু, ত্রিকালনাথ কী জয়।

একে সন্ন্যাসী—তায় শ্মশানচারী বামাসাধক; লোকজন ভিড় করে ওঠে চারিদিকে। হাটুরেরা মজা দেখতে এসেছে তিন চার কোশ দূর থেকে। লোকজনের কোলাহলে ওই হাতি ঘোড়ার ভিড় ঠেলে ঝুঁচলে গাছ থেকে বের হয়ে পড়ে একটা কালো মিশমিশে পুরোনো কেউটে সাপ; হিস্ হিস্ শব্দে চারিদিক ভরে ওঠে, হৈ চৈ কলরব পড়ে যায়—যে যেদিক পারে দৌড়ে চিবি-গম্ভীরা থেকে নেমে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অত্যাশ্চর্য দৈব মাহাত্ম্য দেখতে থাকে জোড়হাত করে। মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি দেয়, আর্তকণ্ঠে, জয় বাবা ত্রিকালনাথ!

সাক্ষাৎ ভৈরব বের হয়ে এসেছেন গম্ভীরা থেকে—মহাপুরুষকে দেখতে।

সাপটা দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ফণা তুলে বাতাসে দোল খাচ্ছে—ওদের কলরব দেখে সে যেন থমকে গেছে। সন্ন্যাসীও নড়ে নি—ঠায় বসে ওর দিকে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে চিমটে নেড়ে হাঁক পাড়ে—আও আও ব্যাটা।

…কি ভেবে পালাবার পথ সাফ দেখে সাপটা আস্তে আস্তে আবার তার আস্তানায় ফিরে গেল। ওদিকে লোকে লোকারণ্য; হাটের কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গেছে—গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে লোকজন বৌ-ঝিরা, দুধ গঙ্গাজল নিয়ে। বাবা ত্রিকালনাথ সাক্ষাৎ হয়েছেন—সাপের রূপে। সেবাইত চক্রবর্তীরা এসে পড়েছে। সামান্য একটা ঘটনা—দৈব মাহাত্ম্যে ফলাও হয়ে ওঠে।

—বাবা নিজের সেবাংশীকে দেখে গেল বটে।

—জাগ্রত মহাপুরুষ!

দলে দলে সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কে ইতিমধ্যে একঘটি জল এনে বাবার পা ধুইয়ে দিয়ে চুল দিয়ে পা মুছে নিয়েছে।

ধুলো আর নেই—বাবার পায়ের কাদা নেবার জন্যেই এত হৈ চৈ।

জোড়হাত করে চক্রবর্তী মশায় অনুরোধ করে—দয়া করে থেকে যান। বাবার সেবা পুজ—

উঁহু, অবধূত আমি, পুজা-দীক্ষা আমার দেওয়া নিষেধ। তবে শ্মশানে থাকতে পারি। মাঝে মাঝে আসবো থানে—পাগলাকে দেখতে।

চক্রবর্তীরা ঐ শ্মশানে বাবার জন্য একটা চালা বানিয়ে দিয়েছে, গোটাকতক মড়ার মাথা এনে রীতিমত আসন গড়ে তুলে অধিষ্ঠান হয়েছে কালানন্দবাবার। শনি, মঙ্গলবার গম্ভীরার সামনে বসে—চাল, কলমূল, মণ্ডাও জমা হয় স্তূপীকৃত হয়ে। গরীবের দেশ, কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধা মুছে যায় নি।

—বাবা, চার বছর হল ছেলেপুলে হয় নি।

কালানন্দ গাঁজায় বুঁদ হয়েছিল, জবাব দেয়—মানসিক করে বটগাছে ঢিল বেঁধে দিয়ে যা—দেখিস বাবাকে যেন ফাঁকি দিস না।

—হেঁই বাবা গো সে কি কথা! জিব কাটে, নাকে খৎ দেয় মেয়েরা।

উপরি রোজকার সবই পড়ে থাকে—বাবা দ্বিপ্রহরের সময় উঠে যায়, মেজ-চক্রবর্তী ধামাভর্তি করে জিনিষগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়, নগদ টাকা সিকেও পড়ে মন্দ নয়।

শিরোমণি মশায় সেদিন চক্রবর্তীদের বৈঠকখানাতেই বলে বসে—ও আস্ত ভণ্ড, কোনই বিভূতি নাই। তন্ত্রমন্ত্র ই বা জানে কি!

চাকলার লোক যাকে মেনে নিয়েছে তাকে হেনস্থা করা সম্ভব নয়; শিরোমণিও ব্রতী ব্রাহ্মণ; করণ কারণ জানেন। কেমন একটা সন্দেহও জাগে অনেকের।

মহাধুমধামে দুর্গোৎসব করে চক্রবর্তীরা, বহুলোক সমাগম হয়। গম গম করছে পুজামণ্ডপ, একধারে কালানন্দের আসনও হয়েছে। শিরোমণি মশায় ঘটস্থাপনা করছেন। কালানন্দও টের পেয়েছে তাকে প্রাধান্য পেতে হলে শিরোমণির স্বীকৃতি চাই; তন্ত্র বিষয়ে কিছু কিছু শুনেছে সে। বাংলার আদিমযুগ থেকে ধর্মের এই বিকাশ কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। বৌদ্ধধর্মের সহজ-যান বজ্র-যান রীতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। লোকায়ত ধর্ম-কর্মের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই দর্শন। বক্রেশ্বর শ্মশানে গিয়ে প্রথম আশ্রয় নিয়েছিল অতীতে; নিজেকে লুকোতে চায়; রহস্যময় এই তন্ত্রসাধনা লতাসাধনার মধ্যে নিজের পরিচয় নিঃশেষ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল—আজ মাঝে মাঝে জেগে ওঠে সেই নিষ্ঠুর পিশাচ—তন্ত্রসাধনার পৈশাচিক রীতির মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রাখতে চায় কালানন্দ।

হঠাৎ বাধা দিয়ে ওঠে—

ষটত্রিংশত্তা পটৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্।

বহিঃ পঙক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তি যুগ্মেন বীথিকা॥

ছত্রিশটি ঘরের বাইরের একপংক্তিতে পীঠ, তারপরের দুই পংক্তিতে বীথিকা—ওই বীথিকার নাম কল্পলতিকা—সর্বতোভদ্রমণ্ডল যন্ত্র ঠিক হয় নি শিরোমণি মশায়।

চণ্ডীমণ্ডপভর্তি লোক—চক্রবর্তীরা সকলেই উপস্থিত। শিরোমণি মশায়ও থমকে যান—ঠিকই! তাঁর ঘটস্থাপনের যন্ত্র ঠিক হয় নি।

কালানন্দ ভৈরব বলে ওঠে—বিষ্ণুসাধক আপনারা—এ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যন্ত্র আপনাদের হওয়া সম্ভব নয়।

কালানন্দ বলে চলেছে—

ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলীনিভব—

পর্ণং বনস্পতেনুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।

শিরোমণি একবার মুখ তুলে চাইলেন কালানন্দের দিকে—

ভস্মমাখা গা—চোখ দু'টো লাল। একটা থেরোমদের টক-টক গন্ধ ···আর্বৈত্তর মন্ত্রের মূর্তিমান রূপ···

হঠাৎ একখানা গাড়ী এসে থামল। সদরে হৈ-চৈ পড়ে যায়। বাঁকুড়ার কোন পদিয়ান মাড়োয়ারীর একমাত্র কন্যা মর-মর। দৈব অনুগ্রহে যদি বাঁচান যায়, কোন এক মহাসাধক আছেন এখানে, তাঁরই সন্ধানে এসে হাজির হয়েছে।

সারা গ্রামাঞ্চলে বিভূতি তন্ত্রমন্ত্র সাহায্যেই হোক—আর আপসেই হোক কোন কার্য সিদ্ধ হলেও নাম-ডাক নেই, সহরের উকিল—ব্যবসায়ীমহলে তার কিছুমাত্র হলেই কার্য সিদ্ধি।

—চলিয়ে বাবা। গোড়পড়ি মহারাজ।

লাখোপতি মাড়োয়ারীর পাগড়ি খসে গেছে—বিশাল ভুঁড়ি বের হয়ে থলথল করছে। হাঁড়ির মত গোমরা মুখ ভেসে চলেছে চোখের জলে। কালানন্দ কি ভাবছে। চক্রবর্তী মশায় সন্ধানী লোক—কপিলদেব মাড়োয়ারীর কার্য সিদ্ধ হলে তারও উপকারের আশা আছে। সে-ই বলে ওঠে—যাও না বাবা।

—আমি গিয়ে কি করবো, সেই ভাংটো বেটি কি শুনবে? বহু পাপ করেছে শেঠজী।

—তুমি বললে তার ঘাড় শুনবে। ভক্তদের কে বলে ওঠে।

অগত্যা যেতে হল। সাতখানা গাঁয়ের লোক—শিরোমণি মশায় আজ অবাক হয়ে ওই শ্মশানচারী তান্ত্রিকের বিভূতি দেখছেন।

চাকাটা চালানোই আসল কথা। ভাগ্যের চাকা যখন একবার চলে যায় তখন ছোট-খাটো বাধা আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়।

কালানন্দ রাতের অন্ধকারে ধুনির আগুনের তাপে বসে ভাবছে। এমনি শীতের হাড়কাঁপানো রাতে জটেশ্বর শ্মশানে পড়েছিল; খাবার জোটে না—গাছের তিতকুটে পাকা বেল খেয়েই কাটাতো; এমনি দিনে এসে জুটেছিল এক দোসর—ঘরপালানো ছুঁড়ো বৌ। আগুনের খাপরার মত রূপ—তেমনি বেবশ করা চাউনি।

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ
মকার পঞ্চমং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম।
মকার পঞ্চমং দেবি দেবানামপি দুর্লভং
মদ্যৈর্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈর্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি।
প্রীতিসার্দ্ধং মহাসাধুরচেৎ জগদম্বিকা
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে খণ্ডিতা সুরৈঃ।

গুরুদেবের বিধানে পঞ্চ'ম'কারের সাধনায় মেতে উঠেছিল।

শীতের হিমকণাচালা রাত্রি আজও নেমে আসে। জীবনে আজ মনে হয় এতটা পথ বে-হিসেবীর মত চলেছে—কি তার দাম।

পরক্ষণেই চোখের উপর ভেসে ওঠে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থ। ইচ্ছা করলে দু' পাঁচশো এখনই পেয়ে যায় সে—নারী-মাংস শ্মশানের মহামাংসের চেয়েও সহজলভ্য। সেদিন বাঁকুড়ার মাড়োয়ারী মেয়ে এমনিতেই সুস্থ হয়ে উঠেছিল চিকিৎসার গুণেই : ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে।···

গাড়ীভর্তি ফল—জিনিষপত্র—টাকা—অঢেল ভক্তি, প্রণাম সবই পেয়েছে সে। কিন্তু কোথায় তবু এই হাহাকার।

—ঠাকুর।

রতনমণি উবু হয়ে বসে আছে, চারিদিকে স্তব্ধতা। শীতের শুকনো বাতাসে ঝরে গেছে পাতাগুলো; ন্যাড়া-মুঁড়ো গাছগুলো বাতাসে ঠক-ঠক করে কাঁপছে—কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাখী; একটা শিয়াল দূর থেকে নীল চোখ মেলে তাদের দিকে চেয়ে আছে—শিমুলগাছের মাথায় একটা শকুন-বাচ্চ কাঁদছে চিঁ চিঁ করে।

—একটি মুহূর্ত।···কালানন্দ ঠাকুর কেঁপে উঠেছে। আকাশ বাতাসে ঝড়—মদের তীব্র নেশা বিহ্বল করে দিয়েছে তাকে।

—রতন।

সাড়া দেয় না স্বৈরিণী; এমনি করেই কতবার কত রাত্রে কত চেনা অচেনা কণ্ঠে ডাক শুনে এসেছে এতদিন। আজ এ ডাক তাকে অতীতের ফেলে আসা রাতের কথা মনে করায়. প্রথম যৌবনের নেশাভরা কত ফুলঝরা রাত্রির স্বাদ আনা এই আহ্বান।

···রতন উঠে বের হয়ে গেল শ্মশানের ও-মাথায় কাঁদর পার হয়ে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সন্ন্যাসী গলায় কাছে বোতলের তলানিটুকু ঢেলে বসলো—দূরে কাদের হরিধ্বনির শব্দ শোনা যায়।

বল হরি—হরি বোল।

কেউ আবার এগোল বোধ হয়।

—বাবা!···

শ্মশানভৈরবের ভোগ বাবদ দু'টো কালীমার্কা বোতল নামিয়ে দিল। সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কালানন্দ ওই দিক পানে আঁধারে কি দেখতে থাকে—সাবধানী রতনমণি—অনেক আগেই মরা কাঁদর পেরিয়ে চলে গেছে। আঁধারের রহস্য আঁধারেই ঢাকা থাক।

শূন্য মন্দির পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কালানন্দ ঠাকুর জাঁকিয়ে বসেছে—ত্রিকালনাথের মন্দিরের সামনে বিশাল নাটমন্দির উঠছে। কালানন্দ বাবা নিজে বের হয়েছে মাগুন করতে—মাড়োয়ারী মহল দিচ্ছে মোটা খরচ; সিমেন্ট—লোহা সব এসে পড়েছে। ফাঁকা জায়গাতে হাটতলায় জমাট দোকান বসেছে—রম রম পশার। ত্রিকালনাথের শেওলাপড়া কালো মন্দিরের রং ফিরেছে।

সাদা চুনকাম-এর রং লাল গেরুয়া ডাঙার সীমায় গাছ গাছালির বেড়া টপকে সোজা আকাশে উঠেছে। ঝকঝক করছে পিতলের নূতন কলস। দূরদূরান্তর থেকে যাত্রীদল আসে—বাবার নোতুন নাটমন্দির উঠছে।

ভিখনলাল শেঠ বলে কালানন্দ বাবাকে—আপনার একটা মকান তুলে দিই বাবা?

হাসে কালানন্দ—আমাদের শ্মশানই ভালো শেঠজী; পাগলা বেটি আবার রাগ করবে।

হা হা করে হাসতে থাকে শেঠজী—ত্যাগী মহাপুরুষের মতই কথা। সমবেত ভক্তগণও সেটা স্বীকার করে, অন্তত লাখোপতি সুতাকলের মালিক শেঠজী বাজে কথা বলতে পারে না।

চাকাটা চলছিল বেশ—হঠাৎ কেমন যেন ঠেক খেয়ে আটকে গেছে অতর্কিতে অতল পাঁকের গর্তে। ওরা চিরকালই পথ আটকে দাঁড়িয়েছে মহাকালের রথের চাকার নীচে ও পড়েছিল—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাপথ ওরা রোধ করেছিল ওই চাকার নীচে পেলব কোমল দেহ মেলে দিয়ে।

··বর্ষার ধারা নেমেছে আকাশে। জনহীন হয়ে গেছে ত্রিকালনাথতলা, ওদিকে দোকানের আলো নিভে গেছে। শ্মশানের শিমুলতলায় ধুপড়ীতে বসে আছে কালানন্দ। মদের নেশায় চুর হয়ে রয়েছে। ধক ধক করে জ্বলছে দু'টো চোখ কি এক পৈশাচিক বিভীষিকায়, ধুনির আগুনে গুঁড়িটা জ্বলছে—টকটকে আঙরায় ভরে উঠেছে গর্তটা। ওপাশে চালের বাতায় ঝুলছে একটা মহাশঙ্খ পাত্র, কে জানে কার মাথার খুলি—

হয়তো কোন চণ্ডালের খুলি—শব সাধনার সেরাই পাবার বস্তু। দমকা বাতাসে ঠক্-ঠক্ করে নড়ছে বাতার সঙ্গে।

রতন বলে ওঠে—উপায় কর ঠাকুর। যা হয় বিহিত করো।

গর্জে ওঠে কালানন্দ—আমি কি করবো—নষ্টামাগী কোথাকার। সাত ঘাটে জল খেয়ে বেড়াস। পেটের কাঁটা কোথায় এনেছিস—

রতন দপ করে জ্বলে ওঠে, স্বৈরিণীর দু' চোখে ওই ধুনির টকটকে আগুনের আভা। সব সইতে পারে অপমান অবিশ্বাস সইতে পারে না সে, বিশেষ করে ওই হীন ভণ্ডামি।

—থামো ঠাকুর। তুমি কে তা আর কেউ না জানুক আমি জানি। চাঁদপুরের মিত্তন ঠাকুরকে আমি পয়লা নজরেই চিনেছিলাম। ভেবেছিলাম এতকাল সাধুগিরির ভেক নিয়েছো বোধ হয় নষ্ট স্বভাব ঘুচেছে তোমার—পুণ্যও কিছু রোজগার করেছ। তাই এসেছিলাম তোমার কাছে। কিন্তু সেই পাপীই রয়ে গেছো চাইলে বাতাসীকে···

—চোপ! গর্জন করে ওঠে কালানন্দ। চারিদিকে একটা আকাশ কাঁপানো শব্দ। একটা তীব্র আলো ঝলসে ওঠে। কোথায় বাজ পড়লো।

অতীতের কথা। চাঁদপুরের বাউণ্ডুলে মিত্তন—কালানন্দের জঘন্য অতীত পরিচয় আজ প্রকাশ পেলে এক মুহূর্তে তার সম্মানের আসন ধুলোয় মিশিয়ে যাবে। পুলিশ কেস আবার জিইয়ে উঠবে। ফেরারী খুনী আসামী মিত্তন ভটচাযকে পুলিশ আবার হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে—ভিখনলাল শেঠ—মুকুল সারোগী—চক্রবর্তী বাবুরা—শিরোমণি মশায়ের মুখখানা মনে পড়ে—হাজারো জনতার ভক্তি শ্রদ্ধা!···সব চিন্তা তার গুলিয়ে আসে—মাথাটায় আগুন জ্বলছে। সামনের বোতলটা তুলে নিয়ে গলায় ঢালতে থাকে গল্ গল্ করে। রতন সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে।

—চল পালাই কোথাও ঠাকুর। তোমাদের ভৈরবী রাখা চলে, আমি'না হয় এই বয়সেই তোমার সাথী হই। এটাকে—

···আবছা আলোয় কালানন্দ ওর জামাখোলা বুক-দেহের দিকে চেয়ে থাকে। মাতৃত্বের স্পর্শ ওর সারা দেহে—পুরুষ্ট হয়ে উঠেছে সুগৌর বুক, কালো দাগ পড়েছে বৃন্তে—নিটোল মোমমাজা দেহে পূর্ণতার ছোঁয়া, কি যেন এক নেশার ঘোরে তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে; এতদিনের দুশ্চর সাধনা ভুলতে বসেছে কালানন্দ।

কোথায় বাজ পড়লো বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে। একটা অত্যুজ্জ্বল আলোকশিখা কেঁপে উঠে মিলিয়ে গেল অসীম শূন্যে।

···কালানন্দের মনে আগুন জ্বলছে। অতীতের এমনি বৃষ্টিঝরা রাতে ঘটেছিল কাণ্ডটা—হ্যাঁ, বাতাসীও অমনি বর্ষার নদীর মত চলনামা রূপের স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার স্বামী।···একটি মুহূর্ত! চোখের সামনে অতীতের ব্যবধান ভেদ করে আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। একটা অস্ফুট

আর্তনাদ··ধারাল ছুরির ফলাটা আমূল গেঁথে গেছে—হাত ভিজে উঠেছে উষ্ণ তাজা রক্তে।

মিত্তন ভটচাব হাঁপাচ্ছে—চমকে ওঠে বাতাসী।

—খুন করে ফেললি!

···আজও সেই উষ্ণ রক্তমাখা অনুভূতি তার শিরায় মাতন আনে।

—ঠাকুর! রতনের দু' চোখে একটা প্রতিহিংসা। আজ ওর হাতে পড়েছে কালানন্দ ঠাকুরের জীবনের সব চাবিকাঠি। একমুহূর্তে তাকে গৌরবের উচ্চ চূড়া থেকে টেনে ধূলোয় নামিয়ে দিতে পারে। একদিকে ওই স্বৈরিণীকে নিয়ে কামনালোলুপ ঘৃণ্য জীবনের বোঝা বওয়া—অন্যদিকে সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি। নিত্য নতুন ভোগের উপকরণ, কত সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুরচারিণীদের সেবা উপচার;

বৃষ্টি একটু ধরেছিল, আবার নেমেছে পুরোদমে। কোথাও জনমানব নেই, কাঁদরের জল থৈ থৈ করছে—তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে।

—রতন!

উষ্ণ আবেশে এগিয়ে আসে রতন, আজ নিজেকে ধরা দিতে বাধা নেই। হাঁপাচ্ছে রতন ওর বলিষ্ঠ বাহুর নিষ্পেষণে। গলার কাছে টিপে ধরেছে শয়তান। ধক্ ধক্ করে জ্বলছে কালানন্দের দু'টো চোখ, মৃত্যু-হিংসার করালছায়া-মাখানো সে দৃষ্টি। চমকে ওঠে রতন—এই তার শেষ আলিঙ্গন। ছটফট করছে অসহ্য যন্ত্রণায়, দম বন্ধ হয়ে আসছে। জিভটা ঝুলে পড়েছে। দাপাচ্ছে পা দু'টো ছুঁড়ে মাটিতে—দু' হাতে কণ্ঠনালী টিপে চলেছে জীবন্ত মৃত্যুদূত। একটু বাতাস, একটি নিঃশ্বাস থেকে বঞ্চিত হতে চায় না রতন! সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে যায়। স্থির হয়ে আসে সারা দেহ—দরদর করে ঘেমে নেয়ে উঠেছে কালানন্দ। ছেড়ে দিতেই প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে যায়।

বাইরে শন্ শন্ করে চলেছে বাতাস-বৃষ্টির ধারা। কাঁদরের অথৈ জল নেচে চলেছে দিগন্তের দিকে দামোদরের পানে···একবার দামোদরে গিয়ে পড়ে যদি আর কোন ভয় নেই।

—ছপ ছপ শব্দ!···চমকে ওঠে কালানন্দ।···অজানা আতঙ্কে সারা শরীর হিম হয়ে আসে।···একটা শিয়াল সিঁয়াকুল ঝোপ থেকে নীল আলোমাখা চোখে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। বুকের গ্রাসটা নিয়ে সন্ন্যাসী জলে নেমে ঠেলে দিল মাঝ কাঁদরের স্রোতে।

পিছন ফিরে চাইল না একবার। সারা গা হাত পা ঝিমঝিম করছে।

স্বৈরিণীর অন্তর্ধান। অর্থাৎ আর কেউও ভেগেছে তার সঙ্গে। ক'দিন এ নিয়ে আলোচনাও চলে। পুলিশ এদিক ওদিক খোঁজে। ক'টা দিন নিরাপদেই কেটে গেল। দেহটা বিনা বাধায় গিয়ে দামোদরেই পড়েছে। বেঁচে থাকতেও শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে খেয়েছিল তাকে, মরে গিয়ে তাদের খাদ্য হয়েই নির্মূল হয়েছে।

নোতুন নাটমন্দির শেষ হয়ে গেছে, দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে হাজারো ভক্তের দল। মন্দির অবধি পাকা সড়ক হয়ে গেছে। গাড়ী হাঁকিয়ে এসেছে ভিকনলাল—সরৌগী—সদর থেকে উকিল, গণ্যমান্য অনেকে চক্রবর্তী মশায় কালানন্দ ভৈরবের গলায় পরিয়ে দেয় পঞ্চমুখী রক্তজবার মালা।

সমস্বরে জনতা জয়ধ্বনি দেয়—বাবা ত্রিকালনাথ কি জয়। কালানন্দ ভৈরব জনতার উদ্দেশ্যে হাত তুলে আশ্বিবচন জানায় মুখে ওর মৃদুমন্দ হাসি।

রতনমণির কথা সবাই ভুলে গেছে।

প্রতীপ চারিত্র

শ্রীসুললিতমোহন গোস্বামী

সূর্যের তাপস মুখ আরক্তিম প্রহর উত্তাপ
প্রদাহের মরুভূমি, পিপাসার্ত প্রকৃতর বুক
সূর্যমুখী নিষ্পলকা, আতপের নির্বোধ সন্তাপ
শ্রমক্লান্ত বলিষ্ঠতা অযুক্ত রয়েছে উন্মুখ।

অকণিত দৃষ্টিরাগ প্রাখর্যের পর্যাপ্ত ধারায়
উত্তাপিত। ধূপান্বিত গতিবেগ পুনঃ শতশ্চল
ধমনীতে শক্তিবোধ অচিন্মান আয়ু ইশারায়
জ্যোতিস্নানে সুপ্তিভঙ্গ স্ফূর্তি পায় নিতান্ত নিশ্চল।

পাষাণ কঠিন বুক তবু স্নিগ্ধ ঝরণার গানে
নিমীলিত ধ্যানমতি প্রাণায়ামে সূর্যাদয় আলা
গ্রহণে ধারণে স্থির, বিভাসিত আলোক আঘ্রাণে
রক্তাভ মলিন মুখে প্রাচুর্যের পূর্ণ প্রাণ ঢালা।

সূর্যের তাপস মুখ কর্মব্রতী তপস্যা সকল
অগ্নিবিহঙ্গ—প্রতীক রৌদ্ররাগে অত্যুতি চঞ্চল।

স্মৃতি

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

হাওয়ায় গোপন ফুলের গন্ধ
উতল করছে মন,
চাঁদের আলোর চন্দন মেখে
নাচে দেওদার বন।

সময় এখানে যেন শরতের
স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী,
বাজে বুকে তার বুঝি বা প্রিয়ার
কাঁকনের কিঙ্কিণী।

হারানো দিনের সুখের পরশ
দোলা দিয়ে যায় বুকে;
আকাশের বুকে চৈতালী চাঁদ
হাসছে সকৌতুকে॥

বিজ্ঞান বার্তা

রক্ত ও জীবন

শ্রীনরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন মানুষের রক্ত আর একজনের শরীরে দেওয়া আজকালকার চিকিৎসায় হামেশাই লক্ষ্য করা যায়। রক্ত দেওয়া খুব সাধারণ ঘটনা বলে মনে হলেও আসলে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ অবাক হওয়ার মতো, মরতে চলেছে এরকম লোককে রক্ত দিয়ে বাঁচানো যায়। আবার কোন রুগীকে অপারেশান করার প্রয়োজন হলে নতুন রক্তের সাহায্যে খুব কম ঝুঁকি নিয়েই অপারেশান করা যায়। এ সবের চাইতেও আশ্চর্যজনক ঘটনা বোধ হয় রক্তশূন্য বা দূষিত রক্ত কচি শিশুকে নতুন রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া।

যুদ্ধের পর থেকে রক্তশূন্য রুগীর সংখ্যা ও চিকিৎসার জন্যে ব্যবহৃত রক্তের পরিমাণ দুই-ই বেড়ে চলেছে। প্রত্যেক বড় হাসপাতালেই রুগীদের দিনরাত রক্ত দেওয়া হয়। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে The National Blood Transfusion Service বা জাতীয় রক্তপ্রদান সংস্থার কাজও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই সংস্থার আয়তন আরও বাড়তে বাধ্য, কারণ হাসপাতালে রক্তের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। তাছাড়া হঠাৎ দরকার হতে পারে এ কথা ভেবেও কিছু রক্ত সব সময়েই মজুত করে রাখা দরকার। রুগীদের শরীরে যে হারে রক্ত দেওয়া হয় তাতে প্রতি মিনিটে দু'জন লোকের রক্তদান করার প্রয়োজন হয়।

এবারে দেখা যাক রক্ত জিনিষটা কি? পৃথিবীতে এমন কিছু আর নেই যা রক্তের কাজ করতে পারে। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যে মানুষই একমাত্র রক্তদান করতে পারে। এককোঁটা রক্তে পঁচিশ কোটি লোহিতকণিকা, চারলক্ষ শ্বেতকণিকা এবং দেড় কোটি Platelet নামে একটি রাসায়নিক জিনিষ থাকে। এ সবগুলোই Plasma নামে একটা ফিকে হলুদ তরল পদার্থের ভেতর ভেসে বেড়ায়। রক্তের লাল কণিকাগুলো ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়; সাদা কণিকাগুলো রোগের জীবাণু নষ্ট করে আর Platelet-এর কাজ হচ্ছে, শরীরের কোথাও কেটে গেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে রক্ত জমাট বেঁধে দেওয়া। Plasma-ই রক্ত কণিকা ও অন্যান্য রাসায়নিক জিনিষ শরীরের সব জায়গায় বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

প্রত্যেক সুস্থ লোকের রক্তে এই উপকরণগুলো থাকা সত্ত্বেও যে কোন লোকের রক্ত কিন্তু যে কোন রুগীকে দেওয়া যায় না। রুগীর শরীরে যে ধরণের রক্ত আছে, তাকে শুধু সেই ধরণের রক্তই দেওয়া যাবে। রক্তের এই বিশেষ ধরণ নির্ভর করে Blood group বা রক্তের শ্রেণীর ওপর। রক্তের শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: A, B, AB এবং O। এগুলোর প্রত্যেকটাই আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, Rhesus Positive ও Rhesus Negative-এ। রুগী যদি তার বিশেষ শ্রেণীর রক্ত না পায় তাহলে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে এ জন্যে রুগীর শরীরে রক্ত দেওয়ার আগে সেই রক্ত খুব ভাল করে নানা রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দেখা হয়। শরীরে দেওয়ার আগে রক্ত অন্তত তিন সপ্তাহ রেখে দেওয়া যায়। এর ভেতর ব্যবহার না হলে রাখার সুবিধের জন্যে রক্তকে Plasmaয় পরিণত করে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে রাখা হয়।

রক্ত কি করে প্রাণ বাঁচায় এবারে সে-কথা আলোচনা করা যাক। অনেক ক্ষেত্রে রক্ত দেওয়া চিকিৎসার একটা প্রধান অংগ। যারা দুর্ঘটনায় আহত হয় অথবা পোড়া, রক্তক্ষয় ও রক্তের অভাবে ভোগে তাদের এবং সন্তান হওয়ার পর অনেক মায়েদেরও রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। রক্ত দেওয়ার দু'টো প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল:

প্রথমত, রক্তক্ষয় হলে অথবা শরীরে যখন যথেষ্ট লাল কণিকা তৈরী হচ্ছে না অথবা লাল কণিকাগুলো যখন তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন নতুন রক্ত প্রয়োজনীয় লাল কণিকা জোগায়। প্রায় রক্তশূন্য সদ্যোজাত শিশুকেও নতুন রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে সবল করে তোলা যায়। রোগের গুরুত্বের ওপর রক্ত দেওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে; শিশুর ক্ষেত্রে কয়েক আউন্সই কাজ হয়। আবার খুব জটিল রক্তশূন্যতায় হয় তো কয়েক বছর ধরে সমানে রক্ত দিয়ে যেতে হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদি শুধু Plasma নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তা'হলে রক্ত দিলে Plasmaরও ক্ষতিপূরণ হয়। সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে গেলে বা আহত হলে Plasma নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রক্তটা ঘন হয়ে গিয়ে রক্ত চলাচল আস্তে আস্তে হয়। তাই শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগও অনেক কম অক্সিজেন পায়। এ-ক্ষেত্রে Plasma রক্তটাকে গুলে পাতলা করে দেয়। তখন রক্তও আগের মত চলাচল শুরু করে। খুব কঠিন ক্ষেত্রে রুগীদের কুড়ি বোতল পর্যন্ত Plasma-র দরকার হতে পারে—অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোকের দান করা রক্তের পরিমাণের সমান। রক্তের চাইতে Plasma-র প্রয়োজন যেখানে বেশী সেখানে Plasma খুবই মূল্যবান। আবার যখন রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না এরকম জরুরী অবস্থায়ও Plasma খুবই কার্যকরী। আরও সুবিধে এই যে, রক্তের মত Plasma-র শ্রেণী-বিভাগ নেই। যে কোন শ্রেণীর রক্তের ক্ষেত্রেই Plasma দেওয়া যায়।

লক্ষ লক্ষ রক্তদাতার রক্ত গত মহাযুদ্ধের সময় বহু আহতের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই সব অজ্ঞাত নর-নারীর দানের ফলেই জাতীয় রক্তপ্রদান সংস্থার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই সংস্থার কাজ সারা দেশে ১৩টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রগুলির কাজ হচ্ছে রক্ত দান করার লোক জোগাড় করা এবং রক্ত ব্লাডব্যাংকে জমা করে রাখা। এই কেন্দ্র আবার Plasma দেওয়া থেকে শুরু করে রক্তের শ্রেণীবিভাগ করার রসায়ন ও রুগীকে রক্ত দেওয়ার সরঞ্জাম এ সবকিছুই হাসপাতালে সরবরাহ করে। এরা এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ও গবেষণার ব্যবস্থাও করে। অনেক সময় হয় তো একটা খুব বিরলশ্রেণীর রক্তের প্রয়োজন হ'ল। তখন সমস্ত কেন্দ্রের মজুত রক্ত নিয়ে যে কেন্দ্রীয় তালিকা তৈরী হয়েছে, সেই তালিকা লক্ষ্য করলেই জানা যাবে প্রয়োজনীয় রক্ত কোথায় রাখা আছে। স্বাস্থ্য বিভাগের তরফ থেকে Medical Research Council দু'টো প্রধান গবেষণারও পরিচালনা করেন।

প্রথমটির নাম Blood Group Reference Laboratory যেখানে রক্তের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে গবেষণা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে Blood Products Laboratory যেখানে Plasma থেকে কতকগুলো বিশেষ জিনিষ তৈরী হয়। কার্যকারিতা অনুযায়ী যদি তাদের পরিচয় দেওয়া যায় তাহলে প্রথমেই আসবে Thrombin। এটি অপারেশানের সময় বেশী রক্ত পড়া বন্ধের কাজে লাগে। (২) Fibrinogen thrombin-এর সংগে ব্যবহার করা হয় শরীরে নতুন চামড়া জোড়া লাগানোর জন্তে। (৩) Gumma globulin—হাম জাতীয় অসুখ বন্ধ করতে বা তার প্রতিক্রিয়া কমাতে পারে।

স্বভাবতই স্বেচ্ছায় রক্তদান করা ছাড়া এই বিরাট প্রয়োজন মেটাবার আর কোন উপায়ই নেই। কাউকে যাতে বছরে দু'বারের বেশী রক্ত দিতে না হয়, বয়স বা অসুখের জন্তে যাঁরা আর রক্ত দিতে পারছেন না—সেই সব রক্তদাতার জায়গা পূরণ করার জন্তে আরও অনেক নিয়মিত রক্তদাতার প্রয়োজন এদেশে। যাঁরা রক্ত দেবেন তাঁদের বয়স আঠারো থেকে পঁয়ষট্টির ভেতর হওয়া চাই এবং তাঁরা রক্তঘটিত কোনও অসুখে না ভুগে থাকেন এটাও বাঞ্ছনীয়। কবে কোথায় কখন রক্ত দিতে হবে এ-সব আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয় যাঁরা রক্ত দিতে সম্মত হয়েছেন তাঁদের।

সামান্ত দানের বিনিময়ে মানুষের জীবন বাঁচানোর এর চেয়ে বড় সুযোগ আর বোধ হয় নেই।

লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্তে।]

য়ুরোপের বুনো ঘোড়া

রিচার্ড হিবলম্

য়ুরোপে বুনো ঘোড়া আছে শুনলে বেশ আশ্চর্য লাগে। কিন্তু সত্যিই আছে। মদ্দা, মাদী এবং বাচ্চা মিলিয়ে এরা প্রায় দু'শো। এদের মালিক হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর ডুইলমেনের ডিউক অফ ক্রয়। এরা ঠিক বুনো ঘোড়া নয়, কোনকালে এদের পূর্বপুরুষরা হয় তো পোষা ঘোড়া ছিল কিন্তু এখন এরা একেবারেই বুনো এবং এরা যে বুনো সেটা এদের পিঠের হাল্কা ডোরা দাগই প্রমাণ করে। ডুইলমেনের কাছে খোলা মাঠে এই বুনো ঘোড়ার দল আজ প্রায় কমপক্ষে ৬০০ বছর বাস করছে, কেন না ১৩১৬ সালের নজীরেও এদের উল্লেখ আছে। কোথা থেকে যে এরা এখানে এল, তা কেউ জানে না। কিছু ঘাস, কিছু খোলা মাঠ, কিছু জঙ্গল এইরকম ৫৫০ একর মত জমিতে এরা চরে বেড়ায়। শীতকালে যখন বরফ পড়ে এবং ঘাস মরে যায় এদের খাবার জন্তে মাঠে বিচালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই দুরন্ত শীতে একমাত্র অত্যন্ত তেজী ঘোড়ারাই বাঁচতে পারে। সেদিক দিয়ে এই ঘোড়াগুলো অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, তেজী, অনেকদিন বাঁচে এবং বুনো হলেও এদের স্বভাব ভালো এবং সহজেই পোষ মানে। বসন্তের শেষে বছরে একবার বাচ্চা মদ্দা ঘোড়াগুলোকে ধরা হয়। সেই ঘোড়া ধরা দেখবার জন্তে বিশ-তিরিশ হাজার লোক আসে। মদ্দা বাচ্চাগুলোকে না ধরলে প্রজননের সময় ভয়ানক রেষারেষি লেগে যায়, তাই। বন্দী হবার পর তাদের গায়ে ডিউকের প্রতীকচিহ্ন ডবল মুকুট ছাপ দেওয়া হয়। ঠিকমতো পোষ মানালে আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যেই এদের কাজে লাগানো যায় এবং এদের চমৎকার স্বভাবের জন্তে বেশ উঁচু দরে বিক্রি হয়। এই ঘোড়ার পালের উন্নতির জন্তে মাঝে মাঝে পোল্যাণ্ড থেকে ভালো জাতের মদ্দা ঘোড়া এনে এদের বংশবৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়। ঘোড়াগুলোকে যখন ধরা হয়, সে এক দেখার জিনিষ! খুরের শব্দে মাটি কেঁপে ওঠে, সারা মাঠ দৌড়ে চষে ফেলে, হাওয়ায় জট পাকানো কেশর উড়তে থাকে, বাচ্চাগুলো তাদের মায়েদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুতে থাকে। হঠাৎ দেখা যায় সর্দার ঘোড়াটা দল ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু নিষ্ঠুর, কৌশলী মানুষ একসময় তাকে কোণঠাসা করে বন্দী করে ফেলে। সন্দিগ্ধমনে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে এবং শুরু হয় বন্দী-জীবন। তারপর শুরু হয় মানুষের কাছে শিক্ষার পালা যাতে সে মানুষের কাজে পরে খাটতে পারে।

ছায়া ছায়া অন্ধকার থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল অনুরাধা। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে নামল। পঁচিশ পাওয়ারের ময়লা টুলিপরা বাল্বটা ল্যাতুর চোখে তাকিয়ে আছে। থাকুক, এ-চোখের তো দৃষ্টি নেই। লজ্জা কি? কিন্তু কি অদ্ভুত ধারালো লিকলিকে সাপের মত চোখ কেলোদা'র, ঠাণ্ডা আর বিষাক্ত, তাকাতে গিয়ে চোখ নামিয়ে নিতে হয়। ভয়ে অস্বস্তিতে। যখন হাত বাড়িয়ে ছোঁয়, পিঠে আঙুল রাখে, একটু চাপ দিয়ে কাছে টানে, অস্ফুট শব্দ করে হাসে, নিঃশ্বাসের হাওয়ায় উনোন-গরম হয়ে ওঠে অনুরাধা। মাংসের তলায় হাড়গুলোর ভেতর বিজলীর ঝিলিক দেয়। হাপরের মত হাঁপাতে থাকে হৃৎপিণ্ড।

পর্দার ওপাশে হিমানীর ফিসফিস হাসি কান না পাতলেও ঠিক শোনা যাবে। তার সঙ্গে আর কারো মিচু গলার কথা ভেসে না আসুক, বৌদির যে আসবে তাতে ভুল নেই। অনুরাধা যখন চার হাত চওড়া জংলী প্যাটার্নের কোঁচকানো তেল চিটচিটে পর্দা ঘেরা বারান্দার এ-অংশটুকুতে আসে এসে দাঁড়ায় কি তক্তপোশে বসে, হিমানী আর বৌদির ফাজিল উৎসুক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করবেই। অনুরাধা জানে। জানে বলেই কেলোদা'র দিকে আগে সোজাসুজি তাকাতে পারত না। কথার জবাব দিতে গিয়ে স্বর জড়িয়ে যেত, শাড়ির আঁচল আঙুলে পেঁচিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বুকের মৃদু কাঁপন ভুলতে চাইত।

তখন তো বয়েস আরো কম ছিল অনুরাধার। বুদ্ধি এতটা পাকে নি। আর কেলোদা' তখনও সকলের কাছেই কেলো, মিষ্টার টেক্সাস হয় নি। সাহেব সাহেব কায়দা ছিল তখনও, ধুতি বেশি পরতে চাইত না, বাবা কি দাদার পুরনো প্যাণ্ট পেলে খুশি হত। দর্জিকে দিয়ে মাপমত মেরামত করে নিতে কতক্ষণ! চুলের আর গোঁফের এত কায়দা তখনও হয় নি। কিছুটা সরল বোকা ভঙ্গী ছিল, একটু গোঁয়ার গোবিন্দ। সেই কেলোদা' কয়েক বছরে একেবারে বদলে গেছে। চেহারায় যেমন লম্বা হয়েছে, চরিত্রেও ঠিক আলাদা মানুষ। এখন সবাই ডাকে টেক্সাস। আঁটসাট প্যাণ্ট আর সার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। ঠোঁটে প্রায় সবসময়ই বিলিতি সুরের শিস বাজে। মাঝে মাঝে মাউথ অর্গান। চৌরঙ্গী পাড়ার সিনেমা হল-গুলোতে রোজই দুপুরে পাড়ি জমায়। মুখে ইংরেজি বুলির খৈ ফোটে। নামটা কেলোদা' নিজেই পছন্দ করে নিয়েছে। সবাই ডাকে টেক্সাস। এই টেক্সাস, ওই টেক্সাস, হেই টেক্সাস—টেক্সাস, টেক্সাস!

এই নামটা এ পাড়ার প্রত্যেককে শুনতে হবেই।

কিরণকুমার রায়

সকালের শেষবেলায় গলিটার মোড়ে শ্রীধর উড়ের চায়ের দোকানে উঠতি বয়সের কলেজ পালানো কি কেলমারা বেকার ছেলেগুলোর গুলতানিতে যখন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে, মেয়েরা দল বেঁধে গুচ্ছের বই বুকে চেপে কোনদিকে না ত কিরে হেঁটে যায়, সে সময় প্রত্যেক মেয়েকে অন্তত শুনতেই হবে এ-নাম। লাভলি টেম্প্রাস সে গানটা একবার গা না ভাই—লাভ মি টেণ্ডার। টেম্প্রাস, আজ ম্যাটিনীটা মিস করব না ম্যাইরি। টেম্প্রাস, ধুত্তোর ছাই তোর ব্রিজিং বার্দোৎ না হাতী না ঘোড়া, হি হি হি, টেম্প্রাস টেম্প্রাস টেম্প্রাস—

ইস্কুলে যাবার পথে অনুরাধার একবার ইচ্ছে হত, চায়ের দোকানটার ভেতরের দিকে তাকায়। কৌতুকের ভঙ্গী নিয়ে একটু হাসে। কিন্তু কিছুই করত না সে। তবে অন্যদের মত মাথা হেঁট করে যেন কিছুই শোনে না, কিছুই বোঝে না এমন বোকা-বোকা ভাব করেও হাঁটত না। পাশে যে থাকত, হিমানী কি শেফালি কি অরুন্ধতী কিংবা যেই হোক, তার সঙ্গে মজাদার গল্প জমিয়ে নিত। কথা বলতে বলতে, সপ্রতিভ মুখে চোরা চাহনিও কখনো কখনো ছুঁড়ে দিত। চায়ের দোকানের সবগুলো ছেলে তখন জড়োড় করে তাকিয়ে আছে মেয়েদের দিকে, মাথার বেণী থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত তাকদৃষ্টিতে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে চলছে ইতর রসিকতার উৎফুল্ল উল্লাস।

সে উল্লাসের বন্যায় যাকেই কুপোকাৎ করুক, অনুরাধা জানত, তাকে আঘাত করবে না কক্ষণো। এক-আধটু ঠাট্টা-কৌতুক যদি বা চলে, তা আহত যন্ত্রণার কারণ হবে না মোটেই। কেলোদা', ওদের টেম্প্রাস, যখন আড্ডাখানার অন্যতম নায়ক, অনুরাধা সেখানে নির্ভয়। একটু-আধটু কাজিল ইয়ারকিতে ক্ষতি কী।

অনুরাধা শুনেও ছিল তেমনি একটা ঠাট্টা।

ইস্কুল থেকে ফিরছে, তিন-চার জনের জট বেঁধে অনেকটা মিছিলের মত চলেছে, শ্রীধর উড়ের দোকানে খুব জোরে কে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছিল। কে বাজাচ্ছে না দেখেও সবাই বলে দিতে পারে। সেই সুরেলা বিলিতি স্বর-ছন্দের উঠা-নামার তালে তালে অনেকগুলো ছেলে জুতো ঠুকে ঠুকে তাল দিচ্ছে। কে যেন হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, টেম্প্রাস তোর বাজনা শুনে ব্রিজিং বার্দোৎ, খুড়ি বিবি—হাওয়ার ওপর সোয়ান ডান্স নাচছে।

বাজনা থামে নি, কিন্তু কেলোদা' যে সাপের মত চোখে তীব্রতা জাগিয়ে অনুরাধার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল, চোখে না দেখেও বুঝতে অসুবিধা হয় নি অনুরাধার। হিমানী কি অঞ্জলি কে যেন কিক করে হেসে উঠেছিল। হঠাৎ রাজ্যের লজ্জা এসে জুড়ে বসেছিল অনুরাধার মনে, হাঁটতে গিয়ে পা চলে না।

ব্রিজিং বার্দোৎ। সংক্ষেপে বিবি। এ-নামটা কার, তাও সকলের জানা। কেলোদা'র ভারী পেয়ারের নাম, পেয়ারের মানুষ। হিমানী বলে অনুরাধার সতীন। সতীন না হাতী, কেলোদা' বলে, তুমিই আমার ব্রিজিং বার্দোৎ।

কেলোদা' মানুষটা কি অদ্ভুত। বাড়িতে এত উপেক্ষা অনাদর

এত বকা ভর্ৎসনা⋯কিন্তু কিছুতে গ্রাহ্য নেই। সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে যায়, ফেরে মাঝ দুপুরে। চান খাওয়ারও অবসর নেই, তাড়াতাড়ি সেরে তক্ষুণি আবার বেরোয়। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। কোথায় যায়, এত ব্যস্ততা কিসের, কিছুই অবশ্য জানতে বাকি নেই কারোর। চায়ের দোকানে বা মিত্তির বাড়ির চওড়া রকে অথবা মোড়ের বড় সেলুন-ঘরটায় দিনরাত্রি আড্ডা। বখাটে বেকার ছেলেদের সঙ্গে গুলতানি। কিন্তু তার পেছনে যে কেলোদা'র আরো একটা সাধনা আছে, এ-খবর তো প্রায় কেউই রাখে না। মেঘলা দুপুরে আকাশ জুড়ে শুধু মেঘের বিমর্ষ কালিমাটাই সকলের চোখে পড়ে, তার পেছনে যে সূর্যের আলো ছড়িয়ে থাকে—সেখানে কারুর নজর নেই।

অনুরাধাই কি জানত। হিমানীদের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত, বিকেলে বৌদির সঙ্গে আড্ডা—কিন্তু কেলোদা'র সঙ্গে দেখা হত কালে-ভদ্রে। মাঝে মাঝে বারান্দার যে অংশটুকু কেলোদা' মোটা পর্দা ঝুলিয়ে একটা তক্তপোশ আর আলনা ফেলে নিজের আস্তানা বানিয়ে নিয়েছে, সেখানে কৌতূহল নিয়ে উঁকি দিত। দেয়ালময় ছবির ভিড়, সিনেমার সব বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উজ্জ্বল মুখ। প্রায় সবই বিলিতী ছবির নায়ক-নায়িকা। বোম্বেরও আছে কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজনের ছবিই চার পাঁচটা। বৌদি বলে, এর নাম ব্রিজিৎ বার্দোং—আমার ছোট জা। নানা ভঙ্গীতে তোলা প্রায় বিবস্ত্র বিভিন্ন ছবি। মেয়েটা সুন্দরী নয়, বিড়ালের মত মুখ, অবশ্য দেহের বাঁধন আছে, কিন্তু এই মেয়েটার মধ্যে এমন কি অতিরিক্ত আকর্ষণ, অনুরাধা বুঝতে পারে না।

সিনেমার ছবির মতই বিছানার একটা দিক ভর্তি হয়ে জমে আছে সিনেমার পত্রিকা। বাংলা, ইংরেজি। অনুরাধা এখান থেকে বাংলা পত্রিকা বাড়ি নিয়ে যায়, পড়ার থাকলে পড়ে, নতুবা ছবি দেখে। দিদি বকে, ও সব ছাই ভস্ম না পড়লে হয় না? দিদি তো জানে না, ঘরের এই ছোট্ট চৌহদ্দীটা ছাড়িয়েও মস্ত বড় একটি পৃথিবী ছড়িয়ে আছে নানা শহর, নানা দেশ, নানা চিন্তা নানা সাধনা। তার মধ্যে সিনেমা এমন একটা বস্তু, যা শিল্প, যা খ্যাতিবহ, যা অকল্পনীয় অর্থদায়ী। সিনেমার জোলুস লাগলে দিদির এই ভাঙাচোরা দারিদ্র্যজীর্ণ সংসারের মুখ এক মুহূর্তে সুখে সমৃদ্ধিতে ঝলমল করে উঠবে। কেলোদা'র সাধনা সেই সিনেমার সাধনা। আজ উপেক্ষা আর নিত্য ভর্ৎসনায় সে উটের মত মুখ গুঁজে আছে, ভবিষ্যতে মরুভূমিময় রূঢ় সংসার অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

ব্রিজিৎ বার্দোতের ছবিগুলির নিচে একটা ঝুলানো বড় আয়না। তার পাশে পালিশহীন নড়বড়ে আলনায় কয়েকটা আঁট-সাট প্যান্ট আর সার্ট, লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি, মোজা, রুমাল। তলায় পায়ের কাছে একটা ভাঙা সুটকেস। তার ওপর ছেঁড়া খবরের কাগজের পিঠে একজোড়া সাদা-কালো মেশানো সৌখীন চকচকে সু-জুতো।

পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল অনুরাধা। আয়নার সামনে ব্রাস ঘষে চুলের কায়দা করছিল কেলোদা'। আর আয়নায় মুখ ভেংচে নিজের চেহারা দেখছিল। আয়নায় ভেংচান মুখ কেলোদা'র পাশে অনুরাধার স্নিগ্ধ মুখের ছায়া পড়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কেলোদা' বলেছিল, এসো।

সলজ্জ ভঙ্গীতে এগিয়ে গিয়েছিল অনুরাধা। কিছু না বলে ফিরে যাওয়াটা বিশ্রী দেখায়, অনুরাধা পত্রিকাগুলির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেলোদা'ই বললে, পত্রিকা নেবে?

—হ্যাঁ।

—এগুলো ভাল লাগে?

—হুঁ, ছবি দেখি।

কেলোদা' পত্রিকার স্তূপ থেকে দু'টো নতুন পত্রিকা টেনে আনল। অনুরাধার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল। তুমি বুঝি সিনেমা দেখতে ভালবাস?

—কে না বাসে? মৃদু হেসে কেলোদা'র চোখের দিকে তাকিয়েছিল অনুরাধা। মুহূর্তে সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। কি অদ্ভুত ঠাণ্ডা আর ধারাল দু'টো চোখ কেলোদা'র। সবার থেকে একেবারে আলাদা। উন্মুক্ত তলোয়ারের মত ভয়ঙ্কর।

—কি ছবি দেখ, বাংলা না হিন্দি?

—বাংলা।

—সত্যজিৎ রায়?

—বুঝতে পারি না।

কেলোদা' প্রায় অস্ফুট গলায় বললে, রবীন্দ্রনাথকেও একদিন বুঝতে পারত না লোকে।

—বাংলা অনেক ছবিই ভাল লাগে।

—হুঁ।

কেলোদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তারপর পত্রিকা দু'টো এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, মাঝে মাঝে এসো। তোমাকে তো প্রায়ই দেখি রাস্তায়। তোমার মধ্যে সিনেমার খুব পসিবিলিটি আছে।

দ্বিতীয়বার শিউরে উঠেছিল অনুরাধার শরীর। সিনেমার সম্ভাবনা, নায়িকার সম্ভাবনা। রূপালী পর্দার যে রহস্যময় জগৎ লোককে মোহিত করে, উদ্ভ্রান্ত করে, তার নিজের মধ্যে আছে সেই রূপলোকের সম্ভাবনা? কি আশ্চর্য, কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ করল কেলোদা' যেন কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব গম্ভীর আর সাধারণ কথাবার্তার হাটে ফেলে দেবার নয়।

পত্রিকাগুলো নিয়ে প্রায় ছুটে চলে এসেছিল অনুরাধা। পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠেছিল, অনু যাচ্ছিস কোথা? কিন্তু না শোনার ভাণ করে দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের তলায় নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে এসেছিল অনুরাধা। খুব অস্পষ্ট অস্ফুট গলায় কে যেন ডাকছিল, রাধা রাধা—

অনুরাধা নিজের বিছানায় এসে হাত দিয়ে চুলের গোছা সরিয়ে বিছানায় শুয়ে পত্রিকাটা বুকের ওপর খুলে ধরেছিল। কালো কালো পিঁপড়ের মত অক্ষরের মিছিল সারা পৃষ্ঠাব্যাপী, মেজেন্টা রঙে ছাপা ছবির ভিড়, অনুরাধা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কান্নায় ভেজা চোখের মত সব ঝাপসা সব অবোধ্য লাগছে তার কাছে। কানে শুধু গানের কলির মত মোটা কণ্ঠের উচ্চারিত একটি শব্দের সুর বাজছে—পসিবিলিটি, পসিবিলিটি।
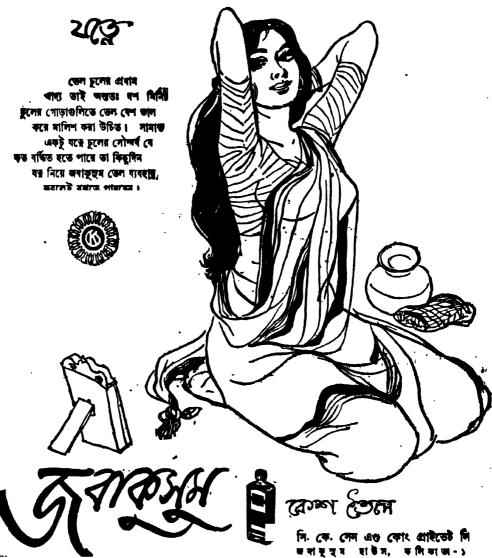
একই বাড়ির উপর তলা আর নিচের তলার ফ্ল্যাট। একই সিঁড়ি দিয়ে দু'বাড়ির যাতায়াত। একই পাম্পে দু'বাড়ির জল আসে, একই ঠিকা-ঝি কাজ করে দু'বাড়িতে। উৎসব-পার্বণ, রোগ-শোকে দু'বাড়ি পরস্পরের সঙ্গী। দশ বছর ধরে একই বাড়িতে থেকে দু'টি ভিন্ন পরিবারের বন্ধুত্ব প্রায় আত্মীয়তার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে।

কেলোদা'র বাবা উকিল, দাদা ডালহৌসীর সরকারী অফিসের কেরাণী। ছোটবোন হিমানী শুধু সমবয়সী নয়, একই ইস্কুলের একই ক্লাশের বান্ধবী। অনুরাধার বাবা বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক। দিদি অকাল বিধবা, ছোট একটি ছেলে নিয়ে বাবার সংসারের কর্ত্রী। মা রুগ্না, সারা বছরই শয্যাশায়ী। কেলোদা' মাতৃহীন।

দশ বছর ধরে কেলোদা'কে দেখছে অনুরাধা। কিন্তু কখনো ভাল করে দেখবার আগ্রহ হয় নি। একটি উঠতি বয়সের ছেলে, বি-এ পরীক্ষায় দু'বার ফেল মেরে পড়াশোনার ইস্তফা দিয়েছে, কাজকর্ম নেই তাই দিনরাত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, এর বেশী জানার অবকাশ ঘটে নি নিজেকে নিয়েই মত্ত ছিল অনুরাধা। আস্তে আস্তে নিজের আকাশটা যেন প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে তার। বাথরুমে চান করতে গিয়ে অন্ধকার ভেজা ছোট ঘরটা অদ্ভুত মাদকতায় ঘিরে ধরে। চৌবাচ্চার পাশে ঝোলান পুরনো লক্কড় আয়নাটার পিঠে নিজের ছায়া দেখে, দেখে নিজের গায়ের চামড়া। চাঁপাফুলের পাপড়ির মত তাজা পেলবতার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ তাকিয়ে থাকে। গায়ের সুডৌল গড়ন, আঙুলগুলোর নরম স্পর্শ, ভেজাচুলের মিষ্টি গন্ধ, বর্তিষ্ণু বুকের রহস্য তার নিজেকেই যেন আচ্ছন্ন করে দেয়। গুন্ গুন্ স্বরে গান গায় সে। একটু দেরি হলেই দিদি দরজায় জোরে জোরে টোকা দেয়, অনু তাড়াতাড়ি বেরো বাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে না ছাই, দিদি অন্য কিছু ভাবে। ওর জীবন তো ছোট হয়ে গেছে তাই সবাইকে সে ছোট গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখতে চায়। অনুরাধা কি বোঝে না? তাই দিদির সঙ্গে বেশী আড্ডা না দিয়ে অবসর পেলেই উপর তলায় চলে যায়, হিমানী কি বৌদির সঙ্গে আড্ডা জমায় হিমানীর থেকেও বৌদিকে বেশী ভাল লাগে। সবসময়ই হাসে বৌদি, মনে হয় সুখ যেন উপচে পড়ছে তার শরীর দিয়ে। মাঝে মাঝে হাল্কা ইয়ার্কির মধ্যে এমন সব কথা বলে, লজ্জায় অনুরাধার কান লাল হয়ে যায়। বৌদি হাসতে হাসতে বলে, পোড়ারমুখী তোরও ও-রকম দিন আসবে। সবুর কর।

রক্ষে কর। বলে পালায় অনুরাধা।

পালাক, তবু খুব ভাল লাগে বৌদিকে। দিদি আর বৌদি একেবারে আলাদা। দিদি গম্ভীর বিষণ্ণ। বৌদি ফাজিল হাসিখুশি। দিদির গাম্ভীর্য কেমন যেন একটা অসুস্থতার এঁটো গন্ধ, বৌদির হাসিখুশিতে জীবনের উষ্ণতা। দু'জনই যুবতী, দু'জনই ছেলের মা, কিন্তু তবু দু'জন একেবারে অন্যরকম। সবল সমর্থ পুরুষ মানুষ পটভূমিকায় না থাকলে হয়ত দিদির মতই শুকিয়ে যায় মেয়েমানুষের যৌবন।

কেলোদা'কে দেখলে আর পালিয়ে আসে না অনুরাধা। কেলোদা'ও মিষ্টি করে হাসে। বিকেলের দিকটায় আজকাল কিছুক্ষণ বাড়িতেও থাকে কেলোদা'। ভাইপোকে নিয়ে খেলা করে, বৌদির ফাইফরমাস খাটে। একদিন বৌদিকে তিনটে সিনেমার টিকিট এনে দিয়েছিল। বৌদির জিজ্ঞেস, তিনটে কার জন্য? তুমি যাবে?

—না আমার দেখা হয়ে গেছে।

—তা'হলে কার?

—দেখো যদি দরকার হয়।

—তা'হলে তোমার দাদাকে বলে দেখি সঙ্গে যায় কি না।

ওমা তিনটেই যে লেডিজ টিকিট!

—নীচের তলার দিদি যায় কি না দেখতে পার।

আড়চোখে তাকিয়েছিল বৌদি, ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু হাসি। ঠিক সে সময়ই অনুরাধা এল হিমানীর সঙ্গে।

বৌদি জিজ্ঞেস করলে, অনু তুই যাবি সিনেমায়?

—কবে?

—আসছে কাল।

—কি ছবি?

—সত্যজিৎ রায়ের।

অনুরাধা তাকিয়েছিল কেলোদা'র দিকে। বোকা বোকা গোবেচারী মুখে সে টবে জল ঢালছিল।

—মন্দ কি!

—বৌদি আর হাসি রাখতে পারে নি, ওঃ ডুবে ডুবে এই কাণ্ড। আমিও ভাবছি, আমাদের জন্য হঠাৎ এত দরদ কেন ঠাকুরপোর।

—দরদ না ছাই। পয়সাটা গুণে গুণে দিতে হবে কিন্তু। বলেই কেলোদা' পর্দা সরিয়ে নিজের আস্তানায় চলে গিয়েছিল।

হিমানী আর বৌদির চোখে ধরা পড়ে গেছে অনুরাধা। ওরা হাসে, ফাজলামো করে। বৌদি বলে, সতীনের ঘরে এলি অনু, ত্রিজিৎ বাদে'র যে তোর দফা সারবে।

যাও। বলে পালায় অনুরাধা।

কিন্তু বেশীক্ষণ নীচে থাকতে পারে না, আবার উঠে আসে অনুরাধা। হিমানীর সঙ্গে কেলোদা'র তক্তপোশে এসে বসে, পত্রিকা-গুলো ঘাঁটে, সিনেমার ছবিগুলো নিয়ে পরচর্চার অনুশীলন করে। কিন্তু আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে যেন নিজের সঙ্গে চুরি করছে এমনি গোপনে কেলোদা'র সার্ট প্যান্টগুলির দিকে তাকায়, বিছানায় হাত রাখে, জুতোয় শাড়ি ছোঁয়ায়। কেলোদা'র আয়নায় নিজেকে দেখে, যেন দেখছে কেলোদা'র চোখের তারায়। একটা বিচিত্র শিহরণের শির শির আচ্ছন্নতা অনুভব করে নিজের মধ্যে।

একদিন অনুরাধাকে একা পেয়ে কেলোদা' বললে, জান, একজন নামকরা ডাইরেক্টার আমাকে এ্যাসিষ্ট্যান্ট করে নিতে রাজী হয়েছেন। আস্তে আস্তে সব শিখব, খুব ভাল করে শিখব। আমার স্বপ্ন খুব বড় ডাইরেক্টার হওয়া।

কেলোদা'র স্বপ্নটা যেন অনুরাধারও স্বপ্ন। মৃদু পুলকে ঠোঁটের রেখা স্মিত হল তার। অনুরাধার পায়ের তলার মাটিও যেন জোরদার হল।

হাত বাড়িয়ে অনুরাধার হাত দু'টো টেনে নিল কেলোদা'।

আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে 'একটু চাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কেলোদা'। ওঃ কি জোর কেলোদা'র আঙুলে, ব্যথা লাগে, কিন্তু ব্যথাও যে কখনো কখনো সুখের মতই আনন্দের, জানত না অনুরাধা।

যেমনি জানত না আজ এই সন্ধ্যের অন্ধকারে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে কেলোদা'। পর্দাটা সরিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে চমকে উঠল অনুরাধা।

আলোর ঝলকানিতে ঘুম ভেঙে গেছে কেলোদা'র। ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটা হাত চোখের উপর রেখে কেলোদা' উঠে বসল।—কে ?

—না আমি। এমনি এসেছিলাম। যাই।

—শোন।

কাছে সরে এসেছিল অনুরাধা।

উঠে দাঁড়াল কেলোদা,' বালিশের তলা থেকে প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বার করল। দেশলাই জ্বালল, ধোঁয়া ছাড়ল। আস্তে আস্তে 'ঘুমের' ঘোর কাটছে কেলোদা'র। আর আস্তে আস্তে শরীরের প্রতি রোমকূপে রোমাঞ্চ শিহরণ জাগছে অনুরাধার।

—আর একটু কাছে এসো।

—না যাই।

—শোন। আমাদের যৌবন কি অপরাধ ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল অনুরাধা। যেন প্রতীক্ষার অহল্যা। কেলোদা' খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অনুরাধার আঙুলগুলো টেনে নিজের মুখ ঢেকে দিল। বলল, রাধা, তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও।

খুব আস্তে আস্তে বলল অনুরাধা, না তুমি আলোক থেকে আলোকে এসো। তুমি বড় হও, খুব বড়, খুব বড়, যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে লোকে সুখী হয়।

যেন ফুলের বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অনুরাধা। তেমন ভাবেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হিমানীর গলা শোনা গেল, বৌদির হাসি। ওরা ছাদ থেকে নিচে নেমে আসছে। সরে এল অনুরাধা। পর্দা সরিয়ে ধীর পায়ে নেমে গেল নিচে। রান্নাঘরে দিদি, বাবা এখনো ফেরেন নি। মেঝেতে প্লাস্টিকের পুতুল নিয়ে খেলা করছে বোন-পো। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে চাপ দিয়ে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে লাগল অনুরাধা।

দিদি তো জানে না, অনু আর ছেলেমানুষটি নেই। মনে মনে হাসল অনুরাধা, জীবনের শুরুটা যদি এমন বিচিত্র অনুভূতিময়, সারা জীবনটা তাহলে কী !

পানের দোকানের জ্বলন্ত দড়িটা টেনে নিয়ে একটু নিচু হয়ে নেভানো সিগারেটটা ধরিয়ে নিল টেক্কাস। নতুন সিগারেটের স্বাদ নেই, আধপোড়া সিগারেটে। কিন্তু সিগারেট তো পোড়ার জন্যই। জীবনও বারে বারে পোড় খাওয়ার জন্য। তাজা নতুনত্ব একবারই শুধু পাওয়া যায়। টেক্কাস সরে এসে বাস-স্টপের কাছে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল।

হাতে ঘড়ি নেই, দরকার মত সময়টা দেখে নেওয়া যায় না। কিন্তু তার জন্ম খুব একটা অসুবিধে বোধ করে না টেক্সাস। কলকাতা শহরে এত ঘড়ির ছড়াছড়ি, প্রায় প্রতি দোকানে, প্রায় সকলের হাতে, একটু শুধু দেখে নেওয়া বা জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা। তবু ঘড়ি না থাকার জন্তই আজ একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। এখন মাত্র সাড়ে তিনটে। আরো আধঘণ্টা থেকে প্রায় একঘণ্টা এই বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে। বাস আসবে, ট্রাম আসবে, লোক উঠবে নামবে, ঘণ্টা বাজবে আবার দৌড়বে ট্রাম-বাস। ভীরু চকিত দৃষ্টি নিয়ে অনুরাধা নামতে পারল কি না, এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে টেক্সাসকে।

অনুরাধা—

অনু, নুরা, রাধা। সব থেকে সুন্দর লাগে ওকে সকালবেলা। চান সেরে ক্ষিপ্রহাতে সামান্ত প্রসাধন করে সে যখন কলেজে যাওয়ার জন্ত হিমানীর অপেক্ষা করে—দাদা ততক্ষণে ছোট টিফিন বাক্স হাতে অফিসের পথে চলে গেছে। বাবাও বড় পোর্টফলিও ব্যাগটা নিয়ে নেমে গেছেন। বৌদি রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত, হিমানী তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছে। হিমানীটা সব কাজেই লেট, ভাগ্যিস লেট, তাই একটুক্ষণ হয় এঘরে না হলে বারান্দায় নতুবা কেলোদা'র পর্দার এপাশে অনুরাধাকে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। এই দুর্লভ কয়েকটি মুহূর্তের জন্ত চাতকের মত সতৃষ্ণ হয়ে থাকে টেক্সাস।

বারান্দায় যখন মৌনমুখী দাঁড়িয়ে থাকে, সকালের সোনালি রোদ ওর সারা মুখে শরীরে শাড়িতে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। মনে হয় যেন পাথরের প্রতিমা। যখন হিমানীর পড়ার চেয়ারে একা বসে থাকে, আধো অন্ধকারের মায়ায় ওকে মোহময়ী মনে হয়। কখনো যখন টেক্সাসের পর্দার এপাশে ঝোলানো আয়নাটার কাছে এসে দাঁড়ায়, টেক্সাস সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গোপন নিবিড়তায় তাকায় ওর মুখের দিকে, হাতের দিকে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে, জুতোয় ঢাকা পায়ের দিকে। মুঠো মুঠো ফুলের তৈরি মনোরমা সুদর্শনাকে ছুঁতে তখন ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে শুধু দৃষ্টি ভরে দেখতে।

তাড়াতাড়ি মুখ ধরে হিমানী ডাকে, অনু চল—

অনুরাধার ঠোঁটে অদ্ভুত এক ধরণের হাসি দেখা দেয়। না প্রসন্ন না বিষণ্ণ, সমুদ্রের গভীর মনের শান্ত গাম্ভীর্যের কথা মনে পড়ে টেক্সাসের। অনু ব্রিজিৎ বার্দো নয়, অনুরাধার নেই উগ্র চাঞ্চল্য, তীব্র চমক। অনুরাধা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার চাঁদ। খাঁটি বাঙালী।

যদি কখনো অভিনয় করে অনুরাধা ব্রিজিৎ হবে না, হবে গ্রেটা গার্বো। চোখের দৃষ্টিতে, কথা বলার সুষমায় মানুষের হৃদয় গভীরে সে দাগ কাটবে। শরীরের ভঙ্গিমা দিয়ে সে হয়ত আবেগের জোয়ার আনতে পারবে না কোনদিন।

না পারুক। ওরাই আদর্শ নয়, রূপের ব্যঞ্জনা দিয়ে রসের পরিবেশন করবে টেক্সাস। আগামী দিনের টেক্সাস, ডাইরেক্টর টেক্সাস। বাংলা দেশের ভাবী ভিত্তোরিও ডি সিকা।

কিন্তু—

দিনের পর দিন জীবনের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে যাওয়ার চেষ্টা এত কঠোর এত কঠিন এত রক্তাক্ত কেন মানুষের। এক-একটা সিঁড়ি ভাঙা বুকের এক-একটা পাঁজর ভাঙার মত বেদনাবহ। যন্ত্রণাকাতর।

বর্ধমানের বিজলবাবু এসে অপেক্ষা করছে। এতক্ষণে হোটেলের চেয়ারে বসে বসে সে হয়ত ঘড়ির কাঁটা দেখছে।

পাপ? পাপ কি এতই সহজ যে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে আরেক নিঃশ্বাসে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়?

জীবনটা কি পাপের নয়, সারা জগতটা। তিন বছর আগে বাবার বন্ধু জিতেনবাবুর নামকরা ওষুধের দোকানে সে যখন চাকরির উমেদার হয়ে সামান্ত একটু করুণা প্রার্থনা করেছিল, জিতেনবাবুর মিছরি মেশান হাসির ফোয়ারায় কি পাপের পচা বীজাণু ঘিন ঘিন করছিল না?

—চাকরি? কি চাকরি দেব, কি পারবে তুমি?

—যা দেবেন তাই আমি করতে পারব। টাইপ জানি, সেলসম্যান হতে পারব—দয়া করে আপনি যা দেবেন—

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন জিতেনবাবু।—না, সে রকম কোন কিছু আপাতত খালি নেই।

কাতর চোখের দৃষ্টি নিয়ে একটুক্ষণ চুপ করেছিল টেক্সাস। তারপর খুব স্পষ্ট ভাবে বলেছিল, তাহলে একটা বেয়ারা-পিয়নের কাজ দিন। আমি ঠিক করতে পারব।

আবার গলা ছেড়ে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন জিতেনবাবু। —কেলো, তুমি এখনও ছেলেমানুষ। অভিনয়-টভিনয় কর কি না, তাই খুব রোমাণ্টিক আছ। বেয়ারা-পিয়নের কাজ পারবে না; তার জন্তে আরেক রকম পরিবেশ দরকার।

উঠে এসেছিল টেক্সাস। শুধু পারবে না আর খালি নেই। এ-অফিসে সে-অফিসে ধর্ণা দিয়েছে সে, এখানে দরখাস্ত করেছে; সেখানে মুরুব্বী ধরেছে। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধু শুনে আসছে তার যোগ্যতা নেই, তার জন্তে কোন কাজ খালি নেই, সে অনুপযুক্ত।

বাবা মুখ ঘুরিয়ে থাকেন; দাদা প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করে। শুধু বৌদি এখনো হেসে কথা বলে, হিমানী কোন অভিযোগ করে না। আর, আর, অনুরাধা অপেক্ষা করে থাকে।

একটা সুস্থ সমর্থ পুরুষ মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে রাখা পাপ নয়?

[illegible] পাড়ার সবচেয়ে বড়লোক বিজলীবাবুকে সকলে এত সম্মান করে কেন? তাঁর কারখানায় ঘি-এর নামে যা তৈরি হয়, আসলে তা বিষ নয়? তবু পাড়ার উৎসব অনুষ্ঠানে সবচেয়ে সম্মানের আসনটা তাঁর বাঁধা থাকে কেন?

কেন কেন?

পাপ আমাদের হাওয়ায়, আমাদের রক্তে-মাংসে, শিরা-উপশিরায়।

ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে টেক্সাস। পায়ের নিচে অনেকগুলো পোড়া সিগারেট জমে গেছে। এবার ঘড়িটা দেখতে হয়। চারটা বেজে দশ। এখনো আসছে না কেন অনু? ওই একটা বাস আর তার ঠিক পেছনেই একটা ট্রাম আসছে। দেখা যাক।

অনেক লোক নামল, অনেক লোক উঠল। ট্রাম-বাস দু'টোই ছেড়ে দিল পরক্ষণে। না, নেই। আরেকটা সিগারেট ধরাল টেক্সাস। শীতের বিকেল এর মধ্যেই প্রায় ফুরিয়ে এল। মরা

রোদ উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় ঠেকেছে। বিমলবাবু এতক্ষণে বোধ হয় ক্যাপচুরিয়াস।

পিঠে কে যেন হাত রাখল। ফিরে তাকাল টেক্সাস। নীল সিল্কের শাড়ি পরেছে অনুরাধা, ফিকে নীল ব্লাউজ। প্রসাধন-সুন্দর মুখে মিষ্টি হাসির ফোয়ারা। জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ এসেছ?

—এই কিছুক্ষণ। চলো হাঁটি।

লোকের ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। ফুটপাথে জুতো পালিশ করার ছেলেগুলো এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল টেক্সাসকে। কে যেন মুখে আঙুল পুরে খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল। হাসির রোল পড়ল ছেলেগুলির মধ্যে।

দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল ওরা। তারপর মৌলালি পেরিয়ে পশ্চিমমুখী। রাস্তার দু'দিকে দোকানপাট, ট্রাম-বাসের ছুটোছুটি, পদচারী মানুষের জনতা।

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা।

খুব মৃদুগন্ধের সেণ্ট ঢেলেছে অনুরাধা তার শাড়িতে। কাঁধে চড়িয়েছে পাটলরঙের ক্লোক। হাতে ছোট্ট একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। তার মধ্যে কি আছে? হয়ত খুচরো কয়েকআনা পয়সা, পাউডারের পাফ, হাত-আয়না। আর কাঁপনলাগা একটি ছোট্ট ভোমরার প্রাণ।

টেক্সাস বললো, চলো আমার এক বন্ধুর কাছে যাই। খুব বড়লোক, ছবির প্রডিউসার—ওকে খুশী করতে পারলে ছবি করার টাকা দেবে বলেছে!

কথাগুলো বললো খুব মৃদুস্বরে। কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল অনুরাধা। বলল, আজ থাকুক, চলো আমরা কোন পার্কে গিয়ে বসি।

চলো না। অনুরোধ করল টেক্সাস।

নিরুত্তরে হাঁটতে লাগল অনুরাধা। গম্ভীর মুখে বিকেলের পাণ্ডুর রোদ লুটিয়ে পড়েছে।

হোটেলের গেট পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল ওরা। দরজায় টোকা দিল টেক্সাস।

দরজা খুলে একমুখ হাসি নিয়ে বলল বিমলবাবু, আসুন, আসুন কি সৌভাগ্য।

ওরা এসে বসলো দু'টো নিচু সোফায়। সিগারেট ধরাল টেক্সাস। অনুরাধা চুপ করে বসে রইল।

হাতকাটা গেঞ্জির উপর পাতলা পাঞ্জাবী পরেছে বিমলবাবু। পরণে ঢিলে পাজামা। পায়ে দিল্লীর নাগরা। কালো গায়ের রং কিন্তু স্বাস্থ্যের তেজে দীপ্যমান। বলল, এই বুঝি আপনার নায়িকা?

—হ্যাঁ। একে দিয়েই ছবিতে নায়িকার অভিনয় করাবো।

—বেশ বেশ। গল্প বেছেছেন না কি?

—কথা হয়েছে কয়েকজন রাইটারের সঙ্গে। দেখি শেষ পর্যন্ত কোনটা লাগে।

অনুরাধার দিকে তাকাল বিমলবাবু।—বলুন কি খাবেন, চা না কফি।

চোখ তুলে তাকাল অনুরাধা।—চা।

বিমলবাবু উঠে গিয়ে কলিং বেল বাজিয়ে ডাকল বেয়ারাকে। বলল, তিন পেয়ালা চা।

চা এল, খাবার এল। বোবা পৃথিবীটা গুমরে কেঁদে উঠল টেক্সাসের বুকে। ঘরে আলো জেলে দিয়েছে বিমলবাবু। আলোক থেকে আলোকে যেতে হবে টেক্সাসকে। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, অনু তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।

—সে কি মশাই, কি হল আপনার? জিজ্ঞেস করল বিমলবাবু।

ছবির প্রডিউসার না হয়ে অভিনেতা হলে নাম করতে পারত, ভাবল টেক্সাস। বলল, নিচের তলায় আমার এক বন্ধু আছে, তার সঙ্গে দেখা করে আসি।

দেখবেন, দেরি করবেন না যেন।

টেক্সাস উঠে দাঁড়িয়ে অনুরাধার দিকে একবার তাকিয়ে সোজা বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে বিমলবাবু ভেতরে গিয়ে বসল।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল টেক্সাস। পশ্চিমের সূর্য সাগরের তলায় নেমে গেছে। আকাশ অন্ধকার। জীবনে কতবার সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। আর শুধু অপেক্ষা করে থাকতে হয়। দু'টো হাত নিসপিস করে উঠল টেক্সাসের। দরজা ভেঙে বিমলবাবুর মাথা গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু রেলিং-এ মাথা ঠেকিয়ে সে ক্লান্ত শরীরটাকে আরো এলিয়ে দিল মাত্র…।

জীবনের আরেক নাম যন্ত্রণা।

আরো কিছুক্ষণ পর অনুরাধা আর টেক্সাস যখন আবার পাশাপাশি হেঁটে গিয়ে হোটেলের গেট পেরিয়ে বাস ব ট্রামে উঠতে যাবে, দু'জনই তখন অনেক বুড়ো-বুড়ী হয়ে গেছে। টেক্সাস হয়ত চমকে উঠবে, অনুরাধার সব চুল বরফের মত সাদা।

ঝগড়াটা একটু বেশি রকমের হয়ে গেল কালুর। শনিবারের সকালে ওর মেজাজ কিছুতেই ঠিক থাকে না। ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম দিকে কাঠের বেড়া ঘেরা মাঠ। তার ভিতর চক্কোর খায় যে ঘোড়াগুলো, তাদের মতই তেতে ওঠে কালুর মনটা। সকাল থেকেই ভাবনা সুরু হয় কালুর, গোটা পাঁচেক টাকার জন্তে। আগে ভাবতে হত না একেবারে। যা মাইনে পেত, তা থেকে তিরিশটাকা লুকিয়ে রেখে বাকিটা শেফালীর হাতে তুলে দিত। প্রথম প্রথম পকেটেই রেখে দিত টাকাটা, হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে গেল শেফালীর কাছে। সোডায় সেদ্ধ করবে বলে শেফালী ছাড়া জামা-কাপড় আলনা থেকে তুলে নিচ্ছিল, সোডায় সেদ্ধ করার আগে পকেটে কিছু আছে কি না খোঁজ করতে গিয়ে ঘড়ির পকেটে কি যেন খর খর ক

উঠেছিল। তাড়াতাড়ি দু'টো আঙুলের ডগা সরু পকেট-কাদিতে পুরে দিয়েছিল এবং পরক্ষণেই শেফালীকে বিস্মিত করে দিয়ে দু'টো দশ টাকার নোট বেরিয়ে এসেছিল।

—একি! টাকা! অবাক শেফালী ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়েছিল কালু মিত্তিরের দিকে।

—অফিসের এক বন্ধু রাখতে দিয়েছে। নির্বিকার অভিনয়ে কালীপদ মিত্র জবাব দেয়।

—সত্তর টাকা মাইনের বাবুকে, কুড়ি টাকা রাখতে দিয়েছে! হারালে কি করবে? শেফালী গজ গজ করতে করতে আঁচলে নোট দু'টো বেঁধে কাপড় সেদ্ধ করতে চলে যায়।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে একশ টাকার কেরাণী কালীপদ মিত্র। সদাগরী অফিসের কেরাণীকে যখন ঘোড়ারোগে ধরে, তখন নানা মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। এ-ছাড়া উপায় থাকে না আর।

পরের মাস থেকে বাড়িতে টাকা আনতো না কালু মিত্তির। অফিস ফেরতা পোষ্ট অফিসে জমা রেখে বাড়ি চলে আসত, সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা তুলে রেসের মাঠে দিয়ে আসত প্রসন্নচিত্তেই।

হঠাৎ একদিন এক বেমক্কা নোটিশে কালুর চাকরি চলে গেল। কালুর মত আরও অনেকেই ছাঁটাই হয়ে গেল কোম্পানীর ব্যবসা গুটিয়ে যাবার অজুহাতে। কিছুদিন সহকর্মীদের সঙ্গে একজোট হয়ে মামলা করার ঠিক করেছিল, কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, নতুন নতুন চাকরি জোগাড় করে নিঃশব্দে সরে পড়েছে সহকর্মীদের দল। কে কোথায় গেছে। তার খোঁজ পর্যন্ত পায় নি কালু মিত্তির। পুরনো বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়ি বদল করেছে অনেকে। যারা বাড়ি বদলের সুযোগ পায় নি, তারা মন বদলে ফেলেছে। দরজা থেকেই কালুকে বিদায় দিয়েছে বরফ-নির্লিপ্ততার মন নিয়ে। সভয়ে এড়িয়ে গেছে তাকে। কে জানে নতুন কোন ঝামেলায় পড়ে নতুন চাকরিটা যদি যায়। দু' এক কথায় শেষ করে দিয়েছে তাদের খবরাখবর, তারপরই কাল্পনিক কোন জরুরী কাজের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে বলেছে, কিছু মনে করবেন না মিত্তির মশায়। বড্ড জরুরী কাজ আছে। নমস্কার।

দরজাটা পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে গেছে কালুর প্রতি-নমস্কারের অপেক্ষায় না থেকেই।

কিছু মনে করে নি কালু মিত্তির। পায়ে পায়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। কিছু না বলে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। দুপুরবেলায় এক সময়ে দু'টো ভাত মুখে গুঁজে বেরিয়ে পড়েছে নতুন কোন চাকরির সন্ধানে।

কিন্তু কলকাতার পীচের রাস্তা বড় কঠিন। আরও কঠিন ড্যালহাউসী অঞ্চলের রাজপথ। পীচের সঙ্গে বোধ হয় অনেকটা সিমেন্ট মেশানো আছে রাস্তার বাঁধুনিতে। কোথাও, কোন অফিসে একটা চেয়ার বা একটা টুলও খালি নেই।

কলকাতায় যদি একটু নরম মাটি পাওয়া যায়, তাহলে একমাত্র গড়ের মাঠে। ড্যালহাউসী ছেড়ে দুপুর রোদেই কালু মিত্তির গড়ের মাঠে চলে এসেছে পায়ে হেঁটে। মাঠের দুপুরটা যেন অনেক ঠাণ্ডা। দক্ষিণ দিকটা আরো বেশি ঠাণ্ডা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনে উঁচু গাছের তলায়। কালু মিত্তির অনেকদিন দুপুরবেলাটা কাটিয়ে দিয়েছে পাশের ঘেরা মাঠটার দিকে তাকিয়ে। সাদা কাঠের বেড়া। সাদা সবুজ ব্যালকনি। ঘোড়াগুলো বনবন করে ছোটে, যেন মানুষের ভাগ্য। একটা টিপ যদি একবার লেগে যেত তার কপালে তাহলে ওই ছোটার গতি বদলে যেত পুরোপুরি। দক্ষিণমুখী ভাগ্যের ঘোড়া, হঠাৎ উত্তরমুখে ছুটত টগবগিয়ে। কালু মিত্তির শা নগরের বস্তী থেকে উঠে আসত, রাসবিহারীর দু' ঘরের ফ্ল্যাটে।

মনটা টনটনিয়ে ওঠে। অনেকদিন ঘোড়া ধরা হয় নি। চাকরি যাবার পর দু' একবার লুকিয়ে চুরিয়ে খেলেছে সে। তারপর একবার নিরুপায় হয়ে শেফালীর কাছে হাত পেতেছিল, পাঁচটা টাকা দেবে?

একটু থেমে কালুর দিকে তাকিয়ে শেফালী জিজ্ঞাসা করেছিল, শনিবারে এত টাকা কি করবে?

—একটু দরকার আছে?

—কি দরকার শুনিই না!

—একটা চাকরির খোঁজে যাব। মিথ্যে কথা বলেছিল কালু।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শেফালী। তারপর একটি কথাও না বলে টিনের সুটকেশ থেকে শেষ পাঁচ টাকার নোটটা সামনে ফেলে দিয়েছিল।—আর কিছু নেই।

নিঃশব্দে নোটটা পকেটে পুরে কালু বেরিয়ে গিয়েছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠে। শা নগর পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তারপর কলকাতা শহরে কে কাকে চেনে জানে? কেই বা কার ধার ধারে?

গড়ের মাঠে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়েছিল এদিক-ওদিক। দু' একজন পাকা বুকির খবর পাওয়া যায় যদি। অনেক বুকি ঘোড়ার পায়ের শব্দ চেনে মনে হয়। যে ঘোড়া জিতবে বলে দেয়, ঠিক লেগে যায়। কিন্তু সহজে বলতে চায় না যে। রেসের টিকিটের চেয়ে ওদের বুকির দাম চড়া! দু' টাকার টিকিটের জন্যে আরও দু' টাকা ওদের দিতে হয়। তাও দিয়েছিল কালু মিত্তির। চার টাকা খরচ করে যদি গোটা বারো টাকা হাতে আসে মন্দ কি।

কালুর কপালে কিন্তু ঘোড়া জেতে নি। কালুর মেজাজ আগুন হয়ে গিয়েছিল। বুকিকে সে খুঁজে বার করে দু' চার ঘা দেবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু তার পাত্তা আর পায় নি। ভীড়ের ভেতর কোথায় যে ডুব মারল, হদিস পাওয়া গেল না আর।

দক্ষিণ গেটের বাইরে বেরিয়ে পা দু'টো পীচের সঙ্গে আটকে গেল যেন। ওধারের ফুটপাথে শেফালী। কালু নিজেকে ভীড়ের ভেতর সেঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু হল না। শেফালীর চোখ দু'টো তার ওপর গেঁথে গেছে যেন। ও যেদিকে নড়ছে, চোখ দু'টোও সেদিকে ঘুরছে নিশানা রেখে।

নিরুপায় পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কালু। শেফালী তার আপাদমস্তক দেখে নিল একবার, তারপর মৃদুস্বরে শ্লেষের ধারালো ছুরি বসিয়ে দিল যেন।—চাকরিটা বেশ বড়ই। কি বল?

নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই কালুর।—আর খেলব না।

উত্তর না দিয়েই শেফালী হনহনিয়ে বাড়ির দিকে হেঁটেছিল। কালু নিঃশব্দে অনুসরণ করেছিল তাকে। বাড়ি ফিরে একটি কথাও বলে নি শেফালী আর সেই না-বলাটুকু মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিয়েছিল স্নায়ুতন্ত্রের ডগায় ডগায়। কোন কথা না বলে কালু শুয়ে পড়েছিল, আর শেফালী নিবে যাওয়া উনুনের তলায় ফুঁ দিয়ে ধরাবার চেষ্টা সুরু করে দিল।

—কী দাদা? স্লিপিং? তন্ময়তা ছুটে গেল। কালু মিস্তির তাকিয়ে দেখে সেই বুকিদাদা পাশে দাঁড়িয়ে।

উঠে বসল কালু। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আমাদের কি ঘুমোলে চলে?

—আজকাল দেখি না কেন মাঠে? বুকি পাশে বসে পড়ে।

—নো পাইস। অসহায় হাসি কালুর ঠোঁটের ফাঁকে।

—কলকাতায় কি পয়সার অভাব? পরম বিজ্ঞের মত প্রশ্নটা উত্থাপন করল বুকি।

কালুর চোখে-মুখে নতুন আশা। নতুনভাবে কিছু রোজগারের প্রত্যাশা।

—আমি একটা ইনকামের পথ বাতলে দিতে পারি। সিগারেটে গোটা দুই বড় রকমের টান দিল বুকি।

—বলে দাও না দাদা! তাহলে দু' একবার খেলে বাঁচি।

বলে দিল বুকি রোজগারের পথ। সেই নির্দেশ মেনে একদিন শ্যামনগরের কালী মিস্তির ব্লাডব্যাঙ্কের দরজায় লাইন দিল। সারি সারি লোক রক্ত দেবার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে সকাল থেকে। বেশির ভাগই বস্তি এলাকার লোক। দু' একজন চেনা লোকও বেরিয়ে গেল। ঘোড়ার মাঠেই পরিচয় হয়েছে।

—আপনিও এসে গেছেন। একজন গায়ে পড়ে আলাপ জমালো।

—কি আর করি দাদা? একটা বিড়ি মুখে লাগায় কালু।

—খাবেন না এখানে। ফিসফিসিয়ে সাবধান করে দিল লোকটি। এখানে সবাই সাধু। জিজ্ঞেস করলে বলবেন, অভাবের জন্য রক্ত দিচ্ছেন। লোকটা হাসল। দার্শনিকের হাসি—অভাব তো বটেই। ভাব থাকলে কি আর ঘোড়ার পেছনে দৌড়ই মশায়।

নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল কালু মিস্তির। কোন রকম বাজে গোলমাল করার উপায় নেই এখানে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে সার সার। ছেঁড়া জামা কাপড়, উস্কোখুস্কো চুল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা ময়াল সাপের খোলস উঠে যাচ্ছে ক্রমশ। মসৃণ গা হঠাৎ যেন খসখসে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছে কালু মিস্তির। ওপরের আকাশ মিলিয়ে গেল। সিঁড়ির তলায় গুমোট-ঘরে লাইন ঢুকে পড়ল। এ-ধরণের ঘরে সে ঢোকে নি কখনও হঠাৎ যেন কয়েদখানায় ঢুকে পড়েছে কালু মিস্তির। ছমছম করছে গায়ের ভিতরটা। সামনের টেবিলের ওপর গোটা তিনেক পুলিশ-সার্জেন্ট। প্রত্যেকের হাতের কনুই পরীক্ষা করছে আর বলছে.—কবে রক্ত দেওয়া হয়েছে?

—মাস পাঁচেক আগে।

—কী নাম?

লোকটি নাম বলল।

—এর আগেও কি ওই নাম ছিল, না বদলে গেছে? সার্জেন্ট সাহেবের গম্ভীর জিজ্ঞাসা।

—কী যে বলেন স্যার? জিভ কেটে লোকটি নিজেই লজ্জা পায় যেন। আপনাদের ঠকাব।

পাশের সার্জেন্ট খাতা মিলিয়ে নাম দেখছিল। সে বলল,—না। ও দেয় নি।

একটুকরো কাগজ লোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে সার্জেন্টের নির্দেশ—ঘরে গিয়ে বসুন। ডাক্তারবাবু ডাকবেন।

লোকটি গেল কৃতার্থ হয়ে।

কালুর পালা এল। সার্জেন্টের সামনে এসে দাঁড়ায়। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। এই প্রথম পুলিশের জেরার সামনে দাঁড়িয়েছে সে।

—দেখে মনে হচ্ছে নতুন আপনি। সার্জেন্টের প্রশ্ন।

কোনমতে মাথাটা হেলিয়ে দেয় কালু। ভালভাবে কথা বলতে পারছে না। কেমন ভয় ভয় করছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটার চার পাশে কেমন একটা ওষুধের গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

—হাত দেখি।

হাতটা বাড়িয়ে দেয় কালু। এ-হাত ও-হাত। দু'হাত পরীক্ষা হয়ে যাবার পর অন্য ঘরে অপেক্ষা করার অনুমতি পায়। হাতের মুঠোয় স্লিপটা ভিজে যাচ্ছে ঘামে। হাতের তালু ঘেমে উঠেছে। একটা ভয় মনের ভেতর তোলপাড় তুলছে।

অনেকক্ষণ বসার পর ডাক এল তার। দুরু দুরু বুকে, কম্পিত-পায়ে কালু টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। অ্যাপ্রন আঁটা ডাক্তারবাবু নির্বিকার ভাবে বললেন,—টেবিলে ওঠ।

টেবিলে উঠে বসল কালু।

—শুয়ে পড়।

কালু নিজেকে সঁপে দিল ডাক্তারের জিম্মায়। সাদা চাদরে ঢাকা টেবিল। সাদা অ্যাপ্রনে লুকোন ডাক্তার। ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ হাতের কনুইতে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে কালু। ওষুধ-

তোয়ালো তুলো চেপে ধরেছেন শিরার ওপর। জায়গাটা পরিষ্কার করছেন বোধ হয়।

—চোখ বন্ধ। ডাক্তারের আদেশে চোখ বন্ধ করে ফেলে কালু মিস্তির।

ভয় করছে। তাকিয়ে থাকলে তবু ভরসা পাওয়া যায় অনেকটা। চোখ বুজলেই অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়।

একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হাতের শিরায়। যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ অচেনা। চিন-চিন করছে। স্নায়ুর ভেতরে শির-শির করছে। রক্ত বেরিয়ে আসছে শিরা থেকে। [illegible]ত কোন বোতল আছে। তার ভেতর রক্ত জমা হচ্ছে। কতটা নেবে কে জানে?

মাথাটা ঘুরে উঠছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁফ লাগছে। কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে কালু মিস্তির। উপায় নেই।

টাকা না পেলে রেস খেলা যাবে না। দশ টাকা পাবে। দশ টাকা পেলেই দু' সপ্তাহ খেলা যাবে। শেফালীকে দু'টো টাকা দিতে হবে সংসার চালানোর জন্যে। কিন্তু টাকা দিলেই ও জিজ্ঞেস করবে, কোত্থেকে টাকা পেল সে। ঠিকমত উত্তর দিতে না পারলেই ঝগড়া শুরু করবে। বলবে, বাকী টাকা রেস খেলে উড়িয়েছ। তার চেয়ে এখন কিছুই বলবে না। একেবারে রেসে জিতে একগাদা টাকা তুলে দেবে শেফালীর হাতে। গর্বভরে বলবে, দেখ, যে-রেসকে তুমি ঘেন্না করতে, সেই রেসই তোমায় লক্ষ্মী এনে দিয়েছে।

—উঠে পড়। ডাক্তারের কথায় উঠে বসল কালু আর উঠতে গিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেল।

—নতুন মক্কেল মনে হচ্ছে। অ্যাসিস্টাণ্ট গোষ্ঠীর একজন টিপ্পনী কাটল।

—খানিকটা স্টিমুল্যাণ্ট খাইয়ে দাও। ডাক্তারবাবু কালুর পাল্‌স্ পরীক্ষা করতে করতে আদেশ দিলেন অ্যাসিস্টাণ্টকে।

খানিকটা ঝাঁঝালো ওষুধ খাইয়ে দিল লোকটি। জিব থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। পুরো স্নায়ুমণ্ডলী চনমনে হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। উঠে বসল কালু।

—ওই চেয়ারে বস। ডাক্তারবাবু দূরের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন,—দুধ আর খাবার খেয়ে যেও।

দূরের চেয়ারে নিজেকে হেলিয়ে দেয় কালু। এখনও মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। হাতের শিরাটা কনকন্ করছে। তুলো গোঁজা, ভাঁজ করা হাতটা খুলে দেখল একবার। না, আর রক্ত বার হচ্ছে না। ধীরে ধীরে হাতটা সোজা করে ফেলল। সামান্য একটু ফুটো দাগ ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই কোথাও। ক্রমে ক্রমে ভয় কেটে যাচ্ছে। রক্ত দেবার মধ্যে ভয়ের তেমন কিছু নেই।

বেয়ারা দুধের গেলাস আর ডিম সন্দেশের প্লেট সামনে রেখে গেল। কালু দুধের গেলাসে চুমুক লাগাল আস্তে আস্তে। গরম দুধ। পাউডার গোলা দুধ, তবু বেশ ঘন। গরম দুধ খেলে শরীরটা গরম হয়ে উঠবে। আবার তো ঘোড়ার পেছনে ছুটতে হবে দুপুর-রদ্দুরে।

সন্দেশের দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শেফালীকে কতকাল ভাল জিনিস খাওয়াতে পারে নি কালু। চাকরি থাকার সময় ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে সে। সংসার খরচের টাকা ফেলে বাকিটা তার নিজের জন্যে রেখে দিয়েছে। শেফালী অনেকবার ভালমন্দ খাবার কিনে আনতে বলেছে শনিবারে, কিন্তু রেস খেলার মাঠে গিয়ে সব ভুলে গেছে কালু মিস্তির। ঘোড় দৌড়ের শেষে তার পকেটে যা তলানী ঠেকে থাকত, তাতে কোনমতে ট্রামে চড়ে বাড়ি ফেরা হত।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে সন্দেশ দু'টো পকেটে চালান করে দিল। বাইরে কোথাও কাগজে মুড়ে নিলেই চলবে। ডিমটা সে তারিয়ে তারিয়ে খেলে, তারপর বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল,—টাকাটা কোথায় পাবো ভাই?

—ওই কাউণ্টারে।

কাউণ্টারের পাশে এসে দাঁড়ায় কালু মিস্তির। ডোনার কার্ডে নাম সই করে বেরিয়ে আসে অন্ধকার রাজত্ব থেকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় কালু। এতক্ষণ যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কোথায় যেন চলে গিয়েছিল সে। একেবারে অচেনা দেশে। সেখানে শুধু তীব্র ওষুধের গন্ধ। রক্তের কি কোন গন্ধ আছে?

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে শেফালীর সামনে সন্দেশ দু'টো রেখে কালু বলল,—এক বন্ধু খেতে দিয়েছিল। নিয়ে এলাম।

শেফালী সন্দেশের দিকে তাকাল একবার। কালুর দিকে আর একবার তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল,—সত্যি কথা?

—তোমার কাছে মিথ্যে বলব, এমন পাষণ্ড আমি?

[illegible] সল। সন্দেশের মোড়কটা তুলে নিয়ে শেফালী বলল,—[illegible] ধুয়ে এস। আমি ভাত বাড়ছি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একসময়ে শেফালী বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। [illegible]শা নগরের বস্তীর ভেতর এখনও ইলেকট্রিক আসে নি। কেরোসিন তেলের হারিকেন আলো বিকিরণ করে। প্রয়োজন ছাড়া আলো জ্বালায় না শেফালী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন খরচ করার সামর্থ্য আর তার নেই।

—চাকরির খোঁজ পেলে কিছু? অন্ধকারেও অভ্যস্ত শেফালী বিছানার একপাশে উঠে বসে।

—[illegible] পেলম বলে। পরম নিশ্চিন্ততা কালুর কণ্ঠস্বরে।

—না পেলে যে আর চলবে না। শেফালীর কথাগুলো কান্নার মতই শোনাল।

—কেন? বেশ তো চলে যাচ্ছে।

—আর আমরা দু'জন নই, মনে থাকে যেন। মৃদুস্বরে শেফালী জানিয়ে দিল।

কালুর দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক বিচিত্র শিহরণ। সে বাবা হতে চলেছে। সন্দেশের বিনিময়ে আর এক রকমের সন্দেশ পরিবেশন করল শেফালী। চোখের সামনে অনেক অনেক আলোর বাতি ঝলমলিয়ে উঠল যেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসল সে। শেফালীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল,—আগে বলো নি কেন?

—বুঝতে পারি নি। কোলের ভেতর মুখ গুঁজে দিল শেফালী।

মাথায় হাত বুলিয়ে কালু আশ্বাস দিল, সোমবার থেকে চাকরির জন্তে হত্তে হয়ে লাগব'। দেখি, পাই কি না।

সোম থেকে শুরু।' রাস্তার পীচের অনেকখানি কালুর জুতোর সঙ্গে উঠে এসেছে এই পাঁচ দিনে, কিন্তু কোথাও আশ্বাসের কথা শোনে নি একবারও। টাকার দরকার। শেফালী হাসপাতালে দেখিয়ে এসেছে। ওষুধ লিখে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। রক্ত হওয়া দরকার। ক্রমশ রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে শেফালী।

হাসি আসে কালুর। রক্তহীন হয়ে যাওয়া কি এতই সহজ! তাহলে কালু বাঁচত না। এই তো গত সপ্তাহে রক্ত দিয়ে এসেছে সে। আবার আজ যাবে। এখন আর ভয়-ডর নেই তার। চেনাশোনা সবাই বলে দিয়েছে রক্ত দেবার ফাঁকফুঁক। মিথ্যে নাম ঠিকানা দিলে ডাক্তারের বাবার সাধ্যি নেই ধরার। নতুন লোক ভেবে নতুন 'ডোনার কার্ড' দিয়ে দেবেন ডাক্তারবাবু। হাতের দাগ দেখে পুলিশ যদি গোলমাল করে। বললেই হবে মশায় কামড়েছে অথবা ফুসকুড়ি হয়েছে।

পরিচিত পদক্ষেপে মেডিকেল কলেজের সিঁড়িওলা বাড়ির একতলাতে হাজির হল কালীপদ মিত্র। যথারীতি লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় নিশ্চিন্ত মনে। হাতের দাগটার দিকে কয়েকবার নজর চালাল কালু। না, বুঝতে পারবেন না ডাক্তারবাবু। একটা মিথ্যে নাম বলে দিলেই হবে। কি নাম বলা যায়? কালিদাস, হরিদাস, শিবদাস।

শিবদাসই বলবে কালু। কালীপদ আর শিবদাস একই হল প্রায়। কালীর পায়ের তলাতেই তো শিবের অবস্থান। নিজের মনেই হাসল কালু।

—কি দাদা? খুব ফুর্তি যে। লাইনের পাশে সহাস্তে দণ্ডায়মান বুকিদাদা।

—এই এলাম। মৃদু হাসিতে কালুর মুখ ভরে যায়,—আর এক বোতল রক্ত দিতে।

—ধরে ফেলবে যে। ফিসফিস করে বুকিদাদা সাবধান করে দেন।

—নাম ধাম বদলে দেব। ততোধিক মৃদুস্বরে উত্তর দিল কালু মিত্তির।

—এবার ঘোড়ার টিপ্‌স্ পেয়েছেন না কি?

লাইন এগিয়ে চলে, তার সঙ্গে বুকিদাদাও এগোয়।

—না। কালুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

—এবার জবর একটা ঘোড়ার খোঁজ পেয়েছি।

—আর খেলব না। কালুর জবাবটা এত স্পষ্ট যে বুক্কিদাদার কয়েক মিনিট লাগল ঠিক বুঝতে।

—খেলবেন না? তবে এখানে?

—টাকার অন্য দরকার আছে।

—অ। বুক্কিদাদা কালুকে ছেড়ে এগিয়ে গেলো বোধ হয় অন্য কোন খদ্দের পাকড়াতে।

সামান্য লোক কমাতে কমতে অবশেষে কালুর ডাক এল। পুলিশ সার্জেন্টের কাছে এসে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কালু বলল,—আমার নাম নিবারণ দত্ত।

—কেন মিথ্যে কথা বলছেন? বুক্কিদাদা পেছন থেকে টিপ্পনী ছাড়ল—আসল নামটা বলেই দিন না।

পুলিশ সার্জেন্ট বুক্কিদাদার দিকে তাকালেন।—আপনি ওকে চেনেন?

—বিলক্ষণ। নির্বিকার ভাবে বুক্কিদাদার উত্তর।—কি ভায়া, আসল নামটা ছাড়বে না কি?

কালু মিস্তির চুপ। এমন ভাবে ধরা পড়বে কস্মিনকালেও ভাবে নি। হঠাৎ কিছু মাথায় এল না বলার মত।

—চুপ করে আছ কেন? পুলিশ সার্জেন্টের ধমকানি।—আসল নাম বল।

—ও বোধ হয় ভুলে গেছে। ফিস্ফিস্ ফিস্ফিস উত্তর দিল বুক্কিদাদা। তারপর পুলিশের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, গত সপ্তাহের খাতা খুলে দেখুন কালীপদ মিত্র আছে কি না।

—আছে। খাতা পরীক্ষা করে পুলিশ দেখল আগের শনিবার কালীপদ মিত্র রক্ত দিয়ে গেছে।

—হবে না। তিন মাস পরে আবার রক্ত দিও। লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে পরের লোককে ডাকলেন সার্জেন্ট সাহেব।

কালু পেছিয়ে এল লাইন থেকে। লাইনের লোক এগিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। কালু ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। কি করবে সে? কোথা থেকে টাকা পাবে? টাকার যে বড় প্রয়োজন। শেফালীর জন্য কিছু ভালমন্দ কিনে নিয়ে যাওয়া দরকার। আজ আর সে একা নয়, আজ আরও একজন অনাগত অতিথি তার দেহের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছে। সংসার বাড়ছে, অথচ আয় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে। চাকরি নেই। চাকরি পাবার আশাও সুদূরপরাহত। যেখানে গিয়েছে, সেখান থেকে ব্যর্থতা নিয়েই ঘরে এসেছে। কেউ উপদেশ দিয়েছে, কেউ বা টিটকারী।

—কি দাদা? টাকা হল? পাশে দাঁড়িয়ে বুক্কিদাদা ফুক ফুক করে সিগারেট টানছে।

কালু তাকাল একবার। রাগে গরগর করছে, অথচ মুখ ফুটে বলার উপায় নেই। সময় অসময়ে দু' চার টাকা ধার পাওয়া যায় লোকটার কাছ থেকে

--কেন দাদা সর্বনাশটা করলেন? কালুর বিনীত নিবেদন।

—আমার ওপর মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন?

—অন্যায় হয়েছে। একটা মঙ্গল বাতলান দাদা।

একটু ভাবল বুক্কিদাদা। টাকার কথাই ভাবছে বোধ হয়।

—কথা বলছেন না যে।

—টাকার একটা ব্যবস্থা করতে পারি—কিন্তু সর্ত একটা।

—বলুন।

—টাকাটা ঘোড়ার পেছনে লাগাতে হবে।

—সবটা লাগালে মরে যাব।

—বেশ আধাআধি।

—রাজি। কিন্তু টাকা রোজগারের উপায়?

—হবে, হবে। চলুন আমার সঙ্গে।

বুক্কিদাদার সঙ্গে কালু হাজির হল ভবানীপুরের হাসপাতালে। এখানেও ছোট একটা ব্লাডব্যাঙ্ক আছে, কয়েকজন লোকের রক্তও নেওয়া হয় রোজ। ঘোড়ার মতই, এসব খবর বুক্কিদাদার নখদর্পণে।

—এখানে নাম-ধাম অন্য বলবেন। ফিসফিসিয়ে শিখিয়ে দিল বুক্কিদাদা।

মাথা নেড়ে সায় দেয় কালু মিস্তির। এ সব আর শিখিয়ে দিতে হবে না কালুকে। ওসব আটঘাট এখন পুরোপুরিই জানে।

এখানে আবার দোতলায় উঠতে হয়। তবে মেডিকেল কলেজের মত পুলিশ পাহারা নেই। একজন দরোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে একতলায় সেই এক এক করে ছেড়ে দেয় সকলকে।

সিঁড়ির মুখে যেতেই দরোয়ান বলল, ক্যা মাংতে?

—রক্ত দেব। বুক্কিদাদা একটু গম্ভীর হয়ে জবাব দিল।

—আজ তো বন্ধ হো গিয়া। কাল আনা। দরোয়ান নির্বিকার ভাবে জবাব দিল।

—কাল সকালেই আসবেন। আমিও আসব। বুক্কিদাদা সমস্যার সমাধান করে ফেলল এক নিমেষে।

শনিবার সকাল বেলাতেই ভবানীপুরের হাসপাতালে লাইন দিয়ে দাঁড়াল কালু মিস্তির। রক্ত তাকে দিতেই হবে। টাকার ভীষণ দরকার। আজ ঘোড়ার চেয়ে আরও বড় রকমের অতিথি পৃথিবীতে আসছে। একটা কর্তব্যবোধ অন্তরের কবরখানা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার ঝাঁকুনি অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই, অবহেলা করার সংগতি নেই। রেস খেললেও সব টাকা খেলবে না। পাঁচ টাকার বাজী ধরবে, বাকি পাঁচ টাকার ওষুধ, পথ্য কিনে নিয়ে যাবে শেফালীর জন্যে। আজ কেমন যেন মায়া লাগছে শেফালীর জন্যে। বড় অবহেলা করা হয়েছে বেচারীকে।

—এসে গেছেন। বুক্কিদাদা সহাস্যে পাশে এসে দাঁড়ায়।

কি বলবে কালু মিস্তির? বলার মত কোন কথা জোগায় না। সব কথা হারিয়ে গেছে যেন।

—এখানে অত কড়াকড়ি নেই। বুক্কিদাদার অভয় দান। দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেবে

আবোল-তাবোল অনেক কথাই বলে যাচ্ছিল বুক্কিদাদা। অনেক কথাই কালুর কানে ঢোকে নি; মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে আলোচনা শুরুও করেছিল। অনেকটা সময় কাটাতে হবে। কথার ভেতর দিয়ে সময় কেটে যায় খুব তাড়াতাড়ি।

এক সময়ে লাইনটা নড়ে উঠল। দরোয়ান এক-এক করে

পাঠিয়ে দিল ওপরে। জন পনেরো পাঠিয়েই বন্ধ করে দিল। ভাগ্যিস কালু আগে থেকে দাঁড়িয়েছিল।

এখানে পুলিশ নয়, একেবারে ডাক্তারের সামনে দাঁড়াতে হয়। ডাক্তারবাবু নিজেই পরীক্ষা করে দেখেন সব-কিছু। কালু মিস্তির দুরু দুরু বুকে ডাক্তারের সামনে হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

—হুঁ। গম্ভীর হয়ে ডাক্তারবাবু জবাব দেন,—ক'দিন আগে রক্ত দেওয়া হয়েছে?

—তা স্যার, মাস পাঁচেক আগে।

ডাক্তারবাবু একবার কালুর মুখের দিকে তাকালেন। বোধ হয় চেনবার চেষ্টা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, দেখি নি মনে হচ্ছে, তা এ দাগটা কিসের?

ছ্যাঁৎ করে উঠল কালুর মন। আগের দিনের রক্ত দেওয়ার দাগটা এখনও কালো বুটিদানার মত উঁচু হয়ে রয়েছে হাতের ওপর। দাগটা নজরে পড়েছে ডাক্তারের।

—ওটা কিছু নয়। একগাল হেসে উত্তর দিল কালু,— একটা মশা কামড়েছে।

ডাক্তারবাবু হাসলেন।—দেখে দেখে ঠিক জায়গাতে মশা কামড়েছে। যাক গে,—ও হাত দেখি।

বাঁ হাতটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেয় কালু মিস্তির। সে হাতটা অক্ষত আছে দেখে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—ঠিক বলছ, তিন মাসের ভেতর রক্ত দাও নি?

—না স্যার। মাথা ঝাঁকিয়ে কালুর জবাব।

—কি নাম?

মিথ্যে নাম, মিথ্যে ঠিকানা বলল কালু। আর ভরসা নেই। যদি আবার ও কলেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তা'হলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।

রক্ত দিয়ে বেরিয়ে এল কালু। আজ আর অত খারাপ লাগে নি রক্ত দিতে। অনেকটা সহ্য হয়ে গেছে ব্যাপারটা। বুকিদাদা দাঁড়িয়েছিল হাসিমুখে। নীচে নামতেই কাছে এসে বলল, সব ঠিক হয়েছে?

—হাঁ।

—চলুন ব্রাদার। একটা ঘোড়ার যা খবর পেয়েছি। নির্ঘাৎ লেগে যাবে আজ।

সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল কালু মিস্তির। একটুর জন্যে তার ধরা ঘোড়াটা বেসামাল হয়ে পড়ল। ফ্যাস্ত করা তো দূরের কথা, একেবারে শেষের দিকে পৌঁছল।

বাড়ি ফেরার মুখে পকেটে হাত দিয়েছিল একবার। আনা চোদ্দ পড়ে আছে এককোণে। রেস কোর্সে খেলার নেশায় কখন যে সব টাকাগুলো খেলে বসেছে, সে খেয়াল একটুও নেই কালুর। ট্রামের ভাড়া দিতে গিয়ে খেয়াল হল, পকেটে যা তলানি পড়ে আছে, তাতে আর কিছু কেনা সম্ভব নয়।

শা নগরের বস্তিতে ঢুকেই দেখা হয়ে গেল শ্যাম নন্দীর মায়ের সঙ্গে। বুড়ি ওর সঙ্গে দেখা করবে বলেই বসেছিল যেন।

—এই যে অলপ্লেয়ে। কোথায় ছিলে সকাল থেকে? বুড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে কালুর ওপর।

—আর বল না মাসী। সারাদিন—

কালুর কথার ওপর একটা চাবুক পড়ল যেন। ওদিকে বউটা যে শেষ হয়ে গেছে।

—সে কি! শেফালীর কি হয়েছে?

—হাসপাতালে নিয়ে গেছে দুপুরবেলায়। আমি বসে আছি তোমায় খবর দিতে। সে কি ভীষণ রক্তস্রাব।

—কোন্ হাসপাতালে—?

হাসপাতালের নাম জেনেই কালু ছুটল হাসপাতালে। এমার্জেন্সীর ডাক্তারকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন মারমুখী হয়ে উঠলেন।—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? খুঁজে খুঁজে হয়রান।

—এইমাত্র ডিউটি থেকে ফিরে খবর পেলাম। কালু মিথ্যে কথা বলল সঙ্গে সঙ্গে।

—দু' বোতল রক্ত লাগবে। রক্তের স্যাম্পেল আর ফরম্ কালুর হাতে দিতে দিতে বললেন,—পেশেন্ট-এর গায়ে আর রক্ত নেই। একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পৃথিবীটা একবার দুলে উঠল যেন। দু' বোতল রক্ত দরকার। এত টাকা কোত্থেকে পাবে? জানে না কত টাকা। কিন্তু টাকা লাগবে। যারা রক্ত কেনে, তারা বিক্রীই করে, বিনা পয়সায় বিলোয় না নিশ্চয়ই।

ব্লাডব্যাঙ্কে এসে পৌঁছল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। কলকাতার একদিক থেকে অন্যদিকে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করতে ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। ভবানীপুর থেকে মেডিকেল কলেজ। এতটা পথ ট্যাক্সীতে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু উপায় নেই। পকেটে যা অবশিষ্ট আছে, তাতে টেনেটুনে ট্রাম-বাসেরই ভাড়া জোটানো যায়।

ব্লাডব্যাঙ্ক অফিসারের হাতে কাগজ আর রক্তের স্যাম্পেল দিল কালু। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। কেমন একটা ভয় ভয় লাগছে মনের মধ্যে। ডাক্তার বোধ হয় বলবেন, রক্ত আর নেই। রক্ত যে এত মূল্যবান, একথা একবারও কি ভেবেছিল কালু সকাল বেলায়।

—রক্ত পাবেন। তিরিশ টাকা লাগবে। ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন ফরমে সই করতে করতে।

তিরিশ টাকা!

ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে রইল কালু ডাক্তারবাবুর দিকে। ঠিক হিসেব করতে পারছে না কত টাকা দিলে তিরিশ টাকা হয়।

—কই, টাকা দিন। ডাক্তারবাবুর তাড়া।

—আমার কাছে টাকা নেই ডাক্তারবাবু। হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কালু মিস্তির।

—তা'হলে? ডাক্তারবাবু একটু ভেবে বললেন,—বিনা পয়সায় তো রক্ত দেওয়া যায় না।

—কোন উপায় নেই?

—বাইরের হাসপাতালে ফ্রী ব্লাড দেওয়া হয় না। ডাক্তারবাবু টেবিলের ওধারে বসে পড়লেন।

—কিন্তু টাকা কোত্থেকে পাই? কালু মিস্তিরের চিন্তা। পনেরো টাকা পেলেও এক বোতল রক্ত জোগাড় হয়ে যেত।

—আমার রক্ত দিলে হয় না?

—এখন তো নেবে না। সকাল বেলায় রক্ত নেয়, কিন্তু—

ডাক্তারবাবু ভাল করে কালুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তো প্রায়ই রক্ত দিয়ে যান। খুব চেনা মুখ লাগছে।

—না, না স্যার।

—কই, হাতে দেখি।

দু' হাতেই সদ্য রক্তটানার ক্ষত। লুকোবার কোন উপায় নেই। ডাক্তারের কাছে ধরা পড়ে গেল হাতে হাতে।

—দূর, মশায়, আজই রক্ত দিয়েছেন। ঘাটা লাল টকটকে হয়ে রয়েছে। আপনার রক্ত এখন তিন মাস নেবে না।

ডাক্তারবাবু কালুর হাত ছেড়ে দিয়ে টেবিলের ওপর বসলেন।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ডাক্তারবাবু গিয়ে ধরলেন। কি শুনলেন কে জানে? কিছুক্ষণ পরে রিসিভার নামিয়ে গম্ভীরমুখে কালুর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কালু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ডাক্তারবাবু বললেন,—রক্তের আর দরকার নেই।

—কেন? কালুর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রলয় তাণ্ডব।

—হাসপাতালে যান। সব শুনতে পাবেন।

কিছু শোনার আগেই সব বুঝতে পেরেছিল কালু। নিঃশব্দে ট্রামরাস্তায় এসে দাঁড়াল। নিশুতি রাত। ট্রাম-বাস অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে কলকাতার রাস্তায়। একমাত্র যান ট্যাক্সী। কিন্তু—।

পকেটে হাত দিল কালু। কয়েক আনা মাত্র সম্বল। সব ঘোড়ার পেছনে খরচ হয়ে গেছে। রক্ত বেচা টাকা। রক্ত কত সস্তা।

আকাশের বুকে অসংখ্য তারা জ্বলছে। ওরা বোধ হয় দিনের আলোয় মুখ দেখাতে পারে না। তাই রাত্রির অন্ধকারে নিজেদের আসর বসায়।

নিজের মনেই একবার হাসল কালু।

শিশুর দৃষ্টিতে

কয়েক বছর আগে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেই যাত্রায় আমাদের ছেলের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কিছু লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা এখানে করেছি। তখন তার বয়স ছয়।

প্রথম সমুদ্র যাত্রা। জাহাজ চলেছে সমুদ্রের বুক চিরে। অদ্ভুত ব্যাপার! কত বড় ঢেউ! কেমন চলছে জাহাজ! কই, পড়ে যাচ্ছে না তো? আমরা ডুবে যাচ্ছি না তো! কেন? যা দেখছে সবই অদ্ভুত লাগে। কত রকম জলের রং! কেমন দুলছে, সোজা হ'য়ে হাঁটা যায় না। হেসেই গড়িয়ে পড়ে। দেখ, কত রকম লোক! আমাদের মত কথাও বলে না সবাই। কি বলছে? ডেকটা গরম, ঘরটা ঠাণ্ডা! ওদিকে আবার সাঁতারের জায়গা। মেসিন কেমন পাগলের মত করছে! ঘুরে ঘুরে শিশু অস্থির। একবার এটা দেখে, একবার ওটা। ওর সঙ্গে তাল দিতে না পেরে মা বসে পড়ে ক্লান্ত হয়ে। বাবাকে তখন টানতে টানতে নিয়ে যায়। ওদিকে একটা কুকুরছানা আছে, দেখতে হবে। কয়েক জনের সঙ্গে আলাপরত হয় মা। হঠাৎ ছুটে আসে ছেলে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—

'মা, মা, মা শোন। তোমার একটা শাড়ী দাও না। তোমার তো অ-নেক শাড়ী।'

'কেন, শাড়ী কি হবে?'

'আ-হা, দেখবে এসো! বে-চা-রী ওখানে শুয়ে আছে। তার বোধ হয় একটাও শাড়ী নেই। দু' টুকরো কাপড় পরে আছে। ডেকে খুব হাওয়া, শীত করছে নিশ্চয়, তাই রোদ্দুরে শুয়ে আছে। দাও না, একটা শাড়ী। আমি দিয়ে আসি।'

মায়ের হাত ধরে টানাটানি করে।

সকলে হেসে ওঠে।

মা বোঝাতে পারে না যে সে স্বেচ্ছায় রোদ পোহাচ্ছে—সান্ বেদিং করছে।

'ধ্যেৎ! জামা-কাপড় থাকলে কি কেউ ওরকম করে সকলের সামনে খুতুম হয়ে শুয়ে থাকতে পারে? ওর লজ্জা করবে না? ও নিশ্চয় গরীব।'

সেবার খাবারের ঘণ্টা রক্ষা করল মাকে।

* * *

সবে ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হয়েছে। নিউ ইয়র্কের রাস্তার দুই পাশের নিয়ন আলোয় বিজ্ঞাপনের বহর দেখতে দেখতে চলেছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—'বাবা, দেখ, সব জায়গায় খালি—বি এ আর—বার লেখা রয়েছে। কিন্তু কোথাও তো বলছে না, কি বার। সোমবার না মঙ্গলবার। কি বার বাবা?'

* * *

ফিলাডেলফিয়ার ফ্ল্যাট। ঘর পরিষ্কার করতে এসেছে মেড। অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে দেখে শিশু, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে তাকে—'তুমি কি মেজেন? তুমি কি মণি?'

'ইয়েস, সনি। হোয়াইট ইজ ইট, ডিয়ারি?'

'তুমি কি মণি—চাঁদমণি, ফুলমণি—না কি মণি?'

'হোয়াট সনি?'

'সনি। সনি কি? সোনা বল। তোমার নাম সোনামণি। শান্তিনিকেতনে আমাদের মেজেন আছে, তার নাম চাঁদমণি। সে কালো।' তারপর ছুটে এসে মাকে বলে—'মা, এখানকার মেজেনদের রং সাদা, চোখ অমন কেন? চুল তো কালো নয়। ওর নাম কি জান সোনামণি। আমাদের চাঁদমণি ভাল। এ শুধু ওয়াক ওয়াক বলছে, কিছু যদি জানে।'

আবার ছুটে যায়। ওর মতন ও মেডের সঙ্গে বাংলায় বকে যায়। মেড বিব্রত হয়ে পড়ে।

* * *

'মা, এখানে দূর থেকে কে ছেলে, কে মেয়ে বোঝা যায় না। সবাই প্যাণ্ট পরে, সিগারেট খায়। এরা শাড়ী পরে না কেন? হ্যাঁ মা—বল না—তুমি প্যাণ্ট পর না কেন?'

* * *

ফ্ল্যাটের নীচের তলায় ছোট্ট এক দোকান। দোকান ছোট হলে কি হবে? সব পাওয়া যায়—মাছ, মাংস, ডিম, সরবত, তেল, মাখন, রুটি, বিস্কুট, সাবান, খাতা, পেন্সিল, বাসন, আরও কত কি। খুব সুবিধে, দশ জায়গায় গিন্নীদের ছুটতে হয় না!

'মা, খাতা কিনতে হবে। তোমায় যেতে হবে না। আমায় পয়সা দাও। আমি গিয়ে হরি ময়রার দোকান থেকে নিয়ে আসি।'

'হরি ময়রা?'

'হ্যাঁ, নীচের দোকান। ওর নাম হরি।' পয়সা নিয়ে দৌড়ে চলে যায় ছেলে। মা হাসে! দোকানের নাম—'হ্যারীজ মার্ট।'

* * *

টেলিভিসান দেখছে ছেলে। কার্টুন ছবি—মাঝে মাঝে জিনিষপত্রের বিজ্ঞাপন! দেখতে দেখতে একবার ছুটে যায় মায়ের কাছে রান্নাঘরে।

'ম', এর সত্যিই বোকা।'

'কেন ?'

'দেখ—বাংলা জানে না, শাড়ী পরে না, ভাত খায় না, মাছের ঝোল খায় না। আবার দেখ—চুমু যে গালে খেতে হয় তাও জানে না। মুখে খায় ! এ কেমন দেশ ? ধ্যেৎ !'

হেসে গড়িয়ে পড়ে।

* * *

'মা, এখানে সব কিছু কাগজের কেন ? রুমাল কাগজের, টেবিলে চাদর কাগজের, হাত-মোছা কাগজের, কাগজের প্যাকেটে জিনিষ দেয়—দুধ পর্যন্ত কাগজের জামাও পরে আবার বাথরুমেও কাগজ থাকে। কেন ? জল তো আছে। আমাদের মত জল ব্যবহার করে না কেন ? বড় নোংরা—না ?'

খুসি যাচ্ছে। একদিন উত্তেজিত হয়ে ফিরে আসে।

'জান, ম, আজ কি হয়েছে ?'

'না তো ? কি হ'ল ?'

'ভাইয়েন বলছিল যে সবাই ওকে ভালবাসে ওর বন্ধুরা সকলেই 'কিস্' করে। আমিও তো ওর ছেলে বন্ধু, আমি কেন 'কিস্' করি না। বারে বারে বলতে এত রাগ হল যে—আমিও ওকে না, ধরে 'কিস্' করে দিলাম।'

'কাণ্ড ! আর নয়—এবার দেশে ফিরে যাওয়া যাক্।'

বারি দেবী

জপ করতে করতে আজ বার বার চঞ্চল মনটা কেন আজ্ঞাচক্র ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিষিদ্ধ এলাকায় ! এ কি হল ?

জপের মালা থামিয়ে, পলাতক মনটাকে আকর্ষণ করে,—ইষ্ট-মূর্তির ধ্যানে তাকে নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করে ললিতা।

এমন মনোহারিণী কলনাদিনী গঙ্গা-সমুখে, এ-সময়ে মনের এই চঞ্চলতা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ! মনটাকে জোর করে ধরে রাখে ললিত ধ্যানের মাঝে, কিন্তু কখন যে সে আবার পালিয়ে গিয়ে নিষিদ্ধপথে বিচরণ করতে শুরু করলো, ললিতা তা জানতে পারলো না।

মন চলে গেছে, সেই দু'বছর আগেকার দিনগুলোতে।

বিয়ের পর নতুন এসেছে স্বামিগৃহে ললিতা। ভোরবেলায় শয্যা ত্যাগ করে স্নানান্তে গোপীচন্দনের তিলক এঁকেছে কপালে, বাহুতে এবং অন্যান্য স্থানে। তারপর জপ-ধ্যান সাঙ্গ করেছে নিরালায় বসে।

আত্মীয়-কুটুম্বজনে তখনও গমগম করছে চৌধুরী-বাড়ী। ওর কপালে তিলক দেখে, অনেকেই হাসাহাসি করলো, কেউ কেউ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়লো না। চুপ করে সব কিছুই হজম করলো ললিতা।

শাশুড়ী ঝাঁজের সঙ্গে বললেন—এ আবার কোন ঢং ? বোষ্টমী সাজা এ-বাড়ীতে চলবে না বৌমা। মুছে ফেলো তোমার ঐ তিলক।

—এ যে ভগবানের মন্দির মা; একে মুছে ফেলার শক্তি আমার নেই। মৃদুস্বরে জবাব দিয়েছিলো ললিতা।

—বটে ? মুছতে পারবে না ? দেখি অশোক তোমার ঐ তিলক কেমন করে সহ্য করে। রাগতভাবে ছেলের দরবারে নালিশ জানাতে চলে গেলেন শ্বশ্রূমাতা।

—ললিতার শ্বশুর বিমল চৌধুরী রিটায়ার্ড জজ। তিনি বললেন,—বৌমা তো কিছু অন্যায় করেন নি। তুলসীর কণ্ঠিমালা ও তিলক ভারি পবিত্র জিনিষ। এর জন্য ওঁকে পীড়ন করা উচিত নয়।—আর বিয়ের আগেই তো বেয়াইমশাই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যদিও তাঁর কন্যা উচ্চশিক্ষিতা, তথাপি একটি কথা জানিয়ে রাখি যে সে স্বেচ্ছায় বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করেছে, অতএব এ-বিষয়ে ওকে যেন কিছু না বলা হয়।

—তুমি থামো তো। বুড়ো হয়ে ভীমরতি ধরেছে তোমার! মন্ত্র যা খুশি নিক না, কে বারণ করছে, শুধু তো ঐ তিলক আর গলায় ঝি-চাকরদের মত কণ্ঠীটা বাঁধতেই বারণ করছি। বললেন তাঁর গৃহিণী।

অশোক একটু গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো,—তোমরা গোলমাল কোরো না মা। আমি দেখছি, কি করতে পারি।

না। অশোকও কিছু করতে পারে নি।

ললিতা খুব নম্রভাবে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে—এটা লোক দেখানো ব্যাপার নয়! দেহের দ্বাদশ স্থানে ভগবানের মন্দির এঁকে তার ভেতর বিন্দু দিয়ে তাঁকে স্থাপনা করতে হয়। দীক্ষিতজনের এই পবিত্র নীতি অবশ্য পালনীয়, কারণ দীক্ষার পর সে হয়ে যায় ভগবানের দাস বা দাসী। আর এই তিলক কণ্ঠীই হচ্ছে তার চাপরাশ।

বিরক্ত হয়ে অশোক বলেছিল,—ওসব তত্ত্ব কথা রেখে দাও! বাস্তবক্ষেত্রে সবটা পালন করা চলে না! ধর্ম ধর্ম করছো, অথচ এটুকু জানো না যে তোমার শ্বশুরকুলের ধর্মই তোমার ধর্ম। আর তোমার স্বামীর বা গুরুজনের আদেশ পালন করাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

—জবাব দিলো ললিতা—তোমার কথা আমি মানি কিন্তু সকল ধর্মের সার কথা এই যে—গুরু আজ্ঞা পালন! সকল গুরুজনের ওপর শ্রেষ্ঠ গুরু যিনি, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করা প্রাণ থাকতে আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে, তুমি বাড়ীতে চুপি চুপি সে আজ্ঞা পালন করো। তবে যখন আমার সঙ্গে বাইরে কোথাও যাবে, তখন ঐ বৈষ্ণবী সাজটি বাদ দিও। আর বাড়ীতে আমার বন্ধু-বান্ধব এলেও ওঁদের সামনে ঐ হাস্যকর পরিবেশটির সৃষ্টি করো না। আশা করি আমার এই অনুরোধটি রাখবে। কথা শেষ করে, ললিতার দিকে চাইলো অশোক।

—তোমার এ অনুরোধটুকুও রক্ষা করতে আমি অপারগ! আমাকে ক্ষমা করো! যাকে মনে-প্রাণে অন্যায় বলে জানি, সে কাজ আমি কিছুতেই করতে পারবো না! রুক্ষ-লিপস্টিক মাখা, রকমারী রং-এর টিপ পরা, অশ্লীল ভঙ্গির ব্লাউজ পরা, শাড়ী পরা এসব যদি, হাস্যকর না হয়, শুধু হাস্যকর হয় ভগবৎ নামাঙ্কিত তিলকচিহ্ন, তবে জেনো ঐ কুৎসিত ভণ্ড মনোভাবকে আমি ঘৃণা করি।—আর তারই সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমি অক্ষম। সজল চোখে জবাব দিয়েছিলো ললিতা।

একটি সামান্য মেয়ের এই অসহ্য ধৃষ্টতাকে সহ্য করে নেওয়া, একজন সদ্য বিলাত ফেরৎ, বিলাতি ছাপের অহমিকাযুক্ত ডাক্তারের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। রুক্ষ দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে থাকবার পর শ্লেষ ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছিলো ডাক্তার অশোক চৌধুরী—আমাকে যতটা নির্বোধ মনে ভেবেছো, জেনে রাখ আমি তা নই! তোমার ঐ ন্যাকামির আড়ালে যে একগুঁয়ে মনোভাবটি রয়েছে, সেটি যে নিছক তোমার ধনীকন্যার অহঙ্কার—এবং সেই অহঙ্কারের শক্তিতে আমাদের সকলকে অপমান করার দুষ্প্রবৃত্তি রয়েছে তোমার মনে, এ কথাটা বোঝবার মত বুদ্ধি আমাদের ঘটে আছে।—তবে প্রথমেই আমি চাই না তেমন কিছু গোলমাল করতে, তবে এটুকুও জানাতে বাধ্য হচ্ছি তোমাকে, যে তোমার এই ধরণের মনোবৃত্তিকে আমরাও বেশী দিন মেনে নেব না, অবশ্য তোমাকে সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে নিজেকে সংশোধন করবার চেষ্টা করতে পারো, কারণ আমাদের বিবাহিত জীবন অশান্তিপূর্ণ হোক—আশা করি, এটা তুমিও চাও না। ভেবে দেখো, আমার কথাগুলো।

ভেবেছে! অনেক ভেবেছে ললিতা। তবুও এই পরম পবিত্র, পরম সত্যকে অন্যায় রূপে কিছুতেই ধারণা করতে পারে নি—তাই তিলক-কণ্ঠীকে ত্যাগ করাও তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

তার মধুর ব্যবহারে শ্বশুর-শাশুড়ী সকলেই তাকে যথেষ্ট স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছিলেন। বাড়ীর অন্যান্য পরিজন, দাস-দাসী সকলেই বৌদি বলতে অস্থির। স্বামীর ভালোবাসারও কিছু কমতি ছিলো না বটে,—তবে ঐ তিলক কণ্ঠী যেন গোলাপের কাঁটার মতোই জেগে ছিলো সব কিছুর মাঝে। মাঝে মাঝে যখন অশোকের বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতো ওকে—।

—সাত সাগর ঘুরে এসে শেষকালে এক আখড়ার বোষ্টমীর ফাঁদে পড়লে ব্রাদার। কোনদিন দেখবো, যে তুমিও সর্বাঙ্গে ছাপছোপ মেরে গলায় কণ্ঠী বেঁধে খোল করতাল নিয়ে নৃত্য শুরু করেছো, দেখলে অবশ্য অবাক হবো না, তবে মাঝে মাঝে মালসা-ভোগ আমাদেরও একটু দিও, দিব্যি মুখ বদলানো যাবে

এই ধরণের কথা বার্তায় অশোকের মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগলো। একদিন সে ঝড়ের বেগে ঘরে এসে বললো ললিতাকে—অনেক বিদ্রূপ সহ্য করেছি তোমার জন্যে,—আর নয়। হয় তুমি তোমার জেদ ছেড়ে ভদ্র চালচলন শুরু কর,—আর তা না হলে, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো, পৃথক থাকবো।

—না, তোমাকে যেতে হবে না। আমিই চলে যাবো, গিরিডিতে, বাবার কাছে। তারপর ঠাকুর যা করেন তাই হবে।

পরম শান্তভাবে জবাব দিয়েছিলো ললিতা।

সেই দিনই গিরিডি রওনা হল ললিতা। যাবার আগে অবশ্য তার শ্বশুর-শাশুড়ী ললিতাকে অনেক অনুরোধ করেছিলে—চলে না গিয়ে, দু'চারদিন, ঐ তিলককণ্ঠীটা বাদ দিলে হয় তো অশোকের মন আবার ঠিক হয়ে যাবে।

ওঁদের প্রণাম করে মৃদু হাসির সঙ্গে জবাব দিয়েছিলো সে—সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। আশীর্বাদ করুন এই বিশ্বাস যেন আমার অটুট থাকে।

তারপর দীর্ঘ দু'বছর কেটে গেছে। এ দু'বছর ললিতা তার বাবার সঙ্গে বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছে। বৃন্দাবনে গুরুর কাছেও থেকেছে কিছুদিন।

পরম বৈষ্ণব সিদ্ধগুরু হরিদাস স্বামী—ওকে আদর করে বলেছেন—কিরে বেটি! মনটা কি বলছে? পরীক্ষাটা বড্ড শক্ত লাগছে না?

—না বাবা! আপনার কৃপায়, সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। গুরুর চরণে মাথা রেখে জবাব দিয়েছিলো ললিতা।

উনিশশো বাষট্টি সাল! হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ যোগ উপলক্ষে বাবার সঙ্গে হরিদ্বারে এসেছে ললিতা। গঙ্গার ধারেই আশ্রম,—সেখানে রয়েছে ক'দিন হল।

গুরুদেব আসবেন কিছুদিন পরে। কি অপূর্ব জায়গাটা। লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়েছে হরিদ্বারে। যে দিকে দৃষ্টি ফেরাও,—সেই দিকেই গেরুয়া রং। সারাদিন রাত, হরিদ্বারের আকাশ বাতাস, ভগবৎ নামে, স্তব-স্তোত্র গানে মুখরিত। সারা দেহে মনে, কি এক অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন এসেছে যেন।

বাবার সঙ্গে ললিতা ঘুরে বেড়ায়। সপ্তর্ষিমণ্ডল, চণ্ডী পাহাড়, কনখল, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা সব দেখা হল।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে কাল থেকে বড় শ্রান্ত বোধ করছে সে। সেজন্য আজ আর বেরুতে পারে নি। গঙ্গার ধারে চাতালের এক পাশে বসে, মালা জপ করছিলো। সামনে উদ্দাম কলনাদিনী জাহ্নবীধারা। ওপারে অসংখ্য কৃষ্ণচূড়া গাছে যেন আগুন লেগেছে। তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসীদের সাদা, লাল, কালো, তাঁবুগুলো। চোখ-ধাঁধানো আলোয় ঝলমল্ করছে মেলামণ্ডপটি। সেখান থেকে ভেসে আসছে লাউড্‌স্পীকারে হিন্দি ভজন।

বিশাল গঙ্গার পাড়টি হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে গম্ গম্ করছে। এপারে আশ্রমের ঘাটে ললিতা বসে আছে একা। মাঝে মাঝে দু' একজন গেরুয়াধারী আসছেন স্নানের জন্য।

গতকাল রাতে অশোককে স্বপ্নে দেখার পর থেকেই ললিতার মনটা হঠাৎ যেন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বার বার মনটা সেই দু' বছর আগেকার টুক্‌রো টুক্‌রো মধুস্মৃতির চারিপাশে ছুটে গিয়ে প্রদক্ষিণ করে আসছে। বারে বারে চমকে উঠেছে ললিতা। এ কি হল? এমন দেবভূমিতে এসে মনের এ কি শোচনীয় অধোগতি হল? কি করবে সে?—'ফরে যাবে, গুরুদেবের কাছে? তা ছাড়া আর উপায় কি? অশোক কেমন আছে? কেন তার কথা মনে পড়ছে বারে বারে?

গুরুদেব, গুরুদেব! বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢেকে ললিতা আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল!

না ধ্যান তো হলো না। ধ্যানলোক থেকে মনটা পালিয়েছে সেই নিষিদ্ধ এলাকায়।

—ললি! ললিতা!

এ কার কণ্ঠস্বর কে ডাকে ওর নাম ধরে?

চমকে উঠে পেছনে মুখ ফেরাতেই নজরে পড়লো ওর,—একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে চেয়ে। তার মুণ্ডিত মস্তক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কপালে তিলক, সর্বাঙ্গে হরিচন্দনের ছাপ,—গলায় তুলসীর কণ্ঠীমালা। আবছা সন্ধ্যার অন্ধকারে—এক অপরিচিত পুরুষকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে, ওর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো।

পুরুষটি ততক্ষণে এগিয়ে এসে বসেছে ওর পাশে।

তারপর মৃদু হাসির সঙ্গে বললো:—তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ললি?

—আঁ্যা। এ কি? তুমি—তুমি?—তোমার এই বেশ? তুমি এসেছো? থর থর করে কেঁপে উঠলো ললিতা।

—হ্যাঁ ললিতা, আমি—প্রসন্ন হাসির সঙ্গে জবাব দিল ডাক্তার অশোক চৌধুরী:—যাকে পরম শত্রুজ্ঞানে প্রচণ্ড রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, ক্রমে ক্রমে কখন যে সে রাগ অনুরাগে পরিণত হলো তা নিজেই জানতে পারি নি ললি। সেই পরম শত্রুর স্বরূপ কি? শক্তিই বা কি? এই সব ভাবতে ভাবতে নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুই জানা গেল না। বাড়লো মনের অস্থিরতা। তারপর ঘুরে বেড়ালাম বহুস্থানে। ঘুরতে ঘুরতে এই কয়েক'দন আগে এসে পড়েছিলাম বৃন্দাবনে। সেখানে এক বৈষ্ণব মহাপুরুষকে প্রথম দর্শনেই বড় ভালো লাগলো, তারপর চললো কয়েকদিন ধরে তাঁর সাথে প্রশ্নোত্তর। তারপরে···দেখতেই পাচ্ছো। উনি যে তোমার গুরু, সে কথা অবশ্য দীক্ষার পরে জেনেছিলাম। আর তাঁর আদেশেই আজ এখানে এসেছি। কথা শেষ করে একটু হেসে বললো অশোক—তিলকটা কিন্তু তোমার মত সুন্দর করে আমি করতে পারছি না ললি, এটা তুমি আমাকে শিখিয়ে দিও।

পরম করুণাময়ের অনন্ত কৃপা স্মরণ করে, দরদর ধারায় ভেসে যাচ্ছিল ললিতার গাল দু'টো। গলায় আঁচল জড়িয়ে সে গুরু আর ইষ্টকে স্মরণ করে অশোকের পায়ে মাথাটা লুটিয়ে দিল।

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

আভা পাকড়াশী

৺বিজয়া দশমী

মাইশোর,
মভার্ণ কাফে,
১১৫৭ (সোমবার)

ভাই অবনীশ,

তুমি আমার ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা নিও, তোমার বাবা মাকেও আমার প্রণাম দিও।

তোমাকে কতকগুলি কথা লিখছি কারণ সেগুলো শুধু তোমাকেই লেখা চলে। তোমার ওপর আমার পুরোপুরি এই বিশ্বাস আছে যে, আমাকে বিদ্রূপ করবে না, উপরন্তু প্রবাসী বন্ধুর মনটা বোঝবার চেষ্টা করবে।

আসল কথা দাদাকে বোলে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে। ভাবছ এতদিন পরে আমার মত বদলাল কেন? তাই না? তারই পুরো বৃত্তান্ত এই চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে। এক তো এতদিন বদলির চাকরি ছিল, দ্বিতীয়ত মন থেকে তাগিদটা তেমন অনুভব করি নি। কিন্তু স্বজনবিহীন সুদূরপ্রবাসে মন যেন বড় ফাঁকা লাগে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বসে আমার এই অবস্থা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

যাই হোক তোমার পছন্দমত এই জায়গার পুরো বর্ণনা দিয়ে তোমাকে গত কয়েকদিনের ঘটনাটা জানাচ্ছি।

এবারও মাইশোরে এসেই বৃন্দাবন গার্ডেনস দেখতে এসেছি। তুই তো জানিস ভাই আমি বড় ভালবাসি এখানে আসতে। অদ্ভুত এর আকর্ষণী শক্তি। এই বাগানকে শুধু বাগান বলে আমার মনে হয় না, এর নৈসর্গিক মনোহারিত্বায় একে সত্যিই শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি

বলে অনুভব হয়। এখনো সন্ধ্যে হয় নি। বাস থেকে নেমে টিকিট কাটলাম। এরা এখানটাকে বলে 'কৃষ্ণসাগর'। তার কারণ মহারাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াডিয়ার এখানে কাবেরী নদীতে একটি ড্যাম তৈরী করেন, আর তারই জল দিয়ে এই অপূর্ব নয়নাভিরাম উদ্যান বৃন্দাবন গার্ডেনস-এর ফোয়ারাগুলি সৃষ্টি করেন। এঁর নাতি এখন মাইশোরের রাজা, ওরফে গভর্ণর।

ড্যামের ওপর থেকে বৃন্দাবন গার্ডেনস্ দেখলে তবে এর প্ল্যানটা বোঝা যায়। না'হলে অতখানি বাগান একদিনে ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। এর বিশেষত্ব ফুলে নয় ফোয়ারায়। স্টেপ বাই স্টেপ নীচে নেমে গেছে বাগান, এক-একটি স্টেপে এক-এক রকম ফোয়ারার ডিজাইন। এ যে কি অপূর্ব দৃশ্য—আহা তোকে যদি দেখাতে পারতাম! যেমন ফোয়ারার জলের নানা ভঙ্গীর বাহার তেমনি রং-এর বাহার, লিখে বর্ণনা কোরে আর তার কতটুকুই বা বোঝাতে পারছি জানি না ভাই। কিছু ভাল জিনিষ দেখলে মনে হয় প্রিয়জনকে এনে দেখাই। আমার লাজুক স্বভাবের জন্য বন্ধুর সংখ্যাও যে কত নগণ্য সে-ও তোর অজানা নয়। একমাত্র ছেলেবেলার বন্ধু তুই। তাই মন-প্রাণ খুলে তোকেই সব লিখি।

হ্যাঁ যা বলছিলাম। প্রথম স্টেপে আছে একটি অদ্ভুত কারুশিল্পের প্রকাশ, রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব যুগল-মূর্তি। তাঁদের পদপ্রক্ষালন করেই প্রথম ফোয়ারা সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটি রঙ্গীন ফোয়ারা। বিভিন্ন স্টেপে ভিন্ন ভিন্ন রং। মাঝখান দিয়ে এক থাক করে সিঁড়ি নেমেছে আর সরু রাস্তা চলে গেছে। দু'পাশে ফ্লাওয়ার বেড। সেই ফুলের সঙ্গে রং মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ফোয়ারার রং। প্রত্যেকটি বিভিন্ন স্টেপের ফোয়ারার আকৃতিও বিভিন্ন, যেমন কোনখানে অনেকগুলি ফোয়ারা ছাতার মত একসঙ্গে জুড়ে গেছে। কোনখানে বা প্রত্যেকটিই ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত, আবার কোথাও লীলাভরে এ-ওর গায়ে হেলে পড়েছে। এখানের ঝর্ণাগুলি বড় বড় ডোমের আকারে ছাঁটা। ফোয়ারাগুলির নীচে জোর পাওয়ারের রঙ্গীন আলো দেওয়া, তাতেই লাল, নীল, সবুজ হলদে রং ধরেছে ফোয়ারাগুলি। প্রত্যেকটি ফ্লাওয়ার-বেডেও নীচু সেডে আলো দেওয়া। মনে হবে নন্দনকানন অলকাপুরীর। বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে হয় কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা আগে দেখবো।

আলো কিন্তু এখনো জ্বলে নি। নীচের দৃশ্য দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময়ে চোখে পড়লো একটি সবুজ শাড়ী পরা তন্বী। তার নৃত্যের ছন্দে সিঁড়ি নামার ঢঙে মনে হোল, ভি শান্তারামের 'সন্ধ্যা' বুঝি। তুই দেখেছিস বোধ হয়, 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে'তে এখান থেকেই কতকগুলি দৃশ্য নিয়েছিল। কিন্তু রঙ্গীন ছবিতে রঙ্গীন ফোয়ারা বড় কৃত্রিম মনে হয়েছিল। এবার আসল কথা বলি। মেয়েটি এতগুলি লোকের মধ্যে থেকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করায় পায়-পায় নীচে নেমে এলাম। অনেক দূর থেকেই ওর মাথার বড় রূপার ফুলটি চোখে পড়ছিল। তাতে আবার চেনের সঙ্গে অনেকগুলি ঘুঙুর গাঁথা। মাথায় মস্ত লম্বা বেণী। লুকোচুরি খেলছে, ছোট ভাইদের সঙ্গে।

আমিও কাছাকাছি একটা ঝাউয়ের ডোমের আড়ালে বসে পড়ি। এবার ও চোর হয়েছে। ছোট ভাইটি টানতে টানতে যার কাছে নিয়ে গেল তিনি বোধ হয় বড় ভাই। ছোটরা ওকে 'ভাইয়া' বলছে। বলছে ভাইয়া বাঈ চোর। মনে হয় মহারাষ্ট্রী হবে। হয় তো মীরাবাঈ বা যমুনাবাঈ এমনি কোন নাম হবে। দুই হাতে মুখ ঢেকে চোর হয়েছে, মাথাটি নীচু করতেই দেখি সেই বড় রূপার ফুলটি নেই। বোধ হয় ভাইয়ার চোখেও পড়েছিল সকলেই খুঁজতে লাগলো। আমিও আমার চারপাশ দেখলাম, হঠাৎ দেখি হাত-দুই ওপরে গাছের ডালে আটকে আছে। আমি এখানে আসার আগে হয় তো ও এখান দিয়ে যাবার সময়ে ওটা ওখানে আটকে গেছে।

উঠে পড়তে যাব এমন সময়ে মিষ্টি একটু ডাকি, 'ভাইসাব। মেহেরবাণী করকে থোড়া উঠিয়ে না, সায়দ মেরী সেজুরী য়েঁহী কহিঁ খো গঈ হোগী'।

আমি শশব্যস্তে বলি, 'হাঁ হাঁ জরুর, পর নীচে নহিঁ গিরী যহ দেখিয়ে ডালোঁপর ফুলকি তরহা ঝুমতী হাঁয়।' পেড়ে হাতে দিই।

বিগলিত হয়ে ধন্যবাদ দেয়, 'বহুত মেহেরবাণী আপকি। বহুত বহুত শুক্রিয়া'। বলেই ছুটে চলে গেল চপলা। নাম তো জানি না চপলাই বলছি। ততক্ষণে কিন্তু আমি ভাল করে দেখে নিয়েছি। হাসছিস্ তো? জানিসই তো শঙ্করাচার্যই বলেছেন, 'তরুণ স্তাবৎ তরুণীরক্ত'।

ভারী সুন্দর গড়ন। মনে হয় কোন শিল্পীর গড়া জীবন্ত প্রস্তরমূর্তি। রং কিন্তু বেশী ফর্সা নয়। তবে স্বাস্থ্য যেন উপচে পড়ছে। দৌড়দৌড়িতে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। আর কপালে দু'একটি চূর্ণকুন্তল। ভারী মিষ্টি লাগল ঘামে ভেজা নরম মুখটি। তবে চোখ দু'টি অদ্ভুত দুষ্টুমিভরা কালো আর গভীর।

এবারে উঠেছি 'দশপ্রকাশ' হোটেলে। অন্ধ্র ভাষায় এর যে কি মানে তা জানি না। তবে ইংরিজী নামও একটা আছে সেটা চিঠির ওপরেই দেখেছিস।

বিরাট বড় হোটেল। সার সার ঘর। সব এক রকম ব্যবস্থা। মনে হয় যেন জাহাজে উঠেছি। রুম নম্বর মনে না থাকলেই বিপত্তি, আমার রুম নম্বর ফরটিসিক্স। জপতে জপতে চলেছি। দোতলা না তেতলায় সেটা ভুলে গেছি। একজন বয়কে জিজ্ঞেস করতেই বললো তেতলার সামনের সারিতে। তালা খুলে দরজা ভেজিয়ে গেলাম খাবারের অর্ডার দিতে। ফিরে ঠিক তেমনি তালা দেখে পাশের ঘরে ঢুকে পড়েই অবাক হয়ে গেলাম। খাটের ওপর সেই সবুজ শাড়ী আর রূপোর ফুল পড়ে আছে আর তাদের মালিক পেছন ফিরে বাক্স খুলে কি যেন করছে। অপূর্ব তার গঠন সুষমা। অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি। আমার জুতোর শব্দে ও ডেকে ওঠে 'ভাইয়া।'

ঘরগুলোর সামনে পেছনে টানা বারান্দা, পেছনের বারান্দায় একসার বাথরুম। বাথরুমে গিয়েও ফিরতে গেলে দরজা ভুল হয়ে যায়। পরদিন সকাল সাতটা। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা; বাথরুমের দিক থেকে। তাড়াতাড়ি গায়ে ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে দরজা খুলে দেখি সদ্যস্নাতা চপলা, হাতে একরাশ কাচা কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে।

ও-ও মহা অপ্রস্তুতে পড়ে বলে, 'মাফ কি জিয়ে, সব এক কিসমকি গলতি হোগয়ী, বড়ি মুস্কিল।'

পাশের দরজা ওর বলে দিয়ে, রুম নাম্বার মনে রাখতে বলি। মনে ভারি শোধ বোধ হয়ে গেল। ভারি সুন্দর চুল মেয়েটির।

আজ বিজয়া দশমী। এখানকার বরাবরের নিয়ম এই দিনে মহারাজা সোনার হাওদায় বোসে হাতির পিঠে চড়ে তাঁরা দেবীর মন্দিরে পুজো দিতে যান। আবার সন্ধ্যেবেলা একটি গাছের ডাল কেটে নিয়ে ফিরে আসবেন। মানে নকল যুদ্ধ হোল আর কি। এইদিনে আগেকার কালের মহারাজা দিগ্বিজয়ে বেরুতেন। যুদ্ধ জয় কোরে মন্দিরে প্রণাম কোরে ফিরে আসতেন। এটা তারই প্রতীক। বিরাট প্রশেসন কোরে মহারাজা বেরোন আজকের দিনে। পুরো যুদ্ধযাত্রা হয়। সমস্ত ভারতে এই বিরাট প্রশেসন 'দশেরা প্রশেসন' নামে পরিচিত। সমস্ত মাইশোর সহর আলো দিয়ে সাজান হয়। বিশেষ কোরে মহারাজার প্রাসাদ। এমনিতে সহরটাই বড় সুন্দর। শুধু এই সহর কেন? সমস্ত দক্ষিণ দেশই তার পরিচ্ছন্নতা শুচিতা ও সুরুচির জন্য আমার খুবই প্রিয়। যাই হোক মাইশোর দেশটাই ফোয়ারা ফুলের দেশ। প্রত্যেক চৌরাস্তায় ফোয়ারা আর প্রত্যেক রাস্তার দু'ধারে ফুলের কেয়ারি। মাঝখানে ঝক্-ঝকে চওড়া রাস্তা, দু'ধারে ফুটপাথ। ফুটপাথের ধারে ধারে নানারকম ফুলের কেয়ারি।

প্যালেস থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার দু'ধারে সামিয়ানা টাঙ্গান আর চেয়ারপাতা। প্রত্যেক চেয়ারের ভাড়া একটাকা। মাইশোর সহর লোকে লোকারণ্য। আশপাশ থেকে এবং বহুদূর থেকেও এসেছে এইসব লোক। এই সময়েই সাধারণে রাজদর্শন পায়। এই প্রশেসন গভর্ণমেণ্ট থেকে বন্ধ করার কথা হয়েছিল, যেহেতু মহারাজ এখানে মহারাজ নন গভর্ণর মাত্র। কিন্তু ওঁর প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ সুরু হয়। তাদের অনুরোধে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছেন গভর্ণমেণ্ট! কত গরীব লোক এসেছে পায়ে হেঁটে, বহুদূর থেকে একটিবার রাজদর্শনের আশায়। সকাল থেকে তারা রোদ্দুরের মধ্যে ফুটপাথে বসে আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই তারা ইউ পির দেহাতিদের মত চেঁচামেচি করছে না, ঝগড়া করছে না বা চিনেবাদাম এবং পান জর্দা খেয়ে রাস্তাও নোংরা করছে না। নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে আর একাগ্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে কখন প্রশেসন বেরুবে। অনেক অ্যামেরিকান এসেছেন তাঁদের মুভী ক্যামেরা নিয়ে।

এবার সুরু হোল প্রশেসন। ঠিক বেলা চারটে এখন। একদল বন্দুকধারী সেপাই প্রথমে মার্চ কোরে বেরিয়ে গেল। তারপর এলো গুর্খা শান্ত্রী। এতেই পাঁচটা বেজে গেল। তারপর বড়বড় লরীতে নানারকম ট্যাবলো। কোনটাতে ঝাঁসির রাণী ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার উঁচিয়ে বোসে আছেন। কোথাও সিদ্ধ বকুলের নিচে শ্রীগৌরাঙ্গ। কোনটাতে চামুণ্ডামূর্তি। এখানে পাহাড়ের ওপর চামুণ্ডা মন্দির আছে। তারপর এলো মেয়ে পল্টন, তারা পরেছে সাদা সালোয়ার-কামিজ, কুচ-কাওয়াজ কোরে বেরিয়ে গেল তারা। এরপর এলো কামান আর গোলার গাড়ী। কত রকম কত ছোট বড় কামন যে নিয়ে গেলো তার যেন শেষ নেই। এবার এলো ব্যাণ্ডপার্টি খুব বড় এটি, আর চমৎকার সাজ-পোষাক এদের। এর আগেও দু'চারটে পার্টি বেরিয়ে গেছে শান্ত্রীদের সঙ্গে তবে এত বড় নয়। সঙ্গে সঙ্গে এলো অশ্বারোহী সৈন্য। যেমন সব তেজী ঘোড়া তাদের সওয়াররাও তেমনি। যেমন ঘোড়ার সাজ পায়ের খুর থেকে মাথা পর্যন্ত তেমনি আরোহীর সাজ, কালো ভেলভেটের ওপর সোনালী জরির কাজ করা আচকান, মাথায় ঝক্-ঝকে শিরস্ত্রাণ, হাতে খাপ খোলা তলোয়ার। বড় সুন্দর লাগছিল। ঘোড়াগুলি সুশিক্ষিত। ব্যাণ্ডের তালে তালে পা ফেলে চলেছে। এবার এলো হস্তিযূথ। ছোট থেকে বড় সুন্দর ভাবে সাজান। তাদের গায়ের আল্পনা, গয়নার সাজ দেখবার মত। প্রায় আরও এক ঘণ্টা লাগলো এই সারি শেষ হোতে।

সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছে। কোথাও কোন শব্দ বা গোলমাল নেই। শুধু আমি চারপাশে দেখছি ভাবছি সে কোথায় বসলো। এরপর এলো দিশি বাজনা। তারপর মহারাজার আট-ঘোড়ার বিরাট সোনার ব্রুহাম। ভেতরে কেউ নেই। এরপরই এলো কালাপাহাড়ের মত বিরাট উঁচু একটি হাতী, সর্বাঙ্গে তার সোনার অলঙ্কার। বিরাট একটি সোনার ঘণ্টা ঢং-ঢং কোরে বাজছে তার গলায়। প্রথমেই সে শুঁড় তুলে সকলকে জানাল অভিবাদন। কিংখাবের অঙ্গাবরণের ওপর বিরাট সোনার হাওদা তার পিঠে, অস্তরবির কিরণে ঝলমল করছে। ভিতরে মহারাজ। ব্রোকেটের আচকান চুড়ীদার পা-জামা মাথায় উষ্ণীস তাতে মুক্তার মালা জড়ান। মাঝখানে একটি মস্ত হীরে জ্বলছে। গলায় মোতির মালা, মুক্তার সাতনরী। সবাই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। তিনি দু'হাতে ফুল ছিটোচ্ছেন। আর তাঁর প্রজারা যেখান দিয়ে তিনি যাচ্ছেন সেখানের ধূলো মাথায় দিচ্ছে আর দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। ফুলের মালা ছুঁড়ে দিচ্ছে তাঁর দিকে।'

আমার চোখে জল এসে গেলো। এখনো লোকে 'রাজা' এত ভালবাসে। এখনো 'রাজারের' প্রতি লোকের এত মোহ! তাই এই নিয়ে সাহিত্য স্থায়ী হয়। সিনেমা উঠলে লোকেরা ছুটে যায়। তা'হলে জমিদাররা শুধু শোষণই করে নি সু-শাসনও করেছে। দান-ধ্যান করেছে প্রজার দুঃখও বুঝেছে। তবুও আজ জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেল। হায়দ্রাবাদ থেকে ফালাকনুমা প্যালেস দেখতে গিয়েছিলাম, ঐ ষ্টেশনের এক দরিদ্র বৃদ্ধ ষ্টেশন মাস্টার আমার কাছে দুঃখ কোরে বলেছিলেন এখনকার তাঁর অবস্থার কথা। নিজামের সময়ে তাঁর কোন অভাবই ছিল না। তখন কোয়ার্টার, ইলেকট্রিক, কয়লা ও চিকিৎসা ফ্রি ছিল। রেশনও কম দামে পেতেন। তা'ছাড়া রিটায়ারের পর অল ইণ্ডিয়া পাশ পেতেন ফ্রি। আর এখন কোনটাই ফ্রি নয় সবেতেই টাকা লাগে। অথচ মাইনে বাড়ে নি, কিন্তু চাল আটার দাম বেড়েছে। সেইজন্য আজও তাঁরা প্রতিপদে আলা হজরৎ নিজামকে ইয়াদ করেন দেশের বিভিন্ন ব্যাপারে।

হোটেলে ফিরে এলাম।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

৬

ব্রাসেলসের সহরতলীতে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন। জায়গাটি মনোরম। একটা বোর্ডিং আছে, অর্ডার চালায় সেটা। ছাত্রী নানদের থাকবার জায়গা সেইখানে হয়েছে। বোর্ডিং থেকে ট্রলিতে ওরা ট্রপিক্যাল স্কুলে আসে. আসতে যতক্ষণ সময় লাগে তার মধ্যে প্রাত্যহিক পঠিতব্য সাতটি অফিসের চারটি পড়া হয়ে যায়—মাটিনস্, লডস্ প্রাইম আর টিয়ার্স্। যতক্ষণে সিস্টার লুক টিয়েসের একশ কুড়ি নম্বর স্টোরে এসে পৌঁছোয়···শৈলশ্রেণীর দিকে চোখ তুলে তাকাই আমি···জানে এখন যে কাফেটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে জন—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল যখন এখানে কফি খেত রোজ।

চোখ তুলে তাকায় না তা বলে কোনদিন। পরিচিত রাস্তার নাম ধরে কণ্ডাক্টর চেঁচিয়ে ওঠে···ওর ঠোঁট দু'টো নড়ে চলে নিঃশব্দে—তোমার পদস্খলন হইতে তিনি দিবেন না··· সূর্য দিনমানে দগ্ধ করিবে না তোমাকে, রাত্রিতে চন্দ্রও না···ঈশ্বর সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন···

তারা চারজন সব সময় এক সংগে বসে। ওদের মধ্যে সিস্টার পলিন সবার চেয়ে বড়। গাড়ীভাড়া তাই তার কাছে থাকে, প্রয়োজনমত গাড়ীর কণ্ডাক্টর বা পুলিশের সংগে কথা সে-ই বলে।

ওরা তিনজন আসছে মাদার হাউস থেকে, আর ওদের সংগে যোগ দিতে সিস্টার পলিন আসছে সোজা কংগো থেকে। পরিদর্শিকার পদে উন্নীত হয়ে এখন ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা নিতে এসেছে ছুটিতে। তার রোগাটে রুক্ষ মুখখানার দিকে প্রথম তাকিয়েই সিস্টার লুক বুঝেছে বিদ্বেষের একটা বিরাট সমস্যা জয় করতে হবে তাকে।

এককালে নীল ছিল তার চোখের তারা দু'টি, প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে থেকে থেকে বরফের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে এখন। সাগ্রহে কংগোর কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে নিরুত্তাপ কণ্ঠে এক-আধটা জবাব দেয়। ধরণ দেখে মনে হবে যেন কংগোর ঐ বৃষ্টিভেজা সবুজ বন-জংগল, ঝোপ-ঝাড় সব ওরই আর ওর সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে কোন প্রশ্ন করা অভদ্রতা, প্রায় ধৃষ্টতার সামিল।

কংগো সম্বন্ধে এই অধিকারসূচক ঈর্ষা শুধু সিস্টার পলিনের একার নয়, যাঁরাই ওখানে কাজ করেছেন তাঁদেরই এটা বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে এটা আরও প্রকট। সবাই তাঁরা পথিকৃৎ চিকিৎসক, কংগোতে কাজ করার ফলে অকালে বার্ধক্য এসে গ্রাস করেছে তাঁদের। এক মুখ দাড়ি, ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে জীর্ণদেহ। সে দেশটা তাঁদের যত প্রিয়ই হোক, স্বাস্থ্য তাঁদের সে দেশে ফেরার অনুমতি আর কোনদিনও দেবে না। তার বদলে নতুন তরুণ ডাক্তার, যাজক, নান আর সাধারণ নার্সদের পাঠাবার জন্য তৈরী করেন তাঁরা।

ওঁরা সব সময় কাঁপেন বলে ক্লাসঘরগুলো অতিরিক্ত গরম রাখতে হয়, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনেও। ছাত্র-ছাত্রীদের তাই বসতে হয় সেই অস্বাভাবিক গরমে।

ওঁদের বক্তৃতা শুরু হয় এইভাবে: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ভাব এই ১৯২৮ সালে—ঝোপ-জংগলের মধ্যে দিয়ে সাইকেল চলার পথ অবধি যখন হয়ে গেছে, উনিশশো সালের প্রথম দিকে আমরা যা দেখেছি তাই দেখবে,—কি দেখছেন তাঁরা তা আর বলেন না কিছু। কিন্তু হাত দু'টো কাঁপে উত্তেজনায়, চোখ দু'টো জ্বলতে থাকে।···

সামনে এনোফিলিস মশার সহস্রগুণ বড় একটা তারের মডেল। অধ্যাপকদের ভাব দেখে মনে হত্য, বিচিত্র নয় যে এ বুঝি কোন মসীবর্ণা দেবী, ওঁদের মনের আকাশে তাঁর নিত্য যাওয়া-আসা। ওটা একটা মশামাত্র নয় যেন, যৌবনের বছরগুলো যাকে দিয়েছেন তাঁরা—

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম্

যেহেতু ওঁ বীজাণুরা বাসা বেঁধেছে তবু মনপ্রাণ ঢেলে এই রোগের লক্ষণ বার নিরাময় নিয়ে গবেষণা করেছেন।

তাঁদের সবাইকে সিস্টার লুকের ভাল লাগে। লেকচাররুমটা তার কাছে কামনার ধন। আবার চিকিৎসা-জগতে ফিরে এসেছে সে, এ আনন্দ বাড়ী ফেরার আনন্দের সমতুল্য। শ্মশ্রু-সমন্বিত মুখগুলির পিছনে বাবার মুখের আভাস দেখে। অধৈর্য হয়ে উঠতেন অলসতা দেখলে। মৃত্যু যেখানে কুৎসিত, চরিত্রহীনতাজনিত, সেখানেও খুঁৎখুঁতেপনা দেখলে বিদ্রূপ করতেন। এঁদের গলায়ও সেই অধীরতা শুনতে পায়।

সবচেয়ে ভাল লাগে ড: গোভার্টসকে। তিনি ওর বাবাকে চেনেন, কিন্তু তাকে নানের হ্যাবিটে দেখে চিনতে পারেন নি। একদিন হঠাৎ ক্লাসে অজ্ঞান হয়ে যেতে বুঝতে পারলো প্রথম, সে কে।

রুগ্ন ড: গোভার্টসের জন্ত এত বেশী গরম করে রাখতে হয় ক্লাস ঘরখানা—হঠাৎ একদিন সেই ভীষণ গরমটাই সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। খোলামেলা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছিল মাদার হাউসে, সেখান থেকে এসে এই ক্লাসরুমের উষ্ণতা প্রায় দুসহনীয় মনে হ'ত। ভারি সার্জের স্কার্ট, কয়ফ আর ভেল—সা কিছুর বিরোধিতার সংগে লড়াই যোগ···সেদিন আর পেরে উঠল না কেমন।

সেদিন প্রথম মশার জীবনবৃত্তের ওপর বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন ডা: গোভার্টস্। সে বেশ বুঝতে পারছিল তার জ্বর হয়েছে।

যাজকদের ফ্যাকাশে চেহারায় ভরসা করবার মত কিছু খুঁজে পান না ডা: গোভার্টস্, তরুণ ডাক্তারদের সুশ্রী মুখের দিকে চেয়ে শুধুই আক্ষেপ করেন আর সাধারণ নার্সদের তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। ক্লাসের মধ্যেই প্রায় রোজই অপদস্থ করেন তাদের সবাইকে, সেদিনও ব্যতিক্রম হয় নি। শেষোক্তাদের তো সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন কংগোতে পা দেওয়ামাত্রই কামুক ঔপনিবেশিকরা ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে তাদের! প্রত্যেক জাহাজে যে ক'জন শ্বেতাংগিনী গিয়ে পৌঁছায়, ওরা তাদের তত থলি সোনা বলে মনে করে।

নার্সদের দিকে চেয়ে আবার বললেন, মশার গুন্‌গুন্ শুনলেও মেয়েরা অজ্ঞান হয়ে যায়···

ঠিক এই কথার সংগে সংগে সিস্টার লুক জ্ঞান হারিয়ে পাশের দিকে সিস্টার পলিনের কোলের ওপর ঢলে পড়ল ···জ্ঞান হতে দেখল ক্লাসরুমের বাইরে করিডোরে শুয়ে আছে। ডা: গোভার্টস মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, সিস্টার পলিন হাঁটু গেড়ে পাশে বসে।

গুইম্প্‌টা ঢিলে করে দিচ্ছিল, ওকে চোখ মেলে চাইতে দেখে ধিক্কারে হিস্‌হিস্ করে উঠল, এই সামান্ত গরম সহ্য করতে না পার যদি, কি করে আশা করছ কংগোতে সুস্থ থাকবে!

পিতৃবন্ধুর চোখে পরিচিতের দৃষ্টি ফুটেছে ততক্ষণে।

চোখ নামিয়ে তাকিয়েছিলেন তার দিকে, বললেন, এটা অন্ত রকম গরম সিস্টার। সেখানকার গরম আবহাওয়ায় আপনি যেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ও-ও তেমনি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আর দেখবেন আপনাদের ঐ কঞ্জুস সংঘ যে আটমাস সময় দিয়েছে তার মধ্যেই আমার সারা বছরের কোর্স রপ্ত করে ফেলবে ও। কেন জানেন? যে বয়েসে বাছারা ক্যালাইডোস্কোপ, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রং আর নক্সার খেলা দেখে সেই বয়েস থেকেই ও বাপের মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে শুরু করেছে।

এমন হ'ল, এর পর থেকে ডা: গোভার্টস্ যখনই এনোফিলিসের ওপর বক্তৃতা শুরু করেন, বলেন, আমাদের শ্রদ্ধার্হা সিস্টারদের মধ্যে বিশেষ একজন কথা দেন যদি অজ্ঞান হয়ে যাবেন না তা'হলে আমি এখন তোমাদের যে সব পরিবেশ মশার লার্ভা বা শূকর ক্রমবিকাশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী তাদের বিষয় বলব।

লাঞ্চের সময় ওরা চারজন অন্তদের কাছ থেকে সরে গিয়ে কাছের একটা পার্কে নীরবে সংগে আনা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে নেয় আর সেন্ট আর নোন আবৃত্তি করে। এই রকম কোন সরস উক্তি যেদিনই করেন ডা: গোভার্টস্ সেদিনই সিস্টার পলিন লাঞ্চের সময় বিরূপ চোখে তাকায় তার দিকে। মাইক্রোসকোপ ক্লাসের ঘণ্টা পড়ার আগেই অফিসগুলো পড়া হয়ে যায় যদি ওদের, বাকি সময়টুকুর আবসরিক আলোচনাটাকে আত্মকেন্দ্রিকতায় টেনে আনে। সিনিয়র এই নার্সটি যে বিশ্বাস করতে পারেন সে ইচ্ছে করে শুধুমাত্র নিজের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেদিন ক্লাসে—সিস্টার লুকের কাছে এটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়।

পারস্পরিক একটা বিতৃষ্ণার মনোভাব যে গড়ে উঠছে সন্দেহ নেই। সেই মনোভাবটাকে দমন করতে সিস্টার লুক সিস্টার পলিনের জন্য কিছু করবার সুযোগ খোঁজে, কিন্তু বৃথাই। সিস্টার পলিন সর্বদাই নিজেকে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলে রাখে। সেই পৌরাণিক রাজকুমারীর মত, যে বরফের চাঙড়ের ওপর ঘুমাত। সিস্টার পলিনের নিরুত্তাপ দৃষ্টির পিছনে কংগোর ছবি জমাট বেঁধে আছে, অমিশুক দু'টি ওষ্ঠাধারের অন্তরালে ঈর্ষার শীলমোহর!

মাইক্রোসকোপ ক্লাসে প্রথম কংগোর স্বরূপ দেখল সিস্টার লুক। অনেক জানলা দেওয়া লম্বা ঘরে সারি সারি মার্বেল দেওয়া টেবিল। প্রত্যেক টেবিলে বেল-গ্লাসের নীচে একটা করে মাইক্রোসকোপ আর কংগোয় তৈরী এক বাক্স শ্লাইড। এই আট মাস প্রতিদিন বিকেলে একটা চোখ আইপিসে লাগিয়ে সে বসেছে, অ্যাডজ্যাস্টমেন্ট স্ক্রু আর ইলিউমিনেটিং আয়নার ওপর আঙুলগুলো কাজ করেছে অবিরাম।

ভ্রু-টিউবের নীচে আলোকোজ্জ্বল লক্ষ্যে কংগো উপত্যকার অণুবীক্ষণ জগৎ। সুন্দর, জড়মূর্তিবৎ!···কুষ্ঠ, স্লিপিং সিকনেস, ইয়স, ম্যালেরিয়া আর গোদের উৎপাদক!···তাদের জীবনবৃত্তের প্রতিটি ধাপ বন্দী হয়ে আছে শ্লাইডের ওপর···ঢেউতোলা রূপোলি সুতোর মত কোনটা কোনটা বাঁকা কোনটা সোজা রডের মত···আঙুরের থোকার মত বা মুক্তোর ছড়ার মত ডিমগুলো···গোল কিংবা চ্যাপটা একটা মাথা, ল্যাজটা ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে—ছোট ছোট সব পোকা যেন।

মাঝে মাঝে উত্তেজনায় হাতটা কপালে উঠে আসে—টুপীর কিনারটা দেখার পথে বাধা দিচ্ছে যেন ছায়া ফেলে, ঠেলে সরিয়ে দেবে তাই!···আঙুলগুলো ঘাসে স্যাৎস্যাতে করকে পিয়ে ঠেকে, অমনি মনে পড়ে যায় কে সে, কি তার পোশাক।

নীল নীল বিচিত্র অবয়বগুলোর আলাদা এক একটা জগৎ। প্রজননস্থান—রক্তে, মাংসপেশীতন্তুতে, মলে কি অন্ত্রে, ডিমে তা দেবার কাল, জীবনবৃত্ত, পরিব্যাপ্তি—আয়ত্ত করে সব কিছু। নিগ্রোদের মত ওরাও যেন বিভিন্ন উপজাতি—প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিশেষত্বে আলাদা।···যেন ঐ উপজাতিদেরই অসুস্থ দেহ থেকে ওদের সংগ্রহ করা হয়েছে।

···এই কংগোকে আপন করে নিতে পারি আমি। ঈশ্বরের কাছে এমনই কোন সুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্র প্রার্থনা করেছিলাম :···

মাইক্রোমিটারের ভাষায় এই সুবিস্তৃত দিকচক্রবালের আয়তন সীমিত, তবু ওর লেন্সে আটকানো দৃষ্টির সামনে সেই সীমিত গণ্ডীটাই পুরো একটা সৃষ্টি রহস্যের দ্বারোদঘাটন করে দেয়···সৃষ্টির অনেক রহস্য ধরা পড়ে সেই চারপাশ ঢাকা ড্র-টিউবের নীচে। বাক্স বাক্স স্লাইড সে দেখে ফেলে, উৎসাহের আধিক্যে অন্যদের চেয়ে সবসময়ই এগিয়ে থাকে অনেকখানি। কাজেই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াল অন্যরা নিজেদের স্লাইড তৈরী করতেও শেখে নি যখন, তখনই সে ল্যাবরেটোরি-বিশেষজ্ঞের সংগে নীচের তলায় ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করেছে। সেখানে টিকা দেওয়া বাঁদর, খরগোস, গিনিপিগ রাখা আছে—ওদের পাঠ্য রোগগুলো তাদের দেহে ঢুকিয়ে দিয়ে রোগী তৈরী করে রাখা হয়েছে ওদের জন্য—রোগীদেহ থেকে রক্ত নিতে হবে।

অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তার তুলনায় অনেক ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। তার মত অত্যুৎসাহী আর কে! সেজন্য সিস্টার পলিনের ফ্যাকাশে চোখের দৃষ্টি প্রায়ই তার ওপর এসে পড়ে, অভিযোগের ছায়া তাতে। ···তার ব্যবহারে পরহিতৈষণার অভাব অতিমাত্রায় স্পষ্ট। অন্যরা যে কত আস্তে আস্তে এগুচ্ছে তা চোখে পড়িয়ে দেবে বলেই না তার এই বাড়াবাড়ি।

প্যারাসাইটের বিমোহন জংগলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সিস্টার লুক। পথ হারায় না তবু। ভগবদ্দত্ত স্মৃতিশক্তি তার কাজটাকে সহজ করে দিয়েছে। পুরো আনন্দ উপভোগ করত, সিস্টার পলিন না থাকত যদি। সে জানে সিস্টার পলিনের অন্যদের চেয়েও অসুবিধা হচ্ছে। নিজের স্লাইডগুলো এলোমেলো করে দেখে সে, প্রথম থেকে দেখতে শুরু করে হঠাৎ যেন ভুলে গেছে।···ট্রপিক্যাল মেডিসিনগুলো শতকরা নব্বুই ভাগ নির্ভর করে স্মৃতিশক্তির ওপর। কংগোয় সবাইকে যে বিশাল পরিমাণ কুইনাইন খেতে হয় প্রতিদিন, সিনিয়র এই নানটির স্মৃতিশক্তি কমে গেছে তাতে।

সহানুভূতি দিয়ে বিদ্বেষকে জয় করতে পেরেছে সিস্টার লুক, নার্ভাস সিস্টারটিকে সাহায্য করবার উপায় খোঁজে সে।

অন্ত দু'টি সিস্টারকে বুঝিয়ে দেয় যক্ষার বীজাণু আর কুষ্ঠর বীজাণুর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হয় কি করে, গলাটা একটু বেশীই তোলে—সিস্টার পলিনও যাতে শুনতে পায়। কেউ শুনলে মনে করতে পারে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করছে সে, সে ঝুঁকি নিয়েই করে।

—এ দু'টো বীজাণুই খুব এক ধরণের—দু'টোই রডের মত দেখতে, এ্যাসিড-বিমুখ, এমন একটা হাল্কা ছায়ার মত আবরণ আছে দু'টোর ওপরই মনে হবে ক্যাপসুলের মধ্যে আছে···কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলে চোখে পড়বে কুষ্ঠ-বীজাণুগুলো একটু বেশী মোটা আর লম্বা।

ইচ্ছে হয় বলে, এ ব্যাপারগুলো সহজ লাগে তার কারণ সে যখন নেহাৎ ছোট তখনই তার বাবা তাকে মাইক্রোস্কোপে যক্ষাবীজাণু ধরে ফেলতে বেশ দুরস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু সে যে নান, অতীতের উল্লেখ করা তার বারণ ···সুতরাং তার ক্লাসে সহপাঠীদের অন্যায় প্রশংসায় বেদনাবোধ করে·· বারবার মনে হয় ধরণী দ্বিধা হোক, ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাঁচে সে।

·· সন্ধ্যায় বোর্ডিংয়ে তাদের বড় শোবার ঘরে পড়তে বসে কনভেন্ট রীতিনীতির বিরক্তিকর অলিগলিতে সিস্টার পলিনকে নিজের নোটগুলো দেখাবার পথ খুঁজতে হয়। নিজে থেকে সে দেখতে চাইবে না কখনও, অন্য দু'জন যেমন সেগুলো সহজভাবে টুকে নেয়, তা করবে না।

কত সহজ ছিল বলা, আমার নোটগুলো ভাল হয়েছে সিস্টার পলিন, বিশেষত মাইক্রোব্যাক্‌টেরিয়ামের ওপর নোটটা—ওই যেটা ব্যাসিলি আর ফাংগির মাঝামাঝি। আপনি একবার দেখে নিন না কেন? মনে হয় আমার আঁকাগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্যাপারটা।

···তার বদলে উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে থাকতে হবে নিজের নোট খাতাখানার দিকে, পাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে হবে যেন ভারি মুশকিলে পড়ে গেছে এবং শেষে ওই একগুঁয়ে সিনিয়রটিকে বলতে হবে, একবার আমার নোটটা যদি আপনায় দেখে দিতে বলি সিস্টার অন্যায় হবে কি? ভয় হচ্ছে আমার কতকগুলো ভুল আছে বোধ হয়।

সিস্টার পলিন যখন ব্যগ্রভাবে পড়বে তার নোটগুলো, তখন পড়ার লম্বা টেবিল ছেড়ে ঘরের একপ্রান্তে নির্দিষ্ট কোণটায় চলে যাবে সে নিজে—দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে থিয়োরিটা রপ্ত করবে। নিজেকে এই আলাদা করে নেওয়ার জন্য ক্ষেত্রটা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছে, সঙ্গিনীদের বলে রেখেছে দেওয়ালের দিকে মুখ করে না বসলে মন দিয়ে পড়ত না সে।

বাক সংযম আর কৌশল! ন্যায্য গর্ব একটু হচ্ছে যখন তখনও বিনীত ভাবে কথা বলার নির্ধারিত বিধি-বিধান! ভাল করেই যখন জান অন্যদের চেয়ে জ্ঞান তোমার বেশী, বদান্যতার দায়ে সে জ্ঞান গোপন করার প্রয়াস—অনেক সময় ভণ্ডামি বলে মনে হয় তার।···এই কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত! ব্রতীরা এমনি হোক তাঁর!

কুষ্ঠরোগের হেতুবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে যখন ক্রিশ্চান কমিউনিটির হেতুবিজ্ঞান মনের দরজায় আঘাত হানে। জানে এই বিশেষ জীবন-পদ্ধতি, গস্‌পেলে লিপিবদ্ধ আছে, তাদের এই জীবন তারই বাস্তব অনুকরণ মাত্র। তবু অবাক লাগে ভাবতে কেন এই সাগ্রহ অনুকরণের চেয়ে ঐ স্বর্ণোজ্জ্বল অনুচ্ছেদগুলায় সেগুলোকে অনেক বেশী বলবান মনে হয়! টমাস সন্দেহ করেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে সামনে এগিয়ে এসে তাঁর ক্ষতস্থানে হাত রাখতে বলেছিলেন। সে পদ্ধতি কত বলিষ্ঠ, অকপট।···রাতের পর রাত আমি যেমন ঘোরানো পথে সচেতন প্রচেষ্টায় সিস্টার পলিনকে জয় করার চেষ্টা করে চলেছি তেমন নয়। অথচ একবার এই কোর্সটা শেষ হয়ে গেলে কোনদিন তাকে আর দেখতে চাইব না আমি। না, চাইব না। ছবিতেও না।

পাথর-চাপা আগাছা পাথরটা সরিয়ে দিলেই যেমন আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, মাদার হাউস ছেড়ে অবধি ওর হৃদয়াবেগগুলোও তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠেছে আবার। নির্জন স্থানে কবরস্থ করেছে বলে ধারণা ছিল যাদের তারা আবার সোজা সতেজ হয়ে উঠেছে। তার পছন্দ আর অপছন্দ, গর্ব আর বাসনার শুকনো, সরু ডালগুলোয় চোখের পলকে নতুন রং ধরেছে। কংগোয় কাজ করবার জন্য তার গোপন আশা এখন যেন মনের বাতিকে দাঁড়িয়েছে। সিস্টার পলিনকে যে প্রথম থেকেই অবিশ্বাস করেছে সেই অবিশ্বাস এখন বিদ্বেষে দাঁড়িয়েছে। জোর করে বিনম্র হেসে আর নোট দিয়ে সাহায্য করার বদান্য চাতুরিতে তাকে আর ঠেকানো যাচ্ছে না। প্রাত্যহিক বিবেক-পরীক্ষার সময় বুঝতে পারে একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে। ফাইন্যাল পরীক্ষার দিন পনেরো আগে ঠিক করল এখানকার মাদার সুপিরিয়রকে নিজের অসুবিধের কথা জানাবে।

সুপিরিয়র মাদার মারসেলা। অন্তরের ধনে পূর্ণ মানুষটি। ছোট সংঘটি তিনি সুন্দর ভাবে চালান। প্রথম দর্শনেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখেছে তাঁকে সিস্টার লুক, তাঁর কাছে মন খুলে রাখা সহজ হবে মনে হয়েছে। রিক্রিয়েশনে এখন আর তারা থাকে না অন্য পড়াশুনার জন্য, সে কিন্তু মাদার মারসেলা আর তাঁর ক'জন অধ্যাপিকা নানের আলাপ-আলোচনা শুনতে মাঝে মাঝে যায় সন্ধ্যাবেলা, ভারি সুন্দর লাগে। কংগোয় কমিউনিটির রূপ কেমন হয় তার একটা আঁচ পাওয়া যায় সেখানে—সম-মনের ছোট ছোট দল—রসজ্ঞ, বুদ্ধিদীপ্ত, এক এক সময় প্রায় জাগতিক।

মাদার মারসেলার চিন্তাধারা উদার যেমন, রুলের প্রয়োগও তেমনি। ওরা চারজন অস্থায়িভাবে আছে তাঁর তত্ত্বাবধানে, উনি ব্যবস্থা করেছেন ওদের জন্য—রাত পর্যন্ত পড়ে বলে অন্যদের চেয়ে একঘণ্টা পরে ঘুম থেকে ওঠার অনুমতি দিয়েছেন, গ্র্যাণ্ড সাইলেন্সের পর নিজেদের মধ্যে কথা বলারও। বিশেষ নৈপুণ্যে ওদের ধর্মীয় পাঠ বেছে দেন তিনি। প্রতি শনিবার আপনাপন প্রার্থনা ডেস্কে একখানা করে বই পায় তারা। যে পাতাগুলো তার চিহ্নিত থাকে বুঝতে হয় মাদার মারসেলা চান সারা সপ্তাহ ধরে সেই চিহ্নিত পাতাগুলো পড়ুক আর চিন্তা করুক তারা। যেমন দেখেন ওদের লক্ষ্য করে সেই অনুসারে ওদের দুর্বল দিকের ওপর জোর দিয়ে এই পাঠ বেছে দেন। অহঙ্কারীদের জন্য বিনয়ের অধ্যায় চিহ্নিত থাকে, গোঁয়ারদের জন্য বাধ্যতার, সন্দেহবাদীদের জন্য বিশ্বাসের। তার জন্য অধিকাংশ সময়ই বিনয়ের ওপর কোন অধ্যায় চিহ্নিত দেখে সিস্টার লুক।

সেদিন সন্ধ্যায় মাদার মারসেলার স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে সিস্টার লুক বুঝতে পারছিল বিনয়ের ওপর তার বেশ একটা সাহসের আচ্ছাদন পড়েছে। আগে কোনদিন কোন সুপিরিয়রের কাছে কোন সিস্টারের সংগে নিজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে আসেনি কখনও। নিজের বিদ্বেষের কথা এবং সে বিদ্বেষ জয় করবার সব চেষ্টাই যে তার ব্যর্থ হয়েছে সে কথাও স্বীকার করতে প্রস্তুত সে। মনকে দৃঢ় করে ভাবছে মাদার সুপিরিয়র যে উপদেশ দেবেন তাই সে মেনে নেবে। যদি বলেন বাকি যতদিন এখানে আছে একনাগাড়ে সিস্টার পলিনের মোজা রিপু করতে হবে তাকে কিংবা সপ্তাহে সপ্তাহে তার জুতো পালিশ করে দিতে হবে, তাতেও সে রাজি।

শান্ত, নিস্তব্ধ চারদিক। সে যে ধর্ম জীবনের কি দুর্গম সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে সে ইঙ্গিত কোথাও নেই।

দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকে অভিবাদন জানাল। ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল দু'টি। কথা বলতে চায়।

—বেনেডিক্ট—মাদার মারসেলা নিয়মানুযায়ী আশীর্বচন দিলেন।

—ডোমিনাস—উত্তরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে সিস্টার লুক চোখ তুলে তাকাল। সুপিরিয়রের পিছনের বিশাল ক্রুশিফিক্সটা বুঝিয়ে দিচ্ছে কেবলমাত্র একটি মহিলার সামনে নতজানু হয় নি সে, স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিভূ তিনি। ক্রুশিফিক্সের উদ্দেশ্যই তাই।

—আমি বড় বিপদে পড়েছি মাই মাদার, তাই আপনার উপদেশ নিতে এসেছি। সুপিরিয়র একটু মাথা নেড়ে সাহস দিলেন শুধু।—সিস্টার পলিনের কথা বলছিলাম, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা এমন দাঁড়িয়েছে যে শান্তি পাচ্ছি না আমি।

বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিতে বলে গেল কি ভাবে মনে তার বিদ্বেষের ভাব গড়ে উঠল, সে বিদ্বেষ জয় করবার ব্যর্থ প্রয়াসগুলো। সিস্টার পলিনের ঠাণ্ডা ব্যবহারের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করল না, কোর্সের কোথায় ঐ সিনিয়র নানটির সাহায্য দরকার বলে মনে হয়েছিল তারই ওপর জোর দিল।

—আমার সবটুকু নম্রতা নিয়ে বলছি মাই মাদার, যদি বন্ধুত্ব করবার অনুমতি দিতেন তিনি আমি সাহায্য করতে পারতাম তাঁকে। আপনি বলুন, আমার কি করা উচিত।

মাদার মারসেলার জ্বলজ্বলে দু'টো চোখ...শোনা গল্প আবার শুনছেন যেন, শেষ হবার আগেই সমাপ্তিটা জানেন। উত্তর দেবার আগে নীরব হয়ে রইলেন একটুক্ষণ। সিস্টার লুকের অস্বস্তি লাগছে। কোনদিন দেখে নি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আগে ইতস্তত করছেন তিনি। বেশ বোঝা যায় সমস্যাটার সহজ সমাধান মনে আসছে না তাঁরও। নিজের বুকে ঝোলানো ক্রুশিফিক্সের ওপর হাল্কাভাবে হাতটা রেখেছেন, ঠিক সিস্টার লুকের সামনে রয়েছে হাতখানা আবলুশ কাঠের ক্রশটির ওপর লম্বা লম্বা ফর্সা আঙুলগুলো ওপর-নীচে আসা যাওয়া করছে। স্পর্শ দিয়ে চিন্তা আহরণ করে নিতে চায় যেন। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

আরতি ঠাকুর

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ট্রেনের সিগন্যাল ডাউন হোয়ে গেছে। যাক আর তাহলে ট্রেন আসতে বেশী দেরী হবে না। অসহিষ্ণু অলকা হাতঘড়ির দিকে তাকায়।

এদিকটায় এই কর্ড লাইনে গাড়ি মাঝে মাঝে বড় লেট কোরে দেয়। মাঝে-মধ্যে এখানে একটা না একটা এ্যাকসিডেণ্ট হোয়ে থাকে আর তারই দরুণ গাড়িটা লেট হোয়ে যায়। হুস্-হুস্ শব্দ কোরতে কোরতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা এসে পড়ে। ব্যস্ত হোয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেনের কামরাতে উঠে পড়ে অলকা। সকালের দিকে ট্রেনটায় খুব বেশী ভিড় হয় না বটে, কিন্তু সব্জিওয়ালাগুলোর ঝুড়ির জ্বালায় ভালোভাবে বোসতে পারা যায় না।

আঃ! এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো অলকা। এবারে যা হোক গন্তব্যস্থানে ঠিকই পৌঁছে যাবে। আরাম অনুভব হয় ওর। কিছুক্ষণ বাদেই পাশের লোকটা একটা বিড়ি ধরাল। আবার অস্বস্তি বোধ কোরতে লাগলো। নোংরা সব্জিওয়ালাটার গা থেকে একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে আর তার সঙ্গে বিড়ির গন্ধে একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হোল। অলকার মাথা ঝিমঝিম কোরতে থাকে। আবার নড়ে চড়ে বসে জানালার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল। এখান থেকে অন্য কোন সীটে উঠে যাবারও উপায় নেই। সমস্ত কামরা ভর্তি সব্জিওয়ালা উঠেছে। ডানকুনি পৌঁছতে আর দু'টো ষ্টেশন মাত্র বাকি আছে। ডলি, পলি হয় তো এতক্ষণে বই নিয়ে বসে গেছে পড়তে। ওর ছাত্রী দু'টি খুবই মনোযোগী। অলকার বেশী বকতে হয় না ওদের পড়াবার সময়।

হুস্-হুস্ কোরে ট্রেনটা এসে থামলো ষ্টেশনে। অলকা কোনমতে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। ট্রেন থেকে নামার সময় হঠাৎ এক অজ-

লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায় অলকার। ভদ্রলোকটিও সে-সময় উঠতে যাচ্ছিলেন ট্রেনটিতে।

ভদ্রলোক নেমে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ান। কি-রকম যেন সঙ্কুচিত হোয়ে পড়েন। বলেন—দেখুন, কিছু মনে কোরবেন না, তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে লেগে গেছে, আমাকে মাফ করুন।

অলকা লজ্জায় রক্তিম হোয়ে ওঠে। বলে,—না না, ছিঃ ছিঃ আমি তো তাড়াতাড়ি কোরে নামতে গিয়ে—

—আপনার খুব লেগেছে নিশ্চয়? ভদ্রলোকের গলায় কুণ্ঠা ও সহানুভূতির সুর।

এর মধ্যে গাড়িটা ছেড়ে দিল। অলকা ও ভদ্রলোকটি দু'জনে দু'জনের দিকে খানিকক্ষণ বোবা হোয়ে অপলকে চেয়ে রইলেন।

—গাড়িটা চলে গেল। এর পর পৌনে ন'টার ট্রেনটা ধরতে পাব।

—ছিঃ ছিঃ, আমি সত্যিই লজ্জিত, আমার জন্যই আপনার আজ দেরি হোয়ে গেল।

—না, না, কিছু দেরি হয় নি। আমার ক্লাস তো সেই দশটা; লাইব্রেরী থেকে কয়েকটা বই নেব বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলাম।

আচ্ছা আসি নমস্কার, বলে অলকা স্টেশনের দিকে এগুতে থাকে। পিছন ফিরে অলকা দেখতে পায় ভদ্রলোক একটা বেঞ্চে বসে পড়েন। সামনেই সাইকেল রিক্সওয়ালারা জড় হোয়ে আছে। অলকা একটায় উঠে পড়ে। ডলি, পলি কতই না ভাবছে আজকে। ওরা মনে কোরেছে, আজ হয় তো আর অলকা এলো না।

সারাটা রাস্তা কি জানি কেন ভদ্রলোকটির চেহারাই ওর মনের মধ্যে ভাসছিলো। ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ সুন্দর। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। কি জানি কেন প্রথম দৃষ্টিতেই ভদ্রলোকটিকে অলকার বেশ ভালো লাগে? ভদ্রলোকটিরও কি অলকাকে ভালো লেগেছে? আচ্ছা মানস বেশী সুন্দর না ভদ্রলোকটি? আচ্ছা কি যে অলকা যা-তা ভাবছে পাগলের মত। ডলি, পলি হয় তো এতক্ষণে পড়া থেকে উঠে পড়েছে।

আজ যেন পড়ানোর মধ্যে নতুন এক আস্বাদ পেল অলকা। রোজকার একঘেয়েমি থেকে আজ যেন ও কিছু নতুনত্ব খুঁজে পেল। রোজ রোজ ডলি, পলিকে পড়ানো আর বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্যে একঘেয়েমি ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকতো না—কিন্তু আজ তার আগেই ব্যতিক্রম ঘটেছে। আজ যেন রোজকার সব চেহারা পাল্টে গেছে। নিত্য যা একই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে—আজ তার ব্যতিক্রম অবশ্যই হোয়েছে। কৈ আজকে তো হরিদাসী মাছের চুবড়ি নিয়ে হাত নাড়াতে নাড়াতে হন্-হন্ কোরে চোললো না। ও যখন এ রকম দুলতে দুলতে যেতে থাকে, তখন অলকার ওকে দেখতে বেশ ভালো লাগে। টুকটুকে লাল পাড়ের শাড়ি আর একমাথা রাঙা সিঁদুরে ওকে বেশ মানাতো। মনে হোত বেশ সুখী ও। ওর স্বামীও তরি-তরকারী বেচতে বাজারে যায়। একদিন টিউশনি থেকে ফেরবার মুখে ও বাজারে যেতে হরিদাসীকে দেখতে পায় ওর স্বামীর পাশে বসে আছে। সেদিন অলকা কিছু তরকারী কিনতে গিয়েছিল।

—কি গো, দিদিমণি, আমাদের কাছে লাও না?

—তুমি তো তরকারী বেচছো না?

—এই তো আমার সোয়ামী বেচছে গো, বলে ফিক কোরে হেসে দিল হরিদাসী। ওর এই হাসির মধ্যে অলকা একটা মাধুর্য দেখতে পেয়েছিল। সেই থেকে হরিদাসীর সঙ্গে ওর চেনা হোয়ে গেছে। হরিদাসীকে দেখতে পেলে অলকা হেসে ফেলে। আর সেও অলকাকে দেখে লাল টকটকে সিঁদুরে মাথাটি নেড়ে চলে যায়।

কিন্তু আজও হরিদাসীকে দেখতে পেল না। হয় তো ও আগেই চলে গেছে। স্টেশনের গায়েই যে সাইকেলের দোকানটা আছে, সেখানে সাইকেল রাখার জন্য আজ এতটুকু ভিড় নেই,—একটুও ব্যস্ততা নেই। অলকার তাই আশ্চর্য লাগে।

আর বেশী দূর নেই ডলি পলির বাড়ি পৌঁছতে। মাঝখানে একটা জলা আছে সেটা পার হোলেই নতুন লাল মাটির রাস্তাটা পড়বে, সেখানে কিছুদূর গেলেই একটা মুদীর দোকানের পাশে ডলি, পলির বাড়ী।

আজ যেন বাড়ি ফিরতেও ভালো লাগে অলকার। অন্যদিন বাড়ি ফিরেই দেখত মেয়েটা ঘ্যান্-ঘ্যান্ কোরে কাঁদতে থাকে। আজ অলকা ওর জন্য একটা খেলনা হাতে কোরে নিয়ে এসেছে।

—খুকু, তোমার জন্য কি এনেছি, দেখেছ? খুকুর বিষণ্ণমুখে একটু হাসি ফুটবে তখন। সেই হাসিটুকু যেন আজকের দিনের একটা বিশেষ স্মৃতি হোয়ে থাকবে।

ঘরে ঢুকেই খুকুর হাতে খেলনাটা দিয়ে ওকে কোলে তুলে নেয় অলকা। তারপর শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বলে—মা, কি রাঁধতে হবে, বলুন! আজকে আমি কিছু একটা রাঁধবো।

—কেন, আজকে তোমার স্কুল নেই বৌমা?

—না, আজ আর স্কুলে যাবো না, আজ একটা মাত্র ক্লাস আছে। সুপ্রিয়াকে বলে রেখেছি, সে-ই আমার ক্লাসটা আজ নিয়ে নেবে।

অন্যদিন অলকা রাঁধতে সময় পায় না মোটেই। টিউশনি থেকে ফিরে কোনরকমে স্নানটা সেরে নিয়েই আবার মৃগাঙ্ক গার্লস হাই স্কুলে পড়াতে যায়। গ্রামটা ডানকুনি স্টেশনেই পড়ে। ওর স্বামী মানসের বেশী আয় নয়। বি-এস-সি পাশ কোরে কিছুদিন বেকার হোয়ে বসেছিল। কিছুদিন হোল একটা ফ্যাক্টরীতে এপ্রেন্টিস হিসাবে কাজে ঢুকেছে। মাইনে বেশী নয়; তাতে দু'টো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চলে না। ওর এতদিন কাজ ছিল না বলে ওরা কোলকাতা থেকে এই মফস্বলে চলে এসেছে। এখানে এসে অলকা টিউশনি পেয়েছে স্কুলে চাকরীও পেল। তাই কোনমতে এখন জীবিকা নির্বাহ কোরতে পারছে। মেয়েটি স্কুলে পড়ে। ছোটটি একেবারেই বাচ্ছা—বছর দেড়েকের হবে। অলকা রাঁধলে কিন্তু মানস বেশ খুশী হয়। ওর হাতের রান্না চমৎকার। মানসের বন্ধু-বান্ধবেরা অলকার হাতের রান্নার খুব সুখ্যাতি করে। এমন কি আত্মীয়-কুটুম্বরা পর্যন্ত অন্যান্য ব্যাপারে অলকার যত নিন্দেই করুক, ওর রান্নায় বশ কোরবেই।

প্রত্যেক দিন ভোর না হোতেই উঠে স্কুলে যাওয়া, তারপর

আবার এসে কোনমতে দু'টো ভাত মুখে দিতে না দিতেই স্কুলে গিয়ে হাজির হওয়া—বাড়ি এসে সংসারের খুঁটি-নাটি কাজ, মেয়েকে পড়ানো—এই সবগুলো কাজের মধ্যে ভীষণ একটা একঘেয়েমি এসে গেছে। ক্লান্তি এসে গেছে জীবনে। আজকে হঠাৎ কোথা থেকে একটা খুশীর বান এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অলকা মৈত্র ইচ্ছে কোরলে আজ মুঠো মুঠো খুশী চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারে। কাল মানসের চাকরীর প্রোমোশনের সংবাদে কি এত খুশী হোয়ে উঠেছে আজ? না কি অরুণিম স্কুলে ফার্স্ট হোয়েছে বলে, তাই কি? আর কিছু কারণও হয় তো হোতে পারে। নাঃ আর কোন কারণ হোতে পারে না। অলকা বিবাহিতা। ও মেয়ের মা, আর কোন পুলকের কথা ও ভাবতে পারে না—ভাবাটাও উচিত নয়। ও খুশী হোয়েছে ঐজন্যই ঐ দু'টো কারণের জন্যই।

তাই মানসকে খুশী করার জন্য ও আজ রাঁধতে বসেছে।

অফিস থেকে ফিরে মানস একটু আশ্চর্য হোয়ে যায় অলকাকে দেখে। ওর সাজগোজের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থাকে।

—কি, কোথাও বেরুচ্ছ না কি?

—না, না, বেরুব কোথায়। তোমার জন্যই তো অপেক্ষা কোরছি।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আজ তুমি বেশ খুশী. ব্যাপার কি?

—বাঃ খুশী হবো না? তোমার প্রোমোশন হোয়েছে এবারে মেয়ে দু'টোকে অন্তত একটু দুধ খাওয়াতে পারবো।

কথাটা বলেই অলকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

প্রত্যেকদিন সকালে এই একই ট্রেনে যাতায়াত করে। সেদিনকার সেই ভদ্রলোকটিও যেন পৌনে নটার ট্রেনটায় যাবার জন্য অপেক্ষা কোরতে থাকে। অলকা যে ট্রেন থেকে নামে সেই ট্রেনে তাড়াহুড়ো কোরে উঠবার জন্য ব্যস্ত হয় না। ওদের দু'জনকার সঙ্গে এখন বেশ অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে আজকাল। অলকা ট্রেন থেকে নামলেই সৌমেন্দু বেশ খুশী হোয়ে ওঠে। অলকা সৌমেন্দুর কাছে এগিয়ে যায়, ও যেখানে বসে থাকে সেই বেঞ্চে গিয়ে চুপ কোরে বোসে পড়ে।

অলকা সংসারের নানা গল্প করে সৌমেন্দুর কাছে। সৌমেন্দুও স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথা বলে। সৌমেন্দু বালি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। মফস্বল কলেজে অল্প মাইনে। মাত্র আড়াইশ' টাকায় ওদের এত বড় সংসার চলে না। তিনটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, বৃদ্ধা মা, অবিবাহিতা বোন—এতগুলি প্রাণী ওরই উপর নির্ভরশীল।

নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বোলতে বোলতে ওদের মধ্যে কি রকম যেন ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। নিজেদের দুঃখের কথা একে অন্যকে বলে ওরা যেন একটা হাল্কা হোতে চায়। শুধু যে সংসারের কথা বলে, তাই না, সংসারের কথা থেকে কখন যে সাহিত্য, সাহিত্য থেকে কখন যে ওরা রাজনীতির আলোচনায় এসে পড়েছে—তা ওরা নিজেরাই জানে না। সুখ-দুঃখের গান গাইতে গাইতে একে অন্যের উপর সহানুভূতিশীল হোয়ে উঠেছে, তারপর ওদের দু'জনকার মধ্যে যেন একটা মমতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

কোন কারণে একদিন অলকাকে দেখতে না পেলে সৌমেন্দু বিষণ্ণ হোয়ে ওঠে। অলকারও তাই হয়। একদিন যদি সৌমেন্দুর আসতে দেরী হয়, তা'হলে ওর মনে বেশ অভিমান জন্মায়।

কিন্তু এরকমভাবে কতদিন চলবে?

সংসার স্বামী কর্তব্য—এই সবকিছু সত্ত্বেও অলকার জীবনে একটা ফাটল ধরে গেছে। অলকার আবেগপ্রবণ মন যে সেই ফাটল সেই ফাঁকটাই চায় না। সেই ফাঁক তো সৌমেন্দুকে নিয়েই। অথচ সৌমেন্দুর সঙ্গে বাহ্যিক ব্যবহারে অলকা অত্যন্ত ধীর, স্থির, গম্ভীর।

প্রেম?

ঠিক কি তাই? অলকা অনেকদিন ভেবেছে—সেদিক দিয়ে স্বামীর প্রেমকেও সে তুচ্ছ করতে পারে না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিতে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে সেই প্রেম।

অলকা অনেক ভেবেছে। মনকে শক্ত করে ফেলেছে। এবারে সে সৌমেন্দুর কাছ থেকে ছুটি নেবে। রোজকার এই চোখের দেখার নেশাকে কাটাতে হবে। সৌমেন্দুর সঙ্গে একটু আলাপ, একটু হাসি, একটু মিষ্টি কথা, এই সব ওর জীবনের অনেক ক্লান্তি অপসারণ করলেও আর ও যাবে না কাছে। এর থেকেই হয় তো দু'টো সংসারে ফাটল ধোরে যাবে। দু'টো সংসারেরই কতকগুলো নিরীহ প্রাণী ছারখার হোয়ে যাবে। অলকা মনটাকে শক্ত কোরে ফেলে। আর টিউশানিতে যাবে না সে। টিউশানি সে ছেড়ে দেবে। সৌমেন্দুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেবে অলকা, বোলবে—ওর স্বামী বদলি হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। কথাটা বোলবে বোলে ভাবতেই অলকার চোখ দু'টো জলে ছাপিয়ে গেছে।

ট্রেনটা হুস্-হুস্ শব্দ কোরতে কোরতে স্টেশনে এসে থামলো। সৌমেন্দুর স্থির অথচ চঞ্চল দৃষ্টি যেন ম্লান হয়ে গেল। আজ কি তা'হলে অলকা এলো না?

অলকা কি আর কোনদিনই আসবে···?

স্মৃতি

কাজল দেবী

সাথীহারা এ বিজন রাতে—
নিদ নামে না আঁখির পাতে।
মনে পড়ে স্মৃতির রাশি,
প্রিয়ের মুখটি ওঠে ভাসি;
ক্ষুদ্র যে সব তুচ্ছ ছিল,
আজকে উচ্চে আসন পেল
হেলায় যাদের হারিয়েছিনু—
নিশীথে নীরব বীণাবেণু,
তাদের সুরে উতাল হয়ে,
কোন সুরভি আনল বয়ে?
ভরিয়ে দিল চিত্ত আমার,
হৃদয়ের রুদ্ধ যে দ্বার,
আপনমনে সঙ্গোপনে—
স্বপন রচে ধরার কোণে।
তুচ্ছ হলেও ক্ষুদ্র সে নয়
এই কথাটি চিত্তে জাগায়॥

বাসন্তী মঞ্জিল

অজিতকৃষ্ণ বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দু'দিন বাদে গোধূলিবেলায় নীলনয়নীর দীঘির কাকচক্ষু জলে সাঁতার কাটছিল এক কাঞ্চনবর্ণা নীলনয়নী সুন্দরী। দেহের একমাত্র আবরণ তীরে ছেড়ে রেখে সে জলে নেমেছে; সে জানে এ সময় এই নিরালা দীঘির একান্ত নির্জনতায় অনধিকার প্রবেশ করতে সাহস পায় না এখানকার কেউ। ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে সুন্দরী, কখনো বা জলের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিরাবরণ সারাদেহ জুড়ে অনুভব করছে জলের স্নিগ্ধ পরশ। সুন্দরীর নাম তহমিনা।

তহমিনা আশ্চর্য . রী, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী আশ্চর্য তার সাহস, অথবা দুঃসাহ   এই দীঘির সঙ্গে বিজড়িত কিম্বদন্তীটি জানা থাকলে এ সময়ে এই থির জলে এমন ভাবে একা সাঁতার কাটতে অপর কোনো মে দূরের কথা, অনেক সাহসী পুরুষও সাহস পেতো না।

অতীতের সেই সুন্দরী নীলনয়নী মেয়েটি নাকি এমনি সময়ে একা এই নিরালা দীঘির তীরে বসন ছেড়ে রেখে সাঁতার কাটত এই দীঘির জলে। তারপর এক গোধূলিবেলায় এই জলেই ঘটল তার মৃত্যু। তারপর—কিম্বদন্তী বলে—মৃত্যুর পরও এই দীঘির মায়া কাটাতে পারে নি সেই নীলনয়নী, তাই এখনো মাঝে মাঝে এসে গোধূলিবেলায় সাঁতার কাটে এই দীঘির জলে। নীলনয়নী তহমিনা অনুকরণ করছে সেই অতীত নীলনয়নীর, এভাবে তাকে আকর্ষণ করে তার দেখা পাওয়া যেতে পারে, এই আশায়।

ভয় নেই তহমিনার মনে। দক্ষিণ, পুব আর উত্তর, এই তিন দিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছের বেড়া দিয়ে আড়ালে লুকানো এই দীঘি। পশ্চিম দিকেও গাছ আছে, কিন্তু বাকি তিন দিকের মতো অত ঘন নয়। এমন ভাবে ঘেরা বলেই ছায়ায় ছায়ায় দীঘির ওপর যেন একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া ভর করে আছে। কিম্বদন্তীটি যারা জানে, এখানে তাই তাদের গা আরো বেশী ছম্ ছম্ করে ওঠে।

দীঘির কিছুদূর পশ্চিমে দু'টি গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এমন ভাবে চারিদিকে ডালপালা ছড়িয়েছে যে, তাদের ও পাশের দু'টি চমৎকার বাংলোকে দীঘির তীরে দাঁড়িয়ে ভালো রকম দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ দু'টিরই একটি বাংলোতে তহমিনার থাকবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা করেছে বাগানবাড়ির মালিক সিরাজ। তহমিনার সঙ্গে এসেছে তার দাসী কুলসাম।

তহমিনাকে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসবার আগেই একটি সোনালী মখমলের থলিতে পঞ্চাশটি টাটকা সোনার মোহর 'নজরানা'র নাম করে দিয়েছিল সিরাজ; সেগুলো তহমিনা রেখে এসেছে তার মা মজিনা বিবির কাছে। এ হলো সামান্য আগাম মাত্র, সিরাজ আশ্বাস দিয়েছে তার মনের কামনাটা পুরাতে পারলে তহমিনাকে আরো অনেক দিয়ে সে ধন্য হবে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই তহমিনার মনে; সে জেনেছে সিরাজের কাছ থেকে পেতে তার যত আগ্রহ, তাকে দিয়ে ধন্য হবার আগ্রহ তার চাইতে অনেক বেশী সিরাজের। তহমিনার বিশ্বাস তার দু'টি ঐশ্বর্যের বাহুতে ঘায়েল হয়েছে পুরুষ সিরাজ, তাই সিরাজকে যথেচ্ছ দোহন করা এখন কঠিন হবে না।

নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায়...
দেবী দুর্গার অকাল বোধনে অষ্টোত্তর শত
নীলোৎপলের অঞ্জলিদানে একটি উৎপল কম দেখে
রামচন্দ্র নিজের নীলোৎপল আঁখি উৎপাটন করে সংখ্যা পূরণ
করতে চেয়েছিলেন । সেবকের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায়
সন্তুষ্টা দেবী আবির্ভূতা হয়ে রামচন্দ্রকে
নিবৃত্ত করেন, তাঁর পূজা গ্রহণ করেন ।
সাধারণের সেবায় নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা
আমাদেরও একমাত্র কাম্য ।
কোলে বিস্কুট কোং, প্রাইভেট লিঃ
১০০এ, চরকডাঙ্গা রোড, কলিকাতা-১০

সিরাজ তাকে বাগানবাড়িতে ঠিক কি উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে সেটা যেন বাগানবাড়িতে এসে একটু কম বুঝছে তহমিনা। আগে সে ধরে নিয়েছিল সিরাজ পতঙ্গ শেষ পর্যন্ত তহমিনার যুগল আগুনের টান এড়িয়ে থাকতে পারে নি, তাই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের জন্য। সেই সান্নিধ্যের স্বর্গসুখের জন্য দু'হাতে অর্থ ওড়াতে কার্পণ্য করবে না সিরাজ, অর্থ নিয়ে যে অনায়াসে ছিনিমিনি খেলতে পারে, তাই সে পারল। কিন্তু তাই আগাম দিয়েছিল পঞ্চাশ মোহর। কিন্তু বাগানবাড়িতে এসে তহমিনার সন্দেহ হয়েছে আসল ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। অথবা হয় তো সিরাজের চক্ষুলজ্জাটা এখনো ভাঙে নি, তাই অর্থ দিয়ে সুন্দরীর যে একান্ত অন্তরঙ্গতা সে কামনা করে, সেইটে সে খোলাখুলি দাবি করতে পারছে না। পঞ্চাশ মোহর আগাম দিলে হবে কি ?

তা যাই হোক, দিলদরিয়া দরাজহাতে সিরাজকে যা দিতে আপত্তি নেই সুন্দরী তহমিনার, তা দেবার জন্যে দুর্বার আগ্রহও কিছু নেই। কিছুদিন এই বাগানবাড়িতে অজ্ঞাতবাসে একটু হাওয়া বদলও হবে—ভেতরের আর বাইরের—বিশ্রামও হবে, আর তাকে রাখবার ভালো মাশুলও নিশ্চয়ই দেবে সিরাজ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই তহমিনার মনে। ঐ মাশুলটুকুই চায় তহমিনা। সিরাজ হার মেনেছে, মাশুল দিচ্ছে, এতেই তহমিনার আনন্দ। সিরাজ সুশ্রী পুরুষ বটে, কিন্তু তহমিনাকে আকর্ষণ করবার মতো সুপুরুষ নয়।

তাছাড়া এই যে নীলনয়নীর দীঘিতে এমন করে নিরালায় নিঃসংকোচে নির্বিঘ্নে সাঁতার কাটা, এ সৌভাগ্যও তো কম নয়। আর যদি দেখা হয়ে যায় নীলনয়নীর সঙ্গে, তাহলে তো সিরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকবে না তহমিনার।

নীলনয়নীকে সামনাসামনি দেখে তার সঙ্গে আলাপ করবার বিশেষ রকমের আকাঙ্ক্ষা তহমিনার। কারণ নীলনয়নী পরলোকের বাসিন্দা, পরলোকের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তহমিনার মিশরী পিতা তৌফিক বে ভারত ছেড়ে মিশরে ফিরে গিয়েছিলেন মঞ্জিলা বিবির দেহে তহমিনার সম্ভাবনা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই, তারপর বহুদিন কোনো দিক থেকেই খোঁজখবর দেওয়া বা নেওয়া হয় নি। কিশোরী তহমিনা যখন কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে সেই সময়ে পিতা সম্বন্ধে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার মন। তখন একটু খোঁজের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কোনো খবর সংগ্রহ করা যায় নি। তৌফিক বে ঐ নামে ভারতে নিজেকে পরিচিত করলেও মিশরেও তার ঠিক ঐ নামই ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহের প্রচুর অবকাশ ছিল। এখনও আছে। তা যাই হোক। বিদেহিনী নীলনয়নীর কাছ থেকে হয় তো তৌফিক বে'র খবর সঠিক শোনা যেতে পারবে। এই ভাবতে ভাবতে নীলনয়নীর দীঘির জলে নিরালায় একা সাঁতার কাটছিল নীলনয়নী সুন্দরী তহমিনা।

দাসী ফুলমণি আসতে চেয়েছিল তহমিনার সঙ্গে দীঘির ধারে। সাঁতার কাটতে নয়, কারণ ফুলমণি জানত নীলনয়নীর দীঘির কিংবদন্তী, আর ঐ দীঘি সম্পর্কে কেমন একটা গা ছম্ ছম্ করা ভয় ছিল তার। বিশেষ করে গোধূলিবেলায় এই দীঘি সম্বন্ধে। বেছে বেছে এই গোধূলিবেলাতেই যখন এর জলে সাঁতার কাটবে ঠিক করল তহমিনা, কোনো মানাই শুনতে তাকে রাজি করানো গেল না, তখন ফুলমণি—মনের ভেতর একটু অস্বস্তি থাকলেও—ঠিক করেছিল তহমিনার সঙ্গে এসে সে দীঘির পারে বসে বসে নজর রাখবে। কিন্তু ফুলমণিকে সঙ্গে আসতে দেয় নি তহমিনা, পাছে দু'জন এলে সেই নীলনয়নীর দেখা না মেলে। নীলনয়নীর সঙ্গে তহমিনা একা, সম্পূর্ণ একা, মুখোমুখি মোলাকাত করতে চায়। আর প্রধানত সেই সম্ভাবনার জন্যই সে আসতে রাজি হয়েছে সিরাজের এই বাগানবাড়িতে। তহমিনা নিজেও নীলনয়নী, তাই তার আশা অতীতের সেই নীলনয়নী বর্তমানে দেখা দেবে, নিরাশ করবে না তাকে। সেই নীলনয়নীকে দেখে নি এই নীলনয়নী তহমিনা, কিন্তু তবু কেমন এক পরম একাত্মতা অনুভব করছে সেই দুঃসাহসিকা মেয়েটির সঙ্গে।

নীল নদের দেশের তৌফিক বে-কেও তো দেখে নি তহমিনা, কিন্তু তারই দুঃসাহসিক রক্তের উদ্দাম উষ্ণতা, চঞ্চলতা অনুভব করছে নিজের ধমনীতে ধমনীতে। নীল নদের নীলত্ব যেন ঘর বাঁধা বাসা বেঁধেছিল আশ্চর্য পুরুষ তৌফিকের দু'টি চোখের তারায়, সেকথা মঞ্জিলা বিবির মুখেই শুনেছিল মঞ্জিলা-তৌফিক দুহিতা তহমিনা। নিজের চোখের নীলত্ব তৌফিক রেখে গেছে তহমিনার চোখে, তাই তহমিনার চোখের দিকে তাকালেই তৌফিকের আশ্চর্য চোখ দু'টি মনে পড়ে যায় মঞ্জিলা বিবির। আর মনে পড়ে যায় তৌফিকের অন্তরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গতম সাহচর্যের দিনরাত্রিগুলোর কথা।

মঞ্জিলার প্রথমে ভালো লেগেছিল তৌফিকের দেওয়া সোনাদানা আর টাকা, তারপর ধীরে ধীরে ভালো লেগে গিয়েছিল দাতা তৌফিককেই। আশ্চর্য তৌফিক, যেমন জানত উজাড় করে দিতে, তেমনি জানত উজাড় করে নিতেও।

হ্যাঁ, তৌফিককে সত্যি ভালোই লেগেছিল মঞ্জিলা বিবির, কিন্তু মানুষটাকে তখন যত ভালো লেগেছিল তার চাইতে এখন যেন তার স্মৃতিগুলোকে আরো বেশী ভালো লাগছে। মঞ্জিলা বিবির এই ভালো লাগাটা তহমিনা বুঝতে পারে তার 'হসবির' দেখা দেখে। বিবিধ রকম ছবির সংগ্রহ ছিল তৌফিকের, ভালো ছবির জন্যে ভালো টাকাও খরচ করত সে। মিশরে ফিরে যাবার আগে স্মৃতিচিহ্ন রূপে মঞ্জিলা বিবিকে দিয়ে গিয়েছিল তার ছবির সংগ্রহ। তার চলে যাওয়ার ঠিক ছত্রিশেক বাদে মঞ্জিলার কোলে এসেছিল তৌফিকের জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন তহমিনা।

সেই তহমিনা নিরাবরণ দেহে গোধূলিবেলায় একা সাঁতার কাটছিল নীলনয়নীর দীঘির জলে, বিদেহিনী নীলনয়নীর প্রতীক্ষায়। অস্তাচলমুখী লাল সূর্যের আলো গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছিল দীঘির জলে, যে জলে পড়েছিল অনেক গাছের ছায়া।

কৌতুকপ্রিয় বিধাতার বিশেষ বিধানে সিরাজের বাগানবাড়িতে ঠিক এই গোধূলিবেলাতেই সিরাজ হাজির নেই। অবশ্য আজই গোধূলিবেলায় তহমিনা এই দুঃসাহসে মাতবার মতলব করেছে, সেটা জানা থাকলে সিরাজ হয় তো থাকত। কিন্তু এ-মতলবটি গোপন ছিল তহমিনার মনের ভেতর, সিরাজ তার আভাসও পায় নি। তাই চলে গেছে তাদের মস্ত কারবারের সদর দপ্তরে কি একটা জরুরী কাজ

সেরে আসতে, সেই সঙ্গে আরো বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখে আসতে, যেন হপ্তা তিনেক সে তার বাগানবাড়িতে অজ্ঞাতবাস করলেও তার অনুপস্থিতিতে তার বিভাগের কারবারী কাজকর্মগুলো সুষ্ঠুভাবেই চলে, কোনো রকমেই ব্যাহত না হয়। ব্যাহত হবার কথা নয়, কারণ তাদের কারবারের কাঠামোটি প্রায় এমনই নিখুঁত যে, কোনো একটি ব্যক্তির কিছুদিনের অনুপস্থিততে কারবারের কোনো কাজের মতো কাজ আটকে থাকবে না, যে কাজ আটকে থাকবে সে কাজ এমন কাজ যে কিছুদিনের জন্যে আটকে থাকলেও তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। তবু একটু অতিরিক্ত সাবধান সিরাজ আমেদ। কারবারের দেখাশোনার কাজ থেকে একটানা ছুটি দু-তিন দিনের বেশী কখনোই নেয় নি সিরাজ, আর এক্ষেত্রে তো একটানা দু'-তিন হপ্তার ব্যাপার।

অবশ্য এদিকে, অর্থাৎ সিরাজের বাগানবাড়িতেও অতুলনীয়া অতিথি তহমিনার সুখ, সুবিধা, নিরাপত্তা, চিত্ত-বিনোদন ইত্যাদির যে ব্যবস্থা করে গেছে সিরাজ, তাও নিখুঁত। যেন কোনো পরম সৌখিনা রাজার দুলালী বা নবাব-নন্দিনী নাগরিক ঐশ্বর্য বিলাসের হৈ-হল্লোড় ছেড়ে সাময়িক চিত্তবিশ্রাম আর দেহবিশ্রামের জন্য পালিয়ে এসেছে স্নেহময়ী প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শ্যামল পরিবেশে অজ্ঞাতবাস করবে বলে। এইভাবেই সিরাজ ব্যবস্থা করেছে। আর তহমিনা খুশী হয়েছে। এইটুকু ইঙ্গিত দিয়েই বিস্তারিত বিবরণের অনাবশ্যক বাহুল্য এড়ানো গেল।

সিরাজের বাগানবাড়িতে সুন্দরী তহমিনার এই অজ্ঞাতবাসের, তথা আতিথ্যের খবরটা কি জানতে পেরেছিলেন সিরাজের আব্বাজান ধনকুবের ব্যবসাদার নাসির আমেদ? ঠিক তহমিনার খবরটা না জানলেও সিরাজের কারবারী গদি থেকে এই ছুটি নেওয়ার ব্যাপারটা যে নারী ঘটিত, এমন কোন সন্দেহের আভাস কি জাগে নি তাঁর সুচতুর এবং অভিজ্ঞ মনে?

হয় তো জাগে নি। অথবা হয় তো জেগেছিল। জেগে থাকলেও এতে বিচলিত বোধ করেন নি নাসির আমেদ, কারণ পুত্র সিরাজকে তিনি চিনতেন, সিরাজের ওপর তাঁর আস্থা ছিল এবং পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর একটা নিজস্ব মত ছিল। তিনি জানতেন নারীর প্রেম টাকা দিয়ে কেনা না গেলেও প্রেমের অভিনয় টাকা দিয়ে কেনা যায়। এবং এ রসের রসিক পুরুষ যারা, অভিনয়কে অভিনয় বলে বুঝতে পারলেও সেই অভিনয়ের পিছনেই টাকা উড়িয়ে, খুশী হয়। সিরাজ যদি তেমনিভাবে খুশী হতে চায় কোনোদিন, তো হবে, তাতে তাঁর নারাজ হবার কিছু নেই, এই ছিল নাসির আমেদ সাহেবের মতবাদ।

তিনি জানতেন এ ধরণের সখ মেটাতে গিয়ে মাত্রা হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বার ছেলে নয় সিরাজ, মাত্রা বজায় রেখে যদি সখ মেটায়, মেটাবে। এভাবে কিছু টাকা খোলাম কুচির মতো ওড়ায়, ওড়াবে। টাকা তো হু-হু করে স্রোতের মতো আসছে, ঢেউয়ের পর ঢেউ; ইচ্ছে করলে তো অনেক সুন্দরীকেই পুষতে পারে সিরাজ অনায়াসে! কিন্তু এও জানতেন ওপথে পা বাড়াবে না সিরাজ। তার জন্যে দু'টি কারণ। একটি সিরাজের বাল্যবন্ধু বাদশা-র প্রভাব। মহাবীর বসির পালোয়ানের প্রিয়তম সাগরেদ বাদশা, যাকে প্রথমে রুস্তম-এ-বঙ্গাল, তারপর রুস্তম-এ-হিন্দ অর্থাৎ ভারতের অপরাজেয় মল্ল বানাবার আশা রাখেন বসির পালোয়ান।

আরেকটি কারণ এক ফকির সাহেবের প্রভাব। নাসির আমেদের এবং সেই অনুসারে সিরাজ আমেদের বিশ্বাস আমেদ পরিবারের অসামান্য কারবারী সাফল্যের মূল এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ফকির সাহেবের আশীর্বাদ। নাসির আমেদের বাল্যবন্ধুর সুন্দরী মেয়ে তরুণী নেশাদবানুর সঙ্গে যখন পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল নাসিরের বংশধর তরুণ সিরাজ, তখন এই বৃদ্ধ ফকির সাহেব আশীর্বাদ করেছিলেন নব-দম্পতিকে, আর সিরাজকে বলেছিলেন নিরালায় ডেকে নিয়ে: দেখ সিরাজ, খোদার দোয়া যদি পেতে চাস তো এইটে ইয়াদ রাখবি—কোনো আওরতের ওপর এতটুকু জুলুম করবি নে, তার চোখে আঁসু বহাবি নে। কোনো আওরৎ যদি তোকে জালিম বলে ভাবে, সে যত বড় বা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তার আঁসুর এক একটা বুঁদ হবে তোর বিরুদ্ধে খোদার কাছে এক একটা নালিশ। ব্যাস, এইটুকু মনে রাখিস হামেশ।

ফকির সাহেব জীবিত নেই। কিন্তু তাঁর উপদেশ কথাগুলো এখনো যখন তখন হঠাৎ গম্ গম্ করে ওঠে সিরাজের বুকের ভেতর আর কানের দু'পাশে। তখন মনে হয় যেন সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো আবার বলছেন অদৃশ্য অশরীরী ফকির সাহেব।

ফকির সাহেবের কথা থেকে সিরাজ এমন ইঙ্গিতও সংগ্রহ করেছে যে এই দুনিয়াতেই যে সব মরদ ইহলোকের হুরীদের নিয়ে মাতামাতি করে, তারা তো হুরী অভিজ্ঞতা এখানেই সেরে গেল, তাই তারা বেহেস্তে গেলেও তাদের কপালে বেহেস্তের হুরী জোটে না; ইহজীবনে যারা হুরী বঞ্চিত, তারা বেহেস্তে গেলে সেখানকার হুরী সৌভাগ্য তাদেরই একচেটিয়া অধিকার, অন্তত অগ্রাধিকার তো বটেই।

কৃচ্ছ সাধক বন্ধু বাদশার প্রভাব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ফকির সাহেবের প্রভাব, এ ছাড়া জীবন-সঙ্গিনী নেশাদরবারের প্রভাবও কম নয় সিরাজের জীবনে। রূপ আর যৌবন দুই আছে এবং প্রচুর পরিমাণেই আছে নেশাদরবারে। নেশাদরবারে আর তহমিনায় প্রধান প্রভেদ এই যে একজন সুধা অপরজন সুরা; একজন স্নিগ্ধ করে অন্যজন উগ্র নেশায় মাতিয়ে চঞ্চল করে তোলে; একজন চোখ জুড়ায়, আরেকজন চোখ ধাঁধায় একজন দিয়ে খুশী অন্যজন আদায় করে খুশী।

সুধা নিয়েই এতদিন খুশী ছিল সিরাজ, সুরার নেশায় মাতবার বাসনা জাগে নি তার মনে। সুরার বোতল দেখেছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট এবং শোভন দূরত্ব বজায় রেখে। কে ভাবতে পেরেছিল সেই সিরাজই তার বাগানবাড়িতে নিয়ে আসবে মর্তের হুরী তহমিনাকে?

নির্জন দীঘির জলে যখন একা আপনমনে নিঃশব্দ সাঁতার কাটছিল কাঞ্চনবর্ণা তহমিনা, তার দেহ ঘিরে একমাত্র আবরণ দীঘির কাকচক্ষু জল, তখন দীঘির পূর্বধারের অরণ্য আড়ালে তৃণশয্যায় একা শুয়ে ছিল আশ্চর্য যুবক মোহন—অসামান্য শক্তিধর, অসামান্য সুপুরুষ অসামান্য নির্ভরচিত্ত, অসামান্য কৌতূহলী। সেদিনের এত অল্পক্ষণের পরিচয়েই সিরাজ তাকে এমন আপন করে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে দোস্ত বলে, তাই বিস্ময় মুগ্ধ হয়েছে মোহন সিরাজের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

মোহন যেখানটায় শুয়েছিল ঘন-ঝোপের আড়ালে, সেখান থেকে দীঘির পূব পাড়ের দূরত্ব খুব বেশী নয়। দীঘির পাড়ে যেখানে পরম নিশ্চিন্ত মনে দেহের একমাত্র আবরণ খুলে রেখে জলে নেমে গিয়েছিল তহমিনা, সেখান থেকে মোহন পর্যন্ত মাত্র কয়েক পদক্ষেপের পথ। কিন্তু তীরে রেখে যাওয়া তহমিনার সেই দেহাবরণ তখনো মোহনের নজরে পড়ে নি, কারণ মোহন গোধূলিবেলায় বেশ কিছুক্ষণ আগে এসে যখন শুয়ে বিশ্রাম শুরু করবার আগে একবার ঠিক ঐখানটায় তাকিয়েছিল, তহমিনা তখনো আসে নি দীঘির ধারে। তারপর ধীরে ধীরে একা দীঘির ধারে এসে ঐখানে আবরণ খুলে রেখে তেমনি ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন দীঘির নীরব জলের প্রশান্তি যথাসাধ্য কম ভঙ্গ করে নিরাবরণ তহমিনা যখন জলে নেমে গিয়েছিল, মোহন তখন গাছের তলায় ঝোপের আড়ালে সবুজ ঘাসে শুয়ে শুয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখছিল অনেক গাছের অনেক ডালপালা কি ভাবে আকাশকে অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে। তার কানে যায় নি তহমিনার মৃদু পদক্ষেপ, চোখে পড়ে নি তহমিনা।

মোহন যে আড়ালের আশ্রয়ে ছিল, সেই আড়াল থেকে ডালপালার ফাঁক দিয়ে দীঘির সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, নিজে সম্পূর্ণ অদৃশ্য থেকে। এই ঝোপটি তাই আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল মোহন, এই আড়াল থেকে গোধূলিবেলায় নিরালা দীঘির ওপর নজর রাখবে বলে। নীলনয়নীর কিংবদন্তী সে শুনেছিল সিরাজের এই বিরাট বাগানবাড়ি আর বাগিচার মালী আর ভৃত্যদের কাছ থেকে, সিরাজের মুখ থেকে নয়।

মালী আর ভৃত্যরা থাকত নীলনয়নীর দীঘির বেশ কিছুদূর দক্ষিণ প্রান্তে সে যেন বাগানবাড়ির অন্দর মহল থেকে দূরে।

মালী আর ভৃত্যদের মহল। সেই মহল থেকে উত্তর দিকে তাকালে—বাঁদিকে নীলনয়নীর দীঘি আর সেই দীঘির পূর্বদিকে অল্প ব্যবধানে দু'টি চমৎকার বাংলো—চোখে পড়ে ঘন সন্নিবিষ্ট বহু গাছের উঁচু দেয়াল শুধু। মালী আর ভৃত্যরা স্নান করতে যায় নদীর জলে, নদী ওদের পক্ষে বেশী দূর নয়। নীলনয়নীর দীঘিতে যে ওরা স্নান করতে আসে না তার একটি কারণ এ দীঘির আভিজাত্য; মনিব বা তার অতিথিরা এসে স্নান করবেন এর জলে, বসবেন এর তীরে এসে, এ দীঘির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে আসবার মতো ধৃষ্টতা তাদের নেই। আরেকটি কারণ সেই কিংবদন্তী। এবং—ওরা মুখে যাই বলুক না কেন—হয় তো ওটাই আসল কারণ, দীঘির আভিজাত্যের প্রতি মর্যাদাটা অজুহাত মাত্র।

মোহনকে নিয়ে এসে সিরাজ তাকে মালী আর ভৃত্যদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিল নিজের অতি পেয়ারের দোস্ত বলে, এই পরিচয় করানোর ভাষায় এবং ভঙ্গিতে ইঙ্গিত ছিল মোহনকে তারা মনিবের মতোই মানবে, তার সব রকম হুকুম তামিল করবে, তার খেয়াল-খুশির মর্জি মেটাবে, তার সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখবে।

মোহন এখানে সিরাজের বিশিষ্ট অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকবে শুনে তারা যেমন খুশী হয়ে উঠেছিল—পৌরুষ আর লালিত্যের এমন অপরূপ সমন্বয় এক দেহে তারা আর কখনো দেখে নি—তেমনি মোহন তাদেরই সঙ্গে থাকবে এবং খানাপিনাও তাদেরই সঙ্গে করবে শুনে তারা তেমনি চমকেও উঠেছিল প্রথমটা। হুজুরের প্রাণের বন্ধু থাকবেন তাদের সঙ্গে, মানে চাকরদের সঙ্গে, এ কেমন কথা? এমন অতিথি পেলে তারা ধন্য বোধ করবে বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নিজেদের ধৃষ্টতার কথাটা খোঁচা দিতে থাকবে তাদের মনে।

ওদের সংকোচ দেখে সিরাজ হাসিমুখে ওদের বুঝিয়ে দিয়েছিল মোহন গোস্ত খায় না, নিরামিষাশী, সেই কারণেই আহারের ব্যাপারে সিরাজের প্রত্যক্ষ আতিথ্য তার পক্ষে সুবিধাজনক নয় বলেই এই ব্যবস্থা। আর 'আরাম হারাম হ্যায়' নীতি মোহনের, আরামে থাকলে সে মন আর শরীর দুই খারাপ বোধ করে, কঠোর মেহনতী বিলাসহীন জীবনধারা তার একমাত্র পছন্দ। এই আশ্বাসে পরম আশ্বস্ত হয়েছিল সবাই। এদের আতিথ্যে মোহনকে রেখে নিশ্চিন্ত মনে সিরাজ চলে গিয়েছিল একদিনের জন্যে শহরে। কি কারণে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তখন অন্তরঙ্গ আলাপে এদেরই একজন হয়ে যেতে

দেরি হয় নি মোহনের। এদের জীবনযাত্রা দেখে সিরাজের ওপর শ্রদ্ধা তার আরো বেড়ে গিয়েছিল। সুন্দর, পরিচ্ছন্ন এদের কুটিগুলো, এদের প্রয়োজনের চাইতে সংখ্যায় বেশি। গরু আর মহিষ একাধিক রয়েছে, দুধ, ঘি, মাখন খেয়ে এদের প্রত্যেকের দেহ পুষ্ট! শুধু খাওয়া নয়, শরীর চর্চাও এদের জীবনযাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। খুশী হলো মোহন।

নদীতে স্নান করতে যাবার সময় নানা কথায় উঠে পড়েছিল দীঘির প্রসঙ্গ, কেন সামনের দীঘি ফেলে অপেক্ষাকৃত দূরে নদীতে স্নান করতে যায় এরা। তখনই মোহন শুনল নীলনয়নার সেই লোমহর্ষণ কিম্বদন্তীর কথা, শুনল এই দীঘিকে আজও ভুলতে পারে নি অশরীরী নীলনয়না, অতুলনীয়া সুন্দরী সেই নীলনয়না। আজও সে আসে গোধূলিবেলায়, যখন ঐ নিরালা দীঘির ওপর চারিদিকের গাছের ছায়া আরো ঘন হয়ে জল আরো কালো হয়ে ওঠে, নির্জনতা হয়ে ওঠে আরো গভীর, আরো রহস্যময়—বাইরের জগৎ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এই দীঘির রহস্যময় জগৎ, অস্তগামী সূর্যের আলো ভালো করে ঢুকতে পারে না গাছের ডালপালার জাল ভেদ করে, যেটুকু ঢোকে তা দীঘির রহস্যকে আরো রহস্যময় করে তোলে। মালী লোকটির কল্পনাশক্তি প্রবল, এই কিম্বদন্তীর কাহিনীটি বলতে বলতে উত্তেজনার আনন্দে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রং তাকে সজ্ঞানে চড়াতে হয় না, বলার বেগে আপনি চড়ে যায়।

মালী যেমন কল্পনাপ্রবণ বক্তা, তার চাইতে শ্রোতা মোহনের কল্পনা অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী। অ সী ম কৌ তূ হ লে, অসীম সহানুভূতিতে ভরে উঠল মোহনের দরদী মন আর তার ভেতরকার দুঃ সা হ সী অ্যাডভেঞ্চার-প্রবণ, বেপরোয়া মানুষটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কি রহস্য ছিল এই জলে সেই অপরূপা সুন্দরী নীলনয়নার মৃত্যুর পিছনে? কেনই বা সে বারবার গোধূলিবেলায় এই দীঘিতেই ফিরে ফিরে আসে? এ র হ স্য সমাধানের জন্য মোহনের অন্তরাত্মা ...

বেদনা অনেক পেয়েছে সে, পরের ব্যথার কথা শুনলে দরদে ভরে ওঠে তার মন।

কিন্তু সিরাজ ভাইসাহেব এ-কাহিনী তাকে শোনায় নি কেন? হয় তো মোহন ভয় পাবে বলেই শোনায় নি। সিরাজের এই মনোভাব কল্পনা করে নিয়ে মনে মনে হাসল মোহন। এই ভয় করাটাই যে মোহনের কোষ্ঠীতে লেখা নেই।

গোধূলির ঠিক আগে রওনা হলে সিরাজের মালী আর ভৃত্যেরা বুঝে ফেলবে তার মতলবটা, তাই বিকেলবেলায় বেশ কিছু আগেই যখন মালী আর ভৃত্যদের মধ্যদিনের বিশ্রাম শেষ হয় নি, তখন পল্লী অঞ্চলটা একটু ঘুরে দেখে আসবার অজুহাতে বেরিয়ে পড়ল

মোহন। তারপর কিছুদূর এসে পল্লীর দিকে না গিয়ে নীলনয়নীর দীঘির পশ্চিমে গাছের অরণ্যের ভেতর ঢুকে পড়ল।

এই হলো আগেকার কথা। এবারে তার পরের কথায় আসা যাক, যে কথা থেকে পিছু হটে একটু আগে এই আগের কথায় আসা গিয়েছিল।

নিরালা দীঘির কালো জলে যখন একা সাঁতার কাটছিল তহমিনা, তখন দীঘির জলের অনতিদূরে ঝোপের আড়ালে ঘাসের ওপর একা শুয়ে শুয়ে মোহন ভাবছিল এখানকার আরণ্যক নির্জনতা, নীরবতা আর রহস্যময়, আধা ভয়ংকর আবহাওয়ার কথা। শ্রবণ-দূরত্বের আওতার ভেতর কেউ নেই যে এখান থেকে চীৎকার করে ডাকলেও সে ডাক শুনতে পাবে, শুনে সাহায্য বা উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। এ কথা ভেবেই মনে মনে হেসে উঠল মোহন, তার অসামান্য শক্তিশালী হাত দু'টিকে মুষ্টিবদ্ধ করে। এখানে বিপন্ন হলে তার এই দু'টি হাতের জোরই যথেষ্টর চাইতে অনেক বেশী হবে, অন্য কোনো সাহায্য তার দরকার হবে না। মনে হল নীলনয়নীর কথা, সে যার আগমন প্রতীক্ষা করছে এই একান্ত আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে, পাছে তার নিকট উপস্থিতি টের পেলে নীলনয়নী না আসে অথবা অন্তর্ধান করে। এই আড়ালে গোপন থেকে চুপি চুপি দেখতে হবে নীলনয়নীকে, তারপর…

এখনো নীলনয়নীর দেখা নেই, সাঁতার কাটতে কাটতে ভাবল নীলনয়নী তহমিনা। 'হয় তো আমি তীরে গিয়ে দাঁড়ালে আমাকে দেখে তখন আসতে পারে। দেখা যাক পরীক্ষা করে।' এই ভেবে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ সাঁতার কেটে তীরের দিকে অগ্রসর হল তহমিনা। যেখানে তার একমাত্র দেহাবরণটি সবুজ ঘাসের ওপর রেখে সে জলে নেমেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করে।

অদৃশ্য আড়াল থেকে ঐ দেহাবরণটির দিকে তখন মোহনের বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটু আগেও ছিল না, নারীর ঐ দেহাবরণ ওখানে এলো কি করে, কখন ?

দীঘির জল থেকে ধীরে ধীরে মৃদু পায়ে তীরে উঠে এসে সবুজ ঘাসের ওপর ছেড়ে যাওয়া সেই একমাত্র আবরণের পাশে এসে দাঁড়াল তহমিনা। দীঘির জলে ভেজা তার সারা দেহে ম্লান গোধূলির আলো। [ক্রমশ।

যশোদা-দুলাল

—রামকিঙ্কর সিংহ

কারুকার্য (উদয়পুর প্রাসাদ)

—এস, এন, দত্ত

মাতৃরূপেণ

—রামকিঙ্কর সিংহ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
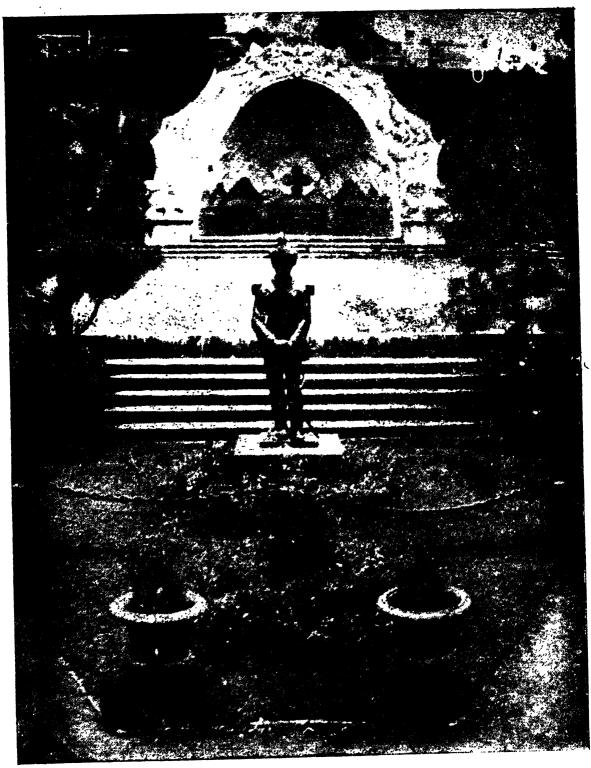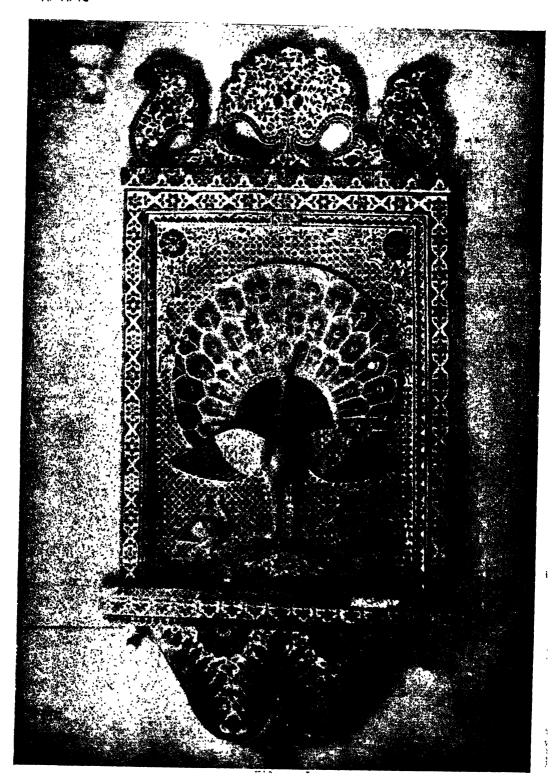
কোঁআমুড় (দেশজ)—সুদৃঢ় লতানিয়া গাছ callicarpa lanceolaria.

কোঁক—লতাগাছ Phoenix acoulis.

কেঁড়—বাঁশের নতন চারা।

কোক—খেজুর গাছ ;

কোকদন্তা—মদীপাতা।

কোকনদ—১ রক্তকুমুদ, ২ রক্ত পদ্ম।

কোকরঙ্গা—কুকুর শোঁকা।

কোক-বরাদি—salvia parviflora.

কোক-শিম—[সং কুলাহল] কোকসীমা calsia coromandeliana. প্রকার ভেদ—(১) বড় কোকসিম blumea lacera, (২) ছোট কোকসিম vernonia cinevea.

কোকাগ্র—সমষ্ঠীল বৃক্ষ

কোকিল নয়ন—কোকিলাক্ষ, কালকাঁটা।

কোকিলাক্ষ—[সং ইক্ষুরক, হিং কৈলয়া, তাল—মথানা, মং বিখরা, গুং এখরো, কং কুলুগোল্লিকে, উং কোইনিখিয়া, মাখুরেণ, কোং খাড়াকুলে] কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা, কোলিকা, কুলিকা। বাসকাদিবর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুপবিং, asteracantha longifolia, barleria lon, ruelia lon., hygrophila spinosa. জলাভূমিতে জন্মে। মূল বহুশাখান্বিত, কাণ্ড চতুষ্কোণ, শাখা গ্রন্থিযুক্ত। রোমান্বিত, চ্যাপ্টা, পাতা সরু, লম্বা ও শাখার গ্রন্থি থেকে জোড়া জোড়া বাহির হয়। ফুলমিলিত দল, নীলবর্ণ। প্রকার ভেদ—(১) রাঙা কুলে খাড়া, (২) কাজলি আক। পর্যায় —ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, শৃগালী, শৃঙ্খলী, শৃঙ্গক, শৃগালঘণ্টী, বজ্রাস্থি, বজ্রকণ্টক, পিকেক্ষণা, পিচ্ছিলা। শ্বেত কোকিলাক্ষের পর্যায়—বীরতরু, ত্রিক্ষুর, ক্ষুরক, শুক্লপুষ্প, কুলাহক। রক্তকোকিলাক্ষের পর্যায়—ছত্রক, অতিচ্ছত্র।

কোকিলাবাস—আম্রবৃক্ষ।

কোকিলেক্ষু—কাজল আক।

কোকিলেষ্টা—মহা জম্বু, বড় জাম।

কোকিলোৎসব—আম্রবৃক্ষ।

কোকোয়া বাঁশ (দেশজ)—বাঁশবিং।

কোঙা (দেশজ)—বৃক্ষবিং।

কোটপাহাড়িয়া (দেশজ)—ক্ষুদ্র গাছ বিং।

কোঠর—অঙ্কোট বৃক্ষ।

কোদালিয়া—শিম্বাদিবর্গের বন্য লতানিয়া ক্ষুদ্র শাকবিং desmodium triflorum পাতায় তিনটি পর্ণ, ফুল ছোট নীলবর্ণ।

কোদ্রু, কোদো—[সং কোদ্রব, হিং কোদকা] ধান্যাদিবর্গের বর্ষায় আরণ তৃণবিং। paspalum scrobiculatum. পাতা মৎস্যাকার বিষাক্ত। বিহারে নিকৃষ্ট জমি চাষ হয়।

কোনী—poa nuicloides.

কোপলতা—কর্ণস্ফোটালতা।

কোমলবল্কল—লবলী বৃক্ষ।

কোমলা—ক্ষীরিকা বৃক্ষ।

কোর—মৃণাল।

কোরকশ—(দেশজ) সুগন্ধি ঘাস বিং, andropogon nardus.

কোরঙ্গী—ছোট এলাচ, ২ পিপুল।

কোরদূষ, কোরদূষক—কোদোধান।

কোদ্রব—কোদোধান।

কোর্ণনেবু—citrus liveonum.

কোলক—১ অঙ্কোট বৃক্ষ, ২ বহুবার বৃক্ষ, ৩ মরিচ।

কোলকন্দ—[সং মহাকন্দ] কাশ্মীরে পুটালু। পর্যায়—ক্রিমিঘ্ন, পঞ্জল, বস্ত্রপঞ্জল, সুপুট, পুটকন্দ।

কোলকর্কটিকা—মধুখর্জুর।

কোলঘোণ্টা—বজ্রবীবিং

কোলবল্লী—গজপিপ্পলী।

কোলাশঙ্খী—আলকুশী লতা ম্রং।

কোল, কোলা—১ কুলগাছ, ২ পিপ্পলী, ৩ চই।

কোলী—কুলগাছ।

কোবিদার—[কোং কাঞ্চনগচ, মং কোরল, গুং চম্পাকাটি, কং কোচালে কচনার, তৈং দেবকাঞ্চন] কাঞ্চন ফুলের গাছ, bauhinia purpuracens. প্রকারভেদ—শ্বেত-কোবিদার —(সং শ্বেত কাঞ্চন) নির্গন্ধ, কেশর b. acominata. (২) শ্বেত কোবিদার—সুরভি কুসুম b. candide, কেশর ৫টি। (৩) তাম্রপুষ্প কোবিদার—(ক) কাঞ্চনার, রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ (হিং কাচনার) b. veriegata, ফুল বড়। পর্যায়— চমারক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, যুগপত্র, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদার, রক্তকাঞ্চন, চম্প, বিদল, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার

বহুমঞ্জরী। (খ) পারিজাত 'মন্দার কোবিদারশ্চ পারিজাতশ্চ নামভিঃ॥' হরিবংশ॥ (গ) পীতপুষ্প কোবিদার—স্বেত কাঞ্চন, b. purpura. ফুল হেমন্তকালে ফোটে। ফুলের জন্য শ্বেতকাঞ্চন বাগানে রক্ষিত হয়। পীতকাঞ্চন পর্বতে জন্মে। ফুলের রং ঘোর গোলাপী।

কোশকার—আক।

কোশদেবী (দেশজ)—momordica umbellata.

কোশফল—কক্কোল (?)।

কোশফলা—১ মহাকোশাতকী, ২ ত্রপুষী, শশা।

কোশবতী—ঝিঙে।

কোশাজ—ওকড়া (?)।

কোশাতকী—ঘোষালতা, ঘোষ, ঝিঙা luffa foetida. ঝিঙা দ্রষ্টব্য। প্রকার ভেদ—(১) ক্ষুদ্রফলা কোশাতকী—[সং জোৎস্নিকা] l. bindaal. (২) বৃহৎফলা কোশাতকী—[সং হস্তী ঘোষা, হিং বড়তোরই] l. graveolans. (৩) রাজকোশাতকী—[সং রাজকোশতক] তেতো ধুঁধুল l. amara. (৪) ধারাকোশাতকী—ঝিঙে, ঘোষ l. acutangula. [হিং ঝিমনী, ওং জনী]। (৫) শ্বেতপুষ্প, পীতপুষ্প কোশাতকী—[সং কৃতবেধন, কেঁড়] l. echinata. পর্যায়—কৃতচ্ছিদ্রা, জালিনী, সুতিক্তা, ঘণ্টালী, মৃদঙ্গফলিনী, কর্কশচ্ছদা। ঘোষলতা আর্দ্র ভূমিতে জন্মে ও ভূলুণ্ঠিত থাকে। পাতা, ফুল ও ডাঁটা প্রায় ঝিঙের মত ও অতি তিক্ত। ভাদ্র আশ্বিনে প্রথম পুষ্পিত, শীতকালে ফল পুষ্ট হয়। ফলের গায়ে কাঁক কাঁক সরু নরম কাঁটা আছে।

কোশাম্র—ফলবৃক্ষবিং, কোশাম, দেশ বিশেষে কেওড়া বলে। পর্যায়—কৃমিবৃক্ষ, সুকোশক, ঘনস্কন্ধ, বনাম্র, জন্তুপাদপ, ক্ষুদ্রাম্র, রক্তাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ, সুরক্তক।

কোশিলা—মুষাপর্ণী।

কোষ্ঠী—আমগাছ। পর্যায়—পত্রশ্রী, পাদবিরজা, পাদরথী।

কোষ—জাতি, জায়ফল (?)।

কোষফল—ঘোষালতা।

কোষফলা—পীতঘোষা।

কোষ্টা—[নদীয়ার, মৈমনসিংহে প্রচলিত নাম] পাট দ্রষ্টব্য।

কোষ্ঠেক্ষু—শাদা আক।

কোহিবাজ—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, Ryoseyamus nigar পর্বতীয় দেশ, জুলাইমাসে ফুল হয়।

কোহী গাছ (দেশজ)—Bridelia scandens

কোহেরা (দেশজ)—কাঁঠাল।

কৌঝি (দেশজ)—sterculia urens.

কৌন্তের—অর্জুনবৃক্ষ।

কৌবল—কুল।

কৌশক—অশ্বকর্ণ বৃক্ষ, লতাশাল।

কৌশফল—নারিকেল বৃক্ষ।

কৌশিক্যোজ—শেওড়া গাছ।

কৌশিক ফল—নারিকেল।

কৌমুদ—১ বনকুসুম, ২ শাক বিং।

ক্রকচ—প্রাহিল বৃক্ষ।

ক্রকচ্ছদ—কেতকী বৃক্ষ।

ক্রকচপত্র—১ শাক বৃক্ষ, ২ সেগুন, কেতকীবৃক্ষ।

ক্রকর—করীর বৃক্ষ।

ক্রমপূরক—বকফুলের গাছ।

ক্রমিকণ্টক—১ বিড়ঙ্গ, ২ চিত্রাঙ্গ, চিতা, ৩ খজ্জুর।

ক্রমিশত্রু—বিড়ঙ্গ।

ক্রমু—সুপারী।

ক্রমুক—১ গুবাক বৃক্ষ, ২ ব্রহ্মদারু বৃক্ষ।

ক্রমশীর্ষ—কপিশীর্ষ, হিঙ্গুল (?)

ক্রাম্তা—বৃহতী।

ক্রিমিকণ্টক—১ বিড়ঙ্গ, ২ খজ্জুর।

ক্রিমিঘ্নী—সোমরাজী।

ক্রিমিশত্রু—রক্তপুষ্পক, পালিতামাদার।

ক্রিমিশাত্রব—বিট্খদির, গুয়েবাবলা।

ক্রুমুক—সুপারি।

ক্রূর—১ রক্তকরবী, ২ ভূতাঙ্কুশ বৃক্ষ, ভূতরাজ।

ক্রূরকর্মা—১ কটু তুম্বিনী বৃক্ষ, ২ অর্কপুষ্পী।

ক্রূরগন্ধা—কন্থারী বৃক্ষ।

ক্রূরা—রক্তপুনর্নবা।

ক্রোঞ্জ—ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিং।

ক্রোটন—সুর্হি-আদি বর্গের বৃক্ষ বিং। মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ হতে আনীত। ইহার ডালে গাছ হয়।

ক্রোড়কশেরুক—ভদ্রমুস্তা।

ক্রোড়চূড়া—বড় থুলকুড়ি।

ক্রোড়পর্ণী—কণ্টকারিকা।

ক্রোড়েষ্ট—১ মুথা, ২ ভদ্রমুস্তা।

ক্রোষ্টুফল—ইঙ্গুদী ফল (?)।

ক্রোষ্টুবিন্ন—পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া, স্থান বিশেষে হিবালছাই বলে। পর্যায়—পৃথক পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অহিপর্ণী, সিংহপুচ্ছী।

ক্রোষ্টেক্ষু—শাদা আক।

ক্রোষ্ট্রী—১ শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, ২ লাঙ্গলী।

ক্রৌঞ্চাদন—১ পিপ্পলী, ২ মৃণাল, ৩ ঘেঁচু (?), ৪ ত্রিকোটক তৃণ।

ক্লীতক—১ করমচার বীজ, ২ বৃক্ষ বিং।

ক্লীতকা—ক্লীতাকিকা, ক্লীতনী—

ক্লীনতক—নীল গাছ। যষ্টিমধু দ্রং।

ক্ষণ্ডু—চীনে ধান।

ক্ষণদা—হরিদ্রা।

ক্ষতঘ্ন—কুকুর শোঁকা।

ক্ষতবিধ্বংসী—বৃদ্ধদারক বৃক্ষ।

ক্ষত্রবৃক্ষ—মুচুকুন্দ।

ক্ষপা—হরিদ্রা।

ক্ষমাদংশ—সজনে গাছ।

[ক্রমশ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

শিবানীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এবার সে উঠতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রনাথের খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত বসাটা ওর উচিত—যখন চায়ের টেবিলে এসে বসেছেই। সে তাকাল ইন্দ্রনাথের সামনের খাবারের দিকে। দেখল সে একরকম কিছুই খায় নি। ডিসগুলো দেখলে মনে হয়, খাওয়ার তার ইচ্ছে ছিল না বা তার খাবার খিদে ছিল না তা নয়। যেন তার জিবে সব কিছু বিস্বাদ ঠেকছে। কর্ণফ্লেকের দু' চামচে মুখে তুলে ঠেলে রেখেছে। টোস্টে কামড় লাগিয়েছে। ডিম ভেঙেছে নাড়াচাড়া করেছে। বেকনে কাঁটা ফুঁড়ে রেখেছে মুখে তোলে নি—সব ছড়াছড়ি হয়ে পড়ে রয়েছে ডিসে ডিসে। কিন্তু সে উঠতে পারে। ইন্দ্রনাথ আর খাবে না, এ ঠিক। টেবিলে দু' হাতের ভার রেখে উঠতে যাচ্ছিল শিবানী কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল টি-কেটলির তলায় চায়ের পট তেমনি চাপা পড়ে রয়েছে টেবিলের মধ্যখানে। চা-ই খাওয়া হয় নি। চা বানাতে ইচ্ছে করল না শিবানীর। আবার কাউকে ডাকতেও ইচ্ছে করল না। অর্থাৎ মুখ খুলতে ইচ্ছে করল না, নইলে যদিও মনে হচ্ছে কেউ কোথাও নেই কিন্তু বাবুর্চি ঠিক দরজার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকলেই এসে চা ঢেলে দিয়ে যাবে কিংবা আর কিছুক্ষণ বাদে সে নিজেই আসবে দেখতে যে, চা ঢেলে দিতে হবে কি না। হয়ত আরো কয়েকবার সে দেখে গেছে উঁকি দিয়ে। হাত বাড়িয়ে গরম ঢাকনাটা টেনে তুলে টি-পট বের করে এনে চা ঢালতে লাগল শিবানী। ইন্দ্রনাথ এতক্ষণে বেশ তৃপ্ত মুখে শিবানীর চা ঢালা দেখতে লাগল। তৃতীয় ফোনটা ধরে শিবানীর ঘোষ 'বস'কে পেরে গিয়ে এবং তাকে 'শিবানী মরে গেছে' বলে ইন্দ্রনাথ বড় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছিল। ভেতরের জ্বালাটা বেশ কিছুটা কমে গিয়েছিল। শিবানীর চা তৈরী হতেই নিজের কাপটা সামনে টেনে এনে হাতে তুলে নিয়ে তাতে একটা খুশীর চুমুক লাগাল। তারপর কাপটা ফের টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, বড় ভুল হয়ে গেছে। আর ভুলই বা বলি কী করে। কথাটা তো আমার নয় তোমার। তোমার বুদ্ধির কাছে কী আর আমি! ইস্, যদি আমার সঙ্গে তুমিও ওদের সামলাবে এটা বলতে পারতাম, তবে এতক্ষণে হয়ত ওরা সব এসে পড়ত!

আমি কোন করে বলব?

হা হা করে হেসে উঠল ইন্দ্রনাথ। বলল, না, তুমি বললেও আর ওরা আসছে না। কুকুরের পিঠে লগুড়ের বাড়ি পড়লে যেমন কেঁউ কেঁউ করতে করতে লেজ গুটিয়ে পালায়, তোমার অমল বোস তেমনি লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। কেবল চিঁ চিঁ শব্দে আজ্ঞে···আজ্ঞে করছিল।

তুমি প্রভু যে।

কী? প্রভু শব্দটা ধরে উঠতে পারল না যেন ইন্দ্রনাথ।

শিবানী বলল, প্রভু—মাষ্টার। তুমি আমার মাষ্টার যে।

—মাষ্টার না হই মিষ্টার তো অবশ্যই—আর সেটাই জানিয়ে দিতে চাই আমি কুকুরদের। হাসি মুখে মস্তক আন্দোলিত করল ইন্দ্রনাথ। তার স্বামিত্ব অসম্ভব তৃপ্তিবোধ করছিল।

চায়ের কাপ ধরা ছিল শিবানীর হাতে। ইন্দ্রনাথের কথার সঙ্গে সঙ্গে কাপটা ঠক করে নামিয়ে রাখল প্লেটের উপর। তারপর ডান হাতটা ইন্দ্রনাথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, হাত মেলাচ্ছি। গীতায় বলে সব আগে নিজেকে জানো, তবেই অন্তকে জানা হবে। তুমি আশ্চর্যভাবে নিজেকে জেনেছ বলেই না নিজেদের জাত সম্বন্ধে এমন উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করতে পেরেছ! হাত মেলাচ্ছি আমি।

শিবানীর ইন্দ্রনাথের দিকে এই হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা ছিল তার বাক্যোক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রাখা একটা ভঙ্গী মাত্র। ইন্দ্রনাথের সঙ্গ হাত মেলাবার বাসনা তার মনে এতটুকুও ছিল না। হাত বাড়িয়েই বাড়ানো হাত টেনে আনছিল, ইন্দ্রনাথ ধরে ফেলল শিবানীর প্রসারিত হাত।

হাতটা ইন্দ্রনাথের মুঠো থেকে বের করে আনবার একটা শান্ত চেষ্টা করল শিবানী। কিন্তু পারল না। মাখন মাখা রুটির প্লেটটার উপর পড়ে হাতের চুড়ি আর হাত মাখন মাখা হয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ শক্তভাবে ধরে রাখল শিবানীর হাতটা।

রবিবারের সকাল। ইন্দ্রনাথের পরিচ্ছদ প্যাণ্ট কোট, টাই নয়। তার পরিধানে দুধ গরদের ঢিলে পাজামা আর তেমনি দুধ গরদের ঢিলে পাঞ্জাবী। বাড়ীতে থাকার সকাল সন্ধ্যার—অবশ্যি সন্ধ্যায় বাড়ীতে থাকার বা ফেরার মতো অসম্ভব ঘটনা যদি কখনো ঘটে তবে এই তার পোশাক। চেয়ারে বসা ইন্দ্রনাথের পাজামা পরা শরীরের অংশটা দেখা যাচ্ছে না। শরীরের উপরের অংশটাই দেখা যাচ্ছে। গরদের পাঞ্জাবীতে তাকে বিয়ের বরের মতো লাগছে। পাখার জোর বাতাসে পাঞ্জাবী নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। মাথার ব্যাকব্রাস করা পাট চুল দু'একটা উড়ে এসে একবার কপালের উপর পড়ছিল আবার সরে যাচ্ছিল। পাঞ্জাবীর হাতটা কিছু উপরে উঠে গিয়েছে। ফরসা হাতের লালচে লোম তামার তারের ছিটানো কুচির মতো ঝকমক করছে হাতের উপর···কুচোগুলো যেন বিদ্যুৎ শক্তি ভরা···

কোন এক জায়গায় চোখ রাখতে হয় বলেই টেবিলের উপর চোখ পেতে রয়েছে শিবানী। টেবিলটা ওর চোখের উপর আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল আলপনা আঁকা মঙ্গল ঘট বসানো বিয়ের চত্বরে। মঙ্গল কলসীর উপর ইন্দ্রনাথের হাত, তার হাতের ওপর ওর হাত—

ওঁ পুণ্যাহম্!

ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্!

ওঁ স্বস্তি!

হে দেবতা, তুমি পরস্পরকে পরস্পরের আরো নিকট করো। পরস্পর যেন অনুরাগের সঙ্গে প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে—প্রিয় বলিয়াই যেন প্রীতি করিতে পারে···

বাইরের প্রকৃতিটা এতক্ষণ বাইরেই ছিল। শিবানীর বারান্দা অতিক্রমের সময়ের দেখা কালো মেঘের টুকরোটা যে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, ওর মুখে ঝাপটা মারা ঠাণ্ডা বাতাসটা যে সঙ্গে করে বৃষ্টি নিয়ে এসেছে, বাইরে যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে—এ সব দেখলেও শ্রাবণ আকাশের এই বাদল রূপ হৃদয়ে কোন ধ্বনি তুলছিল না এতক্ষণ শিবানীর। এবার বাইরের সুরটা ভেতরে ঢুকে হৃদয়ে ধ্বনি তুলতে লাগল শিবানীর—

ওঁ পুণ্যাহম্!

ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্!

হে দেবতা, তুমি পরস্পরকে পরস্পরের আরো নিকট করো! পরস্পর যেন অনুরাগের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে! প্রিয় বলিয়াই যেন প্রীতি করিতে পারে—

সব নেমন্তন্ন তুমি ফিরিয়ে দাও শিবানী—ইন্দ্রনাথের গম্ভীর গলা যেন বহু ভেতর থেকে বেরিয়ে ঠোঁটের বাইরে এসেই মিলিয়ে গেল।

শিবানী হাতটা ফের একবার চেষ্টা করল টেনে আনবার।

না—বলে হাতটা শিবানীর আরো চেপে ধরল ইন্দ্রনাথ। বলল, সব নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দাও শিবানী। আজকের দিনটা সম্পূর্ণ আমার।

শিবানীর মনে পড়ল মা'র অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে একবার সে মা'র কাছে যাচ্ছিল। তখন সবে কয়েক মাস হলো ওদের বিয়ে হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যাচ্ছিল না। সে এসেছিল ওকে তুলে দিতে। ট্রেন ছাড়বার পরও ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল ইন্দ্রনাথ শিবানীর জানালা-ধরা হাতটা শবসামর্থ মুঠো করে ধরে। কাঁদানের জন্যই বা যাচ্ছিল তবু মা'র কাছে যাবার দুর্দান্ত বাসনাটা হঠাৎ যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, শিকল টেনে নেমে পড়ে। গাড়ীর গতি বাড়ল। ইন্দ্রনাথ শিবানীর হাত ছেড়ে দিয়ে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল জোর পায়ে। একটু বিষণ্ণ মলিন হাসল। ইন্দ্রনাথকে আর দেখা গেল না। বুকটা একের পর এক উত্তাল ঢেউ তুলতে লাগল ভেতরে. আর সেই ঢেউ-এর জল যেন গড়িয়ে এসে পড়তে লাগল চোখ বেয়ে, গাল বেয়ে। সত্যি—ইন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ বেদনায় সেদিন কেঁদেছিল শিবানী। যাকে ভালো দেখা সাত দিনের জায়গায় তিন দিনের দিন চলে এসেছিল। আনন্দ কৌতুক মা'র চোখের কোণ চকচক করে উঠেছিল মেয়ের মুখের বুদ্ধির কাঁচা উচ্চারণে চলে যাবার কথা শুনে।

সেই ইন্দ্রনাথ আজ তার কাছে আজকের দিনটা চাইছে। হয় সবগুলো দিন, নয় একদিনও না। আর এ তো ইন্দ্রনাথের ওকে চাওয়া নয়—ওকে যেন অন্য কেউ না পায় সেই কৌশল করা।

মন যেটুকু নরম হয়ে এসেছিল, ফের কঠিন হয়ে গেল। কালকের রাত রাগ, জ্বালা, অসম্মান নিয়ে আবার এসে উপস্থিত হলো। বলল, আজ রবিবার, আজ আমার জন্মদিন—এ সবই তোমার জানা ছিল কিন্তু আমায় কিছু বলনি আগে। আমি নেমন্তন্ন নিয়ে ফেলেছি।

শিবানীর কঠিন গলার জবাবের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে এসেছিল। হাত টেনে এনে উঠে পড়ল শিবানী। ন্যাপকিন নিয়ে ছুরি আর হাতের মাখন মুছতে লাগল।

ইন্দ্রনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমাকে আগে থাকতে নেমন্তন্ন করে রাখতে হবে তোমাকে!

নেমন্তন্ন নয়—একে বলে জানিয়ে রাখ—এই শব্দ নিয়ে ঝামেলা করল না শিবানী। বলল, হবে বৈ কি।

তুমি অপরের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ দেখছ না?

বলে কী! দু'চোখ বিশাল করে এতক্ষণে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শিবানী ইন্দ্রনাথের দিকে। তোমার সঙ্গে অপরের কোন তফাৎ দেখছি নে, আমি। তোমার সঙ্গে আমি মিলই খুঁজে পাই নে একবারে। যার সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়, তাকেই একবার তোমার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখে আমি পারি নে। কিন্তু তুমি অনন্য হয়েই রইলে আমার কাছে। বলেই হেসে উঠল শব্দ করে। বলল, এই যে তুমি আমার হাত ধরেছিলে, আমার শরীর কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু কই আর কেউ ধরলে তো এমন শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে না।

বুকের পুরো আবেগটাকে নিঃশেষে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো শিবানী।

নিখুঁত আওয়াজ ... স্টেশন ধরা সহজ ... মনসুনাইজড্

ন্যাশনাল একো-র

নতুন মডেল এ-৭৮৯

২টি স্পীকার থাকায় হুবহু আওয়াজ

মডেল এ-৭৮৯

৬ ভালব, ৮ ব্যাণ্ড, পুরোপুরি ব্যাণ্ডস্প্রেড, দুটি উচ্চশক্তির ইলিপ্‌টিক্যাল স্পীকার, সুন্দর ভেনিয়ার্ড কাঠের ক্যাবিনেট।

মূল্য ৬৬৭৲ টাকা

উৎপাদন শুল্ক সমেত; অন্যান্য কর আলাদা
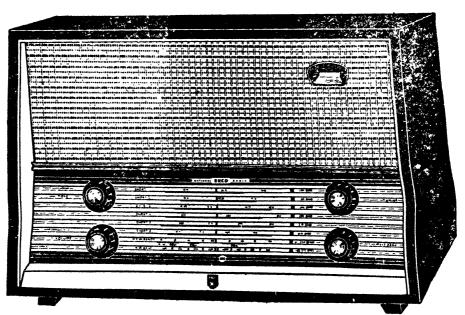
ন্যাশনাল-একোর সগৌরব অবদান—
তাদের নতুন সিরিজের এই প্রথম রেডিও—
মডেল এ-৭৮৯। এতে রয়েছে দুটি স্পীকার
এবং 'ম্যাগনি ব্যাণ্ড' টিউনিং।

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা—
এগুলো।

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ লিমিটেড GR

কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • দিল্লী • বাঙ্গালোর • সেকেন্দরাবাদ • পাটনা

JWT/GRA-1525B

ঘরে এসে কাচ্চিকে বলল, দে তো একটা চমৎকার খোঁপা বেঁধে। যেন যে আমার খোঁপা দেখবে, সে-ই রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ড্রেসিং-টেবিলের টুলের উপর বসে পা দু'টো টান করে সামনের দিকে মেলে দিয়ে বসল শিবানী।

কাচ্চি ফিতে কাঁটা চিরুণী নিয়ে পেছনে এসে চুলের গোছা হাতে নিয়ে বলল, যাবে তো গাড়ীতে। রাস্তার লোক দেখবে কী করে তোমার খোঁপা?

তা বটে! কাচ্চির কথাটা যেন হৃদয়ঙ্গম করল শিবানী।

মস্ত জয়পুরী খোঁপা বেঁধে একটু দূরে গিয়ে ঘাড় মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে কাচ্চি বলল, যা খোঁপা বেঁধেছি না মা। যদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে তবে সত্যি বিস্তর লোক জখম হতো গো মা।

হেসে উঠল শিবানী।

শিবানী শাড়ী বার করল। গয়না বার করল। শাড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাগ বের করল। কিন্তু সত্যি বলতে এ সব কিছুরই প্রয়োজন ছিল না শিবানীর। সে যাচ্ছে এখন তার দিদির বাড়ী দুপুরে খেতে। যে ভাবে ছিল মায়ের পাঠানো নতুন শাড়ী পরে সে ভাবেই সে যেতে পারত। যেতও সে পোষাকেই। তাই সে যায়। কিন্তু আজ এ বেশে সে যেতে পারে না। ইন্দ্রনাথ জানে শিবানী তার বন্ধুদের সাথে বড় হোটেলে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছে। পোষাকটা সেই রকম হওয়া চাই। কচি ধান রং-এর বন্যা বইয়ে দিল শিবানী। পরল ধান রং-এর জরিপাড় শাড়ী ব্লাউজ। গয়না পরল ঠিক সেই রকম ধান রং-এর পান্নার সেট। কানে তিন ফোঁটা সবুজ জলের মত দুলতে লাগল বড় বড় তিনটে পান্না। হাতে নিল সেই রং-এর ব্যাগ রুমাল। পায় দিল সবুজে সোনালীতে জড়ানো হিল তোলা চটি। দিদি পোষাক দেখে ভাববেন শিবানী ওখান থেকে যাবে অন্য কোথাও বুঝি। যাবে না শুনে বিস্মিত হবেন। পোষাকটা খুব ভো রকমই করেছে শিবানী। সত্যি সত্যি বন্ধুদের সঙ্গে লাঞ্চে গেলে এতটা কখনই করত না। কিন্তু মিথ্যার সব সময়ই চড়া সুর দরকার হয়।

গলার পান্নার কণ্ঠীটা ঠিক করে পেতে দিতে দিতে কাচ্চি বলল, মা, তোমাকে যা দেখাচ্ছে না—ইস্...

কাচ্চির দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল শিবানী। বলল, সুন্দর দেখাচ্ছের পর ঐ 'ইস্' শব্দটা কী রে?

কাচ্চি জবাব দিল না।

শিবানী বুঝল ইন্দ্রনাথ যদি দেখত—এই ভাবটাই প্রকাশ করেছে কাচ্চি

কিন্তু শিবানী জানে ইন্দ্রনাথ দেখবেই। ইন্দ্রনাথ বারান্দায়ই আছে। সে কী শান্তমত ঘরে বসতে পারছে। শিবানী অশান্ত ইন্দ্রনাথের দু' চোখে ধাঁধা ধরিয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে—তাই না ওর এই সাজ। তবেই না ওর এই সজ্জা সার্থক। দিদির বাড়ী গিয়ে তো টেনে খুলেই ফেলব সব।

ঘরের দরজায় পাতলা ভেলভেটের চটির নরম শব্দ এসে থামল। ইন্দ্রনাথের বেডরুম শ্লিপারের শব্দ খুব চেনে শিবানী। দরজার দিকে পেছন ফিরে থাকলেও বুঝতে পারল ইন্দ্রনাথ এসেছে।

কাচ্চি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

শিবানীকে কোন রকম সময় না দিয়ে জাস্তের উপর তার কোমর বেড়িয়ে ধরে তাকে উঁচু করে তুলে নিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ।

[ক্রমশ।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
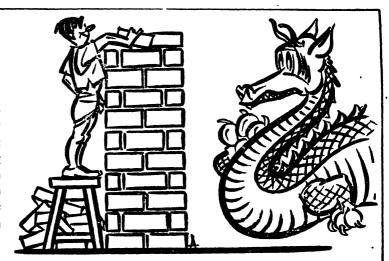
'কুটিল বেণীর বাঁধন খুলতেই, একটি কুরঙ্গনয়নার বাহুমূলে যেই লতিয়ে পড়েছে বেণী, ওমনি কৃষ্ণ-ভুজঙ্গ-ভ্রমে তিনি ত্রস্ত হয়ে উঠলেন ভীষণ। বিক্ষুব্ধ চক্ষু···অয়ালিত ভ্রূ··ওড়নার সঙ্গে সঙ্গে বেণীটিকেও উৎক্ষিপ্ত করে তিনি করলেন অপসরণ।

'ওলো দেখেছিস, কালো ভোমরা মুখের দিকে ছুটে আসছে।'··· বলতে বলতে করকমল দিয়ে তাড়া দিয়ে সেটিকে উড়িয়ে দিতে গেলেন একটি গোপবধূ। কিন্তু উড়ে যায় না। লীলাভরে তখন অবগুণ্ঠনের অঞ্চল দিয়ে তিনি বাধ্য হলেন নিজের ঠোঁট দু'টিকেই ঢাকতে।

একটি পদ্মনয়না সুন্দরী,···তিনি কিন্তু এগিয়ে গেলেন না কৃষ্ণের কাছে, ব্যক্তও করলেন না নিজের অন্তরের পুলক, কথাও কইলেন না একটি। কেবল কান্তের মুখের দিকে নয়ন মেলে নাড়াতে লাগলেন মাথা। ভাবটা যেন···'চিনি তোমায় চিনি।' তারপরেই রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর চোখের কোণ। কটাক্ষ যেন বলল···'না যাবো না, আরো দুঃখ দিতে চাও এখনো!'···তারপরে অবহেলায় বেঁকে গেল তাঁর ভুরু। বাঁকখানি যেন বলে উঠল···

'তাতে আমার কি? চিনি গো তোমায় আমি চিনি।' তারপরে সীমন্তের উপর অঞ্জলি বেঁধে তিনি করলেন নমস্কার। অসূয়া যেন ঠুকলো,—

'তোমার কাছে কি কেউ যায়? চিনি তোমায় চিনি।'

একটি সুন্দরী,···নয়নকোণে তাঁর বঙ্কিম অভিমান আর গর্বিত আলস্য,···একবার কৃষ্ণমুখ দেখেই সহচরীর কাঁধের পাশে নামিয়ে রাখলেন তাঁর বাম-ভুজলতা। হর্ষ ফুটে উঠল তাঁর মুচকি মুচকি হাসিতে, ঔৎসুক্য নেচে উঠল তাঁর ভুরুর ভঙ্গিমায়, বিড়বিড় করে কি যেন কত কি বকতে লাগলেন। শূন্য কথায় সংস্র ব্যঞ্জনা।

আর একটি সুন্দরী···তিনি দাসী,···তিনি তাঁর কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত পাণিপদ্মখানি ঘুরাতে ঘুরাতে, ছোট্ট ছোট্ট ওড়নার বাতাস দিয়ে প্রণয়ভরে পরিবীজন করতে লাগলেন প্রাণেশ্বরকে। খেয়ালই নেই, কখন হাত থেকে খসে পড়ে গেছে ছোট্ট ছোট্ট ওড়নাগুলো; খেয়ালই নেই কেন ঘুরিয়ে চলেছেন কঙ্কণঝঙ্কৃত নিজের পদ্ম-হাত।

'স্থলকমলের মত টুকটুকে এমন চরণ নিয়ে কেউ কি কখনো··· বনে বনে ঘুরে বেড়ায়?'···এই বলে হা-হুতাশ করতে করতে, জনৈকা টিপতে বসে গেলেন পদযুগ শৌরীর।

৫। কবির বর্ণনা করা অসাধ্য,···সেই সময়ের ঐ অবিরাম রমণীয়তা। লাবণ্যের অমৃত-সরোবরে স্নান করে যেন নবীভূত হয়ে উঠল, যেন সরসীভূত হয়ে উঠল প্রত্যেকটি ব্রজাঙ্গনার প্রত্যেকটি অবয়ব। 'তিনি এসেছেন, তাঁকে দেখেছি, তাঁর আলোয় আলো হয়ে গেছি, এই সহজ উল্লাসের বলমানতায় মাননীয়তায়, যেন আরো উজ্জ্বল আরো মধুর হয়ে উঠল সেই রমণীয়তা। সরস্বতীর ক্ষমতা নেই, বৃহস্পতিরও নেই সে রমণীয়তার অনুবর্ণন করা, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি তো কোন ছার।

৬। চরম রমণীয়তার অভিষরণ থেকেই উৎপন্ন হয়··মধুরিমা। সেই মধুরিমায় বিতানিত হয়ে গেলেন লীলাকিশোর শ্রীব্রজরাজনন্দন. মৃদু-পদসঞ্চারে তিনি এলেন; এলেন সেই যমুনার পুলিন-পরিসরে, ···যেখানে থান থান রূপোর চাদরের মত বিছিয়ে ছিল আকাশের জ্যোৎস্না আর পৃথিবীর বালুকা,···চেনা কঠিন কোনটি কে;···যেখানে নয়ন লোভী হয়ে ওঠে শুভ্রতার আহ্লাদে;··· যেখানে শ্রবণ বিহ্বল হয়ে যায় কান্ত কাহলের ক্লান্ত ঝঙ্কারের মত পরিমল-লালস অলস ভ্রমরদের অশ্রান্ত গুঞ্জরণে;··যেখানে চারুতার আচার্যত্ব ফলিয়ে হল্লীশ-নৃত্য-শিক্ষা দেন দক্ষিণ সমীর··নীল কহ্লার আর রক্ত কহ্লারদের। নিজের অসংখ্য শক্তির মত সেই আনন্দময়ী ব্রজরমণীমণিদের সীমাহীন সৌন্দর্যে পরিবৃত হয়ে সেইখানে এলেন শ্রীকৃষ্ণ; আর সঙ্গে সঙ্গে যেন টেনে নিয়ে এলেন যৌবনোত্থ তাঁদের মত্ততা, তাঁদের কাম, তাঁদের হর্ষ, তাঁদের সংসত্তা, তাঁদের মান, তাঁদের সর্বস্ব;···যেমন আসেন যামিনীনাথ নিয়ে তাঁর তারা-বধূদের আনন্দিত সমাজ।

৭। নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত প্রেমের রহস্যলাভ আসন্ন হয়েছে বুঝতে পেরেই একদা যেমন শ্রুতিদেবীরা ধারণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রূপসম্পদ এবং নবোদিত সৌভাগ্যবশত লাভ করেছিলেন মনোরথ সিদ্ধি,···আজও তেমনি নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপসুন্দরীরা, নিজেদের মহিমার মর্যাদা যেন উপলব্ধি করতে না পেরেই, স্থির করে ফেললেন··কৃষ্ণকে তাঁরা দেখছেন, অতএব সেই আহ্লাদে কোথায় যেন খসে পড়ে তলিয়ে গেছে তাঁদের মনোব্যাধির সমগ্রতা।

৮। পরাণপ্রিয়ের সঙ্গে যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল ব্রজমহিলাদের অন্তর। কি পুলিন, কি বাতাস! বাতাসও এত শীতল এত কোমল হয়? নায়ক ভ্রমর ভালবেসে পদ্মফুলের পাপড়ির উপর চলে বেড়ালে পাপড়ি যেমন নরম হয়ে যায় ভালবাসায়, এ বাতাসও ঠিক তেমনি নরম। ব্রজসুন্দরীরা সকলে মিলে তখন নিজেদের অঙ্গ থেকে খুলে ফেললেন তাঁদের কুচকুঙ্কুমারুণ সুগন্ধি উত্তরীয়। একটির পর একটি করে সাজিয়ে সেগুলিকে বিছিয়ে দিলেন পুলিনের বালুবেলায়,···সৃষ্টি করে ত্রিভুবন-কমনীয় একটি বরাসন। তারপরে ঠোঁটের কোণে কোণে মধুহাসির ঢেউ খেলিয়ে বললেন,—'বসুন এইখানে বসুন।'

আসনে শ্রীকৃষ্ণ বসলেন। প্রীতিভরে। উদ্দাম হয়ে উঠল তাঁর অপূর্ব ধাম···যথ-কাম। যোগীন্দ্রদের অতিবিমল মানস পুণ্ডরীকাসনও এত বিমল হয় না; ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর মহারত্ন সিংহাসনও এত ললিত হয় না; শেষ-কমঠাদি আধার-শক্তি ধৃত মহাযোগ-পীঠাদিও এত বিজয়-ধন্য হয় না।

প্রেয়সীদের স্তন-কুঙ্কুমারুণ উত্তরীয়াসনের সুচারু স্নিগ্ধতায়,···

চন্দ্রের মত, কুন্দের মত, ইন্দুর মত যমুনা-পুলিনের সেই বিপুল শুভ্রতায় যখন সমাসীন হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তখন মনে হল, পীনবক্ষা ত্রিভুবন-রমণীত্ব দর সম্মোহ-লীলারাজ্যে যেন ত্রিলোকলক্ষ্মী নিজে এসে তাঁকে অভিষিক্ত করে গেলেন যৌবরাজ্যে; আর তাই তিনি আজ উদ্ভাসিত।

৯। চতুর্দিকে মসীর মত কালিন্দীর কালো জল, আর মাঝখানে হাসছে শ্বেতশতদলের মত শুভ্র পুলিন ভাগ,…সেইখানে তারা সনাথ চন্দ্রমার মত রমণীমণি-পরিবৃত হয়ে যখন উদ্ভাসিত হলেন শ্রীভগবান, তখন ধীরে ধীরে তাঁর চরণপ্রান্তে এগিয়ে এলেন কয়েকটি সীমন্তিনী। তাঁরা সকলেই তখন সরস চাতুরীর তুরীয় দশায় হিল্লোলিনী। কি যেন বলতে চান, অথচ পারছেন না; হৃদয়গুলোকে যেন আক্রমণ করেছে…একটু নয় বেশ…গর্ব, ভয় আর মত্ততা; তাই যেন বলতে গিয়েও খুলতে পারছেন না মুখ, এমনিতর তাঁদের মনের ভাব। প্রথমে ধীরে ধীরে তাঁরা টিপে দিতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণ। ঘামে ভিজে যেতে লাগল তাঁদের হাত। মৃদুল-মেদুর, একান্ত রসময়, তাঁদের গভীর মনের কতকগুলি গহন অনুরাগ যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল স্বেদজলের কণিকায়। তারপর তাঁরা প্রশ্ন করলেন সঠিক এবং উত্তরও পেলেন প্রাসঙ্গিক। যথা,—
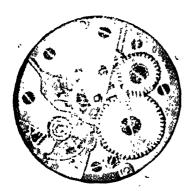
১০। সীমন্তিনী। অমল মন কার?
কৃষ্ণ। কোমল মন যার

সী। কে হয় মোহিত?
কৃ। কাম যার হিত।
সী। কোনটি অপচয়?
কৃ। কোপ-চয়।
সী। মধুরা কা
কৃ। তে…মধু-রাকা।
(বসন্ত-পূর্ণিমা)।

শেষের উত্তরটি শুনেই চোখ মটকালেন সীমন্তিনীরা।
'ওমা, শারদীয়া পূর্ণিমা নয়, শেষে বাসন্তী-পূর্ণিমা?'

এই হেন হল তাঁদের চোখের ভাব। তারপরে সীমন্তিনীরা আবার করলেন প্রশ্ন, উত্তরও এল, যথা,—

সী। বলবান কাঁরা?
কৃ। কেবল ভজনা করেন যাঁরা।
সী। কে সন্ত?
কৃ। সুখে যাঁরা নিরন্ত।
সী। সার-রস-বিলাসিনী কিনি?
কৃ। কাসার-রসে বিলাস করেন যিনি; তিনি পদ্মিনী।

শেষ উত্তরটি শুনে খুসি হয়ে উঠলেন গোপীরা। মনে মনে ভাবলেন,—

'আমরা জয়ী, আমরা জা। আমরা সবাই পদ্মিনী।'

১১। এবার প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণ, উত্তর দিলেন সীমন্তিনীরা।

কৃ। উপাস্য কে?
সী। রসময় যে।
কৃ। রসময় কে?
সী। প্রেমাস্পদ যে। (অক্ষি-সঙ্কোচন করলেন সীমন্তিনীরা)
কৃ। প্রেম কোন্ তত্ত্ব?
সী। অবিচ্ছেদ যার সত্ত্ব।
কৃ। বিচ্ছেদ? তিনি আবার কোন্ জন?
সী। তিনি এলে হায় রে রহে না জীবন।
কৃ। দুঃখ কি? কহ।
সী। প্রিয়ের বিরহ।
কৃ। কি তবে প্রিয়?
সী। সুদুষ্প্রাপ্য যা ইহ।
কৃ। দুষ্প্রাপ্য? কি তা?
সী। অতি চেষ্টাতেও মেলে না যা।

১২। শব্দ আর অর্থ, প্রশ্ন আর উত্তর, তর-তম-ভাব,…নানান্ বৈচিত্র্য,…যেন তুবী-চালাচালি চাতুরীর; তারপরে কাপড়ে পট এঁকে নকলকে আসল করার ও আসলকে নকল করার দু'পক্ষেরই প্রচেষ্টা;…এই সমস্তের মধ্য দিয়ে যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল সীমন্তিনীদের মনোভাব, তখনো কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না তাঁদের গর্ব, কর্পূরের মত উবে গেল না তাঁদের কোপ। অতএব, নেপথ্যে সাবধানা এবং প্রকাশ্যে রস-প্রাণা হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা বললেন,—

১৩। "হে প্রিয়, আমাদের নয়নের তুমি উৎসব; তবু কেন জানি না, অনেক তর্ক অনেক প্রশ্ন থেকে যায় মনে। বলতে

Oatine
Snow
Oatine
Snow
for
DAY USE

হত একদিন, আজই তাই বলে ফেলছি। শোনো,—'একদল দেখি, ভজনা পেলে ভজনা করেন; আর একদল দেখি, ভজনা না পেলেও ভজনা করেন: আবার আর একদল দেখি, ভজনা পান বা নাই পান, কাউকেই ভজনা করেন না। এ কেমন করে হয়? হে পীতাম্বর, তুমি সর্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, ভালো করে বিচার করে এই প্রশ্নের আমাদের উত্তর দাও।'

১৪। আশ্চর্য প্রশ্ন, প্রশ্নের কি খরদীপ্তি। রমণীমণিসভার সকলেই সচকিতা চমৎকৃতা হয়ে উঠলেন। ব্রজপুর-পুরন্দর-নন্দনও বুঝতে পারলেন, আশ্লিষ্ট প্রণয় ও অসূয়া থেকে অংকুরিত হয়েছে এই কঠোর প্রশ্ন। এ প্রশ্ন যেন নিষ্ঠুর বিজ্ঞাপন···প্রিয়তমাদের বিপুল অভিমানের। স্তব্ধ হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপরে প্রিয়তমাদের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসির অমৃতে যেন মৃতসঞ্জীবনী রস মিশিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বললেন,—

'ভজনাকারীকে প্রতিভজনা করেন প্রিয়েরা। ঠিক কথা। সে ভজনা তো কেবল ঋণ পরিশোধের সামিল। তাই নয় কি? ভজনা যাঁরা করেন না, তাঁদেরকেও অনেকে আবার ভজনা করে থাকেন। এর মূলে আছে দয়ামাত্রের সহজাত স্নেহ। নিজেদের সন্তানদের উপর পিতামাতার এই যেন স্নেহ, এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।'

১৫। দুটি প্রশ্নর এইভাবে উত্তর দিয়ে, এবার যেন আনন্দের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—

'ভজনাকারীদেরও যাঁরা ভজনা করেন না তাঁরা কোন্ দুঃখে ভজনা করতে যাবেন তাঁদের, যাঁরা ভজনাই করেন না? অয়ি ভ্রূবিলাসিনী সুন্দরীগণ, পৃথিবীতে চার রকমের রয়েছেন এই হেন মানুষ।

(১) পরমাত্মার স্বরূপে যাঁদের বিলসিত।
(২) নিজের সুখেই অন্তর যাঁদের পূর্ণ।
(৩) উপকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন যাঁরা।
(৪) কৃতজ্ঞ না হয়ে যাঁরা সুকঠোর কৃতঘ্ন হন।
এর দুটি উত্তম, দুটি অধম।'

১৬-১৮। কৃষ্ণের মুখে এই উত্তর শুনে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন সীমন্তিনীরা। নয়নকোণ নীচু করে নিজেদের মধ্যে তাঁদের চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার বলে উঠলেন,—

'আহা হা, অমন সাহসমৃদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির আর সুন্দর হৃদয়ের বালাই নিয়ে, আবার কি সব হর্ষের ঢেউ নাচাতে চলেছেন আপনারা? ঐ তিনটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই তো আমি অপরাধী নই।

আপনারা ভজনা করলেও আমি আপনাদের ভজনা করি না; ভজনা না করলেও করি না। এই তো গেল আপনাদের মত ক্ষুক-নন্দনাদের দুটি প্রশ্নের উত্তর।

তৃতীয় প্রশ্নে ঐ চার রকমের মনুষ্যদেরও আমি অতিক্রম করে আছি। যেহেতু,—

(১) আমি আত্মারাম নই; কারণ আপনাদেরি করুণালাপে আমি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছি।

(২) কেবল নিজের সুখেই আমি পূর্ণ নই; পূর্বোক্ত যুক্তি এক্ষেত্রে অচল।

(৩) উপকারীর বিরুদ্ধে আমি দ্রোহাচরণও করি নি; ঐ একই কারণে কঠিনও হই নি।

(৪) ঐ একই কারণে আমাকে কৃতঘ্ন বলা চলে না।

এখন যদি আপনারা প্রশ্ন করেন,—'তা'হলে আমাদের মত এত ভক্তিমতীদের আপনি ভজনা করেন না কেন?'···তা'হলে নির্ভর-নির্ণয়ে শুনুন আমার উত্তর,—

'যিনি আমায় অনু ভজনা করেন—আমি তাঁকে ভজনা করি না, এ-কথা সর্বৈব সত্য; কারণ আমি যে তাঁর উৎকণ্ঠিত বেদনাকে সমগ্র রূপে বাড়াতে চাই,··ফুলের কুঁড়ি যেমন বাড়ে। ধন পেয়ে, আবার সেই ধন খুইয়ে, নির্ধন যেমন সেই ধনের অনুস্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে যায়,···আমি চাই সেই হেন বেদনার বিবর্ধন।'

১৯-২০। কৃষ্ণ-বাণীর খররৌদ্রে বিমলিন হয়ে গেল বধূরাজির আনন কমল। নিজেরা অপ্রসন্ন হয়েই ছিলেন, তাই লক্ষ্য করলেন না···শ্রীকৃষ্ণেরও ব্যথিয়ে উঠেছে মন। আর কেমন করেই বা লক্ষ্য করবেন, যদি তাঁদের নয়নগুলিকে অমন করে বেঁধে রাখে বনমালীর নয়ন-নলিনের মালা!

কৃষ্ণ তখন পুনর্বার তাঁদের বললেন,—'সামান্যাদের আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে আমার বাণী, মাদৃশাদের আশ্রয় করে নয়। যেহেতু,—নেই, ·পরম মহত্তের পরাবৃদ্ধি নেই। ভগবানের চেয়েও অধিক পরাৎপর কিছু নেই। জেনে দেখো, এর চেয়ে উৎকর্ষ হয় না বৃদ্ধির; এবং চরম দশারও কখনও দশান্তর ঘটে না।

হে আমার হরিণ নয়না প্রেয়সীগণ, অবসানে পৌঁছে গেছে, মহাভাবে পৌঁছে গেছে আপনাদের অনুরাগ। ওর কি আর বৃদ্ধি আছে? কে না জানে আখের রস জ্বাল দিতে দিতে সর্বশেষ দানা বাঁধে গিয়ে শর্করার শুভ্রতায়?

আমি তো আপনাদের কাছেই ছিলুম, আমি তো ব্যস্ত ছিলুম আপনাদেরি অনুভজনায়। তা না হলে কেমন করেই বা নিবারিত হোতো আপনাদের পরম প্রাণগুলির বিদায়-বাসনা?

তাহলেও যদি অতিসাহস দেখিয়ে থাকি, আশা করি, সুন্দর চোখে সে দোষ আপনারা দেখবেন না। ক্ষমা করবেন। যদি কখনও সেবা করতে ভুলে যায় মেঘ, তার উপর কি চিরদিন রাগ করে বসে থাকে বিদ্যুতের সমাজ?

প্রেমীরা অনেক সময় এমন অনেক ব্যবহার করে বসেন, যা সত্যই প্রেমের প্রতিকূল। এও আবার দেখা যায়, সেই প্রতিকূলগুলোই কালে অনুকূল অস্ত্র হয়ে উঠেছে প্রেয়সীদের হাতে। সূর্যকিরণের তপ্ত জ্বালায় কি মর্মে মর্মে পুলকিত হয়ে ওঠেন না পদ্মিনীরা?

কিন্তু আজ আমি বলতে বাধ্য, আমার প্রতি আপনাদের এই উৎসবিত অনুরাগের তুলনা নেই। দেবতাদের দেওয়া আয়ুর মধ্যে সে অনুরাগের প্রতিদান করা কি আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হবে? আশা করি নিজগুণে আপনারাই করবেন নিজেদের সেই উপকার।

ইতি রাসলীলায়াং প্রাদুর্ভাব-ভাবুকোনাম
একোনবিংশঃ স্তবকঃ।

[ক্রমশ।

বীরবলের রসিকতা

শ্রীপুলতা কর

সম্রাট আকবর রাজসভায় বসে রয়েছেন। চারদিকে মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদেরা ঘিরে রয়েছে। রাজসভার কাজ চলছে, হঠাৎ সম্রাট তাঁর পরিহাস-রসিক সদস্য বীরবলের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—'বীরবল, তুমি হলে আমার রাজসভার নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন। শুধু তাই নয়, আমার প্রজারা বলে যে তোমার মত বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ দাও। এমন একটা বুদ্ধির পরিচয় দাও, যার ফলে প্রধানমন্ত্রী ও সভাসদেরা সবাই বোকা বনে যাবে।'

সম্রাটের কথা শুনে বীরবল দু-চার মিনিট চুপ করে বসে রইলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এক মজার ফন্দি ভেবে নিলেন। তারপর বললেন—'সম্রাট, আপনি যা বলছেন আমি তা করতে পারি। কিন্তু সেজন্য আমাকে লক্ষ টাকা দিতে হবে আর এক বছর সময় দিতে হবে।'

সম্রাট বললেন—'রাজকোষ থেকে যত ইচ্ছা টাকা নাও, এক বছর সময়ও নাও। আর তোমাকে যা বলছি, তা করতে গিয়ে যদি দু-চারজন লোকের কোন ক্ষতি হয় বা কেউ অসন্তুষ্ট হয়, তাতেও তোমাকে কিছু বলব না।'

বীরবল সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সম্রাট, আপনি যা চান তাই হবে।'

সেদিন রাজসভায় বীরবলের সঙ্গে এইরকম কথাবার্তা হল। সম্রাট আকবর কিন্তু দু-চার দিনের মধ্যেই নানা কাজের মধ্যে তাঁর কথাটা একেবারেই ভুলে গেলেন। কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন বীরবলের বাড়ী থেকে একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে সম্রাটকে জানাল যে, বীরবলের খুব শক্ত অসুখ করেছে। রাজবৈদ্য বলেছেন—বীরবলকে বাঁচানো যাবে না, শীঘ্রই তিনি মারা যাবেন। সম্রাট তাঁর অন্য সব মন্ত্রীর চেয়ে বীরবলকে বেশী ভালবাসতেন। এই খবর শুনে তাঁর মন এত খারাপ হল যে, রাজসভার কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং কয়েকজন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তখন বীরবলকে দেখবার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন আপাদমস্তক সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে বীরবলকে খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। রাজবৈদ্য শুকনো মুখে পাশে বসে রয়েছেন। বীরবলের স্ত্রী আর ছেলেরা খাটিয়ার চার পাশ ঘিরে বসে 'হায় হায়' করে কপাল চাপড়ে কাঁদছে।

সম্রাটকে দেখে রাজবৈদ্য উঠে দাঁড়ালেন, অভিবাদন করে বললেন—'সম্রাট, বীরবল আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে। আপনি তার প্রিয় বন্ধু। তার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করুন।'

রাজবৈদ্যের কথা শুনে আর বীরবলের স্ত্রী-পুত্রের কান্না দেখে সম্রাটের চোখে জল এসে গেল। তিনি মন্ত্রীদের নিয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করলেন, তারপর রাজবৈদ্যের নির্দেশমত রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। দু'ঘণ্টা পরে সম্রাটের কাছে খবর পৌছল যে বীরবল মারা গেছেন। সম্রাট আদেশ দিলেন যে দু'দিন ধরে তাঁর রাজ্যে বীরবলের জন্য শোকদিবস পালন করা হবে। এর পর চার

মাস কেটে গেছে। সম্রাট আকবর যথারীতি সভায় বসে রাজকার্য করছেন এমন সময় একজন প্রতিহারী ছুটতে ছুটতে সভায় এসে ঢুকল। তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ঠিক যেন ভূত দেখছে এইভাবে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে সম্রাটকে কুর্নিশ করে সে বলল—'সম্রাট, বীরবল।' এই বলেই তার মূর্ছা হল।

প্রতিহারীর কথা শুনে ও হাবভাব দেখে সম্রাট আকবর ও সভাসদেরা অবাক হয়ে গেলেন। কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারলেন না।

প্রধানমন্ত্রী বললেন—'লোকটির জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ না ও সব কথা খুলে বলতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাবে না।'

প্রধানমন্ত্রীর কথা সবে মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ রাজসভার বাইরে ভীষণ হট্টগোল শোনা গেল। হাজার হাজার লোক একসঙ্গে চীৎকার করছে—'বীরবল, বীরবল।' আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দামী রেশমী পোষাক পরে সুস্থ সবল দেহ নিয়ে বীরবল রাজসভায় ঢুকে হাসিমুখে সম্রাটকে অভিবাদন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। সম্রাট আকবর আর তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদেরা হতভম্ব হয়ে বীরবলের মুখের দিকে চাইলেন। এ কি ব্যাপার—ভেবে উঠতেই পারলেন না! এমন আচম্বিতে ব্যাপারটা ঘটল যে ভয় পেতেও যেন তাঁরা ভুলে গেলেন।

বীরবল সম্রাটকে আবার কুর্নিশ করে হাসিমুখে বললেন—'সম্রাট, ভয় পাবেন না। আমি ভূত নই। আমি আপনার প্রিয় সদস্য বীরবল। তবে এ-কথা ঠিক যে আমি চার মাস আগে মারা গিয়েছিলাম। মারা যাবার দু'মাস পরে আমি স্বর্গে গেলাম। সেখানে দু'মাস থাকলাম। স্বর্গে দেবরাজ আর দেবদূতদের আমি চমৎকার চমৎকার গল্প শোনাতাম। দেবরাজ আর দেবদূতেরা বললেন—এমন মজার গল্প তাঁদের কেউ কোনদিন শোনাতে পারে নি। খুব খুশী হয়ে তাঁরা

আমাকে বর দিতে চাইলেন। আমি বললাম—আমি মর্ত্যে, আমার প্রিয় বয়স্য সম্রাট আকবরের কাছেই ফিরে যেতে চাই। তাঁরা বললেন—তথাস্তু। কাজেই আজ স্বর্গ থেকে নেমে আমি সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।'

ব্যাপারটা যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং ব্যাপারটার মধ্যে যে কিছু আছে বুঝতে পেরে সম্রাট আকবর বীরবলকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু চতুর বীরবল কৌশলে সে সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন—'হে মহানুভব সম্রাট, আমি স্বর্গ থেকে আসবার সময়, স্বর্গের এক রাণীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। শীগগিরই আমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে। কেন না বেশীক্ষণ একলা থাকলে তিনি রাগ করে স্বর্গে চলে যাবেন। তা'ছাড়া আমি স্বর্গ থেকে কতকগুলো আশ্চর্য সুন্দর পোষাক এনেছি। স্বর্গের দেবতারা আর দেবদূতেরা সেই সব পোষাক পরেন। এই সব পোষাকও আমি সেই বনে রেখে এসেছি। এই পোষাকগুলির এমন অসাধারণ শক্তি আছে যে, ওগুলো যে গায়ে পরবে সে সোজা উড়ে স্বর্গে চলে যেতে পারবে। কাজেই সম্রাট আমাকে এখনি সেই বনে যেতে হবে। দেরী করলে স্বর্গের রাণী আর স্বর্গের পোষাক সব আবার স্বর্গে চলে যাবে। সেজন্য আপনি যে সব প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর এখন দিতে পারছি না। পরে আবার এসে সময়মত উত্তর দেব।'

বীরবলের কথা শুনে সম্রাটের মনে আরও সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলেন—'বীরবল, তুমি সেই স্বর্গের রাণীকে আর স্বর্গের পোষাকগুলো তোমার সঙ্গে এই রাজসভায় আনলে না কেন?'

বীরবল বললেন—'সম্রাট তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। রাজসভায় আসতে হলে তাঁকে যোগ্য সম্মান দেখাতে হবে ত'। আপনি হুকুম দিন মন্ত্রী আর অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে হাতী, ঘোড়া, বাজনা সাজিয়ে, দামী চতুর্দোলায় চড়িয়ে স্বর্গের রাণীকে আর স্বর্গের পোষাকগুলো রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসি।'

সম্রাট প্রধানমন্ত্রীকে বললেন—'বীরবল যা বলছে তাই কর। স্বর্গের রাণী আর স্বর্গের পোষাক দেখতে আমার মন উৎসুক হয়ে রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বীরবলের নির্দেশমত মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদদের নিয়ে বীরবলের সঙ্গে চললেন। রাজধানী ছাড়িয়ে অনেকদূরে গিয়ে তাঁরা এক বনের সামনে এলেন। বনে ঢুকে তাঁরা এক প্রাসাদ দেখতে পেলেন। গাঢ় লাল আর সোনালী পাথরে তৈরী সেই প্রাসাদের সৌন্দর্যের আর তুলনা নেই।

অবাক হয়ে মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদেরা প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখছেন, এমন সময় বীরবল বলে উঠলেন—'এই প্রাসাদে স্বর্গের রাণী থাকেন। আমি তাঁকে ডাকছি, এখনি তিনি স্বর্গের পোষাক পরে এসে দাঁড়াবেন। প্রাসাদের লাল পাথরের বারান্দার দিকে চেয়ে দেখুন।'

বীরবলের কথা শুনে মন্ত্রী আর সভাসদেরা লাল পাথরের বারান্দার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বীরবল মন্ত্র পড়বার মত সুর করে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—'হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও, হে স্বর্গের রাণী দেখা দাও।'

মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদেরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, চোখের পলক আর পড়ে না। কিন্তু কোথায়ই বা কি, কোথায়ই বা স্বর্গের রাণী, কোথায়ই বা স্বর্গের পোষাক। বীরবল তাঁদের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন—'আমার একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। একটা কথা আপনাদের আগেই বলা উচিত ছিল। কথাটা এই যে স্বর্গের রাণী আমাকে বলেছেন যে তিনি হলেন স্বর্গের রাণী, তাঁর মন স্বর্গের নন্দন কাননের মত পবিত্র। সেজন্য যে সব লোকের মনে দুষ্টবুদ্ধি নেই, যাঁরা অসাধু নয়, শুধু তাঁরাই তাঁকে দেখতে পাবেন। এইবার আপনারা লাল পাথরের বারান্দার দিকে চেয়ে দেখুন। ওই যে স্বর্গের রাণী এসে দাঁড়ালেন। ওঃ কি রূপ, চোখ আমার ঝলসে গেল। দেখতে পাচ্ছেন ত'? দেখুন দেখুন পৃথিবীর কোন লোক স্বর্গের রাণীকে এ পর্যন্ত দেখে নি।'

প্রধানমন্ত্রী কিংবা সভাসদেরা কেউই কিছু দেখতে পেলেন না। কিন্তু কি করে সে কথা স্বীকার করেন। স্বীকার করা মানেই হল নিজেদের দুষ্ট আর অসাধু বলে মেনে নেওয়া। সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন—'হাঁ, দেখতে পাচ্ছি বৈ কি। ওঃ কি রূপ স্বর্গের রাণীর। ওই যে তিনি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, যেন হীরা মাণিক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।'

প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতে অন্য সব মন্ত্রী আর সভাসদেরা একসঙ্গে বলে উঠলেন—'আমরাও দেখতে পাচ্ছি।'

স্বর্গের রাণীর রূপের ছটায় চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে। এত রূপ কি আর পৃথিবীতে কারও আছে।'

নিজেদের সাধু প্রমাণ করবার জন্য তাঁরা সবাই যেন মরীয়া হয়ে উঠলেন। বীরবলকে বলতে লাগলেন—'চলুন, চলুন, এখনি প্রাসাদে ঢুকে সমারোহ করে স্বর্গের রাণীকে নিয়ে সম্রাটের কাছে যাই।'

বীরবল তাঁদের উচ্ছ্বাস দেখে হেসে বললেন—'একটু অপেক্ষা করুন। সম্রাটের কাছ থেকে আর একবার অনুমতি নিয়ে আসি।'

তখন সবাই মিলে সম্রাট আকবরের কাছে গিয়ে বললেন—'সম্রাট, আমরা সেই স্বর্গের রাণীকে দেখেছি। আশ্চর্য রূপ তাঁর। গভীর বনের মধ্যে বিরাট এক প্রাসাদে তিনি রয়েছেন। আপনি অনুমতি দিন আমরা জাঁকজমক করে তাঁকে আপনার প্রাসাদে নিয়ে আসি। মন্ত্রী ও সভাসদদের কথা শুনে সম্রাটের নিজেরও খুব কৌতূহল হল। তিনি বললেন—'চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। স্বর্গের রাণীকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসি।'

জাঁকজমক করে রাজপ্রাসাদ থেকে শোভাযাত্রা বেরোল। সম্রাট আকবর শোভাযাত্রার সামনে দামী রাজ পোষাক পরে সাদা হাতীর পিঠে চড়ে চললেন। তাঁর পিছনে সভাসদেরা, মন্ত্রীরা, আর হাতী, ঘোড়া, উট চলল। শোভাযাত্রার মাঝখানে একটা খালি সোনার চতুর্দোলা বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলল। শীগগিরই সবাই বনের মধ্যে সেই প্রাসাদের সামনে এসে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে বীরবল সেই একই কথা সম্রাট আকবরকে বললেন। বললেন—সম্রাট, চেয়ে দেখুন স্বর্গের রাণী লাল পাথরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনার দিকে চেয়ে হাসছেন। তিনি বলেছেন—

পৃথিবীর কোন অসাধু লোক কিংবা দুষ্ট লোক তাঁকে দেখতে পাবে না।'

সম্রাটও বীরবলের কূটবুদ্ধির ফাঁদে পড়লেন। মন্ত্রী, অমাত্য সভাসদদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অসাধু আর দুষ্টলোক বলতে পারলেন না। কাজেই তাঁকেও বলতে হল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাচ্ছি। কি আশ্চর্য সুন্দরী ওই স্বর্গের রাণী।'

প্রধানমন্ত্রী আর সভাসদেরা বলতে লাগলেন—'সম্রাট, অনুমতি দিন। আমরাই প্রথমে প্রাসাদে ঢুকে সাততলায় উঠি। সেখানে গিয়ে স্বর্গের রাণীকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।'

বীরবল বললেন—'মন্ত্রী মশায়, একটা কথা মনে রাখবেন। তিনি হলেন স্বর্গের রাণী। স্বর্গের পোষাক না পরলে কেউ তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

এই বলে বীরবল হাসতে হাসতে প্রধানমন্ত্রী আর সভাষদদের দিকে হাত বাড়িয়ে পোষাক বিলি করবার অভিনয় করতে লাগলেন। তাঁরাও সবাই এমনি বোকা বনে গেছেন যে সেই অদৃশ্য পোষাক হাত দিয়ে ধরে নেবার ভাণ করলেন। আর নিজেদের সুন্দর পোষাক খুলে ফেলে সেই পোষাক পরবার ভাণ করতে লাগলেন। কেউই সাহস করে বলতে পারলেন না যে, কোন পোষাক দেওয়া হয় নি। কেন না তা হলেই নিজেদের অসাধু আর দুষ্টলোক বলে মেনে নিতে হবে। সেই অবস্থায় মাত্র ভিতরের সামান্য পোষাক পরে তাঁরা সবাই প্রাসাদের সাততলায় উঠলেন, সেখান থেকে আবার নেমে চললেন। ভাণ করতে লাগলেন যেন স্বর্গের রাণীকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন।

তারপর সেই বিরাট শোভাযাত্রা জাঁকজমক করে বাজনা বাজিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে চলল। শোভাযাত্রা রাজধানীর কাছে এসে পড়ল।

স্বর্গের রাণীকে দেখবার বলে দলে দলে প্রজারা এসে দাঁড়িয়েছে। শোভাযাত্রা সামনে আসতেই অবাক হয়ে প্রজারা দেখল প্রধান মন্ত্রী আর সভাষদেরা অতি সামান্য ভিতরের পোষাক পরে রয়েছেন। শোভাযাত্রার মাঝখানে একটি খালি সোনার চতুর্দোলা বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। এই দৃশ্য দেখে প্রজারা সবাই হোঃ হোঃ করে হাসতে আরম্ভ করল। প্রধানমন্ত্রী আর সহ্য করতে পারলেন না। রেগে উঠে চীৎকার করে বললেন—'সম্রাট, এ সবই বীরবলের ধাপ্পাবাজি। এই চতুর্দোলায় স্বর্গের রাণীও নেই, আর আমরাও স্বর্গের পোষাক পরি নি। এ শুধু আমাদের বোকা বানানো হল আর প্রজাদের কাছে অপদস্থ করা হল।'

প্রধানমন্ত্রীর কথা শেষ হতে-না-হতেই সভাষদেরা চীৎকার করে উঠলেন—'সম্রাট, প্রধানমন্ত্রীর কথা সত্য। বীরবল আমাদের সবাইকে প্রজাদের সামনে অপদস্থ করেছে। আমরা এর প্রতিকার চাই।'

সম্রাট অনেক আগেই সব ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, আর বীরবলের সবাইকে ঠকাবার কৌশল দেখে খুব মজা পাচ্ছিলেন। কাজেই তিনি একটুও রাগ করলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন—'বীরবল, এঁদের অভিযোগ শুনলে ত'? এখন তোমার কি বলবার আছে বল।'

বীরবল বললেন—'সম্রাট, এঁদের কথা যে সত্য সে আপনি বুঝেছেন। কিন্তু চার মাস আগে রাজসভায় বসে আপনি যে কথা বলেছিলেন তা মনে করুন। সেদিন আপনি বলেছিলেন, যদি রাজ্যশুদ্ধ সবাইকে, এমন কি স্বয়ং সম্রাটকে পর্যন্ত বুদ্ধির কৌশলে হারাতে পারি তা'হলে আপনি আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন। সেজন্য যদি কারো অনিষ্ট হয় বা কেউ বিরক্ত হয় তাতেও কোন ক্ষতি হবে না। সম্রাট এখন আপনার প্রতিজ্ঞা রাখুন।'

সম্রাট হাসতে হাসতে বললেন—'বীরবল, সে কথা আমার মনে আছে। তুমি যে বুদ্ধির কৌশলে আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়েছ এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমায় আমি যথেষ্ট পুরস্কার দেব। আর প্রধানমন্ত্রীও সভাসদেরা সবাই স্বীকার করবেন যে, তোমার রসিকতার তুলনা নেই।'

সম্রাটের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী ও সভাসদরাও রাগ ভুলে গিয়ে বীরবলের বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগলেন। বলাবাহুল্য সম্রাট প্রিয় সদস্য বীরবলকে তাঁর রসিকতার জন্য প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

অলৌকিক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে বহুদিন থেকে ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে একদল লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজেদের উদরপূর্তির জন্যে, নানান রকম মিথ্যাচার, প্রতারণার ও অসাধু উপায় অবলম্বন করে আসছে। বিশেষ করে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে এঁদের প্রাধান্য খুব বেশী, নিরীহ গ্রামবাসীদের সরল মনের সুযোগ নিয়ে এই সব মহাপ্রভুর দল অলৌকিক মাদুলী দেওয়া, জলপড়া দেওয়া, ভূত নামানো প্রভৃতি নানান রকম রোগযাগের জালব্যবসা বেশ ফলাও করে চালিয়ে আসছে।

যাই হোক আজ যে গল্প বলব তা ওই ধর্মের নামে, দেবতার নামে রোমাঞ্চকর বিক্রান্তের এক সত্যিকারের কাহিনী,—

অনেকদিন আগেকার কথা, তখনও আমাদের দেশ স্বাধীন হয় নি। ভারতের মানচিত্রে বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তের মাঝে একটি করদ রাজ্য ছিল তার নাম কালীগড়। সেখানকার মহারাজা বীরবাহাদুর ছিলেন একজন প্রবল প্রতাপশালী ধর্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রাজত্বে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। পূর্বতন মহারাজদের ইষ্টদেবীর নামে এই রাজ্যের নাম হয়েছিল কালীগড়। বংশানুক্রমে এই ইষ্টদেবী মহাকালীর নামে এই রাজ্যের যাবতীয় রাজকার্য চলে আসছে। মহাকালীর নামাঙ্কিত শীলমোহর এ রাজ্যের রাজচিহ্ন, মহাকালীর প্রতিকৃতি শোভিত নিশান—এ রাজ্যের জাতীয় নিশান। তার মানে এক কথায় মহাকালীকে বাদ দিয়ে এ রাজ্যের কিছুই হোত না।

রাজধানী কালীয়াচকের নাম হয়েছিল মহাকালীর মন্দিরের নামানুসারে। এই কালিয়াচকের মহাকালীর বিরাট মন্দির ছিল এ রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। এখানকার রাজকীয় মন্ত্রী, অমাত্য

কর্মচারী থেকে সাধারণ প্রজারা সকলেই এই মহাকালীর নামে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। এই জাগ্রতা দেবীর নানান রকম অলৌকিক ঘটনার কাহিনী এদিকের মানুষগুলোর মনে বেশ ভয়-মিশ্রিত একটা রূপ জাগিয়ে রেখেছিল। এই মহাকালীই এদিকের সকলের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণ।

এখানকার মহারাজ বীরবাহাদুরের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। মহারাজের চল্লিশ ছাড়িয়ে পঞ্চাশের কোঠায় বয়স হয়ে গেল কিন্তু কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় মন্ত্রিগণ তাঁকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু মহারাজা সে দিকে কর্ণপাত করলেন না। চারিদিকে ভবিষৎ উত্তরাধিকারী নিয়ে নানান কথা শুরু হয়ে গেল। মহারাজকে এ নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়তে হোলো কারণ তাঁর পূর্বপুরুষরা আজ পর্যন্ত কেউ দত্তক গ্রহণ করেন নি, কারণ তাঁদের সকলেরই পুত্র সন্তান হয়েছিল। যতদিন যায় ততই মহারাজের চোখের ঘুম, আহার, আমোদ প্রমোদ সব উঠে যেতে লাগল।

এমন সময় রাজপ্রাসাদে এক জ্যোতিষীর আবির্ভাব হোলো। এই জ্যোতিষী মহারাজের কোষ্ঠী গণনা করে বললেন, তাঁকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে এবং যে কন্যা তাঁকে বিবাহ করতে হবে, তা অবশ্যই হতে হবে রাজ্যের নীচ জাতীয় অতি দরিদ্র এক মালোয়া সম্প্রদায়ের কন্যা। এই মালোয়া সম্প্রদায় হোলো গিয়ে ধীবর জাতীয়। এদের কাজ নদীতে মাছ ধরা। এই এদের পেশা।

জ্যোতিষের গণনার বিচার শুনে মহারাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু রাত্রে নিদ্রায় স্বপনে তাই মহাকালীর নির্দেশ পেলেন। সকালে মন্ত্রীদের জানালেন মহাকালীর নির্দেশের কথা। তারা মহারাজের কথা শুনে বললেন, এ নিশ্চই মহারাজের ভ্রম, মহাকালী এ রকম নির্দেশ দিতে পারেন না—এতে কালীগড়ের রাজবংশে কলঙ্কের কালি লাগবে। কিন্তু মহারাজ প্রতিরাত্রেই নিদ্রায় দেবীর নির্দেশিত এই বিবাহের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তখন তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে মালোয়া বংশীয় এক কন্যার পাণিগ্রহণ না করলে তিনি মহাকালীর প্রকোপে পড়বেন। তারপর তিনি সবার অমতেই জোর করে এক দরিদ্র মালোয়া কন্যাকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন। চারিদিকে নানারকম গুজব শুরু হয়ে গেল। কেউ বলে এ ঘোর অনাচার, কেউ বলে রাজ্য রসাতলে যাবে, আবার কেউ কেউ বলে মহারাজ পথ আর রাজপ্রাসাদ এক করে দিয়েছেন।

কিন্তু মহারাজের মনে কিছুতেই শান্তি ছিল না। তাঁর আত্মীয়-বর্গ মন্ত্রিপরিষদ, আগেকার মহারাণী, রাজভ্রাতা সবাই তাঁর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না, সবাই তাঁকে দেখে এড়িয়ে যায়।

মহারাজ কেবলই চিন্তা করেন—তিনি যা করেছেন তা ভুল কি ঠিক কে জানে? আর তাই নিয়ে তিনি সব সময় চুপ করে পড়ে থাকেন, তাঁর শরীর দিন দিন এই ভাবনায় অত্যন্ত কৃশ হয়ে ওঠে।

এমন সময়ে একদিন অতি প্রত্যূষে মহামন্ত্রী রাজপ্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মহারাজ মহামন্ত্রীর এরূপ অকস্মাৎ আবির্ভাবে নিতান্ত বিস্মিত হয়ে পড়লেন। যাই হোক তিনি তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে তাঁর খাস মহলে ডেকে আনলেন, মহামন্ত্রী বললেন, রাজ্যে অনাচার দেখা দিয়েছে, কাল অমাবস্যার রাত্রে মহাকালী সর্বসমক্ষে তা ঘোষণা করেছেন।

মহারাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তার মানে আপনি বলতে চান পাষাণ মূর্তি মহাকালী মানুষের মত কথা বলেছেন?

মহামন্ত্রী জবাব দেন, আজ্ঞে মহারাজ যদিও বিশ্বাসের অযোগ্য,—তবুও সত্যি।

মহারাজ জিজ্ঞেসা করেন, কে কে ওই পাষাণী মহাদেবীর কথা শুনেছেন?

মহামন্ত্রী বলেন, মহারাজ সকলেই, যাঁরা কাল পূজার সময় ছিলেন সবাই, সে সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম, বড় মহারাণীও উপস্থিত ছিলেন এবং অগণিত প্রজারা।

মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, কি বলেছেন দেবী?

মহামন্ত্রী বলেন, আমার অপরাধ নেবেন না মহারাজ; দেবী যা ঘোষণা করেছেন, তাই বলব, যদিও তা অপ্রিয়।

বলুন, আপনাকে আর হেঁয়ালি করতে হবে না।

মহামন্ত্রী বলেন, মহাকালী আদেশ করেছেন আমাদের ছোটরাণীকে এক্ষুণি পরিত্যাগ করতে নতুবা রাজ্যের অমঙ্গল সুনিশ্চিত।

মহারাজ গম্ভীর হয়ে যান, তারপর বলেন,—জানতাম আপনারা এরূপ কথাই বলবেন; কারণ সকলের অনভিপ্রেতে আমি এই বিবাহ করি।

মহামন্ত্রী কিছু বলতে যান কিন্তু মহারাজ ক্রোধে চিৎকার করে ওঠেন আর বলেন—বেশ, মহাকালীর এই আদেশ আমি নিজের কানে শুনতে চাই। তারপর যা ব্যবস্থা হয় ভেবে ঠিক করা যাবে। কিন্তু আপনার কথার সত্যতার প্রমাণ আমি চাই।

মহামন্ত্রী বলেন, মহাকালীর নির্দেশ যদি সত্যি হয় তাহলে আগামী অমাবস্যার রাত্রে আপনি নিজের কর্ণে তা শুনতে পাবেন এবং গত কাল যা ঘটেছে তার সত্যতার যাচাই আপনি নিজে গিয়ে করুন মহারাজ। তারপর মিথ্যা প্রমাণিত হলে যে শাস্তি দেবেন তা মাথা পেতে নেব।

মহারাজ বলেন, না মহামন্ত্রীকে আমি অবিশ্বাস করছি না। তবে মহাকালী পাষাণ মূর্তির নির্দেশ আমি নিজে পরখ করে দেখতে চাই।

মহামন্ত্রী বলেন, আপনার যা ইচ্ছা তাই হবে মহারাজ। তারপর মহামন্ত্রী চলে যান।

মহারাজ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন আর ভাবতে থাকেন,—যদি একথা সত্যি হয় তাহলে কি করবেন? মহারাজ নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে হতাশ হয়ে পড়েন। এমনি করে সারাটা দিন কেটে যায়।

এদিকে চারিদিকে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়,—মহাকালীর নির্দেশ নিয়ে। সবাই মহাকালীর কথা ভেবে ভয়ে কণ্টকিত হয়ে পড়ে। এমনি করে আবার একটি অমাবস্যা এসে পড়ে।

এই অমাবস্যার রাত্রে মহাকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট জন-সমাবেশ হয়। সবাই বহুক্ষণ পূর্ব থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন মহাকালীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে।

মহারাজ মন্ত্রী, অমাত্য, রাজপরিবার সমভিব্যহারে মন্দিরে উপস্থিত হয়েছেন। দেবীর পূজা কাঁসর, ঘণ্টা, বাজনার সঙ্গে আজ

বিশেষভাবে শুরু হোলো। পূজা সমাপনান্তে স্তুতিবাচন শুরু হোলো এবং শেষ হোলো। তারপর সত্যি সত্যিই ওই পাষাণ মূর্তির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

শোনা গেল,—দেবী বলছেন,—'মহারাজ নীচ জাতীয়া মালোয়া কন্যাকে বিবাহ করে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন, অবিলম্বে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে নতুবা রাজ্য জলোচ্ছাসে, মহামারীতে, অগ্নিকাণ্ডে ছারখার হয়ে যাবে।'

মহারাজ একথা শুনতে, শুনতে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন, তিনি তাঁর কোমরে ঝোলান তরোয়ালটি মুহূর্ত মধ্যে খুলে ফেলে এক কোপ বসিয়ে দেন মহাকালীর কণ্ঠদেশে। আর সঙ্গে সঙ্গে মহাকালীর মুণ্ডু খসে পড়ে এবং দেখা যায় সেই মুণ্ডু থেকে একটি লোহার তৈরী নল বেরিয়ে পড়েছে। ওই নল দিয়েই কোন লোক আড়াল থেকে মহাকালীর কণ্ঠস্বর বলে কথা বলত। তারপর মহারাজ আজ্ঞা দিলেন অনুসন্ধান করতে ওই নল কতদূর গেছে দেখা হোক, দেখা গেল মন্দির থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে ওই নল পৌঁছেছে। আর সেখান থেকেই কেউ মহাকালীর কণ্ঠস্বর বলে কথা বলত।

মহারাজ এই ষড়যন্ত্রের যে কোথায় মূল কিছুক্ষণেই ধরে ফেললেন, তারপর বড়রাণী ও মহামন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কুরুক্ষেত্রের কথা

শ্রীসাধনা কর

আজ মহা প্রলয়ের দিন। বেজে উঠছে রণ-দামামা, কেঁপে উঠছে পৃথিবী, অস্ত্রের ঝনঝানিতে রোদের তাপ ম্লান। কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে কৌরব পাণ্ডব সম্মুখ-সমরে সজ্জিত।

ধর্মপ্রাণ পাণ্ডব। পূবদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়েছেন, সমাপ্ত করেছেন বিবিধ কর্ম—গুরু প্রণাম, সূর্য প্রণাম, নারায়ণ বন্দনা।

আর, বিজয় লাভের উল্লাসে সব ভুলেছেন কৌরবগণ। কতক্ষণে যুদ্ধ বাধবে, বিপক্ষদল ধ্বংস হবে,—রাজ্য হবে নিষ্কণ্টক এই তাঁদের চিন্তা।

লোকে লোকারণ্য কুরুক্ষেত্র—পূবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে হাতীতে ঘোড়ায় রথে পথে সারে-সারে কাতারে-কাতারে লোক। যত দেশের যত রাজা—অসুরের পরিচয় আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ধেয়ে এসেছে যুদ্ধ—মরণ-যজ্ঞে সমিধ যোগাতে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, দুর্যোধন, দুঃশাসন, জয়দ্রথ আর যত রথী-মহারথী শত-সহস্র রাজা-রাজড়া একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে সেজে দাঁড়িয়েছেন। ও-পক্ষে সেজেছেন ভীম অর্জুন নকুল সহদেব দ্রুপদ বিরাট সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যু আর শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ যুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করবেন না—শুধু দেবেন পরামর্শ—এই তাঁর পণ। অর্জুন তবু তাঁকেই বরণ করেছেন আপন রথের সারথীরূপে। প্রিয় সখার পরামর্শই তাঁর কাম্য—সে পরামর্শ সকল বলের বল, সকল অস্ত্রের সেরা।

দু'পক্ষ প্রস্তুত—যুদ্ধারম্ভের ক্ষণ গোণা চলছে।

এদিকে, হস্তিনার বিশাল রাজসভা জনশূন্য, বাকশূন্য, বিষণ্ণ। মহা আশংকা চেপে রয়েছে; সভাকক্ষে একা বসে আছেন ধৃতরাষ্ট্র। পল বিপল যেন দীর্ঘ এক এক যুগ। ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হয়ে মহারাজ ভাবছেন—কী ঘটছে কুরুক্ষেত্রে এই মুহূর্তে। শুরু হয়ে গেল রণ। নেমে এসেছে কী মৃত্যুর করাল কালিমা! উপায় নেই? কোন উপায় কী নেই রক্ষা পাবার?

হায় রে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। কী নিদারুণ পুত্রস্নেহ, কী দুর্নিবার রাজ্য তৃষা! চোখের দৃষ্টি নেই, মনের বিচার নেই—কেবল আছে নিগূঢ় দুরাশা—রাজ্যলোভ। সে লোভে পিতা প্রমত্ত, পুত্র উন্মাদ। বার বার দুর্যোধন চেষ্টা করছেন, বিনাশ করতে চেয়েছেন পাণ্ডবদের। ধৃতরাষ্ট্র পিতা হয়ে দমন করেন নি, রাজা হয়ে দেন নি দণ্ড। কতজন তখন সতর্ক করেছেন,—ক্ষান্ত হও কুরুরাজ, প্রশ্রয় দিও না পুত্রকে। পাপের ফল ভয়ানক। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ব্যাস, বিদুর—কে না এসে বুঝিয়েছেন তাঁকে। তিনি তো তখন সে কথা শোনেন নি। আজ কিসে খুঁজে পাবেন সান্ত্বনা।

গান্ধারী কাতর হয়ে অনুনয় করছেন—শাসন করো, মহারাজ, হানো আঘাত পুত্রকে! সে দুঃখ তবু সইবে, কিন্তু পাপের সহায় হোয়ো না, পুত্রকে নিয়ো না ধ্বংসের পথে, বিনাশ ঘটিয়ো না কুরুবংশের।

প্রবল শংকায় কেঁপে উঠছেন ধৃতরাষ্ট্র, হৃদয় হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। রাজ্য মেনে নিতে চেয়েছেন পাণ্ডবদের দাবী তারপরে! পরাজিত হয়েছেন নিজেরই কাছে। পুত্রের অভিমান আর সুতীক্ষ্ণ বাক্য বিভ্রান্ত করেছে তাঁকে। ধর্ম জেনেও কী সে পথে চলা সহজ? অধর্মকে না চাইলেও কি নিবৃত্ত হওয়া যায়। রাজনীতি আর রণনীতিতে ন্যায়-অন্যায় বলে কথা নেই। ছল-বল-কৌশলই তার প্রধান সম্বল! ধৃতরাষ্ট্র ভেবেছেন ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া যে ছেলে, পৌরুষ বলে করুক-না সে রাজ্য অধিকার, কলে-কৌশলেই নিক না জিনে রাজ-সম্পদ।

দ্যূত-ক্রীড়ায় দুর্যোধনের কাছে পাণ্ডবগণ হার মানলেন; দেখলেন তাঁরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। বারো বছরের বনবাস, আর এক বছরের অজ্ঞাতবাস,—তাও করলেন স্বীকার! কিন্তু বনে যাবার আগে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন—ফিরে এসে নেবেন প্রতিশোধ। সেদিন থেকেই সবাই জেনেছেন—কৌরব বংশে রোপণ হল ধ্বংসের বীজ। রক্ষা পাওয়ার আশা কম। একশ' পুত্রের জননী পুণ্যব্রতা গান্ধারী সেদিন থেকে সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে সব স্নেহ মমতা সরিয়ে রেখে একমাত্র সহায় মেনেছেন ধর্মকে। হে ধর্ম, আসুক দুঃখ, ঘটুক প্রলয়, না-কাঁপে যেন অন্তর। ধৈর্য না হয় বিচ্যুত। ধর্মই সত্য, ধর্মই কাম্য, ধর্মেরই হোক জয়। আর ধৃতরাষ্ট্র বসে-বসে বুনেছেন স্বপ্নজাল। অন্য কথা স্থানই পায় নি মনে।

বারো-বছরের বনবাস, এক-বছরের অজ্ঞাতবাস শেষ হল। অস্ত্রে-শস্ত্রে আত্মীয়-স্বজনে দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে ফিরে এলেন পাণ্ডবগণ। চাই এবার ন্যায্যাধিকার। বারে-বারে প্রস্তাব গেল, প্রত্যাখ্যাত হলো। পাণ্ডবগণ যতই কমিয়ে নেন দাবী, ততই উৎসাহ বাড়ে দুর্যোধনের। ভালোমানুষীকে মনে করেন ক্লীবতা; শেষ পর্যন্ত, যুধিষ্ঠির সব দাবী ছেড়ে দিয়ে চাইলেন পাঁচখানি গ্রাম—মাত্র পাঁচখানি।

এল—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।' ছুঁচের ডগায় যে-মাটিটুকু ওঠে সেটুকুও পাবে না বিনা যুদ্ধে। সেদিনও ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন নির্বাক।

আজ কৌরব-সভা শূন্য, দ্বারে প্রলয় উপস্থিত, ধৃতরাষ্ট্র বিকল বিহ্বল। চারিদিকে অশুভ লক্ষণ—শকুনি উড়ছে, দিনে শিবা ডাকছে, বোবাকে শোনা যাচ্ছে—হায় হায় হায় হায় ধ্বনি। কাতর হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকলেন—সঞ্জয়, বলো সঞ্জয়—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোদ্ধা যত।
পাণ্ডব, কৌরব মোর, বল কী করিতে রত॥

এখনো মনে ক্ষীণ আশা—যদি বন্ধ হয় রণ। বিনা যুদ্ধেই যদি সন্ধি হয়ে যায়। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, স্থান-মাহাত্ম্য অসীম। প্রভাবিত হবে না পাণ্ডবগণ? শুভবুদ্ধি জাগবে না দুর্যোধনের? যুদ্ধের পূর্ব-মুহূর্ত বড় অনিশ্চিত—কী যে ঘটবে আর কী না—ঘটবে, বলা কঠিন। আশা নিরাশায় ব্যাকুল হয়ে ধৃতরাষ্ট্র কেবলই জিজ্ঞেস করছেন—বলো সঞ্জয়, বলো কুরুক্ষেত্রের কথা, কী হচ্ছে ঠিক এ মুহূর্তে।

সঞ্জয় সাধু ইন্দ্রিয় জয় করেছেন, সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেছেন; ব্যাসের কাছে বর পেয়েছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে না-গিয়েও সব-কিছু দেখতে পাবেন, জানতে পারবেন, বলতে পারবেন ধৃতরাষ্ট্রকে। এই বিপদে তিনিই কুরুরাজের পাশে উপস্থিত, একমাত্র সহায়। তাঁরই মুখে ধৃতরাষ্ট্র শুনতে লাগলেন কুরুক্ষেত্রের সংবাদ, দেখতে লাগলেন কুরুক্ষেত্রের দৃশ্য এবং তাঁরই বাণীতে ব্যক্ত হলো কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম।

সহসা রণক্ষেত্রে ঘোরনাদে বেজে উঠল—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্ত-বিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র, অর্জুনের দেবদত্ত, নকুলের সুঘোষ, আর সহদেবের মণি-পুষ্পক শঙ্খ,—বেজে উঠল সমস্বরে। আকাশ কাঁপিয়ে বাতাস মাতিয়ে দিগ্-দিগন্তে ত্রাস জাগিয়ে বয়ে গেল প্রচণ্ড শব্দের ঝড়।

শোনামাত্র কৌরব শিবিরে সে কি উল্লাস। গর্জে উঠল কৌরব-শঙ্খ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন আর যত রাজা-মহারাজার শঙ্খ। শুনে স্থলের প্রাণীর কানে তালা লাগল, জলের প্রাণী খাবি খেতে লাগল; আকাশের প্রাণী মূর্ছা গিয়ে মাটিতে পড়ল লুটিয়ে।

কিন্তু তক্ষুণি যুদ্ধ বাধল না—এ হল যুদ্ধারম্ভের প্রথম সংকেত। দু'পক্ষ যে প্রস্তুত, কেউ কারুর চেয়ে হীনবল নয়, সে-কথাটাই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হল মাত্র। তারপরে দু'পক্ষই অস্ত্র উঁচিয়ে রথের রশি বাগিয়ে ঘোড়ার রাশ আর হাতীর অংকুশ হাতে ধরে স্তব্ধ হয়ে রইল—কে আগে শুরু করবে রণ! যে আগে এ কাজ করবে, সেই যে হবে আক্রমণকারী, নিন্দার পাত্র!

এমনি ক্ষণে অর্জুন বলে উঠলেন—হে কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম, যুদ্ধ বাধবার এই মুহূর্তে নিয়ে চলো আমাকে একেবারে দু' পক্ষের ঠিক মাঝখানে। আমি ভালো করে একবার দেখতে চাই দু' দলকে, ভেবে নিতে চাই সব কিছু, তারপর শুরু করব যুদ্ধ।

কৃষ্ণ প্রীত হলেন। অর্জুন তাঁর প্রিয় সখা, পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তাঁরই জেগেছে যথার্থ কৌতূহল। যুদ্ধ করতে এসে ভালো ভাবে জানা দরকার—কাদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে, কী-রকম তাদের শক্তি-সামর্থ্য, কেমন করে সেজে দাঁড়িয়েছে দু'পক্ষ, কোন্ দিক দিয়ে, যুদ্ধ করলে জয় করা সহজ। এসব যাঁর নখদর্পণে, জয় তাঁর অনিবার্য। সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ রথ চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানটিতে এনে দাঁড় করালেন।

অর্জুন রথের উপর দাঁড়িয়ে নিবিষ্টচিত্তে দেখতে লাগলেন—এদিকে-ওদিকে সামনে-পিছনে। দেখতে-দেখতে বিকল হলো মন, ঠিক রইল না লক্ষ্য হাত থেকে খসে পড়ে গেল গাণ্ডীব। কৃষ্ণের দিকে ফিরে ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন—এ কি দেখছি, সখা, কাদের এসেছি হত্যা করতে। শত্রুপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম—কোলে-পিঠে করে যিনি আমাদের মানুষ করেছেন। দাঁড়িয়ে আছেন আচার্য দ্রোণ—রণশাস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন যিনি পুত্রাধিক স্নেহে। আজ তাঁদেরই আমরা যাচ্ছি হত্যা করতে। অস্ত্রীশ্রেষ্ঠ কৃপ, শল্য, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন, দুঃশাসন আর যত বন্ধুবান্ধব, রাজা-মহারাজা,—এঁদের অমঙ্গল কামনাও যে নিতান্ত দুঃখদায়ক! ধিক্ ধিক্! আত্মীয়-বধ পাপ ব্রাহ্মণ বধ আরো পাপ, পূজনীয় বধে মহাপাতক। এঁদের উপর আমার কোন হিংসা নেই, ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, যাঁদের মৃত্যু আমাকে ব্যথায় করবে কাতর, আজ তাঁদেরই করব অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

সখা, তুমি বলবে তাতে দোষ কী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য সকলেই তো মহাজ্ঞানী, স্নেহশীল,—তাঁরাই যখন এ কাজ করতে উদ্যত, তাঁদের মনে যখন কোন দ্বিধা নেই। তোমার মনেই বা এ দ্বন্দ্ব জাগছে কেন!

এ ব্যাকুলতা তোমায় শোভা পায় না। গুরুজনদের পন্থা অনুসরণ যোগ্য—তাই অনুসরণ করো।

সখা, ধর্ম আমি জানি, কিন্তু এও জানি—গুরুজনের কাজ বা বাক্য সব সময় অনুসরণ করা কর্তব্য নয়। তাঁরা যখন মোহান্ধ হন,—কাজ করেন স্বার্থের টানে, স্নেহ-মমতায় ঠিক রাখতে পারেন না বিচার-বুদ্ধি কিংবা বাধ্য হন বিপরীত কাজ করতে—সে অবস্থায় তাঁদের কাজ অনুসরণ করা একান্তই অনুচিত। ভীষ্ম, দ্রোণ কৌরব অন্নে প্রতিপালিত, সে ঋণ তাঁদেরকে শোধ করতে হবে। পিতামহ ভীষ্ম আমাকে পরিষ্কার বলেছেন—পার্থ, আমি কুরু-ঋণে আবদ্ধ; সে ঋণ শোধ না করলে আমার মুক্তি নেই। কৌরব পক্ষের হয়ে আমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। সখা, ভীষ্ম, দ্রোণ বাক্সর মতো তেজস্বী আগুনের মতো শুদ্ধসত্ত্ব। লোভ মোহ অসত্য তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। কৌরবদের স্নেহবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ঋণ শোধ না করে সে উপায় নেই,—তা'হলে যে অধর্ম হবে।

হে মধুসূদন, ক্ষত্রিয়ের কাজ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। সমবেত জনগণ সকলেই কি দুষ্ট, পাপাচারী? সকলকেই মারতে হবে?

তা ছাড়া রাজ্যের অধিকার নিয়েই দ্বন্দ্ব; রাজা হয়ে রাজ্য ভোগ করতে চাই। কিন্তু একা একা তো রাজত্ব করা চলে না। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে মেরে ফেলে কাদের নিয়ে করব সুখভোগ! হে সখা, ত্যাগ করলাম অস্ত্র—এ যুদ্ধ আমি করব না।

বলতে বলতে অর্জুন রথের উপর বসে পড়লেন। সংকল্পে শরীর হল দৃঢ়, চোখের দৃষ্টি স্থির।

[ক্রমশ।

নতুন হাওয়া

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক সমাজ-জীবনের এক নতুন দিককে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। সম্প্রতি প্রেমজ বিবাহের যে প্রবণতা দেখা যায় তাকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন লেখক। আসলে এ ধরণের মিলনে যেটা স্বভাবতই প্রবল, সেই হঠকারিতাকেই দৃশ্যমান করা তাঁর প্রধান লক্ষ্য। অমলা ও অচিন্ত্যর কাহিনী আজকের দিনের সমাজে বিরল নয়, ভালবেসে ঘর ছাড়লে পরিণামে মেয়েদের অদৃষ্টে যা ঘটে থাকে সচরাচর, অমলার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, এই অবধি কাহিনীর ধারা ঋজু ও স্বচ্ছ; আসল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এর পরে, সমাজের প্রচলিত দিগ্‌দর্শনকে অতিক্রম করে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করে নিতে সক্ষম কি না সেই প্রশ্নই এবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে। লেখক বিশ্বাস করেন নতুন হাওয়ার ঝাপটায় সামাজিক সংস্কারের অচলায়তনকে অপসারণ করা সম্ভব, আর সেই সম্ভাবনাকেই তিনি রূপায়িত করেছেন নৃপেন চরিত্রটির মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। শঙ্কর চরিত্রটি যেন দ্বিধাগ্রস্ত মানবত্বার সার্থক প্রতীক, যুগ যুগান্তর সংস্কারের প্রভাব যে মানুষের অস্থি মজ্জায় কি ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায় এই চরিত্রটির মাঝে; শঙ্কর অনুদার নয় কিন্তু ভীরু, নতুন হাওয়াতে তার লোভ আছে, সুখ আছে কিন্তু সরাসরি সে হাওয়াকে সে আমন্ত্রণ করতে পারে না উন্মুক্ত বাতায়নের উদার দাক্ষিণ্যে। কিন্তু তাও নতুন হাওয়া আসছে যার প্রভাবে নৃপেনের মত মানুষরা খুলে দিচ্ছে সমাজের এক নতুন দিগন্ত, যে দিগন্ত সার্থকতার সম্ভাবনায় রঙীন ও উজ্জ্বল শক্তিমান সাহিত্যকারের বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত এই রচনা, সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যের আসরে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য যোজনা। বইটির আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন, ছাপা ও বাঁধাই, যথাযথ। লেখক—বিমল কর, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দ্বিচারিণী

আলোচ্য উপন্যাসটি পূর্ব প্রকাশিত, বস্তুত 'দু ধারা' নামে এ রচনা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। বর্তমান সংস্করণে পূর্বতন রচনা আমূল সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে এবং তার নতুন নামকরণও হয়েছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু, নারী-হৃদয়ের বৈচিত্র্যকে সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, কোন নারী একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষকে ভালবাসতে পারে কি পারে না এই প্রশ্নই সোচ্চার রচনাটির ছত্রে ছত্রে। নায়িকা মীনা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তা সম্ভব তবে পুরুষের মত প্রকৃতিতে বহুবল্লভ না হওয়ায় অন্তর্নিহিত দ্বিচারিণী সত্তাকে কোন নারীই স্বচ্ছন্দ মনে মেনে নিতে সক্ষম হয় না। নারী হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক নায়িকা মীনার অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে, দরদ ও আন্তরিকতায় তাঁর রচনা সত্যই সমৃদ্ধ। লেখক স্বভাব উচ্ছ্বাসী এবং সেজন্যই ভাবাবেগের আধিক্যে তাঁর রচনা কিছুটা ভারাক্রান্ত, তবে তাঁর শৈলী এক কথায় অনিন্দ্য। বইটির প্রচ্ছদ শিল্পসুষম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—দিলীপকুমার রায়। প্রকাশনায়—বাক্‌ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

দৈনন্দিন

কথা সাহিত্যের আসরে আজ যে ক'জন একেবারে প্রথম সারির বলে গণ্য, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম, তাঁর এই নবতম রচনা তাঁর অনুরাগিবৃন্দকে নিঃসন্দেহে খুশী করে তুলবে। বিভূতিভূষণের রচনায় বাঙালী গৃহস্থ সংসারের যে মধুর ও সরস রূপটি ধরা দেয় তা একান্তভাবেই আমাদের নিজস্ব, আলোচ্য রচনার বিষয়বস্তুও সেই ধারানুসারী। সরোজ ও সুচারু এক সাধারণ ভদ্র বাঙালী দম্পতীর মধুর দৈনন্দিন জীবনই কাহিনী, অতি তুচ্ছ ঘটনা, সাধারণ রাগ-অনুরাগের মাধ্যমে যেন জীবন্ত ছবি হয়ে উঠে লেখকের নৈপুণ্যে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বধূর মা হওয়ার তৃষ্ণা, নারীত্বের এক বিশেষ দিককে সম্পূর্ণরূপেই উদ্‌ঘাটিত করে তুলেছে। আপাত সুখ-শান্তির আড়ালে সন্তানহীনা সুচারুর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা যেন অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ধারার মতই অলক্ষ্যে এক বেদনার ধারায় অভিষিক্ত করে চলেছে সমগ্র কাহিনীটাকেই, আর সেজন্যই কাহিনীর সফল সমাপ্তিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মন। আমাদের একান্ত ঘরোয়া সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার এই রোজনামচা বাঙালী পাঠকের মন কেড়ে নেবে স্বচ্ছন্দেই, অন্তত বইটি পড়ে আমাদের সেই ধারণাই হয়। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক, পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—বাক্‌ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

উনিশ শতকের শেষার্ধে যে ক'জন মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উৎসাহে দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিতে এক নতুন যুগের সূচনা সম্ভবপর হয়েছিল 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' তাঁদেরই অন্যতম, অথচ আজ অবধি সাহিত্যে বা শিল্পে তাঁর অবদান সম্পর্কে তাঁর দেশবাসী সম্যক্‌ভাবে অবহিত নয়, তবুও আমরা বাঙালীরা সাহিত্যরসিক বলে গর্ব করতে ছাড়ি না। সম্ভবত অনুজ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রচণ্ড দীপ্তিই জ্যেষ্ঠের অবশ্য প্রাপ্য স্বীকৃতির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন; না হলে

ব্যক্তি-প্রতিভা হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান তো অনেকেরই ঊর্ধ্বে; রবীন্দ্র-প্রতিভার কৈশোরে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বড় অল্প ছিল না। তাঁর রচিত বহু নাটকই তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে স্থান করে নিয়েছে এবং তার কোন কোনটির সংগীত তখন সাধারণের মুখে মুখে, ওদিকে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর অনুবাদিত গল্প-উপন্যাসাদিরও আদর-কদর যথেষ্ট সে সময়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলা দেশে এই প্রতিভাবান পুরুষের যথোচিত সমাদর প্রচেষ্টা কখনই করা হয় নি, এক আশ্চর্য ঔদাসীন্যে আমরা তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যকর্মকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে দিয়েছি ও দিচ্ছি; এই অগৌরবের ভার কিছুটা মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক এবং আর সব কিছু বাদ দিলেও শুধু সেজন্যই তিনি প্রত্যেক সাহিত্যবোধসম্পন্ন মানুষের ধন্যবাদার্হ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম এতদুভয়েরই এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমান রচনার মাঝে, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। যে ঔদার্য ও দার্ঢ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রের মহিমাকে বিকশিত করে তুলতে সহায়ক ছিল, লেখক গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তার রূপ দিয়েছেন মানুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কর্মী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ত্রিবিধ রূপেই ভাস্বর হয়ে ওঠেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাঠক-মননে। বাংলার অতি মূল্যবান এক জীবনের প্রামাণ্য দলিল বললেই বোধ হয় বর্তমান গ্রন্থকে ঠিক ঠিক মর্যাদা দেওয়া সম্ভব। আমরা বইটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি ও এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—সুশীল রায়, প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২১। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১। দাম—দশ টাকা।

আশা দেবীর হাসির গল্প

শিশু ও কিশোর মনোমুগ্ধকরী রচনায় লেখিকা সিদ্ধহস্তা, তাঁর এই আধুনিক গ্রন্থ কিশোর সাহিত্যে উল্লেখ্য এক অবদান বলেই বিবেচিত হবে। মোট নয়টি গল্প স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থটিতে যার প্রত্যেকটিই উপভোগ্য ও সরস; প্রকৃত পক্ষে লেখিকার মজাদার শৈলী পাঠক মনকে যেন চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে। ছোট ছেলেরা তো বটেই, পরন্তু তাদের বয়স্ক অভিভাবকের দলও যে বইটি পড়ে খুশী হবেন তাতে সন্দেহ নাই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখিকা—আশা দেবী প্রকাশনায়—এ, কে, সরকার এ্যাণ্ড কোং, ৬।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িত মানুষের সাহিত্য এবং সে জন্যই ইতিহাসের মতই সাহিত্যও প্রাচীন। বাংলা ভাষার জন্মমুহূর্ত থেকেই গড়ে উঠছে তার সাহিত্য, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সংক্ষেপে তারই একটা প্রামাণ্য পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের আদিতম প্রকাশ যার মাধ্যমে তা কয়েকটি চর্যাপদের এক সংকলন নাম 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়,' অর্থাৎ এ যাবৎ যা জানা গেছে তাতে বোঝা যায় যে উক্ত গ্রন্থটিই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম দলিল। তারপর থেকে বইতে সুরু করেছে বাংলা সাহিত্য স্রোতস্বিনীর গতিপ্রবাহ নদীর মতই সাহিত্যের ধারা স্রোত ও পথের বাঁকে বাঁকে মোড় ফেরে, অর্থাৎ জীবনের অভিজ্ঞতা অনুভব ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গেই আবর্তিত হয় সাহিত্যের সামগ্রিক আকৃতি-প্রকৃতি, আর সেই অনুসারেই ইতিহাসের দৃষ্টিতে সাহিত্যের যুগ পরিবর্তন চিহ্নিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে আদি ও মধ্য যুগের অবসানে আধুনিক যুগের আরম্ভ উনিশ শতকের প্রায় সূচনাকাল থেকে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক প্রধানত এই নতুন যুগের কথাই আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিকভাবে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন লেখক, অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বইটি পড়ে বিশেষ উপকৃত হবেন, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীর পক্ষে গ্রন্থটির মূল্য অসীম; আমরা আলোচ্য গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক সমৃদ্ধও শোভন। লেখক—ভূদেব চৌধুরী, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা।

অনেক আকাশ

ছোট গল্পে সম্প্রতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা চলেছে পুরোদমে, বহু নবীনের পদক্ষেপ ঘটছে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিতে নিয়ত, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁদেরই কয়েকজনের রচনা সংকলিত হয়েছে। নতুন একটা ভাবধারার গতি এদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, সব রচনাই যে সার্থক তা নয় তবুও তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থও নয়, নতুন যুগের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা ইঙ্গিত সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় তাদের মাঝে, আর এটাই বর্তমান সংকলনের রচনাগুলির সপক্ষে বলবার মত সবচেয়ে বড় কথা। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভূমিকাটি এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ সম্পাদনা—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—এভারগ্রীন পাবলিশার্স, ১১১, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উপন্যাস-বিচিত্রা

আলোচ্য গ্রন্থে তিনটি উপন্যাস একত্র পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস 'জলতরঙ্গ' লিখেছেন অশোক গুহ। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নন, বর্তমান উপন্যাসে তিনি সাম্প্রতিক সমাজ-জীবনের একটা সমস্যাকে যথেষ্ট সার্থকতার সঙ্গেই রূপায়িত করেছেন। প্রেমজ বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ অবলম্বনে গড়ে উঠেছে কাহিনী। বিবাহ আজকের নর-নারীর জীবনে যেন খেলার বস্তু, তাই ঘর বাঁধতেও যেমন তাদের সবুর সয় না ঘর ভাঙতেও হয় না দেরী; কিন্তু এর পরেও যেটা বাকি থাকে, সেটা সেই আদিকালের পচা পুরোন মানব-হৃদয়, এ বস্তুটির হদিস পাওয়া বোধ হয় কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় আজও, তাই ঘর ভাঙ্গার খেলায় মেতে উঠেও কমল আর অনীতাকে আবার মিলতে হয় পরস্পরের সঙ্গে। লেখক হয় তো বলতে চেয়েছেন, আইনের হাতিয়ার তুললেও হৃদয় দোলে না অত সহজে, আর নর-

নারীর সম্মিলিত জীবনযাত্রায় তো হৃদয়ের অনুশাসনটাই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। লেখকের বক্তব্য তাঁর আন্তরিকতায় স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। যুগ-মানসের এক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়, যা পাঠক-মনকে নিজের উপস্থিতির স্বাক্ষর এঁকে দেয়। দ্বিতীয় রচনাটির নাম 'যে ফুলে কাঁটা নেই', রচয়িতা রণজিৎকুমার সেন। ছিন্নমূল মানুষদের জীবন আজ সাহিত্যের পরিসরে বিশেষ একটা দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দিক থেকে এর রূপায়ণে প্রবৃত্ত, আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুতেও ছাপ পড়েছে এর, তবে বর্তমান লেখকের মূল উপজীব্য স্বতন্ত্র। সর্বহারা হয়েও যে মানুষের মনুষ্যত্ব হারায় না নায়ক শুভেন্দুর মাধ্যমে এই সত্যটাকেই বুঝি তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। দারিদ্র্য, কঠোর জীবন-সংগ্রাম এর কিছুই যেন স্পর্শ করে না শুভেন্দুর অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তাকে, সেখানে জ্বালানো শান্তির প্রদীপটি বুঝি কোন ঝড়ের ঝাপটাতেই নেভবার নয়, নীলাদ্রির মুখে তাই ধ্বনিত হয় কেন্দ্রচ্যুত মানুষের প্রতি সর্বোত্তম আশ্বাস যা সর্বজনীন, যে কাঁটায় প্রতিনিয়ত মানুষ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পথ চলে সেটাই তো জীবনের শেষ আর একমাত্র কথা নয়, ফুল হয়ে ফোটার প্রতিশ্রুতি যে হাতেই রয়ে যায়। এক সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবন-বোধের ইঙ্গিতে এই বাঙ্ময় রচনার মাধ্যমে লেখক যেন একটা নতুন সম্ভাবনাকেই মুক্তি দিতে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর বাচনভঙ্গী মনোরম, ভাষা সাবলীল। সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে বর্তমান উপন্যাসের লেখক অপরিচিত নন এবং তাঁর এই রচনাও পূর্ব-পরিচয়ের দাবী রাখে। 'বনহরিণীর সংসার' নামে প্রকাশিত উপন্যাসটিই 'মন মহুয়া' এই নামান্তরে সন্নিবেশিত হয়েছে আলোচ্য সংকলনে। দক্ষিণারঞ্জন বসু আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর এই রচনাতেও এক অনাবিল সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাস্তব-জীবনের কোলাহলময় পটভূমি ছাড়িয়ে তাঁর কাহিনী চলে যায় অরণ্যানীর শ্যামল আদিম বিস্তারের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করতে; সুন্দরবনের আরণ্যক সৌন্দর্যের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে কাহিনী, বৈচিত্র্যে যা চমকপ্রদ পরিবেশন পটুতায় যা আকর্ষণীয়। লেখকের দক্ষতা যেন নতুন করে প্রমাণিত হয় এই রচনায়, আমরা এই বইটি পড়ে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি। বর্তমান উপন্যাস সংকলন শুধু রচনার দিক থেকেই সমৃদ্ধ নয়, এর আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাইও যথেষ্ট উচ্চমানের, বর্তমান কাগজ সংকটের দিনে প্রকাশকরা যে গ্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে দিন দিনই অবহিত হয়ে উঠছেন এ ধরণের সংকলনে তারই আভাস পাওয়া যায়, উপন্যাস সংকলনের এই আধুনিক রীতিকে আমরা সানন্দ স্বাগত জানাই। পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২, প্রকাশনায়—সুকান্ত প্রকাশন, ১৫৭। বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। দাম—চার টাকা।

অঙ্কের খেলা

অঙ্ক জিনিষটাকে ভয়ের চোখে দেখতেই অভ্যস্ত বেশীর ভাগ পড়ুয়ারা, বর্তমান বইটিকে কিন্তু ভয় করার কোন কারণ নেই, সামান্য একটু গাণিতিক জ্ঞান থাকলেই যে কেউ এই বইখানি পড়ে আনন্দ পাবে। অঙ্কের মাধ্যমে নানা রকম খেলা ও ধাঁধার প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে যা হাতে কলমে করে দেখে ছেলেমেয়েরা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ এ দু'টোর সঙ্গেই পরিচিত হতে সক্ষম হবে। এ ধরণের বইয়ের বহুল প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য গ্রন্থটি অবশ্য মূলত বিদেশী ভাষায় লিখিত, রুশ থেকে অনুবাদিত, কিন্তু অনুবাদকের দক্ষতায় এই রচনা সুপাঠ্য হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা একে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। মূল লেখক-ইয়াকভ পেরেলম্যান; অনুবাদক—বিমলেন্দু সেনগুপ্ত। প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ। ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম তিন টাকা।

কুমারী সংঘ

হাস্যরসাত্মক রচনা বলে পরিগণিত হওয়ার দাবী রাখে বর্তমান উপন্যাসটি। শহরের কুমারীরা একত্র হয়ে গড়ল একটি সংঘ, সে সংঘের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য পুরুষজাতিকে নস্যাৎ করে দেওয়া, সভানেত্রী বিপুলা দেবীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনে সোচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে সভা জমিয়ে দিল সংঘের তরুণী সভ্যারা; কিন্তু বিপুলাদি' যখন দাবী করেন পুরুষদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কই চলবে না এমন কি প্রেম-ট্রেমও নিষিদ্ধ তখন একটু দ্বিধা জাগে বৈ কি সভ্যাদের তরুণ চিত্তে, এবারও তারা সায় দেয় বটে কিন্তু আমতা আমতা করে। কৌতুক রসাপ্লুত কাহিনীটিকে উপভোগ্য করেই পরিবেশন করেছেন লেখক, পড়তে পড়তে পাঠকের ওষ্ঠপ্রান্তেও ভেসে ওঠে এক চিলতে হাসির আভাস। বইটির আঙ্গিক, ছাপা, ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুনীল সরকার, প্রকাশনায়—গ্রন্থ বিচিত্রা, ১৫।১, মদন মিত্র লেন, বিক্রয় কেন্দ্র—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম—দুই টাকা।

জ্বালামুখী

১৯৪২-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাস নানা কারণেই উল্লেখ্য। মূল গ্রন্থ হিন্দীভাষায় রচিত, লেখক অনন্তগোপাল শিবড়ে হিন্দী সাহিত্যের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকার, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ব্যাপক ও গভীর প্রভাবের ফলেই সম্ভবত তিনি মাতৃভাষা মারাঠিতে না লিখে, হিন্দী ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হন, বর্তমান রচনা তাঁর সে প্রয়াসের সার্থক ফসল। ১৯৪২-এর গণ-আন্দোলনের নিখুঁত রূপায়ণ করেছেন লেখক আলোচ্য রচনার মাধ্যমে, পড়তে পড়তে পরাধীন জাতির শৃঙ্খলমুক্তির সেই অনন্ত প্রকাশকে যেন নতুন করে উপলব্ধি করেন পাঠক, স্বাধীনতার জন্য যে তীব্র উৎকণ্ঠা সেদিন সমগ্র জাতির মর্মভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাকেও যেন নতুন করে অনুভব করতে পাবেন। ১৯৪২-এর গণ-বিপ্লবের জীবন্ত চিত্র এই রচনা, প্রামাণ্য বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। অনুবাদকও দক্ষতার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁর ভাষা সহজ, ভঙ্গী সাবলীল। আমরা এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অনন্তগোপাল শিবড়ে, অনুবাদক—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, প্রকাশনায়—পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন, মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, দিল্লী-৬। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাঙলা কাব্যের রূপ ও রীতি

মানুষের হৃদয়ের গভীর ভাবব্যঞ্জনা যে ছন্দিত রূপায়ণের মাধ্যমে বাণীরূপ পরিগ্রহ করে তাকেই বলা হয় কাব্য। বস্তুত সাহিত্যের আদি যুগে সর্বপ্রথম মানুষ নিজের ধ্যান-ধারণাকে প্রকাশ করতে পেরেছিল কাব্যের মাঝেই, সুতরাং কাব্যকে সাহিত্যের চিরন্তন সত্তা বললে বোধ হয় অতিশয়োক্তি দোষ ঘটে না। এই কাব্যের গঠন ও ভাবমূর্তিসমূহ আবার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, সংক্ষেপে তাদেরই বলা হয় 'কাব্যের রূপ ও রীতি'; আলোচ্য গ্রন্থে এই সম্বন্ধেই সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন প্রাজ্ঞ লেখক। কাব্যে অলঙ্কারের অবদান সম্বন্ধে প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন লেখক. বিশেষত শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু মনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই এমন ভাবে সমস্ত বিষয়টি তিনি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, যাতে ওই দ্বিবিধ পাঠক সম্প্রদায়ই বইটি পড়ে উপকৃত হতে পারেন। বাংলা কাব্যে অলংকারের লক্ষণ, দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যার যথাযথ রূপ নির্দেশ করে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন লেখক এবং সেজন্যই তাঁর রচনা এককালে সার্থক ও মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি নিঃসন্দেহ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লেখক—ক্ষুদিরাম দাস, এম-এ, ডি-লিট, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। দাম—ছয় টাকা।

ফল্গুর বুকে কত মায়া

পুরোনো দিনের সামাজিক চিত্র হিসাবে বর্তমান উপন্যাসের একটা মূল্যায়ন করা সম্ভব, কাহিনীর মধ্যে একটা বলিষ্ঠ জীবন বোধের আভাস পাওয়া যায়, যদিও তা যথেষ্ট পরিণত নয়। স্মৃতিচারণের ভঙ্গীতে কাহিনীর জাল বুনে গিয়েছেন লেখক, সাধারণ কয়েকটি মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাকে সহৃদয়তার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, সহানুভূতি সঞ্চারে কৃতকার্য হয়েছেন পাঠক মননে। চরিত্রগুলির মধ্যে বসন মামার চরিত্রটি বেশ উজ্জ্বল। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—জয়ন্ত পাবলিশিং এজেন্সী, ২৬৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৫, দাম—দুই টাকা কুড়ি নয়া পয়সা।

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'আইনস্টাইন' কর্তৃক আবিষ্কৃত আপেক্ষিক তত্ত্ব বা 'Law of relativity' একদিন আলোড়ন এনেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, নানা বিরোধিতার প্রাচীর লঙ্ঘন করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল একে। আজ নিউটনের মূল সূত্রগুলির সমপর্যায়ে আসন পেয়েছে আপেক্ষিকতাবাদ। স্বভাবতই বিজ্ঞান-জগতে এর গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য গ্রন্থ এ সম্বন্ধেই প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন লেখকদ্বয়। সহজ ভাষায় আপেক্ষিকতাবাদকে সাধারণের বোধগম্য করে তোলার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অনুবাদক তাঁর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন, মূল রচনার উদ্দেশ্য তাঁর অনুবাদে সার্থক হতে পেরেছে। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখকদ্বয়—এল লান্দাও, ও ওয়াই রুমার। অনুবাদক—বিনয় মজুমদার, প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রাঃ লিঃ। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নাগকেশর

আলোচ্য কাব্য পুস্তকটির লেখক কথা সাহিত্যিক রূপে কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছেন ইতিমধ্যেই, তবে কাব্য-সাহিত্যের পরিসরে সম্ভবত এই তাঁর প্রথম পদসঞ্চার। কবিতাগুলির মধ্যে একটা স্বচ্ছ সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়, সকরুণ একটা লাবণ্যে যেন তারা মণ্ডিত, যে লাবণ্য ভোরের শিশিরের মতই ক্ষণস্থায়ী হয়েও উপভোগ্য, শেষ হয়ে যাওয়া রাগিণীর মতই যার ছোঁয়ায় অনুরণিত হয় মন। বইটির আঙ্গিক রুচিপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—সাত্যকি, প্রকাশনায়—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বেঁচে থাকা

সুধীর বেরা

আমৃত্যু বাঁচার চেষ্টাই
বেঁচে থাকা।
তার বিরতিই মৃত্যু।
মৃত্যু দেহান্তর—বলে শাস্ত্রে,
মৃত্যু রূপান্তর—বলে বিজ্ঞান,
মৃত্যু জন্মান্তরের দ্বার—
বিশ্বাসীরা ভাবে।
জীবনের অভাবই কিন্তু মৃত্যু—
বাঁচার চেষ্টার অবসান।।
চলমান জীবনের
গতির সঙ্গে
গতি মিলিয়ে চলা।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চলে—
সূর্য তারা লক্ষ কোটি,
চলে অণু, চলে পরমাণু—
জীবন চলার ছন্দে বাঁধা—
সে চলার শেষই মৃত্যু।
স্থিতিই মৃত্যু—
গতিই জীবন।
ক্ষণ থেকে ক্ষণে
যুগ থেকে যুগে
স্থিতি থেকে স্থিতিতে
এই গতিই জীবন।
এই বেঁচে থাকা।।

তালপাতার পুঁথি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দশ

॥ ক ॥

মৃন্ময়ী যে ঠিক কি করবে ভেবে পায় না।

দস্যু কর্তৃক সে অপহৃতা।

দস্যুরা একদিন তাকে তার গৃহ, সমাজ ও আশ্রয় থেকে অপহরণ করে এনেছে এবং গত কয়মাস ধরে সেই দস্যুর আশ্রয়েই আছে।

আজ যদি সে গৃহে ফিরে যেতে পারেও—গৃহে কি তার আর স্থান হবে।

তার যে আজ সব গিয়েছে।

জাত গিয়েছে, ধর্ম গিয়েছে, সব গিয়েছে।

আর যদি সে কোথায়ও নাই যায় ত' এই বিধর্মী জলদস্যু সুন্দরমের গৃহেই থেকে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে।

ধর্ম-সমাজ সব কিছু ছেড়ে এই পঙ্কের মধ্যে তাকে বাকী জীবনটা ডুবে থাকতে হবে।

কিন্তু সে ত' এখান থেকে গেলেও হবে, না গেলেও হবে।

গৃহে ফিরে যেতে পারলেও আর তাকে কেউ অন্দরে পা ফেলতে দেবে না। গৃহদেবতার মন্দিরে আর সে প্রবেশ করতে পারবে না।

নিজের গৃহে তার ফিরে যাওয়া, ও না যাওয়া ত' দুইই সমান। একই কথা।

কিন্তু, এখানেও ত' সে বাঁচবে না।

ঐ কুৎসিত দানবসদৃশ জলদস্যুটার অঙ্কশায়িনী সে হতে পারবে না। কোনদিনই হতে পারবে না।

তার চাইতে সে বিষ খাবে।

বিষ!

হ্যাঁ, বিষ। বিষই সে খাবে।

প্রৌঢ়া দাক্ষায়ণী এসে ঘরে ঢুকল।

সব তৈরী হয়ে গিয়েছে গো মেয়ে—স্নান করে নাও—এসো দেখি মাথায় তেলটা দিয়ে দিই। দাক্ষায়ণীর হাতে তেলের বাটিটা ছিল সেটা এক পাশে নামিয়ে রেখে কাছাকাছি মৃন্ময়ীর বাঁধা চুল খুলতে লাগল।

মৃন্ময়ীর মনে হয় এই দাক্ষায়ণীর সাহায্যেই ত' সে বিষ সংগ্রহ করতে পারে। পরক্ষণেই আবার মনে হয় দাক্ষায়ণী কালা, একেবারে বদ্ধ কালা। কানে কিছুই শোনে না।

কথাটা বললেও সে বুঝতে পারবে না।

দাক্ষায়ণী মৃন্ময়ীর গোছা গোছা চুল দু'হাতের মধ্যে ধরে তাতে তেল মাখাতে থাকে। আর আপন মনেই কি যেন বিড় বিড় করে বলতে থাকে।

এতদিন যা কখনো মৃন্ময়ী করে নি আজ তাই করল।

দাক্ষায়ণীর তেলমাখানো হয়ে গেলেই মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়াল এবং সোজা পায়ে পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দু'পা গেলেই ত' গঙ্গার ঘাট।

ঘরের জানালা পথেও গঙ্গার ঘাট দেখা যায়।

এতদিন ঘরেই সে একটা ছোট চৌকির উপর বসে তোলা জলে স্নান করছে, আজ সোজা ঘর থেকে বের হয়ে বাগানের রাস্তা ধরে গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল।

দাক্ষায়ণীও যেন কেমন বিস্মিত হয়েছে।

সেও হাঁ করে চেয়ে থাকে মৃন্ময়ীর দিকে।

মেয়েটা সোজা যে গঙ্গার ঘাটে চললো! এ আবার কি, গঙ্গার ঘাটে ত' কখনো স্নান করতে যায় না—তবে!—

মৃন্ময়ী একবার ফিরেও তাকায় না।

সোজা এগিয়ে চলে।

দাক্ষায়ণী কি ভেবে মৃন্ময়ীকে অনুসরণ করে।

মৃন্ময়ী সোজা এসে গঙ্গার জলে নামে। জোয়ারের স্ফীত গঙ্গা। জল অনেকখানি উঠে এসেছে। গঙ্গার জলে নেমে মৃন্ময়ী যেন আজ অনেকদিন পরে অনেকক্ষণ ধরে ডুব দিয়ে দিয়ে আশ মিটিয়ে স্নান করে।

দাক্ষায়ণী পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ স্নান করার পর ভিজে কাপড়ে যখন মৃন্ময়ী উঠে এলো পাড়ে দণ্ডায়মান দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো।

মুহূর্তের জন্ত থমকে দাঁড়ায় মৃন্ময়ী তারপর আবার এগিয়ে যায়।

দাক্ষায়ণীও তাকে অনুসরণ করে।

মৃন্ময়ী মনে মনে ইতিমধ্যে স্থিরই করেছিল আর অসুখের ভাণ করে সর্বক্ষণ শয্যায় পড়ে থাকবে না। কথা বন্ধ করে মুখ বন্ধ করে থাকবে না। মরবে না সে। মরতে চায়ও না। কেন মরবে। কোন দুঃখে সে মরবে। বাঁচতেই সে চায়। যেমন করে হোক বাঁচবার পথ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। বাঁচতে তাকে হবেই।

শিবনাথ।

শিবনাথ তাকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না।

পারবে। নিশ্চয়ই পারবে।

কাল রাত থেকে কতবার ভেবেছে শিবনাথের কথা এবং যতবার মনে মনে শিবনাথকে ভেবেছে, সমস্ত মুখখানা যেন তার রাঙা হয়ে উঠেছে

মৃন্ময়ী উঠে গিয়ে গঙ্গায় স্নান করে এসেছে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দাক্ষায়ণীর নজরে যখন পড়েছে, সুন্দর সাহেব ফিরে এলে তার কানে কথাটা নিশ্চয়ই উঠবে। আর তারপর যে কি হবে তাও জানে মৃন্ময়ী। সুন্দর সাহেব সোজা এসে তার ঘরে ঢুকবে। স্পষ্টই হয়ত সে জিজ্ঞাসা করবে, এতদিন ধরে এই ছলের মানেটা কি। যা খুশি বলে বলুক সুন্দর সাহেব, মৃন্ময়ী কোন জবাব দেবে না। বোবার ত' শত্রু নেই, সে যদি জবাব না দেয় ত' কি করবে সাহেব।

কিন্তু আশ্চর্য। সারাটা দিন গেল—সন্ধ্যা হলো—রাত হলো সুন্দর সাহেব কিন্তু তার ঘরে এলো না, শুধু তার ঘরেই নয়—সেই যে সকালবেলা সুন্দর সাহেব বের হয়ে গিয়েছিল আর বাড়িতেই এলো না।

সারাটা রাতও এলো না। মৃন্ময়ী সজাগ হয়ে থাকে। কান পেতে থাকে পরিচিত সেই শব্দটা শোনবার জন্য, কিন্তু সে পদশব্দ মৃন্ময়ী শুনতে পায় না।

জীবনকৃষ্ণ দেখা করতে বলেছিল বলে শিবনাথ পরদিন স্কুলের ছুটির পর সোজা একেবারে জীবনকৃষ্ণের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।

জীবনকৃষ্ণ সেদিন কলেজেও যায় নি। বাড়িতেও ছিল না।

জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে কথা ছিল তাকে সে ঐ দিন রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভায় নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় যাবার কথা ছিল।

কিছুক্ষণ বাদেই জীবনকৃষ্ণ ফিরে এলো।

জীবনকৃষ্ণকে দেখে শিবনাথের মনে হলো সে যেন একটু বিশেষ রকম উত্তেজিত।

কি ব্যাপার, তোমাকে যেন অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণ!

দুই দলের মধ্যে দলাদলিটা আবার বেশ পেকে উঠেছে—

কোন্ দল? কাদের কথা তুমি বলছো জীবনকৃষ্ণ? কিসের দলাদলি?

তুমি কি হে শিবনাথ, কোন খবরই কি রাখ না এ যুগের ছেলে হয়ে। যা নিয়ে এত আন্দোলন চলেছে তার কিছুরই খবর রাখ না নাকি।

না ভাই। তুমি ত' জান আমি বেশী লোকের সঙ্গে মিশি না।

মেশ বা নাই মেশ—দুই দলে যে এত আন্দোলন হচ্ছে—

কাদের কাদের দল?

রাজা রামমোহন রায় আর রাধাকান্ত দেবের দল। রামমোহন রায়ের 'কৌমুদী' আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রিকা'ও কি নিয়মিত তুমি পড় না।

না। পড়ি নি ত'!

পড় নি। আশ্চর্য!

এই যে সহমরণ-প্রথা নিবারণ, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন আর ব্রহ্মোপাসনা স্থাপনের ব্যাপার নিয়ে দেশের সব জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও আন্দোলন চলেছে কিছুরই তার খবর রাখ না। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, মতিলাল শীল এঁদেরও নাম বোধ হয় শোন নি।

শুনেছি। সবার নামই শুনেছি। আর ঐ কবিতাটাও শুনেছি—

কবিতা!

হ্যাঁ—ঐ যে—শোন নি তুমি—

> সুরাই মেলের কুল
> বেটার বাড়ি খানাকুল,
> বেটা সর্বনাশের মূল,
> ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল;
> ও সে জেতের দফা, করলে রফা
> মজালে তিনকুল।

থাম। থাম—চিৎকার করে ওঠে জীবনকৃষ্ণ। লজ্জা হয় না তোমার—আজকের একজন শিক্ষিত যুবক হয়ে কার সম্পর্কে ওসব কথা বলছ। জান তুমি, যাকে নিয়ে ঐ কবিতার ব্যঙ্গ করা হয়েছে সে মানুষটা আমাদের দেশের, সমাজের ও শিক্ষার জন্য কি করেছে এবং এখনও কি করছে। তারপরই একটু থেমে জীবনকৃষ্ণ বলে, এ বিরোধ একদিন মিটে যাবেই—সত্যের আলোয় সকলের চোখের অন্ধকার দূর হবে। তখন তারা রাজা রামমোহন রায়ের মূল্য বুঝবে।

আচ্ছা জীবনকৃষ্ণ।

বল।

সত্যিই কি তুমি মনে কর সহমরণ-প্রথা উঠে যাবে এ দেশ থেকে।

নিশ্চয়ই যাবে—যেতে বাধ্য।

কিন্তু হিন্দুর ধর্ম—

ধর্ম। ধর্ম তুমি বল কাকে? ধর্মের নামে ওটা একটা অন্ধ কুসংস্কার। গত বছর অক্টোবর মাসে এই কলকাতা শহরেরই কাছে নৃশংস যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তুমি শোন নি।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড!

হ্যাঁ—যে সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লেখা হয়েছিল—

কি হয়েছিল কি ব্যাপারটা।

জীবনকৃষ্ণ তখন যা বললে তার মর্মার্থ হচ্ছে:

একটি অল্পবয়েসী যুবক কলেরায় মারা যায়।

চিরন্তন প্রথানুযায়ী তার বিধবা স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় সহমরণ যাওয়া মনস্থ করে, সর্বপ্রকার আয়োজন হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে সেজন্য লাইসেন্সও নেওয়া হয়, যথা সময় মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা চিতায় মৃতদেহ স্থাপন করে অগ্নিসংযোগ করে, দাউ দাউ করে যখন আগুন জ্বলে উঠে সেই আগুন চোখের পরে দেখে মৃতের তরুণী স্ত্রীর সহমরণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও সাহস লোপ পায় এবং সে সেখান থেকে সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে পালিয়ে যায় পাশের জংগলে।

বল কি। তারপর।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শিবনাথ শুনতে থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য মেয়েটার, প্রথমে তার পালানোর ব্যাপারটা কারো নজরে না পড়লেও পরে যখন জানতে পারল সকলে—সবাই যেন ক্ষেপে উঠল।

ক্ষেপে উঠল। কেন!

কেন আবার কি তাদের ধর্ম গেল বলে: আসলে তা নয়—একটা পৈশাচিক নিষ্ঠুর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বলেই মানুষগুলো ক্ষেপে উঠেছিল।

তারপর।

তারপর আর কি: সকলে মিলে জংগল থেকে গিয়ে খুঁজে বের করে নিয়ে এল হতভাগিনীকে এবং ডিঙিতে তুলে মাঝ নদীতে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারল শেষ পর্যন্ত—

বল কি!

হ্যাঁ—ধর্মের নামে অন্ধ গোঁড়ামী আজ আমাদের এমনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তুলেছে।

জীবন্মৃত্যু।

বল?

শিক্ষার ব্যাপারে কি সব আন্দোলনের কথা তুমি একটু আগে বলছিলে!

তুমি ত' জান বছর তিনেক কমিটী অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশান নামে একটি কমিটী এই কলকাতা শহরে স্থাপিত হয়েছে।

জানি।

কমিটীর যাঁরা মেম্বার ও কর্মকর্তা তাঁরা চান প্রাচ্য শিক্ষার ব্যাপারেই সব টাকা ব্যয়িত হোক কিন্তু রাজা রামমোহন রায় বললেন, তা'হলে চলবে না। লর্ড আমহার্স্টকে তিনি সে সম্পর্কে দীর্ঘ এক পত্রও লিখেছেন এবং সে পত্রে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এদেশে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে এদের মনের অশিক্ষা ও কুসংস্কার—ধর্মের গোঁড়ামীর অন্ধকার দূর হবে না আর তা না হলে জাতীয় জীবনেরও কোন উন্নতি হবে না।

এই ব্যাপার নিয়েই বুঝি দু'টো দল গড়ে উঠেছে দেশে—এত তর্কাতর্কি এত আন্দোলন !

হ্যাঁ। একদল বলছেন এ দেশে এত কাল যা ছিল সেই প্রাচীনই ভাল—অন্য দল বলছেন প্রাচীনের কিছুই ভাল নয় যাহা কিছু প্রাচ্য সব মন্দ, যাহা কিছু প্রতীচ্য সবই ভাল। তুমি যা বললে জীবনকৃষ্ণ সেই জন্যই কি রাজা রামমোহন রায়ের 'পরে দেশের লোক খাপ্পা হয়ে উঠেছে।

শুধু শিক্ষা ব্যাপারের জন্যই নয়—বললাম ত' এদেশের এতদিনকার ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে সহমরণ-প্রথা তিনি বিলোপ করতে চান তার উপরে আছে তাঁর একেশ্বরবাদ।

কেন দেশের লোক এই সব ব্যাপার নিয়ে মিথ্যে হল্লা করছে বুঝি না, কারণ জ্ঞানভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুলতে হলে ইংরাজী শিখতেই হবে আমাদের। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাল করে পরিচিত হতেই হবে তা ছাড়া ঐ সহমরণ-প্রথা—যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নৃশংস—

হবে—হবে, জীবনকৃষ্ণ বলে, সব কিছুই হবে একদিন শিবনাথ। কলকাতার ইংরাজও যে ব্যাপারটা বুঝছে না তা নয়—

তা যদি হয় তারা ইচ্ছা করলেই ত' অন্তত সহমরণ-প্রথাটা বন্ধ করে দিতে পারে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট কি পারেন না! পারবেন না কেন পারেন। নিশ্চয়ই পারেন কিন্তু ব্যাপারটা কি জান !

কি !

তারা বিদেশী। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ওঁরা কি বলেন জান ? ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করেই হোক এদেশ আজ তারা মানে ইংরাজরা করায়ত্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু এদেশে টিকে থাকতে হলে যে এ দেশের জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে চলতে হবে এটা তারা ভাল ভাবেই বোঝে। পাছে এ দেশের এতকাল প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে হাত দিতে গেলে হঠাৎ বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে জ্বলে ওঠে সেই ভয়েই এরা সর্বদা সংকুচিত। কারণ ঐ সহমরণের ব্যাপারটাই দেখ না, আগে ইংরাজরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ সব নৃশংস অনুষ্ঠান চুপ করে দেখত। মুখ বুজে থাকত কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তা কি তারা থেকেছে—আর থাকে নি বলেই লর্ড আমহার্স্ট কতকগুলো নিয়মও বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে এই অন্যায় কুপ্রথা লোপ পাবেই এবং পেতে বাধ্য। একজন মরেছে বলে আর একজনকে তার সঙ্গে মরতে হবে কেন ! এ ত' হত্যা,—রীতিমত হত্যা। চরম নিষ্ঠুরতা। চরম নৃশংসতা।

উত্তেজনায় জীবনকৃষ্ণের গলাটা যেন কাঁপতে থাকে।

সেই সঙ্গে শিবনাথের চোখের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা যেন সরে যায়। শিক্ষার আলো যেন তার চোখের সামনে একটা নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত করে।

শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ নিয়ে যে দেশের জনগণের মধ্যে এমন একটা আন্দোলন চলেছে এসবের কিছুরই ত' কোন খবর আজ পর্যন্ত রাখে নি শিবনাথ।

ঐ যে মানুষগুলোর নাম করল জীবনকৃষ্ণ একটু আগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মুন্সী কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতির নাম করল তাদের সম্পর্কে কিছু জানত না।

সে তার বিদ্যালয় ও লেখা পড়া নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

দু' মুঠো অন্নর সংস্থানের জন্যই সর্বদা ব্যস্ত। একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁইয়ের জন্যই সে চিন্তিত।

কিন্তু ঐ সব কিছুর বাইরেও যে আর একটা জীবন আছে—সে জীবনের সন্ধান ও কোন দিনই করে নি।

তুমি আজ আমাকে আত্মীয়-সভায় নিয়ে যাবে বলেছিলে।

আজ নয়—পরশু সেখানে আলোচনা সভা আছে একটা। তুমি এসো নিয়ে যাবো।

আর ডিরোজিওর ওখানে !

সেও এই সপ্তাহেই একদিন নিয়ে যাবো।

সেদিনকার মত জীবনকৃষ্ণর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ যখন গৃহে এসে পৌঁছাল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

গৃহে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল তার গতরাত্রির কথাটা এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ল মৃন্ময়ীর কথা।

মৃন্ময়ী !

মৃন্ময়ীকে চুরি করতেই গতরাত্রে অরিন্দম সরকারের লোক এসেছিল।

একটা ভুলের জন্য সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আবার যে তারা আসবে না তার কি স্থিরতা আছে।

তার কর্তব্য মৃন্ময়ীকে সাবধান করে দেওয়া।

ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর ঘরের দিকেই অগ্রসর হলো শিবনাথ।

[ক্রমশ।

প্রসন্ন প্রভাতে

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

আলোর বন্যায় উজ্জ্বল এই প্রসন্ন প্রভাতে,
পুলকিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে মন মোর মাতে।
সবুজ ঘাসের বুকে ঝকঝকে শিশিরের বিন্দু,
উতরোল ঢেউ-এ হলো উত্তাল এ প্রাণের সিন্ধু।
দূরাগত পাখীরা ডানা মেলে যায় উড়ে ঘন নীল আকাশে,
সে কোন অজানা দ্বীপের গন্ধ যেন আসে ভেসে বাতাসে।
ফুলেরা পাপড়ী মেলে স্মিত নয়নে প্রথম রৌদ্রের কবোষ্ণ উত্তাপে।
বৃক্ষনীড়ে কোকিল কূজন ধরে যেন কোন সুগভীর বিরহ সন্তাপে।
দূর প্রান্তরে নীল অরণ্য আলোতে ছায়াতে মেশা,
জনহীন সেইখানে নিঃশব্দ প্রহরগুলি রক্তে ধরায় নেশা।
পীত নদীটির বুকে আকাশ উজাড় করে রৌদ্র ঝরে,
ঢেউ তোলা জলের স্রোত যেন গলানো হীরে।
প্রভাতের স্নিগ্ধ বেলায় সোনালী স্বপ্নে ভরে এ দু'টি নয়ন,
বিশ্বজুড়ে চলে যবে দিনযাপনের মধুর আয়োজন ॥

নাচ গান বাজনা
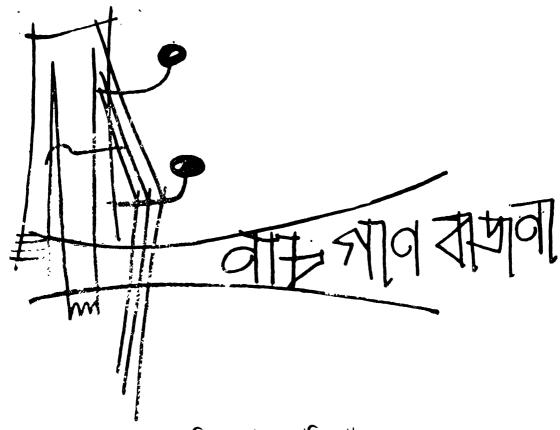
দ্বিজেন্দ্রলাল ও হাসির গান

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ণ প্রতিভার একটি অবিস্মরণীয় ফসল তাঁর 'হাসির গান' (১৯০০); বাংলা সাহিত্যে এ বিভাগটি তাঁর স্বাবলম্বিত। এ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ংস্বতন্ত্র একটি অধ্যায়। কবি-মানসলোকের নানা বৈচিত্র্য, ভাবজীবনের বিবিধ চলচ্ছবি এ জাতীয় রচনাগুলিকে নিপুণ সম্পন্নতা দান করেছে। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় বলেছিলেন:

'এখন দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু ও গুণগ্রাহীরা জীবিত আছেন—তাঁহারা কবির এই স্মৃতিসভা করিতেছেন, কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম শতবর্ষ পরে দ্বিজেন্দ্রের স্মৃতির কি থাকিবে? আমার মনে হয় দ্বিজেন্দ্রের আর কোন স্মৃতি থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে যে হাস্যরসের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যের যে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, সে-কথা কেহ ভুলিতে পারিবে না,—সে স্মৃতি স্থায়ী হইবে।'

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বিষয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী এ যুগে মিলে গেছে কি না সে বিষয়ে সংশয় থাকলেও—সাহিত্যক্ষেত্রে এ হাসির গানগুলি যে মণিখণ্ডবিশেষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) ও 'হাসির গান' (১৯০০) হাস্যরস প্রবর্তনার দিক দিয়ে অতুলনীয়। 'সাহিত্য' (আষাঢ় ১৩২০) পত্রিকাতে সমসাময়িক সমাজ-জীবনে এই হাসির গানগুলির স্থান এবং এরই আলোকে দ্বিজেন্দ্রলালের সংগঠক মনের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল নিম্নোক্ত মর্মে:

'যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসেন,

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

তখন বাঙলার ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল; নব্য হিন্দু কেবল আর্যামীর আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। 'ন্যাকামীর' প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এদেশে আমদানী করিয়া, দেশীয় শ্লেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী রঙ্গের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন।...... ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্যন্ত দার্জিলিঙ্ হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত বাঙলার সকল জেলায়, সকল সমাজে, তিনি স্বয়ং তাঁর হাসির গান গাহিয়া বেড়াইয়াছেন।'

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুগামী ও শিষ্যকল্প রজনীকান্ত সেনের পবিত্রতাসমুজ্জ্বল সংগীতে নিঃসন্দেহে তাঁরই প্রভাব রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এক্ষেত্রে স্বয়ংবৃত স্বায়ত্তশাসন। অন্তরের কতখানি নিষ্ঠা ও স্বতোচ্ছল প্রেরণা এ জাতীয় রচনাগুলির পশ্চাতে স্বয়ংক্রিয় ছিল—দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের বক্তব্যই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়:

'সেই সময়ে (বিলাত হইতে আসিয়া) আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় কোন বাঙালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান ছাড়িয়া দিয়া বাংলা গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অচিরাৎ অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমার স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। (১)

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার মুক্ত স্বচ্ছ সৃষ্টি এই 'হাসির গান'গুলির বিচারের পূর্বে কবির মনোজীবনের উৎসমূলের সংগে তার যোগবন্ধন বিষয়ে ব্যক্তি-জীবনের কিছু তথ্য উল্লেখ প্রয়োজন। কবির জীবনের একটি কেন্দ্রীয় সূত্র তাঁর সৃষ্টিশীল ভাবজীবনের সংগে ওতপ্রোতরূপে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। জীবনভাষ্যের এই গ্রন্থিটি তাই তাঁর কাব্যপ্রত্যয়কে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই গ্রন্থিটি হল—দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহ (১২৯৪, বৈশাখ)—স্ত্রী সুরবালার সুগভীর আত্মিক প্রেম। বিলাত প্রত্যাগত—এই অপরাধে বিবাহকালে দ্বিজেন্দ্রলালের উপর যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল—সে তথ্য আমাদের অনেকেরই অজানা নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় তৎকালীন 'নব্যভারত' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩২০) এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন:

'কিন্তু বিবাহের পূর্বে কোন প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাই।। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।' একদিকে সুনিবিড় প্রেমের আকর্ষণ—অপরদিকে সামাজিক নির্যাতন—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তাঁর মন সমাজ বিষয়গত প্রশ্নে তীক্ষ্ণ কঠিন ও স্যাটায়ার সক্রিয়-হয়ে উঠেছে। এই তীব্র প্রতিক্রিয়ারই বহ্নিজ্বালাময় প্রথম রূপায়ণ 'একঘরে' (২ জানুয়ারী, ১৮৮৯); তিনি নিজেই বলেছেন—'ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা।' এ পুস্তিকায় কবি অতিমাত্রায় ধৈর্যচ্যুত, উচ্চকণ্ঠ।(২) কিন্তু সামাজিক কারণে সৃষ্ট এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার আন্তরধর্মের বিশিষ্ট মেজাজের মধ্যেই কবির পরবর্তী নিপুণ ও অতুলনীয় সৃষ্টি সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত হয়েছিল। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষজ্ঞ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, 'একঘরের কলাকৌশলবর্জিত ও আতিশয্যধর্মী ব্যঙ্গই 'হাসির গানে' নিপুণ হাতের স্পর্শে শব্দার্থ ভ্রূভঙ্গিময় তির্যক কটাক্ষে পরিণত হয়েছে।'

রচনাকালের অনুক্রমের দিক থেকে 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) প্রকাশের অনেক পূর্বেই 'হাসির গানের' অনেকগুলি গান রচিত হয়েছিল। কিন্তু সংকলিত আকারে হাসির গান প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে; এ গানগুলি যেমন কবি-জীবন ব্যাখ্যার উপকরণ—তেমনি আবার এ গানগুলির আরও একটি মূল্য ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনাত্মক লঘু নাট্য রচনাতেও এই গানগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই গানগুলিই প্রহসনের রঙ্গরসকে আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। যেমন 'ত্র্যহস্পর্শ' বা 'সুখী পরিবার' প্রহসনে 'পারত' কেউ না কেউ বিদ্যুৎবাবের বাবুকে'; 'তাকে পেতাম আমি হতে একটা নীর', 'তা বই নাহি প্রেম' প্রভৃতি হাসির গানগুলি, 'প্রায়শ্চিত্তে'—'আমরা বিলাত ফের্তা ক ভাই' 'নতুন কিছু কর, একটা নতুন কিছু কর' 'কটি নকুলকাহিনী,' 'চম্পটির দল আমরা সবে' প্রভৃতি হাসির গান স্মরণ করা যেতে পারে। হাস্যরসাত্মক 'বিরহ' নাটকে চার্বাক দর্শন ও ওমর খৈয়ামী নীতির পরিপোষক অনেক হাসির গান আছে।

স্ত্রী বিয়োগের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল কবি, হাসির গান ও প্রহসন রচয়িতা। পত্নীপ্রেমের প্রসন্ন উজ্জ্বলতার সেই যুগ গীতিভাবুকতায়, রঙ্গরসে তাঁর জীবন তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য তিনি একান্ত অন্তরের সঙ্গে ভুলে থাকতে চাইতেন। এই সময়েই তিনি ১৯০৫-০৬ 'পূর্ণিমা মিলন' নামে একটি সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনির্বেয় 'মজলিসী' উৎসবের উপকরণ রচনা করতেন তিনি 'হাসির গান' দিয়ে। তাই রচনা করলেন:

১। নাট্যমন্দির: শ্রাবণ ১৩১৭

২ স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' (ভাদ্র ১২৯৭) সমালোচনা প্রসংগে বইখানির প্রশংসা করেই লিখেছিলেন: 'পূর্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দু সমাজকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন। বইখানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিল। ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু তাহা অসংগত অমূলক শ্লেষবাক্য নহে। বইখানি পড়িলে মনে হয় হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্মপীড়িত হইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা গালি দেওয়া নহে, তাঁহার ইচ্ছা সমাজের চক্ষুদান। তবে বইখানিতে বেশ একটু খাঁটি হাস্যরস আছে এবং কলমের জোরও বেশ একটু দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন।

এটা নয় কলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন ;
সাহিত্যিক সব ছোট বড়—এইখানেতে হয়ে জড়
সবাই আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে করতে হবে কালহরণ।

১৩১২ সালের রাসপূর্ণিমায় দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের সুকিয়া স্ট্রীটের বাসভবনে অনুষ্ঠিত পূর্ণিমা মিলনে স্বরচিত ইংরাজী হাসির গান শোনান এবং তাঁর শিশু পুত্র ও কন্যার সহযোগে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ইরাণ দেশের 'কাজী ও সাধে কি বাবা বলি' গানগুলি শোনান।

সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি বহির্মুখী সচেতন ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এই হাসির গানগুলিতে বিরল নিপুণতা পেয়েছে। সমসাময়িক বাঙালী জীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে কবির সহজাত প্রতিভা চিন্তা করেছে। কৌতুককর ফেণোচ্ছলতার মধ্যেই আবার ক্ষতার্ত মনের জাগ্রত সমালোচনা উপস্থিত। এই অতিজাগ্রত সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীই আবার কোথাও কোথাও তীব্র ব্যঙ্গের প্রবাহ নিয়ে উপস্থিত।

'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান' একই মানসিকতার সৃষ্টি। প্রথমটির শিল্পশিথিলতা দ্বিতীয়টির কিছুটা প্রলম্বিত রচনাকালীন ব্যবধানে আরও পরিণত হয়েছে। কবির প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞা সেখানে হাসি আর অশ্রুকে নিয়ে একই সংগে মালা গ্রন্থন করেছে। হাসির অফুরন্ত উৎসারের মধ্য দিয়ে জীবন ও সমাজের গভীরতার নির্ধারক হয়েছে এই গানগুলি। বক্তব্যের সংগে সংগে রূপ ও রীতির দিক দিয়েও 'হাসির গান' এক স্বতন্ত্র কবিকর্ম।

মনোগত মেজাজের দিক দিয়ে 'হাসির গানের' বিষয়বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। সমগ্র গানগুলিকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে :

১। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক
২। সামাজিক
৩। প্রেমবিষয়ক
৪। বিচিত্র জীবজগৎ
৫। দার্শনিক
৬। আহার ও পানীয় বিষয়ক।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়গুলিতে কবির এক ধরণের উদ্ভট ঘটনাসংস্থান কাল সচেতনাকে লুপ্ত করে দিয়ে কুশলতার সংগেই হাস্যরসকে উজ্জ্বল ও উচ্ছল করে তুলেছেন—

'যা হোক্‌, এলেন তানসান রাজার দেখাতে ওস্তাদি ;
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—'পিয়ানো' ইত্যাদি ;—
অ—অর্থাৎ আনতেন নিশ্চয়, কিন্তু হন হঠাৎ দৃষ্টি
যে, হয়নি ক তানসানের সময় 'পিয়ানোর'ও সৃষ্টি।
(কোরাস) তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি
মেও এঁও এঁও।'
—তানসান বিক্রমাদিত্য সংবাদ

কিংবা 'রামবনবাসের' গানে কবির সেই অমোঘ কৌতুকদীপ্ত নির্দেশনা :

'যদি নিতান্ত যাইবি বনে, সংগে নে সীতা লক্ষ্মণে,
ভাল একজোড়া পাশা, আর ঐ (ওরে) ভাল দু'জোড় তাস।
ও কি হেরি সর্বনাশ।
ওরে আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমান্টর ভিতরে নিতাম
বঙ্কিমের ঐ খানকতক (ওরে) ভালো উপন্যাস।'

সংলাপাত্মক 'কৃষ্ণরাধিকা সংবাদে' বৈষ্ণব ঐ দর্শন-আবেষ্টনীয় শ্রীরাধিকা লক্ষ্মীরূপে লৌকিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে উচ্চকিত হাস্যরস জুগিয়েছেন :

'কৃষ্ণবলে 'এমন বর্ণ দেখি নি ত' কভু'
আর রাধা বলে 'হাঁ আজ সাবান মাখিনি তবু—
নইলে আরও সাদা।'

সমালোচক প্রবর মোহিতলাল দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার গভীর একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছিলেন :

'মন ও প্রাণের যে স্বাস্থ্য ও স্বভাবের যে ঋজুতা থাকিলে—ভণ্ডামী, ভীরুতা ও নানা কুসংস্কার বিরক্তি উদ্রেক করিলেও, তাহা দুর্দশাগ্রস্ত জাতির নিরতিশয় দুর্বলতা ও অক্ষমের নিষ্ফল আত্মাভিমান প্রসূত বলিয়া, আক্রোশ বা ঘৃণার পরিবর্তে অনুকম্প, এমন কি, সহানুভূতির উদ্রেক হয়—সেই বিচারশীল সহানুভূতি ও মুক্তমনের রসপ্রবণতা হইতেই এমন নির্মল উচ্ছল হাস্যাবেগ উৎসারিত হইয়া ছল।'(৩) এই শক্তি পরিচয়েরই পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর সমাজ বিষয়ক হাসির গানগুলিতে সেখানে তিনি জাতি ও যুগজীবনে নানা ক্রটি-বিচ্যুতিতে সহানুভূতিকরুণ, হাস্যময় অথচ অর্থ গাঢ় রূপদান করেছেন। Reformed Hindoos' গানে শব্দ সৌকর্যের মাধ্যমে কবি অদ্ভুত হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন :

'About female educat on
ও female emancipation,
আর infant marriage, আর widow marriage
আমাদের খুব enlightened views;
কিন্তু views-এর মতে কাজ করি if you think,
তা' লে you are an awul goose.'

কিংবা : 'আমরা বিলাত ধরণে হাসি
আমরা ফরাসী ধরণে কাশি
আমরা পা ফাঁক ক'রয়া সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালোবাসি।'

কিন্তু : 'বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।' (বিলাত ফের্তা)

বিচারকের জাগ্রত মন নিয়ে তিনি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন—অপক্ষপাত মনের বিদ্রূপের অব্যর্থতা নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে সহজেই লক্ষ্য করা যায়—

'পুরুষরা সব শুনছে বসে,
মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে,
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে, শুনে তা পীলে চমকাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্ট শান্ত, প্রজা হচ্ছে জবদ্দার ;
মুনিব কচ্ছে আজ্ঞা হুজুর
চাকর কচ্ছেন খবদ্দার।
—হল কি'

৩। সাহিত্য বিতান (নবসংস্করণ) পৃঃ ৮৪।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কুসংস্কার-যুক্ত প্রাচীন চর্যাগুলির ক্ষেত্রে সমুদ্ভূত উৎকট মানসিকতাকে কবি ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন :

'যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে,
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকাণ্ড ধর্ম ভাঙে গড়ে,
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরে হরির মালা,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে কোন্'—

এ ক্ষেত্রে কবি অতি সহজ পথেরই দিশারী :

'ছেড়ে কিচিমিচি, আর ছি ছি ছি ছি
আর মুহু মুহু হায় উহু উহু
প্রাণের সার যাহা—কর আহা আহা।
আর হো: হো: হো:, হি: হি: হি: হা:
—তা নইলে জীবনটা কিছু না:।
—কিছু না'

জীবন থেকে সকল আদর্শ, পুরাণ-তন্ত্র গীতামন্ত্রের বিলুপ্তির পর কবিচেতনা তীক্ষ্ণ হাস্যরসের মধ্য দিয়েই জীবনের অবশিষ্ট নির্গলতার্থকে বিশ্লিষ্ট করেছেন—'রৈল শুধু—ভার্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।' নানামুখী গতির টানে জীবন পথে বিভ্রান্ত মানুষের সম্পর্কে রঙ্গচ্ছলে কবি যা বলেছেন—প্রবল কৌতুকের ব্যঙ্গবিদ্ধতার মধ্যে দিয়েও সেখানে জীবনের কারুণ্যটুকু উপস্থিত,—

'ছেড়ে দিলাম পথটা,—বদলে গেল মতটা,
(কোরাস) এমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়?'

'ইরাণদেশের কাজী!' 'পাঁচ শ' বছর সয়ে আছি'; 'আজি এই শুভদিনে' প্রভৃতি গানে গভীর শ্লেষেরই তীব্রতা লক্ষণীয়। কিন্তু কৌতুকের অতিরেক (excess) দিয়ে গানগুলিকে এমনভাবেই রসার্দ্র করে দিয়েছেন যে, তা কারুর প্রতি কটাক্ষপাত করে না—প্রবল কৌতুকের উদ্দামতাই সার্বজনীন ভাবে আস্বাদ্য হয়ে ওঠে।

প্রেমবিষয়ক রোমান্সকে অবলম্বন করেও কবির কৌতুক স্বতোচ্ছল রূপ পেয়েছে—

'প্রথম যখন বিয়ে হল, ভাবলাম বাহা বাহা রে।
কি রকম যে হয়ে গেলাম, বলব তাহা কাহারে—
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।'

কিন্তু এ 'প্রণয়ের ইতিহাস' এ শেষ ফলশ্রুতি :

'দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়।'

বাসন্তিক পটভূমিতে নর-নারীর ঘনীভূত প্রেমের ঐশ্বর্যকে কবি নিম্নরূপে হাসির গানের বিষয়বস্তু করেছেন :

'ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু বহে ঘাম গাত্রে,
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায়, শন্‌শনে মশা রাত্রে;
ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচি নে বাঁচি নে উহু উহু উহু হি-হি হু হু হা-হা হস্ত।'

'কোকিল' বিষয়ক রোমান্স সম্বন্ধে কবির স্পষ্টোক্তি—'ভাগগিস নয় সে পাখি বারোমেসে, নৈলে মুশকিল হত বেঁচে থাকা'। 'শালিক পাখি'র রূপদী সংগীত বিষয়ে শব্দ ক্রীড়ার কিশোর-সুলভ কৌতুক :

'ঘ্নি কট্, কট্, কচ্, কচ্, কিচি-মিচি
কক্যো কক্যো ড্যাক্ প্রিং প্রি'

'আহার ও পানীয়' বিষয়ক হাসির গানও সমান উপভোগ্য :

'শুধু বিধি যেন নাহি যায় কাঁকে
ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
স্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট স্যেরি আর, খাও যার খুশী যা;
শুধু কেড়ে-কুড়ে নিও না আমার
আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা।'

কবির 'ক্ষীর যদি হত ভারতজলধি, ছানা যদি হত হিমালয়' এর সংগে রজনীকান্ত সেনের এই জাতীয় হাল্কা হাসিরই ঔদরিক কবিতা যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত পানতুয়া শত শত'র মিল রয়েছে। আবার এরই সংগেই আশ্চর্য গভীর সুরের ও হাসির গান আছে। মানুষ আনন্দ-আকাঙ্ক্ষা ও উল্লাস দিয়ে যে সংসার সাজিয়ে তোলে—তা ভেঙ্গে যাবার, পরিবর্তিত হয়ে যাবার অনিঃশেষ ক্রন্দন আপাত হাস্য তরল রূপের মধ্যেই সংসক্ত হয়ে গানগুলিকে ভাবগভীরতা দান করেছে। স্পষ্ট উজ্জ্বল এ হাসির ভাব-বিভঙ্গে জীবন সত্যই নানা ভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আবেগময় সত্তার ঔজ্জ্বল্যই 'হাসির গান'-গুলির প্রাণবস্তু। 'বিরহ' নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন :

'আমাদের দেশে এবং অন্যত্র অনেকে হাস্যরসের উদ্দীপনাকে অযথা চপলতা বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে, হাস্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক সত্যকে প্রভূত পরিমাণে বিকৃত করিয়া আর এক প্রকৃতিগত অসামঞ্জস্য বর্ণনা করিয়া।'

এই দুই শ্রেণীর রীতিরই পরীক্ষা হাসির গানগুলিতে আছে। প্রসন্ন কৌতুকের সংগে বুদ্ধিদীপ্ত মনন ও আন্তরিক সংবেদন হাসির গানগুলিকে প্রসন্ন দীপ্তির বর্ণময়তা দান করেছে। এ দীপ্তি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্বের। এ-ক্ষেত্রে তিনি একক—তিনি বিরাট।

আমার কথা (১০৩)

পান্না কাওয়াল

গতানুগতিকতার সঙ্গে হাত মেলানো যাঁদের ধর্মবিরুদ্ধ, নিত্যনবীনের আবাহনে যাঁদের সমগ্র সত্তা সদা উন্মুখ বাঙলার বিখ্যাত দরদী শিল্পী পান্না কাওয়াল তাঁদেরই দলের দলী। কাওয়ালী গানের ক্ষেত্রে বাঙলা দেশে আজ তিনি একক এবং অনন্য। এই অদ্বিতীয় কাওয়ালীগায়কের স্থান অধিকার করার দ্বিতীয় যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব সুরসমাজে এখনো ঘটে নি। কাওয়ালী গানের শিল্পীদের মধ্যে পান্না কাওয়াল একটি নাম যে নামের পরে কোন বাঙালী পূর্বসূরীর নাম মিলবে না। উত্তরসূরীর নামও এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত।

কৈকালা (তারকেশ্বর) গ্রাম নিবাসী বসু পরিবারের সন্তান স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ বসুর পুত্র পান্নালাল বসু ১৩৩৩ সালের ২৫শে বৈশাখ (মে, ১৯২৬) জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক বিদ্যারম্ভ হয়

কলকাতায়। সঙ্গীতের সাধনা শুরু হয় মাত্র ন' বছর বয়েস থেকে। এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেরণা পান বন্ধু গোপীনাথ সায়দা (বর্মা)র কাছে। ইনি নিজেও ছিলেন সুগায়ক। পান্নালালের গলা শুনে আকৃষ্ট হয়ে গোপীনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন আপন গুরু বারাণসীর স্বর্গত রামনরেশের কাছে। রামনরেশ সম্ভাবনাময় এই উজ্জ্বল প্রতিভাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। দশ বছর রামনরেশের কাছে শিক্ষালাভ করেন পান্নালাল। এঁর কাছে তিনি শিখলেন কাওয়ালী গীত, গজল, ভজন প্রভৃতি। বারোটি ভাষায় এঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। উচ্চারণ রীতি সম্বন্ধে পান্নালালকে পাঠ দেন বন্ধুবর গোপীনাথ। গানের জন্য হিন্দী, উর্দু, ফারসী, আরবী প্রভৃতি ভাষাগুলির সঙ্গে যথেষ্ট শ্রম ও একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের মধ্যে মিতালি পাতাতে হয়েছে।

ভারতের সমস্ত বিখ্যাত কাওয়ালীদের সঙ্গে বাংলা দেশের একমাত্র কাওয়ালী পান্নালাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, এখনও করে চলেছেন। ১৯৫৭ সালে ইনি 'কাওয়াল কেশরী' উপাধি লাভ করেন। ১৯৪২—৪৩ সালে এঁর প্রথম রেকর্ড গৃহীত হয়। প্রখ্যাত ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের পুত্রের প্রচেষ্টায় রেকর্ড জগতের সঙ্গে এঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এঁর প্রথম রেকর্ড পরিচালনা করেন সুরকার কমল দাশগুপ্ত। আজ পর্যন্ত প্রায় একশ'টি রেকর্ডে এঁর গান ধরা আছে। বানপ্রস্থ (এই দুনিয়া আজব কারখানা), আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ, ইন্দ্রজাল এবং অনেকগুলি হিন্দী ছবিতে ইনি কণ্ঠদান করেছেন। এঁর গাওয়া রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত নেতাজী, বাপুজী শ্রোতৃসাধারণ্যের যথেষ্ট সমাদর অর্জন করেছে। পান্নালালের খ্যাতি শুধু দেশের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশের লক্ষ লক্ষ সুরপিপাসুকে তিনি ভরিয়ে তুলেছেন পরম পরিতৃপ্তি তাঁর অনবদ্য গানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, সাইপ্রাস, পিকিং প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তিনি আমন্ত্রিত হন। দেশের ও বিদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে তাঁর অভূতপূর্ব প্রতিভা। জাতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁকে তাঁর প্রতিভার বিকাশে সুযোগ দেন স্বনামধন্য রাইচাঁদ বড়াল, সেই সম্মেলনে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন তদানীন্তন সঙ্গীত-সম্রাট ফৈয়াজ খাঁ (১৯৪৮)।

কিছুদিন আগে তাঁর কণ্ঠে কাওয়ালী গজল শুনে মুগ্ধ হয়েছেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী। বহু সুপ্রসিদ্ধ জননায়কদের তিনি শ্রোতা হিসাবে লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ, জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী ইউ, এন, ঢেবর। কেন্দ্রীয় আইন ও ডাক-তার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেককে তাঁর নৈপুণ্য এক কথায় মুগ্ধ করেছে।

প্রার্থনা ঃ পাথর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তোমার কাছে কি সেই মন্ত্র আছে
তৃষ্ণা মেটাবার?
প্রজাপতি মাঠে মাঠে ওড়ে
আকাশেতে মেঘ জমে
টুকটুকে ফল বটগাছে
—তবু তৃষ্ণা যায় বেড়ে।

রাত্রির হঠাৎ-আসা অতিথির মতো
তোমার স্বর, তোমার দেহ, তোমার মন
কেন বারবার তৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দেয়?

শুকনো গাছে আবার নতুন পাতার জোয়ার
তোমার চোখের পাতায় কাল-বৈশাখীর বিদ্যুৎ
তোমার কাছে কি সেই মন্ত্র আছে
তৃষ্ণা মেটাবার?

আমার এই দেহ পাথর হয়ে যাক
যে-পাথর জলের স্বপ্ন দেখে না॥

কয়েদী

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কত গিঁট, জড়ধরা রেডিও
বলগা—
করোটির কিমিয়ায় ক্রমে করে
আলগা;
একে-একে কত যে দুরতিক্রম্য বাধা
পেরিয়ে,
শেষে কি না অন্দরের ধাঁধায় পথ
হারিয়ে
নিরন্ধ্র অদৃশ্য এক দেয়ালে মাথা
ঠুকছি!
রুদ্ধ কারায় বৃথা পালাবার পথ
খুঁজছি?

● ●
●

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

কিংশুকরাগিণী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

১১

কিংশুক বাড়ীতে এসে দেখে মহাবীর পড়ার ঘরে বসে আছে। ওকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে মহাবীর বললে, আয় আয় কখন থেকে বসে আছি। বুঝলি কিং ওদিকে কাল রাত্তিরে এক রাউণ্ড হয়ে গেল। আমায় বললে—বলেছিলেন, বললুম সার্টেনলি। তবে এলো না কেন? আসবে না বোলেছে? মনে মনে বললুম, এ তোমার জামাইবাবু পানতোয়া কি না, তু করলেই ছুটে আসবে আর মুখে ফেলে দেবে। এ আমাদের কিং রাজা। তবে ফ্র্যাঙ্কলি এখন বলছি ব্রাদার মনে মনে একটু ভয় ছিল। কি জানি ফাদুরা যদি ঠেলে-ঠুলে পাঠায় তা'হলেই লেজেগোবরে হবে। তাও কি বললে জানিস্? বলল—আপনি আসতে বলেন নি। কি? বলি নি? শুনে আমি ফিউরিয়াস্। নো ডবল ফিউরিয়াস নট্ সিঙ্গল্। একে তো লায়ার বলেছে, দু'নম্বর হচ্ছে মেয়েছেলে লায়ার বলেছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললুম—ডু ইউ মীন টু সে আই য়্যাম এ লায়ার? এ পাক্কা ইনসল্ট। আই মাস্ট লীভ দিস্ প্লেস্। তখন আমতা আমতা করে আমার হাত ধরে বলে—না আমি সে ভাবে বলি নি। আমি বলছিলুম কি—অল্ দোজ, লেডীজ ননসেন্স। আমি দেখলুম যাকগে—যখন বলেছে 'বলি নি' এটেই হল সাম সর্ট অব য়্যাপলোজি আর কেন?···তুই যে কবিতার সেই পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় সেই রকম ছুটে গিয়ে খপ্পরে পড়িস্ নি তার জন্যে আই য়্যাম প্রাউড অব ইউ।

ইয়েস্ ব্রাদার। তুমি আর আমি বার্ডস্ অব, দি সেমফীদার। বলে সিগারেট ধরিয়ে বললে—তারপর কোত্থেকে এলি। খুব জলি জলি ঠেকছে। ফুল অফ টিউন।

—রাগিণীদের বাড়ী থেকে।

—হঠাৎ রাগিণীদের বাড়ী? কি ব্যাপার?

ব্যাপার বর্ণনা করে কিছুটা বলতেই মহাবীরের মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—তারপর?

—তারপর আর কি? রাগিণীর সামনেও বীথি বললে—যাও নি কেন? মহাবীরবাবু তোমায় রিমাইণ্ড করিয়ে দেয় নি, আমি পড়ে গেলুম ডায়লেমায়, কি বলি। কাল রাত্তিরে যে এক রাউণ্ড ফাইট হয়ে গেছে, তা তো আর জানি না। মনে মনে কি উত্তর দেব ভাবছি আর মুখে তা-না-না-না করছি। ফট্ করে রাগিণী বললে—না মহাবীরবাবু রিমাইণ্ড করিয়ে দেয় নি।

—রাগিণী বললে?

—তাই তো শুনলুম। বলেই রাগিণী আমায় সালিশী মানলে তাই না শুকদেবদা'?

রুদ্ধনিশ্বাসে মহাবীর বললে, তুই কি বললি?

একটু ভেবে কিংশুক বললে, তা কি এখন সব মনে আছে। কি সিচুয়েশন ভাব দেখি!

—তবুও যা মনে আছে তাই বল।

—বোধ হয় বললুম, তাই তো। মানে কথাটা একদিকে য়্যাফারমেটিভ বটে আবার অন্যদিক থেকে—।

—থাক্—বলে একটু চুপ করে বললে—বীথি কি বললে?

—বলতে আর পারলে কই, সেই সময় কাজল ঘরে ঢুকল।

—হুঁ।

—আমি কি করব বল? রাগিণী ফট্ করে বলে ফেললে, বলে নি। তবে হ্যাঁ! তোকে ব্লেম দিতে পারবে না। তুই ক্লীন বলে দিবি শুকদেব তো বলে নি, বলেছে রাগিণী। সে এ ব্যাপারের কি—।

—থাক্, এনাফ অব ইট! সেই ডোবালই আমাকে ডোবালি। কাল আমি ফায়ার হয়েছিলুম, আজ ও ফায়ার হবে।

—মোটেই না। আর হলেও ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার হবে। জখম হবি না। সে পথ আমি মেরে এসেছি। ওকে বাড়ী পৌঁছে দিতে বলেছিল। আমি যাই নি। কাজল নিয়ে গেল।

—কাজল নিয়ে গেল!—মহাবীর চুপ্‌সে গেল।

—নিয়ে গেল মানে?

—মানে।—কি বললি?

—কিচ্ছু না। তবে যাবার আগে বীথি জিজ্ঞেস করলে—কবে আসছে। জানলি, ক্লীন বললুম—তবে তোর মত ক্লীন নয়। সেমি ক্লীন্ বলা যেতে পারে। মুখের ওপর এ বিগ নো-ও'-ও তুই-ই খালি বলতে পারিস আর কেউ পারে না। বললুম মাসকেলের বিয়ের হৈ-চৈ চুকলে যাব। যার মানে আগষ্টের গোড়া, তদ্দিনে ধামাচাপা পড়ে যাবে। তা ছাড়া কাজলের সঙ্গে আলাপ হল—। উঠলি কেন?

—স্যার, সন্ধ্যে নাগাদ যেতে বলেছেন।

কিংশুক গম্ভীরভাবে বললে—বস, কথা আছে।

মহাবীর কিংশুকের কণ্ঠস্বরে ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড়ল। টেবিলের ওধার থেকে হাত বাড়িয়ে কিংশুক বললে—দেখি তোর হাত দু'টো।

মহাবীর হাত বাড়িয়ে দিলে, হাত দু'টো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কিংশুক বললে—মহাবীর, গুড এগ। আই লাভ ইউ।

মহাবীর ফ্যাল ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে বললে—মানে।

—মানে, তুই বিয়ে কর। ইয়েস্ ব্রাদার, বিয়ে কর। ইউ লাভ বীথি।

—হাত টেনে নিয়ে মহাবীর বললে—সে সামথিং সেন্সিবল্।

—বিয়ে! হুঁ!

—বিয়েটা মোটেই ননসেন্স ব্যাপার নয়। গম্ভীরস্বরে কিংশুক বললে। অগ্নিদৃষ্টি হেনে মহাবীর চলে গেল।

রাগিণী ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে গুন্ গুন্ করছে। তনুকা পাশে এসে দাঁড়াল খেয়ালই নেই। এতখানি বেসামাল অবস্থায় রাগিণীকে এর আগে তনুকা দেখে নি, বুঝতে পারলে কিছু একটা সাজ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে।

গায়ে ঠেলা দিয়ে তনুকা বললে—জেগে আছিস না ঘুমিয়ে পড়েছিস।

—দুই-ই। ভেতরে জেগে থাকলেও বাইরে ঘুমিয়ে পড়েছি।

—ও বাবা! এ যে সাপের গর্ত, চোখ দেখে বোঝবার উপায় নেই। কি ব্যাপার বল দেখি। অবস্থাটা ভাল ঠেকছে না।

—তুই বল না।

তনুকা সম্ভব অসম্ভব অনেকগুলো অবস্থার কথা বলে গেল।

প্রতিবারেই রাগিণী মাথা নেড়ে বললে—উঁহু হল না। বলতে পারলি না।

তনুকা রাগিণীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বললে—এতক্ষণে বুঝেছি।

শুকদেবদা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে। উঁহু শুধু দেখা নয় আরও বেশী আরও কিছু। কেমন ঠিক বলি নি।

—কি করে বুঝলি?

গম্ভীরভাবে বললে—মুখ দেখে। মুখে যে কিংশুকফুলের রং লেগেছে। ঢাকবি কি করে।

রাগিণী তাড়াতাড়ি তনুকাকে কাছে টেনে নিলে। তনুকা মোড়ার ওপর বসে বললে—হঠাৎ দেবদর্শন হল কি করে শুনি।

সব শুনে তনুকা বললে—ইস্ অল্পের জন্যে অমন জমাটি সীনটা দেখা ফস্কে গেল। বিষ্টি থামলে একবার ভাবলুম আসি। আবার ভাবলুম সবে মোটে চারটে গিন্নী নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। এই কাণ্ড হচ্ছে জানলে ঝড়-বিষ্টি মাথায় করে চলে আসতুম। আমায় কারুকে দিয়ে খবর পাঠাবি তো!

—একদম মনে ছিল না।

—তা থাকবে কেন?

—তা যা না। এখন গেলেও জমাটি সীন দেখতে পাবি। তুই তো রোমিও জুলিয়েটের ব্যালকনি সীন দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলি। যা এখন গেলেও বোধ হয় ড্রইংরুম সীন্ দেখতে পাবি।

—কোথায়?

—ইজিদের বাড়ী। কাজলের চোখে যা আলো দেখেছি তা একেবারে 'বেকন লাইট'। তাড়াতাড়ি কি নিভবে!

—ঠিক বলেছিস্।—বলে বাইরের দিকে তাকিয়ে জিভ্ দিয়ে একটা আওয়াজ করে মুখ ভার করে বললে—সন্ধ্যে হয়ে এল। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। মা ভীষণ বকবে। তারপর একটু ভেবে বললে—না ঘুরেই আসি। বকুনী তো রোজ অদৃষ্ট মাপাই আছে, খণ্ডাবে কে? যাই দেখি যদি ইজি এ্যাফেয়ার দেখার সৌভাগ্য হয়।

ওদিকে তখন ফায়ারিং আরম্ভ হয়ে গেছে। ফায়ার করছে বীথি আর যা ছুঁড়ছে তাকে কস্মিনকালেও ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করা বলে না।

—আপনি কি মনে করেন আপনার মতলব আমি কিছু বুঝি না। আমি কচি খুকী?

মহাবীর মনে মনে বললে—খুকী হলে তো বেঁচে যেত ম, তা'হলে এ দুর্মতি হতো না।

—কি চুপ করে রইলেন যে।

—আমি কি বলেছি তুমি খুকী।

—আপনি চান না কিংশুক এ বাড়ীতে আসে। কার বাড়ী এটা আপনার না আমার?

—প্রফেসর মণ্ডলের।

—তবে? আপনি তাকে আসতে বলেন নি কেন? অথচ নিজের ত' দু'বেলা আসা চাই।

—বিশ্বাস কর বলেছি।

—বলেছি! তবে এলো না কেন? কেন বললে যে মহাবীর আমায় কিছু বলে নি।

—কিংশুক তো বলে নি, বলেছে রাগিণী।

—আপনি শুনেছেন? রাগিণী জানবে কোত্থেকে? আমি সব বুঝি। আপনি ভেবেছেন যে কিংশুক না এলে আমি আপনার দিকে ঢলে পড়বো।

মহাবীর বিস্ময়ে বললে—ঢলে পড়া কথাটা তোমার মুখে মানায় না।

—মানাবার জন্যে বলি নি শোনাবার জন্যে বলেছি। বীথি মণ্ডল অত চীপ্ নয়। এতদিন তো ঘরঘুর করছেন। বুঝতে পারেন না। তবু যদি চেহারাটা মানুষের মতো হত।

মহাবীরের চোখ ফেটে জল এলো।

—কি বললে?

—বললুম ঐ তো চেহারা। চিড়িয়াখানায় গেলে বাঁদরেরা ওয়েলকাম করবার জন্যে ছুটে আসবে। ঐ চেহারা নিয়ে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না আর গেলেও এ বাড়ীর নয়। আমি অত চীপ্ নই, বুঝলেন নট্ সো চীপ্।

এইবার মহাবীর ফায়ারিং আরম্ভ করল।

—বাঁদর! বাঁদর তবু ভালো। তোমার জামাইবাবু পানতুয়া সে কি। ডু ইউ নো হোয়াট হি ইজ্। একটা মোষ। নো, নট এ মোষ, এ বাইসন ইয়েস এ বাইসন। বাঁদর আমাদের ফোর-ফাদার শুধু আমার নয় তোমারও। কাজেই বাঁদরেরা ওয়েলকাম করলে সেটা এমন কিছু লজ্জার নয়। এ বিট মাংস হিয়ার, এ বিট মাংস দেয়ার। তখন এই বাঁদরই ফুল ফ্লেজেড ম্যান্ হবে। কিন্তু মোষ? সে কোনদিনই মানুষ হবে না।

আর সেই মোষের গলায় এ বাড়ীর মেয়েই মালা দিয়েছে। চীপ নও! কি যে নও তা জানতে বাকী নেই।

—মহাবীরবাবু। বীথি গর্জে ওঠবার চেষ্টা করল।

—খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। থ্যাঙ্ক গড হি হ্যাজ সেভড্ মি। খুব বেঁচে গেছি। ইয়েস্ আমার একটা উইকনেস্ ছিল। আই ডু কনফেস্। এখন আর সেটা নেই। বীথি মণ্ডল চীপ্ নয়। বাঁদরই হই আর হনুমানই হই আমার যা আছে শুনলে অনেক রাজকন্যাই মালা নিয়ে ছুটে আসবে। বীথি মণ্ডল তাদের কাছে শাঁকচুন্নী। লুক হিয়ার বীথি মণ্ডল। মাসীমার ছেলেপুলে নেই। তার ওয়ারিশ আমি। আমার বাপও যা রেখে গেছেন তাও অল্প নয়। এইভাবে থাকি ঐ সামান্য মাইনের চাকরী করি বলে ভাবো হি ইজ এ ট্রাম্প। ও ইউ ডোণ্ট নো দি মিনিং অফ্ ট্রাম্প। বাংলা করে বলি বাউণ্ডুল, ভবঘুরে। ভাব ওটা একটা লোফার। মাই ওয়ারথ ইজ্ মোর দ্যান তু' হানড্রেড থাউজেণ্ড রুপীস্। বুঝলে দু' লাখ টাকার ওপর। আমার ভুল হয়েছে। প্রথম থেকেই যদি পানতুয়ার মত গোছা গোছা নোট দেখাতুম আর প্রেজেণ্ট কিনে আনতুম তখন বোঝা যেত বীথি মণ্ডল চীপ্ কি ডিয়ার। তখন এই বাঁদরের বাঁদরী হবার জন্যে বীথি মণ্ডল আহার নিদ্রা ত্যাগ করত। নাউ আই থ্যাঙ্ক গড সে ভুল করেছিলুম বলেই বীথি মণ্ডল ঢলে পড়ে নি, আমিও কেটে পড়তে পেরেছি। বলে গটগট করে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এসে বললে—ইয়েস্ ম্যানাদার থিং। কিংশুককে আমি এখানে আসবার কথা রিমাইণ্ড করে দিয়েছিলুম। অ্যাণ্ড এ্যাট দি সেমটাইম আসতেও বারণ করেছিলুম। আর এও বলে রাখছি হি উইল নেভার কাম। কিংশুক অত চীপ্ নয়। নাউ দি মানকি ইজ্ আউট প্লে উইথ দ্যাট হাড়গিলে কাজল বসু। বাঁদর।...ওয়ান ডে ইউ শ্যাল হ্যাভ টু—বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে হন্ হন্ করে খানিকটা হেঁটে মহাবীর পাকুড় গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে চোখে জল এসে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো ভাল করে মুছে সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই কানে এল—মহাবীরবাবু।

থমকে দাঁড়াল, এ তো বীথির গলা নয়। তবে কে? ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে তমুকা। তমুকা কাছে এসে বললে—একটু আস্তে আস্তে হাঁটুন, বাবা: হাঁপিয়ে গেছি।

বিস্মিত হয়ে মহাবীর বললে—আপনি এখানে কোথায়?

—আপনার পেছনে পেছনেই ত' বীথিদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম।

—ওখানে ছিলেন?

—হ্যাঁ, ঢুকতেই আপনাদের কথা কানে আসতে ছোট ঘরটায় বসেছিলুম। আমি সব শুনেছি।

তমুকার শোনাটা ভালো হয়েছে কি না বুঝতে না পেরে মহাবীর চিন্তিত ভাবে বললে—শুনেছেন?

—হ্যাঁ। আমার এত রাগ হচ্ছিল। আপনি বসে তাই শুধু কথা শুনিয়েই চলে এলেন। আমি হলে চুলের মুঠি ধরে ঠাস্ করে একচড় কষাতাম। নিজে তো ভারী রূপের ডালা। চোখ দু'টো একটু ঢেলা ঢেলা সেই দেমাকে যাকে যা মুখে আসে তাই বলবে।

মনের মত কথাটা হওয়াতে মহাবীর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললে—ফরনাথিং কি রকম যা তা বললে দেখলেন তো।

আপনি ঠিকই বলেছেন চুলের মুঠি ধরে—বলে চড় তুলে বললে—ঠাস্ করে—

রাস্তার লোকেরা কি ভাবছে ভেবে লজ্জিত হয়ে তমুকা বললে—আঃ কি করছেন। লোকে দেখছে যে। এটা রাস্তা।

মহাবীর সংযত হয়ে বললে—হ্যাঁ ভুল হয়ে গেছে। আমার খেয়াল ছিল না। সরি, ক্ষমা করুন।

তমুকা তাড়াতাড়ি বললে—ঠিক আছে, ঠিক আছে। চলুন আমাদের বাড়ী, সব শুনবো। পা চালিয়ে চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে মহাবীর বললে—আপনাদের বাড়ী?

—কেন আপত্তি আছে?

—না আমার আপত্তি ঠিক—মানে আপনার বাড়ীর সবাই। এক বীথির খপ্পর থেকে কি আর এক বীথির খপ্পরে পড়বো না কি।

—আমার বাড়ীর সবাই মহাবীর হাজরাকে চেনে। আপনার আর আমার বাবা বকুলবাগানে একই স্কুলে পড়তেন।

তা জানি।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে প্রাণভরে কথা বলে চা, পাপড় ভাজা, মুড়ি, মোচার ঘণ্ট ও তালের পাটালী দিয়ে গরম গরম রুটী খেয়ে যখন মহাবীর তমুকার কাছে বিদায় নেবে বলে উঠে দাঁড়াল তখন আবার তার চোখ দু'টো জলে ভরে এলো।

তমুকার দৃষ্টি এড়াল না। সে বললে—এ কি আপনার চোখ দু'টো যে জলে ভরে এসেছে।

মহাবীর বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখ দু'টো চেপে ধরে মাথা নীচু করে বললে, ও কিছু না। বলে কিছুক্ষণ পরে তমুকার মুখের দিকে চেয়ে বললে, জান তমুকা। আজকের দিনটা আমার জীবনের স্মরণীয় দিন, ইটস এ রেড লেটার ডে জীবনের চরম লাঞ্ছনা আর পরম সান্ত্বনা দুই-ই আজ পেয়েছি। বীথি মণ্ডলের মত অমন অপমানও আমাকে এর আগে কেউ করে নি আর তোমার মত পরম যত্ন করে খেতেও আমাকে এর আগে কেউ দেয় নি। তাই তো বলছি ইটস এ রেড লেটার ডে। আমি কবি নই, নো, নেভার, তবুও কবিদের মত বলতে ইচ্ছে করে যে চরম লাঞ্ছিত না হলে পরম বাঞ্ছিতকে পাওয়া যায় না। তাই বার বার চোখে জল আসছে।

—ছিঃ। অত সহজে পুরুষমানুষের চোখে জল আসবে কেন?

—বোধ হয় এর চেয়ে বড় সম্পদ আর আমার নেই। আমি দুঃখে ত' কাঁদিই আবার সুখের সময়ও আমার চোখে জল দেখা যায়। দ্যাটস মাই পিকিউলারিটি। আর যদি আমাদের দেখা নাও হয় তবুও আজকের দিনটা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

—কেন দেখা হবে না?

—দেখি অন্য কোথায়ও কিছু কাজ-টাজ পাওয়া যায় কি না। এখানে থাকবার ইচ্ছে নেই। কালই ছুটির দরখাস্ত দেব। ছুটি নিয়ে বাইরে যাব চাকরীর খোঁজে।

তমুকা শান্তকণ্ঠে বললে—না, তোমার কোথায়ও যাওয়া চলবে না।

বিস্মিত হয়ে মহাবীর বললে—তমুকা তুমি কি বলছ?

—বললাম তো কোথায়ও যেতে পারবে না।

তমুকার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মহাবীর বললে—তমু, যদিও আমার অনেক টাকা আছে তবুও চেহারা বা অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে আমি তোমার যোগ্য নই। ইন ফ্যাক্ট আমি কোনও মেয়েরই যোগ্য নই। বীথি আর যাই হোক একটা কথা ঠিকই বলেছে আমাকে দেখতে বাঁদরের মত না হলেও—।

বাধা দিয়ে তমুকা বললে—আমাকে দেখতে ঠিক শাঁকচুন্নীর মত না হলেও আমি যে রাজকন্যের দাসী বাঁদী হ'বার যোগ্য নই তা আমি জানি। বাবার ওষুধ খেলে দু'দিনে তোমার চেহারা পাল্টে যাবে। আর টাকা? বেশী টাকায় আমার দরকার নেই খাওয়া পরা জুটলেই হল কাজেই ওসব কথা থাক। আজ থেকে আমার কথা ছাড়া তোমার কোনও কিছু করা চলবে না। এই আমার হুকুম।

—ও মাই কুইন দাই উইল বি ডান্—বলে মাথা ঝুঁকে বললে—মানে—একটা কথা মনে এলো—ঐ টাকার ব্যাপারে।

তমুকা চোখ পাকিয়ে বললে—আবার!

—না না তোমার শুনে রাখা ভালো। বীথিকে টাকার ব্যাপারে ব্লাফ দিয়েছি।

তমুকা কৃত্রিম হতাশার সুরে বললে—আমি যে ঐ শুনেই তোমার দিকে ঝুঁকলাম!

মহাবীর হেসে বললে—সে মেয়ে নও তুমি, তা বুঝতে পেরেছি।

—ব্লাফটা কি শুনি।

—মানে টাকার অ্যামাউন্টটা দু'লাখ টাকার বেশীও হ'তে পারে আবার কমও হ'তে পারে। শেয়ারগুলোর কোনও কোনটার দাম পড়েছে কোনটার আবার দু'এক পয়েন্ট গেইনও করেছে। তেমনি লটারির পেপারের কোন কোনটার মার্কেট ভ্যালু এখন বিলো পার।

—আমার কাছে সব এনে দিও। উনুনে দিয়ে দুর্ভাবনা ঘোচাবো। [ক্রমশ।

গ্রেট বৃটেন—

প্রফুমো কেলেঙ্কারী সম্পর্কে গোটা ডেনিং রিপোর্টের প্রকাশের পর বৃটেনে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রফুমো-কীলার-আইভানভের গোপন সম্পর্কের ফলে বৃটেনের কোনো গোপন তথ্য ফাঁস কিংবা তার নিরাপত্তার ক্ষতি হয়েছে কি না তাই তদন্ত ও পরীক্ষার ভার ছিল বিচারক লর্ড ডেনিং-এর ওপর। এ-কেলেঙ্কারীর কথা প্রথম প্রকাশ পেলেই বৃটেনে সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড় ওঠে। সাধারণ লোক ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাক্তন সমরমন্ত্রী ছাড়াও আরো কয়েকজন মন্ত্রী, সেক্রেটারী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এ-কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত।

গোটা বৃটেনের সমাজজীবনের মান এর ফলে নেমে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। বাস্তবিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভার পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করেছিলেন অনেকে। বিরোধী শ্রমিক দলপতি মিঃ হ্যারল্ড উইলসন ও উদারনৈতিক দলের নেতা মিঃ জো গ্রিমণ্ড প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতেও কসুর করেন নি। তাঁরা মিঃ ম্যাকমিলানকেই বৃটেনের সমাজজীবন কলুষিত ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করেছেন। মিঃ গ্রিমণ্ড বলেছেন যে, মিঃ ম্যাকমিলান বৃটিশ নাগরিকদের দাস্থপথে চালিত করছেন। মিঃ উইলসনও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থে বিচারককে কাজে লাগাচ্ছেন এ-অভিযোগ এনেছেন।

ডেনিং রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার আর কেউ এ ব্যাপারের সাথে যুক্ত ছিলেন না। যে-নিরাপত্তার প্রশ্নে এ হৈ-চৈ উঠেছিলো তাও সত্য প্রমাণিত হয় নি। লর্ড ডেনিংয়ের মতে প্রফুমো-কেলেঙ্কারীর ফলে বৃটেনের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় নি। প্রাক্তন সমরমন্ত্রীকেও রেহাই দিতে লর্ড ডেনিং বলেছেন, যদিও রুশ দূতাবাসের প্রেস এ্যাটাচি আইভানভের সঙ্গে বিনোদিনী কীলারের প্রেম ভালবাসার ফলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা বা ঝুঁকি ছিলো, আসলে তা ঘটে নি।

মিঃ প্রফুমো সম্পর্কে লর্ড ডেনিং তাঁর রায়ে আরো বলেছেন যে, প্রাক্তন যুদ্ধমন্ত্রীর রাষ্ট্রানুগত্য সন্দেহাতীত। তাঁর কাজের রেকর্ড বরাবরই ভালো, কাজেই তাঁর দ্বারা দেশের গোপন তথ্য ফাঁস হবে এটা কল্পনার বাইরে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিরাপত্তা বিভাগেরই বলে লর্ড ডেনিং মন্তব্য করেছেন। এ-সম্পর্কে লর্ড ডেনিং আরও একটি নতুন সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ১১ বছর আগে স্যার উইনস্টন চার্চিল যখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন নিরাপত্তা বিভাগটিকে স্বরাষ্ট্র-সচিবের অধীনে হস্তান্তর করেন। কিন্তু যেহেতু কেলেঙ্কারীর মুখ্যনায়ক একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সেইজন্যে মিঃ ম্যাকমিলান স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হেনরী ব্রুকস্‌কে অব্যাহতি দিয়ে নিজেই চরম দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মিঃ প্রফুমো সম্বন্ধে ডেনিং রিপোর্টের সার কথা হলো যদিও বিনোদিনী কীলারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে প্রাক্তন সমরমন্ত্রীর নৈতিক স্খলন ঘটেছে কিন্তু তার জন্যে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে মনে করার কোনো কারণ নাই।
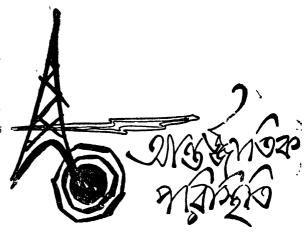
কিন্তু তবুও বৃটেনে আজ উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভার পদত্যাগের জন্যে যেমন দাবী উঠেছে তেমনি স্বয়ং ম্যাকমিলানের অপসারণ কামনা করছেন তাঁর দলীয় কিছু সংখ্যক সদস্য। সরকারী চীফ হুইপ মিঃ রেডমেইন প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যখন কিছুদিন আগে মিঃ ম্যাকমিলানের নেতৃত্ব-সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন ২০ জন রক্ষণশীল সদস্য এই আশায় মিঃ ম্যাকমিলানের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন যে, শীগগিরই তিনি নেতৃত্ব পদ ত্যাগ করবেন। কিন্তু এখন যেহেতু তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, রক্ষণশীল দলের পেছনের সারির সদস্যরা আবার জনমত সংগ্রহ করবেন মিঃ ম্যাকমিলানের বিরুদ্ধে এবং তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করবেন। মিঃ ম্যাকমিলান অবশ্য বীরের মত বলেছেন, নেতৃত্বপদ রক্ষার জন্যে তিনি শেষ অবধি সংগ্রাম করে যাবেন। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন সুরু হলে যখন ডেনিং রিপোর্ট অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হবে, তখন ম্যাকমিলান-বিরোধিতা চরমে উঠবে বলে মনে হয়। ম্যাকমিলান-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হলে বিরোধী দলগুলি ছাড়াও রক্ষণশীল দলের অন্তত ২৭ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়ে মিঃ ম্যাকমিলানের আসন টলিয়ে দিতে পারেন, এমন সম্ভবনা দেখা দিয়েছে।

লর্ড ডেনিং

ডেলিং রিপোর্ট সম্পর্কে অন্য সংবাদ হলো ৫০ হাজার শব্দ সম্বলিত ২০০ পৃষ্ঠার এ রিপোর্ট লুফে নিচ্ছে প্রতি কপি সাড়ে পাঁচ টাকা দামে। আমেরিকাই কিনেছে ৩ হাজার কপি। বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকাগুলি যে নতুন পাওয়া সংবাদের ওপর রঙ চড়িয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে নেবে তা সহজেই অনুমেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—

পৃথিবীতে এমন আশাবাদী লোকও আছেন যাঁরা পরিণতির কথা বিবেচনা না করেই বেপরোয়াভাবে কাজ করে যান। আলাবামার গভর্ণর ওয়ালেস এ-জাতেরই লোক। দক্ষিণ আমেরিকার অঙ্গরাজ্য আলাবামার শাসক গভর্ণর ওয়ালেস বর্ণবৈষম্যের নীতিতে গভীর বিশ্বাসী।

গত বছর স্কুল ও অন্যান্য সাধারণের জন্য ব্যবহার্য স্থান সমূহে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার দেবার—সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অমান্য করে গভর্ণর ওয়ালেস কুখ্যাত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনা ও মার্শালের প্রেরণে ওয়ালেসকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে, বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে আলাবামায় আর কোনো গোলমাল দেখা দেবে না। কিন্তু সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আলাবামায় আবার নতুন ক'রে গোলমালের সৃষ্টি হলো এবং সৃষ্টি করলেন স্বয়ং গভর্ণর ওয়ালেস।

রাজ্যরক্ষী বাহিনী ও সেনাবাহিনী নিয়োগ করে গভর্ণর ওয়ালেস চাইলেন শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট স্কুলগুলিতে যেন কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশাধিকার না লাভ করতে পাবে। ঘটনাটা ঘটেছিলো, যখন গ্রীষ্মাবকাশের পর আলাবামার টাস্কেগী, মবিল, বার্মিংহাম ও হান্টসভিল প্রমুখ চারটে শহরের শ্বেতাঙ্গ স্কুলগুলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত একীকরণ নীতি প্রয়োগের প্রশ্ন উঠলো। গোঁড়া বর্ণবিদ্বেষী সংবাদপত্র বার্মিংহাম পোষ্ট হেরাল্ড যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আদেশ খুশী মনে নিতে না পারলেও জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলো সুপ্রীম কোর্টের আদেশ মেনে চলার জন্যে। কিন্তু সে-আবেদন স্বয়ং গভর্ণর ওয়ালেস কানে তোলেন নি।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর যখন ১৩ জন নিগ্রো বালক-বালিকা টাস্কেগী স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে এলো সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর ওয়ালেস ১০০ জন রাজ্য জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন নিগ্রো ছেলেমেয়েদের প্রতিরোধ করতে। মুহূর্তের মধ্যে ওয়ালেসের রক্ষীবাহিনী গোটা স্কুলটাকে ঘিরে ফেললো এবং পাঠেচ্ছু নিগ্রো বালক-বালিকাকে বাধ্য করলো স্কুল ত্যাগ করতে। গভর্ণর ওয়ালেসের এ-ধরণের ব্যবহারকে শহর কর্তৃপক্ষ শহর আক্রমণ বলে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্কুলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে জাতীয় রক্ষীবাহিনী।

একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটলো বার্মিংহামেও। গভর্ণর ওয়ালেস নিজে না কি এখানকার জাতিবিদ্বেষী শ্বেতকায়দের উৎসাহ জুগিয়েছেন, বার্মিংহাম স্কুলে প্রবেশকামী নিগ্রো ছেলেমেয়েদের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য। ওখানেই শেষ নয়। নিগ্রো নেতা আর্থার শোর্স-এর বাড়িটিকে ডিনামাইট বিস্ফোরণের দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রতিক্রিয়া দেখা দিল নিগ্রোদের মধ্যে। সুরু হল দাঙ্গা। এ-দাঙ্গা যাতে বিস্তৃতি না লাভ করে সেজন্যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী টহল দিয়ে বেড়ালো সারা শহরে, হাঙ্গামাকারীদের নিরস্ত করার জন্যে গুলীবর্ষণও করলো পুলিশ।

গভর্ণর ওয়ালেসের সুবিধা হলো। শান্তির অজুহাত তুলে বিরোধিতা করলেন চারটি শহর একীকরণের নীতির। আলাবামার ফেডারেল জজ গভর্ণর ওয়ালেসকে কারণ দর্শাবার নোটিশ জারী করেছেন এই মর্মে যে, বার্মিংহামের স্কুলগুলিতে একীকরণ নীতি প্রয়োগে হস্তক্ষেপের চেষ্টা থেকে তাঁকে কেন নিবৃত্ত করা হবে না। আলাবামার অন্যান্য শহরগুলিতেও হয় তো শীগগিরই এ-ধরণের নোটিশ জারী করা হবে গভর্ণর ওয়ালেসের ওপর। কিন্তু তারপরেই বার্মিংহাম চার্চে সমবেত নিগ্রো শিশুদের ওপর আক্রমণ করে ২ জনকে হত্যা ও ১৭ জনকে আহত করা হল। বিভীষিকার সৃষ্টি হ'ল সমগ্র আমেরিকায়।

কিন্তু ওয়ালেস সরকারের এ-ধরণের নারকীয় অত্যাচার সত্ত্বেও একীকরণের কাজ সাফল্যের সঙ্গে চলছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির নির্দেশে জাতীয় রক্ষীবাহিনী এখন ফেডারেল সরকারের অধীনে আনা হয়েছে এবং ফেডারেল সৈন্যদের সহায়তায় নিগ্রো ছাত্ররাও এখন বার্মিংহাম স্কুলে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে।

দক্ষিণ ডাকোটা—

দক্ষিণ ডাকোটার পাঁচ সন্তানের (চারটি বালিকা ও একটি বালক) মা শ্রীমতী এণ্ড্র ফিসার একসাথে পাঁচটি সন্তান প্রসব করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। নবজাত শিশুদের মধ্যে চারটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। মেয়েদের নাম রাখা হয়েছে মেরী ও ছেলেটির নাম জেমস এণ্ড্র। শিশুদের পিতা মিঃ এণ্ড্র ফিসার (৩৮) মালখানায় সপ্তাহে ৪০০ টাকা বেতনে সাধারণ কেরাণীর কাজ করেন। আমেরিকায় এ-টাকার ক্রয়ক্ষমতা সামান্যই। হঠাৎ তাঁর পরিবারে সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মিঃ ফিসার খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা সাহায্যও ইতিমধ্যে লাভ করেছেন।

নিউইয়র্ক—

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পাকিস্তানের সুবিধাবাদী নীতির সমালোচনা করেন। কাশ্মীর প্রসংগে উত্থাপিত পাকিস্তানের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী পণ্ডিত জোরালো যুক্তিই দিয়েছেন। কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী তুলে পাক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ জেড এ ভুট্টো যে বক্তৃতা দিয়েছেন, ভারতীয় নেত্রী তাকে মায়াকান্না বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ১৬ বছরের মধ্যে পাকিস্তান একবারও সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারে নি? এমন কি, তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীরে'ও কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। কিন্তু ভারতীয় এলাকার কাশ্মীরীদের জন্যে পাকিস্তানের দরদের অন্ত নেই। ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তিনটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। পাক প্রস্তাবের জবাবে শ্রীমতী পণ্ডিত বলেছেন, পাকিস্তানের উচিত প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য বাহাওয়ালপুর, কামাত কিংবা পাখতুনদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া।

তিনি আরো বলেন, কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণ আজ মূল প্রশ্ন নয়।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

আসল বিবেচ্য বিষয় হল, পাকিস্তানের ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ কাশ্মীর আক্রমণ এবং আজও যে আক্রমণের অবসান ঘটে নি।

পাক-চীন আঁতাত সম্পর্কে শ্রীমতী পণ্ডিত বলেছেন, চীনের সঙ্গে পাকিস্তান এক সুবিধাজনক গাঁটছড়া বেঁধেছে মাত্র। যেহেতু চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত পশ্চিমী দেশগুলি থেকে অস্ত্রসাহায্য লাভ করেছে, অতএব সে-অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে—এ-ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই পাকিস্তান চীনের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে সীমানা চুক্তি করে বসেছে। সীয়াটোর (SEATO) চেয়ে চীনই এখন পাকিস্তানের বড় দোস্ত। 'এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র' থেকে পাকিস্তান যে সাহায্য লাভের কথা বলেছে তা-ও ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে। পাকিস্তানের মতিগতি বন্ধুজনোচিত হলে সে লাডাকের ভারতীয় জমি চীনকে খয়রাত দিয়ে চীনকে দোস্ত মনে করতে পারতো না।

রাষ্ট্রসংঘে বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডি এক অভিনব প্রস্তাব করেছেন। পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে যখন দুই বিরাট দেশের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মস্কো চুক্তির মাধ্যমে, রুশ-মার্কিন যুক্ত উদ্যমে চন্দ্র অভিযান হবে এর পরবর্তী পদক্ষেপ। উভয় দেশ মহাকাশ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আহরণ করেছে, তাকে যদি কাজে লাগানো যায় যুক্তভাবে, স্নায়ুযুদ্ধ আরো হ্রাস পাবে বলে প্রেসিডেন্ট কেনেডি মনে করেন।

সোভিয়েট-মার্কিন চন্দ্র অভিযানের ফলে গোটা মানবজাতির প্রতিনিধিই চন্দ্রে অবতরণ করবে। চন্দ্রগ্রহে মালিকানা নিয়েও আমেরিকা কারুর সঙ্গে বিরোধ করবে না বলে প্রেসিডেন্ট কেনেডি জানিয়েছেন।

কিউবায় এক জনসভায় প্রথম মহাকাশ বিজয়িনী শ্রীমতী ভেলেন্টিনা তেরেস্কোভা বলেছেন যে, চন্দ্রগ্রহে অভিযাত্রীদলে একজন মহিলা থাকবেন, তাঁর সাথী হবেন একজন পুরুষ। হাভানা রেডিওর সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমতী তেরেস্কোভা না কি বলেছেন যে, প্রথম মহাকাশ বিজয়ী রুশ যুবি গাগারিনই চন্দ্র অভিযানে নেতৃত্ব করবেন এবং ভ্যালেন্টিনা হবেন তাঁর সহচরী।

অষ্ট্রিয়া—

যুগোশ্লাভিয়া সফরের পর লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট টাবম্যান সস্ত্রীক অষ্ট্রিয়া এসে পৌছিলে অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হের এডলফ শেরফ ও চ্যান্সেলর ডঃ আলফন্স গরবাক বিপুলভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। তাঁর সম্মানার্থে প্রদত্ত ভোজসভায় প্রেসিডেন্ট টাবম্যান যাঁরা সদ্য-স্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলির রাষ্ট্র পরিচালনার সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন তাঁদের তিনি জোরালো ভাষায় নিন্দা করেন। নানা বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও আফ্রিকান দেশগুলি সদর্পে এগিয়ে চলেছে বলে প্রেসিডেন্ট জানান। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতাই আফ্রিকানদের লক্ষ্য।

সমস্ত দেশের প্রতি প্রেসিডেন্ট টাবম্যান এ-আবেদন জানান যে, তারা যেন আফ্রিকার পরাধীন ও অত্যাচারিত জনগণের মানবিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে সর্বতোভাবে সাহায্য করে।

তেরেস্কোভা

টাবম্যান

প্রেসিডেন্ট টাবম্যান অষ্ট্রিয়ার যে-সব জায়গা পরিদর্শন করেন তার মধ্যে ভিসের্স্ট লৌহ ও ইস্পাত কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানাগুলির অন্যতম। প্রেসিডেন্ট টাবম্যানকে জানানো হয় যে, অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে লাইবেরিয়াতেও অনুরূপ কারখানা গড়া সম্ভব।

নাইজিরিয়া—

নাইজিরিয়ায় দশমাসব্যাপী বিচার-বিসম্বাদের পূর্ণচ্ছেদ পড়লো। পশ্চিম নাইজিরিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চীফ আওলোয়ো রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দশ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

অভিযোগ করা হয় যে, গত বছর ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে—প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নাইজিরিয়া সফরের প্রাক্কালে চীফ আওলোয়ো তাঁর দু'শো শিক্ষাপ্রাপ্ত সহচরকে নিয়ে নাইজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্যর আবুবকর তাফাওয়া, বেলেওয়া ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

আওলোয়ো

চীফ আওলোয়ো পশ্চিম নাইজিরিয়ার শক্তিশালী ইয়োরুবা উপজাতির নেতা এবং আবুবকর সরকারের বিরোধীদল 'অ্যাকসন গ্রুপে'রও অধিনায়ক। নাইজিরিয়ার প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় আওলোয়োর মুখ্য ভূমিকা ছিলো।

আওলোয়ো নাইজিরিয়ার বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করা একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। নাইজিরিয়ার তিনি একজন শ্রদ্ধেয় নেতা। কাজেই ঘানা থেকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে আবুবকরকে হত্যা করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন, এ-কথা নাইজিরিয়ার অনেকেই বিশ্বাস করে নি। কিন্তু বিচারক জর্জ সোয়েমিনো ৫৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে চীফ আওলোয়োকে শাস্তি না দিয়ে পারেন নি। নাইজিরিয়াতে পরিষদীয় গণতন্ত্র সাফল্যের সূচনা করেছিল, কিন্তু বিরোধীদলের নেতাকে এভাবে কঠোর শাস্তিদানের ফলে অনেকেই আশংকা করতে সুরু করেছেন যে, হয় তো শীগগিরই এখানে পরিষদীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হবে এবং একক পার্টিশাসন সূচিত হবে।

এদিকে পশ্চিমাঞ্চলের কানো প্রদেশের অধিবাসী প্রধানমন্ত্রী আবুবকর নাইজিরিয়াকে আগামী ১লা অক্টোবর বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার জন্য সচেষ্ট। ইংলণ্ডের রাণী নন, নির্বাচিত প্রেসিডেন্টই হবেন রাষ্ট্রপ্রধান।

উত্তর কোরিয়া—

পিয়ং ইয়ং : কারো নামের উল্লেখ না করে, সাম্রাজ্যবাদ বজায় থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ার নেতাদের উদারপন্থী সংশোধনবাদী বলে অভিহিত করেছেন চীনের চেয়ারম্যান লিউ-শাও-চি।

উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়ং-এ তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতাকালে এই আক্রমণ চালিয়েছেন। নামের উল্লেখ না করে মিঃ লিউ-শাও-চি ক্রুশ্চেভ-টিটোর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তাগিদে এবং আণবিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ থেকে তাঁরা সরে যাচ্ছেন। লিউ-শাও-চির কথায় পরিষ্কার বোঝা যায় যে, চীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিশ্বশান্তির নীতিতে বিশ্বাসী নয়।

চীনের প্রতি পূর্ণ সমর্থনজ্ঞাপক চিঠি সোভিয়েট নাগরিকদের কাছ থেকে পেয়ে তা' প্রকাশ করার সংবাদ পরিবেশন করে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি আসর জমিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এই চিঠি জাল ঘোষণা করে সোভিয়েট রাশিয়া হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে।

মিথ্যার বেসাতিতে চীন যে কতটা ওস্তাদ এবং সে-কাজে তাঁরা যে কোন আন্তর্জাতিক সৌজন্যবোধেরও ধার ধারেন না, এই জাল চিঠি প্রকাশ থেকেই তা পরিষ্কার হবে। ভারতের বিরুদ্ধে চীনের এই ঘৃণ্য মিথ্যা প্রচারে যাঁরা এক সময় বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের নিশ্চয়ই আর কোন সন্দেহ থাকবে না চীনের প্রচারচক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে। রাশিয়া তার দোসর। এখনও রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া সে চলতে পারে না, তা' সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে নির্লজ্জ প্রচার চালাতে সে কসুর করছে না। চীন তার স্বার্থে যে-কোন প্রতারণার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না, এই কথা আবার প্রমাণ হল।

'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দরিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন যাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর তুল্য থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্ম কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগ্য বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরীব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরীবরাই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে।'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

উনচল্লিশ

সকল যুগের সব সাধকের ধারা যেমন অবলীলায় এসে মিলেছিলো শ্রীরামকৃষ্ণর চিরজাগ্রত চোখের তারায়, তেমনই সকল ধর্মের সব সাধনার স্রোত এসে পড়েছে যেখানে সেখানেই সকল বিশ্বের যিনি নাথ, বিশ্বনাথের বেশে এসে বসেছেন। যিনি শিবের ডমরুধ্বনিতে সৃষ্টির প্রতিধ্বনি শুনতে পান, আর যিনি শ্রীকৃষ্ণর মুরলীতে শুনতে পান সেই কথা ফুলের যে কথা চিরকাল শুনতে চায় অলিতে, এঁরা দু'জনেই জীবনের গংগা-যমুনায় অবগাহন করতে আসেন কাশীতে। শাক্ত আর বৈষ্ণব এ-নিয়ে লেখা হবে কত কথা বইয়ের পাতায় জ্ঞানীর। ভক্তের চোখের পাতায় দেখা হবে শুধু কালী-কৃষ্ণে কোনও পার্থক্য নেই। যিনি এক, তিনিই আর এক। পণ্ডিতের মূঢ়তায় কাশী আর বৃন্দাবনে দুস্তর ব্যবধান। সাধকের ধেয়ানে সৃষ্টির একই বৃন্ত ওরা দু'টি ফুল। যেমন ভাবে দেখতে চাও, তেমনই ভাবে দেখো। যেমন ভাবে চাখতে চাও, তেমনই ভাবে চাখো। কাশীতে দেখতে চাও শ্যামের লীলা, দু'চোখ ভরে দেখো, যিনি শিব, তিনিই সুন্দর, তিনিই বৃন্দাবনের লীলা অভিসারের সার, শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনে বলো, তোমার বংশীধারী মূর্তির বদলে দেখাও ত্রিশূলধারী দিগম্বরকে,—দেখতে, যিনি মনোহর তিনিই মংগল, যিনি পীতাম্বর, তিনিই দিগম্বর। রামপ্রসাদ হও, যেতে হবে না কাশী, হালিসহরেই পায়ে হেঁটে আসবেন তিনি, ভক্তের ডাকে যে ভগবানের না এসে উপায় নেই কোনও কালে। তখন গান করো, সেই 'এক'-এর জয়গান,..কাজ নেই তোর কাশী গিয়ে। তারামায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে তুমি বামাক্ষ্যাপা যদি ক্ষেপে ওঠো কাশী যাবো বলে, তবে ফিরে আসতে হবে তোমাকে তারামায়ের তীরে, কারণ তারার কথায় যে আস্থা হারায়, কাশীর বিশ্বনাথ বারাণসীতে পা দেওয়া মাত্রই তাড়ায় তাকে। তখন জীবনের একতারায় উদগীত হয়, যে তারা সেই তারকেশ্বর। দুই-ই এক।

যদি বলো, মূর্তিতে তিনি নেই, তাহলে সেই আমি তখন 'নেই আমি' বলে ফুটে উঠবেন। ঈশ্বর কোনও বিভূতি নন; ঈশ্বর শুধু অনুভূতি। মলরূপে তিনিই পরিমলরূপে যিনি। ফুল হয়ে ফুটেছেন; হুল হয়েও ফুটে আছেন তিনিই। যিনি আলো, অন্ধকারও তিনি ছাড়া আর কে। দেহের অতীত যে, দেহ-ও যে সেই-ই—এ বিশ্বাস সন্দেহের অতীত। তুমি কলসীর কানা ছুঁড়ে মারো রাগে অন্ধ হয়ে, অনুরাগের কানাই-ই জেনো তোমার মধ্যে দিয়ে রাগে কানা হয়ে ছুঁড়েছেন সে অস্ত্র নিজেরই উদ্দেশে। তুমি রোগে মুক্তি চাও, আরোগ্য হবে। রূপ-যশ-শত্রুবিনাশ চাও, তা-ই পাবে। যে চায় আর যে না চায় দু'জনকেই বিশ্বদেব তুমি নাচাও তোমার অরূপ নৃত্যের তালে সকালে সন্ধ্যাকালে।

সব পাখীকেই ফিরে যেতে হবে ঘরে। সব নদীকেই সিন্ধুতে। শুধু প্রহ্লাদ নয়। হিরণ্যকশিপুও দেখবে তাঁকেই। জীবনমরণ হরণ করে যিনি দাঁড়িয়েছেন নৃসিংহের বেশে। সব রত্নাকরকেই বাল্মীকি হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বিস্মিত হবার নেই। সকলের মধ্যেই সেই রাম আর কৃষ্ণকে একদিন রত্নাকর আর কংস নিধন করে দেখা দিতেই হবে। ঠাকুরের কথাও তাই। খেতে পাবে সবাই; কেউ সকাল-সকাল, কেউ বেলায়। পথের ধারে পায়ের তলায় যে কৃমিকীট, আর দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা মহা জনশূন্যতায় তার রাত্রি সাংগ করছে। তারা দু'জনেই সেই তারার আলো, বামাক্ষ্যাপা যে তারা-র আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসেছিলেন।

'আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' শুধু ভুলছি যে আমরা রাজা। না ভুললে ফকিরের ভূমিকায়, সৈনিকের সজ্জায়, কেরাণীর বেশে, পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে মজে থাকবো কি করে? আর মজে না থাকলে মজা কোথায়? মনে পড়লেই তো ছুটোছুটি শেষ, অশেষ ছুটি সুরু হয়ে গেল সেই। শুধু বিবেকানন্দ কে বললে? আমাদেরও যেই মনে পড়বে আমরা কে, তৎক্ষণাৎ আমাদেরও ধর্ম-অধর্ম, বিদ্যা-অবিদ্যা, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন-মুক্তির পালা খতম। তাই ভুলিয়ে রাখা। তাই মজিয়ে রাখা। অহংকারে, অলংকারে রাখা আচ্ছন্ন করে। স্বয়ং বিশ্বনাথ যিনি, তিনিও তো তাই ভোলানাথ।

'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না',—ঠিক। ফুরোলেই তো লীলা অবসান। 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ',—এ তত্ত্ব যখন নিছক কাব্য থেকে জীবনকাব্য হবে, তখন গীতাঞ্জলির কবি আর গীতার কবিতে তফাৎ নেই। তখন জানা হয়েছে তাই, সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন, বীতরাগ ভয় ক্রোধ হতে বাধা কোথায়? তখন কে বলে, 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায় যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' সব বাধা তখন সবমুক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ হতেই হবে। আজ অথবা কাল, সন্ধ্যাকে হতেই হবে সকাল। বিশ্বের সকল অনাথকে হতেই হবে বিশ্বনাথ।

যিনি জ্ঞানী, তিনি তর্ক করেন। যিনি বিজ্ঞানী, তিনি নস্তাৎ করেন। যিনি সাধক তিনি বিভূতি দেখান। যিনি ভক্ত কেবল তিনিই ভগবানকে পান। বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ করে রেখেছ তোমার সৃষ্টির পথ। এ জাল ছিন্নভিন্ন হয় কেবল তাহই হাতে যে বিশ্বাসী অনায়াসে পেরেছে ছলনা সহ্য করতে এবং এই বিশ্বাসও তার কৃতিত্ব নয়। কারণ এ-ও সে পেয়েছে বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুখ-দুঃখে কর্মফল খোয়াতে খোয়াতে। জন্ম-মুহূর্তেই তাই এবারে 'ক' লিখতে—লিখে বসে আছে কৃষ্ণ। সে বালক নিজেও জানে না কেন কৃষ্ণনাম তাকে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ করে। কৃষ্ণকে পায় কেবল সে-ই জগতে এসেই যে বলে, দেখা দাও। জীবনের সবল কুরুক্ষেত্রেই একথা সত্য। যে না লিখে পারে না শুধু সে ই যথার্থ লেখক। লেখা তার কাছে খেলা। খেলা তার কাছে একমাত্র লেখা। হংস যেমন জলে অনায়াসগতি, জন্ম থেকেই, পরমহংসও তেমনই কেবল সে-ই যে কখনও 'আমার' কথা বলে না। জিজ্ঞেস করলেই বলে, না করলেও বলে, 'মা'-র কথা বলছি।

ঠাকুরের গলায় ব্যথা। ভক্তরা বললো: মা-কে বলুন না, যাতে দু'টো খেতে পারেন। ঠাকুর বললেন: মা বলেছেন, এতগুলো ভক্তের মুখে ত খাচ্ছিস? একথা ঠাকুর না হলে বলবার সাধ্য আছে কার। বইয়ের পাতায় যদি একথা লেখা থাকতো তা'হলে চোখের পাতায় তাকে দেখবার জন্যে কেঁদে মরত না কোটিকে গোটিক কেউ। তা'হলে এই কাব্য, 'নয়ন তোমারে দেখিতে না পায় রয়েছ নয়নে নয়নে' এ কেবল কাব্যই হতো; জীবন-কাব্য হতো না রামপ্রসাদ থেকে রামকৃষ্ণের কান্নায়।

যিনি ঠাকুর শুধু তিনিই জানেন সব ঠাকুরের ইচ্ছেয়। যে রূপে মজেছে, আর অপরূপ মজিয়েছে যাকে দুই-ই তাঁর ইচ্ছেয়। আকার কিংবা নিরাকার তিনি কি এবং তিনি কি নন, এ নিয়ে তর্ক,—এও তাঁরি খেলা। যাকে দেখতে দেবেন না, যাকে জানতে দেবেন না সে কে, সে দেখতে পাবে না কোনও শাস্ত্র মন্থন করে, কোনও সাধনায় ধরা পড়বে না সেই অধরা; আবার যাকে দেখতে দেবেন, জানতে দেবেন কে সে, কোনও শাস্ত্র না পড়েই চোখের পাতায় সে প্রত্যক্ষ পড়বে, সে নিজেই সে-ই। কেবল সেই বলবে, বলতে পারবে: মাকে বল্! আমাকে বলিস নি!

রথ ভাবে, পথও ভাবে, মূর্তি যে ভাবে সে-ই দেব, এবং তাতে যে অন্তর্যামী হাসে, একথা যিনি লিখেছেন, তিনি যদি আরেকটু লিখতে পারতেন যে, রথ এবং পথ এবং মূর্তি, এরাও সেই অন্তর্যামীরই মূর্তি, তা'হলে দেখতেন, তা'হলে একথাও লিখতেন যে, যিনি প্রণাম করেন এবং যিনি প্রণাম নেন,—এ দু'য়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এঁরা একই দুই হয়েছেন।

পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ স্বর্গ-মর্ত্য-জন্মমৃত্যু,—কেবল ততক্ষণই যতক্ষণ না মনে পড়ছে যে তুমিই সে-ই। আসলে ওসব কথার কোনও অর্থ নেই। যারা বলে, পাপীকে ক্ষমা কর, পাপকে নয়;—তারা যদি আরেকটু দেখতে পেত। তা'হলে বলতো, পাপ ও পাপীকে, ক্ষমা করবার বা শাস্তি দেবার কেউ নও তুমি। কারণ ওরাও সেই তাঁর মূর্তি, যাঁর মূর্তি আছে কি নেই এই নিয়ে তর্কের শেষ নেই আজও।

মাতাল, দুশ্চরিত্র, সাধু, অনাসক্ত, রাজা এবং প্রজা, পণ্ডিত ও মূঢ়, এ সবই চেতনার ভিন্ন ভিন্ন রং মাত্র। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, যিনি রামকৃষ্ণ, তিনিই জগাই-মাধাই, কংস, হিরণ্যকশিপু। তিনি দেবী চণ্ডী হয়ে মারছেন, মহিষাসুর হয়ে মার খাচ্ছেন। তিনিই বৃন্দাবন, যিনিই বারাণসী। লোক পৃথিবী জুড়ে ধনবৈষম্যের কথা বলে। তিনি ওই রকম বলান, তাই বলে। না হলে বলতো, যতক্ষণ তিনি চাইবেন একদল উপবাসে থাকবে আরেকদল বাস করবে সুখস্বর্গে ততক্ষণ কোনও ইসম্-এর ক্ষমতা নেই সে বিধানকে উল্টে দেয়।

ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন দেবী-কণ্ঠ: আমার ইচ্ছেয় মুসলমানরা যদি আমার মন্দির নষ্ট করে থাকে, তোর কি তাতে। ইচ্ছে করলেই কি আমি এই মুহূর্তে সপ্ততল স্বর্ণমন্দির তৈরী করতে পারি না? পারি। কিন্তু তবুও ভগ্নমন্দির হয়ে পড়ে আছি যে সে আমার লীলা!

জানি। আপনি বলবেন যে, সবই যদি তাঁর ইচ্ছেয় তবে তো চুপ করে বসে থাকলেই দিন চলে যেত। যারা বলে এই কথা, তারা একবার চুপ করে বসে থেকে দেখুক না,—দিন চলে কি না। চুপ করে বসে থাকতে দেয় না যে সে। যাকে দেয় তাকে মরুভূমিতে মা ভগবতী আপন স্তন্যে অমৃত দান করে।

শুধু ব্যক্তি নয়, জাতির ক্ষেত্রেও তাই, যুগের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষের মতোই যুগের এবং জাতির উত্থান-পতন আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ভারতবর্ষের পরাধীনতাও তাই কবিচিত্তকে বিচলিত করলেও বিস্মৃত হতে দেয় নি এ বার্তা যে, 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে তা ভাগ্যে লিখা' লোকহিত কথাটা আমরা বৃথাই বলি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি জানে, ওকথা ছেঁদো। কোনও লোক কোনও লোকের হিত করতে পারে না। তবুও তা বলতে হয় তার কারণ না হলে সমাজ রসাতলে যায়। আব্রহ্মস্তম্ব সবের যিনি মূলে সেই এক যিনি অনেক হয়েছেন তিনি লোকহিত অথবা অহিত নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরকের সীমাহীন ঊর্ধ্বে তাঁর বাস। কর্মচক্রের দম দিয়ে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সবাইকে। এই দম যতক্ষণ না ফুরোচ্ছে, ততক্ষণই জন্ম-জন্মান্তর, জীবন-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ নরক। পুরুষকার বনাম অন্ধ বিশ্বাসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ততক্ষণই।

এ তত্ত্ব যারা জেনেছে তারা বিভ্রান্ত হয় না কখনও। তারা মানুষের শূন্যে হাত পা ছোঁড়ায় হাসে। যার কর্ম, যার সংস্কার, যাকে দিয়ে যা করাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তার অথবা অন্য কারুর কিছু করবার নেই। একই বাড়িতে একজন টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না, আরেকজন টাকা ছাড়া সব বোঝে। কেন? দু'জনের সংস্কার দুরকম বলে। তাহলে কে পারে প্রারব্ধকে পরিবর্তিত করতে? গুরু পারেন। এই গুরুও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সময় না হওয়া পর্যন্ত দুঃসময় ঘোচে না কারুর।

শুধু গুরু নয়, কে শাক্ত আর কে বৈষ্ণব, কে কাশীর আর কে বৃন্দাবনের, এও ঠিক হয়ে আছে জন্ম-মুহূর্তের অনেক আগে থেকেই। আমি জানি। আমি জানি, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু

আন্তর্জাতিক হকিতে ভারতের সাফল্য

হকি খেলায় ভারতের গৌরবপূর্ণ ভূমিকা আজও বিশ্বের সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন যদিও ভারত বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়েছে। কিন্তু আজ ভারত বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবার তারা লিঁয় আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভ করে বে-সরকারীভাবে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে পাওয়ার সুদৃঢ় সম্ভাবনা যে গড়ে তুলেছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গত রোম অলিম্পিকে এবং পরে জাকার্তায় এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারতকে পাকিস্তানের কাছে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্ব হারাতে হয়। এই বিপর্যয়ের জন্য ভারতের হকি-কর্ণধারেরা বিচলিত হয়ে পড়েন। হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। খ্যাতনামা প্রবীণ কোচ শ্রীহাবল মুখার্জীর শিক্ষাদানে এইসাবসার খেলোয়াড়দের গঠন হয় ঐরূপ প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে এবারকার লিঁয় হকি প্রতিযোগিতার ফলাফলই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফ্রান্সের লিঁয় হকি প্রতিযোগিতাকে প্রাক-অলিম্পিক প্রতিযোগিতা বলে গণ্য করা চলে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলগুলি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান ছিল না তবে ভারতকে এই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্মুখীন হতে হয় নি।

লিঁয় হকি প্রতিযোগিতায় বৈদেশিক ও ফরাসী সাংবাদিকরা সর্বসম্মতিক্রমে ভারতকে উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ দল নির্বাচিত করেছেন। হল্যাণ্ড ১ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় ও পশ্চিম জার্মানী ৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান পায়। এই নির্বাচনের ফলে ভারত ও হল্যাণ্ড তিনটি করে কাপ লাভ করে। একটা আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদানের জন্য, একটি সাবিকালীন খেলার জয়ী হওয়ায় এবং অপরটা সাংবাদিক কর্তৃক শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচিত হওয়ায় তারা পুরস্কার পেয়েছে।

ভারত প্রথম দুটো খেলায় পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। তবে তাদের পরবর্তী সকল খেলায় প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। ভারতীয় খেলোয়াড়দের 'ষ্টিকের' উপর আধিপত্য ও 'সর্ট পাস' পদ্ধতি সকলকে আনন্দ দেয়। ইউরোপের অধিকাংশ খেলোয়াড় বল 'হিট' করে ও অতিরিক্ত দৈহিক-শক্তি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধেও ভারত এক উন্নত ধরণের ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ভারত সাতটি খেলায় অংশগ্রহণ করে কেবলমাত্র পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে প্রথম খেলায় এক পয়েন্ট নষ্ট করে। তারা অপরাজিত ভাবেই শীর্ষস্থান লাভ করেছে। পশ্চিম জার্মানী দ্বিতীয় স্থান পায়। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান মোটেই সুবিধা করতে পারে নি। তারা দু'টো খেলায় পরাজিত হয় ও একটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে।

এবারকার প্রতিযোগিতায় বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করা গেছে যে হল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলির হকি খেলার মান অনেক উন্নত হয়েছে।

টোকিও অলিম্পিকের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দলের ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফরের ব্যবস্থা হয়েছে। তা ছাড়া হকিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কয়েকটা বৈদেশিক দলও ভারত সফর করবে।

এই সব সফর থেকে ভারত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে সেটাই তাদের ভবিষ্যত ক্রীড়াধারা সংশোধনের পক্ষে সহায়ক হবে।

অলিম্পিকের প্রস্তুতি হিসাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় বাছাই করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার। তাতে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলকে অধিকতর শক্তিশালী হতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

বি এন আর দলের আই এফ এ শীল্ড বিজয়

প্রথম শ্রেণীর ফুটবলে বি এন আর দলের আত্মপ্রকাশ বেশী দিনের নয়। কিন্তু এর মধ্যে তারা যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সেটা কেবল বাঙ্গালা দেশ নয় সারা ভারতের ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এর জন্য প্রথমেই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ ও খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৩ সাল বি এন আর দলের ফুটবল ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় বলা চলে। তাদের এবারকার সাফল্যের কথা ক্লাবের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এবার তারা ভারতের প্রাচীন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড বিজয় করে ভারতের খেলাধূলার আসরে তাদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বি এন আর দলের এবারকার সাফল্য আর একদিকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা প্রথম ফাইন্যালে অংশগ্রহণ করেই সাফল্য অর্জন করেছে। এটা সত্যই কৃতিত্বের পরিচয়। শুধু তাই নয় তারা এবার শীল্ডে প্রায় সকল খ্যাতনামা দলকেই পরাজিত করেছে। গত বছরের বিজয়ী এবং এবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে, দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত দল হায়দ্রাবাদ একাদশকে সেমি ফাইন্যালে এবং বহু ঐতিহ্যের অধিকারী এককালের দুর্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিং দলকে ফাইন্যালে পরাজিত করে বি এন আর শীল্ড লাভ করেছে। এই সাফল্য সত্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। পরিচালকদের আন্তরিক প্রচেষ্টাই তাদের সাফল্যের পথে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে সুযোগ্য সম্পাদক শ্রী এস কে খান্না দল পরিচালনায় যে নজীর রেখেছেন তা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বি এন আর দলে খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের সমন্বয় ঘটেছে। খেলোয়াড়রা তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছেন। বি এন আর দলের এবারকার সাফল্যলাভের পথে সুযোগ্য প্রশিক্ষকদ্বয় শ্রীদেবু ঘোষ ও শ্রী এস মেওয়ালালের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা শিক্ষাদানের এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যার ফলে খেলোয়াড়রা দলগত সংহতির যে পরিচয় দিয়েছেন, তা সকলের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী বি এন আর দলের খেলোয়াড়গণ

বি এন আর দলের এবারকার সাফল্যের জন্য আর একজনের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তিনি হলেন সুযোগ-সন্ধানী খেলোয়াড় আপ্পালারাজু। তিনি অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য ও গোল করার এক অপরূপ দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রাপ্ত সুযোগ সদ্ব্যবহার করার উপরই দলের সাফল্য নির্ভর করে। সেই দিক দিয়ে আপ্পালারাজুর ভূমিকা সকলের অভিনন্দনযোগ্য।

এবারকার ফাইন্যালে এককালের দুর্ধর্ষ দল মহামেডান স্পোর্টিং পরাজিত হলেও তারা যে ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছে—তা তাদের পূর্ব ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এবার লীগের খেলায় মহমেডান বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি। কিন্তু শীল্ডের খেলা তাদের বিশেষ ভাল হয় এবং ফাইন্যালে তাদের ভূমিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। এ পর্যন্ত মহমেডান দল ছয়বার শীল্ড ফাইন্যালে উন্নীত হয়ে চারবার জয়ী হয়েছে—আর দু'বার পরাজিত হয়েছে।

আর একদিক দিয়ে এবারকার শীল্ড ফাইন্যাল উল্লেখযোগ্য। বেশ কিছুদিন যাবৎ কলকাতার দুই প্রধান—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলই ফুটবলে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছিল। এবারকার ব্যতিক্রম তাই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে! তা ছাড়া এবার আর একটা বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে জনপ্রিয় দল না হলেও ভাল খেলায় ক্রীড়ামোদীদের সমর্থন পাওয়া যায়। এবার ফাইন্যাল খেলায় দর্শক সমাগমই তার প্রমাণ দিয়েছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণে কলিকাতার সাফল্য

সর্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতা অর্থাৎ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসর এবারে কলকাতার আচার্য [illegible] বাগে পাতা হয়েছিলো। তিনদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল সর্ববিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রেখে চ্যাম্পিয়ানশিপ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের ২০০ মিটার বাটার ফ্লাইতে নতুন রেকর্ডের অধিকারী কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের ১০০ মিটার বাটার ফ্লাইতে নতুন রেকর্ডের অধিকারী কলকাতার মধুসূদন সাহা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সন্তরণ দলের অধিনায়িকা কল্যাণী বসু

লাভ করেছে। ছাত্রদের দলগত প্রতিযোগিতা, ছাত্রীদের দলগত প্রতিযোগিতা, স্প্রিং ও হাই বোর্ড ডাইভিং এবং ওয়াটারপোলো এই চারটি বিভাগে কলকাতা দল সর্বাধিক পয়েন্ট লাভ করে। গত বছর ছাত্রদের দলগত প্রতিযোগিতা ও ওয়াটারপোলোয় বোম্বাই দল সাফল্য লাভ করেছিল। এবার বোম্বাই দলের নিকট হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই দু'টো বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপ ছিনিয়ে নিয়েছে। উপরন্তু ছাত্রীদের জন্য এই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় কলকাতা দলের প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ। বোম্বাই দল একমাত্র ছাত্রদের বিভাগেই কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে ছিলো। কলকাতা অপেক্ষা মাত্র ৫ পয়েন্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। অবশ্য ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বোম্বাই দলের সাঁতারুগণ উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ছাত্রদের মোট নটি বিষয়ের মধ্যে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ৬টিতে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩টিতে প্রথম স্থান লাভ করে। রিলেতে উভয় দলের সাফল্য সংখ্যা সমান সমান। অর্থাৎ ১ × ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে কলিকাতা এবং ৪ × ১০০ মেডলে রিলেতে বোম্বাই দল সাফল্য লাভ করে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন জাগে বোম্বাই দল ১০টির মধ্যে ৭টি প্রথম স্থান লাভ করেও দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করতে পারলো না? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে বোম্বাই দল অধিক বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করলেও কলকাতা দল ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ বিষয়ে প্রথম তিনটি স্থানের মধ্যে দু'টি স্থান দখল করেছে, বস্তুত এমন কোন বিষয় নেই যাতে কলকাতার কোন না কোন প্রতিযোগী প্রথম তিনটির স্থানে একটি স্থান লাভ করে নাই। অপর দিকে বোম্বাই প্রতিনিধি ১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাইতে কোনও স্থান লাভে সমর্থ হয় নাই।

ছাত্রীদের বিভাগে এই বছরই সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট চারটি বিশ্ববিদ্যালয় এতে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কলকাতা দল ৪৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানশিপ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে প্রথম স্থানাধিকারিণী কলকাতার সন্ধ্যা চন্দ্র (ডাইনে), ১০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোকে প্রথম স্থানাধিকারিণী কলকাতার মীরা কারিয়াপ্পা (মধ্যে) ও তৃতীয় স্থানাধিকারিণী পাঞ্জাবের সুরিন্দার সোমন (বামে)।

লাভ করেছেন. পুণা দল ১৪ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং পাঞ্জাব মাত্র ১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটির মধ্যে সন্ধ্যা চন্দ্র একাই চারটিতে যোগদান করে সব কটিতেই প্রথম স্থান লাভ করেন। রেস্ট স্ট্রোকে সন্ধ্যা চন্দ্র যোগদান না করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মীনা কাশ্যপ এই বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেন। ৪ × ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে কলকাতা দল প্রথম স্থান লাভ করে। ছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বিভাগে যিনি প্রথম স্থান লাভ করেছেন তাঁর সময়টাই রেকর্ড হিসাবে গণ্য হবে। তবে সন্ধ্যা চন্দ্রের বর্তমান সময় জাতীয় রেকর্ড অপেক্ষা অনেক পেছিয়ে। যাই হোক এবারের প্রতিযোগিতায়—দলগত প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের জন্য চ্যাম্পিয়নশীল্ডের ব্যবস্থা থাকলেও ছাত্রীদের জন্য কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল না. এটা বড়ই দুঃখজনক। কারণ যেখানে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি

বোম্বাইতে এবার জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার আসর বসে। সার্ভিসেস দলের এবারও প্রাধান্য সর্ব বিষয়ে পরিস্ফুট থাকে। তারা ১৩টি বিষয়ের মধ্যে ১২টিতে প্রথম স্থান লাভ করে পুনরায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। তবে এবারকার প্রতিযোগিতায় বেশ আশ্চর্যের উপলব্ধি করা গেছে যে ভারতে সন্তরণের মান বিশেষ নিম্নগামী। এবারকার অনুষ্ঠানে একটিও রেকর্ড হয়নি। মহিলা বিভাগে বোম্বাই শীর্ষস্থান পায়। বাঙ্গালা সিনিয়র বিভাগে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও জুনিয়ার বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে।

জাতীয় ওয়াটারপোলো ফাইন্যালে রেলওয়ে দল বাঙ্গালাকে পরাজিত করে পুনরায় চ্যাম্পিয়ান হয়।

এবারকার প্রতিযোগিতায় পরিচালনায় যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গেছে। ফলে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বিশৃঙ্খলার ক্ষুণ্ণ হয়।

বোম্বাইয়ের কয়েকজন সাঁতারু সঙ্ঘ দলের ম্যানেজারের ভুল বোঝাবুঝির ফলে কয়েকজন প্রতিযোগী সাঁতার ও ওয়াটারপোলোয় যোগদান করেননি। বোম্বাই সুইমিং এসোসিয়েশন তাঁদের বিরুদ্ধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা চিন্তা করছেন বলে প্রকাশ। বোম্বাইয়ের সাঁতারুদের এই মানসিকতা সত্যই দুঃখজনক।

এবার পুরুষদের ১৫০০ মিটার সাঁতারে পশ্চিমবঙ্গের নিমাই দাস সার্ভিসেস দলের রাম সিং-এর সঙ্গে সমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালান। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। রাম সিং ২১ মিঃ ১৫.২ সেঃ প্রথম স্থান অধিকার করলেও তাঁর সময় মোটেই আশাপ্রদ নয়। কারণ তিনি এর পূর্বেই ২০ মিঃ ২২.৫ সেঃ উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এবারকার প্রতিযোগিতায় জুনিয়ার বিভাগে বাঙ্গালার প্রেমময় বিশ্বাস বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। মহিলা বিভাগে রেলওয়ের সন্ধ্যা চন্দ্র ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে প্রথম স্থান লাভ করলেও ১০০ মিটারে তিনি বোম্বাইয়ের ভেরা ভেসিকার নিকট পরাজয় বরণ করেন। এবার সন্ধ্যা চন্দ্রের ভূমিকা বিশেষ হতাশাব্যঞ্জক।

দলগত অবস্থা

পুরুষ বিভাগ—সার্ভিসেস ১১১ পয়েন্ট, রেলওয়ে ২৪ পয়েন্ট, বাঙ্গালা ২৩ পয়েন্ট ও বোম্বাই ও দিল্লী ২ পয়েন্ট।

মহিলা বিভাগ—বোম্বাই ২৫ পয়েন্ট, বাঙ্গালা ১১ পয়েন্ট, রেলওয়ে ১৬ পয়েন্ট, দিল্লী ২ পয়েন্ট ও মহারাষ্ট্র ১ পয়েন্ট।

জুনিয়ার বিভাগ—বাঙ্গালা ৪৩ পয়েন্ট, বোম্বাই ১৫ পয়েন্ট, দিল্লী ৩ পয়েন্ট ও মহারাষ্ট্র ১ পয়েন্ট।

ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের এবারকার সাধারণ বার্ষিক সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এম সি সি দলের ভারত সফরের ক্রীড়াসূচী অনুমোদন করা হয়। ১৯৬৫ সালের শীতকালে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর শেষে ভারতের বোম্বাই, কলকাতা ও দিল্লীতে তিনটে টেষ্ট খেলা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে ১৯৬৫—৬৬ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে ভারত সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান হবে বলে ঠিক হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে ভারত পরিভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হবে এবং ১৯৬৪ সাল অথবা ১৯৬৫ সালে একটি জুনিয়ার ভারতীয় দলকে ইংলণ্ড সফরে পাঠাবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

ফাষ্ট বোলার আনার ব্যবস্থা

বাইরে থেকে খ্যাতনামা 'ফাষ্ট বোলার' আনা সম্পর্কে এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবারকার সভায় অনুমোদন লাভ করে। অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলার মিকেঞ্জি ১৯৬৪ সালে তিন মাসের জন্য ভারতে আসতে রাজি হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ওয়েসলি হল এবং ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড ট্রুম্যানকে আনার সকল প্রকার চেষ্টা করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

খেলোয়াড়দের সাহায্য দান

এবার বোর্ড প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাহায্যদানের যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। অসুস্থ প্রবীণ খেলোয়াড় সি এস নাইডুকে এককালীন দুই হাজার টাকা এবং মাসিক আড়াই শত হিসাবে আরও তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের সময় মাথায় আঘাত পাওয়ায় ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁকে বার হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া বাঙ্গালার প্রাক্তন টেষ্ট খেলোয়াড় এন চৌধুরীকে দু' হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের এবারকার সিদ্ধান্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং সকলেই তাঁদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।
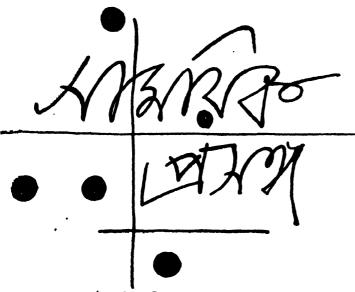
একটি অভিনন্দনীয় প্রয়াস

'কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ হেলথ হোম রুগ্ন ছাত্রসমাজের চিকিৎসা ও সেবাকার্যে গত কয়েক বছর ধরিয়া যে মূল্যবান কাজ করিয়া যাইতেছেন তা' শুধু ছাত্র নয়, এই শহরের সর্বশ্রেণীর নাগরিকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন কলেজে রুগ্ন এবং অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য হেলথ হোম একটি অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। হেলথ হোমের উদ্যোগে একটি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসক ও কম্পাউণ্ডার সহ সুসজ্জিত হইয়া গাড়ী করিয়া বিভিন্ন কলেজে গিয়া চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। সংবাদে প্রকাশ ষ্টুডেণ্টস্ হেলথ হোমের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সুপারিশে কেন্দ্র হইতে হেলথ হোমকে ১৫ হাজার টাকা দান করা হইয়াছে। এই ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই ৩৫ হাজার টাকা এবং বছরে ৬ হাজার করিয়া টাকা ব্যয় হইবে। আমরা আশা করি এইরূপ কল্যাণমূলক কার্যে হেলথ হোমের নিশ্চয়ই টাকার অভাব হইবে না। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ইউনিয়নগুলি একাজে সাহায্য করার জন্য নিশ্চয়ই ইহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবেন।'

—দৈনিক বসুমতী।

অপরাহ্নে রোগী দেখা

'সামান্য ফী লইয়া কলিকাতার কয়েকটি হাসপাতালে অপরাহ্নে রোগী দেখার ব্যবস্থা করার কথা ইতিপূর্বেই সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন। গত সোমবার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই ব্যবস্থার প্রথম উদ্বোধন করেন। গত মঙ্গলবার সুখলাল কারনানী হাসপাতালে এই ব্যবস্থার উদ্বোধন হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে সাধারণ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে দুই টাকা ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পাঁচ টাকা করিয়া ফী লাগিবে। সাধারণ রোগ ছাড়া অন্যান্য জটিল রোগ এবং অস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য রোগের চিকিৎসারও ব্যবস্থা থাকিবে। এই ব্যবস্থার কথা ঘোষিত হওয়ার সময়ই আমরা উহা সমর্থন করিয়াছি। পুনরায় বলিতেছি যে, যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা যদি এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে রোগী দেখাইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে সকালে এক দিকে যেমন রোগীর ভিড় হ্রাস পাইবে, তেমনই দরিদ্র রোগীদেরও চিকিৎসার সুবিধা হইবে। কলিকাতার ও মফস্বলের অন্যান্য হাসপাতালেও এই ব্যবস্থা ক্রমশ প্রবর্তিত হইলে জনসাধারণ সত্যই উপকৃত হইবে।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

দুর্নীতির সংজ্ঞা

'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় বলেন, শুধু ঘুষ নেওয়াটাই দুর্নীতি নয়। কাজে ফাঁকি দেওয়া, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ না করা, নিজের কাজ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া ইত্যাদিও দুর্নীতি। তিনি মন্ত্রী, বিধানসভার সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা···সব পর্যায়েই এই শেষোক্ত ধরণের দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করেন। পরিধিটা আরো বাড়াইলে পুলিশ, হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, পৌর নিয়ন্ত্রণ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও নির্ভয়ে এই দুর্নীতির বলয়-ভুক্ত করা যাইতে পারে। আসলে কাজ না করা, অকাজ করা এবং করণীয় কাজের জন্য দস্তুরি দাবী করা একই অসাধুতার রকমফের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যাধিটা বোধ হয় আমরা সকলেই বুঝি। কিন্তু ইহার চিকিৎসা কি?'

—যুগান্তর।

ভ্রান্তপথ

'ভারত-শাসকেরা পণ্যমূল্যের ক্ষেত্রে সার্থক হস্তক্ষেপের পরিবর্তে আলোচনা-বিলোচনা এবং স্থূল ঘোষণার পথই বাছিয়া লইয়াছেন। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় মূল্যনীতি-নির্ধারণের ব্যাপক নান্দীপাঠ আছে। যদিচ, তাহা ছিল নিছক সদিচ্ছা। মহার্ঘতার প্রতিরোধ অবসান শাসন-কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রেত, এমন কথা কেহ বলিবে না। মূল্যের ঊর্ধ্বগতি আপসে আপ রুখিয়া গেলে তাঁহাদের খুশিয়ালী মাত্রা ছাড়াইবে। উহার জন্য কিছু করার প্রশ্নে কিন্তু আগাগোড়াই তাঁহাদের ঘোরতর অনিচ্ছা। তাঁহারা কচিৎ-কদাচিৎ চুনোপুঁটিদের গায়ে হাত দেন। রুই কাৎলার বেলায় তাঁহাদের অপূর্ব সম্ভ্রম। অতএব, জিনিষপত্রের চড়া দাম কমাইবার পাঁয়তারা কষিতে কষিতে তাঁহারা তৃতীয় পরিকল্পনা প্রায় কাবার করিয়া আনিতেছেন।'

—লোকসেবক।

সংখ্যাতাত্ত্বিকদের প্রতি

'সংখ্যাতত্ত্বের statistics-এর কাজ অনেক। কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাজকর্ম, আয়-ব্যয় ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা হয়ত্ত হইতে দেখা যায় মহানগরী কলিকাতায় খাটাল নামক একটি কুখ্যাত বস্তু আছে। খাটালের মধ্যে আবার মহিষের খাটালই প্রসিদ্ধ। কলিকাতা ও শহরতলীতে বড় বড় নামী রাজপথের ধারে যে সকল মহিষের খাটাল আছে ছোট বড়, উহার মোট সংখ্যা কত এবং এই সকল খাটালের মালিক কাহারা, এই সকল খাটালের মালিকগণের কত অংশ বাঙ্গালী আর কত অংশ অবাঙ্গালী। কেহ বলেন, এই সকল মহিষের এবং খাটালের মালিক একজনও বাঙ্গালী নহে হয় তো

ইহাই সত্য। তবে সঠিক জানিবার জন্য সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌গণের হিসাব প্রয়োজন। মহিষের খাটালে উহার মালিকগণ কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাহারও হিসাবে জানা যাইবে।'

—জনসেবক।

ট্যাক্সি ধর্মঘট

'কলিকাতায় ট্যাক্সি চালকদের আকস্মিক ধর্মঘট বাঙ্গালা দেশে অবাজকতার আর একটি বড় নিদর্শন। কলিকাতার নূতন পুলিশ কমিশনার সহরে চলাচল ভদ্রলোকের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। লোকে ফুটপাথ ফাঁকা থাকিতেও রাস্তায় হাঁটিবে এবং গাড়ীতে ধাক্কা খাইলে তখনি হইবে গাড়ীর দোষ। কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে একটি মামলা হইয়াছিল। এক পথচারী একটি গাড়ীর সঙ্গে রাস্তায় জোর ধাক্কা খায়। সে নিজেও আহত হয় এবং গাড়ীটিরও এমন ক্ষতি হয় যে কয়েক শত টাকা ব্যয়ে উহা সারাইতে হয়। আদালতে মামলা হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট পথচারীকে দণ্ডিত করিয়া আদেশ দেন যে গাড়ী মেরামতের সমস্ত খরচা তাহাকে দিতে হইবে। কলকাতায় ট্যাক্সির অত্যাচার অবর্ণনীয়। পুলিশ তার প্রতিবিধানে অবতীর্ণ হইয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছে। সেদিন যে ড্রাইভারেরা ধর্মঘট করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের শাস্তি হইলে ভাল হইত।'

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

চুক্তির পরে

'করিমগঞ্জ সীমান্তে লাঠিটিলা-ডুমাবাড়ী এলাকায় ১৩০ ঘণ্টাব্যাপী পাকিস্তানী গুলীবর্ষণের পর গত ২০শে সেপ্টেম্বর সুতারকান্দিতে ভারত-পাকিস্তান সেক্টর কমাণ্ডারদ্বয়ের এক যুক্ত বৈঠকে যে গুলীবর্ষণ বিরতি চুক্তি হয় তদনুযায়ী গুলীচালনা বন্ধ হইয়াছে সত্য : কিন্তু লাঠিটিলা ও ডুমাবাড়ী গ্রামের ভারতীয় এলাকায় বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী এখনও অপসারিত হয় নাই—এই সংবাদ দিল্লীর কর্তাদের গোচরীভূত হইয়াছে কি? পাকিস্তানী সিপাহীদের দৌরাত্ম্যে উক্ত ভারতীয় এলাকার অধিবাসিগণ স্বগৃহে গিয়া বাস ও স্বীয় ভূমি চাষ করিতে পারিতেছেন না—ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের আশু মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।'

—যুবশক্তি (করিমগঞ্জ)।

গুপ্তচর হইতে সাবধান

'এতদিন সীমান্তের মুসলমানেরাই পাকিস্তানী গুপ্তচরদের আশ্রয় দিতেছে—এই খবর ছিল। এখন আবার মুসলমান সরকারী কর্মচারীও এই পাপে ধরা পড়িতেছে। অনেকে হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াও পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া আছে। এ রকম ছদ্মবেশীও কেহ কেহ ধরা পড়িয়া স্বীকার করিয়াছে যে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের হুকুমেই তাহারা নিয়োজিত। গুপ্তচরদের প্রশ্রয় দিয়া ঐ সব মুসলমান পাকিস্তানের কি উপকার করিবে জানি না, কিন্তু ভারতের মুসলমানদের প্রচুর অনিষ্ট করিতেছে। দেশপ্রাণ মুসলমানদের এ সময় স্পষ্টভাষায় দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কার্যের নিন্দা করা উচিত। তাঁহাদের কথায় হয় তো বা কিছু ফল হইতে পারে।'

—পল্লীবাসী (কালনা)

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা

'বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা সঙ্কোচনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন অবশ্য বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কামরাজ পরিকল্পনা প্রযোজ্য নয়। কথাটা ঠিকই বলেছেন। কেন না, প্রযোজ্য হলে যাঁদের মন্ত্রিত্ব যাবার কথা ছিল তাঁরা এখনও মন্ত্রিসভায় থাকেন কি করে? তাহলে এখানে নীতিটা কি? না, প্রদেশ কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটী একটা প্রস্তাব পাশ করেছেন মন্ত্রিসভার সদস্য কমাতে হবে। কমাতেই যদি হয় তাহলে পর পর ৩টি 'টার্মেই' মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন যাঁরা তাঁরা আগে যাবেন না কেন? যে জেলার ২ জন ৩ জন মন্ত্রী আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ বাদ না গিয়ে বর্ধমান, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদকে মন্ত্রিসভা থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হল কেন? সারা ভারত যে সময়ে কামরাজ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত সে সময়ে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা এক উদ্ভট পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। সস্তায় নাম কেনার জন্যে তাঁদের মাথায় খেয়াল ঢুকেছে। ব্যয় সঙ্কোচনই যদি মন্ত্রিসভার সঙ্কোচনের কারণ হয় তাহলে সবকয়টি রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ তুলে দিলেই হয়। আর মন্ত্রীদের সংখ্যাও ত' আরও কমানো যায়।'

—জনতা (কলিকাতা)।

পাকিস্তানের নতুন চাল

'পাকিস্তান সীমান্তে যেরূপ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে এবং যখন তখন সীমান্তে গুলি চালাইতেছে তাহাতে পাকিস্তান যে কোন মুহূর্তে ভারত আক্রমণ করিতে পারে এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ ইহা পাকিস্তানের পক্ষে চরম সুযোগ। কারণ পাকিস্তান বেশ জানে যে কোন অজুহাতে যদি সে ভারতের সহিত সংঘর্ষ বাধাইতে পারে তবে সে চীনের সাহায্য পাইবে অথচ আমেরিকা ভারতকে যেমন চীন আক্রমণের সময় অস্ত্র সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল, পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে তবে আমেরিকা সেরূপ অস্ত্র সাহায্যে আগাইয়া আসিতে পারিবে না।'

—জি, টি, রোড (আসানসোল)।

জাতীয় সমস্যা কী

'ভারতের উত্তর সীমান্তে চীন, বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমান্তে পাকিস্তানী হানা নিশ্চয় জাতীয়-সমস্যা, কিন্তু সেই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যে উন্নতমস্তক, স্ফীতবক্ষ জোয়ানদের প্রয়োজন তাহাদের রসদ জোগাইবার, তাহাদের অর্থ জোগাইবার মূলে যে পরিশ্রমী, চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত, শিক্ষক, ছোট ব্যবসাদার ইত্যাদি রহিয়াছে তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন যদি আজ বিপর্যস্ত হয়, আর্থিক কাঠামো যদি চুরমার হইয়া পড়ে তাহা হইলে ইহা কি জাতীয়-সমস্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না? কে তাহাদের রক্ষা করিবে? চাউলের অনটন অথচ খাবারের অভাব নাই বলিয়া প্রকৃত অবস্থা ঢাকা ও গোপন করিবার চেষ্টা যে বিভ্রান্তকর তাহা আশা করি বাংলার জননেতাগণ বুঝিতে পারিবেন। সরকার ও জনগণের সহযোগিতায় অবিলম্বে খাদ্যদ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি বন্ধ করিতে হইবে।'

—নিশান (বর্ধমান)।

শিক্ষক বেতন প্রসঙ্গে

'বীরভূম জেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গত কয়েক মাস ধরিয়া বেতন না পাওয়ার চরম দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছেন। স্কুলগুলিতে প্রাপ্য সরকারী সাহায্য নিয়মিত না পৌছানর ফলেই এই দুর্দশার উদ্ভব। পূজা বন্ধের পূর্বে যদি এই সাহায্য না আসে তাহা হইলে শিক্ষকগণের নিকট সে জাতীয় শ্রেষ্ঠ পূজার আনন্দ-উৎসব বিভীষিকায় পরিণত হইবে সে কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। রাজ্য সরকার এই বিষয়ে পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পূজাবকাশের পূর্বেই যাহাতে উক্ত সাহায্য বিদ্যালয়গুলিতে পৌছায় তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমরা সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। ভবিষ্যতে এই সাহায্য যাহাতে নিয়মিত হয় সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হইতে হইবে।'

—বীরভূমের ডাক (রামপুরহাট)।

যক্ষ্মারোগ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীজয়নাল আবেদিন এক প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছেন—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের তদন্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ১ .৭% অর্থাৎ প্রায় ৬০০০০০ জন লোক যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। সারা পশ্চিমবঙ্গে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য সরকারী হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা ৩৭৩০ ; বে-সরকারী ব্যক্তিগণ ও সংস্থা কর্তৃক ৯৮০টি শয্যা রক্ষিত হয় বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তির জন্য সরকারের কাছে ১৯১২টি আবেদন রহিয়াছে। একটি কেন্দ্রীয় কমিটী রোগীর রোগের অবস্থা ও আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করিয়া শয্যাবণ্টন বা গৃহচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। না জানার জন্য, অক্ষমতাবশত পরিশ্রম, হয়রানি ও অর্থব্যয়ের ভয়ে কতজন যে ফরম ভর্তি করেন না, সরকারী দপ্তরে সে খবর নাই।'

—দৃষ্টি (বর্ধমান

ভাসানীর ভীমরতি

'বার্ধক্যে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয় সত্য, পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধীদলের নেতা মৌলানা ভাসানী সাহেবের যে ভীমরতি ধরিয়াছে তাহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ সত্য সত্যই ভাসানী সাহেবের ভীমরতি ধরিয়াছে। ভাসানী সাহেব গদগদকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, একমাত্র চীনারাই নাকি সাচ্চা কম্যুনিষ্ট আর সব ঝুটা কম্যুনিষ্ট এবং পাকিস্তান সর্বদা চীনের জনগণের সঙ্গে থাকিবে। আমরা এতদিন জানিতাম ভাসানী সাহেব মোল্লাতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁনের মত নির্ভীক জাতীয়তাবাদী ও উদারপন্থী। হয়ত আমাদের ধারণা ভুল, মৌলানা সাহেব কম্যুনিষ্টবাদে দীক্ষিত হইয়াছেন। গোটা পৃথিবী আজ চীনের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিতেছে এবং মানবসভ্যতার কলঙ্ক বলিয়া চীনকে অভিহিত করিতেছে আর সেই চীনকেই কি না মৌলানার ন্যায় একজন দেশভক্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ জগতের কোহিনূরের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া দেখিতেছেন। মৌলানা সাহেবের মতিগতি সত্যই দুর্বোধ্য কেন না এই মানুষ একদা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল এবং আজ আবার সেই মানুষ বিদেশী চীনাদের হাতে তাহার দেশ পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে বসিতেছে।'

—বারাসাত বার্তা (বারাসাত)।

প্রতিকারের পন্থা

'খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত হইতে এবং গঠনমূলক মনোভাব লইয়া ও সাহসের সহিত এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে অনুরোধ করিতেছি। অখণ্ড বঙ্গ বিভক্ত হইয়া এক তৃতীয়াংশ হইয়াছে এবং এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা সত্ত্বেও এবং নানা পরিকল্পনা সত্ত্বেও প্রকৃতির খেয়াল-খুশীর ফলে মোট চালের ঘাটতির হেরফের বিশেষ বছরে বছরে হইয়া থাকে। গত বছর এই কারণে ২২লক্ষ টন চালের ঘাটতি হইয়াছে। সম্পন্ন চাষী ২২৲ টাকা মণে ধান বিক্রয় করিলে সহরে চালের দাম কত পড়ে ? প্রতিকার প্রোকিওরমেণ্ট ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। জনগণ কি রাজী ? বিরোধী দল কিন্তু এই সম্পর্কে নীরব।'

—নদীয়া দর্পণ (কৃষ্ণনগর)।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কম্যুনিষ্টদল

'কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীঅঘোর দেববর্মা বিধানসভায় বাজেট আলোচনাকালে পুলিশ খাতে তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে সীমান্তের ঘাঁটি হ্রাস করিতে জনসাধারণ দ্বারা গঠিত সংস্থাই যথেষ্ট। তাঁহার মতে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। তাঁহার মতে গত দশ বছরের মধ্যে এমন কোন ঘটনাই ঘটে নাই যার জন্য পুলিশের শক্তি বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন আছে। তিনদিক পাকিস্তান পরিবেষ্টিত এই সীমান্তবর্তী রাজ্যের সীমান্তে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের দাবী যে সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ঠিক সেই সময় সীমান্ত এলাকাকে দুর্বল রাখার এহেন আব্দার আমাদের নিকট অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিতেছে। বর্তমান জরুরী অবস্থায় এইরূপ আব্দারকে যদি জনসাধারণ চীন ও পাকিস্তানের পক্ষে পরোক্ষে ওকালতি বলিয়া মনে করে তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কোন অসঙ্গত কারণ নাই। আমরা জানি ত্রিপুরায় আভ্যন্তরীণ সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের বিরুদ্ধেও স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রবল বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন তাহাদের বক্তব্য ছিল রাস্তাঘাট সম্প্রসারিত হইলে সরকার মিলিটারী পুলিশ আমদানী করিয়া সাধারণের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। ত্রিপুরার কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতিতে একটি জিনিষ পরিষ্কার এই যে এই পার্টি ইহার নিজস্ব ঘাঁটিকে সরকারের শাসন ও শাসনযন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া রাখিতে চায়। ইহাতে অবশ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির যথেষ্ট সুবিধা হয়। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা গণতন্ত্র শাসন বিরোধী। ভারতীয় সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে যে অধিকার দিয়াছে তা খর্ব করার অধিকার কাহারও নাই। মানুষের এই অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তা অবশ্যই করিতে হইবে।'

—সেবক (আগরতলা)।

ট্যাক্স কেন বাড়াইতে হয় ?

'ডি, ভি, সির হিসাব লক্ষ্য করুন অন্তত দু' একটা। ১৯৫০ সনে কেনা ইঞ্জিন (৫১০০০৲ মূল্যে) ১৯৬০ সনে প্রাইভেট কোন পার্টির নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় ৮৫০০৲ টাকায়। ১৯৫০ সনে কেনা ৬টি, ব্যাডফোর্ড ডাম্পার ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায়, ১৯৫৬ সনে কোনও প্রাইভেট পার্টির নিকট বিক্রয় করা হয় ১৯৩০৲ টাকায়। সরকারী কাগজপত্রেই তখন ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ বাদ দিয়া জিনিষের মূল্য ছিল ১ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা।'

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

রঙ্গপট
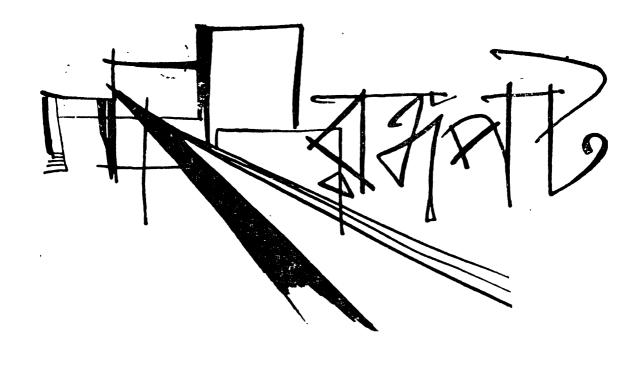
শৈলেনকুমার দত্ত

জার্মানীর তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ১৯১২ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গারহার্ট হাউপট্‌ম্যানের (১৮৬২-১৯৪৬) শতবার্ষিকী উৎসব গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়ে গেছে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। তামাম দুনিয়া থেকে তাবড় তাবড় হাউপট্‌ম্যান বিশেষজ্ঞরা মিলিত হয়েছেন, বার্লিনে, কোলোনে। নতুন করে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে তাঁর সৃষ্টির।

১৮৬২ সালে বর্তমান পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত সাইলেসিয়া শহরে একটি সাধারণ তাঁতী পরিবারে জন্ম হয় হাউপট্‌ম্যানের। ছেলেবেলায় তাঁর অনেক মধুর দিন কেটেছে বাবার হোটেলে। সেদিন পানশালার একটি নির্জন পরিবেশে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকতেন শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সাধারণ অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় পৌঁছাবার জন্যে একজন সাধারণ মানুষকে একটা জাতিকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করতেন তিনি।

এই চোখ আর চৈতন্য থেকেই জন্ম তাঁর সাহিত্যের। বাস্তবতার এই মাটি ঘেঁষা নীতিতে রচিত [illegible] ভিত্তি। ভবিষ্যতের সেই বিস্ময়কর স্রষ্টা তাই লিখলেন: In cases where we cannot adapt life to the dramatic form of art, we should not adapt this form of art to life। মানুষকে দেখলেন bodily concrete entity হিসেবে। মানুষের আদর্শ, তার লক্ষ্য, তার নৈতিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর নাটকে।

হাউপট্‌ম্যানের প্রথম সৃষ্টি Before Sunrise প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। পাশ্চাত্য দেশে তখন অসীমকে সীমায় বাঁধবার, ভাবকে ভাষায় আনবার, আবেগকে রূপদান করবার একটা শৈল্পিক প্রয়াস চলেছে। বাস্তববাদী হাউপট্‌ম্যান লক্ষ্য করলেন সে শিল্পকে। এবং কিছু পরেই মানুষের অন্তর্জীবনের ইতিহাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ, হাসি, আনন্দ-বেদনার কাহিনী নিয়ে তিনি একটির পর একটি নাটক রচনা করতে শুরু করলেন—The Feast of Peace Lonely Lives, Colleague Crampton, The Weavers, The Beaver Cloak ইত্যাদি। একজন

গারহার্ট হাউপট্‌ম্যান

মানব দরদী বাস্তববাদী নাট্যকারের নাম ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত পৃথিবীতে।

এ পর্যায়ের নাটকগুলি রচিত হবার পর তাঁর রচনা রীতিতে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল: শেষের এই নাটকগুলিতে হাউপটম্যান বাস্তবকে আঁকলেন ভিন্নভাবে এবং ভঙ্গীতে। অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া প্রকাশরীতি ইত্যাদি দেখে স্পষ্ট মনে হল তিনি একজন সার্থক রূপকাশ্রয়ী নাট্যকার। স্থূল জগতের অন্তরালে যে অতীন্দ্রিয় জগৎ, গতানুগতিক অভিব্যক্তির পেছনে যে অসাধারণ প্রকাশভঙ্গী, face value-র আড়ালে যে intrinsic value—হাউপটম্যান চিন্তা করলেন সেসব কথা। নতুন ভাবকল্পনার শিল্প মহিমায় ভাস্বর হয়ে প্রকাশিত হল তিনটি রূপক নাট্য—Hannele, The Sunken Bell এবং Henry of Aue। জার্মান, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকায় অভিনীত হল সে নাটক। সাময়িকপত্রের কলমে আলোচনা করলেন সমালোচকেরা। কেউ প্রশংসা করলেন গভীর ধর্মবোধের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি হিসেবে, কেউ নিন্দে করলেন হাস্যকর অপটু রচনা হিসেবে।

এদিক থেকে 'হ্যানেলি' তাঁর বহু আলোচিত নাটক। নাটকের নায়িকা হ্যানেলিকে তার সৎবাবার বাড়িতে অত্যন্ত অত্যাচারের

চিত্রনায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: 'অয়নান্ত' চিত্রের চিত্রগ্রহণের অবসরে

মধ্যে বাস করতে হয়। সারাদিন ভিক্ষায় অর্জিত অর্থ হাতে দিয়েও সে মদ্যপ বাপের কাছে মার খায়। এমনি একদিন অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই ধর্মবিশ্বাসী মেয়েটি চেষ্টা করল পুকুরে ডুবে মরবার। ভাগ্যচক্রে একজন শিক্ষক গিফল্ড নামে এক বন্ধুর সাহায্যে তাকে উদ্ধার করলেন এবং পরে একটি সেবাসদনে নিয়ে গেলেন। এখানে অত্যন্ত যত্নের মধ্যে থেকেও মেয়েটি নানান স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। তার মৃত্যুর স্বপ্ন, কবর খননের স্বপ্ন, দেবদূতের আগমনের স্বপ্ন আর সবশেষে প্রভুর আশীর্বাদের স্বপ্ন। এরপর ডাক্তার ঘোষণা করল হ্যানেলি মারা গেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্তনের যে দুঃখ—সেই দুঃখ থেকে মৃত্যুই একমাত্র মুক্তি দিতে পারে। মৃত্যুই মানুষকে আনন্দ আর শান্তি দিতে পারে—এই দর্শন প্রচার করলেন হাউপটম্যান।

'দি সানকেন বেল' নাটকে রূপায়িত করলেন এক উদ্ধত শিল্পীর তুঙ্গী অভিপ্রায়কে। নানাস্থানে সুখ্যাতি পাবার পর শিল্পী হেনরিক একদিন পাহাড়ের ওপরের চূড়ায় ঘণ্টা বাঁধার চেষ্টা করল। কামনা করল ওই ঘণ্টা থেকে সুন্দর সুমিষ্ট আওয়াজ এসে মোহাবিষ্ট করে তুলবে এ সমস্ত অঞ্চলকে। এই অলৌকিক ঘণ্টাধ্বনি শোনবার জন্যে বাড়িতে যখন তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা উৎকর্ণ তখন সংবাদ এল হেনরিখ পড়ে গেছে এক গভীর পরিখার মধ্যে। গ্রামবাসীদের চেষ্টায় শিল্পীকে ওপরে তোলা হল। সবশেষে রাউটেন ডেলিন নামে এক সুন্দরীর শুশ্রূষায় শিল্পী যখন ভাল হয়ে উঠল তখনও তার যে বাসনা যায় নি। এক সঙ্গে চলল তার সাধনা আর নতুন প্রেম

সুপ্রিয়া চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

সুমিতা সান্যাল বিভিন্ন ভঙ্গিমায়

ঠিক এমনি একদিন শিল্পী স্বপ্ন দেখল তার দুই ছেলে তার কাছে একটা বাক্স টেনে নিয়ে আসছে। ছেলে দুটি তার কাছে এসে বলল, তারা মায়ের আদেশে এই কাজ করছে। তাদের মা জলে ডুবে মারা গেছে এবং বাক্সের মধ্যে আছে তার চোখের জল। হঠাৎ সেই জলমগ্ন ঘণ্টাটি সশব্দে বেজে উঠল আর হেনরিখ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে তাড়িয়ে দিল সেই সুন্দরীকে। তারপর অস্থিরতায় অধীর হয়ে সেও মারা গেল পাহাড়ের ওপরে।

বস্তুত সাংকেতিক নাটকের ইতিহাসে এত সুন্দর ব্যঞ্জনা খুব অল্পই আছে। শিল্প যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং কোন উদ্ধত উচ্চাশা কিংবা অপ্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষার কাছে যে তার পরাজয় অনিবার্য এই সত্যটুকুই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই নাটকে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে তাই দেখতে পাই হাউপট্‌ম্যানের নাটকে 'ফেনার চেয়ে স্রোতই বেশী।' তাঁর নাটকে গতিধর্মের চেয়ে স্থিতিধর্ম কোথাও বড় হয়নি। হাউপট্‌ম্যান জীবনদর্শী নৈষ্ঠিক নাট্যকার। নিয়তির প্রচণ্ড শক্তির কাছে আমরা যে স্বল্পক্ষম. ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারানো যে নৈতিক মৃত্যু—তাঁর নায়ক-নায়িকরা একথা বারবার আমাদের জানিয়েছে। The Peace Festival নাটকের মধ্যেই সে কথা আছে: We are what we are. Other people are not in the least better, even if they are putting on a big show. এবং ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের ওপর আত্মসমর্পণ করলে যে দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—এ কথা জানিয়েছেন তাঁর Henry of Aue নাটকের মধ্যে। প্রকৃত পক্ষে তাঁর সাহিত্য বস্তুবাদী কাহিনী ঈশ্বর বিশ্বাসী প্রগাঢ়ভাব সঙ্গে পরিবেষ্টিত আবদ্ধ। উন্নত শিল্পবোধ আবিষ্ট স্নিগ্ধ অন্তরের ছায়ায়। তাই স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর '*Oh, how deeply I bow before the truly divine errors of all the soul*'—স্বীকারোক্তি আশ্চর্যভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাঁর জীবনে, দর্শনে এবং সাহিত্যের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে।

মহানগর

সমস্যা আর সঙ্কট যখন তাদের বজ্রমুষ্টি দিয়ে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার স্বাভাবিক গতি রোধ করে থাকে বড় বাস্তব যখন দৈনন্দিন সংসার যাত্রাকে অচলাবস্থার প্রান্তবিন্দুতে উপনীত করে তখন সমস্যার চাপে নারী নিজেকে গৃহকোণের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে পারে না, মহানগরের বিরাট জীবন স্রোতে তাকে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হয়। সাংসারিক সমস্যা ও অনটনের সমাধানে নারীর ভূমিকাও কম নয়, নয় অমূলকথ্য। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপক পরিবর্তন বয়স্করা অনেকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেন না, বিদায়ী এবং আগত প্রায় দুটি বিরাট

যুগের সন্ধিক্ষণে পুরাতনে আর নতুনে শুরু হয় আদর্শগত সংগ্রাম। কিন্তু নতুনের মনোজ্জ্বল আন্তরিকতা এবং একাগ্রতা তার কণ্ঠে পরিয়ে দেয় জয়মাল্য, পুরাতনের দৃষ্টি, ধ্যান-ধারণা, ভাব-ভাবনার তখন রঙ বদলানোর পালা শুরু হয়। বিশ্বজয়ী চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক অবদান 'মহানগর' এই পটভূমিকে ভিত্তি করে রূপ নিয়েছে। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি ছোট গল্পের এই অসামান্য চিত্ররূপ দিয়ে শ্রীরায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন। মহানগরের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনায় ভরা জীবনের এক উজ্জ্বল প্রতীক সুব্রত, একটি বিশেষ প্রতিচ্ছবি আরতি। সুব্রত-আরতির পরিবারকে কেন্দ্র করে নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য প্রদর্শন করে অসাধারণ মুন্সীয়ানা এবং যথেষ্ট পরিমাণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেন সত্যজিৎ রায়।

এক-একটি অতি অল্পক্ষণস্থায়ী চরিত্রের মাধ্যমে এক একটি পরিবেশে, কয়েকটি ছোট ছোট সংলাপের মধ্যে এই সমাজের সমগ্র জীবনযাত্রার এক সার্থক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর কুশলী হাতে, বেঁচে থাকার নিদারুণ সংগ্রামে পারস্পরিক ভালবাসা এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবলম্বন যে প্রধান আয়ুধ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই মহান্ সত্যের জয়গান শ্রীরায় সর্বতোভাবে সফল হয়েছেন। ছবিটির আদ্যন্ত তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, জীবন সচেতনতা এবং গভীর অনুভূতিশীল মনের পরিচয় বহন করে। তার গঠনকর্মে, আঙ্গিকে, বিন্যাসে তিনি যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। আলোকচিত্র এবং শিল্পনির্দেশে যথাক্রমে

সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই) : ছায়াছবির বাইরে

সুব্রত মিত্র এবং বংশী চন্দ্রগুপ্ত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কাহিনী এবং বক্তব্য অনুসারে এই ছবিটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের মূলে আলোকচিত্রে ও শিল্পসৃষ্টির গুরুত্ব অনেকখানি। শিল্পীদের অভিনয় যেমনই হৃদয়গ্রাহী তেমনই রসোত্তীর্ণ। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর অভিনয় বিপুল সাধুবাদের দাবী রাখে। তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটির প্রাণসঞ্চার ঘটেছে। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রায়ণও সর্বতোভাবে নিখুঁত, তাঁর সহজ পদক্ষেপ, ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক ও প্রাণবন্ত অভিনয় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হারেন চট্টোপাধ্যায়, শেফালিকা দেবী এবং হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়ও দর্শকচিত্তে দাগ রেখে যায়। এঁরা ব্যতীত ভিকি রেডউড, জয়া ভাদুড়ী, স্মিতা সিংহ, শীলা পাল, অনুরাধা গুহ, গীতালি রায়, শ্যামল ঘোষাল, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সেন সমীর লাহিড়ী, অরুণ চৌধুরী, শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

উত্তর ফাল্গুনী

জীবনের নির্মেঘ ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালোমেঘে কখন যে ছেয়ে আছে সে রহস্যের সুসন্ধান আজও মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত। উদ্দাম ঝড়ের উন্মাদ নর্তন কত স্বাভাবিকতা, নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তির সৌধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার হিসাব মেলা দুষ্কর। ভাগ্যদেবতার এই প্রতিকূল আচরণে মানুষের জীবনের গতিপথ হয় পরিবর্তিত, নিয়তির এই অমোঘ বিধানের ফলেই দেখা যায় যেখানে প্রতিশ্রুতিতে সমুজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, সুন্দর, সতেজ, শক্তিমান তরুণের সঙ্গে মিলনের পুণ্য মুহূর্ত প্রায় সমাগত সেখানে গাঁটছড়া বাঁধতে হয় মদ্য, দুশ্চরিত্র, লম্পটের সঙ্গে। উত্তমকুমার প্রযোজিত এবং অজিত সেন পরিচালিত উত্তর ফাল্গুনী চিত্রের নায়িকা দেবযানীর বেদনাহত জীবনকে কেন্দ্র করে এই পরম সত্যের প্রচার করা হয়েছে।

উত্তর ফাল্গুনীর কাহিনীকার ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। ডাঃ নীহার গুপ্তের এই কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরলোকগত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। এই কাহিনী হৃদয়ধর্মী এবং প্রচণ্ড মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ। সমগ্র ছবিটির মধ্যে সর্বত্র আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার ছাপ মেলে। পরিচালক কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি করে যে রসবোধ, জীবনচিন্তা এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা এক কথায় অপূর্ব। কাহিনী-বিন্যাসে, ঘটনা সংস্থাপনে, পরিবেশ গঠনে কৃতিত্বের ছাপ মেলে। দেবযানীর চরিত্রটির মধ্যে জীবনের অপার রহস্যের একটি দিক উন্মোচনের প্রয়াসে যত্নবান হয়েছেন পরিচালক। সমগ্র কাহিনী যথাযথ পরিচর্যার গুণে এক অনবদ্য রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ও যথেষ্ট প্রশংসা দাবী রাখেন। একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত যুক্ত হয়ে ছবিটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ছবিতে দ্বৈত-ভূমিকায় শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের অবতরণ এক উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। মাতা-পুত্রীর দ্বৈত-ভূমিকায় যে অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা তিনি দেখিয়েছেন তা বিরল দৃষ্টান্ত বলা যায়। জননী আর দু'টি বিপরীতধর্মী চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত, আনন্দ বেদনা তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিকাশ রায়ের সাবলীল, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক এবং মনোরম অভিনয় প্রাণস্পর্শ করে। মুঠো মুঠো অভিনন্দন পাওয়

যোগ্যতা প্রদর্শন করলেন কালীপদ চক্রবর্তী, তাঁর অভিনয়ে মণ্ডপ রাখাল চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর মত শক্তিমান শিল্পীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, শ্যাম লাহা, ছায়া দেবী প্রভৃতি স্বনামধন্য শিল্পীর দল।

ন্যায়দণ্ড

আইনই জীবনের শেষকথা নয়। আইনের সকল কথা যেখানে শেষ হয়ে যায় তখন দেখা যায় জীবনের বাণী অশেষ, অফুরন্ত, অন্তহীন। আইনের অনুশাসনে জীবনে এমন অনেক সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হতে হয় যার পিছনে সত্যের সমর্থন থাকে না। যদিচ সত্য এবং ন্যায়ের রক্ষার জন্যেই আইনের সৃষ্টি এবং বাস্তব-জীবনে আইন অপরিহার্য তবুও ঘটনাচক্রে কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ যথাযথ ঘটে না। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী) তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে এই গভীর সত্যটিকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন এবং তাকেই সাহিত্যরূপ দিয়েছেন তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারা। লেখকের অনুভূতিপ্রবণ মন এবং অভিনন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম পরিচায়ক এই কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ মূল কাহিনীর সম্মান রাখতে পারেনি। চিত্রনাট্যের দৌর্বল্য, একাধিক অসংগতি ছবিটির সাফল্যে উপনীত হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। অতিনাটকীয়তার দোষে দুষ্ট কাহিনীটির কোন কোন অংশ অযথা দীর্ঘ করে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো হয়েছে বহুল পরিমাণে। বিশেষ করে যুক্তিধর্মী মন নিয়ে যাঁরা ছবিটি দেখবেন তাঁরা তো রীতিমত নিরাশ হবেন, কারণ এ ছবিতে এমন অনেক কিছু তাঁরা পাবেন যাতে যুক্তি বস্তুটি সর্বতোভাবেই অনুপস্থিত। জীবনের একটি নির্মম ট্রাজেডিকে ছায়াচিত্রে রূপায়ণের উপযোগী যে গঠনকৌশল আঙ্গিক এবং পরিচর্যার প্রয়োজন তাদের অভাবই ছবিটিকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন ওস্তাদ আলী আকবর খান। অভিনয়াংশে অভূতপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য ও অসিতবরণ, স্বনামধন্য এই দুই শিল্পীর অভিনয় দর্শক চিত্তে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার করে। অরুন্ধতী দেবীর অভিনয়ও সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মর্মস্পর্শী। অন্যান্য ভূমিকায় জহর গঙ্গোপাধ্যায়, আশিসকুমার, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, জহর রায়, ছায়া দেবী, সবিতা বসু, তন্দ্রা বর্মণ, তপতী ঘোষ, বেলা দেবী প্রভৃতির অভিনয়ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হীরালাল সেন প্রসঙ্গে

ভারতীয় ছায়াছবির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ বর্তমানে মহাসমারোহে দিকে দিকে উদযাপিত হ'ল। ঠিক এই মুহূর্তেই, ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় ছায়াছবির জন্মকাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাটি একেবারে ভুল। প্রকৃতপক্ষে এটি সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ নয়। এটি

আগতপ্রায় 'কাঞ্চনকন্যা' চিত্রের নায়িকা কণিকা মজুমদার এবং গীতিকার অসিত মৈত্র, সুরকার ভি. বালসারা চেয়ে আছেন টেপ রেকর্ডারের দিকে।

হীরক জয়ন্তী বর্ষ। ভারতের চলচ্চিত্র বোম্বাই থেকে সৃষ্টি হয় নি তার জন্ম বাঙলা দেশে। তার চিরস্মরণীয় স্রষ্টার অবিস্মরণীয় নাম হীরালাল সেন। তার পবিত্র সৃষ্টির উদ্দেশে চিত্রজগত আজ তার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। হীরালাল সেনই যে ভারতবর্ষের ছায়াছবির প্রবর্তক, নথিপত্রের সাহায্যে তা আজ সর্বতোভাবে প্রমাণিত। দশ বছর প'রে ১৯১৩ সালে বোম্বাইতে যাঁরা ছায়াছবির সূচনা করলেন তাঁরা আসলে স্বর্গত সেনের অনুগামী মাত্র। অথচ স্রষ্টার গৌরব আজ তাঁদেরই অধিকারগত। আসল স্রষ্টা আজ অবহেলিত, বিস্মৃত, উপেক্ষিত। এই প্রসঙ্গে বাংলার সাংবাদিকরা যে আন্দোলন শুরু করেছেন তা সর্বাংশে সমর্থনীয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তিপুষ্ট কিন্তু এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না। ক্ষোভের বিষয়, এই ভ্রান্ত ধারণার সংশোধনের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হল না। এই ঔদাসীন্যের কারণ আমাদের জানা নেই। এ ঔদাসীন্য কি হীরালাল সেনের মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার নাম বাঙলা বলে?

সংবাদ বিচিত্রা

বাঙলা ছায়াছবির আজ জগদ্ব্যাপী সমাদর, সারা বিশ্বে তাকে কেন্দ্র করে আজ উৎসাহ এবং আগ্রহের অন্ত নেই। তবু, সেই সঙ্গেই এই কথাটিও অস্বীকার করার উপায় নেই যে তার ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত নয়। তার আকাশে সমস্যার ঘনঘটা অসংখ্য সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে তাকে পথ চলতে হচ্ছে। দেশবিভাগের পর থেকেই এই সকল সমস্যা বাঙলা ছবিকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। একাধিক সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রধান। আশার কথা, সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাঙলা ছবির সমস্যাসমূহ দূরীকরণে আগ্রহী হয়েছেন এবং চিত্রনির্মাতাদের সহযোগিতায় এই প্রসঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে যত্নবান হবেন। এ বিষয়ে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সাহায্যদানে সরকারপক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

সুলতা চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

সম্পা চক্রবর্তী: 'অয়নান্ত'-এর স্যুটিং-এর অবসরে

* * * *

পশ্চিম বাঙলার মেদিনীপুর শহরে গত ১৮ই আগস্ট তার নিজস্ব একটি ফিল্ম সোসাইটির পত্তন হয়েছে। এই উদ্বোধন উপলক্ষে দেবকীকুমার বসুর 'অর্ঘ' সহ 'সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর', 'ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ', 'টেরাকোটা রামায়ণ', 'ওয়াইল্ড লাইফ' শীর্ষক চারটি প্রামানিক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

* * * *

বোম্বাই থেকে নেপথ্যশিল্পী সঙ্ঘের সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছে। এই নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন বোম্বাইয়ে বাঙলার মুখোজ্জ্বলকারী শিল্পী শ্রীমান্না দে। শ্রীমতী লতা মুঙ্গেশকার ও শ্রীতালাত মাহমুদ যথাক্রমে সংস্থার সহকারী সভানেত্রী এবং সাধারণ সচিব নির্বাচিত হয়েছেন।

রাজ্যসভা থেকে প্রচারিত হয়েছে যে সম্প্রতি এক বৃটিশ প্রযোজক গান্ধীজীর জীবনী অবলম্বনে চিত্রনির্মাণের বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁকে জানানো হয়েছে যে, এ প্রস্তাবে সাধারণভাবে ভারত সরকারের কোন আপত্তি নেই তবে চিত্রনাট্যটি পরীক্ষা করে তাঁরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

পাটনা থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে যে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি দেশনেতা স্বর্গত ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের জীবনীর চলচ্চিত্র রূপদানের ব্যবস্থা হচ্ছে। বিহার স্টেট চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি গঠিত রাজেন্দ্র মেমোরিয়াল ফিল্ম কমিটী এই প্রচেষ্টার হোতা। বিহারের মন্ত্রী শ্রীদীপনারায়ণ সিং এই কমিটির সভাপতি। বর্তমানে জীবনীচিত্রটি নির্মাণের জন্যে স্বর্গত নেতার জীবনী সংক্রান্ত উপকরণাদি সংগ্রহ চলছে। এই মর্মে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এক আবেদন প্রচার করা হয়েছে।

মোগল যুগের চির অবিস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ঘটনাবহুল, চমকপ্রদ, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের যে চলচ্চিত্রায়ণের ব্যবস্থা চলছে তার পরিচালনভার অর্পণ করা হয়েছে বিখ্যাত পরিচালক সোরাব মোদীর প্রতি। আকবরের এবং নামভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন যথাক্রমে পৃথ্বীরাজ কাপুর এবং সায়রাবানু।

সম্প্রতি আফগানিস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রযোজক এফ. সি. মেহরা জানিয়েছেন যে কাবুলে একটি স্টুডিও নির্মাণের ব্যাপারে আফগান সরকার ভারতের সাহায্যপ্রার্থী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্যন্ত আফগানিস্থান কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নি। যতদূর অনুমান করা যাচ্ছে যে এই প্রচেষ্টায় ভারতের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতাই করা হবে।

রঙ্গপট বিভাগের পাঠক-পাঠিকার দরবারে একটি বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করি। সংবাদটি সহজ-বিশ্বাস্য না হলেও সত্য। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে বৃটেনের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন একটিও হলিউড নির্মিত ছবি দেখেন নি। সেখানকার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীদের কাছে শোনা গেছে যে তাঁরা মোট দু'টি কি তিনটি মার্কিন ছবি দেখেছেন। সংবাদটি যে যথেষ্ট পরিমাণ আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

একই অঙ্গে এত রূপ

প্রখ্যাত কথাশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে 'একই অঙ্গে এত রূপ' ছবিটির গঠনপর্ব এগিয়ে চলেছে। হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবিটিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন—বসন্ত চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হরেন চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দীপ নেভে নাই

কনক মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'দীপ নেভে নাই' ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন—বিকাশ রায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সন্ধ্যারাণী দেবী, সুমিতা সান্যাল প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের প্রাক্কালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাধবী মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশদানরত পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত

মায়ের আশীর্বাদ

চিত্ররূপা প্রাইভেট লিমিটেড নিবেদিত 'মায়ের আশীর্বাদ' ছবিটির কাজ সমাপ্ত। চন্দ্রশেখর বসু এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন। চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন—জহর গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, স্বর্গত তুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, অপর্ণা দেবী, স্মৃতিরেখা দেবী, গীতা সোম ইত্যাদি। স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ অনাদি দস্তিদার এর সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেছেন।

শৌখীন সমাচার

ষোড়শী

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন ক্যালকাটা ক্লেমস্ ব্যুরোর কর্মিবৃন্দ। পরিচালনা ও প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ভাগিনেয় তরুণ লাহিড়ী। চরিত্রগুলির রূপদান করলেন সন্তোষ বসু, ব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়, অঞ্জন সেনগুপ্ত, বসন্ত গুপ্ত, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীকুমার পতিতুণ্ডী, বিশ্বনাথ পতিতুণ্ডী, কেতকী দত্ত, সবিতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শেষ লগ্ন

কেটেলওয়েল বুলিন রিক্রিয়েশান ক্লাব অভিনয় করলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'শেষলগ্ন' নাটকটি। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন বীরেশ্বর গোস্বামী, অনিল সিংহরায়, গোপীকৃষ্ণ দেব, নারায়ণ গুহ, শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী, রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, সনৎ বসু, চন্দ্রশেখর সাউ, রাইমোহন মুখোপাধ্যায়, গীতা প্রধান, অজন্তা চৌধুরী, সিপ্রা সাহা, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তামসী

শৌখীন নাট্যগোষ্ঠী মসৃথ নিবেদন করলেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী জরাসন্ধের 'তামসী।' পরিচালনা করেন মনু মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন গোবিন্দ চক্রবর্তী, রণজিৎ ঘোষ, গোরা বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত সেন, তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হৃষীকেশ ঘোষ, দুর্গাপদ ভট্টাচার্য, সৌরেন্দ্রকুমার শীল, সুনাথ ঘোষাল, সুরজিত-কুমার ঠাকুর, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, নমিতা দত্ত, তপতী মণ্ডল, শেলী পাল প্রভৃতি।

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপটবিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত নন্দী, মোনা চৌধুরী এবং বীরেন ধর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।
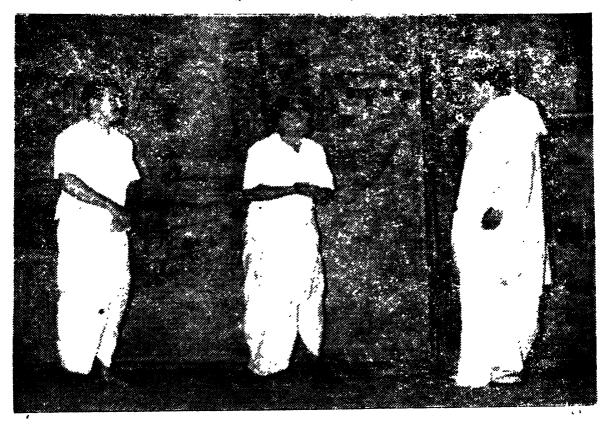
ক্যালকাটা ক্লেমস ব্যুরোর কর্মিবৃন্দ অভিনীত 'ষোড়শী' নাটকের এক দৃশ্যে জীবানন্দের ভূমিকায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ভাগিনেয় পরিচালক তরুণ লাহিড়ী (দক্ষিণে) এবং অন্য দুই শিল্পী

মিশরের পিরামিড

'গিজা'

শ্রীভাগবতদাস বরাট

মিশরের গিজা পিরামিডের নাম অনেকেরই জানা আছে। এই পিরামিড নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান হয়েছে। ফলে বহু নূতন নূতন তথ্যও উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু তবুও ঐতিহাসিকগণ তৃপ্ত নন। শুধু গিজা পিরামিডকে নিয়েই নয়,—মিশরের আরও সব পিরামিডের প্রকৃত ইতিহাস জানবার আগ্রহ দেশ-বিদেশের বহু অনুসন্ধানকারীর মনে উঁকি মারছে। তাই আজও তাঁরা গবেষণারত।

বছর কয়েক পূর্বে কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসার সেলিম হাসান দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর বিখ্যাত গিজা পিরামিড সম্বন্ধে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা ইতিপূর্বে প্রকাশিত তথ্যের অসারতা প্রমাণ করবে।

আমরা এতদিন শুনে আসছি যে, মিশরের অত্যাচারী খলিফা 'খুকু'—যিনি চিয়াপস্ নামে অধিক পরিচিত, তিনি এক লক্ষ ক্রীতদাসকে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর নির্মমভাবে খাটিয়ে এই জগদ্বিখ্যাত গিজা পিরামিডটি নির্মাণ করান। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর মতে যে সব শ্বেত প্রস্তর দ্বারা এই পিরামিডটি নির্মিত, সেই সব শ্বেত প্রস্তর ঐ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সুদূর নীল নদের পূর্ব পার হতে ক্রীতদাসদের দিয়ে তা বহন করে আনা হয়েছিল। গিজা পিরামিড কাইরো হতে দশ মাইল পশ্চিমে মরু-মালভূমির প্রান্তে অবস্থিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একাধিক ঐতিহাসিকদের মতে উক্ত পিরামিড সুলতান চিয়াপস্ এর নির্মমতার স্মৃতিবাহকরূপে বর্তমান। কিন্তু অধ্যাপক হাসান সম্প্রতি উক্ত পিরামিডের পাদদেশে পুরাতত্ত্ব গবেষণার ফলে যে তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা ইজিপ্ট রাজবংশের নূতন পরিচয় জনসমক্ষে স্থাপন করবে। মিঃ হাসান বলেছেন,: গিজা পিরামিড সুলতান খুকুর নৃশংসতার প্রতীক নয়, বরং সে সময়ের উন্নত ভাস্কর্য-শিল্পের পরিচায়ক। তাঁর মন্তব্য এতই প্রামাণ্য যে, সংশয়ের অবকাশ মাত্র নেই। অধ্যাপক সেলিম লিখেছেন: প্রাচীন ইজিপ্টের ইতিহাসে চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকালটি শিল্পে, ভাস্কর্য ও ইমারতি কার্যে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। কারণ, দ্বিতীয় রাজবংশের পর আর তেমন কোন ভীষণ যুদ্ধাদি না হওয়ায় দেশের শিল্পীরা সুকুমার কারুশিল্পের উন্নতিতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন। তৃতীয় বংশের আবির্ভাবের পর হতেই পিরামিড নির্মাণের হুজুক জাগে এবং তা চূড়ান্ত উৎকর্ষ-লাভ করে চতুর্থ রাজবংশের সময়। পূর্ববর্তী সুলতানদের কীর্তি দেখে সুলতান প্রেরণা লাভ করেন এবং একটি বৃহত্তম পিরামিড নির্মাণের সঙ্কল্প করেন। এক বৎসরেরও অধিককালব্যাপী এই পিরামিড নির্মাণের আয়োজন চলে এবং কয়েদীদের শ্বেত মর্মর সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত করা হয়—এ কথা ঠিকই; কিন্তু তা' হলেও তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা হয় নি।

বৎসরের যে তিন মাস নীল নদের বন্যা পিরামিড প্রান্ত স্পর্শ করত, সেই সময় বিরাট বিরাট নৌকায় করে দূর দূরান্তর হতে মালমশলা ও শ্বেত মর্মরসমূহ পিরামিডের প্রান্তে সঞ্চিত করা হত। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাবদ খাদ্য ও অর্থাদি দেওয়া হত। বন্যার সময় কারিগররা ইমারতের কাজে হাত দিত। কারণ, বিভিন্ন অঞ্চল হতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিরাক্লেশে সেই স্থানে আনা হত। তারপর জল নেমে গেলে শ্রমিকগণ ইমারতের কাজ স্থগিত রেখে কৃষিকর্মের জন্যে গ্রামে ফিরত। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুলতান খুকু মোটেই অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি আরও বলেছেন যে, গিজা পিরামিডটি নির্মাণকার্যে সে অঞ্চলের সকলেরই পূর্ণ সহযোগিতার একটি কারণ এই যে ইজিপ্টের রাজবংশে সুলতান হোসেন সত্যাশ্রয়ী ধার্মিক ও ঈশ্বরের প্রতীকরূপে জনসাধারণের কাছে পূজিত হতেন এবং তাঁর পিরামিড তাঁরই স্মরণার্থে নির্মিত। সুতরাং উক্ত ধর্মকাজে যোগ দিলে কালের গতি রুদ্ধ ভেবে সকলেই পিরামিড নির্মাণকার্যে যোগ দিয়েছিল। পিরামিড নির্মাণকল্পে দেশের সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ও উদ্দীপনা ভবিষ্যতে আর্থিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা ঘটায়। দেশের সাধারণ কাজকর্ম ব্যাহত হয়। কিন্তু তথাপি সুলতান চিয়াপসের দক্ষতায় তা ঘটে নি। তা' ছাড়া হেরোডোটাস ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন তা' সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, সুলতান চিয়াপস শ্রমিকদের আহার, পরিধেয় ও আশ্রয় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একাধিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং গিজা পিরামিড সুলতান খুকুর রাজত্বকালের সমৃদ্ধি ও সুলতানেরই প্রতীক।

এই পিরামিডের প্রাচীন নাম 'আখইট খুকু' বা খুকুর দিগন্ত। অধ্যাপক সেলিম হাসানের এই অনুসন্ধান মিশরের ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায়ের অবসান ঘটাবে। তাঁর বর্তমান গবেষণা মিশরের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করল।

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭০ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '৬৩)

অন্তর্দেশীয়—

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): ভারতের আকাশে অনুপ্রবেশকারী বিমানকে গুলী করিয়া নামাইবার স্থায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে' —রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের ঘোষণা।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): শ্রীগোপালন কর্তৃক কম্যুনিষ্ট পার্টির 'মহা আবেদনপত্র' লোকসভা স্পীকারের নিকট পেশ—পূর্বাহ্ণে পার্টি কর্তৃক রাজধানীতে (দিল্লী) বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের অনুষ্ঠান।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): গভীর রাত্রে প্রবল বর্ষণের ফলে দক্ষিণ কলিকাতায় দ্বিতলবাড়ি বিধ্বস্ত ছয়জন নিহত ও দশজন আহত।

২৯শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): দুর্নীতি দমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনে বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি দমন কমিটী গঠনের জন্য কংগ্রেস সাংগঠনিক কমিটির প্রস্তাব।

৩০শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আরও দুইজন মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী (সেচ) ও শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জীর (অর্থ) বিদায়।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): পাবলিক একাউন্ট কমিটীর রিপোর্ট লোকসভায় পেশ—রিপোর্টে বহু গলদের উল্লেখ।

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর): কাছাড় সীমান্তের ডুমাবাড়ী লাটিটিলা এলাকায় বিপুল পাক ফৌজ সমাবেশের সংবাদ।

২রা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর): লোকসভায় নেফা বিপর্যয় সম্পর্কে বিতর্ক—বিতর্ককালে প্রাক্তন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীমেনন ও অবসর গ্রহণে বাধ্য জেঃ কাউলের তীব্র নিন্দা।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর): নেফা বিপর্যয় রিপোর্টের উপর বিতর্কের উত্তরদান কালে রাজ্যসভায় শ্রীচ্যবনের উক্তি: প্রতিরক্ষা অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে নূতন ধরণের নেতৃত্ব গড়িয়া তোলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪ঠা আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর): অবশ্য-সঞ্চয় প্রকল্প ও স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ বিধির সংশোধন সম্পর্কে লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ঘোষণা—নূতন ব্যবস্থায় আয়করদাতা ভিন্ন সকলকেই অবশ্য-সঞ্চয় হইতে রেহাই এবং পুরানো গহনা ভাঙ্গিয়া গিনি বা পাকা সোনার নূতন গহনা বানানোর অধিকার দান।

৫ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর): ভারতের পল্লী এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য অন্তত তিনশত কোটি টাকা প্রয়োজন —বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিকট কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর): উড়িষ্যার উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র রাজ্যের কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নূতন নেতা (মুখ্যমন্ত্রী) নির্বাচিত।

৭ই আশ্বিন (২৪শে সেপ্টেম্বর): দ্রব্যমূল্য ও করবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতা ও শহরতলীতে সর্বাত্মক হরতাল পালন।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার দপ্তর পুনর্বণ্টন।

৯ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর): কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর): 'আয়করদাতাদের অবশ্য-সঞ্চয়ের অর্থ বর্তমান আর্থিক বৎসর (১৯৬৩-৬৪) মধ্যে জমা দিলেই চলিবে'—কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা।

১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর): এলাহাবাদে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার।

১২ই আশ্বিন (২৯শে সেপ্টেম্বর): শিয়ালদহ-ডানকুনি লাইনে অতর্কিতে ধস নামার (বরানগর রোড ষ্টেশনের নিকট) ফলে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত।

১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গের চাউল সঙ্কট তীব্রতর—মন্ত্রিসভা বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা।

১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর): তৃতীয় পরিকল্পনা কালে 'প্রকৃত বাসিক ব্যয়' ভিত্তিতে অর্থ দানের নূতন প্রস্তাব—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট কেন্দ্রের লিপি।

১৫ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) দেশের সর্বত্র মহাত্মা গান্ধীর (জাতির জনক) জন্মজয়ন্তী পালন।

১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত—ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে নিয়মিত চাউল সরবরাহে সরকারী অক্ষমতা।

১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর): মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উদ্বেগপূর্ণ বিবৃতি: কেন্দ্রের নিকট হইতে অবিলম্বে চাউল না পাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

১৮ই আশ্বিন (৫ই অক্টোবর): 'স্বাধীনতার পর ভারতের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। উপরন্তু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে ধন-সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—মহলানবীশ কমিটীর রিপোর্টে মন্তব্য।

১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর): 'কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত নয়—'কামরাজ পরিকল্পনা' অনুযায়ী পদত্যাগী মন্ত্রীদের একজনেরই কংগ্রেস সভাপতি হওয়া উচিত'—বোম্বাই-এ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের বক্তৃতা।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর): চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য-বৃদ্ধি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিশেহারা অবস্থা।

মন্ত্রিসভা গঠনে উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর সঙ্কট।

২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর): অক্টোবর-নভেম্বরের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত ৩০ হাজার টন চাউলের দাবী—কেন্দ্র কর্তৃক সহানুভূতির সহিত বিবেচনার কথা।

২২শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর): দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি হিসাবে শ্রীকামরাজ নাদারের (মাদ্রাজ) নাম সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত।

২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর): কলিকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র চাউল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য—সাধারণ মানুষের মধ্যে হাহাকার—চাউলের দাম মণপ্রতি ৪৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা।

২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): উত্তর প্রদেশের মন্ত্রিত্ব সঙ্কটের অবসান—দিল্লীর উর্ধ্বতন পর্যায়ের বৈঠক ২১জন সদস্য (বিরোধী ত্রিপাঠীর গোষ্ঠির সাতজন সহ) লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন স্থিরীকৃত।

২৫শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর): খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় এলাকায় পাক রাইফেল বাহিনীর হানা ও ভারতীয় সৈন্যদের মারপিট।

২৬শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর): সিকিম সংলগ্ন চুম্বি উপত্যকায় চীনের পুনরায় সমরসজ্জার সংবাদ।

বর্ধমানে জেলা ডাককর্মচারী সমবায় সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন কর্তৃক সমবায় সমিতিকে শক্তিশালী করার আহ্বান—সমবায়ের মাধ্যমে সমষ্টিগত কল্যাণের বিশেষ গুরুত্বের উল্লেখ।

২৭শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর): অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শেষ-পর্যন্ত পুলিশের অভিযান—স্থানে স্থানে জনতার দাবীতে দোকানদারগণ কর্তৃক ন্যায্যমূল্যে চাউল বণ্টন

২৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গে চাউল সঙ্কট অব্যাহত—খাদ্যে মুনাফা শিকারের বিরুদ্ধে যুবশক্তির দুর্বার অভিযান।

২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): প্রবল জনমতের চাপে ন্যায্যমূল্যে চাউল বিক্রয়ে ব্যবসায়ীদের সম্মতি—কেন্দ্রের পক্ষ হইতেও রাজ্য সরকারকে চাহিদা অনুযায়ী চাউল সরবরাহের আশ্বাসদান।

'নিঃসর্তে কলম্বো প্রস্তাব মানিলে আলোচনায় প্রস্তুত'—চীন সরকারের প্রস্তাবের জবাবে ভারত।

৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর): চাউল চুক্তির প্রতিক্রিয়া: ব্যবসায়ী মহলে সাড়ার অভাব—বাজার হইতে চাউল উধাও—জনতার চাপে কতক দোকান হইতে চাউল বিক্রয়।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): 'চাউল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে'—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের বিবৃতি।

বহির্দেশীয়—

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): 'ভারতীয় আকাশে পাক বিমান উড়িতে না দিলে পাকিস্তান চীনের সহিত বিমান চলাচল আরম্ভ করিবে'—পাক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর হুমকী।

২৯শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): মধ্যরাত্রিতে (১৪ই-১৫ই সেপ্টেম্বর) মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক ও সাবাকে লইয়া 'মালয়েশিয়া ফেডারেশন' নামে নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব—ইন্দোনেশিয় ও ফিলিপাইনের বিরোধিতা।

৩০শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): করাচী ও পিকিং-এর মধ্যে সরাসরি রেডিও সার্ভিস প্রবর্তন।

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর): জাকার্তায় 'মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ—বিক্ষোভকারী দল কর্তৃক বৃটিশ দূতাবাস লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর): রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে (অষ্টাদশ অধিবেশন) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাষণ—আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন বলিয়া দাবী।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর): মালয়েশিয়ার দেশগুলির সহিত ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর): প্রফুমো-কীলার কেলেঙ্কারী প্রসঙ্গ লর্ড ডেনিং-এর রিপোর্ট প্রকাশ—প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান (বৃটিশ) ও তাঁহার সরকারকে দোষারোপ হইতে অব্যাহতি দান।

১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর): 'মানব-আরোহী সহ মহাকাশযান ১৯৬৮-৭০ সালের মধ্যে চন্দ্র বিষুবরেখার নিকটবর্তী 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' এলাকায় অবতরণ করিবে—মার্কিন মহাকাশ পরিকল্পনায় দাবী।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর): করাচীতে পাক-সোভিয়েট অসামরিক বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষর।

২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর): প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে হাইতি দ্বীপের প্রায় চার হাজার নর-নারীর প্রাণহানির সংবাদ।

২৬শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর): ভারত-চীন বিরোধ-প্রসঙ্গে কায়রো-এ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের (সফরকারী) জরুরী বৈঠক।

চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এর ঘোষণা—দিল্লীতে আসিয়াও বৈঠক করিতে প্রস্তুত।

২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): রাষ্ট্রসঙ্ঘে রুশ মহাকাশচারী গাগারিণ ও তেরেস্কোভার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): মিঃ ম্যাকমিলানের স্থলে লর্ড হোম (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—পুলক বিশ্বাস

চাল মারিও না

আবার একটা বিরাট চাল মারিয়া বাজী মাৎ করিতে উদ্যোগী হইয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন আমাদের 'সর্বনেশে' পশ্চিমবঙ্গ সরকার। লোকে বলাবলি করিতেছে যে, রাঘব বোয়ালদের প্রসন্ন রাখিতে এবার লালদীঘির বাবুদের হাতে লালবাজারের হুকুমের নোকর পর্যন্ত হাত ভিড়াইয়াছিল। শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনে যে নগরপাল তৎপরতা দেখাইবে, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কারণ থাকিতে পারে না। ফ্যাসাদ হইয়াছে 'ইস্যু' লইয়া। সরকার হয় তো ভাবিয়াছিলেন, মানুষের উদরে আঘাত বা পেটে হাত পড়িলেও দেশের জনসাধারণ নির্বিকারে সহ্য করিবে। সরকারের উদ্দেশ্য সফল হইবে। দেশবাসীর পকেটের পয়সা উদরসাৎ করিবে চালের আড়তদার। অতঃপর অতিলাভের একটা মোটা অঙ্ক কে বা কাহারা যে পাইবে তাহা গণতন্ত্রের একমাত্র ধ্বজাধারী লালদীঘির বাবুরাই বাতলাইতে পারেন। কেন না বাবুরা একাধারে যেমন বিচক্ষণ ও পারদর্শী পরিচালক তেমনই আবার পরিসংখ্যার গুরুমশাই। অঙ্ক না কষিয়া কথ বলিতেই পারেন না পরিণামদর্শী বাবুমশাইয়ের দল। দৃষ্টিশক্তি এমনই প্রখর যে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাঁহাদের চোখে ধরা পড়ে। আমাদের খাদ্য পরিস্থিতি কবে এবং কখন যে মারাত্মক আকার ধারণ করিবে, বাবুরা তাহা একনজরে বলিয়া দিতে পারেন। সরকারী কর্তাদের এককটি ফতোয়া দেখিলেই ইহা সপ্রমাণ হইবে।

পূজার অব্যবহিত পূর্বে বাঙলা দেশের অধিবাসীদের কিছু কিছু বাড়তি রোজগারের টাকা হাতে আসিয়া যায়। বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠতম উৎসবে বাঙালী কয়েকটা দিন অভাব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া নব-অন্ন ভোজন ও নব-বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মুখে পূজায় হাসি ফুটাইয়া তুলিতে দরিদ্র বাঙালীর চেষ্টার অন্ত থাকে না। উপরি উপার্জন তাই বিশেষ উপকারে লাগে। এ হেন সময়ে চাউলের নকল-অভাব সৃষ্টি করিতে উদ্দেশ্যমূলক সরকারী ফতোয়া জনসাধারণ হজম করিতে পারিল না, বড়ই পরিতাপের বিষয়।

পঞ্চাশ টাকা দিয়া চাউল কিনিবার পূর্বে এবার দেশের মানুষ প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। শাসকদল ও পুলিশ বিভাগ যাহা পারে না, ইচ্ছা করিলে দেশবাসী স্বহস্তে তাহা সম্পাদন করিতে পারে, ইহার প্রমাণ দেশের যুব-সম্প্রদায় দিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে এই অসৎ উদ্দেশ্য ধরিয়া ফেলিয়াছে। মুনাফা লাভ করিবার পথ তাই আজ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। পুঁজিবাদীর দল চাউল পাচার করিতে সক্ষম হইতেছে না। সরকারের মুখে চুণ-কালি পড়িতেছে। আমাদের মনে পড়ে, ঐতিহাসিক সিপাই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল কলিকাতা সংলগ্ন দমদম অঞ্চলে। সেই দাবানল তখন দমদম হইতে সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

চাউলের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে দমদম যে উদাহরণ স্থাপন করিয়াছে, সমগ্র কলকাতা তথা বাঙলা দেশে সেই পথ অনুসৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাবু-মার্কা সরকারের টনক নড়িয়া সরকার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একটা মন-ভুলানো 'ভদ্রলোকের চুক্তি' করিবার জন্য এখন উন্মুখ। যদিও আমাদের প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, এই ভদ্দরলোকটা কেডা? সরকার, আড়তদার না পুলিশ?

দর্জি কখনও ভদ্রলোক সৃষ্টি করিতে পারে না। অঙ্গে খদ্দর উঠিলে বা মাথায় গান্ধীটুপি পরিলেই যে ভদ্র হওয়া যায় না, তাহা এখন দেশের লোক অনুধাবন করিতে শিখিয়াছে। ময়ূরপুচ্ছধারী কাক বা ব্যাঘ্রচর্মধারী গর্দভ আত্মগোপনে অসমর্থ হয়,—পশুসমাজ ধরিয়া ফেলিয়াছিল। দেশবাসীকে সরকার যদি পশু ঠাওর করিয়া থাকেন, নেহাতই ভুল হইবে। স্মরণে থাকা প্রয়োজন, পশুর দল উন্মত্ত হইলে ভদ্র এবং ইতরের বাছবিচার করে না। একদা র‍্যাঙ্কেন এবং হোয়াইটওয়ে ভদ্রলোক তৈয়ারী করিতে না পারিয়া পাততাড়ি গুটাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। পরিসংখ্যাবিদ ভবিষ্যদ্রষ্টা খাদ্যের কারবারীদের তাই আমরা সাবধান করিতেছি। লোভ ভাল, কিন্তু অতিলোভ ভাল নয়। তাঁতি নষ্ট হইয়া যায়।

বর্তমান চীনের স্বরূপ

ভণ্ডামি, প্রতারণা, ছলনা, চাতুরি, কপটতা প্রমুখ সদাপরিহার্য প্রবৃত্তিগুলির পৃথিবীর সকল দেশে একটা নির্দিষ্ট সীমা বা গণ্ডী থাকিলেও যে দেশটিতে তাহাদের পূর্ণতম প্রকাশ তাহার নাম চীন। চীনের আকাশে, বাতাসে, রাষ্ট্রনীতিতে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে, বচনে, সংলাপে আজ সর্বত্রই এই সকল প্রবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ পরিদৃশ্যমান। হিংস্র, জঘন্য, মনোভাব তাহার সমগ্র সত্তা আজ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। যে দেশের আকাশ-বাতাস ভরপুর থাকিত একদা অহিফেনের ধূম্রজালে সেস্থলে কুৎসিত প্রবৃত্তি-সমূহ আজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শান্তির মুখোস পরিয়া, বিশ্বমৈত্রীর ভেক ধরিয়া পারস্পরিক প্রীতি-সৌহার্দ্য বিনিময়ের অভিনয় করিয়া নির্লজ্জভাবে এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ভারত আক্রমণ করিয়া চীন যে প্রীতিসৌহার্দ্যের পরিচয় দিল তাহার যথাযথ সংজ্ঞা নির্ণয় করা দুষ্কর।

ভারতবর্ষ শুধু আজ নয়, সুদূর অতীতেও বিশ্বের ঘরে ঘরে তাহার সন্তানদের দ্বারা পাঠাইয়াছে মৈত্রীর বাণী, অপরিচয়ের রুদ্ধ অর্গলগুলি এক এক করিয়া উন্মুক্ত হইয়া নিঃসীম অন্ধকারকে অপসৃত করিয়া এক রাশ আলো আনিয়া দিয়াছে ভারতীয় জীবনযাত্রায়, ভারতের সন্তানরা স্মরণাতীত যুগ হইতে প্রেমের হস্ত প্রসারিত

করিয়া দিয়াছেন বিশ্ববাসীর উদ্দেশে। বিশ্বমানসে ভারতের এক বিশাল প্রভাব তাঁহারা সগৌরবে বিস্তার করিতে সফলকাম হইয়াছেন, এই ধারা আজও অক্ষুণ্ণ, ইহাতে আজও ঘতিপাত ঘটে নাই, শত সহস্র বিপর্যয়ের বন্যা এই দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক কত পতন উত্থান, কত বিপ্লব সংঘটিত হইয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ওলোট-পালোট করিয়া দিয়াছে, বিভিন্ন যুগের অগণিত সমস্যা দৃষ্টি বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে তথাপি এই পুণ্যব্রত হইতে আমরা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হই নাই।

চীন তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ লইল। আমাদের মহত্ত্বের, আমাদের উদারতার, আমাদের মহানুভবতার প্রত্যুত্তরে আমাদের নির্মম আঘাত করিয়া স্বীয় স্বার্থসাধনে তাহার বিবেকে বাধিল না (ভুল বলিলাম, ঐ বস্তুটি চীনে অনুপস্থিত)। পররাজ্যলিপ্সার ভয়াবহ ব্যাধির প্রবল আক্রমণে আজ সে জর্জরিত।

বর্তমান আলোচনার পটভূমি চীন হইলেও একটি বিশেষ প্রসঙ্গই আজ আমাদের আলোচ্য। এক্ষণে সারা বিশ্ববাসীকে জানানো হইতেছে যে চীন নাকি আমাদের আক্রমণ কখনোই করে নাই, সে অতি ছাপোষা ভালমানুষ ভজিত মৎস্য উল্টাইয়া খাওয়ার কৌশলও তাহার জ্ঞানের বাইরে, ভারতই অতি দুর্বৃত্ত সে অতর্কিত আক্রমণ করিয়া সমগ্র চীনের শান্তি বিঘ্নিত করিয়াছে এবং সুন্দর চীনকে শ্মশানে পরিণত করিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা অবলম্বন করিতেছে।

এই উদ্ভট উক্তিতে অতি বড় দুঃখের দিনেও একদিকে যেমনই হাস্য সম্বরণ করা যায় না অন্যদিকে তেমনই ক্রোধে সমগ্র মন ভরিয়া ওঠে। কতদূর মনুষ্যত্বহীন হইলে এই জাতীয় উক্তি সম্ভব তাহা আমাদেরও জানার বাইরে, তবে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি বলে, যে লেশমাত্র বিবেক বা মনুষ্যত্ববোধ অবশিষ্ট থাকিলেও এইপ্রকার কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্লজ্জ উক্তি কোনক্রমেই করা যায় না।

যে ভারতবর্ষ আজ নিপীড়িত, আক্রান্ত, সহস্র সমস্যায় জর্জরিত, শীতে হিমে, দুর্গম তুষারে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া দেশের নিরাপত্তার জন্য সহস্র জোয়ানকে যে অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে কত জায়ার মধুর রজনীর ঘন নিবিড় আলিঙ্গনকে উপেক্ষা করিয়া জীবনপণ করিয়া অনিশ্চিতের উদ্দেশে পদক্ষেপ করিতে কত সোনার ছেলে বাধ্য হইয়াছে—এই সকল অবস্থার জন্য যে দায়ী সে যে কি করিয়া নিজের দোষগুলি অম্লানবদনে ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সাফাই গাহিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

দুর্বৃত্তের ছল গণনাতীত কিন্তু সেই অনুপাতে তাহার যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণও সাধারণবুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত যে এই সকল উক্তির ফলে সারা জগতে সে কতখানি নিন্দিত এবং বিকৃত হইতেছে। সমগ্র জগতের সহানুভূতি হইতে নিজেকে সে কতদূরে সরাইয়া লইয়াছে। কারণ আজিকার পৃথিবী প্রতারিত হইবার নহে সমগ্র জগত তাহার বিশ্লেষণধর্মী মনোভাব এবং বিচারধর্মী মন লইয়া সমস্ত কার্যাবলীর ধারা অনুসরণ করিলেই উভয় দেশের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবে। (কার্যত ঘটিতেছেও তাহাই) চীনের সমর্থনে কেহই বাহু প্রসারিত করিয়া দিবে না। পাকিস্তানকে দোসর পাইয়া চীন যদি মনে করে জগৎ হাতে পাইলাম তাহা হইলে তদপেক্ষা বাতুলতা আর কিছুই হইতে পারে না। পাকিস্তানের স্বরূপও জগতের নিকট আজ অনুদ্‌ঘাটিত নয় তাই তাহার মতবাদ এবং মন্তব্য যে কতখানি মূল্য বহন করিতে পারে সে সম্বন্ধেও সহজেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

জগৎ মিথ্যাকে পটভূমি করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই, সত্যকে ইমারত করিয়া জগতকে অগ্রসর হইতে হইতেছে, সেখানে, সেই বিরাট মিছিলে মিথ্যার স্থান নাই, প্রতারণার দ্বারা জগতকে আজ টলানো যাইবে না, কপটতার বিষবাষ্প আজ আর জগতের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। যেখানে বিশ্ববাসীর দরবারে ন্যায়-নীতির সমারোহ, সেখানে একটি পাকিস্তান, একটি চীন জগতের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করিবার শক্তি যে ধারণ করে না সে কথা বলাই বাহুল্যমাত্র।

পরিবহন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সহজ সরল করিতে এবং তাহার স্বাভাবিকতা বজায় রাখিতে যাহাদের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক এবং গুরুত্ব অপরিসীম, পরিবহন তাহাদের অন্যতম। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইহার প্রভাব অনতিক্রম্য বলিলেও অত্যুক্তির দোষে দুষ্ট হইতে হয় না। পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি বহলাংশে নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ নানাদিক দিয়া নিজের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে আজ তৎপর। বলা বাহুল্য এই উন্নয়নের সফলতা জনজীবনে প্রভূত কল্যাণের রূপ লইয়া দেখা দিবে। বহু অর্থব্যয়ে, শ্রমব্যয়ে, বুদ্ধিব্যয়ে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ভারত সরকার বহুল উন্নতির দিকে আগাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই অগ্রগতি পরিবহন ব্যবস্থায় সুচারু বন্দোবস্তের প্রতি নির্ভর করিতেছে। পরিবহন ব্যবস্থার শৈথিল্য ঘটিলে শিল্প-বাণিজ্যের সহস্রগুণ উন্নয়নও জনগণের নিকট ফলপ্রসূ হইবে না। যানবাহনের প্রধান উপযোগিতা যোগাযোগে; এক প্রান্তের বাণী অপর প্রান্তে বহন করিয়া লইয়া যায় যানবাহন, যানবাহনের মাধ্যমে এক কোণের সংবাদ অন্য কোণে পৌঁছাইয়া যায়। দিকের বারতা যানবাহনের কল্যাণে দিগন্তরে উপনীত হইতে সক্ষম হয়। সে ক্ষেত্রে যানবাহনের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। শিল্প-বাণিজ্যের উল্লেখও এই প্রসঙ্গেই করণীয়। দেশের নানাপ্রকার উৎপন্নদ্রব্য স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার জন্য পরিবহনের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। দেশে নানাপ্রকার বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনের যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার জন্য বহু লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। বহু অর্থ বরাদ্দ করিতে হইতেছে—সেই দ্রব্য যদি সারা দেশে ঘরে ঘরে না পৌঁছিল; দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর নিকট তাহার অপরিচয়ই রহিয়া গেল, অধিকাংশ ঘরের অর্গল তাহার নিকট উন্মুক্ত হইল না—সে ক্ষেত্রে তাহার সৃষ্টির কোন সার্থকতাই থাকে না। অতএব, শুধু দ্রব্য উৎপন্ন করিলেই দায়িত্ব শেষ হইবে

না। দেশের ঘরে ঘরে তাহার ব্যবহার ও প্রসারও ঘটাইতে হইবে। এই কার্য পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া অসম্ভব। আমাদের দেশে পরিসংখ্যানের দ্বারা জানা যায় যে, রেলব্যবস্থা বহু উন্নতির সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু রেলকে কেবল পণ্য সরবরাহের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা অনুচিত, রেলের উপর আমাদের আরও বহু বিষয়ে নির্ভর করিতে হয় (বিশেষত জরুরী সময়গুলিতে) সেইজন্য এই সকলক্ষেত্রে শুধু রেলের উপর নির্ভর করা মোটেই সমীচীন নয় এবং তজ্জন্য অন্যান্য যানবাহনের অর্থাৎ লরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা দরকার।

এখানেও প্রশ্ন আসে ভারতসরকার এই ব্যাপারে আরও অগ্রণী হইয়া—ধরা যাক বহুসংখ্যক লরীর ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাহার পরেই তাহার চলাচলের সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নটি এক বিরাট আকার লইয়া দেখা দিবে। লরী সহজলভ্য হইলেই সমস্যা শেষ হওয়ার নহে, আমাদের পথঘাটের অবস্থাও আশানুরূপ নহে। প্রধান প্রধান নগরগুলিতেই রাস্তাঘাটের দৈন্য-দুর্দশা বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে তাহার ফলে নগরবাসীকে কম দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় না। মহানগরগুলিরই যখন এই অবস্থা তখন অন্যান্য অঞ্চলেও যে পথঘাট সর্বত্র সুবিধাজনক এমন ধারণা করা চলে না, যদিও পথঘাটের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের বহু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি এ বিষয়ে আরও অধিক মনোযোগদান আবশ্যক। লরী চলাচলের উপযোগী পথঘাট নির্মাণ এবং তাহাদের যথাযোগ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহার উপরেই দেশের শিল্প, বাণিজ্য, উৎপন্ন দ্রব্যের সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার জনকল্যাণেরই নামান্তরমাত্র। অতএব, এই গুরুতর বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিদান এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন ও সুচারুরূপে প্রয়োজনীয় কর্মগুলি সম্পাদন জনগণের হিতসাধনে সরকারের আশু এবং অন্যতম পবিত্র কর্তব্য বলিয়াই সর্বতোভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

॥ শোক-সংবাদ ॥

সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতের অন্যতম সংবিধানকার রাজ্যসভার সচিব সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২১-এ আশ্বিন ৬৫ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইনি অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং ১৯৩৪ সালে অবিভক্ত বাঙলার আইনদপ্তরে যোগ দেন। গণপরিষদে নিযুক্ত হওয়ার পর (১৯৪৭) সকল পর্যায়ে সংবিধান প্রণয়নের কার্যে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে রাজ্যসভা গঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি তার সচিবের আসনে সমাসীন ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি 'পদ্মভূষণ' সম্মানলাভ করেন।

শুভময় ঘোষ

তরুণ সাংবাদিক শুভময় ঘোষ গত ২৯-এ ভাদ্র মাত্র ৩৫ বছর বয়সে অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ও সাপ্তাহিক 'দেশ'-এর সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য অভিনয়, চিত্রকলা সমালোচনায়, আবৃত্তিতে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ভারতের বাইরে তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তি ও দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর এই অকালমৃত্যু নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে বেদনাদায়ক।

চিত্ত রায়

বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ চিত্ত রায় গত ২৭-এ ভাদ্র গতায়ু হয়েছেন। কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্বর্গত রায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা গান ও লোকসঙ্গীতের অধ্যাপক ছিলেন। সঙ্গীতবিদ হিসাবে রসিকসমাজে ইনি যথেষ্ট সুনাম ও প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পত্রিকা সমালোচনা

আমার প্রিয় পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী'কে দেবেন প্রীতি ও শুভেচ্ছা, সত্যি সম্পাদক মহাশয় ১৩৭০ সালের বসুমতী যেন আমায় ক'রেছে স্তম্ভিত ও নির্বাক। কি সুন্দর কি চির নূতন ধরণের যে আপনার সৃষ্টি সত্যি এর তুলনা মেলা কঠিন। নূতন বৎসর নূতন ধরণের বসুমতী আমাকে ক'রে তুলছে বিস্মিত এবং আমি আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে প'ড়েছি। এ নূতন ধরণের সম্পাদনাতে আমি (২১ বৎসরের পুরানো গ্রাহক) আনন্দ পেয়েছি। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র আশীর্বাদে ধন্য আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান, এর কোনও দিন অমঙ্গল হ'তে পারে না। জয়তু 'মাসিক বসুমতী'। বাংলা দেশের বাইরে যদিও থাকি তবুও এই 'মাসিক বসুমতী'র মাধ্যমেই যেন বাংলা দেশকে চোখের সামনে দেখতে পাই। আজকের এ দুর্দিনে সবকিছুই দুর্মূল্য হ'য়ে পড়েছে কিন্তু 'মাসিক বসুমতী' এতবড় বই কি ভাবে যে ১.২৫ নঃ পঃ তে সরবরাহ করেন তা ভেবে আশ্চর্য হই এবং আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পরি না। আচ্ছা সম্পাদক মহাশয় 'চারজন' বিভাগে (বসুমতীর) শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় M. A. B. T. মহাশয়ের জীবনী জানাইলে বাধিত হব। তিনি বহুদিন যাবৎ রাণাঘাট 'লালগোপাল' হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও সমাজহিতৈষী। যদি উপযুক্ত মনে করেন তাঁর জীবনী ছাপাবেন। ইতি—তুষার ব্যানার্জী Majulighaur T. E., PO. Sootea, Darrang Assam.

মাননীয়েষু, গত ভাদ্র সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'কালাটং'-এর লেখক শ্রীসুধীরচন্দ্র দে জানতে চেয়েছেন যে সিলেটের বনিয়াচং গ্রামের শ্রীবীরেন সেন মহাশয় এখন কোথায় আছেন ও কি করেন। শ্রীযুক্ত বীরেন সেন আমার আত্মীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নিরলস কর্মী তাঁর আরও অনেক সহযোগীদের মতো উচ্চপদ বা উচ্চ সম্মান কোনটারই অধিকারী হতে পারেন নি। তাই তিনি আজ বিস্মৃত। তাঁর পুত্র হাবড়াতে একটি বাড়ী করেছেন। সেই ঠিকানাতে খোঁজ করলে তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে। শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। ৭৬৩।১, অশোকনগর কলোনী, পোঃ-হাবড়া (২৪ পরগণা)। এই সংবাদ অনুগ্রহ করে বসুমতী মারফৎ বা ব্যক্তিগতভাবে শ্রীসুধীরচন্দ্র দে মহাশয়কে জানিয়ে দেবেন। নমস্কারান্তে ইতি—বিনীতা—উমা মজুমদার, C/O. B. M, Mazumdar. ধুবড়ী, আসাম।

মহাশয়, বিগত ফাল্গুন মাসের বসুমতী পত্রিকায় আমার যে পত্রখানা পত্রস্থ করেছেন, তাহাতে ছাপার ভ্রম ও বিচ্যুতি ঘটেছে। নিম্নে সেগুলি প্রদর্শিত হইল। অনুগ্রহপূর্বক পত্রস্থ করে সুখী করিবেন। (১) লোধ্রবনীকুলীনঃ স্থলে ছাপা হয়েছে লোধবনীকুলীন। (২) পাকশালার স্থলে বাকশালা; (৩) নয়পাল স্থলে নরপাল এবং (৪) অধস্তন সন্তান স্থলে অধীনস্থ। মাঘ মাসের বসুমতীর ৬৫৭ পৃষ্ঠায় 'ভগীরথের শঙ্খধ্বনি' প্রবন্ধে পুনরায় ভ্রম প্রমাদ ঘটেছে। সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য নতুবা ইতিহাসের অঙ্গহানি হইবে। আশা করি, পূর্বের ন্যায় এ পত্রখানিও পত্রস্থ করিবেন। মহারাজ বল্লালসেন দেব ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের হস্তে অর্পণ করত বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ইতিহাসের দিক থেকে ইহা একটা অবিশ্বাসযোগ্য উক্তি। মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১২০৫ খৃ পর্যন্ত ২৭ বৎসর কাল রাজকার্য পরিচালনা ক'রেছেন। উপরোক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি অযৌক্তিক মন্তব্য করিয়া মহারাজকে কাপুরুষ রূপে পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন।

'চতুর্বিংশত্তরে শাকে সহস্রৈক শতাধিকে।
বেহার পাঠনং পূর্বং তুরস্ক সমুপাগতঃ।।' (শক শুভদোয়া)

অর্থাৎ ১২২৪ শক বা ১২০২ খৃঃ।

ইক্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ খিলিজীর অতর্কিতে রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হওয়ার ফলে মহারাজ পূর্ববঙ্গে পলায়ন করত ধার্যগ্রামে রাজধানী স্থাপনপূর্বক আরো ৩ বৎসর স্বাধীন নরপতিরূপে রাজত্ব করিয়াছেন। উপরোক্ত আক্রমণের জন্য মহারাজ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ও উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশ হারাইয়া ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের অন্যতম সভাসদ শ্রীধর দাস মহাশয় কৃত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের ভূমিকায় একটি উক্তি আছে যে, মহারাজের রাজত্বের সপ্তবিংশ বর্ষে উক্ত গ্রন্থখানা রচিত হইল। ইতি—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত। কালীনগর চা বাগান, পোঃ রামকৃষ্ণনগর (কাছাড়)।

মান্যবর সম্পাদক মহাশয়, পত্রের প্রারম্ভেই আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। আশা করি কুশলেই আছেন। আমার 'মাসিক বসুমতীর' সাথে যোগ অতি নিবিড়। সামনের বৈশাখেই আমার এক বছরের গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হবে। তাই আমি আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখছি যে, বৎসর শেষ হওয়া মাত্র আবার 'বসুমতী' এক বৎসরের জন্য V. P. P. ক'রবেন। আপনাদের

'স্মরণী পত্র' দেওয়া বাহুল্য মাত্র, কারণ বসুমতীকে ছাড়া যে থাকতে পারব না তা আপনারা জানেন (পূর্বেই ত' জানিয়েছি)। 'সম্পাদকীয়' বিভাগটি যে আমার কি ভাল লেগেছে তা ভাষায় প্রকাশ ক'রবার সাধ্য আমার লেখনীর নেই। এর ভেতর দিয়ে আমাদের মনে যে সকল গূঢ় বিষয়ের চিন্তা দেখা যায়, অর্থাৎ নিজেকে প্রশ্ন ক'রে যখন মনের মত উত্তর পাই না তখন আপনার লেখনীই আমাদের সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়। আচ্ছা! সম্পাদক মশাই, একটা কথা বলি—আমার প্রিয় মাসিক বসুমতীর পাতায় নারায়ণ গাঙ্গুলীর লেখা দেখতে চাই। আপনি এর ব্যবস্থা ক'রবেন। ইতি—তুষার ব্যানার্জী। Majulighaur T. E, P. O. Sootea, Darrang, Assam.

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীনন্দলাল বসু, গ্রাম ও ডাক—সিংগাদা (বাগিপদা হয়ে), ময়ূরভঞ্জ (উড়িষ্যা) * * * শ্রী এইচ, বিশ্বাস, বান্ধব পাঠাগার, বাঙালী সঙ্ঘ, জে—৪৫।১৫ অর্ডন্যান্স এস্টেট, অম্বরনাথ, মহারাষ্ট্র * * * শ্রীতাপস রায়, কোয়ার্টার নং ৬১ টাইপ 111, সেক্টর 1, ডাক—নয়া নংগাল, জেলা—হোসিয়ারপুর (পাঞ্জাব) * * * প্রধানশিক্ষক, কণ্টাই ক্ষেত্রমোহন বিদ্যাভবন, ডাক—কণ্টাই মেদিনীপুর * * * শ্রীগৌরচাঁদ চৌধুরী, গ্রাম—ছায়াগাঁও বাজার, ডাক—ছায়াগাঁও, জেলা—কামরূপ, আসাম * * * প্রধানশিক্ষক রাতুয়া উচ্চবিদ্যালয়, ডাক—রাতুয়া, জেলা—মালদা (পশ্চিমবঙ্গ) * * * লেবার ওয়েলফেয়ার ইনস্পেক্টার, গভর্ণমেন্ট লেবার ওয়েল ফেয়ার সেণ্টার জাওয়ার মাইন্স * * * সচিব, আশাপুর বিন্দুবাসিনী পাঠাগার, ডাক—খরবা, জেলা—মালদা, পশ্চিমবঙ্গ * * * শ্রী এ, কে, বন পুরকায়স্থ, কায়া টি এস্টেট, ডাক—সোনাচেরা (কাছাড়) আসাম * * * শ্রীমতী ধৃতি দেবী, ১০৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, লালদীঘি, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ * * * সচিব, জে অ্যাণ্ড এন রিক্রিয়েশান ক্লাব, অবধায়ক : জেনসান এ্যাণ্ড নিকলসান প্রাইভেট লিমিটেড, ২ ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-১ * * * প্রধান শিক্ষক, দাসুল হাইস্কুল, ডাক—বাটুন, জেলা—পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ * * * ভি, ভি, কুমারস, গ্রন্থবিক্রেতা, ৮।৪৯-৫১ জঙ্গপুরা, নয়াদিল্লী-১৪ * * * শ্রীসন্তোষকুমার রায়, গ্রাম—মুণ্ডুনিক্যা, ডাক—অমৃতপুর, জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীরাখেশরঞ্জন মালাকার, রাঙ্গিয়া আর, এম, এস, অফিস, ডাক—রাঙ্গিয়া, জেলা—কামরূপ, আসাম * * * সচিব, ফণীভূষণ গ্রন্থাগার, গ্রাম ও ডাক—সারদা, জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীকেদারনাথ মাইতি, গ্রাম ও ডাক—মাধবপুর, জেলা—মেদিনীপুর * * * প্রধান শিক্ষিকা, শিশু বিদ্যাপীঠ, (বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়), ২০ এবং ২২ তারক দত্ত রোড, কলিকাতা-১৯ * * * শ্রীফটিকচন্দ্র বটব্যাল, পানপোষ ডোলোমাইট কোয়ারী, ডাক—রাউরকেল্লা, সুন্দরগড় * * * শ্রীমতী সুরেখা সরকার, ১, বালিগঞ্জ রোড, ইউনাইটেড মিশনারী টিচার্স ট্রেনিং স্কুল, কলিকাতা-১৯ * * * প্রধান শিক্ষক, বাহিরগাছি জুনিয়ার হাই স্কুল, ডাক—হাট বাহিরগাছি (আরাণঘাটা হয়ে) জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ * * * বিচারপতি এস, বি, সেন, মহাত্মা গান্ধী রোড, পাইলকাটি, ইন্দোর।

এক বৎসরের গ্রাহকমূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। আমাকে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বসুমতী পড়িয়া অপার আনন্দ পাই। শ্রীমতী মায়া দাসগুপ্তা—বি-এ, মঙ্গলদই, আসাম।

Sending herewith Rs. 15/—only as the annua subscription from Baisak to Chaitra. The Monthly issue may kindly be send to me regularly. Sm. Chitralekha Kar, Rangjuli, Goalpara Assam.

Kindly accept my half-yearly subscription o. Masik Basumati. Mrs. Prabhabati Mukherjee Poona.

আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করিয়া বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী সবিতা চক্রবর্তী, দেওঘর, এস পি।

I am sending Rs. 15/—towords the annua subscription of the Monthly Basumati. Pleas send the magazine rugulariy. Head Maste: Rasulpur, B. M. Higher Secondary Schoo' Rasulpur. Burdwan.

Sendir g herewith Rs. 7·50 n. p. being the half yearly subscription please send the journa regularly. Mrs. Rama Sen. C/o. Dr. S. N. Sen Aelyar, Madras.

I am remitting herewith Rs. 15/– as an annua subscription of the Monthly Basumati. Pleas send the magazine regularly. Secretary Kumargram Friends Union Library Kumargram duar, Jalpiguri.

Annual subscription of Rs. 15/—is senc herewith. Please send the magazine regularly. Head Master, Ratua High School, P. O. Ratua, Malda.

আমি আপনাদের একজন বহুদিনের গ্রাহিকা। বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী গীতা দাসগুপ্তা, অবধায়ক—ডাক্তার এম, দাসগুপ্ত, ভুনাউল, মহারাষ্ট্র।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। প্রধান শিক্ষক, নলহাটি, হরিপ্রসাদ হাই স্কুল, নলহাটি, বীরভূম।

Remitting my annual subscription of Rs. 15/– for the Monthly Basumati. Please send the magazine rugularly Hony. Secretary, South West Institute, Chakradharpur.

I am sending herewith subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the Masi Basumati regularly. Head Master, R. D. P. M. Higher Secondary School, P. O. Rajnowagarh Dist. Purulia.